প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

একবিংশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২৮ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রবাসী-কার্য্যালয়

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ছয় টাকা আট আনা



প্রবাসী, ১৩২৮

২১শ ভাগ, ২য় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

(এই খণ্ডের চৈত্রের প্রবাসীতে ৮৮৫ হইতে ৯০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বরাবর কুড়ি পৃষ্ঠা বাদ দিয়া পড়িতে হইবে অর্থাৎ ৮৬৫ হইতে আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৮০তে শেষ হইবে।)

বিষয়-সূচী

জোর গান (কবিতা)—কাজী নজরুল ইসলাম ... ১৯৭
ন্ পাখী (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ... ৬৯০
হ-আলোক (কষ্টি)—সার জগদীশচন্দ্র বসু, এফ-আর-এস ... ৯৯
ভ মাছ (সচিত্র) ... ৬৫০
কার (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ... ৭৭০
বতা না স্বাধীনতা (কষ্টি)—বিপিনচন্দ্র পাল ... ১০০
াপিক টমসনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমালোচনা) —ক খ গ ... ৩৭৬
র্ব্বাণ স্মৃতিদীপ ... ৫৩২
(কবিতা)—বনফুল ... ৭১১
দেশের ও জাতির এবং ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের উদ্দেশ্য ... ৮৭৫
মানিনী (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৮৪৯
অভিসার (কবিতা)—জীবনময় রায়, বি-এ ... ৮১৫
অমৃত পিয়াসা (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ২০১
হযোগ ও ছাত্রসংখ্যার হ্রাস ... ১৫৯
অসহযোগ নেতাদের বিচার ... ১৩৫
"অস্পৃশ্য"দের কথা ... ১৩৮
অহল্যা উৎসব (সচিত্র) ... ২০২
অহিংসার সীমা ... ৪৩৬
আইন অনুযায়ী দণ্ড ও বেআইনী অত্যাচার ... ৭১১
"আইন" ও "বিচার" ... ৪৩৪
আইনসঙ্গত ও বেআইনী নিগ্রহ ... ৪৩৩
আইনুদের গল্প (সচিত্র)—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৬৬৯
আকাশ-বাসর ... ৯২
আকের ছোবড়া ... ৫২৯
আগামী বৎসরের প্রবাসী ... ৮৫৯
আগুন-বাঁচানো জলের প (সচিত্র) ... ৫
আগ্নেয়গিরির মধ্যে গোরস্থান ... ৫৩১
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ঘরবোনা কাপড়—কুঞ্জলাল ঘোষ ও সম্পাদক ... ৪৭৫
আচার্য্য রায় ও চরখা ... ৭২৫
আচার্য্য সাহার গবেষণা সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের মত ... ২৮২
আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য (সচিত্র) ... ২৭৫
আধ-ডোবা ডুবো জাহাজ (সচিত্র) ... ৯২
আনাতোল ফ্রাঁস (সচিত্র)—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ... ৫০০
আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলন—ডাকহরকরা ... ২০২
আফশোষ (কবিতা)—বনফুল ... ৮৪
আবেস্তা সাহিত্য—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ... ৭৮৩
আবেস্তা সাহিত্যে রমণীর অধিকার—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ... ৭৭১
আব্দুল বাহা আব্বাস (সচিত্র) ... ৭২০
আভ্যুদয়িক (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ৩৫৩
আমার মালী—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, ও ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৮৪৩
আমেরিকার কাছে জগতের ঋণ ... ৪০৩
আমেরিকার চিত্র ও মূর্ত্তিশিল্পের নমুনা (সচিত্র) ... ৬৪৭
আয়ার্ল্যাণ্ড ... ৪৪০
আয়ার্ল্যাণ্ড ... ৭২৬
আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতাদের নিমন্ত্রণ ... ১৪৩
আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেনের সন্ধি ... ৫ ৪
আরবী ছন্দ—কাজী নজরুল ইসলাম ... ৮৪৬
আলঙ্কারিক পঞ্চক—প্রিয়রঞ্জন সেন, বি-এ ... ৭৭০
আলিদের জননী ... ৭২৭
আলোচনা ১৯৮, ৩৫১, ৫৫৬, ৬৭১, ৮২৪
আশুবাবুর রবীন্দ্রনাথ-গুণগ্রাহিতা—রামকিশোর রায় ৫৫৬

আশ্চর্য্য অন্ধ কালা মেয়ে (সচিত্র)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৩১৯

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্ম্মঘট ... ১৩০

আসার আশায় (গল্প)—দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮০

আহমদাবাদ (সচিত্র)—ঐতিহাসিক ... ৩৫৫

আহমদাবাদে নারীদের কন্‌ফারেন্স ... ৫৮৩

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে চর্‌কা ইত্যাদির তুলনা (কষ্টি) ৬৪৪

ইংলণ্ডে নারী দায়াদ—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩১৪

উড়ো জাহাজে জল ছিটানো (সচিত্র) ... ৪০৬

উদাসী (কবিতা)—জসীম উদ্‌দীন ... ৮২৩

উদ্ভিদের চেতনা ও "ভারত-শ্রমজীবী"—শশিভূষণ বিশ্বাস ... ১২৯

১৯২২—২৩ সালের সামরিক ব্যয় ... ৮৭০

উপনিষৎ (সমালোচনা)—বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী ৬৬৪

উপেক্ষিতা (গল্প)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৩৭

উবট সায়ণ ও গ্রিফিথাদির বেদব্যাখ্যা—উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ... ৩১৩

উবট সায়ণ ও মহীধরাদির বেদব্যাখ্যা রক্ষণ—মন্মথ ভট্টাচার্য্য ... ৬৭৫

উভচর গাড়ী (সচিত্র)—অলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৫৩৪

উভচর রেলগাড়ী (সচিত্র) ... ৮১৯

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্য—শ্যামল বর্ম্মা ... ৫০৩

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব—ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, পি এইচ-ডি ... ১৯৮

একটি উপাধির গূঢ় অর্থ ... ৫৮৩

একটি গ্রাম্য বিদ্যালয় ... ১৩৯

একটি সর্‌কারী পত্রী ... ৫৭৭

এক যাত্রায় ভিন্ন ফল ... ৮৭২

এলাহাবাদে উদারনৈতিক সভা ... ৫৮৩

এলিজাবেথ ফ্রাই (সচিত্র) ... ৩৩২

ওয়াশিংটনে রণতরী-হ্রাস সভা ... ৭২৬

ঔরাংজেবের ফর্ম্মান—অরুণ দত্ত ... ৩৫০

কড়ি ও শামুকের ঘর (সচিত্র) ... ৯২

কথা (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ৫৮৭

কবি (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৮৫৫

কমলা তাজা রাখিবার সহজ উপায়—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী ... ২১০

করাচীতে নেতাদের বিচার— ... ২৮২

করুণাময় (কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র ... ৭৪১

কলহীন এরোপ্লেন (সচিত্র) ... ৮২১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় ও কার্য্যপ্রণালী ৮৭২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি ... ৮৮০

কলিকাতার কথা (কষ্টি)—প্রমথনাথ মল্লিক ২২৪, ৫৪৯

কলিকাতার গৌরীদান ... ৭২৭

কপের মাপে চরিত্র নির্ণয় ... ২৩[illegible]

কল্পতরু হোটেল (সচিত্র) ... ৬৫[illegible]

কষ্টিপাথর... ৯৮, ২২৪, ৩৩৭, ৫৪৮, ৬৯৩, ৭৮[illegible]

কংগ্রেস ... ৫৮[illegible]

কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগের কাজ ... ৫৮[illegible]

কংগ্রেসের একটি নির্দ্ধারণ ... ৪৩[illegible]

কংগ্রেসের দাবী ... ৭১[illegible]

কাকের অহঙ্কার (কবিতা)—বেতালভট্ট ... ৭৮[illegible]

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় (সচিত্র)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ৬৮, ১৮২, ৩৭৭, ৫০৮

কামারের স্বর্গারোহণ (গল্প)—রেণুকণা দেবী ... ৮০[illegible]

কারণ কি ?—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭০[illegible]

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য (সচিত্র) ... ৪

কাঁথিতে অশান্তি ... ১২[illegible]

কাঁদনগাস (সচিত্র) ... ৪০[illegible]

কুকুরটানা গাড়ী (সচিত্র) ... [illegible]

কুয়াসা-পাখা (সচিত্র) ... ৫৩০

কৃষ্ণবট (সচিত্র)—পিয়েমডি ... ৩[illegible]

কোন্ বিশ্বেশ্বরের মন্দির—অরুণ দত্ত ... ৫৫[illegible]

কোন্ মাসে কি খেতে হবে—সত্যভূষণ দত্ত ... ৭৮

কোন্ মাসে কি খেতে হবে ?—উৎপলাক্ষী দাসী ... ৫৫৬

ক্যানাডার নারী প্রাদেশিক মন্ত্রী—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৩১৪

ক্ষণের সঙ্গী (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ৩১৮

ক্ষুধা (কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র ... ২২৩

খাদি নগর ও মোস্লেম নগর ... ৫৮০

খালেদা খানম্ (কষ্টি) ... ২২৬

খুলনা জেলায় চর্‌খা ও তাঁত ... ৫৮২

খুলনায় দুর্ভিক্ষ ... ১৩০

খেয়া ঘাটে (গল্প)—মণীন্দ্রলাল বসু ... ১৮৯

খেলা ভোলা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১২২

খোকার আধ কথা (কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র ... ৫৭৮

খোকার পোষাক—হেমেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল ... ১৮৭

খোঁপার ভাষা (সচিত্র) ... ৩৩৫

গন্ধর্ব্বকুমার (সচিত্র উপাখ্যান)—সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ৬৮০

গাছে তৈরী হাতী (সচিত্র ... ৫৩৫

গান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১১৫

গান (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২৫, ৫৫১, ৫৫৩

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ (কষ্টি)—গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ... ৭৮৮

গান্ধী ও লেনিন (কষ্টি)—ফণিভূষণ ঘোষ ... ৫৫৩

গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিবার প্রস্তাব ... ৭২৬

গোলাগুলি বর্ষণ ... ২৬

গোয়ের বিবাহ সম্বন্ধীয় বিল্ ... ৭[illegible]

গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন—শিবচন্দ্র সিংহ ... ৩৫০
ঘরের ডাক (উপন্যাস)—বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ, ৪২, ১৫৩, ৩৮৯
ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা ... ১৫৫
চন্দ্রভাগায় পদ্মাপার (কবিতা)—সুনির্ম্মল বসু ... ৮৩
চরকা-সঙ্গীত (কবিতা) (কষ্টি)—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, বি-এ ... ৩৪৬
চলন্ত অন্ধকূপ ... ৪৩৮
চলার বেগে (কবিতা)—হৃষীকেশ চৌধুরী ... ৩১২
চাউল রপ্তানী ... ৭২৫
চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত—বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল ৪৬১
চার চাকার সাইকেল (সচিত্র) ... ৯৪
চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে নারী—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫১৯
চিত্রকরের ভুল (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ৫০৭
চিত্রপরিচয় ... ১৪৪
চিত্র প্রদর্শনী (সচিত্র)—বিশ্বপতি চৌধুরী, এম-এ ... ৭৭৪
চিনি-গাছ ... ৮২২
চেরোজাতি—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ২৮৯
চোখের খুব কাছে বই পড়া—সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহা ... ৮২৭
চোখের দৃষ্টির রহস্য-শক্তি (সচিত্র)— ... ৮১৭
চোখের ধাঁধাঁ ... ৭৩
ছন্দ ও অবয়ব (কষ্টি)—চারুচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল ... ৬৪৩
ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ত্যাগ— ... ৪৩৫
ছাত্রহিতসাধক কমিটি ... ৮৮০
ছেলেদের পাততাড়ি (সচিত্র) ৬৮, ১৮২, ৩৯৭, ৫০৮, ৬৬৭, ৮০১
ছোট্ট সবুজ পাখী (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৫১৫
জনতার দ্বারা অত্যাচার ... ৭১২
জন্ ড্যানিয়েল (সচিত্র)—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৬৬৭
জলদ বৃক্ষ যজ্ঞডুমুর—রামতলাল বিদ্যানিধি ... ৪৬১
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের দুই পথ ... ৮৬৪
জাপানের আদিম নিবাসী (সচিত্র) ... ২৩৬
জিউজিৎসু (কষ্টি)—হেম সেন ... ২২৫
জীবন (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল ... ৬৭
জীবন্ত দৃশ্যপট ... ৪০৬
জুতার দোকানের সুখতলা দরজা (সচিত্র) ... ২৩৩
জোনাকির আলো কোথেকে আসে?—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ২৩৯
ঝড় (কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র ... ২৫৬
টেবিল পালঙ্ক (সচিত্র) ... ৮০৮
ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৩৩৬
ডাঙ্গায় চলা মোটর নৌকা (সচিত্র) ... ৮২০
ডুবো জাহাজ ... ৮২০
ঢাকা ও কলিকাতা—তুলনায় আলোচনা ... ৮৭১
তাড়িঙ্গো পোয়ে (সচিত্র গল্প)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৪৭৪
তাতা গবেষণা-মন্দির ... ২৮৫
তামিল সাহিত্য (কষ্টি)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ... ৫৫১
তাঁহারা বুদ্ধিমান, বিবেচক ও প্রাজ্ঞ কি না? ... ৫৭৯
তিব্বতে মৃতের সৎকার—সত্যভূষণ সেন ... ৭৪২
তিমিঙ্গিল (সচিত্র) ... ৫৩২
তুর্কী মহিলার আবেদন ... ৮৩
ত্যাগ ও গ্রহণ ... ১২৮
ত্যাগের মাপ ... ১২৭
থিয়েটারে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের অভিনয় (সচিত্র) ৮১৬
দমন-নীতির অব্যবহিত কারণ ... ৪২৬
দরদী (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ৩২
দশজন-চাপা বাইসাইকেল (সচিত্র) ... ৫৩৫
দাক্ষিণাত্যের উপদেবতা (সচিত্র)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৩৩
দাশ-পরিবার ... ৪৩১
দুটি পুস্তিকা ... ১৩৫
দুটি বর্ব্বর নৃশংস ঘটনা ... ৪৪০
দুপুরের মেঘ—"বনফুল" ... ৪৬৪
দুর্দ্দম জীবন (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ৫৫৭
দুষ্টলোকের চালাকি—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ৫১১
দু হাজার বছরের প্রণয়-লিপি—অনাদি মুখোপাধ্যায় ৯৪
দেউলিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট ... ১৩৬
দেওয়ালের মধ্য দিয়া চলা (সচিত্র) ... ৫২৯
দেবতত্ত্ব (কষ্টি)—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৩৮৫
দেশ-বিদেশের কথা ২৫৭, ৪০৮, ৫৫৮, ৬৯১, ৮২৯
দেশ-বিদেশের মেয়েদের কথা ... ৮৩
দৌড়িয়া ফিরিবার গাড়ী (সচিত্র) ... ৫৩৫
দ্রবিড় জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান (কষ্টি)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ... ৭৮৮
দ্রাবিড় জাতি—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৬১
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ... ৪৩৯
দ্বিধাতু পরিমাণ ও গ্রেস্‌হামের নিয়ম—নরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ ... ৮০৯
ধরা-পড়া (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এস্‌সী ... ৮০০
ধর্ম্মভীরু (কবিতা)—জীবনময় রায়, বি-এ, বি-টি ... ৫৩৬
ধুলার নিধি (কবিতা)—গণেশচরণ বসু ... ৭৯১
ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ... ৮১৪
নক্ষত্রতত্ত্ব (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৩৪

নতুন ইঁদুর-কল (সচিত্র) ... ৯৩
নবাব খাঞ্জা খাঁ (কবিতা)—কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি-এ ... ৪০০
নাথপন্থ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৫৮৫, ৭২৯
নানাদেশে মহিলা-কৃতিত্ব ... ৮৩
নামের খেলা (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৯৮
নায়াগ্রা-কীর্ত্তি (সচিত্র)— ... ৪০৩
নারিকেল-গাছের রক্ষাকবচ ... ২৩৩
নারী (কবিতা)—গণেশচরণ বসু ... ৩৪৯
নারীকে আঘাত ... ৭২৫
নারী জ্যোতিষী—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি এ ... ৫১৯
নারী প্রগতি—সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ৫১৬
নারী-প্রচেষ্টা ... ২১০
নারীধর্ম্ম রক্ষা ... ৭২৫
নারীর আর্থিক স্বাধীনতা (কষ্টি)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ৫৫০
নারীর কথা (কষ্টি)—মহম্মদ লুৎফর রহমান্ ... ২২৫
নারীর কার্য্য ... ১৩৭
নারীর কেশ (গল্প)—অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ ... ৮৯
নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার ... ৭২৪
নারীরা কি "ফাও"? ... ১৭৩
নারীশিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ... ৭২৭
নারী-সমস্যায় আমেরিকা ও ইউরোপ (সচিত্র)—সতীশচন্দ্র সেন, এম-এ ... ৭৯
নিগ্রহ ... ৮৭৮
নিগ্রহ-আইন জারী বন্ধ করিবার দাবী ... ৭২৫
নিগ্রহ-নীতি ও আতঙ্ক ... ১৪২
নিমন্ত্রণ (কবিতা)—নীহারিকা দেবী ... ৬৬৬
নিরস্ত্রীকরণ কন্ফারেন্স্ ... ৫৮৪
নিরুপদ্রব অবাধ্যতা ... ২৩৬
নির্জ্জন অভিসার (কবিতা)—নরেন্দ্রনাথ সেন ... ৭৪৪
নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ (কষ্টি)—যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬৪৪
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে চরিত্র-পরিচয় ... ২৩৮
নূতন বাদ্শাহী আমলের কামান (সচিত্র)—নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ ... ৩১৩
নেতাদের কারাবাস (সচিত্র) ... ৪২০
নেতাদের কারাবাসে আশঙ্কার কারণ ... ৪০৪
নেতার জন্য সাধনা ... ৪২৬
নেপালে বাঙালী অস্ত্র নির্ম্মাতা ... ২৭৯
নোটের আদর ... ৮৭৩
ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বৃক্ষাদির সজীবত্ব—হরিহর শাস্ত্রী ... ১৯৯
পকেটকাটার সর্ব্বনাশ (সচিত্র) ... ৬২০
পঞ্চশস্য (সচিত্র) ৯২, ২৩৩, ৪০২, ৫২৯, ৬৪৭, ৮১১
পথ (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ৯৫
পদব্রজে নদী পার (সচিত্র) ... ৮২০
পরমাণুর গঠন এবং আকৃতি—সত্যবান রায়, এম-এস্‌সি ... ৭০৬
পরাধীন দেশের তালিকা ... ৫৭০
পরিশ্রমের পুরস্কার (গল্প)—সুশীলকুমার রায় ... ৬৭৪
পল্লীসংস্কার সমস্যা—অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি (ইলিনয়) ... ১২৩
পাকা তলোয়ারী (সচিত্র) ... ৮২৩
পাটের চাষ—নিবারণচন্দ্র চৌধুরী ... ২৪৯
পায়ের জোর (সচিত্র) ... ৮২১
পারস্যে দুই মানুষের লাঙ্গলটানা (সচিত্র) ... ৪০৭
পারাপারের ঢেউ ৯৬, ৫০০, ৬৪৫, ৮১৪
পার্লামেন্টে চোখরাঙানি ... ৭২৩
পিঁপ্ড়ের অনুভবশক্তি—অরুণ দত্ত ... ২৩৮
পুচ্ছ (সচিত্র) ... ২৩৩
পুলিশ কন্ফারেন্স ... ৫৮৪
পুলিসের কাজে নারী—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৫১৯
পুস্তক-পরিচয়—মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি; নীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম-এ; মুদ্রারাক্ষস, গ্রন্থকীট, প্রভৃতি ১৪৪, ২২১, ৬৫৬, ৮৫৬
পূজার ছুটি ... ১৪৩
পূজারী (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায় ... ২৫
পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় ... ৭২৭
পৃথিবীর পুচ্ছ (সচিত্র) ... ৮১৮
প্রকৃতির খেয়াল ... ৯২
প্রকৃতির খেয়াল (সচিত্র)—কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, এম-এ, বার-এ্যাট-ল ... ৮২৩
প্রকৃতির পাঁজি—চণ্ডমা ৬৮, ১৮২, ৩৯৭, ৫০৮, ৬৬৭, ৮০১
প্রজাপতির চাষ—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ৫১৭
প্রতিবাদ—সতীশচন্দ্র গুহ ... ৪৪০
প্রতিভা চৌধুরী, শ্রীমতী ... ৫৭৯
প্রবাসীর মূল্য দিবার সর্ব্বাপেক্ষা ভালো উপায় ... ৭১১
প্রবাসীর ষাণ্মাসিক সূচী ... ৮৮০
প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র (কষ্টি)—বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ... ৩৩৯
প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র—রাধাহরি চট্টোপাধ্যায় ... ৭৮০
প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার (কষ্টি)—জিতেন্দ্রলাল বসু ৩৩৭
প্রাচীন ভারতে মনুষ্যগণনা—বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ৭৬৮
প্রাচীন ভারতে যন্ত্রপাতি—অরুণ দত্ত ... ৪৬৩
প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি (কষ্টি)—যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ... ৩৪১
প্রাদেশিক মন্ত্রীদের বেতন ... ৮৮০

ফাল্গুন পূর্ণিমা (গান)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৮৫৭
ফোটো-ভাস্কর্য্য (সচিত্র) ... ৮১৯
... (কষ্টি)—সত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল ... ২২৪
...কের বদনাম (কষ্টি)—সত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল ২২৫
...ঙ্গ জমীদার-সম্প্রদায়, রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব—বাঁকা ২৪১
...ঙ্গের শেষ পাঠান বীর—অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস ... ১৪৫
...ঙ্গের শেষ পাঠান-বীর (আলোচনা) ৫৫৬, ৬৭৫
বড় বোন আর ছোট বোন—কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ ... ১৮৬
বন্দুকের-গুলি-রোধকারী জামা (সচিত্র) ... ৫৩০
বর্ত্তমান ফ্রান্স (কষ্টি)—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ৩৪৪
... বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা ... ৮৭৯
বঙ্গলোৎপাদিকা কৃষি - নগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত ... ২৪৫
বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৪৫১
বাঙ্গালার ইতিহাস—বিমানচন্দ্র মজুমদার, বি-এল ... ২০১
বাকি বিনিময় (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৮৪
...তি-মাছ—অলকেন্দ্র ... ২৩৮
...র বেগ—অলকেন্দ্র ... ২৩৮
বার্লিনের পথে (সচিত্র)—বিনয়কুমার সরকার, এম-এ ৬০০
বার্ষিক ক্ষতিলাভ গণনা ... ৮৬০
বাংলা—সেবক ১১০, ২৬২, ৪০৮, ৫৬১, ৬৯১, ৮৩৫
বাংলা দেশের বজেট ... ৮৭৭
বাংলা ভাষার প্রথম নাটক—সরোজপ্রসন্ন রায় ... ৮২৭
বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র—অমূল্যরতন গুপ্ত, শ্যামল বর্ম্মা ও নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮২৬
...লার ইতিহাস—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ৩২১
...ড়ায় স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ... ৭২৬
বাঁকুড়া শিল্পপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন—সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি-এস্-সী ... ৭৬২
...শের ঘড়ী (সচিত্র) ... ৪০৬
...বিগ যান (সচিত্র) ... ৫৭১
...াপনের জুতা-আকার মোটর-সাইকেল (সচিত্র) ৪০৪
...দেশ—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ১০৪, ২৫৭, ৪১৭, ৫৫৮, ৭০০
...শীবস্ত্র দাহ ... ১৩৫
বিদেহ—বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, এফ-আর-হিষ্ট-এস ... ৪০৫
...লয়ে বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিক্ষা ... ১৩৮
বিদ্রোহী (কবিতা) (কষ্টি)—কাজী নজরুল ইস্‌লাম ... ৫৫৫
...পুলতার বিপত্তি ... ৪০৪
...বাহ-বার্ত্তা—গোলকচন্দ্র ... ৫৫০
...াহের বিজ্ঞাপন—অলকেন্দ্র ... ২৩৭
বিবিধ প্রসঙ্গ (সচিত্র) ১২৭, ২৬৭, ৪২০, ৫৬৯, ৭১১, ৮৫৮
বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা—অলকেন্দ্র ... ২৩৯
বিরাট (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ৮২৮
বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলার কৃতিত্ব ... ৮২
বিশ্বভারতী ... ২৮১
বিহারীলাল সরকার ... ৮৫৯
বুড়ি (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৪৯
বুদ্ধির মাপকাঠি—রেণুপদ কর ২৯৯, ৪৬৫, ৬২২
বৃত্তি-শিক্ষার ব্যয় ... ১৩৬
বৃষ্টিবৈদ্য (কষ্টি)—বীরেশ্বর সেন ... ৩৩৭
বৃষ্টিযন্ত্র (সচিত্র) ... ৫৩৩
"বেআইনীর" অর্থ ... ৪৩৭
বেতালের বৈঠক ৮৫, ২১৫, ৫২০, ৬৬০, ৭৯২
বেদব্যাখ্যা—বিনোদবিহারী রায়, পুরাতত্ত্ববিশারদ ৬৭৫
বেদব্যাখ্যা—উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ... ৮২৮
বেনামী (গল্প)—মণীন্দ্রলাল বসু ... ৩৫৯
বেল্‌জিয়ামে নারী-প্রগতি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ ... ৭৭১
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ডক্টর মেঘনাদ সাহার কৃতিত্ব—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ ... ২১১
বৈজ্ঞানিক মহিলা—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ ... ২০৯
বৈদিক বিষ্ণু ও কৃষ্ণ (কষ্টি)—সীতানাথ দত্ত, তত্ত্বভূষণ ৭৮৭
বৈশালী-বাসী—বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, এফ-আর-হিষ্ট-এস ... ১৭৭
বোম্বাইয়ে নেতাদের মন্ত্রণাসভা ... ৫৮২
বোল্‌শেভিক রুশিয়ায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চা ... ৯৭
ব্যথার পূজা (কবিতা)—ফণীন্দ্রনাথ রায় ... ৬২৮
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় মহিলা - সতীশচন্দ্র সেন, এম-এ ৫৩৩
ব্রহ্মার মূর্ত্তি-পরিচয় (কষ্টি)—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ৩৪৭
ভয়ঙ্কর (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ২১৪
ভাইস্-চ্যান্সেলারের মন্তব্য ... ৭৪১
ভারতবর্ষ ড: কেরকরা ও হেমন্তলাল রায় ১০৮, ২৫৯, ৪১৩, ৫৬৪, ৬৯৪, ৮২৯
ভারতবর্ষের সম্পদ - মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ... ২৫৪
ভারতীয় চিত্রকলা (কষ্টি)—অতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ ৭৮১
ভারতীয় বজেট সম্বন্ধে মন্তব্য ... ৮৭৭
ভারতীয় বজেটের সব অংশের আলোচনা ... ৭০৫
ভারতীয় রূপকথার বিদেশ ভ্রমণ ... ৯৩
ভারতের ১৯২২-২৩ সালের আয় ব্যয় ... ৮৬৯
ভারতের বার্ষিক আয় ব্যয় ... ৮৬৭
ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন ... ১৩৩
ভাষাশূন্য জাতি ... ৯৫
ভূস্বর্গ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৮৮
ভি-পি ডাকে প্রবাসীর মূল্য প্রদান ... ৮৭৭

মণিলাল, শ্রীযুক্ত (সচিত্র) ... ৪২৮
মণ্টেগু সাহেবের পদত্যাগ ... ৮৭৩
মন্ত্রীদের বেতন ... ৫৮৪
মন্ত্রীদের বেতন ... ৭২৭
মরণ হলে বাঁচি (কবিতা)—নরেন্দ্রনাথ সেন ... ৭৪৪
মর্ম্ম-অভিসার (কবিতা) - সুধীকেশ চৌধুরী ... ১২৬
মহাকবি ভূষণ (কষ্টি)—মণীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত ... ৩৮০
মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ... ৮৫৮
মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব ... ১৩৫
মহাত্মা গান্ধীর দায়িত্ব ও দেশের কর্ত্তব্য ... ৭০৩
মহারাজা পূজা—শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মা, বি-এ ... ২৯
মহিলা কবি—নগেন্দ্র ভট্টশালী ... ৭৭১
মহিলা মজলিশ (সচিত্র)
৭৯, ২০২, ৩২৯, ৫০৬, ৬৭৬, ৭৭০
মহিলা মেয়র—সোম ... ৭৭১
মহিলার গ্রেপ্তার ... ৬৩১
মহিলার প্রতি সৌজন্য ... ১৩৪
মহিলা-সম্পাদিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র—অলকেন্দ্র ... ২৩৯
মাছের চাষ ... ৮২০
মাথাধাওয়া টুপি (সচিত্র)—অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৪০২
মাদাম কুরির নূতন উপহার—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৫১৭
মানা (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৫৫৫
মানুষের কাজে প্রকৃতি ... ৮২০
মারি স্টোপস্ (সচিত্র)—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ... ৩৩৪
মালবীয়ের আহূত মন্ত্রণা সভা ... ৭২১
মালাবারে উপদ্রব ও হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ... ২৮৪
মালাবারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য ... ২৮৪
মা-হারা (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৪২
মিথ্যাবাদী ধরার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ... ৯২
মেয়েদের দেহচর্য্যা ও বেশভূষ —বঙ্গনারী ... ৬৭৬
মোপ্‌লা বিদ্রোহ ... ২৭৭
মোম-কাগজের হাতা (সচিত্র) ... ৫২৯
মৌন (কবিতা)—বনফুল ... ৬৯০
মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী ... ৮৭৮
মুক্তি (কবিতা)—হিমাংশুপ্রকাশ রায় ... ৮৪
মুক্তির বাহন—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৩৩৪
মুখুজ্যে মহাশয়ের আনন্দ ... ১৩৬
মুখের দাগ-তোলা মুখোস (সচিত্র) ... ৮২২
মুরংদের লবণ—অতীন্দ্র ... ৪৫০
মুর্গী কাওয়াজ (সচিত্র) ... ৬৫৫
মুসলমান রাজত্ব ও ভারতবর্ষের পরাধীনতা ...
মূর্খ (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...
যাত্রার আয়োজন (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...
যাত্রী (গল্প)—নীহারবালা দেবী ...
যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র)—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...
যুদ্ধসজ্জা সীমাবদ্ধ করিবার কন্‌ফারেন্স ...
যুবরাজ ...
যুবরাজের ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য ...
রঘুনাথ শিরোমণি—রামদয়াল চক্রবর্ত্তী ...
রজনীগন্ধা (উপন্যাস)—সীতা দেবী, বি-এ
১৩, ১৬৭, ৩১৯, ৪৪২, ৬০৩,
রবারের কাগজ ...
রবিবার (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...
রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও খুলনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য—প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ...
রবীন্দ্র-পরিচয়—অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, এম এ (কেম্ব্রিজ) ৪৮৭, ৫৯৫, ...
রাজবন্দীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ...
রাজভাণ্ডারের সেরা মাণিক (গল্প)—কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ...
রাজিয়ার শেষ জীবন (সচিত্র)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...
রাত্রির স্মৃতি (কবিতা)—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ...
রামধনু (কবিতা) - চণ্ডীচরণ মিত্র ...
রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ—বৈকুণ্ঠ দেব ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ...
রাশিয়ার প্রধান নারী—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ...
রাশিয়ান কমিউনিজমের ভিত্তি—প্রবোধচন্দ্র বসু ...
রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমাদের অযোগ্যতা ...
রুশ সাহিত্যিক ডষ্টইভেস্কি—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ...
রেডিয়ো-ফোন ...
রোগী সেবায় অগ্রনী মহিলা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ...
লক্ষ্মীছাড়া (গল্প)—প্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত ...
লর্ড সিংহ সম্বন্ধে গুজব ...
লাহোরে লরেন্সের মূর্ত্তি ...
লিচ্ছবি-দেশ বৈশালী—বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, এম-আর-এস-এ ...
শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব ...
শরীরের উত্তাপ কোথেকে আসে ? ...
শর্টহ্যাণ্ডে সংবাদপত্র ...

শাখা-ছেদনে ফল বৃদ্ধি ... ৫৩২
শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা (সচিত্র) ... ৫৭৭
শান্তি (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৪২
শিক্ষা ও সেবা—স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি-এসসী ... ২৫১
শিক্ষায় স্মৃতি শক্তির অনুশীলন (কষ্টি)—সুশীলকুমার রায় ... ২১৪
শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক ?—অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস ... ৭৮৩
শিক্ষার বনিয়াদ—নলিনীকান্ত গুপ্ত ... ১৫৭
শিল্পে অনধিকার (কষ্টি)—ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই ... ৭৮৪
শিশু-ভোলানাথ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪৪১
শিশুর শিক্ষা ও পেষ্টালট্সি (কষ্টি)—যোগেশচন্দ্র দত্ত ... ৩৪৭
শ্বশুর স্বর্গ ... ৫৮৪
শ্রদ্ধা—বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী ... ২৯৭
…ম লক্ষ্য ও হাতের কাজ ... ২৭৩
…াধ:বাধ (কবিতায় গল্প)—নরেন্দ্র দেব ... ৭২
…-শক্তি—অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল, এম এ ... ২২৭
…মিক-বন্ধু মহিলা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৬৭৯
ষড়্ঋতু (কবিতা)—নীহারিকা দেবী ... ২৪৮
সইয়ে সইয়ে বলা ... ৪০০
…শীতকারী বৃক্ষ ও বালুকা—অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪০২
…ল অন্ধকূপে মোপ্‌লাদের মৃত্যু ... ৭২৪
সত্যবাদী (গল্প)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৭৫
সত্যের আহ্বান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১
…ন্দহান (কবিতা)—জীবনময় রায়, বি-এ ... ৩৭০
…নী (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ ... ৩৭৫
সন্ধ্যাতারা (কবিতা)—গোপেন্দ্রনাথ সরকার ... ১ ৩
সন্ধ্যায় (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ৪৬৭
সন্ধ্যাসুন্দরী (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৪০৭
সভ্যতা বনাম আত্মোৎকর্ষ—তমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৬
সময়-স্রোতে (কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র ... ৮৭
সমাজ-সংস্কার কনফারেন্স ... ৫৮২
…কারী ও বেসরকারী গুণ্ডামি ... ৫৮০
স…ক্ত ও নিরঙ্কুশ বিশ্ববিদ্যালয় ... ৫৮৩
সহজ প্রেম (কবিতা)—বেতাল ভট্ট ... ৬৫৯
…সংস্কার-আইন ও মন্ত্রীগণ ... ৪৩৮
সাঙ্কর্য্যে ফসলের উন্নতি—রামজীবন গুছাইত ... ৭২৭
সার্থকতা (কবিতা)—গণেশচরণ বসু ... ৬৩৯
সাহিত্যিকের কৃতিত্ব ও বদান্যতা ... ২৮৮
সাহিত্যে বৈচিত্র্য (কষ্টি)—এম আনসারি ... ৩৩৭
সাহিত্যে মহিলার কৃতিত্ব—নগেন্দ্র ভট্টশালী ... ৩৩১
সিন্দবাদ (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৩২৮
সিন্ধু-পাঞ্চজন্য (কবিতা) (কষ্টি)—সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ ... ৫৫৩
সুন্দরী কে ?—নগেন্দ্র ভট্টশালী ... ৩৩১
সুলতান ও সৎলোক—গুপ্ত ... ৮০২
সৃষ্টিছাড়া (গল্প)—শান্তা দেবী বি-এ ... ৪৯
সেনরাজগণের কুলপরিচয় (কষ্টি)—অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ,পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি ... ৬০৩
সোয়েডাগোঁ প্যাগোডা (সচিত্র)-সুবোধ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৭১
স্কুল কলেজের দীর্ঘ ছুটি ... ৮৭৯
স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনে মহিলা (সচিত্র)-চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ ... ৫০৬
স্বদেশী মেলা ... ৮৭৭
স্বপন (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৮১৩
স্বপ্ন-দর্শন—ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ ... ১৬৭
স্বরবিবর্দ্ধক যন্ত্র (সচিত্র) ... ৬৫৪
স্বরাজ (কষ্টি)—ইন্দুভূষণ সেন, বার-এ্যাট্-ল ১০০, ৫৩৮, ৭৮৬
স্বরাজ-সাধনায় নারী (কষ্টি)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৯
স্বরাজের প্রকৃতি ... ৫৭৫
স্বর্ণলতা দাস (বর্জ্জাইসে মুদ্রিত অংশ 'সঞ্জীবনী' হইতে গৃহীত) ... ২৭৯
স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য হইবার যোগ্য ... ২৬৭
স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক দলাদলি ... ২৭৩
স্বাধীনতা কখন পাইব ... ২৭৩
স্বাধীনতার অর্থ ... ৫৭২
স্বাধীনতার মূল্য ... ২৭২
স্বাধীনতার স্বরূপ (কষ্টি)—চিত্তরঞ্জন দাশ ... ৭৮৮
স্বাধীনতা লাভে নারীর সাহায্য (সচিত্র)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৩৭০
স্বাধীন দেশের তালিকা ... ৫৬৯
সাঁকো-খেয়া (সচিত্র) ... ৬৫৩
হাতকড়ির বদলে আঙুলকড়ি (সচিত্র) ... ৪০৬
হাঁটুওয়ালা কৃত্রিম পা (সচিত্র) ... ৮১৭
হাঁড়ি চাঁচা পাখী—রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও জগদ্বন্ধু পাল ... ৮০৩
হিন্দু রাজত্ব ও মুসলমানের "পরাধীনতা" ... ৫৭৫
হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষত্ব (কষ্টি)—অতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ ... ৬৪৪
হিসাবনিকাশ (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ৪১৯
হুলুধ্বনি (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ ... ৭০০

চিত্র-সূচী

অদ্ভুত মাছ ... ৬৫১
অহল্যা-উৎসবে অহল্যাবাইর পাল্কী বহন ... ২০৭
অহল্যাবাইয়ের অশ্বারোহী নারী-সৈন্য ... ২০৮
অহল্যাবাইয়ের নারী সৈন্য ... ২০৮
আইনু ঘোড়সওয়ার ও আইনু যোদ্ধা ... ২৩৭
আইনুদের বাড়ী ২৩৭, ২৩৮
আইনু মেয়ের অভিবাদনরীতি ... ৬৭০
আইনু সর্দ্দার ... ২৩৬
আগুন-বাঁচানো জলের পর্দ্দা ... ৫৩৪
আঙুলকড়ি ... ৪০৬
আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য ... ২৭৬
আধ-ডোবা ডুবো-জাহাজ ... ৯২
আনাতোল ফ্রাঁস্ ... ৫০০
আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-সম্মেলনে প্রাচ্য দেশীয় মহিলাগণ ... ২ ৪
আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ... ২০৫
আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-সম্মিলনের নেত্রীগণ .. ২০৩
আব্দুল বাহা আব্বাস ... ৭২১
আমেরিকার লাল লোক ... ৬৪৭
আলিভ্রাতাদ্বয়, শঙ্করাচার্য্য ও ডাক্তার কিচ্‌লু ... ৪২১
আশী বছরের বুড়ি ... ৬৮৪
আহত পাখী—সতীশচন্দ্র সিংহ ... ৭৭৬
আহমদাবাদ কংগ্রেসের ছবি ৬২৯-৬৩৯
ইরুলগ ভক্তদের দুঃখভারবাহী দেবতা ... ৪১
ইঁদুর-ধরা কল ... ৯৪
উজ্জ্বলপুচ্ছ পাখী ... ২৩৩
উপাসিকা মা পাপ—চারুচন্দ্র রায় ... ৪৮২
উভচর গাড়ী ৫৩৪, ৫৩৫
উভচর মোটর গাড়ী ... ৫৩৫
উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী ... ৬৪০
একটি মস্‌জিদের জান্‌লা—আহমদাবাদ ... ৩৫৮
এৎস্ ব্যার্গ্যার ... ৬০১
এপলো ও নয় মিউজ ... ৬৪৯
এলিজাবেথ ব্রাউ ... ৩৩২
এলিস্ পল, কুমারী ... ৮০
কন্নকী—স্বর্ণকারদের দেবতা ... ৪০
কবি দান্তে (রঙিন)—চিত্রকর গিওতো ... ৩৩৬
কাইকোর ফুলের সাজি . ৩৪
করকম মাথায় করিয়া সজ্জিত পুজারী ... ৬১
কলমপুচ্ছ ... ২৩
কলহীন এয়ারপ্লেন্ ... ৮২১
কল্পতরু হোটেল ... ৬৫০
কংগ্রেসের ছবি—আহমদাবাদ ৬২৯—৬৩৯
কাইজার হ্বিলহেল্ম্ ডেক্‌মাল ... ৬০১
কামানের গায়ে ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি ... ৩০৭
কারুপ্পন—চোর-ডাকাতের দেবতা ... ৪১
কালা অন্ধ মেয়ে ৩২৯, ৩৩০
কালী—কলেরার দেবতা .. ৫০
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গলার বাহিরে সানাই ঠেকাইয়া বাজাইতেছেন ... ৪০
কালীর কাছে গর্ভিণী ছাগের উদর বিদারণ ... ৪
কালের আক্রমণ হইতে মিনার্ভা কর্ত্তৃক স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্রকে রক্ষা ... ৬৯
কাঁদনগ্যাসের বোমা ... ৪০০
কিচ্‌লু, শঙ্করাচার্য্য ও আলিভ্রাতাদ্বয় ... ৪২
কুকুরটানা গাড়ী ... ৬৫২
কুয়াসা পাখা ... ৫৩০
কৃষ্ণবট ... ৩১০
কোন্‌টা সত্য ? (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১৮
কোলনের এক নগর দুয়ার ... ৬০৫
কোলনের ডোম ... ৬০৪
খড়্গপুচ্ছ পাখী ... ২৩০
খাবারের দোকানে মণ্ড্ ওণ্ড্ ফে ... ৪৭৬
খালের উপর রেলগাড়ী ... ৫৩১
খুলনার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ... ১৫০
খেলার সাথী (রঙিন) — অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২১
গঙ্গার শীকার ... ৭০
গতস্য শোচনা (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১৭
গানের টহল—ট্রি ওডে ... ৭৭৭
গান্ধী, মহাত্মা ... ৪২৩
গুজরাটের গোয়ালিনী—রাম রাও ... ৭৭৯
গৃহযুদ্ধের যোদ্ধা ... ৬৪৮
"গোলা-খা-ডালা" বর্ম্মা ... ৫২০
ঘড়ি সারা মিস্ত্রী—ফড়্কে .. ৭৮০
ঘোড়া-মাছ ... ৬৫২
চারচাকার সাইকেল ... ৯৮

চিত্তরঞ্জন দাশ ... ৬৪০
চিল্কা হ্রদের ঘোড়া-মাছ ... ৬৫২
চুলের গাঁটছড়া বাঁধা—চারুচন্দ্র রায় ... ৪৮৬
চোখের ধাঁধা—১ম—৫ম ছবি ৭৪—৭৫
জগতের বাজারে দৌড়ের বাজী (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১৪
জগলুল পাশা ... ৫৫৮
জন্ ড্যানিয়েল ... ৬৬৮
জন্মাষ্টমী (রঙীন)—প্রাচীন চিত্র হইতে ... ৪৮
জলছিটানো উড়ো-জাহাজ ... ৪০৬
জাপানী মহিলাদের বিচিত্র খোঁপা ... ৩৩৬
জুতার দোকানের সুখতলা দরজা ... ২৩১
জুতা-সাইকেল ... ৪০৪
জোড়া নৌকার রেলগাড়ী ... ৮১৯
জোসেফাইন্ বি বেনেট্, শ্রীমতী ... ৮০
জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৭৭৬
ঝিনুকের বাড়ীর এক অংশ ... ৯৩
ঝিনুকের বাড়ীর সিংহদ্বার ... ৯৩
ঝুলন (রঙীন)—প্রাচীন চিত্র ... ১৪৫
ঝোলা-গাড়ী ... ৫৩২
টেবিল-পালঙ্ক ... ৮১৮
ট্যাসোর মোরগ সঅনুচর ... ২৩৪
টোগন পাখী ... ২৩৫
ঠোঁটে উল্কি পরা আইনু মেয়ে ... ৬৭২
ডক্টর মারি ষ্টোপ্স্ ... ৩৪৪
ডাক্তার রসের যন্ত্রে দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা ... ৮১৭
ডাঙায় চলা মোটর নৌকা ... ৮২০
ড্রামের ভিতরকার দৃশ্য ... ৬০৫
ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত কতগুলি দেওয়ানবাগ কামান ... ৩১৫
ঢাকার কামান কালু-ঝমঝম ... ৩১৬
তবলা-বাজিয়ে ... ৪৮৪
তরুণী ও কুমার—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৬৮৩
তলোয়ারের তাক ... ৮২৩
তিন দরওয়াজা—আহমদাবাদ ... ৩৫৫
থিয়েটারে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের অভিনয় ... ৮১৬
দশজন-চাপা বাইসাইকেল ... ৫৩৬
দেওয়ানবাগ কামানের গায়ে বাংলা অক্ষরে ঈশাখাঁর উৎকীর্ণ লিপি ... ৩১৮
দেওয়ালের মধ্য দিয়া চলা ... ৫২৯
দোলনা গাড়ী ... ৫৩২
দৌড়িয়া ফিরিবার গাড়ী ... ৫৩৫
দ্রৌপদী দেবী ... ৩৩
নমাজ—যামিনীরঞ্জন রায় ... ৭৭৫
নায়াগ্রার উপর দড়ির খেলা ... ৪০৪
নিরস্ত্রীকরণ সভায় চীন (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১৩
নিরস্ত্রীকরণ সভায় চীন ও জাপান (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১২
নিরস্ত্রীকরণের ব্যঙ্গচিত্র ... ৪১১
পকেট-কাটার সর্ব্বনাশ ... ৬৫০
পায়ের জোর ... ৮০২
পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইবার যন্ত্র ... ৮২১
পারস্যে দুই মানুষের লাঙ্গল টানা ... ৪০৭
পিপায় নায়াগ্রা-বিহার ... ৪০৪
পুণ্যশ্লোকা রাণী অহল্যাবাই ... ২০৬
পূজা (রঙিন)—চারুচন্দ্র রায় ... ৬১৩
পূব আকাশে পৃথিবীর পুচ্ছদীপ্তির ছটা ... ৮১৯
পোয়ে নর্ত্তকী ... ৪৮৭
পোয়ে নাচ ... ৪৮৩
প্রসাধন (রঙিন)—প্রাচীন চিত্র হইতে ... ৫১৭
প্লেগ-আম্মা, প্লেগ রোগের দেবতা ... ৯৩
ফিলিপিনো মহিলা স্বদেশী পোষাকে ... ৩৩১
ফোটো ভাস্কর্য্য ... ৮২০
ফ্রান্সেজ্ মেরী বাস ... ৫১৬
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ... ৮২
ভারতের স্বাধীনতার বন্ধু সমিতির অধিবেশন ... ৭২৮
ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে খোদাই করা খোঁপা ... ৩৩৫
ভূত নামানো (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১১
বদ অভ্যাসের ফল (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১৬
বন-মোরগ ... ২৩৪
বাচাল মোটর ... ৬৫৪
বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়ত বাতি জ্বলবে না (রঙিন)—সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৫৮৫
বাসন্তী দেবী শ্রীমতী ... ৬৪০
বাঁশের ঘড়ি ... ৪০৫
বিজাপুরের কামান মালিক-ই-ময়দান ... ৩১৩
বিজাপুরের কামান লম্ব ছোড়ী ... ৩১৪
বিজাপুরের দুর্গপ্রাকারের উপরকার কতগুলি কামান ... ৩১৪
বিশ্ব-ভারতীর উদ্বোধন ... ৫৭৮
বীরন, শুঁড়ি ও মাতালের দেবতা ... ৪০
বীরভদ্রন্, জ্বরের দেবতা ... ৩৬
বৃষ্টিযন্ত্র ... ৫৩৩
বেঁওয়ারিশ—যামিনীরঞ্জন রায় ... ৭৭৫
মণিলাল, তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ ... ৪২২
মদ্দা-ঘোড়া মাছের নক্সা ... ৬৫০
মহাশ্বেতা (রঙীন)—বিপিনচন্দ্র দেব ... ২০২

মাথা-ধোওয়া টুপি ... ৪০৩
মা পান্ ও মঙ ওঙ্ ফে কাণ্ডজীর ধারে বাগানের মধ্যে ... ৪৮৬
মুখশ্রী বাড়াবার মুখোস ... ৮২২
মুরগী-কাওয়াজ ... ৬৫৫
মেলার পরে (রঙিন)—শ্রীমতী শান্তা দেবী ... ৮০৫
মোম-কাগজের ছাতা ... ৫০৯
মৌলানা মহম্মদ আলি ... ৪২০
মৌলানা শৌকত আলী ... ৪২০
যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৬৭
যুদ্ধাসুর (ব্যঙ্গচিত্র) .. ৪১২
যুদ্ধে কে জয়ী হইল (ব্যঙ্গচিত্র) ... ৪১৪
রবীন্দ্রনাথ ও ইউরোপ (ব্যঙ্গচিত্র) .. ৪১৩
রাঘব-দাদার বিরুদ্ধে অহল্যাবাইর নারী-সৈন্যের অভিযান-অভিনয় ... ২০৭
শঙ্করাচার্য্য, আলিভ্রাতৃদ্বয় ও ডাক্তার কিচ্‌লু ... ৪২১
শামুক-ঝিনুকের বাড়ী ... ৯৩
শান্তা—গ্রাম-রক্ষক দেবতা .. ৩৭
শান্তা বা আয়নার-মন্দিরে উৎসর্গিত মাটির হাতী ঘোড়া ... ৩৮
শান্তার মন্দিরে উৎসর্গিত মাটির ঘোড়া ... ৩৮
শাহীবাগ—আহমদাবাদ ... ৩৫৮
শিশুর স্বর্গ (রঙীন)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪৪১
শৃঙ্খলের বল তার প্রত্যেক বলয়ে ... ৪১৭
সঙ্গীত ... ৬৪৯
সম্বৎ (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ২৮৯
সাগর-ঘরে ঘোড়া-মাছ .. ৬৫০
সাপ ও বিছার আকারের ফুলকপি ... ৮২৩
সারণ-প্লাবনের ছবি ৬৪১—৬৪২
সাঁকোর খেয়া ... ৬৫৩
সিল্‌ভাঁ্যা লেভি রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা পড়িতেছেন ... ৪৯২
সিঁড়ি-গাড়ী ... ৫৩২
সুদালই মদন—চোরের দেবতা ... ৪০
সুনীতি দেবী, শ্রীমতী ... ৬৪০
সুল্‌তানা রাজিয়া ... ৩৭২
সুদান্ বি এ্যান্টনি ... ৭৯
সেকালের হাঙরের হাঁ ... ৫৩৩
সোয়ে ডাগোঁ প্যাগোডা ... ৪৭১
সোয়ে ডাগোঁ প্যাগোডার প্রধান তোরণ ... ৪৭৩
সোয়ে ডাগোঁ প্যাগোডার প্রাঙ্গণের একদিক্ ... ৪৭২
স্ফিঙ্ক্‌স্ ও কিমেরা ... ৬৪৮
স্বরবিবর্দ্ধক যন্ত্র ... ৬৫৪
স্বর্গের পাখী ... ২৩৫
হর-পার্ব্বতী (রঙীন)—বিষ্ণুচরণ রায়চৌধুরী ... ১
হাওয়া-গাড়ীর ট্রেন্ ... ৫৩২
হাওয়ায়-চলা রেলগাড়ী ... ৫৩১
হাঙর আধুনিক ... ৫৩৩
হাতীর আকারে ছাঁটা গাছ ... ৫৩৫
হাতী সিংহের মন্দির, আহমদাবাদ ... ৩৫৬
হাতী সিংহের মন্দিরের অভ্যন্তর ... ৩৫৭
হান্নোফারের টাউন-হল ... ৬১০
হাঁটু-ওয়ালা কৃত্রিম পা ... ৮১৭
হুইডা পাখী ... ২৩৫

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—
রাত্রির স্মৃতি (কবিতা) ... ৪৯৯
অনাদি মুখোপাধ্যায়—
'দুহাজার বছরের প্রণয়লিপি' ... ৯৪
অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, পি এইচ-ডি—
ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব (আলোচনা) ... ১৯৮
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—
দ্রাবিড় জাতি ... ৬১
চেরো জাতি ... ২৮৯
বাঙ্গালী ও দ্রাবিড় ... ৪৫১
নাথপন্থ ... ৫৮৫, ৭২৯
রামায়ণ-মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ (আলোচনা) ... ৮২৪
অরুণ দত্ত—
পিঁপড়ের অনুভব-শক্তি ... ২৩৮
ঔরংজেবের ফরমান ... ৩৫০
প্রাচীন ভারতের যন্ত্রপাতি ... ৪৬১
কোন্ বিশ্বেশ্বর মন্দির ? ... ৫৫৬
অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
বিবাহের বিজ্ঞাপন ... ২৩৮
বায়ুর বেগ ... ২৩৮
বাতি মাছ ... ২৩৮
বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা ... ২৩৯
মহিলা-সম্পাদিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ... ২৩৯
সঙ্গীতকামী বৃক্ষ ও বালুকা ... ৪০২
মাথা-ধোওয়া টুপি (সচিত্র) ... ৪০২
উভচর গাড়ী ... ৫৩১
উৎপলাক্ষী দাসী—
কোন্ মাসে কি খেতে হবে ? ... ৫৫৬
উপেন্দ্রনাথ বস, এম-এ—
শ্রম-শক্তি ... ২২৭
উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—
উবট্ সায়ণ ও গ্রিফিতাদির বেদব্যাখ্যা ... ৩৫৩
বেদব্যাখ্যা (আলোচনা) ... ৮২৮
কাজী নজরুল ইসলাম—
অকেজোর গান (কবিতা) ... ১৯৭
আরবী ছন্দ ... ৮৪৬
কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ—
বড় বোন আর ছোট বোন (গল্প) ... ১৮৬
নবাব খাঞ্জা খাঁ (কবিতা) ... ৪০০
রাজ-ভাণ্ডারের সেরা মাণিক (গল্প) ... ৮০৩
কুঞ্জলাল ঘোষ—
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ঘর-বোনা কাপড় ... ৬৭৫
কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ—
দরদী (কবিতা) ... ৩২
অমৃত-পিয়াসা (কবিতা) ... ২৩১
ক্ষণের সঙ্গী (কবিতা) ... ৩১৮
সন্ধানী (কবিতা) ... ৩৭৫
হিসাব-নিকাশ (কবিতা) ... ৪১৯
চিত্রকরের ভুল (কবিতা) ... ৫০৭
হুলুধ্বনি (কবিতা) ... ৭১০
গণেশচরণ বসু—
নারী (কবিতা) ... ৩৪৯
সার্থকতা (কবিতা) ... ৬১৯
দুলার নিধি (কবিতা) ... ৭৯১
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
জোনাকির আলো কোথেকে আসে ? ... ২৩৯
গোপেন্দ্রনাথ সরকার, বি-এ—
সন্ধ্যাতারা (কবিতা) ... ১৩
গোলক চন্দ্র—
বিবাহ-বার্ত্তা ... ৩৫০
চণ্ডীচরণ মিত্র—
সময়-স্রোতে (কবিতা) ... ৮৭
ক্ষুধা (কবিতা) ... ২২৩
রামধনু (কবিতা) ... ২৫৩
ঝড়ে (কবিতা) ... ২৫৬
খোকার আধ কথা (কবিতা) ... ৫২৮
করুণাময় (কবিতা) ... ৭৪১
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ডক্টর মেঘনাদ সাহার কৃতিত্ব ... ২১১
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—
দাক্ষিণাত্যের উপদেবতা (সচিত্র) ... ৩৩
রোগী-সেবায় অগ্রণী মহিলা ... ৮১
আশ্চর্য্য অন্ধ কালা মেয়ে (সচিত্র) ... ৩২৯
স্বাধীনতালাভে নারীর সাহায্য ... ৩৩০
ডাডিঙ্গো পোয়ে (সচিত্র গল্প) ... ৪৭৪
স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনে মহিলা (সচিত্র) ... ৫১৯
শ্রমিক-বন্ধু মহিলা ... ৬৭৯
বেলজিয়মে নারী-প্রগতি ... ৬৮১

জগদ্বন্ধু পাল—
হাঁড়ি-চাঁচা পাখী ... ৮০৩
জসিমুদ্দিন—
উদাসী (কবিতা) ... ৮২৩
জীবনময় রায়, বি-এ, বি-টি—
সন্দিহান (কবিতা) ... ৩৭০
ধর্ম্মভীরু (কবিতা) ... ৫৩৬
অভিসার (কবিতা) ... ৮১৫
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—
সত্যবাদী (গল্প) ... ৭৫
তমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায়—
সভ্যতা বনাম আত্মোৎকর্ষ ... ৯৬
দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—
আশার আশায় (গল্প) ... ১৮০
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ—
স্বপ্ন-দর্শন ... ১৬৩
নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্ সি (ইলিনয়)—
পল্লী-সংস্কার সমস্যা ... ১২৩
নগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত—
বহুলোৎপাদিকা কৃষি ... ২৪৫
নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী—
কমলা তাজা রাখিবার সহজ উপায় ... ২১০
সাহিত্যে মহিলার কৃতিত্ব ... ৬৩১
সুন্দরী কে ? ... ৩৩১
মহিলা কবি ... ৭৭১
নরেন্দ্র দেব—
শোধ-বোধ (কবিতায় গল্প) ... ৭২
নরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ
দ্বিধাতু-পরিমাণ ও গ্রেস্হামের নিয়ম ... ৮০৯
নরেন্দ্রনাথ সেন—
নির্জ্জন অভিসার (কবিতা) ... ৭৪৪
'মরণ হ'লে বাঁচি' (কবিতা) ... ৭৪৪
নলিনীকান্ত গুপ্ত—
শিক্ষার বনিয়াদ ... ১৫৭
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ—
নূতন বাদশাহী আমলের কামান (সচিত্র) ... ৩১৩
নিবারণচন্দ্র চৌধুরী—
পাটের চাষ ... ২৪৯
নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম-এ—
পুস্তক-পরিচয় ... ২২১
নীহারবালা দেবী—
যাত্রী (গল্প) ... ৭৩৬
নীহারিকা দেবী—
ষড়ঋতু (কবিতা) ... ২৪৮
নিমন্ত্রণ (কবিতা) ... ৬৬৬
পিয়েমডি—
কৃষ্ণ-বট (সচিত্র) ... ৩১০
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—
কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় ৬৮, ১৮২, ৩৯৭, ৫০৮
সন্ধ্যায় (কবিতা) ... ৪৬০
দুর্দ্দম জীবন (কবিতা) ... ৫৫৭
বিরাট (কবিতা) ... ৮২৮
প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত—
রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও খুলনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য ... ২০০
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি-এস সি, কে-টি—
শিক্ষা ও সেবা ... ২৫১
বাঁকুড়া শিল্পপ্রদর্শনী উদ্ঘাটন ... ৭৬৭
প্রবোধচন্দ্র বসু—
রাশিয়ান কমিউনিজমের ভিত্তি ... ৬৪৫
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল—
বৈজ্ঞানিক মহিলা ... ২০৯
বিদেশ ১০৪, ২৫৭, ৪১৭, ৫৫৮, ৭০০, ৮৩৯
মারি ষ্টোপস্ (সচিত্র) ... ৩৩৪
বাংলার ইতিহাস (আলোচনা) ... ৩৫১
আনাতোল ফ্রাঁস্ (সচিত্র) ... ৫০০
রুশ সাহিত্যিক ডষ্টইভেস্কি ... ৫০১
ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ ... ৮১৪
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, এম-এ (কেম্ব্রিজ)—
রবীন্দ্র-পরিচয় (সচিত্র) ৪৮৭, ৫৯৫, ৭৪৫
প্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত—
লক্ষ্মীছাড়া (গল্প) ... ১১৭
প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ—
অচিন্ পাখী (কবিতা) ... ৬৯০
অধিকার (কবিতা) ... ৭৭০
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
অভিমানিনী (গল্প) ... ৮৪৯
ফণীন্দ্রনাথ রায়—
ব্যথার পূজা (কবিতা) ... ৬২৮
"বনফুল"—
আফ্‌শোষ (কবিতা) ... ৮৪
দুপুরের মেঘ (কবিতা) ... ৪৬৪
মৌন (কবিতা) ... ৬৯০
অন্ধ (কবিতা) ... ৭১১
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ—
আবেস্তা সাহিত্যে রমণীর অধিকার ... ৭৭১
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল—
জীবন (কবিতা) ... ৬৭
বাঙালীর ইতিহাস (আলোচনা) ... ২০১

পুস্তক-পরিচয় ... ৬৫৬

বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী—
শূদ্র ... ২৯৭
উপনিষৎ (সমালোচনা) ... ৬৬৪

বিনয়কুমার সরকার, এম-এ—
বার্লিনের পথে (সচিত্র) ... ৬০০

বিনোদবিহারী রায়, পুরাতত্ত্ববিশারদ—
বেদব্যাখ্যা ... ৬৭৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—
উপেক্ষিতা (গল্প) ... ৫৩৭

বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়—
প্রাচীন ভারতে মনুষ্য-গণনা ... ৭৬৮

বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, এফ-আর-হিষ্ট-এস—
লিচ্ছবিদেশ বৈশালী ... ২৩
বৈশালীবাসী ... ১৭৭
বিদেহ ... ৩০৫
চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত ... ৪৬১

বিশ্বপতি চৌধুরী, এম-এ—
ঘরের ডাক (উপন্যাস) ৪১, ১৫৩, ৩৮৯,
চিত্র প্রদর্শনী (সচিত্র) ... ৭৪

বেতালভট্ট—
সহজ প্রেম (কবিতা) ... ৬৫৯
কাকের অহঙ্কার (কবিতা) ... ৭৮১

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
রাজিয়ার শেষ জীবন (সচিত্র) ... ৩৭১

ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—
আমার মালী ... ৮৪৩

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ—
ভারতবর্ষের সম্পদ ... ২৫৪

মণীন্দ্রলাল বসু—
খেয়াঘাটে (গল্প) ... ১৮৯
বেনামী (গল্প) ... ৩৫৯

মন্মথ ভট্টাচার্য্য—
উবট সায়ণ ও মহীধরাদির বেদব্যাখ্যা রক্ষণ ... ৬৭৫

মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—
পুস্তক-পরিচয় ... ৬৫৬

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ—
নারীর কেশ (গল্প) ... ৮৯

যদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস—
বঙ্গের শেষ পাঠান বীর ... ১৪৫
বঙ্গের শেষ পাঠান বীর (আলোচনা) ... ৫২৬

যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, রায় বাহাদুর—
আমার মালী ... [illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
সত্যের আহ্বান ... ১
ভুল স্বর্গ (কথিকা) ... ৮৮
গান ... ১১৫
শিশু ভোলানাথ (কবিতা) ... ৪৪১
ফাগুন পূর্ণিমা (গান) ... ৮৫৭
খেলা-ভোলা (কবিতা) ... ১২২

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
হাঁড়িচাঁচা পাখী ... ৮০৩

রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—
সিন্ধবাদ (কবিতা) ... ৩৮
ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি (কবিতা) ... ৩১৬
ছোট্ট সবুজ পাখী (কবিতা) ... ৫১৫
স্বপন (কবিতা) ... ৮১৩
কবি (কবিতা) ... ৮৪৫

রামকিশোর রায়—
আশু-বাবুর রবীন্দ্রনাথ-গুণগ্রাহিতা ... ৫৫৬

রামদয়াল চক্রবর্ত্তী—
৺রঘুনাথ শিরোমণি (আলোচনা) ... ৩৫০

রামদুলাল বিদ্যানিধি—
জলদ বৃক্ষ যজ্ঞ-ডুমুর ... ৪৬৩

রেণুকণা দেবী—
কামারের স্বর্গারোহণ (গল্প) ... ৮০৫

রেণুপদ কর—
বুদ্ধির মাপকাঠি ২৯৯, ৪৬৫, ৬৬২

শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র) ... ৭৬০

শশিভূষণ বিশ্বাস—
উদ্ভিদের চেতনা ও ভারতশ্রমজীবী ... ১৯৯

শান্তা দেবী, বি-এ—
সৃষ্টিছাড়া (গল্প) ... ৪৯

শিবচন্দ্র সিংহ—
গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন (আলোচনা) ... ৯৫০

শৈলেন্দ্রনাথ রায়—
কাঁটাফুল (কবিতা) ... ২২০

শ্যামল বর্ম্মা—
ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্য ... ৫৩
বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র (আলোচনা) ... ৮২৬

শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মা, বি-এ—
মহারাজা পূজা ... ২

সতীশচন্দ্র সেন, এম-এ—
নারী-সমস্যায় আমেরিকা ও ইউরোপ (সচিত্র) ... ৭
আমেরিকানী পরীক্ষায় মহিলা ... [illegible]

সত্যবান রায়, এম-এসসি—
পরমাণুর গঠন এবং আকৃতি ... ৭০৬
সত্যভূষণ দত্ত—
কোন্ মাসে কি খেতে হবে? ... ৭৮
সত্যভূষণ সেন—
তিব্বতে মৃতের সৎকার ... ৭৪২
সরোজপ্রসন্ন রায়—
বাংলা ভাষার প্রথম (আলোচনা) ... ৮২৭
সীতা দেবী, বি-এ—
রজনীগন্ধা (উপন্যাস) ১৩,১৬৭,৩০৯,৪৪২,৬১৩,৭৫১
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি এ—
পথ (কবিতা) ... ৯৫
ভংকর (কবিতা) ... ২১৪
আভ্যুদয়িক (কবিতা) ... ৩৩৫
কথা (কবিতা) ... ৫৪৭
গন্ধর্ব্বকুমার (সচিত্র উপাখ্যান) ... ৬৮০
সুনির্ম্মল বসু—
চন্দ্রভামার পদ্মাপার (কবিতা) ... ৮০৩
সুবোধ চট্টোপাধ্যায়—
শোয়ে ডাগো প্যাগোডা (সচিত্র) ... ৪৭১
সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহা—
চোখের খুব কাছে বই পড়া (আলোচনা) ... ৮২৭
সুরেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এসসি—
ধরা-পড়া (কবিতা) ... ৮০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—
সন্ধ্যা-সুন্দরী (কবিতা) ... ৪০৭
সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—
কারণ কি? ... ৭০৩
সুশীলকুমার রায়—
পরিশ্রমের পুরস্কার (গল্প) ... ৬৭৪
হরিহর শাস্ত্রী—
ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বৃক্ষাদির সজীবত্ব ... ১৯৯
হিমাংশুপ্রকাশ রায়—
মুক্তি (কবিতা) ... ৮৪
হৃষীকেশ চৌধুরী—
মর্ম্ম-অভিসার (কবিতা) ... ১২৬
জীবন-মরণ (কবিতা) ... ২২৩
চলার বেগে (কবিতা) ... ৩১২
হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি এ—
মুক্তির মহিমা ... ৩৩৪
ক্যানাডার নারী প্রাদেশিক মন্ত্রী ... ৩৩৪
ইংলণ্ডে নারী দায়াদ ... ৩৩৪
দুষ্ট লোকের চালাকি (গল্প) ... ৫১১
মাদাম কুরির নূতন উপহার ... ৫১৭
প্রজাপতির চাষ ... ৫১৭
রাশিয়ার প্রধান নারী ... ৫১৮
নারী জ্যোতিষী ... ৫১৯
চিকিৎসা বিদ্যালয়ে নারী ... ৫১৯
পুলিশের কাজে নারী ... ৫১৯
জন্ ড্যানিয়েল (সচিত্র) ... ৬৬৭
আইনুদের গল্প (সচিত্র) ... ৬৬৯
হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল—
খোকার পোষাক (গল্প) ... ১৮৭
হেমেন্দ্রলাল রায়—
পূজারী (গল্প) ... ২৫
ভারতবর্ষ ৪১৩, ৫৬৪, ৬৯৫, ৮২৯
মানা (কবিতা) ... ৫৫৫

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২১শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২৮

১ম সংখ্যা

সত্যের আহ্বান

পরাসক্ত কীট বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ করে' বাঁচে; খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র তাদের বিকল হয়ে যায়; এমনি করে' শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণিলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে। মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে। কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বল্‌তে কেবল যে পরের প্রতি জড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয়। চিরদিন যা চলে' আস্‌চে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়; প্রচলিতের স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত। কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর, সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুদ্যম হয়ে ওঠে এবং মানুষের পরে অসাধ্যসাধন করবার যে-ভার আছে সে সিদ্ধ হয় না।

এই হিসাবে জন্তুরা এ জগতে পরাসক্ত। তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে; তারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগোয় বা পিছোয়। এইজন্যেই তাদের অন্তঃকরণটা বাড়্‌তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' মৌমাছি যে-চাক তৈরি করে আসচে সেই-চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারচে না। এতে-করে তাদের চাক নিখুঁৎ-মত তৈরি হচ্চে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানাদিকে মেলে দিতে পারচে না। এই-সকল জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখ্‌তে পাই। সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায়, পাছে নিজে চল্‌তে গেলে বিপদ্ বাধিয়ে বসে—এই ভয়ে এদের অন্তরের চলৎশক্তিকে ছেঁটে রেখে দিয়েচে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার জীব-রচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে এই প্রাণীটিকে সর্ব্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্ব্বল করে' এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বল্লে, "আমি অসাধ্য সাধন করব।" অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আস্‌চে তাই যে চিরদিন হতে থাক্‌বে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে। সেই জন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চারদিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে' গেল তখন সে হরিণের মত পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মত লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে—চকমকি পাথর কেটে

কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে। যে-হেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান এইজন্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরেই এই নখদন্তের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অন্তঃকরণের সৃষ্টি; এইজন্যে সেই পাথরের বর্শাফলকের পরেই সে ভর করে রইল না,—তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয় মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান করচে; যা তার চারিদিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই—যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আন্‌চে। পাথর আছে তার সাম্‌নে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; লোহা আছে মাটির নীচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়; পাথরকে ঘষে' মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠ্‌ল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে' যা সবচেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সবচেয়ে অনুগত করে তুল্‌লে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্ম্মই হচ্চে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ; সে কেবলি উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্মকর্ত্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েচে। কিন্তু কোনো একদল মানুষ যদি বলে—"এই পাথরের ফলা আমাদের বাপপিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা-কিছু করতে যাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে," তা হলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে; তা হলে' যাকে তারা জাত-রক্ষা বলে তা হতে পারে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে যে বড় জাত মনুষ্য জাত সেইখানে তাদের কৌলিন্য মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয়নি, মানুষ তাদের ফেলে চলেচে—তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের জিন-লাগামের টানে, চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে; তারা অন্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্যসাধন করতে হবে; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাকবে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে;—তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন "সাধনা" কাগজে আমি লিখ্‌ছিলুম, তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বল্‌বার চেষ্টা করেচি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানতঃ অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্ত্তা; বাহিরের লাভে অন্তরে লোক্‌সান ঘটে। আমি বলেছিলেম, অধিকারবঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা মাথার উপরে "আবেদন আর নিবেদনের থালা।" তার পরে যখন আমার হাতে বঙ্গদর্শন এসেছিল তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালী সেদিন ম্যাঞ্চেষ্টরের কাপড় বর্জ্জন করে' বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যে-হেতু ইংরেজ সরকারের পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্র বর্জ্জনের মূলে, সেইজন্যে সেই দিন এই কথা বল্‌তে হয়েছিল, "এহ বাহ্য।" এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ্য, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা বলে' সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্চে চিরসত্য আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া। মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড় দেখায় যতক্ষণ রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ—তাকে চাইনে বল্‌লেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আর চাই বল্‌লে ত কথাই নেই। মায়া জিনিষটা অন্ধকারের মত, বাইরের দিক

থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেল্তে চাইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে। সত্য আলোর মত, তার শিখাটা জল্বামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেচেন, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। অর্থাৎ ভয় হচ্চে মনের নাস্তিকতা, তাকে না-এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না, উপস্থিতমত তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মত আরেকটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম্ম হচ্চে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না-কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্ত্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্ত্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্ত্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্ব্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলষ বদ্লাতে বদ্লাতে আমাদের হয়রান করে' তুল্বে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্চে সেইসব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্চে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এইজন্য যে-দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্ম্মে সৃষ্টি করে' তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি বাঙালীকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি কর, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্ম্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্চে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে' উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে' তুল্তে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে' দেখ্তে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে-দেশে জন্মেচি কি উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে' তুল্তে হবে বহুকাল পূর্ব্বে স্বদেশী-সমাজ নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেচি। সেই আলোচনাতে যে-কোন ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েচে যে, দেশকে জয় করে' নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষ্যে আমরা ইংরেজ-রাজ-সর্কারের দ্বারস্থ হয়েচি সেই উপলক্ষ্যেই আমাদের নৈষ্কর্ম্ম্যকে নিবিড়তর করে' তুলেচি মাত্র। কারণ ইংরেজ-রাজ-সর্কারের কীর্ত্তি আমাদের কীর্ত্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্ত্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই—অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেচেন, "ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।" দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা এইজন্যই দেশ আমার প্রিয়—একথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্য্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে-কথা বল্বার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর কারো মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই-সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষাব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বল্চি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ;—প্রথম—ক্রোধ দ্বিতীয়—লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্চে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাৎলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল,—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্চি, পিকেট কর্চি, যারা আমাদের পথে চল্ছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্চি এবং ভাষায় আমাদের কোন আব্রু রাখ্চিনে। এইসকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানী আমাকে একদিন বলেছিলেন,

"তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলি শক্তির বাজে খরচ করা ত উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।" তার জবাবে সেই জাপানীকে আমার বল্‌তে হয়েছিল, যে, "উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম করে' নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে থাকে, তখন শক্তিকে খরচ করে' দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না।" যাই হোক্ সে-দিন ঠিক যে-সময়ে বাঙালী কিছুকালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য্য স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বল্‌তে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিষ পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব,—হাত জোড় করে ভিক্ষে না করে, চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষে করার দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সে-দিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে Reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালীর কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোন্‌বামাত্র সে এত বেশী খুসী হয়ে ওঠে যে, মাল্‌টা যে কি, আর তার কি অবস্থা, তার খোঁজ রাখে না, আর যে-ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মার্‌তে যায়। মোট কথা সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন—আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর-এক হাত তার পায়ে। অর্থাৎ কোনো হাতই বাকি ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্ত্তী কালে এই দ্বিধা হয় ত অনেকের একেবারে ঘুচে গেচে—এক দলের দুই হাতই হয়ত উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর-এক দলের দুই হাতই হয়ত নেমেচে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তি-সাধনের পক্ষে দুইই হচ্চে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ-সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ-সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্চে; তার হাঁ-ই বল আর না-ই বল দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

সে-দিন চারিদিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেচে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মত জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে—সে ত সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্য্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে' তুল্‌তে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এত বড় একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে' উঠ্‌তে পার্‌লে না।

এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেকদিন থেকেই আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে একদিকে আছে হৃদয়াবেগ আরেক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেকদিন থেকে কোনো কাজ করে নি; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েচে। এইজন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাৎ দিতে হয় এবং নানা-রকম জাদুমন্ত্র আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অন্তঃকরণের জড়তায় যে-ক্ষতি সে-ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কোনোমতে যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুন্‌লেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ-কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মত এমন আশ্চর্য্য সুবিধার জিনিষ আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, ও জিনিষ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না এ-কথা খুব জোরের সঙ্গে সে-মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না, যার লোভ বেশী অথচ

যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদ্দিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চীৎকার করতে থাকে যেন তার সর্ব্বস্বান্ত করা হল।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আন্‌বার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক্, এই প্রলয়-হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেচেন, যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা—পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোট, কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছন যায় না, মাঝের থেকে পা-দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে-জিনিষের যা দাম তা পূরো না দিতে পারলে দাম ত যায়ই জিনিষও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্ব্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেল-যানে ফার্ষ্টক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক্, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ডক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেচেন, সমগ্র দেশ বলে' একটি জিনিষ সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্চে যোগলব্ধ ধন—অর্থাৎ যে-যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্ব্বশক্তির যোগ চাই। অন্যদেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে' দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি; মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেচে। তখন হিসাব করে' দেখিনে, এর পিছনে দেশ বলে যে-গাড়িটা আছে সেটা চল্‌বার যোগ্য গাড়ি, তার একচাকার সঙ্গে আরেক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের ভাল রকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে' তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি করাত এবং কল-কব্জা লেগেচে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ আমরা দেখেচি সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টান্‌তে থাকে, তখন তার ঝড়্‌ঝড় খড়্‌ খড়্ শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে' সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি দড়া দিয়ে তাকে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভাল হোক্ মন্দ হোক্, স্ক্রু আল্‌গা হোক্ আর চাকা বাঁকা হোক্, এগাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে-জিনিষটা ঘরে বাইরে সাত টুক্‌রো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমত ক্রোধ হোক্ বা লোভ হোক্ কোনো একটা প্রবৃত্তির বাহ্যবন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু এ'কে কি দেশ-দেবতার রথযাত্রা বলে? এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিষ? অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সবচেয়ে দরকার নয়? যমের ফাঁসিকাঠের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেচেন তাঁদের লেখা পড়ে কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাব্‌চেন। তাঁরা বল্‌চেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্বোধিত হয় না, অভিভূত হয়, একাজের পক্ষে তা অন্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে' তোল্‌বার যে-আহ্বান সে খুব একটা বড় আহ্বান। সে কোনো একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলেচি মানুষ ত মৌমাছির মত কেবল একই মাপে

মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মত নিরন্তর একই প্যাটার্ণে জাল বোনে না; তার সকলের চেয়ে বড় শক্তি হচ্চে তার অন্তঃকরণে,—সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পূরো দাবী, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে' তাকে আজ বলি তুমি চিন্তা কোরো না, কর্ম্ম কর, তাহলে যে-মোহে আমাদের দেশ মরেচে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে' আমরা অনুশাসনের কাছে প্রথার কাছে মানব-মনের সর্ব্বোচ্চ অধিকার, অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে' আছি। বলেচি, আমরা সমুদ্র-পারে যাব না, কেননা, মনুতে তার নিষেধ; মুসলমানের পাশে বসে' খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী। অর্থাৎ যে-প্রণালীতে চল্‌লে মানুষের মন বলে' জিনিষের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাস-নিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে-মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর করে' চলে তার যে-রকম পঙ্গুতা, যারা বাহ্যআচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেইরকম। কেননা পূর্ব্বেই বলেচি অন্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েচে। পরতন্ত্রতার কারখানাঘরে সে তৈরি; এইজন্যে এক-চালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আরেক চালকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনার্শিয়া বলে, যে-মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা বলে' অভিমান করে, তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন—উভয়েই তার নিজের কর্ত্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের যে-জড়ত্ব সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মত বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েচে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়, সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে' আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজী-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান্‌নি—কেননা, তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজী-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক্‌ গ্লাডষ্টোন ম্যাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্টমূর্ত্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিষ, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েচে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে' আর কে দেখেচে? আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে-মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠ্‌ল। চাতুরী দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে-নীতি বন্ধ্যা, অনেকদিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কি শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেচি; কিন্তু চাতুরী হচ্চে ভীরু ও দুর্ব্বলের সহজ ধর্ম্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞলোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়ো খেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারে না, যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েচে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়—এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া—ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্চে, হাঁ,—কোনো না-এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য্য উদ্বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌচেছিল। তখন বড় আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে-

বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি এ'কেই আমার দেশের মুক্তি বলি,—প্রকাশই হচ্চে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রী এই সত্যমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে, অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে' রাখতে পারেনি,—সমুদ্র-মরুপারেও যে-দূরদেশকে সে স্পর্শ করেচে তারই চিত্তের ঐশ্বর্য্যকে উদ্ঘাটন করেচে। আজকের দিনের কোনো বণিক কোনো সৈনিক একাজ করতে পারেনি; তারা পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেচে সেইখানেই বিরোধ, পীড়া এবং অপমান জাগিয়েচে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে' দিয়েচে। কেন? কেন না, লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চেষ্টা করে তখন সে জবরদস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে। বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ্য করেচি—সেদিন গরীবদের আমরা ত্যাগদুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেচি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানাপ্রকারে চাপ দিয়ে। তার কারণ, লোভ অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ ফল লাভের চেষ্টা করে; প্রেমের যে ফল সে-এক দিনের নয় অল্পদিনের জন্যও নয়, সে ফলের সার্থকতা আপনার মধ্যেই।

এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইচে এইটেই আমি কল্পনা করে' এসেছিলুম। এসে একটা জিনিষ দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখ্‌চি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ঙ্কর তাগিদ দিয়েচে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই বিচার করতে যাই আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখচাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে—সে লাঠি-সড়্‌কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্ত্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্ত্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে ওঠে। কোনো একটি খবরের কাগজে একদিন কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে একটুখানি আপত্তির আভাসমাত্র প্রকাশ পেয়েছিল; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুল্‌লে। যে-আগুনে কাপড় পুড়েচে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়্‌তে কতক্ষণ? দেখ্‌তে পাচ্চি একপক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আরেকপক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেচে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে' থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা? আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্ল্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সাম্‌নে জাগ্‌চে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-শক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না, তাদের পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এই-রকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এটা যে-ভারতের কথা সে-ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরো মুস্কিল এই যে, যে-লাভের দাবী করা হচ্চে তার একটা নাম দেওয়া হয়েচে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট হলে সে যেমন অতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, লোভের বিষয়টা অস্পষ্ট হলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়—কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মত

করে' গড়ে' নিতে পারে। জিজ্ঞাসা দ্বারা তাকে চেপে ধর্‌তে গেলে সে এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে একদিকে লোভের লক্ষ্যটাকে অনির্দ্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড় করে তোলা হয়েছে; অন্যদিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া হয়েচে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে' তারপরে যখন তাকে বলা হয়, তোমার বুদ্ধি বিদ্যা প্রশ্ন বিচার সমস্ত দাও ছাই করে, কেবল থাক্ তোমার বাধ্যতা, তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্ত্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে একথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনাতর্কে স্বীকার করে' নিলে এবং গদাহাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না? এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করিনে? কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তাহলেই ত বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেচেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ কর্‌লুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস্ আমরা প্রতিদিন গড়্‌তে পারি, প্রতিদিন ভাঙ্‌তে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজিভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে-সোনার কাঠিতে শতবৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে ত আমাদের পাড়ার স্যাক্‌রার দোকানে গড়াতে পারিনে। যাঁর হাতে এই দুর্ল্লভ জিনিষ দেখ্‌লুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তাহলে ফল হল কি? প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মান্‌তে হবে। কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতি কোনো রকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ-অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগ্‌ল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তখন স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস কর্‌ব না? উদ্বোধনের পালায় যাকে মান্‌লুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে বস্‌ব?

মনে কর আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজ্‌চি। পূর্ব্বে, পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে' দেখ্‌লুম কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হল না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজ্‌গার করে যথেষ্ট, কিন্তু তাদের বাহাদুরীতে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি তাঁর তারে দুটি চারটি মীড় লাগাবা মাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এতদিন যে-পাথর চাপা ছিল সেটা যেন একমুহূর্ত্তে গেল গলে'। এর কারণ কি? এই ওস্তাদের মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিষ, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতি সহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাঁকে ওস্তাদ বলে' মান্‌লুম। তারপর আমার দর্‌কার হল একটি বীণা তৈরি করানো। কিন্তু এই বীণা তৈরির বিদ্যায় যে-সত্যের দর্‌কার সে আরেক জাতের সত্য। তার মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তু-তত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া করে' হঠাৎ বলে' বসেন, "বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দর্‌কার, সে তুমি পেরে উঠ্‌বে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝঙ্কার দাও; তাহলে অমুক মাসের অমুক তারিখে এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজ্‌তে থাক্‌বে।" তবে সে কথা খাটবে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। এ কথা তাঁর বলাই চাই, "এ-সব জিনিষ সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।" তিনিই ত আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, "বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তর, এর রচনাপ্রণালী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ত্রুটি

হলে বেসুর বাজ্‌বে—অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্ব্বক সযত্নে পালন কর্‌তে হবে।” দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদজির বীণা বাজানো,—এই বিদ্যায় প্রেম যে কত বড় সত্য জিনিষ সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ করে' শিখে নিতে বসেচি, এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌। কিন্তু স্বরাজ গড়ে' তোল্‌বার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্ম্মে লাগ্‌তে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগ্‌তে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্ব্বদা নির্ম্মল ও নিরভিভূত থাকে—কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে' তোলা না হয়। এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে? সকল ডাকে ত দেশ সাড়া দেয় না, পূর্ব্বে ত বারম্বার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্য্যে আজ পর্য্যন্ত কেউ যোগযুক্ত কর্‌তে পারেন নি বলেই ত এতদিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এতকাল অপেক্ষা করে' আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত করে' দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন, যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্‌ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্ত সর্ব্বতঃ স্বাহা—জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস-সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনও বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্ম্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্ম্মশক্তিকে কেন আহ্বান কর্‌বেন না, কেন বল্‌বেন না, আয়ন্ত সর্ব্বতঃ স্বাহা—তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ,—এবং সেই সর্ব্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাক্‌বার শক্তি দিয়েছেন, কেন না তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই ত ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বল্‌লেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি “সেই আয়ন্ত সর্ব্বতঃ স্বাহা!” এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক? বিশ্ব-প্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্ম্মের সুবিধার জন্যে নিজেকে ক্লীব করে' দিলে; আপনাকে খর্ব্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এ'তে তারা মুক্তির উল্টোপথে গেল। যে-দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চর্‌কা কাটা এক দিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবী কর্‌লে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটিত কর্‌তে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করে' তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স্‌ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে' তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েচে; তার সেই জয়পতাকা আজও মানব-সভ্যতার শিখর-চূড়ায় উড়্‌চে। য়ুরোপে সৈনিকাবাসে কারখানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন কর্‌চে না কি,—লোভের বশে উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে মানুষের মনুষ্যত্বকে সঙ্কীর্ণ করে' ছেঁটে দিচ্চে না কি? আর এইজন্যেই কি য়ুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌চে না? বড় কলের দ্বারাও মানুষকে ছোট করা যায়, ছোট কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চর্‌কার দ্বারাও। চর্‌কা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—

মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চর্‌কা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চর্‌কায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিষটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

একটি কথা উঠেচে এই যে, ভারতে শতকরা আশিজন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের সুতা কাট্‌তে উৎসাহিত কর্‌বার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চর্‌কা ধরা দর্‌কার। প্রথম আবশ্যক হচ্চে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কি পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে-পরিমাণ জীবিকা অর্জ্জন করে সুতাকাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জ্জন কর্‌বে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে' আমরা সর্ব্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন কর্‌তে পার্‌ব না, আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবী করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেচেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা ত চিরদিনের জন্যে সঙ্কীর্ণ কর্‌তে চাইনে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে? যে-হেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ ত কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ ত একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর—সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা, স্বরাজ সৃষ্টি কর্‌তে থাকে। এই স্বরাজ-সৃষ্টি কোনো দেশেই ত শেষ হয় নি—সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেচে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবী করা হচ্চে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পার্‌বে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চর্‌কা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়? যুক্তির পরিবর্ত্তে উক্তি ত কোনোমতেই চল্‌বে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুন্‌তে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠ্‌বে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তাহলে আশুপ্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে—অন্য সকল-রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে যাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো-না-কোনো কর্ত্তার আসন পড়্‌বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে বসে' আছে, আগায় জল ঢেলে কোন ফল হবে না। একথা মান্‌চি, আমাদের দেশে দৈববাণী, দৈব ঔষধ, বাহ্যব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি, কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের দেশে স্বরাজের ভিৎপত্তন কর্‌তে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে' বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে' বসাতে হবে। কেন না, আমার পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলেচি, দৈব স্বয়ং আধিভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেচেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্ত্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি কর্‌তে পারে—যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত কর্‌তে চায় না। এই যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে' কাপড় পোড়ানো চল্‌চে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আস্‌চে? সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়? কাপড় ব্যবহার বা বর্জ্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—এ-সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে;—বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই কর্‌তে হবে। কেন না এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েচে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র

অতএব তাকে দগ্ধ কর। অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে' তার জায়গায় ধর্ম্মশাস্ত্রকে জোর করে' টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা,—অর্থের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জ্জন কর্‌তে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় বলেই যে তা নয়। হোক্ বা না হোক্, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভুল—এটা ধর্ম্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে-ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটেই অধর্ম্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেই দুঃখ আছে—জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিৎ বাঁকা হয়, সাঁকো নির্ম্মাণে এমন গলদ্ ঘটে যে, তার উপর রেলগাড়ি চল্‌লে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে-খাতায় জিয়োমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র বলে' সেই খাতা নষ্ট করে' এ ভুলের সংশোধন হয় না, জিয়োমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন কর্‌তে হবে। কিন্তু মাষ্টার-মশায়ের মনে এ কথা উঠ্‌তে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি, তা হলে এরা ভুলকে ভুল বলে' গণ্য কর্‌বে না। তা যদি সত্য হয়, তা হলে অন্য-সব কাজ ছেড়ে সকলপ্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন কর্‌তে হবে, তবেই এ ছেলেরা মানুষ হতে পার্‌বে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেচে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে' আমি মান্‌তে পার্‌ব না, তার প্রথম কারণ হচ্চে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে আমাদের লড়্‌তে হবে—এক হুকুম থেকে আরেক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মার্‌তে পার্‌ব না। দ্বিতীয় কথা হচ্চে এই যে, যে-কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চল্‌চে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই, ও কাপড় আমি পোড়াবার কে? যদি তারা বলে পোড়াও, তাহলে অন্তত আত্মঘাতীর 'পরেই আত্ম-হত্যার ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ কর্‌বার ভার আমাদের উপর পড়ে না। যে-মানুষ ত্যাগ কর্‌চে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে' ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্চি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পার্‌চে না। এমনতর জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বারবার বলেচি আবার বল্‌ব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পার্‌ব না। যে-কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে' এ লড়াই কর্‌তে পার্‌ব না। কেন না তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই—তাকে তাড়াতে পার্‌লে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন্ যে, কাপড়-পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে-অপরাধ করেচে অর্থ-নৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতীকার হতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন করে' নিশ্চিত বল্‌ব যে, বিশেষ একটা কাপড় পরে' আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেচি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরও বিস্তারিত করে' দিচ্চিনে, ম্যাঞ্চেষ্টারের ফাঁস তাঁতে পরিণামে ও পরিমাণে আরও কঠিন হয়ে উঠ্‌বে না? এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত কর্‌চিনে, কেন না আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই কর্‌চি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলিনে। কিন্তু সুবিধা এই যে বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাব্‌বার দিন এসেচে, সে হচ্চে এই,—ভারতের আজ্‌কের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্য্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেচে। মহাভারতে পড়েচি, প্রকাশ হবার পূর্ব্ববর্তী কাল হচ্চে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে

পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কি-রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেচে সে-কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে একমুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল তখন এই কথাটা আর লুকোনো রইল না। হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিৎ কেঁপে উঠ্‌ল। বোঝা গেল এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘট্‌বে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখ্‌বে বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘট্‌বে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা কর্‌তে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চ্চা করাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছুদিন থেকে আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্ত্তন হচ্চে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত করে' দেখ্‌বার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সাম্‌নে থেকে একটা পর্দ্দা ছিঁড়ে দিয়েচে—যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখ্‌তে পাচ্চে; এবং সে বুঝ্‌চে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাক্‌লেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব্ব করে'ও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোক্‌সান নেই। মানুষের মধ্যে এই যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্তন ঘট্‌চে, তার চিত্ত সঙ্কীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্চে, তারই হাত এই ভারত-রাষ্ট্রনীতি-পরিবর্ত্তনের মধ্যে কাজ কর্‌তে আরম্ভ করেচে। এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে;—স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ কর্‌বেই, তাই বলে' একথা মনে করা অন্যায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাটবৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেচি যে, কপটতার মত দুঃসাধ্য অতএব দুর্ল্লভ জিনিষ আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্চে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্রের দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা, তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে' নিই, এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরী। আজ্‌কের দিনে পৃথিবীতে সর্ব্বজনীন যে-সকল প্রচেষ্টা চল্‌চে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্রের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে অবস্থায় তাকে যদি তার অতীতযুগের দিক থেকে বিচার করি তাহলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে কর্‌ব খাঁটি, কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তাহলে বুঝ্‌ব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবীযুগের একটা প্রেরণা এসেচে মানুষকে সংযুক্ত কর্‌বার জন্যে। যে-বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্চে শুভবুদ্ধি। এই যে লীগ্ অফ্ নেশন্‌স্ প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্চে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে, এর চেষ্টা হচ্চে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্ব্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তাহলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ কর্‌বে। আমি বল্‌চিনে, আমাদের আশু-প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকাল বেলায় পাখী যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্ব্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক্,—কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্চে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম তখন আমরা কেবলি পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্ত্তব্য-ত্রুটি স্মরণ করিয়েচি—আজ যখন আমরা পর-পরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্স্‌কে ছিন্ন কর্‌তে চাই, আজও সেই

পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জ্জননীতির পোষণ পালন করতে চাচ্চি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে-মনোভাব প্রবল হয়ে উঠ্‌চে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধূলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে' রাখ্‌চে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলি বাড়িয়ে তুল্‌চে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্ম্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েচি সে অতি ছোট, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে' তুল্‌চে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড় জিনিষকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিমদেশে এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে' শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোল্‌বার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েচে। সেখানে কত লোক দেখেচি যারা এই সঙ্কল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েচে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেচে। সেই-সব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেচি; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌বার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠিত হন নি। সেইরকম সন্ন্যাসী দেখেচি ফ্রান্সে; যেমন রোমাঁ রলাঁ,—তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জ্জিত। সেইরকম সন্ন্যাসী আমি য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেচি। দেখেচি য়ুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে; সর্ব্বমানবের ঐক্য-সাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্যমান। তারা ভাবীযুগের মহিমায় বর্ত্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন কর্‌তে চায়, সমস্ত অপমান বীর্য্যের সঙ্গে ক্ষমা কর্‌তে চায়। আর আমরাই কি কেবল যেমন "পঞ্চকন্যাংস্মরেন্নিত্যং" তেমনি করে' আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয়সৃষ্টিকার্য্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে থাকব? আমরা কি এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না—য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে শাদা কালো নেই; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি বহুধাশক্তির যোগে অনেক বর্ণের লোকের জন্য তাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বিধান করেচেন;—আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত করুন!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রজনীগন্ধা

(১৩)

ক্ষণিকাদের প্রবাস হইতে ফিরিবার দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। দিনগুলার মত মানুষ ক'জনের মন কিন্তু ততখানি অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। একমাত্র বেণু থাকিয়া থাকিয়া খুব খানিকটা উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ফেলিত। তাহার মোনা ও সোনার নাকি স্কুল খুলিয়া গিয়াছে, আর বসিয়া থাকা চলে না।

যাহা হউক যাওয়ার দিনটা আসিয়াই পড়িল। মানুষে অনেকসময়েই মুখে বলে, এবং কোনো কোনো সময়ে মনেও ভাবে, যে, আপনার ইচ্ছামত কাজ করিবার শক্তি বুঝি যথার্থই তাহাদের আছে। কিন্তু যে অজানা অনামা শক্তি আমাদের এই সংসারে একস্থান হইতে আর-এক স্থানে, এক মনোভাব হইতে আর এক মনোভাবে, বন্ধনহীনতা হইতে বন্ধনের দিকে, পাওয়ার আগ্রহ হইতে দেওয়ার ব্যাকুলতার দিকে কেবলি ঘুরাইয়া মারে, সে কি আমাদেরই ইচ্ছা? না সেই অপরিচিতা কৌতুকময়ীর সহিত আমাদের মনোলোকবাসিনী ইচ্ছার সখী-সম্পর্ক পাতাইয়া আমরা মানুষের আত্মাভিমান তৃপ্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করি মাত্র?

আবার সেই যাত্রার কোলাহল ক্ষণিকাকে চারিদিক

হইতে উত্যক্ত অধীর করিয়া তুলিল। তবে প্রবাসে যাত্রা করিবার আয়োজন এবং প্রবাসান্তে গৃহে ফিরিবার আয়োজনের মধ্যে অনেকখানি যে পার্থক্য আছে তাহা নারী মাত্রেই স্বীকার না করিয়া পারে না। যে ঘর দুদিনের জন্য মাত্র ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহাকে কত শত ব্যবস্থার বন্ধনে যে বাঁধিয়া যাইতে হয়, তাহার ত আর আদি-অন্ত নাই। কিন্তু যে ঘরে আর জীবনে কোনদিন পদার্পণ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহাকে ত পথের ধূলার মত অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারা যায়, সে গৃহের ভবিষ্যতের ভাবনা মনকে কোনখানেও ভারাক্রান্ত করে না। তাহা ছাড়া আসিবার বেলা কোন্ জিনিষটি যে অতি প্রয়োজনীয়, এবং কাহাকে যে না হইলেও দুদিন চলে এই নির্ব্বাচনের পালাতেই মেজাজ ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে এবং দেহের বল ক্রমেই জমার দিক ছাড়িয়া খরচের কোঠায় যাত্রা করে। কিন্তু ফিরিবার বেলা ভাবিবার ত কিছু নাই। যাহা আনা হইয়াছে, তাহা সবই যে লইয়া যাইতে হইবে এবিষয়ে কোথাও কাহারও কোনো সন্দেহ দেখা যায় না। জিনিষ-গুলিকে কোনোপ্রকারের বন্ধনের বেষ্টনে আবদ্ধ করিতে পারিলেই হইল।

পরদিন গাড়ী রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, এইরূপ সহস্র ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষ-পত্র একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারখানি যতখানি সোজাসুজি মনে করিয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল, ঠিক ততখানি সোজা ঠেকিল না। কলিকাতা হইতে যে জিনিষগুলি এখানে বহন করিয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলি ও তাহাদের বাহন বাক্স-প্যাটরাগুলি ত আছেই, কিন্তু এই দুই তিন মাসের প্রবাসের ফলে বেণু যে দুই তিন মণ পাথরের টুক্‌রা জোগাড় করিয়াছে এবং গৃহিণীও যে অকুণ্ঠিত মনে সহস্র প্রকারের গৃহস্থালী ও গৃহসজ্জার উপকরণ আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের কথা সে বেশ ভুলিয়া বসিয়া ছিল। গৃহিণীকে বলিয়া কহিয়া যদি বা সে দুই-চারিখানা হাঁড়ী-কুড়ী কমাইতে পারিল, কিন্তু বেণুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস তাহার হইল না। দুই টুক্‌রা পাথর সরানো কিছু শক্ত নয়, কিন্তু তাহার ফলে বেণুর মনের উপর যে পাষাণভার চাপিয়া বসিল তাহা দূর করা প্রায় সাধ্যের অতীত। অতএব ইট, পাথর, স্লেটের টুক্‌রা, সব নির্ব্বিচারে বাক্সে স্থান দিয়া ক্ষণিকাও বাঁচিল, বেণুও নিশ্চিন্ত হইল। তবুও কথায় বলে "স্বভাব যায় না ম'লে।" তর্কে হারমানা নিশ্চিন্ত জানিয়াও ক্ষণিকা বলিল, "বেণু, অত পাথর নাই নিয়ে গেলে? দু চার খানা রেখে যাও না?"

বেণুর ঠোঁট ফুলিতে আরম্ভ করিল, সে বলিল, "না থাগুলি হবে।"

ক্ষণিকা বলিল, "থাগুলি কি কল্‌কাতায় আছে যে হবে? সে ত এখানে। বেশ ত এইখানে রেখে যাও না?"

বেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কল্‌কাতায় না, মোনা সোনা ট্রেনে করে আস্‌বে।"

থাগুলি পাহাড় সরানোর প্রস্তাব সেখানেই চাপা পড়িল, ক্ষণিকাকে অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হইল।

বিকাল বেলায় শেষবার একটু চারিদিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার আশায় ক্ষণিকা সকাল সকাল বাহির হইয়া পড়িল। ক'দিনের মধ্যেই এখানকার মাঠ বন পাহাড় সকলের সঙ্গে তার যেন কেমন একটা প্রাণের বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছিল। সে যে কেবল তাহাদের সৌন্দর্য্যের খাতিরে, এ কথা ক্ষণিকা নিজের মনের কাছে স্বীকার করিত না। এই যে গাছের ছায়ায় ঢাকা রাঙা মাটীর পথখানি, ইহার তুল্য সুন্দর কি ইহা অপেক্ষাও সুন্দর পথ কি সে দেখে নাই? কিন্তু তাহারা তাহার চোখের দেখার জিনিষ মাত্র, হৃদয়ের মধ্যে তাহারা কোনদিন আসিয়া প্রবেশ করে নাই। এই পথটির উপর দিয়া সে যাহার সঙ্গে হাঁটিয়াছে চলিয়াছে, তাহার প্রতি ক্ষণিকার যে মনোভাব তাহারি একটুখানি আভাস যেন এই পথটির মূর্ত্তিও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। এই যে সম্মুখে শীর্ণ স্বচ্ছতোয়া নদীটি, ইহা কেন এমন করিয়া তাহার হৃদয়কে শতপাকে জড়াইয়া ধরিতেছে? এই মাঠ, এই বন, কেন তাহাকে এমন করিয়া টানিতেছে? যে অপরূপ আলোর উৎসে স্নান করিয়া বিশ্ব এখন তাহার তরুণ দৃষ্টির দ্বারে অতিথির মত আসিয়া দাঁড়ায়, সে উৎস ত তাহার সঙ্গেই থাকিবে, তবে এ বিচ্ছেদকাতরতা কেন? কিন্তু মায়ের মুখে শিশুকালে যে গান প্রথমে শুনিয়া আমরা সঙ্গীত-লোকের প্রথম পরিচয় পাই তাহা চিরদিন কেন বিশেষ

একটি মাধুর্য্য লইয়া আমাদের মনোজগতে বিরাজ করে? শৈশবে প্রথম যে খেলনাটি উপহার পাইয়া খেলার সাথীর প্রণয়কে বুঝিতে শিখিয়াছিলাম, কেনই বা সেটি পরবর্ত্তী বহুমূল্য উপহার হইতে প্রিয়তর হইয়া মনে জাগিয়া থাকে?

সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু সেদিন যেন আকাশের বুক ছাড়িয়া যাইতে কেবলই ইতস্ততঃ করিতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরবর্ত্তী পাহাড়বন ক্রমে কাজলে আঁকা ছবির মত গাঢ়বর্ণ ধারণ করিতেছে, তবুও একটুখানি বাসন্তী আলো কাছের গাছপালার গায়ে তখন ছিটাইয়া পড়িতেছে। ক্ষণিকা বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইল। বাড়ী ফিরিবার বিশেষ কোন ব্যস্ততা নাই, অন্ধকার হইয়া গেলে ফিরিলেই চলিবে।

পিছনে পায়ের শব্দে সে ফিরিয়া চাহিল। বেণু তাহার মামার হাত ধরিয়া ক্ষণিকার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কাছাকাছি আসিয়াই সে অনাদিনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণিকার গায়ের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। "তুমি একলা কোথায় গিয়েছিলে মাসি, খাণ্ডুলিতে?"

বেণুর মতে মাটির ঢিপিই হোক বা গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী শৃঙ্গই হোক সবই খাণ্ডুলি। তবে একান্ত তর-তমের বিচার করিতে হইলে "মস্তবড় খাণ্ডুলি" বলা চলে। ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "না, অন্ধকারে খাণ্ডুলিতে উঠ্‌লে যে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যাবে? তা হলে কল্‌কাতা যাব কি করে?"

বেণু তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিল, "কেন কদমের কোলে চড়্‌বে?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা না হয় চড়্‌লাম, কিন্তু তুমি মোজা খুলে কি সব পুরছ ওর ভিতর?"

মোজাসুদ্ধ হাতখানা পিছনে চালান করিয়া বেণু বলিল, "সোনা 'খুঁতি' খেলবে, সে যে কাঁদছে।" ক্ষণিকাকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই সে সেখান হইতে দৌড় মারিল।

অনাদিনাথ বলিলেন, "পরের দোহাই দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করাটা বেণু খুব সকাল-সকাল আরম্ভ করেছে। এটাও একটা বুদ্ধির ক্রমোন্নতির লক্ষণ নাকি? আমরা ওটা একটু পরে সুরু করেছিলাম।"

ক্ষণিকা বলিল, "অথবা অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু ধরিয়ে নেবার চেষ্টা। মানুষের আয়ু ক্রমেই কমছে, কাজেই ধীরেসুস্থে কিছু করবার আর সময় পায় না বোধহয়। তা না হলে বুদ্ধি যে আজকালকার লোকের, আগের কালকার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী তা ত দেখি না।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনারাও তাই বল্‌বেন? ছেলেদের অবস্থা ত অনেককাল থেকে একরকমই চল্‌ছে, কাজেই বুদ্ধির তারতম্য কিছু চোখে পড়ে না, কেউ অত করে চেয়ে দেখে না। কিন্তু আপনাদের এখন ভাঙাগড়ার সময়, অনেকরকম পরীক্ষা আপনাদের উপর দিয়ে হচ্ছে, ফলাফল জান্‌তেও প্রাচীনপন্থী নবীনপন্থী সকলেই উৎসুক, কাজেই ধরা পড়্‌বার কিছু থাক্‌লে ধরা পড়া উচিত।"

ক্ষণিকা বলিল, "বুদ্ধি বেড়েছে কি না জানি না, তবে সে সম্বন্ধে সচেতনতা খুব বেড়েছে। আগে মেয়েরা কাজে যেমন বাঁধা নিয়ম মান্‌ত, মনেও তেমনি মান্‌ত; এখন কাজে অবাধ্য হবার সাহস যদিও কম জায়গায়ই পায়, কিন্তু মনে মনে যে মন্ত্র আওড়ায় তা একেবারেই মনুর সংহিতায় নেই।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, এটা আমিও বেশ বুঝ্‌তে পারি, যদিও নানাকারণে সংসারের ঠিক মাঝখান থেকে আমার একটু সরে যেতে হয়েছে। আজকালকার মেয়েদের ক্রিয়া-কলাপ বারব্রত করা সবই যেন কেমন প্রাণহীন হয়ে পড়্‌ছে, ওগুলো অনেকেই নিয়ম মানার খাতিরে বাইরে করে, কিন্তু হৃদয়ের যোগ না থাক্‌লে কোনো জিনিসের ভিতর শ্রী আসে না। এরকম করে করার চেয়ে না-করাটা ঢের ভাল। সেটা যারা করে তারাও যে না বোঝে তা নয়, কিন্তু অর্থহীন আচারকে ঝেড়ে ফেল্‌বার মত উৎসাহ বা সাহস সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমার বোন তখন বেঁচে ছিল, একদিন শ্বশুর-বাড়ীর এক বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে স্ত্রী-আচারের সময় যা দৃশ্য দেখ্‌লাম তাতে হাসিও পেল রাগও হল। বর জুতো সুদ্ধ পিঁড়ির উপর উঠে দাঁড়াল, দুচারজন এয়োর পায়েও জুতো ছিল, তাঁরা সেগুলো তাড়াতাড়ি করে খুলে ফেলে দলে এসে ঢুকলেন, কনে বরের পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ গল্প করছিলেন, ইতিমধ্যে শুভদৃষ্টির তাড়া পড়াতে চট্ করে চাদরের তলায় ঢুকে একবার বরের দিকে কাঁদ সারা গোছ একটু চেয়ে

দিলেন। আমি মোটেই বল্‌ছি না যে আমাদের দেশের যতগুলো আচার আছে সব ভাল বা সব ক'টা মেনে চলা উচিত, যদিও দুচারটা জিনিষ যে দেখ্‌তে আমার খুবই সুন্দর লাগে তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আগেকার দিনের লোকেরা এগুলোকে কাজে যেমন মান্‌ত মনেও তেমন মান্‌ত, তারা বড়জোর বোকা ছিল, কিন্তু আজকালের লোকগুলি যে একসঙ্গে বোকা, কাপুরুষ এবং ভণ্ড। তা ছাড়া সৌন্দর্য্য-বোধহীন বল্‌লেও বেশী বলা হয় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "অতখানি তাই বলে বল্‌বেন না। কাজে অনেকে অনেক কিছু কর্‌তে বাধ্য হয়, সাহসের অভাবে, তাই বলে মনেও যে অন্ততঃ মানে না, এটা কি ভাল নয়। মনেও ভাব্‌বার সাহস যে এতকাল ছিল না? এটা কি একটু লাভ নয়?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "হতে পারে, কিন্তু এই মাঝের সময়টা চোখ-কানকে বড় পীড়া দেয়। তা ছাড়া সামান্য দু-চারটা ফিরিঙ্গিয়ানায় মনের সাহস আছে তা কি করে বুঝ্‌ব? বরং মনে হয় আগে যেমন ফ্যাশান বলে জুতো পর্‌ত না, এখন তেমনি ফ্যাশান বলেই পর্‌ছে, মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এরি সূত্রে আর-একটি দৃশ্য মনে পড়ে। এখানে বছর চার পাঁচ আগে সেটা দেখেছিলাম। পূজোর ছুটীর সময় বেড়াতে এসেছিলাম। ঐ যে নদীর ধারে বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে ওতেই ছিলাম। সকাল বেলা একদিন বাজ্‌নার শব্দে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লাম ঢাক ঢোল বাজিয়ে দলে দলে লোক নদীর ঘাটের দিকে এগোচ্ছে। দুটি মানুষ যে এই ব্যাপারটার কেন্দ্র তা দেখ্‌বামাত্র বুঝ্‌লাম—একটি স্ত্রীলোক, একটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটির পরিধানে শাদা কাপড় পথের ধূলায় গেরুয়া হয়ে উঠেছে, চুল খুলে মুখের চারিদিকে উড়্‌ছে, সে একবার করে সাষ্টাঙ্গে পথের উপর শুয়ে পড়ে প্রণাম কর্‌ছে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে সূর্য্যকে নমস্কার কর্‌ছে, আবার তখুনি ধূলোয় লুটিয়ে প্রণাম কর্‌ছে। বাড়ীর থেকে নদীর ঘাট অবধি সারা পথ সে এমনিভাবেই আস্‌ছে। পুরুষটি খুব সম্ভব তার স্বামী, পরনে বেশ ভাল নূতন কাপড় জামা, সে খানিকটা করে হেঁটে নিচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে দুচারটে গল্প গুজব করে নিচ্ছে, আবার থেকে থেকে এক একটা প্রণামও কর্‌ছে, তাও পাছে কাপড় জামায় ধুলো লেগে যায় এই ভয়ে সঙ্গীরা সাম্‌নে চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম যে, স্বামীর অসুখের জন্যই স্ত্রী মানত করেছিল যে অসুখ সার্‌লে সে সারাপথ বুকে হেঁটে নদীর ঘাটে পূজো দেবে। সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম, মনে হল আমাদের সমাজের বর্ত্তমান আর অতীত যেন মূর্ত্তি ধরে এই স্ত্রী-পুরুষরূপে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। সে পুরুষটার চেহারা আমার একেবারেই মনে নেই, শাদা-কাপড়-মোড়া একটা অস্থিমাংসের স্তূপ এই মনে পড়ে, কিন্তু মেয়েটির মুখ এখনও যেন চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। সে মুখ সুন্দর যে খুব তা নয়, কিন্তু বিশ্বাস আর নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব সুন্দর লেগেছিল।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মনে মনে রাগ তাহার ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছিল। এত কথার কি দর্‌কার? ইহা কি শুধুই গল্প করার খাতিরে কথা বলা, না তলায় আর কিছু আছে? নানারকম ছবি আঁকিয়া অনাদিনাথ তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছেন কি? প্রাচীন রীতিনীতি সামাজিক অবস্থা এ-সকলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে ইহাই কি জানাইতে চান? সে ত অনেকেরই আছে, অবশ্য অল্প-বিস্তর পরিমাণে। ফিরিঙ্গিয়ানা পছন্দও সকলে করে না, ক্ষণিকা নিজেও করে না, কিন্তু অনাদিনাথের মুখে হিন্দু কুল-বধূর জুতা খুলিয়া স্ত্রী-আচারে যোগ দিতে যাওয়ার গল্পে তাহার রাগ হইল কেন? কোথায় কি যে তাহাকে আহত করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিল না, কিন্তু আঘাতটা এমনই বাস্তব যে তাহাকে উপেক্ষাও করিতে পারিল না।

চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, "আপনার মতে অন্ধবিশ্বাসই তা হলে মেয়েদের সবচেয়ে মানায়?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "একেবারেই না। বিশ্বাস, নিষ্ঠা, এগুলি তাদের খুব মানায়; অন্ধতা মূঢ়তা ভেদ করেও তার সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। কিন্তু এর উপরে যদি পূর্ণবিকশিত বুদ্ধির আলো পড়ে তাহলে সে যে আরো কত সুন্দর হয়।"

ক্ষণিকার রাগ তখনও যায় নাই। সে বলিল, "অনেকে ত বলেন বুদ্ধির চর্চ্চা কর্‌তে গিয়ে মেয়েদের নিষ্ঠা বিশ্বাস সবই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ও দুটো জিনিষ নাকি একসঙ্গে থাকেই না।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "যাঁরা বলেন তাঁদের নিজেদের বুদ্ধি

সম্বন্ধে সন্দেহ করা যেতে পারে। তা ছাড়া স্বার্থরক্ষার খাতিরে বাজে কথা মানুষ চিরকালই বলে।"

আলোর রেখা আকাশ হইতে ইতিমধ্যে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল। এই বিজন অন্ধকার নদীতটে দুটি মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। চারিদিক ক্রমেই কালিমার স্রোতে মিশিয়া আসিতেছে, উশ্রীর নির্ম্মল জল থাকিয়া থাকিয়া তাহারি মধ্যে ভূতলশায়িনী সৌদামিনীর মত ঝক্‌ঝক করিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আপনি হয়ত আমাকে ভুল বুঝ্‌লেন। কিন্তু জানবেন এটা আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনিও ঐ সূর্য্য-উপাসিকার মত কিম্বা তার চেয়েও বেশী নিষ্ঠা দেখাতে পারবেন। হিন্দুর মেয়ে স্বামীকে ভালবাসতে বাধ্য, স্বামী ছাড়া তার আলাদা অস্তিত্ব নেই, সে তার স্বামীর জন্য যতটা করে, যে মেয়ে স্বেচ্ছায় নিজের স্বামীকে বরণ করেছে, যার আলাদা অস্তিত্ব আছে বলেই যার স্বামীর সঙ্গে মিলন বেশী নিবিড়, সে কেন তার চেয়ে বেশী পারবে না? পশুর ভালবাসার চেয়ে মানুষের ভালবাসা ঢের বড় জিনিষ; যার মনুষ্যত্বের বিকাশ যতখানি হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি তার প্রেম তত বেশী গভীর হয়, তত বেশী আত্মত্যাগে সক্ষম হয়।"

ক্ষণিকার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। সে পারিবে, একথা সে নিজে নিশ্চিতরূপে জানে। কিন্তু অনাদিনাথের কাছে তাহা ধরা পড়িল কি করিয়া? তিনি কি করিয়া বুঝিলেন যে এই স্বল্পভাষিণী নারী, যে নিজেকে সযত্নে গোপন করিয়া রাখিতে চায়, তাহার মনের কোণে কোথায় কি শক্তির ভাণ্ডার আছে? কি করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে যাহাকে অন্তঃসলিলা ফল্গু বলিয়াই সকলে জানে, বর্ষার দিনে তাহাই বিপুল বেগশালিনী মহানদীর আকার ধরিতে পারে?

অন্ধকারে ক্ষণিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মুখে কিছু বলিবার সে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া অনাদিনাথের কথার উত্তর বাজিয়া উঠিল, "ভগবান যদি দিন দেন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব যে আপনার বিশ্বাস বৃথা নয়।"

বাড়ী ফিরিবার পথে কেহ আর একটিও কথা বলিলেন না। অনাদিনাথ কথা বলিলেও ক্ষণিকা তাহার উত্তর দিতে পারিত কি না সন্দেহ। তাহার হৃদয়ে যেন জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছিল। জীবনের যত রিক্ততা, যত দীনতা, এই কয়টি কথার তলায় কোথায় হারাইয়া গেল? ক্ষণিকার চোখের সম্মুখে সহসা যেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার কোন্ যাদুকরের স্পর্শে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল। তাহার আর চাহিবার যেন কিছু রহিল না, পাইবার কিছু রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া সহসা সে সচেতন হইয়া অনুভব করিল তখনও তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে।

পরদিন আর কিছু বলিবার বা ভাবিবার অবকাশ সে পাইল না। যাত্রার আয়োজন করিতে এবং সকলকে সে সম্বন্ধে ক্রমাগত সচেতন করিয়া, যথাকালে নাওয়া খাওয়াটা তাহাদের দ্বারা শেষ করাইয়া লইতেই তাহার দিন কাটিয়া গেল।

গৃহিণীর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়, পাছে যাইবার তাড়ায় কেহ জলের কুঁজাটা ফেলিয়া যায়। তিনি সর্ব্বক্ষণ ক্ষণিকাকে সাবধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "দেখ বাছা, যেন তাড়াতাড়ি করে কুঁজোটা ফেলে যেও না, শেষে এগুবাচ্চা সব গলা শুকিয়ে মরবে।" যেন চিরকাল ক্ষণিকা ঐ অপরাধটা করিয়া আসিতেছে, কেবল গৃহিণীর অসাধারণ দক্ষতা ও তৎপরতায় এ পর্য্যন্ত কেহ পিপাসায় বুক ফাটিয়া মারা যায় নাই।

গাড়ীতে উঠিবার সময় দুইটা কুঁজা দেখিয়া তিনি খুসি হইয়া বলিলেন, "হাঁ, একটা বরং বেশী থাকা ভাল, পথে ঘাটে ভেঙেও ত যেতে পারে। দুটোতেই জল ভরিয়ে নিয়েছ ত?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "হাঁ, একটাতে ফোটানো জল আছে আর-একটাতে এমনি। আপনি যে আবার জল ফুটনো হলে খেতে চান না।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "এতও বাছা তোমার মনে থাকে। জন্মাবধি অনাদি এই জল ফোটানো নিয়ে ঝগড়া করছে, তা দেশেই বল আর এখানেই বল। কিছুতে যদি আমার মনে থাকে। পদ্মা মুকুন্দ ওদেরও কত বলি, তা হতভাগারা কোনো কথা কি মন দিয়ে শোনে? তুমি সে-দিনের মেয়ে, খুব কিন্তু পাকা গিন্নি হয়েছ; আমরা যে এসে অবধি সংসার করছি, অতটা পারি না।"

ক্ষণিকার কানে গৃহিণীর কথাগুলি প্রবেশ করিল বটে কিন্তু মনে বেশী আমল পাইল না। কিছুদিন আগে অলিভ শ্রীনারের একখানি উপন্যাসের কয়েকটি কথা তাহার বড় মনে লাগিয়াছিল, সেই কথা কয়টিই তাহার মনে কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল—

"Experience teaches us in a millennium what passion teaches us in an hour. A Kaffir studies all his life the discerning of distant sounds, but he will never hear my step, when my love hears it, coming to her window in the dark, over the short grass."

(১৪)

সকালবেলাটা প্রায় সকল মানুষেরই কাজের হুড়াহুড়ির মধ্যে কাটে। অন্ততঃ কলিকাতার সহরে প্রাপ্তবয়স্ক এমন পুরুষ বা নারী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, চোখ চাহিয়াই যাহার মন উদয়োন্মুখ তপনের সহিত মিলনের আশায় পুলকিত হইয়া ওঠে। ঊষার রক্তিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী মনোযোগ পায় সেই হতভাগা ছেলেটা, মুখ ধুইয়াই যাহাকে জিওমেট্রি পড়াইতে যাইতে হয়, অথবা ভিজা কয়লা বা ঘুঁটে, যাহার সাহায্যে দৈনিক সংসারের বাষ্পীয় শকটের রসদ জোগাড় করিতে হয়। যে দুচারজন লক্ষ্মীমন্ত মানুষের এ-সকলের বালাই নাই, তাহাদের ভোরে উঠিবার উৎপাতও নাই। সাধারণ মানুষগুলির সাধারণ নিয়ম এই—তাহারা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াই একপালা কাজের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাইয়া তাহার পর আটটা সাড়ে-আটটার সময় একটু একটু হাঁফ ছাড়িবার অবসর খুঁজিয়া পায়। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে আবার কাজের হাটে তাহাদের ডাক পড়ে, কিন্তু এই সময়টুকু প্রায়ই ইচ্ছা-মত ব্যয় করা চলে।

সকালের চায়ের পালা সাঙ্গ করিয়া, বাজারের পয়সা দিয়া গৃহিণীর আহ্নিকের এক রকম ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষণিকা এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। মালী তখন সবে গাছে জল দেওয়া সুরু করিয়াছে। সেও বাত রোগে ভোগে, এই কারণে অনাদিনাথের মাতার তাহার প্রতি একটা বিশেষ করুণা আছে। সকালে উঠিতে না পারিলে তাহাকে শাসন করিবার সাহস ঐ কারণে এ বাড়ীতে কাহারও নাই।

নববোপিত কতগুলি চারাগাছের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নীচে যাইবার ক্ষণিকার একটু প্রয়োজন ছিল। আবার অর্দ্ধপঠিত একখানা উপন্যাস তাহাকে নিজের শয়নকক্ষের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছিল। কোন্ দিক রক্ষা করিবে ভাবিয়া ক্ষণিকা যখন ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় পঞ্চা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, তেওয়ারী বুড়ো নীচে এসে তখন থেকে বসে আছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "তা আমি কি করব, বাবুর কাছে খবর দাও।"

পঞ্চা বলিল, "বাবু এই মাত্তর যে লিখ্‌তে বস্‌লেন।"

অনাদিনাথের এই সময়টা ছিল তাঁহার নিজস্ব কাজের সময়। পরের বেগার খাটিতে বা তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিতে তাঁহাকে দিনের মধ্যে বেশ খানিকটা সময় খরচ করিতে হইত, কিন্তু এই সকাল-বেলাটার উপর হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। চাকর-বাকরেও অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে ইহা জানিতে পারিয়াছিল যে গৃহস্বামীর অন্য-অনেক কথা অবহেলা করিয়া স্বচ্ছন্দে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বটে কিন্তু এ সময়ে তাঁহার কাছে গিয়া গোলমাল করাটা একান্তই চলে না। ক্ষণিকা তাহা জানিত, কাজেই বলিল, "তাকে ও বেলা আস্‌তে বলে দে না, অসময়ে আসে কেন?"

পঞ্চা বলিল, "দশবার কম হলেও বলেছি, শুনবে না কোন-মতে। আজ পাঁচটাকা না পেলে তার একেবারে নাকি সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।"

এই তেওয়ারীটি অনাদিনাথের পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য। পেন্সন হিসাবে এখনও সে মাসে পাঁচ সাত টাকা পায়, এবং তাহা আদায়ের আগ্রহে মাসের মধ্যে পনেরো দিন কলিকাতাতেই কাটাইয়া দেয়।

ক্ষণিকা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। পঞ্চার দেরী দেখিয়া তেওয়ারী লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিয়া সশব্দে কাঁদিয়া উঠিল, "এ মা, হামার সর্ব্বোনাশ হয়ে গেল।"

ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "চুপ কর, অমন করে চেঁচিও না, আমি বাবুকে বল্‌ছি।" পঞ্চা ও তেওয়ারীকে সেইখানে দাঁড় করাইয়া সে দ্রুতপদে অনাদিনাথের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একরাশ লম্বা, চওড়া, লাল, নীল বইয়ের মধ্যে বসিয়া

অনাদিনাথ তখন গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা কাজে ব্যস্ত। খোলা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ক্ষণিকা কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না কি উপায়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। অনাদিনাথকে ডাকিবার কোনো প্রয়োজন এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ হয় নাই, হইলেও অন্যের সাহায্যে সে-সব ক্ষেত্রে কাজ উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু সুবিধামত একটি লোকও যে কাছে নাই, বেণু উপরের ঘরে সোনা-মোনার তদারক করিতে ব্যস্ত। অগত্যা কণ্ঠস্বর যেখানে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিল না সেখানে সে চরণশব্দেরই শরণ লইল।

ঘরে মানুষ ঢুকিবার শব্দে অনাদিনাথ অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ফিরিয়া তাকাইলেন। কিন্তু ক্ষণিকার উপর চোখ পড়িতেই তাঁহার মুখ হইতে বিরক্তির চিহ্ন মাত্র লুপ্ত হইয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দরকার আছে ?"

ক্ষণিকা মনে মনে বলিল, "বিনা দরকারে আসবার সাহসও নেই অধিকারও নেই।" মুখে বলিল, "তেওয়ারী এসে টাকার জন্যে ভয়ানক কান্নাকাটি করছে, না হলেই তার চলবে না।"

অনাদিনাথ সামনের দেরাজ হইতে টাকা বাহির করিতে করিতে বলিলেন, "যতদিন কাজ করে তাকে টাকা উপার্জ্জন করতে হয়েছিল তখন এত তাগিদ দেবার সাহস ছিল না, এখন বিনা শ্রমে পায়, কিন্তু চাইবার সাহস ঢের বেড়েছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "যেখানে চাইলে পাওয়া নিশ্চিত সেখানে সাহসের অভাব কেনই বা হবে?" কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার আপশোষ হইল, খুব নির্লজ্জের মত শুনাইল নাকি ?

অনাদিনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা ঠিক। আমিও কিছু চাইবার উপক্রম করছি, কিন্তু পাব কি না ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্ষণিকার বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা যেন আছাড় খাইয়া পড়িল। সম্ভব, অসম্ভব, আশার অতীত, কত কি যে তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। অন্তরের শিহরণটা যেন দেখিতে দেখিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

উপর হইতে বুড়া তেওয়ারীর কাতরকণ্ঠ তাহাকে খানিকটা তবু আপনাতে ফিরাইয়া আনিল। অনাদিনাথের হাত হইতে টাকা কয়টা লইয়া বলিল, "ওকে দিয়ে আসি ?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিলাম দেখছি। আমার এত বয়স হল, কিন্তু এখনও কেমন করে যে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা শিখলাম না। ইংরেজীতে কথা বলায় একটা সুবিধা আছে, তাদের কথাগুলোর খুব কাটা ছাঁটা মানে, এক বললে আর-এক বোঝায় না। আমাদের ভাষাটা এমন যে অর্দ্ধেক কথারই যা মানে তা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করে নিতে বেশ পারা যায়। 'ফেভর' বলতে ওরা যা বোঝে, বাংলায় কি বললে যে তা বোঝা যায় তা কিছুতেই ঠিক করতে পারি না। অনুগ্রহ বলা যেতে পারে, কিন্তু তাতেও যে বিশেষ ঠিক বোঝায় তাও নয়। কিন্তু ওদিকে তেওয়ারীর কণ্ঠ যে সপ্তমে উঠছে।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তেওয়ারী তখন সিঁড়ির মাঝামাঝি নামিয়া আসিয়াছে, তাহার হাতে টাকা কয়টা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "যাও এখন তোমার বক্‌বকানি আমি শুনতে পারব না, নীচে যাও।"

তেওয়ারী চলিয়া যাইতে সে সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে রেলিংগুলা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার জগৎ যেন কেমন ওলট্‌পালট্‌ হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ভুল বুঝিয়াছিল, সেই অবসরে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণিমা-উদ্বেল সাগরের ঢেউয়ের মত কোনদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিতে ত নিজের তাহার বাকি নাই। কিন্তু হায় নির্ব্বোধ, প্রাণ দিয়া চাহিতে পারাই কি পাইবার অধিকার দেয়? পৃথিবীতে নিত্য কি এই কেবল দেখা যায় না যে একান্ত সাধারণ সুলভ জিনিষ যা, তাহাও তৃষ্ণার্ত্তের চোখের সম্মুখে মরুমরীচিকার মত মিলাইয়া যায়? চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার মিলন এজগতে কোথায়?

কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবসর ত সংসার অধিক দেয় না। ক্ষণিকা কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠিয়া পড়িয়া আবার নীচে নামিয়া গেল। এবার আর তাহাকে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উপায় ভাবিতে হইল না। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই অনাদিনাথ বলিলেন,

"আপনার অবসর বলে জিনিষ খুবই কম বোধ হয়, তার মধ্যেও যদি একটু ভাগ বসাতে চাই তাহলে কি রাগ করবেন? অবশ্য এটা জিজ্ঞাসা করাই আমার অন্যায়, রাগ করলেও ভদ্রতার খাতিরে সত্যকথা সব সময় বলা যায় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তা পারব, আমি সত্যিই বলছি, আমি একটুও রাগ করব না। এ সময়টা আমি কি করে কাটাব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।"

কাজটা শক্ত না হইলেও অন্য সময় ক্ষণিকা নিশ্চয়ই সেটাকে প্রীতিকর ভাবিত না। সকাল বেলা বসিয়া বসিয়া রাজ্যের Census report ঘাঁটিয়া statisticsএর অঙ্ক কষা বা সাত জন্ম আগে কে কবে কোন্ দেশের মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রতীকার সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, ছেঁড়া বই হইতে তাহা নকল করা, কোনো তরুণীর পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হইবার কথা নয়। কিন্তু সময়-বিশেষে মত যে বদ্‌লায় তাহা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়া গিয়াছেন, সে গান তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে মনে মনে গাহে নাই এমন মানুষই বা ক'টা আছে?

অনাদিনাথ ক্ষণিকাকে কাজ আগাইয়া দিয়া আবার আপনমনে নিজের কাজে ডুবিয়া গেলেন। ক্ষণিকার কাজ কিন্তু অত নির্ব্বিবাদে মোটেই হইতে চাহিল না। একে ত মন কেবলি তাহার অবাধ্যতা করিতে লাগিল, বুকের কম্পন তখনও থাকিয়া থাকিয়া কেবলই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু না পাওয়াটা স্ত্রীলোকের জন্মাবধি এমন অভ্যস্ত জিনিষ যে অতি বড় নিরাশার আঘাতকে গোপন করিয়া ফেলিতেও তাহার খুব বেশী সময় লাগে না। কাজেই ক্ষণিকা মনে মনে যাহাই ভাবুক না কেন, তাহার হাতের কাজে বেশী কিছু ভুল হইল না।

খানিকক্ষণ পরে অনাদিনাথ হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হয়ে গেল এরি মধ্যে আপনার? দেখি?"

ক্ষণিকা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে দিয়া একটু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে অনাদিনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অনাদিনাথ যখন বলিলেন, "সব কাজই দেখ্‌ছি আপনি সমান ভাল করে কর্‌তে পারেন," তখন সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু এ ঘরে অনাদিনাথের সাম্‌নে বসিয়া থাকিতে তাঁহার আর একটুও ইচ্ছা করিতেছিল না। কাজ চুকাইয়া দিয়াই সে নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। স্নানাহারে সেদিন আর তাহার একটুও রুচি রহিল না। অনাদিনাথ দশটার সময়ই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া যান। কাজেই তাহার ইচ্ছামত কাজ করার পথে বাধা দিবার কোনও লোক বাড়ীতে না থাকাতে সে নিরুপদ্রবে ঘরের কোণে সারা দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দিল।

ভাগ্যের প্রতি এবং নিজের প্রতি একটা তীব্র রোষ থাকিয়া থাকিয়া যেন তাহার বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অভিমানে, ক্ষোভে, লজ্জায় মিলিয়া তাহার হৃদয়টাকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। বেশ ত সে এক রকম ছিল। নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোল ছাড়াইয়া কোন্ কুগ্রহ তাহাকে এই প্রখর দিবালোকদীপ্ত জাগরণের হাটে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল? পৃথিবীকে যে আড়াল হইতে আবছায়ার মত দেখিয়া চোখে বড় ভাল লাগিয়াছিল, আড়াল চূর্ণ করিয়া দিল কে? নিজের অন্তর তাহার কাছে যে অবগুণ্ঠিতা বধূর মত এতদিন অজানা ছিল, আজ সেই লাজ-আবরণ কাড়িয়া লইল কে? নিজের ভিতর এতখানি অকাঙ্ক্ষা, এত প্রবল বাসনা যে ছিল, তাহা ত সে স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবে নাই, কিন্তু ইহারা যে তাহারই হৃদয়ে জন্মলাভ করিয়া, তাহারই হৃদয়রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহা ত সত্য।

ক্ষণিকা আপনার তরুণ জীবনে প্রেমের দূতকে যে বেশে কল্পনা করিয়াছিল, আজ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া দেখিল কল্পনার সহিত বাস্তবের সাদৃশ্য কোথাও নাই। এ ত পুষ্প-বিভূষিত কোমল কিশোরমূর্ত্তি নয়, ইহার নয়নে ত প্রেমের আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টি নাই? এ যেন মহাকালের রুদ্রমূর্ত্তি, চক্ষে প্রলয়ের অগ্নিশিখা, হস্তে বিনাশেরই অস্ত্র। কিন্তু এই ত মনকে আরো বেশী করিয়া হরণ করিয়া লইল; ইহাকে যে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্ব্বহারা হইতেই অন্তর আকুল হইয়া উঠে? পাইবার আকাঙ্ক্ষা ইহার সম্মুখে লজ্জায় যে মরিয়া যাইতে চায়; কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও যে মনে জাগিয়া ওঠে যে ইহার হাত হইতে পাওয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। কিন্তু কে সে সৌভাগ্যবতী যে সেই অমূল্য দানের অধিকারিণী হইবে? সে ক্ষণিকা নয়। নিজেকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলাইতে আর কি ইচ্ছা করে? কিন্তু দিন কাটিবে কেমন

করিয়া ? এই নবজাগ্রত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার রাশি লইয়া কেমন করিয়া সে লোকের কাছে আপনাকে গোপন করিয়া বেড়াইবে ? সমস্ত প্রাণ যাহার হাহাকার করিয়া মরিতেছে, সে কেমন করিয়া সংসারের প্রকৃতিস্থ পাঁচটা মানুষেরই মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে ?

কিন্তু যে ভাগ্যকে সে এতক্ষণ আপনার পীড়িত হৃদয়ের আক্রোশে অভিশাপ দিতেছিল, সেই ভাগ্যই অলক্ষ্যে তাহার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিল। বিকাল হইতেই একতাড়া চিঠির মধ্যে লালুর একখানা চিঠি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের পিতার অসুখ আবার বাড়িয়াছে, মাতার জ্বর হইয়াছে। ক্ষণিকার অবিলম্বে আসা প্রয়োজন।

তাহার ব্যথাকাতর মন আবার যেন একটা নাড়া পাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। সংসারে কেবল একপ্রকার দুঃখই ত ভগবান তাহার কপালে লেখেন নাই। যাহা কেবল একান্ত আপনার দুঃখ, তাহাকে ত বহন করিতেই হয়, বিশ্বসংসারে সে ভারের ভাগ বহন করিতে আর কেহই নাই। মানুষের সকলের চেয়ে দুঃখের দিনেই সে সবার চেয়ে একলা, সান্ত্বনার স্পর্শ এরাজ্যে আসিতে পথ পায় না। সেটা একদিকে নিষ্কৃতিও বটে, অবুঝ মানুষের অযথা কোলাহলে পীড়িত মনের পীড়া যে আরও শতগুণ বাড়িয়া উঠে। একান্ত একলার ধন বলিয়া অন্তরে যে দুঃখ অগ্নিশিখার মত জ্যোতির্ময়, তাহাই সংসারের ব্যগ্র কৌতূহলের হাটে যখন টানিয়া আনা হয়, তখন তাহাকেই অঙ্গারখণ্ডের মত কালিমাময় বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু কেবল একলা হইয়াই ত মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই ? পরিবারের, সংসারের, সমাজেরও যে সে অংশ। তাহাকে সংসারের দুঃখের একটুখানি অংশ অন্ততঃ বহন করিয়াই চলিতে হয়। ক্ষণিকাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হইল। যে ঘর সেদিন অবধি তাহার সকল স্নেহ ও প্রেমের নীড় ছিল, আজ সেখানে যাইবার কথায় তাহার মন যে বিচ্ছেদের ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিবে এ কথা কে কবে ভাবিয়াছিল ?

গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "তা যেতে হবে বই কি। মা-বাপের অসুখ, এ ত আর যে-সে নয় ? তা বাছা, দেখছ ত কিরকম অথবব হয়ে পড়েছি, মা-বাপকে ভালয় ভালয় রেখে ফিরে এসো যত শিগ্‌গির পারো। কখন যাবে, কার সঙ্গে যাবে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "কিছুই ঠিক করিনি, এই মাত্র ত খবর পেলাম। একবার চিন্ময়দার কাছে খবর দিতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই চিঠি লিখে দাও। এ-সব কাজ একজন পুরুষমানুষ না হলে কখনো হয় না। অনাদি যে আজ কখন আসবে, তার ঠিক নেই, যা ক'দিন থেকে দেরি করতে আরম্ভ করেছে।"

ক্ষণিকা ফিরিয়া গিয়া চিন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। অদ্ভুত এই সংসার। যাহাকে দিবার বেলা হাত গুটাইতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না, চাহিবার বেলা তাহারি কাছে হাত পাতিতে হয় সবার আগে। আর যাহাকে সব দিতে মন ব্যস্ত, তাহারই কাছে চাহিবার নামে সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেই বা ইচ্ছা হয় কেন ?

কলিকাতায় ফিরিবার পর চিন্ময়ের সঙ্গে মাত্র দুইবার দেখা হইয়াছে। তাহারা আসিয়াছে শুনিয়াই সে একদিন মাধবী ও মেনকাকে লইয়া আসিয়াছিল। সেদিন ত ভ্রমণকাহিনী আর বাজে কথা বলিতেই সময় কাটিয়া গেল। আর একদিন সে একলাই আসিয়াছিল। কিন্তু আগেকার মত গল্প করা এখন যেন আর সহজ ছিল না। যে বাধাকে তারা মুখে অস্বীকার করিত, অন্তরে তাহাই পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া উঠিয়া দুজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত। একবার চিন্ময় বলিল, "তোমাকে যতটা ভাল দেখ্‌ব ভেবেছিলাম তা ত কৈ দেখ্‌ছি না।"

ক্ষণিকা বলিয়াছিল, "গিরিধি আর এমন কি অপূর্ব্ব ভাল জায়গা যে খুব ভাল হয়ে উঠ্‌ব।"

চিন্ময় উত্তরে বলিল, "জায়গার কথা বল্‌ছিলাম না।"

চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া ক্ষণিকা নীচে নামিয়া বাগানের মধ্যে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কাজকর্ম্ম করিবার মত অবস্থা আর তাহার দেহ-মনের ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘন হইতেছিল, তাহার হৃদয়ের ভারও ততই বাড়িয়া চলিতেছিল। এই তাহার সম্মুখে অসীমবিস্তৃত দুঃখের সাগর, ইহার কূল সে কবে পাইবে ? আনন্দ কি তাহাকে আলেয়ার

মত কেবল চকিতে দেখা দিয়া, কেবল পথ ভুলাইয়াই অদৃশ্য হইল? অনাদিনাথের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি নামিয়া উপরে চলিয়া গেলেন, সবই সে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার আর শক্তি নাই। সংসারের স্রোতে তাহাকে যেদিকে খুসি টানিয়া লইয়া যাক, সে বাধা দিবে না। নদীর দুই তীরই যখন কণ্টকাচ্ছন্ন, তখন যেদিকে হোক তাহাকে আছড়াইয়া ফেলুক, তাহার তাহাতে কিছু আসে যায় না। অনাদিনাথকে তাহার যাইবার বিষয় সব কথা বলা উচিত, কিন্তু পা তাহার চলিতে চাহিল না।

অনাদিনাথ স্বয়ংই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অগত্যা তখন ক্ষণিকাকে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই হইল। তাহার ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া অনাদিনাথের মনও যেন পীড়িত হইয়া উঠিল। দুঃখের বোঝা বহিবার জন্যই কি ইহার সৃষ্টি? যাহার নিজেরই পরের সস্নেহ আশ্রয়ে দিন কাটাইবার বয়স, তাহারই উপরে সমস্ত সংসারের ভার আসিয়া চাপিল?

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডাক্‌ছিলেন?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "মায়ের কাছে সব শুন্‌লাম। আপনি যতদিন দর্‌কার, বাড়ীতে থাক্‌বেন, আমাদের অসুবিধার কথা ভাব্‌বার কিছু দর্‌কার নেই। আমাকে দিয়ে কোনও রকম কিছু উপকার হয় যদি তবে নিশ্চয় সঙ্কোচ না করে বল্‌বেন।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল। অনাদিনাথের কথার উদ্দেশ্য সে ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিল। সত্যই ত, সে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। কে বা এখানে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে? এখানে সে উচ্চদরের দাসী বই আর কিছু নয় ত? টাকা দিলেই আর-একটা দাসী মিলিবে এখন।

বালক যেমন যে খেলনার জন্য আব্দার করে তাহার বদলে অপর কোনো খেলনা দিতে গেলে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া ওঠে, ক্ষণিকারও ঠিক তেমনি দশা হইল। অনাদিনাথের স্নেহকে সে জোর করিয়া অবহেলা মনে করিয়া, কাঁদিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষুব্ধ মন কেবলি বলিতে লাগিল, "আমার দর্‌কার নেই, কিছু আমি চাই না।"

চিন্ময় খানিক পরে আসিয়া পৌঁছিল। ক্ষণিকার মুখ দেখিয়া বলিল, "এরি মধ্যে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে বসে আছ? এইরকম শক্ত মন নিয়ে তুমি সংসারে টিঁক্‌বে কি করে?"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি কি টিঁক্‌তে চাইছি? আমায় জোর করে যিনি টিঁকিয়ে রাখ্‌ছেন তিনিই সে ভাবনা ভাব্‌বেন, আমি আর পার্‌ব না।"

চিন্ময় বলিল, "এখন তত্ত্বকথা বা কবিত্ব কিছু শোন্‌বার সময় নেই। টাইম্‌-টেব্‌লটা একমাত্র আলোচনার বিষয়। কাল আট্‌টায় যেতে হবে এই মনে করে সব ঠিক করে রেখো, আমি মিনুকে নিয়ে একেবারে ষ্টেসনে যাব।"

ক্ষণিকা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "চিন্ময়দা, যখনি দর্‌কার হয়, বিপদে পড়ি, তোমাকে জ্বালাতন কর্‌তে আমার একটুও বাধে না, তুমি যে আমাকে কি মনে কর জানি না।"

চিন্ময় হাসিল। হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কি মনে করি সব যদি বল্‌তে বসি, শুনে তুমি খুসি হবে না। তবে বিপদের দিনে ডাক বলে দুঃখিত যে হই না এটা জেনে রাখো। এতকাল পৃথিবীতে থেকে এইটুকু শিখেছি যে সুখটা খুব সম্ভব কল্পনা, দুঃখটাই খাঁটি বাস্তব। কল্পনার রাজ্যের বদলে বাস্তবের মধ্যেই যে জায়গা পেয়েছি তাতে রাগ করিনি। আচ্ছা, আমি এখন আবার মিনুকে একটুখানি প্রস্তুত করে আসি।"

ক্ষণিকা পরদিন সকালে বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। অনাদিনাথ বলিলেন, "আমি আপনাকে দিয়ে আস্‌ব ষ্টেশন অবধি, আমার কোন অসুবিধা হবে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "না, না, থাক, আপনাকে যেতে হবে না।"

অনাদিনাথ তাহার ব্যগ্রতায় বিস্মিত হইয়া আর কিছু বলিলেন না। যাইবার বেলায় সে যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখনও হস্তের স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করা ভিন্ন তিনি আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইলেন না। ক্ষণিকার মনের অসাধারণ ব্যথিত অবস্থাটা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কারণটা সব বোঝেন নাই। কথায় মানুষের

ব্যথা যে কমে না, তাহা জানিতেন বলিয়াই কথা বলাটা দরকার মনে করিলেন না।

গৃহিণী বলিলেন, "এসো বাছা, মা বাপ শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠুন, চট্ করে ফিরে এসো।"

ক্ষণিকা মুখের চেষ্টাকৃত হাসিতে বলিতে চাহিল যে সে আবার শীঘ্রই ফিরিবে। কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তর যেন তাহার বাহিরের মিথ্যা হাসিকে তুচ্ছ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর আসব না, এই শেষ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসীতা দেবী।

লিচ্ছবিদেশ বৈশালী

লিচ্ছবিদিগের রাজধানী বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহতীসভা আহূত হইয়াছিল (১)। বৈশালীনগর শাক্যমুনির বাসস্থান বলিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই স্থানে তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন (২)। লিচ্ছবিদিগের আহ্বানে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন (৩)। মহাবীর দ্বাদশটি বর্ষা এখানে যাপন করিয়াছিলেন (৪)। এই দেশ ধনধান্যে পূর্ণ। ইহার জলবায়ু সুন্দর। এখানে শতাধিক বিহার ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে, মাত্র তিনটি কিংবা পাঁচটিতে কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের দেবালয়ও কয়েকটি এখানে আছে (৫)।

লিচ্ছবিদিগের উৎপত্তির পৌরাণিক মতের সহিত তাহাদের রাজ্যের উৎপত্তিরও পৌরাণিক মত জড়িত। লিচ্ছবিদিগের জন্মগ্রহণের সময় হইতে স্থানীয় অন্যান্য বালকেরা তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; এজন্য লিচ্ছবিরা তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল এবং পরিশেষে কৃতকার্য্য হইয়া তাহাদিগকে যেখানে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল তাহার নাম বজ্জি (বৃজি) রাখিয়াছিল।

এই 'বজ্জি' (বৃজি) শব্দ 'বজ্জতব্ব' শব্দ হইতে উদ্ভূত। 'বজ্জতব্ব' শব্দের অর্থ—যাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বজ্জি (বৃজি) রাজ্য তিনশত যোজন বিস্তৃত ছিল। লিচ্ছবিরা এই স্থানে আপনাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাদের রাজপুত্র ও রাজকন্যা বিবাহিত হয়, এবং তাহাদের যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মে। এইরূপে তাঁহাদিগের ষোলটি পুত্র ও ষোলটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বংশবিস্তৃতির সহিত ইহাঁদের রাজ্যও বিস্তৃত হইয়াছিল, এই কারণে রাজধানীর নাম 'বিশাল' বা বৈশালী হইয়াছিল (৬)।

বিষ্ণুপুরাণের মতে বিশাল-স্থাপিত বলিয়া এই রাজ্যের নাম বিশাল বা বৈশালী হইয়াছে। তৃণবিন্দুর ঔরসে ও স্বর্গীয়া অপ্সরা অলম্বুসার গর্ভে বিশাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনিই বিশাল বা বৈশালী নগরের স্থাপয়িতা (৭)। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণসহ গঙ্গা পার হইয়া মিথিলা যাইবার পথে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন (৮)। অত্রত্য রাজা সুমতি তাঁহাদিগের যথোপযুক্ত আতিথ্য-সৎকার করিয়াছিলেন (৯)।

ইতিহাস-বিশ্রুত বৈশালীর ভৌগোলিক স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়। কালিদাসের উল্লিখিত উজ্জয়িনী রাজ্যের শ্রীবিশালা নগরীর সহিত ইহাকে অভিন্ন ধরিয়া অনেকেই গোলে পড়িয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের মতে ইহা প্রয়াগ বা এলাহাবাদ; কিন্তু রামায়ণের মতে ইহা গঙ্গার উত্তরতীরে শোণ নদের সম্মুখে অবস্থিত। গঙ্গার উত্তরতীরে, শোণনদের বিপরীত মুখে বৈশালীর সংস্থান। তাহা হইলে বৈশালী সারণ জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত হইয়া পড়ে। হ্যামিল্টন সাহেব এই মত পোষণ করিয়াছিলেন (১০)।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বৈশালী ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ

১। Buddhism by Monier Williams, pp. 405 and 410.
২। Anguttara Nikaya, Vol. II. Pt. I. pp. 190-194.
৩। Manual of Buddhism by S. Hardy, p. 244.
৪। Kalpa Sutra (S. B. E.) Jaina Sutras, p. 264.
৫। Buddhism by Monier Williams, p. 410.
৬। Manual of Buddhism by Spence Hardy, p. 242. F.
৭। Ramayana (Bombay edition) Balakanda, p. 47.
৮। Ibid. p. 45.
৯। Ibid. p. 48.
১০। Wilson's Vishnupurana.

করিয়া যান নাই। হুয়েন স্যাং এই নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। তাঁর সময়েও সহরটি ২০ মাইল বিস্তৃত ছিল। শতাধিক বিহারের ভগ্নাবশেষ তিনি দেখিয়াছিলেন। কতিপয় বিহার অভগ্ন ছিল এবং এই-সকল বিহারের লোকেরা বিধর্ম্মীদিগের অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ে কিছু উন্নত ছিল (১১)। দেশবাসীরা ধনশালী ছিল। জমীর উর্ব্বরা-শক্তি প্রচুর ছিল। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। দেশবাসীরা নিজ নিজ অদৃষ্টে সন্তুষ্ট। মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের (১২) মতে বৈশালী হাজিপুরের ২০ মাইল উত্তরে পাটনার ২৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে গঙ্গার বামতীরে অবস্থিত। ১৯১৮ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্‌মাইকেল লেক্‌চারে অধ্যাপক ভাণ্ডারকার লিখিয়াছেন যে লিচ্ছবিদিগের রাজধানী বৈশালী, বিহার প্রদেশের মোজাফরপুর জেলার বেসার সহর। বীল (১৩) সাহেবের মতে পাটনাসহরের কিছু উত্তরে গণ্ডকনদীর তীরে বজ্জোরা রাজ্যের রাজধানী বৈশালী অবস্থিত।

ফুল্‌ভা সাহেবের মতে বৈশালীতে তিনটি জেলা ছিল। প্রথম জেলার ভিতর স্বর্ণচূড়ামণ্ডিত ৭০০ গৃহ ছিল। মধ্যম জেলায় ১৪০০০ গৃহ ও রৌপ্যচূড় মন্দির ছিল। শেষ জেলায় ২১০০০ গৃহ ও অনেক তাম্রচূড় বিহার ছিল। এই-সকল জেলায় উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর লোকেরা যথাক্রমে বাস করিত (১৪)। নানাবৃক্ষসমন্বিত দেশটি অতীব রমণীয় ছিল। উদেন, গোতম, বহুপুত্তক, সত্তম্ব, সারণদদ প্রভৃতি নামে সুন্দর সুন্দর চৈত্য ছিল (১৫)। পুরাকালে বৈশালী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। নগরের চারিদিক তিনটি প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। প্রত্যেক প্রাচীর অপরটি হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। নগরের তিনটি দ্বার ও প্রেষণ গৃহ ছিল এবং ৭৭০৭ নৃপতি ইহা শাসন করিতেন। সমসংখ্যক রাজপ্রতিনিধি, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন (১৬)।

নানাবিধ উৎপন্নদ্রব্যে দেশ পূর্ণ ছিল। অধিবাসীরা সন্তুষ্ট ছিল। বৈশালী অমরাপুরীর সহিত উপমিত হইতে পারিত। নানাপ্রকার কুসুমসম্ভারে পূর্ণ, রসাল ফলভারে বৃক্ষসমূহ অবনত থাকিত (১৭); ক্রমরাজের রাজকোষ মণিমুক্তা স্বর্ণরৌপ্যে পূর্ণ ছিল (১৮)। গৌতমের এই সুন্দর রাজ্য বহু-বিস্তৃত ছিল। রাজপুত্রেরা বেশ সদ্ভাবে বাস করিত এবং তাহারা অন্য জাতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত না। এখানে ৭৭০৭ জন রাজপুত্র ভিন্ন ভিন্ন রাজবাটীতে বাস করিত। প্রত্যেকের অধীনে একজন রাজা কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী থাকিত। প্রত্যেক রাজপুত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পর্য্যায়ক্রমে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিত (১৯)।

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে বৈশালী সহরে স্বাধীন-নরপতিবৃন্দ-পরিচালিত রাজ্যে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। লিচ্ছবি নরপতিরা পুণ্যোদকে স্নাত হইয়া রাজকার্য্য করিতেন (২০)। নগরের ভিতরে ও চারিপার্শ্বে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের বহু মন্দির বর্ত্তমান ছিল। অরণ্যচারী যতি সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমের জন্য লিচ্ছবিরা রাজধানীর সন্নিকটে ত্রিকোণ 'হল্'গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (Rhys Davids' Buddhist India, pp. 141-142.)

চিরদিন কখনও কাহারও সমান যায় না। বৈশালীর সুখসমৃদ্ধির দিন শেষ হইয়া এক সময়ে দুঃখের দিন আসিয়াছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অনাবৃষ্টির জন্য শস্য উৎপন্ন হয় নাই। অন্নাভাবে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। লোকাভাবে মৃতের সংকার হইতেছিল না। কোনও গতিকে মৃতব্যক্তিকে লোকেরা রাস্তায় ফেলিয়া দিতেছিল। মৃতদেহের দুর্গন্ধ হইতে দেশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তখন দেশবাসীরা রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইতেছে মনে করিয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল। তখন রাজা তাহাদিগকে তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিতে বলিলেন। তাহারা কিন্তু রাজার কোনরূপ দোষ দেখাইতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা দীনদয়াল বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইল। তাঁহারই কৃপায় আবার বৈশালীর সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছিল। (Paramatthajotika on Khuddakapatha, pp. 158-165)

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

১১। A Manual of Buddhism by Spence Hardy, p. 213.
১২। Buddhism, pp. 409-410.
১৩। Beal's Romantic Legend of Sākya Buddha, p. 28.
১৪। Rockhill's Life of the Buddha, p. 62.
১৫। Divyavadana (Cowell & Neil), pp. 200-201.
১৬। Jataka (Cowell's edition), Vol. I. p. 316.
১৭। Rockhill's Life of the Buddha, p. 63.
১৮। Beal's Romantic Life of the Buddha, p. 28.
১৯। A Manual of Buddhism by S. Hardy, pp. 242-243.
২০। Jataka (Cowell's edition), Vol. IV. p. 148.

পূজারী

গ্রামের এক টেঁয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শালপাতার ছাউনি দিয়ে ঘেরা একখানি কুটির—চাঁদের বুকের কলঙ্ক-রেখার মত বড় সুন্দর, আয়নার মত জলজ্বল, স্বভাব-সুন্দরীর সযত্ন-রচিত কবরীর মত ফিটফাট—পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। সেই কুটিরের বুকে আলোকের ঝিলিকি হেনে মহেশের ললাটনেত্রের ন্যায় যে আগুনের চুল্লী দিনরাত জ্বলতো তারই পাশে আগুনের আলোককেও ম্লান করে বাস করতো তরুণ দীপ্ত সন্ন্যাসী—জোয়ারের জলে ভরা নীল গম্ভীর সমুদ্রের মত ছিল তার লাবণ্য—শরতের ঘন নিবিড় রৌদ্রের মত ছিল তার তরুণ যৌবন। কুটিরের ভিতরে শালপাতের পুঁথি এবং ভস্ম-বিভূতি নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতো সে, যে বাইরের সাড়া তার কানের কাছে বড় পৌছাত না। কেবল নিবিড় সন্ধ্যা নদীর ওপারে বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে তরল সোনার ঢেউয়ের মত যখন গলে পড়তো, নদীহৃদয়ের মৃদুগুঞ্জন বিশ্ববীণার ছন্দের সাথে তাল রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে যখন বড় অধীর হয়ে এক-একবার কান্নার মত করে কেঁপে উঠতো, তখন আর কেউ তাকে ধরে রাখতে পারতো না। সদ্যস্নাত সন্ন্যাসী তখন রক্তবরণ রবির দিকে তার প্রকাণ্ড হাত দুটো তুলে ধরে উদাত্ত কণ্ঠের বন্দনাগীতিতে নীল আকাশ ও মাতাল বাতাস ধ্বনিত করে তুলতো। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউগুলো ভক্তের মত ছুটে এসে ভাঙ্গা নটকনার মত তার রাঙ্গা পায়ের প্রান্ত ঘেঁষে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে লুটে পড়তো।

একদিন অমনি করে সন্ন্যাসী যখন সৌন্দর্য্যের বন্দনায় ব্যস্ত, তখন তার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলো তরুণী রাজকন্যা অরুণা। খেয়ালের রাণী সেদিন মরালের মত সাঁতারে সাঁতারে ভরা নদীর নীল জলধারাকে ওলটপালট করে দিয়ে বিদ্যুৎপুঞ্জের মত তনুলতাখানি নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল—কক্ষে ছিল তার ভরা ঘট—বক্ষ জুড়ে তার আলিঙ্গনের মত হয়ে জড়িয়ে ছিল ধূসর ধোঁয়াটে একখানি শাড়ী। সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই জলভরা ঘট কাঁখে নিয়ে, ফিরবার কথা ভুলে গিয়ে, বাতাসের বুকে ফুলের গন্ধটুকুর ন্যায় সেই দৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অর্পণ করে সে আড়ষ্ট অচল হয়ে থমকে দাঁড়াল। আর এদিকে আলোর আরতি শেষ করে সন্ন্যাসী ফিরে চাইতেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেইখানে যেখানে জমাট যৌবনের মত রাজকন্যা অরুণার তরুণ তনুলতাকে বেষ্টন করে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা আলিঙ্গনের মত হয়ে নেমে পড়েছে।

সন্ন্যাসী দেখলো কি সে সুন্দর মুখ! বসন্তের নিবিড় স্পর্শের মত তার সমস্ত হৃদয় একটা পুলকস্পন্দনে ভরে উঠলো। উচ্ছল নদীর কলগাথার ন্যায় একটা আকুল ক্রন্দন তার বক্ষতটকে আঘাত করে ফেটে টুটে পড়তে লাগল? তার হৃদয় অত্যুগ্র ব্যথায় কাঁদতে গিয়ে সেদিন সাড়া দিল—সে সার্থক—ওগো আজ সে সার্থক।

সন্ন্যাসীর উদাত্ত সেই দৃষ্টির সম্মুখে সারা গায়ে রাজ্যের লজ্জা জড়িয়ে, ভরা ঘট ছলকিয়ে, নতমুখী তরুণী হাওয়ার মত লঘু পা ফেলে তেমনি করে ধীরে ধীরে সরে গেল যেমন করে প্রভাতের ফোটা পদ্মটি বাতাসের ঘায়ে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা বেলায় জলের তলে নুয়ে পড়ে।

ওগো তুমি কে গো—তুমি কি? বসন্তের আনন্দমঞ্জরীর মত তোমার পুষ্পিত তনুলতা! বর্ষার পরিপূর্ণ তটিনীর ন্যায় পরিপূর্ণ যৌবনের স্বচ্ছ আভাস তার কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত! গানের মূর্চ্ছনার মত তোমার করুণ দৃষ্টি—কবিতার ছন্দের মত তোমার ললিত গতি! ওগো চেয়ে দেখ, তারই লীলা প্রতিপদক্ষেপে এক-একটি করে শতদল পদ্ম ফুটিয়ে আমার বুকের উপর তোমার গতিবেগের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। কি লঘু তোমার দেহ—কি মদির—কি স্নিগ্ধ তার ভঙ্গিমা!

সন্ন্যাসীর সমস্ত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আর্ত্তনাদের মত কি একটা বয়ে গেল। সাথে সাথে ঝড়ের মত করে সমস্ত হৃদয়টাকে ওলটপালট করে দিয়ে গেল। সে কঠিন মাটির উপর শুয়ে পড়ে তার ভগবানকে ডেকে বললে—ওগো অন্ধকারের আলো, দুর্দ্দিনের বন্ধু, আজ আমার হৃদয় গুরুভারে অবনত—ভয়ে ভাবনায় বিচলিত। আমার মন

বিক্ষিপ্ত—চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত—শরীর অবশ। আমাকে সবল কর প্রভু—সবল কর।

পরের দিন ভোরের বাতাসে জেগে সন্ন্যাসী যখন চক্ষু চাইলো তখন তার হৃদয় একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। কি একটা গভীর আনন্দে তার সবটা মন ভরপুর। সাদা মেঘের মত নীল আকাশের তলে সে যেন উধাও হয়ে উড়ে চলেছে। মাঝে কোনোখানে কোনো বাধা নেই। কেবল অন্তরের ভিতরে যেখানে তার মূর্ত্তিহীন দেবতার কনক আসনখানি ক্ষুধিত তৃষিত হয়ে এতদিন ধরে খালি পড়ে ছিল সেইখানে ভেসে উঠেছে এক অনিন্দ্য-সুন্দর তরুণীমূর্ত্তি।

তারপর হতে ওপারের ভরা সন্ধ্যা দিনের পর দিন এপারে যখন ঘন হয়ে নেমে আস্‌তো, সন্ন্যাসী ঘাটে এসে দাঁড়াত; আর তরুণী রাজকন্যা সেই ভরা ঘট কাঁখে নিয়ে গমনের পথে তার দিকে আকাশের একটি মাত্র নক্ষত্রের ন্যায় চেয়ে থাক্‌তো। কেউ কোনো কথা কইতো না। কারো পরিচয় কেউ জান্‌তে চাইতো না। শুধু তাদের দুজনের দৃষ্টির ভিতরে ভিতরে কথা চল্‌তো—এর দৃষ্টি ওকে ডেকে বল্‌তো—"আমি তোমায় চিনি—ওগো আমি তোমায় চিনি—জন্ম জন্ম আমাদের এই প্রেম আর-সবাইকে বঞ্চিত করে এমনি করে সঞ্চিত হয়ে এসেছে। এই উন্মুখ হৃদয়ের অগাধ প্রেমে আমরা দুইজনা দুইজনকে অভিষিক্ত করে উজ্জ্বল করে তুলব। কোনোখানে এতটুকু সঞ্চিত করে রাখ্‌বো না—আমি তোমাকে সব দেবো বন্ধু—সব দেবো।"

আনন্দের অশ্রুধারার মত ভরা হৃদয় নিয়ে সন্ন্যাসী ঘরে এসে ভাব্‌তো অরুণার সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখের কথা। নির্ব্বাক প্রণয়ের মুখর গুঞ্জন তাকে অধীর করে তুল্‌তো। পুলক-চঞ্চল তার দেহের ভিতর মূর্চ্ছার মত কি একটা আবেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তো তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌তো না। বুকের উপর দুটি হাত তুলে ধরে, চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে সে স্বপ্ন দেখ্‌তো তার হৃদয়ের মাঝখানে নেমে এসেছে কার দুটি স্নিগ্ধ বাহুর নিবিড় আলিঙ্গন। কি সে স্পর্শ! ফুলের মতন তার ভিতর হ'তে গন্ধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে—মদের মত তার ভিতর হ'তে একটা নেশা জমাট বেঁধে বা'ইরে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

দিনের পর দিন এমনি করে যখন তাদের ভাষাহীন পরিচয় আষাঢ়ের মেঘের মতন গাঢ় হয়ে উঠ্‌ছিল, তখনই সহসা একদিন গ্রামবাসীদের নির্দ্দয় বজ্র তাদের প্রতি উদ্যত হয়ে উঠ্‌লো। এই গোপন আঁখির প্রচ্ছন্ন অভিসারকে তারা সহ্য কর্‌তে পার্‌লো না। রাজাকে জানালো তারা—সন্ন্যাসী সাধুপুরুষের ব্যভিচারীর মত এই ব্যবহার। সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে সন্ন্যাসীর তলব পড়্‌লো।—

রাজবাড়ীর ভিতর পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা রাজার দর্‌বার-খানা। সেইখানে সোনার সিংহাসনে বসে সোনার মত কঠিনহৃদয় মহারাজ নিদারুণ হৃদয়হীনতার সাথে দণ্ড দিতেন, আর ততোধিক হৃদয়হীনতার সাথে সভাসদ্‌গণ তাকে বরণ করে নিত। রাজসভার করুণ কম্পিত হৃদয় সে ঘোষণায় গভীর ব্যথায় আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌তো। কেবলমাত্র রাজকন্যা অরুণার মর্জ্জি যেদিন তাকে রেশমের জালে ঢাকা দর্‌বারখানার জানালার ফাঁকে টেনে আন্‌তো সেদিন এই পাশবিকতা আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠ্‌তে সাহস পেত না—বসন্তের পল্লবশ্রীর মত কোমল একটা আভা সেদিন রাজসভাকে মায়ের মমতার মত করুণ স্নেহে একেবারে ভরপুর করে রাখ্‌তো। কিন্তু কিছু দিন হ'তে দর্‌বারের জালায়নে রাজকন্যার মণিকাটা সিংহাসনের দিকে চাইলেই দেখা যেত—সিংহাসনটা খালি পড়ে রয়েছে। তার মণির দীপ্তিকেও নিজের আগুনের মত দীপ্তি দিয়ে যে উজ্জ্বল করে রাখ্‌তো সে রাজকন্যার সন্ধান সেখানে এখন বড় একটা মিল্‌তো না। সকলে মনে কর্‌তো, বুঝি রূঢ়তার ছোঁয়াচ ফুলের মত কোমল স্থানটাকেও স্পর্শ করে দিনে দিনে পলে পলে কঠোর করে তুলেছে—অহল্যার ন্যায় রাজকন্যার শিশিরের মত কোমল দেহটাও বুঝি তার রুদ্র অভিশাপে ধীরে ধীরে পাষাণে পরিণত হয়ে গেছে।

এমনি যে রাজদর্‌বার সেইখানে সহসা একদিন এসে দাঁড়ালো সেই সগর্ব্ব-স্বাধীন তরুণ কান্ত সন্ন্যাসী।—

এ কে—এ কে গো এ? তরুণ তাপস যে হাসির মত সুন্দর—শিশুর মত সরল। এর আবার অপরাধ কি!

ভীত সকলের বুকের ভিতর কেঁপে উঠ্‌লো। নিশ্বাসের বাতাস দেয়ালে বেধে কেঁদে গাইলো—হায়-হায়-হায়রে! সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়্‌লো জরীর জাল দিয়ে ঢাকা সিংহাসনের পিছনে। সেখানে মণির ঝাঁ্গরে ঘেরা রেশমের ওড়্‌নাতে অনেকদিন পরে ইন্দ্রধনুর বর্ণরাগবৈচিত্র্য বিকশিত হয়ে ওঠে কি না তাই দেখ্‌বার জন্য সকলের নয়ন একসঙ্গে চলচঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

সন্ন্যাসীর নবারুণের মত সেই মুখখানির দিকে বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহসা আপনাকে সচেতন করে তুলে রাজা বল্‌লেন—সন্ন্যাসী, তোমার ব্রত ইন্দ্রিয়-সংযম—লালসার নিবৃত্তি। তুমি এ কি করেছ! আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবো।

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিল—মহারাজ আপনি ভুল করেছেন। আমি সৌন্দর্য্যের পুরোহিত। আমি তারই পূজা করেছি। অন্যায় কিছু করি নি।

রাজা তাঁর স্বাভাবিক কঠোর কণ্ঠস্বরকে আরো কঠোর করে বল্‌লেন—তুমি তন্ময় হ'য়ে যুবতীর পানে চেয়ে থাকৃতে, সে সাক্ষীর অভাব হবে না।

কথার ভিতরে আপনাকে অর্পণ করে সন্ন্যাসী বল্‌ল—মহারাজ, সে যুবতী যে রূপের দীপালী—সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। আমি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে দেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের গায়ে আপনাকে নিবেদন করেছি মাত্র—আর কিছু তো করি নি।

ক্রোধ-কম্পিতস্বরে রাজা বল্‌লেন—পণ্ডব্রত সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্ত—

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই অন্তঃপুরের দুয়ার খুলে সিংহাসনের তলে এসে দাঁড়ালো শরতের আকাশের রঙ্গের মত নীল ঘোম্‌টার মেঘে ঢাকা রাজকন্যা অরুণার দাসী। তার জ্যোৎস্নার মত সুন্দর হাতে সোনার থালার উপর পড়ে রয়েছে ভূর্জ্জপাতে লেখা রাজার নামের চিঠি-খানি। এইরকম অপ্রত্যাশিতভাবে রাজকন্যার চিঠি দাম্ভিকতার রক্ত-লোলুপ অগ্নিজিহ্বার উপর আরো কতবার মেঘমেদুর আকাশের অবিরল জল-ধারার স্নিগ্ধ প্রলেপ টেনে দিয়েছে—সে কথাটা মনে পড়্‌তেই রাজসভার এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজকন্যার জয়ধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো। রাজা রুদ্র রোষ দমন করে হেসে বল্‌লেন—সন্ন্যাসী, তুমি ভাগ্যবান। রাজকুমারী তোমার বিচারভার গ্রহণ করেছেন।

সেদিন অজস্র কালো কেশের মত অন্ধকারের নাগপাশ সমস্ত আকাশ বাতাস ঢেকে ফেলে আপনার বীভৎসতায় ভীত হয়ে আপনিই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। ঝঞ্ঝার ঝাপট ক্ষ্যাপা দৈত্যের মত পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু করে ফুৎকারে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে ফুলে ফুলে গর্জ্জাচ্ছিল এবং ভারি ভারি মেঘগুলো বাঁকা বিদ্যুতের তরবারের আঘাতে দিক হ'তে দিগন্ত পর্য্যন্ত চিরে দিয়ে কি একটা নিবিড় বেদনায় গভীর হাহাকারের মত হয়ে একেবারে ধরিত্রীর বুকের উপর ফেটে ভেঙে পড়্‌ছিল।

রাজকন্যা অরুণা প্রকৃতির প্রলয়ের মত সেই নিমন্ত্রণকে সার্থক করে বজ্র-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়ালো বাহিরের অন্ধকারের মত নিবিড় কালো কারাগারের ভিতর। তার কঠিন পাষাণস্তূপের উপর একমুঠো ঝরে-পড়া শেফালিগুচ্ছের মত যে জায়গায় পড়ে ছিল ধ্যান-মৌন অপূর্ব্বসুন্দর সেই সন্ন্যাসী সেখানটায় এসে তার লীলার মত ললিত পদক্ষেপ একেবারে স্থির নিশ্চল হয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারপর কোনো ইতস্তত না করেই একটি ফুলের উপর আর-একটি ফুল নুয়ে পড়্‌ল। রাজকন্যা আবিষ্টের মত সন্ন্যাসীর বাহুমূল স্পর্শ করে বল্‌ল—চেয়ে দেখ সন্ন্যাসী, তোমার দুয়ারে আজ কে নেমে এসেছে—তোমার মৃত্যুভয়াতুর দুঃখের রাত্রি আনন্দের সূর্য্যকর-লেখায় উদ্ভাসিত করে চেয়ে দেখ—হে চিরসুন্দর, হে চিরসুহৃদ কে আজ নেমে এলো গো—কে আজ নেমে এলো! এ কি কণ্ঠস্বর—এ কি স্পর্শ! সন্ন্যাসীর রেশমের মত পক্ষ্মদলের ভিতর প্রভাতের অরুণ-লেখার মত আনন্দের একটা স্পন্দন জেগে উঠ্‌ল—নীলপদ্মের মত তার বিস্ফারিত চোখ দুটির মুগ্ধ দৃষ্টি সে নিক্ষেপ কর্‌লো প্রজাপতির মত বিচিত্র-বেশ-বিলসিতা রাজকন্যার মুখের উপর। কিন্তু এ কে গো—এ কে? কোথায় তার সেই নিরাভরণা সদ্যস্নাতা জল-কলসী-ভার,

মন্ময়ী প্রেয়সী যে বসন্তের অসজ্জিত গৌরবশ্রীর মত সুন্দর, লজ্জায় রক্তরাগা গণ্ডের মত অপূর্ব্ব—সে কোথায় গো—সে কোথায়? মণিমুক্তাভূষিতা ফিরোজা রঙের ওড়্‌নার আড়ালে খড়ের মত উদ্দৃপ্ত রাজকুমারীর মুখের উপর জলন্ত চোখ দুটো স্থাপন করে সন্ন্যাসী আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—তুমি কে—তুমি কে গো! আমি তো তোমাকে চাই নি—

"ভুল করো না বন্ধু, ভুল করো না—আমি রাজকন্যা অরুণা। এই কঠিন পাষাণ এ তো তোমার যোগ্য উপাধান নয় প্রিয়তম। জাগ বন্ধু, চেয়ে দেখ।" সঙ্গে-সঙ্গেই ফুলের মালার মত তার গলায় জড়িয়ে গেল রাজকুমারীর তরুণ কোমল বাহুলতা—আর বৃষ্টির মত তাকে আচ্ছন্ন করে নেমে এল দুটি তপ্ত লোলুপ ক্ষুধিত অধরোষ্ঠের অজস্র চুম্বনধারা।

মুহূর্ত্তের জন্য সন্ন্যাসীর দেহখানিও অবশ হয়ে এলিয়ে পড়্‌ল—তারপর বাণাহত কুরঙ্গের মত একেবারে সোজা হয়ে দাড়িয়ে সজোরে দুই হাতে সেই কিশলয়ের মত কোমল দেহখানি সরিয়ে দিয়ে সে চীৎকার করে বল্‌ল—সরে যা, তুই সরে যা তোর আলিঙ্গনের চাইতে মৃত্যুর আলিঙ্গন অনেক স্নিগ্ধ, অনেক মধুর।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাতা রাজকুমারী গর্জ্জন করে বলে উঠ্‌ল—তাই হোক্, তবে তাই হোক্। রমণীর প্রেমের সঙ্গে যে এমন করে প্রতারণা কর্‌তে পারে, জমাট তুষারের মত হিম তুহিন মৃত্যুই তার যথার্থ পুরস্কার, ঘাতকের খড়্গের আলিঙ্গনই তার যোগ্য আশ্রয়। রাজকুমারী অরুণা এই প্রথম এই শেষবার ভণ্ড দাম্ভিক সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চরম দণ্ডাজ্ঞা প্রচার কর্‌চেন—বলেই সে স্খলিত উল্কার মত কক্ষের ভিতর প্রলয়ের দীপ্তি হেনে ঝড়ের মত করে বেরিয়ে গেল। আর সন্ন্যাসী সোয়াস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে রূঢ় পাষাণের বুকের উপর আপনাকে অর্পণ করে কেঁদে গাইল—ওগো আমার সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব প্রতিমা—তুমি কোথায় গো—তুমি কোথায়!

সেদিন ভোরের বাতাস ফুলের গন্ধের উপর ঢলে পড়্‌বার আগেই পিশাচখানার মত রাজার কোতলখানার চারিদিকে সাগর-কল্লোলের মত জনসমুদ্রের কলকোলাহল জেগে উঠেছে। রাজকুমারী অরুণার মোমের মত করুণ হৃদয় যাকে বাঁচ্‌বার আদেশ দিতে পার্‌লো না, তাকেই দেখ্‌বার জন্য সহর ভেঙে বন্যার স্রোতের মত জনস্রোত ছুটে চলেছে। কিন্তু আজ আর তাদের মুখে রাজকন্যার জয়ধ্বনি মেঘের দীর্ঘায়ত গুরুগর্জ্জনের মত আকাশ ভরে বাতাস আলোড়িত করে তুল্‌ছে না। লক্ষ লোকের চোখের দৃষ্টি ভরে রেখেছে আজ দ্বিধার মত একটা গভীর বিস্ময়।

পূর্ব্বের দিক রাঙা করে একখণ্ড জলন্ত আগুনের মত নবারুণের রক্ত আঁখি ভোরের আকাশে যেমন জেগে উঠ্‌লো মৃত্যুর মাচার উপর দিক আলো করে এসে দাঁড়ালো প্রশান্ত নির্ভীক সেই সন্ন্যাসী। তার কালো কালো চোখে একখানি দৃষ্টি বড় ব্যগ্র বড় করুণ। সেই একখানি দৃষ্টির ভিতরে বড় এক ফোঁটা অশ্রুর মত সবটা হৃদয় ফুটিয়ে তুলে সে আজ চারিদিকে তার সৌন্দর্য্যপ্রতিমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে যে আজ নিঃশেষে নিজকে বোঝাতে চায়, হৃদয়ের নীরব প্রেমকে পরিস্ফুট করে নিবেদন কর্‌তে চায়, বাইরের বাধা লোকলজ্জা সব মুছে ফেলে আপনাকে দেখাতে চায়—সে কোথায় গো—সে কোথায়!

সহসা সমস্ত জায়গা ঘুরে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সেইখানে এসে স্থির হয়ে দাড়ালো যেখানে দূরে সিংহাসনের গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে মূর্ত্ত শোকের মত তরুণী রাজকুমারী অরুণা। আজ আর তার দেহ বেষ্টন করে হীরকের সূচীমুখ অলঙ্কারগুলো হাসির দীপ্তির মত ঝকমক্ করছে না—রূপের জ্যোতি বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে তার সোনার মত গাখানি বেড়ে পড়ে আছে অতি সাধারণ ধূসর ধোঁয়াটে সেই শাড়ীখানি। তার বুকের ভিতর রক্তের স্রোত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। তার হৃদয়ময় আঘাত করে ফির্‌ছে কেবল একটি মাত্র ধ্বনি—তোমায় আমি এ কি দিলাম বন্ধু—এ কি দিলাম!

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি রাজকুমারীর মুখের উপর পড়েই একটা নিবিড় চুম্বনের রেখার মত হয়ে হেসে উঠ্‌লো। তার সবটা হৃদয় যেন ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌লো—ওগো আমার প্রতি-প্রভাতের ধ্যানের দেবতা—প্রতিসন্ধ্যার জলভার-নতা তরুণী, প্রতিরাত্রের স্বপ্নের প্রতিমা, তুমিই তবে রাজকুমারী

অরুণা! কাল তোমাকে চিন্‌তে পারিনি সখী, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর গো—মার্জ্জনা কর। কিন্তু তোমার চোখের ভিতর অশ্রুবিহীন কান্নার মত ওকি বেদনা আজ ফুটিয়ে তুলেছ? আজ তো তোমার কান্নার দিন নয় প্রিয়তমে! যে প্রেম মানুষকে মাটির সাথে নুইয়ে ফেলে আমি তো তাকে চাইনি। তাইতো তুমি একহাতে জীবন আর একহাতে মৃত্যু নিয়ে ফুলের মত নুয়ে পড়ে বজ্রের মত কঠিন হ'য়ে আমার চোখে জেগে উঠেছ।

বিদ্যুতের তরবারে আকাশকে দীর্ণ করে বজ্র যেমন হ'য়ে ধরণীর বুকের উপর ফেটে টুটে ভেঙে পড়ে তেমনি করে সন্ন্যাসীর বুকের উপর ফেটে পড়ে রাজকন্যার সেই একটি কথা আবার হাজার স্বরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো— আমি তোমাকে এ কি দিলাম বন্ধু—একি দিলাম!

ধনুকের মত সুন্দর চোখ হ'তে তীরের মত হাসিরাশি ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী বল্‌ল—ছিঃ ছিঃ দুঃখ করো না রাজকুমারী, তোমার ন্যায়বিচারে ভণ্ড পূজারীর প্রতি যথার্থ দণ্ডই বিধান করেছ। যে নিজের খেয়ালে মগ্ন থেকে প্রাণের দেবতাকে চিন্‌তে পারে না—মৃত্যুই তো তার যোগ্য পুরস্কার। পূজার ফুল যে আনন্দ নিয়ে দেবতার পায়ে ঝরে পড়ে সেই আনন্দে আমার হৃদয় আজ পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। তোমার ঐ অশ্রুজলের ঝরণায় আমার এই অপূর্ব্ব সার্থকতা এই বিজয়-গৌরবকে ভাসিয়ে দিও না গো—ভাসিয়ে দিও না।

মুখের ভাষার মত করে সন্ন্যাসীর প্রাণের কথাগুলি ঢেউয়ের মত করে ধীরে ধীরে লুটে পড়্‌লো অরুণার দলিত আঙ্গুরের মত মথিত বুকের উপর। মর্ম্মটাকে ভেঙে চূরে রেণু রেণু করে দিয়ে এবার তার হৃদয় গেয়ে উঠ্‌লো—কোথায় যাবে বন্ধু, কোথায় যাবে, আমার এই উন্মুখ প্রেম পরিত্যাগ করে তুমি কোথায় যাবে। কেন এই রাক্ষসীর চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলে প্রিয়তম,—প্রেমের এমন প্রতিদান কেউ কি কখনো দিয়েছে? কাল যদি এমনি করে একবার ডাকৃতে বন্ধু—কাল যদি চিন্‌তে—

কিন্তু তার প্রাণের কথা চোখের ভাষায় শেষ হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বার আগেই ঘাতকের খড়্গ সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক করে উঠে বিদ্যুতের মত নেমে এলো ফুলের অর্ঘ্যের মত সুন্দর সেই সন্ন্যাসীর মাথার উপর। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর সংজ্ঞাহীন দেহ বোঁটাখসা শেফালিটির মত সিংহাসনের গোড়ায় লুটিয়ে পড়্‌লো। উন্মত্তের মত পায়ের আঘাতে সিংহাসন ছুড়ে ফেলে বেপমান বাহুপুটে রাজা যখন তার তনুলতাখানিকে বুকের উপর তুলে ধর্‌লেন তখন সে শরীর হিম—জড়—অসাড় হয়ে গেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

মহারাজা পূজা

দিনাজপুর জেলার কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ সদর মহকুমার পশ্চিমাঞ্চলে, "মহারাজা" পূজা নামে কৃষকদের মধ্যে একটি বারয়ারী পূজা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ কিংবা পৌষ মাসে, ধান পাকিলে, ধান কাটা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে, কখন কখন বা পরে, এই "মহারাজার" পূজা হয়। নবান্নের আনন্দের সময়ে মহাউল্লাসে কৃষকেরা সকলে চাঁদা করিয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে সমারোহ-আড়ম্বরহীন পূজার অর্ঘ্য "মহারাজার" চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস মহারাজার অনুগ্রহে তাহারা যথাসময়ে কৃষিকাজের জন্য জল এবং জীবনধারণের জন্য ভাল ফসল পাইয়া থাকে। সুতরাং মহারাজার পূজা অর্চ্চনা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক কৃষক কর্ত্তব্য মনে করে। প্রতিগ্রামে এই মহারাজার পূজা হইয়া থাকে। গ্রামের খোলা ও উঁচু জায়গায় "মহারাজ" দেবতার একটি করিয়া ধাম আছে। মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচর দেবতাগণেরও পূজা হইয়া থাকে। দেশের রাজা-মহারাজার যেমন অনেক আম্‌লা লস্কর থাকে, দেবতার মহারাজারও তেমনি অনেক অনুচর আছে। এবং মহারাজার ধামে তাহাদের পৃথক পৃথক্ "থান" (স্থান—বেদী) আছে। এই সকল অনুচর

দেবতা "মহারাজার" তাবেদারীতে খাটে এবং তাঁহার হুকুম পেশ ও পর্‌ওয়ানা জারী করাই ইহাদের কাজ। মহারাজা-দেবতার অনুচরগুলির মধ্যে কতকগুলি হিতকর কর্ম্মে এবং কতকগুলি অহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। হিতকরকার্য্যে নিযুক্ত অনুচর হইতেছেন—মহাশান্তি, লক্ষ্মী এবং কাণ্ডী। মহাশান্তি দেবতা মানুষের সুখশান্তির মালিক। লক্ষ্মী ধানের গোলার রক্ষয়িত্রী এবং ধনৈশ্বর্য্যদায়িনী। কাণ্ডী গো-পালক; গোধন রক্ষা এবং গরুর রোগ ব্যাধি তাহার হাতে। অনিষ্টকারী দেবতা—মহাকাল (যম), কালী, হনুমান মহাবীর, বুড়ী, ও গুটি। সৃজন-পালন-সংহারের মধ্যে শেষের কাজটি মহাকালের, কালীরও তাই। হনুমানের কাজ ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া মানুষের ঘর বাড়ী উল্টাইয়া ফেলা। প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও হনুমানের এই কাজ দেখা যায়। পবনদেবের পুত্র বলিয়াই বোধ হয় ইনি এই কাজ এবং শক্তি পাইয়াছেন। মহাবীর রাত্রে লোকালয়ে আসিয়া নাকি মানুষের গায়ে কামড় দিয়া বড় বড় ঘা ও ব্রণ করিয়া দেন। বুড়ীর কাজ খোস পাঁচড়া চুলকানীর সৃষ্টি করা। তাহার ভগিনী গুটির কাজ বসন্ত-রোগের সৃষ্টি করিয়া লোককে মারা।

এই মহারাজা দেবতাটি কে? তাহার আলোচনা করা একটু দর্‌কার। কৃষকেরা "মহারাজা" ছাড়া অন্য কোন নামে তাঁহাকে জানে না। তাহারা বলে তিনি সকল ভূতপ্রেতের রাজা। এই দেবতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে তাঁহার কাজ এবং বিগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। শাস্ত্রাদিতে বোধ হয় মহারাজা বলিয়া কোন দেবতার নাম নাই। কাজেই ইনি অনার্য্য দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন। কিন্তু মহারাজার বিগ্রহ দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয় যে ইনি দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। মহারাজার বাহন হাতী, হাতে একটি অস্ত্র। মহারাজার কাজ পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করা। পূজার সময় এবং অনাবৃষ্টি হইলে কৃষকেরা জলের জন্য "মহারাজার" নিকট প্রার্থনা করে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে কৃষকদের পূজিত "মহারাজা" এবং দেবগণের রাজা ইন্দ্র একই দেবতা। তাহারা "মহারাজা" দেবতাকে পার্থিব রাজার মতই কল্পনা করে এবং রাজার মতই তাঁহাকে ভয় ভক্তি করে। মহারাজার নিকট প্রার্থনা জানাইবার দুইটি উপায় আছে,—প্রথম, সকলে মিলিয়া তাঁহার ধামে গিয়া নাম কীর্ত্তন; দ্বিতীয়, ধামী বা সেবাইতের সুপারিশ। কৃষকদের বিশ্বাস যে কিছু মানত করিলেই গ্রামে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ সারিয়া যায়, এবং সকলে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেই বৃষ্টি হয়।

মহারাজার প্রথম কাজ কৃষির তত্ত্বাবধান, দ্বিতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা, তৃতীয় গোরক্ষণ। দেবদেবী মানুষের মনগড়া। তাই পূজকের অনুরূপ দেবতা হয়। কৃষক-পূজিত মহারাজা কৃষি সুবৃষ্টি গোরক্ষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার দেবতা। কৃষকেরা নিরক্ষর, সরস্বতীর ধার ধারে না, তাই তাদের দেবতা মহারাজার অনুচর দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী আছেন কিন্তু সরস্বতী নাই।

অশিক্ষিত লোকেরা বিশ্বাস করে যে মানুষের রোগ-ব্যাধি দেবতার কোপে হয়। দেবতারা লীলাখেলা করিতে সাধারণতঃ ভাল বাসেন। মহারাজাও নাকি লীলাখেলার জন্য এবং অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য ভূত প্রেত দেও প্রভৃতিকে মানুষের উপর লাগাইয়া দেন। তাহাতে মানুষের পীড়া হয়। পূজা দিয়া মহারাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই সকল প্রকার অসুখ সারিয়া যায়। দুনিয়ায় যত ভূত প্রেত দেবতা উপদেবতা আছে, সকলেই মহারাজার অধীনে, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞাবহ। তিনি 'সদাই' (সদয়) থাকিলে কোন দেবতাই গ্রামে কিছু করিতে পারে না। অতএব মানুষের সুখ দুঃখ, ব্যাধি পীড়া মহারাজার হাতে। নিজ-গ্রামে কিংবা নিকটবর্ত্তী গ্রামে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক এবং মারাত্মক রোগ হইলে গ্রামবাসীরা সকলে মহারাজার নিকট কিছু মানত করে অথবা সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মহারাজার বাহের (বাহিরের, অসময়ের) পূজা দেয়।

মহারাজা-পূজার বিশেষত্ব এই যে পূজা ব্রাহ্মণে করে না; কৃষকেরা নিজেরাই করে। তাহাদের মধ্যে একজন ধামী বা সেবাইত থাকে, সেই পূজা করে। কাজেই পূজার মন্ত্রগুলি সংস্কৃতে না হইয়া দেশীভাষায়। মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের—প্রথম, লাভান (নামান = আহ্বান); দ্বিতীয়, ধিয়ান (ধ্যান); তৃতীয়—শান (শান্তি)।

মহারাজার পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ বা দিন নাই। সাধারণতঃ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে এবং মঙ্গল অথবা শনিবারে পূজা হইয়া থাকে। ধানকাটা আরম্ভ হওয়ার পর মহারাজার পূজা হইলে, পূজার দিন কৃষকের ধানকাটা অথবা কৃষিসম্বন্ধে কোন কাজ করা নিষেধ। পূজার দিন বিকাল বেলায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিপূতহৃদয়ে মহারাজার ধামে উপস্থিত হয়। বেলা ৪টা কি তাহার একটু আগে পূজা আরম্ভ হয়। পূজার সামগ্রী আতপ চাল কলা দুধ চিনি বাতাসা ও অন্যান্য সন্দেশ; মহাকালের ও কালীর জন্য একজোড়া করিয়া কবুতর, কখনও কখনও পাঁঠা; কাত্তীর জন্য তীরধনুক গাঁজা কল্কে হুকা। মহারাজা স্বয়ং, মহাশান্তি, লক্ষ্মী, হনুমান্—এই চারজন দেবতা নিরামিষাশী। আর বাকী সব দেবতা রক্ত খাইতে খুব ভালবাসেন; এইজন্য তাঁহাদের নিকট কোন "গুনহা" (অপরাধ) করিলে তাঁহারা মানুষের কাঁচা রক্ত খাইয়া প্রতিশোধ লন।

প্রথমে মহারাজার পূজা করিতে হয়; তারপর অন্যান্য দেবতার। পূজায় ঢাক ঢোল কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টার দরকার। উপরন্তু একদল কীর্ত্তনীয়া (যাহারা কীর্ত্তন করে) চাই। ধামী অর্থাৎ সেবাইত—অবশ্য তিনি অব্রাহ্মণ—আসিয়া মহারাজার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাকে বসান কহে। বসানের মন্ত্র এই—

শংক সাট শংক পাট শংক সিংহাসন।
শংক পাটে মহারাজ মহাশান্তি জুরিলে আসন।
আইস প্রভু বইস পাটে পূজা-পাটী লেহ হাতে হাতে।
পূজা-পাটী লেহ হস্তে করিয়ে।

এই মন্ত্র জপিয়া পূজার সামগ্রী মহারাজাকে নিবেদন করে। পরে মহারাজার "লাভান" বা আহ্বান করে। লাভান মন্ত্র—

পহিলে (প্রথমে) বন্দিমু চান (চাঁদ) সুরুজ দুইজন,
চৌদিগে বন্দিমু এতিন ভুবন।
এক মন তিন প্রাণ থির (স্থির) করিয়ে
বন্দিমু মহারাজার চরণ।
লাভ (নাম) মহারাজ স্বর্গ ছাড়িয়ে
মঞ্চত (মঞ্চে) দেহ পাও
মঞ্চত আসিয়া ভকতের পূজাপানি খাও।
মহারাজ মহাশান, সকল থানে তোম্হার ধাম।
ভকত ডাকিছে ভোগ ভাগ দিয়া,
আইস মহারাজ হাতীত চড়িয়া,
আন যেত (যত) দেবগণ সঙ্গত (সঙ্গে) করিয়া।
গীর গীর (গুরু গুরু) দেওয়ায় (মেঘে) ডাকে,
চারিদিগ পরি গেল হাঙকার (সাড়া),
উত্তরের দেবগণ সাজিয়ে আইল জনে জন।
এই বেলা কর বন্দিশাল,
সাত সমুদ্দর লঙ্কা কর দেরীয়া পার।
বিচে বিচে (মাঝে মাঝে) পরি গেল ইগিস্কীমার।
ইয়া (ইহা) মহারাজ মহাশান্তি তোম্হার আহ্বান।"

সমস্ত মন্ত্রটির অর্থ ও ভাবসঙ্গতি করা যায় না, সেবাইত মহাশয়ও করিতে পারেন নাই।

ধ্যানের মন্ত্র।

সোনার খাট সোনার পাট সোনার সিংহাসন,
সোনার আসনে বসায়ে মহারাজক জুড়িনু ধিয়ান (ধ্যান)।
তোম্হার দয়াত (দয়ায়) প্রভু হামরা (আমরা) পাই জল,
তোম্হার দয়াত প্রভু হয় ফসল।
তোম্হার দয়াত প্রভু বাঁচে জীব সুখত (সুখে),
তুম্হী সুহাই (সহায়) হৈলে রোগবারি পালায় দূরত।
কি দিয়ে পূজিমু মহারাজ
তোক (তোমাকে) কি দিয়ে পূজিমু।
অন (অন্ন) দিয়ে পূজিলে
অন গরুতে কোলে (করিল) ঝুটা (উচ্ছিষ্ট),
দুধ দিয়ে পূজিলে দুধ বাছুরে করলে ঝুটা।
কিছু নাই মহারাজ পূজিমু কি দিয়ে?
ফুল জল দিয়ে পূজি তোক, লেহ পূজা আসিয়ে।

শানের মন্ত্র।

আয় শান্তি বায় শান্তি মহারাজা মহাশান্তি হো শান্তি
(শান্ত, তুষ্ট),।
মহারাজ মহাশান তুই হো শান্, পূজাপাটী খাইয়ে
তুষ্ট কর মন।
অবুঝ মানুষ হামরা (আমরা) না বুঝি তোম্হার মহিমা।
সকল দোষ মাপ করিয়ে মহারাজ তুই হো সুহাই (সদয়)

গ্রাম ভালয় ভালয় থাকিলে তোক পুজিমু চিরকাল,
ভাল জল ভাল ফল (ফসল) হেলে তোম্হার লেইমু নাম।
মহারাজ মহাশান্তি তুই হো শান্ কি হো শান্।
ভূত প্রেত পিচাশ দেও (দানব) সঙ্গে লেহ বান্ধিয়া,
মহাশান্তি লক্ষ্মীক ঘরে ঘরে যা রাখিয়া।
মোর কাথা (কথা) না শুনিলে কেবা লৈবে তোমার নাম,
হে মহারাজ তুই হো শান্ কি হো শান্।

আমি একজনমাত্র ধামীর নিকট হইতে এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং অন্যান্য ধামীর মন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই। অন্যান্য ধামীর মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের অনৈক্য হইতে পারে।

পূজা শেষ হইলে সকলে প্রসাদ এবং ধামীর নিকট হইতে মহারাজার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ একমুষ্টি আতপ চাল লইয়া বাড়ী প্রস্থান করে।

এই মহারাজ-পূজার সঙ্গে আর-এক দেবতার পূজা হয়। এই দেবতার নাম মহীপাল। মহীপাল দেবতা দিনাজপুরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহীপাল রাজা কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। তিনি বোধ হয় ভাল, দয়াবান্ রাজা ছিলেন, কাজেই বহুদিন পর প্রজারা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে।

মহারাজাপূজা আর্য্যপূজা কি না, মহারাজা বাস্তবিক ইন্দ্র কি না, অন্য জেলায় বা প্রদেশে এরূপ পূজা প্রচলিত আছে কি না, এই পূজায় কোনো বৌদ্ধ দেবতা প্রচ্ছন্নরূপে পূজা লইতেছেন কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া নিতান্ত দরকার।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মা।

দরদী

কোমল বুকে বিরাট তাহার দুঃখ গো—
পুঞ্জীভূত ধরার ব্যথা অন্তরে,
চক্ষে চেরাপুঞ্জী জাগে লক্ষ গো
পাগলা-ঝোরা ঝরছে বুকের প্রান্তরে।

রইতে সে যে চায় না আহা স্বস্তিতে,
বক্ষ তাহার উদ্বেলিত উদ্বেগে,
বজ্র গড়ায় সেই যে তাহার অস্থিতে,
সেই বিনা হায় অত্যাচারে রুধ্‌বে কে ?

সেই পারে হায় করুণ বীণার স্বর দিতে,
আট্‌কে দিতে অশ্বমেধের অশ্বকে,
সেই সে চালায় পুষ্পকরথ স্ফূর্ত্তিতে
নয়ন-নীরে চেতায় চিতা-ভস্মকে।

যুগের যুগের ব্যথার ব্যথী নিত্য সে,
উৎপীড়িতের সেই যে পরম আত্মীয় ;
জীব-নিয়তির নয়কো শুধু ভৃত্য সে
নয়কো চরম মোক্ষ-পদের প্রার্থীও।

মেঘ জমে হায় তাহার বুকের বাষ্পেতে,
বক্ষ তাহার আল্‌তা-দুধের গঙ্গা হে,
কস্তুরী চায় তাহার প্রাণের বাস্ পেতে
জড়ের দেহে সেই যে জাগায় সংজ্ঞা হে

সেই যে প্রেমিক, সেই দরদী, তার স্বরে
বংশীধরের বংশী বাজে কৌতুকে,
মর্ত্ত মলিন মিশায় স্বর্গ ভাস্বরে
অনর্ঘ তার বিপুল প্রেমের যৌতুকে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দাক্ষিণাত্যের উপদেবতা

ভারতবর্ষের হিমালয় হইতে কুমারিকা ও হিন্দুকুশ হইতে আরাকান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই হিন্দুধর্ম্ম প্রবল; কিন্তু এক প্রদেশের হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে অপর প্রদেশের হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্যগত ও মর্ম্মগত সমতা থাকিলেও, প্রত্যেক প্রদেশের স্থানীয় উপধর্ম্ম সেই ধর্ম্মবিশ্বাসকে নূতন ধরণে গঠিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখে। এইরূপে ভারতের আদিম আর্য্য বৈদিক ধর্ম্ম বহু লৌকিক ও বহির্ভারতীয় ধর্ম্মমত ও আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্রণে পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমা-ব্যবধানে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগ আবহমানকাল স্বতন্ত্র পৃথক হইয়া থাকাতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতি ও ধর্ম্মমত চিরকালই স্বতন্ত্র ও অসদৃশ হইয়া থাকিয়া গিয়াছে। যদিও বহু প্রাচীনকাল হইতে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সীমা অতিক্রম করিয়া আর্য্যরা দাক্ষিণাত্যে বারম্বার গিয়া আর্য্যসভ্যতা প্রচার করিয়াছিল ও আর্য্য ধর্ম্মমতে শবরকুলদেবতা বিন্ধ্যবাসিনী উচ্চপদবী লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভেদরেখা ও স্বতন্ত্রতা বিলুপ্ত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্মমত যেমন বৈদিক ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম ও বহির্ভারতীয় ধর্ম্মমতের মিশ্রণ-জাত হিন্দুধর্ম্ম; দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মমতও তেমনি দ্রবিড় ধর্ম্মমত ও আর্য্য ধর্ম্মমতের মিশ্রণজাত হিন্দুধর্ম্ম। আর্য্যাবর্ত্তের লোকের চেহারা, ও দাক্ষিণাত্যের লোকের চেহারা যেমন পৃথক, আর্য্যসভ্যতা ও দ্রবিড়সভ্যতার মধ্যেও তেমনি সুস্পষ্ট পার্থক্য আবহমানকাল থাকিয়া গিয়াছে। দ্রবিড় দেশের উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিলেও নিম্নস্তরের দ্রবিড়েরা লৌকিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছিল। দুই রকম সভ্যতার ও ধর্ম্মমতের সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্ম্ম বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্রবিড়দেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে কোনো গ্রাম-দেবতা নাই। এক একটা বড় গাছের তলায় যেমন-তেমন একটা ঘর বা ঢিপি এইসব গ্রাম-দেবতার মন্দির বা আস্তানা। এইসব দেবতা প্রায়ই স্ত্রীদেবতা; কিন্তু তাঁদের পূজার অনুষ্ঠান প্রায়ই বীভৎস ও জুগুপ্সিত কাণ্ড। দেবতাদের সম্মুখে ছাগ ও মুরগী বলি দেওয়া হয়, এবং বলির রক্ত রাঁধা ভাতে মাখিয়া দেবীর ভোগ দেওয়া হয়। যত কিছু উৎপাত উপদ্রব রোগ শোক গ্রামে ঘটে, সকলের কারণ মনে করা হয় গ্রাম-দেবতার অসন্তোষ ও ক্রোধ। তখন পূজা করিয়া বলি দিয়া ভোগ খাওয়াইয়া ঘুষ দিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিমত চেষ্টা চলিতে থাকে। দেবতার সঞ্জাত ক্রোধ প্রশমনের জন্য যেমন তোয়াজ ও ঘুষ দেওয়া চলিতে



দ্রৌপদী দেবী।

থাকে, দেবতার ক্রোধ যাতে না জন্মিতে পারে তার চেষ্টাতেও মাঝে মাঝে পূজার তোয়াজ চলে। এই তুষ্ট রাখিবার চেষ্টায় পূজার বায়না উৎসবম্ নামে অভিহিত হয়।

গ্রামদেবতাদের মধ্যে প্রধানা হইলেন দ্রৌপদী। ইনি মহাভারতেরই কৃষ্ণা পাঞ্চালী; দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেবী-পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন। ইনি যে অনার্য্য তাহা তাঁর

কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণা নাম হইতেই জানা যায়। তাই আর্য্যাবর্ত্তের সকল দেবতা ও কাব্যের নায়ক-নায়িকার মধ্য হইতে অনার্য্য দ্রবিড়দেশে কৃষ্ণা দ্রৌপদী গিয়া শ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়া বসিয়াছেন। ইনি সেখানে কালীর অবতার কৃষ্ণা; ইনি ধরণীর নর-ভার লাঘব করিবার জন্য অবতীর্ণা। এঁর তুষ্টিসাধনের জন্য পশুবলি কদাচ দেওয়া হয়; এঁর তোষণের উপায় অগ্নিভ্রমণ—কারণ এঁর জন্ম হইয়াছিল অগ্নি হইতে।—

উত্তস্থৌ পাবকাৎ তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ।

* * * *

কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা ॥

* * * *

মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদ্ অমরবর্ণিনী।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায়।

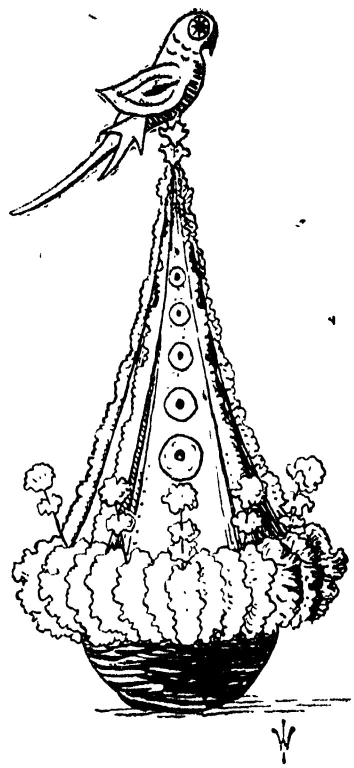
মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অমরবর্ণিনী শব্দের টীকা করেন—

'অমরবর্ণিনী দেবকুমারী দুষ্টবধায়োদ্যতা দুর্গেত্যর্থঃ।'

এই সামান্য ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় দ্রৌপদীকে দাক্ষিণাত্যে দুর্গা বা কালীর অবতার ও অগ্নিপ্রিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

দ্রৌপদী-তোষণের জন্য প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড করা হয় এবং সেই কুণ্ড গন্‌গনে আগুনের আঙারে পরিপূর্ণ থাকে; একজন পূজারী করকম্ নামক পূজার ঘট বা ডালা মাথায় করিয়া সেই আগুনের উপর দিয়া খালিপায়ে হাঁটিয়া কুণ্ড পারাপার হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় জলন্ত আঙারের উপর দিয়া চলাচল করিয়াও পূজারীর পা পুড়িয়া যায় না। কখনো কখনো যে দুর্ঘটনা ঘটে না এমনও নয়; পা পুড়িয়া ফোস্কা হওয়া থেকে পুড়িয়া মরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় ঐ পূজারীর অবিশ্বাসী মনকে ও তার পাপ-কলুষিত চরিত্রকে। এই অগ্নি-ভ্রমণ উৎসবের পূর্ব্ব দিন পূজারী সংযম করিয়া থাকে ও দ্রৌপদী-মন্দিরের অপর পূজারীরা অগ্নিপারী পূজারীকে মহাভারত হইতে দ্রৌপদী-উপাখ্যান হয় অভিনয় করিয়া দেখায়, নয় পাঠ করিয়া শুনায়। পরদিন পূজারী অগ্নিভ্রমণ করে।

এই অগ্নিভ্রমণের প্রথা বহুপ্রাচীন ও বহু দেশে বিদ্যমান আছে। এই প্রথার উৎপত্তিস্থান খুব সম্ভব ভারতবর্ষই। সামবেদের তাণ্ড্যব্রাহ্মণে দুজন পুরোহিতের অক্ষত-



করকম—ফুলের সাজি।

শরীরে অদগ্ধ-অবস্থায় অগ্নিভ্রমণের কথার উল্লেখ আছে। ইহা অন্ততঃ ৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের কথা। তারপরে বাইবেলেও এইরূপ অগ্নিভ্রমণের কথা তিন-চার জায়গায় আছে। আমেরিকার লাল লোকদের মধ্যে, ফিজিদ্বীপের মাওরীদের মধ্যে, প্রাচীন স্পেনে, জাপানে এইরূপ অগ্নিভ্রমণ প্রচলিত ছিল। সার্ উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক; তিনি অগ্নিপর্য্যটকদের নিজের ল্যাবোরেটরীতে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাদের গায়ে কোনো কিছুর প্রলেপ থাকে না। অগ্নিপর্য্যটকেরা বলে ইহা মানসিক বলের ফল—দৈহিক বা ভৌতিক কোনো শক্তির পরিচয় নয়। অগ্নিপর্য্যটকেরা যে-আগুনের উপর দিয়া অক্লেশে অদগ্ধ অবস্থায় বেড়াইয়া আসিয়াছে, সেই আগুনের উপর রুমাল ফেলিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে রুমাল পড়িতে না পড়িতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; এমন কি সে আগুনের এমন তাত যে অগ্নিপর্য্যটকের কাঁধের উপর রুমাল রাখিলেও সে রুমাল পুড়িয়া উঠিয়াছে। এই অগ্নিভ্রমণের শক্তির বহু পরীক্ষা



করকম মাথায় করিয়া সজ্জিত পূজারীর ঢেঁকি-কলে চড়িয়া দেবতা-তোষণের জন্ম নৃত্য।

টানিতে লইয়া যাওয়া হয় এবং কতকগুলি লোক সেই মেচ্‌কো ঘিরিয়া কৃত্রিম বিলাপ করিতে করিতে চলে ও মহরমের শোক-কারীদের মতন বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে নাচিতে নাচিতে যায়। এতে বৃষ্টিদেবীকে এই বুঝাইতে চাওয়া হয় যে দেশের পাপ-বুড়ী মরিয়া গিয়াছে; অতএব যার পাপের জন্য তাঁর ক্রোধ, সেই যখন নাই, তখন আর তাঁর ক্রোধাগ্নি ধারাজলে নিবাইয়া দিতে বাধা কি? এই স্তোকে ভুলিয়া বৃষ্টিদেবী করুণাবৃষ্টি করিতে থাকেন। এই রকম পাপিষ্ঠা বহিষ্কারের অনুষ্ঠান তামিল অঞ্চলে, বিশেষত তাঞ্জোরে, খুব বেশী করা হয়।

সকল উপদেবতার মধ্যে ভীষণ-তমা ভয়ঙ্করী বসন্ত রোগের দেবতা—তামিল নাম মারী আম্মান ও তেলেগু নাম পোলেরি আম্মাল,—আম্মান বা আম্মাল সংস্কৃত অম্বা শব্দজ, মানে মা। এই দেবতা আমাদের দেশের মা-শীতলার অনুরূপ। এই দেবীকে অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির প্রতিহিংসা-পরায়ণা মনে করা হয়; মানুষকে কুশ্রী কুরূপ কুৎসিত করিতে পারায় তাঁর অপার আনন্দ ও আগ্রহ। ইনি কোনো এক জন্মে নাকি ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন; এঁর সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয় তিনি পঞ্চম জাতীয় অস্পৃশ্য; ইহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকন্যা খেদে নির্বেদে ঘৃণায় অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাতে আপনাকে দগ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করেন এবং সমস্ত সমাজের উপর জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা লইবার প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি পূজা ও নৈবেদ্য পাইলে তুষ্ট হন; এঁর নৈবেদ্য দুধ ফল মধু; কিন্তু তাঁর অনুচরী সহচরীদের তুষ্ট

য়ুরোপেও আধুনিক কালে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এর রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি হইলে দ্রৌপদীদেবীর তৃপ্তির জন্য অগ্নিভ্রমণ উৎসব করা হয়; এবং লোকের বিশ্বাস এই উৎসব নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইলে দেবী অনুগ্রহধারা বর্ষণ করিয়া ভক্তদের আশীর্বাদ করিতে পরাঙ্মুখ হন না।

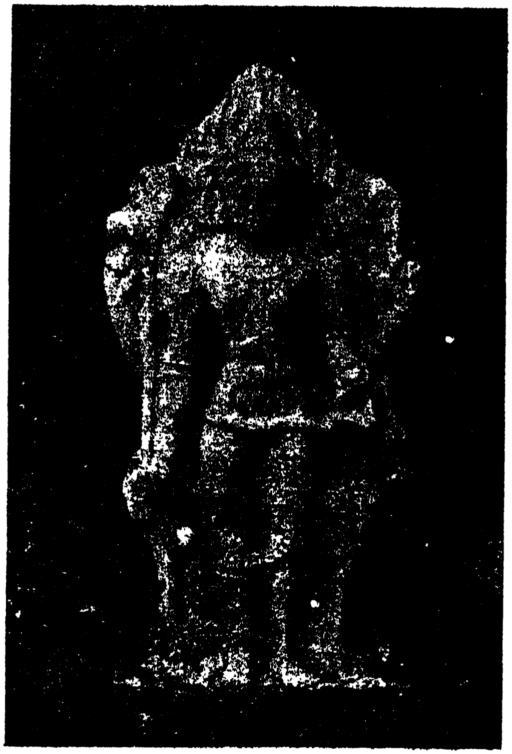
বৃষ্টিদেবীর কৃপা আকর্ষণের জন্য আর-এক অনুষ্ঠান করা হয়। মাটি দিয়া একটা কুশ্রী কুৎসিত স্ত্রীমূর্ত্তি গড়িয়া তাকে মড়ার মতন মেচকোয় চড়াইয়া রাস্তা দিয়া টানিতে

করিতে হয় ছাগ মেষ পক্ষী বলি দিয়া। নিমপাতা এঁর প্রিয় সামগ্রী। বসন্তমারীর প্রাদুর্ভাব হইলে বহু ভিক্ষুক গেরুয়া কাপড় ও মালা পরিয়া চড়কের সন্ন্যাসীদের মতন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং লোকে বিশ্বাস করে যে সেইরূপ সন্ন্যাসী ভিক্ষুককে তুষ্ট করিতে পারিলে মারী দেবীও তুষ্ট হইয়া সেই গৃহস্থের উপর অনুগ্রহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। এঁর ভয়ে লোকে এঁকে বিশেষ ভক্তি করে এবং কায়মনোবাক্যে এঁর সন্তোষ বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকে; মনে মনেও কেউ এঁকে অবজ্ঞা অবহেলা বা বিদ্রূপ করিতে সাহস করে না।



কালী—কলেরার দেবতা।

এঁর পরেই কলেরার দেবতা কালী বিক্রমে ও ক্রূর হিংস্রতায় লোকের ভয়ে ভক্তি আদায় করেন। লোকে কল্পনা করে এই করালা কলেরার দেবতা কালী বাঁ হাতে এক হাঁড়ি ক্যাষ্টার-অয়েল অর্থাৎ রেড়ির তেল ও ডান হাতে ত্রিশূল লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এবং তাঁর নিগ্রহভাজন ব্যক্তিকে ত্রিশূলের খোঁচা দিয়া খানিকটা তেল গিলাইয়া ওলাউঠার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া করেন। অধার্ম্মিক পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এঁর



বীরভদ্রন্—জ্বরের দেবতা।

কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া গ্রামকে-গ্রাম উচ্ছন্ন উজাড় হইয়া যায়—শিশু বালক নির্দ্দোষ লোকও যে এঁর কৃপায় মারা যায়, সে কেবল সংসর্গদোষে! এঁর তুষ্টিবিধান করিতে হয় প্রচুর রক্তপাত করিয়া নানা পশু বলি দিয়া; মহিষ বলি এঁর বিশেষ রুচিকর ও তুষ্টিসাধক। কোথাও ওলাউঠা আরম্ভ হইলেও এঁর পূজা আরম্ভ হয় এবং অনেক সময় প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয় বলিয়া আগে থাকিতেই এঁর পূজার ব্যবস্থা করা হয়। তামিল লোকেরা এঁকে বিশেষ ভয় ভক্তি ও পূজা করে।

প্লেগ ইনফ্লুয়েঞ্জা টায়ফয়েড প্রভৃতি সাংঘাতিক জ্বর-রোগের দেবতা পুরুষ, তাঁর নাম বীরভদ্রন্। ইনি মহাকাল মহাদেবের জটা হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং মহাদেবের অবতার। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য মহাদেব এঁকে জটা উৎপাটন করিয়া উৎপাদন করেন। এই জ্বররূপী বীরভদ্র মূর্ত্তিমান ক্রোধ ও উষ্ণতা; তাই বহু অভিষেক দ্বারা তাঁর মেজাজ শীতল করিতে হয় ও সুস্বাদু সুগন্ধ মাংসের তরকারী দিয়া তাঁর



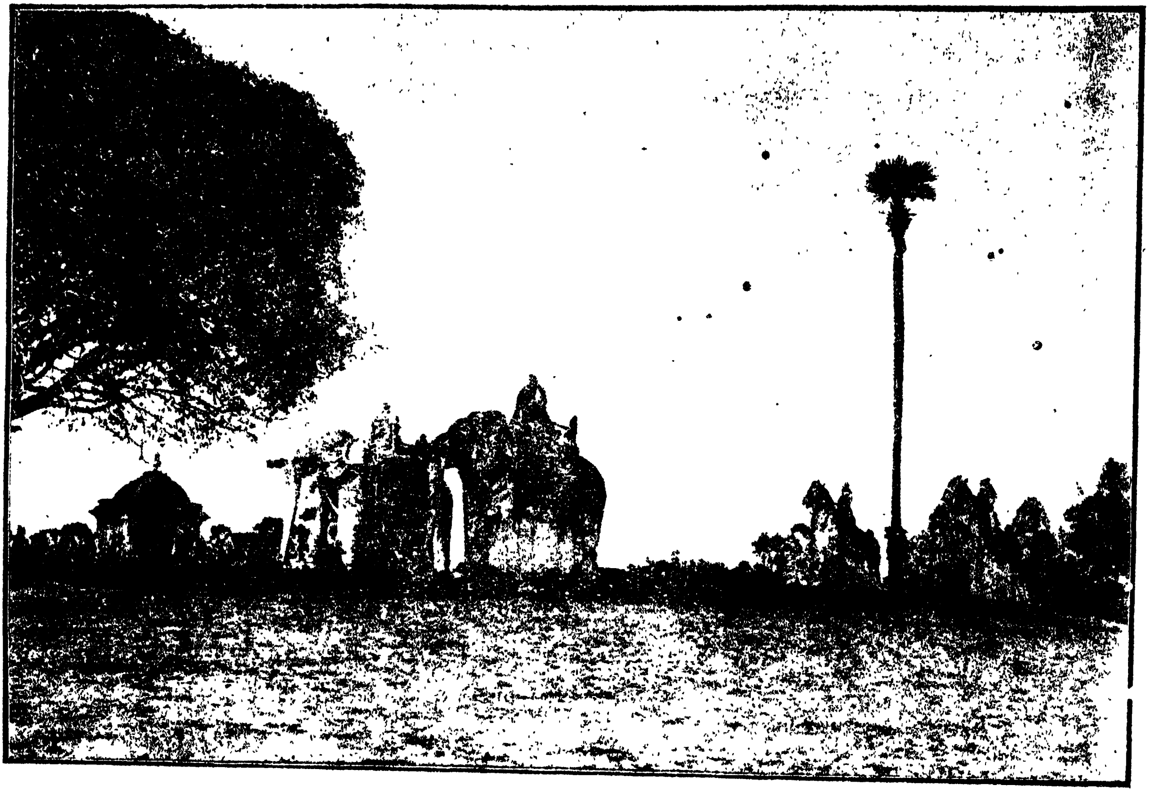
শাস্তা—গ্রামরক্ষক দেবতা।

তুষ্টিবিধান করিতে হয়। ইনি মহাদেবের অবতার বলিয়া কলেরার দেবী কালীর সমকক্ষ; যা-কিছু কালীর রুচিকর ও তৃপ্তিপ্রদ তাই এঁরও গ্রহণীয়। দাক্ষিণাত্যে মাদুরা প্রভৃতি স্থানের শিবমন্দিরের মধ্যে একরকম বীভৎস বিক্রমশালী দেবমূর্ত্তি দেখা যায়; সেইগুলিই বীরভদ্রের মূর্ত্তি। ইনি আর্য্য দেশ হইতে দ্রবিড়দেশে আগত অপ্রধান দেবতা, তাই এঁর স্বতন্ত্র মন্দির নাই; শিবের অবতার বলিয়া শিবমন্দিরেই ইনি আশ্রয় পাইয়াছেন।

কিন্তু বীরভদ্রের বৈমাত্র ভাই কার্ত্তিক ঠাকুর এ বিষয়ে বিশেষ ভাগ্যবান। দাক্ষিণাত্যে এমন নগর গ্রাম পাড়া নাই যেখানে কার্ত্তিক ঠাকুরের মন্দির বা আস্তানা নাই। কার্ত্তিক ঠাকুরের নাম তেলেগু অঞ্চলে শাস্তা; আর তামিল অঞ্চলে আয়নার। ইনি গ্রামদেবতা; ইনি পূজা পাইয়া তুষ্ট থাকিলে গ্রামে আর কোনো উপদেবতার উপদ্রব ঘটিতে ইনি দেন না। ইনি দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, এঁর অপর নাম সুব্রহ্মণ্য, কাজেই ইনি অহিংসাব্রতী, ইনি বলিপ্রিয় নন; কিন্তু এঁর অনুচরদের তুষ্ট করিতে হয় পশুমাংস দিয়া। শাস্তা অর্থাৎ কার্ত্তিক বেশ সৌখিন বাবু দেবতা; তাই ইনি পায়ে হাঁটিয়া চলাফেরা করিতে নারাজ; এজন্য এঁর অনুগ্রহভাজন হইবার জন্য এঁর ভক্তরা গ্রাম্যকুম্ভকারের গড়া মাটির হাতী ঘোড়া আনিয়া এঁর মন্দিরে উৎসর্গ করে, যেমন আমাদের দেশে পীরের দরগায় লোকে মানত করিয়া মাটির ঘোড়া দ্যায়। দাক্ষিণাত্যে এই শাস্তা দেব উত্তরাপথের কার্ত্তিকের মতন শিবেরই পুত্র; কিন্তু তাঁর মা দুর্গা নন; দ্রবিড়ী মতে বিষ্ণু যখন মোহিনী মূর্ত্তিতে শিবকে প্রলুব্ধ করেন তখন শাস্তার জন্ম হয় এবং ইনি জন্মিয়া শিবকে বধোদ্যত দানবদের বধ করেন। শাস্তার মাতা শিবের বৈধ পত্নী নন বলিয়া এই ব্যভিচারজাত সন্তান উচ্চ পদবী ও সম্মানের অধিকারী হন নাই। কিন্তু এঁর ভক্তবৎসলতা ও শরণাগতরক্ষার ক্ষমতা দেখিয়া নিম্ন জাতীয় লোকেরা এঁর পূজা করিয়া অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা খুবই করে। লোকের বিশ্বাস ইনি প্রত্যহ রাত্রিকালে ঘোড়ায় চড়িয়া মশাল জ্বালিয়া গ্রাম পাহারা দিয়া ফিরেন। যদি কোনো হতভাগা লোক সেই সময় সাম্‌নে পড়ে তবে তার আর নিস্তার থাকে না; তবে সে যদি পুণ্যবান ও ভক্তিমান হয়, তবে সে বাঁচিয়া যায়, কিন্তু প্রহরী দেবতার ঐ চৌকীদারীর ব্যাপার তার মন হইতে বেমালুম মুছিয়া যায়, সে তার কিছুই স্মরণ করিতে পারে না। এই আশুতোষ দেবতা একটা নারিকেল বা গোটা কয়েক কলা ভোগ পাইলেই খুসী হইয়া যান। ইনি লোকের অপকারের চেয়ে উপকারই বেশী করেন, কিন্তু এঁর সাঙ্গোপাঙ্গের মর্জ্জির কথা কেউ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; তাই সকল লোক

"সারাটা জীবন ভয়ে ভয়ে রয়,
আঁখি মেলিতে ভয়ে সারা হয়।"

সকল কিছুকেই ভয় করিতে করিতে আমরা ভীরু দুর্ব্বল কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি—আমাদের দেবতার ভয়, উপদেবতার ভয়, শাস্ত্রের ভয়, গুরু-পুরোহিতের ভয়, জাতের ভয়, রাজ-আম্‌লার ভয়!



শাস্তা বা আয়ানার বা সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরে উৎসর্গিত মাটির হাতী ঘোড়া।



শাস্তা বা আয়ানার বা সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরে উৎসর্গিত মাটির ঘোড়া।

অধুনাকালে প্লেগ-আম্মা নামে প্লেগের এক স্বতন্ত্র দেবী কল্পিত ও পূজিত হইতেছেন। এই দেবীর মাথায় সাপ দেখিয়া মনে হয় ইনি হয়ত মনসা-দেবী।

ত্রিচীনপল্লী (ত্রিশিরাপল্লী) জেলার মারবজাতি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়; চুরি তাদের জাত-ব্যবসা। তাদের কুলদেবতা মারব যোদ্ধা সুদালই মদন। এঁকে তুষ্ট করিতে প্রচুর তাড়ি মাংস· তামাক আর ভাত ভোগ দিতে হয়। শ্মশান এঁর প্রিয়স্থান, তাই শ্মশানের কাছাকাছি জায়গায় এঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এঁর পূজা হয় মধ্যরাত্রিতে চুরি করিতে যাত্রা করিবার আগে। পূজার সময় ধুনুরীদের তুলা-ধোনা ধনুকের মতন একটা বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী বাজাইয়া তাঁর বীরত্বগাথা পূজকেরা এককণ্ঠে গান করে। লোকে এঁকে খুব ভয় করে; কারণ লোকের বিশ্বাস কোনো কিছু মানত করিয়া দেব-ঋণ শোধ না করিলে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর জাতের লোকেরাও এই দেবতাকে ডরায়, কি জানি তাঁর কোপে পড়িয়া যদি তাদের বা গোরু-ছাগলের কোনো অনিষ্টই ঘটে। এই দেবতাকে না মানিলে ক্রুদ্ধ দেবতার কোপে কোনো অনিষ্ট হোক না

হোক্ দেবভক্তদের কোপে জান ও মালের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে; কাজেই দেবতার ভক্তদের ভয়েই দেবতাকে মানিয়া চলিতে হয়।

মাদুরা অঞ্চলের লোকপ্রিয় দেবতা বীরন্। নিমগাছে এঁর বাসা; নিমগাছের তলায় একখানা ইঁট বা পাথর বসিবার আসন পাইলেই ইনি খুসী। ইনি শুঁড়িদের রক্ষক, শুঁড়িখানার পাহারাওলা; তাই ইনি তুষ্ট হন প্রচুর তাড়ি, আরক (মদ) ও মাংস পাইলে। ইনি যখন নররূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন, তখন ইনি আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখাইয়া লোকের মনে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। মাদুরার শিবমন্দিরের পূর্ব্ব-তোরণের কাছে ইনি যুদ্ধে নিহত হন; সেখানে এখন তাঁর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এঁকে মুড়ি, শুঁট্‌কি মাছ, জ্যান্ত পায়রা হাঁস মুরগী ভোগ দেওয়া হয়; ইনি নাকি খুব তামাকখোর, যে কোনো আকারে হোক কিছু তামাক সেবা করিতে পাইলেই ইনি বরদ হন। এই-সব উপদেবতার আর-একটি প্রিয় খাদ্য রক্ত-মাখা ভাত; এই ভোগের প্রতি এই দেবতার অনুরাগ একটু বিশেষ।



প্লেগ-আম্মা—প্লেগ-রোগের দেবতা।

কন্নকী নামের আর-একটি দেবতাকে কালীর অবতার মনে করা হয়। তিনি মাদুরার পাণ্ড্য রাজবংশ ধ্বংস করিবার জন্য ধরণাতে অবতীর্ণ হন। ত্রিচীনপল্লীর দক্ষিণ অঞ্চলে এই দেবীর অনেক মন্দির দেখা যায়। এঁর স্বামী ছিলেন বণিকপুত্র কবিলন্; কাবেরী নদীর মোহনার কাছে এক নগরে এঁর বাড়ী ছিল। যৌবনে অনাচারী হইয়া কবিলন শীঘ্রই দরিদ্র হইয়া পড়েন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সাধ্বী পত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। তখন তিনি অর্থ উপার্জ্জনের আশায় পত্নীকে লইয়া পাণ্ড্য-রাজধানী মাদুরায় গমন করেন। পত্নীকে এক তেলিনীর কাছে রাখিয়া, কবিলন পত্নীর পায়ের একটা সোনার মল বেচিতে শহরের বাজারে গেলেন। যে সেক্‌রার কাছে কবিলন মল বেচিতে গেলেন সেই সেক্‌রা ছিল বিষম চোর; কিছুদিন আগে সে মাদুরার রাণীর একটা সোনার মল চুরি করিয়া রটাইয়াছিল যে চোরে উহা চুরি করিয়া লইয়াছে। এই ঘটনা হইতে সেক্‌রা রাজার বিরক্তিভাজন হইয়াছিল। এখন কবিলনের হাতে সোনার মল দেখিয়া সেক্‌রার মনে হইল—এই বিদেশীকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিয়া সে নিজে রাজার প্রসন্নতা ফিরাইয়া পাইতে পারিবে। সেক্‌রা কবিলনকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল এবং রাজাও বিচার না করিয়া কবিলনের প্রাণদণ্ড করিলেন। কন্নকী এই

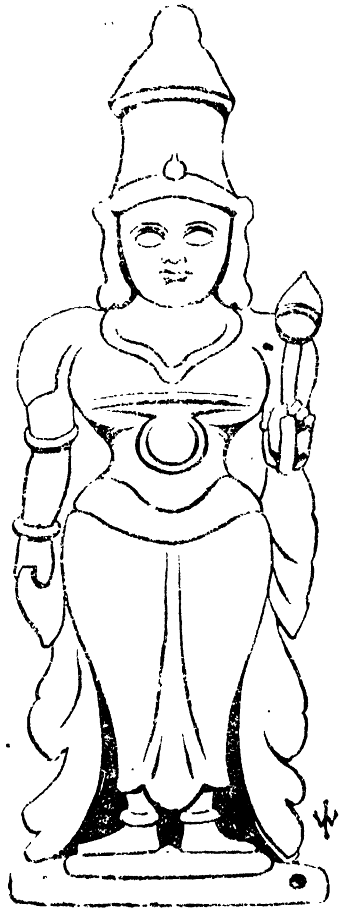


সুদালই মদন—চোরের দেবতা।



বীরন—শুঁড়ি ও মাতালের দেবতা।

দারুণ সংবাদ শুনিয়া শোকাকুল হইয়া রাজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে অবিচারী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা বিধবার উগ্র শোকার্ত্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—তিনি চোরকে শাস্তি দিয়া ন্যায়বিচারই করিয়াছেন। তখন কন্নকী তাঁর নিজের মলের জোড়াটা রাজার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন- ঐ মল রাণীর চোরাই মল নিশ্চয়ই



কন্নকী—স্বর্ণকারদের দেবতা।

নয়। রাণীর অন্য মলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হোক, আমার ফাঁপা মলের ভিতর ভরা আছে মুক্তা—সেই মুক্তার আঘাতে আমার মল বাজে।

রাজা রাণীর মল ও কন্নকীর মল ভাঙাইয়া দেখিলেন—বাস্তবিক কন্নকীর মলের মধ্যে আছে মুক্তার ঘুঙুর, আর রাণীর মলের মধ্যে ভরা আছে কাঁকর।

পাণ্ডুরাজ নিজেকে ন্যায়বান বলিয়া মনে করিতেন।



কারুপ্পন—চোর ডাকাতের দেবতা।



ইরুলন—ভক্তদের দুঃখভারবাহী দেবতা।

নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি এমন কাতর হইলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসনের উপর পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাণী স্বামীর বিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া অনুমৃতা হইলেন।

এই ঘটনাতেও বিধবা কন্নকীর রোষশান্তি হইল না, তিনি শাপ দিলেন যে নগরে আগুন লাগিবে। এবং রাজার উত্তরাধিকারীকে দিয়া আদেশ দেওয়াইলেন যে নগরের সব সেক্‌রার মুণ্ডচ্ছেদ করা হইবে।

তখন মাদুরা নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিন্তা (সরস্বতী) দেবী আবির্ভূত হইয়া কন্নকীকে বলিলেন—তোমার স্বামী কবিলন পূর্ব্বজন্মে মিথ্যা করিয়া একজন বণিককে শত্রুর গুপ্তচর বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া হত্যা করান; সেই পাপের ফলে সেই বণিক এবারে সেক্‌রা হইয়া প্রতিশোধ লইয়াছে। অতএব তোমার ক্রোধ অনুচিত।

চিন্তা দেবীর কথায় সেক্‌রা বধে নিবৃত্ত হইলেও কন্নকীর পতিশোক শান্ত হইল না। তিনি পাগলিনীর ন্যায় চের রাজ্যের রাজধানী কারুর নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁকে ও তাঁর নিহত স্বামীকে স্বর্গে লইয়া যায়। চের-রাজ এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া কন্নকী দেবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এবং রাজ-ভ্রাতা এক কাব্য লিখিয়া ঐ কাহিনী প্রচার করেন। সেই কাব্য সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

একজন স্বর্ণকারের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি নিহত হন বলিয়া কন্নকী দেবী স্বর্ণকারদের শত্রু হইয়া আছেন। এইজন্য স্বর্ণকারেরা প্রতি বৎসর তাঁকে মহিষ বলি দিয়া ক্রোধ শান্তি করে; এই মহিষ হয় স্বর্ণকারদের অনুকল্প প্রতিনিধি; এই বলিদানের সময় অন্তত একজন স্বর্ণকার দেবীমন্দিরে উপস্থিত থাকে। এই কন্নকী দেবী সমস্ত তামিলজাতির দেবতা নন, স্থানীয় লৌকিক দেবী মাত্র; এঁর মহিমা দ্রাবিড় দেশেরই উত্তরাঞ্চলে অজ্ঞাত।

মাদুরা ও তাঞ্জোরের কাল্লার জাতির কুলদেবতা কারুপ্পন; ইনি অতিকায় বিকটদর্শন। ইনি গদাধর ও শৃঙ্খলী। ইনি চোর-ডাকাতের পৃষ্ঠপোষক; তারা চুরি ডাকাতি করিতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রচুর মদ্যমাংস



কালীর কাছে গর্ভিণী ছাগের উদর বিদারণ।

ভোগ দিয়া এঁর প্রসাদ পাইয়া থাকে। ইনি খুব পুরানো গাছে বাসা করিয়া থাকেন; এবং এঁর বাসস্থান বুঝাইবার জন্য গাছের একডাল হইতে অপর ডাল পর্য্যন্ত একটা লম্বা মোটা ভারি লোহার শিকল ঝুলাইয়া রাখা হয়। আলাগার কয়েল মন্দির-তোরণে যে কারুপ্পন আছেন তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি খুব বিস্তৃত ও লোকে তাঁকে খুব ভয় ভক্তি করে। লোকে মানত করিয়া তাঁর কাছে ছাগল পাখী-পাখালী অনেক বলি দ্যায়।

রামনাদ জেলার কিদারম্ গ্রামে একটি বীভৎস বিকট অনুষ্ঠান হয়। অমাবস্যার রাত্রে কালীর কাছে বলি দিবার জন্য একটি গর্ভবতী ছাগী আনা হয় ও তাকে হাড়িকাঠে বাঁধিয়া রাখা হয়। দ্বিপ্রহর রাত্রে পূজারীর দল সুর করিয়া মন্ত্র পড়িয়া কালীর স্তব করে ও সেই সময় সেই ছাগীর পেট চিরিয়া তার ভিতর হইতে জীবন্ত বাচ্চা বাহির করিয়া আনা হয় এবং সেই বাচ্চাটিকে একটি দোল্‌নায় রাখিয়া দোল দেওয়া হয়। ওদিকে সেই পেটকাটা ছাগী মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কাতর আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। লোকের বিশ্বাস কোনো বন্ধ্যা বা অপুত্রবতী নারী সেই ছাগীর ক্রন্দন শুনিলে ফিরে অমাবস্যার মধ্যে গর্ভবতী হয়। অমাবস্যার মধ্য রাত্রিতে মশালের আলো জ্বালিয়া এই নৃশংস ও বীভৎস অনুষ্ঠান লোকের মনে ভয় ও সম্ভ্রম সঞ্চার করে। বাচ্চাটিকে যখন দোল্‌নায় দোলানো হয়, তখন যদি সেটি জীবন্ত থাকিয়া না ডাকে তবে তাহা অমঙ্গল সূচক করে।

এইসব দেবতার পূজার মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এইসব দেবতার পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ ত নয়ই—অধিকাংশই অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য জাতের লোক।

ঘরের ডাক

(১৫)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া নলিনী নন্দরাণীকে ডাকিয়া বলিল, "সেই যে সেদিন তোমাকে একজন দিশী খৃষ্টান মেয়ের কথা বলিনি ছোট-মা?—সে আজ এম্‌নি সুন্দর বক্তৃতা দিলে!"

"কি বল্লে?"

"সে যা বল্লে সবই আমাদের সমাজকে গাল দিয়ে, তবু তার মধ্যে এমনি সব যুক্তি-তর্ক আছে, যা সহজে মানুষের মাথায় আসে না। বলিহারি মাথা ছোট-মা! আমার সঙ্গে তার মতের মিল এক জায়গায়ও নেই, কিন্তু তবু আমার বড় ভাল লাগ্‌লো। সে যা কিছু বল্লে তার একবিন্দুও তার মনের কথা নয়, কিন্তু নিজের মনকেও যে মানুষ এত সুন্দর ক'রে ঠকাতে পারে তা আমার ধারণাতেই ছিল না,—ছোট-মা!"

কথাটা নন্দরাণীর আদবেই ভাল লাগিল না। সে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমার ঐ এক কথা নলিন; সে বেচারা হয়ত তার মনের কথাই বলেছে, তোমার মতের সঙ্গে মেলেনি বলেই সেটা আন্তরিক নয়?"

নলিনী বুঝিল, সে না বুঝিয়া হঠাৎ নন্দরাণীর ব্যথার জায়গাটিতে ঘা দিয়া ফেলিয়াছে। নন্দরাণীও যে ঐ খৃষ্টানী

মেয়েটির মত করিয়াই আজ পর্য্যন্ত নিজেকে ঠকাইয়াই আসিয়াছে। একটু থতমত খাইয়া নলিনী বলিল, "কে জানে, হয়ত আমার ভুল হয়েছে; কিন্তু সেদিন মেয়েটি আমার সঙ্গে যে-সব কথা কইলে, তা'থেকে ত মনে হয়, সে আমাদের সমাজকে যথেষ্ট ভালোবাসে।"

নন্দরাণী ফোঁস্ করিয়া উঠিল, "ভালই যদি বাসে, তবে গাল দিতে যাবে কেন শুনি!"

কি বলিতে গিয়া নলিনী হঠাৎ থামিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মানুষের জীবনে কি এমন ঘটনা নতুন, ছোট-মা?"

নলিনী যে কথাটা বলিতে গিয়াও বলিয়া উঠিতে পারিল না, সে কথাটা যে কি, নন্দরাণীর তাহা বুঝিয়া লইতে একটুও দেরী হইল না।

সেদিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া নলিনীর বুকের মধ্যে লক্ষ্মীর কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। আজ এই যে লক্ষ্মী হিন্দুসমাজকে এমন ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করিল, ইহার জন্য সে দুঃখিত হইয়াছিল যথেষ্ট;—হিন্দুসমাজের জন্য নয়—লক্ষ্মীর জন্য। লক্ষ্মীর সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল তার অন্তরের ব্যথা-মূর্ত্তিটিকে। এ যেন শুধু কেবল অভিমান আর অভিমান।

লক্ষ্মী মনে করিয়াছিল তার এই বক্তৃতার বিষ নলিনীকে সারারাত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে এবং যতই সে এ কথা ভাবিতেছিল, ততই তার মন আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে জানিত না, এই অদ্ভুত হাড়জ্বালানে লোকটি আরও বেশী করিয়া তাহাকে নিতান্ত বেচারী বলিয়া মনে মনে দয়া প্রকাশ করিতেছে।

অনেক রাত পর্য্যন্ত নলিনী ঘুমাইতে পারিল না। তার মনে হইতে লাগিল, "এই যে মেয়েটি আজ এত সব কড়া কথা বলিল, এ সমস্তই তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। তার মনে হইতে লাগিল, তাহার নিকট হইতে এই মেয়েটি অনেকখানি আশা করে বলিয়াই এত কথা বলিল এবং ইহার দ্বারা এই মেয়েটি তাহাকে জানাইতে চায় যে সে তার উপর অনেকখানি দাবী রাখে।"

(১৬)

আজ কদিন হইল করাচি হইতে একটি মিসনারীদের মেয়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বয়স তার তিরিশের ভিতর। চেহারাটি বেশ সুন্দর এবং রক্তটাও বিলাতী। এই মেয়েটির সহিত লক্ষ্মীর খুব আলাপ হইয়া গিয়াছিল।

আজ সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী বেড়াইতে যায় নাই, আপনার কক্ষে বাতি জ্বালিয়া টেবিলের ধারে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। এমন সময়ে মেরী বেড়াইয়া ফিরিল। মাথার টুপি এবং হাতের ঝোলান ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়াই সে বলিল, "আজ সন্ধ্যাটা বড় সুন্দরভাবে কেটেছে লুসী!"

বই হইতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মী বলিল, "অর্থাৎ?"

একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া মেরী বলিল, "একজন ভারী চমৎকার লোকের সঙ্গে আজ আলাপ হয়ে গেল।"

কেন কে জানে, লক্ষ্মীর মনে হইল, এই চমৎকার লোকটি নলিনীকান্ত ছাড়া আর কেউ নয়। এই চতুর লোকটি তাহাকেও অভিভূত করিয়া ফেলিবার জন্য নিশ্চয়ই মোহ-জাল বিস্তার করিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।—মুখে সে বলিল, "কে সে ভাগ্যবান পুরুষ শুনি!"

"নামটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না—তিনি এই গ্রামেরই জমিদারের ছেলে। কিন্তু এমনি সাদাসিধে যে চোখে দেখে তা আদবেই ধরবার জো নেই।"

কথাটাকে নেহাতই যেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত সাধারণভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "ওঃ—তুমি নলিনীকান্ত-বাবুর কথা বলছ!"—তার পর একটু থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ, লোক নেহাত মন্দ নয়।"

একটু বিরক্ত হইয়া মেরী বলিল, "কেবল 'মন্দ লোক নয়' বল্লেই বোধ হয় তাঁর সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না লুসী!"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তবে কি তাঁকে মহাত্মা বলতে হবে না কি?"

"কি ঠিক বলতে হবে তা আমি এখন পর্য্যন্ত ভেবে

দেখিনি। তবে সে রকম লোক যে বড় একটা মানুষের চোখে পড়ে না—এ কথা খুব জোর ক'রেই বল্‌তে পারি।"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমি ত আর তোমার মতন জহুরী নই বোন্, যে, এক মিনিটে রত্ন চিনে ফেল্‌বো।"

একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া মেরী বলিল, "নলিনী-বাবুর সুখ্যাতি তোমার এত খারাপ লাগে কেন লুসী?"

একটা কাঠহাসি হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "খারাপ লাগে? কেন, তিনি আমার কি করেছেন?—আমিও ত তাঁকে সুখ্যাতিই করছি মেরী; তা বলে যাকে-তাকে মহাত্মা বল্‌তে ত আর পারি না।" কথাটা শেষ করিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত হাল্কাভাবে জোর করিয়া টানিয়া একটু হাসিল।

একটু বিরক্ত হইয়া মেরী বলিল, "নলিনী-বাবুকে বোধ-হয় তোমার ঐ যার-তার মধ্যে না ধর্‌লেই ভাল হয় লুসী!"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার ত মনে হয় সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁর বেশী কিছু পার্থক্য নেই; তবে কিনা, আগেই ত বলেছি, তোমরা হচ্ছ জহুরী লোক, হয়ত রত্ন এবং কাচের পার্থক্য আমাদের চেয়ে তোমাদের চোখেই পড়ে বেশী।" কথাটা লক্ষ্মী খুব ঠেস মারিয়া বলিল।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মেরী বলিল, "জহুরী বা রত্নের কথা হচ্ছে না লুসী! আসল কথা, তুমি তাঁকে ঠিক চিন্‌তে পার নি। অথবা তিনি তোমার কাছে কোনদিন নিজেকে ঠিক ধরা দেন নি।"

ঠিক এই সময় সেই কক্ষে মিসেস্ গুঁই আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রসঙ্গটাও মাঝখানে হঠাৎ চাপা পড়িয়া গিয়া থামিয়া গেল।

মেরীর মুখে নলিনীর এই প্রশংসা লক্ষ্মীর একটুও ভাল লাগে নাই। বিশেষ সে যখন বলিল, নলিনীকে সে ঠিক চিনিতে পারে নাই এবং নলিনীও তার কাছে আপনাকে ঠিক ধরা দেয় নাই, তখন তার সমস্ত মনটা একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কটা-চামড়া মেয়েটা মনে করিয়াছে নলিনীকে সে-ই কেবল যা চিনিয়াছে—আর কেউ চিনিতে পারে নাই। কিন্তু সে যখন এ অঞ্চলেও আসে নাই তখন এই নলিনীকান্তকে সেই ত প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই ত প্রথম তার সত্যাগ্রহিতার প্রশংসা করিয়াছিল। আজ মেরী যে তার মুখের উপর বলিয়া গেল, নলিনীকে সে চিনিতে পারে নাই এর বিষটা লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন চন্‌চন্ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে জানে কেন তার মনে হইতে লাগিল নলিনীর প্রশংসা মেরীর পক্ষে নেহাতই অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু নলিনী নিজেই যদি তাকে এ অধিকার দিয়া থাকে। এই যে প্রশংসা, এ প্রশংসা যদি দুতরফা হয়! তার মনে হইতে লাগিল, নলিনী নিশ্চয়ই তার ছোট-মার কাছে এই অপরিচিতা মেয়েটির সম্বন্ধে কত কথাই না বলিতেছে;—হয়ত বলিতেছে—এমন মেয়ে সে আর কখন জীবনে দেখে নাই, হয়ত বলিতেছে—এর কাছে লুসী দাঁড়াই-তেই পারে না। তাকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই বলিতেছে, তাকে দেখিলে দয়া হয়, কেন না সে দয়ার পাত্রী, কেন না অদৃষ্ট তাহাকে অশেষ প্রকার বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত করিয়াছে এবং জীবনটা তার নেহাতই শোচনীয়। কিন্তু এই যে নূতন মেয়েটি—একে দেখিলে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে, মাথা আপনি নত হইয়া যায়। হয়ত এই কথার সহিত সেই অশিক্ষিতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীটিও সায় দিতেছে। লক্ষ্মী দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পর একদিন বৈকালে লক্ষ্মী গ্রামের মেটে পথ ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেছিল, হঠাৎ একটা মোড় বাঁকিয়াই দেখে, নলিনী এবং মেরী অত্যন্ত নিবিষ্ট-ভাবে গল্প করিতে করিতে তাহার দিকে আসিতেছে।

দূর হইতে তাকে দেখিতে পাইয়া মেরী বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! ঠিক তোমার কথাই হাচ্ছল আর তুমি স্বশরীরে এসে হাজির—আচ্ছা মজা ত!"

একটু আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার কথা?"

সমুখের দিকে অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিল, "কেন আপনার কথা হওয়াটা কি খুব একটা অদ্ভুত ব্যাপার নাকি, মিস্ লুসী?"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "কতকটা অদ্ভুত বৈকি!—আমি মহাত্মাও নই, ক্ষণজন্মাও নেই—সাধারণ—একবারে অতি সাধারণ মানুষ।"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী বলিল "এর অর্থ ত কিছুই বুঝলুম না মিস্ লুসী! মহাত্মা এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ছাড়া কারুর কথা মানুষ কি বলে না?"

লক্ষ্মী এ কথার কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাধা দিয়া মেরী বলিয়া উঠিল, "নাও, তোমাদের কথা-কাটাকাটি এখন রাখ দেখি।" তারপর লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কত দূর যাচ্ছ বল দেখি আগে?" মেরী বুঝিতে পারিয়াছিল, লক্ষ্মীর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কতখানি টিট্‌কারি লুকাইয়া রহিয়াছে, তাই সে এইসকল কথাবার্ত্তাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিতে সাহস করিল না;—কে জানে, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে কখন হঠাৎ সাপ বাহির হইয়া পড়িবে।

কি বুঝিয়া নলিনীও হঠাৎ কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল—বলিল, "শুনছিলুম, এখানে এসে অবধি আপনার প্রায়ই জ্বর হয়, অথচ আপনি অনাচার করতেও ছাড়েন না, এ ভারী অন্যায় কিন্তু, একটা ওষুধ-টোষুধ ব্যবহার করেন না কেন?"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আপনি দেখছি আমার খোঁজখবরও মাঝে মাঝে রাখেন!" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লক্ষ্মী মনে মনে হঠাৎ ভয়ানক রকম সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; তার মনে হইতে লাগিল, তার ভিতরের অনেক কথাই ঐ একটি মাত্র কথার ছিদ্র দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

কথাটার মধ্যে যে অভিমানের সুরটুকু বাজিতেছিল, তাহা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, মেরী এবং নলিনীর কাছে তাহা ধরা পড়িয়া যাইতে একটুও বিলম্ব হইল না। তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল—এই কথার মধ্যে বেশ একটি প্রচ্ছন্ন অভিমান লুকাইয়া রহিয়াছে। কেবল এই অভিমানের কারণটা তাহারা কেউ নিরূপণ করিতে পারিল না।

নলিনী বলিল, "কেন, আপনার খোঁজখবর কি আমি রাখি না মনে করেন,—মিস্ মেরীকে বরং জিজ্ঞাসা করে দেখুন—"

বাধা দিয়া একটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমি ঠাট্টা করছিলুম মাত্র; আপনি বুঝি মনে করলেন, আমি সত্যি সত্যি বলছি।"

কথাটাকে একবারে শূন্যে উড়াইয়া দিয়া মেরী বলিল "তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় বল দেখি?"

"ষ্টেশনের দিকে।"

"কেন, কাজ আছে নাকি?"

"না, তেমন বিশেষ কিছু না।"

নলিনী বলিল, "তবে আসুন না নদীর দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

হঠাৎ কি ভাবিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "না আপনারা যান—আমাকে ষ্টেশনের দিকে একবার যেতে হবে।" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ষ্টেশনের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মী ষ্টেশনের দিকে গেল না, এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটু পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জন কক্ষে বাতি নিবাইয়া দিয়া চুপ করিয়া একটা ইজি-চেয়ারের উপর পড়িয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত জীবন ধরিয়া সে যাহাকে চাহিতেছিল এবং আর-একটু হইলেই যাহাকে পাইত হঠাৎ কোথা হইতে কে আসিয়া যেন তার সেই চিরঈপ্সিত জিনিষটিকে এক নিমেষে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—পড়িয়া রহিয়াছে কেবল তাহারই বুকভাঙ্গা অবসাদ। কিন্তু সে ত কোনদিনই নলিনীকে চায় নাই এবং তাকে পাইবার জন্য কোনদিনও ত তার মন এতটুকুও লালায়িত হইয়া উঠে নাই,—তবে আজ হারাইবার সম্ভাবনায় তার মন এমন করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছে কেন?

হঠাৎ কি ভাবিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া লক্ষ্মী বাতি জ্বালিল, তার পর কি ভাবিয়া কালিকলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল।—চিঠি যাহাকে লিখিল সে চিদম্বরম। সে লিখিল—

"এসে অবধি কাজের ঝঞ্ঝাটে আপনাকে একটিও পত্র দিতে পারি নি, সেজন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। আপনার উপর বারবার যে-সব অত্যাচার করেছি সেইসব কথা মনে ক'রে আজ এই সুদূর বিদেশে আপনার জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে,—মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসি। এবার দেশে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলবো। এতদিনে বুঝতে পেরেছি আপনি ছাড়া আমার আপনার বলতে আর দুনিয়ায় কেউ নেই—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর কি ভাবিয়া চিঠিখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া পিছনের বাগানে ফেলিয়া

এবং তার পর বাতিটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিয়া আবার অন্ধকারে ইজিচেয়ারের উপর গিয়া শুইয়া পড়িল।

(১৭)

ইহার দু-চারদিন পর একদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মী টেবিলের ধারে বসিয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে একরাশ বুনো ফুল লইয়া ফেলী আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "ভোর বেলা উঠে কোথায় গেছ্‌লি রে ফেলী ?—এই বুনো ফুল তুল্‌তে বুঝি ?—আচ্ছা পাগ্‌লী ত তুই !"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফেলী বলিল, "শুধু ফুল তুল্‌তে গেছ্‌লুম বুঝি,—কত কাজ ক'রে এলুম তা ত আর জান না ?"

ধীরে ধীরে তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া লক্ষ্মী বলিল, "কি রাজ-কার্য্যটা ক'রে এলি শুনি ?"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফেলী বলিল, "সে কত কাজ! পরেশ ধোপার ছেলের জন্যে ইষ্টিশানের কাছ থেকে ওষুধ কিনে এনে দিলুম,—ছুতোরদের লাটুর জন্যে—" এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ মধ্য পথে থামিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মেরী-বিবি খুব ভাল মেয়ে লক্ষ্মী-দিদি! নলিনী-বাবু আর মেরী-বিবি লাটুকে যে ক'রেই বাঁচিয়েছে, সে মা-গঙ্গাই জানেন।"

হঠাৎ যেন চম্‌কাইয়া উঠিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "মেরীর সঙ্গে নলিনীবাবুর খুব ভাব হয়ে গেছে, নয় রে ফেলী ?"

হাত মুখ নাড়িয়া ফেলী বলিতে লাগিল, "ও বাবা,—তা আবার হয় নি,—দুজনে রাতদিন একসঙ্গে থাকে;—আমাকেও নলিনীবাবু—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "রাতদিন একসঙ্গে থেকে দুজনে কি করে রে ফেলী ?"

চোখ দুটোকে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া, গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া ফেলী বলিল, "ওমা!—তুমি বুঝি কিছু জান না!—অবাক কর্‌লে তুমি লক্ষ্মী-দিদি!—নলিনী-বাবু যে একটা ছোট হাস্‌পাতাল খুলেছে; সেইখানেই ত দুজনে রাতদিন থাকে;—আমিও ত সেইখানে—"

লক্ষ্মী সহসা ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া বাগানে গিয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে ছায়ার মত, সহকারীর মত, বন্ধুর মত, আত্মীয়ের মত মেরী নলিনীর সুখ দুঃখের সহিত ক্রমেই নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছে, এ সৌভাগ্যটা একদিন তারই প্রাপ্য ছিল। সে চেষ্টা করিলেই এ সৌভাগ্যটা অনায়াসে লাভ করিতে পারিত; কিন্তু তখন ইহার জন্য একটুও চেষ্টা করে নাই;—মনে করিয়াছিল হাতের কাছে যে জিনিষ রহিয়াছে, যেদিন ইচ্ছা হাত বাড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া লইলেই চলিবে, তার জন্য তাড়াতাড়ির কোন দর্‌কার সে বোধ করে নাই। কিন্তু যাহাকে অনায়াসে পাওয়া যায় হারাইবার সময় যে তাহাকে অনায়াসে হারানও যাইতে পারে এ সত্যটা তখন তার মাথার মধ্যে আসে নাই। ফেলীর কথা শুনিয়া আজ তার মনে হইতে লাগিল, অল্প অল্প করিয়া যে জিনিষটিকে সে তৈরি করিয়া তুলি॰, একদিন হঠাৎ কোথা হইতে কে আসিয়া তার সেই অনেক-যত্নে-তৈরি-করা জিনিষটিকে নিজের বলিয়া দাবী করিয়া বসিল এবং তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল। কেন সে একবারও চেষ্টা করে নাই, কেন সে পাইয়াও এমন করিয়া স্বেচ্ছায় হারাইল,—এখন যে কোন উপায় নাই! একবার মনে হইল, মান-অভিমান দূরে ফেলিয়া রাখিয়া নলিনীর কাছে ছুটিয়া গিয়া বলে, "আমাকেও তোমার ব্রতে দীক্ষিত ক'রে নাও!" কিন্তু না না, তা হইতেই পারে না! নলিনী ফেলীকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইল, কিন্তু তাকে একবার এসম্বন্ধে কোন কথা বলাই প্রয়োজন বোধ করিল না। তার পর, যেখানে সে জোরের উপর গিয়া একদিন দাঁড়াইতে পারিত, সেখানে আজ মেরীর—। লক্ষ্মীর কান্না আসিতে লাগিল; তার মনে হইতে লাগিল, তার এই খাপ্‌ছাড়া বিড়ম্বনাময় জীবনের একটি জায়গায় সে অতিকষ্টে অতি সন্তর্পণে যে শান্তিময় একটি বাসা বাঁধিয়াছিল, একদিনের একটি মাত্র ঝঞ্ঝাবাতে তার সেই বড়সাধের বাসাটি কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল তাহারই দু-একটা অবশিষ্ট খড় কুটো।

(১৮)

নলিনী যে লক্ষ্মীকে ভুলিয়া গিয়াছিল ঠিক তা নয়। সে যখন প্রথম এই ছোট হাসপাতালখানি খুলিবার সঙ্কল্প ক— তখন হইতেই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল লক্ষ্মীকে —— কথা জানাইবে এবং সে যাহাতে এই দেশহিতকর কার্য্যে

তার সহায়তা করে তার জন্য তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে। কেন না স্ত্রীলোকরোগীদের জন্য তার সহায়তা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যখনকার কথা বলিতেছি তখন পর্য্যন্ত মেরী আসে নাই। নলিনী মনে করিয়াছিল প্রস্তাব করা মাত্রই লক্ষ্মী আগ্রহসহকারে তার সহায়তার জন্য ছুটিয়া আসিবে। ঠিক এমনটি আশা করা নলিনীর পক্ষে খুব অসঙ্গত হয় নাই। কেন না, এটা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে লক্ষ্মী মুখে যাই বলুক না কেন হিন্দুসমাজকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং এই সমাজের দুর্ভেদ্য ব্যূহটার মধ্যে প্রবেশের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়াই সে এতদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া মরিতেছে। তাই সে আশা করিয়াছিল সমাজ-সেবার জন্য এই যে আহ্বান, এ আহ্বান শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিবে না—নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিবে। এমনি একটা অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া সে লক্ষ্মীর সহিত তাদের বাড়ীতে একদিন দেখা করিবার জন্য গিয়াছিল। লক্ষ্মী তখন বাড়ীতে ছিল না। সে ফিরিতেছিল, এমন সময় মিস্ গুই এবং রেভারেণ্ড হোয়াইট তাকে ডাকিয়া বলিল, "শুনুন, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এমন ক'রে যখন তখন নির্লজ্জের মত লুসীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে আসবেন না; জানেন, এর জন্যে বেচারাকে তার মার কাছ থেকে কি ভয়ানক লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করতে হয়!" বলা বাহুল্য এর এক বিন্দুও সত্য নয়। কিন্তু নলিনীর পক্ষে এ জিনিষটা'কে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে একটুও বাধা ছিল না এবং সেই হইতে সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, আর কখন সে লক্ষ্মীর ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইবে না, এমন কি তার সম্বন্ধে মনে মনেও কোন দিন চিন্তা করিবে না। সে নিজের মনটাকে তোলপাড় করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কোথাও একটুও গলদ জমা হইয়া উঠিয়াছে কি না—না, কোথাও ত কিছু নাই—কিন্তু লক্ষ্মীর মনের মধ্যে কি হইয়াছে তা কে জানে! হয়ত কিছু হইয়াছে, হয়ত কোথাও একটা কিছু গজাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল এবং তার মার চক্ষে সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাই তিনি চটিয়া গিয়াছেন। না না!—সে তফাতে থাকিবে, এমন করিয়া নিজেকে অপরাধী করিয়া তুলিবে না।

লক্ষ্মী কিন্তু ভাবিয়াছিল অন্যরূপ;—কেন না সে এসকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। সে মনে করিয়াছিল, সেদিন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে সে যে বক্তৃতা দিয়াছিল তাহারই জন্য নলিনী তার উপর চটিয়া গিয়াছে এবং তার আশা ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য এইটাকেই সে আসল কারণ বলিয়া ধরিয়া লয় নাই। কারণ এটা সে স্পষ্ট জানিত যে, এই অসহ্য প্রত্যাখ্যানের আসল কারণটা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে এই নবাগতা শ্বেতাঙ্গ যুবতীটির রূপযৌবনের মধ্যে। মেরীর রূপ আছে, যৌবন আছে এবং তাহার উপর মানুষের মন অধিকার করিবার অনেক কৌশলই তার জানা আছে। এই যে সে এমন করিয়া উঠিয়া-পড়িয়া সমাজ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছে—ইহা কি আন্তরিক? না না, তা হইতেই পারে না—এ কেবল নলিনীর চিত্ত অধিকার করিবার ছল মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৪৯ সালে আষাঢ় মাসে কলিকাতার আহিরীটোলাস্থিত ভবনে কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্ন বাল্যকালে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে লালিত-পালিত হন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে কালীপ্রসন্ন সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি অসাধারণ উৎসাহে শত বাধা অতিক্রম করিয়া ললিতকলার অনুশীলনে তৎপর হইলেন।

পাইকপাড়ার রাজবাটীতে যে সময় সংস্কৃত নাটক "রত্নাবলী" অভিনীত হয়, সে সময়ে কালীপ্রসন্ন রত্নাবলীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া সম্ভ্রান্ত দর্শকবর্গের পরিতৃপ্তিসাধন করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় অনুজ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালীপ্রসন্নের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হন। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটীতে তিনি সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহোদয়ের নিকট সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এ-দেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষার্থ যখন সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন কালীপ্রসন্ন উক্ত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন আত্ম-বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে তিনি যে বিদ্যালয়ের কেবল শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিদর্শনাদি করিয়াছিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি [illegible] তাঁহার অসাধারণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায় দ্বারা বঙ্গদেশের সঙ্গীতের স্বরলিপি-পদ্ধতি [illegible] প্রচার হয়,



সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গলার বাহিরে জোড়া শানাই ঠেকাইয়া অদ্ভুত কৌশলে বাজাইতেছেন।

সমারোহে এক "জলসা" অর্থাৎ সঙ্গীতাধিবেশনের আয়োজন করেন এবং তাঁহাদিগের মতামত গ্রহণ করিয়া উক্ত "সঙ্গীতসারে" সমস্ত রাগরাগিণী সন্নিবেশিত করা হয়। সেইসকল রাগরাগিণীর শুদ্ধ স্বরলিপি বদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর "সঙ্গীতসার" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিবার ভার তাঁহার প্রধান ছাত্র কালীপ্রসন্নের উপরই পড়িয়াছে এবং তিনিও এই দুরূহ কার্য্য তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় যত্ন ও পরিশ্রমে সমাধা করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ফিলাডেলফিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কালীপ্রসন্ন সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ অধিকার থাকার দরুণ একখানি "সম্মানপত্র" পাইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির বার্লিন নগরী হইতে এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইটালি হইতে এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী মহানগরী হইতে সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শিতা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন উচ্চ-প্রশংসালিপি ও সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গ সঙ্গীত-বিদ্যালয় হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নকে "সঙ্গীত-উপাধ্যায়" নামক পদবী ও একখানি সুবর্ণ-পদক প্রদান করা হয়। তদীয় সঙ্গীত-গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তায় কালীপ্রসন্ন সঙ্গীতের নূতন স্বরলিপি-ধারা প্রবর্ত্তিত করেন। অযোধ্যার সঙ্গীতপ্রিয় শেষ নবাব ওয়াজীদ আলী শা যখন মেটেবুরুজে, কালীপ্রসন্ন "সুরবাহার যন্ত্রের" অদ্বিতীয় বাদক বলিয়া সে সময়ে পরিচিত। নবাব বাহাদুর অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্বীয় কণ্ঠদেশ-বিলম্বিত পুষ্পমাল্য খুলিয়া, স্বহস্তে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গীতপ্রিয় দ্বারবঙ্গের মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কালীপ্রসন্নকে অধিক বেতন দিয়া দ্বারবঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রবৃন্দকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ন্যাসতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটিতে কালীপ্রসন্নের অসাধারণ অধিকার ছিল। ন্যাসতরঙ্গ বাদন হঠযোগ সাধন ব্যতীত সাধারণ সঙ্গীত-সাধকের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। কালীপ্রসন্ন যোগাভ্যাস দ্বারা এমন শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন যে, এই যন্ত্র কুক্ষিদেশের মধ্যে চাপিয়া বায়ু নিরোধ করিয়া সমুদায় সঙ্গীত-তরঙ্গ উত্থিত করিতে সবিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। "ন্যাসতরঙ্গে" তাঁহার তুল্য সুদক্ষ বাদক সে সময়ে ভারতবর্ষে আর কেহই ছিল না।

সে-বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। পূর্ব্বে বিদেশী ও স্বদেশী ওস্তাদ ও শিক্ষাগুরুর নিকট ছাত্রেরা মৌখিক শিক্ষা প্রাপ্ত করিয়া পরে নিজ নিজ স্মৃতিশক্তির দোষে উহার অবমাননা করিত। এইসকল কারণে তিনি যাহাতে আমাদের দেশবিখ্যাত রাগ রাগিণী-সমূহ যথাযথ স্বরলিপি-বদ্ধ হইয়া ভবিষ্যতে বহুল প্রচারিত হয়, তজ্জন্য অশেষযত্নসহকারে তাঁহার গুরুদেব ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কৃত "সঙ্গীতসার" গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ-কালে, আমাদের দেশপ্রচলিত প্রায় সমুদয় রাগ-রাগিণীগুলির যতদূর সম্ভব বিকাশ বাসনায়, তাহা স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষাগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সম্মতি লইয়া সঙ্গীতসারে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে আরও বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃত "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" নামক সেতারের গৎ-শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে মাত্রা বিভাগ, স্বরের 'স্থিতি কাল' এবং স্বরের যুগল রূপ অলঙ্কার ও সংযোগ যেরূপ বিশদ ও সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের গুরু ৺লছমীচাঁদ মিশ্র মহাশয় ভারত-বর্ষের তদানীন্তন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রধান প্রধান গায়ক ও বাদ্যযন্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা ৺শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের অর্থসাহায্যে মহা

ভারতের বড় লাট লর্ড লিটন ও লর্ড রিপন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাসাদে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ন্যাসতরঙ্গ বাদ্য শুনিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার ন্যাসতরঙ্গ বাদ্য-যন্ত্রে অসাধারণ অধিকার দেখিয়া, ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক-খানি প্রশংসালিপি পাঠাইয়া দেন।

ইয়োরোপের বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ অধ্যাপক এডওয়ার্ড রেমিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রো-হঙ্গেরী হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কালীপ্রসন্নের সেতারের আলাপ শ্রবণে মুগ্ধ হন। 'ইংলিসম্যান' পত্রে কালীপ্রসন্নের বাদ্য-নৈপুণ্য সম্বন্ধে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসে ৫৮ বৎসর বয়সে সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিদ্ কালীপ্রসন্ন অনন্তধামে প্রস্থান করেন।



সৃষ্টিছাড়া

(১)

মুখোমুখি দুখানা বাড়ী ছিল। মাঝে শুধু একটা ফালির মত গলির ব্যবধান। জানলা খুললে একবাড়ীর অন্ধিসন্ধি সব আর-এক বাড়ীর চোখে পড়ত। কিন্তু তবু দুই দুই বাড়ীর মানুষগুলো ছিল সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জগতের লোক। তারা সবাই সবাইকার মুখ চিনত, একে অন্যের নাড়ীনক্ষত্র প্রায় সব জানত, জন্ম মৃত্যু বিবাহের আনাগোনা এক বাড়ীকে লুকিয়ে আর-এক বাড়ীতে চলতে পেত না. তবু মানুষগুলোর পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ছিল না। কেন ছিল না? তারা যে কলকাতা সহরের মানুষ, তারা যে কখনও একপাঠশালায় পড়ে নি, এক আপিসে বেরোয় নি, এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খায় নি, এক সভায় বক্তৃতাও করে নি। তবে কি সূত্রে তাদের পরিচয় হবে? শুধু পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে বলে?

বড় বাড়ীখানার মালিক ছিলেন সহরের একজন লব্ধনামধন্য চিকিৎসক; সে বাড়ীর কায়দাকানুন সব হাল ফ্যাশানের। সেখানে হপ্তায় হপ্তায় সান্ধ্য সম্মিলনে পিয়ানো বাজত, চায়ের মজলিস্ বসত, ডাক্তারের তিন মেয়ে মোটরগাড়ী চড়ে নিত্য সন্ধ্যায় হাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বেড়াতেন। আগে থেকে মুলাকাতের বন্দোবস্ত করে কার্ড হাতে এসে যথাসময়ে হাজির না হলে সে বাড়ীর লোকদের দেখা পাওয়া ভার ছিল। বাড়ীখানা ছিল যেন হ্যামিল্টনের দোকানের সুন্দর একটা সোনার ঘড়ী। তার সব কাজই পালিশ করা, সব ব্যাপারই নিয়মে বাঁধা।

ছোট বাড়ীখানার কর্ত্তা কোনো সওদাগর আপিসের বড়বাবু। কায়দা যে কাকে বলে তা সে বাড়ীর লোকে কখনও শেখেনি। পিতামহের কাল থেকে সংসারে যে-সব অনিয়ম নিয়মিতভাবে চলে এসেছে আজও তার ত্রুটি সেখানে ঘটে না। নিয়মিত নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা সে সংসারে ছিল না, কিন্তু তবু অসময়ে অতিথির আবির্ভাবে সে বাড়ীর বৌদের ভাতে কম পড়াটাই যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বৈঠকখানা বলে সে বাড়ীতে একটা জায়গা ছিল বটে, তবে ভৃত্য হরির ছেঁড়া তেলচিটে বিছানা সেখানে বারোমাসের মতন এমন আসন গেড়েছিল যে বাড়ীর ছেলেদের মজলিসটা গলির মোড়েই সচরাচর বসত, অর্থাৎ দাঁড়াত। সাক্ষাৎ করতে লোকে সেখানে কখনও এত্তালা দিয়ে আসেনি, কাজেই আজই বা আসবে কেন? কাউকে কারুর দরকার হলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে যে-কোনো অসময়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করত। কপালে সাক্ষাৎ থাকলে দেখা হত, না থাকলে ফিরে যেতে হত, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের কোনো বন্দোবস্ত না করেই। ওরই মধ্যে কপাল যদি একটু ভাল থাকত তাহলে ভৃত্য হরি জানিয়ে যেত বাবুরা বাড়ী নেই, হরি বিমুখ হলে অতিথির গলা আর ধৈর্য্য যতক্ষণ কৃপা করত ততক্ষণ হাঁকাহাঁকি করে নিজের অদৃষ্ট ও অপরের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ধিক্কার দিয়েই তাকে খুসি থাকতে হত। বাড়ীর মেয়েরা ঘরে বসে বসে বাইরের লোকটার বৃথা পরিশ্রমে দুঃখিত হয়ে তাকে বিদায় দেবার উপায় ভেবে ভেবে বৃথা ছট্‌ফট্ করত, কিন্তু হরিকে গাল দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় তারা ভেবে পেত না, কারণ তারা যে মেয়েমানুষ। নিমন্ত্রণ রক্ষা করাটা সচরাচর সে বাড়ীর লোকের কপালে ঘটত না, কারণ তাদের জগতে অকারণ নিমন্ত্রণের কারণ কেউ কখনও খোঁজে নি। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে ন মাসে ছ মাসে যদি কেউ নিমন্ত্রণ করত, তবে তা সদলবলেই সকলে রক্ষা করতে যেত, পারলে জ্ঞাতিগুষ্টিকে ডেকে দল বাড়িয়েও তুলত। সেদিনকার মত বাড়ীর সংসারপাট বন্ধই থাকত, ছেলেপিলে কেঁদে কেঁদে পরের বাড়ীর মেজেয় ঘুমিয়ে পড়লেও তাদের বাড়ী আনার অবসর হত না, কারণ সে বাড়ীতে ছেলে-পিলের অভাব না থাকলেও গাড়ির অভাব ছিল।

ডাক্তার-বাবুর মেজ মেয়ের নাম ছিল মঞ্জুলা। এই নিয়মে-বাঁধা সংসারে সোনার ঘড়ির একটি কাঁটার মতই বাইরে থেকে তাকে দেখাত, কারণ আজন্ম এমনিভাবেই সে মানুষ হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে সে মোটেই এমন আট ঘাট বেঁধে চলত না। পৃথিবীতে বসন্তের বাতাস যেমন পাকা দেয়ালের ফাটলের ভিতরও ফুল ফোটাতে ছাড়ে না, তার মনের [illegible] মেশাও তেমনি সকল নি-

কানুনকে ফাঁকি দিয়ে এখানে-সেখানে একটু জাল বুনতে লাগিয়েছিল। তাই তাদের চিরকালের বাড়ীর এই সোনার খাঁচাটা তার কাছে ঠেক্‌ত ঠিক লোহার শিকলের মত। বাইরে যত সযত্নে সে এখানকার নিয়মগুলো পালন কর্‌ত, অন্তরে তত নির্ম্মমভাবে দুহাতে সে সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাইত। কিন্তু উপায় ছিল না ছিঁড়ে ফেল্‌বার। কারণ নিয়মগুলোকে যতই কেন না সে অপছন্দ করুক, সে-গুলোকে সে সমীহ করে ভয় করে চল্‌ত। সেগুলোকে তার ঘাড়ের উপর কেউ যদি জোর করে চাপিয়ে দিত, তাহলে শরীরে তার শক্তি হাজার কম থাক্‌লেও বিদ্রোহের জোরেই সেই সেগুলো ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌ত। কিন্তু এক-তরফা জবরদস্তি ত জগতে চলে না। ঝগ্‌ড়া করবে সে কার সঙ্গে? নিয়মকানুনগুলো নিজেও কোনো দিন তাকে বলে নি আমায় মান্‌তেই হবে, তাদের স্রষ্টাও তেমন কোনো বিধি দিয়ে দেন নি। তারা যেন জগৎব্যাপারের বিশ্বনিয়মের মত আপনাআপনিই চল্‌ত। অন্তত মঞ্জু জন্মাবধি তাই দেখেছে। তোমার খুসী হয় তাদের ভাঙ্‌তে পার। কিন্তু ওই যে নীরবে খুসীর উপর ছেড়ে দেওয়া ওইটাই হচ্ছে সবচেয়ে চালাক লোকের ব্যবস্থা। ওকে অমান্য করতে কেউ সাহস করে না। ও তার প্রাপ্য নীরবেই আদায় করে নেয়। মানুষ কখনও ওকে ভেঙে দেখ্‌বার মত চাপ পায় নি বলে চিরকালই ভয়ে ভয়ে ভাবে ওকে ভাঙ্‌লে না জানি কি একটা প্রলয়কাণ্ড হয়ে যাবে।

মঞ্জুদের বাড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে যে-সব মানুষ আসা-যাওয়া করত, আজন্ম তাদের কথাবার্ত্তা শুনে শুনে চাল চলন দেখে দেখে মানুষগুলোকে যেন তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তারা যে কিসের পর কি বল্‌বে, কোথায় কেমন করে পা ফেল্‌বে, হাত নাড়্‌বে, তা সে আগে থেকেই বলে দিতে পার্‌ত। কিন্তু জগৎটা ত বাস্তবিক রিহার্সাল-দেওয়া নাটকের মত নয়, কাজেই নাটকের বাইরের পৃথিবীটাকে দেখ্‌বার জন্যেও মঞ্জুর মন চঞ্চল হত।

ঘরের জান্‌লা খুলে আশপাশের বাড়ীগুলোয় তার এই তৃষ্ণাটা সে মিটোতে চাইত। অল্প অল্প তাদের পরিচয় দূর থেকে দেখার মধ্যা দিয়ে পেত, কিন্তু অনেক-খানিই অদেখা থেকে যেত ... ই কৌতূহলটা কখনও পুরানো হত না। মঞ্জুর ইচ্ছা করত সাতশবার ... পভলের মত তার এই পরিচিত জগৎটা ছেড়ে সে একবার ছুটে ওই অপরিচিতটার কোলে গিয়ে পড়ে। কিন্তু সে পার্‌ত না। কারণ এই জগৎটায় ত কেউ তাকে সত্যি বেঁধে রাখে নি; তার মনে হত গাছ যেমন মাটির সঙ্গে বাঁধা হয়েই জন্মেছে অথচ আকাশের কোলে পৃথিবীর রসময় বুকের পাঁজরে পাঁজরে তার স্বাধীনতার একটা পথ থেকে গেছে, তেমনি এই সংসারের কোলে সে জন্মেছেই শরীরের বন্ধন নিয়ে,মুক্তি আছে তার মনোলোকে। শিকলের বাঁধন ছেঁড়া যায়, কিন্তু এ যেন তার নাড়ীর বাধন, একে সে ছিঁড়্‌বে কি করে? তাছাড়া যে বন্ধনের মাঝে মুক্তির হাওয়া আছে সে ত দম বন্ধ করে মারে না, তাকে ছেঁড়্‌বার দরকার অতি বড় দুঃখে না পড়্‌লে হয় না। আর একটা কথা,—এই পরিচিত জগতের গণ্ডীটা তার খুব ছোট ছিল না। বাঙ্গালীর মেয়ে সে কোথায় না যাচ্ছে, কি না করছে। তবু এটাকে বাঁধন যদি সে লোকের কাছে বলে তবে—হয়তো কেন নিশ্চয়ই—লোকে তাকে পাগল বল্‌বে। মাঠের মাঝখানে খুব বড় একটা দড়ি দিয়ে গরুগুলোকে খোঁটায় বেঁধে চরতে অনেক সময় রাখালেরা ছেড়ে যায়, গরু মনের সুখে ঘাস খায়, খুঁটির কেন্দ্র নিয়ে যতখানি পরিধি সে ঘুরতে পারে তা ঘোর্‌বার আগেই ক্ষুধা তার মিটে যায়, তাই সে যে বাঁধা আছে এ-কথাটা ভাব্‌বার অবসর তার হয় না। সে মনে করে সে খোলাই আছে। মঞ্জুর মনে হত তার পরিচিত মানুষগুলো ঠিক এই গরুগুলোর মত বোকা, তাই তাদের এ বাঁধনের কথা বল্‌তে সে সাহস পেত না, কারণ বোকার দল যেখানে বেশী ভারী, সেখানে তাদের বোকামি দেখাতে যাওয়া মানে নিজেকে বোকা প্রমাণ করা। নিত্য যে-সব কাজ মঞ্জু করত অনেক সময় তার চেয়ে ঢের বেশী ইচ্ছে করত তার রোদে পিঠ দিয়ে ভিজে কাপড়ে শুচি হয়ে বড়ী দিতে,ঘোমটা টেনে বন্ধ পাল্‌কী করে হঠাৎ একটা পুরীতে গিয়ে উঠ্‌তে, চিরকালের আত্মীয় শ্বশুর-ভাসুরকে চির অপরিচয়ের মধ্যে দেখতে, এমন কি প্রিয়ের অতিপ্রিয় চিঠিখানা অচেনা পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়ে শুন্‌তে। কখনও তার সখ হত বেদে

[...] মত নিত্য নূতন গাছের তলায় নূতন করে সংসার পেতে নিত্য উষার উদয়ে মহিষের পিঠে তার ধ[...] সম[...] নিয়ে পথ থেকে পথান্তরে বেরিয়ে পড়ছে। মনে তার এমন সব অনাসৃষ্টি ইচ্ছা করত। কেবল ম[...]র রসটা সে কখনও আস্বাদন করেনি বলে। [...] এ-সব করবার সুযোগ তার কোনো দিন হবে না। যদি বা দু-একটার সুযোগ কখনও হয়, তাও সে করে উঠতে পারবে না, কারণ তার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ঐসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অখণ্ড অবসর তার মোটেই ছিল না; তার নিয়মের জগতে পড়ার পর গান, গানের পর সেলাই, সেলাইয়ের পর ড্রয়িং, তার পর বেড়ানো, ইত্যাদি ভীড় করে সর্ব্বদা চলত। পাগলামি করবার অবসরও তার ছিল না, ইচ্ছাও সব সময় করত না, কারণ এই নিয়মিত কাজগুলোকে সত্যি সত্যি সে ভাল বাসত।

মঞ্জুলার পাশের বাড়াতে সওদাগরী আপিষের বড়বাবুর ছোট ছেলে মোহন ছিল এই রকমই আর-একটা পাগল। তার বড় চার ভাই পিতৃপিতামহের আমলের মর্য্যাদা রক্ষা করে যথাযথসময়ে স্কুল পালিয়ে বিবাহ করে আপিষে ভর্ত্তি হয়ে ছেলেপিলে কোলে করে গৃহিণীদের গয়না গড়িয়ে এবং তাদের নারীত্বকে উদ্ধ থেকে অবজ্ঞা করে বেশ নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাচ্ছিল, বিশ্বের কোনো সমস্যা তাদের সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গাতে পারে নি, জগতের কোনো দুঃখ দারিদ্র্য তাদের ধেনো জমি কিম্বা গৃহিণীদের গহনার তহবিলে টান পড়ায় নি, কল্পনা কোনো দিন তাদের হিসাবের খাতায় গোলমাল করে নি, বাগ্‌দেবী কোনো দিন তাদের গড়গড়াটিকে স্থানচ্যুত করতে পারেন নি। মহিম, মুকুন্দ, মুরারি আর মাধব চার ভাই ঠিক একই ছাঁচে ঢালা। মাঝখান থেকে মোহনটার এমন সৃষ্টিছাড়া স্বভাব কেন হল তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বাবা যথাসময়ে তাকেও আপিষে ভর্ত্তি করে দেবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রায় অজ্ঞাতে টক্ টক্ করে কখন যে সে এম্-এ পর্য্যন্ত পাশ করে বসল তা তিনি টেরও পান নি। ছেলে যখন এম্এ পাশই করল তখন তাকে আপিষে না ঢুকিয়ে হাকিম-টাকিম কিছু একটা করাই বাবার ম[...] হল। কিন্তু বেয়াড়া ছেলেটা বলে বসল সে প্রফেসার হবে। বাবা বললেন, "হতভাগা কোথাকার, প্রফেসার ভদ্রলোক হয়! তার চেয়ে বরং ল পড়্।" ছেলে কিন্তু বেঁকে বসল। অগত্যা বাবা বললেন, "আচ্ছা, তোমার বিবাহের কথা হচ্ছে, সেটা হয়ে যাক্, তারপর ওসব পরে ঠিক করা যাবে এখন।" মোহন বাবাকে বললে, "এখন নয়।" বৌদিদিকে বললে, "তোমাদের সনাতন প্রথার কোনোটাই যখন আমাকে দিয়ে রক্ষা করাতে পারলে না, তখন আর-একটা স্বজাতীয়া জীবকে দগ্ধাবার আর এত উৎসাহ কেন? ও-সব আমার দ্বারা হবে না বৌদিদি।" বৌদিদি বললেন, "ঠাকুরপোর সব তাতে বক্কিমে; দোল না, দুর্গোচ্ছব না, করবে ত বিয়ে, তার আবার অত ভাবনা!"

মহিম, মুকুন্দ, মুরারি আর মাধব বই বলতে বুঝত এন্‌ট্রান্স্ কোর্সস্, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ব্যাকরণ-কৌমুদী, ইত্যাদি। কাজেই মোহন যখন এম্-এ পাশ করবার পর ল না পড়েও হরি ভৃত্যের অধিকৃত বৈঠকখানা ঘরটা বইয়ে ছেয়ে ফেলতে লাগল তখন তারা ছেলেটাকে পাগল না বলে আর বলে কি? পাশের পড়া শেষ হয়ে গেল অথচ একলা দশটা পাশের বই কিনলে লোকে তার মাথার ঠিক আছে ভাবে কি করে! ধেনো জমি কিম্বা গাওয়া ঘি কিম্বা পাটের দালালী বিষয়ে শিক্ষিত ভাইটির মতামত নিতে গিয়ে তারা দেখেছে মূর্খটা এ বিষয়ে এক অক্ষরও বোঝে না। অথচ রুশিয়ার কোনো কেতাবের কথা উঠলে শচীন-মাষ্টারের সঙ্গে সে যে বক্তৃতা জোড়ে তা অর্থে যতই ভুয়ো হোক লম্বায় নেহাৎ কম হয় না। মুকুন্দ অনেক চেষ্টা করেও তার মানে বুঝতে পারে নি, কিন্তু তবু কেন জানি না মোহনের বলবার ভঙ্গীটাতেই তার তাকে তারিফ করতে ইচ্ছে করত।

মোহনের বদ[...]র অন্ত ছিল না। তার উপর হিন্দুঘরের [...]কের ছেলে হয়ে এমন উড়ু উড়ু মন যে কেন তার হল তার ঠিক নেই। মুরারি ভেবে পেত না তাস পাশা থিয়েটার বায়স্কোপ এত থাকতে মানুষের কলকাতা ছেড়ে হিল্লি দিল্লি মক্কার দিকেই মন সমস্ত ক্ষণ ছোটে কেন! বিদেশ[...] মনে [...]

তার গায়ে জ্বর আছে, অথচ এ পাগ্‌লাটার ঘুরুনির আর অন্ত নেই। আবার মহিম সেদিন বল্‌লে মোহন নাকি তার বউয়ের কাছে বলেছে, "দাদারা ত সবাই বাঙালী বিয়ে করে দেখ্‌লেন, ওটা ত পুরোনো হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি যদি কাশ্মীরী কি জাপানী বউ নিয়ে আসি কেমন হয় বল ত! বেশ একেবারে নূতন, অপরিচয়ের গৌরবে আমাদের সনাতন প্রথাকেও ছাড়িয়ে যায়।" শুনেছ একবার কথা! আচ্ছা এমন ছেলে নিয়ে মানুষে কি করে বল ত! এক কথায় বল্‌তে গেলে যেখানে যেমনটি সেখানে ঠিক তার উল্‌টোটি করা অন্ততঃ বলাই ছিল মোহনের স্বভাব। মাধবের অন্তত এই মত।

(২)

আপনার জগৎটা নিয়ে মঞ্জু নেহাৎ যে খুব মন্দ ছিল বল্‌লে অন্যায় হবে; কিন্তু তবু ক্ষণে ক্ষণে তার মনটা এমন ব্যাপায় কাতর হয়ে উঠ্‌ত যে নিজে সে নিজের মত দুঃখী জগতে আর খুঁজে পেত না। ভাব্‌ত কিসের জন্যে সে সংসারে এসেছে যদি চিরকাল এমনি পরের হাতে চালানো ঘড়ির কাঁটার মতই তার জীবনটা কেটে যাবে? মুক্তি কি সে কোনো দিন পাবে না? অথচ মুক্তি যে কোন্‌খানে তার চাই সেটা সব সময় ঠিক সে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ত না। অনেক সময় মুক্তির তৃষ্ণাটাই তার হারিয়ে যেত, আপনার জগৎ নিয়ে সে এমনি মেতে থাক্‌ত। নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মনের যে অচেনারাজ্যে গোপন অভিসার চল্‌ত তার সবচেয়ে অভ্যস্তপথ ছিল গলির ধারের তার সেই জান্‌লাটি। এই জান্‌লাটার উল্‌টো দিকে ছিল নীচু একটা পাঁচিলের পর সেই বাড়ীটার মুখ। বাড়ীর ঘরগুলো সব একতলার পর দুতলা করে থাকে থাকে সারে সারে সাজানো ছিল। পর্দ্দা দেবার কোনো ভাবনা সে বাড়ীর লোকের মাথায় কখনও আসে নি। আর ঘরগুলোর পিছনে ঘর করবার মত জায়গা ছিল না। কাজেই মঞ্জুর জান্‌লার সাম্‌নে সে বাড়ীখানা সারাদিনই একখানা চলন্ত ছবির মত ঘুর্‌ত। বাড়ীর বড় বউ, মেজ বউ সবাইকে সে চিন্‌ত। কিন্তু কোনোদিন সে তাদের সঙ্গে কথা বলেনি। বউরা মঞ্জুদের বাড়ীর ঝিদের সঙ্গে কখনও কখনও কথা বলেছে বটে, কিন্তু মঞ্জুদের দেখ্‌লেই কেন জানিনা তারা ঘোম্‌টা টেনে দূরে পালিয়ে যেত। মঞ্জু দুই বোন ও-বাড়ীর বউদের সঙ্গে গল্প করবার কোনো কল্পনাও কখনও বোধ হয় করেনি, কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লেও সে পার্‌ত না। সে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ত ও-বাড়ীর বউরা মঞ্জুদের ঠিক স্বজাতীয়া বলে মনে করে না, অনেকটা পুরুষদের সামিল বলেই ওরা তাদের ধরে। মঞ্জুর লজ্জাটাও এত কম ছিল না যে এর পর সে ডাকাডাকি করে ও-বাড়ীর সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করে।

বিকেল বেলা মুকুন্দ মুরারি আপিষ থেকে ফির্‌ত, বউরা গাড়ু ভরে জল দিত, জলচৌকিতে বসে খালি গায়ে লাল গামছা কাঁধে ফেলে বাবুরা সশব্দে হাত মুখ ধুত, মঞ্জু একবার উঁকি মেরে দেখে যেত। তারপর মহিম মাধব ফির্‌ত ময়লা সাদা জিনের কোট-প্যান্‌টালুন পরে মাথার টুপি হাতে নিয়ে টিকি সুদ্ধ চুলের উপর পিছন থেকে শ্রান্ত হাত বুলোতে বুলোতে। বউরা তালপাখা হাতে করে ছুটে এসে হাওয়া কর্‌তে কর্‌তে জুতো কোট টুপি মেঝেয় বিছানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে রেখে স্বামীদের শ্রান্ত দেহের ভার লাঘব কর্‌ত, মঞ্জু সেতার হাতে করে ওস্তাদের কাছে যেতে যেতে দেখে যেত। তার পর জলখাবারের পালা। কচি ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে খাবারে ভাগ বসাতে যেত, মারা হয়ত পাখার বাঁট দিয়েই তাদের লোভের শাস্তি বুঝিয়ে দিত। ছোট ছেলের কান্নায় মঞ্জুর মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত। মারের পর মারের শব্দ তার কানে আস্‌ত, ক্রুদ্ধ পিতার গর্জ্জন শোনা যেত, মঞ্জুর ইচ্ছে কর্‌ত তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে আসে একপালা। কিন্তু কে তারা তার?

ঘরের জান্‌লায় আবার যখন সে উঁকি দিতে আস্‌ত, ঠিক সেই সময় ফির্‌ত মোহন। তার বেশভূষা সম্পূর্ণ আলাদা, চাল-চলনের মধ্যেও মুকুন্দ মুরারির কোনো ছাপ নেই। তার গায়ে বনাতের কি জিনের কোট ছিল না, ছিল হাতের-বোতাম-ছেঁড়া টুইলের শার্ট। তার পায়ে ডসনের জুতো ছিল না, মোজাও ছিল না, ছিল একজোড়া মাপে-বড় কটকী চটি। মাথায় তার তেল কি টিকির কোনো বাহুল্য ছিল না, ছিল রুক্ষ ঝাঁকড়া একমাথা চুল। মঞ্জু দেখ্‌ত মোহন নিঃশব্দে আসে, নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে, বাড়ীর লোকেও বিশেষ কোলাহল করে তার অভ্যর্থনা করে না।

...য় ভিতর ঢুকেই সে যে কোন্ কোণে হারিয়ে যেত মঞ্জু ... বুঝ্তে পারত না। বাড়ীরই কেউ একজন তাকে আমা... দিয়ে আসত। দরজার কি জান্লার সামনে থালাটা ... মোহন চট্ করে সেটাকে একটু আড়ালে টেনে থাকলে ...বে খেতে বস্ত। বিশ্রামের সময় সে পাশের বাড়ীর ...র দরজাটা ভেজিয়ে দিত। এইসব ছোটখাট আড়াল তোলার চেষ্টাটা যে এবাড়ীর নিয়ম নয় মঞ্জু তা জানত। সে বুঝত এগুলো মোহনেরই বিশেষ অনিয়ম।

মানুষের চোখে মানুষকে কেন যে ভাল লাগে তার কারণ অনেক সময়ই সাধারণে একটা ভেবে বের করে; আবার অনেক সময় কিন্তু তারা কারণ খুঁজে পায় না। মঞ্জুর চোখে মোহনকে যে ভাল লেগেছিল, একথা লোকে শুন্লে তার কারণ অনেক খুঁজে হতাশ হয়ে যেত। মোহনের চেয়ে ভাল লাগ্বার উপযুক্ত মানুষ মঞ্জুর চেনা-জগতে অনেক ছিল। তবু মোহনকেই তার চোখে সকলের চেয়ে ভাল লেগে গেল।

একদিন নয় দুদিন নয় ছমাস ধরেই মঞ্জুর এই দেখার পালা চল্ছিল। দেখাটার যে এই দেখা ছাড়া আর কিছু পরিণতি থাকতে পারে একথা ভাব্তে সে সাহস করত না। কিন্তু তবু শেষে তাদের এক সাপ্তাহিক কি পাক্ষিক নিমন্ত্রণের দিন সে হঠাৎ যেন ঠাট্টা করে তার দিদি অঞ্জলিকে বল্লে, "আচ্ছা দিদি, আমরা ত এই লোকগুলোকে দেখে দেখে তাদের নাড়ী নক্ষত্র কণ্ঠস্থ মুখস্থ করে ফেল্লাম। একটু নূতন লোক ডাক্লে হয় না?"

অঞ্জলি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বল্লে, "সত্যি ভাই, নাম কর না দুটো চারটে লোকের। কল্কাতায় কি ছাই দুটো নূতন মানুষ দেখ্বার জো আছে!"

মঞ্জুলা বল্লে, "লোকের আবার কল্কাতায় অভাব! এ যেন ঠিক বাঁশবনে ডোমকাণা। এই ধর না, মুকুন্দ, মুরারি, মোহন, এরা রয়েছে। এদের কেন একদিন বল না।"

অঞ্জলি হেসে লুটিয়ে পড়্ল—"মঞ্জু, যাহোক কথা থামিস্ ভাই! এতও তোর মাথায় আসে। আমি বলি সত্যি কারুর নাম করবি বুঝি!"

মঞ্জু বল্লে, "কেন? এদের চেয়ে সত্যি মানুষ ত আমি কোথায়ও দেখি না। পৃথিবীটাকে যে উপভোগ করছে তা ওদের চেহারা দেখ্লেই বোঝা যায়। এক মোহন যা একটু রোগা।" অঞ্জলির কথার পর মঞ্জু নিজের কথাটাকে ঠাট্টা ছাড়া আর কোনো সুর দিতে সেদিন কিছুতেই পার্লে না। কিন্তু যে কথাটা তার মনে মনে এতদিন ছিল আজ ছ মাস পরে তাকে বাইরে প্রকাশ করায় কথাটা যেন তাকেও পেয়ে বস্ল। সত্যি, কেন এমন একান্ত সোজা কাজটা তারা পার্বে না! তার চোখে জল এল। অঞ্জলির কথার উত্তর আর না শুনে সে তার জান্লার ধারে চলে গেল। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কটকী জুতোটার মধ্যে পা ঢুকিয়ে মোহন তখন শচীন-মাষ্টারের সন্ধানে বেরোবে ভাব্ছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়্ল পাশের বাড়ীর জান্লার দিকে। মঞ্জু দাঁড়িয়ে। মঞ্জুকে মোহন চিন্ত। কিন্তু আজ তার চোখে জল কেন? মোহন অবাক্ হয়ে গেল। একি সত্যি মঞ্জু না আর কেউ? একবারটি খুব ভাল করে দেখেই মোহন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। মোহনকে চাইতে দেখে মঞ্জু তখনি সরে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে মোহনের যাবার পথটা ভুল হয়ে গেল। শচীন-মাষ্টারের বাড়ী যে যেতে হবে একথা অনেক ভেবেও সে মনে করতে পার্লে না। তার মনে পড়্ছিল কেবলি মঞ্জুর চোখের পাতার পতনোন্মুখ জলবিন্দু দুটি। কি হয়েছে তার? মোহন পথ থেকে আবার ফিরে এল। শুন্ল ডাক্তার-বাবুর বাড়ীতে পিয়ানো খুব ঢং ঢং করে বাজ্ছে, কার যেন হাসির উচ্চ কলরোল শোনা যাচ্ছে! নিশ্চয় এবাড়ীতে বিপদ কিছু হয় নি। তবে কেন, কেন? তার চোখে জল কেন? মোহনের মাথায় এই কথাটাই কেবল ঘুরতে লাগ্ল।

সেদিন আর শচীন-মাষ্টারের বাড়ী তার যাওয়া হল না। ওবাড়ীর মেয়েদের সে অনেককাল থেকেই দেখেছে তাদের সম্বন্ধে তার কৌতূহলেরও কম্তি কোনোকালে ছিল না। কিন্তু সে ছিল সম্পূর্ণ বাইরের, কেবল চোখের কৌতূহল। ও-বাড়ীর মেয়েরা যে বেশ সুখে আছে, হাসে, খেলে, গান,—গায় মনের দিক দিয়ে এর বেশী ভাবনা মোহন তাদের সম্বন্ধে কস্মিনকালেও করত না। যা করত তাও চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যেত,

কিন্তু আজ এতদিন ধরে তার জান্‌লার ধারের দেখা ওই দু ফোঁটা চোখের জল তার সমস্ত মনটাকে টেনে ধর্‌ল। আজই সে প্রথম ভাল করে অনুভব কর্‌ল, এতদিনও ত এদের মধ্যে এই মঞ্জুলাই তার কৌতূহল সবচেয়ে উদ্রেক কর্‌ত। এ কথাটা মনে তার ছিল, কিন্তু কথাটার দিকে ফিরে চাইতে তার এতদিন সাহস হয় নি। মোহনের সমস্ত ইন্দ্রিয় সেদিন থেকে উন্মুখ হয়ে থাক্‌ত মঞ্জুলার নিমেষের আভাসগুলি ধর্‌বার জন্যে।

মঞ্জুলাদের বাড়ীর সেদিনকার উৎসব তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। মোহন নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ সে বাড়ীর উৎসবধ্বনি অলসভাবে নানা চিন্তার সঙ্গে মেশামিশি করে শুন্‌ছিল। ক্রমে একে একে গাড়ী করে সকলে চলে গেল। বস্‌বার ঘরের আলো নিভে গেল। মোহন সজাগ হয়ে উঠে বস্‌ল। দেখ্‌ল মঞ্জুলার ঘরে আলো জ্বলে উঠ্‌ল। উৎসবসজ্জায় মঞ্জুলা এসে একবারটি জান্‌লার সাম্‌নে দাঁড়াল। কি যেন সে খুঁজ্‌ছিল, অথচ বিশেষ পাবার আশা না করে। দু চার সেকেণ্ডের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে মঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় তার বিষণ্ন মুখখানা অন্ধকার ঘর থেকে দেখে মোহন বাইরে এসে দাঁড়াল। চকিত বিস্ময় আর সলজ্জ আনন্দের খেলায় মঞ্জুর মুখখানা একবার রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। তার পরই জান্‌লার পর্দাটা টেনে দিয়ে সে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল। মোহন বিস্মিত হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

রাত্রে তার ঘুম হচ্ছিল না। অন্ধকারে অনেকবার জেগে উঠে সে দেখেছে জান্‌লার ওদিকে ঝাপ্‌সা ছায়ার মত একটা মানুষের মূর্ত্তি কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে সমস্ত জগৎ যখন ডোবা, সুপ্তিতে সমস্ত বিশ্ব যখন আচ্ছন্ন, তখন একলা জেগে সে অনুভব কর্‌ছিল পাঁচ হাত দূরের ওই আর একটি বিনিদ্র মানুষের চঞ্চল মনটাকে। কতবার তার মনে হচ্ছিল, যেন তারই মনের ছায়া চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চোখের সাম্‌নে। এত কাছে, এত আপনার তাকে তার মনে হচ্ছিল, যে, আর-একটা স্বতন্ত্র মানুষ বলেই তাকে সে ভাব্‌তে পার্‌ছিল না সব সময়। প্রাচীর, জান্‌লা, দরজা, সমাজ, সংসার, পরিচয়, সব কিছুর বাধা-ব্যবধান নিদ্রাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তার ছায়া কেবল চঞ্চল হয়ে ত[illegible] প্রাণের পরিচয়টা জানিয়ে দিচ্ছিল। মোহন মনে [illegible] মঞ্জুলার চোখের জলের সঙ্গে তার ব্যাকুল [illegible]টিকে, সলজ্জ বিস্ময়কে, তার চঞ্চল মনকে, তার নিদ্রাহীন [illegible] মালার মত গাঁথ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল। গাঁথ্‌তে [illegible] ছিলও, কিন্তু সে মালা কার জন্যে? অচেনা ক[illegible] গলার উদ্দেশ্যে হাওয়ায় তাকে উড়ে যেতে দিতে সে পার্‌ছিল না। ইচ্ছা কর্‌ছিল চেপে ধরে রাখে। কেনই বা রাখ্‌বে না। এতই কি অসম্ভব? তা ত মনে হয় না।

সকালে বেশ রোদ হবার পর মোহন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল। ভোর বেলা সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রথম চোখ চেয়েই তার চোখে কাঁটার মত ফুট্‌তে লাগ্‌ল, সারি সারি দরজা, জান্‌লা, পাঁচিল, পর্দা, খড়খড়ি, সার্সী। পাঁচ হাত জায়গাকে সঙ্গীন উঁচিয়ে যেন তারা পাঁচ শ মাইল দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার রাত্রের স্বপ্ন-বাস্তবে-মেলা জগৎটা যেন বিস্ময়ে লজ্জায় ধুলোয় মিশে যেতে চাইল। কি অসম্ভব তার সব কল্পনা!

কিন্তু যতই কেন অসম্ভব হোক না, মোহনের জগৎটা তারা বদ্‌লে দিল। তার বোতাম-ছেঁড়া জামায় হঠাৎ বোতাম দেখা দিল, ব্যোমকেশ মূর্ত্তি যেন ভদ্র হতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল; তার দরজার সাম্‌নের বারান্দায় একটা ফুলের টব দর্শন দিল; শোবার ঘরে একটা ছেঁড়া শালের পর্দাও ঝুল্‌ল।

মুকুন্দর প্রথম ছেলের ভাত পড়্‌ল সেই সময়েই। মোহন গিয়ে মুকুন্দর বৌকে হঠাৎ জিজ্ঞেস কর্‌ল, "কাকে কাকে নেমন্তন্ন কর্‌বে?"

বৌ বল্‌লে, "কর্ত্তারা ফর্দ্দ করেছেন আত্মীয় কুটুম্ব সবাইকেই নিশ্চয় কর্‌বেন। আমি তা কি জানি?"

মোহন বল্‌লে, "তুমি কাউকে কর্‌বে না?"

বৌ হেসে বল্‌লে, "আমি একটা মস্ত মানুষ, তার আবার অত ভাবনা! কর্‌ব আমার সইকে, তুমি চিঠিখানা দিয়ে আস্‌বে?"

মোহন বল্‌লে, "আচ্ছা, দেওয়া যাবে এখন; কে তোমার সই শুনি।"

বউ বল্‌লে, "সে যুগিপাড়ার কার্ত্তিক-বাবুর মেয়ে।"

[illegible] মোহন হতাশ হয়ে বল্‌লে, "পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মেথা[illegible]রি কি দেখনহাসি পাতাও নি এখনো ?"

আমা[illegible] গাঁইলো হাত দিয়ে বল্‌লে, "বড় আমার বাপের [illegible] আমরা গেরস্তর বৌ সায়েব-সুবোর সঙ্গে কথা থাকলে গেলে তারা ঝাঁটা মারবে না !"

মোহন হেসে বল্‌লে, "কেন, তারা কি মানুষ নয় ! আচ্ছা, নাইবা তুমি সই পাতালে, নেমন্তন্ন করে দেখ, মোটেই ঝাঁটা মারবে না, ঠিক আসবে।"

বৌ বল্‌লে, "ঠাকুরপোর এক কথা ! আমি যাই ফিরিঙ্গি-বাড়ী নেমন্তন্ন করতে, তাহলে আর কেউ না মারুক তোমার দাদা আগে ঝাঁটা মারবে।"

মোহন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বউ বল্‌লে, "কই সইকে চিঠি দিয়ে আসবে বল্‌লে, নিলে না ?"

মোহন তখন অনেকখানি দূরে চলে গেছে।

বাইরে খানিকটা ঘুরে মোহন এসে নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। সে পুরুষমানুষ সকারণে কান্নাও তার কোনোকালে অভ্যাস ছিল না, কিন্তু চোখের জল আজ সে ঠেকাতে পারছিল না। এক রকম অকারণেই। আর যে একজনের দু ফোঁটা চোখের জল তার এই চোখের জলের অগ্রদূত তাও যে এমনি অকারণে এই জানলাটার ধারে পড়েছিল, তা জানলে মোহনের মুখে হাসি ফুটত কি না কেউ বলতে পারে না ; কিন্তু চোখের জলটা যে কারণ পেয়ে ধন্য হত তা অনায়াসে বলা যায়।

মঞ্জুলা শোবার ঘরে খাটের উপর একরাশ গরম কাপড় ঢেলে ঝেড়ে ঝুড়ে তোলবার চেষ্টা করছিল। মনটা আজ তার খুসী ছিল। তাই কাজের সঙ্গে গান চলছিল। হঠাৎ ছোট বোন কুন্তলা ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "ছোড়দি, তুমি ভাই এ ঘরে অমন গলা ছেড়ে গান কোরো না ত, আমি নীচ দিয়ে ঘরে ঢুকছিলাম, মনে হল যেন মুকুন্দ না মুরারী কি ওর নাম ঠিক তার দরজায় দাঁড়িয়ে কে গান ধরেছে। কি যে তোমার বুদ্ধি ! কত বাজে লোক আসে যায়, তারা কি ভাববে বল ত। তার উপর ও-বাড়ীর সেই ছেলেটির আবার যে রকম অষ্টপ্রহর ছাতে ওঠায় ঘটা লেগেছে।"

মঞ্জুলার গান রেখাবে চড়েছিল, কুন্তলার কথায় হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু তবু সে তাকে এক ধমক দিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, তুই থাম্ ত ! আমি যদি মুকুন্দদের দরজাতেই দাঁড়িয়ে গান করি তাতে তোরই বা কি আর বাজে লোকেরই বা কি ? আমার খুসী আমি করব।"

কুন্তলা মঞ্জুলার রাগে আর সৃষ্টিছাড়া কথায় বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, "বেশ, বেশ, কার কি, করে দেখ না একবার।"

মঞ্জুলা বল্‌লে, "ভেবেছিস পারি না, আচ্ছা আমি দেখাব পারি কি না-পারি।"

কুন্তলা বল্‌লে, "কে বলছে পার না, তুমি সব পার বাপু, তোমায় কিছু বলাই আমার ঘাট হয়েছে।" কুন্তলা চলে গেল।

মঞ্জুলা গান আর গাইতে পারল না, কিন্তু কুন্তলা যে তার সব পারা মেনে নিয়ে তাকে এমন করে চুপ করিয়ে দিতে পারল এইতে তার রাগটা যেন পাত্রহারা হয়ে কোথায় পড়বে ভেবে পাচ্ছিল না।

ঝি এল দিদিমণির কাজে সাহায্য করতে। পাড়া-পড়সীর গল্প শোনানোও তার একটা কাজ ছিল। মঞ্জুলা রাগটা তার মাথায় ঝেড়েই বল্‌লে, "কি হয়েছে আজকাল তোমাদের সব। কাজের সময় বাড়ী মাথায় তুললেও খোঁজ মেলে না কারুর।"

ঝি বল্‌লে, "কি করব বল দিদিমণি, মুকুন্দর মার ওখানে গেছলাম, বুড়ী সুখ-দুখের কথা তুল্‌লে, কিছুতে ছাড়ে না, তা আসি কি করে ?"

মঞ্জুর সুরটা একটু নেমে এসেছিল ; সে বল্‌লে, "মুকুন্দর মার সুখদুখের ভাবনা ভাবতে তার পাঁচ ছেলে বৌ আছে, তোমার আর অত দরদ দেখাতে হবে না ; নিজের কাজ কর।"

ঝি বল্‌লে, "সেই ত দুঃখ দিদিমণি, তবে আর বলি কি ? বুড়ীর চার চারটে বৌ সবকটা পর হয়ে গেল, ছেলেগুলোকে সুদ্ধ পর করে দিলে। কাঁদবে না বেচারী। ছোট ছেলেটাকে আপনা-আপনির মধ্যে কোথায় বিয়ে দেবে ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক হয়-হয়, কি সোন্দর মেয়ে দিদিমণি, কি বলব তারা দেখতে এল ছেলেকে, তার পর সে এক তুমুল কাণ্ড। ছেলে বলে......" অঞ্জলি ঘরে ঢুকে

বল্‌লে, "মঞ্জু, এখনও কাপড়তোলা হল না তোমার! আজকে কি আর বেরুতে হবে না?"

মঞ্জু বল্‌লে, "কি হবে রোজ রোজ বেরিয়ে? একদিন না হয় ঘরেই থাক্‌লে।"

অঞ্জলি বল্‌লে, "তুই যে কি সব বকিস মঞ্জু, তার কোনো মানে হয় না।" সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ ঝি বল্‌লে, "আমি বলি কি দিদিমণি, মোহনের গায়ে তোমাদের হাওয়া লেগে গেছে।"

মঞ্জু চম্‌কে উঠ্‌ল। তারপরই ঝিকে অন্য কাজে বিদায় করে দিল।

বিছানার উপর কাপড়ের স্তূপ এলোমেলো ভাবেই ফেলে রেখে মঞ্জু হঠাৎ অসময়ে ছাতে গিয়ে হাজির হল। কতক্ষণ সে ছাতে ঘুর্‌ল। মনটা তার আজ বেশ খুসী ছিল। সবাই মিলে কি যে কতকগুলো কথার জট পাকিয়ে মনটাকে বিগ্‌ড়ে দিল তার ঠিক নেই। সেটাকে সোজা পথে চালাতে সে আর কিছুতেই পার্‌ছিল না। ছাদের আল্‌সের উপর ভর দিয়ে সে ভাব্‌ছিল আজ যেন তার লোহার শিকলটা তাকে বড় শক্ত করে বেঁধেছে। কত কি কথা যে তার আজ শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছিল, কিন্তু শিকলটা তার সব ইন্দ্রিয় এমন করে বেঁধেছে যে সে-সব শোনা তার হল না, কতখানেই না তার আজ ছুটে গিয়ে কত কিছুর আড়াল ভেঙে সব দেখে আস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, কিন্তু সে ত তার হবে না, পায়ে শিকল যে ভারী হয়ে টেনে ধরে আছে।

পাশের বাড়ীর সিঁড়ির দরজাটা ঠিক মঞ্জুর চোখের সাম্‌নে ধড়াস্ করে খুলে গেল। কবিতার কি গানের বইয়ের মত সুন্দর একখানা বাঁধানো বই হাতে করে মোহন দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। মঞ্জুকে দেখে মোহন বেশী চম্‌কে উঠেছিল কি মোহনকে দেখে মঞ্জু বেশী চম্‌কে উঠেছিল বলা যায় না। কিন্তু কেউ তারা সরে গেল্ না। মঞ্জুর মনে হল মোহনের সমস্ত অন্তরটা যেন তার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জমাট বেঁধে মঞ্জুর মুখের উপর এসে পড়েছে, তার ঠোঁট দুখানা যেন কতকালের না-বলা কথার ভারে কেঁপে উঠ্‌ল। মনে হল এখনি সব বাঁধন আল্‌গা হয়ে তারা ভিড় করে বেরিয়ে পড়্‌বে। মঞ্জু আকণ্ঠ রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্‌ল। সে আল্‌সেটা তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে অনেকখানি চলে গিয়ে পড়্‌ল, তারপর বোধ হয় এক মিনিট পরেই অল্প মুখ তুলে দেখ্‌ল পাশের বাড়ীর ছাতটা শূন্য খাঁ খাঁ পড়ে পড়ে। মনে হল কত যুগ যুগান্তর ধরে কে যেন তার জন্যে ওইখানে প্রতীক্ষা করে করে শ্রান্ত হয়ে ফিরে গেছে। তার শূন্য মনের মত মস্ত ছাতটা কেবল আকাশের দিকে মুখ তুলে পড়ে আছে। মঞ্জুলা উঠে দাঁড়াল। পাশের বাড়ীর ছাদের সিঁড়ি দিয়ে একপাল ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কোঁচড়ে করে চীনেবাদাম নিয়ে কলরব কর্‌তে কর্‌তে ছাদ জুড়ে এসে বস্‌ল। মঞ্জু দাঁড়িয়ে তাদের দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের উচ্চ কলকণ্ঠে তারা যেন মঞ্জুর না-শোনা কথাগুলোকে অতি বড় মিথ্যা বলে প্রচার কর্‌ছিল। তার এই যে দেখা এই যে শোনা এই ত সত্য। ভাল করে চোখ না মেলে কান না পেতে সে কি যে সব সত্য বলে ধরেছিল, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। কিন্তু তবু সন্ধ্যার ছায়া যত ঘনিয়ে আস্‌ছিল, শিশুদের সভা যত নিস্তব্ধ নিঃঝুম হয়ে উঠ্‌ছিল, ততই যেন মঞ্জুকে কিসে পেয়ে বস্‌ছিল। সেও আজ মোহনের মত ছোট ছোট কত কথাকে বিনি সুতায় মালা গেঁথে তুল্‌তে চাইছিল। সত্যি কি এইসব নানাখানে কুড়োনো ছোট কথা, এরা সব একই মালার ফুল? কেনই বা হবে না?

অঞ্জলি ছাতে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "ধন্যি মেয়ে যাহোক তুই! সরোজ এসে ফিরে গেল। ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও যদি তোকে খুঁজে পেলাম। মোহন পাগ্‌লার মত তোরও কি শেষকালে অন্ধকারে ছাতে ঘোরার রোগে ধর্‌ল। দেখ্ বাপু, সত্যি কথা বলি মেয়েমানুষের ও-সব কবিত্ব পোষায় না।"

মঞ্জুলা বল্‌লে, "মেয়েমানুষের কি পোষায় আমায় এক কথায় বল্‌তে পার!"

অঞ্জলি বল্‌লে, "যেমন আছ তেমনি থাকা। তাদের কোনো কিছু চাইতে নেই।"

মঞ্জু বল্‌লে, "আমি তবে বোধ হয় মেয়েমানুষ নই। আমার অনেক কিছু চাইতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে কর্‌ছে

রাস্তা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে যাই কোনো অজানা দেশে যেখানে কেউ কিছু বল্‌বার নেই, বারণ কর্‌বার নেই, আমারি যা খুসী তাই করি।"

অঞ্জলি বল্‌লে, "এই না বল্‌লি—'একদিন না হয় ঘরেই থাক্‌লে'—আবার এরি মধ্যে উল্টো কথা। চল্‌না কোথায় যাবি, কি কর্‌বি করা যাক্। তোকে কবেই বা কে কি বারণ করেছে যে অত বল্‌ছিস। যখন যা চাস্ সবই ত পাস্।"

মঞ্জুলা বল্‌লে, "তোমার মত মানুষ কোথাও দেখিনি। তুমি কিচ্ছু বুঝ্‌তে পার না। মুখে যা বারণ করা যায়, সেইটেই কি কেবল বারণ? কত জিনিষ আছে যা কেউ বারণ করে দেয় না, কিন্তু তারা বারণ করা থাকে। সেই কারণগুলোকে আমার গুঁড়িয়ে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে।"

অঞ্জলি বল্‌লে, "কি ছাই তোর সে বারণ একটা নাম কর্‌না। তোর ভাঙ্‌তে ইচ্ছে হয় দুটো ভেঙে দেখাই না।"

মঞ্জুলা বল্‌লে, "সে বল্‌লেই তুমি বুঝ্‌বে না। সবাই-কার কাছে সব বারণের অস্তিত্ব থাকে না। বারণ করা জিনিষগুলো কোনো কোনো মানুষ তাদের জগৎ থেকে এমন সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে রাখে যে তাদের যে ভাঙা যেতে পারে এ কল্পনাই তাদের মাথায় কখনও আসে না। তারা কেউ যদি কর্‌তে পাবে না বলে' একটু অন্তত জোর কর্‌ত, তাহলে আমাদেরও কর্‌বার জেদটা একটু বাড়্‌বার সুযোগ পেত। এ যেন গোড়াতেই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া।"

অঞ্জলি বল্‌লে, "সত্যি, তোর কথা আমি কোনো কালেই বুঝ্‌ব না। ছেলেমানুষী করার দিন আমার অনেক কাল কেটে গেছে।"

অঞ্জলি নীচে চলে গেল। সবাইকার কাছেই তাকে হার মান্‌তে হল। কুন্তলা ধরে নিয়েছে মঞ্জু সব পারে, অঞ্জলি ত ছেলেমানুষী বলে তার সব কথাই উড়িয়ে দেয়। কারু সঙ্গে ঝগড়া করে' যে সে তার শক্তি প্রমাণ করে তার ঠিক নেই। কেউ একবার বলে না—"তুই এ কাজ কর্‌তে পারিস না, ও কাজটা তোকে কর্‌তে দেব না।" তবে সে একবার দেখিয়ে দিত নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা তাদের এই জগৎ-টাকে সে কতখানি অগ্রাহ্য করে, কেমন অনায়াসে সে তার সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে।

রাত যখন অনেক হল, তখন মঞ্জুলা ছাদ থেকে নেমে এসে নীচে জান্‌লার ধারে দাঁড়াল। গলিটার দিকে নিতান্ত অকারণে সে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। 'অবাক-জলপান' ডেকে ডেকে একটা লোক কেবল তাদের দরজাতেই ফির্‌ছে। মঞ্জুর ঘরের আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে সে যে দাঁড়িয়ে আছে, কারুর চোখেই তা বোধহয় পড়েনি। পাশের বাড়ীতে আলো জ্বলেছিল। পায়ের শব্দে চেয়ে মঞ্জু দেখ্‌লে উপর থেকে মোহন ঠিক সেই বেশে সেই বইখানা হাতে নেমে আস্‌ছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেবরকে সম্বোধন করে মুকুন্দর বউ বল্‌ছে, "ঠাকুরপো, বল্‌লে ত কথা শোন না, আইবুড় ছেলে ভর সন্ধ্যেয় একলা ছাতে কাটিয়ে এলে, বে থার নাম গন্ধ নেই; দেখ, শেষে পেত্নী কি শাঁখচুন্নিতে না পেয়ে বসে। পাব পাব যে কর্‌ছে তা এরি মধ্যেই হাওয়ায় টের পাচ্ছি।"

মোহন বল্‌লে, "পেত্নীর সাধ্যি কি আমার ছায়া মাড়ায়, রক্ষাকবচ পেয়েছি তবে না এত দুঃসাহস।"

মঞ্জুর কি একটা লজ্জায় বাধ্‌ল, সে আর কোনো কথা না শুনে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু তার কথাগুলো যে কেউ শোনে নি এমন সান্ত্বনা সে নিজেকে দিতে পার্‌ল না। তবে কিইবা এমন সে বলেছে! আরও অনেক কিছু যদি বল্‌ত, যদি সে সব-কিছু কেউ শুন্‌ত? মাগো! ক্ষণিকের মত আবার মনে হল, কেন বেশ ত হত। তার না সব বারণ ভাঙ্‌বার বড় সাধ!

ছাদে উঠে পড়াটা হঠাৎ মোহনের ভারি পছন্দ হয়ে গেল। চিলেকোঠার দেয়ালে ঠেস দিয়ে মঞ্জুলাদের বাড়ীর দিকে পাশ ফিরে সে নিত্য সন্ধ্যায় পড়াশুনো লাগিয়ে দিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ত, বইয়ের পাতা চোখে কেবল কালির স্রোতের মত দেখাত, তবু মোহন আসন ছেড়ে উঠ্‌তে চাইত না। পাশের বাড়ীর শূন্য ছাদটায় নীরবতা যত নিবিড় হয়ে উঠ্‌ত, তত তার মনে কবেকার শোনা দুটি পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ত। প্রতীক্ষা যত দীর্ঘ হত, তত মনে হত আর দেরি নেই, এই এল, এল, এল! কিন্তু মোহন নিত্য এলেও সে কোনো দিনই আস্‌ত না। হয়ত আজ তার নিমন্ত্রণ, হয়ত বা সে মামার বাড়ী গেছে, হয়ত তার সরোজ এসেছে, নয়ত অসুখ বিসুখও ত কর্‌তে পারে।

তবে কি সে রাগ করেছে? কিন্তু মোহনের কি এমন ভাগ্য যে সে তার উপর রাগ করবে? মোহন রোজই একটা কারণ বার করত, রোজই ভাবত কাল যদি না আসি, ঠিক সে কালকেই এসে ওই আল্‌সেটার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু হতেও ত পারে তার আস্‌বার কোনো গরজ নেই, আল্‌সেটার পাশে এদিকে দাঁড়ানোটা যে ওদিকে দাঁড়ানোর চেয়ে বিশেষ কোনো কারণবশত ঘটেছে, এমন কথা ত মোহনের কানে কানে কেউ বলে যায়নি। ও ত কেবল মোহনের লুকিয়ে গাঁথা স্বপ্নমালার একটি ফুল মাত্র। হয় হোক স্বপ্নমালা, হয় হোক বিনি-সুতোয় গাঁথা, তবু নিজের হাতে সে তাকে কেন ছিঁড়বে? কিন্তু তবু দুঃখ অভিমান কতবার তা ছিঁড়ত তার ঠিক নেই।

(৪)

মানুষ নিজের যে কথাটি লুকিয়ে রাখতে চায় চিরকালই পরের সেই কথাটি খুঁচিয়ে বের করতে তার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ। সে-কাজে বিফলও সে বড় বেশী হয় না।

যে-কথাটার উৎস এত কাছে সেই কথাটাই কত স্রোত ঘুরে কত রকমে মঞ্জুলার কানের কাছে যে এসে পৌঁছতে লাগ্‌ল তার ঠিক নেই। এইটেই হল তার সবচেয়ে অসহ্য। মন তার দুর্দ্দান্ত ছিল, তবু এতদিন সংসারের এই লোহার শিকলটাকে অস্বীকার করেও সে চল্‌তে পারত, আজ কিন্তু তা আর পার্‌লে না। মানুষের কথা তাকে বুঝিয়ে দিল, সংসারের আর দশ জনেরই মতন শিকলটাকে সে ভয় করে, কিন্তু মনটাকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখ্‌তে পারে না বলে ভীরুর চিরকালের সম্বল যে লুকোচুরি, তারই আশ্রয় সে নিয়েছে। নিজের মনকে যতদিন নিজে সে ভীরুতার জন্যে অপমান করেছিল, ততদিন মনকে বোঝাতেও সে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরের অপমানকে সে কি বলে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে? সত্যই ত তার মন লুকানো পথের অলিতে গলিতে ঘুরে মরে।

শুধু ছবির মত যে পাশের বাড়ীখানা, যার মধ্যে সে রূপের দেখা পেয়েছে, কিন্তু যার কণ্ঠে বাণী ফোটে নি, তার দিকে চেয়ে মঞ্জুলা ধিক্কার দিল তার আপনার মনকে আর একজনের মনকে। ওরে ভীরু, তোর সাহস নেই যদি, তবে এপথে পা বাড়াস্ কেন? তার রাগ হল তারই উপর সবচেয়ে যে তাকে মাথা পেতে এই ভীরুতার অপমান সইতে দিচ্ছে, আর নিজে সইছে। আজ যদি সে পুরুষ হত, যদি দেওয়া তার ধর্ম্ম না হয়ে কেড়ে নেওয়াই তার ধর্ম্ম হত, তবে বীরের মত জয় করা কাকে বলে তা দেখিয়ে দিতে পারত। লুকিয়ে অন্ধকারে যে হাত পাতে তার জন্যে মঞ্জুলার চোখের জল পড়তে থাক্‌ল, কিন্তু গোপন দানের কল্পনা সে ছেড়ে দিলে।

মঞ্জুলার ছাতে ওঠার অবসান হল, তার জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

সকাল বেলা বাড়ীর সাম্‌নে গলিতে মোহন পাইচারি কর্‌ছিল, বেশী দূরে বেড়াতে যেতে তার ইচ্ছা কর্‌ছিল না। এই পাশের বাড়ীটার মনের চাবি যত সে খুল্‌তে চাইছিল, তত যেন তাতে কে কুলুপের পর কুলুপ লাগিয়ে চলেছিল। মোহন অনুভব কর্‌ছিল সে তারই মঞ্জুলা। কিন্তু কেন, কেন এ নিবিড়তর রহস্য-সৃষ্টি?

গলির মোড়ে শচীন-মাষ্টারের উদয় হল। মোহন হঠাৎ তার হাতখানা ধরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আচ্ছা, বল্‌তে পার মানুষ প্রাণ দিয়ে যা চায় তা পায় না কেন?"

শচীন বল্‌লে, "খুব পারি। গায়ে জোর নেই বলে। অর্থাৎ যা কেড়ে নেওয়া যায়, তার জন্যে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে বলে, আর বন্ধ কালা দৈবের দরজায় কেবলি মাথা ঠোকে বলে।"

মোহন বল্‌লে, "তবে জোর করে যমের দোর থেকে ফেরাতে পার না কেন মানুষকে?"

শচীন বল্‌লে, "বাবাঃ, কোন্ আদিকাল থেকে সৃষ্টিটার রক্ত চুষে চুষে দানবটার গায়ে জোর কি কম হয়েছে? তার সঙ্গে টানাটানিতে আমরা পারব কেন? গায়ে জোর নেই বলেই পারি না। কিন্তু তবু আশ্চর্য্য দেখ, তার সঙ্গে লড়্‌তে আমরা ভরসা পাই, কিন্তু হয়ত একটা সেদিনকার মেয়ের কাছে এগোতে সাহস পাই না।"

শচীন মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল। মোহন মুখখানা যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে বল্‌লে, "বাস্তবিক! মানুষগুলো এমনিই মূর্খ বটে। তবে ভুলের ভয় বলে একটা জিনিষ আছে ত, যেটা যমের বেলা খাটে না।"

শচীন বল্‌লে, "ঐ ত; যা বলেছিলাম তাই হল আর

কি। ভয় ভয় করলে সেইটাই চিরকালের পাওনা থেকে যাবে। আমি হলে হয় একেবারে অভয় পদ পাই, নয়ত আপনার ভুলের বোঝা নিয়ে আপনি বাড়ী ফিরে যাই। সবুরে মেওয়া ফলে কি না জানি না, পচে নিশ্চয়ই।"

কথাটা সত্য। শুনতে খুবই সহজ, কিন্তু করার পথে যে কোথায় বাধে শচীনকে সে কথা বুঝিয়ে বলতেও মোহনের সাহস হল না। অথচ সাহসের অভাবই যে সব অনর্থের মূল, এই কথাই এতক্ষণ সে শুনছিল। মোহন আপনার মনকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে মৃত্যুকে যে মানুষ ঘরের দরজায় না দেখেছে সান্ত্বনা দেওয়া যেমন তার পক্ষেই সবচেয়ে সোজা, তেমনি এ দ্বন্দ্বে যে কখনও পড়েনি, পথ বলে দিতে সেই সকলের চেয়ে অনায়াসে পারে। শচীনের যুক্তিকে মোহন বিদায় দিল; কিন্তু তার মনের মধ্যে যুক্তিটা আপনাআপনিই এদিক ওদিক পথ খুঁজে দেখতে লাগল।

(৫)

মঞ্জুলার জন্মদিন। সকাল বেলা ঘরে বসে সে কি একটা পড়ছিল। কুন্তলা বাইরের থেকে ডাক দিয়ে বললে, "ছোড়দি, দেখ ভাই, তোমার কোন্ ভক্তের অর্ঘ্য এল।"

মঞ্জুলা বাইরে বেরিয়ে দেখল ব্রাউনকাগজে মোড়া একটা ফুলের ডালা নিয়ে একটা মুসলমান কুলী দরজায় হাজির। মঞ্জু বললে, "কোথ থেকে আসছ?"

সে বললে, "নয়া বাজার।"

মঞ্জু অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা একটু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায় বললে, "মার্কিট্‌সে বাবু ফুল ভেজ দিয়া।"

মঞ্জুলা বললে, "দেখি।"

একরাশ ফুল, কেউ যে নিজের হাতে বাছাই করে বিশেষ যত্নে সাজিয়েছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। একটা কাগজে মঞ্জুর নাম আর বাড়ীর ঠিকানা লেখা। হাতের লেখাটা মঞ্জুর চেনা কি অচেনা সে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না। ওই কটা অক্ষরের মধ্যে সে কি যে আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল তা সেই জানে। উল্টে পাল্টে সেটাকে দেখে কিছুতেই তার তৃপ্তি হচ্ছিল না।

কুন্তলা কুলীকে সম্বোধন করে বললে, "তোমায় কত দিতে হবে?"

কুলী বললে, "বাবু পয়সা দিয়ে দিল।"

মঞ্জুলা বোনের দিকে ফিরে বললে, "কি করব বলত।"

কুন্তলা বললে, "থাক্, পরে বুঝতে পারবে হয়ত।"

ফুলগুলো ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে মঞ্জুলা সযত্নে সাজাতে বসল। অনেক দিন পরে সে আজ তার সেই বন্ধ জানলাটা খুলল। ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘর দোর ভরে উঠেছিল।

কতবার কত জায়গায় যে সে সেগুলোকে রাখলে তার ঠিক নেই। কিন্তু কিছুতেই আর তার মনের মতন সাজানো হচ্ছিল না।

ঝি এসে বললে, "দিদিমণি, নীচে সরোজ-বাবু এসেছে।"

মঞ্জুলা "যাই" বলে তাড়াতাড়ি ফুলগুলো ঢাকা দিয়ে রাখল।

মঞ্জুলাকে দেখে সরোজ বললে, "এত সকাল সকাল যে ছাড়া পাব তা মোটেই ভাবিনি। সংসারের কাজের লোকগুলোকে মানুষের আদত কাজের মূল্য ত বোঝানো যায় না, তাই নিজের হাতদুটো থাকতে ধার করতে হল বুড়ো খোদাবক্সের হাত দুখানা। যাক্, ফুলগুলো ঠিকঠিক পৌঁছেছে ত?"

মঞ্জুলা বললে, "হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজ আমার একটু কাজ আছে, বসতে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না।"

সরোজ বিস্মিত ও হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে উপরের ঘরে চলে গেল। ব্রাউন-কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলে ফুলের তোড়া মালা সবগুলো সে খোলা জানলা দিয়ে একে একে পথে ফেলে দিল। তারপর ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল। ভীরু, ভীরু মন, চোখ মেলে দেখবার সাহস যার নেই, সাধ করে যে অন্ধ হতে চায়, তার এমনি দশাই ত হবে। নিজেকে কি বলে ধিক্কার দেবে মঞ্জুলা ভেবে পাচ্ছিল না।

কুন্তলা বাইরের থেকে আবার ডাক দিল, "ছোড়দিদি, দেখ আবার কোন্ 'অচেনা পথিক' কি পাঠিয়েছে। একজনের দানে এত খুসী হয়ে গেলে যে দরজাটা দিনে দুপুরেই বন্ধ করে রাখলে পাছে আমরা ভাগ বসাই।"

মঞ্জু দরজা খুলে দিল। কুন্তলাকে বললে, "বাবা, কেবল

ফুল আর ফুল! আমার অত রাখ্‌বার জায়গা নেই, তুই ফেলে দে, নয়ত নিজের ঘরে রাখ্‌গে যা।"

কুন্তলা বল্‌লে, "আহা, আমার এতই কি পোড়াকপালে ধরেছে যে তোমার ফেলে-দেওয়া ফুল ঘরে রাখ্‌তে যাব? ফেল্‌তে হয় তুমি ফেল, রাখ্‌তে হয় তুমি রাখ, আমার কিছু কর্‌তে গরজ পড়ে নি।" কুন্তলা ফুলগুলো রেখে চলে গেল।

মঞ্জুলা খানিকটা ইতস্তত করে সেগুলো তুলে দেখ্‌তে বস্‌ল। ফুলের তোড়ার গায়ে তারে বাঁধা সরোজের নাম-ছাপানো কার্ড ব্রাউন-কাগজের মোড়কের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে।

মঞ্জু ফুলগুলোকে মেঝেয় আছ্‌ড়ে ফেলে দিল। তার পর আবার কুড়িয়ে নিয়ে ফুলদানির মধ্যে রেখে জান্‌লাটা খুলে তার ধারে চুপ করে এসে বস্‌ল। নীচে সদর দরজার কাছে কতকগুলি ছোট ছোট শিশুর কলকল কাকলি শোনা যাচ্ছিল। কি একটা পাওয়ার আনন্দে তারা অধীর কিন্তু ভাগাভাগির গোলমালে একটা ঝগ্‌ড়াও বেধেছে। মঞ্জু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল নীচে সে যে ফুলগুলো ফেলে দিয়েছিল, তা ধূলিধূসর পথ থেকে উঠে শিশুদের সর্ব্বাঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ তিন চার পাট করে একটা মালা গলায় পরেছে, কেউ শূন্য হাতে মহা কলরব করে নিজের দাবি জানাচ্ছে।

মঞ্জুলা বসে বসে দেখ্‌ছিল। ভাব্‌ছিল কার অঞ্জলি কে গ্রহণ কর্‌ল? ইচ্ছে কর্‌ছিল নীচে নেমে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সব কেড়ে আনে। কিন্তু কিই বা হবে কেড়ে? সত্যই ত সে জানে না এ কার অর্ঘ্য। ভুল করে ফেলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আদর করে যখন রেখেছিল তখনই সে ঠিক করেছিল তা কে বল্‌তে পারে?

পাশের বাড়ীর মুখোমুখি সেই ঘরখানায় অসময়ে শিকল-তোলার শব্দ শুনে মঞ্জু ফিরে তাকাল। দরজার গোড়ায় একরাশ জ্বালানো কাগজ উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, পড়্‌বার টেবিলের জান্‌লামুখো চেয়ারখানার মুখ উল্টোদিকে ঘুরে গেছে। মোহন শুধুহাতে গায়ের চাদরখানাও বাদ দিয়ে দোরে শিকল তুলে বেরোবার উপক্রম কর্‌ছে। মুখখানা সে একবার কোনো দিকে ফিরালও না।

অঞ্জলি ঘরে এসে বল্‌লে, "মঞ্জু, তুই কি ক্ষেপেছিস? সকালবেলা জন্মদিনের দিন ভদ্রলোকের ছেলে ফুলগুলো পাঠিয়ে দিলে, একে ত তার সঙ্গে কথা কইলি না, তার উপর সেগুলো রাস্তায় ফেলে দিলি!"

মঞ্জু বল্‌লে, "ফেলে দিয়ে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যাচ্ছি আমি সেগুলো কুড়িয়ে আন্‌তে।"

অঞ্জলি বল্‌লে, "মঞ্জু, দোহাই তোমার! আর লোক হাসিও না, এইতেই কত লোকে কত কি বল্‌বে তার ঠিক নেই! আবার নূতন একটা কেলেঙ্কারীর সখ কেন?"

মঞ্জু বল্‌লে, "কেন, কি হয়েছে? ভুল করে আমি ফেলেছি, আমি যদি কুড়িয়ে আনি, সে ত ভাল বই মন্দ নয়, তাতে কার কি?"

মঞ্জুলা সিঁড়ি দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে নেমে গেল। ছেলেরা কলরব করে ফুল নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ছিল, মঞ্জু পিছন থেকে দু এক জনকে হাতের কাছে যাকে পেল ধরে বল্‌লে, "আমার ফুলগুলো তোমরা আমায় ফিরিয়ে দেবে কি মণি? আমি তোমাদের অনেক খেল্‌না দেব।"

শিশুরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইল, তারপর ফুলগুলো চেপে ধরে বল্‌লে, "দেবো না, আমা ফুল।" একটি ছোট ছেলে একটা ফুল বাড়িয়ে বল্‌লে, "তুমি এত্তা নাও, আমি এত্তা নি।" মঞ্জু নিজের গালের উপর তার মুখখানা একবার চেপে ধরে ফুলটা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। পথ দিয়ে দুই চারটা লোক যাচ্ছিল, তারা একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে মঞ্জুলার আপাদমস্তক দেখে নিল। কেউবা মুচ্‌কে হাস্‌ল।

ছেলেরা ছুটে যেতে যেতে পথে মোহনকে পাকড়াও কর্‌লে। তাদের অগ্রণী একজন বল্‌লে, "ছোট কাকা, রাস্তার সব ফুল নিয়ে নিয়েছি, এই দেখ! রাণী চাইল দি নি।"

মোহন বল্‌লে, "রাণী কে রে?"

খোকা দুই হাত খুব উঁচু করে বল্‌লে, "ও বাড়ীর এত বড় রাণী, সে বল্‌লে তার ফুল।"

পিছন থেকে আর-একজন এগিয়ে এসে বল্‌লে, "রাণী লক্ষ্মী চুন্দল, আন কাঁদ্‌বে না ছি। আমি এত্তা ফুল দিয়েছি।"

মোহন আর কথা না বাড়িয়ে পাশের বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মোহনকে পাগল লোকে চিরকালই বলত, তাতে জগতের এতদিন কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নি। কিন্তু এতদিনে দেখা গেল তার পাগলামি জগতের একটা উপকার করেছে। মোহনকে পাগল আখ্যা দেবার জন্যে এত কাল পরে পাশাপাশি এই দুটো জগৎকে অন্তত একসুরে গলা মিলিয়ে কথা কইতে হল। অপযশ তার যথেষ্ট বেড়ে গেল, কিন্তু তার মধ্যে আর যাই থাক্, ভীরুতার অপযশটা মোটেই ছিল না। তাই দুটো জগৎই যখন তাকে আপনার কোল থেকে বিদায় করে দিতে একটুও অনিচ্ছা জানাল না, তখন কেবল মাত্র মঞ্জুলাকে সাথী করে সে আর-একটা তৃতীয় জগৎ সৃষ্টি করতে মোটেই ইতস্তত করে নি।

শ্রীশান্তা দেবী।

দ্রাবিড়জাতি

বর্ত্তমান প্রত্নানুসন্ধান-ফলে এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতির ইতিহাসের অনেক বিষয়ই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে জাতিকে আর্য্য জাতি বলিয়া থাকি, সেই জাতি ভারতের বাহিরে এসিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন স্থান হইতে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া, বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আর্য্যগণ ইঁহাদের সর্ব্বশেষ শাখা। প্রতীচ্য আর্য্যগণ দেশান্তর গমন করিলে পর প্রাচ্য আর্য্যগণও বাহির হন। ষোড়শ ও সপ্তদশ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় কয়েকটি আর্য্যভাষাভাষী সম্প্রদায়ের অধিবাস ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পূজিত দেবতার নাম বৈদিক দেবতার নামের অনুরূপ। আর্য্যগণ বরাবর উত্তরদিক দিয়া সগ্‌ডিয়ানার উত্তরে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একদল পশ্চিমে ও আর-একদল পূর্ব্বদিকে চলিয়া যান। আর্য্যবংশসম্ভূত মিতান্নিগণ পশ্চিম দিকে গিয়াছিলেন। খৃষ্টজন্মের দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যজাতি যখন ভারতের উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, মিতান্নিজাতি তখন বাবিলনের উত্তর-পশ্চিমে টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টজন্মের ১৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে এসিয়া-মাইনরে এই মিতান্নিজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা বরুণ, অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের উপাসক ছিলেন। ১৭৪৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে কাশীর জাতি নামক আর্য্য-জাতির অপর এক শাখা বাবিলনে নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ছয় শত বৎসর বাবিলনে আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে পঞ্চনদ-প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মিতান্নিরাজ দশরত্ত ১৩৬৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র মত্তিইউজ (Mattiuza) কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর মত্তিইউজকে বিতাড়িত করিয়া দশরত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা অর্ততম ও তৎপুত্র শুততম্বর সিংহাসন আক্রমণ করেন। মত্তিইউজ খত্তিতে পলায়ন করেন। দেশ অরাজক হইল। মিতান্নিগণ দশরত্তের মৃত্যুর পর পশ্চিমে আর্য্যবংশসম্ভূত হিটাইট জাতিদ্বারা এবং পূর্ব্বদিকে অসুরদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইয়া পড়েন। শেষে হিটাইটদিগের রাজার অনুগ্রহে বোগাজকোইর (Boghazkyoi) সন্ধিসূত্রে দশরত্তপুত্র মত্তিইউজ (Mattiuza) পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অত্যল্প কালমধ্যে হিটাইটগণ মিতান্নি-রাজাকে নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিটাইটগণ এসিয়া-মাইনরের উত্তর-পূর্ব্বে কাপ্পাডোকিয়ায় (Cappadocia) আসিয়া উপস্থিত হন। অসুরগণ ইঁহাদিগকে খত্তি (Khatti) বলিতেন। মিসরে হিটাইটগণ 'খেত (Kheta) নামে পরিচিত ছিলেন। তার পর কালের প্রভাবে ইঁহাদের অধঃপতন ঘটে। অন্য আর্য্যশাখা আসিয়া ইঁহাদের হৃতরাজ্য অধিকার করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ইঁহাদের ভাষা পাঠ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি একজন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত ইঁহাদের পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

পুরাতত্ত্বালোচনায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রাচীন আর্য্যজাতি যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের আদিম নিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া, পরস্পর ভাব ও ভাষার আদান-প্রদানে ও নূতন দেশের জলবায়ুর প্রভাবে প্রকৃতিগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আর্য্যজাতির সকল শাখার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় আর্য্যজাতিকে অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বেদ ও উপনিষৎসমূহ এই শাখাভুক্ত আর্য্যজাতির প্রধান কীর্ত্তি। ইঁহাদিগকে বুঝিতে হইলে, ইঁহাদের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে এই বেদ ও উপনিষৎ আলোচনা করিতে হয়। সকল আর্য্যশাখা মূলে একজাতীয় হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য আর্য্যশাখার সহিত ইঁহাদের বিভিন্নতা এই বেদ ও উপনিষৎ সপ্রমাণ করিয়া দেয়। ইঁহারা ভারতে আসিয়া এক নূতন অবস্থার মধ্যে পড়িলেন;—জল, বায়ু ও প্রকৃতির এক নূতন প্রভাবের অধীন হইলেন। ভারতে আসিয়া, ইঁহারা ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন ও পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল।

ভারতের আদিম অধিবাসী কাহারা ছিল, ইহা নিশ্চয়রূপে স্থির করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষে চিরকালই নূতন নূতন বিদেশীয় জাতি আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম কোন্ জাতি আসিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদ্গণ বহু পরিশ্রম করিয়া, এসিয়ার জাতি সম্বন্ধে নূতন নূতন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতালীয় পণ্ডিত জিউফ্রিদা-রুজেরি এ সম্বন্ধে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় ইহার ইংরেজী ভাষান্তর সটীক করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে দ্রাবিড়গণ ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। নিগ্রিটোগণ দ্রাবিড়দের পূর্ব্বে এখানে আগমন করে। তাঁহারা বলেন, দ্রাবিড়গণ ইথিয়পীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। (Australoid Veddaic) অষ্ট্রেলয়েড বেদ্দা জাতির সহিত ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। প্রথমে নিগ্রিটো জাতি, তারপর বেদ্দাজাতি, ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, ইহাই তাঁহাদের মত। ইঁহারা এরূপও বলেন যে, দ্রাবিড়েরা সংখ্যায় খুব অল্পই ছিল। দ্রাবিড়দের পূর্ব্বে মুণ্ডা-কোল-ভাষাভাষীদের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরে এবং বেদ্দারা দক্ষিণে ছিল। যাহা হউক, আর্য্যেরা আসিয়া এক প্রধান জাতিকে এখানে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ যে প্রধান জাতিকে দেখিয়াছিলেন, যাঁহাদের সংঘর্ষে আসিয়া যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, তাঁহারা দ্রাবিড় নামে অভিহিত। মনুসংহিতায় এই দ্রাবিড়েরা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১০।৪৩, ৪৪)। আর্য্যদের দ্রাবিড়দিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিবার কারণ আছে। দ্রাবিড়েরা যখন প্রথম আর্য্যদিগের সংঘর্ষে আসেন, তখন তাঁহারা সুসভ্য ছিলেন; বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের ভিতর দিয়া এই দ্রাবিড় জাতির সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয়গণ আলোচনা করিয়াছেন। কল্ড্‌ওয়েল অনুমান করেন, সংস্কৃত 'দ্রবিড়' শব্দের বিশেষণে 'দ্রাবিড়' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, 'দ্রাবিড়' শব্দের অর্থ 'তামিল'। দাক্ষিণাত্যে তামিল, তেলুগু, তুলু, কন্নড় ও মলয়লম ভাষার প্রচলন আছে। এই-সকল ভাষার এক সাধারণ নাম "তামিল" বা 'তামল'। সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্য্যন্ত এই জাতি বিস্তৃত। সমগ্র মান্দ্রাজ, হায়দারাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতের অধিকাংশ এই জাতির নিবাস-ভূমি। কাহারও কাহারও মতে খাঁটি দ্রাবিড়েরাই ভারতের আদিম অধিবাসী। ভারতবর্ষে শুধু আর্য্যজাতিই আসে নাই—সিদিয়ান ও মঙ্গলীয় জাতিরাও আসিয়াছিল। এই বিদেশীয় জাতিদের সঙ্গে দ্রাবিড়জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এখন ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। দ্রাবিড়-রক্ত অল্পবিস্তর সকলেরই ধমনীতে প্রবাহিত। কোন জাতি দ্রাবিড় ও আর্য্যশোণিত-মিশ্রিত, কোন জাতি দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয় শোণিত-মিশ্রিত, আবার কোন জাতি বা দ্রাবিড় ও সিদিয়ান শোণিত-মিশ্রিত। কিন্তু আর্য্য নামের এমনই প্রভাব যে, সকলেই আপনাদিগকে আর্য্য নামে পরিচিত করিয়া গৌরব অনুভব করেন। পরন্তু বিশুদ্ধ আর্য্য-শোণিতের জন্য কোন জাতিই স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। সে খাঁটি আর্য্য-শোণিত আর নাই। উত্তরভারতের ন্যায় কিন্তু দক্ষিণভারতে এই সংমিশ্রণ সেরূপ অধিক পরিমাণে হয় নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণভারতের

মধ্যে প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া, দক্ষিণভারতকে তত সহজে বিমিশ্র হইতে দেয় নাই। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রাবিড় আপনার ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে পারিয়াছে। অবশ্য নিজের গণ্ডীর মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন স্থানে যতটুকু পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে। দ্রাবিড়দিগের এই-সমস্ত অঞ্চলে তেলুগু, কন্নড়, মলয়লম—বিশেষতঃ তামিল ভাষায় যে-সমস্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের ধারা এক নূতন প্রণালীর। প্রাচীন তামিল ভাষায় যে সাহিত্য আছে, তাহাতে তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানভাষাভাষীরা প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বুঝিতেই পারে না। আর্য্যসমাগমের পূর্ব্বের ইতিহাস লিখিতে হইলে, কতক উপকরণ এই-সমস্ত সাহিত্য হইতে পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁহার Life in Ancient India ও জাতিতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন দ্রাবিড়গণ বৈদিক আর্য্যদের অপেক্ষা সভ্যতায় কোন অংশে হীন ছিল না। বরং বিষয়বিশেষে আর্য্যগণ অপেক্ষা তাহারা অধিকতর উন্নত ছিল। বিজ্ঞানে, শিল্পে, যুদ্ধবিদ্যা ও বুদ্ধিকৌশলে তাহারা আর্য্যদের সম্যক্ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। যাহা হউক, বিন্ধ্যাগিরির পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যে-সমস্ত নিম্ন তীরভূমি ছিল, আর্য্য ও অন্যান্য নবাগত জাতি এই স্থানেরই মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া, দ্রাবিড়ভূমিতে আসিয়া পড়ে। তবে সে অনেক পরের কথা। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের পূর্ব্বে আর্য্য-সাহিত্যে দক্ষিণ দ্রাবিড়ের কুত্রাপি উল্লেখ নাই। কেবল ইহার পূর্ব্বে পাণিনির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আন্ধ্রগণ তখনও ছিল। এই আন্ধ্রগণ দ্রাবিড়দিগের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ শাসন করিত। দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্রদিগের অধঃপতনের পূর্ব্বে দ্রাবিড়দিগের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় না। মেগাস্থিনেস্ পাণ্ড্য রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আর যদি পাণ্ড্যরাজ্য মেগাস্থিনিসের সময় পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে তিনি উত্তরভারতে পাটলি-পুত্রের রাজসভায় সেলুকস নিকাটরের দূতরূপে (৩০২ পূঃ খৃঃ) আগমন করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের পাণ্ড্যরাজ্যের কথা শুনিতে পাইতেন না। ইনি আন্ধ্রদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, ৩০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দেও আন্ধ্রগণ মৌর্য্যরাজত্বের দক্ষিণাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। খৃঃপূঃ ৪র্থ শতকে ঋষি কাত্যায়ন তাঁহার বার্ত্তিকে প্রাচীন দ্রাবিড়, পাণ্ড্য ও চোড় রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি ইঁহাদের রাজধানীরও উল্লেখ করিয়াছেন। রাজধানীর নাম ছিল—"মদূর" ও "উরৈয়ূর"। দ্রাবিড়-ভাষায় "উর" বলিলে নগর বা গ্রাম বুঝায়। অক্কাডদিগের ভাষায়ও নগরার্থক 'উর' নামে একটি শব্দ আছে এবং 'উর'-সংযুক্ত অনেক শব্দও ইহাদের ভাষায় আছে। এই উভয় উরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধেয়। কাল্ডীয়গণ "উর" নামক দেশে দ্রবিড়ের পণ্যজাতের আদর করিত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে পাণ্ড্য ও চোড়-দেশের শুধু উল্লেখ করেন নাই, দক্ষিণের কাঞ্চীনগর ও কাবেরী নদীরও নাম করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে অশোক-অনুশাসনে "এবমপি সমন্তেসু যথা চোড পাণ্ড সতিয়পুতো কেতলিপুতো" প্রভৃতি বচনে পাণ্ড্য, চোড় ও কেরল রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু পূর্ব্বদিকে চেরদিগের রাজ্যের কথাও আছে। এই-সমস্ত অনুশাসনে অশোক অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তিনি কলিঙ্গদিগকে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তাহাদের এক লক্ষ অধিবাসীকে নিহত করিয়াছিলেন। এই হত্যা-কার্য্যের জন্য তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই দেশে ব্রাহ্মণ, সাধুগণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বাস করিতেন। দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত অশোক-অনুশাসন প্রচারিত হওয়ায় বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দ্রাবিড়-দিগের যথেষ্ট লিপিজ্ঞান ছিল। ষ্ট্রাবো বলেন, চের নামক এক দ্রাবিড় রাজপুত্র রোমানদিগের সহিত বন্ধুত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন। প্লিনি (৭৭ খৃঃ) পাণ্ড্যরাজ্য ও তাহার রাজধানী মদুরার উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমীর গ্রন্থে এবং তৃতীয় শতকে 'Periplus Mari Erythraei' গ্রন্থে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ তিনটি তামিল রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিৎ বরাহমিহির (৫০৪ খৃঃ) পাণ্ড্য, চোল, কেরল, কর্ণাটক, কলিঙ্গ ও আন্ধ্র, এই কয়টি দ্রাবিড়রাজ্যের নাম করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণে কাবেরী ও

তাম্রপর্ণী নদীরও উল্লেখ করিয়াছেন। ৪৯০ খৃষ্টাব্দের চালুক্যবংশের শিলালিপিতে চের, চোড় ও পাণ্ড্যরাজ্যের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, Kolkai পাণ্ড্যরাজ্যের বন্দর ছিল (Ptolemy, Table X)। এইখানে যাবতীয় বাণিজ্যব্যাপার চলিত। চৈনিক লেখকগণ বলেন, ৫০০ খৃষ্টাব্দে "লীম য়ু" নামক একজন দূত ভারতের দক্ষিণ হইতে চীনদেশে গিয়াছিলেন। এই দূত চীনদেশে গিয়া বলেন যে, রোম ও দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বিশেষভাবে চলিয়াছিল। এক দিকে ফিনিসিয়া ও আরব এবং অপর দিকে পাণ্ড্য ও দক্ষিণভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত, তাহা আরব ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। হীব্রু বাইবেলে ময়ূর, কপি প্রভৃতির বাচক কতকগুলি প্রাচীন তামিল শব্দ পাওয়া যায়। হীব্রুজাতি প্রতি তিন বৎসরে একবার করিয়া এই ময়ূর, কপি প্রভৃতি তার্শিশ হইতে জাহাজে করিয়া আনয়ন করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হীব্রুদের রাজা সলোমনের সময়ে ১৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ফিনিসিয়দের সঙ্গে তামিলদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল।

যে জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম, চীন ও আরবদের সহিত বাণিজ্যসূত্রে সম্বদ্ধ ছিল, যাহাদের সুপ্রাচীন অতীত যুগে নিজেদের সুব্যবস্থ সাম্রাজ্যসমূহ ছিল, যাহারা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃত ভাষার সম্পর্কে আসিয়াছিল, সেই দ্রাবিড়জাতি যে এক সময়ে বিশেষ সুসভ্য ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপণ্ডিত হল তাঁহার গ্রন্থে প্রমাণ সহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই দ্রাবিড়জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা খৃঃ পূঃ তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহারাই বাবিলন ও আসিরিয়ার সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ৩০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে সুমেরজাতি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। সুমের ও দ্রাবিড়জাতি অভিন্ন বলিয়া হলের ধারণা। সুমেরজাতি দ্রাবিড়জাতির শাখাবিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বিল্লবর ও মীনবর নামে দ্রাবিড়দের দুইটি অতি প্রাচীন শাখা ছিল। দ্রাবিড়ভাষায় বিল শব্দের অর্থ ধনু, মীন শব্দের অর্থ মৎস্য। কাজেই বিল্লবর বা মীনবর বলিলে ধনুর্দ্ধারী ও মৎস্যজীবী বুঝাইত। পর্ব্বতে ও জঙ্গলে ইহারা বাস করিত ও শীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মীনবরেরা উপত্যকায়, সমতল ভূমিতে ও সমুদ্রতীরে মৎস্যের ব্যবসায় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই দুটি জাতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত। ইহারা সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও ইহাদিগকে রাজপুতানা ও গুজরাতে বহুসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সেখানে ভীল ও মীন বলিয়া পরিচিত। কর্ণাটেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে তাহাদের নাম বিল্লবর।

দ্রাবিড়েরা সভ্য ও সম্পন্ন জাতি ছিল, তাহারা ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের বাসভূমির তিন দিকে সমুদ্র ও উত্তরে কঙ্কণ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিদিগের বাস ছিল। এই জাতিয়া দ্রাবিড় হইতে সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া প্রতিপন্ন। কারণ, প্রাচীন যুগের তাহাদের কোন সাহিত্য নাই। দ্রাবিড়েরাই সগর্ব্বে বলিতে পারে যে, তাহাদের ভাষাই দাক্ষিণাত্যের ভাষা এবং আর্য্যদের ভাষা উত্তর-ভারতের ভাষা। প্রাচীন নাগজাতিকে জয় করিয়া তাহারা রাজ্য অধিকার করে। নাগজাতি অগত্যা অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ডে ও জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। উর্ব্বর ভূখণ্ডগুলি দ্রাবিড়েরা নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়। তাহারা আপনাদের রাজা দ্বারাই শাসিত হইত এবং রাজাদিগকে তাহারা খুব সম্মানের চক্ষে দেখিত। তাহারা তাহাদের জাতীয়তার গর্ব্ব করিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে তাহারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই দ্রাবিড়দিগের কতক উত্তরাপথে ছিল, কতক আবার দক্ষিণাপথে গিয়া বাস করে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের দ্রাবিড়গণ—বিশেষতঃ আন্ধ্র ও কলিঙ্গগণ—দ্রবিড়ের বাহিরে বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, আরাকান ও মার্টাবান পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সমস্ত জারিজুরী ২৯৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়া যায়। উত্তর হইতে আর্য্যগণ আসিয়া ইঁহাদিগকে মলয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, শ্যাম ও কম্বোজে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই-সমস্ত স্থানে ইঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করেন। যবদ্বীপের প্রাচীন কবি-সাহিত্যে দ্রাবিড়-পদ্ধতিতে সিদ্ধ অনেক সংস্কৃত পদও পাওয়া

যায়। ইহা হইতে স্থির করা যাইতে পারে যে, দ্রাবিড়-জাতি যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, সংস্কৃত-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

অধুনা সংস্কৃতজাত, দ্রাবিড় ও মুণ্ডা, এই তিন শ্রেণীর ভাষা ভারতবর্ষে কথিত হইয়া থাকে। যখন বৈদিক ভাষা প্রথম ভারতবর্ষে আসে, তখন এ দেশে দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভিন্ন যে আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে মুণ্ডা কেবল পূর্ব্বঘাটের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বিন্ধ্যপর্ব্বতে ও ছোট-নাগপুরে কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালেও যে এইরূপ ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মুণ্ডা-ভাষা-ভাষীরা বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অসভ্যই আছে। এমন মনে হয় না যে, মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষা বৈদিক ভাষার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তবে দ্রাবিড়ভাষা দ্বারা সংস্কৃতের অন্ততঃ কিছু পরিণতি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দ্রাবিড়ও সংস্কৃতের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। ভারতে যে-সমস্ত ভাষায় এখন কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সেই-সমস্ত ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কি সম্পর্ক, তাহা আজও স্থির হয় নাই। মধ্যযুগের সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহা কিছু মত দিয়া থাকেন মাত্র। ইঁহাদের মতে দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃতের নিকট ঋণী, কিন্তু সংস্কৃত দ্রাবিড়ভাষার নিকট আদৌ ঋণী নয়। এক শব্দ দ্রাবিড় ও সংস্কৃত, উভয় ভাষায় পাওয়া গেলেই ইঁহারা স্থির করিয়া থাকেন যে, দ্রাবিড় সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। এ কথা সত্য যে, মধ্যযুগের সভ্যতায় সংস্কৃতপাঠী ব্রাহ্মণের প্রভাবে দ্রাবিড়-সাহিত্যের অধিকাংশই সংস্কৃত-সাহিত্য-জাত। এখন একটা প্রশ্ন হইতে পারে, সমগ্র বৈদিক ভাষা কি তাহার শব্দসম্ভার বাহির হইতে আনিয়াছে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে-সমস্ত শব্দের সামীপ্য শব্দ আবস্তিক, স্লাভনিক, গ্রীক, লাটিন, জার্ম্মানিক ও কেল্‌টিক্‌ ভাষায় পাওয়া যায় না, সেগুলি নিশ্চয়ই যখন বৈদিকভাষা ভারতে প্রবেশ করে, তখন এখানে যে-সমস্ত ভাষা ছিল, তৎসমুদয় হইতেই গৃহীত হওয়া সম্ভব; কারণ, ভাষা অপেক্ষাকৃত পুরাতন হইয়া গেলে তাহার ধাতু সে আবিষ্কার করে না, তাহার পূর্ব্ব-সম্পত্তি হইতেই লইয়া থাকে। সংস্কৃতভাষায় নামবাচী এমন কতকগুলা শব্দ আছে, যেগুলি ভারতের—বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের উদাহরণস্বরূপ মুক্তা, ময়ূর, ব্রীহি, পিপ্পলি, মরীচ, চিঞ্চ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এগুলি অগ্নি-উপাসকগণ ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কখনই জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা দ্রাবিড় হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। আবার 'নীর'-শব্দ, 'মীন' শব্দ দ্রাবিড়েরা সংস্কৃত হইতে কখনই গ্রহণ করেন নাই কারণ, দ্রাবিড়েরা নিশ্চয়ই জল পান করিতেন এবং মৎস্যও খাইতেন। তাঁহারা যে এই দুইটি নামের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নয়। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দ্রাবিড়জাতির ভাষায় দ্রাবিড়-সভ্যতার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। দ্রাবিড়জাতির ভাষা সংস্কৃতভাষার সংস্পর্শে আসিয়া এক সময়ে বিশেষরূপ পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের ভাষায় বহু অ-সংস্কৃত পদও আছে। এইগুলির সূত্র ধরিয়া, আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে ইহাদের কিরূপ সভ্যতা ছিল, তাহার নিদর্শন বাহির করিতে পারা যায়। বিশপ কল্‌ড্‌ওয়েল, কিটেল, প্রমুখ পণ্ডিত ইঁহাদের ভাষা অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যদের সহিত সংঘর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ইঁহারা বেশ সুসভ্য ছিলেন। ইঁহাদের রাজা ছিলেন। তিনি কতকগুলি ছোট ছোট প্রদেশ শাসন করিতেন। ইঁহাদের উৎসবে বন্দীগণ গান করিত। ইঁহাদের স্বতন্ত্র বর্ণমালা ছিল। ক্ষুরিকা দিয়া তাঁহারা তালপত্রে লিখিতেন। অনেকগুলি তালপত্র গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া ইঁহাদের পুস্তকের পরিচয় দিত। ইঁহারা দেবদেবীর উপাসনা করিতেন। পূজায় পুরোহিতের দরকার হইত। তবে বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্য-প্রথা ছিল না। তাঁহারা কতকগুলি দেবতা মানিতেন ও উপাসনা করিতেন। এগুলি বস্তুতঃ উপদেবতা—বড়ই নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও খেয়ালের বশবর্ত্তী। দ্রাবিড়েরা তাহাদের উদ্দেশ্যে বলি দিয়া, নৃত্য করিয়া, দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রের

প্রচলন খুবই ছিল। পুরোহিতেরা মন্ত্রের সাহায্যে এই উপদেবতাদিগকে বশীভূত করিতেন। উপদেবতা তখন পুরোহিতের স্কন্ধে চাপিতেন। পুরোহিতের উপর উপদেবতার ভর হইত। প্রথম অবস্থায় দ্রাবিড়দের স্বর্গ, নরক, পাপ বা আত্মার কোনই ধারণা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা দেবতাকে 'কো' (রাজা) নামে আখ্যাত করিতেন। এটি আর্য্যদের শব্দ নয়। এই দেবতাদের জন্য তাঁহারা মন্দিরও নির্ম্মাণ করিতেন—মন্দিরের নাম ছিল—'কো-ইল'। তাঁহাদের ভাষা হইতে তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। এই সময়কার দ্রাবিড়দের আইন-কানুন ছিল—তবে বিচারক ছিল না। বিচারে সন্দেহ উপস্থিত হইলে নজির দেখিয়াই মীমাংসার ব্যবস্থা হইত। বিবাহ-বন্ধনকে তাঁহারা আমরণ ধর্ম্মবন্ধন বলিয়াই গণ্য করিতেন। আবশ্যক ধাতুর মধ্যে টিন, সীসা ও দস্তার ব্যবহার তাঁহাদের জানা ছিল না। বুধ ও শনি ছাড়া অন্যান্য গ্রহবিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল। ইঁহারা রোগ হইলে ঔষধ ব্যবহার করিতেন। ছোট বড় সকল রকম নৌকা তাঁহারা তৈয়ারি করিতেন; এমন কি, সমুদ্রগমনোপযোগী জাহাজ নির্ম্মাণেও তাঁহারা বিশেষ কুশলী ছিলেন। কৃষিই জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। যুদ্ধে তাঁহাদের খুব আনন্দ হইত। যুদ্ধের উপাদান ছিল—অসি, বর্ম্ম, তীর ও ধনুক। সীবন, বয়ন ও রঞ্জন-শিল্পে তাঁহাদের বেশ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহারা মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করিতেন।

তামিলভাষার ছন্দ সংস্কৃতের আদৌ অনুরূপ নয়। ইহার ছন্দ সংস্কৃতের ছায়ায় গড়িয়া উঠে নাই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তোল-কাপ্পিয়ম্ প্রাচীনতম তামিল বৈয়াকরণ। ইনি অগবল, বেণপা, কলিপ্পা ও বনচিপ্প, এই চারিটি প্রাচীন ছন্দের বিবরণ দিয়াছেন। এগুলি কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ নয়। কিন্তু তেলুগু, কন্নড় প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে বহুপ্রকারের গণচ্ছন্দ ও মাত্রাচ্ছন্দ আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন তামিল ভাষায় আর্য্যা, বৈতালীয়, অনুষ্টুভ্, গায়ত্রী প্রভৃতি কোন সাধারণ ছন্দের সদৃশ ছন্দ নাই। 'যাপ্পরুঙ্গলম্' তামিল শ্লোকের ছয়টি ... র কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে 'তড়ই' চতুর্থ। তামিল কবিরা ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে ইহার মত কিছুই নাই। তামিলদের স্বতন্ত্র বর্ণমালা ছিল, তাহা ললিতবিস্তরের ৬৪ প্রকারের বর্ণমালায় দ্রাবিড় বা তামিল বর্ণমালার উল্লেখ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ললিতবিস্তরের গ্রন্থকারের সময় যে তামিল বর্ণমালার অস্তিত্ব ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'অগপ্পোরুড় পুরপ্পোরুড় পন্নিরুপদলম্' নামে তামিলদের একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগ পুরপ্পোরুড়'—ইহাতে প্রাচীন দ্রাবিড়দের রাষ্ট্রনীতিব্যাপারের সংবাদ আছে; প্রধানতঃ যুদ্ধনীতিই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। শত্রুর গোধন আক্রমণ করিয়া লইয়া যাওয়ার কথা ইহাতে আছে। যিনি গোধন জয় করিয়া আনিতে পারিবেন, তিনি "বেড্চি" নামক পুষ্পদ্বারা ভূষিত হইয়া সম্মানিত হইবেন। যিনি শত্রুর হস্ত হইতে অপহৃত গোধন উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে "করন্দই" পুষ্পমালা পরাইয়া দিয়া সম্মানিত করা হইবে। যিনি শত্রুকে বাধা দিতে পারিবেন, তাঁহাকে কাঞ্চির মালা দেওয়া হইবে। এইরূপ বহু বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

তারপর 'অগপ্পোরুড়'। ইহাতে আর্য্যদের পূর্ব্বযুগের প্রাচীন দ্রাবিড়-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাদের প্রাচীন কালে জাতিভেদ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। রাজ্য পাঁচটি মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। পঞ্চ মণ্ডলে পঞ্চজাতি বাস করিত। এই পঞ্চ জাতির নাম ছিল,—

১। মরুতনিলমাক্কড়—ইহারা কৃষকজাতি।

২। কুরিঞ্চিমাক্কড়—ইহারা সম্পূর্ণ কৃষকের কার্য্য করে না—অন্য কার্য্যও করিয়া থাকে।

৩। মুল্লইমাক্কড়—গোপালন ইহাদের কার্য্য।

৪। নেয্ডমাক্কড়—ইহারা মৎস্যজীবী।

৫। পলইমাক্কড়—ইহারা যাযাবর জাতি।

১। ইহারা দেশমধ্যে উর্ব্বর ভূমিতে বাস করিত। জলের ধারে "মরুত" নামে একপ্রকার গাছ (Terminalia alata) জন্মিত। যেখানে এইরূপ গাছ জন্মিত, সেইখানে তাহারা বাস করিত। ইহাদের গৃহদেবতা ছিল, নামও ছিল, কিন্তু আর্য্য-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ইন্দ্র তাহার স্থান

অধিকার করিয়াছিল। অন্ন তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তাহাদের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহারই জল পান করিত।

ধান্য বপন, কর্ষণ, কর্ত্তন এবং উৎসবের অনুষ্ঠান, ইহাই তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। উৎসবের সময় এবং যুদ্ধে যাইবার সময় তাহারা "পর্‌রই" নামে বাদ্যধ্বনি করিত। তাহারা 'মরুতম্‌' নামে একপ্রকার বেণুবাদনও করিত। তাহাদের নগরের নাম "পেরুর" (বৃহৎগ্রাম) এবং "মুতুর" (পুরাতন গ্রাম)। তাহাদের সর্দ্দারদের নাম "উরন্‌" ও "কিরবন"।

২। পাহাড়িয়া জায়গার নাম "কুর্‌রুঞ্চি"। কুর্‌রুঞ্চি মাক্কলেরা এইরূপ স্থানে বাস করিত। তাহারা যে দেবতার পূজা করিত, পরে তাহা স্কন্দ নামে অভিহিত হয়। যে স্থানে সুগন্ধি চন্দন জন্মিত, ইহারা সেইরূপ জঙ্গলময় ভূমিতে বাস করিত। বংশ, তণ্ডুল ও ভুট্টা ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা পার্ব্বত্য নদীর জল পান করিত। ইহাদের মধুর বাদ্য-যন্ত্রের নাম 'পণ'। তাহাদের অধিপতির নাম "চিলম্বন"। 'তোণ্ডগম্‌' নামক বাদ্যধ্বনি হইলেই ইহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত। ইহাদের নগর কতকগুলি ছোট ছোট কুটীরের সমষ্টি। তাই নগরের নাম "শির্‌রুকুডি" (ছোট কুটীর)।

৩। মুল্লইমাক্কড়গণ জঙ্গলে (মুল্লই) বাস করিত এবং কৃষ্ণবর্ণের দেবতার পূজা করিত। তাহাদের জঙ্গলে হরিণ, শশক ও বন্য কুক্কুট যথেষ্ট থাকিত। এগুলিকে মারিয়া তাহারা খাইত। শস্যাদিও অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে পাইয়া তাহাদের খাদ্য বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা একটু আমোদ-প্রিয়। তাহাদের বেণুর নাম "কাড়ারি"। তাহাদের গ্রামের নাম "পাড়ি"।

৪। নেয়্‌তমাক্কড়গণ সমুদ্রের ধারে "পত্তনম্‌" বা "পাক্কন" নামে গ্রামে বাস করিত। এখানে মাছ ধরিবার খুব সুবিধা। তাহারা মাছ ধরিত, মাছের কারবার করিত। লবণ তৈয়ারি করিত, আর উদর পূরিয়া মাছ খাইত। তাহাদের পূজনীয় দেবতা পরে বরুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহাদের বেণুর নাম "বিড়রি"। অধিপতির নাম "কেরপ্পন"। পাণ্ড্যদের প্রাচীন উপাধি ছিল "কুমরি-কেরপ্পন"।

৫। পালইমাক্কড়—মরুভূমিতে ইহাদের বাস। ইহাদের প্রতিবেশী ঘুঘু, চিল ও ঈগল। ইহারা শিকার করিয়া ও নিকটস্থ দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। ব্যাঘ্র শিকার করিবার ইহাদের বেশ শিক্ষিত কুকুর থাকিত। ইহারা যে দেবীকে পূজা করিত, তাহার নাম "কাড়ী"। এই দেবীর নিকট ইহারা মহিষ প্রভৃতি বলি দিত। সর্দ্দারকে ইহারা কাড়ই বলিত। ইহাদের বাসস্থানের নাম 'কুরুম্ব্‌', যুদ্ধবাদ্যের নাম "তুড়ি"। *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, কৃতজ্ঞতাসহ তাহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

Ancient History of the Near East—H. R. Hall. The Tamils, eighteen hundred years ago—V. Kanakasabhai. Life in Ancient India—S. Aiyengar [ইঁহার লিখিত দ্রাবিড় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ]। Canarese Prosody of Nagavarma—Kittel. Introduction to the Comparative Grammars of the Dravidian—Caldwell.

J. R. A. S.—Vol V, VI. XIX. (N. 5.),
Journal of the Department of Letters, Vol. V.
পুরর-পোরুড় বেণবা মালই, ইত্যাদি ইত্যাদি—

জীবন

ওগো মণির মতন উজল! ওগো ননীর মত কাঁচা!
স্বপ্নে-চোঁয়া-ছোঁয়ার রসে হর্ষে মোরে বাঁচা।
আশার মত সুরভি এসে দরবি যাক্‌ গলে;
সাধের মত সোয়াদু মধু আদরে যাও ঢেলে।

দুঃখ পিষে বক্ষে মিশে বিকাশ কর গীতি,
বিরহ-ব্যথা-মাঝারে যথা সাঁতার কাটে প্রীতি।
রুধির-ধাবে অধীর হয়ে জাগ গো-তনু জুড়ে;
গুঁড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, জড়ের বাধা কুঁড়ে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।



প্রকৃতির পাঁজি

কার্ত্তিক মাস থেকে হেমন্ত ঋতুর আরম্ভ। এই ঋতুর শ্রী প্রধান ভাবে প্রকাশ পায় শিউলী আর স্থলপদ্ম ফুলে, প্রচুর শিশিরপাতে, কাশফুলের চামরে, আর ধানের ক্ষেতে পুষ্পিত ধানের শীষে।

চশ্‌মা।

—

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়

(৬)

কাকার বন্ধুর কাছে গুলিবারুদ অনেক ছিল। আর আমাদের কাছে যা ছিল সমস্ত নিয়ে আমাদের শেষ পথটা যে বেশ নিরাপদে যাওয়া যাবে তা বোঝা গেল। এঁদের গরু ও ঘোড়া বেশ জোয়ান ছিল। এবার পথে যে অসংখ্য হাতী আর হরিণ পাওয়া যাবে তাতে আর সন্দেহ নেই। গরু তাড়াবার জন্যে তিনজন সে-দেশী চালক আর আরো বারো জন লোক এবার সঙ্গে রইল। এবারে একটি শিকারীও সঙ্গে জুটল। কাকার বন্ধু তাকে সমুদ্রের ধার থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তার নাম ছিল হ্যান্‌স্। এখন জ্যানের সঙ্গে হ্যান এসে জুটলেন। হ্যান্‌স্ না কি শীকারে খুব ওস্তাদ। পনেরো জন সে-দেশী লোকদের ওপর যে কর্ত্তার মত হয়ে যাচ্ছিল, তার চেহারা পরিষ্কার, দেহের গঠন ভাল। কালো অসভ্যদের মধ্যে তাকে বেশ সুশ্রী দেখাচ্ছিল। তার নাম টোকো। ভাল ঘোড়া, প্রচুর গুলিবারুদ আর জোয়ান শিকারীরা সঙ্গে থাকায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল যে, এবার মনের সাধে শীকার করতে করতে যাব।

আমাদের তাঁবুর কাছেই একটা ছোট নদী ছিল। একদিন হ্যারি আর আমি হ্যান্‌স্‌কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলাম। গাছের ডালে উঠে জলে লাফালাফি করবার মতলব করলাম। হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করলাম, নদীটায় কুমীর আছে কি না। সে বল্‌লে, নেই। তাই সাহস করে' জলে নাম্‌তে গেলাম। ও হরি! আমরা জলে লাফাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ডান দিক থেকে একটা লোকের আর্ত্তনাদ কানে এল। আমি ভাব্‌লাম আমাদের কেউ কোন জন্তুর মুখে নিশ্চয় পড়েছে। কাছে একটা লম্বা ছুরি ছিল। সেটা খুলে নিয়ে সে-দিকে দৌড়লাম। গিয়ে দেখি আমাদের শিকারী হ্যান্‌স্ জলের ধারে চিৎপাত হয়ে বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল ধরে আছে, আর তার ডান হাত একটা কুমীরে কাম্‌ড়ে ধরে' তাকে টানাটানি কর্‌ছে। সে কাতরভাবে চীৎকার কর্‌ছে।

কি করে' যে তাকে রক্ষা করবো তা ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। হঠাৎ বুদ্ধি এল। সে বাঁ হাতে যে-ডালটা ধরে' ছিল তার ওপরে উঠে ছুরি বার করে' কুমীরটার একটা চোখে ছুরিটা জোরে গুঁজে দিলাম। কুমীরটা রাগে হাঁ করে ফেল্‌লে। হ্যান্‌স্ মুহূর্ত্তের মধ্যে সরে' এসে গাছের ওপর উঠে পড়্‌ল। আমিও তাড়াতাড়ি গাছে উঠ্‌লাম। কুমীরটা নীচে থেকে খানিকক্ষণ তর্জ্জনগর্জ্জন করলে। অনেকবার জোরে জোরে ল্যাজের ঝাপটা দিলে। আমার শরীর কেঁপে উঠ্‌ল—পড়ে যাই আর কি! আশ্চর্য্য এই, ছুরির আঘাতে কুমীরটা এমন জখম হয়েছিল যে খানিক পরেই দেখা গেল তার দেহটা ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছে।

বিপদ দেখে কাকারা দৌড়ে কাছে এলেন। হ্যান্‌স্‌কে ধরে' ধরে' গাছ থেকে নামান হল। সে তখনো কাঁপ্‌ছে, তার দেহ অবশ, মাটিতে সে স্থির হয়ে বসে রইল। কাকা তার হাত দেখ্‌লেন। কেটে গিছ্‌ল খুব, কিন্তু কোন হাড় ভাঙে নি। তার হাতে ওষুধপত্র দিয়ে তাকে সারাতে সময় লাগ্‌ল।

আমাদের কাছে যে-সব হাতীর দাঁত ছিল তা ব্যবসার জিনিসপত্র কিন্‌তে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তাই আমরা

ঠিক করলাম, এবার এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে হাতীর আড্ডা, আর যেখানে শীকার করতে অল্প লোকেই গেছে। সুতরাং উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আমরা চল্‌লাম। যে-সব অসভ্যদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘট্‌ল তারা মোটেই দুষ্টস্বভাবের নয়। অসভ্য বটে, কিন্তু তারা নিরীহ। অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে তাদের মন পূর্ণ।

যাই হোক একটি গরু নিয়ে আগে আমরা কত কষ্টেই না পথ চলেছি! এবার সঙ্গীসাথী যানবাহন নিয়ে আমরা রাজারাজড়ার মত চল্‌লাম। এগুতে না এগুতেই পথে পথে পাল-পাল বড় হরিণ মহিষ চোখে পড়তে লাগ্‌ল। দ্বিতীয় দিনে দূরে একদল জেব্রা দেখতে পেলাম। আর লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। বন্দুক হাতে তাদের দিকে চল্‌লাম। তারা জান্‌তেই পার্‌লে না। কাছে এসে একটাকে গুলি কর্‌তেই বাকিগুলো ভয়ে পালাল। আর আহতটা আমাদের তাঁবুর দিকে যেতেই আমাদের কয়েকজন লোক বেরিয়ে তাকে মেরে ফেল্‌লে। একটু এগিয়েছি এমন সময় দেখি একটা মহিষ আমি যে-দিক দিয়ে এসেছিলাম সেই দিক থেকে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। বুনো মোষ যে কি রকম রাগী হয় তা আমি জান্‌তাম। কাজেই তাকে মার্‌বার ব্যবস্থা না করলে পরিত্রাণ নেই—এই ভেবে বন্দুক ঠিক কর্‌লাম। মাথায় মার্‌লে গুলি যদি না লাগে এই ভয়ে ইতস্ততঃ কর্‌ছি ;—মোষটা একটা ঝোপের পাশ দিয়ে ঘুরে যেই আস্‌বে অম্‌নি তার কাঁধে গুলি মার্‌লাম। গুলি মেরেই তাড়াতাড়ি মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। সেটা দৌড়তে দৌড়তে আমার পিঠের ওপর দিয়ে চলে গেল। আমাদের তাঁবুর দিকে যেতেই তাকেও তাঁবুর লোকে শেষ কর্‌লে।

টোকো আমার কাছে এসে বল্‌লে যে একলা শীকারে বেরুনো আমার মোটেই ভাল হয় নি। কেননা গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ারের কাছে পড়্‌লে আর গুলি ফস্‌কে গেলে রক্ষা থাক্‌বে না। ঠিক হল শীকারে বেরুবার সময় টোকো সঙ্গে থাক্‌বে।

আমাদের নিয়ম ছিল এমন জায়গায় তাঁবু গাড়া যেখানে কাছে জল থাক্‌বে, আর নানা রকম জন্তু জানোয়ার পাওয়া যাবে। কখনো কখনো আমরা দু'তিন দিন ধরে' এক জায়গায় থাক্‌তাম। ইতিমধ্যেই হ্যারির সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিছ্‌ল। টোকোকে নিয়ে আমরা দুজনে প্রায়ই শীকারে বেরতাম।

একদিন আমরা তিন জনে পায়ে হেঁটে শীকারে বেরুলাম, সঙ্গে ঘোড়া নিই নি। একটা বনের ধারে এসে তিন জন তিন দিকে গেলাম। ঠিক করা রইল যে কেউ কারুর কাছ থেকে বেশী দূরে যাবে না, আর এমন কাছে থাক্‌বে যে একজন ডাক্‌লে আর-এক জন যেন শুন্‌তে পায় ও সাড়া দিয়ে কাছে আসে। আমি গেলাম মাঝে, টোকো বাঁ দিকে, হ্যারি ডান দিকে।

খানিকটা একলা একলা এগুবার পরই টোকোর চীৎকার শুন্‌তে পেলাম—"হাতী হাতী।" আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে চল্‌লাম। "হাতী হাতী" বলে' হ্যারির উদ্দেশে চেঁচালাম, কিন্তু হ্যারির কোন সাড়াই পেলাম না। খানিক এগিয়ে দেখি, টোকো এক গাছের ওপর বসে রয়েছে। সে আমাকে চেঁচিয়ে একটা গাছে উঠে পড়তে বল্‌লে। তার কথামত আমি দৌড়তে দৌড়তে একটা গাছের দিকে যাব কি পায়ে একটা লতা জড়িয়ে গেল, আর ধড়াস্ করে' পড়ে' গেলাম। বন্দুকটা হাত থেকে ফস্‌কে গেল। লতা থেকে পা ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌লাম, পার্‌লাম না। হাঁটুতে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হল, মনে হল যেন হাড়টা ভেঙে গেছে, কাজেই টোকোকে চীৎকার করে' ডাক্‌লাম আমায় সাহায্য কর্‌তে। চেয়ে দেখ্‌লাম, সে গাছ থেকে নড়্‌লও না। কেবল সেখানে বসে' গলাবাজি কর্‌তে লাগ্‌ল। সাম্‌নে তাকিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড হাতী শুঁড় তুলে গাছের আড়াল থেকে বেরুলেন, আর তারই বিপরীত দিকের একটা ঝোপ থেকে একটা সিংহ বেরুলেন। আমার ত বুক শুকিয়ে গেল। আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিলাম। ভাব্‌লাম, হয় সিংহটা গিলে খাবে, না হয় হাতীটা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। টোকো গাছে স্থির হয়ে বসে'। দেখ্‌লাম সে সিংহের মাথা লক্ষ্য করে' গুলি কর্‌লে। বন্দুকের আওয়াজ শুনে হাতীটা কেমন ভড়্‌কে গেল। আমারই পাশ দিয়ে সে চেঁচাতে চেঁচাতে বনের মধ্যে চলে গেল। টোকো গাছ থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল। সিংহটার দিকে চেয়ে

দেখি সে চিৎ হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। টোকো আমায় তুলে নিয়ে খানিকটা দূরে রেখে এল। তার পর ফিরে গিয়ে সিংহটাকে গুলি করে' শেষ করে' দিলে। এমন সময় এক বন্দুকের আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম। বুঝ্‌লাম, হ্যারি আমাদের খুঁজ্‌ছে।

টোকো আমাকে তাড়াতাড়ি একটু নিরাপদ জায়গায় রেখে হ্যারির দিকে গেল। টোকো চলে যাবার পর সেই হিংস্রজন্তুভরা বনে একলা শুয়ে শুয়ে আমার বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—একেবারে অসহায় অক্ষম আমি! কোন জানোয়ার এলে আত্মরক্ষাও করতে পার্‌ব না, পড়ে' পড়ে' মর্‌তে হবে! এখন ভালয় ভালয় হ্যারি এলেই রক্ষা।



গণ্ডার শিকার।

আমি বন্দুকটি আঁকুড়ে ধরে সিংহ-বাঘের আশঙ্কায় ড়ে' রইলাম। হ্যারিরা কি কর্‌ছিল ঠিক বুঝ্‌তে াচ্ছিলাম না। মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ ও হাতীর ৎকার শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, হ্যারি আর াকো সেই হাতীটাকেই মার্‌ছে। ক্রমে ক্রমে হাতীর ওয়াজ আমার কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। হলও তাই। আমার সাম্‌নে একটা ফাঁকা জায়গায় হাতীটা এসে দাঁড়াল। আমার ঘাড়ে এসে পড়্‌লেই চক্ষু স্থির! পরমুহূর্ত্তেই দেখি এক প্রকাণ্ড গণ্ডার বাঁ দিক্‌কার এক বন থেকে বেরুল। হাতীটা তাকে দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়াল—যেন এমন এক বলশালী শত্রুর সঙ্গে লড়্‌তে তার আর ইচ্ছে নেই; সামর্থ্যও নেই। কিন্তু গণ্ডার ছাড়্‌বে কেন? কথায় বলে গণ্ডারের গোঁ। সে গোঁ গোঁ করতে করতে হাতীটার দিকে এগুল। কাছে এসে মাথা নেড়ে সে মাথার শিংটা দিলে হাতীর পেটে গুঁজে। হাতী বেচারী শুঁড় নাড়্‌তে লাগ্‌ল, আর এধার ওধার আস্ফালন করতে লাগ্‌ল। সে যতই নড়াচড়া করে ততই গণ্ডারের শিংটা বেশী বেশী তার পেটে সেঁদিয়ে যেতে থাকে। হাতীটার দুর্দ্দশায় আমারও কষ্ট হল। কিন্তু জানোয়ার দুটোর লড়াই যে কি ভীষণ তা বর্ণনা করা যায় না। হাতীটার আর্ত্তনাদ আর চীৎকার, আর গণ্ডারটার গোঁ গোঁ শব্দে বন যেন কাঁপ্‌ছিল! ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আমি যখন এদের এই ভীষণ লড়াই দেখ্‌ছিলাম, তখন কে যেন পেছন থেকে আমার পিঠে হাত দিলে। চম্‌কে দেখি হ্যারি।

হ্যারি ও টোকোকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তারা তাড়াতাড়ি দুজনে পরামর্শ করে' জন্তু দুটোর দিকে চল্‌ল। হ্যারি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল, আর টোকো একবারে তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতীটার বুকে গুলি চালালে। প্রকাণ্ড হাতীটা গণ্ডারটার পিঠের ওপর পাহাড়ের মত হুড়মুড় করে' পড়্‌ল। গণ্ডারটা একবারে মাটির সঙ্গে চেপ্‌টে পড়্‌ল। হ্যারি ও টোকো তখন দুজনে মিলে গণ্ডারটাকে কয়েকবার গুলি কর্‌লে। সেটা হাতীটার পেটের নীচে খানিকক্ষণ ছটফট করে' মরে গেল।

লড়াইর হাঙ্গাম কাট্‌লে পরে হ্যারি ঠিক কর্‌লে, যে, তারা দুজনে ধরাধরি করে' আমাকে আগে তাঁবুতে রেখে আস্‌বে, তারপর হাতীর দাঁত, সিংহের চাম্‌ড়া প্রভৃতি নিতে আস্‌বে। আমি দেখ্‌লাম—সেই ভাল, কেননা পা'টা কাকাকে দেখাতে হবে। শাস্ত্র দেখানই ভাল। তারা দুটো লম্বা গাছের ডাল এনে তার ওপরে আরো ছোট ছোট ডাল পেতে আমার এক অপূর্ব্ব খাট তৈরি কর্‌লে। সে খাটে চড়ে' আমার মনে হল এবার 'হরিবোল'

বললেই হয়, তবে আমি দানা পেয়ে আছি—এই যা তফাৎ। টোকো ও হ্যারি আমাকে কাঁধে করে' নিয়ে চলল।

পথে হাতী বা সিংহের সঙ্গে আবার দেখা হলে বিপদ রাখ্‌তে জায়গা থাক্‌বে না। গণ্ডার 'আস্‌বে না বুঝে-ছিলাম, কেননা তাদের না রাগালে তারা কোন অনিষ্ট করে না। আর মানুষ দেখ্‌লে গণ্ডার ভয়ে পালায়। পথ আমাদের অল্পই ছিল। তবুও আধাআধি এসেছি এমন সময় একটু দূরের এক ঝোপ থেকে একটা সিংহ বেরিয়ে পথের ওপর এল, দেখা গেল। হ্যারি ও টোকো আমায় তাড়াতাড়ি নামিয়ে বল্‌লে—কিচ্ছু ভয় নেই, তুমি থাক, আমরা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমায় রক্ষা করব।

আমি বল্‌লাম—সিংহটা কাছে না এলে মেরো না। কেননা গুলিতে না মরে' যদি কেবল আঘাত পায় তাহলে রেগে আমাদের ওপর লাফাবেই।

সিংহটা আমাদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ্‌লে, আমরা সবাই মিলে জোরে চীৎকার করে উঠ্‌লাম। সিংহটা কি ভেবে আস্তে আস্তে বনের মধ্যে চলে গেল। সিংহরা দিনের বেলায় মানুষকে বড় আক্রমণ করে না, বিশেষতঃ যদি আবার কেউ বুক ফুলিয়ে জোরের সহিত তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখে ভয়ে দৌড়লে কিন্তু রক্ষা নেই, তাড়া করবেই।

যাই হোক আবার খাটে চড়ে' শীঘ্রই আমি তাঁবুতে এলাম। কাকা বল্‌লেন, পায়ের হাড় ভাঙে নি, কেবল জোর আঘাত লেগেছে। পায়ে জলপটি দিয়ে শুয়ে রইলাম। হ্যারিরা বনে ফিরে' সিংহের চাম্‌ড়া ও হাতীর দাঁত আন্‌তে সে-দিন আর যেতে পার্‌লে না, কেননা সন্ধ্যা হয়ে গিছ্‌ল। সমস্ত রাত্রি ধরে' সিংহদের চাপা গর্জ্জন শুন্‌তে পাওয়া গেল। হ্যারি বল্‌লে, মৃত বন্ধুর শোকে তারা কাঁদ্‌ছে। কীটপতঙ্গ, কুকুর, পাখী প্রভৃতির নানা রকম আওয়াজও শুন্‌তে পাওয়া গেল। সকালে উঠে দেখি আমার পা অনেকটা সেরে গেছে।

খাবার মাংস চাই বলে' সকালে কাকা, হ্যারি ও হ্যারির বাবা কয়েকজন শিকারী নিয়ে আগের দিনের মৃত হাতীটার সন্ধানে বেরুলেন। আমি কাকার অনুমতি নিয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লাম। আমার না-যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আগের দিনের প্রকাণ্ড হাতী-গণ্ডারকে দেখ্‌বার ভারী ইচ্ছা হল। সে জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখি গণ্ডারটা ত নেই! সকলেই 'গণ্ডার কই, গণ্ডার কই' বলে' খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। তখন বোঝা গেল যে, কালকের গুলিতে গণ্ডারটা মরে নি, কেবল ভয়ে চুপচাপ পড়েছিল মাত্র; তারপর সুবিধা বুঝে পালিয়েছে।

টোকো উৎসাহের সঙ্গে এধার ওধার ঝোপঝাপ খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল—যদি গণ্ডারটাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অপর সকলে সিংহটার ছাল ছাড়াতে লেগে গেল। আমার চোখ ছিল টোকোর ওপর। দেখ্‌লাম একটা ঝোপের ভেতর তাকিয়ে চীৎকার করে' সে পালিয়ে এল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎ গণ্ডারটি বন থেকে বেরিয়ে এলেন। টোকো দৌড়ল একটা গাছের দিকে। কিন্তু গাছের কাছে যেতে না যেতেই গণ্ডারটা তার খুব কাছে তাড়া করে' এল। টোকো গাছে লাফিয়ে যাবে কি গণ্ডারটা পেছন থেকে এসে মাথা দিয়ে তাকে এক গুঁতো মেরে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে। তার পরে সে কাকাদের দিকে তাড়া করলে। আমি চীৎকার করে' তাঁদের সতর্ক কর্‌লাম। কাকারা বন্দুক নিয়ে তার মাথায় কয়েকটা গুলি চালালেন, গণ্ডারটা নিপাত হল।

আমি টোকোর কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম। ভেবে-ছিলাম তার হাড়গোড় ভেঙে গেছে। গিয়ে দেখি, সে দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। বল্‌লে, তার বিশেষ লাগে নি। সে এসে দলে যোগ দিলে। গরুর পিঠে হাতীর দাঁত, হাতীর মাংস চাপান হল। খানিকটা গণ্ডারের মাংস কেটে সিংহের চাম্‌ড়ায় জড়িয়ে নেওয়া হল। গণ্ডারের মাংস খেতে ছিবড়ে মতো হলেও সুস্বাদ বটে। কাঁধের ও পাঁজ্‌রার মাংসই আমরা নিলাম। খানিকটা চামড়া নিলাম গরুর চাবুক কর্‌বার জন্যে। আর শিং দুটোও নেওয়া হল, তার দাম হাতীর দাঁতের অর্দ্ধেক। মোটের ওপর সেদিন-কার শীকার খুব বিপজ্জনক হলেও তাতে আমাদের লাভ যথেষ্টই হল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

শোধবোধ

ইঁদুরে কি ক'রে খেয়েছিল সোনা,
একথা হয়ত' অনেকে জানো না,
শোনো তবে বলি জহুরী মিহির,
তীর্থ যাবার ক'রে সব স্থির,
গেল যেথা থাকে মধু হাল্‌দার,
ছেলেবেলাকার বন্ধু তাহার।
মধু অসময়ে মিহিরকে দেখে,
বলে—"আরে কে ও! তুমি কোথা থেকে?"
মিহির মধুকে আড়ালেতে ডেকে,
বলে চুপিচুপি কানে মুখ রেখে,—
"তীর্থে চলে'ছি ভোরে উঠে কাল,
রেখে যেতে চাই সোনা একতাল
তোর কাছে জমা; নেবো ফিরে এসে—"
সোনাটুকু নিয়ে মধু বলে হেসে,
"তুলে রাখি দাদা ভাল ক'রে তবে,
থাক্‌বে কদিন? ফেরা হবে কবে?"
"ঠিক নেই তার কিছুই এখন,"
ব'লে চলে গেল মিহির যখন,
সোনার তালটা নেড়ে নেড়ে হাতে,
মধু হাল্‌দার ভাব্‌লে 'বরাতে
জুটে গেল আজ অনেকটা সোনা,
মিহিরকে আর ফেরত দেবো না,
দেয় বদ্‌নাম দিক্ নিন্দুকে,
রইল এ সোনা তোলা সিন্দুকে!'

২

মিহির সেই যে গিয়েছে তীর্থে,
দেরী দেখে তার বাড়ীতে ফির্‌তে,
মধু ভাবে—'বুঝি মরে' গেছে তবে,
সোনাটা এবার ভোগা দিতে হবে।
বউ বগলার গড়াবো গয়না,
রেগে সে যে আর কথাই কয় না!'
এমন সময় এল কার গাড়ী,
কে যেন ডাক্‌লে—"মধু আছ বাড়ী?"
শুনে ছুটে এসে বল্‌লে বগলা,
"কি হবে গো! এ যে মিহিরের গলা!"
মধু বলে—"চুপ! চেঁচাস্‌নি, এই,—
বল্ গিয়ে ওকে—আমি বাড়ী নেই,
গিয়েছি বাজারে কিন্‌তে সিঁদুর;
চায় যদি সোনা, বলিস্—ইঁদুর
সব খেয়ে গেছে, কিছু নেই আর,
ঘরে ঘটী বাটী রাখা হল ভার,
ইঁদুর বেটারা বড়ই চামার,
যত উৎপাত কর্‌ছে আমার!"

* * *

মিহির যতই দোরে কড়া নাড়ে,
পায় নাকো সাড়া তবু সে কি ছাড়ে!
ছেলে কোলে নিয়ে বগলা তখন,
দোর খুলে দিয়ে বল্‌লে যখন
শিখিয়ে দিয়েছে মধু যা বল্‌তে,
শুনে তা মিহির টল্‌তে টল্‌তে
বাড়ী এসে আর পারে না চল্‌তে,
সোনার শোকে সে শুকিয়ে শল্‌তে!
মিহিরের বউ বুঝে নিলে বেশ,
ছেলেবেলাকার বন্ধুই শেষ
গ্যাঁড়া দিয়ে নিলে সোনার তালটা!
এর শোধ তুলে নেবে সে পাল্টা;
"জোচ্চোর মধু আমাকে চেনো না—
দেখ্‌বো ইঁদুরে খায় কি না সোনা!"

৩

ওৎ মেরে রোজ সন্ধানে থেকে,
সন্ধ্যের ঝোঁকে একদিন ডেকে
মিহিরের বউ মধুর ছেলেকে
ভুলিয়ে-ভালিয়ে দিলে কাছে রেখে।
বগলা বেচারী ছেলেকে না দেখে,
কাঁদে ডেকে ডেকে মুখে হাত ঢেকে।
মধু হাল্‌দার সারারাত ধরে'
ছেলে খুঁজে খুঁজে পথে পথে ঘোরে।

মিহিরে মধুতে দেখা হ'তে ভোরে
মধু কেঁদে বলে—"ছেলেটাকে চোরে
নিয়ে গেছে ধ'রে কাল রাতে ভাই,
বল কোথা যাই, কোথা গেলে পাই?"
মিহির বল্লে—"চোরে কেন নেবে,
দাঁড়াও একটু দেখি রোসো ভেবে,
হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল বটে, সন্ধ্যার মুখে
তোমাদের এই গলিটায় ঢুকে
দেখি দুটো কাক উড়ে গেল ভোঁ—
ছেলেটাকে তোর মেরে নিয়ে ছোঁ!
আমি যেই গেছি ধর্ ধর্ ক'রে
কোথায় উধাও, আর কেবা ধরে!
কাকের জ্বালায় অস্থির দাদা
টেনে নিয়ে যায় ঘোড়া গরু গাধা,
ছেলে কোন্ ছার নিজে থাকা ভার—"
কথা শুনে তার বলে হাল্দার,—
"এ বিপদে আর হাসিয়ো না মিতে,
কাকে কি কখনো পারে ছেলে নিতে?
ইঁদুর-মিদুর ধরে বটে জানি—"
মিহির বল্লে—"সে-কথা তো মানি;
পার্‌তো না বটে আগে কাকে চিলে
ছোঁ মেরে এমন নিতে ছেলে-পিলে,
কিন্তু যেদিন সেই একতাল
সোনা গিলে খেলে ইঁদুরের পাল,
ঘটীবাটী তাও রাখ্‌লে না ঘরে,
সেই থেকে কাক ইঁদুরকে ডরে!
ইঁদুরে এখন সব সোনা-পেট,—"
শুনে লজ্জায় মাথা ক'রে হেঁট
মধু বলে—"দাদা, কর ভাই মাপ!
হয়ে গেছে বটে কাজটা খারাপ,
এখুনি তোমার সোনা ফিরে নাও,
ছেলেটা কোথায় শুধু ব'লে দাও।"

*　　　*　　　*

তখন যে যার বুঝে সুঝে পেলে,—
মিহিরের সোনা, মধু তার ছেলে।
কেঁদে বগলার চোখ দুটি লাল,
ঘুমোয় নি আহা, সারারাত কাল,
ফিরে পেয়ে তার হারা নিধি ছেলে
বুকে চেপে ধরে' কত চুমো খেলে।
মিহিরের বউ সোনার তালটা
ফিরে পেয়ে বলে—"কেমন চাল্‌টা
চেলেছি বাগিয়ে মধুকে পাল্টা
ঘরে ফিরে এল তাই তো মালটা!"

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

—

চোখের ধাঁধা

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে যে, জিনিস বা লোককে চোখে যেমন দেখা যায় সব সময় তারা হয়ত প্রকৃতপক্ষে তেমন নয়। চোখে দেখায় এক রকম, আর বাস্তবিকপক্ষে জিনিসটা হয়ত অন্য রকম। আমরা এখানে কয়েকটি ছবি দিতেছি; সেগুলি দেখিলে ইংরেজি প্রবাদটি যে কতদূর সত্য তা জানা যাইবে।

প্রথম ছবি—দুই পাশে দুইটি টাকার ছবি আছে। একটির চারিদিকে বড় বড় বৃত্ত আঁকা আছে, অপরটির চারিদিকে ছোট ছোট বৃত্ত। এখন এই টাকা দুটির মধ্যে কোন্‌টি বড় আর কোন্‌টি ছোট?

দ্বিতীয় ছবি—দুইটি হাতে দুইটি পাঁকাল মাছ পাশাপাশি রহিয়াছে। একটি বড় আর একটি ছোট দেখাইতেছে। মাপিয়া দেখ দেখি কোন্‌টি ছোট আর কোন্‌টি বড়।

তৃতীয় ছবি—দুই হাতে দুইটি চুরুট রহিয়াছে; একটি আড়ভাবে শোয়ানো আর একটি লম্বাভাবে দাঁড় করানো। মাপিয়া দেখ কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট।

চতুর্থ ছবি—একটি চতুষ্কোণ রহিয়াছে। তাহাতে পর পর কতকগুলি সরলরেখা টানা হইয়াছে। রেখাগুলির উপরে কতকগুলি ছোট ছোট রেখা টানা রহিয়াছে। এখন বল দেখি উপরকার সরলরেখাগুলি সমান্তরাল কি না।

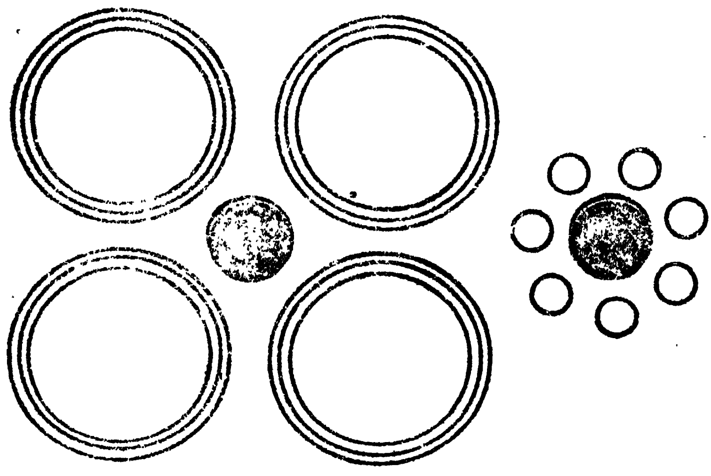
পঞ্চম ছবি—তিনজন পুলিশ সার্জ্জেণ্ট দাঁড়াইয়া আছে। তিনজন একই পোষাক পরিয়াছে, একইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। লোক তিনটির মধ্যে সকলের ডানদিককারটিকে

কিছু বড় দেখাইতেছে। মাপিয়া দেখ কোন্‌টি বড়।

এইবার ছবিগুলির গোলমাল আমরা মিটাইয়া দিব। একে একে ধর :—

প্রথম ছবি—দুটি টাকাই এক আকারের। একটির চারিদিকে বড় বড় বৃত্ত থাকার জন্য ছোট দেখাইতেছে, আর অপরটির গায়ে ছোট ছোট বৃত্ত থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় দেখাইতেছে।

দ্বিতীয় ছবি—পাঁকাল মাছ দুইটি সমান আকারের। একটির দুইদিকে ভিতরে টানা দুইটি কোণ রহিয়াছে বলিয়া সেটি ছোট দেখাইতেছে। অপরটির দুইদিকে উপরে টানা দুইটি কোণ রহিয়াছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত বড় দেখাইতেছে।

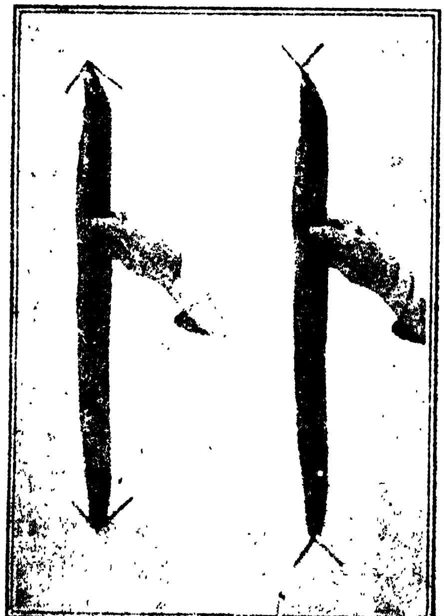


চোখের ধাঁধা—প্রথম ছবি।

তৃতীয় ছবি—একটি চুরুট দাঁড়ানো বলিয়া বড় দেখাইতেছে, অপরটি শোয়ানো বলিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট দেখাইতেছে।

চতুর্থ ছবি—সরলরেখাগুলি বাস্তবিকপক্ষে সমান্তরাল সরলরেখা। প্রথম রেখাটির উপর ডান দিক হেলিয়া ছোট ছোট রেখা কাটা হইয়াছে, দ্বিতীয় রেখাটিকে বাঁ দিক হেলিয়া ছোট ছোট রেখায় কাটিয়াছে। এইরূপে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে ছোট রেখায় কাটাকাটি করিয়াছে বলিয়া সরলরেখাগুলি সমান্তরাল দেখাইতেছে না।

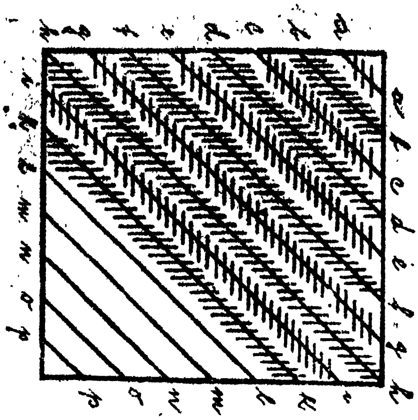
পঞ্চম ছবি—পুলিশ-সার্জ্জেণ্টগুলি সকলেই এক আকারের। ডানদিককারটিকে বড় দেখাইতেছে তার কারণ লোকগুলির পিছনদিককার মোটা মোটা রেখাগুলি। রেখাদুটি প্রথম লোকটির পিঠের উপর দিয়া গিয়াছে বলিয়া



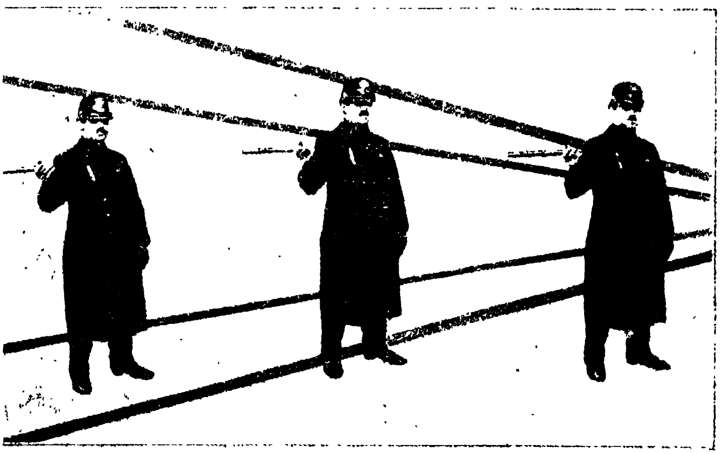
চোখের ধাঁধা—দ্বিতীয় ছবি।



চোখের ধাঁধা—তৃতীয় ছবি।



চোখের ধাঁধা—চতুর্থ ছবি।



চোখের ধাঁধা—পঞ্চম ছবি।

তাহাকে বড় দেখাইতেছে। অপর লোক-দুটির মাথার উপর দিয়া রেখাগুলি চলিয়া গিয়াছে। তাই তারা আকারে ছোট দেখাইতেছে।

গুপ্ত।

সত্যবাদী

সে আজ অনেকদিনের কথা। উজ্জয়িনী নগরে রামরাখাল নামে একটা লোক বাস করত। তার স্বভাব ছিল, সকলকেই সে মিথ্যাবাদী বলত এবং প্রচার করে' বেড়াত তার মত সত্যবাদী ত্রিসংসারে আর কেউ নেই।

মুখে সব সময়েই সে বল্‌ত—'সত্যের জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত।' এমনি করে' সব সময় 'আমি সত্য কথা বলি—আমার মত সত্যবাদী কেউ নও, তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী' বলে' বেড়ানতে নগরের সব লোক তার উপর বড় বিরক্ত হয়ে গেল। কেউ আর তার সঙ্গে কথা বলত না, সবাই তাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সে নগর ছেড়ে চলে' যেতে বাধ্য হ'ল। কি করে' আর বাস করে সে নগরে,—লোকে তাকে দেখ্‌লেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, দোকানীরা অমন সত্যবাদীকে ধারে জিনিষ দেয় না। তাই একদিন রামরাখাল তল্পিতল্পা কাঁধে নিয়ে যে দেশে গিয়ে তার সত্য জাহির করে' মাতব্বরী ফলিয়ে থাকতে পারে, তেমনি দেশের সন্ধানে যাত্রা করল।

অনেকদূর চলে' চলে' সে একটা বনের ধারে গিয়ে উপস্থিত হল। তার পা আর চল্‌ছিল না, ক্ষিধেয় আর পরিশ্রমে সে একেবারে এলিয়ে পড়েছিল। এমন সময় সে দেখ্‌তে পেলে তার আগে আগে একজন পথিক একখানা লম্বা লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে। বুড়ো মানুষ সে, মুখে তার শণের মত সাদা লম্বা দাড়ি। রামরাখাল একটু জোরে হেঁটে তার সঙ্গ নিয়ে দু'জনে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করল। বুড়ো মুখ তুলে রামরাখালকে জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে সে আস্‌ছে, কোথায়ই বা যাবে। রামরাখাল কিজন্য নগর ছেড়ে পালিয়ে কোথায় চলেছে বুড়োকে সব ভেঙে বল্‌ল।

সব কথা শুনে বুড়ো গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ কি ভাব্‌ল, তার পর বল্‌ল—'ভাল, একজন মানুষ কোনই অন্যায় করেনি, শুধু-শুধু তার উপর এমনি অন্যায় অবিচার! এ তো ভাল কথা নয়। চল আমরা দু'জনে একসঙ্গেই যাই। আজ রাত্রি হয়তো এই বনেই কাটাতে হবে। একা একা বসে' রাত কাটানোর চেয়ে দু'জনে গল্পে গল্পে থাকা যাবে, ভালই হবে 'খন।'

চারিদিকে অন্ধকার। কিন্তু রামরাখাল একেবারে অচল হয়ে পড়েছে, সে বল্‌ল—'এইখানেই রাত কাটানো যাক্।'

তারা সেইখানেই বসে' পড়্‌ল। বুড়ো চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে বল্‌ল—'বোধ হয় তোমার সঙ্গে খাবার কিছু নেই—এস আমার যা আছে তাই দু'জনায় ভাগ করে' খাই।' বুড়ো তিনটা আতা আর তিনটা কমলালেবু তার ঝুলির ভিতর থেকে বের করে বল্‌ল—'এস, একটা করে' আতা আর একটা কমলা-লেবু এক এক জনে খাই। আর দুটো কাল সকালে ভাগাভাগি করে' খেয়ে রওনা হওয়া যাবে।'

খাবার খেয়ে বুড়ো ঘাসের উপর শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাতে আরম্ভ করলে। কিন্তু রামরাখালের ঘুম আস্‌ছিল না। ক্ষিধেয় তার পেট জ্বলে' যাচ্ছিল—একটা আতা আর একটা কমলা-লেবুতে কি আর ক্ষিধে মেটে। সে আস্তে আস্তে উঠে বুড়োর ঝুলিটা খুলে যে একটা আতা আর কমলা-লেবু সকালে খাবার জন্য ছিল তা বের করে' খেয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

সকাল বেলায় বুড়ো তাকে জাগিয়ে বল্‌ল—'একটা কমলা আর আতা আজ দু'জনে খাব বলে' রেখে দিয়েছিলুম, কোথায় গেল—তুমি খেয়েছ কি?'

খেয়েছে এ কথা স্বীকার কর্‌তে রামরাখালের লজ্জা হচ্ছিল। সে বল্‌ল—'না, আমি তো খাই নি।'

'সত্যি কথা বল না আমায়, হয়তো ক্ষিধে সহ্য কর্‌তে না পেরে খেয়েছ, তাতে আর দোষ কি!'

বুড়োর এ কথাতে রামরাখালের আরও লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল। এখন স্বীকার করলে সে যে ফল খেয়েছে তা তো বল্‌তে হবেই, এর উপর আগে যে মিথ্যা কথা বলেছে সেও বুড়ো বুঝ্‌তে পার্‌বে। রামরাখাল বল্‌ল—'কেন আমায় বার বার বিরক্ত কর্‌ছ! বল্‌লুমই তো আমি খাই নি। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে তুমি নিজে খেয়ে এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ।'

'বেশ, তুমি যদি না খেয়ে থাক সে তো ভাল কথা। তুমি সত্যবাদী মানুষ, তাই তোমায় আমি বিশ্বাস কর্‌ছি। সকাল বেলায় কিছু একটা খেয়ে বের হওয়া হোলো না, এই আর কি! চল বেরিয়ে পড়া যাক্।'

অনেক দূর গিয়ে তারা একটা বড় সহরে পৌঁছ্‌ল। সে সহরের সকলেই যেন কেমন আনন্দহীন, কারো মুখে হাসি নেই—কোথাও এতটুকু আমোদ আহ্লাদ নেই। রাজার একমাত্র ছেলে রাজকুমার অরিন্দমের ভয়ানক অসুখ। কুমারকে সকলেই ভালবাস্‌ত, তাই কুমার কিসে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন এই চিন্তাতেই সকলে ব্যগ্র। কত লোক কুমারকে ভাল কর্‌তে এসেছে কিন্তু কেউ কিছু কর্‌তে পারে নি, দিন দিন তার অবস্থা খারাপই হচ্ছিল—এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে কখন যে শেষ সময় উপস্থিত হয় তাই ভেবে সকলে আকুল হয়ে উঠেছে।

বুড়ো সব খবর নিয়ে রামরাখালকে বল্‌ল—'আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি না কুমারকে ভাল করা যায় কি না, হয়তো আমি তার এ ভয়ঙ্কর ব্যাধি আরাম কর্‌তে পার্‌ব।"

বুড়োর কথায় রামরাখাল আপত্তি করে' বল্‌ল—'না, না,—ওসবে দর্‌কার নেই আমাদের, মিছিমিছি ভোগান্তি হবে আর কি কপালে।'

কিন্তু বুড়োর জেদে রামরাখালের আপত্তি টিক্‌ল না। বুড়ো বল্‌ল—'ভাল কর্‌তে পার্‌লে অনেক টাকা পুরস্কার পাব আমরা।'

রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বুড়ো বল্‌ল—সে আর তার সঙ্গী কুমার-বাহাদুরকে আরোগ্য কর্‌বার ভার নেবে।

রাজা বল্‌লেন—'অনেকে অনেক রকম বলে' চেষ্টা করে' দেখেছে, কিন্তু কিছু কর্‌তে পারে নি। যা হোক, দেখ্‌তে পার তোমরাও চেষ্টা করে'। যদি ছেলেকে আমার ভাল কর্‌তে পার তবে যথেষ্ট সোনার মোহর পুরস্কার পাবে। আর যদি না পার তবে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড,—লাভের আশায় সকলেই বৈদ্য সেজে রোগ সারাতে চায়, তাই তেমন লোকদেরও শিক্ষা হওয়া চাই। এখন তোমাদের খুসী!'

রামরাখাল পেছন থেকে সঙ্গীর গা টিপে বল্‌ল—'এই বেলা সরে পড়া যাক হে—পরে আর সে অবসরও পাবে না।'

বুড়ো যেন সঙ্গীর কথা শুন্‌তে পায় নি এই ভান করে' রাজাকে বল্‌ল—'বেশ, আমরা সম্মত'। কুমার যেখানে আছেন আমাদেরও সেইখানে তালা বন্ধ করে' রাখুন। চব্বিশ ঘণ্টা



পরে ঘরে ঢুকবেন—হয় কুমারকে ভাল দেখবেন, না হয় তো আমাদের শির নেবেন।”

রামরাখাল আর বুড়োকে কুমারের ঘরে চাবি বন্ধ করে' রাখা হোলো। কুমার মড়ার মত পড়ে' ছিলেন। শরীরে রক্তের চিহ্ন নেই—নিশ্বাস বইছে কি না সেও বোঝবার উপায় নেই। বুড়ো তার পকেটের ভেতর থেকে একখানা ছোরা বার করে' কুমারকে খণ্ড খণ্ড করে' কাটলে। ব্যাপার দেখে তো রামরাখালের চক্ষু স্থির, সে ভয়ে অস্থির,—মুখে তার কথা সর্‌ছিল না। বুড়ো আবার খণ্ডগুলো সব পরিষ্কার জলে ধুয়ে জোড়া দিয়ে কি অদ্ভুত মন্ত্র সব আওড়াতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেহের টুক্‌রোগুলো এমন ভাবে লেগে গেল যে দেখে মনে হয় এ আবার কাটা হয়েছিল কবে। এর পরও কিন্তু রাজকুমার তেমনি নিশ্চল হয়েই পড়ে রইলেন, শ্বাস বইছে কি না সেও বোঝা যাচ্ছিল না।

বুড়ো তখন বল্‌ল—'বেশ, এইবার একে জীবন দিতে হবে। ব্যাধি এর শরীর থেকে ছেড়ে গেছে। এইবার তুমি সত্যি কথা বল্‌লেই এর জীবন ফিরিয়ে আন্‌তে পারি। সত্যি করে' বল—সেদিন রাত্রে তুমি ফল ছুটো খেয়েছিলে কি না?'

'কি বক্‌বক্ করছ! তোমায় তো কতবার বলেছি যে সে ফল আমি খাইনি।'

'সত্যি যা স্বীকার করে' ফেল। নইলে তোমার পক্ষে বড় খারাপ হবে। আমি বুড়োমানুষ, কুমারকে ভাল করতে না পেরে যদি আমার মৃত্যু হয় তো তাতে আমার ভয়ের বিশেষ কিছু নেই।'

রামরাখাল তার সঙ্গীর ভয়-দেখানো সুরে বেজায় রেগে বল্‌ল—'সে ভয় আমায় দেখাতে হবে না। আমি খাইনি বল্‌ছি তোমার ফল, তবু আমায় স্বীকার করতে হবে নাকি! ভারি মজা!'

রামরাখাল এই কথা বল্‌বা মাত্র বুড়োকে আর সে ঘরে দেখা গেল না। এমন বোধ হতে লাগ্‌ল সে যেন কখনই এ ঘরে ছিল না।

রামরাখাল একেবারে একা অসহায় অবস্থায় পড়ে' গেল। চব্বিশ ঘণ্টা চলে' গেছে। রাজা পাত্র মিত্র নিয়ে ঘরে এসে দেখেন কুমার মৃত। তিনি তখনই রামরাখালের শির নেবার হুকুম দিলেন।

রামরাখালকে তখনই অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যাওয়া হোলো। রামরাখাল সে জায়গায় বসে' কাঁদতে লাগ্‌ল, আর তার সঙ্গী বুড়োকে যা-তা বলে' গাল দিতে লাগ্‌ল। সেই বুড়ার জন্যই তো আজ তার এই বিপদ—প্রাণ যায়।

রাত ভোর হলে রক্ষীরা এসে কারাগারের দোর খুল্‌লে,—খট্ করে চাবির শব্দ হোলো, রামরাখালের মনে হোলো তার মাথায় যেন বাজ পড়ছে—বুড়োকে মনে করে' সে বলে' উঠ্‌ল—'হায়, হায়—তুমিই আমার এই করলে!'

ঠিক সেই সময়েই পেছন থেকে তার সঙ্গী এসে তার কাঁধ ধরে' বল্‌ল—'বন্ধু, বল আমায় সেদিন তুমি ফল ছু'টি খেয়েছিলে কি না? হৃদয় খুলে স্বীকার কর—কোন বিপদ হবে না তোমার।'

রামরাখাল গর্জ্জন করে' বল্‌ল—'কেবল ফল ছু'টি, ফল ছুটি!—চলে যাও আমার সমুখ থেকে! বলেছি তো ও আমি খাইনি।'

বুড়ো আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সৈন্যেরা সব এসে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চল্‌ল। বধ্যভূমিতে রাজা পাত্র মিত্র সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, আরো বহু লোক চারিদিকে তামাসা দেখ্‌ছিল। যে জায়গায় তার মাথা কাটা হবে সেখানে তাকে নিয়ে দাঁড় করান গেলো। এমন সময় কে এসে মিষ্টি স্বরে তার কানে কানে বল্‌ল—'আমি তোমার সঙ্গী এসেছি। বল এখনো ফল ছুটি তুমি খেয়েছিলে কি না? স্বীকার করলে তোমার জীবন আমি রক্ষা করব।'

মরণের ভয়ে রামরাখালের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু তবু বুড়োর উপর রাগে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল, সে বল্‌ল—চলে' যাও তুমি, ফল আমি খাইনি।'

বুড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—'এখনো তোমার উপর আমার দয়া হচ্ছে, তোমার মৃত্যু হয় এ আমার ইচ্ছা নয়।'

জল্লাদ রামরাখালকে কাটবার জন্য খড়্গ তুলেছে—এমন সময় বুড়ো চীৎকার করে' বল্‌ল—'ক্ষান্ত হোন রাজা; হত্যার আদেশ বারণ করুন। ছেলে আপনার ভাল হয়ে গেছে।'

চারিধারের লোক সব বিস্মিত হয়ে গেল। রাজা জল্লাদকে বারণ করলেন। কয়েকজন সৈন্যকে তখনি বুড়োকে সঙ্গে করে' কুমারের কক্ষে গিয়ে কুমারকে নিয়ে আসবার আদেশ করলেন।

একটু পরেই কুমারের হাত ধরে' বুড়ো এসে উপস্থিত। কুমার দিব্যি সুস্থ, হাসতে হাসতে আসছিলেন। রাজা তো আনন্দে একেবারে অস্থির। রাজা দৌড়ে গিয়ে কুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বুড়োকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বললেন —'কি চান আপনি বলুন, যা চাইবেন আপনি আমি তাই দেবো, অর্দ্ধেক রাজত্ব আমি আপনাকে দিতে পারি।'

বুড়ো বলল— তোমার অর্দ্ধেক রাজ্য নিয়ে আমি কি করব। আমাকে আর আমার সঙ্গীকে খুব বড় এক থলে মোহর দাও নিয়ে চলে' যাই।'

রাজা মস্ত এক গাড়ী ভরে' মোহর বোঝাই করে' তাদের দিলেন।

রাজ্যের সীমানায় এসে বুড়ো রামরাখালকে বলল— 'এখান থেকে আমরা দুজনে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় যাব। এস এই বেলা আমরা রাজার দেওয়া মোহর ভাগ করে' নি।' গাড়ী থামিয়ে বুড়ো মোহরগুলি তিন ভাগ ভাগ করতে লাগল।

রামরাখাল তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলল—'আমরা তো মাত্র দু'জন, তবে মোহরগুলো তিন ভাগ করছ কেন?'

'এক ভাগ হচ্ছে সেদিন রাত্রে যে ফলগুলি খেয়েছিল তার জন্য।'

রামরাখালের চোখ দুটি আনন্দে জলে' উঠল। সে তখন বলল—'যদি তাই হয় তা হলে আমি সত্যি কথা স্বীকার করছি, ফল দুটি আমিই খেয়েছিলুম।'

বুড়ো তার দিকে চেয়ে দুঃখিত ভাবে বলল— 'রামরাখাল, এ কি ধরণের সত্য যা শুধু সোনা দিয়েই কেনা যায়?'

এই কথা বলেই বুড়ো অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী মোহর সবই যেন উড়ে গেল। রামরাখাল তখন আবার শূন্য মনে একা একা তার লাঠিখানা আর শূন্য ঝোলাটি নিয়ে পথ চলতে লাগল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

কোন্ মাসে কি খেতে হবে

পূর্ব্ববঙ্গের পাড়াগাঁয়ে সাধারণ লোকদের ভিতর বার মাসে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি খাওয়ার একটা বিধি আছে। বিশেষতঃ মেয়ে মহলে ইহার খুবই চলতি দেখা যায়। ওরা বারমাসী অনুশাসন মেনে চলবেই। আমার মনে হয় তখন তখন ওসব খেতে সুস্বাদ হয়। শিক্ষিতা গিন্নি-ঠাকরুণরা পরীক্ষা করে' দেখতে পারেন।

(১) চৈত্রে—চালিতা
(২) বৈশাখে—নালিতা
(৩) জ্যৈষ্ঠে—আম দৈ
(৪) আষাঢ়ে—কাঁটাল দৈ
(৫) শ্রাবণে—ঘোল পান্তা
(৬) ভাদ্রে—তালের পিঠা
(৭) আশ্বিনে—শশা মিঠা
(৮) কার্ত্তিকে—ওল
(৯) অগ্রহায়ণে—খলিসা মাছের ঝোল
(১০) পৌষে—আলা (আতপ চাল)
(১১) মাঘে—বেল
(১২) ফাল্গুনে—তেল॥

সত্যভূষণ দত্ত।



নারী-সমস্যায় আমেরিকা ও ইউরোপ

বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সকল সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নারী-সমস্যা একটি প্রধান। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে—এক কথায় মানবের পূর্ণাঙ্গ জীবনে—নারীর স্থান কতটুকু, অধিকার কতটুকু, তাহার একটা বেশ পরিষ্কার বোঝাপড়া সেখানে চলিতেছে। সেখানকার সকল দেশেই যে এ সমস্যার একই প্রকার সমাধান হইতেছে তাহা নয়। গত যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বহুদেশেই নারীদের অবাধ গতিবিধি ও অনেকাংশে স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনেক অধিকার হইতেই তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। সেখানে অধিকাংশ দেশেই এতকাল ধরিয়া এই মতটাই প্রবল ছিল যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীদের টানিয়া আনিলে রাষ্ট্রীয় জীবনের কলুষতার ভাপে তাঁহাদের কমনীয় বৃত্তিগুলি একেবারে মুষড়াইয়া যাইবে। কিন্তু সেখানকার নারীরা এ কথা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে বর্ত্তমান রাষ্ট্র-পরিচালনায় নারীর সহযোগ শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, অবশ্য-প্রয়োজনীয়; নারী যে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটির ন্যায় নেশনের বৃহৎ সংসারটিরও গৃহিণী; সেখানেও যে সকল কার্য্য-কলাপের মধ্যে তাঁহার কল্যাণময় হস্তের স্পর্শ আবশ্যক।

তাই গত যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশেই নারী-সমস্যার প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কথাটাই ছিল রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভ। নরওয়ে-প্রমুখ কয়েকটি দেশে এ-অধিকারলাভে পূর্ব্বেই নারীরা সফল হইয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও মার্কিন প্রভৃতি কয়েকটি অগ্রগামী দেশের নারীদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। যুদ্ধাবসান পর্য্যন্ত তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

আমেরিকায় নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের আন্দোলন সুরু হয় খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। সুসান বি অ্যান্টনী ছিলেন সে আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম নেত্রী। এ আন্দোলন মার্কিন নারীদের নানা দিক দিয়া চিন্তা ও কার্য্য-প্রসার অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে সমর্থ হয় নাই। গত যুদ্ধ যখন বাধিয়া উঠিল তখন নারীর সে-অধিকার লাভের একটা সুযোগ ঘটিল। যুদ্ধের সময় নারীকে দেশের সেবায় নানাভাবে প্রয়োজন হইয়াছিল। জাতীয় মহিলা-সমিতি (National Woman Party) ছিলেন নারীদের একটি



সুসান বি এ্যান্টনী

আমেরিকার নারী-প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক (১৮৪৮)। ইঁহারই নামে মহিলাদের ভোট অধিকারের আইনটির নামকৃত হইয়াছে। কুমারী অ্যাডিলেইড জন্‌সন কৃত ইঁহার এই প্রস্তরমূর্ত্তিটি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের প্রদর্শনীগৃহে রক্ষিত হইবার কথা।



কুমারী এলিস পল

আমেরিকার জাতীয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী। এই জাতীয় মহিলা সমিতির উদ্যোগেই আমেরিকায় ২১ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়সের সকল নারী ভোট দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

মুখ্য সত্ত্ব। তাঁহারা বলিয়া বসিলেন সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার নারীদের যতদিন পর্য্যন্ত না দেওয়া হয় ততদিন তাঁহারা যে শুধু গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন না তাহা নয়—গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিবেন। তুমুল আন্দোলনের পরে মার্কিন নারীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকারলাভে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শুধু নারী বলিয়া তাঁহারা আর কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

ইউরোপেও ঠিক একই ঘটনা। বিগত যুদ্ধে এই কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বোঝা গিয়াছে যে রাষ্ট্র পরিচালনাটা শুধু পুরুষদেরই একটা কসরৎ নহে—যেখানে নারীর স্থান নাই। রাজ্য-পরিচালনায়ও গৃহস্থের সংসার পরিচালনারই মত সকলেরই—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেরই—চিন্তা ও কার্য্যের সাহায্যের প্রয়োজন, নহিলে রাজ্য চলিতে পারে না। তাই যুদ্ধের পরে ফ্রান্স ইটালি প্রমুখ কয়েকটি দেশ ছাড়া ইউরোপের প্রায় সকল দেশই নারীদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের দ্বারগুলিও উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। এবং ইহাতে এখন পর্য্যন্ত সুফলই দেখা গিয়াছে, কোন কুফল ফলে নাই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশশাসনে যুক্তি-পরামর্শ দিবার অধিকারলাভই নারী-সমস্যার মূল বা বড় কথা নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার নারীরা মনে করেন যে বর্ত্তমানে নারী সম্বন্ধে যে ধারণা, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে যে মত, প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এবং এই ভ্রান্ত মত ও ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন পর্য্যন্ত নারীকে যে অধিকারে অধিকারী বিবেচনা বা অধিকারবিচ্যুত করা হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

তাই ইউরোপে ও বিশেষ করিয়া আমেরিকায় নারী-প্রচেষ্টার গতিটা ছিল বিচ্যুত অধিকার লাভের দিকে। রাষ্ট্রীয় অধিকার চাই, সকল রকম ব্যবসা ও কাজের দ্বারগুলি উন্মুক্ত চাই, সম্পত্তি সম্ভোগ ও বিবাহ সংক্রান্ত আইনগুলির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে সাম্য চাই, এককথায় নরনারীর সমান অধিকার চাই,—ইহাই ছিল তাঁহাদের মুখ্য কথা। এই মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি সফল করিবার জন্য তাঁহারা নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফলও হইয়াছেন অনেক পরিমাণে।



শ্রীমতী জোসেফাইন বি বেনেট

ইনি আমেরিকার জাতীয় মহিলাসমিতির একজন নেত্রী। কংগ্রেসের ইনি একজন সভ্যপদপ্রার্থী ছিলেন। ভারতের মুক্তি ইচ্ছুদের আমেরিকায় একটি সঙ্ঘ আছে। ইনি সেই সঙ্ঘের প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার পাঁচজন সভ্যের মধ্যে একজন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিয়া ইনি বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমেরিকায় ত এমন কোন কাজ নাই যাহা নারীরা না করিতেছেন। সেখানে তাঁহারা আইন-ব্যবসায় ও বাণিজ্য-ব্যবসায় করেন, চিকিৎসা করেন, কাগজ চালান, দোকান করেন, বড় বড় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, বিজ্ঞান সম্বন্ধে রিসার্চও করিয়া থাকেন। যুদ্ধের পুর্ব্বে ইউরোপের কোন কোন দেশ একটু পুরাণপন্থী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় সকল দেশই নারীদের কাছে কাজের সমস্ত দ্বারগুলিই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধের সময় নারীদের ত ট্রামের চালক, এমন কি পুলিসের কাজও করিতে দেখা গিয়াছে।. কিন্তু এবিষয়ে সকলের চেয়ে উত্তর ইউরোপ ও রাশিয়াই অগ্রণী। রাশিয়ার বর্ত্তমান নেতা ও শাসক লেনিনের স্ত্রী ছিলেন শিক্ষাবিভাগের একটি শাখার কর্ত্রী। ইহা ছাড়াও রাশিয়াতে বড় বড় রমণী কাজকর্ম্মচারী আছেন।

মোদ্দাকথা মার্কিন ও ইউরোপের বহু দেশের রমণীরা দুইটা জিনিষই বহুল পরিমাণে পাইয়াছেন—রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আর্থিক স্বাধীনতা। এই আর্থিক স্বাধীনতাতেই তাঁহাদের অবস্থা অনেক সহজ ও ভালো হইয়া আসিয়াছে। কারণ তাহাতে তাঁহাদের অনেকেই আজ আর পুরুষের ভার বা দায় নন। ভার বলিয়াই ত নারীদের সামাজিক লাঞ্ছনা, পুরুষের চেয়ে তাঁহাদের বিবাহের গরজ বেশী। মার্কিন ও ইউরোপের রমণীরা এই ভার ও দায়ের অবস্থা অনেক পরিমাণে কাটাইয়াছেন; এবং কাটাইয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহারা তাঁহাদের লুপ্ত বা সুপ্ত শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন।

কিন্তু এই নারী-প্রচেষ্টাটিকে সফল করিয়া তুলিতে ইউরোপ ও আমেরিকার নারীদের অনেক বেগ পাইতে ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। অনেকে জেলে পর্য্যন্ত গিয়াছেন। ইহার ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলই সুফল নয়। একে ত এতদিন নারী-প্রচেষ্টার মূল কথাটি ছিল নষ্ট-অধিকার-লাভ; তাহার উপর আবার এই বাধা পাওয়াতে সমস্ত প্রচেষ্টাটির মধ্যে এমন একটি রেষারেষী ভাব আনিয়া দিয়াছে যেন ইহা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে জাতিতে লড়াই,—অনেকটা শ্রমিক ও ধনিকের লড়াইয়েরই মতন।

যতদিন দাবী ও অধিকারের উপর নির্ভর করিয়াই নারী-সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া হইবে ততদিন এরূপ একটা সম্পর্ক আসিয়া পড়াই অবশ্যম্ভাবী। কেননা নারী সেখানে আপনাকে দেখিতেছে নিষ্পেষিতরূপে এবং সেখানে নিষ্পেষণকারীর উপর নিষ্পেষিতের যে ভাব হয় তাহাকে আর যাহাই বলা হউক প্রেম বলা চলে না। প্রকৃত পক্ষে নারী-সমস্যার প্রকৃত মূল কথাটি নারীর দাবী ও অধিকার লইয়াই নয়,—বর্ত্তমান অপ্রাকৃত সমাজের অন্যায় ও পক্ষপাত ব্যবস্থায় এরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে মাত্র। তাহা কিন্তু আরও অনেক বড়—তাহা মানব-সমস্যা। সমাজ এতদিন ধরিয়া যে মূল ভিত্তিগুলির উপর দাঁড়াইয়া নরনারীর সম্পর্কের কাঠামো গড়িয়াছে, নারী-সমস্যা আজ তাহাকেই আঘাত করিয়াছে, তাহাকেই যাচাই করিয়া লইতে চাহিতেছে। চিরপ্রচলিত বলিয়াই সব চিরসত্য নয়। তাই নর ও নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণা চিরপ্রচলিত রহিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহারই একটা পরখ হইতে বসিয়াছে এবং এই নূতন পরখের উপরই গঠিত হইয়া উঠিবে নূতন সমাজ নূতন নূতন প্রথা ও বিধি-নিষেধ লইয়া। নারী-সমস্যার মূল কথাটাই এই—নূতন ন্যায়-পরায়ণ ও কল্যাণকর সমাজ-প্রতিষ্ঠা।

মার্কিন ও ইউরোপ আজ এ-কথাটা বুঝিয়াছে। সেখানকার বহুদেশে বিশেষ করিয়া উত্তর-ইউরোপের দেশ-সমূহে তাই বর্ত্তমানে নারী-প্রচেষ্টার গতিটা এদিকেই। বিবাহ, বিবাহভঙ্গের সহজ প্রণালী, মাতার সন্তানের উপর অধিকার, নরনারীর অবিবাহিত সম্পর্ক প্রভৃতি অনেক বিষয় লইয়া আজ তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যাহার একটা সুমীমাংসা হইলে নারীসমস্যা আর এত বড় সমস্যা হইয়া রহিবে না, নরনারীর সম্পর্ক ন্যায্য ও জগতের কল্যাণকর হইয়া উঠিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

রোগী-সেবায় অগ্রণী মহিলা

আগে য়ুরোপের হাঁসপাতালে রোগীসেবার ব্যবস্থা বেশ সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। এই রোগীসেবা সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলেন একজন মহিলা—



ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল।

কুমারী ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল। ইটালীর ফ্লোরেন্স্ শহরে ১৮২০ সালে তাঁর জন্ম হয়; তাঁর জন্মস্থানের নামে তাঁর নাম রাখা হয়। কিন্তু তিনি মানুষ হইয়া উঠেন ইংলণ্ডে। শিশুকাল থেকেই তাঁর সেবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইত, পুতুলের হাত পা ভাঙিয়া গেলে তিনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেন, পশু-পক্ষীদের যত্ন করিতেন, পীড়িত বা দুঃখিত লোক দেখিলে মমতা দেখাইতেন। কৈশোরে তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল—আর্ত্তের দুঃখ ক্লেশ মোচন করিতে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-বিদেশের বহু হাঁসপাতাল দেখিয়া বেড়াইয়া নার্স্ হইবার শিক্ষা সংগ্রহ করিলেন।

১৮৫৪ সালে ইংলণ্ড রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে যুদ্ধের নাম ক্রিমীয়া যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে আহত ইংরেজ সেনাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না; না ছিল তাদের যত্নের ব্যবস্থা, আর না ছিল চিকিৎসার ব্যবস্থা। ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল দেশ-সেবক সেনাদের দুর্গতি মোচনের জন্য সেই দূর যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার আগ্রহে স্বেচ্ছায় আবেদন করিলেন। আবেদন মঞ্জুর হইলে তিনি ৩৩ জন নার্স্ সঙ্গে লইয়া আহতদের সেবা করিতে গেলেন। তাঁর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও শুশ্রূষা আশ্চর্য্যরকম ছিল। আহত-দের সেবার ব্যবস্থা করিতে তিনি এক-এক দিন ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠায় দাঁড়াইয়া কাটাইয়াছেন। এইজন্য গভীর রাত্রে যখন প্রদীপ হস্তে তিনি রোগীদের দেখিয়া বেড়াইতেন, তখন কৃতজ্ঞ সৈনিকেরা তাঁকে দেবী মনে করিয়া তাঁর ছায়াকে প্রণাম করিত। ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেলের সেবা-শুশ্রূষার গুণে আহতদের ক্লেশ লাঘব হইল, মৃত্যুও কম হইতে লাগিল। অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর নিজের জ্বর হইয়া পড়িলেও তিনি তাঁর কাজ ছাড়িয়া যাইতে স্বীকার করেন নাই।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ ও প্রশংসমান দেশবাসীর অভ্যর্থনার আড়ম্বর এড়াইয়া ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল নিজের নিভৃত গ্রামে পলায়ন করেন। কৃতজ্ঞ দেশ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়া তাঁকে দান করে। তাহা দিয়া তিনি নার্সদের শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দৃষ্টান্তে নার্স্ হওয়া আর লজ্জার কাজ রহিল না; ভদ্র ও ধনীঘরের মেয়েরাও এই বৃত্তি শিক্ষা করিতে লাগিলেন; তাঁর চেষ্টায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা ও হাঁস্পাতালে পীড়িতদের সেবা নূতন ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। আজ তাঁরই দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র নার্সের সেবায় রোগীর যন্ত্রণার উপশম হইতেছে।

১৯১০ সালে ৯০ বৎসর বয়সে সম্মান ও গৌরবে মণ্ডিত হইয়া তিনি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়া গিয়াছেন, তার মধ্যে একটির নাম "ভারতে জীবন না মৃত্যু"।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলার কৃতিত্ব

এতকাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহিলাগণ উপাধি পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও উপাধি পাইতেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে উপাধি দেওয়া স্থির করেন। এই বৎসর নূতন নিয়মে প্রথমবার পরীক্ষা গৃহীত হয়। এবং প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই মহিলাগণ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী এস, রাম নাম্নী একটি ভারতীয়

মহিলা এইবার Tripos পরীক্ষা বেশ যোগত্যার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী কে স্নেল নাম্নী একটি ইংরেজ মহিলা আইন পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপুর্ব্বে কুমারী ফসেট্‌ ভিন্ন মহিলাদের মধ্যে কেহ এত উচ্চ স্থান অধিকার করেন নাই। কুমারী ফসেট্‌ অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় সেই বৎসরের সিনিয়র র‍্যাঙ্গ্‌লার হইতেও বেশী নম্বর পাইয়াও পুরাতন নিয়ম অনুসারে উপাধি হইতে বঞ্চিত হন। প্র

—

নানাদেশে মহিলা-কৃতিত্ব

আইন-প্রণয়নে মহিলা।—সম্প্রতি কিউবাতে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নূতন আইন প্রস্তুত করা হইবে। জেনারেল কউডার সে-আইনের খসড়াটি প্রস্তুত করিবেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীমতী এডিথ বি নিউম্যানকে আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কলম্বিয়ার ওয়াসিংটন ল কলেজ হইতে পাশ করিয়া কলম্বিয়াতে আইন ব্যবসা করিতেন। নিউইয়র্কের একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মহিলা পুরোহিত।—নরওয়েতে সম্প্রতি মেয়েদের পৌরোহিত্য ও মন্দিরে উপাসনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবত ফ্রু মার্ত্তা ষ্টিনসৃভিকই সর্ব্বপ্রথম মহিলা-পুরোহিত হইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে লইয়াই এ-বিষয়ে খুব একটু গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। একটি মন্দিরের অধ্যক্ষ একদিন তাঁহাকে মন্দিরে সান্ধ্য-উপাসনা করিতে বলেন। উপাসনা করিতে গিয়া তিনি বাধা পান। কারণ আইন সে-দেশে মেয়েদের প্রকাশ্য মন্দিরে উপাসনা করিতে দেয় না। তিনি শুধু বক্তৃতা করিয়াই সেদিন কাজ সারিলেন। কিন্তু এই ঘটনা হইতেই দেশের লোকের চৈতন্য হয়। এবং বর্ত্তমান এই অধিকার প্রদান ইহারই ফল।

মহিলা রাজকর্ম্মচারী।—আমেরিকার মিসিসিপি বিভাগে মেয়েরা একটি নূতন অধিকার লাভ করিয়াছেন। রাজকীয় উচ্চপদে তাঁহারা এবার হইতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কুমারী জোসেফাইন ফিট্‌স্‌ সেই বিভাগের শিক্ষা-পরিদর্শিকাপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

যন্ত্রবিদ্যায় মহিলা।—ইংল্যাণ্ডে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কলকব্জার নাড়া-চাড়া, মোটর (স্বচল-যন্ত্র) চালানো প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যার কাজে মেয়েরা খুব কমই যাইতেন। যুদ্ধের সময় বাধ্য হইয়া অন্যান্য কাজের ন্যায় ইহাও তাঁহাদের করিতে হইয়াছিল। তাহাতে একটা খবর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। স্বচলযন্ত্রের (automatic machine) কাজে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কাজ বেশী দেন এবং যন্ত্রটাও পুরুষদের হাত হইতে মেয়েদের হাতে বেশী টেকে। বিশেষজ্ঞরা ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে মেয়েরা যেরূপ ধৈর্য্য, নিপুণতা, ও মনোযোগ সহকারে কাজ করিতে পারেন পুরুষেরা ততটা পারেন না বলিয়াই এই তারতম্য। কাজেকাজেই আজকাল ইংল্যাণ্ডে আর এ-কাজটা মেয়েদের নিষিদ্ধ নয়। মেয়েদের যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবারও বেশ আয়োজন চলিতেছে। সমস্ত যন্ত্রবিদ্যা-প্রতিষ্ঠানগুলিই মেয়েদের সভ্য করিতে রাজী হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীমতী হেন্‌রী গুজের, কেটুন ক্যাল ডিষ্ট্রিক্টের পথপরিদর্শক আমিন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ কাজে এই বোধ হয় প্রথম মহিলা-নিয়োগ।

—

তুর্কি মহিলার আবেদন

আর্ত্ত সেবার্থে তুর্কিস্থানে বহুদিন ধরিয়া 'রেড ক্রস সোসাইটির' মত 'রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই প্রতিষ্ঠানের মহিলা সভ্যগণ তুর্কিস্থানের আর্ত্ত মহিলা ও শিশুদের সাহায্যার্থে ভারতনারীদের কাছে এক আবেদন জানাইয়াছেন। বোম্বাইয়ের খিলাফৎ কমিটির শেঠ ছোটানির নিকট সেই আবেদনপত্রখানি ভারতে প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। আবেদনে বর্ত্তমান যুদ্ধে তুর্কিস্থানে যে নরনারীর কি ভীষণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা জানানো হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার অপনয়নার্থে তাঁহারা ভারতনারীর মাতৃত্বের কন্যাত্বের ও ভগ্নীত্বের দোহাই দিয়া তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছেন। যাঁহার যাহা দেয় তাহা যেন সেণ্ট্রাল কমিটি অব্‌ দি রেড্‌ ক্রিসেণ্ট সোসাইটি (Central Committee of the Red Crescent Society, Constantinople) এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

—

দেশবিদেশের মেয়েদের কথা

জাপান।—জাপানে মেয়েদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। কিন্তু সেখানেও এখন এ-বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি সেখানকার ফুজি-মিকো খৃষ্টীয় সমাজ আটজন মহিলাকে সমাজের কর্ম্মকর্ত্রীরূপে বরণ করিয়াছেন। এই সমাজটি প্রেস্‌বীটেরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। পৃথিবীতে এই বোধ হয় এরূপ কাজে সর্ব্বপ্রথম মহিলা-নিয়োগ। জগতে শান্তিস্থাপনের কার্য্যেও মেয়েরা দেখা দিয়াছেন। সার্ব্বজাতিক সম্প্রীতি বর্দ্ধনের জন্য একটি মহিলাসভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই শুধু নয়। মেয়েরা আজকাল এমন অনেক কাজই করিতেছেন যা পূর্ব্বে তাঁহারা করিতেন না। হিগাসী উয়াগুন নামক একটি গ্রামে মেয়েদের লইয়া একটি অগ্নি-সেনা গঠিত হইয়াছে। তাহাতে চারি শত মেয়ে যোগ দিয়াছেন।

ক্যানাডা।—ক্যানাডাতেই সর্ব্বপ্রথম মেয়ে মন্ত্রী হইয়াছেন। ইতি-পূর্ব্বেই সে-খবর দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি সেখানকার মেয়েরা গভর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত অধিকারগুলি চাহিয়াছেন।—(১) কোন মোকদ্দমায় মেয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিলে বিচার করিবার জন্য পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও জুরি নিযুক্ত করা হউক। (২) বিবাহভঙ্গ আইনে মেয়েদেরও পুরুষের মতন সমান অধিকার দেওয়া হউক। (৩) এখন যেমন কতগুলি অপরাধে অভিযুক্ত হইলে ভিন্ন রাজত্বে পলাইয়া গেলেও অপরাধীকে ধরিয়া আনা যায়, স্ত্রী-পরিত্যাগকেও সেইরূপ অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হউক।

চীন।—ক্যাণ্টনের মেয়েরা রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন।

স্পেন।—স্পেনেও মেয়েরা খুব আন্দোলন তুলিয়াছেন। কংগ্রেসের নিকট তাঁহারা পুরুষেরই সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার দাবী করিয়াছেন।—সামাজিক ও আর্থিক নানা বাধার বিরুদ্ধেও মত জানাইয়া তাঁহারা নিজেদের অধিকার চাহিয়াছেন। তাঁহারা চান বিচারালয়ের জুরির অধিকার, সকল রকম কাজের ভিতর প্রবেশ অধিকার।

দক্ষিণ-আফ্রিকা।—দক্ষিণ আফ্রিকায় মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য সেখানকার রাষ্ট্রসভায় একটা আইনের খসড়া উপস্থিত করা

হইয়াছে। খুব সম্ভব তাহা পাশ হইয়া যাইবে। লেডি ফিলিস্ পনসনবি মেয়ে ও শিশুদের লইয়া দুর্নীতিমূলক বিক্রির ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া লিগ্ অব্ নেশনস্ কন্‌ফারেন্স্ সভায় গিয়াছিলেন।

তুরস্ক।—তুরস্কের জাতীয় মহাসভা একজন মহিলাকে শিক্ষাসচিব পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহিলাটির নাম খালিদ আদিব খানুম। ইনি কনষ্টেন্টিনোপলের মহিলাবিদ্যালয়, রবার্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। ১৯০৮ সনের তুরস্কবিপ্লবের সহিত ইঁহার খুব যোগ ছিল।

ইংল্যাণ্ড।—ইংল্যাণ্ডে মেয়েরা অনেক বিষয়েই অধিকার লাভ করিয়াছেন কিন্তু এখনও অনেক বাকী আছে। তাই সম্প্রতি ভাই-কাউন্টেস্ রোণ্ডা সেই-সব অধিকার লাভের জন্য মেয়েদের লইয়া একটি দল বাঁধিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি ছয়টি বিষয় লইয়াই বেশী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহার মধ্যে, বিধবাদের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পেন্‌সনের ব্যবস্থা করা; মাতারও পিতারই মতন সন্তানের অভিভাবক হইবার সমান অধিকার; শিক্ষয়িত্রীদেরও শিক্ষকদের মতন সমান বেতন; মেয়েদেরও পুরুষেরই মতন সরকারী সকল কাজে ঢুকিবার সমান অধিকার ও সুযোগ পাওয়া—এই প্রসঙ্গ-কয়টিও আছে। মেয়েরাও পুরুষদের মত ৩১ বৎসর বয়স হইতেই ভোট দিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য খুব আন্দোলন তুলিয়াছেন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মেয়েদেরও পুরুষের সমান স্বত্ব দিবার জন্য সম্প্রতি একটি আইনের খসড়া পার্লামেন্টের কাছে আনা হইয়াছিল। এই আইন অনুসারে পুরুষও যে যে অবস্থায় যে যে অধিকারে অধিকারী, নারীও সেই সেই অবস্থায় সেই-রকম অধিকারিণী হইবেন। বিলটি লর্ডদের সভায় পাশ হইয়া গিয়াছে। এখন রাজ-অনুমতি পাইলেই ইহা দেশের আইন হইয়া যাইবে।

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখের বিদেশের খবরে প্রকাশ, এক দিনের বাদানুবাদের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্থির হইয়াছে যে, তিন বৎসর পরে মেয়েরা সিভিল সার্ভিসের কাজে প্রবেশ অধিকার পাইবেন। পার্লামেন্ট কিন্তু মেয়েদের পুরুষদের সমান বেতন দিতে সম্মত হন নাই। এইজন্য ইংলণ্ডে নানা জায়গায় মেয়েরা প্রতিবাদ-সভার অনুষ্ঠান করিতেছেন।

বিলাতের হাউস্ অব কমন্সের প্রথম মহিলা সভ্য নির্ব্বাচিত হন্ লেডি এ্যাষ্টর্। মিসেস্ উইন্‌ট্রিংহাম্ নাম্নী আরেকটি মহিলা এবার লিঙ্কনশায়ারের লাউথ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইনি পার্লামেন্ট মহাসভার দ্বিতীয় মহিলা প্রতিনিধি।

অষ্ট্রিয়া।—অষ্ট্রিয়াতে এখন মেয়েরা আইনব্যবসা করিবার ও বিচারক হইবার অধিকার পাইয়াছেন। ভিয়েনা নগরের ম্যারিয়ান্নি বেঠ, ডক্টর অফ ল উপাধি পাইয়াছেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা যিনি এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি আইন ব্যবসা করিবার অনুমতিও পাইয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ড।—সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা নগরে মেয়ে ও শিশুদের লইয়া দুর্নীতিমূলক ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য লিগ্ অব্ নেশনস্‌এর তরফ হইতে জুন মাসে এক সভা বসিয়াছিল। সেখানে ফ্রান্স, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা-প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। ডেন্‌মার্কের কুমারী হেন্নি ফেব্‌কামের সেই কন্‌ফারেন্সের সহকারী সভানেত্রী হইয়াছিলেন।

রুমানিয়া।—রুমানিয়ার রাজসরকার হইতে একটি সংস্কার আইন পাশ হইয়াছে। তাহাতে এক-এক অঞ্চলের মেয়েরা প্রতিনিধি হইয়া ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন। এই আইনকে নাকি আরো সংস্কৃত উন্নত করা হইবে।

আমেরিকা।—আমেরিকার হাউস্ অফ্ রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্ সভার ১৩৩ বৎসর বয়সের মধ্যে সম্প্রতি মিস্ এলিস্ রবার্টসন্ নামে মাত্র একটি মেয়ে সেখানে বক্তারূপে একটি আইন পাশ করেন।

জার্ম্মানি।—আইন ব্যবসায়ে মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দিবার যে প্রস্তাব হয় তাহা রাইকষ্টাগের আইন-সমিতির দ্বারা গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু রাইকষ্টাগের সাধারণ অধিবেশনে মেয়েদের এই অধিকার সমর্থিত হইবে—আশা করা যায়। শিশুদের মঙ্গল বিধানের জন্য একটি আইন পাশ হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনাথ ও গোত্রহীন শিশুদের শিক্ষা, পরিচর্য্যা ও রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। যে-সব শিশুর পিতামাতা সামাজিক হিসাবে ও নৈতিক হিসাবে তাদের ছেলেদের মানুষ করিবার অনুপযুক্ত সে-সব শিশুরাও এই আইনের আশ্রয় পাইবে।

আসিরিয়া।—লেডি সুরমা মার সিম্‌সন্ নামে এক আসিরিয়ার নারী আসিরিয়া দেশের গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। জগতে ইনিই প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হইলেন। ইনি পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিতা হন। প্রাচ্যদেশবাসীদের মধ্যে আসিরিয়াবাসীরা অনেক বিষয়ে খুব অগ্রসর। ইঁহাদের মেয়েরা দেশের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

বিদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক খবর এই ঠিকানায় পাওয়া যায়—Elizabeth Abbot, I. W. S. A. 11, Adam Street, Adelphi, London, W. C. 2, England.

প্যাস।

মুক্তি

মন বলে গো মুক্ত হবে,
মুক্তি কি তা শুন্‌বি তোরা ?—
সবার সনে যুক্ত হ'য়ে
প্রেমের পাকে বেদম্ ঘোরা।

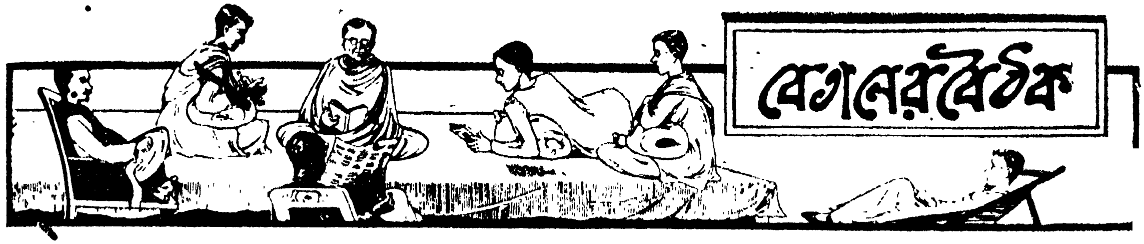
শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

আফ্‌শোষ

(ইংরেজী হইতে)

গোলাপ ফুলেতে কাঁটা আছে বলে'
দুঃখ মানি না তাকে
দুঃখ এই যে গোলাপটা গেলে
কাঁটাগুলো তবু থাকে!

"বনফুল"



জিজ্ঞাসা

(৭১)

রাজশাহী অঞ্চলে করচমাড়িয়া হইতে এক নাতিদীর্ঘ সড়ক দিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে মাইল পাঁচেক গেলে এক মাটীর উচ্চ ভিটা দেখা যায়। সাধারণে উহাকে "দ্বীপ" কহে। ঐ দ্বীপের অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে আর-একটি পূর্ব্বোক্তরূপ "দ্বীপ" আছে। ঐ দ্বীপদুইটি সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস জানা যাইতে পারে কি?

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৭২)

যজ্ঞোপবীত ধারণের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য।

(৭৩)

কোন কোন পুকুরে মাছ খুব শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়, আর কোন কোন পুকুরে অনেক বৎসরেও মাছ অল্প বাড়ে। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রীঅমূল্যচরণ বসু মল্লিক।

(৭৪)

নারিকেল-গাছে পোকা ধরিলে কি উপায়ে তাহা নিবারণ করা যায়? আর কোন্ উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিলে নারিকেল-গাছে আর মোটেই পোকা ধরে না?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার পাল।

(৭৫)

নবদ্বীপ এবং মিথিলা ছাড়া, মুসলমান রাজ্যকালে—বিশেষতঃ মোগল শাসনকালে—আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা, বিহার অথবা উড়িষ্যায় ছিল কি? মুসলমান-শাসন-সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এমন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কি যাহার সঙ্গে তখনকার শাসন-সমাজের সাক্ষাৎ (direct) অথবা গৌণ সম্পর্ক ছিল?

ব, বসু।

(৭৬)

ভেড়ার লোম কাটিয়া আমরা তুলার সহিত মিশাইয়া লেপ তৈরী করিয়াছিলাম। কিন্তু সমানেই কাপড় ফুঁড়িয়া লোম বাহির হইয়া আসিতেছে। কোন রকমে চাপ ধরাইতে পারিলে বোধ হয় তুলার লেপের মত হইতে পারে। চাপ ধরাইবার কৌশল কাহারো জানা আছে কি?

মতিন্ উদ্দীন আহম্মদ্ ও মহি উদ্দীন আহম্মদ।

(৭৭)

পাখী ভিন্ন অন্য কোন জীব মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে কি? বা কখনও কহিয়াছে কি?

শ্রীসারদাপ্রসাদ কর।

(৭৮)

পৌষমাহার সংক্রান্তি দিবসে বহু গৃহস্থ কলা-গাছের ডিঙ্গি প্রস্তুত করিয়া বা সোলার নৌকা (যাহা ঐ দিবস বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়) ক্রয় করিয়া তাহাতে জোড়া শিম, জোড়া কুল, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার সুসজ্জিত করিয়া "সোয়া দোয়া" পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজার তাৎপর্য্য কি? ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ পূজা হইয়া থাকে কি না? বাংলায় কতদিন হইতে এই পূজার প্রচলন হইয়াছে?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক।

(৭৯)

বেঙ্গলা (Bengala) কোথায়? এখন উহার অস্তিত্ব আছে কি না? কোন্ কোন্ গ্রন্থে বেঙ্গলার কথা লিখা আছে? বেঙ্গলা নগরীর অন্য কোন নাম আছে কি না?

শ্রীরোহিণীকুমার দাস।

(৮০)

পুষ্করিণীর দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখা হয় না কেন? এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র আচার্য্য।

(৮১)

আমাদের স্কুলে কাঠের তৈয়ারী তাঁত এবং তাঁতে ব্যবহার্য্য সূতা আলমারিতে রাখা সত্ত্বেও ঘুণে কাটিয়া ফেলিতেছে। এই ঘুণ হইতে তাঁত ও সূতা রক্ষার উপায় কি?

শ্রীসন্তোষকুমার দাসগুপ্ত।

(৮২)

আমাদের দেশে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রিতে অনেক গৃহস্থ ভাত রাঁধিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া রাখে। সংক্রান্তি দিনে তাহা আত্মীয়বন্ধুবান্ধবসহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা অরন্ধন নামে পরিচিত। এই প্রথার তাৎপর্য্য কি? কোন পৌরাণিক ঘটনা আছে কি না? আর কোন্ কোন্ প্রদেশে এরূপ প্রথা আছে? এই অরন্ধন আবার স্থানভেদে অনেক প্রকার,—যথা ইচ্ছা-অরন্ধন, ষষ্ঠী-অরন্ধন, গাবু-রান্না, বুড়ো-রান্না, ইত্যাদি। ঐরূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ কিছু আছে কি?

শ্রীসতীশচন্দ্র কয়াল।

(৮৩)

প্রাচীন ভারতে অবরোধ-প্রথা ছিল কি? যদি স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল তবে তার প্রকার কিরূপ ছিল? আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান দেশে অবরোধপ্রথা আছে কি? যদি না থাকে অথবা অতি সামান্য থাকে তবে মুসলমানদের ভারতবর্ষে অবরোধের এত কড়াকড়ি কেন?

শ্রীআব্দুর রহমান।

(৮৪)

জন্মান্ধ ব্যক্তির স্বপ্ন কিরূপ ? সে কি কোন জাগতিক দ্রব্য স্বপ্নে দেখিতে পায় ? সাধারণতঃ তারা কি দেখে ?

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

(৮৬)

বঙ্গদেশের সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা দ্বারা দেবী মহাশক্তির বোধন করিয়াছিলেন। তদনুসারে অকালে (শরৎকালে) দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। বোধনের মন্ত্রেও প্রকাশ,—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।

অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।"

অর্থাৎ "রাবণবধ ও রামের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য পূর্ব্বকালে অকালে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন হইয়াছিল।" কিন্তু বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণে এ-সকল কথার নামগন্ধ নাই। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি ?

শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার।

মীমাংসা

(৪৩)

কয়েকদিন হয় আমি স্বপ্নে রৌদ্র দেখিয়াছি ; কিন্তু উত্তাপ অনুভব করি নাই।

শ্রীসুনীতিবালা মজুমদারজায়া।

আমি নিদ্রাকালে স্বপ্নে রৌদ্র দেখিয়াছি—ভয়ানক রৌদ্রের মধ্যে নদীর পাড় দিয়া কোথায় চলিয়াছি, আমার শরীর রৌদ্রের তাপে ছটফট করিতেছে ইত্যাদি। (তবে ঐ স্বপ্ন দেখাকালে আমি জ্বরাক্রান্ত ছিলাম।)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র আচার্য্য।

(৪৮)

"সমাসে স্ত্রীলিঙ্গঃ প্রাক্" এই নিয়ম দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে। গ্রন্থকার কি অভিপ্রায়ে কোথায় "শিবদুর্গা" লিখিয়াছেন স্থানটি উদ্ধৃত না করায় তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না। এরূপ স্থানে তৃতীয়াতৎপুরুষও হইতে পারে—শিবেন সহ দুর্গা=শিবদুর্গা। সহার্থে তৃতীয়া হইলে কোন কোন স্থানে সমাস হয়। অথবা শিব-যুক্তা দুর্গা (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়) শিবদুর্গা এইরূপ সমাস হইতে কোন আপত্তি নাই। একবচনান্ত হইলে এরূপই হইবে। কাহারও মতে এরূপ স্থলে দ্বন্দ্ব সমাস হইলে উক্ত প্রকারই সাধু। কলাপের "অল্পস্বরতরং তত্র পূর্ব্বম্" "যচ্চার্চ্চিতং দ্বয়োঃ" এই সূত্রদ্বয়ের বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

বাস্তবিক, প্রায় গ্রন্থকারদের মতেই "দুর্গাশিব" প্রয়োগই সাধু। স্ত্রী, পুরুষ, উভয়ের মধ্যে স্ত্রীই অধিকতর মান্যা এজন্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি পুংলিঙ্গ শব্দের আগে বসে লৌকিক ব্যবহারে।

শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থ।

(৫১)

অধ্যাপক-পরম্পরায় শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় শ্রীহট্টেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসীর ধারণা যে, তিনি নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিকসংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ,—তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাত্যায়ন-গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি। তাঁহার মাতার নাম সীতা দেবী। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালীন রঘুনাথের পিতৃবিয়োগ হইলে, দুঃখিনী মাতা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ৫ বৎসর বয়সের সময় সীতাদেবী তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নান মানসে মুর্শিদাবাদ আসেন। তথায় তিনি খুব পীড়িতা হইয়া পড়েন। সঙ্গীয় যাত্রিগণ এই অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। ক্রমশঃ আরোগ্যলাভের পর আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায়া দেখিয়া জনৈক বণিককে পিতৃসম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে সপুত্র নবদ্বীপে উপনীত হন। তখন বাংলাদেশে নবদ্বীপের খুব নাম। তারপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আশ্রয় লইয়া তদীয় হস্তে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন।

শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থ।

(৫৫)

আমার বাগানে কয়েকটি লেবু-গাছ রহিয়াছে। গতবৎসর যখন প্রথম গাছে ফুল দেয়, সেই সময় একরকম পোকা (পা ঈষৎ লালাভ, দেহ ঘোর হলুদ, দৈর্ঘ্য ½ ইঞ্চি) আসিয়া ফুল কাটিয়া দিত, গাছের নরম পাতা খাইয়া ফেলিত। ঐ পোকার উপদ্রব নিবারণ জন্য আমি (ফসলের পোকা নামক পুস্তক হইতে) "কেরোসিন অয়েল" প্রস্তুত করতঃ পিচ্‌কারী দ্বারা গাছে সকালে ও সন্ধ্যায় ছিটাইতাম, এবং সন্ধ্যাকালে বাগানের একপার্শ্বে আগুন জ্বালাইতাম। এইরূপ করায় তিন দিনের মধ্যে সমস্ত পোকা বিনষ্ট হইয়া গেল।

শ্রীসতীশচন্দ্র কয়াল।

(৫৬)

চক্ষু-কোটরের বাহিরের কোণে এক রকম মাংসগ্রন্থি (Lachrymal gland) আছে, উহা হইতে রস নির্গত হইয়া চক্ষুতারা প্রভৃতিকে সরস রাখে। মানুষের হৃদয়ে যখন কোন আনন্দ বা বেদনার অনুভূতি হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডলের মাংসপেশী সব খুব উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনার ফলে চক্ষুকোটরস্থ এই মাংসগ্রন্থি হইতে প্রভূত পরিমাণে জল নিঃসৃত হয়। তাহাই অশ্রু। চক্ষুর সহিত নাসারন্ধ্রের সংযোগ আছে বলিয়া অশ্রুবিন্দু প্রায়ই নাসিকা দিয়াও নির্গত হয়।

মানুষের মত যে-সকল প্রাণীর এই মাংসগ্রন্থি (Lachrymal gland) আছে তাহারা কাঁদে। গরু, ঘোড়া, মহিষ, কুকুর প্রভৃতিকে কাঁদিতে দেখা গিয়াছে, তবে তাহাদের মানুষের ন্যায় আনন্দ বা বেদনার অনুভূতি প্রখর নহে বলিয়া চোখের জল তত বেশী দেখা যায় না।

শ্রীপরেশনাথ ভুঞ্যা।

(৬১)

দুর্গাপূজার ব্যবস্থা দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকা পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও বামকেশ্বরতন্ত্র প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে আছে। বাংলায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দুর্গোৎসবের বিধিব্যবস্থা সংগ্রহ ও প্রচার করেন (খ্রীষ্টীয় ১৬ শতাব্দী)। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও দুর্গা পূজার বিশেষ উল্লেখ আছে (১৬ শতাব্দী)। অতএব ১৬ শতাব্দীতে বঙ্গে দুর্গাপূজা সুপ্রচলিত হইয়াছিল বলা যায়। কোন্ নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রথম কে পূজা করেন বলা একরকম অসম্ভব।

দুর্গোৎসব বাঙালীর নিজস্ব পূজা। অন্য প্রদেশে দশভুজা-মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত নাই। নেপালীরা নবপত্রিকার পূজা করে, নবপত্রিকার এক নাম বনদুর্গা।

কালিকা ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দশভুজামূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা আছে। দেবীপুরাণে আবার দ্বিভুজা হইতে অষ্টাবিংশভুজা পর্য্যন্ত করিবার ব্যবস্থা পাওয়া যায়। দেবতার মূর্ত্তি মানুষের সাকার কল্পনা ; পূজকের

মনোভাব অনুসারে মূর্ত্তিরও বিভিন্নতা হয়। এইজন্ত পৌরাণিক তান্ত্রিক ও প্রচলিত পদ্ধতিগুলির পরস্পরে অনৈক্য দেখা যায় প্রচুর। শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সহিত অনেক লোকাচারও মিশ্রিত হইয়াছে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ১৩২৭ সালের কায়স্থ পত্রিকার আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্মসংখ্যায় শ্রীযুক্ত গণপতি সুরকার লিখিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসু তাহা দেখিতে পারেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬৩)

সমুপোষ্য দধি প্রাশ্য মাং দৃষ্ট্বা মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

উপবাসী থাকিয়া দধি ভোজন করিয়া দেব-দেবীপ্রতিমা দেখিলে পুণ্য হয় এই শাস্ত্রবিধি। কারণ দধির এক নাম মঙ্গল্য।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের এখানে পরামাণিকেরা আয়নাতে মেয়েদের মুখ দেখায় না। দধিভোজনের ব্যবস্থা আছে। ভগবতী স্বামীর গৃহে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর সম্মুখে জলঘট, আম্রপল্লব, দধি প্রভৃতি রাখিতে হয়। ঐ শুভক্ষণে যদি কেহ দধিভক্ষণ পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া থাকে তবে অন্য সময় কোথাও যাইতে হইলে তাহাকে যাত্রা করিতে হয় না।

শ্রীপ্রথমনাথ বর্দ্ধন।

(৬৪)

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে ব্যবস্থা আছে—

আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য দশম্যাং পূজয়েৎ তথা।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত পূজনঞ্চাপরাজিতাম্॥

বিজয়াদশমীতে অপরাজিতা পূজা করিতে হয়। এ অপরাজিতা সেই শক্তি যিনি কারো কাছে পরাজিত হন না ও যিনি বিজয়দাত্রী। নাম-সাদৃশ্যে অপরাজিতা-ফুলের লতার বলয় অপরাজয়ের চিহ্নরূপে ধারণ প্রচলন হইয়াছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬৫)

একরূপ জনশ্রুতি যে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস রো (Thomas Roe) নামক জনৈক ইংরেজ ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের (James I) দূত হইয়া জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহের রাজসভায় আগমন করেন। তিনিই ভারতে আলু ও তামাক আনয়ন করেন। সেই সময় হইতেই ভারতে তামাক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইস্‌লাম-দর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

"জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্ত্তুগিজ বণিকেরাই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তামাকের আমদানী করেন।"—সুবল মিত্রের 'সরল বাঙ্গলা অভিধানের' ৭৪৫ পৃষ্ঠায় জাহাঙ্গীরের জীবনচরিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বর্দ্ধন।

(৬৮)

সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে গণেশ-পূজা শাস্ত্রবিধি। হস্তিমুখ গণেশের ছবি অঙ্কনের চেষ্টা শেষে /৭ চিহ্নে পরিণত হইয়াছিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬৯)

সি, ভি, বৈদ্য (C. V. Vaidya) মহাশয় History of Mediaeval Hindu India (Vol. I., P. 327-332) গৌড় সম্বন্ধে এই লিখিয়াছেন—

বাঙ্গলাদেশ বুঝাইতে কখন "গৌড়" নামটা প্রথম প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। ইহা যে নূতন নাম তৎসম্বন্ধে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারতে ইহার উল্লেখ নাই, বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বরাহমিহিরও ইহার উল্লেখ করেন নাই। থানেশ্বরের চতুস্পার্শ্বস্থ দেশকে তিনি গৌড় অথবা গুড় নামে অভিহিত করিয়াছেন; একথা আমরা এমনই বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে যখন জ্যাক্‌সন এ কথা জানাইলেন তখন উহা তাঁহারই আবিষ্কার বলিয়া মনে হইল।

আমাদের আজিকালকার ধারণায় গৌড় ও বাংলা অভিন্ন। একটা কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে—দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমদিককার দেশের নাম পূর্ব্বে গৌড় ছিল। ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ আজিও আদি গৌড় বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে এই ব্রাহ্মণগণের অনেকেই হূণদের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া পলাইয়া আসিয়া পশ্চিম বঙ্গে বাস করেন। এইরূপে পশ্চিম বঙ্গের নাম গৌড় হইল। হর্ষচরিতে বাণভট্ট (৬২০ খৃঃ) শশাঙ্ককে গৌড়ের রাজা বলিয়াছেন; হুয়েন-শাঙ (অথবা উয়ান-চোয়াঙ) তাঁহাকে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলিয়াছেন। তাহা হইলে সপ্তম শতকে কর্ণসুবর্ণই হইতেছে গৌড়।

পরবর্ত্তী-গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেনের লেখ (Aphsad inscription) দণ্ডি শিব নামক একজন "গৌড়ে"র রচিত। গৌড় বিদ্যার জন্য বিশ্রুত ছিল। আদিত্যসেন মগধ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজা ছিলেন। প্রাকৃত কাব্য গৌড়বহে আছে যে কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মণ গৌড় আক্রমণ করিয়া গৌড়রাজকে বধ করেন। এই গৌড়রাজ মগধাধিপও ছিলেন। বৈদ্যর মতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম দেবগুপ্ত।

খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে গৌড় বঙ্গ হইতে ভিন্ন ছিল। তখন বঙ্গ বলিতে পূর্ব্ববঙ্গই বুঝাইত। গৌড়বহে লিখিত আছে যে যশোবর্ম্মণ গৌড় বিজয় করিবার পর তবে আরও পূর্ব্বে গিয়া বঙ্গ বিজয় করেন। বৈদ্য বলিতেছেন—"অতএব আমরা দেখিতেছি যে হুয়েন-শাঙএর সময়েও 'বেঙ্গলে' দুইটি বিশিষ্ট রাজ্য ছিল—যথা গৌড় (কর্ণসুবর্ণ) ও বঙ্গ (সমতট)।"

শ্রীকালীপদ মিত্র।

সময়-স্রোতে

(তুলসী দাস)

সময়-নদী চলে—
বসিয়া কিনারায়
তুলসী! ভাব' কিবা?
স্রোত-যে বহে' যায়।

ওঠ হে! উঠে পড়
করোনা ভুলচুক;
থই না পাও জলে,
গাহনে পাবে সুখ।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

ভুল স্বর্গ

১

লোকটি নেহাৎ বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল সখ ছিল নানা রকমের।

ছোট ছোট কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোট ছোট ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত—যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখীর ঝাঁক; কিম্বা এব্ড়ো খেব্ড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চর্‌চে; কিম্বা উঁচু নীচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝর্‌না হবে, কিম্বা পায়ে চলা পথ।

বাড়ীর লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ কর্‌ত পাগ্‌লামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগ্‌লামি তাকে ছাড়্‌ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয় অথচ পরীক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে' তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বল্‌চে, "হাঁফ ছাড়্‌বার সময় কোথা?" মেয়েরা বল্‌চে, "চল্লুম ভাই, কাজ রয়েচে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে"; কেউ বলে না, "সময় অমূল্য।" "আর ত পারা যায় না" বলে' সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুসি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেখানকার সঙ্গীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে' বস্‌তে চায় শুন্‌তে পায় সেখানেই ফসলের ক্ষেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেচে। কেবলি উঠে যেতে হয়, সরে' যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে' যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মত।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েচে। তবু দুচারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে' তার চোখের কালো তারা দেখ্‌বে বলে' উঁকি মার্‌চে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চঞ্চল ঝর্‌নার ধারে তমাল-গাছটির মত স্থির।

জান্‌লা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেম্‌নি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই!"

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বল্‌লে, "কাজ কর্‌ব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বল্‌লে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কি কাজ দেব?"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে' জল তুলে নিয়ে যাও তারি একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কি হবে? জল তুল্‌বে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র কর্‌ব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "আমার সময় নেই, আমি চল্লুম।"

কিন্তু বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পার্‌বে কেন? রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয়, আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।"

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁক্‌তে লাগ্‌ল, কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এর মানে ?"

বেকার লোকটি বল্‌লে, "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে' সেটিকে সে নানা আলোতে নানারকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লে। রাত্রে, থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপ করে' বসে' সেই চিত্রটা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেচে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল, তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েচে। পা দুটি যেন চল্‌তে চল্‌তে আন্‌-মনা হয়ে ভাব্‌চে- যা ভাব্‌চে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ একপাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বল্‌লে, "কি চাও ?"

সে বল্‌লে, "তোমার হাত থেকে আরো কাজ চাই।"

"কি কাজ দেব ?"

"যদি রাজি হও, রঙীন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধ্‌বার দড়ি তৈরি করে' দেব।"

"কি হবে ?"

"কিছুই হবে না।"

নানারঙের নানাকাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধ্‌তে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে' থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড় বড় ফাঁক পড়্‌তে লাগ্‌ল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে' উঠ্‌ল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড় চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বল্‌লে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটেনি।"

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার কর্‌লে। সে বল্‌লে, "আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেচি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙীন পাগ্‌ড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝ্‌লে, বিষম ভুল হয়েচে।

সভাপতি তাকে বল্‌লে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে, "তবে চল্‌লুম।"

মেয়েটি এসে বল্‌লে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখ্‌লে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারীর কেশ

[Guy de Maupassantর *La Chevelure* হইতে]

জেলখানার একটা ঘরের চারটে দেয়াল বেশ চুনকাম করা। খুব উঁচুতে লোহার জাল্‌তি-দেওয়া একটা ছোট্ট গবাক্ষ,—সেখান থেকে পাপের আধার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের ভিতর দেবতার আশীর্ব্বাদের মত আলোকের একটা রেখা এসে পড়ে। পাগল একটা ছোট চেয়ারে বসে' অর্থহীন শূন্যনয়নে একবার আমাদের দিকে কুণ্ঠার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লে। খুব রোগা ও শার্ণগণ্ড সে, চুল এমনি সাদা যে দেখ্‌লেই মনে হয় লোকটা কয়েকমাসের মধ্যেই এমনি দুরবস্থায় এসে পড়েছে। দেহে একটুও মাংস নেই, তাই তার পোষাকটাও বড় ঝল্‌ঝলে। একটা প্রবল দুশ্চিন্তা এসে যে তাকে গ্রাস করে' ফেলেছে, তা দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়। অদৃষ্ট অলক্ষ্য একটা যাতনাময় চিন্তা যেন ক্রমে ক্রমে এই ক্ষুদ্র মানুষটির দেহের রক্তমাংস ও সমগ্র জীবন হরণ করে' নিয়েছে।

চিন্তায় মানুষকে এমনি করে' মেরে ফেল্‌তে পারে! এই পাগলটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই বেদনা, ভয় ও করুণা জেগে উঠে। অকাল-বার্দ্ধক্য-কুঞ্চিত তার সেই ললাটের অন্তরালে কি অদ্ভুত ভীষণ রহস্যময় স্বপ্ন লুকানো আছে, তা কে জানে!

ডাক্তার বল্‌লেন, 'মাঝে মাঝে তার খুব পাগ্‌লামি চাপে। আমি এমন অদ্ভুত রোগী এখনও দেখিনি। লোকটা মরণকে যেন প্রাণ ভরে' ভালবাসে ; আর তার কারণ প্রেম। সে নিজে একটা ডায়েরী লিখে রেখেছে—তুমি ইচ্ছা করলে এটা পড়্‌তে পারে।'

ডাক্তারের আফিস-কাম্‌রায় ঢুক্‌তে তিনি এই হতভাগ্য রোগীর ডায়েরীখানা আমার হাতে দিলেন। তিনি বল্লেন, 'এটা পড়ে' তোমার মত আমায় জানিও।' আমি ডায়েরীখানা পড়্‌তে লাগ্‌লুম—

* * *

৩২ বছর বয়েস পর্য্যন্ত আমার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কেটেছিল। তখনও কাউকে ভালবাসিনি। জীবন একটা সরল, সুন্দর, অবিরত-প্রবাহী নদীর মত মনে হয়েছিল। অবস্থা বেশ ভালই ছিল। যখন যে ইচ্ছা হয়েছে, তা-ই কষ্ঠ ভরে' মিটিয়ে নিয়েছি। এ-জীবন কি মনোহর! রোজ সকালে উঠে যা মনে আস্‌ত, সেই কাজেই লেগে যেতুম; রজনীতে শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম, আগামী কল্যের ভাবনা মোটেই ভাব্‌তুম না। ভালবাসা যেমনি সুন্দর, তেমনি ভীষণ। আমি যখন ভালবেসেছিলুম, তখন মোটেই সাধারণ লোকের মত বাসিনি।

অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলে' নূতন কিছু দেখ্‌লেই কিনে ফেল্‌তুম। খুব পুরোনো সে-কেলে আস্‌বাব পত্র অনেক কিনেছিলুম। আর আদিম কালে যে অজ্ঞাত হাতগুলি সেই জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করত, যে চোখগুলি এদের দেখে মুগ্ধ হত, যে হৃদয় এদের ভালবাস্‌ত—আমি তাদের কথা ভাব্‌তুম। ঘরের আস্‌বাবপত্রগুলিকেও যে মানুষ কখনো কখনো ভালবেসে ফেলে! সেকালের একটা ছোট্ট ঘড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে আমি কতদিন অনায়াসে কাটিয়ে দিয়েছি। এনামেল্‌ ও সোনার কাজ-করা এই ঘড়িটি খুব চমৎকার দেখ্‌তে। একজন নারী এ-ঘড়িটাকে যখন প্রথম কেনে, তখনও যেমন এ টিক্‌ টিক্‌ কর্‌তো, এখনও ঠিক সেই রকম করেই শব্দ করে। তার জীবন-স্পন্দন এখনও থামেনি, তার কলের জীবন এখনও অটুট আছে, শত বৎসর ধরে এখনও সে ঠিক সময় দিয়ে আসছে। রেশমী-পোষাক-পরা কোন্‌ সুন্দরীর বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে নিজের সুর মিলিয়ে বাজ্‌ত সে? হাতের কোমল স্পর্শে তার চকচকে ঢাকনিখানা কলঙ্কিত হয়ে গেলে কে সযত্নে সেখানটা মুছে ফেল্‌ত? কে সেই ঘড়িখানার দিকে দীর্ঘ রজনী চেয়ে চেয়ে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জেগে থাক্‌ত? যে-নারীর চোখদুটি অপলক হয়ে চেয়ে বসে' থাক্‌ত, তাকে আমার জান্‌তে ইচ্ছা করে!— কিন্তু সে ত কবে মরে' গেছে! যারা ভালবেসে মরে' গেছে, তাদের আমার ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে। সেই সৌন্দর্য্য, সেই হাসি, সেই আশা, সেই আদর—সেসব কি চিরন্তন নয়? পুরাকালের সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠাদের জন্য কত দীর্ঘরজনী আমি কেঁদে কাটিয়েছি! তাদের বাহুদুটি শুধু একটি চুম্বন নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাক্‌ত। চুম্বন যে অমর—অধর হতে অধরে, যুগ হতে যুগে, শতাব্দী হতে শতাব্দীতে চুম্বনের এক অবিরাম ধারা চলে' আসচে। যারা সুন্দর, তারাই কেবল এই চুম্বন পায় ও প্রতিদান দেয়, তারপর মরণের নিবিড় স্পর্শে সব মিশিয়ে যায়।

অতীত আমায় এই রকম করেই টান্‌ত, বর্ত্তমান আমায় ভয় দেখাত, কারণ ভবিষ্যতে যে মরণ! অতীতের জন্য অত্যন্ত অনুশোচনা হত আমার। যারা একবার এ-পৃথিবীতে এসেছে তাদের জন্যও আমার দুঃখ হত। সময়টাকে, মুহূর্ত্তগুলিকে একেবারে থামিয়ে দিতে ইচ্ছা হত আমার। কিন্তু সময় যে উড়ে চলে যায়—আগামী কল্যের শূন্যতা আন্‌বার জন্য এ যে তিল তিল করে' আমার সর্ব্বস্ব হরণ করে' নিয়ে যায়! আর ত আমি বাঁচ্‌ব না।। হে আদিমকালের সুন্দরী-গণ!—বিদায়! আমি তোমাদের ভালবাসি, কিন্তু আমায় জীবনে করুণা কেউ কর্‌বে না। কিন্তু সমস্ত জীবন ধরে' যাকে খুঁজেছি, তাকে একবার পেয়েছিলুম; আর তার মধ্যে জীবনের সমস্ত অনাস্বাদিত সুখ উপভোগ করেছিলুম।......

একটি সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে বেশ হৃষ্টমনে একদিন সহরের পথে পথে ঘুর্‌ছিলুম, একটি অস্পষ্ট অজ্ঞাত আনন্দে বিখ্যাত দোকানগুলির বিচিত্র জালায়নসমূহের উপর আমার দৃষ্টি পড়্‌ছিল। হঠাৎ একটা পুরানো আস্‌বাবপত্র বিক্রয়ের দোকানের দিকে নজর পড়্‌ল। সতেরো শতাব্দীর বহুপুরাতন একটা ইটালিয়ান্‌ ক্যাবিনেট দেখ্‌তে পেলুম। খুব দুর্লভ, খুব সুন্দর সেটি। প্রবাদ এই যে, সে-যুগের বিখ্যাত ভিনিশিয়ান্‌ চারুশিল্পী ভিতেলি সেটি তৈরি করেছিলেন। আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগিয়ে চল্‌লুম।

কিন্তু সেটি দেখ্‌বার পর থেকেই তার স্মৃতিটা এমনি করে' আমায় আঁকড়ে ধর্‌লে যে পরমুহূর্ত্তেই আবার সেই পথে ফিরে এলুম। আবার সেই দোকানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালুম সেই দুর্লভ ক্যাবিনেটটা আবার আমায় প্রলুব্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল। কি আশ্চর্য্য এই বিষম প্রলোভন! তুমি একটা জিনিষের দিকে চেয়ে থাক, সেটা ক্রমে ক্রমে তোমার মন হরণ করে' নেবে, তোমায় বিরক্ত কর্‌বে, তোমায় গ্রাস করে' ফেল্‌বে—ঠিক একটি সুন্দরীর কমলাননের মত! তার সৌন্দর্য্য খুব নিবিড়ভাবে তোমায় আক্রমণ কর্‌বে, তার আকার বর্ণ অবয়ব—সব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠ্‌বে, অনেক আগে থেকেই তুমি সেটাকে ভালবেসে ফেল্‌বে, সেটার গভীর আকর্ষণ তোমার মনে জেগে উঠ্‌বে, আর পরমুহূর্ত্তেই তুমি একেবারে সেটা চেয়ে বস্‌বে! পাবার আকর্ষণটা প্রথমে তোমার মনের উপর খুব ভয়ে ভয়ে একটা কোমল রেখা কেটে যায়, তারপর বেড়ে বেড়ে সেটা নিদারুণ প্রচণ্ড, জ্বালাময় হয়ে পড়ে। দোকানওয়ালারা সেই ক্রম-বর্দ্ধনশীল গোপনবাসনাটা তোমার মুখচোখের অবস্থা দেখে ঠিক ধরে' ফেলে!

আমি সেই ক্যাবিনেট্‌টা কিনে ফেল্‌লুম। তখনি সেটা বাড়ীতে আনালুম। আমার শয়নকক্ষে তার স্থান হলো। চোখ দিয়ে, হাত দিয়ে তুমি সেটাকে আদর করে' দেখো,—তোমায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তার কাছে ফিরে আস্‌তে হবে, তার কথা সর্ব্বদাই তোমায় ভাব্‌তে হবে, যেখানেই যাও আর যে কাজেই থাকো! প্রিয়তমের স্মৃতির মত সে তোমায় পথে পথে জগতের সর্ব্বত্রই অনুসরণ কর্‌বে, আর বাড়ী এসে পোষাক বদ্‌লাবার পূর্ব্বেই প্রেমিকের প্রথম অনুরাগের মত তোমায় তার কথা ভাব্‌তেই হবে। আটদিন ধরে' সত্যি সত্যিই সেই ক্যাবিনেটটিকে আমি পূজা করেছিলুম। কেবলই তার দরজা ও ড্রয়ার-গুলি খুলে সমস্ত আবেগ দিয়ে তার উপর হাত বুলিয়ে পাওয়ার সমস্ত গোপন আনন্দই উপভোগ কর্‌ছিলুম।

একদিন সন্ধ্যার সময় আল্‌মারির একটা স্থানের ঘনত্ব অনুভব করে' বোঝা গেল যে তার পাশে একটা গুপ্ত ডালা আছে। আমার বুকের ভিতর প্রচণ্ড স্পন্দন হতে লাগ্‌ল, আর সমস্ত রাতটাই সেই গোপন অনুসন্ধানে কেটে গেল। পরদিন একটা ছুরির ফলা দিয়ে সেই কাটটাকে ফাটিয়ে ফেল্‌লুম। অমনি একটা ডালা খুলে গেল, আর সেখানে দেখি কালো মখ্‌মলের একটা ছোট্ট গদির উপর আশ্চর্য্য একগোছা নারীর চুল রয়েছে! হাঁ, এত নারীরই কেশ—সুদীর্ঘ, সুন্দর একগোছা চুল, মাথার খুব কাছ থেকেই কাটা, আর একটা সুবর্ণ-সূত্রে বাঁধা! কম্পমান, মুহ্যমান ও আর্ত্তদেহে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। মোহময়, অননুভবনীয় একটা গন্ধ—এত পুরানো যে তা গন্ধের মর্ম্মকোষমাত্র—সেই বিস্ময়কর স্মৃতিমাখা ক্যাবিনেটের রহস্যময় ড্রয়ার থেকে ক্ষীণভাবে বেরুতে লাগ্‌ল!

কোমলভাবে ও প্রায় ভক্তিভরেই আমি সেটাকে তার গুপ্তস্থান থেকে বার করে' নিলুম। তখুনি সেটা খুলে গেল। কক্ষতলে সেই সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছের সুবর্ণপ্রতিম তরঙ্গ বয়ে গেল—গম্ভীর অথচ হাল্‌কা, নমনীয় অথচ চিক্কণ—যেন ধূমকেতুর প্রলম্ব পুচ্ছ।

একটা অদ্ভুত ভাব আমায় এসে আক্রমণ কর্‌লে। এ কি এ?

করবে, কেমন করে' কি সূত্রে এই চুলের গোছাটি আলমারির ভিতর এল? এই স্মৃতিচিহ্নের পিছনে কোন গুপ্ত, রহস্যময়, নাটকীয় ব্যাপার লুকানো আছে কি? কে এটা কাটলে? তার প্রিয়তম কি বিদায়ের দিনে এটা কেটেছিল? না, স্বামী কেটেছিল প্রতিশোধ নেবার দিনে? হতাশে সে নিজেই বুঝি একদিন এই চুলের গোছা কেটে ফেলেছিল। অথবা গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করে' সন্ন্যাসিনী-ব্রত নেবার দিন সে জগৎকে এই স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে গেছে। হয়ত সে যখন মরে যায়, তখন তার প্রিয়তম এই কেশগুচ্ছ তার ভঙ্গুর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল—শোকের অবসাদে একে ভালবাসবার, আদর করবার, চুম্বন করবার জন্য। যে দেহ নিয়ে সেই সুন্দরী জন্মেছিল, আজ তার কিছুই নেই। অথচ তার চুলের গোছাটি ঠিক সেই পূর্ব্বের অবস্থাতেই আছে,—এ বড় আশ্চর্য্য নয়?

চুলের গোছা আমার আঙুলগুলির ভিতর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল দেহের সমস্ত অস্থিমাংস সে তার অভাবনীয় আদরে উৎপীড়িত করে' ফেললে,—যে মরে গেছে তার আবার আদর! মনটা আমার এমনি কোমল হয়ে পড়ল, মনে হল যেন তখুনি ঘুম আসবে। দীর্ঘক্ষণ—অনেকক্ষণ তাকে হাতে করে' রইলুম; তখন মনে হয় হৃদয়েরও খানিকটা যেন তার ভিতর লুকানো রয়েছে। আবার তাকে ভেলভেটের ছোট গদির উপর রেখে দিলুম, তারপর স্বপ্নাহতের মত পথে পথে বেড়াতে লাগলুম।……

বিষাদ ও বেদনা ভরা হৃদয়ে সোজা চলে যাচ্ছিলুম—ভালবাসার প্রথম চুম্বনের মত সেই বেদনা। আমার মনে হল, অনেক আগেই যেন আমি জন্মেছি ও এই নারীকে ভালবেসেছি। দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত কবির এই কয় লাইন আপনা হতেই আমার ওষ্ঠাগ্রে এল:—

দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।

বাড়ীতে ফিরে এসেই আবার সেটাকে দেখবার জন্য কি নিবিড় আকর্ষণ! সেই কেশগুচ্ছটিই বার করে' হাত দিয়ে স্পর্শ করবামাত্রই আমার প্রত্যেক অঙ্গে একটা দীর্ঘ শীৎকার-প্রবাহ বয়ে গেল। কয়দিন বেশ ভালই রইলুম, কিন্তু কেশগুচ্ছের সেই জীবন্ত স্মৃতি কিছুতেই গেল না। বাড়ীতে এলেই সেটা দেখতে হবে, স্পর্শ করতে হবে। প্রিয়তমার শয়ন কক্ষের দ্বার খুলবার সময় বুকে যে আনন্দময় কম্পন দ্রুতছন্দে বাজতে থাকে, সেইরূপ কম্পন নিয়েই আমি এই ক্যাবিনেটের দ্বার খুলতুম, কারণ আমার হাতে ও বুকে একটা বিকৃত, অভূতপূর্ব্ব, চিরন্তন প্রেমবাসনা জেগে উঠলো—মৃতা রমণীর রমণীয় কেশতরঙ্গে আঙুলগুলি সঞ্চালন করবার জন্য!

আদর করা হয়ে গেলে ক্যাবিনেটটা যখন চাবি বন্ধ করতুম, তখনো মনে হতো সে সেখানেই আছে—জীবন্ত গুপ্ত বন্দিনী; সেইখানেই তাকে অনুভব করতুম, আর কেবলই তাকে চাইতুম। আবার সেটাকে নতুন করে' তুলে নেবার, স্পর্শ করে' তার শীতল চিক্কণ অঙ্গ অনুভব করবার,—তার জ্বালাময়, মোহময়, সুমোহন আলিঙ্গনে ধরা দেবার একটা উন্মদ বাসনা মনের ভিতর দারুণ বেদনা জাগিয়ে তুলতো।

একমাস—দুমাস এই ভাবেই কেটে গেল। তারপর আর কিছু জানি না। চুলের গুচ্ছ যেন আমায় পেয়ে বসল, দিনরাত আমায় হানা দিতে লাগল। সুখ ও নির্য্যাতন এক সঙ্গেই অনুভব করলুম,—প্রিয়তমকে প্রথম আলিঙ্গন করবার পূর্ব্বে প্রেমিক যেমন তার গভীর প্রেম ভাষায় প্রকাশ করতে চায়, ঠিক সেইরকম প্রেমের একটা পূর্ব্বাভাস পেলুম। আমার অঙ্গে কেশগুচ্ছের স্পর্শলাভ করবার জন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করে' বসে থাকতুম—তাকে চুম্বন করবার জন্যে। মুখের চারিদিকে সেই চুলের গোছা বেঁধে রাখতুম—সেই গভীর সুবর্ণোপমতরঙ্গে আমার চোখদুটিকে ভাসিয়ে দিয়ে তার উজ্জ্বল আলোকে আমার মনকে পরিপ্লাত করে' নিতুম।

সত্যি, আমি একে এতই ভাল বেসে ফেলেছিলুম। একঘণ্টাও তাকে ছেড়ে থাকতে পারতুম না। তার জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকতুম, শুধু প্রতীক্ষায় কেন? আমি জানিনা...শুধু তারই জন্য!

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে মনে হল, ঘরে আমি একলা নেই। কিন্তু বাস্তবিকই আমি একলা ছিলুম। আর আমার চোখে ঘুম এল না। নিশীথ-মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কায় আমি আবার সেই কেশগুচ্ছের কাছে গেলুম। পূর্ব্বের চেয়ে আরও সুন্দর, আরও কোমল বলে' তাকে মনে হল। যে মরে গেছে, সে কি আবার ফিরে আসে? যে চুম্বনরাশি দিয়ে সেই অপূর্ব্ব কেশগুচ্ছ উত্তপ্ত করে' ফেলেছিলুম, তা যেন একটা সুখের আবেশে আমায় মুমূর্ষু করে' দিলে। আমি তাকে আমার শয্যায় নিয়ে এলুম, আমার অধরোষ্ঠে আমার প্রিয়তমার মত আবেগে তাকে চেপে ধরলুম। সত্যিই যারা মরে গেছে, তারা আবার কেমন করে' ফিরে আসে! সে কিন্তু আমার কাছে এল। তাকে আমি দেখতে পেলুম—সে ঠিক সেই আদিমকালের মতই আমায় ধরা দিলে; উচ্চায়ত, সুন্দরী, নিবিড়কুন্তলা, স্নিগ্ধবক্ষা, বীণার তারের মত তরঙ্গায়িত তনুলতা; প্রেমসন্তাপস্বরে তার কণ্ঠ থেকে চরণদেশ পর্য্যন্ত গভীর আদরে তাকে স্পর্শ করলুম।

দিনরাত আমি তাকে আমার কাছে পেয়েছিলুম। সে যে প্রতি রজনীতেই আমার কাছে ফিরে এসেছিল—সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, পূর্ব্বমৃতা, চিরবরণীয়া, রহস্যময়ী, অজ্ঞাতসুন্দরী! আমার সে বিপুল পুলক আমি লুকাতে পারিনি। একটা অমানুষিক আনন্দ, উপভোগজনিত একটা গভীর অবর্ণনীয় আনন্দ, সুচিরমৃতাকে স্পর্শ করবার একটা অদৃশ্য আনন্দ আমি তার কাছে পেয়েছিলুম। এমন উচ্ছ্বাসময় রুদ্র আনন্দ কোনো প্রেমিকই কখনো লাভ করে নি।

কিন্তু সুখ কেমন করে' লুকিয়ে উপভোগ করতে হয়, তা যে জানতুম না। যেখানেই যেতুম, সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম, আমার পরিণীতার মত তাকে সহরে নিয়ে বেড়াতুম, আমার প্রণয়িনীর মত থিয়েটারে তাকে লোকচক্ষুর সমক্ষেই দেখিয়ে বেড়াতুম। লোকে তাকে দেখলে   সন্দেহ করলে…… ……আমার ভুজবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নিলে   তার শত্রু মনে করে' তারা আমায় কারাগারে বন্ধ করলে। সত্যিই তারা আমার প্রিয়তমাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে   হায়, দুর্ভাগা!

* * *

এইখানে পাণ্ডুলিপি শেষ হয়েছে। হঠাৎ ডাক্তার-বাবুর দিকে যেই ফিরে চেয়েছি, অমনি অসহায়ের একটা বুক-কাটা চীৎকার-ধ্বনিতে সেই পাগলা গারদ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। আমি শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম—'আচ্ছা সত্যি সত্যিই কি এই চুল ছিল?'

ডাক্তারবাবু তখন ওষুধের শিশি ও যন্ত্র পরিপূর্ণ একটা বাক্স খুললেন, আর প্রকাণ্ড এক গোছা চুলের রাশ আমার দিকে ফেলে দিলেন। সেটা যেন একটা সোনার পাখীর মত আমার কাছে উড়ে এল। তার সুকোমল সাদর স্পর্শে আমিও কেঁপে উঠলুম। ডাক্তারবাবু একটু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মানুষের মন সবই করতে পারে!'

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

মিথ্যাবাদী ধরার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—

উইলিয়াম এম মার্সটন নামে আমেরিকার এক আইনজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক সম্প্রতি মিথ্যাবাদী ধরার এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র আবিষ্কার করিবার আগে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগে যে, সত্য কথা গোপন করিয়া মিথ্যাবাদী যখন অন্যরূপ কথা বলে তখন তার নাড়ী ও ধমনী আন্দোলিত হইতে থাকে ও নিশ্বাস অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। এই সময়ে ষ্টেথিস্কোপ দিয়া মিথ্যাবাদী লোকটির বুক পরীক্ষা করিলে আর পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নব আবিষ্কৃত যন্ত্রটি তার বাঁ হাতে লাগাইয়া দিয়া রক্ত চলাচলের বেগ নির্দ্ধারণ করিলে জানা যাইবে সে কোন কথা কষ্টের সহিত গোপন করিতেছে কিনা। প্রশ্নকর্ত্তা ও মিথ্যাবাদী উভয়কেই একটি ছোট যন্ত্রের মধ্যে কথা কহিতে হয়। ইহাতে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তী সময় কত তাহার ছাপ পড়ে। এবং সেই সময়ের ব্যবধান দেখিয়া ধরা যায় বক্তার উক্তি সত্য না মিথ্যা।

আধ-ডোবা ডুবো জাহাজ—

যুদ্ধের অনুগ্রহে অনেকরকম জাহাজ আমরা দেখিলাম—উড়ো, ডুবো, টর্‌পেডো ইত্যাদি। এখন সেইসব জাহাজকে একটু আধটু অদল-বদল করিয়া ইউরোপের লোকেরা ভ্রমণের নানারকম বাহন



আধ-ডোবা ডুবো জাহাজ।

করিয়া লইতেছে। যুদ্ধ যখন নাই, তখন বেড়াইবার কাজে জাহাজগুলাকে ব্যবহার করিয়া তারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছে। ভাসাও নয় ডুবোও নয়—টর্‌পেডোর আকারের এইরকম এক জাহাজ এখন সমুদ্রে সাঁতার দিয়া বেড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই জাহাজের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে চাপিয়া চালক ইহাকে যতটুকু ইচ্ছা জলের তলায় ডুবাইয়া রাখিয়া নিজের বুক বা মাথা জলের উপর জাগাইয়া রাখিয়া বিনা কষ্টে অনায়াসে চলিতে পারেন। ইহার আকার টর্‌পেডোর মত, দুটা মুখ সরু, ইস্পাতের তৈরি, পরিধিতে ১৮ ইঞ্চি এবং লম্বায় দশ ফুট। ইহার প্রায় পিছন দিকে বসিবার জায়গা, কলকব্জা ও চালাইবার চক্র ঠিক মোটর গাড়ীর মত। চাকার নীচে একটি সন্ধানী আলোও আছে। আধা ডুবিয়া আধা ভাসিয়া বা মাথা জাগাইয়া লোককে এই জাহাজে চলিতে দেখিলে মাথা-ভাসানো কাৎলা মাছের কথা মনে পড়ে।

আকাশ-বাসর—

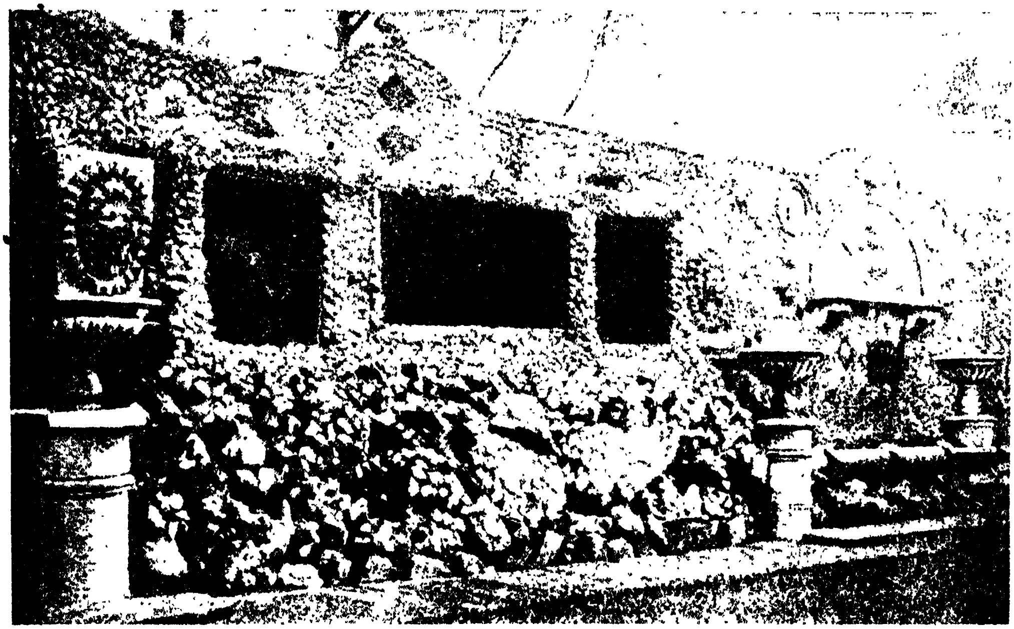
উড়ো জাহাজকে কেবল যুদ্ধের জন্য বা ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করিলেই কি তার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইল? তাকে অন্য আনন্দের কাজে ব্যবহার করিতে ক্ষতি কি? তাই সম্প্রতি আমেরিকার এক যুবক ও এক যুবতী বিবাহের কাজ মাটিতে বসিয়া না সারিয়া আকাশে উঠিয়া নূতনভাবে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁদের খেয়াল হয় আকাশে বসিয়া আকাশ-বাসর করিতে। বিবাহ ত হইবে, কিন্তু সঙ্গে ত পুরোহিত চাই। পুরোহিত মহাশয় বৃদ্ধ, তিনি আকাশে উঠিতে রাজী হইলেন না। অতএব তাঁকে তারহীন টেলিফোনের সাহায্য লইয়া বিবাহের মন্ত্র আওড়াইতে হইল। আর দম্পতী আকাশে বসিয়া মন্ত্র শুনিয়া পরস্পর শুভদৃষ্টি করিলেন! এবার কোন্ দিন না সাব্‌মেরিনে বসিয়া বিবাহের খবর আসে!

প্রকৃতির খেয়াল—

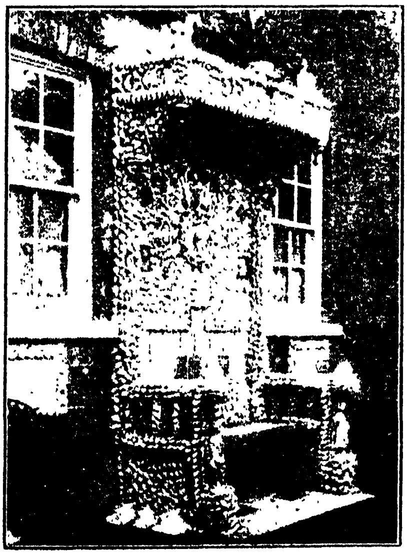
প্রকৃতি আপনার খেয়ালে কতরকম বিচিত্র জিনিষ তৈরী করিয়া চলিয়াছে, আমরা তার কত রকম অর্থ দি! অবশ্য যে-খেয়ালটির কথা আমরা আজ বলিতেছি সেটিতে শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষেরও হাত আছে। বারোবছর আগে আমেরিকায় এক নদীর ধারে একটি ছোট পাহাড়ের গায়ে এক ভদ্রলোক শাদা রং দিয়া "cigars" এই কথাটি লিখিয়া রাখিয়া যান। সম্প্রতি সেখানে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলের ধাক্কা লাগিয়া লাগিয়া পাহাড়ের গা অনেকটা ক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু "cigars" এই কথাটি ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেক অক্ষরের গায়ের ফাঁক হইতে পাথর ধুইয়া ধুইয়া নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু রঙের প্রলেপ থাকাতে অক্ষরগুলি অক্ষয় হইয়া উঁচু উঁচু আকারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কড়ি ও শামুকের ঘর—

কড়ির আল্‌না, কড়ির সিঁদুর-চুপ্‌ড়ী, কড়ি ও শামুকের আল্‌মারি আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে কিংস্‌টনের এক প্রকৃতিপ্রিয় ভদ্রলোক একরকম ছোট শামুকের খোলা দিয়া বড়

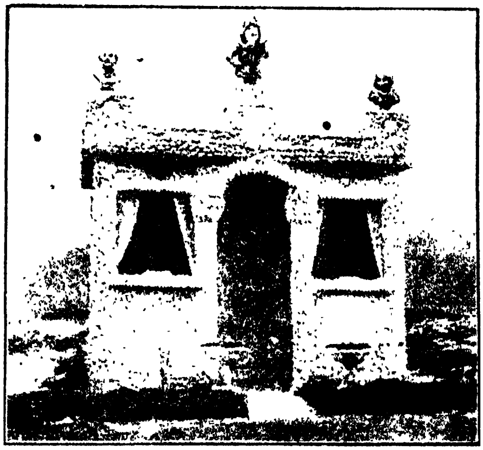


শামুক ঝিনুকের বাড়ী।



ঝিনুকের বাড়ীর এক অংশ।

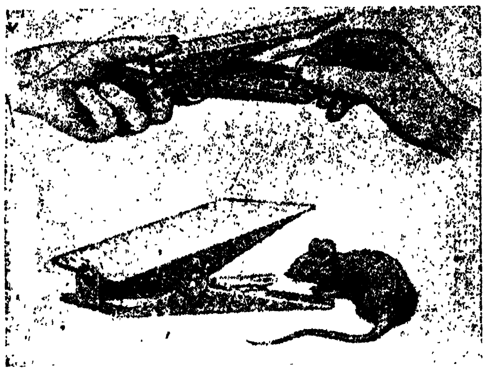
গ্রীষ্মাবাস, বাগানে বসিবার জায়গা প্রভৃতি নানারকম সুন্দর জিনিস তৈরী করিয়াছেন। তাঁর কবিমনের সৃষ্টিতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। বহুদিন হইতে তিনি এক প্রকার শামুকের খোলা সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। সম্প্রতি এইসব দিয়া তিনি যে-সব জিনিস তৈরী করিয়াছেন তাদের ছবি আমরা এখানে দিলাম। সৌন্দর্য্যপরিচায়ক এরূপ কাজ সকল দেশের লোকেরই করা উচিত।



ঝিনুকের বাড়ীর সিংহদ্বার।

নতুন ইত্‍র-কল—

আমাদের দেশে যে-সব ইঁদুর-কল চলিত আছে তাদের চেয়ে মজার ও কাজের একটি কলের ছবি ও পরিচয় আমরা এখানে দিলাম। কলটি তৈরী করা বিশেষ শক্ত নয়। এর তলায় একটি পাত্র, উপরে একটি ঢাক্‌না। ঢাক্‌নাটি খুলিয়া পিছন দিকের একটি আংটায় লাগাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই কলটি হাঁ করিয়া থাকে। তার মাঝখানে একটি জিভ্‌ আছে, তার তলায় একটি কৌটায় খাবার রাখিতে হয়। ইঁদুর আসিয়া জিভটির তলায় খাবার দেখিয়া জিভটি যেমন নাড়ানাড়ি করিতে থাকে অমনি ডালাটি স্প্রিংএর টানে ইঁদুরের

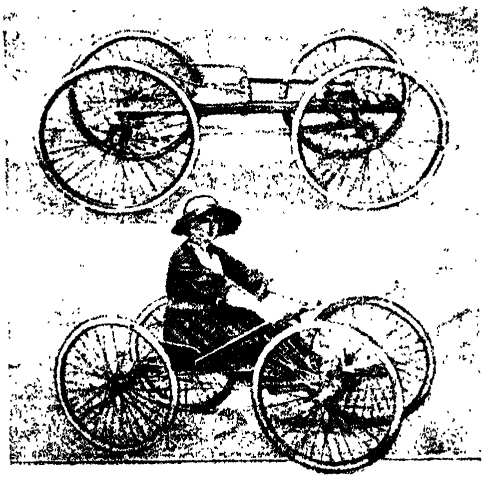


ইঁদুর-ধরা কল।

ঘাড়ে পড়িয়া যায়। কলটি সহজ, আমাদের দেশে তৈরী হইলে মন্দ হয় না।

চার চাকার সাইকেল—

ফ্রান্সের প্যারিসে সম্প্রতি এক রকম চার চাকার সাইকেল তৈরী হইয়াছে। তার ছবি আমরা এখানে দিলাম। এ সাইকেলে চাপিতে বা ইহা চালাইতে কোন কষ্ট হয় না; নৌকার দাঁড় টানার মতন করিয়া দুহাতে হাতল টানিলে এই গাড়ী চলে।



চার চাকার সাইকেল।

শর্টহ্যাণ্ডে সংবাদপত্র—

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ফ্রেজার রিভার ডিস্ট্রিক্ট নামে এক জায়গা হইতে 'ক্যাম্‌লুপ্‌স্ ওয়াওয়া' নামে একটি সংবাদপত্র বাহির হয়, সেটি শর্টহ্যাণ্ডে লেখা। সংবাদপত্রটি সাপ্তাহিক, ষোলটি পাতা থাকে। এটি শর্টহ্যাণ্ডে বাহির করিবার খেয়াল হয় একজন ফরাসী পুরোহিতের। সেখানকার অধিবাসীদিগকে ভাষা শিক্ষা দিতে দিতে তারা তাদের কথা বলিবার সময় যে-সব বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করে সেগুলি টুকিয়া রাখিতে পুরোহিতটি ভাষার অভাব বোধ করেন। তখন তিনি শর্টহ্যাণ্ড চিহ্নের শরণ লন এবং তাতে তাঁর কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়। সেখানকার লোকদেরও তিনি শর্টহ্যাণ্ড-কৌশলে দক্ষ করিয়া তোলেন। প্রথমে দুই-একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ শর্টহ্যাণ্ডে অনুবাদ করায় সেখানকার অধিবাসীদের কাছে সেগুলি খুব আদৃত হয়। তখন পুরোহিতটি শর্টহ্যাণ্ডেই একটি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি সপ্তাহে কাগজখানি দুই হাজার বিক্রি হয়।

ভাষাশূন্য জাতি—

সুইজার্‌ল্যাণ্ড ইউরোপের একটি স্বাধীন দেশ। সুইজার্‌ল্যাণ্ডের কিন্তু নিজস্ব ভাষা নাই। সেখানকার রাজকীয় ভাষা—ফরাসী, ইতালীয় এবং জার্ম্মান। সেখানকার লোকেও এই তিনটিকে মাতৃভাষা বলিয়া মনে করে। কতক লোকে ফরাসী, কতক জার্ম্মান, আবার কতক ইতালীয় ভাষা বলে। সুইজারল্যাণ্ডের যে-ভাগ ফ্রান্সের দিকে আছে সে-ভাগের লোক ফরাসী ভাষা বলে, ইটালীর দিকের লোক ইটালীর ভাষা বলে, জার্ম্মানির দিকের লোক জার্ম্মান ভাষা বলে। পার্লামেণ্টে ও প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতার রিপোর্টে জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষাই বেশী ব্যবহৃত হয়। —গুপ্ত।

দুহাজার বছরের প্রণয়লিপি—

পম্পে সহরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে সবাই জানেন। এই উদ্ধার ব্যাপারে অনেক নূতন ও আশ্চর্য্যজনক জিনিষ বের হচ্চে। সেই-সকল অদ্ভুত জিনিষের মধ্যে এই সেদিন কতকগুলি প্রণয়লিপি পাওয়া গেছে। লিপিগুলি হাতীর দাঁতের পাতের ওপর লেখা। যে-সব বীর অসি-যুদ্ধে বিজয়ী হতেন, প্যাট্রিসিয়ান মেয়েরা এইসব চিঠি তাঁদের লিখেছিলেন। একখানি চিঠি ষ্ট্রাক্স নামে একজন বীরকে লিখিত। নেপল্‌স যাদুঘরের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শিরাজোলার মতে এই ব্যক্তি ব্রিটনের একজন বার্ব্বেরিয়ান। চিঠিখানিতে লেখা আছে—"কে তুমি বীর?—তুমি কি হার্কিউলিস-রূপে কিবাস এ্যাপোলো দেব? * * * তোমার রূপ, তোমার শক্তি আমার মন হ'তে আর সকল বীরের স্মৃতি দূর করে দিয়েছে। * * * দেবতা আমার, আইসিস দেবের মন্দিরের কাছে আমি তোমার অপেক্ষায় থাক্‌ব।"

দেওয়ালে আঁকা বড় বড় অসিবীরের ছবির তলায় লেখা পড়ে বুঝা যায় ক্লিও, লিভিয়া, কর্ণেলিয়া প্রভৃতি নামের মেয়েরা তাঁদের ভাল বাসতেন।

পম্পের একদিন ছিল সবই, কিন্তু পাগলা ভিসুভিয়সের কোপে পড়ে আজ তার কি দশা! কনাদি মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় রূপকথার বিদেশ ভ্রমণ—

আমাদের দেশে মুখে মুখে যে-সকল রূপকথা প্রচলিত আছে, তা যে কবে কার দ্বারা রচিত হইয়াছিল তা বলা কঠিন। কিন্তু সেগুলি যার দ্বারাই রচিত হইয়া থাকুক, তাহা লোকের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। শুধু এই দেশেই যে সেগুলি আবদ্ধ ছিল তা নয়, বিদেশী সাহিত্যেও তারা বেশ একটা স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। বিদেশী পোষাকে তাদের কোন-কোনটির রূপ এমন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে যে তাদের অনেক সময় চিনাই যায় না। সাধারণতঃ আমাদের দেশী রূপকথাগুলি গ্রীক ও আরবি ভাষার মধ্য দিয়াই ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছে। ঈসপ্‌স্ ফেব্‌লের অনেকগুলি গল্পই এরূপ ভারতীয় গল্পের রূপান্তর। কতকগুলি অবশ্য পরবর্ত্তী কালে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষাতেই একেবারে অনূদিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখান হইতে পরে কিছু কিছু আমেরিকাতেও গিয়াছে। মার্কিনের নিগ্রোদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি রূপকথা খুব প্রচলিত। এখন কিন্তু নিগ্রোরা জানেও না যে এগুলির উদ্ভব হইয়াছিল বহুযুগ পূর্ব্বে একদিন ভারতবর্ষে। এরূপ

একটি গল্পের সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। সেটি সিংহ-মামা সম্বন্ধে। সিংহ-মামার শারীরিক ক্ষমতার খুব অহঙ্কার ছিল। বনের অন্যান্য পশুদের উপর সে খুবই ওস্তাদি করিয়া বেড়াইত। তার ওস্তাদি অসহ্য হওয়াতে পশুরা তাকে মানুষের ক্ষমতার কথা শুনাইয়া দিল। সে তা সহ্য করিতে পারিল না। মানুষের সন্ধানে সে বাহির হইল—মানুষকে পাইলে সে তাহাকে এমন জব্দ করিয়া দিবে যে জীবনে তা আর মানুষ ভুলিবে না। খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া একজন মানুষকে সে দেখিতে পাইল, সে তখন কাঠ চিরিতেছিল। কিন্তু সিংহ ত তার আগে কখনো মানুষ দেখে নাই; তাই সে মানুষকেই মানুষের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তার মনের কথাটা জানাইয়া দিল। মানুষটি তার মৎলব শুনিয়া ফন্দি আঁটিল; কাঠের ফাটলের মুখটি একটু ফাঁক করিয়া বলিল, তোমার একখানা পা এর ভিতর ঢুকাইয়া দাও ত, আমি মানুষকে খুঁজিয়া আনিতেছি। সিংহ তার উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া তাই করিল। পা যেই না দেওয়া অমনি মানুষ চেরা কাঠের মাঝের খিলটি তুলিয়া লইল আর সিংহের পা চেপ্‌টাইয়া আট্‌কাইয়া গেল। মানুষটিও সুবিধা পাইয়া তাকে বেদম প্রহার করিল। সে অবধি গাছ কাটিতে দেখিলে সিংহ আর মানুষের কাছে ভিড়ে না। ভারতবর্ষে সিংহ সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত আছে তাহাতে ও ইহাতে সামান্য একটু পার্থক্য আছে মাত্র। এরূপ আরও অনেক ভারতীয় রূপকথাই বিদেশে হাজির হইয়া জন্ম-পরিচয় খোওয়াইয়াছে। উল্টাটাও ঘটিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। তিব্বতীয়, তুর্কী, এমন কি আফ্রিকাবাসী কাফ্রিদেরও অনেক রূপকথা ভারতে আসিয়াছে। এরূপ আদানপ্রদান করিয়াই জগতের কথা-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে ও জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। স।

পথ

স্মৃতির এ পথে পথে কারা আজি কেঁদে কেঁদে ফেরে,
কেঁদে ফেরে অভিমানে! অতীত সমাধিতল ছেড়ে
পিপাসায় দিশাহারা অন্ধ কোটি আত্মার মতন
ক্রন্দনে ভরিয়া তুলি' আমার উৎসব-নিকেতন,
ফিরিয়া চলিতে চায় জীবনের এই পথ দিয়া
যে পথে বারেক ফিরে কি ভেবে চাহিয়া গেল প্রিয়া!

কেঁদে ফেরে আমার শৈশব,
বলিছে সে, 'হায় হায়, একেবারে বৃথা হলো সব
অকারণ হাসাকাঁদা, অকাজের অযুত সঞ্চয়,
তোমার প্রিয়ার সনে না যদি ঘটিল পরিচয়!
লহ মোরে ফিরে লহ, পুনরায় বসি সারা বেলা
মোর যত নামহান আপনি-সৃজন-করা খেলা
সুরু করি লয়ে পথধূলি,
ধূলিমুঠি সোনা হোক!'...

কৈশোর সে বলে, 'গেছ ভুলি'
একেবারে আমারে কি? ব্যর্থ আমি ছিনু এতকাল।
প্রিয়া বিনা কাটায়েছি বৃথা কাজে সাঁঝ ও সকাল,
বৃথা মাঠে ছুটিয়াছি, ছড়ায়েছি বৃথা কলহাসি;
কৌতুক, দুরন্তপনা, তরুছায়ে বিরামের বাঁশী,
শাখে বসে' দোল খাওয়া বাতাসের অলস বীজনে,
আধখাওয়া কালোজাম ছুঁড়ে মারা পথচারীজনে,
সকল ফিরায়ে লও প্রিয়ার প্রসাদভাগ দিয়া,
নহে তারা ব্যর্থ হবে।'..

আরো কারা ফিরিছে কাঁদিয়া,
সবাকারে নাহি চিনি; শুধু মুখ মনে আছে জাগি',
চলিতে পথের 'পরে দেখা হলো চকিতের লাগি',
তখন ছিল না প্রিয়া।

অনাবৃত সবুজ প্রান্তরে
ঘাসের ফুলের হাসি দন্তপাতি মেলি' থরে থরে।...
খাড়া উঁচু দুই তীর, তার মাঝে ফেনোর্ম্মিমুখর
খরগতি নদীস্রোত। পর্ব্বতসঙ্কট ভয়ঙ্কর।...
ধূধূ নীল আকাশের অসীমায় শুধু পথহারা
ছোট একফালি মেঘ।...রবি, চন্দ্র, তারা,
ঋতু ঋতু অয়নে অয়নে।..কত দীঘি-সরোবর-তীর,
স্তব্ধ তরুছায়াতল, সমীরণ-পরশ-অথির
কত শত বেণুকুঞ্জ।...বর্ণ গন্ধ গান হাসিরাশি
যাহা কিছু লাগে ভালো, যা-কিছুরে আমি ভালোবাসি,
জীবনের পথে পথে যাদের এসেছি ভালোবেসে,
আজিকে সকলে তারা মোর ভালোবাসা সনে মেশে।

মনে হয়, এই প্রেম, এ শুধু আমারই প্রেম নহে।
বুকে তার কল্লোলিয়া বহে
অগণিত নদনদী, ফেটে পড়ে গিরি-প্রস্রবণ,
ওঠে রবি, ফোটে ফুল, গাহে পাখী শিহরে পবন,
ষড়্‌ ঋতু আসে যায়। পড়িয়াছে ধরা
মোর প্রেমে শোভাময়ী এ সারা বিপুল বসুন্ধরা
লয়ে' তার সব প্রেম। যৌবনের তপোবনে জাগি'
আছে চিরকাল মোর তপোবন-ঈশ্বরীর লাগি',
আমার জগৎ জাগে, জাগেন আমার ভগবান্‌।...

সারা দিনমান
আপনারে কত ছলে ভুলায়ে রেখেছি নানামতে;
তারা কেউ ভোলে না যে! ভিড় করে' বসে' থাকে পথে,
চেয়ে সুদূরের পানে লয়ে' দুটি জলভরা আঁখি,
যে পথে গিয়েছে প্রিয়া একটি চোখের চাওয়া রাখি'।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।



সভ্যতা বনাম আত্মোৎকর্ষ

বিগত ভাদ্র সংখ্যায় প্রবাসীতে জার্ম্মানীর সুবিখ্যাত কূটনীতি-বিশারদ বেথ্‌ম্যান হল্‌ওয়েগ মহোদয়ের বিগত বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইউরোপের অন্যান্য চিন্তাশীল লেখকদের ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্যই যুদ্ধ ঘটিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অতি অল্পদিন হইল জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক টমাস ম্যানের একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি এই পুস্তকে যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে যে-সব অভিনব কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা এমনই জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ যে সে-গুলিকে তলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। ম্যান নিজেকে সার্ব্বজাতিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার অন্তরনিহিত জাতীয়তার প্রতি সহসা সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অন্তরের 'জার্ম্মানীয়তা' যে তাঁহার বিশ্বহিতৈষণার গর্ব্বকে চূর্ণ করিয়া বাহির হইতেছে তাহা খুব তীব্রভাবে অনুভব করেন। এই দারুণ অনুভূতি তাঁহার চিন্তাধারাকে যে নূতন চেতনা দিয়াছে তাহার ফল তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ম্যানের মতে বিগত খণ্ড-প্রলয়টি আর্থিক উন্নতি এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ নয়। ইহার মূল কারণ, জীবনের মূল্য ধার্য্য করিবার দুইটি ভিন্ন প্রণালীর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত। জার্ম্মানীর দৃষ্টি ইউরোপের অন্যান্য দেশের দৃষ্টি হইতে এতই বিভিন্ন যে এই দুই ধারার মিলন অসম্ভব। জার্ম্মানীর জাতীয়জীবনের যে অন্তর্নিহিত আদর্শ Kultur (আত্মোৎকর্ষ) এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের চরমআকাঙ্ক্ষা যে Civilization (সভ্যতা), এই দুইএর চিরন্তন যুদ্ধ থেকেই এই যুদ্ধের উৎপত্তি। এককথায় বলিতে হইলে এ যুদ্ধ Rational thinking আর Creative impulse, তর্কবুদ্ধি এবং সৃষ্টিপ্রেরণা, এই দুয়ের পরস্পরের উপর প্রাধান্যলাভের লড়াই।

সভ্যতাই যাহাদের আদর্শ সেই-সব জাতি শাসনপ্রথার একত্বের দিকে সুশৃঙ্খল রাজ্যচালনার দিকেই শুধু মন দিয়াছেন। তাঁরা ফ্রান্সের রুসোর বংশধর, অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাধারার জীর্ণ কঙ্কাল বহিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন বুদ্ধি আর তর্কশাস্ত্রে, তাঁরা বিশ্বাস করেন ধারাবাহিকতায়, ক্রমোন্নতিতে আর নূতন নূতন কর্ম্মায়তনের মধ্য দিয়া মানবমনের ক্রমিক বিকাশে। ভবিষ্যৎ তাঁদের সাম্যমৈত্রীর সত্যযুগের আগমনচ্ছটায় উজ্জ্বল।—এককথায় বলিতে গেলে তাঁরা হইলেন প্রজাতন্ত্রের ধ্বজাবাহী। তাঁদের মন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সমস্যাতেই ভরপুর, তাঁরা কলা ও অধ্যাত্মদর্শন সম্বন্ধে নির্ব্বিকারচিত্ত। জার্ম্মানী সাম্য-মৈত্রীর সত্যযুগ চায় না, সে শুধু বিশ্বাস করে মানবজীবনের গভীরতর উৎসে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় তার অধ্যাত্ম জীবনে ও আর্টের বিকাশে। সভ্যতাকে জার্ম্মানী জীবনে বড় স্থান দেয় না; কলাশিল্পের মধ্য দিয়া যে আত্মোৎকর্ষ (culture) তাকেই সে বড় করিয়া দেখে।

প্রজাতন্ত্র জার্ম্মানীর প্রাণের কথা নয়। যাঁরা তাকে প্রজাতন্ত্রের অনুসারিকা করিয়া তুলিতেছিলেন তাঁরা তার প্রাণের সুরটিকে নষ্ট করিয়া দিতে গিয়াছিলেন। জার্ম্মানীর সঙ্গীতবেত্তা, জার্ম্মানীর দার্শনিক, জার্ম্মানীর কবি—ভ্যাগ্‌নার, সপেন্‌হয়ের, গেটে—সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে জার্ম্মানীর রাজনীতির প্রতি কোনও গভীর টান নাই—রাজনীতি তার অন্তরের কথা নয়। অতি-মানুষের সেবা করা, শক্তিমান বুদ্ধিবলবেত্তার অনুগত হওয়া, জার্ম্মান জাতির স্বভাবগত মনের বৃত্তি।

জনসাধারণের নির্ব্বাচন অধিকার একটা বিষম ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির মনের ভাব, জাতির বিশেষত্ব এই রকম ব্যক্তিমতের যোগফলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় না। জনতার মনস্তত্ত্ব (crowd psychology) যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন জনতার মতের মূল্য কতটুকু এবং এইরূপ জনমত কত সহজেই গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয়।

বর্ত্তমানের সম্মিলিত জনসাধারণের সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে দেশপ্রাণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; দেশ আপনাকে প্রকাশ করেন যুগযুগান্তরের দেশমানবের স্বরূপের মধ্য দিয়া। দেশের প্রাণের সুরটি দেশের বিপুল জনতার মাঝে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে সুরটি দেশের কাব্যে, গানে শিল্পে দর্শনে, দেশের সাহিত্যে ও নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। দেশের শ্রেষ্ঠ মন যাঁহাদের, সেই জন-কয়েক আর্টের পূজারী ভাবুক সন্তানের মধ্যে যে সুরটি বাজিতে থাকে তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রাণের সুর। তাহারই মধ্যে চিরন্তন অথচ চিরনূতন দেশমানবের প্রকাশ। দার্শনিক জার্ম্মানী এই চিরন্তন দেশমানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বলিয়াই পাশ্চাত্য জগতের "মানুষের অধিকার" যে ব্যক্তি-তন্ত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে তাতে সায় দিতে পারেন নাই। রাজনীতির মধ্যে আসল মুক্তি, সম্পূর্ণ মুক্তির প্রকাশ অসম্ভব, কারণ রাজনীতি দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার, সন্ধিসর্ত্ত ইত্যাদির কথা এখানে চলে। প্রজাতন্ত্র উন্নতির একটা সোপানমাত্র; এর চেয়ে উচ্চস্তরের জিনিস হ'ল কলালক্ষ্মীর সেবা।

ব্যষ্টি আর সমষ্টিতে একটা বরাবরের লড়াই আছে। এই দুইটি জিনিস কখনও মিলনসূত্রে বদ্ধ হইবে না। যারা বলে হইবে, তারা ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলে। অবিবেচক সাধারণ লোককে সুখ-সমৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া মাতাইয়া তুলিবার উহা তাহাদের একটা কৌশল। শূদ্রমনেরই কাছে এই গরুর মতো জাবরকাটার জীবন লোভনীয় হইতে পারে, কলালক্ষ্মীর পূজারী ব্রাহ্মণ-মন ইহা হইতে কোনও সাঁচ্চা সুখের আস্বাদ আশা করিতে পারেন না। সমাজ এবং শাসনপ্রণালী যে তন্ত্রেরই হোক না কেন, ব্রাহ্মণ-মন সবরকম অবস্থাতেই জীবনের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হন, কেন না জীবনের সুখদুঃখ আশা নিরাশা সবরকম সমাজতন্ত্রের মধ্যেই কোনও না কোনও রকমে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ করিতেছে এবং তাহা বুঝিতে পারাতেই যথার্থ আনন্দ।

যেসব দেশ ন্যায় সত্য স্বাধীনতা বলিয়া চেঁচায় তারা বুঝিয়া দেখে না যে বাস্তব জীবনে অখণ্ড সত্য, অখণ্ড ন্যায়ের মূল্য কতটুকু। জীবনের সীমাবদ্ধতাই, সত্য এবং ন্যায়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, এবং তাই জন্য ইহাদের মূল্য জীবনের মধ্যে খুব বড় হইয়া ওঠে না।

বুদ্ধি-বিবেচনা এবং সদাচারকে জীবনের মধ্যে বড় করিয়া তোলাই প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য। বুদ্ধি জীবনকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া তার সৌন্দর্য্যটুকুকে নষ্ট করিয়া দেয়। শুদ্ধ সদাচারের উপরে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত সে রাষ্ট্র হইতে কলালক্ষ্মী (আর্ট) শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করেন, কেন না সদাচারের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। তাঁহার যুক্তিহীন, অর্থহীন শক্তির কাছে মানুষ বরাবরই মাথা নোয়াইয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে করিয়া স্পষ্টই বোঝা গিয়াছে যে মানুষ কেবলমাত্র বুদ্ধির দাস হইয়া থাকিবে না।

শ্রীতমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

বোল্‌শেভিক্ রুশিয়ায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চা

কথায় বলে, অমঙ্গলের খবর কখনো মিথ্যা হয় না। বোল্‌শেভিক্‌দের যে-সব অমানুষিকতার বৃত্তান্ত বোল্‌শেভিক্-নীতির বিরোধী দলের মার্ফতে আমরা পাইয়া থাকি, সেগুলি সাচ্চাই হোক আর ঝুটাই হোক, বোল্‌শেভিক্ আমলে রুশিয়ার দুঃখ-দুর্দ্দশার যে একশেষ হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ করা চলে না। প্রতিদিন শত শত লোক দুর্ভিক্ষের কুক্ষিগত হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক টাইফয়েডে, কলেরায়, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে মরিতেছে। দলে দলে লোক তাদের আজন্মের পল্লীবাস ছাড়িয়া অন্নের সন্ধানে সহরের দিকে ছুটিতেছে এবং সহরগুলির যা অবস্থা হইতেছে তা বোধ হয় না-বলিলেও চলে। পেট্রোগ্রাডের দুরবস্থা নাকি এমনি চরমে উঠিয়াছে যে পৃথিবীর ইতিহাসে তেমনটির কথা শোনা যায় না। মার্চ্চ মাস হইতে একবিন্দু বৃষ্টিপাত হয় নাই, ফসলের জমি সব ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে। প্রায় তিন কোটি লোক অনশনে মৃতপ্রায় হইয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের এই প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যেও রুশিয়া তার জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষীণ বর্ত্তিকাটি বুক দিয়া আড়াল করিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশের বিজ্ঞ পেট্রিয়টদের মতো তাহা শিকেয় তুলিয়া রাখিবার পরামর্শ কেউ তাহাকে দেয় নাই। রুশিয়া জানে, লড়াইয়ের ও জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে তেলজলের মতো মর্ম্মান্তিক কোনও বিরোধ নাই। মানুষের সমস্ত জীবনটাই ত একটা লড়াই, নানা-রকমে নানা শত্রুর সঙ্গে এই লড়াই প্রতিনিয়তই মানুষকে করিতে হয়। তুমি যে ভাবিতেছ এখন আর-সব ভুলিয়া গিয়া সংগ্রামটাকে কোনমতে জিতিয়া লইবে পরে অবসর মতো অন্য কাজে মন দিবে, ইহা কেবল তোমার জীবনের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও শক্তির দৈন্যের পরিচয় দেয়।—লড়াই চলিবে, আর কিছুও বাদ পড়িবে না, ইহাই মনুষ্যত্বের আদর্শ। রুশিয়া এই আদর্শকে অগণ্য বিরোধের মধ্য হইতেও যে কি আশ্চর্য্য নিষ্ঠার সঙ্গে জাগাইয়া রাখিয়াছে তাহা ভাবিলে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং মন তৃপ্তিতে ভরিয়া ওঠে।

বার্লিনের ফোসিশ্ ট্সাইটুং (Vossische Zeitung) নামক কাগজে বোল্‌শেভিক রুশিয়ায় শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চার অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লিটারেরি ডাইজেষ্ট্ তাহার ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ ছাপিয়াছেন। তাহাতে পাই—

"বিগত তিন বৎসর রুশিয়াতে বোল্‌শেভিক্ প্রচার (Propaganda) পুস্তকাদি ছাড়া আর কোনো-কিছু ছাপা হয় নাই। এমন কি সহরে-বাজারে পর্য্যন্ত স্কুলপাঠ্য বই একটি জোটানো অসম্ভব হইয়াছে। ছেলেরা এই তিন বৎসর স্লেট কাহাকে বলে তাহা জানে না। কলম পাওয়া যায় না বলিলেই চলে, কালি পেন্সিলও দুষ্প্রাপ্য। রুশিয়ার যে-সমস্ত অঞ্চলে গাছগাছ্‌ড়া নাই, সে-সমস্ত অঞ্চলের ইস্কুলগুলিতে আগুনতাতের ব্যবস্থা নাই (রুশিয়া প্রচণ্ড শীতের দেশ, বিশেষতঃ সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলকে চির-তুষারের দেশ বলিলেও চলে)। বোল্‌শেভিক রুশিয়ার কোনো স্কুলে দারোয়ান্ বেহারা নাই, ছেলেরা নিজেরাই ঘরদোর ঝাঁট দেয়, ঠেলাগাড়ী করিয়া, স্লেজে করিয়া দূরদূরান্তর হইতে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনে। সকালে সাড়ে নটায় তারা ইস্কুলে আসে, পড়াশোনা আরম্ভ করিতে এগারোটা বাজিয়া যায়। একঘণ্টা পর তারা তাদের মধ্যাহ্নিক আহার লঞ্চ্ খায়। এই লঞ্চের সম্বন্ধে কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। রুশিয়ার বড় বড় সহরগুলির অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা সহজেই ইহা কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন। বাড়ীর জন্য ছেলেদের কোনো পড়া দেওয়া হয় না; বাড়ীতে পড়িবার সুবিধা নাই, প্রথমত কাহারও বাড়ীতেই প্রদীপ জ্বালিবার মতো তেল নাই, তারপর সময়েরও অভাব,—সেখানেও বাড়ীঘরের আবর্জ্জনা সাফ করা, জলতোলা প্রভৃতি কাজ ছেলেদেরই করিতে হয়।......"

ইস্কুলগুলিতে ছেলেদের সত্যকার শিক্ষা কতদূর হইতেছে সে সম্বন্ধে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজ মাত্রেই ত্রুটি থাকে, আবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা সারানোর ব্যবস্থা হইতেও বেশীক্ষণ লাগে না। আমরা আশা করি, যারা শিক্ষার জন্য এমন প্রাণপাত করিতেছে, সেই শিক্ষা যাতে সত্যকার শিক্ষা হয় সে ব্যবস্থাও তাহারা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবে।

বোল্‌শেভিক রুশিয়াতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—

"রুশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের আর্থিক অবস্থা আগে হইতেই শোচনীয় ছিল। অনাহার, শীত, কৃচ্ছ্রতা, প্রভৃতি মিলিয়া তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কেহ কেহ বোলশেভিক্-নীতির বিরোধী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশই মরিয়াছেন অনশনে এবং জ্বরে। বিখ্যাত আইনজ্ঞ অধ্যাপক প্রোক্রোস্কি জ্বালানি কাঠের বোঝা লইয়া তেতলায় উঠিবার পথে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। ঐতিহাসিক ল্যাপো-ডানিলেভ্‌স্কি ও ডিয়া-কোনোফ্, ভাষাতত্ত্ববিৎ শাখ্‌মাটফ, দার্শনিক ইউজিন ট্রুবেট্‌স্কয়; রাজনীতি- ও অর্থনীতিবিৎ টুগান্-বারানভ্‌স্কি, আইনজ্ঞ গেসেন্ প্রভৃতি আরো অনেকে অকালমৃত্যুর কবলগত হইয়াছেন। মস্কোর দার্শনিক পণ্ডিত ভিক্টরফ, এবং কাজান্-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুক্ আত্মঘাতী হইয়াছেন।.....এই বিপুল বিরুদ্ধতার মধ্যেও অবর্ণনীয় দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া লইয়া, রুশিয়া। বৈজ্ঞানিকেরা যথাকর্ত্তব্য করিয়া ত যাইতেছেনই, এই কর্ত্তব্যের জন্য নানা কঠোর আত্মত্যাগ পর্যন্ত হাসিমুখে স্বীকার করিতেছেন। বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত পাভ্‌লোভ তাঁর পরীক্ষাগারের ঘরে অপ্রচুর যন্ত্রপাতি ও মালমশলার সাহায্যে এই-সমস্ত অনশনক্লিষ্ট জানোয়ারের দল অক্লান্ত নিষ্ঠায় অভাব কাজ করিয়া চলিয়াছেন, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত যোগ তাহাদের ছিন্ন হইয়া গেছে, কিন্তু কাজের মধ্যে যতি নাই। নানজারা শরীরতত্ত্ববিৎ প্যাভ্‌লোফের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতির স্বীকৃতি হিসাবে সরকার হইতে তাঁহার বরাদ্দের এসব কিছু বাড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল; প্যাভ্‌লোফ্ সে অনুগ্রহের দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহারই বাড়ীতে তাঁহার এক সতীর্থ খাটিতে খাটিতে মারা যাইতেছেন, অন্য একজন টিউবার্কিউলসিসে আক্রান্ত, নিজের জন্য এ সুবিধা গ্রহণ করিতে তিনি নিতান্তই অপারগ।"

চীন, তুরস্ক, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রিয়া, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি আরও অনেক দেশে দুঃখের দাহনের মধ্যে দিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা চলিতেছে। রুশিয়ার অবস্থা সকলের চেয়ে শোচনীয়, কিন্তু নানা কারণেই রুশিয়ার জন্যই সকলের আগে মনে আশা জাগে। রুশিয়া না মরুক, টলষ্টয়ের স্বপ্ন সফল হইয়া উঠুক।

স, চ।



মোস্‌লেম ভারত (ভাদ্র)

নামের খেলা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখ্‌তে সুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালী কালীর কিনারা টেনে তারি গায়ে লতা এঁকে মাঝখানে লাল কালী দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখ্‌ত। আর খুব সমারোহে মলাটের ওপর লিখ্‌ত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগ্‌ল। কোথাও ছাপা হ'ল না।

মনে মনে সে স্থির কর্‌লে, যখন হাতে টাকা জম্‌বে তখন নিজে কাগজ বের করব।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার বল্‌লে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা কর, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।"

সে একটুখানি হাস্‌লে আর লিখ্‌তে লাগ্‌ল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হ'ল না।

আন্দোলন হ'ল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে, তার ছোট ভাগ্‌নেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে-বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে লাপাতে লাপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বল্‌লে, "দেখ দেখ, মামা, এ যে তোমারি নাম।"

মামা একটুখানি হাস্‌লে আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একখানি বই বের ক'রে বল্‌লে, "আচ্ছা, এটা পড় দেখি।"

ভাগ্‌নে একটি একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম পড়্‌ল।

বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরল, সেটাতেও প'ড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখ্‌লে, তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে চাইল না। দুই হাত ফাঁক ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "তোমার নাম আরো অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে: একশোটা, চল্লিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোখ টিপে বল্‌লে, "ক্রমে দেখ্‌তে পাবি।"

ভাগ্‌নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ীর বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজী তার নায়ক।

বন্ধুরা বল্‌লে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চল্‌বে।"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌ল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটার-বিলাসী বন্ধু থিয়েটার-ওয়ালাদের কাছে অভিমত আন্‌তে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্‌নেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক খেলা বের করেছে, অন্যমনস্ক হ'য়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্‌নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালী লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্চে। মামাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিতে হবে।

আশ্চর্য্য ক'রে দিলে। মামা এক সময়ে বস্‌বার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারী ব্যস্ত।

কি কানাই, কি কর্‌চিস্?

ভাগ্‌নে খুব আগ্রহ ক'রেই দেখালে সে কি কর্‌চে। কেবল তিনটি মাত্র বই নয়, অন্ততঃ পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম!

এ কি কাণ্ড! পড়া শুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। আর এ কি রকম খেলা!

কানাইয়ের বহু দুঃখে-জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দম্‌কায় দম্‌কায় কেঁদে ওঠে, কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কি হ'য়েছে, বাবা?"

কানাই বল্‌লে, "আমার নাম।"

মা এসে বল্‌লে, "কি রে কানাই, কি হয়েছে?"

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "আমার নাম।"

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে, মাটাতে ফেলে দিয়ে সে বল্‌লে, "আমার নাম!"

মা এসে বল্‌লে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়ীটা।"

কানাই রেলগাড়ী ঠেলে ফেলে বল্‌লে, "আমার নাম!"

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কি হ'ল?"

বন্ধু বল্‌লে, "ওরা রাজী হল না।"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মামা বল্‌লে, "আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি নিজে থিয়েটার খুল্‌ব।"

বন্ধু বল্‌লে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখ্‌তে যাবে না?"

ও বল্‌লে, "না, আমার জ্বরভাব।"

বিকেলে মা এসে বল্‌লে, "খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

ও বল্‌লে, "ক্ষিদে নেই!"

সন্ধ্যের সময় স্ত্রী এসে বল্‌লে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না?"

ও বল্‌লে, "মাথা ধরেচে!"

ভাগ্নে এসে বল্‌লে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও !"
মামা ঠাস্ ক'রে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে !

অদৃশ্য আলোক—আচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, এফ্ আর এস্।

সেতারের তার অঙ্গুলি-তাড়নে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। দেখা যায় তার কাঁপিতেছে; সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে সুর উপলব্ধি হয়। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। কম্পন-সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্য্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয় অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ-স্পন্দনে সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক, আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুর মাত্র দেখিতে পাই। আকাশস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে, কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রং দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির ঊর্দ্ধে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ আবশ্যক। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ—দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে; সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

এখন দেখা যাউক দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

(১) ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

(২) ধাতুনির্ম্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

(৩) আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্ত্তিত হয়।

(৪) সব আলোকের রং এক নহে, কোন আলো লাল, কোনটা পীত, কোনটা সবুজ এবং কোনটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা-রংএর পক্ষে স্বচ্ছ কিম্বা অস্বচ্ছ।

(৫) আলো বায়ু হইতে অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইয়া বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। কাচ-বর্ত্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৬) আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোন শৃঙ্খলা নাই, উহা সর্ব্বমুখী অর্থাৎ কখনও ঊর্দ্ধাধ, কখনও বা দক্ষিণে-বাঁমে স্পন্দিত হয়। স্ফটিক-জাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে। তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ সে সম্বন্ধে পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে, তাহার প্রমাণ এই যে বিদ্যুতোর্ম্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটিকে এক পাশে ধরিলে কোন উত্তেজনাচিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে এবং সেই প্রত্যাবর্ত্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোক দ্বারাও যে আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

জানালার কাচের কোন বিশেষ রং নাই, সূর্য্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ; জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাট্‌কেল অস্বচ্ছ, আল্‌কাত্‌রা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। ইট-পাট্‌কেল যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আল্‌কাত্‌রা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। আল্‌কাত্‌রা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্ধ বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্ত্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্ত্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্ত্তুল নির্ম্মিত হইতে পারে। বস্তু বিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, আবার আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে প্রবল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চীনা বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোনদিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয়, তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে। সেদিন সৌখীন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখান করিয়া পেয়ালা পিরিচের মালা সগর্ব্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

প্রদীপের অথবা সূর্য্যের আলো সর্ব্বমুখী অর্থাৎ তাহার স্পন্দন একবার ঊর্দ্ধাধ অন্যবার দক্ষিণে-বামে হইয়া থাকে; লঙ্কাদ্বীপের টুর্ম্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্ম্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়, কিন্তু একখানি অন্যখানির সম্মুখে আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে।

মনে কর দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—প্রথম জানোয়ার বক ও চেপ্টা জীব কচ্ছপ। সর্ব্বমুখী অদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দনসম্ভূত। সম্মুখে লোহার গরাদে খাড়াভাবে ধরিলে, সহজেই

দুই প্রকার জীবদিগকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই বাধা পার হইয়া যাইবে, কিন্তু চেপ্টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে পড়িয়া থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদেগুলোকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটা গরাদে অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে, দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়াও যাইবে—তখন দ্বিতীয় গরাদেটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদেটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদেটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয়, তাহা হইলে কোন কোন বস্ত একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে, কিন্তু ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

যে-সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণিত হইল।

অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন-হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ১৯০৭ সালে মার্কনী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ-তরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে প্রেরিত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়।

নব্যভারত (ভাদ্র)

অনধীনতা না স্বাধীনতা ?—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আমরা যে স্বরাজ চাহিতেছি, তাহা কি কেবল মাত্র একটা অনধীনতার অবস্থা, না স্বাধীনতার অবস্থা? আমাদের ভাষায় এই "অনধীনতা" শব্দটি নাই। ইংরেজিতে যাহাকে ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স (independence) কহে, এখানে তাহাকেই বাঙ্গালাতে "অনধীনতা" কহিতেছি। ইংরেজি ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স (independence) শব্দটি অভাবাত্মক। ডিপেণ্ডেন্সের অথবা অধীনতার অভাবকেই ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স কহে। প্রকৃত পক্ষে, ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স শব্দে একটা নিরাকার শূন্য অবস্থা বুঝায়। আমাদের দেশের বহুতর স্বরাজ পন্থীরা এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, বলিয়া আশঙ্কা হয়।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে আমরা ইংরেজের অধীন হইয়া আছি। সুতরাং এ অবস্থাটা একটা অধীনতার অবস্থা। ইংরেজের অধীনতা-মুক্ত হইলেই, আমরা ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট (independent) হইব। এই অবস্থাকে যদি স্বরাজ বলেন, তাহা হইলে ইংরেজ-রাজের উচ্ছেদেই স্বরাজ হইয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান ইংরেজ-শাসনের অবসান হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে।

অনধীনতা লাভ করিতে হইলে, ভাঙ্গাই চাই, ভাঙ্গাই যথেষ্ট। যে বন্ধনটা আছে, যে শিকলটা গলায় বড় বাজিতেছে, তাহা কাটিতে বা ভাঙ্গিতে পারিলেই হইল। তারপর যা হয় হউক। স্বাধীনতার পথ কিন্তু কেবল ভাঙ্গার পথ নয়, সঙ্গে সঙ্গে গড়ার পথও। পরের অধীনতা নষ্ট করিয়া, স্বএর বা নিজের অধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—স্বাধীনতার সাধক ইহাই চাহেন। অধীনতার প্রাণ শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার অর্থ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা, ও সে সম্বন্ধকে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করা। ইংরেজ একটা রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা, একটা শাসন-যন্ত্র, প্রজাবর্গের পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজের ইচ্ছা ও শক্তির বলে সে সম্বন্ধকে রক্ষা করিতেছে। ইংরেজের অধীনতা এই শৃঙ্খলাকে আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে আসিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীন হইব, তখনও আমাদের নিজেদের উপরে নিজেদের এই অধীনতা, একটা রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা, একটা শাসন-যন্ত্র, একটা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া রহিবে। সুতরাং, এই শৃঙ্খলার সূত্রপাত, এই যন্ত্রের ছাঁচ, এই রাষ্ট্র সম্বন্ধের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা যদি এখন হইতে আমরা না করি, বা না করিতে পারি, কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের স্বাধীনতার বা স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে? সে অবস্থায় আমরা কেবল মাত্র অনধীনতাই লাভ করিতে পারিব, স্বাধীনতা ত পাইব না।

কি জীব, কি সমাজ, কিছুই একটা অভাবাত্মক বস্তুর উপরে, একটা শূন্যেতে, স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যদি ইংরেজের অধীনতা ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতার আশ্রয় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে, ইংরেজের শৃঙ্খল-মুক্ত হইতে না হইতে আর-কাহারও শৃঙ্খলে আমরা বাঁধা পড়িবই পড়িব। সে কেহ স্বদেশীও হইতে পারে, বিদেশীও হইতে পারে, কে হইবে কে জানে?

এ দেশে দেশীয় কয়েদিদিগকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পথ দিয়া লইয়া যায়। এই দড়িটা শ্বেতাঙ্গ জোহনের, কিম্বা কৃষ্ণকায় জনার্দ্দন সিংহের হাতে আছে, কয়েদি বেচারি এ বিচার করিয়া কোনও সান্ত্বনা পায় কি?

স্বরাজ—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

টলষ্টয় ঘোষণা করেন যে শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের তিরোধানের একমাত্র উপায় নিরুপদ্রব, শক্তি হইতে মুক্ত, প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত সহকারিতা-বর্জ্জন। বল বা শক্তির শাসন মানব-সমাজ হইতে দূর করিবার জন্য বল বা শক্তির শরণাপন্ন হওয়া মূর্খতা। আবার, রাষ্ট্রের আইন মানিয়া জনসাধারণের জন্য ক্রমশঃ অধিকার লাভের চেষ্টাও আত্মপ্রতারণা। লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐ একমাত্র পথ—নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শক্তির সাহায্যে অশুভের সহিত সংগ্রাম টলষ্টয়ের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, প্রেমের জয়। তাঁহার সাধনা, অশুভের বিরুদ্ধে শক্তি-প্রয়োগ-পরিহার (The Law of Love and its corollary the Law of Non-resistance)। মনে কর, তোমার সম্মুখে এক দস্যু আসিয়া অসহায় এক শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যত। দস্যুকে বধ করিয়া শিশুটিকে রক্ষা করিতে তুমি সক্ষম। আর দস্যুকে হত্যা না করিলে শিশুটির প্রাণ রক্ষা অসম্ভব। তখন তোমার কর্ত্তব্য কি? টলষ্টয় বলেন যে তখনও দস্যুহত্যা তোমার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। তোমার স্কন্ধে একটি পর্ব্বত বহন করা তোমার দৈহিক জীবনের পক্ষে যেমন অসম্ভব, বলপ্রয়োগও তোমার নৈতিক জীবনের পক্ষে তেমনই অসম্ভব। যাহা তোমার নৈতিক জীবনের জন্য অসম্ভব (morally impossible) তাহা তুমি করিতে পার না। অসহায় শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য কোনও পর্ব্বত তোমার স্কন্ধে বহন করিবার কথা ত তোমার মনে আসে না। তবে দস্যুর প্রতি বলপ্রয়োগ তোমার মনে আসিতে দেও কেন? টলষ্টয়ের মতে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র অশুভ, পাপ। তাহার সহিত আপোষ অসম্ভব। সুতরাং তাহার সহকারিতা অসম্ভব। বৈষম্য-পোষক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভা, শিক্ষালয়, ভজনালয়

বিচারালয়, সেনা-নিবাস, কারবারের স্থান, কামান-বন্দুকের কারখানা, ছাপাখানা ইত্যাদি সব হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিন্তু সহকারিত্ব বর্জ্জন করিলে রাষ্ট্রশক্তি যখন তোমাকে নির্য্যাতন করিবে, তোমার কর্ত্তব্য তখন প্রীতির সহিত তাহা সহ্য করা।

যেমন সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তেমনই অপরাজেয় প্রীতির প্রয়োজন। প্রীতিশূন্য, বিদ্বেষপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত নির্য্যাতন সহ্য করিলে সহকারিত্ব-বর্জ্জনে জয় লাভের সম্ভাবনা কম। সহগুণ ত যুদ্ধে শত্রুনিপাতে বদ্ধ-পরিকর সৈন্যেরও আছে। বিদ্বেষের প্রতিদান বিদ্বেষই হইয়া থাকে। শুধু কেবল তোমার প্রীতির প্রতিদানে শুভ পাইবে। টলষ্টয়ের মতে আধুনিক সভ্যতা শয়তানের লীলা। ধর্ম্মসঙ্ঘ (church), জাতীয়তা (nationalism), স্বদেশানুরাগ (patriotism), শ্রমবিভাগ (division of labour), কল-কারখানা, রেল-জাহাজ, চিকিৎসাবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র, শিল্প (art), সাহিত্যানুরাগ, নরনারীর তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্দোলন (Feminism), সমাজতন্ত্রবাদ (socialism)—এ সকলই সুকৌশলে বিন্যস্ত শয়তানী ফাঁদ। এক কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক সভ্য সমাজে নরক গুলজার। ভগবানে ও বিশ্বমানবে অজেয় প্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিত্ব বর্জ্জন কর। এ পৃথিবীতে স্বারাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

—

শিক্ষক (আশ্বিন)

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভারতে শিক্ষার উন্নতি-সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে যে মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, মোট ভারতবাসীর তুলনায় মাত্র শতকরা ২·৩৮ জন লেখাপড়া জানে বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। সেই হিসাবে জাপানে ১৩.৭ জন, ফ্রান্সে ১৬.৯০ জন, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ১৬.০২, রুমানিয়ার মত ক্ষুদ্র রাজ্যে ৮.২১ জন এবং যুক্তরাজ্যের ন্যায় বৃহৎ প্রদেশে ১০.৮১ জন শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিল।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালায় একটি বালকের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক ব্যয় অল্প,—

দিল্লী—	১৩.১ টাকা
বোম্বাই—	১২.১ টাকা
উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ—	৮.৭ "
পাঞ্জাব—	৭.৮ "
মধ্যপ্রদেশ—	৭.০ "
যুক্তপ্রদেশ—	৪.৫ "
ব্রহ্মদেশ—	৪.৫ "
বিহার ও উড়িষ্যা—	৪.৩ "
আসাম—	৪.৩ "
বাঙ্গলাদেশ—	৩.৫

শিক্ষার বার্ষিক ব্যয় বাঙ্গলায় যেরূপ তুলনায় অল্প, কিন্তু বাঙ্গালী বালকের বার্ষিক বেতনের হার পড়ে তেমনি সর্ব্বোচ্চ :—

	টাকা	আনা	পাই
উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ—	০	০	২
আসাম—	০	০	৭
মধ্যপ্রদেশ—	০	১	৭
যুক্তপ্রদেশ—	০	৭	০
পাঞ্জাব—	০	৯	৯
মান্দ্রাজ—	০	৯	৯
ব্রহ্মদেশ—	০	১১	৫
বোম্বাই—	০	১১	১১
বাঙ্গলাদেশ—	১	১১	০

সুতরাং এ কথা সুনিশ্চিত যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালী তাহার পুত্রের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে।

এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে (১৯১৮-১৯) :—

দিল্লী—	১১৯
উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ—	৬৬২
আসাম—	৪২৭১
মধ্যপ্রদেশ—	৪১৬১
পাঞ্জাব—	৬১২৩
ব্রহ্মদেশ—	৭৩১০
বোম্বাই—	১১৯৬৮
যুক্তপ্রদেশ—	১২৬৫৩
বিহার ও উড়িষ্যা—	২৭৪২
মান্দ্রাজ—	৩২০০৯—ছাত্রের সংখ্যা—১,৬০০,৯৯৪
বাঙ্গলাদেশ—	৪৬৯২৪—ঐ—১,৩৮৪,২০১

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গলার তুলনা করিলে আর একটি তত্ত্ব জানা যাইতে পারে, তাহা এই যে, অন্যান্য প্রদেশে গড়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা যত, বাঙ্গলায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম। যথা :—

মধ্যপ্রদেশ—	৬১.০
যুক্তপ্রদেশ—	৫৯.৬
বোম্বাই—	৫৭.১
দিল্লী—	৫৩.৩
পাঞ্জাব—	৪৭.৭
মান্দ্রাজ—	৪১.৭
বাঙ্গলাদেশ—	৩৩.৫
ব্রহ্মদেশ—	৩২.৪

এখন একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যদিও বাঙ্গালী অধিক সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে, এবং বিদ্যাদানের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহে, কিন্তু বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে আশানুরূপ ছাত্র আকর্ষণ করিতে অক্ষম।

—

প্রতিভা (ভাদ্র)

অভিনয়—শ্রীসুরজিৎ কবিরাজ।

অভিনয় আমাদের দেশে নূতন নহে। ইহা অহিন্দুকর বা অনার্য্যোচিত নহে। ইহা এ দেশে আর্য্য-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আবহমান কাল বর্ত্তমান আছে। নাটকাভিনয় বৈদিক সময় হইতেই প্রচলিত ছিল। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী-সংহিতায় লিখিত আছে—

"নৃত্যায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং।" (৩০।৬)

"শৈলূষং" শব্দের মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শৈলূষং নটং।"

পাণিনির ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পাদের ১১০ ও ১১১ সূত্রে লিখিত আছে—

"পারাশর্য্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষু-নট-সূত্রয়োঃ"। ৪।৩।১১০

"কর্ম্মন্দ কৃশাশ্বাদিভিঃ।" ৪।৩।১১

পাণিনি মুনি "শিলালিন" ও "কৃশাশ্ব" নামক দুইজন নটের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনি প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে দেখিতে পাই, রামের রাজ্যাভিষেকে তাঁহার শান্তির উদ্দেশ্যে কেহ মনোহর পদ্য, কেহ নৃত্য, কেহ বা বিবিধ প্রহসন নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন। মহাভারতে অর্জ্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষা করিতে ইন্দ্রালয়ে গিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র কর্ত্তৃক—

"এতাশ্চান্যাশ্চ ননৃতুস্তত্রতত্র সহস্রশঃ।

চিত্তপ্রমাদেন যুক্তাঃ সিদ্ধানাং পদ্মলোচনাঃ॥"

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৪৩ অধ্যায়)।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক অভিনীত হইয়াছিল। ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকে দেখিতে পাই কেবল রাজসভায় নহে—উজ্জয়িনীর পবিত্র দেবালয় কালপ্রিয়নাথের মন্দিরে—নাটক অভিনয় হইতেছে। তখনকার রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ংও নাটক রচনা করিতেন। মহারাজ শূদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সামন্ত রাজকবি বিশাখ দত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীরূপ গোস্বামী সংসারত্যাগী সাধু হইয়াও কর্পূর-মঞ্জরী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব 'শ্রী' রামের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন ও রুক্মিণীর ভূমিকা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"তবে আচার্য্যের ঘরে কৈলা কৃষ্ণলীলা।

রুক্মিণীর রূপ প্রভু আপনে হইলা।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)

এই অভিনয়-বিদ্যা এক সময় এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইত। "সঙ্গীতদামোদরে" দেখিতে পাই।

"হস্তবিংশতি-বিস্তারা রঙ্গভূমির্ম্মনোহরা।

পূর্ব্বাভিমুখ এবাত্র নায়কঃ শোভতে পরম্॥

দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।

তন্মধ্যে মণ্ডলস্থানং নেপথ্যং তচ্চ গীয়তে॥" ইত্যাদি।

বিশ হস্ত বিস্তার রঙ্গভূমি হইবে। নায়ক পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিবে। দক্ষিণ পার্শ্বে বাদ্যযন্ত্র এবং পশ্চাতে যবনিকা থাকিবে। ইত্যাদি।

নটের কার্য্য দূষণীয় নহে। আমাদেরই ভগবানের নাম নটরাজ, নটবর।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (ভাদ্র)

প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও কামরূপের পুরাতত্ত্ব—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী বর্ত্তমান "গৌহাটি" নগরীর অতি প্রাচীনতম নাম ছিল "প্রাগ্জ্যোতিষপুর"। রাজতরঙ্গিণীতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু কামরূপের কোন উল্লেখ নাই। "প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামকরণ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে অবস্থান করতঃ নক্ষত্র সৃষ্টি করায় উহা ইন্দ্রপুরীসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্য উক্ত নামে আখ্যাত হয়। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় রাজা "অমূর্ত্তরজা" পুণ্ড্রভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপের ধর্ম্মারণ্য সমীপে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে একটি আর্য্যরাজ্য স্থাপন করেন। এই "ধর্ম্মারণ্য" দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ নামক স্থান হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত বলিয়া তত্রস্থ অধিবাসীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এখন ইহার নাম হইয়াছে "বুড়া গোঁহাই অরণী"। Mr. F. A. Sachse মৈমনসিংহের Gazetteer (P. 22)-এ লিখিয়াছেন:—At the time of Mahabharat Mymensing formed part of Pragjyotish which 3000 years later in Buddhist times was known as Kamrup. গৌহাটী নগরীই প্রাচীনকালে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সম-সময়ে নরক নামে জনৈক দানবরাজ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিত। খ্রীষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীতে রাজত্বকালে কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, "রঘু লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া কামরূপরাজকে পরাস্ত করেন। তিনি রঘুকে করস্বরূপ বহুসংখ্যক হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন।" সুতরাং কামরূপ এককালে হস্তীর জন্য বিখ্যাত ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশে আর্য্যসভ্যতার বিস্তৃতি হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সূত্র কিম্বা সংহিতা শাস্ত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতের কোন স্থানে "কামরূপ" নামের উল্লেখ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে মহাভারত রচনা আরব্ধ হয়।

প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের অংশবিশেষের নাম ছিল "কুণ্ডিল" নগরী; উহা মহাভারতোল্লিখিত "বিদর্ভ দেশ" বলিয়া অবগত হওয়া যায়। "কুণ্ডিল" আসামের লখিমপুর জেলাস্থ শদীয়া নগরী হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে দিক্রাং (দিক্করবাসিনী) ও দিবাং নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঐ নগরীর নামানুসারে তথায় অদ্যাবধি প্রবাহিত একটি নদীর নাম "কুণ্ডল পানী"। দ্বাপর যুগে মহারাজ ভীষ্মক যখন কুণ্ডিল নগরের অধীশ্বর ছিলেন, তখন জরাসন্ধ মগধে রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান গয়ার নিকটবর্ত্তী "গিরিব্রজ বা রাজগৃহ" তাঁহার রাজধানী ছিল। এখন সেই রাজগৃহ "রাজগির" নামে অভিহিত। মগধাধিপতি জরাসন্ধের প্রস্তাবানুসারে চেদিরাজ শিশুপালের সহিত কুণ্ডিলাধিপতি ভীষ্মকের অপূর্ব্বরূপবতী কন্যা "রুক্মিণী দেবী"র পরিণয় সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে শিশুপাল কুণ্ডিল নগরে গমন করেন। যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া সেখান হইতে তাঁহাকে হরণ করত গান্ধর্ব্ব প্রথানুযায়ী পত্নী-স্বরূপে গ্রহণ করেন। এই কুণ্ডিল নগরে রুক্মিণীপিতা মহারাজ ভীষ্মকের "তাম্রেশ্বরী ও গোসানী"র দেবালয় অদ্যাবধি বিদ্যমান। সেখানে প্রতিদিন নিয়মিত সেবা ও পূজা চলিয়া আসিতেছে।

মহারাজ ভগদত্তের নাম ও তৎসঙ্গে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নাম মহাভারতের বহুস্থানে উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরকালে তিনি কুরুকুলপতি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া চীন ও কিরাত সৈন্য দ্বারা তাঁহার সহায়তা করেন।

মহারাজ ভগদত্তের সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যে যবনাদি ম্লেচ্ছশ্রেণীর লোকের বাহুল্য ছিল।

গোব্লে দাল্‌বাইয়ে (Goblet d' Alviell) নামক জনৈক ফরাসীদেশীয় ঐতিহাসিক "সে ক লান্দ দোয়াতা'লা গ্রেস" (Ce que l' Inde doit a' la Grace) নামক পুস্তকের একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "গ্রীকদিগের এপোলোডোটস (Apollodotos) ও

সংস্কৃতে ভগদত্ত একই ব্যক্তি। তিনি একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যবনরাজ ছিলেন।"

এপোলোডোটস একজন ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক ছিলেন, এবং খ্রীঃ পূঃ ৩৫৩ সাল হইতে ১৮০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় সীমান্ত প্রদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল "ইউক্র্যাটিডিস (Eucratides)।

ভগদত্তের মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রসমরান্তে তৎপুত্র বজ্রদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত।

মহাভারতের মতে নরকের পুত্র ভগদত্ত এবং তৎপুত্র বজ্রদত্ত। কালিকাপুরাণের যে ইহাই মত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাসে (পৃঃ ১৪) লিখিয়াছেন, "ভগদত্তের পরে তদীয় ভ্রাতা বজ্রদত্ত উত্তরাধিকারী-সূত্রে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এবং বজ্রদত্তের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বজ্রপাণি সিংহাসনে আরোহণ করেন।"

বজ্রপাণির তিরোধানের পর এই বংশের নয়জন নরপতি রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের নাম—প্রলম্ভ, শালস্তম্ভ, পলকবিজয়, হর্জ্জর, জয়মালদেব, বনমালদেব, বীরবাহু, বলবর্ম্মদেব ও সুবাহু।

তৎপরে ভগদত্তবংশীয় "ভাস্করবর্ম্মা" কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ (প্রকৃত নাম যুয়ন চুয়ঙ) "সি-ইউ-কি" নামক তৎপ্রণীত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মগধের অন্তর্গত বিশ্ববিশ্রুত "নালন্দা"র সন্ন্যাসীমঠে বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন কালে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা কতিপয় দূত দ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করায় তিনি তদীয় রাজধানী "গৌহাটী" নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মাকে উক্ত পরিব্রাজকের সমসাময়িক ধরিয়া লইলে তিনি সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপের অধীশ্বর ছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মার পরবর্ত্তী ব্রহ্মপাল (স্ত্রী কুলদেবী), রত্নপাল, পুরন্দর পালের পুত্র ইন্দ্রপাল প্রভৃতি নৃপতি কামরূপের "শ্রীদুর্জ্জয়" নামক স্থানে রাজত্ব করেন। ভাস্করবর্ম্মার লোকান্তরিত হইবার কিছুকাল পরেই কামরূপে রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা আভাস পাওয়া যায়।

মহারাজ ইন্দ্রপালের তিরোধানের বহুকাল পরে সুবিখ্যাত "ধর্ম্মপাল" কামরূপের রাজা হন। তারপর দেবপাল, জয়পাল, বিগ্রহপাল, ১ম নারায়ণপাল প্রভৃতি নৃপতি সেখানে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশে "উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" অধিকার করেন।

সন্ধ্যাতারা

১

সন্ধ্যাতারা, তুই কি ঝরা
নীল আকাশের ফুল ?
কিংবা ভোলার ভালের নয়ন
নেশায় ঢুলুঢুল্ ?
কোন্ রূপসীর নীলাম্বরীর
একটা খসা চুমকি চুনির ?
কোন্ অলকার যক্ষপ্রিয়ার
ঝিলিক্-জ্বলা দুল ?
সন্ধ্যাতারা, তুই কি ঝরা
পরীর চুলের ফুল ?

২

জোৎস্নারাতের পদ্মপাতের
একটি ফোঁটা জল ?
বিজলীবালার কণ্ঠমালার
একটা মোতির ফল ?
কটাক্ষ কোন্ ফুল-বেগমের
সুর্ম্মা-আঁকা চপল চোখের ?
কিংবা প্রিয়ার বিদায়-কালের
নয়ন ছলছল্ ?
সন্ধ্যাতারা, তুই কি ঝরা
পারিজাতের দল ?

৩

তুই কি রে নীল্‌সাগর-ছেঁচা
জ্যোৎস্না-মণিটুক্ ?
কিংবা কারো মিলন-নিশার
একটি ফোঁটা সুখ ?
রতির ভালের রঞ্জনটীপ্ ?
দেবদেউলের কাঞ্চনদীপ্ ?
বাসররাতির নূতন বধূর
ঘোম্‌টা-তোলা মুখ ?
তুই কি রে নীল্‌সাগর-ছেঁচা
জ্যোৎস্না-মণিটুক্ ?

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।



আয়ার্‌ল্যাণ্ড

আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সমস্যার সুমীমাংসার একটা বন্দোবস্ত হইতে হইতে বারবার এমনই ভাবে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে যে এ সমস্যার সমাধান কি করিয়া হইবে তাহা ঠিক করিয়া উঠা যাইতেছে না। বিগত শ্রাবণের "প্রবাসীতে" ইংরেজ দর্‌বারের আমন্ত্রণে লণ্ডনে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে ডিভ্যালেরার আপত্তির কথা বিবৃত হইয়াছিল। তাহার পর দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী জেনারেল স্মাট্‌সের চেষ্টায় ডিভ্যালেরা লণ্ডনে আসিয়া কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে রাজী হন, তবে লয়েড জর্জ্জকে কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিতে আপত্তি জানাইয়া এই সর্ত্ত করিতে চাহেন যে কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে এ আসন দিতে হইবে। লয়েড জর্জ্জ ডিভ্যালেরাকে এক পত্র লিখিয়া এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে রাজার ঐকান্তিক ইচ্ছা আইরিশ সমস্যার একটা মীমাংসা হয়, তজ্জন্যই ইংরেজ দরবার আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সভাপতির সহিত আলাপ করিতে অত্যন্ত উৎসুক। এবং তাঁহারা আশা করেন যে রাজার ইচ্ছাকে ডিভ্যালেরা কখনই ব্যর্থ করিবেন না। সেইজন্য ডিভ্যালেরা এবং তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীকে ইংলণ্ডে নিরাপদে আসিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। এই পত্র পাইয়া আইরিশগণ ১১ই জুলাই হইতে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার এক ঘোষণাপত্র বাহির করিলেন এবং ১২ই জুলাই ডিভ্যালেরা ইংলণ্ডে আগমন করেন। ১৫ই জুলাই তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের সহিত কয়েকঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করেন। এই কথাবার্ত্তার পর ২০শে জুলাই তারিখে ইংরেজ দর্‌বার আইরিশ সমস্যার যেরূপ সমাধান ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহার মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া একটি লিখিত প্রস্তাব লয়েড জর্জ্জ ডিভ্যালেরার নিকট প্রেরণ করেন। তাহার মূল সর্ত্তগুলি এই :—

(১) করগ্রহণ এবং রাজস্বের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আয়ারল্যাণ্ড পাইবেন।

(২) আইন আদালত সকলের উপর সম্পূর্ণ অধিকারও তাঁহারা পাইবেন।

(৩) পুলিশের ব্যবস্থা করিবার এবং দেশরক্ষার্থে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিবার অধিকার আয়ারল্যাণ্ড পাইবেন।

(৪) আইরিশ পার্লামেণ্ট ডাক বিভাগ, শিক্ষা, ভূমি, কৃষি, খনি, বন, গৃহনির্ম্মাণ, শ্রমিক, সর্‌বরাহ, ব্যবসায়, স্বাস্থ্য, বিমা, আবকারী প্রভৃতি বিভাগের উপর স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

এক কথায় বলিতে গেলে ইংরেজ দর্‌বার মনে করেন যে সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভার আয়ারল্যাণ্ডকে দিতে তাঁহারা এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনের মঙ্গলের জন্য এবং তাহাকে নিরাপদ করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত একান্ত প্রয়োজনীয় সর্ত্তগুলি ইংরেজ দর্‌বার আয়ারল্যাণ্ডকে মানিতে বলেন—

(১) আয়ারল্যাণ্ডের নৌবিভাগ থাকিবে না। এক সাধারণ রাষ্ট্রীয় নৌবিভাগ ইংরেজ দর্‌বারের অধীনস্থ হইয়া গ্রেটব্রিটেনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিবে এবং আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার এবং তথাকার বন্দরের ব্যবহার করিবার অধিকার এই নৌবহরের থাকিবে।

(২) আয়ারল্যাণ্ডের সৈন্যসংখ্যা খুব অধিক হইতে পারিবে না, তাহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পরে নিরূপিত হইবে।

(৩) গ্রেটব্রিটেনের আকাশবাহী ফৌজ আয়ারল্যাণ্ডে নিজের প্রয়োজনমত যাতায়াত করিতে পারিবে এবং ইহার গতিবিধির সাহায্য প্রয়োজনানুসারে করিতে আইরিশগণ বাধ্য থাকিবেন।

(৪) আয়ারল্যাণ্ড ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য, নৌবহর এবং বিমানবহরের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় কিঞ্চিৎ বহন করিবেন।

সাম্রাজ্যের সৈন্যদলে আইরিশগণকে ভর্ত্তি হইতে আইরিশ-পার্লামেণ্ট বাধা দিতে পারিবেন না।

(৫) আইরিশগণ ইংলণ্ডে মাল আম্‌দানী-রপ্তানীর উপর কোনও শুল্ক বসাইতে পারিবেন না।

(৬) বিগত বিশ্বযুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে ঋণ হইয়াছে তাহার কিয়দংশ আয়ারল্যাণ্ডকে বহন করিতে হইবে। এই-সকল সর্ত্তে আইরিশ পার্লামেণ্ট অঙ্গীকার করিলে এই-সকল চুক্তি-সম্বলিত একটি সন্ধিপত্র উভয় পক্ষ সই করিবেন।

লয়েড জর্জ্জের সর্ত্তগুলির খস্‌ড়া পাইয়া আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট জানাইলেন যে আইরিশ পার্লামেণ্টের যতগুলি সভ্য ইংরেজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ আছেন তাঁহাদের সকলকে মুক্তি না দিলে এই সর্ত্তগুলির আলোচনা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এতদুত্তরে ৭ই আগষ্ট ইংরেজ মন্ত্রিসভা এক ম্যাক্‌কাওয়েন ব্যতীত আর সকল আবদ্ধ সভ্যদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিলেন।

ডেল আইরিয়েন (আইরিশ পার্লামেণ্ট) জানাইলেন যে ম্যাক্‌কাওয়েনকে মুক্ত না করিলে তাঁহারা সন্ধিপ্রসঙ্গ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন। ৮ই আগষ্ট বাধ্য হইয়া ইংরেজ মন্ত্রিসভা ম্যাক্‌কাওয়েনের মুক্তি ঘোষণা করেন।

যদিও ইংরেজ সর্‌কার তাঁহাদের প্রস্তাবে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অনুরূপ শাসন আয়ারল্যাণ্ডকে দিতে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইতেছেন, * তথাপি এই প্রস্তাবেই এমন কতকগুলি

* Government proposes that Ireland should forthwith have a status of dominion by which she would enjoy complete autonomy in taxation, etc. * * * * To sum up, Ireland shall exercise all powers on which the autonomy of self-governing dominions is based subject only to the following conditions which the Government are of opinion are vital to the welfare and safety of both Great Britain and Ireland * * *. Vide Lloyd George's letter to D'Valera on July 20th.

সর্ত্ত ছিল যাহা হইতে বুঝা যায় যে এই অলীক প্রতিশ্রুতির কোনও ভিত্তি নাই। মন্ত্রিসভার এই কারসাজিটুকু ডিভ্যালেরার চক্ষে অতি সহজেই ধরা পড়িয়া গেল। এবং উত্তরে তিনি এই ফাঁকিটুকু ধরাইয়া দিলেন, আইরিশ জাতির স্বাধীনতার স্বভাবগত অধিকার পুনর্ব্বার ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ডের 'নেশন' পত্রেও এই ফাঁকিটুকু পরিষ্কার ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'নেশন' বলেন, "ক্যাথলিক ও সিনফিন আয়ারল্যাণ্ডকে আমরা আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালনার জন্ম উপযুক্ত স্বাধীনতা একপ্রকার দিতে চাহিয়াছি, কিন্তু তাহাকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নামে অভিহিত করা ভ্রান্তি। ইহা কখনই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নহে। ডিভ্যালেরা খুব সহজেই এই চাতুরী ধরিয়া ফেলিয়াছেন।" (But rather misleadingly qualified it as an offer for dominion status. This it is not.)

কিন্তু আর-একদল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিশারদ এই প্রস্তাবকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তুলনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং জেনারেল স্মাট্‌স্ ডিভ্যালেরাকে লিখিলেন "full dominion status with all it is and implies is yours if you will but take it" অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বলিতে যে-সমস্ত অধিকার বুঝায় সে সমস্তই আপনাদিগকে দেওয়া যাইবে যদি আপনারা তাহা গ্রহণ করিতে রাজী থাকেন।

ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবার অধিকার উপনিবেশসমূহের আছে। কিন্তু ইংরেজ মন্ত্রিসভার প্রস্তাবে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে আয়ারল্যাণ্ডের এই অধিকার তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। "No such right can ever be acknowledged by us." দ্বিতীয়ত, ইংরেজ মন্ত্রিসভা আয়ারল্যাণ্ডকে জানাইয়াছেন যে আলষ্টার প্রদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আলষ্টারের উপর আয়ারল্যাণ্ডের বাকি প্রদেশ কয়েকটি জোর জবর্‌দস্তি করিতে পারিবেন না। এই বন্দোবস্তের দোষ এই যে ইংরেজ সরকার খেয়াল-মত একটা দাঁড়ি কাটিয়া আয়ারল্যাণ্ডকে বিভক্ত করিলেন। প্রজা-সাধারণের ইচ্ছা অনুসারে শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচন (plebiscite)এর অধিকার এ ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইল না। যদি সাইলিসিয়া, সেস্‌সউইগ হোলষ্টাইন, টি্রষ্ট প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীবর্গের ন্যায় আলষ্টারের অধিবাসীবর্গকে এই অধিকার দেওয়া হইত তাহা হইলে আলষ্টারের ⅓ অংশ অন্তত আইরিশ জাতীয় মহাসভার অধীনস্থ হইয়া আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিবার অভিমত প্রকাশ করিত। নেশন বলেন, "টাইরোন ও ফারমানাগ অঞ্চলে জাতীয় দলের সংখ্যাই বেশী। ডাউন, দক্ষিণ আরমাগ, নিউরি ও ডেরি অঞ্চলেও তাই। * * * সেইজন্য জোর করিয়া এই-সব প্রদেশকে আলষ্টারের সহিত যুক্ত করিয়া আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় দল হইতে পৃথক করিবার জন্ম জোর করিলে যদি সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যদি আলষ্টারবাসীর শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার না দেওয়ার জন্য যুদ্ধ বাধে, তবে আমাদের মতে তাহার জন্ম ইংলণ্ড দায়ী।" নেশন, ২০শে আগষ্ট, ৭৩৩ পৃষ্ঠা।

নেশন আরও বলেন যে ইংরেজ দর্‌বার আয়ারল্যাণ্ডকে যে কয়েকটি সর্ত্ত অঙ্গীকার করিতে বলিয়াছেন তাহার ১, ৩, ও ৪ নম্বর সর্ত্তগুলি হইতে আয়ারল্যাণ্ডের উপর ইংরেজের সামরিক প্রভুত্ব বজায় রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এই-সমস্ত উপায়ে আইরিশ জমিতে আইরিশ শাসনযন্ত্রের বাহিরে সশস্ত্র সৈন্যাবাসের জাল বুনিবার চেষ্টা হইয়াছে। কোন উপনিবেশ এরূপ বিধি সহ্য করিত? শাসকসম্প্রদায়ের অনধীন সৈন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাধীনতার বিরোধী এবং আয়ারল্যাণ্ডের ভাবী শাসনপ্রণালী যাহাদের অনুরূপ হইবে বলিয়া ছলনা করা হইতেছে সেই উপনিবেশগুলি এরূপ ব্যবস্থার সহিত পরিচিত নহে। "An army outside the control of civil authorities creates a situation at once incompatible with freedom and unknown in those dominions to whose status, it is *pretended*, Ireland is to be raised."

যাহা হউক লয়েড জর্জ্জের প্রস্তাবের উত্তরে ১০ই আগষ্ট ডাব্‌লিনের ম্যান্‌সন হাউস হইতে আইরিশ রিপাব্লিকের সভাপতিরূপে ডিভ্যালেরা গেলিক ভাষায় একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। তাহাতে বলেন যে ডেল-আইরিয়েন ইংরেজ দর্‌বারের প্রস্তাব গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না এইজন্ম যে তাহা আইরিশ জাতির গ্রহণের অনুপযুক্ত। তিনি ব্রিটিশ প্রস্তাবের নানা অযৌক্তিকতা দেখাইয়া পরিশেষে আইরিশ জাতির স্বেচ্ছায় ভিন্ন-হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতির বিরোধী তাহাও বলেন। তবে আইরিশ জাতি স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইলে তিনি তাহাদের পক্ষ হইতে ইংরেজের সহিত চিরসখ্যসূত্রে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। ব্যবসায়ের সুবিধা ও রেলপথ ও বায়ুপথে সৈন্য যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিতে এবং দুইপক্ষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা স্থিরীকৃত যুদ্ধঋণের অংশ গ্রহণ করিতে আইরিশ জাতি স্বীকৃত আছে।

এই পত্রের উত্তরে আবার ১৩ই আগষ্ট তারিখে লয়েড জর্জ্জ এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে "আইরিশ জাতির সাম্রাজ্য হইতে ভিন্ন হইবার অধিকার ব্রিটিশশাসনতন্ত্র কখনও স্বীকার করিতে পারেন না। শত শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা এই দুই জাতির অবিচ্ছেদ্য অদৃষ্ট-বন্ধনের সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাকে কি করিয়া অস্বীকার করা যাইবে। পরে ২৬শে তারিখে লয়েড জর্জ্জ ডিভ্যালেরাকে জানাইলেন যে বৃথা বাদানুবাদে লাভ নাই। যদি সত্যসত্যই শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা উভয়-পক্ষের থাকে তবে ভবিষ্যতে যে পথে আলোচনা করিলে সুফল হওয়ার সম্ভাবনা তাহার মূলসূত্রগুলি অবিলম্বে স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। ৩০শে আগষ্ট ডিভ্যালেরা জানাইলেন যে মূলসূত্র ধার্য্য করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পত্রে যে ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা ভুল। আইরিশ জাতি ইংলণ্ডের সহিত চিরসৌহার্দ্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার স্বভাবজাত কোনও কারণ দেখেন না এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করেন। গ্রেটব্রিটেনের কথায় মনে হয় যে তাঁহারা বলিতে চাহেন যে পুরাকালে আয়ারল্যাণ্ড যে সন্ধিসূত্রে গ্রেটব্রিটেনের সহিত যুক্ত হইয়াছিল তাহার সর্ত্তানুসারে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। কিন্তু সে সন্ধি কিরূপ কলঙ্ক-আবৃত তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তথাপি তাহাকে ন্যায্য ও সঙ্গত দাবী বলিয়া ইংরেজ পার্লামেণ্ট আয়ারল্যাণ্ডকে শাসন করিতে চাহেন ইহা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। আইরিশ জাতি সেইজন্ম ইংরেজ সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কারণ এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত স্বেচ্ছায় যুক্ত থাকিবার জন্ম আয়ারল্যাণ্ডকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এই আমন্ত্রণে কার্য্যতঃ উপনিবেশসমূহ হইতে নিম্নতর অধিকার আয়ারল্যাণ্ডের জন্ম স্বীকৃত হইতেছে।

একজন নিরপেক্ষ বিচারকের উপর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তর্কগুলির মীমাংসার ভার ন্যস্ত করিতে আইরিশ জাতি প্রস্তুত আছেন। ভৌগোলিক সংস্থান যদি শাসন করিবার ও অধীন রাখিবার একটি সঙ্গত কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় তবে জার্ম্মান জাতিরও বেলজিয়ামের উপর প্রভুত্ব করিবার ন্যায্য দাবী আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গ্রেটব্রিটেন যদি ঐসব শুনিতে নারাজ থাকেন এবং জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা বজায় রাখিতে চাহেন, তখন নিরুপায় হইয়া আয়ারল্যাণ্ডকে বাধা দিতে হইবে। তবে একথা বলা দরকার যে শক্তি প্রয়োগ করিলে

এ সমস্তার সমাধান হইবে না কেননা কেবল পাশব বল সত্য ও সুবুদ্ধিকে পরাজয় করিতে পারে না। উভয় পক্ষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি যদি পূর্ব্ব হইতে কোনও দাবী না করিয়া সুশাসনের মূল সূত্র ধরিয়া আলোচনা করেন তবেই সুফল লাভের সম্ভাবনা। শাসিতের ইচ্ছায় শাসন (principle of Government by consent of the governed) একমাত্র এই মূলনীতি যদি কন্‌ফারেন্স অবলম্বন করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে আইরিশ জাতি শান্তির আশা করিতে পারেন। এবং এই নীতি অপর পক্ষ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিলে তাঁহারা এখনই প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।" ৮ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ মন্ত্রিসভা জানাইলেন যে তাঁহারা ডিভ্যালেরার ৩০শে তারিখের পত্র বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। 'শাসিতের ইচ্ছায় শাসনকার্য্য পরিচালন ব্রিটিশ শাসননীতির ক্রমবিবর্ত্তনের মূল কথা। কিন্তু সেইজন্য কোনও কার্য্যকারী আলোচনা-সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এমন কোন সূত্রকে স্বীকার করিতে পারি না যাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করা যায় যে আপনারা যাহা চাহিবেন তাহাই—এমন কি আয়ারল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত—দিতে আমরা পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার পাইতেছি। এরূপ স্বীকারোক্তি করিয়া আলোচনা-সভা আহ্বান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে আপনাদিগকে আমাদের প্রস্তাবগুলিকে যথামূল্যে অবধারণ করিতে পুনর্ব্বার আহ্বান করা যাইতেছে। আমরা আশা করি সম্মিলিত কন্‌ফারেন্সে আলোচিত হইবার পূর্ব্বে আপনারা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। তাহা করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করিতে আপনারা অনিচ্ছুক। আশা করি আমাদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যে স্বাধীনতা আপনাদিগকে দিতে আমরা স্বীকৃত আছি বলিয়া প্রচার করিয়াছি প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রস্তাবে তাহা আপনাদিগকে দেওয়া হইতেছে না বলিয়া যদি আপনাদের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কন্‌ফারেন্সে আলোচনা করিলে সেইসব স্পষ্ট হইয়া উভয় পক্ষের অনেক ভ্রান্তি দূর হইতে পারিবে। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে বাগ্‌বিতণ্ডা ও পত্রব্যবহার বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে এবং এখন কাজের সময় আসিয়াছে। আপনারা কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন কি না তাহা সঠিক ভাবে জানিতে চাহি।'

এইরূপ অনেক কথা-কাটাকাটির পর উভয় পক্ষের প্রতিনিধির আলোচনা স্কটলাণ্ডের ইন্‌ভারনেস সহরে হওয়া স্থির হইল। আবার এক নূতন গোলযোগে তাহা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। ডিভ্যালেরা বলেন যে যখন আইরিশজাতি নিজেদের সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং তিনি যখন তাঁহাদের নির্ব্বাচিত সভাপতি, তখন তিনি এমন কোনও কার্য্য করিতে পারেন না যাহাতে আইরিশ সাধারণতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা সন্ধি হইবার পূর্ব্বেই ক্ষুণ্ণ হয়। কাজে কাজেই সন্ধিসভায় তিনি স্বাধীনরাজ্যের প্রতিনিধিরূপেই যাইতে পারেন। তিনি সেইরূপে আসিবার সুযোগ পাইলেই ইন্‌ভারনেস কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হইবেন, নতুবা নহে।

ইংরেজ মন্ত্রিসভা বলেন যে তাহা হইতে পারে না। ইংলণ্ড পূর্ব্ব হইতেই আয়ারল্যাণ্ডকে স্বাধীনরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিলে পরে আইরিশ জাতি উভয় পক্ষের কল্যাণ না দেখিয়া স্বার্থপরের ন্যায় নিজের সুবিধা ষোল আনা জোর করিয়া রাখিতে চাহিলে ইংলণ্ডের বাধা দিবার উপায় থাকে না। এবং ইংলণ্ড আয়ারল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন না। এইসব বাগ্‌বিতণ্ডায় মিলন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া রয়টার ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার একটু আশার কথা শুনা যাইতেছে। ডিভ্যালেরা বলিতেছেন যে তিনি ইংলণ্ডকে এইরূপ কোনও স্বীকারোক্তি করিতে বলেন নাই। কিন্তু নিজেও আপনার পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। কোন পক্ষ অপর পক্ষের কথা পূর্ব্ব হইতে যদি না মানিল তাহাতে কি আসে যায়? আর পক্ষ প্রতিপক্ষ আপনাদের স্ব স্ব দাবী পূর্ব্ব হইতে ছাড়িবেনই বা কেন? পূর্ব্বে নিজের দাবী প্রত্যেকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া তাহার পর কন্‌ফারেন্সে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া উভয়পক্ষ কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিলেই মিলন হইতে পারে। এই উক্তির পর আবার সম্মিলনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে। দেখা যাউক ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে?

*

নিরস্ত্রীকরণ দর্‌বার

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি উইল্‌সন সাহেবের প্রযত্নে বিগত বিশ্বযুদ্ধের শেষ হয়। তাঁহার প্রস্তাবিত "চৌদ্দ দফা"কে সন্ধির ভিত্তি বলিয়া যুযুৎসু শক্তিপুঞ্জ সকলেই ধরিয়া লওয়াতে পারীর শান্তি-কন্‌ফারেন্সের বৈঠক সম্ভবপর হইল। কিন্তু বৈঠকের সময় রাজনীতিধুরন্ধরদের চক্রে "চৌদ্দ দফা"র দফা রফা হইয়া গেল। পৃথিবীর প্রজাসাধারণ মনে করিয়াছিল বুঝি বিধাতার বিশেষ করুণায় মহাপুরুষ উইল্‌সনের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহার চেষ্টায় পৃথিবীতে বুঝি চিরশান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু যুদ্ধ-শান্তির পরও যখন ইংলণ্ড, যুক্তরাজ্য বা জাপান—পৃথিবীর এই তিন মহাশক্তিশালী রাজ্যের কেহই সশস্ত্র ক্ষাত্রশক্তির হ্রাসের কোনও চেষ্টা না পাইয়া বরঞ্চ নৌবহর ক্রমাগতই বাড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রজাসাধারণের শান্তির আশা নির্ব্বাপিত হইল।

কিন্তু যুদ্ধের বিষময় ফলস্বরূপ প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর নৌবহরের অসম্ভবরূপ বৃদ্ধির জন্য তাহার অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যয়ভার বহন করা সকলের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কে সাহস করিয়া নৌবহর বৃদ্ধি স্থগিত রাখিবে? প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত দেশসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার লইয়া যুক্তরাজ্য, জাপান ও ইংলণ্ডে রেষারেষি আছে। সুযোগ বুঝিলেই একে অপরের উপর অনেকদিন হইতেই টেক্কা দিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের শ্বেত জাতিসমূহের পীতাতঙ্কও বড়ই প্রবল। এইসব সমস্যা বর্ত্তমান থাকিতে কে সাহস করিয়া নৌবহর নির্ম্মাণ বন্ধ রাখিয়া নিজের শক্তিকে খর্ব্ব করিবে? কিন্তু যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করাও যে দুঃসাধ্য। তাই ইহার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা সকল দেশেই চলিতেছে। যুক্তরাজ্যের সিনেট সভার সভ্য সিনেটর বোরা কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যের সিনেট সভায় প্রস্তাব করেন যে, জাপান, যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ড ব্যতীত নৌবলে পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অধুনা বলীয়ান না থাকায় এই তিন জাতির আপনাদের মধ্যে একটি নিষ্পত্তি হইলে নৌবহর বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া সম্ভবপর। তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য যুক্তরাজ্যের তরফ হইতে এই তিন জাতির প্রতিনিধিবর্গকে একটি কন্‌ফারেন্সে আহ্বান করা হউক। কিন্তু নৌবহর বৃদ্ধি বন্ধ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ এবং সৈন্যসংখ্যাও হ্রাস করিবার প্রয়াস দর্‌কার—ইহা অনুভব করিয়া যুক্তরাজ্যের সভাপতি হার্ডিং আগামী নবেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যের ওয়াশিংটন সহরে একটি নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সের বৈঠক স্থির করিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালী রাজ্যকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আহ্বান করেন। হার্ডিংএর নিমন্ত্রণের সাড়া সর্ব্বত্রই পাওয়া গিয়াছে, সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন; জাপান উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আদ্যও বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছেন। কারণ, জাপানের সন্দেহ যে সান্‌টাঙ্গ প্রদেশে, স্যাখালিয়েন ও ইয়াপ-দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জাপান যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন তাহাকে

খর্ব্ব করিবার চেষ্টা এই প্রস্তাবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। সিনেটর বোরা কিন্তু এই সাধারণ ভাবের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধী। তিনি বলেন যে তাহা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে। নৌবল আর কাহারও বিশেষ না থাকাতে এবং ইংলণ্ড, জাপান ও যুক্তরাজ্য অন্যান্য দেশ-সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে, এই তিন দেশ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া নৌবহর কমাইলে বহিঃশত্রুর ভয় থাকে না। কিন্তু স্থলসৈন্যবল হ্রাস করা যায় কি করিয়া? জার্ম্মানীর মিলিটারিষ্ট দল এখনও প্রবল; রাশিয়ার বোল্‌শেভিষ্ট সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতেই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইবে কিরূপে? আর ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ যদি আপনাদের হীনবীর্য্য করিয়া ফেলেন, তখন তুর্কী যদি আবার মাথা নাড়া দেয় কিম্বা হাঙ্গেরী আবার হাঙ্গামা বাধায়, তখন কি উপায় হইবে? আর জাতিসমূহের নিরস্ত্রীকরণ কার্য্য যে প্রকৃতই হইতেছে তাহা দেখিবে কে? যদি কেহ অস্ত্রশস্ত্র কমাইতে রাজি না থাকে তবে তাহার উপায় কি? জোর জবরদস্তি করিয়া নিরস্ত্রীকরণ বড় সোজা ব্যাপার নহে। জার্ম্মানী যুদ্ধে পরাভূত হইয়াও সহজে সৈন্যবল কমায় নাই। কত কমিশন, কত চরমপত্র (ultimatum), কত প্রখর দৃষ্টি ও তদ্বিরাদির পর জার্ম্মানী সৈন্যবল কমাইয়াছেন। এইসকল উপায় অবলম্বন করিতে মিত্রশক্তির বড় কম ব্যয় হয় নাই। স্বার্থে স্বার্থে যতদিন সংঘাত থাকিবে ততদিন এইরূপ উপায়ে সীমা-রেখা টানিয়া ক্ষাত্র বলকে সংহত করা সম্ভবপর নহে। কাজেকাজেই ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স হইতে অধিক সুফল লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। বোরা আরও বলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত পরাধীন ও হীনবল জাতির পক্ষে ন্যায়-বিচার সহজপ্রাপ্য না হইবে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ অসম্ভব করিয়া তোলা না যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষাত্রবল সংহত করিবার চেষ্টা বৃথা হইবে।

তবে এরূপ কন্‌ফারেন্স একেবারে বিফলে নাও যাইতে পারে। হেগ শান্তিসভা বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিবার জন্য কতকগুলি আইন-কানুনের সৃজন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তাহার সকলগুলি আইনই প্রায় ভঙ্গ করা হইয়াছিল। তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেই আইনগুলি পূর্ব্ব হইতে ছিল বলিয়া অনেক স্থলে যুদ্ধ আরও ভীষণ হইয়া উঠে নাই, অনেক নিষ্ঠুরতা ও অহেতুক হত্যা নিবারিত হইয়াছে। অন্তত এরূপ পরোক্ষ ফলও এই কন্‌ফারেন্স হইতে পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

*

অ্যাঙ্গোরা ও গ্রীস

অ্যাঙ্গোরার কামাল পাশার জাতীয় দল মিত্রশক্তিপুঞ্জের চক্ষুশূল। যুদ্ধের শান্তি হইল; তুরস্ক মাথা নত করিলেন; কিন্তু কামালের দল তুরস্কের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অমিতবলে যুদ্ধ করিতেছে। এসিয়াবাসীর এ দুর্জ্জয় সাহস ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের ভাল না লাগিবারই কথা। তাই রয়টারের সংবাদে তুর্কী জাতীয়দলের সংবাদ অতি অল্পই থাকে, যাহাও বা বাহির হয় তাহার অর্দ্ধেক ভুল।

আমরা রয়টারের প্রসাদে বরাবরই শুনিয়া আসিয়াছি যে ওখানের গভর্ণমেণ্ট ও প্রজাপুঞ্জ কামালের বিরোধী। কিন্তু সেদিন একটি সংবাদে সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীকেরা বারম্বার কামালের নিকট পরাজিত হইয়া এবার মরণপণ করিয়াছিল যে এসিয়ামাইনর হইতে তুর্কীকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত করিবে। তাই এবার তাহারা অমিতবলে তুর্কসেনাকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধে হটাইতে লাগিল। অ্যাঙ্গোরা সহরের অতি সন্নিকটে যখন গ্রীক সৈন্য উপস্থিত, তুর্ক-সাম্রাজ্যের আশা ভরসা যখন নির্ম্মূলপ্রায়, তখন সংবাদ পাওয়া গেল কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের মসজিদে মসজিদে দলে দলে নরনারী ভগবানের চরণপ্রান্তে কামালের জয় প্রার্থনা করিতেছে। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে সমস্ত তুরস্কসাম্রাজ্যময় এই একই প্রার্থনা উঠিয়াছিল। স্পষ্টই দেখা গেল যে সমস্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য কামালের প্রতি চাহিয়া আছে। রয়টার সংবাদ দিলেন অ্যাঙ্গোরার পতন হইয়াছে। সমস্ত মুসলমান-জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পরদিন সংবাদ আসিল যে সংবাদটি একটু ভুল। গ্রীক সৈন্য অ্যাঙ্গোরার নিকট পরাস্ত হইয়াছে। গ্রীকসৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত হইয়াছে, দশ সহস্রাধিক গ্রীকসৈন্য ধ্বংস হইয়াছে। রণক্লান্ত তুর্ক-সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে অসমর্থ হওয়াতে গ্রীকসৈন্য সমূলে বিনাশপ্রাপ্তি হইতে বাঁচিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু কামাল তাহার ক্লান্ত সৈন্যবর্গকে উৎসাহিত করিয়া চলিতে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। তুর্ক সেনা ক্লান্তি ভুলিয়া দেশরকার্থে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলে গ্রীসের ভাগ্যে কি ঘটিবে কে জানে?

*

ইজিপ্ট

ইংরেজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইজিপ্টের গোলযোগ মিটাইবার প্রয়াস ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট অনেকদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সুল্‌তান ইংরেজের মনস্তুষ্টির জন্য আদলী পাশাকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। 'মার্শাল ল'র সাহায্য লইয়া ইজিপ্টের জনমতকে দমন করিবার নানারূপ চেষ্টা চলিতে লাগিল। অপরদিকে ইংলণ্ডের সহিত ইজিপ্ট-গভর্ণমেণ্টের একটা বুঝাপড়া করিবার অছিলায় ইংলণ্ডে প্রতিনিধিদল পাঠাইবার ব্যবস্থা সুরু হইল। ইজিপ্টের জনমতের মুখপাত্রদের না লইয়া কেবলমাত্র "মডারেট" দলের মুখপাত্রদের বাছিয়া বাছিয়া লইয়া ডেপুটেশন গড়া হইল। আদলীপাশা নিজে হইলেন এই দলের মুখপাত্র। কিন্তু এত চাপাচাপি সত্ত্বেও, নানা নিপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও ইজিপ্টের জনমত মুখরিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মিশরে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই নির্ব্বাচনে সর্ব্বত্রই মহা অসন্তোষ দেখা দিল। জগ্‌লুল জানাইলেন যে এই ডেপুটেশনের সহিত ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার আলোচনার কোনও মূল্য নাই। আদলীও দমিবার পাত্র নহেন। তিনি সদলবলে মিশরের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ইংলণ্ডে হাজির। এই ব্যাপার লইয়া বিগত ভাদ্রমাসে টাইম্‌স্ পত্রের কায়রোস্থ সংবাদদাতা জগ্‌লুল পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। জগ্‌লুল বলিয়াছেন, ইজিপ্টের স্বাধীনতা-স্বীকারসূচক একটি চুক্তিপত্র প্রথমেই যদি ইংরেজের নিকট হইতে আদলীপাশা আদায় করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য জগ্‌লুল আদলীপাশার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ইংলণ্ড যদি সেইরূপ কোন সর্ত্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হন তবে ইজিপ্টের স্বাধীনতাপ্রয়াসীদলকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। সমগ্র মিশরদেশে আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যায় অশান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। এবিষয়ে সমগ্র মিশরদেশ জগ্‌লুলের সহিত একমত। এ ধারে বার্নেস, বেন্‌স্পুর প্রভৃতি কমন্স সভার কতিপয় উদারমনা সভ্য একটি ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা, আদলীর দল মিশরের প্রতিনিধি হইবার কেন সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত, তাহার কারণ দর্শাইয়া ইংরেজজাতিকে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য মিশরের মার্শাল ল' তুলিয়া দিয়া ইজিপ্টে নূতন নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আদলীপাশার দলের সহিত সন্ধি হইলে মিশরে শান্তি স্থাপিত না হইয়া বরং অশান্তির আগুন জ্বলিবে

বেশী। তাঁহারা বলেন যে, "এই প্রকার উপায়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে তাহার ফল স্বরূপ ইজিপ্টে বহুকালব্যাপী অশান্তি দেখা দিবে—এমন কি শেষে বিপ্লবের আগুনও জ্বলিতে পারে। সে দেশে ব্রিটিশজাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রচার সহজ হইয়া উঠিবে এবং প্রায় দেড়কোটি অধিবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রক্ষা নিষ্পত্তি করিলে এবং যে-প্রকার শাসনতন্ত্রে তাহাদের আপত্তি আছে সে-প্রকার শাসনতন্ত্র তাহাদের স্কন্ধে চাপাইবার প্রয়াস পাইলে, সে ব্যর্থ চেষ্টায় ইংলণ্ডের করদাতাদের করভার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। মার্শাল ল' তুলিয়া দিয়া স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের সহিত যদি কোনও সন্ধি সম্পন্ন হয়, তবে তাহা মিশরবাসীর গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের পক্ষে এখন একমাত্র এই পথ আছে।" লয়েড জর্জ্জের মন্ত্রীসভা কি ইহাদের সুমন্ত্রণা গ্রহণ করিবেন? যদি না গ্রহণ করিয়া এখনও মিশরে পূর্ব্বের শাসননীতি পরিচালনের প্রয়াস করেন তবে মিশরে ঘোরতর অশান্তি সুনিশ্চিত।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

—

ভারতবর্ষ

দলননীতির সূত্রপাত।—

কিছুদিন ধরিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই দলননীতির প্রকোপ দেখা যাইতেছে। একধারে দেশবাসী যেমনই নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনটি সফল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, অপরধারে আমলাতান্ত্রিকদেরও তেমনি চেষ্টা চলিতেছে ইহাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার। সুযোগ পাইলেই ধর-পাকড় করিতে তাঁহারা কসুর করিতেছেন না। বেহার, যুক্তপ্রদেশ, ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে সাধারণতঃ ধর-পাকড় হইতেছে মদ ও বিদেশী বস্ত্র-বিক্রয়-নিবারণের পিকেটীং লইয়া। অবশ্য কেহ কেহ তাঁহাদের বক্তৃতার জন্যও ধৃত হইতেছেন। ধর-পাকড় ছাড়াও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতেও আমলাতান্ত্রিকেরা ত্রুটি করিতেছেন না; এবং সব সময়েই যে তাহা সুবুদ্ধি-প্রণোদিত বা আইনসঙ্গত তাও নয়। সম্প্রতি বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের স্ত্রীদের বর্ত্তমান আন্দোলনের মতামতের জন্য দায়ী এবং যথাসাধ্য এই আন্দোলন হইতে তাঁহাদের বিরত রাখিতে বাধ্য। বর্ত্তমান আন্দোলন যে কতদূর গর্হিত তাহা বুঝাইবার জন্য বেহার গভর্ণমেণ্ট ত লম্বা লম্বা ইস্তাহারের উপর ইস্তাহার জারী করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশ সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছেন। সেখানে আমন সভা নামে রাজভক্তদের একটি সভা গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট লোকদের সেই সভার সভ্য করিবার জন্য জোর জুলুম করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। সভ্য না হওয়ার জন্য কোন কোন কর্ম্মচারীর পদচ্যুত হইবার ঘটনাও শুনা গিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই, অত্যাচারকে বীরের ন্যায় অম্লান বদনে বরণ করিয়া লইবার বহু দৃষ্টান্তই ভারতের নানাস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে বালক ও রমণীর শৌর্য্যের দৃষ্টান্তও কম নয়,—বিশেষ করিয়া রমণীর। আজ ভারতের এই দুর্দ্দিনে বহু নারীই যে বীরত্ব ও দৃঢ়তা দেখাইতেছেন তাহা আশাপ্রদ ও গৌরবের বিষয়। মান্দ্রাজে মৌলানা মহম্মদ আলি যখন ধৃত হইলেন, তাঁহার মাতার ও স্ত্রীর তখনকার ব্যবহার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। কাতরতা ভুলিয়া পুত্র ও স্বামীকে তাঁহারা জানাইয়াছেন মহম্মদ আলির অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রিয় প্রচেষ্টাটি যাহাতে বিনষ্ট না হইয়া যায় তাহাতে তাঁহারা যত্নপর থাকিবেন। মাতা ও বধূ দুইজনেই উৎসাহ সহকারে মহাত্মা গান্ধির সহিত কাজে আসিয়া নামিয়াছেন। এরূপ ঘটনা আরও বহুস্থান হইতেই শুনা যাইতেছে। গোলাম মুজাদিদের মাতা পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে, ক্ষমা চাহিয়া খালাস পাইলে তিনি তাঁহার মুখ দেখিবেন না। বাংলা দেশে ত সেদিন পির বাদশাহ মিঞা মাতার উৎসাহেই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক এই অত্যাচারের মধ্য দিয়াই দেশ সত্যের পরখ হইবে—আগুনে খাঁটি সোনাই বাহির হইবে।

করাচির মোকদ্দমা।—

মৌলানা শৌকৎআলি ও মহম্মদআলি ভ্রাতৃদ্বয় আজ বহুকাল ধরিয়াই গভর্ণমেণ্টের নেক-নজরে পড়িয়াছেন। খিলাফৎ সমস্যায় তাঁহারা যাহা বলিতে চান তাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ রুচিকর নয়। পূর্ব্বে তাঁহারা মনখোলাভাবে অনেক কথাই বলিয়াছেন এবং সব সময়েতেই যে তা শান্তিজনক ছিল তা নয়। সেজন্য তাঁহারা কিছুদিন আটক হইয়াও ছিলেন। কিন্তু মুক্তি পাইয়া মহাত্মা গান্ধির সহিত মিলিত হইবার পর হইতে তাঁহারা নিজেদের যথাসাধ্য সংযত করিয়া লইয়াছিলেন। এবং নিরুপদ্রব পন্থা অবলম্বনে স্বরাজলাভ প্রচেষ্টায় তাঁহারাও ছিলেন দুইজন প্রধান পাণ্ডা। কিছুদিন পূর্ব্বে ৮ই, ৯ই ও ১০ই জুলাই তারিখে করাচিসহরে খিলাফৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নিখিল-ভারতীয় খিলাফৎ সভার একটি বৈঠক বসে। তাহাতে কতকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। তাহার মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল মুস্তাফা কমাল পাশার ও তাঁহার অ্যাঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টের অপূর্ব্ব জয়লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা ছিল যে যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অ্যাঙ্গোরার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করেন (resumes hostilities) তবে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের সহযোগে কর দেওয়া প্রভৃতি দেওয়ানী কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবেন (resort to civil disobedience)। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ কতিপয় নেতা বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় নাকি এমন কিছু ছিল যাহা রাজবিদ্রোহজনক এবং পেনাল কোডের ধারার মধ্যে পড়ে। যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না, নেতৃবর্গকে 'পাকড়াও' করিতে স্থির করিলেন। কথাটা অনেক দিন হইতেই শুনা যাইতেছিল। ইতিপূর্ব্বেও একবার মহম্মদ আলিকে তাঁহার একটি বক্তৃতার জন্য ধরিবার প্রস্তাব উঠে। কিন্তু তখন গান্ধি-রেডিং-মোলাকাতে তাহা মূলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জের যে ঐখানেই মিটিল না তা পরে গান্ধির অনুশোচনাতেই বোঝা গিয়াছিল। যাহা হউক অনুমান পরে সত্যই হইয়া উঠিল। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার জারী করিলেন যে, মৌলানা শৌকৎআলি ও মহম্মদআলি প্রমুখ কয়েকজনকে পিনাল কোডের ১২০ বি, ১৩১, এবং ৫০৫ ধারায় অভিযুক্ত করা হইবে এবং মৌলানা মহম্মদ আলি ও শৌকৎ আলিকে পুনরায় ১২৪ বি ও ১৫৩ বি ধারা অনুসারে বিচার করা হইবে। সেই অনুসারে ধরপাকড়ও আরম্ভ হইয়া গেল। সর্ব্বসমেৎ ৭ জন নেতাকে ধরা হইয়াছে—মহম্মদ আলি, শৌকৎআলি, ডাক্তার কিচলিউ, সারদা পীঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য, পির গোলাম মুজাজিদ, মৌলানা হোসেন অহ্‌ম্মদ, মৌলবী নিশার আহ্‌মেদ্। করাচিতে ইঁহাদের মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন তাহাতে লেখা আছে যে স-কৌন্সিল গভর্ণর এই ধর-পাকড়ে মত দিয়াছেন। এই ব্যাপারে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের বা সকল কৌন্সিলারদের (executive councillor) মত আছে কি না

তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'বম্বে ক্রনিক্‌লে' এক বিশিষ্ট ব্যক্তি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহা পড়িয়া বেশ বোঝা যায়, কৌন্সিলে যে দুইজন ভারতীয় সভ্য আছেন (সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ও সার চিমনলাল সিতলবাড়) তাঁহারা দুইজনই ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং মন্ত্রীদের কোন পরামর্শই লওয়া হয় নাই। দুইজন ইংরেজ সভ্য ও গভর্ণরের মতানুসারেই এই কাজ হইয়াছে। ঘটনাটি কতদূর সত্য বলা কঠিন। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান সংশোধিত কৌন্সিলগুলি যে কি এবং ভারতীয়ের মতেরও যে মূল্য কি তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

মোপ্‌লা-বিদ্রোহ।—

মোপ্‌লাদের হাঙ্গামা এখনও মিটে নাই। তবে তাহাদের দলবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া হঠাৎ আসিয়া লুঠ-তরাজ করিয়া পলাইয়া যাইতেছে। যাতায়াতের পথও নষ্ট করিবার জন্য তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া চেষ্টা করিতেছে। ২০শে আগষ্ট তারিখে যে লাল পতাকাটি লইয়া তাহারা প্রথম পুলিসকে আক্রমণ করে তাহা সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—"খিলাফৎ, আল্লাই মহৎ। প্রত্যেকেই,—যুবা বৃদ্ধ সবল বা দুর্ব্বল, পদাতিক বা শকটারোহী, ধনী বা নির্ধন, সশস্ত্র বা নিরস্ত্র, সুস্থ বা অসুস্থ, প্রত্যেকেই সমস্ত ভুলিয়া ভগবানের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও।" বিদ্রোহীদের বিচারার্থে বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হইয়াছে।

রোড্‌স্‌ স্কলার্শিপ।—

১৯০২ সালে শ্রীযুক্ত সিসিল রোড্‌স্‌ নামক জনৈক ক্রোড়পতি বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশ, ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের যুবকদের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা পৃথিবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থান ও উপকারিতা সম্যকরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মিলন সহজ হইবে এবং অন্যান্য দেশের লোকেরাও ইহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবে। জার্ম্মানদেশের যুবকদের জন্য এইরূপ পাঁচটি বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইতে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শেঠ্‌না কাউন্সিল অফ্‌ ষ্টেটে প্রস্তাব করেন যে ঐ পাঁচটি স্কলার্শিপ যাহাতে ভারতবর্ষীয় যুবকেরা পায় গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করুন। কাউন্সিলের কেহ কেহ বিশেষতঃ সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিংহ ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন ও বলেন যে ইহাতে ভারতবর্ষের আত্মসম্মানের লাঘব হইবে। কেননা রোড্‌স্‌ সাহেব তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্জ্জন করেন আর ঐ দক্ষিণ আফ্রিকায় এই কালা আদ্‌মীদের প্রতি প্রীতির যথেষ্ট পরিচয়ই ত আমরা পাইয়াছি। কিন্তু যাঁহারা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া শাসন-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন এবং স্বদেশোদ্ধার করিবেনই স্থির করিয়াছেন তাঁহারা কাঁড়া আর আকাঁড়া চালে তফাৎ দেখিলেন না— সুতরাং শেঠ্‌নার প্রস্তাব কাউন্সিল কর্ত্তৃক গৃহীত হইল।

শিক্ষায় দান।—

বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রীযুক্ত ধনজীভাই বোমানজী গরীব পার্শী বালকদিগের শিক্ষার জন্য এক কোটা টাকা দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেহ শিক্ষায় জন্য এত টাকা দান করেন নাই। শুধু আমেরিকার দানবীরদের সঙ্গেই তাঁহার তুলনা হইতে পারে। কি-ভাবে এই টাকা ব্যয় করা হইবে তাহা এখনও স্থির করেন নাই; তবে তাঁহার ইচ্ছা ৮ হইতে ১৮ বৎসরের বালকেরা ইহাতে ব্যবসা, শিল্প ও গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিক্ষা করে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা।—

১লা সেপ্টেম্বর মাস হইতে সিম্‌লা সহরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দুইটির দ্বিতীয় বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট দুইটি সভার সভ্যদিগের নিকট এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় যুবরাজের আগমন, টমাস হলাণ্ডের কীর্ত্তি, আফগান-মিতালী, ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্য সভা, গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসননীতি, সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতি—এক কথায় বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বসমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ছিল। তাঁহার বক্তৃতায় একটি সুখবর ছিল। বহুকাল হইতেই আমাদের দেশের একদল লোক ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতেও সামরিক কর্ম্মচারীদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের জন্য বার বার বলিয়া আসিতেছেন। বড়লাট সাহেব বলিয়াছেন এবার এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। দেরাদুন সহরে কলেজটি স্থাপিত হইবে, আপাততঃ ৭০ জন ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা থাকিবে। কলেজটির নিয়মপ্রণালীর একটা খস্‌ড়া সেক্রেটারী অফ ষ্টেট-এর নিকট পাঠানো হইয়াছে এবং আশা করা যায় যুবরাজদ্বারা এই কলেজ-গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দুইটি এখন পর্য্যন্ত দেশের কি কি কাজ করিয়াছেন তাহা বলা দুরূহ; তবে এমন বহু বিষয়ের প্রস্তাব, বিল, ও সুপারিস্‌ করিয়াছেন যাহা গৃহীত এবং কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতের মঙ্গলই হইবে। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতের বহু কথাই বলিবার আছে—কিছু কিছুর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, কিছু কিছু নূতন করিয়া প্রণয়নের আবশ্যক এবং কিছু কিছু একেবারে উঠাইয়া দেওয়াই দরকার। সভা দুইটি যে ইহা করিবার একেবারেই চেষ্টা না করিতেছেন তাহা বলা যায় না।

বড়লাট সাহেবের বক্তৃতার পর ব্যবস্থাপক সভা দুইটি সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন যুবরাজের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে। কাউন্সিল অফ ষ্টেটে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লীতে একটু গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। দেশের মধ্যে যে প্রতিবাদ তাহা সেখানেও একটু ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধি অগ্নিহোত্রী মহাশয় শুধু দেশের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লীতে অনেক বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোশী এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন মজুরদের (workmen) চুক্তি-ভঙ্গ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আইনটির পরিবর্ত্তন করিবার জন্য। বর্ত্তমানে আছে যে চুক্তি-ভঙ্গ করিলে তাহারা ফৌজদারী আইনানুসারে অভিযুক্ত হইবে। যোশী সেই ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে চান—তাঁহার মতে ইহা দাসত্ব প্রথারই রকমভেদ। সভ্যদের বিরুদ্ধ-অভিমত দেখিয়া যোশী প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

ইহার কয়েক দিন পরে সরকারের পক্ষ হইতে ভিন্‌সেণ্ট সাহেব ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র-আইনটি (Indian Press Act) উঠাইয়া দিবার 'বিল' সভায় উপস্থাপিত করেন। ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় যে কড়াকড় আইন ছিল, তাহা ইহাতে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত সমর্থ এক প্রস্তাব আনেন যে ফৌজদারী-ব্যাপারে কালা ও সাদার বিচারের যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে তাহার পার্থক্য ঘুচাইয়া দেওয়া হউক। সরকারের পক্ষ হইতে ভিন্‌সেণ্ট সাহেব বলেন যে

একটি কমিটিকে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ভার দেওয়া হউক। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে তাহাই করা ঠিক হইয়াছে।

শাসন ও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য, দুই বৎসরের মধ্যে উপনিবেশগুলির ন্যায় ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনলাভের উপযুক্ততা প্রভৃতি বহুবিষয়েই সভাদুইটি আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে হইতেছে। দেশের মনে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে তাহা কি এই প্রস্তাব পেশ, ও পেশ না করাতেই মিটিবে? আর একটা কথা। কার্য্যকলাপ দেখিয়া এই দুইটি সভার যে কি প্রয়োজন তাহা বুঝা গেল না। একটিই কি যথেষ্ট নহে"

ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন।—

ভারতের আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী অচিরাৎ ঘুচাইবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য খুব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। নূতন ভারত-বিধিতে কথা ছিল যে বর্ত্তমানে যে শাসন-প্রণালী ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ক্ষণিক—স্বায়ত্তশাসনে ভারতবাসীকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য একটি সোপানমাত্র। এখানে ভারতবাসী কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উচ্চ সোপানের উপযুক্ত হইবে। কিন্তু কথা ছিল দশ বৎসর পরে ভারতবাসীর এই দক্ষতার পরীক্ষা লওয়া হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় রায় যদুনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত টি, ভি, শেষগিরি আইয়ার এই সম্বন্ধে দুইটি প্রস্তাব আনিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ভারতের আর পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। প্রাদেশিক সভাগুলিতে ভারতবাসী তাঁহাদের স্বায়ত্তশাসনের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাই আর সময় নষ্ট না করিয়া ব্যবস্থাপক সভার চতুর্থ অধিবেশনের সময় হইতেই অর্থাৎ আগামী বৎসরেই ভারত যাহাতে স্বায়ত্তশাসন পায় সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা হউক। শেষগিরি আইয়ার মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে আপাততঃ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মত ভারতীয় গভর্ণমেণ্টেও 'ডায়ার্কি' বা দুই স্তরে বিভক্ত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেই চলিবে। যদু-বাবু চান উপনিবেশগুলির ন্যায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। তিনি বর্ত্তমান দুই স্তরে বিভক্ত শাসন-প্রণালীর বিপক্ষে। তিনি বলেন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কাজই ব্যবস্থাপক সভাগুলির অধীনস্থ করিয়া দেওয়া হউক এবং মন্ত্রীদের সাহায্যেই তাহা নির্ব্বাহ করা হউক। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধেও তাঁহার সেই ব্যবস্থা। সামরিক প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ ছাড়া সমুদয় বিভাগগুলিকেই ব্যবস্থাপক সভার কাছে তিনি দায়ী করিতে চান। যদু-বাবুর প্রস্তাবটি ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এখনও বিচার শেষ হয় নাই। সপক্ষে বিপক্ষে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট যে কি করিবেন তাহা বলা কঠিন। দেশের মধ্যে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে ক্ষুধা জন্মিয়াছে, তাহা যে বর্ত্তমান "রিফর্ম্‌ড্‌" বা সংস্কৃত শাসনপ্রণালীতে মিটিবে না তাহা সকলেই বেশ বুঝিয়াছে। কিছু না কিছু আরও অধিকার শীঘ্রই দেওয়া দরকার। গভর্ণমেণ্টেরও এরূপ কিছু দেওয়া মৎলব আছে কি না বুঝা যায় না। তবে একটা ঘটনায় কিছু খট্‌কা লাগিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বড়লাট সাহেব ভারতের তরফ হইতে আগামী শীতকালে পার্লেমেণ্টের সভ্যদের ভারতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ভারতের 'ভাগ্যবিধাতা' ভারত ব্যবস্থাপক পার্লামেণ্টের স্থায়ী-সমিতির (Standing Joint Committee for India) সভ্যেরাও আছেন। দেখা যাউক কি হয়।

ব্যবস্থাপক সভায় সঙ্ঘনীতি।—

বহুদেশেই ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যগণই এক-একটি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিয়া থাকেন। রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে কতকগুলি স্থূল মতের ঐক্য অনুসারে এই দলগুলি গড়িয়া উঠে। সভ্যদের ব্যক্তিগত বহুবিষয়ে মতের অনৈক্য থাকিলেও সাধারণতঃ তাঁহারা দলানুবর্ত্তিতা করিয়াই থাকেন। এরূপ দলের দোষও যেমন আছে উপকারিতাও তেমনই আছে। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতীয় বা ব্যবস্থাপক সভাগুলির মধ্যে এরূপ দল সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি ভারতীয় একটি ব্যবস্থাপক সভার (লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লী) ২৭ জন সভ্য মিলিয়া এরূপ একটি দল বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা দলটির নাম দিয়াছেন "ডেমক্র্যাটিক পার্টি।" ১৬ই সেপ্‌টেম্বর সিম্‌লা সহরে মিলিত হইয়া তাঁহারা ঠিক করেন যে অচিরাৎ দায়িত্বমূলক শাসন-প্রণালী পাইবার জন্য যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাঁহারা করিবেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে একজোট হইয়া কাজ করিবেন এবং ভোট দিবেন।—(১) গভর্ণমেণ্টের ব্যয় কমানো, (২) আয় ব্যয়ের স্বকর্তৃত্ব, (৩) মুদ্রা ও বিনিময়-তত্ত্ব, (৪) উচ্চপদে ভারতবাসীকে বসানো, (৫) ভারতবাসীর মঙ্গলের ও সুবিধার দিকে তাকাইয়া গভর্ণমেণ্টের শাসননীতির বিচার, ইত্যাদি।

ডাক্‌হর্‌করা।

বাংলা

দরিদ্রদেশের অর্থের অব্যবস্থা—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর পুলিসের জন্য প্রায় দুইকোটা টাকা ব্যয় করিতে হয়; তন্মধ্যে ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হয় খাস কলিকাতার জন্য। পল্লীবাসীর অর্থ যাহাতে বাবুভায়াদিগকে রক্ষা করিতে ব্যয়িত না হইয়া প্রকৃত করদাতাগণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় হয় তজ্জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ অজয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। ফলে কলিকাতার ও মফস্বলের সভ্যগণের মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলিয়াছিল। অবশ্য এই টাকাটা কলিকাতাবাসীগণকে দিতে হইলে বাড়ীর ভাড়া অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে উক্ত ৩৭ লক্ষ টাকা পল্লীবাসীর যে-কোন মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যয় করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

—যশোহর।

বাংলার রাজকোষেরদুরবস্থা—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এখন বাৎসরিক আয় ১০॥০ কোটী টাকা। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে এ বৎসরের খরচ চালান হইয়াছে, তাই পাট হইতে প্রতি বৎসরে যে দুই কোটা টাকা রপ্তানি শুল্ক আদায় হয় তাহা যাহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয় এইজন্য মন্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন সিম্‌লা গমন করিয়াছেন।—যশোহর।

দুঃখের বিষয় মন্ত্রীরা শূন্যহস্তে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাংলার শিক্ষার দুরবস্থা—

কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ বিস্ রটারি ক্লাবে এক বক্তৃতায় বলেন যে, বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বড় শোচনীয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক বেতন ৪৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা অর্থাৎ গড়ে ১০৲ টাকা মাত্র। একজন সাধারণ শ্রমজীবীও ইহা অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন করে। যদি কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মিউনিসিপ্যালিটী লোকালবোর্ডে বা জেলাবোর্ড অর্দ্ধেক টাকা প্রদান করেন তাহা হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট

বাকী অর্দ্ধেক টাকা দিতে সম্মত আছেন। প্রত্যেক স্কুলে ইংরেজী শিখাইবার কথা উত্থাপন করিলে মিঃ বিস্ বলেন যে, তাহা হইলে ইহাতে বৎসরে এক কোটী টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা ব্যয় করেন।—যশোহর।

দেশের দুরবস্থা—

গাড়োয়ালের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে বস্ত্রাভাব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত দান ফুরাইয়া আসিয়াছে, ডিষ্ট্রিট-রিলিফ-কমিটীও আর এখন আবশ্যকমত-সাহায্য দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা বিদেশী বস্ত্র আগুনে পোড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাঁহারা কি এই বস্ত্রহীন দেশবাসীদের প্রতি তাকাইবেন না?—ঢাকাপ্রকাশ।

দান ও সদনুষ্ঠান—

খুলনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য—খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারীরা রাঁচি, পুরুলিয়া, লোহারদাগা প্রভৃতি সহর হইতে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া যে-অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে চতুর্থ দফার ১০৩, টাকা খুলনার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের নিকট ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল।—বসুমতী।

সাহায্য দান—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ দ্বিতীয় কিস্তীতে খুলনা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ২০০, টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার টিকিট বিক্রয় করিয়া পনর শত টাকা উঠিয়াছে। এই টাকা খুলনা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে।—কাশীপুরনিবাসী।

রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার এ এস জামাল খুলনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্য করিবার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এত অধিক টাকা খুলনার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত আর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।—ঢাকাপ্রকাশ।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে, কলিকাতার মেসার্স বিরলা ব্রাদার্স খুলনা দুঃভিক্ষ ফণ্ডে ৭০০০, সহস্র টাকা দান করিয়াছেন, এ দানের সার্থকতা আছে।—যশোহর।

শাঁখারীটোলা-নেবুতলা সাধারণ সাহায্য সমিতির সভ্যগণ গত রবিবারে শাঁখারীটোলা চাঁপাতলা ও বাদুড়বাগান প্রভৃতি পল্লীতে গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। ঐদিন তাঁহারা এক শত বিয়াল্লিশ টাকা সাড়ে ছয় আনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ৬২ খানা কাপড় ও জামা পাইয়াছিলেন। উক্ত সমিতির জনৈক সভ্য তাঁহার কর্ম্মস্থান ফেঙ্ক মোটর কোম্পানীর আফিস হইতে ১২৷৴১০ আদায় করিয়াছিলেন। এই-সমস্ত টাকা, বস্ত্র ও জামা এবং কিছু চাউল ও ময়দা তাঁহারা খুলনা দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।—বসুমতী।

মেডিক্যাল স্কুলে দান।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ফণ্ডের জন্য যে প্রচুর টাকা উঠিয়াছিল, ঐ ফণ্ডে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহ সহরে যে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইবে, সেই স্কুলের সাহায্যের জন্য এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা পাওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল স্কুলে একটি এনাটমিক্যাল ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য আপাততঃ ১২৫০০, টাকা দান করিয়াছেন।

—ঢাকাপ্রকাশ।

খুলনা দুর্ভিক্ষে সাহায্যার্থ সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গত ২৩এ আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪৯৩৭১৷৴১ চাঁদা পাইয়াছেন। ঐ টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রেরও পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে; এখনও সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

—বসুমতী।

খুলনা দুর্ভিক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।—৬১ খানি গ্রাম সমন্বিত একটি কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীগণ, ১৭০৮ জনকে ৮৫৴০ মণ ৫০ পোয়া হিসাবে চাউল বিতরণ করিতেছেন। ২২৪ জোড়া নূতন ও কয়েক জোড়া পুরাতন বস্ত্র এবং ১৮ বোতল এডওয়ার্ডস্ টনিক, বস্ত্রহীন রুগ্নদের মধ্যে তাঁহারা বিতরণ করিয়াছেন।

—পাবনাবগুড়াহিতৈষী।

কনিকার রাজার বদান্যতা।—কনিকার রাজা বাহাদুর দরিদ্রগণের সেবার জন্য তাঁহার রাজ্যের চারিটি এলাকায় চারিটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন যে-সকল দরিদ্র উক্ত আশ্রমে আসিয়া আহার করিতে দ্বিধা বোধ করিবে, তাহাদের সাহায্যের জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

জলের কলের দান—পাবনার পরলোকগত ৺বনমালী রায় বাহাদুরের পুত্রগণ সেখানকার জলের কল প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে ৫০,০০০, টাকা চাঁদা দিয়াছেন। তাঁহারা এই দান দ্বারা পিতার উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন।—কাশীপুরনিবাসী।

শ্রমজীবীর প্রশংসনীয় দান—

মির্জ্জাপুর পার্কে গাড়োয়ানগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রায় ২০,০০০ লোক উপস্থিত ছিল। দেবকী সিং নামে একজন গাড়োয়ানদের চৌধুরী অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় নিজেদের অভাব-অভিযোগের বর্ণনা করেন এবং তাঁহারা গাড়োয়ান ভাইগণকে একটি সভা অনুষ্ঠান করিয়া শীঘ্রই প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারিত করিতে বলেন। সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের গাড়োয়ানগণ মহাত্মা গান্ধীকে দশ হাজার টাকা পূর্ণ একটি থলে উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছে। এই টাকা তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারে যাইবে। তখন সভায় গাড়োয়ানগণের মধ্যে চাঁদা সংগৃহীত হইতে থাকে এবং প্রায় সকল গাড়োয়ানই এক দুই টাকা করিয়া যাহার যাহা সাধ্য দিতে আরম্ভ করে। এইরূপে সভায় অনেক টাকা সংগ্রহ হয় এবং বাকি টাকা শ্রীযুক্ত দাশের নিকট পাঠানর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।—বসুমতী।

কৃতী মহিলা—

ডাক্তারী পরীক্ষায় উড়িষ্যা মহিলা।—বিহার উড়িষ্যার ডাক্তারী পরীক্ষায় শ্রীমতী কুন্তল কুমারী সাব্বার্থ নাম্নী একটি মহিলা এবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

বস্ত্রের কথা—

ভারতের লোকসংখ্যা ও বস্ত্রের হিসাব।—১৯১১ সালের মে মাসে সমগ্রভারতে লোকসংখ্যা ছিল, প্রায় ৩১৫০০০০০০ একত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। হিসাবে দেখা যায়, ৫১১০১০০০০ পাঁচশত এগার কোটি এক লক্ষ গজ কাপড় ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে ছিল। গড়পড়্তায় প্রতি ব্যক্তি ষোল গজ কাপড় ব্যবহারের জন্য পাইয়াছে। কিন্তু ১৯১৮-১৯, এবং ১৯১৯-২০ সালে, এই দুই বৎসরে কাপড় কমিয়া যায়। ঐ সময়ে মাত্র ৩২৭২৩০০০০০ তিন শত সাতাশ কোটী তেইশ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে ছিল। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে মোট

লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, চল্লিশ লক্ষ। তাহা হইলে এখন, গড়ে জন প্রতি পড়ে মাত্র ১০ দশ গজ। কাপড়ের দর বাড়িয়া যাইবার ইহাও একটি কারণ। ভারতবর্ষের মিল এবং বিদেশ হইতে এদেশে কাপড় আসিয়াছে, ২২৭২৪০০০০০ দুই শত সাতাশ কোটি চব্বিশ লক্ষ গজ দেশীয় মিল হইতে এবং ৯৯৯৯৫০০০০ গজ বিদেশ হইতে পাইয়াছি, ১৯১৮-১৯, ১৯১৯-২০ সালে বিদেশ হইতে আসিয়াছে ১৭২৮৫০০০০ গজ।

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা

হিন্দু	২১৭,৫৮৬৪৪৫
শিখ	৩০১৪৪৪০
জৈন	১২৪৮১৮২
বৌদ্ধ	১০৭২১২২৮
পার্শী	১০০০৯৬
মুসলমান	৬৬,৫৯৩১৭৭
খ্রীষ্টান্	৩৮৭৬১৯৬
নানাজাতি মিশ্রিত	১০,২১৭৫৪৪
অন্য অগণনীয়	৫৮০৮১
মোট	৩১৩,৪১৫,৩৮৯

— প্রবাস জ্যোতিঃ।

কলিকাতায় বিদেশী কাপড়—কলিকাতার বড় বাজারে বিলাতী কাপড়ের ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার সফলতা দেখিয়া মনে হয় সত্বরই বঙ্গদেশ হইতে বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসা এক প্রকার উঠিয়া যাইবে। যে-সকল সাহেব সওদাগর বিলাত হইতে কাপড় আনাইয়া থাকেন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ তাহাদের নিকট হইতে বর্ত্তমান ইংরেজী বর্ষে আর কোনও কাপড় কিনিবেন না বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। বিলাতী বস্ত্রের উপর যে, ট্যাক্স আদায় হইয়া থাকে তাহা যাহাতে উঠিয়া যায় তজ্জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়-কুলের কতক প্রতিনিধি সত্বরই ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। এই সুযোগে ভারতে বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কলিকাতার কুলি মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ পর্য্যন্ত যেরূপভাবে বিলাতীবস্ত্রের ব্যবসা পরিত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে আশা হয়, সত্বরই বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। এই আন্দোলনের কৃতকার্য্যতা সর্ব্বোপরি আমাদের নিজের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমরা যদি বিলাতী বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিই, যদি বিলাতী বস্ত্র ক্রয় না করি, তাহা হইলে আর উহার সফলতার জন্য আমাদের অন্য কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না।

—চারুমিহির।

গত জুন মাসে ভারতীয় দেশী কাপড়ের কলে দুই কোটী ৯০ লক্ষ সের সুতা এবং এক কোটী ৭০ লক্ষ সের কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর জুন মাস অপেক্ষা এবৎসর জুন মাসে ২০ লক্ষ সের সুতা বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।—যশোহর।

কলিকাতা মাড়োয়ারী বণিক সভার এক মহতী অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে কোন মাড়োয়ারী বিদেশী কাপড় আমদানী করিতে পারিবে না এবং বণিক সভার সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যদি কেহ কাজ করে, তাহা হইলে কোন মাড়োয়ারী তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। সভায় ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বণিক সভার প্রতিনিধিগণ প্রত্যেক বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতার নিকট গমন করিয়া বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবেন। মাড়োয়ারীগণের দ্বারাই বিদেশী বস্ত্র বাঙ্গালার প্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে, আজ যদি মাড়োয়ারীগণ বিদেশী বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইচ্ছা থাকিলেও কেহ বিদেশী কাপড় ক্রয় করিতে পাইবে না। এ পাপের প্রশ্রয়দাতা মাড়োয়ারীগণ তাহাদিগকেই তাহার জন্য প্রথম প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।—যশোহর।

গত ১৯১৯, ১৯২০ এবং ১৯২১ সালে বিদেশ হইতে ভারতে কত গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

১৯১৯	১৯২০	১৯২১
গজ	গজ	গজ
	শাদা ধুতি শাড়ি :—	
৭৩১৮৭০৫১	১৬৭৮৪৬০৭৬	৫৭০৫০৩০৪
	রঙ্গিন কাপড় :—	
৩৩৬৫৪৯০৩	১৬৩৪১০৪৫৯	৪৭৪৩৯১৪২

—যশোহর।

জয়া খেলাফৎ বয়ন বিদ্যালয়—মৌলবী মহম্মদ গোলাম রহমানের এই বয়ন বিদ্যালয়, কতিপয় মহোদয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এখন নানাপ্রকার বস্ত্র বয়ন প্রণালীতে জেয়ালে, বাপ্তা, ডায়মণ্ড টুল ইত্যাদি নানা ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী যথোপযুক্ত বস্ত্র প্রস্তত নিয়মাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়। জায়গীরের সুবন্দোবস্ত আছে। ঠিক বেতন ৭৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—কাশীপুরনিবাসী।

স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বঙ্গীয় খিলাফত কমিটীর উদ্যোগে কলিকাতায় একটি নিখিল ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হইবে তাহাতে স্বদেশী বস্ত্র, চরকা, তাঁত, সুতা প্রভৃতির উপরই জোর দেওয়া হইবে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই প্রদর্শনীতে যে অনেক উপকার দর্শিবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—যশোহর।

স্বাধীন ব্যবসার কথা—

চিনি কমিটীর অনুসন্ধান।—চিনির ব্যবসায়ে এক সময়ে ভারতবর্ষ সকল দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। ভারতের উৎপন্ন চিনি দেশের অভাব মোচন করিয়া অন্যান্য দেশের লোককে মিষ্টমুখ করাইত। কিন্তু বৃটিশ অবাধ বাণিজ্য নীতি যেরূপ ভারতের বহু শিল্প নষ্ট করিয়াছে, সেইরূপ চিনির ব্যবসায়েরও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। বিগত যুরোপীয় যুদ্ধে ইংরেজ বুঝিয়াছেন যে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার শিল্পোন্নতি হইলে তাঁহাদিগকে পরদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। এইজন্যই কি উপায়ে ভারতের শিল্পোন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য গতবৎসর শিল্প কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। এবং কি উপায়ে ভারতে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য Indian Sugar Committee নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এখানকার ইক্ষুর আবাদের অবস্থা ও চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী পরিদর্শন করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য যে-সকল দেশে চিনি উৎপন্ন হয় এবং বিশেষতঃ যে-সকল দেশ চিনির ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া, ভারতে সে-সকল দেশের ইক্ষুর আবাদ ও চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে কি

না, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। কমিটী কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমরা সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।—

বাঙ্গালাদেশই যে পৃথিবীর লোককে চিনি খাইতে শিখাইয়াছে এই রিপোর্ট পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অথচ এই বাঙ্গালাদেশের চিনির ব্যবসায়ের উন্নতি সম্বন্ধে রিপোর্টে আমরা কোন আশার সংবাদ পাইলাম না। বাঙ্গালার স্থান এক্ষণে কিউবা দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। যে বাঙ্গালাদেশের চিনি এক সময়ে পূর্ব্বদিকে চীনে এবং পশ্চিমে য়ুরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি হইত, সেই বাঙ্গালাদেশ এক্ষণে চিনি উৎপাদনে ভারতবর্ষে চতুর্থ স্থানে অধিষ্ঠিত। চিনি অনুসন্ধান-কমিটী বলেন বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালাদেশ দ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালার এই অধোগতির প্রধান কারণ বর্ত্তমান কৃষিপ্রথা। বাঙ্গালায় যেরূপ অল্প পরিশ্রমে ধান পাট উৎপন্ন হয়, ইক্ষুর আবাদ সেরূপ অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে হয় না বলিয়াই এখানকার কৃষকেরা ইক্ষুর আবাদে সেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করে না। তাহার পর বাঙ্গালার ইক্ষু হইতে যে গুড় প্রস্তুত হয় অধিবাসীরা তাহার অধিকাংশ ব্যবহার করার ফলে, চিনি প্রস্তুতের জন্য অল্পই গুড় অবশিষ্ট থাকে। বাঙ্গালার সকল জেলাতেই ইক্ষুর আবাদ হয়, এমন কি দার্জ্জিলিং পাহাড়েও ইহার আবাদ দেখা যায়, কিন্তু সকল জেলার কৃষকরাই আবাদে শিথিলযত্ন বলিয়া অনুমিত হয়।

কোচবিহার ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালার ভূমির পরিমাণ ৫ কোটি ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯ শত ৩৭ একর। ইহার মধ্যে গড়ে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮ শত ৮০ একর ভূমিতে আবাদ হয়। এই আবাদী জমীর মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ২১ হাজার ৬ শত ৬০ একর জমীতে ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, এখানে আখের আবাদ কিরূপ উপেক্ষিত। এখানকার ভূমি ও জলবায়ু যে আখের আবাদের অনুকূল নহে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান বহুদিন জলমগ্ন থাকায় তথায় পাট ও ধান আবাদই সুবিধাজনক। এক্ষণে একমাত্র উত্তরবঙ্গেই ইক্ষুর আবাদ অধিক হইয়া থাকে। দিনাজপুর জেলায় ৩০ হাজার একর জমীতে ইক্ষুর আবাদ হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার আর কোন স্থানে এত অধিক আবাদ হয় না। পাবনা জেলায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ৬০ হাজার একর ভূমিতে ইক্ষুর আবাদ হইত, এক্ষণে ৪৬০০ একরে ইহার আবাদ হয়। ঢাকা ও বাখরগঞ্জে ২০ হাজার একর করিয়া জমীতে আখ উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলায় ১৮ হাজার একর জমীতে আখের আবাদ হয় বলিয়া প্রকাশ। কি জন্য বাংলায় এই ইক্ষুর আবাদ হ্রাস হইয়াছে, কি জন্য কৃষকরা ইক্ষুর চাষে উদাসীন, তাহা আলোচনা করিলে বাংলায় ইক্ষুর আবাদের উন্নতিতে নিরাশ হইবার কারণ দেখি না। আমরা মোটামুটী ইহার দুইটি কারণ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। প্রথম কারণ, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার বীটের চিনির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া বাঙ্গালী কৃষক ইক্ষুর আবাদ লাভজনক নহে বলিয়া উহার আবাদে শিথিলযত্ন হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ কিছুকাল হইতে বাঙ্গালার ইক্ষু রুগ্ন হইয়াছে, উহাতে একপ্রকার পোকা লাগায় উহা ক্রমশই উপযুক্ত পরিমাণ চিনি উৎপাদনের অযোগ্য হইয়াছে। এইজন্যই কৃষকগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় ইহার আবাদে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কোন কোন স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীর ইক্ষুর আবাদ দেখিয়া এবং তাহাতে লাভের সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃষকেরা পুনরায় ইহার আবাদে যত্নপ্রকাশ করিতেছে, ইহা আমরা অবগত আছি। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালার কৃষকগণ যদি পরীক্ষার দ্বারা ইক্ষুর আবাদ লাভজনক বলিয়া বুঝিতে পারে তাহা হইলে তাহাতে তাহারা কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে না। এইজন্যই আমরা জেলায় জেলায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও পরীক্ষাগার স্থাপনের পক্ষপাতী।

কিন্তু বাঙ্গালায় একমাত্র ইক্ষু হইতেই চিনি উৎপন্ন হইত না। খেজুর-রস হইতেও এদেশে প্রভূত পরিমাণ চিনি তৈয়ার হইত। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও ২৪ পরগণা, যশোহর, ও নদীয়া জেলায় খেজুরে গুড়ের চিনির অনেক কারখানা বিদ্যমান ছিল। এখনও 'ক্যাপিট্যাল' পত্র প্রভৃতিতে গোবরডাঙ্গার চিনির দর প্রকাশিত হয়। তাজপুর ও সুখচরের চিনিও প্রসিদ্ধ। এই-সকল চিনি একমাত্র খেজুর-গুড় হইতে প্রস্তুত। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, চিনি-কমিটীর রিপোর্টে বাঙ্গালার চিনির কথায় খেজুরে-গুড়ের চিনির উল্লেখ আদৌ নাই। যে সময় চিনি-কমিটী নিযুক্ত হয় আমরা সে সময়ে এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদিগের সে ক্ষীণ স্বর কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বাঙ্গালার এই খেজুরের চিনির কারবার পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে দেশের অনেক লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে। ইক্ষুর মত খেজুর-গাছের আবাদ প্রতি বৎসর করিতে হয় না। গাছ একবার তৈয়ার হইলে ক্রমাগত ৩০।৪০ বৎসর তাহা রস প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং ইক্ষুর আবাদের ন্যায় ইহা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য নহে এবং উহা হইতে রসেরও তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খেজুর-রসের চিনি তৈয়ার করিলে ব্যয় হ্রাস হইতে পারে কি না এ বিষয়ে পরীক্ষা আবশ্যক। আমরা বাঙ্গালার এই বিশেষ ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধারের পক্ষপাতী, এইজন্য ইহার প্রতি সাধারণের ও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণে অগ্রসর হইয়াছি। কৃষি-সচিব সেদিন পাবনায় এই ইক্ষুর আবাদের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি কি এই খেজুর-চিনির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন?—বসুমতী।

খেজুরে গুড় ও দোলো চিনি তৈয়ারির উপায়।—বাতাসের সঙ্গে নানারকম জীবাণু সকল সময় উড়িয়া বেড়ায়। খেজুরের রস খুব সাবধানে রাখিতে না পারিলে ঐ-সকল জীবাণু তাহার উপর পড়িয়া অনেক ক্ষতি করিয়া দেয়। এজন্য রস হইতে ভাল গুড় পাওয়া যায় না এবং চিনির ভাগ কম হয়। কয়েকটি উপায়ে এই ক্ষতি বন্ধ করা যাইতে পারে। (১) প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা রসের কলসী ঝুলাইবার আগে গাছের কাটা অংশ পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফরমালিন্ নামক আরকের কয়েক ফোঁটা ঐ জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ডাক্তারখানায় খোঁজ করিলে এই আরক পাওয়া যাইবে। (২) রসের কলসী আগুনে তাতাইয়া লইবার যে নিয়ম আছে তাহা না করিয়া কলসীর ভিতর-ভাগ মাঝে মাঝে চূন লেপিয়া লইলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এমন কি এরূপ কলসীতে দিনের বেলায় ওলা রস জড় থাকিলে তাহা হইতেও ভাল গুড় করিতে পারা যাইবে। (৩) গাছে কলসী ঝুলাইবার সময় তাহার মুখ যতটা সম্ভব সরা বা আর কিছু দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া দরকার। কেবল নল হইতে কলসীতে রস পড়িবার জন্য একটু গর্ত্ত রাখিলেই যথেষ্ট। (৪) রস জ্বাল দিবার লোহার কড়াইসকল খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কোন রকম পোড়া গুড় বা চিনি তাহার গায়ে লাগিয়া থাকিলে জ্বাল দেওয়া রসের রং কাল হইয়া যায়। (৫) রস জ্বাল দিবার সময় অল্প করিয়া তেঁতুল-গোলা

জল তাহার উপর ছিটাইয়া দিলে খেজুরে গুড় দেখিতে ঠিক কাঁচা সোনার মত হইবে। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই বুঝা যাইবে কোন্ রসে কতটা তেঁতুল জল দেওয়া দরকার। (৬) পাটা-সেওলা দিয়া চিনি পরিষ্কার করিতে অনেক সময় লাগে। আজকাল এই কাজের জন্য একরকম কল পাওয়া যায় তাহাতে হাড়ের কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবহার না করিয়াও অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পরিষ্কার চিনি বাহির করা যায়। একজন খণ্ডসারির পক্ষে এই কল কেনা দুঃসাধ্য হইলেও পাঁচজনে মিলিয়া সমবায়বদ্ধভাবে কিনিলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।—এডুকেশন গেজেট।

কাগজের কথা—

সমগ্র পৃথিবীতে বৎসরে ৩২ কোটি মণের অধিক কাগজ ব্যয়িত হইয়া থাকে। একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই সমগ্র পৃথিবীর এই কাগজের অভাব পূর্ণ করা যাইতে পারে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞ মিঃ রেইট হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে কেবল বাঁশের মণ্ড হইতে বৎসরে ২৭ কোটি মণ এবং আসামে শুধু সাবানা ঘাস হইতে ৮ কোটি মণ কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। হিসাব অনুসারে কার্য্য হইতে দেখিলেই সকলে সুখী হইবে।

—ঢাকাপ্রকাশ।

সরকারের ঔদাসীন্য—

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ৬০০০ লোক এখনও কাজে যোগদান করে নাই। ধর্ম্মঘটকারীগণের মধ্যে ৩০০০ লোক কার্য্যে যোগদান করিয়াছে এবং কতকলোক কোম্পানী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। এতদিন যাবৎ ধর্ম্মঘটকারীগণকে জেলা ও শাখা কংগ্রেস কমিটী সকল সাহায্য করিতেছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া বলিয়াছেন যে, হয় ধর্ম্মঘটকারীগণকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হউক নতুবা স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা হউক। প্রত্যেক উপনিবেশে ১৫০টি চরকা এবং ৫টি তাঁত থাকিবে; এবং গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা না চাহিলে কার্য্যে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আজ পর্য্যন্তও গবর্ণমেণ্ট কেন যে এরূপ উদাসীনতার ভাব দেখাইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।—যশোহর।

সরকারের নিগ্রহ-নীতি—

বাঙ্গালায় চণ্ডনীতি চণ্ডবিক্রমে অনুসৃত হইতেছে। বরিশালে শরৎকুমার, মাদারীপুরে পীর বাদশা মিঞা, ফরিদপুরে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র,—একে একে অসহযোগী কর্ম্মীবর্গ গ্রেফ্‌তার হইলেন, নীরবে জেলে গেলেন।—বসুমতী।

শরৎকুমারের কারাদণ্ড।—বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ তিন মাস কারাদণ্ড এবং দুইশত টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা না দিলে আরও তিন মাস কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। শরৎকুমারকে অতি গোপনে বরিশাল জেল হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার উপর কড়া পুলিশ পাহারা ছিল।—এডুকেশন গেজেট।

পীর সাহেব কারাগারে।—ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ পীর মৌলানা রসিদুদ্দিন আহাম্মদ (পীর বাদশা মিঞা) গরম বক্তৃতা দেওয়ার ১০৮ ধারা মতে অভিযুক্ত হন। প্রায় ৮০ লক্ষ মুসলমান তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করেন। তিনি আর তেমন বক্তৃতা যেন না দেন তেমন ভাবে ১০ দশ হাজার টাকার জামিন তলব করা হইয়াছিল। তিনি জামিন না দিয়া কারাগারে গিয়াছেন। তিনি শিষ্যদিগকে, মুসলমান-সমাজকে ও তাঁহার ভক্তদিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কারাবাস ভোগের জন্য কেহ যেন উত্তেজিত না হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট হইবেন যদি সকলে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করে।—জ্যোতিঃ।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। সে মাদারিপুর শান্তি সেনার একজন ভলাণ্টিয়ার। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ১০৮ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করে, তাকে গ্রেপ্তার করে ফরিদপুর নিয়ে গেছে। নৃপেন্দ্রের জননী পুত্রকে জামিনে মুক্তিপ্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন।

—বিজলী।

জরিমানা আদায়।—ব্রহ্মচারী রামরক্ষার ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। প্রকাশ, জরিমানা না দিলে তাঁহার আরও দেড়মাস কারাদণ্ডের আদেশ ছিল। কিন্তু রামরক্ষা ঐ দেড় মাস কালও জেল খাটিয়াছিলেন বটে তথাপি তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি আটক ও বিক্রয় করিয়া জরিমানার টাকা আদায় করা হইয়াছে।

—বসুমতী।

শ্রীহট্ট করিমগঞ্জের ১৪ জন অসহযোগীকে স্পেশ্যাল কনেষ্টবল করা হইয়াছিল। তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; জরিমানা না দিলে প্রত্যেককে ৬ সপ্তাহ করিয়া জেল খাটিতে হইবে।

—ঢাকাপ্রকাশ।

মালদহ—ছত্রিশীর স্বেচ্ছা সেবক শ্রীযুত মনোরঞ্জন রায় গত ২০শে ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় স্থানীয় পুলিশ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। এই ভলাণ্টিয়ারটি বাংলা মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটীং কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দারোগা তাঁহার জামিন হইবার জন্য ২৩ জন ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মনোরঞ্জন রায় জামিন হইতে নিষেধ করায় কেহ জামিন হন নাই।

ঢাকা—মুন্সীগঞ্জ—বিক্রমপুর। গত ৩১শে মে তারিখে ধামারণ খেলাফৎ কমিটির যে ৬ জন ভলাণ্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল, ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহাদের বিচারকার্য্য শেষ হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন:—(১) কাজী রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ৫৲, (২) কাজী আমির হোসেন ৫০৲, (৩) কাজী আবুল এছলাম ৫০৲, (৪) সেখ আবদুল ৫০৲, (৫) গোলাম দেওয়ান ৫০৲ টাকা। অন্যতম আসামী কাজী শামসুদ্দীন মুক্তি পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের উপর ১ বৎসরের জন্য ১০৩ ধারা জারী হইয়াছে। বিচারক বাদীকে ১৫০৲ টাকা দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। ৫ই তারিখে ধামারণ খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারী কাজী আসাজুদ্দিন আহম্মদকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

—নবযুগ।

সরকারের অপার কৃপা—

পাঠকগণ এখনও ভুলিতে পারেন নাই যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘটের সময় কলিকাতা কালীঘাটে জনতার উপর পুলিশ গুলি চালাইয়াছিল। এতদিন পরে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পুলিস সাবইন্‌স্পেক্টর ঈশ্বর সিংহের ৬ মাসের জন্য বেতন বৃদ্ধি বন্ধ রহিল; সার্জ্জেণ্ট কির্ব্বি তাহার কর্ত্তব্য পালন করে নাই, এবং কে যে গুলি চালাইয়াছিল তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকাশ না করিবার দোষে সার্জ্জেণ্ট চিলষ্টন, এমিলী এবং ভজিরুককে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

—যশোহর।

মদের অপকার—

গত ৫ বৎসরের হিসাব ধরিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর কলিকাতা

সহরে মাতৃলামী করিবার অপরাধে প্রায় ৫ হাজার লোক দণ্ডিত হইয়াছে।—ঢাকাপ্রকাশ।

আমাদের সমাজ—

ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হেনরী হুইলার সভায় বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে গভর্ণমেন্টের জানানিতে পতিত জাতির সংখ্যা ৭০ লক্ষেরও কিছু অধিক।—ঢাকাপ্রকাশ।

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মেয়ের বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন—তার ওপর আবার উপার্জ্জনক্ষম যোগ্য পুত্রের অকালমৃত্যুতে তিনি উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠেন। দুটি বয়স্থা কন্তাকে পাত্রস্থ করতে না পারায় এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সমাজের নির্য্যাতনও যথেষ্ট ভোগ করেন। অবশেষে তাঁর একটি মেয়ের বিবাহের দিন স্থির হয়। কপর্দ্দকহীন ব্রাহ্মণ কোনমতে একশটি টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঋণ প্রার্থনা করেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয় না। পল্লীর মেয়েরা তাই জানতে পেরে নিজেরা চেষ্টা করে টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করেন।

বাংলার আইন মজলিসের সদস্যরা এই 'অশিক্ষিতা' নারীদের কাজের পরিচয় পেয়ে পুরুষের শিক্ষার মূল্য নিরূপণ করবেন কি ?

—বিজলী।

নড়াইলের নমঃশূদ্র উকিল বাবু দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে জল ও পান দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আজ ৩৫ দিন বারলাইব্রেরীতে এইরূপ অবমাননা সহ্য করিতেছেন। তাঁহার অপরাধ—তিনি জাতিতে নমঃশূদ্র। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত চাঁদা আদায় করা হইয়া থাকে।

—কল্যাণী।

পতিত সংস্কারে মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধির সদুপদেশ—মহাত্মা গান্ধি আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে আসিয়া, বেশ্যাদিগকে দর্শন দান করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সকলেই চরকায় সুতা প্রস্তুত শিক্ষা কর, পরিণামে ভাল হইবে। যাহারা সাধুভাবে থাকিতে চায়, ইহাতে তাহাদের পরিণাম ভাল হইবে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে না।

—কাশীপুরনিবাসী।

দেশপ্রেমের কথা—

স্বদেশী আন্দোলন এখন আর শুধু শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ নাই। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার না করিলে দেশবাসীর বাঁচিয়া থাকিবার আর কোন আশা নাই। সম্প্রতি কলিকাতার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, উড়িয়া শ্রমজীবীরা মায়ের ডাকে সাড়া দিয়াছে, তাহারা আর বিলাতী কাপড়ের মোট বহিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। কাজ অভাবে অনাহারে মরিবে তাহাও স্বীকার, তবুও বিদেশী বস্ত্র স্পর্শ করিবে না। মরা গাঙেও যে বান ডাকিতে পারে ইহাই তাহার প্রমাণ।—যশোহর।

তপস্যার অভাব। মনের এক কোণে সামান্য একটুকু সদিচ্ছা প্রকাশ পেতেই এ অহঙ্কার কখনো যেন আমাদের মত্ত করে' না তোলে যে, আমরা বাঁধন ছেঁড়বার শক্তি লাভ করেছি। এমন ইচ্ছা কতবারই তো জেগেছে, আবার কতবারই না অন্তরেই লীন হয়ে গেছে। আজ শত রকমের বাসনা-কামনায় ভরা এই মনে যতটুকু দেশহিতৈষণা উঁকি মারছে, তাতে করে' গলাবাজি বেশ চলতে পারে; কিন্তু স্বরাজ পাওয়া যাবে না। অতীতের বিফলতার কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে এই কথাটাই ধরা পড়ে' গেছে যে, সত্যি সত্যিই সবখানি মন দিয়ে আমরা মুক্তি কখনো চাইনি—তার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির যে তপশক্তির দরকার তা আমরা পাইনি—পেতে চেষ্টাই করিনি।

—বিজলী।

সেবক।

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ-মেঘে ॥
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে'
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥

কি যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই,—
সে যে ঐ শিউলি-দলে
ছড়াল কানন-তলে,
সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ু বেগে ॥

৮ আশ্বিন, ১৩২৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মার্কিন দেশে ম্যালেরিয়া প্রতিকার*

আমরা নরহত্যাকারীকে যথেষ্ট ঘৃণা করি এবং চরমদণ্ডে দণ্ডিত করি। কিন্তু আমাদের দেশ ভারতবর্ষে আমরা কেন অবাধে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীকে প্রতিবৎসর ১,১৩০,০০০ লোক হত্যা করিতে এবং ১০০,০০০,০০০ অপেক্ষাও বেশী লোককে আক্রমণ করিতে দিই? আমরা কেন ইহার কোনও প্রতিকার করি না? অবশ্য আমাদের অর্থাভাব, আমাদের দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ। মার্কিনদেশে কিরূপে স্বল্পব্যয়ে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতেছে তাহা আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত। সেখানে Red Cross Society, State Board of Health ও United States Public Health Service পরস্পরের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া প্রাণপণ উদ্যমে দক্ষিণ জর্জ্জিয়া হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সেখানে প্রতি লোক পিছু ম্যালেরিয়া প্রতিকারের ব্যয় কত অল্প হইতেছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। সেখানে আর্কান্সাস্ ও মিসিসিপি প্রদেশে সম্প্রতি যে উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতেছে আমাদের দেশে সেই উপায় অবলম্বন করিলে ১০০০ অধিবাসীযুক্ত ছোট ছোট সহরে অতি অল্প ব্যয়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে সহরের অধিবাসীর সংখ্যা যত বেশী হইবে প্রতি লোক পিছু ব্যয় তত অল্প হইবে। শেষোক্ত দুই প্রদেশে নিম্নোক্ত উপায়গুলি ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অবলম্বন করা হইয়াছিল।—

(১) মশক-বংশের বিনাশ সাধন।

(২) নির্দ্দিষ্টস্থানের অধিবাসীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক লোককে কুইনাইন নিয়ম-মত সেবন করান।

(৩) নির্দ্দিষ্টস্থানের অধিবাসীদিগের বাসস্থানগুলি ধাতু-নির্ম্মিত জাল দিয়া বেষ্টন করা।

আর্কান্সাসের অন্তঃপাতী ক্রসেট নগরে ২১২৯জন লোকের বাস এবং এইস্থানে শতকরা ৬০ ভাগ রোগী ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এইস্থানের খাল, বিল ও ডোবার মধ্যে অনেকগুলি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং বাকীগুলি হইতে সহজে জল নিকাশ হইবার উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নদীর কিনারার জঙ্গল সাফ করা হইয়াছিল এবং উভয় পাড় এইরূপে ঢালু করা হইয়াছিল যে নদী প্রস্থে ঈষৎ কমিয়া গেলেও ইহার স্রোতের বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে-সকল জলাশয় বুজান অসম্ভব হইয়াছিল সেগুলি পরিষ্কার করাইয়া তাহাতে ছোট ছোট মশা-খেকো মাছ ছাড়া হইয়াছিল এবং প্রতিসপ্তাহে প্রত্যেক জলাশয়ে এক পর্দ্দা কেরোসিন তৈল ছড়ান হইত। ভগ্ন কলসী, হাঁড়ী, বাল্‌তি প্রভৃতিতে জল জমিলে পাছে মশা সেইগুলিতে ডিম পাড়ে এই আশঙ্কায় এইপ্রকার জিনিষ জড় হইবা মাত্র সরাইয়া ফেলা হইত। এইসকল উপায় এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোকের তত্ত্বাবধানে এবং সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে অবলম্বন করা হইয়াছিল। এবং ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মশক-বংশ বিনষ্ট হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া-রোগীকে দেখিবার জন্য এই স্থানের চিকিৎসকদিগের ডাক কিরূপ বৎসরের পর বৎসর কমিয়া গিয়াছিল তাহা দেখিলেই এই-সকল উপায় অবলম্বনের ফল কিয়ৎপরিমাণে প্রতীয়মান হইবে। ১৯১৫ সালে ম্যালেরিয়া-রোগী দেখিবার জন্য ক্রসেটের চিকিৎসকগণের ২৫০০ ডাক হইয়াছিল, ১৯১৬ সালে অর্থাৎ এই-সকল উপায় অবলম্বনের এক বৎসর পরে এই-সকল চিকিৎসকের ম্যালেরিয়া-রোগী দেখিবার ডাক কমিয়া ৭৪১ হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে ইহা মাত্র ২০০ হইয়াছিল। ১৯১৮ সালে মাত্র ৭৩ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তিন বৎসরে ম্যালেরিয়া-রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসকের ডাক শতকরা ৯৭ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। প্রথম বৎসর এই-সকল উপায় অবলম্বনের ব্যয় প্রতি লোক পিছু ৩।০ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ২॥০ টাকা এবং তৃতীয় বৎসরে ১॥০ টাকা হইয়াছিল। যে পরিমাণ চিকিৎসকের ব্যয় বাঁচিয়াছিল তাহার তুলনায় এই ব্যয় যৎসামান্য সন্দেহ নাই। ক্রসেটের নিকটবর্ত্তী আরও পাঁচটি ছোট সহরে এই-সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং ফলও সেইরূপ সন্তোষজনক হইয়াছিল।

* Journal of American Medical Association for November 8, 1919, দেখুন।

আর্কান্সাসের অন্তঃপাতী চিয়াকট্ হ্রদের তীরে গরীব কাফ্রিগণ কুটীরে বাস করে। এইস্থানে ম্যালেরিয়া ও মশার প্রাদুর্ভাব। এই-সকল কুটীর সম্পূর্ণরূপে ধাতুনির্ম্মিত জাল দিয়া বেষ্টন করা হইয়াছিল এবং কুটীরের অধিবাসীদিগকে সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইতে বিশেষরূপে নিষেধ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক বাটী জাল দিয়া ঘিরিতে গড়ে ৪০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং এই-সকল জাল গড়ে দুই বৎসর নষ্ট হয় না—ধরিলে, বাৎসরিক ২০৲ টাকা (প্রত্যেক বাটীর জন্য) এবং প্রতি লোক পিছু ৩॥০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে ম্যালেরিয়া অনেক কমিয়াছিল।

অপর এক স্থানে একটি স্রোতহীন বিলের নিকটস্থ আবাদে অত্যন্ত মশা-ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোককে সপ্তাহে উপরি উপরি দুই দিন প্রত্যহ সকালে ৫ গ্রেন ও বৈকালে ৫ গ্রেন মোট দশ গ্রেন কুইনাইন্ সেবন করান হইত। পনর বৎসর বয়সের নীচের বালকবালিকাদিগকে প্রতি তিন বৎসর বয়সের জন্য এক গ্রেন হিসাবে কুইনাইন্ উপরিলিখিত নিয়ম অনুসারে সেবন করান হইত। এই উপায়ে এক বৎসরে শতকরা ৬০ ভাগ ম্যালেরিয়া কমিয়াছিল, এবং ইহার জন্য প্রতি লোক পিছু ১॥০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জার্ম্মান ডাক্তার ককের (Koch) মতানুযায়ী শরীরস্থ ম্যালেরিয়া-বীজাণু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিবার জন্য প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোক প্রতিদিন ১০ গ্রেন এবং বয়সানুসারে বালকবালিকাগণ কমপরিমাণে কুইনাইন্ সেবন করিয়া মিসিসিপির অন্তঃপাতী সান্‌ফ্লাওয়ারে ১০০ বর্গ মাইল পরিমাণ ভূমির ৯০০০ অধিবাসী অতি সুন্দর ফল পাইয়াছিল। এই ভূমি ডোবা-খাল-বিল-পূর্ণ ছিল এবং এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী জাতিতে কাফ্রি। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের ১ বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল এবং বাকী অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ২২ জনের রক্তে ম্যালেরিয়া-রোগের বীজাণু পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ককের উল্লিখিত উপায় অবলম্বনের পর এই স্থানের ম্যালেরিয়া শতকরা আশী ভাগ কমিয়া গিয়াছিল।

ম্যালেরিয়া দূর করা আমাদের নিজের হাতে। আমরা যে ইচ্ছা করিলেই আমাদের বাসস্থান হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি উল্লিখিত ঘটনা-সকল তাহার জলন্ত প্রমাণ।

কলিকাতার বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-বি, রায় বাহাদুর মহাশয় ১১২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে Central Cooperative Anti-Malarial Society স্থাপন করিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অর্থসাহায্য ও সুপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই প্রবন্ধে লিখিত উপায় অবলম্বনে ম্যালেরিয়া দূর করা। আশা করি কোনও গ্রামবাসী এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (এম্ বি)।

লক্ষ্মীছাড়া

ঠিক নদীর উপরেই ছোট ঘরখানিতে ছিদাম বাস করিত। সে জেলে, নদীতে মাছ ধরিত। এত বড় পৃথিবীটার মধ্যে আপনার বলিতে তাহার কেহ ছিল না। পিতাকে তাহার মনেই পড়িত না; কিন্তু মা যে তাহাকে মুড়িমুড়্‌কী ও মোটা ভাত খাওয়াইয়া ষোলটি বৎসরের করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ছবির মত তাহার চক্ষে ভাসে। সেই মা যখন একদিন চক্ষু বুজিল তখন দুনিয়াটা তাহার নিকট বড়ই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল। দিন কয়েক ছন্নছাড়ার মত ঘুরিয়া সে আপনাকে কতকটা ঠিক করিয়া লইল। পরে একদিন এক বোষ্টম ঠাকুরের নিকট হইতে পাঁচসিকা দিয়া একটা সারেঙ্গ কিনিয়া আনিল, এইটিই তখন হইল তার প্রাণের দোসর। দিনে সে মাছ ধরিত—

মাছ বেচিত, আর রাত্রে সারেঙ্গটির সহিত তাহার প্রাণের যত হাসি-কান্নার আলাপ করিত। মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে যখন ওপারে কাশের বনে মাতন লাগিয়া যাইত, ছিদামের উদাসী চিত্ত আ'নচান্ করিয়া উঠিত; সে তাড়াতাড়ি যাইয়া সারেঙ্গটিকে বুকে চাপিয়া ধরিত—কি যেন একটা ব্যথার দীর্ঘশ্বাসে সারেঙ্গের তারগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিত।

* * * *

তখন এক-প্রহর বেলা হইয়াছে—ছিদাম জাল সারিতেছিল আর গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছিল।

একটি মেয়ে কলসী কক্ষে করিয়া আসিয়া ছিদামের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"ছিদাম-দা—"

"কে রে উজানি! জল নিতে এসেছিস্ বুঝি?"

উজানি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আজ তুমি নদীতে যাবে না?"

ছিদাম জাল বুনিতে বুনিতেই বলিল, "হাঁ, নিতাই এলে যাব।"

উজানি বলিল, "তুমি বুঝি নিতাইর সঙ্গে যাও?"

ছিদাম মুখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ, আমার ত ডিঙি নেই; আর ওই আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। নিতাইর মনটা বড় ভাল—নয় রে উজানি?"

উজানি সে কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

ছিদাম একটু হাসিয়া বলিল, "জালটা সেরেই রান্না করব।"

উজানি বলিল, "এর পরে রান্না করে খাবে কখন?" সে কলসী নামাইয়া বলিল, "আমি উনুনটা ধরিয়ে চালটা চড়িয়ে দিয়ে যাই, তারপর—"

ছিদাম বাধা দিয়া বলিল, "না রে না, আমি নিজেই করব 'খন—আমার এই ত হয়ে গেল বলে।"

উজানি কিছু বলিল না। ঘরে ঢুকিয়া উনুনটা ধরাইতে লাগিয়া গেল।

উজানি এই আপন-ভোলা লোকটিকে ভাল করিয়াই চিনিত। আহার-নিদ্রাটা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাহার ভুল হইয়া যাইত বলিয়াই উজানিকে অনেক সময় উহার খোঁজ লইতে হইত। এই লোকটির জন্য একটা মমতা, একটা সহানুভূতি তাহার প্রাণের ভিতর যে একান্তে জাগিয়া উঠিতেছিল তাহার খোঁজ উজানি রাখিত না,—তাহার শুধু মনে হইত যে সে ছাড়া এই অসহায় লোকটিকে দেখিবার মত আর কেহ নাই। তাই একটা অজানা আকর্ষণ তাহাকে এখানে টানিয়া লইয়া আসিত।

উজানি ভাতের হাঁড়িটা চড়াইয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বাহির হইয়া আসিল।

ছিদাম জাল বুনিতে বুনিতে বলিল, "চল্লি উজানি?"

উজানি একটু হাসিয়া বলিল, "যাব না—কি করব?"

ছিদাম মাথা তুলিয়া বলিল, "না, যা, উঃ তোর চোখ যে ধোঁয়ায় লাল হয়ে গেছে!—তোর খুব কষ্ট হয়েছে—না রে?"

* * *

উজানি না থাকিলে ছিদামকে যে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিনই উপবাসে থাকিতে হইত, তাহা সে জানিত। জানিত না শুধু যে এই কালো মেয়েটির চিত্তখানি তাহার জন্য কতটা ব্যগ্র, আর তাহা জানিতে কোনদিন চেষ্টাও করিত না। এইজন্যই অনেক সময় উজানির এই প্রাণভরা সাহায্য লইতে সে সঙ্কোচ বোধ করিত। এক-একবার সে ভাবিত উজানির এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিবে। কিন্তু সে তাহা পারে নাই—উজানির সম্মুখে তাহার সব সঙ্কল্প গোলমাল হইয়া যাইত। তাহার সঙ্গ-মাধুরী ছিদামকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত—তাহার সব ভুল হইয়া যাইত। উজানিকে তাহার ভাল লাগিত—কিন্তু কেন, তাহা সে বুঝিয়া উঠিত না।

এক-একদিন ঘাটে উজানিকে সে হঠাৎ ডাকিয়া বসিত, "উজানি—"

"কি—ডাকছ কেন?"

ছিদাম উদাসভাবে বলিত, "এমনি।"

উজানি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত—ছিদাম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কি জানি কেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিত।

সেদিন ছিদাম ছেঁড়া জালটা সেলাই করিতেছিল—উজানি ঘরে রান্না করিতেছিল। হঠাৎ ছিদাম বলিয়া উঠিল,

"হ্যাঁ রে উজানি, তুই আমার জন্যে এত কষ্ট করিস্ কেন বল্ ত ?"

উজানি একটু হাসিয়া জবাব দিল, "তুমি লক্ষ্মীছাড়া বলে' ?"

ছিদাম একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুই লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী হবি ?" বলিয়াই নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করিয়া একচোট খুব হাসিয়া লইল।

উজানি গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল, "এসব বল্‌বে ত আমি হাঁড়িকুড়ি ভেঙ্গে দিয়ে চলে' যাব।"

সেইদিন সমস্ত সময়ই লক্ষ্মীছাড়ার "লক্ষ্মী" হইবার কথাটা ছিদামের বারবার মনে পড়িতে লাগিল। এই কথাটা লইয়া যতই সে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল তাহার ততই মনে হইতে লাগিল—এই লক্ষ্মী যেন তাহার বড়ই প্রয়োজন—আর ইহা যেন খুবই সম্ভব। ইহার প্রতিকূল চিন্তা করিতে সে সাহসও প্র... না, আর তাহার অবসরও হইল না। সে বিকালে ...র দাসের কাছে গেল।

* * *

দামোদর স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো, শুনেছ, নটবর ছিদামের সঙ্গে উজানির সম্বন্ধ এনেছে ?"

উজানির মাতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কার সঙ্গে ?"

দামোদর বলিল, "ছিদামের সঙ্গে।"

দামোদরের স্ত্রী হাতনাড়া দিয়া বলিল, "কেন মরণের দড়ি জুট্‌বে না—মেয়ে জলে ফেলে দিতে পার্‌বে না ?"

দামোদর আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "নটবর বল্‌ছিল ওর মা নাকি কিছু টাকা রেখে গেছে—"

উজানির মা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ঝ্যাঁটা মারি অমন টাকার মুখে—চাল নেই চুলো নেই তার সঙ্গে যাব মেয়ের বিয়ে দিতে।"

দামোদর মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বাহির হইয়া গেল।

উজানি কুটনা কুটিতেছিল, মাতার কথা শুনিয়া তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল—সে হিংস্র শ্বাপদের মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার মায়ের দিকে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহার মনে হইতেছিল, কেন, তাহার মাতার এমন কি অধিকার আছে একজনকে এমন করিয়া অপমান করিবার ? কেন, সে কি মানুষ নয়—আর সেই বা এমন কি অসাধারণ ?

সে অভিমানে ফুলিতে লাগিল। সারাটা সন্ধ্যা মায়ের সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল না। কোন রকমে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সে বিছানায় যাইয়া পড়িল। তখনও মাতার কথাগুলি কাঁটার মত তাহার চিত্তে বিঁধিতে লাগিল। ছিদামের উপরও তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। কেন—যাচিয়া অমনভাবে অপমানিত হইবার কি দর্‌কার ছিল তার ? দেশে কি আর মেয়ে নাই ? একটা বিরাট অভিমান তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পরদিন নদীর ঘাটে ছিদাম বলিল, "উজানি, জমীদার-বাড়ীতে বিয়ে—আমাকে মাছ জোগান্ দিতে হবে। আজ চারটে রেঁধে দিয়ে যাস্ ত—আমাকে আবার জালগুলি ঠিক করে' নিতে হবে কিনা।"

উজানি কোন জবাব দিল না, জল ভরিতে লাগিল।

ছিদাম বলিল, "আমি যাই তাহলে, তুই একটু শীগ্‌গির আসিস্।"

উজানি জল লইয়া চলিতে চলিতে বলিল, "আমি পার্‌ব না।"

ছিদাম একটু আশ্চর্য্য হইল—পরে হাসিয়া বলিল, "কেন ?"

উজানি মুখ ফিরাইয়া "আমার গরজ পড়েছে" বলিয়া চলিয়া গেল। ছিদাম অবাক হইয়া এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ী যাইয়াই উজানির মনটা বিশ্রী রকম খারাপ হইয়া গেল। তাহার মন বলিয়া উঠিল—কাজটা কি ভাল হইল ? কেন যে ভাল হইল না আর কি-ই বা মন্দ হইল সে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবু তাহার সারাটা প্রাণের মাঝে একটা অস্বস্তি হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে সে ছিদামের বাড়ীর দিকে চলিল, উজানি কতকটা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চলিতে লাগিল। এই চলার আকর্ষণটা যে কিসের তাহা সে কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই—আজও তাহা ভাবিবার অবসর তাহার হইল না।

ছিদামের বাড়ীতে আসিয়া উজানি দেখিল ঘরের দুয়ার বাঁধা ; সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে

রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে দেখিল বাসি হাঁড়ি কড়া সব তেমনি ভাবেই পড়িয়া আছে; উনুনে যে সেদিন আগুন পড়ে নাই তাহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। উজানির চক্ষু জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

দুপুর বেলা খাইতে বসিয়া একগ্রাস ভাতও সে মুখে দিতে পারিতেছিল না। সে মনের চক্ষে দেখিতেছিল—একটি লোক জাল ফেলিতেছে—ক্ষুধায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।

উজানি ভাতের থালায় জল ঢালিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা বলিল, "ভাত ফেলে উঠ্‌লি যে?"

উজানি সংক্ষেপে বলিল, "ক্ষিদে নেই।"

"তবে ভাতগুলো নষ্ট কর্‌লি কেন?"

উজানি রাগিয়া বলিল, "বেশ করেছি।"

মা বলিল, "মেয়ের কথার ছিরি দেখ!"

উজানি বাহিরে আসিল। আদরের বিড়ালটা মেও মেও করিতে করিতে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া লেজ তুলিয়া পায়ে গা ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। উজানি বিরক্ত হইয়া সেটাকে একটা লাথি মারিল—বিড়ালটা ছুটিয়া পালাইল।

ঘরে যাইয়া উজানি কাঁথা সেলাই করিতে বসিল; কতক্ষণ পরে রাগিয়া সূতাটুতা ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। মাতা বলিল, "আজ তোর হয়েছে কি?"

"আমার মুণ্ডু" বলিয়া কাঁদিয়া চোখে কাপড় দিয়া সে ছুটিয়া পলাইল। মাতা মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার আগটায় উজানি কলসী লইয়া নদীতে গেল। ছিদামের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল—দুয়ার তেমনি ভাবেই বাঁধা! সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের উত্তর কোণে একটা মেঘ জমিয়া ছিল, তাহা চক্ষে পড়িতেই তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না—খালি কলসী লইয়াই বাড়ীতে ছুটিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পর হইতে ঝড়বৃষ্টি সমানভাবে দাপাদাপি করিতে লাগিল। উজানি আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। তখন তাহার মন যে কোথায় ছিল তাহা সে নিজেই জানিত না।

দুপুররাত্রে উজানির ঘুম ভাঙিয়া গেল। মেঘের মাতলামী একই ভাবে চলিতেছিল। উজানি দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় আসিল। নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল সারাটা নদী পাগল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। দূরে কড়্‌কড়্‌ করিয়া বাজ পড়িল। উজানি দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "ভগবান!" আর কোন কথা তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না—শুধু ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া গেল। এ দৃশ্য সে আর সহ্য করিতে পারিল না—ছুটিয়া ঘরে আসিল।

পরদিন ভোরে উজানির আর পা চলিতেছিল না—যদি যাইয়া দেখে সে ফিরে নাই? তবে—তবে—সে আর ভাবিতে পারিল না।

কতকদূর যাইয়াই দেখিল ছিদাম একটা আগুনের হাঁড়ি সামনে লইয়া বসিয়া আছে। উজানির বক্ষ হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া গেল; সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

উজানিকে দেখিয়া ছিদাম একটু হাসিল—এ হাসি উজানির কাছে একটা মর্ম্মভেদী শ্লেষের মত বাজিল। সে ছিদামের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না—একটা বিরাট লজ্জা তাহার মাথাটা নোয়াইয়া রাখিল।

ছিদাম বলিল, "কাল যে বিপদেই পড়েছিলুম উজানি,—এই ঝড়-নৌকা সামলাব, না নিতাইকে ধরব—ছোঁড়াটা কেঁদেই অস্থির। আমরা জেলের ছেলে—বুঝ্‌লি না উজানি—আমাদের কি অত অধীর হলে চলে?"

উজানি এই গল্পস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

ছিদাম বলিল, "এই ত এলুম—রাঁধ্‌ব এখন। তারপর—বুঝ্‌লি কিনা—"

উজানি বুঝিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া ঘরে ঢুকিল—তার পর চাউল লইয়া নদীর ঘাটে চলিয়া গেল।......

* * *

ইহার দশ বার দিন পরে ছিদাম একদিন শুনিল নিতাইর সঙ্গে উজানির সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে। সেদিন নাকি সে একটু অতিরিক্ত রকম গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে নাই এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সারেঙ্গ বাজাইয়াছিল।

সন্ধ্যার বেশী দেরী ছিল না—রবির শেষ-রশ্মি নদীর সারা বুকে রঙ্ ফলাইয়া দিয়াছিল।

ওপারের কাশগুলি রূপের নেশায় হেলিয়া-দুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। ছিদাম দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতেছিল। উজানির বিবাহ ঘোষণা করিয়া করিয়া একটা সানাই বাজিতেছিল। সানাইএর সুরটা যেন ছিদামের অন্তরের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল—অতিষ্ঠ হইয়া সে ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিল।

"ছিদাম-দা' !"

ছিদাম ফিরিয়া দেখিল উজানি। একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন রে উজানি ?"

উজানি কাছে আসিয়া বলিল, "চল, আমাদের বাড়ী চল।"

ছিদাম বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "তা ত হয় না উজানি—আজ ত আমার যাওয়া হতে পারে না।"

উজানি মলিন হইয়া বলিল, "কেন ছিদাম-দা ?"

ছিদাম নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমার দরকার আছে।"

উজানি বুঝিল—কত বড় অভিমানে আজ এ দরকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! সে ছিদামের হাত দুইটি ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "আজ তোমার কোন কাজ নেই ছিদাম-দা—তুমি না গেলে ত চলবে না।" উজানির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ছিদাম উজানির মুখের দিকে চাহিল—তাহার চোখ দুটাও আর্দ্র হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা, যাব 'খন!"

উজানি চক্ষু মুছিয়া বলিল, "যেয়ো কিন্তু।" উজানি চলিয়া গেল। ছিদাম উজানির মাড়াইয়া যাওয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা কান্না তাহার বুকের মধ্যে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছিদাম যেন রক্ষা পাইল—তাহার আর যাইতে হইবে না—এ বিসর্জন দেখিতে হইবে না। তাহার শিরায় শিরায় একটা পুলক নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া সে জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বৃষ্টির বেগ একটু কমিতেই নিতাই দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ছিদাম বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ছিদাম।"

ছিদাম কিছুই বুঝিতে পারিল না—সে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে নিতাইর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল, "এখন উজানির মামা বলছে—আরো পঞ্চাশ টাকা চাই—নইলে বিয়ে হবে না।"

ছিদাম উদাসভাবে বলিল, "তা আমি কি করব!"

নিতাইও জানিত ছিদামের কিছু করিবার সাধ্য নাই, তবু সে এখানেই ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে হতাশ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "কি হবে ভাই ?"

ছিদাম কোন কথা বলিল না, নীরবে ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হইয়াই আবার নিবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে যাইয়া ঘরের কোণের ভাঙা তোরঙ্গটা খুলিয়া একটা পুঁটলী বাহির করিল। পুঁটলীর দিকে চাহিয়াই তাহার দুই চক্ষে বান ডাকিয়া গেল! এ যে তার মায়ের শেষ সম্বল—তাহাকে দিয়া গিয়াছিল। তাহার অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল—মাতা শেষ বিদায়ের সময় বলিয়াছিল, "ছিদাম, আমার ত কিছুই নেই বাপ, তোকে শুধু এই দিয়ে গেলুম—আমি ভাতে কষ্ট পেয়ে তোর জন্যে তুলে রেখেছি—এই দিয়ে তুই বিয়ে করে' সংসারী হোস্।" ছিদামও আজ বিবাহের জন্য এই মায়ের আশীর্ব্বাদ—মায়ের শেষ দান ব্যয় করিতে বসিয়াছে। কিন্তু বিবাহ কার ?

কোন রকমে চক্ষু মুছিয়া আসিয়া নিতাইর হাতে সে টাকা দিল। নিতাই থতমত খাইয়া গেল—সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছিদাম আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "যাও ভাই—সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে।"

নিতাই সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তার গমনে আর তেমন আগ্রহের ব্যগ্রতা রহিল না।

ছিদাম স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ জালটা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সারেঙ্গটি লইয়া ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে গাহিয়া উঠিল—

আশার বাসা ভাঙ্‌ল যখন
কিসের আশে রইবি বসে!

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

খেলা-ভোলা

১

তুই যে ভাবিস্, দিন রাত্তির
খেল্‌তে আমার মন,
কক্ষনো তা সত্যি না, মা,
আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে'
বৃষ্টি-বাদল গেছে ছুটে',
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পূজোর সানাই বাজ্‌চে দূরে,
ঝগ্‌ড়া করে তিনটে শালিখ্
রান্নাঘরের চালে;
খেল্‌নাগুলো সাম্‌নে মেলি'
"কি যে খেলি," "কি যে খেলি,"
সেই কথাটাই সমস্ত খন
ভাব্‌নু আপন মনে।
লাগ্‌ল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারা বেলাই,
রেলিং ধরে' রইনু বসে'
বারান্দাটার কোণে।

২

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমন যেন বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাতের পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ী;
চেয়ে চেয়ে চুপ্ করে' রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি, ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাক্‌ত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্ষনি যে যেতেম, তারে
লাগাম দিয়ে কষে'।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে'।

৩

একেক দিন যে দেখেছি তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ্ করে' কি ভাবিস্ বসে'
ঠেস্ দিয়ে জান্‌লাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই,
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠপারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে,
মনে ভাবি, কোন্‌কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ী ছিল
কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে,
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে'।

১১ আশ্বিন,
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পল্লীসংস্কার-সমস্যা

কোন্ প্রণালী অবলম্বন করে' আমাদের গ্রামগুলোকে গড়ে' তোলা যাবে এই নিয়ে বন্ধুমহলে কথা উঠ্‌লে যদি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, কেউ কেউ তাতে আপত্তি করেন; অনেকে এমনকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁরা বলেন, ভারতীয় সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব, অপর কোনো সভ্যতার মাপকাঠিতে একে বিচার করা ভুল ও সেই অনুসারে কোনো সংস্কারের কাজে হাত দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। অনুকরণের দ্বারা জাতীয় জীবনের কোনো অঙ্গেরই যথার্থ পুষ্টিসাধন হতে পারে না, এ কথা কে না স্বীকার করবে? বিশেষতঃ, যদি কোনো দেশের এমন দুর্ভাগ্য হয় যে তার রাষ্ট্রব্যবস্থা এক প্রবল জাতির হাতে গিয়ে পড়ে, তখন পরাভূত জাতি আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারে না। প্রবলজাতির ধরণধারণ রকমসকম অনুকরণ কর্‌বার নেশা তখন সমস্ত দেশকে পেয়ে বসে। বিপদ এই, নকল কর্‌বার উৎসাহ ও উত্তেজনায় যাদের নকল করতে থাকি তাদের আসল প্রকৃতিটি আমাদের চোখে পড়ে না—চোখে পড়ে তাদের বাইরের সাজ-সরঞ্জাম ও জাল-জঞ্জাল। হ্যাট্‌কোট্ পর্‌লে অনেক বাঙ্গালীর মুখ দিয়ে যে-ধরণের ভাষা ও ভাবভঙ্গি প্রকাশ পায় তার দৃষ্টান্ত পথে ঘাটে সহজেই চোখে পড়ে। রাশিয়ার উপর য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাক্‌লে তার অবস্থা কি রকম হয়ে দাঁড়াল সে বিষয়ে মহাত্মা ষ্টেপ্‌নিয়াক্ আলোচনা কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—

"In social and political life, as well as in the domain of art and fiction, imitations seem always to bear the same original sin, while reproducing with great fidelity the drawbacks, imitators ignore and forget the merits of their exemplars."

ভাবার্থ:—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেই হোক আর শিল্পকলা ও সাহিত্যেই হোক্ অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে এক বিশেষ ত্রুটির চিহ্ন থেকে যায়—সেটা হচ্চে, যাদের অনুকরণ করি তাদের যথার্থ প্রকৃতি ও গুণ আমরা উপেক্ষা করি আর সুধু নকল করি তাদের দোষত্রুটি।

কোনো বিদেশীয় সভ্যতার সত্যটুকু গ্রহণ করতে না পারার কারণ জাতীয় দুর্ব্বলতা। একদিকে আমরা ভারতীয় সভ্যতার সত্যমূর্ত্তির সঙ্গে অপরিচিত, আবার যাদের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হ'ল তাদের সত্য পরিচয়টাও আমরা পাইনি। তাই সামঞ্জস্য হ'ল না—হ'ল বিরোধের সৃষ্টি। তাই এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে পৃথিবীর অপর সভ্যতার ছাপ বা ছায়া দেশের সর্ব্বাঙ্গ থেকে মুছে ফেল। যাকে সত্যভাবে গ্রহণ করতে পারিনি, তাকে অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে' বর্জ্জন করার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আছে, আজ আমরা এ কথা স্বীকার কর্‌তে রাজি নই!

সভ্যতা গড়ে' উঠেছে মানুষকে নিয়ে। নানা দেশে নানা অবস্থার মধ্যে যে পথ ও পাথেয় নিয়ে মানুষ তার সকল সমস্যার সমাধান করেছে ও করছে আমরা সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত কর্‌ব? আজ যাঁরা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে একদল আমাদের জাতীয় সমস্যার মীমাংসার পথ-নির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে এমন সব কথা বলেন যেন ভারতবর্ষ সমস্ত দুনিয়ার বাইরে একটা freak, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া; এখানকার বিধিব্যবস্থায় যেন বিশ্বনিয়ম খাটে না; যেন আমরা ব্রহ্মার বিশেষ সৃষ্টি, অতএব আমাদের শাস্ত্র ও অস্ত্র সমস্তই এমন এক আদর্শে গঠিত যে তার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো শাস্ত্র ও অস্ত্রের মিল নেই।

কিন্তু বিশেষ সৃষ্টি মান্‌বার যুগ অস্ত গেছে। বিশ্বমানবের যাত্রাপথে আমরাও যাত্রী; অতএব আমাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমরা পথ চল্‌তে পার্‌ব না। এতকাল আমরা একঘরে হয়েই ত পড়ে' ছিলাম। স্বরাজের ভিত্তি স্থাপনের দিনে আমাদের সে দৈন্য ঘুচে যাক; আমরা বিশ্বমানবের ভিতর থেকে স্বরাজ গড়্‌বার আবশ্যকীয় মালমসলা সংগ্রহ করি; এমন কথা যেন বলিনে যে ঐ ভাণ্ডারের সামগ্রী ও সাজসরঞ্জামে আমাদের প্রয়োজন নেই।

তাই বলে' আপনারা মনে কর্‌বেন না আমি ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ প্রকৃতি ও ধারা রক্ষা কর্‌তে বল্‌ছিনে। গড়্‌বার ছাঁচ (design) স্বতন্ত্র ত হবেই। এই বিশিষ্টতা

না রাখ্‌লে আমরা কিসের উপর ভর করে' দাঁড়াব? রাষ্ট্রই হোক্‌ আর সমাজই হোক্‌, তা কোনো জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ কর্‌বার অবলম্বন মাত্র এই প্রকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই; কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্বমানবের অখণ্ড নিয়ম কাজ কর্‌ছে বলে' সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্যসূত্র একের সঙ্গে অপরের যোগ রক্ষা কর্‌ছে। এই ঐক্যসূত্র উপেক্ষা কর্‌বার আশঙ্কা হয়েছে বলে'ই আজ এসব কথা বলা প্রয়োজন।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'কৃষিউন্নতির দৃষ্টান্ত' নাম দিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ আমি তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় লিখেছিলাম। তার মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলাম; কেননা সেখানকার কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। স্বার্থপর জমিদার, সুদখোর মহাজন ও দয়ামায়াহীন পাইকার সকলেই আইরিশ কৃষকের পরিশ্রম-জাত ফসল নিয়ে ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসে। কৃষক সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে'ও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর্‌তে পারে না, আর এইসব পরগাছা দিব্যি আরামে জীবন যাপন করে। এর প্রতীকার হয়েছিল কেমন করে? সমবায়ের দ্বারা। কর্ম্মবীর স্যার হোরেস্‌ প্ল্যাঙ্কেটের উদ্যোগে একদল যুবক সমবায় ব্যবস্থার-পত্তন করে কৃষকদের অশেষ কল্যাণ করেছেন। আজ তারা স্বাবলম্বী, নির্ভীক ও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এমন কথা কতবার শুনেছি যে হোরেস্‌ প্ল্যাঙ্কেটের পদ্ধতি এ দেশে খাটবে না। অনেকে গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত সমবায় সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে' বলেছেন যে, কৃষকেরা এখনও এসে জোটেনি, তাদের আকর্ষণ কর্‌তে পারে সমবায়-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু নেই কেন। নেই, এই বিষয় অনুসন্ধান না করে' যদি এমন কথা শোনা যায় যে ঐ প্রণালীটাই এদেশের পক্ষে অনুপযোগী, তখন বল্‌তেই হয় যে আমরা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিনে, জান্‌তে চাইনে। বাংলাদেশে পল্লীসমাজের জীবনযাত্রার অনেক পর্ব্ব সুসম্পন্ন হয় জোট বেঁধে। পূজা পার্ব্বণ থেকে গাই গরু ফসল কেনা বেচা পর্য্যন্ত অনেক কাজে পল্লীবাসীরা পরস্পরকে সাহায্য করে' থাকে। এইজন্য মনে হয়, সমবায়-প্রণালী এদেশেও চল্‌বে; কিন্তু যদি কেবলমাত্র বিশেষ কোনো আইন-কানুনের সীমার মধ্যে এর বিস্তার বদ্ধ রাখা হয় তবে তাতে বিশেষ ফল হবে না। কৃষকের ঋণভার লাঘব কর্‌বার আয়োজন করা চাই; যাতে তার পরিশ্রমলব্ধ জিনিসপত্র বা ফসল বিক্রী করে' ষোলআনা পয়সা তারই হাতে থাকে এর ব্যবস্থা করা চাই; তার চাষবাস যাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হ'তে পারে এমন উপায় উদ্ভাবন করা চাই; এই-সব কাজই হচ্চে সমবায়-প্রণালীর অন্তর্ভূত; কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ পল্লীবাসীর অন্তরের দিক থেকে তাকে সচেতন করে' তোলা। তার জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হ'লে জীবনের সঙ্কীর্ণতা আপনা হতেই ঘুচে যাবে; তখন সে দশের সঙ্গে মিলে পল্লীর শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ব্যবসার উন্নতি কর্‌বার জন্য সচেষ্ট হবেই। এই উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা কর্‌তে হবে; বিংশতি শতাব্দীর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে যা কিছু প্রয়োজন আমরা আহরণ কর্‌ব।

কথা উঠেছে, কল-কার্‌খানা আমরা চাইনে; কেউ কেউ বলেন বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে আমাদের প্রয়োজন নেই; কেননা ওগুলো হচ্চে জড়বাদীর যন্ত্রপাতি। য়ুরোপীয় কার্‌খানার দৃষ্টান্ত দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কলকব্জার বিপুল আয়োজনে মানুষকে পিষেই মারে; এতে মনুষ্যের দুর্গতি বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু এর জন্য বৈজ্ঞানিকসত্যলব্ধ মেশিনগুলোকে দোষী কর্‌লে চল্‌বে না। মেশিনগুলোর ব্যবহারের উপর ভালমন্দ নির্ভর করে। য়েরোপ্লেনের সাহায্যে একদেশের সঙ্গে অপর দেশের যোগ রক্ষা করা সুবিধাজনক, এ-দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে; আবার, এর সাহায্যে বোমা ছুড়ে লোকের বসতি উজাড় করে' দেওয়া অতি সহজ। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে মানুষের কত প্রয়োজনই না মিট্‌ল; আবার এরই তত্ত্ব অবলম্বন করে' মানুষ মানুষকে বিষ দিয়ে মার্‌বার নানা উপায় আবিষ্কার করেছে। হাতে লাঠিগাছা থাক্‌লে আত্মরক্ষার কাজে আসে, কিন্তু ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমি আমার পরমাত্মীয়ের পিঠেও এর ব্যবহার কর্‌তে পারি।

আসল কথা, যন্ত্রপাতি কল-কার্‌খানা অস্ত্রশস্ত্র এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই অনর্থ সৃষ্টি কর্‌তে পারে যদি মানুষ এর ব্যবহারকে সমগ্র সামাজিক জীবনের কল্যাণ সাধনের

নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত না করে। সেদিন একজন ইংরেজ লেখকের লেখা পড়্‌লুম; তিনি বল্‌ছেন,

"We are not materialists because we understand machines. We are materialists because we use them in a predatory unsocial way to heap up wealth for the few at the expense and the privation and degradation of the many."

ভাবার্থ—আমরা কলকারখানা পরিচালনা কর্‌তে ওস্তাদ বলে' আমরা জড়বাদী হ'য়ে পড়েছি তা নয়। এর সাহায্যে আমরা অপরের ধনদৌলত লুট করেছি; সমাজের কল্যাণ চিন্তা না করে' কয়েকজনের ঘরে লুটকরা ধন জড় করেছি; আর তার ফলে কত লোকের যে দুর্গতি হয়েছে তার সীমা নেই;—এই করি বলে'ই আমরা জড়বাদী।

আজ আমাদের প্রধান কাজ স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন করা। তাই বারম্বার এই কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের সমস্যা পৃথিবী-জোড়া সমস্যারই এক অংশ। তার মীমাংসা কেমন করে' হবে, সে পথ আমাদের চোখে পড়্‌বেই, যদি আমাদের বুদ্ধি সজাগ থাকে, যদি গ্রহণ ও বর্জ্জন কর্‌বার জীবনীশক্তির লীলা কোনোপ্রকারে বাধাগ্রস্ত না হয়।

পল্লীসমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গে পৃথিবী-জোড়া সমস্যার উল্লেখ কর্‌ছি শুনে আপনারা হয়ত মনে কর্‌ছেন আমি অবান্তর কথা বল্‌ছি। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর কোনো দেশের কোনো সমস্যাই বিচ্ছিন্নভাবে দেখ্‌লে চলে না। ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মানুষ আর নিজেকে বদ্ধ রাখ্‌তে পার্‌ছে না; এইজন্য আজ আন্তর্জ্জাতিক বহুপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের যোগ আছে বলে'ই তার হিসেব মনে রেখে কাজে হাত দেওয়া দরকার। সুদূর আমেরিকার মাঠে তুলার ফসল ভাল হ'ল না, খবরটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশদেশান্তরে পৌঁছল; আর বোম্বাই সহরে তুলার বাজারে দাম চড়্‌ল। রাশিয়া চা কিন্‌লে না, আর আসামের চা-বাগানের কুলীদের ভাগে কম কাজ পড়্‌ল;—মালিকেরা স্থির কর্‌লেন অল্প করে' চা চয়ন কর্‌তে হবে। ইংলণ্ডের খনি-মজুরেরা নিজেদের দাবী জাহির কর্‌বার জন্যে ধর্ম্মঘট কর্‌ল—এ খবর আমাদের দেশের মজুরদের কানে পৌঁছতেই তারা সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল। আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; কেবল মাত্র ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে বিশ্বমানবের সমস্যার সম্বন্ধ আছে; এ-কথা অস্বীকার কর্‌লে আমরা ভুল কর্‌ব। আজ আমরা পল্লীগুলোকে গড়্‌বার কাজে হাত দিয়ে দেখ্‌ছি যারা কৃষক তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; দেখ্‌ছি চাষবাসের ব্যবস্থায় কোনো শৃঙ্খলা নেই; কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হচ্চে না; গরু-বাছুরের ক্রমশই অবনতি হচ্চে। এই সমস্যার সঙ্গেও বাইরের যোগ আছে। পৃথিবীর হাট-বাজারে আমাদের ফসল চাই; সেখানের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের ভাগে কম পড়ে' যায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি যাতে হয় এমন উপায় করা দরকার। কৃষকদের ভাল বীজ ও উপযোগী সার বুঝিয়ে দেওয়া চাই; আর দশগণ্ডা মহাজন ও পাইকারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা চাই। ভারতবর্ষের কৃষিসমস্যা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যারই অন্তর্ভূত; অতএব এই সমস্যা জটিল, এর সমাধান কর্‌তে হলে বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হবে; একথা বল্‌লে চল্‌বে না "এতকাল যেমন চল্‌ছিল, তাই ভাল।"

আজ দেশের লোকের মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে বলে'ই পল্লীসংস্কারের আলোচনা-প্রসঙ্গে এত কথা বল্‌তে হ'ল। উত্তেজনা ও উন্মাদনা আমাদের মনকে অধিকার করেছে বলে' আশঙ্কা হয় পাছে গড়্‌বার কাজে আমরা অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ পরিচালনার দ্বারা জীবনে যে শক্তিসঞ্চার হয়, আমরা তারই সাহায্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌ব; আর তা হ'লেই একদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

কবি এ-ই আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা বল্‌তে গিয়ে লিখেছেন:—

"What we require more than men of action at present are scholars, economists, thinkers, educationalists, literateurs, who will populate the desert depths of national consciousness with real thought and turn the void into a fullness. We have few reserves of intellectual life to draw upon when we come to the mighty labour of nation-building."

ভাবার্থ:—কেজো লোকের চেয়েও এখন আমাদের

প্রয়োজন হয়েছে একদল চিন্তাশীল, ভাবুক, অর্থশাস্ত্রবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষকের—যারা চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে' জাতীয় জীবনের চিত্তমরুভূমি সরস করবে, তার শূন্যতা পূর্ণ করে' দেবে। জাতটাকে গড়্‌তে গিয়ে দেখি মানসিক শক্তির ভাণ্ডারে বেশী কিছু সঞ্চিত নেই।

আয়াল্যাণ্ডে কবি এ-ই যে জিনিষের অভাব বোধ করেছেন, আমরাও আজ স্বরাজের ভিত্তি গড়্‌তে গিয়ে তাই উপলব্ধি কর্‌ছি। এই অভাব মিট্‌ছে না বলে'ই যাঁরা একটু আধটু কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের মনে অসোয়াস্তি দেখা দিয়েছে। গড়্‌বার শক্তি অর্জ্জন না করে' যাঁরা উত্তেজনার আবেগে পল্লীতে পল্লীতে ছুটেছিলেন, সেদিন শুন্‌লুম তাঁরা ফিরে এসেছেন। ভেবে চিন্তে দেশের সাম্‌নে একটা বুদ্ধিসঙ্গত কর্ম্মপদ্ধতি ত কেউ দেন্‌নি—দিয়েছেন হুকুম। তাই এবার আমাদের কোনো কাজে সফলতালাভ হ'ল না।

কিন্তু দেশের মন আজ মুক্তির পথ খুঁজ্‌চে—কেবল দশপাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রলোক নয়, দারিদ্র্যপীড়িত লক্ষ লক্ষ দেশবাসী চাইছে মাথা তুলে দাঁড়াতে। এই নবজাগরণের দিনে পল্লীসংস্কার কর্‌বার সুযোগ হারালে আমাদের ভবিষ্যৎ আরো তিমিরাচ্ছন্ন হ'য়ে থাক্‌বে। আজ প্রয়োজন একদল কর্ম্মীর—যাঁরা নিজেদের অন্তরে স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ অনুভব কর্‌ছেন, যাঁরা নিঃশব্দে পল্লীসমাজের জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার কর্‌তে পার্‌বেন; যাঁদের দৃষ্টি সত্যের দিকে, কেবলমাত্র সফলতার দিকে নয়। এমন কর্ম্মী হ'তে হলে ত সাধনা চাই, শিক্ষা চাই। দেশের নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে পল্লীসেবকের (rural workers) উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা করা দর্‌কার।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা এ কাজে মন দিয়েছেন তাঁরা যেন এই মনে রাখেন যে পল্লীসমাজসংস্কার করা অতীব কঠিন কাজ। নানাকারণে আমাদের সমস্যা জটিল; যদি এ'কে ছোট করে' বিচার করি তবে এই সমস্যার সত্য পরিচয় ত পাবই না, বরং বারম্বার ভুল কর্‌তে থাক্‌ব। এ কথাও মনে করা চল্‌বে না যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির কর্ম্মপদ্ধতি ও তার সফলতার দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের কিছু শিখ্‌বার নেই।

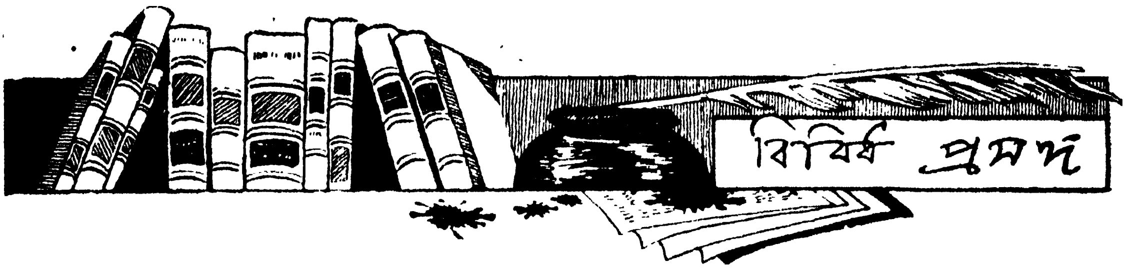
কর্ম্মিসঙ্ঘ, বেহালা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মর্ম্ম-অভিসার

যুগে যুগে নিখিল বাঁধা একটি প্রেমের ডোরে
কোন্‌ প্রেমিকের হিয়ার সাথে, বল্‌ব কেমন ক'রে?
দখিন্‌ পবন নিঃশ্বসিয়া কয় যে-কথা কানে,
কার বাণী সে, বল্‌তে কি চায়, কেই বা গো তা জানে?
কার সে অথির নাড়ীর কাঁপন নদীর কুলুকুলে,
কোন্‌ বিরহীর ব্যর্থ বিলাপ তটের হৃদয়-মূলে?
তপ্ত নিশাস কাঁপ্‌ছে ও কার রক্তগোলাপ-বুকে,
কার কপোলের দীপ্ত সরম অস্ত-তপন-মুখে?
অরূপ প্রেমের ইঙ্গিত এ বিনা-ভাষার ছলে,
বচন-হারা কি ভাবখানি ঘুমায় গগনতলে?

প্রেমিক সে যে কোথায় আছে, লুকিয়ে সে কোন্‌ বনে,
প্রেম যে তবু বাঁধ্‌ল তারে বুকের গোপন কোণে।
এই যে গো প্রেম দেয় না ছোঁয়া নিখিল ধরা-মাঝে,
রঙীন্‌ হ'য়ে তবু মোদের হিয়ার কোণে রাজে;
এই প্রেমেরি মূর্ত্তি মোরা বুকের রক্তরাগে
রাঙাই নিতি,—অরূপ সেথা রূপ হয়ে তাই জাগে;
বিশ্বেরি দেব রন আড়ালে,—বুকের অন্তরালে,
বন্দী তিনি সে মন্দিরে চির-প্রেমের জালে;
রাত্রিদিনে তাই ত মোরা আলোক-অন্ধকারে
যুগে যুগে ছুট্‌ছি শুধু মর্ম্ম-অভিসারে।

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী।



ত্যাগের মাপ

সঞ্চিত ধন হইতে ক্রোড়পতি বহুলক্ষ টাকা দান করিলে, লক্ষপতি বহুসহস্র টাকা দান করিলে, তাঁহাদের খুব প্রশংসা হয়। তাঁহারা এই প্রশংসার উপযুক্ত। কোন ধনীব্যক্তি স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিয়া এবং জীবনের অবশিষ্ট কালও স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিবার মত সম্পত্তি রাখিয়া বহু ধন দান করিলে তাঁহার প্রশংসা হয়। তিনি সেরূপ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু গরীব কিম্বা অপেক্ষাকৃত গরীব লোকেরা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট অর্থ না-থাকা সত্ত্বেও যাহা দান করেন, তাহার মূল্য ধনীদের দানের মূল্য অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী; যদিও এইরূপ দান সংবাদপত্রে ঘোষিত হয় না এবং ছেলেদের পাঠ্য পুস্তকেও দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হয় না। কিন্তু এই দরিদ্র দাতারা পুরস্কারের জন্য দান না করিলেও, বিধাতার পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হন না। তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, এবং তাঁহাদের আত্মা উন্নত হয়। ইহা পরম লাভ।

যাঁহারা দেশের কাজ করিবেন বলিয়া, কিম্বা অন্য কোন কারণে, প্রভূত উপার্জ্জনের পন্থা হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের ত্যাগের যশ সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের ত্যাগ সত্য, তাঁহারা এইরূপ প্রশংসার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কম উপার্জ্জনের উপায় বর্জ্জন করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের যশ তেমন করিয়া কীর্ত্তিত হয় না। কিন্তু তাঁহারাও, যশ বা পুরস্কারের জন্য কাজ না করিলেও, বিধাতার পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হন না। তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, এবং তাঁহাদের আত্মা উন্নত হয়। যাঁহারা প্রভূত উপার্জ্জন ত্যাগ করেন, তাঁহাদের অন্নকষ্ট হইয়াছে, এরূপ শুনা যায় না; কিন্তু অল্প আয়ের লোক, সৎপ্রবৃত্তির বশে রোজ্‌গারের পথ ছাড়িয়া দিয়া, অন্নকষ্টে পড়িয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহাঁদের ত্যাগ এই কারণে অধিকতর প্রশংসনীয়।

এরূপ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত লোক সকল দেশে এবং আমাদের দেশেও আছেন, যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, অর্থ-উপার্জ্জনই তাঁহাদের জীবনের প্রধান চেষ্টা হইবে না, লোকহিতকর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইবে। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই বেশী রোজ্‌গারের দিকে কখন যান নাই, সুতরাং বেশী উপার্জ্জন ছাড়িয়া দিলে লোকে যেরূপ বিস্মিত হয়, সেরূপ বিস্ময় উৎপাদনও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। অনেক টাকা উপার্জ্জনও তাঁহারা কখন করেন নাই, সুতরাং থোক্ কিছু দানের খ্যাতি, কিম্বা অর্থশালী লোকে কিছু একটা ত্যাগের কাজ করিলে যে যশ হয়, তাহা তাঁহারা লাভ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জীবনের যে সার্থকতা, সাধুজীবনের লভ্য যে বিমল আত্মপ্রসাদ, সাধনার ফল আত্মার যে প্রসার ও উন্নতি, তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন না।

এরূপ কথা উঠিতে পারে, বটে, যে, স্কুল কলেজে যে বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে কেহ যে অনেক টাকা রোজ্‌গার করিতে চাহিলেই করিতে পারিত, তাহার প্রমাণ কি? অতএব, যাহারা রোজ্‌গার করিতে পারিবে না, জানে, তাহারাই সাধু সাজে। কি হইতে পারিত বা পারিত না, তাহা প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এরূপ আপত্তি সম্পূর্ণ খণ্ডন করা যায় না। কেবল ইহাই বলা যায়, বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, তর্কশক্তি, শ্রমশীলতা, মানবচরিত্রজ্ঞান, প্রভৃতি দ্বারা অনেককে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং ঐরূপ যোগ্যতা-বিশিষ্ট কেহ যদি অর্থ-উপার্জ্জনকে জীবনের প্রধান কাজ না

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি অর্থ-উপার্জ্জনে মন দিলে তাহাতে সফলকাম হইতেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

—

ত্যাগ ও গ্রহণ

বস্তুতঃ কে কত সম্পত্তি বা সম্ভাবিত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা মহত্বের পরিমাপ করাটাই ভুল।

অনেক উপনিষদ্‌কার ঋষির নাম পর্য্যন্ত জানা যায় না; সুতরাং তাঁহারা যদি উপার্জ্জনের পথে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কত রোজ্‌গার করিতে পারিতেন, বলা যায় না। ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ যদি সাংসারিক লোক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রোজ্‌গারের পরিমাণ কি হইত, ঠিক্ করা অসম্ভব। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে তাঁহারা ঠিক্ কি পরিমাণ সম্ভাবিত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন মহাত্মার সম্ভাবিত রোজ্‌গারের একটা অনুমান করা যায়।

যীশুখ্রীষ্ট এক সূত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা না হইয়া ছুতারের কাজ করিলে খুব বেশী রোজ্‌গার করিতে পারিতেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। মোহম্মদ ধর্ম্মোপদেষ্টা না হইয়া তাঁহার জীবনের প্রথমাংশের কাজেই যদি নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে খুব বেশী ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। চৈতন্য বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে টোলের অধ্যাপক হইতেন। টোলের খুব বড় অধ্যাপকদেরও আয় লোকের অবিদিত নহে। নানক নিজ পরিবারের মুদির দোকানটি চালাইলে খুব ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতেন না। কবীর তন্তুবায়ের কাজ করিতেন, ধনী হন নাই। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমাদের জীবিতকালে পরমহংস রামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। তিনি বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে দেবালয়ের পূজারী, যাত্রার দলের গায়ক, কিম্বা, কথক-ঠাকুর হইতে পারিতেন। কোন কাজটিরই রোজ্‌গার বেশী নয়।

জগতের এইসব ধর্ম্মগুরু যে-পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ, অর্থ-উপার্জ্জন, বা সম্ভাবিত উপার্জ্জন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণে ভক্তি পাইয়াছিলেন, এরূপ কেহ মনে করে না। বিষয়ে আসক্তি এবং বিষয়সুখে আসক্তি ত্যাগ না করিলে সাত্বিক জীবন লাভ করা যায় না। তাঁহারা সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। নৃপতির রাজৈশ্বর্য্যে আসক্তি না থাকিতে পারে, তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে; আবার ভিখারীর ভিক্ষাপাত্রে ও কৌপীনেও আসক্তি থাকিতে পারে, তাহাও অনুমান নহে। কৌপীনের আসক্তি ত্যাগ প্রভূত সম্পত্তির আসক্তি ত্যাগ অপেক্ষা বাস্তবিক সকল স্থলে সকলের পক্ষে সহজ না হইতেও পারে।

যেমন ত্যক্ত বস্তুর আর্থিক মূল্য অনুসারে ত্যাগীর মহত্ব পরিমাপিত হয় না, তেমনি শুধু ত্যাগ দ্বারাও মহত্ব লব্ধ হয় না। বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন ও রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইতিহাসে রাজপুত্রের সিংহাসনের আশা ও দাবী ত্যাগের ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। এরূপ অন্য কোন রাজপুত্র বুদ্ধদেব হন নাই। শাক্যসিংহ যদি কেবল ত্যাগই করিতেন, তাহা হইলে তিনি বুদ্ধদেব হইতে পারিতেন না। তিনি মন হইতে বিষয়াসক্তি ও সংসারের মোহ বিদূরিত করিবামাত্রই বুদ্ধ হন নাই। দীর্ঘকালব্যাপী বহু সাধনার দ্বারা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সম্পত্তি অর্জ্জন ও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই অর্জ্জন ও গ্রহণ দ্বারা, আত্মার মধ্যে যাহা বীজের বা অঙ্কুরের আকারে ছিল তাহার পূর্ণ বৃদ্ধির দ্বারা তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জগতের অন্য যে-সকল ধর্ম্মগুরুর নাম করিয়াছি, তাঁহারা যেমন ত্যাগ দ্বারা আত্মাকে-আসক্তি-মায়ামোহ শূন্য করিয়াছিলেন, তেমনি উহাকে ব্রহ্মজ্ঞানে ও ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন। কেবল ত্যাগ দ্বারা অন্তরটাকে খালি করিলে জন্ম ও জীবন সার্থক হয় না; ত্যাগে আত্মার যে স্থান শূন্য হইল, জ্ঞান ভক্তি ও সেবার ইচ্ছা দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করিতে পারিলে তবে মানবকুলের বন্দনীয় হওয়া যায়।

—

কাঁথিতে অশান্তি

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কাঁথি হইতে "সার্ভেণ্ট" দৈনিক কাগজে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহার সার সংকলন করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা খুব বড়। ইহাতে

নয়টি থানা, এবং প্রায় ছয়লক্ষ লোক আছে। ইহার রামনগর ও কাঁথি থানা দুটিতে বর্ত্তমান ১৯২১ সালের গোড়ায় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে ঐ দুটি থানায় বড় অশান্তি হইয়াছে। লোকেরা নিম্নলিখিত আটটি কারণে এই আইনের বিরোধিতা করিতেছে :—

১। ইহাতে বর্ত্তমান ট্যাক্স সাতগুণ বাড়িবে। গ্রাম্য চৌকীদারী আইন অনুসারে গ্রামবাসীকে বার্ষিক ১২ টাকা দিতে হয়, কিন্তু এই আইন অনুসারে ৮৪ টাকা দিতে হইবে। ২। ইহা দ্বারা জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আঘাত পড়িবে, কারণ এই ট্যাক্সবৃদ্ধি গ্রামবাসীদের কৃষিলব্ধ আয় অনুসারে হইবে। ৩। এই আইন গ্রামসকলকে বাস্তবিক স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই ; কেন না, গ্রামের চৌকিদার ও দফাদারেরা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা নিযুক্ত, রক্ষিত ও বরখাস্ত হইবে ; গ্রামবাসীদের তাহাতে কোন হাত নাই। ৪। পাকা ইটের পায়খানা, মেথর, প্রভৃতির দ্বারা গ্রাম্য জীবন আরও ব্যয়সাধ্য করা হইবে। ৫। আইন-অনুযায়ী উচ্চতম হারে ট্যাক্স ধার্য্য না করিলে আইন অনুযায়ী কাজ হইবে না ও উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ; কিন্তু গ্রামবাসীরা বলে, যে, উচ্চতম হারে কর দিবার সাধ্য তাহাদের নাই। ৬। গ্রামবাসীরা বলে, যে, এই আইন দ্বারা গ্রাম্য অঞ্চলে দলাদলি বাড়িবে, সুতরাং মাম্‌লাবাজীও বাড়িবে। ৭। তাহারা বলে ইহা দ্বারা গ্রামে মৃত্যুর হার কমিবে না ; কারণ তাহাদের মতে গ্রামগুলির অস্বাস্থ্যকর অবস্থা গ্রাম্য অঞ্চলে মৃত্যুর আধিক্যের কারণ নহে, পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে না-পাওয়া উহার কারণ। ৮। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন অনুসারে ১৫ই এপ্রিলের পর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা করা হইয়াছে, সমস্তই বে-আইনী।

এই-সব কারণে প্রায় ছয় লক্ষ লোক কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম মানিতে অসম্মত হইয়াছে, এবং গত সপ্তাহ হইতে [নিরস্ত্র] সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে যুক্তি-তর্ক ও বুঝান, তৎপরে ধমক, তাহার পর কর-বৃদ্ধি, তাহার পর বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল করা, এবং সর্ব্বশেষে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে গ্রেপ্তার, এই উপায়গুলি পরীক্ষা করেন। (বীরেন্দ্র-বাবুকে এই প্রচেষ্টার নেতা মনে করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার চিন্তা কর্ত্তৃপক্ষের মাথায় আসে)। কিন্তু কোন উপায়েই কোন ফল হয় নাই ; গ্রামবাসীরা ছয় মাস ধরিয়া এই আইন-অনুযায়ী কোন কর দিতে অস্বীকার করে। এই প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞাতে চলিতেছিল। কর আদায় না হওয়ায় চৌকিদারেরা বেতন পায় নাই। পরিশেষে কর্ত্তৃপক্ষ, যাহারা কর দিতেছে না, তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য তহসীলদার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার ফলে কাঁথিতে অধিবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ঐক্য দেখা দিয়াছে।

লোকেরা আহ্লাদ-সহকারে তহসীলদার ও তাহার কর্ম্মচারীদিগকে হরিবোল ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে আহ্বান করিতেছে। গত সাত দিনে প্রায় ১৫০০ লোকের সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার মারামারি হাতাহাতি হয় নাই। যে ১৫।২০ জন নগদ টাকায় ট্যাক্স দিয়াছে, তাহারা সরকারী চাকর, কিম্বা সম্পর্কীয় লোক। কয়েক জন গরীব স্ত্রীলোক শাঁক বাজাইয়া তাহাদের বাসন-কোসন সরকারের চাকরদের হাতে অর্পণ করিয়াছে। সকলে সন্তুষ্টচিত্তে জিনিষপত্র ছাড়িয়া দিতেছে। ক্রোক যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে সকলের জিনিষ ক্রোক সমাপ্ত করিতে তিন মাস লাগিবে। ইতিমধ্যে মজুর ও গাড়োয়ানেরা ক্রোকী জিনিষ বহিতে রাজি না হওয়ায় ৮৪ মাইল দূরবর্ত্তী মেদিনীপুর হইতে কয়েকজন গাড়োয়ান আনা হইয়াছে। কোন কোন চৌকিদার পর্য্যন্ত ক্রোকের কাজে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের এখন বুঝা উচিত, যে, কাঁথির এই প্রচেষ্টার সহিত "অসহযোগ" আন্দোলনের সম্পর্ক নাই, গ্রামবাসীরা নিজেরাই এই আইন চায় না বলিয়া এরূপ বৃহৎ জোট বাঁধিয়াছে ও স্বার্থ ত্যাগ করিতেছে।

শাস্‌মল মহাশয়ের চিঠির তাৎপর্য্য দিলাম। কাঁথি সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকায় আমরা বলিতে পারিতেছি না, যে, ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের ফলাফল যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক্ কি না। কিন্তু ঠিক্ হইলে তাঁহাদের প্রচেষ্টা যে বৈধ, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

ঠিক্ হওয়াই সম্ভব। তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়া থাকিলেও, তাঁহাদের ঐক্য, এবং নিরুপদ্রব দৃঢ়তা সাহস ও ত্যাগ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে, এই বোধ জন্মিলেই তাঁহারা তাহা সংশোধন করিতে ও প্রকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের ঐক্য এবং নিরুপদ্রব দৃঢ়তা সাহস ও ত্যাগ তখন বিশেষভাবে ফলবান্ হইবে।

ব্যাপারটি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্গে স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় ঘটনা-স্থলে গিয়া সাক্ষাৎ ভাবে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিলে এবং বিবাদ ভঞ্জন করিলে ভাল হয়।

বঙ্গদেশের গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন-বিষয়ক ১৯১৯ সালের ৫ আইন সম্বন্ধে আমাদের অনেকের কোন জ্ঞান নাই। জ্ঞান থাকা উচিত। উহার বাংলা অনুবাদ কিনিতে পাওয়া যায়। উহার সপক্ষে যাহা বলা যাইতে পারে, ৩৪ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য আইনটি প্রকাশিত করিয়াছেন।

—

খুলনায় দুর্ভিক্ষ

খুলনা জেলায় যত লোক দুর্ভিক্ষে নিরন্ন ও বস্ত্রহীন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এখনও সাহায্য পাইতেছে না। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ, এবং রামকৃষ্ণ মিশন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রভৃতি দরিদ্র-সেবকগণ যথাসাধ্য সাহায্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু খাটিবার লোক এবং চাউল, টাকা ও কাপড় আরও অনেক জুটিলে তবে সকলকে সাহায্য দিতে পারা যাইবে। যে-সকল বদান্য ব্যক্তি চাউল কাপড় ও টাকা দিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বথা কৃতজ্ঞতাভাজন; কিন্তু আরও চাউল, টাকা ও কাপড় চাই, খাটিবার লোকও আরও চাই। কিরূপ অবস্থার লোকদের জন্য সাহায্য চাওয়া হইতেছে, তাহা ছবি হইতে বুঝা যাইবে।



খুলনার দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট আবালবৃদ্ধ-বনিতা।

আসাম-বেঙ্গল রেল-ওয়ের ধর্ম্মঘট

আসামের চা-বাগান হইতে প্রত্যাগত কুলীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার হইয়াছে,

তাহাতে বিচলিত হইয়া কুলীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য এবং গবর্ণমেণ্টকে কুলীদের স্বস্বগ্রামে প্রত্যাগমনের ব্যয় দিতে বাধ্য করিবার জন্য আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যতদিন দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, এবং কুলীদিগকে বাড়ী পাঠাইবার খরচ না দেন, তত দিন ধর্ম্মঘটকারীদের রেলওয়ের চাকরীতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে, ইত্যাকার কথা রটিয়াছিল। ধর্ম্মঘট হইবার কিছুকাল পরে এমন কথাও রটান হইয়াছিল, যে, রেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটকারীদের অসন্তোষের ও অভিযোগের কারণ আছে। সর্ব্বসাধারণের এইরূপ নানা ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য চাঁদপুরের ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ হইতে শ্রীনিরঞ্জন দত্ত ও শ্রীকালীজীবন সেনগুপ্ত সংবাদপত্রে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ধর্ম্মঘটের উৎপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সমগ্র বক্তব্য ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। উহা পড়িয়া এই ধারণা হয়, যে, রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া ধর্ম্মঘট করান হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের যে অঙ্গীকার নেতারা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। লেখকদ্বয়ের কোন কোন কথা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। চাঁদপুরে ধর্ম্মঘটের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন :—

১৯২১ অব্দের ২৪শে মে চাঁদপুরে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট ঘোষিত হয়। বাবু অখিলচন্দ্র দত্ত, মিঃ জে এম্ সেনগুপ্ত দুইজনেই তখন চাঁদপুরে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন চাঁদপুরের নেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ, চট্টগ্রামের বাবু নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু বসন্তকুমার মজুমদার হরদয়াল-বাবুর বাড়ীতে এক সভায় স্থির করেন যে, ধর্ম্মঘট করান হইবে। তদনুসারে তাঁহারা চাঁদপুরের রেলওয়ে কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্ম বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। বাবু বসন্তকুমার মজুমদার ও বাবু নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের নিকট এমনভাবে বক্তৃতা করিলেন যে, আমরা উহাতে বিচলিত হইলাম। তথায় যে-সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বলিলেন, যত দিন ধর্ম্মঘট থাকে, আমরা তোমাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিব; ধর্ম্মঘট বড় জোর ৭ দিন থাকিবে। আমাদিগকে তখন ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার সময় দেওয়া হয় নাই, বিশেষতঃ চাঁদপুরের অবস্থা তখন স্বাভাবিক ছিল না। ঐরূপ সময়ে নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। জননায়কগণ রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ঘটাইবার জন্ম স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করিতেছিলেন। আমরা মূর্খের কথা-মত উল্লিখিত জননায়কদিগকে বিশ্বাস করিলাম, ভাবিলাম ধর্ম্মঘটকালে ইঁহারা আমাদের ভরণপোষণ-ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

বক্তৃতায় বিচলিত হইয়া এবং জননায়কদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য মনে করিয়া তাঁহাদের কথা রক্ষার নিমিত্ত আমরা চাঁদপুরের রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে কোনরূপ বিজ্ঞাপন না দিয়া ২৪শে মে কর্ম্মত্যাগ করি। রেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অসন্তোষের কারণ ছিল না, সুতরাং উক্ত প্রকারে বিচলিত না হইলে আমরা কখনও ধর্ম্মঘট করিতাম না।

এণ্ড্রুজ সাহেব বরাবর এই ধর্ম্মঘটের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার কথা শুনিলে ধর্ম্মঘটের ১০।১২ দিন পরেও কর্ম্মচারীদের পুনরায় চাকরী পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নেতারা তাঁহার কথায় কান দেন নাই।

এই সময়ে আমাদিগকে ইহা বলা হইল যে, বাবু নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশকে এবং মিঃ সেনগুপ্তকে এবং অপর ভদ্রলোকদিগকে জানাইয়াছেন যে, চট্টগ্রাম স্বরাজ প্রায় পাইয়াছে, এখন ধর্ম্মঘটকারীরা যদি রেলওয়ে কোম্পানীর কাছে পরাভব স্বীকার করে, তাহা হইলে সমস্ত মাটি হইবে।

এই সময়ে নেতাদের মনের ভাব কি ছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানি পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে।

"ইহা শ্রমঘটিত ধর্ম্মঘট নহে, কিন্তু ইহা প্রকৃত অস্থায়ী অসহযোগ। ইহার সফলতাতে স্বরাজ-যুদ্ধের অর্দ্ধজয় সূচিত হইবে। সুতরাং এতদ্বিষয়ে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

সি, আর, দাস, ৮।৬।২১।"

ধর্ম্মঘটকারীদিগকে কিপ্রকারে বার বার মিথ্যা আশা দিয়া চাকরীতে যোগ দেওয়া হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

নেতারা তখন আমাদের মনে এই কথা মুদ্রিত করিয়া দিলেন যে, আর এক সপ্তাহ কাল যদি আমরা ধর্ম্মঘট করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে ডাক বন্ধ হইবে, সরকারী কাগজ পত্র কোথাও প্রেরিত হইতে পারিবে না, এবং শাসনকার্য্যে এমন বিশৃঙ্খলা হইবে যে, আমাদের সহিত বাধ্য হইয়া উৎকৃষ্টতর সর্ত্তে মীমাংসা করিতে হইবে।

আমরা এমন অন্ধ যে, ঐ কথা বিশ্বাস করিয়া কার্য্য গ্রহণে বিরত রহিলাম। শীঘ্রই দেখিতে পাইলাম যে, ধর্ম্মঘট সত্ত্বেও রেলওয়ে কোম্পানী সরকারী ডাক প্রেরণ এবং সরকারী আমলাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু লোকসাধারণেরই যাতায়াতে অসুবিধা ঘটিতেছিল। আমাদের চক্ষু যেন একটু খুলিল। আমাদের ভয় হইতে লাগিল যে, আমাদের জীবিকার পথ বুঝি চিরদিনের জন্ম নষ্ট হয়। ঐ সময়ে রেলওয়ে কোম্পানী আবার আমাদিগকে কার্য্য গ্রহণের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

আমাদের এই সংশয়-দোদুল্যমান অবস্থা নেতারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে নেতারা এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, রেলওয়ে কোম্পানীর প্রত্যহ এত ভীষণ ক্ষতি হইতেছে যে, তাঁহারা আপোষ করিবার জন্ম বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা যদি কোনরূপে আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে এমন সর্ত্তে মীমাংসা হইবে যাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা অধিকতর নির্ব্বোধ তাহারা ঐ কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মঘট চালাইতে লাগিল। যাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, এমন কতিপয় ব্যক্তি ঐ সংবাদ অবিশ্বাস করিয়া কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল

ইহার পরও ধর্ম্মঘটকারীদিগকে একাধিকবার ধোঁকা দেওয়া হইয়াছিল, প্রকৃত অবস্থা জানিতে দেওয়া হয় নাই, এবং যখন মহাত্মা গান্ধী কতিপয় নেতার প্রমুখাৎ মিথ্যা বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির করেন, যে, ধর্ম্মঘটকারীদের আর নিজ নিজ চাকরীতে ফিরিয়া যাওয়া অনুচিত, তখনও সে কথা তাঁহাদিগের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। কারণ,

নেতাদের মনে ভয় হইয়াছিল যে, আমরা যদি ঐ সিদ্ধান্ত জানিতে পারি, তাহা হইলে মহাত্মাজীর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, নেতাদের প্রাগ না করিয়াই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট করিব। এইজন্যই তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানিতে দেন নাই।

অর্থসাহায্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ যেমন তাঁহার বদান্যতা-ব্যঞ্জক, তেমনি কলিকাতার নেতাদের অঙ্গীকারভঙ্গের পরিচায়ক।

স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার
ডিষ্ট্রীক্ট কংগ্রেস কমিটী, চট্টগ্রাম
২৭—৮—২১

মহাশয়

ধর্ম্মঘটকারীদিগকে ইহা অবগত করুন যে, কলিকাতার কোন কোন নেতা এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা টাকা পাঠাইবেন, কিন্তু আজও টাকা পাই নাই। গত এক পক্ষ কালের মধ্যে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি অনেকবার করিয়াছেন। আপনাদিগকে অর্থ-সাহায্য দান সম্বন্ধে আমি এখন নিরুপায় হইয়াছি। আপনাদের জন্য আমি নিজে ৪০ হাজার টাকা দিয়াছি। ধর্ম্মঘটকারীদের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। যতদিন কলিকাতা হইতে টাকা না আইসে, ততদিন আমি ধর্ম্মঘটকারীদিগকে কোন অর্থ সাহায্য করিতে পারিব না। আপনারা এক মহৎ উদ্দেশ্যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আপনারা অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন। আমি আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করিয়াছি, এখনও আমি যতদূর পারি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমি আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে ইহা জানাইতেছি যে, আমার শেষ কপর্দ্দক, এমন কি তাহা অপেক্ষাও বেশী, আপনাদিগকে আমি দিয়াছি।

তাঁহাদিগের নিকট হইতে সত্য গোপন করিয়া রাখায় ধর্ম্মঘটকারীগণের মনে শেষপর্য্যন্ত কিরূপ ভুল ধারণা ও আশা ছিল, শুনুন।

এযাবৎ আমাদের মনে এই ধারণা ছিল যে, অনুকূল সর্ত্তে যাহাতে কার্য্য পুনঃগ্রহণ করিতে পারি, সেইরূপ মীমাংসা করাই নেতাদের লক্ষ্য। নেতারাও ইহা জানিতেন যে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে আমরা ধর্ম্মঘট চালাইতাম না। এইজন্য আমরা একান্ত আশান্বিত হৃদয়ে মহাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এবং যখন আমরা মহাত্মাজীর মুখে শুনিলাম যে, আমরা পুনর্ব্বার কর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে পারিব না, আমাদিগকে চরকা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে, তখন আমাদের নিরাশার সীমা রহিল না। আমরা মহাত্মাজীর নিন্দা করি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের নন-কো-অপারেটর নেতারা মহাত্মাজীর নিকট ধর্ম্মঘটের যথার্থ ঘটনাবলী ব্যক্ত করেন নাই। তিনি আমাদের শোচনীয় দুর্গতি, এবং নেতারা আমাদিগকে "বোড়ে" করিয়া কিরূপ রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

গান্ধী মহাশয়ের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে ইহা বুঝিতে পারেন নাই, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। তিনি ধর্ম্মঘটকারীদিগকে যে নৈতিক আদর্শের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

নৈতিক যুক্তি।

মহাত্মাজী আমাদের কার্য্য গ্রহণের বিরুদ্ধে এই নৈতিক যুক্তি দেখাইয়াছেন, যে, গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চা-বাগানের কুলীদিগকে বাড়ী পাঠাইবার পূর্ণ ব্যয় প্রদান না করেন, তাবৎ আমরা কার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি না। স্থানীয় কংগ্রেস-নেতাদের প্ররোচনায় মহাত্মাজী এই যে হেতু দেখাইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অদৃষ্টের পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। যেমন দেখিতেছি, তাহাতে ইহা বলা যায়, যে, মহাত্মাজীর প্রদর্শিত নৈতিক হেতু কেবল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নিরন্ন কর্ম্মীদের উপরই প্রযুজ্য।

নৈতিক যুক্তি কেবল আমাদিগকে মানিতে হইবে।

চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও অপর সকল স্থলের যে-সকল উকীল কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা, গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা প্রার্থনা না করাতেও, আবার ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অসহযোগ-ব্রত রক্ষার কোন দরকার নাই। কিন্তু যে-সকল নিরন্ন শ্রমজীবী মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া উদরান্নের সংস্থান করে, দেশের নৈতিক তেজ রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে আত্মবলি দিতে হইবে। যেসকল নেতা আমাদের দ্বারা এই নৈতিক তেজ বিকাশের অভিলাষী তাঁহারা কিন্তু আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে যাতায়াত করিবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে এক বিন্দু দ্বিধা প্রকাশ করেন না! আমরা-আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের দরিদ্র কর্ম্মীরা কার্য্য গ্রহণে বিরত থাকিয়া যাঁহাদের কাছে নৈতিক বলের দৃষ্টান্ত দেখাইব, সেই দেশবাসীরা এবং নেতৃবৃন্দ এক্ষণে পূর্ব্ববৎ ঐ রেলওয়ে ট্রেনে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিতেছেন।

ধর্ম্মঘটকারীরা কলিকাতা ও চট্টগ্রামের নেতাদিগকে মিথ্যাসংবাদ-দাতা বলিতেছেন।

কলিকাতা ও চট্টগ্রামের নেতারা আমাদিগকে এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, আমাদের কার্য্য পুনঃগ্রহণ করা অন্যায়। তখন তাঁহারা মহাত্মাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া তাঁহার দ্বারা আমাদিগকে ঐ কথা জানাইয়াছেন।

চরখার দ্বারা সংসার-খরচ চালাইবার যে উপদেশ ধর্ম্মঘটকারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা অতি তিক্ত কিন্তু সত্য কথা বলিয়াছেন।

কেবল আমাদিগকেই চরকা দ্বারা ভরণপোষণ চালাইতে হইবে।

মহাত্মাজী আমাদিগকে চরকাদ্বারা ভরণপোষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নেতারা জানেন, আমাদিগকে অনাহার-ক্লেশ সহিতে

হইতেছে। আমরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে কি প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারি, তাহা বুঝিতে পারি না। অসহযোগী উকীল-মোক্তারেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব ব্যবসায় করিবেন, আর আমরাই কেবল চরকাদ্বারা আত্মরক্ষা করিব? প্রাদেশিক কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্ম্মীরা মাসিক ৫০ হইতে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগকে ভুলাইয়া ধ্বংসের মুখে পাঠাইতে চান।

আমাদের দুর্গতি।

উপরে যেসকল নেতার নাম করিয়াছি, ধর্ম্মঘটের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহারা আমাদিগকে প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মিঃ সেনগুপ্তের পত্রানুসারে যেসকল স্থলে ধর্ম্মঘট হইয়াছে সেই সেই স্থানের কংগ্রেস কমিটিকে তাঁহারা এরূপ মুদ্রিত অনুরোধ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ঐ-সকল কমিটি যেন আমাদিগকে আর্থিক সাহায্য করেন। চাঁদপুরে আমরা যে, জুন, জুলাই তিন মাসে মোটে ১৩,৪৬০ টাকা সাহায্য পাইয়াছি। আগষ্ট মাসে আমাদিগকে একরূপ কিছুই দেওয়া হয় নাই। এই মাসে চাঁদপুরের ধর্ম্মঘটকারীরা মোট ৩০০ টাকা অর্থাৎ গড়ে ৫ কি ৬ টাকা এক একজনে পাইয়াছে। এই টাকায় কি প্রকারে এক পরিবার প্রতিপালন: হইতে পারে? আমাদের যে যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিপাটা ছিল তাহা শেষ হইয়াছে। আমাদের এক্ষণে অনশন-দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের অনেকেই সপ্তাহে ৩ বেলার বেশী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।

অনশন ও অভ্যর্থনা।

প্রসঙ্গতঃ আমরা একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। আমরা যখন অনশনে হাহাকার করিতেছিলাম, কংগ্রেস কমিটি যখন আমাদিগের সাহায্য বন্ধ করেন, ঠিক ঐ সময়ে মহাত্মার অভ্যর্থনার জন্য নেতারা চাঁদপুরে ১৫০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। অন্যস্থলে যাইয়া কার্য্যের খোঁজ করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, আমাদের তখন সে অর্থও ছিল না। মহাত্মার চট্টগ্রামে আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাবু বসন্তকুমার মজুমদার চাঁদপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় আমাদিগকে নিরন্ন-নারায়ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরন্ন-নারায়ণেরা কি খাইয়া বাঁচিবে, তাহার উপায় করেন নাই। অল্পদিন মধ্যে ফিরিব বলিয়া তিনি চট্টগ্রামে গমন করেন, কিন্তু তদবধি আর তিনি চাঁদপুরে ফিরেন নাই। তিনি আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য কংগ্রেস কমিটি হইতে কিছু প্রদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায় যোগদান করিবার জন্য সপরিবারে বোম্বাই গমন করিবার জন্য তাঁহার অর্থের অভাব হয় নাই। এইজন্য আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না, কারণ বোম্বাইতে গিয়াছিলেন তিনি ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতে, আর আমরা অতি নগণ্য প্রাণী, তাঁহারই চেষ্টায় অনশন-দশায় উপস্থিত হইয়াছি।

দেশসেবকদের বৃত্তি।

আমরা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি আমরা চরকা শিক্ষা করি, তাহা হইলে মাসে ১০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কয়জন নেতা চরকার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছেন? দেশসেবার জন্য ইঁহারা অনেকেই রেলষ্টীমারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। অনেকে কংগ্রেস ও খিলাফৎ ভাণ্ডার হইতে মাসিক ৫০ হইতে ১৫০ টাকা পাইয়া থাকেন। ইঁহারা যদি মনে করেন যে, পরিবার প্রতিপালন জন্য ৩০ টাকা যথেষ্ট, তাহা হইলে দেশের কার্য্য করিতে যাইয়া ইঁহারা এত টাকা বেতন লইয়া থাকেন কেন? তাঁহারা কেন ৩০ টাকায় সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্থানীয় হইতেছেন না?

নেতারা চরকাদ্বারা ভরণপোষণ চালান না?

আমাদের এই ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে অনেক মিস্ত্রী ও সূত্রধর আছে। স্ব-স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া ইহারা অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে কি উপকার সাধিত হইবে? যে-সকল নেতা চরকার সাহায্যে আমাদিগকে পরিবার প্রতিপালন করিবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন, আমরা ইহা জানিতে চাই যে, তাঁহারা কতজনে ঐ উপায়ে পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন? আমাদিগকে বলা হইয়াছে, যে, আমাদের তাঁতের কাজে আমাদের ছেলেমেয়েদের সহযোগিতার আনন্দ আমরা পাইব। আমাদিগকে যাঁহারা এই দশায় টানিয়া আনিলেন, সেই-সকল নেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাঁহাদের পুত্রদের মধ্যে কয়জনে পড়া ছাড়িয়া চরকার দ্বারা পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে?

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য নেতাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মঘটকারীরা বলেন—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ, তাঁহার সরলতা অসন্দিগ্ধ, প্রারম্ভে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দায়িত্ববোধ-বর্জ্জিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছিল। সেই সঙ্গিগণের পরামর্শে তিনি আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন এক্ষণে এমন একদল দায়িত্ববোধ-রহিত লোকের হস্তে গিয়াছে, যাহারা অসঙ্কোচে ষ্টীমার ধর্ম্মঘটের সময়ে বলিয়াছিলেন যে, যে-পথে স্বরাজ পাইব সেই পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা ৩ হাজার কুলীর জীবন বলি দিতে পারি। তাঁহাদের নিজেদের জীবন যদি নিরাপদ থাকে, তাহা হইলে কুলীদের জীবন তাঁহাদের নিকট ধূলিবৎ। এমনই লোকের দ্বারা মিঃ সেনগুপ্ত শিশুবৎ পরিচালিত হইয়াছেন। ইহাদের কুপরিচালনায় আমাদের মত বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে।

গত ৩।৪ মাস অবর্ণনীয় ক্লেশ পাইয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কতিপয় চঞ্চলমতি বাচাল যে অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আপনাদের আয়ত্ত মধ্যে আনয়ন করিবার সাধ্য আমাদের নেতাদিগের নাই। তাঁহারা উত্তেজনা ও ভাবস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন, দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা আদৌ তাঁহাদের নাই। যখন তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন স্বদেশীয়দের জীবনের কোন মূল্য আছে ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে স্যার উইলিয়ম ভিন্সেন্ট্ বলিয়াছেন যে, আসামের ব্যবস্থাপক সভা ও গভর্ণমেন্টের মত হইলে, ভারত গবর্ণমেন্ট

শ্রীহট্ট জেলা আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিবেন। এবিষয়ে শ্রীহট্টের অধিবাসীদের ইচ্ছাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য; তাঁহাদের অধিকাংশ যাহা চাহিবেন, তাহাই করা উচিত। আসামের ব্যবস্থাপক সভা ও গবর্ণমেণ্ট নিজেদের এলাকা, লোকসংখ্যা ও আয়ের হ্রাসে সম্মত না হইতেও পারেন।

যাহারা একভাষা বলে, তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ড এক দেশ বা এক প্রদেশ-ভুক্ত এবং এক শাসক বা শাসকপরিষদের অধীন হওয়াই স্বাভাবিক ও ন্যায্য। কিন্তু অন্যদিকেও কিছু বলিবার ও বিবেচনা করিবার আছে। এক একটি দেশ বা প্রদেশের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য কিছু অবশ্যম্ভাবী খরচ আছে। কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা দেশবিশেষে এত কম হইতে পারে, যে, তাহারা নিজে এই-সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হইতে পারে। বেল্‌জিয়মের ৩২ লক্ষ লোক ফ্লেমিষ্‌ ভাষা বলে, ২৮ লক্ষ লোক ফরাস্‌ ভাষা বলে, পৌনে নয় লক্ষ ফ্লেমিষ্‌ ও ফরাস্‌ দুই বলে। কিন্তু বেল্‌জিয়মকে দুটি দেশে ভাগ করা সুবিধাজনক নহে। সুইজারল্যাণ্ডের ১৫টি জেলার ভাষা জার্ম্যান, ৬টির ফরাস্‌, ১টির রুমান্‌স্‌, এবং ২টির ইতালীয়। কিন্তু তা বলিয়া ৩৯ লক্ষ লোকের বাসভূমি এই ক্ষুদ্র দেশটিকে ৪টি দেশে ভাগ করা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা একই দেশে বা প্রদেশে বাস করিলে তাহার বহু অসুবিধা আছে। কিন্তু সুবিধাও কিছু আছে। কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা কম হইলে, যে শাসন-ব্যয় তাহাদের পক্ষে একা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য, তাহা অন্যভাষাভাষীদের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা অনায়াসে বহন করিতে পারে। কোন ভাষাভাষীরা একাই একটি প্রদেশে বাস করিলে একপ্রকার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা জন্মে, যাহা একাধিক ভাষাভাষীরা একত্র বাস করিলে নিবারিত হইতে পারে।

কিন্তু কোন ভাষাভাষী লোকেরা যদি সংখ্যায় অধিকতর অন্য ভাষাভাষীদের সহিত একপ্রদেশভুক্ত হইয়া থাকিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের প্রতি অবিচার হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। ওড়িয়ারা বিহার, মান্দ্রাজ, ও বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। কোথাও তাহাদের প্রাধান্য নাই, এবং তাহাদের শিক্ষা, রাজকার্য্য প্রাপ্তির সুবিধা, প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি সুবিচার হয় না। এইজন্য একটি স্বতন্ত্র ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হওয়া ভাল। তাহাদের মোট সংখ্যা এক কোটির উপর। তাহাদের অধ্যুষিত ভূ-খণ্ডের আয়তন লোকসংখ্যার অনুপাতে বৃহৎ। সুতরাং অধিবাসী আরও বাড়িতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ও তাহারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

অন্ধ্রদেশের লোকদিগেরও একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সুবিধা দেওয়া উচিত। ইহাদের ভাষা তেলুগু। মান্দ্রাজপ্রদেশভুক্ত আন্ধ্রদের সংখ্যা দেড় কোটির উপর।

যে-যে স্থলে নূতন প্রদেশ ও গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে না, তথায় ত একভাষাভাষীদিগকে একই প্রদেশভুক্ত করা নিশ্চয়ই উচিত। বাঙ্গালীর জন্য নূতন করিয়া প্রদেশ গড়িতে হইবে না। পুরুষানুক্রমে বঙ্গভাষীর অধ্যুষিত যে-সব ভূখণ্ড পূর্ব্বে শাসনকার্য্যের জন্যও বাংলা দেশের অন্তর্ভূত ছিল, কিছু কাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে বাংলার সহিত আবার জুড়িয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ৩২ লক্ষ বাঙালীকে আসামের এবং প্রায় ২২ লক্ষ বাঙালীকে বিহারের এলাকার অধীন করিয়া রাখা উচিত নয়। তাহাদের বাসভূমিকে আবার বাংলাদেশের সামিল করিলে নূতন করিয়া কোন একটা গবর্ণমেণ্ট গড়িতে হইবে না।

মহিলার প্রতি সৌজন্য

একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক বেঙ্গলীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন দেখিলেন যে, একটা ট্রামগাড়ীতে একটি শিক্ষিতা মহিলা গাড়ীর পা-দানীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, পুরুষ যাত্রীরা কেহ উঠিয়া তাঁহাকে জায়গা ছাড়িয়া দেয় নাই! তিনি এই কারণে বাঙালীদের খুব নিন্দা করিয়াছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে, বাঙালী লেখক ও বক্তারা, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" এই শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া ভারতে নারীর সম্মানের যে বড়াই করেন, এই ঘটনাটি তাহার একটি দৃষ্টান্ত কি না?

মান্দ্রাজী ভদ্রলোকটির জানা উচিত, যে, যেমন

পরিচ্ছদ পোষাকী ও আটপৌরে দু রকম থাকে, পোষাকীটি বাহিরে যাইবার ও লোককে দেখাইবার জন্য, আটপৌরেটি আর সব সময়ে ও উপলক্ষে ব্যবহারের নিমিত্ত, তেমনি আমাদের বক্তৃতা ও তর্ক হইতেছে পোষাকী, ব্যবহার হইতেছে আটপৌরে। "আমাদের নারীরা দেবী," "নারীরা যেখানে পূজিত হন, দেবতারা তথায় প্রীত থাকেন," "আমরা আধ্যাত্মিক জাতি ও পাশ্চাত্যেরা জড়ৈশ্বর্য্যের উপাসক," এই-সব কথা তর্কস্থলে উচ্চার্য্য, আমাদের আচরণের সহিত ইহাদের কোন সামঞ্জস্য রাখিবার আবশ্যক নাই। এই দেখুন না, যদি কোন বিদেশী লোক বলে, বঙ্গনারীর অবস্থা অবনত, অমনি কতকগুলি খবরের কাগজ কয়েকটি নামজাদা শিক্ষিতা মহিলার নাম আওড়াইয়া ঐ বিদেশীকে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু আবার অন্যসময়ে নারীদের উচ্চশিক্ষার নিন্দা এবং শিক্ষিতা নারীদের নিন্দা করিতেও ইহারা পশ্চাৎপদ হইবে না।

—

মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব

মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতেছি, এবং তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

—

বিদেশী বস্ত্রদাহ

মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থানে রাশি রাশি বিদেশী কাপড় পোড়ান হইয়াছে। আমরা এই কাজটিকে গর্হিত বলিয়া মনে করি।

—

অসহযোগ-নেতাদের বিচার

মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতি কয়েকজন নেতাকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিচার করিতেছেন। আলীভ্রাতাদের পক্ষে ইহা ভাল হইয়াছে। তাঁহারা এখন নির্ভীক ব্যবহার দ্বারা দেখাইতে পারিবেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত ত্রুটিস্বীকার ভয়জাত নহে। আমরা কখনও বিশ্বাস করি নাই, যে, তাঁহারা ভয়ে ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন।

নিগ্রহনীতির অনুসরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অসহযোগপ্রচেষ্টা বন্ধ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না; বরং ইহাতে উহার জোর বাড়িবে। কোন-না-কোন অপরাধে ধৃত যুবক ও বালক বন্দীদের নির্ভীক ব্যবহারে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন নেতার ব্যবহারে ও অভিসন্ধিতে দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু অজ্ঞাতনামা নিষ্কলঙ্ক বহু বালক ও যুবকের আত্মোৎসর্গ বিশুদ্ধ আদর্শানুসরণচেষ্টা বলিয়া শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য বিবেচিত হইবে।

ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, নির্ব্বাসন, হাতে ক্ষমতা থাকিলেই এ-সব করা যায়। কিন্তু যুবকদের আদর্শানুসারী হৃদয়মনকে সন্তুষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়া দেশহিতে লাগাইতে হইলে যে দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, মানবচরিত্র-জ্ঞান, ন্যায়-পরায়ণতা, সাহস ও রাজনীতিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষের আছে কি?

—

দুটি পুস্তিকা

জোড়াসাঁকোতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে যে বর্ষা-উৎসব হইয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে গীত ১৮টি বর্ষাবিষয়ক গান "বর্ষামঙ্গল" নামক পুস্তিকায় আছে। ষোলটি গান রবীন্দ্রনাথের, তাহার মধ্যে ৫টি নূতন। পুস্তিকাটির দাম দুআনা; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে পাওয়া যায়।

"সত্যের আহ্বান" পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা। ইহাও ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউসে পাওয়া যায়।

উভয় পুস্তিকার লভ্যাংশ বিশ্বভারতীকে দেওয়া হইবে।

—

ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা

কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা সমাজের একটা মস্ত কুপ্রথা হইয়া উঠিয়াছে। চোর গাঁটকাটা হইতে রাজা-মহারাজা পর্য্যন্ত সকলে উহার কবলে আসিয়া পড়িতেছে। ঘোড়দৌড়ের দিনে যেদিকে খেলা হয় হাজার হাজার লোক সেদিকে যায়। অনেকে সেদিন নিজের উপজীবিকার ক্ষতি করিয়া ও কাজকর্ম্ম আফিস আদালত কামাই করিয়া জুয়া খেলিতে যায়। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সেদিন ট্রাম, মোটর, ঘোড়ার গাড়ীর হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়।

সকলকারই এক উদ্দেশ্য—কিরূপে পরিশ্রম বা বুদ্ধিখরচ না করিয়া হঠাৎ কপাল ঠুকিয়া বড় মানুষ হওয়া যায়। ফলে শত শত "ভদ্র" ও "ইতর" লোক বাড়ী, গহনা, পোষাক, পরিচ্ছদ, আস্বাব, পুস্তক বাঁধা দিয়া বা বিক্রী করিয়া জুয়া খেলে। হারিলে তাদের স্ত্রীপুত্রপরিবার সংস্থানহীন হয়। সময়ে সময়ে তাহাদের গ্রাস-আচ্ছাদন সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। তারা নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে কেহ বা চোর হয়, কেহ বা জুয়াচোর, আর কেহ বা পাগল হইয়া যায়। জিতিলে প্রায়ই বদখরচে ও কুচরিত্র হয়! এই কুপ্রথা যতশীঘ্র সমাজের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের ও স্বেচ্ছা-সেবকদলের যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ততই মঙ্গল। আইন দ্বারা অন্যান্য রকমের জুয়াখেলার মত ইহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে-সব খবরের কাগজ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার উপর বাজী-রাখার খবর, এবং বাজী জিতিবার সঙ্কেত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের তাহা বন্ধ করা উচিত। অন্যান্য জুয়াখেলার মত ইহাও অভদ্র ব্যসন, এইরূপ লোকমত যাহাতে প্রবল হয়, তাহার বিহিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—

দেউলিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট

বাংলা গবর্ণমেণ্টের কাজ চালাইতে হইলে যত টাকার প্রয়োজন, তাহার আয় তাহা অপেক্ষা আড়াই কোটি টাকা কম। বাস্তবিকই যে আয় কম, তাহা নয়। কোন প্রদেশে যত রাজস্ব আদায় হয়, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার অধিকাংশ নিজে গ্রহণ করেন, কিছু প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্য তাহাকে দেন। বাংলা গবর্ণমেণ্টকে যত দিয়াছেন, তাহাতে তাহার কুলায় না। বাংলার একটা প্রধান আয় পাটের ব্যবসা হইতে হয়; উহা ভারত গভর্ণমেণ্ট লইয়াছেন। বাংলার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট মোটামুটি পাটের আয়টা চাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছেন কেবল ৬৩ লক্ষ টাকা। দিবার সময় মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কোন কোন প্রতিনিধি সর্ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের প্রদেশেরও দরকার পড়িলে তাঁহারাও যেন টাকা পান। এক-জন দেশী প্রতিনিধি বলেন, বাংলা দেশকে নিজের ঘর সাম্‌লাইতে বলা হউক, জানাইয়া দেওয়া হউক যে তাকে এই শেষ ভিক্ষা দেওয়া হইল, ফের দেওয়া হইবে না! এই হঠাৎ বড়মানুষ পরের ধনে পোদ্দারদের কথা শুনিয়া হাসি পায়, দুঃখও হয়। এই রকম ভাষা প্রয়োগ করিয়াই কি ইহাঁরা "ভারতীয় জাতি" গড়িবেন?

—

মুখুজ্যে মহাশয়ের আনন্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জানিত (recognised) বিদ্যালয়-সকলে বৃত্তিশিক্ষা দিবার জন্য গত ৯ই, ১১ই, ১২ই জুন যে পরামর্শ-সভা হয়, তাহাতে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টকে দেউলিয়া বলিয়াছেন শুনিয়া আমি প্রগাঢ়রূপে আহ্লাদিত (intensely pleased) হইয়াছি, কারণ এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা গবর্ণমেণ্ট একপর্য্যায়ভুক্ত।" একটু তফাৎ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে-যে কারণে দেউলিয়া হইয়াছে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ঠিক্ সেই সেই কারণে দেউলিয়া হয় নাই। যাহা হউক, মুখুজ্যে মহাশয় যে দেউলিয়াত্ব পাঁচ মাস আগে স্বীকার করিয়াছিলেন, এও ভাল; কারণ আমরা তৎপূর্ব্বেও, আড়াই লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হওয়ার, ও এবম্বিধ অন্যান্য কথা লেখায় তাঁহার ক্রোধভাজন হইয়াছি। আমাদের মত অন্যান্য সমালোচকদিগকে unscrupulous critics, flitting spectres of humanity প্রভৃতি আখ্যা তিনি দিয়াছেন।

—

বৃত্তি শিক্ষার ব্যয়

বিদ্যালয়ে কোন্ কোন্ বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার ব্যয় যে ছাত্রেরা নিজেদের রোজ্‌গার হইতেই তুলিয়া দিতে পারে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার একটি ভাল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন, "সুপরিচালিত হইলে এরূপ শিক্ষা বহু পরিমাণে স্বব্যয়নির্ব্বাহক্ষম হইতে পারে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে লব্ধ আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই কথা বলিতেছি। আমি এলাহাবাদে একটি স্কুলে গিয়াছিলাম। আমি সেখানে একটি চালায় একঘর ছেলেকে ছুতারের কাজ করিতে দেখিলাম। প্রত্যেক ছেলেকে কাঠ দেওয়া

হয়। স্কুল একজন ছুতার মিস্ত্রীকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ছেলেরা কাঠের যে-সব জিনিষ তৈরী করে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বা পাঠাইয়া দেন। প্রত্যেক ছেলের আলাদা হিসাব রাখা হয়। তাহার নির্ম্মিত জিনিষ বিক্রী করিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা তাহার নামে জমা হয়। খরচের ঘরে লেখা হয়, কাঠের দাম, এবং শিক্ষক মিস্ত্রীর বেতনের কিয়দংশ। জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া এরূপ উদ্বৃত্ত থাকে, যে, অনেক ছেলেকে বাড়ী হইতে শিক্ষার মাহিনা আনিতে হয় না।" অতঃপর আশু বাবু কাশীর এই-প্রকার একটি যৌথ শিক্ষাদান-ব্যবস্থার কথা বলেন। জোড়হাটের একটি স্কুলেরও এইরূপ ব্যবস্থার কথা বলেন; পুণাতে কৃষিকলেজে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাও কৃষিকার্য্য করে তাহা বলেন; পাংসা স্কুলে হাতের তাঁতে উৎকৃষ্ট কাপড় বোনা হইতেছে, বলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই-যে, বৃত্তি-শিক্ষাদান-সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য নহে। আমরাও তাহাই মনে করি। গবর্ণমেণ্ট টাকা না দিলেও অনেক স্কুলে কোন কোন বৃত্তি শিখান যাইতে পারে।

—

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিক্ষা

গত ৭ই মে বিশ্ববিদ্যালয়ের জানিত (recognised) স্কুলগুলির হেড্ মাষ্টারদের যে পরামর্শসভা হয়, তাহাতে কতগুলি স্কুল কি কি বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নীচে তাহার অনুবাদ দিতেছি।

বিজ্ঞান।

বিষয়	স্কুলের সংখ্যা
রেখাঙ্কন ও কেজো জ্যামিতি	১১৬
ক্ষেত্রব্যবহার ও জরীপ	৯৭
পরীক্ষামূলক যন্ত্রবিজ্ঞান	৩৯
পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন	৭৩
স্বাস্থ্যতত্ত্ব	৯৬
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা	২৫
হাতের দক্ষতা শিক্ষা	২৫

বৃত্তি।

বিষয়	স্কুলের সংখ্যা
কৃষি ও উদ্যানকর্ম্ম	৯১
সূত্রধরের কাজ	১১৮
কর্ম্মকারের কাজ	৩১
টাইপ-লিখন ও হিসাবরক্ষণ	৮৭
সংক্ষিপ্তলিখন	৩৪
সূতা-কাটা ও তাঁতবোনা	২৪৭
দর্জ্জির কাজ	৯৫
সংগীত	২৬
গৃহস্থালী	২৩
টেলিগ্রাফী	১০
লোহা ও টিনের কাজ	১
প্রাকৃতিক ভূগোল	১
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ	১
সূচীকর্ম্ম	১
বাণিজ্যিক ভূগোল	১
বিবিধ বিষয়	১৮

প্রাকৃতিক ভূগোল ও প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তিশিক্ষার মধ্যে কেন আসিল, বুঝা যাইতেছে না।

—

নারীর কার্য্য

রক্ষা নারীর কার্য্য। দেশহিতৈষণা নারীর হৃদয়ে স্থান পাইলে তাহা রক্ষা পাইবে। স্থান যে পাইয়াছে, তাহার নানা সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। মৌলানা মহম্মদ আলীর গ্রেপ্তারের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী দৃঢ়তার সহিত স্বামীর কার্য্য করিতেছেন। স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তিনি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আলী-ভ্রাতাদের বন্দনীয়া জননী বৃদ্ধ বয়সে হাজার হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। ধৃত অপর একজন মুসলমান নেতার মাতা তাঁহাকে স্বধর্ম্মে দৃঢ় থাকিতে বলিয়াছেন, এবং জানাইয়াছেন, যে, "তুমি যদি গবর্ণমেণ্টের কাছে ক্ষমা চাও, তাহা হইলে আমাকে আর মুখ দেখাইও না।"

—

"অস্পৃশ্য"দের কথা

ব্রিটিশশাসিত মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং উহার সন্নিহিত ত্রিবাঙ্কুড়, কোচীন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে লক্ষ লক্ষ "অস্পৃশ্য" জাতীয় লোকের বাস। ইহাদিগকে পঞ্চম বলা হয়। অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতির অতিরিক্ত এবং তাহাদের বাহিরে ইহারা পঞ্চমস্থানীয় জাতি। এই পঞ্চমদিগের প্রতি ব্রাহ্মণেরা শত শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, কোন দেশের মানুষ ইতর প্রাণীকে তদ্রূপ অবজ্ঞা করে না। মহাত্মা গান্ধী বার বার বলিয়াছেন, যে, "অস্পৃশ্য"দিগের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিলে, তাহাদিগকে মানুষের যে-যে অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া না দিলে আমরা কখন স্বরাজ পাইব না। বস্তুতঃ, পঞ্চমদিগকে অধঃপাতিত রাখিয়াও যদি স্বরাজ পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও তাহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করা অধর্ম্ম হইত। স্বরাজ পাই বা না পাই, মানুষকে অবজ্ঞা করা সাতিশয় গর্হিত কাজ। বহুযুগ ধরিয়া অবজ্ঞা, অত্যাচার, অপমান সহ্য করিয়া পঞ্চমেরা এখন "মরিয়া" হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারা ব্রাহ্মণ ও অপর তিন জাতির লোকদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রহার দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কেবল যে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই অপমানিত অবজ্ঞাত ও উৎপীড়িত হয়, তাহা নহে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই তাহাদিগের লাঞ্ছনা করে। মহাত্মা গান্ধী গত ২৯শে সেপ্টেম্বরের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন :—

Nowhere is the "untouchable" so cruelly treated as in this presidency. His very shadow defiles the Brahman. He may not even pass through Brahman streets. Non-Brahmans treat him no better. And between the two, the Panchama, as he is called in these parts, is ground to atoms. And yet Madras is a land of mighty temple and religious devotion. The people with their big *tilak* marks, their long locks and their bare clean bodies look like Rishis. But their religion seem almost to be exhausted in these outward observances. It is difficult to understand this Dyerism towards the most industrious and useful citizens in a land that has produced Shankara and Ramanuja. And in spite of the satanic treatment of our own kith and kin in this part of India, I retain my faith in these Southern people. I have told them at all their huge meetings, in no uncertain terms, that there can be no Swaraj without the removal of the curse from our midst. I have told them, that our being treated as social lepers in practically the whole world is due to our having treated a fifth of our own race as such. Non-co-operation is a plea for a change of heart, not merely in the English but equally in ourselves. Indeed, I expect the change first in us and then as a matter of course in the English.

This transformation cannot take place by any elaborately planned mechanical action. But it can take place if God's grace is with us. Who can deny that God is working a wonderful change in the hearts of every one of us? Anyway, it is the duty of every Congress worker everywhere to befriend the untouchable brother, and to plead with the un-Hindu Hindus, that Hinduism of the Vedas, the Upanishads, Hinduism of the Bhagavadgita and of Shankara and Ramanuja contains no warrant for treating a single human being, no matter how fallen, as an untouchable. Let every Congressman plead in the gentlest manner possible with orthodoxy, that the bar sinister is the very negation of Ahimsa.

তাৎপর্য্য।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মত আর কোথাও অস্পৃশ্যদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার হয় না। তাহাদের ছায়া গায়ে পড়িলে ব্রাহ্মণ অশুচি হয়। ব্রাহ্মণদের পাড়ার রাস্তা দিয়া চলিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। ব্রাহ্মণেতর আর তিন জাতিও তাহাদের প্রতি ইহার চেয়ে ভাল ব্যবহার করে না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিরা, এই উভয়শ্রেণীর মধ্যে, পঞ্চমেরা জাঁতায় পেষার মত পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইয়া যায়। অথচ মান্দ্রাজ বড় বড় দেবমন্দির ও "ভক্তি"র দেশ। লোকদের বড় বড় তিলক, দীর্ঘ কেশ এবং পরিষ্কার নগ্ন গাত্র দেখিলে তাহাদিগকে ঋষিবৎ মনে হয়। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম এই-সব বাহ্য অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত বলিয়া মনে হয়। যে-দেশে শঙ্কর ও রামানুজের জন্ম হইয়াছিল, তথায় সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমী ও কাজের লোকদের প্রতি এই ডায়ার-সদৃশ অমানুষিক ব্যবহার বুঝা কঠিন। ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে আমাদের জ্ঞাতিভাই আত্মীয়দের প্রতি এই-রকম শয়তানী ব্যবহার সত্ত্বেও দক্ষিণদেশীয় এই মান্দ্রাজী লোকদিগের উপর আমার আস্থা আছে। তাহাদের সমুদয় বিরাট সভায় আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি, যে, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূরীকৃত না হইলে স্বরাজ লব্ধ হইবে না। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র আমরা সামাজিক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের মত ব্যবহার পাই, তাহার কারণ আমাদের ভারতীয় জাতির পঞ্চমাংশ লোককে আমরা কুষ্ঠরোগগ্রস্তের মত অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি। "অসহযোগ"-প্রচেষ্টা কেবল ইংরেজদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চায় না, আমাদের নিজেরও হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চায়। আমি আমাদের পরিবর্ত্তন আগে চাই, তাহার পর ইংরেজদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইবে।

হৃদয়ের এই রূপান্তর বাহিরের কোন একটা যন্ত্রবৎ কার্য্যের বা ব্যবস্থার দ্বারা হইবে না। ভগবৎ-কৃপা আমাদের অনুকূল হইলে ইহা ঘটিতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবান্ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

সাধন করিতেছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? যাহাই হউক, সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যভ্রাতাদের বন্ধুর কাজ করা প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মীর কর্ত্তব্য। একটি মানুষকে, সে যতই পতিত হউক না কেন, অস্পৃশ্য বিবেচনা করিবার সপক্ষে বেদ উপনিষদ ভগবদ্গীতা শঙ্কর রামানুজের হিন্দুধর্ম্মে কোন বচন ও যুক্তি নাই, অহিন্দুভাবাপন্ন হিন্দুসমাজকে এই কথা বলা প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীর কর্ত্তব্য। প্রত্যেক কংগ্রেসওয়ালা খুব মৃদুভাবে নিষ্ঠাবান্ বা গোঁড়া হিন্দুদিগকে বলুন, যে, "অস্পৃশ্যতা"র বিশ্বাস অহিংসার ঠিক্ বিপরীত [অর্থাৎ কেহ যদি অন্য কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করে তাহা হইলে তাহাকে অহিংসায় বিশ্বাসী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না]।

"অস্পৃশ্যতা" সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যাহা বলিতেছেন, ভারতবর্ষের সমাজসংস্কারক দল তাহা অনেক আগে হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় লোকদিগকে কেবল স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের সঙ্গে একত্র উপবেশন ও ভোজনও করেন। তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও কোন কোন স্থলে হইয়াছে। আমাদের জাতভাইয়েরা আমাদের দ্বারা অপমানিত ও উৎপীড়িত হয় বলিয়া তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ আমরাও ভারতের বাহিরে নানা দেশে অপমানিত ও তথা হইতে বহিষ্কৃত হই, একথা অনেক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন; এমন কি দোকানদার প্রবাসীর সম্পাদকও বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে পুনঃপুনঃ এই কথা লিখিয়াছে। অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় জাতি বঙ্গেও আছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ভক্তি যাহাদের একচেটিয়া, সেইসব বাঙ্গালী বাবু কবে হইতে অস্পৃশ্যদের সপক্ষে কি বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, এবং এখনই বা কি বলেন করেন, তাহা কৌতুহলের বিষয় হইতে পারে।

একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়

বাঁকুড়া জেলার রামসাগর গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে আপাতত একবৎসরের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অধিকার দিয়াছেন। অধিকারটি স্থায়ী করিতে হইলে শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় ছাত্র তেমন বাড়ে নাই এবং স্থানীয় লোকেরাও, এপর্য্যন্ত যত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তদপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। দুই বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা আছে। এখন সকলে যদি বিদ্যালয়টির হেডমাষ্টার বাবু লক্ষ্মীকান্ত দত্ত এম্-এর নামে রামসাগর পোষ্ট আফিস্ জেলা বাঁকুড়া এই ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠান, তাহা হইলে ইস্কুলটি টিকিয়া যাইতে পারে। ইহাতে নিকটবর্ত্তী প্রায় ৫০টি গ্রামের ছেলেরা পড়িতে পারে। ইহা একটি উচ্চ ও শুষ্ক ভূখণ্ডে শালবন ও ক্ষুদ্র নদীর নিকট অবস্থিত। ছাত্রাবাসটিতে আলো বাতাস বেশ আছে; ব্যয় মাসিক ছয় টাকা মাত্র। এরূপ সস্তায় যেখানে ছেলেদের খাওয়া থাকা চলে, সেখানকার ইস্কুলটি সাহায্য অভাবে উঠিয়া গেলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে।

অসহযোগ ও ছাত্রসংখ্যার হ্রাস

গত ২৪শে সেপ্টেম্বরের সেনেটের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন ৮৪৬টি জানিত (recognised) ইস্কুলের মধ্যে ৮১৪টির ছাত্রসংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। এইসব ইস্কুলে ১৯২০র জুলাইয়ে ২১০৯৩৬ জন ছাত্র ছিল; ১৯২১র জুলাইয়ে ছিল ১৬৩৭৮৭ জন। ৪৭১৪৯ জন ছাত্র কমিয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ২৩ জন কমিয়াছে। কলেজগুলি সম্বন্ধে তিনি দেখান, যে, ১৯২০র ১৫ই সেপ্টেম্বর তাহাদের ছাত্রসংখ্যা মোট ২৩৮৮৭ ছিল। ১৯২১এর ১৫ই আগষ্ট উহা ছিল ১৭৫৭৯।

আমরা মোটের উপর "অসহযোগ" নীতির সমর্থন করিলেও ছাত্রদের স্কুলকলেজ ত্যাগের বিরোধী বরাবরই আছি। এইজন্য ছাত্রসংখ্যার হ্রাস আমাদের ভাল লাগে নাই। যে-সব ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়সংপৃক্ত স্কুলকলেজ ছাড়িয়াছে, যদি যথেষ্ট জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপিত হইত ও ঐ-সকলে তাহারা পড়িত বা তাহাদের স্থান হইত, কিম্বা যদি তাহারা কোন প্রকার ব্যবসা, শিল্পকাজ (যেমন সুতা কাটা বা কাপড় বোনা), চাষ, কুলি মজুর ফেরীওয়ালার কাজ, বা গ্রামে গ্রামে লোকহিতকর কাজ বা রাষ্ট্রীয়নীতি প্রচারের কাজ করিত, তাহা হইলে এরূপ দুঃখের কারণ থাকিত না। আলস্য, নিষ্কর্ম্মা অবস্থা, ভাল নয়। উহা নানা দোষের আকর। যাহারা লেখাপড়া ছাড়িয়াছে, তাহারা এখন কি করিতেছে, তাহার বিস্তারিত কোন খবর সর্ব্বসাধারণের গোচর হয় নাই। এইসব ছাত্রদের অনেকে উচ্চ্ছৃঙ্খল

প্রবণ ও উচ্চ আদর্শ অনুসরণে সহজেই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। তাহাদের চিন্তাশক্তি, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য ও কর্ম্মশক্তি ব্যর্থ হইলে তাহা সাতিশয় পরিতাপের বিষয় হইবে।

স্কুলের ছাত্র কোন্ জেলায় কিরূপ কমিয়াছে, তাহা নিম্ন-মুদ্রিত তালিকা হইতে জানা যাইবে।

জেলা।	১৯২০ জুলাই ছাত্রসংখ্যা।	১৯২১ জুলাই ছাত্রসংখ্যা।
কলিকাতা	২৯৫৬৫	১৮০০১
২৪ পরগণা	৯৩৮৩	৯১১০
হুগলী	৯০৪৬	৮৯৩৬
হাওড়া	৮৪০৩	৮২৮০
নোয়াখালী	৫১৩৮	৩৬২৬
আসাম প্রদেশ	১২৯৭৬	১০৯৯৭
যশোহর	৬২৪৭	৫৫৪১
খুলনা	৬১৮৬	৫৮০৪
নদীয়া	৬৭৪৩	৬৫২৯
মৈমনসিং	৮৯৫৮	৫২৭৭
বগুড়া	৩৫৩৮	২৬৬৮
বর্দ্ধমান	৭২৯১	৬৭৪৫
বাঁকুড়া	২৭০২	২২৫৮
বরিশাল	১০৪১৯	৬৭৬৭
পাবনা	৬৫৬২	৫৬৪৭
মুর্শিদাবাদ	৫৩৫৮	৪৫০৭
মেদিনীপুর	৬৪৮৪	৫৫৪৩
দিনাজপুর	১৯৯৬	১৫২২
ত্রিপুরা	১৩৩৮২	৮৫০৩
ঢাকা	১৫৮১৮	১০৫২৯
রংপুর	৪০৮৮	৩৪০৯
রাজশাহী	২৭৯৩	২৬৪২
ফরিদপুর	১২০১৪	৭৭৪৯
জলপাইগুড়ী	৯৬০	৮৯৪
বীরভূম	২৯৫৬	৩০০০
চট্টগ্রাম	৮১৪৯	৬২০২
মালদহ	১৮১৩	১৪৯০
কোচবিহার	১৪১২	১২৪৮
দার্জিলিং	৫৫৬	৫৪৪

দেখা যাইতেছে, বীরভূম জেলায় কিছু ছাত্র বাড়িয়াছে, অন্য সর্ব্বত্র কমিয়াছে।

কোন্ কলেজে ছাত্র কত কমিয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দিলাম। প্রথমে কলেজের নাম, তাহার পর ১৯২০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে ছাত্রসংখ্যা, এবং তৎপরে ১৯২১ সালের ১০ই আগষ্টে ছাত্রসংখ্যা দেওয়া হইল।

কলেজের নাম	১৯২০ ছাত্রসংখ্যা	১৯২১ ছাত্রসংখ্যা
মৈমনসিং আনন্দমোহন	৬৭৯	৬২৭
বাগেরহাট	২৩৪	১৪৩
বঙ্গবাসী	১৭৩০	১২৪৪
বেথুন	১১৩	১২০
বরিশাল ব্রজমোহন	৭৬২	৬৬৭
বর্দ্ধমান রাজ	১৪৪	১২৩
রংপুর কার্মাইকেল	৬৩১	৪২২
সেণ্ট্রাল	৪৬৬	১৫২
চট্টগ্রাম	৪৪৯	৪০২
সিটি	১৮৩৯	১৬১২
গৌহাটি কটন	৪৮৩	৪১৩
দৌলতপুর হিন্দু	৬০১	৫২৪
ডায়োসেসান	৯০	৮৪
পাবনা এড্ওয়ার্ড	৩৪৭	৩৫৪
হুগলী	২৬৪	২৪৭
হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র	৫৯	৫৩
কৃষ্ণনগর	২৯৫	২০৯
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ	১১৯৩	৯৮৭
লোরেটো	১২	১৪
মেদিনীপুর	২৩৯	১৮২
সিলেট মুরারিচাঁদ	৫২৬	৪২৬
প্রেসিডেন্সী	৬৮৪	৭৭০
ফরিদপুর রাজেন্দ্র	৩৭৬	২৫৮
রাজসাহী	৮৫৩	৮১৮
রিপন	১৭১৫	১২০৭
সংস্কৃত	১৯৪	৭৯

স্কটিশ্ চার্চেজ	১১০৩	৯৮৫
শ্রীরামপুর	২৯৫	২৫৬
সাউথ সবার্বান্	৭৬২	৪৩৮
সেণ্টপল্স্	২৪৩	২২৫
সেণ্ট জেভিয়াস	৭৯১	৭৫৯
উত্তরপাড়া	১৭৯	৮৮
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া	৮০৯	৫৬৫
কোচবিহার ভিক্টোরিয়া	৪৪০	৩৩২
নড়াইল ভিক্টোরিয়া	১৩০	১০৬
বিদ্যাসাগর	১৬২৩	১৩৩০
বাঁকুড়া ওয়েস্লিয়ান্	৪৪৯	৩৫৮
ঢাকা	৭৮৩	.
জগন্নাথ	৪০২	...
ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা	৫১৮	...
মোট	২৩৮৮৭	১৭৫৭৯

এবৎসর ঢাকা ও জগন্নাথ কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তাহাদের এবৎসরের ছাত্রসংখ্যা দেওয়া হয় নাই। কলেজের ছাত্রী মোটের উপর একজন বাড়িয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই, যে, যে-দল স্বাজাতিকতার (nationalism-এর) বড়াই করেন, সে দল নারীদের কলেজে পড়ার পক্ষপাতী নহেন।

—

ভাইস্-চ্যান্সেলারের মন্তব্য

আশু-বাবু আনুমানিক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলিত বৎসরে (১৯২১, ১লা জুলাই হইতে ১৯২২, ৩০শে জুন পর্য্যন্ত) পরীক্ষার্থীদের ফী ২,৬৩,০০০ টাকা কম আদায় হইবে। ছাত্রসংখ্যার হ্রাস, আনুমানিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যার হ্রাস, এবং ফীর টাকার হ্রাসের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন :—

"In the light of these facts, let the public judge whether the achievement of the non-co-operators, so far as education is concerned, should be enthusiastically acclaimed or emphatically condemned. Let the public also realise the extent of the financial loss sustained by the University. It will then rest with the public to decide whether they wish to maintain a University or not, and the responsibility will be theirs, if the University is compelled to close the doors, for, obviously, a University cannot be maintained without funds."

তাৎপর্য্য।—এই-সব তথ্য মনে রাখিয়া সর্ব্বসাধারণ বিচার করুন, যে, অসহযোগীদের শিক্ষাসম্পর্কীয় অবদান সোৎসাহে প্রশংসিত হইবার যোগ্য, না, দৃঢ়তার সহিত নিন্দিত হইবার যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও সাধারণে উপলব্ধি করুন। তাহার পর তাঁহারা স্থির করিতে পারিবেন, যে, তাঁহারা একটা বিশ্ববিদ্যালয় রাখিতে চান বা চান না; এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয় ইহার দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে দায়িত্বটা তাঁহাদেরই হইবে, কারণ, ইহা সোজা কথা, যে, অর্থ ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় চলিতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হইলে দায়িত্বটা হইবে সাধারণের, এ বড় মজার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা জোগান সাধারণের কাজ, কিন্তু সেই টাকা খরচ কেমন করিয়া হয়, তাহা দেখিবার ও অপব্যয় নিবারণ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা সাধারণের নাই; বর্ত্তমান অবস্থা ত এই প্রকার। ইহাতে কোন অমঙ্গল ঘটিলে সাধারণের দায়িত্ব কেমন করিয়া হয়? বিশ্ববিদ্যালয় যে দেউলিয়া হইবে, ইহা ত বহুপূর্ব্বে বাহিরের লোকেও জানিতে পারিয়াছিল; আমরা বহুপূর্ব্বে একথা মডার্ন রিভিউ বা প্রবাসীতে বা উভয় কাগজেই লিখিয়াছিলাম। তখন শিক্ষাক্ষেত্রে অসহযোগের ঝড় বাংলা দেশে বয় নাই। দেউলিয়া হইবার কারণ অনেক। আশু-বাবু আড়ম্বরপূর্ণ বৃহৎ একটা কিছু করিবেন, সর্ব্বদা এই ঝোঁকের দ্বারা চালিত হইয়াছেন। যে-কয়টি বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আগে হইতে আছে, তাহার শিক্ষার উৎকর্ষবিধান ও স্থায়িত্বসম্পাদনের দিকে তিনি তেমন দৃষ্টি দেন নাই। আয়-অনুসারে মিতব্যয় না করিয়া অমিতব্যয় ও অপব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন। চলিত কাজ স্থায়ী করিবার জন্য রিজার্ভ ফণ্ড স্থাপিত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, এখন গতানুশোচনায় কেবল এই মাত্র লাভ হইতে পারে, যে, অতীতের দোষ যেন ভবিষ্যতে না হয়, তদ্রূপ সাবধানতা অবলম্বন করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ হওয়া দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের উহাকে অর্থ সাহায্য করা উচিত; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সীণ্ডিকেট এরূপ ভাবে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত, যাহাতে স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা কোন প্রকারে পাইবার অপ্রত্যাশী লোকেরা উহার কর্ত্তৃপক্ষ হইতে পারেন। "আগে টাকা দিবে ("গবর্ণমেণ্ট" বা "সাধারণ" নামধেয়)

গৌরীসেন," এবং খরচ করিবেন স্বেচ্ছা অনুসারে আশু-বাবু, এ ব্যবস্থাতে প্রত্যাশী স্বার্থপর লোক ভিন্ন অন্য কেহ রাজী হইতে পারে না।

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ছাত্র কমিয়া যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থার দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ আশু-বাবু না ছাড়িতে পারেন; কিন্তু তাহাতে কোন বুদ্ধিমান্ লোক ঠকিবে না। অনেক আগেই যে আড়াই লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পড়িয়াছিল, বিজ্ঞান কলেজে যে ফী-ফণ্ড হইতে ১৯২০-২১ সালের বজেটে কিছুই দেওয়া হয় নাই, ইত্যাদি ব্যাপারের কারণ ত অসহযোগ আন্দোলন নহে। এ-সব তৎপুর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। গত আর্থিক বৎসরে (financial year)এ প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষার ফী স্বরূপে যে বহুলক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাঘটিত ব্যয় নির্ব্বাহ করা। প্রশ্নকর্ত্তাদের ও পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক ইহার অন্তর্গত। কিন্তু ইঁহারা গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত টাকা পান নাই। (অবগত হইলাম যে গত ৩রা অক্টোবর কেহ কেহ—সকলে কি না জানি না—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপা রসীদ ফর্ম পাইয়াছেন, তাহা দস্তখত করিয়া পাঠাইলে বিশ্ববিদ্যালয় টাকা দিবেন)। ফীর টাকা অসহযোগী ডাকাইতরা নিশ্চয়ই অপহরণ করে নাই। কর্তৃপক্ষ উহা অন্য কাজে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা কি বৈধ হইয়াছিল? না ইহার জন্য অসহযোগীরা দায়ী? আশু-বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ আয় হ্রাসের কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে কর্ম্মীদিগকে পুরা বেতন দিবার সাধ্যের অভাব তাহার নিমিত্ত ঘটিয়াছে কি? তাহার নিমিত্ত কি রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দানের শতকরা ৩½ সুদের ১১ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের বর্ত্তমান নগদ মূল্য (যাহা অনেক কম) আমড় তলা গলির দুজন সওদাগরকে শতকরা ১২ টাকা সুদে ধার দেওয়া হইয়াছে? অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ক্ষতি হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু "যত দোষ নন্দ ঘোষ" নীতি অনুসারে সব ক্ষতির সমস্ত দোষটা অসহযোগের উপর চাপান উচিত নহে, যেমন সব ক্ষতির সমস্ত দোষটা স্যার্ আশুতোষেরও নহে।

তাঁহার বর্ণনাপত্রে দেখা যায়, যে, আগেকার চেয়ে অনেক বেশী ছেলে বিজ্ঞান পড়িতে চায়। অথচ অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইলে যত সরঞ্জাম ও যন্ত্র বাড়াইতে হইবে, পরীক্ষণগৃহ যত বাড়াইতে হইবে, তাহার মত আয় বা সঞ্চিত অর্থ কলেজগুলির নাই। এদিকে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

—

নিগ্রহনীতি ও আতঙ্ক

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ধরপাকড় বহুৎ হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। সেরূপ কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। আমাদের মনে পড়ে, যখন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতিকে বিনাবিচারে হঠাৎ নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন সেই নিগ্রহনীতির প্রতিবাদ করিবার জন্য আহুত সভার সভাপতি পাওয়া কঠিন হইয়াছিল। পরিশেষে ধর্ম্মোপদেষ্টা ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা যাইবামাত্র এবং তাঁহাকে অবস্থা খুলিয়া বলিবামাত্র তিনি রাজী হইলেন। সভাস্থলে তিনি একটি সুচিন্তিত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে অবশ্য ভয়ের চিহ্নমাত্রও ছিল না, ভিক্ষুকতাও ছিল না। কিন্তু ইহাও ভুলিবার নহে, যে, বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ও অন্য অনেকে অন্যূন ছয় মাস কোন স্বদেশী বক্তৃতা করেন নাই; আন্দোলন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোকদিগকে কোন প্রকারে চালাইতে হইয়াছিল।

এখন অবস্থা কিরূপ দেখা যাইতেছে? যেখানে কয়েক টাকা জরিমানা দিলেই খালাস পাওয়া যায় কিম্বা কিছু টাকার মুচলেকা বা জামিন দিলেই চলে, ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহা দিতে রাজি হইতেছে না, হাসিমুখে জেলে যাইতেছে। মায়েরা আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আলীভ্রাতাদ্বয় ও অন্যান্য কয়েকজন নেতাকে করাচী খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের যে প্রস্তাবটির জন্য গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইয়াছে, অনেক প্রকাশ্যসভায় সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া সেই প্রস্তাবটি পুনরায় ধার্য্য করিতেছেন। মুসলমানদের ৫০০ উলেমার স্বাক্ষরিত যে ফতোআ বা ব্যবস্থাপত্র গবর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহ-উত্তেজক বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, সেই ফতোআ মুদ্রি-

করিয়া বহু মুসলমান নেতা প্রকাশ্য সভায় ও অন্যত্র বিতরণ করিতেছেন।

—

আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতাদের নিমন্ত্রণ

আয়ার্ল্যাণ্ডের শিন্‌ফেন্‌ দলই প্রবলতম দল। তাহারা আইরিশ সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়া বহুদিন হইতে কেবল যে ইংরেজের সঙ্গে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করিতেছে (যাহা এক্ষণে স্থগিত আছে) তাহা নয়, দেশে শান্তিরক্ষা, বিবাদ নিষ্পত্তি ও বিচারকার্য্য সম্পাদনও করিতেছে। এখন রক্তপাত হইতেছে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের অধ্যুষিত অলষ্টার প্রদেশে, এবং তথাকার আইরিশ রোমান ক্যাথলিক্‌রাই প্রধানতঃ হত আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

নানা কথা কাটাকাটি ও চিঠি-লেখালেখির পর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্‌ জর্জ আবার আইরিশ সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মিঃ ডি ভ্যালেরা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়াছেন এই বিষয়ের আলোচনা করিতে যে কি কি সর্ত্তে ও কি উপায়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতাদের এবং ভারতবর্ষের নেতাদের প্রতি ভিন্ন রকম ব্যবহারের কারণ আমরা শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে আলোচনা করিয়াছি; পুনরুক্তি অনাবশ্যক। মোট কথা এই, যে, ইংরেজ বুঝিয়াছে, আইরিশ্‌রা স্বাধীনতা ভিন্ন সন্তুষ্ট হইবে না, কিন্তু আমরা এখনও ইংরেজের মনে এ ধারণা জন্মাইতে পারি নাই, যে, আমরা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই।

—

নারীরা কি "ফাও" ?

ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট এক হুকুম জারী করিয়াছেন, যে, সরকারী চাকরদের স্ত্রীরা যদি ধর্ম্মঘট, হরতাল আদি প্রচেষ্টার সহিত যোগ রাখেন, তাহা হইলে চাকর স্বামীদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, তাহাদিগকে দায়ী করা হইবে। ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট সওদা করিতে জানেন ভাল। দাম দিয়া কিনিয়াছেন চাকর পুরুষদিগকে, তাহাদিগকে তাহাদের দেহমনের দাম দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের স্ত্রীদের জন্য কোন মূল্য দেন নাই, অথচ তাহাদিগকেও দাসখৎ লিখিয়া দিতে বলিতেছেন। সরকারী চাকরদের স্ত্রীরা কি "ফাও", যে, স্বামীদিগকে কিনিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও বিনামূল্যে গোলামী করিতে বাধ্য হইবে? নারীদের আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এরূপ আদেশ মানিতে বাধ্য নহেন।

—

বিদেশী কাপড় ও পাপ

চুরি, মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি সকল দেশের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে পাপ বলিয়া স্বীকৃত। এই সব পাপে কেহ যদি লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিষ্পাপ হইতে কেহ উপদেশ দিলে তৎক্ষণাৎ পাপ ত্যাগ করিতে বলেন; বলেন না, যে, "এখনই পাপ ছাড়িয়া দিলে তোমার ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে। অতএব আরও ছয় মাস বা নয় মাস পাপ করিতে থাক, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুবিধাগ্রস্ত হইতে হইবে না"। অসহযোগ-নেতারা বলিয়াছিলেন এবং এখনও বলেন, যে, বিদেশী কাপড় বিক্রী করা ও পরা পাপ। কিন্তু তাঁহারাই আবার পাপীদিগকে ব্যবস্থা দিয়াছেন, যে, "তোমরা আরও কিছুকাল পাপ করিতে পার!" না জানি এ কিম্বিধ পাপ!

—

পূজার ছুটি

প্রবাসী-কার্য্যালয় ২০শে আশ্বিন হইতে ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে; ৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) খুলিবে। ছুটির সময় আফিসের কোন কাজ হইবে না।

পুস্তক পরিচয়

মন্দিরের কথা—শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ, বি সি এস প্রণীত। বাটারওয়ার্থ কোম্পানী লিমিটেড, ৬ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১৮+১৬৪+১৫৮+।০+২২।।০=৫৭০ পৃষ্ঠা, ডিমাই অক্‌টেভো সাইজের প্রকাণ্ড বই। কাপড়ে বাঁধা, সোনার জলে মণ্ডিত। দাম ১৮৲ টাকা।

বইখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে পুরীর কথা, দ্বিতীয় খণ্ডে কোনারকের কথা, তৃতীয় খণ্ডে ভুবনেশ্বরের কথা আছে। উড়িষ্যার পঞ্চতীর্থের প্রধান তিন তীর্থের পৌরাণিক, কিম্বদন্তীমূলক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব, মন্দিরাদির স্থাপত্য ও মূর্ত্তির ভাস্কর্য্য, ইতিহাস ও গঠনসৌষ্ঠবের বিচার, দেবতত্ত্ব ও দেবতামূর্ত্তি গঠনের তত্ত্ব, উড়িষ্যাবাসীর শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের বিচার, উড়িষ্যায় বৌদ্ধপ্রভাব ও বৈষ্ণব প্রভাবের বিচার প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখক এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এর আগে এইসব বিষয়ে যে কেউ পুস্তকে বা প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন, লেখক সেইসমস্ত উক্তি অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন অথবা সমর্থন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পুস্তকে লেখক অনুসন্ধান বিচার পাণ্ডিত্য ও নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ তীর্থ তিনটির সম্বন্ধে এমন সম্পূর্ণ আলোচনা আর কোনো পুস্তকে নাই বোধহয়। অতএব এই পুস্তকখানি তীর্থভক্ত, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দেবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সকলের কাছেই সমাদৃত হইবে। পুস্তকখানির বিশেষত্ব নাম ও বিষয়সূচী; বাংলা বইএ এই আবশ্যক অঙ্গটির অভাব থাকে, এ বইএ সে অভাব নাই—ইহা আনন্দের কথা। বইএ অনেক ছবি আছে। তাতে পুস্তকে বর্ণিত অনেক বিষয় মত তত্ত্ব আরো বিশদ ও বোধগম্য হইয়াছে।

বইখানিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও সংগ্রহ আছে তার তুলনায় দাম বেশী বলা চলে না। তথাপি বাঁধাই আরো ভালো করা প্রকাশকদের উচিত ছিল। কাপড় একটু খেলো ও বইএর নাম ব্লকে না দিয়া টাইপে দেওয়াতে বইএর আকারের তুলনায় ছোট হইয়াছে এবং তাতে বেমানান দেখাইতেছে। এই ত্রুটি এখনো সহজেই সংশোধন হইতে পারে।

যাই হোক, প্রত্যেক লাইব্রেরীর ও প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু সক্ষম ব্যক্তির এই উপাদেয় বই এক এক খণ্ড কেনা উচিত।

সম্ভব হইলে এই প্রকাণ্ড পুস্তকের বিস্তারিত পরিচয় আমরা পরে দিতে চেষ্টা করিব।

রংমশাল—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত, এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। এক টাকা দশ আনা।

রংমশাল আবার বৎসরান্তে পূজার উৎসবে বাংলার শিশুমুখ ও শিশুচিত্ত রঙিন আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে উপস্থিত হইয়াছে। লেখার ও ছবির ফর্দ্দ দেখিলেই এর উপাদেয়তা ও মনোহারিত্ব উপলব্ধি হইবে। লেখার ফর্দ্দ—রবিবার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরতের ডাক—শ্রীনরেন্দ্র দেব, মগের মুলুকে—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সাঁতার-সঙ্গীত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তারে তারে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরতে—শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়, রাখীপূর্ণিমা—শ্রীজলধর সেন, খুকী—শ্রীগিরিজাকুমার বসু, কাঠুরের কপাল—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, গল্প—শ্রীনরেন্দ্র দেব, বোকা চাষা—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ষার ফুল—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, না-দি আর না-ছাড়ি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ভূতোর কাণ্ড—শ্রীনরেন্দ্র দেব, শেষকথা—সম্পাদকদ্বয়। এইসব লেখার মধ্যে কবিতা আছে, গল্প আছে; খেলা আছে, মজা আছে; হাসি আছে, দুঃখও যে না আছে এমন নয়। নাই কেবল শিশুরা যাকে ডরায় সেই গুরুমশায়গিরি। পাকা ওস্তাদদের ভিয়েন, ছেলে-মেয়েদের তৃপ্তি যে হইবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। ছবি আছে স্বতন্ত্র মুদ্রিত ৪ খানা—তার দুখানা রঙিন; খুচরা ছবি আছে ১৮ খানা। রংমশাল পূজার সময় ছেলেদের উপহারের ফর্দ্দে প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। এই বই উপহার দিলে ছেলেমেয়েরা মুখে মুখে আনন্দের রংমশাল জ্বালিয়া বাড়ী রঙিন ও উজ্জ্বল করিয়া দিবে।

পুটুস—শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ। প্রকাশক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, ১৫ নারিকেল-বাগান, কলিকাতা। ১৮ পৃষ্ঠা চৌকো। আট আনা।

ছেলেদের সচিত্র গল্পের বই। গল্পটি রঙ্গভরা মজাদার। রচনা সরস সরল। ছবিগুলি সুন্দর ও হাস্যজনক। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। দাম অল্প। সুতরাং ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার যোগ্য। এবং তারা পাইলে আনন্দিত হইবে নিশ্চয়।

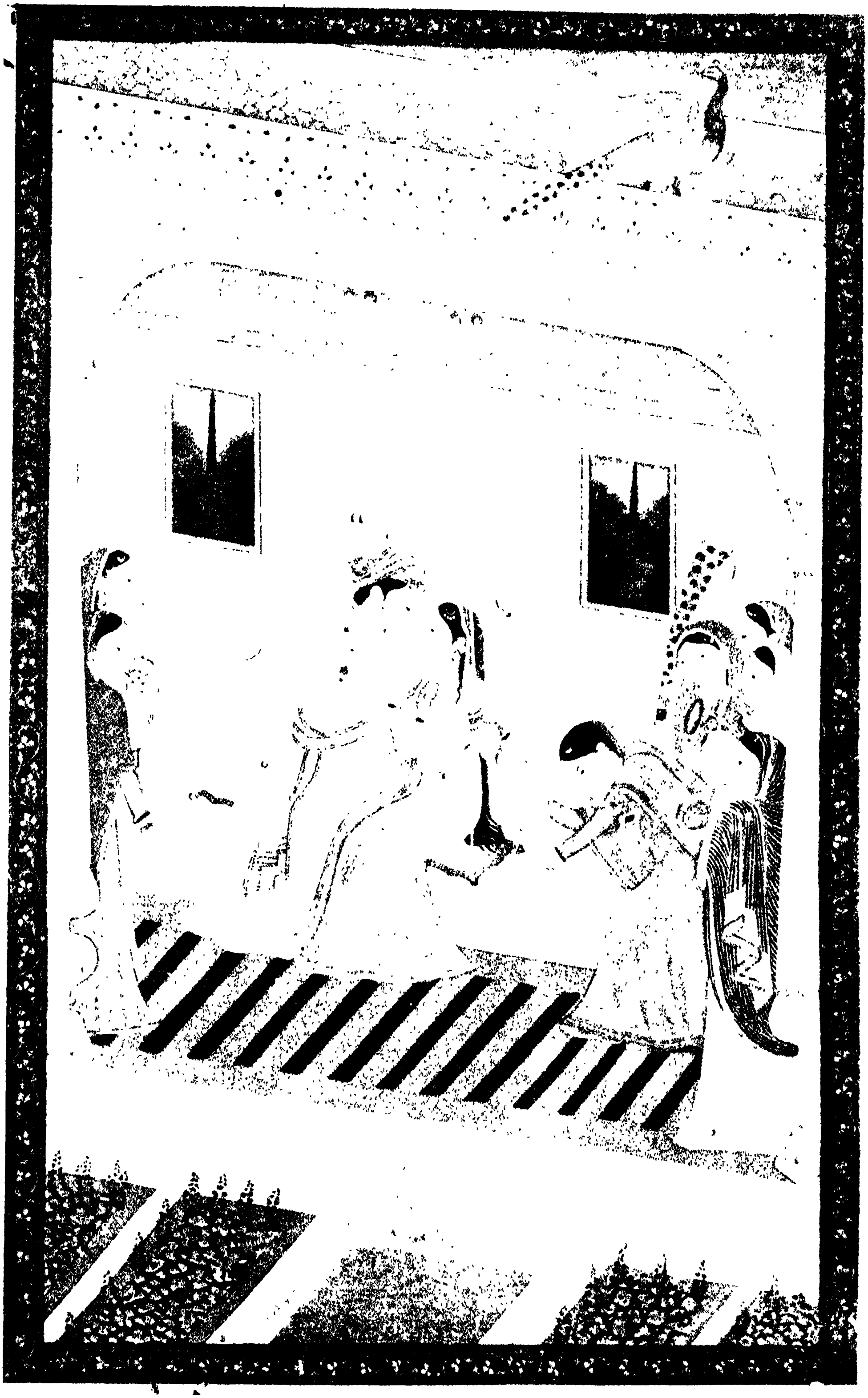
মুদ্রারাক্ষস।

চিত্র-পরিচয়

জন্মাষ্টমী ছবির খোপে খোপে কৃষ্ণজন্ম-সম্পর্কীয় নানা ঘটনা দেখানো হইয়াছে। প্রথমে বিষ্ণুর কাছে ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া বিষ্ণুকে ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিতেছেন। তারপর বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বসুদেব ও দেবকীর কারাগারে অর্দ্ধরাত্রে যখন জন্মগ্রহণ করিলেন তখন ভোজরাজ কংস তাঁর শয়নকক্ষে নিদ্রামগ্ন, ভৃত্য তাঁর অঙ্গসংবাহনে নিযুক্ত; প্রহরীরাও নিদ্রামগ্ন; বসুদেব জানলা দিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া পলায়নের সুযোগ দেখিতেছেন; তারপর তিনি বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে লুকাইয়া রাখিতে যাত্রা করিয়াছেন।

চারু।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২১শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

২য় সংখ্যা

বঙ্গের শেষ পাঠান বীর

[১]

দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার আলোকে দুইটি ঐতিহাসিক চরিত্র বঙ্গের পাঠকদের নিকট চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। একটি কুমার জগৎসিংহ, অপরটি ওস্মান।

ইতিহাস কাব্য নহে। ঐতিহাসিক শুষ্ক সত্য অনেক সময়ই কাব্যে অঙ্কিত মনোহর কল্পনার চিত্রপট দূর করিয়া দেয়। কুমার জগৎসিংহ যৌবনে অতিমাত্রায় মদ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উস্মান বঙ্গীয় পাঠানদের মধ্যে শেষ বীর রাজা; অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে হত হন। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুর সত্য বিবরণ জানা ছিল না; কেহ বলিতেন যে উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখার তীরে তাঁহার পতন হয়, ললাটে বন্দুকের গুলি লাগিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের দুইটিমাত্র বিবরণ এতদিন আমাদের হস্তগত ছিল, একটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে, অপরটি সেই সময়ে লিখিত 'মখজন্-ই-আফগানা' নামক গ্রন্থে; এ দুটিরই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দুটিতেই অনেক ভুল আছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রতিভা" (ঢাকা) পত্রিকায় শ্রীহট্টে প্রচলিত প্রবাদাদি অবলম্বনে উস্মানের শেষদশা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন; তাহাতে তিনি অপর সব লেখকের চেয়ে বেশী পরিমাণে সত্যের নিকট পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদে যে ঐতিহাসিক সত্য এত সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। উস্মানের শেষ যুদ্ধের স্থান এবং মারাত্মক আঘাতের কারণ সম্বন্ধে উপেন্দ্র-বাবুই সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্যারিস্ নগরের 'বহারিস্তান' নামক ফার্সী হস্তলিপিতে উস্মানের পতনের সুদীর্ঘ বিবরণ আছে, ইহা মুঘল সেনাপতি মির্জা নহনের আত্মকাহিনী এবং তাঁহার স্বহস্তে সংশোধিত। নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে নহন্ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষী হইতে পারে না, কারণ তিনি এই অভিযানে আদ্যোপান্ত উপস্থিত ছিলেন, এবং স্বয়ং উস্মানের সহিত শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন। এই বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল।

[২]

বাদ্শাহী সৈন্যগণের জয়লাভের পর মুসা খাঁ [মসনদ্-ই-আলা ইসা খাঁর পুত্র] এবং বারো ভুঁইয়াগণ আসিয়া সুবাদার ইস্লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং এরূপ স্থির হইল যে তিনি [জামিন স্বরূপ] সুবাদারের সভায়

উপস্থিত থাকিবেন, আর তাঁহার ভ্রাতা মহমুদ এবং অপর জমিদারগণ মুঘল সেনাপতি ঘিয়াস্ খাঁর নেতৃত্বে উস্মানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন।

ঘিয়াস্ খাঁ আলাপসিংহ নামক স্থানে থানা গাড়িয়া থাকিলেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাঁহার অধীনস্থ মুঘল কর্ম্মচারী শেখ কমাল ও আব্দুল ওয়াহেদ্ জমিদার-সৈন্য ও বাদ্‌শাহী সৈন্যের অংশসহ তিন দিন রাত্রি কুচ করিয়া হসনপুরে * পৌঁছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্রের পাড় কাটিয়া দিলেন যে নদীর জল [উত্তর-পূর্ব্ব দিকে] নিম্নভূমির উপর গড়াইয়া গিয়া উস্মানের দুর্গ বোকাইনগরের চারিদিকে এত উঁচু হইবে যে বাদ্‌শাহী নৌকাগুলি কামানসহ ভাসিয়া ঐ দুর্গের কাছে পৌঁছিতে পারে।

এই অভিযানে ৩০০ বাদ্‌শাহী নৌকা (কামানপূর্ণ), ৩৮০ রণহস্তী, পাঁচহাজার বর্ক্‌আন্দাজ (নওয়ারার বর্ক্-আন্দাজ ইহার অতিরিক্ত), এবং বারোভুঁইয়ার নৌকা যাত্রা করিল। সুবাদার ক্রমেই ঢাকা হইতে নূতন সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন,—মির্জা সহন কদমরসুল থানা হইতে, এগারসিন্দুর হইয়া হসনপুরে পৌঁছিলেন; তাঁহার পিতা ইহ্‌তমাম খাঁ তোপ ও নৌকা সহ আপাতত এগারসিন্দুরে রহিলেন। ঘিয়াস খাঁ আলাপসিংহ হইতে শাহবন্দরে অগ্রসর হইলেন। এবং স্বয়ং ইস্লাম খাঁ ঢাকা হইতে টোক নামক [কেন্দ্র] স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু সমস্ত শ্রমই নষ্ট হইল। হঠাৎ নদীর জল এত কমিয়া গেল, যে, ব্রহ্মপুত্রের পাড় কাটিয়া দিলেও বোকাইনগরের নিকট জল গেল না; সেই স্থান পর্য্যন্ত যুদ্ধনৌকা ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইল।

তখন স্থলপথে বোকাইনগর আক্রমণ করা স্থির হইল। ঘিয়াস খাঁ পৃষ্ঠরক্ষা করিবার জন্য নওয়ারা সহ ব্রহ্মপুত্রতীরে রহিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ [শাহবন্দরে] শেখ কমাল ও আবদুল ওয়াহিদের অধীনে পথে দুর্গ (block-house) নির্ম্মাণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে বানিয়াচঙ্গের মহাসমৃদ্ধিশালী ও প্রবল জমিদার আন্‌ওয়ার খাঁ ইস্লাম খাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং শ্রীহট্টের দিক হইতে উস্মানকে আক্রমণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তলে তলে অন্যান্য জমিদারদের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন, যে, বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হঠাৎ মুঘল প্রধানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদেক তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত ভাটী (পূর্ব্ববঙ্গ) প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিবেন। * *

এই ষড়যন্ত্রের ফলে আন্‌ওয়ার নিমন্ত্রণের ছলে ইস্লাম কুলী ও রাজা রায়কে বন্দী করিয়া নৌকাযোগে হসনপুর হইতে বানিয়াচং পলাইয়া গেলেন। * * * তাঁহার বিরুদ্ধে মুবারিজ খাঁ এবং ভূলণার জমিদার শত্রুজিৎকে পাঠান হইল।

এ দিকে উস্মানের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদল প্রত্যেক বিশ্রামের স্থলে শিবিরের চারিদিকে নৌকার মাল্লাগণের সাহায্যে গভীর খাদ খুঁড়িয়া এবং সেই মাটি দিয়া প্রাচীর গড়িয়া এক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতি দুর্গে চারি দিন করিয়া বাস করা হইল। আফ্‌ঘানেরা আসিয়া প্রায়ই দুর্গ আক্রমণ করিত, কিন্তু দুর্গের মধ্য হইতে গোলাগুলি পড়ায় অবশেষে ভঙ্গ দিয়া পলাইত।

একাদশ দুর্গে অবস্থান কালে স্বয়ং উস্মান দেখা দিলেন। তাঁহার সেনাপতি তাতার খাঁ নাংবর বীরবেগে দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু অপর কেহই সাহস করিয়া তাহার সঙ্গী হইল না, কারণ দুর্গ হইতে তোপ চালান হইতেছিল। অবশেষে বন্দুকের গুলি ও বর্শার ঘা খাইয়া তাতার খাঁ প্রাণত্যাগ করিল। মুঘলেরা প্রকৃত বীরের উপযুক্ত সম্মান করিয়া তাহার শব বাঁশের পাল্কীতে (অর্থাৎ ডুলীতে) তুলিয়া জাফ্‌রান দ্বারা সুবাসিত করিয়া উস্মানের নিকট পাঠাইল।

ত্রয়োদশ দুর্গে মুঘল সৈন্য পৌঁছিয়া শিবির স্থাপন করিবে এমন সময় উস্মান আসিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তোপের গোলা সহ্য করিতে না পারিয়া বোকাইনগরে পলাইয়া গেলেন।

১৯ নম্বর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মুঘল সৈন্য তথায় রমজান মাস [২৮ অক্টোবর—২৬ নবেম্বর ১৬১১ খৃঃ] ধর্ম্মশাস্ত্রীয় উপবাসে

* হসনপুর (রেনেলের " নং প্লেট) ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পারে, বর্ত্তমান হাইবৎনগর—কিশোরগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বক্‌রগাঁও রেল ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। বোকাইনগর এখান হইতে ২৩ মাইল উত্তরে, অর্থাৎ নেত্রকোণা হইতে কিশোরগঞ্জ পর্য্যন্ত এক লাইন টানিলে তাহার মধ্যস্থলের কিছু পশ্চিমে এবং ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার চারি মাইল দক্ষিণে। এগারসিন্দুর এই হসনপুর হইতে দশ মাইল দক্ষিণে; কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, ব্রহ্মপুত্রের ত্রি-শাখার উত্তর-পূর্ব্বে; এবং ইহার অপর পারে টোক বা টোকনগর। এ দুটি বেশ কেন্দ্রস্থান।

কাটাইল। * * * উস্‌মান তখন ভয়ে পলায়ন করা স্থির করিলেন। নসির খাঁ ও দরিয়া খাঁ পানী নামক তাজপুরের দুইজন আফ্‌ঘান-প্রধান মুঘলদিগের সঙ্গে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে জানিয়া উস্‌মান ২৫০জন আফ্‌ঘানকে বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া লাউড় পর্ব্বত পার হইয়া শ্রীহট্টে পলাইয়া গেলেন। মুঘলেরা পশ্চাদ্ধাবন করিল কিন্তু তাজপুর * অবধি পৌছিয়া ফিরিয়া আসিল, কারণ নেতার অলসতা এবং সেনাপতি-দিগের মধ্যে ঝগড়া। [বহারিস্তান হস্তলিপির ৪২ ক—৪৬ ক পৃষ্ঠা।]

তাহার পর ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া যশোহর রাজ্য অধিকার এবং বগলার রাজার বশ্যতা-স্বীকার গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণবঙ্গে নিষ্কণ্টক হইয়া উস্‌মানের সহিত চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য অভিযান প্রস্তুত হইল। প্রধান সেনাপতি হইলেন শুজায়েৎ খাঁ; তাঁহার অপরাপর সৈন্য ব্যতীত ইস্‌লাম খাঁর নিজ অনুচর ৫০০ বাছা বাছা অশ্বারোহী, চারি সহস্র বর্ক্‌আন্দাজ, প্রায় সমস্ত বাদ্‌শাহী নওয়ারা ও তোপ, এবং সরাইলের জমিদার সোনাগাজীর নওয়ারা, ২০টা হাতী [ইহতমাম খাঁর হাতীগুলি ইহার অতিরিক্ত] এই সঙ্গে চলিল। ঢাকা হইতে ছয় কুচে এগারসিন্দুরে পৌছিয়া সেনাপতি তথায় এক সপ্তাহ বিলম্ব করিলেন।

এগারসিন্দুর হইতে ব্রহ্মপুত্র ভাটাইয়া, বোধ হয় বর্ত্তমান রামপুরহাট, বেল'বো ও ভৈরববাজারের পাশ দিয়া, মুঘল সৈন্য জলপথে মেঘনায় আসিয়া পৌছিল। এখানে শুজায়েৎ খাঁ সৈন্যসহ নদী * পার হইয়া স্থলপথে যাত্রা করিলেন। নৌকাগুলি তোপ সহিত, ইহতমাম্ খাঁর ভাগিনেয় মালিক হুসেনের অধীনে সরাইলের নদীতে রহিল। এই সরাইলে সৈন্য গণনা ও পরিদর্শন (review) করিয়া সেনাপতি স্থল-পথে কুচ করিতে করিতে তরফের দুর্গে † পৌছিলেন। এখানে কিছু সৈন্য রাখিয়া আবার অগ্রসর হইলেন। পরদিন টুপিয়া নামক গিরিসঙ্কটের [বোধ হয় পুটিয়াঝুরি] সম্মুখে শিবির হইল। টুপিয়া দুর্গে উস্‌মানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওলী সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন, কাজেই মুঘলেরা পর্ব্বতের পাদদেশে একটি দুর্গ করিল। কিন্তু ওলী ভয়ে বিনাযুদ্ধে দাদার নিকট পলাইয়া গেলেন। তিনি কোটালে (অর্থাৎ গিরি-সঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ স্থলে) পথের মাঝে খাদ কাটিয়া মুঘলদের বাধা দিবার জন্য তথায় চৌকি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মুঘলবাহিনীর অগ্রগামী দলের নেতা মির্জা সহন রাত্রে চর পাঠাইয়া জানিলেন যে চৌকি ও দুর্গ ছাড়িয়া পাঠানেরা পলাইয়াছে। এই ঘাটি (অর্থাৎ চৌকির স্থান) দখল করা হইল। পরদিন কুর্বানী ইদ্ তিথি (৩রা ফেব্রুয়ারি ১৬১২ খৃঃ), সৈন্যগণ বিশ্রাম করিল। তাহার পরদিন কুচ আরম্ভ হইল, পর্ব্বত পার হইয়া সৈন্যগণ টুপিয়া দুর্গে পৌছিল। এই সময় ইস্‌লাম খাঁর কর্ম্মচারী মির্জা হসন মশ্‌হদী ঢাকা হইতে আসিয়া বাদ্‌শাহী সৈন্য-গুলিকে এইরূপে বিভক্ত করিল:—অগ্রগামী (মির্জা

* তাজপুর—"বোকাইনগর কেল্লার প্রায় পাঁচ ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কেল্লা তাজপুর নামে অপর একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ দুর্গটিও মৃৎপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং উহার অভ্যন্তরেও কয়েকটি প্রাচীন বুরুজ এবং প্রাচীন দীঘী পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে। * * * বোকাইনগর অত্যন্ত প্রাচীন বিধায়, বর্ত্তমান সময়ে উহার ভগ্ন মৃৎপ্রাচীর এবং কয়েকটি বুরুজ মাত্র দণ্ডায়মান আছে। এতদ্ব্যতীত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দর্গা, একটি গুম্বুজহীন ভগ্ন মস্‌জিদ, চাঁদের মন্দির নামে একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির এবং নাগারপুল নামক একটি প্রাচীন পাকা সেতু অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বোকাই-নগরের একটি বুরুজের পাদদেশ চাষের জন্য খনন করাতে কয়েকটি গোলা পাওয়া গিয়াছিল, * * * একটি সীসক নির্ম্মিত, অপরটির * * * উপর ভাগ দেখিতে অনেকটা প্রস্তরের ন্যায়। উভয় গোলারই ব্যাস ১ ৩/৪ ইঞ্চ এবং পরিধি ৫॥ ইঞ্চ।" [কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পত্র হইতে।]

লাউড় পর্ব্বত শ্রীহট্টের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এবং সুনামগঞ্জ শহরের ঠিক ১৪ মাইল পশ্চিমে।

* হস্তলিপিতে নদীটির নাম পন্‌কিয়া। এ নামের কোন নদী এখানে পাইলাম না। নুক্তা বদলাইয়া ইহাকে সহজে মেগ্‌না পড়া যাইতে পারে। সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৭ মাইল উত্তরে। রেনেলের ম্যাপে স্পষ্টই দেখা যায় যে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার পাশে নদী ছিল; এখন একটি খাল ও বাঁধ আছে। আমার বিশ্বাস যে মুঘল নৌসেনা মেঘনা বহিয়া এই প্রাচীন নদীতে পড়িয়া সরাইলে থামিয়া থাকে।

† তরফ সরাইলের একটানে ৩৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। ইহা হবি-গঞ্জ হইতে আট-দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, এবং শ্রীহট্টের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের বিভাগ। রেনেলের ম্যাপে তরফের দুর্গ দেওয়া আছে। টুপিয়া *Indian Atlas*, sheet 125 S.W.এর *Kosba Tarpeh*, (হবিগঞ্জের ঠিক ৭ মাইল পূর্ব্বে) হইলেও হইতে পারে; ইহার কিছু দূরেই উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সাতগাঁও পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ফার্সী হস্তলিপিতে টুপিয়া শব্দ পুটিয়া (অর্থাৎ পুটিয়াঝুরি) নামের ভ্রম। এই পুটিয়াঝুরি দিয়াই রেনেলের সময়ে এবং এখনও পর্ব্বত পার হইবার পথ আছে। ইহা কসবা টাপের ৩ মাইল মাত্র উত্তরে।

সহনের নেতৃত্বে); দক্ষিণ বাহু (ইফ্‌তিখার খাঁ); বামবাহু (কিশ্‌ওয়ার খাঁ); ইল্‌তিমশ্‌ advanced reserve (শুজাএৎ খাঁর পুত্র শেখ কাসিম); মধ্যভাগ (স্বয়ং প্রধান সেনাপতি)।

শুজাএৎ খাঁর ক্রমে নিকট আগমন ও সৈন্যসজ্জা শুনিয়া উস্‌মান নিজপুত্রগণ ও প্রকাণ্ড-দেহ প্রধানগণকে (সর্‌হঙ্গ্‌গণকে) লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং পাঠান সেনা এইরূপে বিভক্ত করিলেন :—

কেন্দ্র (নিজের অধীনে), দুই হাজার বাছা বাছা অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার পদাতিক, ৪০ হাতী।

বামবাহু (খাজা ওলী), এক হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার পদাতিক, ৩০ হাতী। দক্ষিণবাহু (শের ময়দান নামক দাস), ৭০০ আফঘান, এক হাজার পদাতিক, ২০ হাতী। অগ্রগামী (খাজা মল্‌হী ও খাজা ইব্রাহিম, উস্‌মানের সর্ব্বকনিষ্ঠ দুই ভাই এবং খাজা দাউদ্‌—তাঁহার অগ্রজ সুলেমানের পুত্র), দেড় হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার পদাতিক, ও ৫০ হাতী।

নিজ রাজধানী উহার * হইতে রওনা হইয়া দুই কুচে উস্‌মান চৌয়ালিশ পর্‌গণার দৌলম্বাপুর গ্রামে আসিয়া নামিলেন। [উস্‌মানের বয়স তখন ৪১ বৎসরে পড়িয়াছে, তিনি এত মোটা হইয়াছিলেন যে ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না, হাতীর উপর হাওদায় বসিয়া যাতায়াত ও যুদ্ধ করিতেন।] মুঘল অশ্বারোহীদিগকে বাধা দিবার জন্য সম্মুখে কাদাপূর্ণ জলাভূমি রাখিয়া উস্‌মান্ নিজ শিবির দুর্গে পরিণত করিলেন। জলার ওপারে (অর্থাৎ উস্‌মানের দিকে) অনেক সুপারি-গাছ ছিল, তাহার উপর তক্তা বাঁধিয়া দমদমা (raised battery) প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর নিজের কামান চড়াইলেন। তখন শুজাএৎ খাঁ দেড় ক্রোশ দূরে। তিনি শত্রু-আগমনের সংবাদ পাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া উস্‌মানের দুর্গের আধ ক্রোশ দূরে নিজ শিবির স্থাপন করিলেন।

ইফ্‌তিখার খাঁর অনুরোধে, উস্‌মানকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য, শুজাএৎ খাঁ শিহাব্ খাঁ লোদী নামক ইফ্‌তিখারের আফ্‌গান অনুচরকে উস্‌মানের নিকট বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই দৌত্যের কোনই ফল হইল না, উস্‌মান চালাকি করিয়া সময় লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া শিহাব্ খাঁ সেইদিন বৈকালেই নিজদলে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেনাপতিকে সব কথা বলিয়া দিলেন। [কিন্তু এই যাতায়াতে শিহাব্ খাঁ ঐ জলাভূমির মধ্যে নিরাপদে পার হইবার মত একটি শক্ত স্থান চিনিয়া আসিলেন। ইহা পরে মুঘলদের কাজে লাগিল।] তখন শুজাএৎ হুকুম দিলেন যে সে রাত্রি সাবধানে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে যুদ্ধ হইবে।

[৪]

দৌলম্বাপুরের যুদ্ধ আরম্ভ ২ মার্চ্চ ১৬১২।

পরদিন অতি প্রভাতে বাদশাহী নাকাড়া বাজিয়া উঠিল। দলের পর দল, কামানের পর কামান, শ্রেণীবদ্ধ মুঘল সৈন্য নিজ দুর্গ (block house) হইতে বাহির হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিল। শুজাএতের উৎসাহবাণী শুনিয়া তাহারা শত্রুকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

[মৌলবিবাজার শহর হইতে ৪।৫ মাইল দক্ষিণে, হাইল হাওরের এক আধ মাইল উত্তরে এবং "পুটিজুরীর" ৬।৭ মাইল পূর্ব্বে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে মুঘলদের বাজুহা নামক মাটির দুর্গ ছিল। দক্ষিণ-শ্রীহট্ট-বাসী কোন পাঠক এই স্থলে দৌলম্বাপুর অথবা দৌলতিয়াপুর বা ডুলনীপুর গ্রাম আছে কি না, এবং উস্‌মানের রাজধানীর প্রকৃত নাম ('শ্রীসূর্য্য' ছাড়া) কি তাহা অনুসন্ধান করিবেন কি ? —যদুনাথ সরকার।]

---

* ফার্সীগ্রন্থে এই স্থানটির নাম লেখা হইয়াছে আলিফ্। দাল্ (অথবা ও) + হে আলিফ্ (একস্থলে বে আলিফ্) + রে, অর্থাৎ আদ্ হার, আদ্ বার, উবার অথবা উহার। যদি হে-আলিফ্‌কে তো এবং রে-কে আলিফের লিপিকরভ্রম ধরা হয় তবে নামটিকে সহজেই এটা বা ইটা পড়া যাইতে পারে। চৌয়ালিশ পর্‌গণা প্রাচীন ইটা বিভাগের মধ্যে হয়ত পড়িত ; এখন কয়েক মাইল ব্যবধানে আছে। এই পর্‌গণা বর্ত্তমান মৌলবিবাজার থানার এলাকার অন্তর্গত।

শ্রীসূর্য্য—(*Indian Atlas*, Sheet 125, S. E. এ *Sri Shurya* ছাপা হইয়াছে) হাইল হাওরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের ঠিক ১৬ মাইল পূর্ব্বে। ইহার ২ মাইল পূর্ব্বে লালবাগ নামক শহর (আসাম বেঙ্গল রেলের ঠিক দক্ষিণে), এবং চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ঐ রেলের টীলাগাঁও ষ্টেসন।

উস্‌মানের রাজধানী—কমলগঞ্জ শহরের ৫ মাইল দক্ষিণে এবং শ্রীমঙ্গল নামক রেলষ্টেসনের ৮ মাইল পূর্ব্বে উস্‌মানপুর গ্রাম আছে, কিন্তু ইহা বোধ হয় আমাদের উস্‌মানের বাসস্থান ছিল না। আমার বিশ্বাস যে শ্রীসূর্য্যের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে পাটান উশার নামক যে গ্রাম আছে তাহাই উস্‌মানের রাজধানী ছিল ; "উশার" ঢাকাই গলায় "উহার" উচ্চারিত এবং বহারিস্তানের পারসিক লেখক তাহা শুনিয়া আলিফ্ + ও + হে + আলিফ + রে দ্বারা ঐ শব্দ সূচিত করিয়াছেন। উশারের ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং ২ মাইল দক্ষিণে পর্ব্বত আছে।

এমন সময় মির্জা বেগ আইমক্ আসিয়া ভুল সংবাদ দিল যে শত্রু সম্মুখে নহে, দক্ষিণ হস্তের দিকে। তখন বাদ্‌শাহী অগ্রগামী সেনা ডানদিকে বেঁকিয়া চলিল। ইহাই তাহাদের বিশৃঙ্খলার কারণ হইল; অগ্রবিভাগের কতকগুলি সেনানী এবং বাম বিভাগ [সোজা] অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু অবশিষ্ট অগ্রগামী সৈন্যগণ ডানদিকে ঝুঁকিয়া সুপারিগাছের দিকে চলিল [এবং এইরূপে অগ্রগামী সৈন্য ও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় তাহারা দূরে পড়িল ও পরস্পরকে সাহায্য করিতে অক্ষম হইল]। সেই নরম জলাভূমির ধারে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উস্‌মানের কতকগুলি সৈন্য বীরদর্পে জলা পার হইয়া আসিয়া মুঘলদের সম্মুখে অশ্ব ঘুরাইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া বাদশাহী পক্ষ হইতে শেখ আচ্ছে, সাহিব খাঁ, ও মুস্তাফা খাঁ উহাদের উপর গিয়া পড়িল। তখন মির্জা সহন মাল্লাদের কাঁধ হইতে অগ্রগামী তোপগুলি নামাইয়া শত্রুর দিকে সাজাইয়া গোলা বারুদ পুরিতেছিলেন, কিন্তু নিজদল ও শত্রুদল জলার সম্মুখে মিশিয়া যাওয়ায় এই তোপ আওয়াজ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এক ক্রোশেরও অধিক পশ্চাতে যেসব বাদশাহী তোপ ছিল তাহা আওয়াজ করা হইল। ইহার গুলিতে শেখ আচ্ছে পশ্চাতে আহত হইয়া পড়িয়া গেল, অপর মুঘল বীরগণ (সাহিব ও মুস্তাফা) ছত্রভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে ইফ্‌তিখার খাঁ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যুদ্ধে তিনি নিজের বিভাগকে (অর্থাৎ দক্ষিণ বাহুকে) কিছুতেই অগ্রগামী দলের পশ্চাতে থাকিতে দিবেন না, কিন্তু সকলের অগ্রে চলিবেন। সুতরাং যখন শেখ আচ্ছেকে ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া সৈন্য মধ্যে মহাগোলমাল পড়িয়া গেল, এবং "ঐ অগ্রগামী দল ছুটিয়াছে" বলিয়া সকলে চীৎকার করিতে লাগিল, তখন আর কিছু না ভাবিয়া, কোনদিকে না তাকাইয়া ইফ্‌তিখার কেবল ৪২জন অশ্বারোহী ও ১৪জন পদাতিক সহ ছুটিয়া আসিয়া যুদ্ধে মিশিয়া গেলেন।

কিন্তু প্রথমে এক মহা বিপদ ঘটিল। বিখ্যাত বাদ্‌শাহী হস্তী "রণশৃঙ্গার" এ সময় মদ-মত্ত ছিল, সে আসিয়া ইফ্‌তিখারের হস্তীকে আক্রমণ করিল; আর তাঁহার সমস্ত বিভাগের সৈন্যগণ ঐ দুটি হাতীকে পৃথক্ করিবার ভান করিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল, কেহই সেনাপতির সঙ্গ লইল না। শিহাব্ খাঁ লোদী যে পথ চিনিয়া আসিয়াছিল ইফ্‌তিখার খাঁ তাহা দিয়া ঐ জলা পার হইয়া ওপারে পৌঁছিয়া খাজা ওলীকে এমন কাবু করিলেন যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হন আর কি।

। ৫ ।

উস্‌মান মারাত্মক আহত।

উস্‌মান কেন্দ্র হইতে ইহা দেখিয়া ওলীকে ছেলেমানুষ বলিয়া গালি দিয়া ও নিজের পাশে সজ্জিত দুই-তিন হাজার পরিপক্ব সৈন্য ও বিখ্যাত রণহস্তীগুলি লইয়া, আফ্‌ঘান যুদ্ধচীৎকার "হু" "হু" গর্জ্জন করিয়া, ছুটিয়া আসিয়া ইফ্‌তিখারকে আক্রমণ করিলেন। তথাপি রণক্লান্ত ঘর্ম্মাক্তকলেবর ইফ্‌তিখার ও তাঁহার মুষ্টিমেয় সঙ্গীগণ এই দশগুণ, পঞ্চাশগুণ অধিক সংখ্যক শত্রুকে বাধা দিতে লাগিলেন।

এমন সময় রণশৃঙ্গারের মাহুত সেই হাতীটিকে অশেষ কষ্টে খাঁর নিজস্ব হাতী হইতে ছাড়াইয়া জলা পার হইয়া যুদ্ধস্থলে পৌঁছিয়া খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য উস্‌মানের হাতীগুলিকে আক্রমণ করিয়া এমন যুদ্ধ করিল যে তাহা বর্ণনার অতীত। কিন্তু ইফ্‌তিখারের সঙ্গীরা প্রথমেই ৫৬ জন মাত্র ছিল, এখন মরিয়া ও আহত হইয়া তাহাদের মধ্যে অল্পই অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং এই বাদশাহী হাতীকে সাহায্য করিবার জন্য কেহই আসিল না। উস্‌মানের সৈন্যগণ—অশ্ব গজ পদাতিক—রণশৃঙ্গারের চারিদিকে ঘিরিয়া শত শত আঘাতে তাহাকে 'কিমিয়া' (কাবাবের জন্য কাটা মাংসটুকরা) করিয়া ফেলিল; মাহুত মরিল, হাতী পড়িয়া গেল। আফ্‌ঘানগণ এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আবার দলবদ্ধ ভাবে ইফ্‌তিখারকে আক্রমণ করিল এবং মুঘল ঘোড়াগুলির পা কাটিয়া ফেলিয়া নিমেষে আরোহীদিগকে ধরাশায়ী করিল।

একজন আফ্‌ঘানের সহিত ইফ্‌তিখারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি উঁহাকে এক আঘাতে ঘোড়া হইতে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া খাঁর প্রতি তরবার ছুড়িয়া মারিল, তরবারটি খাঁর বামহস্তে পড়িয়া বর্ম্ম সহ হাতের কব্জা কাটিয়া ফেলিল। খাঁর একজন ভক্ত অনুচর ছিন্ন হাতখানি তুলিয়া লইয়া নিজ বগলে রাখিয়া

প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাশে যুদ্ধ করিতে লাগিল। লোকটি চারিজন শত্রু মারিয়া তবে মরিল।

তখন ইফ্‌তিখারের একজন অনুগত সৈন্য শেখ আব্‌দুল জলীল, প্রভুর দুর্দ্দশা দেখিয়া, নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া উস্‌মান যে মাদী হাতীর উপর ছিলেন তাহার সম্মুখে পৌঁছিল এবং তাঁহার মুখে তীর ছুড়িল। তীরটি উস্‌মানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। উস্‌মানের নিক্ষিপ্ত বর্শা বুকে বিদ্ধ হইয়া শেখ পড়িয়া গেল, ও একজন সর্‌হঙ্গ্‌ আসিয়া তাহার ঘোড়ার পা কাটিয়া ফেলিল।

নিজ সৈন্যগণ যেন তাঁহাকে জখম দেখিতে না পায় এজন্য, উস্‌মান এত মারাত্মক আঘাত পাইয়াও দুই হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন, এবং "ঈশ্বরের ইচ্ছায়" (!!!) তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুও ঐ সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল, কারণ দুই চোখের রগগুলি একত্র জড়িত থাকে। বামহাতে রুমাল লইয়া নিজ মুখ ঢাকিয়া, উস্‌মান মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমর্! শুজাএৎ খাঁর দল কোন্ দিকে?" মাহুত প্রভুর অন্ধ হওয়া না জানিয়া উত্তর করিল, "মিয়াঁ, সালামৎ! ঐ যে সাম্‌নে মহুয়াগাছ দেখিতেছেন উহার নীচে পতাকা দেখা যাইতেছে, তাহার নীচে শুজাএৎ খাঁ নিশ্চয়ই দাঁড়াইয়া আছেন।" উস্‌মানের কথা বলিবার শক্তি ছিল না; দক্ষিণ হস্ত মাহুতের পিঠে রাখিয়া সেখানে হাতী চালাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

[৬]

মুঘলদের দুর্দ্দশা, কিশোয়ার খাঁর মৃত্যু।

এতক্ষণ বাদ্‌শাহী অগ্রবিভাগের সৈন্যগণ জলার কাছে পৌঁছিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তেমনি তাহাদের সম্মুখে জলার অপর পারে মল্‌হী ও ইব্রাহিমের অধীনে উস্‌মানের অগ্রবিভাগ ও দাঁড়াইয়া ছিল।

কিন্তু উস্‌মানের দক্ষিণ বাহুর নেতা শের ময়দান সম্মুখে ভীষণ হস্তীগুলি চালাইয়া বাদ্‌শাহী বামবাহুর নেতা কিশ্‌ওয়ার খাঁকে আক্রমণ করিলেন। ঐ খাঁর সঙ্গে বাদ্‌শাহী অগ্রবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া অনেক সৈন্যও ছিল, যেমন সৈয়দ আদম, সৈয়দ হুসেনী, সোনা ঘাজীর দল; ইহারা বামবাহুর অগ্রভাগের সঙ্গে যোগ দিয়াছি। যুদ্ধের প্রথম চোট সৈয়দ আদমের উপর পড়িল। তিনি শীঘ্রই মারা গেলেন, কারণ, তিনি অত্যন্ত মোটা ছিলেন বলিয়া সব ঘোড়া তাঁহাকে বহন করিতে পারিত না, এবং তিনি হাতে একমণ ওজনের লোহার বল্লম লইয়া চলিতেন; দ্বিতীয়তঃ সৈয়দ হুসেনী লোহানী আফ্‌ঘানদের এক পীরের বংশধর বলিয়া অন্তরে ঐ জাতির দিকে ঝুঁকিতেন এবং আদমকে কোন সাহায্য করিলেন না। আফ্‌ঘানেরা আসিয়া আদমের ঘোড়ার পায়ের রগ কাটিয়া দিয়া, তাঁহাকে, অপর একজন সৈয়দ, একজন শেখজাদা এবং একজন কায়স্থকে বধ করিল। সোনা ঘাজী পালাইয়া গেল। তখন আফ্‌ঘানেরা কিশোয়ার খাঁর উপর পড়িল; বাদ্‌শাহী সৈন্যগণের কাপুরুষতা ও চাঞ্চল্যের ফলে দুইতিনবার মাত্র তরবার চালাইবার পরই কিশোয়ার খাঁ, তাঁহার ভগ্নীপতি ও এক পুরাতন নাপিত হত হইলেন।

শের ময়দান মুঘল বাম বিভাগের পলাতক সৈন্যগণকে তাড়া করিতে করিতে ঘোড়া ছুটাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে বাদ্‌শাহী দুর্গে যেখানে ভৃত্যগণ (লস্করী, camp followers) ছিল, সেখানে পৌঁছিলেন। কিন্তু দুর্গের মধ্য হইতে গোলা বর্ষণ হওয়ায় ফিরিতে বাধ্য হইয়া, বাদ্‌শাহী অগ্র বিভাগের ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। তখন মুঘলদের মধ্যে মহা গোলমাল উপস্থিত হইল, "বাম হইতে একদল নূতন শত্রু আসিয়াছে!"

কিন্তু মির্জা সহন অন্য সেনানীদিগকে তথায় রাখিয়া নিজে কয়েকটি বিখ্যাত হাতী লইয়া আগাইয়া গিয়া শের ময়দানের হাতীগুলিকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। শের ময়দান না পারিয়া পলাইয়া গিয়া উস্‌মানের পুত্র খাজা মুম্‌রেজের সঙ্গে যোগ দিলেন।

[৭]

গজযুদ্ধ।

মুম্‌রেজ্‌ পিতার মৃতদেহ (হস্তীপৃষ্ঠে) সঙ্গে লইয়া মুঘলদিগের সম্মুখীন হইলেন। উস্‌মানের দুটি প্রকাণ্ড রণহস্তী, তাজ ও বখ্‌তা নামে, এতক্ষণ ঘন জঙ্গলে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এবং মাহুতকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে যুদ্ধ যখন ঘোরতর বাধিয়া উঠিবে ঠিক তখন ঐ হাতী দুটিকে আনিয়া হঠাৎ মুঘলদিগের উপর পড়িবে, তাহা হইলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইবে। বখ্‌তাটাকে পর্ব্বত বলিলেও চলে,

কিন্তু পর্ব্বত ভাঙ্গিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে কখনও মাহুতের আজ্ঞার বিরুদ্ধে এক পা ফেলিত না—এমন সুশিক্ষিত ছিল। এখন মুবরেজ্ নিজ হাতীগুলির দারোগাকে বলিলেন যে, ঐ হাতীদুটিকে আন। তখন আবার মুঘল সৈন্য মধ্যে মহা শোরগোল উঠিল, "পলাতক শত্রু আবার আসিতেছে!" বাদ্‌শাহী অগ্রবিভাগের আর-সকলেই ভয়ে পিছাইয়া রহিল; একা মির্জা সহন কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া মেষদলের মধ্যে বাঘের মত ছুটিয়া গিয়া আফ্‌ঘানদের আক্রমণ করিলেন। দুই সৈন্যদল মিশিয়া গেল, কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম রহিল না, এমন অবস্থায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

তিনি পূর্ব্বেই নিজ মাহুতদেক বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা যেন রাস্তা ছাড়িয়া দূরে গিয়া আক্রমণ না করে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হস্তী "বাঘদলন" সৈন্যাগ্রে থাকায় অনেক তীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। এজন্য তাহার মাহুত "ফতা" নিজ বড় ভাই "বাজা"কে চেঁচাইয়া বলিল, "আমার হাতী অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আমি ইহাকে শত্রুর উপর ফেলিতেছি।" তাহার দাদা বলিল, "তোমার ভাগ্যে জয় হউক।" তখন ফতা "বাঘদলন"কে লইয়া এবং বাজা "বালসুন্দর" (দন্তহীন বা চাক্‌না হাতী)কে লইয়া ছুটিয়া আফ্‌ঘান সৈন্যের মধ্যে গেল। উস্‌মানের চড়া মাদী হাতীর সাম্‌নে অনুপা নামে অপর এক হাতী ছিল; বাঘদলন তাহাকে পেঁচাইয়া ধরিল, আর বালসুন্দর "সিংহলী"কে আক্রমণ করিল। এই দুই হাতী যে পথ পরিষ্কার করিল তাহা দিয়া তাহাদের পিছু পিছু মির্জা সহনের বীরশ্রেষ্ঠ চারিজন সৈন্য—মহমুদ খাঁ লোদী, মস্ত আলীবেগ, ইয়াদগার বহাদুর এবং মিরমুহম্মদ লোদী—শত্রুর উপর গিয়া পড়িল, [কিন্তু কিছু করিতে পারিল না।]

তখন বখ্‌তাকে আনিয়া বাঘদলনের এক পাশে লাগাইয়া দেওয়া হইল, অপরপাশ হইতে অনুপা ঠেলা দিতে লাগিল; এই উভয়ের জোরে বাঘদলন হটিয়া গেল। এই সময় ফতার ভগ্নীপতি নিজ হস্তী "চঞ্চল"কে * চালাইয়া বখ্‌তার উপর আসিয়া পড়িল, এবং বাঘদলনকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন উস্‌মানের হাতীর উপরের একজন কামানের সৈন্য হাতনলের গুলি দিয়া চঞ্চলের কোমরে এমন আঘাত করিল যে সেই হাতীটি পড়িয়া যাইবার মত হইল; কিন্তু স্থির হইয়া আঘাতটা সহ্য করিয়া পলাইয়া গেল। বালসুন্দর তখন দুই শত্রু হস্তী দ্বারা দুই পাশে আক্রান্ত হইল; সে যেই পাশ ফিরিল আর অমনি আফ্‌ঘান পদাতিরা সুবিধা পাইয়া তাহার এক পা কাটিয়া ফেলিল।

তখন শুজাৎ খাঁর হাতী "ফতুহা"র মাহুত ঐ হাতীকে লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া সিংহলীর পাশে লাগাইয়া দিল। এবং দুই মুঘল হাতীর আক্রমণে সিংহলী রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

এবার জঙ্গল হইতে উস্‌মানের বিখ্যাত হাতী "বাজ্"কে আনিয়া সহনের সৈন্যের বিরুদ্ধে চালাইয়া দেওয়া হইল। সহন আগেই পিতার হস্তী "গোপাল"এর মাহুত মারুফকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাহাকে প্রথমে যুদ্ধের মধ্যে না আনিয়া যেন বিপদে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে উস্‌মানের কোন এক হস্তী যদি মুঘল হস্তীদিগকে আক্রমণ না করিয়া অশ্বারোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে তবে এই গোপাল আসিয়া তাহাকে রোধ্ করিতে পারিবে।

অতএব এখন তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন, "মারুফ! তুমি কেমন নিমক খাইয়াছ তাহা প্রমাণ করিবার এই সময়। দেখাও, তুমি বাজ্‌কে কি করিতে পার।" কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মারুফ—হাতী পাগল হইয়াছে, তাহার আজ্ঞা শুনিতেছে না, এই ভান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক পাশে বাহির হইয়া পলাইয়া গেল। তখন বাজ্ আসিয়া সহনের সমস্ত সৈন্যদলকে তাড়াইয়া দিল। একা সহন, একমাত্র অনুচর সৈয়দ আলীর সহিত একটি মহুয়াগাছের নীচে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে বখ্‌তা বাঘদলনকে তাড়াইয়া দিয়া সেদিকে আসিল। (এই হাতী অনেক সেনা ও সেনানীকে হত আহত করিল; মির্জা সহন আশ্চর্য্যরূপে নানা বিপদের মধ্য দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু তাঁহার পাঁজরের একখান হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। উস্‌মানের হাতীগুলি মুঘলদের অনেক ক্ষতি করিল; যুদ্ধ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইল।) বখ্‌তা * আসিয়া অশ্বসহ শুজাএৎখাঁকে দাঁতের উপর করিয়া কিছুদূর বহিয়া লইয়া গেল; অবশেষে তিনি রক্ষা পাইলেন।

* একদন্ত।

* তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরীতে ইহার নাম 'গজপৎ'। (১০৩ পৃঃ।)

[৮]

যুদ্ধ শেষ।

প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল, কেহই কাহারও খোঁজ লইবার অবসর পাইল না। বাতাস এত গরম হইল যে মানুষ ও ঘোড়ার যেন দম বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বাদ্‌শাহী সৈন্য হটিল না দেখিয়া অবশেষে আফ্‌ঘানেরা হতাশ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। সেই জলাভূমির পশ্চিমধার (অর্থাৎ মুঘলদের দিক) হইতে তাহারা ফিরিয়া আবার জলা পার হইয়া নিজ শিবিরের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে) আসিতে চেষ্টা করিল; তাড়াতাড়িতে তাহারা জলার মধ্যে দৃঢ় পথটি হারাইল। শুজাএৎ খাঁর সৈন্যগণ পশ্চাদ্ধাবন করিল। উস্‌মানের পতাকাধারী (তাস্‌দার) আলাদাদের ঘোড়ার ঘাড়ের চুল ধরিয়া টানিয়া আফ্‌ঘানেরা তাহাকে ওপারে লইয়া গেল আর মুঘলেরা লেজ ধরিয়া টানিয়া এপারে রাখিতে চেষ্টা করিল।

তখন মুঘলসেনাপতির জয়ডঙ্কা বিজয়নিনাদ করিয়া বাজিয়া উঠিল; তুরী ভেরী আনন্দের সুর গাহিল; দূরে-দূরে পর্য্যন্ত সকলে জানিল যে বাদ্‌শাহ পক্ষের জয় হইয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আফ্‌ঘান নেতারা উস্‌মানের মৃত্যু লুকাইয়া রাখিয়া মহাবিক্রমে হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে দুই পক্ষই এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে ঘোড়া আর চলিতে পারে না, অশ্বারোহী জীনে বসিয়া থাকিতে পারে না;—যুদ্ধ করা ত দূরে থাকুক। বৈকাল ও রাত্রে শুধু দুই দিক হইতে গোলাগুলি ও তীর চলিতে লাগিল; ইহাতে মুঘলেরা বেশী ক্ষতি ছিল; উস্‌মানের দুটি বড় রণহস্তী ইহতমাম্ খাঁর এক-এক গোলাতে মারা গেল। তাঁহার পক্ষে একজন 'কবিরাজ" অর্থাৎ হিন্দু বৈদ্য ছিলেন, তিনি ফলিত জ্যোতিষে সিদ্ধহস্ত; গণিয়া বলিলেন যে রাত্রিশেষ হইবার ছয়ঘড়ি পূর্ব্বে শত্রুরা শিবির হইতে পলাইবে। সে রাত্রে মহরম মাসের চাঁদ (নবমী) রণক্ষেত্রে দেখা দিল, বিজয়ী মুসলমানগণ পরস্পরকে শুভ ইচ্ছা (মবারক্‌বাদ) করিল।

মুঘল সেনাপতি নিজের ছড়ান সৈন্যদলকে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে মাটীর প্রাচীর তৈয়ার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বলিলেন, এবং রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এই কাজ করিতে এবং শত্রুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে লাগিল।

হাতাহাতি যুদ্ধ দুপুর বেলায় থামিয়াছিল, তাহার পর রাত্রি দেড়টা পর্য্যন্ত দুইপক্ষে তোপ চালাইয়াছিল। কিন্তু তখন আফ্‌ঘান শিবিরে মহা গণ্ডগোল উঠিল। ইহার কারণ এই :—উস্‌মানের ভ্রাতা ও পুত্রগণ, প্রধান (সর্‌হঙ্গ্)দিগের এবং উস্‌মানের মন্ত্রী ওলী মণ্ডুখেল্‌এর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে প্রভুর দেহ রাজধানীতে (উহারে) লইয়া গিয়া, তথায় তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণকে হত্যা করিয়া, খাজা মুম্‌রেজ্‌কে রাজা করিয়া আবার লড়িবে।

[৯]

আফঘানদের পলায়ন।

অতএব তাহারা আহত অকর্ম্মণ্য হাতীগুলিকে আগে পাঠাইয়া দিল, নিজেদের হত হস্তীগুলির এবং মৃত বাদ্‌শাহী হস্তী রণশৃঙ্গারের দাঁত কাটিয়া লইল, সমস্ত তোপ পাঠাইয়া দিল, এবং প্রভাত হইবার ছয় ঘড়ি আগে সকলে পলায়ন করিল। শিবির খাড়া রহিল।

রাত্রির এক ঘড়ি মাত্র বাকী আছে, তখনও বাদ্‌শাহী দল তোপ চালাইতেছে। এই তোপখানার কয়েকজন লোক খবর পাইবার জন্য একটু একটু করিয়া আফ্‌ঘান শিবিরের দিকে আগাইল। তাহারা দেখিল যে শত্রুর কোন চিহ্ন নাই, শিবির নির্জ্জন পরিত্যক্ত। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা শত্রুর জীন, পতাকা ও অন্যান্য দুই একটি দ্রব্য কুড়াইয়া আনিয়া নেতাকে দেখাইল। আবার শুজাএৎ খাঁর নাকাড়া বিজয়নিনাদ করিয়া উঠিল, আবার তাঁহার কর্ম্মচারীগণ আসিয়া অভিনন্দন করিল। কিন্তু তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না, কারণ অনেক বাদ্‌শাহী বড় কর্ম্মচারী হত আহত হইয়াছেন এবং উস্‌মানের অবস্থা কেহই জানিত না।

কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে প্রেরিত একদল নূতন সৈন্য—এক সহস্র বর্ম্ম-আবৃত অশ্বারোহী, শেখ আবদুস্ সলামের অধীনে—ঠিক তখন আসিয়া পৌঁছিল। অমনি শুজাএৎ খাঁ কুচ আরম্ভ করিবার জন্য ঢাক বাজাইলেন। পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া রাত্রি আইসায় তিনি শিবির করিলেন। ঐ স্থানের চারিদিকে যথারীতি মাল্লারা খাল কাটিল ও মাটীর দেওয়াল তুলিল।

তৃতীয় দিবসের কুচ শেষ হইলে ওলী মণ্ডুখেল্, উস্‌মানের

কনিষ্ঠ পুত্র খাজা ইয়াকুবকে সঙ্গে লইয়া, শুজাএৎ খাঁর সহিত দেখা করিয়া মুমরেজের পক্ষ হইতে আত্মসমর্পণ ও সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং উস্‌মানের মৃত্যুর সংবাদ দিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দ্রুতগতিতে চলিয়া এক রাত্রি ও দিনে উস্‌মানের ভ্রাতাগণ পুত্র ও সরহঙ্গগণ উঁহারে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খাজা দায়ুদের সহিত উস্‌মান্ নিজের যে কন্যাকে বাগ্‌দান করিয়া গিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বিবাহ দিয়া, তাঁহার অপর সব কন্যা ও স্ত্রীগণকে গৃহের এক গোপনীয় স্থানে হত্যা করা হইল। উস্‌মানের প্রাসাদ একটি প্রকাণ্ড বাঙ্গালা ঘর ছিল, তাহার প্রাঙ্গনে তাঁহার জন্য একটি কৃত্রিম গোর প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে এই-সব হত নারীদিগকে সমাধি দেওয়া হইল।

কিন্তু উস্‌মানের দেহ গোপনে লইয়া গিয়া দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে এমন স্থানে গোর দেওয়া হইল যে মুঘলেরা সে স্থান জানিতে না পারে এবং ঐ দেহ খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বিদ্রোহীর মাথা কাটিয়া তাহা বাদ্‌শাহের নিকট পাঠাইতে না পারে। [বহারিস্তান হস্তলিপির ৭৩ খ—৭৪ ক পৃঃ।]

[১০]

এই যুদ্ধের সাক্ষী মির্জা নহনের বিবরণ উপরে দেওয়া গেল। তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে অধিকাংশ মুঘল সৈন্য অত্যন্ত কাপুরুষতা এবং তাহাদের সেনাপতিগণ স্থিরতা দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বশক্তির অভাব দেখাইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালার বিখ্যাত হাতীগুলির সামনে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না। উস্‌মান প্রথমে প্রকৃতই জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি এত শীঘ্র মারা না গেলে এখানে মুঘলদের এমন ভয়ঙ্কর পরাজয় হওয়া ও লুণ্ঠন হইত যে আকবরের সময়ে মুঘলমারির যুদ্ধ ভিন্ন আর কাহারও সহিত তাহার তুলনা হইত না। কিন্তু নেতার অভাবে সব পণ্ড হইল। মুঘলেরা টিকিয়া রহিল, আফ্‌গানেরা প্রথমে লব্ধ সুবিধাটি বাড়াইয়া তাহাদেক বিতাড়িত করিতে পারিল না, এবং অবশেষে প্রভুর দশা জানিতে পারিয়া পলায়ন করিল। জাহাঙ্গীর আত্মচরিতে নিজ সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগের দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

উস্‌মান ৪০ বৎসর বয়সে রণক্ষেত্রে অতুল বীরত্বের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করেন—মরণাহত হইয়াও শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন এবং নিজদশা সৈন্যদিগের নিকট হইতে গোপন রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও অনেকক্ষণ তাঁহার শব লইয়া হস্তী রণব্যূহে দণ্ডায়মান থাকে।

তাঁহার বংশলতা এইরূপ :—

ইসা খাঁ লোহানী মিয়ান্-খেল (কৎলুখাঁর প্রধান মন্ত্রী) কৎলুর মৃত্যুর পর ৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

তাঁহার পাঁচ পুত্র—(১) খাজা সুলেমান, অল্পদিন রাজত্ব করিয়া ১০০২ হিজরীতে মারা যান (পুত্র খাজা দায়ুদ *), (২) খাজা উস্‌মান, রাজ্যকাল ১০০২-১০২১ হিজরী (দুই পুত্র মুমরেজও ইয়াকুব), (৩) খাজা ওলী, ইনি উস্‌মানের মৃত্যুর পর রাজা হন, (৪) খাজা মাল্‌হী, (৫) খাজা ইব্রাহিম।

যদুনাথ সরকার।

* কৎলুখাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা দাউদ কর্‌রাণী ও এই খাজা দায়ুদ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি।

ঘরের ডাক

(১৯)

সেদিন সকালবেলা রেভারেণ্ড হোয়াইট আপনার কক্ষে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মী গিয়া একথা-সেকথার পর বলিল, "আপনাকে আজ কদিন থেকে একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে নি—মেরী দিন দিন বড় বাড়িয়ে তুল্‌ছে।"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "কেন, কি হয়েছে লুসী ?"

"সে নলিনী-বাবুর সঙ্গে অতিরিক্ত রকম মিশ্‌তে আরম্ভ করেছে।"

মুখখানাকে ভার করিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "হাঁ সেটা আজ কদিন থেকে লক্ষ্য কর্‌ছি বটে।"

একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আর তাছাড়া নলিনী-বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা দিন দিন যেরকম হয়ে আস্‌ছে—তাকে আর ঠিক বন্ধুত্ব বলা চলে না।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "ডোরাও সেদিন আমাকে ঠিক ঐ কথাই বল্‌ছিল বটে। এমন জান্‌লে কে ওকে এখানে আস্‌তে লিখ্‌ত!—আমি আজই ওর বাপকে চিঠি লিখে দিচ্ছি—না না, এসব আস্কারা দেওয়া কখনই উচিত নয়। ডোরাও কাল আমাকে ঠিক ঐ কথাই বলেছিল—আমি তার কথা তখন বিশ্বাসই করিনি—আর বিশ্বাসই বা করি কি করে?—যাক্‌, আমি আজই এর একটা যাহোক ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

লক্ষ্মী আবার বলিল, "সে আজকাল যেরকম বাড়াবাড়ি করে তুলেছে—কোন্‌ দিন, না শুন্‌তে হয় সে হিন্দু হয়ে গেছে।"

"আশ্চর্য্য কি!" বলিয়া রেভারেণ্ড অত্যন্ত অস্থিরভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তা হলে আমাদের মুখ দেখাবার আর জায়গা থাক্‌বে না। কি কুক্ষণেই ওকে আস্‌তে লিখেছিলুম!—তখন কে জান্‌তো ও এমনধারা কেলেঙ্কারী করে বস্‌বে? না না! আমাকে এর একটা ব্যবস্থা কর্‌তেই হচ্ছে দেখ্‌ছি; আর ঐ ছোকরাটিকেও একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে হচ্ছে—বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে!"

সেইদিনই বৈকালে মেরীকে ডাকিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তোমার নামে অনেক কথা শুন্‌তে পাচ্ছি মেরী—আমার ইচ্ছে নয় তুমি আর এখানে থাক।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে মেরী বলিয়া উঠিল, "অপরাধ!"

রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "অপরাধ যথেষ্ট হয়েছে—তা না হলে শুধু-শুধু যেতে বল্‌তুম না।"

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে মেরী বলিয়া উঠিল, "তবু, কি অপরাধটা একবার শুনি!"

সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "ভদ্রলোকের মত কথা কইতে শেখ মেরী!"

একটুও বিচলিত না হইয়া ঠিক তেমনি কঠোরভাবেই মেরী বলিয়া উঠিল, "সে শিক্ষাটা আমার বোধ হয় আপনারই সবচেয়ে দরকার হয়ে পড়েছে।"

রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "মুখ সাম্‌লে মেরী—আমি আজই তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

একটু হাসিয়া মেরী বলিল, "কি লিখ্‌বেন শুনি!"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "লিখ্‌বো আপনার মেয়ের চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য হয়ে উঠেছে; সে একজন বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই—"

অত্যন্ত কঠোর স্বরে মেরী বলিয়া উঠিল, "মেরী আজ পর্য্যন্ত কোন মিথ্যাকেই ভয় করতে শেখেনি মিঃ হোয়াইট! আপনার যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পারেন। আমি আপনাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।" কথাটা শেষ করিয়াই সে ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পর একদিন এক ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় লক্ষ্মী আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত দিন বর্ষণের পর এই কিছুক্ষণ হইল বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে এবং তাহারই সজলতা মৌনসন্ধ্যার সেই করুণ এবং বিষাদময় ক্ষণটিকে আরো করুণ করিয়া তুলিয়াছিল। সে একবার বাতি জ্বালিয়াছিল, কিন্তু বাদ্‌লা হাওয়ায় সেটা হঠাৎ নিবিয়া যাওয়ায় দ্বিতীয়বার আর জ্বালে নাই—অন্ধকারেই বাতায়নের ধারে নীরবে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে তখন পর্য্যন্ত বাঁশ-ঝাড়ের বুকের মাঝখানে বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল এবং কালো মেঘগুলো থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া মরিতেছিল। লক্ষ্মীর মনটাও আজ কাঁদিতেছিল,—তার মনে হইতেছিল, এই ক্ষান্তবর্ষণ মৌন সন্ধ্যার বুকের মাঝখানটিতে যে করুণ সুরটি অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, তার সমস্ত জীবনটা যেন তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া বাজিয়া উঠিতে চায়। তার সমস্ত জীবনটাই যেন ঠিক এমনি একটি কান্নাভরা আষাঢ়সন্ধ্যার একটিমাত্র অশ্রুবিন্দু হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল—'লুসী!"

লক্ষ্মী ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

অন্ধকারে আবার কে ডাকিল, "লুসী, তুমি বোধ হয় শুনেছ আমি কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি!"

একটুমাত্র চঞ্চল না হইয়া অত্যন্ত স্থির এবং আর্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কেন যাচ্ছ মেরী?"

"কেন ?—সে কথা তোমরাই আমার চেয়ে বেশী জান লুসী"—বলিয়া মেরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "আমি ত কিছুই জানি না মেরী।"

"তুমি কিছুই জান না ?—মিথ্যে কথা বোলো না লুসী!" তার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মেরী আবার বলিল, "আমার নিজের জন্যে আমি একটুও দুঃখিত নই লুসী—দুঃখ আর একজনের জন্যে; তোমরা কতবড় একটা জীবন যে জন্মের মত মাটি করে দিয়েছ, তা যদি বুঝতে!"

অত্যন্ত ক্ষীণ এবং আর্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কেন ?"

"কেন ?—এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নলিনী-বাবুকে কি হুকুম দিয়েছেন শোন নি ?"

ঠিক তেমনি নির্বিকারভাবেই লক্ষ্মী উত্তর দিল, "কৈ না!"

"তুমি যে আশ্চর্য্য করলে লুসী—তুমি মিথ্যে কথা বলছ না ত ?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে লক্ষ্মী উত্তর দিল, "না, মিথ্যে কথা বল্‌ছি না মেরী!"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মেরী বলিয়া উঠিল, "আমার নামে তুমি রেভারেণ্ড হোয়াইটের কাছে কোনদিন কোন কথা বলনি ?"

"বলেছি।"

"কি বলেছ ?"

"বলেছি, নলিনী-বাবুকে তুমি ভালবাস।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মেরী বলিল, "তার পর রেভারেণ্ড হোয়াইট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে নলিনী-বাবুর নামে যে-সব মিথ্যা অভিযোগ রটিয়ে এসেছেন তুমি তার কিছুই জান না ?"

কম্পিত কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "না, জানি না মেরী!"

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মেরী বলিতে লাগিল, "তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছেন, নলিনী-বাবু গ্রামের ছোটলোকদের ধ'রে ধ'রে রাজদ্রোহী ক'রে তুলছে এবং সেদিন হরিহরপুরে যে ডাকাতি হয়ে গেছে তিনি তাতে লিপ্ত ছিলেন।"

লক্ষ্মী একটি কথাও বলিল না—কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু থামিয়া মেরী আবার বলিতে লাগিল, "প্রমাণ অভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নলিনী-বাবুকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি, কিন্তু আদেশ জারী করেছেন, তিনি আর কখন গ্রামের ছোটলোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারবেন না এবং তাঁকে সারাজীবন পুলিসের নজরবন্দির মধ্যে থাক্‌তে হবে।"

লক্ষ্মী তেমনি নির্ব্বাক হইয়াই বসিয়া রহিল। মেরী আবার বলিল, "অর্থাৎ তাঁর কর্ম্মজীবনটাকে একবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।"

কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বাহিরে তখন আবার ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া ফেলিয়া বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া মেরী বলিল, "আমি কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি লুসী; যাবার সময় তোমাকে একটা কথা বলে যাওয়া নেহাত দরকার বলে মনে হোলো, তাই একবার দেখা করে যেতে এলুম।"

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কি কথা মেরী ?"

গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া মেরী বলিল, "তোমার ধারণা, আমি নলিনী-বাবুকে ভাল বেসে ফেলেছি; তা নয় লুসী; আমি তাঁকে বড়-ভায়ের মত ভক্তি করি; অন্য কোন দৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত তাঁর মুখের দিকে তাকাই নি। আর, তিনিও আমাকে ছোট বোনের মত করেই আজ পর্য্যন্ত স্নেহ করে এসেছেন, অন্য কোন ভাব তাঁর মনে একদিনের তরেও স্থান পায় নি।"

লক্ষ্মী সে কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "তুমি যেও না মেরী!"

সজল কণ্ঠে মেরী বলিল, "আমাকে যেতেই হবে লুসী; ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ, আমাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হবে।"

কম্পিত কণ্ঠে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"তা ঠিক জানি না, জানি কেবল এই যে চলে যেতে হবে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে।"

লক্ষ্মী আর একটি কথাও বলিল না, চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া ছিল তা সে নিজেই জানিতে পারে নাই। কখন একসময় কেলী ডাকিল, "লক্ষ্মী-দিদি!"

চম্‌কাইয়া ফিরিয়া, চাহিয়া সে বলিল, "কেন রে ফেলী?"

অত্যন্ত বিষাদময় কণ্ঠে ফেলী বলিল, "নলিনী-বাবুর কি হয়েছে লক্ষ্মী-দিদি?"

"তা ত জানি না ফেলী," বলিয়া লক্ষ্মী জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; আকাশ যেন মেঘের কালো আঁচলখানিতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে।

ফেলী আবার বলিল, "আমি আজ বিকেল বেলা নলিনী-বাবুকে খবর দিতে গেছ্‌লুম,—ননি সেক্‌রার মেয়ের বড় জ্বর হয়েছে; সেকথা শুনে নলিনী-বাবু আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো লক্ষ্মী-দিদি!"

লক্ষ্মী কেবল বলিল, "হুঁ।"

পরদিন সকাল দশটার ট্রেনে মেরীর যাইবার কথা; অতি প্রত্যূষে উঠিয়া লক্ষ্মী কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার পর যখন ১০টা বাজিয়া গেল তখন সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মেরী যে-ঘরখানিতে থাকিত তাহারই সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে একবার ঘরখানির দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরখানি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে—তার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রেভারেণ্ড হোয়াইট গির্জ্জার সমুখের বাগানটাতে অন্যমনস্কভাবে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মী আসিয়া কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমরা মাদ্রাজ যাব্বো কবে রেভারেণ্ড?"

একটু হাসিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "এখানে বুঝি আর মন টিক্‌ছে না তোমার?"

"না, একটুও না, এখুনি যদি কেউ নিয়ে যায় ত চলে যাই।" বলিয়া লক্ষ্মী নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘন দাড়ির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে রেভারেণ্ড বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলুম লুসী, দু-একদিন বাংলাদেশ লাগে ভালো, কিন্তু কিছুদিন থাক্‌লেই সব পুরাণো হয়ে যায়। শুধু কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানুষকে ক'দিন ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে লুসী?"

সে কথায় কোন জবাব না দিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তা হলে আমরা কবে এখান থেকে যাচ্ছি?"

"যেদিন তোমরা বল্‌বে; যে জন্যে আমার এখানে আসা তা ত হয়ে গেছে লুসী, এখন তোমরা যেদিন বল্‌বে আমি তৈরি হয়ে থাক্‌বো।" বলিয়া রেভারেণ্ড আবার পাচারি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী আবার বলিল, "আমার ইচ্ছে কালই আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন লুসী?"

লক্ষ্মী বলিল, "আমার আর একদণ্ডও এখানে মন টিক্‌ছে না রেভারেণ্ড।"

একটু বিরক্ত হইয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তোমার কি সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি চাই লুসী! মন ত আমারও টিক্‌ছে না, কিন্তু তাই বলে কি এখুনি ছুটতে হবে?"—তার পর সুরটাকে একটু নরম করিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি চারিদিক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লুম এই রবিবারের আগে আমাদের যাওয়া হতেই পারে না। আজ হোলো গিয়ে তোমার মঙ্গলবার—তাহলে মাঝে কেবল চারটে দিন রৈল বৈ ত নয়—এই কটা দিন আর থাকতে পার্‌বে না?"

"পার্‌বো," বলিয়া লক্ষ্মী আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা আসিল। লক্ষ্মীর মন হু হু করিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, বাংলা দেশ যেন সন্ধ্যার মলিন বস্ত্রখানি পরিয়া তাহার শয়নকক্ষের বাতায়নটির ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া তার মুখের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।—সে ছট্‌ফট্ করিয়া জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং আলো জালিয়া সমুখের আল্‌মারি হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে বেড়াইতে যাইবার জন্য কাপড় জামা পরিয়াই হঠাৎ কি ভাবিয়া খুলিয়া ফেলিল। তার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, পথে যদি সহসা নলিনীকান্তর সহিত দেখা হইয়া যায়। তার মনে হইল সে এখনি ছুটিয়া এ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। কি বলিয়া সে নলিনীকান্তকে এ মুখ দেখাইবে! সেই উদার, উন্নতমনা

যুবকটির জীবনের সমস্ত আশা ভরসা, সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সে নিজের একটু সামান্য স্বার্থের জন্য কি নির্ম্মমভাবেই না ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তস্‌নস করিয়া দিয়াছে,—সে কথা মনে করিয়া তার বুকের মাঝখানটা হু হু করিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

শিক্ষার বনিয়াদ

ফরাসীদেশের বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ্জ কার্পান্তিয়ে'র (Georges Carpentier) নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বয়সে তরুণ হইলেও মুষ্টিযুদ্ধে ইনি সেদিন পর্য্যন্ত অদ্বিতীয় ছিলেন; শেষবারের লড়াইতে আমেরিকার ডেম্প্‌সী'র (Dempsey) কাছে শুধু হার মানিয়াছেন। কিন্তু হারাতেও তাঁহার প্রতিভা কিছু ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ডেম্প্‌সী তাঁহাকে হারাইয়াছেন ধারে নয়, কেবল ভারে। পাথরের স্তূপের কাছে মানুষ যদি হটিয়া যায়, তবে তাহাতে মানুষের বিশেষ অপমান নাই। সে যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য বিষয় তা নয়, আমাদের বক্তব্য বিষয় কার্পান্তিয়ে'র ব্যায়াম সম্বন্ধে উপদেশ। শরীরকে কি রকমে তৈয়ারী করিতে হয়, সে সম্বন্ধে এই প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিজের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে যে কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই মূল্যবান বলিয়া আমরা মনে করি; সে কথা আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে কিয়দংশ হুবহু তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"I have always made it a point to shun all exercises that are merely violent, for that which is physically hard to do hurts and tires; it is harmful. For instance, of the prolonged swinging of Indian clubs or dumb-bells or muscle-making exercises, I do not approve. A man who claims perfect physical fitness because his body is bunched with muscle, I would not pass as the ideal or perfectly trained athlete. The severely muscular man is strong only in a given test of strength. he may lift a tremendous dead-weight; he is imposing to look at; but he lacks elasticity, quick footedness; oftener than not he has an indifferent carriage; he has made no special study of deportment. * * * I attach the utmost importance to 'how to walk'. Perfect carriage—the knowledge that you possess a full share of that poetry of movement which we call deportment has a wonderful effect upon the mind, and as I hold that it is absolutely necessary in the striving after physical fitness, first to have a regard for your mentality, I would put deportment down as the beginning of the alphabet of physical culture. Having learned to walk correctly, * * * you have mastered one of the hardest and most exacting lessons of your athletic curriculum, you then know all about poise, balance; and awwakrdness will not seize hold of you. * * * Training as training—a species of mechanics I would call it—is as appalling as it is monotonous and soul-destroying. * * * It is not uncommon to find the average trainer insisting upon his man working full steam until the very eve of a fight. There is nothing in my opinion, more harmful to drill into a pugilist that he is just a fighting machine to be wound up and set working at will."

কথা কয়টি সহজ সাধারণ কিন্তু অতি সারগর্ভ। দেশের শিক্ষা বিষয় লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন তাঁহাদের সকলেরই এই কথা কয়টির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কার্পান্তিয়ে বলিতেছেন—শরীরকে তৈয়ার করিতে হইলে সকলের আগে শিক্ষা করা দরকার ঠিকভাবে হাঁটা। ঠিক ঠিক হাঁটিতে যে শিখিয়াছে, শরীরের চলনটি (deportment) যাহার বিশুদ্ধ, তাহারই শরীরের ভিত খাঁটি হইয়াছে; শরীরের পক্ষে আর যাহা প্রয়োজন তাহা আয়ত্ত করিতে সে ব্যক্তির কিছুই লাগে না। হাঁটিতে জানা অর্থ, ছন্দের তালমানের জ্ঞান; ঠিক হাঁটিতে পারে যে তাহার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা সুর, সামঞ্জস্য, একটা হাল্‌কা অথচ আঁটসাট ভাব। এইটি হইলে শরীরে স্বাস্থ্য সামর্থ্য সৌন্দর্য্য অতি সহজেই আসে। আমরা কিন্তু খোলা আকাশের বাতাসের আলোর সাথে সরল সহজভাবে ছন্দের তালে দোলাইয়া শরীরকে গঠিত করি না। আমরা কঠিন

বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া, কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিয়া শরীরের উপর অত্যাচার করি মাত্র—বিশেষ বিশেষ মাংস-পেশী ফুলাইয়া, বিশেষ বিশেষ অঙ্গ পুষ্ট ও শক্ত করিয়া ওস্তাদ বনিয়া যাইতে চাই। কার্পাস্তিয়ে তাই ডাম্বেল মুগুর ডন বৈঠক এইরকম কোন শ্রমসাধ্য ব্যায়ামবিশেষে শক্তির পুঁজিকে খাটাইতে চাহেন না। তিনি বলেন এ-সব উপায়ে শরীরকে মাংসল পেশীবহুল করা যাইতে পারে, কোন কোন অঙ্গে প্রভূত বল সঞ্চয় করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? এইরকমে মানুষ বিশেষ কোন বল-পরীক্ষায় সফল হইতে পারে—কেহ বুকের উপর দিয়া হাতী চালাইয়া দিতে পারে, কেহ দশবিশ মণ পাথর তুলিয়া ধরিতে পারে, কাহারও বা বপুখানি দেখিয়া তাক লাগিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখানে পাই না সমস্ত শরীরের একটা সাধারণ পুষ্টি, সমান সামর্থ্য, একটা সুবিন্যস্ত সুসংহত শক্তি, একটা ছন্দের সৌন্দর্য্য।

আমরা শরীরের শিক্ষার কথা বলিব না, আমরা বলিব মনের শিক্ষার কথা। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে কার্পাস্তিয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবই মনের সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশেই বা কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা কার্পাস্তিয়ে যেমন বলিতেছেন সেই পেশীবহুল—severely muscular মন ও মস্তিষ্ক তৈয়ারী করিবার শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষায় আমরা করি কি? মনের এক-একটা খণ্ড বৃত্তি ধরিয়া, মস্তিষ্কের এক-এক ভাগের উপর ভর করিয়া আমরা কসরৎ করিতে থাকি। শিক্ষার্থীর মনকে মস্তিষ্ককে এক একটা বিদ্যায় অর্থাৎ এক-একটা কৌশলে (trick) কশলী চতুর করিয়া তুলিতে চাই। রামমূর্ত্তি যেমন বুকের উপর জড়ান শিকল বুকখানা ফুলাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন, তেমনি আমাদের দার্শনিক ওস্তাদের উদ্দেশ্য তর্কের জোরে জগৎসমস্যা মিটাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া। তারাবাই যে-রকমে কয়েকগোছা চুলে বাঁধিয়া বিপুল ভারী পাথর তুলিতে পারেন, সেই-রকম জবরদস্ত স্মৃতিশক্তির সহায়ে আমাদের কেহ কেহ পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলীর সন তারিখ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনর্গল বলিয়া যাইতে পারেন। অথবা স্যাণ্ডোর শরীর যেমন পেশীতে পেশীতে ফুলিয়া দৃষ্টির শোভা হইয়াছে, সেই-রকম আমাদের মধ্যে দুই-একজন বিদ্বান বা পণ্ডিত আছেন যাঁহারা বিদ্যার সম্ভারে পূর্ণ এক-একটি সচল ভাণ্ডার। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে, কিন্তু প্রায়ই দেখি বিশেষজ্ঞ যিনি তিনি আপনার বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে—এমন কি সাধারণ জীবনের সাধারণ বিষয়ে পর্য্যন্ত—কেমন অজ্ঞ, অক্ষম, না হয় উদাসীন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যিনি তিনি সাহিত্যের রসে বঞ্চিত, কেমিষ্ট্ যিনি দর্শনের সহিত তাঁহার ঝগড়া, ভাষাজ্ঞ যিনি বিজ্ঞান তাঁহার মাথায় সহজে প্রবেশের পথ পায় না। একটা উদাহরণ দেই; কথাটা গল্প নয়, একেবারে বাস্তব সত্য। আমাদের জনৈক বন্ধু দর্শনশাস্ত্রে এম-এ দিতেছেন; তাঁহাকে কি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা হয়, মহম্মদ আগে না বুদ্ধ আগে; তিনি মাথা চুল্‌কাইয়া অনেক ভাবিয়া গবেষণা করিয়া বলিলেন মহম্মদই আগে হইবেন! শেষে বিষম অপদস্থ হইয়া ওজর দেখাইলেন যে তিনি দর্শনের ছাত্র, ইতিহাস ত তাঁহার পাঠ্যতালিকায় নাই! এই দৃষ্টান্তটা অসাধারণ কি না জানি না—একজন প্রফেসর বন্ধু আশ্বাস দিতেছেন যে তা নয়, ব্যাপারটা খুবই সাধারণ; কিন্তু এই-রকম গোছের বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি যে আমাদের শিক্ষায় হইতেছে তাহাতে ভুল নাই। সম্প্রতি কোথাও কোথাও অবশ্য বলা হইতেছে আর দায়ে পড়িয়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে সকল বিদ্যার সহিত সকল বিদ্যারই কিছু না কিছু সংযোগ আছে, কোন একটি বিষয়ের মধ্যে একান্তভাবে কূপমণ্ডূক হইয়া থাকা চলে না; আমরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি যে যাহার যত বেশী বিষয়ের উপর অধিকার তিনি নিজের বিশেষ বিষয়টির তত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন, তাহাকে তত গভীরভাবে বিশদভাবে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে পারেন। আজকাল আমরা বলিতে সুরু করিয়াছি, প্রত্যেক বিদ্যাই খণ্ড বিদ্যা, জগতের এক-একটা ভাগ কাটিয়া আলাদা করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে মাত্র; সুতরাং মোটের দিক হইতে, আর-সকল বিদ্যার আলোকে যদি অংশবিশেষের বিদ্যাকে দেখি, তবেই তাহা সম্পূর্ণ দেখা হয়, তাহার পুরাপুরি রহস্য উদ্ধার হয়। কিন্তু এই-রকমেও আমরা বিশেষত্বকেই প্রাধান্য দিতেছি, বিশেষ বিদ্যাই মুখ্য কথা, আর-সকল বিদ্যা শুধু সহায় বলিয়া চর্চ্চা করা দরকার, ইহাদের আলোক সেই

বিশেষ বিদ্যারই উপর কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য। তা ছাড়া, আমরা যদি সকল বিদ্যাই নিরপেক্ষভাবে সমান চর্চা করি, তাহা হইলেও সে জিনিষটা হইবে কার্পান্তিয়ে যে বলিয়াছেন muscle making exercises অর্থাৎ পেশীগড়া ব্যায়াম, তাহারই মত ; ইহাতে মন, মস্তিষ্ক বিদ্যা-খচিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু গোটা মনকে মস্তিষ্ককে—আসল মাংষকে এ-রকমে পাওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ শিক্ষার এই যে পেশীগড়া পদ্ধতির কথা আমরা বলিলাম ইহার ভুল এই যে এখানে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে বাহিরের উপর, খণ্ডের উপর—ভিতরকে, সমগ্রকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় নাই। কি রকমে, আমরা একটু বিশদ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। শিক্ষার মধ্যে তিনটি স্তর বা ধারা আছে। প্রথম, বিষয় অধিকার ; দ্বিতীয়, বৃত্তির চর্চা ; আর তৃতীয়, মনের গড়ন ঠিক করা, সামর্থ্য বাড়ান। প্রথম হইতেছে বিশেষ বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া, তৎসম্বন্ধে যত তত্ত্ব ও তথ্য আছে তাহা জানা বা আবিষ্কার করা। দ্বিতীয় হইতেছে মনের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিকে মাজিয়া ঘসিয়া তীক্ষ্ণ ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলা—যেমন স্মৃতির শক্তি অথবা বিচার-বিতর্কের শক্তি অথবা সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিবার শক্তি। আর তৃতীয়টি হইতেছে কোন বিশেষ বিষয়ে বিদ্বান বা শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া নয়, কিম্বা কোন বৃত্তিবিশেষে উৎকর্ষ লাভ নয়, কিন্তু মনের গোড়াটি গোটা মস্তিষ্কটি সতেজ ও শক্তিমান করিয়া তোলা। চলিত শিক্ষা প্রথমটি লইয়াই ব্যাপৃত অর্থাৎ শিক্ষার যেটি অধমাঙ্গ, যেটি সব-চেয়ে নীচের ও বাহিরের স্তর সেইটিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিয়াছে ; দ্বিতীয়টি, যেটি অপেক্ষাকৃত ভিতরের, সেটি যদি এখানে পাই, তবে তাহা নেহাৎ গৌণভাবে ; আর তৃতীয়টি, যেটি সবচেয়ে ভিতরের, সেটির কোন খোঁজ-খবরই আমরা রাখি না। পূর্ণ শিক্ষায় এই তিনটি অঙ্গেরই দরকার, তবে তাহার প্রণালী হওয়া উচিত বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা নয় কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসা—চলিত প্রণালীর ঠিক উল্টা ধারায়। ভিতরের খোঁজ না রাখিয়া কেবল বাহির হইতে চাপ দিলে, ভিতরটা হয় মুষড়িয়া যায়, না হয় পায় একটা বিকৃত অস্বাভাবিক রূপ। বিষয় জানাকেই একান্ত করিয়া ধরিলে, বিষয়ের গুরুভারে মনের বৃত্তি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিবার পথ ত পায়ই না, বিষয় জানাটাও ঠিক ঠিক হয় না ; কারণ, বৃত্তিকে সেগুলি জোর করিয়া গেলান হয়, হজম করিতে যে সময় যে সামর্থ্য লাগে তাহা সে পায় না। বৃত্তির চর্চ্চাও গোড়ার কথা নয়। স্মরণশক্তি বাড়ান দরকার সুতরাং চেষ্টা করিয়া মনে রাখ, বার বার দেখ, মুখস্থ কর ; অথবা বিশ্লেষণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করা দরকার, সুতরাং মাথা খাটাইয়া লজিকের খাপে খাপে বুদ্ধিকে চালান অভ্যাস কর—এই ভাবে বৃত্তিকে যথাযথ বিকশিত করিয়া তোলা যায় কি না, বিষয়ের উপর অধিকার ও পূর্ণ মাত্রায় হয় কি না, গভীর সন্দেহের কথা। যদি তা'ও হয় তবুও আমরা পাই শুধু বৃত্তিবিশেষে বা বিষয়বিশেষে ওস্তাদী ; এ-রকমে এক-একজন শ্রুতিধর বা চুল-চেরা তার্কিক অথবা একখানা চলন্ত অভিধান আমরা বানাইতে পারি, কিন্তু সে-সব হয় যেন একটি যন্ত্রবিশেষ—বিশেষ বিশেষ জিনিষ তাহার মধ্যে ফেলিয়া দাও, বাহির হইয়া আসিবে বিশেষ বিশেষ ধরণের তৈয়ারী মাল। কিন্তু এ উপায়ে তেজালো জোরালো মনওয়ালা সহজ স্বাভাবিক মানুষ পাওয়া দুষ্কর। শুধু তাই নয়, বাহির হইতে এরকমে গড়িয়া পিটিয়া লই যে মন, তাহা বেশীর ভাগ হয় গ্রহণের আধার মাত্র, সে মন গ্রহণ করিতে পারে যাহা কেবল গ্রহণ করা যায় যন্ত্রের মত ; সৃষ্টিকারী মন, যে মন দান করিতে পারে, যে মন রসজ্ঞ তাহার উদ্ভব এ ভাবে হয় না। সৃষ্টি অর্থ জড় উপকরণ সংগ্রহ বা সাজান নয়, সৃষ্টি হইতেছে প্রকাশ, ভিতর হইতে বাহিরে রূপান্তর, একটা ছন্দে সুরে প্রাণে লালায়িত আত্মশক্তির বিস্ফুরণ। সেই মন শুধু জানা নয়, কিন্তু আবিষ্কার করিতে পারে ভিতরে যে প্রথমে পাইয়াছে, অনুভব করিয়াছে নিজের সামর্থ্য, জীবন্ত সত্তা। সেই-রকম মনই হইয়া উঠে সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। বিষয়বিশেষে, বৃত্তিবিশেষের উপর তাহার অধিকার যেমন সহজ সতেজ হয়, তেমনি আবার সেখানে জমিয়া উঠে এমন একটা নৈসর্গিক প্রতিভা, যাহা প্রয়োজন-মত যে-কোন বিষয় যে-কোন বৃত্তি হইয়া অবলীলাক্রমে খেলিতে পারে ; চিন্তাশক্তির গোড়ায় এমন একটা রস সেখানে সঞ্চিত হয় যাহা যে পথে চলুক না কেন, সেখানেই সজীব সবুজ সৃষ্টির ভাব আনিয়া দিতে পারে। মনের চিন্তাশক্তির এই গোড়া-পত্তন হইলে, আগে যে জিনিষ অতি কষ্টে, জোর করিয়া

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘাম ঝরাইয়া আয়ত্ত করিতে হইত, এখন সেটি—অহো যাহাই হউক না কেন—কেমন স্বভাবসিদ্ধ শক্তি বলে আপনার হইয়া যায়।

শিক্ষার যে তিনটি অঙ্গের কথা বলিলাম সেই হিসাবে ইহাকে একখানা তলোয়ারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তরবারির লক্ষ্য জিনিষ কাটা; শিক্ষার লক্ষ্যও তেমনি বিষয় অধিকার। কিন্তু আগে দর্কার তরবারিকে ধার দেওয়া, শাণ দেওয়া; সেইরকম শিক্ষাতেও আগে দর্কার বৃত্তির চর্চ্চা করা। ভোঁতা তলোয়ার দিয়া কাটিতে আরম্ভ করিলে, কাটিতে কাটিতে কিছু ধার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু কাটা যায় না, ধার ভাঙ্গিয়া যায়, তলোয়ারখানা একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনাও আছে। সেইজন্য সকলের আগে দর্কার তরবারিখানাকে পাকা লোহায় যথাযথ ঢালাই (temper) করা; তাই শিক্ষাতেও দর্কার বৃত্তি-চর্চ্চারও আগে মনকে মস্তিষ্ককে একটা শক্ত সমর্থ সুঠাম গড়ন দেওয়া।

শরীরের উন্নতির পক্ষে কস্রৎ নয়—আগে দর্কার স্বাস্থ্য, একটা সাধারণ সামর্থ্য অর্থাৎ প্রাণশক্তি ও প্রাণশক্তির ছন্দ—কার্পান্তিয়ে যাহাকে বলিয়াছেন poetry of movement, গতির রসায়ন। এই গোড়ার শক্তিটি কস্রৎ দিয়া পাওয়া যায় না, কস্রৎ ইহার প্রয়োগ বা প্রয়োগের কৌশল মাত্র; এটি পাইতে হইলে দর্কার অন্য রকম জিনিষ। শিক্ষার বেলাতেও গোড়ায় চাই এই রকম মনের একটা স্বাস্থ্য, সাধারণ সামর্থ্য, মনেরও একটা প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি। মনের জীবনশক্তি হইতেছে মননশক্তি বা মনীষা, ধীশক্তি বা মেধা। চলিত শিক্ষাপদ্ধতি এই মনীষাকে মেধাকে জন্মাইবার বাড়াইবার কথাটা একেবারে উহ্য করিয়া রাখিয়াছে; ইহার বিশেষ প্রয়োগের উপর, চিন্তার সহজ সমর্থ ছন্দ নয় কিন্তু চিন্তার কস্রতের উপরই সে শিক্ষা সকল শ্রম ব্যয় করিতেছে। চলিত শিক্ষা-পদ্ধতি মেধা ও মনীষার উন্মেষণে যে সাহায্য করিতেছে না, তাহাই নয়, রীতিমত বাধাই দিতেছে। শিক্ষা অর্থ যখন কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট মাসের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা, একটা বাঁধা সময়ের মধ্যে বাঁধা কতকগুলি কথা মগজের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া ও চাহিবামাত্র বাহির করিয়া দেওয়া, তখন সে শিক্ষা চিন্তার সহজ শক্তির উপর যে অনেকখানিই অত্যাচার উৎপীড়ন, তাহা বলাই বাহুল্য।

মনের বা মস্তিষ্কের প্রয়োগের চাতুর্য্য নয়, কিন্তু তাহার বস্তুর সামর্থ্য, তাহার গড়নের ছন্দ কি করিয়া খেলাইয়া তোলা যায়, ইহাই হইল শিক্ষার গোড়ার সমস্যা। কার্পান্তিয়ে বলিতেছেন শরীরের একটা সহজ স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গে একটা লীলায়িত গতি, একটা মুক্ত অথচ সুদৃঢ় বাঁধনী হইতেছে বলচর্চ্চার প্রথম ও মুখ্য কথা। আমরা বলিব মনকেও মার্জ্জিত শিক্ষিত করিতে হইলে, গোড়ায় মনেরও চাই সেই-রকম একটা প্রসাদগুণ, একটা উদার স্বচ্ছন্দ গতি, ধনুকের ছিলা বা বীণার তারের মত একটা সংহত শক্তি। এই উদ্দেশ্যে শরীরের জন্য কার্পান্তিয়ে নির্দ্দেশ করিতেছেন হাঁটিতে শেখা; মনের জন্য আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ভাবিতে চিন্তা করিতে শেখা। শরীরের পক্ষে হাঁটা যাহা, মনের পক্ষে ভাবাও তাই। আমাদের দেশের লোক যে ভাল করিয়া হাঁটিতে জানে না তাহার দৃষ্টান্ত পথে ঘাটে চোখে পড়ে, সুতরাং তাহারা ভাবিতে চিন্তা করিতে—গভীরভাবের ভাবা চিন্তা নয়,—সাধারণ ভাবেই ঠিক ঠিক ভাবিতে চিন্তা করিতে অর্থাৎ মনের হাঁটা হাঁটিতে যে জানে না, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নয়। মানসিক ক্ষেত্রেও আমরা চলি, কখন বাঁকিয়া চুরিয়া, কখন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, কখন বা লম্ফ ঝম্প দিয়া, কখন বা ঝিমাইয়া হাঁপাইয়া। সহজভাবে আমরা হাঁটিতে জানি না—কত মুদ্রাদোষে মনেরও অঙ্গ-সব বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কখন আমরা মোটেও ভাবি না চিন্তি না, গড্ডলিকা ধারার মত শূন্য অন্ধ মনে চলিতে থাকি, কখনও প্রয়োজনের কশাঘাতে উপস্থিত-মত কিছু একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া লই, কখনও আবেগের উত্তেজনায় যা-তা ভাবি, কখনও পরের চিন্তাভারে ক্লিষ্ট হইয়া মরি। এই-রকম পীড়িত বায়ুগ্রস্ত অসমর্থ মন লইয়াই আমরা আবার কস্রতের ওস্তাদীর অভ্যাস করি!

প্রথমে দর্কার সুতরাং ভাবিতে শেখা, সহজভাবে চিন্তা করিবার ধরণটি আয়ত্ত করা,—কি বিষয় লইয়া আছি, কোন্ বৃত্তি পরিচালনা করিতেছি, তাহার উপর জোর দিবার কোন দর্কার নাই; যে-কোন বিষয় যে-কোন বৃত্তি হউক না কেন তাহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া গোটা মনকেই খেলাইয়া তুলিতে হইবে। শিশু যখন খেলা করে, তখন কি

জিনিষ লইয়া সে খেলিতেছে তার উপর তাহার খেলা নির্ভর করে না; সব জিনিষই জোগাইতেছে তাহার খেলার আনন্দ। সেইরকম শিক্ষার বেলাতেও ভাবিবার চিন্তিবার আনন্দই হইতেছে মনের খোরাক। তাই মনকে প্রথমে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, যদৃচ্ছভাবে চলিতে দিতে হইবে; তবেই মন পাইতে থাকিবে চিন্তার রসায়ন, একটা গতির ছন্দ ও সামর্থ্য। শিশু স্বভাবতই কৌতুহলী অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু; তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, চালাইয়া লইতে হইবে এই জিজ্ঞাসার পথে। শুধু ভিতর হইতে যে জিজ্ঞাসা আপনা হইতে আসে, তাহাতেই কিন্তু আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, শিশুর মনে ক্রমে নূতন নূতন জিজ্ঞাসাও তুলিয়া দিতে হইবে। অজানা অপরিচিত জিনিষ তাহার চোখের মনের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে, সে-সবকে সুন্দর মনোহারী করিয়া রসে ভরিয়া শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যত জল্পনা কল্পনা করিতে পারে তাহাতে উৎসাহিত করিতে হইবে। শিশুর বা শিক্ষার্থীর মনের প্রসার ও গভীরতা কম, তাই শিক্ষককে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে, নূতন নূতন অনুভূতির উদ্রেক (stimulus) জোগাইতে হইবে,—কিন্তু কোন রকম জোর না দিয়া, খেলার সাথে, গল্পচ্ছলে, অবান্তরভাবে। টোপ ফেলিয়া, চার ছড়াইয়া বসিয়া দেখিতে হইবে মাছ ধরে কি না—ধরিলে ভালই, আস্তে আস্তে খেলাইয়া তবে ছিপের সম্পূর্ণ আয়ত্তে তাহাকে আনিতে হইবে; না ধরিলেও কোন রকম তাড়াহুড়া করা বা অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া শিক্ষার্থীর মনের দুয়ারে জিনিষ আগাইয়া দিতে হইবে, দেখিতে হইবে কোনরূপ রস সে উহাতে পায় কি না, কোন সুপ্ত তন্ত্রী তাহার মধ্যে বাজিয়া উঠে কি না—শিক্ষার্থীর যদি কোন বিশেষ প্রতিভা থাকে তবে তাহা এই ভাবেই ধরা পড়িবে, ফুটিয়া উঠিবে। তারপর, শিশুর মনে শৃঙ্খলা নাই; বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সে কিছু দৃক্‌পাত না করিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়; একটা বিষয়কে ধরিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত logical conclusion পর্য্যন্ত ধাপের পর ধাপ বাহিয়া চলা হইতেছে পরিণত বুদ্ধির ধর্ম্ম, তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে তাহা আশা করা অন্যায়। এই সে পাখীর ময়চংএর কথা আলোচনা করিতেছে, এই আবার কবিতা আওড়াইতে আরম্ভ করিল, সেটা অসমাপ্ত রাখিয়াই আবার হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, মরিলে পর মানুষ কি হয়। শিক্ষককে অসীম ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষার্থীর মনের এই খেয়ালের পথে চলিতে হইবে, একটু একটু করিয়া অর্দ্ধসমাপ্তভাবে নানা-রকম রস জোগাইতে হইবে। এই-রকমেই মনের মধ্যে সহজ সাড়া পড়ে, সজীব শক্তি সঞ্চিত হয়, একটা গতিবেগ ছন্দে সামঞ্জস্যে লীলায়িত হইয়া উঠে, চিন্তায় জড়তা জন্মিতে পারে না, বুদ্ধিতে মরিচা ধরিতে পারে না।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর এই স্বাধীন স্বেচ্ছাতন্ত্র গোড়ার জিনিষ। অবশ্য, এইটুকুই যদি সব হইত তবে শিক্ষার সমস্যা অনেকখানিই সহজ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয় তাহা নয়। শিক্ষার মধ্যে একটা নিয়ম-সংযমের (discipline) বিশেষ স্থান আছে, সেইটিই যত গোলমাল আনিয়া দেয়। শিশুকে পুস্তকের সহিত পরিচয় করাইতে হয়—তাহাকে ঠিক ঠিক লেখা ও পড়া শিখিতে হয়। এ জিনিষটি এখন যেমন ভাবে করা হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক সরস করিয়া তোলা যাইতে পারে বটে, তবুও একটা জায়গায় গিয়া একটু জোর জবরদস্তি আসিয়া পড়েই। কারণ, মুখে মুখে খেলাচ্ছলে যাহা যে ভাবে শিখান যায় বা যাইতে পারে, তাহা শিশুর স্বাভাবিক জীবনের সুরে তালে মিলিয়া মিশিয়া চলে। কিন্তু অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পাঠ অথবা লিখন ও অঙ্কন যে মুহূর্ত্তে আরম্ভ হয়, সেই মুহূর্ত্তে শিশুর মনের উপর চাপ পড়ে আর-একটা ভিন্ন রকমের জগতে উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য। এই ধাপটা যতই মোলায়েম, এই বাঁকটা যতই সোজা করিয়া ধরা হউক না, একটা ঝাঁকি শিশু অনুভব করিবেই। শুধু শিশুর পক্ষে কেন, শিক্ষার্থীর পক্ষে বরাবরই—শিক্ষা অর্থ উন্নতি বা ক্রমারোহণ বলিয়া—জিনিষটা যতই সুন্দর মনোরম চিত্তাকর্ষক-ভাবে আসুক না, মনের মধ্যে একটা জায়গায় একটু টানা-টানি একটু কশাকশি হইবেই। শিক্ষার্থীর মনের রাশ যদি একদম ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সেখানে জন্মে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব; মন তেজালো হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সাথে থাকিয়া যায় একটা চপলতা, একটা অপক্কতা, নিজের উপর দখলের অভাব। আমাদের দোষ, এই নিয়ম-সংযম বাঁধন-ছাদন আঁটবাটকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলি;

কিন্তু এ জিনিষটা আগের কথা নয় ; আগের কথা—কি নিয়মিত সংযত করিব, কাহাকে বাঁধিব ছাদিব সেই বস্তুটির জন্ম দেওয়া। তাছাড়া, বাহির হইতে নিয়ম যতদূর আরোপ না করা যায় ততই ভাল, শিক্ষার্থী যাহাতে নিজেকে নিজে নিয়মিত (self-discipline) করিবার প্রেরণা ও কৌশল পায় তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু এসব সার্থক হইবে তখনই যখন গোড়ায় পাই তেজালো মন, সজীব মস্তিষ্ক, সৃষ্টি-কারিণী চিন্তাশক্তি।

এই জিনিষ কোন রকম বিদ্যালয়ের মধ্যে—school systemএ—তৈয়ারী হয় কি না, ইহাও একটি দরকারী প্রশ্ন। আমরা মনে করি, তা হয় না, অন্ততঃ হওয়া খুবই কঠিন। স্কুল অর্থই হইতেছে শিক্ষার্থীকে তাহার প্রতি-নিমিষের পারিপার্শ্বিক হইতে তুলিয়া লইয়া শিক্ষাঘরের মধ্যে আট্‌কান, তাহার জীবনের ও শিক্ষার মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করা। স্কুলকে অবশ্য খুব খোলা, খুব মুক্ত, উদার রকমের করা যাইতে পারে—ঘরের মধ্যে পঠন পাঠন না করিয়া গাছের তলায়, নদীর ধারে বা মাঠের কোলে তাহা করিতে পারি, কিম্বা বিদ্যালয়টিকে ছেলেদের বসতবাটীর মত (residential) করিয়া দিতে পারি, কিন্তু এসব ছেলে-দের সহজ জীবন নয়, জীবনের অভিনয় মাত্র। এ-সমস্ত স্কুলের খোলসের পরিবর্তন মাত্র, ইহাতে স্কুলের স্কুলত্ব বিশেষ কিছু নষ্ট হয় না। যে-সব জিনিষ জীবনের সহজ প্রকাশ, জীবনের অন্যান্য সহস্র জিনিষের সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত, সে-গুলিকে যথাস্থান হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাজাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলে অনেক সময়েই আসল সজীব জিনিষ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একটা নকল ছাপ। তাই আমাদের মনে হয়, আধুনিকতম নব শিক্ষা-পদ্ধতিতে (যেমন মন্তেসরির কি রবীন্দ্রনাথের) পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলিও জীবনের অকৃত্রিম বনভূমি নয়, তাহার অনুকরণে এক-একটি সাজান বাগান মাত্র। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কোন বিদ্যাপীঠ ছিল না, ছিল গুরু-গৃহ। শিক্ষার্থী গুরুর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেন; সেইখানে থাকিয়া, সেখানকার কাজকর্ম্মে মিলিয়া মিশিয়া, গুরুর ধেনু-সকলের পরিচর্য্যা করিতে করিতেই শিক্ষার্থী শিক্ষা পাইত। আমাদের মনে হয়, শিশু যেখানে জন্মিতেছে বাড়িতেছে, শত সম্বন্ধে আপনাকে ছড়াইয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে, সেই পরিবারটিকেই যদি বিদ্যাপীঠ করিয়া তুলিতে পারি, তবেই তাহা হইবে জীবন্ত বিদ্যাপীঠ। এজন্য অবশ্য পরিবারের অনেকখানি সংশোধন পুনর্গঠন হওয়া দরকার। সমাজসংস্কারকেরা চরিত্রনীতির দিক হইতে, অর্থনীতির দিক হইতে, এমন কি রাজনীতির দিক হইতেও পারিবারিক সমস্যাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন; পরিবারকে যে শিক্ষানীতির দিক হইতেও দেখা যাইতে পারে, পরিবার যে বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃষ্ট আয়তন হইতে পারে, এ কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সে যাহা হউক, শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবারের কি-রকম সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, সে প্রশ্নের মীমাংসা আমরা এখন করিতে বসি নাই; আমাদের কথা এই যে, পরিবারই যখন হইবে সজীব বিদ্যালয়, শিক্ষার্থীর শিক্ষা যখন চলিতে থাকিবে তাহার সামাজিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া অর্থাৎ শিক্ষা যখন হইবে জীবন্ত জীবনের জীবন্ত প্রকাশ, তখনই হইবে আদর্শ শিক্ষা।

এসব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীবন হইতে বিদ্যা-শিক্ষাকে যখন আমরা পৃথক করিয়া লই তখনই শিক্ষা হইয়া উঠে একটা কষ্টসাধ্য কসরৎ, মন তাহার সজীবতা হারাইয়া হইয়া পড়ে একটা কৃত্রিম যন্ত্র। মন তাজা থাকে, মনের শক্তি বাড়িয়া উঠে জীবনের রসে; জীবন নীচে হইতে মনকে ধরিয়া রাখিবে, মনও আপনার আলো জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে থাকিবে, এইরকম অবাধ আদানপ্রদানে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিয়া পরমশ্রেয় লাভ করিবে—পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ। আমাদের শিক্ষার এই দুইটি স্তরের সংযোগসূত্রটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে (lesion), তাই মনে আসিয়াছে কৃত্রিমতা আর জীবনে অসুস্থতা। মনে যে শুধু সজীবতা সামর্থ্য হয় তাহা নয়, মনের গড়ন ভাবিবার চিন্তিবার ধরণটিও ঠিকঠিক হয় যখন গোড়ায় সে মন—সে ভাবা ও চিন্তা—পরিপুষ্ট সুসংহত হইতে থাকে জীবনেরই অভিজ্ঞতাকে অনুভূতিকে জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করিয়া।

শিক্ষার বনিয়াদ হইতেছে, আমরা আবার বলি, মনের দুইটি শক্তি—মেধা অর্থাৎ মনের ধারণাশক্তি, আর মনীষা

অর্থাৎ মনের গড়ন। সেই মনই মেধাবী যাহার উপর যতখানি চাপ দেও না কেন তাহা অবলীলাক্রমে ধরিয়া রাখিতে পারে, যাহা প্রশস্ত বহুমুখী ও নিবিড় হইয়া যথেচ্ছভাবে আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারে; সেই মনই মনীষী যাহা পাইয়াছে সুবলয়িত সুঠাম গতি, সত্যের একটা সজীব অব্যর্থ শৃঙ্খলা। এই দুইটি জিনিষ স্বভাবজ বা প্রকৃতিগত বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, শিক্ষার মূল সমস্যাটিকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভিত্তি যে রকমটিই পাওয়া যাক্ না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কেবল উপরের গড়াপেটায় সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিলে, সে শিক্ষা হয় মাপ-ভারী শুধু বা দৃষ্টি-শোভাকর। একটা পরিচিত পুরাতন উপমা দিয়াই আমরা বলিব—বৃক্ষকে যদি পাতায় শাখায় ফুলে ফলে সমৃদ্ধ দেখিতে চাও, তবে কেবল সেগুলির উপর লোলুপ হইয়া থাকিলে চলিবে না, দরকার গোড়াটি খুঁজিয়া বাহির করা, তাহাকে পরিষ্কার করা, সেখানে জল ঢালা, সার দেওয়া।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

স্বপ্ন-দর্শন

অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় যুরোপে স্বপ্নবিষয়ক গবেষণাও এরিষ্টটল্ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এই সর্ব্বজনবিদিত মনীষীর মতে স্বপ্ন দৈবক্রিয়া। শুদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হইলে ইহার মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত দেখা যাইবে। যুরোপে প্রাচীনেরা দুই প্রকারের স্বপ্নে বিশ্বাস করিতেন। এক-রকম স্বপ্ন দর্শককে ভবিষ্যৎ-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়া তাহার মঙ্গলার্থে কল্পিত; অন্য-রকম তাহার বিপরীত। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক জগতে স্বপ্নের দৈবমূলীয় ব্যাখ্যা গ্রাহ্য নহে। বৈজ্ঞানিকগণ উহা মানসিক ব্যাপার বলিয়াই গ্রহণ করেন। তবে স্বপ্নের সঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থার সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন জাগ্রৎ জীবনের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াই স্বপ্নের আবির্ভাব, আবার কেহ বলেন উহা জাগ্রৎ অবস্থার সহিত একসূত্রে গ্রথিত উহারই স্রোতপ্রবাহ মাত্র। একথা নিঃসন্দেহ, যে-উপাদানে স্বপ্ন গঠিত তাহার প্রতি বিন্দু জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ। তবে যে সময়ে সময়ে দেখা যায়, স্বপ্নলব্ধ বিষয় সম্পূর্ণই নূতন, তাহার কারণ এই যে জীবনের অনেক কথা—বিশেষ ভাবে শৈশব ও বাল্যের কথা—বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল স্বপ্নের সাহায্যে তাহার উদ্ধার হয়। এমনও হয়, একটা স্থান দেখিয়া মনে হইল যে ইহা পূর্ব্বপরিচিত অথচ এ জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহার মীমাংসা হয় না; আমাদের দেশে এইখানে পূর্ব্বজন্ম আনিয়া ফেলা হয়। কিন্তু হয়তো ইহা শৈশব-দৃষ্ট কোন স্থান, যার সম্বন্ধে অন্য সব কথা স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। আবার পূর্ব্বানুভূত ভাবের আবির্ভাবের মানসিক উত্তেজনায় নূতন জিনিষও পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে।

নব মনোবিজ্ঞান (New Psychology) বা মনোবিশ্লেষণবিজ্ঞান (Psycho-analysis) যাহারা জানেন তাঁহারা মনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম মনের প্রবুদ্ধ দিক্ (conscious side), আর-এক দিকের নাম বোধগম্য (foreconscious)। এই প্রবন্ধ লেখার সময় জীবনের কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার যেগুলি একটু মনোযোগ দিলেই স্মৃতির মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাই বোধগম্য; কিন্তু অনেক বিষয় সম্পূর্ণ স্মৃতির বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে, যাহা শত চেষ্টাতেও জাগ্রৎ চৈতন্যের অন্তর্ভূত হয় না, অথচ যাহা মনেরই অঙ্গ, মনের পশ্চাতে থাকিয়া জীবনে কার্য্য করিতেছে এবং যাহা ইহাদের মতে জাগ্রৎ চৈতন্য (conscious self) অপেক্ষাও বেশী কার্য্যশীল (dynamical), তাহাই আত্মার অপ্রবুদ্ধ বা অজানা দিক্ (unconscious side)। এই দিক্ সম্বন্ধে গবেষণাই নব মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব। এই মতে যাহা কিছু একবার মনের সম্মুখে আসিয়াছে তাহার আর বিনাশ নাই। প্রবুদ্ধ দিকে তাহা খুঁজিয়া না পাও, একেবারে বোধগম্য না হয়, তবুও এ কথা নিশ্চয় যে

উহা মনের পশ্চাৎ হইতে জীবনকে নিয়মিত করিতেছে। কিরূপে পশ্চাৎ হইতে আমার কার্য্যগত জীবনের উপরও উহা প্রভাব বিস্তার করে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত মনো-বিশ্লেষণ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রয়েডের Psychopathology গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। আমরা যাহাকে প্রবুদ্ধ দিক্ হইতে ভুল ভ্রান্তি, আকস্মিক ঘটনা বলি, ইঁহারা তাহা মনের অজানা দিকের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে আমাদের জীবনে জাগ্রৎ চৈতন্যের পশ্চাৎ হইতেই অধিকতর পরিমাণে নিয়মিত হইতেছে। একজন ডাক্তার তাঁহার প্রতিপালক-পিতা পিতৃব্যের গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া পিতৃব্যের নিকট গেলেন এবং একদিন এক ঔষধের মধ্যে অন্য ঔষধ দিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইলেন। তাঁহার জাগ্রৎ চৈতন্যের মধ্যে পিতৃব্যের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না। এবং তাহার বিপরীত ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সকল কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মনোবিশ্লেষণ দ্বারা ধরা পড়িল, অতিবাল্যে পিতৃব্যের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব কোনও কারণে জন্মিয়াছিল তাহাই আজ মনের অজ্ঞাতে এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। দৈনন্দিন কত ঘটনাই ঘটিতেছে। সংবাদপত্র পাঠ করার সময় 'Goondas sent to prison' কথাটা, হঠাৎ পড়িয়া ফেলা গেল—'Govinda Das sent to prison'। কেন? বিশ্লেষণে বাহির হইল গোবিন্দ দাস নামক কোন ব্যক্তির কোন কুকার্য্যের জন্য তাহার জেল হওয়া উচিত এইরূপ একটি ভাব কিছুদিন হইল মনের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সূত্রে অজ্ঞাতসারে তাহা বাহিরে আসিল। কয়েক দিন হইল মনে করিতেছিলাম সান্ধ্যভ্রমণের সময় ডাকঘর ঘুরিয়া একটা কাজ সারিয়া আসিব। আজ বাহির হইবার সময় মনে করিয়া বাহির হইলাম যে ডাকঘর হইয়া যাইব। সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া গেল, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য অন্যপথ ধরিলাম। আমার জাগ্রৎ চৈতন্য এই অন্যপথের সংস্কার লইয়াই যখন চলিতেছে তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম সটান ডাকঘরের রাস্তায় চলিয়াছি। মনের অজানা রাজ্যের কীর্ত্তি। আমাদের ভুলগুলিও নিতান্ত অকর্ম্মক (passive) ভুল নয়। মনোবিশ্লেষকগণের মতে স্বপ্নের মূল মনের এই অজানা রাজ্যে প্রোথিত। তবে জানা রাজ্য হইতেও স্বপ্নের প্রেরণা চার রকমে আসে; ইহার উপাদান স্বপ্নের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। প্রথম আমরা নিদ্রার সময় ইন্দ্রিয়-দ্বার যথাসাধ্য রুদ্ধ করি, সম্পূর্ণ সমর্থ হই না। নিদ্রিতাবস্থায়ও স্পর্শ ও শব্দের কার্য্য আমাদের উপর চলে। এই-সকলকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইবার স্বপ্নের অদ্ভুত ক্ষমতা। কৃষ্ণকান্তের উইলে আছে, কৃষ্ণকান্ত স্বপ্ন দেখিতেছেন, যে, গণেশ মহাদেবের কাছে নালীশ করিতে আসিয়া ডাকিলেন 'জ্যাঠা মহাশয়'। কৃষ্ণকান্ত গণেশের বেয়াদবীর শাস্তি দিবার জন্য হাত তুলিলে হাতে ঠেকিয়া হুকার উপর হইতে কলিকা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি দেখিলেন গোবিন্দলাল শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে 'জ্যাঠামহাশয়'। আর-একটি দৃষ্টান্ত। * —কয়েকদিন ধরিয়া দিবারাত্র পিতা কন্যার সেবা করিয়াছেন। সন্তানের মৃত্যুর পর পিতা পাশের ঘরে শয়ন করিলেন। মৃতদেহ শয্যায় শায়িত, চারিদিকে বাতি জ্বলিতেছে, পাশের ঘর হইতে সে আলো দেখা যায়। বৃদ্ধ ভৃত্যকে পাহারা রাখিয়া পিতা ভয়ে ভয়ে ঘুমাইলেন। খানিকক্ষণ পরে স্বপ্ন দেখিলেন, কন্যা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছে, 'বাবা, দেখিতেছ না আমি পুড়িয়া মরিতেছি।' নিদ্রা-ভঙ্গে উঠিয়া পিতা দেখিলেন একটা বাতি পড়িয়া বিছানার খানিকটা ও কন্যার এক হাত পুড়িয়া গিয়াছে এবং যে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, বৃদ্ধ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা অতি সহজ। শয্যার আগুনের উজ্জ্বল আলোক পিতার চক্ষে পড়িয়া জাগ্রৎ অবস্থায়ও মনে যে চিন্তা আনিয়া দিত নিদ্রাতেও সেই চিন্তাই আনিয়া দিয়াছে অর্থাৎ বাতি পড়িয়া বিছানায় আগুন ধরিয়াছে। বৃদ্ধকে রাখিয়া যাইবার সময় এই আশঙ্কা তাঁহার পূর্ব্বেই ছিল। যে ভীষণ জ্বরে কন্যার মৃত্যু, তাহার প্রবল বেগের সময় বালিকা বাবাকে বলিয়াছিল, 'আমি পুড়িয়া মরিতেছি'—ইহাই স্বপ্নের প্রধান উপাদান

* The Interpretation of Dreams by Sigmund Freud। এই গ্রন্থ অবলম্বনেই প্রবন্ধ লিখিত।

জোগাইয়াছে। 'বাবা, দেখিতেছ না'—হয়তো অন্য কোন ঘটনায় পিতার প্রতি পুত্রীর উক্তির এক অংশ। পিতার হাত ধরা হয়তো অন্য এক ঘটনার অংশ। এই স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিলে ইঁহাদের স্বপ্নবাদের অনেকগুলি খণ্ডমত একসঙ্গে পাওয়া যাইতে পারিবে।

(ক) স্বপ্ন বহু পূর্ব্বাভিজ্ঞতার অংশ একত্র করিয়া রচিত, জীবনের অনেক ঘটনার সংক্ষিপ্তসার (condensation)।

(খ) স্বপ্ন যদিও মানসিক (psychic) ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ব্যাপারও ইহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, যেমন এখানে আগুনের আলোর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান স্বপ্নের অংশ হইল।

(গ) ইঁহাদের মতে স্বপ্ন মাত্রই কোন একটা বাঞ্ছা-পূরণ (wish-fulfilment)। এখানে সন্তানকে জীবিত দেখিবার বাসনা সিদ্ধ হইল। খানিকক্ষণ বেশী নিদ্রা যাইবার অভিলাষও পূর্ণ হইতেছে। আলো দেখিয়াই উঠিয়া গেলে সে বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বপ্নই চলুক নইলে যে জাগিতে হয়, এই অভিলাষ মনের পশ্চাতে ছিল। সুতরাং স্বপ্ন নিদ্রার কাল বৃদ্ধি করিয়া দিল। নিদ্রার মধ্যে তৃষ্ণা পাইলে মানুষ জলপানের স্বপ্ন দেখে সুতরাং স্বপ্ন নিদ্রার সাহায্য করে। অতএব পাওয়া গেল,

(ঘ) স্বপ্ন নিদ্রার পরিপন্থী নয়, সহায় (protector)। স্বপ্নের কাল বৃদ্ধির বাসনা পরিহার করিয়া উঠিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল কি? ইঁহাদের—বিশেষ ভাবে ফ্রয়েডের মতে,

(ঙ) কর্ত্তার মধ্যে নিদ্রা যে নিদ্রা এবং স্বপ্ন যে স্বপ্ন এ ধারণা বর্ত্তমান—"Throughout our entire sleeping state we are just as certain that we are dreaming as we are certain that we are sleeping."

দ্বিতীয়, বাহিরের যে-সকল শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে উত্তেজিত করিয়া জ্ঞান জন্মায় সে-সকল শক্তির কার্য্য থামিয়া গেলেও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা থাকিয়া যায়। এই উত্তেজনাবশতঃ বহির্জ্জগৎ-নিরপেক্ষ হইয়াই দর্শনশ্রবণাদি কার্য্য চলিতে পারে। ইহা দর্শন-শ্রবণের স্মৃতি নহে। কাহারও কাহারও মতে নিদ্রার অব্যবহিত পরে যে দর্শন-শ্রবণ-ঘটিত স্বপ্ন তাহা উত্তেজিত ইন্দ্রিয়ের ফল, স্মৃতির ব্যাপার নয়। উন্মাদগ্রস্ত বহির্জ্জগৎ-নিরপেক্ষ হইয়াই দর্শন-শ্রবণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বপ্ন দুর্ব্বল-রকমের উন্মাদ বা উন্মাদ প্রবল-রকমের স্বপ্ন। আমি প্রবল জ্বরের সময়ে স্বপ্নে বেদাহমেতং মন্ত্র এমন সুস্পষ্ট শুনিয়াছিলাম যে নিদ্রাভঙ্গেও কান খানিকক্ষণ ঝন্‌ঝন্ করিতেছিল। ইহা স্মৃতির ব্যাপার আদৌ নয়, অথচ সেই গভীর রজনীতে বাহির হইতে ঐ মন্ত্র আমার কর্ণে পৌঁছিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

তৃতীয়, দেহখানি যতক্ষণ সুস্থ ততক্ষণ দেহের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি না। বিকল হইলেই তাহা ভার বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। 'স্বপ্ন আসে পাকস্থলী হইতে' এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ এই যে ভাল হজম না হইলে অনেক-রকমের স্বপ্ন উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ, হাজার হউক বাহির হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে স্বপ্নকে বুঝা হইবে না। স্বপ্নের মূল মানসিক (psychic)। স্বপ্নের বাস্তব উত্তেজনা আসে কোন অপূর্ণ বাসনার চরিতার্থতার ইচ্ছা হইতে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্বপ্ন কোন অভিলাষ পরিপূরণ (wish-fulfilment) এবং উত্তেজনা আসে মনের ঐ অপ্রবুদ্ধ দিক্ হইতে।' ফ্রয়েডের মতে এই অভিলাষের প্রায় সমস্তই আসঙ্গলিপ্সাজনিত। ক্ষুধা ও আসঙ্গলিপ্সায় মানুষে পশুতে কোন বিভিন্নতা নাই। কিন্তু মানুষের সভ্যতা ভব্যতা এতজ্জনিত অভিলাষগুলিকে চাপিয়া রাখিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা মনের পশ্চাতে যাইয়া অবস্থিতি করে, নষ্ট হইয়া যায় না। এই অভিলাষের পশ্চাতে যে শক্তি (Libido) তাহাকে যদি কোনও উন্নততর কার্য্যে না লাগাইয়া (sublimation) কেবলই চাপিয়া রাখা হয়, তবে তাহা হইতেই কোরিয়া হিষ্টিরিয়া ম্যানিয়া এমন কি উন্মাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। Psycho-analytic চিকিৎসায় এইসব রোগ সহজেই আরোগ্য হইতেছে। যেখানে অভিলাষ খুব গুরুতর নয় সেখানে উহা শাসনের চাপে পশ্চাতে যাইয়া লুক্কায়িত থাকে; কিন্তু কত পশু রহিয়াছে যাহারা কেবল রাত্রির অন্ধকারে আহারান্বেষণে বাহির হয়। ভালমানুষ কদর্য্য স্বপ্ন কেন দেখে, ইহার কোন সদুত্তর না পাইয়া প্লেটো বলিয়াছিলেন, মন্দ লোকেরা জীবনে যাহা করে সাধু

ব্যক্তিরা তাহা স্বপ্নে দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। আসল কথা, আজকার সাধু যে চিরদিনই সাধু ছিলেন তা না হইতেও পারে। বাল্য-শৈশবোপার্জ্জিত কত কি আমাদের মনের আড়ালে পড়িয়া আছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? আমরা যাহা চিন্তা করি তাহা আমাদিগকে ছাড়ে না। অভদ্র দর্শন, অভদ্র শ্রবণ, অভদ্র মননের শাস্তি আমাদিগকে অজ্ঞাতসারেও পাইতে হইবে। নিদ্রাকালে যখন সামাজিক বিধিনিষেধরূপ পাহারাওয়ালা (censor) অনেক পরিমাণে নিরস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহারা অন্ধকার (unconscious) রাজ্য হইতে আসিয়া স্বপ্নের সাহায্যে আপনাদিগকে চরিতার্থতা দেয়। আমরা আমাদের স্বপ্নের মধ্যে যে তাঁহাদিগকে ধরিতে পারি না তাহার কারণ এই, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মশাসন ত দূরের কথা, সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই আসঙ্গলিপ্সা-বিষয়ক প্রসঙ্গ এমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া (symbolically) উত্থাপন করিতে হয়, রূপক উপমার জালে আচ্ছাদন করিতে হয় যে জাগ্রৎ অবস্থাতেই সে কথা বুঝা ও বুঝান আকার-ইঙ্গিতের ব্যাপার হইয়াছে। উপমা-রূপকের অত্যাচারে, খেয়ালের জ্বালায়, কবিগণের বর্ণনার বাহুল্যে সংসারের যাবতীয় বস্তু ইহার উপমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং ইহা দেখিয়াও চেনা যায় না। মনোবিশ্লেষকগণ স্বপ্ন বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। পাহারা একেবারে নিরস্ত হয় না বলিয়াই স্বপ্নের মধ্যেও কথার ঘোরফের, মারপ্যাঁচ থাকে, উপমারূপকের ভিতর দিয়া বাঞ্ছাপূরণ হয়। পাহারাওয়ালা অনুপস্থিত নয় কেবল অমনোযোগী। উপমারূপক তার সঙ্গে একটা রফা মাত্র। বালকবালিকাদিগের উপর পাহারা নাই, তাই তাহাদের স্বপ্নেও ঘোরফের নাই—সবই স্পষ্ট। গোপন করিবার কিছু থাকে না।

অভিলাষ পূরণের জন্য স্বপ্ন জাগ্রৎ চিন্তাকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লয়, এবং স্বপ্ন দেখার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিনের চিন্তাই—বিশেষভাবে ছোটখাট চিন্তাগুলিই—বেশী কাজে লাগে। পূর্ব্বে (ক) বলা হইয়াছে, বহু চিন্তার অংশ লইয়া স্বপ্ন গঠিত। প্রবুদ্ধাবস্থায়ও দেখা যায় এক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে করিতে ভাব-যোগে কত বিষয় আসিয়া পড়ে। তখন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে জোর করিয়া যাহা সংলগ্ন হয় সেইগুলির সাহায্যে একটি চিন্তাখণ্ড উৎপন্ন হয়। নিদ্রাকালে প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি ও যুক্তিতর্ক (Logic) আচ্ছন্ন থাকে, তাই নানা বস্তুর নানা খণ্ড স্বতঃ একত্র হইয়া কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ হয়। একজন স্বপ্ন দেখিতেছে তাহার বাবাকে। বাবার উপাধি সিংহ—তাহার মাথা কেশরে পরিপূর্ণ। কেশরে মনে পড়িল কেশর ফুল—গোঁফদাড়ীগুলো সেই ফুল। ফুলের শাদা রং আনিয়া দিল একটা বক, সে হইল বাপের নাক। বকা ছিল এক মহিষের নাম—তাহার সিং দুটো হইল বাপের দুই হাত। প্রদর্শনীতে দেখিয়াছিল এক শৃঙ্গনির্ম্মিত প্রকাণ্ড দেরাজ, সেটাই এখন পিতার স্থান অধিকার করিল। সে কিন্তু ভাবিতেছে ওই তাহার বাবা। এক ডাক্তার স্বপ্ন দেখিতেছেন, একজন রোগীর দাঁত তুলিতেছেন, চোখে ঔষধ লাগাইতেছেন, বক্ষস্থল পরীক্ষা করিতেছেন, ইত্যাদি। অর্থাৎ দশ জায়গায় দশজন রোগীর যাহা করিয়াছেন তাহা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। দশ কথায় যে স্বপ্নের বর্ণনা হয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় তাহার পশ্চাতে চিন্তা রহিয়াছে দশ পাতা। (১) সংক্ষেপ (condensation) আর (২) অদলবদল (displacement), যাহা এই দৃষ্টান্তে পাওয়া গেল তাহাই স্বপ্নের প্রধান কাজ। অদলবদলে সময়ে সময়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে। উদো স্বপ্ন দেখিল বুধো তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিশ্লেষণে প্রকাশ উদোই বুধোর প্রতি এই ভাব পোষণ করে। Wish-fulfilment বা ইচ্ছা-পূরণ উল্টা হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। স্বপ্নের আর-একটি কাজ বিসদৃশ দেখায়; তাহা এই—যেখানে যে ভাব (emotion) হওয়া উচিত তাহা হয় না। উহা অনেক স্থলে এই অদলবদলের ফল। একটি স্বপ্ন এই—মরুভূমিতে তিনটি সিংহ, একটি হাসিতেছে, স্বপ্নদ্রষ্টার ভয় হইতেছে না। তিনি গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন, সিংহের সৌন্দর্য্য কেশরে। বাবার গোঁফদাড়ী কেশরের মত। তাঁহার মুরুব্বি সিংহ মহাশয় আর শিঙ্গা তাহার প্রিয় বাদ্য। আর-এক গ্রন্থে তিনি পাঠ করিয়াছেন—মরুভূমিকে নিংড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে কয়েকটা সিংহ। মরুভূমিতে সিংহ হইলে কি হয়, ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। এক মহিলা স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর অন্ত্যেষ্টি, কিন্তু শোক হইতেছে না। বিশ্লেষণে

প্রকাশ, যে, এইরূপ এক অন্ত্যেষ্টিতে বহুদিন পরে প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎটা অভিলাষ, অন্ত্যেষ্টিটা আনুষঙ্গিক—তাই শোক নাই। অন্যদিকে রজ্জু সর্পের উপমান বলিয়া স্বপ্নে দড়ী দেখিয়া ভয়ে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়ি। স্বপ্নের আর-একটি কাজ (৩) স্বপ্নের মধ্যে কর্ত্তার Dramatis Personae হইয়া প্রবেশ (Dramatisation), যেমন কৃষ্ণকান্ত গণেশের কান মলিতে গেলেন। কৃষ্ণকান্তই যেন মহাদেব হইয়া ব্যাপারটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সমগ্রটাকে এক সূত্রে গাঁথিলেন - কানমলাটা তো মহাদেবেরই কাজ এখানে! (৪) স্বপ্ন যখন শেষ হইয়া আসে তখন প্রবুদ্ধ জগতের খেলা তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবার ফুলাইয়া তোলে (secondary elaboration)। ভোরবেলা স্বপ্ন দেখিতেছি এক বিবাহের, বরযাত্র হইয়া চলিতেছি হঠাৎ মাঝখানে মহাভোজ; তার মধ্যে Fowl Curry প্রধান উপাদান। হাত দিয়া তুলিতে যাইতেছি, চাকর আসিয়া ডাকিল। উঠিয়া দেখি মুর্গী ডাকিতেছে। এ যে স্বপ্ন! তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময় দেখি পাহারাওয়ালা (censor) তাহার পরিত্যক্ত ধড়াচূড়া পরিয়া বেটন হস্তে যমদূতের মত উপস্থিত। দেখিয়াই আক্কেল গুড়ুম। Fowl Curryর তো কথাই নাই, পেটের ভাতও চাল। চুরি করিয়া বমাল হঠাৎ লালপাগড়ীর সম্মুখে পড়িলে মানুষের স্মৃতিবিভ্রম সহজেই ঘটে। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা যে স্বপ্ন ভুলিয়া যাই, পাহারাওয়ালার আবির্ভাব তাহার কারণ। তবে উহা আপদো শান্তিঃ।

আমি নবস্বপ্নতত্ত্বের আভাসও দিতে পারিলাম কি না সন্দেহ। তথ্য জানিতে হইলে Freud-Jung-Adler সঙ্ঘের সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রজনীগন্ধা

(১২)

লালু আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ছিল। ক্ষণিকা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পদার্পণ করিয়াই বলিল, "মা বাবা কেমন আছেন রে?"

লালু বলিল, "বাবা ভালই, মায়ের এখনও জ্বর ছাড়েনি, তবে ডাক্তার-বাবু বলেছেন ভয় পাবার আর কোনো কারণ নেই।"

মেনকা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঁচা গেল বাপু, যা ভয় পেয়েছিলাম! বাড়ী আস্‌ব, কোথায় আনন্দ হবে, তা না, যত একটা করে ষ্টেশন পার হচ্ছি তত বুকটা বেশী করে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌ছে।"

লালু বলিল, "সত্যি ছোড়্‌দি, এক এক সময় বাড়ী ঢুক্‌তে এমন ভয় করত, ইস্কুল থেকে এসে আগে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে বাবার ঘরের ভিতরটা দেখে নিতাম, তবে ঢুক্‌তাম। আর যদি শুন্‌তাম যে মা ঘর থেকে কুড়নীর মাকে বক্‌ছেন তাহলে আর একেবারেই ভয় করত না। সত্যি ভাই, মা চুপ করে থাক্‌লে আমার এমন ভয় লাগ্‌ত।"

বালক বালিকা দুজন যতক্ষণ নিজের নিজের মনোভাব কথায় ব্যক্ত করিতে বসিয়াছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ দুজন ততক্ষণ জিনিষপত্র ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়ীর মাথায় বোঝাই করাইতেই ব্যস্ত ছিল। তাহারি ফাঁকে চিন্ময় একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, "বাপ মা ভাল আছেন শুনেও আকাশের মেঘ ত একটুও কাট্‌ল না দেখ্‌ছি। না মনের ভাব মুখে প্রকাশ করাটা এখন বড় বেশী ছেলেমানুষি বলে মনে হয়?"

ক্ষণিকা বলিল, "মা বাবা ভাল আছেন শুনে খুসি যে হয়েছি এটা চীৎকার করে না বল্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না তা ত ভাবিনি।"

চিন্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠিকই ভেবেছিলে, আমি তোমার মনের কথা একটু আধটু বুঝ্‌তে পারি। তুমি

যা জান্‌তে চাওনি, এমন অনেক কথাও আমি বুঝ্‌তে পারি।"

লালু এবং মেনকার আলোচনা এই সময় থামিয়া যাওয়াতে চিন্ময়ের শেষের কথা কয়েকটা তাহাদের কানে গিয়া পৌঁছিল। লালু মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ চিন্ময়-দা, আপনি 'থট্‌রীডিং' শিখেছেন নাকি? আচ্ছা বলুন ত আমি এখন কি ভাব্‌ছি? ম্যাট্রিক্ ক্লাশের শ্যামাপদ একটু আধটু পারে, আর তাই নিয়ে যা চাল দেয়! বাপ!"

ক্ষণিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখন গাড়ীতে উঠ্‌বে, না এই দুপুর রোদে পুড়্‌তে পুড়্‌তে থট্‌রীডিং কর্‌বে? তোমাদের সবই কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!"

মেনকা বলিল, "দিদির কখন যে কিসে রাগ হয়, তার ঠিকানা নেই। উঠ্‌ছি ত বাপু গাড়ীতে, এখানে ত আর ঘর বেঁধে বস্‌ব না?"

গাড়ীতে উঠিয়াই লালু বলিল, "আচ্ছা, এইবার বলুন দেখি কি আমি ভাব্‌ছি? আচ্ছা আমি সহজ করে দিচ্ছি, একজন মানুষের কথা ভাব্‌ছি, বলুন ত সে কে?"

চিন্ময় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "চিনেবাদামওয়ালা।"

"কিচ্ছু পার্‌লেন না, আপনি একটুও শেখেন নি, আপনি চেষ্টাও কর্‌লেন না।"

চিন্ময় বলিল, "তোমার মনের সাম্‌নে এখনো জমাট অন্ধকার, তা ফুড়ে কি সাদা চোখে দেখা যায়? বরং তোমার দিদি কার কথা ভাব্‌ছে বল্‌তে বল যদি এক সেকেণ্ডে বলে দেব।"

মেনকা বলিল, "ছাই পার্‌বেন, ছেলেদের মনের সাম্‌নেই শুধু অন্ধকার আর আমাদের মনের সাম্‌নে বুঝি আমরা ইলেকট্রিক্-লাইট্ জেলে বসে থাকি?"

"সবাই না, কেউ কেউ থাকে। তাদের চোখের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়।"

ক্ষণিকা সশব্দে নিজের পাশের ঝিল্‌মিলিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এত পর্দানশীন আবার আমরা কবে থেকে হলাম? গরমে মর্‌ছি যে," বলিয়া মুখখানা জানালা দিয়া বাহিরে বাড়াইয়া দিল।

লালু বলিল, "দিদি যে কি অদ্ভুত, এই না রোদে দেড় সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে বক্‌ছিলে? এখন নিজের মাথাটা রোদে বার করে দিলে কেন?"

চিন্ময় বলিল, "ঠিক বলেছ, এই দেখ না, যেই তোমার চিঠি পাওয়া, অমনই কেঁদে কেটে পাঁচ মিনিট পরেই ট্রেনে উঠ্‌লেন; আবার দেখো, কাল আরো বেশী উৎসাহে কল্‌কাতায় ফিরে চলেছেন।"

মেনকা বলিল, "আমি যাচ্ছি না বাপু, একটি মাস থেকে তার পর যদি ওমুখো হই। বোর্ডিংএর ঘণ্টা শুনে শুনে ত আমার অরুচি ধরে গেছে।"

ক্ষণিকা মাথাটা ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। রৌদ্রের তাপেই বোধ হয় তাহার মুখখানা অমন সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "আমি আর ফির্‌ছিই না,—এক মাসেও না, দুমাসেও না।"

চিন্ময় বলিল, "দেখা যাবে।"

তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

বাড়ীর অবস্থা ক্ষণিকা যেমন দেখিবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিল, ততটা সাঙ্ঘাতিক নয় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। তাহার পিতার অসুখটা নিতান্ত সাময়িক একটা অসুস্থতা, তাঁহার আসল রোগের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। গৃহিণী দিন কয়েক জ্বরে পড়িয়াছেন, ইহাতেই ভয় পাইয়া লালু দিদিদের আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছে।

মেয়েদের স্নানাদি হইলে পর তাহারা মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। চিন্ময় বলিল, "স্নানটা করে আসি। তার পর কমিটি ডেকে যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে এখন।"

সে চলিয়া গেল। গৃহিণী ক্ষণিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি চেহারাই করেছিস্ বাছা। পরের বাড়ীর চাক্‌রি, খুব বুঝি খাট্‌তে হয়? লোকজন অনেক নাকি?"

মেনকাই দিদির হইয়া জবাব দিল, "কিসের অনেক লোক, বুড়ী গিন্নি, তাঁর ছেলে, আর একটা পুঁটকে মেয়ে। তেমনি ঝি চাকর কতগুলো যে তার গোণাগুন্তি নেই। দিদি যদি ইচ্ছে করে চর্‌কি-বাজির মত ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় ত লোকে কি কর্‌বে?"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "অনেক চাকর থাকার ত যা সুখ, বকে বকে প্রাণ শেষ হয়। খাস-দাস্ ত ভাল করে?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "খাই না আবার? খাবার জন্তেই

ত ওদের ওখানে গিয়েছি, সে কথা ওরাও জানে, আমিও জানি।”

দিদির কথা বলার রকম সম্বন্ধে মেনকা কি একটা মন্তব্য করিতে যাইতেছিল, এমন সময় লালু বলিয়া উঠিল, “দিদি, ছোড়দি, কুড়ুনীর মা ভাত বেড়েছে, তোমাদের কি বলে ডাকতে হবে তা ঠিক করতে না পেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।”

ক্ষণিকা বলিল, “ও পদার্থটিকে কোথা থেকে জুটোলে?”

লালু বলিল, “ও স্কুলের বেয়ারার বউ, যা grand রাঁধে, একবার মুখে দিলে আর জীবনে ভুলতে পারবে না।”

একগ্রাস মুখে তুলিয়াই মেনকা বলিল, “ঠিকই বলেছে লালু, এমন রান্না সাত জন্মে খাইনি।”

ক্ষণিকা বলিল, “আচ্ছা, অত সমালোচনার কাজ নেই, এর পর নিজে খুব ভাল করে রেঁধে খাস্ এখন।”

মেনকা গাল ফুলাইয়া বলিল, “কোথাও যদি নিষ্কৃতি আছে। বোর্ডিংএ সারাদিন পড়; যদিবা দুদিনের জন্যে বাড়ী এলাম ত অমনি হাঁড়ি ঠেল। আমায় ত বক্‌লে, নিজে ত এক হাতাও ভাত খেলে না, সবই ত ফেলে দিলে। অম্‌নি করে বুঝি অনাদি-বাবুর বাড়ী খাও?”

তাহার দিদি কথা না বলিয়া পিড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রবোধ অফিস হইতে চারটা-পাঁচটার আগে ফেরে না, মা-বাবার অসুখেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ক্ষণিকা খাওয়া সারিয়া বলিল, “কাজ নেই আর মায়ের কাছে গিয়ে, আমরা যতক্ষণ কাছে থাক্‌ব ততক্ষণই ত কথা বল্‌বেন কেবল। ঘুমতে পারেন ত একটু ঘুমিয়ে নিন্। জ্বর বাড়্‌বে তা না হলে। আয় না বারাণ্ডায় মাদুর পেতে বসে গল্প করি।”

মেনকা উৎসাহিত হইয়া অতি সঙ্গোপনে পা টিপিয়া টিপিয়া মাদুরখানা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিল, পাছে তাহার মায়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি তখন চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন, ঘুমাইতেছেন কি না বুঝিবার উপায় ছিল না। লালু এককোণে বসিয়া গোটাকয়েক ভোঁতা পেন্সিলের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত ছিল।

মাদুর পাতিয়া বসার পর কিন্তু মেনকার দিদির গল্প করিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শূন্যের দিকে পলকহীন নেত্রে যে মানুষ কি করিয়া অতক্ষণ চাহিয়া থাকে মেনকা তাহা ভাবিয়াই পাইল না। অবশ্য এ জিনিষটা তাহার কাছে কিছুমাত্র নূতন নয়। বোর্ডিংএ আরও অনেক তরুণী ও কিশোরীকেই সে এই রোগে আক্রান্ত দেখিয়াছে।

চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া যখন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে বলিল, “দিদি, এরি নাম বুঝি গল্প করা?”

ক্ষণিকা সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল, “তুই বল্‌না তোর বোর্ডিংএর গল্প, আমি শুনি।”

“আহা আমার বোর্ডিং বড় নূতন কিনা তোমার কাছে, তাই তুমি তার গল্প শুন্‌বে। তার চেয়ে তুমি অনাদি-বাবুর বাড়ীর গল্প করনা বাপু? গিন্নিকে তুমি বুঝি মাসিমা বলে ডাক্‌তে?”

ক্ষণিকা বলিল, “হ্যাঁ।”

মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, “অনাদি বাবুকে দাদা বল্‌তে নাকি?”

“যাঃ, দাদা বল্‌তে যাব কেন?”

“তবে কি বলে ডাক্‌তে? যদি দর্‌কার হত?”

ক্ষণিকা বলিল, “দর্‌কার হয়নি।”

এমন সময় সদর দরজায় মানুষের পদধ্বনি শুনিয়া তাহারা মুখ তুলিয়া দেখিল চিন্ময় স্নানাহার সারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

তাহার পায়ের শব্দটা বোধ হয় পীড়িতার কর্ণেও পৌঁছিয়াছিল, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, “এই ঘরেই এসো না বাবা। মেয়েরা কোথায়, তাদেরও ডাক।”

মেনকা ও ক্ষণিকা উঠিয়া আসিল। ক্ষণিকা বলিল, “মা, তুমি এখন সারাক্ষণ কথা বল্‌লে জ্বর বেড়ে যাবে যে?”

“তা যাক বাছা, এমন করে মুখে চাবি দিয়ে থাকা আমার সাত জন্মে অভ্যেস নেই। খালি মনে হয় এই বুঝি দম আট্‌কে আস্‌ছে। তার চেয়ে কথাবার্ত্তা কইলে থাকি ভাল।”

লালু উঠিয়া পড়িল, বলিল, “আমি একবার বিজয়ের বাড়ী আমাদের ক্রিকেট ম্যাচের খবর জান্‌তে যাচ্ছি, যা দশদিন বাড়ী বসে রইলাম। ছোড়দি, এই ওষুধটা সাড়ে তিনটের সময় মাকে দিও ত।”

মেনকা তখনি উঠিয়া পড়াতে তাহার মা বলিলেন, "আর কড়াতে যে দুধটা আছে একটু গরম করে নিস্ বাছা, যা বুদ্ধিমতী ঝি জুটেছে আমার, এখুনি উনুনে জল ঢেলে রাখ্‌বে।"

লালু মেনকা চলিয়া যাইতেই গৃহিণী বলিলেন, "ক্ষণু, কতদিনের ছুটি নিয়ে এলি? লালু ছেলেমানুষ, সব তাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বলে—না মা দিদি আসুক। আমারও সেদিন জ্বরটা বাড়ল, কাজেই বারণ করতে সাহস হল না। প্রবোধটা যদি মানুষের মত হত, তা হলে না হয় চল্‌ত, ও ছেলেমানুষ আর কদিন সাম্‌লাবে? তারা কিছু মনে কর্‌বে না ত?"

ক্ষণিকা মুখটা ফিরাইয়া বলিল, "আমার কিছু যাবার তাড়া নেই। ওঁরা বলেছেন যত দিন খুসি থাক্‌তে পারি।"

চিন্ময় বলিল, "তার জন্য আপনি কিছু ভাব্‌বেন না কাকীমা, তাঁরা লোক খুব ভদ্র। এই দুএক দিনের মধ্যেই অনাদি-বাবুর লাহোর যাবার কথা, সেখানের সায়েন্স কংগ্রেসে ওঁর বক্তৃতা আছে; এমন সময়েও যখন ছুটী দিয়েছেন, তখন দুদিনের জায়গায় চারদিন হলে যে চটে যাবেন তা মনে হয় না।"

ক্ষণিকা বলিয়া উঠিল, "কই লাহোর যাবার কথা ত বলেননি আমায়?"

চিন্ময় বলিল, "বল্‌লে ত তুমি আরও ব্যস্ত হতে লাভের মধ্যে? থাক্‌বে কি আস্‌বে তাই ঠিক কর্‌তে পার্‌তে না। তাই বলেননি বোধ হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা থাক্‌লে যদি চলে যদিন পারিস্ থেকে যা, যা ছিরি হয়েছে। আমার জ্বর যে ছাড়্‌লে বাঁচি, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু দেখ্‌ব তারও জো নেই। মিনুটা তবু দেখ্‌ছি বোর্ডিংএর ভাত খেয়েও বেশ আছে।"

চিন্ময় বলিল, "ওরা কি আর আমাদের জাত কাকীমা যে কেবল ভাতের উপর ওদের ভাল মন্দ নির্ভর কর্‌বে। ওদের অনেক কিছু হাঙ্গাম।"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "তা ঠিক বাছা। দেখ ত ক্ষণু ক'টা বাজ্‌ল, সাড়ে তিনটেয় আবার ওষুধ গিল্‌তে হবে।"

ক্ষণিকা উঠিয়া পড়িল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "সময় ত হয়েছে, গেলাসটা যে বড় অপরিষ্কার, দাঁড়াও ধুয়ে আনি।" গেলাস হাতে করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চিন্ময় ডাকিয়া বলিল, "জল ত এই ঘরেই ছিল, আবার চল্‌লে কোথায়?"

তাহার কথায় কান না দিয়া ক্ষণিকা হনহন করিয়া টিনে-ঘেরা কলতলায় আসিয়া হাজির হইল। সাবান-জল দিয়া কাঁচের গেলাস ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিল, "মিনু, এখন কুড়ুনীর মায়ের সাতগুষ্টির খবর তোমার নিতে হবে না, উঠে এই গেলাসটা নিয়ে যাও, গিয়ে মাকে ওষুধ দাও গে।"

দিদির কথার ঝাঁঝে বিরক্ত ও চকিত হইয়া মেনকা উঠিয়া পড়িল। ক্ষণিকার কাছে আসিয়া বলিল, "ওকি! আবার দরজা বন্ধ করছ কেন? আর-একবার স্নান কর্‌বে নাকি? অনাদি-বাবুর মায়ের কাছে বুঝি এইসব শুদ্ধাচার শিখে এসেছ?"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা, জ্যাঠামি রেখে এখন নিজের কাজে যাও।"

দরজা বন্ধ করিতেই তাহার কান্না শতধারে ভাঙিয়া পড়িল। এত অবহেলা কেন? বিশ্বের লোক যাহা জানিয়া রাখিল, তাহা হইতে বাদ পড়িল শুধু সে? এ জগতে কাহার কি এমন ক্ষতি হইত যদি ক্ষণিকা অনাদির লাহোর গমনের কথা জানিতে পারিত? ইচ্ছা করিয়াই কি জানান নাই? কিন্তু এমন ইচ্ছাই বা তাঁহার হইবার কি প্রয়োজন ছিল? হঠাৎ ক্ষণিকার মনের মধ্যে একটা ভয়ের শিহরণ খেলিয়া গেল। তাহার মনোভাব কি সে অজ্ঞাতসারে অনাদিনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে? তাই কি এত অবজ্ঞা? ইহা কি তাহার স্পর্দ্ধাকে শাস্তি দিবারই ব্যবস্থা?

কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে কান্না বাড়িল বই কমিল না। এত দুঃখের উপর এত গভীর লজ্জার ভার তাহা হইলে সে কেমন করিয়া বহন করিবে? সে যে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অযাচিতভাবে ভালবাসিবার অধিকার তাহার নাই, সেই ভালবাসাকে কোনও প্রকারে প্রকাশ করিয়া ফেলা যে তাহার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সংসার তাহাকে শাস্তি দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিবে, আর যাহার চরণে নিজের হৃদয়ের সুখ-দুঃখের অর্ঘ্য সাজাইয়া সে নিবেদন করিল সেও কি অবজ্ঞাভরে উপেক্ষার হাসিই হাসিবে না?

কিন্তু ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিয়া ত আর সারাদিনটা

কাটান চলে না? খানিক পরে ক্ষণিকাকে বাহির হইতেই হইল। চোখে মুখে জল দিয়া অশ্রুর চিহ্ন যথাসাধ্য অবলুপ্ত করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল না। মেনকা বলিল, "দিদির কাণ্ডখানা দেখ্‌লে একবার, অবেলায় স্নান করে সর্দ্দি বাধিয়ে আন্‌ল।"

চিন্ময়ের মুখখানা প্রলয়গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কল্‌কাতার লোকের মফঃস্বলে বেরলেই অম্‌নি সর্দ্দি হয়, কল্‌কাতায় না ফির্‌লে সারে না। আচ্ছা, আমি একটু কাজ সেরে আসি।" বলিয়া আর পিছন পানে না তাকাইয়াই সে সোজা বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণিকার মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সাবধানে থেকো মা, দেখ্‌ছ ত আমাদের দশা। আজ আর রান্নাবান্নার দিকে যেয়ো না, কুড়ুনীর মা যা পারে করুক এবেলার মত।"

ক্ষণিকার মন তখন যে রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার মধ্যে রান্নাবান্না বা কুড়ুনীর মা কাহারও স্থান নাই। সুতরাং একান্ত বাধ্য ছাত্রীর মত সে মায়ের কথামত চুপ করিয়া সাবধান হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া রহিল। প্রবোধ অফিস হইতে ফিরিলে পর তাহার সঙ্গে একবার ঝগড়া পর্য্যন্ত করিল না, সংসারটা যেন তখনকার মত তাহার জীবনের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার কোন ব্যস্ততা কোন চিন্তাই তাহার মনকে স্পর্শ করিল না। মেনকা কুড়ুনীর মায়ের কাজের ভুল ধরার আনন্দ উপভোগ করিয়াই সারা সন্ধ্যা কাটাইয়া দিল।

রাত্রে ছোট ঘরে তিনটি ভাই-বোনে মেঝের উপর ঢালা বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণিকা বলিল, "মাথার কাছের জান্‌লাটা খোলা রাখ, তা না হলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

মেনকা আর লালু গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণিকা অনেক রাত অবধি জাগিয়া তারকা-খচিত নিশীথাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা চেনা গানের দুটি লাইন কেবল যেন অশ্রুত সুরে তাহার বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল—

"তখন আমায় নাই বা মনে-রাখ্‌লে,
ঐ তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাক্‌লে।"

মরণের পরপারে কি আর এই তীব্রজ্বালাময়ী স্মৃতিকে বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে? বাস্তবিকই তখন মনে না রাখিলে ক্ষতি কি? কিন্তু এজীবন থাকিতে কি সে কোনো দিনও বলিতে পারিবে "আমায় নাই বা মনে রাখ্‌লে?" তাহার সমস্ত হৃদয় যে মনে রাখাইবার জন্য আকুল ক্রন্দন করিতেছে। কোন্ প্রেমের মধ্যে এ নিষ্ঠুরতাটুকু নাই, কে কবে চাহিয়াছে যে আমি যাহার বিচ্ছেদে এমন কাতর, সে আমাকে ভুলিয়া সুখে থাক? যে কাঁদনে আপনার হৃদয় কাঁদিতেছে, অন্যকেও সেই কাঁদনে কাঁদাইতে না চায় এমন নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে কোথায়? জাগরণে শয়নে যাহাকে আমি ডাকিয়া ফিরিতেছি, সে আমাকে একবারও মনেও আহ্বান করিবে না, এ চিন্তা ত সহ্য করা কঠিন।

দিনের আলোয় মনটা তাহার খানিকটা যেন লঘুভার হইয়া গেল, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-ব্যথা আবার যেন নীড়প্রত্যাগত পাখীরই মত ফিরিয়া আসিল।

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। কলিকাতার কোনো সংবাদই সে পায় না। একবার ইচ্ছা করিল সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলে। লেখাই ত উচিত, আসিয়া যে পৌঁছিয়াছে এ খবর ত দেওয়া কর্ত্তব্য? কিন্তু এই অতি সাধারণ কথা কটা কোনমতেই তাহার কলমের মুখে বাহির হইতে চাহিল না। চার-পাঁচখানা চিঠি সে লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সব ক'টাতেই যেন তাহার মনোভাব বড় বেশী প্রকাশ হইয়া পড়িতে চায়। অবশেষে অনেক কাটাকুটির পর একখানা অতিভব্য রকম খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া সে স্নান করিতে গেল। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া সেখানা নকল করিতে বসিল। এবার চিঠিখানা এত বেশী প্রাণহীন অদ্ভুত বোধ হইল যে রাগ করিয়া সেখানাও ছিঁড়িয়া ফেলিল। অবশেষে আর ভাষার উপর কোনও আটক না রাখিয়া নিজের মনের মত একখানা চিঠি লিখিয়া খামে পুরিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। বাক্সের চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আপন মনে বলিল, "আমি ত লিখ্‌লাম।"

বেণু বা তাঁহার দিদিমা কাহাকেও চিঠি লিখিয়া কোনো লাভ ছিল না, কারণ এযাবৎ ক্ষণিকাকেই উভয়ের প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহার বদলে

কলম যে চিঠি লেখার কাজ চালাইতেছে ইহা মনে করার সঙ্গত কোন হেতু ছিল না।

চিন্ময় ক'দিন থাকিয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহার চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে দুএকটা কথা জানা যাইত।

কিন্তু ক্ষণিকার আসল সান্ত্বনাস্থল ছিল খবরের কাগজ। দিনের পর দিন সে এমন গভীর মনোযোগের সহিত "ট্রিবিউন" পড়ে দেখিয়া লালু বলিল, "দিদির যে কি বুদ্ধি! কলকাতার খবর যেন লাহোরের কাগজে বেরয়।" কিন্তু সে সান্ত্বনাই বা কতদিনের? কংগ্রেসও চিরকাল চলে না, দেশের মানুষ দেশেই ফেরে এবং সেখানে সে ঘরে বসিয়া কি করে তাহার খবর কোনো সংবাদপত্রই দেয় না।

বাড়ীর রোগীর দল ক্রমে সারিয়া উঠিল। মেনকাও বাড়ী থাকার অখণ্ড সুখে উত্যক্ত হইয়া এক-একবার ফিরিবার কথা পাড়িতে লাগিল। ক্ষণিকার মন কবে যে অভিসারে বাহির হইয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু তবু সে যাইবে কি না বুঝিতে পারিল না। একবার কি ডাকিতেও নাই? এতদিন যে কাছে ছিল কোনো উপকারেই কি সে লাগে নাই? সে কিছু এমন কি রাখিয়া আসে নাই যাহার খাতিরে তাকে আবার ফিরিয়া লইবার ইচ্ছা হয়?

সেদিন সকালে স্নানান্তে রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ক্ষণিকা তরকারি কুটিতেছিল, মেনকা কড়াইশুঁটী ছাড়াইবার উপলক্ষ্য করিয়া বসিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। কুড়ুনীর মা একতাড়া চিঠি আনিয়া ফেলিয়া দিল। ক্ষণিকার আগেই মেনকা সেগুলা থপ্ করিয়া তুলিয়া লইয়া বলিল, "দুটো লাল চিঠি রয়েছে। ওমা কার আবার বিয়ে?"

ক্ষণিকা উৎসুক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বিবাহযোগ্য বন্ধু-বান্ধবের ত তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই।

মেনকা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা কি অদ্ভুত কাণ্ড ভাই! সাত জন্মেও যা ভাবিনি। তোমার মনোজাদির সঙ্গে অনাদি-বাবুর বিয়ে! একেবারে দুদিক থেকে নেমন্তন্ন।"

ক্ষণিকার মনে হইল তাহার আজন্মের পরিচিত জগৎ যেন প্রলয়-অট্টরোল করিয়া তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সূর্য্যের আলো মৃতের চক্ষুতারার মত ঘোলাটে হইয়া উঠিল। অথচ সে অবাক হইয়া দেখিল নিজে যেমন এক মনে কাজ করিতেছিল তাহাই করিতেছে। এই প্রচণ্ড আঘাতে যেন বাহিরের ক্ষণিকার সহিত তাহার অন্তরলোকবাসিনীর একেবারে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। একজন যেমন কাজ করিতেছিল তাহাই তেমনি করিতে লাগিল, আর একজন যেন যন্ত্রণার বিষে জর্জ্জরিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার মধ্যে আর প্রাণের চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না।

(১৬)

"আচ্ছা দিদি, তোমার কি আজ আর উঠ্‌তে হবে না? আমার শুদ্ধু চা খাওয়া হয়ে গেল যে? তোমার হয়েছে কি বাপু?"

রোদ তখন উঠানের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবোধ স্নান করিবার আয়োজন করিতেছে, লালু মেনকাকে জ্বালাইবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত আছে। কুড়ুনীর মা গৃহিণীর সঙ্গে বাজারের পয়সা লইয়া তর্কস্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে, এত কম পয়সায় এত বেশী জিনিষ যে পাওয়া যায় না, তাহা কি গিন্নিমার একবারও বুঝিতে নাই? ভদ্দর লোকদের কাণ্ডকারখানা বোঝা ভার।

লালুর সহিত ঝগড়াঝাঁটি করিতে করিতে ক্রমেই মেনকা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। দিদি মাঝে থাকিলে তবু ঝগড়ার রসটা অধিকতর উপভোগ্য হয়, কিন্তু তাহারও যে আজ আর উঠিবার নাম নাই? মেনকা তাড়াতাড়ি দিদিকে তাহার আলস্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে ছুটিল।

তাহার গলা কানে যাইতেই ক্ষণিকা চোখ চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন?"

"চেঁচাব আবার কেন? কটা বেজেছে তার ঠিকানা রাখ কিছু? বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বেই না নাকি?"

তাহার মা এতক্ষণে কুড়ুনীর মায়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া বলিলেন, "অত চেঁচামেচি কর্‌ছিস্ কেন? হয়ত শরীর ভাল নেই, তাই উঠ্‌ছে না। শুধু-শুধু তোমার মত কুঁড়েমি করে ওকে কোনোদিন বেলা কর্‌তে দেখেছ?"

মেনকা বলিল, "আহা, ও কি আর কখনো কিছু করে? সব করি আমি। এ ক'দিন থেকে দিদি যা কর্‌ছে তাকে যদি কুঁড়েমি না বলে তা হলে আমায় আবার দ্বিতীয় ভাগ পড়্‌তে হবে দেখ্‌ছি। উঠ্‌বে ত রোজ আটটায়, খেয়ে উঠে তিন ঘণ্টা হাঁ করে সেইখানেই বসে থাকবে। সারা দুপুর

শুয়ে থাক্‌বে, না এক লাইন পড়্‌বে, না এক ফোঁড় শেলাই কর্‌বে। এই যদি আমি হতাম, তা হলে কুঁড়েমি ছাড়া আরো কত কথা যে শুনতাম তার আর আদি অন্ত নেই।"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "নে থাম, তোকে আর বকবক কর্‌তে হবে না। দিদির মত কাজ একদিন কর্‌তে হতো ত বুঝ্‌তিস্‌। ওঁর অসুখের সময় মেয়ে যা খাটুনি খেটেছে তা ত চোখে দেখেছি? সারা বছরই ত খাট্‌ছে। পরের বাড়ী কি আর বসে খায়? না হয় ক'দিন কাজ নাই কর্‌ল।"

মায়ের সহিত মেনকার কথা কাটাকাটি করিতে একরকম ভালই লাগিতেছিল। সে আবার আরম্ভ করিল, "দিদির এক-এক সময় একএকটা ফ্যাশান আসে। কারু অসুখ হল কি টাকা কম পড়্‌ল, তখন এমন করে খাট্‌তে আরম্ভ কর্‌বে যে দেখে অন্য লোকের দম আট্‌কে আসে। যতটা দরকার তার দশগুণ খাট্‌বে; যারা নিজের কাজ করে নিতে পারে, তাদের কাজগুলো শুদ্ধু করে দেবে। মাঝখানে থেকে নিজের শরীরটি যায়। আবার সবাই যদি ভাল রইল, তাহলে কাপড়ের পুঁটুলির মত সারাক্ষণ পড়েই রইল ঘরের কোণে, উঠ্‌বেও না হাঁট্‌বেও না। নিজের ভাল লাগা, মন্দ লাগা বলে জিনিষ নেই যেন, কেবল সবই দরকার-মত কর্‌তে হবে।"

ক্ষণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া বোনের বক্তৃতা শুনিতেছিল। তাহার মা ভাত চড়াইয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কাজেই মেনকার বক্তব্য শেষ অবধি না শুনিয়াই তিনি আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। মেনকা থামিতেই ক্ষণিকা বলিল, "তোর আজ আর কাজ নেই কিছু নাকি রে? ভোর থেকে উঠে আমার বর্ণনা আরম্ভ কর্‌লি কেন?"

মেনকা বলিল, "কাজ ত কত? বাড়ীর কাজ ত মা কর্‌ছেন, আর পড়াশুনো ত তোমার কল্যাণে উঠেই গিয়েছে।"

"কেন আমার কল্যাণে উঠে গেল কেন? আমি কি তোর চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়েছি না বইয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি? বাড়ী বসে পড়্‌লেই পারিস্‌? জানুয়ারিতে স্কুলে পড়া ত যা চমৎকার হয় তা আমার জানা আছে। মাসের শেষেই ত তোকে পাঠিয়ে দেব। ইয়ার্লি পরীক্ষাটা দেওয়া হল না এই যা।"

লালু কাছে আসিয়া বলিল, "তার জন্যে ত ছোড়দির তোমাকে বখ্‌শিস্‌ দেওয়া উচিত। পরীক্ষা দিলে উনি যা পাশ হতেন তা আমার জানা আছে। সেদিন ওর একখানা খাতা খুলে দেখি ছোড়দি কি গ্র্যাণ্ড ইংরিজি লিখেছেন।"

"হতভাগা, বাঁদর, ছুঁচো, ফের আমার বই খাতা চুরি করে ঘাঁট্‌তে গিয়েছিস্‌।" বলিয়া মেনকা লালুর পিঠে ঠাশ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল।

ভাই-বোনের ঝগড়া মারামারি থামানোটা উচিত জানিয়াও ক্ষণিকা তাহাদের কিছু না বলিয়াই সেখান হইতে সরিয়া আসিল। করুক না হয় ঝগড়া, ক্লান্ত হইলে আপনি থামিবে এখন। না হয়, নাই থামিবে।

ঘরখানার মেজে জুড়িয়া বিছানা পাতা। জিনিষপত্র বই খাতাতে ঘর বোঝাই হইয়া আছে। বিছানা ক'টা তুলিয়া ফেলিয়া সে বাক্সের উপর চাপাইয়া রাখিয়া দিল। ধুলার অভাব নাই, বাক্স ডেস্ক সবের উপরে এক দিনেই বেশ একটি আধ আঙ্গুল পুরু আবরণ পড়িয়া যায়। একটা ময়লা ঝাড়ন ঘরের দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলিতেছিল। ক্ষনিকা একবার সেটা হাতে করিয়া লইল, আবার কি ভাবিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

লালু আর মিনু বোধ হয় তখনও ঝগড়া করিতেছিল, পাশের ঘর হইতে তাহাদের অস্তিত্বের বেশ প্রবল রকম পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। ক্ষণিকা দরজার চৌকাঠে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে উঠানের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার চোখের সম্মুখে যাহা ভাসিতেছিল, তাহা কিন্তু এই দরিদ্রগৃহের প্রাঙ্গণটি নয়। সে যেন আর-এক কোন্‌ দেশ; সেখানে যাহারা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা ত এ বাড়ীর কেহ নয়? বিধাতার বিধানে সে যে-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে-গৃহের অধিবাসীরাই অনেককাল পর্য্যন্ত তাহার একমাত্র আত্মীয় ছিল। কিন্তু সেই নিয়ন্তার নিয়মেই আবার এখন সে কাহাকে অন্তরের মধ্যে অন্তরতম আত্মীয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, আজ সেই তাহার জাগ্রত নয়নের দৃষ্টিকে, রাত্রির নিদ্রার স্বপ্নরাজ্যকে একান্ত আপনার করিয়া রাজদর্পে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, পুরাতন অধিবাসীগুলি কোথায় যে সরিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানাই নাই।

রৌদ্রের ধারা ক্রমেই উঠানের উপর দিয়া গড়াইয়া

অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। ক্ষণিকার কিন্তু নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কলিকাতার সেই বাড়ীতে এতক্ষণে চাকরবাকরের কলরব পূর্ণ বিক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছে। বেণু নাওয়া খাওয়া লইয়া কদমের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে, তাহাকে মারিয়া নিজেই কান্না জুড়িয়া দিতেছে। গৃহিণী ঘর হইতে এক-পাও না নড়িয়া কেবল মাত্র গলার জোরে বিশ্বের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন।

আর সেই ঘরখানিতে এতক্ষণে কি হইতেছে? সকালের চা খাওয়া সারিয়া গৃহস্বামী একমনে পড়ায় ব্যস্ত। জানালা দিয়া রোদ আসিয়া চুলের উপর পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, বিড়ালছানাটা পায়ের কাছে ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রীর ভিতরে কেবলি লাফালাফি করিতেছে। কলেজের বেলা হইয়া আসিল, নিজের সে কথা মনে নাই, মনে করাইয়া দিবার লোকই বা কোথায়? অবশেষে হয়ত গৃহিণীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে চাকরবাকরের চমক ভাঙ্গিল, সশঙ্কচিত্তে কোনপ্রকারে তাহারা প্রভুর ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি করিয়া নামে মাত্র নাওয়া খাওয়া করিয়া বাহির হইয়া যাওয়া। তখনও কি তাঁহার একবারও তাহাকে মনে পড়িল না, যে সদা-জাগ্রত মনোযোগের সহিত তাঁহার সকল সেবার আয়োজন করিয়া রাখিত? একবারও কি মনে হইল না তাহাকে ফিরিয়া পাইলে ভাল হয়?

ক্ষণিকার বক্ষস্থল মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল। হায় নির্ব্বোধ, এ কি দিবাস্বপ্ন? সেই ঘর, সেই মানুষ তেমনিই কি আছে, সে যেমনটি রাখিয়া আসিয়াছিল? নূতন রাণীর অভিষেকে রাজ্যের আগাগোড়া চেহারাই কি বদল হইয়া যায় নাই? যেখানে সে ধ্যাননিরত সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল, এখন সেখানে কে? যে স্বর্গ হইতে তাহার নির্ব্বাসন হইল, তাহাতে ত ফিরিবার আর কোনো পথ নাই! তাহার কুগ্রহ যে রাক্ষসের মত সেই স্বর্গকেও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

সেই মনোজা। তাহার তরুণজীবনে যাহাকে সে মুকুলিত প্রীতির অর্ঘ্য ঢালিয়া পূজা করিয়াছে, যৌবনের রঙীন স্বপ্নলোকে যে থাকিয়া থাকিয়া চপলা ক্ষণপ্রভার মত লীলা করিয়া বেড়াইয়াছে, যাঁহার কোমল চম্পক-অঙ্গুলির স্পর্শেই ক্ষণিকার সুপ্ত মনোবীণা প্রথম ঝঙ্কার দিয়াছিল, সেই আজ তাহার ভাগ্যগগনে ধূমকেতুর মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিল? যে মনোমোহন ঐশ্বর্য্য-লোকে এই যাদুকরী প্রথম তাহাকে প্রবেশ করাইয়াছিল, আজ সেই তাহাকে সেই সুখস্বর্গ হইতে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত করিল? যে নীল গগনের দিকে চাহিয়া সে প্রথম আনন্দের হাসি হাসিয়াছিল, আজ বজ্র আসিয়া যখন তাহার আনন্দের লীলাভূমি ভস্মীভূত করিল, তখন কি এই নীলিমার অন্তরাল হইতেই তাহার করালমূর্ত্তি দেখা দিল?

মনোজা আজ অনাদিনাথের পত্নী। যে দীর্ঘদিন-সঞ্চিত সম্পদের প্রতি ক্ষণিকার মন লুব্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিত, আজ তাহা মনোজার পায়ে ভাগ্য অঞ্জলি ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। যে দৃষ্টির এককণার জন্য সে নিজের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতে পারিত, যে হাসি তাহার কাছে জগতের শ্রেষ্ঠতম রত্নের চেয়েও বহুমূল্য ছিল, তাহা আজ মনোজার কাছে বায়ু বা সূর্য্যালোকেরই মত সহজলভ্য। যে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ পাইবার জন্য ক্ষণিকার অন্তর নিরন্তর হিমালয়কন্যার মত অনন্যমন হইয়া তপস্যা করিয়াছে, কেবলমাত্র মৃদু হাসি হাসিয়া কোমলপদবিক্ষেপে মনোজা আজ সেই রাজ্যের অধীশ্বরীর সিংহাসনে অবহেলাভরেই যেন আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বঙ্কিম ওষ্ঠের হাসিটুকু যেমন ছিল তেমনই রহিল, চোখের জ্যোতি কি একটুও উজ্জ্বলতর হইল!

কিন্তু ইহার কি প্রয়োজন ছিল? মনোজার অভাব ছিল কিসের? তাহার বিশাল নয়ন যেখানে কৃপাদৃষ্টি করিয়াছে, সেখানেই কি প্রীতির অর্ঘ্য তাহার রক্তিম চরণে স্বতঃই আসিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই? দিনরাত্রির সকলগুলি প্রহর যেন তাহাকে আনন্দ জোগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত, সেই অবহেলাভরে কত আয়োজন ঠেলিয়া ফেলিত। এমন যে মহিমাময়ী, ইচ্ছা করিলে যে সকলই করিতে পারিত, সে কেন দরিদ্রের জীবনসম্বল অপহরণ করিতে আসিল? ক্ষণিকার জীবনের প্রথম দুর্দ্দিনে কেন সে তাহাকে স্রোতের মুখ হইতে টানিয়া তুলিল? ডুবিতে দিলেই যে ছিল ভাল। আজ যে মরণ তাহার কাছে আরো কত ভীষণ, আজ যে তাহার প্রাণ সহস্র শিকড় দিয়া জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, এখন কিনা সেই মনোজাই তাহাকে উৎপাটিত

করিয়া ফেলিতে চায়? মনোজার বাঁচিয়া থাকা কোনোকালেই কঠিন নয়, সে যে সংসারে রাণীর অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ক্ষণিকার জন্ম যে ভিখারিণীর দলে। তাহাকে আজন্ম পিপাসা লইয়া কাটাইতে হইয়াছে, ব্যগ্র বাহু মেলিয়া সে কেবলি চাহিয়াছে, কেবলি বঞ্চিত হইয়াছে। এতদিন পরে যখন একটি চাওয়ার মধ্যে তাহার চিরজীবনের সকল চাওয়া আনন্দে মরিতে চাহিল, তখনই কি নিষ্ঠুর নিয়তির কুঠার তাহার সকল আনন্দের মূলে এমন ভাবে আসিয়া পড়িতে হয়? ইহার পর সে বাঁচিবে কি করিয়া? কিন্তু বাঁচা ছাড়া তাহার উপায়ই বা কি?

কিন্তু ক্ষণিকার সকল বাসনা, সকল কামনা, তাহার তরুণ প্রাণের সমগ্র প্রেমের ধারা এখনও যাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিবার অধিকারও নাকি তাহার নাই। নাই বা থাকিল, কিন্তু অধিকারহীনা তাহাকে নিস্কৃতি দিল কই? তাহার প্রাণের সহিত তাহার প্রিয়ের চরণে যে প্রেমের ফাঁশ বাঁধিয়াছিল তাহা এই জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টায় কেবল কঠিনতর হইয়া তাহার মর্ম্মকে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল, শয়নে জাগরণে এই অসহ্য বেদনাকে ভুলিবার আর কোনো উপায় রহিল না। জগৎ-সংসারকে অবহেলা করিয়া সে একমাত্র আপনার প্রিয়কে হৃদয়ের সকল বন্ধন দিয়া বাঁধিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে হারাইয়া জগতের দিকে চাহিয়া দেখিল কেবল আপন মনের অবহেলার প্রতিরূপ মাত্র।

হঠাৎ মায়ের ডাকে সে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

"কি রে এখনও অমন করে বসে আছিস্ কেন, শরীর কি বড় খারাপ লাগ্‌ছে?"

ক্ষণিকা ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "না মা। কিছু দরকার আছে?"

"এই একটু ভাতটা দেখ্‌তিস্, ততক্ষণ তরকারিগুলো কুটে নিতাম। মিনু যে কি চিঠিই পড়্‌ছে, হাজার ডাকেও সাড়া পাওয়া যায় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমিই দিচ্ছি।"

মেনকা তাড়াতাড়ি একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল, "যাচ্ছি ত আমিই, এই মধুর চিঠিখানা পড়্‌ছিলাম। দিদি পড়্‌বে? মনোজাদির বিয়ের সব গল্প লিখেছে, এত কথা তুমিও জান না।"

ক্ষণিকার কোলের উপর চিঠিখানা ছুঁড়িয়া দিয়া সে তরকারির ঝুড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, "মা, কি কুট্‌তে হবে বল? বাপ রে, কি বঁটি যে তোমার! চোরের নাকও কাটে না এতে।"

মাধবীর চিঠি প্রায় বারো পৃষ্ঠা জোড়া, তাহার দশ পৃষ্ঠাই মনোজা আর অনাদিনাথের ইতিহাস। কোথা হইতে এত তথ্য সে সংগ্রহ করিল, তাহা ক্ষণিকা ভাবিয়াও পাইল না। এতকাল মনোজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিয়াও সে জানে নাই যে মনোজার কুড়ি বৎসর বয়সে অনাদিনাথের সহিত বিবাহের কথা হয়। উভয় পক্ষেরই পিতামাতার ঘোর আপত্তিতে বিবাহ ভাঙিয়া যায়। আপত্তির কারণ মাধবীর জানা নাই, সে একটা পুরাতন পারিবারিক কলহের আভাস দিয়াছে মাত্র। তার পর মনোজার পিতা মাতা যে মারা গিয়াছেন সে কথাও ক্ষণিকারও জানা। এই দীর্ঘ ছয়টি বৎসর এই দুটি মানুষের কেমন করিয়া যে কাটিয়াছে তাহা উভয়ের ভাগ্যবিধাতা ভিন্ন কাহারও জানা নাই। অকস্মাৎ লাহোরে উভয়ের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়, দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মনোজা এই সময়েই কেমন করিয়া সেখানে গিয়া দেখা দিল। যাহাকে তাহারা মৃত মনে করিয়া হৃদয়ের অন্ধকারে সমাধিস্থ করিয়াছিল, তাহা এতদিন পরে পরস্পরের দৃষ্টির আলোকপাতে জীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর কেবল বিবাহ-সভার বর্ণনা। কে কি বলিল, কে কি পরিল, কাকে কেমন দেখাইল। মাধবী শেষ করিয়াছে—"মনোজাদি সেদিন স্কুলে বেড়াতে এসেছিলেন। আগাগোড়া purple পোষাক, গলায় আর হাতে 'এমিথিষ্টের' গয়না, দুল আর ব্রোচও এমিথিষ্টের। সে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ভাই, ঠিক যেন ইন্দ্রাণী। অনাদি-বাবুর সুন্দরী স্ত্রী হওয়াতে বড় জাঁক হয়েছে, মনোজাদিকে যখন মোটরে করে নিতে এলেন, তখন এমন মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিলেন, ওঁকে এর আগে সাত জন্মেও হাস্‌তে দেখিনি।"

আরো কয়েক লাইন লেখা ছিল, তাহা না পড়িয়াই ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা মুড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আর যেন পড়িবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। তাহার বুকের ভিতরটা তখন রুদ্ধাবেগ ক্রন্দনে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। ঐ হাসি ফুটাইবার সাধ্য ভগবান তাহাকে দেন নাই, কিন্তু

ঐ হাসির অনলে তাহাকেই পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে হইবে।

আহারান্তে মাকে একটু নিভৃতে পাইয়া ক্ষণিকা বলিল, "মা, আমার শরীরটা সত্যিই তেমন ভাল ঠেক্‌ছে না। আরো মাস দুই ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে এলে হয়। টাকার টানাটানি ত তেমন নেই। লালু এবৎসর স্কুলের স্কলারশিপ্‌টা পাবে, দাদাও বাড়ীতে কিছু কিছু দিচ্ছে। আর তুমি ত বল্‌লে স্কুল-কমিটি বাবাকে অর্দ্ধেক মাইনে দিয়ে সিক্‌ লিভ্‌ দেওয়া স্থির করেছেন। তাহলে আমি দিন কয়েক ছুটি নিলে চলে না?"

তাহার মা বলিলেন, "তুই নে ত ছুটি। চলে না চলে, সে আমি বুঝ্‌ব। সবাইকার জন্যে তাই বলে তোকে বলি দিতে হবে নাকি? ওরা ছুটি না দেয় কাজ ছেড়ে দে, জগতে কাজ কি ঐ একটাই আছে?"

ক্ষণিকা বলিল, "ছুটি হয়ত একেবারেই দেবেন, ওঁর ত এখন ঘুরে স্ত্রীই এল, তা আর সংসার দেখ্‌বার অন্য লোকের দরকার কি? এক বেণুকে পড়ানো, তারি জন্যে যদি রাখে। দেখি লিখে, কি বলেন।"

কেবলমাত্র ছুটির আবেদন করিয়া ক্ষণিকা অনাদিনাথের নামে একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিল। সে প্রথম ছুটি লইয়া আসার পর সংসারের যে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার আভাষ মাত্রও চিঠিতে দেখা গেল না। কিন্তু রোজ যখনই কলিকাতার ডাক আসার সময় হইত, তখনি তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিত। যদি চিঠি আসে? আসিলই না হয়, কি এমন তাহাতে থাকিতে পারে যাহার জন্য তাহার মন উন্মনা হইয়া ওঠে? যাহা আশা করা অসম্ভব, তাহাই সে কি আশা করে? যাহা ভাবিলে বেদনায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, জোর করিয়া তাহাই ভাবা কেন? কিন্তু ক্ষণিকার মন তাহার বুদ্ধির সঙ্গে বিরোধ করিয়া স্বাধীনচালে চলিতে শিখিয়াছিল, তাহাকে আর সে বশে আনিতে পারিল না।

"দিদি, তোমার একখানা চিঠি আছে।" লালু চিঠি দিয়া গেল। ক্ষণিকা চাহিয়া দেখিল, উপরের হস্তাক্ষর মনোজার।

চিঠিখানা না পড়িয়াই তাহার আগুনে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহার উল্টা ইচ্ছাটাও কম প্রবল ছিল না। চিঠিখানা খোলাই হইল। মনোজা লিখিয়াছে—

স্নেহের ক্ষণু,

তুই নিশ্চয়ই আমার উপর খুব রাগ করেছিস্। এতবড় খবরটা একেবারে লাল চিঠি পেয়ে জান্‌লি, রাগ হবারই কথা। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, বিশ্বাস করিস্, কুড়িদিন আগে অবধি আমি নিজেই জান্‌তাম না। কেমন যেন এক ঘূর্ণীবায়ু এসে এক নিমিষে আমার জীবনের সব উলোটপালোট করে দিয়ে গেল, আমার মাথার ভিতরটা সুদ্ধ। এখনও ভাল করে সাম্‌লাই নি। ভেবে দেখ্, এক মাসে কি কাণ্ড! আমার দশাটা ভেবে চিঠি না লেখার জন্যে ক্ষমা করিস্। আর অন্য মানুষটিরও ত পরিচয় পেয়েছিস্, তিনি যে কেমন কাজের মানুষ তা নিশ্চয়ই জানিস্? খবর দেওয়া তাঁর কুষ্ঠিতে নেই।

এমন হুড়োহুড়ির মধ্যে আছি যে চিঠির মত চিঠি লিখ্‌বার অবকাশ নেই। পাছে বেশী রাগিস্ তাই একটু লিখ্‌লাম। উনি বল্‌লেন তোকে তাঁর সাদর সম্ভাষণ জানাতে। আর ছুটি চেয়েছিস্ কেন? আমায় দেখ্‌তে বুঝি আর ইচ্ছে করে না? তবু কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কর্ত্তা তোর ছুটি বাহাল করেছেন। বেণুকে তুই কষ্ট করে যা শিখিয়েছিস্, আমি এই দুমাসে তা বেশ করে ভুলিয়ে রাখ্‌ব এখন। তুই এসে ঠেলা সাম্‌লাস্।

আশা করি তোর মা বাবা ভাল আছেন। বোন কেমন পড়াশুনো করছে?

এখানে সব ভালই, কেবল শাশুড়ী বাতে ভুগ্‌ছেন। আজ থামা যাক।

মনোজাদি।

ক্ষণিকার চিঠি আসার খবর লালু এমন উচ্চকণ্ঠে দিয়াছিল যে সেটা কাহারও জানিতে বাকি ছিল না। তাহার মা পাশের ঘর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে কল্‌কাতার চিঠি নাকি?"

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ মা।"

"কি লিখেছে রে? অনাদি-বাবুই ত?"

"আমি ছুটি পেয়েছি মা। বাড়ীর নূতন গিন্নি খবর দিয়েছেন। অনাদি-বাবু কিছু লেখেন নি।" (ক্রমশ)

শ্রীসীতা দেবী।

বৈশালীবাসী

বুদ্ধদেবের সময়ে বৈশালীর লোকদিগকে ইয়োচি বলিয়া অভিহিত করা হইত।* তাহাদিগকে বজ্জি বৃজি ও বতিও বলা হইত। বজ্জিরাই লিচ্ছবি। খৃষ্টজন্মের পর বহু শতাব্দী ধরিয়া লিচ্ছবিরা পূর্ব্বভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল (১)।

জেনেরাল কানিংহাম সাহেবের মতে বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৃজি বা বজ্জিরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা (১) লিচ্ছবি, (২) বরদেহি, (৩) তিরভক্তি। সম্ভবতঃ বৃজিদের ভিতর আটটি শ্রেণী ছিল, কারণ অপরাধীদিগকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত এবং জুরি নির্ব্বাচনকালে আটটি বিভিন্ন শ্রেণী হইতে লোক নিযুক্ত হইত (২)।

লিচ্ছবিরা অহঙ্কারী ও গর্ব্বিত ছিল। তাহারা তাহাদের রথসমূহ সজ্জিত করিত (৩)। একতাবদ্ধ থাকায় তাহারা শক্তিশালী ছিল। সামরিক কৌশল শিক্ষা করিত বলিয়া তাহারা একরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাহারা দেখিতে সুশ্রী ও স্বাধীনচেতা ছিল (৪)। তাহারা বিলাসী ছিল। ব্যবহারে বেশ অমায়িক ছিল না (৫)। তাহারা কোন নূতন আইন-কানুন প্রচলন করে নাই কিংবা পুরাতন আইনকানুনও পরিবর্ত্তিত করে নাই। বৃজিদিগের চিরানুচরিত অনুষ্ঠানগুলির মতেই তাহারা কার্য্য করিত। বৃজি-বৃদ্ধদিগের প্রতি তাহারা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিত। বৃদ্ধদের কথানুসারে সকলে চলিত। সহরের বা পল্লীর বৃজি-মন্দিরে তাহারা ভক্তি সহকারে পূর্ব্বপ্রথামত পূজাদি করিত। অর্হৎদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করিত (৬)। বানপ্রস্থের শ্রেষ্ঠত্ব তাহারা স্বীকার করিত (৭)। ধর্ম্মকে অটুট রাখিবার জন্য বৃজিরা তাহাদের প্রধান থেরদিগের সহিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া উপদেশ দিত। এই বৃজিদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ছাত্রাবস্থায় আনন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবদত্তের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া সারিপুত্র বৃজিদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহারা প্রথমে বেশ ভাল লোক ছিল, তারপর তাহারা বদ লোক হইয়া পড়ে, আবার তাহারা ভাল হইয়াছিল। প্রথমে তাহারা কামনাশূন্য, আসক্তিহীন হইয়া কার্য্য করিত, হৃদয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করিত না, আলস্যপরায়ণ ছিল না। ক্রমে তাহারা ঐসকল অসৎবৃত্তির বশে খারাপ হইয়া পড়ে। পরে ঐগুলি ত্যাগ করিয়া পুনরায় উন্নত হইয়াছিল (৮)। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধদেবের প্রতি আস্থাবান ছিল, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিত না। এক সময়ে ভিক্ষুগণ সহ বুদ্ধদেব ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে লিচ্ছবিদিগকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহাদিগকে ভাল করিয়া দেখ, যাহারা তাবতিংশ দেবতাদিগকে দেখ নাই তাহারা ইহাদিগকে দেখ।" তাবতিংশ দেবতারা অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া তখন লোকের বিশ্বাস ছিল। বৈশালীবাসী লিচ্ছবিদের বেশভূষায় পারিপাট্য ছিল। তাহারা সুন্দর শিকারী ছিল (৯)। তাহারা ধর্ম্মের ধার ধারিত না। লিচ্ছবি যুবকেরা হস্তীদিগকে শিক্ষা দান করিত (১০)। বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকুমার যুবাবয়সে হস্তীদিগকে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য শিক্ষা দিতেন। লিচ্ছবিরা কুকুর লইয়া শিকার করিতে যাইত (১১)। তাহারা কলানুরাগী ছিল ও বহু শোভন চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা নানাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিত (১২)। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে বৃজিরা একত্রে কার্য্য করিবার জন্য প্রায়ই মিলিত হইত। বিপদের সময়ও তাহারা এইরূপ যুক্তভাবে কার্য্য করিত। পরমার্থজ্যোতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, যখন

* Hieuen Tsang's Life, by Beal, Introduction, XXII.

১. Jaina Sutras (Jacobi), pt. II, p. 321.

২. Cunningham's Ancient Geography of India, p. 77.

৩. S. B. E., Vol XIX, p. 257.

৪. Pali Buddhistical Annals (J. A. S. B.), p. 992. 1838.

৫. Yuang Chwang (Walters), Vol. II. p. 79.

৬. Buddhist Suttas, S. B. E., Vol. XI, pp. 3-4.

৭. Psalms of the Brethren, p. 106.

৮. Psalms of the Brethren, pp. 347-348.

৯. Yuang Chwang (Walters) p. 79

১০. Psalms of the Brethren, p. 106.

১১. Anguttara Nikaya, Vol. III, pp. 75-78.

১২. Mahaparinibbana Suttanta.

দুর্ভিক্ষের ভীষণ কবলে শত শত প্রাণী নিধন প্রাপ্ত হইতেছিল তখন সকলে একত্র হইয়া রাজার নিকট দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য দরবার করিয়াছিল। রাজা কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন না করিতে পারিয়া তাহাদিগকে অনাথশরণ বুদ্ধদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দোষ স্বীকার করিবার সৎসাহস তাহাদের ছিল (১৩)। একতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলিয়া সহমর্মিতা গুণ তাহাদের মধ্যে খুব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। সহানুভূতি তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন লিচ্ছবি পীড়িত হইলে অপর লিচ্ছবিরা আসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিত।

কোন এক লিচ্ছবির গৃহে শুভকর্ম্ম হইলে সকল লিচ্ছবিরা তাহাতে যোগদান করিত। কোন বিদেশী অভ্যাগত নৃপতি লিচ্ছবিরাজ্যে পদার্পণ করিলে, তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিত (১৪)।

এইসকল সদ্‌গুণে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের চরিত্রে কতকগুলি দোষ ছিল। তাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল (১৫)। লিচ্ছবিদিগের নৈতিক জীবন উন্নত না হইলেও (১৬), শিক্ষা সম্বন্ধে তাহারা অমনোযোগী ছিল না। মহালী নামে একজন লিচ্ছবি শিল্পশিক্ষার হেতু তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিল। এবং শিক্ষা শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। মহালী আবার ৫০০ জন লিচ্ছবি যুবককে শিল্প শিক্ষা দিয়া শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল (১৭)। মল্লসৈন্যাধ্যক্ষ ভন্ধুল, প্রসেনজিৎ এবং একজন লিচ্ছবি তক্ষশিলা হইতে শিল্প শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

বৈশালী নগরের বিবাহবন্ধন একটু নূতন রকমের ছিল। রাজ্যের প্রথম জেলার লোকের কন্যারা কেবলমাত্র ঐ জেলার পুরুষগণকে বিবাহ করিতে পারিত, দ্বিতীয় জেলার বা তৃতীয় জেলার পুরুষগণকে বিবাহ করিতে পারিত না (১৮)। রাজ্যের দ্বিতীয়-জেলাস্থিতা কন্যারা প্রথম জেলার ও দ্বিতীয় জেলার পুরুষদিগকে বিবাহ করিতে পারিত এবং তৃতীয়-জেলাস্থিতা কন্যারা রাজ্যের যে-কোন জেলার পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু কেহই বৈশালী-বাসী ভিন্ন অপরদেশীয়কে বিবাহ করিতে পারিত না। বৈশালী নগরে অপর একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। সৌন্দর্য্যের ললামভূতা কন্যারা কাহারও সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিত না, তাহারা লিচ্ছবিদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইত। অম্রপালীকে এইরূপে জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। অম্রপালী মহানামের কন্যা। গোপালের নিকট তাহার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিম্বিসার অম্রপালীর গৃহে আসিয়া সপ্তদিবস বাস করেন। তিনি তখন লিচ্ছবিদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। বিম্বিসারের ঔরসে তাহার গর্ভে অভয় নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লিচ্ছবি পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, "লিচ্ছবি-গণকে" মনোভাব জ্ঞাপন করিতে হইত এবং লিচ্ছবি-গণ অর্থাৎ লিচ্ছবিদের প্রতিনিধিসভা বা পার্লামেণ্ট উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিয়া দিত। লিচ্ছবি বালিকারা খুব সুশ্রী ও মাধুর্য্যমণ্ডিতা ছিল। তাহারা ভালরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিত।

সতীত্বের আদর তাহাদের মধ্যে ছিল। নারীর অপমানকারীর শাস্তির বিধান তখনও ছিল। এবং রাজার ঐরূপ চেষ্টাও কখনই তাহারা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিত না (১৯)।

অম্বসক্করো নামে জনৈক লিচ্ছবি নরপতি (২০) বৈশালীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি একজন সংশয়বাদী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহার কোনরূপ আস্থা ছিল না। তিনি এক গৃহীর পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সেই গৃহীকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং একদা এক অতি ভীষণ কার্য্যে পাঠান। রাজা তাহার প্রতি আদেশ করেন—সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক যক্ষের পুষ্করিণী হইতে রক্তপদ্ম আনয়ন করিতে হইবে; যদি সময়ের মধ্যে সে তাহা না করিতে পারে তাহা হইলে তাহার প্রাণবধ করা হইবে। দুষ্ট নরপতি আশা করিয়াছিলেন যে হতভাগ্য রাজকর্ম্মচারী নিশ্চয়ই যক্ষের হাতে প্রাণ হারাইবে, তখন তিনি তাহার পত্নীকে গ্রহণ করিতে পারিবেন। রাজকর্ম্মচারী যক্ষের

১৩. Cullavagga (S. B. E.), Vol. XX, pp. 118-125.
১৪. Sumangalavilasini (B Edition), pp. 103-105.
১৫. Anguttara Nikaya, Vol, III. pp. 75-78.
১৬. P. T. S Vol III. pp 219-280.
১৭. Anguttara Nikaya, Vol. IV, p 338.
১৮. Rockhill's Life of the Buddha, p. 62.
১৯. Sigala Jataka, Vol. II, p. 4.
২০. Sumangalavilasini, Hevavitarne's Bequest series, No. II, pp. 154-186.

কৃপায় কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিলেও তাহাকে রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তারপর যখন সময়ে আসিতে পারে নাই এই মিথ্যার অজুহাতে তিনি তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হ'ন, তখন সেই দয়ালু যক্ষ আসিয়া রাজার নিকট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

পত্নীর ব্যভিচারের নিমিত্ত স্বামী তাহাকে হত্যা করি'তে পারিত এবং "লিচ্ছবি-গণকে" সে পুনরায় উপযুক্ত পত্নী স্থির করিয়া দিতে বলিতে পারিত। দ্বিচারিণী পত্নী যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, তবে তাহাকে আর হত্যা করা যাইত না। একজন লিচ্ছবি তাহার স্ত্রীকে বারংবার এরূপ গর্হিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলেন; কিন্তু স্ত্রী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। লিচ্ছবি পুরুষ "লিচ্ছবি-গণকে" পত্নীর ব্যভিচারের কথা জানাইয়া পত্নীকে হত্যা করিতে চাহেন এবং তাঁহার জন্য অপর একটি পাত্রী স্থির করিয়া দিতে বলেন। জীবনের আশা নাই দেখিয়া, ব্যভিচারিণী তাহার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি লইয়া শ্রাবস্তিতে ভিক্ষুণীদিগের নিকট প্রব্রজ্যা চাহেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। এইরূপে বিফলমনোরথ হইয়া তিনি পরিশেষে এক ভিক্ষুণীর নিকট গমন করেন এবং বহুমূল্য অলঙ্কারের লোভ দেখাইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। লিচ্ছবি পুরুষ স্বয়ং শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া পত্নীর প্রব্রজ্যা দেখিয়া আসিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। নৃপতি তাঁহার পত্নীকে আনয়ন করিতে বলিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে।" তখন নরপতি বলিলেন, "যখন সে ভিক্ষুণী হইয়াছে তখন তাহার প্রতি আর কোনরূপ শাস্তি দিতে পারা যায় না।"

লিচ্ছবিরা সৌর মাসের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন প্রাণিহত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত (২১)।

বৈশালী ও তিব্বতদেশীয় লিচ্ছবিরা তাহাদের মৃতদেহের সংকার না করিয়া হিংস্র পশুদিগের আহারের জন্য অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া দিত। এক সময়ে যখন বোধিসত্ত্ব বৈশালীদেশে গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি বৃক্ষকুঞ্জের নিকট শবসংকারস্থান দেখিয়া স্থানীদিগের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে মৃতব্যক্তিদিগকে অনাবৃত স্থানে পশুপক্ষীর আহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়; তৎপরে যখন শ্বেতবর্ণের হাড়গুলি পাওয়া থাকে তখন সেগুলিকে বৃক্ষকুঞ্জে রক্ষা করা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে কেহ কেহ মৃতদেহ অগ্নিতেও সংকার করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ মৃতদেহকে বৃক্ষের উপর ঝুলাইয়া রাখেন। যাহাদিগকে খুন করা হইয়া থাকে, বা আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক যাহাদের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ করিবার কারণ হইতেছে—লিচ্ছবিরা বিশ্বাস করিত যদ্যপি তাহারা জীবন পায়, তাহা হইলে তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে। লিচ্ছবিরা কখনও কখনও মৃতদেহের সংকার না করিয়া মৃত্তিকার উপর যে ফেলিয়া রাখিয়া আসিত তাহার কারণ তাহারা আশা করিত যদ্যপি কোন-প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া উঠে তাহা হইলে সে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিবে (২২)।

বিভিন্ন প্রকার মৃতদেহের সংকার-অনুষ্ঠান দেখিয়া ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব বলেন, বৈশালীর পুরাতন অধিবাসীরা সময়ে সময়ে শবকে প্রকৃতির কোলে ফেলিয়া রাখিত, কখন বা মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করিত, আবার কখন বা অগ্নি-সংকার করিত।

লিচ্ছবিরা অনেকগুলি পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করিত, তন্মধ্যে ছন এবং সর্ব্বরাত্রিবারই প্রধান (২৩)। সব্বরাত্রিবার পর্ব্বে পতাকা উড্ডীন হইত, গীত বাদ্য চলিত। রাজা, রাজকুমার, সেনাপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী ইহাতে যোগদান করিতেন। সমস্তরাত্রিব্যাপী আমোদ-আহ্লাদ নৃত্য গীত চলিত।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

২১. Divyavadana, p 136.

২২. Beal's Romantic History of the Buddha, p. 159.

২৩. Samyutta Nikaya, Vol I, p. 201.

আসার আশায়

লাভ যদিও কিছু নেই তবু তোমাকেই উদ্দেশ করে লিখি। লাভ নেই-ই বা বলি কি করে?—হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত করে শান্তি তো একটু পাই!

কিন্তু কেবল লেখাই সার!—এ তো আর তোমার কাছে পৌঁছে না। নিজের লেখা নিজেই একশবার পড়ি। তারপর কোনটা ছিঁড়ে ফেলে দিই, কোনটা বা তুলে রাখি।

মনে যদিও পড়ে না, তবু—হাঁ, তোমায় দেখেছিলুম বৈ-কি! নইলে এ স্মৃতি পেলুম কোথা থেকে? একবার তোমায় দেখেছিলুম—এ-ক-টি বার। তাই কি ছাই তোমার মুখের দিকে তখন চাইতে পেরেছিলুম ভাল করে? পোড়া চোখ দুটো একবার চেয়েই লজ্জায় নীচের দিকে নত হ'য়ে গেল। হৃদয়টা ভরে উঠেছিল। তারপর যখন তোমার মুখ থেকে এই কথাগুলো আমার কানে এসে লাগ্‌লো—'যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'—আর আমিও ঐ কথাটাই ঘুরিয়ে তোমায় জানালুম যে আমার এ হৃদয়ও তোমারি, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেছিলুম। আমার অধীর মন তখন আর-সব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলই হাজার বার এই কথাটাই বল্‌তে চাচ্ছিল,—ওগো, আমি তোমারি!

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তুমি আমার অপরিচিত ছিলে, কিন্তু এই এক-নিমেষের দেখায় যেন চির-পরিচিত হয়ে উঠেছিলে। যা' আগে থেকে আশা করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী আমি পেয়েছিলুম। এই এক নিমিষের পরিচয়েই তুমি আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলে। আমিও নিজেকে তোমার পায়ে বিকিয়ে দিয়ে অমৃতে প্রাণ ভরে নিয়েছিলুম।

কিন্তু কাঙালকে এত ধন কেন দেখিয়েছিলে, ভগবান? যদি দেখালে তো আবার কেড়ে কেন নিলে?

তখন যদি জান্‌তুম যে এই আমার শেষ-দেখা তোমার সঙ্গে, তাহলে লজ্জা-সরম ত্যাগ করে আর-একবার সাধ মিটিয়ে ঐ মুখখানি তোমার দেখে নিতুম।

তারপর কি হয়েছিল মনে নেই। বহু-দিন-বিগত-স্বপ্নের স্মৃতির মত ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে মনের মাঝে ভেসে ওঠে। কোথা থেকে কি যেন একটা গোলমাল উঠ্‌ল। তোমাদের দলের লোকরা যেন ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ঝাঁও ঝাঁও করে উঠ্‌লেন। বাবা যা দেব বলেছিলেন তা' না-কি তিনি সব জোগাড় করে উঠ্‌তে পারেন নি। আমার বাবা গরীব। অপ্রস্তুত যে হতে হবে তা তিনি বিলক্ষণই জান্‌তেন এবং সে-জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, কিন্তু এতদূর হবে ব'লে তাঁর ধরণা ছিল না। একটা কর্কশ আওয়াজ যেন কানে এল,—মহিম, উঠে এস। তুমি হয়তো একবার ইতস্ততঃ করেছিলে, এ নিষ্ঠুর হুকুমের বিরুদ্ধে তোমার মনটি হয়তো ক্ষণিকের জন্য বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল—নইলে তুমি তখনি উঠে গেলে না কেন?

কিন্তু আবার যখন দৃঢ় এবং রূঢ় আওয়াজ এল—'মহিম', তখন তুমি ধীরে ধীরে উঠে গেলে।

সব গোল মিটে গেল। তোমরা সবাই চলে গেলে তোমাদের পায়ের দাপে পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে। কোলাহল-মুখর বাড়ীখানা একবারে নিস্তব্ধ থম্‌থমে হয়ে গেল।

আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। আলোগুলো একে একে সব নিভে গেল। এখান থেকে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াও কেউ দর্‌কার মনে কর্‌লে না। আমার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার নিয়ে আমি আরো কতক্ষণ বসে রইলুম। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে উঠে গিয়ে কবাট বন্ধ করে দিলুম। ইচ্ছা হল, ডাক্ ছেড়ে কাঁদি, কিন্তু পরক্ষণেই এই কথাটাই ভেবে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম যে আমার কি হয়েছে যে আমি কাঁদ্‌বে আর এঁদেরও বা এত চিন্তিত হবার বা নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাব্‌বার কি দর্‌কার? ভেবে আমার হাসি এল, কিছুই হয়নি যে আমার। তাঁদের যদি না ইচ্ছা থাকে আমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বার তবে গেলেনই বা তাঁরা চলে! পুরুষমানুষ বলেই কি তিনি বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পার্‌লেন আর মেয়েমানুষ বলেই কি আমাকে শির অবনত করে থাক্‌তে হবে? কেন? মানুষকে যিনি গড়েচেন তিনিও কি মানুষের গড়া এই নিষ্ঠুর সমাজকে ভয় করে চলেন? তাঁর চোখেও কি পুরুষমানুষ আর মেয়ে-মানুষ আলাদা? একজন অন্যায় কর্‌বে তা'তে তার দোষ

নেই, কিন্তু আর-একজন যদি সে অন্যায় মাথা পেতে সহ্য না করে তবেই তাকে জাহান্নমে যেতে হবে? হাসির কথা নয়?

বিয়ে আমার না-ই বা—ছিঃ, কি বোল্‌তে কি বোল্‌চি। প্রাণ কখনো দুবার দেওয়া যেতে পারে? এ কি কার্‌বারের জিনিষ! আমার সবই যে আমি তাঁকে দিয়েছি। বিয়ে তো আমার হয়ে গেছে। গ্রহণ তিনি আমায় না-ই কর্‌লেন।

মনটা হাল্কা হয়ে গেল।

আশা কিন্তু ছাড়্‌তে পারি নি—সেদিনও পারি নি, আজও পারি নি, আর পার্‌বও না। এই আশা নিয়েই বেঁচে আছি যে! এতদিনের মধ্যে একবারও কি আমাকে তোমার মনে হয় নি! একদিনের তরেও কি তুমি আমাকে মনে ক'রে একফোঁটা চোখের জলও ফেল নি! এত নিষ্ঠুর কি তুমি কখনো হতে পার এত সুন্দর হয়ে?

এই আশা করেই তো সেদিন-থেকে বসে আছি যে তুমি আস্‌বে! কিন্তু কৈ এতদিনের মধ্যে একবারও তো তুমি এলে না?

তবে কি সত্যই ভুলে গেছ? ওঃ, এত নিষ্ঠুর তুমি!

অভিমানে চোখ ফেটে জল আস্‌চে। বুকের মধ্যে বেদনা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌চে।

রূপার চাকতিই কি তোমাদের সবচেয়ে বড় হ'ল? হৃদয়ের খোঁজ নেওয়া একবারও তোমরা দর্‌কার মনে কর্‌লে না? হৃদয় মথিত করে দিয়ে চলে গেলে?

না, না,—তোমার প্রতি হয়তো আমি অবিচার কর্‌চি। তোমার প্রাণটাও হয়তো ঠিক এম্‌নিভাবেই আমার জন্য কাঁদ্‌চে। তুমিও হয়তো আমার কথা ভেবে ঠিক্ এম্‌নি যাতনাই ভোগ কর্‌চ—তোমার হৃদয়ের মাঝেও হয়তো এম্‌নি বেদনাই গুম্‌রে উঠ্‌চে।

কিন্তু তাহলে তুমি আস্‌চ না কেন? এতদিনের মধ্যে একটি বারও দেখা দাওনি কেন? হয়তো গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলার ভয়ে—হয়তো ছুটি পাও নি হয়তো কত চেষ্টা করেও সময় করে উঠ্‌তে পার নি—হয়তো তোমার খুব অসুখ করেচে—এম্‌নি কিছু একটা হবে! নইলে তুমি নিশ্চয়ই আস্‌তে।

দুপুর রাতে গাছের পাতা যখন মর্‌মর্ করে ওঠে, তখন আমার মনে হয়, ঐ বুঝি তুমিই আস্‌চ। পথের ধারে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে,—ভাবি, তুমি হয়তো এলে। আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত তৃষা নিয়ে, প্রাণের অফুরন্ত বাসনা নিয়ে জানালা খুলে ব্যথা-কাতর চোখে চেয়ে দেখি। কিন্তু কৈ, কোথায় তুমি? হৃদয়টা খাঁ খাঁ করে ওঠে।

রাস্তার উপর দিয়ে কত গাড়ী আসে যায়, আমি চম্‌কে উঠি,—তুমিই বুঝি আস্‌চ।

ঐ যাঃ, আমাদের দুয়ারেই গাড়ীটা দাঁড়াল না? তবে তুমি এলে? এতদিন পরে এ দুঃখিনীকে মনে পড়্‌ল? আজ আমার চোখের জলে তোমার চরণ-দুটি ধুইয়ে দিয়ে আমি হৃদয়ের সব খেদ মিটিয়ে নেবো। কৈ! কোথায় গাড়ী! আমি কি পাগল হলুম?

ঐ তো আবার। হাঁ, এদিকেই তো আস্‌চে। ঐ যাঃ দাঁড়াল না যে! তুমি এলে না?

বাইরে ও কার পায়ের শব্দ? তোমারি তো! লুকোচুরি কর্‌চ আমার সঙ্গে? কতক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌বে! আর একটু দাঁড়াও, এই যে আমি দুয়ার খুলে দিচ্ছি। কৈ, কোথায় তুমি? যদি এতদিন পরে এলে তবে আবার চলে কেন গেলে?

কাঙাল বলে এতই হেলা কি কর্‌তে হয়? তোমারই বা দোষ কি? আমার যে রূপ গুণ কিছুই নেই। এ কালো কুৎসিতার কাছে কিসের জন্য তুমি আস্‌বে? কিন্তু আমার রূপ থাক্‌লেই কি তুমি ছুটে আস্‌তে?

ঐ দেখ, কি সব বলে ফেল্‌চি। মনে কোরো না কিছু। মাথার ঠিক্ নেই আমার, রাগের মাথায় যা নয় তাই বলে ফেলি। ক্ষমা কোরো।

কিন্তু, হাঁ,—এও আমি বলে দিচ্চি, এমন লুকোচুরি আর কর্‌তে পাবে না। আমায় কষ্ট দিয়ে তোমার কি সুখ হয়! তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পার্‌চি নে যে! কবে নিয়ে যাবে?

আমি যে এত আকুল হয়ে তোমায় ডাক্‌চি, এ আকুলতা কি একদিনের তরেও তোমার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে নি?

যদি কিছু অপরাধ করে থাকি তোমার কাছে তবে তা' ভুলে যেও। সে অপরাধের শাস্তি তুমি দিয়ে যাও—আমি মাথা পেতে নেবো।

এক এক দিন যায়, আমার মনে হয় যেন এক যুগ গেল।

তুমি আস্‌বে তা' আমি জানি, কিন্তু আরো কতদিন বসে থাক্‌ব এ আশা নিয়ে? সে-দিন এখনো কতদূরে যে-দিন তুমি আস্‌বে?

আস্‌বে না? নিশ্চয়ই আস্‌বে। তোমায় আস্‌তে হবেই যে! তোমার আসার আশাতেই যে আমি বসে আছি!—

প্রতীক্ষমানা।



প্রকৃতির পাঁজি

অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত কালের শেষ। এই মাস থেকেই শীত বেশ অনুভব হয়। সকাল বেলা কোয়াসা জমে ও রাতে বেশী শিশির পড়ে।

এই সময় ব্যাং সাপ গর্ত্তে ঢুকিয়া শীত-ভোর ঘুমাইবার জোগাড় করে।

অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকে; এই সময় ধান কাটা, বিচালি থেকে ধান ছাড়ানো, চাল তৈরি করা চলে। তাই এই মাসে নবান্নের উৎসব হয়।

তরিতরকারির মধ্যে কপি মটরশুঁটি পালং-শাক মূলা বেগুন শিম এখন নতুন উঠ্‌ছে। জলপাই কয়েতবেল নোয়াড় প্রভৃতি পাবারও এই সময়।

এই মাসে স্থলপদ্ম ফোটে। কোনো কোনো জাতের গোলাপের গাছে ফুল হয়।

চশ্‌মা।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়

(৭)

সেদিন রাত্রে অনবরত সিংহের কি ভীষণ আওয়াজ আর গর্জ্জন! এইতেই বোঝা গেল যে, কাছাকাছি আমাদের বেশী শিকার জুটবে না। কেননা শিকারে বেরুলে বিপদ বড় কম হবে না। পরদিন আমরা তাঁবু তুলে নিয়ে উত্তর দিকে চল্‌লাম। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়গুলো উঁচু না হলেও তাদের মাঝে মাঝে যে পথ ছিল সে পথগুলো বড় ভীষণ। তাদের দুধারে অনেক ছোট ছোট গাছ, কোথাও বা বড় বড় গাছ ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা যে আমাদের আক্রমণ করবে এমন ভয় আমাদের ছিল না; তবুও আমরা আগে আগে চর পাঠিয়ে রেখেছিলাম।

টোকো আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দৌড়ে এসে আমাদের বল্‌লে—এক ভারী আশ্চর্য্য জিনিস দেখেছি।

কাকা বল্‌লেন—কি?

সে বল্‌লে—এক পাল সিংহ ঠিক আমাদের পথ আগ্‌লে শুয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের দলকে দাঁড় করালাম। চাকরগুলোর জিম্বায় গরু ও ঘোড়াগুলো রেখে আমরা এগুলাম সিংহের পালের দিকে।

হ্যারি বল্‌লে—গুলিতে যদি কিছু না হয় তাহলে জব্দ করবার আর এক উপায় আছে।

বলেই সে তাদের বোঝা থেকে কয়েকটা হাউই বার করে' আন্‌লে।

তারপর টোকোকে সাম্‌নে রেখে আমরা এগুলাম। একটা গিরিপথ পেরিয়ে এসে আমরা একটা উঁচু জায়গায় এসে পড়্‌লাম। দেখ্‌লাম, দূরে আমাদের একটু নীচেই অনেকগুলো সিংহ ও সিংহী ছোট ছোট বাচ্ছা নিয়ে শুয়ে আছে। এতগুলো সিংহ এক জায়গায় কিজন্য এসে শুয়ে ছিল তা বোঝা দুষ্কর। আমরা না জেনে সকলে এখানে এসে পড়্‌লে কি বিপদই না হ'ত! বোধ হল তারা আমাদের দেখ্‌তে পেয়েছে। কেননা বেশ ল্যাজ নাড়্‌ছিল আর কয়েকটা কর্ত্তাব্যক্তি খুব গর্জ্জন আরম্ভ করে' দিলে। বিপদ মন্দ নয়। তবুও ভয় পাবার পাত্র আমরা নই। আমরা এগুতে লাগ্‌লাম। হ্যারি ও আমি ছোড়্‌বার জন্যে কয়েকটা হাউই তৈরি করে' নিলাম। আমরা এগুতে এগুতে চাৎকার করতে লাগ্‌লাম। আমাদের চীৎকারের উত্তরে তারাও গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। এবং খুব চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

কাকা বল্‌লেন—আর দেরীতে কাজ নেই। তিন জনে করে' করে' গুলি চালানো যাক্ এস।

তিন জন করে' গুলি মারবে আর তিন জন গুলি ভরবে। গুলি ছোড়্‌বার পর ধোঁয়া পরিষ্কার হওয়ায় দেখ্‌লাম তারা নড়েওনি চড়েওনি। তখন আমরা একটা হাউই ছোড়্‌বার জন্য ঠিক কর্‌লাম। একটা উঁচু জায়গায় আমরা হাউইটা পুত্‌লাম; মৎলব যে, সেটাকে জ্বেলে সিংহগুলোর দিকে ছুড়ে দেব। ইতিমধ্যে আর-একবার গুলি করায় দুটো সিংহ খুব আঘাত পেলে দেখ্‌তে পেলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পালাল না। আমরা তখন হাউইটায় আগুন লাগিয়ে সিংহগুলোর মাঝখানে দিলাম ছুড়ে। ফল হল অদ্ভুত; ভয়ে সিংহগুলো এধার ওধার যে যেদিকে পার্‌লে দৌড় দিলে, কেউ কারুর জন্যে ফিরে তাকালে না। একটা খোঁড়া হয়ে সেইখানে পড়ে' রইল। দুটো খানিক দূরে গিয়েই পড়ে গেল। বাকীগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। যে তিনটে আঘাতের যন্ত্রণা পাচ্ছিল তাদের গুলি মেরে আমরা কষ্টের অবসান করে' দিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি সেগুলোর চাম্‌ড়া খুলে নিয়ে আমরা ফির্‌লাম। আমরা কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখ্‌লাম সেখানকার অনেক রকম শকুনি উড়ে এসে সিংহদের সদ্গতি কর্‌তে লাগ্‌ল।

আমরা যেখানে গরু ঘোড়া রেখে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে এলাম। গিরিপথ পেরিয়ে আস্‌তেই সাম্‌নে একদল বড় বড় হরিণ দেখ্‌তে পেলাম; প্রথমেই ছিল একটা প্রকাণ্ড হরিণ, তার রং পাট্‌কিলে। তার শিং দুটোর মাঝে মাঝে গাঁট। কাকারা এগিয়ে সাম্‌নের দু'একটাকে গুলি কর্‌লেন। বাকীগুলো ভয় মোটেই পেলে না। তাড়াতাড়ি ফাঁক ভর্ত্তি করে' নির্ভয়ে এগুতে লাগ্‌ল। আর দু'একটাকে মার্‌তেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। মরাগুলোর চাম্‌ড়া ও শিং নিয়ে আমরা বোঝাই কর্‌লাম।

এইবার আমরা যেদিকে চল্‌লাম সেদিকে খালি হাতীর আড্ডা। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল খুব বেশী দাঁত জোগাড় করা। আর যদি বেশী বিপদ না ঘটে তাহলে গণ্ডারের শিং ও চাম্‌ড়া আর উটপাখীর শাবক ও পালখ জোগাড় করা যাবে।

যেতে যেতে আমরা একটি জায়গায় এসে পড়্‌লাম, সেখানে ছোট ছোট পাহাড় আর এধারে ওধারে উইঢিপির মত পিঁপড়ের ঢিপি ছিল। সেগুলোকে কাফ্রিরা বলে মলোপ্পি। বৃষ্টিতে জল জমে সেখানে একটি ছোট পুকুরের মত হয়েছিল। আমারা সেখানে তাঁবু গাড়্‌লাম। জ্যান পুকুরটা থেকে কতকগুলো বড় বড় ব্যাঙ ধরে নিয়ে এল। রাঁধ্‌বার জন্য একটাকে কাট্‌তে তার পেটের মধ্যে দেখা গেল একটি ইঁদুর, দু'তিনটে বড় বড় পিঁপুড়ে, আর কতকগুলি কীটপতঙ্গ রয়েছে।

সকালে আমাদের দলের কয়েকজন এসে খবর দিলে যে পুকুরটার ধারে সমস্ত রাত্রি সিংহের গর্জ্জন শোনা গিয়েছে। সিংহটা কখন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়্‌বে এই ভয়ে আমরা বন্দুক নিয়ে তাকে শেষ কর্‌বার জন্য বেরিয়ে পড়্‌লাম। যখন আমরা পুকুরটার ধারে গেলাম তখনও আওয়াজ হচ্ছিল। কাছাকাছি কোন ঝোপের আড়ালে সিংহটা লুকিয়ে আছে ভেবে, আমরা সব বন ঠেঙাতে আরম্ভ কর্‌লাম। সিংহের কিন্তু দেখা নেই। শেষে হ্যারি হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। পুকুরের অপর পারে হাত বাড়িয়ে সে দেখালে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙ আগাছার ওপরে মুখ বাড়িয়ে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডাক্‌ছে। ব্যাঙ মহাশয় যদিও সিংহের মত দেহ ফোলাতে পারেন না, তবুও তাঁর স্বরটি হুবহু নকল করেছেন। তাঁবুতে ফির্‌তে ফির্‌তে সমস্ত রাস্তাটা আমরা কেবলই হাস্‌তে হাস্‌তে এলাম।

একেবারে খোলা জায়গায় সিংহ প্রায় আসে না। আমাদের একজন প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙ ধরে' নিয়ে এল। তাকে মেপে আমরা দেখ্‌লাম তিনি লম্বায় ন ইঞ্চি, চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। পেছনকার পা ছড়ালে একটা আঙ্গুল থেকে আর একটা আঙ্গুল মেপে হল আঠারো ইঞ্চি। সেটিকে কেটে দেখা গেল তার পেটে একটি পাখীর ছানা।

এতদিনে আমার চল্‌বার শক্তি বেশ হয়েছিল। হ্যারির সঙ্গে ঠিক কর্‌লাম, আর একদিন সেইরকম শীকারে বেরুনো যাবে। কেবল জ্যান সঙ্গে থাক্‌বে। কিন্তু যাবার সময় হ্যান্‌স্ এসে জুট্‌ল। কাকা, কাকার বন্ধু ও টোকো কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে অপর একদিকে শীকারে বেরুলেন। বারো মাইল দূরে উত্তর দিকে আর-একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুর পেরিয়ে অন্য দিকে যেতে কাকারা আমাদের বারণ কর্‌লেন। খানিক দূর গেলাম, কোন জীব-জন্তুরই দেখা নেই। তবে হরিণ, মহিষ ও হাতীর পায়ের দাগ

অনেক জায়গায় দেখ্‌তে পেলাম। সে জায়গাটাকে আমরা যেমন চিন্‌তাম, হ্যান্‌স্ ও জ্যানও সেইরকমই চিন্‌ত, তারা আগে এদিকে আসে নি। চলেছি ত চলেইছি। উদ্দেশ্য সেই পুকুরটাতে পৌছানো, কোন জন্তু জল খেতে এলেই শীকার জুড়ে দেওয়া যাবে।

সঙ্গে আমাদের অল্পই খাবার ছিল। আশা ছিল পথে জন্তুর মাংস ও ফলমূল পাওয়া যাবে। আর জায়গাটা দেখে বোধ হচ্ছিল, সেখানে তরুগুল্মের অভাব হবে না। কিন্তু সবই ফক্কা। একটু পরেই আকাশের অবস্থা বেগতিক হতে লাগ্‌ল। কালো কালো মেঘ এসে জুট্‌ল, আর ঘন কুয়াশায় চারিদিক ছেয়ে গেল। এ জায়গায় এরকম কুয়াশা প্রায়ই ঘটে। তখন এগুনো যাবে কি ফেরা যাবে এই হল আমাদের ভাবনা। ফের্‌বার পথে যে খাবার পাওয়া যাবে না এ ত আমরা দেখেই এসেছি। অতএব এখন সাম্‌নে গেলে যদি কিছু জোটে ত ভাল। ঝড় বাদল হয় হোক্‌গে। পেটে খেলে পিঠে সয়। এগিয়ে যাবার জন্যে জ্যানের বরাবরই মহা উৎসাহ। সে বল্‌লে—চল চল।

মেঘের কৃপায় সূর্য্য চাপা পড়্‌লেন, আমাদেরও পথ চলার সুবিধা হল। এক জায়গায় এসে আমাদের মনে হল পুকুরটা যেন কাছে। জ্যান এক প্রকাণ্ড গাছে উঠে পড়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করে' দেখ্‌লে। সে কিন্তু জল দেখ্‌তে পেলে না।

আবার আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। শেষে এসে হাজির হলাম একটা পাহাড়ের ধারে। তার উপর উঠে আমরা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব বা পশ্চিম কোন দিকেই জল দেখ্‌তে পেলাম না। আমাদের কিছু ভয় হল। তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পেয়েছে। সঙ্গে বোতলে যা জল ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের কেমন মনে হল যেন পুকুরটার কাছাকাছি এসে পড়েছি। এধার ওধার দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুটো হরিণের মত জানোয়ার দেখ্‌তে পাওয়া গেল। হ্যারি ও আমি দু'একটা মার্‌বার জন্য গেলাম। আর জ্যান ও হ্যান্‌স্ জলের সন্ধান কর্‌তে গেল। ঠিক রইল জল পেলে তারা পাহাড়টার গোড়ায় আস্‌বে, আমরাও সেখানে হাজির হব।

পাহাড়, ঝোপ ও লম্বা লম্বা ঘাসবনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমরা জন্তুদুটোকে লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লাম। হ্যারি বল্‌লে সেগুলোকে অরেবিস্ বলে। তারা এত দূর দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল যে, তাদের গুলি করা অসম্ভব হবে মনে হচ্ছিল। যেতে যেতে আবার তারা মাঝে মাঝে শূন্য পানে কয়েক ফুট লাফিয়ে এগিয়ে পড়ে' আবার চল্‌ছিল।

হ্যারি বল্‌লে—দাঁড়াও, ওদের মার্‌বার এক মৎলব কর্‌ছি। তুমি বন্দুক নিয়ে একটা ঝোপের ধারে লুকিয়ে থাক। আমি মজা করি।

বলে'ই সে তার বন্দুক, টুপ আর গায়ের কোটটা খুলে রেখে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে নীচের দিকে মাথা আর উপর দিকে পা করে' দিলে, আর মাটিতে দু'হাত চেপে রইল। সে ওরকম করাতে আমার বড় ভয় হল। আমার হলে বোধ হয় মাথায় রক্ত জমে' যেত, আর পড়েও যেতাম।

যাই হোক্ আমি অরেবিস্‌গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লাম। তারা লাফানো থামিয়ে হ্যারির অদ্ভুত আকারের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে হ্যারির দিকে এগুতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে আমি তাদের ভাল করে' দেখে নিলাম। গায়ের ওপরের রংটা তাদের ফ্যাকাশে কটা কটা, আর পেটের দিকটা শাদা। মাথার শিং সোজা ও ছুঁচলো, লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি হবে। তাদের আকার খুব বড় নয়, মাটি থেকে দু ফুট হবে। মাদীটার মাথায় শিং ছিল না। একটু একটু করে' তারা হ্যারির কাছে এসে পড়্‌ল। বন্দুক তুলে তাদের গুলি কর্‌তে ইচ্ছা হল। কিন্তু গাছের পাতা নড়ে গেলেও তারা ভয় পেয়ে পালাবে! হ্যারি আমায় চুপিচুপি বল্‌লে—ওরা পিছন ফির্‌লে তবে গুলি কোরো, তার আগে নয়।

আমি বুঝ্‌লাম, সেই ঠিক। খানিক চুপ করে' হ্যারির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারা ফির্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। আমিও আস্তে আস্তে বন্দুক তুলে গুলি চালালাম। মদ্দাটা পায়ে গুলি লেগে পড়ে গেল। হ্যারি তখন তড়াং করে' লাফিয়ে উঠে বন্দুক নিয়ে মাদীটাকে গুলি কর্‌লে। দুটি শীকার জুট্‌ল। পেটে ভীষণ ক্ষুধা, শীকার দেখে মন ঠাণ্ডা হল। হ্যারির বুদ্ধিকৌশলে লাভ হল খুব।

শীকার বয়ে নিয়ে আমরা সেই পাহাড়ের গোড়ায় এলাম। দেখ্‌লাম, জ্যানরা তখনো ফেরেনি। এধার

ওধার থেকে কাঠ জোগাড় করে' আমরা মাংস পোড়াতে আরম্ভ করে' দিলাম। তৃষ্ণায় তখন আমরা এমন অস্থির হয়েছিলাম যে জন্তুগুলোর রক্ত খেতেও তখন ঘৃণা বোধ হচ্ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, রক্ত খেলে তৃষ্ণা বাড়ে বই কমে না।

মাংস পোড়ানও হয়ে গেল, তবুও জ্যানদের দেখা নেই। হ্যারি পাহাড়ের উপর উঠে দেখে এল, দেখতে পেলে না। সে বল্‌লে, সিংহের মত কি একটা জানোয়ার যেন আমাদের দিকে আস্‌ছে। হয় সে আমাদের পায়ের দাগ ধরে' ধরে' আস্‌ছে, কিম্বা হরিণের গন্ধ পেয়ে আস্‌ছে।

দুজনেই সতর্ক হয়ে রইলাম। আমি রান্নার কাজে রইলাম আর হ্যারি পথের দিকে তাকিয়ে রইল। জ্যানরা কেউ ফির্‌ছে না দেখে হ্যারি ত ক্ষেপে উঠ্‌ল। সে জলের সন্ধানে নিজে কোথাও যাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

আমি বল্‌লাম—আগুনের কাছ থেকে এখন বেশী দূরে যাওয়া ঠিক নয়। কি জানি সিংহটা যদি আক্রমণ করে।

হ্যারি কিন্তু নাছোড়বান্দা। তৃষ্ণায় সে অস্থির হয়েছিল। সে বেরুবার জন্যে তৈরী। এমন সময় খুব কাছেই সিংহের একটা গর্জ্জন শোনা গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছিল।

আমি বল্‌লাম—কি, এবার যাবে কি করে'! শুনছ ত?

হ্যারি বল্‌লে—রেখে দাও। সেই রকম একটা ব্যাঙ হয়ত ডাক্‌ছে। যাই হোক আমি আর যাব না।

দুজনে খানিকটা পোড়া মাংস অনেক কষ্টে চিবুলাম। গলা থেকে আর নামে না। মুখে এতটুকু রস নেই। হ্যারি ত মাংস ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—কাজ নেই আমার মাংস খেয়ে। চাকর-দুটো যদি এখনো না ফেরে তাহলে আমি এবার বেরুব।

আমি তাকে শান্ত করতে চেষ্টা কর্‌লাম। আমিও ভেতরে ভেতরে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছিলাম। যদি তখন খানিকটা নর্দ্দামার জলও পেতাম, পোকাভরা হলেও, তাও আমরা খেতে পার্‌তাম্।

আগুনের ধারে এই অবস্থায় বন্দুক হাতে করে' আমরা বসে আছি সিংহকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে। একদিকে তৃষ্ণা আর একদিকে সিংহ। হঠাৎ যেন মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। দুজনেই প্রাণপণে চীৎকার করে উঠ্‌লাম। উত্তরও পেলাম।

আমরা বল্‌লাম—জল পেয়েছ? উত্তর এল—পেয়েছি। ভাল জায়গাও আমরা দেখে এসেছি, সেখানে অনেক হাতী। কাল সেখানে শীকারে যাওয়া যাবে।

জ্যান ও হ্যান্‌স্ কাছে এল। চাম্‌ড়ার বোতল থেকে হ্যান্‌স্ হ্যারিকে জল দিলে। জ্যান তার বোতলটা আমায় দিলে। চোঁ চোঁ করে খানিকটা খেয়ে ফেল্‌লাম। জলটা বিশ্রী। বোধ হয় অনেক পোকা-মাকড় তাতে ছিল। তবুও সেই যেন অমৃতের মত মনে হল।

জল খেয়ে হ্যারি বল্‌লে—এইবার মাংস খাওয়া যাক্।

তখন সকলে মিলে আহার করা হল। খাবার পরই হ্যান্‌স্ বল্‌লে যে, তার বড় ঘুম পেয়েছে। মাটির ওপর সে শুয়ে পড়্‌ল।

হ্যারি বল্‌লে—রাত্রে একজন কাউকে জেগে থেকে পাহারা দিতে হবে। কি জানি এইমাত্র যে সিংহটা ডাক্‌ছিল সে যদি এসে হাজির হয়!

হ্যান্‌স্ তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে। কিন্তু খানিক পরে খুব কাছেই যে গর্জ্জন শোনা গেল তাতে আর কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে সিংহমহারাজ এসেছেন। সকলেই বন্দুক নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালাম। নিজেদের রক্ষা কর্‌বার জন্যে তাকে মারা চাই; আর তার চাম্‌ড়াও নিতে হবে। একসঙ্গে সকলে এগুলাম। আমাদের আগুনের কাছ থেকে খানিক দূরে একটা ছোট পাহাড়ের ঢিপি ছিল। দেখি না তারই ওপরে এসে সিংহটা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। দিনের বেলায় এত লোক একসঙ্গে দেখ্‌লে সে হয়ত চম্পট দিত; কিন্তু রাত্রি বলে' তার সাহস বেড়ে গিছ্‌ল। গোঁ গোঁ করতে কর্‌তে আর ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা দিয়ে সে আমাদের দিকে নাম্‌তে লাগ্‌ল। আমরা তখন গুলি করব ঠিক কর্‌লাম; আগে হ্যারি ও জ্যান গুলি কর্‌বে, তারপর তাদের গুলিতে কাজ না হলে আমি ও জ্যান্‌স্ মার্‌ব।

সিংহটা ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। তার প্রকাণ্ড কেশর আর তার পাশেই তার রোগা থস্‌থসে দেহ—সমস্তই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। দুবার সে থমকে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন কর্‌লে। হ্যারি ও জ্যান ঠিক একই সময়ে গুলি কর্‌লে, কিন্তু তাদের গুলিতে কোন ফল হল না।

সিংহটা রে'গে আমাদের ওপর লাফ দেবার আয়োজন করলে। লাফাবে কি এমন সময় হ্যান্‌স্ ও আমি গুলি চালালাম। এবার অব্যর্থ সন্ধান। বেচারী খানিকদূরে ধড়াম করে' পড়ে' একটু ছটফট করে' চক্ষু বুজ্‌লে। আমরা জোরে চীৎকার করে' আমাদের জয়ধ্বনি প্রচার কর্‌লাম।

তারপর আমরা আগুনের কাছে ফিরে এসে ভাল করে' আগুন জ্বালিয়ে শোবার জোগাড় কর্‌লাম। এবার সাবধান হলাম। প্রথম রাত্রে জ্যান ও হ্যান্‌স্ পাহারা দেবে, শেষ রাত্রে আমি ও হ্যারি। কি জানি ঘুমন্ত অবস্থায় আবার কোন সিংহ বা চিতাবাঘ যদি দেখা দেন; কিম্বা হাতী, মহিষ বা গণ্ডার এসে যদি চেপ্‌টে দিয়ে যান; তাহলে ঘুমের সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে মহাঘুম!

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

—

বড় বোন আর ছোট বোন

দু'বোন। বড়টি যেন আগুনের আংটা, রেগেই টং! আর, দিন রাত কেবল হিংসা আর কোঁদল। ছোট বোন লক্ষ্মীটি,—হাসি-খুসি, দিব্যি।

একদিন দু'বোনের পিসির বাড়ী যাওয়ার কথা। বড় বোন চ'টে উঠ্‌ল—'হুঃ! খেয়ে-দেয়ে তো কাজ নেই—পিসির দোরে হাজ্‌রা-দিচ্ছি!'

ছোট বোন বুঝিয়ে বল্‌লে—'সে কি কথা? পিসিমা কি মায়ের চেয়ে কম?'

কিন্তু দিদি যখন কিছুতেই নড়্‌চে না, তখন ছোট বোন আর কি করে?—একলাই পিসির বাড়ী চল্‌লো।

… … …

খানিক গিয়ে ছোট বোন এক ঝরণার কাছে উপস্থিত। ঝরণা বল্‌লে—'কে যাও, বাছা?—বালি-পাতায় বুকখানি মোর ভ'রে গেছে, বইতে পার্‌চিনে, একবার জঞ্জালগুলো সরিয়ে দিয়ে যাও।'

'আহা, তাইতো!'—ব'লে ছোট বোন বালি-পাতা সরিয়ে দিলে।…ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরণা বইতে লাগ্‌লো।

… … …

আরো খানিক গিয়ে ছোট বোন এক কাপাস-গাছের তলায় হাজির। কাপাস-গাছ বল্‌লে—'কে যাও, বাছা?—আগাছা আর কাঁটাগাছে চারদিক মোর ঘিরে ধরেছে, নড়্‌তে পার্‌চিনে, একবার জঙ্গলগুলো সাফ ক'রে দাও।'

'আহা, তাইতো!'—ব'লে ছোট বোন আগাছার ঝোপ ভেঙ্গে দিলে।…শাঁ শাঁ ক'রে কাপাস-গাছ গা-ঝাড়া দিয়ে ন'ড়ে উঠ্‌লো।

… … …

আরো খানিক পরে ছোট বোনের এক ফড়িঙের সাথে দেখা। ফড়িঙ্ বল্‌লে—'কে যাও, বাছা?—মাকড়সার জালে প'ড়ে আট্‌কে আছি, ছাড়িয়ে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।'

'আহা, তাইতো!'—ব'লে ছোট বোন ফড়িঙ্‌টিকে ছাড়িয়ে দিলে।…ফর্ ফর্ ক'রে ফড়িঙ্ আকাশে উড়ে' গেল।

… … …

কিছু পরে ছোট বোন পিসিমার বাড়ী পৌঁছল। পিসি আদর ক'রে ভাই-ঝিকে খাবার দিলেন। পরে, যাবার বেলা খেল্‌না-পুতুল আর ছেলের এক বাচ্চা-হরিণ দিয়ে বিদায় কর্‌লেন।

… … …

ফিরে-আস্‌তে ছোট বোনের সেই ফড়িঙের সাথে পথে দেখা। ফড়িঙ্ তাকে একটা রং-বেরঙের টুপী দিয়ে বল্‌লে—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ,—তোমার জন্যে পোকা-পাখীর নরম পাখায় এ টুপী গড়েছি, নেও, বাছা, মাথায় পরো।'

মহা-আহ্লাদে ছোট বোন টুপীটি নিয়ে মাথায় দিল।

… … …

কিছু দূর গিয়ে ছোট বোনের সেই কাপাস-গাছের সাথে দেখা। কাপাস-গাছ তাকে একখানা রং-বেরঙের সাড়ি দিয়ে বল্‌লে—'তুমি আমার উপকার করেছ,—তোমার জন্যে কাপাস-সূতায় গঙ্গাজলী সাড়ি করেছি, নেও, বাছা, কাপড়খানি পরো।'

মহা-আহ্লাদে ছোট বোন সাড়িখানি নিয়ে পর্‌লো।

... ...

কতদুর গিয়ে ছোট বোনের সেই ঝর্ণার সাথে দেখা। ঝর্ণা তাকে একছড়া মুক্তার মালা দিয়ে বল্লে—'তুমি আমায় বইতে দিয়েছ,—সাগর হ'তে ঝিনুক ব'য়ে তার মুক্তায় তোমার জন্যে এ সাত-ন'র গড়েছি, নেও, বাছা, গলায় পরো।'

মহা-আহ্লাদে ছোট বোন সাতলহর মুক্তার মালা গলায় পর্‌লো।

... ...

ছোট বোন বাড়ী ফির্‌তেই সব দেখে' বড় বোনের মহা-হিংসা। সে-ও পরদিন তাড়াতাড়ি সাজগোজ ক'রে চুপটি ক'রে পিসির বাড়ী চল্‌লো।

... ...

খানিক গিয়ে বড় বোন এক ঝর্ণার কাছে উপস্থিত। ঝর্ণা বল্‌লে—'কে যাও, বাছা?—বালি-পাতায় বুকখানি মোর ভ'রে গেছে, বইতে পার্‌চিনে, একবার জঞ্জালগুলো সরিয়ে দিয়ে যাও।'

—'অ্যাঃ! আমার বয়েই গেছে। তোমার জন্যে কাদা ঘেঁটে' মরি আর কি!'—এই-না বলে বড় বোন চোক ঘুরিয়ে চ'লে গেল।

... ...

আরো খানিক গিয়ে সে এক কাপাস-গাছের তলায় হাজির। কাপাস-গাছ বল্‌লে—'কে যাও, বাছা?—আগাছা আর কাঁটাগাছে চারদিক মোর ঘিরে' ধরেছে, নড়ুতে পার্‌চিনে, একবার জঙ্গলগুলো সাফ ক'রে দাও।'

—'অ্যাঃ! আমার বয়েই গেছে তোমার জন্যে কাঁটা ফুটে' মরি আর কি!'—এই-না ব'লে বড় বোন হাত ঘুরিয়ে চ'লে গেল।

... ...

আরো খানিক গিয়ে তার এক ফড়িঙের সাথে দেখা। ফড়িঙ্ বল্‌লে—'কে যাও, বাছা?—মাকড়সার জালে প'ড়ে আট্‌কে আছি, ছাড়িয়ে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।'

—'অ্যাঃ! আমার বয়েই গেছে তোমার জন্যে মাকড়সার নালজোলে হাত ডোবাই!'—এই-না ব'লে বড় বোন নাক সিঁট্‌কে চ'লে গেল।

... ...

হেঁটে' হেঁটে' হেঁটে' শেষে সে পিসির বাড়ী পৌঁছল। দরজায়ই পিসির ছেলের সাথে দেখা। কাল এক বোন তার আদরের বাচ্চা-হরিণ নিয়ে গেছে, আর-এক বোন আজ কি নিয়ে যায়!—রাগে পিসির ছেলে বড় বোনকে দরজা থেকেই তাড়িয়ে দিলে।

কাঁদতে কাঁদতে বড় বোন্ ঘরে ফির্‌লো।

... ...

পথে সেই ফড়িঙের সাথে দেখা। ফড়িঙের মাথায় রং-বেরঙের টুপী দেখে' যাই সে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল, অমনি মাকড়সার জালে হাত আট্‌কে গেল। ফড়িঙ্ কুট্ ক'রে তাকে কাম্‌ড়ে দিয়ে ফট্ ক'রে আকাশে উড়ে গেল।

... ...

কিছু দূর গিয়ে সেই কাপাস-গাছের সাথে দেখা। কাপাসের ফুলে রং-বেরঙের সাড়ি দেখে যাই সে হাত বাড়িয়ে আন্‌তে গেল, অম্‌নি কাঁটার ঝোপে পা আট্‌কে গেল। আগাছার ডাল শপাশপ ঝাঁটা-পেটা ক'রে তাকে বিদায় দিল।

... ...

শেষ-পথে সেই ঝর্ণার সাথে দেখা। ঝর্ণার জলে সাত-লহর মুক্তার মালা দেখে' যাই বড় বোন আন্‌তে যাবে, অম্‌নি পা পিছ্‌লে ঝর্ণার জলে প'ড়ে গেল। তারপর, নাকানি-চুবুনি খেয়ে অনেক কষ্টে যখন পাড়ে উঠ্‌ল, তখন তাকে দেখ্‌তে হ'ল—বালি-পাতা-মাখা যেন সংটি!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

খোকার পোষাক

(H. G. Wells-এর একটি গল্প অনুসরণে)

এক খোকাকে তার মা একটি সুন্দর পোষাক তৈরী করে দিয়েছিলেন। সবুজ ভেলভেটের পোষাকটি আর তার উপর কত রকম জরির কাজকরা। আমি জানি তত সুন্দর পোষাক তোমরা দেখনি। না দেখলে কথায় বলে' তোমাদের কাছে তার সৌন্দর্য্য বোঝানো যাবে না। তার বোতামগুলো ছিল সোনার—তারার মতো ঝকঝক করত। খোকা যেদিন তার পোষাকটি গায়ে দিয়ে আয়নার কাছে এসে প্রথম দাঁড়াল সেদিন সে তার নিজের চেহারা দেখে নিজেকে চিন্‌তেই পারেনি, তার মনে হচ্ছিল যেন দিদিমায়ের গল্পের রাজপুত্র তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

খোকার ইচ্ছা হত তাদের বাড়ীর সম্মুখের বড় রাস্তাটা দিয়ে যত-গুলো লোক সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত চলে সবাইকে সে তার সুন্দর পোষাকটি দেখায়। তোমরা বুঝ্‌তেই পার্‌ছ এ শুধু পোষাক দেখানো নয়, পোষাক-পরা পোষাকের মালিককেই দেখানো। খোকা যখন মনে ভাব্‌ত, সে তার সুন্দর পোষাকটি গায়ে দিয়ে কত সব অপরিচিত পথঘাট দিয়ে চলেছে, আর চারদিকের লোকজন তার পোষাকের দিকে চেয়ে আছে, তখন তার ভারী আনন্দ হোত। যখন দুপুর বেলায় খুব প্রখর হয়ে সূর্য্য উঠ্‌ত তখন খোকার ইচ্ছা হত সে তার পোষাকটি পরে তাদের ঘরের সম্মুখের ছোট্ট মাঠের উপর ছুটোছুটি কর্‌বে, তাতে তার পোষাকের জরি আর সোনার বোতামগুলো আঁধার রাতে জোনাকির মতো জ্বলতে থাক্‌বে।

কিন্তু খোকার মা তাকে সর্ব্বদা পোষাকটি পরে থাক্‌তে দিতেন না। তিনি ঠাট্টা করে বল্‌তেন, 'এটা তোর বিয়ের পোষাক। এটি নষ্ট কর্‌লে বর সাজ্‌বি কি গায়ে দিয়ে?" খোকা এই ভেবে খুব খুসী হল যে যত বর তাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যায় তার মধ্যে সবার চেয়ে সেই হবে দেখ্‌তে সুন্দর।

খোকার মা তার পোষাকের সোনার বোতামগুলো নীল পাতলা কাগজে জড়িয়ে রেখে দিলেন পাছে সেগুলোর রঙ খারাপ হয়ে যায়। আর খুব যত্ন করে খোকার ছোট আলমারীটির মধ্যে পোষাকটা রেখে দিলেন। পোষাকটিকে পর্‌বার ইচ্ছা খোকার খুবই হত, কিন্তু আমাদের খোকা মায়ের অবাধ্য কোন দিন নয়। সে ভাব্‌ল দুমাস পরে ছোটদির বিয়েতে সে পোষাকটি পর্‌তে পার্‌বে।

এক দিন রাতে বিছানায় ঘুমিয়ে খোকা স্বপ্ন দেখ্‌ল যে তার পোষাকের বোতামগুলো যেন আর তেমন চক্‌চকে নেই। তারপর হঠাৎ যখন সে জেগে গেল তখন ভাব্‌ল যদি সত্যি এমনি হয়ে থাকে তবে কি হবে? ছোটদির বিয়েতে পোষাক গায়ে দিতে গিয়ে সে ভাব্‌ল বুঝি বোতামগুলো আর তেমন উজ্জ্বল নেই। বিয়ের পর নিজেই সে পোষাকটাকে যত্ন করে তার ছোট্ট আল্‌মারীর ভিতর রেখে দিল। এবার খোকার পোষাকের উপর দরদটা অনেক বেড়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে পোষাকটা বের করে দেখ্‌ত সেটা ঠিক আছে কি না।

একদিন রাতে খোকা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে দেখ্‌ল যে তার মাথার কাছে খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানায় পড়েছে। খোকা খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখ্‌ল; এমন সুন্দর জোৎস্না সে কখনো দেখেনি। চারদিকে কোথাও কেউ জেগে ছিল না, তবু তার একটুও ভয় কর্‌ছিল না। খোকার মনে হল যে উৎসবের রাতের জন্য সে প্রতীক্ষা কর্‌ছে সে রাত্রি যেন আজ এসেছে। খোকা বিছানায় উঠে বস্‌ল—তার বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল। খোকা স্পষ্ট শুন্‌তে পেল কে যেন তার কানে-কানে বল্‌ছে—"পোষাক পর"। খোকার মনে হল পোষাকটি যেন সম্পূর্ণই তার। পোষাকটি গায়ে দিয়ে নষ্ট কর্‌লেও যেন বক্‌বার কেউ নেই। সে তাড়াতাড়ি উঠে তার ছোট আল্‌মারী থেকে পোষাকটি বের করে গায়ে দিল। প্রতিবার খোকার মা তাকে পোষাক পরিয়ে দিতেন, কিন্তু আজ সে কারুর সাহায্য না নিয়েই দিব্যি একা পোষাকটি পরে ফেল্‌ল।

দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে একেবারে তাদের বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তার গায়ের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। পোষাকের জরিগুলো আর বোতামগুলো এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে খোকা তাদের দিকে তাকাতে পার্‌ছিল না।

তাদের বাগানের বড় বড় গাছগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আস্‌ছিল। খোকা দেখ্‌তে পেল যেন গাছেরাও আজ কত সুন্দর সুন্দর পোষাক গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখ্‌ল তাদের সাদা দালানটার উপর ছায়াগুলো কেমন নড়্‌ছে। এমনি সব বড় বড় ছায়া দেখ্‌লে তার ভয় হত, কিন্তু আজ তার একটুও ভয় হচ্ছিল না! খোকার চার পাশে ঝিঁঝিঁপোকা ডাক্‌ছিল, আরো কতরকম শব্দ শোনা যাচ্ছিল। চারদিকে চেয়ে খোকার পাতলা ঠোঁট দুখানির উপর একটু হাসির আভা লাগ্‌ল। সে ভাব্‌ল সবাই যেন তার সুন্দর পোষাকটি দেখে খুব খুসি হয়েছে।

খোকা চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। সুর্‌কী-দেওয়া রাস্তা ছেড়ে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সে চল্‌তে লাগ্‌ল। ডালপালায় বেধে পোষাক অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেল, কিন্তু তার জন্য আজ তার একটুও দুঃখ হচ্ছিল না। তার মনে হল কে যেন আজ তাকে পথ দেখিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে। যেন সে উপকথার রাজপুত্তুর শ্বেতহস্তীর পিঠে চড়ে যাচ্ছে। আজ তার অভিষেক।

একটা বড় কামিনীফুলের গাছের তলা দিয়ে বাগানের ধারে ছোট পুকুরটির পাড়ে এসে সে দাঁড়াল। এই পুকুরে দিনের বেলায় হাঁস চর্‌ত। পুকুরে জল বেশী ছিল না। একরকম বড় বড় ঘাসে পুকুরটা আচ্ছন্ন ছিল। জলের উপর জ্যোৎস্না পড়ে দেখাচ্ছিল যেন অনেকখানি গলানো রূপো কে সেখানে ঢেলে দিয়েছে। খোকা তাড়াতাড়ি সেই পুকুরে নাম্‌ল। প্রথম হাঁটু জল, তারপর কোমর জল, তার পর জল কাঁধ পর্য্যন্ত উঠ্‌ল। সে ওপারে গিয়ে উঠ্‌ল। বড় বড় ঘাসগুলো তার পোষাকের সঙ্গে জড়িয়ে গেল।

তোমরা অনেকে ভাব্‌ছ অতটুকু খোকা সে কেমন করে রাত দুপুরে একা একা পুকুরের জলের মধ্যে দিয়ে যেতে সাহসী হল। তোমরা যাই ভাব—আমি জানি খোকা এমনি করে তার পোষাক পরার উৎসব শেষ করেছিল।

তাদের বাগানের ভাঙ্গা ফটক দিয়ে সে বড় রাস্তায় এসে পড়্‌ল। সেই জলে-ভেজা ছেঁড়া পোষাকটি গায়ে দিয়ে রাস্তার সেই ধুলোর উপর দিয়ে যেতে তার একটুও ভয় বা কষ্ট হচ্ছিল না। কি আশ্চর্য্য! খোকার কেবলি মনে পড়্‌ছিল যে যদি সারা রাত্রি সারা দিন সে অনবরত চল্‌তে থাকে তবুও যেন তার এই আনন্দের পথচলা শেষ হবে না। সে কিছু দূরে গিয়ে খালের ধারে দাঁড়াল। দেখ্‌তে পেল একটা কালরঙের মস্ত বড় ভোম্‌রা তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। সে ভোম্‌রা দেখে খুব ভয় পেত। কিন্তু আজ এমন অদ্ভুত নির্জ্জন জ্যোৎস্না রাত্রিতে এমন একটি অদ্ভুত সঙ্গী দেখে, ভয় না হয়ে তার আনন্দই হল। ভোম্‌রাটা খুব তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছিল। ভোম্‌রাটা কাছে আস্‌তে সে হাত নেড়ে তাকে তাড়াল না। সেটা এসে তার ঠোঁটের উপর বস্‌ল।

পরদিন সকালে সবাই দেখ্‌তে পেল ধুলোকাদা-মাখা পোষাকপরা একটি ছোট ছেলে সেই খালটার মধ্যে পড়ে আছে। এ ছেলেটি আমাদেরি খোকা। সকলে দেখ্‌ল তার দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু তার মুখে এমন একটি হাসি লেগে আছে যে খোকার মা হাজার চুমো দিয়েও অমন হাসি কোনো দিন জাগিয়ে তুল্‌তে পারেননি।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সান্যাল।

খেয়াঘাটে

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত। খোলা জানালা দিয়ে প্রভাতের মূর্চ্ছাহত আলোময় গলিটার দিকে চেয়ে আছি। গলিটা যেন পথ খুঁজে খুঁজে পাচ্ছে না, ঘুরে ঘুরে মরছে, সে ত সোজাই চলতে চায়, কিন্তু এ দিকে ফিরলে বড় লাল বাড়ীটা তাকে ধাক্কা দিয়ে একেবারে বাঁয়ে ঠেলে দিলো, সেদিক থেকে হলদে বাড়ীটার ধাক্কা খেয়ে সাদা বাড়ীটার পায়ের তলায় গিয়ে পড়লো। এঁকেবেঁকে কোনমতে সে চলেছে, তার এদিকে আঁস্তাকুড়, ওদিকে ড্রেন, মাঝে কোথাও গর্ত্তে জল জমেছে, কাদায় ভরেছে, কোথাও খোওয়া সব কঙ্কালের মত বেরিয়ে পড়েছে। স্তম্ভিত কালো আকাশের ছায়ায় জলসিক্ত স্তব্ধ বাতাসে এই আঁকাবাঁকা গলি নগরলক্ষ্মীর কোন শীর্ণ মলিনকন্থা রিক্তভূষণ ভিখারী সন্তানের মত চুপ করে পড়ে ছিলো, সহসা সানাইয়ের মঙ্গলরাগিণীতে আকুল হয়ে উঠেছে; কিন্তু এ শ্রাবণপ্রভাতে বিবাহোৎসবের সাহানার সুর এ কালো গলিতে বড় করুণ বাজছে, মনে হচ্ছে, সারারাত ঝড়ে জলে যে কান্না গলিতে বন্ধ হয়ে আছাড়ি পিছাড়ি ক্ষুব্ধ মত্ত হয়ে ঘুরেছে, প্রভাতে তা শান্ত হয়ে সানাইয়ের সুরে ঝরে ঝরে পড়ছে।

দিনরাত চুপ করে শুয়ে একা দেখে দেখে, কি জানি, গলিটা আমার কাছে কেমন জীবন্ত হয়ে গেছে, এ কালো-পাথরভরা যাতায়াতের নির্জ্জীব পথ নয়, এরও একটা বিশেষ রূপ আছে, প্রাণ আছে, হয় ত এ অহল্যার মত পাষাণ হয়ে গেছে। কখনো গভীর রাতে চাঁদের আলো যদি এর কালো পাথরে ঝিকিমিকি করে, দক্ষিণ হাওয়া হঠাৎ যদি ভুলে এই পথে চলে আসে, বড়রাস্তার কৃষ্ণচূড়া বা কদমগাছ হতে ঝরা ফুল পাতা যদি উড়ে এসে এর বুকে পড়ে, আমি দেখি, ও আনন্দে শিউরে উঠে। তাই মাঝরাতে বার বার মনে হচ্ছিলো, যখন আকাশ ভেঙে জল ঝরছিলো আর নৃত্যময়ী রঙ্গিণীদের মত জলের ধারা কলগানে চলেছিলো, এ গলি যেন দুধারের বাড়ীর সারির বাঁধনে আপনাকে বেঁধে রাখতে পারছিলো না, সব ভেঙে চুরে ভাসিয়ে নেচে ছুটে যেতে চায়—মাঝে মাঝে হেসে উঠছিলো, তারপর কান্না আর কান্না। সে কান্না এখন রসুনচৌকির সুরে তার বুক ভরে বাজছে।

তুলি নিয়ে গলিটার একটা ছবি আঁকতে বসলুম—দুধারে ভূতের ছায়ার মত বাড়ীর সারি, মাঝখানে কালো গলি হতশ্রী, বন্দী, একা পড়ে রয়েছে। হঠাৎ মনে হলো, ও কান্নাটা যে আমার বুকের। তুলি আর চললো না।

মালতীকে ডেকে বল্লুম, হ্যাঁরে, আজ বুঝি ওদের বাড়ী বিয়ে।

ম্লান হেসে সে বল্লে, না, দাদা, আজ গায়ে-হলুদ, পরশু বে।

সামনের চারতোলা লালবাড়ীর ছাদের হোগলাগুলোর দিকে চেয়ে বল্লুম—ও।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সে চলে যাচ্ছিলো, আবার ডেকে বল্লুম—তোকে নেমন্তন্ন করে নি রে।

—হাঁ, সুধার দিদি এসেছিলেন, তুমি কেমন আছো জিজ্ঞাসা করলেন।

—কি গায়ে-হলুদ পাঠাবি?

—তোমায় জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলুম।

—দেখ্, আমার একখানা ছবি পাঠিয়ে দে, নিয়ে আয় ত ছবিগুলো আমি বেছে দিচ্ছি।

ভীতনয়নে সে আমার মুখের দিকে তাকালো, ভাবলে বুঝি একেবারে মাথা খারাপ হয়েছে। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্লে, আচ্ছা, দেখছি। কিন্তু করুণনয়নে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হেসে বল্লুম, না রে, আমার মাথা খারাপ হয় নি—আমি সত্যি বলছি, একটা ভালো ছবি পাঠিয়ে দে, কি সবগুলো, কি আর হবে ওগুলো রেখে—আর শাড়ী সন্দেশ কেনবার টাকা কোথায় পাবি বল্—

সে এবার বাস্তবিক ভয় পেলে। তা হয়ত আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে গেছে, ভুগছি ত বড় কম দিন নয়, তিনমাস হলো। বল্লুম, যা ভালো হয় করগে যা।

স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। মেজাজটা কেমন খারাপ

হয়ে গেলো, ক্রুদ্ধ রুক্ষ স্বরে বল্লুম, যা দিগে যা, মায়ের বিয়ের শাড়ীখানা আছে—

—না, কিছু দিতে হবে না, ওদের বাড়ী বিয়ে তা আমার কি বল্—তুই যাস্‌নে ওদের বাড়ী—বড়লোক আছো থাকো, গরীবদের এমন অপমান করার দরকার কি নেমন্তন্ন করে—

চোখের জল চেপে মাথার কাছে বসে মালতী হাওয়া করতে লাগলো ; কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। সামনের ঘড়িতে টং টং করে আটটা বাজ্‌লো। ঝাঁঝালো সুরে বল্লুম, হ্যাঁরে, এখনো ওষুধ দিলি নি, দুধ খাবার কিছু হয়েছে, না আজ রসুনচৌকির বাজনা শুনে পেট ভরে যাবে।

এবার মালতী ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। আমার সামনে সে কাঁদতে চায় না, পারে না। কোন্ দুঃখের অগ্নিতে যে চোখের সব অশ্রু শুকিয়ে তপ্তবাষ্প হয়ে গেছে তা সে বেশ জানে। তবু চোখের পাতাগুলো ভিজে এলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাক্‌লুম—মালতী।

হাসিমুখে সে ছুটে এলো, যেন কিছুই ঘটেনি। কোন বেদনার স্মৃতিকে সে আমার সামনে জাগাতে চায় না।

—কি দাদা, আর এক মিনিটে তোমার দুধটা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁরে, বিনেটা এখনও জাগে নি ?

—কৈ, তোমার বন্ধু এখনও দিব্যি ঘুমোচ্ছেন, অনেক রাত পর্য্যন্ত কি লেখাপড়া হয়েছে।

—তুই মাঝখান থেকে মারা গেলি মালতী, এই তোর হতভাগা দাদা আর তার পাগ্‌লা কবি বন্ধু—তা তোর দাদা তোকে বেশী দিন জ্বালাবে না।

—কি যা-তা বল্‌ছো দাদা—চুপ করো—

—ওরে কালাজ্বর, বুঝ্‌লি—কালাজ্বর, ও ত মৃত্যুরই পরোয়ানা।

—কেন তোমার বন্ধুটি ত বল্‌ছিলেন, কোন্ ডাক্তারের কাছে কি নতুন চিকিৎসার কথা শুনে এসেছেন—কত লোকের সার্‌ছে, খুব সার্‌বে দাদা, তুমি খালি ভয় করো, একটু মনে বল আন্‌বে না।

—ও, সে injection,—তার খরচ কত, এ পোড়ো বাড়ী বেচ্‌লেও হবে না, আর এম্নি করে বেঁচে কি হবে বল্ ?

—দাদা...

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে চলে গেলো। সে কি বল্‌তে চায় ? সে বল্‌তে চায়, আচ্ছা দাদা তুমি যদি মরো, আমার অবস্থা কি হবে বলো দেখি, হিন্দুসমাজে চোদ্দবচ্ছরের মাতৃ-পিতৃহীনা অনূঢ়া কন্যা—তুমি ছাড়া আর আত্মীয় বল্‌বার কেউ নেই। না, সে বল্‌তে চায়, সুধাকে বিয়ে করতে পার্‌লে না, এ-দুঃখেই কি তুমি মর্‌তে চাও, আর আমায় যদি তোমার ক্ষ্যাপা কবিবন্ধুটি বিয়ে না করে তবে আমিও গলায় দড়ি দেবো বল্‌তে চাও ; আমি যদি ধরো পাশের মেসের কোন ছেলেকে ভালোবেসে ফেলি, আর তার বিয়ে যদি পরশু ঘটে যায় তবে পরশু রাতে কি আমি গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মর্‌বো ?

ভালো লাগে না ভাব্‌তে। ভাব্‌লুম, একবার মালতীকে ডেকে বোঝাই, আমি ত বাঁচ্‌বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ছি, যদি মরি আমার কি দোষ বল। তাকে আর ডেকে কোন ব্যথা দিতে মন সর্‌লো না।

তার চেয়ে পুরানো মধুর স্মৃতিগুলো ভাবি। কীট্‌সের মত যদি আমার রঙীন কল্পনাশক্তি থাক্‌তো, বেশ থাক্‌তুম। কবিকল্পনাকে প্রিয়া করতে পার্‌লে পৃথিবীর কোন দুঃখের স্পর্শ লাগে না। কেননা,

She will bring inspite of frost
Beauties that the earth has lost.

ভাব্‌ছি, বর্ষা নেই, বসন্ত এসেছে, আকাশ মেঘমেদুর নয়, নীলোজ্জ্বল মন ভোলানো, বাতাসে কে মদিরা ধারা ঢেলে দিয়েছে, গলির মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটা লালে লাল। বসন্ত-প্রভাতে সরু গলিটাও বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে, আমার ভাঙা ছোটঘর হাস্‌ছে, তুলির পর তুলি বুলিয়ে ছবি এঁকে চলেছি। লাল বাড়ীটার ঠিক সামনের ঘরে সুধা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো জান্‌লার পাশে একটু এসে দাঁড়াচ্ছে, কখনো নানা অকাজ সৃষ্টি করে টেবিল গুছোচ্ছে, বিছানা ঝাড়্‌ছে—যেন ফুলের বনে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপমঞ্জরী প্রভাতের হাওয়ায় আনন্দে দুল্‌ছে, এখনো সে সব পাপ্‌ড়ি মেলেনি, সব সৌরভ ছড়ায়নি। আমি যে তাকে দেখ্‌ছি তা সে বেশ জানে, তবু যেন দেখ্‌ছি না, এম্নি ভাবে মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে—হঠাৎ চোখে চোখে মিলন হয়ে যায়, তার

গাল লাল হয়ে ওঠে, তার সরল চোখদুটো বলে—তুমি ত ভারি দুষ্টু। আমি জান্‌লা বন্ধ কর্‌তে যাই, সে পর্দা সরায়; আবার আমি পাখি তুলি, সে পর্দা গুটোয়। অন্তরের মাধুরী দিয়ে তাকে এঁকে যাই। জান্‌লা খুলি, ধীরে সে চলে যায়, দেখি তার দেহে শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব লেগেছে, গতি মন্থর, নয়নের দৃষ্টি গভীর রহস্যাকুল, কি কর্‌তে কি করে ফেলে, কাজের মাঝে বার বার আনমনা হয়—ধীরে সে চলে যায়—গোলাপী শাড়ীর ওপর কালো কেশ দুল্‌তে থাকে। তুলি পড়ে থাকে, কি নিবিড় সুখে মন ভরে আসে।

মাধবী রাত্রি, রূপালী জ্যোৎস্না গলির তলায় গিয়ে পৌছাতে পারেনি, আমার ঘরে একটু এসে পড়েছে। অন্তর কানায় কানায় ভরা, স্তব্ধ, এ জোৎস্না রাত্রির মত স্তব্ধ। শীত অস্ত, বসন্তের প্রথম বাতাস বইছে। আমার ঘরে অর্দ্ধেক জোৎস্নার আলো, তার ঘরেও অর্দ্ধেক জোৎস্নার আলো—দুজনে জোৎস্নালোকের দিকে চেয়ে এ চঞ্চল আকুল নিশীথে চুপ করে বসে আছি। সে আমাকে দেখ্‌ছে না, আমিও তাকে দেখ্‌ছি না, কিন্তু সে যে বসে আছে এ কথা দেহে মনে কেন অনুভব কর্‌ছি।

এ গতদিনের সুখস্মৃতির চেয়ে অনাগতদিনের সুখস্বপ্ন সৃষ্টি কর্‌তে আরো ভালো লাগে। ধরো, আমি যদি বন্দ্যোপাধ্যায় না হয়ে ঘোষ কি দাস কি বোস হতাম, মিত্র ছাড়া যে-কোন কায়স্থ-পরিবারে জন্মাতাম, আর, হাঁ, আর আমার যদি অনেক টাকা থাক্‌তো, তা হলে সুধার বাবা ত আমাকে কোনমতেই প্রত্যাখান কর্‌তে পার্‌তেন না।

অথবা ধরো, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ বলে বিশ্রী জিনিষটা যদি না থাক্‌তো; দেখো, নগ্নবর্ব্বরতার যুগে অসভ্য মানুষদের ব্যবস্থা ছিলো যার গায়ে জোর বেশী নারী তার, যে তাকে বাহুবলে জয় করে নিতে পার্‌বে তারি সে উপভোগ্যা। আর এ সভ্যবর্ব্বরতার যুগে মানুষের ব্যবস্থা দেখ্‌ছি, যার সিন্দুকে টাকা বেশী নারী তার, যে তাকে সোনা দিয়ে কিনে নিতে পার্‌বে। তা হলে প্রেম জিনিষটা কি নেহাৎই ফাঁকি? ধরো, এমন যদি সমাজব্যবস্থা থাক্‌তো, যে যাকে ভালবাস্‌বে সে তাকে বিয়ে কর্‌বে, ভালো না বাস্‌লে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না, তা হ'লে—

সে তাহ'লের কথা ভাব্‌তে চোখে জল আসে কেন? আমি একেবারে ক্ষেপে গেছি দেখ্‌ছি। বিকল হয়ে গেছে মাথাটা।

মালতী দুধসাবু নিয়ে মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধস্বরে ডাক্‌লে—দাদা। তার কাতর চাউনিতে বুঝ্‌লুম সে বল্‌ছে, দাদা, ভেবো না, লক্ষ্মীভাইটি অত ভাব্‌লে তুমি কেমন করে সার্‌বে?

বল্লুম, হ্যাঁরে, মালতী, তোর ভারি কষ্ট হচ্ছে, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সহজ রে—আর মিছিমিছি লড়্‌ছিস্।

রাগে মুখ গম্ভীর করে বল্লে, নাও, দুধটা খেয়ে নাও দেখি, আবার খানিক পরে ওষুধ দিতে হবে।

তাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি, আর কষ্ট বাড়াতে চাইলুম না, শান্ত হয়ে দুধটা খেয়ে নিলুম। বাটি নিয়ে আবার সে চায়ের জল চড়াতে গেল।

এম্নি করে রোগশয্যায় পড়ে থাকা, এ যেন একটা ভোগের জীবন। অবশ্য মাঝে মাঝে জ্বরের প্রকোপটা যখন বেশী হয় তখন একটু যন্ত্রণা হয়—তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকা, ছবি আঁকা, সে সত্যি তুলি দিয়েই হোক আর রঙীন কল্পনা দিয়েই হোক। মালতী আর বিনয় মিলে আমায় খাওয়াচ্ছে, সেবা কর্‌ছে আনন্দ দিচ্ছে। কোন কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে নভেল পড়ো, স্বপ্ন দেখো, নিজের মন নিয়ে যা খুসি খেলা করো। না, কাজ কর্‌তে চাই, এম্নি চুপচাপ শুয়ে শ্রান্তি আসে, জীবনের ওপর বিরাগ, বিদ্বেষ আসে—শক্তি যদি না থাকে তবে ভেঙ্গে যাক এ জীবনের জীর্ণপাত্র, আবার নতুন পাত্র ভরে নবজীবনের মদ ফেনিল হয়ে উঠুক।

মালতী, এ আমার সেবায় মা, স্নেহে বোন, পরামর্শে বন্ধু, গৃহকাজে দাসী, আদরে আব্‌দারে ছোট খুকী—ওর মুখে চাইলে মর্‌তে ইচ্ছে করে না, ভাব্‌তে বড় কষ্ট হয়,—আমি চলে গেলে আমার বন্ধু কি ওকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌বে ভাব্‌ছি।

সহসা এক খুন্তি হাতে করে মালতী চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুক্‌লো।

—দেখোনা দাদা, তোমার বন্ধু কি কর্‌ছে।

তার পেছন পেছন বিনয় এক আর্‌সোলা হাতে ঝুলিয়ে এলো।

—কেন আমায় ছেঁকা দিতে গেছ্‌লে।

—বা, তুমি যদি দশটা পর্য্যন্ত ঘুমোও জাগাতে হবে না।

—জাগালেই আমি স্থির থাক্‌তে পারি না জানো, আমার নাম কে ভুলে বিনয় রেখেছিলো, আমি হচ্ছি চঞ্চলকুমার।

মালতীর দিকে সে অগ্রসর হলো, আর মালতী এমন ভাবে ঘরের চারিদিকে দৌড়ে ঘুরতে লাগ্‌লো যেন তার প্রাণসংশয়।

আমি হেসে বল্লুম—বিনি থাম্‌।

—না, তুমি জানালা দিয়ে ফেলে দাও,—বলে মালতী ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালো।

বিনয় আর্‌সোলাটা গলিতে ফেলে দিয়ে আমার পাশে বসে আমার শীর্ণ হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলে। তাদের এই কৌতুক-অভিনয় আমাকে অনেকটা আনন্দ দেবার জন্য; আমার সহাস্য মুখ দেখেই তারা থাম্‌লো।

—বন্ধু, কেমন, রাতে ঘুম হয়েছিলো।

—কেমন আর কি, দেখ্‌ছোনা মরণের রসুনচৌকি বাজ্‌ছে।

মনে ঘা খেলেও মুখে হেসে বিনয় বল্লে, আমি ত শুন্‌তে পাচ্ছি না।

তার মনটা হাল্কা করবার জন্য বল্লুম, কাল রাত জেগে কি সব কবিতা লেখা হয়েছে।

—সে দুপুরে শুন্‌বে—দেখি চাটা কতদূর হলো,—বলে সে চলে গেলো।

মালতী একা যে বাসন মাজ্‌বে, ঘর ধোবে, আগুন ধরাবে, রাঁধ্‌বে, তা সে সইতে পারে না; জল তুলে, কয়লা ভেঙ্গে, কুটনো কুটে সে তাকে কিছু সাহায্য করতে গেলো।

বেশ আছি আমরা। এক কপর্দ্দকহীন কালাজ্বর রোগী তার ওপর সে ব্যর্থপ্রেমিক ও ছবি আঁকে; এক গৃহপরিবারহীন ভবঘুরে কবি; আর এক মাতৃপিতৃহীনা অবিবাহিতা কিশোরী। আমাদের সংসার যে কেমন করে চল্‌ছে তা আমার কাছে বড় রহস্য মনে হয়। জিজ্ঞাসা করলে, বিনয় বলে, চলে ত যাচ্ছে, বাপু, দেখ্‌ছো, আমরা কারো চুরিও কর্‌ছি না আর ধারও ধার্‌ছি না। তোমার সব খোঁজে দরকার কি, অসুখ করেছে, এখন তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে সেরে ওঠা, তোমার কাজ তুমি করে যাও।

রসুনচৌকিটা থেমেছে, ঘন ঘন শাঁক বাজ্‌ছে। লাল রংএ ছোপানো কাপড় পরে হলদে চাদর গায়ে জড়িয়ে ঝি চাকরের দল এবার গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে আস্‌ছে—এক, দুই, তিন,—পনেরো যোল,—আটাশ—ছত্রিশ—একচল্লিশ—না, আর গুন্‌তে পারি না—কত রকমের খাবার, সন্দেশ, কি সুন্দর এই পেঁয়াজীরংএর বারাণসীটা—ও রূপার গেলাস-বাটিগুলো ঝক্‌মক্‌ কর্‌ছে—ও লোলচর্ম্মা বুড়ি ঝিটা আর বইতে পার্‌ছে না—তার হাতে এসেন্স-সাবানের ট্রে যেন একটা বিদ্রূপের মত। কালো পটের ওপর দিয়ে কতগুলি রঙীন ছায়ামূর্ত্তি চলে গেলো—গলিটা স্তব্ধ কালো জলের মত আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়্‌ছে।

দিনের পর দিন চুপচাপ শুয়ে ঘরের প্রতি জিনিষের দিকে একা চেয়ে চেয়ে তাদের সঙ্গে আমার যেন অতি নিবিড় আত্মীয়তা হয়ে গেছে—ওই ভাঙা চেয়ারটা, ওই আন্‌লা, ওই Calendarএ মেমের ছবিটা, ওই শিক-ভাঙা ছাতা, ওই কতদিনের না-পরা জুতো, ওই বাঁশের ছড়ি—সবাই যেন কতকালের বন্ধু। প্রতি প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে চাইলেই, এরা যেন হেসে বলে—জেগেছো? রাতে বিছানায় অনিদ্রায় ছটফট কর্‌লে, এরা যেন ব্যথিত হয়ে বলে,—ঘুমোও, শান্ত হয়ে ঘুমোও। ওই কোণের পা-ভাঙা ডেস্কটা, ও যেন এতদিন ধরে কি বল্‌বে বল্‌বে করে বলে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে, আমি তার দিকে চাইলেই তার যেন সব গুলিয়ে যায়। ওর মধ্যে আমার সব ছবি আর বিনয়ের কবিতার খাতা পোরা আছে। এদের মুখ না থাক্‌তে পারে কিন্তু দুটো চোখ যেন কোথায় লুকানো আছে—কোন পূর্ব্বজন্মে ওদের সঙ্গে কত গল্প করেছি, এখন সে ভাষা সবাই ভুলে গেছি। আবার মাঝে মাঝে বোধ হয়, এরা নিজেদের মধ্যে আমার রোগ ব্যথা নিয়ে কত কথা কইছে। এদের সঙ্গে জানাশোনার জন্য প্রাণটা মাঝে মাঝে তৃষিত হয়ে ওঠে।

এ যা সব ভাব্‌ছি নিছক কল্পনার খেলা, দুর্ব্বল ব্যাধিক্লিষ্ট মস্তিষ্কের সৃষ্টি জানি, তবু মনে হয় এই যে রঙের তুলিটা, এ শুধু আমার হাতের যন্ত্র নয়, আমার প্রাণের বন্ধু, আমি যা ভাবি, এও তাই ভাবে, দুজনে অন্তরে মিল্‌তে পারি বলে আঁক্‌তে পারি। ইচ্ছে কর্‌ছে ওই ডেস্কটাকে বা ও

জুতোটাকে বা জামাটাকে আঁকি, কিন্তু তুলিটা ঘাড় নেড়ে বল্‌ছে, না বন্ধু, এখন একটু বিশ্রাম করো।

* * * *

রাতে কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিলো না। মালতী মাথায় বসে হাওয়া কর্‌ছিলো আর অনর্গল বকে যাচ্ছিলো—গায়ে-হলুদ নিয়ে আশিজন লোক এসেছে, এরা দশহাজার টাকা দিচ্ছে, নগদ কিছুই নয়, মেয়েকে গয়নায় সাজিয়ে দেবে, বর বুঝি এম-এ পড়ে, ইত্যাদি।

কতক শুন্‌ছিলুম, কতক শুন্‌ছিলুম না। বল্লুম, সুধাকে একবার দেখাতে পারিস?

মালতী স্নিগ্ধনেত্রে আমার দিকে চেয়ে র'লো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, সে তার ছোট ভাইকে একবার সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে লুকিয়ে পাঠিয়েছিলো, আমি কেন যাইনি, তোমার অসুখ বাড়লো নাকি, জান্‌তে—তোমার সঙ্গে কি করে দেখা কর্‌তে বোল্‌বো বল—

—তা হলে তুই সত্যি যাস্‌নি, আমার কথায় রাগ করেছিলি?—অন্যায় হয়ে গেল।

—না, দাদা, যাবো।

—হাঁ, কাল যাস্—না, না, আমি কি আর তাকে সত্যি সত্যি এখানে আন্‌তে বল্‌ছি রে? তোর সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিলুম, বুঝ্‌লি—ওরা বেশ একটা শাড়ী দিয়েছে—

—হাঁ, দাদা, সে শাড়ী পরে সুধাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো, আর গলার একটা চুনিপান্নাবসানো হার কি সুন্দর দিয়েছে—

—যা ঘুমোগে যা।

—না, দাদা, তোমায় ঘুম পাড়িয়ে যাবো, না হলে আর তোমার আজ রাতে ঘুম হবে না—ওই তোমার বন্ধু এলেন, গান শোনা যাচ্ছে, সুর না কত—কি করে উনি কবিতা লেখেন?

—যা তোরা খেয়ে নিগে যা।

শুধু একবার তাকে দেখ্‌তে চাই—রক্তপট্টবস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কৃতা চন্দনচর্চ্চিতভালে সলজ্জা নববধূর আনন্দমূর্ত্তি।

বিষ্টি বন্ধ হয়েছে, আকাশটা বেশ শান্ত, একটু নির্ম্মল। মাছের আঁশের আর লুচিভাজার গন্ধ, হৈ চৈ চীৎকার, ঝি-বামুনদের ঝগ্‌ড়ার শব্দ আস্‌ছিলো বলে ও-বাড়ীর দিকের জান্‌লাগুলো সারাদিন বন্ধ ছিলো। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ যখন বর এলো, তাকে আর দেখ্‌তে পেলুম না, শুধু দেখ্‌লুম ফুলের সাজপরা আলোময় মোটরটা অনেকক্ষণ ঝক্‌ঝক্ আর্ত্তনাদ করে অনেক কষ্টে গলি থেকে বেরোলো।

ঘরের আলো বের করে, সব জান্‌লাগুলো খুলে, বালিসে হেলান দিয়ে জান্‌লার মুখে এসে বস্‌লুম। লাল নীল কত রংএর ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় সাজানো বিয়েবাড়ী বরযাত্রী কন্যাযাত্রী আহূত রবাহূতের গোলমালে ভরা।

আমার সাম্‌নের ঘরেই কনেকে সাজানো হচ্ছে, তার চারদিকে মেয়ের দল ঘিরে রয়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু কত নবীনা প্রবীণার কত কথা কানে আস্‌ছে। 'কনে-চন্দন কৈ?' 'হারটা একটু ওদিক করে দাও না—আংটি কোথা গেল, আংটি?' 'কি সুন্দর তোমার মেয়েকে দেখাচ্ছে ভাই, যেন অপ্সরী', 'ডানাকাটা পরী', 'ওগো, চেলির ওদিকটা তুলে দাও, মেজেয় লুটোচ্ছে যে', 'পিঁড়ে কৈ? কি আল্‌পনা কাটার ছিরি?' 'ডাকোনা গো সব ভগ্নীপতিদের, কনে তুলে নিয়ে যাক', 'সরে দাঁড়াও না সব বাপু,—মেয়ের গরম হচ্ছে দেখ্‌ছো না—মেজবৌ পাখা,—পাখা', 'আমার মাথা, কি আদিখ্যেতার কথাই বল্‌লেন', 'ওগো বউরা সব, জান্‌লাটা একটু ছেড়ে দাঁড়াও না, কনে একটু ঠাণ্ডা হোক।'

কনে সাজানো শেষ হলো। সুধা দাঁড়িয়ে ভিড় সরিয়ে জান্‌লার দিকে আস্‌ছে, লাল চেলির ওপর ওই সোনার হারের চিকিমিকি, ওই হাতের চুড়ি, আংটি—ওই তার মুক্তার হার জড়ানো সুন্দর গলা—ওই মুখ দেখা যাচ্ছে—

ওঃ, ঠিক সেই সময়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোর তার পুড়ে সব আলো নিভে গেলো। 'আলো—আলো', আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, 'ওগো', একটা আলো জ্বালো।'

অন্ধকার বাড়ীটা আমার দিকে চেয়ে অট্টহাস্যে বল্লে, 'আলো আলো'! বর্ষা হলেও ত শুক্লপক্ষ, কি তিথি জানি না, কিন্তু চাঁদ কি সব আলো নিঃশেষ করে দেউলে হয়েছিলো, এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু জ্যোৎস্না পাঠাতে পার্‌তো না?

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—'সুধা—আলো—অন্ধকারে তোমার মুখ কেমন করে দেখ্‌বো!'

আমার আর্ত্তনাদ বিয়েবাড়ীর লোকজনের চীৎকারের

সঙ্গে মিলিয়ে গেলো বটে, কিন্তু সাম্‌নের ঘরে যখন আলো এলো, সে নববধূ আর দাঁড়িয়ে নেই, সে মেজেতে লুটিয়ে পড়েছে।

মেয়েদের আর্ত্তনাদ কানে এলো—ওগো কনের একি হলো—জল আনো মেজ বৌ—পাখা—'ওরে মোক্ষদা, একটা পাখা শীগ্‌গির—আহা সারাদিন খায়নি—কচি মেয়ে কি করে থাক্‌বে—যাও না বাপু সব ঘর ছেড়ে, এ ঘরে এত ভিড় কেন—কনের সর্দ্দিগার্ম্মি হয়েছে দেখ্‌ছো না—জল—পাখা—ওই যে—ওঠ ত মা আস্তে আস্তে—'

বিছানায় মুখ গুঁজে পড়্‌লুম। কিছুক্ষণ পরে শাঁখ ও হুলুধ্বনির শব্দে যখন মুখ তুল্‌লুম দেখি সাম্‌নের ঘরটা জনহীন, অন্ধকার, ঘরের সামনে দালানে ছাদ্‌নাতলার আলোয় সবাই গিয়ে জমেছে।

কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না, অন্ধকার ঘরটার দিকে চেয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—এখন সুধা টোপর-পরা বরের সাম্‌নে পিঁড়ের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আর তাদের চারিদিকে কুলবধুরা মঙ্গলঝারি হতে জল ছড়াতে ছড়াতে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে ঘুর্‌ছে, সুন্দরীদের হস্তপদ্মের আলোকশিখায় কারও নীলবাস ঝলমল কর্‌ছে, কারও গোলাপী শাড়ীতে আগুন লেগেছে, কারও সবুজ শাড়ীতে চাঁদের আলোর বান এসেছে—সে আলোকশিখা যুবতীতনুখচিত সোনা-হীরার আভরণে, হাস্যদীপ্ত লাবণ্যময় মুখে, আনন্দদীপ্ত চোখে, রক্তিম ললাটে, তাম্বুলরঞ্জিত অধরে, অলক্তকরক্ত চরণ, জরিজড়ানো কালো কেশে অপরূপ দ্যুতি মণ্ডিত করে বিদ্যুতের মত লীলা কর্‌ছে—তাদের চরণের তালে তালে হার বালা দুল সব দুল্‌ছে, রিনিঝিনি মৃদু শব্দ হচ্ছে—ওর মুখখানি যেন শরতের শেফালী, ওর চোখ যেন প্রভাতের পদ্ম, ওর ঠোঁট যেন বসন্তের কৃষ্ণচূড়া, ওর হাত যেন পুষ্পবল্লরী, ওর হাসি যেন সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, ওর চলন যেন বেণুবনের কাঁপন। আর এদের মাঝে পাষাণপ্রতিমার মত বসে আছে মূর্চ্ছাহতা অলঙ্কারপীড়িতা সুধা।

এবার কনের ঘোরার পালা। দুই তিন জন মিলে গুন্‌ছে, বার বার গুলিয়ে যাচ্ছে—এক—দুই—তিন—ও যেন কত ঘণ্টা লাগ্‌ছে—এই সাত হয়ে গেলো—নাপিতের গালাগাল শেষ হোলো—এবার শুভদৃষ্টি—

জান্‌লাটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়্‌লুম। তারপর বিয়েবাড়ীর কোন শব্দ এসে কানে পৌছালো না। শ্রাবণের আকাশ ভেঙ্গে ঝড় জল এসে সব আলো গান উৎসব ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিলে।

সারারাত হাওয়া যেন পাগল মাতালের মত গলিতে বন্ধ হয়ে সব বাড়ীতে মাথা ঠুকে ঠুকে হা হা করে আর্ত্তনাদ করে ফিরেছে, আর আকাশে যত যুগের যত ব্যথার অশ্রু জমা ছিলো সব ওই গলিটায় ঝরে পড়্‌লো।

* * * *

কাল দুপুরে বরকনে কখন চলে গেলো জানি না। তখন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ভয়ঙ্কর ছটফট কর্‌ছিলুম। মালতী একবার চেষ্টা করে জান্‌লার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। বিয়েবাড়ীর সবাইয়ের মুখে এক কথা—সুধা বড্ড বেশী কাঁদ্‌ছে, বড্ড কেঁদেছে।

ছাত থেকে হোগ্‌লাগুলো খুলে নিচ্ছে, গলির কোণে আঁস্তাকুড়ে কলাপাতা ভাঙা গেলাস খুরি খাবারের পাহাড়ে কাকদের ভোজন-উৎসব বসেছে।

আকাশের ছিন্ন মেঘ হতে একটু আলো ঘরে এসে পড়েছে, হাওয়ায় যেন শরৎ-ঋতুর উত্তরীর গন্ধ। একটা ছোট চড়াই পাখী জান্‌লায় এসে উড়ে বস্‌লো। বন্ধু কাল যে রজনীগন্ধাটি এনেছে তার দিকে তার যেন লোভ। এই মুমূর্ষু চোখে ওই শুভ্রনির্ম্মল ফুলের দিকে চাইতে ব্যথা বোধ হয়। প্রকৃতির শ্যামল কোলের জন্য প্রাণ তৃষিত হয়ে ওঠে—নদীজলের ধারা, প্রভাত-পাখীদলের গান, বনভূমির সৌরভ, ফুলফলের রং, খোলা আকাশের নীচে শরতের সোনার প্রভাত। না, সে মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাইতে বড় লজ্জা হবে—সেখানে প্রাণ প্রতিপ্রভাতে সঞ্জীবিত হয়ে নবরূপ ধারণ করে, কত কত লক্ষ লক্ষ বৎসর গেলো, তবু সুন্দরী পৃথিবী তরুণী রয়েছে, কোথায়ও জরা নেই, এ অনন্তযৌবনা, নবনবসৌন্দর্য্যময়ী, প্রাণের এ নবনবলীলানিকেতনে আমার আর স্থান নেই বুঝি। কে চেয়েছিলো এ প্রাণকে? কে দিয়েছিলো এ প্রাণকে! এ প্রাণকে কে যেন আমায় পৃথিবীর কার্‌বার কর্‌বার-জন্য ধার দিয়েছিলো, সে মূলধন ত সব উজাড় হয়ে গেলো, সুদও কিছু রইলো না, আজ দেউলে হয়ে প্রাণকে উড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে চাই।

একটা কালো পোকা ঘুরতে ঘুরতে সার্সির কাচে লেগে মরে পড়ে গেলো। ওই মরা পোকাটার দিকে চেয়ে ভাবছি প্রাণটা কি! যাঁকে ঈশ্বর বলে, সেই বিশ্বজীবন কি এই প্রাণ দেহে ভরে দিয়েছে, আবার আপন খুসীমত কেড়ে নেবে? এই জড়দেহের গাড়িতে শক্তির ঘোড়া জুতে কি সেই আত্মা কোচম্যানের মত হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে? ছোট বেলায় সাবানের ফেনা খড়ে পুরে ফুঁ দিয়ে রঙীন বল্ করে খেল্তুম। কোন বল্টা অর্দ্ধেক হয়েই খড়ের মুখে ফাট্তো, কোনটা সবটা হয়ে ফাট্তো, কোনটা বা খানিকদুর উড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো। মনে হচ্ছে এম্নি করে কে আমাদের জীবনটা নিয়ে খেলা করছে, তার হাতের সব বল্ই ত ফেটে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তবে এত রঙীন করে গড়া কেন? আত্মা আছে, তা অজর অমর, একথা অনেক বইয়ে পড়েছি, অনেকের সঙ্গে তর্ক করেও বুঝিয়েছি, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, হয়ত কিছুই নেই, ওটা আমাদের কল্পনার সৃষ্টি, মনকে প্রবোধ দেওয়া। তা হলে ত ওই ঘোড়াটার, ওই আর্সোলার, ওই পোকার, ওই টিক্‌টিকিরও আত্মা আছে। সে-রকম আত্মা আমি চাই না, তার চেয়ে না থাকাই আমার ভালো।

আচ্ছা, প্রকৃতির নিয়ম সহ্য করা যায়, ঈশ্বর তাকে চিরকালের জন্য বেঁধে দিয়েছেন, তার হুকুম সবাইকেই মান্তে হবে, কিন্তু এই মানুষের গড়া নিয়ম এই সমাজের শাসন অসহ্য—এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।

একটা কিছু ঠিক করে ভাব্তে পার্ছি না, চিন্তাসূত্রের খেই খালি হারিয়ে যাচ্ছে।

নারীকে ভালোবাস্তে হবে অকারণে, সে সুন্দরী বলে নয়, সতী বলে নয়, বুদ্ধিমতী বা সেবিকা বলে নয়, সে নারী বলে। সেখানে কোন তর্কবিচার থাক্‌বে না, কোন উপমা অলঙ্কার থাক্‌বে না—প্রেম হবে এক দেহমন-প্রদীপে অচঞ্চল অগ্নিশিখা, নিছক মাধুর্য্য, সব ভুলে ডুবে যাওয়া—সেই প্রেমেই নারী জেগে ওঠে, সত্যিকার আনন্দ পায়।

সেই প্রেম নিয়ে তার দ্বারে গেছ্লুম, কিন্তু সে ত নারী নয়, চোদ্দ বচ্ছরের সুধা—এত সরল, এত মিষ্টি—সে এ সমাজের অত্যাচারের কি বোঝে, নারীর অধিকারের কি জানে—সে ত ভোর বেলার এক নির্ম্মল সুন্দর ফুলের কুঁড়ি, আমার প্রেমের আলোয় তার একটু রং লেগেছিলো, পাতাগুলো একটু শিউরে উঠেছিলো। যেদিন তার অন্তর রাঙা গোলাপ হয়ে ফুটবে, এই ভোরের আলোর কথা কি তার মনে থাক্‌বে? যে যত ভালোবাসে তার দুঃখ তত বেশী—ভালো না বাসাই সবচেয়ে ভালো। আমার বয়সই বা এত কি বেশী? উনিশ। হিসাব নিকাশ কর্‌ছি না, তবু এই ছোট জীবনের জমাখরচের খাতাটা দেখ্‌ছি—শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিগুলো বার বার দেখে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি—কোন পাতায় হিজিবিজি, কোথাও হিসেব মেলেনি, কোথাও একটু রঙীন ছবি আঁকা, কোন পাতায় কালো রেখা—আর শেষের এক রাশ পাতা একেবারে সাদা। আচ্ছা মৃত্যুর পর এই জীবনের খাতাখানির সব লেখা একেবারে মুছে যাবে অথবা ওই সমস্ত হিজিবিজির আশ্চর্য্য অর্থ বেরোবে? জীবনে কিছু করে যেতে পার্‌লুম না, জীবন শেষ হয়ে আস্‌ছে, শেষের পাতাগুলো সাদাই থাক্‌বে। সব আশা স্বপ্ন রেখে দাও, ঘন অন্ধকার নদীর তীরে এসে পৌঁছেছি, স্তব্ধ কালো জল, চারিদিকের মানুষেরা যেন ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমায় আর তাদের দর্কার নেই, তাদের আর আমার দর্কার নেই—আচ্ছা ওই কালো নদী পেরিয়ে কি নতুন দেশ আছে, না, জলে জল হয়ে যাবো? যদি থাকে, সে যেন পৃথিবীরই মত রূপে রসে গন্ধে ভরা প্রেমস্নিগ্ধ হয়, সেখানে যেন সাতটি রংকে পাই আর আমার মানসীকে।

একটা ঝগ্‌ড়া কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে কারো সঙ্গে, সৃষ্টি-কর্ত্তার যদি দেখা পেতুম একবার মনের সাধে তর্ক করে ঝগ্‌ড়া করে শান্তি পেতুম।

ঘরে হাসির ঢেউ তুলে মালতী এসে আমার গলা জড়িয়ে বল্লে,—এর একটা বিচার তুমি করে দাও দাদা। তোমার বন্ধু, হয় তিনি রাঁধুন, নয় কবিতা লিখুন—তা নয় ভাত ডাল চড়িয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বস্‌বেন আর আমার ভাত ধরে তর্‌কারি পুড়ে যাক—

—না, দেখো বন্ধু, একটা উপমা লিখ্‌তে লিখ্‌তে কেমন একটু দেরী হয়েছিলো, তাই ভাত একটু ধরেছে—

—আচ্ছা রান্নাঘরে আর এ খাতা নিয়ে ঢুক্‌লে আমি উনানের আগুনে দেবো বল্‌ছি—

আমি হেসে বল্লুম,—আচ্ছা, first warning দিয়ে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

আমার হাসিমুখ দেখে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, আচ্ছা বেশ।

ওরা ইচ্ছে করে ঝগ্‌ড়া বানিয়ে খুন্‌সুটি করে আমার কাছে নালিশ করবার জন্য ছুটে আসে—আমার মনে একটু আনন্দ দেবার জন্য ওদের চিন্তার চেষ্টার অন্ত নেই। হায়রে, দুঃখের ভাগ কি কেউ নিতে পারে? এ মৃত্যুর পথ যে বিজন একা-চলার পথ। বন্ধু কি করতে পারে? ব্যথিত হতে পারে, সেবা করতে পারে, কিন্তু দুঃখ কমাতে পারে এমন গর্ব্ব করলে দুঃখকে অপমান করা হয়।

* * * *

মৃত্যুটা যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মনে হচ্ছে এ দেহ আমার দেহ নয়। এই শীর্ণ হাত জীর্ণ দেহ ছেড়ে আমি বাড়ীর চারদিকে শূন্যে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কাল সন্ধ্যেবেলায় বিনয় ঘরে ঢুকে আমায় জড়িয়ে বল্লে, বন্ধু পেয়েছি।

হেসে বল্লুম, কি পেয়েছো? তোমার কবিতার বই ছাপাবার পাব্‌লিশারকে, না আমার ছবির ক্রেতাকে?

সে বল্লে,—না হে, যখন বরাত খোলে, এম্নি হয়, একসঙ্গে দুটো মাষ্টারি, একটা চাকরি। এবার তোমার injectionএর ব্যবস্থা হচ্ছে।

বল্লম,—হাঁ, প্লানচেটে আমার ভূতটাকে এনে তার গা ফুঁড়ে চিকিৎসা কোরো।

যাক্, এরা দুটো যে না খেতে পেয়ে মরবে না, মরার আগে এই তৃপ্তিটুক্ লাভ করলুম।

যদি আমার টাকা থাকতো, একবার দেখে নিতুম রোগটাকে—দেখে নিতুম, কে বড়—আমি, না সেই ছার-পোকা, আমার দেহে যে কালাজ্বরের জীবাণু ঢুকিয়েছে সে, আমাতে আর সেই Leishmania donovaniতে একটা রীতিমত যুদ্ধ হোত। যা নেই, তার জন্য দুঃখ করে কি হবে।

* * * *

রাতে ঘুম হয় না। এই পিতৃপিতামহদের স্মৃতিবিজড়িত পোড়ো বাড়ীখানা যেন মাঝে মাঝে কেঁদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নীচেকার বালিখসা ভাঙা ঘরগুলোর চাম্‌চিকে ইঁদুর আর্‌সোলার রাতের উৎসব ভূতদলের নৃত্যের মত।

কাল রাতে হঠাৎ মনে হলো, মা যেন আমার মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছেন—আয় বাছা আয়।

জান্‌লার দিকে চেয়ে দেখি, কৈ কেউ নেই। গির্জ্জের ঘড়িতে একটা বাজ্‌লো, লালবাড়ীটা অন্ধকার, নিঝুম। অনন্ত আকাশের এক টুক্‌রা জান্‌লা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—কয়েকটা তারা জ্বল্‌ছে। ওই যেন মৃত্যু সারথি তার নীহারিকায় গড়া রথ নিয়ে এসেছে, চার গ্রহ দিয়ে চার চাকা তৈরী, Great Bear, Little Bearএর মত দুটো ঘোড়া জোতা।

উনিশ বছর আগে যেদিন সে পৃথিবীর আনন্দপুরীর পথে আমায় নামিয়ে দিয়েছিলো, সে দিন হয়ত সে হেসেছিলো, আর আমি মাটির বক্ষে পড়ে কেঁদেছিলুম। আজও তার মুখে মন-ভোলানো হাসি, কিন্তু আমার চোখ জলে ভরে আস্‌ছে যে।

না, আমার মোটেই ভয় করছে না, দুঃখ হচ্ছে না, এই ছোট পৃথিবীতে উনিশ বছরের জীবনে যদি এত রূপ এত গান এত প্রাণ অনুভব করে থাকি তবে এই নীলযবনিকার অন্তরালে যে অনন্ত জগৎ রয়েছে সেখানে কি ওর চেয়ে কম সৌন্দর্য্য কম আনন্দ পাবো, অনন্ত জীবনে কত সুধা ভরে উঠ্‌বে—

না, এসব কবিত্ব করতে ভালো লাগে না, বিদ্রোহ করতে চাই—সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের নিয়মের বিরুদ্ধে।

আচ্ছা যদি মরি একবার পৃথিবীটা ঘুরে গ্রহতারা দেখ্‌তে বেরোব। একটা জ্বালা, অশান্তি, কিছুতেই দূর হচ্ছে না। বেল্‌জিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে আল্‌সের চূড়ায় বসে কাঞ্চনজঙ্ঘায় অরুণোদয়ের আভা মেখে প্যাসিফিকের এক টাইফুনে দুলে আট্‌লান্টিকের এক সাইক্লোনে গান গেয়ে নর্থপোলের এক তুষার-ঝাপ্‌টায় জয়ধ্বনি তুলে আর সবশেষে একরাতে জ্যোৎস্নালোকে সুধার বিছানায় তাকে দেখে চলে যাবো অনন্ত যাত্রায়—

কালো গলিটা করুণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে

আছে। ওরে, তোর বুকের উপর দিয়ে শ্রাবণের ধারা ঝরা এবার শেষ হবে, শরতের আলো এসে পড়্‌বে, বসন্ত চঞ্চল চরণে চলে যাবে—ছয়ঋতুর রঙ্গীন উত্তরীয় এখানে একটু লুটিয়ে যাবে। এই পথ দিয়ে যদি কোন গভীর স্তব্ধরাতে আমার মৃতদেহ নিয়ে যায়, তার জন্যে এত দুঃখ কি? একদিন ত এই পথ দিয়েই আলো জালিয়ে গীত-উৎসবে বিবাহের বর এসেছিলো। আবার এই পথ দিয়েই সেই নববধূ কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীবেশে ফিরে আস্‌বে।

* * * *

অবসাদ আসে, শূন্যতা, ব্যর্থতা। এ কিসের দুঃখ? মনে হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির মর্ম্মস্থলে কিসের বেদনা আছে, তৃপ্তি কিছুতেই হচ্ছে না। জগৎস্রষ্টা নিছক আনন্দে এ বিশ্ব সৃষ্টি করেন নি, তাঁর বুকের মধ্যে কি অভাব ব্যথা রয়েছে। কিসের জন্য আমার তৃষ্ণা? প্রেমের জন্য? সুখের জন্য? জীবনের জন্য? বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ক্ষুধিত বন্যজন্তু যেমন শিকারের সন্ধানে মত্ত হয়ে ঘোরে তেম্নি আমার মনে কে চাই চাই বলে কেঁদে ফির্‌ছে। ঈশ্বর কাকে বলে, জানি না, এই বেদনা এই কান্নাই আমার কাছে দেবতা; তাকে আমি পূজা কর্‌তে, তার পায়ে জীবনশক্তির নৈবেদ্য এনে দিতে চাই।

কিন্তু এ জীবনে আর যে কিছু দেবার নেই প্রভু, এ মরণের পর যা থাকে তোমায় দিলাম।

একটা ছবি আঁক্‌বো ভাব্‌ছি। মৃত্যু প্রিয়ার মত আমার মাথার গোড়ায় এসে এ শীর্ণ মুখে জীর্ণ কপালে রক্তহীন অধরে জ্যোতিহারা চোখে চুমো খেয়ে শ্রাবণমেঘের মত তার কেশভারে জীর্ণদেহ ঢেকে নীহারিকার মত শুভ্র তরীতে তুলে নিয়ে চলেছে—কালো যমুনা-জলের মত তার রং, বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল তার আঁখি, জ্যোৎস্নাধৌত সুনীল পালে উষা-অরুণ-মণ্ডিত হাল ধরে লক্ষ-তারা-ছড়ানো অনন্ত সাগর দিয়ে তরী ভাসিয়ে চলেছে—রোগজীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নবকলেবর ধারণ করে অনন্ত জীবন-স্রোতে ভেসে চলেছি।

হাতটা বড় কাঁপ্‌ছে, আঁক্‌তে কিছুতেই পার্‌ছি না, আঁক্‌তে আর চাই না—চোখে সব রং গুলিয়ে আসে।

কিন্তু এই কালো গলির ভাঙা বাড়ীতে ড্রেনে-পচা ইঁদুরের মত মর্‌তে ইচ্ছে করে না—

ইচ্ছে কর্‌ছে, যখন একে একে তারা মিলিয়ে যাচ্ছে, শরতের উষার আকাশ থেকে সোনা গলে গলে পড়্‌ছে, সেই রাত্রিদিনের সন্ধিক্ষণে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, জলভরা নদীর তীরে কাশবন শেফালীবনের পাশে, ধানেভরা ক্ষেতের সাম্‌নে শিশির-ভেজা ঘাসে শুয়ে প্রভাত-পাখীর প্রথম গানের পূর্ব্বে পৃথিবীর শেষ নিশ্বাস ফেলি।

আঁকাবাঁকা কালো গলিটা করুণ নয়নে তাকিয়ে বল্‌ছে —হাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে করে, এই ইটের বাড়ীস্তূপের বাঁধন ছিঁড়ে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে খোলামাঠ পার হয়ে শেফালী বনের পাশে নদীর খেয়াঘাটে গিয়ে পড়ি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

অ-কেজোর গান

ঐ
ঘাসের ফুলে মটরশুঁটির ক্ষেতে
আমার এ মন্-মৌমাছি ভাই উঠেচে আজ মেতে।
এই রোদ্-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
ফুলের মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন্ শুনি মাঠে রেতে॥

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হল্‌দে আঁচল চল্‌তে জড়ায় অড়হরের ফুলে।
ঐ বাব্‌লা-ফুলে নাক-ছাবি তার,
গা'য় শাড়ি নীল অপ্‌রাজিতার;
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইসারায় পথে যেতে যেতে॥
ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুঁটির ক্ষেতে
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেচে তাই মেতে॥

কাজী নজরুল ইসলাম।



ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে অত্যাধুনিক যুগে (Pleistocene epoch) আধুনিক মানবের বিকাশ হইয়াছিল কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক-একটি বিষয়ে নানারূপ মত আছে। তন্মধ্যে যে মত আধুনিক ও প্রামাণিক, তাহাই গ্রাহ্য। আমি আধুনিক ও প্রামাণিক মতের উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছি যে, অত্যাধুনিক যুগে মানব অপেক্ষাকৃত সভ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। অবশ্য, এই মানব প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইয়োরোপীয় মানব। ভারতীয় প্রাচীন মানব সম্বন্ধে এখনও বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। সুতরাং ইয়োরোপীয় প্রাচীন মানবের অবস্থা হইতেই ভারতীয় প্রাচীন মানবের অবস্থা অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অনুমানও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইতে পারে। হয়ত প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন ইয়োরোপের মানব একই যুগে সমবস্থ ছিল না। যাহাই হউক, প্রাচীন ইয়োরোপের মানব সম্বন্ধে কতিপয় বৈজ্ঞানিক মত আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি ইহা বলিতে চাই যে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মধ্যাধুনিক (Miocene) যুগের স্থিতিকাল নয়লক্ষ বৎসর, বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগের স্থিতিকাল পাঁচলক্ষ বৎসর এবং অত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগের স্থিতিকাল চারিলক্ষ বৎসর স্থির করিয়াছেন।

ডক্‌টর কীথ তাঁহার Antiquity of Man (1916) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন:—"There is not a single fact known to me which makes the existence of a human form in the *Miocene period* an impossibility" (p. 511) অর্থাৎ তাঁহার মতে মধ্যাধুনিক যুগে অর্থাৎ প্রায় ১৮ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানবাকারবিশিষ্ট জীবের, আবির্ভাব অসম্ভব নহে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ অল্পাধুনিক (Oligocene) যুগেও মানবের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে:—"It is also maintained that flints, similar in shape and chipping (as those of the Pliocene epoch), have been discovered in deposits of Miocene and even of Oligocene age" (৫১পৃষ্ঠা)। এই মত Encyclopaedia Britannicaও (11th Edition, Chronology) সমর্থন করিতেছে—And to the age of man must be allotted a period *some* hundreds of times as great as the five thousand and odd years allowed by the old chronologists" অর্থাৎ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ কিঞ্চিদধিক পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবের আবির্ভাবকাল স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তজ্জন্য পাঁচসহস্র বৎসরের শত শত গুণ বৎসর ধরিতে হইবে। যাঁহারা Oligocene এবং Miocene যুগে মানবের আবির্ভাব অসম্ভব মনে করেন না, তাঁহারা যে Pliocene (বহ্বাধুনিক) যুগে মানবের আবির্ভাব বিশ্বাস করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিলাতের পিল্ট্‌ডাউন নামক স্থানে মানবের যে করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ডক্‌টর কীথ বলেন:—"Dr. Dawson and Dr. Smith Woodward were ultra-cautious in assigning a Pleistocene date to the remains found at Piltdown. All the evidence seems to point to a Pliocene age." (P. 315)। পুনশ্চ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন:—"When Dr. Smith Woodward assigns the Piltdown remains to an early phase of the Pleistocene epoch, we may in the present state of our knowledge, suppos chim to refer to a time which is removed about half a mill on years from the present" (p. 308) অর্থাৎ পিল্‌ট্‌ডাউন নামক স্থানে যে মানবের করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই মানব বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই মানবের মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে ডক্‌টর কীথ নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"If then, we find a fairly large brain in the Piltdown man, with an arrangement and development of convolutions very unlike those of modern man, we shall be justified in drawing the conclusion that, so far as potential mental ability is concerned, *he had reached the modern standard.* We must always keep in mind that accomplishments and inventions which seem so simple to us were new and unsolved problems to the pioneers who worked their way from a simian to a human estate" (p. 401).

যদি ইয়োরোপের এক কোণে পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান-কালের মানবের ন্যায় প্রাচীন মানবের মানসিক বিকাশ সম্ভাব্য হইয়াছিল, তাহা হইলে ততকালপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণেরও যে সেইরূপ বা ততোধিক মানসিক বিকাশসাধন হইয়াছিল, ইহা মনে করা কি অসঙ্গত?

ডক্‌টর কীথ অন্যত্র বলিয়াছেন:—"In mid-Pleistocene times, the brain of Neanderthal man, in point clese of size, was equal to that of contemporary form of modern man. His culture, that of the Mousterian age, was not a low one (p. 503) অর্থাৎ বর্ত্তমান মনুষ্যের ন্যায় অত্যাধুনিক যুগের মধ্যভাগের নেয়াণ্ডার্থাল নামক মনুষ্য-গণেরও মস্তিষ্ক আকারে তুল্য ছিল, এবং তাহাদের সভ্যতা নিতান্ত নিকৃষ্ট ছিল না।

Pleistocene (অত্যাধুনিক) যুগে আধুনিক মানবের পূর্ব্বপুরুষগণ যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ওয়াডিয়া তাঁহার Geology of India (1919) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন:—As in other parts of the world, the pleistocene in India also is distinguished by the presence of Man, and is known as the human epoch" (p. 269) অর্থাৎ অত্যাধুনিক যুগে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ন্যায় ভারতেও মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ইহা মানবীয় যুগ নামে অভিহিত।

রেভারেণ্ড ই ও জেম্‌স্‌ তাঁহার "Introduction to Anthropology" (1919) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মধ্যাধুনিক যুগেও মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল:—"There are forms (of palæolithic implements) that have been discovered in the upper-Miocene which shows signs of regular chipping only explicable when regarded as the result of human workmanship" (p. 69)। অত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগ, যে মানবীয় যুগ, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই:—"The geologist divides the earth's strata into definite ages of which the earliest to contain indisputable evidence of human remains is the pleistocene period" (p. 27). অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন:—"The Palæolithic period of archæology corresponds roughly to the Pleistocene of the geologist while the pre-palæolithic or Eolithic Period extended far back into the Tertiary Era" (p. 98). এই অত্যাধুনিক যুগে প্রাচীন মানব কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিল, জেম্‌স্‌ তাহাও বলিয়াছেন:—"It may be reasonably supposed that clothing like cave-dwelling was one of the arts of life learnt by man in the Pleistocene—probably early in the Mousterian phase" (p. 98). অর্থাৎ মানব অত্যাধুনিক যুগে গুহাতে বাস ও বস্ত্র বয়ন করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই যুগে প্রাচীন মানব অগ্নির ব্যবহারও জানিত—"In the early Pleistocene there is evidence of its (fire's) existence, as, for example, in the hearths discovered in the Mousterian sites" (p. 98)। চকমকি ঠুকিয়া অথবা দুইখানি শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া প্রাচীন মানব অগ্নি উৎপাদন করিত। ঋগ্বেদেও অগ্নিকে প্রস্তরের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১০।২০।৭) এবং দুইটি অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করার উল্লেখও আছে। ঋগ্বেদের যুগের আর্য্য মনুষ্যগণ মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করিত (১০।২৬।৬) এবং বল্কলও ব্যবহার করিত। নব্যপ্রস্তরায়ুধযুগের মনুষ্যের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যগণও সূক্ষ্মাগ্র শৃঙ্গসমূহ তীরের ফলক রূপে ব্যবহার করিত এবং জীবজন্তুর সুদৃঢ় অস্থিসমূহ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। দধীচির অস্থি হইতে ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এই দধীচির অশ্বমুণ্ড থাকায় (১।৮৪।১; ৬।১১৬।১২), অনেকে অনুমান করেন যে অশ্বাস্থি পূর্ব্বকালে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে চর্ম্মের আচ্ছাদন এবং চর্ম্মের নানাবিধ পাত্রের উল্লেখ আছে। কাষ্ঠময় পাত্রেরও বহু উল্লেখ আছে। এইসমস্তই যে নব্যপ্রস্তরায়ুধযুগের সভ্যতার নিদর্শন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অতএব ঋগ্বেদের আর্য্যগণকে Pleistocene বা অত্যাধুনিক যুগের মানব বলা যে অন্যায় ও অসঙ্গত হইয়াছে তাহা নহে।

"রাজপুতানা সমুদ্র" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ধীরেন্দ্র-বাবু বিন্ধ্যগিরি কোন্ সময়ে সমুদ্রগর্ভে ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখের তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না। আমি লিখিয়াছি বিন্ধ্য বা আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদমূলে "রাজপুতানা সমুদ্র" তৃতীয়ক (Tertiary Era) যুগে বর্ত্তমান ছিল। যে কারণেই হউক, এই সমুদ্র বিশুষ্ক বা সমুদ্রতল উত্থিত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইলেও মধ্যে মধ্যে ইহার অধিকাংশ বা কিয়দংশ আয়ুবমহাসাগর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর জলমগ্ন থাকিত। জলমগ্ন থাকার কালে ইহাকে সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছুই বলা হইত না। ঋগ্বেদে সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে, এইরূপ উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সেই মন্ত্র রচনার সময়ে রাজপুতানার অধিকাংশ বা কিয়দংশ সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল।

অত্যাধুনিক যুগের মানব ও মানবসভ্যতা সম্বন্ধে উপরে যে-সমস্ত প্রমাণ দেওয়া হইল, তদ্দ্বারা পূজ্যপাদ ঋষিগণের মানবত্ব ও ঋষিত্বের যে কোনও গ্লানি ও হানি হইবে না, তৎসম্বন্ধে ধীরেন্দ্র-বাবু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। ঋগ্বেদের কোনও কোনও মন্ত্রের রচনা যে লক্ষাধিক বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং আর্য্যমানবের প্রাচীনত্ব যে লক্ষ লক্ষ বৎসরেরও অধিক, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

উদ্ভিজ্জের চেতনা ও "ভারতশ্রমজীবী"

আশ্বিনের প্রবাসীতে উদ্ভিজ্জের চেতনা সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া সুখী হইলাম। তরুলতার যে প্রাণ আছে—অনুভূতি আছে—হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি আছে—তাহা অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে ঋষিগণ, মনীষীগণ ও জ্ঞানীগণ নানা প্রকারে জ্ঞাত ছিলেন। তবে, সকলের জ্ঞান সমান ভাবে স্পষ্ট না থাকিতে পারে; কাহারো বা জ্ঞান কল্পনা বিমিশ্রিতও হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বৃক্ষলতার প্রাণ, অনুভূতি ও হিতাহিত বিবেচনা যে আছে তাহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও যে একেবারে ধরা পড়ে নাই, তাহা বলা যায় না। ডারউইনের Origin of Species গ্রন্থ, তাঁহার Fertilization of Orchid বই এবং গ্রাণ্ট এলেনের Sagacity and Wisdom of Plants নামক কেতাব প্রভৃতি পড়িয়া কি এ কথা বুঝা যায় না? কিন্তু এইসব বই পড়িয়া ও সংস্কৃত পুঁথী পড়িয়া এক রকম বুঝা, আর, স্যার জগদীশের পরীক্ষা দেখিয়া আর এক রকম বুঝা। উভয়ে তফাৎ অনেক। উল্লিখিত বই ও পুঁথী পড়িয়া আমরা আনুমানে থাকি—ভাবি, খুব সম্ভব; কিন্তু পরীক্ষা দেখিয়া আমরা বুঝি যে কঠিন জমীনে দাঁড়াইয়া, ও বলিতে হয় "নিশ্চয়ই।" ১৮৮৫।৮৬ সালে স্যার জগদীশ উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্য্যে হাত দিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু সে সময় তাঁহার এ বিষয়ে কোন লেখা বাহির হয় নাই। সেই সময়কার "ভারতশ্রমজীবী" নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকায় উদ্ভিজ্জের প্রাণ ও হিতাহিত-বিবেচনাশক্তি সংক্রান্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল; তাহাতে লতা ও গুল্ম সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষার কথা বিবৃত হইয়াছিল, এবং মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে ভীষ্ম এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সুস্পষ্ট বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। আপনার প্রবন্ধকারেরা শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু বৃক্ষলতার যে হিতাহিত বিবেচনা আছে—কোন্ কার্য্য হিতকর এবং কোন কার্য্য গর্হিত তাহা বুঝিবার যে সামর্থ্য আছে—তাহা ভীষ্ম অতি বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বৃক্ষাদির সজীবত্ব

গত আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে "উদ্ভিজ্জে চৈতন্য" ও "উদ্ভিজ্জের চেতনা" এই নামে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বৃক্ষাদির সজীবত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, প্রথম প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় প্রবন্ধেও কেবল সাংখ্যদর্শন হইতেই তিনটি সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃক্ষলতাদির সজীবত্ব সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যে আলোচনা আছে, তাহা প্রচারিত হওয়া উচিত, এই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

আচার্য্য উদয়ন, প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকা 'কিরণাবলী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বৃক্ষের যখন জীবন, মরণ, স্বপ্ন, জাগরণ, রোগ, চিকিৎসা প্রভৃতি আছে, তখন মনুষ্যাদির শরীরের দৃষ্টান্তে তাহার সজীবত্বই সিদ্ধ হয়; বৃক্ষাদির সজীবত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ এই যে, মাধবীলতা নিজের অনুকূল মনে করিয়া সহকারতরুকেই অবলম্বন করে—কণ্টক-বৃক্ষকে কখনও আশ্রয় করে না। মূলে জলসেক করিলে বা 'দোহদ' অর্পণ করিলে ফলপুষ্পাদি বর্দ্ধিত হয়, এবং বৃক্ষের কোনও অংশ কাটিয়া ফেলিলে ক্রমশঃ তাহা পরিপূর্ত্তি লাভ করে। ইহাতেই অনুভূত হয় যে, বৃক্ষের প্রাণ আছে (১)। বৃক্ষ যে সজীব, এ বিষয়ে বহু শাস্ত্রপ্রমাণও আছে, তাই উদয়নাচার্য্য শেষে লিখিয়াছেন,—"আগমশ্চাত্রার্থে বহুতরোঽনুসন্ধেয়ঃ।"

উদয়নাচার্য্য যে গ্রন্থের ব্যাখ্যাবসরে বৃক্ষের সজীবত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই প্রশস্তপাদ ভাষ্যে কিন্তু মনুষ্যাদির শরীরের ন্যায় বৃক্ষও যে শরীর, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। ভাষ্যে বরং বৃক্ষলতাদি স্থাবর পদার্থকে 'বিষয়ের' অন্তর্ভূতরূপে গণনা করা হইয়াছে (২)। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য, শরীর নিরূপণের সময়ে বৃক্ষের উল্লেখ না করায় উদয়ন লিখিয়াছেন যে (৩), মনুষ্যাদির শরীরের ন্যায় বৃক্ষও যখন শরীর, তখন এইখানেই তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল, কিন্তু বৃক্ষের চৈতন্য অতি অস্ফুট, এইজন্যই বিষয়ের অন্তর্ভূতরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক পদার্থের অন্তর্ভূত বস্তুও যে ভাষ্যকার পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদয়ন তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। উদয়নের এই আত্মপক্ষসমর্থনের চেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, বৃক্ষাদিও যে শরীর, এ সিদ্ধান্ত, তাঁহার পূর্ব্বে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ছিল না—তিনি একটা নূতন মত প্রচারের আয়োজন করিয়াছেন। ভাষ্যের অন্যতম টীকাকার উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীধরাচার্য্য শরীর নিরূপণের ব্যাখ্যাবসরে বৃক্ষশরীরের উল্লেখ করেন নাই, প্রত্যুত আত্ম-নিরূপণের প্রস্তাবে বৃক্ষ যে সজীব নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন (৪)। শ্রীধরের মতে বৃক্ষ যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ছিন্ন বা ভগ্ন অংশ যে পুনর্ব্বার গঠিত হয়, ঈশ্বরই তাহার প্রতিকারণ। তার পর, উদয়নাচার্য্য অপেক্ষা বহু প্রাচীন বাচস্পতিমিশ্র এবং জয়ন্তভট্টও যে বৃক্ষের সজীবত্ব স্বীকার করিতেন না, তাহা "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য-টীকা" ও "ন্যায়মঞ্জরী" দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় (৫)। কিন্তু মহর্ষি গৌতম যে সূত্র করিয়াছেন ["চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয় শরীরম্।" ১।১।১১], সেই সূত্রানুসারে বৃক্ষও যে জীববিশেষের ভোগায়তন শরীর, তাহা যেন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যাহার চেষ্টা আছে, তাহাই শরীর। ক্রিয়ামাত্রই চেষ্টা নহে, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থও শরীর-লক্ষণের লক্ষ্য হইয়া পড়ে। তবে 'কা পুনরিয়ং চেষ্টা?' উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"হিতাহিতপ্রাপ্তি পরীহারার্থঃ স্পন্দঃ।" হিতের প্রাপ্তি এবং অহিতের পরিহারের নিমিত্ত কৃতপ্রযত্ন ব্যক্তির যে ক্রিয়া, তাহাই চেষ্টা। ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়নও এই কথা বলিয়াছেন। ঈদৃশ ক্রিয়া ঘটাদি পদার্থে না থাকিলেও বৃক্ষে তাহার অসদ্ভাব নাই। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বৃক্ষ লতাদি অনুকূল আশ্রয়কেই অবলম্বন করে। এইজন্য আচার্য্য উদয়ন বৃক্ষের সজীবত্ব সিদ্ধির প্রমাণে লিখিয়াছেন,—"অনুকূলোপগম প্রতিকূলাপগমাদিভ্যঃ"। চেষ্টার ন্যায় ইন্দ্রিয় এবং অর্থও বৃক্ষশরীরে আছে। লজ্জাবতী লতার যে ত্বগিন্দ্রিয় আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 'অর্থ' শব্দের অর্থ, সুখ দুঃখ। বৃক্ষেরও সুখ দুঃখ আছে। "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্" (১।১।১১) এই সূত্রের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—"বৃক্ষাদৌ সুখ-দুঃখ-স্বীকারান্নাব্যাপ্তিঃ।"—বৃক্ষাদিতে সুখ দুঃখ আছে, কাজেই তাহা শরীর-লক্ষণের অলক্ষ্য হইল না। বৃক্ষের যে দুঃখ আছে, তাহা দুর্গা-পূজার একটি মন্ত্রপাঠেও জানিতে পারা যায় (৬)।

জৈন দার্শনিকেরা বৃক্ষের সজীবত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে জীব দ্বিবিধ—ত্রস ও স্থাবর। বৃক্ষ, স্থাবর জীবের অন্তর্ভূত। উমাস্বামী লিখিয়াছেন,—"পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুবনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ।"—

তত্ত্বার্থসূত্র, ২।১৩

সূত্রের ব্যাখ্যায় অকলঙ্কদেব বলিয়াছেন,—"পৃথিবীকায়াদয়ঃ সন্তি তদুদয়নিমিত্তা জীবেষু পৃথিব্যাদয়ঃ সংজ্ঞা বেদিতব্যাঃ" (রাজ-বার্ত্তিক, ৮৮ পৃঃ)। জৈন মতে স্থাবর জীবের স্পর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোনও ইন্দ্রিয় নাই (৭)।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

(১) "বৃক্ষাদয়ঃ প্রতিনিয়ত ভোক্ত্রধিষ্ঠিতা জীবন-মরণ-স্বপ্ন-জাগরণ-রোগ-ভেষজপ্রয়োগ-সজাতীয়ানুবন্ধানুকূলোপগম প্রতিকূলাপগমাদিভ্যঃ, প্রসিদ্ধশরীরবৎ। ন বৈ তে সন্দিগ্ধাসিদ্ধাঃ আধ্যাত্মিক বায়ুসম্বন্ধাৎ সোঽপি মূলে নিষিক্তানামপাং দোহদস্য চ পার্থিবস্য ধাতোরভ্যাদানাৎ। তদপি বৃদ্ধিভগ্নক্ষতসংরোহণাভ্যামিতি।"—কিরণাবলী, ৫৮ পৃঃ।

(২) "বিষয়স্তু দ্ব্যণুকাদিক্রমেণারব্ধস্ত্রিবিধো মৃৎপাষাণস্থাবরলক্ষণঃ। স্থাবরাস্তৃণৌষধি-বৃক্ষলতাবতান বনস্পতয়ঃ।"—প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, ২৮ পৃঃ।

(৩) "যদ্যপি চোদ্ভিদোঽপি বৃক্ষাদয়ঃ শরীরভেদতয়া অত্রৈব ব্যাখ্যাতুমুচিতাঃ, তথাপ্যন্তঃসংজ্ঞতয়া…বিষয়তাং বিবক্ষন্ তেষোন্তর্ভাব্য ব্যাখ্যাস্যন্তে।"—কিরণাবলী, ৫৭ পৃঃ।

(৪) "বৃক্ষাদিগতেন বৃদ্ধ্যাদিনা ব্যভিচার ইতি চেন্ন তস্যাপীশ্বর-কৃতত্বাৎ। ন তু বৃক্ষাদয়ঃ সাত্মকাঃ বৃদ্ধ্যাদ্যুৎপাদনসমর্থস্য বিশিষ্টাত্ম-সম্বন্ধস্যাভাবাৎ।"—কন্দলী, ৮৩ পৃঃ।

(৫) "চেষ্টা-ব্যাপারঃ স চাতিব্যাপকতয়া অব্যাপকতয়া চ ন লক্ষণং বৃক্ষাদিষু ভাবাৎ অভাবাচ্চ পাষাণমধ্যবর্ত্তি-মণ্ডূকাদি-শরীর ইতি ভাবঃ।……প্রযুক্তস্যোৎপাদিতস্য ন ব্যাপার মাত্রং চেষ্টা ইত্তি-মত্তাঽপি ঽ বিশিষ্টো ব্যাপারঃ স চ ন বৃক্ষাদিষস্তীতি নাতিব্যাপকতা।"—তাৎপর্য্যটীকা, ১৪৮ পৃঃ।

"ননু চেষ্টা ক্রিয়া ক্রিয়াবত্বে চ সত্যপি ন বৃক্ষাদীনাং শরীরত্ব-মিত্যতিব্যাপকং লক্ষণং বিশিষ্ট চেষ্টাশ্রয়ত্বস্য বিশিষ্ট প্রমেয়লক্ষণ প্রক্রমেঽবসীয়মানত্বাৎ।"—ন্যায়মঞ্জরী, ৪৭৪ পৃঃ।

(৬) বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ।
গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দেবীপূজাং করোম্যহং॥
শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো।
দেবৈর্গৃহীত্বা ত্বৎশাখাং পূজ্যা দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ॥
—কালিকা-পুরাণ।

(৭) "উক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রতিনিয়তবিষয়াণাং স্বামিত্বনির্দ্দেশে কর্ত্তব্যে যৎ প্রথমং গৃহীতং স্পর্শনং তস্য তাবৎ স্বামিত্বাবধারণার্থমাহ—
"বনস্পত্যন্তানামেকম্।"—তত্ত্বার্থসূত্র, ২।২১। একং প্রথমমিত্যর্থঃ। কিং তৎ? স্পর্শনম্।"—সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ১৭০-৭১ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও খুলনা-দুর্ভিক্ষে সাহায্য

কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'র ১১১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে "দেশবিদেশের কথা"র অন্তর্গত "বাংলা" শীর্ষক অংশে লিখিত হইয়াছে যে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার দরুণ "পনর শত

টাকা উঠিয়াছে।" এই সংবাদ 'কাশীপুর-নিবাসী' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় দুটি সাধারণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত সঙ্গীতসঙ্ঘ, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সঙ্গীতসঙ্ঘের মজলিসের দিন বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি জানান যে ঐদিন টিকিট বিক্রয়ের দরুণ পনর শত টাকা উঠিয়াছে এবং ঐ টাকা খুলনা দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে দেওয়া হইবে। সংবাদপত্রটি সম্ভবতঃ এই টাকার উল্লেখ করিতেছে। যে বক্তৃতার টিকিট বিক্রয়ের টাকা খুলনা দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১৮ই আগষ্ট আল্‌ফ্রেড্‌ থিয়েটারে প্রদত্ত হয় এবং তাহার দরুণ পনর শত টাকা নহে ৬৬০৷৹ উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ২৭শে আগষ্টের "হিন্দুস্থানে' আমার পত্র দ্রষ্টব্য। ইতি

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত।

বাঙালীর ইতিহাস

একজন বড় পণ্ডিতের নিকটে হয়ত এই সাহিত্যিক প্রথা বা রীতি অতি কঠোর, যে একজন সাধারণ লোকেও তাঁহার নিজের জানা কোন তথ্যের কথা আগে লিখিয়া ফেলিলে, নিজের মৌলিকতা গবেষণা চাপিয়া পরের কথা স্বীকার করিতে হয়। নব্যভারত ছাড়া "প্রবাসী"তেও "বহির্ভারত" প্রবন্ধে বংলং জাতির কথা ছিল, ও সেই প্রবন্ধ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "প্রাচীন-সভ্যতায়" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। এসকল লেখার একটিও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চোখে পড়ে নাই বটে, তবে একটা বিষয়ে তাঁহার একটুখানি স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা হইবার পর, বক্তৃতাটি ঢাকা-রিভিউ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্‌, আমাকে সেই সময় বলিয়াছিলেন যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার ঐ বক্তৃতাটির ও অন্যান্য বক্তৃতার সমালোচনা করিবেন। ও প্রসঙ্গে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, কারণ অধিক কথায় বৃথা বিবাদের সৃষ্টি হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তমিলকম্‌ রাজ্যের ইতিহাসাদির সম্বন্ধে বড় বড় লোকের ভাল ভাল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন; 'কিন্তু ঠিক' এই কথাটি ঐ গ্রন্থে নাই, যে—"বঙ্গদেশের পঙ্গল-তেরীয়র জাতি মাদ্রাজ অঞ্চলে গিয়া আবাস ও রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল।"

শিলপ্পথিকরন্‌ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বটে কিন্তু উহাতে দূর সম্পর্কেও উক্ত বিষয়ের উল্লেখ নাই।৹ পরলোকগত পিলে মহাশয় রচিত "১৮০০ বৎসর পূর্ব্বের তামিল দেশের কথা" গ্রন্থখানিতে বহু জাতির উল্লেখ আছে, ও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে; কিন্তু সে গ্রন্থেও উক্ত বিষয়টি নাই। যাহা হউক সুপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ বিষয় আমার গ্রন্থে পড়িবার পূর্ব্বেই অন্য কোন গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবেন; তবে গ্রন্থখানির নাম তাঁহার স্মরণ না থাকিতে পারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অমৃত-পিয়াসা

পথের ধারে ওই যে অশথ-গাছে
এখনো তার নামটি লেখা আছে।
পথিক বালক দাঁড়িয়ে শীতল ছায়ে
রাখ্‌লে এঁকে নামটি গাছের গায়ে।
পথের লোকে স্মরবে লেখা দেখে
তাই সে আহা নামটি গেছে রেখে।

এ নয় খেলা, আমোদ করে লেখা,
যেথায়-সেথায় পাই যে ইহার দেখা,—
কেউ পিরামিড, কেউ বা মিনার গাঁথে,
কেউ বা লেখে তাম্র পুঁথির পাতে,
এক পিপাসা একই আবেগভরে
কেউ বা পুতুল কেউ বা মহল গড়ে।

কেউ লেখনী কেউ তুলিকা ধরি
নামটি চাহে রাখ্‌তে অমর করি।
তপ করে কেউ এ বর শুধু মাগি,
মথন করে সিন্ধু ইহার লাগি।
ইহার লাগিই যুদ্ধ দেবাসুরে,
ইহার তৃষাই জাগ্‌ছে ভুবন জুড়ে।

মানব কেন ছাড়্‌বে, আমি ভাবি,
অমৃতে তার জন্ম হতে দাবী।
সুধার ক্ষুধাই জাগ্‌ছে যে ওই দাগে,
মন্থনেরি ঢেউটি বুকে লাগে।
আদিম তৃষা মিটবে নরের কিসে,
দাবীর কথা রক্তে আছে মিশে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মহিলা-মজলিস



আন্তর্জাতিক নারী-সম্মিলন

অন্যান্য অনেক প্রচেষ্টার ন্যায় নারী-প্রচেষ্টাটিও দিনদিন আন্তর্জাতিক হইয়া উঠিতেছে। বহুদেশের রমণীগণ মিলিত হইয়া যাহাতে আপনাদের একতা ও ভিন্ন সত্তা অনুভব করিতে পারেন এবং সেই অনুসারে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার সুযোগ পাইতে পারেন তাহারই কিছু কিছু আয়োজন চলিতেছে রাশিয়াতে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সর্ব্বপ্রথম এরূপ একটি সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। সেই সময় রাশিয়াতে পৃথিবীর গণতান্ত্রিকদের একটি সভা হয়। তাহাতে ঠিক হইয়াছিল পুরুষদের ন্যায় পৃথিবীর নারীদেরও গণতন্ত্রবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাঁহারাও জীবনযুদ্ধে গণতান্ত্রিকদের মত ধনিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন। সেই অনুসারে সর্ব্বপ্রথম নারী-সভাটি ডাকা হয়। সেখানে স্থির হইয়াছিল একটি আন্তর্জাতিক নারীসঙ্ঘ স্থাপন করা। জার্ম্মানী-নিবাসী শ্রীমতী ক্লারা জেট্‌কিন তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীমতী আলেক্‌জান্দ্রা কোল্লোন্‌টাই হইলেন তাঁহার সহকারিণী। শ্রীমতী ক্লারা জেট্‌কিন জার্ম্মান রাইক্‌ষ্টাগ বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। তাঁহার বয়স এখন ৬৫ বৎসর, কিন্তু তিনি এখনও খুব উদ্যমশীলা আছেন। জার্ম্মানীতে তিনি বহুবৎসর ধরিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীমতী কোল্লোন্‌টাই একজন রুশ, রাশিয়ার বিপ্লবে ইঁহার হাত বিস্তর। লেনিন ও ট্রোট্‌স্কিকে বিপ্লব-সময়ে তিনি অনেক বিষয়েই সাহায্য করেন। রাশিয়ার জনহিত বিভাগের তিনিই সর্ব্বপ্রথম নারী পরিদর্শিকা পদে নিযুক্ত হন। তাহা ছাড়া অনেক মনীষাসম্পন্না রমণীও এই সঙ্ঘের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী জি লিলিনা, শ্রীমতী ক্রুপ্‌স্কায়া ও ফ্রান্সের চিন্তাশীল ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত রোমাঁ রোলাঁর ভগ্নী রোলাঁ হল্‌ষ্ট্‌ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন। শ্রীমতী লিলিনা এই সঙ্ঘের একজন বিশেষ উদ্যমশীলা সভ্য। তিনি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিকদের কার্য্যনির্ব্বাহ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গ্রাগরী জিনোভিভের স্ত্রী। শ্রীমতী ক্রুপ্‌স্কায়া জগদ্‌বিখ্যাত লেলিনের স্ত্রী। তিনি রাশিয়ার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি এই সঙ্ঘের চেষ্টায় রাশিয়ার মস্কাউ নগরে আন্তর্জাতিক নারীসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ৯ই জুন হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত এই কন্‌ফারেন্সের বৈঠক বসে। ২৮টি দেশ হইতে ৮২ জন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। চীন, বোখারা, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও বাদ যায় নাই। নানা দেশ হইতে নানা ভাবে ও নানা পোষাকে তাঁহারা এ সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। প্রতিনিধি ছাড়াও আরও অনেকে দর্শক রূপে সভায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষেরাও ছিলেন। একদল ভারতীয় বিপ্লব-বাদীও সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

সভাটি খুব সমারোহ সহকারে আরম্ভ হয়। ট্রোট্‌স্কি প্রভৃতি রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তারা অনেকেই এই সভায় আসিয়াছিলেন এবং এই সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপনাদের সহানুভূতি জানাইয়া গিয়াছেন। জানাইবারই কথা। কারণ, সভাটি তাঁহাদের উদ্যোগেই আহূত হইয়াছিল, এবং একরকম বলিতে গেলে ইহা রাশিয়ার গণতান্ত্রিকদেরই একটি খণ্ড প্রচেষ্টা। রাশিয়ার বিপ্লবে রমণীদের হাত অনেকটা। সে কথা অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরাও এ সভায় স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে রমণীরাও পুরুষদের সহিত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ রাশিয়াতে গণতন্ত্র স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। সেজন্য রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীতে রমণীর স্থান নেহাৎ কম নয়।

শ্রীমতী কোল্লোন্‌টাই সব কয়দিন সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, উইক্রেন, তুরস্ক প্রভৃতি বহু-দেশের রমণীগণই সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি রুশ জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। প্রতিদিন সভার আরম্ভে ও পরে উপস্থিত সকলে সমস্বরে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটি গাহিতেন।



আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের নেত্রীগণ।

জি লিলিনা, সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য। ক্লারা জেট্‌কিন, সম্মেলনের সম্পাদক, সাম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থাবাদীদের প্রতিনিধি—জার্ম্মান রাইখ্‌ষ্টাগ্‌। আলেক্‌জান্দ্রা কল্লোন্‌টাই, সম্মেলনের সহকারী সম্পাদক, সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্টের প্রজাহিতসাধন সমিতির প্রথম নারী অধ্যক্ষ।

সেখানকার সকলের বক্তৃতার মধ্যে এই কথাটাই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে দুই চারিটা অধিকার লাভেই নারীসমস্যা মীমাংসিত হইবে না। নারীসমস্যার মূল কথাটিও যা, শ্রমিক-সমস্যারও তাই—সেটি হইতেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তোলা এবং স্ব-ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবার সুযোগ দেওয়া। ধনিক সম্প্রদায়ের তাঁবেদারীতে সমাজ যতদিন থাকিবে ততদিন আর তাহা ঘটিতেছে না। তাই শ্রমিকদের মতন নারীর এখন প্রধান কাজ—ধনিক-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা—রাশিয়ার মতন দেশে দেশে গণতন্ত্রের স্থাপনা করা।

আন্তর্জাতিক নারীসঙ্ঘটি গত বৎসরে কি কি কাজ করিয়াছেন তাহার একটি বিবরণী শ্রীমতী কোল্লোন্‌টাই পাঠ করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের সহিত এই সঙ্ঘটির যোগ স্থাপন করার একটা কথা ছিল। কিন্তু গত বৎসর যুদ্ধ চলিতে থাকায় দেশদেশান্তরে যাতায়াতের অসুবিধায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু রাশিয়াতে ও পার্শ্ববর্ত্তী গণতন্ত্র-গুলির মধ্যে তাঁহারা অনেক কাজ করিতে পারিয়াছেন। বিবরণীটির মধ্যে সেখানকার নারীদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় বেশ ভাল করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট নারীশিক্ষার জন্য যাহা করিতেছেন তাহারও একটি বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কোল্লোন্‌টাই তাঁহার বিবরণী শেষ করিয়া কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে মেয়েদের প্রধান শত্রু তাঁহাদের ঔদাসীন্য, তাই তাঁহাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য এই ঔদাসীন্যকে, এই জড়ত্বকে দূর করা। তাহার জন্য তিনি বলেন, মানবের সকল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই মেয়েদের সমানদাবীতে যাওয়া উচিত, যুদ্ধব্যাপারেও মেয়েদের বিরত হওয়া উচিত নয়, বরঞ্চ গণতান্ত্রিকেরা যে নূতন সমাজ

প্রতিষ্ঠাতে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সশস্ত্র যোগ দেওয়া উচিত। মেয়েদের মাতৃত্বের দাবী শ্রীমতী কোল্লোন্‌টাই ভুলিয়া যান নাই। তাই তাঁহার একটি প্রস্তাব এই মাতৃত্বকে সামাজিক কর্ত্তব্যরূপে স্বীকার করা। প্রকৃতি নারীকে মানবজাতির ধাত্রী ও রক্ষয়িত্রীরূপে যে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ত ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাদের এই বিশেষত্বের জন্য তাঁহাদের কার্য্যকলাপের একটু বিশেষ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

আবশ্যক। অনেকেই তাঁহার কথা সমর্থন করিয়াছেন। তাই ঠিক হইয়াছে যে ভিন্ন একটি সভায় প্রাচ্যদেশের মেয়েদের জন্য কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইবে।

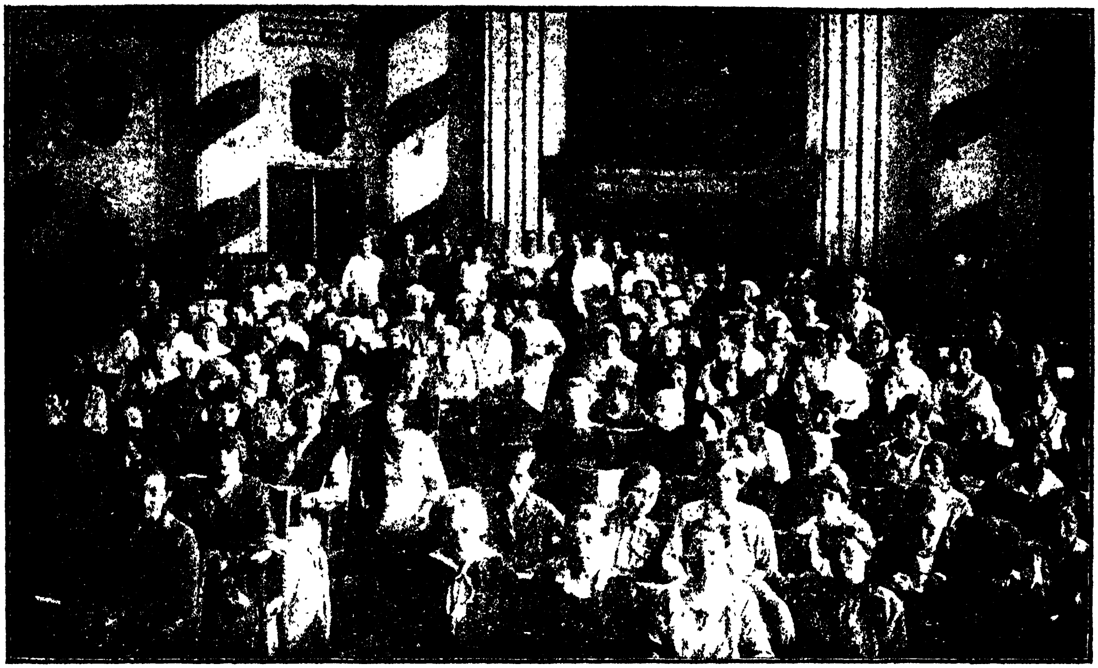
কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ব্যাপারটা মিটিলে পরে শ্রীমতী ক্লারা জেট্‌কিন একটা কথা বলেন। তিনি বলেন যে ভাবিয়া দেখিতে গেলে নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল না; গণতান্ত্রিকদের ও তাঁহাদের কথা একই —সাম্যমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; একটি



আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে আগত প্রাচ্যদেশীয় মহিলাগণ।

ইহার পরে জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের মেয়েরা বক্তৃতা করিয়া, কাগজে লিখিয়া, ঘরে ঘরে গিয়া প্রত্যেক মেয়েদের বুঝাইয়া, নারীপ্রচেষ্টার জন্য কি কি ভাবে কাজ করিতেছেন কেহ কেহ তাহা বলেন। পারস্য হইতে কোন নারী প্রতিনিধি হইয়া আসেন নাই। তাই একটি পারসিক পুরুষ পারস্যের তরফ হইতে সভায় নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে পাশ্চাত্য দেশের নারীরা যে প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন প্রাচ্যদের তাহা করা অসম্ভব। তাঁহাদের জন্য ভিন্ন প্রণালীর

প্রতিষ্ঠানেই এই কাজটি চলিতে পারে; কিন্তু সকল দেশের নারীদের অবস্থা ও চিন্তা এক রকম নয়; সেজন্য সকল দেশের নারীদের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবার জন্য একটি বিশেষ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গণতান্ত্রিকদের প্রতিষ্ঠান হইতে একটা স্বতন্ত্র কিছু নয়, গণতান্ত্রিকদের প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ বিশেষ; পুরুষদের সঙ্গে তাঁহাদের কোনো বিরোধ নাই, বিরোধ হইতেছে একটা মতবাদ লইয়া; গণতান্ত্রিক পুরুষদের সঙ্গেই সমানে সমানে সেই মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে।



আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন। আটাশটি বিভিন্ন দেশ হইতে ৮২ জন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন।

কি প্রকারে তাঁহারা কাজ করিবেন তাহার একটি তালিকা সেখানে প্রস্তুত করা হইয়াছে। তুরস্ক, বোখারা, পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের মেয়েদের মধ্যে কাজ করিবারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রধান কাজ হইবে মেয়েদের সম্বন্ধে অন্যায় প্রথা, আইন ও সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এবং গৃহে, সমাজে ও সন্তানদের উপর সমান অধিকার লাভের চেষ্টা। এইসকল কাজের জন্য তাঁহারা দেশে দেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন, বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, সভা সমিতি করিবেন; গৃহে গৃহে গিয়া মেয়েদের নিকট তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিবেন। এবং যেখানে যেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে সেখানে সেখানে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধীয় আইন-গুলিকে নিরপেক্ষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। এক কথায়, সকল দেশের মেয়েদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে জাগ্রত ও সচেতন করিয়া তুলিবেন যাহাতে তাঁহাদের সাহায্যে প্রত্যেক দেশে নূতন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রস্তাবগুলি সমালোচনা করিয়া দেখিলে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে যে তাঁহাদের নূতন প্রস্তাবিত সমাজ স্থাপনে তাঁহারা বিপ্লবপন্থী,—ধীরে ধীরে সংস্কার পন্থার উপর তাহাদের আস্থা নাই। ধনিকসম্প্রদায়ের তাঁবেদারীতে বর্ত্তমান যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে কোনো সত্য ও প্রয়োজনীয় সংস্কারই সম্ভবপর নয়। শাসনপদ্ধতিটি জনসঙ্ঘের হাতে আসিলেই প্রকৃত সংস্কার আরম্ভ হইবে।

কন্‌ফারেন্সের শেষ দিন রাশিয়ার দেশখ্যাত প্রধান সেনাপতি ট্রোট্‌স্কি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতাও করেন। তিনি বলেন বর্ত্তমানে জগৎ ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারাই শাসিত, তাহাদেরই স্বার্থের দিক-চাহিয়া নিয়ম কানুন গঠিত হইতেছে। রাশিয়ার বিপ্লব সেই ধনিক সম্প্রদায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—যাহাতে অত্যাচরিত লোকেরা আপনাদের শক্তি বিকশিত করিতে পারে তাহার পথ প্রমুক্ত করিয়াছে। নারীপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যও ঠিক রাশিয়ার বিপ্লবের উদ্দেশ্যের মতনই অত্যাচারিত ও অবনত জনসঙ্ঘের মুক্তি ও উন্নতি করা। কাজেই গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসনপ্রণালী স্থাপনে

নারীরা প্রধান সহায়। পাশ্চাত্য দেশের নারীদের মতন প্রাচ্যের নারীদেরও এ ক্ষেত্রে টানিয়া আনা উচিত। জগতের ভবিষ্যৎ তাঁহাদের উপরই অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

ট্রোট্‌স্কির বক্তৃতা শেষ হইবা মাত্রই একটি মজার ঘটনা ঘটে। পারস্য, তুরস্ক, আজারবৈজান, আর্মেনিয়া, বোখারা, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে একদল মহিলা এ সভায় যোগদান করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহারা ঠিক সময় আসিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইসব অবগুণ্ঠনবতী পর্দানশীন মহিলাদের আগমনে সভার মধ্যে একটা মহোল্লাস পড়িয়া গেল। সকলেই একটা জমাট ভাব অনুভব করিলেন।

ইহার পর সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ হইয়া রাশিয়ার বিপ্লবে নিহত দেশভক্তদের সম্মানার্থে তাঁহাদের কবরের অভিমুখে রওনা হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহাদের ও নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া কার্য্য সমাপন করেন।

ডাক-হর্‌করা।

অহল্যা-উৎসব

মারাঠার ইতিহাসে রাণী অহল্যাবাইর নাম চিরস্মরণীয়। শুধু মারাঠা কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অহল্যাবাই পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী মহিলা। তিনি হোল্‌কার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মাল্‌হার রাও হোল্‌কারের পুত্রবধূ ছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অহল্যাবাই স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হন। মাল্‌হার রাও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করেন। তাঁহার স্বামীর নাম ছিল খান্দে রাও। তিনি জাঠদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শ্বশুরের অনুরোধে সহমরণে না যাইয়া অহল্যাবাই ভালই করিয়াছিলেন। তিনি পরে দেখিলেন, তিনি না থাকিলে উত্তর ভারতের শত্রুদের দমন করিয়া নিজরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা বৃদ্ধ মাল্‌হার রাওর পক্ষে বিশেষ কষ্টের কারণ হইত।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাল্‌হার রাও হোল্‌কারের মৃত্যু হয়। তখন অহল্যাবাই আপনার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। তার পরে তাঁহার পুত্র মালোজীরাওর মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। অহল্যাবাই তাহাতে সম্মত না হইয়া নিজেই সমস্ত রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, এবং মালব ও মধ্যভারত শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রজাবাৎসল্য ছিল। তিনি বলিতেন "মী আজ জে কাঁহী সামর্থ্যাচা ব সত্তেচা বলাবর করীত আহে, ত্যাচা মলা পরমেশ্বরাপাশীঁ জাব দ্যাবা লাগেল।" অর্থাৎ—"শাসন-কর্ত্রী রূপে আমি যাহা কিছু করিব, তাহার জন্য পরমেশ্বরের



পুণ্যশ্লোকা রাণী অহল্যাবাই।

কাছে আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।" তিনি কখনও প্রজাদের ধরিয়া বেগার খাটাইতে দিতেন না; সকল প্রজার উপর কর্ম্মচারীদের জুলুম নিবারণের জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। এজন্য প্রজারাও তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অহল্যাবাইর শাসনকাল অতুলনীয় ঘটনা। তাঁহার মত শক্তিসম্পন্না নারী যে-দেশে জন্মিয়াছে

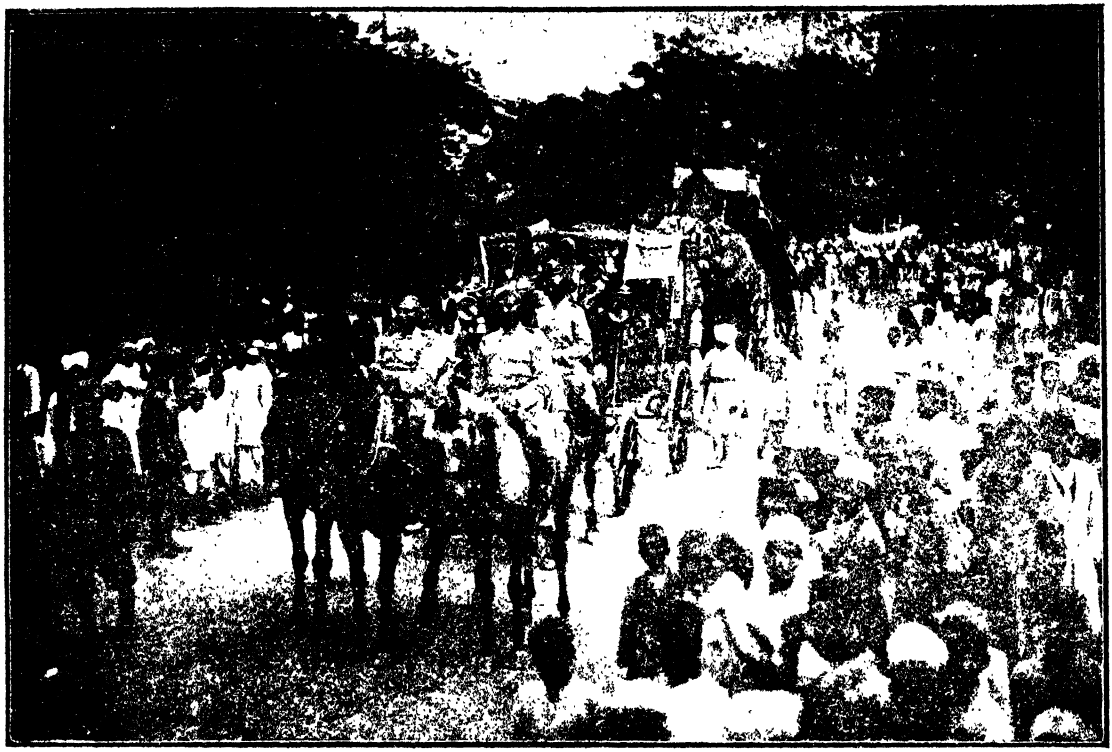


অহল্যা-উৎসবে অহল্যাবাইর পাল্কী বহন।



রাঘব দাদার বিরুদ্ধে অহল্যাবাইর নারী-সৈন্যের অভিযান অভিনয়।

সে-দেশ গৌরবান্বিত। তাই ইন্দোরের প্রজাগণ অহল্যাবাইর স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রতি বৎসর একবার করিয়া অহল্যা-উৎসব করিয়া থাকেন। সর্দ্দার ধোলিয়া সাহেব, সর্দ্দার চঙ্গন এবং ইন্দোরের অপর কয়েকজন প্রধান লোক মিলিয়া আজ পাঁচ বৎসর হইল এই অহল্যা-উৎসব প্রবর্ত্তন করেন। গত আগষ্ট মাসে এই উৎসবের পঞ্চম বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এবারকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছিলেন ইন্দোর-রাজের লিগাল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার হ আ তাল্‌চেরকার। উৎসবের সময় তিনি পুণ্যচরিত অহল্যাবাইর জীবনের কাহিনী বলিয়া দেখান অহল্যাবাই কিরূপে আধুনিক কালের



অহল্যাবাইর নারী-সৈন্য।



অহল্যাবাইর অশ্বারোহী নারী সৈন্য।

সার্ব্বজনীনতা ও সমাজসেবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল নিজ রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষের নানা জায়গায় জনহিতকর নানা রকম কাজের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। নানা দেশে ধর্ম্মশালা অন্নসত্র জলসত্র পথ ঘাট তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ তাঁহার কীর্ত্তি; রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত তাঁহার যেসব কীর্ত্তি আছে সেগুলি এমন সুব্যবস্থ যে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই এবং বহুকাল না পাইবারই সম্ভাবনা। তাঁহার দান তাঁহাকে বিশ্বকুটুম্বকত্ব দান করিয়াছিল। ভীল ও গোঁড়দের মত জন্মগত দুষ্টস্বভাব

লুঠাক জাতিদেরও তিনি সাধুতা ও শান্তির পথে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সুশাসন ও সুবিচার করিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এরূপ বীরত্বময়ী ধৈর্য্য-শালিনী ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী মহাপ্রাণা নারীর স্মৃতি-উৎসব কেবল ইন্দোরে নয়, ভারতবর্ষের নানা সহর ও বিদ্যাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, বিশেষ করিয়া এই নারী-জাগরণের দিনে।

৩১ আগষ্ট তারিখে উৎসবটি সম্পন্ন হয়। সমস্ত ইন্দোর রাজ্যে ঐ দিন পর্ব্বদিন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। দরিদ্র এবং অনাথদিগকে খাওয়ানো হয়। বিকালে তালচেরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে টাউন-হলে এক সভা হয়। সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে অহল্যাবাইর এক চিত্র মাল্যভূষিত করিয়া একটি পাল্কীতে রাখিয়া সমস্ত সহরে ঘুরানো হয়। তার পর নাটকের একটি দৃশ্যের মত অহল্যাবাইয়ের জীবনের একটি ঘটনা অভিনয় করিয়া দেখানো হয়। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গঙ্গাধরের ষড়যন্ত্রে শঠ রাঘব দাদা অহল্যাবাইর রাজ্য দখল করিতে আসেন। অভিনয়ে দেখানো হয় অল্পবয়স্কা বিধবা অহল্যা-বাই এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রীর অধীন ও বশ রাজসৈন্যদের সাহায্য না পাওয়াতে কিরূপে পাঁচশত রমণী লইয়া একটি অদ্ভুত সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তাহা লইয়া কিরূপে রাঘবের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। সঙ্গেসঙ্গে তিনি রাঘবকে এই সংবাদ পাঠান যে, স্ত্রীলোক হইয়া তিনি রাঘবের লোকের কাছে পরাজিত হইলে তত অপমানের বিষয় হইবে না, কিন্তু রাঘব যদি তাঁহার নারী-সৈন্যের কাছে পরাজয় লাভ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ধিক্! এই সংবাদে সুফল ফলে। রাঘব তাঁহার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটি খুব দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়। ত্রিশটি মারাঠা মহিলা ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধের বেশে তলোয়ার লইয়া অভিনয় করেন। এই নারীসৈনিকের পিছনে পিছনে একটি চারঘোড়ার গাড়ী আসে, তাহাতে কয়েকটি রমণী তলোয়ার লইয়া যুদ্ধের বেশে বসিয়া থাকেন। এই অভিনয় খুব চমৎকার ও জীবন্ত হইয়াছিল। ইহার বিশেষত্ব এই যে, যে-সব মেয়েরা অভিনয় করেন তাঁহারা সর্দ্দার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। উৎসবের সময় ধাঙ্গড় সমাজের স্বেচ্ছাসেবক অহল্যাবাইর ধর্ম্ম ও যুদ্ধসম্বন্ধীয় কয়েকটি উক্তি পতাকায় লিখিয়া চারিদিকে বহন করিয়া বেড়ান। উক্তি-গুলি সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী ছিল।

প্রবন্ধের ছবিগুলি ইন্দোরের রামচন্দ্র রাও ও প্রতাপ রাও কর্ত্তৃক গৃহীত।

গুপ্ত।

বৈজ্ঞানিক মহিলা

পাশ্চাত্য দেশে মহিলারা পুরুষের প্রায় সমকক্ষ শিক্ষা পাইলেও সেখানকার মহিলা-সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা অতি অল্প-দিনই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই নূতন গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন এমন মহিলা বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। রসায়নশাস্ত্রে মাদাম কুরী, পদার্থবিজ্ঞানে হার্থা এর্‌টন, জ্যোতিষতত্ত্বে কেরোলিন্ হর্শেল ও লেডি হাগিন্স্, ভূপ্রোথিত অঙ্গারীভূত ও প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে (Palaeobotany) মারী ষ্টোপ্‌স্ প্রভৃতি অনেক মহিলারত্ন বিজ্ঞানজগতে নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

লেডি হাগিন্স ইংলণ্ডে বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেডি হাগিন্স উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আয়ার্লাণ্ডের প্রধান শহর ডাব্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা জন্ মারে আইনব্যবসায়ী (solicitor) ছিলেন। লেডি হাগিন্সের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা পিতৃগৃহেই হয়। মারে অতি যত্নের সহিত কন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করাতে অতি অল্প কালের মধ্যেই লেডি হাগিন্স নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। ১৮৭৫ সালে ইহাঁর সঙ্গে সার্ উইলিয়াম হাগিন্সের বিবাহ হয়। সার উইলিয়াম হাগিন্স তখন ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; আলোকরশ্মির বিকিরণ হইতে নক্ষত্রের পদার্থতত্ত্ব-বিনির্ণয়-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বিজ্ঞানজগতে অমর হইয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞানাগার ও পর্য্যাবেক্ষণাগারের একমাত্র কর্ম্মী সহায় হইলেন তাঁহার পত্নী লেডি হাগিন্স। তদবধি তাঁহাদের গবেষণা-বিষয়ক প্রত্যেক প্রবন্ধ স্বামী স্ত্রী উভয়ের নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১০ সালে সার উইলিয়াম হাগিন্সের মৃত্যু হইয়াছে। স্বামীর আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য লেডি হাগিন্স এখনও

বিশেষ যত্নবতী আছেন। প্রসিদ্ধ বিশ্বকোশ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণের জন্য জ্যোতিষ ও নাক্ষত্র-বিজ্ঞান (Astronomy ও Astrophysics) সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার ভার লেডি হাগিন্সের উপর পড়ে। জ্যোতিষিক পুরাতত্ত্ব (Astronomical Archæology) এবং সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার ইতিহাস সম্বন্ধেও ইঁহার অনেকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধ আছে। সেগুলিতে আলোচ্য বিষয়ে লেখিকার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইঁহার জ্যোতিষতত্ত্বপারদর্শিতায় চমৎকৃত হইয়া জ্যোতিষিক সঙ্ঘ (Astronomical Society) ইঁহাকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া ইঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ইঁহার এই সম্মান লাভে সমগ্র নারীসমাজ সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নারী-প্রচেষ্টা

আন্তর্জাতিক স্ত্রী-শ্রমজীবী-কংগ্রেস—জেনেভা, ২০শে অক্টোবর।—জেনেভাতে আন্তর্জাতিক স্ত্রী-শ্রমজীবী কংগ্রেসের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। চীন, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দশটি রাজ্য হইতে প্রতিনিধি আসিয়া উক্ত কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন।—"রয়টার"।

—স্বরাজ।

জেনেভা ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের সম্মিলিত ভোটে নারীগণ নির্ব্বাচন-অধিকার পাইয়াছেন। সকল দেশেই নারীদের অধিকার দেওয়া হইতেছে। "দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?"

—স্বরাজ।

ভারতে প্রথম মহিলা উকিল—আলাহাবাদ, ২৯শে অক্টোবর।—কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজী আলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইনিই ভারতের সর্ব্বপ্রথম মহিলা উকিল। কুমারী সোরাবজী বাঙ্গলা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন।—"এসোসিয়েটেড প্রেস।" —স্বরাজ।

মহিলার ওকালতি করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা।—পাটনা, ২৯শে অক্টোবর।—গতকল্য পাটনা হাইকোর্টে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ মল্লিক ও মিঃ জওয়ালাপ্রসাদের আদালতে ব্যারিষ্টার মিঃ মানুক কুমারী সুধাংশুবালা হাজরাকে পাটনার জেলাজজের আদালতে ওকালতি করিতে দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। পাটনায় এ পর্য্যন্ত আর কোন মহিলা ওকালতি করার জন্য উপস্থিত হন নাই। কাজেই এই ব্যাপারে আদালতগৃহে বিস্তর লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন। মিঃ মানুক লিগ্যাল প্র্যাকটিসনার্স এ্যাক্টের ৬ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি (person) কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, উক্ত ধারায় এমন কোন কথা নাই, যাহাতে (ব্যক্তি) অর্থে মহিলাদিগকেও ধরা যাইতে না পারে। তবে আলোচ্য ধারাটির স্থানে স্থানে যে পুরুষবাচক ২১টি সর্ব্বনাম পদের ব্যবহার আছে, তাহার দ্বারা এমন মনে করা যাইতে পারে না যে, মহিলাদিগকে বাদ দেওয়াই আইনকর্ত্তাগণের উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ে কেবল পুরুষেরাই 'ওকালতি' করিতেন। তাই, আইন-কর্ত্তাগণের মনে মহিলাদের কথা উদিত হয় নাই। ইংরেজী ১৮৬৮ সনের ১ আইনের ২ ধারায় আছে,—যেখানে কোনরূপ অসঙ্গতি না হইবে, সেখানে পুরুষবাচক শব্দে মহিলাগণও পরিগণিত হইবেন। মহিলাদের আদালতে বক্তৃতা করিতে দিলে কোন অসঙ্গতিই হইতে পারে না। কুমারী রেজিনা গুহ সম্বন্ধে ইংরেজী ১৯১৬ সনে কলিকাতা হাইকোর্ট যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা ভ্রান্তি-সঙ্কুল। বিলাতের বর্ত্তমান আইন অনুসারে এক্ষণে মহিলারা আইন প্রভৃতি সকল ব্যবসায়ই অবলম্বন করিতে পারেন। এক্ষণে বিলাতের কোন মহিলা ব্যারিষ্টারের ভারতে আসিয়া আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কোনো বাধা নাই। পরিশেষে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ক্রীতদাস-প্রথা-নিবারক বিধি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, ঐ-সমস্ত আইনে পুরুষবাচক শব্দে মহিলাগণকেও বুঝাইয়া থাকে। কোনো আইনের বলে মহিলারা আইন পড়িতে পারিবেন, আর অন্য আইনের বলে তাঁহাদিগকে ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেওয়া হইবে না, ইহা বড়ই যুক্তিবিরুদ্ধ। বিচারপতিগণ রায় পরে প্রকাশ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।—"এসোসিয়েটেড প্রেস।" —স্বরাজ।

ওয়াসিংটন কনফারেন্সে নারী—নিরস্ত্রীকরণ, প্রশান্তসাগর সমস্যা প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যার আলোচনা করিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরে একটি আন্তর্জাতিক সভা বসিবে। সকল দেশই প্রায় সেখানে প্রতিনিধিসঙ্ঘ প্রেরণ করিয়াছেন। আমেরিকা যে প্রতিনিধিসঙ্ঘ প্রেরণ করিয়াছেন তাহার ২৮ জনের মধ্যে চারি জন নারী। তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় মহিলা-সমিতি-সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী উইণ্টার একজন।

কমলা তাজা রাখিবার সহজ উপায়

কতকগুলি বালু সংগ্রহ করিয়া খুব ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া লইবেন। মধ্যে কিছু বালু বিছাইয়া কতকগুলি কমলা এইরূপভাবে সাজাইবেন, যাহাতে একটি কমলা আর একটির গায়ে না লাগে। ইহার উপরে ৩।৪ আঙ্গুল পরিমাণ পুরু বালু দিয়া পূর্ব্বের মত কমলা সাজাইয়া রাখিবেন। এইরূপভাবে পর্য্যায়ক্রমে বালু ও কমলা দ্বারা বাক্স পূর্ণ করিয়া উপরে একস্তর বালু দিয়া বাক্স উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া বাক্সটি এমন স্থানে রাখিবেন, যেখানে রৌদ্রও খুব না লাগে, ঠাণ্ডাও খুব না লাগে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাঘমাসে কমলা কিনিয়া এইরূপ উপায়ে রাখিয়া জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসে বিক্রী করিলে উহার মূল্য পূর্ব্বের কিনা মূল্যের চারিগুণ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ডক্‌টর মেঘনাদ সাহার কৃতিত্ব *

গত ১৯২০ সালের ৭ই নভেম্বর রয়টারের তারের এক সংবাদ আসিল যে রয়াল সোসাইটীর এক অধিবেশনে এডিংটন কর্তৃক আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণিত হইয়াছে, প্রমাণিত হইয়াছে যে ত্রিকোণের তিনটি কোণ আর ১৮০ ডিগ্রী নয়, বৃত্তের ব্যাসগুলি (circleএর radius) আর সমান নয়, সমান্তরাল রেখাসমূহ (parallel straight lines) যে একেবারে মিলে না তাহা নয়। লোকে অবাক হইল, কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক বুঝিল না। এদেশে বুঝাইলেন প্রথম শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা। পরদিন সংবাদপত্রস্তম্ভে মেঘনাদ আইনষ্টাইনের গবেষণার এক বিবরণ দিলেন।

নিখিল চরাচর জলস্থল আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে ঈথার বলিয়া একটি পদার্থ আছে, বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন। মাঝে এক কথা উঠে যে পদার্থ যখন ছোটে তখন সে কি তাহার অন্তরস্থ ঈথার লইয়া ছোটে বা জলের মধ্যে জাল লইয়া যাইলে যেরূপ হয় সেইরূপ যেখানকার ঈথার সেইখানেই পড়িয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরীক্ষায় ভিন্নরূপ ফল দাঁড়াইল। সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল, সমাধানের অনেক চেষ্টা হইল—কিন্তু তাহাতে শুধু গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্ত বুজান হইল মাত্র—এক সমস্যা মিটাইতে অন্য জটিলতর সমস্যা খাড়া হইতে লাগিল। আইনষ্টাইন আসিয়া ঈথারকে একদম বাদ দিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতিক নিয়মের ধারার কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না এবং আকাশে আলোকের বেগের কোন তফাৎ নাই, এই দুইটি কথা ধরিয়া লইয়া আইনষ্টাইন সব গোলযোগ মিটাইলেন। আইনষ্টাইনের এই কল্পনা হইতে অনেক নূতন কথায় আলো আসিয়া পড়িল; তিনি গতিশাস্ত্রের অনেক কথার আলোচনা করিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত-সকল নিউটন-প্রবর্ত্তিত গতিশাস্ত্রের ফলাফলের সহিত হুবহু মিলিতে লাগিল না, যদিও উভয়ের পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। দেশ কাল ও বস্তুপিণ্ড (length, time ও mass)—মাত্র এই তিনটি কথায় ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার প্রকাশ করা যায়। এই তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কেহ কাহারও ধার ধারে না, কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না,—এই ধরিয়া লইয়া নিউটন তাঁহার গতিশাস্ত্র খাড়া করেন। আইনষ্টাইন বলিলেন, না তাহা নয়,—দেশ, কাল ও বস্তুপিণ্ড (length, time এবং mass) পরস্পর জড়িত। কিন্তু প্রমাণ? একটা বিষয় প্রমাণিত হইল কাউফ্‌মান, বুকেরের প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষায় ইলেকট্রন্। রেডিয়াম হইতে যে ইলেকট্রন্ ভীমবেগে বাহির হইতেছে সেই ইলেকট্রন লইয়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা দেখাইলেন যে ইলেকট্রনদের বেগ অনুসারে তাহাদের জড়ত্বের (mass) তারতম্য হয়, আইনষ্টাইন যেরূপভাবে বলিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপভাবে বদলায়। কিন্তু বেগ তো দেশ (length) ও কাল (time) লইয়া; অতএব দেশ ও কালের (length ও time) সহিত জড়তা (mass) সংশ্লিষ্ট। আর একটা ব্যাপারেও এতদিন একটু গোল ছিল। নিউটন-প্রবর্ত্তিত গতিশাস্ত্র অনুসারে বুধগ্রহের যে যে পথে চলা উচিত, দেখা যায় ঐ গ্রহ অবিকল সে পথে চলে না, একটু ব্যতিক্রম হয়। এ গরমিলের কোন হেতু মিলিতেছিল না। আইনষ্টাইনের হিসাবে এ গরমিলটুকু চলিয়া গেল। আইনষ্টাইনের সহিত এসকল বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন মিঙ্কোস্কি। এতদিন অঙ্কশাস্ত্রের কারবার ছিল বস্তুর তিন পাশ (dimension) লইয়া। মিঙ্কোস্কী আর-একটি বাড়াইলেন। বোঝার উপর শাকের এই আঁটী চাপাইবার প্রয়োজনও হইল। মনে কর,—কোন দেশে অথবা এই আকাশের মধ্যে আমি একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়াছি। আমি যেখানে ছিলাম সেখান হইতে তিনটা সরলরেখা টান—একটা সামনে-পিছনে, একটা আশে-পাশে, একটা উপর-নীচু; ইহাদের প্রত্যেকটি যেন অপর দুটির উপর সোজা খাড়া (perpendicular) হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহা হইলে আমার পথ—আমার গন্তব্যস্থান—এই লাইন তিনটা হইতে দূরত্ব দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আদেশে লিখিত ও তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত।

হিসাবই চলিয়া আসিতেছিল; মিঙ্কোস্কী বলিলেন, এতে আর চলিবে না; 'দেশের' সহিত 'কাল' জড়িত—এই তিনটা লাইন তো শুধু দেশ সূচিত করিতেছে; অতএব আর-একটা লাইন টান যাহা 'কাল'কে নির্দ্দেশ করিবে; এবং লাইন এইরূপে টান যাহাতে আগেকার তিনটি রেখার প্রত্যেকটির উপর এটি সোজা খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কিরূপে তাহা টানিব? এ যে একেবারে অসম্ভব। এ কল্পনাই বা কিরূপে করিব? নাই বা পারিলে কল্পনায় আনিতে? তোমার ইন্দ্রিয় স্থূল। ভাবিয়া লও এরূপ একটি লাইন থাকা সম্ভব। তোমার আকাশভ্রমণের পথবর্ণনায় শুধু আগেকার তিনটি রেখা নয়, এই সময়ের রেখাটাও হিসাবে আন। তোমার অঙ্কশাস্ত্র এই অনুসারে বদলাও, সেইটাই হইবে খাঁটি অঙ্কশাস্ত্র; প্রচলিত অঙ্কশাস্ত্র সব ভুল। মিঙ্কোস্কী এইরূপে চার dimension বা পার্শ্বওয়ালা ব্রহ্মাণ্ড খাড়া করিলেন। আইনষ্টাইনের কল্পনস্রোত আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে আলোকরশ্মিও মাধ্যাকর্ষণের হাত এড়াইতে পারে না। ইহা পরীক্ষায় নিরূপিত হইতে পারে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময়। জার্ম্মান ও ইংরেজ যুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু জার্ম্মানীবাসী আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিবার ভার লইলেন ইংলণ্ডবাসী এডিংটন। ১৯২০ সালে ২৯শে মে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হইল। এডিংটন সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরা দিয়া সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রসমূহের ফটোগ্রাফ লইলেন। পরে রয়াল সোসাইটীর এক সভায় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নিকট দেখাইলেন যে নক্ষত্রের আলোক সূর্য্যের নিকট দিয়া আসিতে আসিতে বাঁকিয়াছিল, আইনষ্টাইন যতটা বলিয়াছিলেন ঠিক ততটাই বাঁকিয়াছিল। আইনষ্টাইনের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত যে-সকল কল্পনা হইতে প্রসূত তাহাও স্বীকৃত হইল। বিশ্বের এই আকাশের আর অনন্তপ্রসার নাই; ইহা সমাকার নয়, বক্রাকার। এই আকাশস্থিত কোন সরল-রেখাকে আর ইউক্লিডের সরলরেখার সংজ্ঞা দিলে চলিবে না; ত্রিকোণের তিনটি কোণ আর ১৮০ ডিগ্রী নয়; বৃত্তের ব্যাসগুলি আর সমান নয়; সমান্তরাল রেখাসমূহ (parallel straight lines) যে একেবারে মিলে না তাহা নয়; দেশের সহিত কাল বিশেষ ভাবে জড়িত; পদার্থের জড়ত্ব ও দেশ ও কাল পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার বিবরণে লোকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আভাস পাইল। যে আইনষ্টাইনের নাম আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে, সেই আইনষ্টাইনের গবেষণা-সমূহের মূল্য কত অধিক, বিজ্ঞান-জগতে আইনষ্টাইনের স্থান কত উচ্চে, তাহা রয়টারের এই সংবাদের বহুপূর্ব্বে এ দেশে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা। তাই ইহার অনেকদিন আগে মেঘনাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আইনষ্টাইন ও মিঙ্কোস্কীর গবেষণাগুলি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন এবং নিজে সেগুলি জার্ম্মান ভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার ভার লয়েন। শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ লিখিত একটি ভূমিকা-সম্বলিত আইনষ্টাইন ও মিঙ্কোস্কীর গবেষণাসমূহ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু শুধু আইনষ্টাইনকে বুঝিয়া মেঘনাদের তৃপ্তি হইল না, তিনি দেখিতে লাগিলেন মানবের জ্ঞানের ভাণ্ডার পুষ্ট করিতে তিনি নিজে কি দিতে পারেন। পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিলে উহা এমন এক অবস্থায় গিয়া পৌছায় যখন আর উহাকে ভাঙ্গা চলে না; এই অবিভাজ্য পরমাণুর নাম Atom। নব্য বিজ্ঞান এখন এই Atom-এর অনেক ভিতরকার খবর বাহির করিয়াছে। সৌর-মণ্ডলে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন পৃথিবী ও গ্রহগণ ঘুরিতেছে সেইরূপ সংযোগ-তড়িতের চতুর্দ্দিকে বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন ভীমবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং এইসমস্ত লইয়া একটি Atom বা পরমাণু। সীসা যে সোনা নয় তাহার কারণ সীসার একটি পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেক্‌ট্রনগুলির সংখ্যা ও ঘুরিবার ধারা সোনার পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনদের সংখ্যা ও ঘুরিবার ধারা হইতে ভিন্ন।

আইনষ্টাইনের নূতন তত্ত্ব ও মিঙ্কোস্কী-প্রবর্ত্তিত চারিপার্শ্ব-যুক্ত আঁকজোক প্রয়োগ করিয়া শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ইলেক্‌ট্রন-দের গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। তাঁহার এই গবেষণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিলাতের

বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নিকট পাঠান এবং তাঁহাদের নিকট ইহা উচ্চ অঙ্গের আবিষ্কার বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহাকে ডি এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন।

সম্প্রতি আমেরিকাবাসী একজন বৈজ্ঞানিক ডক্টর ক্রেহর্ন পরমাণু সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পরমাণু মধ্যস্থিত ইলেক্‌ট্রনদের চলাফেরা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি মেঘনাদের অনেক হিসাব Saha equations গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকের ভূমিকায় এবং ভিতরেও তিন-চার জায়গায় সে কথা তিনি স্বীকার করিয়া মেঘনাদের আবিষ্কারকে খুব উচ্চ স্থান দিতেছেন।

বিজ্ঞানের আর-একটা বিষয়েও মেঘনাদ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ব্যাপারটা এই :—পরীক্ষা-নলে (Test tubeএ) রাসায়নিক দ্রব্য ঢালিয়া বিশ্লেষণ না করিয়াও বৈজ্ঞানিক কোটী কোটী মাইল দূরস্থিত সূর্য্যের উপাদান বলিয়া দেন। কোন বাতির আলো একটা ত্রিশির-কাঁচের মধ্য দিয়া যাইলে লাল পীত সবুজ নীল বেগুনে প্রভৃতি রংএর এক বর্ণছত্র দেখা যায়। বাতির আলোর বদলে সূর্য্যের আলো দিলে ঐরূপ বিভিন্ন রংএর বর্ণছত্র হয়, কিন্তু এইবার এই বর্ণছত্রের মধ্যে কতকগুলি সরু কাল দাগ দেখা দেয়। সেই কালো দাগের স্থান যথাযথ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া দেন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে কি কি দ্রব্য বাষ্পীয় আকারে আছে। যুক্তির ধারা এইরূপ। একটা ত্রিশির-কাচের সম্মুখে ক্যাল্‌সিয়ামে আলোকিত একটা সরু লম্বা ছিদ্র রাখিলে কাচের ওধারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রেখা দেখা যায়। ছিদ্রটি কিন্তু যদি সৌর আলোকে আলোকিত হয় তাহা হইলে দেখা যায়—এক বর্ণছত্র হইয়াছে, সেই বর্ণছত্রের মধ্যে অনেকগুলি সরু কাল কাল দাগ আছে এবং কতকগুলি কাল দাগ ঠিক যেখানে আগেকার ক্যাল্‌সিয়াম-জনিত উজ্জ্বল রেখা হইয়াছিল অবিকল সেইখানেই হইয়াছে। এখন পরীক্ষাগারে বাতির আলোর সম্মুখে ক্যাল্‌সিয়ামের উত্তপ্ত বাষ্প দিয়া পরীক্ষা করিলে আগের মত কাল দাগ পাওয়া যায়। সুতরাং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ উত্তপ্ত ক্যাল্‌সিয়াম-বাষ্প আছে তাহা অনুমিত হয়। এইরূপে সূর্য্যে আরও অনেক পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি একটা খট্‌কা উঠিয়াছিল। সূর্য্যের বর্ণছত্রে (rubidium caesium) রুবিডিয়াম ও সিজিয়ামের রেখা পাওয়া যায় না ; চেনাশুনা সব ধাতুই আছে, মাঝে থেকে এ দুইটা বাদ পড়িল কেন ? আর-একটা কথা। বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদগণ নক্ষত্রগণকে তাহাদের বর্ণছত্র অনুসারে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ; এবং ইহাও দেখা গিয়াছে প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তপ্ততা স্বতন্ত্র। তবে কি উত্তপ্ততার সহিত বর্ণছত্রের কোন সম্বন্ধ আছে এবং যদি থাকে তো সে সম্বন্ধটা কি ? শ্রীযুক্ত মেঘনাদ এসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। ব্যাপারটা এই—সাধারণত কোন পরমাণুতে সংযোগ-তড়িতের চতুর্দ্দিকে সমপরিমাণ বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতেছে। এখন কোন কারণে এই পরমাণু হইতে যদি ইলেক্‌ট্রন ছুটিয়া পলাইয়া যায় তো সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত এই ভাঙ্গা পরমাণুতে আর আগেকার অখণ্ড পরমাণুর বর্ণছত্র মিলিবে না। কোন পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রন তাড়াইতে যে যে উপায় আছে তাহার একটা উপায় হইল তাপ। খুব প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রন ছুটিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যে উত্তপ্ততায় ইলেক্‌ট্রন ছুটিয়া পালায় তাহা সকল পদার্থের সমান নয়। কোন্ পদার্থে কোন্ উত্তপ্ততায় এই ইলেক্‌ট্রন ছুটিয়া পালাইবে মেঘনাদ আঁকজোঁক দিয়া কসিয়া বাহির করিলেন। তিনি দেখাইলেন অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে রুবিডিয়াম ও সিজিয়ামের ইলেক্‌ট্রন ছুটিয়া পালায় এবং সূর্য্যের যে উত্তপ্ততা তাহাতে রুবিডিয়াম ও সিজিয়ামের পরমাণু আর আস্ত নাই—থাকিতে পারে না—তাই ইলেক্‌ট্রন-শূন্য এই রুবিডিয়াম ও সিজিয়ামে আর পৃথিবীস্থ সাধারণ রুবিডিয়াম ও সিজিয়ামের ন্যায় বর্ণছত্র নাই। সূর্য্য অপেক্ষা সূর্য্যকলঙ্কের উত্তপ্ততা কম ; তাই মেঘনাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে সূর্য্যকলঙ্কে রুবিডিয়মের ও সিজিয়মের রেখা পাওয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানমন্দিরে (Mount Wilson Solar Observatoryতে) মেঘনাদের এই অনুমানের যাচাই হইয়াছে। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ এবারকার বিলাতের Royal Astronomical Societyর সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডাঃ রসেল মেঘনাদকে পত্রে জানাইয়াছেন যে তিনি তাঁহার

১৫০ ফুট লম্বা দূরবীক্ষণে মেঘনাদ-কথিত রুবিডিয়ম ও সিজিয়মের রেখা পাইয়াছেন।

হিলিয়ামের ইলেক্‌ট্রন বিতাড়িত করিতে খুব বেশী উত্তপ্ততার প্রয়োজন; তাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তপ্ত যে নক্ষত্র তাহাতেই দেখা যায় হিলিয়ামের রেখা একেবারে মিশাইয়া আসিল। কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর নক্ষত্রের বর্ণছত্রে কোন্ পদার্থের রেখার ঔজ্জ্বল্য কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে বা একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে ইহা দেখিয়া সেই নক্ষত্র-শ্রেণীর উত্তপ্ততা মেঘনাদ কসিয়া বাহির করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ অন্য উপায়ে জ্যোতিষ্কদিগের উত্তপ্ততা নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হিসাবের সহিত মেঘনাদের হিসাব মিলিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য আধুনিক গবেষণার কথা পরে বলা যাইবে।

Philosophical Magazine, Proceedings of the Royal Society, Astrophysical Journal প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় মেঘনাদের গবেষণাগুলি বাহির হইতেছে এবং সার্ জে জে টম্‌সন, সার্ আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড, অধ্যাপক রিচার্ডসন, অধ্যাপক ফাউলার, সোমরফেল্ড, আইন্‌ষ্টাইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহাকে সাদর অভিভাষণ জানাইতেছেন।

পৃথিবী হইতে কোটী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রনগুলি কিরূপ ভাবে আছে আজ এক বাঙ্গালী যুবক তাহার সঠিক খবর বলিয়া দিতেছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভয়ঙ্কর

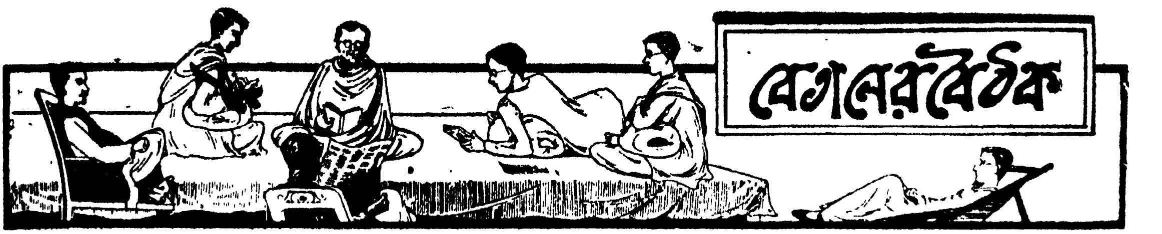
তোমারে দেখিয়া লাগে ভয়,
হে মানব, দুর্ব্বল, নশ্বর!
নিরালয়ে নতমুখে কি কহিছ সুখ-দুঃখ-কথা;
মনে হয়, ছদ্মবেশে শাপভ্রষ্ট এসেছ দেবতা!—
পলে পলে বেলা যায় বয়ে
সঙ্কিত বিস্ময়ে
তোমার মুখের পানে চাহি',
তুমি কি কহিছ কথা এক তিল তাহে মন নাহি।

প্রতিদিবসের শত তুচ্ছ কাজ, দোষ ত্রুটি ভুল,
যা-কিছু ছেড়ে এ ছোট জীবন চলে না একচুল,
তাহারি সীমার মাঝে তোমারে বাঁধিয়া চিরদিন
করি তুচ্ছ পরিম্লান, করি ছোট হীন।
তোমারে সহজ করি ধরার সহজ পরিচয়ে।—

হে সুন্দর, তোমা' হেরি' আজি মোর বুক কাঁপে ভয়ে।
মনে হয়, তুমি কি যে
তুমি তাহা নাহি জান নিজে।
নহ চর্ম্ম নহ অস্থি, রক্ত মাংস ক্লেদ—
আশা সাধ আয়োজন, সুখ দুঃখ খেদ,
নহ বাক্য তত্ত্ব ইতিহাস,
তুমি নহ দেবতার লীলাভরা সৃষ্টির বিলাস
এতটুক।

আজিকে তোমারে হেরি' দুরু দুরু ভয়ে কাঁপে বুক।
মন আজি নাহি মানে, তুমি শুধু দেহ, আর প্রাণ
শোণিতধারার সনে শিরায় শিরায় কম্পমান,
বাঁধা ক্ষণিকের অনুরাগে,
কিম্বা চির-আত্মা তুমি, তাও আজি মনে নাহি লাগে।—
তোমার নয়নে হেরি তলহীন ভয়,
রোমকূপে রোমকূপে অপার বিস্ময়,
সীমাহীন রহস্যবিস্তার অভ্যন্তর।
তোমারে হেরিয়া আজি ভয়ে হিয়া কাঁপে থর থর।
—তুমি কি যে, শুধাবার খুঁজিবার নাহি অবসর।
শুধু জানি, চোখে চেয়ে কিম্বা চোখ বুজি'
যা-কিছু ভাবিতে পারি, যাহা কিছু জানি মানি বুঝি,
দেহ প্রাণ মন আত্মা—যা-কিছুর সনে
নানামতে এ জীবনে
পরিচয় হলো একে একে,
ঢের বেশী ঢের বড় তুমি সব থেকে,
অচিন্ত্য, অনন্ত, ভয়ঙ্কর;
হে মানব, দুর্ব্বল, নশ্বর!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।



জিজ্ঞাসা।

(৮৫)

কলিঙ্গ দেশ কোন্‌টি? কবিকঙ্কণচণ্ডী কলিঙ্গরাজ্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অনেকে উড়িষ্যাকে কলিঙ্গ দেশ বলেন। কিন্তু গোদাবরী নদীর মোহানার নিকটে যেখানে কোকনাদ (Coconada) সহর অবস্থিত—তার সম্মুখেই করিঙ্গ উপসাগর ও করিঙ্গ নামে একটা সহর আছে। বংশধর নদীর মোহানার কাছে সমুদ্রতীরে (বোধহয় গঞ্জাম বিভাগে) কলিঙ্গপটম্‌ নামে আর-একটি সহর আছে। এই কলিঙ্গপটম্‌ বর্ত্তমান উড়িষ্যার অতি নিকটে। কলিঙ্গপটমের নিকটবর্ত্তী স্থানটুকুই কলিঙ্গ দেশ, না করিঙ্গ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানটুকু কলিঙ্গদেশ? অথবা কলিঙ্গপটম্‌, করিঙ্গ সহর, করিঙ্গ উপসাগর সহ সমগ্র (কোরঙ্গীর) মুলুক কলিঙ্গ দেশ? না, বাস্তবিক বর্ত্তমান উড়িষ্যাই কলিঙ্গ দেশ?

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

(৮৬)

বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের ও তাহার সম্পাদকের নাম কি?

শ্রীমুলচাঁদ মাড়ওয়াড়ী ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৮৭)

কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামে একটি তাল-গাছে অস্বাভাবিকভাবে ফল ফলিতে দেখিয়াছি। সাধারণতঃ যেমনভাবে তালের কাঁদি ধরে, ঐ গাছটিতে তাহা ত ধরিয়াছিলই, অধিকন্তু গুঁড়িটির মাঝখানে আরও দুই একটি তালের কাঁদি নামিয়াছিল। অথচ সেখানে কোন পাতা বা শুক্‌না ডাঁটা কিছুই ছিল না। যদি কোন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ ইহার কারণ বলিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসীর মারফতে জানাইবেন।

শ্রীপ্যারীমোহন কুণ্ডু।

(৮৮)

চক্ষুর পাতা আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া দেখিলে একটি বস্তুকে দুইটি বোধ হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

(৮৯)

প্রাচীন ভারতে আর্য্য নারীগণের মধ্যে পাদুকার ব্যবহার ছিল কি না?

শ্রীরাধাচরণ দাস।

(৯০)

গুড় হইতে চিনি বানাইবার বা গুড় পরিষ্কার করিবার কি কি সহজ উপায় আমাদের দেশে প্রচলিত আছে? এরূপ কোন কার্‌খানা আমাদের দেশে আছে কি না যেখানে যাইয়া হাতে-কলমে উক্ত কাজ শিখিয়া আসা যায়।

কিরণ মুখোপাধ্যায়।

(৯১)

এখন যেরূপ বিচারে পক্ষসমর্থনকারী নিযুক্ত করা হয়, ভারতবর্ষে মোগলরাজত্বের সময় এবং তাহারও পূর্ব্বে এইরূপ সমর্থনকারী ছিল কি না? থাকিলে তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কি না?

শ্রীশুভা দাসগুপ্তা।

(৯২)

মুসলমানেরা জাতীয় পতাকায় "অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন" ধারণ করে কেন?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযোগেশচন্দ্র আচার্য্য।

(৯৩)

নবাব আলিবর্দ্দির সময় পরগণাতি সম্বৎ নামে একটি সন প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথম এই সম্বৎ কে প্রচলন করেন? ইহার নাম পরগণাতি সন রাখা হইয়াছিল কেন?

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(৯৪)

বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস কি এবং কাহার রচিত?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৯৫)

কোন্‌ সময়ে ও কাহার দ্বারা ভারতে কাগজের আমদানী ও ব্যবহার সুরু হইয়াছে? ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এবং বাঙ্গালাদেশে এখন কয়টা কাগজের কারখানা আছে?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার।

(৯৬)

একই তেলে সময়ে সময়ে লণ্ঠনের চিম্‌নি ধোঁয়া হইয়া কাল হইয়া যায়। এইরূপ ধোঁয়া হইবার কারণ কি? আর উহার প্রতিকারেরই বা উপায় কি?

"কাউয়া।"

(৯৭)

বাঙ্গালা দেশে টিক্‌টিকি টিক্‌ টিক্‌ শব্দ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে (আমি বৈদ্যনাথ ও কাশীধামে) দেখিয়াছি, ইহারা মূক। বাঙ্গালার টিক্‌টিকির মত ইহারা কোন শব্দ করে না। উভয়ত্র যে টিক্‌টিকি দেখা যায় তাহা এক জাতীয় কি?

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ।

(৯৮)

পৃথিবী এবং অন্যান্য সকল গ্রহগুলি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে (পৃথিবী এক বৎসরে) তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একবার ভ্রমণ করে। পৃথিবীর এই বাৎসরিক গতি ছাড়াও দৈনিক গতি আছে আর তাহার ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি হয়। এই উভয়বিধ গতির কারণ কি? চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া মাসে একবার ইহার চারি পাশে ভ্রমণ করে। চন্দ্রের দৈনিক গতি (পৃথিবীর ন্যায়) আছে কি? যদি থাকে তবে পূর্ণিমা রজনীতে সমস্ত রাত্রি চন্দ্রের একই দিক, অর্থাৎ চন্দ্রের পৃষ্ঠে এক রকম কাল রেখা, একই স্থানে দেখা যায়

কেন? যদি চন্দ্রের দৈনিক গতি না থাকে তাহা হইলে ইহার কারণ কি? যে আকর্ষণের ফলে গ্রহ তারকাদিতে এই উভয়বিধ গতি দৃষ্ট হয়, সে আকর্ষণের প্রভাব হইতে চন্দ্র বঞ্চিত কেন?

ম, ক, খ।

(৯৯)

পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলে মঘি সন প্রচলিত আছে, এখন ১২৮২ কি ১২৮৩ মঘি হইবে। এই মঘি সনের ঐতিহাসিক বিবরণ কি?

শ্রীঅটলকুমার চক্রবর্ত্তী।

(১০০)

বঙ্গদেশে বর্ষাকালে জলাময়ভূমিতে গরু দ্বারা হালচাষ করিতে হয়। তাহাতে কৃষক ও গরুর পা অত্যধিকরূপে "হাজিয়া" যাইয়া ক্ষত হয় ও জোঁকের আক্রমণে খুব কষ্ট পায়। উভয়বিধ অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন সহজ উপায় আছে কি?

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

(১০১)

শুঁয়াপোকার কাঁটা গায়ে লাগিলে তাহার যন্ত্রণা উপশমের সহজ উপায় কি?

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায়।

মীমাংসা

(১৪)

কুমারহট্টে, কেহ কেহ বলেন হালিসহরে, আজু গোঁসাই জন্মগ্রহণ করেন। আজু গোঁসাইয়ের প্রকৃত নাম অচ্যুতচরণ গোস্বামী। তিনি সাধারণের নিকট আজু গোঁসাই নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ৺রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার এক বৃহৎ "কবির দল" ছিল। তাঁহার দ্রুত রচনা-শক্তির ক্ষমতা ছিল বলিয়াই রামপ্রসাদের ভক্তিপূর্ণ গীতের উত্তর অতি সহজেই দিতে পারিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইজন্যই উভয়কে একত্র করিয়া নিকটে বসাইয়া উত্তর প্রত্যুত্তরে মায়ের গান শুনিতেন। রামপ্রসাদের পর আজু গোঁসাইয়ের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(৪৪)

নানারূপ অদ্ভুত ও সুন্দর ঘটনায় এই কাণ্ডটি অলঙ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'সুন্দরাকাণ্ড' হইয়াছে। সুন্দর বা অদ্ভুত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া কৃত্তিবাসও নিজের রামায়ণে এই কাণ্ডের প্রথমে বলিয়াছেন :—

পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর,
রামের আজ্ঞায় নল বান্ধিল সাগর। ইত্যাদি।

অন্যান্য কাণ্ডের ন্যায় এই কাণ্ডে এমন কোনও একটি প্রধানতম বিষয় নাই, যে, ইহার নামে কাণ্ডের নাম হইতে পারে। অনেকগুলি ঘটনাই প্রধান। একের নামে কাণ্ডের নাম হইলে অপর বিষয়ের নামে কেন হইলনা, আপত্তি হইতে পারে। অতএব তন্মধ্যস্থ ঘটনাবলীর উপর দিয়াই কাণ্ডের নাম রাখা হইয়াছে। সুন্দর কাণ্ড স্থলে সুন্দরাকাণ্ড নাম হইবার কারণ এই—এই সমাসবদ্ধ শব্দটি সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিয়াছে। সুন্দরং কাণ্ডম্=সুন্দরাকাণ্ডম্। "হৃবস্য দীর্ঘতা" (কলাপ ২৮৬ সূ) এই সূত্র দ্বারা মধ্যের আকারটি দীর্ঘ হইয়া 'আ' হইয়াছে; যথা—বিষাবসু; মিত্রাবরুণৌ; ইত্যাদি। কোন কোন সংস্কৃত পুঁথিতে সুন্দরকাণ্ডও দেখা যায়। উভয়ই সাধু।

শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থ।

(৫১)

বিগত ভাদ্রমাসের বেতালের বৈঠকে শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত মহাশয় দীধিতি-প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান কোথায়, জানিতে চাহিয়াছেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২য় ভাগের তৃতীয় অংশে ১৮৮-১৯০পৃষ্ঠা, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয়ভাগের ৭ম অধ্যায় ১৩৯ পৃষ্ঠা, এবং অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম-এ মহাশয়ের বিজয়া পত্রিকায় লিখিত "শ্রীহট্টের কাণা ছেলে" শীর্ষক প্রবন্ধ সাক্ষ্য দিতেছে যে—"খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতগৌরব রঘুনাথ শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন।" বিশ্বকোষ অভিধানেও রঘুনাথের শ্রীহট্টে জন্মিবার কথা লিখিত আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

(৬১)

ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায় দুর্গাপূজা কল্পে কল্পে হইয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে ইহার আরম্ভ ঠিক কোন্ সময়ে তাহা বলিবার উপায় নাই। পাষাণ বা ধাতুময়ী সিংহবাহিনী দশভুজা মূর্ত্তি বহু শতাব্দী ধরিয়া অনেক দেবালয়ে ও অনেকের গৃহে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। তন্ত্রযুগে ইহার বহু প্রসার হয় বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমানের ঐতিহাসিক হিসাবেও ইহা পুরাতন। মহারাষ্ট্র-পুরাণ নামক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে বাংলার চৌথ আদায় করিতে আসিয়া বর্গীর সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলে বঙ্গদেশের চিরন্তন প্রথানুসারে কাটোয়া নগরে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালের এই মহাপূজা ত্রেতায় দশরথাত্মজ রাজা রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন এবং মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে দেবী আবির্ভূতা হইয়া বরদান করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণোক্ত দেবীপূজায় এই মূর্ত্তিরই পূজা হয়। শিবদুর্গামূর্ত্তি কেহ কেহ পূজা করেন। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে এই মূর্ত্তির ধ্যান আছে এবং শরৎকালে পূজা করিবার বিধি আছে। শিবদুর্গা মূর্ত্তির নিম্নে কোথাও কোথাও সিংহ ও ছিন্নগ্রীব মহিষের মূর্ত্তি করা হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য প্রদেশে এই দুর্গাপূজা নবরাত্রি নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ঘটে বা পটে এই শরৎকালে দেবীর আরাধনা হয়, তবে আমাদের বাংলা দেশের ন্যায় এত আড়ম্বরে সম্পন্ন হয় না।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়।

লেখকদের মধ্যে বাংলা দেশের দুর্গাপূজার কাল নিয়া মতভেদ আছে; বাংলাদেশ ভিন্ন, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতনা মহারাষ্ট্র ও আর অনেকানেক প্রদেশে মহাসমারোহে এসময় মায়ের পূজা হইয়া থাকে। পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বীরাভিনয়—রামলীলা, মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার বীরোৎসব—অস্ত্রপূজা, ও আরও অন্যান্য প্রদেশের নবরাত্রি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে অধিকাংশ স্থানেই দশভুজামূর্ত্তি মায়ের অর্চ্চনা করা হয়। শিবদুর্গা-মূর্ত্তি অধিকাংশস্থলেই মানসিক অর্থাৎ মানত করা বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(৬২)

দুর্গাপূজার কয়দিন হিন্দু বিধবাদের উপবাস বিধি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নহে। দেবীপূজার পশু বলির প্রাধান্য থাকায় স্পর্শদোষের আশঙ্কায় বিধবারা রন্ধন করেন না, সামান্য ফলমূলাদি খাইয়াই থাকেন। ইহা একটি দেশাচার মাত্র।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়।

(৬৩)

দর্পণ মাঙ্গলিক দ্রব্য, অধিবাসে ইহা ব্যবহার হয়। বিজয়ার দিন সকলেই মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহা হইলে সম্বৎসর সুমঙ্গলে অতিবাহিত হইবে ইহাই বিশ্বাস। আমাদের ধর্ম্মিষ্ঠা মহিলারা এখনও এই বিধি পরিত্যাগ করেন নাই। নাপিতের কাতায় দর্পণ থাকে ও তাহারা আমাদের সমাজে অনেক স্থলে মাঙ্গলিক কার্য্যের বার্ত্তাবহ ও নির্ব্বাহকারক, সুতরাং এই কার্য্য তাহাদের ঘাড়ে আজও পড়িয়া আছে। অনেক স্থানে হস্তী অশ্ব গবাদি দেখাইবার ও দেখিবার রীতি আছে।

দধিও মাঙ্গলিক। সাধারণতঃ এইগুলি মাঙ্গলিক দ্রব্য—ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, দর্পণ, সর্পিঃ, দধি, আদিত্য, আপঃ, রাজা, হরিদ্রা ও মৎস্য। বিজয়ার দিবস মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শনের ও স্পর্শনের শাস্ত্রবিধি আছে।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়।

(৬৪)

দেবীর একটি নাম অপরাজিতা—যাঁহার পরাজয় নাই। দশমী পূজান্তে অপরাজিতা পূজা করা হয় এবং সাধকও অপরাজেয় হইবে, সংসারসংগ্রামে বিজয়লাভ করিবে, এই কামনায় অপরাজিতা নামক লতা বলয়াকারে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে। অপরাজিতা-ধারণমন্ত্র (যাহা প্রচলিত পঞ্জিকা মাত্রেই লিখিত আছে) দেখিলেই জানা যাইবে আয়ু-বল-বৃদ্ধি কামনায় উহা ধারণ করা হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও অপরাজিতার মূল লতা ও পুষ্পের শরৎকালীন ধাতুগত রোগোপশমনের শক্তি আছে। সুতরাং দেহের মনের অপরাজেয়ত্ব লাভই ইহার উদ্দেশ্য। নাম-সাদৃশ্যেও বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বস্তু বা দ্রব্য ধারণ ইত্যাদির প্রথা আছে—অশোকাষ্টমীতে অশোককলিকাযুক্ত জলপান, ভূতচতুর্দ্দশীতে চতুর্দ্দশ শাক ভোজন ইত্যাদি।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়।

(৬৬)

(ক) নিম্নলিখিত দেশে ও রাজ্যে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে—

(১) আমেরিকা (২) জাপান (৩) স্পেন্ (৪) ফিন্‌লাণ্ড (৫) ক্যানাডা (৬) জার্‌মানি (৭) ডেন্‌মার্ক (৮) ফ্রান্স (৯) বেল্‌জিয়াম্ (১০) সিলোন্ (১১) অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারী (১২) ব্রিটিশ্ আইল্‌স্ (১৩) ভারতবর্ষ।

(খ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রাণদণ্ডের প্রকারভেদ—

ডেনমার্কে জনসাধারণের সম্মুখে কুঠারদ্বারা অপরাধীর মস্তক ছেদন করিবার বিধান আছে। ফ্রান্স ও বেল্‌জিয়ামে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্য গিলটিন যন্ত্রে গলাকাটা প্রচলিত। জার্‌মানিতে মাথা কাটিয়া ফেলা হয়। এই কয়টি ব্যতীত উপরোক্ত প্রায় সমস্ত দেশ ও রাজ্যগুলিতে প্রাণদণ্ডের জন্য ফাঁসির বিধান আছে।

(১) আমেরিকায় কয়েকটি ষ্টেট ব্যতীত প্রায় সবগুলিতেই প্রাণদণ্ডের বিধান আছে; আমেরিকায় যে কয়েকটি দেশে সে বিধি নাই তাহাদের নাম পরে উল্লেখ করিতেছি। (২) জাপানে কারাগারের মধ্যেই ফাঁসি দেওয়া হয়। (৩) স্পেনে প্রাণদণ্ড অতি বিরল; প্রাণহত্যার জন্য দণ্ডিত প্রায়ই আজীবন দ্বীপান্তরিত হয়। (৪) ফিন্‌লাণ্ডে খৃঃ ১৮২৪ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন অপরাধীকেই প্রাণদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয় নাই। (৬) জার্‌মানির কয়েকটি ষ্টেটে প্রাণদণ্ড-বিধি সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেওয়া হয়—ব্রান্সউইক্ (Brunswick), কোবারগ্ (Coburg), এবং নাসাউ (Nassau) ১৮৪৯ সালে এই বিধি উঠাইয়া দেয়। সেক্‌সনিতে (Saxony) ১৮৬৮ সালে উঠিয়া যায়, কিন্তু পুনরায় ১৮৭২ সালে প্রাণদণ্ড বিধির ব্যবস্থা করা হয়; কেহ যদি রাজার প্রাণহত্যা করে বা প্রাণহত্যার চেষ্টা করে কেবল তাহাকেই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। (১১) অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারীতে ১৭৮৭ সালে প্রাণদণ্ড বিধি উঠিয়া যায়, কিন্তু ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তাহা প্রচলিত হয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশে পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল, কিন্তু এখন সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া গিয়াছে। কোন্ সময় হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহাও নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

১। হলাণ্ডে—১৮৭০ হইতে

২। ইতালীতে—১৭৮৬ হইতে

৩। নরওয়েতে—১৯০৫ হইতে (৬ই জানুয়ারী)

৪। পর্ত্তুগেলে—১৮৬৭ হইতে

৫। রুমেনিয়ায়—১৮৬৪ হইতে

৬। সুইডেনে—১৯০১ হইতে

৭। সুইজারলাণ্ডে—১৮৭৪ হইতে

৮। রুষিয়ায়—১৯০৭ হইতে (কেবল রাজার প্রাণহত্যা করিলে মৃত্যুদণ্ড)

৯। আমেরিকায় এই কয়টি দেশে প্রাণদণ্ডবিধি নাই—

(ক) মিচিগান—১৮৪৬ হইতে

(খ) উইস্‌কন্সিন—১৮৮৩ হইতে

(গ) মেন্—১৮৮৭ হইতে

(ঘ) রোড্ আইল্যাণ্ড—১৮৫২ হইতে।

শ্রীরামকিশোর রায়।

(৬৭)

শঙ্খবিষ, সোহাগা ও নিশাদল সমভাগে গ্রহণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর উহা জলের সহিত গুলিয়া, তুলিদ্বারা লিখিত কালীর অক্ষরগুলির উপর লাগাইয়া দিলেই—অবিলম্বে ঐ কালীর অক্ষরগুলি উঠিয়া যাইবে, দাগ থাকিবে না। মূল্যবান ও দরকারী কাগজে কোনও প্রকার ভুল হইলে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য এ উপায়টি বিশেষ সুবিধাজনক। ইহা বিষাক্ত; ব্যবহার করিতে খুব সাবধানতা আবশ্যক। কাপড়ের যে স্থানে কালীর দাগ লাগে, সে স্থানটি প্রথমতঃ মোমবাতি কিম্বা চর্ব্বি দিয়া ঘসিয়া পরে সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিলে কালীর দাগ আর থাকে না।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(৬৮)

৺ বিন্দু চিহ্ন প্রণবাত্মক, সংখ্যাবাচক চিহ্ন। বিন্দু-সংযুক্ত ৭, (৭ৗ) সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত পরিপূর্ণা গায়ত্রীমন্ত্র এবং ৭৺ চিহ্নকে গায়ত্রীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। তন্ত্রাদিতে ধ্যানানুসারে দেবতা বিশেষ স্থাপন করিতে বীজমন্ত্র আছে। তন্ত্রযুগে গায়ত্রীর ৭৺ এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হস্তলিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথিতে ৭ং আবাহয়েৎ এইরূপ লিখিত আছে। পুঁথিখানি সংগ্রহ পুস্তক, অনেক মন্ত্রতন্ত্রের উদ্ধার আছে। গায়ত্রীপুরশ্চরণ-বিধিতে ৭ং আবাহয়েৎ দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে আঁজি ৭ৗ গায়ত্রী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কেহ কেহ বলেন পারস্য ভাষায় ৭ৗ চিহ্নটি নিরাকার ঈশ্বর বাচক বর্ণ বিশেষ এবং মোগল আমলে ইহা প্রসার লাভ করে। পারসিকভাষাভিজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে বলিতে পারেন।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়।

আদ্যা শব্দের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁজি অক্ষর। ইহা মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া খাতা পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই আঁজি অক্ষরটি লেখা হয়। দুর্গা বা কালীর যে অর্থ, ইহারও সে অর্থ। আদ্যা শব্দে তন্ত্রোক্ত দুর্গাকে বুঝায় (মুণ্ডমালিনী তন্ত্র)।

শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থ।

(৬৯)

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকে গৌড় সম্বন্ধে এই লিখিয়াছেন—

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে মগধে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। মহাভারতের যুদ্ধের পর বঙ্গের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ। এই সময় হইতে গৌড়ের নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার দৌহিত্ররাজ গৌড়ের নামে এই দেশের নাম গৌড় হয়। ইতিহাসে ৭৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে গৌড় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরে গৌড় সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে আরও চারিটি প্রদেশ গৌড়রাজ্যের অধীন থাকায় তাহারা গৌড় আখ্যা গ্রহণ করে এবং গৌড়াধিপ পঞ্চগৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু মূল বা আদি গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য চিরদিনই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। স্কন্দপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বচন হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—'সারস্বতা কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতাঃ।'

গৌড়ের সীমা যথা—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

(শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, সপ্তম পটল)

অঙ্গ তখন গৌড়রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। অঙ্গ বলিতে তখন বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পুরী বা শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বুঝাইত। * * * * মগধ কিন্তু তখন অঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাহা না হইলে মহাভারতে কখনও উক্ত হইত না যে মগধে গৌতম ঋষির আশ্রমে অঙ্গবঙ্গাদির নৃপতিগণ গমন করিতেন। গৌড়ের ঐশ্বর্য্য ও শক্তিবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্বাংশস্থ বঙ্গের নাম গৌড়ের পর উক্ত হইত অর্থাৎ সাধারণে পূর্ব্বের 'অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ' স্থানে 'গৌড়বঙ্গ' চলিত। ক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া মিলিত 'গৌড়বঙ্গ' গৌড় এবং সমগ্র অধিবাসী গৌড়ীয় নামে অভিহিত হয়। 'আমরা এক্ষণে যে দেশকে বাঙ্গালা বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম গৌড়' (গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব)। তখন তাহারা অতিশয় দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় গৌড়ীয়গণ পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন, ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল।

এই যুগের প্রারম্ভকালে অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর বঙ্গে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহাদেরই বংশাবলী আজি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ (Census of the N. W. P. 1865)। দিল্লী, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে "গৌড়তগা" ব্রাহ্মণ পরিচয়ে অনেকে বাস করেন তাঁহারাও সেই সময় গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা রাজার দানপ্রতিগ্রাহী হইয়া গৌড়দেশ ও গৌড়ের ব্রাহ্মণ-আচার ত্যাগ করতঃ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করায় "গৌড়তগা" নাম প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্রবাসী আদিগৌড়গণও আপনাদিগকে জনমেজয় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত বলিয়া থাকেন। এইসকল ব্রাহ্মণ বঙ্গের আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসীদিগের সংস্রবে সর্পবশীকরণবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বাঙ্গালীরা এজন্য এবং নানাবিধ যাদুমন্ত্রজ্ঞানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ (Census of the N. W. P. 1865)। * * * * কুরুক্ষেত্র বৈদিকযুগ হইতে যজ্ঞভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল—এই পঞ্চগৌড় হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করেন এবং ক্রমে ভারতের নানা স্থানে বিস্তার লাভ করেন। সেই-সকল গৌড়ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্যই বঙ্গদেশ হইতে আগতগণ আপনাদিগকে "আদিগৌড়" নামে অভিহিত করেন। কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ "আদি গৌড়"। তাঁহারা বলেন তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ গৌড়রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছিলেন। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদের আদিপুরুষগণ সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিতেন তাঁহারাও, "আদিগৌড়" বলিয়া পরিচয় দেন। এই সারস্বতগণ এক্ষণে ভারতের সকল প্রদেশেই দৃষ্ট হন। ইহাতে বোধ হয় যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া "আদিগৌড়" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়ের (বঙ্গের) সরস্বতী নদীতীর হইতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য্য।

(৭০)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত কালীকচ্ছের স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় ঝিনুকের বোতাম তৈয়ার করায় একটি সুন্দর কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কল দ্বারা ঘরে বসিয়া অতি সহজে বোতাম তৈয়ার করা যায়। আমি নিজে ঐ কল দ্বারা বোতাম প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। বেশ সুন্দর বোতাম তৈয়ারী হয়। ঝিনুক ব্যতীত নারিকেলের মালা দ্বারাও এই কলে অতি সুন্দর বোতাম তৈয়ারী হয়। পূর্ব্বে এই কলের মূল্য ৮০।৯০ টাকা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মহেন্দ্র-বাবু দিয়াশলাইর কল নিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং অত্যধিক দিয়াশলাইর কলের অর্ডার আসিতে আরম্ভ করায় বোতামের কল বিক্রয়জন্য বর্ত্তমানে তৈয়ারী করেন না, তবে অর্ডার পাইলে অতি সত্বর বোতামের কল তৈয়ার করিয়া দেন। বোতামের কলের আবশ্যক হইলে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী কালীকচ্ছ, সরাইল, ত্রিপুরা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সর্ব্ববিষয় বিস্তারিতভাবে জানিতে পারিবেন।

শ্রীশিবেন্দ্রলাল দত্ত।

বোতাম প্রস্তুত করিবার একটি বৃহৎ কারখানা চট্টগ্রামে আছে। বাঙ্গালা দেশের অনেকস্থানেই বোতাম প্রস্তুতের ছোট হাতকল দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি শ্রীহট্টের অনেক স্থানেও ইহার প্রচলন হইয়াছে। ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায়। এরূপ একসেট্ কলের মূল্য ২৫ ্টাকার বেশী নয়। ইহা চালাইতে বেশী লোকের দরকারও পড়ে না। কম পক্ষে চারিজন লোকই একটি কল চালাইতে পারে। এরূপ একটি কলে রোজ ৬ গ্রোস বা ততোধিক বোতাম তৈরি করা যাইতে পারে।

মোহাম্মদ আবদুল বারি।

বাড়ীতে বসিয়া অল্প খরচে যে কোন লোক দেশীয় ঝিনুক দ্বারা শার্ট, কোট ও পাঞ্জাবীর বোতাম তৈয়ার করিতে পারে।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলিকে 'কল' বলিয়া ধরা যায়:—(১) ১ ফুট উচ্চ কাঠের বার (যাহার উপর বোতাম রাখিয়া পরিষ্কার ও গোলাকার করা হয় ; (২) কোটের ও শার্টের মাপ দাগিবার বিভিন্ন লৌহপাত ; (৩) ইস্পাতের রেত বা উখা ; (৪) বোতাম ধরিবার ও কাটিবার জন্য দুইটি বিভিন্ন প্রকারের লৌহদণ্ড দরকার। ৫ প্রকার যন্ত্র হইলেই নানা বোতাম তৈয়ার করা যাইতে পারে।

সাদা ও উজ্জ্বল করিবার নিয়ম :—

যাহারা বোতাম পালিস ও সাদা করিয়া থাকে তাহাদের নিকট শিক্ষা করা দরকার। ঢাকা শিখিবার উত্তম স্থান। ঢাকার কোনও এক লোক সাদা করিবার প্রণালী বাহির করে। বোতামের কারবারে ঢাকা বঙ্গে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

নিম্নলিখিত বোতামের কারখানায় পত্র লিখিলে যন্ত্রগুলির নাম ও দাম, সাদা ও পালিশ ইত্যাদির প্রণালী জানিতে পারিবেন—(1) Jolly Button & Co. দয়াগঞ্জ, ঢাকা। (2) Basanti Button & Co. Shahajialnagore, Dacca. Sample-Board ক্রয়

করিয়া আনিয়া, নানারূপ বোতামের নমুনা দেখিতে পারিবেন—দাম ।।৹ হইতে ১৲ হইবে।

শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী।

আমাদের দেশে অনেক ঝিনুকের বোতামের ফেক্টরী এবং কল আছে। নিম্নলিখিত ঝিনুকের বোতামের কারখানাগুলিতে পত্র লিখিয়া বোতামের কল সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর জানুন।

(1) Allibhoy Vallijee and Sons,
Multan Cantonment.

(2) Dacca Button Manufacturing Co.
75, Lyal Street, Dacca.

(3) S. Gupta and Co.
45-1, Harrison Road, Calcutta.

(4) Hindu Button Factory,
Bombay.

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(৭২)

যজ্ঞসূত্র ধারণের উদ্দেশ্য সামাজিক অবস্থার পার্থক্য সংসূচিত করা। যখন ত্রেতা যুগে ভারতে চাতুর্বর্ণের প্রতিষ্ঠা হয় তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় "মৌঞ্জী" ব্যবহার করিতেন, পরে কেবলমাত্র "মৌঞ্জীই" পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে এরূপ বিবেচিত হওয়ায় তদানীন্তন সামাজিকগণ "মৌঞ্জী" ও উপবীত উভয়েরই যুগপৎ ব্যবহার করিতে থাকেন। তাই আমরা বর্ত্তমান ভৃগুক্ত মনুসংহিতায় দেখিতে পাই :—

মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।

৪২—২ অঃ

কার্পাসম্ উপবীতং স্যাদ্ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥

৪৪—২ অ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মেখলা মুঞ্জ বা শরতৃণ-বিরচিত ত্রিদণ্ডী, তাহার স্পর্শ সুখকর হইবে। ক্ষত্রিয়ের মেখলা মুর্ব্বাময়ী, তাহাও ধনুকের ছিলার ন্যায় এবং বৈশ্যগণের মেখলা শণতান্তবী করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণগণ কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়গণ শণসূত্রের ও বৈশ্যগণ উর্ণালোমজ উপবীত ধারণ করিবেন। উক্ত উপবীতসকল ত্রিদণ্ডীবিশিষ্ট হইবে। উহা বামস্কন্ধের উপর রাখিয়া দক্ষিণ বগলের নিম্নভাগ দিয়া লম্বিত করিয়া দিবে। কেননা জনসাধারণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য। পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য কি কেবল এই ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? না, আর্য্যগণের মধ্যে কে মাতা মনুর সন্তান অর্থাৎ মনুষ্য কে, কে পিতৃলোক অর্থাৎ আদি পিতৃভূমি (Fatherland) হইতে সমাগত এবং কে কে সাধারণ দেববংশীয় (বিদ্যাংসো বৈ দেবাঃ) ইহা ও বিশেষত্ব প্রদর্শনের জন্য "নিবীত" 'প্রাচীনাবীত' এবং 'উপবীত' এই তিন প্রকারের যজ্ঞসূত্র ধারণের ব্যবস্থা করেন।

মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসায় বলিতেছেন "নিবীতমিতি মনুষ্যধর্ম্মঃ" ১—অ ৪ পাদ পূর্ব্বমীমাংসা। ইহার ভাষ্যে মহাত্মা শবরস্বামী লিখিয়াছেন—

নিবীত মনুষ্যানাং প্রাচীনবীতং পিতৃণাম্ উপবীতং
দেবানামুপব্যয়তে দেবলক্ষ্যমেব তৎ কুরুতে।

"উপবীত" প্রাচীনাবীত" এবং "নিবীত" কাহাকে বলে, ভগবান মনু বলিতেছেন—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥ ৬৩-২ অ

যজ্ঞসূত্র বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণকক্ষ-নিম্ন পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিলে, এবং তন্মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে, তাহাকে উপবীতী বলা যায়। দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বামকক্ষনিম্ন পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিলে ও তন্মধ্য দিয়া বাম বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে, তাহাকে প্রাচীনাবীতী বলে। যাহার কণ্ঠদেশে যজ্ঞসূত্র মালার ন্যায় দোলায়মান থাকে তাহাকে নিবীতী বলে।

কালে সামাজিক নানান বিপ্লবে এইসকল বিশেষ বিধির যেমন বিলোপ ঘটিয়াছিল তেমনি পৈতারও নানান ব্যভিচার ঘটে। তাই বর্ত্তমান সময়ে আমরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকেও কার্পাসসূত্রের পৈতা ধারণ করিতে দেখিতে পাই। যাহা হউক যজ্ঞসূত্র ধারণপ্রথা যে ভারতীয় আর্য্যজাতির আভিজাত্যের চিহ্ন (Badge) ব্যতীত অন্য কিছুই নহে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

শ্রীললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ।

(৭৩)

মাছের বৃদ্ধি অনেকটা তাহার খাদ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। পুকুরে মাছের খাওয়ার জিনিষ যথেষ্ট থাকিলে মাছ বাড়েও তাড়াতাড়ি, ওজনেও হয় বেশী।

সাধারণতঃ মাছের খাওয়ার জন্য কৃত্রিম খাদ্য দিবার আবশ্যক হয় না; কিন্তু বৎসরান্তে পুকুরের মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি না পাইলে, পুকুরে অল্প কিছু পরিমাণে রুটির টুকরা, ভাত ও তরকারী ফেলা যাইতে পারে। পরিমাণ এমন হওয়া চাই যাহাতে পুকুরের জল নষ্ট না হয়। পুকুরে মাছের প্রচুর খাদ্য থাকিলে, প্রত্যেক মাছের ওজন এক বৎসরে তিন পোয়ার কম হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে রুই মাছের ওজন হওয়া উচিত—দেড় সের হইতে দুই সের। মাছের বৃদ্ধি কতকটা মাছের সংখ্যার উপরও নির্ভর করে। ছোট পুকুরে বেশী মাছ থাকিলে, বাড়ে খুব কম এবং অধিকাংশ স্থলেই মাছ মরিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়। পুকুরের আকার এবং গভীরতা দেখিয়া মাছ ফেলিতে হয়। মাছদের মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি হইলে পুকুর হইতে কিছু মাছ অন্য পুকুরে ফেলিতে হয়; তাহা হইলে মাছের বৃদ্ধি ভালরূপে হয়; একথা সকলেই বুঝেন।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

সব জিনিষেই সঙ্কীর্ণতা যত বেশী পরিপূর্ণতা তত কম আর মনের স্বাধীনতা বা অধীনতার সঙ্গে শারীরিক উন্নতি বা অবনতির যথেষ্ট সংস্রব আছে। তাই প্রায়ই দেখা যায় বড়পুকুরে মাছ যত শীঘ্র বড় হয় ছোট পুকুরে তত শীঘ্র হয় না। এর কারণ হচ্ছে বড় পুকুরে মাছ বেশী ছুটোছুটি করতে পারে।

মাছের অবয়বের বৃদ্ধি-অবৃদ্ধি কিছুটা তাদের খোরাকের উপরও নির্ভর করে। যে পুকুরে খাবার বেশী মিলে সেই পুকুরের মাছ বেশী বড় হয়।

চৌধুরী মহিউদ্দীন আহমদ।

(৭৪)

নারিকেল-গাছে পোকা ধরিলে উহার তলাটি বেশ করিয়া খুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। এবং ঐ গাছের গোড়ার চারিদিকে একফুট গভীর করিয়া বৃত্তাকারে একটি গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। ঐ গর্ত্তে দুই তিন দিন যাবত বেশ করিয়া গোমূত্র ঢালিলে পোকা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং পুনরায় গাছ বেশ সতেজ হইয়া উঠে।

নারিকেলচারা রোপণ করিবার সময় যে গর্ত্ত করা হয় ঐ গর্ত্তে

ছাই ও লবণ মিশাইয়া চারা বসাইলে গাছে পোকা ধরিবার আর আশঙ্কা থাকে না, বরং ইহাতে গাছের খুব উপকার হয়।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাখিরা।

নারিকেল-গাছে পোকা ধরিলে গাছের মাথায় কিঞ্চিৎ ঝোলা গুড় অথবা তামাক মাখিবার চিটা গুড় রাখিলে একপ্রকার ছোট লাল পিঁপড়া কর্তৃক পোকা নষ্ট হয়।

বৎসরে একবার নারিকেল-গাছের মাথা পরিষ্কার (বাছাই) করিলে পোকা ধরে না।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র দে।

তুঁতে আধ সের পরিমাণ, তিন সের গরম জলে গুলিয়া, এক পোয়া পরিমাণ গুঁড়া চূন মিশাইতে হয়। পরে উহার সহিত পনর সের জল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পীচকারী দ্বারা নারিকেল-গাছে লাগাইলে, সব পোকা মরিয়া যায়। নারিকেল-গাছে, চারা থাকিতে, প্রত্যহ উনানের ছাই দিলে, সহজে পোকা ধরিতে পারে না।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

নারিকেল-গাছে পোকা ধরিলে, সেই গাছে বেশী পরিমাণে বড় পিঁপড়া ধরাইয়া দিলে পোকা একেবারেই কমিয়া যায়। আর গাছ প্রথম রোপণ করিবার সময় গাছের গোড়াতে ৩৪ সের পরিমাণ লবণ দিয়া রোপণ করিলে মোটেই পোকায় কাটে না।

ঐ।

নারিকেল-বৃক্ষের মাথা অপরিষ্কার থাকিলেই পোকা আসিয়া আশ্রয় করে। যদি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার, আশ্বিন মাসে ও চৈত্রমাসে, খুব পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায় তবে আর পোকা ধরিতে পারে না। গাছের গোড়াতে ধানের তুষ বা পানা দিলেও গাছ ভাল থাকে। যখন পোকা গাছের পাতা কাটিয়া গাছ নষ্ট করিতে থাকে, তখন যদি কিছু চিনি বৃক্ষের গোড়াতে এবং আগায় ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে উহার ঘ্রাণে পিপীলিকা উঠিয়া পোকাগুলিকে খাইয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে। আমি অপর একটি ঔষধ ব্যবহার করিয়াও বেশ উপকার পাইয়াছি। ঐ ঔষধ ভেরেণ্ডা-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গাছের গোড়ায়, মাটীর পাত্রে রাখিয়া দিলে, সব পোকা উহাতে পড়িয়া থাকে। ঐ ঔষধ সাধারণের উপকারার্থে, কোন পারিশ্রমিক না নিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র লস্কর,
ডোহাখলা, ময়মনসিংহ।

(৮১)

কাঠ ব্যবহার করবার আগে তা "পাকাইয়া" লইলে অর্থাৎ পাঁক বা কাদার মাঝে কয়েকদিন পুঁতে রাখলে ঘুণে কাটতে পারে না।

মেটে তেল ব্যবহার করলেও সমান ফল পাওয়া যায়। কেরোসিন তেল লাগালেও কাঠকে অনেকটা বাঁচান যায় ঘুণের পাল্লা থেকে। কাঠকে "ঘুণ-প্রুফ" কোরে ফেল্লেই ঘুণ কাঠে উঠ্‌বে না আর তা হলে পোকাও কাটবে না।

চৌধুরী মহিউদ্দীন আহ্‌মদ।

'নেপ্‌থলিন' ব্যবহার করিলে অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে নেপ্‌থলিন (Naphthalene) দিয়া রাখিলে আর ঘুণে কাটিবে না।

ঐ।

কাঁটাফুল

কেমন করে ফুটলি রে ফুল, বল্;—
কাঁটার সাগর পেরিয়ে এলি
মাণিক-শতদল!
তীক্ষ্ণ কাঁটার কঠোরতা
নিঙড়ে পেলি পেলবতা,
মরুভূমির মাঝখানে
নির্ঝরিণীর জল!

শব-শ্মশানের যোগিনী তুই, ফুল!—
কুরূপ-কোকিল-কণ্ঠে মধু
পঞ্চমেরি বুল!
বিষছেঁচা তুই সাপের মণি!
পঙ্কজিনী, রূপের খনি!
চাষার দরিদ্রতায় প্রিয়া-
প্রীতি-সমাকুল!

ফুলেই এলি কাঁটার বসন ত?—
কঠোর সাধন অন্তে দেবের
আশিস অনন্ত!
নিদাঘ-শোষণ নিঙড়ে এনে
বর্ষা আসে বৃষ্টি হেনে;
তুহিন শীতের শেষ তোরণে
জাগল বসন্ত!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়



পুস্তক পরিচয়

যৌবন-স্মৃতি—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা।

এখানি কবিতাগ্রন্থ। বাইশটি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। ভূমিকায় লেখক স্বয়ং ঠিকই বলিয়াছেন "ইহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই।" না থাকুক, তবুও ছন্দোচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য সব কবিতাগুলিকেই বেশ সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। ভাষাও সর্ব্বত্রই সুললিত ও সুমার্জ্জিত। বেশীর ভাগ কবিতাতেই মৃদু বিষাদের করুণ আভাস ধ্বনিয়া উঠিয়াছে—যৌবনের স্মৃতিই বোধ হয় তাহার কারণ। হাল্কা হাসির সুরেও দুই-তিনটি কবিতা রচিত। ইঁহার কবিতাতে চিন্তার গভীরতার বিশেষ কোন পরিচয় নাই, তবে সূক্ষ্ম রসানুভূতি আছে। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির নিপুণতা সুস্পষ্ট। সেদিন, ছেলেমানুষ, তড়াগ, আর কতদূর, যৌবন, আলোক আঁধার, সঙ্গীহীন, তারা, এই কয়টি কবিতা আমাদের বেশ লাগিয়াছে। তড়াগের শেষ তিনটি স্তবক তুলিয়া দেওয়া গেল—

ক্রমে সন্ধ্যাকালে—
সূর্য্য যবে রক্ত মুখে নেমে যায় ধরণীর নীচে
পুঞ্জায়িত অন্ধকার সন্ধকুটি ছুটে আসে পিছে,
অস্ফুট ভীতির স্বরে পাখীগণ দিয়ে উঠে সাড়া,
গোধূলি-মলিন মুখে অশ্রুজলে হাসে সন্ধ্যাতারা
আকাশের ভালে,
তখন তোমার [তড়াগের]—
কূলে কূলে কৃষ্ণরেখা হয়ে আসে স্পষ্ট স্পষ্টতর,
শীর্ণ তালবৃক্ষছায়া কাল জলে কাঁপে থর থর,
শীতবায়ু-স্পর্শে গাত্রে শিহরণ উঠে অহরহ;—
শীতলস্মৃতিতে যেন মনে কার মরণ-বিরহ
জাগে বার বার।
নিশা তমোময়ী—
তোমার সজলবুকে পুরে দেয় নিবিড় আঁধার,
তারাতে ছায়াতে করে দূরত্বের দ্বিগুণ বিস্তার;
তুমি দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলে থাক অসীমের পানে,
বুকের শূন্যতা ভরে নিতে চাও অন্ধকার দানে,
বিরাট প্রণয়ী।

মোটের উপর আমাদের বিশ্বাস, এই ছোট্ট গ্রন্থখানি কাব্যামোদী পাঠককে আনন্দদানে সমর্থ হইবে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

ছেলেদের সেক্‌স্‌পীয়ার—প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ। আট আনা, ৬৩ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা।

সেক্‌স্‌পীয়ার জগতের শ্রেষ্ঠতম নাটককার কবি। তাঁর সঙ্গে বাঙালী ছেলেমেয়েদের পরিচয় করাইবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। এই ছোট বইখানিতে বিশ্ববরেণ্য কবির চারখানি নাটকের গল্প ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে—(১) শ্রীম্মরাতের স্বপ্নকথা, (২) রোমিও জুলিয়েট, (৩) রাজা লীয়ার, (৪) ঝটিকা। বইএ ছবি আছে। ছবিগুলি বিলাতের প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের আঁকা, সুতরাং সুন্দর যে সে-কথা বলাই বাহুল্য। এই বইএর সঙ্গে বাঙালী ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটিলে বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদ পাইয়া তাদের চিত্ত প্রসারিত ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইবে। দাম খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে।

ছড়া ও পড়া—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। সিটি বুক সোসাইটী, কলিকাতা। সচিত্র। আট আনা।

শিশুদের খেলনা বই। ছোট ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত পুস্তক রচনায় যোগীন্দ্র বাবু অগ্রণী। তাঁর রচনায় রস থাকে, আনন্দ থাকে; তিনি নিরঙ্কুশ কবি-হস্তীদের মতন মা-সরস্বতীর পদ্মবন গোদাপায়ে দলিয়া যান না, তাঁর কবিতাকে তিনি ছড়া নাম দিলেও তাতে ছন্দ ছিন্নভিন্ন হয় না, কবিত্বের মধু পঙ্কে পরিণত হয় না। এই বইখানিতেও গ্রন্থকার স্বাভাবিক দক্ষতায় কবিত্বের মাধুর্য্য, ছন্দের লালিত্য ও পারিপাট্য এবং গদ্য রচনাতেও সরস বচনচাতুর্য্য বজায় রাখিয়া বইখানিকে উপাদেয় উপভোগ্য করিয়াছেন। আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও বুড়া বলিয়া পরিচিত আমরাও শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে, এই পুস্তকখানি আগাগোড়া পড়িয়াছি ও বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। কোনো বই সম্বন্ধে এর বেশী ভালো বলিবার আর কি আছে? এই বই পাইলে ছেলেমেয়েদের আনন্দ যে অবশ্যম্ভব তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

বামন হয়ে চাঁদে হাত—শ্রীকানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, কলিকাতা। আট আনা। ৪৪ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ কর্ত্তৃক লিখিত শিশুদের উপযুক্ত একটি গল্প এই বইএ সরস সরল ভাষায় বলা হইয়াছে। গল্পটিতে ঘটনা-পরম্পরায় কৌতূহল জাগ্রত হইয়া থাকে, কৌতুক ও হাস্যরসেরও প্রবাহ আগাগোড়া আছে। এই বইখানি পড়িলে শিশুরা বিদেশী সাহিত্যের পরিচয়, বিদেশী মনের পরিচয় পাইতে পারিবে। অথচ গল্প রচনার মধ্যে বিদেশীর নামগন্ধও নাই—সমস্ত গল্পটি একেবারে দেশী ছাঁচে নিপুণতার সহিত ঢালাই করা হইয়াছে। বইএ অনেকগুলি সুন্দর ও মজাদার ছবি আছে। দাম বেশ সস্তা হইয়াছে।

মহর্ষি দধীচি—শ্রীহরিদাস মজুমদার। সরস্বতী পুস্তকালয়-৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৪ পৃষ্ঠা। দামের উল্লেখ নাই,

দৈত্যদের আক্রমণ থেকে দেবতাদের রক্ষা করিবার জন্য দধীচি মুনি আপনার আত্মত্যাগের দ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। আত্মত্যাগীর অস্থিতে প্রস্তুত বজ্র স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই আত্মত্যাগী মহর্ষির পৌরাণিক কাহিনী এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই আত্মত্যাগের অবদান ছেলেমেয়েদের পাঠ করা উচিত, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

শিবনাথ—শ্রীসুনীতি দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, ৯৭।১ সি ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। ৬৩ পৃষ্ঠা। আট আনা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনীর গুটিকয়েক কাহিনী ও বিশেষত্ব শিশুদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্যজীবনের কৌতুকাবহ ঘটনা, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন, সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা, কর্ম্মজীবনে তাঁর অক্লান্ত উদ্যম, তাঁর সাহিত্যসাধনা ও রচনাশক্তি, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে তাঁর স্নেহশীল কর্ত্তব্যপরায়ণতা, রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ক্রটি-সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি এই পুস্তকে মোটামুটি সবই বর্ণিত হইয়াছে। মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিলে চরিত্রে তার প্রভাব পড়ে, সেই ছাঁচে চরিত্র গঠিত হয়; বালকবালিকারা এই মহৎজীবনের সহিত পরিচিত হইলে তারা যে বিশেষ উপকৃত হইবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই বইএ অনেকগুলি ছবি আছে, সেগুলি শিশুদের বিশেষ আনন্দপ্রদ হইবে। বইখানির রচনা সুন্দর সুলিখিত ও সংহত হইয়াছে।

বঙ্গগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়, বি-এ; ১৬ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭২ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা। আট আনা।

গুরুদাস বাবু বাংলাদেশের সম্মানিত লোক ছিলেন তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বে ও স্বভাবের মাধুর্য্যে। এই ধর্ম্মভীরু মনস্বীর জীবন এই পুস্তকে দশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, আইন ব্যবসায়ে, বিচারপতিরূপে গুরুদাস বাবুর বিশেষত্ব এবং তাঁর সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিমত স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

কানের দুল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৮২ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা।

গল্পের বই। সাতটি গল্প আছে—কানের দুল, প্রতিদান, কোভার সাহেব, কল্যাণী, যমুনা, পরিচয়, বিদেশী। সব গল্পগুলির অন্তর্নিহিত কৌশল হইতেছে—ভুল বোঝা। গল্পগুলি সেইজন্য কৌতূহল উদ্রেক করে। গল্পগুলি সুলিখিত। আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে প্রতিদান গল্পটি। বোবা যুবকের প্রণয়ের ব্যাপারটি সুন্দর দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে।

দেববীণা—শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী। সাধনা লাইব্রেরী, ২৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, দু টাকা।

বাংলা থিয়েটার মহলে দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়ের সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ বলিয়া সুনাম আছে। বাংলা থিয়েটারের বহু নাটকের গানে সুর সংযোজনার কৃতিত্ব তাঁর। তিনি যে কেবল সুরজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ নন, সঙ্গীতরচয়িতাও তার পরিচয় দেববীণা। এই বইএ দেবকণ্ঠের সঙ্গে দেববীণা লয় মিলাইয়াছে—নানাভাবের গান রচনা করিয়া রচনাশক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন। গানগুলিতে কবিত্ব আছে, রচনা-পারিপাট্য আছে, ভাবাবেশ আছে, সুসঙ্গত সুরতালও যে আছে তাও না শুনিয়াও বলা যায়। সঙ্গীতপ্রিয়দের কাছে এই বই সমাদৃত হইবার যোগ্য।

দেবব্রত—শ্রীঅমিতচন্দ্র কাব্যবিশারদ। প্রকাশক শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এস সি, বি এল, বারাসত। ১৮০ পৃষ্ঠা। পাঁচসিকা।

নাটক। মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্ম কর্ত্তৃক অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা হরণ আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত। প্রস্তুত চরিত্র লইয়া নাটক রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ; সেক্ষেত্রে নাটককারের কৃতিত্বের বিচার রচনা-পারিপাট্য দেখিয়া করিতে হয়। এই নাটকের রচনাপ্রণালী উৎকট সংস্কৃত-ঘেঁষা। পাত্রপাত্রীদের মুখে বড় বড় বক্তৃতা, সংস্কৃত শ্লোক, তত্ত্বকথা গুঁজিয়া বইখানিকে ভয়াবহ করা হইয়াছে। "সম্যকরূপে পরিপাটিত ক্ষেত্রে বীজবপনে ফলের সম্ভাবনা অন্তরের নিকট কার্য্যের আশা করলে অন্তরকে সংযম হল দ্বারা অনবরত কর্ষিত করে আকাঙ্ক্ষাদি তৃণরহিত করে' শান্ত সমতল করতে হয়; তার পর সেই অন্তর-ক্ষেত্রে শালগ্রাম-শিলাগত ভগবানকে রোপণ করলে জ্ঞানময় ভগবান-বৃক্ষ অঙ্কুরিত শাখাপ্রশাখায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করেন।" ইত্যাদি বাক্য নাটকে অচল। ব্রহ্মবিহার কাম্য অবস্থা হইলেও ভগবানবৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় লম্ফঝম্প দেওয়ার কল্পনা অসাবধান অক্ষম লেখকেরাই করিতে পারেন। বইখানি রচনা হিসাবে যেমন কুশ্রী, গঠন ও ক্রমপুষ্টি হিসাবেও তেমনি নিষ্ফল হইয়াছে। যদিও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আমরা এর মধ্যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য একটুও খুঁজিয়া পাইলাম না।

নারীর কথা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। ৭৭ পৃষ্ঠা। পাঁচ সিকা।

নারী সম্পর্কীয় ছয়টি প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে—(১) নারীর কথা, (২) নারীসমস্যা, (৩) নারীস্বাতন্ত্র্য, (৪) বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধ, (৫) দাম্পত্য সম্বন্ধের কথা, (৬) পুরুষ ও নারী। পৃথিবীর সকল দেশে নারীসমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; পুরুষ এতকাল নারীকে যে-সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছিল তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষ হইতেই উত্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার মীমাংসা কি তাহা চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লেখক এই পুস্তকে বিশেষ দক্ষতার সহিত সকলদিকের বিচার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশেও পুরুষ ও নারীর এই বইখানি পড়িয়া চিন্তা করিয়া কর্ম্ম করা উচিত।

সবুজ কথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। ১৫৭ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

সুরেশ বাবু নবযুগের অগ্রযাত্রার মঙ্গল-অনুষ্ঠানের যজ্ঞে একজন পুরোহিত। তাঁর মন্ত্র সতত ধ্বনিত হইতেছে—"আগে চল, আগে চল ভাই!" "ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!" সমস্ত পিঞ্জর মুক্ত হোক, শৃঙ্খল ছিন্ন হোক, বাধা অপসারিত হোক, গণ্ডী মুছে যাক; প্রাণ হোক তাজা, বুদ্ধি হোক তীক্ষ্ণধার, বিচারশক্তি হোক অনাচ্ছন্ন, মন হোক সংস্কারবর্জ্জিত! এই আশার ও উৎসাহের মন্ত্র-উদ্গাতা এই পুস্তকে এক ডজন প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছেন—(১) ভারতবর্ষ, (২) বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়, (৩) অচলায়তন, (৪) পঙ্ক, (৫) শক্তিমানের ধর্ম্ম, (৬) একটি প্রেমের গান, (৭) নারীর উক্তি, (৮) অবরোধের কথা, (৯) বীরবল, (১০) বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, (১১) ঘরে বাইরে, (১২) নূতন ও পুরাতন। যাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সম্পর্কে স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় সজীবতা ও স্বাস্থ্য অনুভব করিতে চান, যাঁরা চির সবুজ থাকিতে উৎসুক, তাঁরা এই বই পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই বই আমাদের অকালবৃদ্ধ দেশের একটি প্রাণকেও তারুণ্যের উৎসাহ দিতে পারিলে তার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাই আমরা সকল নর-নারীকে এই বই পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বরাজসাধনা বা রাষ্ট্রপরিচয়—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বি, প্র, ভাণ্ডার, বসন্তকুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। ১০৪ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

বসন্ত-বাবু যে স্বদেশভক্ত চিন্তাশীল সংস্কারবর্জ্জিত লেখক তার পরিচয় আমরা বহুবার তাঁর বহু পুস্তক সমালোচনা করিবার সময়

নিয়াছি। এই পুস্তকে লেখক বর্ত্তমান রাষ্ট্রের স্বরূপ কি এবং কিরূপ রিবর্ত্তন ঘটাইলে স্বরাজলাভ হইতে পারিবে তাহারই বিচার চক্ষণতার সহিত করিয়াছেন। বইখানি ১৬ পরিচ্ছেদে বিভক্ত—১) রাষ্ট্রের প্রকৃতি, (২) রাষ্ট্র কি কৃত্রিম ব্যবস্থা, (৩) রাষ্ট্রপ্রভু ক—রাজা না প্রজা? (৪) অন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান, (৫) রাষ্ট্রের শ্রেণীভেদ, ৬) রাষ্ট্রের মৌলিক বিধান, (৭) শাসনচক্রের কর্ত্তব্য, (৮,৯) ব্যবস্থাপক বিভাগ, (১০) শাসনচক্র, (১১) বিচারবিভাগ, (১২) মিলিত রাষ্ট্র, (১৩) উপনিবেশ, (১৪) স্থানীয় শাসনকর্তৃত্ব, (১৫) সম্প্রদায়গত শাসনকর্ত্তৃত্ব, (১৬) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও শাসনচক্রের কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রতত্ত্বের সকল অঙ্গের মোটামুটি কথা এই ১৬ পরিচ্ছেদে বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝানো হইয়াছে। বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই—"স্বরাজ কেহ কাহাকে দান করিতে পারে না, তাহা হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। বিদ্বেষ অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অন্তরায়। দেশবাসীর আন্তরিক একতা ও সমত্ববোধের উপরেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।" স্বরাজপ্রার্থী প্রত্যেক নরনারীর রাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞান পরিষ্কার ও গভীর হওয়া দরকার। এই বই সেই সাধনায় অনেক সাহায্য করিতে পারিবে।

পথের প্রদীপ, পথের সাথী—শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ। কল্পতরু গুরুকুল সমিতি ১৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় পয়সা।

চটি বই। দেশোদ্ধার করিতে উৎসাহী লোকদের আশা ও উৎসাহের প্রদীপ জ্বালিয়া পথ দেখানো এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। খুব জোরালো সত্য কথা বলা হইয়াছে। দুখানি বই আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও তার অন্তরে অগ্নিগর্ভ উৎসাহবাণী নিহিত আছে। যাত্রীজন এই পথের প্রদীপ ও পথের সাথী হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

গ্রামের কথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী, বগুড়া। দশ পয়সা।

গ্রামের উন্নতিতে সমগ্র দেশের উন্নতি; কি উপায়ে গ্রাম উন্নত হইতে পারে; স্বশক্তির বিকাশেই স্বরাজ লাভ হয়; ইত্যাদি বিষয় খুব আশান্বিত উৎসাহবাক্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। আশার বাণী যিনি ঘোষণা করেন, তিনি দেশবন্ধু। গ্রামে গ্রামে উৎসাহ ও আশা সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা লেখা। এর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ভারতে বিলাতি কাপড় ও আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীভবেশচন্দ্র মুন্সী। উখ্‌লী কংগ্রেস কমিটী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

ভারতে প্রাচীনকালে বাণিজ্যের অবস্থা কেমন উন্নত ছিল ও বিদেশী বণিকেরা আসিয়া কেমন করিয়া ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট করিল তার ইতিহাস একটু এই পুস্তিকায় দিয়া লেখক দেখাইয়াছেন বিদেশী বর্জ্জন করিলে আমাদের স্বরাজ কিরূপে করায়ত্ত হইবে, স্বরাজের উপকারিতাই বা কি। লেখকের সিদ্ধান্ত এই—"যদি সমস্ত ভারতবাসী একযোগে ব্রিটীশ পণ্য বর্জ্জন করে তাহা হইলে ব্রিটীশ কলওয়ালাগণ ভারতে ও বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিবেন এবং যে অধিকারলাভের জন্য ভারতবাসী বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টকে সেই অধিকারদানে বাধ্য করিয়া ভারতবাসীর অসন্তোষ দূরীকরণে প্রয়াস পাইবেন। এইরূপে অচিরে ভারতে স্বরাজ্য স্থাপিত হইবে।" "স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবাসীর ঘৃণিত দাসত্বজীবন প্রকৃত মনুষ্যজীবনে পরিবর্ত্তিত হইবে।"

মহিম্ন স্তোত্র—অন্বয় অনুবাদ ও বিশেষ ব্যাখ্যা সহ। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। সরস্বতী পুস্তকালয়, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দু আনা।

ভাওয়ালী কাণ্ড—শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী, ২২ গোকুল মিত্রের লেন, কলিকাতা।

ভাওয়ালের মৃতমধ্যম কুমার ও সন্ন্যাসীঘটিত ব্যাপার আলোচনা করিয়া লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে সন্ন্যাসী জাল।

সখী—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ। আট আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলিতে যতগুলি সখীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই বই লেখা হইয়াছে। সাহিত্যে সখীর কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা কি, কাব্য নাটকে সখীর দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য পরিস্ফুটন, সখীগণের শ্রেণীবিভাগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট সখীচরিত্রের বিশেষত্ব এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। নায়িকার অঙ্গরূপেই সখীরা চিত্রিত হন ও নায়িকার কার্য্যে সাহায্য করিয়াই তাঁরা পাঠকের মন হইতে সরিয়া পড়েন। সখীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) নায়িকা তুল্যা সমপদবীর স্বাধীনা, (২) বৃত্তিভোগিনী, নায়িকার অধীনা, কিন্তু ভদ্রবংশজা, (৩) দাসী। বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিন শ্রেণীর সখীই এই পুস্তকে সমালোচিত হইয়াছেন। সমালোচনায় সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় আছে। বাংলা সাহিত্যে এরকম বই নূতন।

মুদ্রারাক্ষস।

ক্ষুধা

(তুলসীদাস)

শারীরিক ক্ষুধা ?—খাও পোওয়া তিন
একেবারে হয় হ্রাস।
মানসিক ক্ষুধা ?—তার ধারা ভিন,
সুমেরু করিবে গ্রাস!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

জীবন-মরণ

মৃত্যু সে যে শুক্তি-কারা জীবন-মুক্তার,
মগ্ন গলা অন্তরে তার প্রাণেরি সঞ্চার,
নিত্য-কালের-সাগর দোলা ঢেউ এর পাগল বেগে
রুদ্ধ-মরণ-দুয়ার ঠেলে উঠ্‌ছে জীবন জেগে।

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী।



সুবর্ণবণিক-সমাচার (আশ্বিন)

বক—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

বক যাযাবর পাখী নহে ; জলাশয় হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া, জলাভাব হইলেই ইহাদের স্থানপরিবর্ত্তন করিতে হয়। বক-চরিত্রের একটা বিশিষ্টতা এই যে, তাহারা সারাদিন খাদ্যান্বেষণে প্রায়ই সঙ্গীহীন অবস্থায় বিচরণ করে, দল বাঁধিয়া থাকিতে পছন্দ করে না। যে সকল বক রাত্রিচর, তাহারা সারারাত আহারের খোঁজে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকালবেলা তাহাদের নিবাসবৃক্ষের উপর আসিয়া জমায়েত হয়।

বাসা-নির্ম্মাণে বকের মোটেই পারিপাট্য বা রচনাকৌশল লক্ষিত হয় না। কদাকার বাসা আয়তনে বড় হইলেও ডিম্বরক্ষার স্থান গম্ভীর হয় না। সাধারণতঃ বৃক্ষশাখায় নীড় রচিত হয়। কিন্তু কতিপয় শ্রেণীর বক জলাশয়স্থ অথবা তৎতীরবর্ত্তী শরবনের ঝোপে-ঝাপে বাসা প্রস্তুত করে। শ্রেণী অনুসারে ডিম্বের বর্ণ কোনটার সাদা, কোনটার সবুজ, কোনটার বা ঈষৎ নীল হয় ; কোনটাই বিন্দু-বিন্দু দাগ-বিশিষ্ট হয় না। ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইতে ৩৭ দিন লাগে। গৃহনির্ম্মাণ, ডিমে তা দেওয়া ও সন্তানপালনকার্য্যে বক দম্পতী উভয়েই দায়িত্ব ভাগাভাগি করিয়া লয়।

বকজাতীয় পাখীগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। দেহের লক্ষণের তারতম্য ও বর্ণের বৈষম্য অবলোকন করিয়া এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। বক মাত্রেই অত্যন্ত লোভী ও পেটুক হয়। মুখের আকর্ণবিস্তৃত হাঁ দ্বারা সে বড় বড় মাছ গিলিয়া ফেলিতে পারে।

কলিকাতার কথা—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

হেষ্টিংসের আমলে রায় রাঁয়ার পদ উঠিয়া গিয়াছিল। কায়স্থ মহারাজা রাজবল্লভ বার্ষিক একলক্ষ টাকা পাইতেন ও গবর্ণর জেনারেলের সভার সভ্য ছিলেন। ইঁহার আদি নিবাস রাজসাহী ; কলিকাতায় বাগবাজারের যেখানে থাকিতেন সেইখানে তাঁহার নামে রাস্তা হইয়াছে। হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে তাঁহার নিকট হইতে একখানি কাগজ সহি করিয়া আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজবল্লভ নবকৃষ্ণকে বসিতে না বলায় নবকৃষ্ণ আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া হেষ্টিংসের কাজে ইস্তফা দিবার ভান করিয়া রাজবল্লভকে পদচ্যুত করাইয়াছিলেন। নয়ানচাঁদ মল্লিক সেকালের কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী।

কলিকাতায় যেখানে নুনের গোলা ছিল অর্থাৎ নুন তৈয়ারী হইত তাহাকে মলঙ্গা বলে, কারণ যাহারা তাহা করিত তাহাদিগকে মলঙ্গী বলিত। অনেক সুবর্ণবণিক তখন এই কাজ করিতেন ও তাঁহাদের বংশধর ঐ মলঙ্গায় আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছেন। নয়নচাঁদ তাঁহাদিগকে উপদেশ ও অর্থ সরবরাহ করিতেন। তখন যে সস্তায় মাল সরবরাহ করিতে পারিত সেই সেকালের ব্যবসাদারদের সকল কার্য্য করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিত। এইজন্য নয়ানচাঁদের বাড়ীতে এইরূপ উমেদার সর্ব্বদাই হাজির থাকিত। পীরিতরাম মাড়, কৃষ্ণ পান্তি তাহাদের মধ্যে ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ছোলা ও বাঁশের দাম বড়ই বাড়িয়া যায়। বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের পুত্রগণ গৌরচরণ ও নিমাইচরণ তখন লায়ের ব্যবসা করিতেন। তাঁহারা কৃষ্ণ পান্তির নিকট আড়ংঘাটার মোহন্তের ছোলার কথা শুনিয়া ভাল লোক পাঠাইয়া দেখিলেন যে সব ছোলা পচিয়া যায় নাই, লোক পাঠাইয়া ছোলা ও ভুষি আলাদা করিয়া ন্যায্য দাম দিয়া কৃষ্ণ পান্তির মূলধন করিয়া দিয়াছিলেন। আর পিরীতরাম ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের জঙ্গলে বাঁশাদি কাটিয়া সরবরাহ করিতেন বলিয়া মাড় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

হেষ্টিংসের আমলে যে সুতানটী জব চার্ণক আসিয়া তাঁহার উপযুক্ত আশ্রয়স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কোম্পানী যাহা লাভ করিবার জন্য কত চেষ্টা ও ব্যয় করিয়াছিল, তাহা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের মূর্খতায় নবকৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কলিকাতার অনেক অধিবাসী আপত্তি করিয়াছিল। নয়ানচাঁদ মল্লিক ইহার পূর্ব্বেই ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ইহা লইয়া কুমারটুলির বিখ্যাত দাতা ও দেওয়ান অভয়চরণ মিত্র বিলাত পর্য্যন্ত মামলা করেন ও তাহাতে নবকৃষ্ণ হারিয়া গিয়াছিলেন।

ইংরেজি ধরণের আমোদপ্রমোদ বাঙালী-সমাজে তখন প্রবেশ করিয়াছিল ; ঠাকুরের উৎসবে ইংরেজের নিমন্ত্রণ, ইংরেজি ধরণের খাবার ব্যবস্থা, নাচ গান টানাপাখা। রাজা নবকৃষ্ণ ও সুখময় কলিকাতায় দুর্গাপূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার লক্ষ ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা আছে ;—

"ভাদুরের নন্দকুমার,
লক্ষ ব্রাহ্মণের করলে হুমার,
কেউ খেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো!"

—

শিক্ষক (কার্ত্তিক, ১৩২৮)

শিক্ষায় স্মৃতিশক্তির অনুশীলন—শ্রীসুশীলকুমার রায়।

স্মৃতিশক্তির অনুশীলন করতে পারলেই শিক্ষালাভের পথটি সুগম ও সিধে হবে। আধুনিক আত্মতত্ত্ববিদেরা বলেন যদি বাস্তবিকই কোন জিনিষ জানবার দরকার হয় ত এমনভাবে জানা উচিত, যেন চিরদিন মনে থাকে,—শুধু পরীক্ষায় পাশ হবার জন্য নয়।

মনে যখনই একটা কথা উঠে তখনই তার পেছনে "হাঁ" আর "না" এই দুটো ভূতকে ছেড়ে দিতে হয়। ঐ দুটোর লড়াই থেমে গেলে যে জিনিষটা থাকে সেইটাই সত্যি, আর নোটবুকে স্থান পাবার যোগ্য। কোনো জিনিষের কথা বলতে বা লিখতে হলেই আগে তার একটা চেহারা ভেবে নিতে হবে। অনেক জিনিস দেখে দেখে, প'ড়ে প'ড়ে মনের পর্দ্দায় এমন একটা দাগ টেনে যায় যে, সেটা হয়ে যায় বায়স্কোপের ফিল্মের মত। একবার চোক বুজে ভাবলেই মনের পর্দ্দায় অনেকদিনকার মুছে-যাওয়া জিনিসগুলো আবার স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে প্রত্যেক কাজ খুব মন দিয়ে করতে হবে। কাজ হালকা ব'লে অবহেলা করলে চলবে না। মন দিয়ে কাজ না করলে তার ফল স্থায়ী হয় না। যে সময় যে কাজটি করব সেই সময়ের জন্য অন্য কোন ভাবনা মনে স্থান দেব না,—এতেই চিত্তের একাগ্রতা আসে, ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে।

যাদের বানান বড্ড বেশী ভুল হয়, তারাও এই স্মৃতিশক্তির অনুশীলনে খুব সুফল পেয়েছে ;—কোনো একটা বানান বেশ একটি একটি করে লিখে একবার চোক বুজে যেন চোকের সামনে দেখ্‌ছি এমনি ভাব্‌তে হবে। এই রকম দু-একবার করলেই এমন মুখস্থ হয়ে যাবে যে আর কখন ভুল হবে না। যেমন মুখে বানান বলার চেয়ে লেখায় কম ভুল হয়। লিখে লিখে কথার চেহারাগুলো এমন চোখে ধরে যায় যে, একটা অক্ষর ভুল হলেই যেন মনে হয় মানাচ্ছে না, কোথায় যেন একটা গোল হল। এই শক্তির উন্মেষ তখনই হয় যখন প্রত্যেক কাজটি মন দিয়ে করা হয়।

তারপরই আত্মবিশ্বাস। কখনো ভাবা উচিত নয় যে, আমি এটা পারব না। স্মৃতিশক্তির অনুশীলন কর, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। প্রত্যেক জিনিস আপনিই সফল হ'য়ে উঠ্‌বে।

নব্যভারত (আশ্বিন)

বকের বদনাম—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

বক আমাদের বাংলা দেশে অত্যন্ত পরিচিত পাখী। সে যে অযাচিত ভাবে কৃষিজীবী বাঙ্গালীর কত উপকার করিয়া আসিতেছে তাহার খবর আমরা রাখি না। যে কীটে চাষ নষ্ট করে, সেই কীটকে এই বকেরা বিনাশ করে। কর্কট মূষিক প্রভৃতি সংহার করিতে বকের মত আর কেহ পটু নয়। এমনই করিয়া বক মানবশত্রুর উচ্ছেদ সাধন করে। গোমহিষের গায়ে এক রকম পোকা হয়, যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা নানা প্রকারে সেই কীট হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে। বক অথবা কাক সেই পোকাগুলোকে যেরূপে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। এইরূপ কীটের অত্যাচার হইতে বক শূকরকে ও হস্তীকে রক্ষা করে। পশুর রক্তশোষক জোঁককেও বক নষ্ট করে। গরু ভেড়া মাঠের উপর দিয়া চলিবার সময় যে সকল পতঙ্গ ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উঠে, বক তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই খাইয়া ফেলে। এই পতঙ্গ আমাদের ক্ষেত্রে শস্যগুলার মহা শত্রু।

নারায়ণ (কার্ত্তিক)

জিউজিৎসু—শ্রীহেম সেন।

"জিউজিৎসুটা" একটা জাপানী বিদ্যা। আড়াই হাজার বছরের অধিক কাল থেকে জাপানে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়ে আস্‌চে। জিউজিৎসুর উদ্দেশ্য শরীরকে সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে, আকস্মিক অথবা অন্য রকমের লৌকিক বিপদ আপদে আত্মরক্ষার এমন কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া, যাতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায়ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহারই শক্তি এবং স্বাভাবিক বা ইচ্ছাকৃত অঙ্গসঞ্চালনের এবং শরীরের ভারকেন্দ্রের চ্যুতির উপর অতি সামান্য শক্তি কৌশল প্রয়োগ করে', এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে, যেখানে বা যে অবস্থায় সে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবে, কিছু কর্‌বার শক্তি তার আদৌ থাক্‌বে না।

জিউজিৎসুতে কখনও গুরুতর পরিশ্রমের সম্ভাবনা নাই, বিশেষ বিশেষ খাদ্য-পেয়েরও প্রয়োজন হয় না। জিউজিৎসু কুস্তী নয়। জিউজিৎসু দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে শিখ্‌তে পারেন। শরীরটাকে জিউজিৎসু শিক্ষার উপযোগী কর্‌বার জন্য যে প্রাথমিক ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে তাহা দুর্ব্বলের পক্ষে মহোপকারী। এই ব্যায়াম-প্রণালী সর্ব্বত্র অভ্যাস করা চলে। জিউজিৎসু অভ্যাস কর্‌তে কোন যন্ত্রপাতি বা উপকরণের আবশ্যক হয় না, কিন্তু শরীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের দর্‌কার হয়। জাপানে স্কুল-সমূহে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে জিউজিৎসু শেখান হয়। বর্ত্তমান জাপান-সম্রাট যখন যুবরাজ, তখন তাঁকেও সাধারণ ব্যায়ামাগারে জিউজিৎসু শিখ্‌তে হয়েছিল। জিউজিৎসু ভাল করে শিখ্‌তে অন্ততঃ চার বৎসর সময় লাগে। তবে অল্পকালের মধ্যেই (যেমন তিন চার মাসে) বেছে বেছে অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শুধু-হাতের ভিন্ন আর দুই রকম জিউজিৎসু আছে, সচরাচর সেগুলির কোন প্রয়োজন হবে না। শুধু-হাতেরটাই শ্রেষ্ঠ।

মোস্‌লেম ভারত (আশ্বিন ১৩২৮)

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি,
শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে।
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে আসা,
এ যে মাটির কোলে মাণিক খসা হাসিরাশি।

নারীর কথা—মোহম্মদ লুৎফর রহ্‌মান—

নারীর রূপ লইয়া মানুষ কবিতা রচনায় ব্যস্ত, কিন্তু সত্য করিয়া কেহ তাহার হৃদয়-বেদনা, তাহার দীনতা, তাহার অপমান বোঝে না।

নারীর প্রাণ আছে, রূপের প্রশংসা শুনিয়াই সে বাঁচিতে পারে না। সে যে মানুষ, এ-কথার স্বীকার সে চায়।

নারী যদি শিক্ষিতা হয়, তবে পুরুষের মতই জীবনের বেদনার সহিত সে সংগ্রাম করিতে পারিবে, সে বিপথে যাইবে না, পুরুষ-সমাজ তাহাকে বিপথে লইতে পারিবে না।

কন্যাকে ছেলের মত শিক্ষিত কর, তাহাকে আত্মবোধ দাও, তাহার হৃদয়ে শক্তি ও মুখে ভাষা দাও, বাহুতে ও বুকে বল দাও। গহনা অপেক্ষা ইহাই শ্রেষ্ঠ দান হইবে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়াই যে মানুষের মনের বড় অধিকার। তবে কেন নারীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের অকল্যাণ করিতেছ—নারীর জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছ?

কোন কারণে স্বামীর বাড়ীতে না থাকিতে পারিলে, কন্যাকে বাপের বাড়ীতে পরানুগৃহীতার মত হইয়া থাকিতে হয়, ভাইবউদিগকে ভয় করিয়া জীবন কাটাইতে হয়। দুই একটা ছেলে থাকিলে ত কথাই নাই, অপরাধিনীর বেদনা লইয়া তাহাকে বাঁচিতে হয়। মানুষের জীবন যে কেমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে নারী-জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞানলাভ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অবরোধ ও শিক্ষাহীনতা নারীজাতিকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়াছে—তাহার ললাটে শত দীনতা ও কলঙ্কের ছাপ লাগাইয়া দিয়াছে। কয়েদী করিয়া নারীর সতীত্ব রক্ষা করিও না, সে সতীত্বের কোন মূল্য নাই। নারী হাত পা থাকিতেও খঞ্জ, হৃদয় থাকিতেও অনুভূতিহীন। তাহা ছাড়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার মত বেদনা মানবজীবনে কি আর আছে।

এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই বলিয়া কোন মেয়ে বাহির হইলেই লোকে তাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া সন্দেহ করে—তাহার দিকে লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। পুণ্যবতী রমণীদিগকে কঠিন বজ্রদৃষ্টিতে এই লালসা-কটাক্ষকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

রেল-ষ্টেশনে কোন বধূ বা মেয়ে যদি হারাইয়া যায়, তাহার স্থান হয় কোথায় জান? কলিকাতায় পথহারা বধূ উদ্ধার হইলেও কেহ তাহাকে গ্রহণ করে না, হারান-মেয়ের অনুসন্ধান হইলেও কেহ তাহাকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হইতে চায় না। শিক্ষিতা হইলে স্বাধীন হইলে নারী চরিত্রহীন হয়, ইহা মিথ্যা কথা। নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষা নাই বলিয়াই আত্মমর্য্যাদার জ্ঞানও তাহার নাই। নারীর মুক্তি ও মঙ্গলের জন্ম পুরুষ-সমাজ ব্যস্ত হউক বা না হউক, আজ নারীকে ব্যথা-জাগ্রত হইতে হইবে।

মনুষ্যত্বের সম্মুখে সকল মানুষই মাথা নত করে। মনুষ্যত্বের সাধনায় নারী অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসুক, জনসাধারণের শ্রদ্ধা সে লাভ করিবেই।

খালেদা খানম—

সুলতান আব্দুল হামিদের স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসানে এবং নবীন সাধারণ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, প্রতিভা, শৌর্য্য ও স্বদেশ-প্রেমের উজ্জ্বল মহিমায় তুরস্ক-জননীর যেসব সুসন্তান বিশ্ব জোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বীরকেশরী গাজী আনওয়ার, তালায়াত, জামাল ও খালেদা খানমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুলতান আব্দুল হামিদ খানের শাসনকালে অ-মুসলমান পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে কোন মোস্‌লেম রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে কোন খাঁটি মুসলমান পরিচালিত বিদ্যালয়েও স্ত্রীশিক্ষার তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। খালেদার পিতা সুলতানের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। অতি শৈশবেই কন্যার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি, তীক্ষ্ণ মেধা ও উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। খালেদাকে কনষ্টাণ্টিনোপলের 'আমেরিকান রবার্ট কলেজে' ভর্ত্তি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সুলতানের অনুমতি ভিক্ষা করেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর একরাশ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হন। কন্যার শিক্ষার জন্য তাঁহার সকল উন্নতির পথ একে একে রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে খালেদা খানম খুব কৃতিত্বের সহিত বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিতেই তিনি আমেরিকান গ্রন্থকার জেকব এবটের একখানি পুরাতন গ্রন্থের তুর্কি অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। সন্তানের প্রতি মাতৃ কর্ত্তব্য-বিষয়ে উপদেশ দানই পুস্তকখানির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ইহার অনুবাদ এতই প্রাঞ্জল ও মনমুগ্ধকর হইয়াছিল যে, খালেদার সাহিত্য-প্রতিভার খ্যাতি বিদ্বজ্জন-সমাজে অচিরেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সুলতান আব্দুল হামিদ খান খালেদাকে নিজ দরবারে ডাকিয়া আনিয়া উচ্চ পদক দানে সম্মানিত করিলেন। কন্যার এই রাজকীয় সম্মান প্রাপ্তিতে বিদ্যোৎসাহী পিতার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি উক্ত পুস্তকের এক সহস্র খণ্ড তুর্ক বীরাঙ্গনাগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। খালেদা তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সেই সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, কিন্তু তখনও জ্যামিতি শাস্ত্রে ততটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময় একজন তুর্ক গণিতাধ্যাপকের সঙ্গে তাঁহার পবিত্র পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এই শুভ সম্মিলনের ফলে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি জটিল গণিতশাস্ত্রের অপরাপর শাখাতেও তিনি স্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ব্যুৎপন্না হন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার হৃদয়ানন্দ স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে খালেদা দেশ ও জাতির কার্য্যে আপনাকে উৎসর্জ্জিত করিলেন। তৎকালে সমগ্র তুর্কিরাজ্য ব্যাপিয়া বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় খালেদা খানম খুব উত্তেজনাপূর্ণ একখানি কবিতা-পুস্তক লিখিয়া প্রকাশিত করিলেন। চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। বিখ্যাত দৈনিক ও মাসিকসমূহে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র ইউরোপ তাঁহার অনন্যসাধারণ রাষ্ট্র-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল। তাঁহার সুখ্যাতির কথা এতদূর ছড়াইয়া পড়িল যে, লণ্ডনের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দানের জন্ম তাঁহার আমন্ত্রণ আসিল। খালেদা লণ্ডনে যাইয়া এমন গবেষণাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন যে, শ্বেতদ্বীপের বড় বড় পক্ককেশ রাষ্ট্র-পতিরাও খালেদা খানমের গম্ভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তুর্ক-তরণীর কর্ণধার আনওয়ার, তালায়াত, জামাল প্রভৃতি সাধারণ-তন্ত্রের প্রধান পুরুষগণ প্রত্যহ তাঁহার গৃহে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। খালেদার যুক্তিতর্কপূর্ণ পরামর্শের ফলে তুর্ক স্বাধীনতার বড় বড় জটিল সমস্যার সমাধান হইতে লাগিল।

বিপ্লবের প্রথম বর্ষ কাটিয়া গেলে সুলতান হামিদ আবার নূতন উদ্যমে তাঁহার ক্ষয়িত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্ম আসরে নামিলেন। বিপ্লবের প্রধান প্রধান পাণ্ডাগণকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের ফাঁসীর হুকুম জারী করিলেন। তন্মধ্যে স্বদেশীপ্রেমিকা বিদুষী মহিলা খালেদা খানমের নাম অন্যতম।

সেই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রধূমিত বিপ্লববহ্নির মাঝখানে তিনি তাঁহার দুইটি শিশু-সন্তানকে সঙ্গে করিয়া আমেরিকান কলেজে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধে রাজী করিয়া শিশু দুইটিকে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। ইহার পর খালেদা খানম কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্যে একেবারে মিশরে পলাইয়া গেলেন। তার পর যখন বিপ্লবের ঘন মেঘ কাটিয়া গিয়া শান্তির মলয় বহিতে লাগিল, তখন খালেদা খানম আবার দেশের বুকে ফিরিয়া আসিলেন। তখন দেশের ডাকে তুর্ক মহিলারাও দলে দলে হেরেম ছাড়িয়া মুক্ত আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন—খালেদা খানমই তাঁহাদের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অল্পদিনের ভিতরেই অনেকগুলি মহিলা-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। মেয়েদের শিক্ষা এবং গার্হস্থ্য জীবনের উৎকর্ষের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। অনেকগুলি মহিলা-পরিচালিত সংবাদপত্রও বাহির হইল এবং এইসকল পত্রের প্রচারও আশাতীতরূপে বাড়িয়া গেল। এইসমস্ত সাময়িক পত্রে শিক্ষা, স্বাধীনতা, রাষ্ট্র, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। অন্যান্য পুরুষ-পরিচালিত কাগজেও স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুকূলে এই সময় খুব লেখা-লেখি চলিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বল্‌কান যুদ্ধের সূচনা হইল। তুর্ক শাহাজাদী মোহাম্মৎ খানমের নেতৃত্বাধীনে 'আঞ্জমনে হেলালে আহ্‌মর' (Red Crescent Society) গঠন করিয়া বীরাঙ্গনারাও দেশের কাজে দলে দলে নামিয়া

আসিলেন। প্রাচীন আরবীয় ভগ্নীগণের অনুসরণ করিয়া তুর্ক ললনারাও রোগী ও আহতের সেবা-শুশ্রূষার জন্য সমর ক্ষেত্রে ছুটিয়া গেলেন। সেই সময় কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের রাজকীয় ইউনিভারসিটী-গৃহে দুইটি বিরাট মহিলা সভা আহূত হইল। প্রত্যেক সভায় পাঁচ ছয় হাজার করিয়া মহিলা প্রতিনিধি যোগদান করিলেন। সভায় জাতীয় একতা, স্বদেশ-প্রেম, দেশ-রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাণোন্মাদিনা বক্তৃতার স্রোত বহিয়া গেল। খালেদা খানম যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার যৌক্তিকতা ও তেজস্বিতায় সমগ্র ইয়োরোপ স্তম্ভিত হইল। এই বক্তৃতার ফলে সারা তুরস্ক ব্যাপিয়া রমণী-মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

পাঁচ হাজার মহিলার মধ্যে সকলেই আপন আপন অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া জাতির কল্যাণের জন্য দান করিলেন। সভা ক্ষেত্রেই কয়েক লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রার অলঙ্কারের সংস্থান হইল।

এই সময় একজন সম্ভ্রান্ত তুর্কি ডাক্তারের সঙ্গে খালেদা দ্বিতীয় বার পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধা হইলেন। খালেদা খানম এই সময় মেয়েদের জন্য কয়েক শত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর্ম্মেনিয়া ও মধ্য এসিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরন্ন নিরাভরণ অনাথ শিশুর জন্য অনেকগুলি 'এতিমখানা' (অনাথাশ্রম) খুলিলেন। তিনি তাঁহার অধিকাংশ সময় বৈরুতেই অতিবাহিত করিতেন। বৈরুত হইতেই দামেস্ক ও অন্যান্য স্থানের বিদ্যাগারসমূহ পরিদর্শন করিতেন।

গাজী তালায়াত পাশা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল হইতে কয়েক শত রমণী অধ্যাপককে খালেদার সাহায্যার্থ মধ্য এশিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। বৈরুত নগরে ফরাসীরা ইতোপূর্ব্বেই এক বৃহৎ কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের কাল। ফরাসীরা কলেজের সুন্দর প্রাসাদ ও আসবাবাদি ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। খালেদা কলেজটি হাত করিয়া লইলেন। সিরিয়ার তৎকালীন গভর্ণর জামাল পাশার সাহায্যে খালেদা খানম তাঁহার কলেজের সকল আসবাব-পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বৈরুতের এই নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজ শ্রেষ্ঠতায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সকল বিদ্যাপীঠের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। এই কলেজ ও অন্যান্য কলেজের ছাত্রদিগকে জাতির মুক্তির কথাই বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া হইত। মুসলমান ও খৃষ্টান মেয়েরা ছাত্রাবাসে একত্রে থাকিয়া একত্রেই অধ্যয়ন করিত। আহার-বিশ্রাম, খেলা ধূলা প্রভৃতি একসঙ্গেই চলিত। জাতি-বিদ্বেষের লেশ মাত্র সেখানে স্থান পাইত না—মেয়েরা সকলে পরস্পর সহোদরার মত সখীভাবে জীবন যাপন করিত। খালেদা খানমের অপর দুই ভগিনীও মধ্য এশিয়ায় অধ্যাপনাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে টেক্‌নিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে এক সভা আহূত হইল, আড়াই শত মহিলা সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। খালেদা খানমের সাধনার ফলে মাত্র তিন বৎসর কালের মধ্যেই স্ত্রী-শিক্ষা এতটা প্রসার লাভ করিল।

ইহার পর ইয়োরোপের মিত্র রাজগণ কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া বসিলেন,—তখন অগণিত সভা সমিতি হইয়া এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ হইতে লাগিল। ঘোড়-দৌড়ের ময়দানে এক লক্ষাধিক লোকের এক সভায় দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, কবি ও ঔপন্যাসিক খালেদা খানম এক অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সমগ্র তুরস্ক দেশে আগুন লাগিয়া গেল। চতুর মিত্র শক্তি তাড়াতাড়ি সভা-বন্ধের হুকুম জারী করিয়া, খালেদার গলা টিপিয়া ধরিলেন।

মোস্তাফা কামাল পাশা অল্পদিনের মধ্যেই আঙ্গোরায় স্বাধীন তুর্ক সাম্রাজ্যের পত্তন করিলেন। এক্ষণে খালেদা খানম্ আঙ্গোরায় শিক্ষা-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের ও জাতির কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

অলোকসামান্যা প্রতিভাশালিনী এই বীর ললনার জীবন-কথা পাঠ করিয়া ভারতের এই মহা জাগরণের সুপ্রভাতে এ-দেশীয় মাতৃ-জাতির প্রাণ মন কি স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রেমের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিবে না?

শ্রমশক্তি

দেশের গুণ

সম্পদ উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে প্রধান স্থান দেয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সে যখন প্রকৃতির মধ্যে আপনার উপভোগের বস্তু বাহির করে তখন তাহার কত আনন্দ। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং কোন কোন দেশের প্রবাদবাক্যে এই পরিশ্রমকে মানুষের শাস্তি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমই তাহার সুখের মূল সূত্র। যাহার যত পরিশ্রম, উদ্যম এবং অধ্যবসায়, সে সেই পরিমাণে সুখী। উদ্যমহীন ব্যক্তি দৈব-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সুখ অন্বেষণ করে। নিজের শক্তির পরিচালনা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম। যে দেশে প্রকৃতির সম্পদ প্রচুর, সে দেশে সাধারণতঃ মানুষ কর্ম্মকুণ্ঠ। প্রাচীন মিশর ও ভারতবর্ষ তাহার উদাহরণ। কর্ম্মকুণ্ঠ জাতি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সহজেই তাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খল গ্রহণ করে।

অন্যপক্ষে যেখানে প্রকৃতির কঠোরতায় মানুষের অভাব অধিক, সেখানে সে দিনরাত সেই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহার বুদ্ধি এবং শারীরিক শক্তি তাহার অভাব দূরীকরণে নিয়োজিত। একবার সে প্রকৃতিকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহার সাহস এবং শক্তি ক্রমে বাড়িয়া যায়। এইরূপ জাতি পৃথিবীর মধ্যে প্রভুত্ব করিতে পারে। তাহারা নূতন কল কৌশল, নূতন শিল্প, নূতন তত্ত্ব ও নূতন জ্ঞান আবিষ্কার করিয়া আপনাদিগের উন্নতি এবং জগতের ধন ও সভ্যতা বৃদ্ধি করে। প্রাচীন গ্রীস, রোম এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ড তাহার উদাহরণ।

আবার যেখানে প্রকৃতি দুর্জ্জেয়, মানুষের শক্তি সেখানে

স্তম্ভিত, সেখানে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু প্রদেশে এত শীত যে সেখানে মানুষের কিছুই করিবার উপায় নাই। আজও পর্য্যন্ত সেখানে মানুষের শক্তি পরাজিত। সাহারার উত্তাপেও প্রায় সেইরূপ অবস্থা।

দেশের জল বায়ু উত্তাপ, দেশের অবস্থান এবং দেশের মধ্যে নদী সাগর ও পাহাড়ের দূরত্ব ও সামীপ্যের উপর পরিশ্রমের শক্তি কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। দেশের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে মানুষ ভাল করিয়া খাটিতে পারে না। যে দেশে মানুষ দিন রাত ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য রোগে ভোগে, সেখানে কর্ম্মশক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষিকার্য্যে মানুষের যথেষ্ট উন্নতি আছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগে কৃষকসম্প্রদায় ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কলেরা এবং বসন্ত বাঙ্গলার প্রধান সংক্রামক ব্যাধি। তাহা ছাড়া অন্যান্য নানা রোগে মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া রাখে। ডাক্তারেরা বলেন, এদেশের প্রায় প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চারি জনের শরীরে হুক-পোকা আছে, তাহাতে মানুষ চিরকাল রুগ্ন ও অশক্ত থাকে। তবে দেশের অনেক ব্যাধি নিবারণ করা যাইতে পারে। লোকে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব জানিলে এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করিলে অনেক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইতে ও দেশের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। ইটালী দেশ এক সময়ে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। দেশের লোকের ও গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টায় উক্ত ব্যাধি বিতাড়িত হইয়াছে। এখন ইটালী একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইটালীর লোকে ক্রমে কর্ম্মশীল হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে। দেশের উন্নতি মানুষের উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উপায়হীন বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে ক্রমে তাহাকে অবনতির পথে যাইতে হয়। কর্ম্মশক্তি যদিও স্থানীয় জলবায়ুর উপর নির্ভর করে, তবুও মানুষ চেষ্টা করিলে এই প্রতিকূল অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ভারতের একজন লোক সমস্ত দিন খাটিয়া যে কাজ করিতে পারে, ইংলণ্ডের একজন লোক অতি অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে তাহা করিতে পারে। শিক্ষার পার্থক্য ইহার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী, কিন্তু জল বায়ু এবং স্বাস্থ্যের পার্থক্য বোধ হয় এই বিভিন্নতার বিশেষ কারণ।

নদীতীরে বা সমুদ্র-উপকূলে মানুষ প্রায় অপর লোকের সঙ্গে মিলিত হয়, পরস্পরের চিন্তা-বিনিময়ে তাহাদের জ্ঞানের উন্নতি হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় এইসমস্ত স্থানের লোক ক্ষিপ্র এবং কর্ম্মশীল। প্রাচীন ভারতের অনেক সহর গঙ্গা বা অন্যান্য নদীর তীরে। ক্রমে বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক জ্ঞান বাড়িয়া গিয়াছে। এখন রেলরাস্তা সৃষ্টি হওয়াতে দেশের ভিতরের উন্নতি হইয়াছে। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কোন নদী নাই কিংবা যেখান হইতে রেলরাস্তা বহু দূরে; সেইরূপ স্থানের অবস্থা বিশেষ উন্নত নয়, এবং লোকের কর্ম্মশক্তি তেমন প্রখর নয়। যেখানে কর্ম্ম-বাহুল্য সেইখানেই কর্ম্মশক্তি বাড়িতে পারে, আর যেখানে পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই, মানুষের অভাব সামান্য, সেখানে মানুষ ক্রমে অলস হইয়া পড়ে, কর্ম্ম করিতে তাহার আর ইচ্ছা যায় না। দেশের বাহ্যিক অবস্থা মানুষের কর্ম্মশক্তিকে নিয়মিত করে। পাহাড়ের লোক যেরূপ খাটিতে পারে, সমতলের লোক সেরূপ পারে না। সহরের লোক যেরূপ পরিশ্রম করে, গ্রামের লোকে তাহা পারে না।

খাদ্যের গুণ

মানুষের আহারের উপর তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তি নির্ভর করে। অল্প কিংবা অস্বাস্থ্যকর আহারে দুর্ব্বলতা আসে। উত্তম খাদ্যদ্রব্য পাইলে দেহের উন্নতি হয়। দেহের উন্নতি হইলে মনে স্ফূর্ত্তি আসে। তাহাতে অধিক কাজ করিতে পারা যায়। দেশভেদে খাদ্যদ্রব্য পৃথক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আহার। সব-রকম আহারে সমান পরিমাণে শক্তিলাভ হয় না। অনেকের মতে আমিষ আহারে যত পরিমাণে বলকর বস্তু পাওয়া যায়, নিরামিষে তত নয়। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও দরিদ্রের পক্ষে তাহা সহজলভ্য নহে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় আমিষভোজী মুসলমান ও খৃষ্টানেরা যেরূপ সবল ও দৃঢ় হয়, শাকান্নভোজী হিন্দু তত নয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া হিন্দুর খাদ্য পরিবর্ত্তন করা উচিত।

সাধারণ শিক্ষা

কল-কারখানার সন্নিকটে থাকিলে শিল্পজ্ঞান সহজে লাভ করিতে পারা যায়। দূরে থাকিলে সেরূপ জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকে না। অনেকে বলেন এদেশের লোক যে তেমন শিল্পনিপুণ নহে তাহার প্রধান কারণ লোকে কল-কারখানার সহিত বিশেষ পরিচিত নয়, এবং অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের শিল্প-নৈপুণ্য বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত। ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য সাধারণ লোকের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিত হইলে লোকে কল-কারখানার কার্য্যশৃঙ্খলা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, কোন্ কৌশলে কল চালাইলে সহজে শিল্পের উন্নতি হয় তাহা অনুধাবন করিতে পারে। শিক্ষিত কারিগরের কার্য্য-তৎপরতা সহজে বাড়িয়া যায়। কেবল শারীরিক পরিশ্রম শিল্পের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। বুদ্ধিমান কষ্টসহিষ্ণু ও সংযমী হইলে একজন মানুষ যে পরিমাণে কাজ করিতে পারে, শরীরে বল থাকিলেও বুদ্ধিহীন অসহিষ্ণু ও অসংযত লোকে তাহা করিতে পারে না। শিক্ষা ও সংযম পরিশ্রমের শক্তি বাড়াইয়া দেয়।

আচার ব্যবহার

দেশের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিতে মানুষের কর্ম্ম-শক্তির পার্থক্য জন্মে। বিবাহ ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান। অল্প বয়সে বিবাহ করিলে শরীরের শক্তির হ্রাস হয় এবং জীবনে উন্নতির পথে বাধা পড়ে। সংসারে উন্নতি করিতে হইলে অনেক সংগ্রাম করিতে হয়। অল্প বয়সে পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা থাকে না, উন্নতির সমস্ত আশা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষার প্রসার লাভ করিলে বাল্যবিবাহপ্রথা রহিত হইতে পারে। বাল্য-বিবাহের আর-একটি অপকারিতা এই—তাহাতে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যদি দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে তাহা হইলে পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়, ফলে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য পাওয়া যায় না ও মানুষ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই প্রকারে জাতির অধঃপতন হয়। নূতন দেশে এই নিয়ম খাটে না, সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, আবাদ করিবার জন্য অনেক পতিত জমি পড়িয়া আছে; নূতন কারখানা স্থাপনের যথেষ্ট সুবিধা; অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর সুযোগ; সুতরাং যত লোক বাড়িবে ততই উন্নতি। আমেরিকার এখনও উন্নতির পথ অনেক। কিন্তু যেসমস্ত দেশে উন্নতির কোন উপায় নাই, কেবল প্রাচীন কৃষি কিংবা গৃহশিল্প একমাত্র নির্ভর, সেইরূপ স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সামাজিক দুর্দ্দশা বাড়ে।

ম্যাল্থস সাহেবের মতে দেশের জনসংখ্যা যত সহজে বাড়ে আহার্য্যের পরিমাণ সেই হারে বাড়ে না। তিনি বলেন যদি জনসংখ্যা হ্রাসের নানাবিধ কারণ না থাকিত তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে সকল মানুষের বাসের উপযোগী স্থানের অভাব হইত এবং তাহাদের আহারের বস্তু পাওয়া যাইত না। ভাগ্যক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে লোকাধিক্য তত সহজ নয়। আধিব্যাধি, যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহা ছাড়া অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অনেকে বিবাহ সহজে করে না এবং নিজেদের জীবনকে এমন ভাবে পরিচালিত করিতে পারে যে তাহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। মানুষ যতই আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারে ততই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু সুখের অন্বেষণে যদি মানুষ সংসারের ভার গ্রহণ করিতে কাতর হয় তাহা হইলেও সমাজের উন্নতি বাধা পায়। শিল্প বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্য্যে অতিরিক্ত লোক বাঞ্ছনীয় না হইলেও জনসংখ্যার হ্রাস প্রকৃতই অনিষ্টকর। ফরাসী দেশে মানুষের সুখলিপ্সা এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে সেখানে বিবাহসংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশের আর্থিক উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে না। যুদ্ধবিগ্রহে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। এক একটি যুদ্ধে এত প্রাণনাশ হয় যে তাহা পরিপূরণ করিতে যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে হয়। নেপোলিয়ান যখন এক সময়ে ফরাসীদেশে লোকবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন বহু সন্তানের পিতামাতাকে রাজকোষ হইতে সাহায্য করিতেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোন কোন দেশে বিবাহের আইন পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

ভারতে লোকের ধারণা বিবাহ ধর্ম্ম ; পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে রক্ষা করে। সুতরাং এদেশে বিবাহ

আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এখানে সকল অবস্থার লোক, সে দরিদ্র হোক বা রুগ্ন হোক, বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত। ফলে দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তানের উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ শিশুই পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য এবং উত্তম ভাবে রাখিতে লোকের অবস্থায় কুলায় না। ইহাতে সমাজের কোন লাভ হয় না, বরং অতিরিক্ত চাপের জন্য জননীকুল রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ১৯১৮ সালে ভারতে ২৪,৩০,৫৬০জন শিশুর জন্ম হয়, কিন্তু ঐ বৎসর ১৪৮,৯৫,৮০১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক মৃত্যুর কারণ ঐ বৎসরে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ৯৩,৮৯,৩৪৯ জন শিশুর জন্ম এবং ৮৭,০৩,৮৩২ জন লোকের মৃত্যু হয় অর্থাৎ হাজার লোকের মধ্যে ৩৮·৪১ জনের জন্ম এবং ৩২·৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

জন্ম-মৃত্যুর এইরূপ হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ইহাতে লোকের শক্তির হ্রাস হয়। শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হইতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে এক হাজার শিশুর জন্ম হইলে, তাহার প্রায় ২০৫ জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইংলণ্ডে এক হাজার শিশুর জন্ম হইলে শিশুমৃত্যু এক শতেরও কম। জননীর স্বাস্থ্য এবং শিশু রক্ষার বিধান না জানার জন্য এদেশে এত অধিক পরিমাণে শক্তির অপচয় হইতেছে। অন্যান্য দেশে দরিদ্র লোকের অবস্থা ভারতের দরিদ্রের তুলনায় বিশেষ ভাল নয়, তবে নিতান্ত গরীব লোক সহজে বিবাহ করিতে পারে না। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা বাড়িতেছে। যাহারা মজুর শ্রেণী হইতে কারিগর-শ্রেণীতে উঠিতে পারিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বাল্যবিবাহ দেখা যায় না। আপনার সংস্থান করিয়া বিবাহ করিব তাহাদের এই ভাব। আর্থিক উন্নতি হইলে তাহারা বিবাহ করিতে চায়। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যাইবার ভয় থাকে। পারিশ্রমিকের হার কমিলে আপনা-আপনি আবার বিবাহের ইচ্ছা কমিয়া যায়। এইরূপে পাশ্চাত্য দেশে সমাজ আপনার সমস্যা আপনি মীমাংসা করে। আচারগত ভারতে এইরূপ নিয়ম খাটে না। সেইজন্য সাধারণ লোকের ভিতর শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইতে পারে।

শ্রমবিভাগ ও জাতিভেদ

অতি আদিম অবস্থায় মানুষ আপনি আপনার সমস্ত অভাব মোচন করিত। ক্রমে এক-একজন এক-একটা বস্তু প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। একদল লোক মাছ ধরে, একদল লোক কৃষিকার্য্য করে, একদল লোক যন্ত্র-পাতি তৈয়ারী করে, একদল লোক বস্ত্র বয়ন করে, একদল লোক রাজকার্য্য করে, একদল লোক পূজা অর্চ্চনা করে, একদল লড়াই করে, এইরূপ নানা বিভাগ হইয়াছে। এক-এক বিভাগের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ আছে। এইরূপ বিভাগে এক-একদল লোক এক-এক কার্য্যে মনযোগ দিতে পারে, তাহার উন্নতি করিতে পারে, এবং সেই বিভাগে শ্রমলাঘবের অনেক কৌশল আবিষ্কার করিতে পারে। শ্রমবিভাগের দ্বারা নানারূপ উন্নতির সম্ভাবনা হইয়াছে। একজন লোককে সব কাজ করিতে হইলে কোন কাজই অধিক পরিমাণে হয় না। কিন্তু শ্রমবিভাগ থাকিলে সকল কাজের পরিমাণ বাড়ে এবং লোকের কাজে দক্ষতা জন্মে। সূক্ষ্ম শিল্পের জন্য এইরূপ বিভাগ বিশেষ আবশ্যক। প্রায় সকল দেশেই এক-একরূপ কার্য্য বা এক-একরূপ শিল্প এক-একটি বংশ বা পরিবারে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে নানারূপ শিল্পসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। ভারতে শিল্প ও কর্ম্মসঙ্ঘ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ব্যবসা বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। বংশ বা জাতির মধ্যে কোন ব্যবসা আবদ্ধ হইলে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আছে। প্রতি ব্যবসার অনেক খুঁটিনাটি আছে। পিতা মাতা যে কার্য্য করে, সন্তান বাল্যকাল হইতে দেখিলে তাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। কর্ম্মকারের সন্তান কর্ম্মকার হইলে, তন্তুবায়ের সন্তান তন্তুবায় হইলে, তাহাদিগকে শিল্প শিক্ষা দিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু কোন ব্যবসার উন্নতি করিতে হইলে নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হয়, অনবরত বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পরীক্ষা করিতে হয়, এবং জগতের অপর সমস্ত কর্ম্মস্রোতের সহিত মিশিতে হয়। জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকিলে গতানুগতিক রক্ষা

পাইতে পারে বটে, কিন্তু বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান শক্ত হইয়া পড়ে। ভারতের অনেক গৃহশিল্প এই ভাবে নষ্ট হইয়াছে। জাতিভেদ কর্ম্মের উচ্চ-নীচ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া মানুষকে স্বাধীনভাবে রুচি অনুসারে কোন বিশেষ শিল্প গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছে। পৈতৃক ব্যবসা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে অনেক সময় মনে সতেজ ভাব থাকে না, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা জাগরিত হয় না। এক বাঁধা-পথে ব্যবসা চলিতে থাকে, তাহাতে ক্রমে অবনতির সূত্রপাত হয়। তন্তুবায় স্বর্ণকারের কার্য্য করিবে না কিংবা স্বর্ণকারের সন্তান কর্ম্মকারের কার্য্য করিবে না এইরূপ সামাজিক প্রথার মধ্যে কর্ম্মকারের নূতনত্ব কিছু আসিতে পারে না।

গৃহশিল্পের পক্ষে জাতিভেদের স্থান থাকিলেও, বর্ত্তমান বৃহৎ কলকারখানায় ইহার আবশ্যকতা কিছুই নাই। এক কারখানায় নানাবিধ কর্ম্ম আছে, তাহাতে অনেক লোকের প্রয়োজন হয়। একটা জাতি এত লোক সরবরাহ করিতে পারে না। এখানে কর্ম্মবিভাগ জ্ঞান ও শক্তির উপর নির্ভর করে। সাধারণ মজুরের পুত্র কারিগর-শ্রেণীতে যাইতেছে, কারিগরের পুত্র চালক হইতেছে, চালকের পুত্র অধ্যক্ষ হইতেছে, এইরূপ নানাভাবে কর্ম্মবিচিত্রতার মধ্যে মানুষ আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লইতেছে। প্রকৃতির অনুরূপ স্বাধীনভাবে কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে লোকে তাহাতে প্রাণপণ করিয়া খাটিতে পারে, তাহাতে সে নিজের উন্নতি করিতে পারে, এবং এইরূপে সমাজের আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয়। স্বাধীন নির্ব্বাচনে উদ্যম বাড়িয়া যায়, গতানুগতিকের মধ্যে মানসিক শক্তি ক্রমে ম্লান হইয়া পড়ে।

শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার

যাহাতে মানুষের শ্রমশক্তির অপচয় না হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার হয় এবং যাহাতে ইহার দ্বারা কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহাই সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষ অনেক সময়ে এ বিষয়ে চিন্তা করে না। তাহাতে অনেক শক্তির অপচয় হইয়াছে। কোন কোন স্থানে এত বেশী লোক আছে যে তাহারা খাটিবার যথেষ্ট সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে খাটিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। কোন কোন জায়গায় অনেক কলকারখানা, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে খাটিবার লোক নাই। যেখানে অতিরিক্ত লোক আছে সেখান হইতে তাহাদের আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যে-সমস্ত কারণে মানুষের মধ্যে রোগ ও দুর্ব্বলতা আসে তাহা দূর করিতে হইবে। শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমাইতে হইবে, মানুষকে সবল সতেজ ও সুস্থকায় করিতে হইবে। দেশের মধ্যে এইরূপ একটা জাগরণের ভাব থাকিলে শ্রমের শক্তি অপরাহতভাবে বৃদ্ধি লাভ করিবে। শ্রমশক্তি বৃদ্ধি হইলে শস্য ও শিল্পের উন্নতি হইবে, এবং মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া যাইবে।

কল বাষ্প ও তড়িৎ

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কল, বাষ্প ও তড়িতের আবশ্যক হইয়াছে। এইসমস্ত উপায়ে মানুষ আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হয়ত তাহাকে পূর্ব্বে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইত তাহা অপেক্ষা কম কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে না। পরন্তু পূর্ব্বে যেরূপ কৌশল ও নিপুণতার আবশ্যক হইত, বর্ত্তমান প্রণালীতে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর কৌশল ও নিপুণতার প্রয়োজন। বাষ্পীয় কল বা তাড়িত-চালিত কারখানার নির্ম্মাণ-প্রণালী অধিকতর জটিল। ইহাতে জ্ঞান ধৈর্য্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন, নতুবা অনেক সময়ে বিপদের সম্ভাবনা। কোন কোন কারখানায় প্রাণনাশেরও ভয় আছে। এইসমস্ত আবিষ্ক্রিয়া মানুষের পরিশ্রমকে তুচ্ছ বলিয়া ফেলিয়া দেয় নাই। ইহারা মানুষের বন্ধুরূপে তাহার শ্রমশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। একা মানুষ যাহা করিতে পারিত না কল-কারখানার দ্বারা তাহা সহজসাধ্য হইয়াছে। যাহা প্রস্তুত করিতে বহু বৎসর লাগিত অতি অল্প সময়ে তাহা পাওয়া যাইতেছে। কলের দ্বারা দূর নিকট হইয়াছে। যাতায়াতের সুবিধা, আমদানী রপ্তানীর সুবিধা, ভাব ও চিন্তা আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত প্রভৃতি নানা আয়োজন হইয়াছে। যে-সমস্ত বস্তু মানুষ পাইবে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারে নাই তাহা তাহার পক্ষে অতি সুলভ হইয়াছে। মানুষের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ লাভ হইয়াছে। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কলকারখানার চালক হইতে পারে। তাহার বুদ্ধির প্রয়োগ যতই আবশ্যক হইবে ততই শ্রমশক্তির বিকাশ হইবে।

শ্রমশক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি

বাল্যে মানুষ যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারে যৌবনে তাহা অপেক্ষা কঠোরতর পরিশ্রম করিতে তাহার কষ্ট হয় না। যে বোঝা সে বাল্যকালে বহন করিতে অক্ষম, যৌবনে তাহা অপেক্ষা অনেক ভারি বোঝা সে অনায়াসে বহন করিতে পারে। তাহাতে প্রমাণ হয় যে তাহার শক্তি ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ অবস্থা চিরকাল থাকে না, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তির হ্রাস হয়। বৃদ্ধাবস্থায় সে একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া পড়ে। সেইজন্য দেশের মধ্যে যত পরিশ্রমশীল ব্যক্তি অধিক বয়স পর্য্যন্ত আপনাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। যদি অল্প বয়সে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় তবে সহজে তাহার স্বাস্থ্য নাশ হয়। অনেক কারখানায় অপরিণত বয়সে কাজ করিলে জীবন অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কয়লার খনিতে যাহারা কাজ করে তাহারা দীর্ঘজীবী হয় না। তুলার কারখানায় যাহারা থাকে তাহাদের ফুস্‌ফুসের ব্যারাম হয়। এইরূপ এক-একটা শিল্পের এক-একরূপ বিপদ। এই-সমস্ত শিল্পের অসুবিধা দূর করিবার পন্থা ক্রমে আবিষ্কৃত হইতেছে। নানা কৌশল আবিষ্কার করিয়া খনির মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতই উন্নতি লাভ করিতেছে ততই শ্রমশক্তির বৃদ্ধি হইতেছে।

একজন মানুষের শ্রমশক্তি চিরকাল সমানভাবে থাকে না। আবার একই দিনে তাহার শক্তির উত্থান-পতন আছে। প্রথম উদ্যমে সে যে ভাবে পরিশ্রম করিবে, ক্রমে তাহার যখন ক্লান্তি আসিবে তখন তাহার উদ্যম কমিয়া যাইবে। শরীরের মাংসপেশীর মাঝে মাঝে বিশ্রাম আবশ্যক হয়। অবিশ্রান্ত খাটিলে শ্রমশক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে। দিনের খাটুনির পর মানুষ যখন রাত্রিতে বিশ্রাম লাভ করে তখন তাহার মাংসপেশী নবশক্তি অর্জ্জন করে। প্রভাতে নূতন বলে সে আবার কাজ করিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কিছু পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিলে আবার সে ভাল করিয়া খাটিতে পারে। সেজন্য শ্রমজীবীগণের পক্ষে সমস্ত দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম আবশ্যক। তাহাতে কাজ আরও ভাল হয়। পাশ্চাত্য দেশের শ্রমজীবীগণ আন্দোলন করিতেছে যে বালকবালিকা এবং স্ত্রীলোকগণের পরিশ্রমের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হোক। বার বৎসরের অনধিক বয়সে যদি খাটিতে না হয় তাহা হইলে শরীরের উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের উপর সমাজের শক্তি নির্ভর করে। সুতরাং যে সময়ে সন্তান উৎপাদন এবং তাহাদের লালনপালন করিতে হয় সেই সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে পরিশ্রম করিতে হইলে, সমাজের শ্রমশক্তির হ্রাস হয়। তারপর তাহাদের প্রধান আন্দোলন এই যে তাহারা দিনের মধ্যে আট ঘণ্টার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না। শারীরিক পরিশ্রম কম হইলে অন্যান্য বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে মন দেওয়া যাইতে পারে। মানুষের জীবনের উন্নতি সমস্ত পরিশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল শরীর রক্ষা করিবার জন্য যদি তাহাদিগকে সমস্তদিন খাটিতে হয়, তাহা হইলে সে উন্নতির সুযোগ একেবারেই পায় না। সেজন্য পরিশ্রমের সময় কমাইয়া দিলে উপকার অনেক। ধনোৎপাদনের দিক হইতে দেখা যায়, কম সময় খাটিতে হইলে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করে, সুতরাং ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল।

একদিন এক মোকদ্দমায় মুন্‌সেফ কোনো পক্ষকে বলেছিলেন, "ওরে বেটা বারলাইব্রেরী থেকে আট আনার পয়সা দিয়ে একজন উকিল নিয়ে আয় না?"—

লোকটি উকীলমজ্‌লিসে গিয়ে হাকিম-সাহেবের কথা জানাতেই একজন ছোকরা উকিল জবাব দিলে, "বল গিয়ে তোমার মুন্‌সেফ-বাবুকে যে যত আট আনা ফিয়ের উকিল ছিল, সবাই মুন্‌সেফ হয়ে গিয়েছে।"

সত্যভূষণ দত্ত।





জুতার দোকানের সুখতলা দরজা—

আমেরিকার জর্জিয়ানার কোনো জুতা-ব্যবসায়ী তার দোকানের দরজাটিকে সাধারণ চৌকা আকারের না করিয়া জুতার সুখতলার মতো করিয়া তৈরী করিয়াছে। যে-কোনো দোকানঘরের দরজায় একখানি মাপ-মাফিক টিন বা আর কোনও ধাতুর পাত আঁটিয়া বসাইয়া তার গা হইতে বেশ বড় একখানি সুখতলার আকারের খানিকটা অংশ



জুতার দোকানের সুখতলা দরজা।

কাটিয়া বাহির করিয়া লইলেই এই দরজা তৈরি হইতে পারে। কাটিয়া লওয়া সুখতলাটিকেও দোকানের বিজ্ঞাপন-হিসাবে সুবিধা মত কোথাও টাঙাইয়া দেওয়া চলে। এই দরজাটির দৌলতে উপরোক্ত জুতাব্যবসায়ীর জুতাবিক্রির পরিমাণ নাকি বাড়িয়া গেছে।

কলের মাপে চরিত্র নির্ণয়—

বার্লিনের প্রোফেসর বুর্গের নামক এক বৈজ্ঞানিক মাথার খুলি প্রভৃতির আকৃতি ও আয়তন হইতে মানুষের নৈতিক চরিত্র মাপিয়া কষিয়া দিবার এক ফন্দি উদ্ভাবন করিয়াছেন। যন্ত্রটি টুপির মতো হইয়া মাথায় আঁটিয়া বসে, তারপর একঘণ্টার পরীক্ষায় পরীক্ষিতব্যের সম্বন্ধে এত অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় যাহা সাধারণ অবস্থায় চক্ষুকর্ণের পরিচয়ে একবৎসরের কমে জানা যায় না। Criminologyর অপরাধ-প্রবৃত্তি ও অপরাধীদের বুঝিবার পক্ষে এই যন্ত্রটি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

নারিকেল গাছের রক্ষা-কবচ—

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে নারিকেলের শস্যই প্রধান কৃষিজাত পণ্য। ইঁদুর এবং ডাঙার কাঁকড়ারা গাছে চড়িয়া সেই নারিকেলের শাঁস কুরিয়া খাইয়া ফোক্‌রা করিয়া দেয়। ডাঙার কাঁকড়াদের নারিকেল খাওয়ার রীতিও বড় চমৎকার। চলতি বৎসরের বৈশাখের প্রবাসীর ১১১ পৃষ্ঠায় আমরা সে সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। এইসব ডাকাতদের উপদ্রব হইতে নারিকেলগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সেসমস্ত অঞ্চলের কৃষকেরা কিছুদিন হইতে নারিকেল গাছগুলিকে একটি করিয়া টিনের বা আর কোনও ধাতুর তৈরী চওড়া পালিশ-করা কোমরবন্ধ পরাইয়া দিতেছে। ডাকাতে কাঁকড়ারা আর ইঁদুরেরা এইতেই একেবারে জব্দ। মসৃণ ধাতুর পাতকে কোনপ্রকারেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপরে উঠিবার উপায় নাই বলিয়া বেচারাদের মাঝ পথ পর্যন্ত উঠিয়াই নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইতেছে। আমাদের দেশেও নারিকেলের অনেক ইঁদুরের উৎপাতে নষ্ট হয়। দরকার হইলে এই উপায়টি কেহ অবলম্বন করিয়া দেখিতে পারেন।

পুচ্ছ—

ল্যাজের অভাব মানুষকে কোনোদিন বোধ করিতে হয় না। কিন্তু ল্যাজওয়ালা অন্য জীবদের উহা যে অত্যাবশ্যক তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবে না। বাতাসের সাগরে যে-সমস্ত

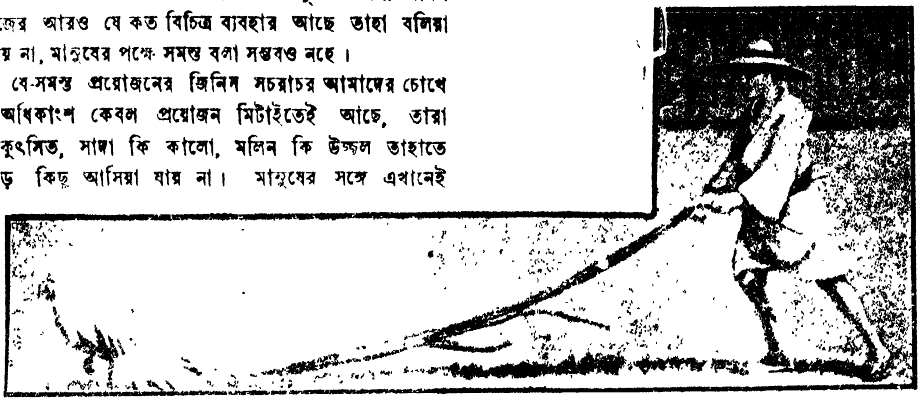


"উজ্জ্বল-পুচ্ছ" পাখী।

জীব পাখার পাল তুলিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, পুচ্ছ তাহাদের দেহতরণীর হাল, পুচ্ছবিহীন হইলে তাহারা চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলে। পশুদের ল্যাজ তাহাদের চামর দুলাইয়া ঠাণ্ডা রাখে, মশামাছির উপদ্রব নিবারণে সহায় হয়, লজ্জা নিবারণ করে। লাফানোর বেলা শরীরের ভারকেন্দ্র ল্যাজ ঠিক রাখে। কুকুরের ল্যাজ কাটিয়া দিলে তাহাদের মেজাজ শুদ্ধ বদলাইয়া যায়, লোকে এইরূপ বলে। জন্তুদের মধ্যে ল্যাজের ইঙ্গিতে

কথা কওয়া চলে এমন কথাও বৈজ্ঞানিকদের মুখে শোনা যায়। এছাড়া ল্যাজের আরও যে কত বিচিত্র ব্যবহার আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, মানুষের পক্ষে সমস্ত বলা সম্ভবও নহে।

মানুষের যে-সমস্ত প্রয়োজনের জিনিষ সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে তার অধিকাংশ কেবল প্রয়োজন মিটাইতেই আছে, তারা সুন্দর কি কুৎসিত, সাদা কি কালো, মলিন কি উজ্জ্বল তাহাতে কাহারও বড় কিছু আসিয়া যায় না। মানুষের সঙ্গে এখানেই



ট্যাসোর মোরগ স-অনুচর।

প্রকৃতির পার্থক্য। তাঁর অতিপ্রয়োজনের আটপৌরে জিনিষগুলিও বিচিত্র রঙের তুলিতে নিপুণ করিয়া আঁকা, বিচিত্র রেখার ছন্দে চন্দিত, বিচিত্র কারুকার্য্যে গঠিত। ইহার সবচেয়ে ভালো একটি উদাহরণ পাখীদের পুচ্ছ।

পশুদের ল্যাজে বিচিত্রতা বেশী নাই, ঝুঁটিওয়ালা ও ঝুঁটিবিহীন এই দুই শ্রেণীতে মোটামুটি তাহাদের বিভক্ত করা চলে। Pen-tail বা "কলম-পুচ্ছ" নামক ইঁদুর-শ্রেণীর এক প্রাণীর ল্যাজ পাশাপাশি দুধারি পালকে অবিকল একটি কুইলের কলমের মতো দেখিতে হয়। ইহার একটি ছবি আমরা ছাপিতেছি।



বন মোরগ।

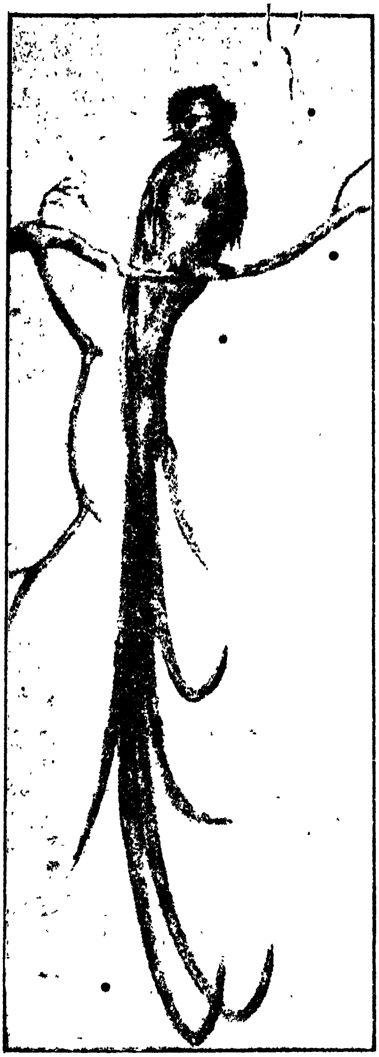
আমাদের পরিচিত পাখীদের মধ্যে পুচ্ছগৌরবে ময়ূরই বোধ হয় সকলের শ্রেষ্ঠ। টিয়া, মাছরাঙা, সা-বুলবুল, নরুণ-পুচ্ছ, মোরগ, বনমোরগ প্রভৃতি আরও নানা পাখী পুচ্ছসম্পদে সমৃদ্ধ। তাছাড়া অন্ত সব পাখীর ল্যাজই কমবেশী সুন্দর। যে কারণেই হোক, পুচ্ছ দান ব্যাপারে প্রকৃতি দেবীর পুরুষ-পাখীর প্রতি একটু পক্ষপাত দেখা যায়। মানুষ জাতির মধ্যেও গৌরব-সূচক নানারকমের পুচ্ছ পুরুষদেরই একরকম একচেটিয়া বটে।

জাপানের টাসো নামক সহরে একপ্রকার মোরগ প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহাদের কোন-কোনটার ল্যাজ তেরো-চোদ্দ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সাধারণ পাখীর খাঁচায় ইহাদের রাখিতে পারা যায় না, ল্যাজের অনুপাতে উঁচু খাঁচা তৈরী করিয়া তাহার মধ্যে ইহাদের পুষিতে হয়। খাঁচার মধ্যে ষোল হাত উঁচু দাঁড়ের উপর পুচ্ছ দোলায়মান করিয়া ইঁহারা বসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের পাদচারণা আবশ্যক হয়, তখন পুচ্ছ-রক্ষক অনুচর পুচ্ছাগ্র হাতে করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকে। এই পাখীর ল্যাজ জন্মের পর একবৎসরে চার হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, পরের বৎসর দ্রুত বাড়িয়া পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।



"খড়্গ-পুচ্ছ" পাখী।

মালয় দ্বীপপুঞ্জে 'স্বর্গের পাখীর' বাস—স্বর্গের পাখীর নাম অনেকেরই শোনা আছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কয়েকটা ছিল। আমাদের দেশে এই পাখী স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অবস্থাতে পাওয়া যায় না। নানা শ্রেণী-ভেদে এই পাখীর ল্যাজ নানা রকমের হয়, সবরকম ল্যাজই সুন্দর। এককালে লোকে মনে করিত এই পাখীর পা নাই, তাই ইহারা অষ্টপ্রহরই পাখায়



টোগোন পাখী।

ভর করিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং শিশিরের জল খাইয়া বাঁচে। এইরকম ভুল বিশ্বাস হইতেই এই পাখীর নাম স্বর্গের পাখী হইয়াছিল।

নিউজিলণ্ডে অতি সুন্দর একপ্রকার পাখীর বাস। তাহাদের ল্যাজ কতকটা বেহালার মতো দেখিতে বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে বেহালা পাখী। পুচ্ছের পালকে ইউরোপের সুন্দরীদের শিরোভূষা জোগাইয়া জোগাইয়া ইহারা এখন প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি কবে কোথায় হইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু চার ইঞ্চি পাখীটির চৌদ্দ ইঞ্চি ল্যাজ দেখিয়ে কি বলিতে ইচ্ছা করে? এই পুচ্ছ-সর্ব্বস্ব পাখীটির বাস পি[illegible] অন্তঃপাতী হুইডা নামক [illegible]। তাহা হইতে ইহার নাম হইয়াছে হুইডা পাখী। এই পাখীটি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া নিজের



হুইডা পাখী।



স্বর্গের পাখী।

ল্যাজের শোভা নিজেই একএকবার মুগ্ধচিত্তে দেখিয়া লয়, তারপর আবার সগর্ব্বে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতে থাকে।

ঠিক ইহার জুড়ি হইতেছে ট্রোগোন নামক পাখী। ইহারও ল্যাজের বহর শরীরের চতুর্গুণ। আর ইহার শরীরের রঙের জাঁকজমক অনেক বেশী, আগাগোড়া উজ্জ্বল সোনালি।

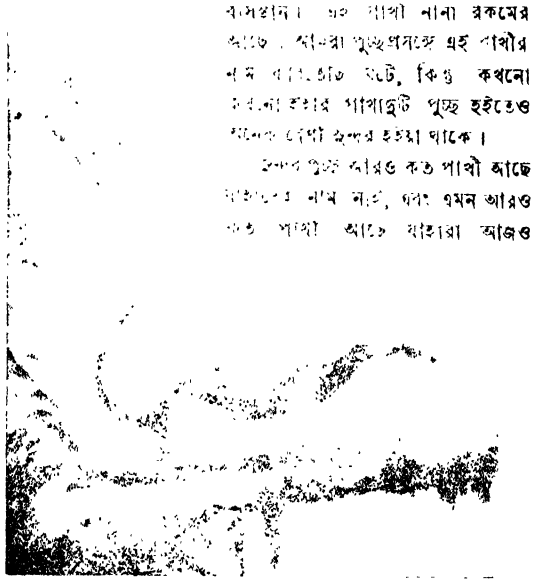
দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকোতে "উজ্জ্বল-পুচ্ছ" নামক এক পক্ষী-জাতির বাস। ফুলের মতো এই পাখীগুলি ফুলের বাগিচা আলো করিয়া দলে দলে বাস করে; ফুলের প্রতি ইহাদের এমনই অনুরাগ যে ফুল-বাগিচা ছাড়া আর কোথাও পারতপক্ষে বাসা তৈরি করে না। ইহাদের গা ভরিয়া সবুজ পালকের রাশি, ল্যাজের সুন্দর স্থানটিতে

আধখানা চাঁদের আকারে সাদা রোঁয়ার গোছা। মখমলের মতো কোমল কালো লম্বা ঝুলো নাকের আগায় আবার এক একটু শাদার আভাস।

পশ্চিম আফ্রিকায় "মক্রা পুচ্ছ" পাখীদের বাড়ী। খড়্গের আকারের দুফুট লম্বা দুটিমাত্র পালকে এদের ল্যাজটি তৈরী।

এশিয়া মহাদেশ। লোকে হিমালয় গিরিশ্রেণী বনমুরগীর আদি বাসস্থান। এই পাখী নানা রকমের আছে। আমরা পুচ্ছপ্রসঙ্গে এই পাখীর নাম করিলাম বটে, কিন্তু কখনো কখনো ইহার পাখাদুটি পুচ্ছ হইতেও অনেক বেশী সুন্দর হইয়া থাকে।

সুন্দর পুচ্ছ আরও কত পাখী আছে যাহাদের নাম নাই, এবং এমন আরও কত পাখী আছে যাহারা আজও



"কলম পুচ্ছ।"

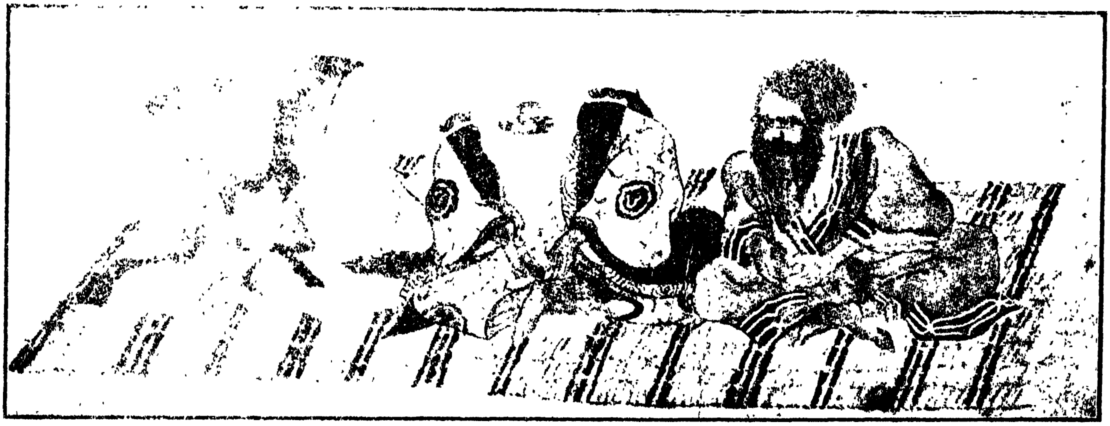
কিন্তু এত তার সাবধানতা সত্ত্বেও মানুষের হাত হইতে ইহারা পরিত্রাণ পাইতেছে না। সুন্দরীকুলের শিরোশোভার জন্য এবং অন্য নানা প্রকারের বিলাস-সজ্জার উপকরণের জন্য বৎসরের পর বৎসর জালে জড়াইয়া, ফাঁদে পড়িয়া, তীর খাইয়া, গুলি লাগিয়া জীবধাত্রী ধরণীর কোল খালি করিয়া ইহারা দ্রুতগতিতে নিঃশেষ হইয়া চলিয়াছে, বাকী যাহারা আছে তাহারাও কাক চিল শকুনিকে বায়ুরাজ্যের একাধিপত্য ছাড়িয়া দিয়া কখনো না কখনো বিলুপ্ত হইয়া যাইবে যদি ততদিন মানুষের শুভবুদ্ধি উন্মেষিত হইয়া তাহাকে সতর্ক না করে।

স চ

—

জাপানের আদিম-নিবাসী-

এখনকার জাপানীরাই জাপানের আদিম-নিবাসী নহে। তাদের পূর্ব্বে অন্য এক জাতি জাপানে বাস করিত। বর্ত্তমানে জাপানের হোক্কাইদো ও সাখালিয়েন দ্বীপে 'আইনু' নামে যে জাতি বাস করে তারাই নাকি সেই আদিম জাতির অবশিষ্টাংশ। এই আইনু জাতি আকৃতি ও প্রকৃতিতে অন্যান্য জাপানীদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। দাড়ি-গোঁপে তারা সমাচ্ছন্ন। আইনুরা কবে এবং কোথা হইতে জাপানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল তাহা কেহই এখন বলিতে পারে না। তবে একথা ঠিক যে এক সময় তারা সমস্ত জাপানটিকে দখল করিয়া বসিয়াছিল। এখন কিন্তু হোক্কাইদো ও সাখালিয়েন দ্বীপ ছাড়া তাদের আর কোথাও দেখা যায় না। তাদের ভাষা জাপানীদের চেয়ে অনেক তফাৎ। প্রাচীন জাপানীদের সঙ্গে নাকি তাহাদের ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। তাদের ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ ছিল, হয়ত বা আর্য্য ভাষার একটা পথ-ভোলা শাখা। হয়ত তারা আমাদের কোন একটা অনুন্নত সম্প্রদায়, বিদেশে বিঘোরে পড়িয়া সকল সভ্য জাতির নিকট হইতে



আইনু সর্দ্দার।

পর্য্যন্ত মানুষের নয়ন পথবর্ত্তী হয় নাই। ইহাদের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে একটা কথা যাহা মনে জাগে তাহা এই, যে, প্রকৃতি যেন দিব্য-নেত্রে সভ্য মানুষ জাতির হাতে তাঁহার এই দিব্য সুন্দর পক্ষীসন্তানদের নিগ্রহের সম্ভাবনা আগে হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই মানুষের অধ্যুষিত দেশগুলি হইতে দূরে, মানুষের দুরধিগম্য অতি দুর্গম অরণ্য-গহনে, গিরিসঙ্কটে, নির্জ্জনে ইহাদের তিনি লালন করিয়া থাকেন।

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তারা আর আপনাদের বিকশিত করিতে না পারিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক বর্ত্তমান আইনুরা নিতান্তই অসভ্য, আমাদের দেশের কোল-ভীলদের মত। জাপানীরা তাদের আত্মীয় বলিয়া মনে করে না, বরঞ্চ তাদের ঘৃণাই করিয়া থাকে, ঘৃণার কারণও আছে। পূর্ব্বে এই আইনুদের হাত হইতেই জাপানীরা জাপানকে ছিনাইয়া আপন করিয়া



আইনু ঘোড়সওয়ার ও আইনু যোদ্ধা।

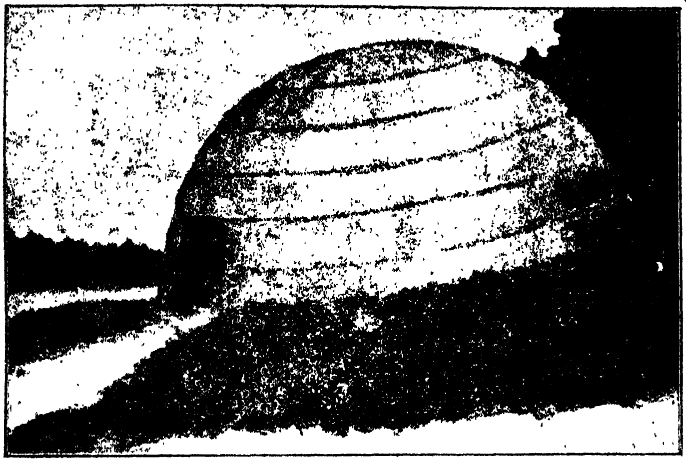


আইনুদের বাড়ী।

লইতে হইয়াছিল। সেটা যে নিতান্তই শান্তিপ্রিয় পন্থা অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল তা নয়। যুদ্ধ দুই পক্ষই করিয়াছিল। আইনুদেরই হার হইয়াছিল, তাই তাদের দশাটাও হইয়াছিল আমাদেরই দেশের কোল-ভীল-সাঁওতালদেরই মত, বা এখনকার আমাদের সকলকার মত। যারা ছিল, তাদের কতক জাপানীদের মধ্যে মিশিয়া গেল আর বাকী সব পাহাড় বনে আশ্রয় নইল।

বর্তমান সময়ে আইনুদের সংখ্যা ১৫ হাজারের কিছু উপর। তাদের আবাসস্থলগুলি নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর এবং তাদের বর্ব্বরতার পরিচয় দেয়। শিশুদের মৃত্যুর হারও তাদের মধ্যে খুব বেশী। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় পৃথিবী হইতে এই জাতিটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইতে আর বেশী দেরী নাই।

—



আইনুদের বাড়ী।

ঈয়র্কসায়ারের অনেক জলাভূমিতে আগুন লাগাইয়া ভাখা গিয়াছে যে বোল্‌তা-মৌমাছিরাও বিপদ উপস্থিত হইবার ঢের আগেই পিঠটান দিয়াছে। আগুন আসিয়া সব সময়ে খালি বাসাকেই গ্রাস করিয়াছে।

অরুণ দত্ত।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসে চরিত্র পরিচয়—

নিশ্বাস-প্রশ্বাস যে আমাদের জীবনের পক্ষে কত বড় প্রয়োজনীয় তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তাহার ভঙ্গি হইতে যে আমাদের চরিত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। সম্প্রতি প্যারীর একটি চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাগো 'এক্স রে'র (X-ray) সাহায্যে এ-বিষয়টির আলোচনা করেন। ইহার জন্য তিনি একটি যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে তিনি সম্যকরূপে লোকের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটির আলোচনা করেন। এই পরীক্ষা ও আলোচনার পরে তিনি এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ভঙ্গির সঙ্গে চরিত্রের খুব সম্বন্ধ আছে। যন্ত্রটির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া লোকদের ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে বলা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্ন প্রকারে সাড়া দিয়াছিলেন। নিরীহ প্রকৃতির লোকেরা তখনি নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা একটু চিন্তাশীল তাঁহারা অনেকটা দেরিতে সাড়া দিয়াছিলেন। সহিষ্ণু লোকেরা একই ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। যাঁহারা খুব সচেতন তাঁহারা ফেলিয়াছিলেন বলিবামাত্রই। আরও বহু লোকে বহু ভাবে সেই কথায় সাড়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরও সাড়া অনুযায়ী চরিত্রের তারতম্য টের পাওয়া গিয়াছিল। স।

পিঁপড়ের অনুভবশক্তি—

জীবজন্তু আর পোকা-মাকড়ের পাঁচরকম বোধশক্তি ছাড়া আর কিছু বুঝিবার শক্তি আছে কি না বৈজ্ঞানিকেরা তাহা নির্ণয় করিতেছেন।

জানা গিয়াছে, পিপীলিকার বোধশক্তি আশ্চর্য্য রকমের। একটা পাহাড়ে জঙ্গলে আগুন ধরে। তার উপত্যকায় অসংখ্য পিঁপড়ের বাসা ছিল। আগুন আসিয়া পৌঁছিবার ২৪ ঘণ্টা আগে জাখা গেল সব পিঁপড়ে তাদের ডিম আর খাবারের টুকরা লইয়া নূতন দেশের সন্ধানে চলিয়াছে। আধ মাইল দূরের একটা নিরাপদ স্থানে তারা তাদের আস্তানা গাড়ে। সেই পাহাড়ের খরগোস, সাপ, কাঠ-বিড়াল ইত্যাদি ঠিক এইউপায়ে পলাইয়া রক্ষা পায়।

বিবাহের বিজ্ঞাপন—

চীনদেশের কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর বাহিরে একটা খালি হাঁড়ি রাখিয়া দেওয়া হয়। হাঁড়ি যদি নীচুমুখ করিয়া রাখা হয় তবে বাটীর কন্যারা অল্পবয়স্কা বুঝিতে হইবে। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে হাঁড়ির মুখ খুলিয়া দিয়া রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া কাত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, ঘটকেরা হাঁড়ি ঐ অবস্থায় দেখিলে এবাড়ীতে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে বুঝিতে পারিয়া সম্বন্ধ লইয়া আসিতে আরম্ভ করে। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে ওবাটীতে অন্য কন্যা নিতান্ত ছোট থাকিলে কিয়ৎকালের জন্য বিবাহের বিজ্ঞাপনটি সরাইয়া রাখা হয়।

—

বায়ুর বেগ—

বাতাস যখন আস্তে আস্তে বহে তখন বাতাস ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়। প্রবল ঝটিকার সময় বাতাসের বেগ থাকে ঘণ্টায় ৮০ হতে ১০০ মাইল; অর্থাৎ এক্সপ্রেস ট্রেনের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়। ঝড়ের আগমন-সূচনায় যখন গাছ পালা ভীষণ নড়িতে আরম্ভ করে ও রাস্তার ধূলি-কণা উড়িয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখনকার বাতাসের বেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ৩০ হইতে ৪০ মাইল। ঘূর্ণাবর্ত্তের সময় (cyclonic weather) যখন বাতাস নিজের রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গাছপালা ঘরবাড়ীর উপর নিজের তাণ্ডব নৃত্যের প্রভাব বিস্তার করে তখন বাতাস কমপক্ষে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়।

—

বাতিমাছ—

আমেরিকার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের অনেক নদীতে এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়, সেখানকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা প্রদীপ ও বাতির কাজ ঐ মাছ দ্বারা সম্পন্ন করে। ঐ জাতীয় মাছগুলি প্রায় ১ ফুট আন্দাজ লম্বা হয় ও মাছগুলির শরীরে এত অধিক পরিমাণ চর্ব্বি থাকে যে ঐ মাছ কেবল শুকাইয়া লইয়া বাতি কিম্বা প্রদীপের বদলে ব্যবহার করা যায়। বিবাহ নৃত্যগীত ও অন্যান্য ভোজ-কাজে ঐ মাছের দ্বারা অসভ্য অধিবাসীরা বড় বড় মশাল প্রস্তুত করিয়া তাদের মশাল নৃত্য (torch dance) সমাধা করে। বাতির কাজ সম্পন্ন হয় বলিয়া তারা ঐ মাছের নাম দিয়াছে 'বাতিমাছ'। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের ভাষায় বাতিমাছের নাম হচ্ছে Thaleichthys Pacificas.

বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা —

ভাষাভেদে বর্ণমালার সংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে। প্রাচীন হিব্রু, সিরীয় ও কাল্ডীয় ভাষার প্রত্যেকের বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্যা হচ্ছে ২২টি। গ্রীক ২৪, ফ্রেঞ্চ ও লাটিন ২৫; জর্ম্মান, দিনেমার ও ইংরেজী ভাষার প্রত্যেকের ২৬; স্পেনীয় ও শ্লাভোনিক ২৭, তুরস্ক ও আরবীয় ২৮, পারস্য ও কাল্ডীয় ৩২, জর্জ্জীয় ৩৫, রুষীয় ৩৬, আর্ম্মেনীয় ৩৮, রুমীয় ৪১, প্রাচীন মাস্কোভাইট ভাষায় ৪৩, বাংলা ভাষায় ৫০, সংস্কৃত ৪৮ (সংস্কৃত ভাষায় ড় ও ঢ় ব্যবহার না থাকায় ৪৮ ধরা হইল), ইটালীয় ২০, বার্ম্মাজদের ভাষায় ১৯, কেল্টিক ১৭ ও স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসীদের বর্ণমালার মোটে ১২টি অক্ষর আছে। ইথিওপীয় ও তাতারীয় ভাষার প্রত্যেকটিতে ২০২, আবিসিনীয় ২০৮ ও চীনা ভাষায় ২১৪টা অক্ষর আছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল ভাষা হচ্ছে চীনাদের। ২১৪টা অক্ষর চিনিতে পারা সহজসাধ্য নয়।

—

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র—

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'ডেলি কুরাণ্ট' (Daily Courant) ১৭০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়। মিস এলিজাবেথ ম্যালেট (Miss Elizabeth Mallet) নামে একজন বিদুষী স্ত্রীলোকের দ্বারা উহা সম্পাদিত হয়। অন্যান্য সংবাদপত্রসমূহ বিনা বাধায় যেসব অন্যায় সংবাদ প্রচার করিয়া অযথা স্ত্রীলোক সাধারণের উপর অন্যায় দোষারোপ করিত তৎসমস্ত নিবারণের জন্য মিস ম্যালেট দৈনিক কুরাণ্ট পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি নিজের মনপ্রাণ ঐ দৈনিকের বিস্তারের জন্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন ও স্ত্রীজাতির উপর সংবাদপত্রসমূহের অনধিকার কটাক্ষ ও দোষারোপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অলকেন্দ্র।

—

জোনাকীর আলো কোত্থেকে আসে ?—

আমার লিখিত গাছপালার আলোবিকিরণের কারণ অনুসন্ধানের উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 'প্রবাসীতে' কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন। গত বছরের 'প্রবাসীতে' তদুত্তরে আমি বলেছিলেম—পচা গাছে যে আলো-দেওয়া Fungus জন্মায়, তারা কি খেয়ে, কোন্ কোন্ উপাদান থেকে ওই রকমের সুন্দর আলো সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু সে থেকে এসম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কারণ শুনতে পাই নি।

বৃক্ষাদির বা বিশেষ বিশেষ প্রাণীর ওই রকমের স্নিগ্ধ আলো বিকিরণের কারণ ও উপাদান কি, সেইটে জানবার জন্য অনেকদিন ধরে অনেকেই কত রকমের চেষ্টা করছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ অভীপ্সিত ফললাভ করতে সক্ষম হন নি।

সম্প্রতি Scientific American পত্রিকায় এসম্বন্ধে একটি পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা হচ্ছে এই যে, ওই রকমের আলো-দেওয়া কীট পতঙ্গ, বা অন্যান্য জিনিষের সংখ্যা পৃথিবীতে বড় একটা বেশী নয়। সেটা কিন্তু তাদের নেহাৎ ভুল। জীবাই (Protozoa) থেকে মেরুদণ্ডী (Vertebrates) জীব পর্য্যন্ত খালি প্রাণীজগতেই কমের পক্ষে পৃথিবীতে তিন শতেরও বেশী জাতের আলো-দেওয়া কীটপতঙ্গাদি প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়—এদের প্রত্যেক জাতের ভিতর আবার, একাধিক শ্রেণীবিভাগ আছে। আলো-দেওয়া প্রাণীদের মধ্যে বেশীর ভাগই সমুদ্রের বাসিন্দা। এদের ভিতর Noctibucaই সবচেয়ে ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক আলো-দেওয়া প্রাণী, এরা গভীর সমুদ্রে জাহাজের তলায় দলে দলে ভীড় করে' ঝিকমিকে আলোর লহর ফুটিয়ে তোলে। সামুদ্রিক জেলিফিশ্, ছোট ছোট কাঁকড়া, চিংড়ি জাতের প্রাণীরাও (Crustaceans) যখন জাহাজের গায়ে, নৌকার দাঁড়ে কিম্বা অন্য কিছুতে ধাক্কা খায় তখন ওই রকমের ঝিক্‌মিকে আলো বিকিরণ করে থাকে।

গভীর সমুদ্রের তলায় এক এক রকমের অদ্ভুত মাছ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের পরিপুষ্ট অঙ্গশিষ খুব সুন্দর এক রকমের জোরালো আলো বিকিরণ করে' ঘরকন্না নির্ব্বাহের সহায়তা করে থাকে। তাদের কোন কোন জাতের আলো-দেওয়া অঙ্গটা ঠিক যেন চোখের মত; ইচ্ছামত খুলতে ও বন্ধ করতে পারে। খুব গভীর সমুদ্রের তলায় ওপরের আলো ঢুকতে পারে না, কাজেই সেখানে গভীর অন্ধকার; সেখানে মৎস্যজাতীয় যেসব প্রাণী বাস করে, তাদের তো খালি চোখ থাকলে চলতো না—আলো থাকলে তবে জিনিষের প্রতিবিম্ব চোখের Retinaর ওপর প্রতিফলিত হবে—ওখানে তো আর সেইটি হবার জো নেই, কাজেই ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসারেই হোক কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্ররোচনাতেই হোক, তাদের ওই অদ্ভুত 'সার্চলাইটের' মতো আলোবিকিরণকারী অঙ্গটা অভিব্যক্ত হয়েছে। সেটাকে তারা আবার এদিক সেদিক ঘুরিয়ে সব দেখে নিতে পারে।

আলো-দেওয়া স্থলচর কীটপতঙ্গাদির মধ্যে জোনাকী আর দীপ-মক্ষিকাদিই বোধ হয় লোকের কাছে পরিচিত বেশী। কারণ এরা প্রায় সর্ব্বদাই রাত্রিবেলায় যেখানে-সেখানে লোকের চোখে পড়ে থাকে। সত্যি সত্যিই আকারের অনুপাতে জোনাকী বা দীপ-মক্ষিকা যে পরিমাণে আলো দিয়ে থাকে সেটা অতুলনীয়। দক্ষিণ আমেরিকার দীপ-মক্ষিকার আলো এত উজ্জ্বল যে, তাতে অন্ধকারে অনায়াসে বই পড়া বা কাজ কর্ম্ম করা যেতে পারে। আমাদের দেশীয় জোনাকীর সঙ্গে ওসব দেশের জোনাকীর পার্থক্য ঢের। ওদের মাদী পোকাগুলোর পাখা নেই, আলোও নেই বোধ হয় তাদের। আবার ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চাগুলি যখন পাখা হয় না তখনও আলো দিয়ে থাকে। সেগুলো মাটির ওপর চরে বেড়ায়। এজন্য অনেকের ধারণা ছিল—ওগুলো কীট জাতীয় একরকমের প্রাণী। বাস্তবিক পক্ষে ওরা Lampyrid Beetle নামে এক জাতীয় পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত। মোটের ওপর সমস্ত রকমের আলো দেওয়া পতঙ্গই "Lampyridæ" শ্রেণীর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মাত্র। 'Lampyridæ' শব্দটা গ্রীক ভাষা থেকে আমদানী, মানে—আলো দেওয়া, শুনে অবাক হতে হয় যে, এই 'Lampyridæ' শ্রেণীর উপশ্রেণীর সংখ্যা পনেরো শতেরও ওপর। একমাত্র যুক্ত-রাজ্যেই ওর দুইশত ত্রিশ শ্রেণীর পতঙ্গ বিয়াল্লিশটা প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়।

এদের আলো বিকিরণের উদ্দেশ্য কি, এসম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম অনুমান করেছেন। কিন্তু কোনটাই দোষবর্জ্জিত নয়। কেউ বলেন—ওদের আলো দেওয়াটা যৌননির্ব্বাচনের ফল। সাপের মুখে মণি থাকার সমর্থ যুক্তি দিতে গিয়ে কেউ কেউ আমাদের দেশীয় জোনাকী পোকার আলো থাকার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন, তাঁরা বলেন যৌন নির্ব্বাচনের ফলে স্ত্রী-জোনাকীর আলো বেশী উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তার আলোর ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে পুং-পতঙ্গগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে পড়ে। সাপ ওই ফন্দিটা যে-কোন প্রকারে হোক জেনে, মণিটাকে নিয়ে কোন স্থানে রেখে লুকিয়ে থাকে; মণির আলোর ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে, জোনাকী বা অন্যান্য পোকামাকড় এসে পড়লেই ধরে উদরপূর্ত্তি করে। অধিকারে স্ত্রী-পুরুষ

বেছে নেবার জন্তেই যদি আলোর উৎপত্তি, তবে যে জাতের স্ত্রী-পতঙ্গের পাখা নেই বা আলো নেই, সেই জাতের পুং-পতঙ্গের আলো দিবার তাৎপর্য্য কি? আবার গভীর সমুদ্রে কাঁকড়া, শম্বুক জাতের একরকমের আলো দেওয়া ছোট প্রাণীর চোখ বা অন্ত কোন রকমের দর্শন-যন্ত্রের অস্তিত্ব নেই মোটেই, তারা সম্পূর্ণ অন্ধ, অথচ শরীর থেকে একরকম রস বেরিয়ে সমস্ত শরীরটাকে আলোকিত করে তোলে; সে আলো থাকা না থাকার তাৎপর্য্য তো কিছুই বোঝা যায় না! গভীর সমুদ্র থেকে সম্প্রতি এক রকমের চিংড়ি পাওয়া গেছে, তাদের কান্‌কোটা খালি খোলার আবরণের ভিতরে আলো বিকিরণ করে; কিন্তু বাইরে সেটার কিছুই টের পাওয়া যায় না। যদি আলো দেওয়াটা যৌননির্ব্বাচনের ফলই হয়ে থাকে তবে এই ভিতরকার আলো দ্বারা তাদের কোন উপকারই হতে পারে না।

সবচেয়ে জোরালো আর বেশী পরিমাণ আলো দিতে পারে Crustacean জাতের Cypridena Hilgendorfi নামে সামুদ্রিক এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী। তাদের আকারের তুলনায় আলোর পরিমাণ এত বেশী আর জোরালো যে, ওদের আকারের অনুপাতে মানুষের যদি ও-রকমের একটা আলো-দেওয়া যন্ত্র থাক্‌তো, তবে একাই একটা সহরকে দস্তুরমত আলোকিত করে তুল্‌তে পার্‌ত। এদের আলো খুব তীব্র আর অনেকদূর জলের নীচ থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

অনেকেই জানেন অনেক রকমের চর্ব্বি, উবায়ু তেল এবং সুরাসার প্রভৃতি (alcohols) উত্তাপ বিশেষে যখন আস্তে আস্তে বায়ুর অক্‌সিজেনের সঙ্গে মিশ্‌তে থাকে তখন ওইরকমের উত্তাপবিহীন একরকমের আলো (phosphorescence) বিকিরণ করে থাকে। এই ব্যাপার থেকেই অনেকে কীটপতঙ্গাদির আলোর মতো কৃত্রিম আলো তৈরি কর্‌বার সন্ধান ধরেছিলেন। আর সে থেকেই রাসায়নিকদের Pyrogallol পরীক্ষায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ হয়েছিল। Pyrogallol একটা যৌগিক (compound) পদার্থ। কিন্তু কতকটা উদ্ভিজ্জজাত পদার্থের মতো। ফটোগ্রাফের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্ত এজিনিষটা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যদি পাইরো কিংবা গেলিক এসিড আর হাইড্রোজেন-পেরোক্‌সাইড কোন উদ্ভিজ্জের (যেমন আলু, গাজর ইত্যাদি) রসের সঙ্গে মেশানো যায় তবে ওই রকমের স্নিগ্ধ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। পাইরো বায়ুর অক্‌সিজেনের সঙ্গে অতি সহজে মিশে যায়। পাইরো অথবা গেলিক এসিড যখনই অক্‌সিজেনের সঙ্গে মেশে তখনই উত্তাপবিহীন আলোর (phosphorescence) উৎপত্তি হয়ে থাকে।

সম্প্রতি তাপ-বিহীন আলো সম্বন্ধে যেসব নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অধিকাংশ পরীক্ষাই হয়েছিল আলো দেওয়া কীট-পতঙ্গাদি নিয়ে। জোনাকী আর দীপমক্ষিকা (Photuris Pennsylvanica) জাতের পতঙ্গ থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে।

আলো দেওয়া পতঙ্গাদির আলো-দেওয়া যন্ত্রগুলি কেটে ছিঁড়ে দেখা গেছে খানিকটা অস্বচ্ছ জায়গা কতকগুলি সূক্ষ্মতন্তুনির্ম্মিত স্বচ্ছ ও ফিকে পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। স্বচ্ছ পর্দ্দাখানিই বোধ হয় আলো ছড়িয়ে থাকে, আর অস্বচ্ছ জায়গাটার কাজ হচ্ছে ওই আলোটাকে বাইরের দিকে প্রতিফলিত করে দেওয়া আর আলোর খোরাক জোগানো। ওই জায়গাটার সঙ্গেই কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বায়ুনল যোগ করা আছে আর সেই যুক্ত গ্রন্থি থেকেই আলোর কণিকাগুলি অন্তান্ত পদার্থের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে আসে। ওসব যৌগিক আলোর কণিকাগুলিকে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদের ভিতর প্রধানতঃ দুটি জিনিষ আছে—একটি হচ্ছে "Luciferine", আরেকটি "Luciferase"।

আগে বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন রকমের তৈল-জাতীয় পদার্থের চর্ব্বির ক্ষুদ্র কণিকাগুলোই সুরাসারাদি যোগে বায়ুর অম্লজানের (Oxygen) সঙ্গে মিশে ওই রকমের আলোর উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু "Luciferine" এবং "Luciferase" বিশ্লেষিত হবার পর দেখা গেছে—ওর কোনটাই বেঞ্জইন, ইথার ইত্যাদির দ্বারা পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত বা নিঃশেষিত হয় না। ওই দুটি জিনিষের মধ্যে Luciferineএর গুণ সহজে নষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হয় না, এমন কি অনেকক্ষণ গরম জলে ফুটিয়ে নিলেও কয়েক মাস অবধি আলো বিকিরণ করতে পারে। বিশেষতঃ অক্‌সিজেনের সঙ্গে মিশ্‌লে এটা Oxyluciferineএ পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, ফের আবার ওথেকে Luciferine বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পারা যায়। কিন্তু Luciferaseএর সঙ্গে না মিশে Luciferine আলো দিতে পারে না। Luciferase আবার সম্পূর্ণ বিপরীত, ওটা সম্পূর্ণ অস্থায়ী আর খুব তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

এখন পরিষ্কার রকমেই দেখা গেল—যে কোন রকম প্রাণীর আলো-যন্ত্রের আলো বিকিরণ কর্‌তে হলে তার অক্‌সিজেন সর্‌বরাহ হওয়া চাইই, তা না হলে আলোর স্ফুরণ হয় না। কাজেই এটা আমরা সহজেই ধারণা কর্‌তে পারি, জোনাকী পোকার আলো বিকিরণ কর্‌বার জন্ত অক্‌সিজেন দর্‌কার। জোনাকীর আলো-দেওয়া যন্ত্রে Luciferine এবং Luciferase দুটোই মিশ্রিত অবস্থায় সংগৃহীত থাকে। জোনাকী বায়ু থেকে যে অক্‌সিজেন সংগ্রহ করে আর বিশেষতঃ বায়ুনলের ভিতর যে অক্‌সিজেন থাকে তাতে মিশে ওই মিশ্রিত পদার্থটা আলো বিকিরণ করে থাকে। জোনাকীর আলোটা একবার উজ্জ্বল একবার নিষ্প্রভ হয় এটা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় অক্‌সিজেনের পরিমাণ বেশী বা কম হওয়াতেই ওরূপ হয়ে থাকে।

স্পেকট্রস্কোপ, বলোমিটার প্রভৃতি যন্ত্রে বিশেষরূপে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—জোনাকী জাতের (Photuris) পোকারা, যে আলো বিকিরণ করে, সেটা infra-red থেকে ultra-violetএর মধ্যে কোন আলোর মতই নয়। মোটা কথায় বল্‌তে গেলে এটাকে ঠাণ্ডা-আলো নাম দেওয়া যেতে পারে। মানুষের উদ্ভাবিত কৃত্রিম আলো-দেওয়া যন্ত্রাদির আলোর তুলনায় একটি জোনাকীর আলোর পরিমাণ অসম্ভব বেশী। কার্ব্বন-গ্লো-ল্যাম্পের শক্তি হচ্ছে শতকরা ১·৪৩ Tungsten Lampএর শক্তি ১·৩ আর জোনাকীদের আলোর শক্তি হচ্ছে শতকরা ৯৯·৫।

এখন সকলের মনেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, উত্তাপবিহীন জৈবিক বা উদ্ভিজ্জ আলো (phosphorescence) কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করে তাকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে চালানো যায় কি না? অনেকে সে বিষয়ে চেষ্টা করে কিছু কিছু কৃতকার্য্য হয়েছিলেন, আবার এখনও পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা চল্‌ছে। তবে এটা নিশ্চয়ই জোর করে বল্‌তে পারা যায়, বিজ্ঞান অচিরেই উত্তাপবিহীন আলো তৈরী করে উত্তাপের বাজেখরচ বন্ধ করে দেবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গে জমীদার-সম্প্রদায়—রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব

রাজস্ব শব্দের ধাত্বর্থ বহুবিস্তৃত হইলেও, রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির কর স্বরূপ যাহা গ্রহণ করেন সাধারণতঃ তাহাকেই আমরা রাজস্ব বলি; এবং এস্থলে রাজস্ব শব্দ সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইল।

ভূমি কাহাকে বলে, সকলেই জানেন। কিন্তু এই ভূমিতে কাহার স্বত্ব সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে, সমুদয় ভূমি রাজার; আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় ভূমি প্রজার। হিন্দু ও মুসলমানগণ দ্বিতীয় মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, রাজা অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভূমিরও রক্ষা করিয়া থাকেন; তজ্জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের কোনও অংশ, কিম্বা তাহার মূল্য, পাইয়া থাকেন। প্রামাণিক হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বারা যে ভূমি আপন ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবে, ঐ ভূমি তাহার হইবে। অবশ্য, পতিত জমী সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, ভূমির স্বামিত্ব লইয়া মতভেদ থাকিলেও, রাজা যে ব্যবহৃত ভূমির রাজস্ব পাইবার অধিকারী, সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না।

হিন্দু ও মুসলমানদিগের সময়ে রাজস্ব স্বরূপ উৎপাদিত ফশলের অংশ গৃহীত হইত—নগদমুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। এই অংশও শস্যবিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইবে। টোগ্‌লক্‌বংশীয় বাদ্‌শাহদিগের অধিকারকালে উহা সম্পূর্ণরূপে তৎকালপ্রচলিত আরবীয় প্রথার অনুরূপ করা হয়। তৎপরে শের সাহ পুনরায় উহার পরিবর্ত্তন ও উহাকে সময়ের ও সমাজের উপযোগী করিয়া রাজস্ব আদায়ের নূতন প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার অসাময়িক মৃত্যু বশতঃ উহা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। অবশেষে, স্বনামধন্য রাজা টোডর মল, উৎপাদিত শস্যের অংশ গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়া, নগদ মুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। রাজা উৎপাদিত ফশলের তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুদ্রার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়; এবং গত ১৬ বৎসরের উৎপন্ন ফসলের মূল্য লইয়া হাঁরাহারি এক বৎসরের পরিমাণ ধরা হয়। এইরূপে স্থিরীকৃত রাজস্ব দশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইত না। এই প্রথা বঙ্গদেশে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। টোডর মল বিহারের কিয়দংশ ও বঙ্গদেশ ব্যতীত আকবরের সুবিস্তৃত রাজ্যের রীতিমত জরীপ ও তদন্তর উৎপাদিকা-শক্তি এবং অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা-সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় ভূমি আট শ্রেণীতে বিভক্ত ও কর নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে চাকলা, পরগণা-তপ্পা কিম্বা অন্য কোনওরূপে নির্দ্ধারিত কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তাহাদিগকে জমীদার (জমীন+দার, দার শব্দের অর্থ রাখনেওয়ালা, ভৃত্য) বলিত। রাজস্ব আদায় ব্যতীত তাহাদিগকে স্ব স্ব এলাকামধ্যে শান্তি রক্ষা, রসদ সরবরাহ ও অন্যান্য সামান্য সরকারী কার্য্য করিতে হইত। তাঁহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না; তাঁহারা নির্দ্ধারিত কর বাদশাহের প্রতি-নিধির হস্তে অর্পিত করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিতেন।

কালে, অন্যান্য চাকরীর ন্যায় এই পদও কুলক্রমাগত হইয়া যায়; এবং আলোচনা ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে জমীদারগণই ভূমির প্রকৃত অধিকারী—তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, যে কোনও জমী যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন—কৃষকদিগের উহাতে কোনও স্বত্ব বা অধিকার নাই। এইরূপেই নানাবিধ মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এই জমীদারগণ ঠিকাদার ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। অতঃপর আমরা এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগকে ঠিকাদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার ঠিকাদারী বন্দোবস্ত মুরসিদাবাদের নবাবের কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইত; এবং রাজস্ব মুরসিদাবাদের রাজকোষে প্রদান করিতে হইত। ফল কথা, রাজস্ব স্থিরীকরণ ও উহার আদায়, নবাব বাহাদুরের সর্ব্বময় আয়ত্তাধীনে ছিল। যে পরিমাণ রাজস্ব স্থির করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইত তাহাকে "আসল জমা" বলিত; এবং আদায়

ও রক্ষণাবেক্ষণের ন্যায্য খরচ বাদে, উহার সমুদয় দিল্লী প্রেরণ করিতে হইত। নবাব মহোদয়ের অধিক টাকার আবশ্যক হইলেই, তিনি একটা না একটা বাহানা করিয়া, ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিতেন। ইহাকে আব্‌ওয়াব্‌ বলিত; এবং কালে উহা স্থায়ী হইয়া যাইত। তদপেক্ষা অধিক টাকার আবশ্যক হইলে, পুনরায় নূতন আব্‌ওয়াব্‌ বসান হইত; এবং উহাও স্থায়ী হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে, নবাবের কর্ম্মচারীগণও স্ব স্ব উদর পূর্ত্তির মানসে স্বতন্ত্র আব্‌ওয়াবের দাবী ছাড়িতেন না। এইরূপে, নবাব কাশিম আলির সময়ে এই আব্‌-ওয়াবের পরিমাণ বাৎসরিক এক কোটি টাকারও অধিক হইয়া উঠে!

ইহা কখনও মনে করা যাইতে পারে না যে, ঐ টাকা ঠিকাদারেরা আপনাদের নিজস্ব হইতে দিতেন। তাঁহারাও প্রজাবর্গের উপর আব্‌ওয়াব্‌ বসাইয়া, অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ, আদায় করিয়া লইতেন। এদিকে নিরীহ প্রজাবৃন্দ কোথায় যাইবে, কাহার নিকট বিচারপ্রার্থী হইবে, তাহার কোন ঠিকানাই ছিল না। কোন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে রাজস্বের নামে প্রজাবর্গের শোণিতের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত শোষিত হইত।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার (রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে উড়িষ্যা বলিত) দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তজ্জন্য তাঁহারা বাদশাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত নবাব, দিল্লীর বাদশাহের দেওয়ান ও নাজিম—উভয়ই—ছিলেন। এখন হইতে তিনি কেবলমাত্র নাজিম রহিলেন; এবং নিজামতের খরচ ও পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য কোম্পানির নিকট হইতে বাৎসরিক প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা পাইবেন, অবধারিত হয়। এই সময়ে মীর্‌জাফরের পুত্র নজমদ্দৌলা নবাব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সায়েফউদ্দৌলা নবাব-নাজীম হইলে এই মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৪২ লক্ষ হইয়া যায়। অতঃপর মবারকউদ্দৌলার নিজামৎ-কালে ইহাকে ৩২ লক্ষ করা হয়; এবং কাল সহকারে উহা ১৬ লক্ষে পরিণত হয়। দিল্লীর সিংহাসন ধ্বংস হইয়া যাইলেও নবাব মহোদয় ঐ টাকা ও নবাব-নাজিম উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঐ উপাধি ও টাকা রহিত করিয়া তাঁহাকে "মুর্‌সিদাবাদের নবাব বাহাদুর" ও "আমীর উল্‌ উমরা" এই উপাধিদ্বয় এবং বাৎসরিক দুই লক্ষ ত্রিশ সহস্র টাকা পেন্সন্‌ দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানি বাহাদুর চারিবৎসর তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে দেওয়ানির কার্য্য সম্পাদন করিয়া কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন; তৎপরে সুশৃঙ্খলে রাজস্ব আদায় ও ভবিষ্যৎ কর নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলায় "সুপার্‌-ভাইজার" নাম দিয়া এক-একজন সিবিলিয়ন নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেত্রের অবস্থা, উৎ-পাদিত শস্য ও উপাদিকা-শক্তি প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রজাবর্গ কিরূপে মালগুজারী দিয়া থাকে এবং ঠিকাদারেরাই বা প্রজাগণের নিকট হইতে কি পরিমাণ ও কত প্রকারের আব্‌ওয়াব্‌ আদায় করিয়া থাকে এবং ঐ আব্‌ওয়াব্‌সমূহের পরিমাণ ও প্রকারভেদ বৃদ্ধি হইতেছে কি না, ইত্যাদি বিষয়েরও যথাযথ সংবাদ লইয়া, মন্তব্য প্রদান করিতে হইত।

এই সময়ে, ১১৭৬ সালে, দুর্ভিক্ষ হয়; এবং ইহাই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত। নবাব বাহাদুর মুখ তুলিয়া প্রজার দুঃখ দেখিলেন না। কোম্পানির কেবল মাত্র রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ছিল; সুতরাং তাঁহারাও কিছু করিলেন না। এই দুর্ভিক্ষে বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় দ্বি-তৃতীয়াংশ ও বাঙ্গালার প্রায় অর্দ্ধাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে ডিরেক্‌টরগণ একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন; এবং ভবিষ্যতে এরূপ ভীষণ কাণ্ডের যাহাতে পুনরাবৃত্তি হইতে না পায়, তন্নিমিত্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে গভর্ণর, ও তাঁহার নিজের বিবেকবুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি, করিয়া দিলেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মুর্‌সিদাবাদ ও পাটনা নগরে "রেবিনিউ কৌন্সিল অব্‌ কন্ট্রোল" নামে এক-একটি রাজস্ব-সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু কলিকাতার দূরবর্ত্তী বলিয়া অনেক অসুবিধা, ও অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আর-একটি রেবিনিউ কৌন্সিল স্থাপিত ও কোষাগার মুর্‌সিদাবাদ হইতে আনীত হয়; এবং সুপার্‌-ভাইজারদিগের নাম "কলেক্‌টর" রাখা হয়। অতঃপর

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কৌন্সিলের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "রেবিনিউ বোর্ড" রাখা হয় ও অপর দুইটি কৌন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হয়।

দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মেদীনীপুর, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগনা এই চারি জেলা কোম্পানির অধিকারে আসিয়াছিল; এবং তাঁহারা স্বয়ং রাজস্ব আদায় করিতেন; অপরাপর স্থানের রাজস্ব পূর্ব্ববৎ ঠিকাদার দ্বারা আদায় হইত। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাতে এক বৎসরের জন্য ও বিহারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য ঠিকা বন্দোবস্ত হইত। ইহা সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়াতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে একেবারে পাঁচ-পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। ইহা দেখিয়া কতকগুলি অপরিণামদর্শী ও অসংযতচিত্ত ব্যক্তি, অধিক টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া, ঠিকা গ্রহণ করে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, কোম্পানিও মুসলমানদিগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যকালে উহার বিপরীত ফল হইল। কারণ ইংরেজেরা প্রজার মঙ্গলার্থ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থকিতেন; এবং কিছুতেই অসাধুতার প্রশ্রয় দিতেন না। এইজন্য ঐসমুদয় ঠিকাদারেরা যথাসময়ে স্ব স্ব দেয় প্রদান করিতে পারিল না—কেহ কেহ সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিল; অনেকেই বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাইয়া গেল!

পাঁচসালা বন্দোবস্তের পরিণাম দেখিয়া পুনরায় বাৎসরিক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। কিছু দিন পরে ডাইরেক্টরেরা অনুমতি করিলেন যে, দেশের চিরন্তন প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ও পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের হিসাব লইয়া, রাজস্ব স্থিরতর (steady) এবং কতকগুলি স্থায়ী নিয়ম প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ঠিকাদারদিগের সহিত একেবারে দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এ দেশে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকে উত্তর প্রদান করিতে অনুমতি করেন। বলিয়া দেন যে—(১) প্রত্যেক এষ্টেটে কি পরিমাণ রাজস্ব ধার্য্য হইতে পারিবে; (২) কিরূপ ও কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা উচিত; (৩) এবং যাহাতে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত না হয়, অথচ ঠিকাদারেরা সহজে রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইবে—ইহা মনে রাখিয়া প্রশ্ন সমুদয়ের উত্তর দিতে হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সার জন শোর নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও অতি সংযত ও সমুচিত যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করিয়া ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে আপন মন্তব্যলিপি প্রদান করেন। ইহাতে শোর মহোদয় আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে আজ পর্য্যন্ত উহা আদর্শমন্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরমালার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দশ-সালা বন্দোবস্ত হয়; এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ মনে করিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, জমীদারগণ আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব জমীদারীর উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্যদেশের ভূম্যধিকারগণের অনুরূপ হইয়া উঠিবেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নহে—ভারতবর্ষ কখনও ইংলণ্ড হইয়া যাইবে না। দশসালা বন্দোবস্তের দ্বারা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রায় তিনি কোটি টাকা অবধারিত হইয়াছিল।

সার জন শোর দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। অধিক কি, তিনি উহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন—বলিয়াছিলেন যে, জমীদার ও প্রজাবর্গের সম্বন্ধ তাঁহাদের আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার এবং প্রজাবর্গের নিকট হইতে জমীদারেরা কি পরিমাণে খাজনা পাইতে পারিবেন—এইসমুদয় যত দিন সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে স্থিরীকৃত না হইবে ততদিন জমীদারদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া দেওয়া উচিত হইবে না—করিয়া দিলেই কোম্পানী ও কৃষকসম্প্রদায় উভয়েই বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত হইবেন। পক্ষান্তরে লর্ড কর্ণওয়ালিস সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম রেগুলেশনের মর্ম্মানুসারে পাট্টা প্রদত্ত ও কবুলিয়ৎ গৃহীত হইলেই উত্তরকালে আর কোনও গোলযোগ উঠিবার আশঙ্কা থাকিবে

না। বলা বাহুল্য যে, অনন্তরসংঘটিত ঘটনাপরম্পরা দ্বারা শোর মহাশয়ের আশঙ্কা অন্বর্থ হইয়া গিয়াছে এবং কেবল মাত্র প্রজারক্ষার্থ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কল্পিত হইয়াছিল, কৃষকসম্প্রদায় তদ্দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই। তাহারা জমীদারদিগের অধীনে যে কৃপাপাত্র ছিল, অনেক পরিমাণে, সেই কৃপাপাত্রই রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টম রেগুলেশনের মর্ম্মানুসারে কোম্পানি বাহাদুর জমীদারগণের নিকট হইতে যে কবুলিয়ৎ গ্রহণ করেন তাহারও নবম ধারাতে ইহাই রহিয়াছে যে, কোম্পানি প্রজার মঙ্গলার্থ যেসমুদয় আইন প্রচলিত করিয়াছেন, বা ভবিষ্যতে করিবেন, জমীদারদিগকে উহা সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমীদারগণ ভূমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন; সুতরাং ঐরূপ লিখাইয়া না লইলে ভবিষ্যতে তাহারা অন্য কোনও আইনে বাধ্য নাও হইতে পারিতেন। ঐ রেগুলেশন দ্বারা ইহাও অনুজ্ঞাত হয় যে, জমীদারগণ পাট্‌ওয়ারী নিযুক্ত করিয়া তহশীলী কাগজ রীতিমত রাখিবেন; তাঁহারা আর কোনও আব্‌ওয়াব বসাইতে পারিবেন না; এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত যে-সমুদয় আব্‌ওয়াব প্রচলিত ছিল ঐ-সমুদয়কে খাজনার অন্তর্গত করিয়া, খাজনা ও জমীর পরিমাণ, ক্ষেত্রের নিদর্শন ও শ্রেণী-বিভাগ প্রভৃতি স্পষ্ট উল্লেখপূর্ব্বক পাট্টা প্রদান ও কবুলিয়ৎ গ্রহণ করিবেন। এরূপ হইলে অনেক অসদাচরণ নিরাকৃত হইতে পারিত; কিন্তু কর্ণওয়ালিসের এই সদিচ্ছা আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়। কারণ জমীদারেরা পাট্টা দিতেন না, কবুলিয়ৎ গ্রহণ করিতেন না; এবং রীতিমত কাগজপত্র রাখিতেন না—রাখিলেও ভবিষ্যৎ ক্ষতির আশঙ্কায় ঐ-সমুদয় কাহাকেও দেখাইতেন না।

পূর্ব্বে, কোম্পানি আপন বাকী আদায়ের জন্য, হয়, ঠিকাদারদিগের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতেন, না হয়, তাহাদিগকে বেদখল করিতেন কিম্বা কারাগারে নিক্ষেপ করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ঐ-সমুদয় রহিত হইয়া "সন্-সেট্-ল" বা সূর্য্যাস্তের আইন জারী হয়। প্রথমাবস্থায় ইহারও ফল অতি শোচনীয় হয়, এবং বিংশতি বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক জমীদার একবারে পিষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যান। ইহাতে অন্যান্য জমীদারগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য ঐরূপ-কোনও সহজসাধ্য নিয়ম নাই বলিয়া, গোলযোগ উত্থাপিত করেন। ইহারই ফলে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত "হপ্তমের আইন" জারী হয়। এতদ্দ্বারা জমীদারগণ স্বেচ্ছানুসারে প্রজাগণের ক্ষেত্রের ফশল, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ক্রোক বিক্রয় এবং প্রজাগণকে কারাবদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। এই আইন দ্বাদশ বৎসর প্রচলিত থাকিয়া প্রজাগণকে একবারে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত করিয়া দেয়। অতঃপর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে "পঞ্চমের আইন" জারী হয়। এতদ্দ্বারা জমীদারদিগের কারারুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়া যায়।

ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের দুই আইন দ্বারা অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রবর্ত্তিত পাট্‌ওয়ারী প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা হয়। ইহা দ্বারা প্রত্যেক পরগনায় একএকজন "কাননগো" ও প্রত্যেক গ্রামে এক-একজন পাট্‌ওয়ারী নিযুক্ত হয়। পাট্‌ওয়ারীরা কোম্পানির চাকর ছিলেন; কিন্তু বেতন দিতেন জমীদারেরা। নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা প্রত্যেক প্রজার জমী ও জমার বিবরণ সুবিস্তৃতভাবে লিখিয়া জমাবন্দী প্রভৃতি তহশীলের কাগজ রাখিবেন, এবং কাননগোগণ ঐসমুদয় রীতিমত পরীক্ষা করিবেন; পাট্টা কাবুলিয়ৎ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন; এবং ঐসমুদয় যে যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন এবং স্বয়ং স্বাক্ষর করিবেন। কার্য্যকালে, পূর্ব্বের ন্যায় ইহাও ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সমুদয় জমী জরীপ করিয়া প্রত্যেক প্রজার জমীর পরিমাণ স্বত্বাধিকার ও খাজনা সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া কাগজ অর্থাৎ রেকর্ড অব্ রাইট্‌স্ (Record of Rights) প্রস্তুতের অনুমতি হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী (৫০) পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা হয় নাই।

এই সময়েও অনেক মহাল কোম্পানির "খাস" ছিল—অতি জঘন্য বলিয়া কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লন নাই। এতদ্ভিন্ন অনেক কুনীতিপরায়ণ ও মোৎফার্ন্নি (ফন্দীবাজ) ব্যক্তি স্বত্ব প্রকাশপূর্ব্বক অনেক জমী লাখেরাজ করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা স্ব স্ব স্বত্বের কোনও প্রমাণ দিতে পারিল

না তাহাদের জমী বাজেআপ্ত হইল। ইহাকে সংক্ষেপতঃ "জপ্তী" সম্পত্তি বলিত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই সমুদয় "খাস" ও "জপ্তী" সম্পত্তির "রেকর্ড অব রাইট্‌স্" প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয় এবং ইহাতে বিংশতি বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়া যায়। এতদ্দ্বারা তত্তৎ স্থানের প্রজাবর্গের প্রভূত উপকার হয়।

জরীপীকাগজে ও রেগুলেশন আইনে প্রজার শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন্ প্রজার কিরূপ স্বত্বাধিকার হইবে, তাহার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ঐ বিষয় বিশদ করিবার চেষ্টা হয়। ইহাতে প্রজাবর্গের দখলীস্বত্ব ও জমীদারগণের নিরিখ বৃদ্ধির ক্ষমতা স্বীকৃত হইলেও এতদ্দ্বারা আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি পিকক ও অন্যান্য রাজস্বকর্ম্মচারিগণ উহা সংশোধনের প্রস্তাব করেন। তজ্জন্য ১৮৬৯ সালের ৮ আইন কেবলমাত্র বঙ্গদেশে প্রচারিত এবং বাকীখাজনার মকদ্দমার বিচার দেওয়ানী আদালতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের সময়ে পাবনা জেলার প্রজাগণ, জমীদারেরা কম মাপ দিতেছেন, জোর করিয়া বৃদ্ধি খাজনার চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইতেছেন ইত্যাদি বলিয়া মহা গোলযোগ উঠাইল ও সকলে এক জোট বাঁধিয়া গেল। ইহা সপ্রমাণের জন্য ১৮৭৩ সালে এগ্রেরিয়ন ডিস্‌পিউট্‌স্ একট্ অস্থায়ীভাবে পাস হয়। টেম্পেল মহোদয়ের ইচ্ছা ছিল যে, প্রজাগণ যাহাতে ইচ্ছামত স্ব স্ব জোতস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারে, এবং বাকী মালগুজারীর জন্য জোতস্বত্ব নিলাম করা যায়, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও মধ্য-স্বত্বাধিকারীদিগের স্বত্ব ও অধিকার সহজে নির্ণীত হইয়া যায়, এরূপ কতকগুলি বিধান উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া, উহাকে স্থায়ীভাবে জারী করিবেন। কিন্তু উহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি অবসর গ্রহণ করেন ও এশ্‌লী ইডেন ছোটলাট হন। তিনি অভিজ্ঞ রাজস্ব কর্ম্মচারী লইয়া বাঙ্গালা ও বিহারে এক-একটি কমিটি বা সভা স্থাপিত করিয়া তাহাদের হস্তে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে আমূল অনুসন্ধান করিতে অনুমতি দেন। অতঃপর রেণ্ট্-ল কমিশন নামে এক সভা স্থাপিত করিয়া তাহাদের হস্তে পূর্ব্বোক্ত দুই কমিটির রিপোর্ট বা মন্তব্যের বিচারভার অর্পিত করেন। রেণ্ট্-ল কমিশন আপনাদের মন্তব্য প্রদান করিলে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইল্‌বার্ট সাহেব এক পাণ্ডুলিপি মন্ত্রী-সভায় উপস্থিত করেন। উহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত হয়, এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আইনে পরিণত হয়, এবং ইহারই নাম "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।"

বাঁকা।

বহুলোৎপাদিকা কৃষি

(Intensive Agriculture)

ইদানীং পাশ্চাত্য জগতে কৃষিব্যবসায় দুইটি স্পষ্ট ধারায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। একটি Extensive Agriculture বা বিস্তীর্ণ কৃষি অর্থাৎ যাহা বহু মূলধনে বিস্তীর্ণ স্থান নিয়া করা যায়। আর একটি Intensive Agriculture বা বহুলোৎপাদিকা কৃষি। ইহাতে অল্পস্থানে বা অল্প মূলধনে যথাসম্ভব বেশী ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিস্তীর্ণ কৃষি অনেকটা বৃহদাকারের কলকারখানারই মত ব্যাপার; উহাতে মনিব ও চাকরের মধ্যে হৃদয়ের সম্বন্ধ খুবই কম। উভয়পক্ষই উভয়ের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব আদায় করিতে চেষ্টা করে। বিস্তীর্ণ কৃষির উদাহরণ চা-বাগান, নীলের আবাদ, ফিজি ও মরিশসের ইক্ষুক্ষেত্র ইত্যাদি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং লোকসংখ্যার আধিক্য-হেতু বাংলাদেশে চাষীর জমি স্বল্পায়তনবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কেবল সুন্দরবন অঞ্চলে বা পদ্মা মেঘ্‌না প্রভৃতির চরে এক এক কৃষকের হাতে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল স্থানেই একজন চাষীর দখলে গড়ে ১০।১৫ বিঘার অধিক জমি দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেশের এই কঠোর অন্নসমস্যার দিনে এই অল্প জমিতে কি করিয়া অধিক ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা পাশ্চাত্য জগতে বিশেষভাবে হইতেছে; এদেশেও হওয়া উচিত।

Intensive Agriculture বা বহুলোৎপাদিকা কৃষিতে উৎকৃষ্ট চাষ, উৎকৃষ্ট বীজ ও প্রচুর পরিমাণে সারের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। উদ্ভিদখাদ্যের সকল উপাদান—যথা নাইট্রোজেন ফস্ফরাস পটাশ, চূন ইত্যাদি—সকলগুলিই জোগাইতে হইবে—জমিকেও পেটে খাওয়াইয়া পিঠে সওয়ান হয়। উৎকৃষ্ট বীজ ত চাইই, তা ছাড়া উপযুক্ত তদ্বির, জল সেচন ইত্যাদি স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে যেরূপ পরিপাটীরূপে করিতে পারা যায়, বিস্তীর্ণস্থানে সেরূপ করা সম্ভব নহে।

স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ, সার ও যত্ন-তদ্বিরের দ্বারা যে কি পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে তাহা অনেকে শুনিলে বিস্মিত হইবেন। ইয়ুরোপে ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম, হলেণ্ড এবং জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ অত্যন্তঘনবসতিবিশিষ্ট হইলেও কৃষকগণ মাত্র ২।৩ একর জমির দ্বারা ভালরূপে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতেছে। এ বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি:—

বেল্‌জিয়াম

বেল্‌জিয়ামের লুভেইন (এই নগরের বিখ্যাত গির্জ্জা ও বিশ্ববিদ্যালয় গত যুদ্ধে জার্ম্মানগণ ধ্বংস করিয়াছে) শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলে প্রতি একরে (৩ বিঘা) গড়ে ৫৭ বুশেল (১ বুশেল—প্রায় এক মণ) করিয়া গম উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বেল্‌জিয়মের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬০০ শত লোক ছিল, অথচ দেশের উৎপন্ন শস্যে তাহাদের প্রায় কুলাইয়া যাইত, এমন কি মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডেও রপ্তানী হইত।

ডেন্‌মার্ক

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ডেন্‌মার্ক হলেষ্টাইন্ ও শ্লেসউইগ্ নামক মূল্যবান রাজ্য হারায়। কিন্তু সে তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া কোমর বাঁধিয়া কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং দেশের সর্ব্বত্র বহুলোৎপাদিকা কৃষির চেষ্টা করিতে থাকে। ফলে পল্লীগ্রামের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে এবং ভূমির উৎপাদিকা-শক্তিও আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিখ্যাত লেখক প্রিন্স ক্রোপোট্‌কিন ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন —"এই সফলতার প্রধান কারণ এই:—বিশেষ উন্নত কৃষিশিক্ষা। সহরে বাজার সকল-চাষীর সহজগম্য, এবং সর্ব্বোপরি সমবায়।" এদেশে প্রতি একর জমি হইতে বৎসরে প্রায় ২০০ পাউণ্ড (তিন হাজার টাকা) মূল্যের ফসল উৎপন্ন করিতে দেখা গিয়াছে।

ফ্রান্স

পারিসের উপকণ্ঠে প্রতি একরের খাজানা ৩২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত (৪৮০ টাকা) হইতে দেখা গিয়াছে! তথাকার জনৈক কৃষকের ২,৭/৮ একর (৮ বিঘা হইতে কিছু কম) জমি হইতে এক বৎসরে কি পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়াছিল তাহার বিবরণ দেখুন।

১।	গাজর	২০০০০ পাউণ্ডের অধিক (২৫০ মণ)
২।	পেঁয়াজ মূলা প্রভৃতি	" " "
৩।	বাঁধাকপি	৬০০০ " (৭৫ মণ)
৪।	ফুলকপি	৩০০০ " (৩৭ মণ)
৫।	টক বেগুন	৫০০০ ঝুড়ি

এতদ্ব্যতীত ছালাদ এবং অন্যান্য ফলও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ফ্রান্সের নিকটবর্ত্তী জার্সি দ্বীপে জনৈক কৃষক প্রতি একরে (৩ বিঘা) ৯৫০ মণেরও অধিক আলু উৎপন্ন করিয়াছেন! পাশ্চাত্য দেশের কৃষকের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতার উপর ফশল উৎপাদন নির্ভর করে না। তাহারা অদৃষ্টবাদী নহে। অত্যন্ত খারাপ জমিকেও সার প্রদান ও উপযুক্ত তদ্বিরের দ্বারা স্বর্ণপ্রসূ করিয়া নেয়। মানুষের হাতে পড়িলে কোন জমিই অনুর্ব্বরা থাকিতে পারে না।

সহরের ও গ্রামের সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা ও নানা-প্রকারের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক সার ব্যবহার করা হইতেছে। নানাপ্রকার গৃহপালিত পশুপক্ষীর বিষ্ঠা, খৈল, হাড়ের গুঁড়া ব্যতীত আরও কত-প্রকার জিনিস সার-রূপে ব্যবহার হয় তাহার কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। শুষ্ক মৎস্য (fish meal)

২। শুষ্ক রক্ত (dried blood)

৩। চুন বা চুনা পাথরের চূর্ণ

৪। নানাপ্রকারের ফস্ফেট প্রস্তরের চূর্ণ

৫। সোরা, সাধারণ লবণ, জিপসম্

৬। গুয়ানো বা ভারতমহাসাগরের দ্বীপ হইতে আনীত পক্ষীর বিষ্ঠার সার।

বিদেশ হইতে সার আনাইতে হইলে অবশ্য খরচও বেশী লাগে। কিন্তু এইপ্রকার অত্যধিক খরচ দিয়াও সে দেশের কৃষকগণ প্রচুর লাভ করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য কৃষক ও কৃষি-সমবায়।

সমবায় সমিতির সাহায্যে পাশ্চাত্য কৃষকগণের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগকে আমাদের দেশীয় চাষাদের মত পরিশ্রমলব্ধ ফসল মধ্যবর্ত্তী পাইকার বা মহাজনদের হাতে তুলিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয় না। সমবায় প্রণালী অনুসৃত হওয়ায় লাভের প্রায় সমস্ত অংশের মালীকই কৃষকগণ হইয়া থাকে।

আর আমাদের দেশের কৃষক তাঁতি ও জেলেদের পরিশ্রমের লাভ প্রায় সমস্তই ফড়িয়ারা গ্রাস করিয়া থাকে। এদেশেও কোন কোন কৃষি-সমবায়-সমিতি প্রচুর লাভবান হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় নওগাঁ সমবায় সমিতি (রাজসাহী) এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা লাভ করিয়াছে এবং এই লভ্যাংশ হইতে প্রায় ১৮ হাজার টাকা নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে সমবায় নীতিতে যে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা Co-operation in Many Lands by Smith Gordons এবং Co-operation in Danish Agriculture by Harold Faber (Longmans) পড়িয়া দেখিবেন।

আমাদের কর্ত্তব্য।

উপরোক্তরূপ উন্নতি ইউরোপের স্বাভাবিক অনুর্ব্বর ভূমিতে শীতপ্রধান দেশে করা যদি সম্ভবপর হয় তবে উহা স্বাভাবিক উর্ব্বর বাঙ্গালাদেশে করা আরও সহজসাধ্য। আমাদের দেশেও উৎকৃষ্ট প্রণালীর চাষ, সমধিক চাষের সার ব্যবহার ও সমবায় নীতির প্রচলনের দ্বারা যে কৃষিব্যবসায়ে অধিক লাভ হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের দেশেও ভিটি জমিতে আখ আলু চীনাবাদাম কার্পাসের চাষ করিয়া, পুকুরপাড়ে ও বাড়ীর চারিদিকে আম লিচু নারিকেল পেঁপে কলা প্রভৃতি ফলের আবাদ করিয়া, পুকুরে মাছ ও ডোবায় হাঁস পুষিয়া যে লাভ হয় তাহা কি ঘৃণিত কেরাণী-গিরির অপেক্ষা কম? ঘরের ভাত, গোয়ালের দুধ, পুকুরের মাছ এবং বাগানের তরকারী পাইলে বাঙ্গালীর লুপ্ত স্বাস্থ্য, উৎসাহ ও আনন্দ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কে একাজ করিবে? দেশের দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকগণের দ্বারা প্রথমে এসকল অনুষ্ঠানের আশা আমরা কিছুতেই করিতে পারি না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেও শিক্ষিতসম্প্রদায়কেই একাজে আগে নামিতে হইবে। শিক্ষিতেরা পূর্ব্বে করিয়া দেখাইবেন, কৃষকেরা পরে অনুসরণ করিবে, নতুবা কেবল কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না। বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক যদি চাকুরীর নেশা, সহরের নেশা, ট্রাম, মোটর, বায়োস্কোপ ও বিলাসিতার নেশা পরিত্যাগ করিয়া পল্লীসংস্কারের জন্য পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীতে বসেন এবং মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া উন্নত প্রণালীতে কৃষি ও সঙ্গে-সঙ্গে পল্লীর শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা করেন, তবেই একাজ হইতে পারে। কেবল প্রচারের উদ্দেশ্যে ২।১ দিনের জন্য সহরের আরাম-আসন ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ে আসিয়া বক্তৃতা দিলে কিছুই হইবে না। শতাধিক বৎসরেরও অধিক ধরিয়া পল্লীগ্রামগুলির যে ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে উহার সংস্কারের জন্য জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সহরের হৃদয়হীন কৃত্রিম জীবনের মধ্যে নিজের মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন করিয়া না দিয়া যদি আমরা এইরূপে "ঘরমুখো" হইতে পারি তবে আমাদের পল্লীমাতা পুনরায় শস্যসম্পদশালিনী হইয়া উঠিবেন এবং আমরাও প্রকৃত মানুষ হইতে পারিব। যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের পল্লীজীবনের উন্নতির ধারা জানিতে চাহেন তাঁহারা এই বহিগুলি অবশ্য দেখিবেন—

1. Country Life Movement in the United States by Bailey (Macmillan)

2. Rural Denmark and Its Lessons by Sir Rider Haggard (Longmans)

3. Land and Labour by B. S. Rowntree (Macmillan)

4. The New Earth by W. S. Harwood (Macmillan)

5. Fields, Factories and Workshops by Prince Kropotkin (Nelson)

6. The Rural Life Problem of the United States by Sir Horace Plunkett (Macmillan)

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।

ষড়্‌ঋতু

রোদ্দুর কাঠ-ফাটা,
পিপাসায় দীর্ণ
খাল বিল শুক্‌না,
গাছ-লতা জীর্ণ!
বালু উড়ে চারদিক,
আঁখি রোষে সূর্য্য,
কে ঘোষিল হুঙ্কারে
ধ্বংসেরই তূর্য্য!

কোথা থেকে মেঘ এল
ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি,
চারধার ঠাণ্ডা,
শ্যামলিত দৃষ্টি!
আজি প্রাণ মুগ্ধ
বাদলের ছন্দে,
নেই কোনো তৃষ্ণা
ভিজা-মাটি গন্ধে!

কোথাকার বাতাসেতে
মেঘ হ'ল লুপ্ত,
শেফালিকা কণ্ঠে
কার মা সুপ্ত!
পুলকিত শরতে
আলোকের পুঞ্জ,
হাসি আর গুঞ্জনে
মুখরিত কুঞ্জ!

মাঠে মাঠে ধান এল
হরিতের সজ্জা,
দাঁড়ায়েছে কোন্ দেবী
কুণ্ঠিত-লজ্জা!
ঘরে ঘরে প্রেম আর
সোহাগের বন্যা,
দাস-দাসী-মাতা-পিতা
ভাই-বোন-কন্যা!

হিম-ভরা কুয়াসায়
হাড় নড়া কম্প,
লেপ গায় ঠক্ ঠক্,
বিছানায় ঝম্প!
জড়ীভূত গাছ-পালা
নর নারী দেশটা,
শীতজ্বালা নিবারিতে
গরীবের চেষ্টা।

ঝরাপাতা, সবুজের
সুনবীন কান্তি,
হাসির ঐ ঝরনা
সুনিবিড় শান্তি!
বন-ভূমি সুশোভিত,
কুহু-রত পক্ষী,
ফুল-ভারে অবনত
বসন্ত-লক্ষ্মী!

শ্রীনীহারিকা দেবী।

পাটের চাষ

আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মনীষীগণ এখন কর্ম্মযোগে লিপ্ত হইতেছেন। বক্তৃতার সময় অতীত হইয়াছে এবং কর্ম্মের সময় আসিয়াছে। দেশের উন্নতির জন্য আমাদের কোন্ পথ ধরিতে হইবে নেতৃগণ এতদিন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মুষ্টিমেয় কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া উন্নতির পথ খুঁজিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিলেন। হঠাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহারা কোথায় কোন অপরিচিত স্থানে ঘর বাড়ী আত্মীয়-স্বগণ ছাড়িয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাই এখন তাঁহারা আত্মীয়গণের সন্ধানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবং উন্নতির পথে সবান্ধবে চলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমাদের স্বগণের শতকরা ৮৫ জন কৃষক। নেতৃগণ তাহাদের সন্ধান করেন নাই। এখন মোহ ভাঙ্গিয়াছে এবং ভারতের সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়াছে যে সমাজের এই কৃষকসম্প্রদায়কে ছাড়িয়া কোন উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে না। নেতৃগণ বুঝিয়াছেন যে এই অসংখ্য কৃষকের উন্নতির উপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য তাহারা কৃষি ও কৃষকের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করেন এবং কৃষকদিগকে উপযুক্ত উপদেশ দেন। কৃষকগণ উন্নত কৃষি-যন্ত্র ও প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। কোন্ স্থলে কোন্ যন্ত্র, কোন্ সার ও কোন্ ফসল লাভজনক হইবে, তৎসম্বন্ধে নেতৃগণ সর্ব্বত্র কৃষিসমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকদিগকে উপদেশ দিবেন। কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা যে শোচনীয় তাহা আমাকে বলিতে হইবে না। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বত্র বহুবার ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি ও জানিয়াছি এবং নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে এতদ্দেশীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গদেশীয় কৃষক অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহার কারণ, তাহাদের পাটের চাষ। ভারতবর্ষের অন্যত্র পাট জন্মে না, কেবল বঙ্গদেশে জন্মে। পাট ফসল অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাট ফসল ধানের ন্যায় অনাবৃষ্টির সময়ে একেবারে বিনষ্ট হয় না, বা অতিবৃষ্টি বা বন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। দুর্ব্বৎসরেও পাট হইতে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। সুতরাং পাট কৃষকের অতি প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। বহুবার বহুব্যক্তি তাহাদিগকে পাট চাষ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিজ্ঞ কৃষকগণ কৃষি-অনভিজ্ঞ নেতার কথায় কান নাই দেন। ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং কৃষকদিগকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে নেতৃগণ অবশ্য অবশ্য কৃষির অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইবেন।

বঙ্গদেশীয় কৃষকের অবস্থা অন্যস্থানের কৃষকের অবস্থা অপেক্ষা উন্নত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ঠিক বর্ত্তমান সময়ে এই কথা খাটে না। আমি এইবার স্বচক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের পাটের দেশ ও পাটের চাষী দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা মহাজনের ঋণে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ ইউরোপের মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বাণিজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে মোটামুটি প্রায় ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ বেল (৫ মণে এক বেল) বিদেশে রপ্তানি হইত। ইউরোপের রপ্তানি একার্দ্ধ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে পাটের দরও অর্দ্ধেক পরিমাণে কমিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণ পাটের দর ছিল ১০৲ টাকা মণ, এখন ৫৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা। কৃষকগণ যে দর পাইয়া থাকেন আমি সেই দরের কথাই বলিতেছি। এক বৎসর অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসর কৃষকগণ ৩৲ টাকা মণ দরেও পাট বিক্রয় করিতে পারেন নাই। পাটের মূল্য ও রপ্তানি হ্রাস হওয়ায় বঙ্গদেশ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারিবে।

রপ্তানি পাটের মূল্য

১৯১৩—১৪	৩০, ৮২, ৬৫, ০০০ টাকা
১৯১৪ ১৫	১৩, ৯১, ০২, ০০০ ,,
১৯১৫—১৬	১৫, ৬৪, ২০, ০০০ ,,
১৯১৬—১৭	১৬, ২৮, ৮০, ৫০০ ,,
১৯১৭—১৮	৬, ৪৫, ৩৭, ৪০০ ,,
১৯১৮—১৯	১২, ৬২, ০০, ০০০ ,,

পাটের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলিয়া যে পাটে প্রস্তুত চট্ কিম্বা থলিয়ার দর কমিয়াছে তাহা কেহ মনে করিবেন না।

পাটের কৃষকদিগের কোন সভাসমিতি বা জোট নাই। কিন্তু কলের অধিকারীদিগের খুব মজবুত সভাসমিতি বা জোট আছে। তজ্জন্য তাঁহারা সস্তায় পাট খরিদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং অনেক অতিরিক্ত মূল্যে চট্ ও থলি বিক্রয় করিয়া অসম্ভবরূপে লাভবান হইয়াছেন। তাঁহাদের লাভের পরিমাণ নিম্নস্থ তালিকা পাঠে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

চট ও থলির রপ্তানির মূল্য।

১৯১৩—১৪	[illegible]	টাকা
১৯১৪—১৫	২৩,৮১,৯৫,০০০	,,
১৯১৫—১৬	৩৮,৯৭,৭০,০০০	,,
১৯১৬—১৭	৪১,৬৭,১৫,০০০	,,
১৯১৭—১৮	৪২,৮৪,৩০,০০০	,,
১৯১৮—১৯	৫২,৬৫,১৫,০০০	,,

কোন কালে একাকী কোন বৃহৎ কার্য্য সমাধা করা যায় নাই। একতার বলে পাটকলের অংশীদারগণ প্রভূত লাভবান হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা শরীরের রক্ত জল করিয়া পাট উৎপন্ন করিল তাহাদের ভাগ্যে, একতার অভাবে, কেবল উপর্য্যুপরি লোকসান ও দারিদ্র্যের আধিক্য। এখন ধীরচিত্তে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি খবরের কাগজে পড়িয়াছি যে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি কৃষকদিগকে পাট চাষ করিতে নিষেধ করিয়াছেন অথবা ইহার চাষ হ্রাস করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এই উপদেশ সমীচীন বলিয়া আমার মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ ও ইউরোপ প্রভৃতি দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন। এই বঙ্গদেশের পাটকলের অধ্যক্ষগণ প্রায় ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিয়া থাকেন। এই ৬০ লক্ষ বেল উৎপন্ন করিতে হইলেও ২০ লক্ষ একরে (৩ বিঘায় এক একর) পাটের চাষ করা প্রয়োজন। গত বৎসরে ২৫ লক্ষ একরে পাটের চাষ হইয়াছে। সাধারণভাবে জন্মিলে এই ২৫ লক্ষ একর জমী হইতে ৭৫ লক্ষ গাঁইট (বেল) পাট উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের জন্য বৎসরে প্রায় ৯০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন। সুতরাং ৩০ লক্ষ একরে পাট বুনিলেও অতিরিক্ত হয় মনে করি না।

গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্ত্তমান বৎসরে ৬০ লক্ষ গাঁইটের অধিক পাট উৎপন্ন হইবে না। তথাপি পাটের বাজার ঠাণ্ডা ভিন্ন বিশেষ গরম হয় নাই। যতই কম উৎপন্ন হউক না কেন পাটের বাজার ধনী ক্রেতাদের মুষ্টির ভিতরে বদ্ধ। ইহার কারণ এই যে দরিদ্র প্রজা অধিকদিন পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। অন্যদিকে, পাটের কলে সাধারণতঃ ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পাট সঞ্চিত থাকে। সুতরাং পাটকলের পরিচালকগণ ছয় মাসের মধ্যে পাট খরিদ না করিলেও তাহাদিগকে পাটের কলের কাজ বন্ধ করিতে হইবে না। ক্রেতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। কৃষকগণের সমবেত যত্নে কৃষিসমিতি ও কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিলে দশবৎসরের মধ্যে কৃষকগণ শক্তিশালী হইতে পারিবেন। পাটের চাষ কম করিয়া পাটের দাম অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিলেও কি আমাদের মঙ্গল হইবে? চিন্তা না করিয়া দেখিলে মনে হয় যে কম জিনিষে অধিক দর পাইলেই তো আমাদের লাভ। কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝিবেন যে অত্যধিক মূল্যে পাট বিক্রয় হইলে পাটের শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য অন্যদেশে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। পাটের প্রস্তুত দ্রব্য অন্য সূত্র দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে পাটের বাজার চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, পাটকল বন্ধ হইবে। জাভায় পাটের মত একপ্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। ব্রাজিলেও পাকো পাকো নামক একপ্রকার পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু তথায় পাটের ন্যায় স্বল্পব্যয়ে এইসকল ফসল উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই পৃথিবীতেই পাটের একাধিপত্য। একাধিপত্য পাটের বাণিজ্য কি আপনারা কেহ বিনাশ করিতে চান?—না তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে আমরা অবশ্যই দেখিব যে পাটের চাষে যাহাতে আমাদের কৃষকের লাভ হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি মণ পাট উৎপন্ন করিতে ৩৸০ খরচ হইত, বর্ত্তমান সময়ে ৫৸০ খরচ হয়। ইহার উপরে লাভ রাখিতে হইবে। প্রতিমণে কৃষকগণ যদি ৯৲ টাকা পান তবেই আমি যথেষ্ট মনে করি। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষকগণ তাহা পাইতেছেন না। কলিকাতায় যে পাটের দর থাকে কৃষকগণ তাহার অনেক কম পায়, কারণ পাট বহু মধ্যবর্ত্তী লোকদ্বারা ক্রয় বিক্রয় হয়;—যথা গ্রাম্য মহাজন

ফড়িয়া প্রভৃতি। তাহারা বাজার অপেক্ষা অনেক কমদর পায় এমন নহে, ফড়িয়াগণ ওজনেও তাহাদিগকে অনেক ঠকাইয়া থাকে। মহাজনের সুদ, খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা লোক্সান দিয়া পাট বিক্রয় করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নানাস্থলে ঋণদান-সমিতির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত মূল্যে কৃষকের ফসল বিক্রয় না হইলে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ঋণের সুদ, জমীদারের খাজনা ও পুত্রকন্যার অন্নবস্ত্রের জন্য যখন চাপ পড়ে, তখন তাহারা লাভ লোক্সান হিসাব করিতে পারে না, যা ক্রেতা বলিবে তাহাতেই তাহার ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় কৃষকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে কৃষক ও নেতার সমবেত চেষ্টায় প্রতি পল্লীতে প্রতি বন্দর ও সহরে কৃষকসমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকদিগের জন্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে কৃষকদিগকে বিনা সুদে বা অতি অল্প সুদে ঋণ দিতে হইবে। আমার মনে হয় কৃষকগণ তাহাদের মূলধন স্থাপন করিতে সক্ষম। আমার প্রস্তাব এই যে প্রত্যেক কৃষক তাহার বিক্রয়ের টাকায় এক আনা কৃষিসমিতি জমা রাখিবেন। এবং প্রয়োজন-মত তাহারা তাহাদের জমার শতকরা ৮০ টাকা ঋণ পাইবেন। সুদের টাকার কিয়দংশ মাত্র সমিতি পরিচালনের জন্য ব্যয়িত হইবে। দশবৎসর পরে এই মূলধন এক বৃহৎ আকার ধারণ করিবে। কৃষকের দারিদ্র্য দূর হইবে। ইহার আয় হইতে কৃষি-উন্নতির কৃষি-শিক্ষার স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ হিতকারী কার্য্য সাধন হইবে। বর্ত্তমানে কৃষকগণ বিনীতবদনে ক্রেতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকে। যদি তাহাদের মূলধনের ব্যবস্থা হয় তবে ক্রেতাই তাহাদের সমিতির দ্বারে বিনীত মস্তকে তাহাদের ফসলের জন্য উপস্থিত হইবেন। প্রত্যেক কৃষক পল্লীসমিতির চালক হইবেন।

যদি নেতাগণ দেশের সেবায় বদ্ধপরিকর হন তবে এই প্রস্তাব অসম্ভব হইবে না। স্বরাজ্যের ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রস্তাবই অধিক ফলপ্রদ হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। গবর্ণমেণ্টও ইহাতে নানারূপে সাহায্য করিবেন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

শিক্ষা ও সেবা

শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করে। কেবল সন্তানকে খাওয়া পরা দেওয়া পিতার কার্য্য নয়, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ। রঘুবংশে এক জায়গায় আছে—

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষনাদ্ভরণাদপি
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

কিন্তু শিক্ষা বল্‌তে গেলে জগতের নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনকে বুঝায়; তর্কশাস্ত্রের কূট প্রশ্নের সমাধান করা নয়, যেসব অসার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শুধু কেবল অমূল্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। কিরূপে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপকর্ষ ঘটেছে তা আমি আমার 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশদভাবে দেখিয়েছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষার কথা উঠ্‌লেই অনেকে হয়তো দর্শন উপনিষদের কথা তুল্‌বেন। অতীতের গৌরব-কাহিনী নিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়; তাহার প্রতিকারসাধনকল্পে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করা চাই। আমরা সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, ভিটেমাটি বিকিয়ে যেতে বসেছে, এখন শুধু আমরা অমুক রাজা-উজিরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের কাছে অসার আভিজাত্য গৌরব রক্ষায় যত্নবান হলে কিছু ফল হবে না। অতীতের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমাদের জড়ভরত হলে চল্‌বে না; আলস্য পরিত্যাগ কর্‌তেই হবে। সারা জগৎ যখন কর্ম্মে ব্যাপৃত তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আমাদের সাজে কি? বাঙ্গালী জাতিও মানুষ, আমাদেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আছে, কেবল যথাযথ অনুশীলন অভাবে আমরা

জগতের কাছে হেয় নগণ্য ও সকলের নিম্নে অবস্থিত। কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এদের সমস্ত গুণই আছে, কেবল সেইগুলির যথাযথ অনুশীলন করাবার জন্য তাদের মধ্যে একজন ঠিকমত চালকের দরকার।"

ডাঃ মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার ছাত্রেরা, আমা অপেক্ষা ন্যূন নন। এত অল্প বয়সে তাঁরা যে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন এতে আমার প্রাণ যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। জার্ম্মানিতে পৌছালে বড় বড় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপভাবে তাঁদের সংবর্দ্ধনা করেন তা তাঁদের লিখিত চিঠি হতে বিশেষভাবে অবগত হয়েছি। নিউটনের 'ল অফ্ গ্র্যাভিটেশনের' মত 'ঘোষের ল' বলে একটা নিয়ম জগতে শীঘ্রই প্রচারিত হবে। তা এখন জার্ম্মানভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারপর জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লণ্ডনে ফ্যারাডে সোসাইটীতে পঠিত হলে তথাকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেকে মনে করতে পারেন যে এপ্রকার কৃতিত্ব লাভ কেবল ইউরোপের জলহাওয়ার গুণে হয়েছে; কিন্তু তা নয়; তাঁরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে বিদেশে গিয়েছেন, বাংলার জল-হাওয়ায় তাঁরা মানুষ হয়েছেন। যখন তাঁরা কলিকাতায় ছিলেন, এখানকার সায়ান্স কলেজের নাম দিয়ে লণ্ডন ও আমেরিকার বিখ্যাত বিখ্যাত মাসিকপত্রে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরও মস্তিষ্ক আছে, তারা শুধু পরের চিন্তিত বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করে না, স্বাধীনভাবে ভাবতেও জানে।

যাক্, এখন সেবা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি। সেবার কথা উঠ্‌লেই আমাদের সময়কার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। আমাদের সময় দেখেছি যদি কোন ছাত্র ছাত্রাবাসে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হত তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ করত, কিম্বা মেথর-মুদ্দফরাসের জিম্মায় তাকে হাঁসপাতালে বাস করতে হত। আর এখনকার ছাত্রেরা পীড়িতের সেবার্থে পালা করে রাত্রি যাপন করে, বন্যা-পীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতে শিখেছে। এসব দৃশ্য দেখ্‌লে সত্যই প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হয়। সেইসব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে ইচ্ছা হয়।

আজকাল একটা সুর উঠেছে ইউরোপের যা কিছু সবই পরিত্যাজ্য। কথাটা একটু তলিয়ে বুঝ্‌লেই আমাদের ভুলটা ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখ্‌তে পাই যা আমাদের সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লণ্ডন সহরে ৬০।৭০টি হাঁস্‌পাতাল আছে; সবগুলিই দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কলিকাতায় ত মোটে ছয়টি কি সাতটি হাঁসপাতাল, তাও আবার গভর্ণমেণ্টের সাহায্য (State grant) দ্বারা চলে। আমাদের দেশে কত অনাথ বালক প্রতিবৎসরে হয় অকালে বিনষ্ট হচ্ছে, নয় তো পশুর মত জীবন যাপন করছে। লণ্ডনেই তো কয়টা কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুদের আশ্রম রয়েছে (Home for Foundlings)। এদের কেবল পালন করা নয়, যাতে কুপথে না যায় তার জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যাদির দ্বারা এইসব বালকেরা যাতে নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে তারও বিপুল আয়োজন। মূকবধিরদের শিক্ষা দিবার তো কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও সেবাশ্রম আছে। তারপর দেখুন শিলং পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানের কুষ্ঠাশ্রমের কথা—সে সকলগুলিই তো খৃষ্টান মিশনারিদের, ফাদার ডেমিএন্ (Father Damien) সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। কুষ্ঠরোগীরা আমাদেরই জাত ভাই, তাদের সেবার ভার নিলেন বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা। আর আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে হলে তো এক দেওঘরে যোগেন্দ্র বসু প্রভৃতির প্রযত্নে একটি মাত্র কুষ্ঠাশ্রমের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও হাঁস্‌পাতাল বা সেবাশ্রম নাই, বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। আর ওদের প্রায় সবগুলিই Public Charity বা সাধারণের দান দ্বারা পরিচালিত। যখন তাদের অর্থের অনাটন হয়, তখন তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, আর অমনি এক তাড়া অজ্ঞাত হস্তের নোট কিম্বা চেক্ এসে হাজির হয় কিম্বা কোন ছদ্মভিক্ষুকবেশধারী লোক এসে টাকা দিয়ে ছুটে পালায়, পাছে লোকে তার নাম জানতে পারে এই ভয়ে।

এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে অর্থদান করতে আমরা কয়জন শিখেছি আর কয়জনই বা মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি। বিবেকানন্দ ঠিক্ বলেছিলেন—আমাদের এখন একদল সেচ্ছাসেবকের দরকার যারা আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণভরে সকলের ও দেশের সেবা করবে। শ্বেতাঙ্গরা জড়বাদী হোক্, কিন্তু তাদের কাছে শেখবার অনেক জিনিষ আছে। মানুষ যদি মানুষকে প্রেমবন্ধনে না বাঁধলে, যদি তার সেবা করে ধন্য না হল, তবে শুধু প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফল কি? *

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রামধনু

১

পশ্চিমেরি অস্তছটা
পূর্ব্বে রচে ইন্দ্রজাল,
সজল নভে দুলিয়ে দিয়ে
সাতরঙা বনফুলের মাল!
সাত বরণের সাতটি মালা
গাঁথা শোভন সুতায় ঠাস,—
সাজল ভূলোকসীমায় একি
স্বপ্নলোকের তোরণ খাস!

২

সাত বরণের পুষ্পধনুর
আকাশগায়ে নূতন ঢঙ্,—
নীল, বেগুনী, সব্জে, সুপীত,
কমলা, গোলাপ, কুসুমী রঙ্;
হরের কোপে পুষ্পধনু
ভস্ম সে ত অনেকদিন,
তাঁরি কি ঐ ফুলধনুখান
গগন-কোলে দেখ্চি লীন!

৩

নিয়ে মোদের প্রাণ-প্রতিমা
বঙ্গ-মায়ের ধাত্রী রূপ,
ঊর্দ্ধে ঝলে জ্যোতি-স্ফুরণ
তাঁরি বিমল ছটার স্তূপ!
তন্বী শ্যামা দেবীরূপের
বিশ্বে ছুটে সুযশভার—
কোন্ পটুয়া নিখুঁত ক'রে
আঁক্‌চে এ চাল্‌চিত্র মা'র!

৪

ঘোরালো ঐ নভস্তলে
মেঘের প্রাসাদ—সুখের নীড়,
বাতায়নে ছাদের 'পরে
দিগ্‌পালদের লাগ্‌ল ভীড়;
মেঘের কোলে এলিয়ে দেহ
কুলমনে করেন গান,
খেজুরছড়ি বসন উজল
তাঁরাই বুঝি মেলিয়ে যান!

৫

দেবশিশুদের চিনি আমি
সাঝে যাঁরা উড়ান ফাগ্,
আজ্‌কে তাঁদের নূতন খেলা
স্ব-দলে আজ দুইটি ভাগ;
লুকিয়ে তাঁদের চল্‌চে খেলা—
আকাশখানি খেলার মাঠ,
ডুরি নিয়ে টানাটানি
রেশ্‌মী রশির অমল ঠাট।

৬

দেখ্চি শোভা, দেখ্চি ছবি,
উল্লসে মন অকস্মাৎ,
উচ্ছ্বসিত পুলকভরে
হৃদয় আমার হচ্ছে মাত্।
প্রাবৃট আসে ফসল নিয়ে
চাষারা আনন্দে চুপ,
দুখাদের আনন্দ কি গো
রামধনুকের ধবল রূপ!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

* আন্দুল সেবা-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ—শ্রীচারুচন্দ্র [illegible] কর্ত্তৃক লিখিত। শনিবার ৩০শে এপ্রিল ১৯২১।

ভারতবর্ষের সম্পদ

গতবর্ষের সরকারী হিসাবে দেখিতে পাইলাম ভারতীয় খনি-সমূহ হইতে ১৯,৮৪৭,০৬৯ টন্ পাথুরে কয়লা, ৫১৫৭২ টন্ অভ্র, ৪১৫৩৫৭ টন্ ম্যাঙ্গানিজ, ১৯৯১৬ আউন্স সোনা, ২০১০৪ টন্ তামা ও বহুপরিমাণে অন্যান্য খনিজদ্রব্য উঠান হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রায় আটাশমণে এক টন্ হয়। ব্যাপারটা দেখিয়া আমাদের দেশের খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিল।

অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে যাইয়া এখন বিস্ময়াভিভূত হইতেছি; আমার ন্যায় আরও অনেকে বিস্মিত হইবেন মনে করিয়া ভারতের খনিজ ঐশ্বর্য্যের একটু বিবরণ দিলাম। স্বার্থচিন্তার মোহ আমাদের হৃদয়টাকে এমনই অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে নিজের জাতি, নিজের দেশের উন্নতি যে আত্মোন্নতিরই প্রকাশ তাহাও ভুলাইয়া দিয়াছে। দেশের দৌলত দশ জনে মিলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; ভয়, শেষে যদি নিজের স্বার্থচিন্তার ন্যায় অন্যের হৃদয়েও পরের সর্ব্বনাশের চিন্তা লুক্কায়িত থাকে। বিদেশীরা দশে মিলিয়া আমাদেরই সাহায্যে, আমাদেরই পরিশ্রমে আমাদেরই মায়ের ধন কাড়িয়া নিতেছে, আমরাই মাথায় বহিয়া তাদের হাতে সব দিতেছি; কিন্তু জাতভায়ের উন্নতি, সমৃদ্ধি আমাদের হৃদয়ে অসহনীয় শেল।

পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে আর্থিক ও সংঘ-বলে; বর্ত্তমানের জীবনসংগ্রামের যোগ্যতা লাভ করিতে আমাদিগকেও ঐ শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। আর্থিক দৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবন ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে তাহা সকলেই আমরা অনুভব করিতেছি। যে জাতি অর্থাভাবে দু বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, পরিধানে বস্ত্র পায় না, সে জাতির জীবন গঠনের প্রথম উপাদান কি হওয়া উচিত তাহা সহজেই বোধগম্য। আমাদের দেশের অর্থ যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের ভোগ্য না হইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এইজন্য যৌথ ব্যবসায় ও সমবায়ের বিপুল প্রসার প্রয়োজন। এই চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যাহারা আমাদের দেশের প্রাণ, যাহারা আমাদের শক্তির উৎপত্তিস্থল, সেই যুবকবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভের ন্যায় যৌথ ব্যবসায় দ্বারা অর্থার্জ্জন করিয়া জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে। আমাদের ধন আমাদের হাত হইতে পরকে দিতে এবং আমাদের মায়ের ঐশ্বর্য্য হইতে সভ্য দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে।

এবার আমাদের দেশ হইতে ১২০ কোটি টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; শুনিতে খুব ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর বিশ পয়সার মালিকও আমরা নই; কারণ, আমাদের মাল বিদেশীর হাত থেকে বিদেশে যায়, লাভের মালিক তারা; আমাদের লাভ কেবল, এই বলায় যে আমাদের দেশের মাল। বিদেশে যেসকল মাল রপ্তানি হয় তার মধ্যে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ খুব বেশী; কিন্তু এই খনিজ দ্রব্যের খোঁজ খবর অনেকেই রাখেন না। এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যরাশি ইংরেজ বণিকগণ প্রায় একচেটিয়াভাবে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া ব্যবসায় চালাইতেছে এবং তাহা হইতে তাহারা যে অর্থ লাভ করিতেছে তাহা চিন্তাদ্বারাও আমরা অনুমান করিতে পারি না।

বাংলার জমীদারগণ পৈতৃক সম্পত্তি বাঁধা রাখিয়া গভর্ণমেণ্টের খেতাবলাভের জন্য চৌদ্দ পুরুষের বাস্তভিটা ছাড়িয়া রাজকর্ম্মচারীদের পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ান; কিন্তু ব্যবসায় করিতে গেলেই তাঁহাদের আভিজাত্যের বিষম মানহানি হয়। তাঁহাদের চেষ্টায় দেশের কত মঙ্গল হইতে পারে তাহা একটুও চিন্তা করেন না, তাঁহাদের অবসর-জীবনের উৎসাহদৃষ্টি যদি এই ব্যবসায়টির প্রতি পতিত হয়, তবে তাঁহারা অনেক অর্থ দেশে রাখিতে পারেন।

আমাদের দেশের খনিজ দ্রব্য কোথায় কোন্টি কি পরিমাণে পাওয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের ব্যবসায়-উদ্যোগী দেশবাসীদের জন্য লিখিলাম।

১। পাথুরে কয়লা (Coal)

আসাম—লক্ষীপুর, নাগাপাহাড়, শিবসাগর। প্রকাশিত পরিমাণ—২৯৩,৮৭৫ টন্।

বেলুচিস্তান—কালাত, লোরালাই, কোয়েটা-নিশিন্, শবি খোষ্ট। প্রকাশিত পরিমাণ ৪৩১২৫ টন্।

বাংলা—বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জ, বীরভূম, বর্দ্ধমান। প্রকাশিত পরিমাণ ৫৩০২২৯৫ টন্।

বিহার ও উড়িষ্যা—হাজারিবাগ (বোকারু-রামগড়, গিরিধি, ঝরিয়া); মানভূম (ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, পালামৌ, ড্যাল্টনগঞ্জ, সম্বলপুর, হিঙ্গির-রামপুর); সাঁওতালপরগণা জৈন্তি, রাণীগঞ্জ)। প্রকাশিত পরিমাণ ১৩৬৭৫৬১৬ টন্।

পাঞ্জাব—ঝেলাম, মিয়ানোয়ালি, সাহপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ৫০৪১৮ টন্।

২। Mica বা অভ্র।

বিহার ও উড়িষ্যা—ভাগলপুর, গয়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মুঙ্গের, সম্বলপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ৪৪২২০ হন্দর।

মাদ্রাজ—নেলোর, সালেম। প্রকাশিত পরিমাণ ৬৩৬৮ হন্দর।

রাজপুতানা—আজমীর, মাড়োয়ার, নসিরাবাদ। প্রকাশিত পরিমাণ ৯৬৪ হন্দর।

৩। Managanese মেঙ্গানিজ্।

বোম্বাই—পাঁচমহল। প্রকাশিত পরিমাণ ৩০৮৯৩ টন্।

মধ্যপ্রদেশ—বালাঘাট, ভাণ্ডারা, সিন্দ্ওারা, নাগপুর। ...২২৩৪ টন্।

মাদ্রাজ—ভিজাগাপট্টম্। প্রকাশিত পরিমাণ ২২৩০ টন্।

৪। Limestone চুনের পাথর বা ঘুটিং।

মধ্যপ্রদেশ—বিলাসপুর, জব্বলপুর, কাস্তি। প্রকাশিত পরিমাণ ১৩০৪৫ টন্।

পাঞ্জাব—হোশিয়ারপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ১০০০ টন্।

৫। Salt সৈন্ধবলবণ।

পাঞ্জাব—ঝেলাম, মিয়ানুওয়ালি, সাহপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ১০৯০৮ টন্।

৬। Gems মণিমাণিক্য।

ব্রহ্মদেশ—মোগক—চুনী ১০১৬৩৭ ক্যারাট (১ ক্যারাট প্রায় ২ রতি); নীলা ৩৪৯৪৯ ক্যারাট; স্পিনেল ২৭৫২৯

৭। Slate শ্লেট্।

বিহার ও উড়িষ্যা—মুঙ্গের। প্রকাশিত পরিমাণ ১৮২১ টন্।

পাঞ্জাব—গুরুদাসপুর, গুরগাঁও, কাংড়া। প্রকাশিত পরিমাণ ৮১১৪ টন্।

৮। Gold স্বর্ণ।

বিহার ও উড়িষ্যা—সিংহভূম। প্রকাশিত পরিমাণ ২০৮৫ আউন্স।

মাদ্রাজ—অনন্তপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ১৭৮৩১ আউন্স।

৯। Iron ore লৌহ।

বিহার ও উড়িষ্যা। সিংহভূম। প্রকাশিত পরিমাণ ১১৫০৮৫ টন্।

মধ্য প্রদেশ—জব্বলপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ৮০২ টন্।

রাজপুতানা—আজমীর, মাড়োয়ার। প্রকাশিত পরিমাণ ৩ টন্।

১০। Wolfram ওল্ফ্রাম্।

বিহার ও উড়িষ্যা—সিংহভূম। প্রকাশিত পরিমাণ ৫১ হন্দর।

ব্রহ্মদেশ—মারগুই, টেভয়, থেটন্। যথাক্রমে প্রকাশিত পরিমাণ ৩৯২৮; ৬৬৩৮০; ১৮৩০ হন্দর।

১১। Magnesite ম্যাগনেসাইট্।

মাদ্রাজ—সালেম। প্রকাশিত পরিমাণ ৫৭৭৩ টন্।

১২। Chromite ক্রোমাইট্।

বেলুচিস্থান—কোয়েটা-নিশিন্, ঝোব। ১০৪০ ও ৪৫৭৮৩০ হন্দর।

১৩। Copper ore তাম।

বিহার ও উড়িষ্যা—সিংহভূম। প্রকাশিত পরিমাণ ৩৬১৯ টন্।

ব্রহ্মদেশ—নিম্ন ঝিন্ডিন্।

মধ্যপ্রদেশ—বালাঘাট।

১৪। Bauxite বক্সাইট্।

মধ্যপ্রদেশ—জব্বলপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ২৩৮৪০ হন্দর।

১৫। Clay চীনামাটী।

বিহার ও উড়িষ্যা—মানভূম, পালামৌ। প্রকাশিত

মধ্যপ্রদেশ—জব্বলপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ৫৮৩৫৭ টন্।

দিল্লী—দিল্লী। প্রকাশিত পরিমাণ ২৫৩৬ টন্।

১৬। Galena গ্যালেনা।

মধ্যপ্রদেশ—দ্রুগ। প্রকাশিত পরিমাণ ৬০ হন্দর।

১৭। Tin টিন্।

ব্রহ্মদেশ—মার্গুই, টেভয়, থেটন। যথাক্রমে প্রকাশিত পরিমাণ ৫৫৯ টন্, ১০৩০৭ টন্, ও ১১৫৭ টন্।

১৮। Steatite ষ্টিয়াটাইট্।

মধ্যপ্রদেশ-জব্বলপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ৬০৯১৭ হন্দর।

মাদ্রাজ—কুর্নুল্। প্রকাশিত পরিমাণ ২০২ হন্দর।

১৯। Fuller's Earth রজকমৃত্তিকা।

মধ্যপ্রদেশ—জব্বলপুর। ২১৮ টন্ (ইহা ঘুটিংএর খনিতে পাওয়া যায়)।

২০। Silver রৌপ্য।

মাদ্রাজ-অনন্তপুর। প্রকাশিত পরিমাণ ১১৬৯ আউন্স (সোনার খনিতে প্রাপ্য)।

২১। Samarskite সামারস্কাইট্।

মাদ্রাজ—নেলোর। ১৷৷০ হন্দর (অভ্র-খনিতে প্রাপ্য)।

২২। Graphite গ্রাফাইট।

রাজপুতনা—আজমীর, মাড়োয়ার। প্রকাশিত পরিমাণ ২০ হন্দর।

২৩। Ochre গিরিমাটী।

বিহার ও উড়িষ্যা—পুরী। ৯৩ টন্।

২৪। Molybdentite মোলিবডেন্টাইট্।

ব্রহ্মদেশ—টেভয়। প্রকাশিত পরিমাণ ৪ হন্দর।

২৫। Barytes ব্যারাইটস্।

মাদ্রাজ—কুর্নুল্। প্রকাশিত পরিমাণ ২৪০০০ হন্দর।

২৬। Apatite আপেটাইট।

বিহার ও উড়িষ্যা—সিংহভূম। প্রকাশিত পরিমাণ ৫১০০ টন্।

২৭। Potash পটাস্।

পাঞ্জাব—ঝেলাম। প্রকাশিত পরিমাণ ১৩৫ টন্ (সৈন্ধব লবণের খনিতে প্রাপ্য)।

এক-একটা কোম্পানী খুলিয়া ইংরেজগণ যে বিরাটভাবে কাজ করিতেছে তাহা দেখিলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের অলসতাবিজড়িত নয়ন কবিতাময় স্বপ্নের দেশ ছাড়িয়া বাস্তব রাজ্যের দৃশ্য দেখিতে বড়ই কাতর।

বড় আশা হইতেছে, এবার আমাদের শুভদিন আসিয়াছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম আমাদের হৃদয়ে একটা জাগরণের প্রবাহ আনিয়া দিয়াছে। আমাদের আজ অন্ন-সমস্যা উপস্থিত, অন্নচিন্তায় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, কবির কবিত্ব লুপ্ত হয়, আর আমাদের অলসতার নিদ্রা কি যাইবে না? অলসের অলসতা থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ সে এক মুঠা অন্ন পায়; কিন্তু আমাদের তো আর একমুঠা অন্নেরও সংস্থান নাই, তবুও কি এদেশ জাগিবে না?

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ঝড়ে

আজকে ঝড়ে আমার গায়ে
উঠ্‌চে যে রোমাঞ্চ,—
নৃত্য ক'রে ফির্‌চে হেথা
তাণ্ডবে প্রেত পঞ্চ!
যে-ফুল ভোরে উঠ্‌বে ফুটে,
পাপড়ি-ভাঙা কাদায় লুটে,
তরুনঞ মালঞ্চ মোর,
ভাঙ্‌ল লতার মঞ্চ!

চূর্ণ দোলে, ঘূর্ণী ওড়ে,
লুট্‌চে বকুল শাখা,
ভূঁয়ে পড়ে' কদলীসার
দলিত,—ধূলি-মাখা;
মাতল গো ঝড়, ভাঙ্‌চে যে বুক,
তবু প্রাণে নাইক অসুখ,—
ঝঞ্ঝামাঝেই অশান্ত-প্রাণ
দুঃখনিশি বঞ্চ।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।



দেশ-বিদেশের কথা

অ্যাঙ্গোরা

ধন্য এই মুসলমান বীর মুস্তাফা কামাল! তুরস্ক সাম্রাজ্য যখন বিধ্বস্তপ্রায়, জনবল ও ধনবল যখন একেবারে নাই বলিলেই হয়, যখন তুরস্কের ভাগ্যনিয়ন্তা মন্ত্রীবর্গ মিত্রশক্তিপুঞ্জের পদানত, তখন জনকয়েক স্বদেশপ্রেমিক তুরস্কবীর এসিয়া-মাইনরের অ্যাঙ্গোরা অঞ্চলে আস্তানা স্থাপন করিয়া নিজেদের তুরস্করাজ্যের প্রকৃত পরিচালক বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সেভার্স সন্ধি অস্বীকার করিয়া তুরস্কের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইউরোপের রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা তুর্কীর এই নূতন জাগরণকে বড় ভাল চক্ষে দেখিতে লাগিলেন না এবং প্রত্যক্ষভাবে না হৌক পরোক্ষে এই জাতীয়দলের বিনাশসাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। গ্রীস সুযোগ বুঝিয়া অন্যায় করিয়া এসিয়া-মাইনরের ভিতরে অভিযান আরম্ভ করিলেন; ইংরেজ শাসনকর্তারা তাহাতে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক বরং খুসী হইয়া উঠিলেন, ভিতরে ভিতরে গ্রীকদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল; কিন্তু ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতায় সে অভিপ্রায়ে বাধা পড়ে। কামাল যে গ্রীক সেনাদলকে যুদ্ধে হারাইয়া একেবারে সমূলে উৎখাত করিয়াছেন সে সংবাদ গতবারেই প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর তিনি রাশিয়া, আজারবৈজান, জর্জ্জিয়া, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের সহিত অ্যাঙ্গোরার একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই সন্ধিপত্রের সকল সর্ত্ত এখনও জানা যায় নাই; তবে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে একটি প্রবল শক্তিশালী মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। সিরিয়ার হাই-কমিশনার বিখ্যাত ফরাসী সেনানায়ক জেনারেল পেঁস্ বলেন, "ইউরোপের পুরাতন রাজনৈতিক মতানুসারে মুসলমানগণ কখনও খৃষ্টানদিগের সমান অধিকার লাভ করিতে পারিত না। ফ্রান্স এতদিন পরে এই পুরাতন অন্যায় নীতি পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।" ফ্রান্স জাতিসমূহের সঙ্ঘের তরফ হইতে সিরিয়া ও সিলিসিয়ার (Cilisia) ম্যাণ্ডেট বা খবরদারী প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এই সন্ধি অনুসারে তুর্কিকে সিলিসিয়া প্রত্যর্পণ করিতে ফ্রান্স অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। থ্রেস ও আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ যাহাতে তুর্কি গ্রীসের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন তাহার সাহায্য করিতেও ফ্রান্স স্বীকার পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রয়োজন হইলে তুরস্কের পক্ষ হইয়া আমির ফইজলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে এবং জাতীয়দলকে যুদ্ধোপকরণের মালমসলা সরবরাহ করিতেও ফরাসী জাতি প্রস্তুত আছেন। জাতীয়দলের সৈন্যদলকে সামরিক কৌশল শিখাইতে একদল উপযুক্ত শিক্ষক পাঠাইবার বন্দোবস্তও ফ্রান্স করিবেন। ফ্রান্স এই-সকলের বদলে এসিয়া মাইনরের হারচিট উপত্যকায় রৌপ্য ও লৌহ খনি-সকল চালাইবার অধিকার পাইবেন। কিন্তু এই-সকল খনি পরিচালনে যে মূলধন প্রয়োজন হইবে তাহার অর্দ্ধেক তুর্কিদিগের থাকিবে। এই সন্ধিসর্ত্তে ইংরেজের আপত্তি দেখা যাইতেছে। ইংরেজ মন্ত্রীসভা আট-পৃষ্ঠাব্যাপী এক আপত্তিপত্র ফরাসী দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া উঠিলে ইংরেজ রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য পাছে পণ্ড হইয়া যায় তজ্জন্য ইহার ভাষা ও বাঁধুনি যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের প্রধান আপত্তির কারণ হইতেছে এই যে, ঠিক যে সময়ে ইংরেজ-রাজ তুরস্কের সহিত গ্রীসের বিবাদ গ্রীসের মান ও প্রতিপত্তি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ফরাসী প্রাচ্য-ভূখণ্ডে নিজের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইলেন না, স্মার্ণা ও থ্রেস হইতে গ্রীসেরও উৎখাতের পথ সুগম করিয়া দিলেন। তুর্কী জাতীয়দলের এই অপ্রত্যাশিত বাহুবল বিস্তারের সঙ্গে আরবে ও মেসপোটেমিয়ায় ইংরেজ-প্রভাব ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে ইংরেজ আরও বেশী চঞ্চল হইয়াছেন। পার্লামেণ্ট সভায় আর্ল উইণ্টারটন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তুরস্কের এই শক্তিসঞ্চয়ে মেসপোটেমিয়াতে ইংরেজ ক্ষাত্র-বলের কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না? ওকোনর সাহেব তো তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাপুঞ্জের জন্য ভাবিয়া আকুল! ভয় তো হইবারই কথা। মুস্তাফা কামালের প্রধান সহচর ইউসুফ কামাল ফ্রান্সের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে না করিতে ককেসাসের কার্স্ সহরে আরমেনিয়া, জর্জ্জিয়া ও আজারবৈজান নামক ককেসীয় সাধারণতন্ত্রত্রয়ের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। পারস্যের সহিতও সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এই সন্ধিপত্রগুলির মূলকথা এই যে ওই মুসলমানরাজ্যগুলির কোনটিও বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর রাজ্যগুলি আক্রান্ত রাজ্যের সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন, এবং মুসলমান রাজ্যের গৌরবরক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া মুসলমানধর্ম্মের শত্রু যে-কোনও রাজ্যকে আক্রমণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। মোস্লেম রাজ্যসমূহের মিত্রতা খৃষ্টানরাজ্যের ভাল না লাগিবারই কথা।

ইংরেজ বলেন, সিলিসিয়া ফরাসীদিগের নিজের সম্পত্তি নহে। জাতিসঙ্ঘের তরফ হইতে ম্যাণ্ডেটরী বা খবরদাররূপে শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। জাতিসঙ্ঘের অনুমতি না লইয়া ফরাসীরা ন্যায়তঃ সিলিসিয়া প্রত্যর্পণ করিতে পারেন না। এই সন্ধিপত্রের দ্বারা ফরাসীরা কার্য্যত জাতিসঙ্ঘকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া যদি তুর্কী জাতীয়দল আরব ও মেসপোটেমিয়া পুনরায় ফিরিয়া চাহেন, তবে তো আর নিরুপদ্রবে ম্যাণ্ডেট-লব্ধ রাজ্য ভোগ করা চলিবে না। আর ফরাসীর নিকট আস্কারা পাইয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমানরাজ্যগুলি সংহতিবদ্ধ হইয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠে তবে ভারতশাসনেও ইংরেজের অসুবিধা হইবে। তাই ফরাসী গভর্ণমেণ্টের উপর ইংরেজ অ[illegible]রক্ত হইয়াছেন। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে পাছে মতলব সিদ্ধ[illegible] সেই জন্য আটপৃষ্ঠাব্যাপী এই নরম প্রতিবাদপত্র প্রেরিত হইয়াছে। [illegible]

মোট বক্তব্যগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে চেম্বারলেন সাহেব বলিয়াছেন যে সাধারণের মঙ্গলের জন্য ইহা প্রকাশিত হওয়া বর্ত্তমানে সমীচীন নহে। উপযুক্ত সময়ে সকল কথা প্রকাশ করা হইবে বলিয়া তিনি পার্লামেণ্টে আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যলোলুপ কতিপয় ইংরেজ পার্লামেণ্ট মহাসভায় এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন করিবার আয়োজন করিতেছেন।

*

মধ্য আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর মধ্য-আমেরিকার গোয়াটিমালা প্রদেশে গ্যাভিনোগিয়াঞ্জা স্পেনের অধীনতা-পাশ হইতে মধ্য-আমেরিকার মুক্তি ঘোষণা করেন। বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত ঘটনার শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে মধ্য-আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে গোয়াটিমালা, সালভাডোর ও হণ্ডুরাস রাজ্যত্রয় মিলিয়া একটি যুক্তরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। নিকারাগুয়া ও কষ্টারিকা রাজ্যদুটিরও এই নবগঠিত যুক্তরাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিতেছিল এবং ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে অরাজকতা ও অবিচার অত্যাচারে উক্তদেশবাসীরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এই-সকল দেশের জননায়কেরা অনেকবার সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই কতিপয় স্বার্থান্ধ শক্তিশালী সেনানায়কের স্বার্থপরতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বহু চেষ্টার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চরাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াসিংটন সহরে মিলিত হইয়া উক্ত জাতিসমূহের একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন, এবং আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ-সমূহের মীমাংসার্থ আন্তর্জ্জাতিক আদালত স্থাপন করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই নিকারাগুয়া রাজ্যের সভাপতি জেলায়া ওয়াসিংটন-কন্‌ফারেন্সের অবধারিত সর্ত্তগুলি পালন করিতে নারাজ হইলেন; এবং উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। বাকি চারিটি রাজ্য উক্ত সন্ধিপত্রের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্তের বিরোধী কোনও সন্ধি করিবার নিকারাগুয়ার কোনও অধিকার নাই। এবং নিকারাগুয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থনা করেন। নিকারাগুয়া উক্ত আদালতের বিচার করিবার অধিকার অস্বীকার করেন। ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর হইয়া জাতিসঙ্ঘ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজনকল্পে আবার যখন রাজ্যগুলির মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল তখন রাজ্যগুলির ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আদর্শে মধ্য-আমেরিকায় যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। বিগত জানুয়ারী মাসে চারিটি রাজ্য মিলিত যুক্তরাজ্য স্থাপনে স্বীকৃত হইয়া এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, কেবলমাত্র নিকারাগুয়া রাজ্য তাহাতে যোগদান করেন নাই। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এই নবসংযুক্ত যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজ্য-পরিচালনা-পদ্ধতি ও রাজ্যের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া ঘোষিত হয়। অল্পদিন হইল নিকারাগুয়া রাজ্য ইহার সহিত সংযুক্ত হইবার অভিলাষ ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায় যে আন্তর্জ্জাতিক কলহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন যুক্তরাজ্য বলশালী হইয়া উঠিবে এবং আভ্যন্তরিক সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৃষি ও খনিজ ধনসম্পদের বিস্তারের সুচারু ব্যবস্থা করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটি সম্পদশালী উন্নতিশীল রাজ্যে পরিণত হইবে। ইয়ুরোপের অর্থগৃধ্নু রাজ্যসমূহের ইঁহাদের খনিজধনসম্পত্তির প্রতি যে লোলুপদৃষ্টি ছিল তাহার অবসান-সম্ভাবনায় অনেকেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং অনেক কুচক্রী চক্রান্তজাল বিস্তার করিতেছেন। যাঁহারা মেক্সিকোর অন্তর্বিপ্লবের ইতিহাসের সহিত সামান্য একটু পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন যে কেরোসিন তৈলের খনিগুলিকে সুবিধামত সর্ত্তে পাইবার লোভে ব্যবসায়ী ইয়ুরোপীয় বণিকগণ মেক্সিকোতে কিরূপ চক্রান্ত করিয়া বিপ্লব বাধাইয়াছিলেন। তাই ভয় হয় নবগঠিত যুক্তরাজ্যের ভাগ্যে না-জানি কি আছে।

*

আয়ার্‌ল্যাণ্ড

আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সমস্যার সুমীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে কন্‌ফারেন্স ডাকিবার পূর্ব্বে লয়েড জর্জ্জ ও ডি ভ্যালেরার যে তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা পূর্ব্ব সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কূট তর্কের পর ১১ই অক্টোবর লণ্ডননগরে কন্‌ফারেন্সের বৈঠক হইবে বলিয়া স্থির হয়, এবং আর্থার গ্রিফিথ, মাইকেল কলিন্স, ডুগান ও বার্টন সিন্‌ফিনারদিগের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে উপস্থিত হন। সিন্‌ফিন-দিগের ভিতর সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী বলিয়া গ্রিফিথের প্রসিদ্ধি আছে, আর মাইকেল কলিন্স আইরিশ জাতীয় সেনাদলের অধিনায়করূপে পরিচিত। ১১ই তারিখে লণ্ডন সহরে ডাউনিং ষ্ট্রীটে কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হইতে যখন আইরিশ জননায়কগণ আগমন করেন তখন বিপুল জনতা তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ সমবেত হইয়াছিল। লয়েড জর্জ্জ একটি বক্তৃতা করিয়া বৈঠকের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং গ্রিফিথ তাহার উত্তর দেন। সেইদিন ডেল আইরিয়েন হইতে আইরিশ জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গের কার্য্যকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতে অনুরোধ করেন। বৈঠকে আইরিশ সমস্যার কোনও মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আয়ার্‌ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ও ইংরেজ-শাসন প্রতিরোধ বন্ধ রাখিবার জন্য কতকগুলি সর্ত্ত স্থির হয়। বৈঠকে আর যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তাহার কোনও বিশেষ বিবরণ বাহির করা হয় নাই। মাঝে মাঝে বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, আবার কৌশলী রাষ্ট্র-নেতাদের চতুর কৌশলে কথাবার্ত্তা চালাইবার উপায় বাহির হইয়াছে।

আইরিশ সমস্যার সমাধানের এই চেষ্টাতে আনন্দিত হইয়া রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু পোপ রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে একটি টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। পঞ্চম জর্জ্জও উত্তরে আইরিশ সমস্যা সমাধানে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টার কথা পোপকে জ্ঞাপন করেন। ডি ভ্যালেরার নিকট সেই উত্তরের কতকগুলি কথার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক বোধ হইল। তিনি দেখিলেন, সেগুলির এরূপ ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব যে আইরিশ জাতি ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বৈঠকে সন্ধি সম্ভবপর হইবার পূর্ব্বে এরূপ উক্তি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিলে আইরিশজাতির স্বাধীনতা ব্যাহত হইতে পারে মনে করিয়া ডি ভ্যালেরা পোপকে আইরিশ পক্ষের কথা জানাইয়া এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ডি ভ্যালেরার উক্তিতে ইংরেজ জাতির প্রতি তীব্র আক্রমণ ছিল। তাহাতে ইংরেজ সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ইউনিয়নিষ্ট দলের চল্লিশজন নেতা পার্লামেণ্টে আইরিশ সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গ তুলিবার জন্য লয়েড জর্জ্জের নিকট এক দাবীপত্র (Requisition) প্রেরণ করেন। ৩১শে অক্টোবর পার্লামেণ্ট মহাসভায় আইরিশ প্রশ্নের আলোচনা হয়। ইউনিয়নিষ্ট

দল প্রস্তাব করিলেন যে, "যেহেতু ইংরেজ রাজের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া আইরিশ প্রজাতন্ত্রের স্থাপনা করিতে উদ্যোগী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হইতেই দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিবর্গ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেইজন্য এই মহাসভার সভ্যরা ইঁহাদের সহিত মন্ত্রীসভার বুঝাপড়া হওয়া ভীতিজনক ও অমঙ্গলপ্রদ মনে করেন, তজ্জন্য এই বৈঠক সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি জানাইতেছেন।" লেবার ও লিবারেল দল কিন্তু মন্ত্রীসভার কার্য্যকে সমর্থন করাতে ইউনিয়নিষ্ট দলের এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু আইরিশদিগের সহিত আলোচনা আরম্ভ হইতেই আবার গোলযোগের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ইংরেজ বলিলেন যে, কোনও কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আইরিশ প্রতিনিধিবর্গকে রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। আইরিশগণ বলিলেন যে, আলষ্টারের গোলযোগের মীমাংসার একটি পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রভাব তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। আলষ্টার সমস্যার সহিত আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় সম্মান এমনভাবে জড়িত যে তাহার সমাধান হইবার উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিলে আয়ার্‌ল্যাণ্ডের মর্য্যাদার হানি হইবে। দেশের সম্মান যখন তাঁহাদের উপর ন্যস্ত তখন তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহারা কখনই দিবেন না। অগত্যা মন্ত্রীসভা আলষ্টার-সমস্যার মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আলষ্টারের জননায়ক স্যার জেম্‌স্ ক্রেইগ তাহাতে ভীষণ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার ভাবগতিকে মনে হয় এই প্রণালীতে কার্য্য হইলে আলষ্টার তাহাতে যথাসাধ্য বাধা দিবে, এমন কি প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। আলষ্টারদল প্রথম হইতে যেরূপ গণ্ডগোল তুলিয়াছেন তাহাতে আয়ারল্যাণ্ডে শান্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে সমস্যার কোনও রূপ কিনারা হইবে কি না কে জানে?

*

ইউরোপে অশান্তি

ইউরোপের খণ্ডপ্রলয়টিতে দেশপ্রাণতা যত না জাগিয়াছিল বৈরিতা ও হিংসা জাগিয়াছিল তাহার শতগুণ। তাই ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করার অজুহাতে নিজের লাভের গণ্ডাটির প্রতি ঝোঁক সকলেই দিয়াছিল। এই স্বার্থ, এই লোভ, সকল মীমাংসার মূলে থাকায় ইউরোপে শান্তি স্থাপিত না হইয়া গোলযোগের সূত্রপাতই হইয়াছে বেশী। এত সন্ধিপত্র, এত আলোচনা হইল, তবুও গণ্ডগোল মিটে না। সন্দেহ মাথা তুলিয়াছে, বিরোধ জাগ্রত হইয়াছে; স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাজিয়াছে। তাই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এখনও থামে নাই। সর্ব্বত্রই একটা অশান্তির উদ্বেগ দেখা যাইতেছে। বল্‌কানে ও মধ্য-ইউরোপে যুদ্ধের আয়োজন নিত্যই চলিতেছে। পর্ত্তুগালে বিপ্লবের পর বিপ্লব লাগিয়াই আছে। চেকোশ্লোভাকিয়া অন্যায়ভাবে আলবেনিয়াকে আক্রমণ করিল, শক্তিবর্গ চক্ষু রাঙ্গাইয়াই শান্ত দিলেন। গ্রীস ও অ্যাঙ্গোরার যুদ্ধ, হাঙ্গেরীতে কার্লের দ্বিতীয় বার সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা, বর্গেনল্যাণ্ড লইয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত হাঙ্গেরীর বিবাদ, জার্ম্মানী ও পোলাণ্ডের কলহ, ইতালীর সহিত বল্‌কান প্রদেশসমূহের কলহ প্রভৃতি কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গণ্ডগোল ইউরোপে নিত্য যুদ্ধের সম্ভাবনা আনিয়া দিতেছে। ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে, ইতালী ও ফ্রান্সে নানা ব্যাপারে বিরোধ বাড়িয়াই চলিতেছে। রেষারেষির ফলে যুদ্ধ-ব্যয় অসম্ভব বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু মুখে শান্তিপ্রতিষ্ঠার, ও মহান্ রাষ্ট্রীয় আদর্শ স্থাপনের লম্বা-চওড়া কথা চলিতেছে। ঠিক এই সময়ে আমেরিকার আহ্বানে ১২ই নবেম্বর হইতে ওয়াশিংটন সহরে নিরস্ত্রীকরণ দরবার আরম্ভ হইল। শক্তিপুঞ্জ তো মহোৎসাহে বৈঠকে যোগ দিতে গিয়াছেন। ইংরেজ প্রতিনিধিবর্গের সহিত ভারতের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় এই দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের প্রতিনিধি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রজা-সাধারণকে নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। এমন কি আমাদের তথাকথিত রাষ্ট্রীয় মণ্ডল লেজিস্‌লেটীব এসেম্বলি হইতেও এই নির্ব্বাচন হয় নাই। বিলাতের মন্ত্রীসভা শাস্ত্রীমহাশয়কে ভারতের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়াছেন। এই বৈঠকে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভুত্ব লইয়া জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে রেষারেষি চলিতেছে তাহার মীমাংসার জন্য আলোচনা হইবে। ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের পীতাতঙ্ক, নৌবহর-হ্রাস প্রভৃতি আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা হইবে। এই সূত্রে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াতে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। জাপানের প্রধানমন্ত্রী হারার এই বৈঠক সম্বন্ধে উৎসাহ ছিল প্রচুর! কিন্তু জাপানের ক্ষাত্রপন্থী দল এই বৈঠকের বিরোধী। জাপানের শক্তিসঞ্চয়কে খর্ব্ব করিবার গুপ্ত প্রয়াস ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে পীত ও কৃষ্ণকায় জাতির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহাতে তাহাদের প্রতি প্রীতি রাখা জাপানের পক্ষে সহজ নয়। তাই ক্ষাত্রপন্থী দলের চক্রান্তে গুপ্তঘাতকের হস্তে হারা প্রাণ হারাইয়াছেন। হারার মৃত্যুতে জাপানের শান্তিপ্রয়াসী দল অনেকটা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং ক্ষাত্রপন্থী দল প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। যদিও অস্থায়ীমন্ত্রী উচিদা বলিতেছেন যে তিনি শান্তিপ্রয়াসী এবং হারার অনুষ্ঠিত শান্তিযজ্ঞ সমাধা করিতে তিনি বদ্ধপরিকর, তথাপি নিরস্ত্রীকরণ দরবারে জাপানের হাবভাব কিরূপ হইবে তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

—

ভারতবর্ষ

মোপ্‌লা-প্রসঙ্গ—

মোপ্‌লা-হাঙ্গামা এখনও মিটে নাই। তাহাদের দলবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া তাহারা এমন উপদ্রব করিতেছে যে প্রায় সমস্ত মালাবারবাসীই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কালিকাটের নিকটবর্ত্তী বহুস্থান হইতেই মোপ্‌লাদের ভয়ে লোকেরা ভিটামাটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। অনেক চা-কর সাহেবও তাহাদের বাগান ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রদেশটি এখনও 'মার্শাল ল' অনুযায়ীই শাসিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কিছু সুবিধা হইতেছে তাহা মনে হয় না। কারণ মোপ্‌লারা এখন সাধারণতঃ লোকালয়ে থাকে না। তাহারা পলাইয়া গিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে। সেখান হইতে তাহারা অকস্মাৎ ঝড়ের মতন গ্রামে গ্রামে আসিয়া লুটতরাজ করিয়া পলাইয়া যাইতেছে। তাহাদের আস্তানার উদ্দেশ পাওয়াই দুষ্কর।

বহু মোপ্‌লাবিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে, সংখ্যায় তিন হাজারেরও উপর হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তাহারা সহজে দমিবার পাত্র নয়। মোপ্‌লারা তাহাদের তিনটি দলে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে। একটি দলের অধিনায়ক বেরিয়ান্‌কুন্নথ্ কুন্‌হি আম্মদ হাজ্জি; আর-একটির নেতা চেম্প্রসেরী থঙ্গল; অপরটির চালক শেঠি কোয়া থঙ্গল। ইহার

মধ্যে চেম্প্রসেরী খঙ্গলই নাকি সবচেয়ে চতুর। চারিধারে চর পাঠাইয়া ইহারা ইংরেজ সেনাদের গতিবিধি খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য রাখিতেছে এবং চরের নির্দ্দেশ অনুসারেই লুটতরাজে অগ্রসর হইতেছে। ইহারা যে শুধুই লুটতরাজই করে তাহা নয়, নিজেদের দলভুক্ত করিবার জন্য গ্রামবাসীদের নিকট বক্তৃতাও দিয়া থাকে। "লিডার" কাগজের একটি বিশেষ সংবাদদাতা চেম্প্রসেরী খঙ্গলের এরূপ একটি বক্তৃতার সারাংশ জানাইয়াছেন। তাহাতে অনেক মজার মজার খবর পাওয়া গিয়াছে—তাহারা মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী; তাহারা যে স্বরাজ্য পাইয়াছে তাহা কিছুতেই আর ইংরেজদের ছাড়িয়া দিবে না; সকলকে মুসলমান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, তবে দয়া করিয়া কাহাকে কাহাকে নাও করিতে পারে, তাহাদের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ও আসন্নপ্রায়; তাহাদের রাজ্যে সুবিচার দুর্ম্মূল্য হইবে না, উকিল থাকিবে না; বর্ত্তমান বিচারপ্রণালীর উচ্ছেদসাধন তাহারা করিবে; তাহারা ব্যক্তির স্বতন্ত্র-স্বত্ব (private property) মানিবে না, যাহার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু রাখিবারই অধিকারী, কেহ ধনী আর কেহ দরিদ্র হওয়া আর চলিবে না, সাম্য স্থাপিত হইবে; বর্ত্তমান পুলিশ-ব্যবস্থা তাহারা চায় না, ইহার চেয়ে অনেক কম খরচে তাহারা পুলিসের কাজ চালাইবে; বর্ত্তমান সরকারের বড় বড় ইমারৎগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে, শাসনপ্রণালীর জন্য ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই, সমগ্র মুসলমানজগৎ তাহাদের সাহায্য করিবে।

মোপ্লারা গোঁড়া মুসলমান। অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছে, হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়াছে, বাড়ীঘর পোড়াইয়া দিয়াছে। ইহা অতিশয় গর্হিত ও অমার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে যে হিন্দু বলিয়াই তাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহা নাও হইতে পারে। তাহাদের আক্রোশ কেবল হিন্দুদের উপর তত না, যত অত্যাচারী ধনী জমিদার শ্রেণীর উপর। কিছুদিন পূর্ব্বে মোপ্লাদের অন্যতম সর্দ্দার বেরিয়ামকুন্নম্ তাহাদের মালায়ালম্ ভাষায় মান্দ্রাজের "হিন্দু" কাগজের সম্পাদককে ৭ই সেপ্টেম্বর একখানি চিঠি লেখে। তাহাতে সে বলে যে মালাবারে হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘুচিয়া যায় নাই; এবং তাহার লোকেরা যে জোর করিয়া হিন্দুদের মুসলমান করিতেছে এ কথাও সর্ব্বৈব মিথ্যা; কোন কোন হিন্দু ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্য করিয়াছে এবং নির্দ্দোষ মোপ্লাদের ধরাইয়া দিয়াছে; শুধু তাহাদেরই উপর কিছু কিছু অত্যাচার করা হইয়াছে; যে নাম্বুদ্রীটি এই হাঙ্গামার মূল তাহার উপরও এই কারণেই অত্যাচার করা হইয়াছিল; অনেক হিন্দুকে ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট সৈন্য বানাইতেছে, তাহাতে অনেকেই আসিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; অনেক নির্দ্দোষ মোপ্লাও এই কারণেই তাহার শরণাপন্ন হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন নির্দ্দোষকে ধরা ছাড়া কিছুই করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সে বলে যে যদি এই চিঠিখানি না ছাপা হয় তবে সম্পাদককে একদিন ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

যাহা হউক মালবারের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রপীড়িত স্থানগুলি হইতে দলে দলে নরনারী পালঘাট কালিকাট প্রভৃতি সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। কংগ্রেস ও সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এইসব বিতাড়িত নরনারীর সাহায্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টও মালাবারের এইসব হাঙ্গাম মিটাইবার জন্য একজন বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছেন।

অযোধ্যায় প্রজাস্বত্ব—

অযোধ্যায় প্রজাস্বত্ব লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রজাস্বত্ব লইয়া জমীদার ও প্রজাদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে; তাহা লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামাও কিছু কিছু হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যায় কিষাণদের জমির উপর কোন স্বত্ব নাই। মিউটিনির সময়ে গবর্ণমেণ্ট তালুকদার ও প্রজাদের নিকট হইতে জমির স্বত্ব কাড়িয়া নেন। পরে অবশ্য তালুকদারদের স্বত্ব ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রজারা আর তাহাদের নষ্ট অধিকার ফিরিয়া পাইল না। ফলে যাহা দাঁড়াইল তাহা কিষাণদের পক্ষে সুখকর হইল না। তাহারা তালুকদারদের একেবারে মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িল। যখন ইচ্ছা তখন তালুকদাররা তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারিত। পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কিষাণদের উপর এই অবিচারের কিছু প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়। সাত বৎসরের মিয়াদে কিষাণরা জমি ভোগ করিতে পারিবে এই অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু মিয়াদের পরে আবার তাহাদের নূতন করিয়া সাত বৎসরের জন্য ইজারা লইতে হইবে। অবশ্য তখন তাহাকে ইজারা দেওয়া না-দেওয়া তালুকদারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যাহা হউক ইহার বিরুদ্ধেও খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল। প্রজারা চায় জমির চিরস্বত্ব, যাহাতে তাহারা নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে জমির ফসল আবাদ করিয়া নিজেদের ও জমির উন্নতি করিতে পারে ও উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা ভোগ করিতে পারে। গত জানুয়ারী মাসে কিষাণদের প্রতিবাদটা কিছু উগ্র রকমের হইয়া গিয়াছিল, মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিমাণটা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট একটু চমকিয়াই গিয়াছিলেন। থামাইতে গোলাগুলিরও কিছু দরকার হইয়াছিল। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে এবার কিছু না করিলে আর চলে না। তাই গত জুলাইমাসে যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার যে বৈঠক বসে তাহাতে অযোধ্যার প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে প্রস্তাব করা হয় যে কিষাণদের সাত বৎসরের বদলে আজীবন ইজারা দেওয়া হইবে এবং দশ বৎসর অন্তর অন্তর খাজনা বৃদ্ধি হইবে। খাজনা বিষয়ে আরও অনেক কথা ছিল। প্রস্তাবটি সম্যক আলোচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। গত মাসে কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে দেখা যায় যে কমিটির অনেক সভ্যই কিষাণদের ইজারা স্বত্বের বদলে চিরস্বত্ব দিতে রাজী, যাহাতে তাহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে জমি ভোগ করিতে পারে; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের জন্য তাহা তাঁহাদের করিবার জো নাই। তালুকদাররা প্রজাদের জমির উপর কোন স্বত্ব দিতে রাজী নন, কাজেই উত্তরাধিকার স্বীকার তাঁহারা করিবেন না। যখন বর্ত্তমান এই আপোষের কথা উঠে তখন নাকি গভর্ণমেণ্ট তালুকদারদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন স্বত্ব দিবেন না। কাজেই যখন কমিটিতে কিষাণদের উত্তরাধিকারের কথা উঠে গভর্ণমেণ্ট তখন বাধা দেন এবং রাজকর্ম্মচারীদের নিজ নিজ মত অনুসারে ভোট দিতে দিলেন না, উত্তরাধিকার স্বত্বের বিরুদ্ধে মত দিতে বাধ্য করিলেন। গভর্ণমেণ্টের এরূপ কোন আদেশ না থাকিলে অনেক রাজকর্ম্মচারীরাই ইহার সপক্ষে ভোট দিতেন। দুইজন প্রধান ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী নাকি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে কৃষাণদের উত্তরাধিকারসূত্রে জমি ভোগ করিবার অধিকার না দিলে অযোধ্যায় কোন দিন শান্তি হইবে না। যাহা হউক গভর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবহার টের পাইয়া বৈঠকের তৃতীয় দিন ৬ জন সভ্য কমিটির সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলেন। কাজেই ব্যাপারটা লইয়া খুব হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ১০ বৎসর অন্তর অন্তর যখন খাজনা বৃদ্ধি করিবার অধিকার তালুকদারদের রহিল, তখন কিষাণদের উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিবার অধিকার না দিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। যুক্ত প্রদেশের নরমপন্থীদের সভা ন্যাশানাল লিবারেল লিগ বড়লাটের নিকট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের এই কাজের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। স্থানে

স্থানে কৃষাণদেরও ইহার বিরুদ্ধে সভা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় আইনটি পাশ হইয়া গিয়াছে। এবার হইতে কিষাণরা আজীবন জমী ভোগ করিতে পারিবে, প্রতি দশবৎসর অন্তর খাজনা বৃদ্ধিও হইবে। আন্দোলনের ফলে, উত্তরাধিকারী পূর্ব্ববর্ত্তী ভোগকর্ত্তার মৃত্যুর পরে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত জমি ভোগ করিতে পারিবেন। তাহার পরে পুনরায় তাহাকে নূতন করিয়া ইজারা গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সে ইজারা দেওয়া না দেওয়া তখন নির্ভর করিবে তালুকদারের উপর। গভর্ণমেণ্টের প্রজার উপর বহুশ্রুত দরদের পরিচয়টা মন্দ পাওয়া গেল না। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের দেশবাসীর চৈতন্য হইবে না ?

রাজস্ব-তদারক সমিতি—

ভারতের রাজস্ব-বিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য যে সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার সভ্যবৃন্দের নাম সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। সভাপতি—সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ; সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত জে এম কীন ; সভ্য—শ্রীযুক্ত শেষগিরি আইয়ার, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা, শ্রীযুক্ত জে সি কোয়াজি, সার মানেকজি দাদাভাই, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস, সার এড্‌গার হোল্‌বার্টন, শ্রীযুক্ত আর এ মেণ্ট, শ্রীযুক্ত নরোত্তম মোরারজি, শ্রীযুক্ত সি ডব্লিউ রোড্‌স্ এবং সার এম ডি ওয়েব। শ্রীযুক্ত এইচ জি হেগ সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নবেম্বর মাস হইতেই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। বোম্বাইতে তাঁহাদের প্রথম বৈঠক বসিবে। সমিতি সাধারণের নিমিত্ত একটি প্রশ্নমালা বাহির করিয়াছেন।

সৈন্যবিভাগ ও কাগজওয়ালা—

আজকাল সৈন্যবিভাগের কর্ত্তাদের কিছু কাগজওয়ালা-প্রীতি দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি কর্ণেল ডব্লিউ এইচ বীচ সৈন্যবিভাগের তরফ হইতে সিমলা হইতে আসিয়া বোম্বাইএর কাগজওয়ালাদের লইয়া এক সভা করেন। তিনি তাঁহাদের বলেন যে সৈন্যবিভাগের খোদ কর্ত্তাদের ইচ্ছা যে কাগজওয়ালাদের সঙ্গে তাঁহাদের একটা সম্প্রীতি স্থাপিত হয় ; তাই এবার হইতে যাহাতে এরূপ সভা আরও ঘন ঘন হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে ; পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে সিমলা সহরে এরূপ সভা হইত, কিন্তু তাহাতে দেখা যায় যে প্রাদেশিক কাগজওয়ালারা হাজির হইতে পারেন না ; তাই এবার হইতে প্রাদেশিক সৈন্যবিভাগের কর্ত্তারা যাহাতে প্রাদেশিক কাগজওয়ালাদের সহিত যোগ স্থাপন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। আর একটা কথাও উঠিয়াছে—প্রফেসার রাস্‌ব্রুক উইলিয়াম্‌স্‌কে অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগের জন্যও কাজ করিতে বলা হইবে। যাঁহারা রাস্‌ব্রুক উইলিয়াম্‌সের বইগুলি পড়িতেছেন তাঁহারা সকলেই জানেন তাঁহার প্রধান কাজই হইতেছে গভর্ণমেণ্টের অন্যায় ও ত্রুটিগুলিকে ওস্তাদের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরাল করা। এইজন্যই কি রাস্‌ব্রুক সাহেবকে সামরিক কর্ত্তাদের বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ? যাহা হউক কর্ণেল বীচ সাহেব আলি ভাতৃদ্বয়, মোপ্‌লা বিদ্রোহ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, সৈন্যবিভাগের কর্ত্তারা সত্যই চান যে ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীরা ভারতবাসীকে সমকক্ষরূপে দেখিতে শিখুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কথাচ্ছলে জানান যে আর ২৫ বৎসর তপস্যা করিলে পর নাকি ভারতবাসী ইংরেজের ন্যায় সমগ্র সামরিক বিভাগটি চালাইবার ও দেশরক্ষা করিবার যোগ্যতা পাইবে—অর্থাৎ ২৫ বৎসর স্বার্থবশ লোকেদের মুখে এই রকম কথা যে শুনিতে হয় তাহা ত জানা কথা।

মিউনিসিপালিটি ও গভর্ণমেণ্ট—

মিউনিসিপালিটিগুলির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কতদূর, বর্ত্তমানে তাহার একটা পরখ হইতেছে। অনেক জায়গায়ই দেখা যাইতেছে যে মিউনিসিপালিটিগুলি গভর্ণমেণ্টের অপছন্দমত কাজ করিয়া বসিলেই গভর্ণমেণ্ট চোখ রাঙ্গাইতেছেন। মদ্যপান নিবারণ করিতে গিয়া কোন কোন মিউনিসিপালিটি রাজকর্ম্মচারীদের কোপনজরে পড়িয়াছিলেন তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের আহমদাবাদ, সুরাট, নদিয়াদ প্রভৃতি কয়েকটি মিউনিসিপালিটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া, মহা ফাসাদে পড়িয়াছেন। মিউনিসিপালিটির কমিশনারদিগের এরূপ করিবার কোন ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট দেন নাই ; এরূপ প্রত্যাখ্যান করাতে মিউনিসিপালিটিগুলির যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার জন্য যে যে কমিশনর এই প্রত্যাখ্যানের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। অক্টোবর মাসের পরে গভর্ণমেণ্ট এই-সকল মিউনিসিপালিটির আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কমিশনরগণ যদি পূর্ব্বের মত না বদ্‌লান তবে যে-কোন করদাতা কমিশনরদের বিরুদ্ধে এই ক্ষতির জন্য নালিশ করিতে পারিবেন। যাহা হউক গভর্ণমেণ্টের করদাতাদের উপর এই দরদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া গেল। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে। যুবরাজের আগমনোপলক্ষে যে বড় মিউনিসিপালিটি ভারতের এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে বাতি ও বাজী পোড়াইয়া ও অন্যান্য বহু তামাসা করিয়া সহস্র সহস্র টাকা উড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন দরদটা থাকিতেছে কোথায় ? লাহোরের ঘটনাটি আরও একটু সরস। লাহোরের একটি চৌরাস্তায় লর্ড লরেন্সের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোর মিউনিসিপালিটি সেখান হইতে মূর্ত্তিটিকে সরাইয়া ফেলিবেন বলিয়া ঠিক করেন। সেখানকার কমিশনর সাহেব তাহাতে মহা খাপ্পা। তিনি মিউনিসিপালিটিকে জানাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম ছাড়া তাঁহাদের এরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা নাই ; গবর্ণমেণ্ট মনে করেন ; মিউনিসিপালিটির এরূপ কাজে মূর্ত্তির অপমান সম্ভাবনা আছে তাই তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এরূপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এই কারণে মিউনিসিপালিটির ধার্য্য প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে দিতে তিনি পারিলেন না। ভাল ! মিউনিসিপালিটির একটি মূর্ত্তি সরাইবারও ক্ষমতা নাই—অথচ শুনা যায় এইগুলিই নাকি আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের শিক্ষায়তন !

মিউনিসিপালিটির সভাপতির সুকীর্ত্তি—

মান্দ্রাজের সালেম মিউনিসিপালিটি কিছু দিন পূর্ব্বে ঠিক করেন যে মদ্যপাননিবারণের জন্য প্রত্যেক সভ্যেরই পিকেটিংএর কার্য্যে লাগিয়া যাওয়া উচিত। তাই সম্প্রতি সেখানকার সভাপতি শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা চেটিয়ার সেখানকার কয়েকজন সভ্যের সহিত পিকেটিংএ নামিয়াছেন। এই ঘটনায় নগরের মধ্যে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং মদনিবারণে যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। অন্যান্য দেশের মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সভ্য ও সভাপতিগণও কি এরূপ সৎকার্য্যে নামিবেন ?

ভারতে জাপানী বাণিজ্য—

অনুসন্ধান করিবার জন্য ছয় জন জাপানী ব্যবসাদার জাপান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভারতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা ভারতে কি কি জিনিষ রপ্তানী ও আমদানী হয় তাহা ভাল করিয়া খোঁজ করিবেন। ভারত-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সকলেই বখ্‌রা বসাইতে আসিতেছে। কিন্তু 'ভারত তবু কৈ'?

করাচির বিচার—

করাচির বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকৎ আলি, হাসান আহমদ, নসির আহ্‌মদ, পির গোলাম মুজাদিদ, ও ডাক্তার কিচলিউর দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য খালাস পাইয়াছেন। মৌলানা শৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলির নামে আর এক দফা নালিশ আনা হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ভিন্ন অপরাধেও তাঁহাদের দুই জনের দুই বৎসরের জন্য কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই দুই বৎসর পূর্ব্বের দুই বৎসরের সহিত মিশাইয়া মোটের মাথায় দুই বৎসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

করাচির মোকদ্দমায় এই কথাটাই প্রধান বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ধর্ম্মের আইন ও রাজার আইনের মধ্যে যখন বিরোধ ঘটে তখন কোন্ আইন অনুসরণ করা উচিত। করাচির খেলাফৎ কন্‌ফারেন্সের যে প্রস্তাবটির জন্য নেতৃবৃন্দ ধরা পড়িয়াছেন, তাহার মূল কথাটাই ছিল এই। মুসলমান মুসলমানের অবধ্য। কাজেকাজেই অ্যাঙ্গোরায় যদি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মুসলমান সৈন্য পাঠায় তবে মুসলমান সৈন্যদের সহিতই তাহাদের লড়াই করিতে হইবে। তাই এই মতের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা মুসলমান সৈন্যদের ইংরেজ সরকারের চাকরি ছাড়িয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি বিচারালয়ে তাঁহার লিখিত ও মৌখিক বক্তৃতায় এই কথাটা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কথাটা অনেক দিক দিয়া ভাবিবার আছে। রাষ্ট্র (state) ও সমাজের (community) কার কতখানি দাবী আমাদের কার্য্যকলাপের উপর এবং উভয়ের বা পরস্পরের কি সম্বন্ধ—সে কথাটাই মৌলানার বক্তৃতায় উঠিয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎও ইহার মীমাংসার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি—

সম্প্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটি বৈঠক বসিয়াছিল। এবারকার বৈঠকটি লইয়া প্রথমে সভ্যদের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল। গত বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারী এই বৈঠকের বিরুদ্ধে ছিলেন। যে সভ্যদের লইয়া গত জুন মাসে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিটি গঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের কাহারও কাহারও নির্ব্বাচনের মধ্যে আইনের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল। তাই সভাপতি মহাশয়ের মতে কমিটিটি বে-আইনী। সেজন্য তিনি নূতন করিয়া কমিটি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। জুলাই মাসে কমিটির যে প্রথম অধিবেশন হয় তাহাতে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়া তাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের যাবতীয় কাজের ও নানা বিষয়ের বিচারের ভার দেওয়া হয়। সেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ঠিক করেন যে আর নূতন করিয়া কমিটি গঠনের এখন কোন প্রয়োজন নাই; কারণ নবেম্বর মাসেই ত আবার নূতন কমিটি গঠিত হইবে। তাই তাঁহারা সকল প্রদেশের বিবদমান সভ্যদের বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। কিন্তু সভাপতি মহাশয় তাহাতে শান্তি পাইলেন না। নূতন কমিটি নিযুক্তের দিকেই তিনি ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কাজেই যখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কমিটির বর্ত্তমান বৈঠকের কথা উত্থাপন করিলেন, সভাপতি মহাশয় তাহাতে আপত্তি জানাইলেন, বলিলেন ইহা বে-আইনী হইবে। যাহা হউক শ্রীযুক্ত মোতিলাল নেহেরু দেখাইলেন যে ইহাতে বে-আইনী কিছুই নাই, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। কাজেই দিল্লীতে বৈঠক বসিল। সভাপতি বিজয়রাঘবাচারী তাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কমিটির বৈঠকে প্রথম কাজই হইয়াছিল এই মতদ্বৈধের মীমাংসা করা। মতদ্বৈধ যাহা লইয়া বাঁধিয়াছিল তাহার একটা সুমীমাংসাই হইয়া গিয়াছে। এবং আশা করা যায় মনোবিবাদের যে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মিটিয়াই যাইবে।

এবারকার কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল একটি গুরুতর বিষয়ের সমাধান করিবার জন্য। গভর্ণমেণ্টের দলন-নীতির প্রসাদে, বিশেষ করিয়া আলিভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের পর, দেশের মন খেপিয়া উঠিয়াছে। অনেকেই এখন কংগ্রেসের ধার্য্য আইনভঙ্গের প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসুক। কিন্তু দেশ তাহার জন্য উপযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা সম্যক না জানিয়া মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এত দিন তাহা করিতে দেন নাই। এই প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। তাহা নীরবে ও ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করিতে সকলেই পারিবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। যাহা হউক কমিটি এই প্রস্তাবটি এবার পাস করিয়াছেন। কিন্তু ইহা করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেককে কতককগুলি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে—(১) সম্পূর্ণ স্বদেশী হইতে হইবে; (২) হাতের বোনা কাপড় পরিতে হইবে; (৩) হিন্দু-মুসলমানের মিলনে ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ঐক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে; (৪) নিরুপদ্রব পন্থা অবলম্বনেই সফলকাম হওয়া যাইবে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; এবং (৫) অস্পৃশ্যতা দেশের কলঙ্ক বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও আরও কতকগুলি কথা তাঁহাদের মনে রাখা দরকার। কংগ্রেস এইরূপ আইন-ভঙ্গকারীদের আর্থিক কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যদি কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কোন কোন স্থানকে আইনভঙ্গের উপযুক্ত মনে করেন, তবে সেই সেই স্থানে আইন ভঙ্গ করিবার অনুমতি দিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধি সর্ব্বপ্রথম এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহার কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া অন্যান্য দেশকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দেশে ফিরিয়াই সুরাটের অন্তর্গত বারদলি নামক গ্রামটি লইয়া কাজ আরম্ভ করিবেন।

ইহার পর আরও কয়েকটি বিষয় কমিটি আলোচনা করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বোম্বাইসহরে করাচির খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের যে প্রস্তাবটির জন্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহা সমর্থন করেন। কমিটি তাঁহাদের সেই কার্য্যের অনুমোদন করেন। পরে তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের টাকার একটি সঠিক তালিকা দিয়া কার্য্য শেষ করা হয়।

ডাকহরকরা।

—

বাংলা

বাংলার অবস্থা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট বাংলাকে ৬৩ লক্ষ টাকা খয়রাত করেছেন শুনে গাত্রদাহ অনেকেরই হয়েছে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর বলেছেন যে বাংলা দেশের দায়ের পরিমাণ যখন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন যুক্তপ্রদেশেরও সেইরূপ ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ যুক্তপ্রদেশ ইণ্ডিয়া

গবর্ণমেণ্টকে সব চাইতে বেশী দান করে থাকে। স্যার হারকোর্ট বলেন যদি রক্ত শোষাই হয়, তাহলেও ভারতগবর্ণমেণ্ট বাংলার রক্ত সামান্ত দু'এক বিন্দু শুষেচেন মাত্র। আমরা গতবারে দেখিয়েচি যে, ১৯২০-২ সালে বাংলা ৩৪ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় করে নিজের জন্ত পায় মাত্র ৮ কোটী ৩৯ লক্ষ, আর যুক্তপ্রদেশ ১৪ কোটী টাকা সংগ্রহ করেই নিজের ভাগে রাখে ৮ কোটী ৪৮ লক্ষ।—বিজলী।

এবার বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে ১৫১৩৩৫৮ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৯৯৫৪১৫ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। এবং এ বৎসর ৪০৫২৬০৯ বস্তা পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল ৫৯৭৩০০০ সহস্র বস্তা। সুতরাং বর্ত্তমান আন্দোলন এবং পাটের মূল্য হ্রাস হইবার ফলেই যে কৃষকগণ পাটের চাষ হ্রাস করিয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক পাটের কল্যাণে বঙ্গপল্লী ম্যালেরিয়ার আকর হইয়াছে। কথঞ্চিৎ লাঘব হইলেও সুখের বিষয়।

বাঙ্গালাদেশে ভূমির পরিমাণ ৫ কোটী ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯ শত একর। তন্মধ্যে ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮ শত একর জমিতে আবাদ হয়। এবং ইহার মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ২২ হাজার ৬ শত ৬০ একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়া থাকে। ফলে আমাদিগকে বহু কোটী টাকার চিনি আমদানী করিতে হয়। এখন হইতে ইক্ষু এবং খেজুরগাছের চাষে আরও অধিক জমি ও অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে।—যশোহর।

পাট ও তুলার ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

বাঙ্গালাদেশে শ্রীরামপুরের নিকট রিষড়া নামক স্থানে প্রথম পাটের কল স্থাপিত হয়। প্রথম তুলার কল কলিকাতায় স্থাপিত হয় ইংরেজী ১৮৩৮ সালে; আর বোম্বাইয়ে দাভার নামক জনৈক পার্শী কর্ত্তৃক তুলার কল স্থাপিত হয় ১৮৫১ সালে। বাঙ্গালা দেশে তুলার কল বিস্তৃতি লাভ করে নাই; কিন্তু বোম্বাই-প্রদেশ আজ তুলার কলে ছাইয়া গিয়াছে। তুলার কল যেমন সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয় কলিকাতায়, কিন্তু পরিণতি ও বিস্তৃতি লাভ করে বোম্বাই প্রদেশে; সেইরূপ পাটের কলের সর্ব্বপ্রথম স্থাপয়িতা জর্জ্জ আক্‌লাণ্ড (George Aucland) নামক জনৈক ইংরেজ, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্ত পাটের কল আজ স্কচ বণিকদিগের হাতের মুঠায়।

পাটের চাষ বাঙ্গালা দেশের একচেটিয়া; কিন্তু তুলার চাষ পৃথিবীর অনেক জায়গায় হয়। ভারতবর্ষে ১৯১৭ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৬৬টা তুলার কল ছিল, আর সেই সময়ে পাটের কলের সংখ্যা ছিল ৭৬। পাটের কলগুলি বাঙ্গালা-দেশে অবস্থিত, কিন্তু তুলার কল সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়ান—যদিও বোম্বাই প্রদেশেই শতকরা ৭৫ ভাগ কল আছে। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে বোম্বাই সহরেই ৮৬টা ও আমেদাবাদ সহরে ৬০টার উপর তুলার কল ছিল।

১৯১৬-১৭ সালে ভারতবর্ষে (করদরাজ্যগুলি ছাড়া) যত তুলা (yarn) প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের অংশ ছিল শতকরা ৭৫ ভাগ; যুক্তপ্রদেশের শতকরা ৭ ভাগ; মাদ্রাজের শতকরা ৭ ভাগ; বাঙ্গালার শতকরা ৫॥০ ভাগ; মধ্যপ্রদেশের শতকরা ৪৸০ ভাগ।

১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ৩৪,০২,৮৫,১৭২ সের সূতা প্রস্তুত হয়; উহার মধ্যে বোম্বাই সহরেই প্রস্তুত হইয়াছিল ১৭,২৯,-৪৯,৭৪৭ সের অর্থাৎ অর্দ্ধেক।

পাটের কল ও তুলার কল দুই-ই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই দুই ব্যবসাই উন্নতির মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আর বাঙ্গালী ইহাদের মাঝখানে বসিয়া চারিদিকে শ্মশান দেখিতেছে!

পাটের কল কেমন ধীরভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখুন,—

খৃঃ অব্দ	কল	
১৮৭৫	১৩	
১৮৮১	২১	৫০০০ তাঁত ও ৮৮,০০০ চর্‌কা।
১৮৯১	২৬	
১৯০১	৩৬	
১৯১১	৫৯	
১৯১৬-১৭	৭১	
১৯১৮	৭৬	

১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে ৪০,০০০ তাঁত ও ৮,০০,০০০ উপর চর্‌কা ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, ১৮৮১ হইতে ১৯১৬-১৭—এই ৩৫ বৎসরে পাট-কলের সংখ্যা সাড়ে তিন গুণ, তাঁতের সংখ্যা ৮ গুণ, ও চর্‌কার সংখ্যা ৯ গুণ বাড়িয়াছে।

এইবার তুলার কল কিরূপ উন্নতি করিয়াছে দেখুন,—

১৯০০	খৃঃ	১৯৩	কল
১৯০৫	"	১৯৭	"
১৯১০	"	২৬৩	"
১৯১৬	"	২৬৬	"

১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত তুলার কল যে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ইহার কারণ হইতেছে বাঙ্গালার "স্বদেশী যুগ"। পাটের কল ও তুলার কলের উন্নতির তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, পাটের কলের উন্নতিই দ্রুত হইয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯১৬-১৭ পর্য্যন্ত পাটের কলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে (১৯০১—৩৬, ১৯১৬-১৭—৭১); কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তুলার কলের সংখ্যা ১৯৩ থেকে ২৬৬তে দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ প্রায় দেড়গুণ। ঐ সময়ের মধ্যে চর্‌কার সংখ্যাও দেড়গুণের চেয়ে কম বাড়িয়াছে কিন্তু তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ হইয়াছে।

১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে পাটের কলের মূলধন ছিল ১৬ কোটী টাকা। সেই সময়ে তুলার কলগুলির মূলধন ছিল প্রায় ২৩ কোটি টাকা অর্থাৎ মোটামুটি একটা পাটের কলের মূলধন ২০।২২ লক্ষ টাকা, কিন্তু একটা তুলার কলের মূলধন মোটামুটি ৮।০ লক্ষ টাকা। ১৮৮১ থেকে ১৯১৬-১৭ পর্য্যন্ত পাটের কলের সংখ্যা ৩॥০ গুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে মূলধন ৫ গুণের বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯১৬-১৭খৃঃ অব্দে ৭১টা পাটের কলে মজুরের সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় ২,৬০,১৯৯ ছিল, আবার ঐ সময়ে ২৬৬ তুলার কলে ২,৭৪,৩৬১ জন মজুর প্রতিদিন কাজ করিত অর্থাৎ মোটামুটি একটা পাটের কলে যেখানে প্রায় ৩৬,৬০ জন মজুর কাজ করে; একটা তুলার কলে সেখানে ১,০৩০ জন মজুর কাজ করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ একটা তুলার কল একটা পাটের কল চেয়ে অনেক ছোট। মজুর ও মূলধন হিসাবে একটা পাটের কল তুলার কলের চেয়ে তিনগুণ বড়।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাটের কল ও তুলার কল বাঙ্গালায় প্রথম স্থাপিত হইলেও বাঙ্গালীর অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। পাট বাঙ্গালার নিজস্ব একচেটিয়া সামগ্রী হইলেও তাহা দ্বারা লাভবান হয় বিদেশীরা, বাঙ্গালার অধিবাসীরা কেবল মুহুরীগিরি করিতেই মজবুত। বাঙ্গালায় এই দুর্দ্দশার মূল কোথায়, তাহা একবার সকলে খুঁজিয়া দেখিবেন কি?—হিন্দুস্থান।

কত মদ বিক্রয় হইয়াছে।—বাবু অমূল্যধন আঢ্যের প্রশ্নোত্তরে বাঙ্গালার আইন মজলিসে সরকার পক্ষ হইতে মন্ত্রী নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী জানাইয়াছেন:—১৯২০-২১ সালে ৭,৬৬৫৭২ গ্যালন দেশী এবং ৫,৭২,৫৪৮ গ্যালন বিলাতি মদ বিক্রয় হইয়াছে। এই ব্যবসায়ে গভর্ণমেণ্ট ১৯২০-২১ সালে ৫৫,৯৭,১৫৫ টাকা শুল্ক এবং ১০,৩৫,০৭৭ টাকা বিলাতি মদের জন্য এবং ৭৪,৪৪,৫৬৩ টাকা দেশী মদের জন্য পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া বিদেশী ও দেশী মদের দোকানের লাইসেন্স হইতে ৩,২২,৩১৮ টাকা এবং ১৫৫,৭৬০ টাকা পাইয়াছেন।

মদবিক্রয়-হ্রাসের প্রস্তাব।—অধ্যাপক এস, সি, মুখার্জ্জি গত বৃহস্পতিবারে বাঙ্গালার আইন-মজলিসে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালাদেশে মদ গাঁজা প্রভৃতির বিক্রয় খুব সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হউক। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যথাসম্ভব সত্বর মদ গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। আমাদের মনে হয়, যথাসম্ভব সত্বর এই সকল নেশার দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই উপলক্ষে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। কারণ প্রজা-সাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনই সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মদ ও গাঁজার সেবা ঐ উভয়বিধ উন্নতিরই পরিপন্থী। সুতরাং উহার অবাধ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।—সম্মিলনী।

জেলের রিপোর্ট।—১৯২০ সালে বঙ্গে যত লোকের কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৬·৫৬ মুসলমান, ৩৯·৯২ হিন্দু, ১·২৩ খৃষ্টান, ১·৭৪ বৌদ্ধ ও জৈন, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ১·৫৫। ইহার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই আছে। মোট ৬৬৪ জন স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৩৭৩ জন হিন্দু, ১৮৫ জন মুসলমান, ৮ জন বৌদ্ধ ও ৪১ জন জৈন খৃষ্টান এবং ৫৭ জন অন্য সম্প্রদায়ের। স্ত্রী কয়েদীদের মধ্যে ১৯৭ জন বিবাহিত, ১৪ জন অবিবাহিত, ৩৬৯ জন বিধবা এবং ১৮৪ জন বেশ্যা।—এডুকেশন গেজেট।

বস্ত্রের কথা—

মহাত্মা গান্ধী তাঁর তরুণ ভারত পত্রে লিখেছেন—"স্বদেশী প্রচারে বাংলা সবার পিছনে পড়ে রয়েচে। বাংলার পল্লী বা সহরে কোথাও খদ্দর-পরা লোকের আধিক্য দেখা যায় না। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায় চর্‌কার প্রচলনও তেমন স্থায়ী হয় নি। কিন্তু বাংলা একবার যদি তার অবসাদ ঝেড়ে ফেলে, তা'হলে আর তাকে পেছনে পড়ে থাক্‌তে হবে না। বাংলায় যে স্বল্পসংখ্য তাঁত ও চর্‌কা আমি দেখেচি তাতে করে' বাংলা নিজের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী কর্‌তে পার্‌বে না; আর বাংলাকে যদি কাপড়ের জন্য বোম্বাই বা আমেদাবাদের ওপর নির্ভর করে' থাক্‌তে হয়, তা'হলে বাংলার নিকট হতে স্বরাজের কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না।"

মহাত্মাজী কিন্তু তাই বলে বাঙালীকে গাল দেন নি; পরন্তু ব'ল্‌চেন বাংলা যেদিন চর্‌কা ধরবে, সেদিন ভারতবর্ষে একটা ঝড় বয়ে যাবে। হে বাঙালী, চাহ চক্ষু মেলি।—বিজলী।

এ বৎসর এ পর্য্যন্ত ১৬১০৩০০০ একর তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহা গত বৎসরের অনুমানের চাইতে শতকরা বারো একর কম। এবার চাষের অবস্থা মোটের উপর ভাল বলিয়াই জানা গিয়াছে।—প্রভাকর।

গত ১৯২০-২১ সালে ১১৮ কোটি গজ কাপড় ভারতের হাতের তাঁতে প্রস্তুত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে যেরূপ তাঁতশালা স্থাপনের কথা শুনা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরকাল মধ্যে শুধু ঠক্‌ঠকি তাঁতের কাপড়েই দেশে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে। শুধু তাঁতীগণের উপর ভার দিলেই চলিবে না, তথাকথিত ভদ্রসন্তানগণকেও এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।—যশোহর।

তাঁতের ব্যবস্থা।—অভয়নীল গ্রামে ৫০০৲ টাকা মূলধনে একটি তাঁত ও চর্‌কার কার্‌বার খোলা হইয়াছে। ঐ মূলধন হইতে গ্রামে ঘরে ঘরে চর্‌কা দেওয়া হইবে এবং দুইখান তাঁত বসান হইবে। গ্রামে চর্‌কার প্রস্তুত সুতা দ্বারা ঐ বস্ত্রবয়ন শিখিয়া গ্রামের কাপড়ের অভাব পূর্ণ করিতে হইবে—এই উদ্দেশ্যেই এই কার্‌বার খোলা হইয়াছে।—বরিশালহিতৈষী।

শিক্ষা—

মিঃ বিস্ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মিঃ বিস্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত আবশ্যক, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার না হইলে ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবীগণ বর্ত্তমান জগতের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জীবনযুদ্ধে কখনও দণ্ডায়মান হইয়া নিজের জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইবে না। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় একমাত্র উপায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে মনুষ্যত্বের ও আত্ম-নির্ভরতার ভাব জাগাইয়া তোলা।

এখন প্রশ্ন উঠিবে এই বিশাল দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে, কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন; এই টাকা আসিবে কোথা হইতে? আমরা বলি এই আপত্তি উঠাইয়া দেশের যাহারা মেরুদণ্ড-স্বরূপ তাহাদিগকে নিরক্ষর রাখিতে পার না। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে যেখান হইতে টাকা আসে, শিক্ষার জন্যও সেখান হইতে আসিবে। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোটী কোটী লোকের জীবন-মরণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, যেখানে নূতন টেক্স বসান সম্ভব হয় সেখানে নূতন টেক্স বসাইয়া, বা অন্য যে কোন প্রকারে সম্ভব হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আবশ্যকীয় টাকা সংগ্রহ করিতেই হইবে। উচ্চ শিক্ষার যেরূপ দর কমিয়া গিয়াছে এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি লোক যেরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে উহার পিছনে রাশি রাশি অর্থব্যয় না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে ঐ অর্থের কতক অংশ ব্যয়িত হইলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইত।—নমঃশূদ্রসখা।

স্বাস্থ্য—

জেলা বোর্ডের চিকিৎসালয়।—সমগ্র বঙ্গদেশে জেলা বোর্ডের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও কেবল জেলা বোর্ডের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত ২৮২টি চিকিৎসালয় আছে। ঐ চিকিৎসালয়গুলির জন্য বাৎসরিক ৪,৭৬,-৫০৬৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ২২১টি চিকিৎসালয়ে জেলা বোর্ড হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। ঐরূপে প্রদত্ত বার্ষিক অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ৩,৩৭,১৩৲টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জেলা বোর্ড হইতে প্রত্যেক চিকিৎসালয়ের জন্য গড়ে বাৎসরিক ১,৪৬২৲ ব্যয় করা হইয়া থাকে।—সম্মিলনী।

জেলাবোর্ডে কবিরাজী।—ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড একটি কবিরাজী বিদ্যালয় খুলিবার জন্য আড়াই হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে একটি কবিরাজী চিকিৎসালয়ও থাকিবে। আশা করি অন্যান্য জেলাবোর্ডও এই সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

—সম্মিলনী।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক।—এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি "ডেলিনিউজ" পত্রে লিখিয়াছেন :—আমাকে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে কিছুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি কয়েকটি বোতল অর্দ্ধেক কার্ব্বলিক এসিড বাষ্পে পূর্ণ করিয়া বোতলের মুখের ছিপি খুলিয়া ছেলেরা উহা ধরিতে না পারে এমন জায়গায় শয়নঘরে রাখিয়াছিলাম। তাহার তীব্রগন্ধে মশকাদি আমার ঘরে ঢুকিতে পারে নাই, ফলে আমার পরিবারস্থ কাহারও ম্যালেরিয়া হয় নাই।—সম্মিলনী।

দান—

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাতৃচরণে সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিত্তগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রধান, তাঁহার জ্যোতিঃ অফিসের দ্বিতল গৃহ, যাহার মূল্য বর্ত্তমানে ৫০,০০০ হাজার টাকার কম নহে এবং দৈনিক "জ্যোতিঃ" পত্রিকা। দ্বিতীয়, তাঁহার স্বগ্রামে তাঁহার ক্রীত জমি ও মহাজনি যাহা আছে। তৃতীয়, তাঁহার পাথরঘাটার বাড়ী জ্যোতিঃ অফিসের সংলগ্ন পশ্চিম দিকের জমি এবং জ্যোতিঃ প্রেস ও সাপ্তাহিক "জ্যোতিঃ"। প্রথমোক্তটি তিনি দেশের সেবার জন্য চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটীর হাতে ন্যস্ত করিলেন। দ্বিতীয়টি তাঁহার পৈতৃক দেবসেবার জন্য এবং তৃতীয়টি তাঁহার পুত্রদের জন্য দিলেন। প্রেসে ও সাপ্তাহিক জ্যোতিতে তাঁহার মধ্যমাগ্রজের পুত্রদেরও অংশ থাকিবে। তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র একজন এখনও নাবালক। কি ভাবে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত হইবে তজ্জন্য সত্বর ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হইবে এবং সমস্তই ঐ ট্রাষ্টীর হস্তে ন্যস্ত হইবে। তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় ও স্বদেশ-সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন।
সম্পাদক, কংগ্রেস কমিটী, চট্টগ্রাম।

দান।—পরলোকগত বনমালী রায় বাহাদুরের পুত্রগণ পাবনায় জলের কল প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

বঙ্গের সমবায় সমিতি—

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সমস্ত কো-অপারেটিভ সমিতির সংখ্যা ৬২০০ শত। ইহাদের সভ্য সংখ্যা ২॥০ আড়াই লক্ষ। সমগ্র বঙ্গের কো-অপারেটিভ সমিতিগুলির বর্ত্তমান মূলধন তিন কোটি টাকার উপর। তা ছাড়া রিজার্ভ ফণ্ড, শেয়ার ও ডিপজিটের পরিমাণ প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা। বিশাল বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ৭৬ হাজার বা ১০ হাজার সমবায় সমিতি খুব সামান্য বলিতে হইবে। তবু ইহা দ্বারা দেশের দরিদ্র অধিবাসী—অর্থাৎ কৃষকগণ বিশেষ উপকার পাইতেছে। সর্ব্বগ্রাসী নির্ম্মম সুদখোর মহাজনদিগের কবল হইতে অনেকে রক্ষা পাইতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা রাজশাহী—নওগাঁর গাঁজাসমিতি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। সেখানে গাঁজার চাষ হয় বলিয়া, গবর্ণমেণ্টও উহাতে খুব জোর দিয়াছেন। নওগাঁয় কো-অপারেটিভ বিভাগের একজন প্রধান অফিসার অবস্থিতি করিয়া, গাঁজা-সমিতির বিস্তৃতি ও উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন। প্রায় ৩০০০ গাঁজার চাষীদের সমবায়ে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। গত ১৯২০ সালে এই সমিতির লাভ হইয়াছে আড়াই লক্ষ টাকারও উপর। এই লভ্যাংশ হইতে ১১৫০০৲ টাকা দানের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। এই সমিতি ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। প্রথম বৎসর এই সমিতি কেবল শিক্ষা-কার্য্যেই ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছে। গাঁজা মহলের অন্তর্গত একটি হাইস্কুল, কয়েকটি মাইনর ও প্রাইমারি স্কুল উহা হইতে সাহায্য পাইতেছে। ইহা ব্যতীত হজ্জ কমিটিতেও ইহারা এ যাবৎ ৮০০৲ টাকা দান করিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার খালায় জল সরবরাহসমিতিও উল্লেখযোগ্য। এই সমিতি মেদিনীপুর জেলের ১০০ বিঘা ও বাঁকুড়া জেলার শালকাঠসমিতি কমবেশী ৬০০০ বিঘা জমিতে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়াছে। এইসকল জমিতে পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন জমি অপেক্ষা ৩ গুণ অধিক ফসল জন্মিতেছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে।—নবযুগ।

বাঙালীর সৎসাহস—

কাঁথিতে কর বন্ধ।—আজ সমগ্র কাঁথি একযোগে কাজ করিতেছে। ধনী নির্ধন, হিন্দুমুসলমান, আজ এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা ব্যথিত হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ, যাহারা ইউনিয়ন বোর্ডে কর দিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি সরাইবার কোনই ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কোন গরুরগাড়ীওয়ালা বা কুলী কাজ করিতে স্বীকার করে নাই। তাঁহারা অনেকে খয়েরখাঁকে সাহায্য করিবার জন্য ধরেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায়ও কোন সুফল হয় নাই।

এক সভায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়। ইহা কাঁথির মত ক্ষুদ্র সব-ডিভিসনের পক্ষে বড় সোজা কথা নহে। সভায় শ্রীযুত শাসমল জিজ্ঞাসা করেন যে, কাঁথির ৩৫ হাজার করদাতার মধ্যে মাত্র সাড়ে চারি হাজার লোক করের বদলে অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি জানিতে চান—আর সকলের এ-বিষয়ে মত কি ? সমস্ত শ্রোতৃবর্গ একবাক্যে চীৎকার করিয়া বলে যে, তাহারা কেহই কর দিবে না। সকলেই অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবে, তবুও আইন মানিয়া লইবে না। শ্রীযুত শাসমল বক্তৃতায় বলেন যে, যাহারা কর দিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট জিনিষপত্র দিতে চাহিলেও বাড়ী ভাঙ্গিয়া পেয়াদা বাড়ী ঢুকিয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ এই সভার তিন দিন পূর্ব্বেই অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বন্ধ করিয়াছেন। অনেক পেয়াদা চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছে। অনেকে বলেন, লোকের অভাবেই বাজেয়াপ্ত করা বন্ধ করিতে হইয়াছে। গুজব যে, গবর্ণমেণ্ট নাকি কাঁথিতে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন বন্ধ করিয়া দিবেন।—প্রভাকর।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জাগরণ—

মুচিদের সভা, ৩ হাজার মুচির প্রতিজ্ঞা।—গত ২৮শে অক্টোবর বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাগানের পশ্চিম-পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে মুচিদের একটি সভা হয়। প্রায় তিন হাজার মুচি সভায় যোগদান করে। মুচিরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা অতঃপর মদ স্পর্শ করিবে না, বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিবে না এবং মাছ মাংস খাইবে না। মধুপুরের মোহান্ত দুলাল দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

—হিন্দুস্থান।

বাঙালী বীর—

মল্লক্ষেত্রে কৃতিত্ব।—বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিখ্যাত বাঙ্গালী মল্ল শ্রীযুত যতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবর-বাবুর নাম অপরিচিত নহে। গোবর-বাবুরা পালোয়ানের গোষ্ঠী। তাঁহার পিতামহ শ্রীযুক্ত অম্বুচরণ গুহ একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। অম্বুচরণের পুত্র

ক্ষেত্রচরণও একজন বড় পালোয়ান ছিলেন। ক্ষেত্রচরণ গোবর-বাবুর জ্যেষ্ঠতাত। অম্বুচরণ অথবা ক্ষেত্রচরণের নাম দেশেই বিখ্যাত হইয়াছিল, ইউরোপ কি আমেরিকা তাঁহাদের শক্তির কোন পরিচয় পায় নাই।

প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে গোবর প্রথমে বিলাতে যান। তখন তাঁহার বয়স ষোল সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। সেই বয়সেই তিনি ইউরোপায় মল্লদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কুস্তি করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি কাহারও সহিত কুস্তি করিবার অবসর পান নাই। কোন এক অনিবার্য্য কারণে তাঁহাকে কয়েকমাস পরেই দেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহার বছর দুয়েক পরে তিনি আবার বিলাত যাত্রা করেন। সেবার তিনি প্যারিস সহরে জর্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান, বেল্‌জিয়ান্‌ ও অন্যান্য দেশের অনেক পালোয়ানের সহিত কুস্তি করেন, এবং প্রত্যেককেই মল্লক্ষেত্রে পরাজিত করেন। সেবারে এডিনবার্গ সহরে গোবর-বাবু ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান জিমি ইসনকে হারাইয়া "অল-ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নসিপ" পাইয়াছিলেন। জিমি ইসনের সহিত গোবর-বাবুর কুস্তির বিবরণ ভারতের দুই একখানি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল মাত্র। অন্য দেশ তাহাদের "বীর"কে যে সম্মান দিয়া থাকে আমাদের বাঙ্গালা দেশ গোবর-বাবুকে তাহার লক্ষাংশের এক অংশ সম্মানও দেখায় নাই কিংবা আদর করে নাই।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি আর কোথাও যান নাই। গত বৎসর গোবর বাবু মার্কিণ যাত্রা করিয়াছেন। মার্কিণে তিনি এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় কুস্তি করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটিতেই জয়লাভ করিয়াছেন। সেখানে তিনি জগদ্বিখ্যাত মল্ল গচকে হারাইয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি আমরা সানফ্রান্‌সিস্কোনগরের একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, গোবর বাবু পৃথিবীর "লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন" এ্যাড স্যান্টেলকে হারাইয়া দিয়া "লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দি ওয়ার্ল্ড" আখ্যা পাইয়াছেন। দুর্ব্বল মসীজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে এই সম্মান সামান্য নহে। গোবর বাবু শীঘ্রই ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মল্ল "হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দি ওয়ার্ল্ড" ষ্ট্রাংলারের সহিত কুস্তি লড়িবেন। এই কুস্তিতে জিতিলে তিনিও ঐ উপাধি পাইবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, গোবর-বাবুর এই কুস্তির খবর ইংরেজি কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। ইহার কি কোন কারণ আছে?

—হিন্দুস্থান।

বাংলার ভবিষ্যতের ভরসা—

সতীন্দ্রনাথ গুহ ব্রজমোহন কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র। নগদ ৮৫০ টাকা নিয়ে সে কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে স্বীকৃত হয়। বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে সে দেখে যে দানসামগ্রীর মাঝে টেবিল চেয়ার নেই—এতে খাপ্পা হয়ে উঠে সে বিবাহে অমত জানায়। তার বাপ যখন অনেক অনুরোধ করেও তাকে সম্মত করতে পারলে না, তখন অনন্যোপায় হয়ে কন্যার মাতুল তাকে চেয়ার টেবিল দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন, সতীন্দ্র তখন খোস মেজাজে বিয়ে করতে রাজী হয়।

ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাংলার তরুণদের এতটা হীনতার পরিচয় পেলে আমাদের সত্যিই বড় কান্না পায়। বাংলার সতীন্দ্র একটিমাত্র নয়—রকম-ফের এমন কত সতীন্দ্র প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে। এতখানি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে কি বড় হওয়া যায়?—বিজলী।

যুবক পুত্র সমাজের শুচিতা-রক্ষায় যত্নবান। জননী বিধবা-বিবাহ-সংশ্লিষ্ট এক আত্মীয়ের গৃহে দিন কত থাকতে বাধ্য হন। পুত্র তাই মায়ের সংশ্রব ত্যাগ করেন। মায়ের প্রাণ তাতে বেদনায় ভরে উঠে। কিছুদিন পৃথক থেকে শেষটায় অভিমান ত্যাগ করে' একদিন পুত্রের গৃহে প্রবেশ করেন। পুত্র হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করেন, সমাজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন!

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত যে সম্প্রদায়, তারই এক যুবকের এই কীর্ত্তি! বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

—বিজলী।

হিন্দু-মুসলমান-মিলন—

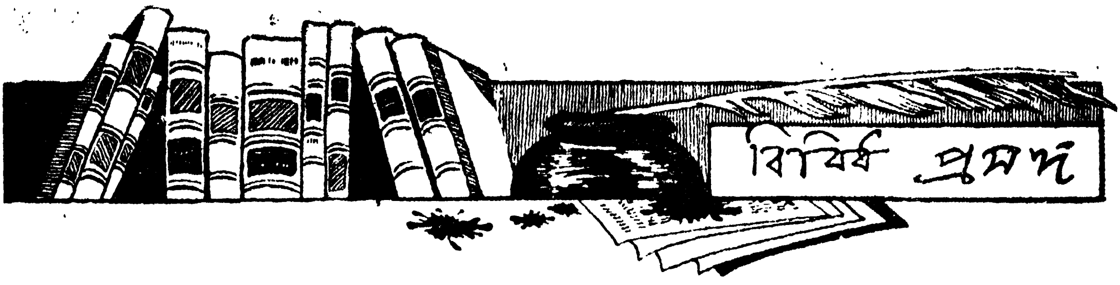
আমরা অবগত হইলাম কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পীর বাদশা মিঞাকে একসঙ্গে হাতকড়ি লাগাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী-গাড়ীতে করিয়া আলিপুর জেলে পাঠান হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টও দেখিতেছি একই রজ্জুতে হিন্দু-মুসলমানের দুইজন নেতাকে বন্ধন করিয়া হিন্দু মুসলমান সম্মিলনের অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রদর্শন করিলেন! বন্দীদ্বয় সহযাত্রীদিগকে অসহযোগের তত্ত্বকথা শিক্ষা দিতে দিতে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনেই অসংখ্য দর্শক সমবেত হইয়া বন্দীদ্বয়কে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট অসহযোগের বীজ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল!

—আনন্দপত্রিকা।

দেশের জন্য আত্মবলি—

এদেশে পেট্রিয়টিজ্‌ম এতদিন ছিল অবসরকালে চিত্তবিনোদনের সভ্যতানুমোদিত একটা পন্থা মাত্র। সখ হিসাবে, খেয়ালের বশে সোহাগে কেত্তন গেয়ে এতদিন দেশসেবার কাজ মৃদুমন্দ চলেছিল। আজ কিন্তু হাওয়া বদলে গেছে। দেশের কাজে সর্ব্বস্ব নিয়োগ করবার লোক বাংলায় দেখা দিয়েচে। এঁদের নিষ্ঠায় এঁদের তপঃশক্তিতে দেশপ্রীতির বান ডাকচে বলেই আশা করা যায়। যতীন্দ্র-মোহন ও তাঁর সহকর্ম্মীরা সত্য বলে যা বিশ্বাস করেছিলেন, যা ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন তা পালনের জন্য আইনের নাগপাশে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েচেন। দেশ-সেবার পন্থা নিয়ে এঁদের সঙ্গে মনের অমিল থাকলেও এঁদের ত্যাগের দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ। মায়ের চরণে যাঁরা স্বার্থবলি দিয়েচেন অহং ভুলে যাঁরা বহুকে আলিঙ্গন করেচেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ না করে আমরা থাকতে পারি না। বাংলায় একদিন বারো শ অন্তরীণ আবদ্ধ যুবকের স্বার্থত্যাগ কেঁদে কেঁদে বিফল হয়ে ফিরেছিল। আজকাল কর্ম্মীদের আত্মদান যেন বহু দেশপ্রেমিকের, অসংখ্য শক্তিমান কর্ম্মীর সৃষ্টি করে, আত্মসুখ-লোলুপ মনকে দেশের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে, মাতৃসেবকের ত্যাগ যেন সার্থক হয়।—বিজলী।

সেবক।



স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য হইবার যোগ্য

স্বাধীনতাই যে প্রত্যেক জাতির একমাত্র রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হইবার যোগ্য, তাহা আমরা আশ্বিনের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। এই মতের সমর্থক আরও কয়েকটি কথা আমরা বলিতে চাই।

একটি গ্রাম বলিতে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝি একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড যাহার অংশগুলি অব্যবহিতভাবে পরস্পরের সন্নিহিত। এমন গ্রাম পৃথিবীতে কোথাও নাই, যে, তাহার একটি অংশ এক জায়গায় এবং অপর অংশ বা অংশসমূহ উহা হইতে বিশ পঁচিশ, শত, বা হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শহর সম্বন্ধেও একথা খাটে। পৃথিবীর অল্প-সংখ্যক শহরের এক অংশ কোন নদীর এক তটে, ও অন্য অংশ তাহার পরপারে অবস্থিত আছে বটে; কিন্তু এরূপ শহর কোথাও নাই, যাহার কোন অংশ অন্য অংশগুলি হইতে বহুদূরে স্থিত, এবং যাহাদের মধ্যে অন্য বহু গ্রাম, নগর বা দেশ আছে। জেলা প্রদেশ ও দেশের সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে, যে, গ্রাম নগর জেলা প্রদেশ ও দেশের ভৌগোলিক একত্বের স্বাভাবিক অর্থ এই, যে, ঐসকল ভূভাগের অংশগুলি অব্যবহিতভাবে পরস্পরসন্নিহিত। রাজ্য বলিতেও আমরা সচরাচর এক রাজা শাসক বা শাসনতন্ত্রের অধীন এক বা একাধিক পরস্পরসন্নিহিত ভূখণ্ড বুঝি।

সাম্রাজ্য বৃহত্তর জিনিষ। ইহা গ্রাম নগর জেলা প্রদেশ দেশের মত স্বাভাবিক না হইতে পারে, বহুদূরবর্ত্তী বহু ভূখণ্ড এক সাম্রাজ্যের অধীন হইতে পারে। কিন্তু এই অধীনতা কখনও স্থায়ী হইতে দেখা যায় নাই। প্রাচীনকালে রোমের সাম্রাজ্য বৃহত্তম ছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বৃহত্তম। ইহাও স্থায়ী হইবে না। ইহার ভৌগোলিক স্বাভাবিকত্ব নাই। এই সাম্রাজ্যের এক এক অংশ অন্য অংশগুলি হইতে অনেক হাজার মাইল দূরবর্ত্তী, এবং তাহাদের মাঝখানে বহু সাগর দেশ নদী পর্ব্বত আছে। এরূপ সাম্রাজ্যের যে একত্ব তাহা নিতান্তই কৃত্রিম, তাহা টিকিতে পারে না। এই কৃত্রিমতা-বশতঃই সাম্রাজ্য একবার ভাঙিলে আর জোড়া লাগে না, দেশ ভাঙিলে জোড়া লাগিতে পারে। পুরাকালের রোমক সাম্রাজ্য কত শতাব্দী হইল ভাঙিয়াছে, তাহার পর আর জোড়া লাগে নাই। কিন্তু পোলাণ্ডকে জার্ম্মেনী, রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছিল, তাহা জোড়া লাগিয়াছে। ইটালীর কোন কোন অংশ অষ্ট্রিয়া দখল করিয়াছিল, কিন্তু ইটালী আবার অখণ্ড হইয়াছে। সাম্রাজ্য টিকিতে পারে না; উহা অস্বাভাবিক। উহাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা বিফল হইবেই। সেইজন্য এক-সাম্রাজ্য-ভুক্ত নানা দেশ ও জাতির যত শীঘ্র সম্ভব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে বাস করিবার জন্য মৈত্রীর সহিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই চেষ্টা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা আর-একটি কারণে বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকা হইতেই তাহা বিশদ হইবে। ভারতকে নিজেদের অধীন রাখিবার জন্য ইংরেজদিগকে এদেশে আসবার পথ নিরাপদ ও নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিতে হইয়াছে। তাহার জন্য অন্য কতকগুলি জাতিকে বঞ্চিত করিয়া অনেক ভূখণ্ড ও দেশকে অধীন করিতে ও রাখিতে হইয়াছে। জিব্রাল্টার, মাল্টা, গোজো, সাইপ্রাস্, এডেন, সুয়েজ, মিশরদেশ, লঙ্কা দ্বীপ—ইহাদের কোনটিই ইংরেজের আদিম বাসভূমি নহে; ভারতের যাতায়াতের পথ নিরাপদ রাখিবার জন্য এগুলিকে ইংরেজরা অধীন করিয়া রাখিয়াছে। অন্যকে অধীন করিয়া রাখা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। এক অধর্ম্মের ফল স্থায়ীভাবে ভোগ করিবার নিমিত্ত, আরো এইসব অধর্ম্ম ইংরেজকে করিতে হইতেছে। গত মহাযুদ্ধেরও একটি প্রধান কারণ

ভারতবর্ষে আগমনের পথ নিরাপদ রাখিবার ইচ্ছা। জার্মেনী বাগ্দাদ রেলওয়ে দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে পশ্চিম এসিয়ার প্রভু কিম্বা প্রভাবশালী হইতে চেষ্টা করিতেছিল। জার্মেনীর এই চেষ্টা সফল হইলে ভারতের পথের মাঝখানে এক প্রবল কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিত। সে ধরাশায়ী হওয়ায় এখন ইংরেজ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের লোকদের কিম্বদন্তী লোকশ্রুতি অতীতস্মৃতি বা ঐতিহ্য এক নহে। আমাদের ও তাহাদের অতীত গৌরব ও লজ্জা, হর্ষ ও শোক, এক নহে। তাহাদের ও আমাদের সভ্যতা এবং হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা ও তাহাদের ফল এক প্রকারের নহে। জাতিতে, ধর্ম্মে, ও ভাষায় তাহারা ও আমরা এক নহি। তাহারা শীতপ্রধান দেশের এবং আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক। তাহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহপ্রণালী, পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা, রীতিনীতি আচারব্যবহার ও প্রথা, পরিচ্ছদ ও আহার, আমাদের হইতে অনেকটা ভিন্ন রকমের। স্বভাবতঃ এই পার্থক্য থাকিবে। এইসব কারণে তাহাদের ও আমাদের একসাম্রাজ্যভুক্ত থাকা স্বাভাবিক নহে। আমরা উভয়জাতি পরস্পরের সহিত বিরোধ না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বাস করিবার জন্য যদি প্রস্তুত হই, তবে তাহা সুফলপ্রদ হইবে। ইহার বিপরীত চেষ্টা সফল হইবে না, এবং তাহাতে সুফলও ফলিবে না।

এমন কতকগুলি দেশ ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত আছে, যাহাদের অধিবাসীরা প্রধানতঃ বা বহুপরিমাণে ব্রিটিশবংশোভূত ও ঔপনিবেশিক। এইজন্য এগুলি ইংলণ্ড হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইলেও ইহাদের ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবার যে কারণ আছে, ভারতবর্ষের ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবার সে কারণ নাই। কিন্তু ইহারা ভারতবর্ষের মত ইংলণ্ডের অধীন নহে; ইহাদের অভ্যন্তরীন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব আছে, এবং পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধেও ইহারা ইংলণ্ডের সহিত সমান ক্ষমতা চাহিতেছে ও অনেকটা পাইয়াছে। কানাডা ইতিমধ্যেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিজের দূত রাখিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত এইসব দেশ ভারতের মত ইংলণ্ডের অধীন না হইলেও ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে চায়। কানাডার স্বতন্ত্রতালিপ্স লোকদের সংখ্যা খুব বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ দল খুব প্রবল ও তথাকার পার্লেমেণ্টেও স্বাধীনতালিপ্সু দল আছে। নিউজীল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র দ্বীপও স্বতন্ত্র হইতে চায়।

কানাডার প্রাচীন আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা এখন আর বেশী নহে, শ্বেতকায়েরা তাহাদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছে। কিন্তু তথাকার ফরাসীবংশোদ্ভূত লোকদের সংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবার ইচ্ছা না থাকিবারই কথা। নিউজীল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদিগকেও শ্বেতকায়েরা প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছে, কিন্তু তথাকার ব্রিটিশজাতীয়দের মধ্যেও অনেকে স্বতন্ত্র হইতে চায়। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতাপ্রার্থীরা প্রধানতঃ বুঅর অর্থাৎ ওলন্দাজজাতীয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার এবং আফ্রিকার সর্ব্বত্রই শ্বেতকায়েরা সংখ্যায় কম, কৃষ্ণকায়েরাই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ; শ্বেতকায়েরা তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই বা করে নাই। জগতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণকায়েরা জাগিতেছে। যাহারা জাগিয়াছে, তাহারা স্বাধীন হইতে চায়; পরে সকলেই জাগিয়া স্বাধীন হইতে চাহিবে। তখন আফ্রিকায় ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য টিকিবে না; শ্বেতকৃষ্ণে মিত্রসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় ও তাহা টিকিতে পারে।

আর-একটি গুরুতর কারণে ভারতবর্ষের ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষের বহুশতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে দেখা যায় যে এই দেশ কখন বৈদেশিক সাম্রাজ্যকামী কিম্বা বৈদেশিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিল না। ভারতবর্ষীয়েরা জাভা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এইসব উপনিবেশ ভারতবর্ষ হইতে শাসিত হইত না, তাহারা কোন ভারতীয় সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না, তাহারা স্বতন্ত্র ছিল। কি কারণে এরূপ ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। দূরবর্ত্তী বিদেশে ভারতের কখন কোন সাম্রাজ্য ছিল না, কেবল এই তথ্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি। অতীতকালে যেমন ভারতবর্ষের কোন বৈদেশিক সাম্রাজ্য ছিল না, ভবিষ্যতেও তেমনি না হইবারই কথা। কারণ সুদীর্ঘ ভারতেতিহাসে ভারতীয় জাতীয় বিশেষত্বের

যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষ কোন কালে বৈদেশিক সাম্রাজ্যস্থাপক ও শাসক ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড কিন্তু বৈদেশিক সাম্রাজ্যস্থাপক ও শাসক; অধিকন্তু ব্রিটীশসাম্রাজ্যবহির্ভূত অনেক দেশকে ইংলণ্ড বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কতকটা নিজের কর্তৃত্বাধীন রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ অতীত কালে কখন ইহা করে নাই, ভবিষ্যতেও করিবে না, অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, আমরা বৈদেশিক সব জাতির সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিবার উপযুক্ত; কারণ আমরা পরদেশ জয় করিতে বা বাণিজ্যব্যপদেশে তাহার ধন লুণ্ঠন করিতে চাই না। অবশ্য যদি কোন বিদেশী জাতি আততায়ী হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, অধীন করিতে চায়, কিংবা বাণিজ্যব্যপদেশে আমাদের ধন অপহরণ করিতে চায়, তবে তাহাদিগকে নিরস্ত করা পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত বিরোধ চলিতে পারে; কিন্তু আমরা গায়ে পড়িয়া কাহারও সহিত ঝগড়া বাধাইব না।

কিন্তু ইংলণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনার্থ বহু পরদেশকে নিজের অধীন করিয়াছে, নিজের বাণিজ্যের বিস্তার করিবার নিমিত্ত নানাদেশকে স্বার্থসাধনের বিষয়ীভূত করিয়া দরিদ্র করিয়াছে ও নিজে ধনী হইয়াছে। এই কারণে ইংলণ্ডের কবলিত দেশ অনেক, শত্রু অনেক, প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক, তাহার ঈর্ষা করে অনেকে। ইংলণ্ডের মত দেশের সহিত যদি ভারতবর্ষ একসাম্রাজ্যভুক্ত থাকে, তাহা হইলে ভারতকে ইংলণ্ডের শত্রু ও প্রতিযোগীদিগকে নিজের শত্রু ও প্রতিযোগী মনে করিতে হইবে, সত্য সত্য মনে না করিলেও শত্রু ও প্রতিযোগীর মত ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা কিন্তু ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত হইবে না, বরং অন্যায় অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক হইবে, বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলিয়াই কোন জাতিকে, তাহারা আমাদের কোন অনিষ্ট না করিলেও, আমাদেরও শত্রুজ্ঞানে তদ্বৎ আচরণ করিতে বাধ্য হওয়া আমাদের পক্ষে অপমানকর ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ইহা আর্থিক অপব্যয় ও সর্ব্বনাশেরও কারণ। স্বাধীন জাতিরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয় করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষকে নিজের জন্য যত হউক বা না হউক ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রভূত যুদ্ধব্যয় করিতে হইয়াছে। ইহাতে ভারতের দারিদ্র্য ঘটিয়াছে, শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষিশিল্পাদির জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করিতে পারা যায় নাই, এবং ভারতবর্ষ ঋণভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হোমরুল নামে অভিহিত স্বরাজ পাইলেও তাহাকে এই প্রকারের যুদ্ধব্যয়ভারপ্রপীড়িত থাকিতে হইবে।

হোমরুল মানে দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়-সকলে জাতীয় কর্তৃত্ব। কিন্তু এরূপ স্বরাজ দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক জাতি কর্তৃক নিজ নিজ শাসনপ্রণালী-নির্ব্বাচন নীতি (principle of self-determination) অনুসারে কাজ হইতে পারে না। বিদেশীজাতির সহিত সমুদয় সম্পর্ক স্বয়ং নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত করিতে না পারিলে আমাদের পক্ষে হোমরুল নামে মাত্র স্বরাজ হইবে। পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ যদি প্রধানতঃ প্রবল পক্ষ ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশগুলি দ্বারা নিয়মিত হয়, এবং তজ্জন্য আমরা যদি ইংলণ্ডের খাতিরে যুদ্ধ করিতে এবং বৃহৎ সৈন্যদল ও তদনুরূপ যুদ্ধসম্ভারের আয়োজন রাখিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে আমাদের স্বরাজ কোন্ কাজে লাগিবে? সৈনিক বিভাগই এখনকার মত আমাদের রাজস্বের অধিকাংশ খাইয়া ফেলিবে, এবং এখনকারই মত আমরা শিক্ষাস্বাস্থ্যকৃষিশিল্পাদির উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ থাকিব।

ইংলণ্ড প্রবল পক্ষ; উপনিবেশগুলির সহিত একমত হইলে ত কথাই নাই। ইংলণ্ড চান নিজের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যবিষয়ে সাম্রাজ্যিক সুবিধা (imperial preference), অর্থাৎ বিদেশী জিনিষ আমদানী করিতে হইলে ভারতবর্ষ বিলাতী জিনিসের উপর যত শুল্ক বসাইবে, অন্য বিদেশী জিনিসের উপর তাহা অপেক্ষা বেশী শুল্ক বসাইবে। সকলেই জানেন বিলাতী জিনিষের চেয়ে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) জার্ম্মেন জিনিষ সস্তা; জার্ম্মেন জিনিষ নিকৃষ্টও নহে। কিন্তু সাম্রাজিক-সুবিধা-প্রদান নীতি অনুসৃত হইলে এদেশে আমদানী জার্ম্মেন জিনিষকে শুল্ক চাপাইয়া অন্ততঃ বিলাতীর সমান মহার্ঘ করিতে হইবে,—সম্ভবতঃ অধিক মহার্ঘ করিতে হইবে। ইহাতে

ভারতবাসীদের লোক্সান, কারণ তাহারা সস্তায় প্রয়োজনীয় বিদেশী জিনিষ পাইবে না। একথা উঠিতে পারে বটে, যে, বিদেশী আম্‌দানী জিনিষের উপর ট্যাক্স্ বসাইলে তাহা মহার্ঘ হওয়ার দরুন আমরা সেইসব জিনিষ ভারতে উৎপন্ন করিবার সুবিধা পাইব। কিন্তু বাস্তবিক কি ঘটিতেছে দেখুন। শিল্পবাণিজ্যে অপটু বাঙালীর কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যে কাপড়ের ব্যবসায়ে পার্সী ও গুজরাটীরা এত অগ্রসর তাহারাও বিলাতী সুতা ও কাপড়ের আম্‌দানী বন্ধ করিতে পারে নাই, এখনও ষাট কোটি টাকার বিদেশী কাপড় এদেশে আসে, এবং আম্‌দানী কাপড়ের উপর ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিলাতী বস্ত্রব্যবসায়ীরা ঘোরতর আন্দোলন চালাইতেছে।

সাম্রাজ্যিক সুবিধাপ্রদান নীতি অনুসারে কোন ভারতীয় দ্রব্য ইংলণ্ডে বা তাহার কোন উপনিবেশে রপ্তানী হইলে তাহার উপর যে শুল্ক বসিবে, অন্য কোন পরদেশে গেলে তদপেক্ষা বেশী ট্যাক্স বসিবে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের কোন কাঁচা মাল ইংলণ্ড কিনিলে তাহাকে রপ্তানীট্যাক্সসমেত যত মূল্য দিতে হইবে, জার্মেনীকে তার চেয়ে বেশী দাম দিতে হইবে, কারণ রপ্তানী শুল্ক জার্মেনীর বেলায় বেশী হইবে। জিনিষের দাম বাড়িলে তাহার ক্রেতা কমিবার সম্ভাবনা। ক্রেতা কমিলে জিনিষ সস্তা হইতে পারে। ভারতীয় কাঁচা মালের ক্রেতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে কমিলে, তাহার দাম কমিবে, ও তাহাতে ব্রিটিশ ক্রেতাদের সুবিধা ও লাভ হইবে; কিন্তু কাঁচা মালের উৎপাদক ভারতীয়েরা তাহাদের জিনিষের জন্য কম টাকা পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিলে, আমাদিগকে কেবল যে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য এখনকার মত অত্যধিক যুদ্ধব্যয়ই করিতে হইবে তাহা নয়, ব্যবসায়ে সাম্রাজ্যিক সুবিধা প্রদান নিমিত্ত আমাদিগকে আম্‌দানী রপ্তানী দুই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এই প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতেও আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ে বাধা জন্মিবে এবং আমরা দরিদ্র থাকিয়া যাইব।

ভারতে রেলওয়ে-বিস্তার নীতি ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষার ইচ্ছা দ্বারা যতটা প্রণোদিত, ভারতবর্ষের কল্যাণকামনা দ্বারা ততটা প্রণোদিত নহে। ইহাতেও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে আমাদের খুব ক্ষতি হইয়াছে। কোন প্রকারের হোমরুলজাতীয় স্বরাজের দ্বারা এরূপ রেলওয়ে-নীতির মূলোচ্ছেদ হইবে কি?

আমাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হওয়া যে আবশ্যক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, ব্রিটিশ-ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে শয়তানী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার একান্ত প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের শাসক ইংরেজেরা তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টকে যত ভালই প্রমাণ করুন না, তাহা দ্বারা, ভারতের চরম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রভেদ হইবে না। আমরা অবশ্য ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দোষ নিখুঁত দেবতার গবর্ণমেণ্ট মনে করি না। কিন্তু যদি ইহা প্রমাণও হয় যে, এই গবর্ণমেণ্ট দেবতার গবর্ণমেণ্ট, ইহার শাসনপ্রণালীটি কেবল ভারতের কল্যাণকামনায় উদ্ভাবিত, শাসকেরা নিঃস্বার্থ মানবহিতৈষী কর্ম্মীর দল, তাহা হইলেও আমাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার প্রয়োজন থাকিবে। মানবীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রথা কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির বৈধতা ও ন্যায্যতা কেবল এই বলিয়া প্রতিপাদন করা যায়, যে, তদ্দ্বারা মানুষ মানুষের মত হইবার ও জীবন যাপন করিবার সাহায্য পায়। মানবের সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ এই যে, সে—বিধিনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে—নিজের বাহ্য ও আন্তরিক জীবনের নিয়ামক ও প্রভু হইতে পারে। সেইজন্য যদি কোন বিদেশী জাতির অধীনতা আমাদিগকে স্বাধীন অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্ন বস্ত্র ঘরবাড়ী গ্রাম নগর রাস্তা ঘাট যান বাহন পুস্তক বিদ্যালয় প্রভৃতির সুবিধা দেয়, তাহা হইলেও এই অবস্থা মানবের আদর্শ জীবন অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবে। সেই জীবনই আদর্শ জীবন, যাহা আমরা নিজে নির্ব্বাচন করিয়া নিজের শক্তিতে অর্জ্জন ও রক্ষা করিতে এবং নিজে নিয়মিত করিতে পারি। জীবনের কোন্ আদর্শ ও অবস্থা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা করিতে হইলে, এই দিক্ দিয়াই করিতে হয়। যে আদর্শ মানুষকে আত্মকর্তৃত্ব দেয়, আত্মনিয়ামক করে, তাহাই উৎকৃষ্ট। অন্য কোন আদর্শে ও অবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। অধীনতাতেও সম্ভব যে-অবস্থার উল্লেখ উপরে করিয়াছি,

তাহা আপাততঃ আরাম ও কার্য্যসৌকর্য্যের দিক্ দিয়া সুবিধাজনক হইলেও, তাহা অন্যের সুবিধা ও অনুগ্রহ সাপেক্ষ, সুতরাং সে আরাম ও কার্য্যসৌকর্য্য মনুষ্যত্বের অপমানকর ও আত্মমর্য্যাদানাশক; অধিকন্তু উহার স্থায়িত্বও আমাদের আয়ত্তাধীন নহে।

আমরা যে-দিক্ দিয়া জীবনের আদর্শ ও অবস্থার বিচার করিলাম, সেই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, বরং স্বাধীন জাতীয়-জীবনের মোটা ভাত কাপড় অনাড়ম্বর ঘর বাড়ী ও সেকেলে যান বাহন ভাল, তবু অধীন অবস্থার পূর্ব্ববর্ণিত আরাম ও কার্য্যসৌকর্য্য বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু স্বাধীনতার ও অধীনতার সহিত জড়িত জীবনের যে দুইপ্রকার বিপরীত অবস্থা আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কল্পনা করিয়াছি, তাহা সব স্থলে বাস্তব না হইতে পারে, অবশ্যম্ভাবী ত নহেই। স্বাধীন এমন জাতি আছে, যেমন আফ্‌গানেরা, যাহাদের ঘর বাড়ী খাদ্য পোষাক যান বাহন আধুনিক উৎকৃষ্ট রকমের নহে। কিন্তু অধিকাংশ স্বাধীন জাতির বাহ্য ঐশ্বর্য্য আরাম স্বাস্থ্য কার্য্যসৌকর্য্য অধিকাংশ পরাধীন জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

স্বাধীনতার একটি সুবিধা এই, যে, যে মুহূর্ত্তে স্বাধীন জাতি উন্নতিকামী হয়, তৎক্ষণাৎ সে উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং শীঘ্রই সে পথে বহুদূর অগ্রসর হয়। যখন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জাপান আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয়শক্তি ও সুবিধার সমুদয় উপায় অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, তখন ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ এক শতাব্দীরও অধিক কাল পাশ্চাত্য এক জাতির অধীনতায় যাপন করিয়াছে। কিন্তু এখন ভারতবর্ষ ও জাপানের অবস্থার তুলনা করুন। শক্তিতে, ধনে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, কৃষিতে, শিল্পে, জাপান ভারতবর্ষকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। এই তারতম্যের প্রধান কারণ জাপানের স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষের পরাধীনতা।

আফ্‌গানীস্তানের আমীর ও আফ্‌গানজাতি সম্প্রতি সভ্যতায় অন্য সব জাতির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। শক্তি ত তাঁহাদের আছেই; উহা বাড়িতেছে ও আরো বাড়িবে। শিক্ষা শিল্প প্রভৃতিতেও কাবুলীরা উন্নতি করিতেছে। কাবুলের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ শত নারী বিদ্যালাভ করিতেছে। ভারতবর্ষে এরূপ কোন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি? সম্ভবতঃ আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আফ্‌গানেরা নানাবিষয়ে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে—যদি ইতিমধ্যে আমরা সম্পূর্ণ জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া স্বনির্দ্দিষ্ট উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে না পারি।

ইউরোপ আমেরিকার স্বাধীন জাতিরা স্বাধীন ত বটেই, অধিকন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান কল-কারখানা আরাম কার্য্যসৌকর্য্য প্রভৃতিও তাহাদের আছে। এশিয়ায় জাপানের সম্বন্ধেও একথা খাটে। আফ্‌গানীস্তানও "আধুনিক" হইতে চলিল। চীন আধুনিক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এশিয়ায় স্বাধীন জাতি হইলেই যে তাহাদিগকে "সেকেলে" থাকিতে হইবে, তাহারা "আধুনিক" হইতে পারিবে না, এমন নয়। কেবল বিদেশের দৃষ্টান্ত দ্বারাই যে ইহা বুঝা যায়, তাহা নয়। ভারতবর্ষেরও অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, যে, এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন তাহারা তৎকালীন অন্য কোন স্বাধীন দেশ অপেক্ষা বাহ্য বিষয়ে ও অন্তরে কম সভ্য ছিল না। সুতরাং আমরা যদি অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে সেই ভবিষ্যৎ-কালের অন্য স্বাধীন দেশের লোকদের সমান সভ্য হইব, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও ভারতের কোন কোন দেশী রাজ্য কোন কোন বিষয়ে ব্রিটিশভারত অপেক্ষা অগ্রসর।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অধীনতার অবস্থা। কিন্তু আমরা অধীনতার সঙ্গে যে উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিচ্ছদ ঘর বাড়ী রাস্তা ঘাট যান বাহন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির অস্তিত্ব পূর্ব্বে ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহা আমাদের নাই। কিন্তু যদি থাকিত, তাহা হইলেও আমরা অধীনতায় সায় দিতাম না ও সন্তুষ্ট থাকিতাম না। মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন স্বাধীনতাই যদি না রহিল, তাহা হইলে বাহিরের জিনিষ ও বাহিরের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত লইয়া কি করিব?

অতএব আমরা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকেই আমাদের চরম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য করিব। এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে বটে, যে, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিলে সংকীর্ণতা কমে, অনেকের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঘরকন্না করিতে হয় বলিয়া উদারতা জন্মে, দশজনের সহিত সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে নানাবিধ শিক্ষা হয়। দু দশটা সমান সমান জাতি যদি একত্র মিলিয়া একটা

সাম্রাজ্য গাড়িয়া তাহাতে বাস করে, তাহা হইলে এই সব সুফল ফলিতে পারে বটে। কিন্তু সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ কর্ত্তা, কোন কোন অংশ গোলাম, এরূপ হইলে ওসব সুফল ফলে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ-গুলির সংকীর্ণতা খুব বেশী। আমরাও উল্লিখিত কোন সুফলভাগী হই নাই। পক্ষান্তরে অনেক স্বাধীন জাতি কোন সাম্রাজ্যের স্থাপক বা কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত না হইলেও উদার-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় অন্ততঃ ইংরেজদের সমান অগ্রসর।

—

স্বাধীনতার মূল্য

স্বাধীনতা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কেবল তাহার বিষয়ে লিখিলে ও বক্তৃতা করিলে তাহা অর্জ্জন করা যায় না, বা তাহা রক্ষা করা যায় না। তাহার মূল্য দিতে হয়। তাহার মূল্য জীবন। ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে, যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু আমরা এ অর্থে প্রাণকে স্বাধীনতার মূল্য বলিতেছি না; কারণ সশস্ত্র যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতালাভের পথ নহে। আর-এক অর্থ এই, যে, যদি স্বাধীনতালাভের জন্য অহিংসাত্মক দ্বেষরহিত উপায় অবলম্বন করিয়াও রাজদ্বারে কোন কারণে কোন আইন অনুসারে কাহাকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, তাহার জন্যও স্বাধীনতালিপ্সুকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা আমাদের অভিপ্রেত একটি অর্থ বটে। আর-একটি অর্থ আছে, যাহা সচরাচর লোকে মনে রাখে না। তাহা এই, যে, স্বাধীনতার জন্য কেবল যে মরিতে হইতে পারে, তাহা নহে, বাঁচিয়া থাকাটাও স্বাধীনতার জন্য হওয়া চাই।

আমরা যে বাঁচিয়া আছি, জীবন ধারণ করিতেছি, তাহা আরামের জন্য, ধনদৌলত বিলাসের জন্য হওয়া উচিত নহে। যে-ভাবে চিন্তা করিব, যে-ভাবে কথা বলিব, বক্তৃতা করিব, যাহা লিখিব, যে-ভাবে কাজ করিব,—সমস্ত, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, স্বাধীনতার পোষক, স্বাধীনতালাভের সহায়ক হওয়া চাই।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, স্বাধীন জাতিরা যেমন নিজ নিজ দেশ রক্ষার জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রাণ দিতে প্রস্তুত, স্বাধীন অবস্থায় ও তৎপূর্ব্বে আমাদিগকেও তেমনি প্রস্তুত হইতে হইবে। পৃথিবীর যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির লোকসংখ্যা বাংলা দেশের ২১৲টা মাত্র জেলার সমান, তাহারাও আক্রান্ত হইলে বিনাযুদ্ধে স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে রাজী হয় নাই, হইবে না। মৈমনসিংহ জেলার লোক-সংখ্যা ৪৫ লক্ষের উপর, ঢাকায় ২৯ লক্ষের উপর, মেদিনী-পুরের ২৮ লক্ষের উপর, চব্বিশপরগনার ২৪ লক্ষের উপর। হুইটেকারের পঞ্জিকা অনুসারে আবিসিনিয়ার লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ, আফ্‌গানিস্তানের ৫০ লক্ষ, আলবেনিয়ার ২০, আর্জেন্টিনার ৮০, বেলজিয়ামের ৭৫, বোলিভিয়ার ২৮, বুল্‌-গেরিয়ার ৫, চিলির ৩৮, কেলোম্বিয়ার ৫৫, ডেন্‌মার্কের ৩০, ইকোয়াডরের ২০, ফিন্‌ল্যাণ্ডের ৩৩, গ্রীসের ৫০, গোয়াটি-মালার ২০, লাইবিরিয়ার ২০, হল্যাণ্ডের ৬৭॥, নরওয়ের ২৬, পারাগোয়ের ৮, পেরুর ৩৫, পোর্টুগ্যালের ৬০, সাল্‌ভাডরের ১৩, শ্যামের ৮০, সুইডেনের ৬০, সুইজার্ল্যাণ্ডের ৪০, উরুগোয়ের ১৪ এবং ভেনিজুয়েলার ৩০ লক্ষ। এই সব দেশই স্বাধীন। ইহাদের অনেকের লোকসংখ্যা বাংলার একটি জেলার লোকসংখ্যা অপেক্ষা কম, কোনটিরই লোক-সংখ্যা বঙ্গের বৃহত্তম তিনটি জেলার সম্মিলিত লোকসংখ্যা অপেক্ষা বেশী নহে। তাহারা যে যে কারণে ও গুণে স্বাধীন, আমাদের দেশের ও জাতির তাহা না থাকায় আমরা পরাধীন। কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই সব গুণ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। চেষ্টা করিলে সকলেই স্বাধীনতার অনুকূল গুণগুলিকে প্রবল ও সুপুষ্ট করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে চাই এই বিশ্বাস, যে, স্বাধীনতা-বিহীন জীবন জীবনই নহে; তাহার পর চাই, স্বাধীনতা লাভের জন্য অদম্য আজীবন আমরণ আকাঙ্ক্ষা। তাহার পর চাই, সাহস ও নির্ভীকতা, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আত্ম-মর্য্যাদাবোধ, নিঃস্বার্থতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, জাতিবর্ণশ্রেণী নির্ব্বিশেষে সদ্ভাব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, নির্ম্মল চরিত্র, সত্যবাদিতা, সততা, শ্রমশীলতা, সময়নিষ্ঠা, সুশিক্ষা, এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের জ্ঞান।

স্বাধীনতা কখন পাইব ?

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমরা স্বাধীনতা কখন পাইব ? তাহার উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ। স্বাধীনতা বাহিরের একটা কোন জড় পদার্থ নহে, যে, কেহ উহা আমাদিগকে আনিয়া দিবে, কিম্বা আমরা উহা ছলে বলে কৌশলে কিম্বা ক্রয় বা ভিক্ষা দ্বারা উহা পাইব। যে-সব জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে, তাহারাও এখন সব বিষয়ে স্বাধীন হইতে পারে নাই, ক্রমশঃ হইতেছে বা হইবে। আমরাও যদি বা হঠাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, যাহার সম্ভাবনা কম, তথাপি পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদিগকেও ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় অর্জ্জন করিতে হইবে। শিল্পবাণিজ্যে ও তাহার সহায় জলপথ স্থলপথ আকাশপথে যানবাহনের ব্যবস্থায়, নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানে, ধর্ম্মবিশ্বাসে ও ধর্ম্মালোচনায় এবং সমাজনীতির ও সামাজিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, ক্রমে ক্রমে স্বকীয় চেষ্টায় লাভ করিতে হইবে।

স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক দলাদলি

অনেকে মনে করেন, কেবল মাত্র চরমপন্থী ও অসহযোগীরাই স্বাধীনতা চান, এবং তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়েই স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। ঐ উপায়ে যে স্বাধীনতা পাইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যাঁহারা মধ্যপন্থী, নরমপন্থী, উদারনৈতিক, বা মডারেট নামে অভিহিত, তাঁহারা আপাততঃ যাহা চাহিতেছেন, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও, তাঁহাদের অনেকের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহারা এখন যাহা চাহিতেছেন, তাহা স্বাধীনতা পাইবার একটা ধাপ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এইজন্য, তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার উল্টা দিকে যাইতেছেন, মনে করি না। তাঁহাদের সভা-সমিতিকে গোলাম-সভা বা অন্য কোন অপমানকর নাম দ্বারা অভিহিত করিবার পক্ষপাতী আমরা নহি। দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য যিনি যে উপায় অবলম্বন করা ভাল মনে করেন করুন। আমাদের বিবেচনায় কাহারো ভ্রম হইলে তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে, তাঁহাকে পরিহাস বিদ্রূপ করিতে পারা যায়, কিন্তু অপমানকর কিছু বলা অনুচিত।

শেষ লক্ষ্য ও হাতের কাজ

শেষলক্ষ্য যে স্বাধীনতা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া, স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থাকিয়া, হাতের কাজে অবহেলা করিলে চলিবে না। স্বাধীনতার প্রয়োজন ও মূল্য বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য, জাতিকে স্বাধীনতাকামী করিবার জন্য, যাহা করা দরকার, সেরূপ কাজ চলিতে থাকুক, স্বাধীনতা পাইবার জন্য যাহা এখন হইতে করা দরকার তাহা করা হউক, স্বাধীনতা পাইবার পর উহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন এখন হইতে তাহার বিকাশ ও আয়োজন হউক; কিন্তু হাতের কাজে যেন অবহেলা না হয়। আমরা ইহাও যেন বিস্মৃত না হই, যে ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, ও জাতিগত ভাবে যাহারা অলস, অকর্ম্মণ্য, অনিপুণ, বিশ্বাসের অযোগ্য, যাহাদের কথার ঠিক নাই, যাহাদের সময়নিষ্ঠা নাই, যাহাদের দেহমন সুস্থ সবল দৃঢ় কষ্টসহিষ্ণু নহে, স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। আমাদের দেশের সব মানুষের সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত অভিজ্ঞতা আমাদের নাই; তাহা বলা উচিত নহে। কিন্তু নিজের গৃহস্থালী ও ব্যবসা চালাইতে গিয়া, সার্ব্বজনিক কাজের সঙ্গে অল্পস্বল্প যোগ রাখিয়া, এবং জাতীয় জীবনের নানাদিক্ লক্ষ্য করিয়া কেবল মাত্র বাংলা দেশে ও বাঙালীদের মধ্যে অনেক স্থলে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় না, যে, আমরা স্বাধীনতা চাই, কিম্বা আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা জন্মিয়াছে। কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া বাবু পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে আলস্যের ও শ্রমশীলতার মাত্রা কিরূপ সকলে ভাবিয়া দেখুন। বাংলা দেশের কৃষিক্ষেত্রের মজুর, কলকারখানার মজুর, শহরের কুলিমজুর, গৃহস্থ বাড়ীর চাকর, দারোয়ান চাপরাসী পেয়াদা, নৌকার মাঝি, রেলওয়ে ষ্টেশনের ও জাহাজঘাটার কুলি, কনষ্টেবল্, ফেরিওয়ালা, পান সরবৎ লেমনেড বরফ বিক্রেতা, মুদী ময়রা, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, মুচি, বস্ত্রবিক্রেতা,—এইসকলের কাজ বাঙালী কতজন করিতেছে, অবাঙালীই বা কতজন করিতেছে, তাহার হিসাব লউন। বড় বড় কারখানা বাঙালীর অতি অল্পই আছে। বঙ্গের প্রধান কারখানা পাটের কলগুলি ইংরেজদের; তৎসমুদয়ের দেশী

অংশীদার যত আছে, তাহার বেশীর ভাগ মাড়োয়ারী। প্রধান প্রধান ব্যবসা অবাঙালীর হাতে। কয়লার খনিগুলি বেশীর ভাগ ইংরেজ ও গুজরাটী প্রভৃতির হাতে। ছুতার মিস্ত্রীর কাজ চীনাদের হাতে গেল কেন? চীনারা ত বাংলা দেশকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া বাঙালী ছুতারদিগের হাত হইতে তাহাদের কাজ কাড়িয়া লয় নাই। চীনারা নৈপুণ্যে, শ্রমশীলতায় ও নির্ভরযোগ্যতায় দেশী ছুতারদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা বেশী কাজ ও ভাল কাজ পায়। তাহারা আলস্য করে না, ফাঁকি দেয় না, তাহাদের উপর চোখ না রাখিলেও কাজ করিতে থাকে, তাহাদের কারীগরী উচ্চতর, তাহারা খাটিতে পারে বেশী, এইজন্য তাহাদের জিত হইয়াছে। শ্রমের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর পরাজয়ের কারণ অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের আলস্য, শ্রমবিমুখতা, নৈপুণ্যের অল্পতা, ফাঁকি দিবার অভ্যাস, প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই ফাঁকি দেওয়া রোগ, চালাকির দ্বারা কিছু একটা করা যায় এই ধারণা, "উচ্চশিক্ষিত" বাবুদের মধ্যেও অনেকস্থলে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা মানুষ গড়িবেন, লোকে এই আশা করে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কাজে ফাঁকি দেন, কেহ কেহ অন্য অন্য গ্রন্থকারের জিনিষ নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন।

অনেকেই মাসিকপত্র পরিচালন ও পুস্তকপ্রকাশ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দেখিয়া থাকিবেন, ছাপাখানা, দপ্তরীখানা, ছবির ব্লকের কারখানা, কাহারো নিকট হইতে বিনা তাগিদে নিয়মিতরূপে সব কাজ পাইবার আশায় নিশ্চিন্ত থাকিবার জো নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এইসব কারখানার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ দোষী, বলিতেছি না। কিন্তু দেশের মানুষই এমন, যে, তাহাদের নিকট হইতে ঠিক্ সময়ে ঠিক্ কাজ পাওয়া কঠিন। মুচি, দরজী, ছুতার, কামার, স্যাক্রা, প্রভৃতিদের মধ্যে নিজের কথা রাখে খুব কম লোকে।

আমরাই ত স্বাধীন হইয়া দেশের সমস্ত বড় বড় কাজ চালাইব। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা দেশহিতকল্পে সভাসমিতি করেন, চাঁদা তোলেন, তাঁহারা কয়জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে অঙ্গীকৃত কাজ করেন, আপনা হইতে টাকার হিসাব দেন? বঙ্গের টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের পরিমাণ, অনেক তাগিদের পর, নানা টীকা টিপ্পনী কৈফিয়তের পর, কেবলমাত্র সাড়ে ছয় লাখ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; তাহারও কয়েক লাখ আবার স্থাবর সম্পত্তি। খরচ কত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সমস্ত সদ্ব্যয় কি না, এখনও জানিতে বাকী আছে। যদি বলা হইত, যে, গবর্ণমেণ্টের কোন তহবিলে ২৫ লাখ টাকা আছে, এবং তাহা ক্রমশঃ "শুকৃতি" বাদ দিতে দিতে ৬৷৷০ লাখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে না-জানি নানা কাগজে কত গালাগালিই বর্ষিত হইত।

গবর্ণমেণ্ট যে-সব লোককে মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য মনোনীত করেন, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাঁহারা স্বেচ্ছায় সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া নির্ব্বাচকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের কাজের বিচার করিলে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক লোকেই নিজের কর্ত্তব্য করেন। সকলে বা অধিকাংশ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে রাস্তাঘাট নর্দ্দামা আরও ভাল হইত ও থাকিত, এবং দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কিছু উন্নতি হইত।

স্বরাজ্য ও স্বাধীনতার মানে এ নয়, যে, ইংরেজের পরিবর্ত্তে দেশী কোন কোন শ্রেণীর কতকগুলি লোক প্রভু হইবে; মানে এই, যে, সকল শ্রেণীর লোকই যোগ্যতা অনুসারে দেশের কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মান্ধতা, সামাজিক গোঁড়ামি, দেশাচারের দাসত্ব ও জাত্যভিমান আছে, তাহাতে কি মনে হয় যে আমরা জাতি ধর্ম্ম স্ত্রীপুরুষ অনাচরণীয় অস্পৃশ্য নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দিতে প্রস্তুত? তাহা ত মনে হয় না। তাহা হইলে স্বরাজ্য ও স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে।

আমরা নিজেদের দোষ ভুলিয়া গিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত নহি; নিজেদের দোষও ভাল করিয়া জানি। প্রত্যেক মানুষকে নিজের গৃহস্থালী, ব্যবসা, বিষয়কর্ম্ম, আফিসের কাজ, প্রভৃতি ফেলিয়া "দেশের কাজ" "দেশের কাজ" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে বলিতেছি না। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে, ইহা বাস্তবিক পরার্থ হইতে ভিন্ন

নহে। প্রত্যেকে শ্রমশীল, সৎ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ, সুদক্ষ হইলে ব্যক্তিগত উন্নতি এবং জাতীয় উন্নতি উভয়ই হইতে পারে।

বস্তুতঃ স্বরাজ জিনিষটি ব্যক্তিগত জীবন হইতে স্বতন্ত্র নহে। রিপুকুলের, কুপ্রবৃত্তির, ব্যসন ও বিলাসলালসার শাসনকর্ত্তা ও প্রভু হইতে পারিলে, মানুষ স্বরাজ্য লাভ করে, নিজে নিজের রাজা হয়, আত্মকর্তৃত্ব পায়। জানি, স্বাধীন জাতির প্রত্যেক মানুষ এক-একটি দেবতা নহে। সেইজন্য, তাহারাও যে সকলে প্রকৃত স্বরাজ্য পাইয়াছে, ইহাও মনে করি না।

আমাদের যে-সব দোষ দুর্ব্বলতা, ত্রুটি ও বদ্‌গুণ আছে, অনেক স্বাধীন দেশের লোকদেরও তাহা আছে। ইহা হইতে সহজেই মনে হইতে পারে, যে, তাহারা যখন স্বাধীন আমরা তবে কেন স্বাধীন হইতে পারি না? ইহার উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। মানুষের দোষক্রটিগুলা যোগ্যতার শ্রেণীভুক্ত নহে, সেগুলা অযোগ্যতার পর্য্যায়ভুক্ত। সমান অযোগ্যতা বা ত্রুটি যাহাদের আছে, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে সমান না হইতে পারে। পঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎসিংহের একটা চোখ কাণা ছিল; তথাকার সেনাপতি হরি সিং নালুয়ার একটা হাত ছিল না। কিন্তু এইপ্রকার অঙ্গহীন প্রত্যেক লোক তাঁহাদের মত যোদ্ধা নহে। শিবাজী ও আকবর কতটুকু লেখাপড়া জানিতেন, সে বিষয়ে এখনও তর্কবিতর্ক হয়। কিন্তু কেতাবী শিক্ষায় তাঁহাদেরই মত অপণ্ডিত প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্রাজ্য স্থাপনে ও শাসনে তাঁহাদের সমকক্ষ নহে। বস্তুতঃ আমাদের যে-সব দোষ ত্রুটি আছে, স্বাধীন দেশের লোকদেরও সেইসব দোষ ত্রুটি থাকিলেই আমরা তাহাদের সমকক্ষ এরূপ মনে করা মহা ভ্রম। দেখিতে হইবে, যে, স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষণের নিমিত্ত যে-সব শক্তির ও গুণের, যে প্রকার যোগ্যতার আবশ্যক, আমরা তাহাতে তাহাদের সমান কি না। যদি সমান হই, বা পরে হইতে পারি, তবে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশা করিতে পারিব। সত্য কথা বলিতে গেলে বরং ইহাই বলিতে হয়, যে, তাহাদের চেয়ে আমাদের যোগ্যতা একটু বেশী হইলে তবে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব। সমতল রাস্তা দিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়া যত সহজ, পথের মাঝখানে এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত কেহ একটা বড় পাথর রাখিয়া দিলে তত সোজা হয় না; কারণ গাড়ীটাকে টানিয়া তাহার উপর তুলিয়া বাধাটাকে অতিক্রম করিতে হয়। বাধাটাকে অপসারিত করিতে পারিলেও হয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের রথ স্বাধীনতার পথে চালাইতে হইলে এই কথা মনে রাখিতে হইবে। স্বাধীন জাতিদের রথ সমতল পথে চলিতেছে; কেবল টানিলেই হইল। আমাদের পথের মাঝখানে বহুশতাব্দী ধরিয়া বাধা স্তূপাকার হইয়াছে। হয় সেই বাধাকে অপসারিত করিতে হইবে, নতুবা রথকে টানিয়া তাহার উপর উঠাইয়া তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। নদীর স্রোত যখন বাধাহীন নদীগর্ভ দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন অল্প জল থাকিলেও, স্রোতের বেগ অল্প থাকিলেও, প্রবাহ রক্ষিত হয়। কিন্তু নদীর মাঝখানে যদি চড়া পড়ে, যদি কেহ বাঁধ বাঁধিয়া দেয়, তাহা হইলে, প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়; পরে জল খুব বাড়িলে, স্রোতের বেগ বর্দ্ধিত হইলে, আবার প্রবাহ চলিতে থাকে। বাঁধ কাটিতে বা অপসারিত করিতে, চড়ার মধ্য দিয়া খাল কাটিতে বা সমস্তটা অপসারিত করিতে পারিলেও হয়। যাহাই হউক, ইহার জন্য, বাধাহীন নদীগর্ভে স্রোত প্রবাহিত হওয়া অপেক্ষা অধিক ও আলাদা অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। সেইজন্য বলিতেছি, আমাদের সাহস, বুদ্ধি, বিবেচনা, স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা, একতা, দলবদ্ধতা, জাতি ধর্ম্ম শ্রেণী স্ত্রী পুরুষ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রতিবেশী জ্ঞান ও সকলের প্রতি মমতাবোধ, দেশহিতৈষণা ও দেশের কল্যাণ-সাধনে একাগ্রতা, স্বাস্থ্য ও বল, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও নৈপুণ্য সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, স্বাধীন দেশের লোকদের অপেক্ষা অধিক হইলে তবে আমরা নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার আশা করিতে পারিব।

পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রায় ৭৪ বৎসর বয়সে প্রয়াগে তাঁহার দারাগঞ্জস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রয়াগ একজন অতি শ্রদ্ধাভাজন ও বিদ্বান্ অধিবাসী হারাইয়াছে



পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য।

তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা পশ্চিমে হইয়াছিল, এবং পশ্চিমেই তিনি সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের সংবাদ তিনি বরাবরই রাখিতেন, এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংশের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। তাঁহার সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ১৩১২ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। উহার লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় পরে উহা প্রবাসীর চিত্র সহ তৎপ্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। পণ্ডিত মহাশয় এলাহাবাদের গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অবসর পাইবার পর কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। প্রয়াগের মাহাত্ম্য ও প্রয়াগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ

জ্ঞান ছিল। প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত Prayag or Allahabad নামক পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশের প্রায় সমস্তটি তাঁহার লিখিত।

তিনি একজন সেকালের কংগ্রেসের লোক ছিলেন। একদা হিউম্ সাহেব তাঁহাকে কতকগুলি অতি গোপনীয় চিঠি পড়িবার নিমিত্ত দিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত ছাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, এবং অন্য কোন কোন সেকালের কংগ্রেস্‌ওয়ালা কখন কখন তাঁহার পরামর্শ লইতেন। দেশভক্তির বাহ্য আড়ম্বর তাঁহার ছিল না; প্রকৃত দেশভক্তি ও দেশহিতৈষণা তাঁহার ছিল। তাঁহার সহিত বহুবার কথোপকথনে ইহা আমরা বুঝিয়াছিলাম। গান্ধী মহাশয়কে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯০৮ সালে এলাহাবাদ ছাড়িবার পর যখনই আমরা এলাহাবাদ যাইতাম, কখন্ তাঁহার সহিত দেখা হইবে, ব্যগ্রতার সহিত সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতাম।

কর্ণেল অল্‌কটের আমলের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রাথমিক সভ্যদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। প্রথম প্রথম মিসেস্ বেসাণ্টের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল; পরে ছিল না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে নানা ধর্ম্মের লোক ছিলেন।

১৩১২ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে পণ্ডিতমহাশয়ের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস আছে। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার দ্বেষ নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন অনুরাগী ভক্ত। তিনি রাজাকে Prince of Bengalis বলিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার কোন কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, যে, তাঁহার মতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। যে-সকল ভারতবর্ষীয় কুলি মজুর ও ব্যবসাদার জীবিকার অন্বেষণে দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশশ, ডেমারারা, ট্রিনিডাড প্রভৃতি স্থানে যায়, তাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করা যে ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য, তিনি কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন না। তিনি বলেন, এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের হাত দেওয়া উচিত; কারণ প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতি যাইবার ভয় থাকায় এই কাজে হাত দিবার সম্ভাবনা কম।"

তাঁহার সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথা পূর্ব্বে প্রবাসীতে বাহির হওয়ায় পুনরুক্তি করিব না।

তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে এক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার এক পুত্র, এবং তাঁহার সসন্তানা কন্যা জীবিত আছেন। তিনি জীবদ্দশাতেই একটি সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার সংগৃহীত বহু সংস্কৃত পুস্তক রক্ষা করেন, এবং তাঁহার জননীর নামে উহার নাম রাখেন "ধন্যগোপী পুস্তকালয়"। তাঁহার মাতা সংস্কৃতে বিদুষী ছিলেন, এবং পুত্রদিগকে প্রথমে নিজেই শিক্ষা দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার উইল দ্বারা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও পুত্রের কেবল মাত্র যাবজ্জীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া লক্ষাধিক টাকার সমুদয় সম্পত্তি উক্ত পুস্তকালয়ের জন্য, কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার জন্য, একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য এবং সাধারণতঃ শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতির জন্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য এম্-এ পূর্ব্বে কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের স্বেচ্ছানিযুক্ত অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

*

মোপলা বিদ্রোহ

মোপলা বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় নানা সংবাদ দিন দিন পাঠ করিয়া আমাদের মনে নানা চিন্তার উদয় হইয়াছে। সংবাদগুলি অল্পাধিক অতিরঞ্জিত ও অত্যুক্তিপূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মোপলারা নানাবিধ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা করিয়াছে ও করিতেছে। এই কারণে তাহাদের শাস্তিতে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক নহে। তাহারা যে জোর করিয়া অনেক হিন্দুকে তথাকথিত মুসলমান করিতেছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এইরূপ তথাকথিত দীক্ষার কোন মূল্য নাই। আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃ কেহ যদি কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তবেই তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা যায়। মোপলা বিদ্রোহ হইবার পর অনেক মুসলমান নেতা বলিয়াছেন, যে, তাঁহাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যে, ধর্ম্মবিষয়ে বলপ্রয়োগ অবৈধ। কোরান শরীফে এরূপ উপদেশ আছে কি না, স্বকীয় জ্ঞান হইতে বলিতে পারি না, কিন্তু নেতারা যখন বলিতেছেন যে আছে, তখন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু এই উপদেশ যে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; পরিজ্ঞাত থাকিলে ইহা, সম্পূর্ণ না হইলেও, বহু পরিমাণে

অনুসৃত হইত। মোপলারা এই উপদেশ পালন করে নাই। ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও এই উপদেশ লঙ্ঘিত হইবার দৃষ্টান্ত আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহম্মদ কাসিম যখন সিন্ধু দেশ আক্রমণ করেন, তখন দেবল নামক বন্দর তাঁহার দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়, অনেককে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হয়। অনেক জাতিভ্রষ্ট হিন্দু পুরুষ ও নারীকে পুনর্ব্বার হিন্দু করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া তখন দেবলস্মৃতি রচিত হয়। পুনার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সপ্তবিংশতিস্মৃতির মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইবে। ইহার শ্লোকের সংখ্যা ৯০। যে-সব হিন্দুনারীর সন্তানের পিতা মুসলমান, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ করিয়া হিন্দু করিবার ব্যবস্থা ইহাতে আছে। বৃহৎ-যমস্মৃতির পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

মোপলা বিদ্রোহ মোটামুটি তিন মাস চলিতেছে। ইহাতে বহু ইংরেজ-প্রজার প্রাণ সম্পত্তি ধর্ম্ম ও ইজ্জৎ নষ্ট হইতেছে। লঘুতর দুঃখকষ্ট ত আছেই। এই বিদ্রোহ একটি জেলার এক অংশের কতকগুলি লোকে করিয়াছে, সুতরাং ইহা খুব বৃহৎ ব্যাপার নহে। অথচ ইহা এখনও দমন হইল না কেন? যে ব্রিটিশজাতি জার্ম্মেনদিগকে পরাভূত করিয়াছে, তাহাদের শক্তি তিন মাসেও ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের কতকগুলি লোককে দমন করিতে পারিল না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতেছে। প্রত্যহ সরকারী সংবাদ আসিতেছে, এতগুলি হিন্দুকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এতগুলিকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছে। এইসব লোককে রক্ষা করা কি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য নহে? ভারত গবর্ণমেণ্ট গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলে, মালাবারের প্রত্যেক গ্রামে যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া অত্যাচার বন্ধ করিতে পারেন। তাহা না করায় তাঁহারা অপরাধী হইতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, স্থানটি পার্ব্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ। কিন্তু কথা এই যে, উহা কি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের বাসভূমি পার্ব্বত্যস্থানসকলের চেয়েও দুর্গম, এবং মোপলাদের যুদ্ধনৈপুণ্য, সাহস এবং অস্ত্রশস্ত্র কি পাঠানদের চেয়ে বেশী? মাহ্‌সুদ, বুনেরওয়াল, প্রভৃতিদের উপদ্রব ত কখন কখন তিন মাস অপেক্ষা কম সময়ে প্রশমিত হইয়াছে। অথচ পাঠানদের আধুনিক উৎকৃষ্ট অস্ত্র সংগ্রহের ও যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার সুবিধা মোপলাদের চেয়ে অনেক বেশী। ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ ও আফ্রিকায় অনেক পার্ব্বত্য দুর্গম জায়গায় যুদ্ধ হইয়াছে। আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের শিখর দখল ও লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। তাহাতে উভয়পক্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ সেনাদলের অধিকারী ছিল; মোপলারা তাহা নহে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধে ত কোন দুর্গম জায়গা দখল করা ও অধিবাসীদিগকে সায়েস্তা করা মিত্রশক্তিদের সাধ্যাতীত হয় নাই। মোপলাদের মত সাধারণ-অস্ত্রবিশিষ্ট কোন শত্রু তিনমাস ধরিয়া ইংরেজকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের তিন মাসেও মোপলা বিদ্রোহ দমন করিবার ক্ষমতা নাই, ইহা বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, প্রজাদের ঘোরতর দুঃখ সত্ত্বেও তাঁহারা বিদ্রোহ ও অশান্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কূটনীতি-প্রযুক্ত জিয়াইয়া রাখিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করাও তেমনি কঠিন।

মোপলারা ইংরেজ রাজত্বেই বাস করে। ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রকাশ্য পুলিশ ও গুপ্ত চর আছে। মোপলারা যে তিন মাস ধরিয়া যুদ্ধ চালাইবার মত এত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা এক দিনে করে নাই। বহু দিন ধরিয়া তাহারা এত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল, অথচ ইংরেজের পুলিশ ও গুপ্তচর তাহার কোন সন্ধান পাইল না, রাখিল না, বা চোখ বুজিয়া রহিল, ইহার কোন্ কথাটি বিশ্বাস করিব? উপদ্রুত অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই বাস করে। এখন হিন্দুরা অত্যাচরিত হইতেছে। যখন অস্ত্র সংগৃহীত ও মোপলা বিদ্রোহীরা যখন যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছিল, তখন প্রধানতঃ হিন্দুরা কি তাহা জানিত, না জানিত না? যদি জানিত, তাহা হইলে, তাহা গোপন করিল কেন? ভয়ে? না অন্য কোন কারণে? যদি না জানিত, তাহা হইলে সেরূপ অন্ধতারই বা কারণ কি? বাস্তবিক অত্যাচারী লোকদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হয় বটে, কিন্তু যাহারা অসহায় ভাবে অত্যাচার সহ্য করে, তাহাদের জন্য লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করাও অনিবার্য্য। কাহারও, কোন শ্রেণীর লোকেরই, আত্মরক্ষায় এরূপ অসমর্থ হওয়া উচিত নহে।

এমন কথাও বলিতে শুনিয়াছি, যে, মোপলারা যে বাস্তবিক অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দস্তুর-মত যুদ্ধ বা, এমন কি, খণ্ডযুদ্ধও, করিতেছে, ইহা বাজে কথা; বস্তুতঃ ইহা একটা হাঙ্গামা মাত্র, কোন-প্রকারের যুদ্ধ নহে, সুতরাং যুদ্ধের খবরগুলা অতিরঞ্জিত ও অত্যুক্তিপূর্ণ। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই হাঙ্গামা দমন করিতে তিনমাসের অধিক সময় লাগা আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এবং এতদিনেও ইংরেজের অতিপ্রশংসিত সুশাসনেও বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিক অত্যাচার হইতে প্রজারা নিষ্কৃতি পাইতেছে না, তাহা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়।

মোপলা বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা প্রথম একমাস বা দেড়মাস গোরা সৈন্য দ্বারা হইতেছিল। তাহার পর গুর্খা, চীন-কাচীন ও গাড়োয়ালী সিপাহী প্রেরিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? ইংরেজ সৈন্য দ্বারা কাজ উদ্ধার হইল না বলিয়া কি এইরূপ করা হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ও কোন কোন প্রকার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য দেশী কোন কোন শ্রেণীর সিপাহী অপেক্ষা নিকৃষ্ট; সুতরাং মোটের উপর সিপাহীরা গোরাদের অন্ততঃ সমকক্ষ; এবং গোরাদের শ্রেষ্ঠতা উৎকৃষ্টতর অস্ত্র ও শিক্ষারূপ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত হইয়াছে। সিপাহীদিগকে এই উৎকৃষ্টতর শিক্ষা ও সরেস অস্ত্র কেন দেওয়া হয় না?

অবশ্য ইংরেজ সৈন্য কিছুদিন নিযুক্ত রাখিয়া পরে সিপাহী পাঠাইবার আর-একটা কারণ অনুমিত হইতে পারে। ব্রিটিশ জাতির ভারত আগমনের কাল হইতেই দেখা যায়, যে, তাহারা প্রধানতঃ দেশীলোকের বিরুদ্ধে দেশীলোক লাগাইয়াই কার্য্য উদ্ধার করিয়াছে। এক্ষেত্রেও মুসলমান মোপলাদের বিরুদ্ধে অমুসলমান সিপাহী লড়াইবার মূলে এই চিরাগত নীতি থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা ত নূতন-উদ্ভাবিত নীতি নহে; এই নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকিলে গোড়া হইতেই অবলম্বিত হয় নাই কেন?

মোপলা বিদ্রোহ সম্বন্ধে এইসব সন্দেহ হয় ত কখন দূর হইবে না, এবং ইহার আগুন্ত প্রকৃত বৃত্তান্তও জানা যাইবে না।

মোপলাদিগকে দমন করা যদি সত্যসত্যই ইংরেজের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে ইংরেজের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে আমাদের খুব ভ্রম আছে বলিতে হইবে।

নেপালে বাঙালী অস্ত্রনির্মাতা

আমরা এই পত্রখানি পাইয়াছি,—

বাবু রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার গত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সালে ১০৫ বৎসর বয়সে নেপাল রাজ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি গত ৪০ বৎসরের অধিক নেপাল রাজ্যে চাকরী করিয়া রাজ্যের কলকারখানার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন; এবং বহুবিধ নূতন কাপ্‌খানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মেশিন গান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তথাকার অশিক্ষিত নেপালীদিগকে সুদক্ষ কারিকর করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় সুদক্ষ ও বহুদর্শী মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার কর্ম্মকার জাতির মধ্যে আর কখনও জন্মিবে কি না সন্দেহ। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। ইঁহার মৃত্যুকালে মহারাজা সার চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা, তথাকার ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ১০০ শত দুগ্ধবতী গাভী দান করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির স্বর্গ কামনায়ও দেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য ইঁহার পুত্রকে ১০০০্ টাকা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হতভাগ্য পুত্র ইঁহার মৃত্যুকালে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইতি—

বিনীত
শ্রীহরিদাস কর্ম্মকার,
৺রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকারের পুত্র,
বেলুড় (হাওড়া)।

এমন একজন বাঙ্গালী শিল্পীর বিয়োগে আমরা দুঃখিত হইলাম। —'বঙ্গবাসী'।

ক্যাপ্টেন রাজকৃষ্ণকর্ম্মকার মহাশয়ের সচিত্র জীবনচরিত প্রথমে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে বাহির হয়। উহার লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস পরে উহা প্রবাসীর চিত্রসহ তাঁহারই লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

*

কুমারী স্বর্ণলতা দাস

কুমারী স্বর্ণলতা দাস বি এ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপাল ছিলেন। গত সোমবার শারদীয় অবকাশের পর স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি সুস্থদেহে হৃষ্টমনে স্কুলে আগমন করেন। * * * স্কুল হইতে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। মুড়ি খাইতে ভাল বাসিতেন। মুড়ি দিয়া জলযোগ করিলেন।

সুশিক্ষিতা নারী, বি এ পাশ করিয়াছেন, বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। হাইস্কুলের লেডি প্রিন্সিপাল স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। সারাদিন স্কুলের কার্য্যের পর রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন, নানাপ্রকার দ্রব্য রাঁধিলেন। কয়েকটি দ্রব্য স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদিগকে পরদিন খাওয়াইবেন, বলিয়া আলাদা করিয়া রাখিয়া দিলেন।

প্রথমে পিতা ও ছোট একটি ভাইকে খাওয়াইলেন। তারপর চৌতালার উপর রন্ধনশালায় আর একটি ভাই, ছোট একটি বোন ও নিজের জন্য ভাত ব্যঞ্জন থাল-বাটিতে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। মা নিকটে ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, কন্যার বুঝি মাথা ঘুরিতেছে। নিকটে আরাম-

কেদারা ছিল। তাহাতে শয়ন করিতে বলিলেন। তখন রাত্রি ৯টা। তিনি শয়ন করিবামাত্র অচেতন হইলেন। সকলেই বুঝিলেন, সন্ন্যাস-রোগ হইয়াছে। অমনই ডাক্তার ডাকা হইল। চিকিৎসার আয়োজন করিতে করিতেই রাত্রি ১১টার পূর্ব্বেই স্বর্ণলতা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বর্ণলতা সাধারণ নারী ছিলেন না। ১৮৮৩ সাল আসামের অন্তর্গত তেজপুর নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা রায় সাহেব রাজমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে। পুলিশের কর্ম্মোপলক্ষে তিনি তেজপুর থাকিতেন। রাজমোহন-বাবু তেজপুর হইতে ধুবড়ি বদলী হন। স্বর্ণলতা এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রথমে বিদ্যারম্ভ করেন। শিক্ষক ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রীর প্রাণে মহা ভাব জাগাইয়াছিল। স্বর্ণলতা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইল। রাজমোহন-বাবু ছিলেন হিন্দু, কিন্তু কন্যার আগ্রহে তাঁহাকে কলিকাতার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কন্যা ক্রমে ব্রহ্মোপাসিকা হইলেন। কন্যার চরিত্র দেখিয়া পিতাও কন্যার অনুগামী হইলেন। ধন্য সেই কন্যা যে পিতাকে অনন্ত জীবনের পথ দেখাইতে পারে।

স্বর্ণলতা ক্রমে বি এ পাশ করিলেন। যে ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় তাঁহার জীবনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া তাহার ঋণ কিঞ্চিৎ শোধ দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তাই ৫০ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য স্কুল তাঁহাকে ১২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় ছাড়িলেন না। ক্রমে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপালের পদ পাইলেন।

আরও বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য তিনি লেডি বসুর সাহায্যে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সের নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় দর্শন করিয়া তিনি অধ্যাপনার নূতন প্রণালী শিক্ষা করেন। তথায় অবস্থান কালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হইল না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরিয়া পুনরায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের কার্য্যেই ব্রতী হইলেন। কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন তাহা পূর্ণ না হইতেই অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন।

আমরা অবগত হইয়াছি, স্বর্ণলতা যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন তাঁহার পরিচিত লোকেরা তাঁহার চরিত্রের প্রভাব অনুভব করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

*

প্রাদেশিক মন্ত্রীদের বেতন

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় একবার মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আলোচিত হয়। ফলে তাঁহাদের বেতন শাসনপরিষদের সভ্যদের বেতনের সমান অর্থাৎ বার্ষিক ৬৪০০০৲ টাকাই থাকে। উহা পরে আর কমাইতে পারা যাইবে কি না, উহার সম্বন্ধে আর ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যদের মত লওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্ন উঠে। বাংলার প্রধান আইন-কর্ম্মচারী বলেন, যে, উহা আর ভোটে দিতে হইবে না, উহা স্থায়ী ভাবেই ৬৪০০০ নির্দ্ধারিত হইল। এই মত আমরা আইনসঙ্গত মনে করি নাই, এবং ইহা সর্ব্বসাধারণের মনঃপূত হয় নাই। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, যে, ইংলণ্ডের উচ্চতম আইন-কর্ম্মচারীদের মতে মন্ত্রীদের বেতন বজেটের সময় আবার ভোটে দিতে হইবে।

এবিষয়ে আমাদের মত অনেকবার খুলিয়া বলিয়াছি। আবার কিছু বলি। নানাদেশের দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। এশিয়ার প্রবলতম দেশ জাপানের দৃষ্টান্তই লউন। তথাকার প্রধান মন্ত্রী বৎসরে ১২৫০০ ইয়েন অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৭৫০৲ টাকা বেতন পান; অন্যান্য মন্ত্রীরা কেহ বার্ষিক ৮০০০ ইয়েন অর্থাৎ ১২০০০ টাকা অপেক্ষা বেশী পান না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, পৃথিবীর প্রবলতম জাতিদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ স্বাধীন জাপানীদের প্রধান মন্ত্রী বেতন পান ১৮৭৫০ টাকা, অন্য মন্ত্রীরা পান ১২০০০ টাকা। তাহার সহিত তুলনা করিতে হইবে দুর্ব্বল পরাধীন সমগ্র ভারতের মন্ত্রীদের বেতনের নহে, তুলনা করিতে হইবে দুর্ব্বল পরাধীন ভারতের একটি প্রদেশ বঙ্গের মন্ত্রীদের বেতনের। এখানে প্রধান মন্ত্রী কেহ নাই; সুতরাং তুলনাটা জাপানের অন্য মন্ত্রীদের বেতনের সহিতই হইবে। তাঁহারা আমাদের মন্ত্রীদের এক-পঞ্চমাংশেরও কম বেতন পান; জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতনের প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশী বেতন আমাদের মন্ত্রীরা পান। বাংলা দেশের সহিত জাপানের রাজস্বের তুলনা করা যাক্। ১৯২০-২১ সালের বাংলার বজেটে ব্যয় ধরা হইয়াছে নয় কোটি তিন লক্ষ টাকা। আয় ইহা অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু ৯ কোটি টাকাই আয় ধরা যাক্। ১৯২০-২১ সালের অনুমিত জাপানী রাজস্বের পরিমাণ ১০৫৫০১৩০০০ ইয়েন্ অর্থাৎ ১৫৮ কোটি ২৫ লক্ষ সাড়ে উনিশ হাজার টাকা। তাহা হইলে জাপানের আয় বঙ্গের আয়ের প্রায় আঠার গুণ, কিন্তু জাপানের মন্ত্রীরা বঙ্গের মন্ত্রীদের এক-পঞ্চমাংশেরও কম বেতন পান। জাপানের লোকসংখ্যাও বাংলাদেশের চেয়ে

বেশী। স্বাধীন জাপানের মন্ত্রীদিগকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক সব কাজ, আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক সব কাজ চালাইতে হয়, দেশ রক্ষার কাজ, দেশকে—জ্ঞান, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, যুদ্ধ,—সব বিষয়ে পৃথিবীর প্রবলতম জাতিদের সমকক্ষ রাখিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত সব কাজ, করিতে হয়। বঙ্গের মন্ত্রীদের এরূপ কোন দায়িত্ব নাই। তাঁহারা জাপানী মন্ত্রীদের চেয়ে শক্তিমান্ ও দক্ষ লোক নহেন। জাপানে লোকদের জীবনধারণের ব্যয় বাংলা দেশের চেয়ে বেশী। অথচ জাপানী মন্ত্রীরা অনেক কম বেতন পান। শিক্ষিত লোকমাত্রেই জানেন, বাংলা গবর্ণমেণ্টকে দেউলিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাপানী গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া নহে। তথাপি বঙ্গের মন্ত্রীরা জাপানী মন্ত্রীদের পাঁচগুণের বেশী বেতন লইতেছেন। বঙ্গের আয়তন ও জাপানের আয়তন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। সুতরাং বাঙালী মন্ত্রীরা ক্ষুদ্রতর পরাধীন প্র-দেশের আভ্যন্তরীন কিছু কাজ করিয়া বৃহত্তর স্বাধীন দেশ জাপানের মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন পাইতেছেন। তাঁহাদের এত বেশী বেতন লইবার সপক্ষে বিবেচনাযোগ্য একটি মাত্র যুক্তি আছে। বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের (Executive Council এর) ইংরেজ সিবিলিয়ান সভ্যেরা বাৎসরিক ৬৪০০০ টাকা বেতন পান। বাঙালী মন্ত্রীরা বলিতে পারেন, আমরা কি কম যোগ্য, যে, আমরা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের চেয়ে কম বেতন লইব? কিন্তু এরূপ প্রশ্ন করাই ভুল। আমরা তাঁহাদিগকে কম যোগ্য বলিতেছি না। আমাদের মতে বঙ্গের মত গরীব দেশের রাজকর্ম্মচারীদের বেতন, কি ইংরেজ কি বাঙালী, কাহারও এখনকার মত উচ্চ হারে প্রদত্ত হওয়া উচিত নহে। আমাদের ক্ষমতা থাকিলে আমরা সকলেরই বেতন দেশের অবস্থা অনুসারে যাহা ন্যায্য সেইরূপ নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সেরূপ ক্ষমতা এখনও আমাদের না হওয়ায় আমরা মন্ত্রীদেরই বেতন জাপানের মত করিতে চাহিতেছি। তদ্দ্বারা আমরা দেখাইতে চাই, যে, জাপানের মত বেতনে আমাদের দেশেও যোগ্য লোক দেশের কাজ করিবার জন্য পাওয়া যায়। মন্ত্রীরা যদি ইহা বুঝিয়া দেশের কল্যাণার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জাপানের মন্ত্রীদের মত বেতন লইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান ও দেশের লোকের উপর প্রভাব যে কিরূপ বাড়িত, তাহা তাঁহারা কেন যে বুঝিতে পারেন নাই, জানি না। তাঁহারা বড়লাটের সমান কিম্বা তাঁর চেয়েও বেশী বেতন পাইলেও তাঁহাদের প্রতিপত্তি সেরূপ হইবে না। এখনও যদি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জানান যে তাঁহারা জাপানী মন্ত্রীদের সমান বেতন লইবেন, তাহা হইলেও তাঁহারা সম্মানিত হইবেন, এবং দেশের লোকের উপর তাঁহাদের প্রভাব বাড়িবে। আমরা কেবল তাঁহাদের সম্মান ও প্রভাব বাড়াইবার জন্য এত কথা লিখিতেছি না। জাপানের মত বেতনে কাজ করিবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেলে, আমরা অন্য সব কাজ সম্বন্ধেও বলিতে পারিব, যে, বেশী বেতনে লোক রাখিবার দরকার নাই, সব কাজের বেতন জাপানের হারে নির্দ্দিষ্ট হউক; তাহাতে ইংরেজ বাঙালী যাহার ইচ্ছা হয় কাজ করুন, নতুবা আমরা অন্য লোক নিযুক্ত করিব। ইহা নিশ্চিত যে দেশের কল্যাণার্থ যোগ্য লোকেরা এখনকার চেয়ে কম অথচ সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট বেতনে সব কাজই করিতে রাজী হইবেন। এইরূপে বেতনের যে হ্রাস হইবে, সেই টাকায় দেশহিতকর অনেক কাজ করা যাইতে পারিবে।

শ্রদ্ধার উপযুক্ত লোক দেশে যত বাড়ে, দেশের ততই মঙ্গল। শ্রদ্ধা অমূল্যধন। কোটি কোটি টাকার দ্বারাও ইহার মূল্যের পরিমাণ হয় না। শ্রদ্ধা করিতে পারা, এবং শ্রদ্ধা করিবার মত বহু লোক পাওয়া, দেশবাসীর পক্ষে অতি উচ্চ অধিকার। যদি দেশের অবস্থা সত্য সত্য কখন এরূপ হয়, যে, আমরা বলিতে পারি, যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা কেবল কিম্বা প্রধানতঃ টাকার জন্য চাকরী করিতেছেন না, দেশহিতার্থ, সংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত কিছু টাকা লইয়া, দেশের কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে বেতনভোগী ও অবৈতনিক দেশসেবকদের মধ্যে একটা ভাবের সামঞ্জস্য জন্মিবে এবং দেশের কল্যাণ হইবে।

অতএব আমরা আশা করি, মন্ত্রীরা এখনও বিবেচনা করিবেন। তাঁহারা বিবেচনা করুন বা না করুন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এবারেও যাঁহারা মন্ত্রীদের ৬৪০০০ হাজার টাকা বেতনের সমর্থন করিবেন, তাঁহারা যে দেশের প্রতিনিধি নহেন, তাহা দ্বিতীয় বার প্রমাণিত হইবে। মন্ত্রীরাও যদি ৬৪০০০ টাকা বেতন লইবার পণ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকের ধারণা আরও হীন হইবে।

"বিশ্বভারতী"

বোলপুরের নিকটবর্ত্তী শান্তিনিকেতন পল্লীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বৎসরের কার্য্য আগামী পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার বিজ্ঞাপন প্রবাসী-বিজ্ঞাপনীর মধ্যে দৃষ্ট হইবে। যাহাতে নূতন বৎসর হইতে কতকগুলি ছাত্রী আশ্রমে পড়াশুনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে। বিশ্বভারতীতে এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা আছে:—

ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে—সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাংলা,

হিন্দী, গুজরাতী, মরাঠী, মৈথিলী, সিংহলী, ফরাসী, জার্মান ও গ্রীক্। দর্শনবিভাগে—অভিধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শন। কলাবিভাগে—ভারতীয় চিত্রকলা। সঙ্গীত বিভাগে—গান ও বাদ্য।

শ্রীযুক্ত সদ্ধর্মবাগীশ ধর্ম্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সী এফ্ এণ্ড্রুজ্, শ্রীযুক্ত এইচ্ মরিস্, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিল্ভ্যাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে আগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন, ও ছাত্রগণকে গবেষণার কার্য্য বিশেষ রূপে শিক্ষা দিবেন।

অধ্যাপক লেভির প্রারম্ভিক বক্তৃতা আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণে হইবে। তৎপরেও তাঁহার ব্যাখ্যান প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে হইবে। এরূপ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য এই, যে, ইহাতে কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র ও অপর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উপদেশ শুনিয়া আসিতে পারিবেন, এবং সোমবারে পুনর্ব্বার স্ব স্ব স্থানে আসিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারিবেন। এইসকল বিদ্যার্থী বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ মহাশয়কে আগে হইতে খবর দিতে পারিলে ভাল হয়।

আচার্য্য সাহার গবেষণা সম্বন্ধে আইন্স্টাইনের মত

ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়, যে, জগদ্বিখ্যাত জার্মেন বৈজ্ঞানিক আইন্স্টাইন্ আচার্য্য মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"উচ্চ তাপে মৌলিক পদার্থের তাপ-গতি বিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত (thermodynamical and optical) আচরণ কিরূপ সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া ডক্টর মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানজগতে সম্মানিত নাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থার সঠিক বৃত্তান্ত নিরূপণের এক নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার গবেষণা আরো প্রসারিত হয়, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ইহা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।" (অনুবাদ)

*

করাচীতে নেতাদের বিচার

করাচীতে আলিভ্রাতাদ্বয়, ডাক্তার কিচলু, প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই ছিল, যে, তাঁহারা সরকারী সিপাহীদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে রাজসেবা ছাড়াইয়া তাহার বিরোধী করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। লঘুতর অভিযোগে তাঁহাদের শাস্তি হইয়াছে। এরূপ শাস্তি দিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কিছু লাভ হইয়াছে, মনে হয় না। বরং, দণ্ডিত নেতাদের যে-সব মত গবর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহাত্মক মনে করেন, তাহা সংবাদপত্রে তাঁহাদের বিচারের রিপোর্ট প্রকাশদ্বারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু সর্ব্বসাধারণের মানসিক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট ও অসহযোগ-মন্ত্রে দৃঢ়তর বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং সরকারী টাকা প্রচুর পরিমাণে ব্যয় হইয়াছে। ভারতীয় কোন সিপাহীর, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমান সিপাহীর, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চাকরী করা উচিত নয়, এই মত ত কংগ্রেস ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নানা প্রকার কথার সাহায্যে অনেক মাস পূর্ব্ব হইতেই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। তাহার জন্য এতদিন পরে কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল না। আলী ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে অন্য রাজদ্রোহসূচক অভিযোগ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার করিয়া সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল, যুবরাজ আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে আটক করিয়া তাঁহাদের মুখ ও কলম বন্ধ করা; তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য কি অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অল্প উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া সিদ্ধ করিতে পারা যাইত না?

অসহযোগীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইলে তাঁহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না, ব্রিটিশ আদালতের তাঁহাদের বিচার করিবার অধিকার স্বীকার করিবেন না, জামীনে খালাস থাকিতে চাহিবেন না, মুচলেকা দিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিবেন না বরং জেলে যাইবেন, এইপ্রকার আচরণের ব্যবস্থা মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের অনুমোদিত বলিয়া দীর্ঘকাল বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। তদনুসারে অনেক অসহযোগী বালক, যুবক ও অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ নেতা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা না করিয়া জেলে গিয়াছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন না করা সুবিবেচনার কাজ কি না, তাহার বিচার এখন করিতেছি না। কিন্তু ব্রিটিশ আদালতকে মোটেই আমলে না আনা, উহাকে অগ্রাহ্য করা, উহাতে আইন ব্যবসা পর্য্যন্ত না করা, যখন অসহযোগ নীতির অন্তর্গত, তখন এইসব লোকদের বিনাবাক্যব্যয়ে কারাদণ্ড গ্রহণ যে সুসঙ্গত ও বীরোচিত আচরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আদর্শ অনুসারে আলীভ্রাতাদ্বয় ও করাচীতে বিচারিত অন্যান্য নেতাদের আচরণ সঙ্গত হয় নাই। তাঁহারা যদি পূর্ব্বাপর আদালতকে অগ্রাহ্য করিতেন, তাহা এরূপ সঙ্গত

ব্যবহার হইত। কিন্তু তাঁহারা একদিকে বিচারকের আদেশে উঠা বসা লইয়া তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যহীন কথা-কটাকাটি ও ব্যবহার করিলেন, অন্যদিকে আবার জুরীকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার দাবী একাধিক বার করিলেন। মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার প্রশ্ন, তর্কবিতর্ক, ও মন্তব্যও তাঁহারা করিয়াছিলেন। এই সকল-প্রকার ব্যবহারের মধ্যে সঙ্গতি আবিষ্কার করিতে আমরা অসমর্থ।

অসহযোগ নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা ও আদর্শ যে পরিমাণে বালক যুবক ও অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ কর্ম্মীদের পালনীয় ও অনুসরণীয়, সুবিখ্যাত কর্ম্মীদের জন্য সে পরিমাণে নহে, এরূপ একটা ধারণা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

করাচীতে বিচারিত নেতাদের স্ব স্ব পক্ষে বক্তৃতায় তাঁহারা এই একটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে বাধ্য; ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত দেশের আইনের বিরোধ ঘটিলে তাঁহারা দেশবিধি অমান্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য ও অধিকারী। ইহা সত্য কথা। কিন্তু দেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। নানা বিষয়ে নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি বিভিন্ন। সুতরাং দেশের আইনের সঙ্গে কোন না কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিধির বিরোধ থাকিবেই। সে স্থলে কেহ যদি স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে গিয়া দেশবিধি অমান্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিনা বাক্যব্যয়ে দণ্ড গ্রহণই উচিত; তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে গিয়া দেশবিধি অমান্য করিয়াছেন, এই ওজুহাতে অব্যাহতির দাবী কোন ক্রমেই করিতে পারেন না। ইহুদী ও খৃষ্টীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ডাইনীদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা আছে; ইহুদী, মুসলমান, ও হিন্দুর শাস্ত্রে জেণ্টাইল, কাফের, এবং ম্লেচ্ছ ও শূদ্রের সম্বন্ধে এমন অনেক ব্যবস্থা আছে, যাহা বর্ত্তমান সময়ের ব্যবহার-বিজ্ঞানের (Jurisprudence-এর) অনুমোদিত সর্ব্বধর্ম্মীর ও সর্ব্বজাতির প্রতি সমান ব্যবহার নীতির বিরোধী। মনুসংহিতা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই শাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ের ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ও ২৮৩ শ্লোক পড়ুন। তাহাতে যে-যে লঘু অপরাধে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ, মুখে জ্বলন্ত লৌহময় শঙ্কু নিক্ষেপ, মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ, করচরণাদি অঙ্গচ্ছেদ, এবং ওষ্ঠাধর ও অন্যান্য অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে, বর্ত্তমান সময়ে শূদ্রকে সেইরূপ শাস্তি দিয়া কেহ কি অব্যাহতির দাবী করিতে পারেন? কোন ধর্ম্মের কোন শাস্ত্রের যে-কোন বিধি উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী অবশ্যই পালন করিবার অধিকারী, কিন্তু অপরের অধিকার, সুবিধা, স্বাধীনতা, দেহ ও জীবনে তিনি সেই ওজুহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কিম্বা "শাস্ত্র মানিয়াছি" বলিয়া দেশবিধি-অনুযায়ী দণ্ড হইতে নিষ্কৃতির অধিকারী হইতে পারেন না।

অভিযুক্ত মুসলমান নেতারা বলেন, যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের যুদ্ধ কোরানে নিষিদ্ধ, ব্যতিক্রম স্থল এই যে মুসলমান চুরি বা নরহত্যা আদি করিলে অন্য মুসলমান তাহার শাস্তি দিতে পারেন। আমরা মুসলমান-শাস্ত্রজ্ঞ নহি বলিয়া বিনা বিচারে তাঁহাদের উক্তি মানিয়া লইলাম। তাঁহাদের মন্তব্যের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই, যে, ইংরেজ রাজা ভারতীয় মুসলমান সিপাহীদিগকে তুর্ক আরব আফগান প্রভৃতি মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাইয়া থাকেন, অতএব ইংরেজের চাকরী করা মুসলমান সিপাহীদের অকর্ত্তব্য। এ-বিষয়ে কেবলমাত্র দুটি কথা বলিতে চাই।

ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমান দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, রাজায় রাজায়, বিস্তর যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সকল স্থলে বা অধিকাংশ স্থলে সেইসব যুদ্ধ যে ঘটিয়াছে, নেতাদের বক্তৃতা অনুযায়ী কারণে ঘটিয়াছে, তাহা ত ইতিহাসে দেখিতে পাই না। কোন মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ কারণে মুসলমানে মুসলমানে কোন যুদ্ধের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাও আমাদের জানা নাই। এরূপ নিন্দা মুসলমানলিখিত কোন ইতিহাসে থাকিলে কেহ যদি তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেন, অ মরা তাহা ছাপিব।

গত মহা যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন করাচীতে বিচারিত কোন মুসলমান নেতা কি তুর্ক আরব সীরীয় মিশরীয় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কাহারো সহিত কাহারো যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ বা নিন্দা করিয়াছিলেন? অমুসলমান আমরা বরং একাধিক বার এই বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর আচরণের সমালোচনা করিয়াছি, যে, গত মহাযুদ্ধে তিনি স্বইচ্ছায় সিপাহী-সংগ্রাহক হইয়াছিলেন, যদিও তিনি নিশ্চয় জানিতেন, যে, ইংরেজের সিপাহীরা তুর্ক আরব প্রভৃতি স্বাধীন কিম্বা প্রায় স্বাধীন জাতিদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে ও লড়িবে, এবং তাহারা হারিলে তাহাদের রাজ্য ও স্বাধীনতা কতকটা যাইবে।

*

লর্ড সিংহ সম্বন্ধে গুজব

"হিন্দুস্থান" লিখিয়াছেন:—

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর লর্ড সিংহ সম্বন্ধে এই কয়েকটি গুজব রটিয়াছে:—

(১) লর্ড সিংহ দন্তশূলে কষ্ট পাইতেছিলেন। ইংরেজ দাঁতের ডাক্তার একদিনে তাঁহার দশটি দাঁত তুলিয়া দেয়। সেইজন্য তাঁহার এমন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে, যে, তিনি নাকি ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

(২) লর্ড সিংহ ছুটী লন নাই, কারণ ছুটী লইলে সরকারী গেজেটে তাঁহার স্থলে অস্থায়ীভাবে যিনি নিযুক্ত হইতেন তাঁহার নাম বাহির হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন ব্যাপারটার ভিতরে কিছু গোল আছে।

(৩) লর্ড সিংহের সহিত বিহারের শাসন-পরিষদের কোনও শ্বেতাঙ্গ

মন্ত্রীর কোন কারণে মতবিরোধ হয়। সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয় কিছু চড়িয়া উঠেন; লর্ড সিংহও তাঁহাকে তিরস্কার করেন। মন্ত্রী সে কথা লিখেন উপরওয়ালাদের। তাহাতে লর্ড সিংহ অপমান বোধ করিয়া নাকি পদত্যাগপত্র দিয়াছেন। বড়লাট নাকি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাই সকল ব্যাপার এখনও ঢাকা আছে।

সহরে এই তিনটা গুজব খুবই চলিতেছে। আমাদের মনে হয়, ইহা মিথ্যা; সেইজন্য ভারত গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ইস্তাহার জারি করিয়া সত্য ব্যাপার কি ঘটিয়াছে, তাহা প্রচার করুন।

তিন নম্বর গুজবটি সত্য হইতেও পারে।

আমরা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা অন্য রকমের। কাহার নিকট হইতে সংবাদটি কি সূত্রে আসিয়াছে, তাহা অবশ্য প্রকাশ করিতে পারি না। সংবাদটি এই, যে, লর্ড সিংহ শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করাইবার জন্য তাঁহাকে বলা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো নীতি অনুসরণ করা চলিবে না; মহাত্মাকে ধরিবার জন্য ত বহুৎ মহারথী আছেন; তাঁহারা থাকিতে একমাত্র বাঙ্গালী গবর্ণরের দ্বারাই এ কাজটি করাইবার চেষ্টা কেন? তিনি ঐ কাজটি করিতে অসম্মত হন। তিনি পদত্যাগ করিলে ইহাই নাকি তাহার কারণ।

এই সংবাদটিও সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে। যাহাতে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হয়, দেশে চাঞ্চল্য উত্তেজনা ও অশান্তি ঘটে, এরূপ কাজ করাইবার প্রয়োজন হইলে তাহা দেশী কর্ম্মচারীদের দ্বারা করাইবার কূট নীতি ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গীভূত বটে। ডায়ারের হুকুমে জালিয়ানওয়ালা বাগে দেশী সিপাহীরাই গুলি চালাইয়াছিল। সংবাদটি বিশ্বাসের অযোগ্য মনে না করিবার আরও একটি কারণ এই, যে, নিগ্রহ ও দলন-চেষ্টা কোন কোন দিকে লর্ড সিংহের শাসিত বিহারেই আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কখন কখন বোঝার উপর শাক-আঁটিটি দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। সংবাদটি সত্য হইলে উহার জন্য লর্ড সিংহকে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিতে হইবে। "হিন্দুস্থানে" প্রকাশিত তিন নম্বর গুজবটিও তাঁহার পক্ষে সম্মানজনক।

মালাবারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য

মোপলা-বিদ্রোহে মালাবারের বিস্তর লোক অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। পুরুষ নারী শিশু সকলের জন্য অন্ন ও বস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। বিপন্ন লোকদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই আছে। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—(১) K. P. K. Menon, Secretary, Kerala Congress Committee, Calicut; (২) Mrs. Annie Besart, "New India", Madras E.; (৩) G. K. Devadhar, Servants of India Society, Poona। যাঁহার যেখানে ইচ্ছা টাকা পাঠাইবেন।

মালাবারে উপদ্রব ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য

মোপলাদের দ্বারা খুব অত্যাচার হইতেছে বলিয়া যদিও আমরা বিশ্বাস করি, তথাপি এই কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট হইতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। লক্ষ্ণৌ হইতে গাদিয়া-নিবাসী মৌলবী মুশীর হোসেন কিডোয়াঈ বোম্বাই ক্রনিক্লে লিখিয়াছেন, যে, মোপলা-বিদ্রোহকে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া মনে করা ভুল; মোপলা উপদ্রবের একটি প্রধান কারণ কৃষিজীবীদের উপর অত্যাচার, এবং ইহা সম্পূর্ণ আকস্মিক যে মালাবারের ভূম্যাধিকারীরা অধিকাংশ স্থলে হিন্দু এবং রায়তেরা মুসলমান; ভূম্যধিকারীরা মুসলমান হইলেও রায়তেরা এইরূপ উপদ্রব করিত। অযোধ্যাতে যখন হিন্দু রায়তেরা ক্ষেপিয়াছিল, তখন তাহাদের হিন্দু তালুকদারদের উপর তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল। [কিন্তু তাহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এতদিন লড়িয়াছিল কি?] তাঁহার মতে, হিন্দুদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিবার কাহিনীগুলি অতিরঞ্জিত ও অত্যুক্তিপূর্ণ, এবং সেগুলি সত্য হইলেও কতকগুলা অশিক্ষিত ধর্ম্মান্ধ লোকদের কার্য্যকে একটা সম্প্রদায়ের মনোভাবের বাহ্যলক্ষণ মনে করা অযৌক্তিক। তিনি বলেন, মোপলাদের হাতে প্রথমেই যাহাদের প্রাণ যায়, তাহার মধ্যে একজন মুসলমান সব্‌ইন্স্‌পেক্টর ছিল; মোপলাদের নিজের মধ্যেও বিস্তর লোকের প্রাণ গিয়াছে, তাহারও পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

তাঁহার মতে, এইপ্রকার হাঙ্গামা ও উপদ্রবকে স্বরাজের নমুনা বলা হাস্যকর; কারণ স্বরাজ মানে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও রাজত্ব নহে, সকল জাতি ও ধর্ম্মের লোকদের আত্মকর্তৃত্বের নাম স্বরাজ; ইংরেজ-রাজত্বেই ত আরা, কাতারপুর, এবং মালাবারে এই-সব শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে; তজ্জন্য ইংরেজ-রাজত্বকে যদি দোষ দেওয়া না চলে, তাহা হইলে এগুলি দ্বারা স্বরাজের নিন্দা কেমন করিয়া করা যায়, বুঝা যায় না; বস্তুতঃ এসব অমঙ্গলের একমাত্র প্রতিকার স্বরাজ; এসব কেবল ব্রিটিশ ভারতে ঘটে, দেশীরাজ্যে ঘটে না।

শতবৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব কিরূপ ছিল, তাহা দুইজন ইংরেজ গ্রন্থকারের বহি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ১৯০৮ সালের জুন ও জুলাই মাসের মডার্ণ-

রিভিউ কাগজে প্রকাশিত হয়। উহা Towards Home Rule নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১০০-১০২) মুদ্রিত হইয়াছে। একজন লেখক ইংরেজ গ্রন্থকারদের এইসব কথা আমাদের কাগজ বা পুস্তক হইতে বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের ১০ই তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে উদ্ধৃত করিয়াছেন—যদিও তিনি মডার্ণ রিভিউ বা টুওয়ার্ডস্ হোমরুল্ বহির কোন উল্লেখ করেন নাই।

*

তাতা গবেষণা-মন্দির

পরলোকগত জাম্‌শেদজী তাতার প্রদত্ত ত্রিশলক্ষ টাকার সম্পত্তিকে ভিত্তি করিয়া মৈসুর রাজ্য ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গালোরে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য এরূপ গবেষণা শিক্ষা দেওয়া যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জ খনিজ ও প্রাণিজ নানা দ্রব্য হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কারখানায় নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহার কাজ ভাল চলিতেছে না, এইরূপ অভিযোগ কয়েক বৎসর হইতে শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একটি কমীটী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং কেম্ব্রিজের রসায়ন-অধ্যাপক সার্ উইলিয়ম্ পোপ্‌কে তাহার সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমীটী নিয়োগের সমর্থন আমরা করি। অধ্যাপক পোপের বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু কিছু একটা অনুসন্ধান করিতে হইলেই বিলাত হইতে লোক আনাইতে হইবে, ইহার মানে কি? একাজের জন্য ত ভারতবর্ষেই লোক মিলে? কার্জনের আমলে তাতা দান করেন। কিন্তু গবেষণা-মন্দিরটির প্রতিষ্ঠায় বহু বিলম্ব ঘটে। এইজন্য ভারতীয়েরা সন্দেহ করেন, যে, এরূপ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক উৎসাহ নাই ও থাকিতে পারে না; কারণ আমরা নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে শিখিলে কালক্রমে বিলাতী বহু পণ্যশিল্পের ক্ষতি হইবে। গবেষণা-মন্দিরটি স্থাপিত হইবার পর উহার কাজ ভাল করিয়া না-চলারও ভিতরের কারণ ইংরেজদের স্বার্থপরতা বলিয়া ভারতবাসীরা সন্দেহ করেন। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এইসব সন্দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সহজেই বুঝা যায়, যে, বিলাত হইতে আমদানী একজন অধ্যাপকের সভাপতিত্বে যে কমীটী অনুসন্ধান করিবেন, তাহার রিপোর্টে এদেশের লোকেরা হয়ত আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, অধ্যাপক পোপ্ এদেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। এই অনুসন্ধান প্রধানতঃ এরূপ নিরপেক্ষ দেশীলোক দ্বারা হওয়া উচিত ছিল যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী নহেন।

শুনা যাইতেছে, স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে গবর্ণমেণ্ট এই কমিটির অন্যতম সভ্য মনোনীত করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাসায়নিক নহেন, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিবার কোন কারখানাও তিনি স্থাপন বা পরিচালন করেন নাই। তাঁহার কাজ দেখিয়া মনে হয়, যে, তিনি মনে করেন, ওয়ার্কশপ্ ব্যতিরেকেও অধ্যাপক দীর্ঘকাল ব্যবহারিক রসায়ন শিখাইতে পারেন! বলা যাইতে পারিত বটে, যে, তিনি বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনে বিশেষ দক্ষ ও অভিজ্ঞ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খল দেউলিয়া অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। উহার অনেক অধ্যাপক নিজেদের কাজে খুব অবহেলা করেন, কিন্তু কোন তত্ত্বাবধান ও শাসন নাই, তাহার বন্দোবস্ত নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক প্রস্তাব স্থির হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, ইহার মানে মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরই কাজের উপর কমীটী বসান। এমত অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাতা গবেষণা-মন্দিরের অনুসন্ধান কমীটীর সভ্য নিয়োগ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতি কার্য্যতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রকারে পরোক্ষভাবে আশু-বাবুর পক্ষ অবলম্বন করায়, তিনিও, গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের রিপোর্টটি যেমন চান, তাহা তদ্রূপ করিবার দিকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারেন। অবশ্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা যে তাঁহাকে

এরূপ পক্ষপাত হইতে রক্ষা করিবে না, ইহা আমরা বলিতে পারি না।

যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট আশু-বাবুকে যখন নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন আশা করি তাঁহার কাজ তিনি যথাসাধ্য করিবেন। কিন্তু বাংলা দেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্রকে রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত, উৎসাহিত ও শিক্ষিত করিয়াছেন, এবং যিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কার্য্যেও দক্ষ এবং অভিজ্ঞ, সেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এই কমীটীর সভ্য কেন করা হইল না, এ প্রশ্ন লোকে করিবেই করিবে। অবশ্য, সরকারী রাসায়নিক চাকরী বিভাগ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে তিনি নিজের যে-যে মত ব্যক্ত করেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিকর না হইবারই কথা। কিন্তু সেই কারণেই ত লোকে বলিতেছে, যে, তাঁহাকে কমীটীর সভ্য না করায়, অনুসন্ধানের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট কিরূপ চান, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

*

নিরুপদ্রব অবাধ্যতা

কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া সরকার নির্দ্দিষ্ট কোন ট্যাক্স্ না দেয়, অথচ এই কারণে ট্যাক্সের দায়ে সরকারী লোকেরা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি উঠাইয়া লইয়া গেলে, তাহাতেও বাধা না দেয়, তাহাকে একপ্রকার "সিবিল্ অবাধ্যতা" বলা যাইতে পারে। সিবিল্ কথাটির ঠিক্ বাংলা প্রতিশব্দ নাই, কিন্তু সিবিল ডিস্ওবীডিয়েন্সের বাংলা মোটামুটি "নিরুপদ্রব অবাধ্যতা" করা যাইতে পারে। এই-প্রকার অবাধ্যতার আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কেহ মনে করিলেন, দেশের হিতের জন্য, কোন শহরের রাস্তায় রাস্তায় দলবদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া বেড়ান দরকার। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম করিলেন, এরূপ করিতে পারিবে না। কিন্তু শহরের লোকেরা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া গানের মিছিল বাহির করিলেন; অথচ পুলিশ যখন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল তাহাতেও তাঁহারা বাধা দিলেন না। কোন দেশসেবকের প্রতি সরকারী হুকুম হইল, "তুমি অমুক শহরে গিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবে না।" তিনি হুকুম না মানিয়া সেখানে গেলেন ও বক্তৃতাস্থানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়াতেও বাধা দিলেন না। সরকারী হুকুম হইল, "তোমরা মদের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মদ্যক্রেতা ও মদ্যপায়ীদিগকে তর্কবিতর্ক অনুরোধ উপরোধ অনুনয় বিনয় দ্বারা মদ ক্রয়ে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।" দেশসেবকেরা হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া মদের দোকানের সাম্‌নে স্বীয় কর্ত্তব্য করিতে গেলেন, কিন্তু বিনা বাধায় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। সরকারী হুকুম হইল, অমুক জেলা বা শহরে প্রকাশ্য সভা করিয়া রাজনীতি বা অন্য কোন বিষয়ে বক্তৃতা আলোচনা আদি করিতে পারিবে না। এই আদেশ লঙ্ঘিত হইল। পুলিশ জোর করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিল, কিন্তু তাহাতে কেহ বাধা দিল না। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে, যে, এই-প্রকার অবাধ্যতা এক-প্রকার বিদ্রোহ; কেবল ইহাতে কোন রকম দৈহিক বলপ্রয়োগ বা অস্ত্রব্যবহার বা উপদ্রব নাই, কাহারো অনিষ্ট করিবার চেষ্টা নাই। নিরুপদ্রব অবাধ্যতা আইনভঙ্গ বটে, কিন্তু ইহা নিয়মতন্ত্র স্বাধীন দেশসকলে রাষ্ট্রের ভিত্তিভূত বিধিসকলের বিরুদ্ধ বিবেচিত হয় না। বড়লাট লর্ড হার্ডিং বলিয়াছিলেন, যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের যেরূপ লাঞ্ছনা হইতেছে, তাহাতে তাহারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ (Passive resistance) করিলে তাহা ন্যায্য বিবেচিত হইবে। ইংলণ্ডে নিরুপদ্রব অবাধ্যতা অনেকে অনেক বার করিয়াছেন এবং তদ্দারা অনেক অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার হইয়াছে। এইরূপ অবাধ্যতার সপক্ষে বিলাতী বিচারপতিদের রায় আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি। ১৮৮৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বোম্যারিস্ এসাইজেসে গ্র্যাণ্ড্ জুরিকে সম্বোধন করিয়া অভিযুক্ত নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীদের সম্বন্ধে বিচারপতি উইল্‌স্ বলেন :—

'The whole thing had been carried out with perfect good will and forbearance. Those who objected to the law, made their protest by suffering these distraints to be made,……If, however, the people said that they were not willing to pay for things which they did not like, and that they simply submitted to distraints so as to show their protest against the law, they would be perfectly justified in doing so. As long as they did this, nothing could be said against them. This was the kind of protest by which some of our best improvements in the laws, which years and years ago were found to be oppressive, were brought about."

বিচারপতি উইল্‌স্‌ যে-প্রকার নিরুপদ্রব অবাধ্যতার প্রশংসা করিয়াছেন, কাঁথি মহকুমার লোকেরা "গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন" অনুযায়ী ট্যাক্স্‌ না দিয়া তাহা করিতেছে। কেহ যদি নিজের দেশের গবর্ণমেণ্টকে অন্যায়কারী অত্যাচারী ও দুষ্ট মনে করে, তবে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সকল দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়া, নিরুপদ্রবে সেই গবর্ণমেণ্টের সমুদয় আইন আদেশ প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিবার অধিকার তাহার সকল সময়েই আছে। কিন্তু সেই কাজ না করিয়া যদি সমষ্টিগত ভাবে কোন স্থান জেলা প্রদেশ বা দেশের লোককে তাহা করিতে বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ বিবেচনা করিতে হইবে, যে, এই নিরুপদ্রব চরম উপায় অপেক্ষা কম দুঃখ ও স্বার্থত্যাগসঙ্কুল অন্য এমন কোন নিরুপদ্রব উপায় আছে কি না যাহার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির খুব সম্ভাবনা আছে; যদি সেরূপ উপায় না থাকে, তাহা হইলে, দ্বিতীয়তঃ, বিবেচনা করিতে হইবে, যে, সমষ্টিগত ভাবে অবাধ্যতা করিতে হইলে জনসমষ্টির শান্ত ধীর ও নিরুপদ্রব থাকিবার মত সংযম ও দেশহিতৈষণা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ-শক্তি আছে কি না।

গত ৪ঠা নবেম্বর দিল্লীতে নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমীটীর যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নিরুপদ্রব অবাধ্যতার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এরূপ অবাধ্যতার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি; কিন্তু দেশের নানাস্থানে, যে কারণে বা যাহাদের প্রকোপনেই হউক, বর্ত্তমানে যেরূপ দাঙ্গা মারামারি হইতেছে, তাহাতে স্থানকালপাত্রনির্ব্বিশেষে সমষ্টিগত নিরুপদ্রব অবাধ্যতার ব্যবস্থা বা পরামর্শ দেওয়া সমীচীন মনে করি না। সেই হেতু কংগ্রেস্‌ কমীটী অবাধ্যতা করিতে ইচ্ছুক লোকদিগকে যে-সব সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিজ্ঞজনোচিত ও আবশ্যক মনে করি। কমীটীতে নির্দ্ধারিত প্রস্তাবটি এই:—

Whereas there is not much over one month for the fulfilment of the national determination to establish Swaraj before the end of the year, and whereas the nation has demonstrated its capacity for exemplary self-restraint by observing perfect non-violence over the arrest and imprisonment of the Ali Brothers and the other leaders, and whereas it is desirable for the nation to demonstrate its capacity for further suffering and discipline, discipline sufficient for the attainment of Swaraj, the All-India Congress Committee authorises every province, on its own responsibility, to undertake civil disobedience including non-payment of taxes, in the manner that may be considered the most suitable by the respective Provincial Congress Committees, subject to the following conditions:—

(1) In the event of individual civil disobedience, the individual must know hand spinning, and must have completely fulfilled that part of the programme which is applicable to him or her, e. g., he or she must have entirely discarded the use of foreign cloth and adopted only handspun and hand-woven garments, must be a believer in Hindu-Muslim unity and in the unity amongst all the communities professing different religions in India as an article of faith, must believe non-violence as absolutely essential for the redress of the Khilafat and the Punjab wrongs and the attainment of Swaraj, and if a Hindu, must by his personal conduct show that he regards untouchability as a blot upon nationalism.

(2) In the event of mass civil disobedience, a District or Tehsil should be treated as a unit, and therein a vast majority of the population must have adopted full Swadeshi and must be clothed out of cloth handspun and hand-woven in the District or Tehsil, and must believe in and practise all the other items of non-co-operation.

Provided that no civil resister should expect to be supported out of public funds, and members of the families of civil resisters undergoing sentence will be expected to support themselves by carding, hand spinning, and hand weaving or any other means.

Provided further that upon application by any Provincial Congress Committee, it is open to the Working Committee to relax the conditions of civil disobedience, if it is satisfied that any conditions should be waived.

প্রস্তাবটির হেতুবাদ (Preamble) অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে করি না। ভারতীয় জাতির আরও দুঃখ-সহিষ্ণুতা ও নিয়মানুগত্য (discipline) প্রমাণ করা দরকার বলিয়াই কেবল নিরুপদ্রব অবাধ্যতার প্রয়োজন, তাহাও আমরা স্বীকার করি না, যদিও স্বরাজলাভের জন্য দেশহিতৈষণাপ্রণোদিত নিয়মনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক মনে করি। ইহাও বক্তব্য, যে, চরখায় সূতা কাটিতে পারেন না, এবং দেশী মিলের সূতার কাপড় পরেন, এমন অনেক লোকের নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ধীরতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস ও দেশভক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবটি কংগ্রেস্‌ কমীটীর, উহা কংগ্রেসের দলভুক্ত লোকদের জন্য, এবং কংগ্রেস নিজের দলের সকলকে সূতা কাটিতে ও খাদ্দার পরিতে উপদেশ দিয়াছেন; এই হেতু সর্ত্তগুলিতে আপত্তি করিতেছি না। স্বরাজ্যের মূলমন্ত্র বাধ্যতা ও নিষ্ঠা, অবাধ্যতা ইহার মূলমন্ত্র নহে। ধ.র্ম্ম-র

দেশহিতৈষণায় নিষ্ঠা দ্বারা, ধর্ম্মবুদ্ধির বাধ্যতা দ্বারা, স্বরাজ্য-সিদ্ধি হয়, ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লব্ধ হয়। যে-গবর্ণমেণ্টের আইন, নিয়ম ও হুকুম এইপ্রকার বাধ্যতা ও নিষ্ঠায় বাধা জন্মায়, অগত্যা তাহার অবাধ্য হইতে হয়; নতুবা হুজুকের জন্য ও নামজাদা হইবার জন্য অবাধ্যতার, অবাধ্যতার জন্য অবাধ্যতার, কোন মূল্য নাই। কংগ্রেস কমীটীর সর্ত্তগুলির মূল্য ও গুরুত্ব এই, যে, তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে, যে, নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ দেশহিতৈষণার বাধ্যতা ও ধর্ম্মে নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়াছেন কি না। যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে, দেশহিতৈষণানিষ্ঠ হইতে পারেন নাই, তাঁহার নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিবার যোগ্যতারও অধিকার জন্মে নাই।

মহাত্মা গান্ধী গুজরাতে প্রথম নিরুপদ্রব অবাধ্যতা আরম্ভ করিবেন। তিনি ও তাঁহার আজ্ঞাধীন লোকেরা যে সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিয়া শান্ত ও ধীর থাকিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

*

লাহোরে লরেন্সের মূর্ত্তি

লাহোরে লাট লরেন্সের একটি মূর্ত্তি আছে। তাহার পাদপীঠের গাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে "তোমরা কি তরবারির শাসন চাও", ইত্যাদি জাতীয় অবমানকর কথা আছে বলিয়া লাহোর মিউনিসিপালিটী তাহা সরাইয়া ফেলিবার প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী লাহোরের লোকদিগকে মূর্ত্তিটি সরাইয়া ফেলিতে বলিয়াছেন ও যাঁহারা সরাইতে যাইবেন তাঁহাদিগকে সঙ্গে কয়েকজন নারীকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এই আজ্ঞার কোন অংশটিই আমাদের সমীচীন মনে হইতেছে না। কাজটি শুধু আত্মিক শক্তিতে হইবার নয়। মূর্ত্তি সরাইতে গেলে দৈহিক বলপ্রয়োগ ও খনিত্র আদি হাতিয়ার ব্যবহার আবশ্যক হইবে। গবর্ণমেণ্টের লোকও বাধা দিবে। তাহাতেও হাতাহাতি মারামারি রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধী আজ্ঞা দিবার পরই খবর আসিয়াছে, যে, মূর্ত্তির নিকট পুলিশ-পাহারা মোতায়েন্ হইয়াছে। সঙ্গে নারী-দিগকে লইয়া যাইতে বলিবার কারণ টেলিগ্রামে এই বলা হইয়াছে, যে, পুরুষেরা ধৃত হইলে নারীরা মূর্ত্তিটির ভার লইতে পারিবেন। যেন নারীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আইনে কোন বাধা নিষেধ আছে! তাহাদের খুব অপমান লাঞ্ছনা পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে দেশময় এবং দূরদেশ পর্য্যন্ত হইচই এবং উত্তেজনাসঞ্চার হইতে পারে বটে; কিন্তু সেই অভিপ্রায়ে মহাত্মা গান্ধী নারীর অপমানসম্ভাবনা জানিয়াও এই উপদেশ দিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

*

গোলাগুলি বর্ষণ

ভারতীয় লোকদের প্রাণের কোন মূল্য আমাদের কাছেও নাই, শ্বেতদের কাছেও নাই। এক হিসাবে প্রাণটাকে আমরা খুবই মূল্যবান্ মনে করি বটে; মান ইজ্জৎ যাক্, স্বাধীনতা যাক্, কিন্তু প্রাণটা বাঁচান চাই! কিন্তু অন্যদিকে, দুর্ভিক্ষে ঝড়ে জলপ্লাবনে ভূমিকম্পে মহামারীতে বিস্তর লোক মরিলেও ভারতে তেমন সাড়া পড়ে না, অন্য দেশে অল্পসংখ্যক লোকের অপঘাত মৃত্যুতে যেরূপ হুলস্থূল হয়। ভারতবর্ষেই ত পঞ্জাবে ২।৪ জন ইংরেজ হত হওয়ায় কথা রটিয়াছিল, যে, প্রত্যেক ইংরেজের হত্যার বিনিময়ে হাজার ভারতীয়ের প্রাণ বধ করিবার হুকুম হইয়াছে, যদিও কাজে হাজারের জায়গায় শত হইয়াছিল। অন্যদিকে মালাবারে কত ভারতীয়ের প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু ত্বরিত প্রতিকার হইতেছে না।

আমাদের প্রাণের মূল্য নাই বলিয়া এদেশে নিরস্ত্র জনতা ভাঙ্গিয়া তাড়াইবার জন্য, কখন কখন তদপেক্ষা সামান্য কারণেও, সিপাহী ও পুলিশকে গুলি সঙ্গীন চালাইতে হুকুম করা হয়। অন্যত্র ইউরোপে আমেরিকায় সশস্ত্র সংখ্যাবহুল দাঙ্গাকারীদিগকেও প্রথমে কেবল পুলিশের রুলের গুঁতার দ্বারা এবং রাস্তা ভিজাইবার নলের দ্বারা জল বর্ষণ করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা হয়; নিতান্ত দরকার না হইলে গুলি চালান হয় না। কারণ, তাহাদের স্বাধীনতা আছে, আমাদের নাই।

যুবরাজ

যুবরাজের ভারতভ্রমণ উপলক্ষ্যে কোন-প্রকার জাঁক-জমকে তামাসায় অভ্যর্থনায় আমাদের যোগ দেওয়া উচিত নহে। কারণ উৎসব করিবার অবস্থা আমাদের নহে, এবং তিনি রাজভৃত্যদের উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহাদের হাতের পুতুল হইবেন।

সাহিত্যিকের কৃতিত্ব ও বদান্যতা

সুবিখ্যাত বৃদ্ধ ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস্ নোবেল্ প্রাইজ পাইয়া তাহা রুশীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ দান করিয়াছেন। যেমন সাহিত্যিক কৃতিত্ব, তেমনি বদান্যতা!



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২১শ ভাগ | পৌষ, ১৩২৮ | ৩য় সংখ্যা
২য় খণ্ড

চেরোজাতি

আমরা যাঁহাদিগকে আর্য্য বলিয়া থাকি, তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে, ভারতে কয়েকটি জাতির অস্তিত্ব যে ছিল, তাহা নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর্য্য-সংঘর্ষের প্রভাবে এই-সমস্ত জাতির মধ্যে বাহিরের আচার, বাক্‌ছন্দ প্রভৃতি ব্যাপার একদিকে যেমন ক্রমশঃ প্রবেশ-লাভ করে, অপর দিকে তেমনই যাঁহারা ইহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতরের ধর্ম্মমতের সহিত এই সমস্ত জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস কতক কতক মিলিয়া মিশিয়া না গিয়াছিল, এমন নয়। সামাজিক প্রথাও কোথাও সামান্য—কোথাও বা বিশেষভাবে ইহারা গ্রহণ করিয়া ফেলে। এই-সমস্ত আদিম জাতির এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে যে, এক্ষণে তাহাদের শুধু আকার দেখিয়া তাহাদের কুলশীলের পরিচয় দেওয়া দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ভিতর অনেক জাতিই আবার অপর জাতির মধ্যে আপনাদের অস্তিত্ব হারাইয়াছে। কাহারও বা অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে। যাহারা অপর জাতির সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে বা কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে বাঁচাইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে, জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। এই-সমস্ত জাতির শ্রেণীবিভাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তবে ইহাদের রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-পদ্ধতি, বিবাহপ্রথা প্রভৃতির আলোচনার সঙ্গে ঐ-সমস্ত জাতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চলিতে পারে।

বাঙ্গালীর ইতিহাসপ্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বঙ্গ, বগধ ও চেরজাতি বাঙ্গালার অতি প্রাচীন অধিবাসী। ঐতরেয় আরণ্যকে তাহার নির্দ্দেশ আছে এবং চিলপ্পতিকারম্, তোণ্ডৈ-মণ্ডল-পদ্দয়ম্ প্রভৃতি প্রাচীন তামিলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, চেরজাতি বঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণভারতে গমন করিয়া চেররাজ্য সংস্থাপন করে। এক সময় তাহারা 'বানবর' নামে পরিচিত ছিল (Tamils Eighteen Hundred Years Ago, p. 50, n. 1; চিল্লপতিকারম্, ২৫।২।১—৩ পঙ্‌ক্তি)। এককালে চেরগণ প্রাচীন বঙ্গের পুরাতন অধিবাসী ছিল। ইহাদের এক শাখা দক্ষিণ-ভারতে গমন করে, অপর শাখা বঙ্গদেশ হইতে কালে মধ্যপ্রদেশের উপত্যকাসমূহে ছড়াইয়া পড়ে। দক্ষিণ-ভারতে যাহারা বাস করিয়াছিল, তাহারা 'চের' নামে পরিচিত হইত এবং যাহারা মধ্যপ্রদেশের উপত্যকায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তাহারা আজও কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। ইহারা বর্ত্তমান কালে গাজিপুরে, গোরখপুরের কিয়দংশে,

বারাণসীর দক্ষিণাঞ্চলে, মির্জাপুরে ও বিহারে বাস করিয়া থাকে। ইহারা অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় পরিণত হইয়া 'চেরো' বা 'চেরু' নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-ভারতের চেরজাতিদের প্রাচীন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাচীন তামিলগ্রন্থ, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। প্রাচীন তামিল গ্রন্থে আছে, চেরদিগের একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম 'অতন'। ইনি সিংহল-নৃপ গজবাহু ও চোড়রাজ করিকলের সমকালবর্ত্তী (১)। ইঁহার রাজত্বকাল ৪০ হইতে ৫৫ খৃষ্টাব্দ। চের ও পাণ্ড্যরাজ বেন্নিল নামক স্থানে একসঙ্গে মিলিত হইয়া করিকলের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে অতন সেনা-নায়ক ছিলেন। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ক্ষত্রিয়দের ন্যায় ইঁহারা অপমানসূচক ও লজ্জাজনক বলিয়া মনে করিতেন। অতন পৃষ্ঠদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, লজ্জায় অনশনে প্রাণত্যাগ করেন (২)। ইঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় অতন সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৫৫ হইতে ৯০ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় অতন ইঁহাদের পূর্ব্বশত্রু চোড়রাজ করিকলের কন্যা সোনাইকে বিবাহ করিয়া (৩) চোড়রাজকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে চেররাজের এই কার্য্য যথেষ্ট কৌশলের পরিচায়ক। দেশকে শান্তিপূর্ণ শাসনের মধ্যে রাখিয়া, রাজ্যের তিনি নানাবিধ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণ চেররাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কবিদিগের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। ব্রাহ্মণকবি কপিলর (৪) রাজ-প্রশস্তি লিখিয়া জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অতনের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ বেনমাল, কনিষ্ঠ ইলঙ্কো-অদিকল। কনিষ্ঠ পুত্র অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। একজন ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি রাজচিহ্নযুক্ত, তাঁহার রাজ্যলাভ হইবে। ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া নির্গ্রন্থসম্প্রদায়ে যোগ দিবার সঙ্কল্প করেন। ইনিই তামিল মহাকাব্য চিল-প্রতিকারম্ রচনা করেন। দ্বিতীয় অতন চিক্কর-পল্লীতে দেহত্যাগ করেন। অনূ্যন ৯০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অতনের রাজসিংহাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আরোহণ করেন। ইনি পার্ব্বত্যভূমির অধিপতি ইরুঙ্কো বেনমালের রাজধানী বিয়লুর আক্রমণ করিয়া, সেই স্থানের স্বর্ণখনি অধিকার করেন। কয়েক বৎসর পরে করিকল চোড়ের পুত্র নলঙ্ক-কিল্লির মৃত্যু হইলে চোড়-রাজ-মুকুট করিকলের পৌত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজপরিবারের কেহ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। নয়জন রাজকুমার বিদ্রোহী হ'ন। বেনমাল মাতুল-পুত্র কিল্লিবনবনের সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া নেরি-বায়িল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করেন; স্বীয় মাতুলপুত্রকে শত্রুশূন্য করিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের দক্ষিণভাগ মোহুর আক্রমণ করেন। মগধরাজ করণদিগের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার মাতা সোনাইকে লইয়া তিনি গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। আর-একবার তিনি মহিষীর সহিত গঙ্গাদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। চেররাজ হিমালয়ের দিকে অভিযান করিবেন স্থির করিয়া সসৈন্য বনজীতে গমন করেন। চেররাজ্য হইতে তিনি সমুদ্রপথে ওড়িষায় গমন করিয়াছিলেন, ইহা মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে। তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহও জয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যানইক-কদ-চে ১২৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হ'ন। পাণ্ড্যরাজ ২য় নেড়ুঞ্চ-চেলিয়ন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধৃত হইয়াছিলেন। পরে পলায়ন

(১) কুমারস্বামীর (P. Coomaraswami) মতে করিকল খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রাজা। চিলপ্রতিকারমের টীকাগ্রন্থে লিখিত আছে, করিকল সিংহলের গজবাহুর সমসাময়িক চেররাজ চেঙ্গুত্তুবনের মাতামহ।—Contributions to the History of Tamil Literature.

(২) করিকল যে বেন্নিল যুদ্ধে চের ও পাণ্ড্যরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ডক্টর হুল্শ্‌ও (Dr. Hultzsch) তাহা সমর্থন করেন।—South Indian Inscriptions, vol. II, part III, p. 377 and 378.

(৩) নান্দককলম্বগন (Tamil Historical Texts by M. K. Narain Swami Ayyar and T. Gopinath Rao)—২১শ সর্গ, ১১শ ছত্র। নন্দি একজন পল্লবরাজ। চেররাজ্য পর্য্যন্ত ইঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল (শ্লোক ৭৪)। চের, চোর, পাণ্ড্য ও উত্তরাঞ্চলের রাজগণ তাঁহাকে করদান করিতেন (শ্লোক ২৭)। ইনি চের, চোড় ও পাণ্ড্যদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (শ্লোক ৪২, ৮১) নন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এই তিন রাজা যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।

(৪) মত্তরম্ চেরল ইরুম্পোরই . . এর সহিত কপিলরের সম্বন্ধ আছে। পোরুন্দিল্ ইলঙ্গিরনর নামক এক কবি ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন

করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে ইঁহার পুত্র পেরুঞ্জ-চেরল-ইরুমপোরই রাজা হইয়া ১৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

কোঙ্গুদেশরাজকল একখানি প্রাচীন তামিল গ্রন্থ। ইহা হইতে ভাষান্তরিত একখানি গ্রন্থ ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে। অধ্যাপক ডাউসন (Prof. Dowson) এই গ্রন্থ হইতে চের রাজাদিগের একটি বিবরণ (J. R. A. S. ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২-৬) প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে একটি চেররাজবংশাবলী আছে। বীররাজ চক্রবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিয়া, মল্লদেব পর্য্যন্ত ২৬ জন রাজার বিবরণ ইহাতে আছে (৫)। গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মল্লদেবের উত্তরপুরুষের সময় চোড়রাজকর্ত্তৃক ৮১৬ শালিবাহনাব্দে (৮৯৪ খৃঃ) চেররাজ্য বিজিত হইয়াছিল। এই বংশের সপ্তম নৃপতি তিরুবিক্রমদেব স্কন্দপুরে অভিষিক্ত হন। কর্ণাট ও কোঙ্গুদেশ ইঁহার শাসনে ছিল। উইল্‌সন মনে করেন যে, চের ও কঙ্গু একই দেশের নামান্তর (Wilson's Mackenzie Collections, পৃঃ ৩৫)। এই বংশের রাজাদের রাজ্যকালের সঙ্গে মেরকারা (Merkera) দানপত্রে উল্লিখিত সময়ের অনেক স্থানের পার্থক্য আছে। কোঙ্গুদেশরাজকলে মল্লদেব পর্য্যন্ত ২৬ জন নৃপতির কথা পাওয়া যায়। লাস্‌সেন (Indische Alterthumskunde ২য় ভাগ, পৃঃ ১০১৭-১৮) বলেন, মল্লদেব পর্য্যন্ত নৃপতির সংখ্যা ২৮ এবং অষ্টাবিংশ চেররাজ ৮৭৮ ও ৮৯৮ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয়ে তিনি ডাউসনের প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া চেরবংশ বিচার করিয়াছেন। এই তামিল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিরুবিক্রম পাণ্ড্য, চোড়, মলয়লম্ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকট শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। তিরুবিক্রমের লিপিতে শঙ্করাচার্য্যের নাম দেখিয়া লিপিখানি জাল বলিয়াই কেহ কেহ সন্দেহ করেন (৬)। সেই লিপিখানি যে সময়ে অঙ্কিত বলিয়া প্রচারিত, সেই সময়ের অন্যান্য লিপির অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, ইহা জাল। দাক্ষিণাত্য হইতে কোঙ্গুরাজগণের যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে, ফ্লীট তৎসমুদয় আধুনিক ও জাল বলিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন।

সুপণ্ডিত ফ্লীট তাঁহার 'সংস্কৃত ও প্রাচীন কন্নড় লিপি' (Sanskrit and Old Canarese Inscriptions—I.A., Vol. VI, p. 23) নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, কদম্বরাজ কৃষ্ণবর্ম্মার ভগিনীকে চেররাজ দ্বিতীয় মাধব বিবাহ করেন। রাইসের মেরকারা ও নাগমঙ্গল তাম্রশাসনেও এই কৃষ্ণবর্ম্মার উল্লেখ আছে (I. A., Vol. I, p. 360, etc.,)। বিশপ কল্‌ডওয়েলের মতে (Exploration at Korkei and Kayal—I. A., Vol. VI), দক্ষিণ-ভারতের সভ্যতার আদিজন্মভূমি 'কোরকেই'। এইখানেই চের, চোড় ও পাণ্ড্যগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল। বাহির হইতে দক্ষিণ-ভারতের এই স্থানে আসিয়া, ইহারা যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

দাক্ষিণাত্য চের, চোড় ও পাণ্ড্য, এই তিনটি বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভক্ত ছিল, তৎপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে (৭)। পুরনমুরু, পত্তু, পত্তু, ইরইয়নর ও অগপ্পোরুড় নামক প্রাচীন তামিল গ্রন্থে চের, চোড় ও পাণ্ড্যরাজাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অগপ্পোরুড় পুস্তকের টীকায় লিখিত আছে যে, চের, চোড় ও পাণ্ড্যরাজ্যের প্রতাপান্বিত রাজগণ পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ইঁহাদের জয়পরাজয় অনুসারে ইঁহাদের রাজ্যের সীমান্ত সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইত। পুরনমুরু গ্রন্থের ১৭, ২০, ২১, ৫৯, ১২৫, ও ২২৯ শ্লোকে কল্লি-পর্ব্বতাধিপতি এক চেররাজের গুণাবলী বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে (৮)।

(৫) Wilson's Descriptive Catalogue, p. 190 ও Taylor's Oriental Historical MSS, Vol. II, pp. 65-04 দ্রষ্টব্য।

(৬) মেরকারা-লিপি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহা ৪৬৬ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। ডক্টর বর্ণেল (Dr. Burnell) ইহাকে চেরদের প্রাচীনতম লিপি বলিয়া মনে করেন। চেরসম্পর্কে ইহা অপেক্ষা পুরাতন লিপি আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বর্ণেল তাঁহার ৪৬৭ খৃষ্টাব্দের চের-লিপির পরিচয় [illegible] বর্ণেলের [illegible] লিপি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বর্ণেল যখন বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতের লিপি (paleography) সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারা গিয়াছিল। যে কোনও বিশেষজ্ঞ এখন এই লিপির অক্ষর দেখিয়া বলিতে পারেন যে, ইহা খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে লিখিত।

(৭) The Date of Maduraikkandhi and Its Hero, by K. V. Subrahmanya Aiyar, B. A.

(৮) এই রাজার নাম "ঘমৈকচ্চে—মন্দরঞ্চেল-ইরুম্পোরই"

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক হিসাবে বিভাগ করা হইয়াছিল। কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর ইহার প্রবাহ ধরিয়া করুরের নিকটবর্ত্তী অমরাবতী পর্য্যন্ত গমন করিয়া, সেখান হইতে পালনী পাহাড় ও পশ্চিমঘাট পর্য্যন্ত যদি আমরা যাই, তাহা হইলে আমরা চের-অধিকারের সীমা নির্ণয় করিতে পারি।

কয়েকটি অনুশাসনেও চেরদিগের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিপিগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কৃষ্ণরায়ের হাম্পি-লিপিতে (১১শ শ্লোক) পাওয়া যায় যে, বিজয়নগরের তুলু-বংশীয় রাজা নরস (নরসিংহ) চের, চোড়, মদুরাধিপতি, গর্ব্বিত পাণ্ড্য প্রভৃতিকে জয় করিয়া তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুন্দর-পাণ্ড্যের রঙ্গনাথ লিপিতে পাওয়া যায় যে, সুন্দরপাণ্ড্য চের, চোড় ও পাণ্ড্যরাজ্যের তিনটি মুকুট ধারণ করিতেন। বিজয়নগরবংশ্য কীর্ত্তিমান্ হরিহরদেব চের, চোড় ও পাণ্ড্যরাজাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় হরিহরদেব বিশ্বাস করিতেন। চোড়রাজ রাজকেশরিবর্ম্মার ত্রিংশৎ রাজ্যাব্দের ক্ষোদিত দানপত্রে লিখিত আছে যে, এই চোড়রাজ চেরপ্রাসাদবিজয়ী ছিলেন। অমোঘবর্ষ একটি বিভীষণ ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব। ধনু চেরদিগেরও রাজলাঞ্ছন ছিল। ইহা হইতে কেহ চেরদিগের সহিত অমোঘবর্ষের যুদ্ধের কল্পনা করিয়া থাকেন।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে (১১-১৬ শ্লোক) দেখা যায় যে, চের, চোড়, কচ্ছ, কর্ণাট, কেরল, কোঙ্কন ও তঙ্কণ দেশ দক্ষিণ-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমস্ত দেশে আভীর, আর্য্যক, ভদ্র, চেরিয় প্রভৃতি জাতির বাস ছিল।

চেরিয় দক্ষিণ প্রদেশের অন্তর্গত চেরদেশীয় লোককেই নির্দ্দেশ করিতেছে (পঞ্চদশ অধ্যায়, ১৭৬ পৃষ্ঠা)। চেররাজ পাণ্ড্যরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া চোড়রাজ রাজা রাজদ্বীপের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, ইহা আমরা তাতিলবর্ম্মার লিপি (Madras Museum Plates of Tatil Varman, by Venkayya, M.A., Bangalore) হইতে জানিতে পারি। ভেন্‌কয়-প্রকাশিত মলবরের প্রাচীন দান-পত্র ও পাণ্ড্য তাম্রলিপিতে চের-তাম্রমুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্লিট্‌কস্ সাহেব বলেন যে, চের এবং কেরল একই রাজ্য-বোধক। "চের" শব্দই কন্নড় কথ্য ভাষায় "কেরল" শব্দে পরিণত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার মত। কিন্তু 'চের' শব্দ কেরল শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। লোগান সাহেব তাঁহার মলবর ম্যানুয়েলে লিখিয়াছেন—"চের" শব্দের কন্নড় প্রতিরূপ "কেরল"। তাঁহার মতে চেরবংশ বহুকাল কেরলদেশে রাজত্ব করায় তাহা কেরল নামে অভিহিত হয়। ডক্টর গুণ্ডের্ট তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন যে, 'চেরম্' শব্দ কন্নড় ভাষায় "কেরম্" বলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। মলয়লম্‌দিগের 'চের' কন্নড়দিগের হাতে পড়িয়া 'কেরল' হইয়াছে। কিন্তু শব্দ-বিজ্ঞান অনুসারে কণ্ঠ্য বর্ণ জিহ্বামূলীয় বর্ণের অপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং "কেরল" শব্দ 'চের' শব্দ অপেক্ষা প্রাচীন। অগত্যা বলিতে হইবে যে, "কেরল" শব্দ 'চের' শব্দের রূপান্তর নহে। বিশেষতঃ, রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন পুরাণাদিতে, এমন কি, কবি কালিদাসের গ্রন্থে "কেরল" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন স্থানে চের শব্দের উল্লেখ নাই—সুতরাং চের শব্দ রূপান্তরিত হইয়া যে 'কেরল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। 'কেরলোৎপত্তি' নামক প্রবাদ-মূলক গ্রন্থে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পশ্চিমঘাটের তলদেশে গোকর্ণতীর্থের পবিত্র মন্দির হইতে দক্ষিণ-কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অতি প্রাচীন কালে কেরল নামে অভিহিত হইত। ঐ ভূমিখণ্ড পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। পরশুরাম সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিলে উক্ত স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, নাসিক হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভূখণ্ড পরশুরাম পশ্চিম সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন তাহা সপ্ত কঙ্কণে বিভক্ত। কেরল উক্ত সপ্ত কঙ্কণের একটি কঙ্কণ। প্রবাদমূলক বাক্য সকল সর্ব্বত্র বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনকালে অনেক সময় এইরূপ

প্রবাদ-বাক্য হইতেও তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হয়; কেন না, অনেক প্রবাদও সত্যমূলক। উপরিলিখিত প্রবাদ হইতে আমরা অন্ততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পরশুরাম উত্তরভারত হইতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই স্থান প্রথমে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, কোন প্রাকৃতিক ঘটনায় সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া পড়ে। যদি এ প্রবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে পরশুরামের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বে কেরল দেশের অস্তিত্বই ছিল না, সুতরাং পরশুরাম স্বয়ং বা তাঁহার কোন সহচর অথবা তাঁহারই সমসাময়িক কোন ব্যক্তি এই স্থানের নামকরণ করিয়াছেন। ডক্টর উইল্‌সন নারীকেল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নারীকেলবৃক্ষ জলময় স্থানে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম নারিকেল হইয়াছে। তাহা হইলেই উইল্‌সনের নারিকেলের ব্যুৎপত্তি অনুসারে কেরলের ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন করিতে হয়। উইল্‌সন সাহেব যখন জলময় দেশজাত, এই অর্থে নারীকেল শব্দ ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন, তখন তিনি বোধ হয়, নার শব্দ হইতেই নারীকেল শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। পরশুরামও ঐ প্রদেশ জল হইতে উত্থিত বলিয়া তাহার নামকরণ করিলেন—কেরল। কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেরল শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ্ নয়।

পক্ষান্তরে কেরল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকে অনেক সূত্র অবলম্বন করিয়াছেন। একটি অতি প্রয়োজনীয় সূত্র এই যে, কেরল নামে যে জাতি ছিল, সগর রাজার সহিত তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং সগররাজের সময় কেরলজাতি বিদ্যমান ছিল। সগররাজ মহাভারতের অনেক পূর্ব্বের লোক এবং এই জাতি আর্য্যজাতির পূর্ব্বেও ভারতে ছিল। সংস্কৃত ভাষার মূল আর্য্যজাতির সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু কেরল নাম তখনও ছিল; অতএব কেরল শব্দ যে সংস্কৃতমূলক, এ কথা বলা যায় না। কেরল সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু 'চের' শব্দ যে রূপান্তরিত হইয়া 'কেরল' হইতে পারে না, তাহা কেহই আলোচনা করেন নাই।

যাহা হউক, এই চেরদিগের প্রাচীন কালে যে প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম ও উন্নত সমাজ ছিল, তাহার নিদর্শন আমরা প্রাচীন তামিল-গ্রন্থে যথেষ্টই দেখিতে পাই।

এইবার আমরা মধ্যপ্রদেশের 'চেরো' বা 'চেরু' জাতি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই চেরো ও দাক্ষিণাত্যের 'চের' জাতি যে এক, তাহা নৃতত্ত্ব সাহায্যে সপ্রমাণ করা যায়।

চেরো জাতি সম্বন্ধে রিজ্‌লী, ওমালী ও কর্ণেল ড্যাল্‌টন্ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের লেখা হইতে চেরোদের অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। আবশ্যকমত ইঁহাদের প্রদত্ত সংবাদও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু ইঁহাদের মতে চেরোরা মুণ্ডা বা কোলেরিয়ান বংশসম্ভূত। রসেল ও রায়বাহাদুর হীরালালও (Tribes and Castes of the Central Provinces) এই মতের পক্ষপাতী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাহাবাদ অসভ্যজাতিদেরই অধিকারে ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল ভড়, চেরো ও শবরজাতি। এই তিনটি জাতি সম্বন্ধে সাহাবাদের নিকট-বর্ত্তী স্থানে কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ মির্জাপুরেও একটি গল্প আছে। এই স্থানের আর্য্য ও ভড়, উভয় জাতিই বলিয়া থাকে যে, রোহতাস্‌গড় হইতে রেওয়া পর্য্যন্ত শোণ নদের নিকটস্থ প্রদেশের উপর একজন পরাক্রান্ত ভড় রাজা আধিপত্য করিতেন। ইনিই রোহতাস্‌গড়ের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। রাজপুত জাতীয় তিন ভ্রাতা ভড় রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া তিন ভ্রাতার মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া লয়। চেরোরা প্রবল-পরাক্রান্ত জাতি ছিল। শবরগণ চেরোদিগকে জয় করে। পরে আর্য্যনামধারী কোন জাতি ইহাদিগকেও বিজিত করে। ভড়, চেরো ও শবরগণ যে এইখানে রাজত্ব করিত, তৎসম্বন্ধে বহু প্রবাদ আছে। ইহাদের নির্ম্মিত অনেক মন্দির ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সাহাবাদে ভড় ও চেরোজাতির অস্তিত্ব এখনও আছে। স্যর হেন্‌রি এলিয়টের মতে চেরোরা ভড়েদেরই একটি শাখা। তিনি বলেন, কোলেদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ আছে। কর্ণেল ড্যাল্‌টনের মতে কোল ও চেরোরা পূর্ব্বে এক জাতি ছিল।

ইহাদেরই একটি শাখা চেরোজাতি। একমাত্র ভাষার নজিরে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই দুইটি মতের এখন কোনও আদর নাই। যাহা হউক, চেরোরা এইখানকার পাহাড়িয়া জায়গায় বিহিয়া পরগণায় জগদীশপুর জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। চেরোদের অধঃপতনের পর বহু সভ্যজাতি সাহাবাদে আধিপত্য করিয়াছিল। এই স্থানটি এক সময়ে গুপ্তদিগের অধিকারে ছিল, তাহা মুণ্ডেশ্বরী-মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং দেওবরুণারকের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়। গুপ্তদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পুনরায় চেরোদের হস্তে আসিয়া পড়ে। মালবের অন্তর্গত উজ্জয়িনী হইতে ভোজরাজ আগমন করিয়া চেরোদিগকে দক্ষিণে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজপুত ও চেরোদের যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষে বিজয়-লক্ষ্মী রাজপুতদিগকেই অনুগৃহীত করেন; চেরোগণ পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই জঙ্গলময় ভূমিতে তাহারা বহুকাল আপনাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই স্থানে বাসকালে তাহারা পালামৌ বিজয় করিয়াছিল। রঙ্কা ও চৈনপুর থানার ঠাকুরদিগের রাজপুত পূর্ব্বপুরুষ ইহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাজা ভোজের নামানুসারে এই নববিজিত দেশ ভোজপুর নামে আখ্যাত হয়। ভোজপুরীর রাজপুতগণ বহুকাল ধরিয়া প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। বালিয়া জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী হল্‌দীর হরিবংশরাজপুতগণ বলিয়া থাকেন যে, মধ্যপ্রদেশের রতনপুরে তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল। ইঁহাদের বংশবিবরণে পাওয়া যায় যে, গগ্‌রীনদী-তীরবর্ত্তী সারন প্রদেশস্থ মজ্ঞিনামক স্থানে তাঁহারা ৮৫০ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ করেন। এই স্থানে চেরোদের সঙ্গে তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম বাধে। যুদ্ধে চেরোগণ পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায় [W. Oldham, Memoir of the Ghazipur District (1870), প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৫]। ২০০ বৎসর পরে ইঁহারা মজ্ঞি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণে বিহিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। বিহিয়া চেরোদের অধিকারে ছিল। চেরোদের সঙ্গে এই রাজপুতদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। শেষে চেরোগণ ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। মুসলমান যুগেও চেরোগণ হীনবল ছিল-না। তারিখে শেরশাহীতে লিখিত আছে, মুহর্ত্ত নামে একজন চেরোদের অধিনায়ক ছিলেন। ইনি সুবিধা পাইলেই পর্ব্বত ও জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া বেহারের চতুর্দ্দিকস্থ প্রজাপুঞ্জকে উৎপীড়িত করিতেন; গৌড়-বাঙ্গালার যে-সমস্ত লোক যাইত, তাহাদের গমনের পথ বন্ধ করিয়া দিতেন; পথিমধ্যে লুণ্ঠনাদি করিতেন; শেরশাহের শিবির হইতে গো, অশ্ব ও উষ্ট্র লুণ্ঠনও করিতেন। স্বগণের সহিত ইঁহাকে নিধন করিবার জন্য শেরশাহ্ তাঁহার একজন সুদক্ষ সেনাপতি খাওয়াস খাঁকে প্রেরণ করেন। সম্রাট্, মির্জ্জা হিন্দলের বিরুদ্ধে বঙ্গ হইতে আগ্রা যাত্রাকালে বেহার, জৌনপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে সমস্ত সৈন্য ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু খাওয়াস খাঁর সেনাদলকে গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই। ইহা হইতে বোধ হয় যে, চেরোদের এই সর্দ্দার প্রবলপরাক্রান্ত ছিল। মখজনে আফগানিতে লিখিত আছে যে, হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধের সময় শেরশাহ্ খাওয়াস্ খাঁকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন। খাওয়াস খাঁ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিলে পর তিনি মুহর্ত্ত চেরোর সর্ব্বনাশ সাধনোদ্দেশে সম্রাটের আদেশে গমন করেন। ওয়াকিয়াতে মুশ্‌তাকিতে লিখিত আছে যে, শেরশাহ্ যে তিনটি মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই চেরোসর্দ্দারের ধ্বংস-সাধন অন্যতম।

কর্ণেল ড্যাল্টন্ বলেন—চেরোগণ রোহতাস্ হইতে আসিয়া পালামৌ অধিকার করেন। পালামৌতে তখন খারওয়ার, গোঁড়, মার করব, পার্থ্য, কিষান প্রভৃতি জাতির বাস ছিল। তন্মধ্যে খারওয়ার জাতিই প্রধান। চেরোগণ তাহাদিগকে সিরগুজার অন্তঃপাতী পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিবার অনুমতি দেয়। পালামৌতে চেরোরাজ্যস্থাপনের প্রারম্ভে তথায় ১২,০০০ ঘর চেরু ও ১৮,০০০ ঘর খারওয়ার ছিল। কেহ কেহ বলেন, খারওয়ার চেরোগণেরই জাতিভুক্ত ছিল। এই দুই জাতি আঠার হাজার ও বারহাজার, এই দুই বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। বার হাজার চেরোরা নিম্নশ্রেণীর। পালামৌর চেরোদের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী আছে—একটি বার হাজার, অপরটি তের হাজার বা 'বীররন্দি'। বীরবন্দিরা বার হাজারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিত না। তবে এখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে। জনশ্রুতি যে, মারব বা মাও্ জাতি সেখানকার আদিম

অধিবাসী। ছোহারী উপত্যকার ও আমানত নদীর সন্নিহিত স্থানে অনেক দুর্গ এখনও তাহাদের অধিকারে আছে। সিরগুজা রাজ্যের পার্শ্ববর্তী স্থানে এখনও তাহাদের বাস আছে।

চেরো-বংশের পঞ্চম রাজা সহাবল রায় চাম্পারণ অধিকার করিয়া, সাহাবাদের দক্ষিণস্থিত চৈনপুর দুর্গে ফিরিয়া আসিলে, জহাঙ্গীরের প্রেরিত সেনা তাঁহাকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসে। তথায় তিনি একটি ব্যাঘ্রের হস্তে নিহত হন। তৎপুত্র ভাগবত রায় মানসিংহের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ সিরগুজায় গমন করিলে, ভাগবত রায় পুরাণ মলকে প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত করিয়া, আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চেরোবংশ পালামৌতে প্রায় ২৮০ বৎসর রাজত্ব করে। ভাগবত রায় সেই বংশের সর্ব্বপ্রথম রাজা।

মেদনী রায় সেই বংশের বিশেষ বিখ্যাত রাজা। তৎপুত্র প্রতাপ রায়ের রাজত্বকাল হইতে সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতির অভিযান সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাস-লেখকের গ্রন্থে বিশ্বাস-যোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। ১৬৪১ ও ১৬৪২ সালের মধ্যে তদানীন্তন বিহারের শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ সম্রাট্ শাহ্‌জহানের আদেশে প্রতাপ রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন। বহু যুদ্ধের পর প্রতাপ রায় বশ্যতা স্বীকার করেন ও ৮০,০০০ হাজার টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করেন।

তার কিছুকাল পরে তাঁহার খুল্লতাত তেজ রায় ও ধৈর্য্য রায় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সায়েস্তা খাঁর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা ইহ্‌তিমাদ খাঁকে প্রতাপ রায়কে সিংহাসনচ্যুত করিতে মত করাইলেন। তেজরায় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। তারপর আবার মুসলমান সেনাপতি জবরদস্ত খাঁ তেজরায়ের রাজ্য আক্রমণ ও তাঁহাকে পরাভূত করেন। কিন্তু প্রতাপ রায় জবরদস্ত খাঁকে তাঁহার সহিত পুনরায় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলেন। এবার প্রতাপ রায় বার্ষিক একলক্ষ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। (H. Blochmann's Notes from the Muhammadan Historians on Chutia Nagpura, Pachet and Palamau. J. A. S. B., Vol. XL, Part 1, 1871) কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্ধিসর্ত্ত চুক্তিপত্রেই সম্বদ্ধ থাকে—কার্য্যতঃ এক কপর্দ্দকও কর প্রদান করেন না দেখিয়া বিহারের শাসনকর্ত্তা দাউদ খাঁ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা বনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, দাউদ খাঁ রাজ্য অধিকার করিয়া, রাজ্যের শাসন-ভার একজন মুসলমান ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করিয়া, পাটনায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ১৬৬৬ সালে পালামৌ বিহার-শাসনকর্ত্তার শাসন-অন্তর্ভুক্ত হইল। আলমগীরনামা গ্রন্থে দাউদ খাঁর এই পালামৌ অভিযানের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। ডক্টর বুকানন হামিল্টন বলেন, সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত দরাউলীতে চেরোদের কয়েকটি প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের পরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেগুলি ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্য, মন্দিরগুলিও স্পষ্ট ব্রাহ্মণ্য কীর্ত্তিতে নির্ম্মিত (A. S. I. R, Vol. XIX, 1885)। বুদ্ধগয়া, সসরাম এবং বংঘুরে অনেক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। এই-গুলির ভিতর শিব ও হনুমানের মূর্ত্তিও পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এই-সমস্ত বাড়ীগুলিকে চেরোদের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মুসলমান আক্রমণের কিছুকাল পূর্ব্বে ভোজপুরের প্রমাররা ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। বুদ্ধগয়ার চেরোরা কাঠ কাটিয়া, ঔষধ সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের সংখ্যা খুব কম। চেরোরা এক সময়ে বেহারের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিল—এখন ৪০০।৫০০ লোক সাহাবাদে আছে। নেপাল সীমান্তেও চেরোদের বাস আছে—সেখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

বিন্ধ্য উপত্যকার চেরোগণ বাসুকি-নাগের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচিত করে (Buchanan Hamilton)। সকল স্থানের চেরোদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ এই যে, তাহারা নানা জাতি হইতে উৎপন্ন। শেরিঙের মতে, অসমীয় পর্ব্বতের নাগাজাতি, নাগবংশী রাজপুত, নাগপুরের আদিম জাতি ও নাগা ফকীরদের সঙ্গে চেরো-জাতির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভিত্তিহীন।

ছোটনাগপুরের চেরোরা আপনাদিগকে নাগবংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। সাহাবাদের অনেক নাগবংশী নিজেদের রাজপুত বলিয়া থাকে। তবে তাহারা ছোট

নাগপুরের চেরোরাজাকে আপনাদের গোষ্ঠীপতি বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। মির্জাপুরের অন্তর্গত সিংরোলিয়ার সর্দ্দার নিজেকে পরিচিত করিবার সময় বেণবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চেরো। পালামৌর রাজা নিজেকে রাজপুতবংশের বলিয়া থাকেন—বস্তুতঃ তিনিও চেরো। পালামৌবাসী চেরোরা আজকাল উপবীত ধারণ করে। গোত্র বলিবার সময় রাজপুত গোত্র বলিয়া থাকে। কিন্তু রাজপুতদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হয় না। পালামৌর চেরোদের বিশ্বাস, তাহারা কুমায়ুনবাসী চৈনমুনির সন্তান। এই মুনি এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্রই চেরোদিগের আদিপুরুষ বলিয়া চেরোরা মনে করে। চৈনমুনির সন্তান বলিয়া তাহারা নিজেদের চৌহান রাজপুত বলিয়াও পরিচয় দেয়। রাজপুতদের সঙ্গে সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহ হয় না। তবে তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্থানীয় রাজপুতদের সঙ্গে বিবাহ করিতে পারে। চেরোরা তাহাদের জাতির গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির কথা ভুলিয়া যায় নাই। তাহাদের মধ্যে কেহই মাথায় করিয়া কোন বোঝা বহন করে না। তবে যাহারা একেবারে হীনদশাপন্ন, তাহারাই কেবল হলকর্ষণ করে।

চেরোরা বড়ই অমিতব্যয়ী ও আড়ম্বরপ্রিয়। বিশুদ্ধ হিন্দু পরিবারের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের 'চের' জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। চেরোদের শরীরের বর্ণ একরকম নয়। বর্ণ বিভিন্ন হইলেও সাধারণতঃ বর্ণ কিছু কটা রকমের। ইহাদের গালের হাড় উচ্চ, চোখ ছোট—ঈষৎ বক্রভাববিশিষ্ট। ইহাদের নাসিকা নত ও কিঞ্চিৎপ্রশস্ত। মুখ বড়; অধর উন্নত। চেরোদের আকার প্রায় বিন্ধ্যবাসীদের ন্যায়। চেরোরা হিন্দুদের দেবতার পূজা করে। আবার তাহাদের আদিম দেবতারও পূজা করিয়া থাকে। হিন্দু দেবতার পূজার সময় কনোজিয়া বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। তাহাদের নিজেদের দেবতার পূজা তাহাদের পুরোহিত করে। এই পুরোহিতের নাম "বৈগা", বা "পাহান", "পান"। প্রতি দুই বৎসর অন্তর চেরোরা একটি উৎসব করিয়া থাকে। ইহাতে বনে বা পাহাড়ে একটি মহিষ বলি দিতে হয়। বৈগা এই উৎসবের পুরোহিত থাকে। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, চেরোরা তাহাকে "দুয়ার" বলে। কোলেরাও এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা "দুয়ার"কে 'দড়া' বলে। বীর-হোয়েদের নিকট ইহার নাম—"সিপাহী"। চেরোরা শিব ও হনুমানের পূজা করে। এই দুই দেবতার মূর্ত্তিও ইহাদের ভিতর পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ অথবা ঘরবাড়ী গোসাঞি তাহাদের গুরু। তাহারা অন্যান্য অসভ্য জাতির মত আদিম দেবতাদের নিকটও ছাগ, পাখী, মদ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য—উত্তম শস্যলাভ হইবে। অগ্রহায়ণ মাসে পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপ্রণালী অনেকটা হিন্দুদেরই মত। কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা-বিবাহ বিরল, কেবল নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃক্ষের শাখায় ইহারা একটি চাঁদোয়া প্রস্তুত করিয়া ভূমিতলে একটি মৃণ্ময় পাত্র স্থাপনা করে। বর ও কন্যা ইহার চারিদিকে ভ্রমণ করিবার সময় বলে যে, সে কখনও তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিবে না। এই কথা বলিবার সময় বর, কন্যার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করে। সিন্দুর দান শেষ হইলে বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরের পদ ধৌত করিয়া যৌতুক প্রদান করে। তারপর বরের মাথার টোপর হইতে 'পাতমৌড়ী' লইয়া কন্যার মাথায় দেওয়া হয়। ইহাদের বিবাহপ্রণালীর এই অনুষ্ঠান "ভানবার" নামে অভিহিত হয়। তাহাদের মধ্যে আরও এক প্রকার বিবাহানুষ্ঠান দেখা যায়। তাহার নাম "আম্‌লো"।

বিবাহ করিবার জন্য বর কন্যার বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে তাহার মা মুখে আম-পাতা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে। ঐ সময়ে তাহার মাতুল ঐ পাতাটির উপর জল ঢালিতে থাকে। আবার বর, কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলে, কন্যার মাতাও ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

চেরোদের ৫।৬ ঘরের জন্য একজন রাজা থাকে। রাজাকে তাহারা তিলক দিয়া গদীতে বসায়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

শূদ্র

শূদ্র শব্দটির আসল ব্যুৎপত্তি কি তাহা এখনো ঠিক নির্ণীত হয় নাই। ঋগ্বেদে একটিবারমাত্র (১০.৯০.১২) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪.২.৩,৫) রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং এই প্রসঙ্গেই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে (১.৩.৩৪) * ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে শব্দটিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, শুক্ (শুচ্) 'শোক' + দ্র 'দ্রুত' 'গত' (√ দ্রু 'গতি', 'দ্রুতগতি')। শঙ্করাচার্য্য সূত্রকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে গিয়া ইহা তিন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, (ক) 'যেহেতু, তিনি শোকের প্রতি দ্রুত (ধাবিত) হইয়াছিলেন, অর্থাৎ শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ("শুচম্ অভিদুদ্রাব"), অথবা (খ) শোক তাঁহার প্রতি দ্রুত হইয়াছিল ("শুচা বা অভিদুদ্রুবে"), কিংবা (গ) শোকে তিনি (ঋষি) রৈক্বের নিকট দ্রুত হইয়াছিলেন,' সেইজন্য তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছিল। উণাদিসূত্রে (২.১৯) যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে (√ শুচ্ + র, "শুচের্দশ্চ"), তাহা আলোচ্য শব্দটির শেষ অংশ বা প্রত্যয়টির সম্বন্ধে ঠিক হইলেও মোটের উপর ঠিক নহে। পূর্ব্বের তিনটি ব্যুৎপত্তির ন্যায় ইহাও কাল্পনিক ও অতিকষ্টকল্পিত।

আমার মনে হয় এ শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত নহে। আমি মনে করি, ইহা মূল ক্ষুদ্র শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন উচ্চতর বর্ণের কার্য্য ও গুণের তুলনায় সেই সময়ে চতুর্থ বর্ণ ক্ষুদ্র অর্থাৎ নিকৃষ্ট থাকায় তাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা হয়, পরে কালক্রমে এই ক্ষুদ্র শব্দই শূদ্র আকার ধারণ করিয়াছে। পালি অগ্গঞ্ঞ সুত্তন্ত, ২৫ (= দীঘনিকায়, ২৭.২৫, — PTS. Vol. III, p. 96) হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি এই মত সমর্থন করিবে। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের গুণ-কার্য্যের কথা বলিয়া শূদ্রদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে :—

"তেসং যেব খো বাসেট্ঠ সত্তানং যে তে সত্তা অবসেসা, তে লুদ্দাচারা (সংস্কৃত রুদ্রাচারাঃ) অহেসুং। 'লুদ্দাচারা খুদ্দাচারা (সংস্কৃত ক্ষুদ্রাচারাঃ) তি' খো বাসেট্ঠ সুদ্দা সুদ্দা ত্বেব অক্খরং উপন্নং।"

'হে বাসিষ্ঠ, সেই-সমস্ত লোকের যাহারা অবশিষ্ট থাকিল তাহারা রুদ্রাচার ছিল (তাহাদের আচরণ রুদ্র অর্থাৎ ভীষণ ছিল)। শূদ্রেরা রুদ্রাচার অর্থাৎ ক্ষুদ্রাচার ছিল বলিয়া শূদ্র এই অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে।'

মহাব্যুৎপত্তিতে, (ASB, Part I, p. 35) বিবিধ মানবজাতির নাম উল্লেখের মধ্যে শূদ্রদের নাম সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে "শূদ্র অথবা ক্ষুদ্র।" ইহাতে মনে হয় এই গ্রন্থকারের মতে শূদ্র ও ক্ষুদ্র এই উভয় শব্দই বস্তুত একই, যদিও ইহাদের আকারটা ভিন্ন।

তিরহাঙ্গী বিভাষার শব্দাবলীর মধ্যে (JASB, 1838, p. 783) 'ছোট' অর্থে সুদ (Suda) শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি যে মূল ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এখানে ইহা বলা আবশ্যক, তিরহাঙ্গী বহু শব্দ সংস্কৃতমূলক।

এখন ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে দেখাইতে হইবে, শূদ্র শব্দটি ক্ষুদ্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে কি না। এ সম্বন্ধে অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলা উচিত যে, বৈদিক ভাষাতেও, এমন কি ঋগ্বেদেরও ভাষায় প্রাকৃত ভাব (Prakritism) দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা ইহা জানেন, তাই এখানে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য দুই-একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। ঋগ্বেদে (১০.১৫৫.১) বিকট শব্দ আছে, কিন্তু ইহা মূল সংস্কৃত নহে, ইহার সংস্কৃত হইতেছে বিকৃত; ইহাও ঋগ্বেদে (১.১৬৪.১৫; ২.৩৮.৮) আছে। এইরূপ শিথির (ঋগ্বেদ, ৬.৫৪.২, ইত্যাদি) হইয়াছে * শৃথির (√ শ্রথ্ 'শিথিল হওয়া')।

হিন্দ-ইরানীয় (Indo-Iranian) ভাষায় ক্ষ স্থানে যে, কোনো একটি উষ্ম বর্ণ (শ, ষ, স) হয়, তাহার প্রচুর উদাহরণ আছে। উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদী সুপ্রসিদ্ধ।

* "শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে।"

* ইহারই পরবর্ত্তী রূপ হইতেছে শিথিল, এবং ইহা হইতে ক্রমে ঢিল।

কালিদাসও মেঘদূতে যে, (১· ৩১) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ("শি প্রা বা তঃ প্রিয়তম ইব"), তাহা আমরা অনেকেই জানি। এই শি প্রা শব্দটি যে, ক্ষি প্রা ('দ্রুতগামিনী') হইতে হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বৃহৎ-সংহিতার (এসিয়াটিক সোসাইটী বেঙ্গল, ১৬· ৯, ও পাঠভেদ পৃ· ১৪)" ও ব্রহ্মপুরাণের (আনন্দাশ্রম, পুনা, ২৭· ২৯) বহু পুঁথীতে শি প্রা স্থানে ক্ষি প্রা পাঠই দেখা যায়। (ব্রহ্মপুরাণের 'খ'-সংজ্ঞক একখানা পুঁথীতে এই স্থলে শী ঘ্রা পাঠ আছে)। এখানে একটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে। কোনো-কোনো পুস্তকে আলোচ্য শব্দটি লিখিত হয় শি প্রা, আবার আর কতকগুলিতে দেখা যায় সি প্রা। এই তালব্য ও দন্ত্য উষ্মবর্ণের সম্বন্ধে পরে বলিব। আপাতত আর-কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করি। সং (=সংস্কৃত) ই ক্ষু 'আখ', ম.(=মরাঠী) উ স অথবা ঊঁ স ; স. অ ক্ষি অথবা অক্ষ 'চোখ', সি.(=সিংহলী) এ স (এই একারটি আমাদের এ ক শব্দের একারের মত উচ্চারণীয়); স. ঋ ক্ষ 'ভালুক', ম. রী স অথবা রীঁ স ; স. ম ক্ষী 'মাছি', ম. মা শী ; স. ক্ষেত্র 'খেত' 'জমি', ম. শে ত ; স. ক্ষীণ 'ক্ষয়প্রাপ্ত', ম. শী ন *।

ইরানীয় ভাষা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—স. √ক্ষি প্ 'ক্ষেপণ করা', অবে. (=অবেস্তা) √সি প্ 'উল্টাইয়া দেওয়া' 'খনন করা' ; স. √ক্ষি 'বাস করা', অবে. √ষি ; স. ম ক্ষু (পরবর্ত্তী স. ম ঙ্ ক্ষু) 'দ্রুত', অবে. মোষু ; স. দ ক্ষি ণ 'ডান', অবে. দ ষি ন।

আবার স. ক্ষী র 'দুধ', ফা. (=ফারসী) শী র ; স. ক্ষ পা 'রাত্রি', অবে. খ্ ষ প্, ফা. শ ব্।

শ, ষ, স, এই তিনটি উষ্মবর্ণের পরস্পর পরিবর্ত্তনের উদাহরণ বৈদিক ভাষায়—এমন কি সংহিতারও সময়ে—অনেক দেখা যায়। উদাহরণরূপে কয়েকটি উল্লেখ করি :—বা শী 'কাঠ কাটিবার একরূপ অস্ত্র, বাশুলা' (ঋ. ১· ৮৮· ৩), আবার বা সী (অথ. ১০· ৬·৩) ; কে শ 'চুল'. (ঋ. ১০. ১০৫· ৫), আবার কে স-র 'ভ্রূর চুল' ; কৃ শ্ম (বাজ.) 'দেবযোনিবিশেষ, দৈত্যবিশেষ', আবার কৃ ষ্ম (মৈত্রা.); √ক্রু 'গতি', আবার √শ্রু (যথা শ্রু ব ৎ শব্দে, ঋ. ১· ১২৭· ৩) ; √স্ব দ 'আস্বাদন করা' হইতে খা দ্য 'স্বাদু' (ঋ. ১০· ৪৯· ১০)।*

* এইরূপে ক্ষু দ্র শব্দের মূর্দ্ধন্য উষ্মবর্ণ (ষকার) যে শূ দ্র শব্দে তালব্য (শ) হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহাতে কোনো বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এস্থানে আমরা আর-একটি শব্দ উল্লেখ করিতে পারি, আলোচ্য কথাটা ইহাতে আরো পরিষ্কার হইবে। 'মাছি' অর্থে ঋগ্বেদে ম ক্ ষ্ (=ম ক্ষ্) শব্দ আছে (ম ক্ষা ও ম ক্ষি কা শব্দও আছে)। এই ম ক্ ষ্ শব্দটি 'মাছি' অর্থেই অন্যান্য আর্য্যভাষায় এই-সমস্ত আকারে দেখা যায় :—

লাতিন *musca*, স্পানিস্ ও পর্ত্তুগীজ *mosca*, ফরাসী *mouche*, লিথুয়ানিয়ান *muse*.

অবে. ম খ্ ষ্ (ম খ্ ষী, স. ম ক্ ষী), ফা. ম গ স্, রা ক্ সী ম ক্ স, বালুচী ম ক স্ ক।

এই-সমস্ত শব্দ আলোচনা ও তুলনা করিয়া স্বভাবতই মনে হয় ঋগ্বেদের ম ক্ ষ্ শব্দই ক্রমে-ক্রমে অথর্ব্ববেদের ম শ ক রূপ ধারণ করিয়াছে—বর্ণবিপর্য্যয়ে। †

ক্ষকার-স্থিত ষকার যে সংহিতার সময়ে শকারে পরিণত হইয়াছিল তাহা আমরা ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি।

এস্থানে আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, ম শ ক শব্দ পূর্ব্বে সাধারণ 'মাছি' অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে তাহা ক্রমশ 'মশা' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। তুল :—স্পানিস্ ও পর্ত্তুগীজ *mosca* 'মাছি', ইহা হইতেই অল্পার্থে উৎপন্ন (diminutive form) *mosquito* শব্দের অর্থ 'মশা'।

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পরে তালব্য স্বর (অর্থাৎ ই, ঈ, এ, ঐ) থাকিলেই স মরাঠীতে শ হইয়া থাকে। অবশ্য এ মন্তব্য তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে।

* দ্রষ্টব্য Macdonell's Vedic Grammar, p. 53 ; আমার পালিপ্রকাশের ভূমিকা, পৃ. ৮১।

† ইহা হইতে আমার মনে হয়, পালির 'মশা' অর্থে ম ক স শব্দ বর্ণবিপর্য্যয়ের নিয়মানুসারে সাক্ষাৎ সংস্কৃত ম শ ক হইতে হয় নাই—যদিও সাধারণত সকলেই ইহাই বলিয়া থাকেন (Geiger, *Pali Literatur und Sprache*, p. 47, § 61) ; কিন্তু বস্তুত ইহা ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ সংস্কৃত ম শ ক ই বর্ণবিপর্য্যয়ে ম ক শ হইতে হইয়াছে। মূল ম ক্ ষ্ হইতে ক্রমিক পরিবর্ত্তন এইরূপ কিছু হইতে পারে :—ম ক্ ষ্ > ম ক্ ষ (তুলঃ ম ক্ ষা) > ম ক ষ > ম ক শ (পালি ম ক স) > (বর্ণবিপর্য্যয়ে) ম শ ক।

মূল ক্ষু দ্র শব্দে যেমন হ্রস্ব উকার আছে, শূ দ্র শব্দেও সেইরূপ তাহা না থাকিয়া তাহার স্থানে দীর্ঘ উকার রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দ দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। তুলনীয়:—মূল √তি জ্ ('শান দেওয়া' 'ধারাল করা বা হওয়া') হইতে তী ক্ষ, আবার তি গ্ম (ঋগ্বেদ); ত লী ক্ষ (তৈত্তিরীয় সংহিতা), আবার হ লি ক্ষ (বাজসনেয়ি-সংহিতা) 'এক প্রকার জন্তু'; * শি ক্ষা আবার শী ক্ষা (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)।

শান্তিনিকেতন। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বুদ্ধির মাপকাঠি

[১]

বিজ্ঞানের দিনে আনুমানিক কথার মূল্য নাই। কোন কথা বলিতে হইলেই প্রমাণাদির সহিত বলিতে হয়। যতগুলি জিনিষের মূল্য আমরা 'আন্দাজে' স্থির করি, অপরের বুদ্ধিমত্তা তাহাদের অন্যতম। 'এ ছেলেটার বুদ্ধি নাই', 'অমুক বেশ বুদ্ধিমান'—এই রকমের কথা আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি ক'রে জানলেন্ কার বুদ্ধি আছে বা কার বুদ্ধি নাই,' অনেক সময় আমরা তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি না।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বুদ্ধিমত্তার ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সকলেই মানিয়া লন যে কতকগুলি কার্য্য করিতে পারিলেই অথবা কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান থাকিলেই মানবশিশুকে বুদ্ধিমান বলিতে হইবে। আমি জানি একটি বালককে খুব বুদ্ধিমান বলা হইত, কারণ সে একশত আট চাণক্যশ্লোক মুখাগ্রে রাখিত, এবং শ্লোকের নম্বর শুনিলেই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া দিতে পারিত। তাহার আরএকটি গুণ ছিল যে সে তাড়াতাড়ি মানসাঙ্ক কষিতে পারিত। বাস্তবিক, যে বালক 'চট্‌পট্' পাঠ মুখস্থ করিতে বা মুখস্থ-করা পাঠ মনে রাখিতে পারে, তাহাকে প্রায়ই বুদ্ধিমান বলিতে কেহ কেহ ইতস্ততঃ করেন না।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে স্মরণশক্তির প্রাখর্য্যই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

কোন বালকের বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ করিতে যাইয়া, আমরা অনেক সময়ই দেখিবার চেষ্টা করি, আমরা যাহা বলিতেছি, বালক তাহা চট্‌পট্ বুঝিতে পারিতেছে কি না। যদি তাহা পারিল, তবেই স্থির করিলাম সে বুদ্ধিমান; যদি না পারিল, তখন বলিলাম 'কি বোকা ছেলে!' তখন আমরা একবার ভাবিয়াও দেখি না যে আমাদের বলিবার মধ্যে কোথাও কিছু দোষ আছে কি না। খুবই সম্ভব যে এইপ্রকারের 'বলা'তে অন্য বালক বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু সেই তথাকথিত 'বোকা' ছেলের জন্য বলিবার ধরণ অন্যপ্রকার হইতে পারে। অন্যভাবে বুঝাইলে যদি সে বুঝিতে পারে, তাহাকে নির্ব্বোধ বলিব কেন?

আবার কখনও কখনও বালকের বুদ্ধিকে আমরা নিজেদের বুদ্ধির সহিত তুলনা করিয়া থাকি। তাহার স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত কি তাহা সকলেই জানেন। অথবা হয়ত আমাদের পরিচিত কোন বালকের বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি আছে; অপর বালকের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রথমোক্ত বালকের সহিত তুলনা করি। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে বুদ্ধিমত্তার অনেক দিক আছে।

এইপ্রকারের বিচারের ফলে এই দাঁড়ায় যে একই বালক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা এ কথা বেশ জানেন যে একই ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের নিকট 'সাধারণ' 'বুদ্ধিমান' বা 'নির্ব্বোধ' আখ্যা পাইয়া থাকে। প্রত্যেক শিক্ষকই নিজের পাঠ্য বিষয়ে পারদর্শিতা দ্বারা বালকের বুদ্ধির মাপ করিয়া থাকেন। মনোবিজ্ঞানবিৎ ফরাসী পণ্ডিত বিনে (Binet) কতিপয় বালককে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করান। ফলে দেখা যায়, একই বালক ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের নিকট, বুদ্ধিমান বা নির্ব্বোধ আখ্যা পাইয়াছিল।

* Macdonell's Vedic Grammar, pp. 10-11.

প্রকৃতপক্ষে সকলের 'মানদণ্ড' একই না হইলে, পরীক্ষার ফল স্বতন্ত্র হইবারই কথা। যদি কোন অপরিচিত বালককে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, এবং যদি আমাদিগকে তাহার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করিতে হয়, তখন আমরা কি উপায় অবলম্বন করিব, পাঠক বলিতে পারেন কি? এইপ্রকারের প্রশ্নই বিনে অনেক শিক্ষকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর প্রশ্নটির দুটি অংশ—(১) আপনারা কি উপায়ে ছাত্রগণের বুদ্ধিমত্তার ধারণা করিয়া থাকেন? (২) আপনাদের ধারণা কতবার ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে?

দ্বিতীয় অংশটির উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রথম অংশটির প্রায় চল্লিশটি উত্তর আসে। অধিকাংশ উত্তরই সন্তোষজনক হয় নাই। কোনটি বা পক্ষপাতদুষ্ট, কোনটি বা অনিশ্চিত। আবার কতকগুলি উত্তর মাত্র বচনের সমষ্টি, যেন উত্তরদাতা আপনার মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাদের পাঠ্য বিষয়ে পারদর্শিতা দ্বারা বালকের বুদ্ধিমত্তা নির্ণয় করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। দুই-একটি উত্তরের নমুনা দেওয়া গেল:—

(১) যে বালক এমন ভাবে পড়িতে পারে যে পঠিত বিষয়ের মর্ম্ম শ্রোতার মর্ম্মে প্রবেশ করে, সে বালক নিশ্চিতই বুদ্ধিমান।

(২) যে বালক ইতিহাস ভূগোল ভাল জানে তাকে বুদ্ধিমান বলা যায়।

(৩) ছেলে বুদ্ধিমান কি না, সে কথা তার চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। "যে ছেলে ভাঁটা খেলে তার নাটার মত চোখ"!

কেহ বলিয়াছিলেন, যে বালক নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারিবে সে বুদ্ধিমান—

(ক) তোমার মা-বাপকে ভালবাস কেন?

(খ) যদি কোন কাজ করতে ৩ জন লোকের ৭ ঘণ্টা লাগে, তাহলে ৭ জনের বেশী সময় লাগবে, না কম সময় লাগবে?

(গ) টাকাটার সিকি বেশী না অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক বেশী?

(ঘ) তোমার হাতে ২০ টাকা দিলে তুমি কি কর?

কেহ বলিয়াছিলেন, মস্তকের আকৃতি দ্বারা বুদ্ধিমান বালক চিনিতে পারা যায়; আবার কেহ বা বলিয়াছিলেন, মাত্র 'চাহনির' দ্বারাই বুদ্ধিমানকে ধরা যায়! অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে আকৃতি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিমত্তার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'আকৃতি' বা 'চাহনি'র এমন একটা কিছু মানদণ্ড নাই যে একই আকৃতি দেখিয়া সকলের একই ধারণা হইবে। তদ্ব্যতীত সকলেই জানেন, ভালমানুষ 'গো-বেচারা' বুদ্ধিমানের অভাব নাই; আবার, অনেক 'সুন্দর গাধা'ও আছেন!

উত্তরগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্বতই মনে হয়—(১) কাহারও কিছু নিশ্চিত মাপকাঠি নাই, সকলেই অনুমানের উপর নির্ভর করেন। স্মরণশক্তিকে অথবা গণিতাদি বিষয়ে পারদর্শিতাকেই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ধরিয়া লওয়া হয়। (২) আকৃতি-গত বিশেষত্ব দেখিয়াও বুদ্ধিমত্তার অনুমান করিতে গিয়া অনেকেই ভুল করেন। (৩) নিজের ভুল হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, প্রত্যেকেই মনে করেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।

কতকগুলি প্রশ্নের দ্বারা বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করিতে যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ বয়সের বালককে এইসকল প্রশ্ন করিতে হইবে বলিয়া দেন নাই।

সকল সমাজেই মোটামুটি হিসাবে তিন শ্রেণীর লোক আছে—(১) ক্ষীণবুদ্ধি, (২) সাধারণবুদ্ধি, (৩) প্রতিভাশালী। আমরা অনেক সময় ঠিক ধরিতে পারি না—কে কোন্ শ্রেণীর লোক। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। সভ্যতার একটি লক্ষণ এই যে যথাসম্ভব অল্প শক্তির ব্যয়ে যথাসম্ভব বেশী লাভ করিতে হইবে। বুদ্ধিমত্তার বিভাগ অনুসারে ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে হয়ত এইরূপ লাভের সম্ভাবনা আছে।

অনেকে বলিতে পারেন যে আমাদের সহজ বুদ্ধির দ্বারা লোককে এই রকমে শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দিতে পারি। সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন লোককে বাহির করা হয়ত সহজসাধ্য। কিন্তু ক্ষীণবুদ্ধি বা প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে

ধরিতে পারা তত সহজ নয়। হয়ত এই শ্রেণীর লোক-দিগকে এত বিলম্বে চিনিতে পারা যায় যখন তাদের জন্য শিক্ষার অন্য ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। ইহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। আমেরিকায় হাজার হাজার বালক-বালিকার পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই দুই শ্রেণীর শিশুদিগকে আন্দাজে ধরা বড় শক্ত।

যদি প্রথম হইতেই প্রতিভাশালী শিশুকে চিনিতে পারা যায়, তবে বিশিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লাভ হইতে পারে। ক্ষীণবুদ্ধির শিশুগণকে প্রথম হইতে জানিতে পারায় একটি বিশেষ লাভ আছে। অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণবুদ্ধির বালকবালিকাই সমাজের অসৎব্যক্তিতে পরিণত হয়।

ওহায়ো ষ্টেট রিফরমেটরীর বালিকাগণের শতকরা ৩৩ জন হইতেছে ক্ষীণবুদ্ধি। নিউজার্সীতে ১০০ বালক-অপরাধীর অধিকাংশই ক্ষীণবুদ্ধি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্যত্র ৫৬ জন অভিযুক্ত বালক-বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বয়সের অনুপাতে তাহাদের বুদ্ধি খুবই কম। মাসাচুসেট্‌স্‌এ ১০০ অপরাধীর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ক্ষীণবুদ্ধির লোক। শিকাগোতে ৫৬৪ জন অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে তাহাদের শতকরা ৯৭ জন ক্ষীণবুদ্ধি। ইলিনয়ের জলিয়েৎ জেলখানার অপরাধিনী স্ত্রীলোকের শতকরা ৫০ জন এই শ্রেণীর। আবার ইণ্ডিয়ানাতে জেফারসন্‌ভিল্‌ ষ্টেটরিফরমেটরীর ১০০৯ জন অভিযুক্ত যুবক ক্ষীণবুদ্ধি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে অন্য তালিকা দেওয়া হইল না। কিন্তু উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে অপরাধপ্রবণতার সহিত ক্ষীণবুদ্ধির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। যদি কোনও উপায়ে এই শ্রেণীর বালক-বালিকাকে চিনিয়া লইয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে হয়ত অপরাধের সংখ্যা কমান যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক কি উপায়ে বুদ্ধির পরীক্ষা করা যায়।

বুদ্ধির মাপ করিতে যাইতেছি বলিলেই অনেকে হয়ত বলিবেন, বুদ্ধি জিনিষটা কি, আগে তাহা বলিয়া তাহার মাপ করুন; নচেৎ আপনার মাপামাপির মধ্যে কোথায় গলদ আছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। কথাটা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে যে জিনিষটার মাপ করিতে যাইতেছি তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত। একথা মনে রাখা অসঙ্গত হইবে না যে বিদ্যুৎস্রোতের বিষয়ে মাপামাপি করিবার আগে বিদ্যুৎ জিনিষটা যে কি তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা ছিল না।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমতঃ একটি মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন; ও পরে, সেই ধারণা সংশোধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমত্তার পরিমাপে বিনেও তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে—(১) তিনি চিন্তিতব্য বা কর্ত্তব্য বিষয়টা স্থির করিয়া, তাহাকে মনঃকেন্দ্রে সর্ব্বদা রাখেন অর্থাৎ তিনি গন্তব্য স্থির করিয়া লইয়া গন্তব্য হইতে মন অপসৃত করেন না; (২) গন্তব্যে যাইতে যাইতে মধ্যপথে আবশ্যকমত অবধারিত উপায়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন; (৩) আত্মসমালোচনার দ্বারা গন্তব্যে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন কি না স্থির করিতে পারেন। অর্থাৎ শাদা কথায় বলিতে গেলে—বুদ্ধিমান তিনি, যিনি জানেন কি করিতে হইবে, কি উপায়ে করিতে হইবে, আর কাজ সমাপ্ত হইলে যিনি ভাবিয়া দেখেন বাস্তবিকই যে-কাজ তিনি হাতে লইয়াছিলেন, তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না।

বুদ্ধিমত্তার যে লক্ষণ দেওয়া গেল তাহাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন বুদ্ধিমত্তার অন্য কোন সংজ্ঞা দেওয়া বিশেষ কঠিন। যাহারা সংস্কৃতমূলক বাক্যাবলী প্রয়োগে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলিতে পারেন যে বুদ্ধিমত্তার প্রধান লক্ষণ হইতেছে—(১) ঐককেন্দ্রিকতা ও ঐকান্তিকতা, (২) অধ্যবসায়শীলতা বা ধৈর্য্য, (৩) আত্মসমালোচনপ্রবণতা।

কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, এই প্রবন্ধে লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, নিরপেক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ অপেক্ষা আপেক্ষিক বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ করাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিনে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পরিমাপের উপায় উদ্ভাবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এবং কয়েক বৎসর যাবত বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকাগণের পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরীক্ষার ধারা এইরূপ—কতকগুলি এক বয়সের বালক-বালিকা লওয়া হইল; তাহাদের প্রত্যেককে কতকগুলি প্রশ্ন করা গেল। এখন মনে করুন, সেই বয়সের বালক-বালিকাগণের শতকরা ৯০ জন প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারিল, অথচ তাহাদের অপেক্ষা এক-বৎসর কম বয়সের বালক-বালিকারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা একবৎসর বেশী বয়সের বালকবালিকাগণ অতি সহজেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিল; এরকম স্থলে ঐ প্রশ্নগুলিকে ঐ বয়সের বুদ্ধির মাপকাঠি ধরিয়া লওয়া হইল। এইপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বালকবালিকাগণকে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধির মাপকাঠি স্থির হইল। বিনে ধরিয়া লইয়াছেন যে যোল বৎসর বয়সের বেশী বালক-বালিকাদের বা যুবক-যুবতীগণের জন্য স্বতন্ত্র পরিমাণের প্রয়োজন হয় না। বিনে সর্ব্বসুদ্ধ ৫৪টি প্রশ্ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পরবর্ত্তী পরীক্ষকগণ এই ৫৪টি প্রশ্নের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবার জন্য প্রায় শতাধিক প্রশ্নের উদ্ভাবনা হইয়াছে। এই শতাধিক প্রশ্নসমূহের নাম বুদ্ধির মাপকাঠি।

নিম্নলিখিত কতকগুলি প্রশ্নের দ্বারা বিনের উদ্ভাবিত মাপকাঠির আভাস পাওয়া যাইবে। তিন বৎসর বয়সের শিশুর জন্য প্রশ্নগুলি হইতেছে: -

(১) তোমার নাক কই; চোখ কোথায়; মুখ দেখি, চুল কই......(অন্ততঃ তিনটার উত্তর ঠিক হওয়া চাই)।

(২) [শিশুর সম্মুখে চাবী, পয়সা, ছুরী, পেন্সিল বা এইপ্রকারের গৃহস্থালীর জিনিষ রাখিয়া] এটা কি? ওটা কি? (অন্ততঃ তিনটা জিনিষের নাম ঠিক বলা চাই। উচ্চারণের দোষ ধর্ত্তব্য নয়)।

(৩) (একখানা সাধারণ ছবি, যেমন ডাকঘরের, ডাক্তারখানার বা স্কুলঘরের ছবি সাম্‌নে রাখিয়া) বল ত, ছবিতে কি কি আছে? (অন্ততঃ তিনটি জিনিষের নাম ঠিক হওয়া চাই)।

(৪) তোমার নাম কি (পুরা নাম বলা চাই)।

(৫) বল দেখি—"আমার বাবা বাড়ীতে নাই" (এতদনুরূপ ক্ষুদ্রবাক্য শিশুকে বলাইতে হইবে)।

এখন এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ইহাদের দ্বারা শিশুর কিরূপ পরীক্ষা হইতে পারে। প্রথম প্রশ্নটির উদ্দেশ্য হইতেছে শিশু ভাষা বুঝিতে শিখিয়াছে কি না দেখা। ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা একটা মানসিক উন্নতির লক্ষণ। শিশু প্রথমে 'হাবভাব' দেখিয়া বুঝিতে শিখে; তার পরে শুনা কথার অর্থবোধ করিতে শিখে; ক্রমশঃ অপরের উচ্চারিত কথা পাখীর মত আবৃত্তি করিতে শিখে। পরিশেষে, নিজের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার ব্যবহার করে। অবশ্য, এই প্রশ্নটি শিশুর ভাষাবোধশক্তির পরীক্ষা করিতেছে, একথা বলা খুব ঠিক নহে। কারণ দুই বৎসর বয়সের সময় হইতেই শিশু ভাষা বুঝিতে আরম্ভ করে। এই প্রশ্নের দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে শিশু ভাষার মধ্য দিয়া নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত পরিচয় করিয়াছে কি না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইতেছে গৃহস্থালীর সাধারণ জিনিষের নামের সহিত শিশুর পরিচয় হইয়াছে কি না নির্দ্ধারণ করা। একটি চাবী বা ছুরী বা পেন্সিলের নাম জানা একজন তিনবৎসরের শিশুর খুবই উচিত; কারণ যে সমস্ত জিনিষ শিশুর সম্মুখে সর্ব্বদাই রহিয়াছে তাহাদের নাম জানিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। যে শিশুর সে ইচ্ছা হয় নাই, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গলদ আছে—মনে করা যাইতে পারে। তবে এমন হইতে পারে যে—শিশু ছুরীকে বলে ছুলী, পেন্সিলকে বলে পেন্‌ছিল; কিন্তু নাম জানা চাই।

তৃতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য:—বস্তুর প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারা মানসিক শক্তিবিশেষের পরিচায়ক। কারণ পার্থক্যসত্ত্বেও একত্ব বোধ করিতে হইলে বিশেষরূপে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন। তোমার নাম কি? শিশু হয়ত বলিবে, 'খোকা' 'পা' বা 'ভুলো'। আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—ভাল নাম কি? হয়ত শিশু বলিবে—প্রফুল্ল। তখন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—প্রফুল্ল কি? তিনবৎসরের শিশুর পক্ষে বংশের পদবী জানা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পঞ্চম প্রশ্ন। এখানে শিশু একসঙ্গে ছয়টি বা সাতটি

শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে কি না তাহারই পরীক্ষা হইতেছে। পরীক্ষক বলিবেন—"দেখ, আমি যা বল্‌চি তা শুন; তারপর বল।—

(১) আমার একটা ছোট্ট বেড়াল-ছানা আছে।

(২) গরমের দিনে খুব রোদ হয়।"

উচ্চারণের দোষ ধর্ত্তব্য নয়। পাঠক দেখিবেন সমস্ত প্রশ্নগুলিতেই স্মরণশক্তির পরীক্ষা হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের প্রশ্নগুলির উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, পরীক্ষার ফল কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে। বহু সহস্র শিশুর পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া তিনবৎসরের অধিকাংশ শিশুর পক্ষে সম্ভব।

এখন মনে করুন কোন শিশুর বয়স তিন বৎসর। তাহার মানসিক বয়স কত যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে উপরোক্ত প্রশ্নগুলি দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সন্তোষজনক হয়, তবে বুঝা গেল যে শিশুর বুদ্ধিমত্তা এই বয়সের সাধারণ শিশুরই মত। কিন্তু মনে করা যাউক যে কোন শিশু উপরের ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে মাত্র চারিটির উত্তর দিল। তাহা হইলে এই শিশুর মানসিক বয়স হইবে ২ বৎসর ৮ মাস; প্রত্যেক প্রশ্নের দ্বারা ২ মাস বয়সের নির্দ্ধারণ করা হয়। ২ বৎসর ৮ মাস×১০০ বা ৮৮·৮ এই সংখ্যাটিকে বুদ্ধির অঙ্ক (Intelligence Quotient) বলা যায়। এইপ্রকারে সমাজের যাবতীয় তিনবৎসরের শিশুর বুদ্ধির অঙ্ক (I. Q.) বাহির করা যাইতে পারে। যাহাদের I. Q. ৬০ অপেক্ষা কম তাহাদিগকে ক্ষীণবুদ্ধি বলা হইবে। তাহাদের জন্য শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা উচিত। আবার হয়ত কোনও তিন বৎসরের শিশু এই বয়সের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে, অথচ চারি বৎসর বয়সের প্রশ্নের কতকগুলির উত্তরও দিতে পারে। মনে করুন পরীক্ষমাণ শিশু তিনবৎসরের বয়সেও চতুর্থবর্ষের প্রশ্নের তিনটির উত্তর দিয়াছে। এই-স্থলে শিশুর মানসিক বয়স হইবে ৩ বৎসর ৬ মাস। ইহার বুদ্ধির অঙ্ক বা I. Q. $= \frac{\text{৩ বৎ॰৬ মাস}}{\text{৩ বৎসর}} \times ১০০ = ১১৬·৬$।

এই শিশু তিনবৎসরের সাধারণ শিশু অপেক্ষা বুদ্ধিশালী। যে-সকল শিশুর I. Q. ১২০ বা ততোধিক তাহাদিগকে প্রতিভাশালী শিশু মনে করিয়া তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

চারি বৎসর বয়স হইতে ষোল বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদিগের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পশ্চাতে লিখিত হইবে। প্রত্যেক বয়সেই I. Q. নির্ণয় করা যাইতে পারিবে। এখন দেখা যাউক পরীক্ষার ফল আমাদের কি উপকারে আসিতে পারে। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে করুন ৯ কিংবা ১০ বৎসরের বালকবালিকাদিগকে তত্তৎ বয়সের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলির দ্বারা পরীক্ষা করা হইল এবং প্রায় একহাজার শিশুর I. Q. জানা গেল। ধরিয়া লওয়া যাউক যে পরীক্ষার ফল এইরূপ হইয়াছে—

শতকরা ১০ জনের	I. Q.	(বুদ্ধির অংশ)	৩০	থেকে	৪০
২০ জনের	I. Q.	,,	৪৫	,,	৫৫
৪০ জনের	I. Q.	,,	৬৫	,,	৭৫
১৫ জনের	I. Q.	,,	৮০	,,	৯০
৫ জনের	I. Q.	,,	১০৫	,,	১২০

(১) সমাজে ৯।১০ বৎসর বয়সের শিশুর মধ্যে সাধারণবুদ্ধির বালক প্রায় শতকরা ৫০ জন। ক্ষীণবুদ্ধি বালকের সংখ্যা শতকরা ৩০ জন এবং প্রতিভাশালী বা সুবুদ্ধির সংখ্যা শতকরা ২০ জন।

যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বা সমাজের একই বয়সের বালকবালিকাদের পরীক্ষা করি, তাহা হইলে এই অংশগুলির দ্বারা তত্তৎ দেশের সমাজের সমবয়স্ক বালকবালিকাগণের বুদ্ধির পার্থক্য বুঝা যাইবে। এই পার্থক্য কেমন করিয়া আসিল তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় হইবে।

(২) সময়ে সময়ে (ধরুন তিন বৎসর অন্তর) এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাইতে পারে সমাজে বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ বাড়িতেছে কি না।

(৩) অধিকাংশ সময়েই স্কুল-কলেজের যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া তাহাদের উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। অবশ্য অন্য বিশিষ্ট উপায় না থাকায়, উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা হইতে যোগ্যতার পরিমাণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি বিনের রীতি অনুসারে

বুদ্ধিমত্তার মাপ লওয়া যায়, তাহা হইলে স্কুলের যোগ্যতার মাপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে লওয়া হইল বলিতে পারা যায়।

(৪) সমাজবিশেষের I. Q. রেখা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের কি না তাহাও দেখা যাইতে পারে।

(৫) একই শিশুর I. Q. চিরকাল একই থাকে কিংবা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় তাহা দেখা যাইতে পারে।

(৬) যে সমস্ত বালকবালিকার I. Q. (বুদ্ধির অংশ) ৬০এর নীচে, তাহাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। কারণ হয়ত তাহারাই সমাজের অসং-প্রবৃত্তির লোক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

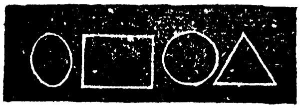
(৭) যাহাদের I. Q. ১২০ বা ততোধিক, তাহাদের জন্যও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, কেন না হয়ত তাহারা ভবিষ্যতে বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইবে।

চারি ও পাঁচ বৎসর বয়সের প্রশ্নগুলি নীচে দেওয়া গেল।

৪ বৎসরের প্রশ্ন—

(১) [কতকগুলি সরলরেখা দেখাইয়া]

বল দেখি কোন্‌টি সব চেয়ে বড়; কোন্‌টি সব চেয়ে ছোট? (তিন বার পরীক্ষায় নির্ভুল উত্তর পাওয়া চাই।)

(২) 

এইপ্রকারের কতকগুলি ছবি বা আকৃতি শিশুর সম্মুখে রাখিয়া শিশুকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—এইরকম খুঁজে বের কর ত?

(৩) চারিটি পয়সা বা মার্ব্বেল দিয়া বলিতে হইবে গুণে বল ত-'টি পয়সা আছে।

(৪) (একটি ১॥০ ইঞ্চ স্কোয়ার দেখাইয়া) তুমি একটা এমনি আঁক ত।

(৫) বল দেখি—(১) ঘুম পেলে কি করবে?
(২) খিদে পেলে কি করবে?
(৩) শীত করলে কি করবে?

(৬) বল দেখি (ক) ৪—৭—৩—৯
(খ) ২—৫—৮—৬
(গ) ৭—২—৬—১
} শুনিবার পর শিশুকে ক্রমান্বয়ে আবৃত্তি করিতে হইবে।

পাঁচ বৎসর বয়সের প্রশ্ন—

(১) [একই আকৃতির দুটি ভারী জিনিষ, একটির ওজন ৩ তোলা আর একটির ওজন ১৫ তোলা, শিশুর সম্মুখে রাখিয়া] বল দেখি কোন্‌টি সবচেয়ে ভারী? [দেখা উচিত শিশু আন্দাজে বলিতেছে কি না।]

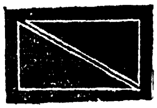
(২) লাল, নীল প্রভৃতি রং দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কোন্‌টি কোন রং।

(৩) দুখানা মুখের ছবি (একখানা কদাকার, আর একখানা ভাল) দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—বল দেখি কোনখানা ভাল। (এইরূপ তিন জোড়া ছবি দেখাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।)

(৪) (ক) চেয়ার দেখেছ? বল ত চেয়ার কি জিনিষ?
(খ) ঘোড়া দেখেছ? বল ত ঘোড়ায় কি হয়?
(গ) কাঁচি দেখেছ? বল ত কাঁচিতে কি হয়?
(ঘ) কলম দেখেছ? কলম কাকে বলে?
(ঙ) পুতুল দেখেছ? পুতুল কাকে বলে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে শিশুকে সংজ্ঞা বলাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে।

(৫) [দুটি আয়ত ক্ষেত্র লউন, একটিকে কাটিয়া দুটি ত্রিভুজ করুন; ত্রিভুজ দুটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শিশুর হাতে দিন; গোটা আয়তক্ষেত্রখানি শিশুর সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে বলুন] তোমার হাতের দুখানা মিলিয়ে এমনি একটা কর ত?



(৬) আমি যা বল্‌চি তা কর ত। এই কলমটি প্রথমে টেবিলে রাখ, তার পরে দরজাটা বন্ধ কর, আর ঐ ছাতাটি আমাকে এনে দাও (দেখিতে হইবে শিশু পরের পর বাক্যগুলি করিতে পারে কি না)।

অথবা—

(৬) তোমার বয়স কত?

বুদ্ধির মাপকাঠির সম্বন্ধে ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অনেক তর্ক উঠিয়াছে।

রেণুপদ কর।

বিদেহ

ব্রাহ্মণ্যযুগে ভারতবর্ষে কুরু, পঞ্চাল, কোশল, কাশী, ও বিদেহবংশ বিখ্যাত ছিল। ইহাদের ভিতর কুরু ও পঞ্চালবংশ এরূপ অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত ছিল যে উভয় বংশকে এক জাতি ধরিয়া লইলেও অত্যুক্তি হয় না। কোশল, কাশী ও বিদেহবংশ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। কুরু-পঞ্চাল বংশের সহিত ইহাদের প্রীতির বন্ধন বড় ছিল না।

প্রাচীন ভারতে যে-সকল জাতি একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যৌথভাবে কার্য্য করিতেন, লিচ্ছবি ও বিদেহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বিদেহদিগের রাজধানী ছিল মিথিলায়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী বিদেহ রাজ্য ছিল কাশী ও কোশলের সন্নিকট। মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগে কোশলরাজ্য অবস্থিত। বিদেহবাসীরা কুরুপঞ্চাল বংশের ন্যায় উন্নত ছিল। তাহারা বিদেঘমাথবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। বিদেহ ও কোশলরাজ্যের মধ্যে সদানীরা নদী প্রবাহিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে ইহার আধুনিক নাম গণ্ডক নদ; ভাষ্যকার সায়ণ ইহাকে করতোয়া নদীর প্রাচীন নাম বলিয়াছেন। বিদেহ রাজ্যের পূর্ব্বস্থলীর অধিবাসীদিগের সীমানা বর্ত্তমান ত্রিহুত বা পূর্ণিয়া জেলা। আর ইহাই প্রাচীন কালের আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে বিদেঘমাথব ও তাঁহার পুরোহিতের কর্ত্তৃত্বাধীনে সরস্বতী নদীকে পশ্চাতে রাখিয়া আর্য্যেরা অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সদানীরা নদী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

এই রাজ্যের নামকরণ সম্বন্ধে একটু নূতনত্ব আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি শতবর্ষব্যাপী এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে ঋত্বিকের কার্য্যে ব্রতী করেন। তিনিও ইহার পূর্ব্বে ইন্দ্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাঁচশতবর্ষব্যাপী অপর একটি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন। সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন বশিষ্ঠদেব মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন নিমিরাজ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা না হওয়ায় বশিষ্ঠ ক্রোধান্ধ হইয়া শাপ দিলেন যে নিমিরাজ দেহশূন্য বা বি-দেহ (বি=বিগত দেহ) হইবেন। নিদ্রোত্থিত নরপতি সকল কথা শুনিয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন—তুমি যেমন অকারণে আমাকে শাপ দিতেছ, আমিও তোমায় সেইরূপ শাপ দিতেছি—তোমাকেও মরিতে হইবে—তুমি আর অমর থাকিতে পারিবে না। মুনিঋষিরা নিমিরাজের মৃতদেহ মন্থন করিলে এক পুত্র সন্তান জন্মে। ইনি মিথি নামে পরিচিত। ইনিই বৈশালীর ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সৌন্দর্য্যশালিনী মিথিলা নগরীর স্থাপয়িতা। নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জনক নামে অভিহিত হন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অনতিকাল পূর্ব্বেই রাজত্ব করিতেন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা-প্রণেতা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় বাস করিতেন। ইনিই রাজর্ষি জনককে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন।

দীঘনিকায়ের মহাগোবিন্দ সুত্তন্তে লিখিত আছে—বিদেঘদিগের রাজধানী মিথিলা গোবিন্দের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বিদেঘমাথব প্রথমে গোতমের সহিত সদানীরা নদী পার হইয়া অপরতীরে অবস্থিত দেশ হইতে যজ্ঞের অগ্নি আনয়ন করেন; এবং এই সময় হইতেই বিদেহরাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে অনুমান করেন নরপতির নাম হইতেই রাজ্যের নাম বিদেহ হইয়াছে; কিন্তু প্রবাদবাক্যে আস্থা স্থাপন করিলে বলিতে হয় বিদেহরাজ্য বিদেহমাধবের বহুপূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। রাজ্যের পরিধি ৩০০ লিগ বা ২৩০০ মাইল। কৌশিকী নদী হইতে গণ্ডকী নদী পর্য্যন্ত বিদেহ রাজ্য দৈর্ঘ্যে ২৪ যোজন ও গঙ্গা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রস্থে ১৬ যোজন বিস্তৃত।

জাতকের মতে মিথিলা রাজ্য ৭ লিগ ও বিদেহ রাজ্য একশত লিগ বিস্তৃত। ডাক্তার রিস্ ডেভিড্‌সের মতে বৈশালীর ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মিথিলা নগর অবস্থিত। ইহা বিদেহদিগের রাজধানী ছিল। ইহা রাজর্ষি জনক ও নরপতি মহেন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত।

ভি দ্য সঁ্যা মার্তঁ্যা চেন-শু-ন নগরকে জনকের রাজধানী জনকপুরের সহিত অভিন্ন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে মিথিলা বর্ত্তমান চম্পারণ ও দারভাঙ্গা জেলা।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় আর্য্যেরা মিথিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। জনকের রাজত্ব-কালে মুনিবর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় আসিয়াছিলেন। অযোধ্যা হইতে আসিতে তাঁহাদের চারি দিন সময় লাগিয়াছিল। পথিমধ্যে বিশাল নগরে তাঁহারা এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। মহীপাল দেবের রাজত্বকালে চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেব গৌড়রাজ্য (বাঙ্গলার প্রাচীন নাম গৌড়) আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করেন।

নেপালবংশাবলী হইতে রাজবংশীয়দিগের তালিকায় আমরা নান্যদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই। নেপালের নরপতি জয়প্রতাপ মল্লের শিলালিপি হইতে নান্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নান্যদেব মিথিলার কর্ণাট-রাজবংশের প্রথম স্থাপয়িতা বলিয়া উল্লেখ আছে। বিজয় সেন তাঁহাকে পরাজিত করেন।

গৌড়-নরপতি লক্ষ্মণদেবের রাজপদে প্রতিষ্ঠার সহিত মিথিলায় লক্ষ্মণাব্দ নামে এক নূতন অব্দ প্রচারিত হয়। এই অব্দকে 'লক্ষ্মণ সংবৎ' বা 'লসম্‌' বলা হইত। বহুদিন ধরিয়া লক্ষ্মণাব্দ মিথিলায় প্রচলিত ছিল।

মিথিলারাজ্য ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। হস্তী, অশ্ব, রথ, বলদ, মেষ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে এখানে পাওয়া যাইত। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা ও মুক্তাদি বহুমূল্য ধাতু ও রত্ন সর্ব্বদাই বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইত। এখানে ১৬০০০ গ্রাম ও খামার ছিল। ১৬০০০ নর্ত্তকী এখানে বাস করিত। চারিঘোড়ার গাড়ী এখানে চলিত। এখানকার বাড়ী ছিল পর্ণশালা। শ্রাবস্তি হইতে লোকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া এখানে বিক্রয় করিতে আসিত। ইহা ক্রয়বিক্রয়ের কেন্দ্র-স্বরূপ ছিল। পেতবত্থু অর্থকথার পরমথদীপনা হইতে জানিতে পারা যায় যে যখন গৌতম বুদ্ধ শ্রাবস্তি নগরে বাস করিতেছিলেন তখন তদন্তে তাঁহার জনৈক শিষ্য একগাড়ী মাল বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে বিদেহরাজ্যে গিয়াছিলেন ও সেখানে তাহা বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে প্রচুর দ্রব্য গাড়ী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে এরূপ লোকহিতকর অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে দুঃস্থ লোকেরা বিনাব্যয়ে সাহায্য পাইত। প্রত্যহ ১৬,০০,০০০ মুদ্রা দরিদ্রের দুঃখ মোচনে ব্যয়িত হইত। গৌতম বুদ্ধদেবের সময়ে এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘজীবী ছিল। কিম্বদন্তী, তাহারা ৩০,০০০ বৎসর জীবিত থাকিত; মিথিলার রাজা মক্ষাদেব ৮৪,০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুস্তকাবলী ও ব্যবহারশাস্ত্র হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় মগধ ও বিদেহবাসীরা বৈদিক সভ্যতার সহিত পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না এবং কখনও পশ্চিমের লোক-দিগের মত বৈদিক সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না যে বিদেহবাসীরা শিক্ষায় হীন ছিল। বিদেহরাজের এক পুত্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। বিদেহরাজের সভায় চারিজন সভা-পণ্ডিত তাঁহাকে ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজাকে পরাবিদ্যা ও বেদান্ত শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। বিদেহরাজারা ও রাজকুমারেরা সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে বিদেহ রাজ-কুমারেরা তক্ষশিলা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন।

মনুসংহিতায় বিদেহ ও মগধদেশের কয়েকটি জাতিকে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে। তাহারা আর্য্যশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

বিদেহরাজদিগের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ না করিলে প্রজাবৃন্দ আসিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ উপায় বলিয়া দিত। সেগুলিকে গ্রহণ করা, না-করা রাজগণের ইচ্ছাধীন ছিল। অপুত্রক রাজাকে প্রজারা ভর্ৎসনা করিতে পারিত। বিদেহবাসী-দিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কাশীনরেশ ব্রহ্মদত্তের সুমেধা নামে এক কন্যা ছিল। তিনি বহুপত্নীক কোন রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হন নাই। কারণ তিনি বলিতেন নিরন্তর বিবাদ-বিসংবাদে গৃহের ও মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ অশান্তিভোগ করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই তিনি বহুপত্নীক রাজ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দেন নাই। অবিবাহিত মিথিলারাজ সুরুচি ব্রহ্মদত্তের যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। বিদেহ ও কাশীরাজ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বিদেহদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।

প্রথমটি হইতেছে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়টি রাজ্যাভিষেক, ও তৃতীয় বিবাহ; এবং সকলগুলিই জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইত। সাতবৎসরব্যাপী আমোদ-প্রমোদ চলিত। ভোজবাজীকরগণ নানাবিধ কৌশল দেখাইয়া বিদেহবাসীদিগের আনন্দ উৎপাদন করিত। নর্ত্তকীরা নৃত্য করিয়া মনোরঞ্জন করিত।

ছাগ মেষ প্রভৃতি বলিদান করিয়া বিদেহবাসীরা নানারূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। রাজারা কেবলমাত্র যজ্ঞের অধিকারী ছিলেন। নিমিরাজের যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাজারা তত্ত্ববিদ্যা আয়ত্ত করিতে তৎপর ছিলেন ও মনোযোগের সহিত আত্মবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকাবলী পাঠ করিতেন। এ সম্বন্ধে রাজর্ষি জনকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক সময়ে জনকরাজা বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কুরু ও পঞ্চাল দেশের বহু ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন বিভিন্ন জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের ভিতর শ্রেষ্ঠ কাহারা? তিনি এক হাজার গাভী আনয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের ভিতর যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন তাঁহাদিগকেই তিনি উক্ত বহুমূল্য উপহার দিবেন। কোন ব্রাহ্মণই যখন এই উপহার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার ব্রহ্মচারীদিগকে গাভীগুলি গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রাজর্ষি জনকই প্রথমে মিথিলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথমে যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু, আরুণি প্রভৃতি ঋষিদিগকে বিদেহরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য ঋষিদিগের সহিত ও জনকরাজার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন। কালে জনকরাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। এবং এই কারণে কাশী-নরপতি অজাতশত্রু তাঁহার হিংসা করিতেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় বিদেহরাজ জনক গৃহী হইয়াও পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিদেহরাজ নিমি ত্যাগই ধর্ম্ম এই মত প্রচার করিয়া জগতে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সে ঘটনার বিবৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনা করিয়া এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। একদিন প্রাসাদের মুক্ত বাতায়ন হইতে নিমিরাজ নিম্নে বাজারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন এক বাজপাখী মাংস-বিক্রেতার দোকান হইতে একটুকরা মাংস লইয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কয়েকটি শকুনি ও অন্যান্য পক্ষীরা তাহাদের লম্বা লম্বা ঠোঁটের দ্বারা বাজপাখীকে ঠোক্রাইতে লাগিল। বেচারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ও দ্রুতবেগে উড়িতে চেষ্টা পাইল; কিন্তু তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া মাংসটুক্‌রা ফেলিয়া দিয়া নিরাপদ হইল; কিন্তু যে পাখীটা সেই টুক্‌রা মাংস মুখে করিয়া ছুটিতে লাগিল তাহার অদৃষ্টও পূর্ব্বোক্ত বাজপাখীর মতই হইল। সে বেচারীও উহা ফেলিয়া দিয়া বাঁচিল। ক্রমে দুই চারিটি পাখী গ্রহণ করিয়া বিপন্ন হইল ও পরে ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। নিমি দেখিলেন আত্মরক্ষা ও শান্তির একমাত্র উপায় ত্যাগ। বিষয়তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ শান্তি পাইবার আশা সুদূরপরাহত। এই জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী হইয়াছিলেন।

বিদেহরাজ বিদেহ ও গন্ধর্ব্বরাজ বোধিসত্ত্ব সমসাময়িক নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎপরিচয় না থাকিলেও উভয়ে বন্ধু ছিলেন।

একদা শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে গন্ধর্ব্বরাজ পঞ্চনৈতিক আচার অনুসারে কার্য্য করিবেন স্থির করিয়া মন্ত্রীদিগকে সিংহাসনে বসিয়া উপদেশ দিতেছিলেন এমন সময়ে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়। মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন রাহু চন্দ্রদেবকে গ্রাস করিতেছে। রাজা দেখিলেন জগতের মত [illegible] বাহির হইতেই আসিয়া থাকে—বাহিরের রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে। রাজকর্ম্মচারীরাই তাঁহার শান্তি নষ্ট করিয়া দিতেছে। তখনই তিনি রাজ্যভার মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন ও হিমালয়ের পাদদেশে গমন করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন এবং তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া শান্তিলাভ করেন।

বিদেহরাজ এই ঘটনার কথা শুনিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজের পদানুসরণ করেন। তিনিও হিমালয়ের পাদ-

দেশে নির্জ্জনস্থানে ধ্যানধারণা করিতে চলিয়া যান। ভাগ্যক্রমে দুইজনে একই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করেন। কিন্তু কেহই কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।

জৈনধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদিগের প্রবাদ হইতে বলিতে পারা যায় বিদেহ নরপতি চেতকরাজ জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

রাজাদিগের বানপ্রস্থ গ্রহণের অপর একটি ঘটনা এখানে বিবৃত করিতে চাই। বিদেহদেশে পুণ্যশীল মোক্ষদেব নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ৮৪,০০০ বৎসরের ভিতর তিনি কখনও রাজকুমাররূপে কখনও রাজপ্রতিনিধিরূপে ও কখনও নৃপতিরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরামাণিককে আদেশ করিয়াছিলেন যেদিন সে তাঁহার মাথায় পাকাচুল দেখিতে পাইবে সেইদিন তাহা তুলিয়া দিবে ও তাঁহাকে দেখাইবে। একদিন সত্যসত্য পরামাণিক তাঁহার মাথা হইতে একটা পাকা চুল তাঁহার হাতে দিল। রাজা পাকাচুল দেখিয়া বুঝিলেন যে ইহা যমরাজের শাসন। আর কালবিলম্ব না করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন ও আম্রকুঞ্জের ভিতর বসিয়া ধ্যানধারণা করিতে লাগিলেন। লোকে এই কুঞ্জকে মোক্ষদেবের আম্রকুঞ্জ বলিয়া থাকে। তিনি সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন ও ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কালে তিনি পুনরায় মিথিলায় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

মোক্ষদেবসূত্রে এই ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। মিথিলারাজ মোক্ষদেব ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তিনি শ্রমণদিগের, ব্রাহ্মণদিগের, গৃহীদিগের, নাগরিকদিগের ও পল্লীবাসীগণের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করিতেন। তিনি চান্দ্রমাসের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, ও পূর্ণিমার দিন কোন কার্য্য করিতেন না। তিনিই তাঁহার পরামাণিককে পাকাচুল তুলিয়া দেখাইতে বলিয়াছিলেন এবং পাকাচুল দেখিয়াই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। মিথিলার শেষ নরপতি মিথিরাজও মোক্ষদেবের ন্যায় সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। মৃত্যুর পর দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা স্বর্গীয় রথে করিয়া তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার রাজ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

স্বাধীন নামে স্বধর্ম্মনিরত মিথিলা-নরপতি পঞ্চগুণ ও উপবাসাদি নিয়ম যথারীতি পালন করেন।

এক সময়ে দেবরাজ-পুত্র শক্রদেবের বিচারগৃহে মিথিলাপতি স্বাধীনের গুণপনার কথা ব্যাখ্যা করেন। দেবতারা আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দেখিতে চান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা দেবসারথি মাতলিকে দেবরথে করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে আনয়ন করিতে আদেশ করেন। মাতলি যখন বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হন তখন পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্রের নিকট দেবরথ অপর একটি চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বিদেহবাসীরা দুইটি চন্দ্র দেখিতেছিল। ক্রমে যখন রথ নিকটবর্ত্তী হইল তখন তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। রথ নৃপতির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে মাতলি তাঁহাকে রথে আরোহণ করিতে বলিলেন। তিনি দানের ব্যবস্থা করিয়া রথে চড়িলেন।

দেবরাজ শক্র (শক্র) তাঁহার মধুরচরিত্র ও অমায়িকতায় এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে অর্দ্ধেক দেবরাজ্য ও সার্দ্ধ দুই কোটী দেবাঙ্গনা ও রাজধানী বৈজয়ন্তের অর্দ্ধেক উপহার দিয়াছিলেন। স্বাধীন তথায় ৭০০ বৎসর বাস করিয়া সুখসম্ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন তাঁহার গুণের শেষ হইল তখন অমরাবতীতে আর থাকিতে চাহিলেন না। রথে করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার রাজধানীতে পাঠান হইল। সাত দিবস দানধ্যানে রত থাকিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন ও অমরাবতীতে পুনরায় নীত হন।

মিথিলারাজ সুরুচি কাশীনরপতির কন্যা সুমেধাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১০,০০০ বৎসরের বিবাহিত জীবনে তাঁহাদের একটিও সন্তান সন্ততি হয় নাই। পুরা-প্রচলিত প্রথানুসারে প্রজারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রলাভের জন্য নানারূপ উপদেশ দেয়; কিন্তু রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না; তখন অগত্যা তাহারা রাণী সুমেধাকে ভগবানের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতে বলে।

রাণী সুমেধা জীবনে কখনও প্রাণীহত্যা, চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, মাদকদ্রব্যগ্রহণ, নিষিদ্ধ সময়ে আহার গ্রহণ, আমোদপ্রমোদে যোগদান, অলঙ্কার ধারণ করিবেন না ও চরিত্রহীন

হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সুখাসনে বসিয়া রাণী অষ্টশীল সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবরাজ শক্র সাধুর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রাজার প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। রাণীও হঠাৎ আপনার শয়নগৃহ হইতে সাধুকে দেখিতে পান এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে ১৫টি ছন্দে রচিত একটি গীত গান। সাধু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হইবে।

জৈন তীর্থঙ্করদিগের ভিতর উনবিংশ তীর্থঙ্করের কাহিনী অতীব চমৎকার। ইনি পূর্ব্বজন্মে জুয়াচুরি করিয়াছিলেন বলিয়া নারীরূপে অবতীর্ণ হন। যে একবিংশ ধর্ম্মের সাধনা করিয়া তীর্থঙ্কর হইতে পারা যায় তাহার সকলগুলিই তিনি তাঁহার পরজীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ইনি মিথিলার রাজা কুম্ভের ঔরসে ও রাণী প্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারী জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে রাণীর এইরূপ অভিলাষ হয় যে, সকল ঋতুর কুসুম দ্বারা গ্রথিত মালা পরিধান করেন। দেবতারা তাঁহার ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে কুসুম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

মিথিলা জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের অতি প্রিয় ছিল। ছয়টি বর্ষা তিনি এখানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানকার নরপতিরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি রাজকুমার বিদেহ দত্তের পুত্র। ত্রিশবৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার ও মাতার পরলোকগমন ঘটে।

মিথিলায় ব্রহ্মায়ু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বয়স ১২০ বৎসর ছিল। তিনি ত্রয়ীবেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও লোকায়ত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। একসময়ে তিনি তথাগতের নয়টি গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ধারণা করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে মানব, দেব, ব্রহ্মায়ু ও মারের ভিতর তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। জগতে ধর্ম্মপ্রচার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য—মানবের কল্যাণ সাধনই তাঁহার ব্রত। উত্তর নামে তাঁহার একজন শিষ্য ছিল। একদা তিনি শিষ্যকে বলিয়াছিলেন সর্ব্বগুণান্বিত বুদ্ধদেবকে শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে। বুদ্ধদেবকে দর্শন জন্য তিনি শিষ্যকে বিদেহরাজ্যে পাঠাইয়া দেন, বুদ্ধদেব তখন বিদেহরাজ্যে বাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া, শিষ্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভো! আমি কি প্রকারে জানিতে পারিব ইনিই বুদ্ধদেব।" উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "তুমি একথাও জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, যে পৃথিবীর উপর দিয়া তুমি চলিতেছ তাহা যে পৃথিবী তাহা কি করিয়া জানিতে পারা যায়? যে চতুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছি তাহা হইতে বুদ্ধদেবের লক্ষণ কি তাহা ত বলিয়াছি। তুমি ঐ লক্ষণ দ্বারা বুদ্ধদেবকে চিনিতে পারিবে।" বিদেহরাজ্যে চলিয়া গিয়া উত্তর সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে লাগিলেন। বত্রিশটি লক্ষণাক্রান্ত একজন সাধুকে দেখিয়া তিনি বুদ্ধদেব বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি বুদ্ধদেব কি না তদ্বিষয়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সন্দেহ ঘুচাইবার জন্য তিনি সাতমাস ধরিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের যে বত্রিশটি লক্ষণ আছে তাহার মধ্যে ৩০টি তিনি উক্ত সাধু পুরুষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সাতমাস পরে অপর দুইটি চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া উত্তরের সন্দেহ দূর হইয়া গেল। তখন তিনি গুরুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে-সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। যে দুটি লক্ষণ তিনি প্রথম দেখিতে পান নাই এবং পরে বুদ্ধদেবের দয়ায় যাহা তিনি দেখিয়াছিলেন তাহাও গুরুর নিকট ব্যক্ত করিলেন। গুরু তখন স্থির করিলেন সত্যই বুদ্ধদেব জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন তিনিও শিষ্য সহ মিথিলায় গমন করিয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন।

সাত-লিগ ব্যাপী মিথিলারাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। রাজকুমারেরা বহুকালাবধি মিথিলায় বাস করিয়াছিলেন।

কথিত আছে জম্বুদ্বীপের মিথিলারাজ্যে সুমিত্র নামে প্রবলপরাক্রমশালী নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার রাজকোষ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। তিনি ব্যবহারশাস্ত্রে বড়ই অনুরাগী ছিলেন।

বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলার বিদেহরা আপনাদিগের জাতীয় সংহতির দ্বারা চালিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদের পরামর্শগৃহে সন্তাগারে মিলিত হইত। বিখ্যাত বহিয়ান শাখারা প্রজাতন্ত্রাবলম্বী ছিল। তাহাদের প্রধান যিনি তিনি রাজা-উপাধি গ্রহণ করিতেন।

বৃজি ও লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের কথা চাণক্য উল্লেখ করিয়াছেন। বিদেহরাজ্য লিচ্ছবিদিগের অধীনে ছিল। বিদেহরাজ্যের রাজা বিরুদকের মন্ত্রী শকল তাঁহার দুই পুত্র গোপাল ও সিংহকে সঙ্গে লইয়া অপর মন্ত্রীদের ঈর্ষ্যার জন্য বৈশালীরাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজ্যের মধ্যে শীঘ্রই শকল একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তত্রস্থ অধিবাসীগণ তাঁহাকে 'নায়ক'রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্রই বৈশালীতে বিবাহ করেন এবং সিংহের 'বাসবী' নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বিম্বিসার এই বাসবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিদেহরক্ত তাঁহার ধমনীতে ছিল বলিয়া বাসবী 'বৈদেহী' নামে সুপরিচিতা। অজাতশত্রু এই বৈদেহীর গর্ভজাত পুত্র।

অমিতায়ুধ্যান সূত্রে লিখিত আছে অজাতশত্রু দেবদত্তের প্ররোচনায় তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে ধৃত করিয়া কারাগারে সাতটি-প্রাচীর-বেষ্টিত একটি কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার আদেশ ছিল কেহই তাঁহার পিতার নিকটে যাইতে পারিবে না। প্রধানা মহিষী বৈদেহী শুদ্ধ স্নাত হইয়া মধু ঘৃত ও আঙুরের রস বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিতেন ও তথায় স্বামীকে খাওয়াইয়া স্বামীকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে অজাতশত্রু কারারক্ষীকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে তাঁহার মাতা গোপনে আহার দিয়া পিতার প্রাণরক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মাতাকে হত্যা করিতে যান। মন্ত্রীরা তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দেন। তখন অজাতশত্রু মাতাকে কারারুদ্ধ করেন। বুদ্ধদেব যখন মিথিলায় আগমন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন।

সম্রাট যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীম গণ্ডক ও দারশন রাজ্যের সহিত বিদেহ রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন।

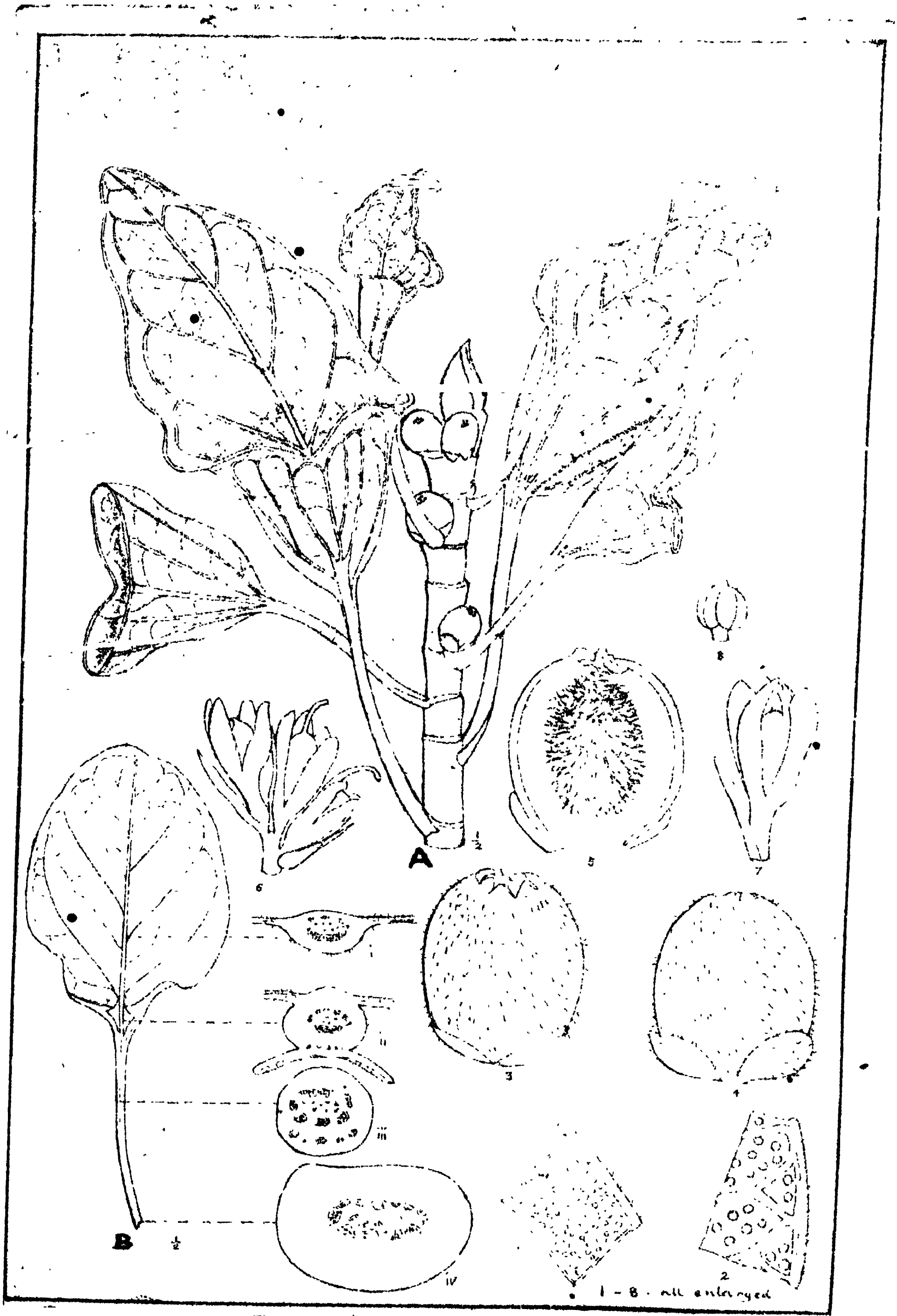
শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

কৃষ্ণবট

একরকমের অদ্ভুত বট (Ficus) আছে, তার নাম কৃষ্ণবট। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ সি ডি কডোল সাহেব এই গাছ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন Ficus Krishnæ। এ বটের ইতিহাস বড়ই রহস্যজালে আবৃত। এ গাছ কোথা হ'তে এল, কেন এর নাম এরূপ হ'ল—এসব বিষয় আজ পর্য্যন্ত সঠিক জানা যায়নি। ইতিপূর্ব্বে এই অদ্ভুত বটের কোন বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বলে' লেখকের জানা নেই। শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ বা অন্য কোন অভিধানেও এর বিবরণ দেখ্তে পাওয়া যায়নি। তাই পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য এ বটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রকাশিত হল।

এ বটের প্রধান বিশেষত্ব পাতায়। সাধারণ বটের (Ficus Bengalensis) পাতা চেপ্টা, কিন্তু এর পাতা ঠোঙ্গার মত। এ ঠোঙ্গাগুলিরও আবার বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। অনেকেই দেখেছেন কোন কোন "বাহারপাতা" বা "পাতা-বাহারের" (Codiacum Variegatum, যাকে সাধারণতঃ 'ক্রোটন' 'Croton' বলে) পাতা আপনা-আপনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠোঙ্গার আকার ধারণ করে। আরও ২।১টি গাছের পাতাও এরূপ ঠোঙ্গায় পরিণত হয়। সেসব ঠোঙ্গার পাতার মসৃণ ওপর দিকটা অর্থাৎ 'বুক'টা থাকে ভিতর দিকে, কিন্তু কৃষ্ণবটের পাতার অদ্ভুত ঠোঙ্গাগুলিতে পাতার নীচের খস্‌খসে দিকটা অর্থাৎ 'পিঠ'টা থাকে ভিতরের দিকে। আর কোন গাছের পাতার স্বাভাবিক ঠোঙ্গার এরূপ উল্টা ব্যবস্থা আছে বলে জানা যায় নি।

এ বটের নাম কৃষ্ণবট হল কেন? এ প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক। এর কোনও অংশ কাল রঙের বলে' যে এ নাম হয়েছে তা নয়। প্রথম যখন এ বটের সন্ধান পাওয়া গিছ্‌ল তখন শোনা গিছ্‌ল যে, যে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় শিলা জলে ভাস্‌ত বলে' শোনা যায় সেই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় নাকি সাধারণ বটের (Ficus Bengalensis) এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু এ কথা কারও



Ficus Krishnæ C. DC.

কৃষ্ণবটের ডাল, পাতা, ফল, ফুল ও পরাগকোষ।

মনঃপূত হল না। তখন আর-এক প্রবাদ শোনা গেল যে নামটার সঙ্গে নাকি শ্রীকৃষ্ণের একটা সম্বন্ধ আছে—তাই নাকি তার নাম হয়েছে কৃষ্ণবট। প্রবাদ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন কংশের অত্যাচারে রাখালবেশে রাখাল ও গোপীদের মধ্যে বাস করতেন তখন গোপীরা স্নেহবশতঃ প্রতিদিনই তাঁর জন্য বটের পাতার ঠোঙ্গায় ননী নিয়ে আস্‌ত। কিন্তু রোজই ননী গলে গিয়ে ঠোঙ্গার তলা দিয়ে পড়ে যেত দেখে শ্রীকৃষ্ণ বড় চটে গেলেন। তাই তিনি এক বট গাছের পাতাগুলিকে সেই থেকে স্বাভাবিক ঠোঙ্গার আকারে পরিণত করে দিলেন। আর সেই থেকেই ননী গলে পড়ে যাবার ভয় ঘুচে গেল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ যিনিই এ ব্যবস্থা করে থাকুন, কেন যে পাতার বাহিরের খস্‌খসে দিকটা বাহিরে না দিয়ে ঠোঙ্গার ভিতরের দিকে দিলেন তা বুঝা দুষ্কর।

বাস্তবিকপক্ষেও অন্যান্য বটের তুলনায় কৃষ্ণবটের (Ficus Krishnae) সঙ্গে সাধারণ বটের (Ficus Bengalensis) কতকটা সাদৃশ্য আছে। এজন্য প্রথমে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌গণের সন্দেহ হয়েছিল যে এ বট বোধ হয় সাধারণ বটেরই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু উভয়েরই বিভিন্ন অংশ তুলনা করে দেখা গেল যে উভয়ের মধ্যে ঢের পার্থক্য আছে।

এ পর্য্যন্ত এ বট মাত্র কলিকাতার আশেপাশে দুই-একটি বাগানে ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া গেছে বলে জানা যায়নি। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ কৃষ্ণবট যখন উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌গণের দৃষ্টিপথে পড়ে, তার পর থেকে তাঁরা এর উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু ঠিক করে উঠতে পারেননি। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে যদি কারও এ সম্বন্ধে কিছু জানা থাকে তবে তা অনুগ্রহ করে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের ঠিকানায় জানালে লেখক তজ্জন্য বিশেষ বাধিত হবে।

যাঁরা এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানতে চান তাঁদেরকে ১৯০১ সালের Archives de Science Physiques et Naturelles, Ser. iv, vol. xii, ১৯০২ সালের Bulletin de l' Herbier Boissier এবং ১৯০৭ সালের Botanical Magazine দেখ্‌তে অনুরোধ করছি।

কৃষ্ণবট গাছের উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট হয়। নীচে অনেকগুলি মোটা শিকড় দেখা যায়।

অন্যান্য বটের ন্যায় কৃষ্ণবটের দুগ্ধবৎ নির্য্যাস ও শুকালে আঠাবৎ পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু এই আঠা থেকে রবার তৈরী করা লাভজনক হবে কি না তা এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ, কারণ কৃষ্ণবটের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জগতের পরিচয় বেশীদিনের নয়।

চিত্র-পরিচয়।—

A—একটি ডাল, B—একটি পাতা ও তার বিভিন্নস্থলে কর্ত্তিত অংশের ছবি (পার্শ্বে অঙ্কিত) 1—পাতার নিম্নভাগের একাংশ, 2—পাতার উপরিভাগের একাংশ, 3-4—ফল বা 'ডুমুর'এর বহির্দৃশ্য, 5—ফলের ভিতরকার চেহারা, 6—পুষ্পগুচ্ছ, 7—পুষ্প, 8—পরাগ-কোষ। A ও B—অর্দ্ধায়তন, বাকী সমস্তই বড় করিয়া আঁকা। এই চিত্র Botanical Magazine থেকে গৃহীত হয়েছে। তজ্জন্য লেখক উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

পিয়েমডি।

চলার বেগে

দিনের পানে রাত্রি চলে, আঁধার পানে আলো,
কে এই চলার পাগল নেশায় নিখিল মাতালো?
ফলের পানে ফুলের গতি, এই চলারি টানে,
মুকুল কাঁদে,—ফুল কতদুর?—গন্ধ-বিধুর গানে,
মাটির বুকের সুধার ধারা কোন্ সে পারাবারে
ছুট্‌ছে চপল ছন্দটি ঋতুর রূপ-রসেরি ধারে!

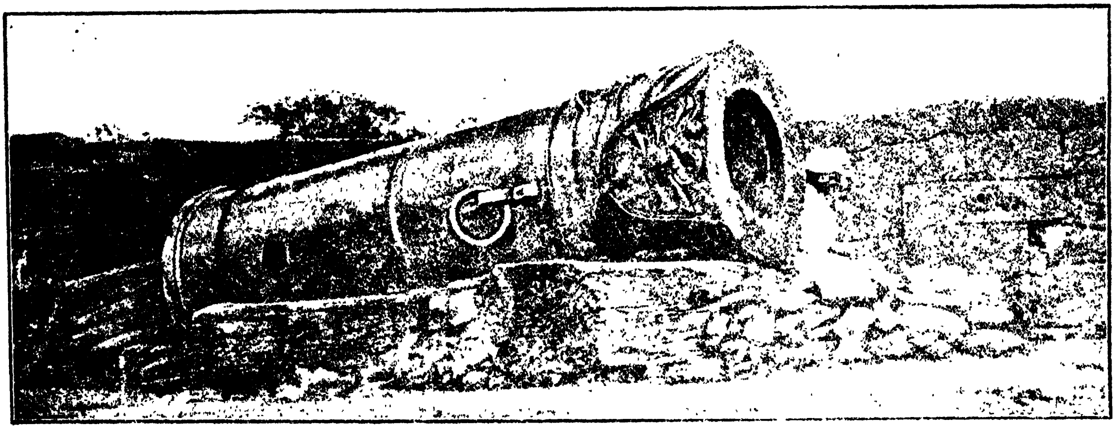
সেই চলারি চিহ্ন কি এই জগৎ জুড়ে জাগে,
পুষ্পে তৃণে, লতায়-পাতায়? সাঁঝে, অরুণ-রাগে?
যে পথ দিয়ে যে গেছে তার দাগ গেছে যে রেখে,
নিখিল-বুকে প্রাণ জেগেছে এই চলারি বেগে।

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী।

নূতন বাদ্‌শাহী আমলের কামান

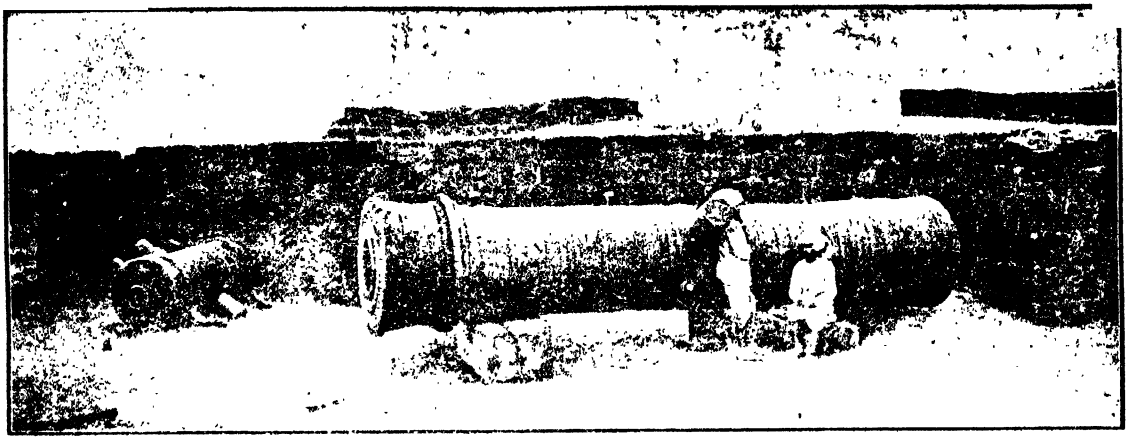
জনসাধারণের বিশ্বাস ভারতবর্ষে কামান প্রথম বাবরকর্ত্তৃক প্রচলিত হয়। এই বিশ্বাসের মূলে যে সত্য নাই, তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মত জগন্মান্য কোষগ্রন্থেও এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। উহাতে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল হাইম (Liet.-Col. H. W. Hime) প্রণীত এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বারুদ ও গোলাগুলি" (Gunpowder and Ammunition) নামক পুস্তক হইতে নিম্নে অনূদিত বাক্যাবলী প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—"পানিপথের নিঃসন্দিগ্ধ-ফল (decisive) প্রথম যুদ্ধের তারিখ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিলের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিস্ফোরক ব্যবহারের কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এই যুদ্ধেই বাবর প্রথম ছোট ও বড় আগ্নেয়াস্ত্র সহায়ে ইব্রাহিম লোদির বাহিনী ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন এবং ইব্রাহিম লোদি যুদ্ধে হত হন।"

বাবরের একখানা আত্মজীবনকাহিনী আছে। ইহা অনেকবার অনূদিত হইয়াছে। শেষ অনুবাদ করেন মিসেস্ বেভারিজ। ইলিয়ট ও ডশন্ সাহেবদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত —"ভারতীয়-ঐতিহাসিকগণ-লিখিত ভারতের ইতিহাস" নামক সংগ্রহগ্রন্থেও এই পুস্তকখানা আংশিক অনূদিত হইয়াছে। উহার চতুর্থ খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় বাবরের নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। পানিপথের যুদ্ধের তিনবৎসরের মধ্যে বাবর প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত দখল করিয়া ফেলেন। ১৫২৯ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাদেশের পাঠান সুলতানের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। গগ্রা (ঘর্ঘর) ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে বাবর গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিলে বাঙ্গালী সেনা তাঁহাকে বিষম বেগে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। বাবর অনেক চেষ্টায় গঙ্গা পার হইতে সমর্থ হন বটে কিন্তু বাঙ্গালীর কামানের গোলাবৃষ্টি তাঁহাকে বিশেষ বিব্রত করিয়াছিল। বাবরের আত্মজীবনীতে এইস্থানে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে—"বাঙ্গালীরা বিখ্যাত গোলান্দাজ। এই উপলক্ষে (অর্থাৎ গঙ্গাপার হইবার সময়) আমরা তাহাদের গোলান্দাজী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া গোলা নিক্ষেপ করা তাহাদের অভ্যাস নহে, তাহারা ইচ্ছাখুসী গোলা ছাড়ে (তাহা শত্রুদলের যেখানেই গিয়া পড়ুক)।"

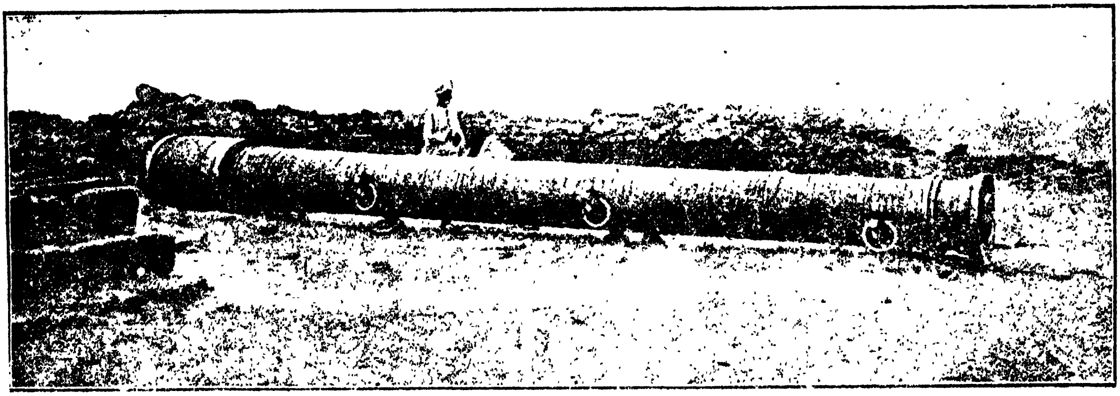


বিজাপুরের কামান "মালিক-ই-ময়দান।"

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দেই যদি বাবর ভারতে প্রথম কামান আনিয়া থাকিবেন তাহা হইলে বাঙ্গালীদের গোলান্দাজী সম্বন্ধে উক্তরূপ মন্তব্য তাঁহার আত্মজীবনীতে স্থান পাইত না। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে কামানের সহিত প্রথম পরিচিত হইয়া ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দেই বাঙ্গালীরা সেই পরিচয়ের বিশেষ প্রমাণ



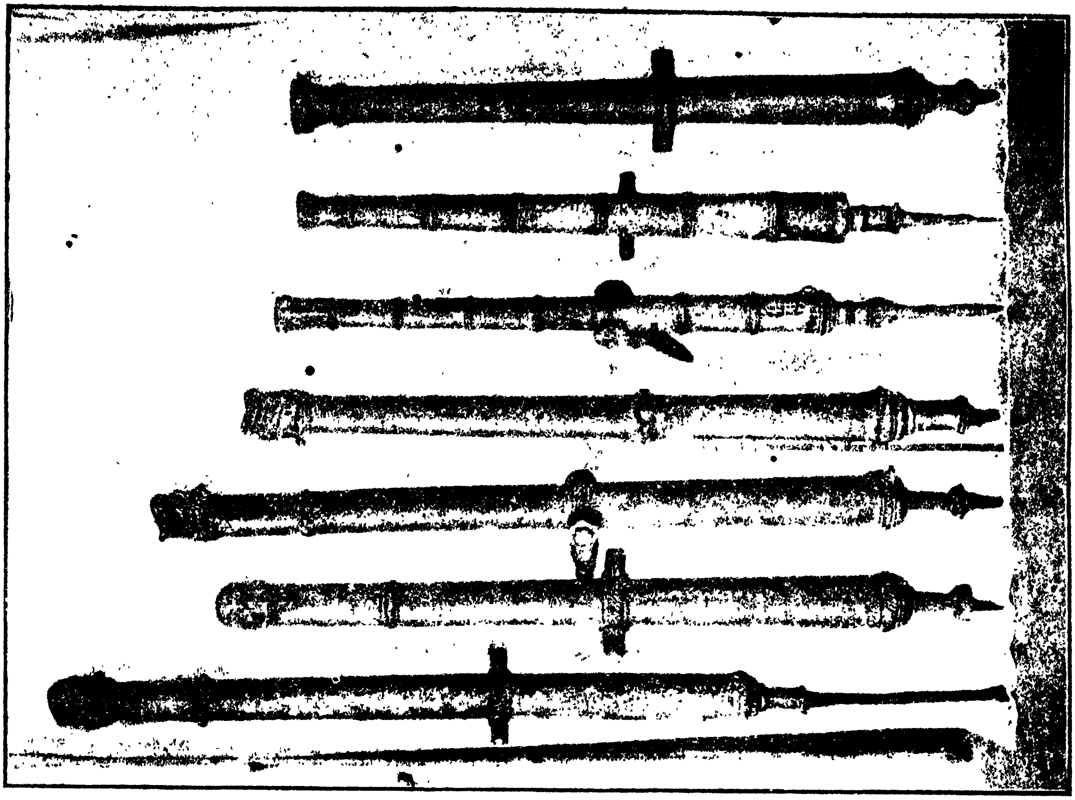
বিজাপুরে দুর্গ-প্রাকারের উপরকার কতগুলি কামান।



বিজাপুরের কামান "লম্ব্ ছোড়ী।"

বাবরকে দিতে পারিয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব। বস্তুতঃ ভারতে কামান-বন্দুকের প্রচলন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বেই হইয়াছিল। এক হিসাবে ধরিতে গেলে, কামান-বন্দুকের প্রয়োগ যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি শুক্রনীতির ন্যায় প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থেও বন্দুক-কামানের অতি আশ্চর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে বীরত্ব নাই অথচ বহু লোকক্ষয় হয় বলিয়া মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহার যদৃচ্ছা প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। স্বয়ং মনু পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। পানিপথ-যুদ্ধে কামানের সাহায্যেই বাবর নিঃসন্দেহ জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদবধি মোসলমান আমলের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহেই গোলাগুলির ব্যবহার একরকম অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এখন পর্য্যন্ত ভারতের বহু স্থানে বহু বড় বড় কামান তাহাদের বিশাল দেহ লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং নীরবে মোসলমান রাজের জয়কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

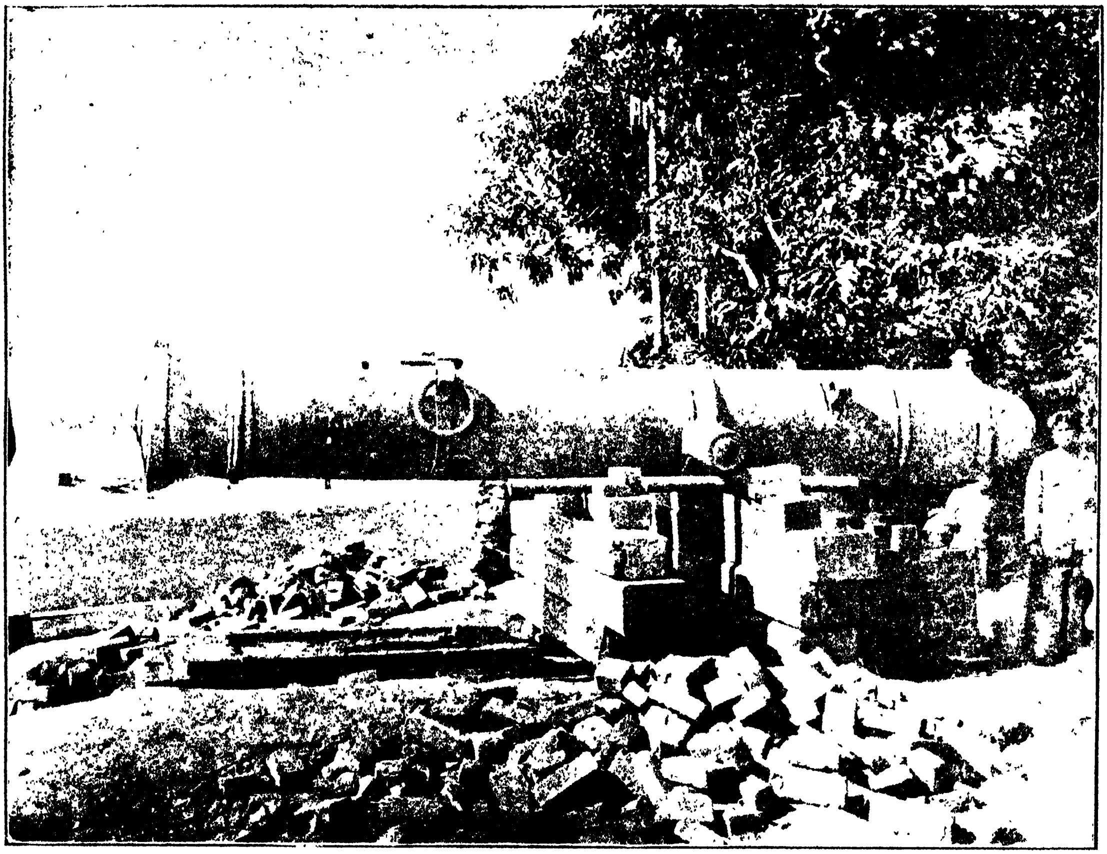
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামানের মধ্যে বিজাপুরের অতি প্রসিদ্ধ বিপুলমূর্ত্তি "মালিক-ই-ময়দান" (যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অধীশ্বর) নামক কামানটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহা পিতল ঢালাই করিয়া প্রস্তুত। ইহা লম্বায় ১৪ ফুট ৪ ইঞ্চি। ব্যাস ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি; পরিধি ১৩ ফুঃ ৩ ইঃ; মুখের ছিদ্রের ব্যাস ২ ফুট ৪ ইঃ; ওজন প্রায় ১৫০০ মণ। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন হুসেন নামক এক ব্যক্তি এই কামানটি প্রস্তুত করে।



ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত কতগুলি "দেওয়ানবাগ" কামান।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মালিক-ই-ময়দান একবার দাগা হইয়াছিল। সেই ব্যাপারটি কৌতূহলপূর্ণ; সমসাময়িক খবরের কাগজ হইতে নিম্নে তাহার একটি বর্ণনা প্রদত্ত হইল—"বিজাপুর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশের বুরুজের উপরে স্থিত এই প্রকাণ্ড কামানটিতে রাজার আদেশে বারুদ ভরা হইয়াছিল। প্রায় এক মণ বারুদ লাগিয়াছিল; সন্ধ্যার সময় দাগা হয়। বারুদগুলা খুব উৎকৃষ্ট ছিল না; কাজেই এত ধূম উদ্গীর্ণ হইয়াছিল যে তাহা দেখিতে নিতান্তই বিস্ময়জনক হইয়াছিল। ধূমের তুলনায় শব্দ তত ভীষণ হইল না। ৪২ পাউণ্ড গোলা নিক্ষেপকারী কামানের শব্দ হইতে ইহার শব্দ উচ্চতর হইল না। দাগিবার বেগে কামানটি যাইয়া প্রাচীরগাত্রে সজোরে প্রতিহত হইয়াছিল কিন্তু কোন অংশ ভগ্ন হয় নাই। এই কামান দাগা ব্যাপারে নগরের অধিবাসীরা বড়ই বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিল; অনেকে স্ত্রী পুত্র লইয়া ১০।১৫ মাইল দূরে পর্য্যন্ত পলাইয়া গিয়াছিল এবং বহু দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া নগরপ্রাচীর ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল।" (বোম্বে কুরিয়ার হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক জার্নেল ও মান্থলী রেজিষ্টার কর্তৃক উদ্ধৃত একখানা পত্রের অংশ)। ইহার পরে রাজকর্ম্মচারীরা এই "মালিক-ই-ময়দান" দুই-তিন বার দাগিয়াছেন। শেষ বারে ইহার ভীষণ গর্জ্জনে অপরপার্শ্বস্থিত হাসপাতালের গবাক্ষের কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত বিজাপুরে লোণ্ডা কোশব দুর্গোপরি আর দুইটি অতিকায় কামান আছে। তাহার একটির দৈর্ঘ্য মালিক-ই-ময়দান হইতেও বড়। উহা ২১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা; পিছনের ব্যাস ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি, মুখের ব্যাস ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি; চুঙ্গির দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৭॥০ ইঞ্চি; চুঙ্গির ছিদ্রের ব্যাস ১ ফুট ৭॥০ ইঞ্চি; ওজন ৪৭ টন বা ১৪০০ মণ। ইহার নিকটে আরও একটি ছোট কামান পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নাম কাচ্চাবাচ্চা (শিশু)।



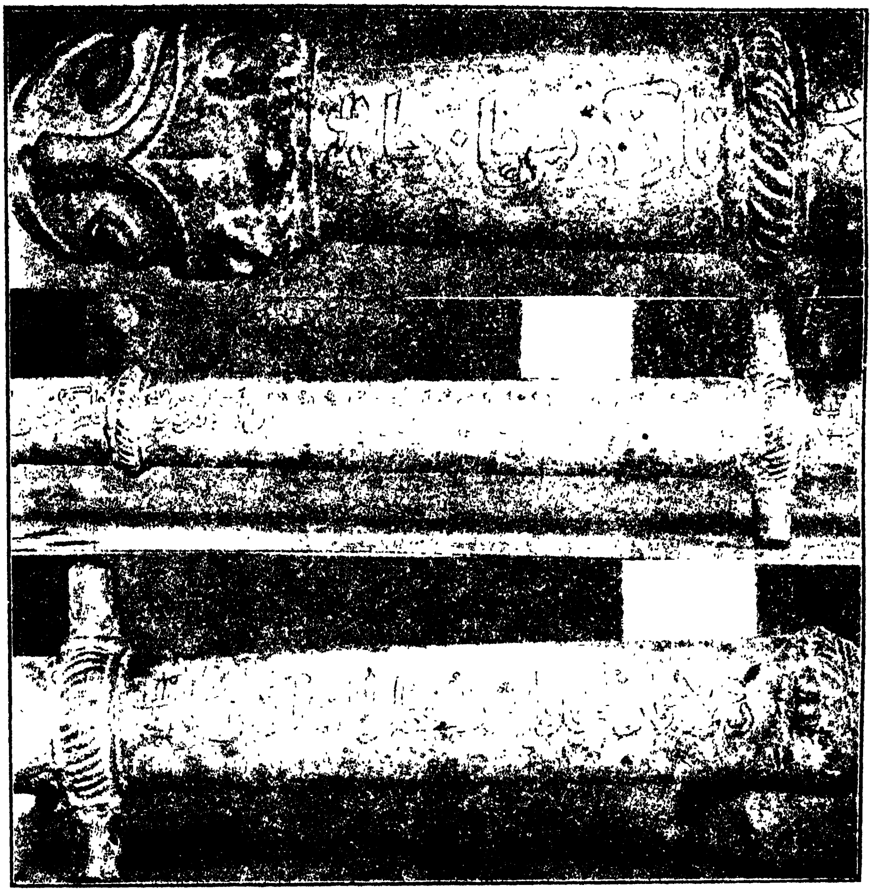
ঢাকার কামান "কালুঝমঝম"।

বিজাপুরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কামানটির নাম 'লম্ব-ছাড়ি'। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩০ ফুট ৭ ইঞ্চি; ব্যাস ৩ ফুট ২ ইঞ্চি; চুঙ্গির ছিদ্রের ব্যাস ১ ফুট। ইহার নিকট আরও একটি কামান আছে। উহা লম্বায় ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি; চুঙ্গির ছিদ্রের ব্যাস ৮ ইঃ। এইসমস্ত কামানই লৌহনির্ম্মিত, কিন্তু ঢালাই করা নহে। চতুষ্কোণ লম্বা লম্বা লৌহদণ্ডসকল কোন লম্বা চুঙ্গির উপর ঘনবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়া তাহার উপর লাল উত্তপ্ত লৌহবলয়সকল একটার পর আর-একটা সংলগ্ন করিয়া পিটাইয়া বসান হয়। এইসকল ঠাণ্ডা হইলেই অতি সুদৃঢ় আবরণ হয়। এই প্রকারেই এই সুদৃঢ় কামান প্রস্তুত।

বিজাপুরের এইসকল কামানের তুল্য একটি কামান ঢাকায় ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নদীতে পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ীগঙ্গার পাড়ের যে স্থানে এই কামানটি বসান ছিল, জলস্রোতে ক্রমশঃ তাহার নিম্নদেশ ক্ষয়িত হওয়াতে পাড় ভাঙ্গিয়া কামানটি নদীগর্ভে পতিত হয়; আর তাহার উদ্ধার করা হয় নাই।

এই কামানটি বিজাপুরের কামানগুলার ন্যায় লৌহদণ্ড-নির্ম্মিত ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ২২ ফুট ১০॥০ ইঞ্চি; পিছন দিকের ব্যাস ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি; মুখের দিকের ব্যাস ২ ফুট ২॥০ ইঞ্চি; চুঙ্গির ছিদ্রের ব্যাস ১ ফুট ৩½ ইঞ্চি; ওজন ৭৭০ মণ। একটি গোলার ওজন ৫॥০ মণ। নির্ম্মাতা কালু কামারের স্ত্রীর নামানুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছিল 'মরিয়াম'।

এসকল হইতে ক্ষুদ্রতর কামান ভারতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আগ্রার প্রকাণ্ড কামানটি ৯ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা; ব্যাস ৩ ফুট। মুখের নলের ব্যাস ১ ফুট ১০॥০ ইঞ্চি; ওজন ৩৩৪ মণ।

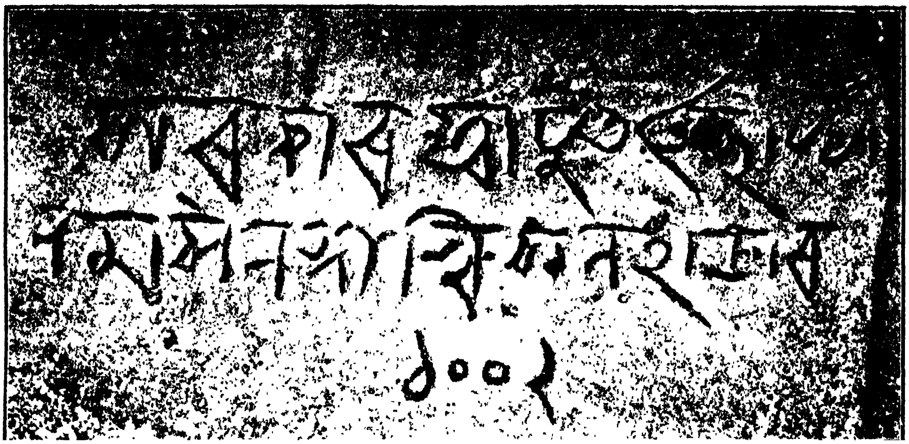


কামানের গায়ে ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ-লিপি।

বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামান ১২ ফুট ৫॥০ ইঞ্চি লম্বা; মুখের ব্যাস ১১॥০ ইঞ্চি।

ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরে বর্ত্তমানে কালু-ঝমঝম নামক একটি কামান আছে। উহা ১৬ ফুট লম্বা; ব্যাস ২ ফুট ৩ ইঞ্চি; মুখের নলের ব্যাস ৬ ইঃ। কথিত আছে যে কালু কামার নামক একব্যক্তি এই কামানটি এবং পূর্ব্বকথিত অতিকায় কামানটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। নির্ম্মাতার নামানুসারে ইহার নাম কালু-ঝম্‌ঝম্ রাখা হয়। এই কালু-ঝম্‌ঝম্ যদিও পূর্ব্বকথিত "মরিয়াম" হইতে ক্ষুদ্রতর, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গে কালু-ঝম্‌ঝম্‌ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঢাকা সহরে কোন আগন্তুক আসিয়া এই কামানটি না দেখা পর্য্যন্ত সহরের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখা হইয়াছে বলিয়া মনে করে না। এইটি বহুদিন পর্য্যন্ত নদীর পারে সোয়ারী-ঘাট নামক স্থানে ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার তদানীন্তন মেজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াল্‌টার্স্‌ লোকের দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, ইহাকে চকবাজারে আনিয়া রাখেন। পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার প্রকাশ্য স্থানে সদর-ঘাটে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

ঢাকা-যাদুঘরে অনেকগুলা ছোট ছোট কামান আছে; এইসকল কামান পিতল এবং লৌহে নির্ম্মিত; নৌযুদ্ধে ইহাদের ব্যবহার হইত। ইহার মধ্যে ৭টি লক্ষ্যানদীর পাড়ে দেওয়ানবাগ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। দেওয়ানবাগ নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল উজানে। এই দেওয়ানবাগ মনোয়ার খাঁর রাজধানী ছিল। মনোয়ার খাঁ বারভূঁয়াদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইশা খাঁর পৌত্র। দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বে এই



দেওয়ানবাগ কামানের গায়ে বাংলা অক্ষরে ঈশা খাঁর উৎকীর্ণ লিপি।

বারভূঁয়ার বীরত্বেই বাঙ্গলায় মোগলেরা বেশী আমল পায় নাই। এই মনোয়ার খাঁ পরে ঢাকার শায়েস্তা খাঁর অধীনে নৌসেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শায়েস্তা খাঁ তাঁহার নৌসেনার সাহায্যেই মগদের হাত হইতে চাটগাঁ জয় করিতে সমর্থ হন। দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত এই কামানগুলা মনোয়ার খাঁর ছিল। কেননা দুই একটি কামানের গায়ে মনোয়ার খাঁর পিতামহ ঈশা খাঁর নাম বাঙ্গলা অক্ষরে খোদা আছে। একটি কামানের উপর হুমায়ুন-বিজয়ী শের্‌শাহের নাম খোদিত আছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ক্ষণের সঙ্গী

ক্ষণিক যারা এক নিমিষের সাথী,
ক্ষণিক যারা অচিন পথের চেনা,
যাদের সাথে কাট্‌ল প্রহর রাতি,
যাদের সাথে চোখের লেনা-দেনা ;

পথের ধারের বনের হরিণ যত
চকিত চেয়ে পলায় যারা ছুটে,
গবাক্ষেরি বদন-কমল মত
লাজুক যারা ফুটেই পড়ে টুটে ;

মরুর পথে শিরীষবনের হাওয়া,
ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখের চপল হাসি,
শিষ দিয়ে ওই শ্যামার উড়ে যাওয়া,
উড়ন্ত ওই কদম্ব-রেণুরাশি ;

আগন্তুক ওই পলাতকের দলে
নিমেষ মাঝে আলাপ করে' যায়,
ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই নাহি বলে
ক্ষণিক ভিড়ে নিরুদ্দেশে ধায়।

কোথায় কালের অতিথ্‌শালে হায়
সবাই তারা রাত্রি করে বাস,
ধর্ম্মশালায় বাউল গীতি গায়,
দেখ্‌তে ফিরে হয় যে বড় আশ।

বুঝ্‌তে নারি কোথায় তাদের ঠাঁই
হিমালয়ে ভূর্জ্জবনের ছায়,
সে কোন্ মহা কুম্ভমেলায় ভাই
আবার তাদের নাগাল পাওয়া যায় ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রজনীগন্ধা

(১৭)

গ্রীষ্মকালের সূর্য্য এত সকালেই বা ওঠে কেন, আর তাহার সঙ্গে মানবশিশু পাল্লা দিতে না পারিলেই বা তাহার মা-বোনেরা এমন অনাবশ্যক চটিয়া ওঠে কেন, তাহা লালু অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছিল না। ছোড়্দিটার এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া বড়ই আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; কথায় কথায় মারিবার জন্য হাত উঠাইয়া আসে। পিতা-মাতার অবিচারে লালুর উল্টিয়া তাহাকে দু ঘা দিবার পথটাও বন্ধ। ছোড়্দি নাকি এখন বড় হইয়া গিয়াছে, তাহার গায়ে হাত তোলা নাকি ভদ্রসন্তানের সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ। মন্দ যুক্তি নয়, মারিবার বেলা বড় হওয়ার কথাটা মনে থাকে না, না?

"এই লালু, আমার নিব্ আর কলম তুই বুঝি কিছুতেই কিনে দিবি না?"

লালু মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, "না দেবোই না ত। নিজের জিনিষ নিজে গিয়ে কিনে আননা।"

"তোর আজকাল বড় বাড় বেড়েছে, কথায় কথায় মুখ ভ্যাঙানি! নেহাৎ বাবা রাগ করেন, তা না হলে উচিত শিক্ষা দিতাম। ভাল চাও ত যাও বল্‌ছি।"

"তুমি ভাল চাও ত চুপ কর, শিক্ষা দিতে এলে তার চেয়েও ঢের বেশী শিক্ষা নিজে পেয়ে যাবে, তা জেনে রেখো। এইয়ো, আমার কলমে হাত দেবে না, বল্‌ছি।"

ভ্রাতা-ভগিনীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা আর মিনিট দুইয়ের মধ্যে বেশ জমিয়া উঠিত, হঠাৎ দরজার কাছে মানুষের পায়ের শব্দে দুজনেই লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেল। যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে চিন্ময়। এতক্ষণে অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি হচ্ছিল শুনি? লালু মিনুকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শেখাচ্ছিলি নাকি, না কুস্তি?"

মেনকা একেবারে সে-দেশ ছাড়িয়া ছুটিয়া পালাইল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া লালু খুসি না হইয়া পারিল না। আচ্ছা জব্দ হইয়াছে ছোড়্দিটা। চিন্ময়দার সাম্‌নে সাধু সাজিয়া কেমন থাকা হয়, আজ ত নিজমূর্ত্তি ধরা পড়িয়া গেল। চিন্ময়ের কথার উত্তরে বলিল, "মেয়েরা আবার কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শিখে কি করবে?"

চিন্ময় বলিল, "মেয়েরা আজকাল সবই শিখ্‌ছে, দুদিন পরে তোমাদেরই রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, তারা কেবল ফুট বল গল্‌ফ্ খেলে আর ভোট দিয়ে দিন কাটাবে। তা তোমার ভাবনা নেই, রান্নাবান্না ত একরকম জানাই আছে, না?"

তাহাকে এ-রকম কচি খোকার মত ক্ষ্যাপাইবার চেষ্টাতে লালুর রাগও হইল, হাসিও পাইল। চিন্ময়দাও দেখি মা-বাবারই দলের! তাঁহাদের মতে পৃথিবীর সব লোকই বাড়ে, গণ্যমান্য সম্মানের উপযুক্ত হয়,—এমন কি ছোড়্দিও,—কেবল লালুই চিরকাল ছোট থাকিয়া যায়। তাহাকে স্বচ্ছন্দে মারা চলে, ক্ষ্যাপান চলে, যা খুসি তাই করা চলে। যাক গে, তাহাকে ছোট মনে করিলেইত আর সে সত্যসত্যই ছোট থাকিয়া যাইবে না? চিন্ময়ের ঠাট্টার উত্তরে একান্ত অবজ্ঞাসূচক হাসি হাসিয়া সে ঘরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বই খাতা কলম পেন্সিল সব আবার গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। চিন্ময় সেখান হইতে বাড়ীর গৃহিণীর সন্ধানে চলিল।

তিনি তখন রান্নাঘরের সাম্‌নের সরু বারাণ্ডায় বসিয়া তরকারি কুটিবার জোগাড় করিতেছিলেন। মেনকা সেইখানে বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্তৃতাও বেশ চলিতেছিল। চিন্ময়কে আবার এদিকে আসিতে দেখিয়া, "ঐ যা, তোমার ডাল উথলে পড়্‌ল," বলিয়া সে চট্ করিয়া রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহার লজ্জার ঘটা দেখিয়া চিন্ময়ের হাসি পাইলেও সে গম্ভীরমুখেই আসিয়া বারাণ্ডার কোণে ভাঙা মোড়ার উপর বসিয়া বলিল, "কেমন আছেন সব? পরশু যদিও এসেছি কিন্তু এপর্য্যন্ত কাজের উৎপাতে একবার বেরতেও পাইনি।"

গৃহিণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, ভগবানের কৃপায় ভালই সব একরকম। দিদি ভাল আছেন? ও ভাঙা মোড়াটাতে বস্‌লে কেন? ও মিনু, রান্নাঘর

থেকে একটা পিঁড়ে-টিড়ে দে ত? কি কর্‌ছিস গরমে আগুন-তাতে বসে?"

চিন্ময় বলিল, "মিনুর দেখ্‌ছি আজকাল বড়ই গৃহকর্ম্মে মন হয়েছে। সেধে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ভাল, ভাল।"

মেনকার মা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ৷ গৃহকর্ম্মে মন ত কত, তার চেয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মারামারিতে মন ঢের বেশী। কি খেয়াল হয়েছে, গিয়ে ঢুকে বসে আছে। ক্ষণু ওর বয়সে দুবেলা সংসারের সব কাজ এক হাতে করেছে।"

মাতার আহ্বানে মেনকা একখানা পিঁড়ি বেশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় শেষোক্ত কথাগুলি তাহার কানে আসিয়া লাগিল। রাগে ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। পৃথিবীতে কেহ কি কখনও ভাইয়ের সঙ্গে এর আগে মারামারি করে নাই নাকি, যে, যে আসিবে তাহাকেই এমন আশ্চর্য্য খবরখানা দিতে হইবে? মায়ের যদি কোন বুদ্ধি আছে, ঘরের যেখানের যত খবর সবাইকে কেন যে বলা? দিদি না-হয় খুবই গুণবতী, তাহা হইলেও মেনকার বয়সে একবারও সে দাদার সঙ্গে মারামারি করে নাই নাকি?

চিন্ময় চোখ তুলিয়া মেনকার ক্রোধারক্ত মুখ দেখিয়া বলিল, "কি খবর, পড়াশুনো কেমন চল্‌ছে? হাফইয়ার্লির ভাবনা এখন থেকে ভাব্‌ছ নাকি, মুখ যে বেজায় গম্ভীর?"

মেনকা গাম্ভীর্য্যের বিন্দুমাত্রও হানি না করিয়া বলিল, "আমাদের মত বোকা লোকের অত পড়ার ভাবনা নেই। আমরা পড়্‌লেও যা, না পড়্‌লেও তা, তা হলে আর ভেবে মরি কেন? দিদির মত ভাল মেয়ে হলে না-হয় কথা ছিল।"

তাহার কথার ঝাঁঝে চিন্ময় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তাই নাকি? তোমার ত খুব সকাল সকাল দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছে দেখ্‌ছি। তোমার অসাধারণ ভাল মেয়ে দিদিটির খবর কি? কেমন আছেন তিনি?"

মেনকা আবার বসিয়া পড়িয়া শাক বাছা সুরু করিল। বলিল, "কি জানি, সে কি আর চিঠিপত্র লেখে আমাকে যে আমি বল্‌ব? মায়ের কাছে চিঠি আসে, মাই জানেন।"

মা বলিলেন, "নে নে থাম, কথা একবার শোনাতে পার্‌লে হয়। মেয়ে আর কিছু চায় না তা হলে। ক্ষণু আছে ভালই ত লিখেছে, দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যেই চলে আস্‌বে বোধ হয়। শরীর বেশ সার্‌ছিল ওখানে, তা যা আমাদের দশা, আরো যে দুমাস রাখ্‌ব তার জো নেই। এর পর এসে আবার কাঁধের জোয়াল কাঁধে নিতে হবে ত? যা চেহারা হয়েছিল মেয়ের, দেখে বুকের ভিতর আমার শুকিয়ে উঠ্‌ত। ভগবানের ইচ্ছায় একটু যে সেরেছে সেই ঢের। অত শীতে আমার পাঠাবার ত ইচ্ছে ছিল না, তা সবাই বল্‌লে—শীত হলে কি হয়, পাহাড়ে শরীর সারে খুব, মেয়েও জেদ ধর্‌ল, তাই পাঠালাম।"

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি অনাদিবাবুর ওখানের সেই কাজেই যাবে নাকি?"

মেনকা তাহার মাকে উত্তর দিবার কোনো অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আহা, সে যেন ইস্কুলের কাজ আর-কি, তাই ছুটীর পরে ঠিক সময় গাড়ী এসে দাঁড়াবে? গিন্নিপনা করার ভার আসল লোকেই নিয়েছে, তার আর দিদির দর্‌কার কি? তাকে ত আর বসে বসে মুখ দেখ্‌বার জন্যে কেউ একশো টাকা করে মাইনে দেবে না?"

তাহার মা বলিলেন, "তা না দেয়, না দেবে। আমরা ত আর সাধ্‌ছি না? ওরা নিজেরাই লিখেছিল যে ছুটি ফুরলেই আস্‌তে, তাই বল্‌ছি। আর বড়মানুষের বৌঝিরা কত কাজের তা ত জানাই আছে আমার, তারা ঘরে বসে গিন্নিপনা কর্‌লে ত?"

মেনকা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, "মা যে কি অদ্ভুত কথা বলেন—ঠিক হিন্দু পাড়ার বুড়ী গিন্নিদের মত! তুমি বুঝি ভেবেছ মনোজাদি সারাদিন জুতো মোজা আর কুঁচিয়ে শাড়ী পরে চেয়ারে বসে থাকেন? তাঁকে দেখ্‌লে আর বল্‌তে না। এত কাজ তিনি জানেন!"

তাহার হাসিতে যোগ দিয়া তাহার মা বলিলেন, "তা যেমন মানুষ, তেমনি কথা বলি। বুড়ী গিন্নি ত বটেই, আর জন্মেছিলামও হিন্দু সমাজেই। নেহাৎ তোর বাবা টেনে আন্‌লেন, তাই ত এলাম।"

"ভাগ্যে এসেছিলেন, তা না হলে এতদিন আমাদের কি যে হত! মাগো।"

চিন্ময় বলিল, "কেন, বেশ ত হত। আমার ত মনে হচ্ছে 'কি'টা হলে তুমি খুসিই হতে।"

"এ রাম, কি যে যা-তা কথা বলেন আপনি! ভারি আহ্লাদ বেড়েছে আপনার, না? অমন করলে আর আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ব না।"

"নাও বাছা, পাগ্‌লীকে আর ক্ষেপিও না," বলিয়া কোটা তর্কারির থালা লইয়া গৃহিণী রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মেনকা মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া ডালার তর্কারি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

চিন্ময় বলিল, "তোমার দিদি গিয়ে অবধি একটাও চিঠি লেখেনি তোমাকে?"

মেনকার রাগের বা রাগের অভিনয়ের পালা তখনও শেষ হয় নাই। সে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "জানি না, আপনার মত আমার ত দিদির ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না আর কি!"

চিন্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "না, তা ঘুম মাঝে মাঝে হয় বই কি। আচ্ছা যাই এখন।"

মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, চিন্ময়-দাও চলিয়া গেল, অগত্যা মেনকা উঠিয়া লালুর সন্ধানে চলিল। সে হতভাগাও এরি মধ্যে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কেন যে মানুষে পৃথিবীতে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মায়। পুরুষ-মানুষের মত তাহাদের নিজ কলম খাতা সবই দর্কার অথচ তাহাদের মত সোজাসুজি কিছুই সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। দিদিটা আসিবে যে কবে। লালু বাঁদরটা তবু দিদি থাকিলে একটু পদে থাকে। নারীজন্মের অশেষ দুঃখে কাতর হইয়া মেনকা দিদিকে চিঠি লিখিতেই বসিয়া গেল। তাহার মনটা দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে সত্যসত্যই বেশ ভার হইয়া আসিল।

এমন সময় প্রবোধ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মিনি, কি কর্‌ছিস্ রে? আমার গেঞ্জিতে দুটো বোতাম লাগিয়ে দে না। দে এখুনি, আবার আফিসের বেলা হয়ে যাবে।"

"বাপ্‌রে বাপ, তোমাদেরি কাজ আছে, আর আমাদের নেই কিছু নাকি? দিদির চিঠিটাও শেষ কর্‌তে দিলে না, আজ আর তা হলে যাবে না।"

"নে নে ভারি লাট-সাহেবের ডেস্‌প্যাচ লিখ্‌ছেন মেয়ে। চিঠি থাক এখন, দিদিকে হাতে করেই দিস্, কতই বা আর দেরি হবে?"

মেনকা বিনুনী সুদ্ধ মাথাটা সজোরে দোলাইয়া বলিল, "আহা কি সময়ের জ্ঞান গো তোমার! পনেরো দিন আর পনেরো ঘণ্টা ঠিক সমান, না?"

প্রবোধ বলিল, "মেলা বক্‌বক্ করিস্ নে। একটা বোতাম লাগাতে বল্‌লাম তা সুরেন বাঁড়ুয্যের মত লেক্‌চার দিতে বস্‌ল। পনেরো দিন, না তোর মাথা! ক্ষণিত কাল সকালেই আস্‌ছে, এই টেলিগ্রাম এল।"

মেনকা একটানে ফড়ফড় করিয়া নিজের অর্দ্ধলিখিত চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "সেটা আগে বল্‌লে কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত তোমার?" এই বলিয়া প্রবোধের গেঞ্জিটা তুলিয়া লইয়া সশব্দে পা ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। সংসারের সব ক'টা মানুষ যেন জোট করিয়া আজ তাহার পিছনে লাগিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

"মা শুন্‌ছ? তুমি ত চিন্ময়দাকে বলে দিলে যে দিদি কুড়ি দিন পরে আস্‌বে। তিনি যে কালই আস্‌ছেন?"

"কে বল্‌লে তোকে?"

"কে আবার বল্‌বে? টেলিগ্রাম এসেছে, তা দাদা সেখানাকে সযত্নে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাছে কেউ দেখে ফেলে। বোতাম লাগানো নিয়ে ঝগড়া কর্‌তে গিয়ে নেহাৎ কথাটা বেরিয়ে পড়্‌ল।"

তাহার মা কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া রাখিয়া প্রবোধের কাছে সঠিক খবর জানিতে চলিলেন। মেনকা সেইখানে বসিয়া পাঁট্ পাঁট্ করিয়া কাপড়ের ভিতর ছুঁচ চালাইয়া মনের রাগটা খরচ করিতে লাগিল। বিশ্বসংসারের উপর আজ কি কারণে জানি না তাহার রাগ ধরিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া তাহার অল্প একটু ভাল লাগিল। পাছে ষ্টেশনে তাহার যাওয়া না যাওয়া লইয়া কোনো কথা উঠে, সেই সম্ভাবনাতেই সে সবার আগে কাপড়-চোপড় পরিয়া পরম ব্যস্তভাবে প্রবোধের কাছে গিয়া বলিল, "বা রে! দিদিকে কেউ আন্‌তে যাবে না নাকি?"

সে বলিল "তুই ত যাচ্ছিস্, তা হলেই হল।"

"আহা তা হলেই যদি হত, তবে আর তোমায় বল্‌তে আস্‌ত কে? যাবে কি না বলনা?"

তাহার মা ঘরে আসিয়া বলিলেন, "যাবে বাপু যাবে, সবাই যাবে, সকালে উঠেই চেঁচামেচি সুরু করো না।"

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পৌঁছিয়া দেখা গেল ট্রেন আসিতে তখনও দেরি আছে। প্রবোধ বলিল, "এখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাবি না, যা ওয়েটিংরুমে বস্‌গে যা, গাড়ী এলে ডাক্‌ব।"

মেনকা বলিল, "দূর ছাই, দাদার সঙ্গে আবার মানুষে আসে! এখন সেই পচাগন্ধওয়ালা ঘরে গিয়ে বসে থাকি। কেন যে এলাম। চিন্ময়দা থাক্‌লে বেশ বেড়াতে দিতেন। লালু, আয়না আমার সঙ্গে।"

লালু বলিল, "থাক্‌ না, অতয় আর কাজ কি? শেষে জরিমানা দিয়ে মরি, মেয়েদের ওয়েটিংরুমে ঢুকে।"

"যা, যা, ভারি পুরুষ হয়েছেন, পরশু অবধি হাফটিকিটে বিনা-টিকিটে যেতেন, ওর আবার কথা শোন।"

সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনটা এই সময় আসিয়া পড়াতে তাহাকে আর পচা ঘরে ঢুকিতে হইল না, দরজা অবধি গিয়াই সে ফিরিয়া আসিল। লালু বলিয়া উঠিল, "ঐ যে দিদিকে দেখা যাচ্ছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, কই কিছু এমন ত মোটা হয়নি?"

মেনকা বলিল, "দূর বোকারাম, আগে নাম্‌তেই দে! এমনি মোটা হবে যে তুই এত দূর থেকে বুঝ্‌তে পারবি? তা হলেই হয়েছে আর কি!"

ক্ষণিকা নামিয়া পড়িতেই লালু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। মেনকার দিদিকে প্রণাম করা বিশেষ অভ্যাস ছিল না, তবু লালুর ভক্তির আতিশয্যে বাধ্য হইয়া তাহাকেও কোনোমতে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিতে হইল। মাথা তুলিয়াই বলিল, "কই, কি এমন সার্‌লে? ভারি যে ঘটা করে মাকে লিখে পাঠাতে? কেবল গালের কাছটা একটু লাল হয়েছে।"

লালু সুবিধা পাইয়া বলিল, "তবে কি আগাগোড়া 'সব লাল' হয়ে যাবে নাকি? এ কি ভারতবর্ষের ম্যাপ পেয়েছ?"

ভাইবোনের ঐতিহাসিক আলোচনা সুরু হইতে না হইতেই প্রবোধ তাহাদের লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই ক্ষণিকা বলিল, "চিন্ময়দা কি এখানে নেই নাকি?"

মেনকা বলিল, "থাক্‌বেন না কেন? তা তিনি থট্‌রীডিং জানেন বলে ত আর গুন্‌তেও জানেন না? কালই বেচারা তোমার খবর নিতে এসেছিলেন, তা মা তাঁকে বলে দিলেন তুমি কুড়ি দিন পরে আসবে। তিনি আর জান্‌বেন কি করে তাহলে?"

প্রবোধ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "এইবার খবরের কাগজে arrival, departureএর নোটিশ ছাপিয়ে তবে পথে বেরিয়ো। তা হলেই অভ্যর্থনা কর্‌বার যথাযোগ্য লোক হাজির থাক্‌বে।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া লালু-মেনকাও আর কথা বলিল না। বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেই ক্ষণিকা রোগা হইয়াছে কি মোটা হইয়াছে, আরো ফর্সা হইয়াছে না কালো, তাহা লইয়া বাড়ীর ঝি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি মানুষই সম্পূর্ণ স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বসাতে, ক্ষণিকার এত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহই অবকাশ পাইল না। বাস্তবপক্ষে ক্ষণিকার চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, মুখে একটু রক্তসঞ্চার হওয়া এবং চোখের দৃষ্টির শূন্যতাটা কাটিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু দুই মাস পরে যে মানুষ কয়েক শ মাইল দূর হইতে ফিরিয়া আসিল, তাহার একটুমাত্র পরিবর্ত্তন মানুষের চোখে উচিত মনে হয় না। অগত্যা নিজেকে এবং পরস্পরকে বুঝাইবার জন্য অনেকগুলি কাল্পনিক উন্নতি বা অবনতিকে রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিতে হয়।

খানিক পরে, মেয়েকে জলটল খাওয়ানো হইয়া যাইবার পর ক্ষণিকার মা বলিলেন, "এত তাড়াহুড়ো করে চলে এলি যে? আর দিন কতক থেকে এলেই পার্‌তিস্‌, শরীর যখন সার্‌ছিল?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা হপ্তাখানেক পার্‌তাম হয়ত, কিন্তু যোগেশ-বাবুরা আস্‌ছিলেন, আবার দেরি কর্‌লে হয়ত সুবিধামত সঙ্গী পাব না, তাই চলে এলাম।"

মেনকা বলিল, "কেন মোটে এক সপ্তাহ কেন? তোমার এত তাড়াতাড়ি কিসের, আমার মত ত আর স্কুল নেই?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "স্কুল নেই বলে কি আমার চিরদিনের ছুটি হয়ে গেছে? কাজ কর্ম্ম কর্‌তে হবে না আর?"

তাহার মা বলিলেন, "আহা আগে কাজ ঠিকই হোক, তারপরে এলেই পার্‌তিস্‌?"

ক্ষণিকা মাদুরের উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "আমার কাজ বেঠিক হল কবে, যে, আবার ঠিক হবে?"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "ওরা কি আবার যাবার কথা লিখেছে নাকি কিছু?"

ক্ষণিকা পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"কি লিখেছে?"

"অনাদি-বাবু লিখেছেন তাঁর স্ত্রীর শরীর ভাল নয়, আমি গেলে ভাল হয়। যত শিগ্‌গির পারি যেতে লিখেছেন।"

"ও মা, নিশ্চয় তোমার দুধ পুড়ছে, ভীষণ গন্ধ উঠেছে," বলিয়া চীৎকার করিয়া মেনকা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার মাও ব্যস্ত হইয়া তাহার পিছন পিছন দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ক্ষণিকা উঠিয়া পড়িয়া নিজের ছাড়া জামা জুতা শাড়া সব গুছাইতে আরম্ভ করিল। বিছানার মোটটা একবার খুলিবার উপক্রম করিয়া আবার রাখিয়া দিল। দুদিন পরেই ত আবার মোট বাঁধিতে হইবে তবে আর খোলাখুলি কেন?

প্রবোধ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওরে তোর কাছে ভাঙানো পয়সা আছে? ট্যাঁকে যা ছিল সবই ত গাড়োয়ান ব্যাটাকে বিদায় করতে খরচ হয়ে গেল। আফিসে গিয়ে এক পয়সার পানও ত কিনতে হবে?"

ক্ষণিকা হাতব্যাগ হইতে কয়েক আনা পয়সা ভাইয়ের হাতে দিতে দিতে বলিল, "এরি মধ্যে তোমার অফিসের সময় হয়ে গেল?"

"হবে না? কতখানি হাঁটতে হয়।" পয়সা পকেটে ফেলিয়া মাথার টেড়ি ঠিক করিতে করিতে প্রবোধ বাহির হইয়া গেল।

প্রবোধ নিজেদের সরু গলিটা পার হইয়া বড় রাস্তায় পা দিবা মাত্র, পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কি হে, আজ এত দেরি?"

প্রবোধ পিছনে ফিরিয়া দেখিল চিন্ময়, বলিল, "এতেই ত ক্ষণির তাক্ লেগে গেল এত সকালে বেরচ্ছি কেন? সে আজ এল, জান না?"

চিন্ময় বলিল, "না, জানব কি করে? এত শিগ্‌গির এল যে? এখন এখানেই থাকবে?"

প্রবোধ বলিল, "অতশত জানি না। কল্‌কাতার সেই চাকরিতে আবার ডাক পড়েছে বুঝি। সব খবর জানতেই পারবে, আমাদের ওখানে যাচ্ছ ত?"

চিন্ময় যে-পথে আসিতেছিল তাহাতে প্রবোধ ঠিকই অনুমান করিল বলা চলে। কিন্তু হঠাৎ উল্টা পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া চিন্ময় বলিল, "না, অন্য কাজে যাচ্ছি। কল্‌কাতায় যাচ্ছে তা হলে আবার? দেখ, বিকেলে যদি একবার যেতে পারি।"

(১৮)

কলিকাতা যাওয়াটা ক্ষণিকা এমন হঠাৎ ঠিক করিয়া ফেলিল, যে, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া, ধীরে সুস্থে গিয়া উপস্থিত হইবার কোনো অবসর রহিল না। পাহাড় হইতে ফেরার দিন দুই পরেই খাইতে বসিয়া বলিল, "এর পর ত যাবার জোগাড় দেখতে হয়।"

তাহার মা বলিলেন, "তা ওদের লেখ, কবে যেতে বলে জেনে নে, তারপর যাস্ না হয়। সঙ্গে যাবে কে?"

ক্ষণিকা বলিল, "যেতে ত বলেইছে, আবার কতবার করে বলবে? আর সঙ্গে যাওয়ার আবার ভাবনা! প্রতি ট্রেনেই কত চেনা মানুষ কল্‌কাতায় যাচ্ছে।"

মেনকা ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "দিদি এক মেয়ে! ঘরের ভাত দুদিন ওর পছন্দ হয় না। হিল্লীদিল্লী ছুটে বেড়াতে পারলে আর ও কিছুই চায় না।"

ক্ষণিকার প্রতি ঠাট্টাচ্ছলেও কোনো দোষারোপ ক্ষণিকার মা একেবারে সহিতে পারিতেন না। মেনকার কথায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের ঘরের ভাত খাবার ব্যবস্থা করতেই না দিদির অত ছুটোছুটি করতে হয়? না হলে দিদি অমন তোমাদের মত ঝড়ের আগে কুটি নেচে বেড়াবার মেয়ে নয়।"

সব কথাতেই দিদির গুণ ব্যাখ্যা আর তাহার নিজের গুণের অভাব সম্বন্ধে মন্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে মেনকা হাড়ে চটিয়া যাইত। রাগ করিয়া সাধের ডাঁটাগুলা অচর্বিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াই সে ভাত খাওয়া সাঙ্গ করিয়া ফেলিল। উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "বেশ গো বেশ, দিদি না-হয় সবই কেবল পরোপকারের জন্য করে।

তবু আমরা পাঁচটা নিষ্কর্ম্মা ভূত আছি বলেই ত পারে অত উপকার করতে? সবাই যদি উপকার করতেই চাইবে, উপকারগুলো চড়্‌বে কার ঘাড়ে?"

ক্ষণিকা বসিয়া বসিয়া নীরবেই তাহার সম্বন্ধে আলোচনাটা শুনিতেছিল। তাহার মা জন্মাবধি কন্যাকে দেখিতেছেন, তিনিও তাহাকে চিনেন না, বোন যে অপেক্ষাকৃত অল্প-দিন দেখিতেছে, সেও চেনে না। যে যাহাকে যেমনটি চায়, কল্পনা ও বিশ্বাসের সাহায্যে তেমনটাই পায়, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে। মানুষকে পরে ত চেনেই না, সেও নিজেকে চেনে না। আমরা কখন যে কোন্ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কোন কাজটা করি, তাহা যথার্থ প্রায় কোন সময়েই বুঝি না। যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধটাকে যে সময় ভাল মনে হয় সেটাকে গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

এই যে ক্ষণিকার কলিকাতা যাওয়ার ব্যগ্রতার কারণ লইয়া মেনকা আর তাহার মায়ে তর্ক হইয়া গেল, তাহাদের দুজনের একজনও তাহার যথার্থ মনোভাবটা বুঝিতে পারে নাই সে কথা না হয় অবিলম্বেই বোঝা গেল। কিন্তু যথার্থ মনোভাবটা কি? ক্ষণিকা কি নিজেই তাহা জানে? জানিলেও কি তাহা সত্য বলিয়া সে নিজের কাছে স্বীকার করে? কলিকাতায় যাওয়ার, যে গৃহকে অসীম বেদনার মধ্য দিয়া সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সেইখানেই আবার ফিরিয়া যাইবার এই যে তাহার মনের ব্যাকুলতা, ইহার মূল কোথায়, ইহার জন্ম তাহার কোন্ মনোভাব হইতে?

কাজ তাহার করিতেই হইবে, আর এই কাজটা সকল দিক হইতেই সুবিধাজনক, এ কথাটার মধ্যে মিথ্যা কোনোখানে নাই। সংসারের লোকের কাছে এ কথাটা বেশ জলের মত সরল, যে শুনিবে সেই বিশ্বাস করিবে; নাও যদি করে, তাহা মুখে ক্ষণিকার সামনে একজনও প্রকাশ করিবে না।

কিন্তু ক্ষণিকা জানে, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে ইহা একান্ত সত্য বলিয়া জানে, যে, তাহার কলিকাতা যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ অন্য। লোকের কাছে সে যখন যাওয়ার কারণ ভাঙিয়া বলিবে, তখন সে প্রায় মিথ্যাই বলিবে। সে মিথ্যার যে আঘাত, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা তাহার মন সারাক্ষণই করিতেছে। কিন্তু হৃদয়ের কষ্টিপাথরে যে মেকী ধরা না পড়িয়া যায় না? ঘুষ দিয়া তাহার কাছে লাভ নাই।

এই যাওয়ার ফল তাহার পক্ষে শুভ হইবে, না অশুভ হইবে; যে কঠিন বন্ধনে সে বদ্ধ, তাহা হইতে ইহার ফলে সে মুক্তি পাইবে, না বন্ধন কঠিনতর হইয়া তাহাকে দুর্গতির অতলতলে টানিয়া লইয়া যাইবে; তাহা কে বলিতে পারে? ক্ষণিকা কি সে কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখে নাই? মানুষের স্বার্থচিন্তা প্রায় কোনো সময়েই তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না, ক্ষণিকা কি ভাবিয়া দেখে নাই যে এই যাত্রার ফলে তাহার কোনও স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না?

অনাদিনাথের পত্র আসিবার পর হইতেই এইসব চিন্তা তাহাকে এক মুহূর্ত্তও নিষ্কৃতি দেয় নাই। কিন্তু যথাসাধ্য ভাবিয়াও ক্ষণিকা কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিল না। তাহার শুভ কিসে, অশুভই বা কিসে, তাহা যে সে কোনোমতে ভাবিয়া পায় না? সাংসারিক অভিধানে যে কথার যে অর্থ, তাহার হৃদয় যদি সে অর্থ মানিতে নাই চায়? আর শুভ ও অশুভকে ভাষায় যেমন পরস্পর-বিরোধী দেখায়, তাহাদের যথার্থ স্বরূপ কি তাই? মানুষে কবে নিঃসংশয়িতরূপে তাহাদের চিনিতে পারিয়াছে? শুভ যে কতদিন অশুভের ছদ্মবেশে আসিয়া দেখা দেয়, তাহার কি ঠিকানা আছে? আপনার অন্তরের মধ্যে চাহিয়া ক্ষণিকা এই কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যবচ্ছেদ-রেখা কোথাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত না, গঙ্গা-যমুনার মত তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া যেন এক হইয়া রহিয়াছে, সে কেমন করিয়া একটিকে ত্যাগ করিয়া আর-একটিকে গ্রহণ করিবে? আর এই যে বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহা কি সত্যই তাহার মনে আছে? তাহার সামাজিক সংস্কার, তাহার বিচারবুদ্ধি বলে যে মুক্তিই তাহার কামনা করা উচিত, কিন্তু কামনার জন্ম যে নিভৃত প্রদেশে, তাহা কি মরুভূমিরই মত রিক্ত পড়িয়া নাই?

ক্ষণিকা দেখিল ভাবনার অন্ত নাই, কিন্তু দিন যে বহিয়া যায়? সর্ব্বভাবনা নিঃশেষে সমাপন করিয়া পরে কাজে নামিবার অধিকার ভগবান ক'টা মানুষকেই দিয়াছেন? আহ্বান ত তাহার অন্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকেই

না-হয় মানিয়া লওয়া যাক। ফলে যাহা হয়, তাহার ভাবনা ভাবিবার সময়ের অভাব হইবে না।

যাওয়া যখন স্থির, তখন অগত্যা তাহার আয়োজনও অল্পস্বল্প করিতে হয়। মেনকা বলিল, "দিদি, যদি আর সাত আট দিন দেরি করতে, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গেই যেতাম। না-হয় বাকি ক'টা দিন মাধবীদের বাড়ী থাক্‌তাম, সে ত আমাকে সারা ছুটিই রাখ্‌তে চাইছিল।"

ক্ষণিকা বলিল, "তোর যাবার তাড়া কিসের? প্রায় তোর স্কুল খোলার সময়েই ত চিন্ময়দারা যাচ্ছেন কল্‌কাতায় জ্যাঠাইমার চোখ দেখাতে, তাঁদের সঙ্গে গেলেই হবে।"

লালু বলিল, "সেই ভাল, চিন্ময়দাদের ঢের লগেজ যাবে, তার মধ্যে ছোড়দিকেও দিলে হবে। দিদি একলা যাচ্ছে, ওর সঙ্গে জিনিষ কম থাকাই ভাল?"

মেনকা বলিল, "তোমাদের জাতটাই আছে কুলিগিরি করতে, জিনিষ নিয়ে যেতে ভাবনা কি? দিদিকে ত আর আমায় ঘাড়ে করে বইতে হবে না?"

চিন্ময় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ইংরিজিতে যে বলে যে দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর মুখ থেকেই আসল তত্ত্বকথা বেরয়, সে কথা অতি ঠিক। অনেক জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে আলাপ আছে, কিন্তু তারা মিনু আর মাধবীর কাছে এ বিষয়ে দাঁড়াতেই পারে না। কিন্তু কোন্ জিনিষ বহন করাবার জন্যে কুলীর খোঁজ হচ্ছিল? পুঁটলীপোঁটলা ত বেশ গোটা কয়েক দেখ্‌ছি!"

লালু বলিল, "ও অচল পুঁটলিগুলো দিদির, আমরা একজন সচল পুঁটলির ভাবনা ভাব্‌ছিলাম।"

চিন্ময় ক্ষণিকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আজই যাচ্ছ নাকি? আমি ভেবেছিলাম কয়েকদিন দেরি আছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আজ না, কাল দশটার ট্রেনে যাব।"

চিন্ময় বলিল, "যাক, আজ হলে তোমার একটা নেমন্তন্ন ফস্‌কে যেত। মা আমায় বলতে পাঠালেন, যে, রাত্রে তোমাদের চার ভাই-ভগিনীর আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন।"

লালু বলিল, "ভাগ্যিস্ দিদি যাচ্ছে না আজ, তা না হলে ওর জন্যে আমাদের খাওয়াটাও মাঠে মারা যেত।"

মেনকা বলিল, "সত্যি, আমাদের যেন কোনো দামই নেই, সব জায়গায় দিদির লেজুড় হয়েই যেতে হবে।"

চিন্ময় বলিল, "অত রাগ করে কাজ নেই, আর বছর দুই তিন যাক, তখন তোমারই দিন আস্‌বে, দিদিকেই তখন লোকে তোমার খাতিরে নেমন্তন্ন করতে আরম্ভ করবে।"

মেনকা বলিল, "আহা, তার জন্যেই যেন আমার ভাবনা। সবাই বেশ ভেবে বসে আছে যে দিদির হিংসেয় আমার যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। মোটেও তা নয়। একজনকে আর-একজনের খাতিরে আদর করা জিনিষটাই আমি দেখ্‌তে পারি না।"

লালু বলিল, "আঃ, ছোড়দি কি যে লেক্‌চার দিতে ভালবাসে। ওকে আমাদের ডিবেটিং ক্লবের মেম্বর করে নেব, খুব লেক্‌চার দিতে পারবে তা হলে। আমাদের যেদিন ক্লব বসে, সেদিন মহা ভাবনা হয় যে কি করে স্যারের চোখ এড়িয়ে ফাঁকি দেব, কেবলি ঘাড় নীচু করে ব্যাক্‌বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে ত ঘাড়ে ব্যথা ধরে যায়।"

ক্ষণিকা বলিল, "নে বাপু, একটু বাইরে গিয়ে যার যা বল্‌বার আছে, বল্‌গে যা। আমাকে জিনিষপত্র ক'টা গুছিয়ে নিতে দে।"

চিন্ময় বলিল, "তোমার আর তর সইছে না গা?"

ক্ষণিকা মাথা নীচু করিয়া জিনিষ গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "তর সওয়াসয়ি আর কি আছে এর মধ্যে? যেতে যখন হবে, তখন জিনিষগুলোকে আগে হোক, পরে হোক বাক্সের মধ্যে পুরে ত রাখ্‌তে হবে?"

চিন্ময় কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার একটু আগে লালু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতেই তাহার মা বলিলেন, "এই, এখুনি পালাস্‌নে যেন, আমাকে পয়সা দুয়ের মুড়ি কিনে দিয়ে যা।"

লালু বলিল, "এখন আবার মুড়ি নিয়ে কি করবে?"

তাহার মা বলিলেন, "মুড়ি নিয়ে আবার মানুষে কি করে? ছেলের কথা শোন।"

লালু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আহা মুড়ি যে খায় তা আমি বেশ ভাল করেই জানি, কিন্তু এমন সময় ত তুমি রোজ মুড়ি খাও না, তাই বল্‌ছি!"

মা বলিলেন, "তোরা সবাই যাবি নেমন্তন্ন খেতে, আর

আমি বুঝি একলার জন্যে এখন রাঁধ্তে বস্ব? যা মিনির কাছে ছুটো পয়সা চেয়ে নে, নিয়ে চট্ করে এনে দে।"

লালু ঘরে ঢুকিল। মিনিট দুই পরে চীৎকার শোনা গেল, "দিদি, শিগ্গির এসে পয়সা দিয়ে যাও, ছোড়দি এখন ফ্যাশান কর্ছেন, তিনি হাতবাক্স খুল্তে পার্বেন না।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "নাও থাম, বাড়ীর ভিতর কে কি কর্ছে তা তোমার চেঁচিয়ে পাড়ার লোককে জানাতে হবে না। এই যে পয়সা।"

মেনকা তখন একমনে এলো খোঁপা বাঁধিতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "দিদি, খোঁপাটা কেমন হয়েছে? অন্য দিনের চেয়ে বড় হয়েছে, না?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "হাঁ, হয়েছে ত বেশ।" পাশের চেয়ারের উপর চোখ পড়াতে ক্ষণিকা দেখিল, এবার মেনকার জন্মদিনে তাহাকে সে নিজে যে রঙীন ঢাকাই শাড়ীখানা দিয়াছিল, সেটা বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে। ক্ষণিকা বলিল, "হাঁরে, এই দুপা দূরে জ্যাঠাইমার ওখানে যাবি, তারি জন্যে এত সাজের ঘটা হচ্ছে?"

মেনকা গাল ফুলাইয়া বলিল, "যত বেশী দূরে যেতে হয়, তত বেশী সাজ্তে হয় তা ত আর জান্তাম না? তা হ'লে ট্রেনে উঠ্বার সময় সবাই বেনারসী পরে ওঠে না কেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা না-হয় হয়, অত সাজ তোর দেখ্বে কে?"

মেনকা রীতিমত রাগিয়া বলিল, "কাউকে দেখ্তে হবে না, আমি নিজেই আয়নার সাম্নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ব এখন।"

তাহার মা ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "ওরে একটু সকাল করে যা না-হয়, ফির্তে যেন রাত করিস্ না বেশী। যে আঁধার, লোক সঙ্গে না নিয়ে দুই বোনে যেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়িস্ না।"

দুই ভগিনীর সাজসজ্জা সমাপ্ত হইতে না হইতেই লালু বাহির হইতে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি এইবার যাচ্ছি কিন্তু, কারু জন্যে দাঁড়াতে-টাঁড়াতে পার্ব না।"

তাহাকে দাঁড়াইতে হইল না, বোনেরাই তাড়াতাড়ি করিয়া হাতের কাজ সারিয়া তাহার সঙ্গ লইল। প্রবোধ যে কখন আসিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না, কাজেই তাহার জন্য অপেক্ষা করা কেহই প্রয়োজন মনে করিল না।

চিন্ময়ের সঙ্গে সদর দরজা পার হইয়াই দেখা হইল। মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাদের নিতে আস্ছিলেন নাকি?"

চিন্ময় একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

সকলে একসঙ্গেই আসিয়া চিন্ময়দের বাড়ী ঢুকিল।

হিরণ্ময় আজ সকালের গাড়ীতে হঠাৎ বাড়ী আসিয়া হাজির হইয়াছিল। লালু তাহার একজন মহাভক্ত, যদিও বছর দেড়ের ছোট বলিয়া হিরণ্ময় এখন পর্য্যন্ত লালুকে একটু কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। লালুকে দেখিয়া সে ঘর হইতে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া বলিল, "আর একটু আগে এলি না কেন? অনেকগুলো ভাল ভাল জিনিষ এনেছি। আমার ষ্ট্যাম্প আর দেশলাইয়ের লেব্লের খাতাগুলো যদি দেখিস! এ সহরে এমন আর কারুর থাক্তে হয় না।"

মেনকা হঠাৎ একলা পড়িয়া গেল। চিন্ময় আর ক্ষণিকা একটু আগে ছিল, হিরণ্ময় লালুদের পথে আসিয়া পড়াতে, তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। এখন লালু ও হিরণ্ময়ের ঘরে ঢোকাতে মেনকা যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সুখের বিষয় তাহাকে এমন অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে হইল না, মিনিট তিন চার পরেই হিরণ্ময় মাথাটা বাহির করিয়া বলিল, "এই, তুমি দেখ্বে না?" এই আহ্বানেই খুসি হইয়া মেনকা তাহাদের অনুসরণ করিল।

ক্ষণিকা রান্নাঘরের দিকে সোজা চলিয়াছে দেখিয়া চিন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "চলেছ কোথায়? তোমার ত খেতেই বলা হয়েছে, রাঁধ্তে ত আর বলা হয়নি?"

ক্ষণিকা বলিল, "জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করে আসি একটু। নিজে রাঁধ্ব না বলে, যিনি রাঁধ্ছেন তাঁর সঙ্গে কথা বল্তে ত দোষ নেই?"

চিন্ময় ইতস্তত করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বল্ব ভেবেছিলাম। আগেই বলা উচিত ছিল বোধ হয়, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আচ্ছা মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসো।"

ক্ষণিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

সেখানে তখন রীতিমত ধূম্রলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। চিন্ময়ের মা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এখন এ ঘরে না বাছা, যেমন গরম, তেমনি ধুঁয়ো এখানে। বাইরে যাও, আমি একটু পরেই আস্‌ছি।"

অগত্যা ক্ষণিকাকে আবার বাহির হইয়া আসিতে হইল।

চিন্ময় ঠিক সেই ভাবেই সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া ছিল। ক্ষণিকাকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া বলিল, "ছাতে চলনা? নীচে বড় গরম।"

ক্ষণিকা বলিল, "চল।" তাহার সম্মুখে কি যে আসিতেছে তাহা তাহার স্পন্দিত হৃদয় নিশ্চিত করিয়াই বলিয়া দিতেছিল, কিন্তু পলায়নের পথ সে কোনোখানেও দেখিতে পাইল না।

ছাতে আসিয়া দুজনে পাশাপাশি খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যাস্তের পর তাহার শেষ রশ্মি-রেখাগুলি এখনও আকাশকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। বিদায়গ্রহণোন্মুখ প্রিয়ের দৃষ্টির মত সেই ম্লান আলোটুকু বড় করুণ হইয়া মাটির বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। সান্ধ্যবায়ুর মৃদু হিল্লোল ক্ষণিকার মনে যেন কোন্ হতাশা-পীড়িত বিশ্বের দীর্ঘনিশ্বাসের মত আসিয়া বাজিল।

হঠাৎ তাহার একেবারে সাম্‌নে আসিয়া চিন্ময় বলিল, "ক্ষণিকা, একবার আমার মুখের দিকে তাকাও।"

ক্ষণিকা তাহার ব্যথিত দৃষ্টি বাহির হইতে ফিরাইয়া আনিয়া চিন্ময়ের মুখের উপরেই স্থাপিত করিল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, সে প্রাণপণ শক্তিতে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

চিন্ময় তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বুঝ্‌তে ত পেরেছ। তোমাকে ত আমার মুখের কথায় কিছুই বল্‌তে হল না।"

ক্ষণিকা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই রহিল, হাত ছাড়াইবারও চেষ্টা করিল না। কেবল তাহার চোখের জল সকল বাধা ভাঙিয়া দুই চোখ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

চিন্ময় বলিল, "উত্তর দাও, কিছু কি বল্‌বার তোমার নেই?"

ক্ষণিকার কণ্ঠস্বর যেন হারাইয়া গিয়াছিল। কি বলিবে সে? আশৈশবের সঙ্গী, তাহার সকল দুঃখ-বেদনার সমভাগী, তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতেও প্রস্তুত এই যে মানুষটি, ইহাকে কঠিন আঘাত করা ছাড়া উপায় নাই কি? জগতে কি আর মানুষ ছিল না? ক্ষণিকার জন্যই ভগবান এই কাজটা এতদিন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন?

কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশায় যে এখনও চিন্ময় তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে? অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "চিন্ময়দা, আমাকেও কি তুমি অমনি বুঝ্‌বে না? কথা বলে আমি আর কি জানাব? ভেবেছিলাম তোমাকে আঘাত করার দুঃখটা অন্ততঃ ভগবান আমায় দেবেন না, কিন্তু তার থেকেও আমি নিস্কৃতি পেলাম না।"

চিন্ময় তাহার হাত ছাড়িয়া সরিয়া গেল। ক্ষণিকা সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এতদিনের সঞ্চিত যত বেদনা, বিফল বাসনা, হতাশা, ক্ষোভ, সব যেন পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিক পরে চিন্ময়ের কণ্ঠস্বর আবার তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল, "তুমি এমনি করে নিজের জীবনটাকে মাটি করবে? মরীচিকার পিছনে ছোটা কি এতই লোভনীয় তোমার কাছে?"

ক্ষণিকা মাথা তুলিয়া বলিল, "চিন্ময়দা, তুমি কি ভাব্‌ছ যে আমার দুঃখ খুব কম? এইসব প্রশ্ন করে আর কি হবে?"

চিন্ময় বলিল, "কিছুই হবে না। কোনো প্রশ্ন করাই আমার বোকামি হয়েছিল, উত্তরটা আমি একরকম ঠিকই জান্‌তাম। কিন্তু তবু আশা ছিল তোমার শুভবুদ্ধি হলেও হতে পারে। কিন্তু দেখ্‌ছি জগতে দুঃখ পাবার লোভ কেউ সহজে ত্যাগ কর্‌তে পারে না। কপালে যখন আছে, তখন তুমিও মর জ্বলে পুড়ে, আর আমিও বাদ যাব না, কারণ যাতে কষ্ট পাওয়া যায় পারতপক্ষে এমন কোনো সুযোগ এ পর্য্যন্ত আমি ছাড়িনি, এখনও যে ছাড়্‌ব, তার কোনো লক্ষণ দেখ্‌ছি না।"

এমন সময় সিঁড়িতে উদ্দাম পদধ্বনি তাহাদের দুজনকেই সচকিত করিয়া তুলিল। ক্ষণিকা চোখ মুছিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইল, চিন্ময় অস্থিরভাবে এধার ওধার পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল।

হিরণ্ময়, মেনকা আর লালু হুড়মুড় করিয়া ছাতের উপর আসিয়া পড়িল। একটা বাঁধনহারা ঘুড়ি আকাশের গায়ে অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য মহা কোলাহল লাগিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসীতা দেবী।

সিন্ধবাদ

১

সাত সাগরের পারের পাহাড়,
সেথা আছে কোন্ গুহা,
মুখ হ'তে যার উঠিছে সতত
জ্বালাকুণ্ডের ধুঁয়া।
সেথায় কোথায় তপ্তশিলায়
ফিরে শত ফণী গর্জ্জ লীলায়,
জ্বলিছে তাদের মাথায় মাণিক—
কে যাবে আনিতে উহা ?
কী দেখাও ভয় ?—হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয় মনে
চলিছে সিন্ধবাদ।

২

সাত সাগরের পারের সে দ্বীপ,
সেথা সে গহন বন,
শাখায় শাখায় কণ্টক যার,—
বিষ-লতা বিভীষণ।
সেথায় কোথায় পাতার পিছনে
লুকিয়ে ফুলটি ফুটেছে বিজনে,
সে ফুল আহরে কে আছে সাহসী,
কে যাবে, কোথা সে জন ?
কী দেখাও ভয় ?—হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয় মনে
চলিছে সিন্ধবাদ।

৩

সাত সাগরের পারের সে দেশ,
সেথা অচলায়তন,
দ্বারে দ্বারে যার ফিরিছে শাস্ত্রী
অসংখ্য অগণন।
সেথায় কোথায় আঁধার কোঠায়
বন্ধ ঝাঁপিতে আঁটা কৌটায়
সাত পুরুষের লক্ষ্মীর কড়ি,—
কে আনে করি হরণ ?
কী দেখাও ভয় ?—হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয় মনে
চলিছে সিন্ধবাদ !

৪

সাত সাগরের পারের যাত্রা,
সেও যেতে শত বাধা,
পিতার বিত্ত, জননীর কোল,
বধূর বাহুর বাঁধা।
প্রবল ঝঞ্ঝা, মগ্ন পাহাড়,
ভীম হিম-শিলা,—আরো কত আর !
সে বাধা ঠেলিয়া কে অকুতোভয়
কে চাহে তুফানে মাতা ?
কী দেখাও ভয় ?—হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয় মনে
চলিছে সিন্ধবাদ !

সিন্ধু-সরণে নির্ভয় মনে চলিছে সিন্ধবাদ,—
ভাগ্যে তাহার শাস্ত্র তাহারে করে না শস্ত্র-পাত !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।



আশ্চর্য্য অন্ধ কালা মেয়ে

আমেরিকার উইসকন্‌সিন ষ্টেটের জানেস্‌ভিল্‌ শহরের অন্ধ-স্কুলে একটি অতি আশ্চর্য্য মেধাবিনী ও অসামান্যশক্তিশালিনী ছাত্রী আছে, তার নাম উইলেট্টা হাগিন্‌স্‌। উইলেট্টা জন্মাবধিই অন্ধ বা কালা নয়; যতদিন তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ছিল ততদিন সে ছিল বোকাটে মেদামারা, বিষণ্ণ আর যেই ক্রমে ক্রমে তার কানের সঙ্গে বিশ্বের গানের যোগ বন্ধ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল আর চোখের ওপর কালো পর্দ্দা নেমে এসে তার কাছে বিশ্বকে বিলুপ্ত করে' দিলে, অমনি তার স্বভাবেরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেল—একবৎসরেই সে হয়ে উঠ্‌ল তীক্ষ্ণধী, তৎপর, পাঠপটু আর অনিবার্য্য আনন্দিত ও প্রফুল্ল। দুই প্রধান ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-বঞ্চিত হয়ে সে যেন নূতন ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ করেছে আর তার জীবন স্ফূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। উইলেট্টার এখন বয়স ষোল বৎসর। সে একেবারে অন্ধ আর বদ্ধ কালা। তবু সে কোনো যন্ত্র বিনাও শ্রবণক্ষম লোকের সমানই শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌তে পারে আর সে চক্ষুষ্মান লোকের মতন বস্তুর রং পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারে, অচেনা পথে হোঁচট না খেয়ে চল্‌তে পারে ও তার চেনা লোকদের কয়েক ফুট দূর থেকেই চিন্‌তে পারে। এই কথা অসম্ভব বলে' মনে হলেও এ খাঁটি সত্য।

একটি মহিলা উইলেট্টার শক্তি পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে তার স্কুলে গিয়েছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ হুপার সাহেব একটি মুখচোরা লাজুক মেয়েকে নিয়ে এলেন—সেই উইলেট্টা। উইলেট্টা হুপারের মাথায় হাত রেখে দাঁড়াল। হুপার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—উইলেট্টা, তুমি কি বল্‌তে পারো এই মহিলার ঘাগ্‌রার রং কি?

বদ্ধকালা উইলেট্টা হুপারের মাথায় রাখা হাত দিয়ে প্রশ্ন শুন্‌তে পেলে ও বুঝ্‌তে পার্‌লে, সে অম্‌নি সেই মহিলার চেয়ারের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ঘাগ্‌রার ধার তুলে শুঁকে বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—ঘাগ্‌রায় নীল কালো আর শাদা রং আছে।

আশ্চর্য্য মেয়ে! শুঁকে সে ঠিক ঠিক রং ব'লে দিতে পারে।

হুপার মেয়েটির হাতে একটা পাতা দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আচ্ছা এটার কি রং?

উইলেট্টা পাতার ওপর আঙুল বুলিয়েই বল্‌লে—ও! এ ত সবুজ।

হুপার আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কেবলই কি সবুজ আছে?

উইলেট্টার দুই গাল রাঙা হয়ে উঠ্‌ল—যেন মস্ত একটা ভুল করে' ফেলেছে। সে তৎক্ষণাৎ পাতাটা নাকের কাছে তুলে বল্‌লে—না, কেবল সবুজ নয়, কিনারায় কালোর আঁজি আছে।

পাতাটার কিনারায় যে কালোর আঁজি ছিল তা এত সূক্ষ্ম যে চোখওলা লোকেও বিশেষ লক্ষ্য না কর্‌লে দেখ্‌তে পায় না; কিন্তু এই অন্ধ মেয়ে শুঁকে তা টের পেলে।

মহিলাটি উইলেট্টাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি কিরকম খেলা খেল্‌তে ভালোবাস?

উইলেট্টা হেসে বল্‌লে—বাইরে ছুটাছুটি খেল্‌তে।

—ছুটাছুটি! গাছপালায় ধাক্কা খাও না?

উইলেট্টা হেসে বল্‌লে—ধাক্কা খাব কেন—আমি যে তাদের গন্ধ পাই।

উইলেট্টা এই গন্ধ শুঁকেই তার চেনা লোকদের কাছে আসা ধর্‌তে পারে। সে বলে যে ঘরের চেয়ে বাইরে খোলা জায়গায় গন্ধ সহজে ধরা পড়ে।

একটা বিড়াল ঘরে এল। মহিলাটি উইলেট্টার হাত নিয়ে নিজের মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ঘরে আর কে . . . . .

প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উইলেট্টা হেসে উঠে বল্‌লে—বুড়ো বিড়ালটা এসেছে।

সকলে কথাবার্ত্তায় আর বিস্ময়ে মগ্ন আছেন, উইলেট্টা বলে উঠ্‌ল—বিড়ালটা চলে গেল।



কালা অন্ধ মেয়ে।

বাঁশের চোঙের ভিতর দিয়া একটি লোক কথা কহিতেছে; মেয়েটির হাতে কথাগুলি আসিয়া বাজিতেছে ও শব্দস্পর্শের দ্বারা মেয়েটি তাহা বুঝিতেছে। মেয়েটি যে পোষাক পরিয়া আছে তাহা তার নিজের হাতে তৈরী।

বিড়ালের যাওয়া চোখকানওলা লোকের কেউ টের পাবার আগেই অন্ধকালা মেয়েটির কাছে ধরা পড়ে' গেল। সবাই ত অবাক! উইলেট্টা ঘাণ দ্বারা যেমন রং চিন্‌তে পারে, তেমনি বস্তু চিন্‌তেও সে কখনো ভুল করে না।

উইলেট্টার জন্ম ১৯০৫ সালে। দশ বছর বয়সে ১৯১৫ সালে সে

স্কুলে লেখাপড়া করতে ভর্ত্তি হয়। তখন সেই মেদামারা বিষণ্ণ মেয়েটির দৃষ্টি আর শ্রবণশক্তির দোষ ধরা পড়ে।

নানাবিধ চিকিৎসাতেও তার সেই দুই প্রধান ইন্দ্রিয় স্ব স্ব শক্তি ফিরে পেলে না, বরং দিন দিন খারাপই হতে লাগ্‌ল। তখন একেবারে কালা ও অন্ধ হয়ে যাবার আগে তাকে যথাসম্ভব চট্‌পট যত বেশী সম্ভব বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতে লাগ্‌ল। প্রথমটা তার শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও যেন বেশী ভোঁতা হয়ে পড়্‌ছিল, কেবল সে সেলাই কর্‌তে দক্ষতা লাভ করেছিল। এখন সে নিজের পোষাক নিজেই কেটে ছেঁটে সেলাই করে' পরে। ..১৯ সালে সে একেবারে কালা হয়ে গেল; এক বছর পরে অন্ধও হয়ে পড়্‌ল। তখন তাকে অন্ধকালাদের স্কুলে দেওয়া হল; সেখানে হেলেন কেলার প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে তাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ হল। হেলেন কেলার আমেরিকার এক অন্ধ মেধাবিনী মেয়ে; তিনি লোকের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে বুঝতে পারেন সে কি কথা কইছে। উইলেট্টা এই পদ্ধতিতে শিক্ষা নিতে অস্বীকার কর্‌লে। লোকের ঠোঁটে হাত দিতে তার ঘেন্না



কালা অন্ধ মেয়ে।
মেয়েটি লোকটির মাথায় হাত দিয়া অনুভবের দ্বারা লোকটির কথা বুঝিতেছে। মেয়েটি যে পোষাক পরিয়া আছে তাহা তার নিজের তৈরী।

করে, হাতে থুথু লাগ্‌বার ভয়ে গা শিরশির করে। তখন উইলেট্টা বক্তার কণ্ঠে বা মাথায় হাত রেখে তার কথা ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল; আর এক হপ্তার মধ্যেই সে কথকের কথা ধর্‌তে শিখ্‌ল। এই নূতন ক্ষমতা অর্জ্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই উইলেট্টার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হতে লাগ্‌ল—বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে এল আনন্দ, জড়তা ঘুচে হল দীপ্তি। হেলেন কেলার যেমন অন্ধশিক্ষার নূতন পথ দেখিয়ে যশস্বিনী ও জগদ্‌বিখ্যাতা হয়েছেন, উইলেট্টাও তেমনি বিজ্ঞানের একটা রুদ্ধ কপাট খুলে দিয়েছে।

উইলেট্টার ব্যাপার থেকে এই প্রমাণ হয়েছে যে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি কিছু পরিমাণে পরস্পরের কর্ম্মক্ষম; চেষ্টা কর্‌লে ইন্দ্রিয়শক্তি বর্দ্ধিত করা যায়; ঘ্রাণ ও স্পর্শ দ্বারা অপর সকল ইন্দ্রিয়ের অভাব অনেকখানি পূরণ করা যায়; মানবজীবন তখনই সার্থক হয় যখন অপরের সঙ্গে সংযোগ অবাধ হয়। অতএব অঙ্গহীন শক্তিহীন বলে' কোনো ছেলেমেয়েকেই অবহেলা করা উচিত নয়; তার জ্ঞানের এক দ্বার রুদ্ধ থাক্‌লে অন্য দ্বার দিয়ে তাকে জগতের সঙ্গে যোগযুক্ত কর্‌তে পারলেই তার জীবন সার্থক সফল মূল্যবান হয়ে উঠ্‌বে।

*

স্বাধীনতালাভে নারীর সাহায্য

কোনো দেশ পরাধীন হলে তাকে স্বাধীন কর্‌বার জন্যে দেশবাসীদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই দেশের বাসিন্দা। নারীর কাছ থেকে সাহায্য না পেলে পুরুষের চেষ্টা একপেশে পঙ্গু হয়। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ প্রধানতঃ হলেও, রাষ্ট্রে সমাজে নারীর সাহায্য ও সমর্থন না পেলে পুরুষের চলে না, তার চেষ্টা সফল হতে দেরী লাগে। অল্পদিনের মধ্যে ইটালী অষ্ট্রীয়ার অধীনতা থেকে, গ্রীস তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাজ্য হয়েছে; ফ্রান্স রাজতন্ত্রের অধীনতা থেকে, আমেরিকা ইংরেজের অধীনতা থেকে, চীন মাঞ্চু রাজার অধীনতা থেকে, রুশিয়া রাজার অধীনতা থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে, স্ব-তন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পেরেছে। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারটি দেশ স্ব-তন্ত্র হবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে—

(১) আয়ারল্যাণ্ড,—স্ব-তন্ত্র হব হব হয়েছে, (২) ঈজিপ্ট,—তার স্বাধীনতা ইংলণ্ড স্বীকার করেছে, (৩) ভারতবর্ষ,—সবে চেষ্টা সুরু হয়েছে মাত্র, আর (৪) ফিলিপাইন দ্বীপ,—আমেরিকা তাকে স্বাধীনতা দেবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে ও তদনুসারে অনেক অধিকার ক্রমশঃ ছেড়ে দিয়েছে ও দিচ্ছে। ফিলিপিনো পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা কর্‌তে লেগে গেছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রথমে স্পেনের অধীন হয়, ৩০০ বৎসর পরে আমেরিকার অধীনে আসে। স্পেনের অধীন থাকার সময়েই ডাক্তার জোজে রিজাল স্বদেশকে পরকবলমুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে বিদেশীর হাতে প্রাণত্যাগ করেন স্বদেশকে আত্মত্যাগের মহৎদৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়ে। *

রিজালের পরামর্শদাতা ছিলেন মাবিনি।

১৮৯৮-১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ফিলিপাইন দ্বীপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার অধিনায়ক ছিলেন এমিলিও আগুই-নাল্‌দো।

এইসব নামজাদা পুরুষদের প্রাণান্তকর চেষ্টাকে বলদান কর্‌বার জন্যে সেদেশের নারীরা আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠেছেন, দেশসেবার কাজের ভার তাঁরা আগ্রহে স্বীকার কর্‌ছেন। এইসব স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষিণী নারীদের যিনি নেত্রী, তাঁর মতে পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ার ফলেই তাঁরা পুরুষের সহধর্ম্মী সমকর্ম্মী হয়ে উঠ্‌তে পেরেছেন। এতে নারীর জড়তা ও সঙ্কোচ দূর হয়েছে, তারা এখন অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশসেবার সকল কাজে অগ্রসর হতে সাহস কর্‌ছে; রেলষ্টেশনে আপিসে হাস্‌পাতালে আর বিদেশিনী মেয়েদের প্রাধান্য নেই। সমাজে মেয়েদের স্থান ও অবস্থা দেখে যদি জাতির সভ্যতার উন্নতি নির্ণীত হয়, তবে বল্‌তে হবে যে ফিলিপিনো জাত সভ্যতায় অগ্রসর হয়ে চলেছে শীঘ্রই সভ্যতম জাতিদের সমকক্ষ হতে পার্‌বে।



ফিলিপিনো মহিলা—স্বদেশী পোষাকে।

ফিলিপাইন প্রাচ্যদেশ, বহির্ভারতেরই এক অঙ্গ। যব (জাভা), সমুদ্রিকা (সুমাত্রা), বরুণিকা (বোর্ণিয়ো), শ্রীবিলাস (সেলিবিস) প্রভৃতি দ্বীপ যখন ভারতবাসীর উপনিবেশ ছিল, তখন ফিলিপাইনও ভারতবাসীর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রাচ্য ও ভারতাংশ ফিলিপাইন যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, আশা করা যায় স্বয়ং বৃদ্ধ ভারতও সেইরূপ নবোদ্যমে অগ্রসর হবে এবং তার জয়যাত্রায় তার কন্যারা বিজয়শঙ্খ বাজিয়ে বাজিয়ে ভারতপুত্রদের কল্যাণের পথে চালিত করবেন। চারু।

—

সাহিত্যে মহিলার কৃতিত্ব

"Femmes" ও "Vie Heureuse" নামে দুখানা ফরাসী পত্রিকা প্রতি বছরই কথাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী গ্রন্থকারকে একটি পুরস্কার দেন। এবার অর্থাৎ ১৯২০-১৯২১ সালে Miss Constance Holmesএর "Splendid Fairing" উপন্যাসখানা পুরুষ ও মহিলা লেখকলেখিকাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে। গত বছর Miss Cicely Hamiltonএর "William and Englishman" নামক উপন্যাসখানা এই পুরস্কার পাইয়াছে। এ দুবছর আগে, কোন মহিলাই এ সম্মানার্হ পুরস্কার পান নাই।

*

সুন্দরী কে ?

সুন্দরী কে, তাহা বলা সহজ ব্যাপার নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক সৌন্দর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত! এখানে আমরা পৃথিবীর কতক কতক দেশের সুন্দরীদের পরিচয় দিলাম :—

১। চীনের সুন্দরীগণ ক্ষুদ্র ও গোল চক্ষু ভালবাসেন। ভ্রূ তাঁহাদের নিকট কদাকার চিহ্ন। তাই সর্ব্বদাই তাঁহারা ভ্রূর চুল হস্ত দ্বারা উৎপাটিত করেন। ছোট পা তাহাদের নিকট পরম সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। চীনমহিলারা শিশুকন্যার পা কাঠের জুতা দিয়া এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখেন যে, উহাদের ভবিষ্যতে পা আর বড় হইতে পারে না, পা-এর আঙ্গুলগুলি বক্র হইয়া পায়ের তলার সাথে থাকে। চীনমহিলারা চিরকালের তরে পঙ্গু হইয়া থাকেন। তাঁহারা হাতে খুব বড় নখ রাখেন; বাঁশের নল দিয়া সেই নখ ঢাকিয়া রাখেন, নতুবা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে।

২। ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহ আমেরিকার মহিলাদের সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। ক্ষীণা ও দীর্ঘাঙ্গিনী হইবার জন্য মার্কিন রমণীরা কোনও প্রকার কষ্টই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। শরীরের স্থূলতা দূর করিবার জন্য তাঁহারা অনশন ব্রত অবলম্বন করিতেও পশ্চাদ্‌পদ নহেন।

৩। আরব দেশের মহিলারা অঙ্গুল রক্তবর্ণে, দাঁত কৃষ্ণবর্ণে, ও ওষ্ঠ নীলবর্ণে রঞ্জিত করেন। আরবেরা এইরূপ রমণীকেই, পরমাসুন্দরী বলিয়া বর্ণনা করেন।

৪। পারস্য দেশের সুন্দরীরা চোখের চারিদিক কৃষ্ণ রেখায় এবং কান নানা মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত করেন। পারস্যবাসীরা এই মূর্ত্তি দেখিয়াই মুগ্ধ হন।

৫। জাপানী মহিলারা তাঁহাদের দাঁত স্বর্ণ বর্ণে, হটেনটট্ রমণীরা সর্ব্বাঙ্গ রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করেন।

৬। গ্রীনল্যাণ্ডের রমণীরা মুখমণ্ডলে নীল ও পীতবর্ণে আলিপনা অঙ্কিত করেন।

৭। নিউজিল্যাণ্ডের মহিলারা তাঁহাদের শিশুকন্যার বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলেন; তাঁহাদের নিকট ইহাই পরমসৌন্দর্য্যের চিহ্ন। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতের দাগ, ইঁহাদের আর-একটি সৌন্দর্য্যের চিহ্ন; এইজন্য শামুক দিয়া শরীর ক্ষত বিক্ষত করেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই ক্ষত শুষ্ক হইতে দেন না; এই ক্ষতচিহ্ন বহুদিন স্থায়ী থাকিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

৮। সুমাত্রা দ্বীপের রমণীরা তাঁহাদের শিশুকন্যার মস্তক সর্ব্বদা হাত দিয়া চাপিয়া দিয়া থাকেন; ইহাতে মাথা চেপ্টা হইয়া যায়। চেপ্টা মাথা তাঁহাদের নিকট পরমসুন্দর।

৯। আফ্রিকার সুন্দরীদের কাম্য ক্ষুদ্র চক্ষু, পুরু ঠোঁট, বড় এবং চেপ্টা নাক, ঘোর কৃষ্ণ ত্বক।

১০। নিউগিনির সুন্দরী তিনি, যিনি নাক ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কাঠখণ্ড প্রবিষ্ট করিয়া দেন।

১১। তিব্বত-রমণীদের অঙ্গরাগ এক অদ্ভুত ব্যাপার। পুরুষকে মুগ্ধ করিবার ইচ্ছায় তাঁরা যখন বাহিরে আসেন তখন মুখে কালি মাখিয়া থাকেন!

১২। আমাদের দেশে সুন্দরীদের সীমন্তে সিন্দুর ও ললাটে সিন্দুর ও খয়েরের টিপ শোভা পায়। চোখে তাঁরা অঞ্জন বা কাজল দিতেন। চন্দন, কুঙ্কুম ও অলকাতিলকারও ব্যবহার ছিল। দাঁতে মিশি দেওয়ার ও উল্কি কাটার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

এলিজাবেথ ফ্রাই

উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রেটব্রিটেনে যে-সকল কারাগার ছিল, তাহাতে নিরপরাধ ও দোষী-সাব্যস্ত লোক একত্র বাস করিত। কারাগারে নানাপ্রকার ব্যাধি ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কারাগারগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার কোন চেষ্টা হইত না। ইহারই ফলে শত শত কারারুদ্ধ ব্যক্তি কালের করালগ্রাসে পতিত হইত। কাহারও পাদদেশে ও গলদেশে লৌহশলাকা স্থাপন করিয়া অতীব নির্মমভাবে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করা হইত। অধিকাংশ কারাগারই মূষিকের আবাসভূমি ছিল; অনেক সময় তাহারা নিদ্রিত কারাবাসীগণের বদনমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত। কোন কোন জেলে কারাকক্ষগুলি মৃত্তিকার অনেক নীচে অবস্থিত ছিল, তাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ ছিল না। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত আর্দ্র কক্ষমধ্যে ভূমির উপর কারাবাসীগণকে শয়ন করিতে হইত। কোন কোন জেলে কয়েদিগণকে পরিমিত আহার পর্য্যন্ত প্রদান করা হইত না; অর্দ্ধাশনে বা অনশনে তাহারা অতিকষ্টে দিনপাত করিত। জেলখানার তত্ত্বাবধায়কগণ প্রকাশ্যভাবে কয়েদিগণের নিকট মদ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা অনুভব করিত না।

জেলখানায় কয়েদিদিগকে অপরাধের তারতম্য-অনুসারে অথবা বয়সের অল্পাধিক্য-অনুসারে বিভিন্ন স্থানে রাখা হইত না। শান্তমতি কোমলবয়স্ক বালকদিগকে অনেক সময় ঘোর দুর্নীতিপরায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেষপালের ন্যায় একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এইরূপে বালক-চরিত্রে সংস্কারের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইত না, বরং তাহারা দিন দিন পাপের পথে অগ্রসর হইত।

যখন ইংলণ্ডের কারাগার সমূহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন এলিজাবেথ একদিন এক কারাগারের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শীতকাল; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দারুণ শীতের কন্‌কনে হাওয়া গায়ে কাঁটা ফুটাইতেছে। এই সময়ে কারাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ একদল বন্দী পাথর ভাঙ্গিতেছে। এই ঘোর শীতেও তাহাদের গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাদের মুখ বিবর্ণ, দেহ অস্থিকঙ্কালসার, মৃত্যুবিভীষিকা যেন তাহাদের বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। এই দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ-দুর্গতি-মোচনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভগ্নহৃদয় লইয়া তিনি বিষণ্ণবদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি কারারুদ্ধ হস্তপদবদ্ধ বন্দীগণের দুঃখমোচনচিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিল। তিনি সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বন করিয়া ধূসরবর্ণের বসন, শ্বেতবর্ণের উত্তরীয় (kerchief) ও শুভ্র অবগুণ্ঠন প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীর উচিত চিহ্নসমূহ ধারণ করিলেন। এবং স্বকীয় স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দীনদরিদ্রই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইল, তাহাদের দুঃখ-দুর্গতিবিমোচনই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল।

এলিজাবেথ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ফ্রাই নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। কিন্তু বিবাহবন্ধন তাঁহার পক্ষে মোহের বন্ধন হইল না। তিনি দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, রোগার্ত্ত ও কৃপার্হ ব্যক্তিগণের সেবাকার্য্যে দ্বিগুণতর উৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইলেন।

এলিজাবেথ ফ্রাই দেশের যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। তিনি দেশের বিদ্যালয় প্রভৃতির সংস্কারসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন; শ্রমজীবীদিগের আবাসগৃহের উন্নতিবিধানে যত্নপর ছিলেন; দেশে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন; খনির কার্য্যে ও কারখানার নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের কষ্টলাঘব-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য যেখানে যে আয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই তিনি সেই আয়োজনের সফলতালাভে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা একনিষ্ঠা সেবিকা জগতে অতি বিরল। শীতার্ত্তকে শীতবস্ত্র, রোগগ্রস্তকে ঔষধ, নিরন্নকে অন্ন প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। অজ্ঞানতিমিরাবৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিবেশিনীগণের চরিত্রের উন্নতি-বিধানের জন্য এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য, তিনি তাহাদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য কারাসংস্কার। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইংলণ্ডের জেল-সকল



এলিজাবেথ ফ্রাই।

পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। একবার তিনি লণ্ডন-সহরে নিউগেট (Newgate) জেলখানায় যাইয়া উপস্থিত হন। তথাকার কয়েদিগণ এত দুর্দ্দান্ত ছিল যে, সেই জেলের তত্ত্বাবধায়ক তাঁহাকে কারাবাসীগণের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে কারাগারের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। স্বভাবকোমল স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত জেলখানার দুর্নীতি-দোষযুক্ত বায়ুতে বাস করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘোর দুর্দ্দান্ত ও দুর্বৃত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে। কারাবাসী স্ত্রীলোকগণের অসংযত ব্যবহার, অশ্লীল ভাষা, অশিষ্ট আচরণ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এলিজাবেথের সৌম্যমূর্ত্তি ও আড়ম্বরহীন বেশভূষা সেই দুর্বৃত্ত কারাবাসিনীদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নিঃশব্দে এলিজাবেথের উপদেশবাণী

ও স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। এমন কি কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি সময় সময় ধীরে ধীরে যাইয়া কারাবাসিনীদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া সরলপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সন্তানদের রুগ্নশয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে তিনি তাহাদের মধ্যে সুনীতি প্রচার করিয়া তাহাদের নিকট দুর্নীতির পথ রুদ্ধ করিলেন।

কারাবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা তিনি তাহাদের সন্তানদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতেন। তিনি একটি সমিতি গঠন করিলেন। নিউগেট-কারাগারে স্ত্রীকয়েদীগণের চরিত্র সংশোধন ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। তাঁহারা কারাবাসিনীদিগের বস্ত্রাভাব দূর করিতে এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে এলিজাবেথের ঐকান্তিক যত্নে ও সেবায় অচিরেই কারাগারের ম্লান দৃশ্য অপসারিত হইল। বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা, অশান্তির স্থানে শান্তি, দুর্নীতির স্থানে সুনীতি, প্রভৃতি ধীরে ধীরে তাহাদের স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া কারাগারের নারকী বিভীষিকা প্রশমিত করিতে লাগিল। এলিজাবেথের খ্যাতি ও যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; তাঁহার দেশবাসী নানাভাবে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। কারা-সংস্কার বিষয়ে পার্লিয়ামেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং তদন্ত কমিটি নিয়োজিত হইল।

তারপর, ইংলণ্ডের বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুর দণ্ডবিধি তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। তৎকালে ইংলণ্ডে অতিকঠোর আইন প্রচলিত ছিল। সামান্য অপরাধের জন্য পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। নরহত্যার অপরাধে যে শাস্তি প্রদত্ত হইত, সামান্য জালের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও তদ্রূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইত। একবার একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক তাহার কম্পিতকলেবর শিশুর শীত-নিবারণের জন্য একখণ্ড শীতবস্ত্র অপহরণ করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এমন কি সামান্য একটি বৃক্ষ কর্ত্তনের অপরাধেও বিচারকগণ ফাঁসির হুকুম দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। হুজুকের মাথায় তৃণস্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়া অনেক উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রাণ হারাইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ মৃতপ্রায় ছাগশিশুকে গৃহে লইয়া গিয়া অনেক ক্ষুধাতুর ব্যক্তি চৌর্য্যাভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কাষ্ঠদণ্ডে বিলম্বিত হইয়াছে।

এলিজাবেথ বহুবার শাসকবর্গের সমক্ষে এই-সকল অসভ্যজনোচিত আইন সংস্কারের জন্য পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। দেশবাসীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল, জনসমূহ প্রসিদ্ধ নেতৃবর্গের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অবশেষে এলিজাবেথের সাধনা সিদ্ধ হইল; ইংলণ্ডে হত্যাপরাধ ভিন্ন অন্যান্য অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান রহিত হইল।

ইহাতেই এলিজাবেথের কর্ম্মের অবসান হয় নাই। তিনি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের হাঁসপাতাল ও পাগলাগারদ-সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই-সকল স্থানে তিনি যে সকল ত্রুটি দেখিতে পাইলেন, নির্ভয়ে সে সকল কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে লাগিলেন।

কারাসংস্কার ব্যাপারে তিনি যেমন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তথাকার নৃপতিবৃন্দে এবং রাজপুরুষগণের নিকট নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তিনি তেমনই স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি কখনও উচিত কথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ফ্রান্সের রাজাকে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন কারাগার নির্ম্মাণ করেন, তখন এই কথা মনে রাখিয়া নির্ম্মাণ করিবেন যে, সেই কারাগৃহে যেন আপনার নিজের সন্তানেরাও অবস্থান করিতে আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে।"

তিনি কয়েদ-খালাসীদের সাহায্যের জন্যও এক সমিতি সংস্থাপন করিয়া তাদের অন্ন বস্ত্র আশ্রয় ও উপার্জ্জনের উপায় সংগ্রহ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই সমস্ত সাধু চেষ্টা দেশের শহরে শহরে প্রসারিত হইতে হইতে শেষে য়ুরোপের মহাদেশেও ছড়াইয়া পড়ে। তিনি য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান জেলখানা পরিদর্শন করিয়া সেখানকার অবস্থার রিপোর্ট লিখিয়া সেইসব দেশের গভর্ণমেণ্টের কাছে পেশ করিয়া সংস্কার প্রার্থনা করিতে থাকেন। বিদেশের রাজা ও রাষ্ট্রপতিরা তাঁকে বন্ধু উপদেষ্টা বলিয়া মনে করিতেন; সকল দেশের জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রকুশলী তাঁর বন্ধুত্ব পরম গৌরবজনক বিবেচনা করিতেন।

যখন তিনি প্রকাণ্ড মহাদেশে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা ও অন্যায় অবিচার সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছিলেন; অসংখ্য হতভাগ্য নরনারী ও শিশুদের সুখী ও পুণ্যপথিক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখনও তিনি নিজের বৃহৎ পরিবারের দিকে অমনোযোগী হন নাই; তাঁর স্বামী দেউলিয়া হইয়া হঠাৎ দরিদ্র হইয়া পড়িলেও তিনি আপনার সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করিতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। জীবনের শেষ ১৭ বৎসর দারিদ্র্যকষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে হইলেও তিনি স্বামী ও সন্তানদের সেবা ও সমস্ত মহাদেশের অপরাধগ্রস্ত দুঃখী নরনারী ও শিশুদের সেবা অক্লান্তভাবে প্রফুল্ল মনেই করিয়া গিয়াছিলেন এবং নিজের জীবদ্দশাতেই স্বকর্ম্মের সফলতার পুরস্কার আত্মপ্রসাদের বিমল আনন্দ ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাঁর হইয়াছিল। অনেকের মতে ইংলণ্ডের জেলখানা-সংস্কারক জন হাওয়ার্ডের চেয়েও শ্রীমতী এলিজাবেথ ফ্রাই শ্রেষ্ঠ সেবিকা ও সংস্কর্ত্রী। ১৮৪৫ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়; কিন্তু এই মহীয়সী মহিলার কীর্ত্তি ও নাম আজও জীবিত আছে এবং কয়েদীজীবনের আপেক্ষিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সেই মহিলার মহিমা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর প্রচার করিতে থাকিবে। *

—

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় মহিলা

এবারকার ইংল্যাণ্ডের ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় অনেক মহিলাই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 'ফাইনেল' বা শেষ পরীক্ষায় চারজন, রোমীয় আইনে চারজন, রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ক ইতিহাসে পাঁচজন, ফৌজদারী আইনে দশ জন এবং সম্পত্তি ও দান বিষয়ক আইনে ছয় জন মহিলা সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী আইভী উইলিয়াম্‌স্ রমণীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রথমশ্রেণীর সম্মানের সঙ্গে শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। আরও কয়েকটি রমণী শেষ পরীক্ষায় সম্মানের তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। শ্রীমতী মনিকা মেরী গেইকী কব দ্বিতীয় শ্রেণীর ও শ্রীমতী ইথেল ব্রাইট এস্‌ফোর্ড এবং শ্রীমতী হেলেনা নর্মেণ্টন তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান পাইয়াছেন। যে চারিটি মহিলা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা এখনও ব্যারিষ্টারী করিতে পারিবেন না। নিয়ম আছে তিন বৎসর পড়িতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের তিন বৎসর পড়া এখন হয় নাই, কাজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তাঁহাদের আরও কিছুদিন বসিয়া থাকিতে হইবে, তবে তাঁহারা আদালতে উপস্থিত হইবার হুকুম পাইবেন। যাহা হউক আগামী বৎসরেই তাঁহারা ব্যারিষ্টারী করিবার অধিকারী

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ ১৩২৮ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে গৃহীত।

হইবেন। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াও সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বোধ হয় তাঁহারাই প্রথম এই অধিকারলাভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইতি-মধ্যে সম্রাজ্ঞীকে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্ত সসম্মানে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনিই মহিলাদের সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান পাইলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

—

মুক্তির মহিমা

ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরে যাহারা পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী করে তাহারা বলিতেছে যে, আমেরিকার নারীরা আজকাল খোলা হাওয়ায় নানাপ্রকার খেলায় এবং ব্যায়ামে যোগ দিতেছেন, তাহাতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার নারীদের অপেক্ষা বর্ত্তমান নারীদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১॥ ইঞ্চি বাড়িয়াছে। কেবল তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বুকও বেশী প্রশস্ত হইয়াছে এবং কোমর চওড়া হইয়াছে।

খোলা হাওয়ায় পরিশ্রমে যেমন শরীরের উন্নতি হয়, তেমনি ঘরের বাহিরের কাজে নারীদের সমান অধিকার থাকিলে তাঁহাদের মনও প্রশস্ত হইবে। অবশ্য কেহ যেন মনে করিবেন না যে আমেরিকার সমস্ত নারীই আজকাল খোলা হাওয়ার খেলা এবং ব্যায়ামে যোগ দিতেছেন। আমাদের দেশের মত এখনও অনেক নারী এমন আছেন যাঁহারা নিজেদের ঘরের সামান্ত সামান্ত কাজ লইয়াই সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন। তাঁহাদের শরীর ভাল করিতে হইলে বাহিরে আসিতে হইবে। মন বড় করিতে হইলে দেশ এবং দশের কাজে যোগ দিতে হইবে।

ক্যানাডার নারী প্রাদেশিক মন্ত্রী

মিসেস্ মেরি আইরেন্ পারল্‌বি, ক্যানাডার আলবার্টা প্রদেশের এক কৃষকের পত্নী। তিনি ঐ প্রদেশের প্রাদেশিক মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ক্যানাডার দ্বিতীয় নারী মন্ত্রী। তিনি মন্ত্রী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপর বিশেষ কোন কাজের ভার নাই।

—

ইংলণ্ডে নারী-দায়াদ

International Women Suffrage News Service প্রকাশ করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের হাউস্ অব্ লর্ড্‌সে সম্পত্তি-বিভাগ বিষয়ে একটি নূতন আইন, তৃতীয়বার উপস্থিত হওয়ার পর, পাশ হইয়া গিয়াছে। এই আইনে [illegible] যে স্বামী যদি কোন উইল না করিয়া মরে, তবে স্ত্রী স্বামীর সমস্ত বিষয়আশয়ের মালিক হইবেন। কোন বিশেষ সম্পত্তির মালিক কোন পুত্র যদি মারা যায় তবে সেই সম্পত্তিতে মৃত-পুত্রের পিতা-মাতার সমান অধিকার থাকিবে। পূর্ব্বে 'ল অব্ প্রাইমোজেনিচার' অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সমস্ত জমিজমা এবং ঘরবাড়ীর মালিক হইত। এখন এই নূতন আইনে তাহা রদ হইল। এবার পিতার সম্পত্তিতে পুত্রকন্তার সমান অধিকার থাকিবে। আমাদের দেশেও নারীর দায়াধিকারের রীতির পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

হেমন্ত।

—

মারি ষ্টোপ্‌স্

অধ্যাপক কুরির মৃত্যুর পর যখন শ্রীমতী কুরি পারী সর্‌বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন তখন চতুর্দ্দিক হইতে ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল। খুব উপযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের সমকক্ষ হইলেও নারীকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে পুরুষ সর্ব্বদাই নারাজ। এই সেইদিন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর অধিকার লইয়া যে বিতণ্ডা হইয়া গেল এবং নারীকে অনেক অধিকার হইতে যেরূপে বঞ্চিত রাখা হইল তাহা হইতে পুরুষের নারীকে



ডক্টর মারি ষ্টোপ্‌স্।

দমাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি সুস্পষ্টরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নারীকে স্বাধিকার দিতে পুরুষের যতই আপত্তি থাকুক না কেন, মাঝে মাঝে এমন এক-একটি ক্ষমতাশালিনী নারী জন্মগ্রহণ করেন যাঁহাদের নিকট পুরুষকে যুগে যুগে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। মারি ষ্টোপ্‌স্ এমনই একটি মহিলারত্ন। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে ম্যান্‌চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগের অধ্যাপকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বর্ত্তমানকালে ভূপ্রোথিত, অঙ্গারীভূত ও প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে (Palaeo-botany) ইঁহার ন্যায় পাণ্ডিত্য কাহারও নাই। মারি ষ্টোপ্‌সের মাতা ও পিতা উভয়েই সুধীসমাজে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

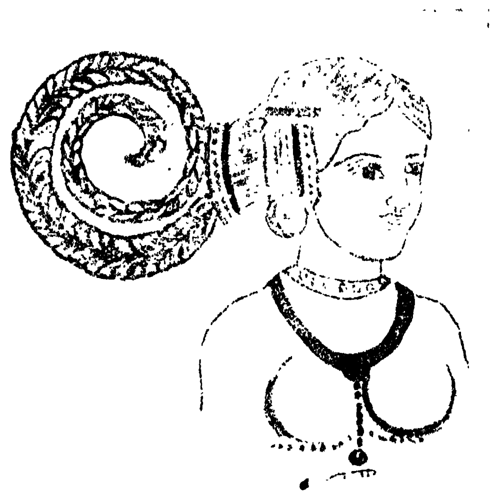
পিতা অধ্যাপক হেন্‌রি ষ্টোপ্‌স্ নৃতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া যশস্বী হন এবং মাতা সেক্‌স্‌পিয়ারের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিতা ছিলেন। ষ্টোপ্‌স্ পিতামাতার যত্নে অতি অল্পদিনেই নানাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন ও পিতৃসাহচর্য্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দক্ষতা লাভ করিলেন। ইনি অতি যোগ্যতার সহিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। লণ্ডন হইতে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি লাভ করিয়াও ইহাঁর জ্ঞানপিপাসা মিটিল না। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূতত্ত্বে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য ইনি জার্ম্মানী গমন করিয়া প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক র‍্যাডেল কফার ও গোয়েবেলের শিষ্যা হন এবং ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি অর্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিদেশে এই মহিলাকে এরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া ম্যান্‌চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাঁকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগে আচার্য্যের পদে বরণ করেন। জাপানের কয়লার খনি-সমূহ অঙ্গারীভূত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গবেষণার বিশেষ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যা ষ্টোপ্‌স্ জাপান যাত্রা করেন। তোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইহাঁকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেন। প্রায় দেড় বৎসরকাল জাপানের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক নূতন গবেষণা দ্বারা প্রস্তরীভূত ও অঙ্গারীভূত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। ইহাঁর গবেষণার ফলগুলিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করেন। প্রাচীন উদ্ভিদ, প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক পুস্তক এবং ভূতত্ত্বালোচনী সভা (Royal Geological Society), উদ্ভিদ্‌বিদ্যালোচনী সভা (Royal Botanical Society) প্রভৃতির পত্রিকাতে নানা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখিয়া ইনি এরূপ যশস্বিনী হন যে লিনিয়ান সোসাইটি, জিওলজিকাল সোসাইটি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সভা ইহাঁকে ফেলো নির্ব্বাচন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন।

অবকাশ সময়ে নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য ইনি গল্প উপন্যাস নাটক প্রভৃতি রচনায় নিয়োজিত থাকেন। সেগুলিও সাহিত্যরসিকের নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। জাপানের প্রাচীন সাহিত্য ও নাটক লইয়াও ষ্টোপ্‌স্ আলোচনা করিয়াছেন এবং ইংরেজীভাষায় প্রাচীন জাপানী সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধেও ইনি অনেক রচনা করিয়া নিজের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জন সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

খোঁপার ভাষা

জাপানী মেয়েদের খোঁপার বাহার যে কতরকম তা ছবিটি দেখিলেই বুঝা যাইবে। খোঁপার এ বৈচিত্র্য কেবল দেখাইবার জন্য নয়। প্রত্যেক খোঁপার একটি করিয়া অর্থ বা ভাষা আছে। সে ভাষা আমাদের ভাষায় এই—



ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে খোদাই-করা খোঁপা।

(১) ছবিটির উপরের বাঁ দিককার কোণের খোঁপা—বিবাহিত মেয়েদের, যে বয়সের হউক না কেন।

(২) উপরের মাঝের খোঁপা—জাপানী বয়স্কা কুমারীর, নিরাশার সাক্ষী বলিয়া খোঁপার মাথাটিও নুইয়া পড়িয়াছে।

(৩) উপরের ডান দিককার কোণের খোঁপা—অবিবাহিতা বিলাসিনীদের বর ধরিবার ফাঁদ।

(৪) নীচে বাঁ দিককার কোণের খোঁপা—অবিবাহিতা, বিবাহের আশায় আশান্বিতাদের।



জাপানী মহিলাদের বিচিত্র খোঁপা।

(৫) নীচে মাঝখানের খোঁপা—যাঁরা বিবাহিতা কি অবিবাহিতা না জানাইয়া লোককে ধোঁকা খাওয়াইতে চান, তাঁদের।

(৬) নীচে ডানদিককার কোণের খোঁপা—বিবাহে বাগ্‌দত্তাদের।

এই সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের একটি খোঁপার নমুনা দিতেছি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে এই খোঁপা খোদাই করা আছে।

প।

ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি

১

ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি,—
সাঁঝ আকাশের ফাগ-সাগরে
ভাসে শিশু চাঁদ কি!
পাপ্‌ড়ি মেলা গোলাপ ফুলে
কুন্দ-কুঁড়ি কে গাঁথ্‌লে তুলে,
ঊষার শিরে বুলায় কি রে
শুক-তারা তার হাতটি!

২

ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি—
বক্ষে বিশদ মেঘোত্তরী
শরৎ পরভাত কি!
সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদূরে
ছড়াতে 'লাজ' পড়্‌ল উড়ে,
চন্দনেরি বিন্দু পরা
আরক্ত ললাট কি!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।


EL SESTO
DANTESCO



পরিচারিকা (কার্ত্তিক, ১৩২৮)

বৃষ্টিবৈদ্য—শ্রীবীরেশ্বর সেন।

অনেক দেশেই বহুলোকের এরূপ সংস্কার আছে যে কোন কোন লোকের বৃষ্টি করিবার এবং বৃষ্টি নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে। বাঙ্গলাদেশে বৃষ্টি-বৈদ্যদিগকে অর্থাৎ যে সকল লোকের এই ক্ষমতা ছিল তাহাদিগকে "সিরেল" বলিত। বর্ষাকালে কোন কৃষকই কোন সিরেলের সঙ্গে বিবাদ করিত না, কেননা সে তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে সেই কৃষকের ভূমিতে বৃষ্টি হইতে দিত না, আর যখন অপ্রয়োজন তখন বৃষ্টি পাতিত করিয়া তাহার শস্য নষ্ট করিয়া দিত। ইহাও শুনিয়াছি জলপাইগুড়ি দুয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারেরা নিজ নিজ বাগানে বেতন দিয়া সিরেল রাখিতেন। স্কটল্যাণ্ডেও বৃষ্টি-বৈদ্য ছিল। সার্ ওয়াল্টার স্কটের একখানি নভেলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। নভেলখানির নাম ঠিক মনে নাই—বোধ হয় রেড্ গণ্টলেট্। আফ্রিকায় একদল লোক বৃষ্টিবৈদ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহাদিগকে ইংরেজীতে Rain Doctor বলে।

চার্লস্ হাটফিল্ড্ কালিফর্নিয়ার অন্তর্গত লোস এঞ্জেলিস (Los Angeles) নামক স্থানবাসী। ইনি সতেরো বৎসরের মধ্যে বিয়াল্লিশ বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বৃষ্টি করাইয়া পণ জিতিয়াছেন।

—

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা (কার্ত্তিক)

সাহিত্যে বৈচিত্র্য—এম্, আন্সারী।

সাহিত্য জাতীয়জীবনের আলেখ্য। প্রত্যেক জাতিরই একটা দর্শন আছে। কিন্তু দর্শন শুধু পথপ্রদর্শন করে, শুধু প্রণালী নির্দ্দেশ করে, কর্ম্মের প্রেরণা দেয় আর-এক বস্তু—সেটি হইতেছে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের অবস্থাও অনেকদিন হইল সৃষ্টিহীন বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা দর্শনের দিকে বাঙ্গালী চরমে উঠিলেও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া বাঙ্গালী একান্তই পঙ্গু। তাই বাঙ্গালীর সাহিত্যও এত বলিষ্ঠহীন ও ক্ষীণজীবী। এই যে এত বড় একটা মহাযুদ্ধ পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া ঝড়ের ন্যায় বহিয়া গেল, ইহা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেরই সাহিত্যের উপর একটা প্রবল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্যে তাহার কোনও সাড়াই দেখা যায় না। সুখের বিষয় অল্পদিন হইল "শ্রীকান্ত" এবং "চোরকাঁটায়" একটা নূতন ধারার সঞ্চার দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ উৎস কতদূর গড়াইবে তাহা এখনও বলা যায় না। যাহাদিগকে 'পতিত' বলিয়া সমাজ এতকাল দূরে ঠেলিয়াছে, মাজিয়া ঘসিয়া দাঁড় করাইলে তাহাদের ভিতরও যে ঋষি বিবেকানন্দের নির্দ্দেশিত "নর-নারায়ণের" সাড়া মিলিতে পারে এ শিক্ষা—ইউরোপে কাউণ্ট টলষ্টয় কর্ত্তৃক বহুদিন পূর্ব্বে বিঘোষিত হইলেও—বাঙ্গালার পক্ষে অত্যন্ত নূতন। এদেশের চক্ষে কর্ম্মবীরের চেয়ে ভক্ত বীরেরই সম্মান অধিক। প্রেমপীড়িত বৈষ্ণব-যুগের সেই "ধর ধর সখি" ভাব যতদিন বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত না হইতেছে ততদিন বাঙ্গালা-সাহিত্যে কর্ম্ম-পূজার শঙ্খমন্ত্র যে উচ্চারিত হইবে না একথা ধ্রুব সত্য। এতকাল যে সমাজ নারীকে শুধু বিলাস, শুধু সাধনার অন্তরায় বলিয়াই ভাবিত, শুধু ভোগের জন্য, শুধু সেবা-লাভের জন্যই আদর করিত, সেই সমাজ সাহিত্যে আজ নারীকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার দিতে বসিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের এ বৈচিত্র্য অত্যন্ত মূল্যবান জিনিষ।

মুসলমান লিখিত অনেকগুলি উপন্যাসেই হিন্দু-নায়িকার সহিত মুসলমান নায়কের প্রণয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রেমের রাজ্যে জাতিবিচার নাই, এবং সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা একটি বৈচিত্র্যও বটে। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি এক কথা আর প্রতিহিংসা-সাধন আর-এক কথা। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ যেন এই বৈচিত্র্যের অবতারণা না করেন। ফলে বাঙ্গালার সাহিত্য নব নব ধারায় নব নব সৃষ্টিতে রঙ্গীন হইয়া, গোলাপ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, আমরা যে সেই দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি।

—

মানসী ও মর্ম্মবাণী (কার্ত্তিক)

প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

পুরাকালে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণের পদ্ধতি ছিল। পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ নাসালঙ্কার ব্যবহার করিত না। পরবর্ত্তীকালে হয়ত মুসলমানদের আবির্ভাবের পরে নথ, নোলক ও বেসর প্রভৃতি নাসালঙ্কারের প্রচলন হইয়া থাকিবে।

অমরকোষে নিম্নলিখিত তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়—

মস্তকের ভূষণ—মুকুট, কিরীট।

মস্তকের চূড়ামণি—চূড়ামণি, শিরোরত্ন।

হারের মধ্যস্থিত মণি—তরল।

সীঁথি (মস্তকের ভূষণ)—বালপাশ্যা, পারিতথ্যা।

টিপ (ললাটভূষণ)—পত্রপাশ্যা, ললাটিকা।

কানবালা—কর্ণিকা, তালপত্র (কোন কোন দেশে ইহার নাম তরপত); অন্যান্য পুস্তকে কুণ্ডল নামও পাওয়া যায়।

কর্ণের ভূষণ—কুণ্ডল (চণ্ডী নিবেদিত) কর্ণবেষ্টন। আগে ড্যাবোয়া মানিকতলায় ১৩১৮ সালে কর্ণভূষণ দেখিয়াছিলেন।

গ্রীবার অলঙ্কার—গ্রৈবেয়ক, কণ্ঠিকা (কণ্ঠী)।

"কণ্ঠমালা" নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

কণ্ঠমালা—লম্বন, ললন্তিকা।

সোনার মালা—প্রালম্বিকা।

মুক্তার মালা—উরঃসূত্রিকা।

হাতের বালা—বলয়, কটক।

হাতের তাড়—কেয়ূর।

হাতের কঙ্কণ—কঙ্কণ। (বিহারে কঙ্কণই প্রচলিত, বলয় নাই বলিলেই চলে।)

আংটী—অঙ্গুরীয়ক, ঊর্ম্মিকা।

অক্ষরযুক্ত আংটী—অঙ্গুলিমুদ্রা।

স্ত্রী-কটির আভরণ (গোট, চন্দ্রহার)—মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, সারসন

পুরুষের কটির আভরণ—শৃঙ্খল।

মল, পাইজোর (পাদালঙ্কার)—নূপুর, মঞ্জীর প্রভৃতি ও ক্ষুদ্রঘণ্টিকা।
একনরী হার—একাবলী।
সাতাশ-নরী হার—নক্ষত্রমালা।
শত-নরী হার—শতযষ্টিক, দেবচ্ছন্দ।

অর্থশাস্ত্রের কোশ-প্রবেশ্য রত্নপরীক্ষা ২-১১ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত হারের বিবরণ পাই—

১। ইন্দ্রচ্ছন্দ—১০০৮ নরী হার (যষ্টীনামষ্টসহস্রমিন্দ্রচ্ছন্দঃ)।
২। বিজয়চ্ছন্দ—ইন্দ্রচ্ছন্দের অর্দ্ধেক নরী।
৩। অর্দ্ধহার—চতুঃষষ্টি (৬৪) নরী।
৪। রশ্মিকলাপ—৫৪ নরী।
৫। গুচ্ছ—৩২ নরী।
৬। নক্ষত্রমালা—২৭ নরী।
৭। অর্দ্ধগুচ্ছ—২৪ নরী।
৮। মাণবক—২০ নরী।
৯। অর্দ্ধ-মাণবক—১০ নরী।
১০। শুদ্ধহার—যখন সকল ন'রগুলিই একই ধরণের।
১১। ফলকহার—মধ্যদেশে তিনটি ত্রিফলক রত্নযুক্ত অথবা পঞ্চফলক যুক্ত রত্নহার।
১২। একাবলী—একনরী হার।
১৩। যষ্টি—একাবলীতে মধ্যরত্ন থাকিলে।
১৪। রত্নাবলী—নানাবিধ রত্নে খচিত হইলে।
১৫। অপবর্ত্তক—পর্য্যায়ক্রমে স্বর্ণ, মণি ও মুক্তার দ্বারা যে হার গ্রথিত হয়।
১৬। সোপান—মুক্তার হারের মধ্যে স্বর্ণসূত্রযুক্ত হার।
১৭। মণিসোপানক—সোপানে মণি গ্রথিত হইলে তাহাকে মণিসোপানক বলে।

এই হারগুলি মস্তক, গ্রীবা, বক্ষোদেশ, কণ্ঠ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে ব্যবহার্য্য ছিল।

মহাভারতের বনপর্ব্বে দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদে "নিষ্ক"-হারের উল্লেখ আছে। স্বর্ণমুদ্রা গাঁথিয়া যে হার রচিত হয়, তাহারই নাম "নিষ্ক" ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে নাগ হারের উল্লেখ আছে। সকল অলঙ্কারেই মণির ব্যবহার হইত। তখন ভারতের এমন দিন ছিল যে শুধু অলঙ্কারে নয়, প্রাসাদিতেও মণিমাণিক্য সন্নিবেশিত হইত; রামায়ণ-মহাভারতের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃচ্ছকটিকের সময় পর্য্যন্ত গৃহশোভায় এই অতি বাহুল্যের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। বহুবিধ মণিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্খনির্ম্মিত অলঙ্কার অর্থাৎ শাঁখা তখনও প্রচলিত ছিল। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে শঙ্খকে মণির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে শঙ্খকে মুক্তার আকর বলিয়াছিলেন; মহাভারতেও কম্বু (শঙ্খ) ধারণের উল্লেখ রহিয়াছে।

তন্ত্রোক্ত কালে অন্যান্য আভরণের মধ্যে নাসাভরণেরও উল্লেখ রহিয়াছে। তন্ত্রসারে ৬৪ উপচারের বিবরণ দৃষ্ট হয়। প্রসাধনের একটা সম্পূর্ণ চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। ৬৪ উপচারের কতক পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

২য় উপচার সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গম্।
৫ম " দিব্যস্নানীয়ম্।
৬ষ্ঠ " উদ্বর্ত্তনম্।
৭ম " উষ্ণোদকস্নানম্।
১০ম " অরুণবস্ত্রপরিধানম্।
১১শ " অরুণবস্ত্র উত্তরীয়ম্।
১৪শ " চন্দনাগুরুকুঙ্কুম-মৃগমদ কর্পূর-কস্তুরী-রোচনা-দিব্য-গন্ধ-সর্ব্বাঙ্গানুলেপনম্। মালতী-জাতী-চম্পকী-অশোক-শতপত্রপুগ-কুহরী-পুন্নাগ-কহ্লার-যূথী-সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমমালাভূষণম্।
১৮শ " নবরত্নমুকুটম্।
১৯শ " চন্দ্রশকলম্।
২০শ " সীমন্তসিন্দূরম্।
২১শ " তিলকরত্নম্।
২২শ " কালাঞ্জনম্।
২৩শ " কর্ণপালিযুগলম্ (কানবালা)।
২৪শ " নাসাভরণম্ (নাসাভরণের কোনও নাম প্রদত্ত হয় নাই)।
২৫শ " অধরযাবকম্ (ঠোঁটে আল্‌তা ও অন্য কোনও রঞ্জনদ্রব্য)।
২৬শ " গ্রথনভূষণম্ (কি ?)।
২৭শ " কনকচিত্রপদকম্ (পদকধারণ এখনও পশ্চিমে প্রচলিত আছে)।
২৮শ " মহাপদকম্।
২৯শ " মুক্তাবলীম্।
৩০শ " কনকাবলীম্।
৩১শ " দেহচ্ছন্দকম্ (ইহা বোধ হয় হার-বিশেষ, অর্থশাস্ত্রের তালিকা দেখুন)।
৩২শ " কেয়ূরযুগলচতুষ্কম্।
৩৩শ " বলয়াবলীম্।
৩৪শ " ঊর্ম্মিকাবলীম্ (আংটী)।
৩৫শ " কাঞ্চীদামকটিসূত্রম্ (গোট)।
৩৬শ " শোভাখ্যাভরণম্ (ইহা যে কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না)।
৩৭শ " পাদকটকম্ (পাইজোর)।
৩৮শ " রত্ননূপুরম্ (ঘুংঘুর)।
৩৯শ " পাদাঙ্গুরীয়কম্ (চুট্‌কী)।
৪০শ " শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকা।
৪১শ " কর্পূরবটিকা।
৫২শ " শ্বেতচ্ছত্রম্।
৫৩শ " চামরযুগলম্।
৫৪শ " দর্পণম্।
৫৫শ " তালবৃন্তম্।
৫৬শ " গন্ধম্।
৬১শ " পুষ্পম্।
৬২শ " তাম্বুলম্।

তারা-ধ্যানে পাদুকাযুক্ত পদের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে তারা চীন হইতে আনীত দেবতা। তাই কি তাঁহার পাদুকার উল্লেখ ?

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অন্তরীয় (পরিধেয় বস্ত্র) ও উত্তরীয় (উড়ুনি) ভিন্ন অন্য কোনও পরিচ্ছদের পরিচয় পাই নাই। অমরকোষে উত্তরীয়ের কতকগুলি নামান্তর প্রদত্ত হইয়াছে—যথা প্রাবার, উত্তরাসঙ্গ, বৃহতিকা, সংব্যান উত্তরীয়। প্রাবার শব্দটী অর্থশাস্ত্রে বারবাণ নামে সৈন্যের বিস্তৃত পরিচ্ছদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কামসূত্রে প্রাবার (প্রাবরণ) অর্থে টীকাকারগণ শালদোশালা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া হন। বহু পূর্ব্বে গ্রীক অভিযানের সময়েই কোনও একপ্রকার দীর্ঘ পোষাক (জামা) ব্যবহৃত হইত, সে কথা মেগাস্থেনীস প্রভৃতি গ্রীক পর্য্যটকগণের বিবরণ হইতে জানা

যায়। অর্থশাস্ত্রে সৈনিকগণের পরিচ্ছদ বর্ণনায় শিরস্ত্রাণ, কণ্ঠত্রাণ, কূর্পাস (অমরকোষে কূর্পাসক), কঞ্চুক (হ্রস্ব পরিচ্ছদ), বারবাণ (দীর্ঘ পরিচ্ছদ, long coat), পট্ট (পটি, পদত্রাণ), নাগোদরিক প্রভৃতি পরিচ্ছদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নাগরিকেরা বহুমূল্য ও রত্নখচিত পাদুকাও ব্যবহার করিতেন। পাদুকার উল্লেখ সুশ্রুতে তো আছেই, সংহিতা ও পুরাণেও আছে, অতএব এটা যে একটা প্রাচীন প্রথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন পাদুকা ছিল, তখন পদাতপ (হিন্দিতে যাহাকে পায়তাওয়া কহে) মোজাও ছিল। অমরকোষের অনুপদীনা মোজা। কূর্পাস বা কালিদাসের কূর্পাংশুক স্ত্রী-পরিচ্ছদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল বোধ হয়। স্ত্রীজাতির অঙ্গাবরণ পরিচ্ছদ ভাগবতের সময় কঞ্চুক বা কঞ্চুলিকা (কাঁচুলি) নামে প্রথিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রামায়ণ-মহাভারতের সময় অথবা বৈদিককালে স্ত্রীলোকের উত্তরীয় ভিন্ন অন্য কোনও পরিচ্ছদের উল্লেখ দেখিতে পাই না। বৈদিক যুগে অলঙ্কারের বিশেষ বাহুল্য হইয়াছিল। তখনই হস্তের ও পদের অলঙ্কার (খাদি) ও মালা (হার) প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু বস্ত্রের বেলা, এমন কি স্ত্রী-বস্ত্রের বেলা অন্তরীয় উত্তরীয় ভিন্ন অন্য কোনও বস্ত্রের উল্লেখ নাই। গৌতম-সংহিতায় (প্রাচীন সংহিতা বলিয়া স্বীকৃত) কূর্দ্দ (কোর্‌তা বা জামা) বলিয়া একপ্রকার পরিচ্ছদের উল্লেখ আছে (১০ম অধ্যায়)।

অমরকোষে নিবীত ও প্রাবৃত নামে পরিচ্ছদের উল্লেখ আছে। এখন যাহাকে পাছুড়ি বা দোপাট্টা বলে, তাহাকে অমরকোষে প্রচ্ছদপট বলা হইয়াছে। অমরকোষে আপ্রপদীন নামে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত আচ্ছাদনকারী একপ্রকার পরিচ্ছদের কথা লেখা আছে। পরিচ্ছদ নির্ম্মাণের উপকরণ, অথবা যাহাকে অমরকোষে বস্ত্রযোনি বলা হইয়াছে, তাহা প্রাচীনকালে অন্যূন ৯।১০ প্রকারের ছিল। অমরকোষে বর্ণিত বস্ত্রযোনি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বাল্ক—বল্কল হইতে উৎপন্ন।

কার্পাস—কাপাস হইতে উৎপন্ন, অথবা অন্য কোনও ফল হইতে উৎপন্ন।

কৌশেয়, কৃমিকোশোত্থ—সিল্কের বা তসরের বস্ত্র (পট্টবস্ত্র)।

রাঙ্কব, মৃগরোমজ—রোম হইতে উৎপন্ন (গরম কাপড়) শাল প্রভৃতি, যাহাকে অমরকোষে নীশার বা প্রাবরা বলা হইয়াছে।

মহাভারতে বাহ্লীচীন-সমুদ্ভব (বাহ্লীক ও চীন দেশে জাত), ঔর্ণেয় (ঊর্ণা বা উলের কাপড়), রাঙ্কব (রঙ্কুমৃগরোমজ), পটজ (পাটের কাপড়), কীটজ (সিল্ক প্রভৃতি), কার্পাস (কাপাসের অর্থাৎ তুলার কাপড়), আবিক (মেষলোমজাত) এবং অজিন (চর্ম্মনির্ম্মিত বস্ত্র)—এই কয়প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সভাপর্ব্ব ৫০ অধ্যায়ে, পুরাণাদিতেও ঐ কয়প্রকার বস্ত্রের বা বস্ত্রযোনির বিবরণ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ স্বর্ণসূত্রগ্রথিত ক্ষৌম বস্ত্রের প্রচলন হইয়াছিল ও এখনও তাহা ভারতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে অজস্র বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

পুরুষের ও স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র সুন্দরচিত্রযুক্ত হইত, বিশেষতঃ কালিদাসের সময় হংসাঙ্কিত বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল।

কৌটিল্যের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূলের জন্য বিখ্যাত ছিল। দুকূল অর্থে সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। বহুবিধ বস্ত্রের বিবরণ-সম্বলিত অর্থশাস্ত্রের ২য় অধিকরণ ১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চতুঃষষ্টিকলার মধ্যে নিম্নলিখিত কলাগুলি প্রসাধন-সম্পর্কীয় কলা:—

১। বিশেষকচ্ছেদ্য।
২। দশন-বসনাঙ্গরাগ।
৩ মাল্যগ্রথন-বিকল্প।
৪ শেখরকাপীড়-যোজনা।
৫ নেপথ্যপ্রয়োগ (বেশ ভূষা করিবার কলা)।
৬ কর্ণপত্রভঙ্গ (কানফুল কানবালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ)।
৭ গন্ধযুক্তি।
৮ ভূষণযোজন।
কৌচুমার যোগ,—(কুরূপাকে সুরূপা করার কৌশল প্রভৃতি)।
১০। সূচীবাণকর্ম্ম—(পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার কৌশল)।
১১। মণিরাগাকরজ্ঞান—মণির রঞ্জনবিদ্যা প্রসাধনান্তর্গত।
১২। উৎসাদন।
১৩। বস্ত্রগোপন—এমন ভাবে বস্ত্র পরাইবার কৌশল যাহাতে কখনও শ্লীলতার হানি না হয়।

সাজসজ্জার (প্রসাধনের) শেষে সুগন্ধবাসযুক্ত তাম্বুলধারণ বিধেয় ছিল এবং দর্পণে আত্মরূপ দেখাটাও সদাচার বলিয়া কথিত হইত। কালিদাস বারবার এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন।

—

মানসী ও মর্ম্মবাণী (আশ্বিন)

প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র—শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিভিন্ন পুরাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, বহু প্রাচীনকালে ভারতে তোপ, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। অগ্নিচূর্ণ (অগ্নিকণা) বা বারুদের সাহায্যে ব্যবহৃত আধুনিক বন্দুক, কামান প্রভৃতি অস্ত্রের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়, যথা,—"শতঘ্নী" "ভুশুণ্ডী" ও "যন্ত্র"।

"করালান্ ভুগ্নবক্ত্রাংশ্চ বিকটান্ বামনংস্তথা।
ধন্বিনঃ খড়্গিনশ্চৈব "শতঘ্নী" মুষলায়ুধান্॥"
বাল্মীকি-রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ—১৭।

"যষ্টিভির্বিবিধৈশ্চক্রৈর্নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
ভিন্দিপালৈঃ শতঘ্নীভিরন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ॥"
বাল্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৯৬—২৩।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ভৌমাসুর-সংগ্রামের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, ইহাতেও শতঘ্নী শব্দ দৃষ্ট হয়,—"চক্রং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীযোধাশ্চ সর্বে যুগপৎস্ম বিব্যধুঃ॥"

"দুর্গঞ্চ পরিগোপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্।
শতঘ্নীযন্ত্রমুখ্যেশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্॥"
মৎস্যপুরাণ, ২১৭ অধ্যায়—৮।

শতঘ্নী দুর্গপ্রাকারে রাখা হইত এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বকালে কামানের চতুর্দ্দিক লৌহময় কণ্টকে বেষ্টিত থাকিত, কামানের উপর যাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ না করে বা প্রাকার হইতে ঠেলিয়া না দেয় সেইজন্যই বোধ হয় এইরূপ করা হইত।

কামানের অন্য নাম—ভুশুণ্ডী।

"ততঃপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূল-পরশ্বধৈঃ।
শক্ত্যষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি॥"
শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায়, ১১।

মৎস্যপুরাণে—

"চক্রাণি কুণপান্ প্রাসান্ ভুশুণ্ডীঃ পট্টিশানপি।"
১৫০ অধ্যায়, ৭১।

পুনশ্চ—

ভুশুণ্ডীং ভৈরবাকারাং গৃহীত্বা শৈলগৌরবাম্।
"রক্ষিণো মুকুটস্থাথ নিষ্পিপেষ নিশাচরান্ ॥"
মঃ পুঃ, ১৫০ অধ্যায়, ১০৬।

এই সকল স্থানে "ভূশুণ্ডী" শব্দ ছোট কামান ও বন্দুক উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। কামানের তৃতীয় নাম—"যন্ত্র"।

যজুর্ব্বেদেও "সুর্ম্মীযন্ত্র" নামক আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বৈদিক যুগেও ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সুর্ম্মীযন্ত্রে একটি লোহার নল বা চোঙা থাকিত, উহার ভিতর হইতেই অগ্নি-গোলক বর্ষিত হইত। অথর্ববেদেও এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সুর্ম্মীযন্ত্র, শুক্রনীতি-বর্ণিত "নালিকাস্ত্রের" পূর্ব্বনাম বলিয়া বোধ হয়। আলেকজাণ্ডারের সমকালীন থেমষ্টিয়স লিখিয়াছেন,—"ভারতবাসী আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে দূর হইতে শত্রুসংহার করিয়া থাকে।"

—

ইতিহাস ও আলোচনা (অগ্রহায়ণ)

মহাকবি ভূষণ—শ্রীমণীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব হিন্দি কবিগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। কবিগণ ঔরঙ্গজেবকে 'ঔরঙ্গ' না বলিয়া আদর করিয়া 'নৌরঙ্গ' বলিতেন, এবং নানারূপ প্রশংসাপূর্ণ কবিতা শুনাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন; প্রতিদানে তাঁহারা প্রভূত ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইতেন। এই কবিগণের মধ্যে চিন্তামণি একজন। আমাদের আলোচ্য কবি ভূষণ চিন্তামণির সঙ্গে থাকিতে থাকিতে দরবারে কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন ঔরঙ্গজেব ময়ূর-সিংহাসনে বসিয়া কবিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ত কেবল আমার প্রশংসাই কর; আমার কি নিন্দার কিছুই নাই?—যদি কেহ বলিতে পার আমার কি নিন্দার আছে, তবে বুঝিব তোমরা সত্যবাদী।"

ঔরঙ্গজেবের ন্যায় উগ্র-প্রকৃতি বাদশাহকে কেহ নিন্দা করিতে সাহস করিলেন না। সকলকে নীরব দেখিয়া ভূষণ বলিলেন, "বাদশাহ! সত্য কথা বলিলে যে ঘাড়ে মাথা থাকিবে না; সুতরাং যাহাতে মাথা হারাইতে না হয় সেইরূপ একটা আজ্ঞা-পত্র আগে লিখিয়া দিন।" ঔরঙ্গজেব ফর্মান লিখিয়া দিলেন। তখন ভূষণ নির্ভয়ে সভামধ্যে ঔরঙ্গজেবের পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃহত্যার বর্ণনা করিলেন। ক্রোধে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে নিজেই ভূষণকে হত্যা করিতে উঠিলেন। উপস্থিত সকলে ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া ও ভূষণকে নিহত করিলে বাদশাহের কলঙ্ক হইবে বলিয়া নিরস্ত করিলেন। ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নাই; ভূষণকে বলিলেন, "দূর হও, আর তোমার মুখ দেখাইও না"। ভূষণ ধীরপদবিক্ষেপে দিল্লীর মোগল দরবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া আপনার 'কেশরী' অশ্বকে সজ্জিত করিলেন এবং মোগলরাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কেশরী ভূষণকে লইয়া রায়গড়ে আসিয়া পৌঁছিল। রায়গড়ের উপকণ্ঠে মনোরম ভূমি, উদ্যান, ঝরণা, পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে ভূষণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় একজন সুদর্শন পুরুষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাঁহার উন্নত ললাট, তাহাতে দেবীর রক্ততিলক, গতি ভঙ্গি তেজস্বিতার পরিচায়ক। তেজস্বী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' তখন ভূষণ ঔরঙ্গজেবের দরবার হইতে বিতাড়িত হইবার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি যে শিবাজী মহারাজের দরবারে আসিতে ইচ্ছুক প্রভৃতি আদি-অন্ত এক-এক করিয়া বলিয়া গেলেন। অজ্ঞাত পুরুষ বলিলেন, "আপনি যখন মোগল দরবার হইতে মহারাজ শিবাজীর দরবারে আসিয়াছেন তখন বোধ হয় আপনি শিবাজীরও প্রশংসা করিয়া কিছু লিখিয়া আনিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া সেগুলি একটু শোনান। আমি শিবাজী মহারাজের সেনাপতি, তাঁহারই ছোট অঙ্গ বলিলে হয়। সুতরাং তাঁহার প্রশংসা আমার শোনা কর্ত্তব্য।" ভূষণ উচ্চৈঃস্বরে শিবাজীর গুণগাথা পড়িতে লাগিলেন:—

ইন্দ্র জিমি জম্ভপর, বাড়ব সুঅম্ভপর,
রাবণ সদম্ভপর রঘুকুলরাজ হৈ।
পৌন বারিবাহপর, সম্ভু রতিনাহপর,
জ্যোঁ সহস্রবাহপর রাম দ্বিজরাজ হৈ।
দাবা দ্রুমদণ্ডপর, চীতা মৃগঝুণ্ডপর,
ভূষণ বিতুণ্ডপর জৈসে মৃগরাজ হৈ।
তেজ তম অংসপর, কাহ্ন জিমি কংসপর,
ত্যোঁ মলেচ্ছ বংসপর সের সিবরাজ হৈ॥

কবিতার মধ্যে কি কোন মোহিনী মন্ত্র লুকান ছিল! কবিতা বার-বার শুনিয়াও বীরপুরুষের তৃপ্তি মিটিল না। "আপনি দরবারে যাইবেন" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন ভূষণ শিবাজীর দরবারগৃহে উপস্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ কত খুঁজিতে লাগিলেন কিন্তু কই সেই সেনাপতি?

কিছুক্ষণ পরে ভূষণ মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলেন সিংহাসনে ও কে! উনিই না সেনাপতি সাজিয়া তাঁহার নিকট কবিতা শুনিয়াছিলেন? তবে স্বয়ং মহারাজ শিবাজীই সেই পুরুষ? ভূষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই মহাপুরুষ মারাঠা-কুলতিলক মহারাজ শিবাজী সিংহাসনে বসিয়া প্রশান্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চিন্তা করিও না। আজ তুমি আমার দরবারের শোভাবর্দ্ধন কর, এখানে নৌরঙ্গের ভয় নাই।"

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ভূষণ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে বুন্দেলের মহারাজ ছত্রসালের দরবারে গিয়াছিলেন। মহারাজ ছত্রসাল ভূষণের পাল্কী স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়া ভূষণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কবিতা দ্বারা ভূষণের ন্যায় আর কেহ তাদৃশ সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

অনুমান, ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কানপুর জিলার পতিতপাবনী যমুনার বামসৈকতসন্নিকটে ত্রিকূটাপুর গ্রামে মহাকবি ভূষণ ত্রিপাঠীর জন্ম হয়। ইনি হিন্দু জাতির উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের উৎকট অভিলাষী ছিলেন। ইঁহার কবিতার ন্যায় জাতীয় ভাবপূর্ণ কবিতা আর কোন হিন্দু কবির কবিতায় পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহার ন্যায় বীরহৃদয়কবি পৃথিবীতে বিরল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

—

শিক্ষক (অগ্রহায়ণ)

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি - শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে বিশেষ গৌরবময় স্থান প্রদান করা হইত। গীতা সত্যই বলিয়াছেন, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। এইজন্যই মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মপুস্তক ও বেদে জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় (বন, ৩১২।১০০)। তাই মনুর মতে, রাজা

ও স্নাতকে সাক্ষাৎ হইলে, রাজা স্নাতককে সম্মান করিবেন (মনু, ২, ১৩৯)। এইজন্যই রাজা স্বদেশেই পূজা পাইয়া থাকেন, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন, এইরূপ প্রচলিত প্রবাদ। এই হেতুই প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থীকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইত না (মনু, ৮,৬৫); কারণ, তাহা হইলে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত জন্মিত (নারদ)।

মনুর মতে (৩.১) শিক্ষার্থীকে ছত্রিশ বৎসর আচার্য্যের নিকট বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। অভাবে, অষ্টাদশ বা নয় বৎসর-কাল অতিবাহিত করিতে হইত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, বেদে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে আটচল্লিশ বৎসর শিক্ষকের নিকট বাস করাই সমীচীন ছিল (বৌধায়ন, ১।২।৩)। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে দশ বৎসর আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভই প্রশস্ত ছিল (মহাবগ্গ, ১।৩২।১)।

শিক্ষককে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হইত। সম্পূর্ণ বেদশিক্ষা-দাতাকে আচার্য্য বলা হইত। যিনি কেবল জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বেদের অংশবিশেষ শিক্ষা দিতেন, তিনি উপাধ্যায় নামে অভিহিত হইতেন (মনু, ২।১৪০।১৪১)। তন্নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে গুরু-আখ্যা প্রদান করা হইত। আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ অধিক পূজিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে আচার্য্য প্রধান প্রধান বিদ্যার্থীকে ছাত্রশিক্ষায় নিয়োজিত করিতেন (মহাধম্মপাল জাতক, ৪ ৪৪৭)।

আচার্য্যের সহিত বাসকালে বিদ্যার্থীকে মধু, মাংস, সুগন্ধি, মাল্য, স্ত্রীলোক, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীতবাদ্য হইতে বিরত থাকিতে হইত (মনু, ২।১৭৭)। দ্যূতক্রীড়া, বিবাদ, পরনিন্দা, মিথ্যাকথন এবং কাহাকেও আঘাত করা হইতে তাঁহাকে বিরত থাকিতে হইত। তাঁহাকে একাকী শয়ন করিতে হইত (মনু, ২।১৮০)।

আচার্য্যের জন্য তাঁহাকে পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া জল আনিতে হইত। পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ—শিক্ষকের প্রয়োজনীয় পরিমাণে আহরণ করিতে হইত (মনু ২।১৮১, ১৮২)। শিক্ষককে সকল প্রকারে সম্মান-প্রদর্শন ও তাঁহার সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত (আপস্তম্ব ১।১।২)। দিবাভাগে বিদ্যার্থীকে নিদ্রা হইতে বিরত থাকিতে হইত (১।১।২)। বিদ্যার্থী শিক্ষাকালে পাদুকা পরিধান করিতে পারিতেন না (বৌধায়ন, ১,২,৩)। আবশ্যক-মত আচার্য্য বিদ্যার্থীকে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতেন (মনু, ৪।১৬৪; জাতক, ২।২৫২ ; গৌতম, ২,৪২-৪৪)।

জাতকে (৪।৪৭৪) দেখিতে পাই যে, উচ্চবংশ-সম্ভূত ছাত্র শিক্ষকের জন্য জল আনিতেছেন, কাঠ আহরণ করিতেছেন, রন্ধন করিতেছেন। আবশ্যকানুযায়ী সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া শিক্ষকের পদসেবা করিতেছেন এবং গুরুপত্নীর সন্তান-প্রসবান্তে প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সমাধান করিতেছেন।

আচার্য্য ও বিদ্যার্থীর মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

প্রাচীনকালে জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা আচার্য্য সমধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন (মনু ২।১৪৬)। শিক্ষকও পিতৃসম্বোধনে সম্বোধিত হইতেন, কারণ তিনি শিক্ষার্থীকে বেদ শিক্ষা দিতেন (মনু, ২।১৭১)।

বিদ্যার্থীকে আচার্য্যের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে হইত ; সকল বিদ্যায়ই বিদ্যার্থীকে শিক্ষিত করিতে হইত (আপঃ, ১,২।৮)। বিদ্যার্থীর পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আচার্য্য তাঁহাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই যাহাতে বিদ্যার্থীর মঙ্গল হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইত। বিদ্যার্থীর শিক্ষা আহার ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত।

আচার্য্য বিদ্যার্থীর নিকট হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ না হইলে আচার্য্য এই দান গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ভূমি, সুবর্ণ, গাভী, অশ্ব, ছত্র, পাদুকা, আসন, শস্য দান করা হইত (মনু, ২।২৪৫, ২৪৬)। মনুর সময়ে নির্দ্ধারিত কোন পারিশ্রমিক ছিল না। অপিচ, কোন আচার্য্য কোনরূপ পারিশ্রমিক দাবী করিলে, অথবা নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে নিন্দনীয় হইতেন (মনু, ৩।১৫৬)।

জাতকে দেখিতে পাই (১।১৬১ ; ২।২৫২) যে, সকল বিদ্যার্থী পারিশ্রমিক প্রদান করিতেন।

তক্ষশিলায় এক এক আচার্য্যের নিকট পঞ্চশত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন (জাতক ২।২৮৭, ৪।৫৭৭, ৬।৪৩৯, ৩।৩৭৭)। বারাণসীতেও কোন কোন আচার্য্যের নিকট পাঁচশত ছাত্র থাকিতেন (১।৬১)। ইৎসিং নামক পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন (সমসাময়িক ভারত, একাদশ খণ্ড)।

নারদ (৭।১.২) পাঠে আমরা অবগত হই যে, ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব চতুর্ব্বেদ ব্যতীত ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, দৈববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা অধ্যাপনা করা হইত। হিউয়েন-সিয়াং নামক চৈনিক পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, বালক-বালিকাগণ সপ্তমবৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেই তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে পঞ্চ বিজ্ঞান (ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ন্যায়, ধর্ম্ম) অধ্যাপনা করান হয়।

তক্ষশিলায় ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত (জাতক, ১।৫০, ১।৮০, ১।১৩০)। এতদ্ব্যতীত ধনুর্ব্বিদ্যারও শিক্ষা হইত (২।২৪১)। বারাণসীতে ধর্ম্মপুস্তক সংক্রান্ত বিদ্যায় পারদর্শিতালাভের উপায় ছিল (জাতক, ৩।৩৭৭)।

পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেশের আচার ও নীতিশিক্ষার জন্য ছাত্র নানা প্রদেশে গমন করিতেন।

সে সময়েও নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছিল (জাতক, ৩।৩৮৮)। শূদ্রের বেদে অধিকার ছিল না। ছাত্র-নির্ব্বাচনেরও প্রথা দৃষ্ট হয়। গুরুপুত্র, আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবক, ধার্ম্মিক, সাধু, বিশ্বাসযোগ্য, দক্ষ, ধনী, আত্মীয় প্রভৃতিকেই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত (মনু, ২।১০৯)।

—

মৌচাক (কার্ত্তিক, ১৩২৮)

রবিবার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১)

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া গাড়ি।
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন দেরি করে?
ধীরে-ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়ীটি
দূর কি সবার চেয়ে?
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

(২)

সোম মঙ্গল বুধ এরা চায়
থাকবারি জন্যেই,

বাড়ি ফেরার দিকে এদের
একটুও মন নেই।
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন তাড়া করে?
ঘণ্টাগুলো বাজে যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়াতে তার
কাজ আছে সব চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

(৩)

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেম্নি উঠি জেগে
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

মা-হারা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১)

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেল্‌তে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুন্‌গুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিশোয় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোল্‌না ঠেলে-ঠেলে;
মা গিয়েছে, যেতে-যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

(২)

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলি-বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?
কবে বুঝি আন্‌ত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হ'য়ে।

(৩)

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জান্‌লা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার মুখে
চাইচে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে' কবে
দেখ্‌ত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

শাস্তি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাত-আট্‌টে সাতাশ—আমি
বলেছিলুম বলে'
গুরুমশায় আমার 'পরে
উঠ্‌ল রাগে জ্বলে'।
মাগো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই যে রঙীন পুতুলখানি
দিয়েছিলে কিনে,
খাতার মধ্যে ছিল ঢাকা;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগে মেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
মাগো, আমি জানাই কাকে?
ওঁর কি গুরু আছে?
আমি যদি নালিশ করি
এক্ষণি তাঁর কাছে?
ওঁর কি কোনো সেইক পুতুল?
কর্‌তে গিয়ে খেলা
কোনোরকম পড়ায় উনি
করেন নি কি হেলা?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল্ দেখি, মা, ওঁর মনে তা'
কেমনতরো লাগে?

মূর্খ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১)

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই,
আমি ত, মা, চাইনে হ'তে
পণ্ডিত মশাই।
না যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,

মুখ্খু হয়ে রইব তবে,
আমার তাতে কিইবা হবে?
মূর্খ যারা তাদেরি ত
সমস্ত খন ছুটি?

(২)

তারাই ত, মা, রাখাল ছেলে,
গোরু চরায় মাঠে,
নদীর ধারে বনে-বনে
তাদের বেলা কাটে।
ডিঙীর পরে পালটি তুলে'
ঢেউয়ের মাথায় দুলে দুলে
তারাই ত যায় ঝাউ কাটতে
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখী তাড়ায় ফসল-ক্ষেতে,
বাঁকে করে' দই নিয়ে যায়,
বেচে ঘরে-ঘরে।

(৩)

কাস্তে হাতে, চুব্ড়ি মাথায়,
সন্ধে হলে পরে
ফিরে গাঁয়ে কিষাণ-ছেলে,
মন যে কেমন করে!
যখন হাতে নিয়ে খড়ি
পাঠশালাতে লিখি পড়ি,
গুরুমশাই দুপুর বেলায়
বসে-বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে কারা গোরুর গাড়ি
গান গেয়ে যায় গলা ছাড়ি'
শুনে আমি পণ করি যে
মুখ্খু হব বলে'।

(৪)

দুপুর-বেলায় চিল ডেকে যায়
দূর-আকাশের পারে,
হঠাৎ-হাওয়া বাঁশি বাজায়
বাঁশ-বাগানের ধারে।
পূবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলায় আঁচল দোলে,
ডালে-ডালে উছ্লে ওঠে
শিরীষ-ফুলের ঢেউ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে,
পাঠশালা সব এড়িয়ে চলে,
আমি জানি, এরা ত, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ।

(৫)

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান।
ঘরে-ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
এম্নি কাটে সারাবেলা,
আমি ত, মা, চাইনে আদর
তোমার আদর ছাড়া।
তুমি যদি, মূর্খু বলে'
আমাকে, মা, না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদ্লা মেঘের পাড়া।

(৬)

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চুল।
ঘাটে যখন যাবে—আমি
কর্ব হুলুস্থুল।
রাত থাকতে অনেক ভোরে
আস্ব নেবে আঁধার করে',
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুক্ব ঘরে
দুয়ার ঠেলে' ফেলে';
তুমি বল্বে মেলে' আঁখি
"দুষ্টু দেয়া ক্ষেপ্‌ল না কি?"
আমি বল্ব, "ক্ষেপেচে আজ
তোমার মূর্খু ছেলে!"

যাত্রার আয়োজন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১)

দেখ্‌চ না কি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার,
সাত সমুদ্র তেরো নদী
আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইক হরিশ খোঁড়া,
তাই ভাবি যে কাকে আমি
কর্ব আমার ঘোড়া?
কাগজ ছিঁড়ে এনেচি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকা দে না বানিয়ে, অম্নি
দিস্ মা ছবি এঁকে।
রাগ কর্বে বাবা বুঝি
দিল্লি থেকে ফিরে?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাতসমুদ্র-তীরে।

(২)

এম্নি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ ত রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্ষণি কি
দিতেই হবে ডাকে?
নাইবা চিঠি ডাকে দিলে,
আমার কথা রাখো,
আজকে না-হয় বাবার চিঠি
মাসী লিখুন নাকো!

আমার এ যে দরকারী কাজ
বুঝ্‌তে পারো না কি?
দেরী হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি!
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠ্‌বে
বৃষ্টি বন্ধ হ'লে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চ'লে।

নক্ষত্রতত্ত্ব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১

ঐ যে রাতের তারা
জানিস্ কি মা কারা?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন-ধারা।
আমার যেমন নেইক ডানা,
আকাশেতে উড়্‌তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই বলে'
পারে না যে আস্‌তে চলে'
এই পৃথিবীর 'পরে।
সকালে যে নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস্ কল্‌সি-কাঁখে
সজনে তলার ঘাটে,
সেথায়, ওদের আকাশ থেকে'
আপন ছায়া দেখে'-দেখে'
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে-চেয়ে,
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল-সাঁঝে
কল্‌সিখানি ধরে' বুকে
সাঁৎরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে।

৩

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায় ওরা আপন মনে,
যেথায় দুয়োরাণী
নঙ্গে ছেলে মেয়ে দুটো,
কুড়িয়ে নিয়ে কাটা-কুটো
বাঁধ্‌লে কুঁড়েখানি।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে'
হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলার-খেলায়,
তার পরে, মা, রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

৪

সেদিন আমি নিশুৎরাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে',
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপ্‌সা আছে মেঘে।
বসে'-বসে' ক্ষণে-ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে'।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোরবেলা যায় চলে'।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে
দেখ্‌তে না পায়, আলো খোঁজে,
সব হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে'
সমস্ত খন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

—

ভারতবর্ষ (অগ্রহায়ণ)

বর্ত্তমান ফ্রান্স—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ।

প্যারিসে "স্বদেশী আন্দোলন" চলিতেছে তুমুলভাবে। সকল ফরাসীর মুখে একই বাণী,—"পাত্রী'র (patrie—স্বদেশ) পুনর্গঠন। ইহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়,—জার্ম্মানদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা। যুদ্ধের খর্চা (সুদে-আসলে) আর পল্লী-সহরগুলা নূতন করিয়া গড়িবার জন্য যত টাকা লাগে, এই সমুদায় ফ্রান্স দাবী করিয়াছে। "তঁ" (Temps), মাত্যাঁ (Matin) ইত্যাদি দৈনিক কাগজে রোজই পড়িতেছি—জার্ম্মানী এই-সব টাকা এবং মাল-মসলা দিবেন কি না সেই সম্বন্ধে তর্কপ্রশ্ন।

একদিন রাত্রিকালে একটা শিশু পাঠশালায় সভা হইল। চাঁছা গলায় একব্যক্তি খোলতাই আওয়াজ করিয়া বক্তৃতা করিলেন। শুনিলাম,—"ওহে শিশু ফ্রান্স, তোমাদের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বদা মনে রাখিও, বর্ব্বর দুস্‌মনেরা তোমাদের মাতৃভূমিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ছাড়িয়াছে। এই দুরাত্মা জার্ম্মানদের অত্যাচারের ফল ফ্রান্সকে অনেকদিন সহিতে হইবে। মানবের সভ্যতাকে এবং ফরাসীজাতিকে পুনর্গঠিত করার ভার তোমাদের হাতে।" বক্তা বাগ্মী বটে,—আমেরিকায় এই ধরণের বক্তৃতা কখনো কানে আসে নাই।

ফ্রান্সের বিধ্বস্ত জেলাগুলার ছবি দেখান হইল। কতকগুলা জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হইল। আরও কয়েকটা বক্তৃতা শুনিলাম। ধুয়া একই। একজন বলিলেন,—"স্বদেশকে নবজীবন দান করিবার জন্য টাকার প্রয়োজন। দুস্‌মনের তহবিল হইতে যত টাকা আসিবে, তাহাতে এই বিরাট রেনেসাঁস্ (renaissance) চালানো যাইবে না। খরচ কুলাইয়া উঠিবার জন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট নূতন এক সরকারী ঋণ-ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। এই ভাণ্ডারে, তোমরা যে যেখানে আছ, টাকা ধার দাও, এবং ধার দিতে অন্যান্য সকলকে পরামর্শ দাও।" রেনেসাঁস্ শব্দটা আজকাল ফরাসী রাষ্ট্রমণ্ডলে অহরহ ব্যবহৃত হইতেছে।

এক ব্যক্তি সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে ছবি আঁকিয়া থাকেন। ইনি বলিতেছেন—"মহাশয়, আমি কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, যুদ্ধের সময়। কি আশ্চর্য্য—আপনারা ঠিক ফরাসীদের

মতনই ইংরেজবিদ্বেষী!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কি? ফরাসী কি ইংরেজকে ভালবাসে না?" চিত্রশিল্পী বলিলেন—"ইংরেজের সমান স্বার্থপর জাত জগতে আর নাই। ইহারা নিজের মতলব হাসিল করিবার জন্য অন্যান্য লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে। নিজ স্বার্থ কোনমতেই ভুলিতে পারেনা। এমন কি যুদ্ধের সময়ও ইংরেজরা ফরাসীদিগকে আত্মীয় বিবেচনা করিতে পারে নাই। আমাদের ফৌজের সঙ্গে উহাদের ফৌজের লেন দেন কখনও প্রীতিজনক ছিল না। কিন্তু ফরাসী জাতের চরিত্র বিপরীত। আমাদের মেজাজে পরাজিত-বিদ্বেষ একদম নাই। আরব, তাতার, হিন্দু, সেনিগালী—সকল জাতকেই আমরা আমাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারি। এই যুদ্ধে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।"

একটা মজা দেখিতেছি। আন্তর্জ্জাতিক কারবারে ইংরেজ যে মতে সায় দিতেছেন, ফরাসীরা ঠিক তাহার উল্টা চলিতে চাহেন। রুশিয়ার বোলশেভিকীকে ইংরেজ গবমেণ্ট মানিয়া লইতে রাজি—ফরাসীরা এ বিষয়ে খড়্গহস্ত। পোল্যাণ্ডের মিত্র ফ্রান্স; ইংরেজ এ সম্বন্ধে গা করেন না। গ্রীসের শাসন-প্রণালী লইয়া গণ্ডগোল। গ্রীকদের রাজা এখন নির্ব্বাসনে। ইংরেজ বলিতেছেন—"গ্রীক জনসাধারণ যা ভাল বুঝে করুক, ইহাতে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না।" ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব এবং রাষ্ট্র-নায়ক ও কাগজওয়ালারা একবাক্যে বলিতেছেন—"গ্রীসে রাজতন্ত্রের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হওয়া আমাদের একদম বাঞ্ছনীয় নয়।" সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের (লীগ অব নেসন্স্‌এর) বৈঠক বসিয়াছে। এক ইংরেজ প্রতিনিধি মত প্রচার করিয়াছেন—"জার্ম্মানীকে এই পরিষদের অন্তর্গত রাষ্ট্র বিবেচনা করা হউক।" ফরাসীরা আগাগোড়া এই প্রস্তাবে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো অতি সোজা।

বর্ত্তমান জগৎ যে একাকার তা বেশ বুঝিতেছি প্যারিসের এক ছোট ছাপাখানায় প্রবেশ করিয়া। গলির ভিতর অথবা রাস্তার পাশে অন্ধকারময় ঘর। দুর্গন্ধের বাথান। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। নিউ ইয়র্কের আর তোকিওর গরীব-পাড়ার ছাপাখানায়ও এইরূপ দৃশ্যই দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, এইজন্যই আজ দুনিয়া ভরিয়া রব উঠিয়াছে—"সকল দেশের মজুর-চাষীর স্বার্থ এক। জাতি-নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, বর্ণ-নির্ব্বিশেষে গরীব লোক মাত্রই ভাই-বোন। অতএব, হে মানব-বংশের দরিদ্র সন্তান, হে জগতের নির্ধন নরনারী, উঠো, জাগো, আর কোমর বাঁধিয়া একদল হইয়া দাঁড়াও।"

—

যমুনা (অগ্রহায়ণ)

দেবতত্ত্ব—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দেব বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি? যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি। তিনি যাহা বলেন, তাহা দেবতা। সেই বাক্যে যে বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা।

বেদে দেবতার কথা আছে, কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের দেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝাইবার মত কোন ঋক বেদে নাই। যাস্ক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কালে যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [৭ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেব-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

"...............দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা............"

দেবরাজযজ্বা যাস্কলিখিত নিঘণ্টুর নির্বচনভাষ্যে বলিয়াছেন—ঐশ্বর্য্য দান করেন বলিয়া অথবা তেজোময়ত্ব হেতু "দেব" এই নাম হইয়াছে। এইরূপ যে দেব দ্যুস্থানস্থ হন, তিনি দেবতা। তাঁহার মতে দিব্ ধাতুর দুইটি অর্থ—একটি অর্থ দান, আর একটি দীপ্তি। দানার্থ দিব্ ধাতু-নিষ্পন্ন দেবসংজ্ঞা বুঝাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তগণকে যিনি তাহাদের অভিমত দান করিয়া থাকেন, তিনিই 'দেব'।

অতঃপর দেবশব্দের দীপ্ত্যর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তেজসত্বাদদীপ্তা বা। দ্যুতের্বাপি বাহুলকাদ্রূপসিদ্ধিঃ।' কুল্লুকভট্টও মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় ১১৭ শ্লোকের টীকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—"দ্যোতনাদ্দেবঃ।" ইহা ছাড়া দেবশব্দের তিনি আরও একটি অর্থ করিয়াছেন। দ্যুঃ অন্তরীক্ষ সম্বন্ধী যাঁহারা, তাঁহারা দেব—"দিবঃ সম্বন্ধিনো বা দেবাঃ।......দ্যুস্থানা ইত্যর্থঃ।" এই দেবতার অর্থ "রশ্মি"। 'দেবা রশ্ময় উচ্যন্তে।' এই অর্থের সমর্থনসূচক ঋক্‌সংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাম্" (১।৬।১।৫।২)।

পাণিনি তাঁহার ধাতুপাঠে 'দিব্' ধাতুর দশটি অর্থ দিয়াছেন। সেই দশটি অর্থ এই,—১। ক্রীড়া, ২। বিজিগীষা, ৩। ব্যবহার, ৪। দ্যুতি, ৫। স্তুতি, ৬। মোদ—হর্ষ, ৭। মদ, ৮। স্বপ্ন—নিদ্রা, ৯। কান্তি, ১০। গতি। এই দশ প্রকার অর্থযুক্ত 'দিব্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেব ও দেবতা একই। 'দেব' শব্দের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া 'দেবতা' শব্দ সাধিত হইয়াছে।

আনন্দগিরি শঙ্করবিরচিত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকায় 'দেব' শব্দের অর্থ বুঝাইতে পাণিনির দিব্ ধাতুর দশটি অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন :—'যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলাকৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর জঙ্গম—নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি দ্যোতনস্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিলবস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতি-ভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহারই গুণকীর্ত্তন করে, যাঁহারই বিভূতি—ঐশ্বর্য্য খ্যাপন করে, যিনি সর্ব্বত্র গতিশীল, সর্ব্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।" আট শত বৎসর পূর্ব্বে সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদানুক্রমণীতে বলিয়াছেন, দেবনার্থ 'দিব্' ধাতু হইতে দেবশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই জন্যই 'দেব' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দেবন (ক্রীড়া) হেতু দেব হইয়াছে; অতএব দেবগণের দেবত্ব।

ঋষি যাস্ক তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া, দেবতাদের সংখ্যা একেবারে কমাইয়া তিন সংখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেবতা তিনটি—পৃথিবী-স্থান দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষস্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র, এবং দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য্য।

নিরুক্তকারের এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের প্রথম ঋকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'সূর্য্যো নো দিবা পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।"

মহাভাগ্যহেতু দেবতার একই আত্মা বহু প্রকারে স্তুত হয়। এই-জন্যই ইঁহাদের বহু নাম [মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি।—নিরুক্ত ৭।২।১ (৫)]।

এই ত্রিদেব ব্যতীত বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শতপথব্রাহ্মণ—৪, ৫, ৭, ২ এবং মহাভারত বনপর্ব্ব ১৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ—১১।৬।৩।৪ ও শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রে—৮।২১।১৪ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক বা বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণোপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ) দেবতার সংখ্যা লইয়া একটি আখ্যায়িকা আছে।

বৈদগ্ধ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবতার সংখ্যা কত, যাজ্ঞবল্ক্য? —তিনি উত্তর করিলেন—৩০৩ এবং ৩০০৩।

ও! তাই—ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—৩৩।

যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—৬।

তাই নাকি?—ঠিক করিয়া বলুন দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—৩।

তাই বুঝি! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—"দুই"।

সে কি? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন —"দেড়"।

বেশ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন —"এক"।

৩০৩ এবং ৩০০৩ এই দেবতারা কাহারা?—তিনি বলিলেন—ইহারা দেবতাদিগের শক্তি। বস্তুতঃ দেবতাদের সংখ্যা ৩৩।

ইহারা কাহারা?

তিনি বলিলেন—ইহারা অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি। [শতপথ ব্রাহ্মণেও (১১,৬৩৫) এই একই বাক্য পুনরুক্ত হইয়াছে।]

বসু কাহারা—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র ও নক্ষত্র।

রুদ্র কাহারা?—মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে দশটি প্রাণ বায়ু, তাহাই রুদ্র।

আর আদিত্য?—বৎসরের দ্বাদশ মাস।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কাহারা?—ইন্দ্র বজ্র; প্রজাপতি—গোগণ।

আপনি যে ছয় দেবতার কথা বলিলেন, তাহারা কে?—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দ্যৌ।

বেশ, তিন দেবতা কাহারা?—এই তিন লোক, ইহাদের মধ্যেই সমস্ত দেব রহিয়াছেন।

আচ্ছা, দুই দেব কাহারা?—অন্ন ও প্রাণ।

এইবার বলুন, দেড় দেব কে?—যিনি এখানে পবমান হইতেছেন (অর্থাৎ বায়ু)।

এক দেব কে?—প্রাণ।

শতপথ ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বেও দেবতার সংখ্যা যত ছিল, এখনও তাহাই আছে, সংখ্যার ইতরবিশেষ হয় নাই। এই ব্রাহ্মণে এক স্থানে আছে যে, তেত্রিশটি দেবতার একাদশটি স্বর্গে, একাদশটি পৃথিবীতে এবং একাদশটি জলে অবস্থিতি করেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ-ভেদে দেবতা ত্রিবিধ। আবার শতপথের অপর এক স্থানে ইহাদিগকে সপ্তবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ছাড়া গ্রন্থোদ্ধৃত ৩৩টি দেবতার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৃহ্যসূত্রে ৩৩টি দেবকে ব্রহ্মাত্মজ বলা হইয়াছে। শতপথে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয় না। ত্রিলোকই যে ত্রিদেব, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক মানিয়া লইয়াছেন।

ঐতরেয় আরণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় কাণ্ডে দেবতাদের একটি বড় ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ,—

ভূমা চিন্তা করিলেন,—"লোক-সমুদয়ে আমি লোকপাল প্রেরণ করিব।" অমনই জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন।৫।

তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন, অমনই ডিম্বের ন্যায় একটি মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অ[গ্নির] প্রাদুর্ভাব হইল। তারপর নাসাছিদ্র উদ্ভূত হইল, তাহা হইতে প্র[াণ,] প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।

এইরূপে ক্রমশঃ—

চক্ষু	হইতে	দৃষ্টি,	তাহা	হইতে	আদিত্য
কর্ণ	"	শ্রবণ,	"	"	দিক্
ত্বক্	"	কেশ,	"	"	বৃক্ষ, লতা
হৃদ্	"	মন,	"	"	চন্দ্রমা
নাভি	"	অপান,	"	"	মৃত্যু
লিঙ্গ	"	বীর্য্য,	"	"	জল

উদ্ভূত হইল।

অগ্নি ও ঐ সমস্ত দেবতা সৃষ্ট হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইল তখন পরমাত্মা ইহাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অভিভূত করিলেন।১।

তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া পরমাত্মাকে বলিলেন, আমাদে[র] অবস্থিতি ও আহারের জন্য আমাদিগকে একটি স্থান দিন।

তিনি প্রথমে গাভী, তারপর একটি গৃহ সমানয়ন করিলেন।

তাঁহারা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি মানুষক[ে] তাঁহাদের নিকট দিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—উত্তম।২।

তিনি তখন প্রত্যেককে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। তখন

অগ্নি	বাক্	রূপে	তাঁহার	মুখে	প্রবেশ করিলেন।
বায়ু	প্রাণ	"	"	নাসিকাগহ্বরে	"
আদিত্য	দর্শন	"	"	চক্ষুতে	"
দিক্	শ্রবণ	"	"	কর্ণে	"
বৃক্ষলতা	কেশ	"	"	ত্বকে	"
চন্দ্রমা	মন	"	"	হৃদয়ে	"
মৃত্যু	অপান	"	"	নাভিতে	"
জল	বীর্য্য	"	"	লিঙ্গে	"

তখন ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "ঐ সমস্ত দেবতাই তোমার স্থান, তাহাদের সহিত তোমরা সমস্ত ভোগ কর।" ৫।

তারপর তিনি স্ত্রীগণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। ৬ অ-১ কাণ্ড—১।

তারপর দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া ধ্যান করি, তিনি কে?।২।

যাহা দ্বারা আমরা দেখি, শুনি, গন্ধ গ্রহণ করি, কথা কহি, মিষ্ট অমিষ্টের পার্থক্য করি, মন ও হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা কি?

তিনি বলিলেন, এগুলি জ্ঞান বা আত্মার বিভিন্ন নাম মাত্র।৪।

আর জ্ঞান-সম্বলিত সেই আত্মা—ব্রহ্ম। তাহাই ইন্দ্র, তাহাই প্রজাপতি।৫।

এই-সমস্ত দেবতা জ্ঞান বা আত্মা হইতে সম্ভূত।

চরকা-সঙ্গীত—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—

* * * *

লাগাও চর্‌কা রাত্রি-দিনে তিরিশ কোটি মেলি';
লাগাও চর্‌কা গর্‌কামী সব ছেঁড়া অকাজ ফেলি';
পরাও খদ্দর ইতর ভদ্রে ঘর্‌দোর সাম্‌লাও সব—
স্ত্রীলোক মর্দ্দ লাগাও হর্দ্দম চরকামহোৎসব।
হাঁক্‌ছে সর্দ্দার খুব খবর্‌দার, মন দাও চর্‌কার কাজে,
চর্কার আহ্বান চর্কার জয়গান ঐ শোন্‌ কানে বাজে।

চর্কার গুন-গুন-গুঞ্জন লাগুক কাল্পনিকের কানে,
চর্কার ঝঙ্কার-ওঙ্কার বাজুক অধার্ম্মিকের প্রাণে ;
চর্কার টঙ্কার উঠুক বক্তা রাজনীতিকের মুখে,
চর্কার মন্তর ভুলাক অন্তর তিরিশ কোটির বুকে ;
ঘর্ঘর ডাকে ঘর ঘর ঘুরুক কর্ম্মের নূতন চাকা—
পাকে-পাকে যাক্ খুলে' আজ মোহের বাঁধন ফাঁকা ;
চাকায় চাকায় আগুন উঠুক, হাতে পড়ুক ঘাঁটা—
চোখের দৃষ্টি আসুক ফিরে, বাড়ুক বুকের পাটা !

—

বামাবোধিনী পত্রিকা (কার্ত্তিক)

শিশুর শিক্ষা ও পেষ্টালট্‌সি—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

মানসিক বৃত্তির বিকাশ ও উন্মেষ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে পেষ্টালট্‌সি এই পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রোবেল (Froebel), হার্ব্বার্ট (Herbart) ও হোরেস্ ম্যান (Horace Mann) সর্ব্বপ্রধান।

পেষ্টালট্‌সি বলেন শুধু জ্ঞানদান বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় ; বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য—শিশুর হৃদয়নিহিত ভগবদ্দত্ত শক্তির উন্মেষ-সাধন। উচ্চ নীচ, ধনী-দরিদ্র, সকলের হৃদয়েই এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। সমাজের নিম্নস্তরের লোকগণও শিক্ষাগুণে তাহাদের সেই ভগবদ্দত্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। তাই কৃষককুল যাহাতে সেই শক্তির সন্ধান পাইয়া উহার উন্মেষসাধনে যত্নপর হয়, তাহাই পেষ্টালট্‌সির জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া উঠে, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন—লিখন, পঠন ও গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ও হৃদয়ের উন্মেষ বিধান করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়া তাহার পক্ষে যত প্রয়োজনীয়। যে বিজ্ঞান কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার মূল্য অতিশয় অল্প। সুতরাং বিদ্যালয়ে গৃহ-শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান প্রদান করিয়া মৌখিক-শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করা উচিত। এবং তাহাদের কোমল চিত্তে শিশুকাল হইতেই যাহাতে জীবে প্রেম ও ভগবানে ভক্তির সুমহান্ আদর্শ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কাজেই এক কথায় বলিতে গেলে, পেষ্টালট্‌সির মতে আদ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিশুকে প্রার্থনা, চিন্তা, ও কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া (—to pray, to think and to work)।

হৃদয়ের বৃত্তির পরিচালনা এবং মস্তিষ্কের পরিচালনার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনাও আবশ্যক। সুতরাং, বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, সকল শিশুকেই যেন কোন না কোনরূপ হাতের কাজ শিক্ষা করিতে হয়।

শিশুদিগকে যে শিক্ষাই প্রদান করা হউক না কেন, তাহা সরল, সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন—"শিশুদের ইন্দ্রিয়ের উপর সাধারণতঃ যাহা অতিসহজে আঘাত করে সেই-সকল পদার্থের প্রতিই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। শিক্ষকদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশের পথে সহজ ও সরল-ভাবে সহায়তা প্রদান করা এবং তাহার বয়সের ও শক্তির তারতম্যানুসারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থসমূহ তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা। সমস্ত শিক্ষাকে তিনি "Anschauung" (sense-impression ; observation ; intuition) এই মূল ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। মনের যে শক্তির প্রভাবে মানব অপরের সাহায্য ভিন্ন অনায়াসে ও নিঃসংশয়িতরূপে বাস্তব-জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, তাহাকেই "Anschauung" বলা যাইতে পারে। মুহূর্ত্তমধ্যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ হয় তাহাই "Anschauung।" ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-সম্বন্ধে উপলব্ধি—এই দুই-ই ইহার অন্তর্গত।

মনোবৃত্তির উন্মেষের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, আদ্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুর চিন্তাশক্তি বিকাশের প্রধান অবলম্বন—তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার জীবনের বাস্তবরাজ্য যাহা তাহার হৃদয়ে কৌতূহল, আগ্রহ, আমোদ প্রভৃতি ভাব জাগাইয়া তুলে।

এই জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপারে জননী শিশুকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, এ পৃথিবীতে অপর কেহ তদ্রূপ পারেন কি না সন্দেহ। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষিত হইলেও তাঁহারা মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা হইতে বঞ্চিত। অথচ মানবশিশুর প্রথম অবস্থায় সদয় ব্যবহার, সস্নেহ যত্ন, সকরুণ দৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার যত প্রয়োজন, আর কিছুরই তত আবশ্যকতা নাই। পেষ্টালট্‌সির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ শিক্ষাকার্য্য জননীগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে যেরূপ সুফলের আশা করা যায়, শিক্ষকের হস্তে তাহা অর্পিত থাকিলে সেরূপ সুফলের আশা দুরাশামাত্র। তাই শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি যে আবেদন পত্র প্রচার করেন, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যদ্বংশধরগণ যাহাতে তাহাদের জননীর নিকট হইতে মানসিক উৎকর্ষবিধানের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ব্রহ্মার মূর্ত্তিপরিচয়—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি গান্ধার-ভাস্কর্য্যেই বোধ হয় প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধারের মূর্ত্তিসকল প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন।

সচরাচর ব্রহ্মার যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায় অথবা ধ্যান হইতে যে মূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়—তিনি চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট, দ্বিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ, রক্ত অথবা রক্তগৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং তাঁহার হস্তে অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, স্রুক্ ও স্রুব নামক দুই প্রকার যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ থাকে এবং তিনি হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ হংসই তাঁহার "বাহন"।

ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল ? ঋগ্বৈদিক যুগে বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বদর্শী ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুখ, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি ছিল অথবা এইরূপে ঋষিগণকর্ত্তৃক তিনি কল্পিত হইয়াছিলেন।

যে সকল দেবতাকে মিলাইয়া ব্রহ্মা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা একটি। অতএব বিশ্বকর্ম্মার অবয়বগুলিও ব্রহ্মা পাইয়াছেন।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায়, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তাঁহার কাজ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি (একা পারিবেন না বলিয়া) দশজন মানস ও দশজন অঙ্গজ প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। শেষ অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা। তাঁহার নানা নাম আছে, কিন্তু গায়ত্রী ও সাবিত্রী নামেই তিনি অধিক পরিচিতা। গায়ত্রী রূপে ভুবনমোহিনী ও গুণে অসামান্যা হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার এই অলোক-সামান্যা রূপবতী কন্যার প্রতি প্রথমদর্শনেই প্রণয়াসক্ত হইলেন এবং "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া নির্নিমেষ নয়নে

তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গায়ত্রী সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া পিতাকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ব্রহ্মার তাঁহাকে দেখিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায় হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। সাবিত্রী একপার্শ্বে গেলেন, সেদিকেও আর-একটি মুখ হইল; এইরূপ অপর পার্শ্বেও একটি ফুটিল। গায়ত্রী তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া আকাশে উড্ডীয়মানা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! উপরের দিকে মুখ করিয়া মাথার মাঝখানে আর-একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ার পাপে তাঁহার সৃষ্ট্যর্থ সঞ্চিত সমস্ত তপ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া জটাদ্বারা পঞ্চমমুখটি আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। মুখ চারিটি হইয়া গেল।

আবার বামনপুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইবামাত্রই কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টির ইহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না দেখিয়া নারায়ণ অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হওয়ায় শিব ও ব্রহ্মার তুমুল ঝগড়া হইল। ঝগড়া করিতে করিতে ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। শিব ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রভাগ দিয়া ব্রহ্মার পাঁচটি মাথার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। ব্রহ্মার চারিটি মুখ হইল।

তাঁহার হংস বাহন কেন হইল? ঋগ্বৈদিকযুগে বিশ্বকর্ম্মার ডানা ছিল। স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে তিনি এই ডানার সাহায্যে সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন। ব্রহ্মার কিন্তু ডানা নাই, বিশ্বকর্ম্মারও হাঁস নাই। বিশ্বকর্ম্মার এই ডানার বদলে ব্রহ্মাকে যে ডানাসংযুক্ত হাঁস বাহন করিয়া দেওয়া হয় নাই, ইহা ভাবিবার কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

স্রুক্ আর স্রুব যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ইহা কেন ব্রহ্মার হাতে দেওয়া হইল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ ঋত্বিক্ বা পুরোহিত। উপনিষদেও ব্রহ্মাকে ঋত্বিক্ বলা হইয়াছে। ঋত্বিকের কাজ যজ্ঞ করা। যজ্ঞ করিতে গেলেই যজ্ঞের উপকরণ পাত্রাদির প্রয়োজন। স্রুক্ ও স্রুব যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। তাই বোধ হয় ব্রহ্মার হস্তে এই দুইটি প্রধান পাত্র দেওয়া হইয়াছে।

তিনি পদ্মযোনি কেন হইলেন এবং কেনই বা তাঁহার হাতে অক্ষমালা আসিল? পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভি হইতে একটি সনাল কমল উত্থিত হয় এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। এইজন্য তাঁহার আর-এক নাম পদ্মযোনি। উৎপত্তি হইবামাত্র ব্রহ্মা যোগ আরম্ভ করেন। অক্ষমালা সেই যোগেরই নিদর্শন।

কিন্তু একই দেবতার মূর্ত্তি নানাপ্রকারের হয় কি করিয়া? শিল্পশাস্ত্র বলিয়া আমাদের দেশে একপ্রকার চলিত পুঁথি আছে। ইহাতে দেবতাদের মূর্ত্তি গড়িবার প্রণালী পাওয়া যায়। নানাদেশের শিল্পশাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রণালী দেওয়া আছে। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের খেয়ালে মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভক্তের ইচ্ছানুসারেও মূর্ত্তির প্রকারভেদ হইয়া থাকে। এইরূপ-ভাবে ব্রহ্মারও মূর্ত্তিভেদ সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মার যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেগুলিকে উপস্থিত নিম্নলিখিত নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক; সাবিত্রী, সরস্বতী, হাঁস কিংবা মুনিঋষি বা ভক্ত কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। তিনি শুধু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন কিংবা পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

(২) তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন হয় শুধু আসনের উপর, নয় পদ্মের উপর। এবার একা থাকিবেন না; সাবিত্রী, সরস্বতী, হংস ও ঋষি সকলেই অথবা ইঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) তিনি বসিয়া থাকিবেন; বসিবেন পদ্মের উপর। তিনি একক হইবেন; সাবিত্রী সরস্বতী ইত্যাদি পরিবারদেবতাদিগের কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

(৪) তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবারদেবতাগণের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৫) তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকিবেন। সঙ্গে পরিবারদেবতাগণের সকলেই বা এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

(৬) তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবারদেবগণ উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

(৭) এই ব্রহ্মার নাম প্রজাপতি-ব্রহ্মা। মুখ একটি থাকিবে। বামে সাবিত্রী থাকিবেন। হাঁস একেবারেই থাকিবে না।

(৮) তিনি শুধুই ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং পদ্মাসনে আসীন থাকিবেন। অপর কোনও পরিবারদেবতা উপস্থিত থাকিবেন না।

(৯) ব্রহ্মার সঙ্গে হয় নন্দী (শিবের বাহন) থাকিবে, নয় গরুড় (বিষ্ণুর বাহন) থাকিবে, না হইলে ঘোড়া (সূর্য্যের বাহন) থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্য পরিবার-দেবতারা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, না থাকিতেও পারেন।

ইহা ছাড়া ব্রহ্মার কোন মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করা যায়। যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাণ। যেমন, ব্রহ্মার দুইহাত-ওয়ালা মূর্ত্তি চারিহাত-ওয়ালার চাইতে পুরাণ। যে ব্রহ্মার একমুখে দাড়ি তাহা আর একটু নূতন; যে মূর্ত্তির চারিমুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। যে মূর্ত্তিতে কারুকার্য্য যত কম, সে মূর্ত্তি তত পুরাণ। খৃষ্টীয় দশম শতকের পর ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সব মুখেই দাড়ি আছে। এইরূপ অবয়ব দেখিয়াই সকল সময়ে মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করা নিরাপদ নহে। যেমন আমরা জানি গান্ধার ভাস্কর্য্য খুব পুরাতন। ইহাতে যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই বৌদ্ধ। ইহারই মধ্যে একটিতে ব্রহ্মার প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখে দাড়ি আছে। তাই বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ১০ম শতাব্দীতে তোলা উচিত নহে।

এককালে ব্রহ্মার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল, এককালে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার উদ্দেশ্যে বিরাটকায় মন্দিরও তৈয়ারী করিতেন। বৌদ্ধদের উপদ্রবেই হউক বা শিবের অভ্যুত্থানেই হউক, তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব সমস্তই প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের গর্ভাগারে (Sanctum Sanctorium) থাকে না; এখন তাঁহার মূর্ত্তি শোভা-বৃদ্ধির জন্য মন্দিরে স্থান পায়—কখনও দেওয়ালে, কখনও দরজার পার্শ্বে, কখনও আলিসার নীচে, চাতালে, আনাচে কানাচে তাঁহার স্থান। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার মন্দির একেবারেই নাই? আছে। পুষ্করতীর্থে সাবিত্রী-পাহাড়ের উপর যে শাদা মন্দিরটি আছে, সেটি ব্রহ্মার। বুন্দেলখণ্ডের দুতাহি নামক গ্রামে কানিংহাম একটি খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির পান। তারপর রাজপুতানার বসন্তগড় নামক স্থানে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। ধারওয়ার জেলায় অন্ততঃ নয়টি ব্রহ্মার মন্দির আছে। সব চাইতে বড়, কারুকার্য্য-খচিত একটি মন্দির ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়ব্রহ্ম নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এখানে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুধু ব্রহ্মারই

পূজা করিয়া আসিতেছেন, অন্ত দেবতার পূজা কখনও করেন না। শুধু তাহাই নহে, রূপমণ্ডন নামক একখানি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিক শিল্পগ্রন্থে ব্রহ্মার মন্দির গড়িবার প্রণালী, আয়তন ইত্যাদি দেওয়া আছে। ব্রহ্মার পূর্ব্বগৌরবের এইগুলিই নিদর্শন।

—

সন্দেশ (অগ্রহায়ণ)

বুড়ি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চর্‌কা-কাটা বুড়ি
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাত শো হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে
হয় না বুনন্ সারা,
পণ ছিল তার ধর্‌বে জালে
লক্ষ কোটি তারা।
হেন কালে কখন্ আঁখি
পড়্‌ল ঘুমে ঢুলে।
স্বপনে তার বয়সখানা
বেবাক্ গেল ভুলে।
মায়ের কোলে নাম্‌ল এসে
পথ-হারা উদাসী,
সঙ্গে কেবল নিয়ে এল
পর্ণ চাঁদের হাসি।
সন্ধ্যা বেলায় আকাশ চেয়ে
কি তার মনে আসে,
চাঁদকে করে ডাকাডাকি
চাঁদ শুনে তাই হাসে।
যে-পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপ্নসাগর-তীরে
দু'হাত তুলে সে পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।
হেনকালে মায়ের মুখে
যেম্‌নি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্ষণি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা,—
এল কি পথ বেয়ে,
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই
আদ্যি কালের মেয়ে।
বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি',—
পাড়ার লোকে সবাই ডাকে
বুড়ি, বুড়ি, বুড়ি।
সব চেয়ে যে পুরোণো, সে
কোন্ মন্ত্রের বলে
সব চেয়ে আজ নতুন হয়ে
নাম্‌ল ধরাতলে"

নারী

বহু যুগ আগে যদি স্বপ্ন হয়ে যেতে কায়া ছাড়ি',
পুরুষের হৃদিমাঝে রহিতে ছড়ায়ে, ওগো নারী,
ওই গাঢ় আলিঙ্গন, ওই দৃষ্টি, হাসি, ওই বুক,
সুধাবিষ-পূর্ণ তপ্ত অধরের ও চুম্বনটুক
নিঃশেষে বিলায়ে দিয়ে অদৃশ্য হইতে কভু তুমি,—
তোমার প্রেমেতে তবে মাতিয়া উঠিত ধরা-ভূমি।
অনন্ত অক্ষয় তব সৌন্দর্য্যের পানে যেত ছুটি',
লক্ষ্য করি' মহাকাশে যেথা ফুটে আছে চক্ষু দুটি
প্রণয়ের পবিত্রতা মাখা, সর্ব্ব-দুঃখ-ব্যথা-হরা,
প্রেম যেত সেই রাজ্যে নাহি যেথা রোগ শোক জরা,
বিরাজিত অনন্ত যৌবন।—ওই দেখ ছুটে যায়
কারা সব কিসের পশ্চাতে, চক্ষুহীন অন্ধপ্রায়,—
প্রেমে দিয়া বিসর্জ্জন, বাসনারে দেখে বড় করি';
আলোক চলিয়া গেছে, অন্ধকারে রহিয়াছে ভরি'
হৃদয়ের বর্ণগন্ধআলোময় সুন্দর গগন;—
যে কুৎসিত পঙ্কগর্ভে নিত্যকাল আছে নিমগন
সেখান হইতে সবে কার সাধ্য করিবে উদ্ধার?
কার সাধ্য বিষাক্ত সে হৃদয়েরে করে আপনার,
হে নারী, তোমার সেই শুভ, পুণ্য, দিব্য প্রেম ছাড়া?
কোথায় তোমার স্থান,—কোনদিন ভাবে নাই যারা
তাদের সম্মুখ হ'তে দূরে নাও দেহ;—এস নামি'
অশরীরী রূপে আজি, ঘিরে থাক সর্ব্ব দিনযামী
স্নেহ, প্রেম, দয়া রূপে।—হে কল্যাণী, সাজে না তোমা
মরীচিকা-মুগ্ধ প্রাণ মোহপাশে টানি' বারম্বার
লালসার বহ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপিয়া দগ্ধ করা তারে।
তুমি আর কিছু নও, শুধু প্রেম,—মুক্ত করিবারে
বিশ্বেরে যতেক গ্লানি হতে।—ওই তনু দেহলতা
প্রকাশ করিছে শুধু নারীত্বের অন্তরের কথা—
"আছে প্রেম, আছে স্নেহ, আছে দয়া, আছে শুধু প্রীতি
ও কাজল দৃষ্টি যেন কোন্ সুখস্বরগের স্মৃতি,
ওই হাসি, ও চুম্বন, মুছে নেয় দুঃখ শোক ভয়,
এই শুধু আছে তব; নয়, নয়, আর কিছু নয়!

শ্রীগণেশচরণ বসু।



গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন

বিগত কার্ত্তিকমাসের "প্রবাসী"র ১৩০ পৃষ্ঠায় সম্পাদক লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের গ্রাম্যস্বায়ত্তশাসনবিষয়ক ১৯১৯ সালের ৫ আইন সম্বন্ধে আমাদের অনেকের কোন জ্ঞান নাই। জ্ঞান থাকা উচিত। উহার বাংলা অনুবাদ কিনিতে পাওয়া যায়। উহার সপক্ষে যাহা বলা যাইতে পারে ৩৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য আইনটি প্রকাশিত করিয়াছেন।"

আমরা উক্ত উভয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত আইনটি আজও দেখি নাই। কিন্তু মহেশপুর রাজ-এষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী, এম এ, বি এল, মহাশয়ের অনুবাদিত "বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন"খানি দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি অতি সরল প্রাঞ্জল এবং সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ঐ আইনটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, ইউনিয়ন বেঞ্চের বিচারকগণ আইনের যে-সকল ধারা অনুসারে মোকর্দ্দমার বিচার করিতে পারিবেন সেই-সকল ধারা টীকা সম্বলিত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উক্ত আইনের অধীনে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে-সকল নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে তাহা ও বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। ফলতঃ বসন্ত-বাবু সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় এই আইন-বহিখানি সর্ব্বপ্রথমে লিখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

তিনি "ভারতশাসন সংস্কার আইন" নামে Reforms Actএর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবং সাধারণের বিস্তর উপকারসাধন করিয়াছেন।

এই উভয় আইনের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আইনগুলি যে কি তাহা জানা সকলেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। সুতরাং আমরা দেশবাসীগণকে উহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীশিবচন্দ্র সিংহ।

—

৺ রঘুনাথ শিরোমণি

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে "বেতালের বৈঠকে" ৺ রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে "বৈদিক-সংবাদিনী" নামক এক কুলগ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। "বৈদিক-সংবাদিনীর" কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—এবং উহা কতদূর প্রাচীন তাহাও বিচার্য্য বিষয়। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় উহা রচনা করেন। পরে তাঁহার সমাজের কতিপয় ব্যক্তি উহাকে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক কুলগ্রন্থরূপে চালাইবার চেষ্টা করেন। উহা মুদ্রিত হইয়া আজও লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই এবং কেহ উহার হস্তলিপি চাহিলেও খুঁজিয়া পান না। তবে অচ্যুতবাবুর "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" উহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে বটে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনুকরণে উহাতেও আদিশূরের স্থানে "আদিধর্ম্মকা" নামক এক অনৈতিহাসিক ত্রৈপুর নৃপতি ও "পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ" "যজ্ঞ" ইত্যাদি খাড়া করা হইয়াছে। উহাতে যে দানপত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাকে ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ "ভাহা জাল" (ঢাকা রিভিউ দ্রষ্টব্য) বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীহট্ট বৈদিক সমাজের সত্যনিষ্ঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণেরাও উক্ত গ্রন্থে লিখিত "পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ" ইত্যাদির উপাখ্যান স্বীকার করেন না। রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টের লোক ছিলেন—ইহা আমরা ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—খুব সম্ভব তাহা সত্য। কিন্তু ইহার স্বপক্ষে "বৈদিকসংবাদিনী" বা পাঁচ গাঁওএর কাত্যায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহাতে আস্থা-স্থাপন করিবার মতন কিছুই নাই। কাত্যায়নবংশে ৺ রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলবীবাজার মুন্সেফ কোর্টে এক মোকদ্দমায় একবার তাঁহার স্বহস্তলিখিত বংশতালিকা প্রয়োজনীয় দলিলস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায় রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই। রঘুনাথ শিরোমণি স্ববংশীয় হইলে উক্ত সার্ব্বভৌমের ন্যায় পণ্ডিত কি তাহা জানিতেন না? এ সকল বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে চান, তাঁহারা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি-এ, বি-টিকে লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। উপেন্দ্রবাবু স্কুলপরিদর্শক রাজকর্ম্মচারীরূপে শ্রীহট্ট-সাম্প্রদায়িক বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের কেন্দ্রস্থান মৌলবীবাজারে দীর্ঘকাল থাকিয়া এতৎসম্পর্কিত বহু সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করতঃ "ঢাকা রিভিউ" ও "প্রতিভা" পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা জানি, আজ পর্য্যন্ত কেহই উপেন্দ্র-বাবুর ঐ-সকল প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই।

শ্রীরামদয়াল চক্রবর্ত্তী।

—

বিবাহ-বার্ত্তা

গত শ্রাবণ মাসের বিবাহবার্ত্তা প্রবন্ধের ৫৩৬ পৃষ্ঠায় ১ম কলমের ৬ লাইনের পরই লিখিত আছে, "আসামে নিয়ম আছে স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও যদি নারী সন্তান প্রসব করে তবে সে সন্তান স্বামীর নামেই পরিচিত হইবে।" কিন্তু আসামে এমন নিয়ম কোথাও চলিত নাই। একথাটার আমি দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করিতেছি।

শ্রীগোলোক চন্দ্র।

—

ঔরাংজেবের ফর্ম্মান

প্রবাসীতে ঔরাংজেবের যে ফর্ম্মানের বিষয় লেখা হইয়াছিল (শ্রাবণের প্রবাসী) তাহার প্রকৃত স্বরূপ অধ্যাপকপ্রবর যদুনাথ সরকার মহাশয় আশ্বিনের প্রবাসীতে দিয়াছেন। সুতরাং তাহার দ্বারা ঔরাংজেবের "কলঙ্ক মোচন" করা যায় না। তবে যে কারণে ঐ ফর্ম্মানে আস্থা স্থাপন করা হইয়াছিল তাহার জন্য ও নিজেকে সুস্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার।

(ক) অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় Journal of the Asciatic Societyতে (Vol. 2, No. 6, 1906) ঔরাংজেবের দুইখানি ফর্ম্মানের অনুবাদ করেন; তাহাতে সম্রাট্ রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে সায়েস্তা খাঁকে কতকগুলি উপদেশ দ্যান্; ইহা হইতে বোঝা যায় যে ঔরাংজেবকে যতটা মন্দ বলিয়া মনে করা হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে ততটা নন। বরং সুশাসনের দিকে চেষ্টিত ছিলেন।

(খ) মুঘলযুগে যে কোন ব্যক্তি মস্‌জিদ তৈরী করিয়া সেই মস্‌জিদ পাদিশা'র দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া প্রচার করিতে পারিতেন। ইহার দ্বারা পাদিশাহকে সম্মান করা হইত। অতএব এইরূপ অনুমান আসিতে পারে যে কাশীর জ্ঞানবাপী ও পঞ্চগঙ্গায় উপরকার মস্‌জিদ বা আলমগীরি মস্‌জিদ ঔরাংজেবের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। আর এক কারণ এই যে, এই-সকল মস্‌জিদ খুব সামান্য রকমের স্থাপত্যের আদর্শ এবং এগুলি আকারেও ছোট। দিল্লী-আগ্রার বড় বড় মস্‌জিদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য মোটেই নাই। অতএব এইরূপ অনুমান হয় যে এইরকম হীন মস্‌জিদ পাদিশাহ্‌ দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই।

(গ) কানিংহামের মতে জহাঙ্গীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন। (*Vide* Archaeological Survey Reports) ইহা কি ভ্রান্ত? এই বিশ্বেশ্বরের মন্দির কোন্ বিশ্বেশ্বরের মন্দির?

(ঘ) কাফি খাঁর ইতিহাসকে মূল্যবান্ বলা যায় না। অধ্যাপক-প্রবর সরকার মহাশয় কাফি খাঁকে একস্থানে "gossipy" ও "outspoken" বলিয়াছেন। অধ্যাপকপ্রবরের মতে কাফি খাঁর ইতিহাস "........a gossipy and unreliable work which enjoys an undeserved reputation among European scholars on account of its pleasant style and arrangement and freedom from dryness of treatment, characteristic of Persian annals."

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রাবণের প্রবন্ধটি "ঔরাংজেবের একখানা চিঠি" নামে পাঠান হইয়াছিল। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় তাহা "ঔরাংজেবের কলঙ্ক মোচন" নামে প্রকাশিত করেন।

অরুণ দত্ত।

—

বাংলার ইতিহাস

আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমার ইতিহাসালোচনার পথপ্রদর্শক গুরু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যে বিতর্ক চলিতেছে তাহার সহিত আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জড়িত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। দুইজনেরই অল্পাধিক ভ্রম হইতে এই অপ্রীতিকর বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। ঢাকা রিভিউ পত্রে যখন বিজয় বাবুর প্রবন্ধ বাহির হয় তখন সেই প্রবন্ধে বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য থাকায় আমি তাহা অমূল্য-বাবুকে দেখাই। অমূল্য-বাবু পড়িবামাত্র সেই প্রবন্ধের কতকগুলি ভুল আমাকে দেখাইয়া বলেন যে "বিজয়-বাবু খুব সুপণ্ডিত ব্যক্তি। দৃষ্টিহীনতার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। তিনি নিজে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া করিতে পারিলে যেরূপ সাবধানতার সহিত গবেষণা করিতেন, এইসব সাহায্যকারীগণ সম্ভবত সেরূপ সাবধান নয়। তাই অনেকগুলি ভুল দেখিতেছি যথা Bong-long বানান ভুল।" তিনি তখনই Gerini, Des Michels, Deveria প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের পুস্তক আনিয়া আমাকে দেখান যে সেই পুস্তকে Vanlang অথবা Vanlan এই বানান আছে। এই ঘট হইতেই বুঝা যাইতেছে বিজয়-বাবুর প্রবন্ধের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞ হইবার পূর্ব্ব হইতেই "বন্-লাঙে"র সংবাদ অমূল্য-বাবুর জানা ছিল অন্যান্য আরও বানান ভুলও সেই সময় তিনি আমাকে দেখান এ ব্যাকরণগত কতকগুলি আলোচনা সম্বন্ধে অমূল্য-বাবু বিজয়-ব হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন এমন কথাও বলেন। তাহাতে আ অমূল্য-বাবুকে একটি প্রতিবাদ লিপি.ত অনুরোধ করি। আমার বিশ ছিল যে দুইজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে এরূপ আলোচনা শুভফলপ্র হইবে। অমূল্য-বাবু বলেন যে, খণ্ড খণ্ড আলোচনায় ফল নাই; সক গুলি প্রবন্ধ বাহির হইলে পর তিনি প্রতিবাদ লিখিবেন স্বীকার করেন সেই সংবাদটি আমি বিজয়-বাবুকে জানাই। তাহার পর ঢা রিভিউতে বিজয়-বাবুর প্রবন্ধ আর প্রকাশিত হয় নাই। এবং সেজ তাহা লইয়া আর কোনও আলোচনা হয় নাই। প্রায় তিন বৎস পূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা করার ক অমূল্য-বাবুর স্মরণে না থাকিতে পারে। থাকিলে তাহার উল্লে করিয়া ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়া Gerini প্রভৃতির উল্লেখ করিলে অমূল বাবুর কোনও অগৌরবের কারণ ঘটিত না। বিজয়বাবুর ও ভুলগুলিও বিজয়-বাবুর পাণ্ডিত্যের অভাবজনিত নয়, সাহায্যকারী অনবধানতারই পরিচায়ক।

এক্ষেত্রে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া বিজয়-বাবু আ একটি ভুল করিয়াছেন যাহার ফলে অমূল্য বাবুর প্রতি অত্যন্ত অন্যা দোষারোপ করা হইয়াছে। বিজয়-বাবু বলিতেছেন—'বিদ্যাভূষণ মহাশ যে বলিয়াছেন পঙ্গল তিরিয়র ও চেরদিগের বঙ্গ হইতে আগমনের কথ কনকসভই লিখিত "The Tamils Eighteen Hundred Years Ago" পুস্তক হইতে জানা যায়, তাহা ঠিক কথা নহে। ওঁ পুস্তকে এরূপ কোন কথাই নাই।' অমূল্য-বাবুর কথা সঠিক ব ইহা বলিবার পূর্ব্বে বিজয়-বাবুর আর-একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল অপরের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময় ভুল করিতে হয়। কনক সভয়ের পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠা একবার উল্টাইয়া দেখিলেই দেখা যাইতে যে অমূল্য-বাবুর কথাই ঠিক। বিজয়-বাবু যাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া অমূল্য-বাবুর প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের অসাবধানতায় বিজয়-বাবু অমূল্য-বাবুর প্রতি একটি গুরু অভিযোগ করিয়াছেন, অথচ তাহার কোনো ভিত্তিই নাই, ভুল করিয়াছেন নিজেই। তোওলমওলপদ্দয়ম ও চিলপ্পতিকারম তামিল গ্রন্থ। এই দুইখানি বই আমরা অমূল্য-বাবুর নিকট দেখিয়াছি। অমূল্যবাবু তাহাতে যে স্থানে পঙ্গলতিরিয়রের কথা আছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। আমি তামিল-ভাষাভিজ্ঞ নহি। তথাপি অক্ষর-পরিচয় করাইয়া আমাদের বহু বন্ধুকে অমূল্য-বাবু দেখাইয়াছেন যে এসব পুস্তকে পঙ্গল প্রভৃতির উল্লেখ ও বিবরণ আছে। এ স্থানেও বিজয় বাবুর অসাবধানে ভুল হওয়াতে অমূল্য-বাবুর প্রতি তিনি অন্যায় করিয়াছেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

উবট্ সায়ণ ও গ্রিফিতাদির বেদব্যাখ্যা

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে কি প্রকারে অধঃপাতিত করে, তাহা মানুষ বুঝে না, বুঝিলে আজি জগদ্বরেণ্য ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কেবল যে বেদই অপৌরুষেয় তাহা নহে, এখন শঙ্কর, উবট ও সায়ণভাষ্য এবং পাশ্চাত্যগণের অনুবাদও অপৌরুষেয় হইতে চলিল!

কিন্তু এ মত কাহাদিগের? যে-সকল তথাস্তুবাদী যুবক, বেদ গোল কি চেপ্টা, সাকার কি নিরাকার ইহাও জানেন না, এ অভিমত তাঁহাদিগেরই!

সংপ্রতি, কাশী, হাবড়া ও কলিকাতা হইতে বেদ প্রকাশিত হইতেছে। তিন জনেরই পন্থা পৃথক্। আমি ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবারের হিতবাদীতে "বেদবিষয়ে বিচার প্রার্থনা" নামে একখানি পত্র ছাপাইয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমার অরণ্যরোদনে কর্ণপাত করিলেন না। কেন? সত্য ও মত কি কখন একটি ভিন্ন দুইটি হইতে পারে? শ্রদ্ধাভাজন দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের মতে বেদের সকল মন্ত্রই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। আমরা মনে করি যে বেদ যেন—প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থ। যদি বেদমন্ত্র-সকল কেবল অধ্যাত্মজগৎ লইয়া বিরচিত হইত, তাহা হইলে গীতাপ্রণেতা পদ্মনাভ ঋষি কেন বলিতেছেন যে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ, মা ত্রৈগুণ্যোভবার্জুন।

যদি বেদ কেবল অধ্যাত্মজগৎ লইয়া প্রাদুর্ভূত হইত, তাহা হইলে কি চারিবেদ ও ইহাদের ছয় অঙ্গকে "অপরাবিদ্যা" বলিয়া মুণ্ডকোপনিষৎ, সংসূচিত করিতেন? আমরা আমাদিগের উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য কেবল দুইটা মন্ত্রের দুইটি চরণের ভাষ্য লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইব যে কি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, কি আচার্য্য সায়ণাদির ভাষ্য, কিছুই সমীচীন হইতেছিল না। এখন আবার সকলই ঢালিয়া সাজা আবশ্যক।

প্রশ্ন পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ,
পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ। ৬১।২৩অ। যজুঃ
৩৪।১৬৪ সূ। ১ম। ঋক্

উত্তর ইয়ং বেদী পরমন্তঃ পৃথিব্যাঃ,
অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ॥ ৬২। ২৩ অ যজুঃ।
৩৫। ১৬৪ সূ। ১ম। ঋক্

ইহার বঙ্গানুবাদ ইহাই যে—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা কি? তোমাকে আমি ইহাও জিজ্ঞাসা করি যে এই ভূমণ্ডলের নাভি কোথায়? উত্তরে বলা হইল যে—এই বেদীই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা, আর এই সর্ব্বজনপরিচিত যজ্ঞই ভুবনের নাভি। বেদী কি? বেদী ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গোলিয়া), ইহা তৎকালে আশিয়ার শেষ উত্তর সীমা ছিল। কেননা তখন সাইবেরিয়া (ত্রিদিব, সংবৎসর, অহঃ, রাত্রি ও সত্য বা ঋতলোক, ১।২।৩—১৯০ সূ ১০ম দেখ) স্থলে পরিণত হয় নাই। কাজেই ইলাবৃতবর্ষ তখন পৃথিবীর উত্তর বেদী বা শেষ সীমা ছিল। (ইলায়াস্পদং যৎ উত্তর বেদী নাভিঃ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।২৯।৩ম ভাষ্য দেখ)। কিন্তু

—"অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ"—

ইহা লইয়াই উবট সায়ণ, মহীধর, দয়ানন্দ ও গ্রীফিতের সহিত আমাদিগের মতদ্বৈধ।

পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।

১। তত্র উবটঃ—পৃচ্ছামি চ যত্র ভুবনস্য নাভিঃ—"নহনং"।
২। মহীধরঃ—যত্র যস্মিন্ স্থলে ভুবনস্য ভূতজাতস্য নাভিঃ কারণং।
৩। সায়ণঃ—যত্র ভুবনস্য ভূতজাতস্য নাভিঃ সন্নাহো বন্ধনং যত্র সর্ব্বং সন্নদ্ধং ভবতি।
৪। দয়ানন্দভাষ্যং—পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য লোকসমূহস্য নাভিঃ বন্ধনং।
৫। রমেশচন্দ্র দত্ত—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ভূতজগতের নাভি কোথায়?
৬। গ্রীফিতানুবাদ—Where is the centre of the world পৃথিবীর মধ্যস্থান কোথায়?

(নাভি—মধ্যস্থান)

This sacrifice of ours is the world's centre—
আমাদিগের যজ্ঞই পৃথিবীর মধ্যস্থান।

এখন সাক্কেল-বিবেকবান্ পাঠকগণ বলুন দেখি তাঁহারা এইসকল ভাষ্য ও অনুবাদ পাঠ করিয়া কি বোধগম্য করিলেন? নহনং, কারণং, সন্নাহ, বন্ধনং, ইহার খোলাখুলি অর্থটা কি? এখানে নাভি শব্দের কি পদার্থগ্রহ করিতে হইবে? নাই (Neval)? যেখানে পৃথিবীর সকল লোকের বন্ধন হয়, তাহার নাম নাভি, দয়ানন্দাদির একথার ভাবার্থ কি? ফলতঃ কেহই নাভি শব্দের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া কেবল যা-তা লিখিয়া গোঁজামেলন দিয়া গিয়াছেন।

তৎপর—শেষ চরণের ভাষ্য করিতে যাইয়া সায়ণাদি বলিতেছেন যে—

১। উবটঃ—অয়ঞ্চ যজ্ঞঃ ভুবনস্য নাভিঃ নহনং। যজ্ঞাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি শ্রুতেঃ।
২। মহীধরঃ—অয়ং যজ্ঞঃ অশ্বমেধঃ ভুবনস্য প্রাণিজাতস্য নাভিঃ কারণং।
৩। সায়ণঃ—অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য ভূতজাতস্য নাভিঃ সংনহনং তত্রৈব বৃষ্ট্যাদি সর্ব্বফলোৎপত্তেঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং বন্ধকত্বাৎ।
৪। দয়ানন্দঃ—অয়ং যজ্ঞঃ যষ্টুং সংগন্তুং অর্হঃ সূর্য্যঃ ভুবনস্য ভূগোলসমূহস্য নাভিঃ আকর্ষণেন বন্ধনং।
৫। রমেশচন্দ্র—এই যজ্ঞই ভূতজগতের নাভিভূত।

ফলতঃ এই মন্ত্রে যে নাভি ও যজ্ঞ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অর্থ ইঁহারা কেহই বুঝিতে পারেন নাই ও না পারিয়াও বাজেকথা বলিয়া সকলকে ধোকা দিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই নাভি শব্দের অর্থ এখানে উৎপত্তি ও উৎপত্তিস্থান, এবং যজ্ঞশব্দের অর্থ আদিস্বর্গ স্তো বা মঙ্গোলিয়া যাহা মানবের আদি জন্মভূমি।

অবশ্য কেহ কেহ আমাদিগের ভারতবর্ষকে মানবের আদি জন্মভূমি লিখিয়া Ph. D. উপাধি লভিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে

যথা দেবো বাহনং তস্য তাদৃক্

এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়া আমরা তূষ্ণীং অবলম্বন করিয়াছি। ৩৩।১৬৪।১ম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় স্বয়ং যাস্ক মহাশয়—নাভিঃ সন্নহনাৎ নাভ্যা সন্নদ্ধা গর্ভা জায়ন্তে (৭৯৮ পৃ প্রথম নিরুক্ত) এই মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া সায়ণ উবট ও দয়ানন্দকে কুপথগামী করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ নাভি শব্দের প্রকৃতার্থ প্রকটনে সায়ণ বহুস্থানেই প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

১। দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র।
অত্র সায়ণঃ—অত্রভিরত্র নাভিভূতো দ্যৌরসঃ।
২। সা দ্যৌরস্মাকং পরমা নাভিঃ—গদিকা। ১৮।৬১। ১০ম

৩। ইয়ং তে নাভিঃ। নাভিঃ সন্নাহনী। ১৯। ৬১। ১০ম

এখন কেহ এই সায়ণভাষ্যের প্রকৃতার্থ বুঝাইতে পারিলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ফলতঃ কেবল যজুর্ব্বেদের এক ঋষি ও একজন সায়ণশিষ্যই এই নাভিশব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্ষত্রস্য যোনিঃ ক্ষত্রস্য নাভিঃ। ৮। ১০অ। যজুঃ

এখানে একত্র যোনি ও নাভি শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে ঋষি এখানে যোনি বা উৎপত্তি অর্থে নাভি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তথাহি ঋগ্বেদভাষ্যং—সা নো নাভিঃ। তত্র সায়ণভাষ্যং—

সা সরণ্যুঃ নঃ আবয়োঃ নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং।৪।১০।১০ম

আমরা সায়ণশিষ্যবিশেষের এই অর্থই সর্ব্বথা সুসঙ্গত মনে করি। মন্বাদিস্মৃতিতেও বহুস্থলে "সনাভি" শব্দের প্রয়োগ আছে। বলাবাহুল্য কুল্লুকাদি তথায় "সনাভয়ঃ সোদর্য্যাঃ" লিখিয়া রেহাই লইয়াছেন, ধরা দেন নাই। বৈদিক কোষ নিঘণ্টু নাভি শব্দের পাড়ায়ও যান নাই। এমন কি নাভি শব্দের অর্থ যে উৎপত্তি ও উৎপত্তিস্থান, তিনি তাহা অবগতও ছিলেন না।

একথা সত্য যে নাভি শব্দের একটি বন্ধনার্থও আছে। যথা—

অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্য। ২৩,২৯ অ

ছাগ অগ্রভাগে তাহার নাভি বা হাড়িকাষ্ঠে নীত হইতেছে। সুতরাং এখানে নাভি শব্দের অর্থ, বন্ধনস্থান বা বধ্যভূমি, যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু প্রস্তুত মন্ত্রের নাভি যে উৎপত্তি বা উৎপত্তিস্থান, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেননা যজ্ঞ বা আদি স্বর্গ দ্যো বা মঙ্গোলিয়া মানবের নাভি বা আদি উৎপত্তিস্থান ছিল। তাই যজুর্ব্বেদের এক ঋষি বলিতেছিলেন যে—

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং
কো দ্যাবাপৃথিবী কো অন্তরিক্ষং। ৫৯। ২৩ অ

এই জগতের সকল মনুষ্যাদির নাভি বা আদি সূতিকাগারের নাম কি তাহা কে জানে? না জানার জন্যই কেহ বলেন ইরাণ পিতৃভূমি, কেহ বা বলেন ভারতবর্ষ, কেহ বা বলেন উত্তরকুরু।

অতঃপর আমরা যজ্ঞ শব্দের অর্থ যে স্বর্গ তাহা দেখাইব। ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

যশ্চিৎ আপো মহিমা পর্য্যপশ্যৎ।
দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞং।৮।১২১।১০ম

যে পরমেশ্বর দেখিলেন যে তাঁহার সৃষ্ট জলরাশি তাঁহার মহিমার মহাশক্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞকে উৎপাদন করিল।

সমুদ্রগর্ভপ্রভব এই যজ্ঞ কি? শ্রুতি বলিলেন যে—

যজ্ঞো বৈ স্বঃ। ১১। ১ অ, যজুর্ভাষ্য

যজ্ঞই স্বঃ বা স্বর্গ। তথা হি—উবটধৃত শ্রুতিঃ—যজ্ঞাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। ৬২। ২৩অ ভাষ্য

যজ্ঞ বা স্বর্গ জনপদ হইতেই প্রজা-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তথাহি ঋগ্বেদঃ—

যো যজ্ঞো বিশ্বত স্তন্তুভি স্ততঃ। ১। ১৩০। ১০ম

যে যজ্ঞ বা স্বর্গ চারিদিকে মানববংশের বিস্তার করিয়াছেন।

যজ্ঞো বিশঃ। ৮। ৭। ৩। ৩১ শতপথ ব্রাহ্মণ

বিশ্ বা প্রজা সকল যজ্ঞ হইতেই সমুৎপন্ন।

এইজন্যই ঋষি বলিতেছিলেন যে—অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। আমরা মনে করি যে এই চরণদ্বয়ের প্রকৃতার্থ ইহাই—

প্র	পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ
উ	অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।

প্রকৃতার্থবাহিনী—অহং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, যত্র যস্মিন্ জনপদে স্থানে ভুবনস্য ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বেষাং মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদীনাং নাভিঃ উৎপত্তির্ভূয তৎস্থানং কিং?

অয়ং সর্ব্বজনপরিচিতঃ যজ্ঞঃ আদিস্বর্গো দ্যোঃ (মঙ্গোলিয়া) ভুবনস্য ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বেষাং মনুষ্যাদীনাং প্রাণীং নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং। উক্তঞ্চ ঋচি ইলা ইলাবৃতবর্ষং মঙ্গো জনপদঃ (মঙ্গলিয়া) যূথস্য মনুষ্যাদীনাং মিথুনানাং মাতা মাতৃভূমিঃ আদ্যোৎপত্তিস্থানং। (অভি নঃ ইলা যূথস্য মাতা। ১১। ৪১। ৫ম)।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ভূমণ্ডলের সকল মনুষ্য ও পশু-পক্ষ্যাদির আদি উৎপত্তি কোন স্থানে হইয়াছে? এই সর্ব্বজনপরিচিত যজ্ঞপ্রধান আদি স্বর্গ মঙ্গোলিয়াই মানবের আদি উৎপত্তিস্থান।

তথাপি কেহ বলেন ইরাণ, কেহ বলেন ককেশশের পাদদেশ, কেহ বা বলেন উত্তর কুরু, বাক্‌ট্রিয়া, আমু বা জাক্‌জাকটাস নদীর পুলিন-দেশ, কেহ বা বলেন মিশর, কেহ বা বলেন বাল্‌টিক-বেলা, কেহ বা বলেন ভারতবর্ষ।

অতঃপর আমি আনতকন্ধরে প্রার্থনা করি, যদি কেহ আমার ব্যাখ্যার দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক উবট, সায়ণ, দয়ানন্দ, মহীধর ও গ্রীফিতের ব্যাখ্যা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দিব। এবং তেষাং বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ তাঁহাদিগের পা ধুইবার জল আমি খাপরাতে করিয়া বহন করিয়া দিব। কেহ এমন সুবর্ণসুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। এ পুরস্কার নগদ দস্ত্ বদস্ত্ বুঝাইয়া দিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আভ্যুদয়িক

আমি বসে' আছি আর, আমার যৌবন
স্তব্ধ হয়ে বসে' আছে, তনু প্রাণ মন
পূজা-উপচার লয়ে' মাঝপথে দাঁড়ায়েছে ফিরে;
ধ্বনিছে বোধন-শঙ্খ উৎসব-মন্দিরে।
কে গো তুমি সাথে নাই, কে তুমি গো কাঙালের মত
অবহেলা অনাদরে মৌন মর্ম্মাহত
আজি এই স্তব্ধ অন্ধকারে
ফিরিতেছ পথে পথে দ্বার হতে দ্বারে
একটু স্নেহের কণা মাগি';
আজি এ উৎসব-রাতে কাঁদে প্রাণ তোমারই লাগি'।
হায় রে, বলিতে বাসি লাজ,
তোমারই ভবনে জুড়ি কত যে উৎসব নিতি
তোমারেই ভুলি মহারাজ!
এসো আজি খোলা সব দ্বার,
হে চিরকালের সাথী, অচেনা সর্ব্বস্ব মোর,
অভিমানী হে রাজা আমার,

না না, ও জলুক বাতি, দুলুক ফুলের মালা,
আর যারা আছে থাক্ সব,
না না, দেরি করিয়ো না, যৌবন-উৎসবে এসো,
তোমা ছাড়া জমে না উৎসব।

যৌবন রবে না যবে, খসা পাতা, ঝরে'-পড়া ফুলে
কেমনে পরাণ ধরে' ওদুটি অতুল তব
রাতুল চরণে দেব তুলে ?
বাসি প্রেম নিবেদন, মুছে-যাওয়া আলিপনা,
দগ্ধবুক ক্লান্ত ক্লিন্ন বাতি
রবে কি তোমার লাগি' ; ফুরাইলে উৎসবের রাতি
তখন বরিব ঘরে উৎসব-রাজারে ?
তুমি সে পূজারে
জানি পায়ে ঠেলিবে না, কাছে এসে চেয়ে লবে হেসে
যাকিছু পড়িয়া রবে সবাকার শেষে,
সকল দাবীর অবসানে। তবু মন মানে না যে !
মনে মনে মরিবে সে লাজে
শ্রান্ত ক্লান্ত জরাজীর্ণ দেহমন টানিয়া টানিয়া
তোমার চুম্বনবাগ্র দুখানি অধরতলে নিয়া
রাখিতে বিশীর্ণ গণ্ড, স্তিমিত পাণ্ডুর আঁখি,
বলিরেখা-কুঞ্চিত ললাট !
আজিকে জ্বলিছে আলো, পুষ্পিয়াছে কোটি তরু,
এসো তুমি এসো হে সম্রাট
আমার জীবন-মহোৎসবে,
নহে দাগা চিরদিন রবে !
যৌবন ত আসিবে না ফিরে,
হয়ত বা দেখা পাব, চরণ-পরশ পাব শিরে,
সে আমার রাজটীকা ললাটে শোভিবে চিরকাল ;
শুধু কি যৌবন মোর তোমার পরশহারা বঞ্চিত কাঙাল
চিরবিদায়ের পথে চলে' যাবে মৌন নতআঁখি ?
কি দোষে সে নিয়ে যাবে সরমে মরমতলে ঢাকি'
অফুরাণ এত প্রাণ, এত হাসি, এত অনুরাগে ?

আজি এ অন্তরে মোর অফুরন্ত কত আশা
দুরন্ত শিশুর মত জাগে !
কত সাধ করে—
দশদিশি সচকিয়া টগবগি' পর্ব্বতে প্রান্তরে
তোমা' পানে ঘোড়া লয়ে' ছুটি,
ছিঁড়ে করি কুটিকুটি
শুব্ধতার অলস উত্তরী
কাড়িয়া ধরার অঙ্গ হতে।...লয়ে' তরী
পাগল বাতাসে পাল তুলি'
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উর্ম্মির দোলায় বুকে দুলি
তোমার বাহুতে বাহু বেঁধে।...যাই দিগ্বিজয়ে ছুটে,
নিখিলের যত পুঁজি ঝড় তুলে' আনি সব লুটে।...
ভেঙে সব করি চুরমার,
আবার মনের মতো করিয়া তোমার
নূতন করিয়া তারে গড়ি।
অক্ষতকে ক্ষয় করি,
অনাস্বাদিতের লই স্বাদ,
অদৃষ্টে দেখিয়া লই,—পুরাই সকল তব সাধ।

হে কাঙালরাজ !
তোমারই লাগিয়া যত বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ
খুলিয়া ফেলেছি দূরে আজ।
আমার এ দেহে এসো, আমার জীবনে এসো,
আমার এ বুকে দাও বুক,
চেতনে চেতনা লভি' বলো তুমি সুখে আছ,
বলো—মোরে দেখে তব সুখ।
মুগ্ধ দুনয়নে মোর তোমারি তৃপ্তিরে প্রিয়
নিবিড় করিয়া তুলি আমি,
জীবন-সম্পদ দিয়া তোমারে সমৃদ্ধ করি
নিশিদিন হে জীবনস্বামী !

* *
*

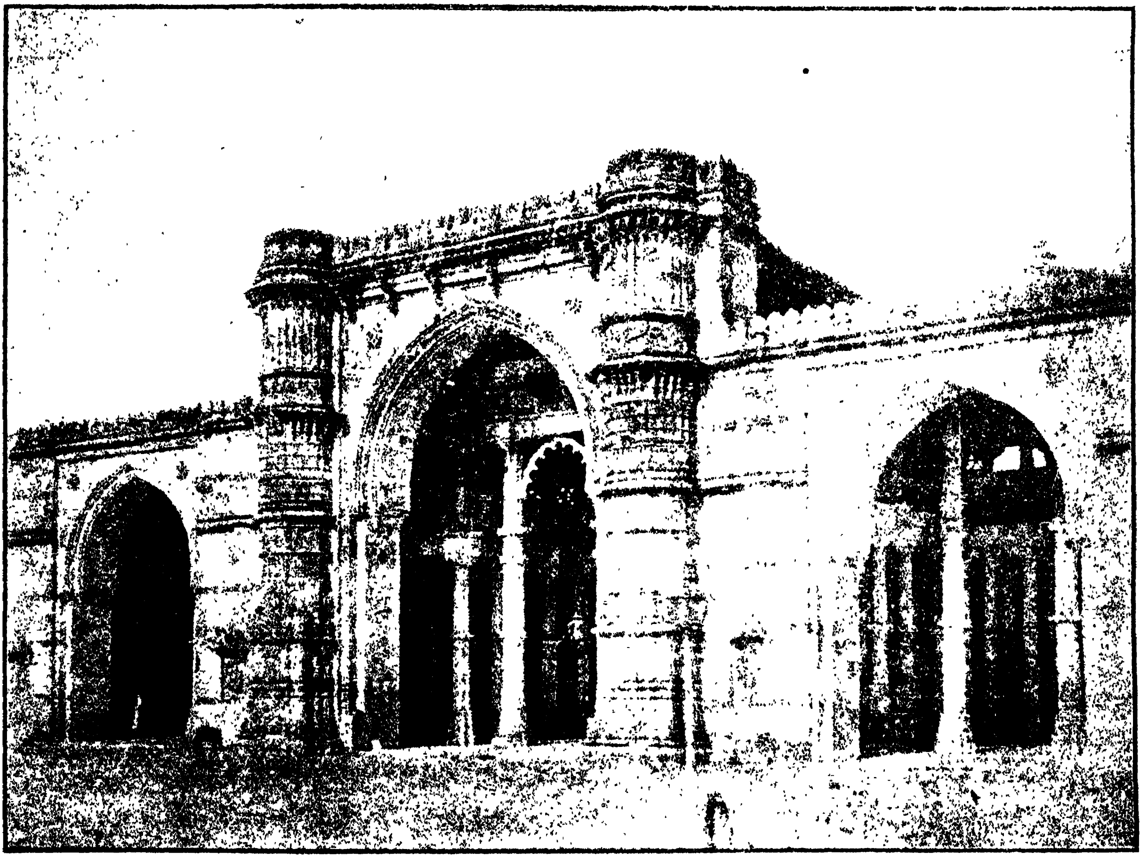
হায় হায় !
কেন গো সুখের ডালা পলকে শুকায়ে ওঠে বেদনার ঘায় !
তোমার নয়নবারি কেমনে মুছাতে পারি, সারাদিন ধরে'
আমারই এ পোড়া চোখে এমন করিয়া যদি
নিরবধি শুধু জল ঝরে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

আহমদাবাদ

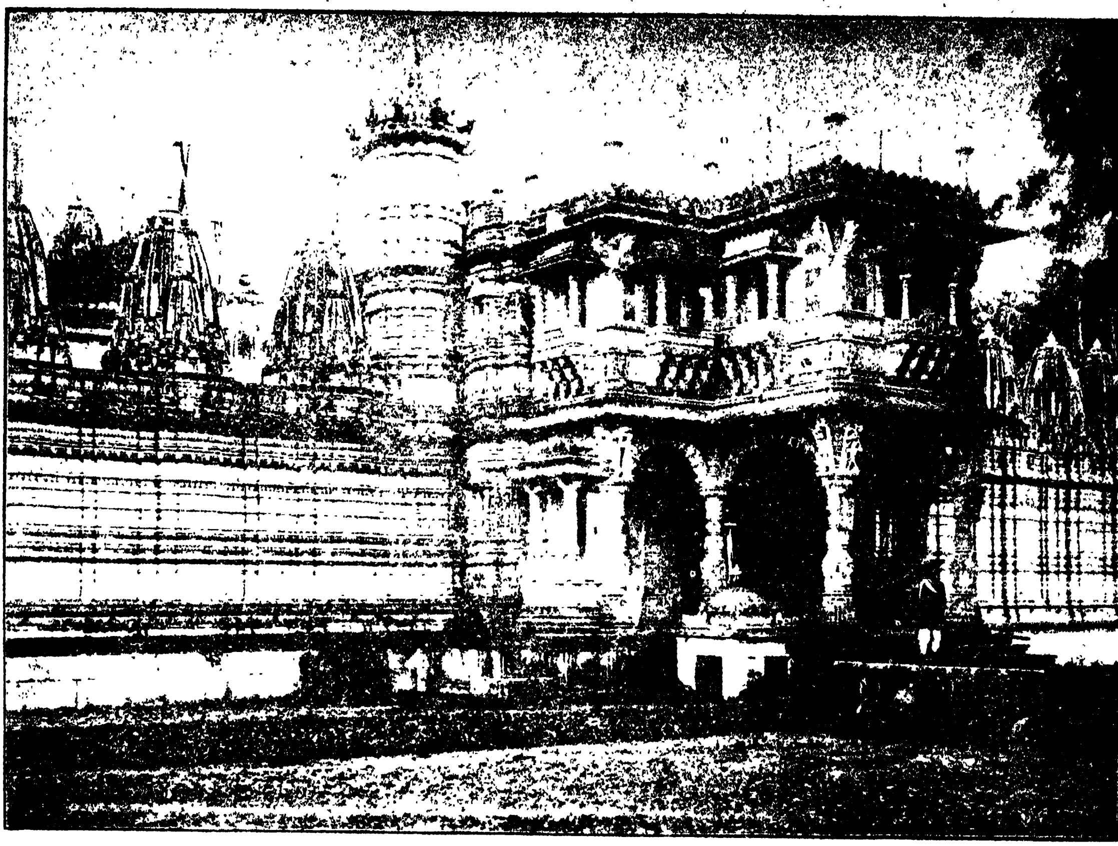
এবারকার (১৯২১ সালের) ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে গুজরাটের প্রধান সহর আহমদাবাদে। আহমদাবাদ রমনীয় স্থান। ইহার চারিদিকে এক ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া প্রাচীর দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রাচীর রাজা আহমদ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। চারিদিকেই নগরে প্রবেশের জন্য কয়েকটি করিয়া সিংহদ্বার আছে। নগরের পশ্চিম প্রাচীরের পদতলে শবরমতী নদী প্রবাহিত। শবরমতীর পশ্চিমে অনুচ্চ পর্ব্বতমালা। নগরের মধ্যে অনেক সুশোভিত মস্‌জিদ ও সমাধিভবন ও হিন্দু দেবমন্দির আছে।

আহমদাবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক গল্প আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিরোজশাহের নিকট হইতে রাজসিংহাসন লাভ করিয়া আহমদশাহ একদিন মৃগয়া করিতে বাহির হন। মৃগয়া করিতে করিতে তিনি এক সুন্দর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দেখিলেন, সেখানে একটি স্বচ্ছসলিলা নদী বহিয়া চলিয়াছে, তার তীরে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফুল ও ফলের গাছ; জলের তরঙ্গে তাহাদের ছবি নাচিয়া বেড়াইতেছে; চারিদিকে পাখীরা সুমধুর কলধ্বনি করিতেছে। এই স্থানের দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া আহমদ স্থির করিলেন এখানে এক নগরী স্থাপন করিবেন। শীঘ্রই তাঁর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিলেন। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদের প্রতিষ্ঠা হইল।



তিন দর্‌ওয়াজা—আহমদাবাদ।

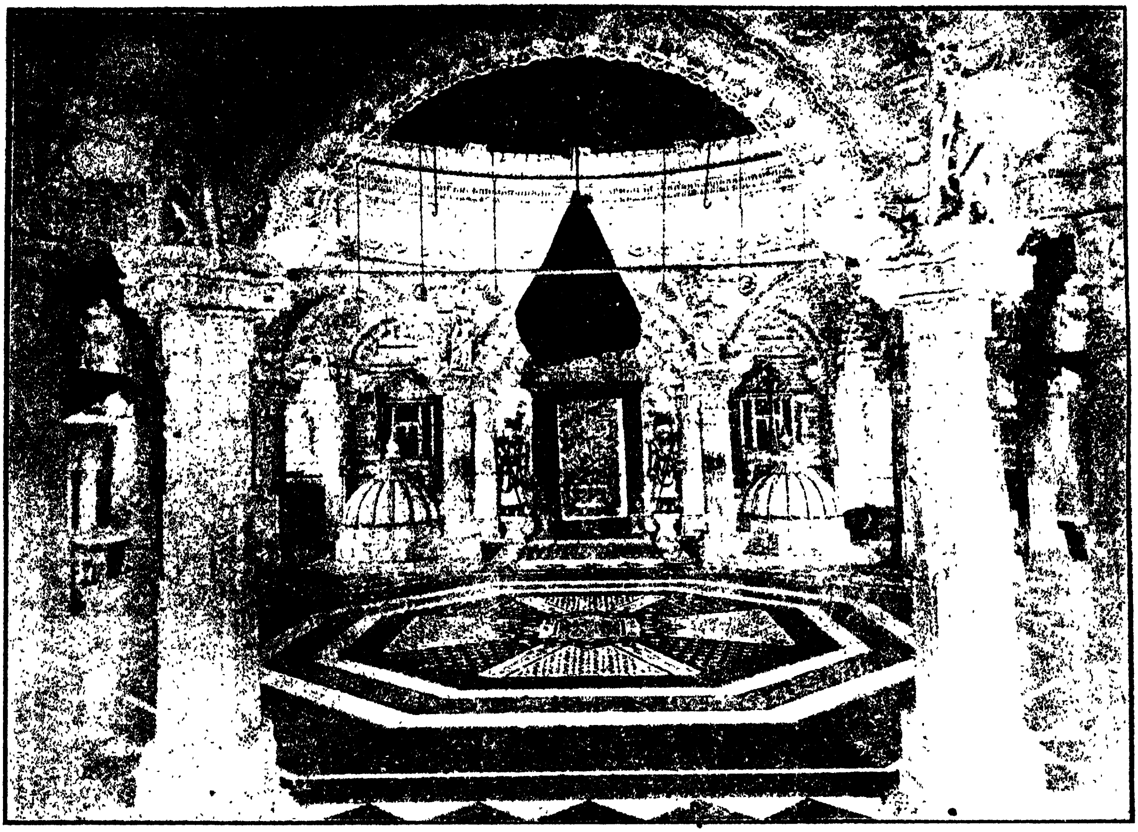
আহমদাবাদ প্রাচীন সহর। মুসলমান যুগের আগে আহমদাবাদের নাম ছিল আসাওয়াল। ভীলদলপতি আসা



হাতী সিংহের মন্দির—আহমদাবাদ।

কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি প্রাচীনকালে আহমদাবাদের নাম ছিল অশ্ববল-কর্ণাবতী। এই নগরেই দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভাধিপতি ভীমসেনের রাজধানী ছিল। সম্রাট আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ইহা দখল করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। সমৃদ্ধ অবস্থায় আহমদাবাদ ৩৬০টি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্র-শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর মুনিম খাঁ ও দামাজী গাইকোয়াড়ের অধিকারে আসে। তারপর ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ গর্ডন এই নগর আক্রমণ করেন ও ১৮৮১ সালে ইহা অধিকার করেন।

এখানে দর্শনীয় স্থান অনেক,—প্রাচীন জুম্মা মস্‌জিদ, আহমদ শা ও তাঁহার বেগমদিগের সমাধি, দস্তুর খাঁর মস্‌জিদ, (কুতব-উদ্দীনের সময়ে নির্ম্মিত) মির্জ্জাপুরের রাণীর মস্‌জিদ, নারায়ণ স্বামীর মন্দির, নয় গজ পীর। যে-সব দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ আছে তার মধ্যে হাতী সিংহের মন্দির, দরিয়া খাঁর কবর, শাহিবাগ, মিয়া খাঁ চিস্তির মস্‌জিদ, অচ্যুত বিবির মস্‌জিদ, দাদাহরির হ্রদ, ভবানীর হ্রদ, চিন্তামনের জৈন মন্দির, হৌজ-ই-কুতবক, কঙ্করিয়া তলাও প্রভৃতি প্রধান। সিদি সৈয়দ ও মহাফিজ খাঁর মস্‌জিদ দেখিতে সুন্দর। ইহাদের শিল্পনৈপুণ্য ও নির্ম্মাণকৌশল প্রশংসার যোগ্য। আহমদাবাদের উপর দিয়া বিদেশীয় নানা জাতির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঝঞ্ঝা বাহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আজও বর্ত্তমান। মুসলমানদিগের সময়ে আহমদাবাদের অনেকবার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। নগরটি কখনও শ্রীবৃদ্ধ হয়, কখনও বা দরিদ্র হইয়া পড়ে। তবে ইংরেজ শাসনের



হাতী সিংহের মন্দিরের অভ্যন্তর—আহমদাবাদ।

সময় হইতে ইহার সমৃদ্ধি বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখানে অনেক কাপড়ের কল ও অন্য জিনিসের কারখানা আছে।

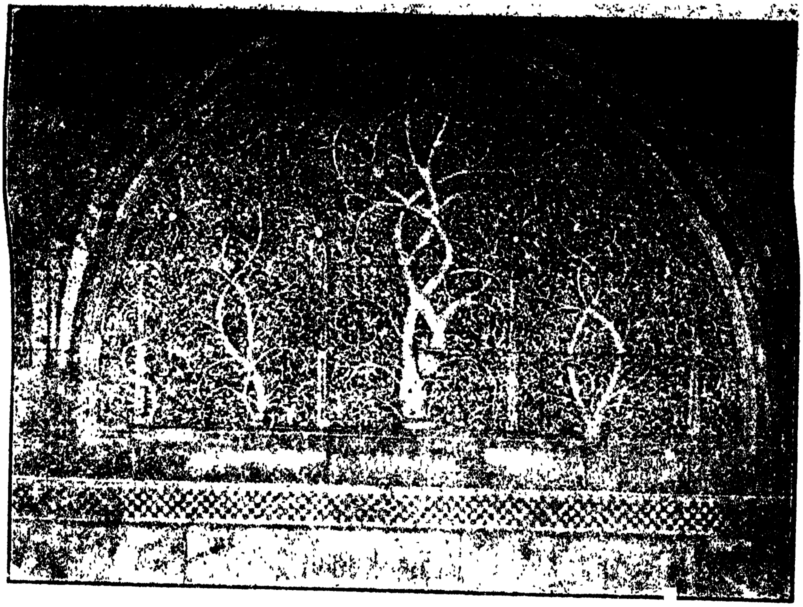
এখানকার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে যে-গুলি অত্যন্ত প্রধান আমরা সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।—

জুম্মা মসজিদ।—সুবিখ্যাত তিন দরওয়াজার কাছে ইহা অবস্থিত। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার পরিসর ৩৮২×২৫৮ ফুট, এবং মূল মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ২১০ ফুট ও প্রস্থে ৯৫ ফুট। ইহার মেজে মর্ম্মর প্রস্তরে তৈরী। ইহার ছাতের উপর পর পর পনেরোটি গুম্বজ আছে। ইহাতে দূর হইতে ইহাকে বড় সুন্দর দেখায়। মসজিদটিতে ২৬০টি স্তম্ভ আছে।

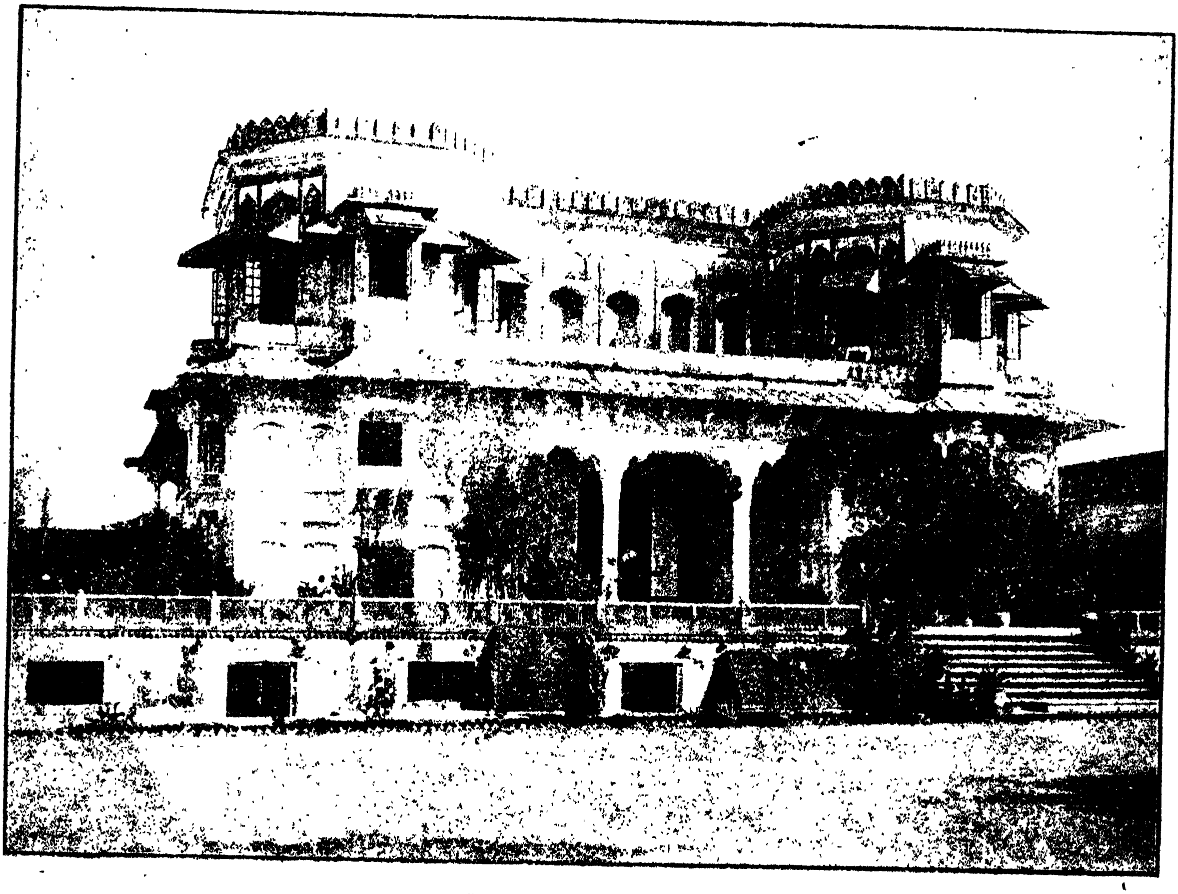
রাণী সিপ্‌রির মসজিদ।—ইহাকে সাধারণ লোকে "আহমদবাদের রত্ন" বলিয়া থাকে। বাস্তবিকই ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শা বেগুরার বিধবা স্ত্রী ইহা নির্ম্মাণ করান। ইহা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সুন্দর নিদর্শন। স্থপতিগণ ইহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধসমূহের অন্যতম বলিয়া মনে করেন।

কঙ্করিয়া তলাও।—ইহার প্রাচীন নাম হৌজ-ই-কুতব। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের নরপতি সুলতান উদ্দীন ইহা খনন করান। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এই জলাশয়টি প্রায় এক মাইল হইবে। ইহার মাঝখানে একটি সুন্দর দ্বীপ আছে। তার নাম নাগিনা বা অঙ্গুরী-মধ্যবর্ত্তী রত্ন। তীর হইতে ঐ দ্বীপে যাইবার একটি পথ আছে, সেটি ঘাসে ঢাকা। দ্বীপের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিককার জলের দিকে ও নগরের দিকে চাহিলে সমস্তই চমৎকার রমণীয় দেখায়।

এইসব ছাড়া হাতী সিংহের সমাধি ও স্বামী নারায়ণের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের মসজিদ অট্টালিক প্রভৃতির গঠন হিন্দুভাবে পূর্ণ। বর্ত্তমানে অনেক বিদ্যালয়



একটি মসজিদের জানলার কারুকার্য্যশোভিত জালি—আহমদাবাদ



শাহি বাগ—আহমদাবাদ।

হাঁসপাতাল, পিঁজরাপোল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার সোনা, রূপা ও জরির বুটি দেওয়া কাপড় সমস্ত ভারতবর্ষেই বিখ্যাত। এখানকার তৈরী কাগজ গুজরাটে ও অনেক দেশীয় রাজাদের রাজ্যে ব্যবহৃত হয়।

আহমদাবাদ জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে কুন্‌বি, রাজপুত ও কোলিরাই প্রধান। ইহাদের মধ্যে আবার কুন্‌বিরা—অঞ্জনা, কাদাবা ও নেবা, এই তিন ভাগে বিভক্ত। কন্যাসন্তান জন্মিলে কুন্‌বিরা আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করে। পূর্ব্বে ইহারা শিশুকন্যাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। পরে একটি আইনের দ্বারা ইহা রদ করা হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বরোদার গায়কবাড় গুজরাটের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। প্রজাসাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যাহাতে উন্নত হয় তার জন্য তিনি বিবিধ পথ ও প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কৃষির উন্নতির দিকেও তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। সমাজ-সংস্কার বিষয়েও তিনি অগ্রসর।

ঐতিহাসিক।

বেনামী

ভাবিয়াছিলাম, বলিব না। জীবনের পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে যে অতি সূক্ষ্ম অপরূপ ভীষণ মধুর বেদনার জাল রচনা হইয়া থাকে, ভাবিয়াছিলাম, জীবনশিল্পীর সেই সুখদুঃখের বিচিত্র রঙীন তন্তুময় আশ্চর্য্য কারুকার্য্য রহস্যের যবনিকা দিয়া চিরকাল ঢাকিয়া রাখিব। কিন্তু বলিতে হইল, বেদনার যবনিকা সরাইয়া অন্তরের রহস্য-শিল্প প্রকাশ করিতে হইল।

আমার বাড়ী যে দেখিয়াছে সেই বলিয়াছে এ থাকিবার বাড়ী নয়, এ বইয়ের গুদাম। বাস্তবিক, বইয়ের ইট দিয়া আমার ঘরের দেওয়ালগুলি তৈরী বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থস্তূপের গুরুভার বহিতে হয় বলিয়াই বোধ হয়, মস্তক অনাবশ্যক চুলগুলি ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু এ বিরলকেশ মস্তক এ বোঝা বহিতে পারিত না যদি অন্তরের মর্ম্মস্থলে সবার অগোচরে একটি প্রেমপদ্ম অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত হইয়া না থাকিত। মাঝে মাঝে ভাবি, এ পদ্ম যে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হয় নাই সেই আমার জীবনে পরম লাভ; যদি হইত, কে জানিত ক্ষণিক সৌরভ সৌন্দর্য্যের মাদকতার পর সকল রূপ গন্ধ দক্ষিণ সমীরে দিকে দিকে ছড়াইয়া হঠাৎ সে দেউলিয়া হইয়া যাইত না, তাহার রাঙাপাতাগুলি কালো হইয়া আসিয়া কোনো স্তব্ধরাতে তারার আলোয় ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িত না? কিন্তু এই অর্দ্ধবিকশিত কমলের ঝরিয়া পড়িবার ভয় নাই, ইহার গন্ধ সব সময়ে পাই, কিন্তু অন্তরের মর্ম্মতন্তুজাল দিয়া অহর্নিশি ইহাকে জড়াইয়া রাখিতে হয়। ভাবিয়াছিলাম জীবনের প্রেমগুহাহিত শ্রেষ্ঠ ধন শুধু মৃত্যুর অমল হাতে রাত্রির অন্ধকারে তারার প্রদীপের মত দিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশ করিতে হইল, বেণু এমন কাণ্ড বাধাইয়াছে যে তাহার জীবন পূর্ণ করিবার জন্য আমার জীবনের অপূর্ণতা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

শীতপ্রভাতে উজ্জ্বল রৌদ্রের স্নিগ্ধ উত্তাপ দুই পায়ে মধুর-ভাবে অনুভব করিতে করিতে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া একখানি স্প্যানিস্ নভেল খুলিয়াছি, এমন সময় পেছন হইতে কে আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল। এ চম্পক-অঙ্গুলির কোমল স্পর্শ যে কাহার হস্তের তাহা বেশ জানিতাম; সে ভিন্ন এ প্রৌঢ় প্রফেসারের গ্রন্থপাঠ-ক্ষীণ চক্ষু টিপিবার লোভ আর কাহারও নাই। এ চোখ দুইটি আজীবন কত শত শত বইয়ের পাতায় পাতায় কালো আঁচড়ে আঁচড়ে কত সুন্দরীর সহিত ঘুরিয়া জীবনের কত নব নব রূপের সন্ধান পাইয়াছে, যেন দুই প্রদীপ জ্বালাইয়া কাহাকে সে গ্রন্থে গ্রন্থে খুঁজিয়াছে, কত দৃশ্য দেখিয়া কত চিন্তা করিয়া সুধাহলাহলময় রঙীন মায়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তবু তৃষ্ণা-তুরের যাত্রার বিরাম নাই। যখন এই চির-অনুসন্ধিৎসু কালো চোখ দুইটির উপর এই কিশোরীর আঙুলের স্পর্শ আসিয়া সেতারের তারের মত বাজে, মনে হয় সেই অজানা রহস্যময়ী ক্ষণিকের জন্য তাহার আঁচল ঠেকাইল।

চুপ করিয়া আছি দেখিয়া বেণু চোখ দুইটি জোরে চাপিয়া ধরিল। হাসিয়া বলিলাম, সুরেশ, ছাড়।

যাও,—বলিয়া চক্ষু ছাড়িয়া গম্ভীর হইয়া সে আমার মুখের দিকে তাকাইল। এই পরিহাসটি আমাদের মধ্যে কিছুদিন প্রচলিত হইয়াছে। সুরেশ নামক কোন এম-এ, বি-এল যুবকের সঙ্গে বেণুর বাবা তাহার শুভপরিণয় স্থির করিতে উদ্যোগী আছেন, তাই এই ঠাট্টা।

কিন্তু আজ বেণুর মুখ একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া বোধ হইল। তীরজোড়া ধনুকের ছিলার মত তাহার ভ্রূ যখন কম্পিত হইয়া উঠে, তখন আমারও ভয় হয়, এবার চক্ষু হইতে না জানি কোন বাণ চারিদিক কথার আগুনে আলো করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের মত বাহির হইবে,—তাহার মায়ের স্বভাব আমি বেশ জানি। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম, দেখিলাম, কুঁচফলের মত তাহার রক্তিম গণ্ডের কৃষ্ণতিলটি স্থির হইয়াছে; ভরসা করিয়া হাসিয়া বলিলাম, এত সকালেই আবির্ভাব যে?

কেন, আস্‌তে নেই বুঝি,—বলিয়া সে পাশের রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ভুটিয়া ভৃত্যটি ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে জল গরম করিয়া কি তৈরী করিতেছিল। বেণু তাহার অপরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে নানা মন্তব্য, তাহার বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে নানা ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া নিজেই রুটি টোষ্ট ও কোকো তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বুঝিলাম, আজ বিশেষ কিছুই খরচ হইবে। বায়োস্কোপে কোনো নূতন ভালো ফিল্‌ম্ আসিল কি, কাগজে কি কোনো ফরাসী গ্রন্থকারের কোনো নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, অথবা নিশ্চয়ই কোন চতুর দোকানদার পথের ধারে শো-কেসে খুব ভালো শাড়ী সাজাইয়া রাখিয়াছে, বন্ধুদিগের বুঝি কোথাও পিক্‌নিক্ বা ষ্টিমার ট্রিপ দিবার কথা আছে, অথবা কোনো মেয়ের হঠাৎ পারিবারিক দুরবস্থার জন্য পড়াশুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, কোনো খোড়া কুকুর রুগ্ন বিড়াল বা মা-হারা পাখীর ছানা বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে কি?—আজ সকালে এই কোকো রুটি-টোষ্টের ঘুস দিয়া কি আদায় হইবে ভবিতে লাগিলাম। ইহাকে ঘুস বলিতে বেণুর রীতিমত আপত্তি আছে, সে সত্যই চটিয়া উঠে, তাহার বাবা মা'র সঙ্গে তর্ক করে,—ঘুস সে দেয় না, আমি দিই। আচ্ছা, আমি সত্য কথা বলিব। অবশ্য, সত্য কথা বানাইয়া বলিব। মনে মনে আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই ঘুস দি।

কোকো রুটি লইয়া বেণু শীঘ্রই হাজির হইল। মার্ব্বেল পাথরের ছোট গোল টেবিল হইতে বইগুলি টানিয়া মেজের কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিয়া খাবার সাজাইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কোকোর কাপে এক চুমুক দিয়া বলিলাম, বা, এত কম চিনি দিয়ে যে কোকো এত মিষ্টি হতে পারে জানতুম না! তোর হাতের কি গুণ, ও ভুটিয়ারত্ন কত চিনি যে ঢালে তবু এমন মিষ্টি ত কোনদিন হয় না।

সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আমার খাওয়া দেখিতে লাগিল। বলিলাম, তুই কিছু খা, দাঁড়িয়ে রইলি।

বেণু ধীরে সোফায় বসিয়া আবার উঠিয়া সাম্‌নের টেবিলের স্তূপীকৃত বইগুলি সাজাইতে আরম্ভ করিল। অন্যদিন সকালে বেণু যখনই আসে, সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। খাও বলিতে হয় না, নিজেই কোথায় বিস্কুটের টিন সন্দেশের হাঁড়ি আছে বাহির করিয়া আনে; চাবি লইয়া বাক্‌স খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া বাহাদুরকে গরম গরম জিলিপি বা তেলে-ভাজা খাবার আনিতে আদেশ করে। আজ তাহার কি হইল? মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যেন কি রহস্যমাখা, একটু বিবর্ণ, শুষ্ক বলিয়া বোধ হইল। বলিলাম, অসুখ করেছে, না ঝগড়া করেছিস্—রাতে ঘুম হয়নি?

আমার দিকে না তাকাইয়া বলিল, হাঁ।

আশ্চর্য্য হইলাম, আমারও ত গত রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন রে?

আমার দিকে কটাক্ষে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ভেবে ভেবে।

তাহার এই হাসিটি বড় মিষ্ট লাগে। ছোট ঠোঁট দুইটি বাঁকিয়া কাঁপিয়া উঠে, কপোল ফুলিয়া গোল হয়—যেন কুঁড়ি ফাটিয়া গোলাপফুল ফুটিল—তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়।

তবু শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, তোর কিসের ভাবনা?

চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম, প্রশ্নটা অবশ্য অর্থহীন হইয়াছে, কেন না পঞ্চদশবর্ষীয়া নবশিক্ষিতা অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণীর যদি ভাবনা না থাকে তবে জগতের ভাবনা কাহার? ক্ষণিকের জন্য মনে পড়িল, নিজের প্রথম যৌবনের কথা, তখন সংসারের ভাবনা, খাইবার পরিবার ভাবনা ছিল না বটে, কিন্তু বিশ্বের সকল বেদনার অন্তর আকুল হইত,

জগতের সমস্ত ভাবনা যেন আমার ভাবনা; শুধু বাস্তব জগতের নয়, অবাস্তব উপন্যাস-জগতের বিরহী-বিরহিণীদের ব্যথাও যে আমার ব্যথা।

ধীরে বলিলাম, কি ভেবেছিস্ সারারাত জেগে?

টেবিল সাজানো শেষ করিয়া আল্মারীতে কি নতুন বই আসিয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে বেণু বলিল, বল্ছি, তুমি খেয়ে নাও না।

খাওয়া শেষ করিয়া ডাকিলাম, বিনি, কাছে আয়।

বেণু ধীরে আসিয়া দেওয়ালের পাশে চেয়ারটায় বসিল। বলিলাম, কি, সব খুলে বল্।

ভীত-স্বরে বলিল, একখানা চিঠি আছে।

এই তাহাকে জীবনে প্রথম সত্য সত্যই ভীত হইতে দেখিলাম, তাহার এ রূপ আমার একেবারে অপরিচিত।

আমি ত একটু ভয় পাইয়া বলিলাম, চিঠি? কার— আমার?

মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, না, আমার চিঠি।

গম্ভীরস্বরে বলিলাম, কে লিখেছে?

তাহার সহিত কখনও গম্ভীরস্বরে কথা বলি নাই, বড় অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল।

অতি ধীরে সে বলিল, একটি ছেলে।

বারুদস্তূপে যেন আগুন পড়িল, ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলাম ছেলে? কে সে ছেলে?

আমার এ ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি জীবনে সে কখনও দেখে নাই। তবু বিচলিত হইল না, ধীরে বলিল, যে ছেলেটি তোমার কাছে প্রায়ই আসে, তোমার কলেজের।

আপনাকে দমন করিয়া বলিলাম, দেখি চিঠিখানা।

ধীরে আঁচল হইতে একখানি গন্ধ-সুবাসিত নীল খাম বাহির করিয়া দিল, তারপর স্তব্ধ হইয়া র‍্যাকের পর র‍্যাকে সাজানো নভেলগুলির দিকে প্রদীপ্ত নয়নে তাকাইয়া রহিল।

চিঠিখানি খুলিলাম, আইভারি-ফিনিস কাগজে বড় বড় হাতের লেখা—তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেলাম, রাগের ঝোঁকে সমস্ত কথা ঠিক বুঝিলাম না, শুধু ছেলেটির নামের সই বার বার দেখিলাম। মোটামুটি বোঝা গেল, এ হচ্ছে যুবকটির প্রেমপত্র এবং এও বেশ বোঝা গেল, যে, এ তাহার প্রথম প্রেমপত্র নয়, বরং শেষ প্রেমপত্র বলা যাইতে পারে, কেননা রঙীন কল্পনার পাল উড়াইয়া প্রেমস্বপ্নের প্রখরস্রোতে বহুক্ষণ উজানে বহিয়া পত্রটি কিছু বস্তুলাভের আশায় বিবাহ-প্রস্তাবের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বেণুর দিকে ভীত নয়নে তাকাইলাম। ইংরেজরাজের আদালতে প্রকৃত গান্ধিভক্ত নন্-কো স্বেচ্ছাসেবক যেমন করিয়া দাঁড়ায় তেম্নি করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে, শুধু চক্ষু দিয়া কি প্রখর অগ্নিদীপ্তি ক্ষরিতেছে—সেই আগুনের স্পর্শে আমার মস্তিষ্কে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল। ছোটবেলা হইতে বেণুর চোখের চাউনি দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আসিতেছি, আজও ভুল বুঝিলাম না।

গম্ভীর ভাবে ডাকিলাম, বেণু—

সে ধীরে উত্তর দিল, কি—

জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিন চিঠি লেখা-লেখি হচ্ছে?

সে বলিল, প্রায় একমাস।

কঠোর কিছু বলিতে যাইতেছিলাম—দেখিলাম, তাহার মুখ লজ্জায় সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, দাঁড়াইতে না পারিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার মুক্ত কালো কেশের ঠিক উপরে লাল ভেলভেট্ কাফে মোড়া সেক্স্পিয়র সোনার জলের তর্জ্জনী তুলিয়া বলিলেন, সাবধান! তাহার একপাশে নীল সিল্কের কাপড়ে বাঁধানো কালিদাস যেন হঠাৎ কত শতাব্দীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া বলিলেন, উজ্জয়িনীর কবি প্রেমের কোন অপমান সহিবে না। তাহার আর-এক পাশে ফ্রেঞ্চ মরক্কো মোড়া টুর্গেনিভ র‍্যাক্ কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিশোরীর প্রেম বিশ্ববিধাতার অপূর্ব্ব পবিত্র আবির্ভাব, তাহাকে প্রণাম কর! তারপর ঘরের চারিদিকে এদেশের ও বিদেশের, এ যুগের ও প্রাচীন যুগের কত কবি ঔপন্যাসিক এই প্রথমপ্রেমভীতা হর্ষশঙ্কাকম্পিতা বেণুকে সমর্থন করিবার জন্য বসন্তের দক্ষিণ সমীরের মত মর্ম্মরধ্বনি করিয়া উঠিলেন। যেন কত শত শতাব্দীর কত বিচিত্র প্রাণ-স্রোত প্রেমধারা এই ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ স্তব্ধ হইয়া ছিল, আজ সহসা আনন্দকল্লোলধ্বনি করিয়া উঠিল—কত বিচিত্র যুগের বিচিত্র দেশের কত কুহু ও কেকা এই মূক গ্রন্থনীড়গুলির শুষ্কপত্র-দলের ভিতর নিদ্রিত ছিল, কিশোরী-প্রেমের স্বর্ণকাটির স্পর্শে সকলে জাগিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, প্রেম চিরসুন্দর

চিরজয়ী, চিরপবিত্র বলিয়া জগতের সৌন্দর্য্যস্রোত আনন্দময় সৃষ্টিধারা চিরপ্রবহমান। মেজেতে বস্‌রার কার্পেটের ফুল ও পাখীগুলি সজীব হইয়া গাহিয়া উঠিল। হার মানিলাম।

ধীরে বেণুকে বলিলাম, আচ্ছা এখন যাও, বিকালে পরামর্শ করা যাবে।

মৃদু হাসিয়া সে ধীরে চলিয়া গেল, বুঝিল তাহার জয় হইয়াছে।

পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া আবার সিঁড়ি হইতে তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ধরিয়া আনিলাম, জোর করিয়া সোফায় বসাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন প্রার্থনার সুরে বলিলাম, বিনি, সত্যি বল্‌, খুব ভালবেসেছিস?

তাহার সমস্ত মুখ রাঙা গোলাপ হইয়া উঠিল, মুখ নত করিল। আবেগের সহিত বলিলাম, বল, সত্যি বল।

হতবাক্‌ সে বসিয়া রহিল, তারপর শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া হাত ছাড়াইয়া দৌড়াইয়া পলাইল।

ভাবিয়াছিলাম, বলিব না। কিন্তু বেণুর জন্য বলিতে হইল। এ নজীর না দেখাইলে কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক করিয়া বেণুর কেসে জয়ী হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ বেণুর বাবা সুরেশ নামক কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রে ফার্ষ্টক্লাস মার্কা-মারা আশ্চর্য্যকর বস্তুটির দিকে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কিন্তু বলিব কি করিয়া? ব্রীড়াবনতা নববধূর মত সে গোপন প্রেমরহস্যকে কেমন করিয়া অবগুণ্ঠনমুক্ত করিব? আমার বয়স চল্লিশ হইতে পারে, কিন্তু সে প্রেম যে চিরতরুণী নববধূ। বলিতে পারি এমন সাহস আমার নাই, সুতরাং লিখিতে হইল।

ভূটিয়াবংশাবতংসকে দিয়া কলেজে লিখিয়া পাঠাইলাম, বিশেষ কাজের জন্য কলেজে যাইতে পারিলাম না। যাক্‌, বেণুর আনন্দের আশায় আমার ছাত্রেরা একটু আনন্দ করুক। তবে তাহাদের যে সহপাঠীর জন্য আমার এ দুরবস্থা তাহাকে ছুটি দেওয়া হইবে না, তাহার নামে এক কড়া চিঠি পাঠাইলাম যেন সে সন্ধ্যায় নিশ্চয় আসে। আমার লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির উপর হঠাৎ তাহার পরমা ভক্তির উদয়ের কারণটা জানা গেল। আজ সমস্ত দিন আমি লিখিয়া মরিব কেন, সেও ভাবিয়া মরুক্‌। দুয়ার বন্ধ করিয়া যৌবনের পূর্ব্বকথা লিখিতে বসিলাম।

দুই

কলেজের সকল ছেলেদের মধ্যে সুরেনের সঙ্গে আমার মুখের ভাব খুব না থাকিলেও মনের ভাব কেমন জমিয়া উঠিতেছিল। আমাদের মধ্যে কেবল অবস্থাগত প্রভেদ নয়, স্বভাবগত প্রভেদও যথেষ্ট ছিল। সে ছিল ধনী ব্যবসা-দারের ছেলে, আর আমি গরীব স্কুলমাষ্টারের; সে থাকিত প্রকাণ্ড প্রাসাদে ইলেট্রিক আলোশোভিত গৃহে, আর আমি থাকিতাম মেসের ভাঙ্গা তক্তায় ভাঙ্গা টিনের বাক্সের ওপর কেরোসিনের আলো জ্বালাইয়া। সে ছিল অতি সৌখীন;—ফিতে-ওয়ালা জুতা ব্যবহার করিতে, কোট, সার্ট বা মিলের ধুতি পরিতে তাহাকে কোন দিন দেখি নাই; জুতা জামা সম্বন্ধে জাতিবিচার করা আমার মত ছিল না, থাকিলেও সামর্থ্যে কুলাইত না। আমাদের মধ্যে শুধু এক বিষয়ে সামঞ্জস্য ছিল, আমরা দু'জনেই কলেজে খুব দেরী করিয়া যাইতাম, ক্লাসের শেষ বেঞ্চে এক কোণে বসিতাম, আর দু'জনেই নোটটোকা বা অধ্যাপকের কোন কথা না শুনিয়া নিবিষ্টমনে ইংরেজী নভেল পড়িতাম। এখানেও কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু ভেদ ছিল। আমি পড়িতাম, যাঁহারা জীবনের উদার রাজপথে সাহিত্যসুধার ভাণ্ড হাতে করিয়া অমৃতরস চিরদিনের জন্য দান করিয়া দিয়া-গিয়াছেন, যেমন, ব্যাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, টলষ্টয়। আর সুরেন পড়িত, যাঁহারা প্রাণের নির্ম্মল উদার পথ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ বক্র গলিতে মদের বোতল হাতে করিয়া একটুকু সাহিত্যরসের সহিত প্রচুর কামরস মিশাইয়া জিনিষটা উগ্রতীব্র করিয়া অতি শস্তাদরে বেচিয়া গিয়াছেন—যেমন, রেনল্ডস, ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌। তবু দুইজনের মধ্যে ধীরে ধীরে কেমন আশ্চর্য্য মিলন হইতে লাগিল। প্রেমের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা আমাকে মুগ্ধ করিত, প্রেমের স্থূলরূপে সে মোহিত হইত। তাই প্রেমের সত্য প্রকৃতি লইয়া আমাদের মধ্যে আলোচনা, তর্ক উঠিত।

সেদিন আমার বেশ মনে আছে, নভেলে মনটা কেমন বসিতেছিল না, ইংরেজীর অধ্যাপক শেলীর কি একটা পদ্য পড়াইতেছিলেন। এই মাংসবহুল বিদ্যাগর্ব্বিত ইংরেজপুঙ্গবের অদ্ভুত সাহিত্যরসজ্ঞান ও অত্যাশ্চর্য্যকর ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, শেলী কি সত্যসত্যই ইঁহার স্বদেশ-

বাসী ছিলেন? যাঁহার পাটের দালাল অথবা চা-বাগানের কুলীর সর্দ্দার হওয়া উচিত ছিল তিনি শেলীর অধ্যাপনা করিলে শেলীর কি দুরবস্থা হয় তাহা ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম সুরেনেরও নভেলে মন নাই, কিন্তু তাহার অন্যমনস্কতাটা অন্যরকমের। সে যে ক্লাসে বসিয়া আছে এ বিষয়েও সে হতজ্ঞান। নীল আকাশে কয়েকটি পায়রা উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহাই সে দেখিতেছে। আমার নভেলের নায়কে লর্ডের দুলাল তখন কোন কুটীরবাসিনীর প্রেমে পড়িয়াছেন। তারপর লেখক প্রেমিকের বর্ণনা করিতেছেন। সেগুলি পড়িতে পরিতে সহসা মনে হইল, হয়ত সুরেন কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে। প্রেমের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলাম, কয়েকটি মিলিয়া গেল, কেমন সন্দেহ হইল, ঠিক করিলাম সুরেনের বিষয় সন্ধান লইতে হইবে।

এক প্রফেসারের অসুখের জন্য সেদিন সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেল। ছুটির পর সুরেনের অলক্ষ্যে তাহার পিছন পিছন চলিলাম। কয়েকটি বড় রাস্তার মোড় পার হইয়া সে এক গলির ভিতর ঢুকিল, গলির পর গলি, তাহার ভিতর গলি। অবশেষে এক ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গলিতে আসিয়া থামিল; গলিটি যেমন বক্র, তেমনি দুর্গন্ধময়। এক আঁস্তাকুড়ের পাশে আসিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সাম্‌নের বাড়ীর দোতালার দিকে তাকাইয়া রহিল। কাহাকে সে দেখিতেছে দেখিতে পাইলাম না; শুধু বুঝিলাম, দোতালার জানালা খোলা কোন সুন্দরী নিশ্চয় বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে জানালা বন্ধ হইয়া গেল, তবু সুরেন নড়িল না, গন্ধবাসিত নীল সিল্কের রুমালটা পকেট হইতে বাহির করিয়া নাড়িতে লাগিল। জানালা বন্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার একটি পাখি যে উঠিয়াছে তাহা আগে লক্ষ্য করি নাই, জানালার গায়ে শাড়ীর লাল পাড় দেখিয়া বুঝিলাম, বুঝিলাম, এবার মেয়েটির দেখার পালা।

আবার জান্‌লা খুলিল। সুরেন কয়েকবার গলির এক মোড় হইতে আর মোড় পদচারণা করিল, তারপর ধীরে ধীরে উদাসভাবে চলিয়া গেল।

আমি লুকানো জায়গা হইতে বাহির হইলাম, ধীরে অগ্রসর হইয়া কম্পিত পদে আঁস্তাকুড়ের নিকট দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখের জানালায় এক কিশোরী কতকগুলি ছেঁড়া সার্ট কাপড় সেলাই করিতেছে। তাহার আলুলায়িত কেশ জানালার গরাদ পার হইয়া বিবর্ণ দেওয়ালে ঝিকিমিকি করিতেছে, চাঁপারঙের শাড়ী গায়ের রঙের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে। গৃহকর্ম্মরতা কিশোরীর মঙ্গল-আনন্দশ্রী কতকক্ষণ দেখিয়াছিলাম জানি না, সহসা এক তীব্রকটাক্ষে চোখ ধাঁধিয়া জগৎ যেন পুড়িয়া গেল, তারপর সশব্দে জানালা বন্ধ হইল, কিন্তু কোন পাখি উঠিল না।

দাঁড়াইয়া রহিলাম—একবার জানালা খোলার শব্দ, আবার এক বহ্নিশিখাময় কটাক্ষ, আবার সশব্দে জানালা বন্ধ।

তবুও দাঁড়াইয়া রহিলাম—বহুক্ষণ পরে একবার একটি পাখি উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল, আর জানালা খুলিল না।

গড়ের মাঠ ঘুরিয়া অনেক রাতে যখন মেসে ফিরিলাম, তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

সে রাতে আর ঘুম আসিল না। ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় একে দেখিয়াছি, কোথায় ওই চোখ দুইটির অমনি অনলভরা দীপ্ত চাউনি দেখিয়াছি।

গির্জ্জার ঘড়িতে রাত একটা বাজিয়া গেল, শুক্লা একাদশার জ্যোৎস্নায় বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল। মনে পড়িল, তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। জেলার স্কুলের ছুটির পর বাড়া ফিরিতেছি, দেখিলাম, পথের এক কোণে একদল ছেলে গোল হইয়া জমিয়াছে। আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম সহসা দেখি সম্মুখের বাড়ী হইতে এক আট নয় বছরের মেয়ে প্রদীপ্তমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দাঁড়াইলাম।

মেয়েটি বিজয়িনীর মত আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, আমার পায়রা কোথায়? দাও।

দেখিলাম, একটি সাদা পায়রা একখানি ডানা ভাঙিয়া এতক্ষণ ধূলায় লুটাপুটি করিতেছিল; কয়েকটি ছেলে ঢিল ছুড়িয়া পেন্সিলের খোঁচা দিয়া, তার ভবযন্ত্রণা শীঘ্র শীঘ্র দূর করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল। মেয়েটিকে এমন ক্ষিপ্তভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সকলে সরিয়া গেল, কেবল একটি ছেলে পায়রাটিকে পথ হইতে নিষ্ঠুর আনন্দের সহিত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, ভারি পায়রা

নিতে এসেছেন! আমি পায়রা পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি—দেবো না। ছেলেটি এতক্ষণ পায়রার মাংসে কিরূপ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য করা যাইতে পারে তাহার বর্ণনা করিয়া ছেলেদের মুগ্ধ করিতেছিল।

মেয়েটি দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—দাও বল্‌ছি, নইলে ভালো হবে না।

সেই দিন তাহার চক্ষে এই তীব্র অগ্নিময় কটাক্ষ দেখিয়াছিলাম।

ছেলেটি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। আমাদের ক্লাসে সে সবচেয়ে দুর্দ্দান্ত ছেলে, স্কুলে গুণ্ডামির জন্য প্রসিদ্ধ। ইচ্ছা থাকিলেও তাহার নিকট হইতে পায়রা উদ্ধার করিতে কেহ সাহসী হইল না।

রাগে আমার গা রি-রি করিয়া উঠিল। ক্লাসে আমাকে সকলে ভালো ছেলে, অতি শান্ত শিষ্ট বলিয়া জানিত, কিন্তু জানিত না যে রাগিলে আমার কোন জ্ঞান থাকে না।

অগ্রসর হইয়া আমি বলিলাম, এই শূয়ার, শীগ্‌গীর পায়রা ফিরিয়ে দে—

আমার গর্জ্জনে সকলে চমকিয়া উঠিল, একটু ভীত হইয়া ছেলেটি উত্তর দিল, ভারি আব্দার দেখাচ্ছেন—জোর ফলাতে এসেছেন—দেবো না, কি কর্‌বি, কী কর্‌বি?

গর্জ্জন করিয়া উঠিলাম—তবে রে!

নিমেষের মধ্যে বইগুলি পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছেলেটির মুখে এক ঘুষি মারিয়া দুইহাতের নখ দিয়া তাহার গাল গলা আঁচড়াইয়া ছিঁড়িতে লাগিলাম, পায়রা ফেলিয়া দিয়া সে আমার সহিত মল্লযুদ্ধে লাগিয়া গেল। মেয়েটি সযত্নে আহত পায়রাটিকে তুলিয়া লইয়া পথের একপাশে দাঁড়াইয়া আমাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধুলায় ধস্তাধস্তির পর কয়েকটি ছেলে মিলিয়া আমাদের ছাড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু আমি বলিতে পারি, সেদিন আমি তাহাকে হারাইতাম, নয় মরিতাম।

তার পর মনে পড়িল, প্রতিদিন স্কুলে যাইবার আসিবার সময় কয়েক মুহূর্ত্ত এই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতাম, যদি এ বালিকার দেখা পাই। যাইবার সময় কোন দিন দেখা পাইতাম, কোন দিন পাইতাম না; আসিবার পথে বিকেলে প্রায়ই সে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিত।

ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভাব হইল; জলছবি, রঙীন মার্ব্বেল, লজনচুষ ইত্যাদি নানা দ্রব্য উপহার দিতাম। প্রথম প্রথম সে কিছুতেই লইতে চাহিত না। তার পর সে লোভে পড়িয়া লইত, না প্রেমে পড়িয়া লইত, এ সমস্যার সমাধান আমি কোন দিন করিতে চাহি নাই।

হঠাৎ এক মাস পরে তাহারা সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রতাপের মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এ বালিকাকে আজীবন ভালবাসিব।

মেসের ছাদে চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে এত কথা মনে পড়িল। বাস্তবঘটনাময় জীবন-নাট্যের আড়ালে কোন্ শিল্পী মানসলোকে সবার অগোচরে তুলির পর তুলি বুলাইয়া কি যে আঁকে তাহার সন্ধান কেহই পায় না; হঠাৎ কোনদিন পর্দ্দা উড়িয়া যায়, আশ্চর্য্য সৃষ্টিকার্য্য বাহির হইয়া পড়ে। সেই সুমধুর বালিকাস্মৃতিটি এ কি নয়নভুলানো কিশোরীশ্রীরূপে পাইলাম।

পরদিন হইতে দুইজনেরই চঞ্চল চিত্ত ইংরেজী নভেলের রাজ্য হইতে বার বার পলাইয়া এক সরুগলির পুরানো বালিখসা বাড়ীর চারিদিকে রাঙা আঁচল ওড়ার ছন্দে কালোচুল ওড়ার তালে বারে বারে দুলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কলেজে আসিতে সুরেনের দেরী বাড়িতে লাগিল, শেষের ঘণ্টা সে কিছুতেই থাকিত না। মাঝে মাঝে আমিও কলেজ পলাইয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে সুরু করিলাম। কিন্তু সুরেনের প্রতি প্রেমের ঝড় যতই স্তব্ধ হইয়া মেয়েটির অন্তরের কোণে কোণে জমিতে লাগিল, আমার প্রতি প্রীতির পারাটা ততই ডিগ্রির পর ডিগ্রি নামিতে লাগিল। অভ্যর্থনা গুরুতর হইতে আরম্ভ হইল। সুরেনের ভাগ্যে একদিন পান জুটিল, আর আমার ভাগ্যে পানের পিচ; সুরেনের মাথায় একদিন ফুল পড়িল, আর আমার মাথায় ঘর ঝাঁট দেওয়া জঞ্জাল; এবার সুরেনের উপর ফুলের মালা পড়িবে, আর আমার উপর সম্মার্জ্জনী-বৃষ্টি আরম্ভ হইবে ভাবিয়া গলিতে যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম, অর্থাৎ গলির রঙ্গমঞ্চে প্রেমের মূক দৃশ্যনাট্যে সুরেনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরাল হইতে দর্শক হিসাবে মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতাম, রঙ্গভূমিতে অভিনেতা হইবার দুঃসাহস দূর হইল।

কলেজে দুইজনেরই নভেল পড়া বন্ধ হইল দেখিয়া পরস্পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, জীবনে যখন নভেল সুরু হয়, তখন নভেল পড়া আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। আমি থাকিতাম প্রেমের মদিরার ঘোরে—রৌদ্রসিক্ত কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ দিন ও জ্যোৎস্নাতপ্ত মদিরাময় বিনিদ্র রাত্রির রঙীন পাত্র যৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাসে বিরহের স্বপ্নসুধায় ভরিয়া তুলিতাম। কিন্তু সুরেনের কাছে প্রেম অগ্নিশিখার মত—তাহার তীব্রতেজে সে দিন দিন দগ্ধ হইতেছিল, চক্ষে কি বুভুক্ষু দৃষ্টি, মুখে কি তৃষিত ভাব, সমস্ত দেহে যেন ক্ষুধার জ্বালা।

সন্ধান লইয়া জানিলাম, মেয়েটি অবিবাহিতা। তাহার পিতা সামান্ত মাহিনার কেরানী, বাড়ীতে কেবল বুড়ী মা আছেন, এক ভাই বিদেশে কাজ করে, বিবাহ হইবার মত বয়স অনেক দিন হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব। আরও জানিলাম, জাতিতে তাহারা কায়স্থ। এবার সমাজ আমার দুরাশা দূর করিল, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। সুরেন যে কায়স্থ এইটুকুই আশার কথা।

কেবল মূক অভিনয়ে কয়েক মিনিট দেখায় গলির নাট্য ভালো জমিতেছিল না, বাক্‌দেবীর আবির্ভাব হইলে প্রজাপতির আগমন সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহারা যে সাহস করিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে এমন লক্ষণ দেখিলাম না।

অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলাম, সুরেনের নাম করিয়া মেয়েটিকে একখানি চিঠি লিখি—এবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করা যাক। এক পাতার একখানি চিঠি লিখিতে আমার একটি রাত ও এক ডজন চিঠির কাগজ নষ্ট হইয়াছিল। কম্পিতপদে দোদুল্যমান অন্তরে হাণ্ট্‌লি পামারের নাইস বিস্কুটের টিনের চিঠির বাক্সে পত্রখানি রাখিয়া আসিলাম।

ইহার পরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

বুঝিলাম কথাবার্ত্তাটা পুরুষের দিক হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। সুরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা অনেকদিন প্রায় বন্ধ ছিল, একদিন তাহাকে কমনরুমের এক নিভৃতকোণে ধরিয়া লইয়া গিয়া ইচ্ছা করিয়া বিবাহে প্রেমের প্রয়োজন সম্বন্ধে তর্ক তুলিলাম। নানা চতুর প্রশ্ন করিয়া নানারূপে তাহার মনের অবস্থা জানিয়া এইটুকু বোঝা গেল, সে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজী। কিন্তু তাহার সমস্যা এই, মেয়ের বাপের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলে পিতা কন্তাদায় হইতে মুক্ত হইবেন বলিয়া প্রস্তাবে রাজী হইবেন, মেয়েও পিতার ভার দূর করিবার জন্য আপত্তি করিবে না, কিন্তু সত্যসত্যই মেয়েটি তাহাকে চায় কি না কিরূপে জানা যাইবে?

অকূলে কূল মিলিল। মেয়েলী ছাঁদে মোটা মোটা অক্ষরে এক চিঠি লিখিয়া সুরেনের নামে পাঠাইলাম। কি লিখিয়াছিলাম সব মনে নাই। মেয়েটি যেন লিখিতেছে, সে সুরেনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে না পাইলে, সমাজে সে আজীবন কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

ডিনামাইট ত পোরাই ছিল, চিঠিটি এক হৃদয়ের আগুন অপর হৃদয়ে বহন করিয়া আনিল। এক ফাল্গুন-জ্যোৎস্নাময় শুভরাত্রে সুরেনের সহিত শান্তির বিবাহ হইয়া গেল।

আমাকে যে সুরেন সে বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য আমি তাহাকে দোষ দিই না। সে রাতে আমিও খুব উৎসব করিয়াছিলাম। আমার ছয়মাসের টিউসানির জমানো সব টাকা নিঃশেষিত করিয়া সমস্ত বন্ধুদের ডাকিয়া অকারণে বিপুল ভোজ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর সাতরাত ঘুম হয় নাই।

গলিতে শান্তির দেখা পাইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিবাহের পর সুরেনের প্রকাণ্ড প্রাসাদে সে কোথায় হারাইয়া গেল। কতদিন সেই পথের ধারে লুকাইয়া ঘুরিয়াছি। চারতলার কোন্ ঘরে সে আছে, কে জানে? মাঝে মাঝে সুরেনকে তাহার দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করিতাম যে, সে বিস্মিত হইত, আমিও লজ্জিত হইতাম। প্রশ্ন করা ছাড়িয়া দিলাম।

তারপর পরীক্ষার পড়া আসিল; ছইবৎসরের পাপ ছইমাসে প্রায়শ্চিত্ত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। পাশের পর এক জেলা-কলেজে চাকুরী লইয়া চলিয়া গেলাম।

কয়েক বছর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সুরেনের সন্ধানে তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখি গেটে এক ভোজপুরী দরোয়ান বসিয়া আছে, উপরের বারান্দায় কতকগুলি ময়লা চিক চট কদর্য্য কাপড় ঝুলিতেছে, তাহা

দেখিলেই বলিয়া দেওয়া যায় এ এক মাড়োয়ারীর বাড়ী। পাড়ার লোকদের নিকট জানা গেল বছর দেড়েক আগে সুরেনের বাবা এক ব্যবসায়ে ফেল হইয়া হঠাৎ মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়সম্পত্তি টাকার থলি সব দেনার ছিদ্র দিয়া পাওনাদারদের হাতে খসিয়া পড়িয়াছে, সুরেন কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

বহু চেষ্টা করিয়া সুরেনের বাড়ীর সন্ধান পাইলাম—এক গলির ভিতর ছোট ভাঙা বাড়ী। একদিন বিকালে সেখানে হাজির হইয়া সুরেনকে ডাকিব ভাবিতেছি, খুব ঝগড়ার শব্দ শোনা গেল। বাহিরের ঘরে কথা-কাটাকাটি হইতেছে, বাড়ীওয়ালার লোক শাসাইতেছে, আগামী মাসে উঠাইয়া দিবে; সুরেন রাগিয়া বলিতেছে, মোটে ত তিনমাস বাড়ী-ভাড়া বাকী আছে, আগামী মাসে একটি চাক্‌রী পাইলে সব চুকাইয়া দিবে। সহসা মুখ তুলিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল দোতলার জানালায় অশ্রুসিক্ত নয়নে কে দাঁড়াইয়া—সে এত কাঁদিতেছিল যে আমি যে তাহার দিকে চাহিয়া আছি তাহা সে দেখিতে পাইল না। সেই দারিদ্র্যক্লিষ্টা অশ্রুময়ী ক্ষীণা তনুলতার দিকে চাহিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, কান্না চাপিয়া গলি হইতে ছুটিয়া বাহির হইলাম।

সারারাত বিছানায় ছট্‌ফট করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিতে পারি এদের জন্য, আমি কি করিতে পারি? এদের সুখের সংসার আমি বাঁধিয়া দিয়াছিলাম, আজ দুঃখের দিনে এদের ভার লাঘব করা যে আমার কর্ত্তব্য। কত অদ্ভুত প্ল্যান মাথায় আসিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম আমার কয়েক বছরের জমানো কয়েক হাজার টাকা কোন কাল্পনিক মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি বলিয়া কোন উকীলের সাহায্যে পাঠাইয়া দি—তাহাদের বংশের কোন দুঃসাহসিক পিতৃতাড়িত যুবক কি রেঙ্গুন বা হনলুলু বা মেসোপোটেমিয়ায় গিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মরিয়া যাইতে পারে না? আবার ভাবিলাম সোজাসুজি যাইয়া তাহাদের অর্থ সাহায্য করি, কিন্তু সে সাহায্য তাহারা গ্রহণ নাও করিতে পারে। বেনামীতে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাই যদি—সে টাকা ফেরৎ আসিতে পারে।

পরদিন কয়েকখানি নোট চিঠির খামে পুরিয়া তাহাদের টিনের ডাকবাক্সে লুকাইয়া দিয়া আসিলাম। টাকা দিলাম বটে কিন্তু দেখা করিবার পথ একেবারে বন্ধ হইল। দেখা করিতে খুব বেশী ইচ্ছা ছিল না, শুধু দরজার গোড়ায় ময়লা-ফ্রক-পরা খুকীটিকে দেখিয়া একটু আদর করিবার বড় লোভ হইয়াছিল, তাহাও সম্বরণ করিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

একবার টাকা রাখিয়া ফিরিতেছি, দেখি, সুরেনের ঠিক পাশের বাড়ীর দেওয়ালে একখানি কাগজ মারা রহিয়াছে—বাড়ীখানি ভাড়া দেওয়া যাইবে। আনন্দে অন্তর নাচিয়া উঠিল। পাশাপাশি থাকিলে এ পরিবারের দুঃখ কষ্ট অভাব সব ঠিক জানিতে পারিব, প্রতিবেশী বলিয়া ভাব করিয়া সাহায্যও করিতে পারিব। কিন্তু রাত্রে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বুঝিলাম এত কাছাকাছি যাওয়া হয়ত ভালো হইবে না। গির্জ্জার ঘড়িতে রাত তিনটা বাজিল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, না, ও বাড়ী ভাড়া লইব না। তখন ঘুম আসিল। জীবনে এত বড় প্রলোভন আমি বোধ হয় কখনও জয় করি নাই। বাড়ী যদি বেশীদিন খালি পড়িয়া থাকিত কি হইত বলিতে পারি না, দিন সাতেকের মধ্যে এক ভাড়াটে আসাতে আমি বাঁচিয়া গেলাম।

টাকা দিয়া অন্তরে তৃপ্তি হইত না, জিনিস দিতে ইচ্ছা করিত। দেখিতাম খুকী ছেঁড়া পাৎলা ময়লা জামা গায়ে দিয়া ঘুরিতেছে, শীতের দিনে একটা গরম জামাও গায়ে নাই। সন্ধ্যাবেলায় খুকীকে কোলে করিয়া আমার বাড়ীর কাছ দিয়া ঝি প্রায়ই কোথায় যাইত। ধূমমলিন শীতসন্ধ্যায় এই ভ্রমণটায় আসলে ঝি বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প করিতে বাহির হইত, বিনা কাজে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দিবে না বলিয়া পাৎলা-জামা-পরা খুকীকে উপলক্ষ্যরূপে টানিয়া আনিত। প্রতিদিন পথের দেখায় আলাপ সুরু করিয়া দিলাম। পুতুল লজঞ্চুষ রঙীন বল ইত্যাদি নানা সৈন্যের সাহায্যে তাহার ছোট হৃদয়রাজ্য জয় করিয়া আনিলাম, একদিন খুকী ও তাহার ঝিকে ধরিয়া আমার বাড়ীতে আনিলাম। একটি গরম লাল ফ্রক খুকীর গায়ে পরাইয়া বলিলাম, দেখ ত ঝি বেশ মানিয়েছে না, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। খুকী নূতন জামা পরিয়া সরল হাসিয়া অস্ফুট

আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নাচিতে লাগিল, আমার কোলে চড়িতে কোন আপত্তি করিল না, চুল টানিয়া স্ব-ইচ্ছায় একটি চুম্বনও দিল। কিন্তু খুকীর কাছে ঝির ব্যবহার আশাপ্রদ হইল না, সে ফ্রক লইতে নানা আপত্তি তুলিতে লাগিল। আমি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলাম, ফ্রকটি আমি একজন ভাগ্নীর জন্য কিনিয়াছিলাম, তাহার গায়ে ছোট হইল, অথচ দোকানদার কিছুতেই ফেরৎ লইবে না, কেন জামাটা মিছামিছি পোকায় কাটিবে। অবশ্য ভাগ্নীটি কাল্পনিক। আরও বলিলাম, খুকীর বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ভাব আছে, আমরা একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ীতে আমি প্রায়ই যাই। কিন্তু ঝি কিছুতেই লইতে চায় না। তখন ঝিএর এই মূর্খের মত লজ্জাজনক ব্যবহার দেখিয়া খুকী দুর্ব্বলের বল ও যুক্তি ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। অগত্যা খুকীর গা হইতে জামা খোলা হইল না, ঝি বলিয়া গেল—কাল সে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে।

শুধু জামা গেল না, তাহার সহিত মোজা, টুপি, গরমগেঞ্জি ও খেলনাও গেল, প্রতিবস্তুটির উপর খুকীর সমান আকর্ষণ, পক্ষপাতিত্বের দোষ তাহাকে মোটেই দেওয়া যাইতে পারে না, সব জিনিষগুলিই তাহার চাই, প্রত্যেক জিনিষ সরাইয়াই দেখা গেল ক্রন্দনের সুর সপ্তমে উঠে। অবশ্য সব জিনিষই সেই কল্পিত ভাগ্নীর জন্য কেনা হইয়াছিল, সে আনন্দচিত্তে খুকীকে সব দান করিল।

রাত্রে কিন্তু বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে ভয় হইল—সে ভয়—ধরা পড়িবার ভয়। খুকীর আনন্দে এ কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। খুব ভোরবেলা উঠিয়া বাড়ীতে তালা লাগাইয়া To Let লট্‌কাইয়া পালাইলাম। দু'এক-দিনের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইল।

অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতে হইল। সুরেন নিজের উদ্যোগে চাকরী জুটাইতে পারিবে এ ভরসা আমার ছিল না, অতি কষ্টে অতি সামান্য মাহিনার এক চাকরী জুটাইয়াছিল। বেশী টাকা মাহিনার এক চাকরীর সন্ধান পাইলাম। আফিসের দরওয়ান, বড়-বাবু ও বড়-সাহেবকে বহু খোসামোদ করিয়া বেনামী চিঠি লিখিয়া সুরেনকে চাকরিটি জুটাইয়া দিলাম।

আমি পশ্চিমের এক কলেজে প্রফেসারি লওয়াতে তাহাদের সহিত আবার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

পাঁচ বছর পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এই হৃদয়হীনা নগরসুন্দরীর কি আকর্ষণশক্তি আছে জানি না—ইহার প্রমত্ত রথস্রোত, বিপুল জনতা, চঞ্চলজনকোলাহল, ইহার মোটরট্রামঘর্ঘরমুখর পিচেমোড়া কালো পথ, বক্র সঙ্কীর্ণ গলি, ইহার প্রাসাদরাশি, কদর্য্য বস্তি, ইহার ধূম ধূলি শব্দ জনপ্রবাহ সব মিলিয়া আমাকে টানিয়া আনে,—মানবের কর্ম্ম ও চিন্তা, প্রমত্ত শক্তি ও বিপুল লোভের নানা রঙের নানা প্রখর স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে অহর্নিশি উন্মত্ত জীবনের ফেনিলতায় চিত্ত মথিত হইয়া উঠে।

এইরকম এক শীতের প্রভাতে মধুর রৌদ্রে আবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছিলাম, সুরেনকে কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব। একটি চাকরের সহিত একটি ছোট মেয়ে নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া আসিল। পাড়ায় যে নূতন বাড়ী তৈরী শেষ হইয়াছে, তাহার স্বামী আসিতেছেন, গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতিবেশী বলিয়া আমার নিমন্ত্রণ। মেয়েটিকে দেখিয়াই চিনিলাম, বয়স বাড়িয়াছে, বুঝিলাম আবার নূতন করিয়া ভাব করিতে হইবে।

মেয়েটিকে আট্‌কাইলাম। বলিলাম, আমার বাড়ীতে কিছু খাইয়া না গেলে আমি তাহার বাবার বাড়ীতে গিয়া আজ কিছুতেই কিছু খাইব না। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া কালো চুল দুলাইয়া কচিহাতে সরু সোনার বালাগুলি বাজাইয়া তাহার মায়ের মত উজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া সে প্রথমে বিশেষ আপত্তি জানাইল। কিন্তু বিস্কুটের টিন, গরম গরম জিলিপি ইত্যাদি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির বেগ কমিতে লাগিল। তারপর যখন অপরিচয়ের পর্দ্দা একবার উড়িয়া গেল, সে আমাকে পরম আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিল—কোন আব্দার করিতে তাহার বাধিল না, টেবিলের উপর লালনীল পেন্সিল, ঝিনুক-বসানো কাগজচাপা, দেওয়ালে এক পাখীর ছবি ইত্যাদি নানা দ্রব্য সম্বন্ধে তাহার পাইবার ইচ্ছাকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিল এবং যখন সে দ্রব্যগুলি পাইল তখন এমন ভাবে গ্রহণ করিল এ যেন তাহার প্রাপ্য, স্বাভাবিক অধিকার।

এক পাড়ায় থাকি বলিয়া সুরেনের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ হইল, কলেজের সেই পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালাইয়া

জমাইয়া লইলাম। পাটের দালালী করিয়া সুরেন এখন লক্ষপতি।

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া সুখ ও সুবিধা এই যে তাহারা যাদের বন্ধুভাবে অন্তরে গ্রহণ করে তাহাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ বা সন্দেহ রাখে না। নিঃসঙ্কোচে তাহারা মনের কথা বলে, নির্ব্বিবাদে তাহারা গ্রহণ করে, নিঃসন্দেহে তাহারা আপন কর্তৃত্ব-অধিকার জারী করে। কিন্তু কোন বয়স্ক নূতন লোকের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে গেলে সংসার-সমাজের নানা রীতি নীতি বাঁচাইয়া নানা অভিযোগ-অধিকারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়। তাই ধনীবন্ধু ও বন্ধুপত্নীর আশা ছাড়িয়া এই বালিকাবন্ধুর বন্ধুত্বের উপর আমার পরম লোভ হইল। বেণু প্রথম দিনই আমার হৃদয় জয় করিয়াছিল, প্রতিদিন কত খেলায় গল্প কয়ায় বেড়ানোয় আমাদের বন্ধুত্ব জমিতে লাগিল।

তারপর কোন্ অজানা শুভ মুহূর্ত্তে জানি না এই অবলা বালিকার হাত ধরিয়া সুরেনের প্রাসাদের দরওয়ান-রক্ষিত গেট পার হইয়া চাটুকার-স্বর-গুঞ্জিত চুরুটধূমপূর্ণ তাসক্রীড়া-শব্দমুখর ভীতিপ্রদ বৈঠকখানাঘরগুলি ছাড়াইয়া স্নিগ্ধ অন্তঃপুরে যেখানে কল্যাণী লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা তাঁহার আনন্দগৃহে আসিয়া পৌঁছাইলাম। আমার কিশোর প্রেম যাহার ঘরে পৌঁছাইয়া ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল, আমার যৌবন প্রেম যাহার রুদ্ধদ্বারে বারবার করাঘাত করিয়াও খুলিতে পারিল না, এ মেয়েটির ভালোবাসার স্পর্শে কোন্ যাদুমন্ত্রে সে দুয়ার খুলিয়া গেল—প্রেমদীপদীপ্ত শান্তি-উজ্জ্বল মাধুর্য্যময় সে পুণ্যগৃহে আনন্দকম্পিত হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম। সত্যই একদিন বেণুর আবদারে তাহার মাতা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন।

তারপর সাত বছর কাটিয়া গিয়াছে—বেণুর আদর-আবদার-মাখানো হাসি-চুমোয়-ভরা কত কবি-ঔপন্যাসিকের রঙ্গীন-কল্পনা-জড়ানো সাত বৎসর।

তিন।

লেখা শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া এই বইয়ে-ভরা ঘরটির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, আমি যখন কত দেশের কত যুগের কত তরুণ-তরুণীর প্রেমের কাহিনী পড়িতেছিলাম, আমার এই ঘরে আমার পরিচিত দুই তরুণ-তরুণী তাহাদের প্রেমের কাহিনীর ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহা কে জানিত।

চাকর দরজা খুলিয়া জানাইল, একটি ছেলে দেখা করিতে আসিয়াছে। খুব রাগের ভান করিয়া বসিয়া যুবকটিকে ডাকিতে বলিলাম। দেখিলাম, বেচারা সারাদিন ভাবিয়া বাস্তবিকই শুকাইয়া গিয়াছে। বসিতে বলিলাম, দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া কপট গর্জ্জন করিয়া বলিলাম, কে এ চিঠি লিখেছে!

নগর গ্রাম হইতে বহুদূরে জনহীন অরণ্যে একসঙ্গে চারটে টায়ার সশব্দে ফাটিয়া গেলে মোটর-চালকের যেমন মুখ হয়, তেমনি মুখ করিয়া সে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

বেণুর সহিত বেশী মিশিয়া মনটা বড় নরম হইয়া গিয়াছে, যুবকটির উপর বড় করুণা হইল। মৃদু হাসিয়া অভয় দিয়া বলিলাম, বোসো। তার পর তাহার বাবা মা পরিবার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে নানা কথা, তাহার নিজের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া সকল তথ্য জানিতে লাগিলাম। সে পিতার একমাত্র পুত্র, পিতা ধনী ব্যবসাদার, জাতিতে কায়স্থ—এসব খবর জানিয়া বেণুর সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আচ্ছা, যাও, বলিয়া আবেগের সহিত কোনমতে তাহাকে বিদায় দিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, বিনি আসিল না। মৃদু জ্যোৎস্নার আলোর দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে-ছিলাম, পদশব্দে চমকিয়া উঠিলাম, দেখি, বেণুর বাবা ও মা আসিয়াছেন।

বলিলাম, আসুন, অনেক দিন পরে একটা গল্প লিখলুম, তাই শোনাবার নিমন্ত্রণ।

তাহার মাতা হাসিয়া বলিলেন, আপনার প্রধানা শ্রোত্রীটি কোথায়?

ধীরে বলিলাম, তাকে ত সারাদিন দেখিনি, কি জানি কোথায় আছে। আপনারাই শুনুন।

পাশের ঘরে আলো থাকিলে দেখা যাইত, আমার শ্রোত্রীটি তার পুরাতন বন্ধুকে ভুলিয়া গিয়া নূতন বন্ধুর সঙ্গে দিব্য গল্প করিতেছে।

ধীর কম্পিত কণ্ঠে সারাদিনের লেখা গল্পটি পড়িলাম। কাগজ হইতে এক নিমেষের জন্যও চোখ তুলিতে পারি নাই —হাত পা কাঁপিতেছিল কি না জানি না।

পড়া শেষ করিয়াও অবনত মুখে বসিয়া রহিলাম।

বেণুর বাবা যেন শুধু বলিল, কি আশ্চর্য্য, আমি এটা আগে ভাবি নি!

নিমেষের জন্য শান্তির চোখের উপর চোখ পড়িল, সে চোখ দু'টি যেন বলিল, আমি কিন্তু বরাবর জানতুম এ অজানা বন্ধু কে।

তারপর নতমুখেই কার্পেটের পাখী ও ফুলগুলির দিকে চাহিয়া বেণুর প্রেমের কথা, চিঠির কথা, আমার ছাত্র যুবকের কথা বলিলাম; বলিলাম, তাহাদের নিকট এ জীবনে কখনও কিছু চাহি নাই, এই একটি ভিক্ষা চাহিতেছি।

বেণুর মা ধীরে উঠিয়া আসিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আপনি একটুকুও ভাববেন না, আমার খুব মত আছে।

বেণুর বাবাও উঠিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বিনির বে আপনি যেমন খুসি দেখে শুনে দেবেন, আমরা একটুও আপত্তি করবো না।

আমি কিন্তু তেম্নি নতমুখে বসিয়া রহিলাম। তাঁহারা দু'জনেই স্তব্ধ। সহসা ঘরটি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, কাহার কালো চুলে টাক ছাইয়া গেল, অশ্রুঘন চোখে দৃষ্টি তুলিয়া দেখি—বেণুর কানের সোনার ইয়ারিঙের চুনীটা চোখের সামনে ঝক্‌মক্ করিতেছে—পাশে শান্তি চোখের-জলে-ভেজা চাউনিতে চাহিয়া আছে।

পাশের ঘর হইতে বেণুর বাবার গলা শোনা গেল, আমার ছাত্রটিকে বলিতেছেন, ইয়ং ম্যান, তোমার সাহস দেখে খুসী হয়েছি, তোমার বাবার নাম ও ঠিকানাটা আমায় লিখে দাও।

বিনিদ্র রাত্রি, ঘড়ীতে একটা বাজিল, চুপ করিয়া পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বসিয়া আছি, নীলসিল্কের কাপড়ে বাঁধানো ব্রাউনিঙের কাব্যগ্রন্থগুলির সোনার জলের লেখায় জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করিতেছে, কবি কি আনন্দে বলিতেছেন, খুসী হইয়াছি।

চুপ করিয়া বসিয়া আছি, কি ভাবিতেছি জানি না, অদৃশ্য শিল্পী নীরবে বসিয়া মনের পটে কি ছবি আঁকিতেছে।

শিল্পী, তুমি কি লিখিতে চাও? সারাজীবনে কি লিখিলে, আরও কি লিখিবে, আমাকে তাহার একটু অর্থ বুঝাইয়া দাও। আমরা ভাবি প্রাণের রঙে রক্তের কালীতে ঘটনার পর ঘটনার কথা সাজাইয়া আপন খুসিমত নিজ জীবনের গল্প লিখিয়া যাইব, কলম ত তুমি আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ; কিন্তু কেন দুঃখের অগ্নিরাঙা রেখা দিয়া লেখার মাঝে মাঝে জ্বালাইয়া দাও, বিচ্ছেদের শুভ্র অশ্রুরেখা দিয়া কাটিয়া দাও, মৃত্যুর কালো তুলি বুলাইয়া দিয়া হঠাৎ কোন পাতা মুছিয়া দাও—দুঃখসুখের পাত্র ভরিয়া তুমি কি পান করিতে চাও? কলম, ত তোমার হাতে দিতে চাই, তুমি নাও না কেন? তোমার অদৃশ্য তুলি দিয়া কি আঁকিতেছ আমায় বুঝাইয়া দাও।

জান্‌লার কাচ দিয়া জ্যোৎস্নার ধারা আমার বিছানায় ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অনুপম আলোর একটি উপমা আমি প্রায়ই ভাবি—তাহা প্রিয়ার চুম্বন নয়, প্রেমিকজনের চাউনি নয়, তাহা শিশুর হাসি। স্বর্গের প্রথম শিশু মাতার বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে যে হাসি হাসিয়াছিল, সেই হাসির স্পর্শে বুঝি অন্ধকার চন্দ্রপিণ্ড মণিপ্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তার পর মায়ের বক্ষে ঘুমন্ত শিশুদের হাসিমাণিক-গুলি প্রতি রাতে কুড়াইয়া সে আপন শিখা উজ্জ্বল রাখে। আজ যখন বেণু চলিয়া গেল, তাহার অধর নয়ন কপোল ভরিয়া যে হাসি উপলমণির ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, এ আলো সে হাসির মত নয়,—এক শীতসন্ধ্যায় বেণুকে যখন প্রথম গরম লাল ফ্রক পরাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার মুখে মুক্তাস্রোতের মত যে আনন্দ-হাসি উছলিয়া উঠিয়াছিল —তাহার কথা বার বার মনে পড়িতেছে।

সারারাত্রি এ জ্যোৎস্নাময় নীলাকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে,—ওই চাঁদটি, ও যেন বেণুর হাসির উপর আমার এক ফোঁটা চোখের জল ঝক্‌মক্ করিতেছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

সন্দিহান

স্থষ্টি ! শাশ্বত যে কে তারে সৃজন করে ?
আপনি সে রূপে রসে বর্ণে স্তরে স্তরে
নব নব বিকাশে স্ফুরিছে নিত্যকাল।
স্থষ্টি ! স্থধু কথা মাত্র—ভাষার খেয়াল।
এই যে বিরাট ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর
আপনাতে পরিপূর্ণ—ইহার ঈশ্বর !
কে ইহার স্রষ্টা, পাতা, কে করে চালন,
কে করিবে ধ্বংস আর কে করে লালন !
চাহি না খেয়ালে-ক্ষ্যাপা ঘূর্ণীবায়ে মিছে,
কুটিল জটিল তর্কে, শূন্যতার পিছে,
ঘুরিয়া মরিতে বৃথা ; শুধু এই জানি
'আমি' আছি, আর এই 'জগতে'রে মানি।
এরি সাথে টান মোর নাড়ীতে নাড়ীতে
শিরায় শিরায় ; তাই ইহারে ছাড়িতে
বুকে মোর বাজে ব্যথা। এরি তপ্ত রসে
শিরা-উপশিরা মোর বিপুল হরষে
প্রাণবান্। এরি শিশু—যত নরনারী—
প্রাণের দোসর মোর। যত বনচারী—
ক্ষুদ্র হ'তে অতিক্ষুদ্রতম জগতের,
রেণুপরমাণু যত নিখিল বিশ্বের,
যারে দেখিয়াছি, যারে দেখি নাই কভু,
যত অগোচর হোক জানি আমি তবু—
সবাকার সাথে মোর অণুতে অণুতে
প্রত্যক্ষ সত্যের যোগ। আমার তনুতে
নিখিলের সর্ব্বকাল সর্ব্বলোক ভব
আপনার পরকাশে লভেছে গৌরব।
কল্পনার লীলারঙ্গে বিশ্বের দ্রষ্টারে
আপনি করিয়া স্থষ্টি অন্তর-স্রষ্টারে
দিলে ফাঁকি ; তাই এই সত্য বিশ্ব হ'তে—
এই মহা জগতের আঁধারে আলোতে
জলে স্থলে চরাচরে বর্ণে রূপে রসে
যে সজীব পূর্ণ প্রেম তোমারি পরশে
শিহরি' উঠিছে নিত্য ; বিদ্যুৎ-আবেগে
টানিছে তোমারে অহরহ ; আছে জেগে
স্নেহসুধাভারাতুর মাতৃস্তন-প্রায়
সতত উন্মুখ, রত তোমারি সেবায়—
সেই বিশ্ব হ'তে তুমি লইলে তুলিয়া
কল্পনায় অন্ধ দিঠি—খেয়ালে ভুলিয়া
'শূন্যে' চাহ আঁখি মেলি,—এ কোন্ মায়ায় !
হায় রে লোলুপ চিত্ত ! মুগ্ধ পিপাসায়
'অনন্তে' করিলে বাঞ্ছা—মায়া মরীচিকা,
অসীমশূন্যতাভরা শূন্য কুহেলিকা।
'পূর্ণতা'র মাঝে রহ 'অসীমে'র কর তবু আশা।
'অসীম' কি 'পূর্ণ' ? হায় ! কেমনে সে মিটাবে পিপাসা !
সে অসীম অনন্ত-অপূর্ণ চিরকাল, দূরে রহি'
মৃগতৃষ্ণিকার মত সংহারিছে লুব্ধজনে দহি'।
কল্পিয়া দেবতা নিজে কল্পনারে পূজি' নিশিদিন,
"বিশ্বাসের" অন্ধ গর্ব্বে মত্ত আছ হে মূঢ় প্রবীণ !
অনন্তের লোভে লুব্ধ আপনারে বলহ বৈরাগী ;
মোরে কহ "মায়ামুগ্ধ" যে সবার প্রেমে অনুরাগী !
সবা হ'তে প্রাণ মোর, জানি আমি সবাকার তরে
আমার অস্তিত্বটুকু ; তাই মোর অন্তরে অন্তরে
এই সুবিপুল প্রেম সবারে চাহিয়া। এই ধরা,
এই চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-খচিত জগৎ মনোহরা,
সবাকার মাঝে রহি' সবার অমৃতরস পানে
সঞ্জীবিত প্রাণ মোর—চির বাঁধা এ বিশ্বের টানে।
সবার মাঝারে "আমি" প্রাণযোগে মুক্ত চিরদিন,
আমার মাঝারে সবে রূপে রসে সুন্দর নবীন।
কল্পনায়-অবিশ্বাসী-মোরে বল নীরস নাস্তিক ?
হায় রে কল্পনাসেবী লুব্ধ অন্ধ মূঢ় পৌত্তলিক !

শ্রীজীবনময় রায়।

রাজিয়ার শেষজীবন

অতি ক্ষীণ, সামান্য কারণ—যাহাতে কোনক্রমেই সহজে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে চাহে না, চাহিলেও সে অবহেলায় আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারে, আশ্চর্য্য এই, তাহার মধ্যেও মানুষের সর্ব্বনাশের বীজ, তাহার সুখের আকাশপ্রমাণ অট্টালিকা ভস্মসাৎ করিবার মত অগ্নিকণা সুপ্ত হইয়া থাকে। এই স্ফুলিঙ্গের আত্মপ্রকাশে দেখিতে দেখিতে কত দেশ গিয়াছে; কত মহাদেশের অধঃপতন হইয়াছে; কত রাজদণ্ড, কত রাজাধিরাজ, কত মহাজাতি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজিয়ার ভাগ্যচক্রেও সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরই নিষ্ঠুরলীলা আরম্ভ হইল।

জমাল্-উদ্দীন্ ইয়াকুৎ জাতিতে হাব্‌শী; তিনি রাজিয়ার অশ্বশালার পরিদর্শক—'আমীর-ই-আখুর'। রাণী ছিলেন কবির মানস-দুহিতা মণিপুর-রাজকন্যার মত :—

*　　*　　*

"অশ্বারোহী, অবহেলে বামকরে বল্গা
ধরি, দক্ষিণেতে শরাসন, নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান * * *
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী।" (চিত্রাঙ্গদা)

বস্তুতঃ রাজ্যশাসনের জন্য সর্ব্ববিষয়েই যে রমণীর পুরুষের ন্যায় হওয়া কর্ত্তব্য - এমন কি, অশনে-বসনে গমনে-উপবেশনেও—রাজিয়ার মনে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই তিনি পুরুষের মত গায়ে 'কবা' (কোর্ত্তা), শিরে 'কুল্যা' (উঁচু টুপী) এবং কোমরে কটিবন্ধ পরিয়া অশ্ব বা গজারোহণে নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন।

বাদ্‌শাহ্‌গণ সাধারণতঃ উচ্চ অশ্বে আরোহণকালে অশ্বপালের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতেন। মহারাণী রাজিয়াও হাব্‌শী জমাল্-উদ্দীন্ ইয়াকুতের সাহায্যে বাদ্‌শাহী-কায়দায় যথারীতি অশ্বারোহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রমণী—রমণী, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পুরুষত্বের দাবী প্রকৃতির রাজ্যে কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। একদিন তাঁহার সেই পুরুষের ছদ্মবেশ—বাদ্‌শাহী কায়দা-কানুন পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহারের অন্তর হইতে যে কেমন করিয়া তাঁহার স্বভাবকোমল স্নেহপ্রবণ রমণীহৃদয় আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। অশ্বশালার পরিদর্শক জমাল্-উদ্দীনের প্রতি দিন দিন তাঁহার অনুগ্রহের ভাবটা কিছু অধিক হইয়া পড়িতে লাগিল। ভৃত্যের প্রতি মনিবের অনুগ্রহের মাত্রা যতটুকু হওয়া রাজনীতির হিসাবে যুক্তিযুক্ত, রাজিয়ার রমণীহৃদয় তাহাতে আদৌ পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। আর এক কথা, আমীর মালিকরা জাতিতে তুর্কী, কিন্তু জমাল্ উদ্দীন ছিলেন হাব্‌শী—বিজাতীয়; স্বভাবতই ইঁহার উপর একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল। ইঁহার প্রতি রাজিয়ার অনুগ্রহের ভাব দেখিয়া তুর্কী আমীর মালিকরা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না—ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

রাজিয়া মুসলমানগণের চিরাচরিত প্রথার মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত করিতেছেন,—পর্দ্দার আড়াল ঘুচাইয়াছেন, পুরুষের বেশে রাজপথে বাহির হইতেছেন, রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন! পারিষদ্‌গণের মনে হইল ইহা রাজিয়ার অসহনীয় স্পর্দ্ধা, অতি ঘোর স্বেচ্ছাচারের পরিচয়। পুরুষ হইয়া তাঁহারা রমণীর এইসকল অত্যাচারের প্রশ্রয় ত কোনক্রমেই দিতে পারেন না। আরও একটা গুরুতর কথা এই—ইহাতে ধর্ম্মের অনুশাসনও অমান্য করা হয়।

মুসলমাণগণের মুকুটমণি, আরবের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছেন,—"দুনিয়ার সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের মত অমূল্য সম্পদ আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহার জন্য রাজসিংহাসন নহে। যাহারা স্ত্রীলোককে সিংহাসন প্রদান করে, তাহাদের মুক্তি নাই।" অতএব রাজিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ায় শুধু অন্যায়ের নহে,—অধর্ম্মেরও দাসত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আমীর মালিকেরা যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া চারিদিকে অসন্তোষের অনল ছড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহের আমন্ত্রণে অনেকেই উল্লাসের সহিত যোগদান করিল।

সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন লাহোরের



সুলতানা রাজিয়া।

শাসনকর্ত্তা মালিক ইজ্জ-উদ্দীন্ কবীর খান্ ই আয়াজ। রাণী কিছুমাত্র ভীত বা চকিত না হইয়া সসৈন্য লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন। ইজ্জ উদ্দীন্ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্ষমার্থী হইলেন। ক্ষমার্থিজনকে ক্ষমা করাই বিধি। রাজ্ঞী তাহাকে পদচ্যুত না করিয়া মুল্‌তানে বদ্‌লী করিলেন। আর মুল্‌তানের শাসনকর্ত্তা করাকুশ খাঁকে লাহোরের সামন্ত নিযুক্ত করিলেন।

এত শীঘ্র ও এত সহজে এই বিদ্রোহ-নাট্যের যবনিকাপাত হওয়ায় আমীর-মালিকগণ যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা নিরাশ হইবার পাত্র নহেন,—তলে তলে একটা ভীষণ বিদ্রোহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তবরহিন্দার (বর্ত্তমান ভাটিণ্ডা) সামন্তরাজ ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন্ অল্‌তুনিয়া জনৈক ক্ষমতাশালী মালিক। তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও অর্থাদির কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। রাজ্ঞীর অন্যতম পারিষদ্ আমীর-ই-হাজিব ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্ এৎ-কীনের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ। হাজিব ইখ্‌তিয়ার তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া রাজিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই সামন্তরাজ, তাঁহার বর্ত্তমান পদমানের জন্য রাজ্ঞীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। রাজ্ঞীই তাঁহাকে জাগীর দিয়া দিল্লীর পূর্ব্বাঞ্চলে বারণে (বুলন্দ্‌শহরে) সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আর অধুনা তাঁহারই প্রসাদে ইখ্‌তিয়ার তবরহিন্দার নামজাদা সামন্ত। কিন্তু সুহৃদের প্ররোচনায় তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন—নিমকের কথা বিস্মৃত হইয়া রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। রাজিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন, দুষ্টের দমনে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব তাঁহার কখনই হইতে পারে না। রণসাজে সজ্জিত হইয়া তিনি অবিলম্বে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

পথ সুদীর্ঘ, মরুকান্তারলীন, সুদুর্গম। নিদাঘের অনলোদগারী দুঃসহ সূর্য্যকিরণের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে এই পথ অতিবাহনপূর্ব্বক যখন রাজিয়া তবরহিন্দায় উপনীত হইলেন, তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অবসন্ন, সঙ্গের সেনাদলও নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ। আততায়ীরা এইরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষাই এতদিন করিতেছিল। শক্তি ও সাহস, তেজ ও বীর্য্যের অবতার এই সিংহীকে বিঘোরে না ফেলিলে যে তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করা অসম্ভব, তাহা তাহারা উত্তমরূপেই অবগত ছিল। তাই এই দুর্দ্দিনে তবরহিন্দার ন্যায় দূরবর্ত্তী দুর্গম স্থানেই ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা বিদ্রোহের কেন্দ্র করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। রাজ্ঞীর পারিষদ্ তুর্কী আমীরগণ তাঁহাকে পথশ্রমে কাতর দেখিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সহসা দানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। অশ্বশালার পর্য্যবেক্ষক হাব্‌শী ইয়াকুতের উপরেই তাহাদের আক্রোশ অত্যন্ত অধিক। সে বিজাতীয়, রাজ্ঞীর অনুগ্রহ-ভাজন, অনুগত, একেবারেই বিশ্বাসঘাতক নহে। অতএব অগ্রেই ইয়াকুৎকে তাহাদের তরবারির মুখে শির দিতে হইল; তাহার পর রাজ্ঞীর দণ্ড-কুসংস্কারান্ধ, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ তুর্কী আমীরগণ তাঁহাকে অসহায়ের মত বন্দী করিয়া তবরহিন্দার দুর্গে কারারুদ্ধ করিল। সিংহী এতদিনে পিঞ্জরাবদ্ধ হইল।

রাজিয়ার ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বিনী নারীর পক্ষে কারাবাস যে দুর্ব্বিসহ কঠোর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কারাবাসকে কঠোরতর করিয়া তুলিল মনের ক্ষোভ—যাহারা তাঁহার একান্ত নির্ভরের পাত্র, শাসন-তন্ত্রের নায়ক, তাঁহারই নিমকে যাহারা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, তাহারাই তাঁহাকে এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখের অতলতলে নিক্ষেপ করিল। রাজ্ঞী মুক্তির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি যে দুষ্টগণের শত্রুমধ্যে পরিগণিত, এবং কুসংস্কারের সনাতন নাগপাশ ছেদন করিয়া শিষ্টগণেরও একান্ত বিরাগভাজন হইয়াছেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই রাজধানী হইতে বহুদূরে—তবরহিন্দার কারাকক্ষে নিবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকারের করাল বিভীষিকাই দেখিতে লাগিলেন—কোথাও এতটুকু আলোর রেখাও দেখিতে পাইলেন না।

রাজিয়াকে কারারুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী মালিক-আমীরগণ মহোল্লাসে রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং রাজিয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুলতান মুঈজ-উদ্দীন্ বহরাম শাহ্‌কে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য ও রাজভাণ্ডার লইয়া স্বার্থের ছিনিমিনি খেলা খেলিতে লাগিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই জগতের খেয়াল, সে যে কেমন করিয়া নিশ্চিতকে অনিশ্চিত, ও অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করিয়া তুলে, বুঝিবার উপায় নাই। হঠাৎ ঘটনা-স্রোতের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ফিরিয়া গেল। রাজিয়া তবরহিন্দার কারাকক্ষে বসিয়া দুঃখময় দিনগুলির দীর্ঘতার পরিমাণ করিতেছিলেন, আর ভাগ্যে আরও বা কি দুঃখদুর্গতি ঘটে, ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছিলেন; সহসা সশব্দে তাঁহার কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। রাজিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, অল্‌তুনিয়া মুক্ত দ্বার দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বিদ্রোহিগণের অগ্রণী। তাহার অভিপ্রায় কি? হত্যা করা, না আর কিছু? উদ্বিগ্ন, ভগ্নহৃদয় রাজিয়ার আশঙ্কা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে পরিণত হইল। অল্‌তুনিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত। সে আজ শত্রু-বেশে আসে নাই, মিত্র ভাবেই তাঁহার নিকট উপস্থিত।

এতদিনে অল্‌তুনিয়ার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। লোকটা যে নিতান্ত মন্দ তাহা নহে; ঘটনাচক্রে, সুহৃদের কুপরামর্শে, 'আশার ছলনায়' ভুলিয়াই তিনি রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিদ্রোহের ফলে বিদ্রোহী নামের কলঙ্ক বই তাঁহার আর কোনও লাভই হয় নাই; অপরপক্ষে তাঁহাকেই ক্রীড়াপুত্তল করিয়া তাঁহার সহযোগীরা নিজ নিজ স্বার্থ ষোল আনা সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে—দিল্লীতে তাহারাই এখন সর্ব্বে-সর্ব্বা, তিনি কেহই নহেন। দেখিয়া শুনিয়া অল্‌তুনিয়ার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর সহযোগীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, প্রতিশোধের এক অপূর্ব্ব উপায় তাঁহার হাতের কাছেই রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তিনি তাঁহার ঘৃণিত সুহৃদ্বর্গকে বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং এমন কি হয়ত অতি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেও পারেন।

অল্‌তুনিয়া রাজ্ঞীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তারপর সসঙ্কোচে এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিবেন। শুধু মুক্তিও নয়, যদি তিনি সম্মতি দেন, অল্‌তুনিয়া তাঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার যাহারা শত্রু,—অল্‌তুনিয়ার যাহারা দুষমন্—তাহাদের বিরুদ্ধে একবার তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়ান,—কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

সম্পূর্ণ আকস্মিক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব। রাজিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ত জানিতেন কারাগারের দ্বার আর উন্মোচিত হইবে না—এইখানেই তাঁহাকে পচিয়া মরিতে হইবে, তাঁহার পিতৃদত্ত রাজ্যের উন্নতিকামনা এই কারাগর্ভেই বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু কারাকক্ষের দ্বার অপ্রত্যাশিত হস্তে উন্মোচিত হইয়াছে, আর সেই হস্ত তাঁহার রাজ্যের কণ্টক দূর করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর। রাজ্য ধ্যান, রাজ্য জ্ঞান, রাজ্যের জন্য তিনি যে তাঁহার রমণীহৃদয়কে পুরুষোচিত কঠোর করিয়া তুলিবার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর রাজ্য তাঁহাকে যেন বাহু বিস্তার করিয়া আকুলকণ্ঠে আহ্বান করিতেছে—"এস, এস, ফিরে এস।" তিনি ইচ্ছা করিলেই সেই রাজ্যের দুঃখদুর্গতি দূর করিয়া দিয়া সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিবার উপায় করিতে পারেন। রাজিয়া অল্‌তুনিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তারপর যথাসময়ে অল্‌তুনিয়াকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। অল্‌তুনিয়াও কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

বিবাহের পর উপযুক্ত বাহিনী সাজাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। খোকর ও জাঠগণের মধ্য হইতে বহু সেনা সংগৃহীত হইল। নিকটবর্ত্তী জাগীরের কয়েকজন আমীরও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। অভিযান-কালে বিপক্ষীয় সেনাদলের মালিক ইজ্জ-উদ্দীন্ মুহম্মদ সালারী, এবং মালিক করাকুশ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মহাসমারোহে রাজিয়া স্বামীর সঙ্গে পাশাপাশি সমরাঙ্গনে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সেই বিপুল আনন্দময় ভারত সাম্রাজ্য, যাহার শাসন ও সংরক্ষণই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রতরূপে পরিগণিত, আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে হস্তচ্যুত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের স্বেচ্ছাচারের লীলাস্থলী হইয়াছে, তাহার উদ্ধারসাধনের জন্য রাজিয়ার যত্ন ও চেষ্টার কোন ত্রুটিই হইল না। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট যাহার বিরূপ, যত্ন ও চেষ্টা তাহাকে কিরূপে সাফল্যের বিজয়মাল্য অর্পণ করিবে?

দিল্লীর বহির্ভাগে দিল্লীর নব সুলতান্ বহ্‌রাম্ শাহ্‌র সহিত তাঁহাদের যে সংঘর্ষ হইল, তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ভাগ্য যাহাদের প্রতি বিমুখ, সহায়সম্পদ্ কদাচ তাহাদের বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল সৈন্য তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিল, কইথাল * নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দম্পতি নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে দাঁড়াইলেন। কাল ইঁহাদের একজন সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী আর একজন তবরহিন্দার সুবিখ্যাত সামন্ত, ঐশ্বর্য্যে প্রতিপত্তিতে ইঁহাদের তুলনাস্থল ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আর আজ তাঁহারা সর্ব্বহারা পথের ফকীর! অবস্থার কি শোচনীয় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কিন্তু ইহাই নিয়তির সর্ব্বশেষ নিষ্ঠুর ছলনা নহে। এই অসীম শূন্য গগনের তলে, ধরণীর সুবিশাল মৃত্তিকাময় বক্ষমাঝে, পর্ণকুটীরে, বৃক্ষতলে যেখানে হাজার হাজার দীনহীন নরনারীর জুড়াইবার স্থান, সেখানেও এই দুঃস্থ দম্পতির জীবনের দিনগুলি কোনওরূপে অতিবাহিত করিবার জন্য এতটুকু ঠাঁই হইতে পারিল না। কইথালের হিন্দু জমীদারগণের হস্তে বন্দী হইয়া † তাঁহারা অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। এই মহামূল্য নিঃসহায় দুইটি জীবনকে অকালে বিনষ্ট করায় তাহাদের কি লাভ হইল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে; কিন্তু মুসলমান রাজত্ব রাজ্ঞীর সুশাসনে যে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিল, রাজা ও রাণীর সম্মিলিত শাসনে তাহা যে সত্য হইয়া, বিরাট্ হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা আপাততঃ স্বপ্নে পরিণত হইল। নবদম্পতির মনের কামনাও তাঁহাদের সঙ্গেসঙ্গেই কইথালের তৃণতলে চির-সমাধি লাভ করিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* কর্ণাল হইতে ৩৮ মাইল দূর, এবং দিল্লীর প্রায় ১০০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

† T—i—Nasiri. অন্য এক বিবরণে প্রকাশ, রাজিয়া ও অল্‌তুনিয়া বন্দীভাবে বহ্‌রাম শাহ্‌র নিকট আনীত হইলে, তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়।

সন্ধানী

১

শ্রান্ত পান্থ, দীর্ঘ তোমার পন্থ হে—
কোন্ সুদূরে কোথায় তাহার অন্ত হে?
উধাও তুমি মানস পারে
কোন্ মহাদেশ আবিষ্কারে,
কোন্ সুমেরু হের্‌বে ভাগ্যবন্ত হে?

২

বাঞ্ছা তোমার কোন্ হিমাদ্রি লঙ্ঘিতে,
কি সুর তুমি বাঁধ্‌তে চাহ সঙ্গীতে?
কোন্ সমস্যা বিশ্লেষণে
ব্যস্ত তুমি রাত্রি-দিনে?
অচিন্ পথে চল্‌ছো কাহার ইঙ্গিতে?

৩

প্রকৃতির এই রহস্যময় অন্দরে,
অনন্তের ওই ইন্দ্রনীলের বন্দরে,
বেড়াও তুমি কি ধন খুঁজি—
পরশপাথর কাম্য বুঝি?
তোমার তরী আকাশ-নীলে সন্তরে।

৪

অতল তলে কোথায় ধরার পঞ্জরে
অতীত যুগের প্রাণের সাড়া সঞ্চরে,
লুপ্ত জীবের অস্থিখানি
কয় যে প্রাচীন স্বস্তিবাণী,
আদিম ধরার প্রীতির গীতি গুঞ্জরে।

৫

চঞ্চলেরে বাঁধ্‌তে চাহ বন্ধনে
বুক পেতে লও ফুলের বুকের স্পন্দনে।
পাষাণ তোমায় কয় যে কথা,
শূন্যে ফুটাও আলগলতা,
দেবের চরণ-চিহ্ন ফুটাও চন্দনে।

৬

হে সন্ধানী, সন্ধানে কি শান্তি হে—
অনন্ত পথ, নাইক তবু ক্লান্তি হে।
সুদূর সুদুর্ল্লভের প্রীতি
বিশ্বাসেরে জাগায় নিতি,
ভক্তি-পথে যুক্তি আনে ভ্রান্তিরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অধ্যাপক টম্‌সনের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"*

(সমালোচনা)

রবীন্দ্রনাথ আজ জগদ্‌বিখ্যাত হলেও, জগৎকে তাঁর পরিচয়ের যে অংশটুকু আমাদের দেবার কথা, আমরা বাঙালীরা তা দিই নি। আমাদের দেশের লোক যাঁরা, তাঁরা তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে, তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে এবং ইচ্ছা করলে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে পরিচিত হয়ে, তাঁকে ত অনেকখানি জান্‌তে পারেন, কিন্তু বিদেশীর পক্ষে সেটা খুবই শক্ত। যাঁদের সাহিত্য রস-বোধ আছে এবং রবীন্দ্রনাথের মত মানুষকে সকল দিক্ দিয়ে বুঝ্‌বার এবং বুঝাবার ক্ষমতা আছে এমন মানুষ যে আমাদের দেশে নেই তা নয়; কিন্তু তবু তাঁর সকল দিকের পরিচয় দেশের ও বিদেশের মানুষকে দেবার চেষ্টা কেউ করেন নি। খণ্ডখণ্ড ভাবে এক একটা দিক দেখাবার চেষ্টা দু এক জন করেছেন, উল্লেখ যোগ্য কাব্য সমালোচনা মাসিকপত্রাদিতে কিছু বেরিয়েছে, কিন্তু তার কোনোটাই তাঁর সমগ্র রূপটিকে ধরাতে পারে না। আমাদের দেশের এই একটা অবশ্য কর্ত্তব্য যে দেশ করে নি, তার জন্ত আমরা বাস্তবিকই লজ্জিত ও দুঃখিত। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় চেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু অসমাপ্ত কাজ রেখেই তাঁকে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। যা আমাদের কাজ, তা বিদেশী সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত টম্‌সন গ্রহণ ক'রে আমাদের লজ্জা দিয়েছেন। তিনি যে ছোট ইংরেজি বইখানি সাধারণের কাছে এনে ধরেছেন, তা নিতান্ত ছোট হলেও তাতে রবীন্দ্রনাথকে সব দিক দিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা আছে, তাতে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে তাঁকে বোঝ্‌বার চেষ্টা আছে, এবং আরো বিস্তৃতভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা কর্‌বার আশ্বাস দেওয়া আছে। এই-সব কারণে আমরা মিঃ টমসনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলা ভাষার সঙ্গে টম্‌সন্ সাহেবের যতখানি পরিচয়, বিদেশী ভাষার সঙ্গে ততখানি পরিচয় নিয়ে আমরা এরকম কাজে হাত দিতে সাহস কর্‌তাম না এবং কর্‌লেও এতখানি সফল হতাম কি না সন্দেহ। রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত কয়েকজন বাঙালীর সাহায্য তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু তাঁর নিজের রসবোধ ও বিচারবুদ্ধি যে উচ্চদরের, তা এই ছোট বইখানির পাতায় পাতায়ই ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে জগৎকে যে উপহার দিয়ে আস্‌ছেন, একখানা ১০৬ পাতার বই লিখে যে তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, মিঃ টমসন নিজেই তা লিখেছেন; কাজেই বইখানির দোষত্রুটিগুলির একটু সদয়ভাবে বিচার করা ভাল। কিন্তু আসল বিষয়টা বড় বলেই ছোট জিনিষের স্বল্প সমালোচনা করলে আশা করি মিঃ টম্‌সন্ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

মিঃ টম্‌সন্ রবীন্দ্রনাথের রচনা আংশিকভাবে পড়েছেন বলেছেন এবং তাঁর দেশবাসী কেউই যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা পড়েননি এই মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। সব কিছু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাড়া কেউ পড়েননি নিশ্চয়, কিন্তু ছাপার অক্ষরে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত আজও যা কিছু অনায়াসে পাওয়া যায়, তার নগণ্য দুই চারটাকে বাদ দিয়ে সব কিছু পড়েছেন এমন বাঙালীর অভাব বাংলা দেশে নাই, যদিও সংখ্যায় তাঁরা খুবই অল্প।

মিঃ টম্‌সন্ বলেন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহু কবিকেই কালিদাসের কাব্যে যতখানি অনুপ্রাণনা দিয়েছে, রামায়ণ মহাভারত তা দেয় নাই (p. 1)। কাব্যের বিষয় ও রচনা পদ্ধতি প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে তৌলদাঁড়ি কোনদিকে কতখানি হেলে তা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক যে স্বয়ং কালিদাস থেকে সুরু করে আমাদের দেশের অন্যান্য প্রায় সব প্রাচীন ও বহু নবীন কবিই তাঁদের খণ্ড ও মহাকাব্যের বিষয়গুলি রামায়ণ-মহাভারতের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করেছেন। কাব্যের বিষয় ছাড়া অন্যান্য অনেক দিক দিয়েও তাঁরা রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

বাংলার সাহিত্যিকদের বিচার কর্‌তে গিয়ে মিঃ টম্‌সন্ বলেছেন (p. 3), পুরাতনপন্থী এবং অধিকাংশ নবীনপন্থী বাঙালী নাকি রবীন্দ্রনাথকে মাইকেলের চেয়ে উঁচুদরের কবি বল্‌লে চটে যান। নবীনদের সম্বন্ধে কথাটা সম্ভবত ভুল। মানুষ গুনে' তাদের মত নিয়ে ঠিক না করলে এর ঠিক বিচার করা যায় না বটে। সেরকমভাবে গুনে' গেঁথে বিচার মিঃ টমসন নিশ্চয় করেননি, আমরাও করিনি। তবু শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের মোটামুটি যা পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, নবীনপন্থীর অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথকে উচ্চতর আসন দিতে রাজি আছেন। বাঁকুড়া জেলার বাঙালীর সঙ্গে মিঃ টম্‌সনের পরিচয় বেশী; দুঃখের সঙ্গে হলেও বল্‌তে হবে, সাহিত্যচর্চ্চায় বাঁকুড়া বাংলা দেশের আদর্শ নয়। কাজেই সেখানকার অধিকাংশ নবীনও হয়ত বিনা বিচারে প্রবীণের কথায় সায় দেন। আমরা নবীনপন্থী অর্থে সকল অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত তরুণ মানুষকেই ধরি না।

খুব ছোট হলেও মিঃ টম্‌সনের আঁকা শিশু রবির চিত্রটি সুন্দর হয়েছে, তিনি ঠিক শিশু কবিটিকেই এনে দেখিয়েছেন। ঠাকুর পরিবারের পরিচয়ে দুই একটা সামান্ত ভুল ও অসম্পূর্ণতা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচয়ে বাংলা দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবর্ত্তকের এবং জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতার পরিচয়টাও দেওয়া উচিত। অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন না, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, পরে অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হন। গগনেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচিত্রে ভারতবর্ষীয় শিল্পীদের অগ্রণী, একথাটা বাদ দিলে তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে।

বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি রাঙামাটির দেশের সঙ্গে সুজলা সুফলা বাংলার একটু তফাৎ আছে। এই বাংলার শুষ্ক রুক্ষ মূর্ত্তি, শাল-পলাশের বন, এর রাঙা ধূলার মতই প্রসিদ্ধ; লজ্জাবতী, বাব্‌লা, আর বুনো কুলের বন, এর বন্ধুর কোলে দিগন্তবিস্তৃত মাঠে তালবন ও খেজুর ঝোপের আশে পাশে প্রায়ই দেখা যায়। তবে ম্যালেরিয়া বর্ত্তমানে এ বাংলাকেও গ্রাস করেছে। মিঃ টম্‌সন্ বলেন (p. 9), রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়্‌লে মনে হয়, এ বাংলার সঙ্গে যেন তাঁর পরিচয় প্রায় হয়ইনি। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতিই টান তাঁর বেশী সত্য। তিনি যে "River-poet" সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ যে বাংলার ছবি শৈশব যৌবন তাঁর মনে এঁকে দিয়ে গিয়েছে, পরবর্ত্তী বয়সের দেখা বাংলা সে বাংলার কাছে হার মান্‌বেই। তবু এ বাংলাও যে তাঁর মনে ছাপ দিয়েছে, তার প্রমাণ আমরা তাঁর আধুনিক গান ও অন্যান্য অনেক রচনাতেই দেখ্‌তে পাই। তাঁর গানে আছে, "ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন"; আর আছে, "রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে।" "গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।" শারদোৎসবে আছে, "কেয়াপাতার নৌকো গড়ে' সাজিয়ে দেব ফুলে, তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব চল্‌বে দুলে দুলে।" ফাল্গুনীর গানে, "ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,

* *Rabindranath Tagore: His Life and Work.* By E. J. Thompson, B.A., M.C., Principal, Wesleyan College, Bankura. Association Press, 5, Russell Street, Calcutta, With the Poet's Portrait as Frontispiece and on cover. Pp. xvi+112. Price Rupee one.

রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বলায়" পলাশের রূপটি ঠিক দেখায়। ফাল্গুনীতেই আছে, "আমরা নবীন পাতা গো, শালের বনে তারে তারে।" গানে আছে, "শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।" শাল-বনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটা বিশেষ টান আছে তা আরো অনেক কবিতা ও গানেই দেখা যায়। বীরভূম অঞ্চলের বাংলার কয়েকটি ছবি খেয়ার কবিতা থেকে তুলে দেওয়া যায়। খেয়ার সুরুই ত, "বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা," দিয়ে। তারপর, "বাব্‌লা ফুলের গন্ধ ওঠে পল্লী পথের বাঁকে।"

"তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ আমলা-গাছের কচি পাতায়
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেউ কোথা নেই মাঠের পরে, কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে
আজ দুপুরে আকাশ-তলে রিমি ঝিমি নূপুর বাজে।"
"ঘন মহুল শাখার মত।"
"আজি রোদের প্রখর তাপে বাঁধের জলে আলো কাঁপে
বাতাস বাজে মর্ম্মরিয়া সারি বাঁধা তালের বনে।"
"সন্ধ্যা যখন পড়্‌চে হেলে, শাল বনেতে আঁচল মেলে।"
"আঁকা বাঁকা রাঙা মাটির লেখা।"
"বাব্‌লা বনে ঐ দেখা যায় ডাঙা।"
"তালের তলে শিউরে ওঠে বাঁধের কালো জল।"
"আজকে এলে নতুন বেশে, তালের বনে মাঠের শেষে।"

এ সব ছবির মধ্যেই বোলপুরের ছায়া দেখা যায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বোলপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সব পত্র লিখেছিলেন তার ছয়খানা "ছিন্নপত্রে" পাওয়া যায়। সেই মাত্র ছয়টি চিঠিতেই বোলপুরের আর সেখানকার ঝড়ের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। "শান্তিনিকেতনে"র চতুর্দ্দশ খণ্ডে বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা বোলপুরেরই ঝড়। "নৈবেদ্য"র "দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি" (৮৮) বোধ হয় বোলপুরেরই ছবি। মিঃ টম্‌সনের বহির চেয়েও অল্প জায়গায় এর চেয়ে বেশী পরিচয় দেবার চেষ্টা না করাই ভাল।

"জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাত-যাত্রার যে কথা আছে তার উল্লেখ করে মিঃ টমসন রবীন্দ্রনাথের "prejudice against England"এর কথা তুলেছেন। ভারত ও ইংলণ্ডের যে সম্বন্ধ, তাতে এই দুই জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষের মনেও পরস্পরের সম্বন্ধে "প্রেজুডিস" থাকা আশ্চর্য্য নয়; টম্‌সন সাহেবের বইখানিতেই ত বাঙ্গালীর সম্বন্ধে তাঁর "প্রেজুডিসে"র কিছু পরিচয় মেলে। এদিকে ব্রিটিশজাতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের Nationalismএ যে মত দেখ্‌তে পাই, মিঃ টম্‌সন ১৩ পৃষ্ঠায় নিজেই তা তুলে দেখিয়েছেন। আমরাও তা নীচে তুলছি।

"I have a deep love and a great respect for the British race as human beings. It has produced great-iearted men, thinkers of great thoughts, doers of great leeds. It has given rise to a great literature. I know hat these people love justice and freedom, and hate ies. They are clean in their minds, frank in their nanners, true in their friendships; in their behaviour, hey are honest and reliable. The personal experience which I have had of their literary men has roused my dmiration not merely for their power of thought or xpression, but for their chivalrous humanity. We ave felt the greatness of this people, as we feel the un; but as for the Nation, it is for us a thick mist of stifling nature covering the sun itself."—*Nationalism*, p. 16-17.

পৃথিবীতে আর ক'জন মানুষ ইংরেজ জাতির এর চেয়ে বেশী প্রশংসা ক'রছেন জানি না। এতখানি পেয়েও মিঃ টম্‌সন রবীন্দ্রনাথের prejudice দেখ্‌ছেন। কোন জাতি কি মানুষের দোষ দেখালেই তার সম্বন্ধে বিচারকের "প্রেজুডিস" আছে বলা চলে না। মিঃ টম্‌সন নিশ্চয়ই ইংরেজের দেশ ও জাতিকে সর্ব্বগুণাকর ও সর্ব্বদোষশূন্য মনে করেন না। কিন্তু 'জীবনস্মৃতির" অপ্রীতিকর গল্পের কথা মিঃ টম্‌সন যখন তুলেছেন, তখন বলা উচিত, মিসেস স্কটের পতিপরায়ণতার কথায় জীবনস্মৃতিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান।... আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।" সাধ্বী মিসেস স্কটের ছবিটিতে রবি-বাবুর মনের প্রেজুডিসের কোনো ছায়া নেই। মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবি-বাবু যা বলেন, মিঃ টমসন তা তুলেও দেখিয়েছেন। ভারতীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর পত্নী সম্বন্ধে গল্পটি অপ্রীতিকর বটে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিবিশেষের কথা মাত্র এবং হয়ত বা তাঁর ব্যবহারটা ভারতের নুন খাওয়ার গুণেই অমন হয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের ভিক্ষুক ও মুটেকেও সাধুতার জন্য প্রশংসা করেছেন; এতেই ইংলণ্ডের কথায় লিখেছেন, "দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত—সেখানে পাহাড়ে সমুদ্রে ফুল বিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় কি আনন্দে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।" ভাল মন্দ দুই তিনি আরো অনেক জায়গায় দেখিয়েছেন এবং তার চেয়ে বড় কথা এই যে গোড়াতেই তিনি বলেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। বস্তুত তার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।" সুতরাং এর বিচার ছবি হিসাবে করাই ভাল।

পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য রবি-বাবুর কবিতাকে তেমন অনুপ্রাণনা দিতে পারে নি যেমন পেরেছে নদী। মিঃ টমসন বলেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পিতা মহর্ষিদেব ও গুরু কবি কালিদাস কাহারও মিলই দেখা যায় না। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ যদিও হিমাচল সম্বন্ধে ছয় সাতটি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, এবং সেগুলি তাঁর প্রথম শ্রেণীর কবিতারই অন্তর্গত, তবু তিনি পর্ব্বতকে তেমন ভাল বাস্‌তে পারেন নি। প্রাচীরের মত স্থির হয়ে তারা কেবলি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে; কারা প্রহরীর মত তারা সমতলকে দূরে ঠেলে রাখে রবীন্দ্রনাথের "সুদূরের পিয়াসী" চঞ্চল মন তাই তাদের কাছে ধরা দিতে চায় না। টমসন সাহেব ত বলেইছেন "He is rarely happy in his landscapes till he has added a river to them"। "চল্‌ চল্‌ ছল্‌ ছল্‌ সদাই গাহিয়া চলেছে জল," তাই নদীর উপরই গানের রাজার এত টান। পদ্মাকে তিনি এত ভাল বেসেছেন যে তাকেই সম্বোধন করে বল্‌ছেন,

"হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।"
"কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আমি ফিরে,
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
আর পরে সেই তীরে সে সন্ধ্যা-বেলায়
হবে নাকি দেখা শুনা তোমায় আমায়?"

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম্য প্রজা ও সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে মিঃ টমসন বলেন, "No man ever had less of class feeling" (p. 22). বাস্তবিক আভিজাত্যের প্রতি তাঁর নির্ম্মম ঔদাসীন্য তাঁর মহত্বেরই পরিচায়ক। "ছিন্নপত্রে" শিলাইদার গ্রাম্য মানুষদের যে চিত্র পাওয়া যায় তার সম্পর্কে মিঃ টমসন বলেন, "These Letters reveal

his ever-stirring sympathy with the toilers. Towards them his attitude is never tinged even with mockery, far less contempt." এইখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলছেন, "the loftiest and most fastidious mind in India."

বৎসরের এক একটা বিশেষ সময়ে এক এক রকম সাহিত্য রচনায় রবি-বাবুর ঝোঁক হয়—অনেক জায়গায় শোনা যায়। মিঃ টম্‌সন্ লিখ্‌ছেন, "Lyric, he tells us, he wrote in spring and summer and the rains, drama in winter"। মিঃ টম্‌সন্ একথাটায় সায় দিয়ে কেবল 'চিত্রাঙ্গদা'র সম্বন্ধে নিয়মটা খাটে না বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং মিঃ টম্‌সন্ দুইজনেই বোধ হয় লক্ষ্য করেননি, যে, রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার অনেকগুলিই শীতকালের রচনা। বাহিরের প্রকৃতি যখন কাব্যসৃষ্টির অনুকূল নয় তখনও যে তাঁর অন্তরের সম্পদ বাহিরের উত্তেজনা অভাবেও অপরূপ রূপ সৃষ্টি করতে পারে এ তারই প্রমাণ। তাঁর সকল রচনার নীচে তারিখ লেখা নেই, যেগুলিতে আছে তার থেকে দেখালেই যথেষ্ট হবে। "বলাকার" 'হে বিরাট নদী' "কে তোমারে দিল প্রাণ" প্রভৃতি ২৬টি অতুলনীয় কবিতা পৌষ ও মাঘ মাসের হিমের বাঁধন অগ্রাহ্য করেই নদীর মত স্বচ্ছন্দ লীলায় দেখা দিয়েছে। বলাকার "তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা," ও "একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সাজাহান" বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলন; কিন্তু এরা কার্ত্তিকের প্রথম শীতের সৃষ্টি। "সোনার তরী"র সুবিখ্যাত 'মানস সুন্দরী' ৪ঠা পৌষের রচনা, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখা ২৭শে অগ্রহায়ণ; "আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরা" ২৬শে কার্ত্তিকে লেখা। চিত্রার অপূর্ব্ব সৃষ্টি "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে" ১৮ই অগ্রহায়ণ লেখা। চিত্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার অধিকাংশই শীতের রচনা। মিঃ টমসনের মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং বিশ্বসাহিত্যে "উর্ব্বশীর" তুলনা নেই (p. 27); কিন্তু এই "উর্ব্বশী" দেখা দিয়েছে ২৩শে অগ্রহায়ণের ভরা শীতে। "স্বর্গ হইতে বিদায়" লেখা ২৪শে অগ্রহায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখা শেষ হয় চৈতালিতে। নামটিতে যেন তারই আভাস পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে মিঃ টম্‌সন্ বলেন, 'There is an autumnal atmosphere over the book. It is one of the most prophetic things that have ever come out of the human spirit. It looks back, in a mood of tranquil reminiscence, knowing the day's work well done; and forward, with serene anticipation."

"উর্ব্বশী" সম্বন্ধে মিঃ টমসন বলেন, "Greatest lyric in all Bengali literature, the most unalloyed and perfect worship of Beauty which the world's literature contains." "Greater poetry comes. But nothing lovelier, nothing more entirely poetical than Urbasi and the Farewell to Heaven" (p. 28)। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীও বলেছেন, "বাস্তবিক উর্ব্বশীর ন্যায় সৌন্দর্য্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।" আমরাও বলি সৌন্দর্য্যের স্তব হিসাবে "উর্ব্বশী" অতুলন এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম কবিতার মধ্যে "উর্ব্বশী" একটি; কিন্তু কেবলমাত্র কবিতা কিম্বা লীরিক হিসাবে বিচার করলে বলতে হবে এর সমশ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় আরও আছে। বলাকায় কবিতা কেবল greater poetry নয়, entirely poeticalও বটে। সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি মাত্র কিম্বা দুটি কবিতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলাটাই ভুল। এতে বিচারককে কেবল একরকম রসের রসিক মনে হয়। "বলাকা"কে যদি আমরা বাদও দিই, তবু "বর্ষশেষ" "বৈশাখ" প্রভৃতি আরো অনেক কবিতাকে ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠের দলে দেওয়া যায়। "উর্ব্বশী", "বর্ষশেষ" প্রভৃতি মোটেই একজাতীয় কবিতা নয় বলে তুলনায় এদের বিচার করা একদিক দিয়ে যেমন শক্ত, অন্যদিক দিয়ে তেমনি সোজা। এদের বিষয় এবং প্রকৃতি আলাদা বলেই এরা নিজ নিজ বিষয়ে সকলেই শ্রেষ্ঠ। 'Entirely poetical' বলতে মিঃ টম্‌সন্ কি বোঝেন জানি না; আশা করি পুষ্প, বসন্ত, পূর্ণিমা, চিরবিরহ, দীর্ঘশ্বাস, হাসি, বাঁশি, অশ্রু, ভৃঙ্গ নয় (p. 71); তা যদি হয়, তবে এই-সবের ছড়াছড়ির জন্যই কবির আবার দোষ ধরা তাঁর উচিত হয়নি; আর না যদি হয়, তবে "বর্ষশেষ" প্রভৃতি কল্পনায় কবিতা ও "হে বিরাট নদী", "দূর হোতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন" প্রভৃতি বলাকার কবিতাকে তাঁর উর্ব্বশীর সঙ্গে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। চিত্রার পরের যুগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে আর sheer poet রূপে পাওয়া যায় না বলে মিঃ টম্‌সন্ দুঃখ করেছেন। এর পর নাকি তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ reflection, intellectual admixture ও prosy admixture প্রভৃতির কাছে কেবলি বাধা পেয়েছে, ডানা মেলে আর উড়তে পারে নি (p. 28)। কিন্তু আমরা ত "হে বিরাট নদী"র মধ্যে prose খুঁজে পাই না, intellectual admixture যদি থাকে ত বিরাট নদীর উন্মত্ত গতিকে তা কোথাও ঠেকাতে পারে নি, বরং বানের জলে মহীরুহ ভাসিয়ে নদীর স্রোতের রূপ যেমন বাড়ে, যেমন পরিষ্কার করে মানুষের চোখে ধরা পড়ে, এতেও বিরাট নদীর মহাস্রোত তেমনি অবিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি" প্রভৃতি "বলাকার" ৩৬ সংখ্যক কবিতার নামও এখানে করা যায়। আবার অন্যদিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যায় 'উর্ব্বশী' এবং 'স্বর্গ হইতে বিদায়'ও intellectual admixture প্রভৃতির গন্ধ আছে। কিন্তু তাতে তাদের রূপ বেড়েইছে, কমেনি। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে intellect, imagination প্রভৃতির ভেদরেখা ক্রমেই কমে আসে বলে আমাদের মনে হয়। কবির সোনার কাঠির স্পর্শে তারা সকলেই এমন সোনা হয়ে ওঠে যে তাদের একটির কাছ থেকে আর একটিকে টেনে দূরে ফেলা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পলিটিক্সের সম্বন্ধ নিয়ে মিঃ টমসন যা বলেছেন তাতে ভাল মন্দ এত মেশামিশি যে এক কথায় মন্তব্য প্রকাশ করা শক্ত। মিঃ টমসন মনে করেন—"Much of what is most independent, and not a little of what the authorities have found most troublesome, in recent Indian political thought, owes its spring to Rabindranath's teaching" (p. 21.)। এ কথা অনেকাংশে সত্য। বিদেশী গবর্ণমেন্টের কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে থাকাকে রবি-বাবু সত্যই চিরকাল নিন্দা করেছেন, সত্যই আজকার রাজনীতি-ক্ষেত্রের অনেক কথা রবি-বাবুই একদিন প্রথম বলেছিলেন, কিন্তু ("He is the parent of many movements which to-day he disowns" p. 21) তিনি একদিন যা বলেছিলেন তা আজ আবার না বললেও তাকে অস্বীকার করেন বলে ত কখনও শুনিনি। সম্প্রতি "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধে বরং অনেকগুলির পুনরাবৃত্তিই করেছেন। স্বদেশীর যুগে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু বলেছিলেন, তা এখন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, যা কাছে পাওয়া যায় তাও সব পড়ে না দেখলে খাঁটি সত্যের বিচার হয় না, সুতরাং মিঃ টম্‌সনের মত তাঁর সমালোচকও অনেক ভুল করতে পারে। পলিটিক্স্ জিনিষটাই যদি muddy হয় ত বলা যায় না, নতুবা রবীন্দ্রনাথের কোনো যুগ সম্বন্ধেই his activity (p. 29) became muddy with politics বলা ঠিক হয় না। মিঃ টমসন নিজেই বলেছেন, রবি-বাবু কোনো দিন এই আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে পারেন নি, কারণ সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ চিরকাল অচলা (p. 29)। সুতরাং পলিটিক্সে

যেখানে গ্লানি আছে, সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই দূরে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সমালোচনা চিরকালই করেছেন, তাদের সব রকম দোষ সম্বন্ধে তিনি তাদের সজাগ করে তুল্‌বার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করছেন; তার জন্য অনেক বাঙালী তাঁর নিন্দা হয়ত করে, কিন্তু Bengalis বল্‌তে অথবা patriotic party বলতে শুধু তাদেরই বোঝায় না। দেশকে যাঁরা প্রকৃতই ভালবাসেন, যাঁরা দেশকে বড় করবার জন্য সাধনা করছেন, এমন অনেক স্বদেশভক্ত বাঙালীর রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগ এর জন্য বেড়েইছে, (p. 30) কমে নি। রবীন্দ্রনাথের real sense কখনও রাহুগ্রস্ত হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই।

স্বদেশীর যুগের বাগ্মী ও সুলেখক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিঃ টমসন বলেন, "In all India there was no voice more powerful than his, no pen more effective. This was the time of his mightiest prose, whose periods march and burn. There is not much political writing in English which can match his best pages of this time." (P. 40)

পলিটিক্‌স ও অন্যান্য অনেক সূত্রে মিঃ টমসন বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে দেখেছেন। বাস্তবিক ভারতের (p. 31) যা tradition, ভারতের যা দোষ গুণ, বাঙ্গালীরও তা খানিকটা বটে, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের। আমেরিকা ভারতের মতই বহু জাতি নিয়ে গঠিত; কিন্তু বিদেশের লোক এবং সেখানকার লোকও আমেরিকান রূপেই তাদের বিচার করে, সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীর মধ্যে দিয়ে করে না। এই সূত্রে বাঙ্গালীর যেসব নিন্দা মিঃ টমসন করেছেন, সেই রকম নিন্দা ভারতের অন্যান্য জাতিরও করা চলে, ইংলণ্ড-আমেরিকারও করা চলে। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে ভারতের অন্যান্য জাতির সমালোচনা করাতে ভেদবুদ্ধির উপাসকদের অনেক খোরাক দেওয়া হয়, সুতরাং তা না করাই ভাল। এ রকম শতজালে জড়ানো traditionহীন বাংলায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব দেখে মিঃ টমসন আশ্চর্য্যবোধ করেছেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন রামমোহন প্রভৃতি মহৎ মানুষও এই বাংলাতেই জন্মেছিলেন। বাংলার যে কোনোই tradition নেই এ কথা অন্ততঃ ইতিহাস বলে না। বাংলার যে বৈষ্ণব কবিরা কোনো কোনো অংশে রবীন্দ্রনাথের গুরু, তাঁরা বাংলারই বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ চৈতন্যদেবের কীর্ত্তিকলাপ ও জীবনী থেকে তাঁদের কাজের অনুপ্রাণনা ও রস সঞ্চয় করেছিলেন। রাজ্যজয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যতীত এই রকম আরও বহু জিনিষ আছে, যাকে Living tradition of historyর মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া tradition জিনিষটা যে মানুষকে অনেকটা বেঁধে রাখে এবং কেবল অতীতমুখী করে তুল্‌তে চায়, তার প্রমাণ স্বরূপ Nationalism থেকে কয়েকটি কথা তুলে দেখাচ্ছি। "America is untrammelled by the traditions of the past......the foundation of her glory is in the future. In America traditions have not had time to spread their clutching roots round your hearts."

বাংলাদেশ হাজার বৎসর দাসত্ব করছে না। "কথা"র উচ্চ আদর্শের অনেক কবিতা শিখ ও মহারাষ্ট্র গল্প অবলম্বন করে লেখা সত্য; রাজপুত কবিতাও আছে; ধর্ম্ম হিসাবে ধরলে বৌদ্ধ নানা গল্প এর অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতকেই দেশ বলে ধরেছেন, ভারতের অন্যান্য মনীষী (p. 32) ও ঋষিরাও চিরকাল তাই ধরেন, সুতরাং বিশেষভাবে বাংলা গল্প না দেওয়ায় দোষ হয় নি। ঐতিহ্য ও অতীতগৌরবস্মৃতি (tradition) না থাকলেই যে কবিরা অন্য জাতির গল্প অবলম্বন করে কাব্য লেখেন, থাকলে তা করেন না, তা নয়। ইংলণ্ডের ত খুব অতীত-গৌরবস্মৃতি আছে, কিন্তু মিল্টন, শেলী, ব্রাউনিং প্রধানতঃ তা অবলম্বন করেন নি। বাঙালীর tradition নেই, এইজন্য রবি-বাবু শিখ্ প্রভৃতিদের কাছে tradition ধার করেছেন, এই ধারণা-বশতঃ মিঃ টম্‌সন্ একটি বেশ হাস্যকর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, শিখ্‌দের প্রতি কবির মনে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বশতঃ (p. 10) রবি-বাবু "ভানুসিংহ" ছদ্ম নাম গ্রহণ করেন! বাস্তবিক কিন্তু যৌগিক শব্দে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠতাবাচক, সিংহও তেমনি শ্রেষ্ঠতাবাচক; সেইজন্য রবি+ইন্দ্র= ভানু+সিংহ।

(P. 33) এইখানে মিঃ টমসন "ক্ষণিকার" সমালোচনা করেছেন। কবির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "Sometimes one feels that there never was such a man for vitality and range." বাস্তবিক সে কথা আমাদেরও মনে হয়। ক্ষণিকার মূল্য অনেক মানুষ তেমন দেয় না, কারণ বইখানায় "গভীর সুরে গভীর কথা" লেখা হয় নি, হাল্কা করে ঠাট্টা করে জগতের ও কবির ব্যথাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাই এর প্রধান সুর। কিন্তু মিঃ টম্‌সন্ বুঝেছেন যে বইখানা মূল্যবান। ভাষা, ছন্দ, কথিত চলন্ত শব্দ প্রভৃতির নূতন নানা রকম ব্যবহারের দিক্ দিয়ে এর মূল্য ত আছেই, তা ছাড়া হাসির ঝড়ে জগতের ব্যথাতুর মনকে হাল্‌কা করার দিক দিয়েও এর একটা খুব বড় সার্থকতা আছে। মিঃ টম্‌সন্ তাঁর পুস্তকের পাতায় ক্ষণিকাকে যথেষ্ট স্থান দিয়েছেন এবং তা ভালই করেছেন।

"পণ্ডিতরা" রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা পড়ে রাগে দুঃখে যে মূর্চ্ছা যেতে পারেন এ কথা স্বীকার করি। সুতরাং রবি-বাবু তাঁকে "পণ্ডিত"দের সম্বন্ধে তাঁর ভীতির কথা বল্‌তে পারেন। কিন্তু এখানে বলা উচিত যে বাংলা দেশে পণ্ডিত কথাটার দুটো অর্থ আছে। আসল অর্থ, বিদ্বান্ (learned; wise); দ্বিতীয় অর্থ, কেবল সংস্কৃত ও বাংলা জানা অল্প বেতনের একজাতীয় স্কুল-মাষ্টার। অধিকাংশ স্থলেই এঁরা সে দুটো জিনিষও খুব ভাল করে জানেন না। মিঃ টম্‌সনের লেখা পড়ে মনে হয় (p. 33) তিনি এই জাতীয় স্কুল-মাষ্টারদেরই কথাই বল্‌ছেন। এঁদের সাহিত্যবিচার খুব উচ্চ শ্রেণীর হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মিঃ টম্‌সনের লেখা পড়ে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী মানুষ তা বুঝতে পারেন না। বাংলা দেশের আসল যাঁরা পণ্ডিত অর্থাৎ বিদ্বান্, মতটা বুঝিবা তাঁদেরই। (P. 34) রেলওয়ে ষ্টেশনের একটা crowdএর 'গীতাঞ্জলি' সমালোচনা মোটেই উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা নয়; বিদ্বান্ ও রসজ্ঞ বাঙালীর সমালোচনাকেই বাঙালীর সমালোচনা বলা উচিত। অন্যান্য জাতের পক্ষেও এ কথা খাটে; তাদেরও crowd শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরসিক নয়। আর-একদিক দিয়ে বিচার করলেও দেখি যে মিঃ টম্‌সনের ষ্টেশনবিহারী ছাত্ররা যদিও রবি-বাবুর গীতাঞ্জলির diction mean and bad বলেছিল, তবু বাংলা দেশের স্কুল ম্যাগাজিন থেকে সুরু করে যেখানে যত অতি আধুনিক কবিতা ও গল্প দেখা যায় সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথের diction অনুসারে চলে। ছাত্রকবিরা মাইকেলকে অনুসরণ কেউ করেন না। পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি দু-একখানা মহাকাব্যের প্রণেতা ছাড়া আধুনিক কোনো খ্যাতনামা কবিকেও মাইকেলের শিষ্য বলা যায় না। রবি-বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে খাড়া করা হয় মাইকেলের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য বেশী। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁরা, এমন অনেক মানুষ নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই কবি-সম্বর্দ্ধনায় রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত শ্লোকে অভিনন্দন করেছিলেন। সুতরাং তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের মূল্য কিছু বুঝেছিলেন বল্‌তে হবে।

ইংরেজী Gitanjaliর ভূমিকায় মিঃ Yeats যা লিখেছেন

(p. 34) সে সম্পর্কে মিঃ টম্‌সন্ বল্‌ছেন,—"Mr. Yeats had no suspicion of the sharp division of opinion as to Rabindranath, and of the intense dislike with which his name is regarded by many of his countrymen." কথাটা সত্য স্বীকার করি। কিন্তু অন্য অনেক দেশের বড় কবিদের সম্বন্ধেও তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে এইরূপ অনুরাগ ও বিরক্তি কি দেখা যায় না? তা ছাড়া, মিঃ টম্‌সন্‌ই বলেছেন (p. 52)—"Every mind that could think was with him (Rabindranath) and though his following might be small and growing smaller, (মিঃ টমসন গুনে' দেখেননি বোধ হয়) they were the very brain and soul of his land." "His most intellectual countrywomen have never made any (mistake) as to where these men (third rate writers) stand in letters and where Rabindranath stands." (P. 79) আমরাও মনে করি বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার অনুপাতে হিসাব কর্‌লে রবীন্দ্রনাথের মূল্য এ দেশের মেয়েরা প্রায় সকলেই বুঝেছেন বল্‌তে হবে। সে ক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা নন, গোঁড়া হিন্দু পরিবারের শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকারাও বাদ যান না। শিক্ষিতা মহিলাবৃন্দ এবং বাংলার brain and soul-রূপী পুরুষদের বাদ দিয়ে যে বাংলা বাকি থাকে Mr. Yeats দূর থেকে স্বভাবতই তার খোঁজ পাননি এবং না পাওয়াতে খুব দোষ হয়নি, এইজন্য, যে, একটা জিনিষকে ভাল করে দেখ্‌তে হলে একটু দূর থেকেই তার প্রকৃত রূপটি দেখা যায়। জরাগ্রস্ত বাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিরকালের বিরোধ। কিন্তু অন্তরে ও বাহিরে "যাদের পাক্‌বে না চুল গো" তাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই। তাঁর গান সম্বন্ধে Mr. Yeats যা বলেছেন তা যে সত্য তা ত টম্‌সন্ সাহেবও স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম বাদ দিয়েও দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই বাংলা যাঁদের নামে জগৎসভায় স্থান পাবার আশা করে সেইসব বৈজ্ঞানিক (জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র), শিল্পী (নন্দলাল), দার্শনিক (ব্রজেন্দ্রনাথ), ঐতিহাসিক (যদুনাথ), সাহিত্যিক (শরৎ, সত্যেন্দ্রনাথ, সরোজিনী), গণিতজ্ঞ (মেঘনাদ সাহা), রাজনৈতিক (অরবিন্দ, গান্ধী,—অবশ্য বাঙালী না), কেউই রবীন্দ্রনাথের নামে intense dislike দেখান না। কেউ কেউ হয়ত তাঁর বিশেষ কোনো মতের প্রতিবাদ করে কড়া কথা বলে থাক্‌তে পারেন; কিন্তু তাঁর কবিত্ব-প্রতিভাকে কেউ অস্বীকার করেন নি। অন্য বিষয়ে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং Mr. Yeatsকে আমরা খুব বেশী দোষ দিতে পারি না। বাংলা দেশের Tom, Dick and Harryর মত জানা Mr. Yeatsএর পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক নয়, তবে বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজটা তিনি নিলে পার্‌তেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুকালব্যাপী অবহেলার জন্য আমরা বাস্তবিকই লজ্জিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা ছাত্র, তাঁরা সাক্ষ্য দেন, রবীন্দ্রনাথের ২২,২৩ বৎসর বয়সেও তাঁর বক্তৃতা কি গান শুন্‌তে শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত বাংলা ভীড় করে ছুট্‌ত। এমন কি তাঁর লম্বা চুল ও চাদর গায়ে দেওয়ার বিশেষ ভঙ্গীর নকলও সৌখীন সমাজে এককালে ফ্যাশান ছিল। এখন (নোবেল প্রাইজ পাওয়ার বহু পূর্ব্বকাল হতেই) ত বাংলার রাজধানীতে টিকিট না করে রবীন্দ্রনাথকে কোনো জনসভায় ডাক্‌তে লোকে সাহসই করে না। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা উপলক্ষ্যে ভীড়ে সভাগৃহের দরজা জানালা ভেঙে পড়া আমাদের দেশে নূতন কথা নয়। আমি জানি না, ইংলণ্ডের কোনো কবির কেবলমাত্র দর্শন পাবার জন্য সেখানকার আধুনিক শিক্ষিত লোকে এর চেয়ে বেশী ভীড় করে কি না। বাংলা দেশের আর কোনো মানুষ বাঙালীর কাছে এমন আকর্ষণের বস্তু নিশ্চয়ই নন, মাইকেলও ছিলেন না। ভারতপূজ্য তিলক ও গান্ধী ছাড়া নামের মহিমায় এমন করে দেশকে টান্‌তে ভারতে আর কেউ পেরেছেন কি না সন্দেহ। মহাত্মা গান্ধী Young Indiaতে নিজে লিখেছেন এবং আমরাও জানি, ভারতে তাঁর বিরুদ্ধবাদীর কিছুমাত্র অভাব নেই। তবু একথা বলা false হয় না যে মহাত্মা গান্ধী দেশপূজ্য। তেমনি অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও Mr. Yeatsএর সঙ্গে মিঃ টম্‌সন্, রবীন্দ্রনাথ ও দেশবাসী সকলেই সায় দিয়ে বল্‌বেন, যে, গান দিয়ে রবি-বাবু দেশকে নিশ্চয় জয় করেছেন। সেটা কম কথা নয়। Nationalistদের দর্‌বারেও "জাগ্রত ভগবান হে" ও "জনগণমনঅধিনায়কের" মত popular গান বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" ছাড়া আর একটিও নেই। কোনো কোনো দিক দিয়ে এ গানগুলি "বন্দেমাতরম্"কেও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ বন্দেমাতরম্ conventionally popular। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেন, কঠোর সত্য কথা যাঁরা বলেন, প্রাণের গতিতে যাঁরা West windএর মত পচা ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চান, সব দেশে সবকালেই তাঁদের পথে বাধা পড়ে (p. 35) (এটা কেবল বাংলা দেশের বিশেষত্ব নয়)। কিন্তু পথে কাঁটা থাকে বলে পথের চেয়ে কিম্বা পথিকের চেয়ে কাঁটা বড় নয়। যখন বলি "পথ আমারে দিয়েছিল ডাক", তখন এই বলে আপত্তি করি না, যে, কাঁটাগুলো চল্‌তে বাধা দিয়েছে, তবে বুঝি পথের ডাকটা মিথ্যা। তরুণ বাংলার সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেন। "Instability of the poetic temperament"এর জন্য স্বদেশীর যুগে এবং এখনও তাঁকে অনেকে নিন্দা কর্‌লেও একথা মনে রাখ্‌তে হবে যে সর্ব্বদা সব দলের লোকই তাঁকে নিজেদের দলে পাবার জন্য ব্যস্ততা দেখিয়েছে গবর্ণমেণ্টের খোসামুদে, মডারেট, একষ্ট্রিমিষ্ট ও "ফ্রিলান্সের" দল, যে যখন নিজেদের মতের অনুযায়ী কোন মতের গন্ধ তাঁর কথায় পেয়েছে, সে তখনই খুসী হয়ে উঠেছে। উল্টা কথা দেখ্‌লে আস্ফালন অনেকে করেছে। কিন্তু আর কোনো মানুষকে সব দলই নিজের দলে টান্‌বার এত চেষ্টা বোধ হয় কখনও করে নি। আর একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দেশকে গান দিয়ে মুগ্ধ করেছেন, Mr. Yeats সেই গানের একখানি বই গীতাঞ্জলির ভূমিকাতেই অত কথা লিখেছেন এবং Nobel Prizeটাও কবি ঐ বইখানার জন্যই পেয়েছেন। ভারত স্বরাজ চায় বল্‌লে মিথ্যা বলা হয় না; কিন্তু স্বরাজ চায় না এমন মানুষ ভারতে অনেক আছে; স্বরাজ কি তা জানে না, কথাটাও শোনে নি এমন লোক ত লক্ষ লক্ষ আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারত বল্‌তে এই সব মানুষকে আমরা নিশ্চয়ই ধর্‌ব না। এই রকম বিচারে Mr. Yeatsএর কথাও সত্য বলে প্রমাণ হয়।

৪১ পৃষ্ঠায় দেখ্‌ছি মিঃ টমসন বল্‌ছেন, রবীন্দ্রনাথ political suspect ছিলেন না। একথা তিনি কি করে জান্‌লেন? বাংলা দেশের লোকের ত ধারণা রবীন্দ্রনাথ political suspect ছিলেন।

বইখানার ৪৩ পৃষ্ঠায় মিঃ টম্‌সন্ লিখ্‌ছেন, রবীন্দ্রনাথ বিলাত ও আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে আসার পর "His own countrymen awoke to his greatness" (p. 43)। এইখানে টম্‌সন্ সাহেব একটা মস্ত ভুল করেছেন। সেই ভুলের জন্য দেশের প্রতি একটা অবিচারও হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে বাঙ্গালীরা টাউনহলে "কবি-সম্বর্দ্ধনা" করেছিলেন। সেকথার উল্লেখ বইখানিতে নেই। এ ঘটনাটার মূল্য নিতান্ত কম নয়। কবি-সম্বর্দ্ধনার বিজ্ঞাপন প্রবাসীতে প্রকশিত হয় ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে, অর্থাৎ ১০ বৎসর ৫ মাস ২১ দিন আগে। তিনি বিলাত-যাত্রা করেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে কি ২৫শে মে, অর্থাৎ ৯ বৎসর

৪ মাস কয়েক দিন আগে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, (অন্ততঃ তার আগে নয়) অর্থাৎ ৯ বৎসর ১ মাসের আগে নয়। নোবেল পুরস্কারের রয়টারের খবর পাঠানো হয় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর অর্থাৎ ৭ বৎসর ১০ মাস ২৪ দিন আগে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী ইউরোপের কষ্টিপাথরে তাঁকে পরখ করে তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে নি। ১৩১৮ সালের ফাল্গুনের প্রবাসী থেকে কবি-সম্বর্দ্ধনার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। "গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বাঙ্গালী জাতির এক সভায় কবির সম্বর্দ্ধনা হয়। টাউনহলে এই উপলক্ষ্যে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্ব শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী, যাঁহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বর লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারাজীবের কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গের নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গের অগ্রণী, তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহু কৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন, বঙ্গের যুবকগণ। ... রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; তিনি যে জীবিত বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে প্রথমস্থানীয়, ইহাও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর, পক্ষপাতশূন্য সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর, বিশ্বাস; যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের এবং বহুভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তির মত এই যে তিনি বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। নয়নগোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্য্যের জগৎ, অনেক কবি, অনেক বাঙ্গালী কবি, দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন—তিনি এবিষয়ে কাহারও অপেক্ষা কম শক্তিশালী নহেন; কিন্তু ধ্বনির জগতের রূপ তাঁহার মত করিয়া অনুভব করিতে ও নিপুণতার সহিত অন্যকে অনুভব করাইতে অল্পলোকেই পারিয়াছে।" ("In his works Bengali Literature has outgrown its provincial character and has become fit to fraternise with world-literature."—Ed., *M. R.*, Feb., 1912.) প্রবাসী-সম্পাদকের এই কথাগুলি প্রায় দশ বৎসর আগে লেখা, একথা মনে রাখ্‌তে হবে। এই সম্বর্দ্ধনায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন,—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব।
বাঙালি আজি গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসনখানি, অতুল বলে লইবে মানি,
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব"।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী গেয়েছিলেন, "বিশ্ববীণা যন্ত্রে তব বিজয়বাণী বাজে।" কবি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বীণাকে উল্লেখ করে ভবিষ্যৎবাণীরূপেই বলেছিলেন, "ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যার সারা বিশ্ব বিস্ময়ে মগনা!" তিনিই বলেছিলেন, "আজ একি মহোৎসব! সারা বঙ্গ আনন্দে চঞ্চল!" ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে বহু মহিলা কবির কবিপ্রশস্তিও দেখা যায়।

টমসন সাহেবের বই পড়ে আমরা জান্‌লাম নোবেল পুরস্কার পাবার ছয় বৎসর আগে (less than half a dozen years before the N. P. award) আশুবাবু রবীন্দ্রনাথকে D. Litt. উপাধি দেবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু সিনেট নাকি "he is not a Bengali scholar" বলে আপত্তি করায় প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। সিনেটের সভার বিবরণ (Minutes) ছাপা থাকে। কোন্ বৎসর কোন্ মাসের কোন্ তারিখে এই সভা হয়েছিল, মিঃ টমসন সেটা অনুগ্রহ করে জেনে নিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে লিখলে আশুবাবুর রবীন্দ্রনাথ-গুণগ্রাহিতার একটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর স্পেশাল ট্রেনে বহু গণ্যমান্য বিদ্বান্ ও সাধু ব্যক্তির সঙ্গে একদল যাত্রী বোলপুর গিয়েছিলেন। মিঃ টম্‌সন্ (p. 52) এবিষয়ে বলেছেন, "A mob of five hundred descended on him" "mob" কথাটা আপত্তিজনক;—সেদিন যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু ভদ্র পুরুষ ও নারী ছিলেন। কিন্তু "মব্" বল্‌তে ইতর লোকের জনতা, উপদ্রবকারী জনতা, বিশৃঙ্খল জনতা প্রভৃতিই বুঝায়। টমসন সাহেবের বই থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিথিদের যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করেন নি। না করার কারণ সম্বন্ধে মিঃ টমসন বলছেন, রবি-বাবু তাঁকে বলেছেন, "I told them I did not want this sort of thing. Some of you are my friends and I value your kindness. But others of you are my enemies, you have always opposed whatever I stood for, and I can't accept your homage." এখানে বলা দরকার, অতিথিদের মধ্যে তাঁর বন্ধু অর্থাৎ অনুরক্ত মানুষই বেশী ছিল, যদিও হয়ত তারা সুপরিচিত বা তাঁর পরিচিত নয় বলে রবীন্দ্রনাথ তাদের চিন্‌তে পারেন নি। তাঁর শত্রু সে দলে কেউ থাকলেও (ছিল কি না জানি না) তারাই ছিল সংখ্যায় কম। তা ছাড়া, যখন তাঁদের সম্মানকে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তাঁর মনে কেবল শত্রুদের সম্বন্ধে বিরক্তি থাকলেও তাঁর অনুরক্ত মিত্ররা যে কারণেই হোক্ অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি। মিত্ররা অনেকেই মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ভালবাসা ও সম্মানের অঞ্জলিকে প্রত্যাখ্যান করছেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেক সুপরিচিত বন্ধুর এ ভুল শীঘ্র ভাঙ্‌লেও রবীন্দ্রনাথের যে-সব 'নগণ্য' অনুরাগী ভক্তির পরিবর্ত্তে আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের এ ভুল ভাঙা বড় সহজ হয়নি। পরিচিত বন্ধুদেরও ক্ষুব্ধ মন প্রসন্ন হয় নি। এইসব মানুষ তাঁর কথায় আঘাত ত পেয়েইছিল, উপরন্তু অতিথিদের প্রতি কবির রূঢ় কথার জবাবদিহি করতে না পারায় লজ্জায় সাধারণের কাছে এবং বিশেষ করে শত্রুদের কাছে তাদের মাথা হেঁট করে অনেক দিন থাক্‌তে হয়েছিল। তাঁকে ভালবাসে বলে তাঁর রূঢ় কথাগুলোর তারা প্রতিবাদ করতে না পেরে সেগুলোকে নিজ পক্ষের কথা বলে মাথা পেতে নিয়ে অনেক সময় অপরের নিন্দা মুখ বুজে শুনেছিল।

আঘাত তিনি শত্রুপক্ষকে করলেও মিত্রপক্ষের বুকেই তা দ্বিগুণ হয়ে লেগেছিল। রবি ও রবিশত্রু দুজনার আঘাতই তারা সমানে সইল। এখানে বলা দর্‌কার, রবি-বাবু স্বয়ং জানেন না, তাঁর দেশের কত লোক তাঁর অনুরাগী। তরুণ বাংলার তাঁর প্রতি যতখানি অনুরাগ, তা মাপ করা শক্ত এই জন্য, যে, সে প্রবীণের কাছে এখনও নগণ্য বলে সব সময় নিজের মনের কথাটা তাঁদের মতো সশব্দে ব্যক্ত

করতে পারে না। দেশে তাঁর শত্রু আছে মানি (যদিচ সমালোচকমাত্রই ভ্রান্ত হলেও শত্রু নয়); কিন্তু কোনো দেশেই (তা ইংলণ্ডই হোক কি ফ্রান্সই হোক) তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দেশবাসী সকলে মিলে সম্মান করে না। সব দেশেই অবুঝ ভ্রান্ত মূর্খ ও শত্রু এবং প্রাচীনপন্থী মানুষ থাকে। Shakespeare বেঁচে থাকতে Rejoicing England তাঁকে কতখানি সম্মান দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে; আজকের দিনে অতি শিক্ষিত ফ্রান্স রোমা রোলাঁকে একঘরে করে রেখেছে। "Rejoicing Bengal (?)" তার শিক্ষার তুলনায় তার কবিকে যতখানি ভালবাসে "Rejoicing England" কি আর কোনো দেশ তার কোনো আধুনিক মহাপুরুষকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ততখানি ভালবাসা দেয় বলে শুনিনি। কেবল "empty national brag" করা যে সেই স্পেশাল ট্রেনের যাত্রীদের উদ্দেশ্য ছিল এবং সেইটা না করতে পারায় এবং কেবল রবি-বাবুর সাফল্যের হিংসাতেই যে লোকে রাগ দেখিয়েছিল একথা আজও বিশ্বাস করি না; তবে একথা মানি, যাদের মনে ঐসব নীচ প্রবৃত্তি ছিল, এ ব্যাপারে তারা মনের আনন্দে ঝাল ঝেড়ে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দেশ শিক্ষায় যতখানি পিছিয়ে আছে এবং পরাধীনতার পাপে সে যতখানি হীন হয়ে আছে, তার তুলনায় তাঁর মত প্রতিভাবান্ এবং অতি-আধুনিক (born before his time) মানুষকে যে সে এতটা ভালবাসতে পেরেছে এই আশ্চর্য্য। স্বাধীন ফ্রান্সের জনসাধারণের সঙ্গে রোমা রোলাঁর শিক্ষাদীক্ষার যতখানি প্রভেদ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরাধীন দেশবাসী জনসাধারণের প্রভেদ তার চেয়ে ঢের বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজকে হিন্দু বললেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক, এই কারণে সাধারণ লোকে ওঁকে হিন্দু মনে করে না; তাদের কাছে তাঁর unpopularityর এটাও একটা কারণ। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে রোলাঁর দেশবাসীর ভালবাসার কথা যা শোনা যায় তাতে বোধ হয় ভারত ফ্রান্সের চেয়ে কম সন্তানবৎসল নয়। মিঃ টমসন লিখছেন, "He found himself, while his fame was worldwide, less and less of a popular poet in Bengal" (p. 52)। এখানেও একটু ভুল আছে বোধ হয়। মানুষের প্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতি ও অখ্যাতি অনেক সময় সমানে বাড়ে। বাংলায় তাঁর বিরুদ্ধবাদী সম্ভবত আগের চেয়ে বেড়েছে, কিন্তু অনুরাগী following আগের চেয়ে কমেনি, তাও বেড়েছে। মোট কথা তাঁর নামটা দিনে দিনে দেশে আগের চেয়ে বেশী শোনা যাচ্চে। তাছাড়া কাউকে popular poet বললে এক দিক্ দিয়ে poetএর মূল্য কমানোই হয়। সাধারণ রকম চলনসই বুদ্ধিবৃত্তি নিয়েই জগতে বেশী মানুষ জন্মায়। তাদের মনের মত সাধারণ রকম বই যারা লেখে সব দেশে তারাই হয় popular author, তাদের বই হয় Best-seller, কিন্তু প্রতিভাবান লেখকের লেখার গুণগ্রহণ সাধারণ মানুষে করতে পারে না বলেই তাঁরা popular author হন না, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের চেয়ে ব্যবসায়বুদ্ধি কম থাকে বলে তাঁরা টাকা রোজগার সব দেশেই কম করেন। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ক্নুট হামসনের বইয়ের চেয়ে অন্য একজন ঔপন্যাসিকের বই তাঁর দেশে বেশী বিক্রী হয়। এই বিক্রয়ের দ্বারা দেশের intelligent publicএর বিচার কেউ করে না। ইংরেজি গীতাঞ্জলির তুলনায় বাংলা গীতাঞ্জলি অনেক কম বিক্রয় হয়েছে, একথায় মিঃ টমসন আমাদের লজ্জা দিয়েছেন বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে বলতে হবে আমরা অতি দরিদ্র এবং বর্ণজ্ঞানহীন জাতি; সকল রকম বই কম কেনা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

Mr. Oaten সম্বন্ধীয় ঘটনায় টমসন সাহেব বলছেন, "The poet came down heavily and excitedly on the wrong side of the fence"। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ আবার পড়ে দেখছি, তিনি ওই বিশেষ ঘটনাটার কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নি। এই সূত্রে ইউরোপীয় শিক্ষক এবং ভারতীয় ছাত্রদের বর্ত্তমান সম্পর্কেরই বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ভক্তি ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে ভালবাসার চেয়ে disciplineকে বড় করে তুলে সেই স্বাভাবিক সম্পর্কটা রক্ষা করা হয় না বলে, শিক্ষক রাজরক্তের গরিমায় সেটা ভুলে যান বলে, এরকম ব্যাপার ঘটা সম্ভব; এই তিনি বলেছেন। তিনি শিষ্যের পক্ষে গুরুকে প্রহার করার সমর্থন কোথাও করেন নি; তিনি বলেছেন, "I know our students intimately. They differ from Western undergraduates in this, that they are eager to worship their teacher, and their hearts are extremely easy to win."

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করে মিঃ টমসন (যিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে বহু দুঃখ ভোগ করেছেন) বলছেন, "He (Rabindranath) never did anything like justice to the nobler side of the tragedy." "Humanity in her throes did not receive from a great poet the help she had a right to expect" (p. 54)। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য হলে বাস্তবিক খুবই দুঃখের কথা হ'ত। আমরা জানি, এই ভয়াবহ ও শোচনীয় ব্যাপারটির এই দিকটার কথা রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী করে বলেন নি; কিন্তু কিছুই বলেন নি একথা ভুল। "বলাকার" ৩৭নং কবিতাটি এখানে সবটা তুলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু কবিতা অতুলন হলেও স্থান অল্প। "ধর্ম্মপ্রচার" কবিতাটি যদি বাঙালীর "bigotry and cowardice"এর প্রমাণ হয় তবে "বলাকা"র এ কবিতার দোহাই দিয়ে আমরা বলতে পারি "Humanity in her throes" রবীন্দ্রনাথের কাছে নিতান্ত সামান্য জিনিষ পায় নি। এছাড়া "জাগ্রত ভগবান" গানে এবং কিছু কিছু গদ্যেও তাঁর এজাতীয় কথা আছে। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে' আছে "বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে,......"

"বলাকা"র কবিতাটিতে আছে—

"দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন
ওই ক্রন্দনের কলরোল
লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল!
"বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে,
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল
যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল।"
"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে' যায়, আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে, অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

সমস্ত কবিতাটি না পড়্‌লে এর মূল্য ও সৌন্দর্য্য বোঝা শক্ত ; সকলে পড়ে দেখ্‌বেন ; আমরা সামান্য একটু নমুনা দিলাম।

এই সম্পর্কে ৯৪ পৃষ্ঠায় মিঃ টমসন বলেছেন, "He would have seen the nobler side of all that he hated so, and might, even, have asked himself if his own civilisation, for all the virtues he finds in it, could have shown one tenth such patience under pain, such willingness to face agony"। প্রথমত দেখ্‌ছি রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশের লোকের নিন্দা কর্‌লে মিঃ টমসনের তা খুবই পছন্দ হয়, কিন্তু প্রশংসার আঁচটুকুও তাঁর গায়ে লাগে। দ্বিতীয় এবং প্রধান কথা হচ্ছে, যে, আমাদের দেশের লোকের দুঃখসহিষ্ণুতা ও স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণের ক্ষমতাকে মিঃ টমসন মিথ্যা দোষ দিয়েছেন। ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মেনীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বেধেছিল। যুদ্ধে পরাজিত হলে ইংরেজের আত্মসম্মানে প্রবল রকম আঘাত লাগ্‌ত, বহু আর্থিক ক্ষতি হত, তাছাড়া মহামূল্য ধন স্বাধীনতা যেতে পারত। সুতরাং ধন প্রাণ ও মানের দায়ে দুঃখবরণ করা ও দুঃখসহিষ্ণু হওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের দেশের সঙ্গে কোনো দেশের যুদ্ধ বাধে নি, রাজ্য সম্পদ আমাদের নেই, স্বাধীনতাও বহুকাল ইংরেজের হাতে বাঁধা পড়েছে, সুতরাং এযুদ্ধের কোনো পক্ষের জয়পরাজয়ে আমাদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। তবু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও অন্যান্য মানুষ (তাদের মধ্যে বাঙালীও ছিল) গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ছেড়ে দুরন্ত শীতের দেশে বহু দুঃখ যন্ত্রণা নীরবে সয়ে যে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল, একবুক হিমশীতল কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করেছিল, তাতে মিঃ টমসন ভারতবাসীর patience under pain and willingness to face agonyকে সন্দেহ করেছেন! ইংরেজ দুঃখ সহ্য করে ধনমান লাভ করেছেন, ভারতবাসী এক হিসাবে তার চেয়ে অধিক দুঃখ সহ্য করে কেবল মৃত্যুস্বয়ম্বরের টীকা এবং অপমান লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ছাড়া কি পেয়েছে ?

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে মিঃ টম্‌সন্ বাঙালী জাতির উপর নানাদিক দিয়ে অবিচার করেছেন। প্রশংসার অতি সামান্য কথাগুলি তাঁর নিন্দার ঝড়ে কোথায় উড়ে চলে গেছে। বাঙালীর বহু দোষ আছে আমরা জানি ; কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম, যিনি নিজে বাঙালীর নিন্দা পাতার পর পাতায় করেছেন, যিনি রবি-বাবুর "বাঙালী-নিন্দা" নানা জায়গা থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন আর সমর্থন করেছেন, তিনি ভারতবাসীর অপমানের কথাও একটু বল্‌বেন। মনে করেছিলাম Dyer, O'Dwyerএর অমানুষিক অত্যাচারের কথা তিনি কিছু বল্‌বেন, যিনি Oaten, মুক্তি ফৌজের মিশনারী, এবং ভারতের কোন্ শুভানুধ্যায়ী Viceroy, সকলের হয়েই কারণে অকারণে বাঙালীর দোষ ধরেছেন। আমরা শুধু শাসক ইংরেজের দেশবাসী বলে তাঁকে ভাবি না, তাই মনে করেছিলাম তিনি Punjab troubles আর Amritsar tragedy বলেই এই নৃশংস কাণ্ডটার কথা শেষ কর্‌বেন না, unfortunate man বলেই Chelmsfordকে রেহাই দেবেন না। এত বড় ব্যাপারটা সম্বন্ধে মিঃ টমসন নিজের মত প্রায় কিছুই দেন নি, নৃশংস অত্যাচারীদের নামও করেন নি, রবি-বাবুর চিঠির খানিকটা কেবল তুলে দিয়েছেন। নিজ মুখে বল্‌তে না চাইলে রবীন্দ্রনাথের সব চিঠিখানা তুলে দিতে পার্‌তেন ; তাতে তবু আর-একটু বোঝা যেত। এটা কাব্য নয় বলে যদি আপত্তি থাকে ত বলা যায় না ; কিন্তু কাব্য যা নয় এমন অনেক জিনিষই ত বইখানাতে আছে।

রবি-বাবুর ইংরেজ ও পাশ্চাত্য জাতির যে-কোন নিন্দাকে তিনি একপেশে বলেছেন, তাঁর Prejudice against Englandএর দোষ ধরেছেন ; বাঙালীর নিন্দার বেলা কিন্তু রবি-বাবুকেই তিনি যথাসাধ্য সমর্থন করেছেন। বাল্মীকি কালিদাসের দেশ হলেও এদেশে রবি-বাবুর জন্মগ্রহণে মিঃ টম্‌সন্ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এ দেশটা এমনি হীন! আমরা কতটা হীন বা মহৎ, তার বিচার করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে টম্‌সন্ সাহেবের দেখান উচিত ছিল, যে, "হীন" বাংলা দেশে রবি-বাবুর মত কবির আবির্ভাব কেমন ক'রে হ'ল। জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়। বাংলা দেশে বাঙালী-সমাজে রবি-বাবুর আবির্ভাবও আকস্মিক নয়। ইহা সত্য, যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার দেশকে নানাদিকে উদ্বোধিত করেছেন ; কিন্তু ঠাকুর-পরিবারের প্রভাবে রবিবাবু বড় হয়েছেন বল্‌লেও সমস্ত কারণটা বোঝা যায় না। কেননা, জোড়াসাঁকোটা বাংলা দেশেই অবস্থিত এবং ঠাকুর পরিবারও বাঙালী। বাংলা ও বাঙালীকে অবজ্ঞা করে ও খাটো করে রবি-বাবুকে বাড়ানোর চেষ্টায় নানা অসঙ্গতি ঘটে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী জাতির এমন কিছু আছে, যা রবি-বাবুর মহত্বের অন্ততঃ আংশিক কারণ।

মিঃ টম্‌সনের মতে মনে হয় যেন বাঙালীরা রবিবাবুকে যেখানে অবহেলা করেছে, সেখানে সেটা বাঙ্গালীর দোষ, কিন্তু ইংরেজ যেখানে করেছে, সেখানে সেটা রবি-বাবুর নিজের, তাঁর publisherএর, Mr. Yeatsএর অথবা বাঙালী জাতিরই দোষ। Western intelligenceএর অপমানে তিনি দুঃখিত। খাঁটি কবিতার মূল্য তিনি বোঝেন জানি, কিন্তু "ধর্ম্মপ্রচার", "দুরন্ত আশা" প্রভৃতিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নিজেই নিজের বিপক্ষে প্রমাণ করেছেন যে খাঁটি কবিতার মূল্য ইংরেজ বোঝে না ; না হলে "বলাকার" বিশেষ বিশেষ কবিতার আলাদা করে উল্লেখ না করে, "সুরদাসের প্রার্থনা" "ভৈরবীগান" "অনন্ত প্রেম" প্রভৃতি মানসীর কবিতাকে উপেক্ষা করে, "নব বঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ" "বঙ্গবীর" প্রভৃতির দীর্ঘ আলোচনা কর্‌তেন না। এটা বাঙালীজাতির সমালোচনা নয়, কবি রবীন্দ্রের সমালোচনা। এতে এরকম জিনিষ দেখ্‌লে মনে হতে পারে, বড় জিনিষের চেয়ে ছোট জিনিষই ইংরেজ ভালবাসেন। Western intelligence যদি "উর্ব্বশীর" আলোচনার পরেই "ধর্ম্মপ্রচার"কে সমালোচনায় সব চেয়ে বেশী স্থান দেয়, সেকি নিজেই নিজের অপমান করে না ? Nationalismকে একপেশে বলে তিন পৃষ্ঠায় তার আলোচনা সেরে বাঙালীর নিন্দায় ১০।১২ পাতার বেশী খরচ কর্‌লে কিসের পরিচয় দেওয়া হয়, tolerance ও আত্মপ্রশংসাপ্রিয়তায় কার স্থান কোথায় হয়, সহজেই তা বোঝা যায়। ধর্ম্মপ্রচারক a scorching arraignment of his (a Salvationist missionary's) assailants বলা যায়, কিন্তু "throbbing protest against his own countrymen's bigotry and cowardice" বল্‌লে বেশী বলা হয়। এ কথা ত বাঙালী সাধারণের কথা নয়, বিশেষ কয়েকজন বাঙালীর কথা। লোককে অন্যায়রূপে মেরেও ইংরেজ কাপুরুষরাও পুলিসের ভয়ে দৌড় মারে, শুধু বাঙালী নয়। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের বিরোধ নিয়ে ইংরেজজাতি যত নরহত্যা করেছে, গত কয়েক বৎসরেও অনুদারতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক ধর্ম্মবিষয়ক দাঙ্গা যত ইংলণ্ডে হয়েছে, তার কথাও ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। সুতরাং এসব কথা না তোলাই ভাল। ধর্ম্মপ্রচারের যে অংশ রবীন্দ্রনাথ নিজে বাদ দিয়েছেন, সে অংশটার আলোচনা না করলে মিঃ টমসনের প্রেজুডিস সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ কম হত। "ধর্ম্মপ্রচার" কবিতাটি খৃষ্টভক্তের প্রাণে লাগ্‌তে পারে নিশ্চয়, কিন্তু সেটি যে রবিবাবুর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার একটি নয় এবং বাঙালী জাতি খৃষ্টভক্তের উপর দুবেলা অত্যাচার করে বেড়ায় না, এবিষয়ে সন্দেহ নেই আমরা মনে করি। এ কথা সকলেই জানে, বাঙালী ইংরেজ কি অন্যান্য জাতির চেয়ে ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিষয়ে tolerant। কবি ও কাব্যের সমালোচক জাতিগত ও ধর্ম্মগত গণ্ডী ছাড়িয়ে সব জিনিষের বিচার করতে বাধ্য। রবি বাবুর কবিতা অবলম্বন করে বাঙালীর যে-সব দোষের উল্লেখ করা হয়েছে তার সব কিছুর বিচার করা এখানে সম্ভব নয়। ধ'রে নিলাম সব দোষই বাঙালীর আছে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্য দরবারে রবি-বাবুর বিচার এইসব কবিতা দিয়ে কোনো কালে হবে না, হওয়া উচিতও নয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী; বাঙালীকে ভালবাসেন বলে তার উপকারের জন্য তিনি তার গুণ দেখাতে তত চেষ্টা করেননি যত করেছেন তার ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম সব দোষ দেখাতে; হয় ত জোর দেবার জন্য কোনো কোনো জায়গায় (যথা "ধর্ম্মপ্রচার") বাড়িয়ে বলেছেন, বল্‌বার তাঁর অধিকার আছে। বাঙালী জাতির প্রতি তাঁর বহু বিষয়ে আস্থার কথা আমরা স্বকর্ণে শুনেছি; কিছু কিছু পড়েওছি। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আছে—"বাঙালীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম্ম কখনই চিরদিন ধার-করা বার্দ্ধক্যের মুখস পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না।" মা ছেলেকে যেমন করে শাসন করে দোষ ধরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের ত তেমন কর্‌বার কথা নয়; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মত করে বাঙালীকে বল্‌বার কারও অধিকার নেই। যদি কেউ বলেন, তবে নিরপেক্ষভাবে সমস্ত পৃথিবীর সকলজাতির দোষগুণের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে বল্‌তে হবে। H. G. Wells, Bernard Shaw, Dickens, Thackeray, Wordsworth, Carlyle, Burke প্রভৃতি স্বদেশবাসীর যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, তা তাঁদের শোভা পায়, আমাদের তা করতে যাওয়া সাজে না। তা ছাড়া তাঁদের বই খুলে সে-দেশের নিন্দাগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে ইংলণ্ডের ঠিক চিত্রও দেওয়া হবে না, এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের বিচার কর্‌তে হলে কোথায় কত দেশের নিন্দা আছে তা দেখ্‌লে চল্‌বে না, দেখ্‌তে হবে সাহিত্য হিসাবে সেগুলোর স্থান কত উঁচুতে কি নীচুতে।

কবি Wordsworth ত লিখেছেন, "At this day, if for Greece, Egypt, India, Africa, Aught good were destined, thou wouldst step between. England! all nations in this charge agree." আমরা অবশ্য প্রত্যেক ইংরেজ সম্বন্ধে একথা মনে করি না। সার চার্লস্‌ ডিল্ক বলেন, "There is too much fear that the English, unless held in check, exhibit a singularly strong disposition towards cruelty, wherever they have a weak enemy to meet......(ইহা কি cowardice নয়?) It is not only in war time that our cruelty comes out: it is often seen in trifles during peace." (Dilke's "Greater Britain." 5th edition of 1870, pp. 445-7.) প্রত্যেক ইংরেজ সম্বন্ধে এরকম ধারণাও আমাদের নেই।

ইংলণ্ডে গত বৎসর রবীন্দ্রনাথের বাণী শুন্‌তে তত আগ্রহ আর দেখা যায় নি শোনা যাচ্ছে। শুনছি কিছু দিন আগে থেকেই সেখানে তাঁর খ্যাতি কমে গেছে। মিঃ টমসন্‌ এর জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের মূল্য বোঝেন এবং বন্ধুভাবে তাঁকে ভালবাসেন। কিন্তু মিঃ টমসনের দেশবাসীকে এই সুযোগে কেউ কেউ বস্তুতান্ত্রিক বলাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে অনেক কারণ দেখিয়েছেন (p. 46) (p. 56)। খ্যাতি কমার কারণ দেখিয়ে মিঃ টমসন বলছেন, "I think the poet himself and his publishers almost entirely to blame।" রবীন্দ্রনাথের দোষ তিনি অনেক দেখিয়েছেন; তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে দুটি। প্রথম, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রকাশক নাকি কেবলি এক "মিষ্টিক" সুরের বই পর পর ইংলণ্ডকে উপহার দিয়েছেন। এতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জাতির বুদ্ধিকে রবীন্দ্রনাথ অপমান করেছেন অনুবাদে কেবল জোলো জিনিষ দিয়ে আর "boldest, strongest poems" বাদ দিয়ে ছেঁটে কেটে। একথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার কাছে তাঁর প্রায় কোনো অনুবাদই দাঁড়াতে পারে না; বাংলায় তিনি যে অক্ষয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছেন, ইংরেজ কি বাঙালী কারো অনুবাদেই তা পাই না, পাওয়া সম্ভব নয়। তার উপর মিঃ টমসনের এ অভিযোগও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি অনুবাদের সময় ছেঁটে কেটে জীর্ণ শীর্ণ করে অনেক সময়ই বিদেশীর কাছে হাজির করেছেন। "বলাকার" 'ছবি' ও "ভারত-ঈশ্বর সাজাহানের" ইংরেজিতে যে শীর্ণ মূর্ত্তি, তা দেখে দুঃখ হওয়া মানুষের স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠতম সুন্দর কবিতার অনেক আজও অনুবাদ করা হয়নি। ছোট গল্পের যে প্রথম খণ্ড ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অনেক গল্প বাদ পড়েছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প স্থান পেয়েছে, একথাও সত্য। মিঃ টমসন এবং আমরা রবি-বাবুর যে-সকল গল্পকে প্রথম শ্রেণীর মনে করি, তার অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত ম্যাক্‌মিলান ছাপান নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, "মেঘ ও রৌদ্র" "মহামায়া" "নিশীথে" প্রভৃতি। শেষের দুটি এবং আরো অনেক অপ্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর গল্প Modern Review পত্রে বহুকাল আগে বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁকে ভাল করে বোঝ্‌বার জন্য পশ্চিমকে তাঁর জীবনকথা, "জীবনদেবতা", বঙ্গ ও ভারতের পুরাণ ইতিহাসের কিছু খোঁজ ভারতবাসীর দেওয়া উচিত ছিল, মিঃ টমসনের একথাও আমরা মাথা হেঁট করে স্বীকার করি। অনুবাদে তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে দেখাবার চেষ্টা প্রথম থেকেই করা উচিত ছিল, একথাও আমরা মানি (যদিও রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদগুলি ঠিক অনুবাদ নয়, সেগুলি তাঁর স্বতন্ত্র ইংরেজি রচনারূপে বিচার করা চলে)। কিন্তু এত কথা মেনে নেবার পর বল্‌বারও আমাদের কিছু আছে। ইউরোপের সব দেশের কথা জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে সাধারণতঃ ইংরেজ সম্পাদক ও প্রকাশকরা "whatever is so delightfully Eastern", অর্থাৎ যা বোঝা যায় না, তাই প্রকাশ কর্‌বার জন্যই বেশী ব্যগ্র। বিশ্বসাহিত্য কি শিল্পহিসাবে যখন কোনো জিনিষের বিচার করা হয়, তখন এইসব সম্পাদক ও প্রকাশক Eastকে সে মাপকাঠিতে বিচার করেন না। যে জিনিষ পশ্চিমে পেলে তাঁরা খুসী হয়ে মাথায় তুলে নেন, পূর্ব্বদেশ তা দিলে তাঁরা তাতে তৎক্ষণাৎ জাল কিম্বা নকল পশ্চিমকে দেখ্‌তে পেয়ে ফিরিয়ে দেন। তা ছাড়া পূর্ব্বদেশের সব কিছুরই depth আর splendour যে পশ্চিম বোঝেন মিঃ টমসনের Crescent Moonএর সমালোচনা দেখে ত তা মনে হয় না। অবশ্য আমরা একথাও বলি যে সবদেশেই এমন মানুষ আছেন যাঁরা অন্য দেশের অন্তরের রূপ বোঝেন। অনুবাদ সম্বন্ধে বলা যায় যে পাশ্চাত্য ভাষা একটার থেকে আর একটায় রূপান্তরিত হলে দুটোর মধ্যে যতখানি মিল থাকে, পূর্ব্বদেশের ভাষা পশ্চিমের ভাষায় অনুবাদ করলে তা থাকা সম্ভব নয়। এ দুইদেশের ভাব ভাষা উপমা প্রকাশভঙ্গী অলঙ্কার পুরাণ ইতিহাসের allusions, সমস্তই দুটো আলাদা জগতের। তার উপর কোনো পশ্চিম দেশের লোক পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে যতটা পরিচিত, প্রাচ্য সাহিত্যের সঙ্গে

তার শতাংশের এক অংশও নয়। আর একটা কথাও বল্‌বার আছে। মিঃ টম্‌সন বল্‌ছেন (p. 56), যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের মানুষ জীবনসংগ্রামে এত ব্যস্ত যে কালিদাস, Shakespeare, Aeschylus একসঙ্গে দল বেঁধে এলেও আগের মত আদর পেতেন না; রবীন্দ্রনাথের না পাওয়া আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ইউরোপের Continentএর মানুষকে ত মহাযুদ্ধ ছেড়ে কথা কয় নি; তাদের জীবনসংগ্রাম কি কিছুমাত্র কম? তারা রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার তর্জ্জমার তর্জ্জমা পড়েও তাঁকে এত সাগ্রহ অভ্যর্থনা যদি যুদ্ধের পর করতে পেরেছে তবে ইংলণ্ড কেন তা পারবে না?" এর দ্বারা কি বুঝ্‌তে হবে না, ইংলণ্ডই বেশী বস্তুতান্ত্রিক? শিল্প সাহিত্যকে ত্যাগ (Renunciation of Beauty) যে এত ঘোর সংগ্রামের মধ্যেও করে না, ইংলণ্ডের চেয়ে বস্তুতান্ত্রিক সে কম বল্‌তে হবে। ইংলণ্ড আগে একবার করে নিরাশ হয়েছে বল্‌লেই যথেষ্ট জবাবদিহি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যের সমালোচনায় মিঃ টমসন যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "He is a great poet, greater than any of us. Very few English writers would believe this to-day. Nevertheless, he is a much greater poet, greater writer than English critical opinion imagines"। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেখে মিঃ টমসন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, "Not even Victor Hugo had a wider range of form and mood"। অবশ্য 'yet he was born a Bengali' বল্‌তে মিঃ টমসন ভোলেন নি! আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেও এই গঙ্গামাতৃক দেশে, এই বাংলায়, অন্ততঃ আরও একজন Universal মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন রায় কবি না হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক জগতের তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ। এই নির্গুণ বাংলাদেশে যে কি কারণে বার বার মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তা মিঃ টমসন গবেষণা করে বার করলে ভাল হয়। তিনি অজিত-বাবুর দোহাই দিয়ে বাঙালীকে মূর্খ, ভীরু, provincial, অনেক কিছু বলে নিয়েছেন। আমরা যোদ্ধাজাতি নই বলে যে নিন্দা করেছেন সেটাতে দুঃখ নেই; কারণ আমরা তা হতে চাই না, যুদ্ধ করাই বীরত্বের আর সাহসের একমাত্র পরিচয় নয়। ক্লাইবের আমলে যে বাঙালী সিপাইরা ইংরেজের তরফে অনেক যুদ্ধ জিতেছিল, ত'তে আমাদের গৌরব কর্‌বার কিছু নেই। বর্ত্তমান বাংলার ইতিহাসেও বাঙালীর নির্ভয়ে প্রাণ দেওয়ার বহু নিদর্শন আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ত দিয়েইছে, স্বেচ্ছায় ফাঁসিকাঠেও সে নির্ভয়ে প্রাণ দিয়েছে। ইউরোপীয় মহাসমরেও বাঙালী নির্ভয়ে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছে। বাঙালীর সমুদ্র-যাত্রা ও উপনিবেশ স্থাপনের কথা ইংরেজ ঐতিহাসিক Hunterএর বই খুলে মিঃ টমসন দেখ্‌তে পারেন। "The ruin of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how Bengalis ceased to be a sea-going people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west and colonised the islands of the archipelago."—W. W. Hunter's Orissa, pp. 314-315. কোম্পানীর আমলে পর্য্যন্ত বাঙালী নিজের তৈরী জাহাজে সমুদ্রে যেত। বঙ্গের জাহাজনির্ম্মাণ ব্যবসা সেই সময়ে বিনষ্ট করা হয়। বাঙালীর tradition হিসাবে এসব কথার মূল্য আছে। বর্ত্তমানে অবশ্য ভারতীয় অন্যান্য জাতির মত বাঙালীরও নিজস্ব জাহাজ প্রভৃতি প্রায় নেই। পরের জাহাজেই তারা সমুদ্রযাত্রা করে। অন্যান্য অপবাদ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে বাঙালী ছাড়া জগতে আরো অনেক জাতি আছে যারা নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের এই সব দোষ আছে—দ্বিতীয় কথা বাঙালী ছাড়া অন্য কোনো জাতির বাঙালীকে এতটা নিন্দা কর্‌বার অধিকার নেই। যদি সে জাতি নিষ্কলঙ্ক হয়, তবে যেন সে অন্যকে নিন্দা করে। খৃষ্ট বলেছেন, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her!" মিঃ টমসন ত নিজেই লিখেছেন, "Let the Westerner who feels entitled to fling a stone at some Indian evils remember England's penal laws of a century ago, or her representatives' paroxysm of fury in the Indian Mutiny, or in Governer Eyre's Jamaica regime, or the savagery of both sides in Ireland, or America's lynching record" (p. 80)। মিঃ টমসন লিখ্‌ছেন, "It (Bengal) brags that it leads the world"। এ কথা আজ প্রথম শুন্‌লাম। বাংলায় নাকি যে-কোন ইংরেজ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করে তাকেই তার শিষ্য বলা হয়। এটাও নূতন খবর। এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবকে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য বলা হয় জানি, কারণ তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব" বলে স্বীকার করেছেন। মিঃ টমসনকে যদি এ আখ্যা কেউ দিয়ে থাকে, তবে সে বেচারাকে বলি, বাঙালীজনসুলভ অলঙ্কারপ্রিয়তাটা যেন সে এর পর থেকে বর্জ্জন করে কথা বলে। মিঃ টমসন বোধ হয় জানেন, বাংলা দেশে রবি-বাবুর বাঙালী "শিষ্যরা" ইংরেজ "শিষ্য"দের মতই স্বাধীন চিন্তার মর্য্যাদা বোঝে এবং রাখ্‌তে চেষ্টা করে। মিঃ টমসন আরো বল্‌ছেন বাংলা দেশে, "The Nobel award was commonly understood to mean that the world's opinion had sent him to the head of the class, with the corollary that his race also now 'led all the rest'"। সব জাতির প্রাপ্ত পুরস্কার জড়িয়ে দেখ্‌লে পৃথিবীতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে জর্ম্মনী সব চেয়ে বেশী, অর্থাৎ ২২ বার। দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে ফ্রান্সের, সে পেয়েছে ১৫ বার।* সকলের চেয়ে কমবার পেয়েছে ভারত (বাংলা) ও পোলাণ্ড, মাত্র ১ বার। নোবেল প্রাইজকে যদি উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ ছাপ বলে ধরাও হয়, তবু একবার মাত্র সেটা পেয়ে জার্ম্মানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল জাতের সেরা নিজেকে মনে করবে বাংলাদেশের বুদ্ধিমান্ লোকেরা এত বোকা নয়। নোবেল প্রাইজ খুব বড় ছাপ একথা বল্‌বই, কিন্তু তবু তারও খুঁৎ আছে; সে ত Johan Bojer, Anatole France (এই সমালোচনা গত আশ্বিন মাসে লেখা হয়; তখন ইনি নোবেল প্রাইজ পান নি), Hermann Sudermann, H. G. Wells কাউকে এখনও ছাপ দেয়নি; অথচ Rudyard Kiplingকে দিয়েছে; কিন্তু তাই বলেই কি R. Kipling এঁদের চেয়ে বড়? আমরা ত তা বলি না। যে-কোনো একজন বাঙালী যদি বলেও থাকে, "Bengal leads the world" তবে তার কথাটা সমগ্র বাংলার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বাঙালী বলে বাংলা দেশ জগতের অগ্রণী, এমন হাস্যকর ধারণা আমাদের নেই। আমরা বাগাড়ম্বর কর্‌বার জন্যে বল্‌ছি না, কারণ আমরা জানি জগৎসভায় আমাদের স্থান কত নীচে কিন্তু এই সব দোষের আকর বাংলাতেও যে সব রকম মহত্ত্বের বীজ আছে তাই জানাবার জন্য বল্‌ছি, বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ছাড়াও এমন মানুষ জন্মেছেন যাঁদের কীর্ত্তি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। যাঁরা "provincial" নন সেইসব সর্ব্বগুণাকর জাতি এঁদের চেয়ে অনেক নীচুদরের কোন কোন কীর্ত্তিমান্‌কে নিয়েও জগতে জয়দুন্দুভি বাজিয়ে বেড়ান। গুণপনায় বাংলার মুষ্টিমেয় এইসব মানুষ যতই বড় হোন, সংখ্যায় তাঁরা অতি অল্প বলে আমরা লজ্জিত; তাই আমরা

* আনাতোল ফ্রাঁস্ পাওয়ার পর ১৬ বার হয়েছে।

তাঁদের কীর্ত্তি ঘোষণা করতে চাই না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বটে, "এর চাইতে হতেম যদি আরব বেদুইন।" কিন্তু জীবনে অনেক কিছুই তিনি খেয়ালের বশে হতে চেয়েছেন। তবু আমাদের বিশ্বাস, সে সব কিছুর চেয়ে তিনি যা আছেন সেইটার প্রতিই তাঁর টান বেশী। মিঃ টম্‌সনও বোধ হয় মনে করেন না, যে, আরব বেদুইন হবার লোভ রবীন্দ্রনাথের খুব প্রবল। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌লে হয় না কি? তিনিই ত বলেছেন, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"; "পরজন্ম সত্য হলে কি ঘটে মোর সেটা জানি, আবার আমায় টান্‌বে ধরে' বাংলা দেশের এ রাজধানী"; "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"। বাঙালীকে তিনি যতই কঠোর কথা বলুন, বাঙালীকেই যে তিনি সকলের চেয়ে ভাল বাসেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ তাঁর রচনাবলীর পাঠকের নেই। তিনি পাতায় পাতায় গর্ব্ব করে না বেড়াতে পারেন, কিন্তু তিনি জানেন ও মানেন যে বাঙালীর এমন অনেক সম্পদ আছে যা জগতের হাটে বাজারে সর্ব্বত্র মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিঃ টম্‌সন্ বলেন, "first among his countrymen, he *lived*, in the fullest sense..." এখানে live কথাটার মানে, to live a life rich in experience, to live vigorously in respect to activity or emotions। রবিবাবুই প্রথমে এদেশে এই অর্থে জীবন যাপন করেছেন, এ কথা বলা বোধ হয় দুঃসাহসের কাজ। নানা দিকে তাঁর প্রতিভা ও মহত্ত্ব আছে, কিন্তু এমন অনেক রকম অভিজ্ঞতা লাভ ও রস আস্বাদন অনেক বাঙালী করেছেন, যা তিনি করেন নি।

কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিগণের প্রভাব রবি-বাবুর কবিতায় কতখানি তার বিচার করে মিঃ টমসন বল্‌ছেন, বৈষ্ণব কবিদের রবীন্দ্রনাথ বড় বেশী সম্মান করেন। আমাদের ত তাই মনে হয়। বৈষ্ণব কবিদের কবিতার বিষয় রবীন্দ্রনাথকে যতখানি অনুপ্রাণিত করেছে, কবিতাগুলি বাস্তবিক ততখানি করেনি। মিঃ টম্‌সন বলেন, কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের আসল গুরু। তিনি বলেন, "The two poets, the greatest India has ever produced, differ as strikingly as they resemble each other. Both are passionate lovers of the rains..." ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে Shelley এবং তার পর Browning ও Keats-এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা যায়। মিঃ টমসনও এই কথা বলেন। আমরা দেখেছি "বর্ষশেষ" কবিতাটির সঙ্গে Shelleyর West Windএর কিছু সাদৃশ্য আছে। সব রকম প্রভাবের কথা বলে মিঃ টমসন বল্‌ছেন, But in the case of a wide and desultory reader like Rabindranath, it is not possible to say where he found the suggestion for this or that idea or phrase." ঠিক কথা।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব সঙ্গীতের কবিতা ও "বলাকা" এবং "করুণা" উপন্যাস ও 'গোরা' "ঘরে বাইরে" প্রভৃতি যাঁরা তুলনা করে পড়েছেন, তাঁরা যদি লেখক হন্, তবে মাসিক পত্রের সম্পাদকদের হাজার কথাতেও তাঁদের হতাশ হবার কিছু নেই। এখানে মিঃ টম্‌সনের কথাটা তুলে দেওয়া চলে। "It must be admitted that he has written a great deal too much, and that the chief stumbling block in the way of accepting him among great poets is the inequality of his work"। এর সব কথায় সায় না দিতে পারলেও এতে সত্য আছে। এর পর মিঃ টমসন রবীন্দ্রনাথের লেখার (বিশেষ করে চৈতালীর আগের দিকের) "flowery undergrowth" কাস্তে চালিয়ে কাটবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর লেখায় ফুল, চাঁদ, দখিন হাওয়া, বসন্ত, শরৎ, অশ্রু, হাসি, বিরহ, ভ্রমর প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখে লোকে নাকি ক্ষেপে ওঠে। মিঃ টমসন "উর্ব্বশী" থেকে শেষটা তুলে দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। এর বিরুদ্ধে কিন্তু আমরাও কয়েকটা হিসাব দিতে চাই। পত্র, সিন্ধুতরঙ্গ, শ্রাবণের পত্র, দেশের উন্নতি, ধর্ম্মপ্রচার ধ্যান, পরশপাথর, নবদম্পতির প্রেমালাপ, সমুদ্রের প্রতি, এবার ফিরাও মোরে, পুরাতন ভৃত্য, বঙ্গবীর, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি চৈতালির আগের অনেক কবিতায় এজাতীয় কথা প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। ক্ষণিকা ১৫৯ পৃষ্ঠার বই, প্রেম ও বিরহ প্রভৃতি বিষয়েই তার অধিকাংশ কবিতা লেখা। তার প্রথম ৭৭ পৃষ্ঠায় ১৫৩০ লাইন কবিতায় কথা আছে প্রায় পাঁচ হাজার; কিন্তু খুঁজে দেখ্‌লাম এতে দক্ষিণ পবনার্থক কথা আমাদের চোখে পড়েছে মাত্র একবার, এবং ওই জাতীয় ফুল, চাঁদ, ভ্রমর প্রভৃতি সব কথার মোট সংখ্যা ৬৪ বা কি বড় জোর ৭০। 'বলাকার' 'ছবি' বিরহের কবিতা বলা যেতে পারে, কিন্তু অশ্রু, বিরহ, কান্না, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কথা তাতে চোখে পড়ে না। এমন কি "উর্ব্বশী", যাতে এসব থাক্‌বারই কথা, তাতেও সবটা গুণে দেখি ৩৩২টি কথার মধ্যে ৩৩টি মাত্র ঐ জাতীয়। মিঃ টমসন যেটুকু বেছে তুলে দিয়েছেন তাতে কথার হিসাব আড়াই গুণ বেড়ে যায়। ৭২ পৃষ্ঠায় কোন্ এক বাঙালীর কথা তুলে মিঃ টমসন বল্‌ছেন, "my Bengali friend who complained of too much south wind and a glut of flowers had reason. Only too many suppose that Rabindranath is a poet of softer beauty, evading the sterner." মিঃ টমসন নিজেই কিন্তু প্রতিবাদ করে বল্‌ছেন, "But this was never the case, even in his early work; at any rate was never the case after Evening Songs. In *Manasi*, for example, is one of the grandest and most terrible sea (সিন্ধুতরঙ্গ) storms in the world's literature" (p. 72)। আমরা এঁদের "সিন্ধুতরঙ্গ, "বর্ষশেষ", "বৈশাখ", "দূর হ'তে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন", "পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি" প্রভৃতি পড়্‌তে বলি।

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"কে (p. 74) পশ্চিমকে বোঝাবার চেষ্টা মিঃ টমসন যথাসাধ্য করেছেন; এর জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। জীবন-দেবতাকে না বুঝ্‌লে তাঁর অনেক উচ্চাঙ্গের কবিতা বোঝা শক্ত। পশ্চিম দেশকে এর পরিচয় দিয়ে মিঃ টমসন বড় একটা কাজ করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে কত নিকট তা মিঃ টমসন বুঝেছেন। তিনি বলেন, "No poet that ever lived has had a more constant and intimate touch with natural beauty." রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিঃ টমসন আরও বলেন, "no poet that ever lived has shown his power of identification of himself with nature, of sinking into her life"। মিঃ টমসনের মতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে আসন পাবার যোগ্য; কিন্তু তবু পশ্চিম দেশ একে অত্যন্ত অবহেলা করেছে দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করেছেন। মিঃ টমসন গল্পগুচ্ছের প্রতি খুব সুবিচার করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের তালিকার সঙ্গে আমাদের তালিকা হুবহু না মিল্‌লেও অনেকটা মিলেছে। মিঃ টমসন বলেন, "no question has stirred him more deeply or constantly than the position of women. His stories show an understanding of women, as the work of exceedingly few men does" (p. 78)। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চোখের বালি'

ও 'চতুরঙ্গ'র উল্লেখ বইখানিতে নেই; "গোরা"কে তার যথাযোগ্য আসন দেওয়া হয়েছে। নাটকের মধ্যে "প্রায়শ্চিত্ত" 'অচলায়তন' 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটির নাম নেই; "বিসর্জ্জন", 'মালিনী' ও চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি মিঃ টমসনের কষ্টিপাথরে সোনার আঁচড়ই দিয়েছে। "কর্ণ ও কুন্তী" মিঃ টমসনের মতে " is beyond praise"। চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে মিঃ টমসন বলেন, "the reader can see how masterly it is, in whole and detail. It is one of the summits of his work, unsurpassed and unsurpassable in its kind. The play's form is superb"। বিসর্জ্জনের সঙ্গে তুলনা করে মিঃ টমসন বলছেন, "If Chitrangada is the lovelier poem, Sacrifice is the greater drama, indeed the greatest in Bengali literature. It is amazing that work so excellent and varied in kind should have come together." প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে মিঃ টমসন বলেন, "The readers can see how remarkable it is"। তিনি বলেন, "The dramas show also how the poet was emancipating himself from the tangles of the solely artistic aim and life. He is a strayed Hercules, trapped, as he slept, in the wood nymphs' flowery meshes, and he breaks free in showers of scattered radiance"। নাটকাদি আলোচনার শেষে তিনি বল্‌ছেন, "I feel the poet has never realised his possibilities as dramatist" (p. 82)। সম্ভবত তাই। বিসর্জ্জন প্রভৃতিই যাঁর যৌবনের রচনা, পরিণত বয়সে তিনি হয়ত এর চেয়েও অনেক বড় ঐ জাতীয় নাটক লিখ্‌তে পারতেন। মিঃ টমসনের ভয় পাবার কারণ নেই। "Tagorite" মাত্রেই সর্ব্বক্ষেত্রে "the symbolism is essential" নাও বল্‌তে পারেন। তবে তাঁরা রূপক নাটকগুলিতে মিঃ টমসনের মত "sob stuff"এর আধিক্য হয়ত দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে মিঃ টমসন বলেছেন, "If the reader can take his English books, and find the half dozen lyrics most perfect in grace and suggestion and then in imagination multiply that grace and suggestion tenfold, he can guess what these Songs are like"। ইংরেজের কাছে বাঙালীর গানের এত বড় প্রশংসা পাওয়া কম কথা নয়। 'উর্ব্বশী' ও 'বলাকার' প্রতি মিঃ টমসনের অনুরাগ তাঁর রসবোধেরই পরিচয় দেয়। 'খেয়া' ও 'শিশু'কে মিঃ টমসন বড় বেশী অবহেলা করেছেন। 'শিশু'কে ত তিনি নিতান্তই তাচ্ছিল্য করেছেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম ও আশ্রমের কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মিঃ টমসন বন্ধুর চোখে দেখেছেন, বিচারকের চোখে নয়। এখানে দোষের দিকে তাঁর চোখ যায় নি, গিয়েছে গুণের দিকে।

মিঃ টমসন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির ধর্ম্মে হিন্দু, খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের প্রভাব কতখানি আছে বা নেই, তার আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই কম, সুতরাং বেশী কিছু না বলাই ভাল। শান্তিনিকেতনের উপাসনায় ও রবিবাবুর জীবনে "পিতানোঽসি" মন্ত্রের উল্লেখ করে মিঃ টমসন খৃষ্টীয় প্রভাবের কথা তুলেছেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের সকালের উপাসনার মন্ত্র "ওঁ পিতা নোঽসি" নাকি "Christian in every phrase"। মন্ত্রটি মহর্ষিদেব তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মে সংগ্রহ করেছেন। এটি শুক্ল যজুর্ব্বেদের সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ২০ মন্ত্র (৩৭।২০) হইতে গৃহীত। যজুর্ব্বেদের সময় ৮০০ হইতে ১০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। তা ছাড়া উপাস্য দেবতায় পিতৃত্ববিষয়ক মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। 'The doctrine of the Fatherhood of God' যে কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা নয়, তার প্রমাণস্বরূপ ইংরেজ লেখক Dr. George A. Grierson এর কথা তুলে দেখান যায়। তিনি বলেন, "India thus owes the idea of a God of Grace, of the Fatherhood of God, to the Bhagavatas." (এই ভাগবতদিগের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ চার শতাব্দী পূর্ব্বেও ছিল।) "The conceptions of the fatherhood of God and of Bhakti were indigenous to India." (Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edited by James Hastings. Vol ii. Bhaktimarga.) এই প্রবন্ধেই আছে, "Devotional faith implies not only a personal God, but one God. This feeling was very old in India. We occasionally come across what it is difficult to distinguish from *Bhakti* even in Vedic hymns."

প্রাচীনপন্থী হিন্দু জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ প্রভৃতিকে যে চক্ষে দেখ্‌তেন, রবীন্দ্রনাথ সে চক্ষে দেখেন না সত্য। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে অনন্তপ্রবাহকে তিনি অনুভব করেন, মানুষের মনে অতীত ও ভবিষ্যতে নানা ছন্দে আপনাকে দেখ্‌বার ও পাবার যে চিরন্তন স্পৃহার কথা তাঁর কবিতায় পাই, এসব কি হিন্দু মনেরই সংস্কৃত রূপ নয়? তবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতির হিন্দুত্বে আপত্তি কোথায়? বাইবেলে যে-সব অসম্ভব অলৌকিক গল্প (Fairy tales) আছে, আধুনিক অধিকাংশ খৃষ্টানই হয়ত তা বিশ্বাস করেন না তবু তাঁরা যদি খৃষ্টান হতে পারেন, তবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু না হবার কারণ এতে কি আছে? খৃষ্টীয় প্রভাব রবি-বাবু যতই অস্বীকার করুন, টমসন সাহেব গীতাঞ্জলিতে তা দেখ্‌বেনই। ভগবানকে আত্মীয় বন্ধুরূপে দেখা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অঙ্গ; রবীন্দ্রনাথের ভগবান খৃষ্টানের ভগবানের চেয়েও অন্তরতর ও নিকটতর বলে মিঃ টমসন বিস্মিত হচ্ছেন; কারণ এটা নাকি ভারতীয়ের ধর্ম্ম নয়! বেদ ও বেদান্তে নাকি এরকম ভগবানের দেখা মেলে না। ধর্লাম, মেলে না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মেই কি ভগবান কৃষ্ণকে বন্ধু, প্রেমিক ও স্বামীরূপে, অন্নপূর্ণা ও কালী তারাকে মাতারূপে, গৌরীকে কন্যারূপে, জগদম্বা জগদ্ধাত্রীকে মাতা ও ধাত্রীরূপে সাধনার কথা নেই? এই সব রূপে হিন্দু ত চিরদিনই তার দেবতাকে ডেকে আসছে।

রবীন্দ্রনাথের "ন্যাশন্যালিজম্‌" সম্বন্ধে মিঃ টমসন যে-সকল কথা লিখেছেন, তাতে কতকগুলি ভুল আছে। মিঃ টমসন মনে করেন (p. 80), রবীন্দ্রনাথের ৩৫ ৩৬ বৎসর বয়সের পর থেকে তিনি "নেশন" গঠনের পক্ষপাতী হতে সুরু করেন। তিনি নাকি পাশ্চাত্য জগতের শক্তি দেখে ভেবেছিলেন "Let India become a nation, and she would be as strong as these nations overseas. So he entered public life"। তারপর স্বদেশীর যুগের যুদ্ধের ফলে নাকি রবীন্দ্রনাথের এই মোহ কেটে যায়, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ "grew weary of nationalism."

আমরা রবীন্দ্রনাথের ৪০ বৎসর বয়সের লেখার কয়েকটি কথা তুলে দেখাচ্ছি মিঃ টমসনের ধারণাটা কতখানি ভ্রান্ত। "হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।" "নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি, অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম—কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করেন না।

নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই।" "এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই?" "আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।" কবির নানাবয়সের লেখাতে, স্বদেশী যুগের সময়ের তার আগের এবং পরের, এই রকম আরো অনেক উক্তি আছে। Nation ও nationalism বল্‌তে কবি যা বোঝেন, সে জিনিষগুলির পক্ষপাতী তিনি কোনো কালেই ছিলেন না। "ন্যাশনালিজ্‌ম্" বইখানারও ঐ বিষয়ক কথার আলোচনা কর্‌বার সময় মনে রাখ্‌তে হবে, রবীন্দ্রনাথের নেশনের যা সংজ্ঞা সকলের তা নয়। কথাটা ভুলে গেলে ন্যায়-শাস্ত্রের গোলমালে পড়্‌তে হবে। মিঃ টম্‌সন জানেন, পীপ্‌ল ও নেশন কথাটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কতখানি পার্থক্য দেখেন। "A nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assume when organised for a mechanical purpose." এই 'নেশন' জাতি নয়, পীপ্‌ল নয়, সমাজের ও সোসাইটির সঙ্গে এর আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ "পরের প্রতি অন্ধ", "কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্ম্মে বর্ম্মে, অস্ত্রে অস্ত্রে কণ্টকিত। এই নেশনের লোভের আর সীমা নাই।" এইদিক থেকে বিচার কর্‌লে দেখ্‌ব nationalism বইখানা ততখানি পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট নয়; remarkably one-sided and unfairও নয়; হয় ত কিছু হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা চিরকালই চেয়েছেন, আজও চান। দেশপ্রীতির তিনি শত্রু নন, দেশকে শক্তিশালী হতে তিনি চিরদিনই বল্‌ছেন। political freedom নেই বলে ব্রিটিশরাজ্যে ভারতবাসী যে কতখানি অসহায়, তা ত তিনি Lord Chelmsfordএর নামে লিখিত চিঠিখানিতেই দুবছর আগেও বলেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মুক্তি কি শক্তিই যে ভারতের চরম লক্ষ্য নয়, একথা তিনি চিরকাল বলে আস্‌ছেন। "স্বদেশে" দেখি, "এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতাকে অনেকে তাঁর আজকার বাণী বলে মনে কর্‌ছেন, কিন্তু তা নয়। ইহা ভারতের চিরন্তন বাণী, রবীন্দ্রনাথের চিরদিনের। "এইখানেই (ভারতে) জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে।" (পথ ও পাথেয়) একথা রবীন্দ্রনাথ আজ বলেন নাই। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলেছেন, "ঐক্যনির্ণয়, মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল;" "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি।" বিশ্বভারতীর বীজ রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বহুপূর্ব্বকাল হতেই সযত্নে সঞ্চিত ছিল।

এইখানে মিঃ টম্‌সনের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্ উক্তি তুলে দেখাচ্ছি।

"The most modern mind Bengal has known" (p. 5 "He has always been a first-rate letter-writer, whether in public or private correspondence"। (অবশ্য আজ-কালকার অনেক ব্যক্তিগত চিঠিতে ব্যক্তির ছায়া বেশী পাওয়া যায় না, পাই কেবল সুন্দর এক-একটি প্রবন্ধ।)

"At his best he can hold an audience as very few men alive" (p. 32). "Never was any poet such an unconscionable time in saying farewell" (p. 37). "He writes English of extreme beauty and flexibility, but with mistakes that can be brought under two or three heads. These things are but the tacks and nails of language. The beauty and music are all his own. It is one of the most surprising things in the world's literature that such a mastery over an alien tongue ever came to any man" (p. 45). "Both mediums are at his choice and absolute command; and he has become almost as great a master of English Prose as of Bengali, so that his craft can sail on many seas at will" (p. 57). "One of the most independent and fearless spirits alive" (p. 63). "His poetry, first to last, has been sincere, as the work of true poets is" (p. 65). "Balaka is a great book intellectually, with a never-pausing flow and eddy of abstract ideas. Its imaginative power surpasses that of any earlier book, and moves to admiration continually" (p. 83). "A personality whose fascination posterity will not be able to guess" (p. 106). "Gitanjali, a book that will stir men as long as the English language is read."

মিঃ টম্‌সনের বইখানি ছোট হলেও তার দোষ গুণ দুই খুব বেশী। তিনি অনেক জায়গায়, সাহস, বিচারশক্তি, নিরপেক্ষতা, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি বহু গুণের পরিচয় দিয়েছেন। বইখানির আগাগোড়াই লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু বহু ভুল ভ্রান্তি ও একদেশদর্শিতার অভাবও যে তাঁর লেখায় নেই, তা আমরা দেখিয়েছি। দুই দিক্ দেখাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু হয়ত মিঃ টম্‌সনের নিন্দার ঝাঁঝ লেগে আমাদেরও নিন্দার ভাগই বেশী হয়ে পড়েছে,—বলা যায় না। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই সাহিত্যরস বোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন, একথা তাই আর-একবার বল্‌ছি। সেইসঙ্গে বল্‌ছি, রবীন্দ্রনাথের অজস্র সৃষ্টির মধ্যে চেষ্টা কর্‌লে প্রায় সব রকম দোষ গুণই খুঁজে পাওয়া যায়; সুতরাং পরস্পরবিরোধিতার নিদর্শন তাতে দুষ্প্রাপ্য নয়; কাজেই রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে মিঃ টম্‌সনের যে-সকল কথার আমরা প্রতিবাদ করেছি, তার মধ্যে অনেক জায়গায় আংশিক সত্য থাক্‌তে পারে। তাঁর রচনাবলী আগাগোড়া সমস্ত খুব মনোযোগের সঙ্গে না পড়ে সমালোচনা করা খুবই শক্ত। আমরা আশা করি বইখানি দ্বিতীয় সংস্করণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে; মিঃ টম্‌সনের প্রতিশ্রুত বৃহত্তর বহিটির ত নিশ্চয়ই হওয়া উচিত।

আশ্বিন, ১৩২৮। শ্রীকথণ।

ঘরের ডাক

(২০)

আজ সকাল হইতেই গ্রামময় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল,—জমিদার ভবতোষ গতরাত্রে ধড়ফড় করিয়া মারা গিয়াছেন। পাড়ার সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—এত বড় ধর্ম্ম-ভীরু লোক এযুগে বড় একটা জন্মায় না এবং তাঁর তিরোভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে ক্ষতি হইল কোন কালেও তাহা পূরণ হইবার নয়।

শিরোমণি ঠাকুর নলিনীকে গিয়া বলিলেন, "যা হবার তা ত হয়েছে বাবা, এখন বাপের যশ যাতে অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পার তারই চেষ্টা কর।"

নলিনী কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শিরোমণি আবার বলিলেন, "সবই মায়ার খেলা বাবা; জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নববস্ত্র"......

নলিনী তবুও উত্তর দিল না।

একটিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া তাজা হইয়া শিরোমণি আবার আরম্ভ করিলেন, "তিনি কি মানুষ ছিলেন বাবা, না আবার কলেবর গ্রহণ কর্‌বেন?—রাধে মাধব—রাধে মাধব!" তারপর প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিরোমণি আবার বকিতে সুরু করিলেন,—"কি দয়ার শরীর ছিল দাদার আমার! একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, শিরোমণি দা মুখখানা আজ অমন ভার-ভার ঠেক্‌ছে কেন?..." এই অবধি বলিয়াই গলাটাকে যথাসম্ভব কাঁপাইয়া এবং গদগদ করিয়া তুলিয়া শিরোমণি সুরু করিলেন, "এমন দরদী বন্ধুই যদি কেড়ে নিলে, তবে এ হতভাগ কেও সেইসঙ্গে টেনে নিলে না কেন মধুসূদন?—এমন করে আর কতদিন বাঁচ্‌তে হবে দয়াময়?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবং উত্তরীয়-প্রান্তটা শুষ্ক চোখ দুটোর উপর একবার বুলাইয়া লইয়া শিরোমণি আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, কি বল্‌ছিলাম,—আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'তোমার মুখখানা আজ অমন বিষাদময় দেখ্‌ছি কেন শিরোমণি-দা?' সত্যই সেদিন মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল; গিন্নীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে নিয়ে সেই সবে বকাবকি করে আস্‌ছি,—বল্লুম, 'মেয়েটা চোখের উপরে কলাগাছের মত দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে চৌধুরীমশাই—এদিকে হাতে একটি পয়সা নেই যে খরচপত্তর করি,—পাত্রের বাজার কি রকম চড়া তা ত আপনার জান্‌তে বাকী নেই!'—হাঁ বুকের ছাতি বটে, এ ত আর ওপারের নরেশ রায় নয়—এ হচ্ছে ভবতোষ রায় চৌধুরী, যার নাম কর্‌লেও দিন ভাল যায়! কর্ত্তা বল্লেন কি জান বাবা?—বল্লেন 'তোমার মেয়ে আর আমার মেয়ে কি ভিন্ন শিরোমণি-দা!—কত হলে তোমার মেয়ের বিয়ে হয় বল ত—চার হাজার?' অন্য কেউ হলে চার হাজারই আদায় করে বস্‌ত,—আমি ত আর তা পারিনে বাবা, এ ত আর পরের সঙ্গে কারবার নয় যে কেবল নিজের গণ্ডাই বুঝে নেবো,—বল্লুম,—'আরে রামচন্দ্র—দু-হাজার হলে ভেসে যাবে যে।' তিনিও চার হাজারের নীচে নাম্‌বেন না, আমিও দু-হাজারের উপর উঠ্‌বো না। এমনি করে প্রায় একঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর শেষকালে তিন হাজারে রফা হয়ে গেল। কর্ত্তা বল্লেন, 'কবে আছি, কবে নেই শিরোমণি-দা, ষ্টাম্প-কাগজ এনে সই করিয়ে নিন্!' আমি বল্লুম, 'খেপেছেন নাকি চৌধুরী মশাই; নলিনী ত আপনারই ছেলে, সে বেঁচে বর্ত্তে থাক্, চারহাজার কেন, চার লাখের জন্যও ভাবি না।' আর তা ছাড়া, আজ যদি বাবা তুমি আমার কথা নাই বা বিশ্বাস কর তাহলেও কি কিছু আসে যায় মনে করেছ নলিনী? কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না! যে জিনিষ হারালুম তার তুলনায় তিনহাজার টাকা যে ভস্মমুষ্টিও নয় বাবা! হায় হায় কি জিনিষই কেড়ে নিলে দীনবন্ধু!—তোমার লীলা তুমিই বোঝ দয়াময়!"—বলিয়া স্মৃতিরত্ন জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের নীলাকাশের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী তবুও কথা কহিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নন্দরাণী আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় পিছন হইতে আসিয়া নলিনী ডাকিল, "ছোট-মা!"

মুখ না ফিরাইয়া নন্দরাণী উত্তর দিল, "কি নলিন !"

মেঝের উপর উপু হইয়া বসিয়া নলিনী বলিল, "আর কটা দিনই বা মাঝে রইলো ছোট-মা,—দায়োদ্ধার হতে হবে ত? এখন থেকে জোগাড়-যন্তর না করলে ত হয়ে উঠ্‌বে না!"

"তা আমি কি করবো বাবা!—সে তুমি বুঝ্‌বে।"

"তা ত বুঝ্‌বো ছোট-মা, কিন্তু তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে ত আর কোনো কাজ করতে পারি না?—শিরোমণি-কাকা বলছিলেন দানসাগর করতে—আমার কিন্তু আদবেই তা ইচ্ছে নয় ছোট-মা!—অপদার্থ ঐ বামুনগুলোর পিছনে অত টাকা খরচ না করে আমার ইচ্ছে সেই টাকা দিয়ে বাবার নামে একটি ইস্কুল খুলে দেবো—তুমি কি বল ছোট-মা?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দরাণী বলিল, "ইস্কুল খুল্‌তে হয় পরে খুলো নলিনী, কিন্তু তাঁর কাজটিও যেন একটুও অঙ্গহানি না হয়। সাতপুরুষ ধরে এই বংশে যেমন সকলের কাজ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই ঠাট্‌টি যেন বজায় থাকে। আজ তিনি নেই বলে আমরা যদি নিজেদের মনগড়া করে তাঁর শেষকাজ সম্পন্ন করি, তাহলে সেটা মোটেই ভাল হবে না নলিনী।"

নলিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নন্দরাণী আবার বলিতে লাগিল, "তিনি থাকতে যে-সব কাজ করতে ইচ্ছে হলেও করতে পারিনি আজ যদি সেই-সব কাজ করি তাহলে সেটা দিয়ে কি এই বোঝা যাবে না নলিনী যে তাঁর এই মৃত্যুটাকে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এত দিন ধরে চেয়ে আস্‌ছিলুম?"

নলিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল;—ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিতর্ক সে মনে-মনেও কল্পনা করিতে পারিতেছিল না।

এই সময় ঝি আসিয়া খবর দিয়া গেল, "রাণী-মা, কাশী থেকে আপনার মা এসেছেন।"

"আচ্ছা রাত্তির বেলায় কথা হবে এখন ছোট-মা"—বলিয়া নলিনী নীরবে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া নন্দরাণী আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, জীবনের গতিকে সে আজ কোন্ দিকে ফিরাইবে?—যে একঘেয়ে পথটাকে ধরিয়া সে এতটা রাস্তা চোখ কান বুজিয়া আসিয়াছে সেই পথটাকে ধরিয়াই কি সে আবার চলিতে থাকিবে—ঠিক তেমনি একঘেয়ে ভাবে?—কিন্তু—তাই বা সে করিতে যাইবে কেন?—আজ ত তার অবাধ মুক্তি! আজ ত সে শৈশবের শিক্ষা এবং স্বাধীন চিন্তার ধারাকে মুক্ত করিয়া দিয়া তাহারই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া দিব্য নিশ্চিন্তভাবে ভাসিয়া যাইতে পারে; আজ কোন বাধাই ত তার পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে না। হঠাৎ নন্দরাণীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—তবে কি সে এতদিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে স্বামীর মৃত্যুকামনাই করিয়া আসিতেছিল? নন্দরাণীর দম্ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল, না, না, স্বামী জীবিত থাকিতে জীবনটা তার যে একঘেয়ে পথটাকে ধরিয়া চোখ কান বুজিয়া এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে সেই পথটা ধরিয়াই তাকে জীবনের শেষমূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চলিতে হইবে, একটুও নড়চড় করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। স্বামীর জীবদ্দশায় যদিই বা সে কোনদিন নিজের স্বাধীন চিন্তাকে মাথা-চাড়া দিয়া উঠিবার অবসর দিয়া থাকে আজ আর সে তাহাও পারে না—স্বপ্নেও না। নিজের অসমাপ্ত এবং অচরিতার্থ যৌবনের দিকে চাহিয়া সে কি আজ বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর বিনিময়ে নিজের বাকি জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে কিনিয়া লইবে? সধবা জীবনের সমস্ত অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা সে কি আজ বৈধব্যের ভিতর দিয়াই সার্থক করিয়া তুলিবে? না, না, তা হইতেই পারে না! বৈধব্যই যদি আসিল ত রাজ্যসুদ্ধ অভাব এবং রিক্ততা লইয়াই সে আসুক!—শুধু কেবল বৃদ্ধ বলিয়াই স্বামীর মৃত্যুকে সে এমন হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারিবে না—কখনই না—কিছুতেই না।

রাত্রে নলিনী আসিয়া বলিল, "কি ঠিক করলে ছোট-মা?"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে নন্দরাণী বলিল, "দানসাগর করতেই হবে নলিনী, এর যেন একটুও নড়চড় না হয়; আর শিরোমণিঠাকুর যা যা বলেন তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়।"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী বলিল, "বেশ ত তাই হবে, তায় আর হয়েছে কি ছোট-মা!"

নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া নন্দরাণী বলিল, "চিরকাল যা চলে আস্‌ছে তা ত আর আমরা বন্ধ কর্‌তে পারি না নলিনী।"

অনেক রাত্রে মেঝের উপর একটা কম্বল বিছাইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া নন্দরাণী ভাবিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের পক্ষে যা সকলের চেয়ে বড় অভিসম্পাত সেই অভিসম্পাতই ত আজ তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বুকখানা ত তার ভাঙ্গিয়া একেবারে চুরমার হইয়া যায় নাই। স্বামীর অভাব সে ত, বুকের মাঝখানে খুব বেশী অনুভব করিতে পারিতেছে না, জীবনটা ত তার একেবারে শূন্য এবং ব্যর্থ হইয়া উঠে নাই! তবে কি সে তার স্বামীকে কোনদিন ভাল বাসিতে পারে নাই?—তবে কি এতদিন ধরিয়া সে কেবল সতীত্বের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল মাত্র? না না, বৃদ্ধস্বামীর অভাবকে দিয়া সে নিজের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার পথ একেবারে চিররুদ্ধ করিয়া দিবে; বৈধব্যকে সে বক্ষের প্রত্যেক পঞ্জর দিয়া অনুভব করিবে।

(২১)

সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী আপনার ঘরের জান্‌লার ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনার পিতৃবিয়োগের কথা সে ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, কিন্তু সেই কথাটাই আজ নূতন করিয়া তার বুকের মাঝখানে বার বার জাগিয়া উঠিতেছিল। তার মনে হইতেছিল নলিনার বুকে সে যে আঘাত দিয়াছে সেই ক্ষতটাই দগ্‌দগে করিয়া তার চোখের সমুখে মেলিয়া ধরিবার জন্যই বিধাতাপুরুষ সেই পুরাতন ক্ষতটার উপর আজ নূতন করিয়া এই দারুণ আঘাতের খোঁচাটাকে বসাইয়া দিয়াছেন। স্বর্গের যত দেবতা আজ যেন তাকে জব্দ করিবার জন্যই একজোট হইয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ভাবিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বাগানময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পাচারি করার পর ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের উপর ফেলী মুখখানি চুন করিয়া বসিয়া আছে। তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে লক্ষ্মী বলিল, "তুই অমন চুপটি করে বসে বসে কি ভাব্‌ছিস রে?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া ফেলী বলিল, "আমরা আর রবিবারে এখান থেকে চলে যাব নাকি লক্ষ্মী-দিদি?"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তুই এ খবর কোত্থেকে পেলি রে?"

"হোয়াইটসায়েব ওদের ডোরাকে বল্‌ছিলেন, তাই শুন্‌লুম—আমি কিন্তু যাব না লক্ষ্মী দিদি।"

"তুই যাবি নি—সে কি?—বাপ-মাকে ছেড়ে তুই এখানে থাক্‌বি?"

মুখ নীচু করিয়া ফেলী বলিল, "নলিনীবাবু বল্‌ছিলেন, বাবা-মাকে তিনি এখানে আনিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। ওরা ছেড়ে দেবে না নাকি লক্ষ্মী দিদি?"—তার চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করিতেছিল।

লক্ষ্মী কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোর একটুও মন কেমন কর্‌বে না ফেলী?"

ফেলী এবার কাঁদিয়া ফেলিল;—সে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মী-দিদি, তুমিও এখান থেকে যেও না!"

রোরুদ্যমান ফেলীকে লক্ষ্মী আপনার বুকের মধ্যে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিল।

(২২)

আজ লক্ষ্মীরা মাদ্রাজ যাইবে। সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী আপনার জামা কাপড় প্রভৃতি একটা চাম্‌ড়ার তোরঙ্গের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতেছিল। মনটা আজ তার ভিতর হইতে কেবলি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। তার মনে হইতেছিল, কে যেন তাকে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এখনও বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে তাহারই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস।

তোরঙ্গের মধ্যে জামা কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া, চাবিবন্ধ করিয়া দিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরময় অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে পাচারি করিয়া বেড়াইয়া সে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের উপর গিয়া অস্থির ভাবে বসিয়া পড়িল এবং একটা পুরাতন বাঁধানো ইংরেজী মাসিক পত্রিকা খুলিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে তার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও মনঃসংযোগ করিতে পারিল না।

হঠাৎ একসময় বইখানাকে মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে বাতায়নের ধারে গিয়া বসিল। এই সেই বাতায়ন যাহার ভিতর দিয়া ক্ষান্তবর্ষণ কত নীরব সন্ধ্যায় বাংলাদেশ তার মলিনবস্ত্রখানি পরিয়া তার দিকে করুণনয়নে চাহিয়া চাহিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে আজিও ঘুরিয়া মরিতেছে তার আকুল ক্রন্দন; লক্ষ্মীর চোখে জল আসিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া জানালাটাকে বন্ধ করিয়া দিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া আসিল এবং টেবিলের ধারে আসিয়া আবার সেই মাসিক পত্রিকাটা খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ব্যর্থপ্রয়াসের পর সে বইখানাকে বিরক্তভাবে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এখনও আকাশে বাতাসে তাহারই সজলতা করুণ হইয়া ভাসিতেছিল। পথের দুই পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিশু-গাছগুলির পাতা হইতে তখন পর্য্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছিল,—সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইমাত্র তারা যেন একটু শান্ত হইয়াছে।

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর হঠাৎ খেয়াল হইল সে নদীর কাছ-বরাবর আসিয়া পড়িয়াছে। আর একটা মোড় বাঁকিলেই নদীর রূপালী রেখাটি দূর হইতে তার চোখে আসিয়া পড়িবে, কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে নলিনী যে নদীতীরে বেড়াইতে আসে—আজিও নিশ্চয় আসিয়াছে—লক্ষ্মী ফিরিল;—অনেকটা পথ সে চলিয়া আসিল—তার পর কি ভাবিয়া আবার নদীর দিকে চলিতে লাগিল।

নদীর কাছ-বরাবর আসিয়া লক্ষ্মী দেখিল, জলের ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-গাছে ঠেস দিয়া নলিনী বসিয়া রহিয়াছে, দেহ তার ক্ষীণ,—দৃষ্টি তার করুণ এবং উদাস। অনেকদিন আগেকার একটা কথা লক্ষ্মীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—প্রথম যেবার সে রেভারেণ্ড হোয়াইটের সহিত বাংলাদেশে আসে এ ততদিন আগেকার কথা;—তার মনে পড়িয়া গেল, ঠিক এমনি নীরব এক মৌনসন্ধ্যায় বাংলাদেশের নির্জ্জন এক পল্লীগ্রামে ঠিক এমনি একটি তরুণ যুবককে সে দেখিয়াছিল, দৃষ্টি তার ঠিক এমনি করুণ এবং উদাস। ধূসর সন্ধ্যার আব্‌ছায়ার মধ্যে সেদিন যে মুখখানি সে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে পারে নাই আজিকার এই ক্ষান্তবর্ষণ তরুণ প্রভাতের অরুণালোকে কে সেই করুণ মুখখানিকে তার চোখের সমুখে এমন স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া দিয়া গেল! ওগো অপরিচিত, আজ এমনি সুন্দর করিয়া ধরা দিবে বলিয়াই কি সেদিন পরিচয় না দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলে?

নীরবে আসিয়া পিছন হইতে লক্ষ্মী ডাকিল,—"নলিনী-বাবু!"—সে স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট—এত ক্ষীণ যে অন্যমনস্ক নলিনীর কানে সে স্বর গিয়া পৌঁছাইলই না।

মানুষ হঠাৎ খেয়ালের মাথায় একটা বিপদজনক কিছু করিতে গিয়া হঠাৎ টের পাইয়া যেমন শিহরিয়া উঠিয়া সাবধান হইয়া যায় ঠিক তেমনিভাবে লক্ষ্মী হঠাৎ নিজেকে এক নিমেষে সাম্‌লাইয়া লইল এবং অত্যন্ত সাবধানে নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অনেকটা পথ ফিরিয়া আসিয়া একটা নিরাপদ এবং সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ওঃ কি জোর বরাৎ তার! নলিনীবাবু যদি তার ডাক শুনিতে পাইতেন? লক্ষ্মীর সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল,—সে আজ একটা প্রকাণ্ড ফাঁড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

* * * *

মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মী তার পূর্ব্বজীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের ঠিক যে জায়গাটায় ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল সেই ফাঁকের জায়গাটুকুকে একটা যাহোক কিছু দিয়া জোড়াতাড়া দিয়া মেরামত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু মাঝখানের ঐ ফাঁকটুকু আয়তনে ছোট হইলেও তলার দিকটায় সে এতই গভীর যে তাকে ভরাট করিয়া তুলিবার মত মাল-মসলা সে এই এতবড় প্রকাণ্ড দুনিয়াটার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না—তার দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

মাদ্রাজে ফিরিয়াই সে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ করিল চিদম্বরমের সহিত।

চিদাম্বরম বলিলেন, "বাংলাদেশ তোমার কেমন লাগ্‌ল মিস্ লুসী?"

সে অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে উত্তর দিল—"মন্দ কি!"

একটু হাসিয়া চিদম্বরম বলিল, "হোয়াইট সায়েব কিন্তু তাঁর চিঠিতে বরাবর লিখেছেন—বাংলাদেশ তোমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে বল্লেই হয় এবং তুমি নাকি বাংলাদেশকে রীতিমত ভালবেসে ফেলেছ।"

একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া লক্ষ্মী বলিল, "সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলা চলে না মিঃ চিদম্বরম। এই ধরুন না কেন, যদি কোন লোককে চোখের সমুখে অনাহারে মরতে দেখেন তাহলে আপনার মনে কি তার উপর একটা দয়ার ভাব আপনা হতে জেগে উঠে না?—এও অনেকটা সেই ধরণের; বাংলাদেশ না হয়ে এটা যদি পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ হোতো তাহলেও এর চেয়ে এতটুকুও কম দয়া হোতো না মিঃ চিদম্বরম!"

একটু হাসিয়া চিদম্বরম বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় জিনিষটা ঠিক তা নয় মিস্ লুসী!—একদিন আমার মনকেও আমি ঐভাবে বুঝ্তে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আজ দেখ্ছি জিনিষটা আসলে তা নয়। আমিও একদিন আমার স্বজাতীয় মাদ্রাজী-সমাজের দুঃখ-দৈন্যের দিকে চেয়ে নিজের ভিতরকার সহানুভূতিকে তোমারি মতন একটা সুবিধামত সাদাসিধে ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বোঝ্বার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আজ দেখ্ছি মানুষের জন্যে মানুষের যে সহানুভূতি এ সহানুভূতি শুধু সেইটুকু মাত্র নয়, তাছাড়াও অনেক জিনিষ এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মিস্ লুসী!"

অন্য নানান কথার মধ্যে লক্ষ্মী এই কথাটিকে হারাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মী দেখিল, ফেলী তার ঘরে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের উপর চুপটি করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে লক্ষ্মী বলিল, "আজ যে বড় লক্ষ্মী মেয়েটির মত এখানে চুপটি করে বসে আছিস্—কতক্ষণ এসেছিস্ রে তুই?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া ফেলী বলিল, "সে কথার কি হোলো লক্ষ্মী-দিদি?"

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে লক্ষ্মী বলিল, "কোন্ কথার বল্ দেখি?"

লক্ষ্মীর মুখের দিকে মিনতিকরুণ নয়নে চাহিয়া ফেলী বলিল, "আমাদের নলিনী-বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেবার?"

কাছে আসিয়া ফেলীর ছোট্ট মাথাটিকে নিবিড়ভাবে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া লক্ষ্মী বলিল, "তোর কি এখানে ভালো লাগ্ছে না ফেলী?"

ভাঙ্গা গলায় ফেলী বলিল, "একটুকুও না লক্ষ্মী-দিদি—আমার রাতদিন কেবল কান্না পায়—তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মী-দিদি আমাদের পাঠিয়ে দাও।"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফেলী আবার বকিয়া যাইতে লাগিল, "আর, তুমিও এখানে থেকো না লক্ষ্মী-দিদি—আমাদের সঙ্গে—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "তোর ভাল লাগে না, তুই না হয় নাই রইলি ফেলী, তাই বলে আমাকেও যেতে হবে?"

হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফেলী বলিল, "তোমার কখনও এখানে থাকতে ভাল লাগ্তে পারে না লক্ষ্মী-দিদি—এ আমি জোর করে বল্তে পারি—এদের সঙ্গে নাকি আবার কারুর থাকতে ভাল লাগ্তে পারে!—না লক্ষ্মী-দিদি, তুমি আমাকে মিছিমিছি ভোলাতে চেষ্টা কোরো না বল্ছি।" সে আরো কত কি বকিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লক্ষ্মী গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিল, "তোকে জ্যাঠামী করতে হবে না ফেলী।"

কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্মী সেই আসন্ন-সন্ধ্যার আব্‌ছায়ার মধ্যে জান্‌লার ধারে নীরবে আসিয়া বসিল। আকাশে এক এক করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল। পথের মোড়ে শিরীষ-গাছটায় বিশ্রামার্থী পাখীদের জায়গা কুলাইয়া উঠিতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া পাখা ঝাপ্টাইয়া তারা উপরে উঠিয়া পড়িতেছিল, আবার আসিয়া বসিতেছিল। কিন্তু ক্রমে কলরব থামিয়া গেল; সবকটি পাখীই গুছাইয়া জায়গা করিয়া রাতটুকুর জন্য পাতার আড়ালে আশ্রয় লইল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, যত দ্বন্দ্ব কি কেবল মানুষের সঙ্গে মানুষের—ইহাদের মধ্যে ত কোন দ্বন্দ্বই নাই, তাই একটি পাখীকেও অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতে হইল না। কিন্তু মানুষ যে মানুষ!—তার দ্বন্দ্ব কোনমতেই বুঝি ঘুচিবে না।

ফেলী কখন্ উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, সে নিস্কৃতি পাইয়াছে। আঁচলে মুখ ঝাঁপিয়া এত-

দিনকার রুদ্ধ অশ্রুর বাঁধ আজ এই অবসরে খুলিয়া দিল। তার আজ ক্লান্তি বোধ হইতেছে—সুখ দুঃখ দুয়েরই ক্লান্তি। আদর-অনাদরের এই দ্বন্দ্ব তার আর ভাল লাগে না। করজোড়ে দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা করিতেও তার ক্লান্তি বোধ হইতেছে। আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন এই শূন্য জীবনটাকে লইয়া সে করিবে কি। কিন্তু থাক্ এখন নিজের ভাবনা, সারাজীবন ধরিয়া সে ভাবনার যথেষ্ট অবসর আছে—এখন ফেলীর মুক্তির পথ তাকে আগে করিতে হইবে—আহা বেচারা সরল ছোট্ট ফেলী!—লক্ষ্মীর চোখে জল আসিল। লক্ষ্মীকে জুতা পরিতে দেখিয়া তার মা জিজ্ঞাসা করিল—"রাত্তির বেলায় আবার কোথায় বেরুচ্ছিস্?"

সে বলিল, "বিশেষ কাজ আছে।"

রেভারেণ্ড হোয়াইট টেবিলের ধারে বসিয়া কেরোসিনের আলোতে কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, লক্ষ্মী হঠাৎ গিয়া বলিয়া উঠিল, "হরিপুর থেকে যে ডোম-পরিবারটিকে আজ বছর খানেক হোলো এখানে আনা হয়েছে তাদের ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে।"

অবাক্ হইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া হোয়াইট বলিলেন, "তাদের ধরে রেখে দিয়েছে কে লুসী?—তুমি যে পাগলের মত কথা বল্‌ছ!"

"আচ্ছা না-হয় তারা নিজে হতেই এসেছে, কিন্তু মানুষ ভুলও ত করে ফেলে, মানুষের কর্ত্তব্য কি নয় তাদের সেই ভুলগুলোকে শুধ্‌রে দেওয়া?"

রেভারেণ্ড একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "মানুষ যদি ভুল করেও হঠাৎ সত্যকে পেয়ে যায় তাহলে তুমি কি বল্‌তে চাও লুসী তাকে তার ঐ ভুলটুকুর জন্যে সত্য থেকে দূরে ফেলে দিতে হবে?"

লক্ষ্মী এই কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, পাদ্রী সাহেব ভারী গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে আগে শেষ কর্‌তে দাও লুসী!—আমি বল্‌ছিলুম কি, এই যে ডোম-পরিবার, এরা ভালমন্দ না বুঝেই এসেছে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা ত জানি ওরা ভালোর দিকেই এসেছে?"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আমরা জান্‌লেই ত আর হবে না,—জান্‌তে হবে ওদের নিজেদের।"

"জান্‌বে লুসী জান্‌বে,—আজ না জানে, কাল জান্‌বে, কাল না জানে পরশু জান্‌বে; তুমিও একদিনে কিছু জাননি লুসী।"

ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা কথা সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেই আজিকার তর্কে সে জিতিয়া যায়; সে যদি একবার কেবল সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে যে, "না না, সে আজ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারে নাই, মনটা তার আজিও ঐ ডোম-পরিবারটির মত করিয়াই গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইয়া মরিতেছে, তাহা হইলেই সব কথার মীমাংসা একমুহূর্ত্তেই হইয়া যায়, কিন্তু সে সাহস তার কই?

কিছুক্ষণ পাচারির পর চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আপনি যা বল্‌লেন তা খুব ঠিক, যে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু ওরাই সবচেয়ে বড় গলা করে চেঁচিয়ে উঠ্‌বে এই বলে যে ওরা খুব জিতে গেছে। ভগবান যাদের অপদার্থ করে গড়েছেন তাদের লক্ষণই এই মিঃ হোয়াইট, যে, তারা যখন হেরে যায় তখন হারকে হার বলে স্বীকার কর্‌বার মত সাহসও তারা সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেলে। এরা যেদিন চেঁচিয়ে উঠ্‌বে এই বলে যে ওরা জিতে গেছে, সেইদিন থেকেই এদের প্রকৃত হার সুরু হবে—এ আমি খুব জানি।"

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না লুসী! ওরা যদি কোন দিন বলে যে সত্যসত্যই ওরা আমাদের ধর্ম্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তা হলে তা থেকে যে তোমার কথাটাই প্রমাণ হয়ে যায় এমন নিশ্চয়তা ত কিছুই দেখ্‌ছি না লুসী! তারা যে একদিন না একদিন সত্য সত্যই এটাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌বে, অন্ততঃ গ্রহণ কর্‌লেও কর্‌তে পারে, তার প্রমাণ তুমি নিজে।"

লক্ষ্মী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝড়ের মত ছিট্‌কাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী ভাবিতে লাগিল, এই যে ফেলীর হইয়া সে এতক্ষণ রেভারেণ্ড হোয়াইটের সঙ্গে এত তর্কবিতর্ক করিয়া আসিল,—এসব তর্কই ত নয় কেবল? এই যে এত কথা সে আজ বলিয়া আসিল ইহার মধ্যে সব কথাই কি তার অন্তরের?—না, সেই সময়টুকুর জন্য

বাহির হইতে ধার করিয়া আনা ?—পরক্ষণেই ফেলীর সেই কান্নাভরা করুণ মুখখানি তার মনে পড়িয়া গেল ;—সে মনে মনে চীৎকার করিয়া উঠিল, "না না, এর মধ্যে ভেজাল এতটুকুও নেই, এর সবখানিটাই খাঁটি—এত হৃদয়হীন নয় সে !" কিন্তু এ ত শুধু ফেলীর হইয়া লড়িতে যাওয়া নয়, এ যে নিজের হইয়া লড়িতে যাওয়াও বটে—তার কি ? লক্ষ্মীর কান্না আসিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, তার সেই অনেকদিনকার চুকাইয়া দেওয়া শৈশব আধময়লা একখানি ডুরে কাপড় পরিয়া তার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "আমিও কি একদিন কম কেঁদেছিলুম, তাই ত ফেলীর কান্না আজ তোমার প্রাণে এত আঘাত করে গেল !" লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল, তবে কি তার যৌবনটাও ঐ ফেলীর মার মত করিয়াই একটা অস্পষ্ট ছবির সাম্‌নে দিনরাত মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে ?

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী তার মাকে ডাকিয়া বলিল, —"এখানে আর আমাদের থাকা হলো না মা !"

"তবে কোন্ চুলোয় যাবি শুনি ?"

"মনে করছি ফরিদপুরে গিয়ে থাক্‌বো।"

"ফরিদপুর ?—সেই গুঁইসাহেবের দেশে নাকি ?"

"হাঁ, গুঁইসাহেবদের গ্রামেই বটে—কিন্তু তাই বলে তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ছি না মা।"

"তবে কোথায় থাক্‌বি ?"

"কেন, গাঁয়ের ভিতরে একটা ছোটখাট কুঁড়ে বানিয়ে ?"

অবাক হইয়া মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্মীর মা বলিল,—"হিন্দুসমাজের ভিতরে নাকি ?"

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পাচারি করিতে করিতে লক্ষ্মী বলিল,—"নিশ্চয়ই !"

"তারা যে আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াবে না লক্ষ্মী !"—লক্ষ্মীর মার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল।

"তারা আমাদের কাছে আস্‌বে না বলেই ত আমরা তাদের কাছে যাচ্ছি মা !—তুমি ভাব্‌ছো পাগ্‌লামী কর্‌ছি ?—না মা, একটুও পাগ্‌লামী কর্‌ছি না—সত্যি বল্‌ছি এবার গাঁয়ে গিয়ে বাস কর্‌বো।"

লক্ষ্মীর-মা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আগে আমাকে সব কথা বল্‌তে দাও মা—তার পর তোমার যা খুসী হয় বোলো !—দেখ মা,—সত্য সব সময় সকলের কাছে হাসিমুখে আসে না ;—আমাদের কাছে সে এসেছিল তার বিকট-মূর্ত্তি নিয়ে, তাই তুমিও ভয়ে চোখ বুজেছিলে, আমিও ভয়ে চোখ বুজেছিলুম—ঠিক কথা বল্‌ছি কিনা বুঝে দেখ মা ! তুমি মনে করেছ আমি তোমার ভিতরের কথা কিছুই জান্‌তে পারিনি—কিন্তু তা নয় মা,—আমি তোমার মনের সব কথাই পড়ে ফেলেছিলুম,—প্রকাশ করিনি কেবল এই ভয়ে পাছে সত্যের সেই বিকট চেহারা খানা আমাকেও একদিন স্বীকার করে নিতে হয়—মানুষের মন কি ভয়ানক দুর্ব্বল মা !—তুমিই প্রথম সেই সত্যের বিকট চেহারাখানা দেখ্‌তে পেয়েছিলে—তখনও আমি খুব ছোট—দুনিয়ার সমস্ত সত্যকে চোখ মেলে দেখ্‌বার মত দৃষ্টি তখন পর্য্যন্ত আমার ফোটেনি ; তুমি মনে করেছিলে, এই যে বিকট সত্য, যা রাতদিন তোমার চোখের সমুখে দীর্ঘ কাল ছায়া ফেলে ঘুরে ঘুরে মর্‌ছে আমাকে তার সেই ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখ্‌তে দেবে না। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পাছে আমি ঘুণাক্ষরেও কিছু জান্‌তে পেরে যাই এই ভয়ে তুমি আমার কাছে কত সাবধান হয়েই না চলেছিলে মা !—কতদিন কত দুঃখ, কত চোখের জল, কত যন্ত্রণাকেই না তুমি বুকের ভিতর জমিয়ে তুলেছ, মুখ চোখ দিয়ে তার একটুও আভাস বাইরে প্রকাশ হতে দাওনি, পাছে আমি দেখে ফেলি, পাছে আমার জীবনটাও তোমারি মতন ব্যর্থ হয়ে যায় ; কিন্তু সত্য কখন চাপা থাকে না মা ! সে আপনিই আপনার পথ করে নিলে একদিন আমার এই বুকের মাঝখানে—আমি শিউরে উঠ্‌লুম, তারপর তোমারি মতন তাকে অস্বীকার কর্‌বার জন্য হঠাৎ একদিন উঠে পড়ে লেগে গেলুম।—তুমি অমন করে চেপে কেঁদো না মা—! কাঁদ্‌তে হয় গলা ছেড়ে কাঁদ, দুঃখ যখন ভিতরে জমা হয়ে উঠেছে তখন তাকে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে দাও মা—চেপে রেখো না—আমার জন্যেও না—নিজের জন্যেও না।"

হঠাৎ ডুকুরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া লক্ষ্মীর মা বলিয়া উঠিল, "কাঁদ্‌বার সময় সারাজীবনে অনেক পাবো লক্ষ্মী—তুই কিন্তু একবার ভেবে দেখ্—কি কর্‌তে

বসেছিস্—তারা যে তোকে একদণ্ডও টিক্‌তে দেবে না লক্ষ্মী!"

ভাঙ্গা গলায় লক্ষ্মী বলিল, "তারা টিক্‌তে দেবে সে আশা করে আমরা যাচ্ছি না মা—আমরা যাচ্ছি নিজেরা টিকে থাক্‌বো বলে;—তুমি সব কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, নয় মা? খোলসা করে বল্‌ছি শোন;—সেখানে গিয়ে আমি গাঁয়ের ভিতর একটা ছোট-খাট মেয়ে-ইস্কুল খুলে বসব, সেখানে ছোট ছোট মেয়েদের প্রাণ ঢেলে লেখাপড়া শেখাবো—তারপর মনে মনে ইচ্ছা আছে একটি ছোট হাস্‌পাতালও খুলবো। এই ত পাওয়া! তারা আমাদের যেটুকু দেবে, সেইটুকুই কি কেবল পাওয়া মা?—আমরা নিজে হ'তে যেটুকু আদায় করে নেবো সে পাওয়ার কি কোনই দাম নেই বল্‌তে চাও?" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ আবার আরম্ভ করিল, "আজ আর কোন সত্যকেই চাপা দিতে চাই না মা—তা সে যতই অপ্রিয় হোক্ না কেন; যে কথা নিজের কাছেও এতদিন লুকিয়ে এসেছি—আজ তোমার কাছেও সে কথা বল্‌তে আমার এতটুকু বাধা নেই,—আমি নলিনী-বাবুকে ভালোবাসি—হাঁকপাঁক কোরো না মা—আমি নিজেই সব কথা গুছিয়ে বল্‌ছি;—তুমি বল্‌ছ, যাকে পাওয়া যাবে না তাকে ভালবেসে সারাজীবন দগ্ধে মরে' লাভ কি, কিন্তু না মা, তোমার ওকথা আর শুন্‌ছি না! হিন্দুসমাজকে তুমি আমি দুজনেই ভালবেসেছি, কিন্তু তাকে পাব না এই ভয়ে দুজনেই সেই ভালবাসাকে এতদিন অস্বীকার করে এসেছিলুম—অস্বীকার টিক্‌লো কি মা?—টেকে না মা—মিথ্যা কখন বেশীদিন টেকে না।"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মীর মা বলিল, "তাদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে পার্‌বি নে যে লক্ষ্মী।"

অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "যাদের আমরা চাই না, তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এতদিন চল্‌তে পার্‌লুম, আর যাদের আমরা চাই তাদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে পার্‌বো না মা?"

"আমরা ত চাই কিন্তু তারা যে চায় না বাছা!"

"নাই বা চাইলে তারা,—আমরা ত চাই, তা হলেই হোলো, আর, যখন চাই তখন পাবই; তারা না দেয়, তাদেরও যিনি দিয়েছেন তিনি দেবেন।"

"তুই বুঝ্‌ছিস্ না লক্ষ্মী, কত বড় শক্ত কাজে হাত দিচ্ছিস্—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "কঠিন যে তা জানি মা। তবু আমি পার্‌বো। আমি জানি না এ জোর আমার কোথা থেকে আস্‌ছে। মা, মানুষ অন্ধনিয়তির সঙ্গেও ত লড়্‌তে ছাড়ে না, আর যে বাধা মানুষের তৈরী তাকেই কি কেবল আমরা ভয় কর্‌ব? দুঃখ আছে মান্‌ছি, কিন্তু তার কাছ থেকে আমি পালিয়ে ছাড়ান পেতে চাই না মা। যদি পারি এ দুঃখকে আমি জয় কর্‌ব, আর যদি না পারি তবে আমার দুঃখভোগ দিয়ে আমার একান্ত আপনার যারা তাদের দুঃখের সাধনাকে একটু অন্ততঃ অগ্রসর করে রেখে যাবো। কোনো আশা আছে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?—আশা কাকে বলে জানি না; একটা কথা জানি, যে-দুঃখের কাছ থেকে আমরা পালাতে চেষ্টা করেছিলুম সে দুঃখ মানুষের সৃষ্টি, যে বাধাকে ভয় করে-ছিলুম সে বাধাও মানুষেরই তৈরী। আমরা মানুষ। আমরা যে মানুষ এই আমার একমাত্র আশা মা!"

(শেষ)

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

স্ত্রী—আচ্ছা, বিয়ে কর্‌লে নাকি আত্মহত্যার ভয় কমে যায়? সত্যি?

স্বামী—তা ত জানি না। তবে আত্মহত্যা কর্‌লে বিয়ে কর্‌বার ভয় থাকে না, এটা নিশ্চয় বল্‌তে পারি।



প্রকৃতির পাঁজি

পৌষ মাস শীতকালের প্রথম মাস।

পৌষ মাসে নানা রকম মরসুমী ফুল ফোটে। জাপানী চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপ ফুল ফোট্‌বারও এই সময়।

এখন ক্ষেতে মুগ মসুর ছোলা যব গম প্রভৃতির গাছ গজাচ্ছে। আলু তোল্‌বার সময়।

পৌষমাসে আকের গাছ বেশ বড় হয়ে উঠে। খেজুর-গাছ থেকে প্রচুর রস ঝরে। খেজুর-রস থেকে খেজুর গুড় তৈরী হয়।

চশ্‌মা।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়

(৮)

আগুন জেলে হিংস্র পশুদের ভয় দেখিয়ে যখন জীবন রক্ষা করতে হয় তখন নিশ্চিন্ত মনে তোফা নিদ্রা দিলে হানুমচাচারা অনায়াসেই ঘাড় মট্‌কাতে পারেন। সেজন্য আমাদের সেদিন ঘুম যা হচ্ছিল তা বল্‌বার নয়। শেষ রাত্রে আমি আর হ্যারি পাহারা দিতে উঠ্‌লাম। ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে আস্‌ছে, চোখ চাইতে পার্‌ছি না; তবুও প্রাণের ভয়ে পাহারা দিতে হবে। তার ওপর সমস্ত দিন সেদিন ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় জীবন কণ্ঠাগত হয়েছে। বসে থাক্‌লে ঘুমিয়ে পড়্‌ব দেখে উঠে দাঁড়ালাম হাতে বন্দুক নিয়ে। আগুনের কাছ থেকে বেশী দূরে আর এগুলাম না, কেননা মশা ও অন্যান্য পতঙ্গের আম্‌দানি চারিদিকেই ছিল; আর এগুলে সিংহ-ব্যাঘ্র মহাশয়দের শুভাগমনে অস্থির হবার ভয়ও ছিল।

জেগে জেগে সিংহের ঘোঁত ঘোঁত শব্দ ও মাঝে মাঝে গর্জ্জন শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। হায়েনা, শেয়াল ও নানা রকম রাত্রিচর পাখীর আওয়াজও কানে আস্‌ছিল। মোটের ওপর শব্দগুলি কানে মধুর লাগ্‌ছিল না, বরং ভীতিকর। তবে এসব আওয়াজ শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে গিছ্‌ল বলে তেমন গ্রাহ্য কর্‌লাম না। শেষে হ্যারিকে উঠিয়ে দিয়ে বল্‌লাম—এবার তোমার পালা, আমি একটু জিরুই।

হ্যারি বল্‌লে—বড় ঘুম পাচ্ছে, কি করি, অগত্যা জাগ্‌ব। আমার বোধ হয় আবার সিংহ এসে হাজির হবে।

আমি কোন কথা না বলেই আগুনের এক পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। মিনিট পাঁচেক চোখ্‌টি বুজেছি কি হ্যারি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ফ্রেড, ফ্রেড, ওঠ, ওঠ, জ্যান্‌কে জাগাও। আবার যুদ্ধ করতে হবে।

আমি ত বন্দুক নিয়ে ধড়মড় করে' উঠে পড়্‌লাম। দেখি পাঁচ সাত হাত দূরে একটা কালো মত জানোয়ার হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে, যেন লাফ দিল বলে'। চোখ দুটো তার জ্বল্‌ছিল। পেছন থেকে হ্যান্‌স্‌ "বাবা রে" বলে' চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, সেদিকেও তাঁবুর পাশে বেরালের মত একটা জানোয়ার দেখা গেল।

আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে বল্‌লাম—হ্যান্‌স্‌, তুমি ও জ্যান ওটাকে দেখ; আমি আর হ্যারি এটাকে মার্‌ব।

জন্তুটা একটু এগিয়ে এসে লাফ দিলে ঠিক হ্যারির দিকে। দেখ্‌লাম সেটা চিতাবাঘ। আমরা দুজনেই গুলি কর্‌লাম। গুলি ঠিক লাগ্‌ল। বাঘটা একেবারে আগুনের মাঝখানে পড়ে' ছটফট করতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্‌সের বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। তাদের চিতাটাও নিপাত হল।

শত্রুবধের পর তাদের গায়ের চামড়া আমরা খুলে নিলাম। প্রথম চিতাটার গা আগুনে একটু পুড়ে গিছ্‌ল। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলেও এখনো যে ভাল রকম পাহারা দিতে হবে তা আমরা বুঝ্‌তেই পার্‌লাম। হ্যান্‌স্‌ পড়ে' পড়ে' দিব্যি ঘুমচ্ছিল। তাকেই জাগিয়ে

রাখ্‌বার মতলব কর্‌লাম। সে ত খানিকটা বাক্‌বিতণ্ডা করে' শেষে রাজী হল।

হায়, হায়, ঘুমবে কে? পোড়া চিতাবাঘের গন্ধ পেয়ে দলে দলে হায়েনা আর শেয়াল এসে আমাদের চারিদিকে বিকট আওয়াজ আরম্ভ করে' দিলে। আগুন ছিল বলে' আমাদের কাছে তারা আস্‌তে পার্‌ছিল না।—এই যা সুবিধা। বাকী রাত্রিটা তাদের গান শুনে আর হাই তোলা দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে গেল। আমাদেরও হাই খুব কম উঠ্‌ছিল না।

সকাল হতেই আবার সে জায়গা ছেড়ে আমরা কোন ছোট পুকুরের সন্ধানে চল্‌লাম। খাবার জন্যে হরিণ বা পাখী ত আবার শীকার কর্‌তে হবে। তাছাড়া জলও কাছে আর বেশী ছিল না। জল ত চাই।

হ্যান্‌স্‌ লোকটার প্রকৃতি বড় গোঁয়ার ছিল। খানিক দূর গিয়ে সে চাম্‌ড়ার বোঝাটা জ্যানের ঘাড়ে চাপাতে এল। হ্যারি তা কর্‌তে দিলে না। হ্যান্‌স্‌ তখন রেগে বন্দুক তুলে হ্যারিকে মার্‌তে উদ্যত হল। আমি দেখ্‌লাম, এ এক ভীষণ বিপদ! জ্যান ছুরি বার করে' তাকে কাট্‌তে গেল। আমি ও হ্যারি বাধা দিলাম। ঠিক কর্‌লাম হ্যান্‌স্‌-এর বন্দুক প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে সেই মরুভূমিতে তাকে তাড়িয়ে দোব। জ্যানকে বন্দুক ঝোলাবার চামড়াটা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হ্যান্‌স্‌কে পেছন থেকে বেঁধে ফেল্‌তে বল্‌লাম। আর হ্যারিকে তার পা বাঁধ্‌তে বল্‌লাম। তারা দুজনে গিয়ে হ্যান্‌স্‌কে ত বাঁধ্‌লে। লোকটা কথা না বলে' কেবলি বাঁধন ছাড়াবার জন্যে ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি কর্‌তে লাগ্‌ল। দাঁত দিয়ে জ্যানের হাত কাম্‌ড়ে দিলে। লোকটা কেমন পাগল হয়ে উঠেছিল। তার হাত দুটো বেশ করে' বেঁধে পায়ের বাঁধন আল্‌গা করে' দিলাম যাতে সে চল্‌তে পারে, কিন্তু দৌড়তে না পারে।

বাঁধা ঠিক হলে হ্যান্‌স্‌কে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে বল্‌লাম। প্রথমে সে রাজী হল না, শেষে অগত্যা উপায় না দেখে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে চল্‌তে লাগ্‌ল। তার কাঁধে চাম্‌ড়ার বোঝাটা চাপিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে সে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু পার্‌লে না।

অনেকক্ষণ চল্‌তে চল্‌তে আমরা একটা ঝরণার কাছে এসে হাজির হলাম। কতকগুলো গাছ ছিল সেখানে। গাছগুলোর গায়ে হাতীর দাঁতের দাগ, আর ডালপালা ভাঙা দেখে আমরা বুঝ্‌লাম হাতীরা সেখানে আসা-যাওয়া করে। অতএব চুপচাপ থাক্‌লে হাতী আস্‌তে পারে, আর শীকারও জুট্‌বে। পুকুর থেকে জল নিয়ে আমরা গাছের আড়ালে এক নিভৃত জায়গায় গেলাম। সঙ্গে যা-একটু মাংস ছিল তাই পুড়িয়ে সব খাওয়া গেল। তারপর হ্যান্‌স্‌কে কাছে বসিয়ে রেখে আমরা একটু শুয়ে পড়্‌লাম। জ্যানকে বল্‌লাম—হ্যান্‌স্‌ যাতে না পালায় সেদিকে দৃষ্টি রেখো।

খানিক পরে জেগে দেখি সকলেই গাঢ় ঘুমে মগ্ন, আর হ্যান্‌স্‌ ত নেই! জ্যান ও হ্যারিকে জাগালাম। লোকটা দোষ কর্‌লেও তার ওপর এখন বড় দয়া হল। আমরা তাকে খুঁজ্‌তে বেরুলাম। পায়ের দাগ ধরে' ধরে' খানিক দূর গেলাম, শেষে পায়ের দাগও দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছিল। আর তাকে খোঁজা যাবে না দেখে আমরা সেই নিভৃত জায়গায় ফিরে এলাম। যদি দুএকটা হাতী আসে ত শীকার কর্‌ব; আর রাত কাটিয়ে সকলে তাঁবুতে ফির্‌ব—এই ঠিক হল। তার পর তাঁবু থেকে লোকজন এনে হ্যান্‌স্‌-এর খোঁজ করা যাবে।

খানিকক্ষণ বস্‌বার পরই দেখ্‌লাম কয়েকটা হাতী আস্‌ছে। তারা যেন আমাদের আগমন বুঝ্‌তে পেরেছিল। তাহলেও তৃষ্ণায় তারা এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় হঠাৎ আমরা দেখ্‌তে পেলাম, একটা লোক চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে প্রথম হাতীটার সাম্‌নে এসে লাফালাফি কর্‌ছে। লোকটা আর কেউ নয়, হ্যান্‌স্‌। মাথা তার এমন খারাপ হয়েছিল যে, সে মর্‌তে এগিয়ে যাচ্ছিল। দেখ্‌লাম, প্রথম হাতীটাকে মার্‌তে পার্‌লে হয়ত হ্যান্‌স্‌ বেঁচে যেতে পারে। আমি প্রথম হাতীটাকে গুলি কর্‌লাম। কিন্তু সে দুর্দ্দান্ত হাতী রাগে এগিয়ে এসে পা দিয়ে হ্যান্‌স্‌কে একেবারে পিষে ফেল্‌লে। আহা বেচারী! প্রাণে বড় কষ্ট হল। হাতীটা শুঁড় দিয়ে হ্যান্‌স্‌কে তুলে ফেলে দিলে। আর একটা গুলি খেয়ে হাতীটা পড়ে গেল। দ্বিতীয় হাতীটা হ্যারির গুলিতে মর্‌ল। অপর হাতীগুলো ভয় পেয়ে পালাল।

আমরা দৌড়ে হ্যান্‌স্‌কে দেখতে ছুটলাম। গিয়ে দেখি বেচারীর সমস্ত শরীরের হাড় একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। মুখটাও বিকৃত হয়ে গেছে, প্রায় চেনা যায় না। আমরা আশেপাশের গাছপালা থেকে কতকগুলো ডাল কেটে এনে তার দেহটা বেশ করে' চাপা দিলাম, যাতে শেয়াল বা হায়েনায় খেতে না পারে। তারপর সেই যায়গায় ফিরে এলাম। হাতীর একটু মাংস নিয়ে রেঁধে খাওয়া গেল। হঠাৎ জ্যান বলে উঠ্‌ল—ঐ একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

বাস্তবিকই আমরা দেখ্‌লাম যে দূরে একটা আলো জ্বল্‌ছে। বোধহয় সেখানকার কোনো অধিবাসীরা তাঁবু গেড়ে কিছু করছিল। আমরা ঠিক কর্‌লাম আলোর কাছে যাওয়া থাক্, দেখা যাক কে আছে ওখানে। আগুনের কাছাকাছি গিয়ে আমরা সাহস করে' এগুলাম না, জ্যানকে এগিয়ে দেওয়া গেল, সে গিয়ে দেখে আসুক ব্যাপার কি। একটু পরেই সে ফিরে এসে বল্‌লে—টোকো রয়েছে, কর্ত্তারা রয়েছে, এ যে আমাদেরই দল!

কিছু না বলে' চুপিচুপি গিয়ে আমরা একেবারে সবাইকে অবাক করে দিলাম। কাকার খুব আনন্দ হল। তিনি ভয় পেয়েছিলেন আমাদের কিছু বিপদ হয়েছে ভেবে।

আমরা দুটো হাতী মেরেছি শুনে অন্য চাকরগুলো তখনি হাতীর মাংস আন্‌তে যেতে ব্যস্ত হল। সকাল হতে কিছু খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে চাকরগুলোকে নিয়ে আমরা সকলে মিলে সেদিকে গেলাম। হাতীর দাঁত ও মাংস জড়ো করে' রাখা গেল। তার পর একটা কবর খুঁড়ে হ্যান্‌স্‌-এর মৃতদেহ পুঁতে ফেলা গেল। এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে টোকো খবর আন্‌লে যে, সে চার পাঁচটা হাতী দেখ্‌তে পেয়েছে। তার কথামত খানিক এগিয়েই আমরা হাতীগুলোকে দেখ্‌তে পেলাম। সেখানটায় অনেক গাছপালা ছিল। কাকা সকলকে হাতীগুলোর চারিদিক ঘিরে ফেল্‌তে বল্‌লেন। আর প্রত্যেককে এক-একটা গাছে চড়ে থাকতে বল্‌লেন। তাহলে হাতী তাড়া করে' এলে বিপদের ভয় থাক্‌বে না।

তিনটে হাতী খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ডালপালা খাচ্ছিল। বাকিগুলো একটু দূরে ছিল। দূরের গুলো কাকার বন্ধুর ভাগে পড়েছিল। কাছের তিনটাকে আমরা মার্‌তে উদ্যত হলাম। গাছের নীচের ডাল খেয়ে তারা ওপরের ডাল খেতে যাবে কি আমরা ঝোপের আড়াল দিয়ে গুড়ি গুড়ি এগিয়ে চল্‌লাম। তখনও হাতীগুলো আমরা যে এসেছি তা টের পায় নি। একটা একটা গাছ আমরা ঠিক করে' নিলাম। কাকার বন্দুকের আওয়াজ পেলে তবে আমিও গুলি কর্‌ব।

যেই কাকার বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া অমনি আমার সাম্‌নের হাতীটার দিকে গুলি চালালাম। হ্যারিও গুলি চালালে। আমার হাতীটা বিকট চীৎকার করে' উঠ্‌ল। এধার ওধার খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল শত্রু কোথায়। তাড়াতাড়ি একটা গাছের কাছে এসে আমি বন্দুকে আবার গুলি ভরে নিলাম। হাতীটার মাথা খালি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। ফের গুলি চালাবার আগে হাতীটা একটু এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে শুয়ে পড়্‌ল। এমন সময় হ্যারির চীৎকার শুন্‌তে পেলাম। দৌড়ে হ্যারির কাছে গিয়ে দেখি তার হাতীটা একেবারে শুঁড় উঁচু করে তাকে ধর্‌ল বলে'। তাড়াতাড়ি গুলি কর্‌লাম। এ হাতীটাও পড়্‌ল।

হাতী দুটোকে একেবারে মার্‌বার আগেই আমরা দুজনে কাকার কি হল, দেখতে চল্‌লাম। তাঁকে জানাবার জন্য দুজনেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। আমাদের চীৎকারের উত্তর এল এক সিংহের গর্জ্জন। ভাল করে' চেয়ে দেখি কাকা একটা গাছের ওপরে বসে রয়েছেন আর তার নীচে একটা সিংহ বসে তাঁর দিকে চেয়ে গোঁ গোঁ করছে। এটাকে না মার্‌লে রক্ষা নেই দেখে আমরা দুজনেই আস্তে আস্তে একটা গাছের পেছনে লুকালাম, এবং সিংহটা একটু মাথা ফেরাতেই দুজনেই গুলি কর্‌লাম। সিংহ বেচারী সেইখানেই নেতিয়ে পড়্‌ল।

"সাবাস্! সাবাস্! বেশ করেছিস্, এবার হাতীটাকে মার্‌তে হবে"—বলে' কাকা গাছ থেকে নেমে পড়্‌লেন। তার পর কোনও কথা না বলে' আমাদের সঙ্গে নিয়ে হাতীটার সন্ধানে চল্‌লেন।

(আগামী বারে শেষ হবে)

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

শরীরের উত্তাপ কোত্থেকে আসে ?

শীতকালের গরম কাপড় বল্‌তে আমরা অনেকেই মনে করি জামা বা শাল বুঝি নিজেরাই তেতে গরম হয়ে থাকে। কিন্তু একটু ভাল করে' দেখ্‌লে আর ভাব্‌লে আমরা সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌ব যে, গরম তারা মোটেই নয়, তারা কেবল একটা উত্তাপকে আট্‌কে রাখে মাত্র। সে উত্তাপটা শরীরের নিজের। এখন শরীরের এই উত্তাপ আসে কোত্থেকে ?

অনেক সময় বাইরে থেকে—যেমন সূর্য্য, আগুন, গরম জলে নাওয়া প্রভৃতি থেকে আমরা উত্তাপ পাই বটে। তাহলেও আমরা নিজেরাই নিজেদের শরীরে এই উত্তাপের সৃষ্টি করি। আমরা যে খাদ্য খাই তা থেকেই উত্তাপ আসে। যে কোন খাদ্য আমরা খাই তাকেই রোদে শুকিয়ে নিয়ে আগুনে পোড়ানো যায়। তবে তা থেকে উত্তাপ আসে। এখন, সব খাদ্য আমাদের পেটে গিয়ে কাঁচা হলেও পুড়্‌তে থাকে। যে-সব খাদ্য বাইরে আগুনে পোড়ে ভাল, সেই-সব খাদ্য পেটে গিয়ে বেশী উত্তাপ তৈরী করে। চর্ব্বি, তেল, চিনি প্রভৃতি এই ভাবের খাদ্য। মাংস ও ডিমের শাদা অংশ থেকেও উত্তাপ তৈরী হয়। তবে এটা আমাদের জানা চাই যে, অক্‌সিজেন গ্যাস না থাক্‌লে উত্তাপ পাওয়া দুষ্কর। আর নিশ্বাসে অনবরত আমরা যে হাওয়া গ্রহণ করি সেও শরীরে উত্তাপ তৈরী কর্‌তে সাহায্য করে।

—

সইয়ে' সইয়ে' বলা

এক গ্রামের এক জমীদারের ছেলে কল্‌কাতায় পড়্‌তে এসেছে। অনেকদিন সে বাড়ী যায় নি, বাড়ীর কোন খবরও পায় নি। একদিন সকালে সে মেস থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে চলেছে, হঠাৎ তাদের বাড়ীর বুড়ো ঝির সঙ্গে দেখা। ঝিকে দেখেই সে বলে উঠ্‌ল—এ কি ঝি, তুমি এখানে ? কোথায় যাচ্ছ ?

ঝি বল্‌লে—তোমারি কাছে যাচ্ছি, বাবা।

ছেলেটি বল্‌লে—কেন, খবর কি ?

—আর খবর, বাবা, তোমার কুকুরটা মরে' গেছে।

—এঁ্যা, কুকুরটা মরেছে ?—কেন, কি হয়েছিল ?

—পেট খারাপ হয়ে মরেছে বাবা। বেশী মাংস খেয়েছিল কিনা।

—বেশী মাংস ? বেশী মাংস পেলে কোথা ?

—তোমার ঘোড়াটার মাংস।

—এঁ্যা, ঘোড়াটার মাংস! ঘোড়াটাও কি তবে মরেছে নাকি ?

—হঁ্যা, বাবা, একদিন খুব বেশী খেটেছিল, তাই হঠাৎ মরে গেল।

ছেলেটি অস্থির হয়ে বল্‌লে—কেন খেটেছিল, কি কাজে ?

ঝি বল্‌লে—গাড়ী গাড়ী জল আন্‌তে হয়েছিল, তাই।

—গাড়ী গাড়ী জল!—জল কি জন্যে ?

—বাড়ীতে আগুন লেগেছিল বাবা, সেই জন্যে।

—বাড়ীতে আগুন! বল কি ? কি করে' লাগ্‌ল ?

—ভিয়েন চড়েছিল, সেই আগুন চালে লেগে যায়।

—কিসের ভিয়েন ?

—আর বাবা! তোমার বাবার শ্রাদ্ধে।

ছেলেটি তখন আগুন হয়ে উঠেছে। বল্‌লে—বাবা মারা গেছেন, কেন তুমি আগে আমায় একথা বলনি ?

ঝি ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—আমায় একটু একটু করে'ই খবর দিতে বলেছিল, বাবা। তাই বল্‌লাম।

—গুপ্ত।

—

নবাব খাঞ্জা খাঁ

দীন্-দুনিয়ার সখের মালেক নাজিম নবাব খাঞ্জা খাঁ—
খাঞ্জা থাকেন তাঞ্জামেতেই, হুকুম চলে পাঞ্জা-কা।
ফূর্ত্তি চলে রাত্রিদিবা—শিকার খেলা তাম্‌সা বাচ,
রোস্‌নায়ে রাত রঙীন করে' আরাম-বাগে গাওনা-নাচ।
বাজ্‌না-গানের তালে তালে চ্যাঁচায় আমীর-ওম্‌রাহ—
'দিল্-দরিয়া ধন্যি নবাব, কোথায় লাগে পাৎশাহ!'
আঁজ্‌লা পুরে' মোহর ছুঁড়ে মজার নেশায় নবাব চুর ;—
উজাড় টাকা, উজীর বুড়ো ভেবে শুধু নাড়েন সুর।

আঘন-মাসে লগন তোফা, প্রজার ক্ষেতে আমন ধান,—
আমীন করে জরীপ জমি, নাএব ছুনো খাজ্‌না চান।

ভাবেন নাজীর—পাটা-পুঁজির এই তো খাঁটি মরসুম্।
খাজ্‌নাখানায় গুণ্‌তে জমা খাজাঞ্চিজীর নাই ঘুম।
প্রজার রোজী জোগায় পুঁজি; চ্যাঁচায় আমীর-ওম্‌রাহ—
'ছেলের মত পালেন প্রজা, এ যে রূমের পাৎশাহ।'
রাজার ভাগে ঠোকর মেরে চালায় প্যাদা চৌবুড়ি।
রাজ্য দেখেন কোটাল-কাজী, নবাব টানেন গুড়্‌গুড়ি।

আরাম-বাগে রাত্রি জেগে ঘুমান নবাব বিহানে,
স্বপ্ন দেখেন—উড়ে গেছেন হুরীর মুলুক্ আস্‌মানে।
দরবারে ক'ন খাপ্পা—'এ কি খোদাতাল্লা কর্‌ল চুক্,—
পোকা-পাখীর মিল্‌ল পাখা, ন্যাংটা লোকের ডানাটুক্!
জমীন্ করে সবাই দখল, আস্‌মানে কার্ নবাবী?—
পাখ্‌না জুড়ে' ডানায়, ওড়া যায় কি না যায় তাই ভাবি।'
মুন্সী লেখেন হুকুমনামা; চ্যাঁচায় আমীর-ওম্‌রাহ—
খোদার উপর খোদ্‌কারী হোক্—পাখ্‌নাওলা পাৎশাহ!'

চীন-মুলুকের মিস্ত্রী আসে, মিশরদেশের ভেল্‌কীবাজ্।
আস্‌রফী নেয় হাজার হাজার, পাখ্‌না গড়ার চলে কাজ।
ওস্তাগরে সেলাই খোলে জোব্বা-চোগা-আচ্‌কানের,—
নেংটী প'রে রাজ্য জোগায় ঢাক্‌নি পাখার মাঝ্‌খানের।
বেতের-ফালায় বাঁশের-শলায় পাখার মুড়ি রয় সিধা,—
ছত্র-ছড়ি কুড়ায় কেড়ে' নগর ঘুরে' পাটক-মৃধা।
পাখ্‌না ডানায় বেঁধে নবাব ছাতের উপর ঠা'য় খাড়া
ঘুড়ির মতন ওড়ার সখে,—সাধ্য তাঁরে কার নাড়া?
হল্লা করে মোল্লা-মীরে; চ্যাঁচায় আমীর ওম্‌রাহ—
'বদর! বদর! ঠ্যাং তুলে' ধর্, আসমানে যান পাৎশাহ!'

হেঁই-য়ো হেঁই-য়ো ঠেল্‌ছে কেহ, সাম্‌নে টানে নফরজন,—
পেখম-ধরা ময়ূর যেন, পাখ্‌না মেলে' খাপ্পা র'ন;—
ওড়ার আগে ছোড়্ কারু নেই, নেই নাওয়া ঘুম, নেই খাওয়া।
দেওয়ানজী ক'ন, 'আদাব জনাব, ওড়ার মতন কই হাওয়া?
বাদাম তুলে' পান্‌সী চলে জোর বাতাসের মুখপানে,
পালের মতন উড়্‌লে পাখা তবেই যাবেন আস্‌মানে।'
খাপ্পা বলেন, 'না থাক্ হাওয়া, রাজ্যে কি মোর মানুষ নাই?
আঁচল নেড়ে বানাও হাওয়া, বায়ুর ঝড়ে উড়্‌তে চাই।'
সবাই বলে—'বান্দা হাজির।' চ্যাঁচায় আমীর-ওম্‌রাহ—
'চালাও হাওয়া, লাগাও হাওয়া, হাওয়ায় উড়ন্ পাৎশাহ!'

কেউ নাড়ে তার পাগ্‌ড়ী জামা, কেউ বা গায়ের ওড়্‌নাখান,
মন্দা হাওয়ায় ঢেউ লাগে গায়, দাড়ির আগায় দেয় নাচান্।
খান্-বাহাদুর হুদু-মিঞা দরবারী ভাঁড় দেন্ সেলাম,—
'ঠোঁটের ফুঁয়ে উড়ুন্ হুজুর, হাজির আছি খাস-গোলাম।'
বক্সী-নাজিম্ সৈয়দ কাজীম্ গাল ফুলিয়ে মারেন ফুৎ,
আম্‌লা-বুড়োর ফোঁক্‌লা দাঁতে টোক্‌লা রাখায় না হয় জুৎ।
পরগনে ধায় সেপাই-সেনা, সুবায় জেলায় হাবিলদার,
পাক্‌ড়ে আনে সঙ্গে টেনে' হাত-নাতে পায় নাগাল যার;—
যুবক-বুড়ো হাজার জড়ো; চ্যাঁচায় আমীর-ওম্‌রাহ—
'শোয়াস টেনে' ফুৎ দে ভায়া, ফুড়ুৎ করুন্ পাৎশাহ!'

সাম্‌নে খাড়া রয় দারোগা, ডাইনে বামে চৌকীদার,
আগ্‌লে ঘাঁটি বাগায় লাঠি লেঠেল, হাঁকে—'খবরদার!'
ইস্তাহারে হুকুমজারী—'গাল ফুলিয়ে লাগাও ফুক্,
জান্ চাহতো দম ছেড়ো না, চুপ্ রহ, মাৎ নোঞাও মুখ।'
দম রেখে কেউ পেট-ফুলে ঢাক, বেরোয় কারুর গুড়্‌গুড়ি,
বুড়োর কেবল কাশিই আসে গলায় লেগে সুড়্‌সুড়ি।
নাছোড়্‌বন্দা খোদাবন্দের হুকুম তামিল চাই করা,—
মুখের ফুঁয়ে পাখ্ নড়ে না,—কেমন মানুষ আধমরা!
নবাব রেগে' লাফান্ বেগে, চ্যাঁচান 'কোটাল, লে আও শির।'
হুঁচোট খেয়ে পড়েন ভুঁয়ে—নিজের শিরই চৌচির।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।



কাঁদন গ্যাস্—

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অনেক, সেইজন্যই বোধ হয় এখানে লোকের প্রাণের দাম কম। এখানের পুলিশও সেইকারণে দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি বন্ধ করিতে [illegible] কোন রকম চিন্তা না করিয়াই বেশ গুলি চালায়। [illegible] সময় অনেক লোক মারা যায়, পুলিসও তাহাতে [illegible] হয় না। আমেরিকার লোকদের মত, ঠিক এখানকার [illegible] নয়। সেখানের পুলিস আজ-কাল এক রকম নতুন বোমা আবিষ্কার করিয়াছে। এই বোমার সাহায্যে অনায়াসেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করা যায়, অথচ একটিও



[illegible] বোমা।

লোক মরে না। [illegible] সাহায্যে চোর-ডাকাতও বেশ সহজে পাকড়াও করা [illegible] একরকম গ্যাস্ বাহির হয়। সেই গ্যাস্ লোকের [illegible] প্রবেশ করিবামাত্র তার মনে ভয়ানক দুঃখ [illegible] কাঁদিতে থাকে। সময় সময় দুঃখের আবেগ [illegible] সে অজ্ঞান হইয়াও পড়ে। ফিলাডেলফিয়া পুলিশ [illegible] ব্যবহার করিয়া খুব চমৎকার ফল পাইয়াছে। '[illegible] American' নামক পত্রিকায় মিঃ এ ম্যাক্গারি [illegible] বলেন "এই বোমা বন্দুকের এবং পিস্তলের গুলির [illegible] কাজ দেয়, কিন্তু ইহার ব্যবহারে কোন প্রাণীহত্যা হয় না। এই [illegible] দুইপ্রকার বোমা অল্পদিনের মধ্যেই বাজারে আসিবে। এই বোমা পুলিস ছাড়া ব্যাঙ্ক, মালখানা এবং তহশীল ঘরেও ব্যবহার করা চলিবে। এই বোমাগুলির কতকগুলির মধ্যে কাঁদন গ্যাস থাকিবে, সেই গ্যাস নাকে মুখে ঢুকিলেই লোককে কাঁদাইতে আরম্ভ করিবে, আর কতকগুলির মধ্যে 'হতভম্ব গ্যাস্' থাকিবে, এই গ্যাস্ যাহার নাকে যাইবে তাহাকে কয়েক মিনিটের জন্য প্রায় স্তম্ভিত অজ্ঞান করিয়া রাখিবে। হেমন্ত।

সঙ্গীতকারী বৃক্ষ ও বালুকা—

উত্তর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত পশ্চিমসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকার নিউবিয়া ও মিশরের সুদান প্রদেশের স্থানে স্থানে এক-জাতীয় বৃক্ষ জন্মায়, তাহা হইতে শিষ দেওয়ার ন্যায় একপ্রকার সুমিষ্ট স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। এইজন্য এই গাছের নাম রাখা হইয়াছে সঙ্গীতকারী গাছ (Whistling tree)। পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের বার্‌বাডোস্ দ্বীপে (Barbados Island) এই বৃক্ষে পূর্ণ একটি উপত্যকা আছে। যখন মৌশুমী বাতাস বার্‌বাডোস দ্বীপের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই সময় গভীর বিষাদ ক্রন্দনের ন্যায় একপ্রকার মর্ম্মস্পর্শী শব্দ সেই উপত্যকা ভূমিতে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বর্টন নামীয় একজন লোক প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একদিন ভ্রমণকালে তিনি কুকুরের ডাকের শব্দের ন্যায় একপ্রকার শব্দ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শুনিতে পাইলেন। কোন মানব, ইতর জীবজন্তু, এমন কি কোনপ্রকার পোকা মাকড় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হওয়ায় যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন শব্দ পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর শোনা যাইতেছে। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বালুকা-প্রান্তর হইতে একমুঠা বালি হাতে তুলিয়া লইলেন, তখন শব্দ অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। পরে কানের নিকট বালুকামুষ্টি তুলিয়া ধরিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালুকা মুষ্টি হইতে ঐ অদ্ভুত শব্দ নির্গত হইতেছে। দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানের চরভূমির বালুকা পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখেন, কোন কোন জায়গায় ঐ প্রকার শব্দ বালুকাতে শুনিতে পাওয়া যায় ও কোন কোন জায়গায় আদপেই পাওয়া যায় না। ডাক্তার বর্টন পরীক্ষা করিয়া দেখেন যখন প্রকৃতি-দেবী শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন ও বাতাস মৃদুমন্দ ভাবে প্রবাহিত হয়, সেই সময় স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের তীরভূমির স্থানে স্থানে প্রায় ১০০ ফুট স্থান ব্যাপিয়া বালুকাকণার এই অদ্ভুত সঙ্গীত অতি সুন্দর শুনিতে পাওয়া যায়। স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীরা যে যে স্থানে এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় সেই-সকল স্থান ডাইনী ও ভূত-প্রেতাদির আবাস-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমেরিকানরা যখন এই দ্বীপ অধিকার করে, তারা ঐপ্রকার অদ্ভুত ও অদৃশ্য সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অসভ্য অধিবাসীদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করে ও তাদের প্রমুখাৎ ঐ-সকল স্থানে ভূতপ্রেত বাস করে শুনিয়া দ্বীপের নাম রাখে "স্যাণ্ড-উইচ" বা বালির ডাইনী।

আমরা ছোট-বেলায় সঙ্গীতকারী জল ও বৃক্ষের কথা আরব্য-উপন্যাসের গল্পে শুনিয়াছিলাম। পরে ঐ-সব কথা আজগুবি বলিয়া মনে হইত; এখন দেখিতেছি শৈশবের শোনা কাহিনী সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিছুদিন হইল সঙ্গীতকারী জলও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মাথাধোওয়া টুপি—

পোষাক পরা থাক্‌লে মাথা ধোওয়া কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার তা সকলেই জানেন। পোষাক না খুলে ফেলে মাথা ধোওয়া যায় না; অনেক



মাথা-ধোওয়া টুপি—একনলা।



মাথা-ধোওয়া টুপি—দোনলা।

সময় পোষাক খুলে মাথা ধুয়ে আবার পরার কষ্ট স্বীকার অনেকেই করতে চান না। পোষাক পরেই যাতে মাথা ধোওয়া যায় তার জন্য অনেক রকম মাথা-ধোওয়া টুপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে দুই রকম টুপির কথা বল্‌ব। এক রকম টুপি মাথায় দিয়ে উপরে জল ঢাল্‌লেই পিছনের নল দিয়ে জল [illegible] এক ফোঁটাও জল পড়ে না। অন্য টুপিটি [illegible] টুপির সাম্‌নের দিকে ও পিছনের দিকে দুটি নল [illegible] নল একটি জলপূর্ণ বাল্‌তিতে ডোবান থাকে, [illegible] টুপির মধ্যে প্রবেশ করে ও সমস্ত মাথা [illegible] দিয়ে বেরিয়ে যায়। অনেক কষ্ট [illegible] টুপি ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ করেছেন। [illegible] ১৫ থেকে ২০ শিলিঙের মধ্যে।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

আমেরিকার [illegible]

আমেরিকানরা [illegible] কর্জ্জ দিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ এবং [illegible] সমস্ত দেশ আমেরিকার নিকট [illegible] ১০,০০০,০০০ ডলার করিয়া বাড়িতেছে!

বিদেশীরা যদি ঠিক সময়মত [illegible] হইলে প্রত্যেক বছরে আমেরিকার রাজকোষে [illegible] ব্যবসাদের পকেটে ১০ কোটি ডলার হাজির হয়। [illegible] হিসাব মত আমেরিকা-গভর্ণমেন্টের তিন বছরে [illegible] ইহা তাহার এক-চতুর্থাংশ।

আমেরিকার কাছে পৃথিবীর ঋণের [illegible]—সমর ঋণের জন্য ১০,০০০,০০০,০০০ ডলার, যুদ্ধের সরঞ্জামের জন্য ৩,০০০,০০০,০০০ ডলার আমেরিকার ব্যবসাদারদের প্রাপ্য [illegible] ডলার; এবং যারা বিদেশী বণ্ড কিনিয়াছেন তাঁদের প্রাপ্য ২,০০০,০০০,০০০ ডলার।

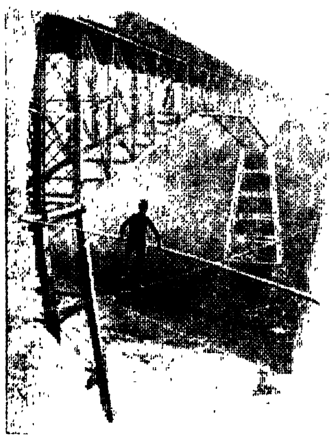
য়ুরোপ আমেরিকাকে এত বেশী পরিমাণে সোনা দিতেছে যে সমস্ত জগতের সোনার এক তৃতীয়াংশ [illegible] আমেরিকায়। অরুণ।

নায়াগ্রা-কীর্ত্তি—

মানব তার দুর্জ্জয় শক্তিবলে [illegible] প্রতাপকেও পরাভূত করিয়া নিজের [illegible] তাহাকে খাটাইয়া লইতেছে। কিন্তু প্রকৃতির [illegible] লড়িয়াই তার তৃপ্তি হইতেছে না, [illegible] নানা দুঃসাধ্য দুঃসাহসের পথে [illegible] তাহাকে প্রবৃত্ত করিতেছে। নায়াগ্রা প্রপাতের কথাই [illegible] নিতান্ত কাজের তাড়া থাকিলেও খুব অল্প [illegible] গঙ্গা পার হইতে রাজি হইবে কিন্তু এই [illegible] বিচিত্র যানের সহায়ে নায়াগ্রা-প্রপাতের উত্তাল জলরাশির [illegible] ফুটেরও বেশী খাড়াই বাহিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে। এই জল [illegible] পড়ার বেগ এত ভীষণ যে ১০ মাইল দূর হইতে তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন ১০০ কোটি ঘনফুট [illegible] উপর ঝরিয়া পড়ে, এবং সেখানে যে বাতাসের [illegible] সৃষ্টি হয় তাহার জোরও যে কোনো প্রবল ঝড়ের জোরের সমান। এই দুঃসাহসিক আমোদে যতজন লিপ্ত হইয়াছে তার মধ্যে মরিয়াছে অনেকে, বাঁচিয়া ফিরিয়াছে পাঁচজন, তাহাদের মধ্যে একজন নারী।



পিপায় নায়াগ্রা-বিহার।



নায়াগ্রার উপর দড়ির খেলা।

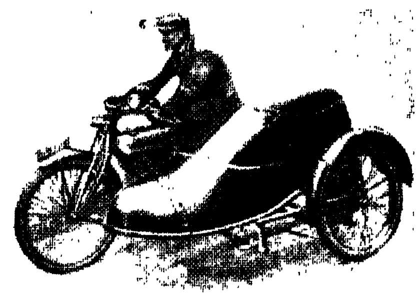
দড়ির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে ও সাইকেল চালাইতে আমরা অনেককে অনেকবার দেখিয়াছি, তাই তাহা আর সহসা তেমন কঠিন বা আশ্চর্য্যজনক কিছু বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু নায়াগ্রা প্রপাতের উন্মত্ত জলরাশির উপর দিয়া দড়ি হাঁটিয়া যাইতে যে কতখানি আত্মস্থতা ও সাহসের প্রয়োজন তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু এই সুকঠিন কাজও অবলীলায় করিয়াছেন Blondin নামক বিখ্যাত বাজিকর। তিনি বারংবার দড়ি হাঁটিয়া নায়াগ্রা পার হইয়াছেন, মাঝ-দড়িতে বসিয়া ঠেলাগাড়িতে-করিয়া-বহিয়া-আনা ষ্টোভে রান্না করিয়া খাইয়াছেন, কেবল তাহাই নয়, দুপায়ে দুটি ঝুড়ি আর পিঠে তাঁর গোমস্তাকে বাঁধিয়া লইয়াও নিরাপদে দড়ির খেলা পার করিয়া দিয়াছেন, সে আজ ৬০ বৎসর আগেকার কথা।

খাড়াই বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়ার সময় অত্যন্ত বেগের দরুণ একেবারে পাহাড়ের গা বাহিয়া গড়াইয়া না পড়িয়া খানিকদূর ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়ে, ইহাতে জলের ধারা ও পাহাড়ের গায়ের মাঝখানে অল্প একটু ফাঁকের সৃষ্টি হয়। নায়াগ্রা প্রপাতের তলাতেও ঠিক এমনি একটুখানি ফাঁক আছে। পাহাড়ের গায়ে সেই জলের তলার সুড়ঙ্গপথ যেমন সরু তেমনি পিছল আর অসমতল। এই ভয়ানক সুড়ঙ্গের ভিতরও পাঁচজন মানুষ পরস্পর দড়িবাঁধা হইয়া নির্ভয়ে প্রবেশ করিয়াছে। স চ।

—

বিজ্ঞাপনের জুতা-আকার মোটর সাইকেল—

টাকের উপর বিজ্ঞাপন, জুতার দোকানের সুখতলা দরজা প্রভৃতি আমেরিকার বিজ্ঞাপন দিবার অনেক কৌশলের খবর আমরা আগে অনেকবার দিয়াছি। এবারে ইংলণ্ডের একটি জুতাব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন



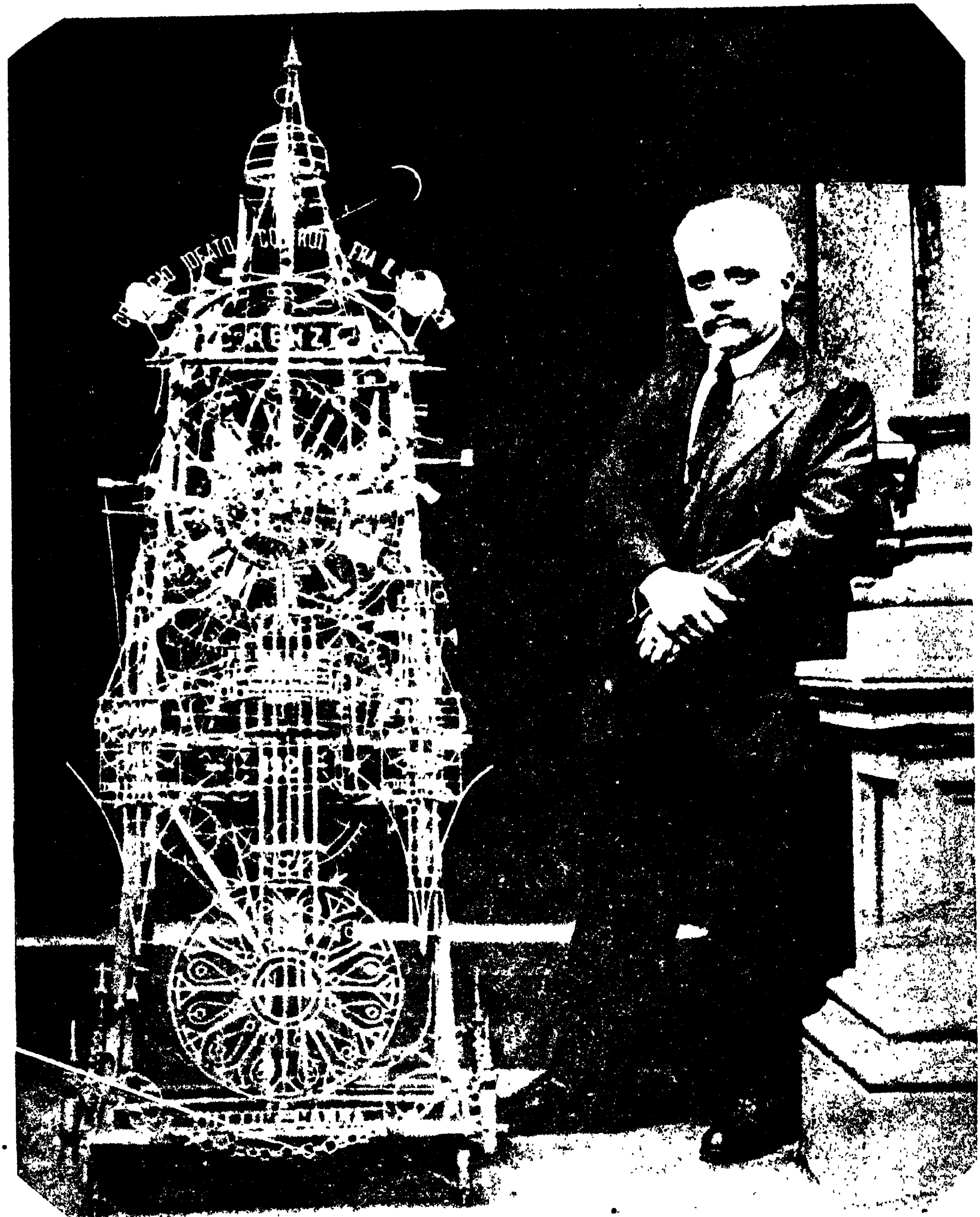
জুতা-সাইকেল।

দিবার এক নূতন কৌশলের খবর দিব। মোটরসাইকেলের পাশে যে বসিবার গাড়ী থাকে, এই ব্যবসায়ীটি সেই গাড়ীটিকে জুতার আকারে তৈরী করাইয়া লইয়াছেন। এবং ইহার উপর বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম-ধাম লিখাইয়া লইয়াছেন। রাস্তা দিয়া এই গাড়ী যখন চলাফেরা করে তখন ইহার অদ্ভুত আকারে ও বিজ্ঞাপনে লোকে খুব আকৃষ্ট হয়। প।

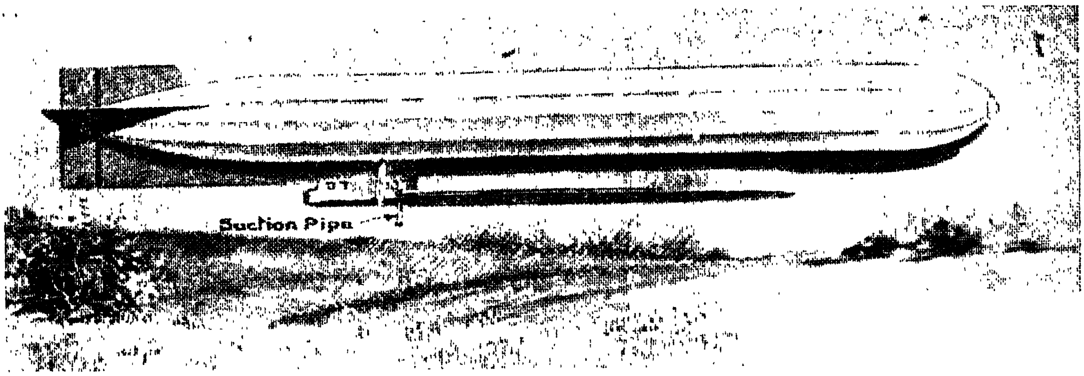
বিপুলতার বিপত্তি—

ক্যালিফোর্নিয়ার সেকোয়্যা ন্যাশন্যাল পার্ক সে দেশে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য বিখ্যাত। এই পার্কে পর্ব্বতগাত্রে "স্ফটিক-গুহা" নামক একটি গুহা আছে, নানাস্থান হইতে বহুলোক ইহার শোভা দেখিতে আসিয়া থাকে। সম্প্রতি এই গুহায় তেত্রিশ ইঞ্চির বেশী কোমরের পরিধিওয়ালা লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মোটা লোকদের চটিবার কারণ কিছু নাই। গুহায় মোটা লোকদের প্রবেশ-নিষেধের কারণ, গুহার তত্ত্বাবধায়কদের স্থূলত্বের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষ নহে, তাহা এই;—কিছুদিন আগে একজন স্থূলকায় লোক গুহাতে ঢুকিয়া পড়িয়া এক সুড়ঙ্গের পথে আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়। সেখান হইতে সে না পারে সামনে চলিতে, না পারে পিছন ফিরিয়া হটিয়া আসিতে। তিন দিন এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কাটাইয়া অনাহারে শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া তবে সে মুক্তি পায়। তাও সহজে নয়, তার চারিদিককার পাথরগুলিকে একদম চাঁচিয়া ছুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। এমনতর দুর্ঘটনা যাহাতে আর না ঘটিতে পারে সেজন্য "স্ফটিক-গুহার" পথঘাটের পরিসর বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। স চ।

—



বাঁশের ঘড়ী।



জল ছিটানো উড়োজাহাজ।

বাঁশের ঘড়ী—

ইটালীর নেপ্‌ল্‌স্‌বাসী শ্রীযুক্ত কন্‌ষ্টান্ট্‌সো রিয়েন্ট্‌সী একটি ঘড়ী তৈরী করেছেন সম্পূর্ণ কেবল বাঁশের টুক্‌রো চেঁচাড়ি চিল্‌তে ছোটা ইত্যাদি দিয়ে; এই ঘড়ীর কাঠামো, কলকব্জা, ডালা, ঘণ্টা-মিনিটের অঙ্কচিহ্ন, কাঁটা, দোলন, স্প্রিং, ঘণ্টা বাজাবার হাতুড়ি সব বাঁশের অংশ; কেবল ঘড়ীটি ধাতুময়। এই ঘড়ী ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড ছাড়া মাসের তারিখ ও সপ্তাহের বার নির্দ্দেশ করে; ঘণ্টা আধঘণ্টা আর পোয়া-ঘণ্টা বাজে। প্রত্যেকদিন দুপুর-বেলা মধ্যাহ্ন ঘোষণা করে' ঘড়ী থেকে আপনা-আপনি একটা ছোট কামান আওয়াজ হয়, একটা নিশান ওড়ে, বাঁশী বাজে, আর ঘণ্টা ত বাজেই। ঘড়ীতে আট দিন অন্তর দম দিলেই চলে; আট দিনে সময়ের এক সেকেণ্ডও এদিক-ওদিক হয় না; চার বছর অন্তর একবার মেরামত কর্‌লেই চলে। এই ঘড়ীটি তৈরী কর্‌তে কারিগরের তিন বৎসরের ধৈর্য্য চেষ্টা ও শ্রম লেগেছে।

কয়ালী।

—

উড়ো-জাহাজে জল ছিটান—

অনাবৃষ্টি হইলে বড় বড় প্রান্তরে গাছপালা কিছুই জন্মায় না, অত বড় মাঠে জল সেচন করিয়া গাছপালা রক্ষা করাও অসম্ভব। অনাবৃষ্টির সময় সমস্ত প্রান্তরময় যাহাতে জলসেচন করা যাইতে পারে তজ্জন্য বৃহদাকার উড়োজাহাজের সৃষ্টি হইয়াছে। উড়োজাহাজের উপরে একটা প্রকাণ্ড জলের চৌবাচ্চা ও তার নীচে ঝাঁঝ্‌রার ন্যায় জল ছিটাইবার জন্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। জাহাজ উড়িয়া যাইবার সময় চৌবাচ্চা হইতে জল ঝাঁঝ্‌রার ভিতর দিয়া বৃষ্টির ন্যায় প্রান্তরের মধ্যে পড়িতে থাকে। দর্‌কার-মত ঐ প্রকারে জলসেচন করিলে, আর বৃষ্টির জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

অলক।

—

হাতকড়ির বদলে আঙুল-কড়ি—

আমেরিকার এক ভদ্রলোক সম্প্রতি হাতকড়ির বদলে অপরাধীদের জন্য একরকম আঙুলকড়ি তৈরী করিয়াছেন। হাতকড়ি দিয়া লইয়া যাইবার সময় অনেক বদ্‌মাইস চোর খুব টানাটানি করে ও পাহারাওয়ালাকে কাবু করিয়া অনেক সময় পলাইয়া যায়। কিন্তু এই



অঙুল কড়ি।

নূতন আবিষ্কৃত আঙুলকড়ি পরাইয়া দিলে নাকি চোর বেশী টানাটানি করিতে পারে না, তাতে তার হাতে খুব লাগে। খুব টানাটানিতেও কিন্তু হাতকড়িতে লাগে কম ও চোরদের ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি করিবার সুবিধা।

প।

—

জীবন্ত দৃশ্যপট—

ইউরোপ আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে হাতে আঁকা দৃশ্যপটের বদলে বায়স্কোপের সচল রঙিন ছবির সাহায্যে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে জীবন্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়াই পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু শোনা যাইতেছে রঙ্গমঞ্চের যাবতীয় দৃশ্য-সজ্জাই ক্রমে বায়স্কোপের লণ্ঠনের সাহায্যে জোগানো সম্ভব হইবে। রাস্তায় লোকচলাচল, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমাবেশ প্রভৃতি যে-সমস্ত ব্যাপারে

অভিনেতাদের কিছু বলা প্রয়োজন হয় না কিন্তু বহু অভিনেতা প্রয়োজন, বায়স্কোপের ফিল্মের সাহায্যে সহজেই সে-সমস্ত দৃশ্যও দেখানো যাইবে। কলিকাতার কোন কোন নাট্যমঞ্চে 'অশ্বারোহীর পলায়ন' প্রভৃতি ধরণের মূকঅভিনয়-অংশ বায়স্কোপের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

সচ.।

পারস্যে দুই মানুষের লাঙ্গল টানা—



পারস্যে দুই মানুষের লাঙ্গল টানা।

আমাদের দেশে গরু-টানা লাঙ্গলেরই প্রচলন বেশী। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ঘোড়া-টানা লাঙ্গলের ব্যবস্থা। পারস্য দেশে আবার দুইজন মানুষে একসঙ্গে লাঙ্গল টানে। এই লাঙ্গল অনেকটা মাটি আঁচড়াইবার যন্ত্রের মত, চার-পাঁচটি ফলা আছে, ও দুইটি লম্বা লম্বা বাঁট দুই দিকে লাগানো। দুজন লোকে দুইদিকে দাঁড়াইয়া পরস্পর জোরে জোরে টানাটানি করিতে থাকে। তাহাতে মাটি খোঁড়া হইতে থাকে। প।

সন্ধ্যা-সুন্দরী

অস্তরবি-রশ্মি মাখি' দিগন্তেতে যত মেঘমালা
সপ্ত রঙে রঙ্গি' যেন খুলিয়াছে কার চিত্রশালা!
প্রশান্ত আকাশ দিয়া ছড়াইয়া গোধূলি-অঞ্চল
মৌনবতী সন্ধ্যা নামে, বিহঙ্গেরা গাহে কলকল্,
পূরব দিগন্তে ধীরে আঁখি মেলে তারকা-সুন্দরী,
অতি দূর বনান্তরে কানাকানি করিছে অপ্সরী!

আঁধার ঘনায়ে আসে; দীঘিধারে যত দূর্ব্বাদল
তার মাঝে ধীরে ফোটে তরঙ্গের মৃদু ছলছল্।
কিশোরীরা ফিরি' যায় আর্দ্র বাসে কক্ষে ল'য়ে বারি,
নূপুরে গুঞ্জন তুলি' মুখরিয়া পল্লীপথে সারি।
অযুত খদ্যোত খুঁজি' ফেরে কোন্ রত্ন করি আশা,
পৃথিবীর বক্ষ হ'তে স্তব্ধ ধীরে দিবসের ভাষা।

অয়ি মৌনবতী সন্ধ্যা, অয়ি রিক্তা, অয়ি শান্তিময়ী!
তোরে ভালবাসি আমি; তোর শান্ত গোধূলিতে অয়ি
মোর চিত্তপটে ফুটি' ওঠে ধীরে কত স্বপ্নরাশি,
কোন্ দূর দিগন্তেতে কে বাজায় মিলন-প্রত্যাশী
সকরুণ বাঁশী তার,—তারি তানে ভরি' ওঠে হিয়া
তোরি স্তব্ধতার মাঝে, অয়ি সন্ধ্যা, প্রাণ আকুলিয়া।

অয়ি সন্ধ্যা, অয়ি দীপ্তা আকাশের লক্ষ তারকায়,
সান্ত্বনা-রূপিণী অয়ি, ধীরে ধীরে আমার হিয়ায়
পশি' সান্ত্বনার সম মৌন গানে মোর আঁখি-আগে
ফুটায়ে তুলিস্ ধীরে দিবানিশি নীরবে কে জাগে
আমার মর্ম্মের তলে—কেবা সেথা গাহিয়া সঙ্গীত
পথ হ'তে পথান্তরে যেতে সদা করিছে ইঙ্গিত।

অয়ি সন্ধ্যা, অয়ি তৃপ্তা, আপনাতে আপনি লুকায়ে,
পূরবীর সুরে সুরে গোধূলির অঞ্চল বিছায়ে,
আবরিয়া দিবসের যত ক্ষুদ্র দৈন্যময় ছবি
খুলিস্ দুয়ার তুই আঁখি-আগে যেথা বিশ্বকবি
আপনার বীণাতানে বিশ্বকাব্য করিছে রচনা—
দিবসের তপ্ত খিন্ন প্রাণ যেথা বহে না কামনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।



বাংলা

বাংলার অর্থের উপর সরকারের অনুগ্রহ—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি"

ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়া—

আয়—৮ কোটী টাকা

গবর্ণরের মাহিনা—৫০০০৲ টাকা।

বাঙ্গালা—

আয়—৯ কোটী টাকা।

গবর্ণরের মাহিনা—১০,৬৬৬৲ টাকা।—হিন্দুস্থান।

বাংলার অর্থসমস্যা—

স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই হউক বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক গত ৬ মাসে ৭ কোটী টাকার কম মাল কলিকাতায় আসিয়াছে, ইহা সুখের কথা বটে; কিন্তু রপ্তানী মালের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায়, রপ্তানী অপেক্ষা ১৪ কোটী টাকার বেশী মাল আমদানী হইয়াছে। গত-পূর্ব্ব ছয় মাসে ২৫ লক্ষ টাকার বিদেশী জুতা বাংলায় আমদানী হইয়াছিল, আর সেই স্থলে গত ৬ মাসে মাত্র ৭ লক্ষ টাকার বিলাতী বিনামা কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। এবং সূতার কাপড় ১৮ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার স্থলে ১১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকার আসিয়াছে। রেশমী কাপড় ১৮ লক্ষের স্থলে ৬ লক্ষ, পশমী কাপড় ৫০ লক্ষের স্থলে ১২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। এবং মোটর গাড়ী ১ কোটির স্থলে ২৪ লক্ষে এবং গত ৬ মাসে ৪০ লক্ষ টাকার কম সিগারেট আমদানী হইয়াছে। আমদানী কম করিয়া রপ্তানী বেশী করিতে পারিলেই দেশ লাভবান হয়। কিন্তু এ বৎসর প্রায় এককোটী টাকার মাল কম রপ্তানী হইয়াছে, এবং কয়লা ৯১ লক্ষের স্থলে ১১ লক্ষ, পাট ৫ কোটী ৬৫ লক্ষের স্থলে ৪ কোটী ২৫ লক্ষ, চট ৩১ কোটী ৮৪ লক্ষের স্থলে মাত্র ১৪ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ফলে পাটের বাজার অত্যন্ত মন্দা যাইতেছে, এবং প্রজার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছে। মোটের উপর গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বাঙ্গালাদেশ হইতে ২৪ কোটী টাকার মাল কম রপ্তানী হইয়াছে। ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। অতএব দেশকে বাঁচাইতে হইলে দেশে শিল্পের উন্নতি করিয়া কাঁচা মালকে নানা কাজে মূল্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ করিতে না পারিলে আর উপায় নাই।—যশোহর।

বস্ত্রের কথা—

মৃতের গায়ে খদ্দর—বিগত ১২ই নভেম্বর তারিখে বরিশালে এক অতি করুণ ঘটনা ঘটে। ঐ দিন তথাকার একজন দরিদ্র মুসলমানের মৃত্যু হয়। মৃতের সৎকারার্থ তাহার আত্মীয়েরা প্রায় ১২ টাকার বিদেশী বস্ত্র কিনিয়া আনে। ইহাতে পারিপার্শ্বিক কবরযাত্রীরা খুব আপত্তি করে। মৃতের গায়ে খদ্দর না দিলে তাহারা কিছুতেই মৃতদেহের সৎকারার্থ যাইবে না। অগত্যা ঐ বিদেশী বস্ত্র দোকানদারকে ফিরাইয়া দিতে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু কিছুতেই সে তাহা ফিরাইয়া লইবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণকে হরদিওদাস নামক জনৈক উন্নতমনা ভদ্রলোকের নিকট যাইয়া সবিশেষ বলিতে হয়। দয়ার্দ্র হৃদয় হরদিওদাস ঐ বিদেশী বস্ত্র স্বয়ং লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং খদ্দরের দাম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়া দোকানদার এক টাকা কাটিয়া রাখিয়া বিদেশী বস্ত্রগুলি ফিরাইয়া লয় এবং বাকী টাকার খদ্দর দেয়। অবশেষে আত্মীয়েরা যাইয়া মৃতের সৎকার করে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় মহাত্মার অকৃত্রিম ভক্তেরা তাঁহার আজ্ঞা পালনে কতদূর বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

—নবসঙ্ঘ।

দেশের কথা।—কলিকাতা হাতিবাগানে তাঁত ও চরকার একটা বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারখানায় ২॥০ শত চরকা ও ১॥০ শত তাঁত বসান হইবে। আপাততঃ চরকার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।—কাশীপুরনিবাসী।

চরকার সূতা শক্ত করিবার উপায়।—অনেকেই আজকাল চরকায় কাটা সূতা দ্বারা তাঁতে টানা দিতে পারেন না বলিয়া চরকায় কাটা সূতা খরিদ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। চরকায় কাটা সূতা শক্ত করার উপায় আছে। আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে চরকায় কাটা সূতা দুইদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে সেই জল দ্বারা সূতা জল ফুটা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা ছায়ায় শুকাইয়া লইলে সেই সূতা অনেক পরিমাণে শক্ত হয়।

—জনশক্তি।

স্বদেশী খাঁটি রঙীন সূতার অভাবে লোকে রং বেরঙের কাপড় পরিতে পাইতেছে না। আমরা পাহাড় হইতে একরকম গাছের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার বীজ কোন পোড়ো জায়গায় রোপণ করিলে কয়েক দিনের মধ্যে গাছ বাহির হইবে। গাছের ফল পাকিবার অল্পদিন পূর্ব্বে তাহার ডালপাতা কাটিয়া সিদ্ধ করিলে গাঢ় নীল রং উৎপন্ন হয়। তাহাতে অবাধে সূতা বা কাপড় রঙীন করা যায়। এই রং পাকা, ধোপে আরও উজ্জ্বল হয়। পত্র লিখিলে নমুনা দিয়া থাকি।

এফ, এন, চৌধুরী।
চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

চরকার সূতা।—চট্টগ্রাম জেলার চকোরিয়া থানার অধীন কাকাড়া গ্রামে "কাকাড়া স্পিনিং ও উইভিং ফ্যাক্টরী" নাম দিয়া একটা কারবার খোলা হইয়াছে। এই কারবারের যাঁহারা মালিক তাঁহারা গ্রামের মেয়েদের দ্বারা চরকায় সূতা কাটাইয়া থাকেন। এই সূতার নমুনা আমরা দেখিয়াছি;—সুন্দর সুচিক্কণ সূতা। ইহার পারিপাট্য মিলের চল্লিশ নম্বর সূতার ন্যায়। কারবারের মালিকগণ তাঁহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সূতা বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। কলিকাতায়ও এই সূত্রে আমদানী হইয়াছে। ৫ নং কলুটোলা লেনে "সাধনা" পত্রিকার ম্যানেজারের

নিকট পাওয়া যায়। ম্যানেজার মহাশয় আমাদের জানাইয়াছেন যে তাঁহারা মাসে বিশ মণ পর্য্যন্ত সূতা সরবরাহ করিতে পারিবেন। চট্টগ্রামে উৎপন্ন, স্বভাবতই রঙ্গীন "বিনি সূতা"ও ইঁহারা দিতে পারিবেন। কলিকাতার লোক "সাধনা" আফিসে গেলেই নমুনা দেখিতে পাইবেন, আর মফঃস্বলের লোকেরা উক্ত কারখানাতে পত্র লিখিলে ডাকযোগে নমুনা ও মূল্য-তালিকা পাইবেন।

স্বাস্থ্যের কথা—

বাঙ্গালার ২৩টি জেলায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত লোকদিগের ভিতর কুইনাইন বিতরণের জন্য ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। গড়ে প্রতি জেলায় প্রায় হাজার টাকা এবং প্রতি মহকুমায় দুইশত কি আড়াই শত টাকা করিয়া পাইবে। কুইনাইনের যেরূপ দর তাহাতে আজকাল দুইশত টাকায় প্রায় চারি পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যাইতে পারে। হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় বিলাইলেও কয়জনের ভাগ্যে তাহার একটু ঘ্রাণ গ্রহণ জুটিবে ভাবিয়া পাই না। যদি স্বাস্থ্য-বিভাগে এতই টাকার অভাব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু মশাকে চৌষট্টি হাজার টাকা বার্ষিক দিয়া কি লাভ হইবে বুঝি না। বরং ও-বিভাগটি একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ টাকার কিছু কুইনাইন বিতরণ করিলে বোধ হয় কাজ হইতে পারিত। —প্রভাকর।

লেবুর রসের উপকারিতা।—কাগ্‌জী কিংবা পাতি লেবুর রস প্রত্যহ সৈন্ধব লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গরম জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণতা-রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্যে কাশীর চিনির সহিত লেবুর রস ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

লেবুর রসের সহিত মিছরীর গুঁড়া মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন-ইচ্ছা প্রশমিত হয়।

ভাতের সহিত লেবুর রস ব্যবহার করিলে অরুচি সারিয়া যায়।

পাতি লেবুর শাঁস পুরাতন ঘৃতের সংযোগে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে প্রত্যহ লেবুর রস ব্যবহার করিলে সহজে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না।

লেবুর রসে যকৃতের ক্রিয়ার সাহায্য হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু সরল হয়।

লেবুর রসের বাহ্য প্রয়োগে দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

সামান্য পরিমাণ লেবুর রস জল সংযোগে হাতে, ঘাড়ে, মুখে মর্দ্দন করিলে কেবল যে মুখের রং ফর্সা হয় এমন নহে, অধিকন্তু ইহার দ্বারা চর্ম্ম কোমল হয়।

ম্যাগ্‌নিসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে মিশাইয়া উত্তমরূপে ফুটাইয়া মুখে, হস্তে, হস্ততলে, গ্রীবায় ব্যবহার করিলে নারীগণের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এমন কি কাল চামড়াও একটু ফর্সা হয়, ইহা মুখ প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া তাহার পর ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহার দ্বারা মুখের ও ঘাড়ের কুঞ্চিত লোম মাংস বেশ সুডৌল হয়।

নখের দাগ প্রভৃতি উপসর্গে এক চামচ লেবুর রস, একবাটী গরম জলে মিশাইয়া নখ এবং হস্ত ধৌত করিলে নখের দাগ নষ্ট হইয়া নখগুলি বেশ সুন্দর হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে স্নানের জলে লেবুর রস মিশাইয়া স্নান করা একটি বিশেষ আনন্দদায়ক সুখভোগের মধ্যে গণ্য। এখানে লোকে স্নানের জলে কতকগুলি লেবু কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পরে লেবুর রসকে কচ্‌লাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নান করে।

মুখ ধুইবার সময়ে জলে লেবুর রস দিয়া ধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। ইহার দ্বারা দন্তমূলে যে Tartar বা এক প্রকার চূণের মত দ্রব্য জমিয়া দাঁতকে আল্‌গা করে, তাহা জমিতে পারে না।

স্বাস্থ্য-রক্ষার সহায়তা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ব্যতীত বস্ত্রাদিতে দাগ লাগিলে বা হাতে কোন প্রকার রংএর দাগ লাগিলে লেবুর রস এবং একটু সামান্য মাত্র লবণ একত্রে মিশাইয়া দাগের উপর মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিলে তাহা অনায়াসে উঠিয়া যায়।

—নবযুগ।

দেশবাসীর নিকট আবেদন—

আশ্রমস্থ বালকবালিকা ও রোগীদিগের উপযোগী গরম কাপড়, জামা, গেঞ্জি, কম্বল, বিছানাদি বিশেষরূপে না থাকায় আগামী দারুণ শীত হইতে আশ্রমবাসীদিগকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, ভাবিয়া আশ্রমস্থ তত্ত্বাবধায়কগণ চিন্তিত হইয়াছেন। আশ্রমবাসীদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের উপর নির্ভর করে।

উপস্থিত মোট আশ্রমবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০০। তন্মধ্যে ১ হইতে তিন বৎসর ৫টি, তিন হইতে পাঁচ বৎসর ৩০টি, পঞ্চম হইতে অষ্টম বর্ষীয় ৭০টি, দশম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০টি, পঞ্চদশ হইতে তদূর্দ্ধ প্রায় ৪৫টি; ইহার ভিতর আমাদের সেবা-বিভাগের রোগী-দিগকেও ধরা গেল। কম্বল, জামা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও যতই সামান্য হউক না কেন গৃহীত হইবে। ব্যবহারোপযোগী পুরাতন শয্যাদ্রব্য গরম কাপড়চোপড় দিলেও সাদরে ও ভক্তিসহকারে গৃহীত হইবে।

নিখিল ভারত অনাথ-আশ্রম,
৩১ নং কালীঘাট রোড, ভবানীপুর।
টেলিফোন নং ৪৯৪৯।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ (সভাপতি)
শ্রীইন্দুভূষণ সেন (সম্পাদক)
শ্রীশুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)

—বিজলী।

কুমারখালি দরিদ্রভাণ্ডার

আমরা গত আষাঢ়মাসে কুমারখালী দরিদ্রভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছি। স্থানীয় ৪০।৫০ জন ভদ্রমহোদয় ইহার সাধারণ সভ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী হইতে প্রতি রবিবারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, ভাণ্ডারের সভ্যগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা, স্থানীয় প্রত্যেক বিবাহে বৃত্তি ও অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই শিশু দরিদ্রভাণ্ডারের জীবন রক্ষা করা হইতেছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে দরিদ্রভাণ্ডার একালপর্য্যন্ত পল্লীর ৭।৮ জন সহায়শূন্যা নিরন্না বিধবার, ১ জন সম্পূর্ণ কার্য্যাক্ষম রুগ্ন পুরুষের অন্নসংস্থানের নিয়মিত মাসিক সাহায্য এবং ১ জন বালকের আর্থিক সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমরা রিজার্ভ ফণ্ডে প্রায় ৪০ টাকা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। ক্রমে ক্রমে বিপদগ্রস্ত অসহায় স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; সেজন্য "প্রবাসীর" সহৃদয় পাঠকপাঠিকার ও মুক্তহস্ত জনসাধারণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা "দরিদ্র নারায়ণের' মুখের দিকে চাহিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও দরিদ্রভাণ্ডার সাদরে গ্রহণ করিবে এবং "প্রবাসীতে যথাসময়ে প্রাপ্তি স্বীকার করিবে। শ্রীব্রজগোপাল কুণ্ডু—প্রধান পরিচালক, কুমারখালী পোষ্ট (জেলা নদীয়া)।

স্বাধীনতার আয়োজন—

বঙ্গে তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারের আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—অনেক-দিন হইতেই বঙ্গদেশে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। সেদিন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় একটি হিসাবে প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালায় মোট ৬২৩৮৬৯৮/১৫ টাকা আদায় হইয়াছে। সম্প্রতি এই ভাণ্ডারের টাকার একটি আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ যে উপরোক্ত ঐ টাকা ব্যতীত আরও ১০৭৯০০০৲ টাকা এসীন্ড এবং কার্য্যবিশেষের জন্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই ৬২৩৮৬৯৮/১৫ টাকার হিসাব আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—**নিখিল ভারতীয়** কংগ্রেস কমিটিকে দান ১৭০০০৲ টাকা, বিভিন্ন **জেলা কংগ্রেস** কমিটিগুলিকে দান ৬০৮০৮৫॥/১১ পাই, ষ্টীমার **রেলওয়ে** এবং চাষাগণের দুর্দ্দশাগ্রস্ত অসহযোগী শ্রমজীবীদের **সাহায্যের জন্ম** দান ১৬৪৫২০॥০ আনা, জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে **দান** ৬৮৬৪৬৲ টাকা, দুর্ভিক্ষ সাহায্যভাণ্ডারকে দান ৩৮৮১।/৯ পাই, **চরকা এবং বয়ন** শিল্পের প্রচলনের জন্ম ব্যয় ৩৭২০।০ আনা, জাতীয় **সংবাদপত্র** এবং পুস্তক প্রকাশ কার্য্যে সাহায্যস্বরূপ দান ৪৪৩।৶৬ **পাই, জাতীয়** আন্দোলনের যাবতীয় কার্য্য-বিবরণী প্রকাশের জন্ম **ব্যয়** ২০০৲ টাকা, নারীদিগের উন্নতিকল্পে গঠিত সমিতিকে দান ৩০০৲ টাকা, জাতীয় সেবক-সমিতিকে দান ১৫০০৲ টাকা, **চণ্ডনীতি-প্রপীড়িত** ব্যক্তিদিগকে সাহায্যের জন্ম ব্যয় ১০০০৲ টাকা, **ছাপা খরচ** ৭৬৮৪॥৶৬ পাই, যাতায়াত ব্যয়, ডাক খরচ অথবা পত্রাদির **ব্যয় এবং অন্যান্য** নানাপ্রকারের ব্যয় ২০০৮৮॥৯ পাই, এবং জাতীয় **সেবকদলকে অগ্রিম** দেওয়ার জন্ম ব্যয় ৩০৫০ টাকা। এতদ্ব্যতীত ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি, ব্যাঙ্কে জমা ১৩৬৪৮/১০ পাই, এবং ভাণ্ডারের নিকট নগদ ১৫৭০৮/৬ পাই রহিয়াছে।—সেবক।

স্বাধীনতার পথে তীর্থযাত্রী—

দেশবন্ধু গ্রেপ্তার—শনিবার অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটার সময় পুলিস **ভবানীপুরে** শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে গেপ্তার **করিয়াছে।** শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন ও শ্রীযুত **ভোলানাথ** বর্ম্মণ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পুলিশ বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির **অফিস খানাতল্লাস** করিয়াছে।—বসুমতী।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলালের শাস্তি. দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস—গত **৭ই ডিসেম্বর** কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কংগ্রেস-কর্ম্মী **এবং** অসহযোগীদের অন্যতম অগ্রণী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যো-**পাধ্যায়ের** প্রতি দুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

—সেবক।

মৌলানা আক্রাম খাঁ গ্রেফ্‌তার—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ **সাহেব** গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি হাসিতে হাসিতে সকলের নিকট **বিদায়** লইয়া গিয়াছেন।—বসুমতী।

পূর্ণচন্দ্র দাসের কারাদণ্ড—মাদারিপুরের জনপ্রিয় নেতা পূর্ণচন্দ্র **দাসের** মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র জামিন দিতে **অস্বীকার** করেন। তিনি বলেন, যে গবর্ণমেণ্ট জালিয়ানওয়ালাবাগের **নৃশংস হত্যাকাণ্ড** সম্পাদন করিয়াছে, পেলাফৎ ধ্বংস করিয়াছে, এবং যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয় রমণীগণের সতীত্ব রক্ষিত হয় না, সে গবর্ণমেণ্টের আদালতে আমি কিছু বলিতে চাহি না। তৎপরে ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণবাবুর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।—সেবক।

ইহা ছাড়া সুভাষ বসু, ওয়াহেদ্‌ আলি, মৌলানা কালাম আজাদ, প্রভৃতি কলিকাতার আরো অনেক বিশিষ্ট নেতা ধরা পড়িয়াছেন। আজ অবধি প্রায় একহাজার স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ নাম মাত্র অপরাধে বন্দী করিয়াছে। এই নির্য্যাতনের আগুনে আমাদের অন্তরাত্মা পূত, পবিত্র, শক্তিমান হইয়া উঠুক।

দেশের আহ্বানে কেরাণীর পদত্যাগ।—বিগত ১৭ই নবেম্বর তারিখে হরতালের দিন আফিসে গিয়াছিলেন বলিয়া, কলিকাতার এঙ্গাস কোম্পানীর কেরাণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী তৎপর দিনই পদত্যাগ করতঃ ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। চৌরঙ্গীর ও হেয়ার ষ্ট্রীটের বিষধর যাঁহারা এই কয়দিন স্বেচ্ছাসেবকগণের উৎপীড়নের ভয়ে কলিকাতার লোক হরতালে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া রাগে গরগর করিতেছেন ও তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিতেছেন, এই ব্যাপারে তাঁহাদের মুখ চুণ হওয়া উচিত নয় কি?—জ্যোতিঃ।

কনষ্টেবলের পদত্যাগ।—জামালপুরের গোলাম নবী খাঁ ও সেখ আলী নামক দুইজন কনষ্টেবল "উলেমা ফতোয়ার" নির্দ্দেশানুসারে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। প্রত্যাহার করিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিলেও তাহারা কর্ম্মত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নাই। কিন্তু তাহাদিগকে মাসের মধ্যে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না। আরও অনেকে কর্ম্মত্যাগ করিবে আশা করা যায়। আবুল খালেক নং ৫০২, সুলতানপুর; বাণেরআলী খাঁ নং ৫৪০ উনাও; আমাদত উপাধ্যায়, নং ১৩১১, প্রতাপগড়; গবা সিং, নং ৬৭৭, আরা; আবুল মজিদ নং ৬৯৬, মুঙ্গের; সীতানারায়ণ মিশ্র, নং ৫৩০, প্রত্যাগত; সেখ আবুল হক, নং ৫৪৫, মজঃফর; জগন্নাথ কুর্ম্মি, ৬৯৪, ছাপ্‌রা; মোহিত সিং নং ৫১০, গয়া; প্রভৃতি কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। জ্যোতিঃ। মোহাম্মদী।

তেজপুরের কোন একটী চা বাগান হইতে ১২৫ জন কুলী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য কংগ্রেস আফিসে উপস্থিত হইয়াছে। কারণ তাহাদিগকে নাকি পূর্ব্বের ন্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন মিটাইয়া দেওয়া হইতেছে না।—যশোহর।

উকিলের অসহযোগ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সমগ্র বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া বাংলার কোন্ জেলার কতজন উকিল ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। উত্তরে মাস্কবর সার আব্দার রহিম নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।—

বর্দ্ধমান ১, নদীয়া ২, পাবনা ও বগুড়া ১৩, খুলনা ৭, মুর্শিদাবাদ ১০, চট্টগ্রাম ৮, ত্রিপুরা ৩, নোয়াখালী ৫, রঙ্গপুর ১, জলপাইগুড়ি ১, ময়মনসিং ১৬, ২৪পরগণা ১, বাঁকুড়া ১, যশোহর ২, ফরিদপুর ১২, রাজসাহী ১৩, হুগলি ও হাওড়া ৩, ঢাকা ৮, মেদিনীপুর ৬, দিনাজপুর ১, বাখরগঞ্জ ১০, কলিকাতা ৭জন, মোট ১০৮জন।

—জ্যোতিঃ।

সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা।—(১) পদ্মরাম রত্নতেওয়ারী আলিপুর পুলিশ ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেছিল। সম্প্রতি সে শিক্ষানবীশ-দের তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়ার জন্ম কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে। (২) চিন্দওয়ারার দেওয়ানী আদালতের সমনজারির পেয়াদা আব্দুল করিম কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছে। (৩) ফরিদপুর জেলার বাখরগঞ্জ গ্রামের ৬ জন গ্রাম্য চৌকিদার চাকরিতে জবাব দিয়াছে। (৪) মোরাদাবাদ গবর্ণমেণ্ট বয়নবিদ্যালয়ের শিক্ষক লুমেদ মৌরাজ ফারুকী পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। (৫) ঢাকা কালেক্টরীর নায়েব নাজীর মৌলবী শামশুল হুদা গত ৫ই নবেম্বর পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। (৬) জলপাইগুড়ির মৌলবী শামসুদ্দিন গবর্মেণ্ট চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

স্বাধীনতার পথে তীর্থযাত্রী মহিলা—

কলিকাতায় মহিলা গ্রেপ্তার—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, তাঁহার ভগ্নী উর্ম্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী এবং **অন্যান্য আরও প্রায় এক শত খেলাফৎ** স্বেচ্ছাসেবকগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। **শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী** সুনীতি দেবী এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারে **খদ্দর** কাপড় বিক্রয় করিতে যান। **গবর্ণমেণ্টের** আদেশ অমান্য **করার জন্য** পুলিস ইহাঁদিগকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। তখন দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ **অগ্রসর হইতে** থাকে আর দলে দলে গ্রেপ্তার হইতে থাকে। এই-**সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে** গ্রেপ্তার **করিয়া** পুলিস প্রেসিডেন্সি জেলে **লইয়া** যায়। সেখানে সকলেই জামিনে খালাস পাইতে অনিচ্ছা **প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট** শেষে অনেক রাত্রে স্ত্রীলোকগণকে মুক্তি **প্রদান করেন।**—সেবক।



য়ুরোপ—ওরে বাবা! পারে যদি শাম্‌খুড়ো ওদের বিষ-দাঁত ভাঙুক।
নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে নৌবহর ও সৈন্যবল কমাইবার প্রস্তাবের নিষ্ফলতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ।

মহিলাদের বাণী—**আমরা** গ্রেপ্তার হইব, ইহা জানিয়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত **হইয়াই আসিয়াছিলাম।** আমাদের ছেলেরা বীরের মত জেলে যাইতেছে, **আর আমরা মা হইয়া** ঘরে বসিয়া থাকিব, ইহা **আমাদের পক্ষে বড়ই কষ্টপ্রদ।** যে কার্য্য **অসম্পূর্ণ** রহিল, আমরা আমাদের অপরাপর **ভগিনীদিগকে** তাহা সম্পন্ন **করিতে** অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন ভুলিয়া যান না যে, তাঁহাদিগকে ভ্রাতা এবং ভগিনীদের পাশে জেলে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহারা বুঝুন যে, তাঁহারা বাস্তবিক **জেলেই** বাস করিতেছেন, জেলটা **কেবল** একটু বড়। দাসভূমির **কলুষিত** বায়ুতে **জীবন-ধারণ** অপেক্ষা খাঁটি জেলে গিয়া থাকাই **সম্মানজনক।**

সরকারী স্কুল ও **কলেজে** এখনও যে-সব ছাত্র **আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে** অনুরোধ **করিতেছি,** তাঁহারা একযোগে বাহির হইয়া **আসুন, আসিয়া স্বাধীনতার যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যোগ দিন।** যদি অভীষ্টলাভ করিতে হয় ত এই সময়; **না হইলে আর নয়।** যে যুদ্ধে আমরা অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাতে হয় বিজয়লাভ করিব, নতুবা জীবন বলি দিব। উভয়ই গৌরবার্হ। **জীবন অথবা মৃত্যু—** এ দাসত্ব আর নয়। পুলিশ কর্ম্মচারীদের নিকট আমাদের অনুরোধ— তাঁহারা এখনই কাজে জবাব দিন। তাঁহারা বুঝুন, ঐরূপ জঘন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যুও ভাল।

বাসন্তী দেবী
উর্ম্মিলা দেবী
সুনীতি দেবী।
—হিন্দুস্থান।



ভূত নামানো।

আমেরিকায় একটি সম্প্রদায় হইয়াছে তার নাম—**কু ক্লুক্স্ ক্ল্যান।** এদের উদ্দেশ্য নিগ্রো বিরোধ, য়িহুদি বিরোধ, **ক্যাথলিকধর্ম্ম-বিরোধ।** একেই বিশ্বজোড়া স্বার্থবিরোধ সঙ্কীর্ণতা জাত্যভিমান **প্রবল হইয়া** আছে, তার উপর সেই সব ক্ষুদ্রচিত্ত লোক সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায় **হইয়া** উঠিলে জগৎসংসার নরকের চেয়েও ভয়ানক হইবে।

কুলমহিলার স্বদেশব্রত গ্রহণ।—চট্টগ্রাম জেলা **খেলাফৎ ও** কংগ্রেসকর্ম্মিগণের প্রতি সরকার-পক্ষের বর্ত্তমান কঠোর **ব্যবহার** তাঁহাদিগকে দলে দলে গ্রেপ্তার হইতে সাহসী করিয়াছে। **নেতৃবর্গের** জেল ও হাজতে গমন প্রভৃতির ফলে জননায়ক মৌলবী **শাহ মোহাম্মদ** বদিউল আলম সাহেবের সহধর্ম্মিণী বেগম ফিরোজা খাতুন ও কংগ্রেস-কর্ম্মী জনাব ফরোজ আহামদ নেজামপুরী সাহেবের **সহধর্ম্মিণী বেগম** তথিয়া খাতুন চৌধুরাণী স্বেচ্ছাসেবিকার কার্য করিতে **অগ্রসর** হইয়াছেন। **কুলমহিলারা এবার নিজহস্তে সেবাব্রত গ্রহণ করিতেছেন।** ইঁহাদের দৃষ্টান্তে মাতৃজাতি প্রবুদ্ধ হউন।—জ্যোতিঃ।

সভা-নেতৃত্ব।—চুঁচুড়া বালিকা বিদ্যালয়ের **পুরস্কার-বিতরণী** সভায় শ্রীযুক্ত **অন্নদাচরণ গুপ্ত** মহাশয়ের পত্নী **শ্রীযুক্তা** প্রিয়তমা **গুপ্তা**

মহোদয়া সভা-নেত্রীত্বের পদে বৃত হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় সুখী হইলাম। পল্লীগ্রামের সভায় একজন পুরনারী সভানেত্রীত্বের পদে আসীন হইয়া বক্তৃতা প্রদান করা সম্পূর্ণ অভিনব। একজন রমণীকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া চুণ্টা গ্রামের শিক্ষিত সমাজ রমণীর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় এবং সকলস্থানের শিক্ষিত সমাজের অনুকরণীয়।—ত্রিপুরাগাইড।

আসামের স্বদেশী-সাধনা।—আসামের লক্ষ্মীপুরের এক মহিলা-সভায় শ্রীযুক্তা রত্নেশ্বরী ফুকনান নাম্নী ৬০ বৎসর বয়স্কা বর্ষীয়সী রমণী তাঁহার পুত্র শ্রীমান শশধরকে নেতৃবর্গের সম্মুখে দেশমাতৃকার সেবার জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, "দেশবাসীর সেবায় আমার পুত্র জেলে গেলে আমি সুখী হইব।" - বীরভূমবাসী।

মহিলা অগ্রসর।—গতকল্য শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও উমেশচন্দ্র গুহের হাজত গমন এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের নামে ওয়ারেন্ট বাহির হওয়ার সংবাদ শুনিয়াই স্বর্গীয় দুর্গাদাস দস্তিদার



যুদ্ধাসুর—"নখ কাট্‌বে না আঙুল ছাঁট্‌বে, বাবা ?"

নখকে যতই কাটিয়া কমানো যাক্ কিছুদিন যাইতেই তাহা আবার বাড়িয়া বড় হয়। নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্সে যুদ্ধসজ্জা কমাইবার যে আয়োজন হইতেছে তাহার পরিণামও এইরকম হইতে পারে। যুদ্ধাসুরকে জব্দ করিতে হইলে তাহার আঙুলের গোড়াসুদ্ধ ছাঁটিয়া ফেলা প্রয়োজন।

মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দস্তিদারের পত্নী শ্রীমতী নিরুপমা দস্তিদার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দলে কাজ করিবার জন্য নাম পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের অন্তঃপুরস্থা কুলমহিলাগণ পর্য্যন্ত যে কত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, এবং স্বেচ্ছাসেবক একদল গেলে যদি উপযুক্ত পুরুষেরা আসিয়া তাঁহাদের স্থান পূরণ না করেন তবে কুলমহিলারা বাহির হইয়া যে তাঁহাদের অপূর্ণ কাজগুলি পূর্ণ করিয়া লইবেন তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ উপস্থিত।—জ্যোতিঃ।

স্বাধীনতার পথে বাধা —

ছোট-জাতের কথা।—দেশে আমরা যত লাঞ্ছনা পেয়ে আসছি, তা আপনাদের অজানা নেই। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার স্নেহের কোলে পালিত আমরা নমঃশূদ্র, পোদ, সাহা, সোনার বেণে ইত্যাদি জাতের ছেলেগুলো—যাদের আগে একই স্কুলে, ভিন্ন বেঞ্চে বস্‌তে হ'ত;—এখনও স্থান বিশেষে অশেষবিধ লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হয়। তাদের ত 'সর্ব্বংসহ' এই বিশেষণটির মান রাখ্‌তে হবে, তাই চুপ করে সয়ে আছি—মা বসুমতীর সত্যিকারই ছেলের মত! কল্‌কাতায় এসে পাঠ্যাবস্থাতে, সকল শ্রেণীর যুবকদের সাথে মিশে



চীন নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে বসুক তাতে জাপানের আপত্তি নেই যদি চীনের মুখে থাকে তালা আর তার চাবিকাঠিটা থাকে জাপানের জিম্মায়।

মনে কতক ধারণা হয়েছে যে, যা হ'ক এখানে হয়ত ঘৃণা বিদ্বেষের হাত হতে নিষ্কৃতি পাব। তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যাও নয় যে, যুবকেরা বাস্তবিকই হৃদয়বান্; কিম্বা হয়ত আমারই সৌভাগ্য যে, আমি হৃদয়বান বন্ধুরত্ন পেয়েছি।

যাক্ সে কথা, যা বল্‌তে বসেছি তাই বলি। শুনলুম আমার বন্ধু—জাতিতে সোনার বেণে, Bengal Technical Instituteএ পড়ে। সে আছে ৪২ সুকিয়াতে—ঐ স্কুলেরই একটা মেসে। মেসটা খুলেছে প্রায় মাসখানেক; এর ভেতর কোন কথা ওঠেনি। আজ শুনলুম কর্ত্তৃপক্ষের কোন উচ্চজাতীয় !) ব্যক্তি বলেছেন যে নিম্নজাতির ছেলেকে ভিন্ন ঘরে খেতে দেওয়া হবে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। বন্ধুটির সাথে কর্ত্তৃপক্ষের বেশ বিবাদ চলেছে। বন্ধুটি বলেছেন, এতদিন

খেয়ে এসেছি তাতে জাত যায় নি, আর এখন যাবে?……বন্ধুবর পূর্ব্বে হিন্দু হোষ্টেলে ছিল ; সেখানে কোন গণ্ডগোল হয়নি! নমঃশূদ্র, সাহা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নজাতির ছেলেরা ত স্কটিশ হোষ্টেলে, প্রেসিডেন্সী, কি রিপন, বিদ্যাসাগর সকল স্থানেই অল্লাধিক পরিমাণে আছে। তারা কি করবে? ভয়ে ভয়ে ইন্দুরের গর্ত্তে লুকোবে নাকি? হায়রে যেখানে একগাছা পৈতা গলায় দিয়ে যে-সে বামুন ঠাকুর বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, সেই কলকাতায় আবার জাত্যভিমান!

* * *

এই সঙ্কীর্ণতা কি যাবে না? এতকাল ছোটজাত ভাবতে ভাবতে আমরাও যে বাস্তবিকই ছোট হয়ে যেতে বসলুম। এর কি কোন প্রতিকার নেই? হাঁড়ির ভেতরে ঢোকা জাতটাকে ভেঙ্গেচুরে চুরমার করে দিতে পারে এমন উদার কি কেহ এ অভাগ্য দেশে জন্মাবে না? এদেশে কি রামমোহন, বিবেকানন্দ পথ ভুলে এসেছিলেন?

মানুষের ভেতর যে ভগবান আছেন একথাটা অস্বীকার না করলেও স্বীকার করার মত সাহস ও বুকের পাটা যে বেশী মানুষের আছে, এই হতভাগ্য বাংলা দেশে তা বিশ্বাস হয় না। ইতি

কলিকাতা।　　　জনৈক নমঃশূদ্র ছাত্র।

—বিজলী।

—সেবক।



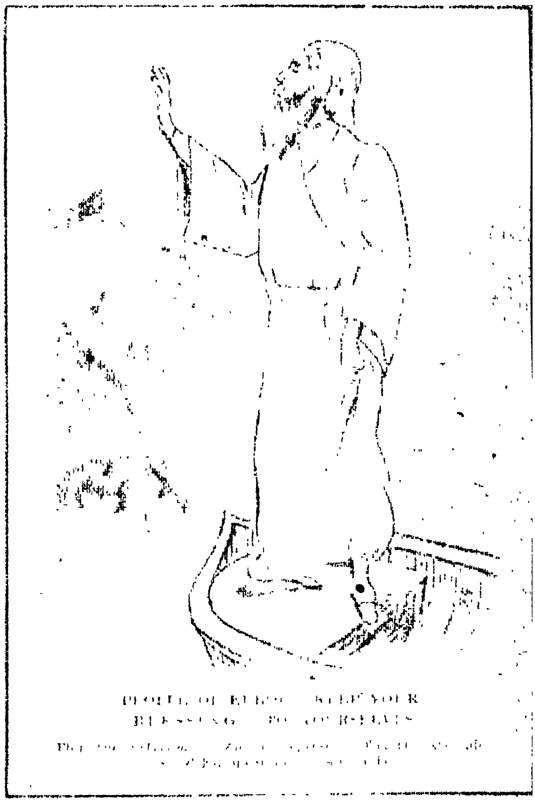
চীন—ওহে শামু খুড়ো! এটা কি তোমাদের ধোপা পঞ্চায়েৎ নাকি—যত ময়লা কাপড়ের মোট আমারই ঘাড়ে!

ভারতবর্ষ

মালাবারের অন্ধকূপ

'এসোসিয়েটেড প্রেস' ২০শে নবেম্বর কোইম্বাটোর হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন,—মালাবারে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তিরুর হইতে একশত-এক মোপলা বন্দীকে মাল-গাড়ীতে পুরিয়া রায়বেরিলিতে পাঠানো হইয়াছিল। গাড়ীর ভিতর দমবন্ধ হইয়া তাহাদের ভিতর ৬৪ জন মারা গিয়াছে।

এই ৬৪ জন মোপলা বন্দীর মৃত্যু-কাহিনী লইয়া ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে আন্দোলন নিতান্ত কম হয় নাই। সেইজন্যই হোক্ অথবা চিরন্তন প্রথা অনুসারেই হোক্, সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই কমিটির তদন্তের খবর বাহির হইয়াছে।



রবীন্দ্রনাথ—ওগো যুরুপী, তোমাদের ভালো তোমাদেরই থাক!

এই তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে,—যে মালগাড়ীতে করিয়া বন্দীদিগকে পাঠানো হইয়াছিল সেখানি বিভক্ত ছিল তিনটি কুঠরীতে। প্রত্যেক কুঠরীতে স্বতন্ত্র দরজা ছিল। কিন্তু এই দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিলে বাতাস চলাচলের জন্য একটি করিয়া অপরিসর ফুকর ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফুকরগুলিরও আগাগোড়া ছিল আবার ঘন লোহার জাল দিয়া ঢাকা। গাড়ীখানি পরীক্ষা করিয়া পল্টনের সৈন্যদলের সিনিয়ার মেডিক্যাল অফিসার কাপ্তেন পি এম মাথাই, আই-এম এস্ বলিয়াছেন, "এরূপ গাড়ীতে লোক পাঠানো ব্যাপার কিছুতেই চলিতে পারে না—ফুকরের সমস্ত জাল খুলিয়া ফেলিলেও তাহা সম্ভবপর নহে।"

বাতাস যেখানে নাই সেখানে জলতৃষ্ণা নিদারুণ হইয়া উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বন্দীরা পুনঃ পুনঃ করুণ কাতর কণ্ঠে জল ভিক্ষা করিয়াছে—প্রহরীরা সে-সব কথা শুনিয়াও শোনে নাই। তাহাকে

কাতর প্রার্থনা কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত উপেক্ষিত হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে আয়নাই তালুকের এমন একজন লোক, যাহার ঘর বাড়ী ধন সম্পদ সমস্ত লুণ্ঠিত হইয়াছে এই মোপ্‌লা বিদ্রোহীদের দ্বারা। কি অসহ্য পিপাসার যন্ত্রণা তাহারা সহ্য করিয়াছে, পারেপলাল ইস্মাইল নামক একজন বন্দীর কথায় তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিয়াছে,—প্রথম ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই জলের জন্য চীৎকার করা হয়। সকলেই জলের অভাব ভীষণ ভাবে অনুভব করিতেছিল। ক্রমেই তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিতে থাকে। পরের ষ্টেশনেও তাহারা চীৎকার করিয়া বলে, তাহাদিগকে জল দেওয়া না হইলে তাহারা মারা যাইবে। এত অনুনয় বিনয় কাতরতার বিনিময়ে একজন আসিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া যায়, এসমস্তই তাহাদের অরণ্যে রোদন হইতেছে। পদান্নুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে কিছুতেই দরজা খোলা হইবে না। ঘামে



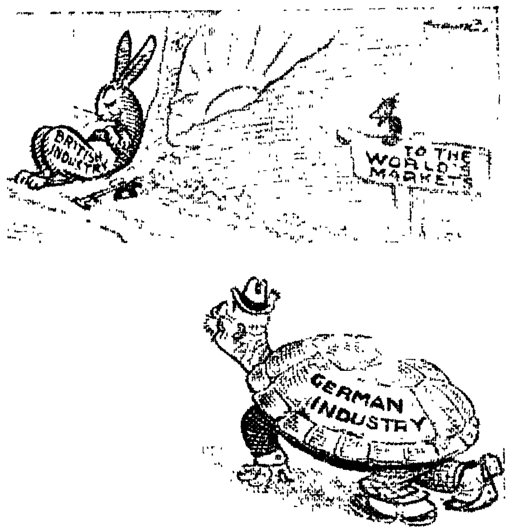
যুদ্ধে কে জয়ী হইল ?

যে ভাব্‌ছে—সে। যার ধারণা—সে। যে জানে—সে।
(ইংলণ্ড) (আমেরিকা) (ব্যবসাদার)

তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছিল। অনেকে তৃষ্ণার জ্বালায় সেই ঘর্ম্ম-নিসিক্ত ন্যাক্‌ড়াগুলি মুখে পুরিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। গাড়ীতে বাতাসের চলাচল একেবারেই ছিল না। বন্দীরা জালটি ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে সক্ষম হয় নাই। ক্রমে তাহাদের দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি লোপ পাইয়া যায়। তখন একজনের উপর আর একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া মোপ্‌লা বন্দীরা মারা গিয়াছে।

জল জোগানো কঠিন বলিয়াই যে রক্ষী সেনাদল এত নির্লিপ্ত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার কোনো হেতু নাই। কারণ ওলডাকটের এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার মিঃ টি আর শ্রীনিবাস আয়ার একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন, জল চাহিলে তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই মিলিতে পারিত। ছেলের কোলের উপর লাথ মারা গিয়াছে—সে বাতাসের প্রার্থনা করিয়া ধমক খাইয়াছে; মৃত্যু-বিহ্বল কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা থামাইবার জন্য গুলি করার ভয় দেখানো হইয়াছে—এসব কথা অনেক সাক্ষ্যে এমন ভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে সংশয়ের আর অবকাশ নাই।

এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রিকা বলিয়াছেন, "ব্রিটিশ শাসনের ছদ্মবেশে এই ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার মত ইংরেজের ললাটেও একটা দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছে। এই ব্যাপারটির জন্য যে দায়ী তাহাকে এই মুহূর্ত্তে খুঁজিয়া বাহির করা উচিত এবং বিচার করিয়া তাহাকে ফাঁসী দিতে দেরী করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। যে ন্যায়-বিচারের আমরা গর্ব্ব করি ভারতে সে গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।"



জগতের বাজারে দৌড়ের বাজি

ব্রিটিশ-বাণিজ্য শশকের মতন দ্রুতগামী হইলেও আত্মম্ভরিতায় অসতর্ক নিদ্রালস; জার্ম্মাণ-বাণিজ্য মন্থরগামী হইলেও নিরলস সদা-চলিষ্ণু; সুতরাং জয় শেষে জার্ম্মাণেরই অবশ্যম্ভাবী।

তদন্তে ঘটনাটির ইতিহাস প্রকাশ হইয়াছে। ইহার ফল কি হইবে তাহা আমরা জানি না। তবে 'অর্দ্ধ-সভ্য' 'অখৃষ্টান' সিরাজ-দ্দৌলার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল 'সভ্য' 'খৃষ্টান' ব্রিটিশ রাজত্বেও তাহা অসম্ভব নহে এই ব্যাপার হইতেই তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস এখনো কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যাকে অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রহণ করে নাই, কখনো করিবে কি না তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু তাহার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার জন্য ইংরেজ মর্ম্মরস্তম্ভ গড়াইয়াছেন। মালাবারের এই অন্ধকূপ সভ্য জগতের চোখের উপর ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহার স্মৃতিকে অক্ষয় করিবার জন্য মর্ম্মর-মঠ না গড়াইলেও তাহা অক্ষয় হইয়াই থাকিবে এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস

ঝরিয়ায় 'ট্রেড ইউনিয়ন' কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছিল। এই সভায় সভাপতির আসন অধিকার করিয়াছিলেন মিঃ জোসেফ, ব্যাপ্টিষ্টা। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:—

(১) ভারতীয় শ্রমজীবীদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সেজন্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে।

(২) বাংলা এবং বিহার প্রদেশের কয়লার খনির স্বত্বাধিকারীদিগকে অনুরোধ করা হইবে,—মজুরদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দুর করিবার জন্ত। তাঁহাদিগকে মজুরদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে মজুরদিগকে যতটা সময় খাটিতে হয় তাহার পরিমাণ কিছু কমাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মজুরীর হারও বাড়াইয়া দিতে হইবে। তাহাদের বাসের ভালো ব্যবস্থা এবং লেখাপড়া শিক্ষার সুবিধা না করিয়া দিলে চলিবে না। খনির মজুরেরা যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে আহত হয় তবে তাহাদের চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইসমস্ত ব্যাপার যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সেজন্য 'ট্রেড ইউনিয়নে'র কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা খনির স্বত্বাধিকারীদের সহিত আলোচনা করিবেন।

(৩) ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসীগণ স্বরাজ্য লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন এবং ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশন ঝরিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্ত গবর্ণমেণ্টে তাহাদের দরখাস্তও পেশ হইয়াছিল। কংগ্রেস এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের এই কাযের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই প্রতিষ্ঠান দুইটির মতিগতি ভালো নহে, তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত; নতুবা মনিব ও মজুরদের ভিতর একটা সম্পদায়গত রেষারেষির ভাব জাগিয়া উঠা কিছু মাত্র অসম্ভব নহে।

সভাপতি মিঃ ব্যাপ্টিষ্টা তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা ভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মীমাংসা অসম্ভব। অনেকে হয়তো মনে করেন, স্বরাজ লাভের পূর্ব্বেই স্বদেশীতে জয় লাভ করা যাইবে। স্বদেশী ছাড়া স্বরাজ লাভ অসম্ভব না ও হইতে পারে কিন্তু স্বরাজ ছাড়া স্বদেশীতে জয় লাভ সম্পূর্ণই অসম্ভব। স্বদেশীতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে শুল্কের উপর অধিকার চাই-ই চাই। এই শুল্কের উপর অধিকার, স্বরাজ না পাইলে লাভ করা যায় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্বরাজকেই লাভ করিতে হইবে। * * * * এদেশের শত করা ৯০ জন লোক শ্রমজীবী, এবং রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগ আদায় হয় এই শ্রমজীবীদের নিকট হইতে। এ অবস্থায় মজুরদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য বিলাতের ন্যায় এখানেও মজুর মন্ত্রী-সভা গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। * * * * বাগাড়ম্বর বা অস্ত্র-শক্তির দ্বারা ইংলণ্ড ভারতকে অধীনে রাখিতে পারেন। কিন্তু যদি মহাত্মা গান্ধীর আত্মশক্তি পরাজিত হয় তবে পাশব শক্তি প্রয়োগের জন্য ভারতবর্ষে দশ সহস্র গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

*

হরতাল ও তাহার জের

গত ১৭ই নবেম্বর প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌স্ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিয়াছেন। অসহযোগ-পন্থীরা মনে করেন—তাঁহার এই আগমনের সঙ্গে আমলা-তন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য তাঁহার অভ্যর্থনাকে বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা সেদিনটাকে হরতালের বিশেষ দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই সেদিন হরতাল করা হইয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলেই অসহযোগীদের এ প্রচেষ্টা আশাতীত রকম সাফল্য লাভ করিয়াছে।

অন্তান্ত স্থলে এই হরতালের ব্যাপারটা যেরূপ সহজে মিটিয়া গিয়াছে বোম্বাই সহরে কিন্তু তত সহজে মেটে নাই। সেখানে ইহা লইয়া হিন্দু-মুসলমানের সহিত পার্শী ও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গায় বহু লোকের প্রাণ তো বিনষ্ট হইয়াছেই, নারীদের সম্মানও রক্ষিত হয় নাই। তাহা ছাড়া পুলিসের গুলি বোম্বাই সহরে কয়েকদিন ধরিয়া রীতিমত ভাবেই চলিয়াছিল।

এই ব্যাপারে পার্শী ও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় একেবারে নির্দ্দোষ এবং অসহযোগীরাই সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে একথা বলা যায় না। তথাপি একথা ঠিক, সমস্ত অসহযোগীই যে নিছক নিরুপদ্রব আন্দোলনের উপাসক নহেন এই ব্যাপারে তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তন—বোম্বাইয়ের ঘটনার পর হইতেই গবর্ণমেণ্টের নীতির হঠাৎ বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাঁহারা একেবারে 'মার মূর্ত্তি' ধারণ করিয়াছেন। এবার দলন-নীতির পথে বাংলাই সম্ভবতঃ সকলের অগ্রদূত। পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন মাত্র। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সভা-সমিতি, ভলাণ্টিয়ারদের প্রচার কার্য্য এবং পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য নানারূপ ইস্তাহার প্রত্যহ জারী করা হইতেছে। গবর্মেণ্টের এই ইস্তাহার যে কেবলমাত্র ফাঁকা আওয়াজ নহে, একেবারে গোটা ভরা, তাহা বোঝা আজ নিতান্তই সহজ। প্রতিদিন নেতাদিগকে এবং ভলাণ্টিয়ারদিগকে জেলে পুরিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতার বহরটা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না। লাহোরে সন্তানম, সর্দ্দার মেহ্‌তাব সিং ও লালা লাজপত রায়কে তাঁহারা জেলে পুরিয়াছেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রায় সপরিবারেই কারারুদ্ধ, এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সভাপতি পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন গ্রেপ্তার হইয়াছেন, আসামের নেতা শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ বরদোলাইকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাংলাদেশের ব্যাপার আরো চমৎকার—এখানে রমণীরাও কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃবর্গ ধৃত হইয়াছেন। প্রত্যহই গ্রেপ্তারের মরশুম চলিতেছে।

কংগ্রেস কমিটি—বোম্বাইয়ের ব্যাপারের পর কংগ্রেস-নেতারাও তাঁহাদের গতিপথের অনেকটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আইনভঙ্গের প্রস্তাবটা যে ভাবে চালাইবেন বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন অতঃপর তাহা আর সে ভাবে চলিবে না। স্বেচ্ছাসেবকদেরও আইন কানুনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—তাহা যথেষ্ট রকমেই কড়া করিয়া তোলা হইয়াছে। এইতো তাঁহাদের নিজেদের ব্যবস্থা, গবর্ণমেণ্টকেও তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, তাহাও ন্যায়ের পথ নহে—তাহাও অন্যায়, সুতরাং তাঁহাদের অন্যায় আদেশ মানিয়া চলাও আর চলিবে না।

দেশের নেতারা এবার প্রকাশ্যভাবেই গবর্ণমেণ্টের জবরদস্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদের নিরুপদ্রব বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহা যে তাঁহাদের পক্ষেও কেবল ফাঁকা আওয়াজ নহে—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিদিন নির্ব্বিবাদে শত শত লোক কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইতেছে।

এই আন্দোলনে এবার একটি নূতন ব্যাপার ভালো করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেটি হইতেছে—এ আন্দোলন এখন আর কেবল পুরুষের আন্দোলন নহে—ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের আন্দোলন। রমণীরা তাঁহাদের নিভৃত নীড়টি পরিত্যাগ করিয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে একান্ত



বদ্ অভ্যাসের ফল

লেনিন—সব যে টপ্‌টপ্ মর্‌ছে—এ বদ্ অভ্যাসের ফল—উপবাস এদের এখনো অভ্যাস হয়নি দেখ্‌ছি।

রুষিয়ায় দুর্ভিক্ষক্লেশের একশেষ হইয়াছে।

অকুতোভয়েই পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভারতবর্ষের এ যুগের ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণই নূতন।

দেশের ভয় যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এই-সব দেখিয়া তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা শুভ লক্ষণ। কারাভয়, মৃত্যুভয়, দুঃখভয় প্রভৃতিই স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায়। এইসব ভয় যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে এ জাতি অচিরে স্বাধীনতা পাইবেই একথা জোর করিয়াই বলা চলে।

*

বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা

রমণীদের ভোটের অধিকার—বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের রমণীদের ভিতর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার লইয়া এবার আন্দোলনের অত্যন্ত তাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সভা-সমিতি করিয়া রমণীরা তাঁহাদের অধিকারের দাবী পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা কাউন্সিলের ভাগ্যবিধাতাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত দেবকীপ্রসাদ সিংহ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া ভোটের দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। বিহার এবং বাংলা গায়ে গায়ে লাগানো দেশ, সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার এই ব্যবস্থায় বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

রাজনৈতিক বন্দী—এ দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সাধারণ কয়েদীদের মতই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। চোর, ডাকাত, খুনীর সহিত যাহারা দেশকে মুক্তি দিবার জন্য সকল রকম দুঃখকে বরণ করিয়া লয় তাহাদের কোনো তফাৎ রাখা হয় না। কোনো সভ্য দেশ এ ব্যবস্থা অনুমোদন করে না এবং করা যে উচিত নহে তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়। গত ২৪শে নবেম্বর বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় এই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি বিলাতে যেরূপ ব্যবহার করা হয় এখানে তদনুরূপ ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ অনুরোধ কাজে কতদূর ফল প্রসব করিবে তাহা বলা কঠিন। হয় ত অনুরোধের কোঠা ছাড়াইয়া বাস্তবের কোঠায় ইহা কোনোদিনই পৌঁছিতে পারিবে না। কিন্তু তথাপি কাউন্সিলের এই প্রচেষ্টা যে সঙ্গত, সময়োপযোগী এবং অন্যান্য প্রদেশের কাউন্সিলগুলির অনুকরণযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

*

মহিলার ওকালতি ব্যবসা

কুমারী সুধাংশুবালা হাজরা, বি-এল বিহারে ওকালতি করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পাটনা হাইকোর্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুধাংশুবালার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিবার আর কোনো কারণ নাই—ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে, তিনি রমণী—পুরুষ নহেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী রেজিনা গুহের আবেদনও এই কলিকাতা হাইকোর্টে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই দুইটি প্রদেশ নারীদিগকে তাহাদের কোনো ন্যায্য অধিকার প্রদান করিতেই রাজি নহে। অথচ অন্যান্য কোনো প্রদেশেই রমণীদের সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি নাই। এলাহাবাদ হাইকোর্ট অতি সহজেই শ্রীমতী কর্ণেলিয়া সোরাবজীকে আইনের ব্যবসা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বাংলা এবং বিহারকে পিছনে রাখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি যে দ্রুতগতি আগাইয়া যাইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ইজিপ্ট

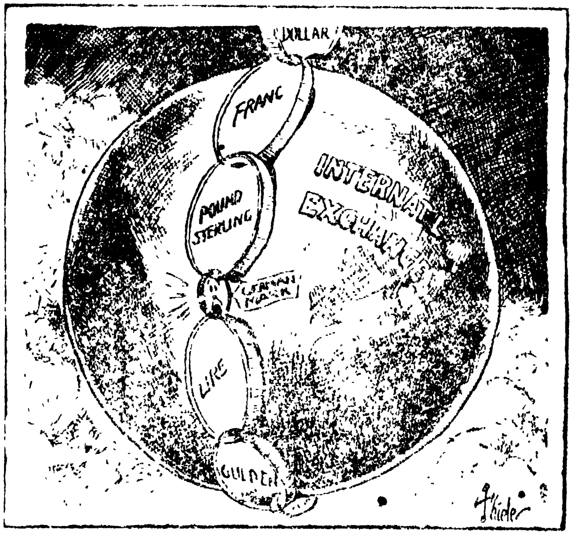
আদ্‌লী পাশা বড় আশা করিয়া ইংলণ্ডে রফা-নিষ্পত্তি করিবার জন্য গিয়াছিলেন। কিন্তু আবেদন নিবেদনের অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা তাহাই ভাগ্যে জোটাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইংরেজের দয়ার দান মিশরের মডারেট প্রতিনিধিরও মনঃপূত হয় নাই। ইংরেজপক্ষ আদ্‌লী পাশার নিকট রফা নিষ্পত্তির সর্ত্ত-সকলের যে খসড়া পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের অসীম দয়াতে ইংরেজ আশ্রিত রাজ্য হইতে মিশরকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তবে একজন ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি 'হাই কমিশনার' রূপে মিশরে থাকিবেন এবং ইজিপ্ট গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ দরবারের অনুমতি ভিন্ন অন্য কোনও রাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। সুদানে ইংরেজ শাসনকর্ত্তা থাকিবেন কিন্তু সেখানকার সামরিক ব্যয়-ভার আংশিকরূপে ইজিপ্ট গবর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হইবে। যে-সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী মিশর-সরকারে কাজ করিতেন তাঁহারা কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে তাঁহাদের ক্ষতি-পূরণ করিতে মিশর দরবার বাধ্য থাকিবেন এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের প্রতি মিশর-দরবারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আদ্‌লীর



গতস্য শোচনা

লেনিন দুর্ভিক্ষমৃতদের দেখিয়া স্বকৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করিতেছেন।

দল বলেন যে এই সকল সর্ত্তে অঙ্গীকার বদ্ধ হইলে ইংরেজকে মিশরের অভিভাবক স্বীকার করা হয়। এই স্বীকারোক্তি স্বাধীনতার অনুকূল নহে।" আবার অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সহিত সন্ধি করিবার স্বাধীনতা না থাকা এবং পররাষ্ট্র-ব্যাপারে ইংরেজের একান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা স্বরাট্ ইজিপ্টের পরিপন্থী। ইংরেজ-দরবার আবার সামরিক কতকগুলি সুবিধা আদায় করিয়া লইতে চাহেন। ভারতবর্ষ ও প্রশান্ত মহাসাগরে আসিবার দ্বারস্বরূপ সুয়েজ খাল অবস্থিত, ইহাকে সুসংরক্ষণের জন্য সৈন্যাবাসস্থাপন ইংরেজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সুয়েজের আশেপাশে থাকিবার উপযোগী বড় সহর এবং সৈন্যদের আমোদ আহ্লাদের আনুষঙ্গিক বিলাস-উপাদান প্রচুর পরিমাণে না থাকাতে মিশরের রাজধানী কাইরো এবং প্রধান বন্দর আলেকজান্দ্রিয়াতে সৈন্যাবাসস্থাপনের অধিকার ইংরেজ দরবার মিশরের নিকট আদায় করিতে চাহেন। আদ্‌লী পাশা কিন্তু তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না। মিশরের রাজধানীতে ইংরেজ সৈন্যাবাস থাকিয়া যাইলে মিশরের আত্মশ্লাঘায় আঘাত লাগিবে। আর রাজধানী এবং প্রধান বন্দরে এত বড় সৈন্যাবাস থাকা সে রাজ্যকে করতলগত রাখারই নামান্তর মাত্র। ইংরেজ দরবারের পক্ষ হইতে লর্ড আলেন্‌বি বলেন যে



শৃঙ্খলের বল তার প্রত্যেক বলয়ে

পৃথিবী জোড়া মুদ্রা বিনিময়ের ব্যাপারে এক দেশের মুদ্রা হীন অল্পমূল্য হইয়া পড়িলে ক্ষতি হয় সকলেরই যেমন শৃঙ্খলের একটি বলয় কমজোর হইলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রাচ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং মিশরের ভিতর দিয়া প্রাচ্য সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ এতাবৎকাল এত সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে যে মিশরকে ইংরেজ নিজ সাম্রাজ্যের অংশরূপেই দেখিয়া আসিয়াছেন। মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও প্রাচ্য সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে মিশরের উপর কতকটা প্রভুত্ব ইংরেজকে রাখিতেই হইবে। সৈন্যাবাস, বন্দর, বায়ুপথ প্রভৃতির উপর কতকটা ক্ষমতা ইংরেজের প্রয়োজন। মিশর যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ চিন্তা না করিয়া ইংরেজ-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া উগ্র জাতীয়তার উপাসক হন তাহা হইলে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই জাতীয়তারূপ ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইবে। আদ্‌লী প্রত্যুত্তরে বলেন যে ইংরেজ প্রার্থিত অপ্রতিহত সামরিক প্রভুত্ব এবং বিচার এবং ব্যয় বিভাগের উপর আংশিক প্রভুত্ব প্রদান করিতে তিনি কখনই সম্মত হইতে পারেন না। ইহা মিশরের জাতীয় সম্মানের হানিকর। আদ্‌লীর দল অন্ততপক্ষে এই কয়েকটি অধিকার দাবী করেন :-(১) মিশরের স্বাধীনতা ও অধিবাসীদিগের স্বরাজ্য (sovereignty) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। (২) সুদানের উপর মিশরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কেননা সমগ্র নাইল উপত্যকা একটি অখণ্ডনীয় ভূখণ্ড। নদীমাতৃক মিশরের

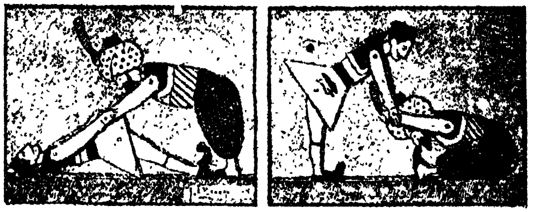
প্রাণরূপী নাইল নদ ; সেইজন্য মিশরের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া এই নদকে না রাখিতে পারিলে মিশরের চলে না। মিশর নাইল নদের কর্তৃত্ব অন্য কোনও শক্তিকে ছাড়িয়া দিতে রাজি নহে। (৩) ইংরেজ সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রাখিবার সুবিধার জন্য সুয়েজ খালের আশেপাশে ইংরেজের সামরিক প্রভুত্ব বজায় রাখিতে মিশর রাজী আছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত কোনও সামরিক সুবিধা করিয়া দেওয়া মিশরের পক্ষে অমর্য্যাদাকর বলিয়া মিশর রাজী নহে। (৪) ইউরোপীয় অধিবাসীবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও বিশেষ প্রতিশ্রুতিও মিশর দিতে রাজী নহে। কারণ এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া মিশর অগৌরবকর মনে করে। ইউরোপের উদাঙ্গের রাষ্ট্রশাসন প্রণালী অনুযায়ী শাসন প্রণালীতে মিশর অনেকদিন হইতেই শাসিত হইয়া আসিতেছে এবং ইজিপ্টের অধিবাসীবৃন্দ আতিথেয়তা ও ঔদার্য্যে পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি হইতে ন্যূন নহে। কাজেকাজেই এরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

আদলী পাশার এই-সকল ন্যায়সঙ্গত দাবী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিবর্গ স্বীকার করিতে রাজী নহেন। সৈন্যদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস উপভোগের জন্য যখন মিশরের রাজধানীতে সৈন্যাবাস থাকাই সুবিধা তখন সে স্থান ছাড়িয়া সুয়েজের মরুভূমিতে সৈন্যাবাস স্থাপন করিতে ইংরেজ নারাজ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুবিধার জন্য ইজিপ্টের স্বাধীনতা-গর্ব্ব যদি একটু ক্ষুণ্ণ হয় তাহা হইলেও মিশরের সেটুকু সহ্য করা উচিত বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। আর মিশরের মত প্রাচ্যজাতির পাশ্চাত্যজাতির সমকক্ষতা চাওয়াই অন্যায়। ইংরেজের তাঁবেদারীতে থাকিয়া পররাষ্ট্রতন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু "প্রাচ্যের লোকদিগের মধ্যে সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অভিলাষী এক প্রকার সংকীর্ণ জাতীয়তা উগ্ররূপে দেখা দিয়াছে ;" তাহা যাহাতে মিশরে সংক্রামিত না হয় সেইজন্য লর্ড অ্যালেনবি 'মার্শাল ল' বা সামরিক আইন প্রভৃতি জারি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া এই "উগ্র জাতীয়তার বিষ" মিশরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই আদলীর মত নরম-পন্থীরাও গরম হইয়া ইংরেজ প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনায় ভঙ্গ দিয়াছেন। আদলী-পাশা মিশরের স্বাধীনতাপ্রয়াসী দলের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জগ্‌লুলের দল তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। জগ্‌লুল মিশরের স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। "হয় স্বাধীনতার গৌরব-মুকুট কিম্বা স্বদেশের মুক্তিকামনায় আত্মবিসর্জ্জনের মহিমাময় মৃত্যু" বরণ করিতে সমস্ত মিশরবাসীকে জগ্‌লুল আহ্বান করিতেছেন।

*

স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড

আশানিরাশার সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া বুঝি বা আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল ! বিগত মাসে দিনের পর দিন পরস্পর-বিরোধী সংবাদের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বুঝি বা একটু আশার আলোক দেখা দিয়াছে ! আল্‌ষ্টারের অরেঞ্জ-দল একবার মন্ত্রীসভার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল ; আবার আইরিশ জাতীয়দল রাজার নিকট বশ্যতাস্বীকার লইয়া গোলযোগ করিলেন, এইরূপ নানা গণ্ডগোলের মধ্যে সন্ধি-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে মিলনের সকল আশা-ভরসাই যখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে এমন সময় হঠাৎ সংবাদ আসিল মন্ত্রীসভার সহিত আইরিশ প্রতিনিধিদিগের একটি মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। লর্ড বার্কেনহেড মিলন-সূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। বশ্যতা লইয়াই আইরিশদিগের প্রধান আপত্তি ; কেননা তাঁহাদের মতে বশ্যতার অঙ্গীকারগুলি স্বাধীনতার পরিপোষক নহে। এই একটি ব্যাপারে মিলনের সকল আশা ভাঙিয়া যায় দেখিয়া লর্ড বার্কেনহেড একটি উপায় বাহির করিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা অনুসারে মন্ত্রীসভা আয়ার্ল্যাণ্ডকে "স্বাধীন রাজ্য" বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই সর্ত্তে, যে, আইরিশ রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যকে এই স্বীকারোক্তি করিতে হইবে যে :—"আমি আইন অনুসারে স্থাপিত স্বাধীন আইরিশ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলীকে পালন করিয়া চলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাষ্ট্রের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলাম, এবং যেহেতু আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ ইংলণ্ডের অধিবাসীবৃন্দের সহিত একত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নামধেয় জাতি-সংঘের সভ্য ও প্রজা সেহেতু আমি রাজা



কোন্‌টা সত্য ?

তুর্কীদের দেওয়া যুদ্ধসংবাদ—গ্রীকদের দেওয়া যুদ্ধসংবাদ।

পঞ্চম জর্জ্জ, তাঁহার বংশধর এবং রাজবংশের অন্যান্য ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর আনুগত্য স্বীকার করিলাম।" (Oath of Allegiance to Irish Free State and Fealty to His Majesty the King). মিলনের এই সূত্রটি আইরিশ প্রতিনিধিবর্গ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইল এবং রাজার নিকট গ্রেট ব্রিটেনের প্রজারূপে বশ্যতা স্বীকার করা হইল না বটে কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতির নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়া সাম্রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিবার বন্দোবস্ত এই সর্ত্তে রহিয়া গেল। আল্‌ষ্টার সম্বন্ধেও এই স্থির হইল যে স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজ্যের সহিত মিলিত হওয়া না-হওয়ার শেষ সিদ্ধান্ত এক মাসের মধ্যেই আল্‌ষ্টারকে করিতে হইবে। আল্‌ষ্টার যদি এক মাস পরে আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চাহেন তবে আল্‌ষ্টারের সীমানা পুনরায় স্থির করিবার জন্য একটি সালিসী বসিবে। ফারমানাগ, টাইরোন প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে অধিকাংশ অধিবাসী জাতীয় দলভুক্ত সেই-সকল অঞ্চল স্বাধীন আইরিশ রাজ্যের সহিত যুক্ত হইবে।

সন্ধি-সর্ত্তের প্রথম সর্ত্তানুসারে আইনকানুন শান্তি শৃঙ্খলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য আইরিশ রাষ্ট্রীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার ঘোষণা করা হইল। দ্বিতীয় সর্ত্তে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সহিত আইরিশ পার্লামেন্টের সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় সর্ত্তে ইংলণ্ডের একটি রাজপ্রতিনিধি থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

চতুর্থ সর্ত্তে পূর্ব্বোল্লিখিত বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার আছে।

পঞ্চম সর্ত্তানুসারে আয়ার্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ ঋণের কিয়দংশ গ্রহণে সম্মতি জানাইয়াছেন। যুদ্ধ-ঋণের পরিমাণ স্থির করিবার ভার কোনও ইংরেজের হাতে দিতে আইরিশদল স্বীকার না করাতে উহা স্থির করিয়া দিবার ভার একজন নিরপেক্ষ ঔপনিবেশিক বিচারকের হস্তে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষই সম্মত হইয়াছেন। আরও অনেকগুলি সর্ত্ত এই সন্ধিপত্রে আছে। যতদিন পর্য্যন্ত না আয়ার্ল্যাণ্ড তাহার আত্মরক্ষার উপযুক্ত নৌবহর গড়িয়া তুলিবেন ততদিন পর্য্যন্ত আইরিশ উপকূল রক্ষণা-

বেক্ষণের ভার ইংলণ্ডের উপর থাকিবে। সামুদ্রিক মৎস্তের ব্যবসায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর শুল্ক এবং নৌবহর প্রভৃতির ভার উপযুক্ততা অনুসারে ইংরেজদিগের নিকট হইতে লইয়া আইরিশদিগের উপর দিবার জন্ত প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর উভয়পক্ষের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া আলোচনা করিবেন। আইরিশগণ সামরিক বিভাগের ভার সম্পূর্ণ নিজ হস্তে পাইবেন। কেবলমাত্র ইংরেজদিগকে বন্দরে কতকগুলি সুবিধা করিয়া দিবেন এবং যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রয়োজনানুসারে বিমান-বহরের জন্ত বায়ুপথ ও সৈন্ত সরবরাহের জন্ত স্থলপথে স্বাধীন যাতায়াত ও ছাউনি স্থাপনের সুবিধা করিয়া দিবেন। যেসব ইংরেজ কর্ম্মচারী আয়ার্ল্যাণ্ডে নিয়োজিত আছেন তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হইলে কিম্বা কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইলে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

মোটামুটি সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলি এই। ইংরেজপক্ষে লয়েড জর্জ্জ, লর্ড বার্কেনহেড, অষ্টেন চেম্বারলেন, উইনষ্টন চার্চ্চিল, স্যার এল, ওয়ার্দ্দিংটন ইভান্স, স্যার হ্যামার গ্রিনউড এবং স্যার গর্ডন হিউয়ার্ট এবং আইরিশ পক্ষে গ্রিফিথ, বার্টন, কলিন্স, ড্গান এবং গাভান ডাফি সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়াছেন।

এই সংবাদ পাইয়া আশা হইয়াছিল যে বহু যুগের এই বিরোধ বুঝি বা শেষ হইল, আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু আবার ঝড়ের সূচনা হইয়াছে। আইরিশ মন্ত্রীসভার অধিবেশনে ডি ভ্যালেরা জানাইয়াছেন যে এই-সকল সর্ত্ত গ্রহণ করিতে ডেল আইরিয়েনকে অনুরোধ করিতে পারিবেন না। আনুগত্য স্বীকার করিতেও তাঁহার আপত্তি আছে। পররাষ্ট্র বিভাগ ও আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা বিভাগের মন্ত্রীদ্বয়ও তাঁহার সহিত এবিষয়ে একমত। ইঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার অভিলাষী; পূর্ব্ব হইতে কোনও অঙ্গীকার করিতে ইঁহারা রাজী নহেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইতে স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইঁহারা অনুরোধ করিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কোনও সর্ত্ত স্বীকার করিয়া (qualified) সর্ত্তবদ্ধ স্বাধীনতা ইঁহারা লইতে প্রস্তুত নহেন। ডেল আইরিয়েন কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন দেখা যাউক। সেই সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে শান্তি না যুদ্ধ ?

* শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায়।

[এই সংখ্যার ব্যঙ্গচিত্রগুলি, স্টার ম্যাধিউ এ্যাডামস্ সার্ভিস, টাকোমা লেজার, সাটুল্ টাইম্স্ নেবেলস্পাটের (টহুরিক্), লণ্ডন ডেলি এক্সপ্রেস্ প্রভৃতি হইতে গৃহীত।]

হিসাব-নিকাশ

আজকে হিসাব নিকাশ দেওয়ার সাঁজে
বক্ষে আমার কি এক ব্যথা বাজে।
দেনা-লেনার খস্‌ড়া-খতেনগুলি,
খরচ জমা সব রেখেছে তুলি'।
কিন্তু তাতে বাদ পড়েছে কি যে,
স্পষ্ট করে বুঝতে নারি নিজে।
কোন্ ছেলেটি পয়সা নাহি দিয়ে
চাইলে পুতুল, ধমকে দিলাম গিয়ে;
কাঁচুমাচু মুখখানি তার কেন
পড়ছে মনে, কর্‌ছে ব্যাকুল হেন ?
কোন্ ভিখারী হাত বাড়ালে আসি',
দিলাম তারে উপেক্ষারি হাসি;
তার সে শীতল শীর্ণ করতলে
মুক্তা ঢালে গোপন আঁখিজলে।
কাছ দিয়ে কোন্ বন্ধু গেছে ডেকে
অভ্যর্থনা পায়নি দোকানী থেকে।
কাজের ভিড়ের গর্ব্বে অভিমানে,
কতই কথা পশ্‌লো না মোর কানে।
চোখের কাছে ঝর্‌লো আঁখি-ধারা
তন্ময়তায় দিইনি তাদের সাড়া।
আজকে হিসাব নিকাশ দেওয়ার সাঁজে
বক্ষে আমার কি এক ব্যথা বাজে।
কয়লা তুলে ভাব্‌ছি এখন মনে
হীরার কণা রইলো গুঁড়ার সনে।
ছিলাম ভুলে বাদ্যকরের দলে,
সাম্‌নে দিয়ে দেব্‌তা গেছে চলে।
দিন কাটালেম শুক্তি বৃথায় ধরে'
হাত পিছ্‌লে মুক্তা গেছে পড়ে'।
মর্‌ছি যখন বৃথায় পাঁজি ঘেঁটে
মহেন্দ্র-খণ তখন গেছে কেটে।
স্নান করিনি অর্দ্ধোদয়ের যোগে,
কাট্‌লো বেলা দোকান-দারীর ঝোঁকে।
আজকে হিসাব নিকাশ দেওয়ার সাঁজে
বক্ষে আমার কি এক ব্যথা বাজে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিবিধ প্রসঙ্গ

নেতাদের কারাবাস

কংগ্রেস্ ও খিলাফৎ দলভুক্ত ভারতবর্ষের সমুদয় মুসলমানের প্রধান নেতা মৌলানা মোহম্মদ আলী ও মৌলানা শৌকৎ



মৌলানা মোহম্মদ আলী।
মিঃ মহতাবসিং এস্ সাহানী, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

আলী ধৃত ও কারারুদ্ধ হইবার পূর্বেও উক্ত দুই দলের অনেক লোক ও নেতা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব ইহাঁদের সমান ছিল না। প্রধান প্রধান নেতাদিগকে দণ্ডিত করিবার নীতির সূত্রপাত তাঁহাদের গ্রেপ্তার



মৌলানা শৌকত আলী।
মিঃ মহতাবসিং এস্ সাহানী, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

হইতেই আরব্ধ হয়। তাহার পর নানাপ্রদেশের নেতারা ধৃত ও কারারুদ্ধ হইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে লালা লাজপৎ



মৌলানা শৌকত আলী। শ্রীশঙ্করাচার্য্য। মৌলানা মহম্মদ আলী।
ডাক্তার কিচ্‌লু।
মিঃ মহতাবসিং এস্ সাহানী, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

রায় প্রভৃতি পঞ্জাবী নেতা গবর্ণমেণ্টের হুকুম অমান্য করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে আইনজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের হুকুম ছিল, অনুমতি না লইয়া পাব্লিক মীটিং অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ্য সভা কেহ করিতে পারিবে না। তাঁহারা পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটীর সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাকে পাব্লিক্ মীটিং বলা যায় না। যাহা হউক, তাঁহারা একারণে বন্দি ধৃত না হইতেন তাহা হইলেও, অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের নেতাদের মত ভলণ্টিয়র দল গঠন ও তাহার সভ্য হওয়ার জন্য পরে ধৃত হইতেন।

যে-ভাবে ও যে-যে নামে ভলাণ্টিয়র দল গঠন ও ভলাণ্টিয়র হওয়া বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, সেরূপ কোন দল গড়িয়া তাহার সভ্য কেহ বা কতগুলি লোক হইয়াছিল বা হয় নাই, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ, নামে না হউক, কার্য্যতঃ কংগ্রেস ও খিলাফৎ দলের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা কতকগুলি লোক করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বক্তব্যের তাৎপর্য্য আমরা এই বুঝিয়াছি, যে, এই লোকগুলি নানাপ্রকারে সর্ব্বসাধারণের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া স্বকার্য্যসাধন করিতেছিলেন, লোকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হৃত হইতেছিল, আইন লঙ্ঘিত ও শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতেছিল, ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্টের ধারণা সত্য হইলে, রাজকর্ম্মচারীরা যে হুকুম করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দিক্ হইতে ঠিক্ হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি গবর্ণমেণ্টের ধারণা ঠিক নয়। কংগ্রেস্ ও খিলাফৎদলের প্রতিজ্ঞা (resolution) গুলিতে কোথাও ভয় দেখাইবার, লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিবার, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিবার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বা ইঙ্গিত নাই; বরঞ্চ এই দলের সমুদয় চেষ্টা ও কাজ যে নিরুপদ্রব ও অহিংসা-প্রণোদিত হওয়া চাই, নেতারা তাহা বার বার বলিয়াছেন, এবং এখনও বলিতেছেন। ইহা সত্য, যে, দেশের নানা স্থানে শান্তিভঙ্গ ঘটিয়াছে, মানুষ খুন পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহাও সত্য, যে, ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন লোক অন্য কতকগুলি লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং কাহারও কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, এসব



শ্রীযুক্ত মণিলাল, তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ।

হইতে, ইহা প্রমাণ হয় না, যে, কংগ্রেস ও খিলাফৎদলের উদ্দেশ্য উপদ্রব করা, লোকের স্বাধীনতা হরণ করা, শান্তিভঙ্গ করা ইত্যাদি; ইহাও প্রমাণ হয় না, যে, ঐ দলের সমুদয় বা অধিকাংশ লোক উপদ্রবকারী ও শান্তিনাশক; এবং ইহাও প্রমাণ হয় নাই, যে, পূর্ব্বকথিত দাঙ্গা ও নরহত্যাকারী প্রভৃতিদের সকলে বা অধিকাংশ কংগ্রেস্ ও খিলাফৎদলের লোক। উল্টা পক্ষের একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করি। গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু মডারেট দলেরও অনেকে স্বীকার করিবেন, যে, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের আগে ও পরে সরকারের অনেক ভৃত্য খুন জখম অত্যাচার স্বাধীনতাহরণ শান্তিভঙ্গ অনেক করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এবং মডারেটরা ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দিতে রাজী হইবেন না, যে, ঐসব অপকর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে বা জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে বা তৎসমুদয় সরকারের অনুমোদিত; কারণ ঐ সকল গর্হিত কাজ গবর্ণমেণ্টের আইনের এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত নীতির বিরোধী। আমরা নিজে কংগ্রেস এবং খিলাফৎদলের বিচারও অন্ততঃ ঠিক্ এইভাবে করিতে চাই, এবং ইহা চাই, যে, অন্যেরাও—সরকার পক্ষের লোকেরাও—অন্ততঃ এই ভাবে বিচার করেন।

"অন্ততঃ" বলিতেছি এইজন্য, যে, জালিয়ানওয়ালা বাগ, চাঁদপুর, প্রভৃতি স্থানের ঘটনার অপরাধীরা সরকারী চাকর বলিয়া যেরূপ সুপরিজ্ঞাত, কোন স্থানের ঘটনার অত্যাচারীরা কংগ্রেস ও খিলাফৎদলের কর্ম্মচারীরূপে অপরাধ করিয়াছে, এরূপ লোকও ঘটনার তেমন প্রমাণ নাই। সত্য বটে, রাজনীতিক্ষেত্রে চাতুরী ও কপটতার আশ্রয় অনেক সময় লওয়া হয়, অনেক সময় মুখে ও প্রকাশ্য কাগজে পত্রে যাহা বলা হয়, কাজে এবং গোপনে তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও খিলাফৎদলের

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা সরকারী শাসনকর্ত্তাদের চেয়ে অধিকতর কপট ও কূটনীতিপরায়ণ, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই জন্য বলি, কংগ্রেস্ ও খিলাফৎ দলের সমুদয় কর্ম্মীকে বেআইনী কার্য্যে নিরত বলিয়া ঘোষণা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচ্চ রাজনীতিসঙ্গত ও সত্যানুসারী হয় নাই। যেখানে যে কেহ গবর্ণমেণ্টের মতে বেআইনী কাজ করিতেছে, তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শাস্তি দিবার চেষ্টা করিলে অধিকতর সঙ্গত হইত।

সরকার পক্ষের লোকে বলিতে পারেন, এই দুই দলের উদ্দেশ্যই হইতেছে, নানা প্রকারে গবর্ণমেণ্টের কাজ অচল বা দুঃসাধ্য করিয়া তুলিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধন ও স্বরাজ স্থাপন। তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া



মহাত্মা গান্ধী।

উত্তরে আমরা বলি, যে, এইসব উদ্দেশ্য ত ১৯২১ সালের ১৮ই নবেম্বর প্রচারিত ও বিদিত হয় নাই; বৎসরাধিক পূর্ব্বে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের তখন হইতে স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হওয়া উচিত ছিল, কিংবা কংগ্রেস্ ও খিলাফৎদলের দাবী অনুযায়ী কাজ করিয়া পঞ্জাবের অত্যাচারের সমুচিত প্রতিবিধান এবং তুরস্কের প্রতি সুবিচার করিলে ও করাইলেও চলিত। যখন কংগ্রেস্ ও খিলাফৎ গবর্ণমেণ্টকে ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন বা তাহার পরে ঐ কারণেই সাক্ষাৎভাবে ঐ দুই সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে কি গবর্ণমেণ্টের সাহস হয় নাই, তাই হরতালটা উপলক্ষ্য করিয়া পরোক্ষ ভাবে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিতেছেন? না, ইহার মধ্যে আর কোন নীতি (policy) আছে?

গবর্ণমেণ্টের ভিতরের কথা আমরা জানি না। বাহির হইতে আসল কথা এই অনুমান হয়, যে, ১৭ই নবেম্বর ভারতের সব প্রদেশে নানা নগরে ও গ্রামে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, হরতাল হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা এই ভাবিয়া বিষম চটিয়া যান, যে, প্রভু ইংরেজ যাহা চান তাহা হইল না, তাহার বিপরীতই হইল! তবে কি ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব নাই গান্ধী-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? তাঁহাদের জেদ হইল, ইংরেজ যে এখনও প্রভু তাহা দেখানো চাই। ইংরেজদের দৈনিক কাগজ ও বণিক্-সভা গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করেন। ফলে ক্রমে ক্রমে এক একটি প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া ও থাকা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। ইহার মধ্যে কৌতুকাবহ ব্যাপার এই, যে, যদিও ১৭ই নবেম্বর ও তাহার পরবর্ত্তী কয়দিন বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা, খুন ও নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছিল, কিন্তু অসহযোগের স্বেচ্ছাসেবক হওয়া ও থাকা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গে, যেখানে ওরূপ কিছু হয় নাই—অল্পস্বল্প ভীতিপ্রদর্শন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা আঘাত-মাত্র কয়েকস্থলে হইয়া থাকিবে। ভারতব্যাপী হরতাল হইয়া যাইবার পর আমলাতন্ত্রের মাথায় বুদ্ধির উন্মেষ হওয়াটাও কম কৌতুকাবহ নহে।

গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়া বসিয়াছেন, তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য যাহাই হউক, নেতারা যাহা করিয়াছেন, কথায় ও কাজে সঙ্গতি রাখিতে গেলে তাহা ছাড়া অন্য কিছু করা তাঁহাদের চলিত না। অবশ্য, তাঁহাদের মতের ও কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার বিপরীত আচরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাই তাঁদের কাজ বেআইনী বলিলেন, অমনি তাঁদের মত বদলিয়া

গেল, এইরূপ ঘটিলে, তাঁদের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না, লোকে তাঁহাদিগকে ভীরু ও ভণ্ড মনে করিত। কিন্তু লোকে যাহাই মনে করুক, মানুষের মত ও মতির পরিবর্ত্তন হইলে আচরণের পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। নেতাদের যখন মত ও মতি অপরিবর্ত্তিত ছিল, তখন তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও পুরুষোচিত হইয়াছে। যদিও ইহাও নিশ্চিত যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশ না-মানায় দণ্ডনীয় হইয়াছেন।

সরকার বলিলেন (ভাষাটা আমাদের), তোমরা মানুষকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছিলে, তোমরা শান্তিভঙ্গ শৃঙ্খলাভঙ্গ ও উপদ্রব করিতেছিলে, ইত্যাদি ; অতএব তোমাদের কর্ম্ম ও স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম্ম বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলাম। নেতাদের এবং তাঁহাদের দলের অন্য কর্ম্মীদের আচরণ যে ঐ প্রকারের তাহা তাঁহারা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারাও প্রতিজ্ঞা করিলেন ও ঘোষণা করিলেন যে তাঁহাদের কাজ নিরুপদ্রবভাবে পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে, এবং আরও কর্ম্মী চাই। তাঁহাদের এই সঙ্গত ও সাহসিক আচরণে দলে দলে কর্ম্মী জুটিতেছে। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টও নিজের প্রভুত্ব এবং ঘোষণা ও কাজে সঙ্গতি রক্ষার জন্য দলেদলে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ও নেতাদিগকে জেলে পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের কারাদণ্ডে দুঃখ করিবার বা প্রতিবাদ করিবার বা গবর্ণমেণ্টকে দয়া করিতে বলিবার কোন কারণ নাই—তাঁহারা ত জানিয়া শুনিয়াই দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। বরং কংগ্রেস্ ও খিলাফৎদলের লোকেরা এই মনে করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারেন, যে, এতদিন গবর্ণমেণ্ট অসহযোগ প্রচেষ্টাকে কতকটা অগ্রাহ্য করিতেছিলেন এবং তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছিলেন, কিন্তু এখন ইহার শক্তি বুঝিতে পারিয়া ইহাকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে ইহার সহিত লড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নেতা ও অন্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জেলে পাঠান হইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া বাহুল্যমাত্র; কারণ, গবর্ণমেণ্টের গোড়ার ভ্রম ও দোষ হইতেছে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া ও স্বেচ্ছাসেবকের কর্ম্ম-করা—এই দুটিকে বেআইনী ঘোষণা করা; স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠান উহারই স্বাভাবিক ফল।

নেতারা প্রফুল্লচিত্তে কারাদণ্ড গ্রহণ করায় দুরকম লোকের একটা ভ্রম ভাঙা উচিত। আম্‌লাতন্ত্রের অনেকের এই রকম একটা ধারণা ছিল বলিয়া বোধ হয়, যে, নেতারা ছেলেদের ও সাধারণলোকদের ক্ষেপাইয়া দিয়া নিজেরা নিরাপদে আছেন। আমাদের দেশের অনেক লোকেরও এই রকম ধারণা থাকা অনুমান করি। এরূপ ভ্রম এখন দূর হওয়া উচিত।

নেতাদের কারাবাসে আশঙ্কার কারণ

মৌলানা মোহম্মদ আলী ও মৌলানা শৌকৎ আলী কারারুদ্ধ হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন, যে, মৌলানা শৌকত আলীর অভাবে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে আবশ্যকমত প্রভাবিত করিতে পারিতেছেন না। নেতাদের কারাবাসে দেশের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার একটি কারণের আভাস এই উক্তি হইতে পাওয়া যায়। অহিংসার সহিত, নিরুপদ্রবভাবে, কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না করিয়া, কাজ করিলে, অসহযোগ প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে; নতুবা সম্ভাবনা নাই। ইতিমধ্যেই ত নানাস্থানে শান্তিভঙ্গ, রক্তপাত নরহত্যা, অন্যবিধ অত্যাচার ও সম্পত্তিনাশ হওয়ায় অসহযোগ প্রচেষ্টার বিশেষ অখ্যাতি ও ক্ষতি হইয়াছে; যদিও উক্ত কুফলগুলি কি পরিমাণে অসহযোগ আন্দোলনের ফল, তাহা ধীর শান্ত নিরপেক্ষভাবে এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। এখন অসহযোগীদিগকে খুব বেশী সাবধান ও সংযত থাকিতে হইবে। সরকারপক্ষের কতকগুলি লোকের আচরণ অনেকস্থলে অত্যন্ত উত্তেজক ও প্রকোপক হওয়ায় সংযমের আরো বেশী প্রয়োজন হইয়াছে। নেতারা অনেকে পুনঃপুনঃ সকলকে ধীর শান্ত ও সংযত হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন এবং অনেক স্থলে জনতার মধ্যে গিয়া লোকদিগকে ঠাণ্ডা রাখিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা একে একে কারারুদ্ধ হইতে থাকায় অসহযোগী দল ভাঙ্গিয়া যাইবার কিছু আশঙ্কা আছে। ঐ দলের বিরোধী যাঁহারা তাঁহারা ভাবিতে পারেন, তাহা হইলে ত ভালই হয়। আমরা তাহা মনে করি না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত

সহযোগী থাকিবার পক্ষে, তাঁহাদের জানা উচিত, যে, অসহযোগীদলের অস্তিত্বের অন্ততঃ এইটুকু ফলদায়কতা আছে, যে, তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট সহযোগীদের কথায় অন্ততঃ একটু বেশী কান দেন কিম্বা অন্ততঃ একটু বেশী মৌখিক আদরও করেন। যাহা হউক, নেতাদের কারাবাসে দল ভাঙ্গিয়া যাওয়া অপেক্ষা অধিকতর আশঙ্কার একটি কারণ আছে। নেতাদের মধ্যে সকলের না হউক অনেকের প্রভাব দলের লোকদিগকে ও জনতাকে নিরুপদ্রব রাখিতে প্রযুক্ত হইতেছিল। এই প্রভাব কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলে দেশে শান্তিভঙ্গ ও উপদ্রব হইতে পারে। তাহাতে সহযোগী অসহযোগী ও নিরপেক্ষ সকল লোকেরই ক্ষতি। সাময়িক কিছু সুবিধা একমাত্র জবরদস্ত রকমের রাজভৃত্যদের হইতে পারে। কারণ, তাঁহারা নিরুপদ্রব কর্ম্মীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তিহীন, কিন্তু শান্তিনাশক ও উপদ্রবকারীদিগকে বলপ্রয়োগে সহজেই জব্দ করিতে পারেন এবং তাহা করিয়া বাহাদুরী লইতে পারেন।

দেশের অবস্থা যাহাতে অরাজক না হয়, তাহার জন্য অপসারিত নেতাদের জায়গায় বুদ্ধিমান্ কর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র শান্ত সংযত অন্য নেতাদের আবির্ভাবের প্রয়োজন। তাহার চেয়েও আবশ্যক, দেশবাসী প্রত্যেকের পক্ষে শান্ত অচঞ্চল সংযত অহিংস এবং সুদৃঢ় দেশহিতৈষণা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখা। অনেক এমন ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে যাহাতে বৃদ্ধেরও রক্ত গরম হয়। কিন্তু প্রতিশোধের ভাব যখনই হৃদয়ে আসিবে, তখনই তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভাবিতে হইবে কি প্রকারে স্থায়ী প্রতিকার হয়, কি প্রকারে মানবপ্রেম ও জনহিতের ভিত্তির উপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

স্বরাজলাভের বর্ত্তমান চেষ্টার সহিত যুদ্ধের খুব সাদৃশ্য আছে। এই চেষ্টাতেও যুদ্ধের মত দক্ষ নেতৃত্ব, সাহস, আজীবন ও আমরণ আত্মোৎসর্গ, অশেষদুঃখসহিষ্ণুতা, একান্ত বাধ্যতা, প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু যুদ্ধের সহিত পার্থক্যও অনেক আছে। প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রভেদ এই, যে, ইহাতে যুদ্ধের হিংস্র ভাব নাই, বরং তাহার বিপরীত অহিংসাই ইহার প্রাণ। অহিংসা যাহার নাই, তিনি এই প্রচেষ্টার বড় কর্ম্মী হইলেও বাস্তবিক ইহার শত্রু। আর একটি প্রধান প্রভেদ এই, যে, নেতা ব্যতীত যুদ্ধ চলে না, সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু আবশ্যক হইলে, স্বরাজলাভের চেষ্টা নেতা ব্যতিরেকেও অনেকটা চলিতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস ও খিলাফৎ কনফারেন্সে যে-সব প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা পড়িয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে, তাহার সবগুলি, অন্ততঃ অনেকগুলি, যেমন দলবদ্ধ হইয়া বা সমষ্টিগতভাবে পালন করা যায়, তেমনি আলাদা আলাদা ব্যক্তিগতভাবেও পালন করা যায়। মদ আফিং প্রভৃতি খাওয়া যাহাতে বন্ধ হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা গত শতাব্দীতে কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির সময় হইতে হইতেছে। ইহার জন্য সুরাপান-নিবারণী সভা, টেম্পারেন্স কনফারেন্স প্রভৃতি দলবদ্ধ চেষ্টা অনেক হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দলবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত অন্য ফলদায়ক চেষ্টা একটি আছে। তাহা আর কিছু নহে, প্রত্যেকে কোনপ্রকার নেশা না-করা; সেইরূপ, কংগ্রেস নিজের দলের লোকদিগকে বলিতেছেন, নেতারা বলিয়াছেন, আপনারা এই এই কাজে এই এই রকমে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিবেন না, চাকরী করিবেন না। এই-সব আজ্ঞা পালন করিবার জন্য দল বাঁধিবার একান্ত প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকে নিজের বিশ্বাস ও বিবেক অনুসারে কাজ করিলেই হয়।

কিন্তু নেতা থাকিলে যে ভাল হয় এবং সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী এখনও জেলের বাহিরে আছেন, এবং নিজের দলের লোক, দেশের অন্য লোক, গবর্ণমেণ্ট, কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া, আবশ্যক হইলে নিজেকেও রেহাই না দিয়া, সত্য কথা বলিয়া, অনুতাপ করিয়া, অনুযোগ করিয়া ও উপদেশ দিয়া সকলকে সুপথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও কেবলমাত্র তাঁহার শরীর অবরুদ্ধ হইবে, তাঁহার আত্মা কাজ করিতে থাকিবে। জগতের সাধু উপদেষ্টাদের মৃত্যুর পরও তাঁহাদের বাণী প্রাণময় হইয়া মানবের হিতসাধন করিতেছে। সুতরাং কোনকালেই অসহযোগীদের নেতা ও উপদেষ্টার অভাব অনুভব করা উচিত নহে।

তথাপি নূতন ঘটনা নূতন অবস্থা পরিবর্ত্তিত কার্য্য-প্রণালী ও অভিনব পরিচালনা আবশ্যক করিতে পারে। তাহার নিমিত্ত নেতা হইলে ভাল হয়।

নেতার জন্য সাধনা

পৌরাণিক নানা আখ্যায়িকা এবং ইতিহাসের সহিত জড়িত কাহিনী হইতে নেতৃত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। পুরাণে বার বার দেখা যায়, পৃথিবীতে অত্যন্ত অত্যাচার ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দেবগণ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন, যে, তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া উহার প্রতিকার করুন। তদনুসারে নারায়ণ মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহার মূলে এই সত্যটি রহিয়াছে, যে, অধর্ম্মের ও অত্যাচারের অস্তিত্ব হাড়েহাড়ে অনুভব করা চাই, তাহা হইতে মুক্তির জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতার উৎপত্তি হওয়া চাই, এবং সেই ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হওয়া চাই। পুরাণে ইহাও দেখা যায়, যে, দেবগণ নারায়ণকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে বলিয়াই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দেন নাই, তাঁহারাও নিজে নরদেহ ধারণ করিয়া নরদেহধারী ভগবানের পার্শ্বচর অনুচর রূপে কাজ করিয়াছেন। আমাদেরও শুধু ভগবানের নিকট নেতা পাঠাইবার প্রার্থনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সিদ্ধিলাভ হইবে না, তাহাতেই আমাদের কর্ত্তব্যের সমাপন হইবে না। অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মকে, অত্যাচারের জায়গায় মানবের স্বাধীনতা এবং মানবপ্রীতি ও নরহিতৈষণাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আজীবন চেষ্টা আমাদিগকেও করিতে হইবে।

সংখ্যাতীত মানুষের ব্যাকুল আগ্রহ ও চেষ্টা পুঞ্জীভূত হইয়া নেতৃত্বশক্তির আকারে কোন কোন মানুষকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করে, যদিও তাঁহারা কেহই অবতার নহেন, কোন মানুষই অবতার নহেন। এইরূপ ব্যাকুলতা ও আন্তরিক চেষ্টা আমাদের সাধনা হউক; তাহা হইলে আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব।

যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড হইতে তেজস্বী পুরুষের আবির্ভাবের বৃত্তান্ত ইতিহাসের সহিত জড়িত কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। আমরাও যদি তেজস্বী ও শুদ্ধসত্ত্ব নেতা চাই, তাহা হইলে আমাদিগকেও প্রায়শ্চিত্তের আধ্যাত্মিক অগ্নিকুণ্ডে সমুদয় দুর্ব্বলতা আহুতি দিতে হইবে। আরামস্পৃহা, বিলাসলালসা, ভোগবাসনা, ভীরুতা, ক্ষুদ্রস্বার্থের আকর্ষণ, ক্ষুদ্রলক্ষ্য, ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও নীচতা, সব পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তখন সেই যজ্ঞের আগুন হইতে আমাদের নেতা, তিনি পুরাতন বা নূতন হউন, বলীয়ান্ হইবেন।

দমননীতির অব্যবহিত কারণ

বেসরকারী দাঙ্গা হাঙ্গামা শান্তিভঙ্গ অত্যাচার যদি বর্ত্তমান সরকারী দমননীতির কারণ হইত, তাহা হইলে ইহার প্রয়োগ সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাইয়ে হওয়া উচিত ছিল; কারণ সেখানেই ১৭ই নবেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজের পদার্পণের দিনে খুব মারামারি খুনোখুনি আরম্ভ হয় ও তিন চারি দিন চলিতে থাকে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান দমননীতির প্রথম প্রয়োগ হইয়াছে বঙ্গে যেখানে ওরূপ মারামারি খুনোখুনি হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান দমননীতির অব্যবহিত কারণ কলিকাতায় (এবং ভারতবর্ষের সব প্রদেশে) যুবরাজের বোম্বাই আগমন উপলক্ষ্যে হরতালের অপ্রত্যাশিত সাফল্যই বলিতে হইবে।

দমন করিতে হইলে তাহার একটা কারণ থাকা চাই, ও তাহা দেখান চাই। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবকেরা বড় উৎপীড়ন নির্য্যাতন ভীতিপ্রদর্শন এবং সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিতেছিল। এরূপ কাজ কোথাও কেহ করে নাই, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু কলিকাতা সহরের দশ লক্ষের অধিক লোক এইরূপ ভয়ে হরতাল করিয়াছিল, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে নানাস্থানে অসংখ্য লোক এইরূপে ভয় পাইয়া হরতাল করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যেখানে যতটুকু বলপ্রয়োগ ভীতিপ্রদর্শন স্বাধীনতাহরণ ও অত্যাচার হইয়াছে, তাহা অতীব নিন্দনীয়; কিন্তু তাহার জন্য দুইটি অথবা একটি ভারতব্যাপী প্রচেষ্টাকে কলঙ্কিত করিয়া তাহার পর উহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা উচিত হয় নাই।

আয়ার্ল্যাণ্ডের শিন-ফেন দল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, গোপন যুদ্ধও করিয়াছে; ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও তাহার সহিত

প্রকাশ্য ও গোপন যুদ্ধ করিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত শিন-ফেন আইরিশদের সাধারণতন্ত্রকে (Irish Republicকে) বে-আইনী ঘোষণা না করিয়া উহার প্রতিনিধিদের সহিত সমানে সমানে বিচারবিতর্কের পর একটা সন্ধিপত্রের খসড়া স্থির করিয়াছেন। এই খসড়া আইরিশদের সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি-সভায় বিবেচিত হইবে, এবং তাহারা উহা গ্রহণ করিলে উহা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিয়া তদনুযায়ী আইন পাস্ করা হইবে। "আশ্চর্য্যের বিষয়" লিখিয়াছি, কিন্তু লিখিবামাত্রই মনে হইয়াছে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—"তেজীয়সাং হি ন দোষায়।"

যাহা হউক, আমরা যখন আইরিশ নহি, তখন তাহাদের কথা না তোলাই ভাল। এখন কয়েকদিন হইতে যে-কারণে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। এমন বিস্তর লোককে ধরা হইয়াছে, যাহারা স্বেচ্ছাসেবক নহে, এবং স্বেচ্ছাসেবকের কাজও করে নাই। কিন্তু যাহারা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করার জন্য ধৃত হইয়াছে, তাহারা কি কাজের জন্য ধৃত হইয়াছে? তাহারা নাকি দোকানদার গাড়োয়ান প্রভৃতিকে বলিয়াছে, তোমরা আগামী ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজের কলিকাতা আগমনের দিনে হরতাল করিও, দোকান বন্ধ রাখিও, গাড়ী চালাইও না, ইত্যাদি। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যে, যুবরাজের আগমনের দিনে দোকান খুলিয়া রাখিতে হইবে, গাড়ী চালাইতে হইবে, ইহা কোনো আইনে লেখা আছে কি? কেহ যদি আইন ভঙ্গ করিতে কাহাকেও বলে, তাহা হইলে অবশ্য গবর্ণমেণ্ট তাহার শাস্তি দিতে বাধ্য। অর্থাৎ যদি এমন আইন থাকে, যে, যুবরাজের আগমনের দিনে দোকান খোলা রাখিতে হইবে, গাড়ী চালাইতে হইবে, তামাসা দেখিতে যাইতে হইবে, ইত্যাদি, তাহা হইলে কেহ যদি দোকানদার, গাড়োয়ান, সর্ব্বসাধারণকে সেই আইন ভঙ্গ করিয়া দোকান না-খুলিতে, গাড়ী না-চালাইতে, তামাসা দেখিতে না-যাইতে উপদেশ দেয়, তাহা হইলে তাহার বে-আইনী কাজ করার অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য শাস্তি হইবে। নতুবা শুধু কেহ হরতাল করিতে বলিলেই আইন অনুসারে প্রমাণ হয় না, যে, সেব্যক্তি বে-আইনী কাজ করিয়াছে বা বে-আইনী স্বেচ্ছাসেবক-সম্প্রদায়ভুক্ত। ধৃত-লোকের কেহ ভাল উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া এবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করাইলে ভাল হইত। নিরস্ত্র যুদ্ধে নিয়মতন্ত্রের অনুমোদিত সব রকম উপায় অবলম্বিত হওয়া ভাল।

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, তুমি যেরূপ আইনের কথা বলিতেছ, সেরূপ আইন নাই বটে, কিন্তু যদি সেরূপ আইন অবিলম্বে করা হয়, তাহা হইলে কি বলিবে? তাহা হইলে বলিব, আধুনিক সভ্যজাতিসকলের ব্যবস্থা-বিজ্ঞানের (jurisprudenceএর) নীতির বিরুদ্ধ বলিয়া ওরূপ আইন ব্যবস্থাবিজ্ঞানবিদ্দিগের চক্ষে বে-আইনী বলিয়া প্রতীত হইবে।

কারণ আধুনিক সভ্যসমাজের ব্যবস্থা-বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বলে, যে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর গবর্ণমেণ্ট কেবল ততটুকু হস্তক্ষেপ করিবেন, যতটুকু রাষ্ট্রের (state-এর) সংরক্ষণ জন্য এবং সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা ও কল্যাণ সাধনের জন্য দরকার। কিন্তু ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না, যে, বিশেষ একটি দিনে দোকানদারদিগকে দোকান খুলিতে বা গাড়োয়ানদিগকে গাড়ী চালাইতে বাধ্য না করিলে রাষ্ট্রের পতন এবং সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা-লোপ ও অকল্যাণ হইবে। দোকান খোলা বা না-খোলা, গাড়ী চালান বা না-চালান, দোকানদার ও গাড়োয়ানের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসাপেক্ষ থাকা উচিত। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের লোকেরা বলিয়াছেন, যে, ১৭ই নবেম্বর জোর করিয়া লোকদিগকে হরতাল করান হইয়াছিল। তাহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের লোকদের উচিত কি ছিল? উচিত এই ছিল, যে, যেমন একদল লোক বলিয়া বেড়াইতেছে, হরতাল করিও, তেমনি তাঁহারাও বলিয়া বেড়ান, হরতাল করিও না। কোনপক্ষেরই বল প্রয়োগ করা বা ভয় দেখান উচিত নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে বল-প্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শনের ওজুহাতে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ও তাহাদের সর্ব্ববিধ কর্ম্মকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন, প্রকারান্তরে সরকারী লোকদের পক্ষ হইতে সেই বলপ্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শন হইতেছে। কেহ কাহাকেও হরতাল

করিতে বলিলেই যদি তাহার জেল হয়, তাহা হইলে তাহার মানে কি এই দাঁড়ায় না, যে, মানুষ হরতাল না-করিতে বাধ্য? শুধু এইপ্রকার পরোক্ষ বলপ্রয়োগই যে হইতেছে, তাহা নহে। রাস্তায় রাস্তায় লাঠি বন্দুক হাতে পাহারা-ওয়ালা সার্জ্জেণ্ট গোরার টহল দেওয়া, স্থানে স্থানে লুইস্ গান্ স্থাপন, ঐ-সব গবর্ণমেণ্টভৃত্য এবং সিবিল গার্ডদের দ্বারা অনেক নির্দ্দোষলোকদের প্রহার, নির্দ্দোষ লোকদের বুকের উপর রিভল্‌ভার ধরা, বন্দুকহাতে নির্দ্দোষ লোকদের পশ্চাদ্ধাবন, ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রহার, এ-সব কি বলপ্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শন নহে? আমরা গবর্ণমেণ্টের চেয়েও বেসর্‌কারী গুণ্ডামির বিরোধী; কারণ বেসর্‌কারী গুণ্ডারা গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে না, আক্রমণ করে আমাদিগকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-ভৃত্যদের কাহারো গুণ্ডামিও তা বলিয়া প্রশংসনীয় কিম্বা সহনীয় হইতে পারে না। এরূপ লোকদের গুণ্ডামি আরো ভয়ানক। কারণ, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বেসর্‌কারী গুণ্ডার অত্যাচারের প্রতিকারের সম্ভাবনা যতটুকু আছে, সর্‌কারপক্ষের লোকদের গুণ্ডামির প্রতিকারের সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক কম কিম্বা নাই বলিলেও হয়।

হরতাল যাহাতে না হয়, তাহার এই যে চেষ্টা হইতেছে, ইহার একটি উদ্দেশ্য এই, যে, যুবরাজকে জানান ও দেখান, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জকে জানান, জগৎকে জানান, যে, ভারতবর্ষের লোকেরা এমন সুশাসিত যে তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে সানন্দে স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ যুবরাজের অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। আমরা যুবরাজকে বিন্দুমাত্রও অসম্মান দেখাইতে চাই না, তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নাই। কিন্তু অন্য দিকে, যে সন্তোষ ও আনন্দ আমাদের অন্তরে নাই, হৃদয়ের যে উৎসবসজ্জা নাই, বাহিরে তাহা দেখাইতেও আমরা অনিচ্ছুক। সে যাহা হউক, হরতাল না-করাইয়া ইংরেজ আম্‌লাতন্ত্র যাহা জগৎকে দেখাইতে চান, তাহা এই যে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে যুবরাজকে সম্মান দেখাইয়াছে ও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই ব্যাপারটির বাহ্য চেহারা কি এইরূপ দেখাইতেছে না, যে, লোককে ফৌজ পাহারাওয়ালা কামান প্রদর্শন দ্বারা ভয় দেখাইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা-উৎসবে যোগ দিতে বাধ্য করা হইতেছে? সত্য যাহা আমরা তাহাই চাই। যদি মানুষের সন্তোষ আনন্দ উৎসবের ভাব থাকে, তাহা প্রকাশিত হউক; যদি না থাকে, তাহা হইলে কপট সন্তোষ আনন্দ ও উৎসব-সজ্জা চাই না। সত্য যাহা তাহা জানা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও সুবিধা আর কিছুতেই নাই। মানুষের মনে যদি বাস্তবিক সন্তোষ আনন্দ উৎসব না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কোনপ্রকার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ বলপ্রয়োগ বা ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা কপটতা করিতে বাধ্য করিলে, যুবরাজকে এবং তাঁহার পিতামাতাকে জগতের চক্ষে, সম্মানের পরিবর্ত্তে, কতখানি অসম্মানভাজন করা হইবে, ভারতবর্ষের ইংরেজ আম্‌লা-তন্ত্র কি তাহা কল্পনা করিতেও অসমর্থ?

ইহাতে আমাদের মনে হয়, যুবরাজের ভারত-আগমন তাঁহাদেরই কোনপ্রকার জেদে ঘটিয়া থাকিবে। অসন্তুষ্ট ভারত সন্তুষ্ট হয়, পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রকৃত প্রতিকার হইলে, তুরস্কের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা হইলে, এবং স্বরাজ লব্ধ হইলে; কিন্তু তাঁহারা হয়ত ভাবিয়াছিলেন, যে, যুবরাজ আসিলে ভারতের চিরপ্রথিত রাজভক্তির ফোয়ারা খুলিয়া যাইবে ও তাহাতে অসন্তোষের আগুন নিবিয়া গিয়া সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে; অথবা ভাবিয়াছিলেন, নানাপ্রকার রং তামাসা আতসবাজী ভোজে লোকে লাঞ্ছনা অপমান দারিদ্র্য রোগ-যন্ত্রণাদি ভুলিয়া গিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। এখন কিন্তু নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা নিজেদের শক্তি ও প্রভুত্বের জোরে ভুলটা চাপা দিতে চাহিতেছেন, দেশের যে ভাব স্বভাবতঃ বা তাঁহাদের কৌশলে হইবে বলিয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এখন প্রভুত্ব-প্রয়োগে তাহার কেবলমাত্র বাহ্য আকৃতিটা উৎপাদন করিতে চাহিতেছেন।

আমরা এইরূপ শুনিয়াছি, যে, কোন কোন ভারতীয় ব্যক্তি (তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একজন) ভারতসচিব মণ্টেগুকে বলিয়াছিলেন, যে, এখন যুবরাজকে ভারতে পাঠান উচিত নয়। কিন্তু মণ্টেগু সাহেব সম্ভবতঃ এখানকার স্থানীয় শ্বেত মনুষ্যদের পরামর্শ অনুরোধ বা জেদ বশতঃ ভারতীয়দের পরামর্শ গ্রহণীয় মনে করেন নাই।

শ্রীযুক্ত মণিলাল

ফিজি দ্বীপের ভারতীয় অধিবাসীদের হিতকারী বন্ধু

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মণিলালকে সে দেশের গবর্ণমেণ্ট বিনা-বিচারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, যে, তিনি সেখানকার ভারতীয়দের সমস্ত আন্দোলনের গোড়া এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার শত্রু। শ্রীযুক্ত মণিলাল ইহার পর নিউ-জীলণ্ডে যান। কিন্তু কেবলমাত্র স্বদেশীয়দের মধ্যে ব্যবসা চালাইবার সর্ত্তেও তিনি সেখানকার আদালতগুলিতে আইন-ব্যবসা করিবার সম্মতি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি যে নির্দ্দোষ, এবং ফিজি দ্বীপের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইয়াছেন, বিচারালয়ে ইহা প্রমাণ করিবার সুবিধা পর্য্যন্ত নিউজীলণ্ড তাঁহাকে দেয় নাই।

যুবরাজের ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য

সেদিন কলিকাতায় একটি ভোজের পর বড় লাট রেডিং বলিয়াছেন, যুবরাজের ভারত-ভ্রমণের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। তাহা বুঝিলাম; তাঁহার এখন ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্য কি তাহাও একটু খুলিয়া বলিলে ভাল হইত না কি?

আমরা আগে আম্‌লাতন্ত্রের দুটি উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছি। তাহারই অঙ্গীভূত আর-একটি উদ্দেশ্য এই হইতে পারে যে, তাঁহারা যুবরাজের আগমন উপলক্ষে নানাবিধ ঘটা ও জাঁকজমক করিয়া ও করাইয়া জগৎকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের শাসনে ভারতবাসীরা খুব সমৃদ্ধ সুখী সন্তুষ্ট রাজভক্ত (অর্থাৎ আম্‌লাতন্ত্রভক্ত) আছে, এবং অসহযোগীরা মুষ্টিমেয়, সংখ্যাবহুল সন্তুষ্টরাজভক্ত ভারতবাসীদের প্রতিনিধিস্থানীয় নহে। এই তিনটি উদ্দেশ্য কূটরাজনৈতিক। কিন্তু ইহা ছাড়া আরো যে-সব উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহাও রাজনৈতিক।

যদি বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাটের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা দরকার; সেই জ্ঞানলাভার্থ তিনি এদেশে আসিয়াছেন; তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি, এই জ্ঞানলাভ প্রয়োজন কিসের জন্য? নিশ্চয়ই ভারতের সুশাসনের সাহায্যার্থ। যাহা সুশাসনের জন্য প্রয়োজন, তাহা কি একটি রাজনৈতিক জিনিষ নয়?

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে সমগ্র ভারতের বৃহত্তর অংশ কোন্‌টি, ব্রিটিশ-শাসিত ভারত, না দেশীরাজ্যসমূহ? ব্রিটিশ শাসিত ভারতই বৃহত্তর অংশ এবং ইহার সুশাসনের জন্যই ব্রিটিশরাজভৃত্যেরা সাক্ষাৎভাবে দায়ী। অতএব ভারতবর্ষের এই অংশের জ্ঞান লাভ করাই যুবরাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার ভারত-দর্শনের বন্দোবস্ত আগে হইতে যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে তিনি দেশীরাজ্যসমূহেই বেশী সময় কাটাইবেন, এবং সেখানেও ভোজ, খেলা, শীকার, রাজা-মহারাজাদিগকে লইয়া দরবার এবং তাঁহাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ এই-সবই প্রধানতঃ করিবেন। দেশী রাজ্যগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ইহাই কি শ্রেষ্ঠ উপায়, না ইহাই যথেষ্ট? দেশী রাজাদিগের প্রজাদের সুখ-দুঃখ অধিকার-অনধিকারই প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়; তাহাদের শ্রমেই ত রাজাদের ভোগ-বিলাস জাঁক-জমক চলে। এই প্রজাদের সম্বন্ধে জ্ঞান যুবরাজ কখন কি প্রকারে লাভ করিতেছেন?

ভারতবর্ষের ব্রিটিশশাসিত অংশ বৃহত্তর হইলেও যুবরাজ তাহাতে কম সময় যাপন করিয়া তাহার সম্বন্ধে কি জানিবেন? অধিকাংশ সময় রাজভৃত্যদের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া, তাহাদের চোখে ভারতবর্ষ দেখিয়া, তাহাদের দ্বারা বা তাহাদের হুকুমে সজ্জিত রাস্তাঘাট দেখিয়া, সাধারণ লোকদের সঙ্গে একবারও না মিশিয়া, ভারতের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ রাজনৈতিক দলের একজনও নেতা বা অন্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বা তাহাদের চেহারাও না দেখিয়া, এমন কি মডারেট্ দলেরও সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনচিত্ত প্রধান প্রধান কোন লোকদের সঙ্গেও বাক্যালাপ না করিয়া, তিনি ব্রিটিশশাসিত ভারত সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ করিবেন?

সুতরাং আমাদের মনে হয় না, যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাকে জ্ঞানী করিবার জন্য তাঁহাকে আনা হইয়াছে। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য বাস্তবিক তাহাই হয়, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তবে যদি ইংরেজ আম্‌লা-বর্গের অভিপ্রায় এই হয়, যে, যুবরাজ ভারতবর্ষকে তেমন একটি দেশ বলিয়া জানুন, যেমন দেশ বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে জানাইতে চান, তাহা হইলে সে-উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে। "কতকটা" এই জন্য বলিতেছি, যে, যুবরাজ বোম্বাইয়ে

নামিয়াই নিশ্চয় অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, এদেশের ইংরেজ শাসকেরা শান্তি-রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা লোককে শান্তিপ্রিয় ও পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ প্রতিবেশী করিতে পারেন নাই, এবং দেশে অসন্তোষ রহিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এবং তাঁহার নিজেরও প্রতি লোকদের যে খুব একটা উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আছে, সেবিষয়েও সম্ভবতঃ যুবরাজ সন্দিহান হইয়া থাকিবেন। কারণ, দেখিতেছি আজমীরে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যতপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, হরতাল বশতঃ সব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এবং সম্প্রতি এসোসিয়েটেড্ প্রেসের টেলিগ্রামে দেখিলাম, এলাহাবাদে তাঁহার আগমন উপলক্ষে লোকদের কোন আগ্রহ লক্ষিত হয় নাই, ঔদাস্য সুস্পষ্ট হইয়াছিল। এলাহাবাদ একটা প্রদেশের রাজধানী। অন্য সব জায়গাতেও জনসাধারণ তাঁহার অভ্যর্থনা সম্বন্ধে কি ভাব দেখাইতেছে, তাহার যথার্থ বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে কি না বলা যায় না।

যদি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মানুষের তৈরী দুর্গ মন্দির সমাধি মস্‌জিদ সেতু প্রভৃতি দর্শন, (তাহাদের ভাঙা কুঁড়েঘর দর্শন্ নহে), ভারতীয় মানুষ ও তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ দর্শন (তাহাদের নগ্নতা ও অর্দ্ধনগ্নতা দর্শন নহে), ভারতবর্ষে শীকার ও অন্য নানাবিধ খেলা ও আমোদপ্রমোদ সম্ভোগ যুবরাজের ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিন্তু তাহা হইলে এই ভ্রমণের সম্পূর্ণ ব্যয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পারিবারিক আয় হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৭ই নবেম্বরের হরতাল

১৭ই নবেম্বর কলিকাতায় ও অন্যত্র যে হরতাল হইয়াছিল, তাহা কতটা অসহযোগীরা ভয় দেখাইয়া করাইয়াছিল এবং কতটা লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আমাদের মত আগে বলিয়াছি। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, লোকে প্রধানতঃ ভয়ে হরতাল করিয়াছিল, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইবে, যে, অসহযোগীরা গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষাও এবিষয়ে শক্তিশালী হইয়াছে। খুলিয়া বলিতে গেলে ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়ায়। লোকে যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও আইন মানে তাহার কারণ, অংশতঃ, গবর্ণমেণ্টের শাস্তি দিবার ক্ষমতা। গবর্ণমেণ্টকে লোকে ভয় করে বলিয়া তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতে চায় না, গবর্ণমেণ্টের যাহা অভিপ্রায় বা ইচ্ছা তদনুরূপ কাজ করে। কিন্তু যদি এমন কোন জিনিষ থাকে, যাহা করিলে গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হন, না করিলে অন্যপক্ষ অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে লোকে যাহা করে, তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যে, সর্‌কারের ও অন্যপক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অধিক ভয়ানক শক্তিশালী বলিয়া লোকের ধারণা। হরতাল করিলে সর্‌কার চটিবেন, ইহা লোকে জানিত; এবং সর্‌কারপক্ষের লোকদের ধারণা যে হরতাল না করিলে অসহযোগীরা চটিয়া অনিষ্ট করিবে এই ভয়ে লোকে হরতাল করিয়াছে। অতএব, সরকার-ভীতি ও অসহযোগী-ভীতি এই উভয় ভয়ের যাহা বেশী তাহার ভয়েই লোকে কাজ করিয়াছে, সর্‌কারপক্ষকে ইহা মানিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকই কি লোকে মনে করে, যে, অসহযোগীরা বেশী শক্তিশালী? আমাদের ত তা মনে হয় না। এইজন্য আমরা মনে করি, বেশীর ভাগ লোক হরতাল করিয়াছিল আপনা হইতে, কিম্বা অসহযোগীদের যুক্তি তর্ক পরামর্শ তাহাদের ঠিক্ মনে হইয়াছিল বলিয়া।

অসহযোগীরা কোথাও ভয় দেখায় নাই বা বল প্রয়োগ করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে এরূপ কোন ঘটনা আমরা নিজে দেখি নাই। যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি বটে। এরূপ যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সর্ব্বাগ্রে অসহযোগীদিগেরই ইহা নিবারণ করা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার উপায় করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য সকলের আগে। যুক্তি প্রয়োগ করিতে তাঁহারা পারেন, পরামর্শ দিতে তাঁহারা পারেন, কিন্তু কোন প্রকার চাপ দেওয়া, এমন কি মিনতি করা, হাত জোড় করা, হাতে পায়ে ধরা পর্য্যন্ত অনুচিত; কারণ ইহাও এক প্রকার বলপ্রয়োগ।

১৭ই নবেম্বরের হরতাল যতটা লোকদের স্বেচ্ছাপ্রসূত হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের আপত্তি ত নাই-ই, বরং

অনুমোদন আছে। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারকে আমরা অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় মনে করি। ঝাড়ুদার ও মেথরেরা যে সেদিন কাজ করে নাই, ইহা ভাল হয় নাই। যাহাতে সহরের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়, এমন কিছু করা বা করান কাহারও উচিত নহে। কোথাও কোথাও (সর্ব্বত্র নহে) দুধ বিক্রী করিতে দেওয়া হয় নাই, কোথাও বা দুধ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য ইহা অসহযোগ-নেতাদের আজ্ঞানুসারে বা জ্ঞাতসারে হয় নাই; কিন্তু যাহারা ইহা করিয়াছিল, তাহারা শিশুর ও রোগীর খাদ্যপ্রাপ্তিতে বাধা দিয়া বড় গর্হিত কাজ করিয়াছিল। ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতির গতিবিধিতে বাধা না-দিবার আদেশ অসহযোগনেতারা করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। কিন্তু এই আদেশ সর্ব্বত্র পালিত হয় নাই। এরূপ ব্যবহার সাতিশয় নিন্দনীয়। বাইসিক্‌ল্ হইতে অনেককে নামান হইয়াছিল, গাড়ী করিয়া আফিস আদালত যাওয়ায় অনেককে বাধা দেওয়া হইয়াছিল, ইত্যাদি। লোকের স্বাধীনতায় এরূপ হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গর্হিত। রেলওয়ে ষ্টেশনে অনেক যাত্রীর যাতায়াতে ও মোট বহায় অসহযোগীস্বেচ্ছাসেবকেরা সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা খুব প্রশংসনীয়। কিন্তু রেলের যাত্রীদের যেসব অসুবিধা হরতালের জন্য ঘটিয়াছিল এবং অসহযোগীরা যাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই, তাহা দুঃখের বিষয় এবং তাহার জন্য অসহযোগ প্রচেষ্টার অখ্যাতি হইয়াছে।

আর বেশী দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। হরতাল হইলেই আমাদের মোক্ষলাভ হইবে না, না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা অনুসারে যে কাজ হইবে, তাহা জানার মূল্য আছে। অসহযোগীরা জোর করিয়া কোন স্থলে হরতাল ঘটাইলে তাহার কোন মূল্য নাই, গবর্ণমেণ্টও কোথাও জোর করিয়া হরতাল হইতে না দিলে তাহারও কোন মূল্য নাই।

অসহযোগীরা হরতালের সপক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য বলুন এবং সরকার-পক্ষ হরতালের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বক্তব্য বলুন, কিম্বা উভয়পক্ষই কাহাকেও কিছু বলিবেন না; এইরূপ হইলেই ভাল হয়। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ জোরজবরদস্তী কোন পক্ষেরই ভাল নয়।

দাশ-পরিবার

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কার্য্যকলাপের যাঁহারা সমালোচক, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, যে, তিনি, তাঁহার পত্নী, তাঁহার ভগিনী ও তাঁহার পুত্র একই কার্য্যে একপ্রাণতা ও সাহসের সহিত ব্রতী হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পারিবারিক এই একপ্রাণতা বিষয়ে তিনি সৌভাগ্যবান্। শুধু "সৌভাগ্যবান্" বলিলে কম বলা হয়। তাঁহার প্রভাবে যে তাঁহার পরিবারবর্গ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে অকপটতা এবং তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লর্ড রোনাল্ড্‌শের সহিত সাক্ষাৎকারের পরও তিনি নিজের মত ও আদর্শে স্থির থাকায় তাঁহার দৃঢ়তা সপ্রমাণ হইয়াছে।

তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, তাঁহার ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী, এবং শ্রীমতী সুনীতি দেবী রাজপথ বাহিয়া চলিয়া স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ, "হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা ও আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে," ইত্যাকার চীৎকার করায়, হাস্যসম্বরণ কঠিন হইয়াছে। হিন্দুত্ব রক্ষার ভার এই কাগজটাকে কে দিল? লোকহিত ও রাষ্ট্রহিত সাধন জন্য হিন্দুনারীর ধর্ম্মসংগত সব কিছু কাজ করিবার অধিকার আছে; হিন্দুর ইতিহাসে তাহার প্রমাণ ও নজীর আছে।

মহিলার গ্রেপ্তার

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করায় দেশে একটা খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পড়িবারই কথা। কিন্তু যাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তজ্জন্য প্রস্তুতই হইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করায় তাঁহারা বিস্মিত হন নাই। বস্তুতঃ পুরুষ ও নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দায়িত্ব সমান, যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কখন এরূপ আশা করেন না ও করিতে পারেন না, যে, যে-কাজ পুরুষের পক্ষে বেআইনী বলিয়া

গণিত হইবে, নারী তাহা করিয়া অব্যাহতি পাইবেন। নারীদের মুখেই শুনিয়াছি, যে, তাঁহারা মনে করেন, নারীকে নারী বলিয়া কোন প্রকার কৃপা প্রদর্শন করিয়া সরকারী আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিলে নারীর অপমান করা হইবে। শিশু যেমন কোন-একটা কাজ করিলে তাহা দণ্ডনীয় বিবেচিত হইলেও লোকে বলে, "আহা, ছেলেমানুষ, ওকে কিছু বোলো না," নারীকে কতকটা সেই ভাব হইতে অব্যাহতি দিলে তাঁহার অপমান করা হইবে বটে। তবে যদি বলেন, যে-সব পুরুষের শিভ্যাল্‌রী (chivalry—ইহার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নাই) আছে, নারীদিগকে গ্রেপ্তার করা তাদের উচিত নয়, তাহা হইলেও এরূপ অব্যাহতি লইতে নারীরা রাজী হইবেন না। কারণ, এ পর্য্যন্ত যে-সব কাজ পুরুষেরাই করিয়া আসিতেছিলেন, যে-সব মহিলা তাহাতে হাত দিবেন, তাঁহারা আপনাদিগকে দেশের ভৃত্যই মনে করিবেন, পুরুষ বা নারী তাঁহারা কোন্ জাতীয় ভৃত্য তাহা কেহ বিবেচনা করিবে, তাহার আশা করিবেন না। আর, শিভ্যাল্‌রীর কথা তুলিলে ইহাও বলি, ইংলণ্ডে নারীর ভোট প্রাপ্তির আন্দোলনে যে-সব মহিলা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেরূপ অকথ্য ব্যবহার কখন কখন পাইয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি কেম্ব্রিজে সমান পরীক্ষা দিয়া সমান কৃতিত্বের জন্য মেয়েদের ও ছেলেদের সমান উপাধি ও অধিকার লাভ আন্দোলন সম্পর্কে তথাকার পুরুষ ছাত্রেরা নারী কলেজ নিউন্‌হ্যামের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে অন্য জাতি অপেক্ষা ইংরেজ জাতির নিকট শিভ্যাল্‌রী জিনিষটার বেশী আশা করা উচিত নয়।

আমরা দুটি কারণে আমাদের দেশে মেয়েদের এমন ভাল কাজও করিবার পক্ষে নহি, যাহাতে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম কারণ এই, যে, পুরুষ কয়েদীদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে আমরা অসমর্থ; তথাপি আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি। কিন্তু নারী বন্দিনী হইলে এমন অপমান ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ রাজভৃত্য দ্বারাই কখন কখন হইতে পারে, যাহা অসহ্য এবং যাহাতে অহিংসাব্রত রক্ষা করা অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমরা চাই না, যে, অহিংসা ব্রত ভঙ্গ করিবার কোন উত্তেজক কারণ ঘটে। দ্বিতীয় কারণ এই, যে, আমরা যদিও আবশ্যক হইলে নারীর যে কোন বৈধ কাজ করার আপত্তি করি না, তথাপি কোন প্রকার সংগ্রাম মাতৃজাতির উপযোগী ও প্রধান কাজ মনে করি না। অবশ্য, কোন প্রকার সংগ্রাম করিতে পুরুষের অভাব ঘটিলে নারী অবতীর্ণ হইতে পারেন। নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিয়া আমরা একথা বলিতেছি না, নারীর বিশেষত্ব বশতঃ বলিতেছি। বাংলা দেশে পুরুষের অভাব হইলে নারীরা সংগ্রামের কাজে নামিতে পারেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার পুত্রের কোন অপৌরুষ হয় নাই, কারণ তাঁহারা রণে নামিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে ও পরিবারে পিতা স্বামী ভ্রাতা পুত্র জেলের বাহিরে থাকিতে কোন নারী রণে নামিলে পুরুষ আত্মীয়দের কাপুরুষতা প্রমাণিত হইবে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। অবশ্য কোন সরকারী আইন বা আদেশ লঙ্ঘন কেহ করিবেন কিনা, তাহা প্রত্যেকে নিজে স্থির করিবেন, এবং লঙ্ঘন করা স্থির করিলে আমরণ দুঃখকে বরণ করিয়া লইবেন। অন্য সব দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এদেশের হাজত ও জেলগুলির নৈতিক অবস্থা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে ওরূপ অশুচি স্থানে মহিলাদের অবরোধ কল্পনা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

রাজনৈতিক কারণে দণ্ড দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষে দণ্ড দিতে বাধ্য হইতে পারেন। সেইজন্য পুলিশ বিভাগের যে-একটি সংস্কার বহু পূর্ব্বে হইতেই হওয়া উচিত ছিল, তাহা এখন করা কর্ত্তব্য। অনেক সভ্য দেশে নারী-পুলিশের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে-সব দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত আছে, সেখানে পুরুষেরা সচ্চরিত্রা নারীদিগকেও গৃহের বাহিরে দেখিতে অভ্যস্ত; এইজন্য কোন নারীকে গৃহের বাহিরে দেখিলেই তাহাদের মনের মধ্যে অসম্মানের ভাব জাগা অবশ্যম্ভাবী নহে। তথাপি সেইরূপ অনেক দেশে নারীজাতীয় পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক প্রদেশে ভদ্রমহিলাদের বাড়ীর বাহিরে সর্ব্বত্র উন্মুক্ত স্থানে যাইবার রীতি নাই। এইজন্য সেরূপ অবস্থায় ও স্থানে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিলে অসম্মানের ভাব মনে আসিতে পারে। এবম্বিধ নানা

কারণে এদেশে নারী-পুলিশের প্রয়োজন বেশী। রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপারে নারীরা নিরস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের আগে হইতে সভ্য ব্যবহার করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা দরকার। এমনিই ত রাজনৈতিক কারণে নারীর কারাদণ্ড হইলে আমাদের দেশে খুব উত্তেজনা হইবে। তাহার উপর যদি দণ্ডিতা নারীর কোন ব্যক্তিগত অপমান হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ও দেশের পক্ষে ভাল হইবে না।

"আইনসঙ্গত" ও বে-আইনী নিগ্রহ

আগে হইতেই কাগজে পড়িতেছিলাম ও লোকমুখে শুনিতেছিলাম, যে, কোন কোন গোরাসৈন্য, সার্জেণ্ট, সিভিল গার্ড, প্রভৃতি সরকার-পক্ষের লোক ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে, এবং অধৃত রাস্তার পথিক এবং দোকানের লোককে মারপিট করিয়া থাকে। এই প্রকারের কতকগুলি সংবাদ যে সত্য তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। কাহারো কোন সন্দেহ থাকিলে প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রতি কলেজ ষ্ট্রীটে গোরা সেনানায়কের আক্রমণে সে সন্দেহ দুর হওয়া উচিত।

এরূপ মারপিটের কারণ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই প্রকার মত শুনা যায়। একটি মত এই, যে, এসব মারপিটের জন্য, যাহারা উহা করে, তাহারাই দায়ী; পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষের বা গবর্ণমেণ্টের বিনা আদেশে ও অজ্ঞাতসারে উহা ঘটে। আর-একটি মত এই, যে, আইন-অনুযায়ী দণ্ড রাজনৈতিক অপরাধীদের পক্ষে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ বা গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট মনে না করায়, প্রহারের ব্যবস্থা তাঁহাদের চোখ-টিপুনি বা আদেশ অনুসারেই হয়। শেষ মতটির সমর্থন করিতে হইলে অনেক প্রমাণের আবশ্যক হয়; তাহা সম্প্রতি এদেশে এপর্য্যন্ত কেহ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু এরূপ যদি ঘটে, যে, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মারপিটের সত্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন সাজা হয় না, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, যে, কর্ত্তৃপক্ষ মারপিটের হুকুম দিয়া থাকুন বা না দিয়া থাকুন, উহা তাঁহাদের অননুমোদিত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, শ্রদ্ধাস্পদ মৈত্র মহাশয়কে যে অপমান ও আঘাত করিয়াছে এবং যে বীরত্ব-বশতঃ নিজের নামটি দেয় নাই, তাহাকে আবিষ্কার করা খুব সোজা; মৈত্র মহাশয় সমুদয় ব্যাপার লাট সাহেবকে জানাইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণে লক্ষ্য রাখিবেন, আক্রমণকারীর কিরূপ সাজা হয়।

গবর্ণমেণ্টের আদেশে বে-আইনী মারপিটের কোন প্রমাণ এদেশে সম্প্রতি কেহ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিলাতী গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেক্রেটারীর সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও আদেশে আয়ার্ল্যাণ্ডে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বে-আইনী প্রতিহিংসার কাজ বর্ত্তমান সময়ে যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ ১৯২১ সালের ২৮শে মে তারিখের "দি নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" নামক প্রসিদ্ধ বিলাতী কাগজে আছে।

উপরে লিখিত প্রথম মতটি সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু মারপিট্ যে কারণেই ঘটুক, সে-সম্বন্ধে সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই একটি কর্ত্তব্য আছে। আইন অনুসারে বিচারের পর দণ্ডের একটা সুবিধা এই আছে, যে, দণ্ডের প্রকার ও মাত্রা অপরাধ অনুযায়ী করিতে পারা যায়, এবং, কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকিলে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু বিনা বিচারে যাহাকে তাহাকে মারপিটের ব্যবস্থা করিলে কিম্বা উহার প্রশ্রয় দিলে, ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকে না, অপরাধী-নিরপরাধের ভেদ থাকে না; প্রতিহিংসা-পরায়ণতা বাড়ে, এবং প্রহৃত ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যুও হইতে পারে। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের সভ্যতার দাবী লোপ পায়, এবং তাঁহারা লোকের সম্মানের আর অধিকারী থাকেন না। যে-গবর্ণমেণ্ট যত শক্তিশালীই হউন না কেন, কেবল ভয় উৎপাদন দ্বারা কেহই বেশী দিন প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। ভয় কাটিয়া যায়,—যেমন এদেশেও দ্রুত যাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকেই ত লোকে আর আগেকার মত ভয় করে না। সর্ব্বসাধারণের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপর গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এইজন্য আমরা চাই না, যে, গবর্ণমেণ্ট এরূপ কিছু হইতে দেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা যদি কিছু এখনও বাকী থাকে, তাহাও লুপ্ত হয়। যদি কোন শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে তাহা আবার জন্মে, ইহা আমরা ইচ্ছা করি। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

যাঁহারা বিস্মিত হইবেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, "তোমরা ত চাওই যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে স্বরাজ স্থাপিত হউক। তোমরা বলিতেছ, যে, কোন গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বেশ, তাহা হইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অশ্রদ্ধেয় হইয়া বিনষ্ট হইলে ত তোমাদের অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। তবে আবার উহার প্রতি শ্রদ্ধার অবশিষ্ট অংশ রক্ষিত হইবার জন্য কিম্বা লুপ্ত শ্রদ্ধার পুনরুদ্ভবের জন্য কেন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ?" তাহার কারণ বলি। আমরা যে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায় পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। কিন্তু ঐ স্বাধীনতালাভের পথ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, ইহাও বলিয়াছি।

হিংসার মানে যে শুধু কাহারো প্রাণবধ বা প্রাণবধের ইচ্ছা, তা নয়; কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার

ইচ্ছা বা অনিষ্ট হউক এই কামনাও হিংসা। ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশ জাতির প্রভুত্ব নষ্ট হউক, এরূপ ইচ্ছা হিংসা নহে; কারণ তাহাদের সাম্রাজ্য গেলে তাহাদের মঙ্গলই হইবে; সুইডেন্, নর্‌ওয়ে, ডেন্মার্ক, সুইজারল্যাণ্ডের কোন সাম্রাজ্য নাই; কিন্তু সেইসব দেশের লোকেরা ইংরেজদের চেয়ে কম ধার্ম্মিক, সুখী ও সভ্য নহে। কিন্তু ভারতশাসক ব্রিটিশ জাতির চারিত্রিক অধঃপতন হউক, তাহারা আমাদের উপর এরূপ বে-আইনী গর্হিত ব্যবহার করুক যে তাহাতে তাহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাক্ এবং এই প্রকারে এদেশে তাহাদের সাম্রাজ্য নষ্ট হউক, এইরূপ ইচ্ছা নিশ্চয়ই হিংসা। এইজন্য আমরা এরূপ ইচ্ছা করি না।

তদ্ভিন্ন, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া আইন-বহির্ভূত শাস্তি যাহাকে-তাহাকে দিবার আদেশ করিলে অর্থাৎ বিনা বিচারে যাহাকে-তাহাকে মারপিট্ করাইবার বন্দোবস্ত করিলে, এই হিংসায় জনসাধারণের প্রতিহিংসাও জাগিয়া উঠিবে। তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হইয়া শেষ ফল কি দাঁড়াইবে, বলা যায় না। তবে, তাহাতে শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব বিপ্লব যে ঘটিবে না, ইহা নিশ্চিত; রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটিবারই সম্ভাবনা; তাহা আমরা চাই না। আমরা ইংরেজের ও অন্য জাতিদের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে চাই।

"আইন" ও "বিচার"

ইংরেজীতে একটা পরিহাস, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ আছে, যে, The law is an ass, "আইন গাধা।" কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা নয়। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে শত শত লোককে ডায়ারের হুকুমে কতকগুলা সিপাই বিনা বিচারে বিনা দোষে খুন করিল; কিন্তু হুকুম যে দিল এবং যাহারা হুকুম তামিল করিল, তাহাদের কাহারো একদিনের জন্যও, বিনাশ্রমেও জেল হইল না। চাঁদপুরে স্থানীয় উচ্চতম রাজভৃত্যদের হুকুমে ও তাহাদের সাক্ষাতে গুর্খারা কুলিদিগকে প্রহার করিল, রক্তপাত হইল; কিন্তু হুকুমদাতা ও প্রহারকর্ত্তা কাহারও একদিনেরও জেল হইল না। টিরুর ও বেল্লারীর মধ্যে রেলপথে প্রায় ৭০ জন মোপ্‌লা বন্দী সচল অন্ধকূপের মত একখানা মালগাড়ীতে দম্ বন্ধ হইয়া মারা গেল; কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহারও একদিনেরও জেল হইল না—পরে হইতেও পারে। কলিকাতার হাজতে, থানায়, রাস্তায় এবং দোকানে অনেক লোককে রাজভৃত্য কোন কোন শাদা ও কাল মনুষ্য প্রহার করিল, ফেলিয়া দিল, অপমান করিল, বলিয়া কাগজে প্রকাশ; কিন্তু কাহারো একদিনেরও জেল এপর্য্যন্ত হইল না। কিন্তু লোককে হরতাল করিতে বলায়, খদ্দার পরায় এবং বন্দেমাতরম্ বলায় অনেকের জেল, সশ্রম জেল, তিনমাস ছয়মাস চট্‌পট্ জেল হইতেছে। আবার ঠিক্ এইরকম "অপরাধেই" এলাহাবাদে বিনাশ্রমে জেল হইতেছে। অথচ সর্ব্বত্রই ইংরেজের আইন অনুসারে একই কারণে সশ্রম ও বিনাশ্রম দুইরকম দণ্ড হইতেছে।

"আইনের" মহিমা, "বিচারের" মহিমা, বুঝে কার সাধ্য!

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমাদের অযোগ্যতা

ইংরেজরা বলেন, যে ভারতীয়েরা রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেই স্বরাজ পাইবে; এখন তাহারা অযোগ্য আছে, এইজন্য তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই। আমরা যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার বুঝিতে অসমর্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দেখুন না আমরা ভাবিতেছিলাম, ইংরেজদের হয়ত যথেষ্ট সৈন্য নাই ও যথেষ্ট কামান বন্দুক নাই, এইজন্য মোপ্‌লা-বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব ঘটিতেছে; কিন্তু কলিকাতার সহরে কোথাও কোথাও কলের কামান ও গোরাসৈন্য বসানতে এবং বেনারসের কোন কোন পথে বন্দুক হস্তে রাজভৃত্যদের পরিক্রমণে বুঝিতে পারা গিয়াছে, যে, সব সৈন্য ও সব অস্ত্র মালাবারে প্রেরিত হয় নাই। এবং খুব বীর সৈন্যও যে এখনও মালাবারে প্রেরিত হয় নাই, তাহারও প্রমাণ কলিকাতার রাস্তায় পাওয়া গিয়াছে। কারণ, তাহাদের কেহ কেহ মারপিট করিয়াছে, নিরস্ত্র লোকদের বুকের ও মুখের উপর রিভল্‌ভার ধরিয়াছে, নিরস্ত্র পথিকদের পশ্চাতে বন্দুক লইয়া তাড়া করিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ মনুষ্যকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এবং নাম জিজ্ঞাসা করায় এরূপ প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে ও নাম বলে নাই। এসব আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনে যে অযোগ্যতা আমাদের আছে, তাহাতে আর ভুল কি?

শুধু সর্কারী ইংরেজদের রাজনীতিই যে আমরা বুঝিতে পারি না, তা নয়, বেসর্কারী ইংরেজদের এবং তাহাদের প্রভাবাধীন দেশী লোকদের রাজনীতিও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য বুঝিতে পারি নাই, কেন ইংরেজের ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্ প্রিন্সিপ্যাল মৈত্র মহাশয়ের লাঞ্ছনাকে তাঁহার "adventure" বলিয়া শিষ্টাচার, মানবিকতা ও রসিকতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ এই, যে, তিনি কতকগুলা গোরাকে বন্দুক লইয়া অনেক নির্দ্দোষ নিরস্ত্র পথিকের পশ্চাৎ ধাবন করিতে দেখিয়া ভয়ে "চাচা আপনা বাঁচা" মন্ত্রের সাধন করিতে করিতে বাড়ী যান নাই, গোরাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফলে গোরাদের নায়ক তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল, এবং তিনি তাহার নাম জানিতে চাওয়ায় বীরপুঙ্গবেরা বলে নাই। নিউ এম্পায়ার একজন ধনী মাড়োয়ারীর কাগজ। ইহাতে মৈত্র মহাশয়ের লাঞ্ছনাকে alleged assault বলা হইয়াছে। এই অতিভক্তি বা

অতিসাবধানতার রহস্য উদ্ভেদ করিতেও আমরা পারি নাই। Assault সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে কি ?

ছাত্রদের স্কুলকলেজ ত্যাগ

অসহযোগের নেতাদের পরামর্শ অনুসারে একবার ছাত্রেরা স্কুলকলেজ ছাড়িয়াছিল। আমরা তখন তাহার বিরোধী ছিলাম। এক্ষণে আবার তাহাদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে বলা হইতেছে। তাহারা অনেকে কলেজে যাইতেছে না। কাগজে দেখিতেছি, তাহারা গবর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রতিবাদ স্বরূপ এইরূপ করিতেছে। ইহার ঠিক্ অর্থ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অসহযোগ-নেতারা সকলকে স্বেচ্ছাসেবক হইয়া হরতাল প্রচার করিতে বলিয়াছেন, এবং ধৃত হইলে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া জেলে যাইতে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই, যে, গবর্ণমেণ্টের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া যত লোক জেলে যাইবেন, স্বরাজ ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। তদনুসারে দলে দলে সাহসী স্বেচ্ছাসেবকেরা হরতাল প্রচার করিতেছেন ও ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। অসহযোগ-নেতারা যাহা চান, তাহাই হইতেছে। সুতরাং অসহযোগীদের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ কেন করা হইবে বুঝিতে পারি না। অন্যেরা দমননীতি যদি ভাল মনে না করেন, তাহা হইলে কারণ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয়, যে-সব ছাত্র ও অন্য লোক দমননীতির প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় অসহযোগী নহেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক নহেন, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা ও দণ্ড দেওয়ার নিন্দা এবং স্বেচ্ছাসেবক ও অন্য লোক-দিগকে প্রহার করার নিন্দা সহযোগী অসহযোগী সকলেরই করা কর্ত্তব্য মনে করি।

ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা অসহযোগী, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রতিবাদ করিতে পারেন না, এবং প্রতিবাদ স্বরূপ কলেজে অনুপস্থিত হইতে পারেন না। অবশ্য অন্য সকলের মত তাঁহারাও কতকগুলা সরকারী বা সরকার পক্ষের লোকদের গুণ্ডামির প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কলেজে অনুপস্থিত হওয়ার বা কলেজ ত্যাগ করার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহারা পড়াশুনা বন্ধ করিলে বা রাখিলে গবর্ণমেণ্টের সদ্য সদ্য বা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত ও জব্দ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, ও থাকিলে কতটুকু আছে, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। উত্তেজনা বশতঃ কেবল নিজেদের ক্ষতি করা উচিত নয়।

আমরাও এক সময়ে যুবক ছিলাম। যুবকদের মহাপ্রাণতা ও সমবেদনাপ্রবণ হৃদয়ের মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহারা ভাবিতেছেন, "আমাদের এত ভাই মার খাইতেছে ও জেলে যাইতেছে, আর আমরা আরামে মজায় দিন কাটাইব ?" এরূপ মনোভাবকে আমরা অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করি। এবং শ্রদ্ধার সহিতই আমরা যুবকদিগকে কয়েকটি কথা বলিতেছি। আমরা স্বয়ং জেলে না-যাইবার জন্য প্রাণপণ না করিলেও যাইবার জন্যও ব্যগ্র নহি, এই-জন্য তাঁহাদিগকেও জেলে যাইবার পরামর্শ দিব না, অনুরোধও করিব না ; কিন্তু একথাও বলিব না, যে, জেলে না-যাওয়াটাই প্রধান কর্ত্তব্য এবং মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াও তাঁহাদিগকে জেলের বাহিরের জগৎটাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে।

শিক্ষালাভ ভোজ খাওয়ার মত কিম্বা রংতামাসা দেখার মত আরাম মজা বা বিলাস নহে। সুতরাং সঙ্গীরা জেলে গিয়াছে আর আমরা আমোদ প্রমোদ করিব, প্রকৃত বিদ্যার্থীদের এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। তবে ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত, তাঁহাদের এবং সকল লোকেরই জাতীয় দুঃখের দিনে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও বিলাস ত্যাগ করা যে উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি দেখি, যে, ছাত্রেরা কলেজ যাইতেছেন না, কিন্তু থিয়েটার, সিনেমা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি আমোদের জায়গায় তাঁহারা যাইতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের জেলবাসী সঙ্গীদের সহিত সমবেদনা প্রকাশকে ভণ্ডামি ভিন্ন কিছুই মনে করিতে পারিব না, এবং আমোদনিরত ব্যক্তিদের প্রতি একটুও শ্রদ্ধা রাখিতে পারিব না। জাতীয় অপমান দুর্গতি নিগ্রহ যাঁহাদিগকে বাস্তবিক পীড়া দেয়, তাঁহারা আমোদ প্রমোদ রং তামাসার ধার দিয়া যান না। যাঁহারা বাস্তবিক পীড়া বোধ করেন, কারাবাসীদের প্রতি যাঁহারা সমবেদনা বোধ করিতেছেন, তাঁহারা যদি জেলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হন, তজ্জন্য ভলাণ্টিয়ার হন, এবং জেলে যান, তাহাতে আমরা তাঁহাদের এই সত্য সমবেদনাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিব। কিন্তু যাঁহারা জেলে যাইতেছেন না, তাঁহাদের সমবেদনা-বোধ নাই, ইহাও মনে করিতে পারি না। জেলেই থাকুন, আর জেলের বাহিরেই থাকুন, যিনি জাতীয় দুর্গতির দিনে তাহার উপযুক্ত প্রকার জীবন যাপন করেন এবং দুর্গতি দূর করিবার চেষ্টা নিজ শক্তি ও সাধ্য অনুসারে করেন, তিনিই স্বদেশভক্ত ও স্বজাতিবৎসল।

হরতাল না-করিতে কেহ ধর্ম্ম বা আইন অনুসারে বাধ্য নহে, হরতাল করিতেও কেহ বাধ্য নহে। করা বা না-করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে। করিতে বা না-করিতে বলিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে ; কিন্তু কোনদিকেই কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিবার বা চাপ দিবার অধিকার কাহারও নাই। "এখন আমাদের জাতীয় দুর্গতির ও অপমানের দিন, আমাদের মনে সুখ ও সন্তোষ নাই, আমাদের ব্যবহার তদ্রূপ হওয়া উচিত, এইজন্য আমরা

যুবরাজের অভ্যর্থনা-উৎসবে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিব না, এবং আমাদের মনোভাব প্রকাশার্থ হরতাল করিব," হরতালকারীদের এবং তাহা করিবার পরামর্শদাতাদের বক্তব্য বোধ হয় এইরূপ। ইহা যদি তাঁহাদের হৃদ্‌গত কথা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আচরণে অকপট থাকিবার জন্য যাহা কিছু করা দরকার তাহা নিজ নিজ দায়িত্বে অবশ্যই করিবেন এবং তাহার ফলে যদি কোন দুঃখ আসে তাহাও বরণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত থাকিবেন। কিন্তু যদি দেখি, যে, যাহারা হরতাল করিতে বলিল বা করিল, তাহারা বা তাহাদেরই আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, এবং যাহারা জেলে গিয়াছে তাহাদেরই আত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুরা দলে দলে যুবরাজের অভ্যর্থনার অঙ্গীভূত আতসবাজী ঘোড়দৌড় আমোদ প্রমোদ জাঁকজমক সাজসজ্জা দেখিতে ভোগ করিতে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছে বা যাইতেছে, তাহা হইলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, যে, তাহারা হরতালের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিল, বা জাতীয় অপমান দুর্গতি তাহাদিগকে বিন্দুমাত্রও পীড়া দিয়াছে?

অতএব ছাত্রদিগকে বলি, আপনারা ধীর শান্ত ভাবে মনটাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সর্ব্ববিধ আচরণে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অকপট হউন, কেবল হুজুকে মাতিয়া নিজেদের ক্ষতি করিবেন না।

কংগ্রেসের একটি নির্দ্ধারণ

কংগ্রেসের মত এই, যে, কোন ভারতীয়ের গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগে চাক্‌রী করা উচিত নয়, পুলিশ বিভাগে ও সৈনিক বিভাগেও চাকরী করা উচিত নয়। করাচীর কন্‌ফারেন্সে এই মতের শেষ অংশটি একটি প্রতিজ্ঞার আকারে ধার্য্য হওয়ায় সেই সংস্রবে কয়েকজন নেতার জেল হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাটিও নানাস্থানে প্রকাশ্য সভায় আবার নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে রাজদণ্ডের আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহাদের একটি কর্ত্তব্যেও তাঁহাদের মন দেওয়া উচিত ছিল। এখনও সেই কর্ত্তব্যে তাঁহারা মন দিতে পারেন। সহযোগী অসহযোগী আমরা সকলেই দেখিতেছি, যে, ভারতবর্ষের সব লোকের মন অহিংসাপরায়ণ শান্ত সংযত ও নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত এখনও হয় নাই; দাঙ্গা মারামারি খুনোখুনি করিবার লোক বিস্তর রহিয়াছে, এবং তাহারা হত্যা রক্তপাত উপদ্রব অশান্তি ঘটাইতেছে। এ অবস্থায় শান্তি রক্ষার জন্য লোক থাকা চাই। সর্‌কারী পুলিশের ও সৈনিকের কাজ যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শান্তিরক্ষা এবং অপরাধ (crime) উপদ্রব নিবারণ করিবার অন্য কোন রকম বন্দোবস্ত এবং লোকও ত চাই? এইজন্য, কংগ্রেস ও খিলাফৎদলের প্রত্যেক সভ্যের এই প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য, যে, তাঁহারা শান্তিরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

দু এক জায়গায় এই দলের সভ্যদের চেষ্টায় শান্তিভঙ্গ ও উপদ্রব ঘটে নাই, ইহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র সকল সভ্যের ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য ও ব্রত বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, যখন সর্‌কারী সৈন্যদলে কোন ভারতীয়ের কাজ করাও কংগ্রেস ও খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স্ গর্হিত বলিয়াছেন, তখন বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ভারও তাঁহাদের লওয়া উচিত। সুতরাং কংগ্রেসের ও খিলাফৎদলের সভ্য হইতে হইলে যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়, তাহার মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাও থাকা উচিত, যে, "আমি ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইলাম।"

অহিংসার সীমা

এইখানে এক কঠিন সমস্যা দেখা দিবে। অসহযোগীরা অহিংসাবাদী। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে ভিতরের ও বাহিরের সশস্ত্র শত্রুদিগের হাত হইতে দেশরক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবেন কি না? অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ না করিয়া সশস্ত্র শত্রুকে, বিশেষতঃ বহিঃশত্রুকে নিরস্ত করিবার অন্য কোন ফলদায়ী উপায় আছে কি?

এরূপ শান্তিপ্রিয় লোক পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্যও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতীয় অসহযোগীরা ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারা সাহসী সেই শ্রেণীর লোক কি না।

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পুরামাত্রায় অহিংসাচারী হইতে সম্মত হইতে পারি, নির্ব্বিবাদে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতেও পারি; কিন্তু এক জায়গায় খট্‌কা লাগে। আততায়ীর প্রাণ-

বধ ছাড়া নারীর উপর অত্যাচার নিবারণের যদি আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে আততায়ীর প্রাণবধ করা উচিত কি না?

পুরুষের উপর অত্যাচার ও নারীর উপর অত্যাচারে প্রভেদ আছে। নারীর উপর অত্যাচারে তাঁহার জীবন এরূপ কালিমাময় দুর্ব্বহ ও দুঃসহ হইতে পারে, যাহা অপেক্ষা মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয়। ইহা নিবারণ করিবার জন্য আবশ্যক হইলে আততায়ীর প্রাণ বধ করা উচিত নহে কি? এক-জন দুর্বৃত্তের প্রাণ কি নারীর স্বচ্ছন্দ পবিত্র নারীজীবন অপেক্ষা অধিক পবিত্র ও মূল্যবান্? আমরা পুরুষজাতির পক্ষ হইতে এইসব কথা লিখিতেছি; কারণ দেশের উপর শত্রুর আক্রমণ নিবারিত না হইলে নারীর অপমান অবশ্য-ম্ভাবী, এবং যে পুরুষ তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে নিবারণ না করে, সে কাপুরুষ। নারীরা আত্মরক্ষার জন্য স্বয়ং আততায়ীর প্রাণ বধ পর্য্যন্ত করা উচিত মনে করেন কি না, তাহা তাঁহারা স্থির করিবেন।

আমরা কংগ্রেস ও খিলাফৎদলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা লঘুচিত্ততাবশতই লিখিতেছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। পুলিশ ও সেনা বিভাগে কাজ না করার অনুরোধ যদি তাঁহারা অন্তরের সহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুলিশ ও সৈনিকদের শান্তিরক্ষার কাজ তাঁহারা অন্তরের সহিত করুন ও করিতে প্রস্তুত থাকুন। আয়ার্ল্যা-ণ্ডের শিন্-ফেন্ দলের লোকেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রভাবাধীন জেলা সকলে শান্তি রক্ষা ও সুবিচারের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। ভারতীয় অসহযোগীরা অহিংসাবাদী, সুতরাং সশস্ত্র যুদ্ধ করিবেন না; কিন্তু শান্তিরক্ষা ও সুবিচারের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। কেবল ভাঙ্গিব, গড়িব না, ইহা ত হইতে পারে না। যদি গড়িতে না পারেন, ভাঙ্গিবেন না।

"বেআইনী"র অর্থ

ইংরাজীতে "ল" (Law) এবং কন্‌স্‌টিটিউশ্যন্ (Constitution) দুটি কথা আছে। এই দুটি কথার মানে ঠিক্ এক নয়। কিন্তু আমরা সচরাচর কন্‌স্‌টিটিউশ্যন্যাল এজিটে-শনের বাংলা "আইনসঙ্গত আন্দোলন" করিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক এমন অনেক প্রচেষ্টা থাকিতে পারে, আইন লঙ্ঘন বা অমান্য করাই যাহার কার্য্যপ্রণালী, অথচ যাহা কন্‌স্‌টিটিউশ্যন-বিরুদ্ধ নহে। যেমন নিরুপদ্রব অবাধ্যতা (civil disobedience) কিম্বা সাত্বিক প্রতিরোধ (passive resistance)। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গুজরাটের কায়রা জেলার লোকেরা যে জমীর খাজানা দেয় নাই, তাহা নিরুপদ্রব অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি কাঁথি মহকুমার লোকেরা ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে। ইহাও ঐজাতীয় প্রচেষ্টা। উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলনকারীরা বে-আইনী কাজ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কন্‌স্‌টিটিউশ্যন-বিরুদ্ধ কাজ করে নাই। কন্‌স্‌টিটিউশ্যনের মানে রাষ্ট্রের ভিত্তীভূত নিয়মাবলী। ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসে নিরুপদ্রব অবাধ্যতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তীভূত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ বলিয়া গণিত হয় না। আমরা গত মাসের প্রবাসীতে ইহার সপক্ষে ব্রিটিশ জজের রায় উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

বর্ত্তমানে যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া দোকানে গিয়া দোকানদারদিগকে হরতাল করিতে বলিতেছেন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়াটা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অনুসারে তদুল্লিখিত একটি আইনের বিরুদ্ধ বটে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা ব্রিটিশ কন্‌স্‌টিটিউটিশ্যন-বিরুদ্ধ নহে। আমরা কন্‌স্‌টিটিউশনাল-ব্যবস্থাভিজ্ঞ নহি, সুতরাং আমাদের মতের কোন মূল্য না থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের সোজা বুদ্ধিতে মনে হয়, অসহযোগীদের লক্ষ্য যখন স্বরাজস্থাপন এবং তাঁহাদের নেতা মহাত্মা গান্ধীর মতে স্বরাজের অর্থ যখন আপাততঃ ডোমিনিয়ন হোমরূল বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন, অধিকন্তু তাঁহারা যখন কোন প্রকার উপদ্রব বা সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা স্বরাজ স্থাপন করিতে চান না ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই থাকিতে চান, তখন কংগ্রেসের পালিতব্য প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে অচল করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও কংগ্রেস বা তাহার অন্তর্গত কোন প্রচেষ্টা কন্‌স্‌টিটিউশ্যন্-বিরুদ্ধ নহে। এখন নেতারা ও অন্য অসহযোগীরা এক হিসাবে বে-আইনী কাজ করিতে-ছেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা কন্‌সিটিটিউ-শ্যন্-বিরুদ্ধ কাজ করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট যে সংশোধিত ১৯০৮ সালের ক্রিমিন্যাল্ ল এমেণ্ডমেণ্ট আইনের ১৬ ধারা

অনুসারে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বেআইনী জনসমষ্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাই আইনসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আইনজ্ঞেরা ঠিক্ বলিতে পারিবেন। যদি কোন জনসমষ্টির কোন প্রতিজ্ঞার শেষ ফল হয় গবর্ণমেণ্ট অচল হওয়া, তাহা হইলেই ঐ জনসমষ্টিকে বে-আইনী সমিতি বলা যায় না। যাহারা খাজনা বা ট্যাক্স্ না দিয়া আইন অমান্য করে, তাহাদের কাজেরও শেষ ফল ত গবর্ণমেণ্ট অসম্ভব হওয়া; কারণ বিনা টাকায় দেশশাসনকার্য্য চলিতে পারে না। কিন্তু ট্যাক্স্ না দিয়া যাহারা নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করে, তাহারা কি বেআইনী সমিতি বলিয়া ঘোষিত ও দণ্ডিত হয়?

এত কথা লিখিতেছি, এইজন্য, যে, স্বেচ্ছাসেবক হওয়াই বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, কাহাকেও হরতাল করিতে বলা, খদ্দর পরা, কিম্বা "বন্দে মাতরম্" চীৎকার করা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই; এই কাজগুলি স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার লক্ষণ বা প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ইহাদের জন্য লোকে দণ্ডিত হইতেছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক হওয়াটা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কন্স্টিটিউশ্যনাল হইয়াছে কি না, তাহাই বিবেচ্য।

সংস্কার আইন ও মন্ত্রীগণ

কাগজে দেখিতেছি, বাংলা গবর্ণমেণ্ট দেশী মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়াই দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাও জানা কথা, যে, মন্ত্রীরা চাঁদপুরে গুর্খাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে বা তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভাও কিছু করিতে পারেন নাই। অন্যান্য প্রদেশেও হয় ত এইরূপ ঘটিয়াছে। শাসন-সংস্কার আইন দ্বারা কোন উপকারই হইতে পারে না, এরূপ মত আমরা কোনকালে প্রকাশ করি নাই; কিন্তু ইহাতে আমরা বিশেষ কিছু অধিকার পাই নাই, অধীনতার অপমান লাঞ্ছনা ও অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় ইহা দ্বারা হয় নাই, এই মত আমাদের আগে ছিল, এখনও আছে। এবিষয়ে এবং মোটের উপর শাসন-সংস্কার আইনটার মূল্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মডারেটদের মত আগে কি ছিল, এবং এখন তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি না, তাঁহারা তাহা বিবেচনা করিবেন।

আমরা মনে করি, ক্ষুদ্রতমের লাঞ্ছনাও লাঞ্ছনা, প্রসিদ্ধ লোকের লাঞ্ছনাও লাঞ্ছনা। প্রভেদ এই, যে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির লাঞ্ছনা হইলে তাহাতে লোকের দৃষ্টি পড়ে বেশী। সেইজন্য জিজ্ঞাস্য এই, যে, শ্রদ্ধাস্পদ প্রিন্সিপ্যাল্ মৈত্রেয় মহাশয়ের লাঞ্ছনাতে মডারেট্‌দলের কাহারও চোখ ফুটিবে কি না। তাঁহার আযৌবন বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আগামী সোমবার কলিকাতায় পৌঁছিয়া সব কথা জানিয়া কি মনে করিবেন, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না।

চলন্ত অন্ধকূপ

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তিরুর হইতে বেল্লারী প্রায় ৪৬০ মাইল। এই ৪৬০ মাইল পথ কতকগুলি বিদ্রোহী মোপ্‌লা বন্দীকে রেলে লইয়া যাইবার জন্য একটা মালগাড়ীতে পুরিয়া পাঠান হয়। তাহাদের মধ্যে রেলগাড়ীতেই বাতাসের অভাবে দম্ বন্ধ হইয়া ছাপান্ন জন মারা যায়, এবং পরে আরো চৌদ্দ জন মারা যায়। ইতিহাসে ইহার মত শোকাবহ ঘটনা আর একটিও মনে পড়িতেছে না। অবশ্য সিরাজউদ্দৌলার আমলে অন্ধকূপহত্যা ইংরেজদের লেখা ইতিহাসের এইরূপ আর-একটি ঘটনা বলিয়া অনেকের মনে পড়িবে। কিন্তু অন্ধকূপহত্যার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, তুলনা ও আলোচনার নিমিত্ত আমরা ইহা সত্য ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতেছি।

মোপ্‌লা বন্দীদের মৃত্যু যে প্রকারে হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। তাহাদের হৃদয়বিদারক দুঃখকাহিনী পুনরায় বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা নাই, আবশ্যক নাই। তাহারা মধ্যপথে জল চাহিয়াও পায় নাই, প্রহরীরা তাহাদের কাতর প্রার্থনা শুনে নাই, তাহারা তৃষ্ণায় নিজের নিজের ঘর্ম্মসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া খাইয়াছে, এরূপ অনেক কথা পাঠকেরা পড়িয়াছেন। আমরা সে-সকলের পুনরুক্তি না করিয়া কেবল অন্ধকূপ হত্যার সহিত এই ঘটনাটির তুলনা করিব।

মেকলে লিখিয়াছেন, অন্ধকূপ নামক কাম্‌রা ২০ ফুট লম্বা ও কুড়ি ফুট চৌড়া অর্থাৎ ৪০০ বর্গফুট ছিল। উচু

কত ছিল জানা নাই। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মতে উহা ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি চৌড়া অর্থাৎ ২৬৭ বর্গফুট ছিল। ইহাতে ১৪৬ জন ইউরোপীয় যুদ্ধ-বন্দীকে জুনমাসে রাত্রিতে বন্ধ করা হইয়াছিল। রেমণ্ডের মতে ১১৩ জন। মেকেলের বর্ণনা অনুসারে এক একজন বন্দী প্রায় ৩ বর্গফুট জায়গা পাইয়াছিল, রেমণ্ডের মতে তিনেরও বেশী, এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার মতে ১২৮/৭৩ বর্গ-ফুট। অন্ধকূপে দুটি ছোট জানালা ছিল। প্রহরীরা ইংরেজ বন্দীদিগকে সামান্যমাত্র জল দিয়াছিল। প্রাতে কাম্‌রাটা খুলিয়া দেখা গেল যে ১২৩ জন মরিয়াছে, ২৩ জন বাঁচিয়া আছে। মোপ্‌লা বন্দী বোঝাই মালগাড়ীটা রেলওয়ে ট্রাফিক্ ইন্‌স্‌পেক্টর রীভের সাক্ষ্য অনুসারে ১৮ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চৌড়া অর্থাৎ ১৬২ বর্গফুট ছিল। ইহাতে জানালা ছিল না, দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে তালাচাবি হুড়্‌কা লাগাইয়া বন্দীদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। জানালার পরিবর্ত্তে তারের জাল ছিল, কিন্তু তাহার ছিদ্রগুলি রং দেওয়ায় বুজিয়া গিয়াছিল। সরকারী ডাক্তারদের মতে তারের জাল ফেলিয়া দিলেও গাড়ীটা মানুষ লইয়া যাইবার অনুপযুক্ত ছিল। ডাক্তার ওকোনর আই-এম-এস্ ও আর ৭৮ জন মানুষ দরজা বন্ধ করিয়া এই গাড়ীতে দু মাইল গিয়া কষ্টবোধ করিয়াছিলেন। এই গাড়ীতে মোপ্‌লা বন্দীকে বোঝাই করিয়া পাঠান হয়। তাহাদের সংখ্যা ১২২, ১০৬ বা ১০০ ছিল। ন্যূনতম সংখ্যাটা ধরিলেও তাহারা প্রত্যেকে ১৩/৫ বর্গফুট জায়গা পাইয়াছিল, অর্থাৎ অন্ধকূপের বন্দীদের চেয়ে কম জায়গা পাইয়াছিল। অন্ধকূপে ২টা ছোট জানালা ছিল, মালগাড়ীটাতে জানলা ছিল না; অন্ধকূপের বন্দীরা অতি সামান্য জল পাইয়াছিল, মোপ্‌লারা মোটেই পায় নাই। অন্ধকূপে অতগুলা মানুষ রাখা হইতেছে, সিরাজউদ্দৌলা তাহা জানিতেন না, মান্দ্রাজের লাট উইলিংডন তাহা জানিতেন না—যদিও জানা উচিত ছিল। কারণ, এই দুর্ঘটনা ২০শে নবেম্বর ঘটে। তাহার বহুপূর্ব্বে বন্ধ মালগাড়ীতে বন্দী লইয়া যাইবার অভিযোগ মান্দ্রাজের "হিন্দু" কাগজে বহুবার বাহির হইয়াছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বরের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল্ রিফর্ম্মারে এন্ লক্ষ্মণন্ এই বিষয়ে লেখেন। লর্ড উইলিংডন না জানিলেও মালাবারের স্পেশ্যাল্ কমিশনার মিঃ ন্যাপের (Mr. Knapp) নিশ্চয়ই জানা উচিত ছিল। আগে আগে মালগাড়ীতে নীত বন্দী কেহ মরে নাই বটে, কিন্তু খুব কষ্ট পাইয়াছিল, এবং অন্ধকূপ গাড়ীটা আগেকার গাড়ীগুলা হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

অন্ধকূপ সম্বন্ধে মেকলে লিখিয়াছেন, "Nothing in history or fiction,......approaches the horrors which were recounted by the few survivors..." এতদিনে মেকলের জাতিরই রাজত্বে উহার সদৃশ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু মেকলে ভুল করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি "thoughtless action" তাঁহার আগেকার ইংরেজরা বাংলাদেশে করিয়াছিলেন। এম্ রেমণ্ড্ (M. Raymond) তাঁহার কৃত সেইর্ মুতাখেরিন্ গ্রন্থের অনুবাদে নিজে একটি টীকায় অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Were we, therefore, to accuse the Indians of cruelty, for such a thoughtless action, we would of course accuse the English, who intending to embark four hundred Gentoo (i. e., Hindu) Sipahis, destined for Madras, put them in boats, without one single necessary, and at last left them to be overset by the boar, where they all perished, after a three. days' fast."

মেকলে লিখিয়াছেন যে অন্ধকূপহত্যা বর্ব্বর নবাবের ("savage Nabob") হৃদয়ে অনুতাপ বা করুণার উদ্রেক করে নাই, এবং সে হত্যাকারীদিগকে কোন শাস্তি দেয় নাই ("He inflicted no punishment on the murderers")। মোপ্‌লা বন্দীদিগের "হত্যাকারীদের" এপর্য্যন্ত কোন শাস্তি সভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দেন নাই, তদন্ত চলিতেছে, পরে কি দেন বা না দেন সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

"জীবজন্তু" নামক বালকবালিকাদের পাঠ্যগ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর ৫৫ বৎসর বয়সে আকস্মিক মৃত্যুতে বালকবালিকারা একজন স্নেহশীল বন্ধু হারাইলেন

তিনি 'সখা ও সাথী' হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বহু মাসিক পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধদের জন্যও লিখিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুবিস্তৃত ছিল, জ্ঞানপিপাসাও খুব বেশী ছিল। তিনি এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এবং ভারতসভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন ও প্রাণের মায়া ছাড়িয়া একবার কুলির বেশে আসাম চা-বাগানে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। ঢেন্‌কানাল রাজ্যে তিনি বহুবৎসর দক্ষতার সহিত রাজ-কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সদা প্রফুল্লচিত্ত ও তেজস্বী লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময় ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ীর চালকদের সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

আয়ারল্যাণ্ড

আইরিশ সাধারণতন্ত্রের ও ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত লোকেরা যে সন্ধিপত্রের খসড়া স্থির করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রীসভার তিন জন সভ্যের মত উহার বিরুদ্ধে, চার জনের উহার পক্ষে। সভাপতি মিঃ ডি ভ্যালেরা উহার বিরুদ্ধে। আইরিশ সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি-সভায় অর্থাৎ পার্লেমেণ্টে উহা বিবেচিত হইবে। উহার নির্দ্ধারণ না জানিলে বুঝা যাইবে না, যে, আইরিশ সংস্যার সমাধান হইল কি না।

যুদ্ধসজ্জা সীমাবদ্ধ করিবার কন্‌ফারেন্স্

আমেরিকার ইউনাটেড্ ষ্টেট্‌সের রাজধানী ওয়াশিংটনে শক্তিশালী স্বাধীন জাতিদের কন্‌ফারেন্সে যুদ্ধসজ্জা সীমাবদ্ধ করা সম্বন্ধে চারিটি প্রধান জাতি কতকগুলি প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধসজ্জার সীমারেখা যেখানেই টানুন, পরাধীন জাতিদের তাহাতে কোন লাভ বা আশাভরসা নাই; এবং যে-সব জাতির জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধের আয়োজন নাই বা সামান্য আছে, তাহাদের কোন সুবিধা নাই; কারণ শক্তিশালী জাতিদের সীমাবদ্ধ যুদ্ধসজ্জাও এই-সব জাতির ভয়ের কারণ।

দুটি বর্ব্বর নৃশংস ঘটনা

বহু সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, যে, একটা লোক তাহার নয় বৎসরের ছেলেকে কালীর কাছে বলি দিয়াছে।

আর-একটা লোমহর্ষণ সংবাদ এই, যে, একটা জমিদারের লোক একটা চোরাই পদক বাহির করিবার জন্য একটি স্ত্রীলোককে নগ্ন করিয়া নানা অত্যাচারের পর তপ্ত লোহা দিয়া তাহার জিব টানিয়া ধরে ও তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়।

এই দুরকমের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা কবে এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে?

প্রতিবাদ

বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ (১৩২৮) প্রবাসীর ২৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় "শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব" শীর্ষক সম্পাদকীয় টিপ্পনী পড়িলাম। Young India কাগজের ১০ নবেম্বরের সংখ্যায় Hindu-Moslem Unity in the Early 19th Century নামক লেখাটি আমার। উহাকে Modern Review হইতে অথবা Towards Home Rule নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, "প্রবাসী"-সম্পাদক এরূপ ধরিয়া লইয়াছেন; এবং উক্ত Review বা পুস্তকের নামোল্লেখ করি নাই বলিয়া আমার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। আমি কিন্তু Towards Home Rule পুস্তক পড়ি নাই; এবং Modern Reviewএ যে ঐসব কথা বাহির হইয়াছিল, তাহাও জানিতাম না।

সতীশচন্দ্র গুহ।

সম্পাদকের মন্তব্য।—লেখক মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলিয়া জানি। তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, এবং মন্তব্য প্রত্যাহার করিতেছি।

এই সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠা পরিমিত।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

八

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২১শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৮

৪র্থ সংখ্যা

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি' দুই হাত
যেখানে করিস্ পদ-পাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব;
আপন বিভব
আপনি করিস্ নষ্ট হেলাভরে;
প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্র পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস্ অনর্গল,
খেলারে করিস্ রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরি ত কোনো মূল্য নাই,
রচিস্ যা-তোর-ইচ্ছা তাই
যাহা-খুসি তাই দিয়ে
তার পর ভুলে যাস্ যাহা-ইচ্ছা তাই নিয়ে।

আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি পর।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে'
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্ত্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রজনীগন্ধা

(১৯)

ক্ষণিকাকে ষ্টেশন হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে অনাদিনাথের মনে থাকিবে কি না, সে বিষয়ে ক্ষণিকার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আসিবার সময় একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিবার জন্য তাহার মা লালুকে অনেকবার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছিতে তাহার এত দেরি হইল যে তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ক্ষণিকার সঙ্গে কেবল লালু আসিয়াছিল, টেলিগ্রাম করিবার অভ্যাস তাহার কোনোকালে ছিল না, কাজেই তাহাকে অনুরোধ করিয়া লজ্জিত ও ব্যস্ত করিতে ক্ষণিকার ইচ্ছা হইল না। লালু ট্রেনের সঙ্গে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, অনাদিবাবুরা লোক পাঠাবেন ত ষ্টেশনে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "জানেনই ত আমি আজ যাচ্ছি, কোনো ব্যবস্থা কি আর না করবেন ? তুই যা, রোদে আর দৌড়োস্‌নে।"

লালু লম্বা লম্বা পদক্ষেপ করিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "কোথায় আবার দৌড়চ্ছি, এইটুকু ত speed, এর জন্য আবার দৌড়ব। চিন্ময়দাদা ত হেঁটে প্ল্যাটফর্ম্ম অবধি পার হয়ে যায়।"

ক্ষণিকা আর কথা বলিল না, প্ল্যাটফর্ম্মের শেষ অবধি আসিয়া লালু থামিয়া পড়িল। ক্ষণিকা জান্‌লা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতেছিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, লালু মহা উৎসাহে রুমাল উড়াইতে লাগিল।

দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া যাইতেই ক্ষণিকা ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে বসিল। মেয়েদের কাম্‌রাটা একেবারে শূন্য ছিল না, গুটি পাঁচ-ছয় মহিলা আপনাদের পুত্র-কন্যা পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া তাহার ভিতর বিরাজ করিতেছিলেন। একজন প্রৌঢ়া একটুখানি সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটি কে তোমার সঙ্গে এসেছিল ?"

ক্ষণিকা বলিল, "ও আমার ছোট ভাই।"

প্রৌঢ়া চোখে মুখে করুণরস সঞ্চার করিবার বিপুল চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আহা, চোখে জল এসে গিয়েছে। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বুঝি মা ? আমার একটি ভাসুরঝি আছে, অবিকল তোমার মত দেখ্‌তে। ছেলে হতে এসেছিল, এই দিন দশ হল ছেলেটিকে এক মাসের নিয়ে ফিরে গেল। যাবার সময় তার যা কান্না, এত বয়স হয়েছে তবু। শাশুড়ী মাগী তার বড় বজ্জাত, মেয়েকে ভারি যন্ত্রণা দেয়। তা কান্নাকাটি করলে আর কি হবে ? চিরজন্ম ঐ ঘরই ত মেয়েমানুষকে করতে হবে ?"

আর-একজন মহিলা বলিলেন, "যা বলেছ ভাই। এই আমার তের বছরের মেয়েটা, বড় কান্নাকাটি কর্‌ত, তাই কত সাধ্য-সাধনা বলা-কওয়ার পর এনেছিলুম। তা কি রাখ্‌তে দিলে দুদিন ? অমনি দেওরের বিয়ের ছল করে' মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেল।"

দুজনের মধ্যে নারীজন্মের সুখদুঃখের আলোচনাটা বেশ জমিয়া উঠিল। ক্ষণিকা নিস্তার পাইল। তাহাকে আর প্রশ্নকারিণীর ভুল ভাঙিয়া নব নব প্রশ্নের তরঙ্গাভিঘাতে হাবুডুবু খাইতে হইল না। সে যে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে এই কথা শুনিয়াই তাহার মুখে একটু তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেটা তখনই আবার মিলাইয়া গেল। তাহার যে চোখে জল আসিয়াছে সে সম্বন্ধে মহিলাটির মন্তব্যে সে সচেতন হইয়া চোখ মুখ মুছিয়া লোকের চোখের সম্মুখ হইতে আপনার মনকে একেবারে আড়াল করিয়া ফেলিল।

বাস্তবিক তাহার কাঁদিবার কারণটা কি ? তাহাকে ত সকলে রাখিবার জন্য শেষ অবধি চাহিয়াছে। যাহার আহ্বান নারীর হৃদয়ের কাছে প্রায়ই ব্যর্থ হয় না সেই প্রেম ত তাহাকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছিল, তবু ত সে থাকিতে পারিল না। সকল বন্ধন, সকল আহ্বান ত সে তুচ্ছ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে; তবে আর তাহাদের জন্য অশ্রুপাত কেন ?

ট্রেন যতই কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ক্ষণিকার মন ততই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজেকে যত রকমে প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহা করিতে ত সে নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কল্পনায় যতদূর দেখা যায়,

মানুষের বেদনা পাইবার ক্ষেত্র তাহা হইতে বহু বিস্তৃত। তাহা ছাড়া মানসচক্ষে আমরা নিজেদের হৃদয়ের শক্তিকে যত বিপুল দেখি, কার্য্যকালে তাহা তেমন নয় দেখান আশ্চর্য্য নয়। সর্ব্বোপরি, অদৃষ্ট বা নিয়তি যাহাই হউক, একটা কিছু আছে, সে পলকে আমাদের সকল কল্পনা জল্পনা সংকল্পকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া কোন্ আবর্ত্তের মধ্যে আমাদের যে আনিয়া ফেলে, মানুষের সাধ্য নাই যে তাহার জন্য সে প্রস্তুত থাকে।

হাওড়ায় ট্রেন থামিবামাত্র কুলি ডাকিয়া জিনিষপত্র লইয়া ক্ষণিকা নামিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই কানের কাছে শুনিল, "আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি, গাড়ী আর কর্তে হবে না।"

ক্ষণিকা ফিরিয়া দেখিল অনাদিনাথের মোটরের চালক কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া আছে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছাড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। কুলিটা পয়সা লইয়া একটু বকাবকি করিবার উপক্রম করিতেই, কৃষ্ণলাল হিন্দি ইংরেজি ও বাংলা মিশাইয়া ও তাহাতে খানিকটা দাঁতখিঁচুনি যোগ করিয়া কুলিটাকে ভীষণ এক তাড়া দিয়া মোটর চালাইয়া দিল। মলিন জীর্ণ কাপড়-পরা লোকটাকে দুটা পয়সা বেশী দিতে ক্ষণিকার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণলালের অকস্মাৎ গর্জ্জনে সে একটু চম্‌কাইয়া গেল, এবং চমক ভাঙিতে না ভাঙিতেই গাড়ীখানা ষ্টেশনের সীমানা পার হইয়া ব্রিজের উপর আসিয়া পড়িল।

এই সামান্য ব্যাপারটাতে তাহার মনের অবস্থা আরও অনেকখানি খারাপ হইয়া গেল। পৃথিবীতে অবিচার অত্যাচার সবই একবার যাহাদের উপর আরম্ভ হয় ক্রমাগত কি তাহাদের উপরেই চলিতে থাকে? সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য কি এমনি ভিন্নজাতীয় যে পরস্পরের ছায়া তাহাদের কোনোক্রমেই মাড়াইতে নাই?

কলিকাতার জনবহুল রাস্তা ছাড়াইয়া গাড়ী ক্রমে বিরলপথিক বালিগঞ্জের পথে চলিল। ক্ষণিকার মনের ভিতরটা কেমন যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। আর বড় জোর দশ মিনিট। জোর করিয়া সে মনকে আবার নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনাদিনাথের বাড়ীর গেট দেখা গেল। গেটের সামনে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ তেওয়ারি নূতন দারোয়ানটার কাছে বোধ হয় নিজের অশেষ দুর্গতির কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া ফেলিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষণিকা চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কৈ, যেমন ছিল তেমনি ত সব আছে? নূতন রাণীর জয়ধ্বজার চিহ্ন কোনোখানে ত দেখা যায় না?

কৃষ্ণলাল তাহার বাক্সটা নামাইবার উপক্রম করিতেই ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি কেন? পঞ্চা কি অন্য কাউকে ডাকুন না?"

বাক্স বিছানা নামাইতে নামাইতে কৃষ্ণলাল বলিল, "সে বেটা কি আছে যে তাকে ডাকব? আমি নামিয়ে রাখ্‌ছি এখানে, তারপর দরোয়ান কি ঠাকুর কেউ তুলে দেবে ওপরে।"

ক্ষণিকা ভাবিল পুরানো চাকরগুলা সবই তাহা হইলে বোধ হয় নূতন গৃহিণী বিদায় করিয়াছেন, তা আমাকেই বা আবার ডাকিয়া আনিলেন কেন?

কৃষ্ণলাল আবার মোটরে "ষ্টার্ট" দিতেই উপর হইতে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, "ওমা, এর মধ্যেই এসে গেল নাকি? গাড়ী তা হলে কলেজে নিয়ে যাও, উনি আজ সকাল-সকাল পাঠাতে বলেছেন।"

ক্ষণিকার সে কণ্ঠস্বর চিনিতে বাকি রহিল না। পরক্ষণেই সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল, এবং মনোজ্ঞা হাসিমুখে নামিয়া আসিয়া ক্ষণিকার হাত ধরিয়া বলিল, "গাড়ী গিয়েছিল ত ঠিক সময়? যা দেরিতে বেরোল, আমি ভাবলাম বুঝি তোর সঙ্গে মাঝপথে দেখা হবে। উপরে চল্, তোর সেই ঘরই আছে, যদিও উনি অন্য ব্যবস্থা কর্‌ছিলেন। কেমন ছিলি? মুখ ত একেবারে শুকনো, বাবা মা ভাল আছেন ত? আর তোর সেই ছোট বোন, এখনও স্কুলে পড়্‌ছে নাকি?

কথা বলিতে বলিতেই তাহারা সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। উপরতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া মনোজ্ঞা বলিল, "কি রে, একটাও যে কথা বল্‌ছিস না? আমাকে এমন নূতন অবস্থায় দেখেও তোর বলবার কথার অভাব হচ্ছে?"

ক্ষণিকা বলিল, "ঠিকই বলেছেন। আপনাকে এমন

অবস্থায় দেখ্‌ব তা ত কোনোদিন ভাবিনি, কাজেই কি যে বল্‌ব তা ভেবেও পাচ্ছি না। তবে এইটুকু মনে হচ্ছে আপনি আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছেন।"

মনোজা তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "কম কথা বল্‌লে কি হয়, যা দু-একটা বলিস তা সারবান কথা। তোর সঙ্গে কিন্তু সকলের মতের মিল হবে না, দেখিস্‌। আচ্ছা চল্‌ এখন নিজের ঘরে, এসে অবধি ত দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনছিস্‌।" ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মনোজা বলিল, "সুন্দর ত বলিস্‌, কিন্তু একেবারে মাকালফলের সৌন্দর্য্য, ভিতরে কিছু নেই। এই ত দেড়খানা মানুষের সংসার, তা চালাবারও আমার মুরোদ নেই, দুবারের বেশী চারবার ওঠা নামা কর্‌লেই সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত।"

ক্ষণিকা বলিল, "কই বোর্ডিংএ থাক্‌তে ত আপনার শরীর এত খারাপ ছিল না? তখন ত সারাদিনই ঘুরে বেড়াতেন।"

মনোজা বলিল, "তা ত ঘুরতামই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে চলেছিলাম বোধ হয়। এতদিনে টের পাচ্ছি। নে, তুই হাত মুখ ধো, ট্রেনের ধুলোয় ত ভূত হয়ে রয়েছিস। আমি যাই, আবার চায়ের ব্যবস্থা এখুনি কর্‌তে হবে। কিছু কি পারি? কর্ত্তা একদিন বল্‌লেন, 'গিন্নি আসার আগে কিন্তু খাবার সুখ বেশী ছিল।' কি এত খাইয়েছিস্‌ দু-একটা বল্‌ ত বাপু, হাজার হোক নিজের মানটা ত বজায় রাখ্‌তে হবে?"

কিন্তু কিছুর নাম শুনিবার জন্য বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণিকা ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, দক্ষিণ দিকের জান্‌লাটা খুলিয়া তাহার সাম্‌নে আসিয়া বসিল। প্রথম দর্শনের পালা ত এক রকম কাটিল। ব্যাপারটা কেমন যেন অতি সহজে হইয়া গেল, ঠিক এতখানি সহজে যে হইবে তাহা ক্ষণিকা আগে ভাবিতে পারে নাই। উপরে মনোজার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সিঁড়িতে যখন পদধ্বনি শোনা গেল, দুখানি আরক্ত পায়ের উপর শাড়ীর টক্‌টকে লাল পাড়টা বিদ্যুতের মত ক্ষণিকার চোখের সম্মুখে খেলিয়া গেল, তখন তাহার মনের চাঞ্চল্য কোথায় যেন হারাইয়া গেল। তাহার পর মনোজা নামিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই, কেমন করিয়া ক্ষণিকার বর্ত্তমান অবস্থাটা শূন্যে মিলাইয়া গেল। মনে হইল সে যেন সেই কিশোরী ক্ষণিকা, যাহার জীবনাকাশে এই অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানিই প্রভাতসূর্য্যের মত আলোক বিতরণ করিত, ইহারই হৃদয়ের অপরূপ মাধুর্য্য তাহার জীবনপথের পাথেয় হইয়া তাহাকে নব নব লোকে বিচরণ করাইয়া ফিরিত। এ ত সেই।

ঘরে আসিতে আসিতে কিন্তু তাহার অতীতের স্মৃতি আবার অল্পে অল্পে অতীতেই ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

সেই বটে, কিন্তু কেবল কি সেই? ভাগ্যবিধাতা এই দুটি নারীকে প্রথম জীবনে যে কোমলবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, এখন কি তাহার উপর আর কোনো বন্ধন যোগ করেন নাই? উভয়ের মধ্যে যে অনাবিল স্বচ্ছপ্রেমের ধারা বহিতেছিল, তাহা কি ঈর্ষার আবিলতায় পঙ্কিল হইয়া উঠে নাই? একদিন ছিল যখন ক্ষণিকার সম্মুখ হইতে মনোজাকে যে কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও আড়াল করিতে চাহিয়াছে সেই তাহার বিরাগভাজন হইয়াছে, কিন্তু মনোজা আজ নিজেই আড়াল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণিকার সাধ্য নাই আপনার কল্পিত সুখস্বর্গলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তাহার পূর্ব্বের অনুরাগের স্মৃতিকে তাহার বর্ত্তমানের বিরাগ যেন কেবলি গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ বাহিরে মোটরের শব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। মুখ হাত ধুইয়া বেশভূষার যতটুকু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল। এখনি হয় ত মনোজা তাহাকে ডাকিতে আসিবে। তাহার পর অনাদিনাথের সহিত সাক্ষাৎ। কিন্তু ক্ষণিকার মন এই আসন্ন সাক্ষাতের সম্ভাবনায় একবারও চঞ্চল হইল না। সে নিজেই অবাক হইয়া গেল।

তাহার ঘরের সাম্‌নে একটি ছোট বারাণ্ডা, এখান হইতে নীচের বাগান টেনিসকোর্ট সবই দেখা যায়। বাহির হইতেই তাহার চোখে পড়িল দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি।

সন্ধ্যার ছায়ার মধ্য দিয়াও তাহাদের চিনিতে ক্ষণিকার বিলম্ব হইল না। বাহিরের আলোকের অভাব এক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দিল না। সেইখানেই সে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া গেল।

অনাদিনাথ ও মনোজ্ঞা দুজনেই বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মনোজ্ঞা উচ্ছ্বসিত হইয়া কিসের যেন বর্ণনা করিতেছিল, তাহার হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গী দূর হইতেই পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল। বাগানের শেষপ্রান্ত অবধি গিয়া দুজনে আবার ফিরিতেই অনাদিনাথ হাসিয়া মনোজ্ঞার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া তাহার কথার উত্তর দিলেন।

ক্ষণিকা ফিরিয়া নিজের ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। বাক্স খুলিয়া দু-চারটা ছোট-খাট জিনিষ ইতিমধ্যেই সে ঘরের এধার ওধার সাজাইয়া রাখিয়াছিল। হাতির দাঁত ও রূপা মিশাইয়া তৈয়ারী একটি ছবির ফ্রেম তাহার টেবিলের উপর ছিল। ফ্রেমটির ভিতর দুখানি ছবির স্থান ছিল। ক্ষণিকা দুখানির ভিতর হইতে তাহার মায়ের অস্পষ্ট ছবিখানি বাহির করিয়া লইয়া, অন্যখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ফ্রেমটাকে জুতার তলায় মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জান্‌লা দিয়া সশব্দে বাহিরে ফেলিয়া দিল। যে মনোজ্ঞাকে সে চিনিত, ভালবাসিত সে ত নাই, তাহার ছবি রাখিয়া কি হইবে? সে ক্ষণিকাও নাই।

বাহিরে দরজার কপাটে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। মনোজ্ঞা ডাকিয়া বলিল, "এই ক্ষণি, বেরবি না নাকি আজকে আর? আচ্ছা মেয়ে যাহোক, আমাদের কখন চা খাওয়া হয়ে গেল।"

ক্ষণিকা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। মনোজ্ঞার পশ্চাতেই অনাদিনাথ দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়াই মনোজ্ঞা বলিল, "চল এখন ঠাণ্ডা চা গিল্‌বে, এমন কুটুম এসেছ যে না ডাক্‌লে আর ঘর ছেড়ে বেরবেই না।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "নিজের কর্ত্তব্যের অবহেলার জন্যে পরকে গাল দিচ্ছ, বেশ ত তুমি! উনি এখুনি এলেন, আর এখুনি কি কাজ ঘাড়ে নিয়ে বস্‌বেন?"

ক্ষণিকা অবনত হইয়া অনাদিনাথকে নমস্কার করিল। তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভাল ছিলেন ত?"

মনোজ্ঞা অনাদিনাথের কথার উত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, আমার আবার কর্ত্তব্য। ও কথাটার বানান আর মানে অনেক মেয়েকে শিখিয়েছি বটে, কিন্তু নিজে কোনো দিন শিখিনি।"

তিনজনে আবার নীচে খাবার ঘরে নামিয়া গেল। মনোজ্ঞা বলিল, "একেবারেই খেয়ে নে। আর চা আর ভাত আলাদা করে খাবার সময় কোথায়?"

ক্ষণিকার বিশেষ খাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া কথা কাটাকাটি করিবার ইচ্ছাটা ছিল আরো কম। কাজেই বিনাবাক্যব্যয়ে সে খাইতেই বসিল। মনোজ্ঞা বলিল, "বল্‌ ত ভাই, রান্না-বান্না খুব কি খারাপ হয়েছে? উনি ত সারাক্ষণ আমার দোষই দেখ্‌ছেন। অবিশ্যি সেইসঙ্গে তোর গুণব্যাখ্যা এত বেশী পরিমাণে হচ্ছে যে তোর সত্যি কথা বল্‌বার ইচ্ছা হওয়া শক্ত।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি ত মন্দ কিছু দেখ্‌ছি না।"

মনোজ্ঞা স্বামীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে ত?"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লাম বটে, তোমাদের স্বজাতিপ্রীতি খুব আছে।"

মনোজ্ঞা বলিল, "আর বিজাতিপ্রীতিটা তার চেয়ে এক বিন্দুও কম নয়।"

ক্ষণিকা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মনোজ্ঞা বলিল, "এখনও দেখ্‌ছি সেই বোর্ডিংএর খাওয়াই বজায় রেখেছিস।"

ক্ষণিকা চেষ্টা করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "মাসিমা আর বেণু কই? তাঁদের যে একবারও দেখ্‌লাম না?"

মনোজ্ঞা বলিল, "তাঁরা বাড়ী থাক্‌লে ত দেখ্‌বি? বেণুর এক পিসির বিয়ে, সেখানে নেমন্তন্নে গিয়েছে। আমাদেরও অনেক করে' বলেছিল, তা আমার যাওয়া হয়ে উঠ্‌ল না! সময়ই পাই না। মা গিয়েছেন কুটুম্বের মান রাখ্‌তে। অবিশ্যি রাত্রেই সব ফির্‌বেন, একটু দেরী হতে পারে।"

ক্ষণিকা বলিল, "যাই তবে আমি, উপরে জিনিষপত্র-গুলো ছড়িয়ে রেখে এসেছি।"

মনোজ্ঞা বলিল, "আচ্ছা!" সে নিজে অনাদিনাথের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ক্ষণিকা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে

উঠিতে মনে মনে বলিল, "তোমার অন্ততঃ কোথাও ঢুক্‌তে অনুমতির দর্‌কার হয় না।"

জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে হঠাৎ তাহার কানে গানের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। মনোজ্ঞা গাহিতে ভালই পারিত, তবে গান করিতে বলিলে না গাওয়াটাই তাহার নিয়ম ছিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিলে তবে একটা গান শোনা যাইত। এখন আর বোধ হয় বলিবারও দর্‌কার হয় না, গান আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিতে চায়।

ঘর গোছানো অসমাপ্ত রাখিয়া ক্ষণিকা আবার বাহির হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শরীর মন ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা প্রবল অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল যে সে কোনোকাজেই মন দিতে পারিতেছিল না। ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে কি যেন নিজেকে ভুলাইতে চাহিতেছিল। যেন স্থির হইয়া একবার দাঁড়াইলেই কি এক বিপদ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে।

নীচে মনোজ্ঞা গাহিতেছিল,—

"আমায় কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো,
আমি তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতন
অঞ্চল পাতি রহি গো।"

ক্ষণিকার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। এত গান থাকিতে মনোজ্ঞা কিনা গাহিতে বসিল, "আমায় কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা!" হাসিটা কিন্তু অকস্মাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর সারাদিনের অবসাদের পর প্রবল উত্তেজনার বশে কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

(২০)

ভোরের বেলা কিসের একটা শব্দে ক্ষণিকার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সুপ্তি ও জাগরণের মাঝের একটা ঘোরের ভিতর দিয়া সে যেন শুনিতে পাইল কে যেন ডাকিতেছে, "মাসি, দরজাটাকে খুলে দাও।"

ক্ষণিকা উঠিয়া বসিল, বলিল, "দি'চ্ছ বেণু, তুমি একটুখানি দাঁড়াও।"

দরজা খুলিবামাত্র বেণু ছোটখাট একটি ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ক্ষণিকার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাথাটা তাহার গায়ে ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিল, "তুমি দুষ্টু, তুমি ভাল না, কেন তুমি চলে গিয়েছিলে? আর একদিনও আমি তোমার কাছে পড়্‌ব না, লিখ্‌ব না, কিছু কর্‌ব না।"

ক্ষণিকা বলিল, "মামীমার কাছে পড়্‌বে বুঝি?" ভাবিল, সব শূন্যস্থানই যদি মনোজ্ঞা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে কিসের জন্য ডাকা হইল? নিজের ঐশ্বর্য্য পরকে দেখাইয়া, তাহাদের ঈর্ষায় পুলকিত হওয়া একদল মানুষের স্বভাব বটে, ইহা কি তাহারই একটা উদাহরণ? কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষণিকা নিজের চিন্তায় নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তে আজ না-হয় তাহাদের দুজনের সম্বন্ধ ঈর্ষা-কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই বলিয়া দুজনের স্বভাব-চরিত্র কি একেবারে অন্যপ্রকার হইয়া যাইতে পারে? দীর্ঘ ছয় সাত বৎসর ধরিয়া দিনে দিনে তাহার হৃদয়ে মনোজ্ঞার যে মূর্ত্তি সে অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা কি আজ দুদিনেই মুছিয়া যাইবে? ভালবাসার অঞ্জন চক্ষে পরিয়া সে যাহাকে দেখিয়াছিল, সে কি মরীচিকা মাত্র? আজ হিংসাকুটিল দৃষ্টিতে যাহাকে সে দেখিতেছে সেই কি সত্য?

বেণু তাহার ভাবনায় বাধা দিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মামীমা, ভয়ানক দুষ্টু, তার কাছেও পড়্‌ব না। সে কেবল মামাকে গল্প বলে, আর গান শোনায়, আমাকে শোনায় না, আমি একটুও যাব না তার কাছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা, সবাই দুষ্টু, একমাত্র ভাল তুমি, এখন নীচে চল, মুখ ধোবে, দুধ খাবে। তোমার ঠাকুরমা কি কর্‌ছেন।"

"শুয়ে আছে, আমি দুধ খাব না, সবাই চা খায় আমিও চা খাব। মামীমার মত কালো চা খাব, দুধ-দেওয়া চাও খাব না।"

ক্ষণিকা তাহাকে লইয়া বৃদ্ধা গৃহিণীর ঘরের দিকে চলিল। অনেকদিনের পরিচয়ে তাঁহার অভ্যাসাদি সে খুব ভাল করিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে যদিও তিনি রোদ উঠিবার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন না, তবুও চিরদিনের অভ্যাসবশতঃ ঘুমটা তাঁহার সকাল-সকালই টুটিয়া যাইত। এই সময়ে মানুষের মুখ দেখিতে পাইলে

তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, এমন গল্প আরম্ভ করিতেন যে আগন্তুক বেচারা অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য তাঁহার শয্যা-পার্শ্ব হইতে নড়িতে পারিত না।

বাহিরে ক্ষণিকার পদশব্দ শুনিয়া তিনি উৎসুক হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা? কে যাচ্ছ ওখান দিয়ে?"

ক্ষণিকা ঘরের চৌকাঠ পার হইতে হইতে বলিল, "আমি, মাসিমা। কাল এত সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে আপনার সঙ্গে রাত্রে আর দেখা করতে পারিনি। কেমন আছেন?"

গৃহিণী শুইয়াই রহিলেন, কাজেই তাঁহাকে আর প্রণাম করা হইল না। বৃদ্ধা হইলেও কোনওরূপ আয়ুক্ষয়কর ব্যাপারে তাঁহার আপত্তি যে কি-রকম প্রবল তাহা ক্ষণিকার বিলক্ষণ জানা ছিল। কাজেই নবা নিয়ম মত তাঁহাকে অবনত হইয়া একটা নমস্কার করিয়া সে তাঁহার খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী তাহার শেষের কথার উত্তরটাই আগে দিতে আরম্ভ করিলেন, "আর বাছা, কেমন আছি। আছি যে এই আমার কপাল। বাতের জ্বালায় আর কি কোনো সুখ আছে? বুড়ো হাড় ক'টা সারাক্ষণ ব্যথায় টন্‌টন্ করছে, না বসে সুখ, না শুয়ে সুখ। রাত্তিরে আর তুমি কি দেখা করবে, তুমি ত পরের মেয়ে, সারাদিন পথের কষ্টে তেতে পুড়ে এসেছ; ছেলে, বৌ, তারাই কোন্ খোঁজ রাখে, বুড়ী এল, না পথে পড়ে মরল। রাত দুটো নয় তিনটে নয়, বারোটা বেজেছে সবে, এরি মধ্যে নবাবনন্দিনী বৌ ঘুমিয়ে গেছেন। ছেলের মা আসচে না চোর আসচে। কত ডাকাডাকি করে তবে ঘরে ঢুকি। অত রাতে ঠাণ্ডা লেগে ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল আর কি?"

গৃহিণীর কথার সুরে ক্ষণিকা বেশ খানিকটা অবাক হইয়া গেল। যতদিন ঘরে বৌ আসে নাই ততদিন সেই খেদে অনাদিনাথের জননীর আহার নিদ্রা ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা শুনিলে মনে হইত যেন যেমন হউক না কেন একটি বউ ঘরে আসিলে তিনি হাতে স্বর্গ পান। আর আজ বউয়ের আবির্ভাবমাত্র তাঁহার সুর একেবারে বদল হইয়া গেল? যে তাঁহার ঘরে আসিয়াছে বধূরূপে তাহার কোনো অযোগ্যতাই ত চোখে পড়ে না। রূপ, ধন, মান, কোন অংশে সে তাঁহার পুত্রের অনুপযুক্ত? কিন্তু সুন্দরী বধূ পাইয়া গৃহিণী যে পরম পরিতুষ্ট, তাহা ত তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্রও বোধ হয় না। মানুষে যাহা একমনে চায়, তাহা পাইবামাত্র তাহাদের পাওয়ার আগ্রহ কেমন করিয়া এমন বিরাগে পরিণত হয়? যাহা কল্পনায় এত সুন্দর তাহা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিবামাত্র কেমন করিয়া এতখানি কুরূপ হইয়া যায়?

কিন্তু গৃহিণীর এতগুলা কথার উত্তরে কিছু ত একটা বলা দরকার? ক্ষণিকা বলিল "আবার তাহ'লে সেই কবিরাজকে ডাকুন না? তাঁর চিকিৎসায় সেবার ত বেশ উপকার পেয়েছিলেন।"

গৃহিণী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমিও যেমন বাছা! কে বা বসে আছে আমার জন্যে ডাক্তার কবিরাজ ডাকতে? বুড়ী মা মরলেই এখন সবাইকার হাড় জুড়োয়। সে সব আসবে বৌ-ঠাকুরাণীর জন্যে—কবে তিনি একবার কেশেছেন, কোন্ রাত্রে তাঁর একটু গা গরম হয়েছে, রোজ হ্যাট-কোট-পরা ডাক্তার এসে তার খোঁজ নিচ্ছে। অসুখ কি তা ত চোখে দেখি না, দুবেলা মাছ ভাত খাওয়া হচ্ছে, গাড়ী করে বেড়ান হচ্ছে, তবু রোজ ডাক্তার, রোজ ওষুধ। কুটোগাছটি ভেঙে ত দুখান করেন না কখনো। ও বয়সে আমাদের কি না করতে হয়েছে!"

ক্ষণিকা বিষম বিপদে পড়িল। ঘরে ঢুকিবামাত্র এমন ভাবে মনোজার গুণব্যাখ্যা আরম্ভ হইবে জানিলে সে এধার মাড়াইত না। মনোজার প্রতি তাহার মনোভাব যেমনই হউক না কেন, সে যে এ সংসারের গৃহিণী তাহা ভুলিয়া থাকা চলে না। তাহার শাশুড়ীর হয়ত বা কারণে ও অকারণে তাহার নিন্দা করিবার কোনো আর্য্যশাস্ত্র-অনুযায়ী অধিকার থাকিতেও পারে, কিন্তু ক্ষণিকার সে নিন্দাবাদে যোগ দিবার অভিরুচি বা অধিকার কিছুই নাই। অথচ এমন বক্তৃতা-স্রোতের মধ্যে হঠাৎ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে সেটা বক্তৃতাকারিণীর প্রতি সৌজন্যের পরিচয় দেওয়া একেবারেই হইবে না।

এমন সময় বেণু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মামীমা, জান আমি তোমার মত কালো চা খাব, মাসিমাকে বলে দিয়েছি।"

ক্ষণিকা চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। দরজার ওধারে একটা সবুজ আঁচল আর লাল পাড়ের

খানিকটা দেখা গেল? মনোজ্ঞা কতক্ষণ না জানি ওখানে দাঁড়াইয়া আছে? ক্ষণিকাকে সে ভাবিতেছে কি? আসিবামাত্র সে আর-কোনো কাজ করিবার আগে ছুটিয়া গিয়া শাশুড়ীর সহিত বধূর নিন্দার গল্পে মজিয়া গেল? ইহাকে কি মনোজ্ঞা ক্ষণিকার ইচ্ছাকৃত ঘটনা বলিয়াই জানিবে? কিন্তু যদিই সে তাহা মনে করে, তবে তাহার সে ভুল ভাঙিয়া দিবার উপায়ই বা কোথায়? ক্ষণিকার অন্তর পর্য্যন্ত যেন লজ্জার আভায় লাল হইয়া গেল।

বধূর আগমনের খবর পাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "বৌমা নাকি? এত সকালে উঠেছ যে? গায়ে গরম জামা দিয়েছ ত? তোমাদের আবার যা শরীর এখুনি একখান বাধিয়ে বসবে কিছু। একি আর আমরা? পোষ মাসের শীতে শান্তিপুরের শাড়ী পরে শুধু কাটিয়েছি, কোনোদিন একটু পাঁচন শুদ্ধ খাইনি।"

মনোজ্ঞা ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "এখন আর ঠাণ্ডা কোথায় মা যে ঠাণ্ডা লাগবে? গরমে ত টেঁকা যায় না। আপনি আছেন কেমন?"

বৃদ্ধা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আমার আর থাকা-থাকি কি? আছি ঐ একরকম। এখন তোমরা ভাল থাকলেই বাঁচি। যাও বাপু তোমরা নিজেদের চা টা খাও গিয়ে, বুড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আর হবে কি?"

ক্ষণিকা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া মনোজ্ঞাকে দেখিতেছিল। চৈত্রের শেষাশেষি এবার বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। তাই বোধ হয় সকালেই মনোজ্ঞা স্নান করিয়া আসিয়াছে। তাহার আলুলায়িতকুন্তলা সদ্যস্নাতা মূর্ত্তিটিকে ক্ষণিকার চোখে বড় সুন্দর লাগিল। মনোজ্ঞার রূপসম্বন্ধে ক্ষণিকার ধারণা চিরকালই উচ্চ ছিল, কিন্তু নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সে এখন বড় অস্বাভাবিক রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই নিজের মূর্ত্তিকে আপনার মনের কাছে সে যত বেশী করিয়া কালিমাচ্ছন্ন করিত, মনোজ্ঞার রূপের প্রভা যেন সেই আঁধারের পাশে আরো জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া উঠিত।

মনোজ্ঞা ক্ষণিকার দৃষ্টিটা দেখিয়া লইল, তাহার পর তাহার কাঁধে হাত দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ক্ষণি চল্, সত্যিই আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো দরকার নেই।"

ঘরের বাহিরে আসিয়াই মনোজ্ঞা বলিল, "দেখ্ আমি এসে তবে ত তোকে উদ্ধার করলাম, তা না হলে আরো ঘণ্টা-খানেক ধরে আমার গুণব্যাখ্যা শুনতিস্।"

ক্ষণিকা মুখ লাল করিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ ওখানে ছিলেন?

মনোজ্ঞা বলিল, "সব শুনেছি গো সব শুনেছি। কবি বার্ণস্ যে বলেছিলেন যে অন্যের চোখে নিজেকে দেখ্তে তাঁর বড় সাধ, সেটা তিনি বাঙালী-ঘরের বউ হলেই মিটিয়ে নিতে পারতেন। তা আমি শাশুড়ীরও দোষ দিতে পারি না ভাই, বুড়ো মানুষ রোগে ভুগ্ছেন, বউ এলে কোথায় সেবা-শুশ্রূষা করবে, তা নয় নিজের রোগ নিয়েই ব্যস্ত। তাঁর ছেলে তবু এতদিন একলা মাকে দেখ্তেন; এখন মা, স্ত্রী দুই সাম্লাতে তাঁরও প্রাণান্ত।"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনার কি হয়েছে? মাসিমা অনেক কিছু ত বলে গেলেন, কিন্তু আসল ব্যাপার ত কিছু বুঝ্লাম না।"

মনোজ্ঞা বলিল, "আর আসল ব্যাপার জেনে তোর কাজ নেই। আমি নিজেই কি জানি ছাই? কদিনই বা বিয়ে হয়েছে, এরি মধ্যে বাহাত্তুরে বুড়ীর মত স্বামীর সঙ্গে শুদ্ধ কেবল রোগেরই গল্প হচ্ছে, অন্য লোকের ত কথাই নেই। যে আসে সেই বলে 'কেমন আছ বৌমা, আজ শরীর একটু ভাল ত?' বৌমা হয়েছেন এবাড়ীর এক একজিবিশন। নাটক নভেলে রোমান্স অবসান হবার হরেক রকম কারণ পড়্তাম ভাই, হিংসা সন্দেহ আরো ছাইভস্ম কত কি। কিন্তু হাঁচি বা কাশির কথা কেউ বলেনি যে কেন? ওর মত instantaneous effect আর কিছুরই নেই।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি, এমনি ঠুন্কো প্রাণ রোমান্সের, যে, কাশির ধাক্কায়ই লুপ্ত হয়ে যায়?"

মনোজ্ঞা বলিল, "আর বিজ্ঞের মত হাসতে হবে না। জান ত ছাই। ভাবরাজ্যে সব জিনিষের যেমন মূর্ত্তি কল্পনা কর, বাস্তব জগতে তারা তেমন নয় গো। আমরা যতক্ষণ অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক মানবী, ততক্ষণ আমাদের আদরের ও মর্য্যাদার সীমা থাকে না; কিন্তু ঐ গোড়ার অর্দ্ধেকটুকু যেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, অমনি মান মর্য্যাদা সব উবে যায়।"

ক্ষণিকা বলিল, "আর আদরটা ?"

মনোজা তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল, "সব যদি বলে দিই, তা হলে তুই নিজে আবিষ্কার করবি কি ? যেটুকু বললাম তাতেই বিবাহিতা নারীর guildএর গোপন কথা অনেকখানি বলে দেওয়া হল। জানিস্ ত, পৃথিবীটা কত বড় একটা মায়া, সে সম্বন্ধে সকাল-সকাল ছোটদের সচেতন করে দিতে নেই।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "আমাকে সচেতন করলেও ক্ষতি নেই কিছু, কারণ নিজে কিছু আবিষ্কার করবার সম্ভাবনা আমার বিশেষ নেই।"

মনোজা বলিল, "আহা মরে যাই। আমা হেন খুঁটি যখন নড়েছে, তখন আর কারু মুখে ও কথা আর শোভা পায় না। তবে এইটুকু বলে রাখি, দূর থেকে বিয়ে জিনিষটাকে যতখানি মনোহর লাগে, তার ভিতরে এসে পড়লে ঠিক তেমনটা আর লাগে না। পান থেকে চুন খসলে যে এতখানি হ্যাঙ্গাম বাধে তা কি আর কখনো কল্পনা করেছিলাম ?"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা নীচের খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষণিকা গল্প করিতে করিতে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এ বাড়ীতে অবস্থাটা তাহার কি রকম অদ্ভুত। ঠিক যেন মনোজার বাড়ী সে বেড়াইতে আসিয়াছে এই ভাবেই সে গল্প করিতেছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকিবামাত্র অনাদিনাথকে দেখিয়া তাহার মন আবার বিমুখ হইতে আরম্ভ করিল। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের ক্রীড়নক হইয়া কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে ? যে দুটি মানুষকে এ জীবনে সে ভালবাসিল, তাহারাই যদি নিরন্তর পরস্পরকে আড়াল করিয়া, পরস্পরের সত্যরূপকে বিকৃত করিয়া ফেরে, তাহা হইলে ক্ষণিকার দশা হইবে কেমন ? সে ভাবিয়া আসিয়াছিল মনোজা বুঝি এই নূতন রাজ্যে ক্ষণিকার কাছে কেবল মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্যরূপিণী হইয়া বিচরণ করিবে, কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, তাহার পুরাতন রূপকে তাহার নূতন রূপ ত একেবারেই আবৃত করিতে পারে নাই! সে যেমন সুন্দর ছিল অন্তরে বাহিরে তেমনই ত আছে! তবে ইহাকে কেমন করিয়া সে জীবনের অভিমান রূপে, তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে কলুষিত করিয়া দেখিবে ?

কিন্তু ঐ যে আর-একটি মানুষ, যিনি একদিন তাহার জীবনের কেন্দ্র হইয়া তাহার সকল ভাবনা, সকল কল্পনা ও বাসনা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাকেই বা সে কি ভাবে এই নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে গ্রহণ করিবে ? সমাজ ত তাহাকে তর্জ্জনী তুলিয়া কেবলি শাসন করিতেছে, কিন্তু তাহার বিদ্রোহী অন্তর অধীনতা স্বীকার করে কই ? কিন্তু মুখ না ফিরাইলে বাঁচিয়া থাকা চলেই বা কেমন করিয়া ? সমস্যাটাকে ঠিক এতখানি জটিল বলিয়া সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এখন কি ভীরুর মত পলায়ন ছাড়া কোন উপায়ই নাই ?

সে নীরবে আপনার অভ্যস্ত কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। মনের ভিতরে যতই কেন না মন্থন চলুক, বাহিরের জগতের দাবি তাহার জন্য উপেক্ষা করিবার অধিকার নাই। বেণুর আব্দার রক্ষাও তাহার মাঝে আছে, কারণ বিশ্ব-সংসারে তাহার চেয়েও অধিকতর মূল্যবান জিনিষ যে ক্ষণিকার কাছে অন্ততঃ কিছু আছে, এ কথা ভাবিতেও সে অক্ষম।

মনোজা চা খাইতে খাইতে বলিল, "ক্ষণি, একেবারে যে চুপ হয়ে গেলি ?"

অনাদিনাথ ক্ষণিকাকে উত্তর দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া বলিলেন, "উনি ত কাজের ভার নিলেন, এখন কথা বলার ভারটা তোমার নেওয়া উচিত।"

মনোজা বলিল, "উচিত কাজ আর কবে আমি করি বল ? বোর্ডিংএ থাকতে নিজের ঘর পরিষ্কার রাখা, কাপড়-চোপড় গোছানো সবই আমার কাজ ছিল, তা সেগুলো আমি সব ক্ষণিকে দিয়ে করিয়ে নিতাম। আমার মত অকর্ম্মণ্যের উচিত ছিল না কোনোদিন সংসার করতে আসা, ঠিক সেইটাই লোভে পড়ে করে বসলাম। নিতান্ত বিধাতা আমায় অক্ষম করে সৃষ্টি করেই নিজেই নিজের ভুল বুঝে ক্ষণিকে গড়েছিলেন, তাই যেখানেই যাই ও আমার তদারক করতে এসে জোটে।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "সে হিসাবে বিধাতার ভুল একটি মাত্র নয়, তবে ভুল সংশোধন তিনি দেখছি একবারই করেছেন। অক্ষম তিনি অনেকগুলি গড়েছেন, তবে যার উপর তাদের সামলে চলবার ভার দিয়েছেন, তার

কাজের সুবিধার জন্য অক্ষমগুলিকে এক জায়গায় এনে জুটিয়েছেন।"

মনোজা বলিল, "যাক, এতদিন ভাবতাম কেন যে ভগবান আমার মত অপদার্থকে সংসারে টেনে নিয়ে এলেন! এখন দেখ্‌ছি ক্ষণির কাজের সুবিধার জন্যই। পরোক্ষভাবে তাতে আমারও খানিকটা সুবিধা যে হয়নি তা নয়। আমাদের মধ্যে কে কাকে বখ্‌শিস্ দেবে বল্ দেখি?"

ক্ষণিকা বলিল, "থাক, আমার আর বখ্‌শিসে দর্‌কার নেই। কাজের ভার কোনো রকমে বইছি, বখ্‌শিসের ভার আর বইতে পার্‌ব না।"

মনোজা বলিল, "নিতান্ত হেসে বল্‌ছিস তাই কথাটাকে ঠাট্টা মনে করে হাল্কা করে নিচ্ছি, কিন্তু ঠাট্টার মত ঠিক শোনাচ্ছে না।"

এমন সময় অনাদিনাথ চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মনোজা বলিল,"ও কি, অর্দ্ধেক জিনিষ ফেলে চল্‌লে কোথায়? আমার গিন্নিপনার আমলে না হয় খেতে রুচি হত না, এখন ত regime বদ্‌লেছে, এখন তোমার ধরণ বদ্‌লানো উচিত।"

ক্ষণিকা বেণুর দুধ আনিবার ছলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রায় সহ্যের সীমানা অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছিল। মনোজার পরিহাসের বাণগুলি যে কাহার ব্যথিত অন্তঃকরণকে রক্তরঞ্জিত করিতেছিল তাহা সে নিজে বুঝিল না। কিন্তু ক্ষণিকার ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার আঘাতক্লিষ্ট মূর্ত্তি যে বাহিরে আসিতে চায়? এমন অবস্থায় পলায়ন ভিন্ন তাহার আর পথ কোথায়?

দুধ লইয়া ফিরিবার মুখে দেখিল মনোজা খাইবার ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়াছে। ক্ষণিকাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিয়া গেল, "যাচ্ছি ডাক্তারের মুখ দেখ্‌তে। বেণুকে তুই দুধ খাওয়াতে আমার চেয়েও ঢের ভাল পার্‌বি, সে বিষয়ে তোকে কোনো উপদেশ দেবার দর্‌কার নেই। আর রান্নাবান্না কি হবে তা তুই নিজে ঠিক করিস। এতদিন কোনো রকমে যা-তা কর্‌ছিলাম, এখন তুই আসল পারের কাণ্ডারী এসেছিস্ তুইই হাল ধর।"

ক্ষণিকার বুকের ভিতর অবধি যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কেবলি তাহাকে ঐ কথাই শুনিতে হইবে? এ রাজ্যের সিংহাসনে তাহারই যদি যথার্থ অধিকার তবে সেখান হইতে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিল কে? বাহিরের সংসারে দাসীর ন্যায় খাটিবার জন্যই বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এ কথা মনোজা সত্যই বলিয়াছে। কি অন্তর-লোকে, যেখানে নারী দেবীরূপে প্রেমের আরতি পায় সেখানকার দ্বার তাহার জন্য চিররুদ্ধ। সে পূজার অর্ঘ্য জোগাইয়া দিবে, ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিবে, আরতির প্রদীপখানি সযত্নে সাজাইয়া ভক্ত পূজারীর হাতে তুলিয়া দিবে। এইটকু তার অধিকার। তাহার পরে কাহার রক্তিম চরণে সে পূজোপহার অর্পিত হইল, কাহার অপরূপ হাসির উপর আরতির দীপের মধুর স্নিগ্ধ আলো পড়িয়া সেখানে আনন্দের দেয়ালি দেখা দিল, কাহার কমনীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া কুসুমের মালা আপনার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিল সে-সবে তাহার প্রয়োজন কি? সে শুধু বাহিরের সংসারের মানুষ, মানুষের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিবার পরোয়ানা বিধাতা তাহার জন্য রাখেন নাই।

(ক্রমশ)

শ্রীসীতা দেবী।

মুরুংদের লবণ

মুরুংদের বাসস্থান পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে। উহারা বাঁশ হইতে লবণ সংগ্রহ করে। চলু নামক একপ্রকার বাঁশ যখন পাঁচ ছয় হাত লম্বা হয় তখন উহারা এই কচি বাঁশগুলি কাটিয়া শুকাইতে দেয়। অতঃপর এই শুক্‌নো বাঁশগুলি পুড়াইয়া ছাই করে। এই ছাইগুলি জল মিশ্রিত করিয়া বেতের সরু চালুনি ও নেকড়ার সাহায্যে ছাঁকিলে ঘোলা লোনা জল বাহির হয়। মুরুংরা এই ঘোলা জল লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। তাদের আর লবণের দর্‌কার হয় না।

"অতীন্দ্র"।

বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়

ইতিহাস আলোচনা করিলে বাঙ্গালী জাতির উপর দ্রবিড়ের তিন রকমের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ভাষা, সমাজ ও ধর্ম্মের উপর দ্রবিড় কিছু কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যে দ্রাবিড়গণ কোন সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল "তাম্রলিপ্তি" নামই তাহার এক প্রমাণ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এক সময়ে তামল বা দামল জাতির প্রাধান্ত তমোলুকে ছিল। বহুপ্রাচীন সংস্কৃতেও তমোলুকের নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামল বা দ্রাবিড় জাতির একটি প্রধান নগর। প্রাচীন দ্রাবিড়গণের যে সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সুনিবদ্ধ সমাজ ছিল তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় অনেক দ্রাবিড় শব্দ প্রবেশ করিয়া সংস্কৃতের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও যে বহু দ্রাবিড়শব্দ প্রবেশলাভ করিয়া বাঙ্গালার ধাতুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহার যথেষ্ট উদাহরণ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায়, প্রবাসীতে ও তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী যখন যে জাতির সংঘর্ষে বা সম্পর্কে আসিয়াছে, সেই জাতির কোন না কোন চিহ্ন তাহার ভাষায় রাখিয়া দিয়াছে। বঙ্গভাষার আলোচনা করিলে এইরূপ নিদর্শনের অভাব হয় না। বাঙ্গালীর জন্য এ নিয়ম নূতন নয়। সকল জাতির পক্ষে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে সংস্কৃতভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাব যে ছিল একথা সকলে স্বীকার করিতে চান না। অধুনা তিন শ্রেণীর ভাষা ভারতবর্ষে কথিত হইয়া থাকে—সংস্কৃত-জাত, দ্রাবিড় ও মুণ্ডা। যখন বৈদিক ভাষা প্রথম ভারতবর্ষে আসে, তখন এ দেশে দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভিন্ন আর কোন ভাষা যে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে মুণ্ডা কেবল পূর্ব্বঘাটের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বিন্ধ্যপর্ব্বতে ও ছোটনাগপুরে কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালেও যে এইরূপ ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মুণ্ডাভাষা-ভাষীরা বৈদিককাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অসভ্যই আছে। এমন মনে হয় না যে, মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষা বৈদিক ভাষার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তবে দ্রাবিড় ভাষা দ্বারা সংস্কৃতের অন্ততঃ কিছু পরিণতি ঘটিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দ্রাবিড়ও সংস্কৃতের উপর সেইরূপ করিয়াছে।

ভারতে যে-সমস্ত ভাষায় এখন কথাবার্ত্তা চলিতেছে সেই-সমস্ত ভাষার সহিত বৈদিক ভাষা বা ইহা হইতে জাত সংস্কৃত ভাষার কি সম্পর্ক তাহা আজও স্থির হয় নাই। মধ্যযুগের সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিকেরা কেবল যাহা কিছু মত দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃতের নিকট ঋণী—কিন্তু সংস্কৃতভাষা দ্রাবিড় ভাষার নিকট আদৌ ঋণী নহে। এক শব্দ দ্রাবিড় ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় পাওয়া গেলেই ইঁহারা স্থির করিয়া থাকেন যে, দ্রাবিড় ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। এ কথা সত্য যে, মধ্যযুগের সভ্যতায় সংস্কৃতপাঠী ব্রাহ্মণের প্রভাবে দ্রাবিড় সাহিত্যের অধিকাংশই সংস্কৃতসাহিত্য-জাত। এখন একটা কথা—তবে কি সমগ্র বৈদিক ভাষা তাহার শব্দ-সম্ভার বাহির হইতে আনিয়াছে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে-সমস্ত শব্দের সামীপ্য শব্দ অবেস্তীয়, স্লাভনিক, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মানিক ও কেল্টিক ভাষায় পাওয়া যায় না, সেগুলি নিশ্চয়ই যখন বৈদিকভাষা ভারতে প্রবেশ করে, তখন এখানে যে-সমস্ত ভাষা ছিল তৎসমুদয় হইতে গৃহীত। কারণ, ভাষা অপেক্ষাকৃত পুরাতন হইয়া গেলে তাহার ধাতু সে আবিষ্কার করে না, তাহার পূর্ব্ব সম্পত্তি হইতেই লইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি নামবাচী শব্দ আছে যেগুলি ভারতের, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতের। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—মুক্তা, ময়ূর, ব্রীহি, পিপ্পলি, মিরীচ, চিঞ্চ। এগুলি অগ্নিউপাসকগণ ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কখনই জানিতেন না। নিশ্চয়ই দ্রবিড় হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবার 'নীর,' 'মীন' সংস্কৃত হইতে দ্রাবিড়গণ কখনই গ্রহণ করেন নাই। কেন না, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্রাবিড়গণ নিশ্চয়ই জল পান করিতেন ও মাছ খাইতেন—তবে এ দুটি নামের জন্য কি তাঁহারা

সংস্কৃতের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন? ডক্টর হ্যাডন (Dr. Haddon) সত্যই বলিয়াছেন—

"So far as is known the bulk of the population of India has been stationary.......The so-called Aryan conquest was more a moral and intellectual one than a substitution of the white man for the dark-skinned people—i. e.—it was more social than racial......Proto-vedic must have been profoundly affected by the languages of the Ganges Doab."

আমাদের মনে হয় এই Ganges Doab-এর ভাষার মধ্যে দ্রাবিড় একটা ভাষা। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারও এই মত পোষণ করিয়াছেন।

বৈদিক ও দ্রাবিড় ভাষার ব্যুৎপত্তিগত অভিধান নাই। ইহা রচিত হইলে এবিষয়ের আলোচনা চলিতে পারে। আর একটি প্রশ্নের উত্তর আরও কঠিন। উত্তর ভারতের লোকেদের মধ্যে সংস্কৃত কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল? আর দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষার গণ্ডীর বাহিরে এখন যে-সকল ভাষায় কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কই বা কি? বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্বপ্রণালী অনুসারে এই-সমস্ত ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ যতদিন না তৈয়ারী হইবে, ততদিন কোন উত্তরই দেওয়া যাইবে না। এদিকে এপর্য্যন্ত খুব কমই কাজ হইয়াছে। হোর্ণ্লের "Grammar of the Eastern Hindi", ডক্টর গ্রীয়ারসনের Linguistic Surveyর প্রকাশিত রিপোর্টগুলি ও ইয়ুল্ ব্লশের "La formation de la langue Marathe" এই কয়খানি গ্রন্থ হইতে এবিষয়ে অতি সামান্যই উপকরণ পাওয়া যায়। ডক্টর গ্রীয়ারসন মনে করেন, ঋগ্বেদের ভাষা Upper Doab-এ বলা হইত। আর যখন ভাষা চাঁচিয়া ছুলিয়া সাহিত্যের সংস্কৃতে দাঁড়াইল, তখন ইহা প্রাকৃতে পরিণত হইল, তারপর মধ্যদেশের ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই এক স্রোত। আর এক স্রোত আর্য্যেরা প্রথম চোটে আনিয়া পঞ্জাবে ফেলিয়াছিল। তাহাই মধ্যদেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাই গ্রীয়ারসনের ভাষায় "Outer Band of Indo-Aryan dialects" হইয়া পড়ে। গ্রীয়ারসন্ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "Outer Band"-এর দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বিস্তৃতি ঘটায় এইরূপ হইয়াছে। তাঁহার মতে কালে এই-সমস্ত বিভাষা (dialect) নষ্ট হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উত্তর-ভারতের কথিত ভাষায় পরিণত হয়। গ্রীয়ারসনের এই ভিত্তিহীন প্রমাণ-শূন্য খেয়াল কাহারও কাহারও নিকট মধুর স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে। গ্রীয়ারসন উত্তরভারতে সংস্কৃতেতর ভাষাগুলির অস্তিত্বের বিষয় আদৌ ভাবিতে ভুলিয়াছেন; কাজেই আমরা ইহা অন্তঃসার-শূন্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

ব্রাহ্মণযুগে সংস্কৃত ব্রহ্মবাদীদের ভাষা থাকিলেও থাকিতে পারিত। ভারতের উত্তরাঞ্চলের কথ্য-ভাষার একটু ছিটে ফোঁটা অশোক-অনুশাসনে পাওয়া গিয়াছে। যখন বিদেশী বিজেতারা কিছু পরে আসল এবং হিন্দু-ভাবাপন্ন হইল, তখন আবার শিলালিপি ও অনুশাসনের ভাষার স্থান সংস্কৃত গ্রহণ করিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে কথ্যভাষাগুলির অবস্থা কি ছিল তাহা এখনও কেহ জানিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু এই ভাষাগুলি আমরা এখন যেমন বলিয়া থাকি, সেই হিসাবে ধরিয়া ইহাদিগকে সংস্কৃতজাত বলিয়া বিভক্ত করিলেও নানা গোল ওঠে। ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া ভাষার সম্বন্ধ ঠিক করা যায় না, বরং বৈয়াকরণ বাক্‌ছন্দের (Fundamental Grammatical Structure) দ্বারা কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। Theoryতে বিদেশীভাষা হইতে একটি ভাষার সমস্ত শব্দ গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহার বৈয়াকরণিক গঠন (Framework) আদৌ বদ্‌লান যায় না। আর বৈয়াকরণ গঠনই ভাষার বংশ নির্ণয় করিয়া দিতে সমর্থ।

বাঙ্গালী জাতি-হিসাবে দ্রাবিড়, এ কথা আমি বলি না। রিজলী বাঙ্গালীকে দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণ-জাত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেও বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা আদৌ স্বীকার করেন না। হ্যাডন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, জিউফিদা রুজেরি-প্রমুখ বর্ত্তমান জাতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বাঙ্গালীকে প্রশস্তকরোটীবিশিষ্ট (brachycephalic) ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতি বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ এখনও লেখনী ধারণ করেন নাই। বাঙ্গালীর জাতি

নিরূপিত হইলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, দ্রাবিড়ের কয়েকটি প্রভাব বাঙ্গালীর উপর ছিল। সুপ্রাচীনকালে আর্য্যদিগের মধ্যে দ্রাবিড়দিগের ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। ইহা কিরূপে বিস্তৃত হইল তাহা আলোচনার বিষয়। আর্য্যেরা অধিকতর সভ্য, প্রবল-প্রতাপ ও বিশুদ্ধরুচিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনার্য্য রীতি-নীতির বিস্তার কিরূপে হইল? যখন কোন জাতি কোন নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে, তখন স্বভাবতঃ সেই নূতন প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহিত মিলিবার জন্য ও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সেই জাতি তাহাদের অনেক রীতিনীতি ও ধর্ম্মপদ্ধতি নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে। সকল স্থলেই যে এইরূপ হইয়া থাকে তাহা নয়। তবে অনেক স্থলে অবস্থানুসারে এইরূপ হইয়া থাকে। যে জাতির যে বিষয়ে প্রভাব যত বেশী, অপরজাতি তাহার সংস্পর্শে আসিয়া সেই বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিবার তত প্রয়াস পায়। আর্য্যেরা অনার্য্য দ্রাবিড়দিগের কতকটা ভাব অনুকরণ করিয়াছিল, কেন না সেই ভাবটুকু তাহাদের সমাজ-শরীরের অস্থিমজ্জাগত করা—প্রাকৃতিক বিধানে আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টির জন্য সেরূপ করা তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই আর্য্যেরা অনার্য্যপ্রভাব এড়াইতে পারে নাই। অনার্য্যদিগের পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতি নিম্নস্তরের হিন্দুদিগের মধ্যে স্থান পাইয়া ক্রমশঃ হিন্দুসাধারণের ভিতর বিশুদ্ধাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। অনার্য্যদের দানব ও উপদেবতা প্রভৃতি হিন্দুদিগের মধ্যে দেবতায় পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপে স্থানবিশেষে অনার্য্য ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের উপর একটা উদ্ভটভাব অর্পণ করিয়াছে—বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু নিষ্ঠুর-ভাবাপন্ন করিয়াছে। জীব-বলি-প্রথা, মানুষের প্রতি ধর্ম্মার্থ নির্য্যাতন, দেবকার্য্যে সুরাপান প্রভৃতি কয়েকটি ধর্ম্মানুমোদিত রীতি অনার্য্য ধর্ম্ম হইতে আর্য্যধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যাপার একধর্ম্ম অপরধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে। অনেক সময় উভয় ধর্ম্ম-পদ্ধতির সাদৃশ্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত ভুল করা হইয়া থাকে। যে যে জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে, সেই সেই জাতির সভ্যতা, সংস্পর্শ, পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় যথোচিত আলোচনা না করিয়া কিছু স্থির করা উচিত নয়।

বেদানুমোদিত ধর্ম্মবিশ্বাস ভারতের প্রায় সকল শ্রেণীর ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রকৃত বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বলিতে গেলে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম বোঝায় না। বাঙ্গালা দেশে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান, আবার প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই ধারণা তাহাদের ধর্ম্ম বেদানুমোদিত; এ ছাড়া বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। বেদানুমোদিত ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রধানতঃ হিন্দুনামে অভিহিত। এই হিন্দু বাঙ্গালীরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, নানা উপধর্ম্মের সেবা করিয়া, বেদবিধির বহু প্রকারে অসম্মান করিয়াও, আপনাদিগকে বেদানুমোদিত-ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সময় সময় বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও রীতি-নীতির অভ্যন্তরে কতকগুলি অবৈদিক সংস্কার এরূপ দৃঢ়-সম্বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালায় এখন সম্পূর্ণ বেদ-বিহিত রীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত করা কঠিন। এই-সকল সংস্কার হিন্দু বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহা আলোচনার বিষয়। আর্য্যেরা এদেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা এখন নানা শাখাপ্রশাখায় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা এদেশের আদিম-অধিবাসীদিগের সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক সংস্কার আপনাদিগের অস্থিমজ্জাগত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহার মূলে এক আদিম ধর্ম্মবিশ্বাসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই আদিম সংস্কার-সকল তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আচারে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধাকারে স্থান লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় এখনও এমন অনেক জাতি আছে যাহারা খাঁটি পুরাতন সংস্কার এখনও কতকটা পোষণ করিয়া থাকে। উচ্চ-শ্রেণীর বাঙ্গালীরা মনে করেন, তাঁহারা খাঁটি বেদবিহিত-ধর্ম্মাবলম্বী। আদিম সংস্কার-সকল তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ইহা তাঁহারা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছেন।

আদিম সংস্কারসকল প্রথমে এদেশের কতকগুলি

আরণ্য জাতির মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহারা আপনাদিগকে কোন বিশেষ-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিত না। আদিম-মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ কতকগুলি সংস্কার তাহাদের মনে স্থান পাইয়াছিল। সর্ব্বশক্তিমান্ কোন আত্মসত্তার ভাব অপরিস্ফুটভাবে তাহাদের ধারণায় আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অপরিণত মন সেই সত্তার উপাসনার উপযোগী ছিল না, তদ্ব্যতীত তাহারা কতকগুলি উপদেবতার উপাসক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা তাহাদের শরীর ও মনের উপর ক্রিয়াশীল যাবতীয় বাহ্য পদার্থকেই, ইচ্ছা- ও শক্তিসম্পন্ন মনে করিত। বৃক্ষের আত্মা আছে, নদী ও পাহাড়ের আত্মা আছে, ইহা তাহারা মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের দৃষ্টিগোচরে অবস্থান না করিলেও ইহাদের আত্মা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিত। তাহারা মনে করিত, দেহবিচ্যুত আত্মা পরলোকে থাকিয়া ইহলোকের তত্ত্বাবধান করিত। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষগণও তাহাদের পূজ্য ও উপাস্য ছিল। আত্মার অস্তিত্বে তাহারা বিশ্বাস করিত, কিন্তু জন্মান্তরের ধারণা তাহাদের ছিল না। জন্মান্তরের ধারণা না থাকা আদিম ধর্ম্মবিশ্বাসের এক বিশেষত্ব। ইহার আর-এক বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত পৌরোহিত্য প্রথা ছিল না। তাহারা তাহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে দৈবশক্তিসম্পন্ন মনে করিত। এইরূপ ব্যক্তির নিকটে অনেকে আসিয়া, তাহারা কোন্ দেবতার কোপে পড়িয়াছে, আর কোন্ দেবতাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিত। ইহারা যে-দেবতাকে মানিত সেই দেবতাকে তাহাদেরই ন্যায় দ্বেষহিংসা-পরায়ণ অথচ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। এই-সকল দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে তাঁহাদের উদ্দেশে পশুবলি করিতে হইত। সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিত, তাহারা যেমন নিজে পশুমাংসে পরিতৃপ্ত হইত, তাহাদের দেবতাদেরও পশুমাংস তদ্রূপ সন্তোষপ্রদ। তাহারা ভাবী শুভাশুভের কতকগুলি পূর্ব্বলক্ষণ মানিত এবং কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার বা কোন স্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই-সকল পূর্ব্বলক্ষণ বিচার করিয়া কার্য্য করিত। কিন্তু এই খাঁটি সংস্কারগুলি আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না; অন্নবিস্তর-হিন্দুভাব-মিশ্রিত অবস্থায় এই-সকল সংস্কার বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। বাঙ্গালীরা জলাশয়ে, বৃক্ষবিশেষে, প্রস্তরবিশেষে দৈব-অস্তিত্ব মানিয়া থাকে। ইহারা বিবাহাদি কর্ম্মে অনেকগুলি সংস্কারজাত রীতি মানিয়া চলে, সেগুলি বেদ-বিহিত ক্রিয়া বলিয়া মনে হয় না। হয় ত বঙ্গদেশে এখন খাঁটি আদিম-ধর্ম্মাবলম্বী একটিও জাতি না থাকিতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব এখন সকল জাতির উপরই অন্নবিস্তর বিস্তৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের দেবতাদিগের পূজা ও উপাসনা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এই-সকল পূজা ও উপাসনা কোন না কোন আকারের আদিম ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার আমরা দ্রাবিড় সম্পর্কে বাঙ্গালীর কথা কিছু বলিব। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর উপর দ্রাবিড় কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারই একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

সমাজ সম্পর্কে বাঙ্গালীর উপর দ্রাবিড়ের প্রভাব অতি অল্প। দ্রাবিড়ের সম্পর্কে আসিয়া মাত্র কয়েকটি জিনিস বাঙ্গালী দ্রাবিড়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালী ও দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্পর্শ সমালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, নারিকেল, তাম্বুল ও চন্দন দ্রাবিড় দেশ হইতেই বাঙ্গালী পাইয়াছে। এগুলি দ্রাবিড় দেশেরই নিজস্ব সম্পত্তি। নারিকেলকে তামিলভাষায় তেন্ন-মরম্ অর্থাৎ দক্ষিণ দেশের বৃক্ষ বলে। নারিকেল ফলকে ইহারা "তেন্নংকাই" ও "তেংকাই" বলে (Asiatic Quarterly Rev. July 1897, p. 100)। তেলুগুভাষায় ইহার নাম "নারীকেলমু"। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে যুয়ন-চয়ঙ্ "নাড়ীকের দ্বীপে"র উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, নালীকের জাতি নালীকের দ্বীপেরই অধিবাসী ছিল। কথা-সরিৎসাগরে নারীকেল নামে একটি বড় ও সুন্দর দ্বীপের কথা আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে নারীকেল নিকোবার দ্বীপেই জন্মিত। তথা হইতে সিংহলে আসিয়া সিংহলের উর্ব্বরভূমিতে বহু পরিমাণে জন্মিতে থাকে। তারপর সেখান হইতে দক্ষিণ-ভারতে নারিকেল জন্মিতে থাকে। দক্ষিণভারত হইতেই বাঙ্গালায় নারিকেলের আগমন হইয়াছে। দ্রাবিড়

প্রভাবের পর হইতেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পূজা ও ক্রিয়ায় নারিকেলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের শাস্ত্রাদিতে নারিকেলের নামগন্ধই ছিল না। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় প্রভাবের অবান্তর ফলে ক্রমশঃ শাস্ত্রাদিতেও নারীকেল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মহাভারতে নারীকেল অনেক পরে সংযোজিত হইয়াছে। চন্দন দ্রাবিড় ভিন্ন অন্য কোথাও জন্মিত না। এখনও দ্রাবিড় ভূমিই জগতের সর্ব্বত্র চন্দন সরবরাহ করিয়া থাকে। তার্শিশ্ হইয়া দ্রাবিড়ের চন্দন সলোমানের রাজত্ব পর্য্যন্ত সুগন্ধে আমোদিত করিয়া আসিয়াছে। সিংহলে ছোট ছোট চন্দন-গাছ আছে। স্যাণ্ডুইচ দ্বীপেও দুই রকম চন্দন-গাছ আছে, কিন্তু সেগুলি খাঁটি চন্দন নয়। পূর্ব্ব- ও দক্ষিণ-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট চন্দন জন্মিত। এখন নাই। ভারতে এখন নানা জায়গায় চন্দন জন্মে। বাঙ্গালায় চন্দনের ব্যবহার দ্রবিড়ই শিখাইয়াছে। চন্দন বাঙ্গালী তামল জাতির নিকট হইতেই পাইয়াছে। খুব উত্তরাঞ্চল ছাড়া ভারতের সকল স্থানেই এখন পান পাওয়া যায়। উষ্ণদেশের স্যাঁত্সেতে জায়গায় পান জন্মায়। ভারত, সিংহল ও বর্ম্মায় পানের চাষ হয়। মধ্যভারতের চাষ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কম পরিশ্রমে হইয়া থাকে। এখানকার পানের চাষীদের নাম 'বরে' (বারুই) বা 'বরোজা'। কয়ড় দেশে পান আমগাছের গোড়ায় বোনা হয়। ধারবারের পান খোলা জমীতে হয়, বরজের দরকার হয় না। দ্রবিড় ব্যতীত ভারতের কোথাও পান আপনাআপনি অসংখ্য পরিমাণে জন্মায় না। তামলজাতিই তাম্বুল ব্যবহারের সূচনা বাঙ্গালায় করে। তাহাদেরই জন্য বাঙ্গালায় পানের চাষ হয়। বাঙ্গালী তাম্বুল ব্যবহার শিখিয়াছে এই তামল জাতির নিকটে।

কোন কোন ধর্ম্ম-ব্যাপারে বাঙ্গালী দ্রাবিড় প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। ইহাদের কতকগুলি পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতি নিম্নস্তরের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে বিশুদ্ধাকারে পরিণত হইয়াছিল। দ্রাবিড়দিগের উপদেবতা প্রভৃতি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দেবতায় পরিণত হইয়াছে। শীতলা, কালভৈরব প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বাসুদেব ও যুগলমূর্ত্তির পূজা বাঙ্গালা দ্রাবিড়দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। শক্তিপূজার বীজ দক্ষিণ ভারতেই প্রথমে উপ্ত হয়। বাঙ্গালার পূজায় বলি দ্রাবিড়েরই অনুকৃতি। শিবপূজা, কালীপূজা, ও হোলিকোৎসব দ্রবিড় হইতেই বাঙ্গালা গ্রহণ করিয়াছে। আমরা এই বিষয়টি একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

বাঙ্গালায় কালভৈরবের পূজা হয়। পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মে ইহার পূজা ছিল না। দক্ষিণাপথে কুন্বী কৃষকেরা ভৈরোঁ নামে এক দ্রাবিড় দেবতার পূজা করে। ইনি ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। ইঁহার অপর হস্তে ঢক্কা— আশেপাশে সর্প ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতের কোনও কোনও স্থানে ইঁনি ক্ষেত্রপাল নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইনি কালভৈরবের আকার ধারণ করিয়া অষ্টাবিংশ হস্ত-সমন্বিত হইয়াছেন। ইনি নর-কপাল-মালা-বিভূষিত।

বাঙ্গালা দেশে বলির প্রথা খুব প্রচলিত। সাধারণ বলির প্রথা সকলে জানে। আমাদের দেশে বাঁকুড়ার গোয়ালারা বলি দিতে হইলে একটা শূকরকে একপাল মহিষের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। মহিষগুলা শূকরটাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া ফেলে। তিয়রেরা দীপালীতে কালী-দেবীর নিকট ছাগ বলি দিবার সময় একটি খুব তীক্ষ্ণ কাঠের ছুরী দিয়া তাহার কণ্ঠদেশে আঘাত করে, ইহাতেই ছাগের মৃত্যু হয়। এই বলির ব্যাপার দ্রাবিড়দের প্রথমাবস্থার কীর্ত্তি, শনৈঃ শনৈঃ তাহা কালে বাঙ্গালায় সংক্রামিত হয়। দ্রাবিড়দের কালী দেবীর নিকট বলি দিবার প্রথা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগের শেষে আরণ্যজাতির ভিতর দিয়া বাঙ্গালায় কালীপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। দ্রাবিড়দের মধ্যে অতি পূর্ব্বকালে যে নরবলির প্রথা ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

গৃহ-দেবতার পূজা দ্রাবিড়গণের মধ্যে গৃহস্বামীই করিয়া থাকেন। এই প্রাচীন পদ্ধতিটি ইহারা এখনও পরিবর্ত্তন করে নাই। বাঙ্গালায়, মালেরা যে ধর্ম্মের গোঁসাইয়ের পূজা করিয়া থাকে, তাহার পুরোহিত হন গ্রামের মণ্ডল। এটিও দ্রাবিড়-প্রথা-সঞ্জাত।

যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় তাহা আর্য্যজাতির ধর্ম্ম। বাঙ্গালাদেশে অন্যান্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের

প্রভাব অধিক। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম নয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে এই ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ধর্ম্মকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারে নাই। এ ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও, বাঙ্গালার প্রাচীন ধর্ম্ম ভিতরে ভিতরে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গে অনেক জাতীয় লোক আসিয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড়, মঙ্গলীয় ও আর্য্য-প্রভাব উল্লেখ-যোগ্য। দ্রাবিড়েরা অতি প্রাচীন জাতি। অতি প্রাচীনকালে ইহাদের কয়েকটি শাখা বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী ছিল বলিয়া মনে হয়। মরণ-ময় জাতি বাঙ্গালা হইতে দক্ষিণ-ভারতে গমন করিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে, পঙ্গলজাতি চোড় রাজ্য এবং বানবর জাতি চের-রাজ্য স্থাপন করে। ইহারা দ্রাবিড়দিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, এই দ্রাবিড় জাতি এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল; ইহারা আর্য্যদিগের উপর কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর্য্যেরাই দ্রাবিড়দিগকে অধিক পরিমাণে অভিভূত করিয়াছিল। দ্রাবিড়েরা ঠিক কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ দেশের একটা খাঁটি দেশীয় ধর্ম্ম ছিল, তাহার প্রায় সমস্তটা চলিয়া গেলেও প্রাণ এখনও আছে। এই সুপ্রাচীন কালের বাঙ্গালার ধর্ম্মের কোন নাম ছিল কি না জানিতে পারা যায় না; কিন্তু এখন তাহার কোন নাম নাই। বৈদিক ধর্ম্মের মূলে যে ভাব, এ দেশীয় ধর্ম্মমত এককালে সেইভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহার নড়িবার শক্তি আছে তাহারই প্রাণ আছে। প্রাণ না থাকিলে নড়িবে কেমন করিয়া? বাতাস নড়ে, নদী বহে, বৃক্ষ বাড়ে, সুতরাং ইহাদের সকলেরই প্রাণ আছে। আমাদের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্বন্ধ আছে, যাহারা আমাদের ক্ষতি করে, ও মঙ্গল সাধন করে, তাহারা সকলেই জীবন-বিশিষ্ট, মানুষ স্বভাবতঃ এই ভাবই পোষণ করিয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্গালীরা সকল বস্তুতেই প্রাণের কল্পনা করিত। বাঙ্গালা দেশের মত উর্ব্বরভূমি আর কোথাও নাই। উদ্ভিদজাতি এদেশে যেমন প্রশ্রয় পায়, এমন আর কোথাও পায় না। কাজেই বন-দেব-দেবীর আদর এদেশে বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল। বন যেমন উপকারে আসিত, তেমনই ইহা ভয়েরও কারণ ছিল। হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ পার্ব্বত্যবন তাহাদের জাগ্রত দেবতা ছিল। বাঙ্গালায় আজও বট-অশ্বত্থের পূজা হইয়া থাকে, উৎসর্গ হইয়া থাকে, এমনকি লক্ষ্মী-নারায়ণ বলিয়া বট-অশ্বত্থের বিবাহও হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বটগাছের গুঁড়ি হন ব্রহ্মা, শাখাপ্রশাখা হন বিষ্ণু, বৃক্ষের পত্র হ'ন অন্যান্য দেবতাগণ। বৃক্ষের পূজা বাঙ্গালায় এক সময়ে খুব চলিত। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় তাহার নিদর্শন বিরল নয়। বাঙ্গালীর বাস্তুপূজায় ডাল পুঁতিয়া পূজা হয়। অরণ্য-ষষ্ঠীতেও গাছে সিন্দুর মাখাইয়া পূজা দিতে হয়। যূপকাষ্ঠ প্রভৃতি প্রস্তুতকালে কুঠার ও গাছের মাঝখানে কোন কোন স্থানে দুর্ব্বাদল দিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয়। সুন্দরবনের কাঠুরিয়ারা বনদেবতাকে খুব মানে। তাহাদের বিশ্বাস কাঠ কাটিতে গেলে অরণ্যদেবতা তাহাদের অনিষ্ট করিবে। তাই তাহারা নিজেদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন দরবেশকে আগে না পাঠাইয়া জঙ্গলে যায় না। বৈষ্ণবেরা তাহাদের আখ্‌ড়ার গাছের ডাল ভাঙ্গিতে দেয় না। আখড়ার গাছও কাটিতে কাহাকেও দেয় না। তুলসীগাছ উপ্‌ড়াইতে দেয় না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ শ্রীফল বা বেলকাঠ জ্বালাইয়া রন্ধন করিতে পারে না। বাঙ্গালীর শাস্ত্রে, নারীকেল বৃক্ষ কিছুতেই কাটিতে নাই।

ক্রুক ও ফ্রেজার বহু পরিশ্রম করিয়া নানা জাতির পূজা-পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছে; তাঁহাদের লেখা হইতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালার অসভ্যজাতিদের মধ্যেও গাছ-পূজা আছে। ওরাওঁদের পহান বা গ্রাম্য-পুরোহিতগণ পুরান জঙ্গল হইতে শালগাছের ফুল সংগ্রহ করে। তাহারা এইরূপ প্রাচীন জঙ্গলকে "সর্ণাবুড়ী"র বাড়ী বলে বা "সর্ণা" বলে। মুণ্ডাদেরও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বৃক্ষ-পূজায় ওরাওঁদের বনভোজনের ব্যবস্থা থাকে। গাছ-পূজার সঙ্গে বনভোজন প্রায় সকল

অসভ্যজাতিরই আছে। খারওয়ার, সাঁওতাল মাঝি, বিন্ধ্য ও কৈমুর পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চলের অনার্য্যজাতির মধ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। এইসমস্ত জাতির যুবক-যুবতী সকলে মিলিয়া বনভোজনের সময় নৃত্য করে।* বাঙ্গালাদেশে যেমন ঝোপের অভাব নাই, তেমনই ঝোপের পূজারও ক্ষান্তি নাই। গাছের ঝোপে মনসাতলা, কলাগাছের ঝোপে শীতলাতলা অনেক জায়গায় আছে। প্রাচীন জঙ্গল কাটিয়া দেখা গিয়াছে, সামান্য ঝোপ রাখিয়া দিয়া সেখানেও কোন গ্রাম্য কাঁচা-খেকো দেবতার পূজা হইতেছে। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শীতলা দেবীর নিকট পায়রা ছাগ বলি দেওয়া হয়। চেরোরা ঝোপের কাছে মহিষ ও অন্যান্য পশু বলি দেয়। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকদের একটা করিয়া ঝোপ থাকে; সেই ঝোপগুলিকে তাহারা খুব পবিত্র মনে করে। ভুঁইয়ারা এইরূপ ঝোপকে 'দেওতা সরা' বলে। তাহাদের এই পবিত্র স্থানে চারিজন গ্রাম্য দেবতার পূজা হয়। মুণ্ডাদের বিশ্বাস তাহাদের "দেশৌলী"র (ঝোপ) কোন বৃক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেবতারা অনাবৃষ্টি দ্বারা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। জঙ্গল আবাদ হইয়া গেলে পর প্রত্যেক গ্রামে জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নস্বরূপ একটু ঝোপ রাখিয়া দেওয়া হয়। সংস্কার এই যে, যদি এই ঝোপ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বৃক্ষদেবতা চটিয়া যাইবেন।

বাঙ্গালাদেশে কাঁচাখেকো দেবতাকে লোকে বড় ভয় করে এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। গঙ্গায় ডুবিয়া কত লোক মরিয়া যায়, গঙ্গার হাঙ্গর কুম্ভীর কত লোককে উদরসাৎ করে, তাই গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পূর্ব্বে ছাগল ভেড়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হইত। গঙ্গা-পূজার জন্য গঙ্গাস্নান-যোগের সময় দেশ বিদেশ হইতে যাত্রী আসে। বিবাহের সময় পুকুরে গঙ্গা-পূজা হয়। জেলেরা মাছ ধরিবার পূর্ব্বে এখনও ছাগ বলি কোথাও কোথাও দিয়া থাকে। লোকে গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করে, ভস্ম নিক্ষেপ করে, প্রথম পিণ্ড গঙ্গায় দেয়। প্রথম সন্তানও পূর্ব্বে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইত। বাঙ্গালার নানাস্থানে গঙ্গা-পূজার নানারূপ বিধি আছে।

বাঙ্গালায় পৃথ্বী-পূজার রীতিও আছে। বসুন্ধরাকে দুধ-কলা দেওয়া, পাথরে সিন্দূর মাখাইয়া তাঁহার পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পাথরে সিন্দূর মাখানকে কেহ কেহ রক্তদান-প্রথার নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। দ্রাবিড়দের মধ্যেও রক্তদান-প্রথা আছে। ধরিত্রীর বিবাহ প্রথাও কোন কোন স্থানে আছে। গ্রাম্য-দেবতার সঙ্গেও ধরিত্রীর বিবাহ হয়। পশ্চিম বঙ্গে ক্ষেত্রপালের সঙ্গে ধরিত্রীর বিবাহ হয়।

শীতলাদেবী গর্দ্দভবাহিনী, সম্মার্জ্জনীহস্তা। সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ। ইঁহার পূজায় ছাগ ও পারাবত বলি হয়। যশোহর ও নোয়াখালিতে ইনি শ্বেতমূর্ত্তি, বরিশালেও তাই। ওড়িষার যোগিনী, বর্দ্ধমানের দিদিঠাকুরাণী এই শ্রেণীর ঠাকুর।

ভুঁইয়াদের "ঠাকুরাণী মাঈ" রক্ত-পিপাসিনী দেবী। এই মূর্ত্তি আমাদের কালী-মূর্ত্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কালী-পূজার প্রকার-ভেদে জীব-বলির নিয়ম সর্ব্বত্রই আছে। ওড়িষার শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে অনেকের দেবতা হিন্দু দেবতা নয়। তাহাদের ব্রাহ্মণ নাই, শ্রাদ্ধ নাই; কিন্তু ছাগল ও মোরগ বলি আছে।

বঙ্গদেশে অসভ্য জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ সুসভ্য জাতির মধ্যে বহুবিধ দেব-দেবীর নানাপ্রকার পূজা-পদ্ধতি আছে। সুসভ্য বাঙ্গালীর অনেক পূজা-প্রণালীর সঙ্গে দ্রাবিড়, মুণ্ডা, ভুঁইয়া, খন্দ, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিদের পূজার রীতি আংশিক বা পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। শুধু মিলিলেই যে সেগুলি বাঙ্গালী ইহাদের নিকট হইতে লইয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রে বলা যায় না। পৃথ্বী-পূজা, জলদেবতা-পূজা, বৃক্ষ-পূজা প্রভৃতি বাঙ্গালী কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই। এগুলি ইহাদের নিজস্ব। তবে কাল-ভৈরব-পূজা, হনুমৎ-পূজা, কালী পূজা, লিঙ্গ-পূজা, জগন্নাথ-পূজা প্রভৃতি যে বাঙ্গালী দ্রাবিড় সংসর্গে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন দ্রাবিড়েরা না-মানুষ না-পশু এমন এক কিম্ভুত-কিমাকার মূর্ত্তির পূজা করিত। তাহার কতকটা বানর, কতকটা মানুষ, সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর-লিপ্ত—কেবল একটি লাঙ্গুল তাঁহার পশুত্বের পরিচয় দিত। ফ্রেজার অনুমান করেন

যে, হিন্দুরা এই অদ্ভুত জীবটিকে রামানুচর হনুমানে পরিণত করিয়াছিল। মরাঠারা এই হনুমানজীর অত্যন্ত ভক্ত। ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামে এই হনুমদ্দেবের এক-একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

সুপ্রাচীনকালে যখন দ্রাবিড়গণ শক্তি ও লিঙ্গ পূজা করিত, তখন বঙ্গদেশে ইহাদের পূজা অনুষ্ঠিত হইত না। তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তন্মন্ত্র বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিলেও (Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 557) স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর শাক্তধর্ম্ম খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া সেইখানকার জন-সাধারণের প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণোপযোগী হয়। লোকে সেই শাক্তধর্ম্ম গ্রহণ করে। সূচনাতেই কামাখ্যায় শক্তি-পূজা বেশ জাঁকিয়া বসে। এই স্থান হইতে শক্তিপূজা ক্রমশঃ তিব্বত, নেপাল ও গুজরাতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পঞ্চম শতকের পূর্ব্বে শক্তিপূজা বঙ্গদেশে ছিল না। দ্রাবিড়-সম্পর্কেই বাঙ্গালায় এই উপাসনার বিস্তৃতি হইয়াছিল। দ্রাবিড় দেশে পৃথ্বীপূজা হইতেই শক্তি-পূজার প্রথম উদ্ভব হয়। সেখানে গ্রামদেবতা পৃথ্বী, ভু-দেবী বা ভূমিদেবীরূপে পূজিত হইতে হইতে ক্রমশঃ শক্তি-রূপে পরিণত হইয়াছেন। বাদামী-গুহামন্দিরের পৃথ্বীও এইরূপ ভু-দেবী। পৃথিবীর বীজোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য দ্রাবিড়েরা পৃথিবীর সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহার উদ্দেশে পশু বলি দিত।

প্রাচীন কন্নড়-সাহিত্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, লিঙ্গপূজা দ্রাবিড়দিগের একটি সুপ্রাচীন রীতি। আমরা যাহাদিগকে আর্য্য অভিধান দিয়া থাকি তাহাদিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে লিঙ্গোপা-সকগণ বাস করিত। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। কন্নড় ভাষায় তাহাদের প্রাচীন ভাষার উপকরণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই জাতি যখন লিঙ্গপূজা করিত, তখন ভারতের কোথাও লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতকের পূর্ব্বে কোথাও লিঙ্গ-প্রতীকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের কাছাকাছি দুইটি প্রাচীনতম লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। একটি ভিটা হইতে প্রাপ্ত—এক্ষণে তাহা লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, অপরটি উত্তর আরকটের অন্তর্বর্ত্তী গুড়িমল্লমে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে দ্রাবিড়েরা তাহাদের বীরগণকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাহাদের সমাধির উপর লিঙ্গাকৃতি "বীরকল" বসাইয়া দিত। এই বীরকল-স্থাপন-রীতিই সম্ভবতঃ লিঙ্গপূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পরযুগে এই দ্রাবিড়গণের ন্যায় বৌদ্ধেরাও স্তূপের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। লিঙ্গপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইলে পর প্রাচীন পল্লব, পাণ্ড্য ও চোড়দিগের মধ্যে লিঙ্গ-প্রতীকোপাসনার প্রবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড়দেশে খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্ব্বে প্রথমে জৈন ও তারপর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়ও দ্রাবিড়েরা লিঙ্গ পূজা করিয়া আসিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তর-ভারত হইতে শৈবধর্ম্ম প্রথম দ্রাবিড়-ভূমিতে প্রচারিত হয়। লকুলীশ ইহা প্রবর্ত্তন করেন। দ্রাবিড়দের অনেকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। দক্ষিণ-ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকিয়া শৈবধর্ম্মের পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইয়াছিল (Indian Antiquary, XXX, 17)। তারপর কিছুদিন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে শৈবধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম তেলুগু প্রদেশে বিশেষরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তারপর শৈবধর্ম্মের স্রোত পুনরায় চলিতে থাকে। লিঙ্গপূজা ও শিবপূজায় মেশামিশি হইয়া গেল। লিঙ্গোপাসকদিগের সঙ্গে শৈবদিগের আর কোন বিরোধ রহিল না।

দক্ষিণ-ভারত হইতে দলে দলে শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া বঙ্গদেশে ও অন্যত্র শৈবধর্ম্ম প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহারই ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ-প্রপীড়ক বঙ্গরাজ শশাঙ্ক শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় মহারাজ হর্ষও শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্রাবিড় প্রভাবে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় শৈবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে লিঙ্গপূজা ও শিবারাধনার ধূম চলিল। যাহারা লিঙ্গপূজার নিন্দা করিতেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাদি রচিত হইল। এই সময়ে নানাদিক্ হইতে

লিঙ্গের নানারূপ ব্যাখ্যারও অভাব হইল না। কেহ বলিলেন,—"শিবলিঙ্গং শিব এব ন তু শিবস্য শিশ্নঃ।" কেহ সূতসংহিতার ধ্যানযোগখণ্ডের দোহাই দিয়া,—

"আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্বেদবেদান্তবিত্তমাঃ।
তত্রাপি শঙ্করঃ সাক্ষাল্লিঙ্গং নান্যৎ মুনীশ্বরাঃ॥

* * * *

স্বয়মেব সদা লিঙ্গং ন লিঙ্গং তস্য বিদ্যতে॥"

শিব ও লিঙ্গের একত্ব-দ্যোতক এই বচনের দোহাই দিয়া অনেকে লিঙ্গ ও শিবের একত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। লিঙ্গপূজার মন্ত্রের সঙ্গে লিঙ্গের সাধারণ অর্থের আর কোন ঐক্য রহিল না। এই পূজার মন্ত্রে যে ধ্যান হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, উপাসক যে মূর্ত্তি কল্পনা করেন তাহা শ্বেত, মূর্ত্তির কপালে চন্দ্র, চারি হস্ত, পাঁচ মুখ, তিন চক্ষু, মূর্ত্তি পদ্মাসনে স্থিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। তিনি বিশ্বের বীজ, বিশ্বের আদি। নানাস্থানে লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাদিও প্রণীত হইল। খৃষ্টীয় নবম শতকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়া চোড়রাজ্যে শৈবধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। "বাতকুরর্ পুরাণম্" নামক দ্রাবিড়গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতঃপর বঙ্গ ও চোড়সম্পর্কে বঙ্গদেশে শৈবধর্ম্মের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়।

পুরীর বর্ত্তমান মন্দির অনুমান ১১০০ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্ত চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তি জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা। এই ত্রিমূর্ত্তি যে বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ তাহা ক্যানিঙ্‌হম নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন (The Stupa of Bharhut, 1879, p. 112, &c.)। ইহা যে বৌদ্ধমূর্ত্তি তাহার কয়েকটি কারণ আছে :—

১। বিশেষণপদরূপে নয়, দেবতার নামরূপে 'জগন্নাথ' শব্দ হিন্দুশাস্ত্রে নাই। অথচ বুদ্ধের একটি নাম "জগন্নাথ" (অভিধানপ্রদীপিকা)। কর্ণেল কিটো যবদ্বীপের একটি বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নে "নমো বুদ্ধ-জগন্নাথায়" এই খোদিত লিপির উদ্ধার করিয়াছেন। বুদ্ধের নাম যে জগন্নাথ তাহা আরও একটি মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় (Transactions of the Literary Society of Bombay, Vol. III, p. 284, Sketch no. ii)।

২। ত্রিরত্ন-যন্ত্র এবং জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রার আকৃতি একেবারে অনুরূপ।

৩। জগন্নাথের মূর্ত্তিতে 'দারুপঞ্জর' আছে। দেববিগ্রহে অস্থি থাকা নিষিদ্ধ; তাহা সত্ত্বেও অস্থি থাকায় প্রমাণিত হইতেছে যে ইহা পূর্ব্বে বুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

৪। বৌদ্ধদিগের জাতিভেদনাশক একটি প্রথা পুরীতে বর্ত্তমান আছে। মহাপ্রসাদ-সেবায় জাতিভেদ নাই। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যেও জাতিভেদ নাই।

৫। বিষ্ণুপুর-অঞ্চলের বহুপ্রাচীন দশাবতার তাস আছে। ইহার মধ্যে নবম অবতার বুদ্ধ। তাসে এই বুদ্ধের স্থানে জগন্নাথ-মূর্ত্তি আছে।

তবে বর্ত্তমান বিগ্রহ আদি-বিগ্রহ নয়। ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। অধিকাংশ কিংবদন্তীর মূলে দেখিতে পাওয়া যায় একটি ঘটনা আছে। একটি দারুমূর্ত্তি শবরগণ উদ্ধার করে। তারপর তাহারাই তাহার পূজা করে। পুরীতে এখনও অনেক শবর বাস করে। ইহারা পূর্ব্বে মন্দিরের সেবা করিত। ইহাদের পূজা না হইলে ব্রাহ্মণেরও পূজার অধিকার ছিল না। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে Hewitt লিখিয়াছেন (History and Chronology of the Myth-making Age, p. 3[illegible])—"The Dravidian mother tree goddess Mariamma, is the mother (amma) of the tree marom). She is the only goddess in the Hindu Pantheon whose image is always made of wood. It is she who, in the story-telling of the founding of the great temple of Jagannath of Orissa, was the mother goddess of the primaval temple... ..."

এইসমস্ত দেখিয়া জগন্নাথ-পূজার মূলে দ্রাবিড় প্রভাব আছে ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সন্ধ্যায়

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে, জাহাজ থেকে বাঁশি
সুদূর হতে আঁধার নভে উঠ্‌ছে ভাসি' ভাসি',
বাজ্‌ছে এসে কানের পরে যেন ঋষির বাণী
অতীত কালের উদাত্তরস ; কোথায় নাহি জানি
গগন-কোণে মেঘের গুরু গুম্‌রে যেন ফুটে।
ক্ষান্ত কথা, দুচার গৃহে শঙ্খ বাজে মৌনতারে টুটে'!
জান্‌লা দিয়ে আকাশ দেখি—সৌম্য বিপুলতা,
তার ওপরে আঁধার ঢাকে চাদর, হিয়া নতা!
আবার বাজে বাঁশি,—মনটা উদাস চল্‌ল ধীরে
আঁধারমাখা আকাশ বেয়ে সেই সে নদী-তীরে—
তাল তমাল ও আম্র যেথা জড়িয়ে শিরে আঁধা
দাঁড়িয়ে আছে মৌন নিবিড় অবোধ্য এক ধাঁধা
ধ্যান-নিরত সাধুর মত; পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ডালের ফাঁকে আঁধার যেথা জড়িয়ে পাকে পাকে
উঠ্‌ছে কেঁপে যেম্‌নি বাজে বাঁশির গুরু ভাষা!
ঐ বাঁশিরই গভীর সুরে প্রাণটা নিয়ে ভাসা!—
আজ মনে হয় চলি উধাও চলি রে বুক মেলে
জড়িয়ে গাছে পাতায় বাড়ী আকাশ পানে ঠেলে
আঁধার ভেদি' উঠি রে আজ; বাঁশির সুর সাথে
আকাশটারে আঁক্‌ড়ে আপন বক্ষ-সীমানাতে
ছড়িয়ে যাব, মিশিয়ে যাব আঁধারে ক্ষীণ হয়ে;
কাঁপন তবু থাম্‌বেনাক, ঢেউ সে রয়ে রয়ে
উঠ্‌বে দুলে, বুকের রণন আকাশ-সীমা ব্যেপে'
আজকে রাতের গতির সাথে উঠ্‌বে কেঁপে কেঁপে,
জাগ্‌বে অটুট।
আকাশ-বুকে আজ এ মেশামিশি
এই যে সাঁঝের বিপুলতায় ছড়াই দিশি দিশি—
কোন্ জনমের কোন্ বাঁধনের প্রীতির ডাকাডাকি
আজ্‌কে এটা? এই যে পরাণ হর্ষে থাকি' থাকি'
মিশ্‌তে ছোটে, নেশায় মাতে,—এ যেন আজ চাই
কোন্ এক পরিচিত আবাস, আত্মীয় প্রাণ পাই
কোন্ অতীতের। নিখিলটাকে জড়িয়ে নিয়ে বুকে
পাওয়া ভরে পরম পাওয়া, পাওয়া পরম সুখে।

আজ মনে হয় ভালবাসি, বড়ই ভালবাসি
আকাশ আঁধার নদীটিরে গাছ ও পাতার রাশি,
ধরায়, কুটীর শত। আজ নিখিলে নেইক কিছু
যাহা আমার ভালবাসায় আছে পড়ে পিছু;—
নিছি সবায়—তারার আলোয় নিবিড় বটে মাঠে,
নদীতীরের ক্ষীণ সে দীপের শিখা, সরু বাটে।
আজ ছড়ায়ে আঁধার হয়ে আঁক্‌ড়ে নিখিলটাকে
দিচ্ছি খালি চুমা, আকুল চুমা। সে আমারে রাখে
বক্ষে তারি চেপে!—আজি বিশ্ব আমার, আমার ধরা,
যা-কিছু প্রাণ আছে আমার, আমার প্রাণ-হরা।

কোন্ প্রীতিমান আমায় এত বেসেছিল ভালো?—
তার বদলে নিখিলব্যাপী আলো এবং কালো
সবার লভি বুকে। বুঝ্‌ছি যেন আমায় ভালবাসে
এই আঁধার এই আকাশ এমন মৃদুল বায়ু-শ্বাসে;
আমি তাদের, তারা আমার,—একই প্রাণে মনে,
আজ্‌কে তাদের অন্তরে মোর রাখ্‌বো যতনে।

হায়রে পরাণ, ছেড়ে কবে আকাশ-ঘরের সুখে
অসীম হতে ছিঁড়ে এলি এই সসীম বুকে?
বাঁশির ডাকে সসীম বাঁধা ভেঙে কারা টুটে'
বিশ্ব আশে চল্‌লি আজি বাহির পানে ছুটে!
আজ্‌কে বুঝি নইক আমি নগণ্য এক দীন,
ক্ষুদ্র নহি হেলায় ফেলা সবার পিছে, হীন।—
অসীম-পিতার দুলাল আমি, তনয় তারি প্রিয়,
তাই ত এমন বাঁশির ডাকে অনির্ব্বচনীয়
পরিচয় এ বিশ্ব সাথে, চিরদিনের চেনার সাথে!
হায় রে পরাণ, কোথায় ছিলি আপন বেদনাতে!—
বিশ্বব্যাপী আপন ঘরে আজ্‌কে চিনে এলি
অন্তবিহীন বিভব, চিরবাঞ্ছিতেরে পেলি!
আলিঙ্গনে আত্মীয়েরে বাঁধ্‌ রে দিয়ে স্নেহ,
বিশ্বে আজি সত্য রে তুই, সত্য অসীম গেহ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত

বুদ্ধদেবের জীবনকালে পিপ্‌ফলী-বনের মৌর্য্যেরা বিড়ুধব কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া হিমালয়ে গমন করে এবং সেখানে একটি সরোবর দেখিতে পায়। ঐ সরোবরের চারিদিকে পিপ্‌পলীবৃক্ষের বন ছিল। সেখানকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মৌর্য্যেরা সেখানে একটি প্রাকার-বেষ্টিত সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিল। ঐ স্থান সর্ব্বদা ময়ূরের কেকারবে মুখরিত থাকিত, এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে ময়ূর-বহুল স্থান বলিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল মরিয়। পিপ্‌পল বন মরিয় নাম পাইলে তথাকার অধিবাসীদেরও নাম হয় মরিয়, এবং সেই অধিবাসীদের বংশ মরিয় বংশ নামে পরিচিত হয়। মরিয় বংশ ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

মহাবংশ-টীকায় লিখিত আছে যে মোদিয় শব্দ হইতে মোরিয় ও মোরিয় শব্দ হইতে মৌর্য্য শব্দ উৎপন্ন। মোদিয় শব্দ সংস্কৃত মোদিত শব্দের অপভ্রংশ। মোদিত মানে আনন্দিত। যাহাদের সৌন্দর্য্যশালী নগর দেখিলে লোকে মোদিত বা আনন্দিত হয়, তাহারা মোদিয় বা মোরিয় বা মৌর্য্য।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন এই মৌর্য্যবংশের লোক। তাঁহার সুশ্রী চেহারা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে নাম দিয়াছিল শ্রীধর। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত।

মহাবংশটীকায় চাণক্যকে চণ্ড-চাণক্য ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। চণ্ড মানে উগ্রস্বভাব। চাণক্য কালাশোকের নবম পুত্র ধনানন্দের বিনাশসাধন করিয়া তাঁহার ধন লইয়া জম্বুদ্বীপে পুষ্পপুর নামে একটি রমণীয় নগর স্থাপন করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে ঐ নগরের শাসনকর্ত্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

চাণক্য তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র। চাণক্যের পিতা ত্রিবেদী অর্থাৎ তিন বেদে পারদর্শী ছিলেন। চাণক্যের পিতার মৃত্যুর পর চাণক্যের মাতা পুত্রের দেহে রাজলক্ষণ দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। চাণক্য মাতার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মাতা নিজের ক্রন্দনের কারণ পুত্রকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া চাণক্য মাতাকে বলিলেন—"আমি যদি রাজা হই তবে তাহাতে আপনার মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। অতএব আপনি কেন বৃথা ক্রন্দন করিতেছেন?" তাঁহার জননী বলিলেন—"যখন তুমি রাজা হইবে তখন তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে।" চাণক্য মাতার শঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিলেন—"আমার দেহের রাজচিহ্ন আমি ত্যাগ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার রাজচিহ্ন-স্বরূপ দুটি দন্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ করাতে তিনি কেবল রাজচিহ্নবর্জ্জিত হইলেন না, অত্যন্ত কুৎসিত হইয়া পড়িলেন।

ইহার পরে চাণক্য পুষ্পপুরে ধনানন্দের নিকট গমন করিলেন। তিনি যখন ধনানন্দের সম্মুখে উপনীত হইলেন তখন রাজা ধনানন্দ ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। ধনানন্দ চাণক্যের কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভিক্ষাদানের অপাত্র বিবেচনা করিলেন ও চাণক্যকে তাঁহার সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করিতে মন্ত্রীগণকে আদেশ দিলেন। মন্ত্রীগণ ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাজা বারম্বার মন্ত্রীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন অগত্যা মন্ত্রীগণ চাণক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন। চাণক্য রাজার আদেশ শুনিবামাত্র পবিত্র যজ্ঞোপবীত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন—"হে সম্রাট, ইহজগতে তোমার সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ যেন না হয়।" রাজা চাণক্যের অভিসম্পাত শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু চাণক্য অভিসম্পাত দিয়াই রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং রাজকর্ম্মচারীরাও ব্রাহ্মণকে বন্দী করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না বলিয়া চাণক্য বন্দী হন নাই।

চাণক্য কিছুদূরে গিয়া আজীবকের বেশ ধারণ করিয়া পুনরায় নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে রাজকর্ম্মচারীদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ লাভ করেন। ক্রমে রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। চাণক্য রাজপুত্রকে সাম্রাজ্য দিবার প্রলোভনে বশীভূত করিয়া

তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত করান। রাজপুত্র জননীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া গুপ্তভাবে চাণক্যের সহিত প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন। রাজপুত্র এক বনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকাগর্ভে অশীতি কোটি মুদ্রা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া দিলেন।

সেই সময় চন্দ্রগুপ্তের জননী ছিলেন পিপ্‌ফলী বনের মোরিয়দিগের সম্রাটের প্রধান মহিষী। যখন মোরিয়-সম্রাট সামন্তরাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হন, তখন তাঁহার মহিষী ছিলেন পূর্ণগর্ভা। মোরিয়-মহিষী পুষ্পপুরে পলায়ন করিয়া পুত্র প্রসব করেন, এবং সদ্যজাত শিশুকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র গমন করেন। চন্দ নামে একটি বৃষ ঐ শিশুকে প্রহরা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া এক গোপ ঐ শিশুকে নিজের গৃহে লইয়া যায় ও পুত্রস্নেহে তাহার লালন-পালন করিতে থাকে। চন্দ বৃষ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও গোপ দ্বারা পালিত শিশুর নাম রাখা হয় চন্দ্রগুপ্ত। মহাবংশের টীকাকার চন্দ্রগুপ্ত নামের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—গোপ > গুও > গুপ্ত ; চন্দ > চন্দ্র ; চন্দ + গুও = চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত বয়স্ক হইলে তাঁহার সহিত গোপবন্ধু নামে এক ব্যাধপুত্রের সাক্ষাৎ ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মে। ব্যাধপুত্র গোপবন্ধু চন্দ্রগুপ্তকে নিজের ভবনে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিয়াছিল। সেখানে একদিন চন্দ্রগুপ্ত সহচরদের লইয়া রাজা-রাজা খেলা করিতেছিলেন; রাজা হইয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্ত, অপর সঙ্গীদের কেহ হইয়াছিল মন্ত্রী, কেহ অপর কর্ম্মচারী, কেহ হইয়াছিল চোর। খেলাঘরের রাজা চন্দ্রগুপ্ত চোরের বিধিমত বিচার করিয়া যখন প্রমাণ পাইলেন যে সে বাস্তবিকই চোর প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন চোরের শাস্তিবিধান করিলেন যে মেষশৃঙ্গ দ্বারা চোরের হস্তপদ কর্ত্তন করিয়া ফেলা হউক। তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে চোরের হস্তপদ কাটিয়া ফেলা হইল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে চোরের কাটা হস্তপদ পুনর্ব্বার জোড়া লাগিয়া গেল।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের এই খেলা দেখিতেছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি বিচার-ক্ষমতা ও দৈববল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন এই যুবক রাজা হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। চাণক্য ব্যাধপুত্রকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে নিজের সঙ্গী করিয়া লইলেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে দীক্ষিত করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রায়ই নানাবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারের স্বপ্ন দেখিতেন ও চাণক্যকে বলিতেন। চাণক্য সেইসব স্বপ্নবিবরণ শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে যাহার ভাগ্যে ঐরূপ স্বপ্নাগম ঘটে সে বিশ্বসম্রাট হইয়া থাকে। কিন্তু এই কথা তিনি চন্দ্রগুপ্তকে বলেন নাই।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়া ধনানন্দের গুপ্তধন উদ্ধার করিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে ধনানন্দের রাজ্য আক্রমণ করিতে বলিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে ধনানন্দের রাজ্যের মধ্যপ্রদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাভূত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত পরাভূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথে দেখিলেন, এক বালক পিষ্টকের মধ্যভাগে দংশন করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা দেখিয়া তাহার মাতা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—"তুমি চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছ? চন্দ্রগুপ্ত যেমন রাজ্যের প্রান্ত আক্রমণ না করিয়া মধ্যভাগ আক্রমণ করিয়াছিল, তুমিও সেইরূপ করিতেছ দেখিতেছি।" বালকের মাতার এই পরিহাসবাক্য চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়েই শুনিয়া নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন। তখন চাণক্যের পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত ধনানন্দের রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিলেন। এইরূপে চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।*

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

* সিংহলী ভাষায় লিখিত মহাবংশ-টীকা, ১১৯-১২৩ পৃষ্ঠা অবলম্বনে লিখিত।

জলদ বৃক্ষ যজ্ঞডুমুর

যজ্ঞডুমুরের গাছ হইতে বিশুদ্ধ পানীয় পাওয়া যায়, ইহা জনসাধারণ অবগত আছেন কি না জানি না। এই জল কোন রোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না তাহা পদার্থ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন।

অনেক পুথি-পুস্তকে পান্থ-পাদপ প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই যজ্ঞডুমুরকে পান্থ-পাদপ বলিয়া স্বীকার না করিলেও, জলদ পাদপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহার গোড়ার যে কোনও একটি বড় শিকড় কলম-কাটার মত কাটিয়া তাহার নীচে পাত্র স্থাপন করিলে অন্ততঃ তিন-চারি সের বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইতে পারে। আমি নিজে জল পান করিয়া দেখিয়াছি, জলে কোনরূপ খারাপ স্বাদ অনুভব হয় না। কলেরা কি অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধির সময় এই জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। সব সময় বৃক্ষ হইতে জল পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। তবে যতদিন শীতকাল বর্ত্তমান থাকে ততদিন জল পাওয়া যাইতে পারে।

বিধি—প্রথমতঃ যজ্ঞডুমুর-গাছের গোড়া দুই-তিন হাত পরিমাণ খনন করিয়া একটা মোটা শিকড় পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কলম-কাটার মত কাটিতে হয় এবং সন্ধ্যাকালে তন্নিম্নে একটা পাত্র স্থাপন করিয়া রাখিলে প্রাতঃকালে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি।

প্রাচীন ভারতের যন্ত্রপাতি

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে আমাদের আর্য্য পিতৃ-পুরুষগণ নিয়ত পরমার্থচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন; বাস্তবক্ষেত্রে যাহা কল্যাণকর তাহা তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। আজ য়ুরোপ আমেরিকা বিজ্ঞানক্ষেত্রে অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত করিতেছে, আর তাহাতে আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিজেদের 'হীন' 'হেয়' বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু যেদিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ছিল, সেই দিনের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে আজকাল যন্ত্রবিদ্যায় আমরা যতই অজ্ঞ হই না কেন, আমাদের আর্য্য পিতৃ-পুরুষগণ তদ্রূপ ছিলেন না। তাঁহারা যত যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এযুগে তাহা অতি বিস্ময়কর।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্যে যে-সব যন্ত্রপাতির অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই তাহার কতক এখানে দেওয়া হইল।

(১) 'তেজোময় যন্ত্র'—'তেজোময়ন্তু যদ্ যন্ত্রং তদ্ জ্বালাঃ পরিমুঞ্চতি'—তেজোময় যে যন্ত্র তাহা অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করে (কথাসরিৎসাগর)। এই যন্ত্র আধুনিক 'ইলেক্ট্রিক লাইটে'র অনুরূপ।

(২) 'বাত-যন্ত্র'—'বাতযন্ত্রং চ কুরুতে চেষ্টাগত্যাগমাদিকাঃ'—চেষ্টা, গতি, আগম ইত্যাদির কার্য্য 'বাতযন্ত্র' দ্বারা সাধিত হয়। এই 'বাতযন্ত্র' বা 'বায়ুযন্ত্র' বায়ু-পরিচালিত যান-বিশেষ হওয়াই সম্ভব। অতএব ইহা মোটরকারের অনুরূপ হইতে পারে।

(৩) 'আকাশসম্ভব যন্ত্র'—'বাক্যীকরোতি চালাপম্ যন্ত্রমাকাশসম্ভবম্'—অর্থাৎ এই যন্ত্র বাক্যকে প্রকাশ করে। (কথাসরিৎসাগর)। ইহা আধুনিক ফনোগ্রাফের তুল্য।

(৪) 'বিমানযন্ত্রে'র উল্লেখ 'কথাসরিৎসাগরে' আছে। এই 'বিমানযন্ত্র' ব্যোমযান বা এরোপ্লেন। 'বিমানযন্ত্রের' গতি পাঁচ হইতে আট শো যোজন। ইহাতে কীলক সংলগ্ন থাকিত।

(৫) আজকাল আমেরিকায় এক যন্ত্রের সাহায্যে ইট-পাথরের বাড়ী সমগ্রটি একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়। ইহাকে 'বাড়ী বহনের যন্ত্র' বলে—ইংরেজীতে Hydraulic Machine। প্রাচীনভারতে সম্ভবতঃ এইরকম যন্ত্র ছিল। ময়দানব কর্ত্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরের যে সভামণ্ডপ প্রস্তুত হয় তাহা স্থানান্তরে বহন করা চলিত। (মহাভারত—সভাপর্ব্ব)।

(৬) 'আগ্নেয়াস্ত্র' বা বন্দুক-কামানের চলনও

প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' হইতে ইহা জানা যায়। এই দুই মহাকাব্যে লিখিত 'শতঘ্নী' অস্ত্র—যাহা একবার নিক্ষিপ্ত হইলে শত লোকের প্রাণ হরণ করে—তাহা আধুনিক কামান ব্যতীত আর কিছু নয়। 'মহাভারত' পাঠে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যরা বারুদ ব্যবহারে সুপটু ছিলেন। বারুদকে আগ্নেয় ঔষধ বলিত।

ঐতিহাসিক যুগেও আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময়ে আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময় এখানে বন্দুক-কামানের প্রচলন ছিল। তাহার প্রমাণ, থেমিষ্টিয়স ও ফিলষ্ট্রেটসের বিবরণ। তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"হিন্দুরা স্বর্গের বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিত।" আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার গুরু এরিষ্টটলকে লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষের যুদ্ধে আমার সৈন্যের উপর ভীষণ আগুন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল।" গ্রীকরা বন্দুক কামান ইত্যাদি ব্যবহারে অজ্ঞ ছিল, অতএব তাহাদের এইসব বৃত্তান্ত কিম্ভূতকিমাকার—কিন্তু এইসব হইতে প্রমাণ হয় যে তৎকালে আগ্নেয়াস্ত্র সুপ্রচলিত ছিল। ইতিহাস-ক্ষেত্রে পণ্ডিতপ্রবর এল্‌ফিন্‌ষ্টোনেরও মত এই।

(৭) অধুনা, বিজ্ঞানবিষয়ে আমরা যতই অজ্ঞ হই না কেন, আমাদের আর্য্য পিতৃ-পুরুষগণ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা (research) ও পরীক্ষায় (experiment) ব্যাপৃত থাকিতেন। চরক, কণাদ, চক্রপাণি, প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ উত্তাপ আলোক ও শব্দ সম্বন্ধে বহু উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহাদের পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রস্তুত ব্যাপারে তাঁহারা কিরূপ অগ্রণী ছিলেন তাহা পূজ্যপাদ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন। আচার্য্য মহাশয় রসায়ন (Chemistry) শাস্ত্রে তাঁহাদের অপরিসীম পাণ্ডিত্য লোকগোচর করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুরা practical experiment দ্বারা বিজ্ঞান শিখাইতেন ইহা টুণ্ড্‌কনাথ বলিয়াছিলেন। আর experiment দ্বারা বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা আজ উপলব্ধি করিতেছি।

অরুণ দত্ত।

দুপুরের মেঘ

দুপুরের মেঘহীন
আকাশেতে একদিন
একাকী ভাসিতেছিল একখানি মেঘ,
একেবারে আন্‌মনে
আকাশের এককোণে,
বরফের রাশি যেন—নাই গতি-বেগ!
একেবারে সোজাসুজি
আমি ভাবিলাম, বুঝি
মেঘেদের দেশে ওটা কুঁড়েদের সেরা,
তাড়াতাড়ি নাই কিছু
খালি প'ড়ে থাকে পিছু
চিরকাল টেনে চলে জীবনের জের!!

তার পর যবে ধীরে
পছিম গগন-তীরে
সন্ধ্যা নামিল আসি ছড়ায়ে হিরণ,
আঁখি তুলে চেয়ে দেখি,
দুপুরের মেঘ—এ কি!
সারা গায়ে ফেটে পড়ে সোনার কিরণ!
অবাক্ হইয়া থাকি,
দেখে' জুড়াইল আঁখি,
বুঝিলাম সব কথা যেন এতখনে,
বুঝিলাম কি আশাতে
দুপুরের এই তাতে
মেঘটুকু পড়েছিল আকাশের কোণে!

"বনফুল"।

বুদ্ধির মাপকাঠি

পূর্ব্বেকার প্রবন্ধে পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুর জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। প্রশ্নগুলির দ্বারা কি প্রকারে পরীক্ষা হইবে তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। অন্য অন্য বয়সের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উল্লেখ করিবার আগে একটু কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি; তাহা এই।- প্রশ্ন বলিবার দোষে, অনেক সময় সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং পরীক্ষ্যমাণ বালকবালিকা প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে কি না—তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।

কতকগুলি প্রশ্ন এমন যে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবার ইচ্ছা পরীক্ষকের মনে উদিত হইতে পারে; কিন্তু পরীক্ষক যত সহিষ্ণু হইবেন, ততই সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন। উত্তরগুলি শুনিবার সময় কোন মত প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ ইহাতে শিশু ভীত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিনের উদ্ভাবিত মাপকাঠি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আজ প্রায় বারো বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার ফলে মাপকাঠি বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন ভারতবর্ষীয় বালকবালিকাদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরীক্ষক যদি মনে করেন যে বালক আন্দাজে উত্তর দিতেছে তাহা হইলে একটু জেরা করিয়া দেখিবেন।

৬ বৎসর বয়সের প্রশ্ন—

(১) তোমার ডান হাত কোনটি? বাম চোখ কই? তোমার ডান কানটা ধর ত।

(২) [দ্বিপদ বিড়াল, একচক্ষু মানুষ, বা এতদনুরূপ অঙ্গহীন জন্তুর ছবি শিশুর সম্মুখে রাখিয়া] বল ত এ ছবিতে কি ভুল আছে? (অন্ততঃ চারিখানি ছবি দেখাইতে হইবে; ইহাদের তিনখানির সম্বন্ধে উত্তর ঠিক হওয়া চাই।)

(৩) (তেরটি পয়সা বা অন্য-কিছু শিশুর হাতে দিয়া) গুনে' বলত কটি আছে।

(৪) (ক) স্কুলে যাবো-যাবো, কর্‌ছো, এমন সময় বৃষ্টি নেমে গেল; তখন তুমি কি কর্‌বে?

(খ) তোমাদের বাড়ীতে আগুন লেগে গেলে তুমি কি কর?

(গ) মনে কর তোমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে ষ্টেশন আছে। তুমি রেলগাড়ী চড়ে তোমার মামার বাড়ী যাবে মনে করেছ। তুমি ষ্টেশনে পৌঁছিলে, আর গাড়ী ছেড়ে দিলে। তখন তুমি কি কর্‌বে?

(৫) (একটি টাকা, একটি আধুলী, একটি দুয়ানি দেখাইয়া) বল ত কোনটা কি? কোনটার দাম বেশী?

(৬) বল দেখি——

(ক) 'বাড়ীতে এক কাণ্ড হয়েছে। একটা বিড়াল জানালা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দুধ খেয়ে পালিয়েছে।'

(খ) 'মেসো-মশায়ের ঘোড়া-গাড়ী আছে। আমরা রোজ গাড়ী চড়ে বেড়াতে যাই।'

(গ) 'আমি মেলা দেখ্‌তে যাব; আমার ছাতা চাদর নিয়ে এস।'

মন্তব্য:—

(১) প্রথম প্রশ্নে বাম দক্ষিণ জ্ঞান জন্মিয়াছে কি না দেখা হইতেছে। অধিকাংশ শিশুই খুব কম বয়সে ডান হাত বাম হাত চিনিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জগতে এমন অনেক শিশুও আছে যাহারা ছয়বৎসর বয়সেও ডানদিক বামদিক বুঝিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে-শিশু 'উঁচু নীচু' বা 'সামনে পিছনে' কথার মানে বুঝিতে পারে নাই, সে ডানদিক বামদিকও চিনিতে পারে নাই। এখানে ভাবিবার কথা আছে। কেন এমন হয়? 'ডানদিক বাঁদিক' বুঝিবার আগে 'সাম্‌নে-পিছনে', 'উপর-নীচ', কথার মানে বুঝাইবার জন্য প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য আছে?

(২) ইহাতে ছবির 'খুঁৎ' বাহির করিতে বলা হইতেছে। বাস্তবিক ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে শিশুর স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা জন্মিয়াছে কি না তাহা দেখা। মনে করুন, ছবিতে একটি দ্বিপদ বিড়াল আছে। ছবি দেখিয়া শিশুর বলিতে পারা চাই যে—বিড়ালটির

ছুটি পা নাই। এখন এই সামান্য ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে শিশুকে কতগুলি মানসিক ক্রিয়া করিতে হইবে দেখুন। প্রথমতঃ মনে মনে একটি বিড়ালের সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে হইবে; অথবা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে 'বিড়ালত্বের' ধারণার উদ্রেক করিতে হইবে। পরে ছবির বিভিন্ন অংশের অনুভূতিগুলিকে একত্র করিয়া যে আকৃতির ধারণা হইবে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত 'বিড়ালত্বের' ধারণার তুলনা করিতে হইবে। অন্যান্য ছবিগুলিতেও ঠিক এইরূপ মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবে। ফলতঃ এই প্রশ্নের দ্বারা মনের তিনটি শক্তির পরীক্ষা হইতেছে; (১) উদ্বোধনী শক্তি (Power of reviving an image); (২) বিশ্লেষণের শক্তি ও সংশ্লেষণের শক্তি (Powers of analysis and synthesis)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-শিশু বিড়ালের অঙ্গহীন ছবি দেখা সত্ত্বেও বিড়ালকে চিনিতে পারে, সেও অনেক সময় ছবির বিড়ালটির যে ছুটি পা নাই তা দেখিতে পায় না, অর্থাৎ সে মনে স্বাধীন চিন্তা উদ্রেক করিতে পারে না।

(৩) এই প্রশ্নে সংখ্যা জ্ঞানের পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। যে শিশু ছয় বৎসর বয়সেও তের পর্য্যন্ত গণনা করিতে শিখে নাই, তাহাকে নির্বোধ মনে করা যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে অধিকাংশ অতিনির্ব্বোধ শিশু (Idiot) কস্মিন্ কালেও গণনা করিতে শিখে না।

(৪) এই প্রশ্নগুলিতে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ক্ষমতার পরীক্ষা হইতেছে। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইসকল প্রশ্নের উত্তরে শিশু কি বলে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যেমন (ক)-প্রশ্নের (অর্থাৎ স্কুল যাবে যাবে মনে করছ এমন সময় জল নেমে গেলে কি করবে?) উত্তরে কোন শিশু বলে (১) বাড়ীতে থাকবো, (২) কেউবা বলে দৌড়বো; কিন্তু অল্প সংখ্যক শিশুই উত্তর করে যে 'ছাতা নিয়ে যাব'। (খ)-প্রশ্নের উত্তরগুলি আরও চমৎকার:— প্রশ্নটি হচ্চে—বাড়ীতে আগুন লাগলে কি করবে? উত্তরগুলি এইরূপ—(১) বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব, (২) আবার বাড়ী তৈরী করাবো, (৩) মামার বাড়ী গিয়ে থাকবো, (৪) আবার যাতে আগুন না লাগে তা করবো। ইত্যাদি। অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে খুব কম শিশুই বলে—চীৎকার করে লোক জড় করবো, বা দমকলের অফিসে খবর দেবো বা জল এনে আগুন নিবাবো। আবার কেউ বলে—জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়বো। শিশু যদি বাস্তবিক বুদ্ধিমান হয়, তাহার অন্ততঃ বলা উচিত যে কাপড়চোপড় বইপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। যে শিশু বলিবে—পয়সা কড়ি আর যত পারি দামী জিনিষ নিয়ে বেরিয়ে যাব, তার পর চীৎকার ক'রে লোক জড় করবো, ইত্যাদি—তাহাকে নিশ্চিতই সুবিবেচক শিশু বলা যাইবে।

(৫) আশা করা যায় ছয় বৎসরের শিশু টাকা আধুলি প্রভৃতির মূল্য জানে। যে শিশু তাহা না জানিয়াছে তাহাকে নির্বোধ মনে করা উচিত।

(৬) এই প্রশ্নে স্মরণশক্তির পরীক্ষা করা যাইতেছে। শিশু কতকগুলি সংবদ্ধ শব্দ একবার শুনিয়া, মনে রাখিতে পারিতেছে কি না, তাহারই পরীক্ষা হইতেছে।

৭ বৎসর বয়সের প্রশ্ন:—

(১) তোমার ডানহাতে কটি আঙুল? বামহাতে কয়টি? দু হাতে কটি? (না গুনিয়া বলা চাই।)

(২) [ক্রমান্বয়ে তিনখানি ছবি দেখাইয়া) এই ছবিতে কি কি দেখিতে পাও?

(৩) প্রথমে শুন, তার পরে বল—

(ক) ৩—১—৫—৯—৪

(খ) ২—৮—৬—৫—৩

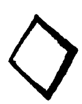
(গ) ৯—১—৪—৭—৫

(৪) তোমার জুতার ফিতেটা ঠিক ক'রে বাঁধ দেখি।

(৫) বল দেখি—(ক) মাছি আর প্রজাপতিতে কি কি প্রভেদ।

(খ) পাথর আর ডিমে কি কি প্রভেদ।

(গ) কাঠ আর কাঁচে কি তফাৎ।



(৪) [একটি—রুইতনের টেক্কা দেখাইয়া] এমনি একটি আঁক।

মন্তব্য :—

(১) দু হাতে কয়টি আঙুল আছে তাহা না গুনিয়া বলিতে পারা নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে সাত বৎসর বয়সের সকল শিশুর পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত।

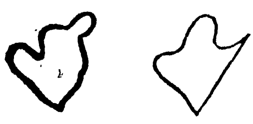
(২) ছবি দেখিয়া তাহার বর্ণনা করায় শিশুর ভাষা-পরিচয়ের পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। কল্পনাশক্তিরও পরীক্ষা হইতেছে।

(৩) ৪—৭—১—২—৯—৫ একবার মাত্র শুনিয়া আবৃত্তি করানর উদ্দেশ্য স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা।

(৪) জুতার ফিতা বাঁধা সাতবৎসরের শিশুর পক্ষে অসাধ্য নয়। যে শিশু তাহা পারে না, হয় সে নির্ব্বোধ, নয় সে অতি আদুরে। যে-সকল শিশু জুতা ব্যবহার করে না, (যেমন পল্লীগ্রামের শিশু) তাহাকে অন্য প্রকারের প্রশ্ন করিতে হইবে, যথা—একটি 'ঘর-গিরে' দাও ত। 'ঘর-গিরে' জিনিষটি পল্লী শিশুর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বা অসাধ্য হওয়া উচিত নয়।

(৫) 'মাছি ও প্রজাপতিতে' কি কি প্রভেদ আছে? এই প্রকারের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে শিশুকে মনে মনে বস্তুগুলির ধারণা করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করিতে হইবে। এই প্রশ্নের দ্বারা মনঃসংযোগ, স্মৃতিশক্তি ও বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(৬) রুইতনের টেক্কা আঁকা খুব সহজ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু দেখিবেন শিশুর পক্ষে তাহা খুব সহজ-সাধ্য নহে। শিশুর সম্মুখে নমুনাটি রাখিয়া তাহাকে তিন বার আঁকিতে বলা হয়। তাহার অঙ্কিত টেক্কাগুলির মধ্যে কোনটি নমুনার কাছাকাছি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—অতিনির্বোধ শিশু (Idiot) এটি ভাল করিয়া আঁকিতে পারে না। একটি শিশু (যাহার



I. Q. বা বুদ্ধির অঙ্ক ৭৫) এইরূপে আঁকিয়াছিল তাহার প্রকৃত বয়স ৯⅓ বৎসর, মানসিক বয়স ৭ বৎসর।

৮ বৎসর বয়সের প্রশ্ন :—

(১) মনে কর একটা খুব বড় জমিতে তোমার হাতের সোনার আংটি হারিয়েছ। জমিটা খুব বড়, কিন্তু তার আকৃতি এই রকম [প্রায় দুই ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধের একটি বৃত্ত আঁকিয়া ও 'কখ' অংশ শিশুর সামনে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়।]



এই রকমের জমির মধ্যে থেকে খুব সহজে আংটিটি খুঁজে বের্ করতে হবে। কি রকম ভাবে জমিতে ঘুরে খুঁজ্‌বার চেষ্টা করবে, পেন্সিল দিয়ে দেখাও।

(২) ২০ থেকে ১ পর্য্যন্ত উল্টা দিকে বলিয়া যাও।

(৩) (ক) দৈবাৎ পরের জিনিষ নষ্ট ক'রে ফেলেছ। তা হলে তোমার কি করা উচিত?

(খ) পায়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছ। রাস্তায় মনে হ'ল যে দেরী হয়ে যাচ্চে। তখন তুমি কি করবে?

(গ) খেল্‌তে খেল্‌তে তোমার সাথী হঠাৎ তোমাকে মার্‌ল। তখন তুমি কি করবে?

(৪) আমি দুটি দুটি জিনিষের নাম বল্‌ছি। তুমি তাদের মধ্যে কি তফাৎ আছে বল :—

(ক) কাঠ ও কয়লা, (খ) আমড়া ও পেয়ারা, (গ) লোহা ও রূপা।

(৫) (ক) ব্যোমযান কা'কে বলে?

(খ) বাঘ বলিলে কি বুঝায়?

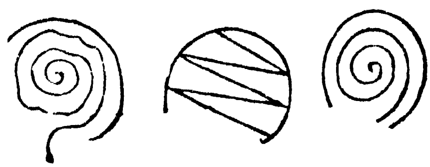
(গ) ফুট বল জিনিসটি কি?

(ঘ) সিপাই কাকে বলে?

(৬) প্রচলিত কুড়িটি কথার প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন অগ্নি=আগুন। বস্ত্র=কাপড়। ইত্যাদি।

মন্তব্য :—

(১) বৃত্তাকার ক্ষেত্রের মধ্য হইতে মার্বেল খুঁজিবার উপায়। শিশু হয় ত আঙুল বাড়াইয়া দিয়া বলিবে এই-খানে। তাহাতে চলিবে না। তাহার হাতে পেন্সিল দিয়া বলিতে হইবে, তুমি যে পথে যাইবে, তাহা পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া দাও। কোন কোন শিশু এইরূপে দেখাইতে পারে



—এই সকল প্রকারের উত্তরই গ্রাহ্য।

(২) ২০ হইতে ১ পর্য্যন্ত পিছন দিকে বলিতে পারা ৮ বৎসর বয়সের শিশুর পক্ষে শক্ত হওয়া উচিত নয়। ৭ বৎসর বয়সের শিশুরা প্রায়ই ইহা বলিতে পারে না।

(৩) (ক) এই প্রশ্নের উত্তরে শিশুর বলা চাই—যা নষ্ট করেছি, তার বদলে কিছু দেব; বা—বাবাকে ব'লে তার দাম দেওয়াব; অথবা—বলব যে হঠাৎ নষ্ট করেছি, তার জন্যে দুঃখিত, ইত্যাদি। শিশু যদি বলে 'দোষ স্বীকার করবো,' 'ক্ষমা চাইবো,' তাহা হইলে উত্তর সন্তোষজনক হইল মনে করিতে হইবে।

(খ) শিশু যদি বলে,—দেরী হ'য়ে গেলে হেড-মাষ্টারের কাছে যাব, বা—মাষ্টার মশায়কে বলবো যে দেরী হয়ে গেল, বা—ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকবো, বা একটা ওজর দেখাব, তাহা হইলেও সন্তোষজনক উত্তর হইবে না। এখানে এইরূপ উত্তরের আশা করা যাইতেছে, যথা—তাড়াতাড়ি চলবো। এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইল কি না জানিতে হইলে স্কুলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরীক্ষকের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(গ) এই প্রশ্নের উত্তরে শিশুর বলা উচিত 'খেলতে খেলতে লেগে গেছে তার দোষ কি?'

(৪) এখানে বস্তুজ্ঞানের পরীক্ষা হইতেছে। কোন্ উত্তর সন্তোষজনক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(৫) এখানে 'সংজ্ঞা' দিবার ক্ষমতার পরীক্ষা করা হইতেছে। বিশ্লেষণ করিবার শক্তির পরিচয় লওয়াই এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য। শিশুর বলা চাই 'ব্যোমযান আকাশে যাইবার একপ্রকার কল।' যদি বলে 'ব্যোমযানে ক'রে আকাশে উঠা যায়' তাহা হইলে সংজ্ঞা দেওয়া হইল না। এইরূপে শিশুর বলা চাই 'ফুটবল হচ্ছে বাতাস-ভরা চামড়ার জিনিষ—যার দ্বারা খেলা যায়।' বা এই প্রকারের অন্য কিছু।

(৬) এখানে ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। বিবেচনার সহিত শব্দগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে, শিশুর ভাষার সহিত কতখানি পরিচয় হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

৯ বৎসর বয়সের প্রশ্ন:—

(১) আজ কি বার? তারিখ কত? কোন্ মাস? কোন্ সাল?

(২) (একই আকারের একই আয়তনের পাঁচটি দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠের ভুষা, লোহাচূর্ণ, বালি, বা অন্য কিছু রাখিয়া, পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ওজনের বাক্স প্রস্তুত করা হয়। সেইগুলি শিশুর সাম্‌নে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়।) বল ত, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টি ভারী? তার পরে কোন্‌টি? তার পরে কোন্‌টি?

(৩) (ক) রথের মেলায় তুমি ১০টি পয়সা নিয়ে গিয়েছিলে। তার মধ্যে থেকে ৪ পয়সায় সন্দেশ কিনেছ; তোমার কাছে ক'টি পয়সা বাকী আছে?

(খ) ১২ পয়সার খাবার কিনে, ময়রাকে চার আনা পয়সা দিয়েছ। কত ফেরত পাবে বল দেখি?

(গ) যদি ৪ টাকায় একজোড়া কাপড় কিনে, দোকানদারকে ১০ টাকার একখানা নোট দেওয়া যায়, তা হলে কত টাকা দোকানদার ফেরত দেবে বল দেখি?

(৪) শুন—(ক) ৬—৫—২—৮, (খ) ৪, ৯, ৩, ৭, (গ) ৩, ৬, ২, ৯। উল্টা দিক থেকে বলে যাও। পরীক্ষক প্রথমে বলিবেন। শুনিবামাত্র শিশুকে উল্টা দিক হইতে বলিতে হইবে। যেমন পরীক্ষক বলিবেন—৬—৫—২—৮, শিশু বলিবে—৮—২—৫—৬। এইরূপে তিনবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) আমি তিনটি করে' কথা বলচি—তুমি শুনেই সেই তিনটি কথা দিয়ে একটি বাক্য রচনা করবে। শুন—(ক) পুকুর, মাছ, মানুষ; (খ) কাজ, টাকা, লোক; (গ) মরুভূমি, নদী, হ্রদ। [প্রত্যেকটির উত্তর এক এক মিনিটে হওয়া চাই।]

(৬) ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতে হবে। মনে কর আমি বলবো মতি। তুমি বলবে, গতি, রতি, পতি। এখন বল—(ক) মণ

(খ) ভয়

(গ) বীর

মন্তব্যঃ—(১) ৯ বৎসর বয়সের বালকের পক্ষে বার তারিখ বলিতে পারা আশ্চর্য্যের কথা নয়; কিন্তু এমন অনেক বালক আছে যাহারা ইহাও পারে না। পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই বয়সে 'সাল'-জ্ঞান প্রায়ই হয় না। তারিখের ধারণা হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক তারিখ বলিতে যাইয়া তিন দিনের ভুল করিলেও তাহা ধর্ত্তব্য নয়।

(২) এখানে বাক্স পাঁচটির ওজন হইবে—যথাক্রমে ৩, ৬, ৯, ১২ ও ১৫ রতি। সমস্তগুলির আকৃতি একই প্রকার হইবে। তিনবার পরীক্ষা করিতে হইবে। শিশু বাক্সগুলি হাতে তুলিয়া আন্দাজে ঠিক করিবে কোন্‌টি ভারী কোন্‌টি হাল্কা। পরীক্ষক মাত্র বলিবেন—যেটি সবচেয়ে ভারী সেটি প্রথমে রাখ; তারপরে যেটি সবচেয়ে ভারী সেটিকে রাখ। কিন্তু তিনি যেন বলিবেন না 'হাতে করে তুলে দেখ, কোনটি ভারী।' কারণ শিশু কি উপায়ে 'ভারী' 'হাল্‌কা' ঠিক করে তাহা দেখাও এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে লঘুত্ব ও গুরুত্বের স্বল্প তারতম্য অনুমান করিবার শক্তির সহিত বুদ্ধিমত্তার উন্টা সম্বন্ধ আছে। আরও দেখা গিয়াছে সভ্য মানবের সহিত তুলনায় অসভ্য মানবের এই শক্তি অধিক। পাপুয়ান দ্বীপের অধিবাসী বালকদিগের এই তারতম্য উপলব্ধি করিবার শক্তি ইংরেজ বালকবালিকাদিগের শক্তির প্রায় সওয়া-গুণ। [Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits—vol, ii, part ii, 1903, page 198.]

(৩) যদি ৯ বৎসর বয়সের শিশুকে জিজ্ঞাসা করা যায়, ১০ থেকে ৪ বাদ দিলে কত থাকে? সে উত্তর ঠিকই দেয়। অথবা ৪ পয়সার জিনিষ কিনিয়া দশ পয়সার থেকে ৬ পয়সা বাঁচাইয়া আনা তাহার পক্ষে শক্ত ব্যাপার নয়। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্চে মাত্র কথাটা শুনিয়া ব্যাপারটি বুঝিয়া লইতে পারে কি না তাহাই দেখা। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে নিতান্ত নির্বোধ শিশু (Idiot) এই সামান্য দৈনিক ব্যাপারেরও অর্থ বুঝিতে পারে না। অনেকে বোধ হয় জানেন বালক হয়ত লম্বা লম্বা যোগ বিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে যোগ করিতে হইবে কি বিয়োগ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া না যায়, সেখানেই তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(৪) এখানে স্মরণশক্তির পরীক্ষা করা হইতেছে। অন্য মন্তব্য অনাবশ্যক।

(৫) এই প্রশ্নের দ্বারা ভাষাজ্ঞানের সামান্যরূপ পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। অপরের প্রদত্ত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করাইয়া বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার রীতি প্রথমে প্রচলিত করেন মাসেলন (Masselon)। জার্ম্মান মনোবিজ্ঞানবিৎ ময়মান (Meumann) মনে করেন এটি একটি বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার সুন্দর উপায় [Zeitschrift fur Padagogische Psychologie und Experimentelle Padagogik, 1912, p. 145-63.] মনোবিজ্ঞানে Association অর্থাৎ ভাবসম্পর্ক পরীক্ষা করিবার জন্য Completion test বা পূরণ পরীক্ষা কতকটা এই ধরণের।

(৬) অনেকের মনে হইতে পারে ছন্দে ছন্দে মিলাইতে পারিলে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সন্দেহ ঘুচিবে। ছন্দে ছন্দে মিল করা মনোবিজ্ঞানের 'Constrained association' চেষ্টাকৃত সম্পর্কসাধন পরীক্ষার কতকটা অনুরূপ। একটি শব্দ উচ্চারিত হইলেই আমাদের মনে কত শব্দের আবির্ভাব হইবে। ছন্দ মিলাইতে হইলে এই আবির্ভূত শব্দসমূহের অধিকাংশকে দমন করিয়া বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন কোন পরীক্ষক এই প্রশ্নটির পরিবর্ত্তে অন্য প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা (১) বৎসরের সমস্ত মাসগুলির নাম বল; (২) (পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প কতকগুলি সাম্‌নে রাখিয়া) এটির দাম কত? ওটির দাম কত?

১০ বৎসর বয়সের প্রশ্ন—

(১) প্রচলিত ৩০টি শব্দের প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। (এই প্রশ্নে ভাষা-পরিচয়ের পরীক্ষা হইতেছে।)

(২) আমার কথাগুলি শুন। যা বল্‌চি তার মধ্যে যদি কিছু অসঙ্গত থাকে তা হ'লে তুমি বল :—

(ক) একজন ইঞ্জিন-ড্রাইভার বলেছিল যে একখানা ট্রেনে যত বেশী গাড়ী থাকবে, ট্রেন তত তাড়াতাড়ি চল্‌বে।

(খ) কাল পুলিস একটা লোকের মৃতদেহ পেয়েছিল। দেহটা একেবারে আঠারো জায়গায় কাটা ছিল। বিশ্বাস হয় যে লোকটা নিজেকে নিজেই খুন করেছে।

(গ) একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী রেল থেকে পড়ে যায়। তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নি—মাত্র ৪৮জন লোক মারা গেছে।

(ঘ) একটি লোক সাইকেল থেকে প'ড়ে গিয়ে মাথা ফেটে সঙ্গে সঙ্গে মরে গিয়েছিল। তাকে ধরাধরি ক'রে

হাস্‌পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আশা আছে সে শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।

(৩) (দুখানি সোজা ড্রয়িং দশ সেকেণ্ডের জন্য দেখাইয়া) এই ড্রয়িং দুটা বেশ করে দেখে নাও; তার প'রে না দেখে আঁক ত!

(৪) "কলিকাতা, ১৭ই মাঘ। গতরাত্রিতে সহরের মধ্যভাগে অগ্নিকাণ্ড হইয়া তিনটি বাড়ী একেবারে পুড়িয়া যায়। আগুন নিভাইতে সময় লাগিয়াছিল। পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি লোক্‌সান হইয়া গিয়াছে ও অনেক লোক গৃহহীন হইয়াছে। এক নিদ্রিত বালিকাকে বাঁচাইতে গিয়া একজন লোক সাংঘাতিক ভাবে পুড়িয়া গিয়াছে।"

উপরোক্ত অংশটি বালককে পড়িতে দিতে হইবে। নির্ভুল ভাবে পড়া চাই। পড়া হইয়া গেলে তাহাকে বলিতে হইবে—"আচ্ছা, এখন কি পড়্‌লে আমাকে বল দেখি।"

(৫) (ক) মনে কর, একজন লোকের সম্বন্ধে তোমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হচ্চে; তুমি লোকটিকে খুব ভাল ক'রে জান না। এমন জায়গায় তুমি কি কর্‌বে?

(খ) একটি খুব দর্‌কারী কাজ হাতে নেবার আগে কি করা উচিত বল দেখি?

(গ) কোন লোকের সম্বন্ধে ধারণা কর্‌তে হ'লে, সে মুখে কি বলে তার চেয়ে সে কাজে কি করে তাই দেখা উচিত। তোমার কি মনে হয় বল দেখি।

(৬) তুমি যতগুলি শব্দ (কথা) জান—বলে যাও দেখি। (তিন মিনিটে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিতে পারে তাহা দেখা চাই।)

অথবা—

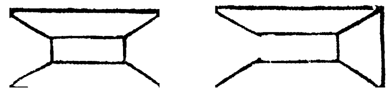
(১) শুন—৩—৭—৪—৮—৫—৯: উল্টা দিকে ব'লে যাও।

(২) শুন—৫—২—১—৭—৪—৬: উল্টা দিকে ব'লে যাও।

মন্তব্য:—

(১) এখানে অসঙ্গতি দেখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নগুলি করিবার আগে বালককে প্রশ্নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। বয়স্ক লোকদিগকে এই প্রশ্ন করিলে, কি উত্তর পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। অনেকেই না ভাবিয়া একটা উত্তর দিয়া বসিবেন। ফলতঃ এই প্রশ্নে মনোযোগ ও চিন্তাশীলতার পরীক্ষা লওয়া যাইতেছে। দশবৎসর বয়সের বালকের পক্ষে চিন্তার কথা এ প্রশ্নে নিশ্চিতই আছে।

(৩) এই প্রশ্নে মনঃসংযোগ, চাক্ষুষ স্মৃতি (Visual memory) ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা পরীক্ষা হইতেছে। ড্রয়িং দুটি কতকটা এই রকমের:—



এই দুইটিই পাশাপাশি একসঙ্গে দশ সেকেণ্ডের জন্য বালকের সম্মুখে স্থাপিত হয়। দুইটির মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিশেষ মনোযোগের সহিত না দেখিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা। পাঠক দেখিবেন ১ নম্বরটিতে ১২টি রেখা আছে, কিন্তু ২ নম্বরটিতে ১১টি রেখা আছে।

(৪) এই প্রশ্নে 'বৈষয়িক' স্মৃতির (Topical memory বা memory for ideas) পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। উদ্ধৃত অংশে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহার মধ্য হইতে কতগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে তাহাই দেখা যাইবে। বর্ত্তমান প্রশ্নে অন্ততঃ আটটি বিষয়ের উল্লেখ আছে।

(৫) এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অনাবশ্যক। পাঠক স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে বালকের চিন্তাশীলতার পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

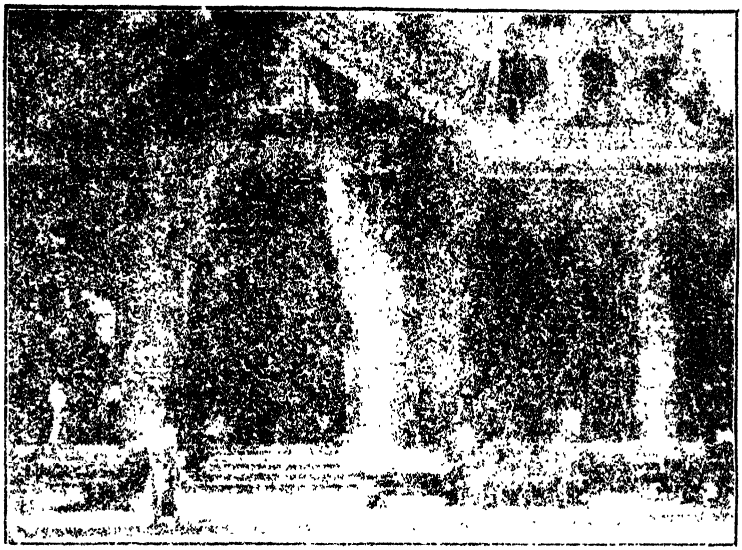
(৬) এখানে স্মৃতির পরীক্ষা হইতেছে। তিন মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ ৬০টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ পাওয়া চাই।

১১ বৎসর বয়সের জন্য কোন প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট নাই। ১২ বৎসরের জন্য যে প্রশ্নগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটি তিন মাস বয়সের পরিমাপক। অর্থাৎ যে বালক দশ বৎসরের জন্য নির্দ্ধারিত প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে পারে অধিকন্তু ১২ বৎসরের প্রশ্নের ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে পারে, তাহার মানসিক বয়স হইবে ১০ বৎসর ১৫ মাস অর্থাৎ ১১ বৎসর ৩ মাস।

শ্রীরেণুপদ কর।

সোয়েডাগোঁ প্যাগোডা

বর্ম্মা দেশের দেখ্‌বার মত একটি জিনিষ এদেশের মন্দির, বর্ম্মা ভাষায় যাকে বলে 'ফায়া'। নদীর ধারে, পাহাড়ের গায়ে, গ্রামের আশেপাশে, সহরের মাঝখানে, ঝোপ-ঝাপ নানা জায়গায় এর চূড়া চোখে পড়ে বলে' এদেশকে একবার যে দেখে তারই ভাল লাগে। আমাদের দেশের মন্দিরে যেমন কোলাহল, এখানে ঠিক তার বিপরীত। পাণ্ডা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যুদ্ধের মত বাজনার শব্দ কানে লাগে না এবং চারিদিক এতই শান্ত নিস্তব্ধ যে চূড়ার ঘণ্টার বাতাসে নড়ার মৃদু শব্দটি পর্য্যন্ত বেশ শুন্‌তে পাওয়া যায়। সারা-পৃথিবী-ঘুরে-আসা লোকের মুখেও শোনা যায় যে এই মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ এবং এর সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য শুধু বাজে লোকের নয়, শিল্পীদেরও দেখা উচিত।

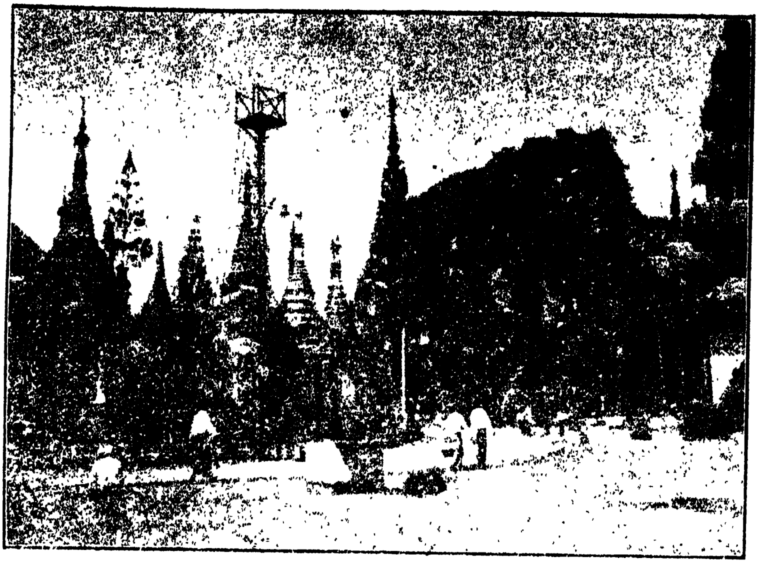


সোয়েডাগোঁ প্যাগোডার অভ্যন্তরের একটি মন্দিরের কারুকার্য্য।
মন্দিরের সম্মুখে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী।

বর্ম্মাদেশের রাজধানীর নাম য়ঙ্গুন—অর্থাৎ শত্রু আক্রমণের শেষ সীমা। য়ঙ্গুন শব্দ এখন ইংরেজদের মুখে রেঙ্গুন রূপ ধরেছে। রেঙ্গুন সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে থিন্‌গট্টরা নামে একটি পাহাড় আছে এবং এই মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে সেই পাহাড়ের উপর। সমতল ভূমি থেকে পাহাড়টি ৫০০০ ফুট উঁচু। বুদ্ধদেবের আগে আরও তিন বুদ্ধ এসেছিলেন এবং তাঁদের চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় বলে' এই পাহাড়টি এত পবিত্র। শোনা যায় বুদ্ধদেব তাঁর নিজের আটগাছি দাড়ির চুল 'তাপোসা' ও 'পালোকা' নামে দু শিষ্যকে দেন এবং এই দুই ভাইই এই পাহাড়ে এসে সেই চুলগুলি সোনার কৌটায় রেখে পাহাড়ে পুতে ফেলেন এবং তার উপর এই চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধাতুপাত্রের মধ্যে পবিত্র কিছু নিহিত করে' তার উপর চৈত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়; তাই সংস্কৃত ভাষায় চৈত্যের এক নাম ধাতুগর্ভ। ধাতুগর্ভ শব্দ অপভ্রংশ হয়ে হয় দাগোবা। দাগোবা শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে প্যাগোডা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এখন প্যাগোডা মানে মন্দিরই বুঝায়। এ দেশের সমস্ত মন্দির-গুলির মধ্যে এই মন্দিরটি বিশেষ বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ এবং এটি এত পবিত্র যে হাজার হাজার যাত্রী বছরে বছরে শ্যাম চীন জাপান কোরিয়া নানা দেশ থেকে শুধু তীর্থ কর্‌তে আসে।

মন্দিরটি আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া, সেজন্য এর নাম সোয়ে ডাগো বা স্বর্ণ-মন্দির। সকালে সূর্য্যের সাদা আলো এবং সন্ধ্যায় লালচে রোদ্দুর এসে চারিদিকের দৃশ্যটি সুন্দর অপরূপ করে' তোলে। মন্দিরটি সহর থেকে অল্প দূরে। যাত্রীরা ক্রমেই যাতায়াত করে—সহর থেকে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত ট্রাম যাতায়াত করে এবং রোজকার যাত্রী কম করেও প্রায় ৪।৫ হাজার। সমস্ত মন্দিরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং প্রবেশের জন্য চারদিকে চারটি কারুকার্য্য-করা দ্বার বা তোরণ আছে। দক্ষিণদিকেরটিই বিশেষ প্রশস্ত ও সুন্দর, কারণ ট্রাম থেকে যাত্রীরা এই দ্বার দিয়েই

প্রবেশ করে। তোরণের ছুই পাশে ছুটি প্রকাণ্ড সিংহ-মূর্ত্তি দ্বার-রক্ষক স্বরূপে স্থাপিত, এবং এ কাজের ভার সিংহের পাবার একটি গল্প আছে। একবার একজন-রাজার মেয়ে চুরি যায় কিন্তু সেই মেয়েকে উদ্ধার করতে কেউই পারে নি - সিংহের দ্বারা সেই কাজ হয়েছিল বলে' দ্বার-রক্ষার ভারসিংহই পায়। সমস্ত মন্দিরের দ্বারের পাশে এই মূর্ত্তি দেখা যায়, কারণ সিংহকে ভূত প্রেত অপদেবতা সবাই ভয় করে, সে ওখানে থাকার ফলে মন্দিরের মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারে না। ছুটি মূর্ত্তির একটির জিহ্বা নির্গত হয়ে আছে, কিন্তু আর-একটির নাই; তার কারণ বোধ হয় পুরুষ আর স্ত্রীর পার্থক্য। ইহার পরই পাহাড়-কাটা সিঁড়ি বরাবর উপরে উঠেছে, তার উপর খিলান-করা ছাঁত। সিঁড়ির পাশে পাশে যাত্রীদের বস্‌বার ব্যবস্থা এবং ধাপে ধাপে দোকান; দেয়ালে খিলানে নানা কারুকার্য্য কিম্বা চিত্রাবলী। সাজ-গোজ করে' এদেশের মেয়েরা দোকানে বসে' থাকে। ভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় বিদেশী যাত্রীদের মাঝে মাঝে ডাক দেয়। দোকানে ফুল ফল ধূপ ধুনা পূজার সব জিনিষই পাওয়া যায়। এ ছাড়া দর্শক ও যাত্রীদের জন্যে বুদ্ধের মূর্ত্তি, ঘণ্টা ইত্যাদি নানা জিনিষই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মন্দির ছাড়া বর্ম্মাদেশে আর যাকিছু দেখ্‌বার আছে সবই এখানে এই সিঁড়ির ছুপাশে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বর্ম্মীদের পোষাক 'লুঙ্গী' এবং 'এঞ্জী'। সিল্কের লুঙ্গী এদেশের সব মেয়েরাই ব্যবহার করে কিন্তু গায়ের জামা এঞ্জী প্রায়ই কাপাস-সূতার তৈরি। ফুল এরা খুবই ভালবাসে। তাদের সাজ-পোষাকের জন্যে দোকানের নানা জিনিষের সাথে বসে' থাকায় তাদের ভারি সুন্দর দেখায় এবং সবাই দেখে আনন্দ পায়।



সোয়েডাগোঁ প্যাগোডার প্রাঙ্গণের একদিক—প্রাঙ্গণেও বসিয়া লোকে উপাসনা করে।

উপরে উঠার পরই সাম্‌নে একটি মন্দির। ভিতরে নানা-রকমের বুদ্ধের মূর্ত্তি। ছোট বড়, পাথরের পিতলের, শান্তমূর্ত্তি বুদ্ধ বসে আছেন এবং হাতের ভঙ্গি দেখে মনে হয় শিষ্যদের কি বল্‌ছেন। এগুলি ছাড়া আরও অনেক হাজার হাজার মূর্ত্তি আছে, তবে কেবল বুদ্ধের ছাড়া অন্য কোন মূর্ত্তি বিশেষ দেখা যায় না।

মন্দিরের গড়ন ঠিক ঘণ্টার মতন—তলার দিক গোল এবং বরাবর সরু হয়ে উপরে উঠেছে। এরই চারি-পাশে কেবল ছোট বড় নানা মন্দির ঘেরা। এরই পরে একটি গোল রাস্তা—যাত্রীরা ঘুরে ঘুরে দেখ্‌বে বলে' সমস্ত পথ মার্ব্বেল পাথরে তৈরী; রোদের সময় পথ গরম হয়ে যায়, সেজন্য মাঝে একটি দড়ির চেটাই-মত ফেলা আছে; মাঝে মাঝে একটি করে টীন বসান থাকে—থুতু ও উচ্ছিষ্ট ফেল্‌বার জন্যে।

মন্দিরটি উঁচু ৩৭০ ফুট এবং মাথার উপরে একটি সোনার ছাতি আছে। বর্ম্মাভাষায় ছাতিকে বলে 'ঠি' এবং এই 'ঠি'টি মান্দালয়ের রাজা মিণ্ডনুমিন্‌ একটি মেলার সময়ে মন্দিরকে দান করেন। ছাতিটি খুব ছোট নয়; তার আগাগোড়া সোনার হীরে মুক্তা ইত্যাদি দামী পাথর ও ধাতু দিয়ে তৈরী এবং শোনা যায় এটির দাম প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা। সমস্ত মন্দিরটি ইলেকট্রিক

আলোয় ভরা এবং রাত্রে আলোর মালাগুলি মন্দিরের সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। রাত্রের অন্ধকারে ঐ আলো বহুদূর থেকে দেখা যায় এবং এটি দেখ্‌লে রাস্তা বা দিক ভুল হয় না।

এদেশের ধারণা যে নূতন মন্দির না করলে পুণ্য হয় না, পুরাণ মন্দির সংস্কার করলে তাতে কোন লাভ নেই—এই ধারণার জন্যে এই মন্দিরের আকৃতি এত বড় হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন এত মন্দির তৈরী হতে আরম্ভ হল যে আর মোটে জায়গা থাকে না, কিন্তু কতকগুলি লোকের পরামর্শে সেটি এখন বন্ধ হয়েছে। চারিদিকে মন্দিরের ছড়াছড়ি এবং বুদ্ধের নানা মূর্ত্তিই চারিদিকে, কোথাও বসে আছেন, কোথাও শুয়ে আছেন, কোথাও আবার না শোওয়া না বসা অবস্থায়। এইসব মন্দিরের মধ্যে একটি চীনে মন্দির আছে, তা-ছাড়া শান্ মন্দির এবং অন্য নানা মন্দিরই দেখবার আছে এবং সবগুলির কথা একসাথে বলাও কঠিন।

এদেশে পূজার হাঙ্গামা খুবই কম—লোকেরা আসে ফুল ধূপ-ধূনা বাতি নিয়ে এবং যার যেখানে ইচ্ছে সেই-খানেই বসে' আরাধনা করে' বাতি জ্বেলে দেয়। মেয়ে পুরুষ সবাই পাশাপাশি বসে' যায় এবং রাস্তার আশে-পাশে আবার অনেকে বসে' স্তব পাঠ করে—পাশের লোকের চলা-ফেরার দিকে গ্রাহ্য না করে।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মূল কথা; তাই মন্দিরের মধ্যে সব জানোয়ারই নিরুপদ্রবে বাস করে—তাদের তাড়ায় না কেউ। এক-এক মন্দিরে পায়রার দল বাস করে। কুকুরের রাজত্ব মন্দিরের মধ্যে—ঠাকুরের সাম্‌নে থেকে খাবার খেয়ে যায়, কিন্তু তবু তাদের কেউ কিছু বলে না। জন্তুদের কোন কষ্ট নেই এখানে।

মন্দিরের মধ্যে দেখ্‌বার আর-একটি জিনিষ হচ্ছে একটি ঘণ্টা—এ রকম ঘণ্টা অনেকেই দেখেননি। এটি ওজনে ১১৫৮ মণ ভারী। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা থারা-ওয়াডি (Tharrawady) এই মন্দিরকে এই ঘণ্টাটি দান করেন। যারা মন্দিরে যায় সবাই একবার করে' ঘণ্টা বাজিয়ে আসে, প্রবাদ যে বিদেশীরা বাজালে আবার তাদের এ দেশে আস্‌তে হয়; অনেকে বলেন প্রমাণ



সোয়েডাগোঁ প্যাগোডার প্রধান তোরণ।

পেয়েছেন। ঘণ্টাটির নানা গল্প আছে; এক-একটি মন্দিরের কারুকার্য্য আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম ও প্রচুর—সবই কাঠের এবং রং করা সোনালীতে। কাঠের কাজ এত সুন্দর যে যতবার দেখা যায় ততবারই দেখার তৃপ্তি হয় না।

বছর-খানেক আগে এ মন্দিরের নিয়ম ছিল যে-সাহেব ছাড়া অন্য সবাইকে জুতা খুলে যেতে হবে। ফরসা রং এবং বিলাতী পোষাক থাক্‌লেই সব বিদেশীই সাহেব হয়ে যেতেন। কিন্তু সে নিয়মের অদলবদল হয়েছে। জুতা সকলেরই নিষেধ, তবে শাসনকর্ত্তাদের আদেশ নিয়ে সামরিক কাজে কেবল ইংরেজ সৈনিক যেতে পারে—অবশ্য এই নিয়ে চারিদিকে খুবই গোলমাল চল্‌ছে। কর্ণেল ওয়েজউড্ এখানে এসে খালি-পায়ে যাতায়াতের পর থেকেই এই গোলমালের সূত্রপাত।

জুতা পায়ে দিয়ে যাওয়া নিষেধ, সবাইকে বাধ্য হয়ে জুতা হাতে নিয়ে ঘুরতে হয় এবং এ-দেশবাসীরা সব সময়ই কাঠের জুতা পরে' যায়। মন্দিরের সৌন্দর্য্য যত দেখা যায় কিছুতেই অতৃপ্তি হয় না এবং বিরক্তি আসে না এবং দেখার পর বাইরে এলে মনে হয় যেন স্বপ্নরাজ্য থেকে ঘুরে এলুম।

সুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

(চিত্রগুলি শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক গৃহীত।)

তাডিঙ্গো পোয়ে

(উপবাস-পারণার মহোৎসব)

বর্ম্মার রাজধানী য়াঙ্গুন (রেঙ্গুন) শহরের সবচেয়ে উঁচু টিলার মাথায় সবচেয়ে বড় মানুষ প্রভু বুদ্ধদেবের কেশচৈত্য ঘিরে শোয়ে ডার্গ ফায়া (সোনাডাঙার মন্দির)।

শারদ শুক্লপক্ষ। যে মহৎ সন্ন্যাসীর ত্যাগের মহিমায় জগৎ সমুজ্জ্বল, তাঁর সম্মানের জন্য এই নির্ম্মল শুক্ল-পক্ষে তাঁর ভক্তদেরও ত্যাগ অভ্যাস করতে হয় এক-বেলা খেয়ে থেকে অথবা হপ্তায় হপ্তায় তাডিন বা উপোষ করে'। এই উপোষথ ব্রত পালনের সময় নিত্য নিরন্তর কত উপাসক উপাসিকা ক্রমাগত স্রোতের মতন ফায়াতে আসে বুদ্ধদেবকে ফুল ধূপ বাতি দিয়ে পূজা করতে। যে মহা সন্ন্যাসীর মন ছিল ফুলের মতন কোমল সুন্দর পবিত্র, যাঁর অন্তর জগতের দুঃখে দগ্ধ হয়েও ধূপের মতন সুগন্ধ ও বাতির মতন আলো বিতরণ করে' গেছে, তাঁর পূজার প্রকরণ শুধু তাঁর পায়ের কাছে সুন্দর শৃঙ্খলায় ফুলদানীতে ফুলের তোড়া সাজিয়ে রাখা, ধূপকাঠি আর বাতি সারি দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া।

পাহাড়ের মাথায় মন্দিরে ওঠ্‌বার সিঁড়ি উঠেছে ধাপে ধাপে, থাকে থাকে, ছাত-ঢাকা দীর্ঘ তোরণের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে। সিঁড়ির দুধারি চাতালে চাতালে পাতা আছে ফুল ধূপ বাতি প্রভৃতি পূজার উপকরণের দোকান। দোকানে দোকানে বসে' আছে শুচিবেশা ও শুচিস্মিতা সুন্দরী দোকানী—ফুলের পশরার পাশে ফুলের মতন, জনস্রোতের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় পুষ্প-মঞ্জরী-জড়িত শুভ্র শুক্ল ফেনপুঞ্জের মতন। দোকানীদের পরণে রঙিন রেশমী ফুলকাটা ধূপছায়া ময়ূরকণ্ঠী 'লোউঙ্গি' (লুঙ্গি), গায়ে সদ্য ধোপার পাটভাঙা অমল শুভ্র 'এইঙ্গি' বা জামা, গলায় জড়ানো রঙিন রেশমী 'পাওয়া' বা উত্তরীয়; তাদের মাথার তেলোয় এলো চুলের বিঁড়ে খোঁপায় গোঁজা আছে একগুচ্ছ ফুল, তাদের মুখে মাখানো আছে তানেখা আর চন্দন, আর ঠোঁটের উপর মাখানো আছে ভুবন-ভুলানো মিষ্ট হাসির এতটুকু একটু ক্ষীণ রেখা—নির্ম্মল স্বচ্ছ গগনের গায়ে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মতন। তাই এখন তাদের আর পান্‌দে (ফুলওয়ালী) কেউ বলে না, তাদের শোয়ে-দে (সোনাওয়ালী) বলে' পরিচয় দ্যায়।

উপাসক-উপাসিকারা আসছে দলে দলে কাতারে কাতারে; উপরে উঠ্‌ছে সিঁড়ির ধাপের পরে ধাপের উপর পা রেখে রেখে,—জনস্রোতের আন্দোলন ঢেউ খেলিয়ে ক্রমাগত চলেছে। যাত্রীদের হাতে হাতে ঝুলছে ফা-না (চটি-জুতা) আর বাঁশের চোঙার মতন বড় বড় সলেই (চুরুট); কারো হাতে আছে ঠি বা ছাতা, আর কারো হাতে আছে সোনা-রূপার জরির কাজকরা 'এই' —শানদের তৈরি থলি।

পূজারী-পূজারিণীরা সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে ফেলে উপরে উঠ্‌ছে, আর সিঁড়ির চাতালের দোকান থেকে রূপসী তরুণী দোকানীরা মিহি গলায় মিষ্টি কথায় আদর করে' তাদের ডাক্‌ছে—লা বা, দি সাঁই লা বা, ফা-না ঠা বা, থানা ঠাঁই বা, কোঁন্ সা বা, পী ওয়ে বা। যাত্রীদের মধ্যে ভারতবাসী লোক দেখ্‌লে এই আহ্বানের অনুবাদ করে' ভাঙা-ভাঙা আধ-আধ হিন্দি কথায় থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে পরদেশী ভাষায় সুখস্থ-

বুলি মনে করে' করে' মিষ্টিসুর টেনে টেনে ডাক্‌ছে—বাবু, আও না, ই দোকানমে আও না, জুতা রাখো, বৈঠো, পান খাও, ফুল লেও। যাত্রীদের মধ্যে যার যেখানে মন টান্‌ছে সে সেই দোকানে জুতো রেখে ফুল বাতি ধূপকাঠি কিন্‌ছে প্রভু বুদ্ধদেবকে উপহার দেবে বলে'।

মঙ্‌ ওঙ্‌ ফে দূরের দেহাতী শহর ইন্‌সিন থেকে ভোর বেলাই রওনা হয়ে পড়েছে শহরের ফায়াতে পোয়ে বা উৎসব দেখ্‌বার জন্যে। সে শহরে এসে এক রাস্তার ফুটপাথের উপর পাতা খাবারের দোকানের সাম্‌নে উবু হয়ে বসে' একটা চীনে-মাটির পেয়ালায়



খাবারের দোকানে মঙ্‌ ওঙ্‌ ফে।

করে' একটা এনামেলের চামচে দিয়ে খানিকটা চাউ-চাউ অর্থাৎ সেমুইএর ঝোল, একটু ভাত আর খানিকটা শুঁট্‌কি মাছের তর্‌কারী ভাপি খেয়ে নিয়েছে, ফায়াতে তার কত দেরী হবে কে জানে? সে খুব দামী নতুন রেশমী লোউঙ্গি পরেছে, গেরুয়া রঙের খদ্দরের নতুন কোরা এইঙ্গি গায়ে দিয়েছে, সুন্দর গোলাপী রঙের রেশমী 'গাউং-পাওয়া' বা রুমাল-পাগ্‌ড়ী মাথায় বেঁধেছে, একটা নতুন 'ঠি' বা ছাতা আর একজোড়া বাহারে 'ফানা' চটিজুতাও কিনেছে—একেবারে সম্পূর্ণ উৎসব-বেশ। গরিব মানুষ সে; কিন্তু তাই বলে' উৎসবকে সে ত অবহেলা কর্‌তে পারে না,—তার সমস্ত পুঁজি খরচ হয়েও কিছু ধার হয়েছে, তা হোক,—সে দেবতার পূজা কর্‌তে চলেছে, যথাসাধ্য সজ্জা তার কর্‌তেই হবে যে।

সে চলেছে মন্দিরের পথে। কিন্তু চোখ তার ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে সারা পথের উপর দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে চলেছে, যেন পথের ধূলোতে তার বিশেষ দামী কিছু হারিয়ে গেছে, তাই খুঁজ্‌ছে। সে মন্দিরের তোরণের সাম্‌নে ট্রাম থেকে নাম্‌ল। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে সে জুতো খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিলে। তারপর একবার পিছনে পাশে সমুখে জনতার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে সিঁড়ি উঠ্‌তে লাগ্‌ল—তখনো তার দৃষ্টি চকিত, কাকে যেন খুঁজ্‌তে ব্যস্ত।

সিঁড়ির প্রথম কয়েক ধাপ উপরেই প্রথম চাতালে দাঁড়িয়ে কটি তন্বী তরুণী রূপসী রূপার সুন্দর কাজকরা ফুলকাটা বড় বড় ভিক্ষাভাজন নিয়ে যাত্রীদের সাম্‌নে ধরে' নাচাচ্ছে, আর তাতে ভিক্ষা-পাওয়া টাকা-পয়সাগুলি উছ্‌লে উছ্‌লে ঝন্‌ ঝন্‌ করে' বাজ্‌ছে। মঙ্‌ ওঙ্‌ ফে সেই সুন্দরীদের সাম্‌নে এসে থমকে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেকের মুখের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে—সুন্দরীদের মাথায় গোঁজা পুষ্প-মঞ্জরীগুলি কপালের উপর দিয়ে গালের পাশে ঝুলে পড়েছে সুন্দরীদের পুষ্পাধরের স্মিতহাসিটুকু উঁকি মেরে দেখে শিখে নেবার জন্যে; সুন্দরীদের মণিবন্ধে ডায়মনকাটা সোনার চুড়ি হাতের নাচের তালে তালে নূপুর বাজিয়ে নাচ্‌ছে; তাদের হীরের দুল আর হীরের বোতাম জ্বল্‌জ্বল্‌ করে' দুল্‌ছে; তাদের চরণ-কমলে রূপার খাদ দেওয়া সোনার মল রূপের রঙের অঙ্গ হয়ে মিশে থেকে, থেকে থেকে চিক্‌চিকিয়ে উঠ্‌ছে। মঙ্‌ ওঙ্‌ ফে যখন দেখ্‌লে সে যাকে খুঁজ্‌ছে সে এই সুন্দরীদের মধ্যে নেই, তখন সে এক

রূপসীর রূপার পাত্রে একটা আনি ফেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চল্‌ল—চোখের তার খুঁজে ফেরার বিরাম ছিল না।

পথের ধারে ধারে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা কাঠের উপর গালার রং করা হাঁড়ীর আকারের ভিক্ষাভাজন পেতে বসে' রয়েছে, আর অতি মৃদুস্বরে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চাইছে—দয়া উদ্রেকের জন্যে উৎকট চেষ্টা তাদের নেই। কাজেই মঙ্‌ ওঙ্‌ ফের দৃষ্টি তাদের দিকে নাম্‌ল না;—যে বিপুল জনস্রোত নিঃশব্দে নীরবে নেমে আস্‌ছে তাদেরই ভিড়ের ভিতর ওঙ্‌ ফের দৃষ্টি গিয়েছে হারিয়ে।

ওঙ্‌ ফে সিঁড়ি উঠে চলেছে। ফুলের দোকানীদের মিহি গলার মিঠা কথার আমন্ত্রণ ক্রমাগত কানে আস্‌ছে—লা বা, দি সাঁই লা বা, ফা-না ঠা বা, থানা ঠাঁই বা, কোঁন্‌ সা বা, পাঁ ওয়ে বা।

ওঙ্‌ ফে দোকানে দোকানে চোখ বুলিয়েই চলে' চলেছে, থাম্‌বার কোনো লক্ষণ নেই। দোকানে দোকানে কত ফুল—জলের স্থলের, জড় জীবন্ত; কত রকমের বাতি—বাঁশের মোটা লাঠির মতন থেকে খোকার কোড়ে আঙুলের মতন পর্য্যন্ত, তাও আবার কত আকারের, কত রঙের—শাদা লাল নীল হল্‌দে। ওঙ্‌ ফের এসব কিছুর দিকেই লক্ষ্য নেই; সে জুতো ছাতা হাতে ঝুলিয়ে চলেছে ত চলেছেই, কোনো দোকান কি দোকানীই তার চোখে ধর্‌ছে না, যার জিম্মায় সে জুতা ছাতা গচ্ছিত রাখ্‌তে রাজি হতে পারে।

ওঙ্‌ ফে একেবারে উপর চাতালে উঠে গেল। তবে কি ও জুতো ছাতা হাতে ঝুলিয়েই মন্দিরে যাবে? অনেকে ত যাচ্ছেও—মন্দিরে জুতো পায়ে দিয়ে যাওয়াই নিষেধ, হাতে নিয়ে যেতে বাধা নেই। হঠাৎ ওঙ্‌ ফে শুন্‌তে পেলে বড় মিহি গলার ভারি মিষ্টি মোলায়েম ডাক—লা বা, দি সাঁই পা বা, ফা-না ঠা বা, থানা ঠাঁই বা, কোঁন্‌ সা বা, পাঁ ওয়ে বা.....

ওঙ্‌ ফে ফিরে চাইতেই যার সঙ্গে দৃষ্টি মিল্‌ল, তার তের্ছা টানা চোখ দুটি বেশ আবেশভরা, মুখখানি তার কমনীয়, তনুলতা তার বাসন্তী ব্রততীর মতন যৌবনের পূর্ণতায় নিটোল ঢলঢল; তার মুখের হাসি আর চোখের চাহনি তার দোকানের পসরার ফুলের চেয়েও সুন্দর, তার গায়ের গড়ন আর রং তার দোকানের মোমবাতির বলনি ও লাবণ্যকেও হার মানিয়েছে। তার মাথার তেলোয় একরাশ কালো চুলের বিঁড়ে খোঁপা—যেন শাদা মার্ব্বেল-পাথরের পাহাড়ের মাথায় নিকষ-কালো মেঘ জমেছে; শাদা বকফুলের মতন তার দুটি কানের উপর দু-বিন্দু শিশিরের মতন হীরের টব জ্বলজ্বল কর্‌ছে; তার বুকের পাশে পাঁজরের গায়ে জামার বোতামে হীরে ঝল্‌কাচ্ছে; বিকাশোন্মুখ শ্বেতপদ্মের কলির মতন পা দুখানি সে পিছন পানে মুড়ে রেখে বসে' আছে, তাতে রূপার খাদ দেওয়া সোনার মল চন্দ্রের চারিদিকে প্রভামণ্ডলের মতন সুন্দর দেখাচ্ছে; তার পরণে ময়ূরকণ্ঠী ফুলকাটা লুঙ্গি, তার এইঞ্জি জামা শারদজ্যোৎস্নার মতন অমল শুভ্র, জামার ভাঁজের দাগগুলি এখনো ভাঙেনি; চাঁপার কলির মতন আঙুল দিয়ে ফুল তুলে তুলে সে কাঠির গায়ে সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে তোড়া গড়্‌ছিল; তাকে দেখে মঙ্‌ ওঙ্‌ ফের মনে হল যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিয়ে মাজা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা আকাশ থেকে ফুলের লোভে ফুলের বনে খসে' পড়েছে। ওঙ্‌ ফের সন্ধানী চোখ ক্ষণেকের জন্য নিজের কাজ ভুলে ফুলওয়ালীর দিকেই মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতন ঝুঁকে পড়্‌ল ওঙ্‌ ফে তার দোকানে ঢুকে একটু হেসে বল্‌লে—ভাগ্যিস আগেই আর-কোথাও জুতো ছাতা রেখে ফেলিনি, ত হলে ত আফ্‌শোষের শেষ থাক্‌ত না!

ফুলওয়ালী খিলখিল করে' হেসে উঠ্‌ল—যেন একছড় মুক্তার মালা হঠাৎ ছিঁড়ে ঝরঝর করে' মুক্তাগুলি ছড়িয়ে পড়্‌ল, যেন একসারি জলভরা রূপার বাটিতে কে জলতরঙ্গ বাজিয়ে গেল; সে ত শুধু হাসি নয়, সে যেন রূপসাগরে কলকল্লোল!

ওঙ্‌ ফে দোকানের বেঞ্চির তলায় জুতো রেখে ছাতা কোথায় রাখ্‌বে খুঁজ্‌ছে, ফুলওয়ালী পাপ্‌ড়িমেলা পদ্মের মত হাতখানি বাড়িয়ে বল্‌লে—ছাতা আমার হাতে দাও।

হাতে হাতে ছাতা দিতে নিতে দুজনের আঙুলে আঙুল একটু ঠেক্‌ল। ফুলওয়ালীর তের্ছা চোখ আর-একটু বেঁকে গেল চোরা কটাক্ষে, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠ্‌ল একটু হাসি

রেখা ফুলের বুকে মধুবিন্দুর মতন। ফুলওয়ালী মধুমাখা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল—কি ফুল দেবো, কত্তকের ?

ওঙ্ ফে হেসে বললে—মা পান (শ্রীমতী ফুল) নিজে যে ফুল বেছে দেবে সেই ফুলেই আমার পূজা সার্থক হবে।

ফুলওয়ালীর কানের আর গালের পাশটা একটু বেশী লাল হয়ে উঠ্‌ল পূর্ব্বগগনে অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাসের মতন। ফুলওয়ালী তার হাসির মতন সুন্দর আর তার স্পর্শের মতন সরস কোমল কতকগুলি ফুল তুলে হাসি মাখিয়ে ওঙ ফের হাতে দিলে। আবার তাদের আঙুলে আঙুল ঠেক্‌ল।

ওঙ্ ফে হেসে বললে—তোমারি করকমলে বাঁধা ফুলের তোড়া না দিলে যে আমার পূজার অঙ্গহানি হবে মা পান।

ফুলওয়ালী আবার খিলখিল করে' হেসে উঠ্‌ল তার সেই মধুর শীতল সরবতী হাসি। সে একটি ফুলের তোড়া তুলে ওঙ্ ফের হাতে দিলে।

ওঙ্ ফে ফুল নিয়ে মন্দিরের মধ্যে চলে' গেল। তার দিকে চেয়ে চেয়ে ফুলওয়ালীর বুক ঠেলে কেন একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

ওঙ্ ফে মন্দিরের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার সন্ধানী চোখের দৃষ্টি একবার ডাইনে বাঁয়ে বুলিয়ে কাকে খুঁজে নিলে। আধ মাইল জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড উঠান। তার মাঝখানে আকাশস্পর্শী উচ্চচূড় চৈত্য সোনার রঙে মণ্ডিত; চৈত্য ঘিরে কত ভক্তের উৎসর্গ-করা কত মন্দির—ছোট বড়, কারুকার্য্যে খচিত, ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত; সেইসব মন্দিরে মন্দিরে শুভ্র মর্ম্মরের অথবা মাটির উপর সোনা লেপা কত বুদ্ধমূর্ত্তি—রাজবেশী বুদ্ধ, ভিক্ষু বুদ্ধ, বোধিলব্ধ বুদ্ধ,—কোথাও তিনি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট, কোথাও বা বরদ মুদ্রায় আসীন, কোথাও বুদ্ধদেব তাঁর পঞ্চ শিষ্যদের কাছে ধর্ম্ম-প্রচারে রত, কোথাও তাঁর শায়িত মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে বিষণ্ণ-মুখ শিষ্যগণ কাতর দৃষ্টিতে প্রভু বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণ দেখ্‌ছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির সাম্‌নেই নানান আকারের ফুলকাটা ফুলদানীতে থরে থরে সাজানো আছে শুধু ফুল আর ফুল আর ফুল—স্থলের জলের রংবেরঙের মরশুমী ফুল—সে যেন শুধু রঙের রঙ্গভূমি; স্থানে স্থানে বাতিদানে সারি সারি বাতি জল্‌ছে দিনে রাতে সমান ভাবে; ধূনাচিতে গুচ্ছ গুচ্ছ ধূপকাঠি গন্ধ-ধোঁয়ার ধ্বজা উড়িয়ে ক্রমাগত পুড়্‌ছে। মন্দিরের সাম্‌নে এখানে-সেখানে শিশু বালিকা কিশো[রী] যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা সব বয়সের সব অবস্থার উপাসিকা হাঁটু মুড়ে বসে' জোড়হাতের মধ্যে ললিত ভঙ্গিতে ফুল ধ[রে] বুদ্ধদেবের দিকে তাকিয়ে নীরবে নিজের কথায় পূজা প্রার্থনা কর্‌ছে, অবিবাহিতা কিশোরী ও বালিকাদের মাথ[ায়] চৈত্যের মতন চূড়াবাঁধা খোঁপার নীচে থরকাটা বাবরী চু[ল] বারম্বার প্রণামে ঝালরের মতন দুল্‌ছে; কোথাও বা নে[ড়া] মাথা গেরুয়া-কাপড়ে-সর্ব্বাঙ্গঢাকা ফুঙ্গি শ্রমণ ও মেতিলা[রা] ভিক্ষুণীরা উবু হয়ে বসে' হাত জোড় করে' বিষম বেগে পা[লি] মন্ত্র আউড়ে চলেছে, আর তারা যত তাড়াতাড়ি মন্ত্র ছুটি[য়ে] হাঁপিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠ্‌ছে তত তাড়াতাড়ি তাদের কো[ন] পুণ্যলোভী ভক্ত ক্রমাগত পাখা চালিয়ে হুস্‌হুস্ ক[রে] বাতাস করে' চলেছে। মঙ্ ওঙ্ ফের উৎসুক দৃষ্টি এ[ই] সবের উপর দিয়ে একবার চকিতে বুলিয়ে এল, কিন্তু কোথ[াও] সে তার সন্ধানের ধন দেখ্‌তে পেলে না বলে' কোথাও ত[ার] দৃষ্টি লগ্ন কি মগ্ন হল না।

মঙ্ ওঙ্ ফে ফুল ধূপকাঠি আর বাতি হাতে করে' [...] মন্থর পদে উঠান প্রদক্ষিণ কর্‌তে লাগ্‌ল আর তার [...] ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে ফির্‌তে লাগ্‌ল। প্রদ[ক্ষিণ] শেষ করে' সে যে-পথে উঠানে উঠেছিল সেই তোরণপ[থের] মুখের কাছে ফিরে এল, তবু তার প্রার্থিত দেবতার [...] মিল্‌ল না, হাতের ফুল হাতেই রয়ে গেল। তখন সে [...] হাতের পূজার উপকরণ সাম্‌নের এক মন্দিরে কো[ন] মতে সাজিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এল ফু[লের] দোকানে।

মঙ্ ওঙ্ ফেকে ফির্‌তে দেখেই ফুলওয়ালীর সু[ন্দর] হাসি প্রবালপুটের ঢাক্‌নি খুলে মণিদর্পণে নিজের মুখের ছ[বি]খানি একবার দেখে নিল; ফুলওয়ালী তার মাথা [নেড়ে] নীরবে আবার তার দোকানের অচেনা অতিথিকে অভ্য[র্থনা] কর্‌লে।

ওঙ্ ফে এসে হতাশ হয়ে বেঞ্চির উপর এলিয়ে ব[সে] পড়্‌ল। ফুলওয়ালী ফুল বোনা ফেলে রেখে উঠ্‌ল—গা[ঢ়] রঙে ছবি আঁকা কাঠের কৌটা পানের বাটা এনে অতি[থির] সাম্‌নে রেখে হেসে বল্‌লে—কোঁন্ সা বা (পান খাও)।

ওঙ্ ফে জাঁতি তুলে সুপারি কুচোতে কুচোতে বল্‌লে

আমি হয়ত সমস্ত দিন তোমার দোকান জুড়ে বসে' জ্বালাব, —আমায় মাপ করতে হবে মা পান।

ফুলওয়ালী ফিরে গিয়ে নিজের কাজে বসতে বসতে বল্লে—সে কি কথা! আমার দোকান ত যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যেই।

ওঙ্ ফে বল্লে—আমায় হয়ত পোয়ে উৎসব-ভোর রোজই আসতে হবে, আর সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত থাকতে হবে মা পান।

ফুলওয়ালীর মুখ বসন্তাগমে বসুমতীর মতন, সূর্য্যোদয়ে পদ্মফুলের মতন, বিত্তলাভে নিঃস্ব-জনের মতন প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে সুন্দর হাসিতে তার সামনের ফুলদের লজ্জা দিয়ে বল্লে—আমার ভাগ্য ভালো, একজন বাঁধা খদ্দের জুটে গেল; বউনি যখন এম্‌নি হল, আপনার পয়ে পোয়ে-ভোর রোজকার রোজ্‌গার মন্দ হবে না।

ওঙ্ ফে বল্লে—আচ্ছা মা পান, রোজ যখন তোমার বাসায় আসা-যাওয়া করতে হবে, তখন তোমার নামটি জেনে রাখলে হয় না?

ফুলওয়ালী আয়নার মতন উজ্জ্বল শুভ্র দাঁতের উপর লাল ঠোঁটের আভা ফেলে হেসে বল্লে—আমাকে যে সুন্দর নাম তুমি দিয়েছ তার কাছেও দাঁড়াতে পারে এমন নাম ত আমার বাপ-মা আমায় দিতে পারেনি। তবে সে নাম শুনে কাজ কি? তুমি আমায় মা পান (ফুল) বলেই ডেকো।

ওঙ্ ফে হেসে বল্লে—বেশ, তাই হবে মা পান।

ফুলওয়ালী মুখ ফিরিয়ে চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত্ত ফুলের তোড়ায় সুতো জড়ালে, তারপর কাজ করতে করতেই চোখ না তুলেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—তোমাকে কি বলে' ডাকব আমি?

ওঙ্ ফে হেসে বল্লে—আমার নাম মঙ্ ছিয়ে সেয়া (হৃদয়বল্লভ)।

মা পান হাতের ফুল ফেলে চট্ করে' উঠে ব্যস্ত হয়ে আগন্তুক যাত্রীদের ডাকতে লাগল—লা বা, দি সাঁই লা বা, ফা-লা ঠা বা, খানা ঠাঁই বা, কোঁন্ সা বা, পাঁ ওয়ে বা...... বাবু আও না, ই দোকান্‌মে আও না, জুতা রাখো, বইঠো, পান খাও, ফুল লেও.........

মা পান যাত্রীদের ডাকতে ব্যাপৃত থাকলেও ক্ষণে ক্ষণে তার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠ্‌ছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার কানের হীরার দুল চুনির রং চুরি করছিল। একজন যাত্রীকে কিছু ফুল বেচে ফুলওয়ালী ফিরে এসে নিজের আসনে বসল; তার দোকানে কেউ যে আছে এমন ভাব তার মুখে কোথাও ছিল না।

ওঙ্ ফে তার ব্যাকুল দৃষ্টি পথে পেতে সমস্ত দিন সেই দোকানে বসে' রইল। দুপুর বেলা মা পান তাকে জিজ্ঞাসা করলে—নাওয়া খাওয়া কিছু করতে হবে না মঙ্ ছিয়ে সেয়া?

মঙ্ ছিয়ে সেয়া নাম সে এমন সহজে উচ্চারণ করলে যেন সেইটাই সম্বোধিতের আসল নাম, সে নামের মানে যেন ব্যবহারে লোপ পেয়ে শব্দটা শুধু লোক চেন্‌বার চিহ্ন হয়ে গেছে, সে নামের মানে যেন সে জানেই না।

ওঙ্ ফে বল্লে—স্নান আমি ভোর বেলা সেরে এসেছি, খাওয়াও পথে সেরেছিলাম। আর-একবার এই মন্দিরের এক দোকানে চুকিয়ে নেবো।

মা পান জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি কারো জন্যে অপেক্ষা করছ মঙ্ ছিয়ে সেয়া?

ওঙ্ ফে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—হ্যাঁ মা পান। একসঙ্গে কলেজে পড়্‌তাম এক বন্ধুর ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি, তাকেই আমার খুঁজতে আসা—উৎসবের ভিতর একদিন না একদিন সে ত পূজো করতে মন্দিরে আসবেই।

ও!—বলে' মা পান তার নিজের কাজে মন দিল—মন দিল ঠিক বলা চলে না, চোখ দিল, আজ তারও যেন মনের ঠিকানা মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল।

ওঙ্ ফে সমস্ত-দিন যাত্রীদের আসা-যাওয়ার পথে দৃষ্টি ফেলে হা-প্রত্যাশায় বসে' রইল, কিন্তু তার সেই সহপাঠী বন্ধুর সন্ধান সেদিন মিলল না। রাত আটটার পর যখন মন্দির একরকম জনশূন্য হয়ে এল, ফুলওয়ালী বাড়ী যাবার জন্যে ফুলের পসরা গুটিয়ে তুলতে লাগল, তখন ওঙ্ ফে বল্লে—মা পান, তোয়ামে (আজ তবে চল্লাম), আবার কাল সকালেই দেখা হবে।

মা পান নত হয়ে ফুল তুলতে তুলতে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলে, যেন বাতাস লেগে নত শাখার বড় একটি ফোটা

ফুল ছুলে উঠে ফিরে এল। তার পর সে আবার মুখ নামিয়ে কাজ গোছাবার জোগাড় কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—আচ্ছা মঙ্‌ ছি্য সেয়া। কাল তোমার আসা সার্থক হবে আশা করি।

ওঙ্‌ ফে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

ফুলওয়ালীর মুখে মাখা চন্দনপ্রলেপ রক্তের ছোপ পেয়ে গোলাপী হয়ে উঠ্‌ল।

* * * *

পরদিনও ওঙ্‌ ফের এমনি নিষ্ফলে গেল। পরদিনও, তার পরদিনও, পর পর কয়েক দিনই। কিন্তু তবু ওঙ্‌ ফের আসার বিরাম নেই, আশার ক্লান্তি নেই, প্রতীক্ষায় ক্ষান্তি নেই। সে ফুলওয়ালীর সঙ্গে কথা বলে, রসিকতা করে, বসে' বসে' কেবল সুপারি কুচোয় আর পান সাজে আর খায়; কিন্তু তার চোখ পড়ে' থাকে যাত্রীদলের পথের দিকে।

পাঁচ দিন পর পর ওঙ্‌ ফে ফুলওয়ালীর দোকানে সমস্ত দিন যাপন কর্‌লে। ফুলওয়ালীর প্রথম দিনের দেখাতেই যাকে ভাল লেগেছিল, পাঁচ দিনের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ পেয়ে সেই ভালো-লাগা ভালো-বাসায় পরিণত হয়ে উঠ্‌ছিল যেমন করে' ধীরে ধীরে ফুলের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ি মেলে সৌন্দর্য্যে সৌরভে শোভায় ভরা প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে উঠে' বুকের কৌটায় মধু সঞ্চয় করে। রাতে সে বাড়ী ফিরে যায় ওঙ্‌ ফের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে; বিছানায় শোয় সেই নেশাতেই ভোর হয়ে অচেনা আত্মীয়ের ভাবনাটুকুকে বুকে নিয়ে; ঘুমের ফাঁকে উঁকি মেরে যায় তারই কথা স্বপ্ন হয়ে। স্বপ্ন পাকা জাদুকরের মতন তাকে কখনো আশার দোলায় তুলে ফুলের ডোর ধরে' দোলায়; কখনো তাকে চাওয়ার রত্ন পাইয়ে দিয়ে ভোলায়; আবার কখনো বুকের মানিক ছিনিয়ে নিয়ে কাঁদায়। ঘুম ভাঙে তার সেই অজানার ভাবনাটাকে মনোরাজ্যের দখল ছেড়ে দিয়ে। বিছানা ছেড়েই তার ভয় হয়—আজ যদি সে না আসে! তাড়াতাড়ি সে দোকানে গিয়ে ফুলের সাজি পেতে অচেনা অতিথির অপেক্ষাতে পথ তাকিয়ে বসে' থাকে। রোজ রোজ হাজার যাত্রী তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে এসেছে গেছে, কত ক্রেতা তার দোকানে ফু[ল] কিনেছে, বিশ্রাম করেছে, পান খেয়েছে; কিন্তু কাউকে [সে] সে ভিড় থেকে আলাদা করে' দেখেনি। এই অতিথি সবা[র] থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তাকেই যে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এসে বল্‌[লে] —ভাগ্যিস অন্য দোকানে জুতো ছাতা রেখে ফেলিনি তা হলে ত আফ্‌শোষের শেষ থাক্‌ত না! সেই আগন্তুক আকস্মিক তাকে পাওয়া যে ভাগ্য বলে' মেনে তাকে একেবারে ভাগ্যবতী করে' দিয়েছে! সে যে তাকে আদর করে' নামের সেরা নাম দিয়েছে মা পান; [সে] নিজে যে হতে চেয়েছে তার কাছে মঙ্‌ ছি্য সেয়া! [সে] এসে চেয়েছিল হৃদয় জয় কর্‌তে, তার হাতে সে ফুলে[র] মতন হৃদয়খানি তুলে দিয়েছে ভাগ্য মেনে। এখন সে তা[র] মঙ্‌ ছি্য সেয়াকে দোকানে গিয়ে খেতে দ্যায় না; নিজে[র] পয়সায় খাবার কিনে এনে নিজের হাতে পরিবেষণ করে খাওয়ায়। বাছা বাছা সেরা ফুলে রোজ রোজ পূজা[র] আয়োজন সে করে' দ্যায়। ওঙ্‌ ফে তাকে ফুলের আ[র] খাবারের দাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে ফুলওয়ালী হেসে বলে—দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিতে এত ব্যস্ত কেন? অমুক মা শেষে একদিন হিসাব-নিকাশ কর্‌লেই হবে।

ওঙ্‌ ফে হেসে বলে—ধার যে বড় বেশী হয়ে জমে উঠ্‌ছে মা পান! ঋণ ভারী হয়ে উঠ্‌লে কি শুধ্‌[তে] পারব?

ফুলওয়ালী তার সুন্দর মুখে আরো সুন্দর হাসি মাখিয়ে বলে না হয় ঋণী হয়েই বাঁধা থাক্‌বে মঙ্‌ ছি্য সেয়া!

এমনি রহস্য-কৌতুকের কথার ফাঁকে ফুলওয়ালীর মনের কথা ছদ্মবেশে উঁকি মেরে যায়।

সেদিনও সূর্য্যোদয়ের মতন যথাসময়ে মঙ্‌ ওঙ্‌ ফে এসে হাজির হল, আর অমনি সূর্য্যোদয়ে পদ্মফুলের মতন পুষ্পপেলব ফুলওয়ালীর সর্ব্বাঙ্গে হর্ষসুখের পুলকপ্রভা ছড়িয়ে পড়্‌ল। ফুলওয়ালী লজ্জাজড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে —মায়েলা (কেমন আছ)?

ওঙ্‌ ফে পথের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলে —মা বায়ে (আমি ভালো আছি)।

ফুলওয়ালী তখন মনে মনে প্রার্থনা কর্‌ল—ভগবান বুদ্ধদেবের পূজার ফুল বেচে যা পুণ্য অর্জ্জন করেছি তার

সমস্তর বিনিময়ে আমি এই চাই ভগবান, মঙ্ ছিা সেয়া যেন তার হারানো বন্ধুর সন্ধান না পায়! বন্ধুর দেখা পেলেই ত তার প্রতীক্ষা কর্‌বার আর দরকার থাক্‌বে না।

কিন্তু ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌লেন না। সেদিন বিকেলবেলা অপেক্ষমান ওঙ্ ফের মুখ অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, তার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আন্দোলিত হয়ে গেল, তার দৃষ্টি কৃতার্থ হয়ে যেন একেবারে গলে' গিয়ে কার পায়ের তলায় পথের ধূলায় গড়িয়ে লুটিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

ওঙ ফের মুখে অকস্মাৎ পুলকসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তার মনের বিশ্ব-বিস্মরণ অবস্থা দেখে ফুলওয়ালী তার দৃষ্টির পথ ধরে' দৃষ্টি পাঠিয়ে দেখ্‌লে সিঁড়িতে উঠ্‌ছে সঞ্চারিণী পল্লবিনী পুষ্পিতা লতার মতন একটি তন্বী তরুণী— তার পরণে নীল লুঙ্গি, সাগরজলের একটি উর্ম্মির মতন তার সিঁড়ি ওঠার তালে তালে দুই হাঁটুর ক্রমান্বয় বিক্ষেপে উঠ্‌ছে পড়্‌ছে দোল খাচ্ছে; তার গায়ে সুশুভ্র এইঙ্গি জামা ঘন নীল সাগর-তরঙ্গের মাথায় ফেন-পুঞ্জের মতন দেখাচ্ছিল; আর তার গলায় জড়ানো ফিন্‌ফিনে পাতলা নীল রেশমী 'পাওয়া' ওড়্‌নাখানি যেন স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশের একটুখানি টুক্‌রা; তার উপরে শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতন সুন্দর মুখখানি, তার গালের পাশে একগুচ্ছ পুষ্পমঞ্জরী ঝুলে পড়েছে—চন্দ্র থেকে চন্দ্ররশ্মির ঝারার মতন। তাকে দেখেই যে ওঙ্ ফের এই আনন্দ তা তার দৃষ্টির অভিসার দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তরুণীটির সঙ্গে ছিল একজন বর্ষীয়ান ও বর্ষীয়সী, তার বাপ মা বোধ হয়। তারা সঙ্গে থাকাতেই তরুণীর কাছে ওঙ্ ফে ছুটে যেতে পার্‌ছিল না এও বেশ বোঝা গেল,—তরুণীর সঙ্গে ওঙ্ ফের মিলনের মধ্যে ঐ বুড়ো-বুড়ী যে বাধা হয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। যাত্রী তিনজন উপরে উঠে আস্‌তেই ওঙ্ ফে দোকানের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল; অমনি তাকে দেখে বুড়োবুড়ীর মুখ হয়ে গেল গম্ভীর, আর তরুণীর মুখ হয়ে উঠ্‌ল হর্ষ-বিকশিত, কিন্তু বাপ-মার বিরাগের ভয়ে সেই আনন্দের ব্যগ্র উচ্ছ্বাস তাকে তখনই দমন কর্‌তে হল, আনন্দকে বন্দী করে' সঙ্কোচের অবরোধে লজ্জার জালের আড়ালে সরিয়ে ফেল্‌তে সে বাধ্য হল। ওঙ্ ফের সাম্‌নে বুড়োবুড়ী আস্‌তেই সে তাদের নমস্কার কর্‌লে; তারা গম্ভীর মুখ বিরক্ত করে' কেবল একটু মাথা নুইয়ে এগিয়ে গেল; কেবল সেই তরুণী বাপ-মার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ঠিতমুখে এগিয়ে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে গেল, আর সেই মুখে ফুটে উঠ্‌ল একটু কুণ্ঠিত সরম-সঙ্কুচিত হাসি বাপ-মার অবিনীত রূঢ়তার দোষ ঢাক্‌তে প্রয়াসী আর তাদের দোষের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

তারা এগিয়ে যেতেই ওঙ্ ফে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ফুলওয়ালীকে বল্‌লে—মা পান, শিগ্‌গির আমায় কিছু ফুল বাতি ধূপকাঠি দাও।

কথা বলেই তার মুখ ফিরে গেল গম্যমানা তরুণীর দিকে।

ফুলওয়ালী একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌লে—কি ফুল দেবো মঙ্ ছিা সেয়া?

ওঙ্ ফে মুখ না ফিরিয়েই হাত বাড়িয়ে ব্যস্ত স্বরে বল্‌লে—যা হয় দাও মা পান, যা হয় কিছু দাও—শিগ্‌গির—শিগ্‌গির……

ওঙ্ ফের এমন ত্বরা, যেন এক নিমেষের বিলম্বে তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

ফুলওয়ালী কিছু ফুল, এক বাণ্ডিল বাতি আর এক গোছা ধূপকাঠি তার হাতে তুলে দিতেই ওঙ্ ফে এক রকম ছুটে চলে' গেল যে পথে সেই তরুণী সন্ধ্যার শেষ আলোটুকুর মতন ভিড়ের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ফুল দিয়েই ফুলওয়ালীর মনে হল এ ফুল সে তার ছিা সেয়াকে যে দিলে, এ ত ঠিক বুদ্ধদেবের পূজার জন্য নয়, এ পূজা যে তারই মতন আর-একজন রমণীরই! আর সেই ফুল তারই হৃদয়বল্লভ ছিা সেয়ার হাতে তুলে দিতে হল তাকেই!

খানিকক্ষণ পরেই তরুণীরা ফিরে নেমে চলে' গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওঙ্ ফেও সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত গিয়ে তরুণীকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে ফুলওয়ালীর দোকানে ঢুক্‌ল—আবেগে তখন তার নিশ্বাস হয়েছে ঘন, আর তার মুখ হয়েছে রাঙা!

ফুলওয়ালী মধুর করে' হাস্‌তে আর উদাসীনের স্বর

অনুকরণ করতে চেষ্টা করে' জিজ্ঞাসা করলে—তোমার সহপাঠী বন্ধুর দেখা কি মিলল মঙ্ ছি সেয়া ?

ফুলওয়ালীর চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখের হাসি হয়ে গেল বড় ম্লান ও করুণ, আর গলার আওয়াজে বেজে উঠল মর্ম্মবেঁধা ব্যথা !

ওঙ্ ফে তখন নিজের আবেগের আবেশে ছিল অভিভূত, সে ফুলওয়ালীর হিংসাক্লিষ্ট মুখের দিকে লক্ষ্য না করেই বললে—হ্যাঁ মা পান, হ্যাঁ, বুদ্ধদেবের দয়ায় আর তোমার কল্যাণে !

ফুলওয়ালী গলা-রূপার ঝর্ণা ঝরার শব্দ করে' হেসে উঠে বললে—আমার কল্যাণে ! আমার কল্যাণেই বটে !

ওঙ্ ফের তন্ময় হর্ষবিভোর চিত্ত ফুলওয়ালীর কথার মাঝের শ্লেষটুকু ধরতে পারল না। সেও হাসিমুখে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

ফুলওয়ালী জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বন্ধুর নাম কি মঙ্ ছি সেয়া ?

ওঙ্ ফে হেসে বললে—আমি তাকে মা মিয়া ইয়েন বলে' ডাকি তার নীল পোষাকের জন্যে। দেখলে ত তুমি মা পান, নীল পোষাকে ওকে কী সুন্দর মানায়—যেন একখানি নীলা হীরা !—নয় কি ? কিন্তু ওর মা-বাপের দেওয়া নামটিও নিন্দার নয়—মা হ্লা ইয়েন—অপরূপ নিখুঁত সুন্দরী সে ত বটেই—তুমি ত দেখলে মা পান !......

নিজের প্রণয়িনীর কথা বলতে পাওয়ার পরম আনন্দে ওঙ্ ফে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, তার মুখের কথা যেন কখনো ফুরোবে না এমনি তার অবিশ্রাম প্রবাহ। তার নিশ্বাস নেবার ফাঁক পেয়ে ফুলওয়ালী জিজ্ঞাসা করলে—ওর সঙ্গেই একসঙ্গে কলেজে পড়তে বুঝি ?

ওঙ ফে ছাতা নেবার জন্যে ফুলওয়ালীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—হাঁ মা পান।

ফুলওয়ালী ওঙ্ ফের হাতে হাতে ছাতা দিতে দিতে নিজের ছাতিফাটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললে—ওকেই বিয়ে করবে ত মঙ্ ছি সেয়া ?

ওঙ্ ফে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমাদের দুজনের ত তাই ইচ্ছে ; কিন্তু বিষম বাধা জুটেছে আমাদের দুজনেরই বাপ-মারা, বাবায় বাবায় শত্রুতা, সুতরাং মায়ে মায়ে ঝগড়া ; তাঁরা চান না তাঁদের ছেলেমেয়ের ভাব।

ফুলওয়ালীর বাসী ফুলের মতন বিমর্ষ বিষণ্ণ মুখখানি আশার সরস আভাস পেয়ে আবার তাজা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু তবু ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বন্ধুর ত তুমি দেখা পেলে মঙ্ ছি সেয়া, আর কাল থেকে ত তুমি আসবে না ?

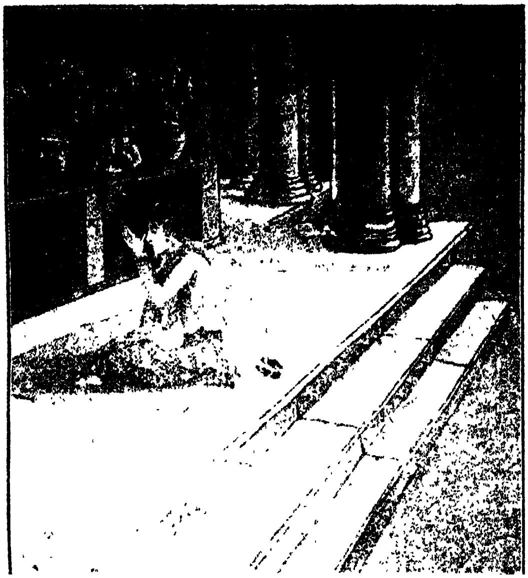
ওঙ্ ফে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ফুলওয়ালীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে' গেল—রোজ আসব মা পান, রোজ আসব—যতদিন পোয়ে উৎসবে যাত্রীর যাতায়াত এমনি ভাবে ভিড় করে' চলবে। আমি তাকে ইসারা করে' বলে' দিয়েছি—আমি রোজ আসি, আমি রোজ আসব, শুধু তাকে দূর থেকে একটু দেখতে পেতে।

ফুলওয়ালীর মনটা হিংসায় হতাশায় আনন্দে আশায় বিমথিত হতে লাগল। ওঙ্ ফে যখন বললে—তবে আজ রাতের মতন চললাম মা পান।—তখন ফুলওয়ালী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—অন্ধকার রাত্রির অবসানে সূর্য্যোদয়ের মতন তোমার আগমন মঙ্গলময় হবে।

ওঙ্ ফে মনে করলে ফুলওয়ালী তারই মন্দিরে আসার উদ্দেশ্যের সফলতা কামনা করে' আশীর্ব্বাদ করলে, ফুলওয়ালীর কথার বুকের গোপন অর্থটুকু সে ধরতে পারল না। সে মুখ ফিরিয়ে মাথা নেড়ে হাসি দিয়ে কেবল জানিয়ে গেল—তথাস্তু।

ওঙ্ ফে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভিড়ের ভিতর হারিয়ে যেতেই ফুলওয়ালী কেমন ক্ষিপ্তের মতন নিজের সাজি থেকে কতকগুলো ফুল টেনে নিয়ে দোকান ফেলে রেখে ছুটে চলে' গেল মন্দিরের মধ্যে। সে একপাশের এক নির্জ্জন জায়গায় এক বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে' হাত জোড় করে' পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে কাতরমনে নিবেদন করতে লাগল—এ কি করলে ভগবান বুদ্ধ, এ কি করলে ! একের সুখ কেড়ে না নিয়ে তুমি কি অপরকে সুখ দিতে পার না প্রভু, তোমার ভাণ্ডারে কি উদ্বৃত্ত সম্পত্তির এতই অভাব হে ভগবান !

এই কথা বলতে বলতেই ফুলওয়ালীর মনে পড়ে' গেল—বুদ্ধদেব সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষুক, তাঁর প্রাণের প্রেম ও



উপাসিকা মা পান।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

মৈত্রী তিনি বিশ্বে বিলিয়ে নিঃস্ব। তাই একের পাত্র থেকে ঢেলে নিয়ে অপরের পাত্র পূর্ণ করা ছাড়া তাঁর আর উপায় নেই। তখন সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—ওগো মহাভিখারী, এ কি তোমার কঠিন নিষ্ঠুর খেলা—তোমার সাথে বিশ্ব-হৃদয়কেও ভিক্ষাব্রতে দীক্ষিত করা। হে ঠাকুর, আমার ভিক্ষাভাজন ত তুমি অমৃত দিয়ে পূর্ণ করে' দিচ্ছিলে; হঠাৎ আবার তাকে শূন্য করে' অপরের পাত্রে সেই অমৃত ঢেলে দেবার কি এমন তাড়াতাড়ি দরকার পড়্‌ল তোমার? এখন এইটুকু করুণা কোরো ঠাকুর, এই কোরো, তাদের দুজনেরই বাপ-মার অন্তর তোমার মৈত্রীর অমৃতে ভরে' তুলো না; তা হলে আমার শূন্য পাত্র তাদের বিদ্বেষের বিষে যে পূর্ণ হয়ে উঠবে; আর তার পরিণাম যে হবে আমার প্রণয়ের আশার প্রাণের মৃত্যু!

ফুলওয়ালীর হতাশার ভয়ের প্রণয়ের বেদনা তার চোখ ছাপিয়ে বুক ভাসিয়ে ঝরে' পড়্‌ছিল পাষাণমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের চরণতলে। এমন সময় তার পাশের দোকানের পান্‌-দে (ফুলওয়ালী) এসে তার কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে—ওলো ও ভক্তিওয়ালী, তোর পুজো হল? সব লোক যে দোকান-পাট গুটিয়ে চলে' গেল,—তুই দোকান তুল্‌বি কখন?

ফুলওয়ালী পুষ্পাঞ্জলি বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে রেখে দিয়ে প্রণাম করে' উঠে দাঁড়াল। তার থম্‌থমে মুখ দেখে তার সঙ্গিনীর ঠাট্টার কথা ঠোঁটের উপর থম্‌কে থেমে গেল। দুজনে নীরবে এল দোকান তুল্‌তে।

***

মঙ্‌-ওঙ্‌ ফের আবার সারা দিনমানের হা-প্রত্যাশা প্রতীক্ষা চল্‌তে লাগ্‌ল—তার মা মিয়া ইয়েনের আর দেখা নেই। দিন পাঁচেক পরে আবার একদিন তাদের দেখা হল। আবার সে নিরুদ্দেশ। আবার ওঙ্‌ ফের প্রত্যাশার তপস্যা চল্‌তে লাগ্‌ল।

ওঙ্‌ কে যেদিন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, সেদিন তার আনন্দতরঙ্গ ফুলওয়ালীর বক্ষ-বীণায় আঘাত করে' ব্যথার সুর বাজিয়ে যায়; আবার যেদিন ওঙ্‌ কে নিষ্ফল অপেক্ষায় বিষণ্ণ ক্ষুণ্ণ বিমর্ষ হয়, সেদিন ফুলওয়ালীর মুখ আশার আলোকে পুলকিত প্রফুল্ল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এমনি বিপরীতের দ্বন্দ্বদোলায় দোল খেয়ে তাদের দুজনের দিনগুলি কাটে।

ক্রমে এল কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রি। আজ তাডিঙ্গো পোয়ে—আজ উপবাস-ব্রত উদ্‌যাপন হবে, তাডিন উপবাসের চো অর্থাৎ পারণা হবে, পূর্ণিমার পূর্ণতায় ব্রত পূর্ণ হবে। আজ মন্দিরে যাত্রী সমাগমের অন্ত নেই—জনস্রোত অবিশ্রাম বন্যা-প্লাবনে জোয়ার-ভাঁটার মতন আসা-যাওয়া কর্‌ছে। আজ রোগ-শয্যাগত ছাড়া আর-কেউ বাড়ীতে নেই। এত বড় বিপুল জনতা, কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, ব্যস্ততাবিহীন; কোথাও ঠেলাঠেলি নেই, কলহ নেই, পাওয়ার কাড়াকাড়ি নেই, ভিক্ষুকের কোলাহল নেই। মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে চূড়া পর্য্যন্ত দীপ-মালায় আলোকিত হয়েছে। কোজাগর পূর্ণিমার স্বচ্ছ নির্ম্মল জ্যোৎস্না-সাগরে দীপালীর আলোক-ধারার পুণ্য-সঙ্গম হচ্ছে,—সেই আলোক-বন্যায় ভেসে বেড়াচ্ছে অযুত নিযুত ফুলে গাঁথা দীর্ঘ একছড়া মালার মতন উৎসব-বেশে সুসজ্জিত আনন্দে পুলকিত কত শত নরনারী। মন্দির-প্রাঙ্গণ ঘিরে সারি সারি বাতি জ্বলছে, সারি সারি ফুলদানীতে



পোয়ে নাচ।

ফুলের অর্ঘ্য আজ উপ্‌চে পড়্‌ছে, থরে থরে গুচ্ছ গুচ্ছ ধূপের কাঠি প্রধূমিত হচ্ছে। স্থানে স্থানে মাদ্রাজী পুরুষেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মুল-গায়েনকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে পর্য্যায়ক্রমে নিজের দুহাতের আর দুপাশের দুইসঙ্গীর দুহাতের কাঠে কাঠে ঠুকে ঠুকে তাল রেখে কীর্ত্তন গাইছে; কোনো মন্দিরের চত্বরে গৈরিকধারী ফুঙ্গি শ্রমণেরা, কোথাও আপাদমস্তক-শুভ্রপরিচ্ছদপরিহিত গৃহী পুরুষেরা, কোথাও ভিক্ষুণীরা, কোথাও গৃহস্থ মহিলারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বসে' পালিমন্ত্র উচ্চারণ করছে আর থেকে থেকে সবাই একসঙ্গে নত হয়ে প্রণাম করছে, আবার একসঙ্গে উঠে বসে' মন্ত্র আওড়াচ্ছে; কোথাও ভোজ হচ্ছে, কোথাও ক্লান্ত যাত্রীরা বিশ্রাম করছে। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক টেরে হচ্ছে পোয়ে কা অর্থাৎ উৎসব-নৃত্য—একটা লোক ড্রাগনের মতন একটা বিকটাকার জন্তুর খোলসের মতন সর্ব্বাঙ্গ-ঢাকা মুখোস পরে' বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে' চার হাতপায়ে পশুর মতন নাচ্‌ছে; সেই নাচের তালে তালে কৃত্রিম খোলসের থাক থাক ভাঁজে ভাঁজে যে-সব আকুঞ্চন প্রসারণ হচ্ছে, তাতে সেটাকে একটা জীবন্ত জন্তুর অঙ্গ বলেই ভ্রম হচ্ছে; সেই নাচের সঙ্গে সঙ্গে বাজ্‌না বাজ্‌ছে তব্‌লার সুরতরঙ্গ—ছোট বড় নানা আকারের খুরো-দেওয়া তব্‌লা নানা সুরে বেঁধে স্বর-সপ্তক করা হয়েছে, আর রাগরাগিণীর সুরের অনুসারে সেই তব্‌লাগুলি পর্য্যায়ক্রমে পিটে পিটে একজন যন্ত্রী বিচিত্র সঙ্গীত বার করছে। আর-এক জায়গায় হচ্ছে নর্ত্তকীর নৃত্যগীত—সে যেন উল্লসিত গতিচ্ছন্দ, সে যেন তালের হিল্লোল, সে যেন স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাস, সে যেন সুসঙ্গত সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ, সে যেন ললিত লাবণ্যের প্লাবন, সে যেন চর্কী-বাজীতে প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের জ্যোতিস্ফুরণ, সে যেন রামধনুকের কোলে বিদ্যুৎবিলাস! সে নাচ অনির্ব্বচনীয় সুন্দর, ইন্দ্রজালের মতন মোহকর, মূর্চ্ছার মতন মনোহর!

গভীর নিশীথে যখন পোয়ে ভেঙে গেল, তখন ফুলওয়ালী দেখ্‌লে মা হ্লা ইয়েন খুসীভরা হাসিমুখে ফিরে গেল,—আজ সে যেন দুর্লভ প্রার্থিত বর দেবতার কাছ থেকে পেয়ে পূর্ণকাম হয়ে ফিরছে। তার পিছনে পিছনেই ফিরে এল ওও্‌ ফে—তারও মুখের ভরা হাসি তার মনের খুসীর



পোয়ে নর্ত্তকী।



ডব্ না-বাজিয়ে।

খবর প্রচার কর্‌ছিল, তার আনন্দ তার সর্ব্বাঙ্গের প্রতি-আন্দোলনে উপ্‌চে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছিল। ওঙ্‌ ফের সেই খুসীর হাসি ধারালো ছুরীর ফলার মতন ফুলওয়ালীর বুকে এসে বিঁধ্‌ল ; সমস্ত উৎসব তার কাছে ম্লান হয়ে গেল, ওঙ্‌ ফের সেই হাসি প্রলয়রাত্রির বিদ্যুৎবিকাশের মতন ফুলওয়ালীর কাছে মরণের অটুট অন্ধকারেরই পূর্ব্ব-সূচনা জানাতে লাগ্‌ল।

ওঙ্‌ ফে হাসিমুখে ফুলওয়ালীর কাছে এসে উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্‌লে—বুদ্ধদেবের দয়ায় আর তোমার কল্যাণে আজ ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেয়েছি মা পান!

ওঙ ফের সমস্ত শরীর-মনের প্রতি-পরমাণু যেন সেই আনন্দে অনুরণিত হচ্ছিল। কিন্তু ফুলওয়ালীর কানে দারুণ উপহাসের মতন ওঙ্‌ ফের কথা নির্ম্মম রকমে বাজ্‌ল—তোমার কল্যাণে তার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেয়েছি! তার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ যে ফুলওয়ালীর কত বড় বিষম অকল্যাণ তা যদি এই প্রণয়ভোলা তন্ময় লোকটি বুঝ্‌ত! ফুলওয়ালী আড়ষ্ট হয়ে বসে' রইল, কোনো কথা সে বল্‌তে পার্‌লে না। ওঙ্‌ ফে বল্‌তে লাগ্‌ল—আর কাল আস্‌ব না মা পান। আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি, এখন তোমার পাওনা তুমি চুকিয়ে নাও।

ফুলওয়ালী এবার তার স্বভাবসুন্দর মধুরস্বরে খিলখিল করে' হেসে উঠে বল্‌লে—আমার পাওনা যে অনেক জমেছে মঙ্‌ ছি সেয়া—সব কি তুমি চুকিয়ে দিতে পার্‌বে?

ওঙ্‌ ফে ফুলওয়ালীর হাসির মধ্যে কেমন একটা হতাশ ব্যথার সুর আর কথার মধ্যে গোপন অর্থের আভাস বাজতে শুনে চম্‌কে উঠে বল্‌লে—তোমার কাছে আমি অনেক ঋণী, সব শোধ কর্‌বার আমার সাধ্য নেই।

ফুলওয়ালী ফুল দিয়ে সাপ ঢাকা দেওয়ার মতন হাসি দিয়ে হতাশার ব্যথা ঢেকে বল্‌লে—তোমার সঙ্গে আর কি দেখা হবে না মঙ্‌ ছি সেয়া?

ওঙ্‌ ফে ফুলওয়ালীর এই প্রশ্নে হঠাৎ কেমন উন্মনা বিমর্ষ হয়ে গেল; পনেরো দিনের নিত্য পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ, অবিচ্ছেদ-সঙ্গলাভে প্রীতিপ্রদ এই সুন্দরী তরুণীর বিচ্ছেদ এতক্ষণে তাকে গিয়ে আঘাত কর্‌লে—তার বিবশ বিহ্বল প্রণয়মত্ত চিত্ত এতক্ষণে এই বিরহের বেদনা অনুভব কর্‌তে পার্‌ল; সে করুণ স্বরে বল্‌লে—না মা পান, তোমার সঙ্গে শিগ্‌গির হয়ত দেখা হবে না; আমরা দুজনে কোথাও দূরদেশে পালিয়ে যাব ঠিক করেছি।

ফুলওয়ালী উঠে দাঁড়িয়ে হাওয়ার মতন হাল্কা উত্তরীয়ের আঁচলখানি গলা জড়িয়ে উল্টে পিঠের দিকে ফেলে বল্‌লে—এমনি করে' পালাবে যদি তবে আমার কাছে ছি-সেয়া হয়ে কেন এসেছিলে তুমি? ফুলের মালা বলে' যা কণ্ঠে আমার জড়িয়ে দিলে, সে যে সাপ হয়ে আমার একেবারে বুকে দংশন কর্‌লে ছি-সেয়া!

ফুলওয়ালীর বেদনাতুর মুখ আর কাতর কথা দেখে শুনে ওঙ্‌ ফে ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—মাপ করো মা পান, মাপ করো। এমন যে হবে তা আগে ভাবিনি। কত যাত্রীই ত তোমার দোকানে নিত্য নিত্য আসে যায়, কাউকে ত তোমার মনে থাকে না; আমাকেও তুমি দুদিন বাদে দুঃস্বপ্নের মতন ভুলে যাবে।

ফুলওয়ালী ব্যথাভরা দৃষ্টিতে ওঙ্‌ ফের দিকে চেয়ে বল্‌লে—অন্যকে মনে থাকে না, মনে ধরে না বলে'।

ওঙ্‌ ফে সান্ত্বনার স্বরে বল্‌লে—আমাকেও তুমি ভুলে যাবে মা পান, তোমার ভয় নেই। তোমার জন্যে যে মহা সুখ আমি পেয়েছি, তাতে তুমি কখনো দুঃখী থাকবে না মা পান, প্রভু বুদ্ধ তোমাকেও সুখী কর্‌বেন।

ফুলওয়ালী কান্না-গলা স্বরে বল্‌লে—বুদ্ধদেব যে নিঃস্ব রিক্ত সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষুক; তাঁকে তাই একের কেড়ে অপরকে সুখ দিতে হয়; আমার সব সুখ কেড়ে নিয়ে তিনি তোমায় দিলেন, আর আমায় দিতে তিনি পাবেন কোথায়?

ওঙ্‌ ফে ভয় পেয়ে মিনতির স্বরে বল্‌লে—আমার এই সুখের সম্ভাবনার সূত্রপাতেই তুমি আমায় অমন করে' অভিসম্পাত কোরো না মা পান। তোমার দীর্ঘনিশ্বাস লাগ্‌লে আমার সব সুখ পুড়ে যাবে। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—তুমি সুখী হবে। তুমিও আমায় আশীর্ব্বাদ করে' বিদায় দাও—আমার বহু কষ্টে পাওয়া সুখ যেন নষ্ট না হয়।

ফুলওয়ালীর মুখে একটা হতাশার হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—তুমি ত দীর্ঘ উপবাসের পরে আজ পারণা করে' তাডিঙ্গো পোয়ের উৎসব সম্পন্ন কর্‌লে; আমারও উপবাসী অন্তরকে আজ তুমি পারণা করাও—আর কিছুক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক ছি-সেয়া।

ওঙ্‌ ফে ফুলওয়ালীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—এখনি ত মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে মা পান।

ফুলওয়ালী একটু ভেবে বল্‌লে—চলো একবার কাণ্ডজীর ধারে বেড়াতে যাই।

ওঙ্‌ ফে উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—তাই চলো মা পান, তাই চলো—জলের ধারে খোলা হাওয়ায় চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ থাক্‌লে তোমার মনের নেশার ঘোর কেটে যাবে।

ফুলওয়ালী একটু শুধু হেসে দোকানপাট ফেলে রেখে বেরিয়ে এল।

ওঙ্‌ ফে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দোকান তুল্‌লে না?

ফুলওয়ালী শুষ্ক মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে বল্‌লে—থাক্‌ পড়ে', কার জন্যে আর তুল্‌ব? ফুলের বেসাত আমার সারা হয়ে গেছে।

ওঙ্‌ ফে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফুলওয়ালীর পাশে পাশে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চল্‌ল—তার মন তখন ফুলওয়ালীর দুঃখের বোঝায় ভার হয়ে উঠেছে।

●●●



মা পান আর মঙ ওঙ্‌ কে কাণ্ডজীর ধারে বাগানের মধ্যে।



চুলের গাঁট্‌ছড়া বাঁধা।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

মন্দিরের কাছেই প্রকাণ্ড ঝিল, অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘুরে ফিরে এঁকে বেঁকে গেছে, তার পাড়ে পাড়ে বাগান, গাছের কেয়ারিতে ছবির মতন সাজানো। এ'কে বর্ম্মীরা বলে কাণ্ডজী (বড় জলা), আর-সবাই ইংরেজের কথার প্রতিধ্বনি করে' বলে রয়াল লেক।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ তরুবীথির ভিতর দিয়ে মা পান আর ওঙ্‌ কে হাত-ধরাধরি চলেছে নীরবে। তরুবিতানের পত্র-জালের ফুকোর দিয়ে ঢালা জ্যোৎস্না পথের উপর নানা আলপনায় চিতাবাঘের পরিকল্পনা এঁকেছে।

চল্‌তে চল্‌তে মা পান আর ওঙ্‌ কে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। সুরসুন্দরীদের মুখ দেখবার মুকুরের মতন সবুজ ঘাসের মখ্‌মল-মোড়া ফ্রেমে আঁটা ঝিলের জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। সমস্ত আকাশ জ্যোৎস্না-প্লাবিত হয়ে বড় একখানি শুক্তির খোলার মতন মনে হচ্ছে, আর তার কোলে পূর্ণচন্দ্র নিটোল একটি মুক্তার মতন লাবণ্যে টলটল ঢলঢল কর্‌ছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না জলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, চাঁদের ছায়া জলের তলে চকমক্ করছে; সোনার পাত-মোড়া দীপমালাজড়ানো মন্দির-চূড়ার উল্টা ছায়া নাগবালাদের জলের তলে পাতালে নাম্‌বার স্বর্ণসোপানের মতন শোভা পাচ্ছে। মৃত্যুর মতন নিঃশব্দ, নিদ্রার মতন প্রশান্ত, মূর্চ্ছার মতন স্তব্ধ, নেশার মতন আবেশভরা এই জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে তরুণ-তরুণী হাত-ধরাধরি দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

হঠাৎ ফুলওয়ালী ফিরে দাঁড়িয়ে দুই হাতে ওঙ্‌ কের দুই হাত চেপে ধরে' বলে' উঠ্‌ল—দিগ্‌নে তাডিঙ্গো মী ঠোং পোয়ে ছি-সেয়া (আজকার রজনীতে আমাদের দুজনের উপবাস-পারণার দীপালি-উৎসব ওহে হৃদয়বল্লভ)!

ওঙ্‌ কে অভিভূতের মতন স্তব্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফুলওয়ালীর আবেগদীপ্ত মুখের উপর ব্যথিত করুণ দৃষ্টি ফেলে।

ফুলওয়ালী হঠাৎ তার ডান হাতের একটি টানে মাথার খোঁপা খুলে ফেল্‌লে। অমনি তার অতিদীর্ঘ এলো

চুলের বিপুল রাশি কালো কালো সাপের মতন তার সর্বাঙ্গ ব্যেপে ছড়িয়ে পড়্‌ল তার পায়ের তলায় ধূলাটুকু মুছে নিতে। ফুলওয়ালী তার দীর্ঘ চুল দুভাগ করে' দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুই গুচ্ছে সাম্‌নে টেনে আন্‌ল, আর এক এক গুচ্ছ চুল দিয়ে ওঙ্‌ফের এক এক হাত জড়িয়ে জড়িয়ে শক্ত করে' বাঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

ওঙ্‌ফে দুঃখভরা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—এ কি হচ্ছে মা পান, এ কি খেলা তোমার?

ফুলওয়ালী উন্মত্তের মতন খিলখিল করে' হেসে' উঠ্‌ল; সে হাসি ঝর্ণা-ঝরা শব্দের মতন জলের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল; সে হাসি পাপিয়ার একটানা সুরের মতন, টিট্টিভের টিট্‌কারীর মতন আকাশ চিরে জ্যোৎস্না কাঁপিয়ে তরু-কুঞ্জের ভিতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌ল; ফুলওয়ালী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে' উঠ্‌ল—ছি্য-সেয়া, ছি্য-সেয়া, ইয়েনে নিয়া মেঙ্গলা সাঁউ মে (হৃদয়বল্লভ ওগো প্রাণপ্রিয়, আজ রজনী আমাদের বিবাহ-বাসর)!

কথা শেষ হতে না হতে ফুলওয়ালী দুই হাতে ওঙ্‌ফেকে নিবিড় অশিথিল আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরে' ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল ঝিলের জলে। চুলের গাঁটছড়া-বাঁধা আর বাহুপাশে বন্দী ওঙ্‌ফে ফুলওয়ালীর সঙ্গে সঙ্গে অতল জলে ডুবে গেল। জ্যোৎস্নাঢালা জলের তলে রূপালি চাঁদ আর সোনালি মন্দিরের ছায়ার ছবি হাজার টুক্‌রা হয়ে ভেঙে চুরে থরথর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তখনো জলের উপর ফুলওয়ালীর শেষ কথার প্রতিধ্বনি কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল—ছি্য-সেয়া ছি্য-সেয়া, ইয়েনে নিয়া মেঙ্গলা সাঁউ মে!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-পরিচয়

ভূমিকা

বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই যাহাতে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাব্য-সাহিত্য, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, সাহিত্য-সমালোচনা ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সাহিত্য বাদ দিয়াও শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক আদর্শ, রাষ্ট্রনীতি, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় আদর্শ এবং ধর্ম্ম সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধাদি নিতান্ত সামান্য নহে। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, একই বিষয় নানা বিভিন্ন সময়ে নানা বিভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য ও আলোচনা-প্রণালীর বিভিন্নতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য এরূপ সু-বিস্তৃত ও বহু-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার সমগ্র রূপটিকে উপলব্ধি করা কঠিন।

১৩০৩ সালে কাব্য-গ্রন্থাবলীর একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—অনেক লেখা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকদের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর সম্পূর্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্ম্মকথাটি পাঠকদের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতে পারে। ১৩০৩ সালের সংগ্রহে কবিতাগুলি রচনার কালক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ বহুদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহার পরে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন প্রামাণ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হইল না। কোন্ কবিতাটি কোন সময়ের লেখা তাহা জানিবার উপায় নাই; গদ্য-গ্রন্থাবলীর প্রায় কোন লেখায় কোনপ্রকার তারিখ নাই। পৌর্ব্বাপর্য্যের মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও পরিণতি আছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করা সম্বন্ধে আরও একটি গুরুতর অন্তরায় ঘটিয়াছে। নিজের লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনরূপ দয়া মায়া নাই, অতি নির্ম্মমভাবে নিজের লেখা কাটিয়া কুটিয়া বাদ দিয়াছেন। শৈশবকালের অধিকাংশ লেখা, পুনর্মুদ্রিত হয় নাই (ক)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আঠারো বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লেখা প্রায় সাত হাজার লাইন কাব্য-সাহিত্য এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে মাত্র তিন চারিশত লাইন আজকালকার প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায়। এই বয়সের গদ্য-সাহিত্য একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। কেবল শৈশব-রচনা নহে, প্রাপ্তবয়সের অনেক লেখা, বিশেষত গদ্যপ্রবন্ধ ও সমালোচনা, মাসিক পত্রিকার পাতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ লেখা সমস্ত সংগ্রহ করিলে বোধ হয় যাহা আছে তাহার উপর আরও এক-তৃতীয়াংশ হইতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্য সমগ্রভাবে আলোচনা করিতে হইলে এইসকল লেখা কোনমতেই বাদ দেওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথের মতামত লইয়া আজকাল নানাপ্রকার বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। কবির লেখার সহিত সমগ্র-ভাবে পরিচয়ের অভাবই তাহার কারণ। যেসকল লেখা খণ্ড খণ্ড আকারে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, সমগ্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে তাহাদের পরস্পর-সঙ্গতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এইজন্য কিছুকাল হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচি (Bibliography) সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি (খ)। এই সূচি-সংকলন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কালক্রমানুসারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বত্রই কবির নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার চিন্তার ধারা কিরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন দিবার চেষ্টা করিব। এখন মাত্র কবির ২২।২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আলোচনা যেমন অগ্রসর হইবে "রবীন্দ্র-পরিচয়গুচ্ছ" তেমনি বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্য্য অগ্রসর হওয়ায় ইহাতে সমালোচনার ধারাবাহিক ঐক্যসূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যক যে "রবীন্দ্র-পরিচয়" সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্ব্বাভাষ মাত্র। কবির জীবন আলোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, যদিও প্রসঙ্গ ক্রমে জীবনের কিছু কিছু ঘটনার কথা আসিয়া পড়িবে। আপাততঃ, কবির জন্ম-তারিখটি ১২৮৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে—স্মরণ রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১। শৈশবকালে দেশ-বিদেশের প্রভাব

বর্ত্তমান সংখ্যায় ১২৮৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কবির মনের উপর দেশীয় ভাব ও বিদেশীয় প্রভাব কি কি ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে তাহার পরিচয় দিব। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র কবি বারংবার উচ্চারণ করিয়াছেন। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী। শৈশবকালের কথা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এই আদর্শ সূচিত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তর কালে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র।

বাড়ির আবহাওয়া

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বাড়ীর আবহাওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশা-ভিমান স্থিরদীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিল।......আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির

(ক) বাল্যরচনায় সাধারণতঃ কোন স্বাক্ষর নাই। এইরূপ স্থলে আমি সর্ব্বত্রই রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি। কবি যে-সকল লেখা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু নিজের লেখা যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। যে লেখা তাঁহার মনে নাই সেরূপ লেখা তাঁহার কোনও বইতে স্থান পাইয়াছে কিনা ইহাই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছি।

(খ) এই সূচি পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। সূচিতে কেবল প্রকাশিত লেখার তালিকা সংগ্রহ করিতেছি। এই কার্য্যে সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অ-প্রকাশিত লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও সমালোচনার একটি স্বতন্ত্র সূচি প্রস্তুত করাও আবশ্যক।

চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের গুণগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" (১)

"ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।" বাড়ির বয়স্কদের কথা লিখিয়াছেন, "সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।……বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা, যখন গণদাদার (২) রচিত "লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে" গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত।" (৩)

বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই বাংলাসাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

"আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।" (৪) ….."ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।…বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই।…..প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়িবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার (৫) উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।" (৬)

সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চাও চলিতেছিল। একেবারে গোড়া হইতেই সংস্কৃত কাব্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার বাল্যকালেই গীতগোবিন্দখানা হাতে পড়িয়াছিল।

"বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।……জয় সম্পূর্ণও বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও ন তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগো সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।" (৭)

পণ্ডিতমহাশয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দি তিনি আমাকে অর্থ করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।" (৮)

কুমারসম্ভবও এই রকম করিয়া পড়া হইল। এইরূ খুব কম বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মনের উপর সংস্কৃতসাহিত্যে একটি ছাপ পড়িয়া গেল।

গায়ত্রী গীতা উপনিষদ

রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্র অন্তরের মে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল।

"আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিকভা গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি 'ভূর্ভুবঃ স্ব এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করি চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া ব কঠিন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষে পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে ব অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।……তা বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য্য আমি যে বয়সে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটি আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনে কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধান মেজের উপ কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চো ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহ আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না।" (৯)

রবীন্দ্রনাথের গীতা-উপনিষদের সহিত অলক্ষ্যে পরিচয়ও আরম্ভ হইল।

"ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে পারিলাম।" (১০)

বক্রোটায় "আমার শোবার ঘর ছিল একটি প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্ব্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন—জানি না কত রাত্রে—দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায়

(১) জীবনস্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৬ পৃঃ।

(২) ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা।

(৩) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, মাঘ, ৩১৫ পৃঃ।

(৪) জীবন-স্মৃতি,—প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, ৩১৪ পৃঃ।

(৫) ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৬) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, অগ্রহায়ণ, ১০৮ পৃঃ।

(৭) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, অগ্রহায়ণ, ১১৩, ১১৪ পৃঃ।

(৮) জীবন-স্মৃতি।

(৯) জীবন-স্মৃতি,—প্রবাসী, ১৩১৮, অগ্রহায়ণ, ১১৩, ১১৪ পৃঃ।

(১০) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, পৌষ, ২১০ পৃঃ।

বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।......তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্ত আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন।"

"সূর্য্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।" (১১)

এইরূপে প্রাচীন ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রভাব দশমবর্ষীয় বালকের মনে নিগূঢ়ভাবে কাজ করিতেছিল। (১২)

বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়

বাংলাভাষা চর্চ্চা ও বাংলা সাহিত্য আলোচনার সূত্রে বাংলাদেশের কথা রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে বসিয়া গিয়াছিল।

"আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্য্যে এককালে পাঁচালির দলের নায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত —আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কি বলিব। শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম 'ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন', 'প্রাণ ত অন্ত হল আমার কমল-আঁখি', 'রাঙা জবায় কি শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখ রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীর একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে' এই গানগুলিতে আমাদের আসর জমিয়া উঠিত।" (১৩)

কিন্তু কেবল পাঁচালি নয় :—

"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে ত তাহার জন্ত মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়দলের পড়ার শেষের জন্ত অপেক্ষা করা আরো বেশী দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে খুসী সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তির, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।" (১৪)

এই সময়েই বাংলাদেশের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি লোভের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম।" (১৫)

স্বাদেশিকতার নেশা

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন স্বদেশ-প্রেমের ভরপুর নেশা। তাহার মধ্যে ছেলেমানুষি যে কিছু ছিল না তাহা নয়; বস্তুত বেশির ভাগই ছিল কল্পনা আর উত্তেজনা মিশাইয়া ক্ষ্যাপামির একটা খেলা।

"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কি করিতে যাইতেছি তাহা আমার আত্মীয়েরাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশী কিছু প্রয়োজন ছিল না। ......স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্ত সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরী করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা-কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণ তেজ প্রকাশ পায়, কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশালাই তৈরী হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরান চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহার জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্য্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।" (১৬)

"খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্প বয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোন কাজের জিনিষ হইয়াছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় এক-খানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছা-টুকুরা তৈরি হইয়াছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।" (১৭)

বাল্যস্মৃতি আলোচনা করিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক কবি হাসিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষ্যাপামি তাঁহাকে কোনো বয়সেই

---

(১১) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, পৌষ, ২১২, ২১৩ পৃঃ।

(১২) কম বয়সের লেখায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সংখ্যায় এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(১৩) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, মাঘ, ৩১৩ পৃঃ।

(১৪) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, মাঘ, ৩১৫ পৃঃ।

(১৫) জীবন-স্মৃতি।

(১৬) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৩-৪১৪ পৃঃ।

(১৭) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৪ পৃঃ।

পরিত্যাগ করে নাই। "চিরকুমার সভায়" ঠাট্টার সুরে এইসকল কল্পনার কথা কবি আবার শুনাইয়াছেন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি চিরদিন অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ফল প্রায় সর্ব্বত্রই সমান হইয়াছে, ভারতসন্তানের উৎসাহের নিদর্শন স্বরূপ নহে, খরচের পরিমাণ অনুপাতে তাঁহার চেষ্টা প্রায় সর্ব্বত্রই বহুমূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার জ্যোতিদাদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, সে কথা তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও বলা যায়:—

"কিন্তু তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এইসকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন; আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্ত্তী ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।" (১৮)

রচনা-প্রকাশ

যাহা হউক্ স্বদেশপ্রীতি আর বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের দ্বারা খুব কম বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন, এই সময়ের লেখায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

"আগমনী" কবিতাটিতে তিনি বাংলাদেশের ঘরের কথা, গিরিরাজ-দুহিতা উমার গৃহাগমনের কথা গাহিয়াছেন। (১৯) "ভারতী-বন্দনা" (২০) 'হর-হৃদে কালিকা' (২১) প্রভৃতি কবিতায় মধ্যে দেশীয় ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভানুসিংহের কবিতা (২২) সমস্তই বৈষ্ণবপদাবলী অনুসরণ করিয়া রচিত।

"বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য"

প্রথম বর্ষ ভারতীতে এই নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ষোল বৎসর। জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে এই প্রথম প্রবন্ধেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের কথা দেখিতে পাই।

"ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভা পূর্ব্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম-দেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অ শীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণ-শীলতা, পূর্ব্বদেশের কল্পনা ও পশ্চি কার্য্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠি হইবে! ....ইউরোপের শিল্পবিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলি আমাদের জ্ঞানের কি উন্নতি হইবে! এইসকল কল্পনা করিলে আ ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতার অস্পষ্ট ছায়া দেখি পাই।" (২৩)

বিশ্বভারতীর পূর্ব্বাভাস

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার আদর্শ যে দিগ্বিজয় বা সাম্রা বিস্তার নহে, তাহা যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীনতার আ প্রচার এবং মঙ্গল আদর্শ স্থাপনা করা, তাহা তিনি তখ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন।

"মনে হয়, ঐ সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কো অধীনতায় ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনি পাইব, তখন, স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহা অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতা পর্য্যন্ত অধীনভাবে অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রু মোচন করিয়া আসিয়া আমরা সেই কাতর জাতির মর্ম্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যেসকল দেশ নিদ্রিত আ তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞ দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শি করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে এই দে বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে।" (২৪)

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিতে না যে তাঁহার বাল্যকালের কল্পনা ক্রমে বিশ্বভারতী র ধারণ করিয়া সত্য হইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

অনুকরণকে তিনি চিরদিন ঘৃণা করিয়াছেন, কি পাশ্চাত্যসভ্যতার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করি দ্বিধা বোধ করেন নাই। বিদেশী বলিয়া কাহাকেও তি দূরে ঠেলিয়া ফেলেন নাই—বিদেশী অধ্যাপক ও পরদে বন্ধুর প্রভাব তাঁহার জীবনকে গভীরভাবে স্প করিয়াছে। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধকেই তিনি ব বলিয়া জানিয়াছেন, সেখানে দেশী-বিলাতি ভাব কখ আনেন নাই।

বিদেশী অধ্যাপক

বিদেশী অধ্যাপকদের একটি পবিত্রস্মৃতি বাল্যকা হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সেণ্ট জেবিয়ার্সের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

(১৮) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৩১ পৃঃ।
(১৯) ভারতী, ১ম বর্ষ, ১২৮৪।
(২০) ভারতী, ৪র্থ বর্ষ, ১২৮৭।
(২১) ভারতী, ১ম—৪র্থ বর্ষ, ১২৮৪-১২৮৭।
(২২) ভারতী, ১ম বর্ষ, ১২৮৪, মাঘ, ৩০৫-৩০৬ পৃঃ।
(২৩) "কাল্পনিক ও বাস্তবিক"—ভারতী, ১২৮৫, ভাদ্র, ২১৬ পৃ
(২৪) ঐ, ২১৮ পৃঃ।ঐ, ২১৯ পৃঃ।



রবীন্দ্রনাথের কাছে সিল্‌ভ্যাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে বাংলা পড়িতেছেন।

"সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডিপেনারাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশী ছিল না... তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরাজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণেই তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন, কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাঁহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত তিনি সর্ব্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম

হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা-তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডিপেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন বোধ করি দুই তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন, এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাগোর, তোমার কি শরীর ভাল নাই'—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই।...আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেব-মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।" (২৭)

এর পরেও এই রকম আরো কয়েকজন বিদেশী অধ্যাপকের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন যাঁহাদের জীবনের পবিত্রতায় বিদেশী শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের নিকট শ্রদ্ধার জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী শিক্ষাকে হৃদয়ের সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সে শিক্ষা তাঁহার মনকে একটি বৃহৎ মুক্তির ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছে, কেবল স্তূপাকার উপকরণের বোঝা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছেন যে বিদেশী শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করা আবশ্যক। মনের মিলন না ঘটিলে বিদেশী অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করা যে নিতান্তই বিড়ম্বনা একথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে হৃদয়ের যোগাযোগ নাই এইজন্য তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী। বিদেশী বলিয়া নহে—হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই বলিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছেন।

ইংরেজি ভাষা চর্চ্চা

রবীন্দ্রনাথের অল্প অল্প করিয়া ইংরেজি ভাষা চর্চ্চা আরম্ভ হইল। ভাষা অপেক্ষা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই বেশি ছিল।

"আহমদাবাদে একটি বড় ঘরের দেয়ালের থাপে থাপে মেজ দাদার (২৮) বইগুলি সাজান ছিল। তাহার মধ্যে, বড় বড় অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। ... আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না, তাহা নহে—কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতই ছিল।" (২৯)

কিন্তু ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য পরিশ্রমের ক্রটি ছিল না।

"ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্সনারী লইয়া নানা ইংরেজী বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ একরকম চলিয়া যাইত।" (৩০)

য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা চলিতে লাগিল। "স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন সাহিত্য" "পিত্রার্কা ও লরা" "দান্তে ও তাঁহার কাব্য" "গেটে" (৩১), "নর্ম্যান্ জাতি ও অ্যাঙ্গ্‌লো-নর্ম্যান সাহিত্য" "চ্যাটার্টন বালক-কবি" (৩২) প্রভৃতি প্রবন্ধ তাহার নিদর্শন।

জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার ফলেই হউক অথবা নিজের ভিতর হইতেই হউক, ষোল বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে,

"যতদিন ভাষার উন্নতি না হয়, ততদিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষায় উন্নতি।" (৩৩)

বিলাত যাত্রা

সতেরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বার বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত হইতে প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে যে পত্রগুলি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" (৩৪) নামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রগুলিতে ইংলণ্ডে গিয়া কিরূপে তাঁহার মত গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

"এই ত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়্‌ল। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক, মনে করেছিলেম, য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে, সে যে কি, তা' কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য-রাজ্যের প্রায় বনে না। কোনো নূতন দেশে আস্‌বার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর' মনে করে রাখি যে, এসে আর তা' নূতন বোলে মনেই হয় না; ...ইউরোপে আমার তেমন নূতন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক্।" (৩৫)

---

(২৭) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, ৩১৪ পৃঃ।

(২৮) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইনি তখন আমেদাবাদের জজ ছিলেন।

(২৯) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৩ পৃঃ।

(৩০) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৩ পৃঃ।

(৩১) ভারতী, ২য় বর্ষ, ১২৮৫।

(৩২) ভারতী, ৩য় বর্ষ, ১২৮৬।

(৩৩) ভারতী, ১ম বর্ষ, মাঘ ১২৮৪, ৩০৭ পৃঃ।

(৩৪) ভারতী, ৩য়-৪র্থ বর্ষ, ১২৮৬, ১২৮৭। পুস্তকাকারে:—১৮০৩ শক।

(৩৫) য়ুরোপযাত্রী, (১ম পত্র, ১৯ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, জ্যৈষ্ঠ, ৯০ পৃঃ।

বিলাতি সমাজ

বাহিরের চাকচিক্যে রবীন্দ্রনাথের মন ভোলে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়া নানা বিষয়ে তিনি প্রথমে ভারি নিরাশ হইয়াছিলেন।

"আমি ইংলণ্ড দ্বীপটাকে এত ছোট ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে করেছিলেম যে, ইংলণ্ডে আস্‌বার আগে আমি আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্রদ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে; মনে করেছিলেম, এই দুইহস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাডষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্‌স্‌মুলারের বেদব্যাখ্যা, টিণ্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব; মনে করেছিলেম, যেখানে যাই না কেন, intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হোয়েছি।" (৩৬)

বাইরে থেকে ফ্যাশানেব্‌ল্ মেয়েদের দেখে তাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয় নি।

এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটারদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক ও অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে, এই ত আমার অভিজ্ঞতা।" (৩৭)

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে কিছুদিন থাকার পর আরেকটু তলাইয়া দেখিতে দেখিতে ভালদিকটাও চোখে পড়িতে আরম্ভ করিল। অষ্টম পত্রে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আগের চিঠিতে,

"কেবল একশ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র; তাঁরা হোচ্চেন Fashionable মেয়ে। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলাতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলাতে সংসার চল্‌ত না।" (৩৮)

মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ সমস্ত দেখেন, সংসার চালানোর ব্যবস্থা করেন।

"এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম শাদাশিদে, যদিও তাঁরা ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার; এদেশে কথায় বার্ত্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন, আত্মীয়সভায় একটা কোনো বিষয় নিয়ে চর্চ্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বোল্‌তে পারেন।" (৩৯)

স্ত্রীস্বাধীনতা

"মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিষ না দেখ্‌লে দূর থেকে কল্পনা কোর্ত্তে পারিনে। এখানে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব্বপ্রথমেই তাঁদের চোখে কি ঠেকেছে?—এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি সাধনে মহিলাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখানে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হোয়েছে।" (৪০)

দেশীয় সমাজ

কেবল স্ত্রীস্বাধীনতা নহে, বিলাতে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সর্ব্বত্রই যে স্বাধীনভাবের স্ফূর্ত্তি দেখা যায় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন:—

"এই রকম ছেলে-বেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলে-বেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব কোরে আস্‌চে সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচি-জনক বোলে ঠেকে না, তার কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। আজ্ঞা পালন কোরে কোরে তার এমন অবস্থা হোয়ে যায়, যে, আজ্ঞা কোরে বল্লেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বোলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়।" (৪১)

"আমরা ছেলেবেলা থেকে আমাদের গুরুলোকদের অভ্রান্তবুদ্ধির উপর নির্ভর কোর্‌চি, আমরা যেখানেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেইখেনেই তাঁরা ছেলেমানুষ বোলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করেননি। ছেলেমানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এককালে তাই মনে কোর্ত্তেম, তাঁরা শ্রমসংক্ষেপ কর্‌বার জন্য সত্যকথাগুলিও মিথ্যার আকারে প্রচার কোরেচেন, ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন।......যখন গুরু-লোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার, এমন কি কুসংস্কারের বিরোধী হোলো বলে ছোটর প্রত্যেক ইচ্ছা অবিচারে দলন না কোর্বেন, তখন অনেক উপকার হবে। আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্চে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পেরেচি।" (৪২)

সামাজিক স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথ বিলাতের সমাজের কথা বলিয়াছেন:—

"এখানকার ছেলেদের একরকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখ্‌লে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। তার প্রধান কারণ এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমানভাবে রাখে।......

(৩৬) য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র—(২য় পত্র—২৬-২৭ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ আষাঢ়, ১১৯ পৃঃ।

(৩৭) ঐ (২য় পত্র, ২৮-২৯ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আষাঢ়, ১২০ পৃঃ।

(৩৮) ঐ (৮ম পত্র, ৭৮, ১৭৪ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, কার্ত্তিক, ২৯৬পৃঃ।

(৩৯) ঐ (৮ম পত্র, ১৭৮ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, কার্ত্তিক, ৩০১ পৃঃ।

(৪০) ঐ (৬ষ্ঠ পত্র, ১২৯ পৃঃ), ভারতী, ১২৮৬, অগ্রহায়ণ, ৩৫৮ পৃঃ।

(৪১) য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (৯ম পত্র, ২০৪ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, পৌষ, ৪০০ পৃঃ।

(৪২) য়ুরোপ-প্রবাসী (৯ম পত্র, ২০৩ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, পৌষ ৩৯৮ পৃঃ।

এমন স্বাধীনতাব বর্ত্তমান যে, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সে রকম আকাশ-পাতাল সম্পর্ক নেই। এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা' হয় ত তুমি না দেখ্‌লে ভাল কোরে বুঝ্‌তে পার্‌বে না।……এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন কোর্ত্তে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীনতাব কোথা থেকে আসবে? কিম্বা হয়ত আমি উল্‌টো বল্‌চি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীনভাব না থাক্‌লে এমন কি কোরে হবে? যাদের হৃদয়ে স্বাধীনভাব নেই, তারা যেমন অম্লানবদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধ্‌তে পারে, একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধ্‌তে ভালবাসে। আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ।" (৪৩)

দেশীয় ভাব

বিলাতের সামাজিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশীয় আচার ব্যবহার ও দেশীয় প্রথার প্রতি অনুরাগ কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। বিলাতে বাল্যকালেও তিনি বরাবর দেশী কাপড় পরিয়াছেন। এর জন্য যথেষ্ট হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপও সহ্য করিতে হইয়াছে।

"আমাদের দিশি কাপড় দেখে, রাস্তার এক এক জন সত্যি সত্যি হেসে উঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাস্‌বার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ কোরে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ি আস্‌চে হুঁস্ নেই। …ইস্কুলের ছোক্‌রা এক একজন আমাদের মুখের উপর হেসে উঠে, এক একজন চেঁচাতে থাকে—"Jack, look at the blackies!" কিন্তু আমি সেসব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।" (৪৫)

ইঙ্গ-বঙ্গ-সংবাদ

রবীন্দ্রনাথ সাহেবিয়ানাকে চিরদিনই ঘৃণা করিয়াছেন। বিলাতি চালচলন হাবভাবের নকল তিনি কোনোদিনই সহ্য করিতে পারেন নাই। য়ুরোপপ্রবাসীর পঞ্চম পত্রে ইঙ্গ-বঙ্গ-নামক অদ্ভুত নূতন জীবের বিস্তারিত বর্ণনা যখন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর।

"ইংরেজ ও অ্যাঙ্গ্‌লো-ইণ্ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালী ও ইঙ্গ-বঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এইজন্য ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের যত নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলেতের আর খুব কম জিনিষের উপর পারব।" এই ইঙ্গবঙ্গদের "দেশের আর কিছুই ভাল লাগে না, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধোর্‌তে প্রবৃত্তি হয়। তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশ্‌তে আরম্ভ করে, তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায়।" (৪৬)

ইঙ্গ-বঙ্গ ভদ্রতা

"ইঙ্গবঙ্গদের ভাল করে চিন্‌তে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখ্‌তে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন। …একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সুমুখে দেখ, তাঁকে দেখ্‌লে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভারে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পোড়্‌চে, মৃদু ধীরস্বরে কথাগুলি বেরোচ্ছে।…তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখ, দেখ্‌বে, তিনিই একজন মহা তেরিয়া মেজাজের লোক।" (৪৭)

"…ব্যক্তি-বিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ বিশেষ মাত্রা স্থির কোরে রেখেছেন। ইংলণ্ডে যারা জন্মেছে, তাদের জন্যে বড় চামচের এক চামচ,—ইংলণ্ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে, তাদের জন্য মাঝারী চামচের এক চামচ,—ও ইংলণ্ডে যারা যুলে যায় নি, তাদের জন্য ফোঁটা দুই তিন ব্যবস্থা! ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি, তাঁদের Principle-এর পায়ে গড় করি।" (৪৮)

বিলাতি কুসংস্কার

"যে ইঙ্গ-বঙ্গগণ আমাদের দেশীয়-সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার আছে বোলে নাসাকুঞ্চিত করেন, বিলেত থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যাণ্টলুনের পকেট পুরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান। …সে দিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হোচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্যি করি, বেশভূষা করিনে, ইত্যাদি—শুনে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ যুবক অধীরভাবে আমাকে বোলে উঠ্‌লেন, যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এসকল অনুষ্ঠান ভাল বলেন না।" আমি বল্লেম, "কেন নয়? মৃত আত্মীয়ের জন্য শোক প্রকাশ কর্‌তে আমি ত কোনো দোষ দেখিনে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ কর্‌বার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরেজেরা কাল কাপড় পোরে শোক প্রকাশ করে বোলে শাদা কাপড় পোরে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না; আমি দেখ্‌ছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বোলে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত ও মনে কোর্‌তে হবিষ্যান্ন খায় না বোলেই আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে আরম্ভ কোর্‌লেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠ্‌তে পার্‌বে। এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হোতে পারে?" (৪৯)

"…কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ কোরে তোলে, তা' বাঙ্গালার অশিক্ষিত কৃষাণদের মধ্যে অনুসন্ধান কর্‌বার আবশ্যক করে না, ঘোরতর

(৪৩) য়ুরোপ-প্রবাসী (৯ম পত্র, ২০৬-২০৯ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, পৌষ, ৪০৪-৪০৬ পৃঃ।

(৪৫) য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র (৩য় পত্র, ৫১ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ শ্রাবণ, ১৩৭ পৃঃ।

(৪৬) য়ুরোপপ্রবাসী (৫ম পত্র, ৭৪ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, ভাদ্র, ২২২ পৃঃ।

(৪৭) য়ুরোপযাত্রী (৫ম পত্র, ৭৮-৮০ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, আশ্বিন, ২৪৯-২৫০ পৃঃ।

(৪৮) য়ুরোপপ্রবাসী (৫ম পত্র, ৮০ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫০ পৃঃ।

(৪৯) ঐ (৫ম পত্র ৮৩ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫১ পৃঃ।

সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙ্গালীদের মধ্যে তা দেখ্‌তে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোক একেবারে অন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে পড়েন?...কেবল বাহ্য চাকচিক্য! এ বিষয়ে তাঁরা ঠিক বালকের মত! একখানি বই দেখ্‌লে তাঁরা তার সোনার জলের চিত্র করা বাঁধান মলাট দেখে হাঁ করে থাকেন, তার ভিতরে কি লেখা আছে, তার বড় খবর রাখেন না!" (৫০)

ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেবিয়ানা

"আমি আগেই বলেছি বিলাতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোটখাটো বিষয় বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হোতে যান, তখন সাহেবদের ছোটখাট আচারগুলি নকল কোর্ত্তে যান।" (৫১)

"......বাঙ্গালীরা ইংরেজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার-ব্যবহারের নিন্দে করেন, এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে কোরে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে পরিহাস করেন।......তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারতবর্ষীদের 'নেটিব নেটিব' কোরে সম্বোধন করেন।......সাহেব-সাজা বাঙ্গালাদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙ্গালী বোলে ধরা পড়েন।.....তাঁর মা-বাপেরা যে বাঙ্গালী ও সে হতভাগ্যেরা যে বাঙ্গালায় কথা কয় এতে তিনি নিতান্ত লজ্জিত আছেন। আহা! যদি টেম্‌সের জলে স্নান করলে রংটা বদ্‌লাতো, তবে কি সুবিধা হোত!" (৫২)

ইঙ্গ-বঙ্গ জাতীয় সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ একটি ইঙ্গ-বঙ্গ জাতীয় সঙ্গীতের নমুনা দিয়াছেন:—

"মা এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট্‌ বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখ্‌লে পরে 'ব্ল্যাকি' বোলে মুখ ফেরাব!" (৫৩)

আত্ম-সম্মান রক্ষা

"আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, ভবিষ্যতে যেসকল বাঙ্গালীরা বিলাতে আস্‌বেন, তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত-সমুদ্র-পারে আর রাষ্ট্র না করেন। জন্মে অবধি শত শত নিন্দা গ্লানি অপমান নতশিরে সহ্য কোরে আস্‌ছি, এই দূর-দেশে এসে একটু মাথা তোল্‌বার অবকাশ পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বোলেই আমাদের পদাঘাতজর্জ্জরিত মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভরতা স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা কর্‌বার সুবিধা পায়; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার কোর্‌তে আরম্ভ কর, এখানকার লোকের মনেও বাঙ্গালীদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা' হলে এখানেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা, সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে।......বিলাতের কুহকগুলি আগে থাক্‌তে তোমাদের চক্ষে খোর্‌লেম, যখন বিলাতে আস্‌বে, তখন সাবধানে পদক্ষেপ কোরো। ইঙ্গ-বঙ্গদের দোষগুলিই আমি বিস্তৃত কোরে বর্ণনা কোর্‌লেম, কেন না লোকে গুণের চেয়ে দোষগুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে।" (৫৪)

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের স্বভাব

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত পড়িলে বাল্যকাল হইতে তাঁহার আত্ম-সম্মান-বোধ কিরকম উজ্জ্বল ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন।...প্রত্যহ সকালে উঠেই শুন্‌তে পেতেম তিনি ইংরিজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের চাকর-বাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ কোরেছেন, ও দশদিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাস্‌তে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্ত্তা নেই; আপনার ক্যাবিনে গোঁ হোয়ে বসে আছেন। কোন কোন দিন ডেকে বেড়াতে আস্‌তেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা কটাক্ষে নেত্রপাত কর্‌তেন, তাকে যেন পিঁপ্‌ড়াটির মত মনে কর্‌তেন।......তাঁর তালবৃক্ষের মত শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফ, সজারুর কাঁটার মত চুল, হাঁড়ির মত মুখ, মাছের চোকের মত ভাববিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোক, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার গা কেমন কর্‌ত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সোরে যেতাম।" (৫৫)

"....জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড় হোয়ে উঠে না। যে সাহেবেরা তখন জাহাজে থাকেন, তাঁরা টাট্‌কা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌চেন, সেই 'হুজুর, ধর্ম্মাবতার'গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখ্‌লে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে চোলে যান, ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ কোরে কৃষ্ণবর্ণের মনে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার কোরেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন ......এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন, জোন্স, টমাস্'গণ কিল্‌বিল কোর্‌চে, যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দরজী ও একজন কয়লাবিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হোয়ে যায়, যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়ত সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে উঠে, এ রকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুল্‌তে ফুল্‌তে যে হস্তীর আকার ধারণ কোর্‌বে, আমি ত তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

(৫০) য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৮৫ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫২ পৃঃ।

(৫১) য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৮৯ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫৫ পৃঃ।

(৫২) য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৯২-৯৪) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫৬।

(৫৩) য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৯৫) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫৭ পৃঃ।

(৫৪) (৫ম পত্র, ১০৩ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৬১ পৃঃ।

(৫৫) য়ুরোপ-প্রবাসী, (১ম পত্র, ১১ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, বৈশাখ, ৪৭ পৃঃ।

তারা রক্ত-মাংসের মানুষ বৈ ত নয়, যে দেশেই দেখ না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান্‌পদ পায়, তখনি সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে মহত্ত্বের একটা আড়ম্বর, আস্ফালন করতে থাকে; এর অর্থ আর কিছু নয়, তারা মহত্ত্বের শিক্ষা পায়নি।" (৫৬)

"……উদ্ধত, গর্ব্বিত, বিকৃত, নীচ-স্বভাব অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানরা আমাদের যে রকম নীচু নজরে দেখে,…তাতে বিশেষ কি এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙ্গুল নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা গর্ব্ব-স্ফীত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের পা চাটতে যাবার প্রয়োজন কি?" (৫৭)

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এইরূপ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌দের নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ভদ্র ইংরেজ

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি কখনো মনে করেন নাই যে ইংরেজ মাত্রই অভদ্র:—

"মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখ্‌তে পাবে, তাঁরা হয়ত তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশ্‌তে চেষ্টা কোরবেন, জান্‌বে তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলী-ক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আস্‌চেন, তাঁরা এখানকার কোনো অজ্ঞাতকুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আট-খানা হোয়ে পড়েন নি।" (৫৮)

"ভদ্র ইংরেজদের দেখ, তাঁদের কি সুন্দর মন! মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের ঘোরতর সংক্রামকরোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্ব্বিত হয়ে উঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে, সহস্র সহস্র সেবকের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক অগ্নিপরীক্ষা।" (৫৯)

বিলাতের ছাত্র

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া ব্রাইটনে একটি পাব্লিক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সহপাঠী ছাত্রদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ ইহাই আমার বিশ্বাস।" (৬০)

(৫৬) য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৬৭-৬৮ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র, ২১৯ পৃঃ।

(৫৭) য়ুরোপ-প্রবাসী, (১০ম পত্র, ২৩৩ পৃঃ) ভারতী ১২৮৭, বৈশাখ, ৩৬-৩৭ পৃঃ।

(৫৮) ঐ, (৫ম পত্র, ৬৭ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র, ২১৯ পৃঃ।

(৫৯) য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৬৮ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, ভাদ্র, ২১৯ পৃঃ।

(৬০) জীবন-স্মৃতি,—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৫ পৃঃ।

বিলাতের শিক্ষক

"একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোক অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নগ্ন গা[ছের] মতই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে র[ক্ষা] করিতে পারিতেন না। ..তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বু[ড়া] হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। …..এক[টা] মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন পৃথিবীতে এ[ক এক]টা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব সমাজে একই ভাবে আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সে ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরে দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদে[খি] নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জ[ন্য] তিনি কেবলি তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই। …এক একদিন আমাকে পড়াইবা[র] সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন …সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখ দুটো কোন্ শূন্যে দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনো মতেই প্রথম পাঠ্য লাটি[ন] ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভা[রে] ও লেখার দায়ে অবনত অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড় বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিয়াছিলাম ইঁহার দ্বারা আমা[র] পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না—তবুও কোনো মতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে কয়দিন সে বাসায় ছিলা[ম] এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবা[র] সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন—আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি ত কোনো কাজই করি নাই; আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারি[ব] না। আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণস[হ] উপস্থিত করেন নাই তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্য্যন্ত অবিশ্বা[স] করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক-জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।" (৬১)

বিলাতের গৃহিণী

"এবারে ডাক্তার স্কট্ নামে একজন ভদ্রগৃহস্থের ঘরে আমার আশ্র[য়] জুটিল। …অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ। এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ স্কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। …গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের

(৬১) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৬ পৃঃ।

পড়াশুনা গান বাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদপ্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ।…এইসময়ের মধ্যে একটি জিনিষ দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জ্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে।" কিছুদিন পরে দেশে ফিরিবার সময় হইল। "বিদায় গ্রহণ কালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে?—লণ্ডনে এই গৃহটি আর এখন নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ বা পরলোকে, কেহ বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না, কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।' (৬২)

বিলাতের মানুষ

প্রথমবার বিলাতে অবস্থান কালের আরো দুই একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

"একবার শীতের সময় আমি…দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোন কথা বলিল না, কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন—বলিয়া মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়ত আমার মনে থাকিত না, কিন্তু ইহার অনুরূপ আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ষ্টেসনে প্রথমে যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকা গাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনীজাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধ ক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্ব্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি পেনী মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।"

"যতদিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুসি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি—তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করে নাই।" (৬৩)

রবীন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

(৬২) জীবন-স্মৃতি,—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৭ পৃঃ।
(৬৩) জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৮ পৃঃ।

বিলাত যাত্রার সার্থকতা

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিলাত গিয়াছিলেন। অল্পবয়সের অভিজ্ঞতা মনের উপর যেরূপ দাগ রাখিয়া যায়, বেশি বয়সে প্রায় সেরূপ ঘটে না। এইজন্য প্রথম বারের বিলাত যাওয়ার কথা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বাহ্য চাকচিক্যে আদৌ মুগ্ধ হন নাই, বরঞ্চ প্রথমে কতক পরিমাণে নিরাশ হইয়াছিলেন। বিলাতি আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মে নাই, এমন কি তিনি তাঁহার দেশী কাপড় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন না। বিলাতি চালচলনের নকল করা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; ইঙ্গবঙ্গদের সাহেবিয়ানাকে জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ মনে করিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কিছুদিন বিলাতে অবস্থান করিবার পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বিলাতের সামাজিক স্বাধীনতা একটি মূল্যবান জিনিষ। স্ত্রীস্বাধীনতার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া দেশীয় সমাজে তাহা প্রচলন করিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। দেশীয় সমাজের প্রতি প্রবল অনুরাগ সত্ত্বেও বিদেশী সমাজের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে তিনি বাধা বোধ করেন নাই।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের উদ্ধত ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই, অভদ্র ইংরেজের গর্ব্বিত হাবভাব তাঁহার আত্ম-সম্মানবোধকে পীড়িত করিয়াছে, তিনি নিজে তাহাদের নিকটসম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে থাকিবার জন্য বাঙ্গালী যুবকগণকে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজবিদ্বেষী হইয়া উঠেন নাই। ভদ্র ইংরেজের মহত্ব তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট অকালবৃদ্ধ লাটিন-শিক্ষকের ভাব-পীড়িত করুণ মুখচ্ছবি, ব্রাইটনে সহপাঠীদের গোপন সহানুভূতি, জীর্ণচীর ভিক্ষুক ও সামান্য মুটের সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা, আত্মবিসর্জ্জনতৎপরা পতিব্রতা মিসেস্ স্কটের নম্র মাধুর্য্য ও সস্নেহ বাৎসল্য রবীন্দ্রনাথের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের যোগাযোগের দ্বারা, এবং

ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মাধুর্য্য দ্বারা বিলাতি সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন—ইহাই বিলাতগমনের সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে মানুষের প্রকৃতি সব জায়গায়ই সমান, তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে। ইংলণ্ডে না গেলে অত অল্প বয়সে একথা তিনি এমন করিয়া বুঝিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

য়ুরোপের উপকরণবাহুল্য ও কর্ম্মব্যবস্থার জটিলতা

অল্প বয়সের আর একটি কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। য়ুরোপে পৌঁছিয়াই সেখানকার উপকরণ-বাহুল্য ও কর্ম্মব্যবস্থার জটিলতা রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়িল।

"সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছিলেম। কি জমকালো সহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পোড়্‌লে অভিভূত হোয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে হোলো, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কি আবশ্যক! একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, যে, ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাক্‌তে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণ-স্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে-বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।" (৬৪)

য়ুরোপের এই উপকরণ-বাহুল্য তাঁহার মনকে চিরদিনই পীড়া দিয়াছে—আধুনিক কালের লেখার মধ্যে সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সতেরো বৎসর বয়সে য়ুরোপে বাহ্যাড়ম্বরের বিড়ম্বনা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

"ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে কি পড়ে জান, লোকে ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখ্‌লে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হস্ হস্ কোরে চোলেছে, পাশের লোকের উপর ভ্রুক্ষেপ নেই, মুখে ব্যস্তভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। ইংলণ্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই, সমস্ত লণ্ডনময় রেলোয়ে—প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর এক একটা ট্রেন যাচ্চে। একটা রেলোয়ে-ষ্টেশনে গেলে দেখা যায় পাশাপাশি যে কতশত লাইন রোয়েছে তার ঠিক নেই। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আস্‌বার সময় দেখি, প্রতিমুহূর্ত্তে—উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারিদিক থেকে হস্ হস্ করে ট্রেন ছুটেছে—সে ট্রেনগুলোর চেহারা দেখ্‌লে আমার লণ্ডনের লোক মনে পড়ে—এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস কর্‌তে কর্‌তে চোলেছে, একতিল সময় নষ্ট কোর্‌লে চলে না! দেশ ত এই এক রত্তি, দোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দুপা চোল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাইনে!" (৬৫)

বিলাত আসিবার পূর্ব্বেই পনেরো-ষোল বৎসর বয়সে তিনি লিখিয়াছিলেন যে দারিদ্র্য দূর করা আবশ্যক, কিন্তু অত্যধিক অর্থে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

"অর্থ…ইংরেজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ তোমার সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতা-চরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি।" (৬৬)

(৬৪) য়ুরোপ-প্রবাসী, (১ম পত্র, ২৩ পৃঃ,) ভারতী, ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯২ পৃঃ।

(৬৫) য়ুরোপ-প্রবাসী (২য় পত্র, ৩২ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আষাঢ়, ১২১-১২২ পৃঃ।

(৬৬) "বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য", ভারতী, ১২৮৫, মাঘ, ৩০৯ পৃঃ।

রাত্রির স্মৃতি

গত রজনীর কথা আজিকে প্রভাতে
অপরূপ স্মৃতিসুখে অপূর্ব্ব শোভাতে
কেবলি জাগিছে! যেন সবি গেছে মুছি—
ধরণী আকাশ নাই, শুধু জলে শুচি
রুচির চন্দ্রমাখানি—অভিসার-দীপ
নীলাম্বর-অঞ্চলেতে ঢাকা। লক্ষ নীপ
ছড়ায় কেশরভার পথে পথে, তার
সৌরভে পবন মাতে, অকূল পাথার
মুকুতার মালা গাঁথি দুই হাতে তুলি
চন্দ্রমা-গলায় আসে দিতে পরাইয়া।
অকস্মাৎ রহস্যের দ্বার যায় খুলি
নিসুপ্ত প্রেমের পুরে, পর্দ্দা সরাইয়া
দুটি হিয়া মুগ্ধ সম চাঁদের আলোকে
চোখে চোখে চেয়ে রয় উদ্বেল পুলকে!

৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী



আনাতোল ফ্রাঁস

এবৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁস। এই পুরস্কার এতদিন পর্য্যন্ত ফ্রাঁসের ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া ফরাসীজাতির মনে একটা ক্ষোভ ছিল। ফ্রাঁসের ভাগ্যে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান চিরদিনই কিছু বিলম্বে ঘটিয়াছে। তাঁহার সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হয় অতি অল্পবয়সে, কিন্তু নিজের দেশেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন পঞ্চাশোর্দ্ধে; যদিও তাহার বহুপূর্ব্বে সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "সিল্‌ভেষ্টার বনার্ডের অপরাধ" প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি তখন নানাকারণে ফ্রাঁস লোকচিত্তহরণে সমর্থ হন নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে ফ্রাঁস অনেককাল পর্য্যন্ত আপনাকে খুঁজিয়া পান নাই; নিজের মৌলিকতাকে প্রকাশ করিবার সাহস না থাকাতে প্রচলিত সাহিত্যের ধারা অন্ধভাবে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য সৃজনের চেষ্টা পাইতেছিলেন। আপনার পূর্ণপ্রকাশকে ব্যাহত করাতে তাঁহার লেখা তেমন জোর অথবা সহজ না হইয়া জড় ও আড়ষ্ট হইতেছিল, যদিও তাহার মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু যৌবনে ফ্রাঁসের যশের সবচেয়ে বেশী অন্তরায় ছিল সে সময়কার ফরাসী সাহিত্যের অভাবনীয় সম্পদ। ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণ যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁহার পক্ষে বড় সহজসাধ্য ছিল না। তখন মোপার্সাঁ, জোলা, দোদে গল্প রচনা করিতেছেন; বুর্জে ও হুইস্‌মাঁ ধর্ম্মান্দোলনে মাতিয়া উঠেন নাই; ও জুল্ লেমেৎর্ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই; হার্ভিউ তখনও উপন্যাস রচনা লইয়াই আছেন, থিয়েটারের আকর্ষণে মাতিয়া নাটক রচনাতে তখনও মনোনিবেশ করেন নাই। এতগুলি শক্তিশালী লেখক যখন উপন্যাসজগতে নূতন রস সৃজনে ব্যাপৃত, তখন একজন নবীন লেখকের সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। তাই "সিল্‌ভেষ্টার বনার্ডের অপরাধ" বাহির হইলে যে চঞ্চলতা দেখা গিয়াছিল তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু ফ্রাঁস ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ, মনোজ্ঞ কবিতা, সুন্দর গল্প ক্রমাগত লিখিয়া ক্রমে ক্রমে নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। প্রথম রচনাগুলিতে তিনি তৎকালীন রুচির নিকট নিজের মৌলিকতাকে বলি দিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-রথীদিগের অনুকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে স্বীয় মৌলিকতা বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রৌঢ়ে ফ্রাঁস আপনাকে খুঁজিয়া পাইলেন। মৃদু ভৎসনা ও পরিহাস (Irony) ফ্রাঁসের লিখন-ভঙ্গীকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। এইপ্রকার রচনাভঙ্গী এক রেনাঁ ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। এইজন্য অনেকেই ইঁহাকে রেনাঁর শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহার রচনার আর-একটি গুণ এই যে সর্ব্বত্রই অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু এত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও রসের হানি ঘটে নাই। ইঁহার রচনাতে আদিরসের বহুলতাও আছে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভূত রসসমূহের কোনটিই বাদ যায় নাই। তবে ইন্দ্রিয়-



আনাতোল ফ্রাঁস

তাড়নার প্রবল বিক্ষোভ বা ভাবের উগ্রতা কোথাও বিশেষ ভাবে দেখা দেয় নাই। তাঁহার প্রেম বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে। সবটাই যেন বাছা, সবটাই যেন বিলাসের সামগ্রী। সজীব সতেজ সৃষ্টি অপেক্ষা তাঁহার লেখনীতে সুন্দর কারুকলা ও মনোজ্ঞবর্ণনে

গড়া চারু সাহিত্যের বিকাশই বেশী পাওয়া যায়। তাঁহার ভাবপ্রবণতা হইতে কল্পনা অধিক; সেইজন্য তাঁহার কল্পিত চরিত্রে স্বাভাবিক পরিণতিকে বাধা দিয়া ফ্রাঁসের নিজের মূর্ত্তিটাই প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে। ফ্রাঁস তাঁহার সমস্ত লেখার মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিলেও নিজেকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। সকলের সহিত সমবেদনায় এক না হইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহল উত্থান-পতন দূর হইতে দেখিতেছেন এবং রণক্লান্ত মানুষের দুর্ব্বলতাকে উপহাসের হাসি দিয়া তিরস্কার করিতেছেন। কিন্তু প্রৌঢ় ফ্রাঁসের চিন্তার ধারায় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফ্রাঁস আর এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন নাই। নিপীড়িতদিগের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে অস্ত্র ধরিতে হইয়াছিল। এতদিন যাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি জীবনের শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। জনসাধারণের সহজ জ্ঞান, মতাধিক্যের মধ্যে স্বভাবের স্বপ্রকাশ এবং বিশ্বের ক্রমোন্নতিতে তিনি আস্থাবান হইয়া উঠিলেন, তাই ফ্রাঁস জনসাধারণের সংঘবদ্ধ শক্তি দেখিয়া ভীত হন না। তিনি বলেন যে, কাহারও প্রভুত্ব যদি মানিতে হয় তবে গণপ্রাধান্য মানাই শ্রেয়। মানুষ এপর্য্যন্ত যে-সকল শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহাদের সকল হইতে গণতন্ত্রের প্রাধান্যকে ফ্রাঁস বেশী শ্রদ্ধা করেন। অবশ্য সেইজন্য একথা তিনি বলেন না যে গণতন্ত্রের মধ্যেই বুদ্ধি বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু জনসাধারণ অতিশয় সাবধানী, তাহাদের এই সাবধানতা তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে রক্ষা করে। সেইজন্য গণতন্ত্রকে ভয় পাইবার কিছু নাই। কিছুদিনের জন্য হয় তো জনসাধারণ প্রমত্ত হইতে পারে, অন্যায় আচরণ করিতে পারে, কিন্তু পরিশেষে শুভবুদ্ধির জয় হইবেই হইবে। যেখানে মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করে সেখানে শুভবুদ্ধি পরিশেষে জয়লাভ করিবেই করিবে। এই বিশ্বাস হইতেই ফ্রাঁস জনসাধারণের পক্ষ হইয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয়দলের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন।

ইতিহাস সম্বন্ধে ফ্রাঁসের ধারণাও বেশ নূতন। ইনি ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা ইতিহাসের পক্ষে সম্ভব মনে করেন না। ইঁহার মতে অতীতের ঘটনার স্বরূপকে প্রকাশ করাই ইতিহাস। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা বলি কাহাকে? একটা স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায়। কিন্তু একটা ঘটনা যে স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য তাহা স্থির হয় কিরূপে? ঐতিহাসিকগণ আপনাদের অভিরুচি অনুসারেই তাহা স্থির করেন। তাহা ছাড়া একটি ঘটনার অন্তরালে নানা বৈচিত্র্যময় ব্যাপার থাকে এবং তাহা এত বিভিন্ন বস্তু ও চিন্তার সংমিশ্রণের ফলে সম্ভাবনীয় হয় যে তাহার প্রত্যেকটিকে পাওয়া ও প্রকাশ করা মানুষের সাধ্যাতীত। অতএব ঐতিহাসিক আপনার মনের দর্পণে যাহা ধরিয়াছেন তাহাকেই প্রকাশ করেন। কাজেকাজেই প্রকৃত ঘটনার অনেকটাই কাটিয়া বাদ ছাঁট পড়িয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে নিজের মনের সৃষ্টি-প্রেরণাই ঐতিহাসিককে অতীতের আবরণের মধ্যে নব সৃজনে নিয়োজিত করে। ইতিহাস ঐতিহাসিকের সৃষ্ট এক নূতন সামগ্রী।

ফ্রাঁস ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল পারী সহরে এক পুস্তকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দরিদ্র পুস্তকব্যবসায়ী ছিলেন। এই পুস্তকালয়ে বহু সাহিত্যিক সমবেত হইয়া সাহিত্যালোচনা করিতেন ও বালক ফ্রাঁস তাহা শুনিবার সুযোগ পাইতেন। এই ছোট পুস্তকালয় এবং পারীর রাস্তাগুলি ফ্রাঁসের শিক্ষাশালা। ফ্রাঁসের পূর্ব্বে যেসব সাহিত্যবীর ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ বড় একটা সহরে ছিলেন না এবং প্রায় সকলেই পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রাঁস পারীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পারীতে পরিবর্দ্ধিত হন বলিয়া পল্লীর পরিচয় তাঁহার লেখায় বড় একটা পাওয়া যায় না, বরং পারীর সহরে সভ্যতা তাঁহার লেখার সর্ব্বত্রই উঁকি মারিতেছে। আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার ছদ্মনাম, তাঁহার আসল নাম জাক্ আনাতোল্ তিবোল্ট্; দেশপ্রীতি হইতে তিনি দেশের নাম গ্রহণ করেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

রুস সাহিত্যিক ডষ্টইভেস্কি

বিগত ৩০শে অক্টোবর রাশিয়ায় প্রায় সর্ব্বত্রই বিখ্যাত রুস ঔপন্যাসিক ডষ্টইভেস্কির শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বোল্‌শেভিক রাষ্ট্রীয়মণ্ডল এতদুপলক্ষে ডষ্টইভেস্কির একটি মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বোল্‌শেভিকদিগের সম্বন্ধে যে-সকল অপবাদ আমরা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে একটি প্রধান কলঙ্ক এই যে ইহাঁরা সাহিত্য ও কলাচর্চ্চার প্রসারে কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। কিন্তু রাশিয়ার জাতীয় সাহিত্যের প্রধান পুরোহিতের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন হইতেই এই জনরবের অসারতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। জারের অত্যাচার ও নিহিলিষ্টদের ভীষণ প্রতিহিংসার অতিরঞ্জিত গল্প ভিন্ন রাশিয়ার আর সবটুকুই জগতের নিকট রহস্যাবৃত ছিল। টুর্গেনিভ, টলষ্টয় ও ডষ্টইভেস্কির লেখনী রাশিয়ার প্রাণের স্পন্দনের পরিচয় দিয়া জগৎবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

টুর্গেনিভের কিন্তু জাতীয় জীবনের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা ছিল না। জার্ম্মান সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া টুর্গেনিভ রাশিয়ার যাহা কিছু তাহার প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে একটা প্রবল ভূমিকম্পে যদি রাশিয়ার সবটাই ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলেও জগতের কোনও ক্ষতি হইবে না। স্বদেশপ্রেমিক ডষ্টইভেস্কির প্রাণে টুর্গেনিভের রাশিয়ার প্রতি এই অবজ্ঞা বড়ই বাজিয়াছিল। তিনি টুর্গেনিভকে এইজন্য বিশেষ তিরস্কার ও বিদ্রূপ করেন। নবপ্রকাশিত ডষ্টইভেস্কির পত্রাবলীর মধ্যে প্রকাশিত বন্ধু মাইকভকে লিখিত একটি পত্রে ডষ্টইভেস্কি বলিতেছেন, "আমি যেরূপ তীব্র বিদ্বেষের সহিত টুর্গেনিভ সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং টুর্গেনিভ এবং আমি পরস্পরকে যেরূপভাবে অপমানিত করিয়াছি তাহা আপনার নিকট প্রীতিকর না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবানের দোহাই, আমি অন্যরূপ ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। তাঁহার অদ্ভুত মতামত আমাকে গভীরভাবে আহত করিয়াছে। লোকের সহিত তাঁহার উদ্ধত ব্যবহার যদিও কাহারও নিকট প্রীতিকর নয় তথাপি সেইসব ব্যক্তিগত কারণে আমি বিরক্ত হই নাই, সেগুলিকে বরং উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু যে শক্তিশালী স্বদেশদ্রোহী ইচ্ছা করিলেই দেশের যথেষ্ট মঙ্গলসাধন করিতে পারিত তাহার মুখে রাশিয়ার অন্যায় নিন্দা চুপ করিয়া শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। টুর্গেনিভ যে ভাবে রাশিয়ার গ্লানি প্রচার করেন তাহা আমি বরদাস্ত করিতে পারি না। তাঁহার রাশিয়ার প্রতি ঘৃণা ও কুকুরের ন্যায় জার্ম্মানীর পিছনে ল্যাজনাড়া আমি চারিবৎসর লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু "ধোঁয়া" নামক পুস্তকের অনাদর হওয়ার পর হইতে টুর্গেনিভের রাশিয়ার প্রতি যে ক্রোধ তাহার মূলে তাঁহার আত্মম্ভরিতাই। রাশিয়া যে তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মান দেখায় নাই তাই তাঁহার এই বিক্ষোভ। সেইজন্যই এটা আরও ঘৃণার যোগ্য।"

বাস্তবিকই ডষ্টইভেস্কির সমস্ত প্রাণটা তাঁহার দেশের জন্য কাঁদিত। দেশকে তিনি ভালবাসিতেন বলিয়া রাশিয়ার সকল লোকই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি নিজেই বলিতেছেন—"আমি প্রত্যেক রাশিয়ানকে আমার এমনই অন্তরতমভাবে পাই যে আমি রাশিয়ান অপরাধীদেরও ভয় পাই না। তাহারাও তো রাশিয়ান, তাহারাও তো আমার ভাই—আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাই। আমি কত সময় খুনী আসামী এবং চোর-ডাকাতের প্রাণে সুপ্ত মহাপ্রাণতার পরিচয় লাভ করিবার মহাআনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমি রাশিয়ান বলিয়াই রাশিয়ানদের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া এই মহানুভবতার পরিচয় লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ঘটনাচক্রে আমাকেও কয়েদী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি বিশেষভাবে অনুভব করি যে আমার অন্তরতম আত্মা, আমার অণুপরমাণু রাশিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ।" আরেকস্থলে তিনি তাঁহার বন্ধু মাইকভকে বলিতেছেন—"আমি তোমার স্বজাতিপ্রীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করি, স্লাভ জাতির আত্মিক মুক্তির জন্য তোমার চেষ্টা সফল হোক। আমাদের চির-গরীয়সী মাতৃভূমির সেই তো লক্ষ্য। হাঁ; আমি তোমার সহিত একবাক্যে বলিতেছি যে ইউরোপের শেষ আশ্রয় হইবে রাশিয়া! ইউরোপের মুক্তি, ইউরোপের শান্তি, ইউরোপের জাগরণের জন্যই রাশিয়াকে প্রস্তুত হইতে হইবে। রাশিয়ার এই নিয়তি।" অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগে রঞ্জিত তাঁহার প্রাণ দারিদ্র্যনিপীড়িত অত্যাচার-জর্জ্জরিত রাশিয়ান কৃষাণদিগের জন্য ব্যথায়-ভরা যে গান গাহিয়াছে তাহা জগতে অতুল। দীনদরিদ্র, অপরাধী ও বদমায়েস, সকলেরই জন্য ডষ্টইভেস্কির অশ্রু ঝরিত। তিনি তাহাদের সুখ দুঃখ, নীচতা ও মহত্ত্ব সকলকেই নিজের প্রাণের ব্যথায় রাঙ্গাইয়া জগতের কাছে প্রকাশ করিয়া রাশিয়ার লোকদিগকে জগতের কাছে অমর করিয়া তুলিয়াছেন।

আবার এইসব সুখদুঃখের পশ্চাতে এক মহান জীবন্ত আদর্শ ডষ্টইভেস্কির সমস্ত লেখনীকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। যিশুর সুমহান ত্যাগ ইহাঁকে এমনইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল যে ইহাঁর সকল লেখাতেই খৃষ্টের বাণী বাজিয়া উঠিয়াছে। ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া তিনি নিরীশ্বরবাদীদিগকে সহ্য করিতে পারিতেন না। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "টুর্গেনিভ আমার নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে তিনি ঘোর নাস্তিক। হে ভগবান! আমরা যে দৈবতবাদ হইতে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যিশুর পরিচয় লাভ করিয়াছি! মানবের এরূপ একটি মহান আদর্শ যিশুজীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহার ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে মাথা আপনি নত হইয়া যায়। এই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ যে এই জীবনের মধ্যে। এবং এই জীবনের মধ্যদিয়াই যে অরূপের স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ লাভ করিয়াছে।"

বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক টলষ্টয় ইহাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে বন্ধু ষ্ট্রাকভকে লিখিতেছেন—"ডষ্টইভেস্কির বলিবার ভঙ্গি যদিও খুব সুন্দর ছিল না কিন্তু বলিবার বিষয়টি সরল সহজ এবং খৃষ্টবাণীর ন্যায় উদার মহান। ইহাঁর পুস্তকাবলী সুন্দর, পড়িলে মনের প্রসার বাড়িয়া যায়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সুন্দর রচনা দেখিলে আমার ঈর্ষা হয়, কিন্তু হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তিমাত্রোতক রচনা আমার প্রাণে আনন্দই জাগাইয়া তুলে। এইজন্যই ইহাঁর লেখা পড়িয়া ইহাঁকে আমি বন্ধুরূপেই জানিয়াছিলাম, যদিও ইহাঁর সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। আশা ছিল ইহাঁর সহিত একদিন দেখা হইবে। কিন্তু হঠাৎ ইহাঁর মৃত্যুসংবাদে আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, ক্রমে চৈতন্যোদয়ে বুঝিলাম তিনি আমার কত আপনার জন ছিলেন। আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম—আজও কাঁদিতেছি।"

ডষ্টইভেস্কি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মস্কৌ সহরে এক হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা মাইকেল ডষ্টইভেস্কি সেখানকার চিকিৎসক ছিলেন। ডষ্টইভেস্কি পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই দুই-একটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তাহার পর ব্যাল্‌জ্যাক, জর্জ্জ-সাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিকদিগের গ্রন্থাবলী তর্জ্জমা করিয়া হাত পাকাইয়া লয়েন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর প্রথম উপন্যাস "গরিব লোক" প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠকসমাজের নিকট খুব আদৃত হয়। বিখ্যাত রুস-কবি নেক্রাসভ ইহা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হন যে রাত্রি দ্বিপ্রহরে ইহার পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র মনের আবেগে বন্ধু গ্রেগরিভিচকে সঙ্গে লইয়া ডষ্টইভেস্কির গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের গভীর তৃপ্তির কথা জানাইয়া শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। বিখ্যাত সমালোচক বাইলেন্‌স্কি উপযাচক হইয়া ইহাঁর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

ইহার পর ডষ্টইভেস্কি উপরি উপরি দশখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া রুস সাহিত্যজগতে এক অপূর্ব্ব চঞ্চলতার সৃজন করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিপ্লববাদী দলের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য ডষ্টইভেস্কি ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। যখন তাঁহাকে বধমঞ্চে লইয়া হত্যা করিবার উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, তখন তিনি জারের কৃপায় প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পান; কিন্তু যাবজ্জীবন সাইবিরিয়াতে অন্তরিত থাকিবার আদেশ লাভ করেন। সাইবিরিয়াতে কয়েদীদিগের সঙ্গে একত্রে বসবাস করিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে সূক্ষ্মদৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফল তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাসসমূহের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। প্রায় দশ বৎসর পরে জার দ্বিতীয় আলেক্‌জান্দারের অনুগ্রহে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পান। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ডষ্টইভেস্কি মৃত্যুর সময়ে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন যে তাঁহার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলা হইল না।

তাঁহার প্রধান বক্তব্য যাহা তাহার তিনি সবে সূচনা করিয়াছিলেন। "নির্ব্বোধ" নামক পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জীবনে যিশুত্ব লাভ। "Possessed" পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জীবনে নিট্‌সে দর্শনের প্রভাব বিস্তার। এক পুস্তকে ত্যাগের আদর্শ, অন্যে ভোগের; কিন্তু ডষ্টইভেস্কি জানিতেন এই দুইটি পূর্ণজীবনের একএকটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই দুইটি প্রবৃত্তির মূলশক্তি একই। মনের একটি নিভৃত অন্তস্তলে এমন এক শক্তি আছে যাহার প্রকাশ কখনও ত্যাগে হয়, কখনও বা ভোগে। কিন্তু ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যে। সেই সুসমঞ্জসিত ত্যাগ ও ভোগের মহান আদর্শকে মূর্ত্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা ডষ্টইভেস্কির প্রাণে সাহিত্যসাধনার প্রেরণারূপে বিরাজিত ছিল। এত বড় কঠিন সাধনার উত্তরসাধকরূপে তিনি খণ্ড খণ্ড প্রবৃত্তিগুলির মূর্ত্তি আঁকিতেছিলেন। তাই 'অপরাধ ও তাহার শাস্তি' 'নির্ব্বোধ,' Possessed ও 'কার্ম্মানসভ ভ্রাতৃবৃন্দ' প্রভৃতি পুস্তকগুলি তাঁহার প্রকৃত প্রকাশ নহে। এইগুলির মধ্য দিয়াই ডষ্টইভেস্কি তাঁহার মহাযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া সব শেষ করিয়া দিল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্য

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্য* লিখিয়া প্রথমে গ্রিফিথ-স্মৃতির পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহার পর উক্ত একই প্রবন্ধের গৌরবে পুনরায় তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। আমাদের দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর গবেষণার এরূপ সমাদর হইতেছে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। ইঁহার প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, ইহা পড়িয়া সকলের আনন্দ হইবারই কথা। আমরাও তাঁহার এই সাধু উদ্যমের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তবে পুস্তকখানির মধ্যে কয়েকজন পণ্ডিতকে তাঁহাদের সামান্য কয়েকটা ভুলের জন্য রীতিমত কটাক্ষ করা হইয়াছে। এমন কি ছাপার ভুলের জন্যও কেহ নিস্তার পান নাই। যিনি কাজ করেন তাঁহারই ভুল হয়। ভুল হয় না এমন লোক বিরল। আলোচ্য গ্রন্থকারের লেখাতেও নানারকমের ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের ভ্রম-প্রমাদের কয়েকটি স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিতে চাই যে, তিনি সেই ভ্রমগুলি ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইবেন।

সুশীল-বাবু এরূপ না করিলে অন্যক্ষেত্রে ছোটখাট কথা লইয়া আলোচনা করিবার দরকার আমাদের না হইতেও পারিত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের এরূপ বিষয়ে হাত দিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। কাজেই P. R. S. বৃত্তিভুকের গ্রন্থখানির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা দুইচারিটি উদাহরণ পাঠকগণকে উপহার দিতে বাধ্য হইতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই—"From 1800, the year of the foundation of the Hindu College and the formation of the Srirampur Mission, to 1825, the year of the publication of the last volume of Carey's Dictionary and the laying of the foundation stone of the Hindu College ...."।

এই লেখা হইতে ধরিতে পারা যায় যে, লেখক দুইটি বিষয়ের তারিখের পরিচয় দিয়াছেন। কেরির অভিধানের শেষখণ্ড ১৮২৫ খৃঃ বাহির হয়। বেশ কথা। কিন্তু হিন্দু-কলেজের ভিত্তি-স্থাপন যে যথার্থই ১৮২৫ খৃঃ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কোথায়? পাদটীকায় কোন প্রমাণের উল্লেখ নাই। আমরা হিন্দু-কলেজের আসল (হস্তলিখিত) কার্য্যবিবরণ হইতে জানি যে ১৮২৪ সালের ২৫এ ফেব্রুয়ারি হিন্দুকলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কার্য্যবিবরণের পাণ্ডুলিপি দেখিতে হইলে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। তাহা না করিয়াও তিনি তাঁহার Bibliographyতে উল্লিখিত পাজ্রে লঙের "Hand Book of Bengal Missions"এর ৪৭৫ পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিতে পাইতেন—"The foundation stone of this edifice was laid on the 25th of February 1824."

তারপর অনেক ঐতিহাসিক আগড়ুম-বাগড়ুম আছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া ৭৮ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হাল্‌হেড সাহেব বাঙ্গালায় আসেন ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি নয়, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দেই আসেন। সুশীলবাবু একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইতেন যে হাল্‌হেড সাহেব ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের "Friend of India" ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তারপর হাল্‌হেডের জীবনবৃত্তান্তটি তিনি "Dictionary of National Biography" হইতে নিছক আত্মসাৎ করিয়া ফুটনোটে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—"For further particulars see *Asiatic Journal*, 1830" ইত্যাদি ১১খানি গ্রন্থ। ইহার মধ্যে Dictionary of National Biographyও বসাইয়াছেন। আর মজাটুকু এই যে, ঐ এগারখানি গ্রন্থের মধ্যে "World" প্রভৃতি অধিকাংশ বইএর নাম Dictionary of National Biographyতে উল্লিখিত আছে। "World" এদেশে পাওয়া যায় না, অথচ তাহার নাম রহিল; কিন্তু এদেশের Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম হইল না।

১১৩ পৃষ্ঠায় *Primitiæ Orientales* হইতে James Hunterএর একটি thesis তুলিয়াছেন। Calcutta Review, Vol. XIIIতে ইহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। শিবরতন মিত্র মহাশয়ও এইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এটি সুশীলবাবুর মৌলিক অনুসন্ধান নয়। Primitiæ Orientales-এ টড্ সাহেবের একটি thesis আছে। সেটির নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল।

১৩০ পৃষ্ঠায় সুশীল-বাবু Fort William College হইতে ১৮০০ হইতে ১৮২৫ পর্য্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। ফুটনোটে এই তালিকার পুস্তক সম্বন্ধে বেশ মুরুব্বিয়ানা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তালিকার ভূমিকাটি যেখান হইতে লইয়াছেন তাহার নামগন্ধ নাই। Calcutta Reviewএর ১৩শ খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় যাহা আছে সুশীল-বাবু একেবারে প্রায় ভাষাসমেত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে আছে—

"A list of Oriental books, published under the patronage of Fort William College between 1800 and 1818, comprises, besides thirty-one in Urdu, twenty in Arabic, twenty-one in Persian, and twenty-four in Sanskrit, the following Bengali works—"

আর সুশীল-বাবুর পুস্তকে (১৩০ পৃঃ) আছে—

"The list of its publications between 1800 and 1825 comprises, besides 31 works in Hindusthani, 24 in Sanskrit, 20 in Arabic, and 21 in Persian, the following principal works in Bengali chronologically arranged—"

সুশীলবাবু এই অংশটুকু তুলিবার সময় খেয়াল করেন নাই যে ১৮০০ হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত যত বই হইবে, সাল বাড়াইয়া দিলে বইও বাড়িবে। Roebuckএর Annals of Fort William দ্রষ্টব্য। আর ১৮১৮ সালে Fort William Collegeও কিছু উঠিয়া যায় নাই। Calcutta Review পত্রের লেখকের হিসাবে কিছু ভুল আছে। ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী পুস্তকের সংখ্যা ৩৩,—৩১ নয়। ভুলটি পর্য্যন্ত নকল হইয়াছে। মৌলিক

* History of Bengali Literature in the Nineteenth Century. 1800—1825: By Sushil Kumar De, M.A. Published by the University of Calcutta.

গবেষণায় তাহা সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। পুস্তকের তালিকায় ফুটনোটে অন্ত গ্রন্থের উল্লেখ আছে,—Calcutta Reviewএরও স্থান হওয়া উচিত ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে Fort William Collegeএর পণ্ডিত ও মুন্সীদের কথা আছে। ইহার প্রারম্ভেই দেখিতে পাই—

"Ram Ram Bose, who unlike Carey was a native of Bengal, born at Chinsurah towards the end of the 18th century and educated at the village of Nimtah in the 24 Pergunnahs. He was a Bangaja Kayastha, as is indicated in his *Pratapaditya Charitra*." (১৫৯ পৃঃ)

রাম-রাম বসু যে চুঁচড়ায় জন্মিয়াছিলেন ও নিমতায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ সুশীল-বাবু পাইলেন কোথা হইতে তাহা তিনি পাদটিকায়ও উল্লেখ করেন নাই। নিখিল-বাবুর লেখা 'প্রতাপাদিত্যর' ১৮৪ পৃষ্ঠায় আছে—" 'রাজা প্রতাপাদিত্য'-প্রণেতা রাম-রাম বসু মহাশয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুঁচড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জেলা চব্বিশপরগণার অন্তর্বর্ত্তী নিমতা গ্রামে তাঁহার বাল্যশিক্ষা শেষ হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।"

এই অংশটুকুর ইংরেজী তর্জ্জমা করিলে কিন্তু সুশীলবাবুর অনুরূপ ইংরেজী হইয়া যায়।

সুশীল-বাবু ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"But the influence of Rammohon's unpublished work, which Ram Basu is said to have taken as his model, can never be disputed; and it was from the learned Raja that Ram Basu got the first impluse to write in Bengali. Carey reports to have heard that Ram Ram took the manuscripts of his first work, Pratapaditya Charitra and got it revised by him."

নিখিল-বাবু "প্রতাপাদিত্যে" (১৮৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"রাজা রামমোহন তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই পাঠ করিয়া রামরামের বাঙ্গালা গদ্য রচনায় প্রবৃত্তি হয়।" তিনি আবার লিখিয়াছেন—"রাজা-প্রতাপাদিত্য-চরিত্র লিখিত হইলে তিনি গুরুকল্প রাজা রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত পুস্তক লইয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহা দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক সংশোধিত করিয়া লন।"

আমরা যতদূর জানি নিখিল-বাবু ছাড়া আর কেহ একথা লেখেন নাই। সুশীল-বাবুও তাঁহার নিজের উক্তির কোন নজির দেন নাই। এরূপ অবস্থায় এই ঘটনাটুকু তিনি কিরূপে জানিলেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

সুশীল-বাবু লিখিয়াছেন—

"It was this reputation for learning which secured him not only the post of a Pandit in the college of Fort William in 1801, but also the friendship of Raja Rammohan Ray."

নিখিল-বাবু লিখিয়াছেন—

"বসু মহাশয়ের এই-সমস্ত ভাষায় অপরিসীম ব্যুৎপত্তির জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ইহার অন্যতম পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।......বসু মহাশয়ের এই-সকল ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট পরিচিত হন।"

সুশীল-বাবুর উক্তির সমর্থনের কোন নজির নাই। কিন্তু নিখিল-বাবুর উক্তির সঙ্গে বেশ মিল আছে। তিনি যে নিখিল-বাবুর গ্রন্থ দেখিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই আছে। এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সুশীল-বাবু রাম-রাম বসুর নিয়োগের সাল (১৮০১) কি উপায়ে জানিলেন? তাঁহার গ্রন্থে তাহার কোন পরিচয় নাই। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটা কথা বলিব। Carey সাহেব রামরাম বসুর পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না। ঘনশ্যাম বসুর কথা শুনিয়া যাহা-কিছু জানিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি এই—রামমোহন রায় যখন নিতান্ত বালক তখন রামরাম বসু ভাল বাঙ্‌লা লিখিতে পড়িতে পারিতেন। ১৭৮৮ সালে তিনি বেশ ভাল বাঙ্‌লা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সালে তিনি Thomas সাহেবেরও মুন্সী ছিলেন। তখন রামমোহন বড় জোর ১৪ বছরের বালক। ১৭৮৮ সালে রামরাম বসুর বাঙ্‌লা রচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজস ক্রাইষ্ট বিনা গো।
সাগর ওঘোরে লর্ড
জিজস ক্রাইষ্ট বিনা গো।
সেই মহাকায় ঈশ্বরতনয়
পাপির ত্রাণের হেতু।
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
পার হবে ভবসেতু।
এই পৃথিবীতে নাহি কোনজন
নিষ্পাপি ও কলেবর।
জগতের ত্রাণকর্ত্তা সেই জন
জিজস্ও নাম তাঁহার।
ঈশ্বর আপনি জন্মিল অবনী
উদ্ধারিতে পাপিজন।
যেই পাপি হয় ভজয়ে তাঁহায়
সেই পাবে পরিত্রাণ।
আকার নিকার ধর্ম্ম-অবতার
সেই জগতের নাথ।
তাঁহার বিহনে স্বর্গের ভুবনে
গমন দুর্গম পথ।
সে বদনবাণী শুন সব প্রাণী
যে কেহ তৃষিত হয়।
যে নর আসিবে শুদ্ধবারি পাবে
আমি দিব সে তাহায়।
অতএব মন কর রে ভজন
তাঁহাকে জানিয়া সার।
তাঁহার বিহনে পাতকি তারণে
কোন জন নাহি আর।"

টমাসের গ্রন্থ—৮৩ পৃষ্ঠা।

১৬১ পৃষ্ঠার ফুটনোটে রাম-রাম বসু সম্বন্ধে সুশীল-বাবু লিখিয়াছেন—

"He was almost on the verge of avowing Christianity but was possibly deterred by Ram Mohan."

আন্দাজে ঢিল মারিলে গবেষণা হয় না। রামমোহন রায় রামরাম বসুকে ক্রিশ্চিয়ান হইতে দেন নাই এ কথার কোন ভিত্তি নাই। তাঁহার উক্তির সমর্থনে সুশীলবাবুর কোন authority দেওয়া উচিত ছিল। রামরাম বসু কেন ক্রিশ্চিয়ান হন নাই তাহার প্রকৃত কারণ এই—

"The writer was a Kayastha, named Ram Ram Basu, who had been deeply convinced of the truth of Christianity through the instructions of Mr. Thomas, whose *Munshi* he was, as early as 1788, —three years before Carey had propounded to his brethern, at their meeting at Clipstone, the question: 'Whether it were not practicable and their bounden duty, to attempt somewhat toward spreading the Gospel in the Heathen World?' This interesting man could never be prevented upon to give up Caste for Christ: he knew the truth, and he despised the superstition of his forefathers, but to the last he was ashamed to hear the reproach of having joined himself to the people of God. This must have been a bitter disappointment to the missionaries, and even now, the fact cannot be contemplated without distress."
——Bengali Tract distribution previous to 1823.

সুশীল-বাবু লিখিয়াছেন—"Carey says that Rām Basu resigned his appointment through a difference of opinion with the authorities of the college. The date of his resignation however cannot be determined .....He must have resigned somewhere between 1805 and 1818." একেবারে বিসমল্লায় গলদ। রাম রাম বসু মৃত্যুর পূর্ব্বে কলেজের কাজ ছাড়েন নাই। সুশীল-বাবু Board of Revenueএর নাম দু' এক জায়গায় করিয়াছেন, কিন্তু Board of Revenueর কাগজ-পত্রের কোন সন্ধান রাখেন না। রাখিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে রাম রাম বসু ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তাঁহার স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হন।

তাঁহার পুস্তকে নাম, তারিখ প্রভৃতির যথেষ্ট গোলমাল আছে—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থানে আছে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (Preface, p. viii); নিতাই বৈরাগীর জন্ম তিনি লিখিয়াছেন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে (৩০২ পৃঃ)—হইবে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ ইত্যাদি।

কবিওয়ালাদের পরিচ্ছেদে তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিওয়ালাদের এতগুলি গীত সংগ্রহে বেশ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গীতগুলি এত পাদটীকায় ভারাক্রান্ত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পাঠ প্রভৃতির এদিক্ ওদিক্ থাকিলেও না হয় দরকার হইতে পারিত। একমাত্র ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কবিওয়ালাদের গীতে তাঁহার সংগৃহীত চৌদ্দ আনা গীত পাওয়া যাইত। প্রথম গীতে "সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান" (পৃঃ ৩২৩) পদটি চিতেনে বসিবে, অন্যান্য গ্রন্থেও তাই আছে, মহড়ায় বসিবে না। ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে সে সময় চিতেনের গান মহড়ায় গাওয়া হইত না (প্রভাকর, ১২৬১ সাল)। ৩৪৯ পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্রের "At a certain sitting at the Sobhabazar Palace" প্রভৃতি হইতে পর পৃষ্ঠার প্রায় শেষ "কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি" পর্য্যন্ত (অবশ্য ৫ ছত্র বাদ) অংশে "বঙ্গভাষার লেখকের" ৩৭৩ ও ৩৭৬ পৃষ্ঠার নজির থাকা উচিত ছিল। সুশীল-বাবু কিন্তু তাহা দেন নাই। বঙ্গভাষার লেখক লিখিয়াছেন—'একবার দুর্গোৎসবের সময় কলিকাতা শোভা-বাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে কবি হইতেছে। এক পক্ষে রাম বসু,—রাম বসুর তখন পেশাদারী দল,—অপর পক্ষে রামপ্রসাদ ঠাকুর, নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর ইনিই তখন দলপতি। রামপ্রসাদ ঠাকুর রাম বসুকে গালি দিয়া বলিলেন,—

"নাইক রাম বোসের এখন সেকেলে পৌরষ।
এখন দম করে হয়েছেন রাম বোস—রামকামারের * *।

রাম বসু উত্তর দিলেন,—

"তেমনি এই নীলুর" ইত্যাদি।

সুশীল-বাবু লিখিতেছেন—

At a certain sitting at the Sobhabazar palace the parties of Ram Basu, then an old veteran, and of Nilu Thakur (a disciple of Ram Ram's old rival Haru Thākur) met. Nilu was dead, but Ramprasad Thakur was then the leader of the party. Ramprasad began the attack "নাইক রাম বোসের" ইত্যাদি। But immediately Ram Basu retorted 'তেমনি এই নীলুর' ইত্যাদি।

সুশীল-বাবুর এই পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। কিন্তু আমাদের স্থান অতি অল্প। সুতরাং আর এক-আধটি গবেষণার নিদর্শন দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

সপ্তম অধ্যায়ে সুশীল-বাবু লিখিয়াছেন—

"..........for the first Bengali newspaper was not the *Samachar Darpan* but the *Bengal Gazette*. The latter journal, now scarce, was published for the first time in 1816 by one Gangadhar Bhattacharya of whom, however, little is known. This paper lasted for two years, having been extinguished in 1818."

বাঙ্গলা বেঙ্গলগেজেট কোন দিন বাহির হয় নাই। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র 'সমাচারদর্পণ'। সুশীল বাবু নিজেই লিখিয়াছেন তিনি কোন দিন বেঙ্গল গেজেট দেখেন নাই (২২৯ পৃঃ)। যাঁহারাই বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কখনও বেঙ্গল গেজেট চক্ষে দেখেন নাই। আর ১৮১৬ সালে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র বাহির হইবার আদৌ সুবিধা ছিল না। সরকারের আইনের খুব কড়াকড়ি ছিল। এ সময় নূতন কাগজ বাহির করিবার সাহস কাহারও ছিল না। লর্ড হেষ্টিংস্ তাঁহার শাসনের শেষভাগে censor তুলিয়া দেন। আর সম্পাদক-দিগের জন্য মিঠেকড়া আইনের ব্যবস্থা করেন। এই আইন ১৮১৮ সালে জারি হয়। এই সালের পূর্ব্বে কাগজ বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আর এত কড়াকড়ির মধ্যে যদি কেহ কাগজ বাহির করিবার সাধই করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সেই সময়কার অন্যান্য কাগজে এই কাগজের নামগন্ধও থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও কাগজে এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে লিখিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে বেঙ্গলগেজেট নামে এক পত্রিকা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কাব্য প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত, এ সংবাদটি একেবারে ভুল। ১৮১৬ সালে গঙ্গাধরের অন্নদামঙ্গল প্রতিকৃতি সহ বাহির হইয়াছিল সত্য। কিন্তু তাহার কলেবরের কোথাও বেঙ্গলগেজেটের ছাপ নাই। গঙ্গাধরের ১৮১৬ সালের ছবিওয়ালা বই আমাদের কাছে আছে।

এইবার সুশীল-বাবুর গ্রন্থে ৪৮৭ পৃষ্ঠার অংশবিশেষ ও ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Christian Observerএর অংশ বিশেষ পরপর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। এই উভয় গ্রন্থের বিষয় ও ভাষার মিল আশ্চর্য্য। সুশীল-বাবুর পাদটীকা কিন্তু এখানে একেবারে নীরব।

Christian Observerএর অংশ

"On the 4th of January of that year 1798 there was the following entry made in Fountain's Diary: "This morning the Pandit attended upon us. It was observed that the word *Mangalákhyán* would not properly denominate the whole Bible, as it only signified 'good news', a term more applicable to the Gospel. It was then proposed to call the Bible *Dharma Shástra*: but the Pandit said, *Shastra* only meant that writing which contained commands or orders. We must therefore call it *Dharma Pustak, viz.*, the Holy Book."

* * * * * *

"In 1800, on the 18th March, the first sheet of Matthew was printed. And in 1801, on the 7th February, the first edition of the Bengali New Testament was finished. It consisted of 2,000 copies,............ The expense was £62.......................................

....

"In 1800, the translation of the Old Testament was finished...

....

In 1803, from Job to Canticles was ready,.............. ; and in the same year the second edition of the Bengali New Testament was commenced. The proof sheets were examined by every one of the Missionaries, and in addition to this, Carey and Marshman went through it verse by verse, one reading the Greek, and the other the Bengalee............................In 1806, the second edition of the Bengali New Testament was ready, 1,500 copies;..................................In 1809, the Old Testament was published, and thus, after fifteen years of labour, the Bengali Bible was completed. It was contained in five large volumes, and was the work of Dr. Carey's own hand, for Ward, writing some years subsequently, mentions that Carey 'wrote with his own pen, the whole of the five volumes, Octavo.'..In 1809, besides the completion of the Bengali Bible, a third edition of the New Testament was sent to Press. It was to consist of only 100 copies, in folio.......................................In 1813, they were however ready, and the fourth edition of the New Testament was commenced................................By the close of 1817, the fourth edition of the Serampore New Testament was printed and in circulation, 5,000 copies."

সুশীল-বাবুর গ্রন্থের অংশ

"We have the following entry in Fountain's Diary on the 4th January, 1798 (quoted in Contributions towards a History of Biblical Translation in India, Calcutta, 1854):—"This morning the Pandit attended upon us. It was observed that the word Mangalakhyan would not properly denominate the whole Bible, as it only signified 'good news', a term more applicable to the Gospel. It was then proposed to call the Bible Dharma Shastra: But the Pundit said, Shastra only meant that writing which contained commands or orders. We must therefore call it Dharma Pustaka, *viz.*, the Holy Book." On the 18th March, 1800, the first sheet of Matthew was printed. On the 7th February, 1801, the first endition of the Bangali New Testament was published. It consisted of 2,000 copies, the expense was £62. In 1800, the translation of the Old Testament was finished.

* * * * * *

"In 1803, the second edition of the Bengali New Testament was commenced and in 1806, it was ready, 1500 copies. The proof sheets were examined by everyone of the missionaries, and in addition to this, Carey and Marshman went through it, verse by verse, one reading the Greek, the other the Bengali Text. In 1809, the Old Testament was published and in the same year, the whole Bible appeared in five large volumes. It was the work of Carey's own hand (manuscripts may be seen still in the possession of the Serampore Baptist Missionaries); for, Ward, writing some years subsequently, mentions that Carey 'wrote with his own pen the whole of the five volumes.' In 1809, a third edition of the New Testament went to the press, consisting of 100 copies and came out in 1811. It was a folio edition. The fourth edition of the New Testament was commenced in 1813 and published in 1817 (5,000 copies)."

সন্ধান করিলে এইরূপ সাদৃশ্য আরও আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্যামল বর্ম্মা।

চিত্রকরের ভুল

তুলিকাতে হাতটি তাহার পাকা,
রাজার প্রধান চিত্রকরই সেই,
ব্যবসা তাহার প্রতিচ্ছবি আঁকা,
অন্যদিকে খেয়াল বড় নেই।

মর্ম্মরেরি ছবির মত দেহ,
মিশেছে তার রঙের কোমলতা ;
কেউ বা কবি, পাগল বলে কেহ,
বুঝ্‌তে নারি প্রতিভা তার কোথা।

সাগর-বুকে চন্দ্রোদয়ের ছবি
আঁক্‌তে রাজা দিলেন উপদেশ,
আঁক্‌লে ছবি এম্‌নি সে আজ্‌গুবি
নেইক তাতে সুনীল রঙের লেশ ;—

রূপসী এক কুঞ্জবন-ছায়ে
হঠাৎ যেন পেয়ে কাহার দেখা
আঁচলখানি দিচ্ছে টেনে গায়ে,
অধরেতে জাগ্‌ছে হাসির রেখা।

চিত্র দেখে উঠ্‌লো সবাই হাসি',
শিল্পীচোখে অশ্রু এলো ছেয়ে ;
সবাই দিলে বিদ্রূপেরি রাশি,
তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।

আঁক্‌তে হবে দুর্ভিক্ষেরি ছবি,
আজকে রাজার আদেশ হল তাই ;
পাগল সে যে, নূতন তাহার সবই—
চিত্রে ত কই জনমানব নাই ;—

বালুর বেলায় কণ্টকেরি গাছে
মলিন কোরক কাঁদ্‌ছে শিশির মাগি,
পুড়্‌ছে দেহ খর রবির আঁচে,
কাছেই সাগর গর্জ্জে কিসের লাগি।

সভার মাঝে আবার হাসির রোল,
শিল্পীচোখে অশ্রু এলো ছেয়ে ;
সবাই হাসে সবাই করে গোল,
তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।

আঁক্‌তে হবে নিগু্ণেরি ছবি।
এবার নূতন উপহাসের পালা,
শিল্পী সে যে প্রেমিক, সে যে কবি,
বক্ষে তাহার জাগ্‌ছে দারুণ জ্বালা।

মাঠের মাঝে একটি পলাশ-গাছে
ফুল ফুটেছে, কাকগুলা দেয় গালি,
বাসন্তী হায় আসি তাহার কাছে
সিঁথায় পরেন, সাজান বরণডালি।

রাজার সভায় আবার হাসির ঘটা,
শিল্পী এবার রইলো শুধু চেয়ে ;
চক্ষে হানি আনন্দেরি ছটা
তারিফ দিলেন আবার রাজার মেয়ে।

আজকে আবার রাজা দিলেন বলে'
দয়ার ছবি আঁক্‌তে হবে তাকে ;
চিত্রকর হায় পড়্‌লো বিষম গোলে,
কয় না কিছুই, চুপটি করে' থাকে।

অনেক ভেবে অনেক দিবস পরে
আঁক্‌লে ছবি; আঁক্‌লে মনের মত,—
শিল্পী আছে চেয়ে আবেগ ভরে,
মূর্ত্তি দয়ার রাজকুমারীর মত।

সাবাস দিলে সভাসদের দলে,
রাজকুমারী কিন্তু এবার বাম ;
ভুলটি কেটে লিখে দিলেন তলে—
'দয়া' নয় এ, 'প্রেম' যে ইহার নাম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



প্রকৃতির পাঁজি

মাঘ মাস শীতকালের শেষ মাস। এই মাসে সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

মাঘ মাসে কুল পাকে। গোলাপ-ফুল ফোটে। দুটো-একটা আমের গাছে বোল ধরে, দুএকটা কোকিলও ডাকে। এমাসে কুয়াসা বেশী হয়। মাঝে মাঝে মেঘ করে' বৃষ্টিও আসে। এমাসের বৃষ্টি ফসলের পক্ষে খুব উপকারী। মাঘমাসে সর্ষে ক্ষেত হল্‌দে রঙের ফুলে ছেয়ে যায়, মৌমাছিরা সেই ফুলের মধু চাক ভরে' নিয়ে সংগ্রহ করে' রাখে, এই মধু খেতে খুব উপাদেয় হয়।

চশ্‌মা।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়

(৯)

বন-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দূরে একটা হাতী দেখ্‌তে পেলাম, খোলা জায়গা দিয়ে খুব জোরে জোরে চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গিয়ে তাকে শিকার করা খুবই শক্ত; তবুও কাকার জিদ হল তাকে মার্‌তেই হবে। কাকার জিদ হবার কারণও ছিল;—দেখ্‌লাম হাতীটা যেখান দিয়ে গেছে সেখানে বরাবর রক্ত পড়ে' রয়েছে; তাতেই সেটা যে আহত তা বেশ বোঝা গেল, আর সেজন্যে মার্‌তেও দেরী হবে বলে' বোধ হল না।

কাকা বল্‌লেন—চল, চল, ওটাকে এখুনি ধর্‌বো। সিংহটা এসে না জ্বালালে এতক্ষণ ওকে শেষ করে' ফেল্‌তাম। ভাগ্যিস্ তোমরা এসে পড়েছিলে! না হলে সিংহটার হাতেই আমার প্রাণ যেত।

কাকার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চল্‌লাম। দেখ্‌লাম হাতীটার গতি একটু একটু কমে' আস্‌ছে। তবুও পায়ে হেঁটে তাকে ধরা সম্ভব নয় দেখে আমরা যেখানে আমাদের ঘোড়া রেখে গিছ্‌লাম সেখানে টপ্ করে ফিরে এসে যে যার ঘোড়ার পিঠে চেপে চল্‌লাম হাতীর সন্ধানে। খানিক ঘোড়া ছোটাবার পরই হাতীর দর্শন মিল্‌ল। আমাদের দেখেই তিনি শুঁড় উঁচিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের ঘাড়ে পড়্‌বার ইচ্ছা দেখালেন। কাকা সাহস করে' এগিয়ে এসে তাকে গুলি কর্‌লেন। গুলি করেই হাতীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে খানিকটা দূরে সরে গেলেন। তখন আমি ও হ্যারি এসে গুলি কর্‌লাম। হাতীটা কাৎ হল।

কাকা আমায় বল্‌লেন—তুমি তাঁবুতে গিয়ে গরু দুটোকে নিয়ে এস, দাঁত ও মাংস বহে নিয়ে যাবে। আমি ও হ্যারি অপর মরা হাতীগুলোর সন্ধান করি, আর সিংহটাকেও দেখি।

সে জায়গাটা যদিও তখনো আমার খুব পরিচিত হয়নি, তবুও সাহস হল যে পথ চিনে তাঁবুতে ঠিক পৌছতে পার্‌ব। বেরিয়ে ত পড়্‌লাম। খানিক দূর যেতেই এক দল লম্বা-গলা জিরাফের সঙ্গে দেখা। চমৎকার দেখ্‌তে। শিকার করে' করে' মন এমনি হয়ে গিছ্‌ল যে জিরাফ্ মার্‌তে ছুট্‌লাম। হঠাৎ দেখি আমার ঘোড়াটা যেন একটা খানার দিকে টলে' পড়্‌ল। আর একটু হলেই একটা খানায় পড়্‌তাম। খানিক পরে দেখি দুটো জিরাফ্ ধপাস্ ধপাস্ করে' খানায় পড়্‌ল। পেছনে দেখি একদল সেই দেশী লোক বর্শা হাতে শিকার কর্‌তে আস্‌ছে। এরাই জিরাফ্‌গুলোকে তাড়িয়ে এনেছে।

জিরাফগুলো যে গর্ত্তে পড়েছিল সেগুলো প্রায় বারো' ফুট গভীর। কোনোটার সাম্‌নের পা গর্ত্তের ভিতর আর পিছনের পা গর্ত্তের পাড়ে কাদায় পুঁতে গেছে,

কোনোটার বা পিছনের পা গর্তের মধ্যে আর সাম্‌নের পা পাড়ে পুঁতে গেছে; তাদের দেহটা খাল ওপরে নড়্‌ছিল, আর প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা গলা সাপের গলার মত এধার ওধার দুল্‌ছিল। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ওঠ্‌বার জন্যে, কিন্তু বৃথা। শিকারীরা তাদের ঘিরে ফেল্‌লে। শিকারীরাই এই গর্তগুলো করে' ওপরে সরু সরু ডালপালা চাপা দিয়ে রেখে গিছ্‌ল। এগুলোকে জিরাফ্‌ধরা ফাঁদ বলা চলে।

শিকারীদের হাতে জিরাফ ছেড়ে দিয়ে আমি তাঁবুর দিকে চল্‌লাম। খুব সাবধানে চল্‌লাম—কি জানি যদি আমিই জিরাফের সঙ্গে ফাঁদে পড়ে যাই! তাঁবু থেকে গরু নিয়ে কাকাদের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি আরো হাতী হরিণ মারা হয়েছে। হাতীর দাঁত মাংস প্রভৃতি যা পারা গেল সঙ্গে নেওয়া হল।

পরদিন আমরা উত্তর দিকে চল্‌লাম। একটা খোলা জায়গার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লাম একটা যেন জানোয়ার একটা খানার মধ্য থেকে একবার করে' উঠ্‌ছে আবার পড়ে' যাচ্ছে। জন্তুটা কি দেখ্‌বার জন্যে এগিয়ে গিয়ে দেখি সেটা একটা কোয়াগা, প্রায় গাধার মত দেখ্‌তে, কি রকম করে' খানায় পড়েছে, উঠ্‌তে পার্‌ছে না। হ্যারির ঝোঁক চাপ্‌ল কোয়াগাটাকে ধর্‌বে। সে বল্‌লে—দড়ি দিয়ে পা বেঁধে এটাকে টেনে তুল্‌ব। তারপর ঠিক করে' নিলে এটার পিঠে বেশ চড়া যাবে, ঘোড়ার মত হবে।

টোকো আর হ্যারি একটা থলে আর দড়ি নিয়ে এল। থলে দিয়ে টোকো তার মুখটা এঁটে দিলে, তাহলে আর কিছু দেখ্‌তে পাবে না ও কাম্‌ড়াতে পার্‌বে না। তারপর তার গলায় ও পায়ে দড়ি গলিয়ে গাছের গুঁড়ি টানার মত হেঁইয়ো হেঁইয়ো কর্‌তে কর্‌তে সকলে মিলে তাকে তুলে ফেল্‌লাম। কোয়াগা মশাই উঠেই চার পা তুলে নাচ্‌তে আরম্ভ করে' দিলেন। দু এক ঘা পিঠে পড়্‌তে তবে তার আনন্দ থাম্‌ল। তারপর তার পিঠে একটা জিন লাগিয়ে হ্যারি তড়াক্‌ করে' চেপে পড়্‌ল। আমি বারণ কর্‌বার আগেই চেপেই তাকে ছুটিয়ে দিলে। আমার ভয় হল এমন একটা বুনো জানোয়ার শীঘ্র বশ ত মান্‌বেই না, বরং হ্যারিকে ফেলে দিতে পারে। তখন টোকোকে নিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ে' হ্যারির পেছনে পেছনে ছুট্‌লাম।

সাম্‌নে একদল কোয়াগা পড়্‌ল। তারা ত আমাদের দেখেই দে চম্পট। আমরা তাদের পেছনে পেছনে হু হু শব্দে চলেছি। পথে জল-খাত বা ঝরণা কিছু ছিল না। তবে অনেক পাথুরে জায়গা, ঘন বন, ছোট পাহাড়, উপত্যকা প্রভৃতি দিয়ে আমরা চল্‌লাম। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে এল। হ্যারির কোয়াগা কিন্তু তখনো খুব ছুটেছে। তার আত্মীয়-স্বজন ছুট্‌ছে দেখে তার ছোটারও বিরাম নেই। হ্যারিকে যদি এই রকম কর্‌তে কর্‌তে বনের মধ্যে নিয়ে যায় তাহলে তার নিশ্চয় বিপদ ঘট্‌বে। কি করা যায় কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। এমন সময় হঠাৎ এক সুবিধা জুটে গেল। একদল সেই দেশী কালো লোক বর্শা প্রভৃতি নিয়ে কোয়াগাগুলোর সাম্‌নে এসে হাজির হল। তাদের চীৎকারে অন্য কোয়াগাগুলো এধার ওধার ছুট্‌তে লাগ্‌ল। আর হ্যারির কোয়াগাটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সেটা বোধ হয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কালো শিকারীরা কয়েকটা কোয়াগা মেরে আমাদের কাছে এল। হিজিবিজি করে' তারা আমাদের কত কি বল্‌লে। আমরা ত বুঝ্‌লাম না গঙ্গা। টোকো বুঝিয়ে দিলে যে তারা আমাদের দেখে আনন্দিত হয়েছে, আর তাদের গ্রামে যেতে আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌ছে।

তাদের গ্রামে যেতে আমাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছিল, তাঁবুতে ফির্‌তে কষ্ট ও বিপদ হতে পারে ভেবে আমরা গেলাম তাদের গ্রামে। আমরা আগে এখানকার যে-সব কুঁড়ে দেখেছিলাম তার চেয়ে এদের কুঁড়েগুলো বড় ও পরিচ্ছন্ন ছিল। লোকগুলি শিকারী হলেও চাষবাস করে' খেত। গ্রামের পেছনে ফসলের ক্ষেত দেখ্‌তে পেলাম।

মাংস পেয়েই তাদের মেয়েরা রাঁধ্‌তে আরম্ভ করে' দিলে। একটু পরে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক সেখানে এসে জুটে গেল। আমরা আর তাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ না থেকে একটা ঘরে শুয়ে পড়্‌লাম। একটু ঘুমিয়েছি

এমন সময় চারিদিকে ভীষণ কান্না আর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি গ্রামের মেয়েরা সব ছোট ছোট ছেলেদের বিছানা থেকে টেনে এনে লাঠি দিয়ে খুব মার্‌ছে আর ছেলেগুলো কাঁদ্‌ছে। এ নির্দ্দয় প্রহারের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় টোকো বল্‌লে যে ফসলের ক্ষেতে হাতীর পাল এসে পড়েছে, তাই ছেলেদের কাঁদিয়ে আর নিজেরা চীৎকার করে' মেয়ে-পুরুষে হাতী তাড়াবার চেষ্টা কর্‌ছে।

খবরটা আমাদের মন্দ লাগ্‌ল না। এই তালে যত হাতী মারা যায় ততই ভাল। আমরা তখনই বন্দুক নিয়ে হাতী মার্‌তে বেরুলাম। সঙ্গে সেখানকার দু-চারজন লোক নিলাম। তারা আমাদের গাছ দেখিয়ে দেবে আর তাতে উঠে আমরা হাতী মারব। যেতে যেতে দেখি গ্রামের অনেক লোক বেরিয়ে পড়েছে, পুরুষদের হাতে একটা করে' মশাল আর মুখে চীৎকার; তার সঙ্গে মেয়েদের চীৎকার, ছেলেদের কান্না, আর কুকুরের ডাক, সমস্ত মিশে গ্রামটা যেন তোলপাড় করে' তুলেছে। অন্ধকারে আমরা কয়েকটা গাছে উঠে পড়্‌লাম। গাছ থেকে দেখ্‌লাম মশালের আলোয় ও চীৎকারে ভয় পাওয়া দূরে থাক্ লম্বা লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে বনের ঘন অংশ থেকে হাতীরা বেরিয়ে আস্‌ছে। আমরা সাম্‌নের দুটোকে ত গুলি মার্‌লাম। দুটোই পড়্‌ল। দলটা একটু থম্‌কে দাঁড়াল। আমরা আবার গুলি ভরে' নিয়ে আরো তিনটাকে মার্‌লাম। অন্য হাতীগুলো যে বিশেষ ভয় পেলে তা বোধ হল না। দু-একটা চীৎকার করে' উঠ্‌ল। একটু দাঁড়িয়ে তারা আবার এগুতে লাগ্‌ল। আমরা ফের গুলি ভর্‌তে ভর্‌তে কয়েকটা আমাদের কাছ দিয়ে চলে গেল। ক্ষেতের বেড়া ভেঙে ফসল খেতে লাগ্‌ল। আরও তিনটা আমরা মার্‌লাম। একে একে তারা কিন্তু এগিয়েই চল্‌ল। সাম্‌নে কয়েকটা কুঁড়ে ঘর ছিল, পা দিয়ে সেগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল যেন কাগজের ঘর। টোকো বল্‌লে এরকম হাতীর অত্যাচার অনেকবারই ঘটে। লোকদের অত্যধিক চীৎকারে গ্রামের আর বেশী কিছু তারা নষ্ট কর্‌তে পার্‌লে না।

দলটা যখন প্রায় চলে' গেল তখন আমরা গাছ থেকে নেমে তাদের পেছনে পেছনে চল্‌লাম। পেছনে থেকেও কয়েকটাকে শেষ কর্‌লাম। কটা ঠিক বলা যায় না, কেন না অন্ধকারে বুঝ্‌তে পারা গেল না।

ফিরে যখন গ্রামে এলাম তখন দেখি গ্রামের লোকেরা ফসলের ক্ষতি হওয়ার জন্যে দুঃখ কর্‌ছে। ভোর হতেই আমরা কাকাদের কাছে গিয়ে মরা হাতীর খবর দিলাম। তাঁরা আনন্দিত হয়ে গাড়ী নিয়ে সেই গ্রামের দিকে এলেন। গ্রামবাসীরা আমাদের খুব আপ্যায়িত কর্‌লে। খুব ভদ্র তারা। ফসল যেমন নষ্ট হয়েছিল তেমনি তারা হাতীর মাংস নিয়ে ক্ষতি পূরণ কর্‌ছিল। দেখ্‌লাম প্রায় সকলেই খানিকটা করে' মাংস ঘরের সাম্‌নে টাঙিয়ে রোদে শুকোতে দিয়েছে। তা থেকে এক বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল।

হাতীর দাঁতে আমাদের গাড়ী প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেল। আর একদিন ভাল রকম শিকার কর্‌তে পার্‌লেই এবারকার মত আমাদের কাজ মিটুবে দেখা গেল। তাই আমরা সেখানকার লোকদের বল্‌লাম তারা যদি হাতীর পালটা কোন্ দিকে গেছে খবর এনে দিতে পারে তাহলে আমরা তাদের পুরস্কার দেব।

সেদিনও রাত্রিতে আমরা ঘুমিয়েছি এমন সময় কড় কড় করে' ভীষণ বাজ পড়্‌ল। আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম আমাদের তাঁবুর কাছেই গ্রাম থেকে লোকেরা খুব চীৎকার কর্‌ছে। আমরা বেরিয়ে পড়্‌লাম। যে দিক থেকে আওয়াজ আস্‌ছিল সে দিকে গিয়ে দেখি গ্রামের সব পুরুষরা তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, আর যেমনি বিদ্যুৎ জ্বলে উঠ্‌ছে অমনি তারা মেঘের দিকে তীর ছুঁড়্‌ছে।

তাদের এই অদ্ভুত কাজের উদ্দেশ্য কি তা আমরা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। টোকো বল্‌লে—তীর মেরে মেঘ তাড়িয়ে দেবে এই ওদের বিশ্বাস। তাই ওরা এরকম কর্‌ছে।

আমরা লোকগুলোর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে না হেসে থাক্‌তে পার্‌লাম না। খানিক বাদে ঝড় বৃষ্টি কেটে গেল। অসভ্য লোকরা হয়ত ভাব্‌লে তাদের তীরের খোঁচা খেয়েই বাদল পালাল।

পরদিন দুপুর বেলা আমরা খবর পেলাম প্রায় আট মাইল দূরে হাতীগুলো বেড়াচ্ছে। সেই দিকে রওনা হওয়া গেল। হাতীগুলো যে দিকে চর্‌ছিল তার অপর দিকে একটা জলাভূমি ছিল। তাইতে আমরা ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম আর কোয়াগাটাকে একদিকে বেঁধে রাখ্‌লাম। তারপর গাছে উঠে বা বনের আড়ালে লুকিয়ে যে-যার জায়গা ঠিক করে' নিয়ে হাতী মার্‌তে আরম্ভ করা গেল। অনেক চেষ্টার পর কয়েকটা হাতী মর্‌ল, বাকিগুলো পালাল।

পরদিন দুপুর বেলা কয়েকটা পাখী মারা হল, তাই আহার করা গেল। ঘোড়াগুলো ও কোয়াগাটাকে আন্‌তে গিয়ে দেখি তারা বেশ চরে' বেড়াচ্ছে। কোয়াগাটার দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যাবে কি না এসম্বন্ধে হ্যারি আর আমি কথা বলাবলি কর্‌ছি এমন সময় দেখি ঘোড়াগুলো হঠাৎ লাফালাফি করে' এধার ওধার ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

ব্যাপার কি ?—বলে' হ্যারি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

হঠাৎ দেখি একটা এঁদো খানা থেকে দুটো প্রকাণ্ড গণ্ডার বেরিয়ে এসেছে। তাদের জলায় ঘোড়াগুলাকে দেখে তাদের বোধ হয় রাগ হয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি সরে না এলে তাদের শিংএর খোঁচায় শেষ হয়ে যেতাম। ঘোড়াগুলো পালাল। কোয়াগা বেচারা পালাতে পার্‌লে না। একটা গণ্ডার তেড়ে এসে শিং দিয়ে তার পেট ফুঁড়ে তাকে একেবারে মাটিতে গেঁথে ফেল্‌লে। আমরা কোয়াগাটাকে বাঁচাতে পার্‌লাম না। তবুও দুজনে বার বার গুলি করে' একটা গণ্ডারকে মার্‌লাম। অপরটা আমাদের তাঁবুর দিকে ছুট্‌ল। আমরা ভাব্‌লাম এবার তাঁবুর জিনিষপত্র ও গাড়ী প্রভৃতি সব লণ্ডভণ্ড করে' দেবে। ভাগ্যক্রমে তা আর হল না। টোকো বেরিয়ে এসে কয়েকটা গুলি করে' সেটাকে মার্‌লে।

সেদিন বিকালটা আমাদের খুব আনন্দে কাট্‌ল। বাঘের চাম্‌ড়া, গণ্ডারের শিং, আর হাতীর দাঁত আমাদের প্রচুর হয়েছিল ;—গাড়ী একবারে ভর্ত্তি। এবারকার যাত্রায় আর-কিছু নেওয়া অসম্ভব হবে দেখে আমরা মরুভূমি ত্যাগ কর্‌লাম। ধীরে ধীরে দলবল নিয়ে সমুদ্রের দিকে চল্‌লাম। ওয়াল্‌ফিস্ উপসাগরে পৌঁছে সব মালপত্র জাহাজে চাপিয়ে আমরা জননী জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লাম—"বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী।"

শেষ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

দুষ্টলোকের চালাকি

১৮ শতাব্দীর শেষদিকে, ফ্রান্সের আরাস্ সহরে এক রুটিওয়ালা থাক্‌তো—তার নাম ছিল ভিডক্। ভিডক্ রুটিওয়ালার নাম এখন আর কারো মনে নেই। কিন্তু তার এক ছেলে, তার নাম ছিল ছোট ভিডক্, অনেকদিন হল মরে গিয়েও বেঁচে আছে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড সে কতকগুলো করে' গেছে যে এখনও ঐ দেশের লোকে তাকে ভুল্‌তে পারেনি। আর পার্‌বে বলেও মনে হয় না। বাবা ছিল খুব ভাল, কিন্তু তার ছেলে হল তেমনি পাজী। তার বয়স আট বছর হতে না হতেই সে নানারকম বদমাইসিতে হাত বেশ পাকিয়ে ফেল্‌লে। ছেলেবেলায় তার কপালে বাবার আদর কোনো দিন জোটেনি, তা পেলে সে বোধ হয় ভাল হতে পার্‌ত। আদরের বদলে সে রোজই প্রায় দু-চার ঘা বেত পেত। রাস্তায় যাচ্ছে সে বাবার দোকানের রুটি নিয়ে বিক্রি কর্‌তে—মাঝখানে হঠাৎ দেখ্‌ল, দুটো মুরগী, বেশ বড় বড়। অম্‌নি সে সেই দুটো ধরে' তার এক বন্ধু চোরের বাড়ীতে নিয়ে গেল বিক্রি কর্‌তে। সুবিধা পেলেই সে চুরি কর্‌বে, এ তার এক চমৎকার অভ্যাস হয়ে গেল। যখন তার চুরি খুব বেড়ে উঠ্‌ল, তখন একদিন সে ধরা পড়ে' মাস কয়েকের জন্য জেলখানায় বাস করতে গেল। লোকের মনে হয়েছিল যে এবার বোধহয় বাছাধন ঘানি টেনে ঠিক হয়ে আস্‌বেন। কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে'—ভিডকেরও ঠিক তাই হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে পাকা চোর হয়ে দাঁড়াল। আগে তার মনে একটু ভয় ডর ছিল, এখন তাও একেবারে গেল।

এক রাত্রে সুবিধামত সে তার বাবার টাকার থলিটি ট্যাঁকে করে' নিয়ে, বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়্‌ল। তারপর কয়েকমাস সে কখনও থিয়েটারের দলে, কখনও সার্কাসের

দলে, কখনও পুতুল-নাচের দলে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল। কোথাও সে বেশী দিন থাকতে পারল না। তারপর একদিন আবার সে বাড়ী ফিরে এল। তখন তার কাপড়-চোপড় সব ছেঁড়া, ময়লা। খেতে না পেয়ে শরীর তার একেবারে মরার মত, মাথার চুল তেল-জল না পেয়ে আগাছার মত হয়ে উঠেছে। তার মা তাকে বড় ভালোবাসত, তাই এতদিন পরে বাড়ী এসে ভিডক্ মায়ের স্নেহ এবং আদর খুব বেশী করেই পেল।

কিছুদিন বাড়ী থাকার পর ভিডক্ ধরা পড়লেন পুলিসের হাতে। বেচারা দোষ কিছু করেনি, কিন্তু নাম খারাপ ছিল বলে' পুলিস তাকে ধরল, তার বিরুদ্ধে সাক্ষীর কমতিও হল না। তার আবার জেল হল। এমন অন্যায় রকমে জেল হওয়াতে ভিডকের বড় রাগ হল। সে জেল থেকে পালাবার মতলব করল।

ভিডক্ একটি মেয়েকে বড় ভালোবাসত। সে একদিন জেলখানায় এসে ভিডককে একটা ছদ্মবেশ দিয়ে গেল। পরদিন ভিডক্ এই স্ত্রীলোকের বেশ পরে' বেশ গম্ভীরভাবে জেল থেকে একেবারে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রাস্তায় গিয়ে তার ভয়ানক চা খেতে ইচ্ছে হল, সে এক চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। বেচারী আরাম করে' একটু চা খাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ চারজন পুলিস ভিডকের খোঁজে সেখানে হাজির! তারা দোকানে আসতেই ভিডক্ হাসতে হাসতে বললে, "কি! তোমরা বুঝি সেই পাকা চোরটাকে ধরতে এসেছ? তা তোমরা একটা কাজ কর, এই পাশের ঘরটাতে লুকিয়ে থাক—ওলোকটা এখুনি এখানে চা খেতে আসবে।" পুলিস চারজন খুব বুদ্ধিমান ছিল। তারা খুব চটপট সেই একটাও-জানলা-নেই ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভিডক্ অমনি দুয়ারটি বেশ করে বাইরের থেকে বন্ধ করে' দিয়ে বলল, "ওহে বন্ধুগণ, তোমরা বিশ্রাম কর, আমিই ভিডক্—আপাতত চল্লাম, আশা করি পরে আবার দেখা হবে—নমস্কার!" এই বলেই ভিডক্-বাবু সেখান থেকে দৌড় দিলেন।

কয়েকদিন পরে সত্যিই আবার ভিডকের সঙ্গে সেই চারজন পুলিসের দেখা হল। এবার তারা বেশী বুদ্ধিমানের মত কাজ না করে' তাকে একেবারে সোজাসুজি গারদে বন্ধ করে' রাখল। জেলখানার কালো অন্ধকার ঘরে বসে' বসে' সে পালাবার পথ ভাবছে, এমন সময় দেখতে পেল আর-একজন তার মত ভাগ্যবান লোক সেই ঘরে বসে' আছে। সে ঘরের এক কোণে একটা সুড়ঙ্গ কাটছে। তার মতলব হচ্ছে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে একেবারে নদীর ধারে গিয়ে পড়বে। তারপর নদীর জলে পড়ে' সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে গিয়ে উঠবে। দুঃখের বিষয় সুড়ঙ্গটা একটু বেশী গভীর হয়েছিল। সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হবা মাত্র তা দিয়ে হু হু করে' নদীর জল, একেবারে জেলখানার ঘরে এসে পড়ল। বন্ধু দুজন ঘরের মধ্যেই খুব সাঁতার কাটতে লাগল। একটু পরে জেলার-বাবু এসে তাদের উদ্ধার করলেন।

জেল থেকে খালাস পাওয়ার কয়েকদিন পরে বেচারি কি-একটা দলিল জাল করে' আবার ধরা পড়ে। এবার জেলখানায় এসে তার একটি বন্ধু লাভ হল। বন্ধু ভিডকের অনেক আগে থেকে সেখানে বাস করছিল। সে দেওয়ালে একটা সিঁদ কাটছিল। দেওয়াল ফুটো হতে আর খুব কমই বাকি ছিল। যখন দেওয়াল কাটা শেষ হল, ভিডক্ তার মধ্যে দিয়ে বার হতে চেষ্টা করল। তার কপাল বড় খারাপ ছিল, তাই কোমর পর্য্যন্ত গিয়ে আটকে গেল। তখন ভিডক্ না পারে এদিকে আসতে, না পারে ওদিকে যেতে। সে একটু মোটা ছিল। যাক—দুজন সিপাই এসে তাকে টেনে হিঁচড়ে কোনো রকমে বার করল। বেচারার প্রাণ তখন একেবারে যাবার মত অবস্থায়।

যেদিন তার বিচার হবে সেদিন তাকে আর তার সঙ্গে আরো জন কয়েক কয়েদিকে জেল থেকে বার করে' কোর্টে নিয়ে গেল। সেখানে বিচার হবার আগে কয়েদিদের বাইরের একটা ঘরে বসিয়ে রাখা হল। একজন পুলিস তার বড় লম্বা কোটটা আর মাথার টুপীটা খুলে রেখে চলে' গেল। পুলিসটা যাই বেরিয়ে গেল, ভিডক্ অমনি তার কোটটা আর টুপীটা পরে' আর-একজন কয়েদির হাত ধরে' যেন তাকে বিচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে এমনি ভাবে বেরিয়ে গেল। কেউ তাকে একটু সন্দেহও করল না।

এমনি ভাবে আরো কিছুদিন দেশের লোকদের জ্বালাতন করে' শেষে ভিডকের শাস্তি হল ভয়ানক।

এবার তাকে আর দেশে রাখা হবে না, অনেক দূরের এক জেলখানায় পাঠানোর বন্দোবস্ত হল। সেখানে দেশের যত মহা মাতব্বর চোর বদমাইসের স্থান। ভিডক্‌কেও সেইখানে যেতে হবে। শাস্তি পেয়ে এবার তার মন সত্যিই তার মায়ের জন্যে কেঁদে উঠ্‌ল। তার ত মায়ের কথা মনে পড়ে' তখন চোখ থেকে জল পড়্‌ছিল। সেখানে গিয়ে ভিডকের মন আরো ভেঙে গেল। বেশী দিন থাক্‌লে বোধ হয় সে পাগল হয়ে যেত। দিন রাত তাদের পায়ে পনেরো সের ওজনের শিকল বাঁধা থাক্‌তো—আর সেই শিকল পায়ে নিয়ে তাদের হাড়ভাঙা মেহনত কর্‌তে হত। ভিডক্ একজন বন্ধুর সাহায্যে একটা উখা, একটা নাবিকের পোষাক আর একটা পরচুলা জোগাড় কর্‌ল। সেইগুলো পরে' আর উখার সাহায্যে একরাতে পায়ের শিকল কেটে দৌড় দিল কাছাকাছি একটা সহরে। কিন্তু সহরে গিয়ে তার মহা বিপদ হল। সহরের-বার-হবার গেটে একজন পাহারাওয়ালা থাকে, সে একটা পুরানো চোর। তার চোখ এড়ানো শক্ত। সে লোকটা লোকের চলন দেখে বল্‌তে পার্‌ত সে চোর কি না। অনেক ভেবে চিন্তে ভিডক্ তার কাছে গেল বেশ সোজা হয়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে। তাকে গিয়ে বল্‌ল—"ভাই হে একটা লণ্ঠন দাও ত, আমায় একবার ঘাটে যেতে হবে।" পাহারাওয়ালা কোন রকম সন্দেহ না করে' তাকে একটা লণ্ঠন দিল; লণ্ঠন কৌশলে লুণ্ঠন করে' ভিডক্ সহরের সীমানা পার হয়ে গেল।

দুর্ভাগ্য ভিডকের পিছনে পিছনে চলেছে। কিছুদিন পরে আবার তার জেল হল। এবার সে কোনো অপরাধ করেনি। জগতে একবার যার নাম খারাপ হয়, তার সুনাম কিন্‌তে বড় দেরী হয়, এমন কি অনেক সময় আর ভালোনাম সে কিন্‌তেও পারে না। এবারও সে জেল থেকে পালাল।

বাড়ী গিয়ে তার মাকে একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হল। সে নিজের দেশে গেল। ভিডক্ মাকে খুব ভালোবাস্‌ত। দেশে ফিরে দেখ্‌ল, সেখানে চারিদিকে পুলিশ ঘুর্‌ছে তাকে ধর্‌বার জন্য। বেচারা হল্যাণ্ডের দিকে দৌড় দিল। পথে পুলিসের জাল পাতা ছিল। তাতে ভিডক্ ধরা পড়ে' আবার ভীষণ শাস্তি পেল। কিন্তু জেল-খানার দেওয়াল আর পায়ের লোহার শিকল কেটে পালানো যেন ভিডকের পক্ষে ছেলেখেলার মত হয়েছিল। এবারও সে উখার সাহায্যে পায়ের শিকল কেটে জেলখানার দেওয়াল ভেঙে আবার পথে এসে পড়্‌ল।

এবার পালাতে পালাতে ভিডক্ একদল ডাকাতের মধ্যে এসে পড়্‌ল। সে দায়ে পড়ে' তাদের সঙ্গে কিছুকাল একটা জঙ্গলের মধ্যে ছিল। একদিন একজন ডাকাতের টাকার থলি চুরি যায়। ভিডক্ নূতন লোক বলে' তাকেই সবাই সন্দেহ করে। তার গায়ের সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলেও টাকার থলি পাওয়া গেল না যদিও, তবু ভিডকের কাঁধের দাঁগ দেখে সবাই তাকে পাকা দাগী চোর বলে' চিন্‌তে পার্‌ল। দলের সর্দার হুকুম দিলেন—ভিডক্‌কে গুলি করে' মারা হবে। যখন তাকে গুলি কর্‌বার সব বন্দোবস্ত হয়েছে, তখন সে কানে-কানে সর্দারকে কি একটা কথা বল্‌ল। সর্দার তার উত্তরে বল্‌ল—বেশ, তাই হোক। তারপর সে একবোঝা খড় বেশ সমান করে কাটাল। সর্দারের হুকুম-মত দলের সবাই তখন সার দিয়ে দাঁড়াল। সর্দার তারপর সবাইকে ডেকে বল্‌ল—তোমরা প্রত্যেকে একটা করে' খড় টেনে নাও। যার খড় সবচেয়ে ছোট হবে, সেই টাকার থলি চুরি করেছে। খড়টানা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে, দলের একজন পুরানো লোকের ভাগ্যে সবচেয়ে ছোট খড়টা পড়েছে। সে বেচারা চোর হল। ভিডক্ খালাস পেল বটে, কিন্তু তাকে দল থেকে বার করে' দেওয়া হল। ডাকাতের দলে চোর থাক্‌বে কেমন করে'—এ যে বড় অন্যায়!

ডাকাতের দল ছেড়ে দিয়ে ভিডক্ নানা রকমের কাজ করেছিল। একবার সে মাঝখানে সৈন্যদলে ঢুকেছিল। তাতেও বেশ নাম কিনেছিল। যদি টিকে থাক্‌তে পার্‌ত তবে বোধ হয় সেখানে তার বেশ উন্নতি হত। কিন্তু তার ভাগ্যে কোথাও একটু স্থির হয়ে বস্‌বার কথা ছিল না। পল্টনের কাজ ছাড়ার পর সে প্যারিসে গিয়ে দরজীর দোকান কর্‌ল। সেখানে তার মা এসে তার সঙ্গে যোগ দিল।

বেচারা অনেকবার জেলখাটার পর একটু শান্তি পাবার চেষ্টা কর্‌ছিল—দেশের পুলিস তা হতে দিল না। কোনো

কারণ নেই, হঠাৎ একদিন তার দোকানে এসে তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।

ভিডকের প্রাণ একেবারে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। এবার সে ঠিক করল সে পুলিসের দলে নাম লেখাবে, আর চিরকাল চোর বদমাইস্‌ ধরার কাজেই থাকবে।

প্যারিসের পুলিসের কর্ত্তাকে ভিডক্‌ তার ইচ্ছা জানাল। তিনিও রাজি হলেন। কিন্তু হঠাৎ ত আর একটা দাগী চোরকে ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে' তাকে মুক্তি দেওয়া হল। একদিন লোকে দেখ্‌ল যে ভিডককে শিকল দিয়ে বেশ করে বেঁধে কোথায় নিয়ে যাওয়া হল। তার দুদিন পরে হঠাৎ সহরের লোকে জান্‌তে পার্‌ল যে ভিডক্‌ একটা জঙ্গলের মধ্যে পাহারাওয়ালার হাত থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। আসলে কিন্তু তাকে পুলিস জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। যাক—কয়েক দিন পরে ফিরে এসে গোপনে সে পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নিল। এখন থেকে তার একমাত্র কাজ হল যত সব নামজাদা চোর আর বদ্‌মাইসদের ধরা।

এমনি ভাবে সে আছে। এমন সময় একদিন তার এক নিমন্ত্রণপত্র এল সেণ্ট্‌জারমেন্‌ নামে একজন নামজাদা সিঁদেল চোরের কাছ থেকে। এই চোরটি আবার বেশ শিক্ষিত, সহরের অনেক আড্ডাতে বেশ আদর সম্মান তার ছিল। সবচেয়ে সেরা গুণ ছিল তার—অতি প্রখর বুদ্ধি। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে ভিডক্‌ তার বাড়ী গেল। সেখানে গিয়ে সে শুন্‌ল যে সেই রাত্রেই তারা একটা ব্যাঙ্ক লুট করবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। বেচারা ভিডক্‌ বড় বিপদে পড়্‌ল, কেমন করে' পুলিসকে খবর দেবে। অথচ যদি পুলিসকে খবর না দেয়, তবে ধরা পড়্‌লে পুলিস তার কোনও ওজর শুনবে না—তাকে আবার জেল খাট্‌তে হবে। একটু ভেবে সে বল্‌ল—"দেখ আমার বাড়ীতে ভাল মদ আছে—আমি গিয়ে নিয়ে আসি—।" সেণ্টজারমেন্‌ কাঁচা লোক নয়, সে বল্‌ল, "বেশ কথা বলেছ—তুমি একটা চিঠি লিখে দাও আমি লোক পাঠাচ্ছি।" কি করে, বেচারা একটা চিঠি লিখে দিল। লোকটা যখন চলে গেল—ভিডক্‌ বসে' বসে' তার স্ত্রীকে আর একখানা পত্র লিখ্‌ল—"একটু পরে তুমি আমাদের পেছনে এসো। রাস্তায় যখন আমি একটা চিঠি ফেলে দেব, তুমি সেটা নিয়ে, থানায় দিয়ে আসবে।" একটু পরে তার স্ত্রী মদের বোতল নিয়ে এল। বোতল নেবার সময় এক ফাঁকে ভিডক্‌ পত্রখানা স্ত্রীর হাতে গুঁজে দিল। তার স্ত্রী চলে গেল।

যখন সমস্ত আয়োজন শেষ হল, তখন ভিডক্‌ বল্‌ল, "ওহে তোমরা সবাই ব্যাঙ্কটা দেখেছ বটে, কিন্তু আমারও একবার দেখা দরকার নয় কি?" তখন সর্দ্দার জারমেন্‌ তাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্ক দেখ্‌তে গেল। ব্যাঙ্ক দেখে ফির্‌বার পথে ভিডকের পেন্সিলের দরকার হওয়ায় সে একটা দোকানে পেন্সিল কিন্‌তে গেল। দোকানে চট্‌ পট্‌ একখানা কাগজে পুলিসকে কিছু লিখে নিল। পথে চল্‌তে চল্‌তে সেখানা রাস্তার পাশে ফেলে দিল। ভিডকের স্ত্রী কাছেই ছিল, সে কাগজখানা নিয়েই একেবারে পুলিসের ভুঁড়িওয়ালা কর্ত্তার কাছে গিয়ে হাজির হল।

রাত্রে সেণ্ট জারমেন্‌ দল সমেত ধরা পড়্‌ল। একটু আধটু বন্দুকও চলেছিল। এতদিন পরে ভিডক্‌ পুলিসের কাছে একটু আদর পেল। আহা! বেচারা! অনেক কষ্ট সহ্য করেছিল, তার পুরস্কার পেল।

এই সময় ফ্রান্সে কসাকদের আস্‌বার ভয় ক্রমশ বেড়ে উঠ্‌ছিল। সেই ভয়ে একজন লোক তাদের পাড়ার এক বুড়ো খুব ভালো পাদ্‌রীর সঙ্গে পরামর্শ করে' একটা গর্ত্তে তাদের সমস্ত রূপোর বাসন-কোসন টাকা-কড়ি, সব পুঁতে রাখ্‌ল। দিন চারেক পরে লোকটা বুক চাপ্‌ড়ে মারা যাবার জোগাড়;—গর্ত্ত খুঁড়ে কে সব নিয়ে গেছে! পুলিস অনেক করেও চোর ধর্‌তে পার্‌ল না। বুড়ো পাদ্‌রী বড় ভাল লোক, সে কি আর চুরি করতে পারে! একথা মনে করাও মহাপাপ! ভিডকের উপর ভার পড়্‌ল, যেমন করেই হোক চোর ধর্‌তে হবে।

ভিডক্‌ প্রথমেই পাদ্‌রীকে জেলখানায় পাঠাল। তার পর একটা ফেরিওয়ালার বেশ ধরে' পাদ্‌রীর বাড়ীতে গেল পুরানো জিনিষ কিন্‌তে। কিছুই পেল না। বুড়ী বড় চালাক। তারপর ভিডক এক মজা কর্‌ল—নিজেও কয়েদীবেশে জেলখানায় গেল। সেখানে গিয়ে সে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে' পাদ্‌রীর সঙ্গে বেশ ভাব কর্‌ল। কথায় কথায় বল্‌ল—"দেখ ভাই! এবার আর দেশে থাক্‌ছি না, এবার

যদি পালাতে পারি, তবে জার্ম্মানি পালাবো। আমার একটা জঙ্গলে কিছু সম্পত্তি পোঁতা আছে। তা বিক্রি করলে বেশ কিছু টাকা পাব—কেয়া আরামে থাকবো।" পাদ্রী বেচারা বিশ্বাস করে' তাকে অনেক কথা বল্‌ল। শেষরাত্রে তারা দুজনে জেল থেকে পালাল। জঙ্গলে গিয়েই তাড়াতাড়ি পাদ্রী একটা ঝোপ থেকে একটা কোদাল বার করে' দিল। তাই দিয়ে ভিডক্ একটা জায়গা খুঁড়ে কতকগুলো টাকা-কড়ি বার কর্‌ল। সেগুলো অবশ্য পুলিসের লোকে পুঁতে রেখেছিল। তারপর আর অবিশ্বাস না করে' পাদ্রী কোদালখানা হাতে নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ঝোপের তলায় মাটি খুঁড়ে সেই-সব বাসন-কোসন টাকা-কড়ি বার কর্‌ল। তারপর আর কি—বেচারা পাদ্রীকে আবার জেলে ফিরে যেতে হল। পাদ্রীর যখন শাস্তি হল, সে বল্‌ল, "ওর চেহারা দেখে ভালমানুষ মনে করেছিলুম—ও যে এমন তা কে জান্‌ত।"

প্রায় ২০ বছর ধরে' ভিডক্ এই কাজ করে' প্রায় কুড়ি হাজার নিরীহ চোরদের সর্ব্বনাশ করেছিল। তারপর সে প্যারিসের এক গোয়েন্দাদলের কর্ত্তা হয়। কিন্তু এত বড় কাজ সে দেশের জন্য কর্‌লেও, তবু সে যে এককালে খারাপ ছিল লোকে তা ভুলতে পার্‌ল না। তাকে দেশের লোক কোনোকালে ক্ষমা করেনি। শেষে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে গেল। সেখানে গিয়ে সে নিজের জীবন সম্বন্ধে অনেক গল্প বল্‌ত। লোকে তার গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে একেবারে অবাক হয়ে যেত। তার গল্প বলার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে হাঁ করে' চেয়ে তার কথা শুন্‌তো। সে গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে পোষাকও বদল কর্‌ত। কখনও কয়েদির বেশে, কখনও নাবিকের বেশে, কখনও দর্জ্জীর রূপে, কখনও মেয়ের পোষাকে তাকে খুব চমৎকার মানাত। ভিডকের ৮২ বছর বয়স হলে, সে মারা যায়। মরণকাল পর্য্যন্ত তার অর্থকষ্ট কোনো দিন হয়নি। লণ্ডনে গল্প বলে' সে অনেক টাকা উপায় করেছিল। ভিডকের চরিত্রে কতকগুলি ভালো জিনিষ ছিল, কিন্তু সুবিধা না পেয়ে তারা প্রকাশ হতে পারেনি। সে হয়ত খুব বড় একজন সৈনিক কর্ম্মচারী হতে পার্‌ত। কিন্তু সে জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়েছিল—দেশের পাজী এবং বদ্‌মাইস লোকদের সঙ্গে। দেশের ভালো লোক তার সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, কাজেই তাকে বাধ্য হয়ে খারাপের সঙ্গেই থাক্‌তে হয়েছিল। তার ভাল না হওয়ায় জন্য তার দেশ অনেক পরিমাণে দায়ী।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

ছোট্ট সবুজ পাখী

ছোট্ট সবুজ পাখী,—
তাজা তৃণের সবুজ-কুচি
কাঁপিস্ হাওয়া লাগি!
নয়া বেতের থোপার সবুজ,
দূর্ব্বা-দেবীর খোঁপার সবুজ,
সবুজ—প্রথম-পল্লবিত
শিশু অশথ্ শাখী,
কোন্ সবুজে নীড় বেঁধেছিস্?
ছোট্ট সবুজ পাখী!

ছোট্ট সবুজ পাখী,—
ছোট্ট সবুজ পরীর মত
নাচিস্ থাকি থাকি!
ছায়া-দীঘির জলে যেয়ে
তুই কি পাখী আস্‌লি নেয়ে,
আসার বেলা শ্যাম শেহেলা
অঙ্গে বিলেপ মাখি?—
সব সবুজের সেরা সবুজ
ছোট্ট সবুজ পাখী!

ছোট্ট সবুজ পাখী,—
কচি প্রাণের কাঁচা পুলক
মূর্ত্তি নিলি নাকি!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মহিলা-মজলিস



স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে মহিলা

ইংলণ্ডে আগে মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের মতনই ছিল—মেয়েদের একটু লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াই অভিভাবকেরা দায় খালাস মনে করিতেন। ছেলেদের সমান শিক্ষা মেয়েরাও পাইবে এমন কথা দেশের মেয়েপুরুষ কেউ ভাবিতেও পারিত না। মেয়েরা যে লাটিন ভাষা বা অঙ্ক শিখিবে এমন কথা মনে করাও লজ্জার ও নিন্দার কারণ ছিল। কুমারী ফ্রান্সেস্ মেরী বাস্ দেশের এই অস্বাভাবিক দুরবস্থা প্রথম হৃদয়ঙ্গম



ফ্রান্সেস মেরী বাস্।

করেন এবং তিনি সম্পন্ন ধনীকন্যা হইয়াও স্ত্রীশিক্ষাদানে ও প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর চেষ্টায় দশ বৎসরে ৪৫টি দানপুষ্ট বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৬৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে সম্মত হন। তাঁর জীবনের সাধনার মন্ত্র ছিল—"বোনদের সব ভাইদের সমান করিয়া ছাড়িব!" তিনি ইংলণ্ডের নারী-বুদ্ধিকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিয়া দেশকে কুসংস্কারমুক্ত ও সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট হইয়া উন্নত হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজের কৃতকর্ম্মের ও চেষ্টার সফলতা দেখিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে ১৮৯৪ সালের বড়দিনের আগের দিনে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

নারী-প্রগতি

১৯২০ সালের নূতন মিউনিসিপাল ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে মান্দ্রাজের বহু নারী ভোট দিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে এজন্য আলাদা করিয়া নারী-কেন্দ্র গঠন করা প্রয়োজন হইয়াছিল, বেলারী ও তাঞ্জোর মিউনিসিপালিটির নারী ভোটারদের প্রায় তিনচতুর্থাংশ, তাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া সাধারণ কেন্দ্রগুলিতেই দলে দলে গিয়া ভোট দিয়া আসিয়াছিলেন।

জাপানের হিগাসী, উওাগুণ ও এহিমেকেন্-এ নারী দমকল-দল গঠিত হইয়াছে। তিনটি শহর হইতে ৪০০ নারী এই দলগুলিতে যোগ দিয়াছেন। আগুন নিবানোর কাজে সাধারণ দমকলওয়ালাদের সঙ্গে একযোগে ইঁহারা কাজ করিবেন।

ওয়াশিংটনের নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সে মার্কিন প্রতিনিধিদলের পরামর্শ-সমিতিতে (advisory committee) ৪জন মহিলা পরামর্শদাত্রী নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের নাম:—মিসেস ক্যাথারিন্ ফিলিপ্‌স্ এড্‌সন, মিসেস্ টমাস্ উইণ্টার, মিসেস্ চার্ল্‌স্ সামার বার্ড, মিসেস্ ইলিয়নর ফ্রাঙ্ক্‌লিন এগান।

সুইডেনের পার্লামেণ্টে চারজন নারীসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ব্রাজিলের রিয়ো জানেইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা



ও পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত কাজই এখন হইতে মেয়েরা করিতে পারিবেন।

ডাক্তার শ্রীমতী এল্সী রিৎটের অষ্ট্রিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিয়োজিত হইয়াছেন।

গত বৎসর অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা মিউনিসিপালিটি চারজন নারীকে স্কুল-পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উঁহারা এমন আশ্চর্য্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন যে ভিয়েনার সমস্ত স্কুলগুলিরই পরিদর্শকের কাজে নারীদের নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গত ৬—৮ অক্টোবর কলোনে জার্ম্মানীর জাতীয় নারী মহাসভার দ্বাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ নারীদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় এই প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হয়:—১। (ক) বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কোনও সমস্যার মীমাংসা, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই সম্মতি ব্যতীত হইতে পারিবে না। (খ) সন্তানদের উপর পিতার যে যে বিষয়ে যতখানি অধিকার, মাতারও সেই সেই বিষয়ে ঠিক ততখানি অধিকার থাকিবে। (গ) স্বামী স্ত্রী উভয়েই পারিবারিক আয়-ব্যয়-বিভাগের উপর সমান কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন, তা তিনি বাহিরে রাজকাজই করুন বা গৃহে গৃহকর্ম্মই করুন। (ঘ) সন্তানদের শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার সুযোগ বাড়াইতে হইবে।

২। রাইষ্টাগে শিশুহিত সম্বন্ধে একটি বিল উপস্থিত করিয়া শীঘ্রই উহা কাজে পরিণত করিতে হইবে। এই কাজে নারী-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সাহায্য লওয়া হইবে।

৩। সমস্ত রাজকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে নারীদের যে-সমস্ত বাধা ও অবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়িতে হয় সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সমান শ্রমে নারী শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরির প্রথা প্রভৃতিরও প্রতিবাদ হয়। স চ।

*

মাদাম কুরির নূতনউপহার

বিখ্যাত নারী-বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরি (রেডিয়াম্ আবিষ্কারক) আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে গিয়া বহু সম্মান এবং উপহার লাভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল সেখানে তিনি কতকগুলি বই উপহার পাইয়াছেন। মাদাম কুরির আমেরিকা আগমন লইয়া খবরের কাগজে যত কিছু লেখা বাহির হইয়াছে—এই বইগুলি সেই-সব খবরের কাগজের "কাটিং" লইয়া বাঁধান হইয়াছে। বইগুলি ১১ খণ্ডে ভাগ করা—প্রত্যেকখানি ২১ ইঞ্চি লম্বা, ১৪ ইঞ্চি চওড়া, ৩½ ইঞ্চি মোটা। প্রত্যেক খণ্ড মরক্কো চামড়ায় বাঁধান। মাদাম কুরি এই উপহার পাইয়াছেন—"ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রেডিয়াম্ কর্পোরেশন্ অব্ নিউ ইয়র্কের" নিকট হইতে।

*

প্রজাপতির চাষ

ফ্রান্সের মেন প্রদেশে একজন মহিলার একটি প্রজাপতির কারবার আছে। এই মহিলার মুরগীর কারবার আছে এবং তাহা হইতে তাঁর যথেষ্ট আয় হয়। প্রজাপতির কারবারে যদিও আয় কম, তবুও মহিলাটির এই বিষয়ে একটা নেশা আছে। তিনি প্রজাপতির কারবার করিয়া তাঁর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এবং গ্রামের অন্যান্য লোকদের প্রজাপতি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মাইয়াছেন। তিনি যখন প্রথম এই কারবার আরম্ভ করেন, তখন জঙ্গল হইতে প্রজাপতির গুটি খুঁজিয়া আনিতেন। তাঁহার প্রজাপতি-খোঁয়াড়ে কেবল প্রজাপতির জন্মটুকুই হইত। কিন্তু এখন তাঁহার প্রজাপতি-খোঁয়াড়ে প্রজাপতির ডিম পাড়া হইতে, সেই ডিমের নানা রকম অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করা পর্য্যন্ত সমস্তই হয়। ভদ্রমহিলাকে আর প্রজাপতির গুটির জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মাঠে ঘাটে এবং বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। প্রজাপতির ডিমে তা দিবার জন্য ছোট ছোট কাঠের বাক্স আছে—এই বাক্স লম্বায় ২ ফুট, চওড়ায় ১ ফুট এবং উচ্চতায় ১ ফুট। এই বাক্সের ছাদ এবং পাশ তারের জাল দিয়ে ঘেরা। বাক্সের নীচে মস্, খোয়া বা মাটি থাকে। এক এক প্রকারের প্রজাপতির গুটির জন্য এক এক প্রকারের বন্দোবস্ত প্রয়োজন হয়। বাক্সের উপরে একটি দুয়ার থাকে—এই দুয়ার দিয়া গুটি ভিতরে রাখা হয়।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রজাপতি-চাষ করার সব-চেয়ে বড় অসুবিধা হইতেছে গুটিপোকাদের ধরিয়া রাখা। গুটিপোকারা বড় চঞ্চল—সব সময় যেখানে সেখানে চলিয়া যাইবার মতলব আঁটে, একটু সুবিধা পাইলে হয়, অমনি তাহার টিকি দেখা ভার হইবে। তবে গুটিপোকা একবার গুটির ভিতর প্রবেশ করিলে আর কোন ভয় নাই। গুটির মধ্যে গুটিপোকা একেবারে অচেতন হইয়া নিদ্রা দেয় বা প্রজাপতি হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

প্রজাপতি গাছের পাতায় এবং ডালে ডিম পাড়ে। কোন কোন প্রজাপতি একবারে অনেকগুলি ডিম পাড়ে, আবার কোন কোন প্রজাপতি একবারে একটি মাত্র ডিম প্রসব করে। মাতা-প্রজাপতির মনে স্নেহ-মমতা আছে। সে ডিম পাড়িয়া তাহাতে তা দেয়। এই সময় খুব নজর রাখিতে হয়। ডিম গুটিপোকা হইলে তাহাকে গাছের ডালে ছাড়িয়া দিতে হয়। গাছের ডালে আবার এই পোকা গুটি বাঁধে। গুটিপোকাদের গাছের ডালে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কৌশল বা মন্ত্রটি ভদ্রমহিলা কাহাকেও বলিতে চান না—হয় ত মরিবার সময় তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে শিখাইয়া যাইবেন। তারপর গুটিকে নির্দ্দিষ্ট বাক্সে বন্দী করা হয়। এই বন্দীশালায় প্রজাপতি-জন্ম লাভ করিয়া তাহার মুক্তি হয়।

এই প্রজাপতিগুলিকে কাঠ বা কাগজের তক্তার উপর আল্‌পিন দিয়া বিদ্ধ করিয়া আট্‌কান হয়, এবং বিক্রয় করা হয়। এই ভদ্রমহিলা পৃথিবীর আরো অনেক স্থান হইতে প্রজাপতি আমদানী করিয়া বিক্রয় করেন। তাঁহার কাছে এমন কতকগুলি প্রজাপতি পাওয়া যায় যাহা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

*

রাশিয়ার প্রধান নারী

কিছুদিন পূর্ব্বে লুইস্ ব্রায়াণ্ট নামে এক ভদ্রমহিলা মস্‌কাও সহরে ম্যাডাম লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

পূর্ব্বে রাশিয়ার কমিশারদের (জেলার শাসনকর্ত্তা) পরিবারবর্গ বড় আনন্দে এবং সুখেই বাস করিত। তাহাদের অবস্থা কতকটা আমাদের দেশের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের মত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাশিয়ার প্রত্যেক লোকের সমান অধিকার। তাহাদের বাড়ীর অভ্যন্তরের অবস্থার মধ্যেও কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। কমিশারের স্ত্রীকেও সাধারণ লোকের মত, এমন কি অনেক স্থলে সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। লেনিনের স্ত্রী নাড্‌জেডা কন্‌ষ্টান্টিনোভা ক্রুপ্‌স্‌কায়ার (Nadejda Constantinova Krupskaya) শরীর খুব ভাল নয়। কিন্তু তিনি দেশের এবং দশের জন্য এমন ভীষণ পরিশ্রম করেন যে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এখন তাঁহার প্রধান কাজ হইয়াছে দেশের অশিক্ষিত বয়স্ক লোকদের শিক্ষিত করা। তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। কেবল মাত্র মস্‌কাও সহরেই ৮০০০০০ লোক শিক্ষিত হইয়াছে। রাশিয়ার লাল পল্টনে এখন শতকরা ৭৬ জন লেখা-পড়া জানা। আর যখন 'জার' রাশিয়ার একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন তখন শত করা ৮৫ জন ছিল না-লেখা-পড়া-জানা। আমাদের ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য যে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছেন এবং যে কার্য্যের জন ৫৬৩৩ টাকা মাসিক বেতনে বাঙ্গলা দেশে বিশেষ করিয়া একজন মহামতি মন্ত্রীও নিযুক্ত হইয়াছেন, রাশিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট অ-শিক্ষা রাক্ষসীকে দূর করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে সেখানের অ-শিক্ষা রূপ ম্যালেরিয়া দূর করিতে অনেক পরিমাণে সফলও হইয়াছেন। লুইস্ ব্রায়াণ্ট ম্যাডাম লেনিনের সঙ্গে যখন দেখা করিতে গেলেন, দেখিলেন তাঁহার ঘরের সামনে একজন সৈনিক বন্দুক-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখটি বেশ হাসিতে ভরা—তাহার মনটিও বেশ সরল। ম্যাডাম লেনিন খবর পাইবা মাত্র বাড়ীর বাহিরে আসিয়া অতিথিকে, তাঁহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরম আদরে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের বাস করিবার জন্য তাঁহারা মাত্র দু-খানি ঘর লইয়াছেন। একখানি শুইবার ঘর, আর-একখানি খাইবার এবং ভাঁড়ার ঘর। মস্‌কাওএ এখন বড় স্থানাভাব। কাজেই দেশের

প্রধান ব্যক্তি হইয়া তাঁহারা দুখানির বেশী ঘর লইবেন কেমন করিয়া ? ঘরের মধ্যে আস্‌বাব-পত্রের বাহুল্য নাই। কয়েকখানি চেয়ার। একটি বইয়ের আলমারি। ঘরের কাজের জন্ত কোন চাকর নাই। রান্না-বান্নার কাজ তিনি নিজেই করেন।

বর্ত্তমান সময়ে রাশিয়ার বিদ্রোহী দলের প্রধান চেষ্টা হইতেছে Capitalism অর্থাৎ মহাজনী ব্যাপারটাকে একেবারে চিরকালের মত নষ্ট করা। কিন্তু ইহার প্রতিকূলে Modified Capitalism স্থাপন করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। ম্যাডাম্ লেনিন্ এ বিষয়ে বলেন—আমার কাছে এই Capitalism এবং Modified Capitalism-এর মধ্যে একটা মাঝামাঝি পথ পাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বছর পূর্ব্বে রাশিয়াতে কোন প্রকার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মতের পরিবর্ত্তন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এই মহা-বিদ্রোহের পর আমার কাছে রাশিয়াতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না-হবার-মত বলিয়া মনে হয় না। তবে এ পরিবর্ত্তন যে তাড়াতাড়ি হইবে তাহা বলিতে চাই না। বিদ্রোহের মধ্যে আমরা যে সত্যকে লাভ করিয়াছি তাহা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। Capitalism এবং Modified Copitalism এর মিলন হওয়া শক্ত, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমার এ মিলনের আশা আছে, এবং এ আশা ব্যর্থ হইবার নয়।

নারী জ্যোতিষী

মিস্ অ্যানি ক্যানন্ নামে এক আমেরিকান মহিলা একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। এই পুস্তকে ৭০০,০০০ নক্ষত্রের নাম এবং আমাদের পৃথিবী হইতে তাহারা কতদূরে তাহার বর্ণনা থাকিবে। এই মহিলা ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ডেলাওয়েরে ডোভার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিনটি নূতন তারা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি হার্বার্ড অবজার্‌ভেটারির অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল ফটোগ্রাফ্‌স্‌এর কিউরেটার। এই ভদ্রমহিলার একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, ইনি কোন একটা তারার আলো দেখিয়াই পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব কত বলিয়া দিতে পারেন।

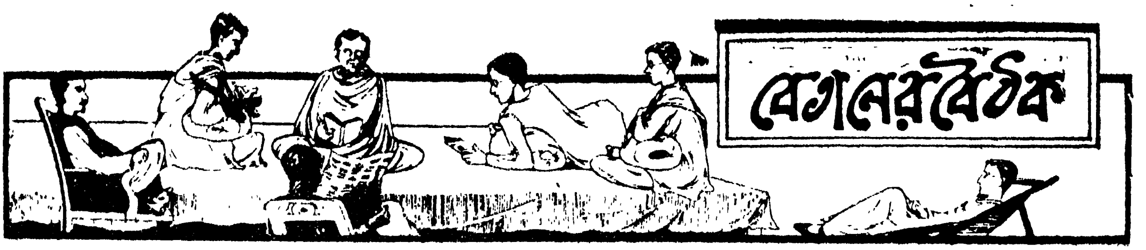
চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে নারী

'Our Home' নামক পত্রিকাতে প্রকাশ যে এবার চ্যারিংক্রস্ হস্‌পিট্যাল মেডিক্যাল স্কুলের সতেরোটি পুরস্কারের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ছাত্রীরা লাভ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং ছাত্রীদের সকল বিষয়ে সমান অধিকার। মিস্ মৈরি জোয় আটন সতেরোটি পুরস্কারের মধ্যে নয়টি পাইয়াছেন। মিস্ গেণ্ডোলিন মেরি লাভ করিয়াছেন তিনটি। ছাত্রগণ পাঁচটি পুরস্কার পাইয়াছেন। পুরুষ নারীর অপেক্ষা উঁচু আসন পাইবার যোগ্য—এই মত যাঁহারা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহারা একবার এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-প্রাপ্ত ছাত্রীদের দিকে দৃষ্টি দিলে, একটা নূতন কিছু শিখিতে পারিবেন।

পুলিসের কাজে নারী

গত যুদ্ধের সময় মহিলা-পুলিসের প্রথম চলন হয়। গত ১৫ই জুন ক্যাক্‌টন্ হলে একটি নারী-সভা হয়। এই সভাতে লেডী অ্যাষ্টর বলেন যে মহিলা-পুলিস এখন আর পরীক্ষার ভিতর নাই। মহিলা-পুলিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন পুরুষ পুলিসের মতই কার্য্যকরী হইয়াছে। ইংলণ্ডে কামাণ্ডাণ্ট অ্যালান প্রথম উদ্দীপরা নারী-পুলিস। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগত মিস্ ড্যামার ডসন প্রথম নারী-পুলিসের সৃষ্টি করেন। এখন ১৫০০ শত নারী পুলিসের সমস্ত কার্য্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমেরিকাতে এখন স্বতন্ত্র মহিলা পুলিসের দল আছে। ইংলণ্ডের মত আমেরিকাতেও প্রথম এই প্রথার চলন করিবার সময় বিস্তর বাধা ও আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আজ আমেরিকার অনেকগুলি সহরে নারী, পুলিসের সকল কার্য্যই করিতেছে। ওয়াসিংটন সহরের মহিলা-পুলিসের প্রধান-কর্ম্মচারীও একজন নারী। তাঁহার নাম মিনা ভ্যান উইঙ্কিল। সেখানের নারী-সমাজ কেবল ঘরের বাহিরে আসে নাই, ঘরের বাহিরের সমস্ত কাজেই পুরুষের সমান কাজ করিতেছে।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।



জিজ্ঞাসা

(১০২)

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধাপুকা নামক গ্রামে মৃত্তিকাগর্ভে পুরাতন দালানের ভগ্নাবশেষ এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। উহার ঐতিহাসিক বিবরণ কেহ প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র আচার্য্য।

(১০৩)

নারিকেল হইতে কি উপায়ে অল্প আয়াসে তৈল বাহির করা যায়। কাহারও জানা থাকিলে জানাইবেন।

শ্রীউষাবালা গুহ।

(১০৪)

কোনও লেখা চোখের যতই সাম্‌নে আনিয়া পড়িতে চেষ্টা করা যায়, উহা ততই অস্পষ্টতর হইয়া উঠে; ইহার কারণ কি?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(১০৫)

গৌড়াধিপ হোসেন সাহের রাজত্বকালে "ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শকে" বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়। উক্ত সাঙ্কেতিক শকের অর্থ কি?

প্রিয়দাসী ঘোষ।

(১০৬)

শান্তিপুরের পূর্ব্বে অন্য কোন নাম ছিল কি না জানিতে ইচ্ছা করি। শান্তিপুর নাম কতদিনকার?

শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল।

(১০৭)

আদিশূরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণের মধ্যে 'বাৎস্য'-গোত্রীয় 'ছান্দড়'ও একজন। তাঁহার পদবী কি ছিল?

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

(১০৮)

চীনা বা জাপানী বেতের জিনিসের উপর যে পাকা রং ফলান থাকে তাহা কি উপায়ে হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি? Glaze হয় কি প্রকারে?

শ্রীফণিভূষণ দত্ত।

(১০৯)

তামা, পিতল, বা জার্ম্মান-সিল্‌ভারের পাতের নিব্‌ তৈয়ারী করিবার কল কোথায় পাওয়া যায়? সেই নিব তৈয়ারীর সহজ ব্যবস্থা কি? উহার জন্য যন্ত্রপাতির দৌকানদার কাহার কাছে পাওয়া যায়? ছুঁচ, আল্‌পিন প্রভৃতির সুলভ কোন কল আছে কি না এবং কোথায় কি দামে পাওয়া যায়? Cover, খাম প্রভৃতি কাটিবার যন্ত্র কোথায় প্রাপ্তব্য?

শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত।

(১১০)

পদার্থে পদার্থে আঘাত কিম্বা ঘর্ষণ করিলে শব্দ হয় কেন এবং পাত্র-ভেদে বিভিন্ন প্রকার শব্দ ঘটিয়া থাকে কেন?

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন।

(১১১)

দেবতার মন্দিরে ধন্না দেওয়া অথবা ৺তারকেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দেওয়া বলে। "ধন্না" বা "হত্যা" শব্দ ঐ অর্থে প্রয়োগ হইবার অর্থ কি?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(১১২)

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম নাটক কি? ইহার রচয়িতা কে এবং ইহা কোন্ সনে প্রকাশিত হয়?

"সুফি"

(১১৩)

কেবল আচার্য্য রামানুজ বা মাধবের টীকা অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায় কোন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আছে কি না? থাকিলে তাহা কাহার দ্বারা অনুবাদিত ও তাহার প্রাপ্তিস্থান কোথায় ও মূল্য কত?

শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম।

(১১৪)

আজকাল স্বদেশীর যুগে অনেকেই চর্‌কায় সূতা কাটিয়া সেই সূতায় কাপড় বোনাইতেছেন। কিন্তু রং স্থায়ী করিবার উপায় না জানায় বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে কাপড়ের পাড়ের জন্য বিলাতী রঙ্গিন (কল্‌) সূতা ব্যবহার করিতে হইতেছে। এমন কোন স্থায়ী রং আছে কি যাহা দ্বারা সূতা গাবাইলে সেই সূতার রং উঠিয়া যায় না, বরাবর একরূপই থাকে?

শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১৫)

মহামুনি বাল্মীকির পিতার নাম চ্যবন;—মাতার নাম কি? চ্যবন মুনি কয়টি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন? দুই বা ততোধিক হইলে, বাল্মীকি কাহার গর্ভজাত? তাঁহার মাতার পরিচয় কি?

শ্রীঅবন্তীভূষণ পাল।

মীমাংসা

(৩৫)

লাক্ষা চাষ

লাক্ষা হইতে অধুনা আর রং প্রস্তুত হয় না, ইহার পরিষ্করণ (Refine) প্রথায় বিশেষজ্ঞ অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশ, আসাম, বেহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপন্ন হয়।

বৎসরে দুইবার করিয়া লাহার চাষ করিতে হয়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিকে লাহা কর্ত্তন করিতে ও লাহার বীজ লাগাইতে হয়।

প্রকৃতির উপর অর্থাৎ দেশের জল-বায়ু ও বর্ষার জন্য স্থানবিশেষে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। উপরোক্ত সময়ে লাক্ষা-কীট পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয়। কীট পূর্ণ বয়স উপস্থিত হইলে তাহারা পুরাতন বাসা হইতে বাহির হইয়া নূতন বাসা প্রস্তুত করিবার জন্য গাছের সরু

সরু ডালের মধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। কীটের এই ভাব পরিলক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই বীজের জন্ম (Seed Lac) গাছ হইতে লাক্ষা কর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। লাক্ষা-কীট (Larva Coccadi) অতি ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ। এত ক্ষুদ্র যে সম্পূর্ণ অবয়ব অর্থাৎ তাহার হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক।

গাছ হইতে লাহা কর্ত্তন করিয়া যে ঘরে রাখা যায় সেই ঘর লাক্ষা-কীটে পরিপূর্ণ হয়। লাক্ষা যে ঘরে রাখা যায় সেই ঘর আবির-রঞ্জিত বলিয়া ভ্রম হয়।

লাহা, গাছ হইতে কর্ত্তন করিয়া যে দিবস আনা যায়, সেই দিবস হইতে ৫।৬ দিবস পর্য্যন্ত লাক্ষা-কীট বীজের উপযোগী থাকে। ৫।৬ দিন মধ্যে গাছে না লাগাইলে বীজের (Seed Lac) ক্ষতি হইবে। এই লাক্ষা হইতে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত জীবিত লাক্ষা-কীট দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তৎসমুদয় এত দুর্ব্বল হইয়া যায় যে উহারা গাছে গিয়া বাসা অর্থাৎ লাহা প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয় না। সবল ও সুস্থ কীট বীজরূপে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে বীজ (লাহা) গাছে লাগান যায় তাহা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়; এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে যে বীজ গাছে লাগান হইবে, তাহার লাহা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। প্রথমোক্ত-কালোৎপন্ন লাক্ষাই দেশময় প্রচুর আমদানী হয়। জেঠুয়া অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের লাহা সকল প্রদেশে সমান হয় না; এ দেশে উহা অতি সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বীজের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বীজ-লাহা সংগ্রহের ৫।৬ দিন মধ্যে গাছে লাগাইতে হইবে। লাহার পোকা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলে ঠিক ঐ সময় অতি সাবধানে লাহা-সহ গাছের ছোট ছোট ডালগুলিকে কর্ত্তন করিয়া গুদাম-ঘরে যত্নসহকারে রাখিতে হইবে। খুব প্রাতে বা অপরাহ্নে যখন রৌদ্রের তেজ কম থাকে তখন বাঁশের খাঁচায় বীজ-লাহা ভরিয়া ঐ খাঁচা লাক্ষা-উৎপাদক বৃক্ষে সাবধানে বাঁধিয়া বা ঝুলাইয়া দিতে হয়। কোন কোন প্রদেশে বাঁশের খাঁচায় বীজ-লাহা না দিয়া ঝুড়িতে ভরিয়াও গাছে ঝুলাইয়া দিয়া থাকে। অতিশয় কোমল ও রক্তবর্ণ পরমাণু-সদৃশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাক্ষা-কীট উহা হইতে বাহির হইবে ও তাহারাই ভবিষ্যতে লাহা প্রস্তুত করিবে। বীজ (লাহার) মধ্যে লাক্ষা-কীট ৫।৬ দিন সতেজ ও কার্য্যক্ষম থাকে বটে, কিন্তু বৃক্ষ হইতে বীজের খাঁচা ১০।১২ দিনের পূর্ব্বে নামাইয়া আনা কর্ত্তব্য নয়। বীজ-লাহা ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত উৎপাদক বৃক্ষে রাখিয়া তৎপর আনিয়া বিক্রয় করার জন্য বাজারে পাঠান যায়। এই বীজ-লাহা অন্য কোন শত্রুতে নষ্ট না করিলে মণকরা দশ-বার সের মাত্র ঘাট্‌তি (কম) হইবে। পক্ষান্তরে কাঁচা লাহা অর্থাৎ সদ্য সদ্য বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনীত লাহা যে দরে বিক্রয় হইবে, এই পাকা অর্থাৎ শুক্‌না লাহা তদপেক্ষা অনেক অধিক দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। পলাশ, অশ্বথ, পাইকর, কুসুম, ঢন, কুল ও অড়হড় প্রভৃতি বৃক্ষে উৎকৃষ্ট লাহা জন্মে। উপরোক্ত বৃক্ষ ব্যতীত কৃষিবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকে আরও অনেক লাক্ষা উৎপাদক বৃক্ষের নাম আছে। শাল, লিচু, সুকতা-পাতিয়া, ও নেউরী প্রভৃতি বৃক্ষেও অল্পাধিক পরিমাণে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। গারো পর্ব্বতে পার্ব্বতীয় গারোগণ যে উৎকৃষ্ট জাতীয় লাক্ষা বিক্রয় করিয়া থাকে তাহা প্রায় সুকতা-পাতিয়া নামক বৃক্ষেই উৎপন্ন করে। এই গাছ পাইকর, পলাশ, বট প্রভৃতির ন্যায় একবার রোপণ করিলে বহু বৎসর জীবিত থাকে। ইহার বোটানী (Botanic) নাম কি তাহা অনেক চেষ্টাতেও স্থির করিতে পারি নাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহ তাহা জানাইলে বাধিত হইব। বিভিন্ন বৃক্ষের জন্য বিভিন্ন জাতীয় লাক্ষা-কীট বীজরূপে দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নাই। যে-কোন বৃক্ষের উৎপন্ন লাক্ষা বীজরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে অড়হড় প্রভৃতি কোন কোন বৃক্ষে সমজাতীয় বীজ লাগাইলে অত্যধিক ও আশানুরূপ লাক্ষা উৎপন্ন হয়।

অসম জাতীয় বীজ এক বা দুইবার লাগাইলেই Cultivation দ্বারা সমজাতীয় হইয়া যায়। গাছের পুষ্টতা অনুসারে (Growth) প্রতি গাছে এক পোয়া হইতে অর্দ্ধ মণ পর্য্যন্ত লাহা বীজ স্বরূপ (Seed Lac) দিতে হয়। কত বড় কিরূপ বৃক্ষ এবং উহাতে কি পরিমাণ বীজ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা অভিজ্ঞতার দ্বারাই ক্রমে নির্দ্ধারণ হইবে। বীজ-লাহা কিছু কিছু অপচয় হয়। সদ্য কর্ত্তন করিয়া যে লাহা গাছ হইতে গৃহে আনা যায় তাহাকে কাঁচা লাহা বলে। ইহার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্তবর্ণ রস থাকায় ওজনে ইহা ভারি হয়। এই লাক্ষা হইতেই রং প্রস্তুত হইত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম রঙের প্রভাবে আমাদের এই রঞ্জন-শিল্প লোপ পাইয়াছে।

লাক্ষা চাষ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ভারতে অপর কোন প্রাদেশিক ভাষায় যে এতদ্‌বিষয়ে কোন পুস্তক আছে তাহাও বোধ হয় না। ইংরেজী ভাষায় বহু পুস্তক আছে।

লাক্ষা চাষ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কাহারও কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে যথাসাধ্য লিখিত বিষয়ের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

নিম্নে লাক্ষা চাষ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরেজী পুস্তকের নাম দেওয়া গেল।

1. The Indian Forest Memoirs, Vol. I, Part III, By E. P. Stabbing, P.I.S., etc.
2. Lac and Lac Cultivation, By D. N. Avasia.
3. A Note on the Lac Insect (Tachardia Lacca), Its Life History, Vol. I, Part III A, By E. P. Stabbing.
4. The Indian Forest Memoirs, Vol III, Part I, By A. D. Imm and N. C. Chatterjee.
5. The Cultivation of Lac in the Plains of India, (Tachardia Lacca, Kerr), By C. S. Mirra.
6. Note on the Chemistry and Trade of Lac By Puren Singh.
7. Note on the Lac Industry of Assam, By B. C. Bose, Bulletin No. 6.

শ্রীতিলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ।
Po. Lakhipur
Dt. Goalpara
(Assam.)

(৬৭)

কাগজ হইতে কালীর দাগ তোলা

পি, এম, বাগ্‌চীর শিল্প-প্রস্তুত-প্রণালীতে এইরূপ লেখা আছে—"সোডা, সোহাগা ও নিশাদল একত্রে পেষণ করিয়া কাগজে মাখাইলে লিখিত অক্ষর উঠিয়া যায়"।

শ্রীলালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬৮)

/৭

অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসীর" বেতালের বৈঠকে "/৭" ইহার দুইরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। /৭র আরও একরূপ ব্যাখ্যা শুনা গিয়াছে, সে ব্যাখ্যাটিও অগ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয় না। "/৭" ইহার মানে ১০৮ সংখ্যা অর্থাৎ ১০৮ কড়াতে একপণ সাত গণ্ডা হয়।

হিন্দুদের অষ্টোত্তর-শত-সংখ্যক জপের বিধি আছে, অনেকে বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ জপের মালায় সংখ্যা ১০৮ রাখিয়া থাকেন। /৭ এইটি ঈশ্বর-বাচক নামের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয় যথা /৭শ্রীশ্রীহরি ও /৭শ্রীশ্রীদুর্গা, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা লেখক আশা করেন যে আমার ১০৮বার শ্রীশ্রীহরি ও শ্রীশ্রীদুর্গা লেখার ফল লাভ হইবে।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি।

প্রাচীন ভারতে /৭ এই চিহ্ন মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হইত। পত্রের উপরি-ভাগে একটি অঙ্কুশের ন্যায় চিহ্ন; মধ্যে বিন্দুচিহ্ন ও নিম্নে সপ্তাঙ্ক লিখা থাকিত। তাহার নীচে "স্বস্তি" এই কথাটি লিখিয়া সুন্দর গদ্য আরম্ভ হইত। 'শ্রী' শব্দের ব্যবহারও ছিল। সংস্কৃত শ্লোকটি এই—

"অঙ্কুশং প্রথমং দদ্যাৎ মঙ্গলার্থং বিচক্ষণঃ
মধ্যে বিন্দুসমাযুক্তং অধঃ সপ্তাঙ্কসংযুতম্।
তদ্ অধঃ স্বস্তি বিন্যস্য ততো গদ্যং সুশোভনম্
ততঃ শ্রীশব্দরূপাণি পদন্যাসক্রমং লিখেৎ।"

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(৭৯)

বেঙ্গলা

এদেশে আগত পর্তুগিজদের মধ্যে বেন্‌গালা (Bengala) নামে এক সমৃদ্ধিশালী বণিক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে, বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসেন। উহা তাঁহার নামানুসারে 'বেঙ্গলা' নগরী বলিয়া কথিত হয়। উহা হইতেই প্রদেশের নাম 'বাঙ্গালা দেশ' হয়। কালক্রমে 'বেঙ্গলা' নগরীর নাম 'ঢাকা' হয়। উহার ভগ্নাবশেষরূপে এখনও ঢাকাতে 'বাঙ্গালা-বাজার' নামক একটি স্থান আছে। ঢাকা অর্থাৎ বেঙ্গলা নগরী যখন সুবিস্তৃত ছিল, তখন তাহার একাংশের নাম ছিল 'ফিরিঙ্গি-বাজার'। ইহা হইতে ফিরিঙ্গি-সংস্রব সুস্পষ্ট হইতেছে। এই স্থান ঢাকার অনতিদূরে আজও বিদ্যমান আছে। সুতরাং 'বেঙ্গলা' নগরী ঢাকার পূর্ব্ব নাম।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টশালী।

(৮৩)

প্রাচীন ভারতে ও মুসলমান-জগতে অবরোধ

প্রাচীন ভারতে আর্য্য হিন্দুদিগের মধ্যে "অবরোধ প্রথা" ছিল। অযোধ্যার রাজান্তঃপুরচারিণীগণকে "অসূর্য্যম্পশ্যা" বলা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, রামায়ণযুগে হিন্দুসমাজে আমাদের পর্দ্দার কাছাকাছি অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে ভারতবর্ষে এই প্রথা স্ত্রীলোকের জন্য মুসলমান রাজত্বের আদি হইতে প্রচলিত আছে। তা ছাড়া ইসলাম ধর্ম্মের ভিত্তি মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরানেও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি "ঘরে আটক" হইয়া থাকার স্পষ্ট আদেশ আছে।

সুরা "আহজাব" মধ্যে খোদাতায়ালা আমাদের মহামান্য পয়গম্বর সাহেবের (ছঃ আঃ) স্ত্রীগণের প্রতি আদেশ করিতেছেন :—

"………এবং তোমরা আপন আপন ঘরের মধ্যে আটক হইয়া থাক।" ইত্যাদি।

এই আদেশ অন্যান্য সমস্ত মুসলমান নারীগণের প্রতিও বর্ত্তিয়াছে। এক সময়ে হজরত পয়গম্বর সাহেবের (ছঃ আঃ) বাড়ীতে এক অন্ধ আসিয়াছিলেন। অন্ধ বলিয়া মাননীয়া হজরত আয়েসা (রাজিঃ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। ইহাতে হজরত কারণ জিজ্ঞাসিলে বিবী সাহেবা বলিয়াছিলেন, "সে অন্ধ।" তাহাতে হজরত বলিলেন, "সে ত অন্ধ, তুমিও কি অন্ধ? তুমি ত তাহাকে দেখিতেছ!"

ইহাতে প্রমাণ হয়, স্ত্রীলোক নিজেও কোন পরপুরুষ দেখিবে না, কোন পুরুষকেও নিজের রূপ দেখাইবে না ইহাই হজরত মহম্মদের উদ্দেশ্য ছিল।

"সৌভাগ্য-স্পর্শমণি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঠিক এইরূপ ভাবের আর-একটি উক্তি মহামাননীয়া, হজরত রসুলের (ছঃ আঃ) কন্যা বিবী ফতেমা খাতুনের মুখে প্রকাশ আছে, যথাস্থানে তাহা দ্রষ্টব্য।

মোহাম্মদ গোলাম হোছেন।

(৮৫)

কলিঙ্গ

প্রাচীন ভারতের পূর্ব্ব উপকূল প্রায় সমস্তটাই কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; পরে তাহা তিন ভাগে ভাগ করা হয়—উত্তর কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ ও দক্ষিণ-কলিঙ্গ। এই তিন ভাগের নাম হয় ত্রিকলিঙ্গ। ত্রিকলিঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ ত্রৈলঙ্গ, তেলেঙ্গা, তেলেগু, করিঙ্গ। বর্ম্মায় এখনো মাদ্রাজী মাত্রেই করিঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কলিকাতায় কলিঙ্গা বাজার আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর কলিঙ্গদেশের চৌহদ্দি ঐ পুস্তকে এইরূপ পাওয়া যায়—

দক্ষিণে বিজয়ীহাট, বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর, শত কোশ বাট॥

গোলাহাট রসুলপুর নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গঞ্জ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কলিঙ্গদেশকে কাঁসাই ও ধামরাই নদীর মধ্যবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলার অংশ স্থির করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আমারও বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মোটামুটি মেদিনীপুর জেলাকেই কবিকঙ্কণ কলিঙ্গ দেশ মনে করিয়াছিলেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিঙ্গ প্রাচীন ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। ভারতের সেই প্রাচীন যুগে কলিঙ্গ বলিতে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমকূলের অধিকাংশ স্থানই বুঝাইত।

মহাভারতের মতে গঙ্গাসাগরের পর হইতেই কলিঙ্গ দেশ আরম্ভ। উড়িষ্যার "বৈতরণী" নদী মহাভারত অনুসারে কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। মহাভারতের এই মতের সহিত "টলেমীর" মতের বেশ মিল আছে। (Indian Antiquary, XIII, 363-)

কবিবর কালিদাসের "রঘুবংশ" পড়িলে বুঝিতে আর বাকী থাকে না যে তাঁর আমলে উৎকলের দক্ষিণ দিকে কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। তিনি উৎকল ও কলিঙ্গ নামে দুটি পৃথক রাজ্যের পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় দেখা যায় যে তিনি কলিঙ্গ জয় করিয়া দক্ষিণ দেশে অগ্রসর হইতে না হইতে কাবেরী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই বর্ণনা কলিঙ্গজনপদের সনাক্ত ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে প্রকাশ যে জগন্নাথের পূর্ব্বদিক হইতে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গদেশ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ মতটির সহিত বেশ সামঞ্জস্য রহিয়াছে রঘুবংশের মতের। পুণ্যশ্লোক মহারাজ অশোকের অনুশাসনেও উল্লেখ রহিয়াছে যে তিনি কলিঙ্গদিগকে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক হিউএনসাং কলিঙ্গদেশে ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন কলিঙ্গ ও বর্ত্তমান গঞ্জাম-ভিজাগাপত্তন প্রদেশ প্রায় পুরাপুরি অভিন্ন। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে চীনা পরিব্রাজকের কলিঙ্গ ও কবি কালিদাসের কলিঙ্গ অবস্থান হিসাবে অভিন্ন।

কোল্‌ব্রুক সাহেব বলেন যে কলিঙ্গ জনপদ গোদাবরীতটপ্রদেশেই বর্ত্তমান ছিল (Essays, II, 1791)। Hultzsch's South Indian Inscriptions প্রকাশ করে যে প্রাচীন কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল।

দশম ও একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে চালুক্যরাজগণের শাসনাধীনে কলিঙ্গরাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গদেশের দক্ষিণ অংশ "তেলিঙ্গা"। "তেলিঙ্গা" শব্দের মূল লইয়া যতই মতভেদ থাকুক না কেন উহা যে কলিঙ্গের অংশবিশেষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কলিঙ্গের বর্ত্তমানে আর কোন চিহ্ন নাই। সে রাজ্য ও তার গৌরব স্বপ্নসম লুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থ "কলিঙ্গপত্তন" ও গোদাবরীর মোহানাস্থিত "করিঙ্গ" নগর কালের প্রহরীর হাত এড়াইয়া সেই অতীত যুগের "গজসাধন" "কলিঙ্গ" রাজ্যের জীর্ণস্মৃতি জাগাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে।

সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে একথা বেশ জোর করিয়াই বলা যায় যে উৎকল ও কলিঙ্গ অভিন্ন নয় এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণ দিকেই কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্য বিস্তৃত ছিল। তবে একথাও ঠিক যে কলিঙ্গগণ এক সময় উৎকল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং সেই কারণেই কোথাও কোথাও উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ অনেকটা অভিন্ন এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

(৮৬)

বাঙ্গলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র

'বেঙ্গল গেজেট' ও উহার সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য (১৬১৬ খ্রীঃ)। S. K. De প্রণীত Bengali Literature in Nineteenth Century পুস্তকের ২৩৬ পৃঃ দেখুন।

সৈ, ম, আ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে "সমাচারদর্পণ" নামক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান নামক জনৈক খৃষ্টান মিশনরীর সম্পাদকতায় শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। ইনিই "দিগ্‌দর্শন" নামক বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

মহম্মদ খলিল রহমান।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় ১৮১৬ খৃঃ অঃ প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "বেঙ্গল গেজেট" কে "বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাদ্রী জে, লঙ্‌ সাহেব (ইনি দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন) ১৮৫৫ খৃঃ অঃ প্রকাশিত তাঁহার "Descriptive Catalogue of Bengali Books"-এও উক্ত বেঙ্গলগেজেটকে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই মাসের প্রবাসীর ৫০৫ পৃষ্ঠায় ২য় কলম দেখুন।

প্রবাসীর সম্পাদক।

(৮৮)

চোখের পাতা টিপে দেখা

চোখের ভিতরের রেটিনার সাহায্যেই আমরা দেখতে পাই। রেটিনার চারদিকে অনেক নার্ভ (স্নায়ু) আছে, আর রেটিনার উপর কোনো-কিছুর ছায়া পড়্‌লেই নার্ভগুলো সে খবর মস্তিষ্কে বা মগজে নিয়ে পৌঁছায়। একচোখের রেটিনায় যতগাছা নার্ভ আছে, আরেকটিতেও ঠিক ততগাছা আছে; তবে একটি বিশেষত্ব এই যে বামচোখের রেটিনায় যে জায়গায় একগাছা নার্ভ আছে ডান চোখেরও ঠিক সেই জায়গায় একগাছা নার্ভ আছে, আর এই প্রত্যেক দু'-দু'-গাছা নার্ভ কিছুদূর পর্য্যন্ত দুই থেকে শেষে এক হোয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছেচে। এইরূপে ডান চোখের রেটিনার প্রত্যেক নার্ভ বাম চোখের রেটিনার corresponding নার্ভের সঙ্গে মিলে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছেচে। আমাদের দুটি চোখ একই রেখায় স্থাপিত, তাই যখন আমরা কোন জিনিষ দেখি তখন তার ছায়া বাস্তবিক দুটোই আমাদের দু'চোখে সমান জায়গায় পড়ে, আর নার্ভ দুটোও দুই ছবির খবর নিয়ে এগোয় মস্তিষ্কের দিকে; কিন্তু পথে তারা এক হোয়ে যায়, আর তাই একটি ছবির খবরই মস্তিষ্কে পৌঁছায়, আর আমরা দু'চোখে একটি জিনিষই দেখি। চোখের পাতা টিপে ধর্‌লে জিনিষটির ছবি দুই চোখের রেটিনার দুই ভিন্ন জায়গায় পড়ে, আর সেই ছবির বার্ত্তাবহ হয় দুটি ভিন্ন নার্ভ যারা পথে গিয়ে এক হয় না। তাই আমরা তখন দুটি জিনিষ দেখি, যেমন রঙিন ছবির দুই ব্লক পরস্পর না মিললে হয়। এই প্রকারে যখন কোন বস্তুর প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে সেই বস্তু ও চক্ষের মধ্যে একটি পেন্সিল বা অঙ্গুলী ধীরে ধীরে এক লাইনে রাখা যায় তখন পেন্সিল বা অঙ্গুলীটি দুটি দেখা যায়। প্রথম দৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টি বদ্ধ রাখা উচিত। একবার বস্তুর উপর অন্যবার অঙ্গুলীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অঙ্গুলী কখনও দুটি মনে হবে না। অঙ্গুলী বা পেন্সিলটি আস্তে আস্তে এধার ওধার করা উচিত যতক্ষণ না তাদের দুই দেখা যায়।

চৌধুরী মহিউদ্দীন আহ্‌মদ ও মোহাম্মদ আব্দুল বারি। আবদুর রহমান। শ্রীদুর্গেশনন্দিনী গুপ্ত। সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য। শ্রীনিশিকান্ত সেন। শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ।

চোখের পাতা টিপে ধরলে আমরা কখনো কখনো যে একটি জিনিষকে ডবল দেখি কেন তা বুঝ্‌তে গেলে চক্ষুগোলকের গতিবিধির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর্‌তে হবে। প্রত্যেক অক্ষিগোলকের সঙ্গে তিন জুড়ী পেশী আছে। এই পেশীর দৌলতে চোখকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌বার জো আছে বলেই আমরা মাথাটা না নাড়িয়েও অনেক দিকের (Plane) জিনিষ দেখ্‌তে পাই। মনে করুন আমি বাঁ দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি; আমার চোখের পেশীতে এখন কি কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? না, আমার বাঁ চোখের External Rectus বাঁ চোখকে (Eyeball) বাঁ দিকে টেনে ধরেছে এবং ডান চোখের Internal Rectus ডান চোখটাকে বাঁ দিকে টেনে এনেছে। এইবার স্মরণ করতে হবে যে আমরা দুটো চোখে দেখ্‌ছি, এই দুটো চোখই দৃষ্ট জিনিসের একটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিবিম্ব নিয়েছে। আমরা কিন্তু দুটো চোখের এই দুটো প্রতিবিম্বকে যে সতত একটা দেখ্‌ছি—তার কারণ অক্ষিগোলকের পেশীগুলি চোখ দুটিকে স্বভাবতঃ এমনভাবে পরিচালন করছে যে প্রতিবিম্ব প্রত্যেক চোখের Corresponding point-এ পড়্‌ছে। সুতরাং যখন কোন-একটি জিনিষ দেখ্‌বার কালে জোর করে (যেমন টিপে ধরে) দুটোর মধ্যে কোন একটি অক্ষিগোলকের (পেশীর) গতি ভঙ্গ করা যায়, তখন দুটি চোখের দেখা প্রতিবিম্ব Retinar Corresponding point-এ পড়্‌বে না, কাজেই মস্তিষ্কের ভিতর একটি Impression ছাপ না গিয়ে, দুটি চোখের দুটি Impression যাবে এবং আমরাও তখন একটা জিনিষকে ডবল দেখ্‌বো।

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

(৮৯)

প্রাচীন ভারতে নারীদের পাদুকা

প্রাচীনভারতে নারীগণ যে জুতা পরিতেন তার প্রধান প্রমাণ জুতা উদ্ভাবনার ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। ঋষি জমদগ্নি লক্ষ্যভেদ করিয়া বাণনিক্ষেপ অভ্যাস করিতেছিলেন, ও তাঁহার পত্নী রেণুকা দেবী স্বামীর নিক্ষিপ্ত শর কুড়াইয়া আনিয়া দিতেছিলেন। রেণুকার বাণ লইয়া ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়া জমদগ্নি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পত্নীকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। রেণুকা বলিলেন— বিলম্বের কারণ তাঁর কর্ম্মে অবহেলা বা অলসতা নয়; সূর্য্যতাপে তপ্ত পথ অতিক্রম করিতে হইতেছে—মাথায় রৌদ্র ও পায়ে তপ্ত বালুকা সহ্য করিয়া সত্বর চলা দুঃসাধ্য। তখন জমদগ্নি সূর্য্যকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত। সূর্য্য তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন— আমার কোনো দোষ নাই, আমি বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। আমি রেণুকাকে ছত্র ও পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি; তাহাতে তাঁহার রৌদ্র ও পথক্লেশ নিবারিত হইবে। এইরূপে মহিলার ব্যবহারের জন্যই প্রথমে জুতা ও ছাতা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছিল। তারার ধ্যানে পাদুকার উল্লেখ আছে। এখন আমরা তাঁহাদিগকে জুতা ছাতা ব্যবহার করিতে দিব কি না স্থির করিবার জন্য শাস্ত্রের বচনের তল্লাস করিতেছি, কারণ আমাদের দয়া মমতা সৌজন্য ভদ্রতা বুদ্ধি বিবেচনা সব কিছুই যে শাস্ত্রের দুয়ারে মানতে বাঁধা!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে নারীরা যে জুতা পরিতেন তন্ত্রসারে উদ্ধৃত নিম্নের ধ্যানটি পাঠ করিলেই তাহা বেশ বোঝা যায়:—

> শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্কজে
> দধানাং বহুবর্ণাভির্বিবহরূপাভিরাবৃতাম্।
> শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিকভূষণাং।
> রত্নপাদুকয়োস্ত্রস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ।

ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন পুর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন বড়িজান গ্রামে যজ্ঞোপবীতযুক্ত চারহাতওয়ালা একটি মূর্ত্তি বাহির হইল। মূর্ত্তিটির দুপাশে চামরহস্তে দুটি যুবতীর মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের পায়ে আজানু-ব্যাপ্ত জুতা। প্রাচীন ভারতে নারী যে সত্যসত্যই জুতা পায়ে দিতেন এই মূর্ত্তিটি স্পষ্টাক্ষরে যে তাহার প্রমাণ দিতেছে একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ নারীর জুতা পরা প্রাচীন ভারতে একটা অপূর্ব্ব, ভয়াবহ বা বিসদৃশ ব্যাপার ছিল না।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ধনী ব্যবসায়ী স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে পাদুকার প্রচলন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

প্রাচীন ভারতে আর্য্য নারীদিগের মধ্যে পাদুকার ব্যবহার ছিল, এরূপ প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ছত্র ও পাদুকার উৎপত্তি বিষয়ে মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বে (৯৫—৯৬ অধ্যায়) লিখিত আছে যে রেণুকা সূর্য্যোত্তাপে তাপিত হইলে জমদগ্নি সূর্য্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং সূর্য্য তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রেণুকার ব্যবহার জন্য ছত্র ও চর্ম্মপাদুকা দিলেন। আর্য্য নারীগণের মধ্যে পাদুকার ব্যবহার না থাকিলে রেণুকার সূর্য্যোত্তাপ নিবারণের জন্য পাদুকা সৃষ্টির উল্লেখ থাকিত না।

কাদম্বরীর গৃহসজ্জা বর্ণনাকালে বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে সেখানে নারিকেলের ছোবড়া-নির্ম্মিত জুতা ছিল। কাদম্বরী বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী; তাঁহার গৃহেও যখন পাদুকা ছিল, তখন যে গৃহস্থ নারীগণ পাদুকা ব্যবহার করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাদম্বরী হইতে সেই উল্লেখ লইয়া তুলিয়া দিলাম—

"বিশাখিকা শিখরনিবদ্ধ নারিকেলীফলবল্কলময় যৌতোপানদ্বয়োপেতাম্...গৃহামদ্রাক্ষীৎ।"

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

(৯০)

চিনি পরিষ্কারের উপায়

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে "শেওলা" দিয়া গুড় পরিষ্কৃত হইত— এবং এখনও অনেক জায়গায় হয়। কিন্তু এই উপায় অতিশয় সময়-সাপেক্ষ, পরন্ত অল্প পরিসরে উহা সম্পাদিত হয় না। এইসকল কারণে উহা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে।

রস ও গুড়ের মাঝামাঝি অবস্থাকে "রাব" কহে। এই রাব হইতে চিনি তৈয়ার করিবার একটি সহজ উপায় আছে। অতএব ইক্ষুর রসকে ফুটাইয়া রাবে পরিণত করিতে হইবে। অথবা গুড় থাকিলে তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া রাবে আনিতে হইবে। এই রাব একটি Centrifuge-এর মধ্যে রাখিয়া দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে ইহার জলীয় অংশ বাষ্পাকারে নিষ্কাশিত হইবে এবং চিনির দানা পরিপার্শ্বস্থ তারের জালের গায়ে লাগিয়া থাকিবে। এই চিনির রং শাদা করিবার জন্য কল চলিবার সময় সোডা (Soda Bicarb.), বিশুদ্ধ সাজিমাটী (Sodium Carbonate) প্রভৃতি জলে গুলিয়া অথবা চুনের জলের ছিটা দিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে রীঠা, নীল প্রভৃতি ব্যবহার করিলে অতীব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। অবশ্য রস ফুটাইবার সময় নিয়ম মত ঘী, কাঁচাদুধ, ঢেঁড়শের আটা প্রভৃতি দিয়া উহা যথারীতি শোধিত হওয়া চাই।

Messrs. Thomas Broadbent and Sons, Huddersfield, England—ইঁহাদের প্রস্তুত Hydro-extractor দ্বারা উপরোক্ত কলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কারণ উহা যুক্তপ্রদেশের ইক্ষুশাস্ত্র-বিশারদ হাদি সাহেবের নক্সা ও উপদেশ-মত গঠিত ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। এই কল ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় চলিতেছে। তবে সব জায়গায় সমান লাভজনক হয় নাই।

উল্লিখিত উপায়ে ইক্ষুরস হইতে শর্করা প্রস্তুত করিবার বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তিকাতে প্রাপ্তব্য—বইখানি Superintendent Government Printing, Allahabad, এই ঠিকানায় দশপয়সার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলেই পাওয়া যাইবে।

Bulletin No. 19. Improvement in Native Methods of Sugar Manufacture. By S. M. Hadi.

অবশ্য কেহ আশা করিবেন না যে এই হাতকলে তৈয়ারী চিনি আমরা যে 'কলের চিনি' ব্যবহার করি তাহার সমকক্ষ হইবে। তাহা হইতে পারে না। কারণ শেষোক্ত চিনি অস্থি-অঙ্গার দ্বারা (Bone charcoal) শোধিত হয় ও সেইজন্য এত শুভ্র। কিন্তু তাহাতে অনেকের ধর্ম্মহানি হয় বলিয়া এই উপায়ান্তরে কাজ চলিতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে প্রতাপগড়ে সরকারী চিনির কারখানায় Centrifugal উপায়ে গুড় হইতে চিনি পরিষ্কার করিবার প্রকরণসকল শিক্ষা করা যাইতে পারে। Director of Agriculture, U.P., Allahabad—ইঁহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্য জানা যাইবে।

শ্রীজীবনতারা হালদার।

হস্তচালিত কারখানায় চিনি প্রস্তুত করিবার উপায় মোটামুটি এইরূপ:—কলসী বা ভাঁড় হইতে গুড় ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া একটি বাঁশের পেতের মধ্যে রাখিতে হয় এবং ঐ পেতে একটি মাটির নাদার উপর বাঁশের তেকাটা দিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। পরে পেতের উপর শেওলা দিয়া কয়েকদিন ঐ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পাতলা অংশটা, যাহাকে মাৎ বলে, তাহা পেতে হইতে চোয়াইয়া বাহির হয় ও নিম্নের নাদার মধ্যে পড়ে। শেওলার সাহায্যে উপরকার গুড় পরিষ্কার হয়।

এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে পেতের উপর হইতে শেওলা তুলিয়া গুড় যতদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়াছে তাহা কাটিয়া লওয়া হয়। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া বেশ ভাল করিয়া পিষিয়া থলিতে বোঝাই করা হয়। এই প্রথমবারের চিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম চিনি—সাধারণতঃ উহাকে "সরকাটা" চিনি বলে। পরে আবার শেওলা দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত উপায়ে পুনরায় চিনি প্রস্তুত হয়—এইরূপে ক্রমাগত শেওলা দেওয়া ও পরিষ্কার অংশ কাটিয়া লওয়া হয়। নিম্নের নাদায় যে মাৎ জমে উহা একত্র করিয়া বড় বড় লৌহকটাহে জ্বাল দেওয়া হয় ও যাহাতে পুনরায় দানা বাঁধে তাহার জন্য বড় বড় হাতা দিয়া ঘাঁটিয়া মাটিতে যে-সকল বড় বড় পেতে পোঁতা আছে তাহাতে ঢালিয়া রাখা হয়। তারপর আবার ঐ গুড়কে পেতের দেওয়া হয় ও পূর্ব্বোল্লিখিত শেওলা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কতকটা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। এবারও যে মাৎ নির্গত হয় তাহাকে আবার জ্বাল দিয়া দানা বাঁধা হয় ও এইরূপে দুই তিন বার পেতে দেওয়ার পরে যে মাৎ নির্গত হয়—তাহাতে আর দানা বাঁধে না। কাজেই তাহা হইতে আর চিনিও প্রস্তুত হইতে পারে না। যশোহর জেলার মধ্যে কোটচাঁদপুর ও তাহেরপুর নামে দুইটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান আছে। গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা এখানে কমের পক্ষেও ৫০টি আছে। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে এখানে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া উক্ত কাজ শিখিয়া যাইতে পারেন।—প্রবাসী ১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(৯২)

মুসলমানী পতাকায় অর্দ্ধচন্দ্র

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন তখন একদল লোক তিনি যে ঈশ্বর-প্রেরিত এবিষয়ে সন্দিহান হইয়া কোন অলৌকিক উপায়ে তাহা সপ্রমাণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করে। তদনুসারে একদা পূর্ণিমা রাত্রে তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পূর্ণচন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ মুসলমানেরা তাঁহাদের জাতীয় পতাকায় "অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন" ধারণ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য জাতি নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ স্বরূপ "সিংহ" "বাজপক্ষী" প্রভৃতির ছবি পতাকায় ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানেরা প্রাণীর ছবি অঙ্কিত করেন না। পতাকা "চন্দ্র"-চিহ্নিত করিবার ইহাও অন্যতম কারণ। পূর্ণচন্দ্রের পরিবর্ত্তে "অর্দ্ধচন্দ্র" ধারণ করিবারও কারণ আছে। চন্দ্র পূর্ণ হওয়ার পরই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ইস্লাম এইজন্যই পতাকায় অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া থাকে।

মোহাম্মদ আবদুল হাসিম খান।

মুসলমানদের জাতীয় পতাকায় "অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন" ধারণের দু'টি কারণ আমাদের জানা আছে—

১। মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন এই পৃথিবীবাসী অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন লোকদের দরকার হয়েছিল চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের ন্যায় বিমলধর্ম্মজ্যোতির, তাই মুসলমানের পতাকায় "অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন"।

২। পৃথিবীর প্রায় সব জাতির পতাকাতেই পার্থিব কোন জিনিষের ছবি আছে, কারণ তারা চায় পার্থিব শক্তি দিয়ে জয় কর্‌তে। কিন্তু মুসলমানদের পতাকায় আকাশের চাঁদ স্বর্গীয় জিনিষ, কারণ তারা চায় স্বর্গীয় বলে, ধর্ম্মের জোরে জয়ী হোতে। চন্দ্র স্নিগ্ধ, তাই তাকেই নেওয়া হয়েছে, উগ্র সূর্য্যকে ত্যাগ কোরে। চন্দ্র পূর্ণ হয়ে গেলেই তার কমতি হয় তাই পূর্ণচন্দ্র না দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া হয়েছে, কারণ এর বাড়তি এখনো শেষ হয় নি।

অবশ্য জাপানের পতাকারও আকাশের জিনিষ—"উদীয়মান সূর্য্য" আছে। কিন্তু তারা দিয়েছে আরেক উদ্দেশ্য নিয়ে—তারা দিয়েছে তাদের উদীয়মান অবস্থার সঙ্গে তুলনা কোরে "উদীয়মান সূর্য্য"।

চৌধুরী মহীউদ্দীন আহম্মদ।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে ম্যাসিডন-অধিপতি ফিলিপ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল অবরোধ করেন।

একদা নিশাকালে গোপনে অন্ধকারে তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীর ভগ্ন করিতেছিল। সেই সময় সতারকা চন্দ্রকলা উদিত হওয়াতে দুর্গপ্রহরিগণ শত্রুর কার্য্য দেখিতে পায় এবং সেই সময় হইতে সতারকা চন্দ্রকলা তুরস্করাজ স্বকীয় রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করেন। মতান্তরে বলে যে, প্রাচীন তুর্কীগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রোমসম্রাট কনস্তান্তিন বিতাড়িত হইয়া এশিয়া-মাইনরে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ওসমান নামে এক বীর্য্যবুদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তুর্কীদের অধিনায়ক হন। এবং তিনি তুরস্ক জয় করিয়া এশিয়া-মাইনরে একাধিপত্য সংস্থাপিত করেন। তদ্বংশীয় সুলতান মোহাম্মদ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে রোমকদিগের নিকট হইতে ইস্তাম্বুল জয় করিয়া তাহাতে তুরস্কের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়া-মাইনর অধিকারের পূর্ব্বে ওসমান স্বপ্নে দেখেন একটি সতারকা চন্দ্রকলা ক্রমশঃ উত্তর পার্শ্বে বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমের সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ইহা ইস্লামের ধর্ম্মশক্তি ও রাজশক্তি বিস্তারের ঐশ্বরিক ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি ঐ চিহ্ন স্বীয় পতাকায় গ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ চিহ্ন হজরত মহম্মদের সমসাময়িক। ভগবান ঈশার আবির্ভাবের পর যে তমসা ঘনীভূত হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া প্রতিপদের চন্দ্ররূপে মহম্মদের আবির্ভাব সূচনা করিবার জন্যই ঐ চিহ্ন। হজরত মহম্মদের সময় জাতীয় পতাকায় একটি সর্প চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ইস্লামধর্ম্মরূপী আজদহা নামক এক অজগর সর্প পবিত্র হেজাজের মকানগররূপ বিবর হইতে বাহির হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিবে এই সঙ্কেত। কিছু কাল পরে এই চিহ্ন পরিত্যক্ত হইয়াছিল।—প্রবাসী, ১৩১৮ সাল, কার্ত্তিক সংখ্যা, কষ্টিপাথর, ১০০ পৃষ্ঠা। নগেন্দ্র ভট্টশালী।

"অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন" পূর্ব্বে রোমক সম্রাটের জাতীয় ও রাজকীয় পতাকায় ছিল। ১৪৫৩ খৃঃ অঃ তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ খান রোমকদিগকে পরাজিত করিয়া কনষ্টান্টিনোপল দখল করেন এবং তাহাদের পতাকা কাড়িয়া লইয়া বিজয়ের গৌরবস্বরূপ উহা জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তুরস্কের সুলতান খলিফা বলিয়া উহা ক্রমে সমগ্র মোস্লেম জগতের জাতীয়চিহ্ন হইয়াছে।

শ্রী।

তারকাসহ অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা ব্যবহৃত হইত সর্ব্বপ্রথম গ্রীসের ইলীরিয়া প্রভৃতি বহু অঞ্চলে। গ্রীস জয় করিয়া সমরবিজেতা তুর্কেরা গ্রীকদের কাছ হইতে ইহা গ্রহণ করে। সেই অবধি এই পতাকা তুরস্ক সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা হইয়াছে। সেইজন্য খিলাফৎ-সেবকরা আজকাল এই পতাকা ব্যবহার করিতেছেন। এই

পতাকাকে ইস্‌লামের জাতীয় পতাকা মনে করা ভুল, কেননা, হজরৎ মহম্মদ যে পতাকা ব্যবহার করিতেন তাহা এইরূপ ছিল না। ভারতীয় মুসলমানেরা যদি এই পতাকা ব্যবহার করেন তবে তাহা তুরস্কের আদর্শে করিতেছেন, মুঘল বা পাঠান বাদশাহদের অনুকরণে নয়।

অরুণ দত্ত।

(৯৩)

পরগণাতি সন

১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী গৌড় জয় করেন। মহম্মদের মদিনাতে পলায়নের সময় হইতে যেরূপ 'হিজরী সন' গণনা করা হয়, সেরূপ লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের সময় হইতে একটি সন গণনা করা হয়। উহাই 'পরগণাতি সন' বলিয়া কথিত হয়। উহার আরম্ভকাল ১২০২-১২০৩ খৃষ্টাব্দ। কাহারও মতে পরগণা বিভাগের সময় হইতেই 'পরগণাতি সন' গণনা করা হয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টশালী।

(৯৪)

"বাঙ্গলা ভাষার প্রথম উপন্যাস"

শ্রীমতী মুলেন্স কৃত—'ফুলমণি ও করুণা'। ১৮৫২।—সাহিত্য পত্রিকা ৪ পৃঃ।

সৈ, ম, আ।

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক (টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে) রচিত "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস। ইঁহার পূর্ব্বে পণ্ডিত তারাশঙ্কর সংস্কৃত "কাদম্বরী"ও ইংরেজী "রাসেলাস"এর অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু মৌলিক উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরই প্রথম রচনা করেন।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

(৯৫)

কাগজ

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে চীনদেশীয় কাগজ ও তুলট এই দুই শ্রেণীর লিখন-সামগ্রী ভারতবর্ষে বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। তদনন্তর ইউরোপীয় বণিকগণ উৎকৃষ্ট উপাদানের কাগজ আমাদের দেশে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, চীনের কাগজ ও তুলটের আদর খুবই কমিতে থাকে। আমাদের দেশের মধ্যে শ্রীরামপুর ও টিটাগড়ের কারখানাই খুব প্রাচীন।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

বাঙ্গালাদেশে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়েছিল শ্রীরামপুরে। বাঙ্গালাদেশে এখন টিটাগড়, কাকিনাড়া ও রাণীগঞ্জ এই তিন জায়গায় কাগজের কল আছে। বালীর কাগজের কল এখন চটকলে পরিণত হয়েছে। শ্রীরামপুরের কাগজের কল বহুকাল উঠিয়া গিয়েছে।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

(৯৬)

লণ্ঠনের ধোঁয়া

লণ্ঠন অপরিষ্কার থাকলে কিম্বা বাতি ভাল করে অর্থাৎ সমানভাবে কাটা না থাকলেই ধোঁয়া হ'তে দেখেছি। ভালো তেল হলেই শুধু হয় না; লণ্ঠন খুব পরিষ্কার রাখা দরকার। মধ্যে মধ্যে লণ্ঠনের ভিতরটা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা ভাল; উপরটাও মধ্যে মধ্যে সোডা কিম্বা ছাই দিয়ে মেজে ফেল্লে ধোঁয়া হবার ভয় থাকে না। লণ্ঠনের মাথায় কালির ভুষো জম্‌লেই ধোঁয়া উপরে জমবার জায়গা না পেয়ে চিম্‌নির ভিতর নেমে আসে আর জমে।

সরযূ দেবী।

কেরোসিন তৈলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কোনক্রমেই চিম্‌নি ধোঁয়া হইয়া কাল হয় না। অত্যন্ত খারাপ তৈলেও ধোঁয়া হয় না।

শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্ত।

অনেক দিনের ব্যবহারে লণ্ঠনের ফিতায় ময়লা জন্মিলে, লণ্ঠনের চোঙের মধ্যে কালি হইলে এবং বার্ণারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি ময়লায় বন্ধ হইয়া গেলে, ভাল তেল ব্যবহারেও লণ্ঠনের চিম্‌নীতে ধোঁয়া হইয়া কালি পড়িয়া থাকে। সাবান দিয়া ফিতা পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করিলে, জল দিয়া চোঙের ময়লা পরিষ্কার করিলে ও বার্ণারের ছিদ্রগুলির ময়লা দূর করিয়া লইলে, চিম্‌নীতে কালিপড়া বন্ধ হইবে।

মহম্মদ খলিল রহমান।

(৯৭)

পশ্চিমাঞ্চলের টিকটিকি কি বোবা?

আমি কাশীধামে স্বকর্ণে টিকটিকির টিকটিক শব্দ শুনেছি। বৈদ্যনাথের কথা বলতে পারি না।

সরযূ দেবী।

(৯৮)

চন্দ্রের গতি

বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে অতি পূর্ব্বে একটা অতি বৃহৎ তাপময় গোলাকার পিণ্ড আকাশে নিজের চতুর্দ্দিকে অতি বেগে আবর্ত্তন করিত। তাহার ফলে ঐ পিণ্ড হইতে কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিই গ্রহ, এবং কেন্দ্রে স্থিত সেই তাপময় পিণ্ডের অবশিষ্টাংশ সূর্য্য। গ্রহগুলি জড় পদার্থের সাধারণ গুণ জড়ত্ব (inertia) প্রভাবে আপনার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। ইহাই দৈনিক গতি। আর কেন্দ্রস্থ পিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় তাহারা যে কেন্দ্রাপসারক বেগ (Centrifugal force) পাইয়াছে তাহা ও সূর্য্যের আকর্ষণ এই উভয় বলের সমবেত ফলে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে। ইহাই তাহাদের বার্ষিক গতি।

চন্দ্র একটি উপগ্রহ। পৃথিবী গ্রহের আবর্ত্তনের ফলে তাহার গাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন এক খণ্ড। সূর্য্যের দৈনিক গতি যে কারণে পৃথিবীতে সংক্রামিত, ঠিক সেই কারণে পৃথিবীর দৈনিক গতি চন্দ্রে সংক্রামিত। কিন্তু একের গতি অন্যে সংক্রামিত হইলেও তাহার বেগ কমিয়া যায়। সেইজন্য পৃথিবীর দৈনিক গতির সময় ২৪ ঘণ্টা হইলেও চন্দ্রের দৈনিক গতির সময় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১½ সেকেণ্ড। পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতেও চন্দ্রের ঠিক ঐ সময় লাগে। ইহাতে চন্দ্রের এক পিঠই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরান থাকে। অপরার্দ্ধ কখনো আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। এইজন্যই পূর্ণিমা রজনীতে সমস্ত রাত্রিই চন্দ্রের পৃষ্ঠে একই প্রকার কাল চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এবং প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই ঐ একই প্রকার দৃষ্ট হইবে। যে আকর্ষণ এবং জড়ত্ব (inertia) অন্য সকল গ্রহ-উপগ্রহের উপর কার্য্য করে তাহা হইতে একমাত্র চন্দ্রকে মুক্ত মনে করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

প্রত্যেক সীমাবদ্ধ পদার্থেরই একটা permanent axis of rotation আছে; যদি সেই axisএ ইহাকে একবার ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, তবে অন্য কোনও শক্তির ক্রিয়া ব্যতীতও ইহা চিরদিনই ঘুরিতে থাকিবে; অবশ্য যদি ইহা অন্য কোনও বল (force) দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়। পৃথিবীর মেরুদণ্ড পৃথিবীর সেই permanent axis; সৃষ্টির আদিতে কোনও কারণে ইহাকে ঘুরিতে হইয়াছিল, আজও সেই কারণে তাহাকে তদ্রূপভাবে ঘুরিতে থাকিতে হইতেছে। এই প্রচণ্ড ঘূর্ণন-বেগের তুলনায় সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদির ঘূর্ণন-বেগ ব্যতিক্রম করিবার শক্তি এত সামান্য যে তাহাতে মেরুদণ্ডের লক্ষ্যের অতি সামান্য পরিবর্ত্তন (precession and nutation) ছাড়া আর কিছুই হয় না। একটা লাটিম দ্রুতবেগে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে সে ঘুরিতেই থাকে, পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার axisটাকে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নেয়, কিন্তু axisএর চারদিকে লাটিমের ঘূর্ণনের কোনও পরিবর্ত্তন সে কারণে ঘটে না। আহ্নিক গতির ইহাই কারণ। অবশ্য মূল কারণ দেখিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়, তাহা এখনও Theory মাত্র।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণ সূর্য্যের আকর্ষণ। গতিবিজ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত এই যে যদি ক এবং খএর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ থাকে, যাহার পরিমাণ উভয়ের পদার্থসমষ্টির গুণফলকে উভয়ের দূরত্বের বর্গ দিয়া ভাগ করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে, এবং যদি ক পদার্থটি স্থির থাকে এবং খ পদার্থটি একটি স্থান হইতে কোনও বিশেষ বেগে (সেই বেগের পরিমাণ স্থির করা আছে) চলিতে আরম্ভ করে, তবে অন্য কোনও শক্তি ইহাদের উপর কার্য্য না করিতে থাকিলে, খ একটা বৃত্তাভাস (ellipse) পথে চলিতে থাকিবে, ক হইবে তাহার focus বা কেন্দ্র। ক-কে সূর্য্য এবং খ-কে পৃথিবী বলিয়া ধরিলে এবং নিউটনের আকর্ষণ নিয়মের কথা মনে রাখিলেই, এই সিদ্ধান্ত হইতে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বোঝা যাইবে। মনে রাখিতে হইবে যে সূর্য্যের আকর্ষণের তুলনায় পৃথিবীর উপর অন্যান্য গ্রহের বা নক্ষত্রের আকর্ষণ অতি সামান্য।

চন্দ্রের দৈনিক গতি আছে। যতক্ষণে চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরিয়া আসে, ততক্ষণে তাহার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকেও একবার ঘোরে। এইজন্য তাহার একদিকই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে থাকে। চন্দ্রও আকর্ষণ নিয়মের অধীন, তাহা হইতে মুক্ত নয়।

শ্রীদুর্গেশনন্দিনী গুপ্ত।

(১০০)

হাজিয়া ও জোঁক

সরিষা-তেল ও চূণ একত্র মিশাইয়া তুলি দিয়া গায়ে লাগাইয়া জলে নামিলে জোঁকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তেল ও চূণ জলে ধুইয়া গেলে আবার লাগাইতে হয়।

হাজিয়া হইলে মেড়ুয়া নামক একপ্রকার গাছের ফল পোড়াইয়া তাহার ভস্ম লাগাইলে দুই এক দিনের মধ্যেই হাজিয়া আরোগ্য হয়। পূর্ব্ববঙ্গে মেড়ুয়া-গাছে অভাব নাই।

শ্রীপ্রমীলা চৌধুরী।

ফেনাইল "হাজার" খুব ফলপ্রদ ঔষধ।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

(১০১)

শুঁয়া পোকার বিষ নিবারণের উপায়

শুঁয়া-পোকার কাঁটা ফুটিয়া থাকিলে ধারাল ছুরী, অথবা কুমড়া বা শসা-পাতা দ্বারা কাঁটা তোলা আবশ্যক। পরে সেই স্থানে চূন বা ময়দা জলে গুলিয়া মণ্ডের মত করিয়া লাগাইয়া দিলে সত্বর যন্ত্রণার উপশম হয়।

শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শশা-গাছের পাতা হূলসংস্পৃষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা উপশমিত হয়। চূন লাগাইলেও চলে। 'ঝিঙা'-গাছের পাতা দ্বারা ক্ষত স্থান ঘসিয়া ফেলিলেও চলিতে পারে।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

ধারাল ছুরি দ্বারা শুঁয়া-লাগা স্থান চাঁচিয়া ঢোলা-পাতার রস দিলে শীঘ্র উপশম হয়।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

শুকনা গোবর (গেঁঠা বা ঘুঁটে) দ্বারা সেখানে ৫।৭ বার ঘষিলেই সত্বর যন্ত্রণা উপশম হয়।

মহম্মদ সাদেক।

শুঁয়াপোকার কাঁটা যেখানে লাগে সেখানে চুল ঘষে' দিলেই কাঁটা উঠে যায়। অথবা মোম গলিয়ে সেখানে ফেলে দিলে এবং মোম ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেলে হাত দিয়ে তা' তুলে ফেল্লে কাঁটাও মোমের সঙ্গে উঠে যায়।

চিটাগুড়-মিশ্রিত চূন অথবা খালি চূন দিয়ে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

চৌধুরী মহিউদ্দীন আহ্মদ্ ও
মোহাম্মদ আব্দুল বারি।

নরম কচি কলাপাতা দিয়া সে স্থান রগ্ড়াইলে শুঁয়াপোকার কাঁটা উঠিয়া যাইবে। তারপর কিঞ্চিৎ সরিষার তেল ও লবণ একত্র মিশাইয়া ঐ স্থানে লাগাইলে, সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইবে। ইহা আমাদের পরীক্ষিত।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

১। যেখানে কাঁটা লাগে, সেই স্থানে কিঞ্চিৎ ধূনা গুঁড়া করিয়া লাগাইয়া একটি লোহা গরম করিয়া সেই ধূনাগুঁড়াগুলির উপর লাগাইলেই সমস্ত কাঁটাগুলি উঠিয়া আসিবে।

২। কুম্ড়ার ডাঁটা সেই স্থানে ঘসিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

শ্রী।

শরীরের কোন স্থানে শুঁয়া পোকা লাগিলে তথায় "মধু"-গাছের পাতার রস নিংড়াইয়া মাখাইয়া দিলে ভবিষ্যতে আর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। মধুগাছ খুব ছোট, ইহার ফুল হল্‌দে, ছেলেরা এই ফুল চুষিয়া মধু পান করে।

তেঁতুর পাতা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তথায় চূন লাগাইলেও হয়।

শ্রীনীলমাধব ভট্টাচার্য্য।

কচুপাতা ও ডুমুরপাতা রগ্‌ড়াইয়া কাঁটা উঠাইয়া পরে ভেলা-কাঞ্চনের পাতা রগ্‌ড়াইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। পুঁইপাতার রস দিলেও ব্যথা কমে।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

[তালগাছের অস্বাভাবিক শাখা ও ফলধারণ সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উত্তর একজন লেখক আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়—আমরা সেটি হারাইয়া ফেলিয়াছি। লেখক অনুগ্রহ করিয়া উত্তরটি আর-একবার পাঠাইয়া দিলে আমরা আনন্দের সহিত ছাপিব।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

বৈদিকযুগে ঘোড়দৌড়

শতপথব্রাহ্মণে (১) একটি গল্প আছে যে এক সময়ে কোন বিষয় লইয়া দেবতাদের মধ্যে 'আমি লইব, আমি লইব' এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা কোন উপায়ে 'লটারি' করিতে ইচ্ছা করিলেন। ঘোড়দৌড় করাইয়া এই 'লটারি' নির্দ্ধারিত হইল। বৃহস্পতি দৌড়ে প্রথম হওয়াতে তিনি ঐ বাজি জিতিয়াছিলেন। এই কাহিনীর আভাস ঋক্-সংহিতায়ও পাওয়া যায় (২)।

ঋক্‌বেদেরও অনেক স্থানে (৩) ঘোড়দৌড় বা 'আজি'র উল্লেখ আছে। এই 'আজি' সেকালের লোকের একটি প্রধান ক্রীড়া ছিল। ধাবনভূমি বা রেস-কোর্স‌কে 'কাষ্ঠা' (৪) বা 'আজি' (৫) বলা হইত। ইহা সম্ভবতঃ কতকটা গোলাকার ছিল (৬)। ঘোড়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে (৭) পৌঁছিয়া আবার ফিরিয়া আসিত। এই ধাবনক্ষেত্র বেশ চওড়া থাকিত এবং উহা মাপা হইত (৮)।

যিনি প্রতিযোগিতায় জিতিতেন তাঁহাকে পুরস্কার ['ধন' (৯) বা 'কার' (১০) বা 'ভর' (১১)] দেওয়া হইত। দ্রুতগামী ঘোড়াদেরই দৌড় করান হইত। দৌড়ের পূর্ব্বে তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া অলঙ্কার পরান হইত।

এইরূপে একটি দৌড়ের ঘোড়ার নাম ঋক্‌বেদে অমর হইয়া আছে। ইহার নাম ছিল—'বিশ্‌পলা'। দৌড়ে ইহার একটি পা ভাঙিয়া যাওয়াতে অশ্বিদ্বয় ইহার লোহার পা করিয়া দেন (১৩)।

বৈদিকযুগের পরে এই ক্রীড়া একরকম লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবল মাত্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে রহিয়া গেছে (১৪)।

শ্রীসুকুমার সেন।

১। ২—৪—৩—৪ ইত্যাদি।
২। অভিশ্যাবং কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো
ত্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্ বৃহস্পতির্
ভিনদদ্রিংবিদদ্ গাঃ ॥
১০—৬৮—১১ ॥
৩। ৫—৩৭—৭ ইত্যাদি।
৪। ঋক্ ৮—৮০—৮ ; অথর্ব্ব ২—১৪—৬ ইত্যাদি।
৫। ঋক্ ৪—২৪—৮ ; অথর্ব্ব ১৩—২—৪ ইত্যাদি।
৬। অথর্ব্বসংহিতা ২—১৪—৬, ১৩—২—৪।
৭। এই নির্দ্দিষ্ট চিহ্নকে 'কাষ্মর্ন্' বলা হইত। যথা—
অসর্জি রথ্যো যথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ।
কাষ্মর্ন্ বাজী নি অক্রমীৎ। ঋক্ ৯—৩৬—১ ॥
৮। যা সীমবত্ত্ব আ ভাগ্ উর্ব্বী কাষ্ঠা হিতং ধনং।
অপাবৃক্তা অরত্নয়ঃ ॥ ঋক্ ৮—৮০—৮ ॥
৯। ঋক্ ১—৮১—৩ ইত্যাদি।
১০ ঋক্ ৫—২৯—৮ ইত্যাদি।
১১ ঋক্ ৫—২৯—৮ ইত্যাদি।
১২ ঋক্—১০—৬৮—১১, ৯—১০৯—১০।
১৩ চরিত্রং বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্ত্তবে
প্রত্যধত্তম্। ১—১০৬—১৫ ॥
এই ঋক্ হইতে পিশেল এইরূপ অনুমান করেন।
১৪। বাজসনেয়ি সংহিতা ১০—১৯ ; শতপথব্রাহ্মণ ৫—৪—২, ৩ ; ইত্যাদি।

খোকার আধ'কথা

খোকার প্রথম ফুটচে কথা,
পড়্‌চে সাধের ময়না,
সুর মিঠা ওর সবটা মিঠা,
ঘরের গায়ের গয়না।
কুঞ্জে মধু গুঞ্জরি'
ভ্রমর ফিরে সঞ্চরি'—
নূতন হাওয়ায় জাগ্‌লে গো পিক
নীরব ত কই রয় না!

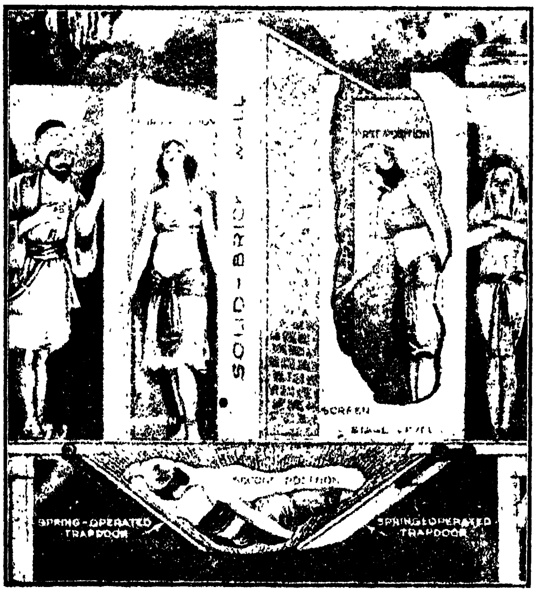
যেথায় যত মিষ্ট আছে
সব ও গীতে ঝল্‌কায়,
ক্ষীরসাগরের উথ্‌লে' যে ক্ষীর
চারিদিকেই চল্‌কায়!
বিশ্বে প্রথম ওঙ্কার এ,
ঝর্ণা ঝরে ঝঙ্কারে,—
মানস-সরের মঞ্জু মরাল
তিলেক বিরাম সয় না!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

পঞ্চশস্য

দেওয়ালের মধ্যে দিয়া চলা—

বিলাতের সার্কাসে অনেক অদ্ভুত খেলা দেখান হয়। তার মধ্যে একটা ব্যাপার বড় অদ্ভুত বলে' মনে হয়। একটা দেওয়াল—সত্যিকার ইঁট, চুণ, সুর্‌কি ইত্যাদি দিয়ে, আপনার সাম্‌নে গাঁথা হবে। তারপর তার মধ্যে দিয়ে একজন লোক বেশ অনায়াসে চলে যাবে—এবং একধার দিয়ে প্রবেশ করে, অন্য দিকে গিয়ে দাঁড়াবে। লোকে একেবারে অবাক হয়ে ভাবে এ কি অদ্ভুত কাণ্ড—একটা ১০ ফুট লম্বা, ৮ ফুট চওড়া আর ৯ ইঞ্চি মোটা, নিরেট-গাঁথা দেওয়াল, তা ভেদ করে' মানুষ কেমন করে' যেতে পারে! কিন্তু এ কাজটা যত অদ্ভুত বলে' মনে হয়, ততটা নয়। দেওয়ালটা তৈরি হবার পর ষ্টেজের সাম্‌নে রাখা হয় এমন ভাবে, যাতে দর্শকগণ তার দুদিক বেশ ভাল



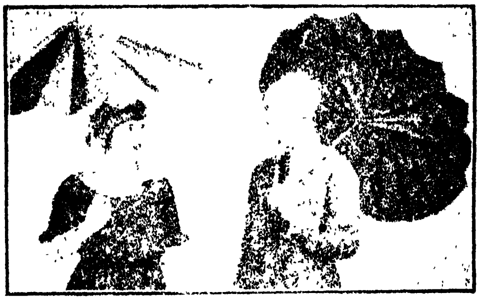
দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে চলা।

করে' দেখ্‌তে পায়। তারপর একজন লোক দেওয়ালের গায়ে এসে দাঁড়ালে পর, তার চারদিকে পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তার ঠিক উল্টাদিকেও এমনি আর একটা পর্দ্দা থাকে। তারপর হটাৎ উল্টাদিকের পর্দ্দা সরাইয়া দিবামাত্র দেখা যায় যে লোকটি দেওয়াল ভেদ করে' উল্টাদিকে দাঁড়াইয়া আছে। দেওয়ালের নীচে অর্থাৎ ষ্টেজের কাঠের মঞ্চের তলায় একটা স্প্রিঙ্গের দুয়ার আছে। লোকটি পায়ের চাপে এই দুয়ার ফাঁক করে' ষ্টেজের তলায় যায়, সেখানে একটা খুব শক্ত রবারের মত কার্পেট ঝোলানো থাকে;—লোকটি হামাগুড়ি দিয়া দেওয়ালের উল্টাদিকে পৌঁছায় এবং সে দিকের স্প্রিঙ্গের দুয়ার চাপ দিয়ে খুলে ষ্টেজের উপরে উঠে যায়। স্প্রিঙ্গের দুয়ারে চাপ কম্‌লেই তা বেশ শক্তভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। উপর থেকে এই দুয়ার কিছু বোঝা যায় না। দর্শকরাও কেবল দেওয়ালই পরীক্ষা করে, অন্য কিছুর কথা তাদের মনে আসেনা।

—

মোম-কাগজের ছাতা—

রাস্তা দিয়ে, বা মাঠের ওপর হাঁটছি, এমন সময় ঝম্‌ঝম্ করে' বৃষ্টি এলো! কাপড়-চোপড় সব ভিজে চুব্‌চুবে হয়ে গেল! তখন মনে হয় যে একটা যেমন-তেমন দেখ্‌তে, অথচ বৃষ্টি-আট্‌কানো কম দামী ছাতা থাক্‌লে মন্দ হত না। এই রকম খুব কম-দামী



মোম-কাগজের ছাতা।

অথচ বেশ দর্‌কারী ছাতা তৈরী হয়েছে। ছাতার উপরে থাকে খুব ভাল করে তেল-চোবান এক রকম শক্ত কাগজ—তাতে যতই জল পড়ুক না কেন, সব গড়িয়ে যাবে। ছাতার হাতল খুব কম-দামী কাঠের। এই ছাতার দাম এমনি ছাতার চেয়ে অনেক কম।

—

আকের ছোব্‌ড়া—

আমাদের দেশে আকের রস বাহির করিয়া ছোব্‌ড়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সে ছোব্‌ড়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন তখন আর থাকে না—এক পোড়ানো আর ক্ষেতের সার করা ছাড়া। পশ্চিমের লোকেরা নেহাত সব বাজে জিনিষ হইতেও অতি দর্‌কারী জিনিষ আবিষ্কার করিয়া পূর্ণমাত্রায় একটা জিনিষের রস বাহির করিয়া লয়। তাহাদের কাছে পৃথিবীর কোন কিছুই বাজে নয়। আকের ছোব্‌ড়া এতদিন পর্য্যন্ত কেবল গাদা করিয়া পোড়ানো হইত। তাহার ধোঁয়ায় চারিদিকের আকাশ একেবারে অন্ধকার হইয়া যাইত। (একটা আকের শতকরা ১০ ভাগ ছোব্‌ড়া) তারপর এই আকের ছোব্‌ড়া জ্বালাইয়া আকের রস সিদ্ধ করিবার জন্য কাজে লাগান হইত। এখন এই আকের ছোব্‌ড়া হইতে এমন একটা জিনিষ বাহির হইয়াছে যাহার দাম অনেক ক্ষেত্রে কাঠের অপেক্ষা ঢের

বেশী। এখন এই আকের ছোব্ড়া হইতে এক রকম তক্তার মত জিনিষ তৈয়ার হইতেছে। এই ছোব্ড়ার তক্তা করিবার কার্খানা প্রথম নিউ-অর্লিয়েন্স সহরে হয়। এই কার্খানা বসাইতে মোট খরচ পড়ে ৫০০,০০০ ডলার। গত আগষ্ট মাস হইতে এই কার্খানা কাজ আরম্ভ করিয়াছে। দুই বছরের পরীক্ষার পর এই কার্য্য সফল হইয়াছে।

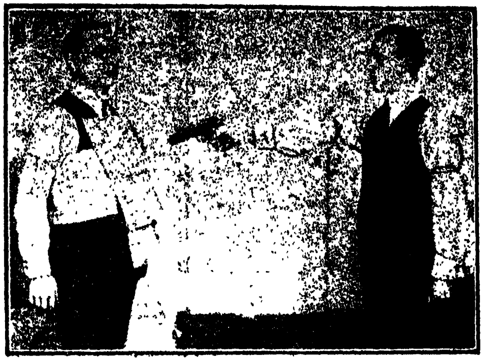
চিনির কার্খানা হইতে আকের ছোব্ড়া গাঁট গাঁট করিয়া আনা হয়। এই আকের ছোব্ড়া হইতে পচনশীল উদ্ভিদাণু সমস্ত নষ্ট করা হয়। তাহার পর ইহাকে "ওয়াটার-প্রুফ" অর্থাৎ জল-সওয়া করিয়া লওয়া হয়। ছোব্ড়া জল সওয়া হইবার পর তাহাকে "বিটিং মেসিনে" (পেটা কলে) ফেলা হয়। সেখানে ইহাকে বেশ করিয়া ধুনিয়া মণ্ড বা কাই করিয়া ফেলা হয়। তারপর ইহাকে রোলারের নীচে ফেলা হয়। রোলারের চাপে পড়িয়া এই ছোব্ড়ার মণ্ড বারো ফুট চওড়া তক্তার মত হইয়া উল্টা দিক দিয়া বাহির হইতে থাকে। দৈর্ঘ্যের কোন সীমা নাই। ছোব্ড়ার তক্তা ক্রমাগত বাহির হইতেই থাকে। এই অবস্থায় ইহা খুব নরম থাকে—ব্যবহারে আনিবার পূর্ব্বে ইহাকে বেশ করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইবার ঘরটি হাজার ফুটেরও বেশী লম্বা। নরম ছোব্ড়ার তক্তাকে এইখানে ভয়ানকভাবে তাপ দেওয়া হয়। এই ঘরের মেঝের নীচে, পাকান নলের মধ্যে গরম বাষ্প রাখা হয়। এই ভয়ানক তাপের চোটে নরম তক্তা একেবারে ঠিক কাঠের তক্তার মত হইয়া যায়। এইখানে একটা তক্তা হয় ১২ ফুট চওড়া এবং ৯০০ ফুট লম্বা। এই পরিমাণ তক্তা দিয়া তিন-চারখানি ৫ ঘর-ওয়ালা বাঙ্লো তৈয়ার হইতে পারে। এই তক্তাকে প্রয়োজন-মাফিক্ করাত দিয়া কাটিয়া লইতে হয়। তবে সাধারণত ১২ ফুট ৪ ফুট করিয়াই কাটা হয়। এই তক্তার মধ্যে খুব ছোট ছোট বায়ুকোষ থাকার জন্য ইহা খুব হাল্কা। ১ বর্গ-ফুটের ওজন হয় মাত্র আধ পাউণ্ড বা ১ পোয়ারও কিছু কম। একজন লোক অনায়াসেই একখানা ২৪ ফুট লম্বা ৮ ফুট চওড়া তক্তা বহন করিতে পারে। এই তক্তাকে ঘরনির্ম্মাণের কাজে ভিতরে এবং বাহিরে বেশ লাগান যাইতে পারে। তবে ঘরের আঢাকা মেঝে, দুয়ার জানালা ইত্যাদির কাজে চলে না। সেখানে খুব মজবুত কাঠের তক্তার দর্কার। ইহার উপর রঙ্ এবং প্লাষ্টার বেশ সহজে লাগান চলে। গরমকালে এই তক্তা-নির্ম্মিত ঘর বেশ ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালেও খুব বেশী ঠাণ্ডা হয় না।

এক টন্ ছোব্ড়া হইতে ৩০০০ ফুট লম্বা তক্তা হয়। আমাদের দেশে যত ছোব্ড়া নষ্ট হয়, তাহাতে কত লক্ষ ফুট তক্তা যে হইবে বলা যায় না। আমেরিকাতেও যে পরিমাণ ছোব্ড়া হয়, তাহার খুব সামান্য অংশমাত্র এই কারখানাতে আসিয়া তক্তায় পরিণত হয়। বাকি যাহা পড়িয়া থাকে তাহা এখনও নষ্ট হইতেছে বা আকের রস সিদ্ধ করিবার সাহায্য করিতেছে।

—

বন্দুকের-গুলি-রোধকারী জামা—

নিউ ইয়র্কের পুলিস এক নূতন ধরণের জামা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জামা পরিয়া পুলিসের লোকে বেশ নির্ভয়ে বন্দুকের গুলির সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে—কারণ এই জামা ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলি তাহার দেহে লাগিবে না। এই জামা ইস্পাত, রেশম এবং ক্যান্ভাস দিয়া তৈয়ারী হয়। ওজন হয় প্রায় ৬ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের দেশী মতে তিন সেরের কিছু কম। জামাটা দুভাগে ভাগ করা থাকে। প্রথম ভাগ



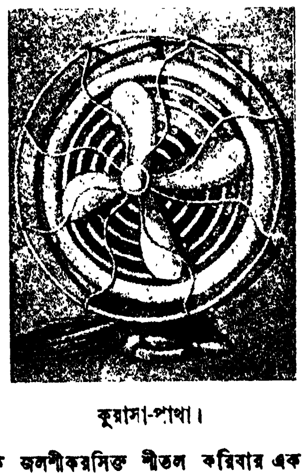
"গোলা-খা-ডালা" বর্ম্ম।

একটা পেটির আকারে থাকে—তাহা কাঁধের কাছ হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখে। দ্বিতীয় ভাগে তিনটি প্লেট পর পর গলা হইতে কোমরবন্ধের কিছু নীচ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখে। ইহাতে দেহের সমস্ত মারাত্মক স্থানগুলি বেশ ভাল রকমে রক্ষিত হয়। এই জামা "ষ্ট্র্যাপ" বা দড়ির সাহায্যে শরীরের সঙ্গে বেশ করিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। শরীরের মাপ অনুযায়ী ইহাকে ছোট বড় করিয়া পরিতে পারা যায়।

—

কুয়াসা পাখা—

কলিকাতার ঘোর গরমে ঘূর্ণাপাখা খুলিয়াও কিছুমাত্র তৃপ্তি পাওয়া যায় না, মনে হয় উহা ঘরের গরম হাওয়াটাকেই একটুখানি ঘোলাইয়া দিল মাত্র। ঘূর্ণপাখার সঙ্গে জলভরা কতগুলি এলুমিনিয়ামের ঝাঁঝ্রা নল ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিয়া দারুণ গ্রীষ্মেও



কুয়াসা-পাখা।

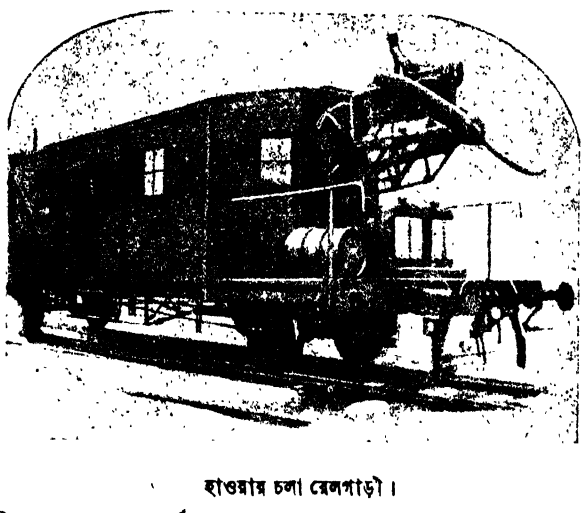
ঘরের হাওয়াকে জলশীকরসিক্ত শীতল করিবার এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ঘোরার বেগে এবং বাতাসের টানে ঝাঁঝ্রা নলের মধ্য হইতে জল চোয়াইয়া বাহির হইয়া খুব পাৎলা কুয়াসার সৃষ্টি হয়, এবং ঘরের সমস্ত বাতাস সেই কুয়াসার স্পর্শে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

—

আগ্নেয়গিরির মধ্যে গোরস্থান—

হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা বলে যে প্রাচীনকালে, নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি হ্যালিয়েকালার গহ্বর, ঐ দ্বীপের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের গোরস্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এখন এই কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ গহ্বরের মধ্যে দেওয়াল-ঘেরা তিনটি ক্রমশঃ সরু গর্ত্ত পাওয়া গিয়াছে। আর-একটা নিকটবর্ত্তী এই রকমের গর্ত্তে একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। আর-একটা জিনিষ পাওয়া গিয়াছে; যাহা দেখিতে অনেকটা মানুষ-বওয়া দোলার মত। কুকুরের দাঁত, পাখীর পালক ইত্যাদি অনেক-কিছু দ্রব্যও এইখানে পাওয়া গিয়াছে। হ্যালিয়েকোলা পাহাড় ১০০৩২ ফুট উঁচু। ইহার গহ্বর ২০০০ ফুট গভীর। ইহার পরিধিও ২০ মাইল। এই গহ্বরের মধ্যে এই রকমের ফানেলের মত গর্ত্ত অনেক আছে।

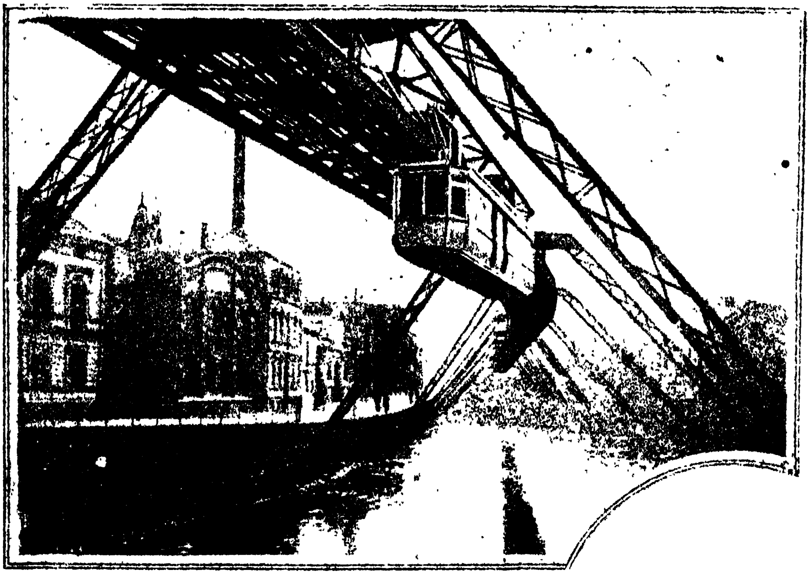
—হেমন্ত।



হাওয়ায় চলা রেলগাড়ী।

বিচিত্র যান—

ডাঙ্গায় রেল পাতিবার জায়গা নাই, তাই জার্ম্মেনীর এল্‌বারফেল্‌ডে রেলগাড়ী চলে বরাবর খালের জলের উপর দিয়া। এজন্য খালের উপর অবশ্য বরাবর পুল বাঁধা প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু রেলগাড়ী সেই পুলের উপর দিয়াও না চলিয়া, চলে নীচ দিয়া। কেমন করিয়া চলে? ঘরের সিলিং বাহিয়া পোকামাকড় যেমন করিয়া চলে,—নীচে হইতে রেল আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া।



খালের উপর রেলগাড়ী।

এরোপ্লেনের বাতাসঠেলা দুটি দাঁড় দুদিকে জুড়িয়া একটি বাতাসঠেলা রেলগাড়ী জার্ম্মেনীর বার্লিন হইতে হামবুর্গে নিয়মিত যাতায়াত করে। গাড়ীটি ঘণ্টায় ২০০ মাইল চলে।

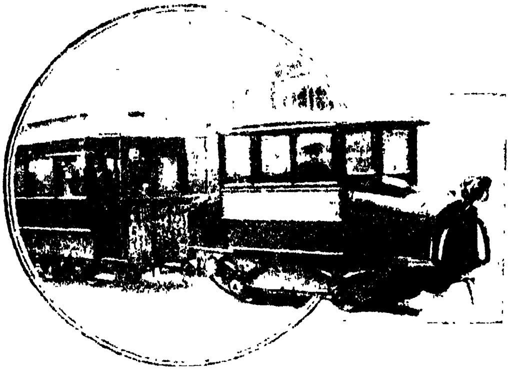
সোজা গাড়ী পাহাড় ঠেলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলে লোকজন সব জড়াজড়ি করিয়া পেছনে গড়াইয়া পড়া অনিবার্য্য। তাই এম্‌সেরমাবুলবের্গ্‌ রেলওয়ের মানুষচলা পাহাড়ে, রেলগাড়ীগুলি সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে তৈরী।

হলণ্ডের এ্যাপেলডুর্ণে সাধারণ রাস্তাচলা গাড়ী তিন-চারটিকে জুড়িয়া ট্রেন তৈরী করা হয়, আর একটি সাধারণ মোটরকার ইঞ্জিনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সেই ট্রেনকে টানে।

ক্যালিফর্ণিয়ার বুর্‌ব্যাঙ্কে বৈদ্যুতিক ট্রাম বাতাসঠেলা দাঁড়ের সাহায্যে পথ চলে, কিন্তু কষ্ট করিয়া মাটিতে পা ঠেকায় না। উড়িতে পারে না বটে, তবু মাটির সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া ঝুলিয়া চলে। এই গাড়ীর নির্ম্মাণও চমৎকার। ক্যালিফর্ণিয়ায় ঝড়বাদলের উৎপাত নাই বলিলেই হয়, তাই এই গাড়ীগুলিতে ছাত কিম্বা প্রাচীর থাকে না।



সিঁড়ি-গাড়ী।



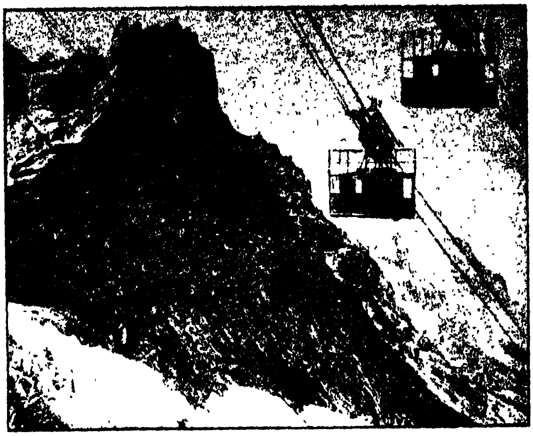
হাওয়াগাড়ীর ট্রেন।



ঝোলা-গাড়ী।

আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের ওয়েটারহর্ণের উপর দড়ি বাহিয়া গাড়ী ওঠা-নামা করে। ওয়েটারহর্ণের শিখর ১২০০০ ফুটেরও বেশী উচু।

—



দোল্‌না-গাড়ী।

শাখা-ছেদনে ফল-বৃদ্ধি—

গাছের গায়ে জায়গায় জায়গায় শাখার ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে ফলের ফসল বাড়িয়া যায়, ফুল পাতা বেশী সতেজ হয়, আকারে বড় হয়। ইহার কারণ গাছের ছাল রসের যে অংশ শুষিয়া লইত ছাল ছাড়াইয়া ফেলার দরুণ সেই উদ্বৃত্ত রসের অংশ ফল ফুল পাতায় সঞ্চারিত হয়। ছাল ছাড়াইবার সময় খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন; যেন ছালের নীচে কাঠ কোথাও গভীর হইয়া না কাটিয়া যায়। কাঠে ক্ষত হইলে শাখাটি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ছাল ছাড়াইয়া তার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করিয়া, না-শুকানো পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখা রীতি। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলে এ্যাষ্টন-পরীক্ষাগারে এসম্বন্ধে নানা পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে একটু সতর্ক নিপুণতার সঙ্গে কাজ করিলে এই উপায়ে ফুল ও ফলের ফসল যথেষ্ট বাড়ানো যাইতে পারে।

—

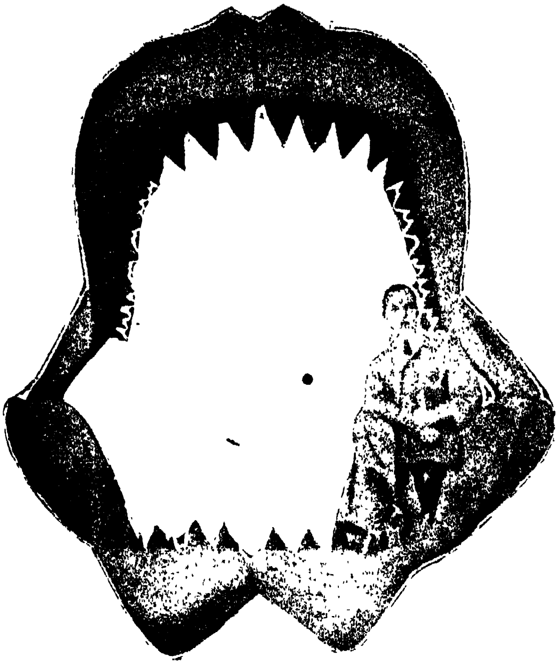
অনিব্বর্াণ স্মৃতিদীপ—

বিখ্যাত ইটালীয় গায়ক কারুসোর নাম অনেকেরই হয়ত শোনা আছে। ইনি একবার নিউইয়র্কের অনাথাশ্রমে দশহাজার ডলার দান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। খবর আসিয়াছে নিউ-ইয়র্কের অনাথ ইটালীয় ছেলেমেয়েরা তাহাদের এই প্রতিভাবান্‌ স্বদেশীয় গায়কের স্মৃতি চিরপ্রজ্জ্বলিত রাখিতে নেপ্‌ল্‌সের মাদোনা দি পোম্পিআই গির্জ্জাকে একটি বাতি উপহার দিয়াছে। এই বাতিটি কারুসোর প্রতি-জন্মদিনে ২৪ ঘণ্টা করিয়া জ্বলিবে এবং পাঁচ হাজার বৎসর জ্বলিবে। বাতিটির ওজন প্রায় পাঁচশ মণ। নিউ-ইয়র্কের কোনও প্রসিদ্ধ বাতিনির্ম্মাতা একপয়সাও না লইয়া অনাথ শিশুদের জন্য এই বাতিটি তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন।

—

তিমিঙ্গিল—

ক্রমোন্নতির ধারায় ধরিত্রীর জীববংশ সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বাড়িতেছে, কিন্তু আকারে কমিতেছে। পৃথিবীর এক যুগ গিয়াছে যখন তাহার সন্তান-মাত্রেই ছিল এখনকার চেয়ে অনেক গুণে বেশী বলিষ্ঠ ও বিপুলাকার। শক্তিমান্‌ মানুষ পর্য্যন্ত বংশপরম্পরাক্রমে আকৃতি ও আয়তন



সেকালের হাঙরের হাঁ।

হিসাবে অবনতির স্তর হইতে স্তর-নিম্নে নামিতেছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু মানুষ পৃথিবীমায়ের সেদিনকার ছেলে। যে-সব জীব যুগযুগান্তর-ব্যাপী নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও পৃথিবীর কোলে টিকিয়া আছে, উপরোক্ত পরিণাম তাহাদের বেলাতেই হইয়াছে সবচেয়ে ভয়াবহ। ফ্লোরিডাতে পাওয়া কোটিবৎসরের প্রাচীন একটি হাঙরের

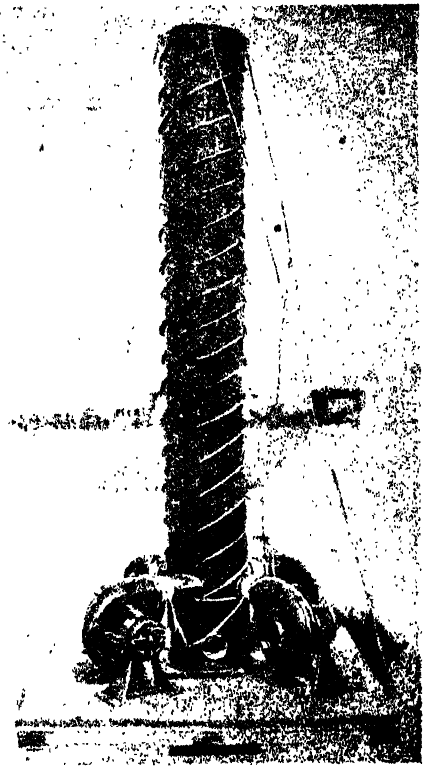


হাঙর, আধুনিক।

দন্তপংক্তি নিউইয়র্কের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। হাঙরটি লম্বায় একশত ফুটেরও নিশ্চয় অনেক বেশী ছিল। আজিকার দিনের ছোটখাট একটি তিমিমাছকে এই হাঙর সহজেই গিলিয়া খাইতে পারিত। তুলনার জন্য এই হাঙরের দন্তপংক্তি ও তাহার আধুনিক একটি বংশধরের ছবি একই মাপের অনুপাতে ছাপা হইল।

—

মিনিটে ১১০০ ঘনফুট বাতাসকে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চর্কিপাকে উপরে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অনৈসর্গিক উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন। একটি স্ক্রু-পাকের চোঙের ভিতর



বৃষ্টি-যন্ত্র।

দিয়া, হাঁপরের সাহায্যে পৃথিবীর নিম্নস্তরের গরম বাতাসকে কিছুকাল উপরে চালান করিয়া দিতে থাকিলে তাহার স্থান ভরাইতে উপরের ঠাণ্ডা বাতাস নীচে নামিয়া আসিবার বেগে সেই স্থানে একটি কৃত্রিম ঘূর্ণাবাত্যার সৃষ্টি হইবে। এবং উপরে হাল্‌কা গরম বাতাস থাকার দরুণ বায়ুর চাপ কমিয়া গিয়া তলার বাতাস বৃষ্টি জন্মিবার অনুকূল হইবে। এই যন্ত্র নির্ম্মাণে এখন পর্য্যন্ত কেহ হাত দেন নাই, যন্ত্রটির একটি ছোট মডেল বা নমুনার ছবি আমরা ছাপিতেছি। পণ্ডিতদের অনুমানে হিসাবের কোনও ভুল না থাকাই সম্ভব, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কোটা কোটা টন বাতাস স্থানান্তরিত করিতে যে বিরাট শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন, মানুষের চেষ্টায় তাহা প্রস্তুত হওয়া সম্ভব এবং সুবিধাজনক হইবে কি না তাহা লইয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

—

আগুন-বাঁচানো জলের পর্দ্দা—

শিকাগো পাব্‌লিক লাইব্রেরীর বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বইগুলিকে আগুনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ চমৎকার একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যখনই কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগে লাইব্রেরী বাড়ীর চারিপাশের ছাতের কার্ণিশ বাহিয়া চারিটি জল-ধারার পর্দ্দা ঝরিয়া পড়ে। ছুটকো আগুনের ফুল্‌কি ছুটিয়া আসিয়া ঐ জলের পর্দ্দায় বাধা প্রাপ্ত বলিয়া কিছুতেই আগুনের ছোঁয়াচ লাইব্রেরীর গায়ে লাগিতে পায় না।

সংগ্র।



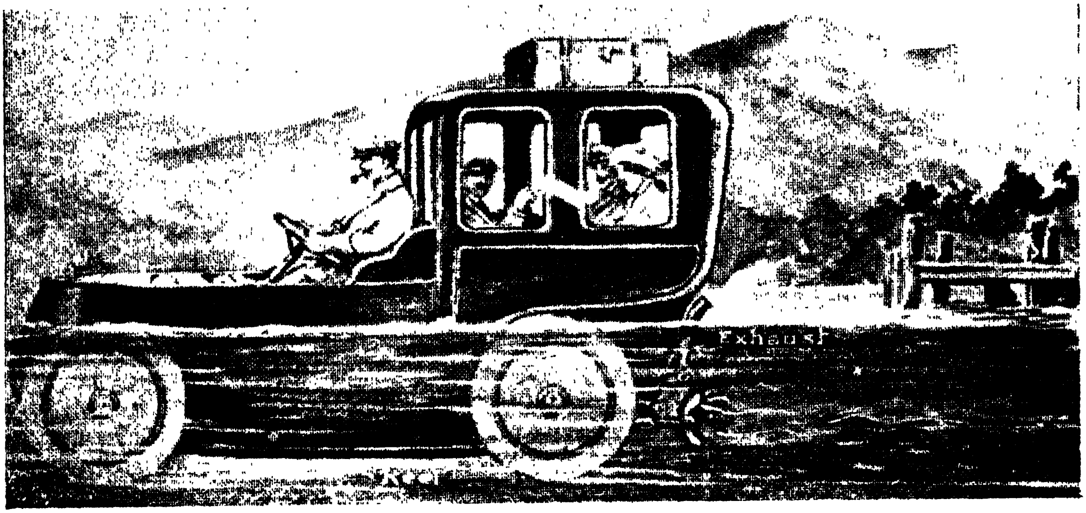
আগুন-বাঁচানো জলের পর্দা।

উভচর গাড়ী—

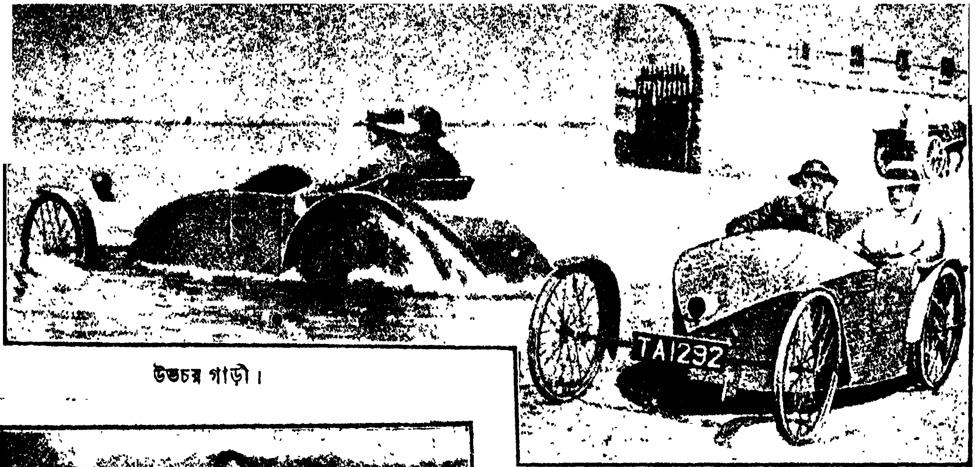
একরকম নৌকা-গাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গাড়ীর সুবিধা এই যে, এ যেমন চলে জলে, তেমনি চলে ডাঙ্গায়। ডাঙ্গার থেকে জলে নাম্‌তে হলে বা জল থেকে ডাঙ্গায় উঠ্‌তে হলে এর শক্তি বাড়াতে বা কমাতে হয় না। এই গাড়ীর পিছনের চাকাতে জল কাটাবার উপযোগী প্যাডেল লাগান আছে। এই প্যাডেল থাকে চাকার ভিতরের দিকে। চাকাদুটি খুব শক্ত এবং চওড়া মাড্‌গার্ডে ঢাকা থাকে। সমস্ত গাড়ীখানি দেখ্‌তে অনেকটা একটা নৌকার খোলের মত। গাড়ীর সাম্‌নে, মোটর সাইকেলের মত একটা চাকা থাকে, সেটা নিরেট। এই চাকার সাহায্যে গাড়ীর গতি ঠিক করা হয়। চালক একটা চাকা (অনেকটা জাহাজের ষ্টিয়ারিং হুইলের মত) হাতে ধরে' গাড়ীর মধ্যে বসে' থাকে। হঠাৎ কল খারাপ হয়ে গেলে সাইকেলের মত প্যাডেল করে'ও এই গাড়ীকে চালান যায়।

জলে চল্‌বার সময় নৌকার মত গাড়ীর কতকটা অংশ জলে ডুবে থাকে। সাধারণ মোটরকারগুলির তলা ও অন্যান্য পার্শ্ব খোলা থাকে, কিন্তু এই মোটরগুলির তলা থেকে উপর পর্য্যন্ত কেবল গ্যাস বের হয়ে যাবার জন্য দু-এক জায়গায় ছাড়া সমস্ত অংশ ষ্টীলের পাতের আবরণে ঢাকা থাকে।

অলক।



উভচর গাড়ী।



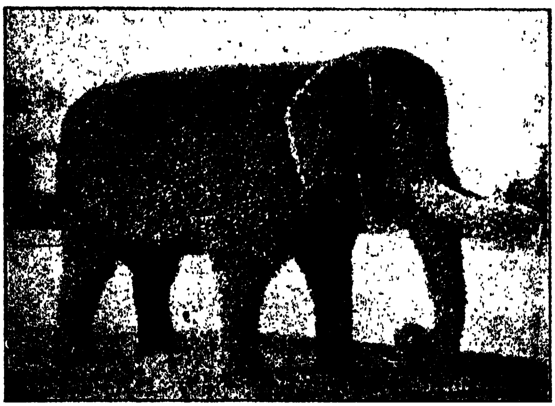
উভচর গাড়ী।



উভচর মোটর-গাড়ী।

গাছে-তৈরী হাতী—

কয়েকটি গাছ কাছাকাছি বসাইয়া তারা বড় হইলে মাথায় মাথায় জুড়িয়া ঝোপ বাঁধিয়া গেলে তাদের কাটিয়া হাতীর আকারে তৈরী করা কঠিন নয়। ছবিটি দেখিলেই তাহা বোঝা যাইবে।



হাতীর আকারে ছাঁটা গাছ।

দৌড়িয়া ফিরিবার গাড়ী—

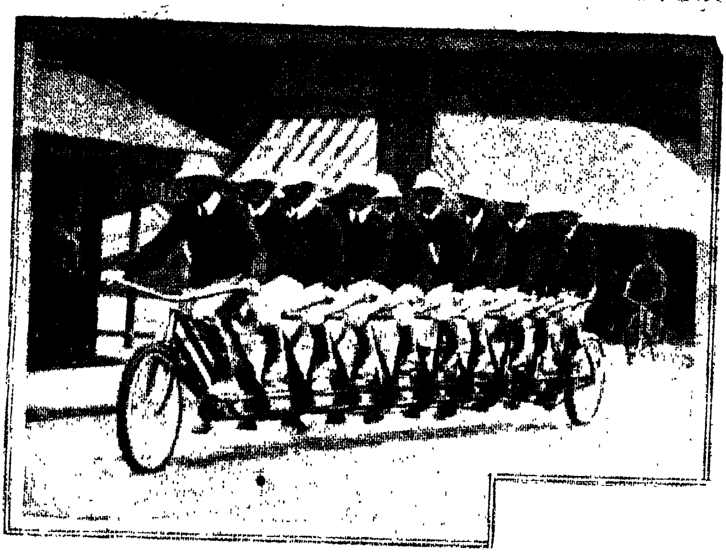
লণ্ডনের মত বড় সহরে মোটরগাড়ী রাখা সব-চেয়ে বড় হাঙ্গামা, গাড়ী রাখিবার স্থান বা গারেজের অভাব। লণ্ডনের এক জন লোক এই গারেজ-হাঙ্গামা অনেকটা দূর করিয়াছেন। তিনি একটা খুব ছোট অথচ বেশ সুবিধাজনক গাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। এই গাড়ী দেখিতে অনেকটা মোটর সাইকেলের মত, অথচ মোটর সাইকেল রাখার এবং মেরামতের যত হাঙ্গামা হয়, ইহাতে তা অনেক কম পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। সহরের অলি-গলি, বড় রাস্তা, ভীড়ের মধ্যে দিয়া, এই "রান্ এবাউট" গাড়ী বেশ সহজে চলা-ফেরা করে। বসিবার জায়গার নীচে দু-একটা বোচ্‌কাও লওয়া যায়। গাড়ীখানি আড়াই হর্স-পাওয়ার ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে।

দশজন-চাপা বাইসাইকেল—

বাইসাইকেলে একজন লোকেরই বসিবার স্থান থাকে। আরোহীর সঙ্গে পিছন দিকে বা সাম্‌নে আর-একজন চাপিয়াও অনেক সময় যায়। সম্প্রতি



দৌড়িয়া ফিরিবার গাড়ী।



দশজন-চাপা বাইসাইকেল।

আমেরিকায় একরকম প্রকাণ্ড লম্বা বাইসাইকেল তৈরী হইয়াছে। ইহার সামনে একটি চাকা ও পিছনে একটি, মাঝখানটায় লম্বা লোহার ডাণ্ডা। ইহাতে বসিবার দশটি জায়গা আছে। দশজন লোক লইয়াও এই গাড়ী ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটিতে পারে। দশজন লোককেই প্যাডেল ঘুরাইয়া গাড়ী চালাইতে হয়। ওয়াল্‌টার্‌ মেজ, ওয়াল্‌থাম, মাসাচুসেট্‌স্‌—এই ঠিকানায় গাড়ীটি আছে। প

ধর্ম্মভীরু

সত্য তব ভীরু নাম ; কেন তবে বৃথা আপনারে
"ধর্ম্ম"-ভীরু বলি' সুধু ভীরুতার গ্লানি মিটাবারে
লোকের করুণা যাচি' ফিরিতেছ ম্লান হাসি নিয়া
সুকোমল সুবিনয়ে প্রাণপণে সবারে তুষিয়া
কুড়ায়ে সবার কৃপা, অপরাধী অভাগার মত
—হায়রে সুনাম-ভিক্ষু—নিতান্ত সঙ্কোচে ভয়ে নত।
চেয়ে দেখ ফুল্ল ধরা আনন্দের নির্ব্বিরোধ টানে
ছুটিয়া চলেছে বেগে, বাধা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাহি মানে ;
শস্যশ্যাম বসুন্ধরা আনন্দের বিপুল আবেগে
তুলিছে রসের স্বর্গ। উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে জেগে
পুলকিত রসের জোয়ার—স্নেহের পরশে নিত্য
দিকে দিকে অন্তরে বাহিরে—এই ত জীবন-বিত্ত ;
আপন শক্তির বলে এই রসভোগ ;—মহাপ্রাণ
আপন শক্তির অনুভূতি ;—ধরণীর মহাদান।

তুমি হেথা সাবধানে ভয়ে ভয়ে ফেলিছ পা-দুটি,
পাছে হয় অপরাধ ; পাছে কোন হয়ে যায় ত্রুটি ;
পরকালে—কে জানে কোথা সে পরকাল—সুসঞ্চিত
পুণ্যের সঞ্চয় হতে কণামাত্র করেন বঞ্চিত
তোমার "করুণাময়" পাছে ;—প্রকৃতির মুক্তদান
প্রকৃতির শিশু পাছে করিলে সম্ভোগ, অপমান
হয় বিধাতার। তাই আছ ভয়ে ত্রস্ত নিশিদিন,
বহুযত্নে তিলে তিলে আপনারে করিয়াছ দীন।
ওরে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী! চিনিলে না আপনারে
ছায়ার ছলনে হায়! অমৃতের অর্ঘ্য ভারে ভারে
সাজায়ে রেখেছে এই রত্নময়ী রসময়ী ধরা
তোমারি সেবার লাগি' ; তোমার এ দেহ-মন-ভরা
উদ্দাম বাসনা-বেগে ঝাঁপায়ে পড়িয়া তার বুকে
দস্যুবৃত্ত লুব্ধ নরশিশু—বিপুল নির্দ্দয় সুখে

শুষিয়া লুটিয়া লবে বলে'। ব্যর্থ করিয়াছ তারে—
সেই সে অমৃতরূপ বিশ্বরূপ ভুবন-মাঝারে।
মাঝে মাঝে যবে কোন বসন্তের রঙিন সন্ধ্যায়
বাঁশরীর-মন্ত্র-স্তব্ধ অতিদূর শ্যাম নীলিমায়
রাখিয়া অলস আঁখি, জেগে ওঠে আকুল বেদনা
বিরহী বুকের মাঝে—নিপীড়িত মূর্চ্ছিত চেতনা
প্রাণ পেয়ে উঠে কেঁদে নিরাকুল রুদ্ধ হাহাকারে,
নিরন্তর উপবাসী ক্ষুধা তার চাহে মিটাবারে,
উন্মত্ত আবেগভরে স্নায়ু-শিরা করে কম্পমান,—
অপরাধ-ভয়ে তব আতঙ্কে শিহরি' উঠে প্রাণ।
এ কি ব্যর্থ—এই দেহ, এই তৃষ্ণা, এ জাগ্রত ক্ষুধা?
এও ব্যর্থ—ধরণীর অফুরাণ পরিপূর্ণ সুধা?
আপনারে ভয়ে ভয়ে বঞ্চিত করিয়া পলে পলে
মৃত্যুরে আনিলে বরি',—হতভাগা, ধর্ম্ম তারে বলে?
কোথায় সে পরকাল "স্বর্গ" যার শূন্য মরীচিকা!
কোথা বা সে "দয়াময়" ধার্ম্মিকের চির-বিভীষিকা!
ভুলিয়া "মানবধর্ম্ম" তরাসে আকুল নিশিদিন
করুণা-কাঙাল ভীরু, ওরে ব্যর্থ, ওরে ধর্ম্মহীন!

শ্রীজীবনময় রায়।

উপেক্ষিতা

পথে যেতে যেতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে বোধ হয় বাংলা দুই কি তিন সালের কথা। নতুন কলেজ থেকে বার হয়েছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, স্কুল-মাষ্টারী নিয়ে গেলুম হুগলী জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। গ্রামটির অবস্থা একসময়ে খুব ভাল থাকলেও আমি যখন গেলুম তখন তার অবস্থা খুব শোচনীয়। খুব বড় গ্রাম, অনেকগুলি পাড়া, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত বোধ হয় এক ক্রোশেরও ওপর। প্রাচীন আম-কাঁটালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার।

আমি ও-গ্রামে থাক্‌তুম না। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সে গ্রামের রেলষ্টেশন। ষ্টেশনমাষ্টারের একটি ছেলে পড়ানোর ভার নিয়ে, সেই রেলের P. W. D.-এর একটা পরিত্যক্ত বাংলায় থাক্‌তুম। চারিদিকে নির্জ্জন মাঠ, মাঝে মাঝে তাল-বাগান। স্কুলটি ছিল গ্রামের ও-প্রান্তে, গ্রামের মধ্যে নেমে হেঁটে যেতুম প্রায় এক ক্রোশ।

একদিন বর্ষাকাল, বেলা দশটা প্রায় বাজে, স্কুলে যাচ্ছি। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটু শীঘ্র যাবার জন্য, পাড়ার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে সেইটে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত পথটা বড় বড় আম-কাঁটালের ছায়ায় ভরা। একটু আগে খুব এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আকাশ মেঘে ভরা ছিল। গাছের ডাল থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টির জল ঝরে' পড়্‌ছিল। একটা জীর্ণ-ভাঙ্গা-ঘাট-ওয়ালা প্রাচীন পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কে একজন স্ত্রীলোক, খুব টকটকে রংটা, হাতে বালা অনন্ত, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ী, বয়স ২৫।২৬ হবে, পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঘড়া নিয়ে উঠ্‌লেন আমার সাম্‌নের রাস্তায়। বোধ হয় পুকুরে যাচ্ছিলেন জল আন্‌বার জন্যে। আমায় দেখে ঘোম্‌টা টেনে পথের পাশে দাঁড়ালেন। আমি পাশ কাটিয়ে জোরে চলে' গেলুম। আমার এখন স্বীকার কর্‌তে লজ্জা হয় কিন্তু তখন আমি ইউনিভার্সিটীর সদ্যপ্রসূত গ্রাজুয়েট, বয়স সবে কুড়ি এবং অবিবাহিত। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পাতায় পাতায় যে-সব তরলিকা, মঞ্জুলিকা, বাসন্তী; যে-সব উজ্জয়িনীবাসিনী অগুরু-বাস-মোদিত-কেশা তরুণী অভিসারিকার দল, তারা আর তাদের সঙ্গে ইংরেজি কাব্যের কত Althea কত Genevieve কত Theosebia তাঁদের নীল নয়ন আর তুষার-ধবল কোমল বাহুবল্লী নিয়ে আমার তরুণ মনের মধ্যে রাতদিন একটা সুমিষ্ট কল্পলোকের সৃষ্টি

করে' রেখেছিল। তাই সেদিন সেই সুশ্রী তরুণী আর তাঁর বালা-অনন্ত-পরা অনাবৃত হাতদুটির সুঠাম সৌন্দর্য্য আর সকলের ওপর তাঁর পরনের শাড়ী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট তাঁর সমস্ত দেহের একটা মহিমান্বিত সীমারেখা আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত করে' ফেললে। আমার মনের ভিতর একপ্রকারের নূতন অনুভূতি আমার বুকের রক্তের তালে তালে সেদিন একটা নূতন স্পন্দন আমার কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো।

বিকাল বেলা রেল-লাইনের ধারে মাঠে গিয়ে চুপ করে' বসে' রইলুম। তালবাগানের মাথার ওপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রংএর মেঘগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো, হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখ্‌তে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর। বেশ কল্পনা করে' নেওয়া যাচ্ছিল যে সেই সমুদ্রের চারি-পাশে একটা গূঢ় রহস্য ভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিন কেটে গিয়ে রাত হল। বাসায় এসে Keats পড়্‌তে সুরু কর্‌লাম। পড়্‌তে পড়্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে। অনেক রাত্রে উঠে দেখ্‌লুম বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ মেঘে অন্ধকার।

তার পরদিনও পাড়ার ভেতর দিয়ে নেমে গেলুম। সেদিন কিন্তু তাঁকে দেখ্‌লুম না। আসবার সময়ও সেখান দিয়েই এলুম, কাউকে দেখ্‌লুম না। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার দিন আবার সেই পথ দিয়েই গেলুম। পুকুরটার কাছাকাছি গিয়েই দেখি যে তিনি জল নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌ছেন, আমায় দেখে ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার বুকের রক্তটা যেন দুলে উঠ্‌ল, খুব জোরে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম। রাস্তার বাঁকের কাছে গিয়ে ইচ্ছা আর দমন কর্‌তে না পেরে একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখি তিনি ঘাটের ওপর উঠে ঘোম্‌টা খুলে কৌতূহল-নেত্রে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইতেই ঘোম্‌টা আবার টেনে দিলেন।

ওপরের পথটা ছেড়েই দিলুম একেবারে। পুকুরের পথ দিয়েই রোজ যাই। দুএকদিন পরে আবার একদিন তাঁকে দেখ্‌তে পেলুম। আমার মনে হলো সেদিনও তিনি আমায় একটু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য কর্‌লেন। এইভাবে পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেল। কোনদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাই, কোন-দিন পাই না। আমার কিন্তু বেশ মনে হতে লাগ্‌লো, তিনি আমার প্রতি দিনদিন আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠ্‌ছেন। আজ-কাল ততটা ত্রস্ত ভাবে ঘোম্‌টা দেন না। আমারও কি হলো,—তাঁর গতি-ভঙ্গীর একটা মধুর শ্রী, তাঁর দেহের একটা শান্ত কমনীয়তা, আমায় দিন-দিন যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

একদিন তখন আশ্বিনমাসের প্রথম, শরৎ পড়ে' গিয়েছে, নীল আকাশে সাদা সাদা লঘু মেঘখণ্ড উড়ে যাচ্ছে, চারিদিকে খুব রৌদ্র ফুটে উঠেছে, রাস্তার পাশের বন-কচু ভাঁট শেওড়া কুঁচলতার ঝোপ থেকে একটা কটুতিক্ত গন্ধ উঠ্‌ছে। শনিবার আমি সকাল-সকাল স্কুল থেকে ফির্‌ছি। রাস্তা নির্জ্জন, কেউ কোনদিকে নেই। পুকুরটার পথ ধরেছি, একদল ছাতারে পাখী পুকুরের ও-পারের ঝোপের মাথায় কিচ্‌কিচ্‌ কর্‌ছিল, পুকুরের জলের নাল-ফুলের দলগুলো রৌদ্রতাপে মুড়ে ছিলো। আমি আশা করিনি এমন সময় তিনি পুকুরের ঘাটে আসবেন। কিন্তু দেখ্‌লুম তিনি জল ভরে' উঠে আস্‌ছেন। এর আগে চারপাঁচ দিন তাঁকে দেখিনি, হঠাৎ কি মনে হলো, একটা বড় দুঃসাহসের কাজ করে' বসলুম। তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌লুম, "দেখুন, কিছু মনে কর্‌বেন না আপনি। আমি এখানকার স্কুলে কাজ করি, রোজ এই পথে যেতে যেতে আপনাকে দেখ্‌তে পাই, আমার বড় ইচ্ছা করে আপনি আমার বোন্ হন। আমি আপনাকে বৌদিদি বল্‌ব, আমি আপনার ছোট ভাই। কেমন তো?" তিনি আমার কথার প্রথম অংশটায় হঠাৎ চম্‌কে উঠে কেমন জড়সড় হয়ে উঠ্‌ছিলেন, দ্বিতীয় অংশটায় তাঁর সে চম্‌কানো ভাবটা একটু দূর হলো। ঘড়া-কাঁখে নীচু-চোখে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যুক্ত-করে প্রণাম করে' বল্‌লুম, "বৌদিদি, আমার এ ইচ্ছা আপনাকে পূর্ণ কর্‌তে হবে। আমাকে ছোট ভাইয়ের অধিকার দিতেই হবে আপনাকে।"

তিনি ঘোমটা অর্দ্ধেকটা খুলে একটা স্থির শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সুশ্রী মুখ যে আমি কখনো দেখিনি তা নয়, তবুও মনে হলো তাঁর ডাগর কালো চোখদুটির শান্ত ভাব আর তাঁর ঠোঁটের নীচের একটা বিশেষ ভাঁজ এই দুটিতে মিলে তাঁর সুন্দর মুখের গড়নে এমন এক বৈচিত্র্য এনেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে' রইলুম। তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

আনন্দে সারা গা কেমন শিউরে উঠলো। বললুম, "কলিকাতার কাছে, ২৪-পরগণা জেলায়। এখানে ষ্টেশনে থাকি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি ?"

নাম বললুম।

তিনি বললেন, "তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন ?"

বললুম, "এখন বাড়ীতে শুধু মা আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাবা এই দুবৎসর মারা গিয়েছেন।"

তিনি একটু যেন আগ্রহের সুরে বললেন, "তোমার কোন বোন নেই ?"

আমি বললুম, "না। আমার দুজন বড় বোন ছিলেন, তাঁরা অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বড়দি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট, মেজদি আজ পাঁচ-ছ বছর মারা গিয়েছেন। আমি এই মেজদিকেই জানতুম, তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি আমার চেয়েও ছয় বছরের বড় ছিলেন।"

তাঁর দৃষ্টি একটু ব্যথা-কাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মেজদি থাকলে এখন তাঁর বয়স হত কত ?"

বললুম, "এই ছাব্বিশ বছর।"

তিনি একটু মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন, "তাই বুঝি ভাইটির আমার একজন বোন খুঁজে বেড়ান হচ্ছে, না ?"

কি মিষ্টি হাসি! কি মধুর শান্ত ভাব! মাথা নীচু করে' প্রণাম করে' তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম, "তা হলে ভাইয়ের অধিকার দিলেন তো আপনি ?" তিনি শান্ত হাসি-মাখা মুখে চুপ করে' রইলেন।

আমি বললুম, "বৌদি, আমি জানতুম আমি পাব। আগ্রহের সঙ্গে খুঁজলে ভগবান নাকি ধরা দেন, আমি একজন বোন অনায়াসেই পাব। আচ্ছা এখন আসি। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না যেন, বৌদি ? আপনার যেন দেখা পাই। রবিবার বাদে আমি দুবেলাই এ রাস্তা দিয়ে যাব।"

আমার মাঠের ধারের তালবাগানটায় পাখীগুলো রোজই সকাল বিকাল ডাকে। একটা কি পাখী তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আনে; মন যেদিন ভারী থাকে সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য্য প্রাণের মধ্যে কোন সাড়া দেয় না। আজ দেখলুম পাখীটার গানের সুরের স্তরে স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্ণের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্ততঃ-বর্দ্ধিত অযত্ন-সম্ভূত তাল নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্ণের অবসন্ন রৌদ্রে চিকচিক্ করছে।

তার পরদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা হলো ছুটার পর বিকাল বেলা। বৌদিদি যেন চাপাহাসির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে, বিমলের বুঝি আজ খুব সকাল-সকাল স্কুল যাওয়া হয়েছিল ?"

আমি উত্তর দিলুম, "বেশ বৌদি, আমি ওবেলা তো ঠিক সময়েই গেলুম—আপনিই ছিলেন না, এখন দো[illegible] বুঝি আমার ঘাড়ে চাপান হচ্ছে, না ? আর বৌদি, ঘাটে ওবেলা আরও সব মেয়েরা ছিলেন।"

বৌদিদি হেসে ফেললেন, বললেন, "হাইতো! ভাইটির আমার ওবেলা তো বড় বিপদ গিয়েছে তা হলে ?"

আমার কেমন একটু লজ্জা হলো, ভাল করে জবাব দিতে না পেরে বললুম, "তা নয় বৌদি, আমি এখানে অপরিচিত, পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ, পাছে কেউ কিছু মনে করে।"

বৌদিদির চোখের কৌতুক-দৃষ্টি তখনও যায় নাই, তিনি বললেন, "আমি ওবেলা ঘাটের জলেই ছিলাম বিমল। তুমি ওই চটকা গাছটার তলায় গিয়ে একবার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে, আমায় তুমি দেখতে পাও নি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বৌদি, আপনার বাপের বাড়ী কোথায় ?"

বৌদিদি উত্তর দিলেন, "খোলাপোতা চেন? সেই খোলাপোতায়।" আমি ইতস্ততঃ কর্‌ছি দেখে আমায় আর-একটু বিশদ সংবাদ দিয়ে বল্‌লেন, "ওই যে খোলাপোতায় রাস হয়?" বৌদিদির হাসি-ভরা দৃষ্টি যেন একটু গর্ব্বমিশ্রিত হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু বলা আবশ্যক যে খোলাপোতা বলে' কোন গ্রামের নাম এই আমি প্রথম শুন্‌লুম। অথচ বৌদিদির বাপের বাড়ী, যেখানে এমন রাস হয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত খোলাপোতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা পাছে তাঁর মনে ব্যথা দেয়, এই ভয়ে বলে' ফেল্‌লুম, "ও! সেই খোলাপোতায়? ওটা কোন্ জেলায় ভালো—"

বৌদিদির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম কিন্তু দেখ্‌লুম তিনি সে বিষয়ে নির্ব্বিকার। তাঁর হাসি-ভরা সরল মুখখানির দিকে চেয়ে আমার করুণা হলো, এ-সমস্ত জটিল ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে তাঁকে পীড়ন কর্‌তে আর আমার মন সর্‌ল না।

বল্‌লুম, "আচ্ছা বৌদি, আসি তা হলে।"

বৌদিদি তাড়াতাড়ি ঘড়ার মুখ থেকে কলার-পাত-মোড়া কি বার কর্‌লেন। সেইটে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "কাল চাপ্‌ড়া-ষষ্ঠীর জন্যে ক্ষীরের পুতুল তৈরী করেছিলাম, আর গোটাকতক কলার বড়া আছে, বাসায় গিয়ে খেও।"

একদিন চার-পাঁচ দিন জ্বর-ভোগের পর পথ্য পেয়ে স্কুলে যাচ্চি, বৌদিদির সঙ্গে দেখা। আমায় আস্‌তে দেখে বৌদিদি উৎসুক দৃষ্টিতে অনেকদূর থেকে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। নিকটে যেতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এ কি বিমল, এমন মুখ শুক্‌নো কেন?"

বল্‌লুম, "জ্বর হয়েছিল বৌদিদি।"

বৌদিদি উদ্বেগের সুরে বল্‌লেন, "ও, তাই তুমি চার-পাঁচ দিন আসনি বটে! আমি ভাব্‌লাম বোধ হয় কিসের ছুটি আছে। আহা, তাইতো, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ যে বিমল।"

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের-ব্যথা-মিশ্রিত স্নেহের আত্মপ্রকাশ বেশ বুঝ্‌তে পেরে মনের মধ্যে একটা নিবিড় আনন্দ পেলুম। হেসে বল্‌লুম, "যে দেশ আপনাদের বৌদি, একবার অতিথি হলে আপ্যায়নের চোটে একেবারে অস্থির করে তুলবে।"

বৌদিদি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আচ্ছা বিমল, ওখানে তোমায় রেঁধে দেয় কে?"

আমি বল্‌লুম, "কে আর রাঁধ্‌বে, আমি নিজেই।"

বৌদিদি একটু চুপ করে' রইলেন, তার পর বল্‌লেন, "আচ্ছা বিমল, এক কাজ কর না কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "কি?"

তিনি বল্‌লেন, "মাকে এই পুজোর ছুটির পর নিয়ে এস। এ রকম করে' কি করে' বিদেশে কাটাবে বিমল? লক্ষ্মীটি, ছুটির পর মাকে অবিশ্যি করে' নিয়ে এস। এই গাঁয়ের ভেতর অনেক বাড়ী পাওয়া যাবে। আমাদের পাড়াতেই আছে। না হলে অসুখ হলে কে একটু জল দেয়?...আচ্ছা হ্যাঁ বিমল, আজ যে পথ্য কর্‌লে, কে রেঁধে দিলে?"

আমার হাসি পেল, বল্‌লুম, "কে আবার দেবে বৌদি? নিজেই কর্‌লুম।" তিনি আমার দিকে যেন কেমন ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর সেদিনের সেই সহানুভূতি-বিগলিত স্নেহ-মাখানো মাতৃমুখের জল-ভরা কালো চোখদুটি পরবর্ত্তী জীবনে আমার অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে ছিল।

সেদিন স্কুল থেকে আস্‌বার সময় দেখি, বৌদিদি যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা কর্‌ছেন। আমায় দেখে কলার পাতায় মোড়া কি একটা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "শরীরটা একটু না সার্‌লে রাত্রে গিয়ে রান্না, সে পেরে উঠ্‌বে না বিমল। এই খাবার দিলাম, রাত্রে খেও।" বোধ হয় একটু আগেই তৈরী করে' এনেছিলেন, আমি হাতে বেশ গরম পেলুম। বাসায় এসে কলার পাত খুলে দেখি, খানকতক রুটি মোহনভোগ আর মাছের একটা ডাল্‌না মতো।

তার পরদিন ছুটির পর আস্‌বার সময়ও দেখি বৌদিদি খাবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "বিমল, তুমি তোমার ওখানে দুধ নেও?"

আমি বল্‌লুম, "কেন, তা হলে দুধও খানিকটা করে দেন বুঝি? সত্যি বল্‌চি বৌদি, আপনি আমার জন্য অনর্থক এ কষ্ট কর্‌বেন না, তা হলে এ রাস্তায় আমি আর আস্‌চি না।"

বৌদিদির গলা ভারী হয়ে এল, আমার ডান হাতটা আস্তে আস্তে এসে ধরে' ফেল্‌লেন, বল্‌লেন, "লক্ষ্মী ভাই, ছি ও-কথা বোলো না। আচ্ছা আমি যদি তোমার মেজদিই

হতাম তা হলে এ কথা কি আজ আমায় বল্‌তে পার্‌তে? আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে।" সেই দিন থেকে বৌদিদি রোজ রাত্রের খাবার দেওয়া সুরু করলেন, সাত-আট দিন পরে রুটির বদলে কোনদিন লুচি কোনদিন পরেটা দেখা দিতে লাগ্‌লো। তাঁর সে আগ্রহভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর সে-সব স্নেহের দান ঠিক অস্বীকারও কর্‌তে পার্‌তুম না, অথচ এই ভেবে অস্বস্তি বোধ কর্‌তুম যে আমার এই নিত্য খাবার জোগাতে না-জানি বৌদিদিকে কত অসুবিধাই পোহাতে হচ্চে। তার পরই আশ্বিন মাসের শেষে পুজোর ছুটি এসে পড়াতে আমি নিষ্কৃতি পেলুম।

সমস্ত পুজোর ছুটিটা কি নিবিড় আনন্দেই কাট্‌ল সেবার! আমার আকাশ বাতাস যেন রাতদিন আফিমের রঙীন ধুমে আচ্ছন্ন থাক্‌তো। ভোর বেলা আমাদের উঠানের শিউলী গাছের সাদা-ফুল-বিছানো তলাটা দেখ্‌লে—হেমন্ত-রাত্রির শিশিরে-ভেজা ঘাসগুলোর গা যেমন শিউরে আছে, ওই রকম —আমার গা শিউরে উঠ্‌তো; কার ওপর আমার জীবনের সমস্ত ভার অসীম নির্ভরতার সঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আমার মন যেন শরতের জল-ভার-নামানো হাল্‌কা মেঘের মত একটা সীমাহারা হাওয়ার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো।

ছুটি ফুরিয়ে গেল। প্রথম স্কুল খুল্‌বার দিন পথে তাঁকে দেখ্‌লুম না। বিকালে যখন ফিরি, তখন শীতের হাওয়া একটু একটু দিচ্চে। পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু, কালকাসন্দা ধুতুরা কুঁচকাটা আর ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি করে' একটুখানি ছোট ঝোপ-মত তৈরী করেছে, শীতল হেমন্ত-অপরাহ্নের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে, এমন একটা মিষ্ট নির্ম্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠ্‌চে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চল-প্রান্তের মতো।

তার পরদিন তাঁকে দেখ্‌লুম।

তিনি আমায় লক্ষ্য করেন নি, আপনমনে ঘাটের চাতালে উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন। আমি ডাক্‌লুম, "বৌদি?" বৌদিদি কেমন হঠাৎ চম্‌কে উঠে আমার দিকে ফিরলেন।

"এ কি, বিমল! কবে এলে? আজ কি স্কুল খুল্‌লো? কি রকম আছো?" সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বরটি! সেই স্নেহ-ঝরা শান্ত চোখ-দুটি! বৌদিদি আমার মনে ছুটির আগে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, ছুটির পরের স্থানটা তার চেয়ে আরও ওপরে। আমি সমস্ত ছুটিটা তাঁকে ভেবেছি, নানা মূর্ত্তিতে নানা অবস্থায় তাঁকে কল্পনা করেছি, নানা গুণ তাঁতে আরোপ করেছি, তাঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধ মনের মধ্যে অনেক ভাঙা-গড়া করেছি। আমার মনের মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা-ভালবাসায় গড়া তাঁর কল্পনা-মূর্ত্তিকে অনেক অর্ঘ্য-চন্দনে চর্চ্চিত করেছি। তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখ্‌লুম তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্ম্মলা, পূতহৃদয়া, পুণ্যময়ী মানসী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদিদিকে তিনি তাঁর মহিমা-খচিত দিব্য-বসনের আচ্ছাদনে আবৃত করে' রেখেছিলেন, তাঁর স্নেহ-করুণার জ্যোতির্বাষ্পে বৌদিদির রক্তমাংসের দেহটার একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ কাকে দেখ্‌লুম বল্‌বো?

আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু উর্দ্ধে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধ্‌বে; হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন্, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভার-সমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মতো তাঁদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্য্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা-বোনেরা যে দেহ ধারণ করে' বেড়াবেন;—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিদিতে দেখ্‌তে পেলুম। আমার মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়্‌লো, আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম কর্‌লুম। বৌদিদি বল্‌লেন, "এস, এস ভাই, আর নমস্কার কর্‌তে হবে না, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি এমনিই রাজা হও। আচ্ছা, বিমল, বাড়ী গিয়ে আমার কথা মনে ছিল?"

মনে এলেও বাইরে আর বল্‌তে পার্‌লুম না, কে তবে আমার মগ্নচৈতন্যকে আশ্রয় করে' আমার নিত্য সুষুপ্তির মধ্যেও আমার সঙ্গিনী ছিল, বৌদি? শুধু একটু

হেসে চুপ করে' রইলুম। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন, "মা ভাল আছেন?"

আমি উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ, বৌদি, তিনি ভাল আছেন। তাঁকে আপনার কথা বললুম।"

বৌদিদি আগ্রহের স্বরে বললেন, "তিনি কি বললেন?"

আমি বললুম, "শুনে মার দুই চোখ জলে ভরে' এল, বললেন—একবার দেখাবি তাকে বিমল? আমার নলিনীর শোক বোধ হয় তাকে দেখ্‌লে অনেকটা নিবারণ হয়।"

বৌদিদিরও দেখ্‌লুম দুই চোখ ছলছল করে' এল, আমায় বললেন, "হ্যাঁ বিমল, তা মাকে এই মাসে নিয়ে এলে না কেন?"

আমি বললুম, "সে এখন হয় না বৌদি।"

বৌদিদি একটু ক্ষুন্ধ হলেন, বললেন, "বিমল, জানো তো সেবার কি রকম কষ্টটা পেয়েছ! এই বিদেশ বিভুঁই, মাকে আন্‌লে এই মিথ্যে কষ্টটা তো আর ভোগ করতে হয় না?"

আমি উত্তর দিলুম, "বৌদি, আমি ত আর ভাবি নে যে আমি বিদেশে আছি, যেখানে আমার বৌদি রয়েছেন সে দেশ আমার বিদেশ নয়। মা না থাকলেও আমার এখানে ভাবনা কিসের বৌদি?"

বৌদিদির চোখে লজ্জা ঘনিয়ে এল, আমার দিকে ভাল করে চাইতে পারলেন না, বললেন, "হ্যাঁ, আমি ত সবই করছি। আমার কি কিছু করবার জো আছে? কত পরাধীন আমরা তা জানো ত ভাই? ও-সব নয়, তুমি এই মাসেই মাকে আন।"

আমি কথাটাকে কোন রকমে চাপা দিয়ে সেদিন চলে' এলুম।

তার পরদিনও ছুটির পর বৌদিদির সঙ্গে দেখা। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আস্‌বার সময় তিনি কলার পাতে মোড়া আবার কি একটা বার করলেন। তাঁর হাতে কলার পাত দেখ্‌লেই আমার ভয় হত, আমি শঙ্কিতচিত্তে বলে' উঠ্‌লুম, "ও আবার কি বৌদি? আবার সেই—"

বৌদিদি বাধা দিয়ে বললেন, "আমার কি কোন সাধ নেই বিমল? ভাই-ফোঁটাটা অমনি অমনি গেল, কিছু কি করতে পারলাম?" কলার-পাত-মোড়া রহস্যটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এতে একটু মিষ্টিমুখ কোরো, আর এইটে নেও একখানা কাপড় কিনে নিও।"

কথাটা ভাল ক'রে শেষ না করে'ই বৌদি আমার হাতে একখানা দশটাকার নোট দিতে এলেন। আমি চমকে উঠ্‌লুম, বললুম, "এ কি বৌদি, না না এ কিছুতে হবে না; খাবার আমি নিচ্ছি, কিন্তু টাকা আমি নিতে পারব না।" আমার কথাটার স্বর বোধ হয় একটু তীব্র হয়ে পড়েছিল, বৌদিদি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তাঁর প্রসারিত হাতখানা ভাল করে' যেন গুটিয়ে নিতেও সময় পেলেন না, যেন কেমন হয়ে গেলেন। তারপর একটুখানি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরই তাঁর টানা কালো চোখদুটি ছাপিয়ে বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়লো। আমার বুকে যেন কিসের একটা খোঁচা বিঁধলো।

এই নিতান্ত সরলা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটির আগ্রহ-ভরা স্নেহ-উপহার রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বুকে যে লজ্জা আর ব্যথার শূল বিদ্ধ করলুম, সে ব্যথার প্রতিঘাত অদৃশ্যভাবে আমার নিজের বুকেও গিয়ে বাজলো।

আমি তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁর হাত থেকে নোটখানা ও খাবার, দুই নিয়ে বললুম, "বৌদি, ভাই বলে' এ অপরাধ এবারটা মাপ করুন আমার; আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না।"

বৌদিদির চোখের জল তখনও থামেনি।

দুই চোখ জলে-ভরা সে তরুণী দেবী-মূর্ত্তির দিকে ভাল করে চাইতে না পেরে আমি মাথা নীচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাড়ী এসে দেখ্‌লুম কলার পাতের মধ্যে কতকগুলো দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলী, সুন্দর করে' তৈরী। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে বৌদিদির বিষণ্ণ মুখের কাতর দৃষ্টি বারবার চোখের সাম্‌নে আস্‌তে যেতে লাগ্‌লো।

মাস-খানেক কেটে গেল।

প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে দেখা হত। এখন আমরা ভাই-বোনের মত হয়ে উঠেছিলুম, সেই রকমই পরস্পরকে ভাবতুম। একদিন আসচি, ফ্লানেল-সার্টের একটা বোতাম আমার ছিল না। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কি, বোতাম কোথায় গেল?"

আমি বললুম, "সে কোথায় গিয়েছে, বৌদি, বোতাম পরাতে জানিনে কাজেই ঐ অবস্থা।"

তার পরদিন দেখলুম তিনি ছুঁচ-সুতো-বোতাম-সমেতই এসেছেন। আমি বললুম, "বৌদি, এটা ঘাটের পথ, আপনি বোতাম পরাতে পরাতে কেউ যদি দেখে তো কি মনে করবে। আপনি বরং ছুঁচটা আমায় দিন, আমি বাড়ী গিয়ে চেষ্টা করব এখন।"

বৌদিদি হেসে বললেন, "তুমি চেষ্টা করে যা করবে তা আমি জানি, নাও সরে এস এদিকে।"

বাধ্য হয়ে সরেই গেলুম, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বোতাম পরাতে লাগলেন। ভয়টা দেখলুম তাঁর চেয়ে আমারই হলো বেশী। ভাবলুম, বৌদির তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু যদি কেউ দেখে তো এর সমস্ত কষ্টটা ওঁকেই ভুগতে হবে।

একদিন বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিমল, গোকুল-পিটে খেয়েছ ?"

আমার মা খুব ভাল গোকুল-পিটে তৈরী করতেন, কাজেই ও-জিনিষটা আমি খুব খেয়েছি। কিন্তু বৌদিদিকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বললুম, "সে কিরকম বৌদি ?"

আর রক্ষা নেই। তার পরদিনই বিকাল বেলা বৌদিদি কলার পাতে মোড়া পিটে নিয়ে হাজির।

আমায় বললেন, "তুমি এখানে আমার সামনেই খাও। ঘড়ার জলে হাত ধুয়ে ফেল এখন।"

আমি বললুম, "সর্ব্বনাশ বৌদি। এই এতগুলো পিটে খেতে খেতে এ পথে লোক এসে পড়বে, সে হয় না, আমি বাড়ী গিয়েই খাবো।"

বৌদি ছাড়বার পাত্রীই নন, বললেন, "না কেউ আসবে না বিমল। তুমি এখানেই খাও।"

খেলুম, পিটে খুব ভাল হয় নি। আমার মায়ের নিপুণ হাতের তৈরী পিটের মত নয়। বোধ হয় নতুন করতে শিখেচেন, ধারগুলো পুড়ে গিয়েছে, আস্বাদও ভাল নয়। বললুম, "বাঃ বৌদি, বড় সুন্দর তো! এ কোথায় তৈরী করতে শিখলেন, আপনার বাপের বাড়ীর দেশে বুঝি ?"

বৌদিদির মুখে আর হাসি ধরে না। হাসিমুখে বললেন, "এ আমি, আমাদের গুরুমা এসেছিলেন, তিনি সহরের মেয়ে, অনেক ভাল খাবার করতে জানেন, তাঁর কাছে শিখে নিয়েছিলাম।"

তারপর সারা শীতকাল অন্যান্য পিটের সঙ্গে সেই বিস্বাদ গোকুলপিটের পুনরাবৃত্তি চললো। ঐ যে বলেছি আমার ভাল লেগেছে, আর রক্ষা নেই।

একটা কথা আছে।

কিছুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ একটু একটু করে' জমছিল, জীবনটাকে খুব বড় করে' অনুভব করবার জন্যে। আমার এ কুড়ি-একুশ বছর বয়সে এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ থাকা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। চলেও যেতাম একদিন। এখানকার একমাত্র বন্ধন হয়েছিলেন বৌদিদি। তাঁরই আগ্রহে, স্নেহ-যত্নে সে অশান্ত ইচ্ছাটা কিছুদিন চাপা ছিল। এমন সময় মাঘ মাসের শেষের দিকে আমার এক আত্মীয় আমায় লিখলেন যে তাঁদের কারখানা থেকে কাচের কাজ শিখবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় ছেলে পাঠানো হবে, অতএব আমি যদি জীবনে কিছু করতে চাই, তবে শীঘ্র যেন মুরাদাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেখানকার কাচের কারখানার ম্যানেজার।

পত্র পেয়ে সমস্ত রাত আমার ঘুম হল না। ইউরোপ, আমেরিকা! সে কত ঊর্ম্মি সংগীত-মুখরিত শ্যাম সমুদ্রতট... কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি...... দূরে সবুজবিন্দুর মত ছোট ছোট দ্বীপ, ঐ কর্সিকা, ঐ সিসিলী। নতুন আকাশ, নতুন অনুভূতি......ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়... প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাদচারণ, লাডগেট সার্কাস, টটেন্‌হাম্‌ কোর্ট রোড ......বার্চ্‌-উইলো-পপ্‌লার-মেপ্‌ল্‌ গাছের সে কত শ্যামল পত্রসম্ভার, আমার কল্পলোকের সঙ্গিনী কনক-কেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী, কত ইউজিনী, কত তুষার ধবল ললাট, কত হরিণীর মত ডাগর ডাগর নীল নয়নে সে কত চকিত দৃষ্টি!

পরদিন সকালে পত্র লিখলুম আমি খুব শীঘ্রই রওনা হব। স্কুলে সেই দিনই নোটীশ দিলুম, পনেরো দিন পরে কাজ ছেড়ে দেবো।

মন বড় ভাল ছিল না, উপরের পথটা দিয়ে কয়েক দিন গেলুম। ১৪।১৫ দিন পরে নীচের পথটা দিয়ে যেতে যেতে একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা। বৌদিদি একটু অভিমান প্রকাশ করলেন, "বিমল, বড় গুণের ভাই তো। আজ চারপাঁচ দিনের মধ্যে বোনটা বাঁচলো কি মলো, তা খোঁজ করলে না।"

আমি বল্লাম, "বৌদিদি, করলে সেটাই অস্বাভাবিক হতো! বোনেরাই ভাইয়েদের জন্যে কেঁদে মরে, ভাইয়েদের দায় পড়েছে বোনদের ভাবনা ভাবতে। দুনিয়া সুদ্ধ ভাই-বোনেরই এই অবস্থা।"

বৌদিদি খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলেন। এই তরুণীর হাসিটি বালিকার মত এমন মিষ্ট নির্ম্মল যে এ শুধু লক্ষ্মীপুর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার মত উপভোগ করবার জিনিষ, বর্ণনা করবার নয়। বল্লেন, "তা জানি জানি, নাও, আর গুমর করতে হবে না, সে গুণ যে তোমাদের আছে তা কি আমরা ভেতরে ভেতরে বুঝি না? কিন্তু বুঝে কি করবো, উপায় নেই। হ্যাঁ, তা সত্যি সত্যি মাকে কবে আনছো?"

আমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বৌদিদিকে কিছু বলিনি। সে কথা বললে যে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। একবার ভাবলুম, সেই তো জানাতেই হবে একদিন, বলে ফেলি। কিন্তু অমন সরল হাসি-ভরা মুখ, অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব,—বলতে বড় বাধলো। ভাবলুম, এই অবোধ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটি, এঁর সকাল-সাঁজের ছায়া-বিছানো পুকুরের ঘাট, বাঁশ-বাগান, চন্দনষষ্ঠী আর এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত দিয়ে তৈরী এর ক্ষুদ্র জগৎটিতে বেশ সুখে বাস করছিলেন। আমি যখন আমার চঞ্চল তরুণ হৃদয় নিয়ে হঠাৎ সেই কোমল প্রাণের বেড়া-ঘেরা ক্ষুদ্র জগৎটির মধ্যে এসে দাঁড়ালুম, তখন ইনি স্নেহদুর্ব্বল নারী-হৃদয়ের আন্তরিকতা নিয়ে, আমায় এঁর আঁচল দিয়ে ঘিরে নিয়েছিলেন, কিন্তু এই যে আমি আজ সে স্নেহ-বাঁধন নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছি, আমায় বাধা দিতে এঁর কোন উপায় আছে? কিছুই না—ইনি তখন শুধু উপেক্ষিত স্নেহের চোখে নিয়ে আমার দিকে চেয়েই রইবেন, নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবে। কিছুই করবার ক্ষমতা নেই এঁর।

তাই বৌদিদির হাসি-ভরা মুখ দেখে করুণায় আমার চোখে জল এল, মনে মনে বললুম, তোমরা কেবল বুঝি স্নেহ ঢেলে দিতেই জানো? তোমাদের স্নেহ-পাত্রদের বিদায়ের বাজনা যে বেজে উঠেছে, এ সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞান কেন?

জিজ্ঞাসা করলুম, "বৌদি, একটা কথা বলি। আপনি আমায় এই অল্পদিনে এত ভালবাসলেন কি করে? আচ্ছা, আপনারা কি ভালবাসার পাত্রাপাত্রও দেখেন না? আমি কে বৌদি, যে, আমার জন্যে এত করেন?"

বৌদিদির মুখ গম্ভীর হয়ে এল। তাঁর ওই এক বড় আশ্চর্য্য ছিল, মুখ গম্ভীর হলেই প্রায়ই চোখে জল আসবে, জল কেটে গেল তা আবার হাসি ফুটবে। শরতের আকাশে রোদ-বৃষ্টি খেলার মত। বললেন, "এতদিন তোমায় বলিনি বিমল, আজ এই পাঁচ বছর হলো আমারও ছোট ভাই আমার মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে, তারও নাম ছিল বিমল। থাকলে সে তোমারই মত হতো এতদিন। আর তোমারই মত দেখতে। তুমি যেদিন প্রথম এ রাস্তা দিয়ে যাও, তোমায় দেখেই আমার মনের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠলো, সেদিন বাড়ী গিয়ে আপন মনে কত কেঁদেছিলাম। তুমি এখান দিয়ে যেতে রোজ তোমাকে দেখতাম। সেদিন তুমি আপনা হতেই দিদি বলে' ডাকলে, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে কি সুখে আছি, তা বলতে পারি নে। তোমায় যত্ন করে', তুমি যে বড় বোনের মত ভালবাস, তাতে আমি বিমলের শোক অনেকটা ভুলেছি। ওই এক ভাই ছিল আমার। তুলসী-তলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা কত প্রণাম করি, বলি, ঠাকুর এক বিমলকে তো পায়ে টেনে নিয়েছ, আর-এক বিমলকে যদি দিলে তো এর মঙ্গল কর; একে আমার কাছে রাখ।"

চোখের জলে বৌদিদির গলা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি কিছু বললুম না। বলবো কি?

একটু পরে বৌদিদি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জল-ভরা চোখদুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন, কি সুন্দর যে তাঁকে দেখাচ্ছিল! কালো চোখদুটি ছল ছল করছে, টানা ভুরু যেন আরও নেমে এসেছে, চিবুকের ভাঁজটি আরও পরিস্ফুট, যেন কোন নিপুণ প্রতিমা-কারক সরু বাঁশের পাত

দিয়ে কেটে তৈরী করেছে। পথের পাশেই প্রথম ফাল্গুনের মুগ্ধ আকাশের তলায় আঁকোড় ফুলের একটা ঝোপে কাঁটা-ওয়ালা ডালগুলিতে থোলো থোলো শাদা ফুল ফুটে ছিল; মনের ফাঁকে ফাঁকে নেশা জমিয়ে আনে, এমনি তার মিষ্টি গন্ধ!

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। খানিক পরে বৌদিদি বল্‌লেন, "সেইজন্যেই বল্‌ছি ভাই, মাকে আনো। আমাদের পাড়ায় চৌধুরীদের বাড়ীটা পড়ে' আছে। ওরা এখানে থাকে না। খুব ভাল বাড়ী, কোন অসুবিধা হবে না, তুমি মাকে নিয়ে এসো, ওখানেই থাকো, সে তাঁদের পত্র লিখ্‌লেই তাঁরা রাজি হবেন, বাড়ী তো এম্‌নি পড়ে' আছে। তোমার বোন পরাধীন, কিছু কর্‌বার তো ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে এ-সব দেখাশোনা, এ সব লুকিয়ে, বাড়ীর কেউ জানে না। তুমি দুবেলা ঘাটের পথ দিয়ে যেও, দেখেই আমি শান্তি পাবো ভাই। মাকে এ মাসেই আনো।"

কেমন করে' তা হবে?

আমি কিছু বল্‌লুম না। সমস্ত বুক উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো কিসের ঢেউয়ে। তাইতো, ওগো ভ্রাতৃ-বিরহ-কাতরা লক্ষ্মী মেয়েটি, তুমি কি ধরে' রাখ্‌তে পার্‌বে তোমার ঐ দুর্ব্বল হাত-দুটি দিয়ে এই অশান্ত আহ্বান-চঞ্চল বিদ্রোহী হৃদয়কে? আজ যে আমার ধমনীর মালা দুলে উঠেছে, বাইরের বিশাল কর্ম্মমুখর জগতের ঝটিকা-তরঙ্গ যে আমার প্রাণের বেলায় উদ্দাম হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে, আমার সমস্ত মস্তিষ্ক তার উচ্ছ্বাস-ফেনিল মাদকতায় যে ভরে' উঠ্‌লো! ওই শোন কান পেতে আমার বুকের মধ্যে তরুণ উত্তেজনার উন্মত্ত সঙ্গীত, আমার শিরা-উপশিরার রক্তে রক্তে রৌদ্র উৎসাহের উদ্‌ভ্রান্ত মীড়্-টান্!

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "বৌদি, আমি এখানে থাক্‌লে কি আপনি খুব সুখী হন?"

বৌদিদি বল্‌লেন, "কি বল্‌বো বিমল। মাকে আন্‌লে তোমার কষ্টটাও কম হয়, তা বুঝেও আমার সুখ। আর বেশ দুটি ভাই-বোনে এক জায়গায় থাক্‌বে, বারো-মাস দুবেলা দেখা হবে, কি বল?"

আমি বল্‌লুম, "ভাই যদি কোনো গুরুতর অপরাধ করে আপনার কাছে, তাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন?"

বৌদিদি বল্‌লেন, "শোনো কথার ভঙ্গী ভাইটির আমার। আমার কাছে তোমার আবার অপরাধটা কিসের শুনি?"

আমি জোর করে বল্‌লুম, "না বৌদি, ধরুন যদি করি তা হলে?—"

বৌদিদি আবার হেসে বল্‌লেন, "না না, তা হলেও না। ছোট ভাইটির কোন-কিছুতেই অপরাধ নেই আমার কাছে, আমি যে বড় বোন্।"

আর সাম্‌লাতে পার্‌লুম না, কান্নার ঢেউ চোখ ছাপিয়ে পড়্‌লো। বৌদিদির কাছে থেকে লুকোবার জন্য তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে গেলুম। আড়ষ্ট গলায় বল্‌লুম, "ঠিক্? বৌদি, ঠিক?"

বৌদিদি অবাক্ হয়ে গেলেন, বল্‌লেন, "বিমল, কি হয়েছে ভাই! অমন কর্‌ছো কেন?"

মুখ ফিরিয়ে আম্‌তে উদ্যত হলুম, বল্‌লুম, "কিছু না বৌদি, এমনি বল্‌ছি।"

বৌদিদি বল্‌লেন, "তবুও ভালো। ভাইটির আমার এখনও ছেলেমানুষী যায় নি। হ্যাঁ, ভাল কথা বিমল, তুমি ভালবাসো বলে' বাগানের কলার কাঁদি আজ কাটিয়ে রেখেছি, পাক্‌লে একদিন ভালো করে' বড়া করে' দেব এখন।"

সেদিন চলে' এলুম।

বাড়ী এসে ভাব্‌লুম, "এই তো বেশ আছি। থাকিই না কেন এখানে? এঁর এই বুক-ভরা স্নেহ ঠেলে ফেলে দিয়ে কোথায় যাবো?" তার পরই ভাব্‌লুম,"—এই পাড়াগাঁয়ে, এরকম থাবে? সে হয় না—"

তার পরদিনই আমার নোটিশ অনুসারে স্কুলের কাজের শেষ দিন। গিয়ে শুন্‌লুম আমার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্কুলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে' এলুম।

শুধু একবার শেষ দেখা কর্‌বার জন্যেই তার পরদিনই পুকুরের ঘাটে ঠিক সময়ে গেলুম। তাঁর দেখা পেলে যে কি বল্‌বো তা ঠিক করে' সেখানে যাই নি, সত্য কথা সব খুলে বল্‌তে বোধ হয় পার্‌তুম সেদিন,—কিন্তু দেখা হলো না। সবদিন তো দেখা হত না, প্রায়ই দু-তিন দিন অন্তর দেখা হত, আবার কিছুদিন ধরে' হয়তো রোজই দেখা হত।

সেদিন বিকালেও গেলুম, তার পরদিন সকালেও গেলুম, কিন্তু দেখা পেলুম না।

সেদিন চলে' আস্‌বার সময় সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনই বিকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত সে গ্রাম পরিত্যাগ কর্‌লুম।

মাঠের কোলে ছাতিমগাছের বনের মধ্যে কোথায় ঘুঘু ডাক্‌ছিল।

* * * *

সে-সব আজ ২১।২৬ বছর আগেকারের কথা।

তার পর জীবনে কত ঘটনা ঘটে' গেল। ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ করে' দেখ্‌লুম, এ কি মধু! কত নতুন দেশ, নতুন মুখ, কত গন্ধ, কত রঙ্, কত দুঃখসুখ, কত প্রীতি-ভালবাসা, কত জ্যোৎস্না রাত্রি, নতুন বন-ঝোপের কত নতুন ফুল, কত যুঁই ফুলের মত শুভ্র-নির্ম্মল হৃদয়, কান্না-জড়ানো কত দূর স্মৃতি!

কাকার কাছে মোরাদাবাদ কাচের কার্‌খানায় গেলুম। বছর-খানেক পরে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে জার্ম্মানীতে কাচের কাজ শিখ্‌তে। তারপর কোলোয়ে গেলুম, কাটা বেলোয়ারী কাচের কার্‌খানায় কাজ শেখ্‌বার জন্যে। কোলোয়ে অনেকদিন রইলুম। সেখানে থাকৃতে একজন আমেরিকান্ যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হলো, তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। "শিকাগো ইণ্টার-ওশ্যন্" কাগজের তিনি ফ্রান্সদেশস্থ সংবাদদাতা। কোলোয়ে সব সময় না থাক্‌লেও তিনি প্রায়ই ওখানে আস্‌তেন। তাঁরই পরামর্শে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গেলুম। তাঁরই সাহায্যে দু-তিনটা বড় বড় কাচের কার্‌খানায় কাজ দেখ্‌বার সুযোগ পেলুম। পিট্‌স্‌বার্গে কার্ণেগীর ওখানে প্রায় ছ-মাস রইলুম, নতুন ধরণের ব্লাষ্ট্‌ফার্ণেসের কাজ ভাল করে বুঝ্‌বার জন্যে। মিড্‌ল্‌-ওয়েষ্টের একটা কাচের কার্‌খানায় প্রভাত দে কি বসু বলে একজন বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর বাড়ী ২৪-পরগণা জেলায়। সে ভদ্রলোক নিঃসম্বলে জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মহা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাঁরই মুখে শুন্‌লুম, সেয়াট্‌ল্‌-এ একটা নতুন কাচের কার্‌খানা খোলা হচ্ছে। আমি জাপান দিয়ে আস্‌বো স্থির করেছিলুম, কাজেই আস্‌বার সময় সেয়াট্‌ল্‌-এ গেলুম। তারপর জাপান ঘুরে দেশে এলুম। মা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ভাই-দুটিকে নিয়ে গেলুম মোরাদাবাদে। বেশীদিন ওখানে থা'কৃতে হলো না। তাঁরা ব্রিটিশ ইষ্ট-আফ্রিকার মোম্বাসায় একটা কাচের কার্‌খানা খুল্‌বেন ঠিক করে' আমায় সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকে মোম্বাসাতেই আছি। বম্বেতে বিয়ে করেছি, আমার শ্বশুর এখানে ডাক্তারি কর্‌তেন। সেই থেকে বম্বে অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছি।

* * * *

বহুদিন বাংলাদেশে যাইনি, প্রায় ১৬।১৭ বছর হলো। বাংলাদেশের জল-মাটি গাছপালার জন্যে মনটা তৃষিত হয়ে আছে। তাই আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বসে' বসে' আমার সবুজ-শাড়ী-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাব্‌ছিলুম। রাজাবাই টাওয়ারের মাথার উপর এখনও একটু একটু রোদ আছে। বন্দরের নীলজলে মেসাজেরী মারিতিম্-দের একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়্‌ছে, এখানা এখুনি ছেড়ে যাবে। বাঁ-ধারে খুব দূরে এলিফ্যাণ্টার নীল সীমারেখা। ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃতপ্রায় ঝাপ্‌সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এলো। ২৫ বছর পূর্ব্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ-শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠছে, আর্দ্রবসনা তরুণী এক পল্লীবধূ। মাটির পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা-দুখানির রেখা আঁকা। আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণুকুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অজ্ঞানতায় ভরা। আম-কাঁটালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু-একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহদুর্ব্বলা বধূটির ওপর সস্নেহ কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তারপর এক শান্ত আঙ্গিনায় তুলসী-মঞ্চমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিনী সে কোন্ প্রণাম-নিরতা মাতৃমূর্ত্তি, করুণামাখা অশ্রুছলছল।......

*　　*　　*　　*

ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো? এই সুদীর্ঘ ২৫ বছর পরে আজও তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটে সেই রকম জল আনতে যাও? আজ সে কত কালের কথা হলো, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম, আবার কত কি পেলুম…আমার জীবনের সেই ফুল-ফোটা পাখী-ডাকা সকাল বেলাটিতে তুমি প্রাণে যে অমৃত সিঞ্চন করেছিলে, তার কথা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলুম…আজ কতদিন পরে আবার তোমার কথা মনে পড়লো…তোমায় আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করচে, দিদিমণি, তুমি আজও কি আছো? মনে আসচে অনেকদূরের যেন কোন্ খড়ের ঘর..মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলো…মৌন সন্ধ্যা…নীরব ব্যথার অশ্রু..শান্ত সৌন্দর্য্য…স্নেহ-মাখা রাঙ্গা শাড়ার আঁচল……

*　　*　　*　　*

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্য্যাস্ত কখনও হয়নি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথা

পথ চেয়ে কাটে বেলা :
শত পথিকের আনাগোনা-ভরা হাসিকান্নার মেলা
হেরি' বিস্ময় লাগে,—
কোন্ গোপনের রঙিন স্বপ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগে
আজি দিনটির সব কোলাহলে, কলহে, কর্ম্মে, গীতে,
সব-মানুষের সুখেদুখে-ভরা ভাবনা-নিবিড় হৃদয়ের নিভৃতে।
প্রতিটি দিনের জীবনবেগের আবেগ-আকুল
আশা ও নিরাশাগুলি
কোটি বক্ষের কূলে কূলে ঢেউ তুলি'
পলক ফেলিতে কোথা হয়ে যায় হারা ;
কোনো ঘাটে গিয়ে লাগে না কি, ফিরে
তোলে না কি ঢেউ তারা ?
সুদূরে চাহিয়া বিমনা ব'সিয়া রই,
পথিক জীবন বলে, 'ভালবাসো? বলো ।বাসো, তবে
দাঁড়াইয়া কথা কই।'…

পথিকেরা চলে পথে,
ধূলিধূসরিত চরণে কেহ বা, কেহ বা অশ্বে রথে।
চকিতের লাগি' ছায়াটি ফেলিয়া আমার দ্বারের পাশে
জানি না তাহারা কোথা চলে' যায়,
কোথা হতে তারা আসে।
পলকের পথে মিলিয়া—অসীম বিরহে ছাড়িয়া যাই,
তবু মনের কথাটি বলিনি কারেও, শুনিনি কাহারো ঠাঁই।

আনমনে শুধু চোখে চোখে চেয়ে রই,
বলে চোখগুলি, 'ভালোবাসো? বলো ভালোবাসো, তবে
কানে কানে কথা কই।'…

অসীমের বুক জুড়ে
তারাগুলি আজ ফুটিয়া উঠিয়া কাটিতে চাহিছে সুরে ।
যত চাই, চোখ ফিরিতে চাহে না ; শিহরণ জাগে প্রাণে ;
সেই না-শোনা সুরের রেশ এসে বাজে
আমার বাঁশীর তানে।
মনে হয় এক সুরের মিলনে বাঁধা এ নিখিল
জানা ও অজানা ব্যেপে,
তাই তারকা-লোকের পুলক-কম্প মোর বুকে ওঠে কেঁপে।
ছলছল চোখে শূন্যে চাহিয়া রই,
বলে তারাগুলি, 'ভালোবাসো? বলো ভালোবাসো, তবে
কাছে এসে কথা কই।'…

একটি কণিকা ধূলি,
এরই পানে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আপনারে আজ ভুলি!
পথের পাশের জলটুকু ওই তরুমূলটিতে ধরা,
সৃষ্টির যত রহস্য যেন ওরই বুকটিতে ভরা!
প্রতি তরুটিতে, প্রতি তৃণটিতে,
কুয়াসার প্রতি বারি-কণাটিতে ভেসে
জাগে নিখিলের মর্ম্মকথাটি গোপন ছদ্মবেশে।
চাহিতে জানি না, তবু চেয়ে বসে' রই,
বলে সবে তারা, 'ভালোবাসো? বলো ভালোবাসো, তবে
মুখ খুলে কথা কই।'…

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী



নব্যভারত (অগ্রহায়ণ)

স্বরাজ—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

রুশদেশ আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের জন্মভূমি। আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র রুশদেশেই রাষ্ট্র মার্‌কস্-(Karl Marx)-প্রচারিত সমাজ-তন্ত্র-বাদ (State socialism) প্রকাশ্যে বরণ করিয়া তদনুরূপ গণতন্ত্র (Democracy) সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। শক্তি-বিবর্জ্জিত, প্রেমে-প্রতিষ্ঠিত নিরুপদ্রব অসহযোগ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিবার আধুনিক পদ্ধতিরও প্রচার রুশদেশেই।

কিন্তু বল বা শক্তি (Force) ও শক্তিমূলক শাসনের প্রয়োজন শুধু পাশ্চাত্য যবনসমাজে ছিল, আছে ও থাকিবে, তাহা নয়। এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তেও ইহার প্রয়োজন ছিল, আছে ও বহুশতাব্দী যাবৎ থাকিবে। আজ নাকি ভারতে রাবণ-রাজত্ব, সেকালে ভারতে রাবণ রাজত্ব ছিল না। কিন্তু রাবণ রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত পুণ্যাবতার রাম ও অতুল-সংযমী লক্ষ্মণকে কত না বিপুল বল বা শক্তি আহরণ ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে দেশে প্রচারিত হইয়াছে, সে দেশেই বা পুণ্যশ্লোক রাষ্ট্রপতি অশোক কয়দিন স্বীয় রাষ্ট্রে অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে পারিয়াছিলেন।

শক্তি ও শাসনের প্রয়োজন আছে বলিয়াই যে রাষ্ট্র তথাকার সর্ব্ব-সাধারণকে শুধু শাসনভয়ে চালিত করিবে ইহাও কাজের কথা নয়। মানুষ ভয়ে কাজ করে সত্য, আবার সেই মানুষই প্রেমে প্রণোদিত হইয়া কাজ করে। ভয় যদি মানুষকে সংযত রাখে, প্রেম মানুষের কর্ম্মের উৎস। যে রাষ্ট্র শুধু শাসনভয়ের কথাই বোঝে, কিন্তু মানব-মনের প্রীতির পূর্ণবিকাশের পথে অন্তরায় বা তাহার প্রতি উদাসীন, সে রাষ্ট্র কখনও সুরাষ্ট্র নহে। মানুষ লইয়াই রাষ্ট্র।

মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আত্মরক্ষার জন্ত যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততদূর পর্য্যন্ত সে অপরের সম্পত্তি, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত, বিনাশ করিতে পারে। ইহা করিবে না, উহা করিবে না--এই নিবর্ত্তনা-বিধি লইয়া মানুষ ও রাষ্ট্র এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, প্রবর্ত্তনা যে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তাহা যেন লোকে বিস্মৃত হয়। আর এই বিস্মরণ যে শুধু আমাদের দেশেই--তাও নয়। স্বাধীনতায় সুখ। সুখের চেয়েও বড় কথা—স্বাধীনতায়ই আত্মবিকাশ।

সমাজের সকল লোকের অধিকারের একটা সামঞ্জস্য করিয়া সমাজ প্রত্যেকের স্বাধীনতার সীমা-রেখা টানিয়া দেয়। সমাজ যদি স্বাধীনতার সীমা-রেখা-পাত এমন করিয়া করে যে তাহাতে তোমার আমার বিকাশ খর্ব্ব হয়, তবে সে সমাজ তোমার আমার পক্ষে কু সমাজ। সমাজের বেলায় যেমন, রাষ্ট্রের বেলায়ও তেমন। রাষ্ট্র আসিয়া আবার নূতন রেখাপাত করিয়া আমার স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যাই সীমা অতিক্রম করিয়াছি, অমনই শাসন। শাসন অর্থ আমার অধিকার-হ্রাস।

"নেশান" ব্যাপারটা আমাদের দেশে ত খুবই নূতন, আধুনিক য়ুরোপেও নূতন। আমাদের জাতি ছিল, গোত্র ছিল, বর্ণ ছিল, দল ছিল, রাষ্ট্র ছিল; "নেশান" ছিল না। সমগ্র ভারতবাসী ত দূরের কথা, আজও সব বাঙ্গালী ভাল করিয়া জমাট হইয়া এক নেশান হয় নাই। তবু যা হইয়াছে বাঙ্গালীই "নেশান" হইয়াছে। আধুনিক য়ুরোপেও নেশান-বাদ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে সুরু হইয়াছে, আজও তাহার জের চলিয়াছে। আমরা জাতীয়তাবাদ বা "নেশান"-বাদ (Nationalism) পাইয়াছি কিছুটা ইংলণ্ড হইতে; কিছুটা ইটালীর মাট্‌সিনির নিকট হইতে।

কিন্তু এই "নেশান"-বাদ (Nationalism) যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়াছে, য়ুরোপের বড় বড় প্রবল রাষ্ট্রগুলি তেমনই আবার সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) প্রচার করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি যদিও বল বা শক্তি (Force), সভ্য-সমাজে প্রবল রাষ্ট্রগুলি সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিয়াছে। তাহারা "জোর যার মুলুক তার" এ কথা না বলিয়া, বলিয়াছে যে গৌরবর্ণ "নেশানের" কর্ত্তব্য শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির ভার বহন করা। এই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লীলাভূমি হইয়াছে আফ্রিকাতে; কারণ সেখানে বাহুবল পাশব-শক্তি জড়শক্তি প্রচুর থাকিলেও তাহাকে রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করিবার মানুষ সেদেশে নাই ও আফ্রিকার মানুষগুলি সভ্যসমাজে তাহাদের মনের দুঃখ জোরের সহিত জাহির করিতে শেখে নাই।

রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তনা-বিধি বা পোষণ-কার্য্যের কথা পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের দেশে তাহা কতটা সুসম্পন্ন করা সম্ভব তাহার বিচারের সময়ও এই জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ও সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শাসকসম্প্রদায় আর-এক "নেশানের", তাহাদের দেশ সাত সমুদ্র তের নদী পারে। শাসক-সম্প্রদায় যে "নেশানের," সেই ব্রিটিশ "নেশানের" পৃথক্ স্বার্থ আছে। রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা যদি তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হয়, রাষ্ট্রের শাসকসম্প্রদায়ের স্বজাতিপ্রীতি যদি স্বাভাবিক, অনেক স্থলে এক "নেশানের" লাভ যদি অপর "নেশানের" লোকসান, তবে রাষ্ট্র কেমন করিয়া গঠনোন্মুখ "নেশানের" প্রতি তাহার প্রবর্ত্তনা-বিধি বা পোষণ-কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবে? সত্যই বিস্ময়ের বিষয় হইবে যখন আমরা এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া, এই রাষ্ট্র লইয়া, সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিব। সত্যই বিস্ময়ের বিষয় হইবে, যখন আমরা এই জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের স্কন্ধে সুখে সন্তুষ্টচিত্তে আরোহণ করিয়া শুধু আব্দার করিব, "হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ।"

সাম্রাজ্যই বল আর রাষ্ট্রই বল, উহা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য, সমষ্টিভাবে ইতিহাসে মানবের আত্মপ্রকাশ, ও ব্যষ্টিভাবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মানবের দেহ মন ও আত্মার বিকাশ। মানুষ যত বড়, রাষ্ট্র তত বড় নয়। যতদিন কোন সাম্রাজ্য দ্বারা, সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়তঃ মানবের বিকাশের সহায়তা হয়, ততদিন উহার আদর। তারপরে—সকল সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে যে সাম্রাজ্য তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ, তাহার বিলয়; আবার তাহার স্থানে সেই ভাগ্য-বিধাতারই নিয়মে নূতন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য আসিয়া উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত হয়।

—

সুবর্ণবণিক সমাচার (অগ্রহায়ণ)

কলিকাতার কথা — শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক ।

কলিকাতার বর্ত্তমান টেজারি ও ইম্পিরিয়াল আফিসের মধ্যে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৭৯ খৃঃ টমাস্ হিকি সাহেব কলিকাতায় "বাকিংহাম্ হাউস্" লাট সাহেবের বাড়ীর ভিত পত্তন করিয়াছিলেন। ঐখানে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস হইতে লর্ড্ ওয়েলেস্লি পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ের মাঠের সম্মুখে যে মিলিটারি হাঁসপাতাল আছে, উহাই সেকালের সদর দেওয়ানি আদালত ছিল। এখন যেখানে ষ্ট্যাম্প্ ষ্টেসনারি আফিস আছে, সেখানে টাঁকশাল ছিল। ১৭৭০ খৃঃ উহাতে তামার পয়সা তৈয়ারি আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৮৪ মার্চ্চ মাস হইতে প্রথম সরকারি কাগজ "কলিকাতা গেজেট" বাহির হয়। কলিকাতার ষ্টুয়ার্ট্ ও ডাইক কোম্পানি গাড়ীওয়ালা ও বরন্ কোম্পানি লোহাওয়ালা এই কাগজে বিজ্ঞাপন দিত এবং ঘোড়দৌড়েরও বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ঠাকুর-দেবতাকে কিছু দিবার আগে কোম্পানির ভেট আগে দিতে হইত। তীর্থযাত্রার উপর কর হওয়ায় সাধু-ফকিরেরাও বিদ্রোহী হইয়াছিল। কলিকাতায় সেই সময়ে সাধক রামপ্রসাদ কালীমাতার গান গাহিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, আর কোম্পানির এইসকল বেনিয়ান মহাপ্রভুরা মা কালীর কাছে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জোড়া পাঁঠা বলিদান, কবির গান, ফুল আখড়াই প্রভৃতি বাড়ীতে দিয়া আমোদ করিতেন। ইহাদেরকে দেখিয়া লোকে তখন হিংস্র পশু অপেক্ষাও বেশী ভয় করিত। তখন লোকে ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিত :—

"বাঘ ভালুকে নাই ভয়।
ঢেঁকি দেখলে প্রাণ যায়॥"

হেষ্টিংসের আমলে মুদ্রাযন্ত্র ও ইংরেজি ধরণের বিদ্যাচর্চ্চা এদেশে আরম্ভ হইয়াছিল। মির্জ্জাপুরের একটি বাগানবাড়ীতে জন্ ষ্টেনসবরা একটি স্কুল খুলিয়াছিল। ফিরিঙ্গী বালকবালিকারা কুড়ি ও ত্রিশ টাকা মাসিক বেতন দিয়া দু'বেলা লেখাপড়া ছুঁচ ও লেসের কাজ শিখিত। প্রাচীন কলিকাতার উন্নতির জন্য কলিকাতায় একটি লটারি কমিটি হইয়াছিল। ১৭৮৪ খৃঃ হইতে ইহার দস্তুরমত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই লটারির টিকিটে লোকে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার ফন্দি শিখিয়াছিল। সেই সময়ে লোকেরা বড় বেশী মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইজন্য কলিকাতার দশ মাইলের ভিতর মদের ভাটি হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। পাদ্রী কিয়ারনণ্ডার সাহেব কলিকাতায় ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন।

—

নব্যভারত (পৌষ)

স্বরাজ-সাধনায় নারী — শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন, এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুধুমাত্র চর্কা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাকবে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর (সমাজতত্ত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে।—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতার শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের ওপর জাঁতার মত বসে আছে। মনে হয় এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকি রয়ে গেছে, ইংরেজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি; অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও ও বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবে না। শুধু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেইদিন থেকে একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে সুরু করেছিল অন্যদিকে তেমনি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেইদিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক শহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিস তারা আজও হারায়নি। কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকেই একটা 'ফেটিস' করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার-ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখতে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত, আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙবে, এই সমবেত নরনারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক, খসে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না : তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।

একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই-পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দরিদ্রজীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি, কেবল

এইটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্তার এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা করে ফেলি। আমি বলি মেয়ে-মানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি-ডোমকেও যদি মানুষ বল্‌তে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি কর্‌বার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌঁছোক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত কর্‌তে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও বল্‌তে নেই, ওখানে যেতে নাই,—তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এস আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পর্দা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশী চলা-ফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙে দেব। দীর্ঘদিন বর্ম্মা দেশে থেকে এটা আমার বেশ করে শেখা, যে, মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে মেলাই তার হিত কর্‌বার আবশ্যক নেই।

আমি বলি, যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে যদি ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে, রাগ কর্‌বারই বা কি আছে! ছুটো সুপরামর্শ দিতে পারি,—কিন্তু মেয়ে-ধরে হাত-পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায়ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুঁড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে' কর্‌ত ত তারাও আরামে থাক্‌ত এদেরও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু-আধটু হবারও জায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল কর্‌তে গিয়ে, এই কথাটা আমার তোমরা ভুলো না।

উপাসনা (পৌষ)

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

নারীর স্বাতন্ত্র্য বাস্তব হইয়া উঠিতে থাকিবে তখনই যখন সে পাইবে আর্থিক (economic) স্বাধীনতা। প্রথমে অবশ্য চাই ভিতরের স্বাধীনতা, মনের মুক্তি, গতানুগতিক সংস্কার হইতে অভ্যাস হইতে অব্যাহতি, চাই অন্তরে এবং অন্তরের অন্তরে স্ব'এর, ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন; এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং শিক্ষারও বেশী দীক্ষা। কিন্তু ভিতরের জিনিস রূপ লইতে পারে বাহিরেরই আশ্রয় অবলম্বনে; বাহিরের একটা প্রতিষ্ঠা না পাইলে অন্তরের সত্য পাকা হয় না, প্রকাশের পথ পায় না। সুতরাং নারীর আত্মার ও মনের স্বাতন্ত্র্যকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাকে লাভ করিতে হইবে শরীর ও প্রাণধারণের স্বাতন্ত্র্য।

আমাদের দেশে মেয়েরা অন্নবস্ত্রের জন্য পুরুষের যে কতখানি দাস তাহা বলাই বাহুল্য। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যেই—মস্ত একটা আধ্যাত্মিক-ভাবে মণ্ডিত করিয়া—ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, পুরুষের ভার নারীর ভরণপোষণ আর নারীর ভার পুরুষের সেবা। স্বাধীন উপজীবিকার কথা দূরে থাকুক, দানস্বরূপ হউক আর উত্তরাধিকার স্বরূপেই হউক নারীর ধনসম্পত্তি গ্রহণে ও ভোগে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যত সব আঁটঘাট বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যটিই কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

আমাদের দেশে তথাকথিত ছোটলোকের ঘরের মেয়েদের যা-কিছু বা স্বাধীন উপজীবিকার প্রয়াস ও অবকাশ আছে; কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের তাহা পর্য্যন্ত নাই। ভদ্র-ঘরের মেয়েদের পক্ষে রোজ্‌গার করা একরকম অপমান। মৃত্যুকে বরং বরণ করিয়া লইব, কিন্তু পুরুষের ধর্ম্ম নিজের উপর লইব না। আপত্তি যে কেবল মেয়েদের দিক হইতেই তাহা নয়; সমাজের একটা সমবেত চাপ, মেয়েদের ইচ্ছা থাকিলেও, সে ইচ্ছাকে দাবিয়া চাপিয়া রাখে।

কথাটা কেবল জীবনধারণের কথা নয়। এই একান্ত পরবশ্যতা, শুধু পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা, ইহাতে নারীর অন্তঃকরণ কতখানি দীন হইয়া থাকে, সেই কথাটির উপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দর্‌কার। নারী যখন জানে অনুভব করে তাহার কিছুই নাই, আছে কেবল অভাব, আর সেই অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে ও দিতে পারে কেবল পুরুষে তখন তাহার স্বভাব তাহার নারীত্ব অনেকখানি সঙ্কুচিত অনেকখানি আপনা হারা হইয়া যায়। কি রকমে বলিতেছি।

আমাদের সমাজের বিশেষত্ব এই যে, নারীর এমন অকুণ্ঠিত আত্মদান এমন অটুট একনিষ্ঠা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আমাদের নারীর নারীত্ব জগতে অতুলনীয়। বাহির হইতে যখন দেখি কথাটা যেন খুবই সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে, ব্যাপারটার মধ্যে এমন সব জিনিষ ধরা পড়ে যাহাতে আমাদের সে সহজ সরল বিশ্বাসকে অনেকখানিই টলাইয়া দিয়া যায়। "স্বামীর অভাবে আমার কি উপায় হইবে"—মেয়েদের এই চলিত কথাটির মধ্যে যথার্থ প্রাণের অর্থাৎ অন্তরাত্মার সহিত অন্তরাত্মার মিলের টান কতখানি আর কতখানিই বা নেহাৎ আধিভৌতিক অর্থাৎ আশয়ের অন্নবস্ত্রের আশঙ্কা লুকাইয়া আছে সে প্রশ্ন আমাদের আত্মাভিমানকে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু সত্যকে ত বদ্‌লাইতে পারে না। আমাদের মেয়েরা পতিকে দেবতা মনে করিয়া ভক্তি করে কিন্তু সেই ভক্তির উৎস কতখানি যে ভয়—দেবতা হারাইলে পাছে দেবতার ভোগের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই—এ কথাটা খুব রূঢ় শুনাইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসুর ত তাই বলিয়া পশ্চাদ্‌পদ হওয়া চলে না।

মেয়েরা যে গোড়াতেই পুরুষদের কাছে, যাহাকে বলে, ভাতে মরিয়া রহিয়াছে। এই গোড়ার বন্ধনটি মুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে নারীর স্বভাব স্বধর্ম্ম কি চায়, কি ভাবে চলে; পুরুষের সহিত তখন সে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহার মধ্যে আর কিছু না থাকুক দাতার ও গ্রহীতার, মনিবের ও দাসের যে একটা অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ সেটির কোন ছায়া পড়িবে না—উভয়ের মধ্যে দুটি মুক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠ সত্তার সত্য সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সুযোগ হইবে। আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাতে নারীরও মঙ্গল পুরুষেরও মঙ্গল; সমাজেরও ব্যবস্থা একটা নূতনতর স্বাভাবিকতর সত্যতর রূপকে ফলাইয়া ধরিতে পাইবে। আধিভৌতিক হিসাবেও বিশেষতঃ বর্ত্তমানের অন্নকষ্টের দিনে সকলের সুবিধা হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের অসহায় বালিকাদেরও আর যেনতেন-প্রকারে বলিদান দিতে হইবে না, পুরুষদেরও যে ভার ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহার লাঘব হইবে,—সমাজের যে অর্দ্ধেকঅংশ এখন কেবল খরচই করিয়া আসিতেছে তাহারাও জমার দিকে কিছু নজর দিলে গোটা সমাজ সমৃদ্ধতরই হইয়া উঠিবে।

নারীর স্বাধীন উপজীবিকার বিরুদ্ধে একটা হেতু দেখান হয়, তাহার মাতৃত্বের ভার। এই হেতু একটা ছুতা মাত্র, কারণ, আমরা চোখের সম্মুখে নিত্যই দেখিতেছি নিম্নতর শ্রেণীর অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা এই মাতৃত্বের ভার সত্ত্বেও কত উপায়ে কিছু না কিছু

উপার্জ্জন করিতেছে। আর আমাদের ভদ্রঘরের মেয়েরা পরিশ্রম হিসাবে কি কিছু কম করিতে পারে, সে পরিশ্রমটার মধ্যে একটু কৌশল একটু সাজান গোছান একটু ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকিলেই যে তাহাকে উপজীবিকার উদ্দেশ্যে খাটান যায় না তাহা নয়; আর যাহারা বসিয়া বসিয়া গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বা বাজে কাজে সময় কাটান, তাঁহাদের ত কোন অজুহাতই নাই। তারপর এই মাতৃত্বের ভার মেয়েদিগকে সারা জীবনের প্রতিদিন কিছু বহন করিতে হয় না—প্রয়োজনমত অবসর ত লওয়াই যাইতে পারে, এই অবসর ছাড়াও আরও যে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকে, সেটির সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে চাহে বা পারে?

আমাদের দেশে মেয়েদের "ভোট" অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া একটা আন্দোলন সম্প্রতি বেশ উঠিয়াছে—বর্ত্তমান যুগের হাওয়া আমাদের সনাতন সমাজের বুকের উপর দিয়া যে চলিতে সুরু করিয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার তখনই সত্যিকার হইয়া উঠে যখন তাহার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক অধিকার। তাই আমরা মনে করি, পলিটিক্যাল স্বাধীনতা অপেক্ষা ইকনমিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পক্ষে বেশী জীবন্ত জিনিষ, এই বস্তুটিই নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের গোড়া ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী তাহার একটা স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, আর কোন স্বাধীন মতামত থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার বা তদনুসারে কার্য্য করাইবার পথ থাকে না—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। রাষ্ট্রে অথবা আরও বড়ভাবে সমাজে মেয়েদের যদি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে হয়, রাষ্ট্রের সমাজের ব্যবস্থার উপর নারীরও হস্ত-চিহ্ন থাকা যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে আগে অর্থ সম্বন্ধে আত্মবশ হইতে হইবে। সমাজের মধ্যে এই আন্দোলন আমরা আগে দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝিব নারী-রাষ্ট্রনৈতিক-অধিকারের আন্দোলনটিই কেবল যে খাটি হইয়া উঠিতেছে তা নয় নারীর সমগ্র জীবনের স্বতন্ত্রতাও সত্যিকার ভিত্তি পাইতেছে। পুরুষেরা এই আন্দোলনে কতখানি যোগ দেয় তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিব, নারীর যথার্থ মুক্তির অধিকারের জন্য পুরুষের প্রাণের সায় কতখানি আছে।

তাই বলিয়া নারীর অর্থাধিকারকেই যে আমরা সর্ব্বে-সর্ব্বা করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি গোড়ার কথা হইতেছে মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন—শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভিতরের জিনিষ ব্যতিরেকে বাহিরের সব আসবাবই বিফল। বর্ম্মায়, আমাদের দেশে খাসিয়াদের মধ্যে নারীর অর্থাধিকার যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবুও তাহাদের সমাজ যে খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত ধরণের তাহা মনে হয় না; কারণ সেখানে অভাব এই গোড়ার জিনিষটির। তবুও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজশৃঙ্খলার অন্তরায় যাঁহারা বলেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা ঐ ঐ সমাজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই—পুরুষের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ছাড়া নারীর কর্তৃত্ব যে সমাজ গাঁথিয়া তুলিতে পারে, সমাজকে একটা ভিন্ন রকম মূর্ত্তিই দিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ এখানে পাওয়া যাইতে পারে।

—

প্রভাতী—(শীত সংখ্যা)

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া।
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।
কোন্ ফাগুনে সে ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়েছিলাম গানের সুরে
ব্যথায় ভরে' ফিরে আসে সে গান গাওয়া॥

—

নারায়ণ (পৌষ)

তামিল সাহিত্য—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহের মধ্যে তামিলভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং তামিল সাহিত্যই সমধিক সম্পন্ন। প্রাচীনকালে তামিল গ্রন্থকার মাত্রেই স্ব স্ব রচনা অগস্ত্য ঋষির নামে চালাইয়া দিয়া আত্ম-গোপন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। তামিল সাহিত্যে অগস্ত্য ঋষি কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা এক্ষণে জানিবার কোনও উপায় নাই। কেবলমাত্র তদ্রচিত ব্যাকরণের অংশ বিশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া তামিলভাষীগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান তামিল ভাষা সে ব্যাকরণের আইন মানে না। কারণ সেটা প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ।

অগস্ত্য ঋষির একজন সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন; তাঁহার নাম এক্ষণে অবিদিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "তোল কাপ্পিয়ম্"। 'তোল্' শব্দের অর্থ 'প্রাচীন' এবং 'কাপ্পিয়ম্'—কাব্য। গ্রন্থখানি কিন্তু কাব্য-গ্রন্থ নহে। গ্রন্থখানি ব্যাকরণ-শাস্ত্র অলঙ্কার শাস্ত্রও বলা যাইতে পারে, কারণ কাব্যের লক্ষণ ও কাব্য প্রণয়নের রীতি ও পদ্ধতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কাব্যরচনার উদাহরণস্বরূপ অসংখ্য প্রাচীন কাব্যের উদাহরণ আছে। সংস্কৃত কাব্যাদর্শ সাহিত্যদর্পণে যেমন উদাহরণস্বরূপ বহু প্রাচীন কবির রচনার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, এই গ্রন্থেও সেই প্রকার আছে। সুতরাং প্রাচীন তামিল সাহিত্যের কোনও উদাহরণ দেখিতে হইলে এই গ্রন্থে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। ইহাতে যে-সকল গ্রন্থ তামিল গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলান্বেষণ করিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে যে সাহিত্য ছিল, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা এখনে সর্ব্বপ্রকার অসম্ভব। সেই জন্য 'তোলকাপ্পিয়ম্' গ্রন্থকেই তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দশম শতক পর্যান্ত দাক্ষিণাত্যে জৈনগণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের প্রভাবে পাণ্ড্য বা তামিলদেশে চারিশতাধিককাল সাহিত্যসেবা চলিয়াছিল। প্রাচীনকালে মাদুরা সহরে একটি জৈন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু তামিল কাব্য ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। জৈন তামিল সাহিত্য সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়াস্বরূপ হইলেও একটা বিষয়ে তামিল সাহিত্য মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছে। সেটা তামিল নীতি-সাহিত্য। অনেক তামিল-সাহিত্যবিৎ ইওরোপীয় পণ্ডিতের মতে এই বিষয়ে তামিল সাহিত্যই সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ।

তিরুবল্লুবর্ প্রণীত কুরাল্ একখানি নীতিশাস্ত্র বা পুরুষার্থ বিষয়ক সুপ্রতিষ্ঠিত তামিল কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম, এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ বিষয়ে ১৩৩০ পঙ্ক্তি কবিতায় রচিত সূত্র আছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ তামিল সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। জৈন-

ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" "সর্ব্ব জীবে সম দয়া" এই গ্রন্থেরও মূল মন্ত্র। বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বা বেদান্তাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের দেশব্যাপী প্রভাব এই গ্রন্থে লক্ষিত হয় না বলিয়া তামিলভাষাবিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে অতি প্রাচীন তামিল কাব্য বলিয়া মনে করেন। এবং কল্‌ড্‌ওয়েল্ বলেন খৃষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

'নালড়িয়ার্' আর-একখানি প্রাচীন কবিতা-গ্রন্থ। ইহার ছন্দোরূপে চতুষ্পদী বৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'নালড়িয়ার' বা চতুষ্পদী। ইহার গ্রন্থকারের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই। ইহারও প্রতিপাদ্য বিষয় "ত্রিবিধ পুরুষার্থ" বা 'ধর্ম্ম, অর্থ, কাম'।

'চিন্তামণি' একখানি অতি প্রাচীন জৈনসম্প্রদায়-রচিত তামিল কাব্য। ইহাতে ১৫০০০ চরণ বা কবিতার পঙ্‌ক্তি আছে। ইহারও প্রণয়িতার বিবরণ নাই। ইহারই অনুকরণে ইটালী দেশীয় 'বেশ্‌চি' নামক জনৈক তামিল কবি 'তেম্বাবণি' নামক একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন (অষ্টাদশ শতাব্দী)। ইনি চিন্তামণির অনামা রচয়িতাকে 'তামিল কবির সম্রাট্' বলিয়াছেন।

জৈনগণ বহু কোষ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'পবণন্তি' নামক আর-একজন জৈন 'নন্নূল' নামক বিখ্যাত তামিল ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের এইখানিই প্রামাণিক ব্যাকরণ।

তামিল রামায়ণ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য। ইহার রচয়িতা 'কম্বন্' রাজা রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে (দ্বাদশ শতাব্দী) জীবিত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ ও তামিল রামায়ণে যে সম্পর্ক তাহাতে কম্বনের মহাকাব্যকে বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ না বলিয়া বাল্মীকির উপাখ্যান মাত্র লইয়া রচিত কাদম্বরীর ন্যায় পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ একখানি মহাকাব্য বলা যায়। কম্বনের রামায়ণের সর্ব্বত্রই পাণ্ডিত্যের পূর্ণ বিকাশ, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, ছন্দোজ্ঞানের চরম নিদর্শন। বাল্মীকির রামায়ণ স্বাভাবিক কাব্য, কম্বনের রামায়ণ সর্ব্বত্রই পাণ্ডিত্যের কৃত্রিমতাপূর্ণ। বাল্মীকির কাব্য যেন স্বাভাবিক বনভূমি, কম্বনের রামায়ণ যেন সযত্ন-রক্ষিত কৃত্রিম পার্ক।

তামিল শৈব সাহিত্যের দুই ধারা। প্রথম ধারার প্রধান গ্রন্থ 'মণিক বাশগর্' (মাণিক্য-বাচক) বিরচিত 'তিরু বাশগম্' (শ্রীবাচক)। তামিলগণের মধ্যে এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় শৈব সিদ্ধান্ত বা শৈবদিগের দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব। সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধগণকে (ইঁহাদের বিচারে বৌদ্ধগণ বিধর্ম্মী বা heretic) তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাণিক বাশগরের প্রতিষ্ঠা। 'তিরুবাদুর্ পুরাণম্' নামক একখানি গ্রন্থে এই তর্ক-যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শৈব সাহিত্যের দ্বিতীয় ধারার প্রধান কবি 'জ্ঞান সম্বন্ধন্'। জ্ঞান সম্বন্ধর্ প্রমুখ শৈব ভক্তগণের ধর্ম্মের শত্রু জৈনগণ। ইঁহাদের তর্ক-যুদ্ধের বিবরণ ও ভক্তগণের জীবনী 'তিরুত্তোণ্ডর্ পুরাণম্' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। চিদম্বরম্ অঞ্চলে শীগারী গ্রামে জ্ঞান সম্বন্ধর্ জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার দুই শিষ্যও কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম 'সুন্দরর্' ও 'অপ্পরর্'। ইঁহাদের কবিতা-সমূহ সাধারণতঃ 'দেবারম্' (দেবাই) নামে পরিচিত (আর্য্যাবর্ত্তে যেমন তুলসী, কবীর প্রভৃতি গুরুগণের 'দোঁহা')। তামিল শৈবগণের মধ্যে এই তিনজন কবি ও ধর্ম্মপ্রচারক এত সমাদৃত হইয়াছেন যে ইঁহাদের জীবনীর সহিত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে।

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য শৈব তামিল সাহিত্যেরই সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ উত্তরকালব্যাপী। রামানুজের স্থিতি-কাল দ্বাদশ শতক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যই প্রধানতঃ তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের রচয়িতা। ইঁহারা তামিল ভাষায় 'আড়্‌বার্' বা বৈষ্ণব ভক্ত নামে পরিচিত। ইঁহারা সকলে যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের একত্র সমাবেশে 'নালায়ির প্রবন্ধম্' [চারি সহস্র কবিতা] বা 'পেরিয় প্রবন্ধম' (মহাগ্রন্থ) নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইয়াছে। শৈব সাহিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণব সাহিত্য কাব্যের হিসাবে অপকৃষ্ট। তবে শৈব সাহিত্যে তিরুবাশগম্ ও দেবারম্ সমূহ যেমন শৈবদিগের 'বেদ' স্বরূপ, বৈষ্ণবদিগেরও সেইরূপ নালায়ির প্রবন্ধম্। 'নালায়ির প্রবন্ধমের দুইটি খণ্ড 'পেরিঅ তিরু মোড়ি' (শ্রীমহাবাক্য) ও 'তিরু বায়্‌মোড়ি' (শ্রীমুখের বাণী) বৈষ্ণবগণের নিকট আমাদের গায়ত্রী-মন্ত্রের ন্যায় পবিত্র।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে তামিল সাহিত্যে কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য উদ্ভূত হয় নাই। এই কালের মধ্যে কোন বিখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নাই। এই কালকে তামিল সাহিত্যের জড় যুগ বা নিষ্ক্রিয় যুগ বলা যায়। ইহার পরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে তামিল ভাষায় পুনরায় সাহিত্যচর্চ্চা আরব্ধ হয়। এই যুগের বহু গ্রন্থই অতি-বীর রাম-পাণ্ডিয়ন নামক একজন পাণ্ড্যদেশের রাজার নামে প্রচারিত। ইঁহার প্রকৃত নাম 'বল্লভ দেব' এবং ইনি খৃষ্টীয় ১৫৬৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইটি সাধারণতঃ তামিল সাহিত্যে অনুবাদের যুগ।

বল্লভ দেব বা অতিবীর-রাম-পাণ্ডিয়ন্ যে আমাদের বল্লালসেন বা ভোজরাজ বা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই যুগে অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুরাণ-গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে; মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছে; বেদান্ত-দর্শন ও শৈবদর্শনের অনুবাদ হইয়াছে; এবং অনেক আয়ুর্বেদ-গ্রন্থেরও অনুবাদ হইয়াছে। আদিরসাত্মক খণ্ড কাব্যও অসংখ্য রচিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মের তান্ত্রিকতার পরিণামে বহু সিদ্ধ (তামিল 'শিত্তর্') তামিল দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কালে আরবদেশ হইতে রসায়ন ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা তামিল দেশে আনীত ও আলোচিত হয়। ইহার পূর্ব্বে রসায়নের আলোচনা হয় নাই। এইকালে সিদ্ধগণ 'ঋষি' নামে বিদিত হইতেন এবং হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী মত প্রচার করিতেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে আধুনিক তামিল সাহিত্যের কাল। বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে গদ্য সাহিত্য ছিল না, এবং ইউরোপীয় প্রভাবেই এখানেও গদ্য সাহিত্য গঠিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দিকে কয়েকখানি কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বীর শৈবদিগের অনুবাদ-গ্রন্থ 'প্রভুলিঙ্গ-লীলা' ও নীতি-বিষয়ক 'নীতি-নেরি-বিলক্কম্' ('পটিনত্তু পিল্লেই কৃত') প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইজন প্রধান কবি 'তায়ুমান বর্' ও 'বেশ্‌চি'। তন্মধ্যে 'বেশ্‌চি' একজন ইটালী দেশীয় ইউরোপীয়। এদেশে থাকিয়া তিনি তামিল শিখিয়া কুড়ালের অনুরূপ উৎকৃষ্ট মহাকাব্য 'তেম্বাবনি' লিখিয়াছেন। ইনি যে প্রকার তামিল ভাষা ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার্হ। ইনি গদ্য সাহিত্যও অনেক লিখিয়াছেন। নাটকাদি নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য-সাহিত্যিক 'তাণ্ডব রায়-মুদলিয়ার্'। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ইনি গদ্য অনুবাদ করিয়াছেন। একালে অসংখ্য তামিল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বটে, তবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কিছুই নাই।

গান্ধী ও লেনিন্—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ।

গান্ধিবাদ ও বোলশেভিকবাদের প্রধান বৈষম্য হইতেছে লক্ষ্য-সাধনের প্রণালী লইয়া। গান্ধিবাদ বর্ত্তমান সভ্যতার আবিষ্কৃত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী।

কল-কারখানার আমদানীতে পল্লীবাসী সাধারণ শিল্পীগণ সহরের অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং মূলধনীদের অর্থবলের নিকট পরাজিত হইয়া তাহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজের জীবিকাউপার্জ্জনের পথ দেখিতে বাধ্য হইতেছে।

কল-কারখানাই বিলাসের সকল অঙ্গকে সহজলভ্য করিয়া তুলিয়াছে, ইহাতে সমাজে আলস্যের প্রশ্রয় ঘটিতেছে এবং একদল লোক অন্যের পরিশ্রমের ফল ফাঁকি দিয়া উপভোগ করিতেছে। এই দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংখ্যা কমাইয়া ফেলিতে হইবে, এবং কেহ নিজে অলস ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারিবে না, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াও আবশ্যক। সমাজে কেহই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না, কারণ অলস ও তস্কর একই পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

বোলশেভিজম্ বলিবে, শ্রমজীবীগণকে চালনব্যাপারে স্বাধীনতা দাও, দেশের ধনরত্ন সমগ্র দেশবাসী তুল্যাংশে উপভোগ করুক, সাম্রাজ্যতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন কর, তাহা হইলেই তোমরা সুখী হইবে।

গান্ধিবাদের মূলমন্ত্র হইতেছে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মানবসমাজের বর্ত্তমান ভোগলিপ্সা হ্রাস করা। বিলাস-বাসনাই যদি ত্যাগ করা গেল তাহা হইলে বিলাস-দ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য শ্রমজীবী-নিয়োগও আবশ্যক হইবে না এবং তাহাদের পরিশ্রমের এবং পারিশ্রমিকের ন্যূনাধিক্য লইয়া সমাজে অশান্তিরও সৃষ্টি হইবে না। একদিকে প্রভুত্বস্পৃহা, অন্যদিকে ভয় যদি দূরীভূত হয় তাহা হইলে জগত হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্তর্হিত হইবে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে গান্ধি ও লেনিন উভয়েরই লক্ষ্য এক—সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন, বিশেষতঃ দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচন ও যথেচ্ছাচারী প্রভুত্বের মূলোচ্ছেদ।

গান্ধিজির মতে এ অবস্থার প্রতীকার আধুনিক সভ্যতা ও কল-কারখানার মূলোচ্ছেদ; লেনিনের মতে প্রতীকার—আধুনিক সভ্যতার প্রধান ফল কল-কারখানার বিনাশ সাধনের প্রয়োজন নাই কিন্তু এই-সকল উপায়ে লব্ধ অর্থ জাতির অন্তর্গত সকলের মধ্যে তুল্যাংশে বণ্টিত হউক।

গান্ধির অসহযোগের আদর্শ প্রাচীন ভারতের চিন্তা- ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং পাশ্চাত্য ঋষি টলষ্টয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত। আর লেনিন পাশ্চাত্য দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের নিকট হইতে পাশ্চাত্যের স্বভাবানুযায়ী নিজ আদর্শ লাভ করিয়াছেন। একজনের কর্ম্মস্থল সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল রুশিয়া, অপরের কর্ম্মস্থল আত্মিক শক্তির জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

—

বেতাল (মাঘ)

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শীতের হাওয়ার লাগ্‌ল নাচন
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে কর্‌ল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে॥
শূন্য করে ভরে দেওয়া
যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে'
সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন্ কোন সকালে॥

সিন্ধু-পাঞ্চজন্য—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ডাকে সিন্ধু ডাকে।
মাটির এ খেলাঘরে তরুণ শৈশবে তার ভুলে ফেলে রেখে গেছে কাকে;
সেই হতে চিরকাল ধরি'—
নীল নয়নের কোণে নিদ নাহি দিবস-শর্ব্বরী,
কল্লোলিয়া উচ্ছ্বসিয়া মাটিরে ঘিরিয়া শত পাকে
তরঙ্গ-ইঙ্গিতে তারে ডাকে তারে ডাকে তারে ডাকে ডাকে ডাকে।

মুকুতার কণ্ঠী সে কি, শুক্তিপুটে সিঁথির সিন্দুর?
প্রবাল মুকুট? কোটি ঘননীল সলিল বিন্দুর
মরম চোয়ানো নীলকান্তমণি? কি সে হারাধন,
যার লাগি' যুগে যুগে থামিতে চাহে না তার উচ্ছলিত আকুল ক্রন্দন,
সমস্ত অস্তিত্ব যাহে মুখরিত হাহাকারে একখানি আঁখি-জলে গলি',
সৈকতে লুটিয়া-পড়া বৃথা অশ্রু অনুনয়ে দাও দাও ফিরে দাও বলি'।

বুঝি নীলাকুল-খসা পদ্মমুখ শুভশঙ্খ খুঁজি' খুঁজি' বধ তুমি দিন,
পরাণের সব ভাষা পরতে পরতে তার অনাহত নীরব নিলীন।
হেথা নিরুপায় তব ভাষাহীন সব ভাষা সুরহীন সব তব সুর,
অস্পষ্ট অস্ফুট শুধু প্রাণপণ প্রয়াসের আর্ত্তধ্বনি ব্যাকুল বিধুর।
যে কথা বলিতে চাও কিছুই হয় না বলা, ডাকো যারে বোঝে না সে ডাক,
শিরোপরে নীলাকাশ নির্ণিমেষে চেয়ে রয় ব্যথাতুর নিস্পন্দ নির্ব্বাক্।

অদূরে ধরার বুকে নিশিদিন দুঃখে সুখে যে উৎসব চলে,—
ঋতুতে ঋতুতে তার কত ফলফুলসম্ভার ভরে' ওঠে সবুজ অঞ্চলে,
কত ভুল কত ভ্রান্তি, কত যুদ্ধ কত শান্তি; সংশয় দ্বিধায় ভরা
মানব সংসার;
যুগে যুগে জয়রথে, চরিতার্থতার পথে ক্লান্তিহীন কি বিচিত্র
তার অভিসার।
চকিত বিহগগীতে কি বারতা আসে চিতে, তটছায়া কানে কানে
কি যে কথা বলে,
শত-কোটি নদ-নদী কি পরশ নিরবধি অনুরাগে বহে ঐ হৃদয়ের তলে?
নিঃসঙ্গ তুহিনবাসে কাটে দিন দীর্ঘশ্বাসে, থেকে থেকে দুর্ণিবার
জাগে কৌতূহল,
তটের বাঁধন টুটি' কাছে যেতে চাও ছুটি', ফেনিল হতাশে ফেরো
ছল ছল ছল।

ওগো সিন্ধু, কারে ডাকো কিছু তার জানি নাকো,
তবু প্রাণ করে বাই বাই।
আমি ও আগল টুটি' পাগল হইয়া ছুটি' তোমা' পানে বাহিরিতে চাই।
তট-কন্দরের মাঝে বাতাসে যে বাঁশি বাজে—জানি না কাহার নামে সাধা,
তবু কল-উতরোলে শোণিতের স্রোত দোলে, খসে' পড়ে জড়তার বাধা।
হে সিন্ধু, তোমার ডাকে জন্ম-মৃত্যু কোথা থাকে, বিপুল বিক্ষোভবেগ
বুকে এসে লাগে,
আপনার মাঝে চাহি' হেরি কোথা কূল নাহি, ভিতরে বাহিরে এক
অতলতা জাগে।
এ বুকের মাঝ থেকে বাহিরিয়া আসে যে কে, সিন্ধু আঁখিবিন্দু সম তার,
কিরীটে কৌস্তুভ জ্বালা, কণ্ঠে নীল অশ্রুমালা, দুটি বাহু অসীম-বিস্তার।
বক্ষ পরাক্রমভরা শুভ্র ঝটিকায় গড়া, দেহ গড়া মরীচি-নিচয়ে,—
যেন গো আমারই লাগি' যুগে যুগে আছ জাগি'—বাঁধা দোঁহে দোঁহা-সনে
চির-পরিচয়ে।
ভুলি সব ছোট কথা, অবহেলা বিমুখতা, দীনতা, রিক্ততা মোর যত,
তোমার পথের পরে ক্ষণেক স্পর্দ্ধার ভরে তুলি শির দেবতার মত!

* * * *

নিজ বিপুলতাভরে স্বপন ভাঙিয়া পড়ে, ক্ষণেক ধরিয়া তারে রাখো,
শুধাব না কারে ডাকো, কার পথ চেয়ে থাকো, তুমি শুধু ডাকো সিন্ধু,
ডাকো ডাকো ডাকো।

—

মোস্‌লেম ভারত (কার্ত্তিক, ১৩২৮)

বিদ্রোহী—হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি',
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি',
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর—
আমি চির উন্নত শির।
আমি চির দুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্ব্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুর-মার!
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খল!
আমি মানিনাক কোনো আইন,
আমি করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন্!
আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর,
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'!
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্!
আমি চপলা চপল হিন্দোল্!
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি, উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!
আমি চির-দুরন্ত দুর্ম্মদ,
আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম্ হ্যায় হর্দ্দম ভরপুর্ মদ!
আমি হোম শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে-চাঁদ ভালে-সূর্য্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণ-তূর্য্য!
আমি কৃষ্ণ কণ্ঠ, মন্থন বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন হারা ধারা গঙ্গোত্রীর!
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!
আমি সন্ন্যাসী, সুর সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজ-বেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্ম্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র, মহাশঙ্খ, আমি প্রণব নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্ব্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!
আমি প্রাণ খোলা হাসি-উল্লাস, আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প হারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছলছল, চল-ঊর্ম্মির হিন্দোল্ দোল্!
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিত্তে চেতন,
আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!

আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চরি' ভূমিকম্প !
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি' !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম-ঘুম,
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম,
মম বাঁশরীর তানে পাশরি' !
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক, হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।
আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুলধ্বংস-ধন্যা।—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি।
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী,
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !
আমি মৃণ্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
আমি বিশ্বের চির-দুর্জ্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য !
আমি উন্মাদ ! আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!
আমি উত্থান, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,
আমি বিবসন আজ ধরাতল নভ ছেয়েছে আমারি জটাজাল !
আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর, বিদ্রোহী সৈন্য।
আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা- বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর —
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !

মানা

বিদায়ের বেলা সে ত কথা কহি' করে নাই মানা,
বেড়ে নাই পথখানি তুলি' কম্প্র শীর্ণ হস্তখানা ;
তবু কিছু ছিল না কি তার সেই নির্ব্বাক অধরে,
সকরুণ মানা যাহে ফুটিয়া উঠেছে থরে থরে !
কিছু ছিল না কি তার ছলছল আঁখি-প্রান্তে লেখা,
মানারে ছাড়ায়ে যাহা দেগেছিল মরণের রেখা ?
অস্ফুট আগ্রহভরা ভাষাহীন শব্দহীন বাণী
হাজার মিনতি দিয়া রোধে নাই মোর পথখানি ?
অনলের রেখা দিয়া যদি কেহ ঘিরে দিত পথ—
সে বাধা কি তার চেয়ে হত কভু অলঙ্ঘ্য বৃহৎ ?
তবু তারে ছেড়ে গেছি, এমনি যে ছেড়ে যেতে হয় ;
জগৎ দেখে না খুঁজি' কোথা কাঁদে বিরহী হৃদয় !
বিরহী কোথায় কাঁদে খোঁজে তার নাহি অবসর,
অচ্ছেদ্য কর্ম্মের গ্রন্থি সে শুধু গাঁথিছে পর পর।
যে নিশ্বাস ছুটি' দেহ প্রাণ দিয়া প্রেম দিয়া কেনে,
বিপুল বসুধা তারে দূর হ'তে দূরে লয় টেনে।
দূর হতে দূরে লয়, তাই বলে' ব্যর্থ হয় সে কি ?
সে দেখা ত দেখা নহে মোরা যাহা প্রতিদিন দেখি ;
প্রাণের নন্দন-বনে এ নিশ্বাস রহে যে সঞ্চিত,
রস ভরে বেড়ে উঠে, পুষ্পভারে হয় বিকসিত।
জগতের বাধা গণ্ডী কত দিন— রবে কত দিন ?—
জানি তা অটুট নহে, একদিন জানি হবে ক্ষীণ।
জানি এ নিশ্বাস বাধা, অশ্রুখসা এ নির্ব্বাক মানা,
এ জীবনে ব্যর্থ হোক্, চিরকাল ব্যর্থ তা' হবে না।
অন্ধ এ ধরায় যাহা অনাদৃত উপেক্ষার ভারে,
স্বর্গে তাহা জমে আছে—উপেক্ষা সে করে নাই তারে'
যে মানা করেছে ব্যর্থ হেথাকার বিচ্ছেদের ব্যথা,
চির মিলনের মাঝে স্বর্গে তার আছে সার্থকতা।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।



বঙ্গের শেষ পাঠান বীর

অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত "পন্‌কিয়া" নদী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র রায় মহাশয় বনগ্রাম (মৈমনসিংহ) হইতে লিখিয়াছেন :—

"মুঘলবাহিনী ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ এগারসিন্দুর বন্দরে ছিল। সেখান হইতে সরাইল হইয়া শ্রীহট্টে যাইতে হইলে মেঘনায় যাইয়া পড়া আবশ্যক। অধ্যাপক সরকার মহাশয় এইস্থলে অনুমান করিয়াছেন যে 'এগারসিন্দুর হইতে ব্রহ্মপুত্র ভাটাইয়া বোধ হয় বর্ত্তমান রামপুরহাট বেলাবো ও ভৈরব-বাজারের পাশ দিয়া, মুঘল সৈন্য জলপথে মেঘনায় আসিয়া পৌঁছিল।' আমার মনে হয় এইখানেই একটু গোল রহিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মূল পারসী লিপিতে পনকিয়া নামে নদীর উল্লেখ আছে বলিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন। আমার কিন্তু মনে হয় এই পন্‌কিয়াই হয়ত নিয়ে বিবৃত 'পন্‌কড়িয়া' নদী।

এগারসিন্দুরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতেই পন্‌কড়িয়া নদী বহির্গত হইয়া কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে যাইয়া মেঘনার সহিত সংযোগ সম্পন্ন নদীগুলির সহিত মিলিত হইত বলিয়া এতৎপ্রদেশে জনশ্রুতি আছে।......এই প্রদেশটি বহুকাল হইতে বৃহৎ বৃহৎ নদীনালায় সমাচ্ছন্ন, এবং সকলগুলিই বহুস্থলে পরস্পর মিলিত হইয়া দক্ষিণ ভাগে 'ঘোড়াউত্রা' নাম ধারণ করতঃ মেঘনায় যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে।

এগারসিন্দুর হইতে পন্‌কড়িয়া ভাটাইয়া কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের কোণাকোণি মেঘনায় পড়িয়া সরাইলে উপস্থিত হওয়া যতটা সহজ, অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের অনুমিত পথে ঘুরিয়া মেঘনায় যাইয়া পড়া ও তারপর উজান বাহিয়া সরাইলে পৌঁছা অপেক্ষাকৃত অনেকটা কঠিন বই সহজ নহে।"

এ সম্বন্ধে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—

"রেনেলের ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জরিপের ম্যাপে স্পষ্টই দেখা যায় যে একটা নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে রায়মহাশয়ের নির্দ্দেশিত পথে ঘোড়াউত্রায় গিয়া পড়িয়াছে এবং তৎপরে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু রেনেল উহার নাম দেন নাই। উহা ম্যাপে বড় সঙ্কীর্ণ দেখায় বলিয়া আমি উহার উপর দিয়া মুঘল যুদ্ধ জাহাজ চলা সম্ভব ভাবি নাই। রায়মহাশয়ের পত্র পড়িয়া এখন মনে হইতেছে যে এই নদী অর্থাৎ পন্‌কড়িয়া বাহিয়াই মুঘলসৈন্য ঘোড়াউত্রা এবং তৎপরে মেঘনায় পৌঁছিয়াছিল। আমার প্রবন্ধে অনুমিত পথে নহে।"

—

কোন্ মাসে কি খেতে হবে

গত কার্ত্তিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্ত মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ গিন্নি-মহলের চলতি কথা দিয়ে শিক্ষিতা গিন্নিঠাকরুণদের পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন—"কোন্ মাসে কি খেতে হবে"। পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন গিন্নি-মহলের মধ্যেও অনুরূপ একটি ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি এখানে দেওয়া গেল—

চৈত্রে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম ;
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল ;
শ্রাবণেতে খৈ দৈ, ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে নারিকেল, কার্ত্তিকেতে ওল ;
অগ্রহা'নে নবঅন্ন চিঙ্‌ড়ি মাছের ঝোল।
পৌষমাসে মূলা মুড়ি খেতে লাগে মিঠা ;
ঘন আউটা দুধের সাথে বাসি পোড়া পিঠা।
মাঘেতে মকর মিঠা তেলে ভাজা সীম ;
ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্ত্তাকুতে নিম।

পূর্ব্ববঙ্গের "মাঘ বেল" কি ঠিক? অসময়ের ফল অপেক্ষা সময়ের ফল নিশ্চয় সুমিষ্ট স্বাদু ও পুষ্টিকর।—মাঘের বেল কি সময়ের ঠিক ফল ?

শ্রীউৎপলাক্ষী দাসী।

—

কোন্ বিশ্বেশ্বরের মন্দির ?

কানিংহামের উক্তি সম্বন্ধে যে খট্‌কা লাগিয়াছিল তাহা দূরীভূত হওয়ায়, আমি তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। কানিংহাম বলিয়াছেন, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ঔরংজেবের দ্বারা ধ্বংস হয় নাই, হইয়াছে জাহাঙ্গীরের দ্বারা,—কিন্তু এই উক্তিতে ভ্রম আছে।......

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে দেখিলাম যে সম্রাট্ বলিতেছেন—"কাশীতে ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে রাজা মানসিংহ এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। [ইহার নাম 'আদি বিশ্বেশ্বর মন্দির'—বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর মন্দির হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।] ঐ মন্দির ভাঙিয়া উহারই মালমসলা দ্বারা আমি সেই মন্দিরের উপর এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম [জামি মসজিদ।] ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহা স্বধর্ম্মীদের দ্বারাই পূর্ণ করা আমার অভিলাষ।"......অতএব দেখা যাইতেছে, কানিংহাম "আদি" কথাটা বাদ দেওয়াতেই যত ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল।

—অরুণ দত্ত।

গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে টম্‌সন্ সাহেবের লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র সমালোচনায় "শ্রী ক খ গ" ৩৮১ পৃঃ লিখিয়াছেন—

"টম্‌সন্ সাহেবের বই পড়ে আমরা জান্‌লাম নোবেল পুরস্কার পাবার ছয় বৎসর আগে আশুবাবু রবীন্দ্রনাথকে D. Litt. উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু সিনেট নাকি "He is not a Bengali scholar" বলে আপত্তি করায় প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।......
..............কোন বৎসর কোন মাসের কোন তারিখে এই সভা হয়েছিল, মিঃ টমসন্ অনুগ্রহ করে জেনে নিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে লিখ্‌লে আশুবাবুর রবীন্দ্রনাথ-গুণগ্রাহিতার একটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।"

আমি ছয় বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা যথার্থ জানি না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ্ পাইবার পূর্ব্বে যে আশু-বাবু তাঁহাকে D. Litt. উপাধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সিন্‌ডিকেটের মিটিংএ তাহা গৃহীত হইয়াছিল সে বিষয়ে বেশ স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

রবি-বাবুর নোবেল প্রাইজ্ পাইবার শুভসংবাদ ভারতবাসী ইং ১৯১৩, ১৩ই নভেম্বর তরিখে রয়টারের টেলিগ্রামে প্রথম জানিতে পারে।

কিন্তু ২৮শে অক্টোবর, ১৯১৩, তারিখে কলিকাতা ইউনিভারসিটি সিন্‌ডিকেটের একটি মিটিং হয়; সেই মিটিংয়ে ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে D. Litt. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিবার প্রস্তাব করেন: এবং সিন্‌ডিকেটে এই প্রস্তাব সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(p p. 2571,2572, Minutes of 1913, Part VII দ্রষ্টব্য।)

এখন জানা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ্ পাইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে আশু-বাবু তাঁহাকে D. Litt. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহা যে আশুবাবুর রবীন্দ্রনাথ-গুণগ্রাহিতার একটি অকাট্য প্রমাণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকিশোর রায়।

সম্পাদকের মন্তব্য। লেখক এরূপ প্রতিবাদ কেন করিয়াছেন, জানি না। কথা হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার ছয়বৎসর আগে তাঁহাকে D. Litt. উপাধি দিবার কথা সেনেটে উঠিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে লেখক যখন কিছুই জানেন না, তখন তাঁহার কিছু না-লেখাই উচিত ছিল। যখন আশুবাবু প্রস্তাব করেন, লেখকের মতে তাহা রবি বাবুর নোবেল প্রাইজ পাইবার ১৫ দিন আগে। কিন্তু ইহাও স্মর্তব্য, যে, গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের জন্য রবি-বাবু পাশ্চাত্য দেশে বিখ্যাত হওয়ার পর সেনেটে তাঁহাকে D. Litt. করিবার এই প্রস্তাব হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেহ স্বাধীন ভাবে তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই কারণে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। তাহা কেহ দিতে পারিলে তাহা মুদ্রিত হইবে। নতুবা বৃথা চিঠি লিখিবার প্রয়োজন নাই, তর্ক করিবারও প্রয়োজন নাই।

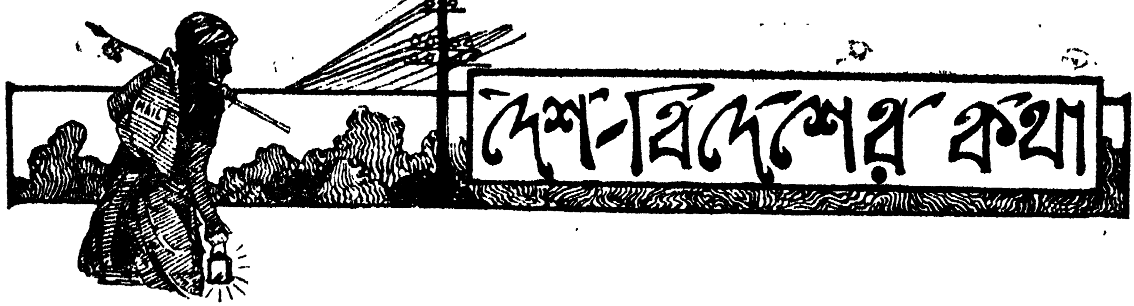
দুর্দ্দম জীবন

বক্ষের এ ক্ষুদ্র পাত্র ভরি' উপচিয়া
আজি বাহিরিয়া
ছুটিতে লুটিতে চায় বাধা-ভাঙা এ মোর জীবন
দুর্দ্দম ভীষণ!
আজি সে উদ্দাম মুক্ত আপনায় আপনি চঞ্চল
নৃত্যমান, প্রমত্ত প্রবল;
অম্বরের অন্তরাল টুটি'
চলে আজি ছুটি'
প্রবল দুর্ব্বার
উচ্ছ্বসিত নদী সম বক্ষ মেলি' ছাড়িয়া হুঙ্কার,—
ঊর্দ্ধ পানে শূন্য পানে
চলে সে দুর্দ্দম দৃপ্ত ব্যাকুল সন্ধানে
সুপ্তি-স্তব্ধ বিমানের স'তে পরিচয়।
আজি সে প্রলয়
দেখিতে শুনিতে চায়—বৈশাখ-গর্জ্জন,
বজ্রে বজ্রে মেঘে মেঘে ভীম আস্ফালন।
আজি মোর প্রাণ
আলোড়ি' বিমান
গ্রহ হতে গ্রহ পরে ছুটে যেতে চায়
প্রমত্ত লীলায়।

আজ সে হইতে চাহে উন্মত্ত বাতাস—
ছড়াইয়া ত্রাস
ধরারে শূন্যেরে চাহে কাঁপাতে বিষম
সব স্থিতি নাড়া দিতে, দোলাতে নির্ম্মম।
মেঘের পতাকা কাঁধে লয়ে
তাপ-তপ্ত তপনেরে উপাড়ি' বিজয়ে,
কোণে কোণে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যতেক গোপন
এ বিশ্বে লুকায়ে আছে—করি' উদ্‌ঘাটন
মৃত্যু-স্তব্ধ ভবনেতে নির্ঘোষিয়া বজ্রের বিষাণ
বিশ্বেরে জিনিতে চায় দুরন্ত পরাণ।

জেনো, চেনা, জানা—
বিশ্বের গোপন দ্বারে আজি কর হানা
অবিরাম;—
মৃত কথা, লুপ্ত রূপ, গুপ্ত ছবি চা'বে অফুরাণ
জেগে জেগে মুখ পানে,
দৈত্য-দানবের মত আজি ফোটা নিস্তব্ধ বিমানে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।



ইজিপ্টে অহিংস অসহযোগ

আবেদন নিবেদনে কোনও সুফল না হওয়াতে আদ্‌লীর দল বিফল-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর মিশরের জাতীয় দলের নেতা জগ্‌লুল পাশা মিশরের মুক্তির জন্য দেশবাসীকে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। মিশরের অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, মাহদী বিদ্রোহে মিশরের ক্ষাত্র-বলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তথাপি রক্তের পথ ছাড়িয়া প্রবীণ দেশনায়ক মিশরের জন্য এই অভিনব মুক্তির পথ গ্রহণ করিয়াছেন এইজন্য, যে, তাঁহার বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ বিশ্বে নূতন যুগ আনিবে, যে যুগে

"উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না ॥"



জগ্‌লুল্ পাশা।

জগ্‌লুল জাতিতে কপ্ট, ধর্ম্মে খৃষ্টীয়ান এবং ব্যবসায়ে ব্যবহারাজীবি। অথচ মুসলমানপ্রধান মিশরের জাতীয়দলের নেতার পদে মিশরবাসী মুসলমান খৃষ্টীয়ান সকলেই জগ্‌লুলকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। দেশ-সেবায় হিন্দু মুসলমানের মিলন যাঁহারা সম্ভবপর মনে করেন না তাঁহারা মিশরের মুসলমান-খৃষ্টীয়ানের এই মিলনের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

জগ্‌লুল অসহযোগের বার্ত্তা প্রচার করাতে ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড অ্যালেন্‌বি জগ্‌লুলকে তাঁহার স্বগ্রামে অন্তরিত থাকিবার আদেশ করিলেন। জগ্‌লুল বলিলেন যে তাঁহার হস্তে তাঁহার দেশবাসী যে পবিত্র কার্য্যের সম্পাদন-ভার প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে দেশবাসীর আদেশ ভিন্ন তিনি কিছুতেই বিরত হইবেন না। ইংরেজ যদি তাঁহাকে জোর করিয়া অন্তরিত করেন তাহা হইলে তিনি কাইরো ত্যাগ করিবেন; নতুবা কিছুতেই তিনি কাইরো ত্যাগ করিবেন না। জগ্‌লুলের যে কয়েকজন অনুচর আদ্‌লীর কার্য্য সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহারাও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের নিকট জগ্‌লুলের নির্ব্বাসন-আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তার-বার্ত্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু অ্যালেন্‌বির আদেশে জগ্‌লুল ও তাঁহার কতিপয় সঙ্গী ধৃত হইয়া সুয়েজে প্রেরিত হইলেন এবং তথা হইতে পরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্য সিংহলে প্রেরিত হইলেন। জগ্‌লুলের দলের কাহাকেও জাতীয়-দলের গচ্ছিত টাকা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া মিশরের ব্যাঙ্কগুলির উপর এক আদেশ জারি হইয়াছে। জগ্‌লুলের আরও কয়েকটি অনুচরের প্রতিও নির্ব্বাসন-আদেশ জারি হইয়াছে। তাঁহারাও নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়া স্থানত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। জগ্‌লুলের দল বেশ ধীর ও শান্ত ভাবে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। কিন্তু অপর একদল উগ্রপন্থী লোক মিশর-বাসীকে বিদ্রোহী হইতে উস্কাইতেছেন। মিশরের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হরতাল করিয়াছে এবং সরকারী-কর্ম্মচারীদিগকেও ধর্ম্মঘট করাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। পাল্টা জবাবে ইংরেজও মার্শাল ল বা সামরিক আইন জারি করিয়াছে। এই-সকলের প্রতিবাদ-কল্পে মিশরের ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় আইন-আদালত বর্জ্জন করিয়াছেন। বিচারকবর্গ সুল্‌তানের নিকট ইংরেজের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন আন্দোলনও পুরা বেগে চলিতেছে। শ্রমজীবীবর্গও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নানাস্থানে ধর্ম্মঘট হইয়াছে।

ইংরেজ প্রতিনিধি জগ্‌লুল-পত্নীকে স্বামীর নিকট থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, শ্রীমতী জগ্‌লুল বিদেশীর দয়ার দান প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বামীর আরব্ধকার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। দেশবাসীর নিকট এক আহ্বান-পত্রে তিনি বলিতেছেন, "ইংরেজদিগকে অস্বীকার কর। তাহাদিগকে কোনও রকমে সাহায্য করিও না।" ভগবানের চরণে সমস্ত দেশবাসীকে এই প্রার্থনা জানাইতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন যে—"হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পরম অন্তরঙ্গ নির্ব্বাসিতদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। তাঁহারা যেন মুক্ত স্বচ্ছ উজ্জ্বল স্বাধীনতার আলোকের সঙ্গে শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" সমস্ত মিশরবাসী শ্রীমতী জগ্‌লুলের সহিত একপ্রাণে এই প্রার্থনা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবেই।

*

অ্যাঙ্গোরা ও ইংরেজ

অ্যাঙ্গোরা-গভর্ণমেণ্টের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে তলে তলে খর্ব্ব করিয়া এসিয়ামাইনরে গ্রীক-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা যে ইংরেজ বরাবরই করিয়া আসিয়াছেন তাহা শ্রাবণ-সংখ্যা "প্রবাসী"তে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের মুসলমান-জনসাধারণের বিরাগভাজন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও এত বড় ব্যাপারটা ইংরেজ যে শুধু তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য করিয়া আসিতেছিলেন ইহা মনে হয় নাই; কিন্তু ইংরেজের সহসা-গ্রীক-প্রীতিরও একটা

সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। ক্যানিং, পামারষ্টোন, ডিসরেলি প্রমুখ ইংরেজ রাজনীতিকগণ বরাবরই বলিতেন, ধর্ম্ম-যুদ্ধের (Crusade) যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম রক্ষার অজুহাতে আনাটোলিয়া উপত্যকার খৃষ্টানে মুসলমানে যুদ্ধ ইংরেজ যদি নির্ব্বিচারে সহ্য করেন তবে প্রাচ্যে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। অথচ বর্ত্তমানকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্ত্তারা হঠাৎ চিরন্তন নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। ইহার অন্তরালে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে।

বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা মাদাম গলিস্ (Madame Berthe Georges-Gaulis) ও তাঁহার সাহিত্য-সঙ্গী Jacques Bardoux, L'opinion পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা ধারণা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গ্রীক-বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এসিয়ামাইনরে স্থাপিত হইলে তথায় গ্রীক-বন্ধু ইতালীর প্রভাবের বিস্তার হইবে। ইতালীর সহিত ফরাসীজাতির নানাকারণে মনোমালিন্য ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। ইতালী ফ্রান্সের শত্রু হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। কাজেকাজেই ইতালীর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তারে ফরাসীর প্রভাব কমিবেই। গ্রীকদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টার অন্তরালে ইংরেজের ফরাসী-শক্তিকে এরূপে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। নবীন তুরস্ক ইংরেজকে বড় ভাল চক্ষে দেখে না।

তুরস্ক-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে মনে করিয়া ফরাসী রাজনৈতিকগণ তুরস্কের প্রভাবকে অটুট রাখিতে চাহিতেছিল। ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে বিরোধ ঘটাতে কিন্তু তুরস্কের সুবিধাই হইল। ফরাসীজাতি তুরস্কের প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য সিলিসিয়া (Cilisia) তুরস্ককে ফিরাইয়া দিলেন; থ্রেস ও আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধারে গ্রীকের বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইংরেজের এই সন্ধিসর্ত্তে আপত্তি দেখা গেল। ম্যাণ্ডেট বা খবরদারী-প্রাপ্ত রাজ্য জাতিসমূহের সংঘের অনুমতি না লইয়া ফেরৎ দেওয়ার অধিকার ফ্রান্সের নাই এই অজুহাতে ইংরেজ গণ্ডগোলের সূত্রপাত করিলেন। তুরস্কের খৃষ্টীয়ান প্রজাগণের জন্যও ইংরেজ সহসা ভাবিয়া আকুল হইলেন।

প্রথম দৃষ্টিতে ইংরেজের এই আচরণ খুবই আশ্চর্য্যজনক মনে হইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে জাতিসংঘকে উপেক্ষা করিয়া ফরাসী সিলিসিয়া প্রত্যর্পণ করিয়াছেন তখন তুরস্ক যদি প্রলুব্ধ হইয়া মেসপটেমিয়া চাহিয়া বসেন তখন ত নিরুপদ্রবে ম্যাণ্ডেট-লব্ধ রাজ্য ইংরেজের ভোগ করা সম্ভব হইবে না। তারপর ফরাসী যদি ইংরেজ-শক্তিকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে তুরস্ককে ক্রমাগত উস্কাইয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের পারস্য, আফগানিস্থান, আরব, তুর্কীস্থান, বোখারা, ককেশস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্যগুলিকে সংহতিবদ্ধ করাইয়া একটি পরাক্রান্ত ইস্লাম (Pan-Islamic) সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করেন তাহা হইলে ইংরেজের সাম্রাজ্য-লালসায় বাধা পড়ে।

ফ্রান্সে-ইংলণ্ডে পরস্পরের এই হিংসা এবং পরস্পর-বিরোধী সাম্রাজ্য-লিপ্সা দুইজনকেই সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকের প্রতিকার্য্যটিকেই অপরে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে এবং প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে কোনও গোপন অভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছে। মাঝখান হইতে অ্যাঙ্গোরা'র ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

ইংরেজও আজকাল খিলাফৎ-সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ফরাসী বা ইংরেজের কখনও বা মুসলমান-প্রীতি আবার কখনও বা খৃষ্টীয়ান-প্রীতির মূলে রহিয়াছে দুইজনেরই গভীর স্বার্থ। এই স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতে অ্যাঙ্গোরার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে, প্রাচ্যের ইহাই পরম লাভ।

—

নিরস্ত্রীকরণ-দরবারে ডুবোজাহাজ

ওয়াশিংটনের নিরস্ত্রীকরণ দরবারে ডুবোজাহাজের আলোচনায় বৈঠক ভরাডুবি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহার মূলে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে যে মনোমালিন্য ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ প্রতিনিধি ব্যালফুর দরবারের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের বৈঠকে প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু আত্মরক্ষার্থ ডুবোজাহাজের মূল্য অত্যন্ত কম এবং যেহেতু ইহা হইতে এই ধারণাই হয় যে ডুবোজাহাজের নির্ম্মাণ ও রক্ষণ যুদ্ধনীতিসম্মত নহে ও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে, সেই হেতু ইংরেজ প্রতিনিধিবর্গ ইচ্ছা করেন যে সকলে সমবেত হইয়া ডুবোজাহাজ নির্ম্মাণ রক্ষণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে ডুবোজাহাজ আত্মরক্ষার অস্ত্র না হইলেও আক্রমণের জন্য খুবই কার্য্যকারী। জার্ম্মানী যদি তাহার জলবাহিনী আবার শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে সেই নবজার্ম্মানীর আক্রমণ স্থলপথেই হইবে। জলপথে আক্রমণের সম্ভাবনা অতি অল্প। এবং জার্ম্মান ডুবোজাহাজের আক্রমণ হইতে ফরাসী ডুবোজাহাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। তখন ফ্রান্সকে ইংরেজের ডুবোজাহাজ-ধ্বংসকারী নৌবহরের সাহায্য লইতেই হইবে। কাজেকাজেই জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই যে ফরাসী ডুবো-জাহাজগুলি প্রস্তুত করিতেছেন তাহা মনে হয় না। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি ইংরেজের জাহাজ বিনাশ করিবার সাজসরঞ্জাম। ফরাসীর সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান তাহাতে এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা ডুবোজাহাজ যখন আক্রমণের অস্ত্র এবং ডুবোজাহাজ যখন বহুদূরে আক্রমণ করিতে যাইতে অসমর্থ তখন নিকটের কোনও শত্রুকে আক্রমণ করিবার বল সঞ্চয় করিবার জন্য এই সরঞ্জাম। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের ডুবোজাহাজ তৈয়ারী করিবার আর কোনও সঙ্গত কারণ ব্যালফুর খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য তিনি ডুবোজাহাজ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখার পক্ষপাতী। ইতালীর প্রতিনিধিরা বলিলেন যে আরও বড় বৈঠক না হইলে, অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা না আসিলে এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভবপর নহে। অতএব এ বিষয়ের মীমাংসা আপাততঃ স্থগিত থাকুক।

ফরাসী তরফে নৌসেনাপতি দেবঁ (Debon) বলেন যে ডুবোজাহাজ কেবলমাত্র আক্রমণের অস্ত্র নহে; আত্মরক্ষার্থ ইহা অতি উত্তম অস্ত্র; ইহা ব্যতীত ভবিষ্যতে এক মহা বিপদ হইতে একমাত্র ডুবোজাহাজ ত্রাণ করিতে পারিবে। মনে করা যাউক যে জার্ম্মানী খুব বড় বড় উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ফ্রান্সের নৌবহরকে আক্রমণ করিল। তখন ডুবিয়া থাকিতে পারে বলিয়া আত্মরক্ষা করিয়া সেইগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য এক ডুবোজাহাজ লড়িতে পারিবে; অন্য কোনও জাহাজ উড়োজাহাজ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না।

এরূপ নানা কারণে ডুবোজাহাজ-নির্ম্মাণ ফরাসী স্থগিত রাখিতে পারে না।

ব্যালফুর বলেন যে তাহা হইলে ডুবোজাহাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ছোট ছোট দ্রুতগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে সকলকেই অনেক অর্থব্যয় করিতে হইবে। ফ্রান্স এত ছোট দ্রুতগামী জাহাজ

কোথা হইতে পাইবে? বিগত যুদ্ধে ফ্রান্স ২৫৭-খানি, ইতালী ২৮৮-খানি ও ইংলণ্ড ৩৮৭৮-খানি দ্রুতগামী ছোট জাহাজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিল। ইংলণ্ড যদি এইরূপে সাহায্য না করিত তবে ফরাসী উপকূল জার্ম্মানীর অবরোধ হইতে রক্ষা পাইত কিরূপে? ইংলণ্ডের যে দ্রুতগামী ছোট জাহাজের বহর আছে তাহাতে ইংলণ্ড ডুবোজাহাজ হইতে ভয় পায় না। তবে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হইলে ডুবোজাহাজগুলি দিয়া ফ্রান্স ইংলণ্ডের বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি করিতে পারে সেজন্য তাহারা ডুবোজাহাজের অবাধ নির্ম্মাণ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না।

জাপানের প্রতিনিধি হাকুহোনা বলেন যে তাঁহাদের দেশ বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য শক্তিবর্গের দেশ হইতে অনেক দূরে। কাজে কাজেই জাপানী ডুবোজাহাজ কাহারও বিরুদ্ধে আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেই পারে না। জাপান কিন্তু আত্মরক্ষার্থ ডুবোজাহাজকে অতি উত্তম অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করে। সেইজন্য তাহারা ডুবোজাহাজ নির্ম্মাণের একান্ত পক্ষপাতী। এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় সভা পণ্ড হইবার জোগাড় দেখিয়া আমেরিকার প্রতিনিধি সিনেটর রুট প্রস্তাব করেন যে যুদ্ধে ডুবোজাহাজ আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলেও পণ্যবাহী জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। যদি কোনও নৌসেনানী এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পণ্যবাহী জাহাজ আক্রমণ করেন তবে তিনি জলদস্যু বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাঁহার সেইরূপ শাস্তিও হইবে।

ফ্রান্স ও জাপান এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়াছেন। কেবল ফ্রান্স বলেন যে পণ্যবাহী জাহাজ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেন ততক্ষণ আক্রমণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। কিন্তু অন্যায় আচরণ করিলে তাহা নিস্তার পাইবে না। এই বিতণ্ডা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অসদ্ভাব বাড়িতেছে। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না এবং গোপনে নিজ শক্তিকে বাড়াইতে দুইজনই প্রয়াসী। শান্তির পক্ষে ইহা বড় শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না।

ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্যা ও কান্ (Cannes) বৈঠক

মধ্য-ইউরোপের শোচনীয় দুর্দ্দশা সমস্ত ইউরোপের আর্থিক অবস্থাকে এমনই আঘাত করিয়াছে যে মধ্য-ইউরোপের হৃতশ্রীর পুনরুদ্ধার না হইলে সমস্ত ইউরোপের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। কাজেকাজেই জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা আজকাল আর মিত্রশক্তিবর্গের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌কে তত চিন্তিত করিয়া তুলিতেছে না—মধ্য-ইউরোপের আর্থিক উন্নতির উপায় যেরূপ কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৬ই জানুয়ারি তারিখে সমস্যা-পূরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য Cannes কান্ সহরে এক বৈঠক বসিয়াছে। রাশিয়া ও জার্ম্মানীকে এযাবৎকাল সমস্ত বৈঠক হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল কিন্তু এখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া লয়েড জর্জ্জের ইচ্ছায় তাহাদিগকেও এই বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বৈঠকে ইংরেজ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন যে ইউরোপীয় বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় একটি সার্ব্বজনীন অর্থ-ঋণদান সমিতি গঠিত হোক। এই সমিতিতে বৈঠকের নির্দ্ধারিত অংশ প্রত্যেক দেশ ক্রয় করিতে পারিবেন। এমন কি জার্ম্মানীকেও অংশ কিনিতে দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে যে জার্ম্মানী তাহার লাভের অর্দ্ধেক অংশ নষ্টপ্রায় দেশগুলির উন্নতি-সাধনকল্পে ব্যয় করিবার জন্য জাতিসংঘের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই কারবারে জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইতালীর সমান অংশ এবং অন্যান্য দেশের অংশ অল্প থাকিবে। বন্দর ও মাল-সরবরাহের পথ নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য উপায়ে বাণিজ্য-বিস্তারের সাহায্য করিবার জন্য ধনদান এই সমিতির প্রধান কার্য্য হইবে।

লয়েড জর্জ্জ বলেন, জার্ম্মানী ও রাশিয়া এই ব্যবসায়-চুক্তি-সর্ত্তে রাজী না হইলে ইউরোপকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা বৃথা। কাজে-কাজেই জার্ম্মানী ও রাশিয়াকে আর একঘরে করিয়া রাখা চলিবে না। তবে রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রুশ ব্যবসায়ীগণ যে চুক্তি রক্ষা করিবেন এবং না করিলে চুক্তি যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার জন্য রুশ গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিবেন ইহা সোভিয়েটকে স্বীকার করিতে হইবে।

*

আইরিশ সমস্যা

আয়ার্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডনের বৈঠকে ইংরেজ মন্ত্রীসভার সহিত তো একটা রফানিস্পত্তি করিয়া আসিলেন। কিন্তু সে-সকল চুক্তি-সর্ত্ত আইরিশ-পক্ষে ডেল আইরিয়েন ও ইংরেজ-পক্ষে বৃটিশ পার্লামেণ্ট মঞ্জুর না করা পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকারী হইতে পারে না। ইহারা আবার এই নিস্পত্তি গ্রাহ্য করিতে বাধ্যও নহে। ডেল আইরিয়েনে কিন্তু চুক্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্বন্ধে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। আইরিশ সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ডি ভ্যালেরার এই সন্ধি সর্ত্তে বিশেষ আপত্তি দেখা যাইতেছে।

কর্কের আত্মত্যাগী মেয়র মৃত মহাত্মা ম্যাক্‌সুইনির ভগিনী কুমারী ম্যাক্‌সুইনি এবং সুবিখ্যাত আইরিশ মহিলা নেত্রী কাউণ্টেস্ মারকেভিচ এই সর্ত্তগুলি আয়ার্‌ল্যাণ্ডের অপমানকর বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, আইরিশগণ এই সন্ধি গ্রহণ করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না এবং আইরিশগণ ভবিষ্যতে যাহাতে ইহাকে অস্বীকার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করে তাহার চেষ্টায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিবেন।

১৯শে ডিসেম্বর তারিখে ডেল আইরিয়েন সন্ধি-প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য আহূত হয়। গ্রিফিথ প্রস্তাব করেন যে আলোচ্য সন্ধি প্রস্তাব গৃহীত হউক। তিনি বলেন, "এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আয়ার্‌ল্যাণ্ডের মর্য্যাদার হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। আনুগত্য স্বীকারের অঙ্গীকারটি যে-কোনও আইরিশ আত্ম-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রহণ করিতে পারে। আর এই প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে সমস্ত জগতের সহানুভূতি হারাইতে হইবে; এবং আয়ার্‌ল্যাণ্ডে রক্তের প্রবাহ বহিবে। কোনও বিবেকবান্ ব্যক্তি আইরিশ রক্ত বৃথা বহিতে দিতে পারেন না।"

ডি ভ্যালেরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেন, "আইরিশ জাতির ন্যায়-সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা এই সন্ধিসর্ত্তে পূরে নাই এবং তজ্জন্য এই রফা-নিস্পত্তি দ্বারা ইংরেজ আইরিশদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা কখনও সম্ভবপর হইবে না। এই রফানিস্পত্তি জোর করিয়া লওয়া হইয়াছে। আইরিশগণ কখনও এই সন্ধি গ্রহণ করিবেন না।"

ডি ভ্যালেরা রফানিস্পত্তির জন্য যে সন্ধির খসড়া করিয়াছিলেন তাহাও ৪ঠা জানুয়ারিতে ডেল আইরিয়েন মহাসভায় পেশ হইয়াছে। আনুগত্য স্বীকারের পরিবর্ত্তে ডি ভ্যালেরা ইংলণ্ডেশ্বরকে বৃটিশ রাজ্য-সমূহের সংঘের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে এবং এই সংঘের সহিত সকল বিষয়ে একযোগে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। লণ্ডন

সর্ত্তের অনুরূপ নৌবহরের সুবিধা করিয়া দিতেও তিনি রাজি আছেন। ইংলণ্ডের অনুমতি না লইয়া ডুবোজাহাজ (Submarines) প্রস্তুত করিবার অধিকার থাকিবে না এরূপ একটি সর্ত্তও এই নূতন খসড়াতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নূতন খসড়ায় ইংরেজ শাসনকর্ত্তা (Governor General) থাকিবার সর্ত্তটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং কর্ম্মচারী-নিয়োগ মাত্রেই আইরিশ জাতির সভার অনুমতি-সাপেক্ষ করা হইয়াছে। ডি ভ্যালেরা আইরিশ জাতির নিকট একটি নিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আইরিশ জাতিকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের সমূহ বিপদ; মহামারী অপেক্ষা ভীষণ শত্রু আপনাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সমস্ত আইরিশ জাতি এক মহাবিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। আপনাদের স্বস্তি ও শান্তির অভিরুচিকে জাগাইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা চলিতেছে। আপনারা যদি হাল ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। আপনারা যাহা-কিছু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা সমস্তই নষ্ট হইবে। যাহারা শান্তি শান্তি করিয়া চীৎকার করিতেছে তাহারা আপনাদিগকে শান্তি না দিয়া কৃতঘ্নের ন্যায় আপনাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।" এরূপ নানা কথা বলিয়া শেষে বলিতেছেন, "যাহারা বলেন যে শুধু চুলচেরা তর্ক এবং ফাঁকা লম্বাচওড়া কথার আড়ালে শান্তির সম্ভাবনা আমরা নষ্ট করিতেছি, আমাদের সহিত এই সন্ধি-সর্ত্তের শুধু কথার মারপ্যাঁচ লইয়া লড়াই, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে ইংরেজ রাজা, মন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার প্রভুত্বকে আয়ারল্যাণ্ড হইতে বিদূরিত করা এবং ইংরেজ সাম্রাজ্য-শাসন-বিভাগের কর্ত্তাদিগের হুকুমে পরিচালিত ইংরেজ শাসককে—যিনি ডাউনিং ষ্ট্রীটের টেলিফোনে কান দিয়া বসিয়া আছেন বলিলেই চলে—চিরকালের জন্য বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা কি শুধুই কথার ফের? ইংরেজ অধিকার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করুন। আইরিশ নরনারীর রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হউক। এই-সব জন্মগত অধিকার চাওয়াটাকে কেহ কেহ বৃথা মায়া-মরীচিকা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এবং সেই নিশ্বাসেই তাঁহারা বলিতেছেন যে আপনাদের পূর্ণ অধিকার চাহিলে লয়েড জর্জ্জ আপনাদের বিরুদ্ধে এইক্ষণেই এক ভীষণ যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। এই ভয়ে আপনারা কখনই সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত হইবেন না। যদি আপনারা এত সহজেই ভয়ে কাঁপেন তবে আপনাদের এই ভীতি দেখিয়া সুবিধা পাইয়া পরে আপনা-দিগকে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিতে যে ভয়-প্রদর্শন করা হইবে না তাহার প্রমাণ কি?"

যাহা হউক অনেক তর্কাতর্কির পর দেখা যাইতেছে যে ডেল্ আইরিয়েন লণ্ডনের রফানিষ্পত্তিকেই গ্রহণ করিলেন। মাইকেল কলিন্স বলেন যে যদি কাহারও এই রফানিষ্পত্তিতে আপত্তি দেখা যায় তবে তিনি রাষ্ট্রসঙ্গত প্রণালীতে আপনার মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে এখন এই নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে ডেলকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি এখন দেশে আন্দোলন করিতে থাকুন এবং নূতন নির্ব্বাচনে যাহাতে তাঁহাদের দল প্রবল হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। তখন আয়ারল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে। ডি ভ্যালেরা বলিয়াছিলেন যে এখন যদি তাঁহারা হারিয়া যান তবে সে প্রণালী তাঁহারা অবলম্বন করিবেন। পরে সংবাদ আসিয়াছে ডি ভ্যালেরা পদত্যাগ করিয়াছেন। আবার নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহার আসরে নামা সম্বন্ধে আপত্তি হইয়াছে। ৯ই জানুয়ারী খবর আসিয়াছে যে ডেল রফা-নিষ্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৬৪ জন এবং বিপক্ষে ৫৭ জন মত দিয়াছিলেন। ডেলের মহিলা-সভ্যেরা সকলেই বিপক্ষে ছিলেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে আয়ারল্যাণ্ড এই সন্ধি-সর্ত্ত বর্ত্তমানে গ্রহণ করিয়া একরূপ শান্তি স্থাপন করিলেও এই শান্তি বেশী দিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা

গৌরীসেনের টাকা—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক তুমি"

মার্কিন যুক্তরাজ্যের কলোরাডো ষ্টেট, আয়—৯ কোটি টাকা। গবর্ণরের মাসিক মাহিনা—১৫০০৲ টাকা।

ম্যাসাচুসেট্স্ ষ্টেট, আয়—৩৬ কোটি টাকা। গবর্ণরের মাসিক মাহিনা—৩০০০৲ টাকা।

আর

বাঙ্গলাদেশের আয়—৯ কোটি টাকা, কিন্তু গবর্ণরের মাসিক মাহিনা—১০৬৬৬৲ টাকা।—হিন্দুস্থান।

স্বাস্থ্য-কথা—

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডিসেম্বরের ৩রা থেকে ১০ই তারিখের মধ্যে বাংলাদেশের নানা জেলায় কলেরা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।

	পূর্ব্বহার	বর্ত্তমান হার
বর্দ্ধমান	০	৩
মেদিনীপুর	৩	২২
হাওড়া	১৯	২২
মৈমনসিংহ	২০৯	২৫৪
ফরিদপুর	৪০	৬৭
বাখরগঞ্জ	১	২০
নোয়াখালি	৬৫	৭৪

—বিজলী।

বাংলার কৃষি—

কৃষি-কথা।—এ বৎসর বাঙ্গালাতে ২২০,৬০০ একর জমিতে আকের চাষ হইয়াছে। বিগত বৎসর চাষ হইয়াছিল ২১০,৫০০ একর জমিতে। বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গদেশে ৬৩,৩৭৭ একর জমিতে তুলার চাষ দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর ৬৮,৪৪৮ একর জমিতে দেওয়া হইয়াছিল। এ বৎসর বঙ্গদেশে ভাদই ধান ৬,৩৯৩,৫০০ একর জমিতে বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর চাষ হইয়াছিল ৫,৯২২,০০০ একর জমিতে। পাটের চাষ কমিয়া যাওয়ায় এবং খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় লোকে পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা এবার অধিক জমিতে ধান চাষ করিয়াছে। সাধারণতঃ যে পরিমাণ ধান্য জন্মে এবার উহার শতকরা ৮১ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এ বৎসর বঙ্গদেশে ১৫,১৮৭,০০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের ফসল দেওয়া হইয়াছিল। গত বৎসর ১৫,৩১৯,৫০০ একর জমিতে এই ধান্য বপন করা হইয়াছিল। বৃষ্টির অভাবে পশ্চিমবঙ্গে কয়টি জেলায় শস্য বপনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ যে পরিমাণ শস্য জন্মে এবার উহার শতকরা ৮০ ভাগ জন্মিবে বলিয়া অনুমিত হয়।—সম্মিলনী।

বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়—

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক।—জার্মানীতে এক্ষণে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তক এমন লোকপ্রিয় হইয়াছে যে পুস্তক-বিক্রেতা মিঃ এ্যালফ্রেড, এ, নক রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী ৩০ লক্ষ ছাপিবার জন্ম ২ লক্ষ পাউণ্ড কাগজের অর্ডার দিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের এই গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালী নিশ্চয় গৌরব অনুভব করিবেন।—বঙ্গরত্ন।

বস্ত্র-সমস্যা-সমাধান—

কলের নূতন তাঁত।—কাটোয়ার এক ব্যক্তি এমন এক নূতন তাঁত তৈয়ার করিয়াছেন যে একজন লোক কেবল দড়ি টানিলেই যুগপৎ মাকু চলা, কাপড় বুনা ও কাপড় গুটান প্রভৃতি তাঁতের সব কার্য্যই সম্পন্ন হয়। এই তাঁতে একদিনে একজন ৭ জোড়া পর্য্যন্ত কাপড় বুনিতে পারেন। ইহা তৈয়ার করিতে প্রায় ৩ শত টাকা খরচ পড়িয়াছে।—সম্মিলনী।

বিরাট কারখানা—কলিকাতা হাতিবাগানে তাঁত ও চর্‌কার একটি বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় ২৫০ চর্‌কা ও ১৫০ তাঁত শীঘ্রই বসান হইবে।

চট্টগ্রাম জেলার চকোরিয়া থানার অধীন কাঁকড়া গ্রামে "কাঁকড়া স্পিনিং ও উইভিং ফ্যাক্টরী" নাম দিয়া একটি কারবার খোলা হইয়াছে। এই কারবারের মালিকগণ গ্রামের মেয়েদের দ্বারা চর্‌কার সূতা কাটাইয়া থাকেন। মাসে ২০ মণের অধিক সূতা এখানে তৈরী হয়, সূতাও নাকি সুন্দর চিকণ, ৪০ নং মিলের সূতার ন্যায়।—হিন্দুরঞ্জিকা।

বয়ন-কার্য্যালয়।—জয়নগর মজিলপুরে একটি বয়ন-কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বয়ন-কার্য্যালয়ের কর্তৃপক্ষ চরকার সূতার কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু চর্‌কা-কাটা সূতা উপযুক্ত ও যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়ায় বয়ন-কার্য্যের অসুবিধা হইতেছে। যাঁহারা চর্‌কার সূতা কাটেন কিন্তু ক্রেতার অভাবে সূতা বিক্রয় করিবার অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের অবগতির জন্ম জানান যাইতেছে যে উক্ত কার্য্যালয়ে প্রতি রবিবার চর্‌কা-কাটা সূতা উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করা হয়। যাঁহারা সূতা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ দিন কার্য্যালয়ে গিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিভূষণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।—২৪-পরগণা বার্ত্তাবহ।

খুলনা জেলার তালা থানার অন্তর্গত মৃজাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ Weaver's Winding Machine নামক একটি সূতা-নাটান কল আবিষ্কার করিয়াছেন, এই কলে অনায়াসে দৈনিক ৮ যোড়া সূতা নাটান যায়। হ্যাণ্ডেল ঘুরাইলে আপনা হইতে সূতা গুটাইয়া যায়। কলের জন্ম অর্ডার দিলে তিনি উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। মূল্য ১০৲ টাকা। কলের সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিতে হইলে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, গ্রাম মৃজাপুর, পোঃ অঃ কুমিরা, জেলা খুলনা, ঠিকানায় জানা আবশ্যক।—খুলনাবাসী।

স্বাধীনতার যুদ্ধে নারী—

সরযূবালা দেবী গ্রেপ্তার।—গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীমতী সরযূবালা দেবী ও অন্যান্য কয়েকজন মহিলা ভলান্টিয়ার পিরোজপুর গভর্ণমেন্ট স্কুলে পিকেটিং করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই স্কুলের শিক্ষকদিগকে কার্য্যত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। সে স্থানে পিরোজপুরের সব্‌ডিভিশনাল অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। মহিলারা তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে কার্য্যত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সব্‌ডিভিসনাল অফিসারের আদেশক্রমে শ্রীমতী সরযূবালা দেবী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সেখানে যে-সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, কেহই এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই।—প্রকাশক।

মহিলার আত্মোৎসর্গ।—সারোয়াতলীর প্রসিদ্ধ মহাজন-বংশের অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রাণকুমারী বিশ্বাস গত বৃহস্পতিবার নিজের মধ্যম ছেলে শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথকে দেশের সেবায় জেলে যাইতে পাঠাইয়া গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাসেবক-সংক্রান্ত ঘোষণা জানিয়াও নিজে স্বেচ্ছাসেবিকা-দলে নাম দিয়াছেন। —জ্যোতিঃ।

মোস্লেম মহিলার স্বদেশী-প্রচার।—মাদারিপুরের মৌলবী আব্‌দুল আজিজের পত্নী মোসাম্মৎ জবেদা খাতুন স্বদেশী-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে মাদারীপুরের ৩৫ জন চৌকিদার তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে। যতদিন স্বরাজ লাভ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।—সম্মিলনী।

তীর্থযাত্রী নেতা—

গ্রেপ্তার সংবাদ।—গত হরতালের দিন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায়, স্বামী বিশ্বানন্দ ও সর্দ্দার লছমন সিং গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুত শশাঙ্কজীবন রায় এইক্ষণ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেছেন।—খুলনাবাসী।

সভ্যতার যুগে বর্ব্বরতা—

খিদিরপুর জেল।—খিদিরপুর ডক জেল স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য সার আব্দার রহিমের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা বড়ই হৃদয়-বিদারক। তাঁহার পত্রের স্থূলমর্ম্ম এইরূপ—"সেখানে হাসপাতালের বন্দোবস্ত মোটেই ভাল নয়। বায়ু চলাচলের উপযুক্ত পথশূন্য ঘরের মেজের উপর রোগীদিগকে ফেলিয়া রাখা হইতেছে। গত তিন-চারিদিন যাবৎ বন্দীগণ একপ্রকার অনাহারেই আছে। পানীয় জলেরও নিতান্ত অসদ্ভাব এবং যাহা দেওয়া হয় তাহাও অপরিস্কৃত। প্রায় চারিহাজার কয়েদীকে একটি বসবাসের অনুপযুক্ত গুদামে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই গুদামের মেজে হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। পায়খানার বন্দোবস্ত মোটেই ভাল নয়। রাত্রে কাহারও পায়খানায় যাইবার দর্‌কার হইলে তাহার উপায় নাই। বন্দীগণকে এই দারুণ শীতের দিনে মাত্র একখানি করিয়া কম্বল দেওয়া হইয়াছে।"—খুলনাবাসী।

সিভিল গার্ড ও পুলিস—

সিভিলগার্ডের শান্তি-রক্ষা।—সিভিলগার্ডদের কীর্ত্তিকাহিনী চারদিক থেকেই শোনা যাচ্ছে। যাঁরা অসহযোগী, নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করাই তাঁদের ব্রত ; সুতরাং এসব বিষয় গবর্ণমেণ্টের নজরে এনে কোন প্রতিকারের প্রার্থনা তাঁরা করেন না ; তবে দেশের লোকের ব্যাপারগুলো জেনে রাখা ভাল।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় "সার্ভেণ্ট" কাগজে লিখেছেন—"গত শুক্রবারে তিনজন স্বেচ্ছাসেবক নতুন বাজারে হর্‌তাল প্রচার কর্‌ছিলেন, এমন সময়ে একজন ফিরিঙ্গি সিভিল-গার্ড আর একজন গোরা সার্জেণ্ট সেখানে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠি আর রুল দিয়ে মারতে আরম্ভ কর্‌লেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক পড়ে গেল। তার অঙ্গ থেকে রক্তের ধারা ছুটে তার সমস্ত কাপড় ভিজে গেল আর মাটিতে রক্ত জমে গেল। আর দুজন স্বেচ্ছাসেবকের গা থেকেও

রক্ত পড়ছিল কিন্তু তারা পড়ে যায় নি। শেষে পুলিস এসে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেল।—বিজলী।

হরতালের দিন তিনজন লোককে অজ্ঞান অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। প্রথম জনের মাথায় ৩½ ইঞ্চি লম্বা একটা ক্ষত দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় লোকটিকে একজন সিভিল-গার্ড ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল আর তৃতীয় লোকটি ভিক্ষুক। একজন গোরার হাতে মার খেয়ে সে শ্রীমানি বাজারের কাছে পড়ে ছিল।

শান্তিরক্ষার এসব নমুনা!

গত রবিবার ইটালিতে দাঙ্গা হয়। পুলিস আস্‌বার পর একজন লোক মারা পড়ে আর ২৩ জন আহত হয়। বলা বাহুল্য হতাহত কেউ পুলিসের লোক নয়।

মেছুয়াবাজারের অত্যাচার সম্বন্ধে একজন ভদ্রলোক "সার্ভেন্ট" কাগজের রিপোর্টারের কাছে এই কথাগুলি বলেছেন—"২৫এ ডিসেম্বর রাত্র ২টা ২০ মিনিটের সময় বাড়ীতে ঘুমুচ্ছিলাম, এমন সময় ৩জন সার্জেণ্ট আর একজন পাহারাওয়ালা রিভলভার আর লাঠি নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো, আর আমাকে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে টেনে নিয়ে গিয়ে লাঠি দিয়ে মার্‌তে লাগ্‌লো। আমার ভাইকেও তারা ঐ রকম মার্‌তে লাগ্‌লো। আমার মাথায় হাতে, কোমরে খুব চোট লেগেছে; আর ভাইয়ের মাথায়ও জখম হয়েছে। তার অবস্থা বড় খারাপ।"

—বিজলী।

দেশসেবকের শক্তি-বাণী—

দেশবন্ধুর বাণী।—দেশের নরনারীর প্রতি এই আমার শেষ আহ্বান। বিজয়লক্ষ্মী বিজয়মাল্য নিয়ে দ্বারে সমাগতা। আমরা এই বিজয়মালা পর্‌তে পার্‌ব তখন, যখন আমরা দেখাতে পার্‌ব অদম্য সাহস, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। মনে রাখ্‌বেন যতদিন নিরুপদ্রব অসহযোগ মন্ত্র দিকে দিকে ধ্বনিত হতে থাকবে ততদিন বিজয়লক্ষ্মী আমাদেরই। আর যেই নিরুপদ্রব মন্ত্রের স্থান এসে অধিকার করবে উপদ্রব, উচ্ছৃঙ্খলতা, তখনই দেশে মহাঅনর্থের সৃষ্টি হবে; তখনই বুরোক্রেশীর হাতে পড়ে দেশজননীর দীপ্ত মুখচন্দ্রমা মসীলিপ্ত হয়ে পড়্‌বে। দেশের একমাত্র আশা-জেটি স্বরাজ-লাভও সেই সঙ্গে সঙ্গে মিড়্‌বে। স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য, স্বরাজই আমাদের জীবন। খণ্ড স্বরাজ আমরা চাই না, পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্যই আমাদের এই জীবন-মরণ-সংগ্রাম। হয় স্বরাজ লাভ কর্‌ব, না-হয় স্বরাজের জন্য যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে তিল তিল করে জীবন দান কর্‌ব।

মডারেট ভ্রাতারা যে পথ অবলম্বন করেছেন, সে পথ অনুসরণ করে' পৃথিবীর কোনও জাতি কি কখনও স্বাধীনতা পেয়েছে? যদি সত্য সত্যই আপনারা দেশ-মায়ের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌তে চান, যদি মায়ের শৃঙ্খল-মোচন আপনাদের উদ্দেশ্য হয়—তাহলে ভারতের পক্ষ হয়ে আপনারা লড়্‌বেন, তা না হলে সময় থাক্‌তে বুরোক্রেশীর শরণাপন্ন হোন্!

তার পর তোমরা—যারা ভারতের ভবিষ্যৎ, যারা মায়ের আশা ও গৌরব, যাদের কীর্ত্তিকলাপ দিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস চিত্রিত হবে, তারা কেন আজও মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থের আঁচল ধরে' জীবনকে পঙ্গু করে' ফেল্‌ছ? মায়ের এই আহ্বানে সাড়া যে তোমাদেরই দিতে হবে। যে শিক্ষার মোহে পড়ে তোমরা মায়ের আহ্বান শুন্‌তে পাচ্ছ না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। তাই বলছি এগিয়ে এস জীবন ও সাধনা নিয়ে। মায়ের কাজে জীবন দিয়ে জন্ম সার্থক ও পূর্ণ করে তোল!

অন্তঃপুর হতে বিদায় নেবার সময় তিনি বলেছেন, যে, যদি আমাদের এই যুদ্ধ হিংসাযুক্ত হয়, তাহলে আমরা নিশ্চয় বিজয়ী হব, না হলে জয়ের আশা সুদূর-পরাহত। আমাদের কোন নেতার দরকার নেই, ভগবানই আমাদের একমাত্র নেতা। ভগবানের উপর নির্ভর করে কার্য্য কর্‌তে পার্‌লে সিদ্ধি আপনা হতেই আস্‌বে।—নবসঙ্ঘ।

জিতেন্দ্রলালের উক্তি।—"প্রাণের পূর্ণ আবেগ ভরে দেশের জন্য স্বাধীনতা চাওয়া যদি পাপ হয়, তা হলে সে পাপ আমি করেছি। সে পাপের জন্য আমি অনুতপ্ত নই, ক্ষমাও চাই না, অধিকন্তু সে পাপ করেছি বলে আমি উৎফুল্ল। যে দাসত্বের ভরে আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হচ্ছে আমার দেশবাসীকে বিদেশীর সে দাসত্ব-শৃঙ্খল ফেলে দেবার জন্য অনুরোধ করা যদি অপরাধ হয়, তা হলে আমার মত অপরাধী আর কেউ নেই; আর ভগবান আমাকে সে অপরাধ কর্‌বার সাহস ও সামর্থ্য দিয়েছেন বলে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এযাবৎ দয়াময় ভগবান যেমন আমাকে সত্যকথা বল্‌বার সাহস ও শক্তি দিয়েছেন, আশা করি ভবিষ্যতেও তিনি আমাকে এই অন্যায় অত্যাচার সহ্য কর্‌বার সহিষ্ণুতা দেবেন।"—বিজলী।

বাঙালীর শক্তি ও সাধনা—

বাঙ্গালী।—সকলে বলেছিল বাঙ্গালী একেবারেই পেছিয়ে গেছে! আমরা তাতে কখনও বিশ্বাস করিনি। আমরা জানি, বাঙ্গালীর যে শক্তি ও ভক্তি আছে, তা এখনও অন্যান্য প্রদেশকে পেতে ঢের দেরী লাগবে। বাঙ্গালী যে ত্যাগে কারও চাইতে কম হবে না তা ঠিক। অবশ্য বাঙ্গালী প্রথম প্রথম তত গা করে নি। এখনও পুরাতন শক্তি কেহই কার্য্য-ক্ষেত্রে নামেন নি। সম্পূর্ণ এক নূতন শক্তি, নূতন মানুষ, মার আহ্বানে আজ সাড়া দিয়েছেন! সুরেন্দ্রনাথ আজ আত্মবিভ্রান্ত, বিপিনচন্দ্র বুদ্ধিবিপর্য্যস্ত! তা'ছাড়া, বারীন্দ্র, পুলিনচন্দ্র, অতুলচন্দ্র, অমরেন্দ্র আদি কেহই এই রাজনীতি-যুদ্ধে আজ নামেন নি। তবুও সমভাবে দেশে শক্তির খেলা নির্ভীক ভাবেই চলেছে! কবি গেয়েছিলেন—

"অথবা কি দুঃখে হায় মা জননী, নহ তুমি আর বীরপ্রসবিনী?"—তাঁর আশা বুঝি আজ মিটেছে! শক্তি ও ভক্তি ইহা যে বাঙ্গালীর সিদ্ধ সম্পত্তি!

মহাত্মা মনে করেছিলেন তাঁর দেশেই প্রথমে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স হবে; কিন্তু বাঙ্গালী যেন গুজরাটের হাত থেকে এই ভাগ্যটা কেড়ে নিলে। ভগবানের মনে কি আছে কে তা জান্‌তে পারে?—নবসঙ্ঘ।

আন্দোলন।—যে জাতি ক্রমাগত ১৭ বৎসর সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে একটা আন্দোলন চালিয়ে আস্‌তে পারে, তার পেছনে কি শক্তি খেলা কর্‌ছে তা বেশ বোঝা যায়। নেতাদের ধর্‌লে এ আন্দোলন থাম্‌বে না। দাস গেলে বাসন্তী দেবী দেশকে পরিচালিত কর্‌বেন। তিনি গেলে, আর-এক দেবী এসে তাঁর স্থান অধিকার কর্‌বেন, তার পর বাঙ্গালার কোন্ অজ্ঞাত পল্লী থেকে কোন্ মানুষ এসে জাতীয় জীবন-তরণীর কর্ণ ধারণ কর্‌বে কে জানে? প্রাণ যেখানে জেগেছে, জাতীয় আত্মার যথায় জাগরণ হয়েছে, মানুষ যেখানে চল্‌তে চেয়েছে, সেখানে নেতার কখন অভাব হবে না। যার উপর দেশের আত্মা চাপ্‌বে সেই পাগল হয়ে ছুটবে ও সকলকে ছোটাবে। গান্ধীকে ঐ দেশ-আত্মাই অধিকার করেছে, চিত্তরঞ্জনকেও গ্রাস করেছে, চিত্তরঞ্জনেরও তাই ঐ আত্মার স্পর্শ পেয়ে জীবন ধন্য হল।—ঐ অমানুষিক শক্তির হস্তেই যে মানুষ সত্যই এক-একটি ক্রীড়াপুত্তলি!—নবসঙ্ঘ।

শুশ্রূষা-শিক্ষালয়—

বহুদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে আমাদের দেশে

চিকিৎসকের ও চিকিৎসার অভাব অপেক্ষা শুশ্রূষা বা রোগী-পরিচর্য্যার অভাবেই অকাল-মৃত্যু ও শোচনীয় মৃত্যুর হার বেশী ও রোগীর যন্ত্রণাও হয় বেশী। প্রধান কারণ এই যে যাঁহারা রোগীর সেবা করেন, তাঁহারা অধিকাংশই শুশ্রূষাতত্ত্বে নিতান্ত অজ্ঞ। এই শিক্ষালয় বা সমিতির চেষ্টা, যাহাতে গৃহে থাকিয়াই এক প্রকার বিনা আয়াসে বিনা ব্যয়েই আমাদের দেশের লোক, বিশেষভাবে কুলমহিলাগণ, শুশ্রূষা-শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষালয় বা সমিতির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য এক টাকা মাত্র প্রবেশিকার চাঁদা দিলে ছাত্র- বা ছাত্রী-সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারা যায়। সমিতির নির্ব্বাচিত পুস্তকাবলীই তাঁহাদের পাঠ্য হইবে। সমিতির পক্ষ হইতে যখন যাঁহাকে পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত বিবেচনা করা হইবে, তখন তাঁহার নিকট প্রশ্নপত্র পাঠান হইবে ও তিনি উত্তরপত্র দিবেন। ছাত্র বা ছাত্রী নিজে লেখাপড়া জানেন বা অন্যের দ্বারা পাঠ লইয়া পরীক্ষা দিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাইবেন।

যোগ্য ছাত্রছাত্রীগণকে পুস্তক, পদক প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন চাঁদা বা ফি দিতে হয় না। নাম, ধাম (ছাত্রীপক্ষে পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নামও দিতে হয়), কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সম্পাদক—(শুশ্রূষা সমিতি) বিশ্বাস-ভবন,
আসানসোল, ই-আই-আর।

—

ভারতবর্ষ

সামরিক বিদ্যালয়—

দেরাদুনে একটি সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আপাততঃ তাহার অনুষ্ঠান পত্র বাহির হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টির নাম হইবে "প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজ" এবং কলেজটির তত্ত্বাবধান করিবেন ভারতের জঙ্গীলাট। যে-সমস্ত ছাত্র স্যাণ্ডহার্ষ্ট রয়েল মিলিটারী কলেজে পড়িয়া সামরিক বিভাগের উচ্চপদ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা এই কলেজটিতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যেই জীবন-যাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং যাঁহাদের অভিভাবকদেরও তাহাতে আপত্তি নাই, এই বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র তাঁহাদেরই আছে। বিলাতি ধরণেই এখানে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবে। এবৎসর ছাত্র লওয়া হইবে মোটে ৪০ জন। প্রত্যেক ছাত্রকে খরচের বাবদ বৎসরে ১৫০০ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতে হইবে। আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে এই দক্ষিণার পরিমাণ আরো বাড়িতে পারিবে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহারও একটা সর্ত্ত রাখিয়া দিয়াছেন।

কলেজ তো খোলা হইবে কিন্তু অত টাকা দিয়া সেখানে সামরিক বিদ্যা শিখিবার শক্তি ক'জন ভারতবাসীর আছে? তাহা যদি না থাকে তবে এ কলেজের সার্থকতা কি?

বয়নশিল্প-প্রদর্শনী—

পাটনায় ভারত-বস্ত্র-বয়ন-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে লর্ড সিংহই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহী এবং উদ্যোগী। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ইহাতে যোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। প্রদর্শনীতে বস্ত্র-বয়ন-সম্পর্কীয় অনেকরকম জিনিষেরই আম্‌দানী হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সেরা আম্‌দানী হইতেছে শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রাওএর তাঁত। এই তাঁতখানি নাকি সম্পূর্ণ অভিনব ও উন্নত ধরণে তৈরী। কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ এস কে দে, অত্যুৎকৃষ্ট তাঁতের উদ্ভাবককে এগারো শত টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শিল্পপ্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ সেই টাকা শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রাওকে প্রদান করিয়াছেন। বয়ন-শিল্পই বর্ত্তমানে কুটীরশিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিল্প। ভারতে যত কাপড় লাগে তাহার প্রায় এক-চতুর্থভাগ তৈরী হয় তাঁতে। সুতরাং আশা করা যায় ইহার দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

লোকমান্যের প্রতিমূর্ত্তি—

আহমদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করার জন্য ৩৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার কলেক্টর ব্যাপারটি সর্ব্বসাধারণের ব্যাপার নহে বলিয়া ঐ টাকা মঞ্জুর করিতে রাজী হন নাই। ইহার পর সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির আর-একটি সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থির হইয়াছে, ১৯০১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার জন্য যখন গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইবার আবশ্যক হয় নাই তখন এক্ষেত্রেও আবশ্যক হইবে না। এটাকা মঞ্জুর করার ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটির আছে।

এইরূপে নিজের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লইয়া আহমদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি যে বিশেষভাবেই প্রশংসার্হ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশ যদি ভারতবাসীর দেশ হয় তবে তিলকের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা যে এদেশের সর্ব্বসাধারণের ব্যাপার তাহাও অতি অনায়াসেই বলা চলে। কারণ লোকমান্যকে শ্রদ্ধা করে না এরূপ লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। দেখা যাইতেছে লোকমান্য স্বর্গে গিয়াও আম্‌লাতন্ত্রের বিদ্বেষের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

রাউণ্ড্ টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স—

যুবরাজের বয়কট ব্যাপার লইয়াই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং অসহযোগ-পন্থীদের ভিতর প্রথম প্রকাশ্য বিরোধের সূত্রপাত হয়। সেই বিরোধের জের টানিতে টানিতে ব্যাপার এখন গড়াইয়াছে অনেকদূর। সভা করা, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, পিকেটিং চালানো আইন-বিগর্হিত বলিয়া গবর্মেণ্ট হুকুম জারি করিয়াছেন। অসহযোগ-দলের মুখপত্র অনেকগুলি সংবাদ-পত্রের প্রচারও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য অসহযোগীরা এরূপ আদেশ অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন এবং অন্যায় আদেশ যাহারই হোক্ তাহা মানিয়া চলা ভীরুতা মনে করিয়া আদেশগুলি অমান্য করিতে কসুর করিতেছেন না। ফলে অসহযোগ-আন্দোলনের নেতা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের জেল একেবারে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা এরূপ ভাবে চলিলে তাহার ফল যে দেশের পক্ষে শুভ হইবে না, এক তৃতীয় পক্ষ রাজনৈতিক দল তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই দলের মুখপাত্র ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। তিনি বড়লাট লর্ড রেডিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবিত কন্‌ফারেন্সেরই নাম দেওয়া হইয়াছে রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স।

কন্‌ফারেন্স বসিবার সম্ভাবনা মধ্যপন্থী নেতাদের মুখে যখন একরূপ

সুনিশ্চিত তখনই লর্ড রেডিং সহসা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিলেন। কারণ-স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন এরূপ একটি কন্‌ফারেন্স বসিবার পূর্ব্বে অসহযোগপন্থীদের সমস্ত কর্ম্ম-তৎপরতা বন্ধ করা কর্ত্তব্য। অসহযোগ-পন্থীদের মত যে লর্ড রেডিংএর মতের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা হয় তো বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা ভাবিয়াছিলাম কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব ঐখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ যে তাহা হয় নাই পণ্ডিত মদনমোহন প্রমুখ কয়েকজন মধ্যপন্থীর পত্রে সম্প্রতি তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা বোম্বাই হইতে নানা দলের নেতাদের কাছে একখানি চিঠি পাঠাইয়াছেন। এই চিঠিতে ১৪ই জানুয়ারী বোম্বাই সহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বৈঠক বসিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সার্ শঙ্করণ নায়ার উহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

কেন যে মধ্যপন্থী নেতারা মিটমাটের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহার কারণ বোঝা কঠিন নহে। এবারকার কংগ্রেস এবং মোস্‌লেম-লীগের অধিবেশনের পর তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না যে দেশ আর বেশীদিন নিরুপদ্রবের পথ ধরিয়া চলিতে পারিবে। কংগ্রেসের আইন-অমান্যের নীতিটা তাঁহারা বেশ ভয়ের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও একথা তাঁহারা মনে করেন না যে, কংগ্রেস মিটমাটের অপক্ষপাতী বা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ মিটমাটের পরিপন্থী। বরং তাঁহারা মনে করেন, এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন তাহাই মিটমাটের পথ নহে, তাঁহারা দেশের শিক্ষিত ও শক্তিমান জননায়কদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া দেশের অবস্থা ক্রমে ক্রমে গুরুতর করিয়া তুলিতেছেন।

এই বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের আলোচনার ফল কি হইবে তাহা বলা কঠিন। সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতারা একমত হইতে পারিবেন কি না এবং পারিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও দেশের এই সঙ্গীন সময়ে সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের মিলিত হইয়া পরামর্শ করিবার প্রয়োজন আছে। ইহার ফলে যদি তাঁহারা একমত হইতে পারেন তবে তাহা একটা পরম লাভ। খণ্ড ভারতবর্ষকে উপেক্ষা করা যতটা সহজ, মিলিত ভারতবর্ষকে সেরূপ ভাবে উপেক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে ততটা সহজ হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

লিবারেল ফেডারেশন—

'লিবারেল ফেডারেশন' কংগ্রেসের পাল্টা সভা—ভারতীয় মডারেট নেতাদের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের সহিত মডারেটরা সংশ্রব ত্যাগ করিবার পর গত চারিবৎসর হইতে ইহার অধিবেশন সুরু হইয়াছে। বড়দিনের বন্ধে এলাহাবাদে এবার এই ফেডারেশনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দ রাঘব আয়ার।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:—

(১) ফেডারেশন ভারতবর্ষে সংস্কার-আইনের বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

(২) অযথা গ্রেপ্তার এবং ফৌজদারী-আইন-সংস্কার বিধির দ্বারা সাধারণের সহানুভূতি নষ্ট হইয়া অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের প্রবর্তিত নীতি সম্বন্ধে আবার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

(৩) গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পূর্ণ অধিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন পেশ করা হইতেছে।

(৪) সেনা-বিভাগ, বৈদেশিক ব্যাপার, সামন্ত রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য যাবতীয় অধিকার সম্পূর্ণরূপে দেশীয়দের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(৫) মোপ্‌লা হাঙ্গামা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমর্থন করিলেও "চলন্ত অন্ধকূপ" হত্যা ব্যাপারে যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ফেডারেশন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

(৬) পঞ্জাবের হত্যা সম্পর্কে সামরিক আইন অনুসারে যাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের পুনর্ব্বিচার সন্তোষজনক হয় নাই। সামরিক আইনের আমলে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের শাস্তিও অত্যন্ত লঘু হইয়াছে।

(৭) প্রধান মন্ত্রী মুসলমানদের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং তুরস্কের সন্ধির সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(৮) দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীগণের নাগরিক স্বত্ব সম্বন্ধে 'সাম্রাজ্য সভায়' যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে সে অনুসারে কাজ হইতেছে না। সেই প্রস্তাব অনুসারে যাহাতে কাজ হয় সেজন্য ফেডারেশন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৯) পূর্ব্ব-সর্ত্তানুযায়ী রেল কোম্পানীগুলির কার্য্যকাল শেষ হইলে গবর্মেণ্ট সেগুলির ব্যবস্থাভার যাহাতে খাসে গ্রহণ করেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।

মহিলা কন্‌ফারেন্স—

গত ৩০শে ডিসেম্বর আহমদাবাদে মহিলাদের এক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন আলিভ্রাতাদের জননী। সভায় প্রায় ছয় হাজার মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—মুসলমানদের শাসন সময়ে হিন্দুমুসলমানে বেশ মিল ছিল কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বকালেই তাহা লোপ পাইয়াছে। এই দুই জাতির ভিতর পূর্ব্বের সেই সৌহার্দ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে, ভারতকে মুক্তি দিতে হইলে রমণীদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, তাঁহাদেরও কাজের আসরে নামিয়া পড়িতে হইবে।

ভারতের সমস্ত রমণীকেই স্বেচ্ছাসেবিকা হইতে অনুরোধ করিয়া স্বামী সত্যদেব সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

বিচারে দেশী ও বিদেশী—

বিচার ব্যাপারে ইউরোপীয়দের সহিত ভারতবাসীদের আইনগত সমস্ত পার্থক্য তুলিয়া দিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। সেই প্রস্তাব অনুসারে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল একটি কমিটি গঠন করিয়া এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্য-বিধিতে ভারতীয় এবং ভারত-প্রবাসী বিদেশী আসামীদের সম্বন্ধে কিরূপ বর্ণগত ব্যবস্থা-বৈষম্য আছে কমিটি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন ভারতগবর্ণমেণ্টের আইন-সচিব ডাঃ তেজবাহাদুর সাপ্রু; সদস্য হইয়াছেন—স্যার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট; শ্রীযুক্ত এস্, আর, দাস; জজ মিঃ শঃ; মিঃ পি, ই, পার্শিভ্যাল; রাও বাহাদুর টি, ভি, রঙ্গচারিয়ার; শ্রীযুক্ত এম্ সমর্থ; মিঃ ডব্লিউ, এল,

কেরী; মিঃ আবুল কাসিম; ডাক্তার শ্রীযুক্ত এইচ, এম গৌর; মিঃ সুলতান সৈয়দ আহমদ; রায় বাহাদুর এল, এম্, বন্দ্যোপাধ্যায়; মিঃ ই, ষ্টুয়ার্ট রস্কে; মিঃ ডব্লিউ, মুইর ম্যান্স্; মিঃ এফ, ম্যাককারটি; কর্ণেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট এইচ, এ, জে গিড্নি। বৈঠক বসিবার স্থান স্থির হইয়াছে দিল্লী। বৈঠকটি প্রকাশ্য হইলেও কমিটি প্রয়োজন বোধ করিলে কোনো কোনো দিনের বৈঠক গোপনেও করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষে বৈঠক বসে ছোট বড় মাঝারি সব ব্যাপারেই। কিন্তু দুঃখ এই, তাহাতে ভারতবাসীর কোনো অভাবই ঘোচে না—অন্ততঃ কোন্ অভাবটি যে ঘুচিযাছে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও আমরা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। লাভ হয় অর্থহানি ও মনস্তাপ।

পুলিশ কন্‌ফারেন্স—

হাওড়ায় সম্প্রতি ব্রিটিশ ভারতের পুলিশ ও কর্ম্মচারীদের কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল। রায় সাহেব পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বেশ নির্ভীক তেজস্বীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি সর্‌কারী কর্ম্মচারী হইয়াও স্পষ্ট ভাষায় সর্‌কারের পক্ষপাতিত্ব এবং অবিচারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"বিপদের সময় পুলিশ প্রাণ দিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করে। কিন্তু তাহার বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট যাহা দেন সে জিনিষটা একেবারেই ফাঁকা। খাঁ বাহাদুর শাম্‌সুল আলম, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এবং আরো শতশত পুলিশ-কর্ম্মচারী, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কাজে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি কথা বলিতে পারিতেন তবে নিশ্চয়ই এই কথা বলিতেন যে, গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রাণ দেওয়ায় কিছুমাত্র লাভ নাই—তাহা একান্তই ভুল, তাহা নিতান্তই বোকামী। বস্তুতঃ যাহারা জাতীয় উন্নতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহারা বাস্তবিকই হতভাগ্য—তাহাদের ভালো কিছুতেই হইতে পারে না। জগতের সমস্ত দেশেই পুলিশকে জন-সাধারণ প্রীতির চোখে দেখে। কিন্তু ভারতবর্ষে পুলিশের অবস্থা স্বতন্ত্র। তাহারা জন-সাধারণের ঘৃণার পাত্র।—ইহার কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নহে। অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশে প্রজারাই আইন তৈরীর কর্ত্তা। পুলিশ আইন অনুসারে কাজ করিয়া তাহাদেরই আদেশ প্রতিপালন করে মাত্র। সুতরাং সে-সব স্থানে পুলিশের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া অনেকটা সহজ। কিন্তু ভারতবর্ষে আইন তৈরীর মালিক হইতেছেন গবর্ণমেণ্ট। সাধারণের বিশ্বাস সে-সব আইন তৈরী হয় জনসাধারণকে পীড়ন করিবার জন্য, তাহাদের জাতীয় উন্নতির চেষ্টাকে সংযত করিবার জন্য। সুতরাং এদেশে পুলিশের অপ্রিয় হওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।"

কিন্তু কেবলমাত্র সভাপতির অভিভাষণের জন্যই নহে, আরো একটি কারণে হাওড়ার এই পুলিশ কন্‌ফারেন্স লোক-সমাজের দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করিয়াছে। সেটি হইতেছে, বাংলার ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল মিঃ হাইডের ব্যবহার। সভাপতির সভার কাজ শেষ না হইতেই মিঃ হাইড তাঁহাকে সভা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। এরূপ আদেশ যতই অদ্ভুত হোক্ না কেন, ইহার কারণ বোঝা অত্যন্ত সহজ। ইহার কারণ, রায়-সাহেবের স্বাধীন সমালোচনা মিঃ হাইড বর্দ্দাস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিঃ হাইডের অন্যায় আদেশও উর্দ্ধতন আদালতের রায়ে টেঁকে নাই। পুলিশ কন্‌ফারেন্সের লোকেরা সার্ হেন্‌রী হুইলারের দর্‌বারে হানা দিয়াছিলেন। ফলে মিঃ হাইডকে তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। রায়সাহেব তাঁহার সভার কাজ শেষ করিয়া তবে স্বস্থানে ফিরিয়াগিয়াছেন।

পুলিশ বিগ্‌ড়াইলে তাহার ফল বড় ভালো হইত না। সুতরাং সার্ হেন্‌রী এ চালটি যে খুব ভালো চালিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা গবর্ণমেণ্টের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের পক্ষে এই নূতন নহে। এরূপ ঘটনা প্রায় হামেসাই ঘটিতেছে। সম্প্রতি পোষ্টাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিও অত্যন্ত অন্যায় করা হইয়াছে। কন্‌ফারেন্সে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলার অপরাধে ডিরেক্টর জেনারেল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। সর্‌কারী কর্ম্মচারীরাও মানুষ। তাঁহাদেরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। সে স্বাধীনতাকে জবর্‌দস্তির চাপে পিষিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবার অধিকার কাহারো আছে বলিয়া মনে হয় না।

ছোট-খাট জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ—

পুলিশের গুলি এখন ভারতবর্ষের প্রতিদিনকার ঘটনা। ও জিনিষটা এ দেশবাসীর একরূপ গা-সওয়া হইয়া যাইতেছে। কতকটা সেইজন্য এবং কতকটা বা প্রতিকার করার উপায় নাই বলিয়া ইহা লইয়া আন্দোলন-আলোচনাও বিশেষ হয় না। নতুবা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো সভ্য দেশে এই ব্যাপারগুলি সংঘটিত হইলে তাহার জের গড়াইত অনেক দূর—তাহার ফলে পার্লামেণ্ট হইতে রাজার তক্ত পর্য্যন্ত যে নড়িয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ মাসে যতগুলি স্থানে পুলিশের গুলিতে রক্তের ছাপ পড়িয়াছে তাহার দুই-একটার নাম করিতেছি।

ফিরোজপুর স্থানটি গির্‌গাঁও জেলার অন্তর্গত। এখানকার হাঙ্গামায় সম্পর্কে সর্‌কারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আমন সভার কতিপয় সদস্যকে প্রহার করার জন্য পুলিশ কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে। একদল লোক পুলিসের হাত হইতে এই বন্দীদিগকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করার ফলেই দাঙ্গা বাধিয়াছিল। পুলিশের বিশেষ দোষ নাই। জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই তাহারা গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। ডেপুটি কমিশনার তদন্ত করিয়া জানাইয়াছেন এ হাঙ্গামায় দাঙ্গাকারীদের চারিজন মারা গিয়াছে এবং ২৩ জন আহত হইয়াছে। সর্‌কার পক্ষের আহতের সংখ্যা হইতেছে ১৭ জন।

এই তো গেল সর্‌কারী ইস্তাহারের মর্ম্ম; কিন্তু বেসর্‌কারী সংবাদের গুরুত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এ সম্বন্ধে লাহোরের "বন্দেমাতরম্" পত্র লিখিয়াছেন:—গির্‌গাঁও জেলার ফিরোজপুর সহরে ১০জন খেলাফতী স্বেচ্ছাসেবককে ধরা হয়। এই উপলক্ষে অনেক লোক তাহাদের চারিদিকে জমায়েৎ হইয়া তাহাদের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে। পুলিশ ভিড় ভাঙ্গিবার জন্য গুলি চালাইয়াছিল। গুলিতে ১৫ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ২০০ জন লোক আহত হইয়াছে।

নীলফামারীর সর্‌কারী ইস্তাহার বলিতেছে, নীলফামারীতে অশান্তির সূচনা হওয়ায় গত ২৮শে ডিসেম্বর জলপাইগুড়ী হইতে ৩২ জন সশস্ত্র গুর্খার আম্‌দানী করা হইয়াছিল। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা স্থির করেন, এই গুর্খা দলকে সহরের ভিতর দিয়া একবার ঘুরাইয়া আনা হোক্। সুতরাং তাহাদিগকে বাজারের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে একজন গুর্খার সহিত একটি হিন্দুস্থানীর বচসা বাধে। সেই বচসা ক্রমে দাঙ্গায় পরিণত হইয়াছিল। বাজারের লোকেরাই পুলিশের উপর ইঁট-পাটকেল ছুঁড়িয়াছিল। পুলিশের লোকেরা বিশেষ কিছু করে নাই, তাহারা কেবলমাত্র ভয় দেখাইবার জন্য শূন্যে গুলি ছোড়ে। এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সাধারণ লোকদের ভিতর ছয়জন গুলিতে সামান্য রূপ আঘাত পাইয়াছে। ইহা ছাড়া কুক্রীতে আহত হইয়াছে আরো দুইজন; তাহাদের আঘাতই কিছু সাংঘাতিক। এই

কুক্রীও ভয় দেখাইবার জন্ত শূন্যে ছোড়া হইয়াছিল কি না ইস্তাহারে তাহা লেখা নাই। পুলিশের পক্ষে আহত হইয়াছে ৮ জন।

এই তো গেল সরকারী ইস্তাহার। বাহিরের রিপোর্ট যে ইহার সঙ্গে মেলে না তাহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিতেছেন, ২৮শে ডিসেম্বর যখন হাট বসিয়াছিল তখন একজন পুলিশের সাবইন্‌স্পেক্টর এবং ৩২জন গুর্খা হাটে গিয়া হাজির হয়। হাটের ভিতর একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে একজন গুর্খার ধাক্কা লাগে। কেহ কেহ এই মারপিটের প্রতিবাদ করায় গুর্খারা কুক্রী খুলিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে ১০জন লোক আহত হয়। তাহার পর গুর্খারা দুইচারি পা পিছাইয়া গিয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। গুলিতে একজন অন্তঃসত্বা স্ত্রীলোক এবং আরো তিনজন লোক আহত হইয়াছে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় সরকারী ইস্তাহার ঠিক তথাপি প্রশ্ন আসে. যে-অশান্তির কথা সরকারী ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার জন্ত নীলকামারীতে গুর্খা পুলিশের আমদানী করা হইয়াছিল তাহার স্বরূপ কি? যাহারা অশান্তি ঘটাইতেছিল সেই স্বেচ্ছাসেবকের দল কোনোরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে কি না? হাটের ভিতর যেখানে তিনচারি হাজার লোক জমিয়াছে সেখানে সশস্ত্র গুর্খা লইয়া কুচকাওয়াজ করা কেমনতর অশান্তি দমনের উপায়? শূন্তে যদি গুলি ছোড়া হইয়া থাকে তবে এতগুলি লোক আহত হইল কিরূপে?

কংগ্রেস—

১৯২১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছিল আহমদাবাদে। এবার কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। কারণ কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বেই তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এবারকার কংগ্রেসের অনেকগুলি বিশেষত্ব ছিল যাহা অন্যান্যবার চোখে পড়ে নাই। অত বড় সভামণ্ডপটি আগাগোড়া খদ্দর এবং অন্যান্য স্বদেশজাত দ্রব্যের দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল—কোথাও এতটুকু বিদেশী দ্রব্যের চিহ্নমাত্র ছিল না। মণ্ডপে বসিবার জন্ত কোনো চেয়ার বা বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয় নাই—ঢালা ফরাসে প্রায় বিশ হাজার নরনারী খাঁটি প্রাচ্য ধরণে গালিচার উপর সমবেত হইয়াছিলেন। বক্তৃতায় বাজে কথার বহরও ছিল অত্যন্ত কম। যে-কেহ যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র কাজের কথা।

সভাপতি চিত্তরঞ্জনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিয়াছেন হাকিম আজ্‌মল খাঁ।

এবারকার কংগ্রেসে বিশেষভাবে আলোচনা চলিয়াছিল—স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এবং ব্যাপক ও ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্য-বিধি—এই দুইটি প্রস্তাব লইয়া। প্রস্তাব দুইটি উত্থাপন করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী, জয়ও হইয়াছে তাঁহারই। সভায় প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক-দল সংগঠন সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে, নরনারী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবেন।

এতদ্ভিন্ন সভায় আরো ছয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি হইতেছে :—

(১) অসহযোগ আন্দোলনে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই অথচ যাঁহারা খেলাফত ও পাঞ্জাবের অনাচার ও অবিচারের প্রতিকার চাহেন, এবং স্বরাজ লাভ যাঁহাদের বাঞ্ছনীয় এমন সব লোককে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর মিত্রতা স্থাপন, স্বদেশী প্রচার, মদ্যপান বর্জ্জন, অস্পৃশ্যতা দোষ নিবারণ প্রভৃতি হিতকর অনুষ্ঠানের জন্ত আহ্বান করা হইতেছে।

(২) মালাবার হাঙ্গামা দমন করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত ও নিন্দনীয়। মোপ্‌লারাও হিন্দুদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়া প্রভৃত অন্যায় করিয়াছে।

(৩) কামাল পাশা ও তুর্কীগণের সাফল্যে কংগ্রেস আনন্দিত হইয়াছেন।

(৪) বোম্বাইয়ের দাঙ্গার জন্ত কংগ্রেস আন্তরিক দুঃখিত। সকল সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের নিজেদের অধিকারের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া যাহাতে কাজ করিতে পারে তাহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

(৫) পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ২১ বৎসরের কমে কেহ কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিবেন না। নূতন নিয়মে ১৮ বৎসরের লোকও কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিবেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণের মধ্যে যদি কেহ কংগ্রেসের 'এক্স-অফিসিও মেম্বার' থাকিতে চান তাঁহাকেও কংগ্রেসের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

(৬) বাবা গুরুদৎ সিং প্রমুখ শিখ-জাতির যে-সব লোক ধর্ম্মের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, ধরা দিয়াছেন এবং অসহযোগ নীতি অনুসরণ করিয়া কারাগৃহ বরণ করিয়া লইয়াছেন কংগ্রেস তাঁহাদের সৎসাহস এবং কার্য্যপদ্ধতির অনুমোদন করেন।

মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী বৈদেশিক প্রাধান্য বর্জ্জিত স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব কংগ্রেসে পেশ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি কংগ্রেসের নীতির বিরোধী বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

দুইদিন আগেই হোক আর পরেই হোক কংগ্রেসের অধিকাংশ কর্ম্মীর বন্দী হইবার সম্ভাবনা আছে আশঙ্কা করিয়া কংগ্রেস, নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস-কমিটির সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধী আবশ্যক মনে করিলে আবার অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবেন। এই স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হাতেও প্রয়োজনমত উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের ক্ষমতা থাকিবে।

কংগ্রেসের যাবতীয় ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হইলেও দুইটি বিষয়ের অধিকার তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।—

(১) যদি কখনো গবর্ণমেন্টের সহিত কোনোরূপ মিটমাটের কথা হয় তবে মহাত্মা গান্ধী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে কিছু করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মতামত লইতে হইবে।

(২) ভবিষ্যতে কংগ্রেসের মূল-নীতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে তাহা করিবার ক্ষমতাও ইঁহাদের হাতে থাকিবে না। সে ক্ষমতা কংগ্রেস কমিটি স্বাধিকারে রাখিয়াছেন।

কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি যাঁহারা এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় তো কংগ্রেসের এ জিনিষটাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে কংগ্রেসের একটি সম্প্রদায় অসহযোগপন্থার পক্ষপাতী হইলেও নিরুপদ্রব অসহযোগপন্থার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। ব্রিটিশ অধিকারের আওতায় থাকিয়াই ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করা সঙ্গত কি না কংগ্রেসে এবার তাহা লইয়া বিশেষভাবেই তর্ক-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং যে দল ব্রিটিশ সম্পর্ক পরিবর্জ্জনের পক্ষপাতী তাঁহারা পরাজিত হইলেও তাঁহাদের শক্তি ও সংখ্যা যে নিতান্ত কম নহে তাহাও এই তর্ক-যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

বিদ্যার্থী মহাসভা—

এবার ভারতীয় ছাত্র কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন—"অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা গত যুদ্ধে 'ট্রেঞ্চ' কাটিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। আজ ভারতের ছাত্রদের সম্মুখেও মহাযুদ্ধ উপস্থিত। তাহাদিগকেও সাহসের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে। তবে প্রাচ্য প্রতীচ্যের যুদ্ধের তফাৎ এই—প্রতীচ্যে যুদ্ধ জয় করিতে যেখানে রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হয় প্রাচ্যের যুদ্ধ জয় করিতে সেখানে প্রয়োজন হয় আত্মশুদ্ধির। গত বৎসরও আমি ছেলেদের স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা অন্যায় মনে করিয়াছি কিন্তু আমার সে মত বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমি বিশ্বাস করি তাহাদের পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর শান্তিপূর্ণ সেনাদলে যোগদান করা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। সেজন্য সর্ব্বপ্রকারের দুঃখ কষ্ট এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিবার জন্য তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। পথ দুর্গম। কিন্তু তাই বলিয়া বিচলিত হইলে চলিবে না। তাহারা যে শপথ গ্রহণ করিয়াছে সেই শপথ অনুসারে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হউক। যখন অভীষ্ট লাভ করিবে তখন আর কোনো কষ্টই থাকিবে না।"

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

(১) পনেরো বৎসরের বেশী বয়স্ক সকল ছাত্রকে লেখা-পড়া পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দলে নাম লেখাইতে হইবে।

(২) ছাত্র-সম্মিলনের প্রথম সভাপতি লালা লাজপত রায়কে তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের জন্য এই ছাত্র-কন্‌ফারেন্স অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৩) এই সম্মিলনের নাম নিখিল-ভারত ছাত্রসভা না রাখিয়া 'বিদ্যার্থী মহাসভা' রাখা হউক।

(৪) সকল ছাত্রকেই চর্‌কা কাটিতে ও তাঁত বুনিতে শিখিতে হইবে এবং খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে।

মোস্লেম লীগ—

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে আহমদাবাদে মোস্লেম লীগেরও চতুর্দ্দশ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলানা হজরৎ মোহানী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেব ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি ঘোষণা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এই গণতন্ত্রের নাম রাখিয়াছিলেন The United States of India (ভারতের যুক্তরাজ্য)।

তিনি বলিয়াছেন গণতন্ত্র ঘোষণা করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সামরিক আইন জারি হইবার সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইবে Guerilla war চালানো। যেরূপেই হোক ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতন্ত্র শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতেই হইবে। মৌলানা সাহেবের সমস্ত কথা স্পষ্ট এবং নির্ভীক—কোথাও কিছু ঢাকিয়া বলিবার চেষ্টা নাই।

মিঃ ষ্টোক্‌স্—

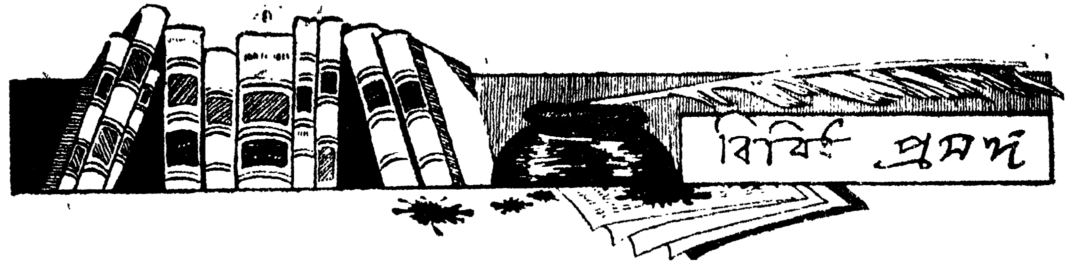
মিঃ ষ্টোক্‌স্ শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ হইয়াও তিনি সিমলার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। রাজনৈতিক অপরাধে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলে। বিচারের সময় মিঃ ষ্টোক্‌স্ বলিয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে যেন শ্বেতাঙ্গ কয়েদী মহলে না রাখিয়া ভারতীয় কয়েদীর মধ্যে রাখা হয়। সম্প্রতি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা জানাইয়াছেন মিঃ ষ্টোক্‌সের অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, শ্বেতাঙ্গ বিভাগেই তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইহাই সব নহে, ব্যাপারটার ভিতর আরো একটু রহস্য আছে। সম্প্রতি লাহোরের রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে ভিন্ন রকমের। তাহাদিগকে সরাইয়া সাধারণ কয়েদীদের সংস্রব হইতে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। এই নূতন নিয়মে কেবলমাত্র মিঃ ষ্টোক্‌স্ ছাড়া সব রাজনৈতিক বন্দী এক ভিন্ন 'ওয়ার্ডে' বাস করিতেছেন। তিনি সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে সেই শ্বেতাঙ্গ কয়েদীর মহলেই আছেন।

এদেশের কালো লোক নিজেদের শত শত অসুবিধা সত্ত্বেও শাদার জন্য সাদরে সুবিধা করিয়া দিতে কুণ্ঠিত নয়, তাহার যথেষ্ট নজির আছে। কিন্তু শাদা নিজের শত সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া কালোর সহস্র অসুবিধা বরণ করিতে চাহিবে ইহা যেমন নূতন তেমনি অদ্ভুত। ইহার কোনোই নজির নাই। হয় তো সেইজন্যই মিঃ ষ্টোক্‌সের নিজের মুখে কালো কয়েদীদের মহলে থাকিবার প্রার্থনা শুনিয়াও লাহোরের ডেপুটি কমিশনার তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। নতুবা ষ্টোক্‌সের প্রতি যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার অন্য কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হাতে-লেখা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'—

এলাহাবাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পত্রিকা গরম দলের কাগজ। সুতরাং তাহার জন্য অনেক কোটি টাকা জামিন দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের মন জোগাইয়া চলিতে না পারায় এই টাকা গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন। পুনর্ব্বার জামিনের টাকা না দিয়াই পত্রিকাখানি সাধারণের দুয়ারে আনিয়া হাজির করা হইয়াছে। কিন্তু এবারকার 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের' মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এই নব কলেবরে সে আর ছাপাখানায় প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই। সে বাহির হইয়া আসিয়াছে হাতের লেখার অলঙ্কার পরিয়া। শ্রীযুক্ত মহাদেও দেশাই মহাশয় ইহাকে সাজাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়ী 'আনন্দ ভবন' হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এত সহজে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'-সমস্যার মীমাংসা হইতে দিতে রাজি নহেন। তাঁহারা দেশাই মহাশয়কে হাতে লেখা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহাকে একশত টাকা জরিমানাও দিতে হইবে কিন্তু এবারকার আন্দোলনের বিশেষত্ব এই—কোনো কাজের জন্য লোকের বড় অভাব হইতেছে না। দেশাই মহাশয়ের জেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী। দেবদাস মহাত্মা গান্ধীর পুত্র। শোনা যাইতেছে, এই হাতে-লেখা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকা পড়িবার জন্য এলাহাবাদের জনসাধারণ একেবারে উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।



স্বাধীন দেশের তালিকা

পৃথিবীতে যতগুলি স্বাধীন দেশ আছে, তাহাদের নাম, লোকসংখ্যা, ও বর্গমাইলে আয়তন নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।—

দেশের নাম	লোকসংখ্যা	আয়তন
ইংলণ্ড	৩৪০৪৫২৯০	৫০৮৭৪
ওয়েল্‌স্	২০২৫২০২	৭৪৬৬
স্কটল্যাণ্ড্	৪৭৬০৯০৪	৩০৪০৫
আমেরিকার ইউনাটেড্ ষ্টেট্‌স্	১১৭৮৫৭৫০৯	৩৬৯৫১০০
আবিসীনিয়া	৭০০০০০০	৩৫০০০০
আফ্‌গানিস্তান	৬৩৮০৫০০	২৪৫০০০
আল্‌বানিয়া	৮৫০০০০	১১০০০
আর্গেণ্টিনা	৭৮৮৫২৩৭	১১৫৩১১৯
অষ্ট্রিয়া	৬১৩৯১৯৭	৩০৭১৬
বেল্‌জিয়ম্	৭৪২৩৭৮৪	১১৩৭৩
বোলীভিয়া	২৮৮৯৯৭০	৫১৪১৫৫
ব্রাজিল্	৩০৬৪৫২৯৬	৩২৭৫৫১০
বুল্‌গেরিয়া	৫০০০০০০	৪২০০০
চীলি	৪০৩৮০৫০	২৮৯৮২৯
চীন	৩২০৬৫০০০০	৩৯১৩৫৬০
কোলোম্বিয়া	৫৮৪৭৪৯১	৪৪০৮৪৬
কোষ্টারিকা	৪৫৯৪২৩	২৩০০০
কিউবা	২৮৯৮৯০৫	৪৪২১৫
চেকো-শ্লোভাকিয়া	২৯৪০৩৭৪	৫৪৪৩৮
ডান্সিগ্ (শহর)	৩৫১৩৮০	৭০৯
ডেন্মার্ক্	২৯৪০৯৭৯	১৫৫৮২
আইস্‌ল্যাণ্ড	৯২৮১৮	৩৯৭০৯
একোয়াডর্	২০০০০০০	১১৬০০০
এস্তোনিয়া	১৭৫০০০০	২৩১৬০
ফিন্‌ল্যাণ্ড্	৩৩৬১৮১৪	১২৫৬৮৯
ফিউমে (শহর)	৪৯৮০৬	৮
ফ্রান্স্	৪১৪৭৫৫২৩	২১২৬৫৯
জর্জ্জিয়া	৩০৫৩৩৪৫	৩২৭৬৯
জার্ম্মেণী	৬০৯০০১৯৭	১৮৩৩৮১
গ্রীস্	২৬৪৩১০৯	৪১৯৩৩
গোয়াটিমালা	২০০৩৫৭৯	৪৮২৯০
হাইটি	২৫০০০০০	১০২০৪
হণ্ডুরাস্	৬৩৭১১৪	৪৪২৭৫
হাঙ্গেরী	৭৮৪০৮৩১	৩৫১৬৪
ইটালী	৩৯০৯৯৮৫৭	১১০৬৩২
জাপান	৫৫৯৬১১৪০	২৬০৭৩৮
লাট্‌ভিয়া	১৫০৩১৯৩	২৪৪৪০
লাইবীরিয়া	২০০০০০০	৪০০০০
লাইক্‌টেন্‌ষ্টাইন্	১০৭১৬	৬৫
লাক্সেমবুর্গ্	২৬৩৮২৪	৯৯৯
মেক্সিকো	১৫৫০১৬৮৪	৭৬৭১৯৮
মোনাকো (শহর)	২২৯৫৬	৮
নেপাল	৫৬০০০০০	৫৪০০০
হল্যাণ্ড্	৬৮৩১২৩১	১২৫৮২
নিকারাগুয়া	৭৪৬০০০	৪৯২০০
নর্‌ওয়ে	২৬৯১৮৫৫	১২৫০০১
ওমান্	৫০০০০০	৮২০০০
পানামা	৪০১৪২৮	৩২৩৮০
পারাগুয়ে	১০০০০০০	৭৫৬৭৩

দেশের নাম	লোকসংখ্যা	আয়তন
পারস্য	১০০০০০০০	৬২৮০০০
পেরু	৪৫০০০০০	৭২২৪৬১
পোল্যাণ্ড	২৪২৭২৩৪৯	১৪৯০৪২
পোর্টুগ্যাল	৫৯৫৭৯৮৫	৩৫৪৯০
রুমেনিয়া	১৭৩৯৩১৪৯	১২২২৮২
য়ুরোপীয় রুশিয়া	১৩৭৪২০৪০০	১৯৫৩৫০৫
এসিয়ার রুশিয়া	২৯১৪১৫০০	৬২৯৪১১৯
আর্মীনিয়া	২১৫৯০০০	৮০০০০
আজেরবৈজান্	৪৬১৫০০০	৪০০০০
লিথুআনিয়া	৪৮০০০০০	৫৯৬৩৩
উক্রাইন্	৪৬০০০০০০	৪৯৮১০০
সাল্‌ভাডর	১৩৩৬৪৪২	১৩১৮৩
সাণ্টোডোমিঙ্গো	১০০০০০০	১৯৭৩২
সার্ব, ক্রোট্ ও শ্লোভীন্ রাষ্ট্র	১১৩৩৭৬৮৬	৯৫৬২৮
শ্যাম	১৯৫০০০	৮৯২৪০০০
স্পেন্	১৯৯৫০৮১৭	১৯০০৫০
সুইডেন্	৫৮৪৭০৩৭	১৭৩০৩৫
সুইজার্ল্যাণ্ড	৩৮৬১৫০৮	১৫৯৭৬
তুরস্ক	৮০০০০০০	১৭৪৯০০
উরুগুয়ে	১৪৬১৮৮৭	৭২ ৫৩
ভেনিজুয়েলা	২৮৫২৬১৪	৩৯৮৫৯৪

স্বাধীন দেশসমূহের এই তালিকায় কয়েকটি দেশের উল্লেখ নাই; যথা—আরব, ভুটান, মরোক্কো। আরব দেশের কোন্ কোন্ অংশ ঠিক স্বাধীন বলা যায় না। ভুটান্ নামে স্বাধীন হইলেও বস্তুতঃ ইংরেজের প্রভাবাধীন। নেপালও কিয়ৎপরিমাণে তদ্রূপ। মরোক্কোর অনেক অংশ স্পেনের ও ফ্রান্সের অধীন। তদ্ভিন্ন মরোক্কোর সুলতান ১৯১২ সালের এক সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের রক্ষণাধীনতা স্বীকার করেন।

স্বাধীন দেশসকলের তালিকায় দেখা যায়, যে, স্বাধীন শক্তিগুলি ছাড়িয়া দিলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক স্বাধীন দেশ আছে। অবিখ্যাত স্বাধীন দেশগুলি দেখিয়া ভারতীয় পর্য্যটকেরা তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত লিখিলে আমাদের খুব জ্ঞান বাড়ে ও উপকার হয়। এক এক জনে দুই চারিটা বা অন্ততঃ একটা করিয়া দেশ দেখিয়া বৃত্তান্ত লিখিলে বেশ হয়।

সম্পূর্ণস্বাধীন দেশ ছাড়া দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে স্বাধীন দেশও অনেক আছে; যথা—আয়ার্ল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলেশিয়া, তিব্বত, গোয়া, ইত্যাদি।

পরাধীন দেশসকলের মধ্যে ভারতবর্ষের মত প্রাচীন সভ্যতা-বিশিষ্ট বিশাল ও বহুজনাকীর্ণ দেশ আর নাই। ইহা আমাদের সাতিশয় লজ্জার বিষয়। বস্তুতঃ, চীন দেশ বাদ দিলে, আর কোন স্বাধীন দেশ নাই যাহা ভারতবর্ষের মত এত বড় এবং যাহার লোকসংখ্যা এত অধিক।

পরাধীনতার লজ্জা, অপমান ও অসুবিধা আমরা সকলে হৃদয়ঙ্গম করি, এবং কেন আমরা পরাধীন তাহার কারণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি।

ভারতবর্ষের বিস্তৃতি ১৮০২৬২৯ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৯০ লক্ষের উপর।

—

পরাধীন দেশের তালিকা

স্বাধীন দেশসকলের তালিকা দিয়াছি। পরাধীন দেশসকলের তালিকাও দিতেছি। বিস্তৃতি বা আয়তন বর্গমাইলে দেওয়া হইল —

দেশের নাম	আয়তন	লোকসংখ্যা
জিব্রাল্টার	১ ৭/৮	২৫৩৬৭
মাল্টা ও গোজো	১১৮	২২৮৫৩৪
এডেন, পেরিম, সোকোত্রা, ও কুরিয়ামুরিয়া	৯১০০	৪৬১৬৫
বাহরীন্	—	১১০০০০
ব্রিটিশ-বোর্ণিও	৩১১০৬	২০৮১৮৩
ব্রুনেই	৪০০০	৩২০০০
সারাওয়াক	৪২০০০	৬০০০০০
সিংহল	২৫৪৮১	৪১১০৩৬৭
সাইপ্রাস্	৩৫৮৪	২৭৪১০৮
হংকং	৩৯১	৫৯৮১০০

দেশের নাম	আয়তন	লোকসংখ্যা
ভারতবর্ষ	১৮০২৬২৯	৩১৯,০০০,০০০
বালুচীস্তান	১৩৪৬৩৮	১৮৩৪৭০৩
সিকিম	২৮১৮	৮৭৯২০
আণ্ডামান ও নিকোবর	২২৬০	১৬৩১৬
ষ্ট্রেট্‌স সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌স্	১৬৬০	৭১৪০৬৯
মিলিত মালয় রাষ্ট্রসমূহ	২৭৫০৬	১০৩৬৯৯৯
জোহোর	৭৫০০	১৮০৪১৭
কেডা	৩৮০০	২৪৫৯৮৬
কেলাণ্টান	৫৮৭০	২৮৬৭৫১
পের্লস্	৩১৬	৩২৭৪৬
ট্রেঙ্গানু	৬০০০	১৫৪০৩৭
ওয়েহাইওয়ে	২৮৫	১৪৭০৭৭
এসেন্সন্ দ্বীপ	৩৪	২৫০
কেন্যা	২৪৬৮২২	২৮০৭০০০
টাঙ্গান্যিকা	৩৮৪১৮০	৭৬৫৯৮৯৮
উগাণ্ডা	১১০৩০০	৩৩১৮০০০
জাঞ্জিবার	১০২০	১৯৬৭৩৩
মরিশস্	৭২০	৩৭৭০৮৩
ন্যাসাল্যাণ্ড	৩৯৫৭৩	১২০২২০৮
সেণ্টহেলেনা	৪৭	৩৫২০
সীচেলিস্	১৫৬	২৪৫২৩
সোমালিল্যাণ্ড	৬৮০০০	৩০০০০০
বাসুটোল্যাণ্ড	১১৭১৬	৪০৪৫০০
বেচুয়ানাল্যাণ্ড	২৭৫০০০	১২৫৩৫০
দক্ষিণ রোডেশিয়া	১৪৯০০০	৮০৮০০০
উত্তর রোডেশিয়া	২৯১০০০	৯২৮০০০
সোয়াজিল্যাণ্ড	৬৬৭৮	৯৯৬৫৯
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৭৩০৯৬	৭৩০৫০০০
উত্তমাশা প্রদেশ	২৭৬৯৬৬	২৫৬৪৯৬৫
নেটাল	৩৫২৯১	১১২৪৪৪৩
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	৩২২৪০০	১০৫০০০
নাইজীরিয়া	৩৩২০০০	১৭,৫০০,০০০
গাম্বিয়া	৪১৩৪	২৪৮০০০
গোল্ড্‌কোষ্ট্	৮০০০০	১৫০৩৩৮৬
সিয়েরালিওন	৪০০০	৭৫৫৭২
টোগোল্যাণ্ড্	৩৩৭০০	১০৩১৯৭৮
ক্যামেরুন	১৯১১৩০	২৫৪০০০০
মিশর বা ঈজিপ্ট্	৩৫০০০০	১২৭৫০৯১৮
সুদান	১০১৪৪০০	৩৪০০০০০
বার্মুডাস্	১৯	২২০০০
ফিলিপাইন্‌স্	১১৪৪০০	১০৩৫০৭৩০
কঙ্গো (বেল্‌জিয়ান)	৯০৯৬৫৪	১১,০০০,০০০
ফরাসী ভারত	১৯৬	২৬৩৮৬৮
„ ইণ্ডো-চীন	২৫৬০০০	১৬৯৯০২২৯
„ আল্‌জিরিয়া	২২২১৮০	৫৫৬৩৮২৮
„ কঙ্গো	১০৩৭১৩১	৮৭৭০০০০
„ মাডাগাস্কার	২২৮০০১	৩৫৪৫২৬৪

বাহুল্যভয়ে আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় ফ্রান্সের অধিকৃত ১৯টি দেশের উল্লেখ করিলাম না। তদ্ভিন্ন, ইটালীর অধিকৃত এরিট্রিয়া, সোমালীল্যাণ্ড ও ত্রিপলী, জাপানের অধিকৃত কোরিয়া, ফর্মোসা, সাথালিন্, কোয়াণ্টাং, কিয়াউচাউ, প্রভৃতি, হল্যাণ্ডের অধিকৃত বোর্নিও প্রভৃতি, পোর্টুগালের অধিকৃত গোয়া, এবং রুশিয়ার অধীন বোখারা ও খীবার আয়তন ও লোকসংখ্যা দিলাম না। লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় মনে হয় নাই, যে, পরাধীন দেশ-সকলের সংখ্যা এত বেশী। লিখিতে গিয়া দেখি, যে, তালিকা ফুরায় না। তাই সময়াভাবে তালিকাটি অসম্পূর্ণ রাখিলাম।

পরাধীন দেশসকলের মধ্যে মিশর, ভারতবর্ষ ও কোরিয়া প্রভৃতি ছাড়া আর কোন বৃহৎ দেশের প্রাচীন সভ্যতা বা শিল্প ও সাহিত্য নাই। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে সভ্য এইসব দেশে আধুনিক জ্ঞান, বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্মাণ-শিল্প এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শিল্পের জ্ঞান, বিস্তার লাভ করে নাই। ইহা এইসকল দেশের পরাধীনতার অন্যতম কারণ। অবশ্য ইহা একমাত্র কারণ নহে। অন্যান্য অনেক কারণ আছে।

আবিসীনিয়া, আফ্‌গানিস্তান ও নেপালে আধুনিক জ্ঞান-বিস্তার ভারতবর্ষ অপেক্ষাও কম হইয়াছে। অথচ ঐসব

দেশ স্বাধীন। প্রাকৃতিক ভৌগোলিক সুবিধাবশতঃও কোন কোন দেশ স্বাধীন আছে।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কারণ যাহাই হউক, আবার বলি, ইহা আমাদের ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ভারতবর্ষের মত বিস্তৃত, বহু কোটি লোকের অধ্যুষিত, এবং প্রাচীন কাল হইতে সভ্য অন্য কোন দেশ এখন পরাধীন নাই। ইহা যে আমাদের কিরূপ লজ্জার কারণ তাহাও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

—

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতা কথাটি দুরকম অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোন দেশ অন্য কোন্ দেশের লোকদের দ্বারা শাসিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বাধীন দেশ বলা হয়। যেমন আফ্‌গানিস্থান, আবিসীনিয়া, ও নেপাল স্বাধীন দেশ; কারণ এইসব দেশের রাজারা উঁহাদেরই বাসিন্দা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও, যখন রুশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল, তখনও উহা ঐ অর্থে স্বাধীন ছিল; কেননা রুশিয়ার সম্রাট্ রুশিয়ারই অধিবাসী ছিলেন। এই অর্থে গত শতাব্দীতে জাপানের সম্রাট কর্তৃক তথায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও জাপান স্বাধীন ছিল; কারণ, উহা কোন বিদেশী লোকের দ্বারা শাসিত হইত না। স্বাধীনতার এই অর্থকে আমরা পরে প্রথম অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিব।

স্বাধীনতার আর-একটি অর্থ আছে, তাহা উৎকৃষ্টতর অর্থ। তাহাকে আমরা দ্বিতীয় অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিব। যে দেশের লোকেরা নিজে বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের আইন প্রণয়ন বা রদ করে, ট্যাক্‌স্ বসায় বা উঠায়, কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করে, দেশের আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব করে, এবং যুদ্ধঘোষণা ও সন্ধি করে, তাহারা এই উৎকৃষ্টতর অর্থে স্বাধীন। রাজতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্র, উভয় প্রকার শাসনপ্রণালীতেই এই প্রকার স্বাধীনতা থাকিতে পারে। ফ্রান্সে ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডে রাজা আছে। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে এই তিনটি দেশই সমান স্বাধীন।

যেসব দেশ এই উৎকৃষ্ট অর্থে স্বাধীন, তাহাদের অধিবাসীদেরও স্বাধীনতার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ শ্রমজীবীদের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না, তাহারা বাস্তবিক পরাধীন ছিল এবং পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিত না। এখন কিছুদিন হইতে তাহারা ঐ অধিকার পাইয়াছে, যদিও এখনও পার্লেমেণ্টের অধিকাংশ সভ্য শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি নহে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এবং আরও অনেক স্বাধীন দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না। অল্পকাল হইল তাঁহারা এই অধিকার পাইয়াছেন। বস্তুতঃ এত দিন তাঁহারা পরাধীন ছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কোন দেশ এক অর্থে স্বাধীন হইলেও দেশের সকল লোক কিম্বা অধিকাংশ বা কিয়দংশ লোক অন্য অর্থে পরাধীন থাকিতে পারে। কিন্তু কোন দেশ যদি তদ্দেশজাত ও তদ্দেশবাসী রাজার দ্বারা শাসিত হয়, অর্থাৎ প্রথম অর্থে স্বাধীন হয়, তাহা হইলে সেই দেশের লোকেরা সাধারণতঃ যত সহজে ও যত অল্পকালে দ্বিতীয় ও উৎকৃষ্টতর অর্থে স্বাধীন হইতে পারে, বিদেশজাত ও বিদেশবাসী লোকের দ্বারা শাসিত লোকেরা তত সহজে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।

—

মুসলমান রাজত্ব ও ভারতবর্ষের পরাধীনতা

ভারতবর্ষ যখন মুসলমান রাজাদের অধীন ছিল, তখন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল, এই ধারণা আমাদের প্রায় সকলেরই আ[illegible] অন্ততঃ প্রায় সব হিন্দুরই আছে, বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক ইংরেজেরা ও অন্য ইংরেজগণ এই ধারণা বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

বিদেশাগত বা বিদেশজাত রাজার অধীন দেশমাত্রকেই পরাধীন বলা যায় কি? ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। রাজা আল্‌ফ্রেডের আমলে ইংলণ্ড প্রথম অর্থে স্বাধীন ছিল, ইহা সকলেই বলিবেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ও তিনি বিদেশী অ্যাংলোসাক্সন

জাতীয় ছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা কেল্টিক্ জাতীয় ছিল। তাহাদেরও আগে ইংলণ্ডে কালো চোখ ও কালো চুলওয়ালা খুব বেশীসংখ্যক অশ্বেত রঙ্গের লোক (সম্ভবতঃ জেতা রূপে) আগমন করে, এবং সেইজন্য আজও ইংলণ্ডের অর্দ্ধেকের উপর লোকের চুল ও চোখ কালো।

বিজেতা উইলিয়ম্ একাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডি প্রদেশ হইতে আসিয়া ইংলণ্ড দখল করেন। বিলাতের বর্ত্তমান রাজা পঞ্চম জর্জ্ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এই উইলিয়ামেরই বংশধর। অতএব যদি কোন দেশে বিদেশী বংশের রাজা থাকিলেই তাহাকে পরাধীন দেশ বলা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড পরাধীন দেশ। কিন্তু বাস্তবিক ইংলণ্ড পরাধীন নহে। কারণ, ইংলণ্ডের রাজারা অনেকদিন হইতে ইংলণ্ডেই জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী, এবং তাঁহারা অপর ইংরেজদের মত ইংলণ্ডেরই অধিবাসী। আর-একটি কারণ এই, যে, ইংলণ্ডে উহার অধিবাসীরাই প্রভু, তাহাদেরই শক্তি রাজার শক্তিকে ক্রমশঃ কমাইয়া এখন প্রায় নাম মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছে।

বিজেতা উইলিয়ামই যে ইংলণ্ডের একমাত্র বিদেশজাত ও বিদেশাগত রাজা ছিলেন, তাহা নহে; ষ্টিফেন্, তৃতীয় উইলিয়াম, এবং প্রথম জর্জও ইংরেজ ছিলেন না, এবং ইংরেজী তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল না। প্রথম জেম্‌স্‌ও ইংরেজ ছিলেন না, ছিলেন স্কচ্। পঞ্চম জর্জের পিতামহ আল্‌বার্ট জার্ম্যান ছিলেন।

দেশের অধিকাংশ লোক যদি একধর্ম্মাবলম্বী হন, এবং রাজা বা রাণী হন অন্যধর্ম্মাবলম্বী, তাহা হইলেও দেশকে পরাধীন বলা চলে না। অষ্টম হেন্‌রীর কন্যা মেরী ছিলেন রোম্যান কাথলিক, কিন্তু ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক ছিল প্রটেষ্টাণ্ট। তথাপি মেরীর সময়ে ইংলণ্ড পরাধীন ছিল, বলা চলে না। দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ও রোমান কাথলিক ছিলেন।

প্রথম উইলিয়মের বংশধরদের মধ্যে কাহার রাজত্বকাল হইতে ইংলণ্ডকে প্রথম অর্থে স্বাধীন বলা যায়, তাহা বলা কঠিন। এবিষয়ের আলোচনা ইংরেজরা করে নাই। কারণ, ইংলণ্ড যে কখনও পরাধীন ছিল, ইহা তাহারা ভুলিয়া যাইতে এবং অন্য জাতিসকলকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। অথচ স্কটের লিখিত আইভ্যান্‌হো উপন্যাস হইতেও বুঝা যায় যে, জন্ এবং প্রথম রিচার্ডের রাজত্বকালেও বিজেতা নর্ম্যানদের বংশধরেরা দেশের এংলোসাক্সন্ অধিবাসীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। যখন ইউরোপ মহাদেশে ইংলণ্ডের রাজাদের রাজত্ব একেবারেই বা প্রধানতঃ রহিল না, এবং তাঁহারা ইংলণ্ডকেই মাতৃভূমি ও পিতৃভূমি এবং ইংরেজীকেই মাতৃভাষা জ্ঞান করিতে লাগিলেন, তখন হইতে ইংলণ্ডকে প্রথম অর্থে স্বাধীন দেশ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় অর্থে অর্থাৎ প্রজার কর্তৃত্ব অর্থে স্বাধীনতার সূত্রপাত ইংলণ্ডে ম্যাগ্না-কার্টার সময় হইতে এবং সাইমন্ ডি মণ্টফোর্টের সময় হইতে হয়।

এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিষয় আলোচনা করা যাক্।

পাঠান- ও মোগল-বংশের প্রথম রাজারা বিদেশজাত এবং বিদেশাগত বিজেতা ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের যতটুকু দখল করিয়াছিলেন তাহা পরাধীন দেশ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের সেই অংশের প্রথম বা দ্বিতীয় কোন অর্থেই স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরেরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ভারতবর্ষেই সমস্ত জীবন যাপন করিয়া এখানেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহাদের প্রধান কীর্ত্তিও সমস্তই ভারতবর্ষে অবস্থিত। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, প্রভৃতি বাদশাহ্ ভারতবর্ষীয় ছিলেন। মোগল বাদশাহদের অনেকে মাতৃকুল অনুসারে হিন্দুর সন্তান ছিলেন। অতএব, তাঁহারা ভিন্নধর্ম্মী হইলেও, মেরীর অধীন ইংলণ্ড যেমন প্রথম অর্থে স্বাধীন ছিল, তেমনি তাঁহাদের অধীন ভারতবর্ষও স্বাধীন দেশ ছিল। বস্তুতঃ সমুদয় পাঠান মোগল বাদশাহদের মধ্যে ২।১ জন ছাড়া সকলেই ভারতবর্ষের লোক্ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আমলে ভারতবর্ষ প্রথম অর্থে স্বাধীন ছিল। বিদেশাগত কাহারো দ্বারা একবার কোন দেশ বিজিত হইলেই সেদেশ তাহার বংশধর সমুদয় রাজাদের সমগ্র রাজত্বকাল ব্যাপিয়া পরাধীন ছিল, এরূপ মনে করা ভুল। তাহা হইলে স্বাধীন ইংলণ্ডকে অতীত বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীন বিশেষণে কলঙ্কিত করিতে হয়।

মুসলমান বাদশাহ ও নবাবদের আমলে যদি, ইংলণ্ডের মত, এদেশে প্রজাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমে

ক্রমে বিস্তৃত হইত, তাহা হইলে এখনও ভারতে মুসলমান রাজত্ব থাকিলেও, ভারতবর্ষকে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অর্থেই স্বাধীন বলা চলিত। ইংলণ্ডে হিন্দুজাতিভেদের মত জাতি-ভেদ না থাকায় এবং কেল্টিক্, এংলোসাক্সন্ ও নর্ম্মান্ জাতীয় সকল লোকই খৃষ্টিয়ান্ থাকায়, বৈবাহিক আদান-প্রদান দ্বারা সকলে এখন একজাতি হইয়া গিয়াছে, এবং সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় ইংলণ্ড প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অর্থেই স্বাধীন। আক্‌বর বাদ্‌শাহের প্রবর্ত্তিত বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন নীতির দ্বারা যদি হিন্দুমুসলমানের একজাতিত্ব উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইত, এবং এই সম্মিলিত ভারতীয় জাতির সমবেত চেষ্টায় যদি ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রজার কর্তৃত্ব স্থাপিত হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ এখন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অর্থেই স্বাধীন দেশ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন তাহার জন্য অনুশোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।

আমরা যদি অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়া থাকি, যে, অধিকাংশ বাদ্‌শাহ ও নবাবদের আমলে ভারতবর্ষ প্রথম অর্থে স্বাধীন দেশ ছিল, তাহাও পরম লাভ। তাঁহাদিগকে বিদেশী মনে করা উচিত নয়। ইংরেজরা প্রথম উইলিয়মের পরবর্ত্তী সেই-সব রাজা ও রাণীদিগকেও বিদেশী মনে করে নাই, যাহাদের আমল পর্য্যন্ত প্রজার অধিকার বিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই। সত্য বটে, ভারতের অনেক বাদ্‌শাহ ও নবাব অত্যাচারী ছিলেন; কিন্তু রুষিয়ার জারেরাও ত অত্যাচারী ছিলেন, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের অনেক রাজা ও রাণী অত্যাচারী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের অধীন ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রুশিয়াকে পরাধীন দেশ বলা হয় না। অনেক হিন্দু রাজাও অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু সে কারণে তদ্রূপ হিন্দুরাজার শাসিত ভারতকে পরাধীন বলা হয় না। সত্য বটে, মুসলমানেরা দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের রাজত্বকে বিদেশীর রাজত্ব বলা যায় না। শিখেরা এখন বা পূর্ব্বে কখনও পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন না, কিন্তু পঞ্জাবে তাঁহাদের রাজত্বকালকে পঞ্জাবের পরাধীনতার কাল বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। ইংলণ্ডের মেরী ও দ্বিতীয় জেম্‌স্ রোমান ক্যাথলিক হইলেও এবং ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা প্রটেষ্টান্টদের চেয়ে কম হইলেও, মেরী ও দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্ব-কালীন ইংলণ্ড ইতিহাসে পরাধীন বলিয়া উল্লিখিত হয় না। সত্য বটে মুসলমান বাদ্‌শাহ ও নবাবেরা হিন্দু নৃপতি-দের সহিত যুদ্ধ করিতেন; কিন্তু তজ্জন্যও মুসলমান রাজত্বকালকে বিদেশী রাজত্ব বলা চলে না। কারণ, তাঁহারা মুসলমান নৃপতিদের সহিতও যুদ্ধ করিতেন এবং হিন্দু নৃপতিরা হিন্দু নৃপতিদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতেন।

টডের রাজস্থান পাঠ করিয়া আমরা অনেকে সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও অনেকে উপকৃত হইবেন। কিন্তু ইহার দ্বারা অনিষ্টও হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর বৈর ভাব জন্মাইবার বা জাগাইয়া রাখিবার একটি প্রধান কারণ এই গ্রন্থখানি। আমরা যেমন করিয়া এই গ্রন্থ পড়িয়া এবং এই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বহু কাব্য উপন্যাস নাটক পড়িয়া হিন্দুমুসলমানের অতীত ঝগড়া জাগাইয়া রাখি, ইংরেজরা তেমন করিয়া কোন গ্রন্থের সাহায্যে এংলোসাক্সন ও নর্ম্মানের, ইংরেজ ও স্কচের, এবং রোমান ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্টান্টের ঝগড়া জাগাইয়া রাখে না। আমরা অতীত ইতিহাসকে লুপ্ত বা বিকৃত করিতে বলিতেছি না; কিন্তু অন্য সকল দেশের ইতিহাস সেই সেই দেশের লোকেরা যেমন ভাবে লেখে ও পড়ে, আমাদের দেশের ইতিহাসও আমরা যাহাতে তেমনি করিয়া লিখি ও পড়ি, তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছি।

অনেক মুসলমানের এবং অনেক হিন্দুরও এইরূপ ধারণা আছে, যে, মুসলমানেরা সকলেই বা অধিকাংশ বিদেশী-বংশোৎপন্ন ও বিজেতার জাতি। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইংলণ্ডে আজিও অনেক লর্ড পরিবার নিজেদের নর্ম্যান রক্তের বড়াই করে, যদিও তাহাদের অনেকের কুলজী কল্পিত, এবং অনেকের ধমনীতে কেল্টিক্ ও এংলোসাক্সন রক্ত প্রবাহিত। বর্ত্তমান ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ মুসলমানধর্ম্মে-দীক্ষিত হিন্দু ও আদিমনিবাসীদের বংশধর। সমুদয় হিন্দু যেমন আর্য্যবংশীয় নহে, দেশীয় খৃষ্টিয়ানেরা যেমন বিজেতার জাতি নহে, অধিকাংশ মুসলমানও তেমনি আরব মোগল পাঠান তুর্ক আদি বিজেতার জাতি নহে। তা ছাড়া, কাহারও পূর্ব্বপুরুষ পোলাও খাইত বলিয়া যেমন সেই স্মৃতিতেই তাহার ক্ষুধা নিবারণ হয় না,

কাহারও পূর্ব্ব পুরুষ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া যেমন তাহাতেই তাহার অজ্ঞতা দূর হয় না, তেমনি কাহারও পূর্ব্ব পুরুষ বিজেতা থাকিলেও, এখন সকল ভারতীয়েরই দশা এক। সবাই পরাধীন।

আর-একটা ভ্রান্ত ধারণাও দূর হওয়া আবশ্যক। ইংরেজ যখন ছলে বলে কৌশলে ভারতবর্ষের রাজা হইল, তখন দেশে মুসলমানের প্রভুত্ব অধিকাংশ স্থানে লুপ্ত হইয়াছিল। পঞ্জাব ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে শিখদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। অন্যত্র মরাঠারাই হয় প্রভু নতুবা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। পানিপথের শেষ যুদ্ধ বাস্তবিক মরাঠাদের সহিত হইয়াছিল; দিল্লীর শেষ বাদশাহেরা মরাঠাদের নজরবন্দী ছিল।

হিন্দু রাজত্ব ও মুসলমানের "পরাধীনতা"

অনেক মুসলমান যেমন মনে করেন, যে, স্বরাজ মানে মুসলমানপ্রভুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তেমনি অনেক হিন্দুও মনে করেন, স্বরাজ মানে হিন্দু রাজত্বের পুনঃস্থাপন। কিন্তু অতীতকালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমরা হিন্দু রাজত্বও কামনা করিব না, মুসলমান রাজত্বও কামনা করিব না। তদ্রূপ আবার খৃষ্টিয়ান্, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, প্রভৃতি কাহারও রাজত্বও কামনা করিব না। আমরা ভারতবর্ষের সমুদয় ধর্ম্মের, জাতির ও ভাষার লোকদের কর্তৃত্ব কামনা করি। অর্থাৎ আমরা এরূপ স্বরাজ চাই, যাহাতে জাতিধর্ম্মভাষানির্ব্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর, নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিলে, সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকিবে। তাহার কথা পরে বলিতেছি।

অতীতকালে যখন ভারতের অনেক প্রদেশে মুসলমান রাজত্ব ছিল, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া হিন্দুরা মনে করিতে পারেন, "আমরা তখন ছিলাম সংখ্যায় বেশী, অথচ সংখ্যায় কম মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষ হইতেন রাজা, এবং অধিকাংশ উচ্চপদে মুসলমান কর্ম্মচারী অধিষ্ঠিত ছিলেন; এইজন্য মনে করি আমরা পরাধীন ছিলাম।"

বর্ত্তমানসময়ে ধরুন যদি বঙ্গে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরাও ত মনে করিতে পারেন, "আমরা পরাধীন হইলাম; কেন না বাঙ্গালী হিন্দুরা বাঙ্গালী মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও রাজা হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত এবং অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও হিন্দু।" উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ আগেকার মত পঞ্জাবের সামিল হইলে এবং তথায় হিন্দু বা শিখ্ রাজত্ব স্থাপিত হইল তথাকার মুসলমানেরা, সংখ্যায় অধিক বলিয়া, ঠিক্ বাঙ্গালী মুসলমানদের মত কথাই বলিতে পারেন। অতএব বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যে স্বরাজ হইবে, তাহা, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ্, ইহুদী, পার্সী, কাহারও রাজত্ব হইলে চলিবে না, প্রধানতঃ বা একমাত্র কাহারও প্রভুত্বকে স্বরাজ নাম দেওয়া যাইতে পারে না।

তবে স্বরাজ কেমন হইতে পারে?

স্বরাজের প্রকৃতি

আমরা আগে বলিয়াছি, ইংলণ্ডে রাজা থাকিলেও তথাকার বাসিন্দা লোকেরাই প্রভু, সুতরাং তাহারা স্বাধীন, ও তথায় পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও যদি সমুদয় আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল ভারতীয় জাতির লোকদের প্রভুত্ব হয়, এবং ধর্ম্ম জাতি ভাষা নির্ব্বিশেষে সকলেরই রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ রাজতন্ত্রেও হইতে পারে, সাধারণতন্ত্রেও হইতে পারে। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে সকলে সকল পদ পাইতে পারিত; কিন্তু এক সময়ে ইংলণ্ডে আংলিকান্ (Anglican) খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকদের যেসব রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল, রোমান কাথলিকদের ও ইহুদীদের তাহা ছিল না, কালে তাহাদের এই অধিকারশূন্যতা দূর হয়। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, যে, যদিও ইংলণ্ডের রাণী ও রাজারা আংলিকান খৃষ্টিয়ান্, তথাপি ইহুদী ডিসরেলী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, এবং রোমান্ কাথলিক লর্ড রিপন ভারতে রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহুদী মণ্টেগু সাহেব ভারতসচিব এবং ইহুদী লর্ড রেডিং ভারতে বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি। তেমনি যদি কেহ ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা হন এবং তাঁহার ভারতীয়

প্রজাদের পুরামাত্রায় সেই সব অধিকার থাকে, যাহা ইংলণ্ডে ইংরেজদের আছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই স্বাধীন রাজার ধর্ম্ম ও জাতি যাহাই হউক, তাহাতে আসিয়া যাইবে না।

যদি ইংলণ্ডের রাজবংশোদ্ভূত কেহ ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা হইয়া আসিয়া এখানে পুরুষানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, যদি তিনি ইংলণ্ডের রাজার অধীন না হন, এবং যদি তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্বে ভারতীয় জাতির সেইরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে যেমন বিলাতে ইংরেজ জাতির আছে, তাহা হইলে এরূপ অবস্থাকেও স্বরাজ বলা যাইতে পারে। ভারতীয় কোন হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খৃষ্টিয়ান শিখ ইহুদী বা পার্শী রাজার রাজত্বে যদি ঐরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ত নিশ্চয়ই স্বরাজ বলা যাইতে পারিবে।

কিন্তু রাজা যে ধর্ম্মের বা জাতির হন, তাহাতে যেন সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় বা জাতির একটু বেশী গৌরব হয়, সাধারণতঃ লোকের মনের ভাব এইরূপ হওয়ায়, এবং ভারতবর্ষে অতীত ও বর্ত্তমান বিরোধস্মৃতির পোষক নানা ধর্ম্ম ও জাতির লোকের বাস থাকায়, ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ সাধারণতন্ত্র আকারের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, যোগ্যতা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও জাতির লোক প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ দেশনায়ক বা দেশপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন; স্থায়ী রাজবংশ কোন ধর্ম্মের বা জাতির হওয়ার জন্য কাহারও অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে না, বা কাহাকেও দীর্ঘকাল মনক্ষুন্ন থাকিতে হইবে না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতি ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা, অন্য সব স্থায়ী বাসিন্দারা তাহাকে নিজেদের সমান ভারতীয় মনে করিলে, তবে আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জন করিবার ও রক্ষা করিবার যোগ্য হইব। হিন্দু মনের নিভৃততম কক্ষেও এভাব পোষণ করিতে পারিবেন না, যে, তিনি মুসলমানের চেয়ে বেশী ভারতীয়; মুসলমানও ভাবিতে পাইবেন না, যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা পারস্য তুরস্ক বা আরব দেশ অধিক পরিমাণে তাঁহার স্বদেশ। কোন সম্প্রদায় অন্য কোন সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা বা দ্বেষ করিলে চলিবে না। পরস্পরকে সকলে সর্ব্ববিধ অতীত ও বর্ত্তমান অপরাধের জন্য ক্ষমা করিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিবেন।

এ পর্য্যন্ত ইহা দেখা গিয়াছে বটে, যে, মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ঝড়ে সাতিশয় বিপন্ন হইলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই বেশী টাকা দিয়াছে ও খাটিয়াছে। কিন্তু তুরস্ক বিপন্ন হইলে বা আঙ্গোরার জন্য টাকা তুলিতে হইলে মুসলমানেরা মুক্তহস্তে টাকা দিয়াছেন। আমরা এজন্য মুসলমান-দিগকে দোষ দিতেছি না। মানুষ পরাধীন হইলে বা অন্য কোন প্রকারে দুরবস্থাপন্ন হইলে, স্বাধীন ও সুদশাপন্ন কাহাকেও আত্মীয় জ্ঞান করিতে পারিলে তৃপ্তি বোধ করে। মুসলমানের আধিপত্য এককালে এসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র তুরস্কই প্রকৃত শক্তিশালী স্বাধীন মুসলমান দেশ ছিল, এবং মুসলমানের অতীত শক্তির গৌরবময় স্মৃতির ভগ্নাবশেষ রক্ষা করিতেছিল। তাহাকে আত্মীয়বোধে তাহার সাহায্য করিতে চেষ্টিত হওয়া মুসলমানের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারত মহাসাগরে কোথায় ক্ষুদ্র বলী দ্বীপ আছে, তাহাতে এখনও হিন্দু আছে, তাহারা অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল বা এখনও আছে, মনে করিয়া আমরা সুখ পাই। অতএব মুসলমানের মনের ভাব বুঝা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। কিন্তু যখন অতীত কালে ভারতবর্ষে মুসলমানের প্রভুত্ব ছিল, তখন ভারতীয় মুসলমানেরা ও তাঁহাদের বাদ্‌শাহেরা গৌরবের জন্য স্বাধীন পারস্যের বা তুরস্কের গাঘেঁসা হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। কারণ তাঁহারা নিজেই স্বাধীন ও শক্তিশালী ছিলেন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আমাদের বাঞ্ছানুরূপ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুর মত মুসলমানও স্বাধীন এবং গৌরবমণ্ডিত হইবেন। তখন ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের মমতা আরও বাড়িবে। কিন্তু বুদ্ধিমান বিবেচক স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় মুসলমানদের মনের অবস্থা এখন হইতেই ভারতের প্রতি মমতায় পূর্ণ বলিয়া মনে করি। অন্য সকল মুসলমানের মনেও তাঁহারা ঐরূপ ভাব জন্মাইতে চেষ্টা করুন। ভারতীয় ভাবা

ও সাহিত্যের এবং ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্পের চর্চ্চায়, এবং ভারতের হিতকর সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায় তাঁহারা অন্যসব সম্প্রদায়ের সহকর্ম্মী হউন।

—

একটি সরকারী পত্রী

পৌষের প্রবাসী প্রকাশিত হইবার দুই দিন পরে আমরা বাংলা গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যবিভাগ হইতে কয়েকটি ক্ষুদ্র পত্রী (leaflets) প্রবাসীতে প্রকাশার্থ প্রাপ্ত হই। নীচে তাহার একটি মুদ্রিত করিতেছি।—

হরতালে কি ক্ষতি হয় ?

হরতালে কি হয় ?—তোমাকে তোমার কাজ করিতে দেয় না; তোমার একদিনের রোজ্‌গার নষ্ট হয়; আর বিশেষ করিয়া, ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে, দোকানদারেরা সমস্ত বৎসরের মধ্যে সব চেয়ে লাভের কাজ অর্থাৎ বড়দিনের বেচা-কেনা, করিতে পারিবে না।

হরতাল কে চায় ?—কেবল গুণ্ডারা; কারণ তাহা হইলে তাহারা সাধু ও রাজভক্ত লোকদের ক্ষতি করিবার ও টাকা কড়ি লুট করিবার সুবিধা পায়।

হরতালের হুকুম কেন লোকে মানে ?—কারণ যাহারা গুণ্ডাদের হুকুম না মানে, গুণ্ডারা তাহাদিগকে ভয় দেখায়, পীড়ন করে ও মারে।

২৪এ ডিসেম্বর তারিখে কেন এ হুকুম মানা উচিত নয় ?—কারণ যে সমস্ত সাধু ও গরীবলোক হরতাল চায় না, অথচ গুণ্ডাদের ভয় করে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর সাধু ও রাজভক্ত ইংরাজ ও ভারতীয় সহরবাসী একজোট হইতেছেন।

অতএব গুণ্ডাদের ভয় করিবার দরকার নাই, তাহারা রাজার শত্রু। গরীবদের রক্ষা করা হইবে, কাহাকেও তাহাদের ক্ষতি করিতে দেওয়া হইবে না।

তোমাদের ভাবী রাজার আগমনের সময় তাঁহাকে সমাদর দেখাইবার জন্য আসিতে ভয় পাইও না। তোমাদিগকে কেহ পীড়ন করিতে পারিবে না।

ঈশ্বর যুবরাজকে নিরাপদে রাখুন।
ঈশ্বর রাজাকে নিরাপদে রাখুন।

এই পত্রীটির বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক। ইহাতে যে অসত্যকথা আছে, তাহা সহজেই ধরা যায়।

"হরতাল কে চায়? কেবল গুণ্ডারা"; গবর্ণমেণ্ট কি বাস্তবিক ইহা বিশ্বাস করেন? মহাত্মা গান্ধী হরতাল চাহিয়াছিলেন; তিনি কি গুণ্ডা? ভারতবর্ষের এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক হরতাল চাহিয়াছিল ও করিয়াছিল, যাহারা চরিত্রে এবং শান্তিপ্রিয়তায় গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কাহা অপেক্ষাও হীন নহে। "কেবল গুণ্ডারা হরতাল চায়", এরূপ বাজে ও অসত্য কথা প্রচার করায় গবর্ণমেণ্টেরই সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

গবর্ণমেণ্ট এইরূপ পত্রী বিতরণ এবং অন্যান্য নানা উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও হরতাল হইয়াছিল। তাহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, (১) গুণ্ডাদের উৎপীড়ন ও ভয়প্রদর্শন হরতালের একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে, অধিকাংশ স্থলে উহা স্বেচ্ছাপ্রসূত; কিম্বা (২) ইহাই প্রমাণ হয়, যে, "গুণ্ডারা", অর্থাৎ সরকারের মতে অসহযোগীরা, গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা এরূপ শক্তিশালী, যে, গবর্ণমেণ্ট লোকদিগকে অভয় দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা "গুণ্ডাদের" ভয়ে হরতাল করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

—

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

বিশ্বভারতীর কার্য্য আগে হইতেই চলিতেছিল। গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উহার নিয়মাবলী সভাস্থ সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, প্রিন্সিপ্যাল সুশীলকুমার রুদ্র, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস্ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলেই বিশ্বভারতীর সভ্য হইতে পারেন। ইহাতে ছাত্র ছাত্রী উভয়েরই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রীদের বাস ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। বিশ্বভারতীতে প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্ববিধ বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য, সকল বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত এখন হয় নাই, কিম্বা অদূর ভবিষ্যতেও না হইতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বিদ্যাকেই বাদ দেওয়া হয় নাই। কোন বিদ্যা শিখাইবার সামর্থ্য যখনই হইবে এবং উহা শিখিতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীও জুটিবে, তখনই উহা শিখাইতে আরম্ভ করা হইবে।

—

ভি-পি ডাকে প্রবাসীর মূল্য প্রদান

ডাক-বিভাগের বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই, যে, কোন বহি ডাকে পাঠাইতে হইলে উহার প্রত্যেক পাঁচ তোলা বা তাহা অপেক্ষা কম ওজনের জন্য দু পয়সা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হয়। সংবাদপত্রের উপর, প্রথম আট তোলা বা তন্ন্যূন ওজনের জন্য এক পয়সা মাশুল লাগে; তাহার উপর কুড়ি তোলা পর্য্যন্ত দুই পয়সা লাগে। কুড়ি তোলার উপর ওজনের জন্য প্রত্যেক কুড়ি তোলা বা তন্ন্যূন ওজনের নিমিত্ত আবার দু পয়সা করিয়া লাগে। প্রবাসীর ওজন আজকাল গড়ে পঁচিশ তোলা। সেইজন্য এখন ইহার প্রত্যেকখানির উপর এক আনা করিয়া মাশুল লাগে। আগে চল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত দু পয়সা মাশুলে যাইত। এইজন্য আজকাল আমাদের ডাকব্যয় আগেকার দ্বিগুণ হয়। আগে রেজেষ্টারী না করিয়াও ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে জিনিষ



বিশ্বভারতীর উদ্বোধন।
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উদ্বোধক, পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি উপবিষ্ট।

পাঠান যাইত; কিছুকাল হইতে সমুদয় ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ জিনিষ রেজিষ্টারী করিবার নিয়ম হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক জিনিষে দুইআনা করিয়া খরচ বাড়িয়াছে। ইহার উপর বঙ্গের ডাকবিভাগ গত কয়েকমাস হইতে ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ ডাকে সংবাদপত্র প্রেরণের ব্যয় আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। বঙ্গের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বলিতেছেন, যে, সংবাদপত্র ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ করিয়া পাঠাইলে তাহার উপর বহির মত ডাকমাশুল লাগিবে। অর্থাৎ ২৫ তোলা ওজনের প্রবাসীতে এক আনার টিকিট লাগাইলে উহা সাধারণ ডাকে যায়; কিন্তু উহা ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ করিতে হইলে উহার ২৫ তোলা ওজনের জন্য প্রত্যেক পাঁচ তোলায় দু পয়সা অর্থাৎ মোট দশ পয়সা মাশুল লাগিতেছে। ২৫ তোলার উপর ৩০ তোলা পর্য্যন্ত তিন আনা, ৩০ তোলার উপর ৩৫ তোলা পর্য্যন্ত সাড়ে তিন আনা, ৩৫ তোলার উপরে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত চারি আনা লাগিতেছে। বার্ষিক সাড়ে ছয় টাকা মূল্য লইয়া এইরূপ অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। গ্রাহকদের নিকট হইতে ইহা আদায় করিতে গেলে তাঁহারাও অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং অনেকে গ্রাহক না থাকিতেও পারেন। এইজন্য আমরা উভয় পক্ষের সুবিধার নিমিত্ত বার্ষিক চাঁদা আদায়ের জন্য অন্য একটি উপায় অবলম্বন করিব, স্থির করিয়াছি। তাহা এই—

আগামী ১৩২৯ সালের প্রবাসীর মূল্য সাড়ে ছয় টাকার একখানি করিয়া রসিদ আমরা গ্রাহকদিগকে খামের মধ্যে পুরিয়া ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ ডাকে আগামী ১০ই চৈত্র পাঠাইব। ইহাতে গ্রাহকদিগের ছয় টাকা তের আনা লাগিবে। তাঁহারা টাকা দিয়া উহা গ্রহণ করিবার পর ঐ টাকা আমাদের হস্তগত হইলে আমরা তাঁহাদিগকে যথানিয়মে ও যথাসময়ে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রবাসী পাঠাইব। ইহাতে সুবিধা এই, যে, গ্রাহকদের ও আমাদের অতিরিক্ত খরচ হইবে না, অধিকন্তু গ্রাহকদের নিকট টাকা দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ একটি রসিদ থাকিবে, যাহা ভ্যালুপেয়েব্‌লে কাগজ লইলে থাকে না।

কেহ যদি ভ্যালুপেয়েব্‌লে প্রবাসী লইয়া একবৎসরের

মূল্য দিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রবাসীর ওজন অনুসারে সাত টাকা পর্য্যন্ত লাগিতে পারে।

প্রবাসীর মূল্য দিবার সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা উপায় দুটি। (১) নিজে বা লোক-মারফৎ আমাদের আফিসে ৬৷৹ জমা দেওয়া; ইহাতে অতিরিক্ত কোন ব্যয় নাই। (২) মনিঅর্ডার করিয়া ৬৷৹ প্রেরণ; ইহাতে মোট ব্যয় ৬৷৵৹। আমরা কলিকাতার গ্রাহকদিগকে প্রথম উপায়, এবং মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আগামী ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে যে-সকল গ্রাহকের নিকট হইতে ১৩২৯ সালের প্রবাসীর মূল্য কিম্বা নিষেধ-পত্র পাওয়া যাইবে না, তাঁহাদিগকে আমরা আগামী ১০ই চৈত্র পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে খামের মধ্যে ভ্যালুপেয়েবল রসিদ পাঠাইব। তাঁহারা উহা ৬৸৹ দিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

যাঁহারা বৈশাখ সংখ্যা ভ্যালুপেয়েবলে পাঠাইতে বলিবেন, তাঁহাদিগকে ভ্যালুপেয়েবলেই পাঠাইব। কিন্তু তাঁহারা জানিয়া রাখুন, যে, উহাতে সাত টাকা পর্য্যন্ত লাগিতে পারে।

—

শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী মহোদয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন; তদ্ভিন্ন কয়েকটি ভাষা জানিতেন, এবং সাধারণতঃ লোকে যাহা শিখিয়া থাকে তাহাতেও সুশিক্ষিতা ছিলেন। সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি "সঙ্গীতসঙ্ঘ" স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ঐ বিষয়ে যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সুশিক্ষা পায় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবতী ছিলেন এবং ব্যয় করিতেন। তিনি "আনন্দ-সঙ্গীতপত্রিকা" নামক সঙ্গীতবিষয়ক অন্যতম বাংলা কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

—

রাজবন্দীদিগের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

বৈধ উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রকাশ্য নিরুপদ্রব সভা করিবার এবং তথায় মত ও ভাব প্রকাশ করিবার, এবং স্বেচ্ছাসেবক হইয়া নিরুপদ্রবে অন্য বৈধ কার্য্য করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্ট হরণ করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা (দৃষ্টান্তস্বরূপ) চাঁদপুরে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ওলাউঠা রোগীদেরও সেবা করিয়াছিলেন। অথচ গবর্ণমেণ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবককে গুণ্ডাশ্রেণীভুক্ত করিয়া, ঐ ঐ অধিকার হরণ করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা গুণ্ডা, ইহা যাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা কার্য্যতঃ ইহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ক্রোধভাজন হইতে ভীত নহেন, যাঁহারা জাতীয় আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য সকল দুঃখ সহিতে প্রস্তুত ইচ্ছুক ও ব্যগ্র, তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া দলে দলে জেলে গিয়াছেন ও যাইতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও অনেক লোক বৈধ কথা বলিবার ও বৈধ কাজ করিবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে জাতীয় অপমান অত্যাচারের প্রতীকারের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি।

—

তাঁহারা বুদ্ধিমান্ বিবেচক ও প্রাজ্ঞ কি না

যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ বিবেচক ও প্রাজ্ঞ কি না, তাহার বিচার আমরা করিতেছি না, করিতে চাই না। এরূপ আলোচনা করা আমাদের পক্ষে হয়ত সুশোভনও হইবে না।

যাঁহারা জেলে গিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধি বিবেচনা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকুন বা না দিয়া থাকুন, তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিবার এবং তজ্জন্য কষ্ট ও ক্ষতি সহিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা জেলে যান নাই, তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে গিয়া অতটুকু ক্ষতি ও দুঃখ সহিতে প্রস্তুত কি না, নিজ নিজ হৃদয় মন পরীক্ষা করিয়া স্থির করুন। আমরা অপরকে উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হই নাই। আমরাও আত্মপরীক্ষা করিতেছি।

মোট কথা এই, জেলে যাওয়া বা না-যাওয়াটাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে; উহা একটা আনুষঙ্গিক ঘটনা বা উপায় মাত্র। প্রধান বিচার্য্য এই, যে, আমরা স্বার্থপর ও কাপুরুষ হইয়া কেবল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ও আরাম এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকেই জীবনের নিয়ামক করিব, না শ্রেয়ের অন্বেষণে সুখ সুবিধা আরাম ও স্বার্থ বলি দিয়া মানুষের মত আচরণ করিব?

"মনুষ্যত্বের পথ যদি আমাদিগকে কারাগারে বা মশানে লইয়া যায়, তাহাতে আমরা প্রস্তুত; মনুষ্যত্বের পথ যদি আমাদিগকে সেখানে লইয়া না যায়, তাহাতেও আমরা প্রস্তুত। আমরা যেমন আরামপ্রিয়তা স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতা বশতঃ কারাগার ও মশানকে ভয় করিব না, তেমনি হুজুক, খ্যাতি বা তদ্বিধ কোন নিকৃষ্ট কারণে রাজদণ্ডের অভিলাষীও হইব না।" এইরূপ আন্তরিক বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আচরণ যাঁহাদের, তাঁহারা ধন্য।

সরকারী ও বেসরকারী গুণ্ডামি

অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকেরা অত্যাচার করে, ভয় দেখায়, জোর করিয়া টাকা আদায় করে, এক কথায় গুণ্ডামি করে, এই ওজুহাতে গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাসেবক হওয়াটাকেই বেআইনী কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের মধ্যে কোথাও কোন অত্যাচার হয় নাই, ইহা আমরা বলিতে পারি না। চট্টগ্রামে ও অন্যত্র লোককে অস্ত্রাঘাত, লোকের বাড়ীতে, গায়ে ও মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ, ইত্যাদি হইয়াছে, খবরের কাগজে দেখিয়াছি। ইহা অত্যন্ত বর্ব্বর ও গর্হিত আচরণ। কোন অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক এরূপ কাজ করিয়া থাকিলে তাহা সাধারণ গুণ্ডার এরূপ কাজ অপেক্ষা অনেক বেশী নিন্দনীয়। কিন্তু অসহযোগীদের দ্বারা এরূপ কাজ হইয়াছে বলিয়া আদালতে কয়টি মোকদ্দমা হইয়াছে, এবং কয়টিতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে? আমাদের ধারণা, এরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা এবং এরূপ প্রমাণের পরিমাণ এরূপ হয় নাই যাহাতে অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে গুণ্ডামির অভিযোগ আনা যাইতে পারে।

অপর দিকে ইংরেজী ও বাংলা খবরের কাগজে সরকারী গোরা-সৈনিক, সরকারী পুলিস্ সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালা, এবং আধা-সরকারী সিবিল গার্ডদের দ্বারা মানুষকে প্রহারের এবং লুটতরাজের বহুসংখ্যক অভিযোগ, তারিখ, সময়, স্থান, ও অত্যাচারীদের নাম সমেত, মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ বিস্তারিত বর্ণনাও বাহির হইয়াছে, যাহাতে সংক্ষেই ধরা যায়, যে, কে বা কাহারা অত্যাচার করিয়াছে। এই সব অত্যাচার কাহিনীর অধিকাংশের গবর্ণমেণ্ট কোন তদন্ত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

কংগ্রেস্

আগে আগে কংগ্রেসে যেখান হইতে যত ইচ্ছা প্রতিনিধি পাঠান চলিত। গত বৎসর স্থানের লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইবার নিয়ম হয়। তাহা সত্ত্বেও এবার আহমদাবাদ কংগ্রেসে খুব প্রতিনিধির ভীড় হইয়াছিল। দর্শক ও প্রতিনিধির সংখ্যা বার হাজার হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দিনে যত লোক কংগ্রেস পাণ্ডালে দর্শকরূপে গিয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী বলেন, তাহাদের সংখ্যা ন্যূনকল্পে দুই লক্ষ হইবে।

সকলের মুখে বিশ্বাস ও আশার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। সকলে যেন অনুভব করিতেছিল, যে, দুঃখ সহিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে।

কংগ্রেসের কাজ এবার খুব অল্প সময়ে হইয়াছিল, বক্তৃতাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়ায় দুর্শকগণগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন, এবং দু-একবার জোর করিয়া কংগ্রেস মণ্ডপে ঢুকিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আরো সুশৃঙ্খলা ও আত্মসংযমের প্রয়োজন। প্রতিনিধিরাও কেহ কেহ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই, নিজ নিজ প্রদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাদের বাসের ও আহারের ব্যয় দিতে চান নাই। গান্ধী মহাশয় বলেন, যে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে, একজন গুজরাতী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য একজন দর্শক-বন্ধুর টিকিট নিজের বলিয়া চালাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যের জন্য কেবল নৈতিক শক্তির, সাত্ত্বিক শক্তির উপর নির্ভর করে। অতএব আমাদিগকে সর্ব্বদা খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

খাদি নগর ও মুস্‌লিম নগর

কংগ্রেসের ও খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিদের বাসস্থানকে খাদি নগর ও মুস্‌লিম নগর নাম দেওয়া হইয়াছিল। মণ্ডপ ও তাঁবু নির্ম্মাণ করিতে যত কাপড় লাগিয়াছিল, সমস্তই চর্‌খায় কাটা সুতায় হাতের তাঁতে বোনা; ইহাই খাদি নগর নাম দিবার কারণ। সাড়ে তিন লক্ষ টাকার খাদি বা ঘর-বোনা কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা সমস্তই গুজরাটে নির্ম্মিত এবং ইহা ব্যবহারের জন্য অভ্যর্থনা-কমিটি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন। তাঁহারা পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের মত স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি-দের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। নারীদের কার্য্যে ও গতি-বিধিতে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করা সমাজসংস্কারকদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে।

খাদি নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থায় বিশেষত্ব ছিল। পায়খানার জন্য জুলি (trench) কাটা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর তাহাতে পরিষ্কার মাটি চাপা দেওয়া হইত। এইজন্য কোন দুর্গন্ধ ও মাছির উপদ্রব হয় নাই। বেতনভোগী মেথর নিযুক্ত করিতে হয় নাই। সকল জাতি ও ধর্ম্মের স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজনীয় কাজ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া করিয়াছিলেন। প্রক্রিয়াটি এরূপ পরিষ্কার, সহজ ও শীঘ্রসম্পাদ্য, যে, কাহাকেও ময়লা বা মাটী স্পর্শ করিতে হইত না।

কংগ্রেসের ও মুস্‌লিম লীগের কাজ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীনতালাভ কংগ্রেসের বা মুস্‌লিম লীগের উদ্দেশ্য, এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই; যদিও

ইহা বুঝা গিয়াছে যে, এরূপ প্রস্তাবের পক্ষপাতী লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, এরূপ প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের মত অনেকবার প্রকাশ করিয়াছি। কাহারো কাহারো ধর্ম্মবিশ্বাস এইরূপ, যে, তাঁহারা কোন কারণে এবং কোন অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ ও অস্ত্র ব্যবহার করিয়া মানুষকে আঘাত বা বধ করিতে চান না। তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্যও যুদ্ধ করিবেন না। যাঁহারা অবস্থা বিশেষে যুদ্ধ করা বৈধ মনে করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, ভারতবর্ষের লোকদের সশস্ত্র যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং যুদ্ধ করিবার কথা পর্য্যন্ত তোলা উচিত নয়। সুখের বিষয়, প্রাণ দিতে রাজী লক্ষ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে আছেন। কিন্তু প্রাণ দিতে রাজী থাকিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না; অস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। জলযুদ্ধের জন্য আমাদের সশস্ত্র রণতরী কোথায়? ডুবন্ত জাহাজ বা সব্‌মেরীন্ কোথায়? আকাশযুদ্ধের জন্য এরোপ্লেন কোথায়? স্থলযুদ্ধের জন্য নানাপ্রকার ছোট বড় কামান বন্দুক শেল্ গোলা গুলি বারুদ প্রভৃতি কোথায়? কুচকাওয়াজ শিখাইবার ময়দান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এই-সব কোথায়? যেরূপ যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের সামর্থ্য ও আয়োজন বেশী, এবং আমাদের সামর্থ্য ও আয়োজন খুব কম, তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করা মূর্খতা নহে কি?

কিন্তু তাহারও আগে জিজ্ঞাস্য এই, যে, শান্তির পথে, নিরুপদ্রব পথে, যাহা কিছু করা যায়, গবর্ণমেণ্টের বৈধ অবাধ্যতা করিয়া, গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স না দিয়া, গবর্ণমেণ্টের সৈনিক অসৈনিক কোন বিভাগে কাজ না করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া, সিদ্ধিলাভের জন্য যাহা যাহা করা উচিত, তাহা কি করা হইয়াছে, যে, তাড়াতাড়ি যুদ্ধের কথাটা তোলা হইল? মহাত্মা গান্ধীও বারবার বলিয়াছেন, যে, স্বরাজ লাভের জন্য যাহা কিছু করা দরকার, এখনও তাহা করা হয় নাই।

অনেক অসহযোগী মুখে বলিতে না পারুন, কিন্তু মনে করেন, যে, অস্পৃশ্যতা দূর করা স্বরাজ লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক নহে। অস্পৃশ্যতা-দূর না করা যে ঘোরতর অধর্ম্ম, এই অতি সত্য কথা না-হয় এখন নাই তুলিলাম। কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য দেশের লোকদের মধ্যে এমন একটা একপ্রাণতা আবশ্যক, যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের শত্রুতা করিবার জন্য কোন প্রবল বা সংখ্যাবহুল দল পাইবেন না; ইহা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় লোকদের সংখ্যা ৫.৬ কোটি। ইহাদের উপর শত শত বৎসর ধরিয়া এরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, যে, ইহাদের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে যেখানেই ইহাদের জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেখানেই ইহারা "উচ্চ" জাতিদের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া আছে। দক্ষিণভারতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই কারণে ঘোর বিবাদ ও বিরোধের অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ রক্তপাত হইয়াছে। বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময় নমঃশূদ্রেরা তাহাতে যোগ দেয় নাই; এখনও অসহযোগ আন্দোলনে তাহাদের সকলের বা অধিকাংশের যোগ নাই। অথচ সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর ও জাতির লোকদের যোগ ব্যতীত স্বরাজ্য লাভ হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী আর যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন, যথা ঘর-বোনা কাপড় ব্যবহার, তাহাও অল্পই হইয়াছে। সরকারী চাকরী ত্যাগও সামান্যই হইয়াছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি যুদ্ধের কথা পাড়া, তর্কের খাতিরে একাগ্রতা ও উৎসাহের পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহা হোঁৎকামি তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রয়োজন হইলে নিরুপদ্রব সাত্ত্বিকভাবে আইন লঙ্ঘন ও গবর্ণমেণ্টের অবাধ্যতা করা যে বৈধ, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে নিজের দায়িত্বে ইহ যে-কেহ ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন। কিন্তু দলে দলে ইহা করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী যে-সব সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আগে পালিত হওয়া আবশ্যক; এবং যথেষ্ট আত্মসংযমও চাই। অনেক মানুষ একা একা বেশ ঠাণ্ডাভাবে কাজ করা যায়। কিন্তু জনতার উৎসাহের এমন একটা মাদকতা আছে যে, উৎসাহের আতিশয্যে জনতার অঙ্গীভূত মানুষ অনেক সময়ে এমন অপকর্ম্ম করিয়া ফেলে যাহা সে একা মনের ধীর শান্ত অবস্থায় কখনও করিত না। এইহেতু নিরুপদ্রব সাত্ত্বিক অবাধ্যতা করিবার জন্য খুব বেশী সাধনা ও সংযম চাই।

কংগ্রেসের একটি কাজের সমালোচনা কংগ্রেসের বিরোধীরা করিয়াছেন, এবং কোন কোন কংগ্রেসদলভুক্ত লোকেও করিয়াছেন। তাহা, মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দেওয়া। একচ্ছত্র প্রভুত্ব গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং কোন মানুষ যত বুদ্ধিমান্ বিবেচক জ্ঞানী ও সাধু হউন না কেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত যে বরাবর সকল স্থলে জনসাধারণের পরস্পরপরামর্শোদ্ভূত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বা তাহার সমান ভ্রমশূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং যদি স্থায়ীভাবে গান্ধী মহাশয়কে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইত, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই ভুল হইত। কিন্তু যেমন যুদ্ধের সময় সর্ব্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক দেশেও

একজন সেনাপতিকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হয়, তেমনই বর্ত্তমান সময়ে স্বরাজ-লাভের জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতীয় জনসাধারণের নিরস্ত্র সংগ্রাম যে সঙ্কট অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহাতে কিছুকালের জন্য একনায়কত্বের আবশ্যক আছে মনে করি। মহাত্মা গান্ধীকে খুব ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকিলেও তিনি কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতে গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে কিম্বা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ও নীতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

—

বোম্বাইয়ে নেতাদের মন্ত্রণাসভা

গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নিগ্রহনীতির পুরাপুরি সমর্থন মিসেস্ এনী বেসাণ্ট ও তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া দেশের আর কোন রাজনৈতিক দল বা নেতা বোধ হয় করেন না। এলাহাবাদে উদারনৈতিক সঙ্ঘের অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনাকমীটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাঘব আইয়ার ইহার প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন। অন্য দিকে, ব্রিটিশসাম্রাজ্য হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত না হওয়ায়, দেখা যাইতেছে, যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব্রিটেনের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া স্বরাজলাভ। তদ্ভিন্ন, কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধী মডারেটদিগের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি এবং তাঁহাদিগকে উপহাস বিদ্রূপ আদি চান না, বরং যতটা সম্ভব তাঁহাদের ও কংগ্রেসের সাধারণ উদ্দেশ্যসকল সাধনে তাঁহাদের সহযোগিতাই চান। কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে নিরুপদ্রব অবাধ্যতা আরব্ধ হইলে দেশে জনসাধারণের মধ্যেই ছুটা দলে অন্তর্বিবাদের সৃষ্টি হইয়া তাহা সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে, এরূপ লক্ষণও দেখা যাইতেছে। এ-অবস্থায় প্রধানতঃ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় বোম্বাইয়ে সকল দলের নেতাদের যে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন অদ্য ৩০শে পৌষ হইবে, তাহা সর্ব্বথা অনুমোদনীয়। ভারতীয় জনসাধারণের আত্মসম্মানের কোন লাঘব না করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে কি না, পারিলে উহার সর্ত্ত কি কি, তাহা স্থির করা এই এই সভার উদ্দেশ্য।

—

খুলনা জেলায় চর্‌খা ও তাঁত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ খুলনা জেলার নিরন্ন দরিদ্র লোকদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য চর্‌খা ও তাঁত চালাইবার খুব চেষ্টা করিতেছেন। মানুষকে ভিক্ষোপজীবী না রাখিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় ও সাধু চেষ্টা। সকল জেলাতেই এইরূপ কাজ হওয়া উচিত। কাগজে দেখিলাম, রায় মহাশয় ঘর-বোনা কাপড়ের সর্ব্বত্র প্রচলন জন্য সামাজিক শাস্তি বিধানেরও, অর্থাৎ যাহারা ঐরূপ কাপড় ব্যবহার না করিয়া অন্যবিধ কাপড় পরিবে তাহাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করা বা তাহাদিগকে একঘরে করার, সমর্থন করিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে দুঃখের বিষয়। কোন প্রকার চাপ বা শাস্তি দিয়া মানুষকে সৎকার্য্য করানও সুনীতি নহে। ইহাতে সিদ্ধিলাভও হয় না।

—

সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্স

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কংগ্রেস্-সপ্তাহে সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল্ রিফর্ম্মার কাগজের সুযোগ্য সম্পাদক নটরাজন্ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন, যে, অস্পৃশ্যতা দূর না করিতে পারিলে আমরা স্বরাজের যোগ্য হইতে পারি না। কন্‌ফারেন্স জাতিভেদের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে, সকল হিন্দু-জাতির একত্র পংক্তিভোজন ও বৈবাহিক আদান-প্রদানের সপক্ষে, এরূপ বিবাহের বৈধতাসম্পাদক আইনের সপক্ষে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অবনত জাতিদের উন্নয়নের সপক্ষে, কার্‌খানা ও খনির শ্রমজীবীদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ, তাহাদের পরিবেষ্টন সুনীতিবর্দ্ধক করা এবং তাহাদের সন্তানদের জন্য স্কুল স্থাপনের সপক্ষে, সুরা ও মাদক দ্রব্য উৎপাদন, আম্‌দানী ও বিক্রীর বিরুদ্ধে, বিধবা-বিবাহের সপক্ষে, এবং বিধবাদের অবস্থার উন্নতির জন্য পরিচালিত সেবাসদন বনিতাবিশ্রাম প্রভৃতির সপক্ষে প্রস্তাব ধার্য্য করেন। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কুসংস্কার অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় কন্‌ফারেন্স সন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু এখনও বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুবিধা বিদ্যমান না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন; এবং সমুদয় সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানকে ও ধনীলোকদিগকে বালিকা ও নারীদের শিক্ষার জন্য সর্ব্ববিধ শিক্ষালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। জাতীয় দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের অবনতিতে কন্‌ফারেন্স ভীত হইয়াছেন। ইহার মতে এই অবনতির কারণ (১) বাল্য-বিবাহ, (২) দৈহিক উৎকর্ষসাধনে যথেষ্ট মনোযোগের অভাব, (৩) খেলা ও নির্দ্দোষ কালক্ষেপের জায়গার অভাব, (৪) খাদ্য-দ্রব্যের অপকৃষ্টতা ও মহার্ঘতা, (৫) অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ। কন্‌ফারেন্স সর্ব্বসাধারণকে এবং মিউনিসিপালিটী, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতিকে এইসব কারণ দূর করিতে অনুরোধ করেন। মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞেরা বলপূর্ব্বক কাহাকেও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করায় এবং হিন্দু পণ্ডিতেরা এরূপে দীক্ষিত লোকদের জাতি বা ধর্ম্ম নাশ হয়

না বলায় কন্ফারেন্স অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মালাবারে মোপ্লাদের দ্বারা দীক্ষিত এরূপ হিন্দুদিগকে জাতিতে লইতে অন্য হিন্দুরা প্রস্তুত থাকায় কন্ফারেন্স সন্তুষ্ট হইয়াছেন, মালাবারের উপদ্রবে বিপন্ন লোকদের সহিত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাদের সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠিত ফণ্ডের সমর্থন করিয়াছেন। কন্ফারেন্স সর্ব্বান্তঃকরণে এই ইচ্ছা জানাইয়াছেন, যে, অপরাধপ্রবণ বা চৌর্য্যাদিজীবী জাতি (criminal tribes)-সমূহের সংশোধন, নিঃসম্বল ভিক্ষুকদের দুঃখ মোচন, পতিতা নারীদের জন্য স্থাপিত উদ্ধারাশ্রম পরিচালন, প্রভৃতি সামাজিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের ভার যেন ভারতীয়দের উপর দেওয়া হয়; এইজন্য ভারতীয় পুরুষ ও নারীদিগকে এইসব প্রতিষ্ঠানের ভার লইবার, উপযুক্ত শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য। কন্ফারেন্স নিম্নলিখিত প্রথা ও রীতিগুলি দূষণীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন:—বাল্যবিবাহ, অল্পবয়স্কা বালিকাদের সহিত বৃদ্ধ পুরুষদের বিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অতিরিক্ত ব্যয়, মৃত্যু উপলক্ষ্যে লোক-দেখান শোকাতিশয্য প্রকাশ। কন্ফারেন্স সর্ব্বপ্রথমেই এই প্রস্তাব ধার্য্য করেন, যে, দেশে যেরূপ অধিক রাজনৈতিক প্রগতি হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সামাজিক কর্ম্মশক্তি ও কার্য্যক্ষমতা তদনুরূপ বাড়াইয়া জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনার্থ একাগ্র ও আন্তরিক চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

(" In view of the immense political progress visible all round in the country, this conference is of opinion that in order to bring about a harmonious all-round national development, it is essentially necessary to make strenuous efforts to bring about higher social efficiency for the Indian Nation.")

—

এলাহাবাদে উদারনৈতিক সংঘ

পঞ্জাবে অত্যাচারী সরকারী কর্ম্মচারীদের সমুচিত দণ্ড দেওয়া হয় নাই, এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ভারতীয় মুসলমানদিগকে তুরস্ক সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি রক্ষা করেন নাই, এবং এই দুই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য পালন উচিত, বলিয়া, উদারনৈতিক সংঘ মত প্রকাশ করেন। সংঘ প্রাদেশিক সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব, এবং সমগ্রভারতীয় কতিপয় রাষ্ট্রীয় কাজ ও বিভাগে দায়ী ভারতীয় মন্ত্রী নিয়োগ চাহিয়াছেন। নিগ্রহনীতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু ও গোবিন্দ রাঘব আইয়ারের মতের উল্লেখ উপরে করিয়াছি। প্রথমে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদপূর্ণ প্রস্তাব ধার্য্য করিবার এবং প্রকাশ্যসভা ও বেআইনী সমিতির নিষেধক আইন দুটি প্রত্যাহার করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার কথা হয়। কিন্তু মিসেস্ বেসাণ্টের জেদ, প্রভাব ও অনুচরবাহুল্যে তাহা হয় নাই। ইহাতে সংঘ নিন্দাভাজন হইয়াছেন।

—

আহমদাবাদে নারীদের কন্ফারেন্স

আহমদাবাদে নারীদের কন্ফারেন্সে সভাপতি ছিলেন মৌলানা শৌকতআলী ও মৌলানা মোহম্মদআলীর শ্রদ্ধেয়া বর্ষীয়সী মাতা। ১৫০০০ নারী উপস্থিত ছিলেন। সভামণ্ডপে আলীভ্রাতাদ্বয়ের জননীর বক্তৃতা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। এরূপ বিরাট নারীসভার কথা ভাবিলে হৃদয় পুলকিত হয়।

—

একটি উপাধির গূঢ় অর্থ

ইংরেজী নও-রোজে দস্তুর-মত উপাধি-বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। একটি উপাধি গভীর অর্থপূর্ণ। মালাবারে মালগাড়ীতে বদ্ধ মোপ্লা বন্দীদের বাতাস অভাবে দম আট্কাইয়া মৃত্যু ঘটে স্পেশ্যাল কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ন্যাপ (Knapp) নামক কর্ম্মচারীর কার্য্যকালে। তিনি এ বিষয়ে দোষী কি না, বা কি পরিমাণে দোষী, তাহা নিরূপিত হওয়া উচিত ছিল। অথচ এই শোচনীয় ঘটনাটির তদন্ত করিবার ভারপ্রাপ্ত কমিটির সভাপতি তিনিই নিযুক্ত হন! এক্ষণে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট একটা উপাধিও দিয়াছেন! কিন্তু এ পর্য্যন্ত মোপ্লাদের মৃত্যুর জন্য কাহারও সাজা হয় নাই। ইংরেজ আম্লাতন্ত্রের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। উহার রীতিই এই, যে, ভারতীয় জনমত যে-কর্ম্মচারীকে দোষী মনে করে, বা যাহার কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চায়, জনমতের গালে চপেটাঘাত স্বরূপ উহা তাহাকে সাক্ষাৎ বা প্রকাশ্যভাবে পুরস্কৃত করে।

—

সর্ব্বজ্ঞ ও নিরঙ্কুশ বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লাহোরে এক বক্তৃতা করেন। খবরের কাগজে তাঁহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে দেখিলাম, তাঁহার মতে যত রকমের ছাত্র যে-কোন বিদ্যা শিখিতে চায়, তাহা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। এরূপ লম্বাচৌড়া কথা বলিতে ও শুনিতে বেশ। কিন্তু এহেন বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীতে সমৃদ্ধতম ও শিক্ষিততম কোন দেশেও নাই। গরীব ভারতবর্ষে বিশালতম হইবার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা (megalomania) প্রকাশ না করিয়া দমন করিলেই ভাল হয় না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ত দেউলিয়া করা হইয়াছে; উহার মূলীভূত একবিধ উন্মাদ আবার অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা কেন?

ঐ বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বাধা দিবার শক্তিবিশিষ্ট বাহিরের কোন মানুষ, নিয়ম, ইত্যাদি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। একটু বলিতে বাকী থাকিয়া গিয়াছে। বলা উচিত ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সর্ব্বেসর্ব্বা থাকা উচিত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করিবার কোন শক্তি, লোক বা নিয়মের বাধা যেন না থাকে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা আমরাও চাই। কিন্তু উহা গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে লোকমত দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহাই চাই। অধিকন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট বা আর কাহারও নিকট হইতে টাকা চান, তাহা হইলে অর্থদাতার নিয়মে ও সর্ত্তে অবশ্যই আবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং তজ্জন্য জবাবদিহিও থাকিবে। একেবারে নিরঙ্কুশ হইবার ইচ্ছা করা ভাল নয়।

—

মন্ত্রীদের বেতন

আগামী সপ্তাহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনজন মন্ত্রীর বেতন বাবতে বার্ষিক ১৯২০০০ টাকার অর্থাৎ প্রত্যেকের ৬৪০০০ টাকা বেতনের মঞ্জুরী চাওয়া হইবে। ইহা কমাইবার প্রস্তাব অনেকগুলি আছে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, জাপানী মন্ত্রীদের মত আমাদের মন্ত্রীদের মাসিক বেতন ১০০০ টাকা হওয়া উচিত। সত্য বটে, মন্ত্রীদের অধস্তন অনেক কর্ম্মচারী ১০০০ অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন পান; কিন্তু তাহার উপর আপাততঃ আমাদের হাত নাই। যেখানে হাত আছে, সেখান হইতেই দেশের হিতকর ব্যবস্থার সূত্রপাত হউক। মন্ত্রীদের বেতন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে অনেক আগে হইতে লেখা হইতেছে। দৈনিক হিন্দুস্থান এইরূপ কার্য্যে হয়ত আমাদের পরে হাত দিয়াছেন; কিন্তু এই কাজ হিন্দুস্থানের মত অধ্যবসায় তথ্যবাহুল্য ও যুক্তিবলের সহিত কোন কাগজই করেন নাই। এজন্য মুক্তকণ্ঠে হিন্দুস্থানের প্রশংসা করিতেছি।

—

আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেনের সন্ধি

আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেনের সন্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সন্ধির সপক্ষে শিন-ফেন প্রতিনিধিসভায় ৬৪জন সভ্য ভোট দিয়াছিল, বিপক্ষে ৫৭জন। মিঃ ডি ভ্যালেরাকে শিন-ফেন দলের পুনর্ব্বার সভাপতি করার প্রস্তাব কেবল দুটি ভোটে নামঞ্জুর হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান সন্ধির বিরোধী ছিলেন। সুতরাং এখনও বলা যায় না, যে, আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

—

নিরস্ত্রীকরণ কন্ফারেন্স

যুদ্ধের আয়োজনের ব্যয় উত্তরোত্তর না বাড়াইয়া ইংরেজী-ভাষী জাতিদের সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধশক্তিমান্ থাকিবার ব্যবস্থা ওয়াশিংটন নিরস্ত্রীকরণ কন্ফারেন্সে কাগজে কলমে হইয়াছে। কাজে কি হয়, দেখা যাইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির এরোপ্লেনের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই ত? উহা দ্বারাও খুব যুদ্ধ চালান যায়।

—

পুলিশ কন্ফারেন্স

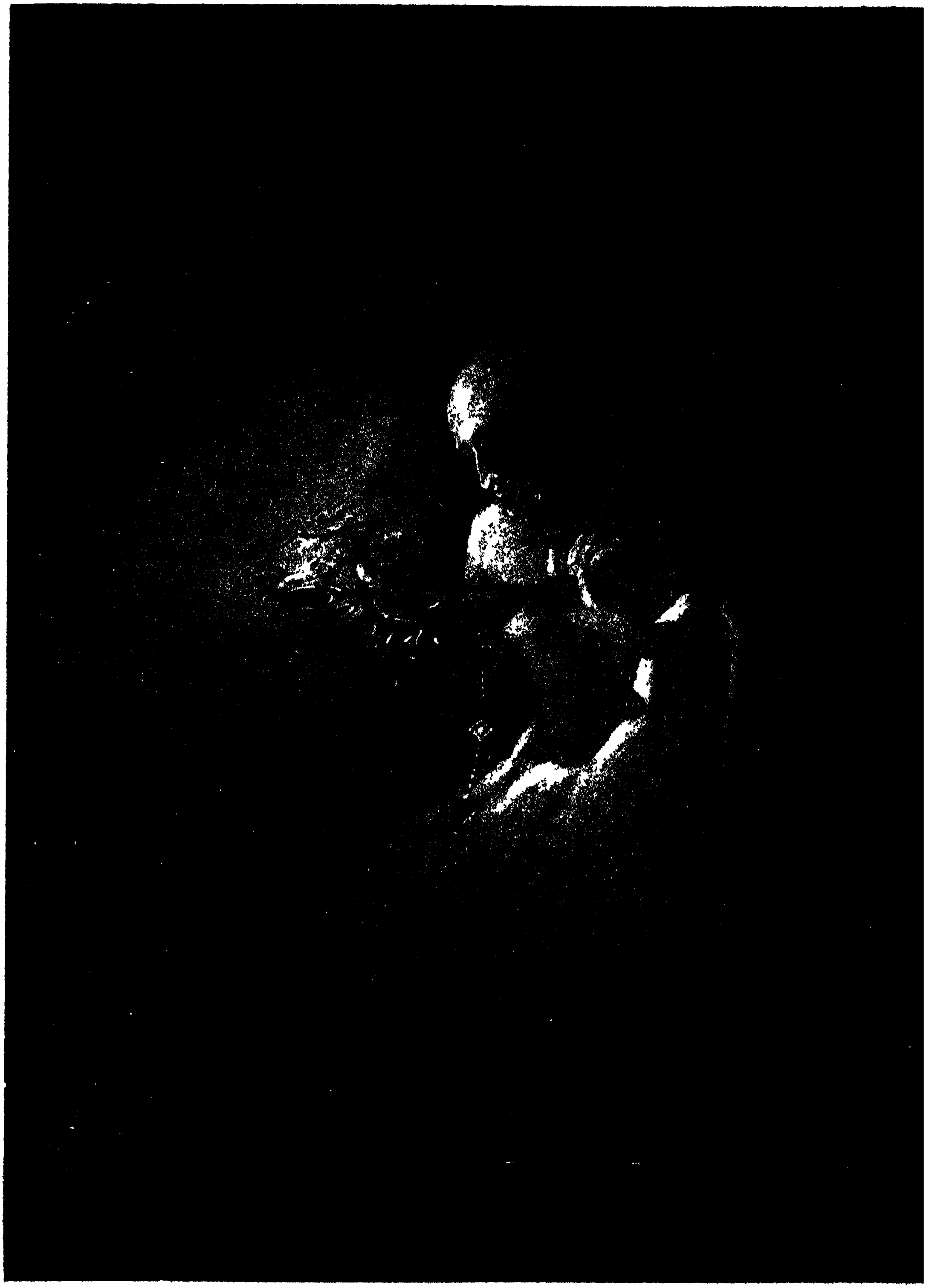
হাবড়ায় পুলিশ কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি রায়সাহেব পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস বি-এর অভিভাষণ খুব যোগ্যতার পরিচায়ক। পুলিশের কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব হিসাবে নিম্নতন কর্ম্মচারীদের বেতন বড় কম; উচ্চতম কর্ম্মচারীদের বেতন সে অনুপাতে অত্যন্ত বেশী। পাহারাওয়ালা ১৩ বা ১৫ টাকা বেতন পাইলে ইন্স্পেক্টর-জেনারেলের ৩০০০ টাকা পাওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। ন্যূনতম বেতন ৩০, এবং উচ্চতম বেতন ১০০০এর অনধিক হওয়া উচিত। নানা কারণে আমাদের দেশে পুলিশের বদ্নাম আছে। কর্ম্মচারীদের অভাব-অভিযোগ দূর করিলে সে বদ্নাম দূর হইবে। সমাজস্থিতির পক্ষে পুলিশের কাজ অত্যাবশ্যক, এবং এই বিভাগে এখন আগেকার চেয়ে অনেক ভাল লোক কাজ করেন।

—

"শিশুর স্বর্গ"

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত বড় রঙীন ছবিটি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত। তিনি উহার নাম দিয়াছেন, "শিশুর স্বর্গ"। শিশু একটি সামান্য খেলনা পাইয়া কেমন তদ্গতচিত্তে আনন্দে বিভোর হইয়াছে, তাহাই তিনি সুনিপুণ ভাবে, শিশুর সহিত একহৃদয় হইয়া, দেখাইয়াছেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি, হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না

শিল্পী শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সৌজন্যে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২১শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৮

৫ম সংখ্যা

নাথপন্থ

নাথপন্থ নামে একটি বড় ধর্ম্মসম্প্রদায় খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষে * প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে। তার পর ক্রমশঃ পূর্ব্বভারতে, পশ্চিম-, মধ্য- ও দক্ষিণ-ভারতে নাথ-সম্প্রদায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিষ্য-শাখার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। সাধারণতঃ পণ্ডিতদিগের ধারণা যে, নাথপন্থীদের প্রাদুর্ভাব কবীর বা নানকের সময়েই হইয়াছিল †। ইহার পূর্ব্বে যে নাথদের অস্তিত্ব ছিল, একথা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এতদিন মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিব্বতীয় গ্রন্থ-মালার প্রমাণে রুশদেশীয় পণ্ডিত ভাসিলীফ (Wasilief) স্থির করিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খৃষ্টজন্মের আট শত বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন। তিব্বতীদের মতে গোরক্ষনাথ প্রাচীন ধর্ম্মগুরু হইলেও, বস্তুতঃ এত প্রাচীন ছিলেন না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মৎস্যেন্দ্র বা মচ্ছেন্দ্রনাথের ২২জন (কাহারও কাহারও মতে ১২জন) শিষ্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোরক্ষনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। তার পর গুরুপরম্পরা লইয়াই গোলমাল। মচ্ছেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ। তারপর ধর্ম্মনাথ। ধরমনাথ পেশওয়ার হইতে কাটিয়াবাড়ে আগমন করেন। অতঃপর তপ করিবার জন্য কচ্ছদেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে সরনাথ নামে একজন সাধক ছিলেন। আরও একজন শিষ্য ছিলেন—নাম গরীবনাথ। কচ্ছপ্রদেশের অদ্যাপি ধিনোধরের নাথপন্থীদের নিকট মচ্ছেন্দ্রনাথের গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়। তদনুসারে—

প্রথম গুরু	নিরঞ্জন নিরাকার
দ্বিতীয় „	অধিক সোমনাথ
তৃতীয় „	চেৎ সোমনাথ
চতুর্থ „	ওঁকারনাথ
পঞ্চম „	অচেৎনাথ
ষষ্ঠ „	আদিনাথ
সপ্তম „	মচ্ছেন্দ্রনাথ

এই মচ্ছেন্দ্র সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, বহু তীর্থে বাস করিয়া অনেক শিষ্য করেন। নেপালীরা ইঁহাকে ও আর্য্য-

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অষ্টম শতকের শেষে নাথধর্ম্ম বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয় (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশন, কার্য্যবিবরণ ২১-২২ পৃষ্ঠা)। পূর্ব্বে তিনি লুইপাদের সময় নিরূপণ অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। লুইপাদ যে সে সময়ের লোক নন, পরবর্ত্তী কালের—তাহা তিনি পরে স্থির করিয়াছেন।

† Sir Charles Eliot [Hinduism and Buddhism (1921), Vol. II, p. 117] বলেন যে, চতুর্দ্দশ শতকে নাথদের প্রাদুর্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই তাহাদিগকে সম্মান করিত।

বলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে [Hodgson's Essays (Trubner's reprint), Vol. II, p. 40]।

পঞ্জাবে ও নেপালে সন্তনাথের মন্দির আছে। এই দুই স্থানে ইঁহার পূজা হয়। ধরমনাথ সন্তনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে যে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। রাঁএ়া নামক গ্রামে রাও ভারমলজী-নির্ম্মিত মন্দিরগাত্রে একটি লিপি আছে, তাহাতে লেখা আছে—

সংবৎ ১৬৬৫ না বরষে কারতক সুদ
১৯ পীর শ্রী
ভীযারীনাথ পীর হুআ পীরপন্থ
নাথনা চেলা পীর ভী-
যগীনা চেলা পীর পরভাতনাথ
সধ ধোরমনাথ না পীর আদ
নাথ আ পীর পরভাত রাজশ্রী
খেঙ্গারজী সুত রাজশ্রী
ভারতমলজী বারে পীর আয়া গাম
রায় যরাজত সুপত ধীনোধরজ
যে জে পদ্দর—রাজশ্রী খেঙ্গার-
জীয়ে সাদাবৃত হিন্দুআণে গায়ঠরকাণে
সুথর জে কোই এ গামনো
পচার করে তেহেনে গরীবনাথনা
ভবোভবনা পাপই রাজশ্রী
ভীমনো ধরম ছে, আয়ী দাবো
ধীনোধরনো ছে......

লেনার্ড (Notes on the Kanphata Jogis—Indian Antiquary, Vol. VII, pp. 298-300) বলেন, যখন গোরক্ষনাথ ধরমনাথের সতীর্থ বলিয়া কচ্ছ-প্রদেশের লোকের ধারণা, তখন গোরক্ষনাথকে এই সময়ের ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পশ্চিম ভারতের মতে গোরক্ষনাথ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের ব্যক্তি। এইখানে একটা বিষয়ের বিচার আবশ্যক। গরীবনাথ নামে ধরমনাথের এক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই গরীবনাথ চাটদিগকে বিতাড়িত করিয়া বরার-রাজ্যে রায়ধনকে ১১৭৫খৃঃ হইতে ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (Ind. Ant., Vol. VII, p. 49)। কচ্ছিভাষায়ও এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে *। দলপতরাম প্রাণজীবন খক্কর (Ind. Ant., Vol. VII, p. 49) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এ হিসাবে আবার গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর হইয়া পড়েন।

রাইট সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, (১৪০-১৫২ পৃঃ) রাজা বরদেব বা বরদেবের সময় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে গোরক্ষনাথ নেপালে ছিলেন। Sylvain Levi (Le Nepal, i, 347) লিখিয়াছেন যে, খৃঃ ৭ম শতকে যখন রাজা নরেন্দ্র দেব নেপালে রাজা ছিলেন, সেই সময়ে গোরক্ষনাথ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

উত্তরভারতের প্রচলিত মত অনুসারে ইনি কবীরের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কবীর যখন ১৫শ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন, ইনিও এই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। উইল্‌সন (H. H. Wilson) তাঁহার Religious Sects of the Hindus গ্রন্থে (Vol. I, p. 213) এই উক্তি প্রচার করিয়াছেন। গোরক্ষনাথের সময় সম্বন্ধে এইরূপ অনেক মত আছে। আর যেমন শঙ্কর একজন ছিলেন না, যিনি শঙ্কর-মঠের গদিতে বসিতেন সেই মহান্তই যেমন শঙ্কর হইতেন, সেইরূপ গোরক্ষনাথও একাধিক ছিলেন। সেইজন্যই এত গোল। তবে তিনি যে দ্বাদশ শতকের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীতার মরাঠী ভাষায় বিশদ ভাষ্য-সমন্বিত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়—নাম "জ্ঞানেশ্বরী"। ব্রাহ্মণ সাধু ও কবি জ্ঞানেশ্বর ইহার রচয়িতা। জ্ঞানেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিবৃত্তিনাথ, অপর ভ্রাতার নাম সোপানদেব। মুক্তা-বাঈ তাঁহার ভগিনী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাধু ও কবি ছিলেন। জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত। "জ্ঞানেশ্বরী"র রচনা ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থে গোরক্ষনাথের নাম আছে এবং ইহাতে লিখিত আছে যে, জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। দেখা যাইতেছে, গোরক্ষনাথ এ হিসাবে দ্বাদশ শতকে আসিয়া পড়িতেছেন। জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং গোরক্ষনাথের সময় যে দ্বাদশশতকের পরবর্ত্তী নয়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ গোরক্ষ-নানক-সংবাদ, গোরক্ষ-কবীর-কথা পড়িয়া গোরক্ষনাথকে পঞ্চদশ শতকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এই-সমস্ত গ্রন্থে সম্প্রদায়ের মতবাদ জানা

---

* "গরযো গরীব নাথ। আযো মুখ আবাজ।
কুভা জত কচি ডিয়ো রায়ধনকে রাজ।"

যাইতে পারে, কিন্তু সময় জানা যায় না। কেন না, বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রবল সম্প্রদায়ের সাধুরা দেখাইতে চান যে, তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়াছে। সম্প্রদায়-বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ আখ্যায়িকা প্রধানতঃ রচিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই নানক-পন্থীরা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের গুরু নানক, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথগুরুকে পরাভূত করিয়াছেন. কবীর গোরক্ষনাথকে হারাইয়াছেন; মধ্বাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যকে পরাজিত করিয়াছেন; শঙ্কর ও মধ্ব একসময়ের ধর্ম্মগুরু না হইলেও তাঁহাদের তর্কযুদ্ধের গ্রন্থ যেমন আছে, কবীর-গোরক্ষ, নানক-গোরক্ষের তর্ক-ব্যাপারগ্রন্থও সেইরূপ।

নাথপন্থীদের ধর্ম্ম বুঝিবার দুইটি উপায় আছে। নাথ-, কবীর- ও নানক-পন্থীদের গ্রন্থে নাথদের মতের অনেক খবর আছে। সেইগুলি হইতে তাহাদের ধর্ম্মমত উদ্ধারের একটি পথ আছে। ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত পরম্পরাগত নাথমত সংগ্রহ, আর-একটি পথ। এই উভয়বিধ উপায়ের তুলনা ও সামঞ্জস্যে নাথমতের বিবরণ ও ইতিহাসের উদ্ধার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

নাথগুরু গোরক্ষনাথ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম,—

(ভাষা-গ্রন্থ)

(১) গোরখবোধ, (২) দত্তগোরখসংবাদ, (৩) গোরখনাথজীরাপাদ, (৪) গোরখনাথজীকে স্ফুটগ্রন্থ, (৫) জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, (৬) যোগেশ্বরী সাখী, (৭) বিরাট্ পুরাণ, (৮) গোরখসার।

(সংস্কৃত-গ্রন্থ)

(৯) গোরক্ষশতক (জ্ঞানশতক), (১০) চতুরশীত্যাসন, (১১) জ্ঞানামৃত, (১২) যোগচিন্তামণি, (১৩) যোগ-মহিমা, (১৪) যোগ-মার্ত্তণ্ড, (১৫) যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি, (১৬) বিবেকমার্ত্তণ্ড, (১৭) সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি।

ইঁহার রচিত আরও ২৭খানি ছোট ছোট গ্রন্থের নাম 'মিশ্রবন্ধুবিনোদ' পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে। ইঁহার একখানি গদ্যগ্রন্থ আছে। তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

শ্রীগুরু পরমানন্দ তিনকে দণ্ডবত হৈ। হৈঁ কৈসে পরমানন্দ আনন্দ স্বরূপ হৈ সরীর জিন্‌হি কো। জিন্‌হী কে নিত্য গাঁয়ে তে সরীর চেতন্নি অরু আনন্দময় হোতু হৈ। মৈঁ জু হৈঁ গোরিখ সে। মছন্দর নাথকো দণ্ডবত করত হৌঁ। হৈঁ কৈ সে বৈ মছন্দর নাথ। সম্মা জ্যোতি নিশ্চল হৈ অন্তহকরন জিনি কো স্বার তৈ ছহ চক্র জিনি নীকী তরহ জানৈ।......

পরাধীন উপরাতি বন্ধন নাহী, সুআধীন উপরাতি মুকতি নাহী, চাহি উপরাতি পাপ নাহী, অচাহী উপরাইতি পুনি নাহী, ক্রম উপরাতী মল নাহী, নিহক্রম উপরাইতি নিরমল নাহী, দ্রুম উপরাতি কুবধি নাহী, নিরদোষ উপরাতি সবধি নাহী, যোর উপরাংতি মন্ত্র নাহী, নারায়ণ উপরাঈতি ঈসট নাহী, নিরজন উপরাঈতি ধ্যান নাহী।

মরাঠী ভাষায় 'নবনাথ ভক্তিসার' নাথপন্থের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ সাত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সুপ্রাচীন নাথ মত-পরম্পরা হইতে সংগৃহীত হইয়া ১০৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪১ শক জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদে* সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে নবনাথের বিবরণ আছে। ইহাতে নাথ-পন্থের কিছু কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। "প্রাণ-সংগলী" পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত নানক-বিরচিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৯১২ সালে এলাহাবাদ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে নাথ-সম্প্রদায়ের মতবাদের অনেক কথা আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "কৌলজ্ঞাননির্ণয়" নামে মৎস্যেন্দ্রনাথের একখানি তন্ত্রের পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয়-সম্পাদিত "বৌদ্ধগান ও দোহাকোষে" নাথপন্থী মীননাথের একটি কবিতা আছে। কবিতাটি বাঙ্গালায় লিখিত বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥
—(৩৮ পৃষ্ঠা)

সন্ধ্যাভাষায় লিখিত বৌদ্ধগান ও দোহাকোষে নাথ-পন্থেরও একটু আধটু ইঙ্গিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নাথদিগের মত ছিল "হঠযোগ"। প্রথম প্রথম নাথেরা শিবের পূজা করিত, শিবকে তাহাদের দেবতা বলিয়া মানিত। তারপর শৈব মত ভাঙ্গিয়া তাহাতে সহজযান ও বজ্রযান মিশাইয়া নাথেরা একটি মতের প্রবর্ত্তন করে। মৎস্যেন্দ্রনাথ কিছু বেশী শৈবভাবাপন্ন ছিলেন।

* "তরী সম্রাণে একে চালিস। প্রমাথী নাম জ্যেষ্ঠমাস। শুক্লপক্ষ প্রতিপদেস। গ্রন্থ সমস্ত জাইলা। ১৭।"

গোরক্ষনাথ ছিলেন বেশী বৌদ্ধভাবাপন্ন। পরে তিনি পুরা বৌদ্ধ হন। শেষে নামে শৈব—কিন্তু কাজে নয়। নাথদের কোন্ সময়ে কি মত ছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। নাথধর্ম্ম জানিতে হইলে নাথদিগের বর্ত্তমান ও যতদূর সম্ভব অতীতকালের প্রথার আলোচনা আবশ্যক। আপাততঃ দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমরা নাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

নাথ সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ গোরখপন্থীরা কর্ণ বিদ্ধ করিয়া স্ফটিক, বেলওয়ার, গণ্ডারের শিং অথবা হাতীর দাঁতের তৈয়ারি ভূষণ কর্ণে পরিয়া থাকে। এই কর্ণভূষণের নাম 'মুদ্রা'। সাধারণতঃ বসন্ত পঞ্চমীতে ইহারা কর্ণবেধ করিয়া থাকে। মন্ত্র পড়িয়া কানে মুদ্রা পরে। স্ত্রীলোকের দর্শনে বা আহারের দোষে কান পাকিয়া যাইবে, এই ভয়ে কান ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা ফলাহার করে ও নির্জ্জন গৃহে থাকে। নাথদের মধ্যে এই মুদ্রার একটি বিশেষ তত্ত্ব আছে। তাহা এই—জপজী উপদেশ করেন—

মুদ্রা সন্তোষ, সরম পত ঝোলি, ধিয়ান কী করে বিভূতি,
খিন্থা অকাল কুয়ারি কায়া, জগতি ডণ্ডা পরতীত।
আয়ী পন্থী সগল জমাতী, মনজীতে জগজীত।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একো বেস।

"নাথ-যোগীদের সন্তোষই মুদ্রা বা কর্ণবেধস্বরূপ, অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচারে স্থিতি হওয়াই যোগিগণের সন্তোষরূপী মুদ্রাস্বরূপ; লজ্জা অর্থাৎ জ্ঞানে নম্র হওয়াই, যোগিগণের ভিক্ষার ঝুলি স্বরূপ; পরমাত্মার ধ্যান তাহাদের ভস্মলেপনস্বরূপ; কালপরিচ্ছেদ-রহিত, অর্থাৎ জন্মমরণাদি-রহিত কায়া, তাহার আবরণ কন্থাস্বরূপ এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই তাহার আশ্রয়দণ্ডস্বরূপ। মনোজয়ের দ্বারা পঞ্চভূতাদির জয়, সকল ধর্ম্মপথের ভিতর শ্রেষ্ঠ পথ, অর্থাৎ ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা বিষয়াকার বৃত্তির জয়ের নামই মনের জয়; সেই মনের জয় করিতে পারিলেই সকল পথ জয় করা যায়। পরমাত্মাকে আমি বার বার নমস্কার করিতেছি, এবং আদি, নির্গুণ, অনাদি, অক্ষয় এবং যুগ যুগান্তর ধরিয়া একভাবাপন্ন, সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করিতেছি।"

গোরক্ষনাথ-প্রণীত "সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি নামক গ্রন্থে "আদেশ" একটি সংজ্ঞাত্মক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ আদেশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,——

"আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারতঃ।
ত্রয়াণামেকসংভূতিরাদেশঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

ভূগতি গিয়ান্ দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ, আপি নাথ, নাথী সভ জাকি, রিদ্ধি সিদ্ধি ঐরা সদা। সংযোগ বিয়োগ দুইকার চলাবে লেখে আরে ভাগ আদেশ তিসৈ ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি পরমাত্মার দয়ার ভাণ্ডারস্বরূপ; এই অনুভূতি চরাচর প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বে বিঘোষিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা স্বাক্ষিস্বরূপে, কখন বা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাস্বরূপে, কখনও বা ঋদ্ধিস্বরূপে, কখনও বা সিদ্ধিস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু যোগীরা সংযোগ-বিয়োগরূপ দুই কর্ম্মের নির্ণয় করিয়া উহাদের সত্য অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে নিরালম্ব হন। পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি।

একা মাই জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবাম,
ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দিবান।
জিব তিস্ ভাবৈ, তিব চলাবৈ, জিব হোবৈ ফুরমাণ,
ওহু বেখে, ওনা নদরী ন আবৈ, বহুতা এহু বিড়াণ।
আদেশ তিসৈ আদেস।

এক মাতা স্বাক্ষিস্বরূপ হইয়া তিনজন অনুচরকে প্রমাণরূপে প্রকটীভূত করিয়াছেন; তাঁহার এক চেলার নাম সংসারী, একের নাম ভাণ্ডারী এবং অপরের নাম বিচারকর্ত্তা, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকে সাক্ষী করিয়া তিন গুণ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে একের নাম তমঃ, অন্যের নাম রজঃ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ত্ব। যে ব্যক্তি যে গুণসম্পন্ন, সে সেই গুণের কাজ করে অর্থাৎ সেই গুণের দ্বারা সে সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যে যে গুণপ্রধান, সে সেই গুণের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। অন্য গুণের কার্য্য সে জানে না; এই প্রকারে সে খণ্ডন করিলেও তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। আমি পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

গোরখনাথ বলিতেছেন—

ভাব তাহা—যাহা জ্ঞানের অতীত, অজ্ঞানের স্বপ্নেরও অগোচর, জ্ঞানও নাই, অজ্ঞানও নাই। জ্ঞান অজ্ঞান দুই তিরোহিত কর।

চর্পটনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন জল আর তরঙ্গ, প্রকৃত এক বস্তু, সেইরূপ সংসারে জ্ঞান

বলিয়াও কিছু নাই, অজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, শুধু তাহাই আছে—যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞান পরিহার করিয়া এক অপূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। যাহা আছে, তাহার প্রতিশব্দ নাই, চিহ্ন নাই, সঙ্কেত নাই, যাহা দিয়া লোককে বুঝান যায়। যখন দ্বিত্ব কল্পনা তিরোহিত হয়, তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই তিরোহিত হয়।

আমাদের কঠোপনিষৎও সেইজন্য উপদেশ করিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদপি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥

নাথসন্ন্যাসীরা ঊর্ণনির্ম্মিত সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে ইহারা 'সেলী' বলিয়া থাকে। এবং অঙ্গুলিপরিমিত 'নাদ' নামক একপ্রকার কৃষ্ণ পদার্থ পরিয়া থাকে। যোগিসম্প্রদায় "মেখলা" "বিষ্টি" "সেলী" ও "বিশতি" দেহে ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের দেহে যে মেখলা থাকে, তাহা ধারণের গূঢ়ার্থ "গগন"। 'বিষ্টি' শব্দের প্রকৃতার্থ নরক-দণ্ড হইতে রক্ষার উপায়। দুরাচারী ব্যক্তি নরকে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কিঞ্চিন্মাত্র প্রলোভনবশতঃ যে ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়, তাহাকে দান্ত বা জব্দ রাখিবার জন্য ইহাদের কৌপীন ধারণ। কোন কোন উলঙ্গ সাধু তাম্র বা পিতলের চক্রদ্বারা ইন্দ্রিয় বন্ধ করিয়া থাকে। ইহারই নাম 'বিষ্টি'। কোন কোন সাধু ফকীর বিশতি বা বেড়ীর আকারের কাষ্ঠপাত্র রাখিয়া থাকে। কেহ বা হাতে খপ্পর রাখিয়া থাকে। নাথপন্থীরা এইসব কারণে বলিয়া থাকে—

"গগন মেখলা ধরতি বিসটী।
দয়া সেলী হাথ কিসতী॥"

নাথদের অনেক পরিভাষা আছে। ইহাদের সঙ্গে না মিশিলে সেগুলির অর্থ বোঝা যায় না। ইহারা মর্য্যাদাকে 'বেলা' বলিয়া থাকে। গুরু শব্দে 'শব্দ' বুঝিয়া থাকে। চেলা বলিতে ইহারা 'সুরতি' বুঝিয়া থাকে। ধ্যানকে ডিবী বলে। সন্তোষকে ভুক্তি বলে।

সন্ধ্যা ভাষাতেও ইহাদের অনেক উপদেশ আছে। একটি উদাহরণ হঠযোগ হইতে তুলিয়া দিলাম।

মন ধীরিতে পবন থীর পবন থীরিতে বিন্দু থীর।
বিন্দু থীরিতে কন্দ থীর বলে গোরক্ষ সকল থীর॥

ইহারা বলে—

জোগ যুগতি কৌ চীনতে, তিনকে লক্ষণ কৌন।
তজি নিদ্রা খুধ্যা তরুহি, সুখ শোভা নিশি সৌন॥
(প্রাণসংগলী)

এই উক্তি অনুসারে ইহারা বলিয়া থাকে যে, সুখস্বরূপ শোভায়মানা রাত্রিতে যোগী শয়ান (মগ্ন) হইয়া থাকে। নাথপন্থীমতে ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাত্রিতে যেমন দিবসের সমস্ত কার্য্যের অভাব হয়, সেইরূপ অসৎপ্রপঞ্চের অভাব সম্পাদন করিয়া ভাবরূপী সত্তার উদয় হয়। আর শোভা প্রকাশের অর্থদ্যোতক, সেই প্রকাশ চেতন বস্তুর দ্যোতক এবং ইহাই সুখ বা আনন্দের অপর নাম। এই-জন্য আনন্দস্বরূপী চিন্মাত্রসত্তায় ক্ষুধা ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া থাকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমধামে যোগী শয়ন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যোগী যোগযুক্তি চয়ন করিয়া থাকে।

হঠযোগপ্রদীপিকায়ও এইরূপ কথা আছে—

গজ বাধিয়া রাজা পবন বাধিয়া যোগী।
ধান্য বাধিয়া গৃহস্থ বিন্দু বাধিয়া ভোগী।
(হঠযোগ)

নাথযোগীদের অনেকে নারীকেলের ভিক্ষাপাত্র বা কাঁসার ভিক্ষাপাত্র লইয়া বেড়ায়। হোলির সময় ইহাদের গুরুরা মাটির ঘড়ায় আগুন রাখিয়া তাহা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাকে তাহারা 'খপ্পর' বলে।

গোরখপন্থী ও নানকপন্থী সাধুরা মাথার পাগড়ীতে লৌহের বৃত্তাকার চক্র রাখিয়া থাকে। ইহারা বলে, হাতের আঙ্গুলে ইহা ঘুরাইয়া শত্রুর গলায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। চক্র গলা কাটিয়া বাহির হইয়া চক্রের অধিকারীর নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিত। নাথ সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ ধুনা জ্বালিয়া রাখে। গোকুলাষ্টমী ও নবরাত্রির সময়ে ইহারা খুব বেশী কাঠ দিয়া ধুনী জ্বালাইয়া রাখে। এই সময় চিনি মিশাইয়া গমের আটা কড়ায় করিয়া তাহারা রাঁধে ও খায়। ইহাকে তাহারা "লাপ্সী" বলে। ইহাদের মঠে দুইবার করিয়া খাওয়া হয়। খিচুড়ি ভোগই ইহারা বেশী পছন্দ করে। ইহাদের যাহারা শিষ্য হইতে চায়, তাহাদিগকে শৃঙ্গীনাদ পরিতে হয়। ইহা দিয়া ওঁকার উপদেশ, আদেশের কার্য্য হইয়া থাকে। এখানে আদেশ শব্দের অর্থ নমস্কার, কোথাও কোথাও উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইহাদের

"উপদেশ" দুইবার খাইবার সময় হইয়া থাকে। প্রত্যহ দেবতার নিকট ও গুরুর নিকটও আদেশের ব্যবস্থা আছে। যদি ইহাদের স্বভাব ভাল হয়—তাহা হইলে যথাকালে তাহাদের ভৈরবের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহাদের কর্ণবেধ হয়—এই ব্যাপারের নাম "দর্শন"। গুরু তখন কর্ণে মন্ত্র দেন এবং বলেন—"জ্ঞানী হও, ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, গুরুসেবারত হও।" শিষ্য তখন যোগী হয়—নাম হয় "নাথ"। শিষ্য গুরুর পুত্ররূপে বিবেচিত হয়। গুরু দেহ রাখিলে তাঁহাকে পুতিয়া ফেলা হয়। তারপর ১২ দিনের পর ভোজ দেওয়া হয়। শিষ্য অর্থাৎ পুত্র ভিক্ষা দিয়া থাকে, শিষ্য অশৌচ লইয়া থাকে, জুতা পরে না। তবে চাখড়ি বা কাঠের জুতা পরিতে পারে।

নাথদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নাথেরা আপনাদিগকে কশ্যপ, সত্য, মীন, গোরক্ষ, আই, আদি, ভৈরব, বীর গোত্রের বলিয়া থাকে। এ ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য দুই-একটি গোত্রের প্রচলনও দেখা যায়। বটুক গোত্রেরও নাথ জুনাগড়ে আছে। বাঙ্গালাদেশের নাথেরা অধিকাংশই কশ্যপ বা আই গোত্রের। সকল দেশের নাথদের মধ্যে নিজেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। অনেকগুলি কিংবদন্তীর মূলে কোনরূপ সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যে প্রবাদগুলি প্রায় সকল দেশে একরূপ, আমরা কোন মন্তব্য না দিয়া সেইগুলির উল্লেখ নিম্নে করিতেছি :—

১। ইহাদের বিশ্বাস, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচির ঔরসে ও কলার গর্ভে কশ্যপ মুনির জন্ম হয়। কশ্যপ দক্ষের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণার জন্ম হয়। কশ্যপ-কন্যা কৃষ্ণা মহাযোগী বিন্দুনাথে সমর্পিত হন। ইঁহাদের প্রথম সন্তান যাঁহারা, তাঁহারাই 'নাথ' বা যোগী।

২। এই নাথদের মধ্যে যাঁহারা যোগাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সমাধি হইয়া থাকে।

৩। সিদ্ধযোগী অবধূতনাথ হইতে যোগধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ইনি সাক্ষাৎ শিবাবতার। ইঁহা হইতেই যোগীবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের কতকগুলি লক্ষণ আছে। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র রেখা, ত্রিদণ্ড যোগপট্ট, অঙ্গে বিভূতি, রক্তবস্ত্র পরিধান, সর্ব্বদা পরমগুরুর ধ্যান ইত্যাদি লক্ষণের ইঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

৪। ঈশ্বর হইতে যোগিগণ এবং একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। মহাযোগী প্রধান পুত্র। ইঁহার পুত্র বিন্দুনাথ। বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ। আইনাথ রুদ্রকুল প্রকাশ করেন। গরুড়পুরাণের ৮৭ম অধ্যায়ে এবং রুদ্রযামলের উত্তরখণ্ডে যে রুদ্রকুলের বিবরণ আছে, নাথেরা রুদ্রকুল বুঝিতে তাহারই দাবী করিয়া থাকে। যাহা হউক, এই আইনাথের পুত্র মীননাথ (ইঁহার অপর নাম মছন্দরনাথ); তাঁহার পুত্র গোরক্ষনাথ ও ছায়ানাথ; ছায়ানাথের পুত্র সতানাথ। সতানাথের এক শিষ্য অর্জ্জুননাথ শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচার করেন।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের নাথদের মধ্যে নানারূপ প্রথা প্রচলিত আছে। নাথসম্প্রদায়ের বিষয় জানিতে হইলে বিভিন্ন স্থানের নাথদের আচারাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

পঞ্জাবপ্রদেশে রোহতক জেলার মধ্যে দিল্লী হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বোহর নামে একটি স্থান আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড মঠ আছে। মঠটি শ্রীমন্তনাথের সমাধি-মন্দির। মঠাধিপতির নাম সন্তোষনাথজী। ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক রাজাদের কুলগুরু। ইঁহার সম্পত্তি যথেষ্ট। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার নাথ আছে। এখানকার মঠের নিয়ম এই যে, বার বৎসরের পর অধিপতি সমাধি লইয়া থাকেন। কাজে কিন্তু তাহা দেখা যায় না। এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথি হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত একটি মেলা হয়। ১০০ বৎসর ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এই মেলায় ২ লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ শ্রীমন্তনাথের সমাধির উপর পূজা মানসিক দিয়া থাকে। ওড়িষ্যায়ও অনেক নাথ বাস করিয়া থাকে। ইহারা বাঙ্গালা দেশের নাথদের মত নয়। ইহাদের উপনয়ন হইয়া থাকে। এখানকার নাথেরা কেহ চিকিৎসক, কেহ জ্যোতিষী, তবে অধিকাংশই চাকরী করিয়া খায়।

কাঠিয়াবাড়ের নাথেরা আপনাদের 'যোগী' বলিয়া

পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা ধর্ম্মের ওজুহাতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ভিক্ষা ছাড়াও বাঁচিয়া থাকিবার ইহাদের আর-একটি উপায় আছে। দাঁতন, ঝাঁটা, মুন, ইন্ধনী, সুখিয়া ও স্ত্রীলোকদের চুলে লাগাইবার জন্য সেন্দোনী বেচিয়া যে দুপয়সা পায়, তাহা দিয়াই নিজেদের খরচ চালায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভূত ঝাড়ে, সাপ ধরে। এই রকম উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। দেব-দেবীর পূজা না করিলেও তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলে। বহুবিবাহের প্রথা ইহাদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার নিয়মও মানিয়া চলে। রত্নগিরি বোম্বাই প্রদেশে। এখানকার যোগীরা অনেক রকমের। এখানকার যোগীরা লোকেদের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া থাকে। কেহ বা কৌতুকপ্রদ বিকৃত জন্তু দেখাইয়া বেড়ায়। অবশিষ্ট যাহারা, তাহারা কাণফট্ যোগী। ইহারা কানে কাঠের বা হাতীর দাঁতের বড় বড় গোলাকৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকে।

কঙ্কণ প্রদেশে আজকাল যোগীর সংখ্যা খুব কম। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পর্ত্তুগীজগণ যখন সাল্‌সেট অধিকার করে, তখন তাহারা কানেড়ী (Kanheri) গুহাতে বহুসংখ্য যোগী দেখিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজগণ আশ্চর্য্যজনক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি ৩০০০ গুহা দেখিয়াছিল। এই-সমস্ত গুহায় যোগাচারী নাথেরা থাকিত। একজন যোগীর বয়স তাহারা ১৫০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে নাসিকে যে-সমস্ত নাথ যোগীরা আছে, তাহারা রত্নগিরির যোগীদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তবে এখানে সকল জাতির লোকেরা নাথসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। ইহাদের কেহ বিবাহ করে, কেহ করে না। এখানকার কাণফট্ যোগীরা বীণাযন্ত্র বাজাইয়া প্রধানতঃ রাজা গোপীচাঁদের গান করিয়াই নিজেদের উদরের ব্যবস্থা করে। ভোজ নগরে শিব্‌রা মণ্ডপে, ভোজের উত্তর-পশ্চিমে ধিনোধরে এবং বাগদে মনফরা নামক স্থানে কাণফট্ যোগীদের তিনটি আস্তানা আছে। এই তিনটির মধ্যে ধিনোধরের আড্ডাই বেশ বড় ও বিখ্যাত। জন পঞ্চাশ কাণফট্ যোগী এখানে থাকে। ইহাদের আবার বালাধিয়া, আরাল ও মাথালে তিনটি শাখা আছে। ইহারা কর্ণবেধক্রিয়াকে 'দর্শন' বলে। দর্শনের পর ইহাদের পৃথক্ নাম হয়। অতঃপর তাহারা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ধরমনাথকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করে। কচ্ছদেশীয় ইতিকথায় পাওয়া যায় যে, ধরমনাথ অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন মান্দবী বা রায়পুর ধ্বংস করিয়াছিলেন, রান নদী শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কাণফট্ যোগীরা খুব পরাক্রান্ত ছিল। প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে পশ্চিমে কোটেশ্বর এবং পূর্ব্বাঞ্চলে আজপালে তাহাদের প্রধান আখড়া ছিল। জুনাগড়ের এক দল নাগা-সন্ন্যাসী ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া ইহাদের হাত হইতে আখড়া দুইটি কাড়িয়া লয়।

ধিনোধর যোগীদের বেশ দুপয়সা আছে। ইহারা ধিনোধর পাহাড়ের নীচে বেশ সুরক্ষিত মঠে বাস করে। মঠের আশেপাশে ইহাদের থাকিবার জায়গা ও মঠধারীর সমাধি আছে। মঠধারীকে ইহারা 'পীর' বলে। ধরমনাথের মঠে ৭ বর্গফুট উচ্চ ধরমনাথের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে ধরমনাথের একটি মার্ব্বল পাথরের ৩ ফুট উচ্চ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির কানে সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্ণভূষা আছে। তাহার পার্শ্বে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ এবং পিতলের ও পাথরের অন্যান্য মূর্ত্তি আছে। এইখানে ধরমনাথের সময় হইতে একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়া থাকে। পূজা দিনে দুইবার হয়। নিকটেই একটি আবৃত স্থানে সকল সময় হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত থাকে।

সাধারণতঃ ইহাদের কর্ণভূষার ব্যাস সাত ইঞ্চি এবং ওজন ৬ তোলা হইয়া থাকে। ইহারা কোট ও লাল রঙের বক্ষাবরণ পরিয়া থাকে। যিনি গদিতে বসেন, তিনি জরির কাজ-করা নীল রেশমের পাগড়ী পরিয়া থাকেন। ইহারা গলায় একপ্রকারের পশমী সূতা পরিয়া থাকে। ইহার নাম শেলি। এটি ইহাদের বড়ই পবিত্র জিনিস। ইহারা অনেক পুরাণ ধরণের গহনা পরিয়া থাকে। ইহারা গলায় গণ্ডারের শিঙ্ ঝুলাইয়া রাখে। পূজার সময় তাহা বাজাইয়া থাকে।

বেরারে অনেক নাথ আছে। অধিকাংশই গৃহী—

তাহাদের নাম সংযোগী, যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদের নাম যোগী। সংযোগীদের সম্বন্ধ গোসাঁইদের সঙ্গে হয়। যোগীর সংখ্যা খুব কম।

নেপালে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের দুইটি মন্দির আছে। মন্দির দুটি বাগমাতী নদীর পূর্ব্বতীরে পর্ব্বতের উপর। ঐ পর্ব্বতের অধিত্যকা হইতে উপত্যকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ নদীতীর পর্য্যন্ত প্রস্তর দ্বারা ঘাট নির্ম্মিত। ঐ ঘাট দৈর্ঘ্যে শঙ্খমূল থাপাতলি হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত প্রায় তিন ক্রোশ বিস্তৃত। নদীর পশ্চিম তীরে পশুপতিনাথের মন্দির। মৎস্যেন্দ্রনাথ ভোগবিলাসে রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের আদেশে নেপালাধিপতিকে আজও এক-একটি ব্রাহ্মণকন্যা মৎস্যেন্দ্রনাথের মঠের সহিত বিবাহ দিতে হয়। ঐ প্রথা মহারাজের কৌলিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ-সমস্ত বিবাহিতা কন্যা মঠে সতীরূপে থাকিয়া সেবা-কার্য্যে জীবনাতিপাত করে। ইহারা নাথিনী।

নেপালে ব্রহ্মনাথজী ও ভিনকুনাথজীর দুইটি আস্তানা আছে। জুনাগড়ে নাথদের খুব বড় মঠ আছে। আবুল ফজল্ পেশওয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বারকার নিকট আর-একটি গোরক্ষক্ষেত্র আছে। হরিদ্বারে একটি সুড়ঙ্গ নাথদের কীর্ত্তির নিদর্শন। কাশীতে ইহাদের একটি মঠ আছে। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে গয়ায় কপিলধারার নিকট গম্ভীরনাথের আশ্রম ছিল। ইনি অল্প কথা কহিতেন। একটু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। বাঁকীপুরে ইঁহার শিষ্যগণ আশ্রম রক্ষা করিতেছেন।

কলিকাতায় দমদমার নিকট নাথদের একটি আড্ডা আছে। ইহার নাম 'গোরখবাসলি', ইহাতে তিনটি মানুষের মূর্ত্তি এবং শিব, কালী ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে।

ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে অনেক নাথের বাস। বগুড়ায় ৩,৩১৮ জন নাথ আছে। ইহারা শব পুতিয়া ফেলে। বগুড়া থানার অন্তর্গত ও বগুড়া সহর হইতে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এবং মহাস্থানগড় হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে "যোগীর ভবন" নামে একটি বিখ্যাত গ্রাম আছে। এখানে গোরক্ষনাথের একটি মন্দির আছে। গোরক্ষনাথ-মন্দিরের পূর্ব্বোত্তর কোণে তিনটি সমাধি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি গুরুর, দ্বিতীয়টি শিষ্যের এবং অপরটি গুরুর কুকুরের। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি পুষ্করিণী আছে —নাম 'সিদ্ধপুকুর'।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

রবীন্দ্র-পরিচয়

২। শৈশব-রচনা—কাব্য-সাহিত্য।

এইবার ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত লেখা শৈশব-কবিতার পরিচয় দিয়া পরে এই সময়ের গদ্যসাহিত্যের আলোচনা করিব।

কবিতা রচনারম্ভ

সাত আট বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। জীবন-স্মৃতিতে আছে:—

"আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়।...আমার মত শিশুকে কবিতা লিখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

"পদ্য জিনিষটিকে এপর্য্যন্ত ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটা-কুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই; কোনোখানে মর্ত্ত্যজনোচিত দুর্ব্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।...... গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্য রচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।"

"ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে? কোনো একটি কর্ম্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড় বড় কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু

করিয়া দিলাম।......কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই। কবিতা কবির জামার পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম (১)।"

জীবন-স্মৃতিতে কবি বাল্যকালে কাব্যচর্চ্চা সম্বন্ধে সকৌতুক বর্ণনা করিয়াছেন—

"সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মত ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মত হইয়া ভিতরের লেখাগুলিকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুল্‌স্‌ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠর-যন্ত্রণার হাত সে এড়াইল (২)।"

এই সময়কার কবিতার দুয়েকটি নমুনাও কবি দিয়াছেন (৩)। বাল্যকালে 'ঈশ্বর'-স্তব রচনাও বাদ পড়ে নাই, তাহাতে যথারীতি দুঃখকল্প ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ ছিল (৪)।

কাব্য-চর্চ্চা

যাহা হউক কাব্যচর্চ্চা চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বার তেরো বছর তখনকার কথা লিখিয়াছেন—

"বাড়ীর লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিকে আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম (৫)।"

রচনা প্রকাশ

আর দু-এক বছরের মধ্যেই ১২৮২ সালে রচনা প্রকাশ প্রথম আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর।

"এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্ব্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে সুরু করিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে (৬)।"

(১) জীবন-স্মৃতি, (২৪-২৫ পৃঃ) প্রবাসী, ১৩১৮, আশ্বিন, ৫৯৩-৫৯৪পৃঃ।
(২) জীবন-স্মৃতি (৩৪ পৃঃ) প্রবাসী, ১৩১৮, কার্ত্তিক, ২ পৃঃ।
(৩) জীবন-স্মৃতি (৩৪-৩৫পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, কার্ত্তিক, ৩ পৃঃ।
(৪) জীবন-স্মৃতি (৩৮-৩৯পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, কার্ত্তিক, ৪-৫পৃঃ।
(৫) জীবন-স্মৃতি (৯৩ পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৩ পৃঃ।
(৬) জীবন-স্মৃতি, (৯৬ পৃঃ) প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৪-৪১৫ পৃঃ।

এই জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (অগ্রহায়ণ, ১২৮২ – কার্ত্তিক ১২৮৩) কবিতায় "বনফুল" ও "প্রলাপ" এবং গদ্যে "ভুবন-মোহিনী প্রতিভা"র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

বনফুল নামে কবিতায় উপন্যাসখানি ছয় সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল (১)। তিন বৎসর পরে ১২৮৬ সালে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পুস্তক-পরিচয়

বনফুল বইখানি সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া (৬½″ × ৪″), ডিমাই ১২ পেজি, ৮ ফর্ম্মা ২ পৃষ্ঠা, ইংলিশ অক্ষরে ২০ এম্-এ কম্পোজ, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কুড়ি লাইন ছাপা। কাগজের মলাট, এক পৃষ্ঠা নামপত্র (title page) + এক পৃষ্ঠা অশুদ্ধ সংশোধন + ৯৩ পৃষ্ঠা। উৎসর্গপত্র নাই। নাম-পত্র (title page) এইরূপ :—

বনফুল

কাব্যোপন্যাস

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুপ্ত প্রেস ;

২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

১২৮৬ সাল। (ক)

বনফুল বইখানি আট সর্গে বিভক্ত। ১ম, ২য়, ৭ম ও ৮ম সর্গের বিশেষ নাম আছে, বাকি সর্গের কোন নাম নাই। প্রত্যেক সর্গের পত্রাঙ্ক ও লাইনের সংখ্যা এইরূপ—

১ম সর্গ—"দীপ-নির্ব্বাণ" ১—১০ পৃষ্ঠা, ১৭২ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, অগ্রহায়ণ, ৩৫—৩৮ পৃঃ।

২য় সর্গ—"যেওনা! যেওনা!" ১০—২২ পৃষ্ঠা, ২২৯ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৫—১৩৮ পৃঃ।

৩য় সর্গ—২২—৪২ পৃঃ, ২৮৫ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৮—২৩৪ পৃঃ।

৪র্থ সর্গ—৪২—৪৯ পৃঃ, ১০৮ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৬—৩১৯ পৃঃ।

৫ম সর্গ—৪৯—৫২ পৃঃ, ৬৭ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৬—৩১৯ পৃঃ।

(১) জ্ঞানাঙ্কুর, ৪র্থ খণ্ড, ১২৮২—১২৮৩।

৬ষ্ঠ সর্গ—৫২—৭০ পৃঃ, ৩১৪ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, শ্রাবণ, ৪২০—৪২৫ পৃঃ।

৭ম সর্গ—"শ্মশান"—৭০—৭৯ পৃঃ, ১৬০ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, ভাদ্র, ৪৫৭—৪৬১ পৃঃ।

৮ম সর্গ—"বিসর্জ্জন"—৭৯—৯৩ পৃঃ, ২৪৭ লাইন। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, কার্ত্তিক, ৫৬৭—৫৭১ পৃঃ। (১)

বনফুল বইখানি অনেকদিন হইল অপ্রচলিত (out of print) হইয়া গিয়াছে। পুরাণো কাপিও এখন দুষ্প্রাপ্য। মোট ১৫৮২ লাইনের মধ্যে এক লাইনও পুনর্মুদ্রিত হয় নাই বা কাব্যগ্রন্থাবলীর কোন সংস্করণে স্থান পায় নাই।

১২৮২ সালে প্রথম বাহির হইলেও "বনফুল" লেখা হইয়াছিল আরো আগে। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন—জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইবার "বেশ কিছুদিন আগে" ইহা লেখা হয় (২)। যদি এক বছর পূর্ব্বে লেখা হইয়া থাকে তবে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো বছর। যাহা হউক বনফুল বইখানি মোটামুটী তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের লেখা বলা যায়।

বনফুলের আখ্যানভাগ

কমলা শিশুকাল হইতে নির্জ্জন কুটীরে পালিত, শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পরে সে তাহার পিতা ছাড়া আর কোন মানুষ দেখে নাই। বিজনকাননের তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু লোকালয়ের সে কিছু জানে না। কমলা যখন ষোড়শী বালিকা তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়, বিজয় নামে এক পথিক ঘুরিতে ঘুরিতে পর্ণকুটীরে উপস্থিত হয় ও কমলাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া তাহাকে লোকালয়ে লইয়া আসে ও পরে কমলাকে বিবাহ করে। কমলা বিবাহের কিছুই বোঝে না, সে মনে মনে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে ভাল বাসিল। এই লইয়া ক্রমে নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হয় ও শেষে বিজয় হিংসায় উত্তেজিত হইয়া নীরদকে হত্যা করে। কমলা ভগ্নহৃদয়ে বিজনকাননে পলাইয়া আসে। কিন্তু সেখানে আসিয়াও শান্তি পাইল না, বনভূমির সহিত তাহার সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাননেও তাহার কোন আশ্রয় রহিল না—ইহাই বনফুলের ট্রাজেডি।

ট্রাজেডির মূল সুর

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি মূল সুর। এই তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের লেখার মধ্যেও সেই সুর বাজিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-মনের মিলন যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই সেইখানেই বিরোধ সেইখানেই দ্বন্দ্ব। বনফুলের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির শান্ত সহজ সরলতার সহিত মানবসমাজের ক্ষুদ্র কৃত্রিম জটিলতার কোন সামঞ্জস্য হইল না, বনভূমির সহিত মানবসমাজের বিরোধ অত্যুগ্র আকার ধারণ করিল, কাননে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে স্নেহের সম্বন্ধটি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল লোকালয়ের সংস্পর্শে তাহা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—ইহাই বনফুলের করুণগীতির মূল সুর।

বনফুলের মধ্যে অতিশয়োক্তি, কৃত্রিমতা ও অনেক ছেলে-মানুষি আছে, কিন্তু তাহাই তখন বাংলাসাহিত্যের প্রচলিত রীতি। বনফুলের লেখা কাঁচা, তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের লেখা কাঁচা হইবারই কথা ; কিন্তু বনফুলের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের সুখদুঃখের পিছনে যে একটি বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমরা তাহার আভাষ পাই। প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই, একটি সরল স্বাভাবিকতায় তাহা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের লেখার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়তা ও মানব-হৃদয়জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম সর্গ—"দীপনির্ব্বাণ"

গল্প আরম্ভ হইয়াছে হিমালয়ের প্রান্তে—

" . . . . . প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্ ;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত-সীমায় গিয়া যেন অবসান!
. . . .
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!
. . . .

(১) শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, অনেক উদ্ধৃত অংশ মূলগ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

(২) শান্তিনিকেতনে কথাবার্ত্তায়, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১।

হিমাদ্রি-শিখর শৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি, তুষার-বিভায় নাশি
স্থিরভাবে হেথা সেথা রয়েছে নিদ্রিত।
পর্ব্বতের পদতলে, ধীরে ধীরে নদী চলে
উপলরাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গকুল, সিক্ত করি বৃক্ষমূল
নাচিছে পাবাণতট করিয়া প্রহত (১) !"

তাহার পর দুই লাইনের মধ্যে অন্ধকার রাত্রির চিত্র—

"আজি নিশিথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা (২)।"

বিজনকুটীরের বর্ণনা—

"চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন-কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর;
কুসুম-স্তবকরাশি, দুয়ার-উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর।
কুটীরের একপাশে, শাখা-দীপ ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোকে তায় আঁধার মিশিয়া যায়
ম্লানভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর-দ্বার!
গভীর নীরব ঘর শিহরে যে কলেবর!
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়—
বিষাদের অন্ধকারে, গভীর শোকের ভারে
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকারময় (৩)।"

মুমূর্ষু বৃদ্ধ পিতার মস্তক কোলে লইয়া কমলা বসিয়া আছে। পিতা অচেতন, বলিকার মুখে কথা নাই, অবিচল নেত্রে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে পিতার জ্ঞান হইল, কমলাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ কন্যার নিকট বিদায় লইলেন—কিন্তু বনে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কেবল কন্যার নিকটে নহে, পর্ব্বত উপত্যকা গিরিনদী বিজনকাননের নিকটও বিদায় চাহিতে হইল—

"আজি রজনীতে মাগো! পৃথিবীর কাছে
বিদায় মাগিতে হবে এই শেষ দেখা ভবে
জানি না তোমার শেষে অদৃষ্টে কি আছে;
দিনকর, নিশাকর, গ্রহ তারা চরাচর
সকলের কাছে আজি লইব বিদায়;
গিরিরাজ হিমালয়, ধবল তুষারচয়
অয়ি গো কাঞ্চন-শৃঙ্গ মেঘ-আবরণ!
অয়ি নির্ঝরিণী-মালা, স্রোতস্বিনী শৈলবালা,
অয়ি উপত্যকে! অয়ি হিমশৈল বন!
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।
. . . .
এই এই শেষবার—কুটীরের চারিধার
দেখে লই! দেখে লই মেলিয়া নয়ন!
শেষবার নেত্র ভোরে—এই দেখে লই তোরে
চিরকাল তরে আঁখি হইবে মুদ্রিত!
সুখে থেকো চিরকাল!—সুখে থেকো চিরকাল!
শান্তির কোলেতে বালা থাকিও নিদ্রিত (১)।"

কমলার পিতার মৃত্যু হইলে কমলা শোকাবেগে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এদিকে—

"গাইল নির্ঝর-বারি বিষাদের গান
শাখায় প্রদীপ ধীরে হইল নির্ব্বাণ (১)।"

এইরূপে প্রথম সর্গ শেষ হইল।

দ্বিতীয় সর্গ—"যেওনা! যেওনা!"

রাত্রি ভোর হইল। পথভ্রান্ত পথিক বিজয় আসিয়া দুয়ারে আঘাত করিতেছে, কমলা তখনও অচেতন—

"দুয়ারে আঘাত করে কে ও পান্থবর?
'কে ওগো কুটীরবাসী! দ্বার খুলে দাও আসি!'
তবুও কেন রে কেউ দেয় না উত্তর?
আবার পথিকবর আঘাতিল ধীরে!
বিপন্ন পথিক আমি, কে আছে কুটীরে?
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই—
তটিনী বহিয়া যায় আপনার মনে!
পাদপ আপন মনে, প্রভাতের সমীরণে
দুলিছে, গাইছে গান সর সর স্বনে।
সমীরে কুটীর-শিরে লতা দুলে ধীরে ধীরে
বিতরিয়া চারিদিকে পুষ্প-পরিমল (২)!"

পর্ণকুটীরে কেবল তরুলতা নহে, বনের পাখীর সঙ্গেও মানুষের একটি মধুর সম্বন্ধের পরিচয় পাই। বিজয় যখন কাহারো সাড়াশব্দ পাইতেছে না, তখন হঠাৎ শুনিল কে কমলা কমলা বলিয়া ডাকিতেছে।

"পথিক চমকি প্রাণে, দেখিল চৌদিক পানে
কুটীরে ডাকিছে কে ও 'কমলা' 'কমলা'!
. . . . . .
পথিক পাইয়া ভয়, চমকি দাঁড়ায়ে রয়
কুটীরের চারিভাগে নাহি কোন জন।

(১) বনফুল, ১ম সর্গ (১-২ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, অগ্রহায়ণ, ৩৫ পৃঃ।

(২) বনফুল, ১ম সর্গ (৩ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, অগ্রহায়ণ, ৩৫ পৃঃ।

(৩) বনফুল, ১ম সর্গ (৩-৪ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, অগ্রহায়ণ, ৩৫-৩৬ পৃঃ।

(১) বনফুল, ১ম সর্গ (৭-৮ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, অগ্রহায়ণ, ৩৭ পৃঃ, ৩৮ পৃঃ।

(২) বনফুল, ২য় সর্গ (১০-১১ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৫ পৃঃ।

এখনো অস্ফুটস্বরে, 'কমলা' 'কমলা' ক'য়ে
কুটীর আপনি যেন করে সম্ভাষণ।
কে জানে কাহাকে ডাকে, কে জানে কেন বা ডাকে,
কেমনে বলিব কেবা ডাকিছে কোথায় ?
সহসা পথিকবর, দেখে দণ্ডে করি ভর
'কমলা' 'কমলা' বলি শুক গান গায় (১)।"

বিজয় দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল কমলা অচেতন, নিকটে নদী হইতে জল আনিয়া কমলার চৈতন্য সম্পাদন করিল। কমলা কখনো অন্য মানুষ দেখে নাই—

"মেলিয়া নয়নপুটে বালিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ,
পিতা মাতা ছাড়া কারে মানুষ দেখেনি হা রে
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন।
আঁচল গিয়াছে খ'সে, অবাক রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক পানে যুগল নয়ন (২)।"

শকুন্তলা ও মিরান্দার কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। বালক রবীন্দ্রনাথ তেরো বছর বয়সে ইচ্ছা করিয়াই শকুন্তলা ও মিরান্দার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু শকুন্তলা ও মিরান্দার সহিত তুলনা করিলে তবেই কমলার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিবে। কমলা মানুষের সঙ্গ কখনো পায় নাই, মানুষের সম্বন্ধে মিরান্দার সহিত তাহার সাদৃশ্য অধিক।

বনফুল লেখার অনেক বৎসর পরে শকুন্তলা ও মিরান্দার পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"মিরান্দা যে নির্জ্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত, শকুন্তলার সে নির্জ্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্য্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্দ্ধিত,—তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদান-প্রদানে, হাস্যে-পরিহাসে-কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত, তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুতঃ শকুন্তলার সরলতা স্বাভাবিক এবং মিরান্দার সরলতা অস্বাভাবিক। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইরূপ সঙ্গত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিরক্ষিত নহে (৩)।"

কমলা মিরান্দারই ন্যায় সরলা, সে ঋষ্যশৃঙ্গের মতনই বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—

"সজল নয়ন মুছি ধীরে ধীরে কয়,—
'কে তুমি জিজ্ঞাসা করি, কুটীরে এলে কি করি,
আমি যে পিতারে ছাড়া জানি না কাহারে!
• • • • • • • •
কোথা হতে তুমি আজ আইলে পৃথিবীমাঝ?
কি বলে তোমারে আমি করি সম্বোধন?
তুমি কি তাহাই হবে, পিতা যাহাদের সবে
মানুষ বলিয়া আহা করিত রোদন?
কিংবা জাগি প্রাতঃকালে, যাদের দেবতা বলে
নমস্কার করিতেন জনক আমার?
বলিতেন যার দেশে, মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথাই কি নিবাস তোমার (১)

এদিকে ক্রমে ভোর হইয়া আসিতেছে—

"নিশা হল অবসান, পাখীরা করিছে গান
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাতের বায়!
আঁধার ঘোমটা তুলি, প্রকৃতি নয়ন খুলি
চারিদিক ধীরে যেন করিছে বীক্ষণ—
আলোকে মিশল তারা, শিশিরের মুক্তাধারা,
গাছপাতা পুষ্পলতা করিছে বর্ষণ (২)!"

বিজয় বৃদ্ধের মৃতদেহ শুভ্র তুষাররাশির মধ্যে রাখিয়া আসিল। কাব্যের এইস্থলে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একটি সহজ মিলনের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাস সংযত হইয়াছে, মৃত্যুর বিষাদ-ছায়া শান্তি- ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর বনভূমি হইতে কমলার বিদায় দৃশ্যের। এস্থলে শকুন্তলার কথাই মনে পড়ে, মিরান্দার সহিত শকুন্তলার যে পার্থক্য কমলারও সেইরূপ।

"মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি; কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশবধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্ব্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জ্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র; কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।"

"শকুন্তলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যান-ভাগ ব্যাঘাত পায়, তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মত স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দ্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশু-পক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস

(১) বনফুল, ২য় সর্গ (১২ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৬ পৃঃ
(২) বনফুল, ২য় সর্গ (১৪ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৬ পৃঃ।
(৩) "শকুন্তলা" (প্রাচীন সাহিত্য, ৩২ পৃঃ), বঙ্গদর্শন, ১৩০৯, আশ্বিন, ২৭৮ ২৭৯ পৃঃ।

(১) বনফুল, ২য় সর্গ (১৭ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৭ পৃঃ।
(২) বনফুল, ২য় সর্গ (১৮ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৭ পৃঃ।

তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্ত বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।"

"…. তাহার হৃদয়-লতিকা চেতন-অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিত বেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদর-স্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল-হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্ম্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়।…বিসদৃশের মধ্যে এমন প্রকাণ্ড মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে সম্ভবপর হইত না।… ……দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়-সম্ভাষণ হইল না।… টেম্পেষ্টে প্রকৃতি মানুষ-আকার ধারণ করিয়াও মানুষের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী আত্মস্বভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে (১)।"

বিজন কাননের সহিত কমলারও ঠিক সেই এক সম্বন্ধ; সেইজন্যই কবি কমলার নাম দিয়াছেন বনফুল।

তপোবন হইতে চলিয়া যাইবার সময়ে শকুন্তলা তরুলতা-মৃগ-পক্ষীর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিদায় লইয়াছে। বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে শকুন্তলার মত কমলাও তাহার হরিণ তাহার পাখীর নিকট বিদায় লইল।

"হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি,
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ রহিব কোথায়?
' ' ' '
আয় পাখী! আয় আয়! কার তরে রবি হায়
উড়ে যা উড়ে যা পাখি! তরুর শাখায়!
প্রভাতে কাহারে পাখি! জাগাবি রে ডাকি ডাকি
কমলা! কমলা! বলি মধুর ভাষায়?"
' ' ' '
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে,
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার (২)।"

শকুন্তলা চলিয়া যাইবার সময়ে মৃগেরা পশ্চাৎ হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়াছে, তরুলতাও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে—

"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ
ময়ূর নাচে না যে আর
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হ'তে
যেন সে আঁখিজল ধার (১)।"

কমলা চলিয়া যাইবার সময়ে তাহার আসন্ন বিয়োগে সমস্ত বনভূমিও বিরহ-কাতর—

"সমীরণ ধীরে ধীরে, চুম্বিয়া তটিনীনীরে
দুলাইতেছিল, আহা, লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায়?
সহসা রে জলধর নব অরুণের কর
কেন রে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে?
পাপিয়া শাখার পরে, ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি করনা গান, থামিলি কেন রে?"
' ' ' '
কুটীর ডাকিছে যেন যেওনা যেওনা!—
তটিনী-তরঙ্গকুল ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেওনা! যেওনা!'—
বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙুল তুলি
যেন বলিছেন আহা "যেওনা! যেওনা (২)!"

তৃতীয় সর্গ

লোকালয়ে আসিবার পর বিজয়ের এক সখী নীরজা কমলাকে নানাপ্রকারে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। যমুনার তীরে বাগানে দুই সখী বেড়াইতেছে, নীরজার সহিত কমলার বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কমলার হৃদয় ভারাক্রান্ত। নীরজা কমলাকে বলিল—

"আয় আয় সখি! আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা
হেথায় আয় লো বিপিনবালা!
* * * *
আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে,
কুড়ানা হোথায় বকুলগুলি,
মাধবীর ভারে লতা নুয়ে পড়ে,
আমি ধীরি ধীরি আনি লো তুলি।
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্ সে হেথায় কামিনী-পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
পারি না লো আর, আয় হেথা বসি
ফুলগুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি!
হেথায় পবন, খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি।

(১) "শকুন্তলা" (প্রাচীন সাহিত্য, ৩২-৩৪ পৃঃ), বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আশ্বিন, ২৭৯-২৮০ পৃঃ। "লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।"

(২) বনফুল, ২য় সর্গ (১৯-২০ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৮ পৃঃ।

(১) শকুন্তলা (প্রাচীন সাহিত্য, ৩৭ পৃঃ), বঙ্গদর্শন, ১৩০৯, আশ্বিন, ২৮২ পৃঃ।

(২) বনফুল, ২য় সর্গ (২১ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, মাঘ, ১৩৮ পৃঃ।

আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
শুই একটুকু ঘাসের পরে,
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুরু
আঁখি মুদে আসে ঘুমের ভরে!
বল্ বন-বালা এত কি লো জ্বালা?
রাত দিন তুই কাঁদিস বসে!
আজো ঘুমঘোর ভাঙ্গিল না তোর
আজো মজিলি না সুখের রসে (১)!"

কিন্তু কমলা কিছুতেই তাহার সেই বন, সেই পাহাড়, সেই গিরি-নদী, সেই পাখী ও হরিণের কথা ভুলিতে পারিতেছে না—

"ভুলিব সে বন? ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগে যাব ভুলে কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিঙ্গ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে (২)।"

কমলার মনে পড়ে—

"সরসী ভিতরে ফুটিলে কমল
তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে।
দেখি মুখ তুলে কমলিনী দুলে
এ পাশে ও-পাশে পড়িতে চলে!
গাছের উপরে ধীরে ধীরে ধীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে দিতাম লতা।
বসি একাকিনী আপনা-আপনি
কহিতাম ধীরে কত কি কথা (৩)।"

প্রকৃতির কোলে শৈশবের খেলার কথা মনে পড়ে—

"তুষার কুড়ায়ে আঁচল ভরিয়ে
ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে।
পড়িলে কিরণ কত যে বরণ
ধরিত; আমোদে যেতাম গলে!
দেখিতাম রবি বিকালে যখন
শিখরের শিরে পড়িত ঢোলে;
করি ছুটাছুটি শিখরেতে উঠি
দেখিতাম দূরে গিয়েছে চলে'!
আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
দেখিতাম আরো গিয়াছে সরে' (৪)!"

(১) বনফুল, ৩য় সর্গ (২২-২৪), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

(২) বনফুল, ২য় সর্গ (২৫ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

(৩) বনফুল, তৃতীয় সর্গ, (২৬ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

(৪) বনফুল, ৩য় সর্গ, (২৭ পৃঃ), জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

সরসীর জলে খেলা করিতে করিতে—

"তট-দেশে পুনঃ ফিরি আসি পর
অভিমান ভরে ঈষৎ রাগি,
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম, জল উঠিত জাগি (১)!"

শকুন্তলা ও কমলা দুজনেই প্রকৃতির শিশু, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত উভয়ের সম্বন্ধ অতি নিবিড়, কিন্তু এক বিষয়ে শকুন্তলা ও কমলার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। শকুন্তলা চিরদিন মানুষের সঙ্গ পাইয়াছে, মানব-সমাজের প্রতি তাহার কোন বিতৃষ্ণা নাই। কমলা মিরান্দার ন্যায় লোকালয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সে মানুষের সঙ্গ কখনও পায় নাই, তাই মানবসমাজের প্রতি কমলার কোন টান নাই।

"চাহি না জেয়ান, চাহি না জানিতে
সংসার মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে,
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে (২)।"

কিন্তু তাহা হইবার নহে, কমলাকেও মানুষের সংসারে আসিয়া পড়িতে হইল। মিরান্দাকে সংসারের আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই, কিন্তু মিরান্দারই ন্যায় অসহায় বনফুল কমলাকে সংসারের আঘাত সহ্য করিতে হইল।

বিজয় কমলাকে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু কমলা সংসারের কিছুই জানে না, বিবাহ কাহাকে বলে বোঝে না, সে বিজয়ের বন্ধু নীরদকেই ভালবাসিল। মানুষের সংস্পর্শে হৃদয়বৃত্তির উত্তাপে বনের স্বাভাবিক সরলতা ঘুচিয়া গিয়াছে, কমলা এখন লোকালয়ে আসিয়া পড়িয়াছে—

"জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি রে হায় ভালবাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে (৩)!"

কমলা ও নীরজা বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দূরে নীরদ গান ধরিল। বালক-কবি এই বয়সেই গীতি-কবিতায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত নীরদের গানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বালক-কবি বড় বড় ছন্দ কিরূপ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়—

"কি জানি লো বালা! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে!

(১) বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৭ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

(২) বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩০ পৃঃ।

(৩) বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৯ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩০ পৃঃ।

কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
    জাগিয়া উঠেছে হৃদয়পুটে !
অফুট মধুর স্বপন যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
    কি ভাব কে জানে কিসের লাগি !
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
    কি ভাব কে জানে কিসের লাগি !
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে
    ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি (১) !

কমলা মনের কথা লুকাইতে জানে না, নীরদকে যে সে ভালবাসে নীরজার নিকট সহজেই তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল—

"আপনার ভাবে আপনি কবি
    রাত-দিন আহা রয়েছে ভোর !
সরল প্রকৃতি মোহন-ছবি
    অবারিত সদা মনের দোর।
. . . .
কারে ভালবাসে ? কাঁদে কার তরে ?
    কার তরে গায় খেদের গান ?
কার ভালবাসা পায় নাই ফিরে
    সঁপিয়া তাহারে হৃদয়-প্রাণ ?
. . . .
বসেছিনু কাল ওই গাছ-তলে
    কাঁদিতেছিলেম কত কি ভাবি—
যুবক তখনি সুধীরে আপনি
    প্রাসাদ হইতে আইল নাবি।
. . . .
চাহিতে নারিনু মুখপানে তাঁর
    মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
সরমে পাশরি বলি বলি করি
    তবুও বাহির হ'ল না কথা !
কাল হতে ভাই ! ভাবিতেছি তাই
    হৃদয় হয়েছে কেমন ধারা !
থাকি, থাকি, থাকি, উঠি লো চমকি,
    মনে হয় কা'র পাইনু সাড়া (২)।"

চতুর্থ সর্গ

একদিন নিভৃত যমুনা-তীরে নীরদ-কমলার দেখা হইল। বালক-কবি দুই লাইনে সেই ছবি আঁকিয়াছেন—

"যেন দোঁহে জ্ঞান হত—নীরব চিত্রের মত
    দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে (৩)।"

কমলা মুখ ফিরাইয়া লইল—

"মুখ ফিরাইল বালা, দেখিল জোছনা-মালা
    খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোল স্বর উঠিছে আকাশ পর
    অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী গভীরে।
দেখে শূন্যে নেত্র তুলি—খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি
    জোছনা মাখিয়া গায় উড়ে উড়ে যায়।
দেখিছে লুটায় ঢেউ, আবার লুটায়
    দিগন্তে খেলায় পুনঃ দিগন্তে মিলায়।
এক খণ্ড উড়ে যায়, আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি—মলিন করিয়া রাতি
    মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।
পাখী এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
    ফেনখণ্ড গেল ভেসে নীল নদীজলে,
দিবা ভাবি, অতি দূরে, আকাশ সুধায় পূরে
    ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপিয়া।
পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে, উচ্চ হতে উচ্চে উঠে,
    আকাশ সে সুধাস্বরে উঠিল কাঁপিয়া।
. . . .
দেখি দেখি থাকি থাকি আবার ফিরায়ে আঁখি
    নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র—অবশ পলকপত্র
    অপূর্ব্বমধুর ভাবে বালিকা বিবশা (১)।"

কমলা মানুষের সংসার চিনিত না, শকুন্তলারই ন্যায় "তাহার হৃদয় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার—গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই।" সে সহজেই নীরদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

নীরদও কমলাকে ভালবাসে কিন্তু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে না বলিয়া কমলাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, বলিল যে—বিজয় তাহার স্বামী, এখন অপর কাহারও কথা মনে করা পাপ। কিন্তু কমলা এসব কথা কিছুই বুঝিতে পারে না—

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না ত আমি—
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী ;
এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি—
দেখিবারে আঁখি মোর ভালবাসে যারে,
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধাবাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে (২)।"

(১) বনফুল, ৩য় সর্গ ৩৫ পৃঃ ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩২ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৩য় সর্গ ৩৩, ৪০-৪২ পৃঃ ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩১-২৩৪ পৃঃ।
(৩) বনফুল, ৪র্থ সর্গ ৪২ পৃঃ ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৬ পৃঃ।

(১) বনফুল, ৪র্থ সর্গ ৪৩-৪৪ পৃঃ ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৬ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৪র্থ সর্গ (৪৬ পৃঃ) ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ, ৩১৭ পৃঃ।

লোকনিন্দা কলঙ্ক সে কিছুই বোঝে না—

"ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বল গো নীরদ আমি কি করিব তায় ?
রটায়ে কলঙ্ক তবে হাস্থক না তারা (১)।"

নীরদ যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে, কমলার সেই এক কথা "আমি তা জানি না।" নীরদ তখন কমলাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল যে তাহাকে সে কোনমতেই প্রশ্রয় দিবে না এবং কমলার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবে না। চোদ্দ বছর বয়সেও বালক-কবির মানব-হৃদয়-জ্ঞানের অভাব ঘটে নাই—

"ভর্ৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত!
কমলা নয়নজল ভরিয়া নয়নে,
মুখপানে চাহি রয় পাগলের মত (২)!"

(১) বনফুল, ৪র্থ সর্গ (৪৭ পৃঃ); জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৭ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৪র্থ সর্গ (৪৮পৃঃ); জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৭ পৃঃ।

নীরদ অশ্রুসংবরণ করিয়া সবেগে সেখান হইতে প্রস্থান করিল, কমলা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে অনাবশ্যকরূপে জটিল করিয়া তুলিয়া মানুষ যে কত দুঃখ পায় বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়াছিলেন। বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্যেও যে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে তাহা এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়িয়াছিল। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের মধ্যে যেখানে একমাত্র প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কত অশান্তির সৃষ্টি কত দুঃখ কত গ্লানি এবং সেখানে পরিণামে যে কি ভীষণ সর্ব্বনাশ তাহা রবীন্দ্রনাথ পরেও অনেকবার দেখাইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

বার্লিনের পথে

১। উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ বেল্‌জিয়াম

সেইনের জল পেটে পড়িতে না পড়িতেই প্যারিস ছাড়িতেছি। টিকেট কাটিলাম বার্লিন পর্য্যন্ত। ভরা গরম চলিতেছে, আগষ্ট মাসের প্রায় শেষাশেষি। বার্লিন প্যারিসের উত্তরপূবে, কাজেই গার্‌-দ্যু নর্ (Gare du Nord) অর্থাৎ উত্তরী ষ্টেশনের রেলে বসিতে হইল।

বিপ্লব-মুখো হইয়া বার্লিন চলিতেছি,—কেননা জার্ম্মান রাষ্ট্রের এক পাকা কর্ণধার এৎর্সব্যার্গ্যার (Erzberger) গুপ্তঘাতকের হাতে মারা পড়িয়াছেন। ইনি ছিলেন সোশ্যালিষ্টপন্থীদের, বেশী গরম নয়, নরম-গরম-মেশানো একপ্রকার বড় মাতব্বর ব্যক্তি। ইঁহাকে খুন করিয়াছে বোধ হয় অ-সোশ্যালিষ্ট বা বুর্জোআ ও ন্যাশন্যালিষ্ট এবং সমরপন্থী কোনো জার্ম্মান ছোক্‌রা।

জার্ম্মানির স্বদেশ-সেবক মহলে এৎর্সব্যার্গ্যারকে দেশদ্রোহী বিবেচনা করা হইত। ইঁহার দোষ, ইনি ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি পাতাইবার সময় জার্ম্মানির ইজ্জৎ বাঁচাইয়া চলিতে পারেন নাই। ফরাসীদের প্রত্যেক কথায় একপ্রকার সায় দিয়াই ইনি জার্ম্মান-তরী চালাইতেছিলেন। কাজেই এৎর্সব্যার্গ্যারের মরায় ফ্রান্সের স্বার্থে কিছু গোল বাধিবার সম্ভাবনা। ফরাসী কাগজগুলা একবাক্যে জার্ম্মান ন্যাশন্যালিষ্টদেরকে গালাগালি করিতেছে।

চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের ভিতর লড়াইয়ের মাঠ সুরু হইয়াছে। সাঁকাঁতাঁ (St. Quentin) শহরটা গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। জার্ম্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের বাবদ যে টাকা আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্স পাইয়াছে তাহার অনেক পরিমাণ জুটিয়াছে সাঁকাঁতাঁর কপালে। তাই শহরটা দেখিতেছি আবার নয়া জাঁকিয়া উঠিতেছে। বৃহৎ নগর বটে।

চাষ-আবাদে রেলপথের দুইধার শস্যশ্যামল। পার্ব্বত্য উপত্যকাও মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। প্রায় সাড়ে তিন বা চার ঘণ্টার পর ফ্রান্সের সীমানা ছাড়াইয়া বেল্‌জিয়ামে পড়িলাম। গাড়ীর ভিতরই পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা করা হইয়া গেল। কাষ্টম-অফিসের বাবুরা মাল খোলাখুলির



এৎস্‌ব্যার্গ্যার।

জন্য তাগিদ করিল না কেন বুঝিতে পারিলাম না। সহযাত্রীরা সকলেই গাঁটুরি বোঁচ্‌কা খুলিয়া প্রস্তুত থাকিতে কসুর করিল না যদিও।

বেল্‌জিয়ামে দেখিতেছি পাহাড়ের পর পাহাড়। অনেকগুলাই মরা আগ্নেয়গিরির ন্যায় ন্যাড়া-বোঁচা। ধাতুর খনি সর্ব্বত্রই বিস্তর। শহরে পল্লীতে কলকারখানার চিম্‌নি অগণিত। আগাগোড়া সমস্ত রেলপথটাই যেন ফ্যাক্টরি দিয়া বাঁধানো বোধ হইতেছে। লোহা-গলানো, ইস্পাতগড়া, কারখানার জন্য যন্ত্র হাতিয়ার ইত্যাদি তৈয়ারি করা, এই সবই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। একটা বড় নামজাদা শহর পার হইলাম। নাম শার্ল্‌রোআ (Charleroi)। এখানে কাঁচের কাজও বড় রকম চলিয়া থাকে। মোটের উপর এই শহরকে বেল্‌জিয়ামের শাকৃচি বলিতে পারি।

ছোটখাট খালসদৃশ নদী বা ঝরণাগুলায় যন্ত্র বসাইয়া তড়িৎ বা আগুনের শক্তি তৈয়ারি করা হইতেছে। নদীর উপর বহু ষ্টীমলঞ্চ বা কলে-চলা নৌকা ভাসিতেছে। কোথাও কোথাও ছিপে মাছ ধরার সখও দেখিতেছি প্রচুর।

ফ্রান্সে জানোআর চোখে পড়ে নাই। বেল্‌জিয়ামের মাঠে মাঠে ভেড়া চরিতেছে পালে পালে। সেদিনকার লড়াইয়ে এই দেশের সকল পল্লী-নগরই খবরের কাগজে বিখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তর ফ্রান্স আর বেল্‌জিয়াম চিরকালই লড়াইয়ের মাঠ রূপে বিরাজ করিতেছে। নামুর ও লিয়েজ শহর দুইটার দুর্গ নামজাদা। পাহাড়ী দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু গাড়ীতে বসিয়া বুঝা যাইতেছে।

লিয়েজে (Liege) মধ্যযুগের মন্দিরাদি অট্টালিকার নমুনা আজও দেখা যায়। বেল্‌জিয়ামের অন্যান্য নগরের মতন লিয়েজও শিল্পপ্রধান।

বেল্‌জিয়ান নারীরা বাঁক ঘাড়ে করিয়া জল বহিতেছে। ইয়োরোপে বাঁকের রেওয়াজ এই প্রথম দেখিলাম। বাঁক বস্তুটা তাহা হইলে বুঝিতেছি এশিয়ারই খাস আবিষ্কার নয়!

বহুসংখ্যক পাহাড়ে সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া রেল চলিতেছে। বেল্‌জিয়ামের যতটুকু চার পাঁচ ঘণ্টার ভিতর নজরে আসিল সবই হয় হাজারিবাগ রাঁচি, না হয় আল্‌মোড়া দার্জিলিঙ। কথাটা খাটে প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক তরফ হইতে। কিন্তু আসল তফাৎ এই যে, বেল্‌জিয়ামের

প্রতি বর্গমাইলে লোকের বসত পাঁচশতেরও অধিক। অর্থাৎ এমন ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয় জগতের অতি অল্প জায়গায়ই দেখা যায়।

২। পরাধীন জার্ম্মানী

বিকাল হইয়া আসিল। গাড়ী সকাল হইতে জোরে চলিয়াছে। এখন দেখিতেছি গাড়ী চলেও না জোরে, থাকেও প্রত্যেক ষ্টেশনে অনেকক্ষণ, এদিকে আবার প্ল্যাটফর্ম্মে প্ল্যাটফর্ম্মে বেল্‌জিয়ান বা ফরাসী ফৌজ। অথচ বাহিরের লোকজন কথা বলিতেছে জার্ম্মান। খবরের কাগজ আর কেতাব বিক্রি হইতেছে জার্ম্মান। মায় পল্লীর বাড়ীঘরগুলির গড়ন পর্য্যন্ত ঠেকিতেছে নূতন ধরণের অর্থাৎ পরাধীন জার্ম্মানির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আসিয়া পৌঁছিলাম আখেন্ (Aachen) শহরে। এইটার ফরাসী নাম এ-লা-শাপেল (Aix la chapelle)। জার্ম্মানে বিদ্যাটা জাহির করিবার জন্য এক জার্ম্মান শিশুর সঙ্গে কথা পাড়িলাম। প্রথম বাক্যটা বাহির হইল আধা-জার্ম্মান আধা-ফরাসী। খবরের কাগজে দেখিলাম জার্ম্মানির জনসাধারণও কালিকটের ভারতীয় "বিদ্রোহের" খবর পাইয়াছে।

আখেন্ ইয়োরোপের এক প্রসিদ্ধ শহর। এখানে যুগে যুগে অনেক লড়াই হাঙ্গামা দরবার ও রাষ্ট্রীয় জটলা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পর যেমন ভার্সাইয়ে বসিয়াছিল জেতাদের এক বড় কংগ্রেস, সেইরূপ নেপোলিয়ানি সমরের পর ১৮১৮ সালে আখেনে বসে "সর্ব্বরাষ্ট্রীয়" সম্মেলন।

আখেন্ আজ পরাধীন জার্ম্মানির পশ্চিম সীমানা। এই শহরটা জার্ম্মানির প্রতিজ্ঞাপালনের বন্ধক স্বরূপ ফরাসী-বেল্‌জিয়ান-ইংরেজের হাতে রহিয়াছে। যতদিন জার্ম্মান-রাষ্ট্র সুদে আসলে লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের টাকা সমঝাইয়া না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিজেতাদের তাঁবে থাকিবে এই শহর। এই ধরণের আরও অনেক জার্ম্মান শহর আজ পরহস্তগত বন্দী। বলিতে কি, গোটা রাইন-মাতৃক জনপদই এইরূপ পরাধীন।

ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে আখেন্ উত্তর-ইয়োরোপের এক দিল্লী বিশেষ। এইখানেই ছিল শার্ল্‌ম্যাঞের (Charlemagne) রাজধানী। এই কেন্দ্র হইতে তখনকার ফ্রান্স ও জার্ম্মানি একভাবে শাসিত হইত। তখন উত্তর-ভারতে চলিতেছে ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্য। আজকালকার খেয়ালের "জাতীয়তা" বা স্বাদেশিকতা তখন পৃথিবীর কোনো লোকের মগজেই গজায় নাই,—না ইউরোপে, না এশিয়ায়।

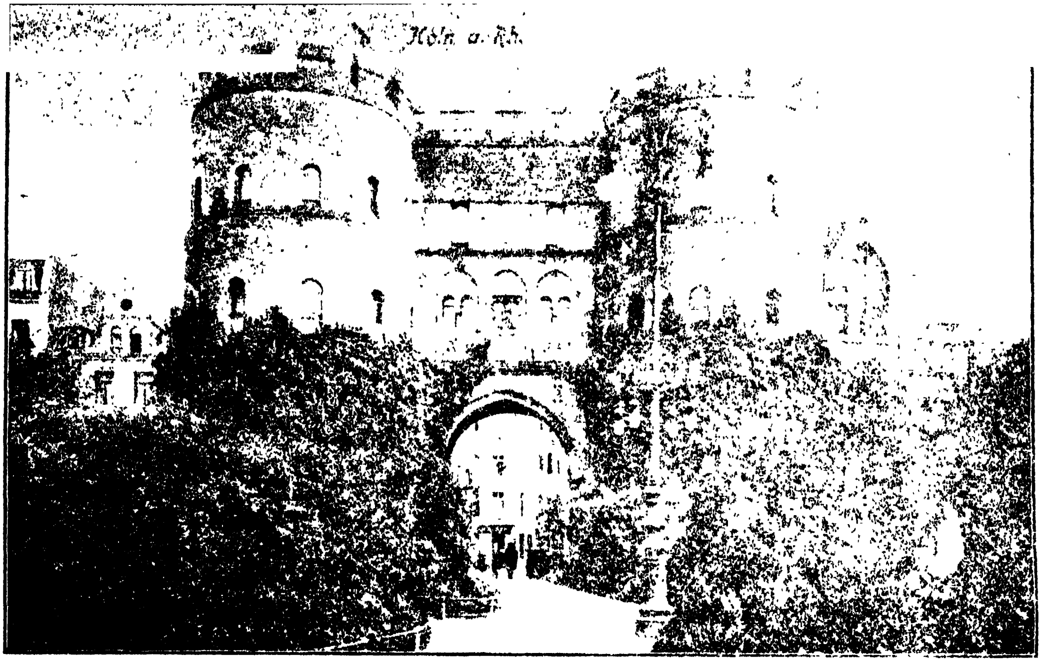
যাহা হউক,—কিছু দিন পর ফ্রান্সের ও জার্ম্মানির জেলাগুলা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। কিন্তু তখনও আখেনের গৌরব লুপ্ত হয় নাই। অন্ততঃ জার্ম্মানভাষাভাষী জেলাগুলার জোড়া-তালি-দেওয়া কথঞ্চিৎ-ঐক্যবিশিষ্ট এক তথাকথিত সাম্রাজ্য ফ্রান্সক্রাটা হইয়া চলিতে থাকে। সেই সাম্রাজ্যের সম্রাট-বাহাদুরদের রাজ্যাভিষেক হইত এই শহরে। সাড়ে তিনশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত আখেনে এই ধরণের রাজদরবার বসিয়াছে। সাবেক কালের চিহ্ন প্রাসাদে কবরে গির্জ্জায় দেখিতে পাওয়া যায় শুনিতেছি

আজ রবিবার। জার্ম্মান পল্লীতে পল্লীতে নরনারীরা বিকালে সান্ধ্য সফরে বাহির হইয়াছে। কোথাও কোথাও খোলা উঠানে রেষ্টরাণ্ট্ জাতীয় দোকানে বসিয়া লোকেরা কাফি বা বিয়ার ইচ্ছা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা মারিতেছে। ভূমি সর্ব্বত্র দেখিতেছি তরীতরকারীর জন্য চষা। স্বচ্ছন্দ সচ্ছল জীবনযাপনের প্রমাণ পাইতেছি।

মাঠে মাঠে গরুর পাল দেখিতেছি অনেক। গরুগুলা হৃষ্টপুষ্টও বটে। জার্ম্মান গাইয়ের রং বিচিত্র। আমরা ভারতে সাধারণতঃ এই ধরণের গরু দেখি না। প্রায় প্রত্যেকটাই দুই রংয়ের, সাদায় ও কালোয় চিত্রিত। আর চামড়ার বর্ণসমাবেশটাও বিচিত্র। প্রায়ই মনে হয় যেন জেব্রাজাতীয় দুই রংয়ের রেখা বা লেপাওয়ালা জানোয়ার বিশেষ দেখিতেছি। তবে জেব্রার গায়ে রেখাগুলা সরু এবং গুনতিতে অনেক। কিন্তু জার্ম্মান গাভীর পিঠে অত বেশী দাগ নাই।

রাইনের কিনারায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্যারিস হইতে লাগিল বার ঘণ্টা। এইটাই প্যারিস-বার্লিনের সোজা পথ। রাত্রি এখন প্রায় নয়টা। শহরের নাম ইংরেজিতে কোলোন (Cologne), ফরাসী উচ্চারণ যার কোলোঞ্। খাঁটি স্বদেশী জার্ম্মান নাম ক্যোল্‌ন্ (Köln)।

জার্ম্মাণ ভাষায় "o" হরপের উপর দুই ফুটকি থাকিলে



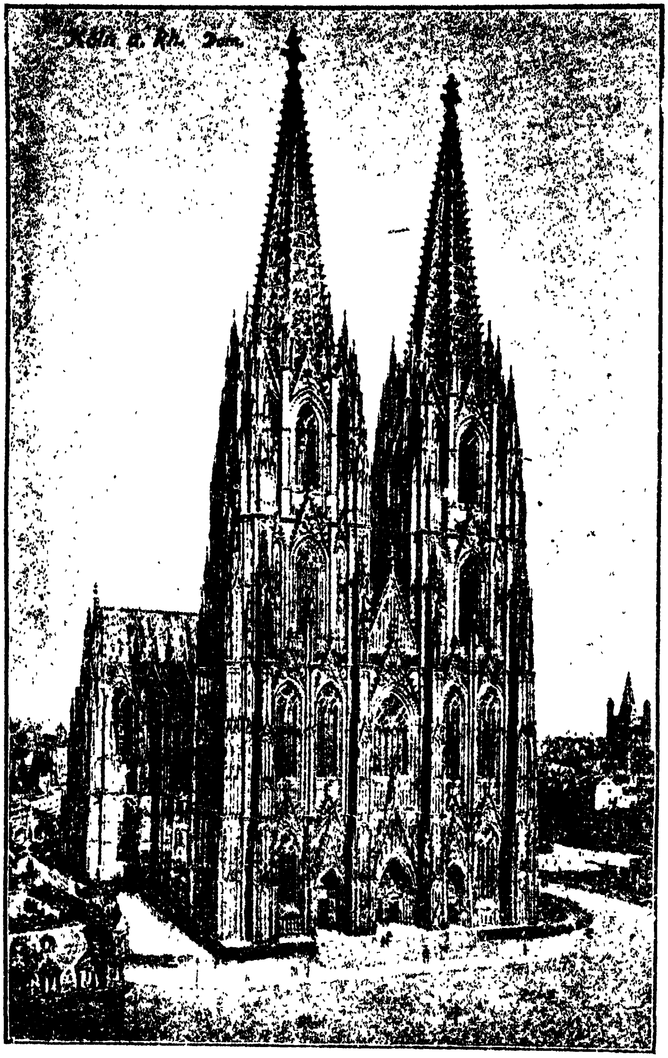
কোল্‌নের এক নগর-দুয়ার।

"o"র দাম বদ্‌লাইয়া যায়। সাধারণতঃ ইংরেজিতে লিখিতে হইলে দুই-ফুট্‌কিওয়ালা "o"র বদলে লেখা হইয়া থাকে "oe"। উচ্চারণের সময় "ও"কারকে প্রায় "এ"কারে নামাইতে হয়। বলা বাহুল্য অ-জার্ম্মান মাত্রের পক্ষেই এই স্বরূপ উচ্চারণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

হোটেলের ছোক্‌রা ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হে বাপু, এশিয়ার নাম শুনিয়াছ কি?" নিজকে কিছু অপমানিত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া উঠিল—"এদেশ কি রুশিয়া মনে করিতেছেন? আমাদের দেশে ইস্কুল আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আরে চটো কেন? ইংরেজিটা শিখিলে কোথায়?" "কোল্‌নের পাঠশালায়। আমার পরিবারের কেহ কেহ বহু বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে বসবাস করিতেছে।" নানা কথাবার্ত্তার ভিতর যুবক বলিল—"আজকাল কোল্‌ন্ শহরটা বানান করা হয় K দিয়া। এইটা বিপ্লবের ফল।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ বিপ্লব?" জবাব—"১৯১৮ সালের ঘটনা,—যাহাতে কাইজার পলাইতে বাধ্য হইয়াছেন হল্যাণ্ডে।" প্রশ্ন—"K দিয়া বানান করার ভিতর এমন কি বিশেষত্ব আছে?" "আরে মশায়, কাইজারটার বাতিক ছিল সব K-ওয়ালা শব্দগুলাকে C দিয়া লেখানো। বাদ্‌শার আমলে এ শহরটার নাম বানান করা হইত Cöln রূপে। কিন্তু জার্ম্মানরা আবহমানকাল পছন্দ করিয়া আসিতেছে Köln, কাজেই কাইজারকে গদি হইতে তাড়াইবার মুহূর্ত্ত হইতেই জার্ম্মান-রিপাব্লিক শব্দের বানানেও স্বরাজ ফিরাইয়া আনিয়াছে।"

কোল্‌ন্ অনেকদিনের পুরাণা শহর। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে এইটা ছিল "সভ্যতার" উত্তরপূর্ব সীমানা। রোমানরা রাইন পার হইয়া পূর্ব্বদিকে—অর্থাৎ আজকালকার জার্ম্মানির বুকের উপর—রাজ্য কায়েম করিতে পারে নাই। শহরটার ল্যাটিন নাম ছিল কোলোনিয়া।

ষ্টেশনের নিকটেই বিরাট মন্দির দেখিলাম। ক্যাথিড্রালকে জার্ম্মানে বলে ডোম্ (Dom)। এটা মধ্যযুগের কীর্ত্তি। গড়া সুরু হইয়াছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। নির্ম্মাণকাণ্ড শেষ করিতে



কেলনের ডোম্।

লাগিয়াছে ছয়শত বৎসরের অধিক। শুনিতেছি ১৮৮০ সালে নাকি মন্দির গঠন সমাপ্ত হইয়াছে। এ এক বিপুল ব্যাপার—এপাশ ওপাশ যেদিক হইতেই দেখি, মনে হয় যেন পাহাড়ের পায়ে দাঁড়াইয়া আছি। বাস্তুরীতি বিলকুল গথিক,—যাহার প্রসিদ্ধ নিদর্শন প্যারিসের "নোৎর্ দাম"। তবে কোল্নের ডোমের শিখরগুলা ছুঁচোলো পুরাপুরি আর ফরাসী-গথিকের প্রধান শিখর দুইটার মাথা সাধারণ ছাদের মতন সমতল। কোল্নের গির্জ্জা এক জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মসৌধ সন্দেহ নাই।

রাস্তায় রাস্তায় ছেলেরা নিশান লইয়া ম্যাণ্ডোলিন বাজাইয়া গান করিয়া ফিরিতেছে। সর্ব্বত্র দেখিতেছি ইংরেজ পল্টনের গতিবিধি। কোল্ন্ রহিয়াছে ইংরেজের দখলে। রাইন-ধৌত জনপদে কোল্নই জার্ম্মানির সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নগর। এত বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রও জগতে খুব অল্পই আছে। বাড়ীঘরগুলা নিরেট এবং ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক।

৩। কোল্ন্ হইতে কোব্লেন্ৎস্

পরদিন সকালে রেলে বসিলাম। গাড়ী চলিতেছে দক্ষিণে রাইনের ধারে ধারে নদী উজাইয়া;—ঠিক যেমন কায়রো হইতে গিয়াছিলাম নাইলের কিনারা দিয়া লুক্সর—কার্ণাক—আসোআনের দিকে। এখনো রাইন পার হই নাই,—অর্থাৎ নদীর বাঁদিকেই চলিতেছি। সমতল ভূমি, উর্ব্বর ও চষা। কোথাও কোথাও লাঙ্গলে দেখিতেছি তিন তিন ঘোড়া জুতিয়া আবাদ চালানো হইতেছে। পল্লীকুটিরের গড়ন-ভঙ্গিমায় ত নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি আথেনের অঞ্চল হইতেই।

একটা বড় শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। নাম বন্ (Bonn)। ফরাসী পল্টনের আওতা দেখিতেছি। জমিন এখানে সমতলই বটে, কিন্তু গাড়ী হইতেই দেখিতেছি শহরের সীমান্তে কিছু দূরে অল্পোচ্চ পাহাড়শ্রেণী আর গিরিপৃষ্ঠে বিলাসভবন বা শাটো (chateau) জাতীয় গ্রীষ্মকুটির বা ঐ ধরণের কিছু। গড়নরীতিতে এই-সকল ঘর দেখায় মধ্যযুগের দুর্গজাতীয় হর্ম্ম্য। নিকটেই বাঁদিকে রাইন।

রাইন-মাতৃক ক্ষেতগুলা লালচে মাটির ভূমি। বিশেষ শুক্না বোধ হইতেছে না। বিহার প্রদেশের মাটিই মোটের উপর লক্ষ্য করিতেছি। কপি শালগম কুমড়া আলু ইত্যাদির আবাদ সুপ্রচলিত। মাঝে মাঝে গাঁদাফুলের হলুদে বাহারও ক্ষেত গুল্জার করিয়া রাখিয়াছে।



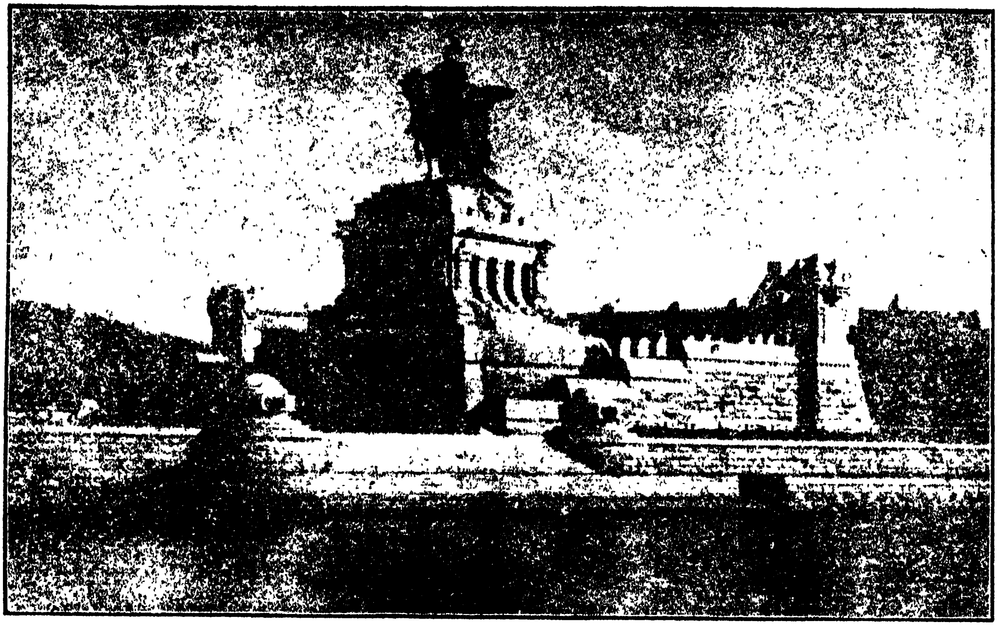
ডোমের ভিতরকার দৃশ্য।

লড়াইয়ের দাগ ফ্রান্সে দেখিয়াছি জমিনে ঘরবাড়ীতে। জার্ম্মানিতে দেখিতেছি লোকজনের ঘাড়ে কপালে নাকে মুখে। জার্ম্মান পুরুষদের একটা বিশেষত্ব ইতিমধ্যেই নজরে পড়িয়াছে। ইহাদের চুল ছাঁটা হয় একদম মাথার চাম্‌ড়া ঠেকাইয়া। ক্ষুর দিয়া কামানো মাথাই যেন দেখিতেছি অনেক,—অথবা মাথাগুলা আগাগোড়াই কি টাক-পড়া? যাহোক একটা রহস্য বটে।

অনেক সহযাত্রীকে দেখিতেছি ঘাড়ে বোঁচ্‌কা বা বস্তা বাঁধিয়া চলাফেরা করিতেছে। বোঁচ্‌কাগুলা ছেলেদের হাতের কেতাবী ব্যাগের মতনই অনেকটা,—যাকে বলে স্যাপ্‌স্যাক্‌,—তবে কিছু বড়। ভাবিতেছি, মধ্যবিত্ত জার্ম্মান সমাজে এ একটা লড়াইয়ের সুফল। লড়াইয়ের সময়কার মোটবহা ও কষ্টস্বীকার করার অভ্যাসটা দেশে রহিয়া গিয়াছে আজও। বাবু-সমাজকে দুরস্ত করিবার পক্ষে লড়াইয়ের সমান মুগুর আর নাই। মাঝে মাঝে লড়াইয়ের দেখা পাওয়া জগতের পক্ষে মঙ্গলকর।

বন্‌ জার্ম্মান কুল্টুরের এক বড় খুঁটা। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুরু বেঠোফেন (Beethoven) জন্মিয়াছিলেন এই নগরে। বেঠোফেনের সঙ্গীতকলা ভারতবাসীকে ভাষায় বুঝানো আজও সহজ নয়। ইঁহার রচিত সুরের "রূপ"গুলাকে বলে সিম্‌ফনি। সিম্‌ফনি বস্তুর বাংলা প্রতিশব্দ ঢুঁড়িতে বসা সময় নষ্ট করা মাত্র। কোনো কোনো সিম্‌ফনি এত লম্বা যে অনর্গল একঘণ্টা লাগে বাজাইয়া শেষ করিতে। ভারতসন্তান পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইবে না কি? যদি রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি আর বোল্‌শেভিক-তত্ত্ব পর্য্যন্ত ঝুঁকিতে পারিলাম, তাহা হইলে সিম্‌ফনি-মাহাত্ম্য বশে আনিতে অরাজি থাকিব কেন?

ঘণ্টা দু-একের ভিতর কোল্‌ন্‌ হইতে গাড়ী কোব্‌লেন্‌ৎস্‌ পৌছিল। মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাইনের লাগাই রেল। এখানে এক বড় বন্দর রেমাগেন (Remagen)। ল্যাটিন আমলেও এই বন্দর প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য যুগের গির্জ্জা পুনর্গঠিত হইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য রাইনধৌত অঞ্চলের গির্জ্জাগুলা সবই প্রায় ক্যাথলিকপন্থী। বস্তুতঃ আখেন হইতে সুরু করিয়া ক্যাথলিক আওতাতেই আছি। নয়া প্রটেষ্টাণ্ট মতের



কাইজার হ্বিল্‌হেল্ম ডেঙ্ক্‌মাল (কোবলেন্‌ৎস্)।

গির্জ্জার সঙ্গে গোঁড়া ক্যাথলিক গির্জ্জার সদ্ভাব আজও গজাইয়া উঠে নাই।

কোব্‌লেন্‌ৎস্ (Koblenz) এই অঞ্চলের এক প্রয়াগ স্বরূপ। মোজেল ও রাইনের সঙ্গমে ইহার অবস্থিতি। পুল দেখিতেছি দুইটা দুই নদীর উপর। সঙ্গমের কোণে এক বিরাট কাইজার-হ্বিল্‌হেল্ম ডেঙ্ক্‌মাল বা স্মৃতিস্তম্ভ। এই ধরণের বাদ্‌শাহী মনুমেণ্ট আখেন, কোল্‌ন্, বন্ ইত্যাদি সকল শহরেই আছে। কোব্‌লেন্‌ৎসের ডেঙ্ক্‌মাল(Denkmal)টায় অশ্বপৃষ্ঠে কাইজার বাহাদুর নদীর অপর দিকে তাকাইয়া আছেন। ওপারে এরেনব্রাইটষ্টাইন (Ehrenbreitstein) নগরের বিপুল গিরিদুর্গ পাহাড়ের উপর পাহাড়ের মতন দেখাইতেছে। স্মৃতিস্তম্ভে লেখা রহিয়াছে:—"Nimmer wird das Reich zerstoret Wenn ihr einig seid und treu" (নিম্মার হ্বিয়ার্ড ডাস্ রাইখ্ ৎসার্ষ্টোয়েরেট্, হ্বেন্ ঈয়র আইনিষ্ জাইড্ উন্ট্ ট্রয়)। অর্থাৎ "সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে না কোনো দিন, থাকিস্ যদি দেশ-ভক্ত আর একাধীন।" জার্ম্মান-সমাজে একতা ঐক্য ইত্যাদির দরদ ছিল খুব বেশী। কাজেই মুলুক জুড়িয়া (১৮৭০ সালে সাম্রাজ্য গঠনের পর অবশ্য) নগরে নগরে বাদ্‌শাহী বয়েৎ আর হিতোপদেশ জারি করা হইয়াছে।

কোব্‌লেন্‌ৎসে দেখিতেছি ইয়াঙ্কি পল্টনের দৌরাত্ম্য। যেখানে-সেখানে খাকি-পরা মার্কিন সৈনিক চলাফেরা করিতেছে। বড় বড় সর্‌কারী অট্টালিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিশান উড়িতেছে। মায় এরেন্‌ব্রাইটষ্টাইনের কেল্লার মাথায়ও আমেরিকান পতাকা। জার্ম্মান নরনারীর চরম দুর্গতি সন্দেহ নাই। আর দেখিতে পাইলাম, মস্ত মস্ত মার্কিন মোটর-লরিগুলা এ-রাস্তা হইতে ও-রাস্তায় ছুটিতেছে,—যেন কাজে শশব্যস্ত। অথচ কাজটা যে কি বোধ হয় ঢুঁড়িয়া পাওয়া কঠিন। বোধ হয় জার্ম্মান জাতকে এবং বিশেষতঃ জার্ম্মান সরকারকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝানো হইতেছে—দেখিতেছ না আমাদিগকে কত খাটিতে হইতেছে? এইসকল খাটার মজুরি তোমাদের খাজাঞ্চিখানা হইতেই ত উসুল হইবে। ভাবিও না আমরা না খাটিয়া তোমাদের রাষ্ট্রকোষ দুহিতেছি। অর্থাৎ ভার্সাইয়ের সন্ধিতে আমাদিগকে যত টাকা দিবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে তাহার কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত ন্যায্য।"

একটা রাইন-মিউজিয়াম কোব্‌লেন্‌ৎসে স্থাপিত হইয়াছে।

এই ধরণের মিউজিয়াম বোধ হয় রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরেই এক-আধটা আছে। কোব্লেন্ৎস্ মিউজিয়ামের কর্তা ডাক্তার স্পীজ্ (Spies) একখানা কেতাব প্রকাশ করিয়াছেন। নাম Rhein Kunde (রাইন-কুণ্ডে) অর্থাৎ রাইন-তত্ত্ব। রাইন বিষয়ক তথ্য,—ভূ-তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, শৈল্পিক, আর্থিক, সবই কিছু কিছু পুস্তিকায় পাওয়া যায়। এই আদর্শে গঙ্গা-কুণ্ডে বা গঙ্গাতত্ত্ব লইয়া কাশীতে একটা ছোট মিউজিয়াম তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথম তলায় রাখা হইবে নানা প্রকার মানচিত্র নদীর প্রাকৃতিক অবস্থা ও গঠন বুঝাইবার জন্য। দ্বিতীয় তলায় রাখা হইবে নদীর উপর মানুষের কাজের নিদর্শন—অর্থাৎ যুগে যুগে ভারতসন্তান কবে কোথায় কিরূপ নগর বা পল্লী নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার ছবি ও বিবরণ ইত্যাদি। তৃতীয় তলায় দেখিতে পাইব গঙ্গা লইয়া কোন্ শিল্পী বা কবি কিরূপ কারিগরি করিয়াছেন তাহার পরিচয়। রাইন-মিউজিয়ামে দেখিলাম কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ আর চিত্রে রাইনের দুইধারকার দৃশ্যাবলী। গঙ্গা-মিউজিয়ামে আরও দেখিতে হইবে শিল্প ও বাণিজ্যের ধারা, অর্থাৎ নৌকা, ষ্টীমার, পুল, রেল, বন্দর ইত্যাদির ক্রমবিকাশ। আমাদের দেশে যাহারা গঙ্গামাহাত্ম্য, গোদাবরী মাহাত্ম্য ইত্যাদি গাহিয়া থাকেন তাঁহাদের কেহ কেহ রাইনমাহাত্ম্য কীর্ত্তনের এই নয়া কায়দা হইতে কিছু নয়া কার্য্যপ্রণালী শিখিতে পারেন।

স্পীজ্ মহাশয় বলিলেন "কোব্লেন্ৎসেও ভারতবাসী? ব্যাপার কি?" ইনি ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে জানেন—"ইণ্ডো-গার্মাণিষে স্প্রাখে" (Indo-Germanische Sprache), যার সোজা প্রতিশব্দ "আর্য্য"ভাষ। ইহার বেশী ভারতকথা কোনো জার্ম্মান জানে কি না তাহা "রিসার্চ্চ" করিবার বস্তু!

৪। রাইন-বক্ষে

কোব্লেন্ৎসে কাটাইলাম প্রায় চার ঘণ্টা। প্যারিসের প্রায় আধা দামে রেষ্টরাণ্টে খাওয়া গেল। আর কিছুক্ষণ রেলে থাকিলে পৌঁছিতাম রাইন-মাইন (Main) সঙ্গমে। সেই সঙ্গমের এলাহাবাদের নাম মাইন্ৎস্ (Mainz), যে শহরটাকে ইংরেজিতে লেখা হয় Mayenceরূপে। মাইন্ৎস্ও জার্ম্মান কুল্টুরের এক প্রধান স্তম্ভ। এই শহরে জন্মিয়াছিলেন গুটেনব্যার্গ (Gutenberg) ১৪০০ খৃষ্টাব্দে। গুটেন্ব্যার্গ নব্যজগতের প্রথম মুদ্রাকর। মাইন্ৎসের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে হ্বীজ্বাডেন (Wiesbaden) শহর। এটা জার্ম্মানির এক নামজাদা বিলাসনগর। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে শকর করিতে আসেন। হ্বিজ্বাডেনের পূর্ব্বে বোধ হয় আধঘণ্টার রেলপথে মাইন নদীর উপর ফ্রাঙ্কফোর্ট নগর (Frankfort) অবস্থিত। ফ্রাঙ্কফোর্ট গোটের জন্মভূমি। দেখা যাইতেছে রাইনের আশপাশ আগাগোড়াই জার্ম্মান সমাজের গৌরবস্থল।

ভার্সাইয়ের সন্ধির কড়ার অনুসারে কোব্লেন্ৎসের দক্ষিণ হইতে মাইন্ৎস্ পর্য্যন্ত ফরাসাদের তাঁবে। কাজেই মাইন্ৎসে ফরাসী ফৌজের ছড়াছড়িই দেখিতে পাইতাম। আরও দক্ষিণে মান্হাইম্ (Mannheim) শহরেও ফরাসীদের কর্ত্তৃত্ব। মান্হাইম্ রাইন ও নেকারের (Necker) সঙ্গমস্থল। রাইন-মাহাত্ম্যে মান্হাইমের ইজ্জৎ খুব বড়—শিল্প ও বাণিজ্যের আসরে। ইহারই অল্প দূরে পূর্ব্বদিকে নেকারের উপর হাইডেল্ব্যার্গ (Heidelberg) শহর। হাইডেল্ব্যার্গে জার্ম্মানির সর্ব্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সুবিদিত। হাইডেল্ব্যার্গের উপর ফরাসী আওতা নাই। মান্হাইমের অনেক দক্ষিণে রাইনের এক বড় শহর ষ্ট্রাস্বুর্গ (Strasburg)। এটা অবশ্য লড়াইয়ের ফলে আজ পুরাপুরি ফ্রান্সের অন্তর্গত।

এইসব দেখিতে হইলে রাইন-যাত্রায় বাহির হইতে হইত। তাহাতে প্রলুব্ধ না হইয়া কোল্নে ফিরিবার মতলবে কোব্লেন্ৎসে ষ্টীমার ধরিলাম। রাইনে স্রোত খুব জবর। ষ্টীমার চলিতেছে উত্তর দিকে অর্থাৎ স্রোতের মুখে। আরোহীর সংখ্যা অনেক, বোধ হয় দুই হাজারেরও বেশী। এক মোসাফির বলিলেন:—"এরেনব্রাইট্ষ্টাইনে পুরাণা মন্দির আছে কতকগুলা। তীর্থ-যাত্রীর ভিড় ওখানে খুব বেশী।" দুর্গ কিনারায় পাহাড় দেখিতে দেখিতে ভাটাইয়া অগ্রসর হইতেছি।

রাইন ইয়াংসিকিয়াঙের মতন রক্তদরিয়া নয়। অথবা সেইনের মতন নেহাৎ বর্ণহীনও নয়। অনেকটা গঙ্গার ঘোলা জলই এখানে চোখে পড়িতেছে। বিকালে ঘাটের

ধারে বেড়াইতে আসিয়া অনেকেই দেখিতেছি সাঁতার কাটিতেছে। ষ্টীমারের ষ্টেশনে ষ্টেশনে হৃষ্টপুষ্ট যুবার দল করিয়া আসিয়া জুটিতেছে। অনেকেরই হাতে লাউটে, গিটার, মাণ্ডোলিন, ইত্যাদি তারের বাদ্যযন্ত্র; গান বাজনা চলিতেছে।

কোনো কোনো দলে "যুবক সমিতির" নিশানে লেখা আছে—"জয় যৌবনের জয়।" একদিন না একদিন এই যৌবন-পূজাই ভার্সাই-সন্ধির প্রতিহিংসা লইয়া ছাড়িবে। যে ব্যক্তি জীবনে কখনো প্রতিহিংসা রাখে নাই সে নরাধম,—আর যে জাতি প্রতিহিংসা শব্দটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে সে জাতি বাঁচিয়া নাই। মানব-রক্তের এইটাই অতি প্রাথমিক কথা। ইংরেজ ফরাসী বেল্‌জিয়ান মার্কিন ফৌজের আওতায় জার্ম্মান সমাজ মুশ্‌ড়িয়া রহিয়াছে, বেশ বুঝিতেছি; এই কয় ঘণ্টাতেই কিন্তু জার্ম্মান নরনারীর জীবনবত্তাও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। জার্ম্মানি আবার উঠিবে, অল্প দিনের ভিতরেই; তবে কোন্ মূর্ত্তিতে তাহা আন্দাজ করা কঠিন।

রাইনের দুই ধারের পাহাড়ে পাহাড়ে দুর্গ মধ্যযুগের আমল হইতেই বিরাজ করিয়া আসিতেছে। কোনিগ্‌স্‌ভিণ্টার (Konigswinter) বন্দরের জিবেন্‌গেবির্গে (Siebengebirge) বা সাত-পাহাড় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। পুরাণা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তরুহীন পাহাড়ের মাথায় পাথরের স্তম্ভের মতন বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য এইসকল অঞ্চলে ক্যাথলিক দুর্গের গির্জ্জাগুলা আজও জার্ম্মান নরনারীর লৌকিক ধর্ম্ম বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বনে (Bonn) পৌঁছিলাম। পথে পড়িল অজস্র ষ্টীমার বা ষ্টীম-চালিত নৌকার সারি। এই-গুলার অধিকাংশই মালের নৌকা। প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী হইবে ওলন্দাজ জাতীয় লোকের জলযান। চিম্‌নি এবং ফ্যাক্টরির ধোঁয়াও প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই লক্ষ্য করিয়াছি। ইয়াংসি বা গঙ্গা ও পদ্মার উপর অবশ্য নৌকায় ও ষ্টীমারে মাল চালান হয় কম না। কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গা আর হ্যাংচাওয়ের নিকটবর্ত্তী ইয়াংসি ছাড়া আর কোথাও কলকারখানার আওতা নাই। পরন্তু রাইন ব্যবসায় বাণিজ্যে যেমন চঞ্চল, শিল্পেও তেমন সন্ত্রস্ত।

বনে পূর্ব্বেই দেখিয়া গিয়াছি ফরাসী ফৌজের তাঁবু ও কুচকাওয়াজ। অথচ এই অঞ্চলটা থাকা উচিত ইংরেজের অধীনে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে। এক ব্যক্তিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। জবাব পাইলাম—"সিলেশিয়ার আর আয়র্ল্যাণ্ডের হাঙ্গামার জন্য ইংরেজকে এখান হইতে অনেক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদের স্থানে বসিয়াছে ফরাসী।"

সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গ আর লুডেন্‌ডোর্ফের ছবিতে এই দুই জনের ভুঁড়ি দেখিয়া আমরা বুঝিয়া রাখিয়াছি যে জার্ম্মানরা ভুঁড়িওয়ালা জাত। কিন্তু ষ্টীমারের এতগুলা পুরুষের ভিতর সেই ছবিপ্রসিদ্ধ ভুঁড়ি ঢুঁড়িয়া পাইতেছি না। আর কাইজারি গোঁফও নেহাৎ বিরল। বরং দেখিতেছি উল্টা। খাড়া উঠা গোঁফের বদলে দেখিতেছি আধা-কামানো গোঁফ। মোসাফিররা খুব আমোদে সময় কাটাইতেছে। বোতল বোতল বিয়ার (শরাব-বিশেষ, যদিও নেশা হয় না) উজাড় হইতেছে, তাসের জুয়া চলিতেছে। মাঝে মাঝে পুরুষেরা দল বাঁধিয়া গান ধরিতেছে, মেয়েরা কোনো দিকেই বিশেষ অগ্রণী নয়।

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রাইন অঞ্চলে বিজেতাদের পল্টন বসিয়াছে সত্য কথা। কিন্তু ইহাতে জার্ম্মানির টাকা খরচ ছাড়া আর কোনো লোক্‌সান হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।" সহযাত্রী বলিলেন—"তাহা হইলে আপনি কিছুই বুঝিলেন না। যে যে অঞ্চলে ইংরেজ ফরাসী মার্কিন বেল্‌জিয়ানের এক্তিয়ার কায়েম হইয়াছে সেই সেই অঞ্চলের খবরের কাগজের উপর কড়া আইন। সভাসমিতি বক্তৃতা ইত্যাদি এক প্রকার রদ হইয়াছে। বিজেতাদের মঞ্জুর না হইলে কোথাও জনসমাগমের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এমন কি ইস্কুল-গুলায় পর্য্যন্ত ইহাদের হাত আসিয়াছে। স্বদেশী গান গাওয়ায় বাধা পড়িয়াছে। ইতিহাস বিষয়ক কেতাবগুলা বাজেআপ্ত করা হইয়াছে অথবা বদ্‌লাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইত্যাদি।" শুনিলাম ক্যোল্‌নের এক গির্জ্জায় ইংরেজ সিপাহীরা সশস্ত্র খৃষ্টপূজা করিয়া থাকে। আর সেখানে "নেটিভ"দের অর্থাৎ জার্ম্মান নরনারীর প্রবেশ নিষেধ।

একব্যক্তি বিলাতে বসবাস করিয়াছেন একপ্রকার

আজীবন; স্ত্রী তাঁহার ইংরেজ। বিলাতী ব্যবসায়-মহলে এই জার্ম্মানের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ইনি বলিতেছেন— "ইংরেজে আর জার্ম্মানে সামাজিক লেনদেনে রেষারেষি বাড়াইয়া তুলিয়াছে লর্ড নর্থক্লিফের দুই কাগজ 'ডেলি মল' আর 'ঈভনিং নিউজ'। লড়াইয়ের সময় ষাট হাজার জার্ম্মান নরনারীকে বিলাতের লাগালাগি ছোটখাটো দ্বীপগুলায় নির্ব্বাসিত করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। আর্মিষ্টিসের পর এই ষাট হাজার লোক কপর্দ্দকহীন ভাবে জার্ম্মানিতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।"

বনের নিকট রাইন অনেকটা প্রশস্ত, কলিকাতার গঙ্গার সমান যদিও নয়। এখান হইতে আর পাহাড় দেখিতেছি না। সমতল ভূমি দুইধারে কোল্‌ন্ পর্য্যন্ত। কোল্‌নের পুল জাঁকালো বটে।

রাইনের বিদেশী সৈন্যরা জার্ম্মান নারী বিবাহ করিতেছে। ইংরেজ আর মার্কিনের সঙ্গে বিবাহ সহজেই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে জার্ম্মান সমাজ এখনো ঘনিষ্ঠতা চাহে না।

বিদেশী ফৌজ অতি উঁচু হারে বেতন পায়। শুনিলাম ইংরেজ সৈনিক পায় রোজ ছয় শিলিঙ্। অর্থাৎ ইহারা স্বদেশে কারখানায় খাটিয়া খাইতে হইলে যত মজুরি পাইতে পারে এই পরাধীন মুল্লুকের রক্ত শুষিতে আসিয়া তাহার অন্ততঃ চারগুণ বেশী ভোগ করিতেছে। পরাধীনতার অবস্থা জগতে সর্ব্বত্রই একপ্রকার, কি এশিয়ায় কি ইয়োরোপে। এমন কি সাদাচামড়াওয়ালা পরাধীন জাতির সঙ্গেও সাদাচামড়াওয়ালা বিজেতারা বিশেষ ভ্রাতৃত্বের সহিত ব্যবহার করিতেছে না। এশিয়ায় যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন অথবা ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ল সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পরাধীন জার্ম্মানি সংক্রান্ত দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিলে নূতন আলোক পাইবেন।

৫। মধ্য জার্ম্মানির উত্তর জনপদ

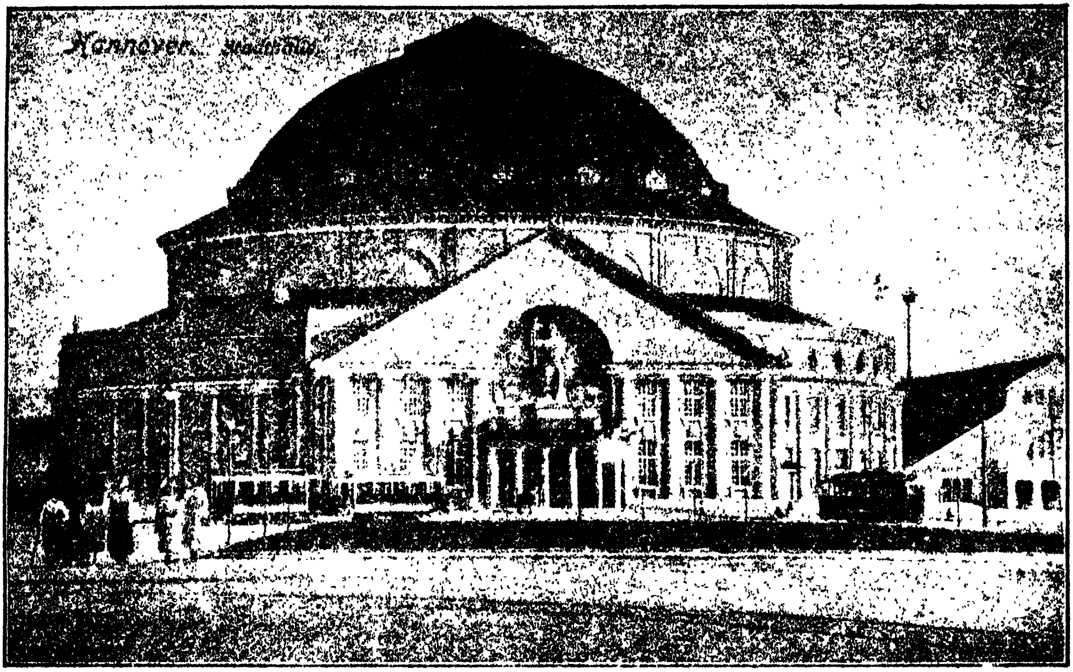
কোল্‌নে বার্লিনের রেলে বসিলাম। প্রথমেই পার হইতে হইল রাইন পুলের দুই মাথায় ইংরেজ পল্টন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আধখানাই "রিজার্ভ্‌ড্"। বিজেতাদের উচ্চ কর্ম্মচারীর যাওয়া-আসার জন্য এই ঘরগুলা মার্কামারা রহিয়াছে। অথচ কোনো ঘরেই বিদেশী সৈন্যসামন্তের টিকি দেখিতে পাইলাম না।

সমতল ভূমির উপর রেলপথ নির্ম্মিত। রাইনের কিনারায় ডিসেল্‌ডোর্ফ (Dusseldorf) এক প্রসিদ্ধ শিল্প-বন্দর। আর-এক বড় বন্দর ডুইজ্‌বুর্গ (Duisburg)। শহর দুইটায় আবার বেলজিয়ামের শার্লরোয়া অঞ্চলের লোহালক্কড়ের আওতা পাইলাম। ডিসেল্‌ডোর্ফ হায়নে (Heine) কবির জন্মভূমি। জার্ম্মান পল্লী-শহরের নামে "ডোর্ফ" আর "বুর্গ" শব্দ অতি সাধারণ। এইগুলা আমাদের সুপরিচিত পুর গঞ্জ ইত্যাদি। বস্তুতঃ ডোর্ফ্ শব্দের অর্থ গ্রাম, আর বুর্গ্ শব্দের অর্থ শহর।

ডুইজ্‌বুর্গ্ রুর (Ruhr) রাইন সঙ্গমে অবস্থিত। অল্প দূর পূর্ব্বে পাইলাম মুল্‌হাইম (Mulheim) শহর রুরের উপর। মুল্‌হাইমে জার্ম্মান ক্রোড়পতি ষ্টিন্নেস্ (Stinnes) তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ কারখানা কায়েম করিয়াছেন। ষ্টিন্নেসের নাম জানে না জার্ম্মানিতে এমন লোক নাই। সমরপন্থী আর ন্যাশন্যালিষ্ট লোকেরা ষ্টিন্নেসের ষ্টিল-ফ্যাক্টরিগুলাকে স্বদেশের লৌহবর্ম্ম বিবেচনা করে। ঠিক এই কারণেই কমিউনিষ্ট আর ইণ্টার্ণ্যাশন্যালিষ্টরা এইগুলার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। বলা বাহুল্য এইজন্যই ষ্টিন্নেস্ ফরাসী রাষ্ট্রেরও চক্ষুশূল।

অল্পক্ষণের ভিতরেই ষ্টিন্নেসের আওতা হইতে ক্রুপের (Krupp) আওতায় পৌঁছিলাম। শহরের নাম এস্‌সেন (Essen)। ক্রুপ আর-এক ক্রোড়পতি, পুরাণা কাইজারের বন্ধু, হিণ্ডেনবুর্গের এক-গেলাসের ইয়ার ইত্যাদি। ক্রুপের নাম জানে জগতের সকল লোকেই। এস্‌সেনের তোপখানা ছিল মরা জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের আসল কেল্লা।

এস্‌সেনে শেষ হইল রাইন প্রদেশের পূর্ব্বসীমানা। বিজেতারা ডিসেল্‌ডোর্ফ, ডুইজ্‌বুর্গ্, মুল্‌হাইম্ আর এস্‌সেন —এই শহর কয়টা ভার্সাইয়ের সন্ধিতে স্ববশে আনিবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে এই অঞ্চল জার্ম্মানদের হাতছাড়া হয় নাই। তবে ফরাসীরা আজও যখন-তখন জার্ম্মানিকে শাসাইয়া থাকে—"বেশী বাড়াবাড়ি যদি কর, তাহা হইলে রুর উপত্যকা দখল করিয়া বসিব।" মুল্‌হাইম্



হান্নোফারের টাউন হল।

আর এস্‌সেনকে যদি চুরমার করিতে পারিত তাহা হইলে ইংরেজ-বেল্‌জিয়ান-ফরাসীর সাধ মিটিত। শুনিয়েছি ইতি-মধ্যে এস্‌সেন ছাড়া অন্য শহর তিনটায় কয়েকমাস ধরিয়া বিজেতাদের নিশান উড়িতেছে।

রাইন জেলার পর হ্বেষ্ট্‌ফালিয়া (Westphalia) জেলায় গাড়ী পড়িল। দেখিবার নাই কিছুই। সমতল মাঠের পরে মাঠ, কিন্তু "মাঠের শেষে সুদূর গ্রামখানি" আর চোখে পড়িতেছে না। কদাচ এক-আধটা পল্লী-কুটির দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে এক বিরাট লড়াই হয়। তাহাতে জার্ম্মানির হাড় গুঁড়া হইয়া যায়। সেই যুদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হ্বেষ্ট্‌ফালিয়া প্রদেশে। শহরটার নাম ম্যিন্‌ষ্টার। রেলপথের অনেক উত্তরে এই নগর অবস্থিত।

হ্বেষ্ট্‌ফালিয়ার পূর্ব্ব সীমানায় হ্বেজার (Weser) নদী পার হইলাম। হান্নোফার জেলার ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। এই জেলাই আজকালকার বিলাতী রাজাদের পূর্ব্বপুরুষের জমিদারী ছিল। পাঠশালায় শেখা গিয়াছিল এই বংশের প্রথম দুই রাজা ইংরেজিতে কথা বলিতে পারিতেন না, তাঁহাদের ভাষা ছিল জার্ম্মান।

হান্নোফার জেলার কেন্দ্রের নামও হান্নোফার। শহরটা অনেক দূর হইতেই রেলে বসিয়া দেখিতে পাইলাম। নানা রং-বেরঙের শিখর- ও গুম্বজওয়ালা ঘরবাড়ীর পরিচয় পাইতেছি। ফ্যাক্টরির চিম্‌নিও দেখা গেল অনেক। রাইনের কিনারায় হ্বীজ্‌বার্ডেন শহরে শুনিয়াছি সোনালী-চূড়া-সমন্বিত সৌধ আছে। হান্নোফারেও এইরূপ হর্ম্ম্য নজরে পড়িল। কিন্তু গোটা হান্নোফার জেলার মধ্যে রেলপথে একটা কুঁড়েও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল জঙ্গল, পাইনগাছের বন বিশেষ, আর রেলপথের ধারে ধারে কাটা কাঠের স্তূপ।

কাম্‌রার ভিতরই খান্‌সামা চা দিয়া গেল। সম্মুখে উপবিষ্ট এক ওলন্দাজ জাতীয় ইহুদি যুবক ও তাঁহার স্ত্রী। সদ্য বিবাহের পর ইঁহারা সফরে বাহির হইয়াছেন। যুবক গরুর ব্যবসা করে। ওলন্দাজ গাভীর দাম অনেক। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে যেসকল গরু রপ্তানি করা হয় তাহার দাম এক হাজার হইতে তিনহাজার টাকা। রোজ আধমণ দুধ

হল্যাণ্ডের প্রায় প্রত্যেক গরু হইতেই পাওয়া যায়। যে গরুর দাম তিনহাজার টাকা তাহার দুধ মাখন ও চর্ব্বি হইতে সপ্তাহে আয় হয় অন্ততঃ ষাট টাকা।

হান্নোফার জেলার বন্দরের নাম ব্রেমেন (Bremen)। এই শহর হেবজারের উপর; সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। সেই শহর অবশ্য পথে পড়িল না। বন-জঙ্গলের আওতাতেই আছি। মাঠের কোথাও কোথাও দুএকটা কুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুযন্ত্র বা বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখা যাইতেছে। এইগুলা বাষ্পযুগের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন। এশিয়ায় বোধ হয় কোনো যুগেই এই ধরণের উইণ্ড্-মিল উদ্ভাবিত হয় নাই।

স্যাক্সোনি (Saxony) জেলায় পড়িলাম। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দৃশ্য যথাপূর্ব্বং তথাপরম্। চোখ বুজিয়া থাকিলেও কোনো ক্ষতি নাই। যাহা হউক চোখ খুলিয়াই এদিক ওদিক চিন্তা করা গেল। ভারতবাসী আজ ইয়োরো-আমেরিকান্ হইতে তফাৎ কিসে? পশ্চিমাদের মাথার জোর বেশী ইহা ত কখনো মনে করিতে পারি নাই। ইহারা চরিত্রবলে বড় তাহাও কোনো দিকে লক্ষ্য করি নাই। কর্ত্তব্যজ্ঞানে আমরা ইহাদের চেয়ে ছোট তাহাও বিশ্বাস করি না। দলাদলি হিংসা পরশ্রীকাতরতা (এমনকি বিদেশী শত্রুর মুখামুখি থাকিয়াও) পশ্চিমা পূর্ব্বের চেয়ে কম নয়।

তবে পার্থক্য কোথায়? পশ্চিমারা বাঁচে বেশীদিন,—ইহারা খাইতে পায় পেট ভরিয়া,—আর ইহারা মেহনত করে যত খাইতে পায় তাহারই মাপে অর্থাৎ ভূতের মতন। মোটের উপর, ইয়োরামেরিকান যে-কোনো ব্যক্তির জীবন-ব্যাপী কাজের পরিমাণ ভারতসন্তানের জীবনব্যাপী কাজের তুলনায় অনেক বেশী দাঁড়াইয়া যায়। আমাদের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক কাজ করে ঠিক যেন পঁয়ত্রিশ লাখ নরনারীর মতন। আর পশ্চিমের যে-কোনো দেশের পঁয়ত্রিশ লাখ কাজ করে প্রায় আমাদের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর সমান। অনুপাতটায় হয়ত অত্যুক্তি রহিয়া গেল। কিন্তু কথাটা এই যে, গুণ হিসাবে বা মূল্য হিসাবে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নরনারী বর্ত্তমান ভারতসন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমাদের ব্যক্তিগুলার প্রত্যেকের কার্য্যক্ষমতা বাড়াইয়া দিতে পারিলে,—অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নরনারীর আয়ুর মাত্রাটাও লম্বা করিয়া দিতে পারিলে, ভারতের নামেও ত্রিভুবন কাঁপিবে।

স্যাক্সোনি জেলায় এল্‌বে (Elbe) নদীর উপর দিয়া রেলগাড়ী ছুটিয়া গেল। পুল হইতে অদূরে একটা শিল্প-নগর দেখিতে পাইলাম। এল্‌বের মোহনায়, অনেক উত্তরে জার্ম্মানির সর্ব্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর হাম্বুর্গ (Hamburg)।

এল্‌বের একটা শাখানদী পার হইয়া ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ (Brandenburg) জেলায় পড়িলাম। নদীর কিনারায় র‍্যাটেনো (Rathenau) এক শিল্পনগর বোধ হইল।

৬। "ভোজপুরিয়ার দেশ"

সাড়ে নয়টার সময় রেলে বসিয়াছি সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সারাদিনের ভিতর দুএকটা শহর ছাড়া মাত্র চোখে পড়িল বন জঙ্গল। ঠিক যেন আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম প্রদেশগুলার ভিতর দিয়া আসিলাম। একদম "ভোজপুরিয়ার দেশ" আর কি! উত্তর চীনেরও কোনো কোনো অঞ্চল মনে পড়ে।

ঐতিহাসিক বা প্রাচীন সভ্যতাবিষয়ক কোনো বড় জনপদ এই পথে পাইলাম না। রাইন প্রদেশের তুলনায় শ্লেস্‌ভিগ্‌-হোল্‌ষ্টাইন, হান্নোফার, স্যাক্সোনির উত্তরাংশ আর ব্র্যাণ্ডেন্‌বুর্গ এই চার জেলা নিতান্তই অসভ্য, বর্ব্বর বা অর্দ্ধসভ্য বিবেচনা করা চলে। এই জেলা মাত্রা তার আদলে রোমান সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। রাইন ছিল সেই যুগের সভ্যতা-মণ্ডলের পূর্ব্ব কিনারা। সুতরাং রাইনের অপর পারে বিরাজ করিয়া আসিতেছে "অনার্য্য" জাতির আবাস। ঠিক যেমন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাংলা দেশে ছিল বহুকাল পর্য্যন্ত "পক্ষী" জাতীয় অর্থাৎ "ভোজপুরিয়া" নরনারীর বাগান। অর্থাৎ উত্তর জার্ম্মানি নেহাৎ অর্ব্বাচীন দেশ। এখানে পুরাণা সভ্যতার নিদর্শন, বানরাদি সমাজের ইট কাঠ ঢুড়িতে আসা উচিত নয়। এমন কি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানে খৃষ্টধর্ম্মই প্রচারিত হয় নাই।

এই ভোজপুরিয়ার আবহাওয়াতেই নবীন সভ্যতার এক নয়া কর্ম্মকেন্দ্র সজোরে মাথা তুলিয়াছে। সেই কেন্দ্রের নাম বার্লিন। স্বদেশী-জার্ম্মান উচ্চারণ বের্লিন (ফরাসীতে বলে ব্যার্লাঁ)।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বার্লিনে পৌঁছিলাম। পথে শহরের চার-পাঁচটা রেলওয়ে-ষ্টেশনে গাড়ী থামিল,—শার্লোটেন্‌বুর্গ্ (Charlottenburg), ফ্রিড্‌রিশ্‌ষ্ট্রাসে (Friedrichstrasse) ইত্যাদি। কয়েকবার স্প্রে (Spree) দরিয়াও পার হওয়া গেল। শেষে আসিয়া ঠেকিলাম বার্লিনের পূর্ব্বতম কিনারায়। গাড়ী হইতে নামিলাম বোধ হয় আমিই এক মোসাফির! আর সকলেই অন্যান্য ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে।

ষ্টেশনে নাই মুটে! অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ফরাসীতে জার্ম্মানে বচসা করিয়া এক ছোকরার ঘাড়ে মাল চাপাইয়া দিলাম। এক ড্রোশ্‌কাতে (Droschke) বসা গেল। চলিল ঠিক এক্কার মতন। গাড়ীটা যদি নূতন থাকে আর ঘোড়াটা যদি চলে ভাল, তাহা হইলে ড্রোশ্‌কাকে বলিব ল্যাণ্ডো। এক মিনিট চলিয়াই গাড়োয়ান বলিল—"বাবু, সম্মুখেই হোটেল, নিয়ে এস দশ মার্ক্ ড্রোশ্‌কা ভাড়া। রাত্রে আর যাওয়া যায় কোথায়? যথাস্থানেই নামা গেল। পাঁচ মার্ক্ বাহির করিয়া দিলাম। গাড়োয়ান নাছোড়বন্দ। হট্টগোল সুরু হইল,—লোক জমিয়া গেল। মজাটা দেখিতেছে কে? উহারা, না আমি? গাড়োয়ানকে বলিলাম—"বিরক্ত করিলে ফোন্ করিয়া পুলিশ ডাকিব।" এই বলিয়া হোটেলওয়ালীকে টেলিফোনের নম্বরওয়ালা কেতাবটা আনিতে বলিলাম। এমন কি একটা ফোনে কথা পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিলাম। জার্ম্মান ভাষার একটা সুবিধা এই যে, যে শব্দটা জান তাহার উচ্চারণ যে-কোনো লোকের মুখেই ধরিতে পার। কিন্তু ফরাসীতে বিপদ অনেক, বহু জানা শব্দও উচ্চারণের দৌরাত্ম্যে অবোধ্য থাকিয়া যায়।

এতক্ষণে ড্রোশ্‌কাওয়ালা বুঝিয়াছে যে এই মোসাফির সহজে ছাড়িবে না। ঘর পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিল। আর দুই মার্ক্ দিয়া বিদায় করিলাম। অতঃপর অদ্য রজনী (৩০ আগষ্ট) বার্লিনে প্রথম রাত্রি বাস। প্যারিস হইতে বার্লিন সোজাপথে প্রায় চব্বিশঘণ্টা দূর।

৭। উচ্চারণ-সমস্যা

প্রত্যেক ভাষায়ই উচ্চারণের মারপ্যাচ্ এক মহা হাঙ্গামা। জার্ম্মানেও তাই। তবে জার্ম্মানে বাঁধাবাঁধির জোর এত বেশী যে নিয়মগুলা জানা থাকিলে ভুল করা এক প্রকার অসম্ভব। তা ছাড়া নিয়মের ব্যতিক্রম গুন্‌তিতে খুবই কম। এই হিসাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিদেশীমাত্রের পক্ষে উচ্চারণ হিসাবে যারপরনাই কঠিন। জার্ম্মানের মোটা নিয়মগুলা দেখান যাইতেছে।

স্বরবর্ণঃ—a = আ, e = এ, i = ই, o = ও, u = উ, ai = ei = আই, au = আউ, eu = অয়; Berlin = বের্লিন, Spree = স্প্রে, Auf recht = আউফ্ রেষ্ট্, Eucken = অয়কেন, Reuter = রয়টার। ö = oe = —এ (ও); এখানে "ও" ধ্বনি একপ্রকার উঠিবেই না বলা যাইতে পারে। অথচ আওয়াজটা খাটি—"এ" নয়; "এ" উচ্চারণ করিতে করিতে ঠোঁট দুইটা পাকা য় গোলাকার করিয়া তুলিতে হইবে। ü—ue—ঈ (উ); এখানে "উ" ধ্বনি একপ্রকার উঠিবেই না' অথচ আওয়াজটা খাঁটি "ই" নয়। (ফরাসীতে rue শব্দ "রু" নয়,—অনেকটা "রি" ধরণের। অথচ "ই"কারটাও সুস্পষ্ট না হওয়া চাই।)

ব্যঞ্জনবর্ণঃ—d = ড অথবা ট ("দ" কখনো নয়), ch = শ অথবা খ, (ich = ইশ্, noch = নোখ্, nicht = নিষ্ট্), sch = শ্, g = গ, অথবা শ, অথবা ক ("জ" কখনো নয়), s = জ, v = ফ, w = ভ্ব, z = ৎস্ (zeitgeist = ৎসাইট্‌গাইষ্ট্)।

লেখায় বিশেষ্য শব্দগুলা সবই বড় অক্ষরে সুরু করা হয়—বাক্যের যে-কোনো স্থানেই এইসব ব্যবহৃত হউক না কেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।



রজনীগন্ধা

(২১)

সকাল বেলার ডাকে গোটা দুই চিঠি পাইয়া ক্ষণিকা তাহা লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তাহার মায়ের চিঠিতে বাড়ীর সব ক'জন মানুষের কুশল এবং পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যখন সে সবে লালুর চিঠিখানা সুরু করিতেছে, এমন সময় কদম আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, বৌদিদি আপনাকে ডাকৃছেন একবার।"

ক্ষণিকা চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া বলিল, "যাচ্ছি, ডাক্তার-সাহেব চলে গিয়েছেন কি?"

কদম বলিল, "হ্যাঁ, এই মাত্তর গেলেন।"

লালুর চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ক্ষণিকা মনোজ্ঞার ঘরের দিকে চলিল। মনোজ্ঞার শরীর খারাপ হইতে হইতে এখন তাহাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর সকলের মনের উপর একটা আশঙ্কার ছায়া ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও কেহ মুখের কথায় সেটা কাহারও কাছে স্বীকার করে না। অনাদিনাথের স্বাভাবিক গম্ভীর মুখ আরও যেন বিষাদপরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আর তাঁহার মাতার মুখে ভাগ্যের আর বিধাতার নিন্দাবাদ ভিন্ন অন্য কথা প্রায় শোনাই যায় না। এতদিন পরে যদি বা ছেলে বিবাহ করিল, তা অমনি কি বউকে রোগে ধরিতে হয়? বিধাতার ন্যায়বিচার কি ইহাকেই বলে? তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর বিধাতা একবারও দিতেন না, মায় হইতে তাঁহাকে শান্ত করিবার বিফল চেষ্টায় ক্ষণিকার মন অশান্তিতে ভরিয়া উঠিত।

মনোজ্ঞার ঘরে তখন কেহই ছিল না। সকালের রোদ জানলার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া কৌতুকের হাসি হাসিতেছে। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিয়া বলিল "ওকি! রোদে মাথাটা দিয়ে শুয়ে আছেন কেন? এই জানলাটা বন্ধ করে দিই?"

মনোজ্ঞা বলিল, "থাম্ বাপু, তোকে কিছু বন্ধ করতে হবে না, আমি মাথা সরিয়ে নিচ্ছি। কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সকাল থেকে যে একবারও চুলের ডগাও দেখ্‌তে পেলাম না।"

ক্ষণিকা বলিল, "কাজের ভারি কম্‌তি কি না, এতক্ষণ ত ঠাকুরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই কাটল। এখনও তবু বেণুর সন্ধানই করিনি। আমি ভাব্‌ছিলাম অনাদি-বাবু বুঝি ঘরে আছেন, তাই আসিনি। ডাক্তার আজ দেখে কি বল্‌লেন?"

"বল্‌বে আর কি? নূতন কিছু বল্‌বার ত আর বাকি নেই? চুপ ক'রে শুয়ে থাক, কপালে থাকে ত সেরে উঠ্‌বে, এ কথা আর মানুষ ক'শ বার বল্‌বে বল্?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা কতদিন ধ'রে রোগ জমিয়ে রাখ্‌লেন, সারাবার বেলা এত তাড়া দিলে কি চলে?"

মনোজ্ঞা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার তাড়া কে শুন্‌ছে? কিন্তু তোদেরও কি কোনো তাড়া নেই? দিনের পর দিন এই যে শুয়ে থাকি, বাইরের জগতের মুখ দেখা বন্ধ, তোদের যে ক'টাকে সামনে পাই, জ্বালিয়ে খাই, এতে তোদের বিরক্ত লাগে না? ইচ্ছে করে না,—হয় একেবারে চিতায় শুক, ন হয় খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াক।"

ক্ষণিকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মনোজ্ঞাদি, কি বল্‌ছেন আপনি যা তা? যে কথা মনেও আন্‌তে নেই, এই রকম ক'সম ক'রে আপনার মুখ দিয়ে তাই বেরয় কেমন ক'রে? আমাদের হাতে থাক্‌লে কি আর এক মুহূর্ত্তও আপনাকে আমরা শুইয়ে রাখ্‌তাম? আমরা কি চাই না যে আপনি সেরে উঠুন? কিন্তু দু দিন দেরি হলেই কি ঐ রকম কথা ভাব্‌তে হয়?"

মনোজ্ঞা বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া বলিল, "যা, যা, বক্তৃতা করতে হবে না। ভাবা না-ভাবা নিজের হাতে, কিনা বড়? তুই কখনও অনুচিত কিছু ভাবিস্ না? তোদের না হয় সেবা ক'রে বিরক্তি নেই, আমার সেবা নিয়ে নিয়ে যে হাড়ে ঘুণ ধ'রে গেল।"

ক্ষণিকা ভাবিল আর কথা বলিয়া লাভ নাই, মনোজ্ঞার মন তাহাতে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিবে। সে নীরবে ঘরের জিনিষপত্র নাড়িয়া-চাড়িয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। মনোজ্ঞার প্রশ্নটা যে নিতান্তই রাগের ঝোঁকের কথা তাহা বুঝিয়াও তাহার মনের ভিতর কেমন একটা ঘা আসিয়া

লাগিল। বাস্তবিকই ত, অনুচিত ভাবনা ভাবিতে তাহার সমকক্ষ এই পৃথিবীর বুকে আছে ক'টা?

এই যে দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে ইহার ভিতর ক'টা ঘণ্টা এমন কাটিয়াছে যাহাতে সে এমন কথা চিন্তা করে নাই, সমাজ যাহাকে অনুচিত ত মনে করিবেই, অপরাধ বলিয়া ধরিতেও পারে। আসিবার মুখে সে মনোজার প্রতি জ্বালাময়ী ঈর্ষা আর অভিশাপই মনে বহন করিয়া আসিয়াছিল। মনোজাকেই সে তাহার সর্ব্বস্ব-অপহরণ-কারিণী রূপে চিন্তা করিয়া তার ক্ষোভে অভিশাপ দিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে ভাব তাহার আছে কি? তাহার বালিকাজীবনের প্রীতির অর্ঘ্যে সে যাহাকে পূজা করিয়াছিল, সে মনোজা ত এখনও মরে নাই? ইহাকে অভিশাপ দিবার অভিলাষও তাহার নাই, অধিকারই বা কোথায়? আজ সেই যে মনে মনে পরস্ব অপহরণের চিন্তা করিয়া নিজের কাছে নিজে অপরাধী আরও এমন কোনো ভাবনা কি তাহার মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই আসিয়া জোটে নাই, যাহার আবির্ভাবে সে নিজেই লজ্জায় ক্ষোভে আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে?

সে পিছন ফিরিয়া জান্‌লার উপরকার ফুলদানী হইতে বাসি ফুলপাতাগুলা টানিয়া ফেলিতেছিল। হঠাৎ শুনিল, "হ্যাঁরে রাগ কর্‌লি? আমি কি এখনও রাগের পাত্রী হবার উপযুক্ত আছি?"

ক্ষণিকা তাহার খাটের কাছে আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া বলিল, "রাগ কর্‌ব কেন? আপনার দিন যে কেমন ক'রে কাট্‌ছে তা কি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না? মানুষের ইচ্ছা যতটা হয় সাধ্যে যে তার একশ' ভাগের এক ভাগও কুলোয় না, এই ত দুঃখ। আমার সাধ্যে যদি থাকৃত, আমি যেমন ক'রে হোক আপনাকে ভাল ক'রে দিয়ে যেতাম।"

মনোজা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তোর ভার যখন নিয়েছিলাম, সবাই আমাকে কত প্রশংসা না করেছিল। সবাইকার কথা শুনে শুনে আমিও কি এক এক সময় ভাবিনি যে আমার মত পরোপকারী মানুষ আর হয় না? আমার ভাগ্যবিধাতা তখন কেমন ক'রে হেসেছিলেন বল্‌ দিখি? তখন কে জান্‌ত যে আমি তোর জন্যে যা কিছু করেছি, তুই তার হাজারগুণ ক'রে তার শোধ দিবি? এর পরের জন্মে আমাকে তোর ঋণ শোধ কর্‌তে না জানি কি কর্‌তে হবে। এ জন্মে সময় হবে না আর। বোর্ডিংএ থাক্‌তে জান্‌তাম বটে যে তুই আমাকে ভালবাসিস্‌, কিন্তু এতটা ভালবাসিস্‌ তা বুঝ্‌তে পারিনি। আমার মা থাক্‌লেও এর চেয়ে বেশী কি কর্‌তে পার্‌ত?"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল। ইহার উত্তরে সে বলিবে কি? যাহা তাহার বলিবার আছে, তাহা ত মনোজাকে বলিবার নয়, ঈশ্বর ছাড়া কাহারও কাছে তাহা স্বীকার করা যায় না। সত্য বটে, মনোজার ঋণ সে আজ প্রাণপণ সেবা করিয়া শোধ করিতেছে, কিন্তু সে কি কেবল তাহার অর্থের ঋণ? আর এই যে তাহার গভীরতম বেদনা আর গোপন অশ্রুজল, ইহা কি কেবল ঋণ শোধই করিতেছে, জগতে কোথাও কি নূতন ঋণ সৃষ্টি করিতেছে না? মানুষ হইয়া জন্মিবার যে মহাসম্মান, তাহার মূল্য নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়াও কি তাহার এখনও কিছু পাওনা ঘটে নাই?

বেণু বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাসিমা, আমার দুধ বিচ্ছিরি, আমি কক্ষনো খাব না।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'মনোজাদি, আমি আস্‌ছি বেণুকে দুধটা খাইয়ে। ও যা দুষ্টু, কদমের কাছে কিছুতেই খাবে না, এখুনি ওর দিদিমার কাছে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করবে।"

মনোজা বলিল, "যা ভাই, একেই ত তিনি আমার উপর যা খুসি, তার উপর যদি তোকে ধ'রে রাখি আর তাঁকে নাত্‌নীর জ্বালা পোয়াতে হয়, তা হলে আরও খুসি হবেন। এর পর তোর সেবা করবে কে রে? দশটা মানুষের খাটুনি ত একলা খাট্‌ছিস্‌।"

ক্ষণিকা বলিল, "কাউকেই আমার সেবা কর্‌তে হবে না। খাটা ত আমার কাছে নূতন জিনিষ নয় যে তার জন্যে এখন থেকে সেবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে?"

মনোজা বলিল, "এ জন্মে ধার দিয়ে রাখ্‌, পরের জন্মে এত পাবি যে রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌বে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনার মাথায় আজ কেবল ঐ কথাই ঘুর্‌ছে দেখ্‌ছি। আগের আর পরের জন্মের

ভাবনা অত না ভেবে যে জন্মটা চলছে তার কথাই একটু ভাবুন্।”

মনোজ্ঞা বলিল, “আচ্ছা, তাই ভাবছি, তুই যা বেণুকে দুধ খাইয়ে আয়।”

ক্ষণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বেণু ততক্ষণ দুধের বাটি সমেত তাহার দিদিমার দরবারে হাজির হইয়াছে। তিনি ক্ষণিকাকে দেখিয়া অত্যন্ত ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ছিলে কোন্ রাজ্যে, বুড়ো হাড়ে আমাকেই সব করতে হবে?”

ক্ষণিকা তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল, “এই যে আমি খাইয়ে দিচ্ছি। এস ত বেণু আমার সঙ্গে, চল দুধ ষ্টোভে গরম করে দিই, তা হলেই আর বিচ্ছিরি থাকবে না।”

গৃহিণী একটু শান্ত হইয়া বলিলেন, “তুমিও গেলে বাছা খেটে খেটে। বৌমা কেমন আছে, খেল কিছু? আমারও যা দশা হয়েছে, একটু যে দেখব কাউকে তারও ক্ষমতা নেই।”

ক্ষণিকা বলিল, “এখনও খাননি, এই বেণুকে খাইয়ে যাচ্ছি, তাঁর বেদানার রস ক'রে নিয়ে।”

গৃহিণী বলিলেন, “বেদানাগুলো আর কাঁচের গেলাসটা আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে যাও, আমি ব'সে ব'সে ক'রে দিচ্ছি। বৌমারও কপাল, মা ত কবে গেছে তার ঠিকানাও নেই, শাশুড়ী হয়েছে এক খোঁড়া, না নড়বার সাধ্যি আছে, না কিছু।”

মনোজ্ঞাকে পৃথিবীতে সৌভাগ্যবতীর শিরোমণি ভাবাই ক্ষণিকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, গৃহিণীর কথায় হঠাৎ তাহার মনটা যেন চম্‌কাইয়া গেল। তাই ত, কেবল একপাশ দিয়া দেখিলে ত চিত্রের সবটা দেখা যায় না। আলো-ছায়ার সম্মিলনেই যে চিত্রের সৃষ্টি তাহা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে কেন? ক্ষণিকার কাছে যাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, মনোজ্ঞা তাহা লাভ করিয়াছে, কিন্তু মনোজ্ঞা যে মনোজ্ঞাই, ক্ষণিকা নয়। ক্ষণিকা যাহা পাইলে নিজের জীবনকে সার্থক মনে করিত, যাহার অভাবে সে জগতের আর কোনো সম্পদের দিকে চাহিয়াও দেখে না, সেই অমূল্য ধন কি সকলের কাছেই ততখানি মূল্যবান? আর সকল অভাব, সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলাইয়া রাখিবার ক্ষমতা সত্যই কি অনাদিনাথের প্রেমের আছে, না ক্ষণিকা আপনার অন্তরলোকে যে প্রেমের দেবতাকে সৃষ্টি করিয়াছে সে সাধ্য কেবল তাহারই? মনোজ্ঞা যে সুখী নয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু সে যে স্বামীর ভালবাসা পরিপূর্ণরূপে লাভ করিয়াছে ইহাও সত্য। তবে সত্যই হয়ত সুখ কেবল মানুষের কল্পলোক ভিন্ন আর কোথাও নাই।

বেণুকে দুধ খাওয়াইয়া, তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-পড়াইয়া কদমের হাতে সমর্পণ করিয়া, সে কমলালেবুর রস আনিতে গৃহিণীর ঘরে ঢুকিল। রস করিয়া রাখিয়া তিনি তখন অন্য কাজে মন দিয়াছিলেন। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিলেন, “বৌমাকে বোলো সবটা খায় যেন। এই ত জল পথ্যি, তার আবার অর্দ্ধেক ফেলে রাখবে, তা সারবে কিসের জোরে? যত সাহেবী কাণ্ড, জ্বর ছাড়ছে কতবার, মাছের ঝোল ভাত খেলে এতদিনে গায়ে কত বল পেত।”

ক্ষণিকাকে সারাদিন এমন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত যে বৃথা কথা বলিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল না। সে গেলাসটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর ঘর হইতে মনোজ্ঞার ঘরে যাইতে হইলে অনেকখানি বারাণ্ডা পার হইতে হয়। বাহির হইয়াই ক্ষণিকা দেখিতে পাইল, অনাদিনাথ মনোজ্ঞার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন।

সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিল। ইদানিং পারতপক্ষে আর সে তাহার সম্মুখে পড়িতে চাহিত না। দুঃখবহন করিবার শক্তি তাহার শেষ হইয়া আসিতেছিল, দুঃখকে আর ঘরে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা তাই সে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিত। অনাদিনাথ একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিলেন, ক্ষণিকাকে তিনি দেখিতে পান নাই, সে ইচ্ছা করিলেই ফিরিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু মনোজ্ঞা সকাল হইতে কিছু মুখে দিতে চায় নাই, এখন একবার কিছু না খাওয়াইলেই নয়, অগত্যা সে অগ্রসর হইয়াই চলিল।

বারাণ্ডার মাঝামাঝি আসিতেই তাহার পদশব্দে অনাদিনাথ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। ক্ষণিকার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “দিন আমাকে। আপনার ত কাজের অন্ত নেই, এমন কাউকে দেখ্‌ছিও না যে আপনাকে একটুখানি relieve করতে পারে। কিন্তু

আপনার উপর এত চাপ দেওয়া কিছুতেই আমার উচিত হচ্ছে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "না, না, আমায় এমন বেশী কিছু খাটতে ত হচ্ছে না চাকরবাকররা ত সবই প্রায় কর্‌ছে। বাবার অসুখের সময় আমাকে এর চেয়েও বেশী খাটতে হয়েছে।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনার বাবার জন্য যতখানি আপনাকে করতে হয়েছে, অন্য লোক ততটাতে ত দাবি করতে পারে না? বিধিদত্ত অধিকারের সঙ্গে আর কোনো জিনিষের তুলনা হয় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "দাবি না কর্‌লেও যে মানুষ পায়, এইটুকু সুবিধা ভগবান এখনও রেখেছেন, তাই রক্ষা।"

কথাটা বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। কেবল এই এক সমস্যা লইয়াই কি তাহার জীবন কাটিবে? দিবার অধিকার আছে কি না, লইবার অধিকার আছে কি না? কিন্তু দেনা-পাওনাটা কবে এই সমস্যা-সমাধানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? মানুষ যাহা পাইবার তাহা না চাহিতেই পায়; যাহা দিবার তাহা অযাচিতভাবে দেয়,—না দিয়া তাহার উপায় নাই শান্তি নাই বলিয়াই দেয়, তবে বৃথা কেন এই মীমাংসার চেষ্টা? এই যে সে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিতেছে দিনে, দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ইহা করিতে কেহ তাহাকে বাধা করিতে পারে না, কিন্তু জগতে কোন্ শক্তি আছে যাহা তাহার এই নিরন্তর দানকে বাধা দিতে পারে? তাহার যে প্রবল আবেগ এই সেবার রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে সে নিজেই বা পারিল কই? আর-একজন মানুষ যে তাহাকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ লইয়া নিশিদিন প্রার্থনা করিতেছে, সেই তপস্যার কি ক্ষণিকা উপযুক্ত? কিন্তু ইহা না ভাবিয়াও মানুষ পারে না কেন?

অনাদিনাথ ঘরে ঢুকিতেই মনোজা বলিল, "ও কি! তুমি যে? ক্ষণু গেল কোথায়?"

অনাদিনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "এটা ঠিক আমাকে compliment দেওয়া হল না।"

মনোজা বলিল, "তোমাকে compliment দেবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। সারারাত জেগে ব'সে রইলে, কোথায় নেয়ে খেয়ে একটু ঘুমবে তা না complimentএর সন্ধানে এলে। যাও, গেলাসটা রেখে নিজের কাজ সার গিয়ে।"

অনাদিনাথ তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এই যে যচ্ছি। কিন্তু তুমি যে-মানুষটির সন্ধান কর্‌ছ, তাঁকে ত আমার চেয়ে বেশী বই কম খাটতে হয় না, তবু তাঁর খাটনি একটুখানি বাড়িয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে চাও কেন? আমারই ত সব কর্‌বার কথা, উনি যা কর্‌ছেন তাতে আমার দিন দিন বেশী ক'রে লজ্জা হচ্ছে।"

মনোজা বলিল, "মেয়েমানুষের স্বভাবই অম্‌নি। নিজের ভালবাসার জিনিষটিকে যে-কোন উপায়ে সে একটু বাঁচিয়ে চল্‌তে চায়, তাতে পরের যা হবার হোক।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "তা ঠিক নয়, পুরুষ জাতটা মুখের কথায় ছাড়া কাজে তোমাদের জন্যে কিছু করতে এলেই তোমাদের মহা অস্বোয়াস্তি ধরে। তুমি না-হয় আমাকে বাঁচাতে চাও, কিন্তু তোমার বন্ধুটিও যে আমাকে কিছু কর্‌তে দেখ্‌লেই ঘর থেকে বিদায় ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হন। আমাদের কাজ করা তোমাদের চোখে কিছুতেই সয় না।"

মনোজা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ অনাদিনাথের কোলের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "তোমার এত বুদ্ধি, তবু তুমি কিছু বোঝ না কেন?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "বেশ কথা, কি না বুঝ্‌লাম?"

মনোজা বলিল, "যা বোঝোনি তা বুঝ্‌বেও না, যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্নান কর গিয়ে।"

অনাদিনাথ বাহির হইয়া যাইতেই মনোজা বালিশে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাহার শরীর দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ঠিক এই সময় ক্ষণিকা আসিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। বিস্মিতদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সে মনোজার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মনোজাদি, অমন কর্‌ছেন কেন? কি হয়েছে?"

মনোজা সবলে তাহাকে ঠেলিয়া দিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুই যা, আমার কাছে আর আসিস্ না।"

ক্ষণিকা বলিল, "কি হয়েছে শুনি, কি আমি দোষ কর্‌লাম যে আর আস্‌ব না?"

মনোজা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর ক্ষণিকার হাতটা

চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুই কেন আমার জন্যে এমন ক'রে মরছিস বল্ দিখি? সত্যি কথা বল্।"

ক্ষণিকা তাহার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মিনিট দুই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "সত্যি কথাই বল্‌ছি। আপনার সেবা না ক'রে আমার উপায় নেই, তাই করছি। যা করছি তার বেশী করবার সাধ্য থাক্‌লে করতাম। আমার বুকের সব রক্ত দিয়েও যদি আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলা যেত, তাও করতাম।"

মনোজা বলিল, "আমাকে বাঁচিয়ে তোর কি হবে?"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনি বাঁচ্‌লে কি হবে জানি না, কিন্তু না বাঁচ্‌লে যে কি হবে তা ভাববারও আমার সাহস নেই।"

মনোজা বলিল, "তুই যা, আমি একটু একলা থাক্‌তে চাই।"

(২২)

বিকালবেলার চায়ের ব্যাপার সারিয়া ক্ষণিকা উপরে আসিতেছিল। কোথা হইতে এক গা ধূলাকাদা মাখিয়া বেণু আসিয়া তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্ষণিকা একহাতে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আঃ বেণু, কি করছ, এখনি আমার কাপড় চোপড় সব কাদামাখামাখি হয়ে যাবে। কোথায় ছিলে, এত কাদা জুটল কোথা থেকে?"

বেণু বলিল, "আমি মালী হয়েছিলাম। বেশ করব, কাদা লাগিয়ে দেব, তুমি কেবল মামীমাকে ভালবাস্‌বে কেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "আর তোমায় একটুও ভালবাসি না, না?"

বেণু বলিল, "না বাসই না ত। তুমিও না, মামাবাবুও না, কেউ না। সবাই কেবল মামীমাকে ভালবাসে, তাকে খেতে দেয়, আর ফুল দেয়। আমি আবার স্বর্গে চ'লে যাব।"

ক্ষণিকা অবাক হইয়া বলিল, "আবার মানে? তুমি আর-একবার গিয়েছিলে নাকি?"

বেণু মাথা দোলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ আমি জানি, আমায় ওদের বাড়ীর লিলি বলেছে যে আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি।"

ক্ষণিকা তাহাকে কোলে করিয়া বলিল, "না, না, তোমাকে সবাই ভালবাসে খুব, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। মামীমার কিনা অসুখ, তাই সবাই তার কাছে বেশী যায়, আর ফুল দেয়।"

"তবে আমিও ফুল নিয়ে আসি" বলিয়া ক্ষণিকার কোল হইতে নামিয়া বেণু ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা আসিয়া মনোজার ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া মনোজা জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট পুষিটার সঙ্গে কি এত গল্প হচ্ছিল?"

ক্ষণিকা বলিল, "তার মান অভিমান চল্‌ছিল; সবাই কেবল আপনাকে খেতে দেয় আর ফুল দেয়, তাকে কেউ দেয় না, তাই মহা রাগ হয়েছে তার।"

মনোজা বলিল, "তা এমন গুরুতর অপরাধ, রাগ ত হতেই পারে। শিশু ব'লে ন্যায়তঃ তার যাতে অধিকার, আমি রোগ বাধিয়ে নকল শিশু সেজে তার সে পাওনা বেদখল করছি। আমার এবং তোদের সকলেরই শাস্তি হওয়া উচিত।"

ক্ষণিকা বলিল, "শাস্তি অবধি সে সবই ঠিক ক'রে রেখেছে।" কথাটা বলিয়াই তাহার মনে হইল এ কথা না বলিলেই ছিল ভাল। শাস্তিটা ঠিক মনোজাকে শুনাইবার মত ত নয়?

মনোজা তৎক্ষণাৎ বলিল, "কি শাস্তি শুনি?"

ক্ষণিকাকে অগত্যা বলিতে হইল, "সে চলে যাবে।"

মনোজা বলিল, "চলে যাবে? কোথায়?"

ক্ষণিকা বলিল, "কে এক ওর বন্ধু ওকে বলেছে যে সব মানুষ স্বর্গ থেকে আসে, তাই ওর মাথা ঘুরছে। সে রেগে আবার স্বর্গেই ফিরে যাবার ব্যবস্থা করছে।"

মনোজা বলিল, "মন্দ নয়, তুই উল্টো পথের একই অবদান; কেউ ভাল না বাস্‌লেও সেই স্বর্গ, আর সবাই বেশী ভাল বাস্‌লেও সেই স্বর্গ। আমাকে যে সবাই এত ভাল বাস্‌ছে তাতে স্বর্গের পথে কাঁটা পড়্‌ল কই?"

ক্ষণিকা জিনিসটাকে হাল্কা করিয়া তুলিবার আশায় বলিল, "তাই নাকি? তা বলেন ত আমরা সবাই মিলে আপনাকে দু চার ঘা' দিতে সুরু করি তাতে যদি আপনার সেরে ওঠার সুবিধা হয় ত আমার কিছু আপত্তি নেই।"

মনোজা বলিল, "গোড়ায় হলে কাজ হত, এখন আর ওতে কিছু হবে না। তা ছাড়া প্রাণ ছাড়্‌তে রাজি আছি, কিন্তু ভালবাসা ছাড়্‌তে পার্‌ব না। প্রাণ না থাকা যে কি তা ত জানিনা ভাই, কিন্তু ভালবাসা না পাওয়া যে কি তার এমন পরিচয় পেয়েছি যে আর আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছি না।"

ক্ষণিকা ভাবিল, সে পরিচয় তাহারই বা পাইতে বাকি আছে কই? কিন্তু জীবনের মায়া কাটাইবার মত সমস্যা ত তাহার একেবারেই জন্মে নাই। বরং এই নব নব বেদনার ভিতর দিয়া তাহার যেন নব নব জীবনই লাভ হইতেছে। দুঃখ তাহাকে নিত্য দহন ক'রতেছে, কিন্তু শেষ করিতে পারিল কোথায়?

মনোজা বলিল, "বেজায় যে গম্ভীর হয়ে পড়্‌লি?"

ক্ষণিকা বলিল, "কিছু হাস্‌বার কথা ত বল্‌লেন না, তা হাসি কি ক'রে বলুন?"

মনোজা বলিল, "হাসির কথা নয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি কথা। আজন্ম লোকের কাছে আদরই কেবল পেয়েছি, তাই ভাব্‌তেও পারি না যে আদর পাচ্ছি না, তবু বেঁচে আছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমাকে ত জন্মাবধি কেউ যে বিশেষ আদর করেছে ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু আমি যে-পরিমাণে বেঁচে আছি, এমন খুব কম লোকই আছে।"

মনোজা বলিল, "তোদের বাঁচাটাই আসল। আমরা গোড়ার থেকে parasite হয়েই সুরু করেছি, আমাদের তেমনই চল্‌তে হবে। একটা না একটা কাউকে আঁকড়ে না থাক্‌লে আমরা বাঁচ্‌তে পারি না। বাপ মা বেশীদিন সে অবসর দেন নি, কিন্তু কপালগুণে অন্য লোক জুটে গেল। যে ক'টা দিন আছি তোকে আর আর একটি মানুষকে জ্বালিয়েই কেটে যাবে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা থাক্, ভারি ত জ্বালাচ্ছেন, তার আবার কথা। ভারি যে এ-জন্ম আর আর-জন্ম করেন, তা এখনই যদি আপনার আর-এক জন্ম হাজির হয়, তখন কে আপনার ভার নেবে শুনি? আমরা ত এখনকার মত বহুকাল এই ভাবেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌ব।"

মনোজা বলিল, "লোক জুটে যাবে। কিন্তু যাকে-তাকে আমার পছন্দ হলে বাঁচি। দেখ্ এই আমার কর্ত্তাটিকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, তখন আমার বড় জোর সতেরো বৎসর বয়স, আঠারোও পোরেনি। তখন ত এর মত হল না, ওর মত হল না, সে মহা কাণ্ড। কিন্তু পছন্দও আমার আর কাউকে হল না, যদিও কটা রঙের গুণে বর জুটেছিল ঢের। এই আট বছর ওরই জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে ছিলাম। তারপর তোর কথাই ধর, আমার ঘরকন্না দেখ্‌তে যতক্ষণ না তুই এলি, ততক্ষণ ভরসা ক'রে বিছানায়ও শুইনি, যাকতার হাতে কি সংসার ছাড়া যায়? তোরা দুজন না হলে যে পরের জন্মে কি করব তা ত জানি না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমরা এখন কিছুতেই আপনার অন্য জন্মের ভার নিতে পার্‌ব না। আমাদের চাইলে এখন এখানেই থাক্‌তে হবে।"

মনোজা বলিল, "থাকাটা কি আমাদের হাতে নাকি? যাই হোক, আবার তোদের ফিরে পাব। আমি যাবার পর এ ভাঙা-চোরা আবার তালি-জোড় দিয়ে রাখিস্ কোনো রকম ক'রে। তোর হাতেই দিয়ে যাচ্ছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "থাক্, তা আর না? আমার ঘুম হচ্ছে না। সেরে উঠে নিজের বোঝা নিজেই বইবেন এখন।"

মনোজা হঠাৎ ক্ষণিকার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে একেবারে নিজের কোলের কাছে আনিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা ক্ষণু সত্যি করে বল্, আমাকে ভুলোসনে, নিজেকেও ভুলোস্‌নে, আমি বাঁচ্‌ব না কি? বেঁচে থাকার সাধ আমার একেবারেই যায় নি।"

ক্ষণিকা কাঁদিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। সত্য কথা তাহার অজানা নাই, কিন্তু সে বলিবে কি করিয়া? সে কি জানে না মনোজার বাঁচিবার সাধ কতখানি? আর না হইবেই বা কেন?

বাহিরে আসিতেই সর্ব্বপ্রথম সে চোখে পড়িল অনাদিনাথের। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাইয়া তিনি দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে?"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "কিছু না।"

অনাদিনাথ আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া মনোজার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

ক্ষণিকার তখন বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। সে ধীরে ধীরে সাম্‌নের খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্য তখন পশ্চিমের কুঙ্কুম-সাগরে ডুবিবার মুখে, লালিমার স্রোত চারিদিকে তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহার উপর উজ্জ্বল আলোকোচ্ছ্বাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই বিচিত্র বর্ণনাট্যের উপর আঁধার-যবনিকা নামিয়া আসিল, কেবল তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া দুএকটি আলোকরশ্মি রক্তকমলের মত ফুটিয়া রহিল।

ক্ষণিকার মনে হইল এ যেন তাহারই জীবনের একটা প্রতিকৃতি। এই ত সবে সেদিন জগৎ তাহার চক্ষে কি অপরূপ মাধুরীতে আর সুষমাতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন স্মৃতি ছাড়া সেদিনের আর কিই বা অবশিষ্ট আছে? আরো যে কালিমা নিবিড়তর হইতে চলিয়াছে, তাহাও ত বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই যে তাহার কাঁদন আগেকার পুলক-উদ্বেল জীবন আর এই বেদনাভারাক্রান্ত বর্ত্তমান দিন, ইহার মধ্যে এমন গভীর বিদারণ-রেখা টানিয়া দিল কে? যাহাকে ভাগ্যবিধাতা এমন নিষ্ঠুর অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেন, ক্ষণিকা ত তাহাকেই প্রথমে তাহার সকল দুঃখের মূল জানিয়াছিল। আজ আবার যখন সেই বিধাতাই ক্ষণিকার জীবনের সেই মূর্ত্তিমতী অভিশাপকে অজানা দেকে ডাক দিলেন, তখন আবার তাহারই জন্য ক্ষণিকা চোখের জল ফেলে কেন? অনাদিনাথ আর তাহার মাঝের আড়াল যখন ধূলিসাৎ হইতে চলিল, তখন সেই আড়ালকেই আজ কেন সে দুই হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়?

তাহার জীবনে অমৃত ও হলাহলের ধারা এমনভাবে মিশিয়া গেল কেমন করিয়া? প্রথম জীবনে যাহাকে সে ভালবাসিল, দুদিন পরে তাহার কাছ হইতে তাহাকে দূরে টানিয়া ফেলিল কে? তাহার পর অতীতের সকল ভালবাসার স্মৃতি যে বিপুল প্লাবনে ভাসিয়া গেল, তাহা কেবল ক্ষণিকার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াই নিরস্ত হইল। শুধু তাহাই নয়, তাহার জীবনাকাশের ভোরের শুকতারা, কেন তাহার ভাগ্যগগনে প্রলয়-ধূমকেতুর রূপে পুনর্ব্বার উদিত হইল? সংসার তাহাকে সকল দিক হইতে নিরন্তর আঘাতই করিয়াছে, যে অমৃত-উৎসে স্নান করিয়া সে নূতন উৎসাহে আবার এই আঘাতের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইত, সেই উৎসই কেমন করিয়া এমন বিষাক্ত হইয়া উঠিল?

পূর্ব্বে সে যাহা লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, যাহার অভাবে তাহার জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহাতে তুষ্ট হইতে সে পারে না। যে স্নেহকণা একদিন তাহার কাছে সব ছিল, এখন তাহা কিছুই নয়। অন্যকে যেখানে অমৃতের ধারায় স্নান করিতে দেখে, মানুষ কেমন করিয়া সেখানে জলকণায় তৃপ্ত হয়? এককালে সে অনাদিনাথের প্রিয় না হউক, তাঁহার কাছে সজীব মানুষ ছিল, এখন ত সে ছায়াও নয়। মনোজার সেবা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে যে মানুষটির মধ্যে, তাঁহার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া ক্ষণিকা বলিতে আর যাহা কিছু বোঝায়, তাহাদের অনাদিনাথের জগতে কোনও অস্তিত্ব নাই।

এমন সময় বৃদ্ধা গৃহিণীর ঘরে তাহার ডাক পড়িল। ক্ষণিকাকে কাছে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, বৌমার কাছে রাত্রে তুমি যদি আজ থাক ত ভাল হয়, ছেলে আমার না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে; পুরুষ-মানুষ, ওসব ত ওর অভ্যেস নেই।"

তাহাকেই এমন অখণ্ড-অবসরসম্পন্ন মনে করাতে ক্ষণিকার একটু হাসি পাইল। সেটা গোপন করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাই শোব।"

অনাদিনাথ বাস্তবিকই সেদিন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া মাতার এই ব্যবস্থায় বিশেষ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ব্যবস্থাটা যে একান্ত সাময়িক তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য ডাক্তারের কাছে একজন নর্সের জন্য তখনই চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। দিনের বেলা রোগীর সেবা বাড়ীর সকলে না হয় ভাগাভাগি করিয়া করিল, কিন্তু রাত্রির বিশ্রাম হইতে বঞ্চিত হইলে, দিনের বেলা তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা না করিবে, এমন মানুষ সংসারে বড়ই বিরল।

ক্ষণিকাকে ঘরে বিছানা পাতিতে দেখিয়া মনোজা অবাক হইয়া বলিল, "তুই যে বড় আজ এ ঘরে? আবার রাত্রে শুশ্রূষাকারীর বদল হল কেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "অনাদি-বাবুর শরীর তেমন ভাল নেই, তাই আমিই আজ থাকব।"

মনোজা বলিল, "তোর শরীর বেশ, কখনও খারাপ হতে জানে না, অন্ততঃ সকলে তাই ধ'রে নিয়েছে।"

ক্ষণিকা শুইয়া পড়িয়া বলিল, "একটু ঘুমোন না এখন? শেষ রাত্রে ত ঘুম হয়ই না, গোড়ার দিকটাও কেবল কথা ব'লে কাটিয়ে দেবেন? আমি আলো নিভিয়ে দিচ্ছি।"

ঘরের আলো নিভিয়া যাইতেই, তারার মৃদু আলো খোলা জানলার পথে ভিতরে আসিয়া পড়িল। দেবতার চির-জাগ্রত নয়নের মত তারার দল যেন এই মর্ত্ত্যবাসিনী দুইটির দিকে চাহিয়া নীরবে বলিতে লাগিল, "কেবল মাটির দুঃখ বহন করিয়াই দিন কাটাইবে? একবার আমাদের দিকে চাও।"

ঘরের ভিতরের নীরবতা অটুট দেখিয়া ক্ষণিকা ভাবিল মনোজা হয় ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন একটু বাহির হইয়া ছাতে কি বারাণ্ডায় ঘুরিয়া আসিলে হয় না? সারা দিনের পরিশ্রম তাহার দেহকে যতই অবসন্ন করুক, তাহার মনের ভিতরের বেদনার তীব্র অনুভূতি এমন নিত্য জাগরূক থাকিত যে নিদ্রা তাহারনয়নে প্রায়ই আসিত না। এক-একদিন শরীর যখন জবাব দিতে চাহিত, মন এই বলিয়া বুঝাইয়া তাহাকে খাড়া রাখিত যে কাঁদিবার আর ঘুমাইবার সময়ের অভাব হইবে না, সম্মুখের সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া রহিয়াছে। যে ক'টা দিন আপনাকে দান করিবার সুযোগ রহিয়াছে, বৃথা কেন আর তাহার অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অপব্যয় করা?

কিন্তু তাহার উঠিবার সামান্য শব্দেই মনোজা বলিল, "তুই ঘুমুচ্ছিস ভেবে আমি এতক্ষণ জোর ক'রে চুপ ক'রে ছিলাম। ক'দিনই বা আর কথা বল্‌তে পাব? ওকে তাই রোজ রাত্রে জাগাই। এত কথা বিয়ের আগে courtshipএর সময়ও বলিনি।"

ক্ষণিকা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমরা দুজনেই পরোপকার করবার খাতিরে চুপ ক'রে রইলাম, কিন্তু উপকারটা কারুরই হল না।"

মনোজা বলিল, "আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছিলাম জানিস্? কতকাল আগেকার যে কথা, তখন সবে নিজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মনে করতাম আগেকার দিনের মেয়ের মত আমার স্বামী যদি আগে মরে ত আমি সহমরণে যাব। তাকে ছেড়ে বাঁচা যে কি ক'রে যায় তা আমার কল্পনায় আস্‌ত না। তখন স্বামী যে কি তা ত জান্‌তামও না। কিন্তু এখন ভাব্‌ছি যে কেউ যদি আমায় অধিকার দেয় ক্ষমতা দেয় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে, উনি যদি যেতে চানও, তা হলেও কি আমি নিয়ে যাই? যাই না বোধ হয়। জীবন যে কত বড় জিনিষ তা জীবন শেষ হবার সময়ই বুঝ্‌লাম। ভালবাসার খাতিরেও এর অবসান কামনা করতে নেই। আমি গেলে ওঁর খুবই লাগ্‌বে বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু সে দুঃখ সময়ে সয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ক'দিনের বা।"

ক্ষণিকা বলিল, "ভাই, বাইরের সম্বন্ধ অনেক কারণে ঘুচে যায়, কিন্তু মনের কাছে কি সম্বন্ধের কখনও শেষ হয়?"

মনোজা বলিল, "তুই এখনও তাই ভাবিস্? তোর মনে আছে ছেলেবেলায় একবার জন্মদিনে তোকে Ships That Pass In The Night ব'লে একখানা বই দিয়েছিলাম? তুই আরম্ভের আগে চার লাইন কবিতা প'ড়ে বল্‌লি—'সমস্ত বইটার মধ্যে এই ক'টা লাইন সব চেয়ে সুন্দর'।"

ক্ষণিকা বলিল, "খুব মনে আছে; গল্পটা ভুলে গেছি, কিন্তু ওই লাইনগুলো আজও পরিষ্কার মনে আছে।"

মনোজা বলিল, "আমিও ভুলিনি। সেই ত—

"Ships that pass in the night, and speak each other in passing
Only a signal shown and a distant voice in the darkness.
So on the ocean of life, we pass and speak one another,
Only a look and a voice, then darkness again and silence."

ঘরে আর শব্দ নাই। খানিক পরে মনোজা বলিল, "ক্ষণি, কথা বল্‌ছিস্ না যে?"

ক্ষণিকা অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি বল্‌ব?"

মনোজা বলিল, "কাঁদ্‌ছিস কেন? মনে রাখিস কাল-সাগর যতই বড় হোক, অনন্তকাল আমাদের প'ড়ে রয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার দেখা হবেই। কিন্তু তোর দুঃখ কেন

এত? আমাকে জানার ফলে সুখ তুই আর কিই বা পেয়েছিস, কিন্তু আমার হাত দিয়ে বিধাতা তোকে যা আঘাত দেওয়ালেন, তা আমি অন্ততঃ বুঝেছি। বরং এই কামনা কর্ যে এর পর যে আঁধার তোর আর আমার মাঝে নেমে আস্‌বে তা আর যেন না শেষ হয়।"

ক্ষণিকা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মনোজ্ঞার কাছে আসিয়া তাহার হাত দুখানা নিজের হাতের ভিতর লইয়া বলিল, "আপনি কি বুঝেছেন তা আমি জান্‌তে চাই না; কিন্তু এইটুকু কেবল জেনে রাখুন, যাদের ভিতর দিয়ে ভগবান্ আমাকে সব চেয়ে ব্যথা দিয়েছেন, তারাই আমার সব চেয়ে প্রিয়। আমি এই বিশ্বাস নিয়েই মর্‌ব যে তাদের জন্যে আমি অত দুঃখ সয়েছি ব'লেই তাদের আমি আবার ফিরে পাব। সুখের দেনা-পাওনা অল্প দিনেই চুকে যায়, কিন্তু দুঃখের ঋণ অত সহজে শেষ হবে না।"

মনোজ্ঞা বলিল, "তুই আমায় বাঁচালি ভাই। যাকে আমি এ জীবনে সকলের চেয়ে ভালবেসেছি, তারও তা হলে আবার আমার কাছে ফিরে আস্‌তে হবে। একদিন দুদিন নয়, আট বছর তার জন্য আমার বুকে আগুন নিয়ে বেড়াতে হয়েছে। বাইরের সাজে আমার সে তপস্যা কোনো দিন ধরা দেয়নি, কিন্তু মনের ভিতর তাকালে দেখ্‌তিস, সেখানে কি চেহারা ছিল।"

শেষের দিনটা বড় হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। মনোজ্ঞা যে তাহাদের ছাড়িয়া যাইবে এ কথা সবাই বুঝিত, কিন্তু কেহই তাহা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাহিত না। কিন্তু চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে অন্ধকারকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, তাহা মানুষ মাত্রকেই বুঝিতে বাধ্য হইতে হয়।

সকাল বেলা হইতেই সকলে সেদিন পরস্পরকে এড়াইয়া ফিরিতেছিল। কেহ কাহারও সহিত কথা বলে না, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। নিজের মনের আশঙ্কার ছায়া পাছে অন্যের চোখেও প্রতিফলিত দেখে এই ভয়ে তাহারা চোখ ফিরাইয়া লয়।

দিন দুই তিন হইতে গোটা দুই নর্সের আবির্ভাব হওয়াতে রোগীর সেবার ভার বাড়ীর লোকের হাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। অনাদিনাথ তবু সারাক্ষণই সেই ঘরের ভিতর, না হয় সাম্‌নের বারাণ্ডাতে কাটাইয়া দেন। সকাল হইতে বারাণ্ডায় ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, আহারাদির কথা কেহ তোলে নাই।

ক্ষণিকা চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া ছিল। মনোজ্ঞার মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখ দেখিতে আর তাহার ইচ্ছা ছিল না। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখই ক্ষণিকার হৃদয়ে চিরদিনকার মত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; মরণের বিভীষিকা তাহার উপর ছায়াপাত করে, ইহা সে চায় না। বেণুকে তাড়াতাড়ি তাহার এক পিসির বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কদম আসিয়া বলিল, "মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

ক্ষণিকা উঠিয়া গেল। গৃহিণী সকাল হইতেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমায় একবার ধ'রে ও ঘরে নিয়ে চল, শেষ দেখা দেখে আসি।"

ক্ষণিকা নীরবে তাঁহাকে লইয়া চলিল। ঘরের দরজার সামনে আসিতেই তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো মাগো বুড়ীকে ফেলে কোথায় যাচ্ছিস্।"

অনাদিনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "মা চল, আমরা এখান থেকে যাই। আর ত দেখ্‌বার কিছু নেই।"

ক্ষণিকা দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর অনেক লোক, কাহাকেও যেন সে চিনিতে পারিল না। আর খাটের উপর ঐ কি মনোজ্ঞা? এতদিনকার এত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, ভয় শঙ্কা ইহাকে আশ্রয় করিয়াই কি ছিল? আজ তাহাদের ভগ্ন পিঞ্জর ফেলিয়া তাহারা কোথায় উধাও হইয়া গেল? যাহাকে ভালবাসা নিরন্তর ঘিরিয়া রাখিত, আজ সে কেবল ভয়ই উদ্রেক করিতেছে।

কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসিয়া ছিল, তাহার ঠিকানা নাই। একজন নর্স আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। কে যেন শব্দহীন ভাষায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে তাহার এতদিনের সঙ্গিনী আজ চিরদিনের মত বিদায় লইতেছে।

বাহিরে তখন লোকে লোকারণ্য। আপাদমস্তক পুষ্পাভরণভূষিতা মনোজ্ঞার মুখ হইতে মরণ জীবনের সব

বিক্ষোভ-যন্ত্রণার চিহ্ন মুছিয়া লইয়াছে। নববধূর মত তাহার মুখ প্রীতিপ্রফুল্ল।

শববাহীদল ফটক পার হইয়া গেল। হঠাৎ কে যেন বুকফাটা চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদি, দিদিমণি আমার!"

ক্ষণিকা চাহিয়া দেখিল, মনোজার একটি ভাই সিঁড়ির সামনে দাঁড়াইয়া। আর-একজনের সন্ধানে তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল, তাহাকে পাইল না।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এতদিন পরে তাহার কাঁদিবার অবসর মিলিয়াছে। শুধু এই মৃত্যুশোকের জন্য নয়, নিজের জীবনের যত দুঃখ, যত ব্যথা, যত নিরাশার বেদনা, যত রিক্ততা, সকলে যেন আজ ভীড় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ আর অন্য কাজ নাই, আজ এই অশ্রুর ঋণ শোধ করিতেই দিন যাক।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীসীতা দেবী।

বুদ্ধির মাপকাঠি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১ ও ১২ বৎসরের প্রশ্ন—

(১) ৪০টি অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(২) দয়া কাহাকে বলে? প্রতিহিংসা কি? বদান্যতা কাহাকে বলে? ঈর্ষ্যা কি? ন্যায়পরতা কিরূপ?

(৩) ৮ বৎসর বয়সের ১নং প্রশ্ন দেখ।

(৪) নীচের বাক্যগুলি ঠিক ভাবে বল :—

(ক) হ'তে দেরী বাড়ীর আমাদের হ'ল বাহির।

(খ) আমার সংশোধন বলিলাম বাবাকে চিঠিখানার করিতে।

(গ) শিশু আপনার প্রাণপণে কাজ বুদ্ধিমান করে।

(৫) 'ধূর্ত্ত শৃগাল ও বায়স'; 'কৃষক ও সারস'; 'লাঙ্গুলহীন শৃগাল'; ইত্যাদি প্রকারের গল্প বালককে শুনাইতে হইবে। প্রত্যেক গল্প হইতে কি উপদেশ পাওয়া গেল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(৬) শুন—(ক) ৩—১—৮—৭—৯; এইবার উল্টা দিকে বল।

শুন—(খ) ৬—৯—৪—৮—২; এইবার উল্টা দিকে বল।

শুন—(গ) ৫—২—৯—৬—১; উল্টা দিকে বল।

(৭) চারিখানি ছবি একে একে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—ছবিগুলিতে কি দেখান হইতেছে? ছবির উদাহরণ—গগনেন্দ্রনাথের—পুলিসম্যান ও আম-চোর, 'দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা'।

(৮) (ক) সর্প, গাভী, শালিক।

(খ) পুস্তক, শিক্ষক, সংবাদপত্র।

(গ) পশম, তুলা, চামড়া।

(ঘ) ছুরী, পয়সা, তার।

(চ) গোলাপ, আলু, গাছ।

তিন তিনটির মধ্যে কি বিষয়ে ঐক্য বা সাদৃশ্য আছে—জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

মন্তব্য :—

(১) এই প্রশ্নে ভাষা-পরিচয়ের পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কোন্ ৪০টি কথার অর্থ বালকের অবশ্যজ্ঞেয়। এবং এই ৪০টি কথার অর্থ জানিলেই বালকের ভাষার সহিত উত্তমরূপে পরিচয় হইয়াছে কিরূপে জানা যাইবে? মনে করুন জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০০০০ কথা আছে। তাহাদের মধ্য হইতে সুবিবেচনার সহিত ১০০ কথা নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। এই কথাগুলি অভিধানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখন ধরিয়া লওয়া

যাউক, যে বালক এই ১০০টি কথা জানে তাহার এই ৮০০০০ কথার সহিত পরিচয় আছে। তাহা হইলেই দেখিবেন যে বালক ৪০টি প্রচলিত অথচ দুর্বোধ্য কথার অর্থ জানে তাহার ৩২০০ কথা জানা আছে। এই প্রশ্নটি তত সন্তোষজনক মনে হয় না।

(২) এখানে গুণ বা অবস্থাবাচক শব্দ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়াছে কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। বালকের নিকট নিম্নলিখিত রকমের উত্তর আশা করা হইয়া থাকে। যথা—দয়া=কাহারও দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। প্রতিহিংসা=অপকারীর অপকার করা। ইত্যাদি। বালকেরা সাধারণতঃ বলিবে দয়া মানে কৃপা বা অনুগ্রহ। তখন পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—'কৃপা' কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। অন্যান্য শব্দের সম্বন্ধেও এইরূপ করিতে হইবে।

(৪) এই প্রশ্নে কতকগুলি এলোমেলো ভাবে সাজানো শব্দকে একত্র করিয়া অর্থযুক্ত বাক্যের গঠন করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের Completion test এইরূপেই করিতে হয়। এই ধরণের পরীক্ষা প্রথমে এবিংহাউস (Ebbinghouse) করিয়াছিলেন। বিনেও বলেন যে তিনি এই প্রশ্নটির জন্য এবিংহাউসের নিকট ঋণী। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে ১২ বৎসর বয়সে শতকরা ৬৫ জনের অধিক বালক এই প্রশ্নটির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না।

(৫) অনেক সময় বালকেরা তাহাদের 'কথামালায়' এই গল্পগুলি পড়িয়া থাকে। পুস্তকে লিখিত 'উপদেশ-গুলি'ও গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা 'নীতিটি' হৃদয়ঙ্গম না করিয়াও গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া দিতে পারে। এইজন্য পরীক্ষকের উচিত যেন বালকের পঠিত কোন গল্প হইতে তাহাকে নীতি সংগ্রহ করিতে না বলেন।

(৬) এই প্রশ্নে স্মরণশক্তির পরীক্ষা হইতেছে।

(৭) ছবিগুলি এমন হওয়া চাই—যাহা বালকের পরিচিত ঘটনা চিত্রিত করিবে। অবশ্য এরূপ আশা করা যায় না যে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক একজন কলাবিদের মত চিত্রের ব্যাখ্যা করিবে।

(৮) এখানে পার্থক্যসত্ত্বেও সাদৃশ্য নির্দেশ করিতে বলা হইতেছে। 'পুস্তক, শিক্ষক ও সংবাদপত্র' এই তিনের এক বিষয়ে মাত্র সাদৃশ্য আছে, যথা—প্রত্যেকটিই শিক্ষালাভের উপায়। বালক হয় ত বলিবে তিনই আমাদের উপকারে আসে। তখন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—কি রকমের উপকার? অন্যান্যগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৩।১৪ বৎসর বয়সের প্রশ্ন (এক-একটি প্রশ্ন ৪ মাস বয়সের পরিমাপক)।

(১) পঞ্চাশটি 'কথার' অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(২) ছয়খানি পাতলা কাগজ ($8\frac{1}{2}'' \times 11''$) লইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করিতে হয়। একখানি কাগজ লইয়া একবার ভাঁজ করুন। বালকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ভাঁজের উপর হইতে একটু কাগজ কাটিয়া লউন। তাহা হইলে ভাঁজের উপর একটি ছিদ্র হইবে। এখন ভাঁজ খুলিয়া বালককে দেখাইলে বালক দেখিতে পাইবে যে একটি ছিদ্র হইয়াছে। এইবার দ্বিতীয় কাগজখানি লউন, বালকের সম্মুখে কাগজটিকে দুই ভাঁজ করুন। আগেকার মত ভাঁজের লাইনের উপর হইতে কাগজ কাটিয়া লউন। ভাঁজ খুলিয়া বালককে দেখাইলে কয়টি ছিদ্র হইয়াছে সে বলিতে পারিবে। তৃতীয় কাগজটি তিনবার ভাঁজ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ছিদ্র করিয়া বালককে ছিদ্রগুলি দেখিতে দেন। চতুর্থ কাগজখানিকে চারিবার ভাঁজ করিয়া আগেকার মত ছিদ্র করিয়া বালককে দেখাইতে হইবে। পঞ্চম কাগজখানিকে পাঁচ বার ভাঁজ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ছিদ্র করিতে হইবে। এবার জিজ্ঞাসা করিবেন—'বল দেখি কয়টি ছিদ্র হইবে? ষষ্ঠ কাগজখানিকে ছয় বার উপরি উপরি ভাঁজ করিয়া ছিদ্র করিয়া জিজ্ঞাসা করুন —'এবারে কয়টি ছিদ্র হইবে?' দেখিতে হইবে বালক কোন নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে কি না। পাটীগণিত বা বীজগণিত একটি শ্রেণীপর্য্যায়ের কতকগুলি রাশি (term) দেখিয়া কোন বিশিষ্টরাশি (term) বাহির করিতে বলার অনুরূপ প্রক্রিয়া করিতে বালক আদিষ্ট হইতেছে।

(৩) ইংলণ্ডের রাজা আর যুক্তরাজ্যের সভাপতির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে বল। বা রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসনরীতি কাহাকে বলে বুঝাইয়া দাও।

(৪) (ক) এক ভদ্রলোক সহরের এক বাগানে বেড়াইতেছিলেন। একটি গাছের কাছে আসিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া নিকটের থানায় সংবাদ দিলেন—বল দেখি কি সংবাদ দিলেন?

(খ) একজন সাঁওতাল সবে মাত্র সহরে আসিয়াছিল। কিছুকাল রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বলিয়া উঠিল—'সহরে এমন লোকও আছে যারা বসে বসে ছুটতে পারে।' বল দেখি সাঁওতাল কি দেখেছিল?

(৫) (মুখে মুখে উত্তর দিতে হইবে)

(ক) একজন লোক সপ্তাহে ২০ টাকা রোজ্‌গার করে। কিন্তু সে ১৪ টাকা খরচ করে। বল দেখি কতদিনে সে ১০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারবে?

(খ) ৬টি পেন্সিলের দাম ৫ পয়সা হইলে কয়টা পেন্সিলের দাম ৫০ পয়সা হবে?

(গ) ১৫ পয়সায় ১ গজ কাপড় পাওয়া যায়। বল দেখি ৭ ফুট কাপড়ের দাম কত?

(৬) মনে কর ঘড়িতে ৬টা বেজে ২৪ মিনিট হয়েছে। মনে মনে ভাব কোন্ কাঁটা কোথায় আছে। তার পরে মনে কর ছোট কাঁটাটি বড় কাঁটার জায়গায় গেছে আর বড় কাঁটাটি ছোট কাঁটার জায়গায় এসেছে। তা হলে তখন ঘড়িতে কটা বেজেছে বল দেখি?

এইরূপ আরও দুইটি প্রশ্ন করিতে হইবে।

অথবা:—

শুন, তারপর উল্টা দিক হইতে বলিয়া যাও—

(ক) ২—১—৮—৩—৪—৬—৯।

(খ) ৯—৭—২—৮—৪—৭—৫।

মন্তব্য:—

(১) এই প্রশ্নে পূর্ব্বেকার মত ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় লওয়া হইতেছে।

(২) এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

(৩) ইউরোপ ও আমেরিকার বালকবালিকাগণের পক্ষে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বলা সহজ। ভারতীয় বালকগণের জন্য অন্য প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। যেমন জজ আর ম্যাজিষ্ট্রেট এ দু'জনের মধ্যে কি তফাৎ।

(৪) এখানে পরস্পর-সম্বন্ধ কতকগুলি ঘটনার মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট ঘটনাটি বালক বুঝিতে পারে কি না তাহাই দেখা যাইবে। ইহাও এক প্রকারের Completion test.

(৫) মানসাঙ্কগুলির প্রত্যেকটির উত্তর এক এক মিনিটে দেওয়া চাই। মানসাঙ্কের দ্বারা বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা সব দেশেই প্রচলিত আছে।

(৬) এখানে চাক্ষুষ স্মৃতির পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। যখন শ্রুত সংখ্যাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে বলা হয় তখন 'শ্রুতিস্মৃতি' পরীক্ষা করা হয়।

১৫।১৬ বৎসর বয়সের প্রশ্ন:—(প্রতি প্রশ্ন ৫ মাস বয়সের মাপক)

(১) ৬৫টি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(২) 'কথামালা' বা 'আখ্যানমঞ্জরী' অথবা এতদনুরূপ পুস্তক হইতে গৃহীত উপাখ্যানের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(৩) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থের প্রভেদ বল—

(ক) অলস, নিষ্কর্ম্মা; (খ) বিপ্লব ও ক্রমবিকাশ;

(গ) দুঃখ ও দারিদ্র্য; (ঘ) চরিত্র ও খ্যাতি।

(৪) (ক) একটি বড় বাক্সের মধ্যে; দুটি ছোট ছোট বাক্স আছে। আবার এই ছোট বাক্সের প্রত্যেকটির মধ্যে এক-একটা খুব ছোট বাক্স আছে। বল দেখি সবসুদ্ধ কটি বাক্স আছে?

(খ) একটি বড় বাক্সের মধ্যে দুটি মাঝারি বাক্স আছে। এই মাঝারি বাক্সের প্রত্যেকটির ভিতর দুটি ক'রে বাক্স আছে। সব শুদ্ধ ক'টি বাক্স আছে?

(গ) একটি বড় বাক্সের মধ্যে তিনটি মাঝারি বাক্স আছে। আবার এই মাঝারি বাক্সের প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি ক'রে ছোট বাক্স আছে। সবসুদ্ধ ক'টি বাক্স আছে?

(ঘ) একটি বড় বাক্সের মধ্যে চারটি মাঝারি বাক্স আছে। মাঝারি বাক্সগুলির প্রত্যেকটির ভিতর

চারটি করে' ছোট বাক্স আছে। সবসুদ্ধ ক'টি বাক্স আছে ?

(৫) (ক) শুন—৪—৭—১—৯—৫—২ ; উল্টা দিক হ'তে বলে যাও।

(খ) শুন—৫—৮—৩—২—৯—৪ ; উল্টা দিকে বলে যাও।

(গ) শুন—৭—৫—২—৬—৩—৮ ; উল্টা দিকে বল।

(৬) (ক) প............ফ

চ......................ছ

উপরের চিত্রটি দেখাইয়া বলিতে হইবে :—মনে কর 'প—ফ' রেখাটি একটি কামান, 'চ—ছ' রেখাটি একটি সোজা সমতল রাস্তা। কামান হ'তে গোলা ছাড়া গেল। গোলাটি কি রকম ভাবে এসে জমিতে পড়্বে, একটি পেন্সিল দিয়ে এঁকে দেখাও।

(খ) সব ভারী জিনিষ জলের ভিতর হাল্কা বোধ হয় তা ত জান ? মনে কর একটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে এক বালতি জল রাখা গেল; তার ওজন হল ১৫ সের। ২ সের ওজনের একটি মাছ জলের মধ্যে রাখা গেল। এখন ওজন কত হ'বে ?

(গ) মনে কর একটি বন্দুকের গুলি ১০০ গজ যেতে পারে। যদি এই বন্দুক নিয়ে ৫০ গজ দূরে লক্ষ্য করা যায়, তবে লক্ষ্য-বেধ করা সহজ হবে কি শক্ত হ'বে ?

মন্তব্য :—

(১) এই প্রশ্নে পূর্ব্ববৎ ভাষা-পরিচয়ের পরীক্ষা হইতেছে।

(২) পঠিত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণের শক্তির পরীক্ষা লওয়াই এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এই পরীক্ষা দ্বারা মনোযোগ ও মানসিক বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(৩) এই প্রশ্নের উত্তরে পার্থক্যগুলি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে পারা চাই।

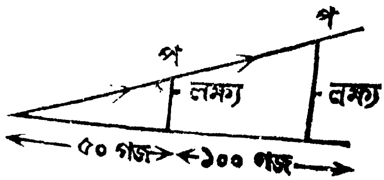
(৪) এখানে মনশ্চক্ষু দ্বারা বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিবার শক্তির (Power of imagery) পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

(৫) এই প্রশ্নে স্মৃতিশক্তির (Memory Span) পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

(৬) (ক) এই প্রশ্নের উত্তরে গোলার পথটি যে ক্রমশঃ ঈষৎ বক্র হইবে—তাহা দেখান চাই। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যে ব্যক্তি গতি-বিজ্ঞান পড়ে নাই তাহার পক্ষে ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত। বাস্তবিক তাহা নয়। সকলেই বাল্যকাল হইতে ঢিল ছুড়িয়াছে।

(খ) অনেকেই বলিয়া থাকে যে ওজন হইবে ১৭ সের অপেক্ষা কম। যাহারা উত্তরে বলে যে ১৭ সেরই হইবে তাহাদিগকে একটু জেরা করিয়া দেখিতে হইবে।

(গ) যদি উত্তর পাওয়া যায় যে ৫০ গজ দূরে লক্ষ্যবেধ সহজ হইবে, তৎক্ষণাৎ এইরূপ অনুমানের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কারণ এইরূপে দর্শাইতে হইবে :— ৫০ গজ দূরে লক্ষ্য-বেধ করিতে যে পরিমাণ ভুল হইবার সম্ভাবনা ১০০ গজ দূরে তদপেক্ষা ভুল বেশী হইতে পারে।



উপরের প্রশ্নগুলির দ্বারা 'সাধারণ জ্ঞানের'ই পরীক্ষা লওয়া যাইতেছে।

১৬ বৎসরের অধিক বয়সের প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্ন পাঁচ মাস বয়সের পরিমাপক) :—

(১) পঁচাত্তরটি নির্ব্বাচিত শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(২) (একখানি কাগজের টুকরা লইয়া বলিতে হইবে) এই দেখ আমি কাগজটি একবার ভাঁজিলাম। এই বার ফের ভাঁজিলাম। (এখন যে দিকে মাত্র একটি ভাঁজ দেখা যাইতেছে—সেদিক হইতে কাঁচি দ্বারা একটি টুকরা কাটিয়া লইয়া) তুমি একখানি কাগজে আঁকিয়া দেখাও কি রকম ভাবে ভাঁজ করা হইয়াছে। কাটিবার পর যদি কোথাও কোন ছিদ্র হইয়া থাকে তাহাও আঁকিয়া দেখাও।

(৩) শুনিয়া উল্টা দিকে বলিয়া যাও—

(ক) ৭—২—৫—৩—৪—৮—৯—৬

(খ) ৪—৯—৮—৫—৩—৭—৬—২

(গ) ৮—৩—৭—৯—৫—৪—৮—২

(৪) নিম্নলিখিত অংশগুলি শুনাইয়া, সারসংগ্রহ করাইতে হইবে—

(ক) আমরা সম্প্রতি যে-সকল পরীক্ষা লইতেছি, তাহাদের দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইবে, এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিও বিশেষ উপকৃত হইবে। এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির পার্থক্য কিরূপ, এবং এই পার্থক্যের কারণ কি তাহা জানিতে পারা বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বংশানুগত দোষগুণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যক্তিবিশেষের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে মানবের উন্নতির পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা আছে।

(খ) জীবন সুখময় না দুঃখময়, এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন—জীবন সুখময়, আবার কেহ মনে করেন—ইহা দুঃখময়। কিন্তু বোধ হয়, জীবনকে সুখ-দুঃখময় বলিলেই যথার্থ কথা বলা হয়; কারণ, আমরা যত সুখ চাই, তত সুখ পাই না; আবার যে পরিমাণে দুঃখ পাইলে আমাদের শত্রুর মনে সুখ হইবে সে পরিমাণ দুঃখও পাই না। বাস্তবিক সুখ-দুঃখ-সমন্বিত বলিয়াই জীবন সহনীয় হয়।

(৫) শুনিয়া উল্টা দিক হইতে বলিতে হইবে—

(ক) ৪-১-৬-২-৫-৯-৩। (খ) ৩-৮-২-৬-৪-৭-৫।

(গ) ৯-৪-৫-২-৮-৩-৭।

(৬) মুখে মুখে উত্তর দিতে হইবে ;—

(ক) একটি দুধের ঘড়া হ'তে ৭ সের দুধ নিতে হবে। তোমার কাছে দুটি ঘটী আছে,—একটিতে তিন সের দুধ ধরে, অপরটিতে পাঁচ সের দুধ ধরে। এই দুটি ঘটীর সাহায্যে ৭ সের দুধ মাপিতে হইবে। অন্য কোন ঘটী-বাটি পাইবে না। প্রথমে পাঁচ-সেরী ঘটীতে দুধ ঢালিতে হইবে।

(খ) মনে কর, তোমাকে একটি পাঁচ-সেরী আর একটি সাত-সেরী ঘটী দেওয়া গেছে। এই দুটি ঘটীর সাহায্যে আট সের দুধ মাপিতে হইলে কি কর? প্রথমে দুধ পাঁচ-সেরী ঘটীতে ঢালিতে হইবে।

(গ) মনে কর, একটি চার-সেরী ঘটী আর একটি নয়-সেরী ঘটীর সাহায্যে ৭ সের দুধ মাপিতে হইবে। বড় ঘটীতে প্রথমে না ঢালিয়া, কি উপায়ে ৭ সের দুধ মাপিতে পার?

মন্তব্য :—

(১) এই প্রশ্নে ভাষা-পরিচয়ের পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

(২) 'কাগজ-কাটা' পরীক্ষার উদ্দেশ্য মনশ্চক্ষে দর্শন করিবার ক্ষমতার (Power of Visual Imagination) পরীক্ষা করা। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া পাঠক আপনার এই শক্তির পরীক্ষা লইতে পারেন।

(৩) কতকগুলি সংখ্যা এক সেকেণ্ড অন্তর শুনিয়া বা দেখিয়া বিপরীত দিক হইতে আবৃত্তি করিতে হইলে বিশিষ্ট স্মরণশক্তির (Visual or Auditory Memory) আবশ্যক।

(৪) একবার মাত্র পাঠ করিয়া, পঠিত বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ করিতে পারা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই প্রশ্নের উত্তরে মাত্র সারাংশ দিলেই যথেষ্ট হইবে না। যে কয়টি বিষয়ের কিছু না কিছু বলা হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ করা চাই।

(৫) তৃতীয় প্রশ্নের আটটি সংখ্যার পরিবর্ত্তে এখানে সাতটি সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; উভয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য একই; দেখা গিয়াছে, এই দুই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কোন বয়সের লোকের শতকরা পঞ্চাশ জনেরও নিকট হইতে পাওয়া দুষ্কর।

(৬) এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য,—মনঃসংযোগ ও মানস-পটে চিত্র-অঙ্কনের শক্তির (Power of mental imagery) পরীক্ষা লওয়া। এইজন্য কাগজ-পেন্সিলের সাহায্য লইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক অঙ্কটির জন্য পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর সাহায্যে বুদ্ধির মাপ লইয়াছেন, তাঁহারা বলেন—ষোল বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর অনেক বয়স্ক লোকেও সম্পূর্ণভাবে দিতে পারে না। সর্ব্বশেষে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরও বয়স্ক লোকদিগের অল্প সংখ্যকের নিকট হইতে পাওয়া যায়। এইজন্য তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে সাধারণতঃ ষোল বৎসর বয়সের

পর মানুষের বুদ্ধি আর বাড়ে না। সুতরাং যাহার বয়স যতই অধিক হউক না কেন তাহার মানসিক বয়স হিসাব করিবার জন্য তাহাকে ষোল বৎসরের বালক ধরিয়া লইতে হয়। যদি সে ব্যক্তি ষোল বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মানসিক বয়সও ষোল ধরিয়া লওয়া যাইবে। এখন মনে করুন এই ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে; তাহা হইলে তাহার মানসিক বয়স হইবে ১৬বৎসর ১০মাস। তাহার বুদ্ধির অঙ্ক বা I. Q. হইবে (১৬বৎ ১০মা + ১৬বৎ) × ১০০ বা—১০৫·৩। পক্ষান্তরে যদি কোন বয়স্ক ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে; এবং ষোল বৎসর বয়সের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন ছয়টির মধ্যে চারিটির মাত্র উত্তর দিতে পারে, তাহার মানসিক বয়স হইবে ১৪বৎসর + ৪ × ৫মাস বা ১৫বৎসর ৮মাস। এ স্থলে I. Q. = (১৫বৎসর ৮মাস + ১৬বৎ) × ১০০ = ৯৮ (প্রায়)।

ষোলবৎসরের বয়সের পর মানুষের বুদ্ধি বাড়ে না—এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কারণ আছে। কিন্তু বুদ্ধি ও বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে এ কথা মনে রাখিলে, হয়ত বিস্ময়ের উদ্রেক না হইতে পারে। বাস্তবিক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমরা বিদ্যালাভ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তা চিরকাল সমান থাকে।

বিনের ধারণা ছিল—বুদ্ধি পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত বাড়ে; তাঁহার পরবর্ত্তী মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের কেহ কেহ মনে করেন ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধি বাড়িতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি এই ফেব্রুয়ারী মাসে British Psychological Societyর গত অধিবেশনে একজন বলিয়াছেন যে তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বুদ্ধির বৃদ্ধি তের বা চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। যাহা হউক বুদ্ধির মাপকাঠির দ্বারা এ বিষয়ের তথ্য নিরূপণে কিছু সাহায্য লাভ হইলেও হইতে পারে।

Binet-Simon Intelligence Scale কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং প্রয়োগের ফলে কিরূপে উপকার হইতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

এই মাপকাঠির বিষয়ে বর্ত্তমানে মতদ্বৈধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি বহুসংখ্যক একই বয়সের বালকদিগের মানসিক বয়সের পরিমাণ স্থির করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে আমরা এই মাপকাঠির উপর নির্ভর করিতে পারি। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে আমরা জানি যে একই বয়সের বালকদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ-বুদ্ধির, কতকগুলি অল্পবুদ্ধির এবং কতকগুলি সুবুদ্ধির। তন্মধ্যে সাধারণ-বুদ্ধির বালকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আর মোটামুটি হিসাবে বলিলে বলা যাইবে যে যতগুলি অল্পবুদ্ধির বালক আছে প্রায় ততগুলিই সুবুদ্ধিও আছে, নচেৎ প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এই মাপকাঠির সাহায্যে বুদ্ধির মাপ করিলেও ঠিক তাহাই দেখা যায়।

কোন স্কুলে একই বয়সের অনেক বালক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পড়িতেছে দেখা যায়। তাহাদের বুদ্ধির অঙ্ক বাহির করিয়া দেখিলেও বুঝা যাইতে পারিবে যে, যে বালক উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেছে তাহার বুদ্ধির অঙ্ক সাধারণতঃ অন্য শ্রেণীর অল্পবয়স্ক বালকের অপেক্ষা বেশী। অবশ্য মানিয়া লওয়া হইতেছে যে সকলেই যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ করিয়াছে; যে স্থলে তাহা হয় নাই সে স্থলে এরূপ তুলনার মূল্য নাই। এই দুই উপায়ে মাপকাঠির যাথার্থ্য স্বীকৃত হইতে পারে। আরও একটি উপায় আছে। অনেক সময় দেখা যায় কোন বালক এক ক্লাস হইতে অপর ক্লাসে প্রমোশন পাইতেছে না। অথচ সে নিতান্ত নির্ব্বোধ নয়। এখন মনে করা যাউক যে তাহার I. Q. (বুদ্ধির অঙ্ক) বেশ উচ্চ। তাহাকে উপরের ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া যাইতে পারে। যদি সে উপরের ক্লাসে বেশ চলিতে পারে—তাহা হইলে আমাদের 'মাপকাঠির' যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ থাকিবে না। এই উপায়ে সত্য-সত্যই এই মাপকাঠির পরীক্ষা প্রতিপন্ন হইতেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় যাহা হইতেছে, ভারতে তাহার পরীক্ষা করিতে স্কুলের হেডমাষ্টারগণ চেষ্টা করিবেন কি?

বিনের মাপকাঠি সম্বন্ধে একটি খুব সাধারণ আপত্তি উঠিতে পারে; সেটা এই কেহ কেহ বলিতে পারেন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লইয়া মানসিক বয়স ও বুদ্ধির অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইতেছে; সুতরাং যে বালক লেখা-পড়া শিখিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহার বুদ্ধির অঙ্ক হয়ত বাড়িয়া যাইবে, কারণ সে বেশী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। প্রথম দৃষ্টিতে

এই আপত্তিটা বড় রকমের মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রশ্নগুলির আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ইহাদের মধ্যে এমন কোন প্রশ্ন নাই যাহার উত্তর বিনা লেখা-পড়ায় দেওয়া যাইতে পারে না। এমন কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন আছে যাহার সম্বন্ধে কস্মিনকালেও কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালক স্বভাবতঃ যে-সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহাদের উপরই প্রশ্ন করা হইয়াছে। এই স্বেচ্ছায় জ্ঞান-লাভের আগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন বালকের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আছে। এই পার্থক্যের কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহার সহিত বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আর-একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালাভের জন্য মানসিক বয়স না বাড়িতেও পারে। সুতরাং বুদ্ধির অঙ্কের বাড়িবার সম্ভাবনা না থাকিতেও পারে। স্বল্পবুদ্ধি (Feeble-minded) বালকগণের উপর পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে বিদ্যালাভ সত্ত্বেও বুদ্ধির অঙ্ক বাড়ে না [Journal of Educational Psychology, Vol. 3, 1917, pages 85-96 and 151-165]।

যাহাই হউক ব্যাপারটি পরীক্ষণীয়। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে এতদ্বিষয়ে ঔৎসুক্যের উদ্রেক হয় তাহা হইলে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, এই মাপকাঠি পাশ্চাত্য বালক-বালিকাগণের বুদ্ধি মাপিবার জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই মাপকাঠির সাহায্যে ভারতীয় বালক-বালিকাগণের বুদ্ধির মাপ করা যাইতে পারিবে কি না—কিংবা এইপ্রকারের অন্য মাপকাঠির আবশ্যক হইবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়।

বুদ্ধিমত্তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। নির্দ্দেশ করাও দুঃসাধ্য। তবে বুদ্ধিমত্তার সহিত ভিন্ন ভিন্ন মানসিক শক্তির সম্বন্ধ (Correlation) থাকিতে পারে। স্মৃতি, কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক শক্তির সহিত বুদ্ধিমত্তার কি প্রকারের সম্বন্ধ আছে, তাহার সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহাদের পরীক্ষার ধারা ও পরীক্ষার ফল মনোবিজ্ঞানের ছাত্রগণ অবগত আছেন। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

[এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি—

(১) Measurement of Intelligence—Terman.

(২) Brightness and Dullness of Children—Woodrow.

রেণুপদ কর।

ব্যথার পূজা

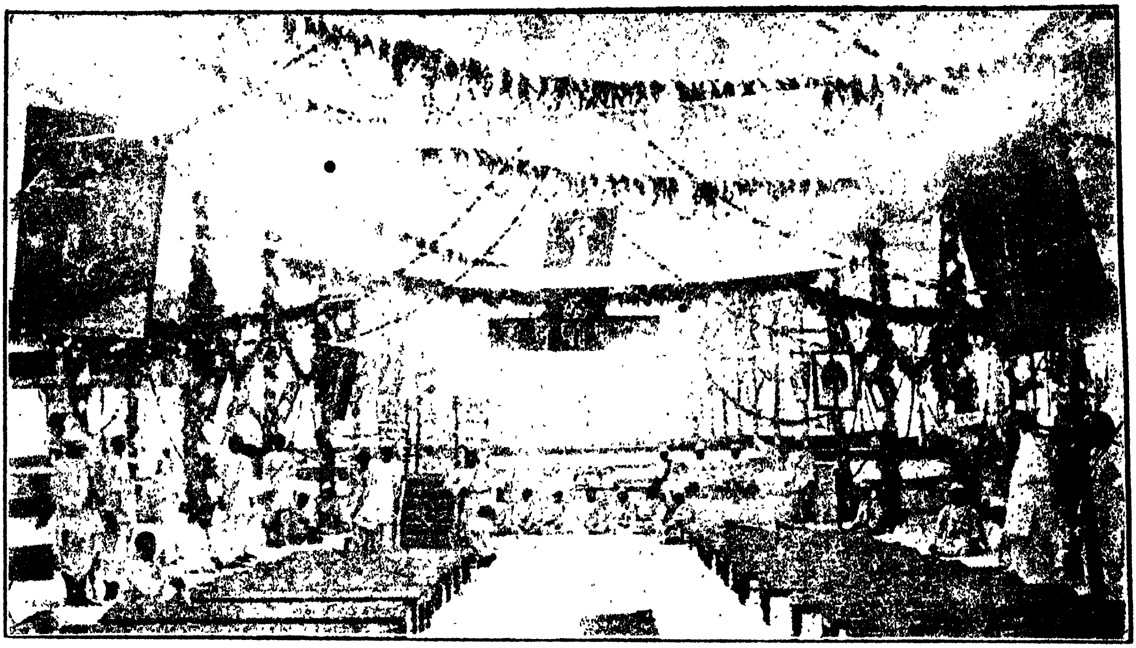
ওগো জগতের নিদয় বিধাতা
তোমারে নমস্কার।
এই বিশ্বের ব্যথা অঞ্জলি দিয়ে
তোমারে নমস্কার।
সারা নিশিদিন তোমার ভুবনে
যে রোদন রাজে গগনে গগনে,
তাহারি করুণ সুরের রণনে
তোমারে নমস্কার।

কুসুমের শাখে কুসুম শুকায়,
মিলনের হাসি বিরহে লুকায়,
জননীর বুকে শিশু রেখে যায়
উতরোল হাহাকার।
এই জগতের শত আঁখিজল
শত করপুটে করে টলমল ;
নিবেদি' তোমায় সে মধু-গরল
তোমারে নমস্কার।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

আহমদাবাদের কংগ্রেসের ছবি

[চিত্রস্বত্বাধিকারী—গোরস ষ্টুডিও, বারাণসী]



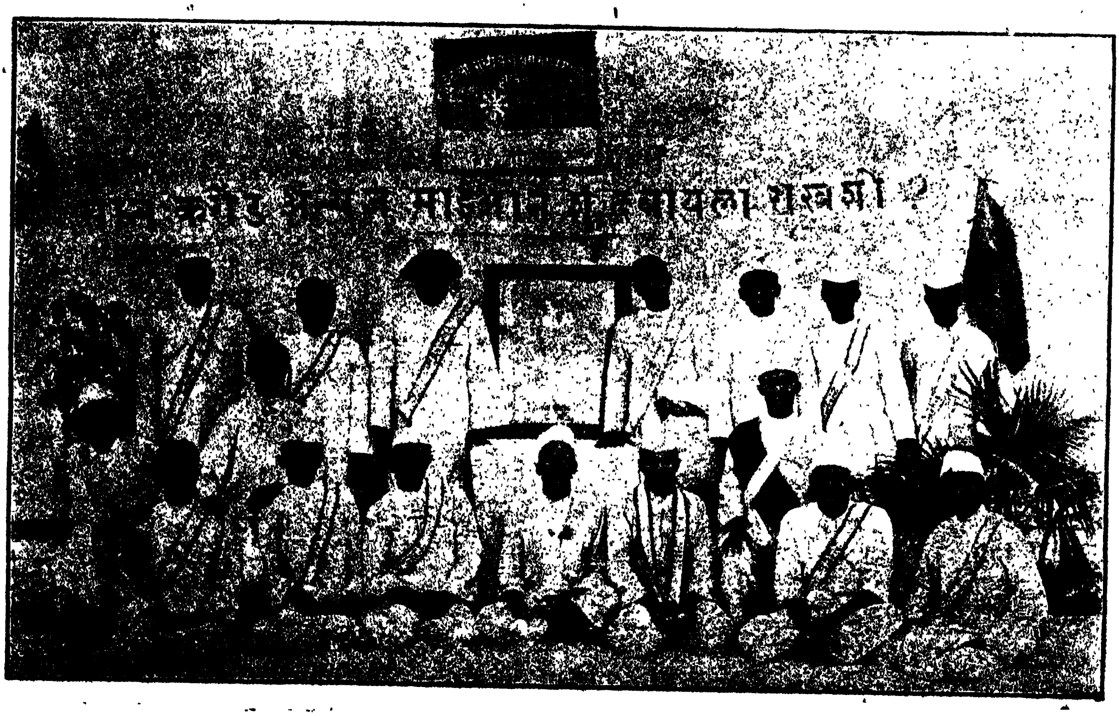
কংগ্রেস মণ্ডপের সজ্জা।



কংগ্রেস ময়দান।



কংগ্রেস এগ্‌জিবিশন অর্থাৎ জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনী।



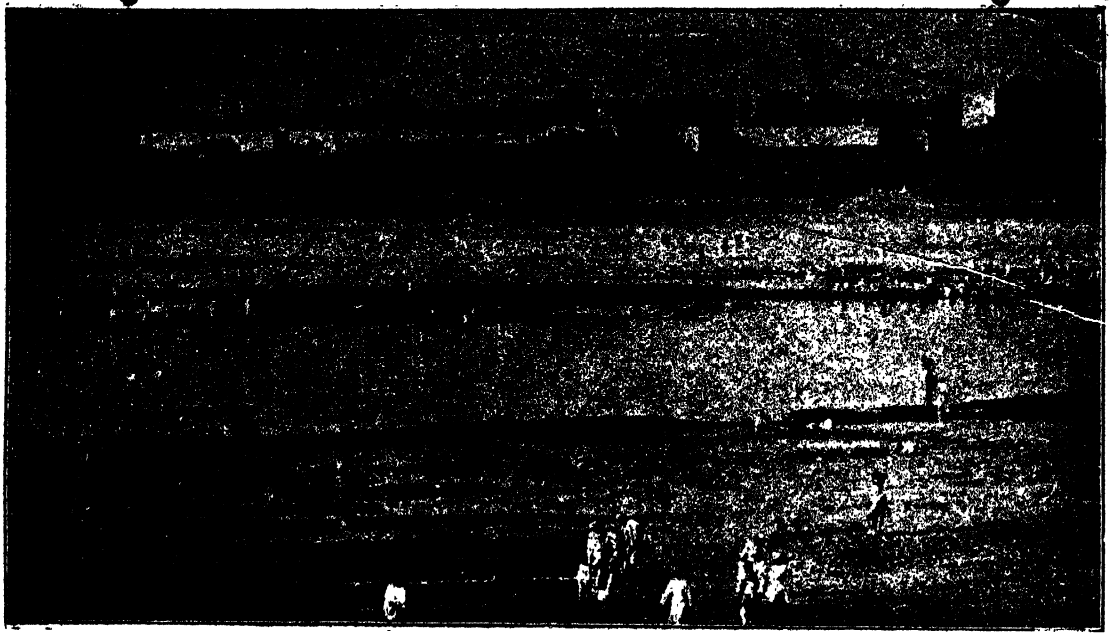
কংগ্রেসের স্বাস্থ্যসংরক্ষক সঙ্ঘ।



কংগ্রেস প্রদর্শনীতে আন্ধ্র মহিলার চরকা-কাটা।



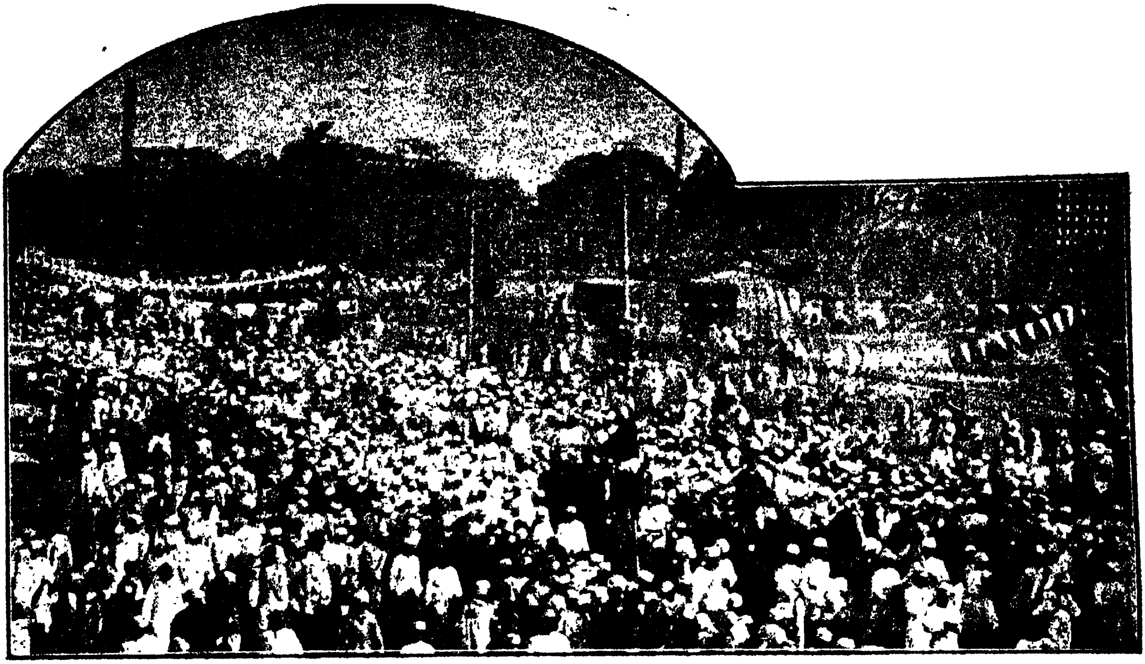
কংগ্রেস-ভলাণ্টিয়ারদের কুচ-কাওয়াজ।



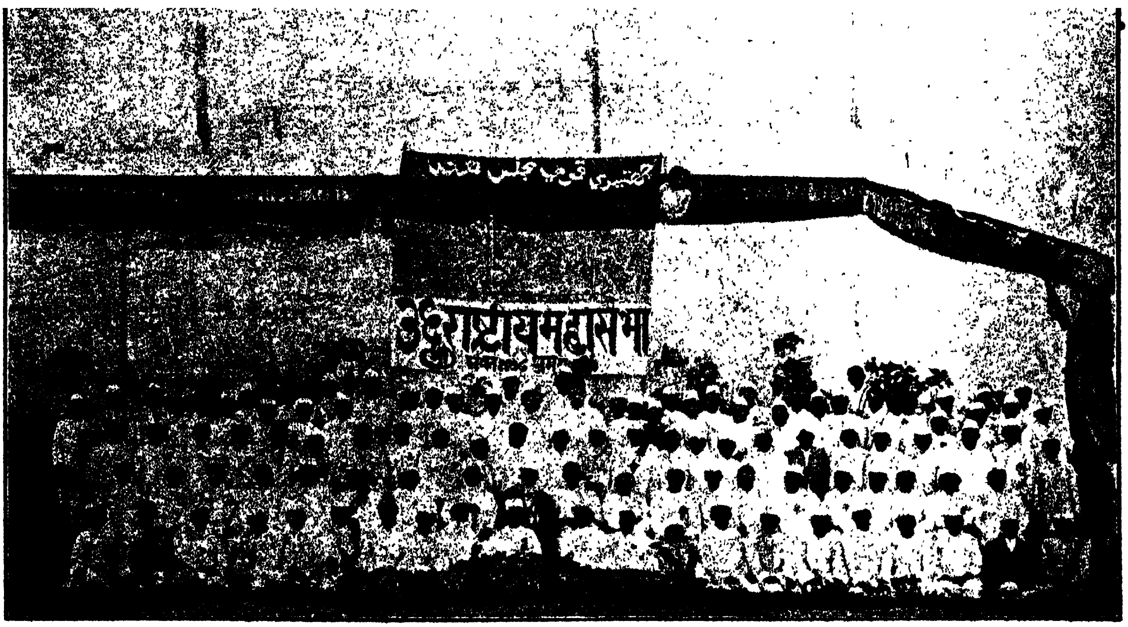
শবরমতী নদীর তীরে খাদি-নগর অর্থাৎ খাদি কাপড়ের অতিথিশালা ও কংগ্রেসমণ্ডপ।



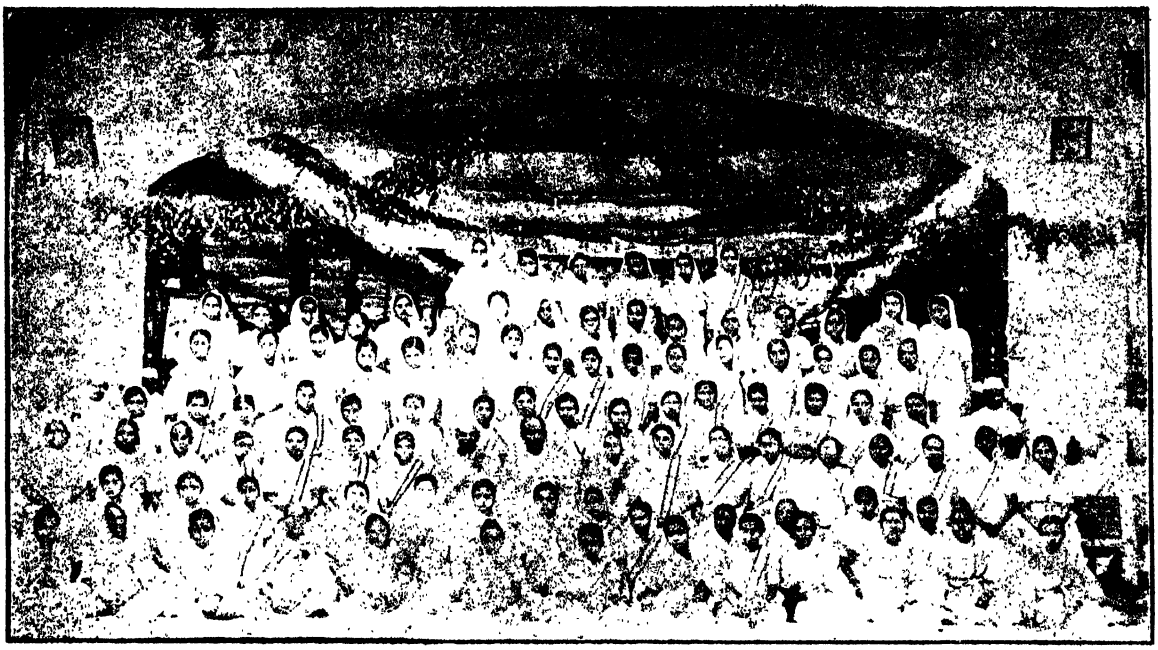
কংগ্রেসের উদ্বোধন।



কংগ্রেসের শোভাযাত্রা ও মিছিল।



কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি



কংগ্রেসের মহিলা ভলাণ্টিয়ার-দল।



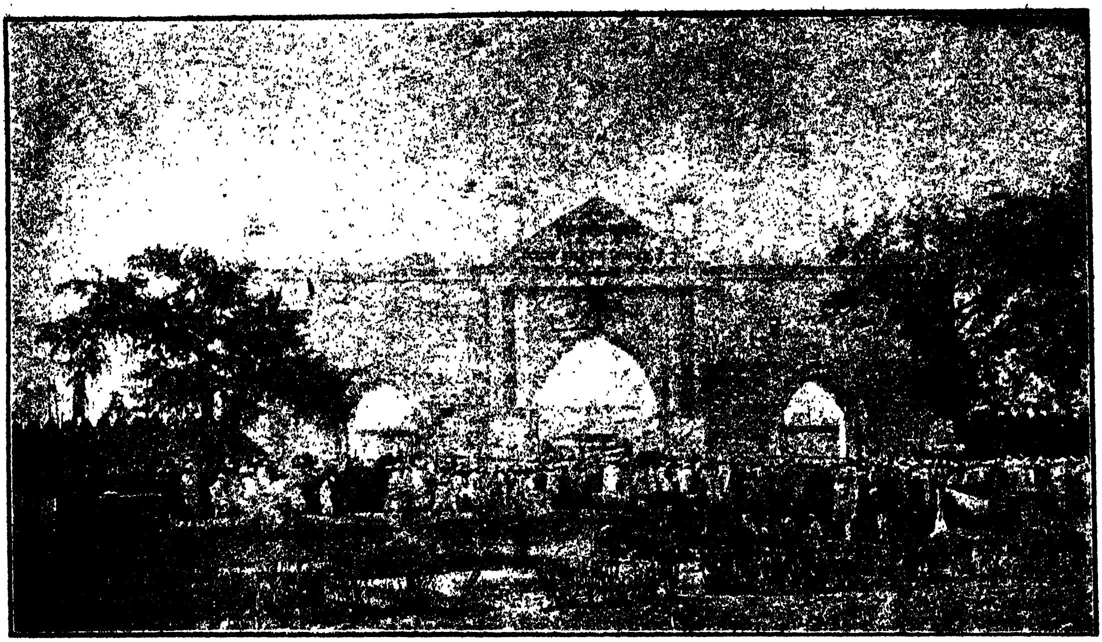
কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচনী সভা।



কংগ্রেসের মুস্লিম-নগর অর্থাৎ মুসলমান অতিথিদের আশ্রম।



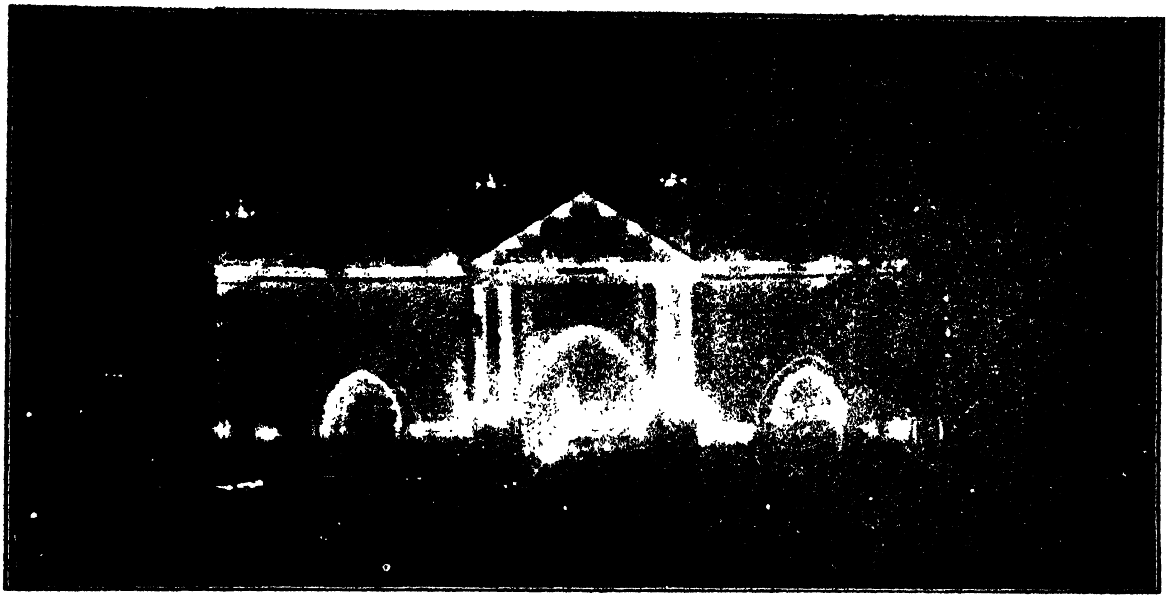
কংগ্রেস-প্রদর্শনীর অন্তর্গত বাজার।



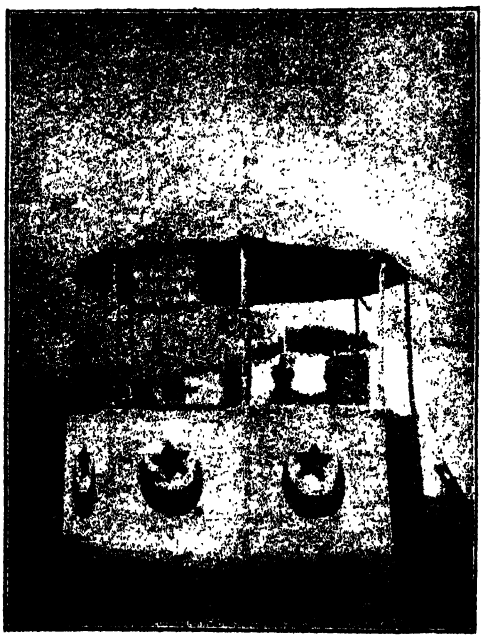
কংগ্রেস-মণ্ডপের প্রধান তোরণ।



কংগ্রেসের অধিবেশন।



কংগ্রেস-মণ্ডপের নৈশ দৃশ্য।



কংগ্রেসের মুস্লিম-নগরের পোষ্ট আফিস।



কংগ্রেসের ময়দানে ফোয়ারা।



কংগ্রেসের সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ সাহেব বক্তৃতামঞ্চে।



কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু



কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে শ্রীমতী তায়াবজী পারস্যভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতেছেন।

সার্থকতা

আজকে যাহা হৃদয়-মাঝে অবহেলায় পাই
দু'দিন বাদে কোথায় যাবে দূরে,
আজকে যাহা আমার কাছে অতি সুলভ তা'
মিল্‌বে না আর সকল বিশ্ব ঘুরে।

বেণুর বনে রঙ্গ-ভরে এই যে গলাগলি,
আলোর কাঁপন তরঙ্গিণীর জলে ;
প্রাণের কথা মিষ্টি সুরে এই যে বলাবলি,
চঞ্চলতা কাজল চোখের কোলে ;

জ্যোছ্‌না রাতে মাতাল হাওয়ায় ফুল্ল-ফুলের দোল
লুটিয়ে-পড়া প্রণয়মাখা লাজে ;
নীল আকাশে আপন মনে শুভ্র মেঘের চলা,
চাঁদের হাসি উৎসবেরি মাঝে ;



কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে মহাত্মা গান্ধী।

এই যে যারা সদর পথে যাচ্ছে দলে দলে
কলস্বরে গগন পূর্ণ করি' ;
আবার যারা গোপন পথে আসছে নানান্ ছলে
হৃদয়-মাঝে প্রণয় সুধা ভরি,

আজ নিশীথে আনন্দেতে সবাই মোরে ঘিরে'
তুলছে রচে কি বিচিত্র গান ;
হয়ত কভু এমন মধু আর পাব না ফিরে,
সকল সুখের ঘটবে অবসান।

যে আনন্দে চিত্ত আমার পূর্ণ হয়ে আছে,
হয় ত হবে শূন্য নিরাশতা ;
আজকে যারা আপনা-ভোলা আছে আমার কাছে,
বিশ্ব-মাঝে পালিয়ে যাবে কোথা !

তাইত আজি সংসারেতে যতেক ক্ষুদ্রতম
আমার চোখে অসীম যেন লাগে ;
সকল কথাই হৃদয়-মাঝে আঘাত করে মম,
সকল সুরেই গভীর আবেগ জাগে।

বিশ্বমাঝে নানান্ স্থানে আমার আপন পর
চলার বেগে ব্যস্ত সদাই যারা ;
আমার মাঝে বাঁধ্‌ছে যারা দু'দণ্ডেরি ঘর,
তাদের পানে চাই যে নিমেষ হারা।

মুগ্ধ প্রাণে সবায় নিয়ে দীর্ঘ করি দিন,
সার্থকতায় সময় পূর্ণ করি' ;
উৎসবেরি আনন্দেতে মাতি বিরামহীন,
দিবস ভালোবাসায় সদা ভরি।

শ্রীগণেশচরণ বসু।

সাত্ত্বিক প্রতিরোধে কর্ম্মী-চতুষ্টয়



[illegible]



শ্রীমতী বাসন্তী দেবী



[illegible]

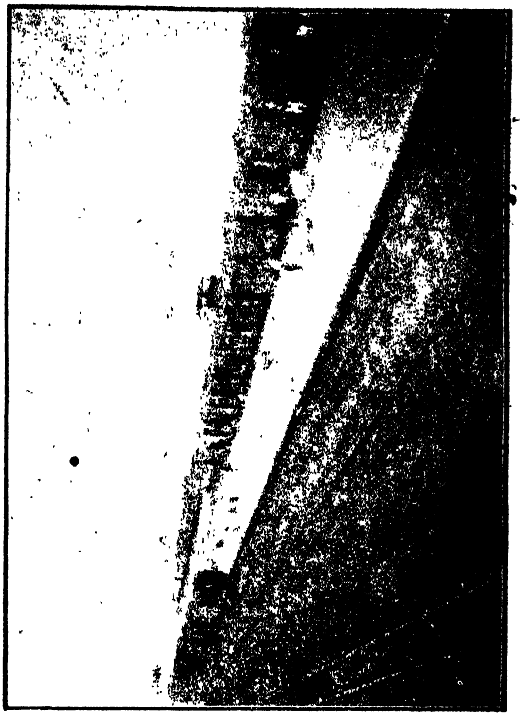


শ্রীমতী সুনীতি দেবী

সারণ-প্লাবনের ছবি

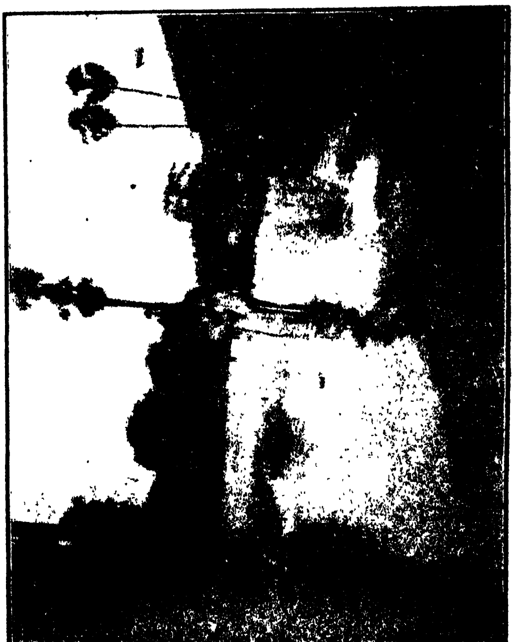


বন্যার দৃশ্য।





জলে জলময়।



বাড়ী ঘর জলে ভাসমান।



বন্যাতাড়িত লোকদের পলায়ন।



বন্যাপ্লাবিত পরিত্যক্ত গ্রামের দুর্দ্দশা।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ই ও ১০ই তারিখে বিহারে সারণ জেলায় ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। সে বন্যায় বহুলোক গৃহহীন হয়। বন্যায় জন্ম হাজার হাজার লোককে অন্নকষ্টে ভুগিতে হয়, এবং বন্যাজনিত রোগে তাহারা আজ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত। কতকগুলি মাড়বারী ভদ্রলোক দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া অর্থ ও অন্ন লইয়া বন্যাপীড়িত স্থানে গিয়া হাজির হন। এই সহৃদয় ভদ্রলোকরা কাপড়, কম্বল, ঔষধ, সাগু প্রভৃতি প্রায় সাত হাজার টাকার জিনিষ বন্যাক্লিষ্ট লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। এই সমিতি অনুগ্রহ করিয়া বন্যাপীড়িত স্থানের কয়েকটি ছবি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৭।১ জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় যথাসাধ্য পাঠাইতে পারেন।

প।



ভারতবর্ষ (মাঘ)

সেনরাজগণের কুল-পরিচয়—অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-আর-এস, পি এইচ-ডি।

দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি শিলালিপিতে 'সেন' উপাধিধারী এক জৈন আচার্য্য-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বংশ সেন-বংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ধারওয়াড় জেলা ও তৎসন্নিহিত ভূভাগে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে 'সেনবংশ' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কতকগুলি কারণে এই সেনবংশের সহিত বাংলার সেনরাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে।

১। প্রথমতঃ, সেনরাজগণের শিলালিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্ণাটে তাঁহাদের আদি বাস ছিল। বর্ত্তমান ধারওয়াড় জেলা এই কর্ণাট প্রদেশের জন্মভূমি।

২। দেওপাড়া লিপির পঞ্চম শ্লোকে সামন্তসেন 'সেনান্বয়' ও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় কুল হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জৈনাচার্য্য কনকসেন 'সেনান্বয়'-সমুদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ধারওয়াড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। সেনরাজগণের শিলালিপিতে স্পষ্টই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সেনরাজগণ শৈব ছিলেন; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের জৈনাচার্য্যগণের সহিত কিরূপে তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মবিপ্লবের যুগ। এই বিপ্লবের ফলে যে কর্ণাটের অনেক জৈন-সম্প্রদায় বীর-শৈব অথবা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন ইহা সুবিদিত ঐতিহাসিক সত্য। পশ্চিম চালুক্য-রাজ, জগদেকমল্ল উপাধিধারী, দ্বিতীয় জয়সিংহ (রাজ্য-কাল ১০১৮—১০৪২ খৃঃ অঃ) জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অসম্ভব নহে যে, রাজার দৃষ্টান্তে কর্ণাট অঞ্চলস্থ অনেক জৈনসম্প্রদায় ও সেনবংশও জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বল্লাল নামটি আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত নাই। কিন্তু বল্লাল সেনের জন্মের অনতিকাল পূর্ব্বেই ধারওয়াড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে হৈমলরাজ বল্লাল রাজত্ব করিতেন।

সুদূর কর্ণাটের সেনবংশ কি প্রকারে বাংলার রাজ-সিংহাসন লাভ করিল, তাহা এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। বিক্রমাঙ্ক-চরিতে উক্ত হইয়াছে যে, পশ্চিম চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য যুবরাজ অবস্থায় গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করেন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁহার সামন্ত অচ কর্ত্তৃক বঙ্গ ও কলিঙ্গের পরাজয়ের বিষয় শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নেপালের শিলালিপি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী হইতে জানিতে পারি যে, কর্ণাটবাসী নান্যদেব একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিহুত ও নেপালে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সামন্তসেন বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তরাপথ অভিযানে বহির্গত হইয়া, মিথিলায় নান্যদেবের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সেনরাজগণের সম্বন্ধে যে মতবাদ উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনুমান মাত্র,—প্রতিষ্ঠিত সত্য নহে। যে কয়েকটি নূতন প্রমাণ আমি উপস্থিত করিয়াছি, তাহার বলে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে; এবং সেনরাজগণের আদিম ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে, আমাদের হাতে এখন যে-কিছু প্রমাণ আছে, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—কেবলমাত্র ইহাই আমার প্রতিপাদ্য।

ছন্দ ও অবয়ব—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

বিশ্ব-বিশ্রুত কলা-কুশলী ষ্টকহল্‌ম্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার অস্‌ওয়াল্ড সাইরেন প্রণীত Essential in Art পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে "Rhythm and Form" প্রবন্ধের সার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

যে চিত্রকর কেবল মাত্র প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহার চিত্র যথাযথ নকল হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভিতর প্রাণের স্পন্দন বা সাড়া পাওয়া যায় না। শুধু অবয়বের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, প্রাণহীন পুত্তলিকা নির্ম্মিত হইবে। চিত্র বা মূর্ত্তিকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে, কলাবিদ্‌কে যে শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে তাহাই ছন্দ। কলার ছন্দ আর গানের তাল একই। গান আবৃত্তি করিলে তাহা হৃদয়গ্রাহী হয় না; সুর সংযোগে তালের বশে গীত হইলে, হৃদয়ে ভাবের ঝঙ্কার উঠিয়া থাকে—হৃদয়ের পরতে-পরতে স্পন্দন অনুভূত হয়। তালকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, ছন্দকেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাল কণ্ঠদেহে সংস্কৃত হইয়া হৃদয়ে ভাবের বন্যা যেরূপ ছুটাইয়া থাকে, ছন্দও সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়া ভাবের লহর ছুটায়।

এই ছন্দের দ্বারা ভাবের গতি, গভীরতা ও প্রসার বুঝিতে পারা যায়। ছন্দ বাহ্য ও অন্তর উভয় প্রকার ভাবের দ্যোতক। ভ্রমণ ও নর্ত্তনে ছন্দ আছে; কাব্যে ও অবসাদে ছন্দ আছে। ছন্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়, কোনও শক্তিধর পুরুষ চিত্রের ভিতর আপনার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

ছন্দ উৎপাদন করাই কলাবিদের অন্যতম লক্ষ্য। এই ছন্দ চিত্রের অবয়বের উপর নির্ভর করে না। অবয়বগুলির সংস্থান প্রকৃতির অনুসারী হইলে যে বেশী ছন্দ উৎপন্ন হইবে, তাহা সকল সময়ে বলিতে পারা যায় না। অবয়বের ভিতর দিয়া শক্তি সঞ্চারণেই ছন্দের উৎপত্তি।

চিত্রে রেখায় (line) ও তুলিকার কোমলতায় (tone) ছন্দের উৎপাদন করিতে পারা যায়। সরলভাবে বলিবার জন্য দুইটি উপায়ের নাম করা হইয়াছে। বাস্তবিক উপায় দুইটি অ-চ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আর দ্বিতীয় উপায়টি হইতেছে আলো ও আঁধারের (light and shade) নিয়মবশে তুলিকার সাহায্যে কোমলতা উৎপাদন করা। গাঢ় রং বা বিভিন্ন রংএর মিশ্রণে ইহা উৎপন্ন হয় না। এই

উপায় দ্বারা যাঁহারা ছন্দ উৎপাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকস্থলেই এক রং ব্যবহার করিয়াছেন।

—

ভারতী (মাঘ, ১৩২৮)

নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ (বৌদ্ধমত)—শ্রী যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বৌদ্ধমতে পুনর্জ্জন্মবাদ ও নির্ব্বাণ :—বৌদ্ধমতে মৃত্যুতে বাসনা ও কর্ম্মফল বিনষ্ট হয় না। আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে; কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। আমার বর্ত্তমান জীবন ও আমার মৃত্যুর পর আমার বাসনা-সম্ভূত জীবের জীবন একই জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থা মাত্র।

কোন চিৎশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী আত্মার স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। কোন কোন পাঠক আত্মার অভাবে পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আমার উত্তর এই— আত্মার দ্বারাও পুনর্জ্জন্মের মীমাংসা হয় না; কারণ স্মৃতিযোগেই ব্যক্তিত্বের একত্ব। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের একত্ব ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। রাম পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়া এ জীবনে হরি-রূপে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ স্থলে হরির পূর্ব্বস্মৃতির অভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির একত্ব অনুমান করা অসম্ভব, রাম করিল পাপ আর শাস্তি পাইল হরি ? ইহা ঘোর অবিচার। এজন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'জাতিস্মর' কল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতে রামের বাসনা-জাত হরি পূর্ব্বজীবনের অর্থাৎ রামের পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছে। হরি রাম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ বীজ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কার্য্য এবং কারণ একই বস্তুর ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হরির জীবন রামময় বাসনা ও কর্ম্ম দ্বারা যুক্ত হইয়া রামের সহিত এক হইয়াছে। এই অর্থে রামের পুনর্জ্জন্ম বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমার কর্ম্মফলে এক নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইবে ইহা ভাবিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়েই মানব পাপ হইতে বিরত হইবে; নরকের ভয়ে নহে। ইহাই বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। "নির্ব্বাণ" লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। নির্ব্বাণ লাভের অর্থ বাসনার বা তৃষ্ণার বিনাশ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি-সাধন ও প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা ইহ জীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ।

—

নারায়ণ (মাঘ)

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের বিশেষত্ব—শ্রী অতুলচন্দ্র দত্ত।

আর্য্য-হিন্দুদর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল-মাত্র জ্ঞান লাভ। পক্ষান্তরে হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাপেক্ষা গভীরতর। আদি বিধান কপিল, মহর্ষি বাদরায়ণ, পতঞ্জলি, কনাদ, গৌতম, শাক্যসিংহ বুদ্ধ প্রভৃতি মহা মহা তত্ত্ববিৎরা যে-সব মোক্ষশাস্ত্রের প্রচলন করিয়া যান তাহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল দুঃখ হইতে জীবকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা। প্রধানতঃ দুঃখ বাদই হিন্দুদর্শনের গোড়ার কথা, মধ্যের কথা ও শেষের কথা। এইটাই পাশ্চাত্যদর্শন হইতে হিন্দুদর্শনের প্রধান ভেদলক্ষণ।

ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র is a science of the ultimate principles of Being জীবাত্মা পরমাত্মা ও জগৎ ইহাদের অস্তিত্ব ও সম্বন্ধ বিচার পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম হইতে ইহার ভেদ বিস্তর। পশ্চিমে ধর্ম্ম revealed তত্ত্ব, উহাতে বিশ্বাস জীবের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য। উহা বিচার-বিতর্কের মধ্যে নহে। ভারতবর্ষে দর্শনতত্ত্বে ও ধর্ম্মতত্ত্বে মূলতঃ ভেদ নাই। পরন্তু দর্শনের মীমাংসিত তত্ত্বের উপরই প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের ভিত্তি। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র যে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ভিন্ন নহে তাহার প্রধান প্রমাণ উহার নাম "মোক্ষশাস্ত্র"। ব্রহ্মপ্রাপ্তি কৈবল্যলাভ নির্ব্বাণলাভ এই-সব কথায় বুঝা যায় দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে পরমপদ লাভ করান; যে পদ লাভ করিলে মানুষের সংসার-গতাগতি শেষ হয়। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রেরও কি উদ্দেশ্য নয়? পরন্তু দর্শনশাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্র না হইবে তবে দার্শনিকেরা শ্রুতিকে কেন এত মান্য করিয়াছেন? শ্রুতি সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের মহা আশ্রয়স্থল। সেই শ্রুতির অনুমোদন ও সম্মতিলাভের জন্য দার্শনিকদের এত চেষ্টা কেন?

বেদ উপনিষদে ও দর্শনে তফাৎ এই বেদ উপনিষদ শ্রুতি, উহার দর্শিত পন্থা যেন দিব্যদৃষ্টিতে লব্ধ, আর দর্শনের দর্শিত পন্থা বুদ্ধি বিতর্কিত যুক্তির দ্বারা লব্ধ। বেদের সহিত দর্শনের, বিশেষ সাংখ্যের, তফাৎ এই যে, বেদ ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞাদির ভিতর দিয়া মুক্তি নির্দ্দেশ করেন; সাংখ্যকার কপিল দেবদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে মিথ্যা উপায় বা অপূর্ণ উপায় বলিয়া যুক্তির দ্বারা আত্মানাত্ম বিবেক দর্শন করান। উভয়েরই উদ্দেশ্য ভবরোগের চিকিৎসা; ঔষধ নির্ণয় কেবল ভিন্ন।

—

বিকাশ (পৌষ)

ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের চর্‌কা ইত্যাদির তুলনা—

ইংলণ্ডের চর্‌কা সংখ্যা আমাদের চেয়ে ৮॥০ গুণ, তাঁতের সংখ্যা ৭ গুণ এবং কলের সংখ্যা ৭॥০ গুণ বেশী।

বিভিন্ন দেশে মন্ত্রীর ও গবর্ণরের মাহিনা।—

দেশের নাম	লোকসংখ্যা	আয়	মন্ত্রীর মাহিনা	গবর্ণরের মাহিনা
বঙ্গদেশ	৪॥০ কোটী	৯ কোটী টাকা	৫৩৩৩৲	১০,৬৬৬৲
হল্যাণ্ড	৬৮॥০ লক্ষ	৫০ কোটী টাকা	১৮৭৫৲	
নিউইয়র্ক ষ্টেট্‌	প্রায় ৭॥০ লক্ষ	৩৮ কোটী টাকা		৩০০০৲
নিউজিল্যাণ্ড	১২ লক্ষ	৩০ কোটী টাকা		১২৫০৲—১৬২৫৲
মার্কিন যুক্তরাজ্য	১১॥০ কোটী	২০০০ কোটীর উপর		প্রায় ৩৫০০৲
অষ্ট্রেলিয়া			প্রায় ২০০০৲	
ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়া		৮ কোটী টাকা	৫০০০৲	
ক্যানাডা			প্রায় ২০০০৲	
দক্ষিণ আফ্রিকা	প্রায় ৫ কোটী		৩১২৫৲	
জাপান	৫॥০ কোটীর উপর	১৫৮,২৫,১৯,৫০০৲	১২০০০৲	
			১৮৭৫০৲	

ভারতে সামরিক ব্যয়।—দরিদ্র ভারতের সামরিক ব্যয় কি ভাবে বৎসর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত দশবৎসরের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দে ১৯ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯১৩—খৃঃ ১৯ লক্ষ পাউণ্ড,
১৯১৪—১৫ খৃঃ ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯১৫—১৬ খৃঃ ২২ লক্ষ পাউণ্ড,
১৯১৬—১৭ খৃঃ ২৪ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯১৭—১৮ খৃঃ ২৯ লক্ষ পাউণ্ড,
১৯১৮—১৯ খৃঃ ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯১৯—২০ খৃঃ ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড,
১৯২০—২১ খৃঃ ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২১—২২ খৃঃ ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড।

অর্থাৎ ১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দে মোটামুটি কিছু কম তিন কোটী টাকা সামরিক বিভাগে ব্যয় করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে সেই ব্যয় প্রায় ৭ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যুদ্ধের সময়কার ব্যয়ের কথা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।



রাশিয়ান কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি

রাশিয়ার বিপ্লব যে সে-দেশের জাতীয় আত্মার জাগরণের সাড়া—সেটা যে কতকগুলি রক্তপিপাসু নরখাদকের নিজ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে হয় নাই, তা আজ আমাদের কাছে কতকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এতদিন আমাদের 'ভারতবন্ধু' দলের কাগজ-গুলিতে ও গভর্ণমেণ্ট সার্কুলারে বল্‌শেভিকদের যে মূর্ত্তি দাঁড় করান হইয়াছিল তাহাতে মনে হইত যে উহারা সেকালের নরখাদকদের কাছাকাছিই একটা কিছু। এর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্ব্বপ্রথম বই লেখেন—বোধ হয়—আমেরিকার বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আল্‌বার্ট রাইস্ উইলিয়াম্‌স্। ইনি বিপ্লবের পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়াতে ছিলেন এবং লেনিনের সাথে নানা জায়গায় ঘুরিয়া সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার অধিকাংশ কথাই বিশ্বাসযোগ্য।

অনেকে মনে করেন যে লেনিন, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি কয়েকজন নেতার প্ররোচনাতেই নিরক্ষর জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। তার উত্তরে উইলিয়াম্‌স্ বলিতেছেন—

রাশিয়ার বিপ্লবকে একটি বা জনকয়েক লোকের সৃষ্টি মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। যে জনমত হইতে ইহার উৎপত্তি, তার উপরেই এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যে-সমস্ত অর্থনৈতিক কারণে জনসাধারণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে তার ভিতরেই এর সমাধান রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই ইহারা নিঃশব্দে দুঃখদারিদ্র্য সহ্য করিয়া আসিয়াছে। মস্কোর মাঠে—উক্রেনের পাহাড়ে—সাইবেরিয়ার বিশাল নদীগুলির তীরে তীরে, দারিদ্র্যের অত্যাচারে আর কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত হইয়া ইহারা প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছে,—তবু দু'বেলার অন্ন জোটে নাই—অবস্থা তাদের এমনি পশুর চেয়ে হীন ছিল। কিন্তু তার পর এমন দিন আসিল যেদিন হতভাগ্য দরিদ্রেরও ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল—সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হইল। ১৯১৭ সালের মার্চ্চমাসে বিরাট হুঙ্কারে সমস্ত জগৎকে সচেতন করিয়া জনসাধারণ তাহাদের যুগযুগান্তের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

তারপর শীতল তুষারের উপর উষ্ণ রক্তের স্রোত বহাইয়া রাশিয়ার কমিউনিজ্‌ম্—তাদের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট—প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে বিদেশে এই কমিউনিজ্‌মের মূলশক্তি Proletariatদের (দরিদ্র জনসাধারণ) বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে তারা চলৎশক্তিহীন, অলস, নিরক্ষর ও কাণ্ডজ্ঞানরহিত প্রাণীবিশেষ। তাদের সম্বন্ধে তাদের নিজেদের ধারণাও ইহা অপেক্ষা বেশী উচ্চ ছিল না। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন লেনিন তাঁর অসীম বিশ্বাস আর শক্তি লইয়া—তাদের ভিতরকার সুপ্তশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে। তিনি বুঝাইলেন এই নিরক্ষর জনসাধারণকে—তাদের কর্ম্মের দৃঢ়তা কত স্থায়ী, সহ্য ও আত্মোৎসর্গ করিবার শক্তি কত প্রবল, বড় বড় রাষ্ট্রতন্ত্রগুলি আয়ত্ত করার শক্তি কত বেশী, আর তাহাদের ভিতরে যে সৃজনীশক্তি নিহিত আছে তা কত বিরাট।

ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম জনসাধারণের প্রাণের প্রবল বিকাশ—তাদের অদ্ভুত কার্য্যকরী ক্ষমতা। উইলিয়াম্‌স্ বিপ্লবের এক বৎসর পরের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নিরক্ষর জনসাধারণই বস্ত্র ও দেশলাই প্রস্তুত করিবার নব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, এবং রাশিয়ার বড় বড় বনগুলিকে নিজেদের কাজে খাটাইয়া লইবার নূতন উপায় বাহির করিয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগেও ইহাদের দক্ষতা কম নয়,—বাষ্প-ও তড়িৎশক্তিকে তারা তাদের অজস্র কাজে নিয়োজিত করিয়াছে,—বাল্টিক সাগর ও ভল্‌গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রকাণ্ড খাল কাটিয়াছে আর হাজার মাইল জুড়িয়া রেল-লাইন পাতিয়াছে।

সৈন্যবিভাগে এই কৃষক এবং মজুরেরাই নিজেদের সংযমের পথে পরিচালিত করিয়া যে Red Army লাল পল্টনের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজ জগতের ভিতর যুদ্ধকৌশলে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার দাবী করে।

কিন্তু এই "লালমুখো" জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতকার্য্যতা হইয়াছে কাল্‌চারের রাজ্যে। হওয়া উচিতও তাই; কারণ মানব-মনের ধর্ম্মই হইতেছে এই যে স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। এই নবজীবনের তড়িৎস্পর্শে দশটা নূতন য়ুনিভার্সিটি, অসংখ্য রঙ্গমঞ্চ, হাজার হাজার লাইব্রেরী আর লক্ষাধিক নূতন স্কুলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অদ্ভুত কৃতকার্য্যতাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ঘোর শত্রু ম্যাক্সিম গর্কিকে কমিউনিজ্‌মের দলে টানিয়া আনিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—কাল্‌চারের ক্ষেত্রে রুশ-গভর্ণমেণ্ট যে অত্যাশ্চর্য্য সৃজনশক্তি দেখাইয়াছেন তাহা মানব-ইতিহাসে নূতন পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিককে এই বিরাট সত্যের সম্মুখে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইতেই হইবে।

যুদ্ধে তাহাদের বিশলক্ষ লোক মরিয়াছে—ত্রিশলক্ষ আহত ও পঙ্গু হইয়া আছে। তাহাদের আগেকার রেলওয়ে চুরমার হইয়াছে,—খনিগুলি ভাসিয়া গিয়াছে ও দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি নগরে নগরে দেখা দিয়াছে। ইংরেজ, আমেরিকান, জাপানী, ফরাসীরা সকলে মিলিয়া উক্রেন আর সাইবেরিয়া হইতে তাহাদের শস্য আমদানী বন্ধ করিয়াছে। বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদান বন্ধ; তার উপরে বিপক্ষদল ভয় দেখাইয়া, উৎকোচ দিয়া, গুপ্তহত্যা করিয়া সকলপ্রকারে তাহাদের ধ্বংসের পথ খুঁজিতেছে। এই-সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও ইহারা আজ সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, ক্ষাত্রশক্তিতে যে উন্নতি দেখাইতেছেন ও দেখাইয়াছেন তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া এই প্রশ্নটা সাধারণতঃই মনে আসে—কোন্ বলে এই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এত বলীয়ান যে শত বাধাবিঘ্নের মাঝখান দিয়া পথ কাটিয়া চলিয়াছে? ইহার উত্তর পাই আমরা কর্ণেল রেমণ্ড রবিন্সের "My Story" বইখানাতে। রবিন্সের নাম অনেকের কাছেই সুপরিচিত; ইনি আমেরিকান্ রেড ক্রস মিশনের নেতা হইয়া রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। সুতরাং রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে ইঁহার যতটা জানিবার সুযোগ হইয়াছিল অন্যের ততটা

হওয়া সম্ভব নয়। রাশিয়ান কমিউনিজ্‌মের উন্নতির বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত দেশ তাকে ঠিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে,—ইহাই তার উন্নতির মূল। কারণ, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর—অন্যান্য দেশের মত রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর নয়। লেনিনও এই কথাটার উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। কর্ণেল রবিন্সকে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বপ্রধান গণতন্ত্র আমেরিকার দোষ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট বাস করিতেছে অতীত যুগের রাষ্ট্রনীতিতে—টমাস জেফার্‌সনের যুগে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর ইহা দাঁড়ায় নাই। এর মধ্যে অভাব রহিয়া গিয়াছে সার্ব্বভৌমিক দূরদৃষ্টির। * * * আপনার নিউইয়র্ক আর পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার কথাই ধরা যাক্। নিউইয়র্ক আপনাদের ব্যাঙ্কিংএর কেন্দ্র আর পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ইস্পাতের ব্যবসার প্রধান গদী। ব্যাঙ্কিং আর ইস্পাত এ দুইটি হইয়াছে আপনাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবসার মধ্যে; এদের জোরেই আপনারা বর্ত্তমান জগতে এত বড় আসন লইয়াছেন। যদি এই ব্যাঙ্কিংএর উপর আপনাদের প্রকৃত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে তবে আপনারা মিঃ মর্‌গ্যান্‌কে যুক্ত-রাজ্যের মন্ত্রণাসভায় পাঠান না কেন? ইস্পাতের কার্‌খানার উপর এতই যদি আপনাদের আস্থা, তবে মিঃ সোয়াবকে সেনেটে পাঠান না কেন? যাঁরা ব্যাঙ্ক আর ইস্পাত সম্বন্ধে অতি অল্পই খবর রাখেন, কেন আপনারা তাঁদের সেখানকার প্রতিনিধি করিয়া পাঠান? ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর—এইটাই হইতেছে এর প্রধান দুর্ব্বলতা। আপনারা এই কথাটাই বুঝিতে চান না যে আজকার শাসনের ভিত্তি রাষ্ট্র নৈতিক নয়। এইজন্যই আমাদের প্রণালী আপনাদের প্রণালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর ঠিক এইজন্যই ইহা আপনাদের প্রণালীকে ধ্বংস করিবে।

"আমাদের সমাজতান্ত্রিক শাসন বর্ত্তমানকালের ভিত্তিকে মানিয়া চলে;—আমরা জানি যে আজকার প্রধান শক্তি হইতেছে অর্থ-নৈতিক। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে।

"আমাদের বাকু জেলাটা হইতেছে তেলের দেশ—এই তৈল-বাণিজ্যই তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই তৈলবাণিজ্যের জোরেই এ চলিতেছে। সুতরাং এই তৈলবাণিজ্যের দ্বারা সেখানকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে—সে ব্যবসায় শ্রমিকেরাই এ কাজ করিবে। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—শ্রমিক কারা? আমি বলিব পরিদর্শক, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী আর কুলীমজুর, অর্থাৎ যারা গায়ের জোরে অথবা মাথার জোরে আসলে ব্যবসা চালাইতেছে তারাই শ্রমিক। যারা ব্যবসার মধ্যে লিপ্ত নয় অর্থাৎ যারা Speculation করে, royalties দেয় অথবা টাকা ধার দেয় তাদের শ্রমিক বলা যায় না;—তারা তেলের সম্বন্ধে কিছু জানিতেও পারে, নাও পারে। এবং অধিকাংশ সময়েই তারা জানে না। যাই হোক্, মোটের উপর তারা তৈল উৎপাদনের কার্য্যে আসে না। কিন্তু আমাদের প্রজাতন্ত্র হইতেছে উৎপাদকের (producers) প্রজাতন্ত্র।

এই রকম করিয়া আমরা কয়লা-বাণিজ্যের হিসাবে ডোনেট্‌জ্‌ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইব। সেখানকার প্রতিনিধি হইবে কয়লার কার্‌খানারই প্রতিনিধি। আবার কৃষিপ্রধান জেলা হইতে যাইবে কৃষকদেরই প্রতিনিধি। কারণ শস্য উৎপাদন করে তারা, সুতরাং কৃষিকার্য্যের কথা বলিতে পারিবে তারাই সব চেয়ে ভাল। আমাদের এই প্রণালী আপনাদের চেয়ে প্রবল, কারণ, বাস্তবের সঙ্গে এর মিল আছে। মানুষের দৈনিক কার্য্যের মূল্য কি ও মূল কোথায় তা ইহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং সেই মূলকেই ভিত্তি করিয়া এই প্রণালী গড়িয়া তুলিবে সমাজতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র। আমাদের গভর্ণমেণ্ট হইবে অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রের শাসন—এই অর্থনৈতিক যুগে। এই প্রণালীই জয়ী হইবে, কারণ ইহাতে আছে বর্ত্তমান জগতের বাণীর উপলব্ধি।"

পারীর ১৯১৯ এপ্রিলের তাঁ পত্রিকায় প্রকাশিত লেনিনের সহিত নাওয়ানের বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের কথা এইখানে আমাদের মনে পড়িতেছে;—সেখানে পাই সোস্যালিজ্‌মের উপর লেনিনের অসীম বিশ্বাস। লেনিন বলিয়াছিলেন—"জগতের ভবিষ্যৎ?—আমি মহাপুরুষ নই। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি যে মূলধনমূলক (capitalistic) ষ্টেট—ইংলণ্ড যার দৃষ্টান্ত,—ধ্রুব ধ্বংস পাইবে। পুরাতন প্রণালীর দিন গিয়াছে; মহাযুদ্ধ হইতে যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে—তাহা নূতন প্রণালীর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। মানবের বিবর্ত্তন তাহাকে নিশ্চয় সমাজতন্ত্রে (Socialism) আনিয়া পৌঁছাইবে!

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে আমেরিকার রেলওয়ে জাতির করায়ত্ত (Nationalised) হওয়া সম্ভবপর? * * * প্রত্যেক জাতি বিভিন্ন পথে যাত্রা করিতে পারে,—কিন্তু সকলকেই আসিয়া সমাজতন্ত্রে মিলিতে হইবে।"

লেনিনের স্থির বিশ্বাস যে ফরাসীবিপ্লব যেমন ইয়োরোপের সমস্ত অভিজাততন্ত্র শাসনকে ধ্বংস করিয়াছে—তেমনি রুশ-বিপ্লব বর্ত্তমানের এই রাষ্ট্রনৈতিক প্রজাতান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য্য ধ্বংসসাধন করিবে, তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করিবে অর্থনৈতিক প্রজাতান্ত্রিক সামাজিক শাসন (economic democratic Socialism)।

যুদ্ধের পর বিলাতে এবং ইয়োরোপের অন্যান্য জায়গায় শ্রমিকের হাঙ্গামা আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার বড় বড় কাগজওয়ালারা উর্দ্ধবাহু হইয়া সমস্ত দোষ চাপাইলেন বল্‌শেভিজ্‌মের ঘাড়ে। এর উত্তর লেনিন আগেই দিয়াছেন—তিনি বলেন—"বিপ্লব কোথাও প্রচারের (propaganda) উপর নির্ভর করে না। যদি আসলেই কোন কারণ না থাকে তবে শত প্রচারেরও সাধ্য নাই যে বিপ্লব জাগায়। বিশ বৎসরের জন্য রাশিয়াকে সমুদ্রের অতল জলে ডুবাইয়া দাও—তাতে ইংলণ্ডের শ্রমিকের এক শিলিং অথবা এক ঘণ্টার দাবীও কমিবে না।" (Russia in 1919—by Arthur Ransome)।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু।

পঞ্চশস্য

আমেরিকার চিত্র ও মূর্ত্তি-শিল্পের নমুনা—

আমেরিকা বলিতে এখন বুঝায় য়ুরোপ হইতে সমাগত ঔপনিবেশী বাসিন্দাদের দেশ। এই হিসাবে আমেরিকা নিতান্ত আধুনিক দেশ। কিন্তু নূতন দেশে নূতন অবস্থায় নূতন আবেষ্টনের ভিতর য়ুরোপ ওঁচা লোকদের ভিতর যে উদ্যম ও কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল, তার ফলে আমেরিকানরা শিক্ষায় শিল্পে বাণিজ্যে উদ্ভাবনায় আবিষ্কারে তাদের পিতৃভূমি য়ুরোপেরই সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকানরা বিষয়ী লোক বলিয়া তাদের একটা কুখ্যাতি আছে। বিষয়ী লোকেরা



আমেরিকার লাল লোক।

অর্থ উপার্জ্জনের ধান্দাতেই এত জড়িত থাকে যে তাদের সুকুমার চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের অবসর ঘটে না। তাই আমেরিকায় এখন পর্য্যন্ত কোনো নাম করিবার মতন বড়দরের কবির আবির্ভাব ঘটে নাই;—লংফেলো কবিতায় মিল করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু গভীর ভাব ফুটাইতে পারেন নাই; হুইট্‌ম্যান্ গভীর ভাবের ব্যাপারী ছিলেন কিন্তু তাঁর কবিতায় সবই গরমিল; এমার্সন কবিতা লিখিয়া কবিযশ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সুকুমার চিত্তবৃত্তি আপনাকে প্রকাশ করে কাব্যে ও কলায়। কাব্যে আমেরিকানরা বেশী কিছু করিতে না পারিলেও, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে তারা আপনাদের সৌন্দর্য্যবোধকে আকার দিতেছে মন্দ না।

আমেরিকান ভাস্কর্য্যের পথপ্রদর্শক শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে সম্মানভাজন হইতেছেন জন্ রোজার্স। রোজার্স আমেরিকার জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়কে মূর্ত্তি দিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁর ভাস্করমূর্ত্তির মধ্যে কতকগুলি খুব নামকরা—দাস-বাজার, গেঁয়ো হাতুড়ে ডাক্তার, রিপ্ ভ্যান্ উইংক্‌ল্, আমেরিকার লাল লোক, গৃহযুদ্ধের যোদ্ধা, ইত্যাদি।

রোজার্স ভাস্করশিল্পের প্রবর্ত্তক গুরু হইলেও এ পর্য্যন্ত মাত্র দুজন শিষ্য গুরুর অনুপ্রেরণা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ফ্রেড্ রেমিংটন ও মিস্ এবার্স। ফ্রেড রেমিংটনের আর্টের পরিচয় কিছুদিন আগে প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছিল।

চিত্রবিদ্যায় আমেরিকানদের মধ্যে নাম করিয়াছেন সার্জেণ্ট্। বষ্টনে একটি সুকুমার শিল্পের মিউজিয়ম আছে। সেই মিউজিয়মের গোলঘর চিত্রভূষিত করিয়াছেন সার্জেণ্ট্। তাতে সুকুমার শিল্পের সংগ্রহ-গৃহ সুসজ্জিত হইয়া সুকুমার শিল্প আধের ধারণের উপযুক্ত আধার হইয়াছে। বষ্টনের সাধারণ পাঠাগারের দেওয়ালেও সার্জেণ্টের আঁকা ছবি আছে। সার্জ্জেণ্ট নিতান্ত আধুনিক দেশের আধুনিক লোক হইলেও তাঁর তুলির আনন্দ অতীতে ও পুরাণে; এই নিতান্ত আধুনিকতার যুগে তাঁর আধুনিকতাস্পৃষ্ট পুরাণচিত্র সকলকে আনন্দ দান করিতেছে। সমঝদারেরা বলিতেছেন যে সার্জেণ্ট পৌরাণিক বিষয় চিত্র করিতেও নূতন অনুপ্রেরণার, স্বতন্ত্র কল্পনার, মৌলিক সমাবেশের, উদ্ভাবনার প্রাচুর্য্যের ও পুরাতন বিষয়ে নূতন রসোদ্রেকের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর চিত্রের বিষয়ের মহিমা, চিত্ররীতির বিশুদ্ধতা, রচনার সম্পূর্ণতা, বিস্ময় ও প্রশংসা আকর্ষণ করে। এই ছবিগুলিতে চিত্রকলা, মূর্ত্তিভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্প একত্র সম্মিলিত হইয়াছে এবং একে অন্যের সাহায্যে নিজের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে; এই ত্রিশিল্প সমাবেশে ছবিগুলিতে একটি শৃঙ্খলা শান্তি সমন্বয় ঘটিয়াছে যাহা কেবলমাত্র একপ্রকার শিল্পে দুর্লভ। এই ত্রিশিল্প-সমন্বয় দর্শকের মনে একটি আনন্দময় শান্তভাবের উদ্রেক করে। একটা ঘরের দেয়ালের ফাঁকের নানা আকার ছবি দিয়া



গৃহযুদ্ধের যোদ্ধা।



কালের আক্রমণ হইতে মিনাভা কর্ত্তৃক স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকে রক্ষা



স্ফিংক্স্ ও কিমেরা।

ত্মাইয়া সুসঙ্গত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ; সেই কঠিন কাজকে সুসম্পন্ন করিয়া সার্জেণ্ট্ আপনার প্রতিভার বিচক্ষণতা সমঞ্জসতা ও মানসিক ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

১৯১৬ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর একাগ্র সাধনায় এই আনন্দ সৌন্দর্য্য ও ভাবের আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। এই চিত্রগুলিকে সমঝ্দারেরা—superb masterpiece of modern mural work—আধুনিক দেয়ালচিত্রের অত্যুত্তম শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

এই চিত্রগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য নীল শ্বেত ও স্বর্ণের সংমিশ্রণে ও সমাবেশে সম্পাদিত; বর্ণসুষমা তরল স্বচ্ছ আনন্দিত স্বাধীন; উচ্ছল বলিয়া মনে হয়।

দেয়ালের গায়ে তোলা-ছবি (bas-reliefs) আছে চারটি—মদন ও রতি (Cupid and Venus), ত্রিদেবী (Three Graces), রতি ও মানসী (Venus and Psyche), এবং নর্ত্তন (Dancing Figures)। চারদিকের চার দেয়ালে বড় বড় চারটি রঙে আঁকা ছবি আছে—উত্তর দেয়ালে ডিম্বাকৃতি ফ্রেমের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে মিনার্ভা-দেবীর অঙ্কলাশ্রয়ে কালের আক্রমণ হইতে রক্ষিত স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্র। স্থাপত্য সমস্ত শিল্পকলার মাতা, মধ্যস্থলে বসিয়া দক্ষিণে ভাস্কর্য্যকে ও বামে চিত্রকে অবলম্বন করিয়া আছে। কাল



এপোলো ও নয় মিউজ।

তার কাস্তে নিড়ানি উঁচাইয়া উচ্ছেদ করিতে ঝুঁকিয়াছে, তাকে আড়াল করিয়া শিল্প ত্রিমূর্ত্তিকে অঞ্চলাশ্রয়ে রক্ষা করিতেছেন দেবী মিনার্ভা।

দক্ষিণ-দেয়ালেও একটি ডিম্বাকৃতি ফ্রেমের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে— The Sphinx and the Chimera, স্ফিঙ্কস্ ও কিমেরা। স্ফিঙ্কস্ ও কিমেরা গ্রীক পুরাণের দুই কল্পিত রাক্ষস—স্ফিঙ্কসের দেহ সিংহের, মস্তক নারীর, পিঠে দুটি ডানা, সে থীব্‌স্ নগরে গিয়া লোককে হেঁয়ালি বলিত ও সমস্যা পূরণ করিতে না পারিলেই তাকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত, ইডিপাস সমস্যা পূরণ করাতে সে পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করে। ইজিপ্টে এই মূর্ত্তি নারীর কল্পিত স্বভাবের রূপকরূপে গঠিত হইত; কিমেরা মানে কল্পনা, তার পা সাপের লেজ; কল্পনার সঙ্গে কল্পনার মিলন এই ছবিটির তাৎপর্য্য। এই ছবিটি বিশেষ জোরালো ও প্রভাবপূর্ণ হইয়াছে। কিমেরার পক্ষধর মূর্ত্তি সার্জেণ্টের দক্ষতার পরিচায়ক। কল্পনা ডানায় ভর করিয়া উড়িয়া আসিয়া অসীম রহস্যের ধ্যানস্তিমিত স্মিত মুখের অজানা অজ্ঞেয় তত্ত্বের সন্ধান করিতেছে। এ ছাড়াও এই ছবির আরো হাজার রকম তাৎপর্য্য দর্শক আবিষ্কার করিতে পারে—এ চিত্রখানি এমনি অর্থপূর্ণ।

পশ্চিম দেয়ালে ডিম-ফ্রেমে ছবির বিষয় এপোলো ও নয় মিউজ। এপোলো সঙ্গীতের গ্রীক দেবতা এবং নয় মিউজ শিল্প সঙ্গীত কাব্য প্রভৃতির দেবতা, এক কথায় কলাবিতা। এই বিষয়টি দেশে দেশে কালে কালে কত চিত্রকরের তুলিকাকে ধন্য করিয়াছে, কিন্তু এমন গতিচ্ছন্দে নৃত্যপরা কলাবতীদের ছবি কোনো চিত্রকর নাকি আঁকিতে পারেন নাই—সঙ্গীত-দেবতাকে ঘিরিয়া কলাবতীদের আঙ্গুলীগুলা সুন্দর সুরযন্ত্রের গতিহিল্লোলে ছন্দোময়ী হইয়াছে।

পূর্ব্ব দেয়ালে আছে Classical and Romantic Art—পৌরাণিক ও অবাস্তব ভাবময় আর্ট। এখানেও এপোলো মধ্যমূর্ত্তি; তাঁর দক্ষিণে প্যান—পশুপতি, ও অর্ফিউস্—পশুসম্মোহনকারী সঙ্গীত-দক্ষ দেবতা; এপোলোর বামে অপর দুই দেবতা। এঁদের পশ্চাতে স্বর্ণাভ বিদ্যুৎবিকাশে আকাশ উদ্ভাসিত।



সঙ্গীত।

চারটি ছোট ছোট গোল ছবিতে খুব উঁচুদরের মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই চারখানি ছবির বিষয়—সঙ্গীত, জ্যোতিষ, শকুন্তলা্রাহ্মা

প্রতিমূর্ত্তি, ঈগলরূপী জুস কর্ত্তৃক গানীমীড হরণ। এইসব গভীর ভাব-ব্যঞ্জক ছবি অল্পপরিসর জায়গার মধ্যে আঁকিয়া চিত্রকর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষেমশূন্ত তোলা-ছবি কতকগুলি আছে, তার বিষয়—সেণ্টর চিরন কর্ত্তৃক একিলেসকে শিক্ষা দান, সঙ্গীতবিশারদ এম্ফিয়ন—জুসের যমজ পুত্রের অন্যতর, স্তাটীর ও মীনাড এবং বশু।

এতগুলির মধ্যে কোনো ছবিতে এতটুকু জড়তা আড়ষ্টভাব বা ভারীর ভাব নাই; কোথাও চেষ্টার চিহ্নমাত্র নাই। মোটের উপর এর মধ্যে স্বাধীনতার আনন্দ স্বচ্ছ উচ্ছলভাবে দেদীপ্যমান। —কয়ালী।

—

পকেট-কাটার সর্ব্বনাশ—

পকেটকাটাদের ধর্‌বার জন্যে সম্প্রতি আমেরিকায় এক রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। যন্ত্রটি কোটের বা প্যাণ্টালুনের পকেটে রাখা হয়। এর সঙ্গে কয়েকটি খুব সরু বৈদ্যুতিক তার লাগানো থাকে। তারগুলি জামার সুতোর সঙ্গে এমনভাবে সেলাই করা থাকে যে বাইরে থেকে ধর্‌তে পারা যায় না। আর এই তারগুলি গিয়ে যুক্ত হয়েছে গলায় একটি বোতাম পরাবার ফাঁকে।



পকেটকাটার সর্ব্বনাশ।

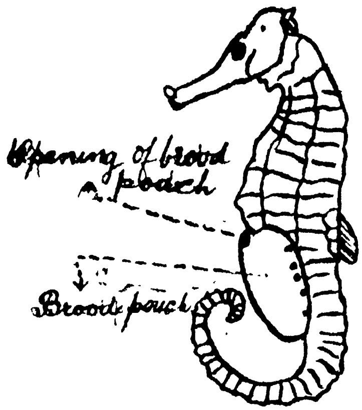
সেখানে একটি কৌটা আছে। তার ভিতর চার রকমের আলো থাকে। পকেটকাটা পকেটে হাত দিলেই যন্ত্রটির মুখ বন্ধ হয়ে যায় আর আলো জ্বলে' ওঠে। তখন যাঁর পকেটে হাত পড়েছে তিনি সজাগ হন আর তৎক্ষণাৎই চোরকে ধর্‌তে পারেন। হে বড়বাজারের পকেটজীবী, সাবধান!

...

অদ্ভুত মাছ—

প্রকৃতির রাজ্যে অদ্ভুত বিচিত্র জীবের অভাব নেই। এক-এক জাতির জানোয়ারের মধ্যেই কত রকম বৈচিত্র্য। কিন্তু মাছের মধ্যে যে-রকম বৈচিত্র্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় এমন আর কোন জীবের মধ্যে দেখা যায় না। দেশভেদে নদীভেদে সমুদ্রভেদে মাছের নানা বৈচিত্র্য। কতক মাছ আবার এমন অদ্ভুত দেখ্‌তে হয় যে তাদের দেখে অবাক হতে হয়। এই রকম কয়েকটি অদ্ভুত মাছের আমরা এখানে পরিচয় দিলাম।

ট্যাপা মাছ।—এ মাছ আমাদের দেশেও প্রচুর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একে রোগা রোগা দেখ্‌তে। কোনো শত্রু তেড়ে এলে এই মাছ পেটটা ফুলিয়ে একেবারে বেলুনের মত হয়ে ওঠে। শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্যেই এর এই বীভৎস আকার।



মদ্দা ঘোড়ামাছের নক্‌সা।

আলো মাছ।—এ মাছও শত্রুর হাত থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করে। এর দেহ অনেকটা পাঁকাল মাছের মতন। মাথার দুপাশে দুটো শিংএর মত আছে। তার ওপরে গোল গোল দুটো চোখ। চোখ দুটো থেকে বিদ্যুতের আলোর মত আলো বেরোয়। সেই আলোতেই মাছটা শত্রু আছে কি না এধার ওধার দেখ্‌তে দেখ্‌তে যায়।



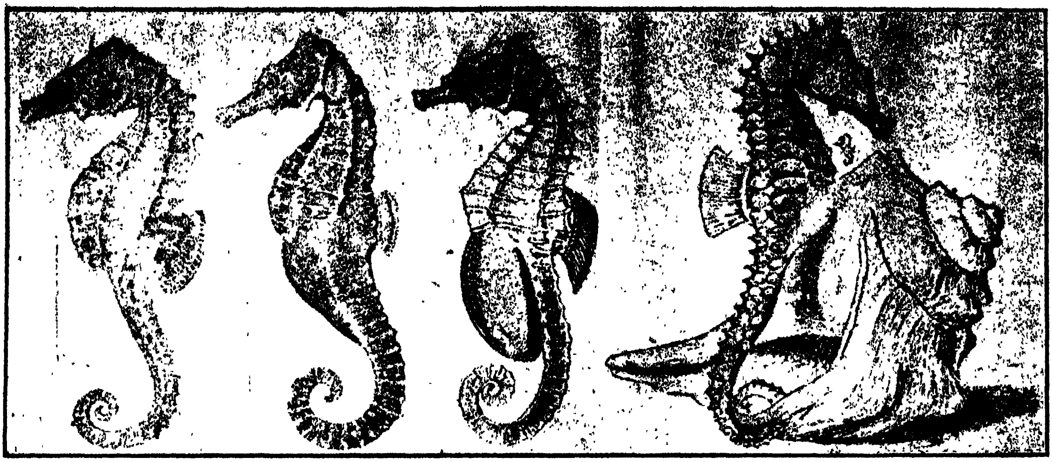
সাগরঘরে ঘোড়ামাছ।

মৌকোমুখো মাছ।—এ মাছের শরীর রোগা-রোগা শিঙি মাছের মত। কিন্তু এর হাঁ অতি প্রকাণ্ড। ধনেশ্বর নামে ঠোঁটসর্ব্বস্ব একরকম পাখী আছে, তাদের মতনই এর হাঁ। এঁর মুখে অবারিতভাবে অজস্র খাবার চলে' যায়, তবুও এঁর খেতে কোন আপত্তি নেই। কেবল মাঝে মাঝে ঠোঁটের চাক্‌না চিপে খাবার গিল্‌তেই যা কষ্ট।

পেটসর্ব্বস্ব মাছ।—এ মাছ দেখ্‌তে খুব অদ্ভুত নয়, তবে এর পেটটি


THE FEMALE SEA HORSE HAS AN EASY TIME
THE ARCHER FISH STUNS INSECTS WITH A JET OF WATER
THE PILOT FISH GETS FREE RIDES BY CLINGING FAST TO A SHARK WITH THIS SUCKER MOUTH
THE BLACK SWALLOWER HAS AN ELASTIC STOMACH THAT WILL HOLD A FISH TWICE AS LARGE AS HIMSELF
PUFFER FISH WILL SWELL UP INTO A PRICKLY BALLOON WHEN ENEMIES APPROACH
THE BLACK GULPER HAS A HUGE MOUTH THAT SUGGESTS THE PELICANS BEAK
HIS EYES ARE AT THE END OF FEELERS—THEIR PHOSPHORESCENCE IS NECESSARY IN THE DARKNESS OF THE OCEAN DEPTHS

অদ্ভুত মাছ



ঘোড়ামাছ (মাদি) মদ্দা ঘোড়ামাছ—পেটের থলি সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও থলি হইতে বাচ্চাদের নিষ্ক্রমণ।

যেন একটি নৌকার খোল। এ পেটে প্রচুর খাদ্য ধরে। মাছটির চেহারা যা তার চেয়ে দ্বিগুণ জিনিস এই পেটে স্থান পেতে পারে।

হাঙর-সখা মাছ।—ইনি হাঙরের পরম বন্ধু। বিনা পয়সায় হাঙরের পিঠে চেপে বেড়ানোই এঁর কাজ। হাঙর যখনই কোন শিকার করে তখনই ইনি দৌড়ে এসে শিকারের তত্ত্বাবধান করেন, আর প্রসাদ পাবার প্রভূত চেষ্টা করেন। এর মুখের নীচের দিকে কতকগুলো কাঁটার মত হাড় আছে। তাই দিয়ে সে হাঙরের পিঠ আঁক্‌ড়ে থাকে।

তীরন্দাজ মাছ।—এই মাছ পাড়ের ধার দিয়ে ধার দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর কোন কীটপতঙ্গ দেখ্‌লে মুখ দিয়ে পিচকিরি ছোড়ার মত জল ছুঁড়ে পতঙ্গকে জব্দ ও আহত করে। তার পর আহত পতঙ্গ খেয়ে নেয়।

ঘোড়া-মাছ।—সবচেয়ে অদ্ভুত দেখ্‌তে এই ঘোড়া-মাছ। এর মুখটা ঘোড়ার মত, পেটটা সাধারণ মাছের মত, আবার একটা ল্যাজ আছে, সেটার ওপর ভর দিয়ে এরা দাঁড়ায়। আমাদের দেশে যাঁরা পুরী, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছেন তাঁরাই এই ঘোড়া মাছ বা সাগর-ঘোড়া দেখে থাক্‌বেন। ঘোড়া-মাছ আকারে এক ফুটের বেশী হয় না। এরা সমুদ্রের এমন জায়গায় থাকে যেখানে খুব গাছপালা আছে। গাছপালার মধ্যে এরা লুকিয়ে থাক্‌তে ভালবাসে, কেননা আত্মরক্ষা কর্‌বার মত শক্তি এদের কম। ঘোড়া-মাছের চোখ খুব উজ্জ্বল। আর টিকটিকির মত এরা একটা চোখকে আলাদাভাবে এধার ওধার ঘোরাতে পারে। এদের মাথার দুদিকে ছোট ছোট দুটো পাখা আছে। এরা যখন চল্‌তে থাকে তখন পাখা-দুটো খুব নড়ে, আর দাঁড়ালে পাখা-দুটো খাড়া হয়ে থাকে। এরা দাঁড়িয়ে ল্যাজটা কোন আগাছায় আটকে দেয় যেন নৌকো নঙর ফেলে আছে। আর ল্যাজ আটকে রেখে খাদ্যের আশায় এধার ওধার শরীর দোলাতে থাকে। এদের মুখ সরু। মুখের গঠন দেখে বোধ হয় এরা ছোট ছোট জলের পোকা খেয়ে থাকে। এদের গায়ে আঁশ নেই। মদ্দা ঘোড়া মাছের পেটের তলায় কাঙ্গারুর মত একটি থলি আছে। তার মধ্যে সে ডিম বহন করে বেড়ায়। আবার বাচ্চারা বাপের পেটের এই থলিতে লুকিয়ে থাকে। আশ্চর্য্য এই যে ঘোড়া-মাছের পুরুষকেই ডিম ও বাচ্চাদের বহনের কষ্ট সমস্তই পোহাতে হয়।

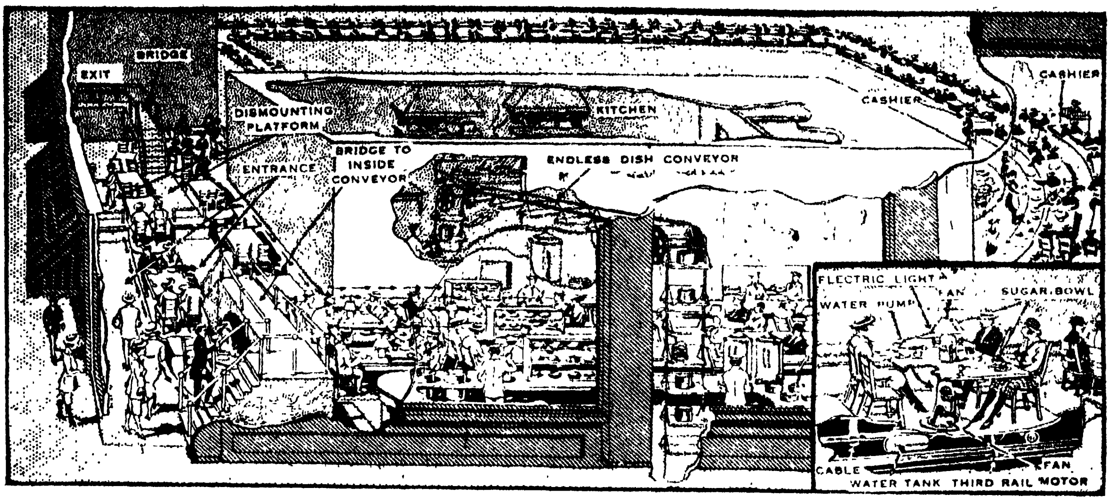


চিল্কাহ্রদের ঘোড়ামাছ।

চিল্‌কা হ্রদেও এক রকম ঘোড়া-মাছ আছে। তাদের আকার সাধারণ ঘোড়া-মাছদের আকারের চেয়ে কিছু ভিন্ন। এরা একটু মোটাসোটা ও ভারি ভারি দেখ্‌তে। প।

কল্পতরু হোটেল—

'রাঁধ্‌তে সয় বাড়্‌তে সয় না' একথাটা অবস্থা-বিশেষে সব মানুষের পক্ষেই খাটে। তারপর যখন পাঁঠার কোর্ম্মা চাহিবার আধঘণ্টা পর আলুর চচ্চড়ি আসিয়া জোটে, তখন তাহা সব সময় হাসির উদ্রেক করিয়া পরিপাক-রস নিঃসরণে সুহায়তা করে না, ইহাও নিশ্চিত।

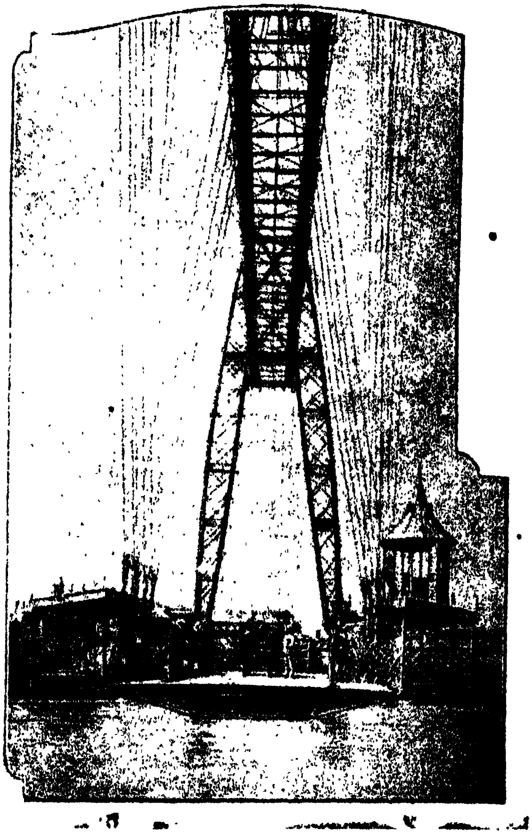


কল্পতরু হোটেল।

এই-সব উপদ্রবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার এক উপায় আমেরিকার এক হোটেলে সম্প্রতি হইয়াছে। হোটেলে ঢুকিয়া সুবিধামত কোথাও একটা টেবিলে বসিয়া গেলেই থরজোড়া সাজানো খাবারের স্তূপ ঘেঁসিয়া সেই টেবিল ঘুরিতে আরম্ভ করে, চলিতে চলিতে হাত বাড়াইয়া যেটা খুসি তুলিয়া লইলেই হইল। সারি সারি টেবিল তাড়িত-চালিত হইয়া সারাক্ষণ সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক টেবিলের মাঝখানে সোডা ও জলের ফোয়ারা, বৈদ্যুতিক আলো ও চর্কি পাখার বন্দোবস্ত। একবার ঘুরিয়া আসিতে নিজের মনের মতো খাবারটি কোনো কারণে যদি হাত এড়াইয়া যায় ত আরেকবার ঘুরিয়া সেটিকে খুঁজিয়া লওয়া চলে। এই আহার-ব্যবস্থায় পরিবেষক মোটে লাগে না বলিলেও চলে, আহারকারীদেরও আহার ও ভ্রমণ দুইই একসঙ্গে করা হইয়া যায়।

সাঁকো খেয়া—

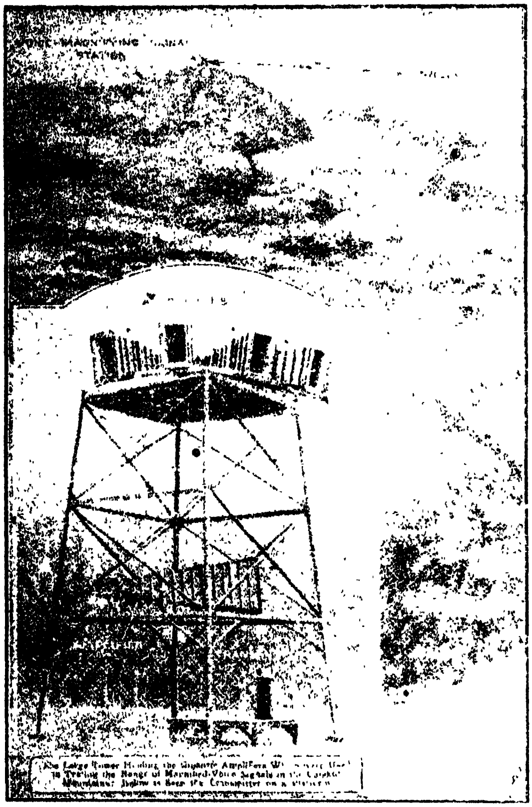
নদীর উপর লোক-যাতায়াতের সাধারণ পুল জাহাজের চলাচল ব্যাহত করে, হয়ত তার জন্ম পুলের মাঝখানটায় কোথাও খুলিয়া পথ করিয়া দিতে হয়—সে সময়টা লোকজন গাড়ীঘোড়ার চলাচল ব্যাহত হয়। এই-সমস্ত অসুবিধার হাত এড়াইতে ইংলণ্ডের নিউপোর্টে উস্ক নদীর উপরে একটি নূতন রকমের পুল নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা নদীর উপর নৌকাচলাচলের পথ জুড়িয়া বিরাজ করে না—নিজেই খেয়া-নৌকার মতো নদীর এক তীর হইতে অন্য তীরে লোক পারাপার করিয়া বেড়ায়। পুলটিকে তাই সাঁকো খেয়া বা খেয়া সাঁকো বলা চলিতে পারে। নদীর দুই পারে খুব উঁচু দুইটি থামের মাথায় মাথায় জোড়া কড়ি বাহিয়া ঝুলিয়া একটি দোলনা এপার-ওপার যাতায়াত করে, পথে নৌকা বা জাহাজ পড়িলে থামিয়া দাঁড়াইয়া পথ করিয়া দেয়, নদী পার হইতে সময়ও লাগে কম, লোকও কম ধরে না।

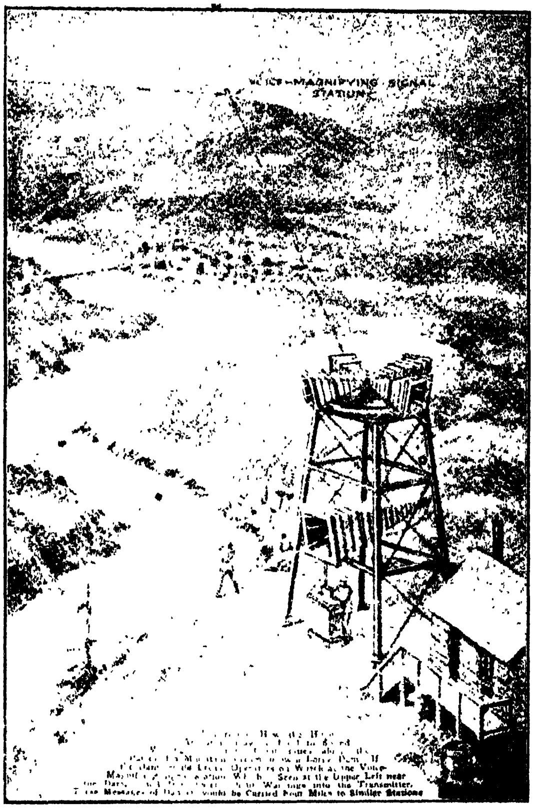


সাঁকোর খেয়া।



বাচাল মোটর।





স্বরবির্দ্ধক যন্ত্র।

স্বরবিবর্দ্ধক যন্ত্র—

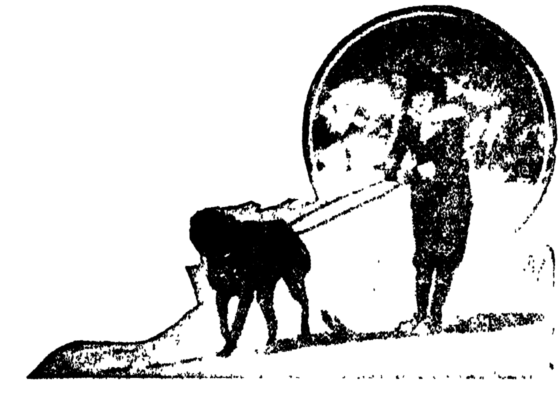
পথের ধারে একটি আরোহীহীন শূন্য মোটর হঠাৎ যদি চীৎকার করিয়া গান গাহিতে শুরু করে অথবা হাসির তুওবে চারিদিক কাঁপাইয়া তোলে ত' তাহা এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক miracle বা অঘটন-ঘটন-পরতায় দি.নও লোককে একটু তাক্ লাগাইয়া দেয়। কিন্তু এই ব্যাপারটিই আমেরিকায় শহরবাজারের পথে আজকাল ঘটিতেছে শোনা গেছে। শূন্য মোটর ঠিক গান না গাহিলেও চীৎকার করিয়া নিজের গুণব্যাখ্যা ও বংশ-পরিচয় পথের লোকদের ডাকিয়া বুলিতেছে।

ইহা ফনোগ্রাফের কলে হইতেছে না। Voice Amplifier বা স্বরবিবর্দ্ধক নামক যন্ত্র মোটরের মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া দূর আড়াল হইতে ফাঁপা নলের সাহায্যে তার মধ্যে কথা কহিলেই সেই কথার শব্দ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া বৃদ্ধি-যন্ত্রের মধ্যে বাজিয়া ওঠে, পথের লোক বহুদূর হইতেও তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই বৃদ্ধি-যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক চার বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া নিজের চীৎকার-শব্দ প্রতিধ্বনিত করিতে পারে, এমন কি নিজে চীৎকার না করিয়াও সেই চারি বর্গমাইলের অধিবাসী আবালবৃদ্ধ সমস্ত নরনারীকে কোনো আসন্ন বিপদ্‌বার্ত্তা এক মিনিটের মধ্যে জানাইয়া দিতে পারে। এজন্য প্রতি একমাইল বা

প্রয়োজন-মত দূরে দূরে এক-একটি বিরাট যুদ্ধযন্ত্র স্থাপিত করিতে হয়, তাদের পরস্পরের সঙ্গে টেলিফোঁর যোগ থাকে। তারপর তার যে-কোন একটির মধ্যে কথা কহিলেই সেই কথা অন্য যন্ত্রগুলির মধ্যে ঘোর চীৎকার-শব্দে বাজিয়া ওঠে। হয়ত চার মাইল দূরে নদীর বাঁধ ভাঙিতে সুরু হইয়াছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে স্থানত্যাগ করিয়া না গেলে বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই বিপদের বার্ত্তা পলকে সকলের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া সহজেই কতকগুলি অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর হইবে। আমেরিকাতে প্রধানত এইদিক দিয়াই যন্ত্রটির পরীক্ষা হইয়াছে, এবং প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ইহার ব্যবহারও হইবে। আমাদের দেশে বৎসর বৎসর বন্যা হইয়া কত সহস্র সহস্র লোকের ধনপ্রাণ নষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও স্বরাজ অর্জ্জন করিবার পর আমাদের দেশের ধনপ্রাণ রক্ষার কাজে এই যন্ত্রটি নিয়োগ করিতে পারিব।

স।



কুকুর-টানা গাড়ী।

কুকুর-টানা গাড়ী—

কুইবেকের নিকটে স্যান্‌ফোর্ড ক্যাংসান নামক স্থানে শীতকালে কুকুর গাড়ী টানার কাজে লাগে। শীতকালে সেখানকার পথঘাট বরফে ঢাকিয়া যায়। তখন চাকাওয়ালা গাড়ী চলা সম্ভবপর নয়। স্লেজ গাড়ীতে—একে গাড়ী না বলিয়া একখানা তক্তা বলিলে ঠিক হয়—একজন লোক দাঁড়াইয়া থাকে, এবং একটা কুকুর তা বেশ সহজেই টানিয়া লইয়া যায়। জিনিষপত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার সময় বড় গাড়ী থাকে—আর তা কয়েকটা কুকুরে টানিয়া লইয়া যায়। গরমকালের জন্য বরফ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়—তাও আবার এই কুকুরটানা গাড়ীতে করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে পঁহুছান হয়। এই বরফের উপরে চলা গাড়ীর তলা খুব মসৃণ, তাহার জন্য বরফের উপর টানিতে কুকুরকে খুব বেশী জোর দিতে হয় না।

মুরগী-কাওয়াজ—

সৈন্যদলের দ্বারা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা কুচকাওয়াজ করাইয়া অনেক সময় নানা রকমের অক্ষর প্রস্তুত করা হয়। এই



মুরগী-কাওয়াজ।

রকমে মানুষকে সারি সারি বিশেষ বিশেষ অক্ষরের আকারে বসান বা সাজান খুব আশ্চর্য্যের কথা নয়। কিন্তু মুরগীদের এই রকম অক্ষরের আকারে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসাইয়া রাখিয়া তাহার ছবি তোলা খুব সহজ কাজ নয়, এবং এ রকম কথা বোধ হয় খুব কম লোকেই শুনিয়াছেন। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়াতে একটি মুরগী-খোঁয়াড় আছে। কিছুদিন আগে ঐ খোঁয়াড়ের কর্ত্তারা একদল শাদা মুরগীকে P. P. F. এই তিনটি অক্ষরের আকারে সাজাইয়া বসাইয়াছিলেন এবং তাহার পর তাহার ছবি তুলিয়াছিলেন। ব্যাপারটা বোধ হয় নিম্নলিখিত উপায়ে করা হইয়াছিল। প্রথম দাগ কাটিয়া ঐ অক্ষর তিনটি লিখিয়া তাহার উপর দানা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর মুরগীদের ঐখানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুরগীরা একটু স্থির হইয়া খাইতে আরম্ভ করিবামাত্র তাহাদের ছবি তোলা হয়। কিন্তু খাবার ছড়াইয়া মুরগীদের এমন ভাবে বসানও বড় শক্ত ব্যাপার। কারণ তাহারা এক জায়গায় দঙ্গল বাঁধিয়া খাইতেই ভালবাসে। তাই যাঁহারা এই ছবি তুলিয়াছেন তাঁহাদের যথেষ্ট বাহাদুরী আছে।

হেমন্ত।

পুস্তক পরিচয়

অতীতের ব্রাহ্মসমাজ—অনেকগুলি প্রতিকৃতি সহিত। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব প্রণীত। কলিকাতা, ১৪নং এণ্টনিবাগান লেন। ১৯২১ সাল। মূল্য এক টাকা।

ইহাতে প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আয়তনের ১৪৪ পৃষ্ঠা লেখা আছে। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের রামমোহন রায় প্রমুখ প্রধান কর্ম্মীদের, পরমহংস রামকৃষ্ণের, এবং ভারতাশ্রমবাসিনী মহিলাদের ছবি ইহাতে আছে। ইহার বাঁধাই সুদৃঢ়। ছাপা ও কাগজ ভাল। দাম সস্তা।

গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে অতীতের ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বলিয়াছেন। ইহা যদিও তাহা নহে, তথাপি ইহাতে পরলোকগত বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্রাহ্মের এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের অনেক আখ্যায়িকা ও উপদেশ আছে বলিয়া ইহা পড়িলে পাঠকগণ উপকৃত হইবেন এবং অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। এই সংস্করণে ভুল ত্রুটি যাহা আছে, তাহা ভবিষ্যতে সংশোধিত হইতে পারিবে। ভক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বধিরমূক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সিটি স্কুল ও কলেজের জন্য তাঁহার পরিশ্রম, প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। এগুলি বাস্তবিক তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

মনোবিজ্ঞান—(সাহিত্যপরিষদ্ গ্রন্থাবলী, সং ৬৭), শ্রীমলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য বিরচিত। ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৪+৩৩০+১৭। মূল্য ১।০।

এই গ্রন্থে ১১টি অধ্যায়। এই কয়েকটি অধ্যায়ে—মন, শরীর ও মন, সম্বিৎ, মনোবৃত্তি বিভাগ, মনঃসংযোগ, সংবেদন, উপলব্ধি, স্মৃতি ও সংস্কার, ভাবনা, অহং বা আমি, বেদনা ও রস, এবং ইচ্ছা—এই-সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের বিশেষ অভাব। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় এই অভাব আংশিকরূপে নিবারিত হইল। গ্রন্থখানির একটি বিশেষত্ব আছে, ইহাতে যে কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতই বিবৃত হইয়াছে তাহা নহে, পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মতামতও জানিতে পারিবেন।

বঙ্গভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ লেখা সহজ ব্যাপার নহে। অনেক স্থলে নূতন শব্দের সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; ইহাতে আবার পুস্তকের ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু এই পুস্তকে সে প্রকার আশঙ্কা নাই। বিষয়ের তুলনায় ভাষা প্রাঞ্জল।

পরিশিষ্টে এই পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষা ও তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। বাংলা ব্যাখ্যা দিলে পুস্তক আরও সুখবোধ্য হইত।

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

গীতাধর্ম্ম—শ্রীহেরম্বনাথ পণ্ডিত প্রণীত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ১৩০ পৃষ্ঠা; কাপড়ে বাঁধা মলাট—মূল্য একটাকা চারিআনা।

সমগ্র গীতা গ্রন্থখানি সরল বাংলা পদ্যে ভাষান্তরিত হইয়াছে, ও শেষ ভাগে গীতা-মাহাত্ম্য মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গীতার নানাবিধ সংস্করণ টীকা-টিপ্পনী ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে পদ্যে যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সরল ও সুখবোধ্য। বইখানি সুন্দর করিয়া ছাপিবার জন্য গ্রন্থকার অনেক অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাজনীতি—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। পৃঃ ।৶০+৩১৬। মূল্য ১।০। প্রকাশক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, বি-এ, সরস্বতী পুস্তকালয়, ৯ নং রমানাথ মজুমদারের লেন।

প্রকাশকের নিবেদনে লিখিত আছে যে "গ্রন্থকার সন্ন্যাসী, রাজনৈতিক কারণে তিনি চার বৎসর আবদ্ধ ছিলেন। এই সময় লিখিত পুস্তক-সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম।" শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। স্বয়ং গ্রন্থকারেরও একটি ভূমিকা আছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ইউরোপীয় রাজনৈতিক আদর্শের সহিত ভারতীয় আদর্শ তুলনা" করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।" ইউরোপীয় ও ভারতীয় রাজনীতি-লেখকদের সঙ্গে গ্রন্থকারের যথেষ্ট পরিচয় আছে বুঝা যায়। কিন্তু একটা ভুল তিনি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইউরোপীয় বা ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শ একটা নয়। উভয়দেশেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ দেখা গিয়াছে। ইউরোপের মত ভারতেও রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, কুলতন্ত্র প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। রাজশক্তির উদ্ভব সম্বন্ধেও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত ভারতীয় শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল; এবং যে চুক্তিবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থকার শ্লেষবর্ষণ করিয়াছেন এবং যাহা শুধু ইউরোপেই সম্ভাব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভারতীয় মনীষী ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁহার রাজনীতি-ব্যাখ্যায় ভারতীয় মত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এরিষ্টটল্, প্লেটো, রুশো প্রভৃতি ইউরোপীয় বহু রাজনৈতিকের মতই গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের মতে কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধেই ন্যায়-বিচার করেন নাই। তাঁহার বিচারের মধ্যে অনেকটা অসংলগ্ন চিন্তা রহিয়া গিয়াছে, এবং অনেক স্থলেই এক কথায় আর-এক কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গিয়া যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। রাষ্ট্রীয় শক্তির উদ্ভব, রাষ্ট্রের স্বরূপ ও কাজ, রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলি ধরিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয় মতবাদগুলির আলোচনা করিলে বিষয় সহজ ও সুন্দর হইত। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় মতের বিশেষত্ব বলিয়া যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভারতীয়ের কিরূপ বিশেষত্ব বুঝিলাম না। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক নিয়ম, রাজার ব্যক্তিগত নিয়ম, চর প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে ইউরোপেও হুবহু প্রায় তাহাই আছে।

আমাদের মতে, রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে ভারতের যাহা বিশেষত্ব তাহাই পরিষ্কাররূপে গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই—তাহা হইতেছে রাষ্ট্রের (state) সহিত ব্যক্তির (individual) সম্বন্ধ বিষয়ক। এ বিষয়ে

ভারতের যাহা প্রধান মতবাদ তাহা অনেকটা বর্ত্তমান ইউরোপীয় গিল্ড সোসিয়ালিজমের (Guild Socialism) মত। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিগণ এক-একটা স্বার্থে (interest) সংঘবদ্ধ হইয়া, জাত গড়িয়া উঠিতেন। তাঁহাদের নিয়ম-কানুন,—তাহা আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয়ই হউক বা জীবিকা-উপার্জ্জন সম্বন্ধীয়ই হউক—ছিল তাঁহাদের নিজ নিজ সংঘের হাতে। রাজা ছিলেন শাসনকর্ত্তা বা রক্ষক বা পরিদর্শক। সংঘগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। একই সংঘের লোক বিভিন্ন রাজ্যে বাস করিতেন। স্থানভেদে তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখা যাইত মাত্র। এই সংঘগুলির ভিন্ন ভিন্ন সংঘপতিও ছিল এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও নেহাৎ কম ছিল না। ব্যক্তির সম্বন্ধ ছিল এই সংঘগুলির সঙ্গেই বেশী ঘনিষ্ঠ। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন আলোচনা করিতে হইলে এই সংঘের দিকটাই বেশী করিয়া নজরে আনা উচিত।

গ্রন্থকারের ভাষা অনেক সময় বড় দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। একে ত এই-সমস্ত বিষয়ে বাঙালী পাঠক বিরল, তাহার উপর যদি আবার এরূপ দুর্ব্বোধ ভাষায় লিখিত হয় তবে সে ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ত বুঝাই যাইতেছে। যাহা হউক গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ যে তিনি এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বাংলা ভাষাকে সম্পদশালী করিবারই প্রয়াসী হইয়াছেন।

জহরী।

পায়ের ধূলো—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সিল্কে বাঁধান। দুই টাকা।

উপন্যাসটি উদ্দেশ্যমূলক। গ্রন্থকার দেশের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ অন্যায়কে আমাদের সামনে হাজির করেছেন, তাঁর আদর্শের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। আমাদের সকলেরই আশা আছে দেশের সামনে যে সমস্যাকে গ্রন্থকার এগিয়ে দিতে চাচ্ছেন বাঙলার সহৃদয় নরনারীর সহানুভূতি সে সমস্যাপূরণের সাহায্য করবে। বইটি যে উদ্দেশ্যমূলক তা আগেই বলেছি; এটি চারিত্রমূলকও বটে। সুখের বিষয় এই, যে, চরিত্রসৃষ্টি কোথাও উদ্দেশ্যের তলায় একেবারে চাপা পড়েনি। নায়ক সমাজের উন্নতির জন্য নিজের জীবনটিকে উৎসর্গ করেছিল, জীবনের সমস্তই হারিয়েছিল, কেবল কয়েকটি নারীর স্নেহ-প্রেম পেয়েছিল; আর তার জীবনের সংকল্প কতক পরিমাণে সফল হয়েছিল। গ্রন্থকার তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে একে তৈরী করেছেন। দোষগুণে সে মানুষের মত মানুষই হয়ে উঠেছে, পুতুল হয়ে ওঠেনি। তার শক্তি অপরিসীম, আনন্দও অপরিসীম, ভালবাসাও অগাধ, আবার রাগও প্রচণ্ড,—সে ভালবাসে কিন্তু তার ভালবাসার আবেগে অস্বাস্থ্যকর ভাবপ্রবণতা নেই। আলোককে আমাদের ভালই লেগেছে। মুকুল আর রাধারাণী খুব ভালই ফুটেছে। রাধারাণী আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। "রমণীর দয়া জননীর স্নেহ কুমারীর নব নীরব প্রীতি" তাকে পূত করে তুলেছিল। এই বুদ্ধিমতী মেয়েটি সহানুভূতির শক্তিতে আর অসাধারণ কর্ম্মোৎসাহের গুণে দেশের অনেক কল্যাণ করতে পেরেছিল।

চরকার উৎসব—শ্রীসরসীবালা বসুর রচিত উপন্যাস। কমলিনী সাহিত্য-মন্দিরের এক টাকা সংস্করণ। ১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত এই উৎসবে আজ গৃহে গৃহে নরনারী বিবিধ শুভকর্ম্মে রত হইয়াছেন, তাঁহারা তুচ্ছ মান অপমানের কথা আজ ভুলিয়া গিয়াছেন, আজ দেশের হৃদয় এক হইয়াছে। লেখিকা এই পুণ্য উৎসবের ছবি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

শিবানী—গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীসরসীবালা বসু। শিশিরপাব্লিশিং হাউসের উপন্যাস-সিরিজের ২৬ সংখ্যা। মূল্য এক টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সরল স্বচ্ছ ভাষায় গভীর সহৃদয়তা দিয়া তিনি বাংলার পল্লীজীবনের কয়েকখানি চিত্র আঁকিয়াছেন, বর্ত্তমান সমাজের সমস্যা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। ইঁহার গল্পে আর্ট নাই; কিন্তু ইঁহার মমতার স্নিগ্ধ হৃদয়খানি উপন্যাসটিকে মূল্যবান্ করিয়াছে, বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ইহাতে মনোবিজ্ঞানের প্রবলেম্ নাই, সূক্ষ্ম তর্কবিচারের আতিশয্য নাই, কেবল আছে একটি সুন্দর করুণ মধুর আখ্যায়িকা। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা জীবন্ত, বিশেষতঃ জেঠাইমার ছবি খুব ভাল ফুটিয়াছে।

ছায়াবাজি—নূতন ধরণের গল্পের বই। বর্ত্তমান সমাজের কতকগুলি সমস্যা বায়োস্কোপের ছবির মত পাঠকের সামনে ধরা হইয়াছে। মূল্য আট আনা। যুগশঙ্খ—যুগোপযোগী প্রবন্ধ। তিন আনা। স্পষ্টকথা—কতকগুলি প্রবন্ধ। পাঁচ আনা। উল্টোকথা—সাহিত্য, শিল্প, সমালোচনা, ভাষা, রাজনীতি—ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ। আট আনা। লেখক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

বাংলা দেশের অবস্থা আজ শোচনীয়। "দৈন্য-জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা, ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা"—ছায়াবাজিতে গ্রন্থকার সেই ছবিই আঁকিয়াছেন। এই আখ্যায়িকাগুলির বিষাদ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। স্পষ্টকথায় ও যুগশঙ্খে কতকগুলি সাময়িক প্রচার (Propaganda) প্রবন্ধ আছে, দেশের মঙ্গলকাজে গ্রন্থকার দেশের যুবকদের ডাক দিয়াছেন। প্রবন্ধগুলির যুক্তিমত্তা ও সহৃদয়তা প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থপাঠে আমাদের যুবকদের দুর্জ্জয় রক্ষণশীলতা একটু নাড়া পাইলে আমরা সুখী হইব। উল্টোকথাই বই-চারিখানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকার সাহিত্য আদি বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ অতিশয় উচ্চ, বাংলার সাহিত্য সে আদর্শের নিকটেও দাঁড়াইতে পারে না বলিয়া অত্যন্ত অধিক তিরস্কৃত হইয়াছে। পাঠকেরা বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

বাঁশরী—শেখ হবিবর রহমান প্রণীত। এক টাকা। ৫।এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। নূরনূমী লাইব্রেরী। কতকগুলি গীতি কবিতার সমষ্টি।

সুহাগা—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। এক টাকা। মেসার্স গুরুদাস চাটার্জ্জী এণ্ড কোং। ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিতাপুস্তক—গ্রন্থারম্ভেই কতকগুলি ধর্ম্মমূলক কবিতা। "বিদায়-মিলন" ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল ৯৫ সূক্ত, পুরূরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত। ছন্দ বেশ গম্ভীর হইয়াছে। শেষে কতকগুলি বিবাহমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল এবং কতকগুলি হাসির কবিতাও রহিয়াছে।

আধুনিক ইউরোপ—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ প্রণীত। বারো আনা। কর মজুমদার এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিং।

এই বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে পড়িতেছে, "আসল কথা আধুনিক

শিক্ষা তার বাহন পায় নাই। তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না।·····ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিষ করিয়া লইতে হইবে। পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ সেই শিক্ষাকে তার দেশী ভাষায় আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।·········এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালীর ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজী ভাষা দখল করিতে পারিল না, তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ······আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ-শিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষা-গ্রন্থ কই?" (শিক্ষার বাহন, সবুজপত্র, পৌষ, ১৩২২।) কবিগুরু যে শ্রেণীর শিক্ষাগ্রন্থের কথা বলিয়াছেন সে শ্রেণীর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। বাস্তবিকই ইংরেজী ভাষার যোগে যখন শিখি তখন প্রায়ই মনে হয় যেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না। বাংলা ভাষার যোগে শিখিলেই ঠিক শেখা হয়। গ্রন্থকার আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস বিষয়ে যে শিক্ষাগ্রন্থটি আমাদের দিয়াছেন তাহাতে ছোটখাট ভুলচুক আছে বটে, তথাপি ইহাকে আমরাও সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম। বাংলাভাষায় সরল শিক্ষাগ্রন্থ যত প্রকাশিত হয় আমাদের ততই মঙ্গল।

রহমান খাঁর দুর্গোৎসব—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—বিনোদিনী সাহিত্যমন্দির, ১১নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন।

কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি মোটের উপর ভাল লাগিয়াছে। ছাপা বাঁধাই ও কাগজ সবই সুন্দর।

ভাগ্যলেখা বা লালা গোলকচাঁদ—উপন্যাস। কলিকাতা ৬নং গোপাল বসু লেনস্থ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (ভিখারী নীরানন্দ) কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ। চার আনা। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

ইউরোপে মহাজনে মজুরে লড়াই বড়ই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অনেকের মত এই যে বর্ত্তমান বণিক্‌তন্ত্র সমাজের সর্ব্বনাশ করেছে, সমাজতন্ত্রই দেশের কল্যাণসাধন করবে। সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সামনে রেখে লেনিন প্রমুখ অনেক কর্ম্মী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছিলেন; রক্তপাতের দ্বারা আকস্মিক বিদ্রোহের দ্বারা সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করতে চাননি; সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার করাই তাঁদের জীবনব্রত; যুক্তির দ্বারা, অভিনিবেশের দ্বারা তাঁরা সত্যকে লাভ করতে চেষ্টা করেছেন। লেনিন স্বয়ং আদর্শ জ্ঞানতপস্বী। Wilcox বলেন, "Like Karl Marx he was never happier than when exploring the treasures of the British Museum"। লেনিন যে সত্যকে লাভ করেছিলেন সে সত্যকে আমরা সকলে মানতে রাজী না হতে পারি। তিনি যে নিঃস্বার্থ কর্ম্মী, তিনি যে অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক, তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ সে কথা সকলেই স্বীকার করব। বিগত যুদ্ধ রাশিয়ার সর্ব্বনাশসাধন করেছিল। ১৯১৭ সালে তার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লেনিন রাশিয়াকে বাঁচিয়েছেন, তিনি মানবজাতির শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর জীবনচরিত সকলেরই পড়া উচিত। বইটির দামও খুবই কম। সমালোচক।

গাছপালা—শ্রীজগদানন্দ রায়, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড এলাহাবাদ। ৩০৫+৸৹+।৹ পৃষ্ঠা, সচিত্র। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী উদ্ভিদবিদ্যার বই। বাংলাদেশে যেসব গাছপালা ছেলেমেয়েদের পরিচিত তাদেরই পত্র পুষ্প কাণ্ড মূল স্বভাব বিশিষ্টতা প্রভৃতির পরিচয় সহজ ভাষায় সরস করিয়া বলা হইয়াছে। বইখানি ছেলেমেয়েদের পড়িতে ভালো লাগিবে ও তারা গাছপালার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়া জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দ লাভ করিবে। বইখানির কাগজ ছাপা বাঁধা ছবি সবই সুন্দর—ইণ্ডিয়ান প্রেসের সুনামের উপযুক্ত।

বাঘগুহা ও রামগড়—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড এলাহাবাদ, ডিমাই আট-পেজি ৭৭ পৃষ্ঠা, সচিত্র। কাগজ ছাপা ছবি বাঁধা অত্যুত্তম। দেড় টাকা।

বাঘগুহা গোয়ালিয়র রাজ্যে অবস্থিত পর্ব্বতের গা খুঁদিয়া তৈরি। এই গুহার মধ্যে বৌদ্ধযুগের কিছু চিত্র আছে। চিত্রগুলি অজণ্টাগুহা-চিত্রাবলীর ধরণের, এই গুহার সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধযুগের ধর্ম্ম ও শিল্পের ইতিহাস সংযুক্ত আছে। একজন শিল্পী স্বচক্ষে ঐ গুহা দেখিয়া উহার বর্ণনা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং বর্ণনা মনোরম ও মূল্যবান হইয়াছে।

রামগড় মধ্য-ভারতের সুরগুজা রাজ্যে। সেখানেও এক গিরিগুহা আছে। সেই গুহাতেও কিছু চিত্র আছে। তারও বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পী ছবির ভাষায় ও তুলির রেখায় দিয়াছেন। বর্ণনা সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। দেশকে জানিবার জন্য এ বই সকলের পড়া উচিত।

হোদের গল্প—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ৬৯ পৃষ্ঠা, সচিত্র। ছাপা কাগজ ছবি মলাট সুন্দর। দাম এক টাকা।

ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের অন্যতম হো। হোদের কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করিয়া অসিত বাবু প্রকাশ করিয়াছেন। এই কৌতুককর গল্পগুলি ছেলেমেয়েদের প্রীতিজনক ত হইবেই, অধিকন্তু ইহাদের দ্বারা তাদের কাছে অসভ্য এক জাতির মনস্তত্ত্বের সংবাদ প্রকাশিত হইবে। এইজন্য এই বইখানি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছেও সমাদৃত হইবে।

ছোটদের গল্প—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত। বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৬ পৃষ্ঠা। দশ আনা।

মোট আটটি গল্প আছে—নানা বিষয় ও রসের, ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী। শেষের দুটি গল্প নাটকের ধরণে কবিতায় লেখা, আবৃত্তির উপযোগী।

ভারত-পরিচয়—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ৩০ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ৫৭৫+৷৹+১৷৹। কাপড়ে বাঁধা। ২৸৹।

এই বই এ ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানব, গ্রাম-নগর, স্বাস্থ্য, উপজীবিকা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস, সংখ্যা, প্রকার, বিস্তৃতি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজীতে যেমন Almanac বা Year Book আছে, এখানিও সেই শ্রেণীর বিবিধতথ্যপূর্ণ reference book। সংবাদপত্রপরিচালক, শিক্ষক, ছাত্র, প্রভৃতির সহচর হইবার যোগ্য। যাঁরা স্বদেশকে ভাল করিয়া চিনিতে চান তাঁদেরও পড়া উচিত

পর্ণপুট—শ্রীকালিদাস রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কলিকাতা। ১২৪ পৃষ্ঠা।

কালিদাস বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থও প্রথিতযশ। এর তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। অনেক সুন্দর কবিতা এই পুস্তকে আছে। কাব্যামোদী যাঁরা এখনো এই পর্ণপুটের অমৃত আস্বাদ করেন নাই, তাঁরা এইবার তাহা করিবেন আশা করি।

ভারতবাণী—শ্রীজ্ঞানদাশঙ্কর সান্যাল। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা। এক টাকা।

কবিতার বই, অনেকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতায় কোনো বিশেষত্ব নাই, ছন্দ পঙ্গু, মিল মন্দ, ভাব সাধারণ।

বেহার-চিত্র—শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী, ৬৮.৫ রসা রোড নর্থ কলিকাতা। ১৪৪ পৃষ্ঠা, পাঁচ সিকা।

কথার রং কৌতুকরসে গুলিয়া লেখনীর মুখে বেহারীদের কতকগুলি চিত্র আঁকা হইয়াছে। সে চিত্রে হুজুর, রায়সাহেব, গরিবপরবর, মাষ্টার প্রভৃতির হাস্যকর রূপগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। বইখানি পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। কলমের মুখে কথার ছবি বড় সুন্দর সুস্পষ্ট আঁকা হইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ—শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিষানন্দ ব্রহ্মচারী। কোলা, বসন্তমাধব আশ্রম, পোষ্টাপিস হৃদয়পুর। চার আনা।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে অপর ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হিন্দুর কর্ত্তব্য এই গ্রন্থে শাস্ত্র ও প্রাচীন-আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই খণ্ডে মুখ ধোওয়া ও জিহ্বা শোধন পর্য্যন্ত আছে।

জাতি সংস্কার বা চক্ষুদান—খাঁকুলনিবাসী রাজগুরুপ্রো-পাধিক কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর দেবশর্ম্মা কবিরত্ন।

চক্ষুদানে মুক্তিযোগপত্র—ঐ

এই দুটি বই দুখানিতে নানা শাস্ত্রবচন তুলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে যে বৈদ্যরা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন। ইণ্ডিয়া প্রেস, মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

এই বইএ প্রমাণ করিবার দুশ্চেষ্টা আছে যে বিধবা-বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রের ও হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নয়। এবং এই সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুল সংশোধনেরও দুশ্চেষ্টা আছে। আমরা জাতিভেদ মানি না; শাস্ত্র মানি না; আমরা মানি মানুষ ও মানুষের যুক্তিসঙ্গত কালোচিত সর্ব্বলোকের সাম্যমূলক ব্যবস্থা এবং সকলের চিন্তা ও আচরণের স্বাধীনতা। কিন্তু সরকার মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ, তাই জানিতে ইচ্ছা হয় সরকার মহাশয় কোন্ জাতি। যদি ব্রাহ্মণ না হন তবে হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই শাস্ত্র আলোচনা তাঁর অনধিকারচর্চ্চা। অতএব তাঁর কথা কেই বা শুনিবে? মিছামিছি তিনি এক দিকে শাস্ত্র লঙ্ঘন ও অপর দিকে মানববুদ্ধির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কেন পাপ সঞ্চয় করিতেছেন জানি না। এখনও এইসব কুতর্ক করিবার ও শুনিবার লোক দেশে আছে বলিয়াই ত আমাদের এমন হীন দশা। বিধবাদের জন্য সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিবার লোকের ত অভাব হয় না; বিপত্নীকদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয় না কেন? ব্যবস্থাকর্ত্তারা পুরুষ বলিয়া?

মুদ্রারাক্ষস।

মানসী—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক অন্নদা বুক-ষ্টল, ২২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৷৷০।

একটি গল্প আর একটি ভ্রমণ-কাহিনী আছে। গল্পের নাম মানসী। গল্পের প্লটের মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। চলতি কথায় লেখা হইলেও ভাষার মধ্যে লালিত্য নাই। মাঝে মাঝে কবিত্ব একটু ফুটিয়াই মুসড়িয়া পড়িয়াছে। কবিত্ব করিবার বৃথা চেষ্টা না করিলে বইখানি আরো একটু ভাল হইত—'পুরীতে দিনকয়েক'—ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দৃশ্য স্থান এবং দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ভাষা একই রকমের, তবে এটি লেখ্যভাষায় লেখা।

হ।

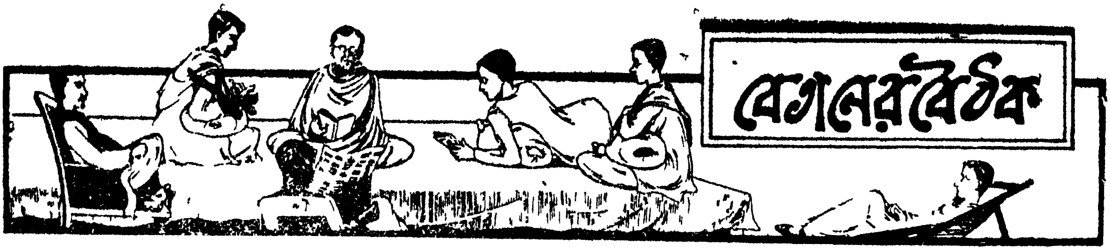
সহজ প্রেম

(কবীর)

নীরের মাঝে মীনের মত তোমার প্রেমেই রই—
প্রেমের অতুল আদর লভি, প্রেমের আঘাত সই।
জানি না ক' তোমার বরণ,
তোমার স্বরূপ, তোমার ধরণ,
বুঝি শুধু তোমার প্রেমের যায় না পাওয়া থই।

সইতে নার হোমের জ্বালা,
জপি না ক' তুলসী-মালা,
যাই না কোথাও, তীর্থপথের পথিক আমি নই।
ও প্রেম ছাড়া আর কি পেতে
হবে আমায় গুহায় যেতে?
জানি না আর কাম্য কি বা তোমার ও প্রেম বই

বেতালভট্ট



জিজ্ঞাসা

(১১৬)

কেহ কেহ বলেন, ভাস্করাচার্য্যের যুগে ঘড়ি প্রভৃতির প্রচলন ও সূচিকা-সংযোগে শিরার মধ্যে ঔষধ প্রবেশ করাইবার প্রথা ছিল। বাস্তবিক ঐ যুগে ঐ-সকল দ্রব্যের প্রচলনের সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না ?

শ্রীক্ষীরোদকুমার দাস।

(১১৭)

বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-লেখিকা কে ? এবং পুস্তকখানির নাম কি ? কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রীহরকৃষ্ণ সামন্ত।

(১১৮)

আখের ডগায় উই ধরে কেন ? উহা নিবারণের কোন বৈজ্ঞানিক উপায় আছে কি না ?

শ্রীবিজয়কুমার বড়ুয়া।

(১১৯)

আমরা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বৈনতেয়, দৈত্য, রুদ্র বয় ইত্যাদি নামের উল্লেখ আছে দেখিতে পাই ; ঐ-সকল ব্যক্তিগণ পিতার নামানুসারে পরিচিত না হইয়া মাতার নামানুসারে হইত কেন ?

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

(১২০)

পঞ্জাব প্রদেশে সাপুড়িয়াকে "বাঙ্গালী" বলে—ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না ?

শ্রীশিশিরকুমার দত্ত।

(১২১)

একখণ্ড দড়িতে গুড় মাখাইয়া তাহা ঘরের মধ্যে টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহাতে মাছি বসে। দুই-তিন মাস পরে এই দড়ি সরস মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে তাহা হইতে পুঁদিনার গাছ জন্মে, এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়। ইহা সত্য কি না ? যদি সত্য হয় তবে এইরূপ হইবার বৈজ্ঞানিক কারণ কি ?

মহম্মদ খলিলররহমান।

(১২২)

লোকের হাত ও পায়ের আঙ্গুল ফুটে কেন ? ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি ?

শ্রীনীরদগোবিন্দ গোস্বামী।

(১২৩)

দেবীচৌধুরাণীতে তামা-তুলসী স্পর্শ করিয়া কিম্বা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করার কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ দুইপ্রকার শপথের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীসুকুমার রাহা।

(১২৪)

কোন কোন গ্রন্থে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কম্বোজ নামক একটি স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহা কি এবং কোথায় অবস্থিত ? বর্ত্তমানে কোন চিহ্ন আছে কি ?

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টশালী।

(১২৫)

শুনা যায় ধূম শোষণ করিবার একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা কি সত্য ? কলিকাতায় ধূম নিবারণের কোন উপায় আছে কি না ?

শ্রীকেশবশঙ্কর রায়।

(১২৬)

এক চোখ দেখালে বা এক চোখে হাত দিলে দু চোখে হাত দিতে বলে কেন ? সঙ্গত কারণ কি ?

শ্রীপুলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১২৭)

পিপারমেণ্ট গাছ এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইতে পিপারমেণ্ট তৈয়ারী করিতে কেহই জানেন না। প্রবাসীর পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কাহারও জানা থাকে তবে প্রবাসীতে প্রকাশিত করিলে অনেকেরই উপকার হয়।

শ্রীমণিমোহন রায়চৌধুরী।

(১২৮)

মুখে ব্রণ ও মেচেতার বিশ্রী দাগ নিবারণ করিবার উপায় কি ?

শ্রীকিরণময়ী গুহ।

(১২৯)

কাঞ্চি দেশ কোথায় ছিল ? ইহার ঐতিহাসিক তথ্য কি ?

শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

(১৩০)

রেখাক্ষর-বিদ্যা (Short hand) পদ্ধতি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন কে ?

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(১৩১)

কর্পূর জলে দিলে ঘুরিয়া থাকে কেন ? ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি ?

শ্রীতারিণীচরণ দাস।

(১৩২)

১। কবিকঙ্কণ চৈতন্য-পারিষদদের নামের মধ্যে লিখিয়াছেন—

রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর। লক্ষ্মী কে ও তার পরিচয় কোথায় পাওয়া যায় ?

২। শিব যে শিঙ্গা ডমরু ও সর্প ধারণ করেন ও ধুতুরা ভাং খান তার শাস্ত্র-প্রমাণ কোথায় ?

৩। শপ দিতে নন্দী কুশ লৈলা হাতে। কোন্ শাস্ত্রে আছে যে শাপ দিবে কুশ-হস্ত হইয়া ?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীমাংসা

(৭৮)

পোকার উপদ্রব হইতে ডালিম রক্ষা।

পোকার উপদ্রব হইতে ডালিম রক্ষা করিবার জন্য আমি কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

ডালিম ফুলের লাল লাল পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িবার কয়েকদিন পরে যখন সেই ফুলের উর্দ্ধভাগ ফলের আকার ধারণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময় নিম্নাংশের ফুলটি ধারাল ছুরি দ্বারা কাটিয়া দিতে হইবে, এই কাজটি অতি সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে; পরে সমস্ত ডালিমটিতে আলগা করিয়া কাপড় জড়াইয়া দিতে হইবে। যেন কোন স্থান দিয়া কীট প্রবেশ না করে। এরূপ ক্ষেত্রে কাপড়ের থলি ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে ফলের বৃদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না; অধিকন্তু থলির মুখ ফলের বোঁটার সহিত সুন্দররূপে সংবদ্ধ রাখা যায়। পরে একটি ছোট কাপড়ের টুকরায় দুই-এক ফোঁটা কেরোসিন তৈল দিয়া ঐ কেরোসিন-মিশ্রিত কাপড়টি লইয়া সপ্তাহ অন্তর এক একবার ডালিমটি মুছিয়া দিতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে ডালিম পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা করা যায়।

সর্ব্বাগ্রে ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া চাষ করিতে পারিলে পোকার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ডালিম শুষ্ক আবহাওয়া ও বালুকাময় উচ্চভূমির ফসল। নিম্নাঙ্গে ইহার আবাদ করিতে হইলে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৪ হাত জায়গা ২ হাত গভীর করিয়া খুঁড়িতে হইবে, এবং ঐ গর্ত্তে টালি বা ইট বিছাইয়া তার মধ্যে বালি, গোয়ালের আবর্জ্জনা খৈল ও হাড়ের গুঁড়া দ্বারা গর্ত্তটি পূর্ণ করিতে হইবে। পরে একটি ডালিম-চারার মূল শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া উক্ত স্থানে রোপণ করিতে হইবে; ইহাতে রসের প্রাচুর্য্য-হেতু পোকা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীরামচরণ গুহাইত।

(৭৯)

বেঙ্গলা।

মহাভারতে, সভাপর্ব্বের ৩০ অধ্যায়ে—"বেণ্বা-তটের" নাম পাওয়া যায়:—

"কোশলাধিপতিঞ্চৈব তথা বেণ্বা-তটাধিপম্
কান্তারকাংশ্চ সমরে তথা প্রাক্‌কোশলান্ নৃপান্।"

এই বেণ্বা নদীর বর্ত্তমান নাম "বেনগঙ্গা"। নাগপুরের পূর্ব্বদিক হইতে উৎপন্ন হইয়া, এ নদীটি গোদাবরীতে পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, এ বেন-গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানই "বেঙ্গলা"।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(৮০)

পুকুর কাটার নিয়ম।

শাস্ত্রে এ বিষয়ে কিছু বলে কি না তা আমার জানা নাই। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও মিষ্টার রাভেন্‌শার মত এই—গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে-সকল উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ পুরাতন দীঘি ও পুকুর দেখা যায়—তা হিন্দু-বৌদ্ধ শাসনকালের পরিচয়। অক্ষয়বাবুর মতে—আমরা ঐ-সকল দীঘি ও পুকুর অনুকরণ করিয়া আজকাল উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ পুকুর ও দীঘি কাটাইয়া থাকি।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(৮৫)

কলিঙ্গদেশের স্থান নির্ণয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই কলিঙ্গদেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন। অশোকের কলিঙ্গবিজয় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু (অশোক, অষ্টম অধ্যায়) ইহার নানা বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। "মহাভারত হরিবংশ ও কালিদাসের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে একসময় সমগ্র উৎকল প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কাল সহকারে এই সীমা ক্রমশই খর্ব্ব হইয়াছিল।"

"ভারতগৌরব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ত্রিকলিঙ্গ অর্থে তিনটি কলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গের অপভ্রংশ উৎকল।"

"প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণকালে কলিঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি কোঙ্গোদ প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকেই বর্ত্তমান গঞ্জাম প্রদেশকে কোঙ্গোদ রাজ্য বলিয়া অনুমান করেন।"

শ্রীসুহাসিনী শ্যাম।

(৮৭)

গাছের অস্বাভাবিক শাখা ও ফল।

ইহা প্রকৃতির একপ্রকার খেয়াল। ইহাতে অন্য কোন প্রকার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে-সমুদয় উপকরণ (elements) লইয়া এই তালের কাঁদি বৃক্ষের ভিতরে প্রস্তুত হয়, তাহা, কোন প্রকারে নিম্নদিকে চলিয়া আসিয়াছিল, এবং তাহা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতেই আবার আপনাহইতে নূতন কাঁদি বাহির করিয়া দিয়াছে। শাখা সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু।

এই উত্তর বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অন্য একজন বাংলায় ও ইংরেজিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেটি হারাইয়া গিয়াছে তিনি অনুগ্রহ করিয়া সেটি পুনরায় পাঠাইলে ছাপা হইবে। —প্রবাসীর সম্পাদক।

(৮৯)

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকের জুতা।

প্রাচীনভারতে স্ত্রীলোকের জুতা ব্যবহার করিবার কথা 'শূদ্রক' কবির 'মৃচ্ছকটিক' নামক রূপকে পাওয়া যায়। চতুর্থ অঙ্কেও বিদূষক বসন্তসেনার প্রাসাদ দেখিতে দেখিতে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ভবতি! এষা পুনঃ কা ফুল্লপ্রাবারক-প্রাবৃতা উপানদ্-যুগলনিক্ষিপ্ততৈলচিক্কণাভ্যাং পাদাভ্যামুচ্চাসনে উপবিষ্টা তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ 'ওগো, ঐ যে উঁচু আসনে ফুলো কাপড়ে গা ঢেকে, তেলা পা দুখানা জুতার মধ্যে দিয়ে স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছেন, উনি কে?" এই স্ত্রীলোকটি বসন্তসেনার বৃদ্ধা মাতা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(৯০)

চিনি প্রস্তুত প্রণালী।

চিনি প্রস্তুত করিবার দেশী প্রণালী নানা রকমের আছে। যাঁহাদের ইচ্ছা হয় "The Sugar Industry of the United Provinces of Agra & Oudh" by S. M. Hadi, M. R. A. C., M. R. A. S. পড়িয়া দেখিবেন। প্রক্রিয়াটি সংক্ষিপ্তভাবে Wattএর "Commercial Products of India"তে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

(৯৫)

কাগজ।

কাগজের প্রথম আবিষ্কার হয় চীন দেশে ১০৫ খৃষ্টাব্দে। চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন লেখক ভারতে কাগজের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ৬৩০ বৎসর পূর্ব্বে শিয়ালকোটে কাগজ প্রস্তুত হইত বলিয়া স্থির হইয়াছে। Nicoto Conti পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি বলেন এক কাম্বে ব্যতীত আর কোথাও তখন কাগজের ব্যবহার ছিল না।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম।

(১০২)

বিক্রমপুরের ধানুকা গ্রামের ইতিহাস।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সময় দক্ষিণ বিক্রমপুর নানা বিষয়ে কিরূপ উন্নত ছিল, তা ঐতিহাসিকদের নিকট অজ্ঞাত নহে। স্থাপত্য শিল্পে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে তখনকার সময়কে বিক্রমপুরের "গৌরবময় যুগ" বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অভিহিত করিয়াছেন।

চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রভৃতির কীর্ত্তির কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দক্ষিণ বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে গুপ্তাবস্থায় আছে। ধানুকার মাটির নীচের দালান প্রভৃতি তাঁহাদের সময়কার বলিয়াই মনে হয়।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(১০৩)

নারিকেল তৈল প্রস্তুত প্রণালী।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে গাছ হইতে "কাটঝুনো" নারিকেল পাড়াইয়া যে সমস্ত নারিকেলের ভিতর জল নাই বুঝা যাইবে সেইগুলিকে কুড়ুল দিয়া চিরিয়া উত্তমরূপে রৌদ্রে শুখাইতে হইবে। পরে "মালা" হইতে নারিকেল টুক্‌রা টুক্‌রা উঠাইয়া বঁটিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুনরায় রৌদ্রে উত্তমরূপে শুখাইতে হইবে। যাহাতে রাত্রে শিশির লাগিয়া নরম না হইয়া যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একমাস রৌদ্রে ভাল করিয়া শুখাইবার পর ঘানিতে ভাঙ্গাইয়া আনিলে উৎকৃষ্ট তেল হয়।

ঐ তেলকে সুগন্ধি করিতে ইচ্ছা থাকিলে ঘানিতে ভাঙ্গাইবার পূর্ব্বে নিয়মিত দুই মাস প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত, নারিকেল-খণ্ডগুলির সহিত কোনরূপ সুগন্ধযুক্ত ফুল মিশাইতে হয়। যখন ঘানি হইতে ফিরিয়া আসে তখন তেলে ঐ ফুলের সদ্যপ্রস্ফুটিত গন্ধ কুসুম-রাজির মধ্যে আমোদ করিতে থাকে।

শ্রীনীহারিকা দেবী।

শ্রীশরৎকান্ত সান্ন্যাল।

প্রথমে নারিকেলের শাঁস উত্তমরূপে বাঁটিয়া লইতে হয়, পরে যে কোনও পাত্রে খানিকটা জল অগ্নির উত্তাপে বেশ করিয়া ফুটাইয়া উহাতে পূর্ব্বোক্ত নারিকেল-বাটা মিশ্রিত করিতে হয়। পূর্ব্বদিন রাত্রে উল্লিখিত উপায়ে নারিকেল ও জল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে পরদিন প্রাতে উহা বেশ জমিয়া থাকে। অতঃপর ঐ জমাট বাঁধা অংশটি অগ্নিতে জ্বাল দিয়া উহার জলীয় অংশ শুকাইয়া লইলেই উত্তম তৈল প্রস্তুত হয়। নারিকেলপাতা আমের পাতা কিম্বা তুষ দ্বারা মৃদু জ্বাল দেওয়া উচিত। ইহা আমাদের নিজের পরীক্ষিত।

শ্রীবিনয়েন্দ্রকিশোর গুপ্ত।

শ্রীমোহিতমোহন রায়চৌধুরী।

নারিকেল ভালরূপে কুরিয়া পরে শিলে বাটিয়া শক্ত কাপড়ের দ্বারা তাহা হইতে দুধ নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়। পরস্ক দুধ জ্বাল দিবার নিয়মে সেই দুধ জ্বাল দিলে সহজে নারিকেল তৈল পাওয়া যায়। জ্বাল দিবার পর আর-একবার ছাঁকিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

শ্রীসুধাংশুভূষণ পুরকাইত।

শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

শ্রীজগন্নাথ দাস।

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু।

(১০৪)

চোখের খুব কাছে বই পড়া।

আমাদের চক্ষুর গঠন অনেকটা ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মত। ক্যামেরাতে একটা বা দুইটা লেন্সের সাহায্যে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব আসিয়া পিছনে একটা কাচের পর্দ্দার উপরে পড়ে—এই পর্দ্দাটি ঘষা কাচের। ঘষা কাচের পর্দ্দার উপরে প্রতিবিম্ব যে অবস্থায় (স্পষ্ট বা অস্পষ্ট) আসিয়া পড়ে তাহারই উপরে ফটোগ্রাফের চিত্রের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নির্ভর করে। সাধারণ ক্যামেরাতে ঘষা কাচের পর্দা হইতে লেন্সের দূরত্ব ইচ্ছানুসারে বাড়ান বা কমান যায়। ঘষা কাচে যে-কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব ফেলিতে হইলে লেন্সটা এদিকে ওদিকে সরাইয়া এমন একটি স্থান পাওয়া যায় যেখানে লেন্সটা থাকিলে প্রতিবিম্বটি সবচেয়ে স্পষ্ট হয়। এই অবস্থাকে ঐ নির্দ্দিষ্ট বস্তুর ফোকাস্ বলে, ফোকাস্ করা অবস্থা হইতে লেন্স সম্মুখে বা দূরে সরাইলে প্রতিবিম্ব আবার ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে থাকে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে দূরত্ব হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ফোকাসও বিভিন্ন স্থলে হইবে। এই-সব ক্যামেরাতে ছবি তুলিবার সময় প্রত্যেক দর্শনীয় বস্তু বা দৃশ্যের ফোকাস নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। আর-এক রকম ক্যামেরা আছে তাহার নাম Fixed Focus Camera অর্থাৎ তার বন্দোবস্তই এমনি যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের (দুই তিন ফুট বা এমনি কিছু) বাহিরের যে-কোন বস্তু হিসাবে ক্যামেরা ফোকাস করাই আছে, অর্থাৎ ঐ দূরত্বের বাহিরের যে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সর্ব্বদাই স্পষ্ট হয়—লেন্স এদিকে ওদিকে সরাইয়া লইয়া আবার ফোকাস করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের ভিতরের কোন বস্তু উহাতে প্রতিবিম্বিত হইবে না, তাহার ছবিও এই ক্যামেরাতে উঠিবে না, লেন্স সরাইবার বন্দোবস্তও এই ক্যামেরাতে নাই। আমাদের চক্ষু ঠিক এই স্থিরনির্দ্দিষ্ট-ফোকাস ক্যামেরার (Fixed Focus Camera) মত। চক্ষুর তারকা হইল লেন্স, চক্ষুর পর্দ্দা (Retina) হইল ঘষা কাচের পর্দ্দা। এ স্থলেও ঘষা কাচের পর্দ্দা হইতে লেন্সের দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ফোকাস স্থিরনির্দ্দিষ্ট হওয়ার দরুণ একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের বাহিরের যে-কোন বস্তু আমরা স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাই, কিন্তু স্থিরনির্দ্দিষ্ট-ফোকাস ক্যামেরার মতই ঐ নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের ভিতরের বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। কাজেই অত্যন্ত সম্মুখের বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। সেইজন্যই "কোনও লেখা চোখের যতই সাম্‌নে আনিয়া পড়িতে চেষ্টা করা যায়, উহা ততই অস্পষ্টতর হইয়া উঠে।" প্রশ্নকর্ত্তার বলা উচিত ছিল "একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব হইতে যতই সাম্‌নে।"

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

শ্রীদুর্গেশনন্দিনী গুপ্ত।

আমরা যে জিনিষ দেখি, চোখের ভিতরে তার ছায়া পড়ে বলিয়া তাহা দেখা যায়। জিনিষট ও চক্ষুর ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুসারে ছায়া স্থান-পরিবর্ত্তন করে এবং ঐ ব্যবধানের উপরই ছায়ার স্পষ্টত্ব নির্ভর করে। সেইজন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে লেখা ধরিলেই আমরা ভাল পড়িতে পারি। সেই দূরত্ব বাড়াইলে বা কমাইলে লেখা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া উঠে। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন চোখের পক্ষে পৃথক। সেইজন্য দেখা যায়, কোন ব্যক্তি চোখের খুব কাছে আনিয়া বই পড়েন আবার কেহ বা অপেক্ষাকৃত দূরে রাখিয়া ভালরূপ পড়িতে পারেন। প্রত্যেকের পক্ষেই একটা আন্দাজ দূরত্ব আছে, যেখানে লেখা ধরিলে তার পক্ষে পড়া সব চেয়ে সুবিধা, তার চেয়ে দূর বেশী বা কম হইলেই লেখা অস্পষ্ট হয়। এই কারণে লেখা চোখের খুব কাছে আনিলে পড়া যায় না।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

(১০৫)

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সময় নির্ণয়।

ছায়া=২; শূন্য=১; বেদ=৪; শশী=১। অঙ্কস্য বামা গতি—এই নিয়মে পড়িলে দাঁড়াইল ১৪১২ শক।

শ্রীঊষাবালা দেবী।

সাঙ্কেতিক অঙ্ক লেখার প্রধান নিয়ম "অঙ্কস্য বামা গতি" অর্থাৎ অঙ্ক দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে অগ্রসর হইবে।

ছায়া আলোকের অভাব। এজন্য ছায়া শব্দ অভাব অর্থাৎ শূন্য, বুঝাইতেছে। অতএব অঙ্কটির সর্ব্বদক্ষিণে শূন্য, তার বামে শূন্য, তার বামে "বেদ" অর্থাৎ "চারি", তার বামে "শশী" অর্থাৎ "এক"। সুতরাং ১৪০০ শক সূচিত হইতেছে।

ছায়া সূর্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী। এজন্য ছায়া শব্দে দুই ধরিয়া লও। যায়। সেক্ষেত্রে ১৪০২ শক বুঝাইবে।

উক্ত সাঙ্কেতিক বাক্যের একটি পাঠান্তর আছে তাহা "ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক" সেক্ষেত্রে ঋতু অর্থে ছয় ধরিতে হইবে; এবং ১৪০৬ শক বুঝাইবে।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

(১০৬)

শান্তিপুরের প্রকৃত নাম।

শান্তিপুরের নাম ছিল শক্তিপুর। অদ্বৈতাচার্য্যের সময় ইহার নাম হয় শান্তিপুর।

শ্রীবিশ্বমোহন সান্ন্যাল।

(১০৭)

বাৎস্য-গোত্রীয় ছান্দড়ের পদবী।

বাৎস্য, সাবর্ণ, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয়—মোট ৫ গোত্রীয়—৫জন ব্রাহ্মণকে মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে 'গৌড়ে' আনয়ন করেন। আদিশূরের পুত্র ভূশূর উপরোক্ত পাঁচ গোত্রীয় পাঁচজন বংশধর, অর্থাৎ 'ছান্দড়', 'বেদগর্ভ', 'দক্ষ', 'শ্রীহর্ষ' ও 'ভট্টনারায়ণ'কে রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দেন। তখন পর্য্যন্ত পদবীর সৃষ্টি হয় নাই।

রাঢ়দেশগামী ছান্দড়াদির ৫৯ পুত্র জন্মে। ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর তাঁহাদের বসবাসের জন্য ৫৯খানি গ্রাম দেন। ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর, এই ৫৯-গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে—মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, মুখৈটি, বন্দ্য, চট্ট ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময়কার মুখৈটি, বন্দ্য, চট্ট, ইত্যাদি পদবীই আজকাল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" পুস্তক পাঠে, এসম্বন্ধে আরও অনেক খবর জানা যায়।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(১০৮)

বেতের জিনিষে পাকা রং।

পচা-পাঁক-পূর্ণ পুকুরের জলে বেত ভিজাইয়া রাখিলে তাহাতে পাকা রং হয়।

শ্রী[illegible]ভূষণ দত্ত।

(১০৯)

নিব তৈয়ারীর কল।

নিম্নের ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে, নিব তৈয়ারীর কল ইত্যাদির সব খবর জানা যায়।

The Bengal Small Industries, Co.
91, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

নিব তৈয়ারীর কলের জন্য, ইউ দেব, ৩৯।১ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা বা মিস্ত্রী রাম খেলওয়ারী, ছাপরা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। Cover (envelope) খাম কাটিবার কল ওরিএন্টাল মেসিনারি সাপ্লাই কোং, ২০।১ লালবাজার, কলিকাতা (Oriental Machinery Supply, Co., 20-1 Lal Bazar St., Calcutta বা Set Dass & Co., 74 Beadon St., Calcutta বা Baldeo Lal, Taylor Road, Gaya ঠিকানায় পাইবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্ন্যাল।

(১১০)

পদার্থে-পদার্থে ঘর্ষণে শব্দের কারণ।

বায়ুমণ্ডলে একপ্রকার তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিলে শব্দ শ্রুত হয়। পদার্থে-পদার্থে আঘাত কিম্বা ঘর্ষণ দ্বারা বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গসম্পাত হয় বলিয়াই শব্দ হইয়া থাকে। এবং বিভিন্ন পদার্থের আঘাতজনিত তরঙ্গ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এজন্য শব্দও বিভিন্ন প্রকারের হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

কোনও পদার্থকে অন্য কিছু দ্বারা আঘাত করিলে বা ঘর্ষণ করিলে তাহার অণুতে অণুতে কম্পন উপস্থিত হয়; এই অণুকম্পন প্রথমে সংলগ্ন বায়ুস্তরে, তাহা হইতে স্তরান্তরে, এইরূপে বায়ুমণ্ডলের অনেকদূর অবধি পরিব্যাপ্ত হয় এবং শ্রোতার কর্ণপটহে আঘাত করিয়া শব্দানুভূতির সৃষ্টি করে। যে সুরটি উৎপন্ন হয় তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পন-সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবং তাহার quality নির্ভর করে উৎপত্তিস্থানের উপর। নারীকণ্ঠের প্রথম সপ্তকের 'সা' আর পুরুষকণ্ঠের প্রথম সপ্তকের 'সা' বা লোহার তারের 'সা' এবং পিত্তলের তারের 'সা' সুরে এক, কিন্তু quality-তে এক নহে।

শ্রীদুর্গেশনন্দিনী গুপ্ত।

(১১১)

দেবতার কাছে ধন্না বা হত্যা।

দেবতার সম্মুখে 'ধন্না' বা 'হত্যা' দেওয়ার অর্থ—মৃত্যুপণ করিয়া ভূমিশয্যায় দেবতার সম্মুখে পড়িয়া থাকা। ইহার অর্থ—আমার প্রার্থনা পূরণ না করা পর্য্যন্ত আমি দেবতার চরণ 'ধারণ' [illegible]

পড়িয়া থাকিব এবং দেবতার দয়া না হইলে তাঁহার সম্মুখে 'হত্যা' হইব।

শ্রীসুধাংশুভূষণ পুরকাইত।
শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

(১১২)

বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম নাটক।

"কলিকাতার যাত্রা" নামক একখানি বাংলা নাটক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়, এবং উহাই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম নাটক।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও রামগতি ন্যায়রত্নর মতে:—বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বপ্রথম নাটকের নাম—"কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব।" উহার রচয়িতার নাম রামনারায়ণ তর্করত্ন। স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে এ নাটকখানা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টেল সেমিনারী গৃহে অভিনীত হয়।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

(১১৪)

সূতার পাকা রং।

লাল, নীল অথবা যে কোন রং জলে গুলিয়া তাহাতে সূতা ভিজাইতে হইবে এবং তাহাতে পরিমাণমত খানিকটা দুধ দিয়া কিছুক্ষণ ফুটাইয়া শুকাইয়া লইলে রং উঠিবে না। জ্বালের সময় একটু খয়ের দিলে রং আরও পাকা হয়। এখানে রাজসাহীর কোন গ্রামে নূতন তাঁতশালায় শুধু লাল রং দিয়া সূতা রঞ্জিত করিয়া পাড় বুনা হইত কিন্তু তাহা উঠিয়া যাইত, এখন আমার কথা মত সূতা রং করিয়া কাপড় বুনিয়া বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা পরীক্ষিত। নীলরঙে সূতা ভিজাইয়া তার মধ্যে কয়েকটি আমলা ছেঁচা করিয়া দিয়া ঐরূপ দুধ দিয়া ফুটাইয়া লইবেন। সূতা ফুটাইয়া লইলে শক্তও হয়। ১৩২০ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রের অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় জনৈক রাসায়নিকের লিখিত "সূতা রঞ্জন প্রণালী" প্রবন্ধ দেখুন। তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সূতা রং করিবার উপায় লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সান্যাল।

সূত্র রঞ্জিত করিবার উপায়। আজকাল বাস্তবিক দিশি কাপড়ের পাড়ের রঙ খুব শীঘ্র উঠিয়া যায়। সূতাতে বিশেষ পাকা রঙ করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। গত পৌষ ও মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা তাহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা দুই-একটি পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা নির্ণয় করিয়াছি। তৎসম্বন্ধে আমরা আর অধিক বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি না। প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত দুই সংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীবিশ্বকর্ম্মার "ইঙ্গিত" পাঠ করিলে সকল বিষয় দেখিতে পাইবেন

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু।

পৌষের প্রবাসীর দেশবিদেশের কথায় (বাংলা) আছে যে, পোষ্ট চকরিয়া—জেলা চট্টগ্রাম নিবাসী এক্‌, এন্‌ চৌধুরীর নিকট এক প্রকার পাকা রংএর সূতা পাওয়া যায়। এই সূতা একরকম পাহাড়ে গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। সূতার রং স্থায়ী। কাপড়ের পাড়ে ঐ সূতা দেওয়া চলে। তাঁহার নিকট পত্র দিলে নমুনা পাওয়া যায়।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

পাকা রঙের প্রস্তুত-প্রণালী শিখিবার জন্য Dyeing of Cotton Fabrics by Beach এবং Dyeing Textile Fabric by Owen—এই বই-দুখানি পড়িতে পারেন। T. N. Chackravartyর পাকা রং প্রণালী, মূল্য ৵০, প্রাপ্তির ঠিকানা Homeo Research Hall—P.O. Brahmangaon, Dacca—বইখানা পড়িতে পারেন। Pure Soda—?, Alum (ফিটকিরি) ১০, Plumby Acilas ৯, Dist. Water ১৫, এই অনুপাতে প্রথমে রং পাকা করিবার আরক প্রস্তুত করিয়া লইয়া রংয়ের সহিত মিশাইয়া লইলেই পাকা হইবে। এই ভাবের অনেক প্রকারের formula আছে; অনেকগুলি পরীক্ষায় বেশ ভাল হইয়াছে, প্রয়োজন বোধ করিলে আমাকে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।
Dumkal, মুর্শিদাবাদ।

(১১৫)

বাল্মীকির মাতার নাম।

বাল্মীকির মাতার নাম সুমতি।

শ্রী।

উপনিষৎ

দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ একটাকা।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ. আমাকে তাঁহার পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার উপনিষদের আলোচনাতে শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি এই চারখানা উপনিষদের মূল সংস্কৃত, এবং তাঁহারই রচিত একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ আছে।

উপনিষদের আলোচনা দেশে ক্রমশই বাড়িতেছে ইহা আনন্দের বিষয়। এখন ইহার নানারূপ ভাল ভাল সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার চেষ্টাও লক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পর্যাপ্ত নহে। যাঁহারা বাহুল্যের মধ্যে যাইতে চান না, বা তাহার জন্য সময় পান না, এরূপ পাঠকগণের অনুকূল সংস্করণ বাঙ্গলায় খুব কমই আছে। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের আলোচ্য সংস্করণটি এই অভাবের খানিকটা দূর করিবে ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

সংস্করণ ক্ষুদ্রই হউক, আর বৃহৎই হউক, সাধারণেরই জন্য হউক বা বিশেষজ্ঞেরই জন্য হউক, তাহা সুবিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। টীকা বা অনুবাদ যাহাতে মূলকেই অনুসরণ করে,—মূল কি বলিতেছে তাহা যথাযথভাবে প্রকাশ করে, এবং মূলের অতিরিক্ত যাহা কিছু ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক হয় তাহা যাহাতে মূলের সহিত মিশিয়া না যায়, কোন্‌টা মূল, আর কোন্‌টাই বা মূলের বাহিরের কথা, ইহা যাহাতে পাঠক সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, টীকাকারের ও বিশেষত

অনুবাদকের সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। মূলে যাহা নাই অনুবাদে তাহা দেওয়া ঠিক নহে। মূল বুঝিবার জন্য যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের জন্য টীকায় ও অন্যদের জন্য পাদটীকায় দেওয়া যাইতে পারে। অনুবাদের মধ্যে ইহার স্থান হইতে পারে না, কারণ পাঠক ইহাতে ভ্রান্ত হইতে পারেন যে, ঐ ব্যাখ্যার অংশও মূল উপনিষদেরই অন্তর্গত। যদি বা অনুবাদেরই মধ্যে কোনো অতিরিক্ত কথা বসাইতে হয় তবে তাহা এরূপভাবে চিহ্নিত করা উচিত যাহাতে মূল ও মূলের অতিরিক্ত কথাটা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সংস্করণে অনেকস্থানেই ইহা করা হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানির প্রথমেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাহার প্রথম শ্লোকটি তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুবাদের সহিত উদ্ধৃত করিতেছি :—

মূল

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্ম কি কারণ? অথবা পরশ্লোকে উক্ত কালাদি? আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি? কি হেতুতে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছি? প্রলয়কালে কোথায় থাকি? কি হেতুতে আমরা সুখদুঃখ বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমান থাকি?"

এখানে 'অথবা পরশ্লোকে উক্ত কালাদি' ও 'প্রলয়কালে' মূলে নাই, তাই অনুবাদের মধ্যে ইহা দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

যদি "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা" ইত্যাদি পরশ্লোকের সহিত আলোচ্য প্রথম শ্লোকটির অন্বয় থাকে তো টীকায় তাহা বলিলেই হইতে পারিত। টীকাকারদের অনেকে অনেকরূপে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় ঐসব ব্যাখ্যার একটিকে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে দোষ দিই না; কিন্তু আমার মনে হয়, যতদূর সম্ভব মূলকেই অনুসরণ করিতে পারিলে ভাল হইত। মূলের অনুসারে আলোচ্য অংশটুকুর 'কারণ কি ব্রহ্ম?' এইমাত্র অনুবাদ করিলেই পর্যাপ্ত হয়। 'ব্রহ্ম কি কারণ?' 'কারণ কি ব্রহ্ম?' ইহাদের মধ্যে ভেদ আছে। 'ব্রহ্ম কি কারণ?'—বলিলে বুঝাইতে পারে 'ব্রহ্ম কারণ অথবা কারণ নহে?' ইহাতে বুঝাইতে পারে 'ব্রহ্ম কিরূপ কারণ, উপাদান কারণ বা নিমিত্ত কারণ?' আর 'কারণ কি ব্রহ্ম?'—ইহা বলিলে বুঝায় 'কারণ কি ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু?' আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এখানে এই শেষোক্ত প্রশ্নই অভিপ্রেত।

প্রথম শ্লোকে (জগতের) কারণ ব্রহ্ম কি না এই প্রশ্ন হইলে দ্বিতীয় শ্লোকেরও সহিত ইহার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে বলা হইতেছে কাল-স্বভাব প্রভৃতি যে কারণ (বলিয়া কথিত হয় তাহা) চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

'জীবাম কেন' ইহার অনুবাদ 'কাহা দ্বারা জীবন ধারণ করি' এইরূপ করিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত ও পরিষ্কার হইত। "কি হেতুতে..." বলায় অস্পষ্ট থাকিয়া গিয়াছে। এই শ্লোকের মূলের 'অধিষ্ঠিতাঃ' পদটি আলোচ্য টীকা ও অনুবাদ উভয়স্থলেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

চতুর্থ শ্লোকের টীকা ও অনুবাদে মূলের 'নেমি' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'চক্রনাভি' (পৃ-৩)। ইহা ঠিক নহে। নেমি বলিতে চাকার গোল বাহুটা (Circumference or ring of a wheel) বুঝায়, নাভি (nave) নহে। অন্যত্র (কৌষী ৩,৮; পৃ-১১০,১১১) এই দুই শব্দের অর্থ ঠিকই করা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১-২; পৃ ৩৪-৩৫) "বায়ুঃ সন্ধানম্" ইত্যাদি স্থলে 'সন্ধান' শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে 'সংযোগকর্ত্তা', কিন্তু বস্তুত ইহার অর্থ হইতেছে যাহা দ্বারা সন্ধি বা সংযোগ করা যায় (সন্ধীয়তে অনেন ইতি সন্ধানম্—ভাষ্যকার)। অতএব 'সন্ধান' শব্দের অর্থ সংযোগের কর্ত্তা নহে, সংযোগের কারণ। অনুবাদে কয়েকস্থলে আবার 'সংযোগের কারণ' লিখিত হইয়াছে। কারণ ও করণ ঠিক এক নহে।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি" (১।৩, পৃঃ ৬৮।৬৯) ইহার টীকা ও অনুবাদে মিল নাই; টীকা ঠিকই হইয়াছে, অনুবাদটা ঠিক হয় নাই। 'জল যেরূপ নিম্ন স্থানে যায়' না হইয়া 'জল যেরূপ নিম্ন স্থান দিয়া যায়' হইবে।

৬৮শ পৃষ্ঠায় ফুটনোটের ভাষ্যকারের বাক্যটি উদ্ধৃত করিতে ভুল হইয়াছে। "অহানি কস্মিন্ জীর্য্যন্তি" হইবে।

'ভূতি' শব্দের অর্থ (৭৮ পৃঃ) ভাষ্যেও 'বিভূতি' করা গিয়াছে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে লিখিত হইয়াছে 'মহত্ত্ব'। ইহার সমর্থক কিছু দেখা যায় না। এইরূপ 'শ্রী' ("শ্রিয়া") শব্দের (পৃঃ ৭৯) অর্থ 'বৃদ্ধি', এবং 'আযুক্ত' (পৃঃ ৮০) শব্দের অর্থ 'স্তব্ধ' কেন করা হইয়াছে জানিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথমে "সহ নাববতু" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রে (পৃঃ ৮২-৮৩) কিছু আলোচনা করিবার আছে। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও বলিবেন তিনি এখানে ভাষ্যকারকে অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে কোনো ক্ষতি নাই। আলোচ্য শান্তির

"সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।"

এই অংশের অনুবাদ করা গিয়াছে—

'আমরা উভয়ে যেন সামর্থ্য লাভ করি। আমাদের দুজনকার জ্ঞান বর্দ্ধিত হউক। আমরা দুজনে কলহ করিব না।'

'বীর্য্য' শব্দে আমার মনে হয় এখানে 'উদ্যম' 'উৎসাহ'। আচার্য্য ও শিষ্য উভয়েই বলিতেছেন, আমরা উভয়েই একসঙ্গে উদ্যম করি। কেবল আচার্য্যের বা কেবল শিষ্যের উদ্যমে হইবে না, উভয়েরই একসঙ্গে উদ্যম করা চাই। তবেই আচার্য্যের অধ্যাপন ও শিষ্যের অধ্যয়ন ঠিক হইতে পারে। ভাষ্যেও সামর্থ্য-করারই কথা আছে ("সামর্থ্যং করবাবহৈ"), সামর্থ্য লাভ করার কথা নহে। সামর্থ্য-করা হইল সাধন, আর সামর্থ্য-লাভ হইল ফল। এখানে সাধনেরই কথা বলা হইতেছে, ফলের নহে।

'আমাদের দুজনার জ্ঞান বর্দ্ধিত হউক।' এ অনুবাদটা মোটেই হইতে পারে না। ভাষ্যকারও এখানে কষ্টকল্পনা করিয়াছেন। "তেজস্বি নাবধীতমস্তু" (তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু)। ইহার ভাষ্য হইতেছে এই— "তেজস্বি নৌ আবয়োঃ তেজস্বিনোঃ অধীতং স্বধীতম্ অস্তু।" ইহার অর্থ—তেজস্বী আমাদের দুজনের অধ্যয়ন সু-অধ্যয়ন হউক। ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "'তেজস্বি' জ্ঞানম্ 'নৌ' আবয়োঃ 'অধীতম্' বর্দ্ধিতম্।" অর্থাৎ 'তেজস্বি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' (!), 'নৌ' শব্দের অর্থ 'আমাদের দুজনের, আর 'অধীতম্' শব্দের অর্থ 'বর্দ্ধিত' (!)। এখানেও টীকা নিষ্প্রয়োজন। পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমার মনে হয় সাদাসিদে যে অর্থটা পাওয়া যাইতেছে, তাহাই অতি সুন্দর—'আমাদের অধ্যয়নটা যেন তেজস্বী হয়!'

"মা বিদ্বিষাবহৈ" এখানে তত্ত্বভূষণ মহাশয় 'বিদ্বেষ' অর্থে 'কলহ' করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্বেষ ও কলহ এক নয়।

কৌষীতকি-উপনিষদে (২-৩; পৃঃ ১৫৩) আছে "বাচং তে ময়ি

জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রাণং ত্বে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা।..." ইত্যাদি। এখানে "অসৌ" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "অয়ং কামঃ।' কিন্তু বস্তুত ইহার অর্থ হইতেছে 'অমুক'; অর্থাৎ যাহার (যে পুরুষের বা যে স্ত্রীর) প্রিয় হইবার জন্য আজ্যের আহুতি দেওয়া হয় তাহারই নামটি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে এরূপ অনেক স্থানে আছে।

"যৎ তে সুসীমং হৃদয়মধি চন্দ্রমসি স্থিতম্" (ঐ, ২-৫; পৃঃ ১৫৯); "যৎ তে সুসীমে হৃদয়ে" (২ ৬; পৃঃ ১৬৩)।—এখানে 'সুসীম' বস্তুত 'সুশীম', ইহার অর্থ 'শীতল'; 'শোভনাকার' বা 'সুন্দর' নহে।

এই পৃষ্ঠাতেই "অস্তং যন্তং (...আদিত্যম্) [উপতিষ্ঠেৎ]," এখানে উপতিষ্ঠেত লেখা উচিত ছিল, উপতিষ্ঠেৎ হয় না।

"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত" (ঐ ৩-৮; পৃঃ ১৯০-১৯১), ইত্যাদি স্থলে 'বিজিজ্ঞাসীত' শব্দের অর্থ 'জানিতে চেষ্টা করিবে' না লিখিয়া 'জানিতে ইচ্ছা করিবে' লেখা উচিত ছিল।

"জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি" (ঐ ৪-১; পৃঃ ১৯৪)। এখানে প্রথম 'জনক' শব্দের অর্থ 'রাজা জনক' ঠিকই হইয়াছে। দ্বিতীয় 'জনক' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'পালয়িতা'। তত্ত্বভূষণ মহাশয় টীকাকারকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহাই হউক, দ্বিতীয় 'জনক' শব্দও রাজা জনককেই বুঝাইতেছে। এ কথাটা যে বৃহদারণ্যক (২-১-১) হইতে ঠিক তোলা হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।* কথাটার আসল অর্থ হইতেছে "লোকেরা 'জনক! জনক!' এই বলিয়া (তাঁহার নিকটে) ধাবিত হয়।" তাৎপর্য্য এই যে, জনক রাজা ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিতেও খুব উৎসাহী, আর দান করিতেও খুব উৎসাহী, তাই লোকেরা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য অন্য কাহারো নিকটে না যাইয়া তাঁহারই নিকটে ধাবিত হইত।

স্থানে স্থানে ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। অনবধানতায় একই অংশে একটি শব্দ বহুবার অশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। কৌষীতকিতে (৩·৫; পৃঃ ১৮৩—১৮৫) মূলে আছে 'উদূঢ়ং' (উদ্-বহ্)। ইহা সেখানে ৭ বার প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সংস্করণে মূল ও টীকায় সর্ব্বত্র তাহা মুদ্রিত হইয়াছে 'অদূঢ়ঠং'।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় শঙ্করাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া নিজের টীকা লিখিয়াছেন, তাই তাহার নাম দিয়াছেন শঙ্কর-কৃপা। কিন্তু দেখা যায় তিনি তাহা সর্ব্বত্র অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে পাঠকদের মনে শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই:—

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২·১) আছে—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতেই পারে না, ইহা বলি না, কিন্তু তাহা শঙ্করের মতে হয় না। শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপে যুগপৎ (সহ) সমস্ত কাম (কাম্য বস্তু) ভোগ করেন। শঙ্কর "সহ" শব্দকে ধরিয়াছেন "অশ্নুতের" সঙ্গে, আর তত্ত্বভূষণ মহাশয় ধরিয়াছেন "ব্রহ্মণা" পদের সঙ্গে। ইহাতে শঙ্করের মতের মহান্ বিরোধ করা হইয়াছে, এবং সেইজন্যই টীকাটিকে শঙ্কর-কৃপা বলিতে পারা যায় না।

এই জাতীয় ত্রুটীগুলি সংশোধিত হইলে পুস্তকখানি বিশেষভাবে আদৃত হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* "বা উ" স্থানে বৃহদারণ্যকের পাঠ "বৈ"।

নিমন্ত্রণ

মোর বাগানের রোশ্‌নি-ফোটা
ফুলের বাসরে,
ও মেনকা, আয় না নেমে
নাচের আসরে!
পাপ্‌ড়িতে তোর চরণ ফেলে
নাচের টানে পড়্‌ না গলে',
বুকখানি তোর উথ্‌লে উঠুক
নেশার আতরে!

মোর বাগানের আবেগ-তোলা
গন্ধ-গোলাপে,
তিলোত্তমা, আয় না নেমে
গানের আলাপে!
হাওয়াতে তোর আঁচল তুলে
ঘুঙুর বাজাস্ দুলে দুলে,
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে
বায়ুর প্রলাপে!

মোর বাগানের রোশ্‌নি-ফোটা
ফুলের বাসরে,
উর্ব্বশী, তুই আয় না নেমে
নাচের আসরে!
রূপ-দরিয়ায় তুফান-তোলা,
ফাগুন-হোলির আবীর-গোলা,
চুম্ বুলা না ফুলের পাতে
গভীর আদরে!

শ্রীনীহারিকা দেবী।



প্রকৃতির পাঁজি

এটি বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস। শীত কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক থেকে মিষ্টি হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। গাছে গাছে পুরানো পাতা ঝরে গিয়ে হাল্‌কা সবুজ রংএর রাশিরাশি নতুন পাতা কুয়াশাহীন বসন্তের খোলা আলোয় চিকচিক ক'রে জ্বলছে। কলকাতার মতো নীরস ইট-পাথরের তৈরি সহরেও দুটো একটা কোকিল এসে প'ড়ে ডাকতে সুরু ক'রে দিয়েছে, পল্লীগ্রামের ত কথাই নেই। প্রায় সব আমগাছগুলিতেই বোল ধরেছে। খেজুরের রস শেষ হয়ে এলো, কিন্তু আকের ফসল কাটা হচ্ছে, তার রস নিংড়ে এবার নূতন গুড়ের ভিয়ান চড়বে। কলাই, মুগ প্রভৃতি রবিশস্য এখন থেকে কাটা হতে আরম্ভ হবে। এ মাসের তরিতরকারীর মধ্যে নূতন পটল, আলু, ফুট, তরমুজ নাম করবার যোগ্য, তার সঙ্গে দুটো একটা কাঁচা আমও কখনো কখনো জুটতে পারে।

চশমা।

*

জন্‌ ড্যানিয়েল

উপরে যে নাম রহিয়াছে তাহা একটি বনমানুষের, মানুষের নয়। জনের বাপ-মার আদি-নিবাস আফ্রিকার একটা কোনো অন্ধকার জঙ্গলে ছিল। কিন্তু জন্‌ তার বাপ-মার বাসভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়া পুরামাত্রায় সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। টেবিলে খাওয়া আর মশারি খাটানো খাটে শোওয়া আর তোয়ালে দিয়া মুখ ধোওয়া, এ-সব তাহার না হইলে চলিত না। সে অবশ্য জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিয়াই এই-সব একদিনেই আয়ত্ত করিয়া ফেলে নাই। এই-সব শিখাইবার জন্য তাহাকে এবং তাহার শিক্ষকদের যথেষ্ট ক্লেশ এবং পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহাকে খুব ছোট অবস্থায় জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনেন একজন ফরাসী জাহাজের কাপ্তেন। তারপর তাহাকে কিনিয়া আনিয়া ইংলণ্ডে এক চিড়িয়াখানায় রাখা হয়। মেজর রুপার্ট পেনি জীবজন্তুর সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ১৯১৮ সালে জন্‌কে ক্রয় করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আনেন। বাড়ীর একটা ছোট কাম্‌রার চারিদিকে লোহার গরাদ দিয়া খাঁচার মত করিয়া তাহার থাকিবার স্থান হইল। বিদ্যুতের সাহায্যে ঘরটাকে সব সময় বেশ গরম রাখা হইত এবং ঘরের হাওয়া যাহাতে সব সময় বেশ পরিষ্কার থাকে তাহারও উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল।

সমস্ত দিন বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাহার খাঁচা-ঘরের সামনে দিয়া আসা-যাওয়া করিত—গোলমাল করিত। তাহাতে জন্‌ সাহেব অনেকটা নিজের আত্মীয়দের মধ্যেই আছে মনে করিত। কিন্তু রাত্রে যখন সবাই আপন আপন ঘরে চলিয়া যাইত এবং বাড়ী অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ হইয়া উঠিত, তখন জন্‌ ভয়ানক কান্নাকাটি আরম্ভ করিত। এই সময় বোধ হয় তাহার বাবা-মার জন্য মন কেমন করিত, অথবা ভূতের ভয় করিত। কোন্‌টা যে ঠিক তা বলতে পারি না। তাহার কান্না ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পাড়া-প্রতিবেশী এবং বাড়ীর লোকজনদের ঘুমের বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন বাড়ীর একজন লোক জনের খাঁচার সামনে বিছানা করিয়া রাত্রে ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। সেই দিন হইতে জন্‌ নির্ভয়ে ঘুমাইতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে সে আর নিজেকে একলা মনে করিত না। ইহার পর হইতে তাহার ওজন বাড়িতে লাগিল এবং তাহার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল হইতে লাগিল।

জন্‌ খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বেশ সৌখিন ছিল! এক রকম খাবার সে উপরিউপরি তিন দিন খাইতে পারিত না। গরম দুধ তাহার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল এবং এই একটি জিনিষে তাহার কোনদিন বিতৃষ্ণা দেখা যায় নাই। সে



পোষা বনমানুষ—মিঃ জন্ ড্যানিয়েল।

নিজের খাবার নিজেই বাছিয়া লইতে বড় ভালবাসিত। তাহার সাম্‌নে নানা রকমের ফল রাখা হইত, সে তাহা হইতে ইচ্ছামত যাহা ইচ্ছা তুলিয়া লইত। টাট্‌কা ফলের প্রতি তাহার বড় লোভ ছিল। জঙ্গলে বাসি ফল খাইতে হয় না, আর পাওয়াও যায় না, সেইজন্য বাপ-ঠাকুরদাদার আমলের এই বনিয়াদি অভ্যাসটি জন্ ত্যাগ করিতে পারে নাই। ঘরের একটা খুব উঁচু স্থানে একটা তাকের উপর নানা রকমের ফল থাকিত। জন্ মধ্যে মধ্যে সেখান হইতে দু'একটা ফল চুরি করিত। চুরি-করা দ্রব্য সে এত আনন্দে খাইত যে বলা যায় না। চুরি করিয়া কিছু খাইবার পর তাহার মন হঠাৎ খুসী হইয়া উঠিত। ফুলদানে গোলাপফুল রাখিবার জো ছিল না, জনের চোখে পড়িবামাত্র সে তাহা দিব্য আরামে এবং মনের আনন্দে ভোজন করিত। গাছের কচি কচি ডগাও তাহার বড় ভাল লাগিত। সভ্যতার আলোক লাভ করিয়াও জনের মন হইতে আফ্রিকার জঙ্গলের অন্ধকারের মোহ একেবারে কাটিয়া যায় নাই। জন্‌কে মধ্যে মধ্যে নারিকেল দেওয়া হইত। সে জানিত নারিকেল কামড়াইয়া খাওয়া যায় না, সে তখন হতাশভাবে বাড়ীর কোন লোকের হাতে নারিকেলটি তুলিয়া দিত। তারপর তাহার হাতে একটা হাতুড়ি দেওয়া হইলে সে হাতুড়ি দিয়া নারিকেল ভাঙিতে চেষ্টা করিত, যদি না পারিত তবে আবার কাহারো কাছে গিয়া চোখের ভাষায় করুণ সুরে বলিত, "কেন কর জ্বালাতন—দাও না ভেঙে।" হাতুড়ি বাটালি ইত্যাদির ব্যবহার দু-একটা সে শিখিয়াছিল, কিন্তু সব রকম ব্যবহার তাহাকে শেখানো হয় নাই। তাহাতে বাড়ীর ঘর-দুয়ারের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছিল।

বাড়ীতে যেদিন কোন নূতন লোক বা অতিথি জন্‌কে দেখিতে আসিত সেদিন জনের আনন্দ আর ধরিত না। সে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীর কোথায় কি আছে সবাইকে দেখাইয়া দিত। কেহ যদি জন্‌কে দেখিয়া একটু ঘাব্‌ড়াইয়া যাইত তবে জন্ তাহার পায়ে ঠোক্কর দিয়া বুঝাইয়া দিত— "আবার যদি আমায় ভয় কর তবে ঠোক্কর আরো জোরে হবে।"

জন্ ঘরের মধ্যে অন্ধের ভাণ করিয়া লাফালাফি করিয়া খেলা করিত, তাহার লাফালাফিতে ঘরের টেবিল চেয়ার আলমারি ইত্যাদি সবাই যোগ দিত, এবং কিছুক্ষণ পরে তাহারা সবাই ক্লান্ত হইয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকিত—ঘরের প্রায় সমস্ত নিশ্চল দ্রব্যগুলি কিছুকালের জন্য সচল হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসিয়া থাকিত। আর একটা কাজ সে প্রায়ই করিত—বাজে-কাগজ-ফেলিবার ঝুড়িটাকে লইয়া সে হঠাৎ উপরে ছুড়িয়া দিত। ঘরের চারিদিকে কাগজপত্র ছড়াইয়া পড়িত। তারপর তাকে ধমক দিলে সে তার অমন সুন্দর মুখখানাকে যতদূর পারা যায় গম্ভীর করিয়া আবার এক-একটি করিয়া সব কাগজ কুড়াইয়া ঝুড়ি ভর্ত্তি করিত। সে মাঝে মাঝে ঘরের যেখানকার যা দ্রব্য সেখানেই সাজাইয়া রাখিতে পারিত।

টেবিলে বসিয়া খাইবার সময় তাহার ব্যবহার বড় শান্ত দেখাইত। সে একখানা চেয়ার টানিয়া নিজের স্থানটিতে গিয়া গম্ভীরভাবে বসিত। বেশী কিছু খাইত না। গেলাস হইতে জল পান করিতে তাহার ইচ্ছা বড় ঘন ঘন হইত।

বিকালে জন্-সাহেবের চা না হইলে চলিত না। সে চায়ের সঙ্গে একটুকরা রুটিতে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম মাখাইয়া খাইত। খাওয়ার সময় সে কোনদিন কিছু কাড়াকাড়ি করিত না। আস্তে আস্তে নিজের মনে খাইয়া যাইত। পেটুকের মত গবাগব্ যা-তা ক্রমাগত পেটে

পূরিত না। সে মাঝে মাঝে জলের কল খুলিয়া জল গেলাসে ভরিত, এবং পান করা শেষ হইলে কল বন্ধ করিতে ভুলিত না।

জনের মনে ধারণা ছিল যে সবাই তাকে দেখিলে বড় খুসী হয়। তাই সে প্রায়ই জান্‌লার ছিট্‌কিনি খুলিয়া রাস্তার দিকে গিয়া দাঁড়াইত। রাস্তার লোকে যখন তার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিত, সে আনন্দে হাততালি দিত। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতে জন্ সব-চেয়ে বেশী ভালবাসিত।

জন্ মাঝে মাঝে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিত। একদিন বাড়ীর কর্ত্তা কোথায় বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া ভাল পোষাক পরিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় জন্ আসিয়া তাঁহার কোলে বসিতে গেল। পোষাক ময়লা হইবার ভয়ে কর্ত্তা তাহাকে কোলে বসিতে দিলেন না। জন্ রাগে অভিমানে মাটিতে পড়িয়া এক মিনিট কাঁদিল, তারপর হঠাৎ ঘরের কোণে গেল, সেখান হইতে একটা খবরের কাগজ আনিয়া কর্ত্তার কোলে তাহা বিছাইয়া তার উপর সে বসিল। চোখে না দেখিলে জন্তুর যে আবার এত বুদ্ধি হইতে পারে, তা বিশ্বাস হয় না।

জন্ রোজ রাত আটটার সময় ঘুমাইতে যাইত। সে তাহার ছোট ঘরে স্প্রিঙের খাটে উঠিয়া কম্বল ঢাকা দিয়া নিদ্রা দিত। রাত্রে উঠিবার প্রয়োজন হইলে, কাহাকেও বিরক্ত করিত না। এই-সমস্ত ব্যাপারে সে একেবারে মানুষের মত ব্যবহার করিত। তাহাকে কোনোদিন জোর করিয়া কিছু শেখানো হয় নাই। সে নিজেই দেখিয়া শুনিয়া সব শিখিয়াছিল। রেলগাড়ীতে সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যাইত। তাহাকে শিকল দিয়া বাঁধিবার কোনো প্রয়োজন হইত না। খোলা মাঠ সে একেবারেই পছন্দ করিত না, তবে বাগানে থাকিতে খুবই ভালবাসিত।

তাহার অনেক কু-অভ্যাস সে ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিল, কিন্তু একটা বিষয়ে তাহার ভয় কোনদিন যায় নাই। সে তার খাঁচা-ঘরে কখনও একলা থাকিতে পারিত না। তাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে লোক রাখা হইত, কিন্তু মেজর পেনি তাকে যেমন চোখে দেখিতেন, আর কেহই তেমন ভাবে তাকে দেখিতে পারিত না। তার রক্ষক ঠাঙার সাহায্যে তাহাকে বশ করিবার চেষ্টা করিত। লাঠি হাতে কাহাকেও দেখিলে জন্ চীৎকার করিয়া একটা বীভৎস কাণ্ড করিয়া বসিত। সে কোনো দোষ করিলে তাহাকে মাঝে মাঝে বকুনি দেওয়া হইত। তখন সে খানিকক্ষণ ঘরের কোণে চুপ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিত, তারপর অনুতপ্ত হইয়া বাড়ীর লোকদের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

জন্‌কে পালন করা যখন আর বাড়ীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না, তখন তাহাকে বিক্রয় করিবার কথা হইল। ফ্লোরিডাতে একটা বাগানে তাহাকে রাখা হইবে স্থির করিয়া জন্‌কে আমেরিকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যাহাকে জনের সঙ্গে আমেরিকা পাঠানো হইল সেও একেবারে আনাড়ি। জন ফ্লোরিডাতে গিয়া নিজেকে বড় একলা মনে করিতে লাগিল। তাহার মন ক্রমশ খারাপ হইয়া গেল। অবশেষে মেজর পেনির বাড়ীতে জরুরি 'তার' আসিল, "জনের অবস্থা বড় খারাপ।" মেজর পেনির বাড়ী হইতে যখন মিস ক্যানিংহাম ফ্লোরিডা পঁহুছিলেন, তখন জন্-গরিলা মানুষের বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

আইনুদের গল্প

জাপানের মধ্যেই একটা জায়গা আছে, তার নাম হোক্কাইদো। এই হোক্কাইদো দেশে বাস করে জাপানের আদিমকালের অধিবাসী আইনুরা। যাঁরা আইনুদের দেশে দু-একবার ভ্রমণের জন্য যান, তাঁরা ফিরিয়া আসিয়া বলেন —যে আইনুরা রস-কষ-হীন এবং বড় মনমরা জাতি; কিন্তু এই কথাটা সকল আইনুর প্রতি প্রয়োগ করিলে অবিচার করা হইবে। কারণ এমন আইনু অনেক আছে যাহাদের মনে রসের সঞ্চয় খুব বেশী পরিমাণেই আছে। অনেকে বলেন আইনুরা অসভ্য। হইতে পারে, কারণ তাহারা এখনো আমাদের মত সকল বিষয়ে এত শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলোক পায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বুনো, অসভ্য ইত্যাদি বলাটা একেবারেই ঠিক হইবে না। বর্ত্তমানে

জাপান-রাজসরকার তাহাদের শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাহারা বোকা নয়; তাহাদের যে-কোন বিষয় শিখাইলে তাহারা বেশ সহজেই তাহা শিখিতে পারে। তাহারা অতিথির সেবা করিতে পিছুপা হয় না। মন তাহাদের সরল এবং স্বভাব তাহাদের খুবই মিষ্ট তবে তাহাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিলে তাহাদের মনের মধ্যে সুপ্ত, আদিম-কালের রুদ্র মূর্ত্তিটি জাগিয়া উঠে। রাগের মাথায় এমন কাণ্ড নাই যে তাহারা করিতে পারে না।



আইনু মেয়ের অভিবাদন-রীতি।

পথ চলিতে চলিতে যদি কারো সঙ্গে কোনো আইনু রমণীর দেখা হয়, তবে সে হাত দিয়া মুখ ঢাকে। এই ব্যবহারটই তাহাদের অভিবাদনের রীতি। যদি কোনো অচেনা পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, তবু আইনু রমণী এই ভদ্রতা করিতে ভুলিয়া যায় না। সে মুখে হাত দিয়া পথের একপাশে স'রিয়া দাঁড়ায়। (ছবিতে অভিবাদনের কায়দা দেখানো হইয়াছে)। কোন রমণীর সঙ্গে যদি কোন পুরুষ কথা বলে তবে সে মুখ হইতে হাত নামায় না, কিন্তু মাথায় কোন ঢাকা রাখে না। মাথায় ঢাকা দিয়া কারো সঙ্গে কথা বলিলে আইনু-মতে তাহার অসম্মান করা হয়। তুমি কেমন আছ—এই কথা বলিতে হইলে মুখে না বলিয়া একজন আইনু তাহার তর্জ্জনী বাম হাতের তালুর উপর হইতে বাহুর উপর দিয়া আস্তে আস্তে মুখ পর্য্যন্ত লইয়া যায়। তবে আইনু মেয়েরাই এই প্রথাতে কুশল জিজ্ঞাসা করে।

আইনুরা দেখিতে মাঝারি আকারের। পুরুষরা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, আর মেয়েরা ৫ ফুটের বেশী লম্বা হয় না। তাহাদের শরীর বেশ সুস্থ এবং সবল। তাহাদের গায়ের রঙ্ জাপানীদের অপেক্ষাও ফর্সা। তবে আইনুদের মধ্যেও এমন অনেক আছে যাহাদের গায়ের রঙ্ কতকটা আমেরিকার লাল-লোকদের মতো তামাটে। একবার একজন আইনু আমেরিকার আলাস্কাতে শীকার করিতে গিয়া সেখানকার রাঙা-মানুষদের কথা শুনিয়া বলে যে তাহাদের ভাষা অনেকটা আইনুদের মতই। আইনুদের হাত-পা বেশ ছোট ছোট—তবে তাহাদের পায়ের তলা এবং হাতের তালু বেশ বড়। বুক তাদের খুবই চওড়া—আর মাথার চুলও তেমনি প্রচুর এবং ঝাঁক্ড়া। চুলের রঙ্ কালো। তাদের নাক সোজা, ডগার দিকে একটু চ্যাপ্টা। তাদের চোখ গোল গোল, ভ্রু বেশ লম্বা এবং ঘন। আইনুদের সঙ্গে জাপানীদের প্রধান তফাৎ এই চোখে। পুরাকালে ইহুদীরা যেমন নিজের জাতির কোনো লোকের কথা বলিতে হইলে বলিত, "আমার হাড়ের হাড় এবং মাংসের মাংস"—তেমনি এই আইনুরা বলে—আমার চোখের লোক—"সাইন্ সিক্-পুই কোরো গুরু"। আইনুরা মাথার চুল খুব বড় করিয়া রাখে। অনেক আইনু নারীর চুল খুলিয়া দিলে একেবারে মাটিতে গিয়া লুটায়। যে-সব নারীদের চুল অসাধারণ লম্বা তাহারা নাকি বড় ভাগ্যবতী—তাহারা নাকি "কামুই-ওতোপ্-উস-গুরু"—অর্থাৎ দেবীর চুল লইয়া মানুষী হইয়াছে। আইনুরা যখন কথা বলে তাহাদের গলার স্বর বড় মিষ্টি বলিয়া মনে হয়। তবে তাহারা যখন রাগিয়া কথা বলে তখন তাহাকে বীণার ঝঙ্কার বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের মুখের হাসি বড় ভালো লাগে।

অনেক লেখক আইনুদের লোমশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কথাটা খাঁটি সত্য নয়। ইয়োরোপীয়ান্ এমন অনেক দেখা যায়, যাহাদের লোম বনমানুষদের চেয়েও বেশী, তা বলিয়া ইয়োরোপীয়ান হইলেই তাহাকে বনমানুষ বলা ঠিক হইবে না। অনেকে বলেন আইনুরা খুব দাড়ি রাখে। এটাও ঐ রকমের কথা। তবে অনেক আইনুর বেশ বড় বড় দাড়ি আছে। কারো কারো এক ফুট লম্বা দাড়িও আছে। দাড়ি যখন বেশ পাকা শণের মতো হয় তখন বৃদ্ধ আইনুকে দেখিতে বেশ এক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির সর্দ্দার সর্দ্দার বলিয়া মনে হয়। অনেক লম্বা-দাড়ি-ওয়ালা আইনু দাড়ি রক্ষা করিবার কোন ঔষধ পাইলে বড় সুখী হয়। অনেক আইনু বেশ ইয়া-লম্বা-লম্বা গোঁপ রাখে। ঝোল বা কোন পানীয় মুখে লইবার সময় তাহারা গোঁপ কানের সঙ্গে টাঙ্গাইয়া রাখে।

আইনুর কাছে তাহার চুল বড় সাবধানে রক্ষার ও যত্নের জিনিষ। একটা চুল যদি কোনরকমে ছিঁড়িয়া যায় তবে আইনুর মনে বড় গভীর দুঃখের ঝড় আসে।—তাই সে তাহার চুলের ভাবনায় সব সময় অস্থির থাকে। মারামারির সময় শত্রু যদি কোন রকমে তাহার কয়েকটা চুল ছিঁড়িয়া লইতে পারে, তবে আইনুর আর রক্ষা নাই! শত্রু সেই চুলকে যদি কবরে দেয়, তবে চুলের মালিক দিন দিন রোগা হইবে এবং এমন একদিন তাহার কপালে আসিবে যেদিন সে হাজার চেষ্টা করিয়াও আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাকে মরিতে হইবেই। যাহারা কোন দোষ করিয়া জেল খাটে, আইনুদের মতে তাহাদের দু-রকমে শাস্তি ভোগ হয়। প্রথমত কারাগারের কষ্ট; দ্বিতীয়তঃ তাহার চুল ছাঁটা হয়, তাহার জন্য আয়ুক্ষয়ের কষ্ট।

পুরাকাল থেকেই আইনুদের চুলের প্রতি একটা ভয়ানক মায়া আছে। তাহারা মন্ত্রশক্তিতে খুবই বিশ্বাস করে, এবং চুলের উপর মন্ত্র পড়িয়া চুলের মালিককে যে হাজার রকমে জ্বালাতন করা যায়, এমন কি শেষে তাহার প্রাণকে পর্য্যন্ত শরীর হইতে দূর করা যায় এ বিশ্বাস আইনুদের মন হইতে কেহ দূর করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আইনুদের দেশে অনেক কাল আগে, তোকুগারোয়ার রাজত্বের সময়, একজন শাসনকর্তা আইনুদের চুল কাটিয়া ফেলিতে হুকুম করেন। তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল আইনু একজোট হইয়া বলে—"ধর্ম্মাবতার, আমাদের চুল কাটিয়া ফেলিতে বলিবেন না। তাহা হইলে আমাদের এবং আপনার সর্ব্বনাশ হইবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা চুল কাটিয়া ফেলিব, সেই মুহূর্ত্তে জগতের সমস্ত দেবতার এবং অপদেবতার অভিশাপ আমাদের এবং আপনার ঘাড়ে আসিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িবে। অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন।" সুখের বিষয় তাহাদের চুল কাটিবার আজ্ঞা রদ হইয়াছিল। জেল যাইবার সময় আইনুদের যে চুল কাটা হয়, তাহাতে আইনুদের মহা আপত্তি আছে। জেল হইতে ফিরিবার পর সেইজন্যই নাকি অনেক আইনু আরো পাকা-বদ্‌মাইস হইয়া যায়।

তবে আইনু গল্পশাস্ত্রে চুল কাটিবার একটা ব্যবস্থা পাওয়া যায়। যদি কোনো লোকের স্ত্রী মারা যায়, সে সেইক্ষণেই তাহার চুল কাটিয়া ফেলিবে এবং মুখ যতদূর-পারা-যায় দুঃখপূর্ণ করিবে। কিন্তু তাহার মাথায় কোনো রকমের ঢাকা থাকিবে না। মাথায় ঢাকা দিয়া দেবতা বা মানুষের সামনে যদি কেহ যায়, তবে তাহার অকল্যাণ হয়। কিন্তু যদি কেহ তাহার চুল কাটে অথচ দেখা যায় তাহার স্ত্রী মরে নাই, তবে তাহাকে এত ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে যে বলা যায় না। হয় সে মরিবে, নয় তাহার নিকট বন্ধু কেহ মরিবে।—দেবতারা এই কথা বলিতেছেন। অতএব হে আইনু সাবধান।—তারপর এই গল্পশাস্ত্রেই পাওয়া যায়—যদি কোনো নারীর স্বামী মরে, তবে সেই নারীকে মাথার চুল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার মুখ গম্ভীর করিতে হইবে, এবং মাথায় ঢাকা দিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে সকলের কাছে কাছে থাকিতে হইবে। বিধবার মাথায় চুল যেন কখনো বড় না হয়। এবং একবার যাহার স্বামী বা স্ত্রী মরিয়াছে, সে যেন আবার বিবাহ না করে, কারণ পরলোকে তাহাদের মিলন হইবে। অসভ্য আইনুরাও পুরুষ এবং নারীর আসন সমান রাখিয়াছিল, যাহা লাভের জন্য সমস্ত সভ্যদেশের নারী-নর এখন চেষ্টা করিতেছেন।

আইনুদের মধ্যেও মাঝে মাঝে বেশ রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার এক ভদ্রলোক আইনুদের

একটা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে উটের কথা বলেন। শ্রোতারা হঠাৎ বক্তৃতার আসল কথা ভুলিয়া উটের কথা শুনিতে ব্যগ্র হইল। উটের প্রাণ আছে, সে ডাল-পালা খাইয়া আবার জলও যে খায় তাহাদের কাছে এও অদ্ভুত লাগিল। ভদ্রলোক বক্তৃতা দিতে না পারিয়া হয় ত মনে বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু আইনুরা উট সম্বন্ধে এত নূতন কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিল। উটের পা লম্বা—এই কথা শুনিয়া আইনুরা বড় হাসিয়াছিল। আইনুদের সম্বন্ধে আর-একটা বেশ মজার গল্প শোনা যায়—একবার একজন সাহেব শীকারী ইয়েজো জঙ্গলে একজন আইনু পথপ্রদর্শকের সঙ্গে শীকার করিতে যান। তিনি একটা ঝোপে একটা জানোয়ার দেখিয়া গুলি করিলেন। জানোয়ারটা লম্ফ দিয়া দৌড় দিল। আইনু সেই ঝোপে গিয়া আধখানা খরগোস্ দেখিতে পাইল। সে সেই আধখানা খরগোস পাইয়া বড় খুসী হইয়া সহরে গেল। সেখানে এক হোটেলওয়ালা আধখানা খরগোস আনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—'আমার প্রভু ভয়ানক টিপওয়ালা লোক। বন্দুকধারী লোকদের মধ্যে তিনি একজন নামজাদা বন্দুকধারী। আর এই খরগোস পশুজাতির মধ্যে সব চেয়ে বেশী মজবুত ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিতে। আমার প্রভু কখনো গুলি হাওয়াতে মারেন না বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না, আর খরগোসও গুলি খাইয়া মরিতে পারে না।—এ ক্ষেত্রে আর কি হইবে? আমার প্রভু যেমনি গুলি করিলেন, অমনি খরগোসও পণ্ডিতের মতন তাহার আধখানা ত্যাগ করিয়া দৌড় দিল। কাহারো পূর্ণ জয় বা পূর্ণ হার হইল না।' হোটেলওয়ালা এই ব্যাখ্যা শুনিয়া খানিকক্ষণ অবাক হইয়া থাকিল। তাহার পর চায়ের জল গরম করিতে গেল।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গে উল্কি পরা এদের একটা প্রধান সখ ছিল। মেয়েদের উল্কি না হইলে তাহারা সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইত না। তবে আজকাল এই প্রথা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। উল্কি পরা এখানে বড় কষ্টকর ব্যাপার। গায়ের চামড়া ছুরি দিয়া কাটিয়া এরা উল্কি পরে। এখানের উল্কির রঙ ঘন নীলবর্ণ। যে প্রথায় এরা উল্কি পরে, তা যেমন সরল তেমনি কষ্টকর।—একটা হাঁড়িতে করিয়া একরকম গাছের ছাল জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। তারপর যখন সেই ছাল জলে বেশ সিদ্ধ হইয়া যায় এবং হাঁড়ির তলায় ঝুল পড়ে তখন একজন একটা ভোঁতা বা ধারাল ছুরি লইয়া উল্কি-পরিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির অঙ্গে কয়েকটা ফালি কাটিয়া দেয়। তারপর হাঁড়ির তলা হইতে খানিকটা ঝুল লইয়া তাহার সেই ক্ষতস্থানে ঘসিয়া দেয়। ঘসা হইয়া গেলে পর হাঁড়ির সেই ছাল-সিদ্ধ জলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া ক্ষতস্থান বেশ করিয়া ধুইয়া দেয়। ছেলেমেয়েদের



ঠোঁটে উল্কিপরা আইনু মেয়ে।

উপরের ঠোঁটে প্রথম উল্কি পরান হয়, দেখিতে দেখিতে সেই উল্কি ক্রমশ নীচের ঠোঁটে এবং দুই কান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে।

আইনু-মেয়েরা উল্কি পরে, তাহা বিনা কারণে নয়, তাহারও শাস্ত্র ব্যাখ্যা আছে। আইনু-শাস্ত্রে বলে যে প্রত্যেক মেয়ের শরীরে অনেক বদ্‌রক্ত আছে। এই বদ্‌রক্ত বাহির না হইলে মঙ্গল নাই। তাই উল্কি পরিবার আগে ছুরি দিয়া অঙ্গ কাটিয়া তাহারা বদ্‌রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তাহারা

তাহাদের মুখে এবং হাতে উল্কি পরিবার যথেষ্ট কারণ দেখায়।—স্বর্গে দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের মুখে এবং হাতে উল্কি পরা থাকে। শয়তানের বাচ্চারা বড় ভাল লোক নয়। তারা মাঝে মাঝে ফুরসৎ পাইলেই স্বর্গের ফলের বাগান হইতে আম, লেবু, কলা, কচু ইত্যাদি চুরি করিতে যায়, আর সেইসঙ্গে সুবিধা পাইলে সেখানকার অধিবাসীদের গায়ে চিম্‌টি কাটিতেও ছাড়ে না। তবে সাম্‌নে যদি এই উল্কি-পরা দেবী আসিয়া পড়ে, তবে তাহারা সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেয়। এই-সমস্ত শয়তানের বাচ্চারা পৃথিবীর লোকদের পিছনে সব সময় লাগিয়াই আছে। তাহাদের তাড়ানোর একমাত্র উপায় মেয়েদের উল্কি পরানো। উল্কি-পরা মেয়ে দেখিলে তাহারা স্বর্গের দেবী মনে করিয়া পালায়। বৃদ্ধাদের চোখে যখন ছানি পড়ে তখন তাহারা বার বার উল্কি পরে। তাহাদের চোখ ইহাতে হারানো দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, এই তাহাদের বিশ্বাস। এই প্রথার নাম "পাশ-কা-ওইনগারা" (উল্কির উপর ভর করিয়া দেখা)। গ্রামে যখন কোনো সংক্রামক ব্যাধি আসে তখন গ্রামের সমস্ত মেয়েদের উল্কি পরিবার ধুম পড়িয়া যায়। উল্কির ভয়ে মহামারীও গ্রাম ত্যাগ করিয়া পালায়।

না-উল্কিপরা মেয়েরা কোনো প্রকার উৎসবে যোগদান করিতে পারে না। তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। আকাশের দেবতাদের কোপ সমস্ত পৃথিবীর উপর আগুনের শিলাবৃষ্টি করিবে। আইনু-মেয়েরা বাগ্‌দত্তা হইবার পূর্ব্বে তাহাদের ঠোঁটের দুই পাশের কান পর্য্যন্ত উল্কি শেষ করে না। যেদিন তাহার কাহারো সঙ্গে বিবাহ ঠিক হইয়া যায়, সেই দিনই সে তাহার ঠোঁট হইতে কান পর্য্যন্ত উল্কি পরা শেষ করে। ব্যাঙের পায়ে এবং মুখের কাছে একরকম উল্কির মত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এদেশে কাহারো বোধ হয় জানা নাই।—পুরাকালে এক গৃহস্থ ছিল। তার স্ত্রীর সঙ্গে তার বনিবনা হইত না। একদিন এই নারী তাহার স্বামীকে এবং বাবা-মাকে কেমন করিয়া মায়া-মুগ্ধ করিয়া হত্যা করিল। তারপর সে ছয়বার বিবাহ করে এবং ছয়-জন স্বামীকেই এমনিভাবে হত্যা করে। ভগবান আকাশ হইতে এই সমস্ত দেখিয়া বড় রাগ করিলেন। তিনি আর সহিতে না পারিয়া হঠাৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া ঐ দুষ্টা নারীকে একটা মোটা লাঠির ঘায়ে একটা থ্যাব্‌ড়া-নাকওয়ালা ব্যাঙ করিয়া দিলেন। তারপর তাহার একটা ঠ্যাঙ ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—'তোমার বাস এখন হইতে জল-কাদার মধ্যে হইবে—যদি কখনো কোনদিন মানুষের ঘরে যাও তবে তাহারা ঠ্যাঙ ধরিয়া তোমায় রাস্তার কাদায় ফেলিয়া দিবে। অতএব সাবধান, মানুষের ঘরে কখনো প্রবেশ করিও না।' ভগবান দয়া করিয়া তাহার উল্কির দাগ তুলিয়া দেন নাই, তাই আজ পর্য্যন্ত ব্যাঙের গায়ে উল্কির দাগ রহিয়াছে। ব্যাঙকে আইনুরা বলে "তেরেকি-ইরে"। আইনুদের মধ্যে উল্কি পরা এবং ব্যাঙ সম্বন্ধে আরো অনেক ছোট ছোট গল্প চলিত আছে।

আজকাল উল্কি পরা ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। অনেক আইনু-মেয়ে তাহাদের শরীর হইতে উল্কির দাগ উঠাইয়া ফেলিতে চায়, যদিও তাহা সম্ভবপর নয়। উল্কিকে আইনুরা বলে, "আঞ্চি-পিরি"। আর কয়েক বছর পরে উল্কি পরার প্রথা আইনুদের মধ্যে হয়ত একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

পুরাকালে জাপানীরা যেমন দাঁত মিশ্‌মিশে কালো করিত, বর্ত্তমান আইনুরা তাদের দাঁত তেমনি কালো করে। তাদের মতে যার দাঁত যত কালো হইবে, সে নাকি তত বেশী সুন্দর।

আইনুদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেকটা ইউরোপীয় জীপ্‌সিদের মত দেখিতে। তাহাদের মধ্যে অনেককে আবার আরব দেশের লোক বলিয়াও মনে হয়। আরব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই আইনু ছেলেমেয়েদের চেহারায় বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। আইনুমেয়েরা গহনা পরিতে বড় ভালবাসে। তাহাদের বয়স পনেরো পার হইতে না হইতে তাহারা কানে নানা রকমের ইয়ারিং পরিতে আরম্ভ করে। একরকমের সাদা ধাতু-নির্ম্মিত ইয়ারিং এরা বড় বেশী পছন্দ করে। ইয়ারিং না জুটিলে কানে টুক্‌টুকে লাল কাপড়ের ফালি ঝুলাইয়া রাখে। অনেকে আবার ইয়ারিং পরিয়াও তাহাতে খানিকটা লাল কাপড়ের টুক্‌রা বাঁধিয়া দেয়।

ছোট ছোট আইনু ছেলেদের দেখিতে অনেকটা জাপানী শিশুদের মতো। তাহার দুইটা কারণ আছে। অনেক

জাপানী পুরুষ আইনু-নারী বিবাহ করে। তাহাদের সন্তানেরা জাপানীদের মতো দেখিতে হয়। আর অনেক আইনু-নারীর কোনো সন্তান না হওয়ার দরুণ তাহারা জাপানী অনাথ ছেলেমেয়ে পালন করে। পরে বড় হইলে তাহারা জনসমাজে নিজেদের আইনু জাতির লোক বলিয়াই পরিচয় দেয়। আইনুদের মধ্যে জন্মসংখ্যা আস্তে আস্তে কমিয়া আসিতেছে। তাই দেখিয়া মনে হয় পৃথিবীতে খাঁটি আইনু আর বড় বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিবে না।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

—

পরিশ্রমের পুরস্কার

[Frances Julia Melchiorএর একটি গল্প হইতে]

কোন এক পল্লীগ্রামে একটি ধনী লোক বাস করত। তার রাজাদের মত সুন্দর বড় বাড়ী, আর তার চারিদিক খুব বড় মাঠ দিয়ে ঘেরা।

মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে অপর গ্রামের দিকে চ'লে গেছে। রাস্তার আশেপাশে কতদিনের পুরানো বড় বড় গাছ, আর মাঝে মাঝে লতা-পাতার ঝোপ।

ধনী লোকটির মন উঁচু ছিল। সে গ্রামের গরীব লোকদের ডেকে এনে প্রত্যেক রবিবার দিন মাঠের মাঝখানে একটা বড় গাছের নীচে নিজেরা রেঁধে সকলে মিলে আমোদ করে খেতো। বাড়ী ফিরে যাবার সময় কিন্তু যে যার বরাতের ওপর দোষ চাপিয়ে বলত, "আমাদের অবস্থা আর ফিরবে না। এই রকম কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে, আর বন্ধুটির পয়সায় ভোজ খেয়েই দিন কাটাতে হবে।" ধনী লোকটি লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে থাকতো।

একদিন খুব ভোরে উঠে ধনী লোকটি একটা মস্ত বড় পাথর রাস্তার মাঝখানে বসিয়ে রেখে দূরে একটা ঝোপের পাশে চুপ ক'রে বসে রইল।

সমস্তদিন ধ'রে কত চাষা, কত লোক, সেই রাস্তা দিয়ে চ'লে গেল। প্রত্যেকে ঐ পাথরটির জন্যে কত রাগ করলে, কত রকম কথা বল্লে, কিন্তু কেউ কষ্ট ক'রে ওটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলে দিলে না।

সন্ধ্যের সময় এক কামারের ছেলে নিজের মনের আনন্দে শিষ দিতে দিতে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সমস্তদিন লোহা পিটে পিটে তার হাত দুখানা ও দেহটা হ'য়ে গেছে বড়ই দুর্ব্বল, কিন্তু রাস্তার ওপর অত বড় একখানা পাথর দেখে সে আর এক পাও নড়্‌ল না। সে অতি কষ্টে পাথরটাকে টান্‌তে টান্‌তে আপন মনে ব'লে যাচ্ছিল, "কোন লোক হয়ত রাত্রিতে হটাৎ এটা পায়ে লেগে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যেতে পারে, কোন ঘোড়া হঠাৎ হয়ত ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে পারে। ওঃ এটা বড্ড ভারী। তবুও আমি একে টেনে রাস্তার এক পাশে ফেল্‌ব।"

কিছুক্ষণ টানাটানি কর্‌বার পর পাথরটিকে গড়িয়ে নিয়ে এসে যখন রাস্তার একপাশে ফেল্লে, তখন সে দেখে যে যেখানে ঐ পাথর ছিল সেইখানে এক-থলে টাকা রয়েছে, আর এক-টুকরো কাগজে বড় বড় ক'রে কি লেখা। কামারের ছেলে ঐ টাকার থলির সঙ্গে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, "এই টাকার থলি তার, যে বড় পাথরটা সরাবে।" কামারের ছেলেটি আনন্দে খুব জোরে শিষ দিতে দিতে নিজের বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

ধনী লোকটি ঝোপের আড়াল থেকে ব'সে ব'সে এই-সব দেখ্‌ছিল। তার মনেও আজ খুব আনন্দ! সে এতদিন বাদে এমন একটি ছেলে দেখ্‌তে পেলে, যে পরিশ্রমে ভয় পায় না, আর পরের ভালর জন্যেও কিছু কর্‌তে পারে।

শ্রীসুশীলকুমার রায়।



"বঙ্গের শেষ পাঠান বীর"

গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুর-গ্রামবাসী (পোষ্ট মুন্শীবাজার, শ্রীহট্ট) শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রতিভায়" প্রকাশিত 'বঙ্গের ওসমান খাঁ ও শ্রীহট্টের খাজে ওসমান' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য যে আপনি উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয়কে "সর্ব্বপ্রথম" আবিষ্কর্ত্তা মনে করিয়াছেন, ইহা অতি বড় ভুল কথা। এ প্রবন্ধ উপেন্দ্রবাবু ১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি লিখি—কতলু খাঁর পুত্র পাঠানবংশীয় খোয়াজ ওসমানই যে দক্ষিণ শ্রীহট্টে রাজা সুবিদ-নারায়ণের রাজধানী রাজনগর বিজেতা তাহাতে সন্দেহ কি?

১৩১৮ অগ্রহায়ণের 'অবসর' নামক মাসিক পত্রে আমি 'খোয়াজ ওসমান' প্রবন্ধ লিখি; তাহার এক স্থলে বলিয়াছি—শ্রীসূর্য্য মৌজার প্রায় তিন মাইল বায়ুকোণে লাঘাটা ছড়ার [নদীর] পশ্চিমে ও দগদেগা বিলের পূর্ব্বে আদমপুরে এই যুদ্ধ [অর্থাৎ মুঘল সৈন্য কর্ত্তৃক উস্মানের পরাভব] হয়। সৈয়দ আদম বারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বরক্ষক সেনানী ছিলেন।

উপেন্দ্র-বাবু ১৩২০ সনের গ্রীষ্মের বন্ধের সময় আমার বাড়ীতে আসিয়া খোয়াজ ওসমান সম্বন্ধে আমার মতসম্বলিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন এবং কানিহাটির সনন্দ ও অন্যান্য বিবরণ আমা হইতে নিয়াই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিভায় প্রকাশ করেন।...এ নগণ্য কর্ত্তৃকই ওসমানের নিধন-স্থান জগতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।"

[এই পত্র পড়িয়া অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ঈশানবাবুর উক্তি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু উস্মান কতলু খাঁর পুত্র নহেন, মন্ত্রীপুত্র।]

—

উবট সায়ণ ও মহীধরাদির বেদ-ব্যাখ্যা রক্ষণ

পৌষ মাসের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়, উবট সায়ণ মহীধরাদির বেদব্যাখ্যায় ভ্রম ও প্রমাদ দেখাইয়া স্বীয় ব্যাখ্যার প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী হিন্দুদের উবট সায়ণ ও মহীধরাদির বেদব্যাখ্যা রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমি একাকী হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে, উবট সায়ণ ও মহীধরাদির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহিত বিচারার্থে প্রস্তুত আছি। (টাকার জন্য নহে।)

শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।

৩৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেদ-ব্যাখ্যা

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কতকটা ঠিক। সায়ণাদির ভাষ্যের সাহায্যে অনেকস্থলেই প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমিও বেদ-ব্যাখ্যায় নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের পক্ষপাতী"। "পৃথিবীর পুরাতত্ত্বে' তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছি *। সর্ব্বত্রই উমেশবাবুর মত সমর্থন করিতে পারি না।

শ্রীবিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ব-বিশারদ।

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ঘর-বোনা কাপড়

গত মাসের "প্রবাসীতে" দেশে তাঁত-চর্কা প্রচলন সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে চাহেন "যাহারা ঐরূপ (ঘরেবোনা) কাপড় ব্যবহার না করিয়া অন্যবিধ কাপড় পরিবে, তাহাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করা—বা তাহাদিগকে একঘরে করা" উচিত। আচার্য্যের আদেশানুসারে আমার স্বগ্রাম কাটীপাড়াতে তাঁত-চরকার প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতেছি, ও আমি সেই সভার উদ্যোক্তা এবং সেই সভাতে উপস্থিতও ছিলাম। তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি সমাজচ্যুতি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি এমন একটা ভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইতে চাহেন যাহাতে সকলেই নিজের হাতের চর্কাকাটা-সুতার কাপড় পরিধান করেন এবং বিদেশী ও বিলাতী কাপড় পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এবং যে এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে লোকে যেন স্বদেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করে। জনসাধারণ বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সামাজিক অত্যাচার কখনই পছন্দ করেন না। জবরদস্তি করিয়া লোককে নিজমতাবলম্বী করা তাঁহার মূলমন্ত্র (persuastion not coercion, is his motto) নহে।

শ্রীকুঞ্জলাল ঘোষ।

সম্পাদকের মন্তব্য।—লেখক আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আমরা যাহা ইংরেজী দৈনিকে পড়িয়াছিলাম, তাহাই লিখিয়া, তাহা সত্য হইলে দুঃখের বিষয়, ইহাই বলিয়াছিলাম। আচার্য্য রায় মহাশয় প্রবাসী বাহির হইবার পর আমাদিগকে বলিয়াছেন, যে, লোককে বুঝাইয়া কাজ করানই তাঁহার অভিপ্রেত, কোনপ্রকারের বলপ্রয়োগের তিনি বিরোধী। তিনি চান যে, এরূপ লোকমত গঠিত হউক যেন কেহ ঘরবোনা কাপড় না-পরিয়া লোকসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে।

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, মেরুতত্ত্ব, ১২০ পৃষ্ঠা ও ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য।



মেয়েদের দেহচর্য্যা ও বেশভূষা

এদেশে মেয়েদের বেশভূষা সাধারণতঃ বিলাসিতা বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষেই দেখা হইয়া থাকে। অবশ্য এই বিষয়েই আবার তাঁহারা অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা সকল দেশেই বেশী ছাড়া পাইয়া আসিতেছেন সন্দেহ নাই। ইহা যখন এতই সর্ব্বত্র-প্রচলিত ও মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত তখন ইহাকে একেবারে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা সঙ্গত হইতে পারে না। বাস্তবিক আমাদের সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই যেমন ঘৃণার বস্তু নহে, কেবল তাহার অপব্যবহারেই দোষের হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপ।

মনের ন্যায় দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টাও স্ত্রী পুরুষ সকলেরই করা উচিত। মেয়েদের সম্বন্ধে ত তাহা বিশেষ-রূপেই খাটে। তাঁহারা সাজিয়া-গুজিয়া পুতুল বা গৃহসজ্জার একটি অংশ হইয়া থাকেন, ইহা যেমন অনুচিত তেমনি ঘৃণার্হ। বাস্তবিক অনেক আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষায় সজ্জিত মেয়েদের অনেকের মধ্যে যে একটি আত্মম্ভরিতা কিম্বা অর্থশূন্য চাহনি ও আড়ষ্টভাব ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিলে ঐগুলি দূরে ফেলিয়া দিতেই ইচ্ছা করে। দেখিলে মনে হয় মেয়েগুলিকে যেন পৃথিবীর সমস্ত সার পদার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। ঐরূপ সজ্জায় সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ত হয়ই না, অধিকন্তু উজ্জ্বল বস্ত্ররাশির মধ্য হইতে অন্তরের দৈন্য আরও পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয়। বাস্তবিক দেহচর্য্যা ও বেশভূষার রুচিজ্ঞানও শিক্ষাসাপেক্ষ; মনের সম্পদ তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ না পাইলে তাহাতে কখনই প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখিয়া মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টাই একসঙ্গে করা উচিত। ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, মানুষের জ্ঞানের পরিধির যতই বিস্তার হইতেছে, আগে যেগুলিকে পরস্পরবিরোধী বোধ হইত তাহার পরস্পর সম্বন্ধ ততই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। তাই পূর্ব্বে যাঁহারা মনের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেন, দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব থাকিত। সেইজন্য মেয়েদের মধ্যেও যাঁহারা মানসিক উন্নতির চেষ্টা পাইতেন, তাঁহাদেরও দৈহিক সৌন্দর্য্য ও বেশভূষায় ঔদাসীন্য দেখা যাইত। বিদুষীদের লোকের নিকট অপ্রিয় হইবার ইহাও একটি কারণ। এদিকে মার্জ্জিতরুচি, যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে বঞ্চিত হইয়া মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও বেশভূষা মলিন হইয়া থাকিত। বিদুষীরা তাহাই দেখিয়া ঘৃণাভরে ঐসকল পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু এখন ক্রমেই লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বাস্তবিক দেহ ও মনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। একটির সঙ্কোচে অপরটির অবনতি ব্যতীত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক আপাততঃ আমরা যখন দেহচর্য্যা ও বেশভূষার কথাই বলিতে বসিয়াছি, তখন তাহাই আরম্ভ করা যাক্। তবে মনের বিকাশ ব্যতীত যে তাহার চেষ্টা বৃথা, তাহাই কেবল বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে মেয়েদের দেহচর্য্যায় ও বেশভূষায় সৌন্দর্য্যচর্চ্চার চেষ্টা অন্য সকলপ্রকার শিক্ষার মত যথার্থভাবে আরম্ভই হয় নাই, বলা যাইতে পারে। অল্পসংখ্যক শিক্ষিতারা বেশভূষার অনেকটা উন্নতি করিয়াছেন, এবং অপর সকলে তাহার যথেষ্ট নিন্দা করিতে করিতেও অনুকরণ করিতেছেন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বেশভূষার শোভনতার আগেও দেহচর্য্যার প্রয়োজন; তাহার সুযোগ শিক্ষিতারাও অল্পই পাইয়াছেন। বাস্তবিক মেয়েদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপায় যে স্বাস্থ্যলাভ তাহাতে এ পর্য্যন্ত কেহই ভালরূপে মন দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। সেইজন্য আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতাদেরও স্বাস্থ্যহীনতার অপবাদ শোনা যায়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার ঠিকমত সুযোগ তাঁহারাও যে প্রায় কিছুই পান না, অধিকন্তু মানসিক পরিশ্রমে দেহের ক্ষয়মাত্র সার হয় তাহা কেহই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন না। ইহার জন্য বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কতকটা দায়ী সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রধান কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মলঙ্ঘন। মানসিক পরিশ্রমের সহিত যেরূপ পুষ্টিকর

আহার, মুক্তবাতাসে অবস্থান, মনের প্রফুল্লতার সহিত সকল অঙ্গের যথাযথ সঞ্চালন আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত হওয়ার ভালমত সুযোগ ঘটে নাই। বাস্তবিক মানসিক পরিশ্রম ঠিকমত করিলে স্বাস্থ্যহানির কোন কারণ নাই। অনেক সময় মানসিক পরিশ্রমের পরে মনের, বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও শারীরিক পরিশ্রম, আমোদ-আহ্লাদ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। সেই স্বাভাবিক ইচ্ছা ঠিকমত পথে পরিচালিত হওয়া উচিত, নতুবা স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী।

শারীরিক পরিশ্রমে সকল অঙ্গের সঞ্চালনের সহিত মনের স্ফূর্ত্তি একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সাধারণতঃ ঘরের কাজে যে পরিশ্রম হয়, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। কারণ আমাদের প্রকৃতি সর্ব্বদা কাজ চাহে না, অনেক সময় তাহাকে নিছক আনন্দ-খেলাতেও ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ বালিকাদের সম্বন্ধে ইহা যে কত সত্য তাহা ত বলাই বাহুল্য। মানসিক পরিশ্রম যাহাদের করিতে হয়, তাহাদের ইহা আরও আবশ্যক। সুতরাং মেয়েরা স্কুল হইতে আসিলেই সংসারের সব কাজ তাহাদের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নহে। তখন তাহাদের উপযুক্ত আহারের পর হাসিখেলা করিতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে যাঁহারা মনে করেন—মেয়েরা ঘরের কাজ কিছুই শিখিবে না, তাঁহাদের কথায় সায় দেওয়া কঠিন। রাতারাতি সকল বিষয়ে পারদর্শী করিতে গেলে কিছুই হইয়া উঠে না; সকল বিষয়ে রহিয়া সহিয়া করিলেই পরিণামে হিতকর হয়। গৃহকর্ম্মও প্রথম হইতেই মেয়েদের ঘাড়ে না চাপাইয়া খেলাচ্ছলে ক্রমে ক্রমে শেখানো যাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের উহাতে আগ্রহ ও স্ফূর্ত্তি জন্মিবে। বাস্তবিক মেয়েদের শরীর-মন সুস্থ থাকিলে গৃহকর্ম্মেও তাহাদের স্বভাবতঃ অনুরাগ আসিতে দেখা যায়। তাহার পর আর-একটি কথাও না বলিয়া পারা যায় না, যে, গৃহকর্ম্মে বালিকাদের তেমন অপকার হইতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বদা শিশুদের কোলে লইয়া থাকিলে তাহাদের শরীর বৃদ্ধির যথার্থ ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু ঘরের কাজ বিশেষ কিছু না করিলেও অল্পবয়স্কা মেয়েদের সর্ব্বদা ছোটছেলে কোলে লইয়া বাঁকিয়া থাকা আমাদের দেশের সাধারণ দৃশ্য। ইহার পরিণামে মেয়েদের যে কত অপকার হইয়া থাকে ও তাহারা ঠিকমত বাড়িতেই পায় না, ইহা মনে রাখা উচিত। এখানেও মেয়েদের সন্তান-পালন শিক্ষার কথা উঠিতে পারে জানি, কিন্তু ঐ শিক্ষাটি এরূপভাবে না হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। মেয়েরা ছোট ছোট ভাই-বোনদের লইয়া আমোদ প্রমোদ খেলা করিতে করিতেই, তাহাদের শিশুদের প্রতি ভালবাসা বেশী হইবার সম্ভাবনা। আমরা অনেকস্থলেই দেখিয়াছি, সর্ব্বদা ছেলে লইতে লইতে তাহাদের ভাইবোনদের প্রতি ঘৃণার ভাব আসিয়া থাকে, এবং বাড়ীতে ঐরূপ নূতন প্রাণীর আগমন-সম্ভাবনাও তাহারা আশঙ্কার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। তাহা অপেক্ষা সংসারের কাজ তাহারা অনেক পছন্দ করে।

কথা হইতে পারে—মেয়েরা ঘরের কাজ, ছেলেদের রাখা কিছুই না করিলে গৃহস্থলোকের কেমন করিয়া চলিতে পারে; সকলের ত আর বেশী দাসদাসী রাখিবার ক্ষমতা নাই; আর তাহা রাখাও ক্রমেই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বলিতে হয় যে মেয়েটি বড় হইতে না হইতেই যদি এত কাজের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আর-একটু বড় হইয়া সম্পূর্ণ কাজের উপযুক্ত হইলে যখন বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবে তখন চলিবে কি করিয়া? তাহা হইলে ত বিবাহ দেওয়াও বন্ধ করিতে হয়। বাস্তবিক ঘরসংসারের গঠনপ্রণালী যথেচ্ছাচারতন্ত্র (Autocratic)। অধিকাংশ পরিবারেই অবস্থা যেমনই হউক—কর্ত্তা হইতে বাড়ীর ছেলেরা পর্য্যন্ত "বাবু"। কাজ কিছু করা দূরে থাকুক—তাঁহারা নবাব বাদ্শার মত পান, তামাক, খাবার চান; আর বাড়ীর মেয়েদের হাড়ভাঙ্গা খাটিয়া তাহা হাতে হাতে জোগাইতে হয়। এই বিষয়ে কলিকাতা ও তাহার আশপাশের বাবুদের ব্যবহারই অধিকতর প্রসিদ্ধ। ইহার উপর পূর্ব্ব-আভিজাত্যের এতটুকু গন্ধ থাকিলে ত আর রক্ষা নাই। অনেকে বলিবেন—কর্ত্তাদের অর্থোপার্জ্জন ও ছেলেদের পড়াশুনার জন্য এমনই অনেক খাটিতে হয়, তাঁহারা তাহার উপর ঘরের কাজ কখন করিবেন? ইহাতে বলিতে হয়—তাঁহারা ঐ-সকল এবং পরিমিত বিশ্রামাদি করিয়াও যেটুকু করিতে পারেন তাহাও সকলে করিয়া থাকেন কি?—তাহার অধিক অবশ্য তাঁহাদের কাছে কেহ চাহিতেছে না। তাঁহারা বুঝিয়া

সংযত হইয়া চলিলেই যে বাড়ীর কাজ অনেক কমিয়া যাইতে পারে। অবস্থা বুঝিয়া খাওয়া-দাওয়ার অন্যায় হাঙ্গামা ইত্যাদি ছাড়িয়া বাড়ীর প্রত্যেকে আপন আপন কাজ নিজ হাতে করিতে থাকিলেই কেবল মেয়েদের উপর অতটা চাপ পড়িতে পারে না। বাস্তবিক ইহাতে কেবল মেয়েরাই যে কষ্ট পান তাহা নহে, শিশুরাই অধিকতর দণ্ড ভোগ করে। মার প্রধান কাজ সন্তান পালন না হইয়া তাঁহার অধিকাংশ সময় বাড়ীর পুরুষদিগের রসনার তৃপ্তিসাধন ও তাঁহাদের পরিচর্য্যাতেই অতিবাহিত হওয়ায় সন্তানদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ইহাতে শিশু-মৃত্যুর হারও যে কতটা বাড়াইতেছে বলা যায় না। তাহার পর শিশুরা যেরূপ দায়িত্বশূন্যভাবে আমাদের এই অনটনের সংসারে "ভাসিতেই" থাকে, তাহা আর আজকালকার দিনে চলিতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও দায়িত্বশূন্যতার পরিমাণ দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। বিষয়টি এতই গুরুতর যে এখানে উল্লেখ মাত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা সম্ভব নহে। এই-সকল বিষয়ে দৃষ্টি আসিলে সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্ম এত বিরাট ব্যাপার অথচ এত কুপরিচালিত হইতে পারিবে না।

এখন আমাদের আসল কথায় ফিরিয়া আসা যাক। আমাদের মেয়েদের আর-একটি অভাব তাঁহারা সকল অঙ্গ অবলীলাক্রমে ও শোভনভাবে সঞ্চালন করার কৌশল কিছু শেখেন না। ইহাতেও তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অনেক হানি হইয়া থাকে। ইহা ঠিকমত আয়ত্ত করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সহিত কয়েকটি নৃত্যকলাও শেখা উচিত। ইহাতে অনেকেই হয়ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, অথবা হাসি রাখিতে পারিবেন না জানি, তথাপি মেয়েদের ব্যায়াম ও সহবৎশিক্ষার জন্য নৃত্যকলার উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যদেশে ইহার প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, আমাদের অবশ্য তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কয়েকটি দেশী বিলাতী নৃত্যকলা ও শোভনভাবে দেহসঞ্চালন করিবার কৌশল মেয়েদের শেখানো দরকার। এ বিষয়ে ইসাবেলা ডান্‌কান যে মেয়েদের নূতন প্রণালীতে নৃত্যকলা শিখাইতেছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানাইয়া আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে তাহা কতটা উপযোগী হয় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কেবল মাংসপেশীর পুষ্টির উপর এখন সকল বিশেষজ্ঞরাই বিশ্বাস হারাইতেছেন; সুতরাং মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডাম্বেল ইত্যাদি অপেক্ষা যাহাতে মনের স্ফূর্ত্তির সহিত সকল অঙ্গের চালনা হয় তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। মুক্তবাতাসে খেলা ও নৃত্যকলার চর্চ্চা ইহার সবিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়। সাঁতার শিক্ষাও আর-একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা শেখাও যেমন অবশ্য-কর্ত্তব্য, ব্যায়ামের কাজও তেমনি। Swiss drill ও জিউজিৎসুও মেয়েদের শেখানো মন্দ নহে। তবে সকল ব্যায়ামই যে প্রত্যেক বালিকার শক্তি ও প্রকৃতি বুঝিয়াই করা উচিত তাহা অবশ্য সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে।

এইবার বেশভূষার কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শিক্ষিতারা অনেকটা উন্নতি করিয়াছেন এবং অপর সকলে নিন্দা করিলেও তাহাই গ্রহণ করিতেছেন—তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু জাতিহিসাবে বলিতে গেলে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের বড়ই অভাব ও ঔদাসীন্য দেখা যায়। প্রকৃত পরিচ্ছন্নতায় তাঁহারা হয়ত অপর প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাব তাঁহাদের যথেষ্টই আছে। বাঙ্গালী মেয়েদের সাধারণ বেশ যে শোভনতা শালীনতা কিছুর পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ইহাতে যে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ক্রমেই তাহা বিস্তৃত হইবার আশা আছে।

এই প্রসঙ্গে দারিদ্র্যের কথা উঠিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে অনেকেই কি অবস্থানুযায়ী চলিয়াও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শোভনতার দিকেও কতকটা দৃষ্টি রাখিতে পারেন না? ইহাতেই ত আরও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। অবস্থা ভাল নহে বলিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চেষ্টাও ছাড়িয়া না দিয়া তাহার মধ্যেই যতটা পারা যায় করিতে চেষ্টা করাই উচিত নহে কি? ভূষণের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, তাহা বসনের দিকে আর-একটু যাওয়া উচিত। অনেকে বলিতে পারেন গহনার কিছু স্থায়ী মূল্য আছে, এবং আমাদের মেয়েদের যখন তাহাই একমাত্র সম্বল, তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সত্যতা কতকটা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই অবস্থাই কি চিরকাল চলিতে থাকিবে?

বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়াই কেবল যদি চলিতে হয়, তাহা হইলে ত কোন উন্নতির কথা বলাই সম্ভব হয় না।

তাহার পর আর-একটি কথা বলাও আবশ্যক। আমাদের পোষাকী ও আটপৌরে পরিচ্ছদের যেরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য তাহা আর-একটু কমাইলে ক্ষতি নাই। এই দুইরকম পরিচ্ছদের কতকটা ভেদ রাখা প্রয়োজন হইলেও পোষাকী পরিচ্ছদের অযথা ব্যয়বাহুল্য ঠিক নহে। বাড়ীতেই যখন অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয় তখন একেবারে কুবেশে থাকাও ঠিক নহে। বাড়ীতে মোটা কাপড়ও শোভনভাবে পরিবার ভঙ্গী ও রীতি শেখা উচিত, এবং তাহার মধ্যেও পরিচ্ছন্নতার সহিত যতটা সম্ভব সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যের দিকেও দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে। তাহার পর বাহিরের পরিচ্ছদও অবশ্য স্থান কাল ও উপলক্ষ্যভেদে উপযোগিতা বিচার করিয়া ব্যবহার করা উচিত। শীতের দিনে বা সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের মধ্যে পাত্‌লা কাপড় পরিয়া বেড়ানো, কিম্বা রেলগাড়ীতে যাতায়াতে হাল্কা রংয়ের কাপড়, যাহা সহজে ময়লা হইয়া যাইতে পারে তাহা ব্যবহার করা সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। স্থান-কালভেদে ভিতরের কাপড়ও ঠিক-মত ব্যবহার করিতে জানা চাই। বাহিরে হাঁটিয়া বেড়ানো, ও গাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবার কাপড় এক রকম হইতে পারে না। এই-সকল ঠিক রাখিতে খুব অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। আমাদের সচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত লোকেও আজকাল মেয়েদের বেশভূষায় যেরূপ খরচ করেন তাহাতে ত সব গুছাইয়া করাই যায়, অপেক্ষাকৃত অল্পসৌভাগ্যশালীরাও আপনাদের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে শিখিলে সহজেই অনেকটা সুবেশে থাকিতে পারেন। ইহার সহিত অবশ্য ইহাও বলা উচিত—আজকাল মেয়েদের যেরূপ মূল্যবান পরিচ্ছদের উপর আসক্তি দেখা যায়, তাহা সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিচয় হইলেও সমর্থনযোগ্য নহে। বেশভূষা প্রয়োজনীয় হইলেও তাহাকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তোলা বা তাহাতে অধিক অর্থব্যয় করা কিছুই ভাল নহে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের অবস্থা দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। তাঁহাদের মেয়েদের ঐ ব্যসনটি না থাকিলে তাঁহারা বোধ হয় আরও অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন। তবে তাঁহাদের সমস্ত সমাজের গতিই তাঁহাদের ঐ দিকে চালাইতেছে, সুতরাং একা তাঁহাদেরও সমস্ত দোষ দেওয়া চলে না। যাহা হউক আমাদের যখন সে বালাই নাই, তখন অন্যের দোষ ডাকিয়া আনিয়া কাজ নাই। তাহাতে আমাদের অর্থ সামর্থ্য কোন বিষয়েই তাঁহাদের সহিত তুলনা হইতে পারে না। বসন-ভূষণ ব্যতীত আর-একটি জিনিষেও মেয়েদের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহা যথোপযুক্ত কেশরচনা। ইহাতেও অনেক শিখিবার আছে।

মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রফুল্লতা সৌন্দর্য্যচর্চ্চা ও সুবেশের যোগ হইলে তাঁহারা বাড়ীঘরও অপরিচ্ছন্ন ও কুদৃশ্য করিয়া রাখিতে পারিবেন না, ছোট ছেলেমেয়েরাও এখনকার ন্যায় আগাছার মত কোনমতে বাড়িয়া চলিবে না, তাহাদেরও স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি না পড়িয়া যাইবে না। তাহা হইলে আমাদের নিরানন্দ সংসারের কতটা যে শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। "বঙ্গনারী"।

শ্রমিক-বন্ধু মহিলা

মিসেস্ সিড্‌নী ওয়েব তাঁর স্বামীর সহিত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বর্ত্তমানযুগের চিন্তাধারা একেবারে ওলটপালট করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমতী ওয়েবের পিতা রিচার্ড পটার প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের বন্ধু ছিলেন এবং দার্শনিক পণ্ডিত তাঁর বন্ধুকন্যা বিয়াট্রিসকে এমন ভালোবাসিতেন যে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মরিবার সময় বিয়াট্রিস যেন তাঁর কাছে থাকেন। বিবাহের পূর্ব্বেই বিয়াট্রিস বার্ত্তাশাস্ত্র ও অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং চার্লস্ বুথ যখন ইংরেজ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন তাঁকে সাহায্য করেন। শ্রমিকদের আট ঘণ্টায় রোজ, শ্রমিকসঙ্ঘ, শ্রমিকসমবায়, পানদোষ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুতথ্যপূর্ণ বই ইনি লিখিয়াছেন। দারিদ্র্য-সমস্যা সম্বন্ধে এই ওয়েব-দম্পতির অভিমত সমস্ত দেশকে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এঁরা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির পথনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—শ্রমিকেরা সেই পথের সন্ধান পাইয়াছে, ধনিকেরাও সেই পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। তথাকথিত ছোটলোকের জন্য এই ভদ্র-দম্পতির চেষ্টা সহৃদয়তায় সরস, যুক্তিতে অকাট্য, তথ্যে অবশ্যস্বীকার্য্য। তাই এঁদের কথার বল অপরিসীম, বেগ প্রবল। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গন্ধর্ব্বকুমার

(উপাখ্যান)

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দিগন্তের একেবারে শেষ সীমায় মানুষের অশ্রুর সমুদ্র। তার ওপারে, সেই সমুদ্রেরই জলের জমাট ফেনার মতো, স্বপ্নে গড়া গন্ধর্ব্বদের দেশ। পৃথিবীর কোনো মানুষ নাবিক আজ পর্য্যন্ত সে দেশে পৌঁছবার পথ খুঁজে পায়নি, কেবল মাঘী পূর্ণিমার রাতের প্রথম প্রহরে সমুদ্রের গাঢ় নীল জল যখন রূপালি আলোয় ঝকমক্ করে' ওঠে, তখন সেই আধ-আলোয় আধ-কুয়াসায় একেবারে পশ্চিম দিগন্তের কোল ঘেঁসে সে দেশের অস্ফুট একটুখানি আভাস পাওয়া যায়।

সেই যে দেশ, এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ আছে এমন কথা কবি আর পাগলে ছাড়া আর কেউ বলে না; তবু এই মাটির পৃথিবীরই জন্যে সে দেশের এক তরুণ গন্ধর্ব্বকুমারের প্রাণ কাঁদ্‌ত। তার খেলার সাথী অন্য ছেলেরা বাঁশীর সুরে তাকে ডেকে ডেকে, কত মাঠ পেরিয়ে, কত পাহাড় ডিঙিয়ে দূর-দুরান্তে খেল্‌তে চলে' যেত, তাদের ক্লান্ত বাঁশীর ডাক একটু একটু করে' আর শুন্‌তে পাওয়া যেত না। সে তখন চুপিচুপি অশ্রু-সমুদ্রের এক নির্জ্জন পাড়ে এসে বসে' থাকৃত। ওপারের ব্যথা হাওয়ায় ভেসে এসে, ঢেউয়ের কলোচ্ছ্বাসে ছুটে এসে তাকে যেন তার নিজেরই কত জন্মজন্মান্তরের ব্যথার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। তার চোখে জল ভরে' আস্‌ত।

গন্ধর্ব্বদের দেশে কথা দিয়ে কেউ কথা কয় না, সে দেশের সব কথাই গানে। গন্ধর্ব্বকুমার গায়:—

নয়নের জল জলধির কোন্ পারে
হৃদয় আমার লুটায় নমস্কারে।
কোথা সেইখানে দুঃখ-মাণিক জ্বালা,
দাহনের জ্যোতি ত্রিভুবন করে আলা।
স্বর্গেরে কে সে লজ্জিল হাহাকারে!
এতটুকু বুকে অসীম বেদনা বয়,
বিশ্বে একাকী যুঝিয়া মরণ সয়।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর সুর মাঝে
মানুষ মানুষ, তব জয়গান বাজে;
নমো নমো বীর দুঃখী মরণ-জয়ী,
মরণ-বিহীন দেবতার বিস্ময়!

গানের সুরের শেষ রেশটুকু সাত সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে, গাংচিলদের ঝাঁকের মতো, তরতর করে' নেচে চলে' যায়; সুরের ঢেউ জলের ঢেউয়ের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে মানুষের ঘাটে গিয়ে আছ্‌ড়ে পড়ে, প্রতিধ্বনি হাহাকার হয়ে ফিরে আসে। গন্ধর্ব্বকুমার শোনে, তার চোখ জলে ভরে' আসে। এমন রোজ হয়।

গন্ধর্ব্বকুমারের হিতার্থীদের ভাবনায় আহার-নিদ্রা বন্ধ। সে দেশে এমনতর অঘটন কখনো ঘটেনি। চোখে জল! চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া আর যে কোনো কাজ হয় একথা চাক্ষুষ না দেখ্‌লে বিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে কঠিন হত। তাই অগত্যা এই নূতনতর ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করতে রাজ্যের যত নামজাদা ওঝাবদ্যিদের ডাক পড়্‌ল। ওঝা-বদ্যিরা এক এক করে' এসে কুমারকে দেখ্‌লে, দেখে' শুনে বল্‌লে,—গন্ধর্ব্বমুলুকের চিকিৎসাশাস্ত্রে এমনতর অসুখের কথা ত লেখে না, তাছাড়া স্বরবিপর্য্যয়, স্বরভঙ্গ, তালবিভ্রম প্রভৃতি কোনোরকম অসুস্থতার লক্ষণই কুমারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। অতএব তাকে নিয়ে কিছুদিন একটু ভাল রকম নৃত্যগীতবাদ্য করা হোক। তাতেও যদি কোনো ফল না হয় তবে সাগর-পারের গুহা-বাসী সেই যে বুড়ো তার কাছে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

ছয়দিন ছয়রাত কুমারকে ঘিরে গন্ধর্ব্বমুলুকের বাছাবাছা সুন্দরীরা প্রজাপতির মতো চপল নৃত্যে রঙিন স্বপ্নব্যূহ রচনা করে' রইল, তারও ওপর রইল বেগবান্ নিরবচ্ছিন্ন সুর-প্রবাহের পরিখা। কিন্তু চোখের জল এত সাবধানতারও বাধা মান্‌ল না!

তখন সাগর-পারের সেই বুড়োর কাছে যাওয়াই ঠিক হলো।

সেই যে বুড়ো, সে সত্যিকারেরই বুড়ো। তার কাশ-ফুলের মত গোছা গোছা জটপাকানো পাকা দাড়ি-চুলকে যৌবনের ছদ্মবেশ মনে করবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না, কেননা যৌবন তার কোনোকালে ছিলই না। গন্ধর্ব্ব-

মুলুকের ইতিহাস যতদিন ধরে' লেখা হচ্ছে ততদিন সেই ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ক্রমাগত থুড়থুড়ো বুড়ো বলে'ই তার উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়; তাই লোকে বল্‌ত সে জন্মে' অবধিই বুড়ো। সমুদ্র-পারে গন্ধর্ব্ব-মুলুকের সীমানার বাইরে ছোট একটি পাহাড়ে' দ্বীপের এক গহ্বরে সে থাক্‌ত। সেই গহ্বরের গা বেয়ে সারাক্ষণ টসটস করে' ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা হিম ঘাম ঝরে' পড়ত, আর সমুদ্রের অশ্রান্ত কলোচ্ছ্বাস তার ছোট-বড় হাজারো ফুকরের মধ্যে কত বিচিত্র সুরে যে বাজ্‌ত—খুব পাকা ওস্তাদরাও তার মানে বুঝ্‌ত না। গন্ধর্ব্বরা সদলবলে সেইখানে এসে উপস্থিত হলো।

সাগর-পারের বুড়ো খানিকটা শুনেই বলে' উঠ্‌ল, 'আরে এও জানো না? ওকে নিশ্চয় মানুষে পেয়েছে।'

সকলে খুব ভয় পেয়ে গেল। মানুষের নাম তারা কোনোদিন শোনেও নি, ভয়টা সেইজন্যেই আরো বেশী হলো। কিন্তু মানুষে পেলে কি হয়, মানুষ কাকে বলে? সকলে বুড়োর চারদিকে আগ্রহে শঙ্কায় কৌতূহলে নিবিড় হয়ে ঘেঁসে বস্‌ল। বুড়ো বলতে আরম্ভ করলে।—

'মানুষেরা দেখ্‌তে ঠিক তোমাদেরই মতো, এককালে তোমরা ভাই ছিলে। কিন্তু জায়গার দখল নিয়ে তোমাদের মধ্যে কলহ হত, তাই তোমাদের আলাদা করে' দেওয়া দরকার হলো। সুরের পুরোপুরি দখল নিয়ে সুরের দেশে তোমরা রইলে, আর সেই সুরকে ভেঙে টুটুক্‌রো করে' মানুষ পেলে—হাসি আর কান্না, আর তাই নিয়ে সাত সমুদ্রের পারে মাটির দেশে সে বাস করতে গেল। কিন্তু হলে কি হয়? যে বাঁধন নাড়ীর, ছিঁড়লেই কি আর একেবারে সে ছেঁড়ে? আজও সেই নাড়ীর টানে তোমাদের কারও নাড়ীতে থেকে থেকে টান পড়ে, আর তোমাদের সকল সুর হাসি-কান্নায় টুটুক্‌রা হয়ে ভেঙে পড়তে চায়, তোমরা সেইটেকেই অঘটন মনে করে' ভয় পাও। ওদিকে মানুষের দেশেও হাসিকান্না কেবলি চায় জুড়ে উঠ্‌তে; হাসি চায় কান্না হয়ে, কান্না চায় হাসি হয়ে সুর হয়ে ফেটে পড়্‌তে; মানুষেরাও যেখানেই সেই ব্যাপার দেখে,—বলে ব্যাধি, বলে পাগ্‌লামো, বলে কবিত্ব, আর অঘটন মনে করে' ভয় পায়। তা তোমাদের কিছু ভয় নেই, রোগীকে তোমরা কিছুদিনের জন্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও গে, আমি সব ঠিক করে' দেব।'

তখন সকলে আশ্বস্ত হয়ে বাড়ী ফিরল।

কিন্তু বাড়ী ফিরে কুমারকে কেউ কোথাও দেখ্‌তে পেলে না। সকলের অনুপস্থিতির কোন্ এক ফাঁকে, দিন-শেষের এক পূরবী গানের নৌকোয় দীর্ঘশ্বাসের পাল তুলে পূর্ব্বদিগন্তের পারে মানুষের দেশের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছে।—তার এর চেয়ে বেশী সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।···

সমস্ত গন্ধর্ব্বপুরীকে স্তব্ধ সচকিত করে' সেদিন দেবালয়ে দেবালয়ে অসময়ে বেহাগ বাজ্‌তে লাগ্‌ল। সাগরপাড়ে কাতারে কাতারে স্ত্রীপুরুষ এসে জমা হলো, সকলে মিলে সুরে র ইশারায় সুরের মিনতিতে সুরের সন্ধানে অনেক রাত ধরে কুমারকে ডেকে ডেকে, সেধে সেধে, খুঁজে খুঁজে বাড়ী ফিরে গেল, কুমারের সাড়া মিল্‌ল না।

* * * *

ভোরের সোনালি আলো তখন সবেমাত্র পূবআকাশের গায়ে সোনার বীণার তারের মতো কোন্ জ্যোতির্দ্দীপ্ত ভৈরবী আলাপের জন্য বাঁধা হচ্ছে। তারই মৃদু কম্পনে উপলশয়নে জল জেগে উঠছে, গাছের পাতা ঝির ঝির করে' কাঁপ্‌ছে, শাখানীড়ে পাখীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গন্ধর্ব্ব-কুমারের নৌকো জাগরণের তীরে রাত্রিশেষের শেষ স্বপ্নটির মতো, স্তব্ধগতিতে মানুষের ঘাটে এসে লাগ্‌লো। শিথিল উত্তরীয়টি টেনে গায়ে জড়িয়ে গন্ধর্ব্বকুমার করজোড়ে মাটিতে এসে নাম্‌লেন। পাখীরা একসঙ্গে জয়ধ্বনি করে' উঠল।

প্রভাতের প্রথম আলোয় বহুজীবধাত্রী ফলশস্যশালিনী শ্যামকান্তি সুন্দর ধরিত্রীকে প্রণাম করে' কুমার গাইলেন,

তোমায় আমার কেবল দিতে আসা,
মাগো আমার!
দুঃখসুখের আকুল কাঁদা হাসা,
মাগো আমার!
চিরকালের পরিচয়ের পারে
পথের মাঝে কুড়িয়ে পেলাম যারে,
এক নিমেষে দিলাম একেবারে
পাথেয় মোর সকল ভালোবাসা,
মাগো আমার!
তোমায় ছেড়ে চল্‌ব আমি যবে
মৃত্যুদূতের রথে,
কি লয়ে' মোর যাত্রা সুরু হবে
চিরকালের পথে?

পারের কড়ি সেই বিদায়ের রাতে
রইবে না গো রইবে না আর হাতে,
অন্ধকারে কোন্ সে অজানাতে
রিক্তবুকে বাঁধ্‌ব গিয়ে বাসা,
মা গো আমার !...

মানুষের দেশে পথে পথে তখন লোকের চলাচল সুরু হয়েছে। কাজে অকাজে স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধ, কেউ ছেলে কোলে করে' কেউ বোঝা কাঁধে নিয়ে, কলরব কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। তারা কেউ কুমারকে দেখে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে' গেল, কেউ মুখভঙ্গি করে' হেসে টিট্‌কিরি দিলে, কেউ বা ভিড় ঠেলে কাছে এসে খামকা এমন যা তা কটুতিক্ত কথা শোনাতে লাগ্‌ল যে কুমারের কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ত উঠ্‌লই, তাঁর এমনও মনে হতে লাগ্‌ল—নৌকোর গলুই অন্তদিগন্তের মুখে ফিরিয়ে আবার তাঁর সেই স্বপ্নে ছাওয়া নিভৃত মনোরম সুরের দেশটিতে ফিরে যান! কিন্তু এ সঙ্কল্প ছাড়্‌তে হলো। একসঙ্গে অনেকগুলো সেতার কোমল নিখাতে বাজিয়ে দিয়ে পাশ থেকে আফ্‌শোষের সুরে কে বল্‌লে, 'চলে' যাচ্ছ ?'

কুমার দেখ্‌লেন, ভোরের শিশিরসিক্ত একগোছা কচি আম্র-পল্লবের মতো সতেজ স্নিগ্ধকান্তি পৃথিবীর এক তরুণী দুহিতা, দুখানি আঁখি-পল্লবে দুটি বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলের মতো টলটল কর্‌চে! কুমার ব্যস্ত হয়ে সুর খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু এই মায়াবিনী মানবীর গভীর চোখদুটির রহস্যদৃষ্টির অতলতায় সব সুর কোথায় নিখোঁজ হয়ে তলিয়ে গেছে, সুরহীন সাদা কথায় জড়িয়ে জড়িয়ে কুমারকে বল্‌তে হলো, 'তুমি কে গো ?'

সে বল্‌লে, 'আমি এই গাঁয়েরই মেয়ে গো বিদেশী! বাগানের ফলমূল তরিতরকারী এই পথ দিয়েই রোজ আমি শহরের হাটে বেচ্‌তে নিয়ে যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?'

কুমার বল্‌লেন, 'শহরের হাটে ? কি নিয়ে যাব ? আমার সঙ্গে ত বেসাতি কিছু নেই !'

'নেই বা থাক্‌ল। তুমি কিছু কাজ জানো ?'

'আমি গাইতে জানি, কিন্তু সুরও আমার সব হারিয়ে গেছে।'

তরুণী হেসে গড়িয়ে পড়্‌ল, বল্‌লে, 'তা সুর অমন কত হারায়। তুমি এসো আমাদের বাড়ী !'

ছোট একটি আম্‌লকি-বনের ধারে, গাঁয়ের একেবারে শেষ সীমায়, তরুণীর শান্ত স্তব্ধ ছোট্ট ছায়াস্নিগ্ধ কুটীরটি। বাদামী রংএর উলুখড়ের ছাউনীর ওপর কত রাজ্যের বিচিত্র লতাপাতা জড়াজড়ি করে' উঠে গেছে, আর সেই-সব লতার গিঁঠে গিঁঠে রংবেরংএর গোছা গোছা কত ফুল! লতার পর্দা সরিয়ে তরুণী তার তকতকে করে' নিকানো ঘরটিতে কুমারকে নিয়ে গিয়ে বসালো, থালাতে করে' বাগানের শসা পেয়ারা কিছু আতা আনারস, বাটিতে বাটিতে বেলের পানা তরমুজের সরবৎ, সদ্য দোয়ানো ফেনোচ্ছল উষ্ণ দুধ এনে তাঁকে খেতে দিলে, তারপর কুলুঙ্গি থেকে ময়ূরপুচ্ছের পাখাখানি পেড়ে নিয়ে তাঁর পাশে আঁচল বিছিয়ে বসে' পড়ে' তাঁকে হাওয়া করতে লাগ্‌ল।

বিদ্যুতের মতো তার শুভ্র হাতটির লীলাচপল দোলানির সঙ্গে সঙ্গে বলয়-কঙ্কণ মুখর হয়ে বাজে, আর তারই ছোঁয়াচে কুমারের গলার কাছে সুর কেবলি আকুলিবিকুলি করে' ওঠে; তাঁর খাওয়া আর হয় না। তরুণী চুপ করে' দেখে' দেখে' হঠাৎ বলে' উঠ্‌লে, 'তুমি খাচ্ছ না যে ? তুমি ভারী লাজুক !'

কুমার তাঁর সুরের ব্যথা কথা দিয়ে বোঝাতে পারেন না।...

তবু দিন যায়। তরুণীর পরমাত্মীয়ের মতো আদরে আপ্যায়নে কুমার তাঁর সাগরপারের সুরের দেশটির কথা এতদিনে একরকম ভুলেই গেছেন। কিন্তু এইখানে এই মানুষের দেশেরই যুগযুগসঞ্চিত দুঃখ, তার লোকলোক-বিশ্রুত চিরঅফুরন্ত কান্না, তাঁর প্রতিদিনের নিশ্চিন্ত নিরাকুল জীবনযাত্রার বুকের মধ্যে ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঝাপটের মতো এসে পড়ে' মাঝে মাঝে বড় বেসুর বেজে ওঠে; কুমারের মনটা উড়ু উড়ু করতে থাকে।

একদিন এক স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে নিদ্রাতুর আম্‌লকি বনের এক নিরালা কোণে তরুণীকে নিয়ে বসে' কথায় কথায় কুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'আচ্ছা, এতদিন একসঙ্গে আছ, আজ পর্যন্ত একটি কথা তোমার কাছ থেকে শোনা হলো না।'

আশায় উৎকণ্ঠায় তরুণীর গণ্ডমূল আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। একটি করবীফুলের পাপ্‌ড়ি নখের আগায় করে' কাট্‌তে কাট্‌তে সে বল্‌লে, 'কি ?'

কুমার আর-একটু তার কাছে সরে' বসে' বল্লেন, 'শোনা হলো না, তোমার কিসের দুঃখ!'

ব্যর্থ আশার আবেগে তরুণীর মুখখানি রৌদ্রদগ্ধ ধান্যশীর্ষের মতো কালো হয়ে উঠ্‌ল। হাতের ফুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে' দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে সে বল্লে, 'আমার আবার



তরুণীর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে কুমারের বুকটা একটা দীর্ঘশ্বাসে ভরে' এল।
(চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

কিসের দুঃখ? বালাই, আমি বেশ আছি।' তারপর তাড়াতাড়ি সে জায়গা ছেড়ে চলে' গেল। তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে কুমারের বুকটা একটা দীর্ঘশ্বাসে ভরে' এল।

সেদিন অনেক রাত অবধি কুমার সেখানে বসে' কাটালেন। গাছের শাখায় পাখীরা কয়েকবার অস্থিরভাবে পাখা ঝটপট করে' চুপ করল, একটি শিশু নিদ্রাভঙ্গে অকস্মাৎ একবার চীৎকার করে' কেঁদে উঠে আবার তেমনি অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল; তারপর অনাহত জ্যোৎস্নারাশি, স্রোতো-বেগের কলকলের মতো, অশ্রান্ত ঝিল্লীমুখরতায় একটানা স্তব্ধগতিতে বয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

রাতের যখন আর অল্পই বাকী, আম্‌লকি-বনের পাশ দিয়ে নেমে ধূধূ মাঠের ওপারে সাগরজলে ঝিলিক দিয়ে দ্বাদশীর চাঁদ অস্ত গিয়েছে, কুমার তখন গা—ঝাড়া দিয়ে উঠে পথের রেখা ঠাহর করে' আম্‌লকি-বন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে চল্লেন। কিন্তু পথটি দুফলা হয়ে যেখানে বাড়ীর দিকে মোড় ফিরেছে সেই দিকে না ফিরে, সেই রাত্রিশেষের কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে একলা চল্লেন, দূর শহরের হাটের দিকে, সেইখানে যদি মানুষের দুঃখের সন্ধান পাওয়া যায়।... তরুণীর মুখটি একবার মনে পড়্‌ল, তার পরেই আর পড়্‌ল না।

যেতে যেতে যেতে শহরে গিয়ে প্রহরেক বেলা হলো। এরই মধ্যে শহরের পথে লোক ধরে না, গাড়ী-ঘোড়ার দাপটে কোথাও একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ায় কার সাধ্যি? তবু চলার যাদের তাগিদ আছে তারা ভিড় ঠেলেঠুলে কোনোরকম করে' চল্‌তে পায়, ঠিকানা যাদের ঠিক আছে পথ খুঁজে পেতে তাদের দেরি হয় না। কুমার যাকেই বলেন, ওগো একটু শুন্‌বে? সেই বলে, না না, এখানে কিছু হবে না। চল্‌তে চান, পথের নিশানা ঠিক কর্‌তে না পেরে ফিরে ফিরে আবার আগের জায়গাটিতেই এসে হাজির হন।

সমস্তদিন এমনিধার, তাঁতির হাতের মাকুর মতো, শহরের এমাথা থেকে ওমাথায় লোফালুফি হয়ে শেষটা ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে, একটা পুরানো কালো মস্তবড় ভাঙা বাড়ীর সিংদরজার সাম্‌নে এসে, ধূলোর উপর একটুখানি জায়গা করে' নিয়ে তিনি বসে পড়্‌লেন। একটু দূরেই, মাথা-ভরা জট-পাকানো চুল, এক আশীবছরের বুড়ি একখানা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসে' ছিল। কুমারকে দেখে গুধুগুধু মুখ বেঁকিয়ে সে ঘুরে বস্‌ল। তাকে দেখে' কুমারেরও কি মনে হলো, আস্তে আস্তে উঠে এসে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন, 'হাঁ গা, তোমার কি অনেক দুঃখ?'

বুড়ি মুখনাড়া দিয়ে বলে, উঠ্‌ল, 'আমার দুঃখ আছে বা নেই তা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন রে মুখপোড়া?'

সুরের দেশে বাস করে' যত রকম সুরের সঙ্গে এত বয়স পর্য্যন্ত কুমারের পরিচয় ঘটেছিল তার প্রত্যেকটির সঙ্গে তিনি বুড়ির এই কথাকয়টিকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কোনোটার সঙ্গেই যখন মিল্‌লে না তখন ভাব্‌লেন,—এবার নিশ্চয় একেবারে খাঁটি, মানুষের মতো একজন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর কোথাও সুরের

ভেজাল নেই। দুঃখের সন্ধান এ নিশ্চয় বল্‌তে পারবে। মুখে বল্‌লেন, 'না অম্‌নি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। অবশ্য বল্‌তে যদি তোমার কোনো বাধা না থাকে। আমি কিনা মানুষের দুঃখের সন্ধান নিতে বেরিয়েছি!'

বুড়ি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কি একটা বল্‌লে। সে যত রেগে জ্বলে' ওঠে, কুমার তত ভাবেন, এইবার ঠিক-মানুষের নাগাল পাওয়া গেছে, আর তত তিনি নাছোড় হয়ে তাকে সেঁটে ধরেন। হাড় জ্বালাতন হয়ে তাঁর হাত থেকে রেহাই



মাথাভরা জটপাকানো চুল, আশী বছরের এক বুড়ি।
(চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।)

পাবার জন্যে বুড়িকে বল্‌তে হলো, 'কি জানি বাপু, আমরা ত এই ভাঙা বাড়ীটাকেই ছেলেবেলা থেকে দুঃখের বাড়ী বলে' শুনে আস্‌ছি। এও যদি না জানো ত এ দেশে এসেছিলে কোন্ মুখে?'

কুমার মহা খুসি হয়ে উঠে পড়্‌লেন, বল্‌লেন, 'তোমার ভালো হোক বুড়ি মা, কিন্তু এই বাড়ীতে আমায় ঢুক্‌তে দেবে ত?'

বুড়ি ফোক্‌লা দাঁতে মাড়ি বার করে' হেসে উঠ্‌ল। একটা ভাঙা কাঁসার বাটিকে কে যেন পর পর কয়েকবার লাঠি দিয়ে বিষম ঠুকে দিলে। কুমার আর-কোনো কথা না বলে' সেই কালো অন্ধকার প্রকাণ্ড জীর্ণ পুরীটার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন। পুকুরের মধ্যে ছোট্ট একটি ঢিল পড়্‌লে যেমন হয়, পুঞ্জ পুঞ্জ নিতল স্তব্ধতা ঠিক তেমনি করে' ছুটে এসে কুমারকে চার'দিক থেকে ঘিরে ধরে' নিজের মধ্যে নিখোঁজ করে' ডুবিয়ে নিলে।

কুমারের সারা গাটা কেমন ছমছম কর্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীটার ফাট-ধরা চাতালে চাতালে কত নিদারুণ বিপ্লবের অটুট ইতিহাস, অন্ধকার শ্যাওলার ছোপ ধরা স্যাঁৎসেতে কক্ষগুলিতে কত বেদনার যুগযুগব্যাপী অশ্রুনিষেক, জীর্ণ কঙ্কালসার দেয়ালগুলিতে শোচনীয় দৈনদুর্দ্দশার কত অক্ষয় কাহিনী। কুমারের মনে হতে লাগ্‌ল, গলা ছেড়ে একবার গেয়ে নিতে পার্‌লে একটু সুস্থ বোধ কর্‌বেন। কিন্তু তাঁর ক্ষীণ গলার সুরটুকুকে টিপে মার্‌বার জন্যে চারদিককার স্তব্ধতাটা যেন উদ্‌গ্রীব উদ্যত হয়ে আছে। গলা তাঁর শুকিয়ে উঠ্‌ল, গাইতে গিয়ে সুর আট্‌কে গেল। মনে মনে দেবতাকে ডেকে বল্‌লেন, ওগো অন্তর্য্যামী, দুঃখে সুখে মানুষের দেশে সুরের এ কি লাঞ্ছনা! আমাকে এখানে পাঠালে কি মুখ গুঁজে পড়ে' মরে' থাক্‌বার জন্যেই?

কুমারের চোখদুটিতে জল ছলছল করে' উঠ্‌ল। সেই চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে প্রকাণ্ড অজগরের মতো কালো ভয়ঙ্কর সেই বাড়ীটাকে তাঁর একটু একটু করে' কেমন পরিচিত, কেমন যেন আপনার বলে' মনে হতে লাগ্‌ল। সাহসে বুক বেঁধে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার তিনি অগ্রসর হতে লাগ্‌লেন।

কত চত্বরের পর চত্বর, কত দালানের পর দালান, কত মহলের পর মহল তিনি পার হয়ে গেলেন, কিন্তু কোথাও জন-মানবের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলেন না। এত বড় বিরাট বাড়ীটাতে একটিও মানুষের বাস নেই! যারা গেছে তারা তাদের শেষ দিনের সম্বলটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ করে' ফুরিয়ে বা সঙ্গে করে' নিয়ে তবে গেছে। কোথাও একটা পুরানো কালিমাখা হাঁড়ি, ছেঁড়া পাটি বা ভাঙা পেট্‌রাও পড়ে' নেই। কোণে কাণাচে কুলুঙ্গিতে সর্ব্বত্র খা খা শূন্যতার একাধিপত্য। ভাঙা চূড়ো-খসে-পড়া দেবালয়ে দেবালয়ে দুঃখের দেবতারা সারি সারি স্তব্ধ হয়ে বসে' আছেন, তবকাল

কেউ তাঁদের পূজো করেনি, প্রদীপের বুক থেকে সলতের ছাইটুকু পর্য্যন্ত উড়ে গেছে। কুমার ঘুরে ঘুরে সব দেখে' হতাশ হয়ে আবার সিংদরজার সামনে সেই বুড়ীর কাছে ফিরে এলেন। তাঁর একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ বুড়ী মা, এই বাড়ীতে ত কই কিছু দেখ্তে পেলাম না!'

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠে বল্লে, 'কিছু ত দেখ্তে পেলে না, কিন্তু সুখ দেখ্তে পেয়েছ?'

কুমার কিছুই বুঝ্লেন না, বল্লেন, 'বুড়ি মা, তুমি আর-জন্মে আমার মা ছিলে। আমার অনেক উপকার করলে। আর একটি কথা কেবল বলে' দাও, খুসি হয়ে চলে' যাচ্ছি।'

বুড়ি কোটরের মধ্যে চোখদুটো ঘুরিয়ে বল্লে, 'আর-জন্মে আমি তোর মা ছিলুম, সেই পাপেই আমার এ জন্মে এত দুর্দ্দশা, না? এই কাটারি দেখছিস্, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।'

কুমার আর দ্বিরুক্তি না করে' সেখান থেকে সরে' পড়্লেন। সন্ধ্যার আব্ছায়ায় পথে এক বাউল নিজের মনে গান গেয়ে চলেছিল; কুমার ভাব্লেন, এ নিশ্চয় আমার মনের কথা বুঝ্বে। কাছে গিয়ে ডাক্লেন, 'ও বাউল!'

বাউল ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'কি গো বিদেশী, কি চাই তোমার!'

কুমার বল্লেন, 'না, এমন কিছু না। এই যে দুঃখের বাড়ী, এর লোকজন সব গেল কোথায় জান্তে চাই।'

বাউল বল্লে, 'ও! তা ও-বাড়ীতে ত আমিও একদিন ছিলুম। মন ওখানে বস্ল না, তাই সারেঙা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছি।'

কুমার বল্লেন, 'তা মন ওখানে না বসা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এতবড় বাড়ীতে ত আর তুমি একলা ছিলে না; আর যারা ছিল তারা সব গেল কোথায়?'

বাউল বল্লে, 'তারা সবাই ত আর আমার মতো লক্ষীছাড়া নয়। তারা গেছে তাদের পুঁজিপাটা ভেঙে তীর-ধনুক গড়িয়ে খেয়ালকাটার মাঠে।'

'সেখানে কি হয়?'

'লড়াই হয় গো বিদেশী।'

বাউল যেখানে গান শেষ করেছিল আবার সেইখান থেকে সুরু করে সারেঙায় ঝঙ্কার দিতে দিতে চলে' গেল।

তখন রাত বেশ অনেকটা হয়েছে। নিশীথে নগরীর স্তব্ধতা পল্লীস্তব্ধতার চেয়েও অনেক বেশী নিথর নিঃসাড়, একটা ঝিঁঝিঁপোকাও ডাকে না, একটা পাখীও পাখা ঝাড়ে না। কুমার বাউলের গাওয়া সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুন গুন করে' গাইতে গাইতে চল্লেন, পথের শেষে মস্ত লাল এক উৎসব বাড়ীতে সে রাত্তিরের মতো আশ্রয় নিতে।

দেখ্লেন, একটিও লোক চল্ছে না, তবু পথের দুধারে কাতারে কাতারে অজস্র আলো জল্ছে, আশে-পাশে কেয়ারি-করা চমৎকার চমৎকার ফুলের বাগান খোঁচা-তোলা কদাকার শিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সিংদরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুদিকের সার-দেওয়া সান্ত্রীরা বর্শার সঙ্গে বর্শা ঠেকিয়ে পথ আড়াল করে' দাঁড়িয়ে রইল, কুমারের হাজারো প্রশ্নের জবাবে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত কর্লে না!

কুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা লোক, তার একটা চোখ কানা, একটা কান কাটা, পেছন থেকে কুমারের কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় বল্লে, 'এটা সুখের বাড়ী, এ বাড়ীতে ঢুক্বার পথ এ নয়। ঢুক্তে চাও ত আমার সঙ্গে এসো।' বলে' তাঁর হাত ধরে' টেনে নিঃশব্দে বাড়ীর এক পাশে পুকুরের ধারে একটা লিচুগাছের তলায় নিয়ে গিয়ে হাজির কর্ল। বল্লে, 'গাছে চড়্তে জানো?'

কুমার বল্লেন, 'আগে কখনো দর্কার হয়নি।'

সে বল্লে, 'আচ্ছা রোসো।' টপটপ করে ডালের পর ডাল বেয়ে উঠে একটা লম্বা ডাল ধরে' ঝুলে পড়ে' সে পাঁচিলের ওপাশে বাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। একটু পরে পাঁচিলের গা বেয়ে একটা দড়ির সিঁড়ি নেমে এল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কুমার আবার সেই সিঁড়ি ঘুরিয়ে ফেলে'ই নীচে নাম্লেন। সুখের বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের দ্যুতিতে তাঁর চোখ ঝল্সে গেল। তিনি থম্কে দাঁড়ালেন।

তাঁর চোখে একটু সয়ে গেলে লোকটা তাঁকে সঙ্গে করে' কক্ষের পর কক্ষ দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্ল। সে কি ঐশ্বর্য্য, তার সংখ্যা হয় না! সোনা রূপো হীরে

জহরতের গহনা দিয়েই কেবল কত ঘর ঠাসা। কত নীল-কান্ত, চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত, সূর্য্যকান্ত মণির স্তূপ; কত কৌস্তভরত্ন, কত গজমোতি, কত বৈদূর্য্যমণি তার লেখা-জোখা নেই। কুমার ঘুরে ঘুরে সব দেখ্‌লেন, দেখে' দেখে' তাঁর তৃপ্তি হলো না। সঙ্গের লোকটিকে বল্‌লেন, 'আচ্ছা, এ বাড়ীর মালিক কেউ নেই?'

সে বল্‌লে, 'থাক্‌বে না কেন? তাদের কি আর কাজ নেই ভেবেছ? তারা কেউ আছে বাইরে পাহারায়, আর বাদবাকী সব খেয়ালকাটার মাঠে।'

কুমার বল্‌লেন, 'এই রাজৈশ্বর্য্য ফেলে খেয়ালকাটার মাঠে? তারা সেখানে কি কর্‌তে গেছে?'

লোকটা বল্‌লে, 'নাঃ, তুমি ভারি নেকা। তোমার সঙ্গে আমার পোষাল না। আমি চল্লুম, আমার কাজ আছে।'...

অত বড় সুখের বাড়ীতে কুমার তখন একলা পড়্‌লেন। একলা বসে' বসে' কি আর করেন, ভাব্‌লেন, একটা গান গাই, মনটা একটু ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু যে গানই ধর্‌তে যান অত্যন্ত খেলো মনে হয়। মণিমাণিক্যের চটকের পাশে সুর যেন নিজের নিরাভরণতার লজ্জায় শুকিয়ে মর্‌তে চায়। নিরুপায় হয়ে তখন অকাজে আনমনে প্রাঙ্গণ থেকে প্রাঙ্গণে চত্বর থেকে চত্বরে মহল থেকে মহলে স্বপ্নাহতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। দেখ্‌লেন, বাক্স সিন্দুক বোঝাই করা টাকা থাক থাক করে' সাজানো রয়েছে—একটিও তার খরচ করা হয়নি! স্তূপাকার রত্নখচিত মণিময় উজ্জ্বল মখমলের পোষাক, তার একটিকে কেউ পাট ভেঙে গায় পরেনি! সোনার শামাদানে স্ফটিকের বাতিতে ঘিয়ের সল্‌তেয় আগুন জ্বলার চিহ্ন নেই! কক্ষে কক্ষে রূপার পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার বহুমূল্য শালের আস্তরণ কোথাও মানুষের স্পর্শে এতটুকু একটু কুঁচ্‌ড়েও যায়নি। সুগন্ধি অঙ্গরাগের পাত্র কানায় কানায় ভরাই আছে! কুমার দেখ্‌লেন, সবই আছে কেবল সুখ নেই।—ক্ষোভে তাঁর চোখে জল এল। তখন সেই প্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীরগুলো হঠাৎ যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্বচ্ছ হয়ে গেল। কুমার অবাক হয়ে দেখ্‌লেন, সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে যতদূর চোখ যায় কেবল কক্ষের পর কক্ষ, তোষাখানার পর তোষাখানা, রত্নধনির পর রত্নখনি, কোথাও তার আর শেষ নেই। সে-সমস্তের উপরে শুক্তিপুটের মর্ম্মরাগের মতো উজ্জ্বল আলোর ঢেউ, আবর্ত্তে আবর্ত্তে, তরঙ্গে তরঙ্গে, দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে বয়ে চলেছে। তার ওপর দিয়ে রাশি রাশি প্রজাপতি রংবেরংএর পাখার পাল তুলে উড়ে আস্‌ছে, সারি সারি জোনাকীরা মশাল হাতে করে' ছুটে চলেছে, আর সকলের পেছনে আস্‌ছেন লাল নীল সোনালি রংএর পদ্ম-পাথ্‌নার মাছে টানা পদ্মপাপ্‌ড়ির নৌকোয় চড়ে' এক বিদ্যুৎবরণী জ্যোতিরাভরণা দেবী, মাথায় তাঁর ধান্য-মঞ্জরীর মুকুট কোন্ আকাশে গিয়ে যে ঠেকেছে তার ঠিক নেই। কুমার পথ আড়াল করে' দাঁড়িয়েছিলেন, অলকা-পুরীর শোভাযাত্রা বাধা পেয়ে থেমে গেল।

দেবীকণ্ঠে প্রশ্ন হলো, 'আমার পথ আট্‌কায় কে?'

কুমার বল্‌লেন, 'আমি গন্ধর্ব্বদের ছেলে, তুমি কে মা?'

'আমি মা-লক্ষ্মী গো বাছা! আমার এক লহমা সময় নেই, লক্ষ্মীটি পথ ছেড়ে দাও!'

'দিচ্চি, কিন্তু দয়া করে' যখন দেখা দিয়েছ, তখন একটা বর দাও মা-লক্ষ্মী!'

'কি বর চাই?'

'আমি তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।'

'এক বরে কি তিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে বাছা? তোমাকে তিনটি বর চাইতে হবে।'

আচ্ছা তবে তিন বরই চাইছি।'

'বল কি জান্‌তে চাও।'

'মা, তোমার এই যে ঐশ্বর্য্যপুরী, এর শেষ কোথায়?'

'নেই। এই পুরীর চাবিকাঠিটি যাদের হাতে, দরজায় যাদের এত সতর্ক পাহারা, তারাও তার এক-কণিকার খোঁজ জানে না।'

'মানুষ আর কাকেও বঞ্চিত না করে'ও কতটুকু নিতে পারে তোমার এই ভাঁড়ার থেকে?'

'তুমি কত নেবে? কত নিতে পারো?'

'মা, মানুষের সুখৈশ্বর্য্য দেখে' দেবতাদের কি ঈর্ষ্যা হয়?'

'না বাছা, সুখে দেবতাদের লোভ নেই।'

'মানুষ কেন তাহলে কাড়াকাড়ি কাটাকাটি করে' মরে?'

'তুমি তিনটি বর চেয়েছিলে, তিন বরে তিনটি প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি; আর পার্‌ব না, এবার পথ ছেড়ে দাও।'

কুমার বল্লেন, 'আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি কেবল বলে' দিয়ে যাও, এই পুরী থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যাবার পথ কোন্ দিকে। আমি চল্‌ব খেয়ালকাটার মাঠে, আমার শেষ প্রশ্নের জবাব জান্‌তে।'

মা-লক্ষ্মী তখন প্রজাপতিদের পাখায় হাত বুলিয়ে দিলেন, জোনাকীদের উস্কে দিলেন, দিয়ে, গজদন্তের দণ্ডটিকে তিনবার মেজের গায় ঠুকে চক্ষের পলকে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। কুমার দেখ্‌লেন, সেই কালো অজগরের মতো প্রকাণ্ড জীর্ণ অন্ধকার বাড়ীটার মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাইরে থেকে সেই বুড়ির কলহের শব্দ কানে আস্‌ছে। ভোর হয়েছে। গাড়ী ঘোড়া লোকজনের চলাচল সুরু হয়েছে। পথে বেরিয়ে কুমার গাইলেন,

ওরে তোর ভরসা যে নেই,
রয়েছিস্ দুঃখ মেনেই
আগুলি' সাত পুরুষের দুপোটা মুক্তাগীরে।
আকুরাণ রত্নখান চাস্ যদি ত চল বাহিরে।
ও তোর এই ভয়ের পারে,
তোর এই সংশয়ের পারে
অসীমের তোষাখানার দুয়ার খোলা,
ওরে ও আপনা ভোলা, একবার দেখ্ চাহি' রে।
দুখী তোর ভাই ভিখারী,
কড়ি তার কাড়াকাড়ি
অসীমের রাজপুরীতে;
ছি ছি তোর কাংলা-রীতে
দেখাতে নারি যে মুখ, এ লাজের পার নাহি রে!

শহরের পথে গান গেয়ে কুমারের সেদিন ক'গণ্ডা পয়সা জুট্‌ল। তারই কিছু ভেঙে খরচ করে' খেয়ে, বাকী চাদরের খুঁটে বেঁধে কুমার বেরুলেন, খেয়ালকাটার মাঠের উদ্দেশে। পথের লোক যে শুন্‌ল, মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করলে।—তিনি কারও কথাই শুনলেন না। যেতে যেতে যেতে খেয়ালকাটার মাঠের ধারে এক বনের মধ্যে এসে রাত হলো। কুমার শ্রান্ত হয়েছিলেন, একটা ঝরণা থেকে আঁজ্‌লা করে' জল খেয়ে একটা গাছের কোটরের মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন।

তিন-তিনবার কুমারের ঘুম ভাঙ্‌ল, তিন-তিনবার হাজার হাজার পাখী কলরব করে' উঠে থেমে গেল, রাত আর ফুরোয় না। ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসে কুমার দেখেন, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি হয়ে আকাশ অন্ধকার। আশেপাশে ডাইনে-বাঁয়ে সে অস্ত্র ক্রমাগত এসে ছুটে ছুটে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। তার কোনোটা বা নিশিত বজ্রপাথরের তৈরী, কোনোটা বা কেবল মর্ম্মভেদী কথার; কোনোটা চোখে দেখা যায়, কোনোটা বা যায় না। সে অস্ত্র কে ছুঁড়্‌ছে, কোথা থেকে ছুঁড়্‌ছে, কাকে ছুঁড়্‌ছে তার কিছু ঠিক নেই।

একটা ফুলভরা চাঁপা-গাছের তলায় একটি লোক রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে পড়ে' ছিল, ছুটে গিয়ে তার মাথাটিকে দুহাতে কোলে তুলে নিয়ে কুমার বল্লেন, 'আহা, কে তোমার এ দশা করলে!'

লোকটি ম্লান হেসে বল্লে, 'আমার নিজেরই অস্ত্রে আমি কাটা পড়েছি গো বিদেশী।'

কুমার বল্লেন, 'কি করে' এমন অঘটন ঘট্‌ল?'

লোকটি বল্লে, 'আকাশে যে অস্ত্র ছুড়ে দিয়েছিলাম ফিরে এসে তা আমারই গায়ে লেগেছে। ডান হাতের আঙুল-ক'টা একেবারে গেছে; বাঁ পাটা নাছোড়, শরীরের সঙ্গে তিন আঙুল সম্বন্ধ বজায় রেখে আছে এখনো।'

নিজের উত্তরীয় দিয়ে তার গায়ের ক্ষত জড়াতে জড়াতে কুমার বল্লেন, তোমার 'অস্ত্রে কাকে তুমি মার্‌তে চাও?'

সে বল্লে, 'কাউকেই না। এ কি খেলা পেয়েছ? এ লড়াই, কে মর্‌ল, না মর্‌ল, সে খোঁজ নেবার কি অবকাশ আছে এখানে?'

তার মাথাটিকে কোল থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে কুমার নিঃশব্দে উঠে পড়্‌লেন। পাথরের দৃষ্টিতে সুমুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে হঠাৎ চাঁপা-গাছের একটা ফুলভরা নীচু শাখা মড়মড় করে ভেঙে নিয়ে একপাশে ঘুরে গড়িয়ে পড়্‌লেন। নির্লক্ষ্যের পথ দিয়ে ছুটে মর্ত্ত্যলোকের মর্ম্মান্তিক এক আঘাত এই প্রথম এক গন্ধর্ব্বকুমারের বুকে এসে লাগ্‌ল। বনের পাখী সব হায় হায় করে' উঠ্‌ল। হিংস্র পশুদের মুখে সেদিন আর রক্ত রুচ্‌ল না।

বুকের রক্ত দুহাত দিয়ে চেপে, পড়্‌তে পড়্‌তে টল্‌তে টল্‌তে কুমার আবার সেই শহরের হাটে ফিরে এলেন। এবার মানুষের দেশের ওঝাবদ্যিরা এসে তাঁকে দেখে' গেল, দেখে'শুনে বলে' গেল, কুমারের এখনই প্রাণ হারাবার কোনো সম্ভাবনা নেই বটে, কিন্তু বেশীদিন বেঁচে থাকাও আর তাঁর অদৃষ্টে নেই। বুকে তাঁর বিষ-শায়কের ঘা, এর চিকিৎসা হয় না। দিনে দিনে পলে পলে অলক্ষ্যে তাঁর প্রাণশক্তিকে এই বিষ হরণ কর্‌বে।...তখন কুমার আবার এক স্তব্ধ গভীর রাত্রে, মানুষের সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে,মানুষের পৃথিবীর কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে, এক করুণ বাগেশ্রীর গানের নৌকোয় হাহাকারের পাল তুলে শরাহত সারসের মতো উধাও হয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে মানুষের অশ্রুর সমুদ্রের ওপারে গানে ঘেরা স্বপ্নে গড়া গন্ধর্ব্বদের নিভৃত মনোরম দেশটির সন্ধানে। সাগরপাড়ের তাঁর সেই প্রথম পরিচয়ের তরুণী মানবীর লজ্জানম্র মুখখানি চকিতের মতো একটিবার তাঁর মনে পড়্‌ল, কিন্তু তখনি প্রাণপণ করে' মন থেকে তাকে তিনি সরিয়ে দিলেন।

* * * *

কুমার চলেন চলেন, সাত দিন সাত রাত পর তাঁর নৌকোর পাশে যে গন্ধর্ব্বদের দেশের আরেকখানি গানের নৌকো। তার মাস্তুলের ডগায় ডগায় পিলু বারোঁয়ার কত শত রঙিন নিশান, কত সাহানার পাল, কত ইমণ-কল্যাণের ক্ষেপণী! কুমার দেখেন দেখেন, তাঁর বুকের বিষক্ষতের কথা ভুলে' যান। বাতায়নে মুখ বাড়িয়ে গেয়ে ওঠেন, 'একলা পথের গানের সাথী, তুমি কে গো?'

সাহানার নৌকোর গবাক্ষে ঝিলমিলি খুলে যায়। মেঘবরণ চুল, কুচবরণ এক কন্যা সারা আকাশের গায় রূপ-জ্যোৎস্নার লহর তুলে, হাসিভরা চোখে তাঁর দৃষ্টির সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে গেয়ে ওঠে, 'আমি যে গন্ধর্ব্বদের এক মেয়ে! আমার মনের মানুষটিকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। চোখদুটি তোমার স্বপ্ন ছেঁকে তৈরি, কণ্ঠে তোমার সুরসরস্বতীর আসন পাতা; তুমিই কি সেই মানুষ?'

কুমার কি জবাব দেবেন ভেবে পান না। বাগেশ্রীর নৌকো আর সাহানার নৌকো পাশাপাশি চলে। যতক্ষণ না অন্ধকারে দৃষ্টি জড়িয়ে যায় দুটি গবাক্ষে দুজোড়া চোখে পলক পড়ে না। সুরের ভাষায় গানের আলাপনে দুটি মনের আনাগোনা চল্‌তে থাকে। কুমারের খোলা বাতায়নে যে চাঁদের আলোটুকু এসে পড়ে, রাতবিরাতে কন্যাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গানের মধ্যে করে' সেই আলোটুকুকে তিনি তার কাছে উপহার পাঠিয়ে দেন। কন্যার ফুলের মঞ্চে যে ফুল লুকিয়ে ফুটে ওঠে, তার সুবাসটুকুকে হাসিটুকুকে চুরি করে' গানের মধ্যে দিয়ে কুমারকে তিনি প্রতিউপহার পাঠান। এমনি করে' দিনের পর দিন কেটে যায়।

এক মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে, গন্ধর্ব্বদের দেশ যখন পশ্চিম দিগন্তের কিনারায় স্বপ্নের আব্‌ছায়ার মতো চোখে পড়ছে, কুমার তখন সেই ভরা চাঁদের আলোয় রূপসী গন্ধর্ব্বকন্যার দিকে তাকিয়ে ভরা মনে গেয়ে উঠ্‌লেন,—

কোন্ জীবনের সব-হারানোর হাটে
সর্ব্বস্বান্ত
এসেছিনু ওরে ফেলে,
চির-জনমের ঐ চেনা মুখটিরে,
অচেনা পান্থ,
কুড়িয়ে কোথায় পেলে?....

তখন সেই কন্যা যে জ্যোৎস্নার আলোয় সমাট জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র পেলব হাতখানি দুলিয়ে ধরা যায়-বা-না-যায় মতো করে' ইসারায় কুমারকে ডাকে। কুমার স্বপ্নাহতের মতো তার দিকে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চান্ আর তাঁর বুকের ক্ষতে রক্তস্রোত গল্‌গল্ করে' ওঠে, বেদনায় সারা দেহ কালো হয়ে যায়, দু পা যেতে না যেতেই মুখ থুব্‌ড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে তিনি পড়ে' যান্।

তখন কুমার গানের সুরে তাঁর বুকের বেদনার কথা কন্যাকে জানাতে বসেন। কিন্তু মানুষের দেশের বিষশায়কের মর্ম্মান্তিক ক্ষত, সুরের সাধ্য কি তাকে বোঝানো, গন্ধর্ব্বকন্যার সাধ্য কি তাকে বোঝা? কুমার যতরকম করে'ই বলেন, কন্যা ভাবেন—রূপক! ভাবেন, কুমার তাঁর অন্তরের প্রণয়ব্যথাকেই গানের সুরে গোপন করে' ঢেকে বল্‌ছেন! কুমার যত মিনতি করে' ডাকেন, 'অচেনা পথিক, অচেনা পথিক, চিরকালের ছাড়াছাড়ির আগে একটিবার' ভালো করে' তোমায় কেবল দেখ্‌ব, তুমি কাছে এসো। তোমার ঐ পদ্মকলির মতো হাতদুটির নখমুক্তাপংক্তি

যে আমার দেখা হয়নি, তোমার গালের কাছে চোখের পাতার নীচে ওটি কি তিল না আমার চোখের ভুল? গানের সাথী, একটিবার কেবল কাছে এসো।' কন্যার তত স্নেহের হাসিতে মুখ ভরে' ওঠে, গানের সুরে বিদ্রূপের বান ডেকে যায়, বলেন, 'গানের সাথী, গানের সাথী, তুমি না পুরুষ? জয় করে' নেওয়াই না তোমার স্বভাব? ছি ছি, তোমার এই নিরুপায়ের কান্না শুনে আমি সুদ্ধ যে লাজে মরে' যাই। ভিখারীর স্বভাব পেলে কোথায়?' সাহানার নৌকো বাগেশ্রীর নৌকোকে পেছনে ফেলে গর্ব্বে অবজ্ঞায় এগিয়ে চলে যায়, পৌরুষের এই অপমান বিষশায়কের আঘাতের চেয়েও কুমারের বুকে বেশী মর্ম্মান্তিক হয়ে বাজে।

শেষে একদিন, সাহানার নৌকো ছোট হতে হতে যখন দিগন্তের সীমার আড়াল পড়ে' যায়-যায়, তখন আর না পেরে, এক অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে বাগেশ্রীর নৌকোর পালের রশি খুলে দিয়ে, হালের দড়ি ছিঁড়ে ফেলে গন্ধর্ব্ব-কুমার মনের দুঃখে অশ্রুর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ঝড়ের মুখে ছুট্‌তে ছুট্‌তে শূন্যবুকভরা হাহাকার নিয়ে বাগেশ্রীর নৌকো গন্ধর্ব্বদের দেশে এসে ঠেক্‌ল। গন্ধর্ব্ব-রাজ্যের দেবালয়ে দেবালয়ে তিনদিন তিনরাত ধরে' মহা সমারোহে অন্ত্যেষ্টির বাজ্‌না বাজ্‌ল। কত গান লেখা হলো, কত ছড়া বাঁধা হলো তার আর গোনাগুন্‌তি নেই।

* * * *

এখন সেই যে অশ্রুর সমুদ্র, তার একটি স্রোতরেখা মানুষদের দেশের এক গোপন নিভৃত ঘাটের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। মানুষের দেশে গন্ধর্ব্বকুমারের সেই প্রথম-পরিচয়-দিনের তরুণী, গন্ধর্ব্বকুমার চলে' যাওয়ার পর থেকে, চিরস্মৃতির পাথর-বাঁধা সেই ঘাটে বসে' সকালসন্ধ্যা চোখের জল ফেলে। স্রোতের টানে ভাস্‌তে ভাস্‌তে গন্ধর্ব্বকুমার সেই ঘাটে এসে লাগ্‌লেন।......

একুশদিনের দিন আবার এক ফাল্গুনীপূর্ণিমার রাত্রে কুমার চেতন পেয়ে চোখ খুলে চাইলেন। লতার ঝালর দোলানো খোলা বাতায়নে চেয়ে দেখ্‌লেন, আমলকি বনের স্বচ্ছ সবুজ পাতার আড়াল ভেদ করে' আকুল জ্যোৎস্না স্নিগ্ধতর হয়ে ঝরে' পড়ছে। শিয়রে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, সেখানে দুটি অতল চোখের নিমেষহীন দৃষ্টির থেকে যা ঝরে' পড়্‌ছে তার আর তুলনা নেই! একখানি স্নেহতপ্ত কমনীয় হাতকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে কুমার বল্‌লেন, "আমি তোমার মনে ব্যথা দিয়ে চলে' গিয়েছিলাম; কিন্তু আমার বুকের ব্যথা কে এমন করে' হরণ করে' নিলে!"

তরুণী নতমুখে উত্তর দিলে, "সে আমি তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে' নিয়েছি। তোমার বুকে যে বিষটুকু ছিল, একটি প্রাণকে নষ্ট করতে তাই পর্য্যাপ্ত হত, কিন্তু দুটি প্রাণের পক্ষে তা কিছুই নয়।"

কুমার বল্‌লেন, "আমার ব্যথা এত করে'ও কাউকে বোঝাতে পারিনি। তুমি নিজে থেকেই এমন অনায়াসে বুঝ্‌লে কেমন করে'?"

তরুণীর লজ্জারাঙা মুখখানি তার হয়ে উত্তর দিল।

কুমার তখন দুটি হাতকে জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে বলে' উঠ্‌লেন, "এই পৃথিবীকে নমস্কার, এই স্নেহে স্নিগ্ধ করুণায় করুণ মাটির পৃথিবীকে! ওগো তরুণী, তোমার চোখের দৃষ্টিতে স্নান করে' এই পৃথিবীকে বড় সুন্দর মনে হচ্ছে আজ। এর আঘাতকে, এর বেদনাকে, এর দুঃখকে, এর নির্য্যাতনকে, এর সমস্ত-কিছুকে আজ আমার সুন্দর মনে হচ্ছে। আজ আমার আশা হচ্ছে।— আমার নিজের জন্যে কেবল নয়; এই পৃথিবীর জন্যে, এই পৃথিবীর মানুষের জন্যে আমার আশা হচ্ছে। এই পৃথিবী যে এত সুন্দর, এই পৃথিবীর মানুষ যে এত সুন্দর, এই আমার আশা গো তরুণী!"

গলার সুরে মধু ঢেলে তরুণী বল্‌লে, "আচ্ছা, তুমি চুপ করো ত এখন একটু।"

কুমার সুবোধ শিশুর মতো তার সেই স্নেহের শাসন মেনে কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলেন, তারপর বল্‌লেন, "বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন অশান্ত, কিন্তু তুমি আমায় হার মানিয়েছ। তোমার নামটি কি গো তরুণী?"

তরুণী বল্‌লে, "শান্তি!"

কুমারের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল, বল্‌লেন, "কোন্ শুভলগ্নে আমাদের নামদুটির যেন বিয়ে হয়ে গেছে, আমরা তার খবরও জানি না।"

তরুণী নত হতে হতে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যেতে চাইল।

আবার একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে কুমার বল্লেন, "মানুষের যুগযুগসঞ্চিত দুঃখের সঙ্গে আমি পরিচয় করে' এলাম, কিন্তু তোমার একফোঁটা চোখের জলকে তার চেয়ে কত বেশী মনে হচ্ছে। মানুষের ভাঁড়ারভরা সুখৈশ্বর্য্য, কিন্তু তোমার মুখের একটুখানি হাসিকে তার চেয়ে কত বেশী মনে হচ্ছে। মানুষ সুখ কাকে বলে চিন্‌ল না, দুঃখ কাকে বলে চিন্‌ল না গো তরুণী!"

আনন্দাশ্রুতে চোখ ভরে' তরুণী কুমারের গলায় দিলে পাঁচমিশালী বনফুলের একটি মালা। কুমার তার গলায় নিজের হাতদুখানি জড়িয়ে দিয়ে তার মুখটিকে কাছে টেনে এনে তার ফুলের পাপ্‌ড়ির মতো ছোট্ট ঠোঁটদুটিতে দিলেন অনুরাগ-ভরা ধ্যান-ভরা নিবিড় একটি চুম্বন। পূর্ণিমার চাঁদ অলক্ষ্যে কখন্ বাতায়নের তলায় নেমে এসেছিল, লতার ঝালর সরিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে পরম কৌতুকে হেসে উঠ্‌ল।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

মৌন

আমার গোলাপ-গাছটিরে ঘিরে
জানি না কখন উঠেছিল ধীরে
বনের একটি লতা,
বাজেনি সাহানা—আলোর বাহার
হয়নি কিছুই মিলনে তাহার,
উঠেনিক কল-কথা!
বনের একটি লতা,
নীরবে গোপনে মিটেছিল তার
পরাণের আকুলতা!

তা'পরে যখন বাগানের মালী
বনলতাটিরে দিয়ে শত গালি
ছিঁড়ে ফেলে দিল দূরে,
তখনও গভীর বেদনা তাহার
উঠিল না করি' কোনো হাহাকার
বিরহ-করুণ সুরে!
বনের একটি লতা
শুধু মনে মনে সহিল গোপনে
বুক-জোড়া তার ব্যথা!

"বনফুল"

অচিন পাখী

(লেখক ওকাকুরা)

এ কোন্ নূতন পাখী মোর জানালায়?
বহিয়া তারার আলো আঁখি তারকায়?
শাণিত দৃষ্টির তেজ অন্তর ভেদিয়া
আঁধারের করে অবসান, বিচ্ছেদিয়া
রুদ্ধ প্রাণ রহস্যের করে আবিষ্কার!
অগ্নি দ্যুতি-সমুজ্জ্বল পক্ষ দুটি তার
দক্ষিণের আকাশের হিরণ্য-প্রভায়,
কণ্ঠস্বরে রাগিণীর মূর্চ্ছনা ছড়ায়!
আমার নিরালা ঘর ভরি উঠে গানে,
বিফল জীবন ভরে আনন্দের দানে।
নাহি জানি নাম তার, এল কোথা হতে,
অবারিত-আলো-ভরা আকাশের পথে,
কি বারতা নিয়ে এল দূর অজানার!
স্বপ্নে যেন ফিরে আসে জীবনে আবার
অতীত নিদাঘস্মৃতি, ফিরে আসে ধীরে
বসন্তের সঞ্জীবনী হেমন্তের তীরে!
উড়িয়া পলাবে পাখী সে ভয়ে দুর্ব্বল
রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি, বিস্ময়ে নিশ্চল!
জানি যাদুকর-জালে পড়িয়াছি ধরা,
মায়ার আলোকে যার স্বর্গ আজি ধরা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী



বাংলা

দরিদ্র দেশের অর্থের অপব্যয়—

বাঙ্গালার মন্ত্রীরা পাঁচহাজারি রইলেন, লুঠ বন্ধ হইল না। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা এ বৎসর বাঙ্গালার মন্ত্রীদের মাস মাহিনা ৫৩৩৩৲ টাকাই বাহাল করিলেন। এক পাইও কমিল না। দেশমাতৃকার ভাণ্ডার সমান ভাবেই লুণ্ঠিত হইতে চলিল!

আমেরিকা হইতে দাস-প্রথা উঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে ক্রীতদাসদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—তোমরা মুক্তি চাও কি না? তাহাতে অধিকাংশ দাসই বলিয়াছিল,—আমরা এতকাল বদ্ধ অবস্থাতেই আছি, এই অবস্থায় থাকাই আমাদের অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে, আমরা মুক্তি বুঝি না, তাই মুক্তি চাইও না।

আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরও এই দাসদিগেরই মত অবস্থা হইয়াছে। দরিদ্র, নিরন্ন, অজ্ঞ, রুগ্ন, দুর্ব্বল দেশবাসীর অর্থ লুণ্ঠনে ইঁহারা এমন অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, সে ঘৃণিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে ইঁহারা পারিতেছেন না।

দেশবাসী চিরকাল অজ্ঞতায়, দারিদ্র্যে, অন্নাভাবে, রোগে, দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন থাকুক—মন্ত্রীরা ৫৩৩৩ টাকা লইবেনই। স্বয়ং লজ্জা ইহাদের কার্য্য দেখিয়া লজ্জায় মুখ লুকাইতেছেন!—হিন্দুস্থান।

স্বাস্থ্যের কথা—

স্বাস্থ্যসমাচার। বাংলা দেশের অনেক জায়গায় কলেরা থেকে মৃত্যুর হার বাড়্ছে।

	জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ	দ্বিতীয় সপ্তাহ
দিনাজপুর	০	২
মালদহ	০	৫
কলিকাতা	৫	১২
নদীয়া	৫	৭
২৪ পরগণা	৩১	৮৬
মুর্শিদাবাদ	৭	১০
খুলনা	১৯	২৭
বগুড়া	১	৪
পাবনা	৩	৯
ফরিদপুর	১১	১৯

—বিজলী।

হলধর রূপে ম্যালেরিয়া তাড়াও।—বাংলার সাড়ে চারকোটী লোকের মাঝে তিনকোটী লোকই ম্যালেরিয়ায় ভোগে আর দশলক্ষ করে লোক বছর বছর মারা যায়। ম্যালেরিয়া নিবারণ করবার জন্য কত লোক কত কথাই বলেছেন, দেশের গরীব লোকদের কত উপদেশই দিয়েছেন; কিন্তু কিছুতেই ম্যালেরিয়ার বিষদাঁত একটিও ভাঙেনি, সে অপ্রতিহত প্রভাবেই নরক গুলজার করছে।

স্বাস্থ্য-বিভাগের বেণ্টলি সাহেব টাকা উড়িয়ে, মশা মেরে, কুত্রিম বাণ ছুটিয়ে, কুইনিন বিলিয়ে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করছিলেন; শত্রুর বিক্রম দেখে তিনিও ভড়কে গেলেন। তিনি দেখলেন পানামা হতে ম্যালেরিয়া তাড়াবার জন্য অন্যান্য খরচ ছাড়া মাথা পিছু চার টাকা খরচ করা হয়েছিল। বাংলা দেশে ততটুকু কাজ করতে হলেই বছরে লাগে আঠার কোটী টাকা। গ্রীসের অনুকরণে কুইনিন বিলি করতে হলে আড়াই কোটী হতে চার কোটী টাকা লাগে। মশারীর ব্যবস্থা করতে হলে আরো বেশী টাকা লাগে; আর পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল করতে হলে বাংলা দেশে কম করেও ছয়কোটী টাকা ব্যয় করতে হয়। এত ব্যয়, অথচ বাংলাসরকারের রেভিনিউ হতে আয় মোটে আট কোটী টাকা।

বেণ্টলি বলতে চান যে কৃষির উন্নতি করতে হলে খাল খনন করতে হবে এবং জমির ওপর দিয়ে যাতে প্রয়োজনমতে জলের স্রোত বইয়ে দেওয়া যায়, তা ও ব্যবস্থা করতে হবে।

বেশ কথা। কিন্তু এই খাল কাটা ও বান বহাবার টাকা বাংলা গবর্ণমেণ্টের আছে কি? বেণ্টলি সাহেব তাও চিন্তা করে দেখেছেন। কৃষির উন্নতি হলে দেশের লোক বেশী খাজনা দিতে পারবে। তা'হলেই গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়বে। আর তার ফলে দেশ ধন-ধান্যে সুস্থলোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমরা কিন্তু বার বার এমনি—"কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে।"

—বিজলী।

বস্ত্রের কথা—

ভারতে বিদেশী কাপড় বর্জ্জনের ফলে বিলাতের ব্লাকবার্ণ সহরে ২৪০০০ তাঁত বন্ধ রয়েছে। শীঘ্রই আরও তাঁত বন্ধ হবার যোগাড়।

—নবসজ্ঘ।

বিলাতে কাপড়ের কলের অবস্থা।—বিলাতের লাঙ্কেশায়ারে ৭৫টা কাপড়ের কল আছে। তাহার মূলধন ১২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা। ১৯২১ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর—এই ৩ মাসে—৪৩টা কলে কোন লাভ হয় নাই। দুইটা কল বার্ষিক শতকরা ৫৲, একটা ৭॥০, ১৫টা ১০৲, একটা ১১৲, দুইটা ১১॥০, দুইটা ১৩॥০, একটা ১৫৲, আটটা ২০৲ ও একটা শতকরা ২৪৲ লাভ দিয়াছে। ব্লাকবার্ণ সহরের ২৮০০০ আটাশ হাজার তাঁত অর্থাৎ শতকরা ৩১ ভাগ বয়নযন্ত্রগুলি কাজের অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৭ই ডিসেম্বর সংখ্যায় "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান" বলেন,—বড়দিনের মধ্যেই সেখানকার শতকরা ৫০ ভাগ তাঁত বন্ধ হইয়া যাইবে।—সম্মিলনী।

ভারতের কার্পাস, সূতা ও বস্ত্র।—১৯২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে এ দেশে পাঁচ কোটী সত্তর লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সূতা কাটা হইয়াছে এবং তিন কোটী ষাট লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্ববর্ত্তী বৎসর এই মাসে সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল, পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ও বস্ত্র হইয়াছিল তিন কোটী বিশলক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সূতা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২'৪, আর কাপড় বাড়িয়াছে শতকরা ১২'৩।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে চল্লিশ কোটী ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড সূতা তৈয়ার হইয়াছে, আর বস্ত্র হইয়াছে চব্বিশ কোটী বিশ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সময়ে সূতা হইয়াছিল তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত ছিষট্টি পাউণ্ড, আর বস্ত্র হইয়াছিল দুই লক্ষ ১৫ হাজার ছয় শত উনসত্তর পাউণ্ড।

ভারতীয় কার্পাসের রপ্তানি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে হইয়াছে পাঁচ কোটী বাট্ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২০ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ঐ সময়ে তার চেয়ে ঢের কম।

এই যে এত শীঘ্র আমাদের দেশে শিল্প এত উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর তাহার রপ্তানিও অসম্ভাবিত রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই আশার কথা, আনন্দের কথা। অন্যান্য বিভাগেও দেশবাসীদেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। —এডুকেশন গেজেট।

তুলা ও তুলা বীজ।—আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই তুলাগাছের চাষ হইতেছে। যাঁহারা চাষ করিতেছেন তাঁহারা উক্ত গাছের উৎপন্ন তুলা হইতে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিবেন ইহাই উদ্দেশ্য। উক্ত ফলের বীজের ব্যবহার বোধহয় অনেকেই জানেন না। বীজ ঘানির সাহায্যে পেষণ করিলে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল নিঃসৃত হয়। উক্ত তৈল আলো জ্বালিতে, সাবান প্রস্তুত করিতে এবং আহার্য্য দ্রব্যের উপকরণ স্বরূপ সর্ষপ তৈলের ও স্থান-বিশেষে ঘৃতের পরিবর্ত্তে নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তা ছাড়া উহার খইল ময়দা ও আটার সহিত মিশাইয়া রুটি, লুচি প্রস্তুত করিয়া খাইলে মাংসের ন্যায় পুষ্টি ও বল প্রদান করে। উক্ত খইল জমিতে উৎকৃষ্ট সারেরও কার্য্য করে। তুলা-চাষকারীগণ যেন মনে রাখেন যে তুলা-বীজ নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ অল্প অল্প সংগ্রহ করিয়া রাখিলে উহা তাঁহাদিগকে একদিন প্রচুর অর্থ প্রদান করিবে। শ্রীদুর্গাচরণ দাস।

—মেদিনী-বান্ধব।

প্রকাশ,—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মহাত্মার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চর্‌কা-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে চরকাই একমাত্র মুক্তির উপায়। যদি গ্রামবাসীগণ ৬ মাসের মধ্যে নিজের হাতে-কাটা সূতায় হাতেবোনা কাপড়ে আপনাদের বস্ত্রাভাব দূর করিতে পারেন, তবে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিবে না। তিনি সকলকে চর্‌কা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন, গ্রামের মনোভাব এমন করিতে হইবে যে বিলাতী কাপড় পরিতে গ্রামবাসীগণ যেন লজ্জা ও অপমান বোধ করে। —বীরভূমবাণী।

দেশবাসীর দৃঢ়তা—

বিলাতী লবণ পরিত্যক্ত।—৩০০ বস্তা লিবারপুলের লবণ পাবনা জাহাজ-ঘাটে পড়িয়া আছে। কুলী বা গাড়ীওয়ালা কেহই তাহা স্পর্শ করিতে চাহে না। ধনীরা স্বরাজভাণ্ডারে পাঁচ টাকা ও ভবিষ্যতে বিলাতি লবণ আনিবে না বলিয়া ১০০৲ টাকার বণ্ড দিতে স্বীকার করিয়াছিল যদি তাহারা এইবারের জন্য মালগুলি উঠাইয়া দেয়। কুলিরা তজ্জন্য এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছে, যে-কোন-প্রকারেই হউক না কেন, তাহারা আর বিলাতি মাল স্পর্শ করিবে না।—জ্যোতিঃ।

উল্লেখযোগ্য দান—

নীরব দান।—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবাদ দিয়াছেন, ২২শে জানুয়ারী কোনও বাঙ্গালী ধনকুবের চর্‌কার উন্নতিকল্পে তাঁহার হস্তে ১৫০০৲ দান করিয়াছেন। দাতা তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপম ঘরে পুরমহিলারা চর্‌কা কাটিতেছেন, সূতা তৈয়ারী করিতেছেন। এসকল সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিরা এইভাবে যদি নীরবে দেশের কাজ করেন, তাহা হইলে দেশের গঠন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আশা থাকে, পরন্তু দেশবাসী শক্তিসঞ্চয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবেন। —এডুকেশন গেজেট।

স্যর আশুতোষের দান।—দরিদ্র হিন্দু বিধবাদের সাহায্যের জন্য স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় তাঁহার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী প্রতিভা দেবীর নামে দুই সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। —হিন্দুস্থান।

ব্যবসায়ের নূতন পথ—

খেজুর গুড় ও চিনি তৈয়ারী প্রণালী।—আমাদের এতদঞ্চলে প্রচুর খেজুর গুড় তৈয়ারী হয়, কিন্তু চিনি তৈয়ারী প্রণালী সাধারণে জানে না। সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের "ভাল খেজুর গুড় ও দোলো চিনি তৈয়ারী করিবার উপায়" শীর্ষক বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

"বাতাসের সঙ্গে নানা রকম জীবাণু সকল সময় উড়িয়া বেড়ায়। খেজুরের রস খুব সাবধানে রাখিতে না পারিলে ঐসকল জীবাণু তাহার উপর পড়িয়া অনেক ক্ষতি করিয়া দেয়। এজন্য রস হইতে ভাল গুড় পাওয়া যায় না এবং চিনির ভাগ কম হয়। কয়েকটি উপায়ে এই ক্ষতি বন্ধ করা যাইতে পারে।

১। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা রসের কলসী ঝুলাইবার আগে গাছের কাটা অংশ পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফর্‌মালিন্ নামক আরকের কয়েক ফোঁটা ঐ জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ডাক্তারখানায় খোঁজ করিলে এই আরক পাওয়া যাইবে।

২। রসের কলসী আগুনে তাতাইয়া লইবার যে নিয়ম আছে তাহা না করিয়া কলসীর ভিতরটা মাঝে মাঝে চুণ লেপিয়া লইলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এমন কি এরূপ কলসীতে দিনের বেলায় ওলা রস জড় থাকিলে তাহা হইতেই ভাল গুড় করিতে পারা যাইবে।

৩। গাছে কলসী ঝুলাইবার সময় তাহার মুখ যতটা সম্ভব সরা বা আর-কিছু দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া দর্‌কার। কেবল নল হইতে কলসীতে রস পড়িবার জন্য একটু গর্ত্ত রাখিলেই যথেষ্ট।

৪। রস জ্বাল দিবার লোহার কড়াইগুলি খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কোন রকম পোড়া গুড় বা চিনি তাহার গায়ে লাগিয়া থাকিলে জ্বাল দেওয়া রসের রং কাল হইয়া যায়।

৫। রস জ্বাল দিবার সময় অল্প করিয়া তেঁতুল-গোলা জল তাহার উপর ছিটাইয়া দিলে খেজুর-গুড় দেখিতে ঠিক কাঁচা সোনার মত হইবে। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই বুঝা যাইবে কোন্ রসে কতটা তেঁতুল-জল দেওয়া দর্‌কার।

৬। পাটা-সেওলা দিয়া চিনি পরিষ্কার করিতে অনেক সময় লাগে। আজকাল এই কাজের জন্য একরকম কল পাওয়া যায় তাহাতে হাড়ের কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবহার না করিয়াও অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পরিষ্কার চিনি বাহির করা যায়। একজন খণ্ডসারির পক্ষে এই কল কেনা দুঃসাধ্য হইলেও পাঁচজনে মিলিয়া সমবায়বদ্ধ ভাবে কিনিলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কলিকাতায় ৮৭এ পার্ক ষ্ট্রীটে ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রির নিকট লিখিলে জানা যাইবে।

ডি, বি, মীক, ডাইরেক্টর, ৫০এ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—নীহার।

বয়ন শিক্ষালয়—

মহিলাদিগকে বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ৪১ রমানাথ কবিরাজের লেন মেবুতলায় একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। বালকদিগকে

শিক্ষা দিবার জন্য ২১১ নং অক্রুর দত্তের লেন, ১৫.১ গড়পার রোড, ২৩ নং মুক্তারাম বাবুর ৪র্থ লেন, ৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, ১৪৬ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ও ৬ নং নিবেদিতা লেনে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

—আনন্দ-পত্রিকা।

শক্তিমান গণিতজ্ঞ—

শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু, উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র। উমেশ বসুর বাড়ী, ঢাকা জেলায় বজ্রযোগিনী গ্রামে। অঙ্কশাস্ত্রে সোমেশ-বাবুর অসাধারণ রকমের অধিকার। বড় বড় অঙ্কগুলি ইনি ৫।৭ মিনিটের মধ্যে মুখে মুখে নির্ভুলভাবে করিয়া ফেলেন। কয়েক মাস হইল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সোমেশ-বাবুকে ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিউটে অঙ্ক বিষয়ে পরীক্ষা করেন। একটি গুণ অঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩০টি, সোমেশ-বাবু এ অঙ্কটিকে মুখে মুখে করিয়া ফল যা বলেন তা এই :—

১২১৯৩০৭৫৯৮৩৪৩৫১৭৯০৫৩৩০৮০৮০৭৪৮৭৮৯০৯০৫০৪৯৫৫৮৬১ ৭৪৬৬২৭৪০৯৬৩৪৪৯

এত বড় অঙ্কটিকে শেষ করিতে সোমেশ-বাবুর সময় লাগিয়াছিল মাত্র ২০ মিনিট। ওদিকে ঠিক এ অঙ্কটিকে শেষ করিতে পাঁচজন প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের সময় লাগে, ৪ ঘণ্টা !!

শ্রীনগেন্দ্র ভট্টশালী।

দমন নীতি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দমন-নীতির দমনের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গতকল্যকার অধিবেশনে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দমন-নীতি দমনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তবে মূল প্রস্তাবটির সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন—কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়। সংশোধিত প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই :—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারি করিয়া প্রকাশ্যভাবে সভা করা বে-আইনী বলিয়াছিলেন, এবং কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার তাঁহার এলেকায় প্রকাশ্য সভা করা ও মিছিল করা বন্ধ করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের ও পুলিশ-কমিশনারের এই আদেশ প্রত্যাহার করা হউক। উক্ত দুই আদেশ অমান্য করিয়া যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক।

এই প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় ভোটে ফেলা হয়, তখন ৫০ জন ইহার পক্ষে এবং ৩৯ জন ইহার বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। যাঁহারা বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র আছেন।—হিন্দুস্থান।

ছেলে ঠাঙ্গাবার টাকা দাও। গত সোমবারে বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় কর্ত্তৃপক্ষেরা আবদার ধরেছিলেন—'পুলিসের খরচের জন্যে আরও ২,৪২,৪৬২ টাকা চাই। অসহযোগীরা ভীম ভৈরব হুঙ্কার ছাড়্ছে, শোভাযাত্রা কর্‌ছে, মিটিং কর্‌ছে, বক্তৃতা কর্‌ছে—রাজ্য প্রায় অরাজক হবার যোগাড় হয়েছে। অতএব হে রাজভক্ত নাগরিকগণ! গাঁটের পয়সা খরচ করে আড়াই লক্ষ টাকা তুলে দাও, অসহযোগীদের মাথা ফাটিয়ে শান্তি রক্ষা কর্‌বার জন্যে পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, ঘোড়সওয়ার পুলিসের ঘোড়া কিনে দাও, তোমাদের ছেলেদের জেলে পাঠাবার জন্যে পুলিসকে মোটর লরি কিনে দাও, সিভিল-গার্ডদের জন্যে চুষিকাঠি কিনে দেওয়া হয়েছে তার দাম দাও।'

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বল্‌লেন—'এই সেদিন পুলিসের পেটে ২৩ লাখ ঢালা হয়েছে ; আবার এখনি আরও টাকা ঢাল্‌তে পারা যায় না। নেহাৎ না ছাড় কিছু কম করে দাও।'

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত বল্‌লেন—"সরকার বাহাদুরের যেন মনে থাকে যে শুধু পুলিস আর পল্টনের জোরে কোন গবর্ণমেণ্টই টিকতে পারে না। কৃআয়র্লণ্ডের ব্যাপার দেখে এটা কি আমরা শিখিনি যে সঙ্গীন আর বন্দুকের জোরে শান্তির শৃঙ্খলা স্থাপন করা চলে না ?"

সর্‌কার বাহদুর যে তা শেখেননি তা ত দেখ্‌তেই পাওয়া যাচ্চে। অধিকন্তু আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকেরাও তা শেখেন নি। কেন না ভোটের সময় দেখা গেল যে সর্‌কারী জিদই বজায় রয়েছে।—বিজলী।

নারীর উপর অত্যাচার।—সেদিনকার ভবানীপুরের সভায় শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবী সাংঘাতিকরূপে আহত হন। দেশীয় খবরের কাগজে খবর বাহির হয়, যে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিড এই অত্যাচারের পাণ্ডা। তিনিই তাঁহার হাতের লাঠির ঘায়ে ভদ্রমহিলাটিকে ঘায়েল করেন। এই খবর যেই বাহির হওয়া,—সঙ্গে সঙ্গে সর্‌কারী ইস্তাহারেরও আবির্ভাব! সর্‌কার পক্ষ বলেন—কিড্ সাহেব মারেন নি ; আর কে যে মেরেছে, তারও কোন পাত্তা পাওয়া যাচে না।

কি জানি, আমরা অবশ্য জানিনে যে, শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবীর মাথায় কোন ঘা বা ফুস্কুরী ছিল কি না,—তা হ'লে তা' থেকেও রক্ত পড়্‌তে পারে তো!"

"সার্ভেন্টে" কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী বেরিয়েছে। তাঁরা শুধু যে প্রত্যক্ষদর্শী তা নয়,—এ ব্যাপারের রসগ্রহণ পর্য্যন্ত করেছেন। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন—এ কাণ্ড কিড্ সাহেবেরই নিজের হাতে সম্পন্ন করা।

আমরা কি আর বল্‌বো—

"Bid a man go to the কিড্।"—বিজলী।

কিড সাহেব সার্ভেণ্ট ও অমৃতবাজার পত্রিকার নামে মানহানির নালিশ করিয়াছেন।

শ্রীমতী হেমপ্রভা আহত।—হরদয়াল নাগ মহাশয়ের পাকাশয়ের প্রদাহ গ্যাস্‌ট্রাইটিস্ হওয়ায় তাঁহাকে ক্যাম্বেল হাস্‌পাতালে পাঠান হইয়াছে। গত মঙ্গলবার কংগ্রেস আফিস হইতে সত্তর জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত বুধবার পঁচিশ জন স্বেচ্ছাসেবককে সভা করিতে পাঠান হইয়াছিল। গোলদীঘিতে প্রায় তিন-চার হাজার লোকের ভিড় হইয়াছিল। দুইজনের বক্তৃতা হইবার পর পুলিশ পঁচিশজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার ও অন্যান্য কয়েকজন মহিলা সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। ইঁহাদের সহিত একজন গুর্খা মহিলা আসিয়াছিলেন। মহিলারা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করা মাত্র সার্জ্জেণ্টরা সাধারণের উপর লাঠি চালাইতে থাকে। দুই-তিন জন লোক আহত হইয়াছে। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার একটি বালককে রক্ষা করিতে গিয়া বাঁ হাতের কব্জীতে লাঠির আঘাত পাইয়াছেন।—হিন্দুস্থান।

গত ২৭শে জানুয়ারী সিরাজগঞ্জের সন্নিহিত সালঙ্গা হাটে স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিংএ গিয়েছিল। পুলিশ আগে থেকেই রণসাজে সজ্জিত হ'য়ে সেখানে হাজির ছিলেন। বেলা দেড়টার সময় পুলিশ তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। আর রাইফেলের কুঁদার দিক দিয়ে এই তিনজনকে মারে। ব্যাপার দেখে অনেক লোক সেখানে জমায়েত হয় ও সকলে পুলিশদের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে। ফলে আবার কুঁদার প্রয়োগ। ইতিমধ্যে পুলিসদের গায়ে একটি ঢিল পড়ায়—পুলিশ রাইফেল চালাতে সুরু করে। প্রথমতঃ ফাঁকা আওয়াজ, তার পর গুলী। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জন মারা গেছে আর ২০০ উপর লোক ঘায়েল হয়েছে। হতাহতের মধ্যে মাত্র সাতজনকে হাস্‌পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাদবাকী সব হাটের মধ্যেই পড়ে। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের সেবাশুশ্রূষা করছেন।

এখানকার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট চাঁদপুরের কেলেঙ্কারী ব্যাপারের সেই স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সিংহ। অর্থাৎ লর্ড সিংহের পুত্র।—বিজলী।

টিটাগড় কলে হাঙ্গামা।—গত বৃহস্পতিবার টিটাগড় ষ্ট্যাণ্ডার্ড (পাটের) মিলে ভয়ানক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পুলিশ জনকয়েক কুলি সর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়াই মূল কারণ। সর্দ্দারদের গ্রেপ্তারে কুলিরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে পুলিশ গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। সংবাদে প্রকাশ যে মিলের দুইজন সাহেব সশস্ত্র পুলিশের হস্ত হইতে দুইটি রাইফেল্ কাড়িয়া নেন এবং মিলের পায়খানার ছাদে উঠিয়া পলায়মান জনতার উপর গুলি ছুড়িতে থাকেন। প্রায় ১৫ মিনিট গুলি চলে। তাহার ফলে একজন গুলি খাইয়াই পঞ্চত্ব লাভ করে। সাতজন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে একজন বিকালেই মারা যায়। ৫৭ জন হাসপাতালে আছে, ২০০ গজ দূরবর্ত্তী পথিকেরাও গুলির আঘাত পাইয়াছে। এই হাঙ্গামার এক সরকারী তদন্ত হইতেছে। শুক্রবার সকালে হাসপাতালে পুলিশ পাহারা মোতায়েন থাকে। কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বাহিরের রোগীরা পর্য্যন্ত ঔষধ পায় নাই।—জনশক্তি।

জেলে অত্যাচার।—ফরিদপুর জেলে যে-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী আছেন, তথায় তাঁহাদের উপর জেলাকর্তৃপক্ষ ও জেল-কর্তৃপক্ষের বড়ই কুনজর পড়িয়াছে। বন্দীদের উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতেছে। সম্প্রতি ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-এল সি, স্বয়ং এসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। যে-সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক আজ দেশের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কাহাকে বহু কয়েদির সামনে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হাত বাঁধিয়া বেত মারা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন। কাহাকে কাহাকে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে প্রাতের ছয়টা পর্য্যন্ত হাতকড়ি লাগাইয়া রাখা হয়। এরূপ বহু অত্যাচার-অবিচারের কথা ডাক্তার মৈত্রের রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। সরকারপক্ষ এসম্বন্ধে এক ইস্তাহার জারি করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, এইসমস্ত কয়েদীগণ জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, "সরকার সেলাম" বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রর সাহেবকে সেলাম দেয় নাই ইত্যাদি, তাই ইহাদিগকে জেল-আইন অনুসারে শাসন করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি বাছিয়া বাছিয়া কেন এরূপ করা হইল তাহার কোন কৈফিয়ৎ সরকার দিতে পারেন নাই। তাই দেশময় মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবাসী কেন স্বরাজ চাহে ইহা তাহার প্রমাণ; সুতরাং এসম্বন্ধে অধিক মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক।—নোয়াখালী-সম্মিলনী।

স্বাধীনতাকামীর জয়যাত্রা—

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর তিন মাস কারাদণ্ড।—গত ২৯শে তারিখে শিলিগুড়িতে দশজন গুর্খা স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। সাবিত্রী দেবী গুর্খা মহিলা।—হিন্দুস্থান।

কামিনীকুমারের পত্নী স্বেচ্ছাসেবিকা।—শিলচরের ২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, এখানে এক সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দের পত্নী স্বেচ্ছাসেবিকা-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।—হিন্দুস্থান।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার।—১৬ই ডিসেম্বর ১৩০ জন ধৃত, ১৭ই তারিখ ৫০২ জন প্রেরিত ২৩১ জন ধৃত, ১৮ই তারিখ ৫৭০ জন প্রেরিত ৩১০ জন ধৃত, ১৯শে তারিখ ৫০৬ জন প্রেরিত ২৫৫ জন ধৃত, ২০শে তারিখ ৫৩৯ জন প্রেরিত ৩২০ জন ধৃত, ২১শে তারিখে ৩০৯ জন প্রেরিত ২২৫ জন ধৃত, ২২শে তারিখ ৫১০ জন প্রেরিত ২৭০ জন ধৃত, ২৫শে তারিখ ৩৫৮ জন প্রেরিত ৪০ জন ধৃত, ২৮শে তারিখ ২৪০ জন প্রেরিত এবং ১২ জন ধৃত হইয়াছেন।—জনশক্তি।

গ্রেপ্তার।—জাতীয় শিক্ষা সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বি-এ, বার-এট-ল মহাশয়কে পুলিশ ১২৪ (ক) ধারার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বাঙ্গালার কথায় বর্ধশেষ নামক একটি প্রবন্ধ লিখাই নাকি তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ।—বীরভূমবার্ত্তা।

পুলিশ এবারে কংগ্রেস কমিটিতে বেড়াজাল ফেলে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় সভ্যদের গ্রেপ্তার করে' নিয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন—শ্রীযুত হরদয়াল নাগ, শ্রীযুত শশাঙ্কজীবন রায়, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি। হোমরাচোমরা নেতাদের রেখে খুচরো কর্ম্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।—বিজলী।

শ্যামসুন্দরের এক বৎসর।—প্রসিদ্ধ দেশনায়ক শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে যে নূতন অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার বিচার-ফলে তিনি এক বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছেন।—খুলনাবাসী।

স্বেচ্ছাসেবক বন্দীদের আটক রাখ্‌বার জন্যে দুটো নতুন অস্থায়ী জেলখানা তৈরী হচ্ছে। একটা কাঁকনাড়ায় আর একটা চিংড়িখাল দুর্গে। বোধ হয় ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকেই বন্দীদের এখানে আনা হবে।—বিজলী।

আইন ভঙ্গে গ্রেপ্তার, বাঙ্গালায় ৬৮৪১ জন।—ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে হেনরী হুইলার প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতা সহরে আইন-ভঙ্গের অপরাধে এ পর্য্যন্ত ৫,২০৯ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। এবং ৭টি জেলা হইতে ১,৬৩২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।—হিন্দুস্থান।

সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স।—কলিকাতায় সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ হয়েছে। রাজা যখন প্রচার কর্‌লেন কেউ ভলেণ্টিয়ার সমিতি গড়ে তুলতে পারবে না, তখন দেশের দিক থেকে তার প্রত্যুত্তর স্বরূপে দলে দলে লোকে স্বেচ্ছাসেবক হতে ছুটে এল—এখন সহস্র সহস্র লোকে এইজন্য কারাগার-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। রাজা আরও প্রচার করেছিলেন কলিকাতায় কেহ সভা-সমিতি করতে পারবে না—তার প্রত্যুত্তরে আজ দেশবাসী প্রতি পার্কে মিটিং করতে আরম্ভ করেছে। গুর্খা, পুলিশ, সার্জ্জেণ্ট দলে দলে এই মিটিং ভাঙ্গ্‌বার প্রচেষ্টা কর্‌লেও মিটিং সর্ব্বত্রই হচ্ছে। একজন যেই বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান, অমনি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তারপরে আবার একজন উঠে দাঁড়ান—শেষে মেয়েরা পর্য্যন্ত একে একে উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছেন। এই অজুহাতে প্রায় দুই তিন শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—নবসঙ্ঘ।

ঢাকায় আইনভঙ্গ।—২৯শে জানুয়ারী বেলা প্রায় ৪টার সময়ে ঢাকার করোনেশন পার্কে সভা হইবে বলিয়া সহরময় ঢেঁড়া পিটাইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ-পূর্ব্ব হইতেই পার্কের ফটক বন্ধ রাখিয়াছিল। এজন্য পার্কের দক্ষিণ পশ্চিমে নদীর ধারে সভা হইয়াছিল। প্রায় ১৫ হাজার লোক সভায় যোগ দিয়াছিল। প্রথমে সভাপতি শ্রীযুত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে সেখানে গিয়া তাঁহাকে সভা ভঙ্গ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পর দুইজন বক্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে প্রত্যেক বক্তা বক্তৃতা করিতে উঠিতে গেলে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট সময়

শেষ হওয়ায় সভা বন্ধ হয়। সার্জ্জেন্টরা কয়েকজন শ্রোতাকে জোর করিয়া সভাস্থল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। —হিন্দুস্থান।

তেজপুরে আইন ভঙ্গ, খাজনা দিব না।—কংগ্রেসের কার্য্যকারী সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে আসাম প্রদেশকে আইন-অমান্যকারী প্রদেশসমূহের মধ্যে ধরা হয় নাই। কিন্তু স্থানীয় অসহযোগীগণের উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে আইন অমান্যের ভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। তাহারা সরকারী টেক্স বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। মৌজাদারগণের উপর টেক্স আদায়ের ভার। কিন্তু হলেশ্বর মৌজার মৌজাদারগণ প্রজাগণের নিকট নানারূপ কাকুতি-মিনতি করিয়াও টেক্স আদায় করিতে পারে নাই। তখন তাহারা এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানায়। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এলেন ঐসকল প্রদেশে গমন করিয়া দেখেন, অবস্থা বড় সুবিধা নহে। তিনি রায়তগণকে আইন-অমান্যের পরিণাম বুঝাইয়া দেন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অচল অটল থাকে। তখন কমিশনার গুর্খা ফৌজ পাঠান। গুর্খা কুচকাওয়াজ করিয়া হলেশ্বর মৌজার ভিতরে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু গুর্খাদের এসব কুচকাওয়াজে লোকে ভীত হয় নাই।—হিন্দুস্থান।

সৎসাহসের নিদর্শন—

সিরাজগঞ্জের বড় দারোগা মৌলবী আবুল হোসেন গবর্ণমেণ্টের পীড়ন-নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁর কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে যদিও সভা হয় নি, কিন্তু সিরাজগঞ্জবাসী আপন আপন ঘর-বাড়ী আলো দিয়ে সাজিয়ে মৌলবী সাহেবকে অভিনন্দিত করেছিলেন।—বিজলী।

দেশহিতকর সময়োপযোগী অনুষ্ঠান—

জনসাধারণ রক্ষা সমিতি।—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে ঐ সমিতি গঠিত হয়েছে। দেশে যত মার-ধর, অবিচার অত্যাচার হয় সে-সম্বন্ধে সত্য সংবাদ প্রচার করা আর তার প্রতিকার কর্‌বার চেষ্টা ঐ সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির অনুরোধ, যেন সকলে পুলিশ, পল্টন, সিভিল-গার্ড বা জেলের কর্ম্মচারী, যে কেউ অত্যাচার ও অবিচার করবে সে-কথা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন, সি, সেনকে জানান। সমিতির কার্য্যালয়ের ঠিকানা ১৮ নং বেলতলা রোড, কালীঘাট।—বিজলী।

সেবক।

ভারতবর্ষ

মালবীয় কন্‌ফারেন্স—

গত ১৪ই এবং ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাইসহরে সমন্বয় বৈঠকের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বিভিন্ন প্রদেশের নানা সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০ নেতাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তাঁহাদের ভিতর প্রায় ২৫০ জন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেণ্ট এবং অসহযোগপন্থী এই উভয়দলের সম্মান বজায় রাখিয়া দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করা। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন স্যার শঙ্করন্ নায়ার। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সর্ত্তসমূহ মিটমাটের পরিপন্থী মনে করিয়া সভার কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি সভা ত্যাগ করেন। তাঁহার পর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

(১) কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের নানাস্থানে ফৌজদারী সংস্কার আইন এবং সভাবন্ধ আইন জারি করিয়াছেন; তাহার ফলে দলে দলে লোক জেলে প্রেরিত হইতেছে। বহু সম্মানিত জননায়কেরাও বাদ পড়িতেছেন না। ইহাতে লোকের নাগরিক স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতা দিবার এবং সভা করিবার অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া যে উদ্দেশ্যে এই দমননীতি অবলম্বন করা তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। গবর্মেণ্ট দেশবাসীর সহানুভূতি হারাইয়াছেন এবং লোকের অসন্তোষও বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং অবিলম্বে গবর্মেণ্টের এই দমননীতি পরিহার করা কর্ত্তব্য।

(২) যতদিন একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা না যাইবে যে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতিকার এবং পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি লাভের আর কোন উপায় নাই, ততদিন আহম্মদাবাদ কংগ্রেসের পরিকল্পিত আইন-অমান্য নীতি গ্রহণ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না।

(৩) গত ২১শে ডিসেম্বর লর্ড রেডিং কলিকাতার বক্তৃতায় যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইলে পাঞ্জাবের অত্যাচার, খেলাফৎ-সমস্যা এবং স্বরাজ—এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সামঞ্জস্য ও সম্মান-সহকারে মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সেজন্য দেশবাসীর প্রতিনিধিদের সহিত গবর্মেণ্টের মিলিত হইয়া পরামর্শের প্রয়োজন আছে। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ধীর ও স্থিরভাবে বিচার করিতে হইলে দেশের অবস্থা উত্তেজনাহীন হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সেজন্য ফৌজদারী সংস্কার এবং রাজদ্রোহজনক-সভা-বন্ধ আইন অনুসারে যেসব আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে গবর্মেণ্টকে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া উক্ত আইনের বলে যাঁহারা দণ্ডিত অথবা অভিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। ফতোয়া-সংক্রান্ত ব্যাপারে যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও বন্দী করিয়া রাখা চলিবে না। গবর্মেণ্টের পক্ষের একজন এবং এই পরামর্শ বৈঠকের মনোনীত একজন সদস্য, এই দুইজন লইয়া এক বৈঠক বসিবে। এই বৈঠক মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র আলোচনা করিয়া যে-সমস্ত কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে বলিবেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অপরপক্ষে কংগ্রেসের দিক হইতে এই কমিটি শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত হরতাল পিকেটিং এবং আইন-অমান্য বন্ধ রাখিতে হইবে।

(৪) দেশের বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব যেরূপ তাহাতে মিটমাটের বিলম্ব হওয়াটা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে এবং অনতিবিলম্বেই পরামর্শ-সভা বসা আবশ্যক। সেজন্য সম্রাটের গবর্মেণ্ট যেন রাজপ্রতিনিধিকে যথাযোগ্য অধিকার প্রদান করেন।

(৫) পঞ্জাবের অত্যাচার, খেলাফৎ সমস্যা এবং স্বরাজের সম্বন্ধে দেশবাসী কোন্ কোন্ দাবী পেশ করিবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এই কন্‌ফারেন্স প্রস্তাবিত পরামর্শসভার আয়োজনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিতেছেন। তাঁহারা উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের সংখ্যা, অধিবেশনের দিন ইত্যাদি ঠিক করিবেন, এবং গবর্মেণ্ট ও দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত পত্রব্যবহার করিবেন। এই কমিটির উপর আবশ্যকীয় সকল কার্য্যের ভার থাকিবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, শ্রীযুক্ত শেষগিরি আয়ার, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জিন্না, শ্রীযুক্ত জয়াকর, স্যার দীনশা এম্ পেটিট, স্যার এইচ ওয়াদিয়া, মিঃ সি আর রেড্ডি, শ্রীযুক্ত এস সত্যমূর্ত্তি, অধ্যাপক এস সি মুখোপাধ্যায়, মিঃ জোসেফ ব্যাপ্‌টিষ্টা, শ্রীযুক্ত রায়জাদা ভাটরাম, শ্রীযুক্ত ভার্গবী, শ্রীযুক্ত বি চক্রবর্ত্তী, মিঃ এইচ এম গৌর, পণ্ডিত এইচ কুঞ্জরু, শ্রীযুক্ত কে নটরাজন, মিঃ হাসান ইমাম, এবং পণ্ডিত গোকর্ণনাথ মিশ্র।

যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বৈঠক বসিয়াছিল, ইহার কর্ম্ম-পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে একরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা মাঘমাসের 'প্রবাসী'তে বলিয়াছিলাম, গবর্মেণ্ট এই পরামর্শ-সভার উপদেশ গ্রহণ না করিলেও এই কন্ফারেন্সের ফলে সমস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা যদি একমত হইতে পারেন তবে তাহাই পরম লাভ। দেশের নেতাদের মতের ভিতর যে যথেষ্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্যর শঙ্করন্ নায়ারের পদত্যাগের দ্বারাও তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ এই পদত্যাগ যেমন আকস্মিক তেমনি অযৌক্তিক। ইহার পর স্যার শঙ্করন্ নায়ার আম্‌লাতন্ত্র ছাড়া আর কোনোদলের প্রতিনিধি একথা হয়তো আর কোনো সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন না। স্যার শঙ্করন্ দীর্ঘপত্র লিখিয়া আপনাকে সমর্থন করিলেও তিনি আজ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিই একথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, গবর্মেণ্টের পীড়ননীতির কোনো কৈফিয়ৎ নাই। তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে অপমানকর এবং তাহাই দেশের মাথার উপর অকল্যাণ ও বিপদের মেঘ গাঢ় ও আসন্ন করিয়া তুলিতেছে। গবর্মেণ্ট নেতাদের এই অত্যন্ত সুস্পষ্ট কথায় কান দিবেন কি না তাহা আমরা জানি না, তবে দিলে যে ভালো করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যে মতের ঐক্য ইহাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

কংগ্রেস কমিটি—

বোম্বাইয়ের সমন্বয়-বৈঠকের পরিগৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ১৭ই জানুয়ারী বোম্বাই সহরেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।—

"বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে লইয়া সভা করার জন্য এই সমিতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং উঁহার অন্যান্য উদ্যোগীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। পরামর্শ-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে আগামী ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আহম্মদাবাদ কংগ্রেসের পরিকল্পিত আইন-অমান্য-নীতি অবলম্বিত হইবে না। কিন্তু 'রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্ফারেন্স' সফল করিতে হইলে—

(১) ভলাণ্টিয়ার দলকে বে-আইনী বলিয়া গবর্মেণ্ট যে আইন জারি করিয়াছেন তাহা তুলিয়া লইতে হইবে, সভাভঙ্গের আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে, এই-সমস্ত আইন অনুসারে যাঁহারা কারাদণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(২) ফতোয়া বাহির করার অপরাধে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, অর্থাৎ আলিভ্রাতাদ্বয় এবং তাঁহাদের সঙ্গীগণকে মুক্তি দিতে হইবে।

(৩) নিরুপদ্রব অসহযোগ বা অন্যান্য নির্দ্দোষ কাজের জন্য যাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে অথবা যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৪) গবর্মেণ্ট যদি এই-সকল ব্যবস্থা মানিয়া লন্ এবং 'রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্ফারেন্স' যদি আহূত হয় তবে কন্ফারেন্স শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হর্‌তাল, পিকেটিং ও অন্যান্য আইন-অমান্য নীতির অনুসরণ বন্ধ রাখা হইবে।

কংগ্রেসের দাবী সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ ভুল ধারণা জন্মিতে না পারে সেজন্য এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মালবীয় পরামর্শ-বৈঠকের দ্বারা নিযুক্ত কমিটির দৃষ্টি খেলাফৎ-সমস্যা, পাঞ্জাব-অত্যাচার এবং স্বরাজ, এই তিনটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। এই বিষয়গুলির সম্পর্কে কংগ্রেস যে কি চাহেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই মাঝে মাঝে কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চ হইতে প্রকাশ্য-ভাবে বলা হইয়াছে।

কংগ্রেস যে মিটমাটের অপক্ষপাতী নহেন কংগ্রেস কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাবটি হইতেই তাহা বোঝা যায়। অন্ততঃ মিটমাটের জন্য কংগ্রেস তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং দেশের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এবং আম্‌লাতান্ত্রিকেরা কংগ্রেসের বেপরোয়া দাবীর যে ধুয়াটা ধরিয়াছেন তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কার্য্যটা বন্ধ থাকিবে না এই অজুহাতে সমন্বয়-সমিতির সহিত সংস্রব পরিহার করিয়াছেন। মোট কথা, কংগ্রেস নিজের সম্মান বজায় রাখিয়া যে সর্ত্তগুলি উপস্থিত করিয়াছেন এবং মীমাংসার জন্য কংগ্রেস যতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা তাহা অন্যায় বলিয়া মনে করেন নাই;—সম্ভবতঃ কোনো নিরপেক্ষ লোকই তাহা করিবেন না। অন্ততঃ কংগ্রেস যেটুকু করিয়াছেন গবর্মেণ্টের তরফ হইতে সেটুকুও পাওয়া যায় নাই একথা জোর করিয়াই বলা চলে।

মাদ্রাজের হাঙ্গামা—

ইংলণ্ডের যুবরাজের মাদ্রাজ-পরিদর্শন-ব্যাপার নির্ব্বিবাদে শেষ হয় নাই। সেখানেও বোম্বাই হাঙ্গামার একটা পুনরভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই হাঙ্গামায় পাঁচ-ছয়জন লোক মারা পড়িয়াছে এবং আহত হইয়াছে অনেকে। আর্থিক ক্ষতি খুব বেশী হয় নাই। ইংলণ্ডের যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে সমস্ত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল দাঙ্গাকারীরা তাহার কতকগুলি ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া তচ্‌নচ্ করিয়া দিয়াছে। তবে অধিকাংশ স্থলেই কাঁচের দরজা-জানালা ভাঙ্গার উপর দিয়াই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

এই হাঙ্গামার উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এক দল বলিতেছে এটা অসহযোগীদেরই ব্যাপার। তাহারাই ইংলণ্ডের যুবরাজের অভ্যর্থনা পণ্ড করিবার জন্য যাহারা অভ্যর্থনার আসরে যাইতেছিল তাহাদের উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে এবং তাহার পর হইতেই দাঙ্গা সুরু হয়। আর-এক দল বলিতেছেন, এই ব্যাপারের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের কোনই সম্পর্ক নাই। রাস্তার ছোট ছোট বালকেরা নিজেদের স্বভাবসুলভ চপলতা-বশতঃ ইট-পাট্‌কেল ছুঁড়িয়াছিল—তাহারই জের আসিয়া গড়াইয়াছে এতবড় একটা হাঙ্গামায়। স্যার পেরি রবিন্‌সন ইংলণ্ড হইতে যুবরাজের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যতটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ দাঙ্গাকারীদের প্রায় সকলেই বালক এবং আমি নিজে এই বালক দাঙ্গাকারীদিগকে দেখিয়াছি।"

বালকদের পক্ষে এরূপ চপলতা প্রকাশ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এই কলিকাতা সহরেও অনেক সময় দেখা যায়, একদল সার্জ্জেণ্ট পুলিশ রাস্তা দিয়া যখন চলিয়াছে হঠাৎ তাহাদের ভিতর দুই চারিটা ঢিল আসিয়া পড়ে। এ ঢিল ছোড়ে বালকের দল অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া। এই ঢিল ছোড়ার ফল সময়-বিশেষে সঙ্গীন হইয়া উঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সার্জ্জেণ্টরা যদি এই-সব ব্যাপার উপেক্ষা না করিয়া পথের লোককে ধরিয়া ঠেঙ্গানো সুরু করিয়া দেয় তবে তাহা দাঙ্গায় পরিণত হইতে বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয় না। মাদ্রাজের হাঙ্গামাও হয়তো সেই রকমের ব্যাপার হইতে উদ্ভূত।

সে যাহাই হউক, দেশের সব লোককে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লওয়া যদি অসহযোগীদের পক্ষে একান্তই সম্ভবপর না হয় তবে যাহারা বিপক্ষ-দলভুক্ত তাহাদের উপর যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা তাহাদিগকে করিতেই হইবে।

ইংলণ্ডের যুবরাজের আগমনের দিনই মাদ্রাজে আরো একটি বড়-রকমের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এ হাঙ্গামা বাধিয়াছিল আদি-দ্রাবিড়দের সহিত উচ্চাভিমানী হিন্দুদের। হাঙ্গামা থামাইবার জন্য পুলিশকে সঙ্গীন ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সঙ্গীনের খোঁচায় ছয়জন লোক আহত হইয়াছে। এ হাঙ্গামার কারণ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

মাদ্রাজের পঞ্চম জাতিরাই বর্ত্তমানে আদি-দ্রাবিড় নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই পঞ্চম জাতির উপরে হিন্দু-সমাজ এতদিন ধরিয়া যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা যেমন অমানুষিক তেমনি অপমানকর। কেবলমাত্র মাদ্রাজে নহে, অন্ত্যজ নামে অপমানিত জাতির প্রতি হিন্দুজাতির এই অনুদার ব্যবহার হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট। সুতরাং উচ্চাভিমানী হিন্দুদের প্রতি এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটা বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস মর্ম্মগত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্ কোনো ব্যাপারেই এই এতবড় একটা সম্প্রদায়ের সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করা হিন্দুদের পক্ষে তেমন সহজ হয় না। কংগ্রেস অবশ্য এই অস্পৃশ্যতার দোষটা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা আরো আন্তরিক—আরো ব্যাপক হওয়া উচিত। নতুবা এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হামেশাই হইবে এবং দেশবাসীর ভিতর একতা না থাকিলে তাহার যে অবশ্যম্ভাবী দুঃখ তাহাও আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

কর-বন্ধের আয়োজন—

গুন্টুরে কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুসারে আইন-অমান্য-নীতি অনুসৃত হইতেছে। সেখানকার অধিবাসীরা স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা খাজনা জলকর প্রভৃতি দিবেন না; পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পদও তাঁহারা পরিত্যাগ করিতেছেন। গত ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সেখানে যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহারও একটা হিসাব কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা হিসাবটা এখানে তুলিয়া দিলাম।

বাপটিলা তালুক—খাজনা দুই লক্ষ টাকা; আদায় মাত্র এক-হাজার চারিশত টাকা।

নরসারা ভুপেট তালুক—খাজনা দেড় লক্ষ; আদায় মোট একহাজার একশত।

সাটেন পল্লী তালুক—দেড় লক্ষের স্থানে দেড় হাজার টাকা আদায়।

রেপালী তালুক—দুই লক্ষ টাকা খাজনার ভিতর মাত্র ছয় হাজার টাকা আদায়।

গবর্ণেণ্ট নানা উপায়েই ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। যাহারা কর দেওয়া বন্ধ করিবে তাহাদের সম্পত্তি চটপট নীলামে চড়াইবার নূতন আইনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহা ছাড়া যে-সমস্ত স্থানে আইন-অমান্য-নীতি অনুসৃত হইবে সেইসব স্থানে প্রজাদের খরচে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইতেছে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের জন্য একটা দিন স্থির করা হইয়াছে। সেই দিনের ভিতর খাজনা যাহারা দিবে তাহাদিগকে অতিরিক্ত পুলিশের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। কর-অনাদায়ী প্রজার যে-সব সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে তাহা নীলামে খরিদ করিবার লোক যদি পাওয়া না যায় তবে গবর্ণেণ্ট সেই-সব সম্পত্তি খাসে আনিয়া পতিতমস্ত জাতিদের ভিতর তাহা বিতরণ করিবেন। গুন্টুরে গোরাসৈন্য, সিপাহী, রিজার্ভ-পুলিশ, 'মেশিন গান্' আমদানী করা হইয়াছে।

সীতামাঢ়ী—মজঃফরপুর জেলার সীতামাঢ়ী থানার এলাকাভুক্ত স্থানগুলিতে ছয় মাসের জন্য পিটুনী পুলিশ নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত পুলিশ রাখিবার জন্য প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ পড়িবে। এ খরচ আদায় করা হইবে সীতামাঢ়ী থানার অধিবাসীদের নিকট হইতেই। এই ব্যবস্থার কৈফিয়ৎ স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, সীতামাঢ়ীর অধিবাসীরা অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে মানিতেছে না, জন-সাধারণকে গবর্ণেণ্টের কর বন্ধ করার জন্য উৎসাহিত করিতেছে, অনেকে চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় নাই, বিচারাধীন আসামীরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অপমান করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছে না, দণ্ডপ্রাপ্ত অসহযোগীরা জেলে অন্যান্য বন্দীদের ভিতর অবাধ্যতা প্রচার করিতেছে; ফলে জেলের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকিতেছে না। এই একস্থানে পিটুনী পুলিশ বসাইয়া যদি ফল না হয় তবে অন্যান্য থানাতেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

রংপুর—রংপুরেও নাকি রায়তেরা চৌকিদারী টেক্স দিতে চাহিতেছে না। তাহা ছাড়া জমীর খাজনা ভিন্ন জমিদারদিগকে তাহারা উঠবন্দী আবওয়াব প্রভৃতি বাবদ এক পয়সাও দিবে না, একথাও নাকি স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছে। অসহযোগীরা বলিতেছেন, তাঁহারা সকলরকমের ট্যাক্সই বন্ধ করিতে চান—এসব তাহারই আয়োজন।

আসামের তেজপুর হইতেও খবর পাওয়া গিয়াছে। এই ধরণের বিদ্রোহ প্রজাদের ভিতর অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বরদলীতেও আইন অমান্যের আয়োজন চলিতেছে।

এই শক্তি-পরীক্ষার ব্যাপারটাতে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ উত্তেজনার মুহূর্ত্তে নিজের শক্তিকে বড় করিয়া দেখা মানুষের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং এই ভুলটা যাহাতে না হয় সেজন্য এই বহুবিপদের পথটায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে নেতাদের একবার নহে হাজারবার করিয়া আপনাদের সংযম শক্তি সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যাচাই করিয়া লওয়া উচিত।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি বেত্রাঘাত—

'হাকিকত' নামক সংবাদপত্র খবর দিয়াছেন, লাক্ষ্ণৌএর ডেপুটি কমিশনার কয়েকজন কয়েদীকে এমনভাবে বেত মারাইয়াছিলেন যে তাহাতে দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে। এই খবরের প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মতিক্রমে তাঁহারই সম্মুখে কয়েদীদের উপর বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কয়েদীদের অপরাধও ছিল গুরুতর। তাহারা জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল এবং অন্যান্য কয়েদীদিগকে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। এই কয়েদীদের কেহ রাজনৈতিক বন্দী নহে—এবং মারাও কেহ যায় নাই।

সরকারের এই কৈফিয়ৎ হইতেই বোঝা যায় যে তাঁহারাও রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি বেত্রাঘাতের দণ্ডটাকে অন্যায় বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে বেত চালানো হয় তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সম্প্রতি ফরিদপুরেই দুইজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত মারা হইয়াছে। রাজনৈতিকই হোক্ আর সাধারণই হোক্ কোনো শ্রেণীর অপরাধীর উপরেই বেত চালানো বর্ব্বরোচিত, অমানুষিক, অনাবশ্যক এবং অন্যায়। সমস্ত সভ্য দেশ

হইতেই উহা পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু বিচিত্র এই, অন্যান্য দেশে যে জিনিষটা অন্যায় বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়, ভারতগবর্ণমেণ্ট তাহাই বিশেষ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অত্যাচার অন্যান্য সভ্য দেশের আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু এখানে তাহা ক্রমেই চরমে উঠিতেছে। নাইনী জেল হইতেও বেত্রাঘাত এবং অন্যান্য অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 'মাদারল্যাণ্ড' পত্রিকা শিহলিয়া, চন্দ্রপুর, ভাবাটোয়া প্রভৃতি স্থানের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, অশ্বারোহী পুলিশ সেখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং কারখানার ম্যানেজার সকলে মিলিয়া রীতিমত লুট আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রাম-কয়েকটির অপরাধ যে গ্রামবাসীরা বেগার দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। আড়িখবিহারী শরণ একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী। তাঁহাকে চারপাইতে বাঁধিয়া রাখা হয়। * * * প্রত্যেকটি ভলাণ্টিয়ারকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। এই সংবাদের প্রতিবাদ গবমেণ্ট তরফ হইতে এখনো হইতে দেখি নাই।

এইরূপ আরও বহু অত্যাচারের অভিযোগের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। এইরূপ অত্যাচার যখন এক তরফ হইতে অনুষ্ঠিত হয়, অন্য পক্ষ তখন ইচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক্ অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। খবর পাওয়া গিয়াছে, হর্দোর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর গুলি চলিয়াছিল এবং এই গুলির সহিত রাজনীতির সংশ্রব আছে। কর্ত্তৃপক্ষ এখন যত-কিছু সমস্ত ব্যাপারই রাজনীতির সহিত জুড়িয়া দিতে চেষ্টা করিবেন ইহা জানা সত্ত্বেও এ সংবাদটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ মানুষ দীর্ঘকাল নিরুক অত্যাচার বিনা বাধায় সহ্য করিতে চায় না—পারেও না। শ্রমজীবী কন্ফারেন্সে মিঃ বাপ্‌টিষ্টা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন, "মহাত্মা গান্ধীর নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইলে দেশের ভিতর দশ সহস্র গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।" মিঃ বাপ্‌টিষ্টার এই কথাটির ভিতর সত্য আছে অনেকখানি। তাহার ফল দেশের পক্ষে অবশ্য বিশেষ ভালো হইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও যে তাহার ফল শুভ হইবে এরূপ মনে করিবারও কোনো কারণ নাই।

ট্রেনে রাজনৈতিক বন্দী—

গত ৯ই জানুয়ারী রাত্রিতে একদল রাজনৈতিক বন্দীকে এলাহাবাদ হইতে আগ্রায় পাঠানো হয়। বন্দীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ জন। শ্রীযুক্ত দেশাই, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় প্রভৃতি এই দলের ভিতর ছিলেন। গাড়ীতে যেরূপভাবে বস্তাবন্দী করিয়া তাঁহাদিগকে পাঠানো হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া পণ্ডিত জবহরনাথ কুঞ্জরু এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানির সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, তিনি ষ্টেশনে গিয়াছিলেন কয়েকটি বন্ধুকে বিদায় দিতে। যেসব রাজনৈতিক বন্দী সেদিন আগ্রায় প্রেরিত হইতেছিলেন তাঁহাদের ভিতরেই তাঁহার এই বন্ধুরাও ছিলেন। তিনি গিয়া দেখেন একটি কাম্‌রার ভিতর ৩৮।৩৯ জন বন্দীকে, গরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতি জানোয়ারকে যেমনভাবে গাদা করিয়া রাখা হয়, তেমনি করিয়া রাখা হইয়াছে। গাড়ীখানি এতই ছোট যে তাহাতে ইঁহাদের বসিবার স্থানটুকুও নাই, অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইতেছে। গাড়ীর ভিতর বাতিরও কোনোরূপ ব্যবস্থা নাই। তাহা ছাড়া পানীয় জলও তাহাতে ছিল না। পিপাসাতুর হইয়া কয়েকটি বন্দী জলের প্রার্থনা করিতেই তাহাদের বন্ধুরা দৌড়াইয়া গিয়া কয়েক গ্লাস জল লইয়া আসে। কিন্তু যে সাবইন্‌স্পেক্টরটি বন্দীদের খবরদারী করিতেছিলেন তিনি জল খাইতে তো দেনই নাই, উপরন্তু গ্লাসগুলি আছ্‌ড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মিঃ কুঞ্জরু কমিশনারের কাছে গাড়ীর এই বিশৃঙ্খলার কথা টেলিফোঁ করিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনার ইহার প্রতিকারের কোনো উপায় খুঁজিয়া পান নাই।

কয়েক মাসের কথা মাত্র—মালাবারে চলন্ত ট্রেনের ভিতর অন্ধকূপ-হত্যার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তাহা ত আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র বলিয়া সাব্যস্ত হইল! কিন্তু তাহার স্মৃতি দেশের লোকের বুকের উপর ভারী পাষাণের মত বহুকাল চাপিয়া বসিয়া থাকিবে। সুতরাং আবার যাহাতে সেরূপ কোনো ব্যাপার না ঘটে তাহার উপর কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবেই দৃষ্টি রাখিবেন, সভ্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এইটাই সকলে আশা করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, মালাবার ট্রেন-দুর্ঘটনা এ দেশের আম্‌লাতন্ত্রের মনের ভিতর কোনোরূপ দাগ ফেলিতে পারে নাই। তাহা পারিলে সেই ট্রেন-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই আবার এরূপ একটা সঙ্গীন রকমের অভিযোগ কিছুতেই উঠিতে পারিত না। এ দেশের গবর্ণমেণ্ট যে এ দেশের জনসাধারণের জীবন সম্বন্ধে, সুখ সুবিধা সম্বন্ধে কতটা উদাসীন তাহা এইসমস্ত ব্যাপার হইতেই স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। মালাবারের মোপ্‌লা বন্দীদিগকে ট্রেনের গুদামজাত করিবার সময় কতজন লোক গাড়ীখানিতে ধরিতে পারে তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কোনো খোঁজ-খবর লন নাই। সেইখানেই তাঁহারা কর্ত্তব্যের একটা মস্তবড় অবহেলা করিয়াছিলেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন, তবে ভুল ধরা পড়া মাত্রই তাঁহাদের এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত ছিল যে আর কখনো সেরূপ ভুল করিবার অবকাশ না আসে। কিন্তু এলাহাবাদের এই ব্যাপারটা পড়িলেই বোঝা যায় কোনো দায়িত্বজ্ঞানশীল সরকারী কর্ম্মচারীই তদন্ত করিয়া দেখেন নাই, যতগুলি বন্দীকে আগ্রা পাঠাইবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে একখানি গাড়ীতে তাহাদের স্থানের সংকুলান হইতে পারে কি না। যে গবর্ণমেণ্টের প্রজার প্রতি দরদ থাকে তাঁহারা এইরূপই করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দরদী গবর্ণমেণ্ট তাহা তো করেনই নাই, উপরন্তু ট্রেনের বিশৃঙ্খলার সম্বন্ধে একজন তৃতীয় ব্যক্তি কমিশনারকে জানাইলেও তিনি তাহার কোনোরূপ প্রতিকার করেন নাই। প্রতিকারের পথ যে ছিল না তাহা নহে। কারণ সব বন্দীকে একসঙ্গে না পাঠাইয়া দুইখানি ভিন্ন গাড়ীতে পাঠানো চলিত, একদিনে না পাঠাইয়া দুইদিনে পাঠানো যাইত, অথবা একসঙ্গে এবং একদিনেই পাঠানোর যদি প্রয়োজন ছিল তবে সে দিনের মত যাওয়াটা স্থগিত রাখিয়া পরের দিন বৃহত্তর গাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থাও কমিশনার করিতে পারিতেন।

সব দেশেই রাজনৈতিক অপরাধীদের ব্যবস্থা সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষা অনেক ভালো। সভ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেও হয় তো সে ঠাটটুকু বজায় আছে। তাহাই যদি হয় তবে সাধারণ বন্দীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা যে কিরূপ তাহা বলাই বাহুল্য।

বালকদের কারাগারে গুলি—

গত ১৯শে ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশের বেরিলী সহরে বালকদের কারাগারে (Juvenile Jail) গুলি চলিয়াছিল। এই ঘটনা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

চন্দ্রলাল নামক একজন রাজনৈতিক বালক-বন্দী অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে হাস্‌পাতালে পাঠানো হইয়াছিল। এই লোকটিকে স্থানান্তরিত করার জন্য বেরিলীর বালক-কারাগারের কয়েদীরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া বসে। কেবলমাত্র তাহাই নহে, ওয়ার্ডারের আলমারী ভাঙ্গিয়া যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া

কারাগারের দরজা এবং তালা-চাবিও তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর তাহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পলায়নেরও চেষ্টা করে। কারাগারের ভিতর ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় অবশেষে প্রহরীদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাহারা আসিয়া ১৬ বার গুলি ছোড়ে। অধিকাংশ গুলিই শূন্যে ছোড়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে ৮জন বালক গুলির আঘাতে এবং ৯জন বালক বেটনের আঘাতে আহত হইয়াছে। ১৯০জন বালক নানা দিকে ছুটিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং লাঠির সাহায্যে দুই-চারিজন ওয়ার্ডারের দ্বারা তাহাদিগকে সংযত করা সম্ভবপর ছিল না। কাহারো জখম তেমন গুরুতর হয় নাই। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রভাবই বালকদের অসংযত হইয়া উঠিবার কারণ।

সরকারী ইস্তাহার—সুতরাং অভ্রান্ত! সরকারী ইস্তাহারের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া সার্ভাণ্ট ও অমৃতবাজার-পত্রিকা মানহানির দায়ে পড়িয়াছেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—

বোম্বাইএর ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহার আলোচনা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। স্যার নারায়ণ চন্দাবরকর হইয়াছেন উহার সভাপতি। কমিটি বোম্বাইয়ে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ লোকের মত গ্রহণ করিয়া ফিরিতেছেন। সম্প্রতি বেলগাঁয়ে এই কমিটির অধিবেশন বসিয়াছিল। প্রায় ২৫জন লোকের সাক্ষ্য সেখানে গৃহীত হইয়াছে। একজন ব্যতীত আর সকলেই বালকদের সহিত বালিকাদেরও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বে-সরকারী সাক্ষীদের প্রায় সকলেই বলিয়াছেন যে, এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা লোকাল বোর্ড অথবা অন্য কোন বিশেষ শিক্ষা-বোর্ডের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। কিন্তু শিক্ষা ও রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা ঐ মত সমর্থন করেন নাই।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ করা যায় সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্র-দিগকেও সাধারণ স্কুলেই গ্রহণ করা চলিবে। কিন্তু গ্রাম হইতে যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলিয়াছেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন না করিলে চলিবে না। এই কমিটি সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁহাদের রিপোর্ট ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার এই যে প্রচেষ্টা ইহা বিশেষভাবেই প্রশংসনীয়। অন্যান্য সকল প্রদেশেরও এ বিষয়ে বোম্বাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সঙ্গত। তবে শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে মনকে উদার ও বৃহৎ করিয়া তোলা। অনুন্নত জাতিকে যদি লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও অন্যান্য জাতির সহিত একত্র মিশিবার সুযোগ না দেওয়া হয় তবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষৎ—

এবার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনার পক্ষে সব চেয়ে গুরুতর বিষয় ছিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণের দমননীতি সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি। প্রস্তাবটিতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণ গবর্ণমেণ্টের দমন-নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবটি লইয়া স্যার উইলিয়াম ভিন্সেণ্ট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, বিস্তৃতির বহরের দিক দিয়া তাহা বিপুল হইলেও যুক্তির দিক দিয়া তাহার ভিতর অনেক গলদ আছে। দেশের প্রতিনিধিরা যদি সত্যসত্যই দেশের প্রতিনিধি হইতেন তবে স্যার ভিন্সেণ্টের এতবড় লম্বা-চওড়া বক্তৃতা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণের পরাজয় হইত না। কারণ দেশের চারিদিকে গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে পীড়নের জাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার সমর্থন কোন দেশের কোন প্রতিনিধিই করিতে পারেন না। বস্তুতঃ দেশের প্রতিনিধিদের ভোটের দ্বারাও প্রস্তাবটি ব্যর্থ হয় নাই। মূল প্রস্তাবটির স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ৩৩ জন এবং বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন ৫৩ জন। প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে যাহারা মত দিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই কমবেশী গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক। ৩৩ জন তো গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তাহা ছাড়া কয়েকজন হইতেছেন গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী লোক। বাদবাকীর বেশীর ভাগই উপাধিধারী। সুতরাং এ অবস্থায় যাহা একান্ত স্বাভাবিক, ব্যবস্থাপক সভার বিচারে তাহাই ঘটিয়াছে—অন্ততঃ এ ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

ডাঃ গৌরের বিবাহ-বিল—

নাগপুরের ডাক্তার গৌর সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অসবর্ণ-বিবাহ-বিলের উত্থাপন করিয়াছিলেন। সমাজের সংস্কারের দিক হইতে এই বিলটির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইলেও ভোটের জোরে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। ব্যবস্থা-পরিষদে বিলটির আলোচনা এই প্রথম নহে। আরো দুইবার ঐ সভায় উহা পেশ করা হইয়াছিল। প্রথমবার পেশ করিয়াছিলেন ১৯১২ সালে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নাথ বসু। তখন যে বিলটি অগ্রাহ্য হইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ তখনকার জনসমাজের মনের অবস্থা ঠিক সংস্কারের উপযোগী ছিল এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাহার পর ১৯২০ সালে আবার ইহাকে পেশ করেন মিঃ প্যাটেল। সেবারে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে ঠিক একথা বলা যায় না। বরং নূতন সংস্কারের আমলে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ভালো ভাবে আলোচনা করা চলিবে মনে করিয়াই তখনকার মত উহা মুলতুবী রাখা হইয়াছিল বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। সুতরাং নূতন সংস্কারের আমলে পরিষদে ডাক্তার গৌর প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক-সভায় উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলটির ভাগ্যে এবারও জনসাধারণের প্রতিনিধি-দের অনুমোদন লাভ ঘটে নাই। এবার বিলটিকে অগ্রাহ্য হইতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। রাজনীতি-ক্ষেত্রের মত সামাজিক ক্ষেত্রেও সংস্কারের প্রবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক—এক ভিন্ন অপরের অস্তিত্ব মিথ্যা বা কৃত্রিম হইতেই হইবে। এইসব দেখিয়াই মনে হয়, দেশময় লোকত কাউন্সিলে ঢুকিয়াছেন দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনোরূপ গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নাই!

শিখনেতাদের মুক্তি—

অমৃতসর গুরুদ্বার সাহেবের চাবির ব্যাপারে গুরুদ্বার-প্রবন্ধক কমিটির অনেকগুলি সদস্য এবং নেতা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সভাসমিতি এবং বক্তৃতা করাই ছিল তাঁহাদের অপরাধ। এই ব্যাপারের ভিতর রহস্য এই, তাঁহারা গুরুদ্বার ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করিলেও তাঁহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল রাজদ্রোহমূলক সভা-আইন অনুসারে। সম্প্রতি পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক-সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ইঁহাদিগকে

মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্ত শিখ জনসজ্ঞ বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেছেন তাঁহারাই জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এইসব ব্যাপার হইতেই বোঝা যায় যে গবর্ণমেণ্ট আর যাহাই হোন না কেন জনপ্রিয় ইঁহারা কিছুতেই নহেন।

সিরাজগঞ্জের রক্তারক্তি—

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সলঙ্গা হাটে পুলিশের গুলিতে অনেকগুলি লোক মারা পড়িয়াছে ও জখম হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই,—হাটের লোকেরা পুলিশের ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রহারের চোটে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তিনি নিজে ও পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টও প্রহৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং বাধ্য হইয়াই পুলিশকে গুলি ছুড়িতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। গুলি ছোড়ার ফলে লোক মারা গিয়াছে চারিজন ও আহত হইয়াছে ছয়জন মাত্র।

একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টের ভিতর যে তফাৎ আকাশ-পাতাল হইতে পারে, সম্প্রতি অনেকগুলি ব্যাপারের সরকারী ও বে-সরকারী রিপোর্টের দ্বারা তাহা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাতেও এই দুই রিপোর্টের ভিতর মোটেই মিল নাই। বে-সরকারী একটি রিপোর্ট বলিতেছে, সিরাজগঞ্জের ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাটে উপস্থিত হইয়াই ভলাণ্টিয়ারদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন। একটি ভলাণ্টিয়ারকে তিনি হাটের ভিতর এমন প্রহার করেন যে, উপস্থিত জনগণের পক্ষে তাহা বিনা-প্রতিবাদে সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং কয়েকটি লোক আসিয়া তাঁহাকে বলে, "এই লোকটি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাকে আপনি গ্রেপ্তার করিতে পারেন—কিন্তু মারিবার অধিকার আপনার নাই।" সাধারণ লোকের এতবড় স্পর্দ্ধার কথা সহ্য করিতে না পারিয়া পুলিশ-সাহেব সঙ্গের সশস্ত্র পুলিশদিগকে বন্দুকের কুঁদা ব্যবহার করিতে হুকুম দেন। হাটের জনতার ভিতর কুঁদার ব্যবহার! একদিক হইতে পলায়নের চেষ্টা, অন্তদিক হইতে কৌতূহলপরবশ লোকগুলির ঔৎসুক্য জনতার ভিড় আবার বাড়াইয়া তোলে। এই দুইটিতে মিলিয়া একটি হট্টগোলের সৃষ্টি করিতেই জনতাকে স্থানত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হয় এবং সেজন্য তাহাদিগকে নাকি সময় না দিয়াই গুলি চালানো হয়। কতগুলি লোক এ পর্য্যন্ত হতাহত হইয়াছে, তাহা এখনো স্থির হয় নাই। তবে ইহাদের সংখ্যা দুইশতের কম কিছুতেই হইবে না। পুলিশ যে সঙ্গীন ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারও চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এবং বেসরকারী তদন্ত কমিটিকে এই বেসরকারী রিপোর্টের সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। কিরূপ বিপদের সম্ভাবনায় পুলিশ গুলি চালাইতে পারে এবং সলঙ্গা হাটে এই বিপদের সম্ভাবনা কতটা ছিল তাহার উপরই এই গুলি চালানো ব্যাপারটার সঙ্গতি অসঙ্গতি নির্ভর করিতেছে। ইংরেজের নিজের দেশের ইতিহাস হইতে দেখা গিয়াছে, পুলিশ বিশেষ বিপন্ন নাচার বা-জখম না হইলে গুলি ছোড়ে না। এ ক্ষেত্রে পুলিশের কতজন লোক জখম হইয়াছিল, এবং পুলিশ-সাহেবের যে আঘাতের কথা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, তাহা ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে কি না ও পরীক্ষিত হইয়া থাকিলে তাহার স্বরূপ কি, তাহাও জনসাধারণ জানিতে চাহিবে—তাহা জানিবার অধিকারও তাহাদের আছে। এইসব তথ্য নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

আমরা স্থানটা নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। স্থানটার প্রায় তিন দিকেই বদ্ধ, একটা দিক খোলা আছে, কিন্তু ঘটনার দিন সেখানে নাকি পাঁচ-ছয় শত গো মহিষ বিক্রয়ার্থে নীত হইয়াছিল, সুতরাং কোনো দিকই খোলা ছিল না, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই চারিদিক-ঘেরা স্থানটি হইতে জনতাকে সরিয়া যাইতে কতটুকু সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও সকলে জানিতে চাহে। তাহা ছাড়া, আরও একটি কথা আছে, জনসাধারণ যদি উত্তেজিত হইয়াই থাকে, তবে তাহাদিগকে উত্তেজিত করার ভিতর পুলিসের হাত ছিল কি না, অর্থাৎ উৎপীড়নের দ্বারাই তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলা হইয়াছিল কি না, ইহাও বিশেষভাবে নির্ণয় করিবার বিষয়।

এ সম্বন্ধে জনরক্ষা-সমিতি এবং কংগ্রেস, বে-সরকারী তদন্ত-কমিটি বসাইয়াছেন। এই দুইটি কমিটির রিপোর্ট পাইলে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে জানা যাইবে। সুতরাং সেই রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ সঙ্গত মনে করি না। তবে এই সম্পর্কে পুলিসের বিরুদ্ধে আর-একটা নৃশংসতার অভিযোগ শোনা গিয়াছে, অনুসন্ধানের জন্ত সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। সলঙ্গা হইতে সিরাজগঞ্জ ষোল মাইল পথ। পুলিস সেই রাত্রিতেই কয়েকটি মৃতদেহ এবং কয়েকজন জখমি ব্যক্তিকে নাকি সিরাজগঞ্জে চালান দিয়াছিল। মাঘ মাসের দারুণ শীতের ভিতর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মৃতকল্প আহত ব্যক্তিদের পক্ষে বিনা আচ্ছাদনে প্রায় নগ্নদেহে ষোল মাইল পথ গো-শকটে অতিক্রম করা যে কি ব্যাপার, তাহা কলিকাতার উপর বসিয়া অনুভব করা যায় না। কিন্তু গো-শকটের ঝাঁকুনি এবং উত্তর বঙ্গের শীতের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন, ইহা হইয়া একান্ত অন্যায় ও অমানুষিক হইয়াছিল। অধিকন্তু পুলিস মড়ার সহিত আহত জ্যান্ত মানুষকেও একই গাড়ীতে চালান দিয়াছিল বলিয়া শোনা গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি মৃতদেহের সঙ্গে দেহ লাগাইয়া যাপন করা জীবিতের পক্ষে বিশেষতঃ ওরকম আহতের পক্ষে যে কিরূপ দুঃসহ ব্যাপার তাহা বোঝা কঠিন নহে। এই দুটি সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

বিদেশ

মুক্তিপথে মিশর—

জগ্‌লুল পাশাকে ভারতমহাসাগরস্থ সিসেল্‌স দ্বীপে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। জগ্‌লুলের নির্ব্বাসনে আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল। আদ্‌লীর দলের অনেকেই জগ্‌লুলের দলের সহিত একযোগে অহিংস অসহযোগ মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হইলেন। জাতীয়-দল এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়া দেশবাসীকে ইংরেজের সহিত সকলপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। সমগ্র দেশবাসীকে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি পালন করিতে ইঁহারা আহ্বান করিলেন:—(১) কোনও মিশরী জন-নায়ক বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন না এবং সরকারী কাজ করিবেন না। (২) কোনও ইংরেজ কর্ম্মচারীর নিকট কোনও কাজে কেহ যাইবেন না। (৩) ইংরেজ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা সমস্ত ফেরৎ লইতে হইবে। (৪) ইংরেজের জাহাজে কেহ মাল আমদানী রপ্তানী করিবেন না। (৫) ইংরেজ জাহাজে কেহ কয়লা বিক্রয় করিবেন না এবং মাল ওঠা-নামার কাজে সাহায্য করিবেন না। (৬) ইংলণ্ডে প্রস্তুত জিনিষ কেহ ব্যবহার করিবেন না। এই ঘোষণাপত্রে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করা

হইয়াছে। তাই লর্ড অ্যালেন্‌বির আদেশে স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া আটজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য চারিটি খবরের কাগজ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে সংবাদ আসিয়াছে যে গ্রেপ্তারী নেতাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সংবাদপত্রগুলিকে আবার প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইজিপ্টের গণ্ডগোলে চঞ্চল হইয়া একদল ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ 'ইংলণ্ডে ইজিপ্টের বন্ধুসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। লর্ড মিল্‌নার এই সভার সভাপতি। লর্ড কার্জ্জন, স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরল, ফ্রাঙ্ক মরেল, প্রভৃতি আফ্রিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বহু ব্যক্তি এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। ইঁহারা মিশরবাসীদিগের আকাঙ্ক্ষা ন্যায্য মনে করিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাই ইংরেজ পররাষ্ট্র-বিভাগের তরফ হইতে লর্ড অ্যালেন্‌বিকে মিশর-সংক্রান্ত সকল খবরাখবর পরিষ্কার বুঝাইয়া দিবার জন্য দপ্তরের কাগজপত্র সমেত ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতে তলব করা হইয়াছে। ইংরেজ পররাষ্ট্র-বিভাগ বলিতেছেন যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট অভিভাবকরূপে ইজিপ্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও মঙ্গলসাধনের ভার লইয়াছিলেন, তাহা হইতে মিশরবাসীদিগকে মুক্তি দিতে রাজী আছেন। তাঁহারা মিশরকে স্বরাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে এবং পররাষ্ট্র-বিভাগে অব্যাহত ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মিশরকে একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি একরারনামা স্বাক্ষর করিতে হইবে। যথা (১) প্রাচ্যে ইংরেজ-অধিকারভুক্ত দেশসমূহে প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য সৈন্যগতিবিধির পথসমূহ ইংরেজ সৈন্যের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে মিশর বাধ্য থাকিবেন। (২) বিদেশী লোকেরা মিশরে বাসকালীন ইংরেজের নিকট অভয় পাইয়া যেরূপ নিরুপদ্রবে ও নিশ্চিন্তমনে বসবাস করিয়া আসিয়াছে এখনও তাহারা ইংরেজের নিকট সেইরূপ অভয় প্রত্যাশা করে, সেইজন্য তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইংলণ্ডের যে কর্ত্তব্য আছে তাহা ইংলণ্ড ছাড়িবেন না। (৩) বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির হস্ত হইতে মিশরকে মুক্ত রাখিতে ইংরেজ সর্ব্বদা চেষ্টা পাইবেন। ইংলণ্ডের অনুমতি না লইয়া মিশর অন্য কোনও শক্তির সহিত কোনও সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবেন না।

ইংরেজের এই দয়ার দান গ্রহণ করিতে মিশর নারাজ। আদ্‌লীর দলও যখন ইংরেজের অনুকূলে আসিতে রাজি হইল না তখন বাধ্য হইয়া ইংরেজ শাসনকর্ত্তা যাহাদের বরাবর ইংরেজের খোসামুদে বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন এইরূপ শ্রেণীর খয়েরখাঁদিগকে হাত করিয়া মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরেজভক্তদলের নেতা সরওয়াত পাশাকে মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করা হইল। কিন্তু মিশরের আব্‌হাওয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যে-কয়েকটি সর্ত্তে সরওয়াৎ প্রধান মন্ত্রী হইতে প্রস্তুত আছেন জানাইয়াছেন তাহা ইংরেজ সহজে গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহার দাবী আদ্‌লীর দাবী হইতে কিছু কম নহে। সরওয়াতের প্রধান দাবীগুলি এই :—

(১) ইজিপ্ট শাসনের জন্য লর্ড কার্জ্জন যে প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

(২) মিশরে ইংরেজ-অভিভাবকত্বের শেষ করিয়া মিশরকে স্বরাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(৩) মিশরের পররাষ্ট্র-বিভাগ আবার স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হইবে।

(৫) অর্থনৈতিক এবং বিচার সম্বন্ধীয় মন্ত্রণাদাতা ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে ইংরেজ মন্ত্রণাদাতা (advisor) থাকিবে না।

(৬) বৈদেশিক কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করিয়া তৎস্থলে মিশরী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

(৭) সামরিক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৮) স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত মিশরী গণসভা কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিগণ ইংরেজের সহিত ব্রিটিশ-স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

মিশরের নরমপন্থীদিগের দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের নরমপন্থীদিগের দৃষ্টি খুলিবে কি ?

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যে ইংরেজ ও ফরাসী —

অ্যাঙ্গোরা প্যালেষ্টাইন মেসপটেমিয়া ও সিরিয়া সংক্রান্ত বিবাদ লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যে মতান্তর ও মনান্তর চলিতেছে তাহাতে প্রত্যেকে অপরের প্রস্তাবগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন এবং উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। অ্যাঙ্গোরা লইয়াই বিবাদটি সব চেয়ে বেশী জমিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ তরফ হইতে লর্ড কার্জ্জন সমস্যার নিরাকরণ মানসে কতকগুলি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। গ্রীসকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইঁহারা তুরস্ক গ্রীক যুদ্ধ বন্ধ করিবার পক্ষপাতী; এমন কি প্রয়োজন হইলে জোর জবরদস্তি করিতেও ইঁহারা রাজী। স্মার্ণা তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে ইংরেজ প্রস্তুত আছেন, এবং গ্রীক সৈন্য যাহাতে স্মার্ণা পরিত্যাগ করেন তাহার বন্দোবস্ত তখনই করিবেন, যখন তুরস্ক-পক্ষ খৃষ্টান প্রজাদিগের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অঙ্গীকার করিবেন। তবে স্মার্ণায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তুরস্কের খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত বলিয়া ইংরেজ মনে করেন। থ্রেসের অধিকাংশও তুরস্ককে ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। লর্ড কার্জ্জন কৃষ্ণসাগরের উপকূলস্থ মিডিয়া সহর হইতে আরম্ভ করিয়া থ্রেসের মধ্য দিয়া রডোষ্টো পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিয়া থ্রেসকে বিভক্ত করিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই সীমা-রেখাটি রাষ্ট্রনৈতিক কারণে খুব সমীচীন বলিয়া ফরাসী জাতি মনে করেন না।

তাঁ পাত্রিকা ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিশারদদিগের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন যে এই কয়েকটি সর্ত্তে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যের সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে :—

(১) ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে প্রাচ্য সম্বন্ধে রফানিষ্পত্তির সঙ্গে গ্রীক ও তুরস্কের মধ্যে শান্তি স্থাপনার কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। গ্রীক ও তুরস্কের যুদ্ধ নিরপেক্ষ হইয়া এই রফানিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার জন্য তুরস্ক বা গ্রীসের প্রতি কোনও প্রকার সামরিক বা নৌসংক্রান্ত চাপ দেওয়া হইবে না।

(৩) খৃষ্টান প্রজাগণের জন্য কোন বিশেষ প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে না। এরূপ বিশেষ একটি স্থান নির্ব্বাচন করিলে তুরস্কের সহিত খৃষ্টান প্রজাদিগের বিবাদ বাড়িয়াই চলিবে। তবে খৃষ্টান প্রজাদিগের স্বত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা অন্যপ্রকারে দেখা যাইতে পারে।

(৪) এশিয়ামাইনরের সমস্তটাই তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

তাঁ আরও বলেন যে রডোষ্টো গ্রীকদিগের অধীনে রাখার প্রস্তাব অত্যন্ত অন্যায় ও অনিষ্টকর। বুল্‌গেরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটুখানি গ্রীক-অধিকৃত স্থান রাখাতে বুল্‌গেরিয়া ও তুরস্ক উভয়েই গ্রীসের বিরোধী হইবেন। ফলে গ্রীস ও সার্ভিয়ার

সহিত তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার বিবাদ ক্রমশঃ বাড়িয়া আর-একটি ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে।

ইংরেজ কিন্তু ইহার পরও বলিতেছেন তুরস্ক ও গ্রীস কাহারও ক্ষতি না করিয়া তুরস্ক-গ্রীস যুদ্ধ থামাইয়া দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে গ্রীস কিন্তু তুরস্ককে আবার আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। তাহারা এস্কিসের (Eskisher) আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বহুসৈন্য ক্ষয় হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। যুদ্ধে হারিলে গ্রীসকে রক্ষা করা অসম্ভব মনে করিয়া গ্রীসকে বাঁচাইবার জন্য ইংরেজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; এবং তুরস্ক প্রভাব বাড়াইতে পারিলে ফরাসীর প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিবে, তাই ফরাসী তুরস্কের প্রভাব বাড়াইতে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতেছেন।

সন্দেহ-দোলায় ইউরোপ—

শুধু প্রাচ্যসমস্যা লইয়াই যে ইংরেজ ও ফরাসীর মতান্তর মনান্তর হইয়া উঠিয়াছে তাহাই নহে; নানাকারণে রণক্লান্ত ইউরোপ পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কান্ বৈঠকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ যে মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা কিন্তু তাঁহাদের দেশের লোক নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে নাই। ফ্রান্স ও ইটালীর প্রজাসাধারণ এই মীমাংসা তাহাদের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া মনে করেন। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী (Briand) ব্রিয়াঁ কান্ বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবাবলী যখন ফরাসী রাষ্ট্রীয় মহাসভায় উপস্থিত করেন তখন চতুর্দ্দিক হইতে মহাআপত্তি শুনা যাইতে লাগিল। ব্রিয়াঁ উপস্থিত সভ্যবর্গকে কান্ প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পরে নিবেদন করেন যে ইহা গৃহীত না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। রাষ্ট্রতন্ত্রের সভাপতি মিলেরাঁ ব্রিয়াঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং ফরাসী জাতীয়দলের নেতা পোয়াঁকারেকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। পোয়াঁকারে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ব্রিয়াঁর পদত্যাগ ইংরেজদিগের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ফরাসীগণ কান্-বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়াতে কান্ বৈঠক বৃথা হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিবার জন্য জেনোয়া সহরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের যে বৈঠক হইবার কথা ছিল তাহাতেও ফরাসীগণ উপস্থিত থাকিতে নারাজ হইয়াছেন। পোয়াঁকারে বলেন যে ইংরেজ জার্ম্মানীর দিকে ঝুঁকিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এখন যে স্থগিত রাখিতে চাহিতেছেন ফ্রান্সের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব। জয়ী ফ্রান্স নিজব্যয়ে তাহার ধ্বংসপ্রায় সহরগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন আর পরাজিত জার্ম্মানী যুদ্ধে হারিয়াও অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে থাকিবেন, ইহা হইতে ঘোর অবিচার আর কি হইতে পারে? অথচ দেখা যাইতেছে যে ফ্রান্সের জাতীয়ধন নিঃশেষিতপ্রায়, কিন্তু জার্ম্মানীর লক্ষ্মীশ্রী দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। সেখানকার প্রজাসাধারণ ফ্রান্সের অনুপাতে কম খাজনা দেয়; সেখানকার কলকারখানা পুরাদমে চলিতেছে এবং যৌথ কারবারগুলি অংশীদারদিগকে মোটা হারে লাভ দিতেছে, আর ফ্রান্সের ঘরে ঘরে হাহাকার লাগিয়াই আছে। এই বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিকার করিতে ইংরেজ যদি সত্যসত্যই ইচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে ফরাসীগণ জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন, নতুবা তাঁহারা যাইতে প্রস্তুত নহেন। ডুবো জাহাজ লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছিল তাহা আরও তীব্রতার সহিত চলিতেছে।

এদিকে লয়েড জর্জ্জের শাসনপ্রণালী লইয়া ইংলণ্ডেও তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছে। রক্ষণশীল দলের নেতা রবার্ট সিসিল সম্মিলিত-দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন। শাসনের ব্যয়াধিক্য প্রভৃতি নিরাকরণ কল্পে রক্ষণশীল দল পুনর্গঠন করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া তিনি রক্ষণশীল নেতাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অপর দিকে লর্ড গ্ল্যাড্‌ষ্টোন উদারনৈতিকদলকে সম্মিলিত দল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন উদার দল গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্মিলিত দল ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে নিজেদের সংহতি বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করেন। ম্যাক্‌নামারা ও ক্যাপ্টেন গেষ্ট্ এই সভায় বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদ বলিয়া লয়েড জর্জ্জকে অভিনন্দিত করেন। ক্যাপ্টেন গেষ্ট্ আরও বলেন যে লয়েড জর্জ্জের বিরুদ্ধবাদীগণ ইংরেজ রাজনীতি-সাগরে দুই-একটি ঢেলা ফেলিয়া সামান্য একটু চঞ্চলতা তুলিয়াছেন, তাহা সহজেই থামিয়া যাইবে। এই আন্দোলনকে সমুদ্রবিক্ষোভ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। রক্ষণশীলদলেরও উপযুক্ত নেতার অভাব, কাজেকাজেই তাহাদিগকে লয়েড জর্জ্জের নেতৃত্ব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর উদারনৈতিকদলের সহিত সম্মিলিতদল তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন।

পাল্টা জবাবে লণ্ডন সহরে উদারনৈতিক দলের পক্ষ হইয়া গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বলিলেন "লয়েড জর্জ্জের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।" লর্ড গ্রে রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অ্যাস্‌কুইথ সাহেব এতকাল নীরব ছিলেন। তাঁহারাও আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। সম্মিলিত দলের কবল হইতে ইংরেজ রাজনীতিকে মুক্ত করিয়া সতেজ সবল দলাদলি সৃজন করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই ইঁহাদের বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিল। সম্মিলিত দল সুবিধাচারের সৃষ্টি, তাহা নিজের বিশ্বাস অনুসারে সব সময়ে চলিতে পারে না। প্রয়োজনের নিকট নিজের মতবৈশিষ্ট্যকে বলি দিতে ইহাকে অনেক সময় বাধ্য হইতে হয়। সেইজন্য মতপার্থক্যকে স্বীকার করিয়া দুইটি দল যদি নিজের বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় তাহা দেশের পক্ষে অধিক কল্যাণপ্রদ। দক্ষিণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ব্যাক্সটন বলেন যে 'লয়েড জর্জ্জ এতকাল ভাল খেলোয়াড়ের মত না খেলিয়া বরাবর খারাপ খেলিয়া আসিয়াছেন; এখন আবার নূতন করিয়া খেলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে চান; সমস্যা-পূরণ বৈঠকগুলিতে ভুল করিয়া আবার নূতন বৈঠকের উদ্যোগ করিতেছেন। আমার বিশ্বাস আর-একজন নূতন প্রধান মন্ত্রী না পরিবর্ত্তন করিলে বৈঠকে কোনও ফল হইবে না।' লর্ড গ্রে বলেন যে, লয়েড জর্জ্জ গল্প করিয়াছেন, যে, তাঁহার আমলে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি এক ধারা বহিয়াই চলিতেছে, এপথ ওপথে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, তাহা সম্পূর্ণ অলীক। এক বল্‌সেভিকদিগের সহিত লয়েড জর্জ্জ নানাপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। ফরাসীদিগের সহিত মতান্তর ঘটাইয়া লয়েড্ জর্জ্জ যে অবস্থা সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে ইউরোপকে পুনর্গঠন করিবার প্রয়াস সুদূরপরাহত হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রতি বিশ্বাস না ফিরাইয়া আনিতে পারিলে ইউরোপের উদ্ধারের চেষ্টা বিফল হইবে। সুবিধাচার ও খেয়ালের এলোমেলো পথে চলিয়া সম্মিলিত দল ইংলণ্ডের যে বিপদ ঘনাইয়া আনিতেছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া অ্যাস্‌কুইথ সাহেব এই সভায় এক তীব্র বক্তৃতা করেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে উদারনৈতিকদল বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া নিজেদের মন্ত্রীসভা গঠন করিবার চেষ্টা শীঘ্রই বিপুল উদ্যমে আরম্ভ করিবেন।

ইটালীর রাষ্ট্রীয়গগনেও ঝড়ের পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়াছে। সাম্যবাদী দলের তীব্র আক্রমণ সহ্য না করিয়া বনোমী মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করিয়াছেন। গণতন্ত্রদলের নায়ক ডেসিকোলা

মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পাইয়াছেন। ভেসিকোলা সাম্যবাদাদিগকেও তাঁহার সহিত একত্রে কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু পোপের মৃত্যুর পর নব পোপ নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়াও অশান্তি ও অসন্তোষ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কার্ডিনাল গ্যাস্পেরির দল ইটালী-গবর্ণমেণ্টের সহিত বনিবনাও রাখিয়া চলিতে চাহেন, কিন্তু কার্ডিনাল মেরিডিভ্যাল মোহন্তগিরির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে চান। তাই নির্ব্বাচন লইয়া এইবার খুব দলাদলি হইয়াছিল। কার্ডিনাল গ্যাস্পেরির দলই জয়যুক্ত হইয়াছে। ইঁহাদের দলের কার্ডিনাল রাট্টি (Ratti) পোপ নির্ব্বাচিত হইয়া একাদশ পায়াস নাম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাট্টি মিলানের প্রধান ধর্ম্মযাজক ও পোপের পুস্তকাগারের রক্ষক ছিলেন।

জার্ম্মানযুদ্ধ ঋণদান প্রভৃতি ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সহিত মতানৈক্য হওয়াতে জার্ম্মান প্রধান মন্ত্রী হার্ ভির্থ্ (Wirth) পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে কাউণ্ট রাটেনো প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার ন্যায় অর্থনীতি বিশারদ পণ্ডিত ইউরোপে দুর্ল্লভ। বিধ্বস্তপ্রায় জার্ম্মানী ইঁহার চেষ্টায় এত শীঘ্র আবার নূতন বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। তাই সমস্ত জার্ম্মান জাতি একান্ত নির্ভয়ে জাতির ভাগ্য ইঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন।

জেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রীয়া স্পেন হলাণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অশান্তি জাগিয়াছে।

সীমারেখা নির্দ্দেশ লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে বিবাদ বাঁধিয়াছে।

স্কট্ল্যাণ্ড যুগযুগান্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করিয়াছেন।

সমস্ত ইউরোপ এখন সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে। এই যে মাতামাতি, ইহা ইউরোপের জাগরণের ঝুলন, না মরণের দোলা ?

অচিনপথের যাত্রী—

গতমাসে তিনটি বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি ইহধাম ছাড়িয়া অজানা পথে মহাযাত্রা করিয়াছেন।

সমস্ত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে ব্যথিত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু পোপ ২১শে জানুয়ারী তারিখে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণকারী পর্য্যটক আর্নেষ্ট স্যাক্ল্টনের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য ইনি যেরূপ কষ্টস্বীকার করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য ইনি বহুবার অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া দক্ষিণমেরুপথে যাত্রা করিয়া অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত বুয়ারবীর ক্রিশ্চান ডি ওয়েটের মৃত্যু হইয়াছে। জেনারেল ক্রঞ্জি বন্দী হইলে পর বুয়ার সেনাপতিরূপে ডি-ওয়েট যে অদ্ভুত বীরত্ব এবং অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যুদ্ধে হারিয়া যখন বুয়ারজাতি ইংরেজের সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, তখন স্বদেশবাসীর এই ব্যবহারকে ঘৃণ্য মনে করিয়া ডি ওয়েট লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিলেন। দেশকে পুনরায় স্বাধীন করিবার বাসনা ইনি কোনওদিন ত্যাগ করেন নাই; তাই ইংরেজবন্ধু জেনারেল স্মাট্স্ তাঁহার চক্ষুশূল ছিলেন। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে বিব্রত দেখিয়া সুযোগ বুঝিয়া ইনি বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরেজভক্ত বুয়ারদিগের চক্রান্তে ধরা পড়িয়া ছয় বৎসরের জন্য কারাবাসে প্রেরিত হন। কারামুক্তির পর আর অধিক দিন তাঁহাকে অধীনতাশৃঙ্খল পরিয়া থাকিতে হইল না। মুক্তিপ্রয়াসী এই মহাপ্রাণ অনন্তপথে মহাতীর্থ-যাত্রা করিয়াছেন। স্বাধীন পথের এই তীর্থযাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদিগের মাথা নত হউক। তাঁহার জীবনের আলোক আমাদিগের তীর্থযাত্রার সম্বল হউক।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

কারণ কি ?

Slave mentality বা দাসসুলভ মনোভাব—কথাটা আজকাল খুব চল্তি। এ মনোভাব আমরা অর্জ্জন করেছি কোথা থেকে এবং কিরূপে ? কারো কারো মতে ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীই এর মূল কারণ। কথাটা অনেকটা সত্য, তবে সম্পূর্ণ নয়। আমাদের ইস্কুলে সাধারণত যে-সব পাঠ্য কেতাব চলে তা একটু মন দিয়ে পড়্লেই দেখি তাতে নিজেকে খাটো কোরে পদে পদে ইংরেজেরই স্তুতিগান ধ্বনিত হয়েছে। এইরূপে শিশুকাল থেকেই আমাদের মন আত্ম-অবিশ্বাস ও আত্মগ্লানিতে ভোরে ওঠে। নিজেকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখিনে, শিখি যে আমরা নিতান্ত অক্ষম দুর্ব্বল এবং অশ্রদ্ধেয়। শিখি যে ইংরেজের কল্যাণেই ট্রাম মোটর ও রেলগাড়ী চড়ি, ডাকে চিঠি পাঠাই, গরমের দিনে ইলেক্ট্রিক পাখার বাতাসে দেহ ঠাণ্ডা করি এবং গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোয় রাতকে প্রায় দিন কোরে তুলি; প্রতিদিন প্রভাতে বিমলানন্দে চা পান করতে করতে খবরের কাগজে দেশবিদেশের যে খবর পড়ি তাও নিঃসন্দেহ ইংরেজেরই কল্যাণে! আর শিখি ইংরেজ যদি ভারতবর্ষে না থাক্তো আর আমাদের তেত্রিশকোটিকে নাকে দড়ি দিয়ে অহরহ না ঘোরাতো তাহলে আমরা পরস্পরের গলা কাটাকাটি কোরে দেশে রক্তগঙ্গার সৃষ্টি করতুম। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কংগ্রেসের কাজে নেমে গত কয়েক মাসে কিছু

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি। তা থেকে আমাদের দাসসুলভ মনোভাবের অন্যান্য কারণ কতকটা নির্দ্দেশ হতে পারে।

***

কংগ্রেসের সভ্যসংগ্রহের চেষ্টায় পথের দুধারে দোকান-পসারে ঢুকছিলুম। একটা আড়তের গদিতে জনকয়েক লোক বোসে ছিলেন। সবায়ের হাতে একখানি কোরে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অঙ্গীকারপত্র দিয়ে ব্যাপারটি বিশদভাবে বুঝিয়ে বল্লুম। কর্ত্তা সই করলেন। তাঁর পাশের লোকটি সই না করেই অঙ্গীকারপত্রখানি ফিরিয়ে দিচ্ছেন দেখে বল্লুম, আপনি?

তিনি বল্লেন, আমি আর কেন?

আমি বল্লুম, সে কি! এ তো সবায়েরই কাজ। নিন্, সই করুন।

তখন তিনি কর্ত্তার দিকে ঘাড় হেলিয়ে বল্লেন, উনি করেছেন, তাহলেই হবে। উনি আমার দাদা!

একথা যিনি বল্লেন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

আর-একদিন প্রভাতে পাকপাড়ার ছায়াশীতল গ্রাম্যপথে ঘুরতে ঘুরতে দেখি, রাস্তার কলে এক যুবক স্নান করছেন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। আমাদের একজন সঙ্গী তাঁকে চিনতেন। তিনি বল্লেন, ওহে! কল ছেড়ে একবার এসে এই ফর্ম্মে সই কোরে দাও দেখি।

ব্যাপার কি?—বোলে যুবক এগিয়ে এসে সবিশেষ শুনে বল্লেন, তা আমার কাছে কেন? বাবা বাড়ীতে আছেন, তাঁর কাছে যাও না।

আমাদের সঙ্গী বল্লেন, বাবার কাছে তো যাবোই। এখন তোমার কাছে এসেছি। সইটা দাও।

যুবক ঈষৎ হেসে বল্লেন, হুঁ আমি আবার—

অনেক আড়তেই কর্ম্মচারীরা বল্লেন, আজ্ঞে কর্ত্তা এখন নেই। তিনি না সই করলে আমরা কেমন করে করি!

একদিন সন্ধ্যায় রুষ মনীষী ক্রপট্‌কিন লিখিত 'নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। মেয়েরা চিরদিন যে কেবল household drudge হয়ে থাকবে অর্থাৎ সংসারের বাঁদি-গিরি করবে এটা যে শুধু অশোভন তা নয়, এটা একটা দারুণ অবিচার। নিত্যনৈমিত্তিক গৃহকর্ম্ম থেকে অব্যাহতি লাভ কোরে ঘরের বাহিরে মানুষের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁদের নিযুক্ত হতে হবে। তবেই মানুষের কল্যাণ। আমেরিকায় অধুনা যন্ত্রপাতির সাহায্যে গৃহকর্ম্ম অনেক সরল ও সহজসাধ্য হয়েছে বলে মেয়েরা অনেকটা সময় নিজেদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির চেষ্টায় পাঠে ভ্রমণে বা ক্রীড়াকৌতুকে এবং সামাজিক নানা হিতকর কাজে ব্যয় করতে পারেন।

দলের একজন সভ্য কথাটা শুনে বড়ই বিচলিত হলেন। মেয়েরা যদি ঘরের বাইরে গেলো তো সংসার দেখ্‌বে কে? তারপর যখন কথাটা ভালো কোরে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া গেলো, তখন বল্লেন, যাক! মার্কিনের সাংসারিক-পরিশ্রম-কমানো কলগুলো যখন এখনো এদেশে পৌঁছোয়নি, তখন সনাতন প্রথায় মেয়েরা আপাতত সকাল সন্ধ্যা কলতলা আর রান্নাঘর করুক, তারপর সুদূর ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সে-সব কল বাংলা দেশে পৌঁছয় তখন সেকথা ভাব্‌লেই চল্‌বে!

এই না বোলে তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লেন। বলা বাহুল্য সেদিন থেকে তিনি আমাদের সঙ্গ বর্জ্জন করেছেন।

অনেক স্থানে গিয়ে দেখেছি রবিবার সকালের নিশ্চিন্ত অবসর পুরুষেরা বন্ধুর বৈঠকখানায় তবলা বা তাস পিটে বা গাছতলায় কোঁচার খুট গায়ে জড়িয়ে জটলা কোরে কাটাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সভ্যও হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন একুশ বৎসর বয়স হলে মেয়েরাও কংগ্রেসের সভ্য হতে পারেন, তখন অনেকে কথাটা যেন কানেই যায়নি এমনি ভাব দেখালেন, আর কারো মুখে ঈষৎ একটু বিদ্রূপের হাসির আভাস ফুটে উঠ্‌লো।

ছাত্রদের মেসে গিয়ে দেখেছি তক্তপোষের উপর গোল হয়ে বোসে জোর তাসখেলা চলেছে। টেবিলের উপর দেখ্‌লুম প্রসাধন-সম্ভারের ছড়াছড়ি। তাঁদের সভ্য হবার জন্য অনুরোধ করা হল। ক্ষণকাল স্তব্ধতার পর একজন একটা ঢোক গিলে বল্লেন, আমরা তো সভ্য হয়েছি। সেদিন একজন ভদ্রলোক এসে সই করিয়ে নিয়ে গেছেন।

কে সে ভদ্রলোক এবং কোন্ কমিটি থেকে এলেন জিজ্ঞাসা করাতে সবাই বোবা হয়ে গেলেন।

***

এখন ভাব্‌বার কথা, আমাদের দেশে মানুষ পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও শিশুর মত অসহায় থাকে কেন? স্ব-ইচ্ছায় কর্ম্ম না কোরে অধিকাংশ লোক 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' করে কেন? আমরা নিজে যা চাই পারতপক্ষে পরকে তা দিতে চাই না কেন? নারীকে কেন তুচ্ছ ভাবি, কেন তাঁকে অবজ্ঞা করি?

কারণ, কলিকাতার সেনেট-হাউস অপেক্ষা বাংলার পরিবার এবং সমাজ ঢের বড় গোলাম-খানা। সে পরিবারে স্বাধীন কেবল কর্ত্তা, অবশিষ্ট সকলেই পরাধীন। এই পরাধীনতা যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা পুরুষ তাঁরা অলস ভীরু কর্ম্মকুণ্ঠ ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীন, আর যাঁরা নারী তাঁরা একেবারেই অসহায় দুর্ব্বল ও অশিক্ষিত। কর্ত্তা পরিবারের যেরূপ চালচলন ব্যবস্থা করেন সকলকেই তা মানতে হয়। বাড়ীর মেয়েরা ইস্কুলে লেখাপড়া কর্‌বে কি গণ্ডমূর্খ হয়ে গৃহকোণে বোসে থাকবে তা স্থির কর্‌বেন কর্ত্তা। শিক্ষিত ছেলেরা বিবাহে পণ গ্রহণ কর্‌বে কি না এবং দশম বর্ষীয়া বা ততোধিক-বয়স্কা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কর্‌বে কি না তাও নির্দ্দেশ কর্‌বেন কর্ত্তা। মেয়েরা কতটুকু জোরে হাসবে বা হাস্‌বে না, তারা জামা-সেমিজ অঙ্গে ধারণ কর্‌বে, না, একবস্ত্রে থাক্‌বে, তাও নির্ভর করে কর্ত্তার ইচ্ছার উপর। মেয়েরা যখন গাড়ীতে বাড়ার বার হবেন তখন গাড়ীর জান্‌লা খোলা হবে, না, দরজা খোলা হবে, বা খোলা হলেও কোন্ দিক্‌কার দরজা-জান্‌লা কতটুকু খোলা হবে তা নির্ভর করে সেই গাড়ীতে যিনি অভিভাবক আছেন তাঁর ইচ্ছার উপর, তা তিনি অজাতশ্মশ্রু বালকই হোন না কেন। কারণ, শাস্ত্রে আছে নারী কোনো কালেই স্বাতন্ত্র্য লাভ কর্‌তে পারে না! সারাজীবনই তাঁরা অধীন থাক্‌বেন, হয় পিতার, নয় পতির, নয় পুত্রের! সেই নজিরেই তো 'ধর্ম্মপুত্র' যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশার পণে বসিয়েছিলেন, 'পিতৃভক্ত' পরশুরাম মাতৃরক্তে ধরণী রঞ্জিত করেছিলেন, আর 'প্রজারঞ্জন' রামচন্দ্র সন্তানসম্ভবা মহিষী সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন!

এই যে সাধারণ বাঙালীঘরের আবহাওয়া, এর মাঝে বর্দ্ধিত হয়ে যদি কেউ মানুষের মত উচ্চশিরে না দাঁড়িয়ে সরীসৃপের মত আপনাকে অহরহ ধূলিলুণ্ঠিত করে, তাতে বিস্ময়ের কি কারণ আছে? আমাদের 'গৃহলক্ষ্মী' মেয়েরা যদি সংসারের ভক্তি ও আদরযত্নের মাত্রা সহ্য কর্‌তে না পেরে প্রতিদিন তিলে তিলে অন্তরের আগুনে দগ্ধ হন বা নিমিষে কেরোসিনের আগুনে অকালে জীবননাট্যের উপর যবনিকা পাত করেন, তাতেই বা বিচলিত হই কেন? সংসার ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এর বিপরীত ঘটাটাই অসম্ভব।

আসল কথা, আমাদের দেশ অধীনতার দেশ— ইংরেজীতে যাকে বলে Country of Slaves। "সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে শূদ্রাদি যেমন ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে। এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে; আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে; পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতা স্বরূপ; দেবতা স্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে; দাসীত্ব এতদূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থে সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।" (বঙ্কিমচন্দ্রের "সাম্য"।)

আষাঢ়, ১৩২৮ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরমাণুর গঠন এবং আকৃতি

পদার্থ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎ অনেক দার্শনিক ও পদার্থবিদ্ পণ্ডিত জড়ের পরমাণুর (Atom) গঠন ও আকৃতি লইয়া অনেক গবেষণা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেহই একটা নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি যতই সূক্ষ্ম হইতেছে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও ক্রমে আরও জটিল হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের এই আদি সূত্রের মীমাংসা ব্যতীত বিজ্ঞান আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পদে পদে কত নূতন নূতন ঘটনা আসিয়া পড়ে, সে-সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাদের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গেলেই এইখানে আসিয়া সকলকে ঠেকিতে হয়। এই ঘটনাস্রোতে পড়িয়া পরমাণুর কত সংস্করণ এবং কত পরিবর্ত্তন হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে এখন পরমাণু জড়দেহ ছাড়িয়া এক অভেদ্য শক্তিময় পদার্থে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান পরমাণুতে শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, তাই উহাকে এখন আর সামান্য জড় না বলিয়া এই বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিময়ের অংশ রূপে তাহার পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আজ আমরা এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার মোটামুটি কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রায় বিংশাধিক শতাব্দী পূর্ব্বে, ইউরোপে যখন সবেমাত্র বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতেছে, হিন্দুস্থানের প্রাচীন দার্শনিক জড়জগতের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়া গিয়াছেন 'পরমাণুভ্যো বিশ্বম্ উৎপাদ্যতে'। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জড়জগৎ ছিল 'গূঢ়ম্ অব্যক্তম্ অলিঙ্গম্'। ইহাই সাংখ্যদর্শনের 'প্রকৃতি' এবং বেদান্তের 'মায়া'। পরিণাম-ক্রিয়ার (evolution) সঙ্গে সঙ্গে এই অব্যক্ত অজ্ঞেয় অলিঙ্গ ভূতাদি 'প্রকৃতি' রজঃ (শক্তি) প্রভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া পরিস্পন্দনশক্তিযুক্ত এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হইল। এই সূক্ষ্ম পদার্থের নাম 'তন্মাত্র'। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গুণবিশিষ্ট তন্মাত্র পাঁচ প্রকার। এই তন্মাত্র আবার আদিপ্রকৃতি হইতে একটু একটু করিয়া আরও জড়ত্ব (তমঃ) লাভ করিয়া অবয়বযুক্ত পরমাণুতে পরিণত হইল। এইরূপে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন এই পরমাণুই আমাদের পরিদৃশ্যমান জড়জগতের শেষ পরিণতি। পরমাণুও তন্মাত্রের গুণভেদে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকার পরমাণুর সংমিশ্রণেই মহাভূত জড়ের সৃষ্টি। বৈশেষিক ন্যায়ের মতে পরমাণু চার প্রকার; ব্যোম (আকাশ) নিরবয়ব এবং নিষ্ক্রিয়, ইহার গঠন পরমাণবিক নহে। জড়পদার্থের উত্তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি গুণ কোথা হইতে আসিল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বৈশেষিক নৈয়ায়িক কণাদ বলিয়া গিয়াছেন যে পরমাণু নিত্য পরিস্পন্দনশীল এবং ইহার এই পরিস্পন্দন হইতেই জড়ের ভৌতিক ব্যাপারের সৃষ্টি, ইহার সকল প্রকার ক্রিয়া এবং গুণ এই পরিস্পন্দন হইতেই আসে।

এইরূপে হিন্দু দার্শনিক যখন জড়জগতের পরমাণবিক গঠন নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার কিছুকাল পরে, পূর্ব্ব-ইউরোপের প্রাচীন সভ্য দেশ গ্রীসে কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিত প্রচার করেন যে জড়পদার্থ কতকগুলি অণুর (molecule) সমষ্টি মাত্র। জড়পদার্থটি যদিও দেখিতে নিশ্চল, অণুগুলি কিন্তু নিশ্চল নহে, তাহারা প্রতিক্ষণই বেগে স্পন্দিত হইতেছে; এই স্পন্দনের বেগে কতকগুলি অণু জড়পিণ্ডের বাহিরে চলিয়া গেলেও অধিকাংশই পরস্পরের সহিত ধাক্কাধাক্কি করিয়া একেবারে উহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারে না।

ইহার পর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কত জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত মতের প্রচার হইল, আবার তাহা কালক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইল, কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক পদার্থবিজ্ঞানের এই প্রথম সূত্রের যেরূপ আবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড্যাল্টন ইহাকে আরও কিছুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি দেখাইলেন যে জড়পদার্থের অণুগুলি মৌলিক নহে অর্থাৎ

সোনা রূপা তামা প্রভৃতির ন্যায় কোনও এক পদার্থে গঠিত নহে, উহারা মিশ্র পদার্থ; এবং এই অণুই জড়ের শেষ পরিণাম নহে, অণুকে ভাগ করিলে তাহা অপেক্ষা ছোট কতকগুলি পরমাণু পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক জড়পদার্থের পরমাণু ভিন্ন প্রকারের এবং উহারা অখণ্ডনীয় ও অবিভাজ্য, জড়পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনকালেও পরমাণুগুলি আপন আপন সত্তা বজায় রাখিয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। জলের একটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্‌সিজেন পরমাণু আছে। এখন তাড়িত-সংযোগে জলের এক-একটি অণুকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকবারই একটি একটি পূর্ণ অক্‌সিজেন কিম্বা হাইড্রোজেন পরমাণু খসিয়া যাইবে, পরমাণুর আর কোনও-রূপ আংশিক পরিবর্ত্তন হইবে না। ড্যাল্টনের এই মত তৎকালে বৈজ্ঞানিক জগতে নবযুগের আবির্ভাব করিল। রসায়নবিজ্ঞানকে পরমাণুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে দেখাইয়া উহাকে আরও সরল এবং আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া দিল।

ড্যাল্টনের এই অবিভাজ্য পরমাণু (indivisible atom) সকলেই স্বীকার করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু অনেকেই শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত আসিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। পরমাণুর স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা ইহাতেই একেবারে চূড়ান্ত হইল—এরূপ আশা অনেকেই করিতে পারিলেন না। তবে কিছুদিনের জন্য সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন সত্য।

আবার যখন ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের (element) পরমাণুর ভার (atomic weight) পরীক্ষা করা হয়, তখন দেখা যায় যে কতকগুলির ভার অন্যগুলির সহিত প্রায় সমান ভাবে প্রভেদ এবং এই সমান কমবেশিটুকু ঠিক চারিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর একত্র যে ভার হয় ঠিক তাহাই। ইহা দেখিয়া প্রাউট্ বলিলেন যে আর কিছুই নহে, কেবল ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে জড়ের পরমাণু কতকগুলি পূর্ণসংখ্যক অতি-পরমাণুর (Proto-atoms) সমষ্টি মাত্র এবং একই প্রকার অতি-পরমাণুই সকল মৌলিক পদার্থের মূল। তিনি আরও বলিলেন যে এই সনাতন অতি-পরমাণু অন্য কিছু নহে কেবল একটি একটি হাইড্রোজেন পরমাণু কিম্বা উহার অর্দ্ধেক ওজনের আর কোনও পদার্থের পরমাণু হইবে। তিনি এইরূপে ড্যাল্টনের মতের প্রতিবাদ করিলেন এবং আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর পদার্থের কল্পনা করিয়া গেলেন। কিন্তু প্রাউটের এই সরল এবং অতিস্বাভাবিক মত তৎকালে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে বেশীদিন টিকিতে পারিল না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের নিকট এই পুরাতনের আদর আবার বাড়িয়াছে। প্রাউট কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে যাহা বলিয়াছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান নানা স্থান হইতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আবার নূতন করিয়া তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একটি কাচের গোলকের ভিতরকার কতকটা বাতাস যদি পাম্প করিয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহার দুইদিকে দুইটি প্লাটিনাম ফলক লাগাইয়া উহার ভিতর তাড়িত সঞ্চালন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে-ফলকটি দিয়া তাড়িত গোলক হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে (kathode) সেইটি হইতে একপ্রকার রশ্মি বাহির হয়। গোলকের ভিতর অবশিষ্ট যেটুকু বাতাস থাকে তাহার ভিতর দিয়া এই রশ্মি যতদূর যায় সমস্তটাই আলোকিত করে। আবার ঐ গোলকের নিকট একটি চুম্বক লইয়া গেলে দেখা যায় যে ঐ রশ্মির সোজা পথ চুম্বকের আকর্ষণে বাঁকিয়া গিয়াছে। এই কাচের গোলকের খানিকটা অংশে যদি কাচের পরিবর্ত্তে একটা পাত্‌লা এলুমিনিয়ামের পাত দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ কাথোড্-রশ্মিকে এলুমিনিয়াম ভেদ করিয়া বাহিরে আনিতে পারা যায়। অধ্যাপক সার জে জে টম্‌সন্ প্রভৃতি অনেকে দেখাইলেন যে এই অদ্ভুতগুণসম্পন্ন রশ্মি বাস্তবিক অতি সূক্ষ্ম তাড়িত-কণিকার সমষ্টি মাত্র, এইসকল কণিকা কাথোড্-ফলক হইতে বিকর্ষিত হইয়া গোলকের ভিতর ভীষণ বেগে চলিতে থাকে এবং উহার অবশিষ্ট বাতাসকে আলোকিত করে। এই তাড়িত-কণিকার নামকরণ হইল ইলেক্‌ট্রন্। এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্, অধ্যাপক জে জে টমসন্ প্রভৃতি কয়েকজন নববিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই ইলেক্‌ট্রন্ পদার্থবিজ্ঞানকে নূতন আলোকে

আলোকিত করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে নবযুগের আবির্ভাব করিয়াছে।

তাহার পর মানবের সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম উৎকর্ষ হইল যখন এই অদৃশ্য ইলেক্‌ট্রনের ভার এবং তাহার তাড়িতের পরিমাণ মাপা হইল। এইরূপে দেখা গেল যে এক-একটি ইলেক্‌ট্রনের ভার সবচেয়ে হাল্কা একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু অপেক্ষা অনেক কম, প্রায় উহার ১০০০ ভাগ হইবে।

উপরিউক্ত গোলক হইতে বিকর্ষণী তাড়িত-যুক্ত (negatively charged) ইলেক্‌ট্রন ছাড়া আকর্ষণী তাড়িত-যুক্ত (positively charged) আরও একপ্রকার তাড়িত-কণিকা পাওয়া যায়, গোলকের ভিতর ইহারা ইলেক্‌ট্রনের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। ইহারা ইলেক্‌ট্রনের অপেক্ষা অনেক বড় এবং ইহাদের ভার প্রায় একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমান হইবে। বিকর্ষণী তাড়িতকণা পরে আরও অন্যান্য স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেকেরেল দেখাইলেন ইউরেনিয়ম্ ধাতু হইতে এইরূপ কণিকা নির্গত হয়। এবং স্বনামধন্য মাদাম কুরী এক-প্রকার প্রস্তরের ভিতর হইতে যে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন রেডিয়ম্ আবিষ্কার করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন তাহার ভিতর হইতেও অবিশ্রান্তভাবে এইরূপ তাড়িতকণিকা নিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ ধাতুনিঃসৃত তাড়িতকণা ঠিক ইলেক্‌ট্রনের ন্যায় গুণসম্পন্ন হইলেও ইহাদের নাম দেওয়া হইল বিটা পার্টিক্‌ল্। রেডিয়ম্ ও ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি হইতেও বিকর্ষণী তাড়িতযুক্ত বিটা পার্টিক্‌লের সহিত আকর্ষণী তাড়িতযুক্ত কণিকাও নির্গত হয়, ইহাদের নাম আল্‌ফা পার্টিক্‌ল্। এইসকল তাড়িতকণিকার জড়ের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহারা তাড়িতশক্তির অংশ মাত্র; তবে জড়ের ন্যায় ইহাদের ভার কোথা হইতে আসিল তাহা পরে বলিব।

বিভিন্ন প্রকারের তাড়িতশক্তিসম্পন্ন এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা আবিষ্কৃত হইবার পর পরমাণুর গঠন লইয়া অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ইলেক্‌ট্রন্ যখন পরমাণু অপেক্ষা অনেক ছোট, তখন স্বভাবতঃ ইহাই মনে হয় যে ইহা পরমাণুর অংশ হইতে পারে। অনেকেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে একটি মৌলিক পরমাণু কতকগুলি ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি, কেবল খানিকটা তাড়িত মাত্র, ইহার জড়ত্বের কোনও বাস্তব সত্তা নাই। পরমাণুর গঠন কতকটা আমাদের সৌর জগতের ন্যায়। সৌর জগতের কেন্দ্রস্থলে যেরূপভাবে সূর্য্য বর্ত্তমান, সেইরূপ একটা আকর্ষণী তাড়িৎযুক্ত আল্‌ফা পার্টিক্‌ল্ পরমাণুর কেন্দ্রস্বরূপ, এই আকর্ষণী তাড়িতকণিকা হইতেই পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভারটাই আসে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহ-সকল যেমন ঘুরিতেছে এই আকর্ষণী তাড়িতকণিকার চতুর্দ্দিকে সেইরূপ কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতেছে।

অধ্যাপক রাদারফোর্ড সম্প্রতি এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার ভিতরকার গঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য বাহির করিয়াছেন। বড় বড় অট্টালিকা প্রভৃতি ভাঙ্গিতে হইলে কামানের সাহায্যে যেমন বড় বড় গোলা ছুড়িতে হয়, সেইরূপ এই অদ্ভুতশক্তিশালী ও বেগবান একটা আল্‌ফা পার্টিক্‌ল্ কিম্বা একটা ইলেক্‌ট্রন্‌কে যদি কোনও জিনিষের খানিকটা মোটা পাতের ভিতর দিয়া যাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে অনায়াসে তাহারা উহা ভেদ করিয়া যাইবে এবং হয় ত কতকগুলি পরমাণুকে ভেদ করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। এইরূপে রেডিয়ম্ হইতে নির্গত আল্‌ফা পার্টিক্‌লের সাহায্যে রাদারফোর্ড, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া উহাদের উভয়ের ভিতর হইতে হাইড্রোজেন-পরমাণু এবং একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভারের তিনগুণ ভারী আর-একপ্রকার পরমাণু পাইয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে এই দুই প্রকার পদার্থই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-পরমাণুর ভিতর হইতে আসিল। এইরূপে আল্‌ফা পার্টিক্‌লের সাহায্যে খুবই অল্পসংখ্যক পরমাণুকে চূর্ণ করা যায়; বোধ হয় দশ হাজারের মধ্যে একটা পার্টিক্‌ল্ একটা পরমাণুর ভিতর দিয়া যায় কি না সন্দেহ। উপরিউক্ত পরীক্ষায় রাদারফোর্ড এক-একটি পরমাণুর ফটো লইয়া তবে তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলেন। আরও বিশদভাবে নিক্তির সাহায্যে চূর্ণ পরমাণুখণ্ডকে ওজন করিয়া দেখিতে হইলে পৃথিবীর সমস্ত রেডিয়ম্ একত্র করিলেও কয়েকবৎসর কাটিয়া যাইবে।

এইরূপে আরও কয়েকটা মৌলিক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া সকলগুলি হইতেই হাইড্রোজেন পাওয়া গিয়াছে।

শুধু হাইড্রোজেন কিম্বা হাইড্রোজেন ও ইলেক্‌ট্রন যে সকল প্রকার পরমাণুর মূল তাহা এই পরীক্ষা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ইহাই প্রাউটের কল্পিত অতিপরমাণু।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে পরমাণু যদি খানিকটা তাড়িতশক্তি মাত্র, তাহা হইলে তাহার ভার আসিল কোথা হইতে? ইংরেজিতে যাহাকে weight বলে তাহাকেই বাঙ্গালায় আমরা ভার বলিয়াছি; ইংরেজীতে mass শব্দের অর্থ quantity of matter (জড়ের পরিমাণ), বাঙ্গালায় কেহ কেহ উহাকে 'বস্তু' আখ্যা দিয়াছেন। এখন কোনও একটা জিনিষ হাতে করিয়া উঠাইলেই আমরা একটা ভার বা চাপ অনুভব করিয়া থাকি; এই ভার ঐ জড় পদার্থের নিজস্ব নহে—পৃথিবী সকল পদার্থকেই তাহার কেন্দ্রের দিকে টানিতে থাকে, সুতরাং আমরা উহা উঠাইতে গেলেই পৃথিবী বাধা দিবে, এই বাধাকেই আমরা ভার বলিয়া থাকি। জড়পদার্থের যে জিনিষটা নিজস্ব সেটাকে আমরা 'বস্তু' বলিয়া থাকি। পৃথিবী টানুক আর নাই টানুক জড়ের 'বস্তু' থাকিবেই; অতএব বস্তুই জড়ের জড়ত্ব। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জড় থাকিলেই তাহার বস্তু থাকিবে এবং বস্তু থাকিলেই তাহার ভারও থাকিবে। জড়ের ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা হইতে আমরা তাহার বস্তুর পরিমাণ করিয়া থাকি। দুইটা পদার্থ পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করিয়া বিপরীতদিকে ছুটিয়া যায়, যেটির বস্তু কম সেইটি অপরটি অপেক্ষা বেশী দূরে গিয়া পড়ে, দুইটাই সমান হইলে সমান দূরে গিয়া পড়িবে, এইরূপে বস্তুর কমবেশি বুঝা যায়। নিক্তির সাহায্যেও আমরা একটা জিনিসের বস্তু অপর একটার সহিত তুলনা করিয়া থাকি; পাঁচ ভরি ওজনের সোনা বলিতে আমরা বুঝি ঐ সোনার বস্তুর পরিমাণ পাঁচ ভরি। এতদিন আমরা জানিয়া আসিয়াছি যে ঐ সোনাটুকু সকল অবস্থাতেই পাঁচ ভরি থাকিবে, উহা গলাইয়া অলঙ্কার করিলেও পাঁচ ভরি থাকিবে, উহাকে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেও পাঁচ ভরি থাকিবে, আবার উহাকে তাড়িতযুক্ত করিলেও পাঁচ ভরি থাকিবে। ইহা পরীক্ষালব্ধ সত্য হইলেও, এতদিন ইহাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি এবং এইজন্য একদিনও আমাদিগকে কোথাও ঠকিতে হয় নাই। আজকাল অনেকে বলেন এবং প্রকৃত পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছেন যে ঐ তাড়িতযুক্ত পাঁচভরি সোনাটা যতক্ষণ নিশ্চল কিম্বা আস্তে আস্তে চলিতে থাকে ততক্ষণ উহা পাঁচ ভরি থাকে বটে, কিন্তু যখন উহা একটা ইলেক্‌ট্রনের ন্যায় ঘণ্টায় ৬০ কোটী মাইল বেগে ছুটিতে থাকে তখন উহার ওজন প্রায় ১৫ ভরি হইবে। সোনাটা তাড়িতযুক্ত না হইলেও তাহার ওজন এইরূপে বাড়িয়া যাইত কি না তাহা কেহ দেখান নাই, তবে উহা না বাড়িবারও কোন কারণ নাই। যাহাই হউক, তাঁহারা বলেন ভীষণ বেগে গতিই তাড়িতের ওজন বা বস্তুত্বের অনুমান করাইয়া দেয়। সুতরাং ইলেক্‌ট্রন বাস্তবিক তাড়িতকণিকা হইলেও তাহার সমস্ত ওজন বা বস্তুটাই কেবল তাহার এই অতি ভীষণ গতি হইতেই উদ্ভূত। ইহার গতি যদি আরও বেশী হয়, ইহার ওজনও আমাদের নিকট আরও বেশী বলিয়া বোধ হইবে; শেষে যখন উহা আলোকের ন্যায় ভীষণ বেগে ছুটিবে তখন উহার ওজন আর আমরা মাপিয়া কুলাইতে পারিব না, এমন কি কল্পনাতেও আনিতে পারিব না, উহা তখন অপরিমেয় (infinite); তবে একটা সুবিধার বিষয় এই যে আলোকের ন্যায় তীব্র গতিতে আলোক ছাড়া আর কিছুই ছুটিতে পারে না।

তাহা হইলে এখন আমরা দেখিলাম ইলেক্‌ট্রন তাড়িতকণিকা হইলেও তাহার বস্তুত্ব কিরূপে আসিল। বস্তু থাকিলেই তাহার ভারও থাকিবে এবং এই ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি পরমাণুরও ভার থাকিবে।

এই ত গেল পরমাণুর গঠন, এখন উহার আকৃতি কিরূপ? অধ্যাপক অস্‌বর্ণ্‌ রেনল্‌ড্‌স্‌ বহুদিন আগে পরমাণুকে সমুদ্রতীরের নুড়ি পাথরের ন্যায় গোল বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে সমুদ্রতীরের ছোট ছোট পাথরগুলি যেমন বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা আলোড়িত হইয়া পরস্পর ঠোকাঠুকি ধাক্কাধাক্কি করিয়া ক্রমশঃ গোল হইয়া যায়, তেমনি পরমাণুও আগে ত্রিকোণ কিম্বা চতুষ্কোণ যাহাই থাকুক, এখন এতদিন ধরিয়া পরস্পর ধাক্কাধাক্কিতে ঘষিয়া গোল হইয়া গিয়াছে। রেনল্‌ড্‌সের কল্পিত এই গোলাকার পরমাণুর কেহ কোনও বিশেষ প্রতিবাদ করেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানও পরমাণুর

আকৃতির কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ না পাইলেও ইহাকে গোলাকার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। পরমাণুর কেন্দ্রে যে আকর্ষণী তাড়িতযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুটা আছে সেটা গোল, ইহা কতকগুলি ফাঁপা গোলকের ভিতর (ঠিক যেরূপ ভাবে একটা বড় কৌটার ভিতর আর-একটা কৌটা থাকে সেই ভাবে) আছে। বাহিরের এই ফাঁপা গোলকগুলি আর কিছুই নহে কেবল ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন। তবে একটা পরমাণুতে এইরূপ কয়টা স্তর ইলেকট্রন আছে তাহা তাহাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবং ইহা সকল মৌলিক পরমাণুতে সমান নহে, যাহার যেরূপ ওজন তাহার ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাও সেই অনুসারে কমবেশি।

পরমাণুকে এইরূপে শক্তির ছাঁচে গঠন করিয়া আধুনিক বিজ্ঞান জড়কে একবারে বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাসন করিতে চাহে এবং জড়ের পরিবর্ত্তে শক্তি নামক পদার্থকে বসাইয়া তাহাকেই পূজা করিতে চাহে। জড়পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করিতে চাহে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র যে জড়কে অবিনাশী বলিয়া এতদিন তাহারই শ্রীচরণে পুষ্পচন্দন দিয়া আসিয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র সেই জড়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া শক্তির অবিনাশিতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহারই জয়ধ্বজা তুলিয়াছে।

শ্রীসত্যবান রায়।

হুলুধ্বনি

উলু উলু উলু উলু কি মধুর কল্লোল !
নন্দন হতে এলো উল্লাস-হিল্লোল।
মন্থন-রব শোনো, সুধা ওই উঠ্‌ছে ;
বাঁধুলী ও কুন্দ যে একসাথে ফুট্‌ছে।
কিন্নরী ছড়াইছে কুবেরের বিত্ত,
কুড়াইতে ভুলে যায় আনমনা চিত্ত।

পিনাকীর জটাজালে সুরধুনী আস্‌ছে,
বাঁশী হাসি ফাগে রাগে কুঞ্জ যে ভাস্‌ছে,
বেজে উঠে রয়ে রয়ে শঙ্খ কি জন্য,
ঝরে লাজ মুক্তার, ধন্য গো ধন্য।
জাগে সুর নৃত্যের মঞ্জীর-গুঞ্জন
অনুরাগে পরীদের ফুল-সুধা ভুঞ্জন।

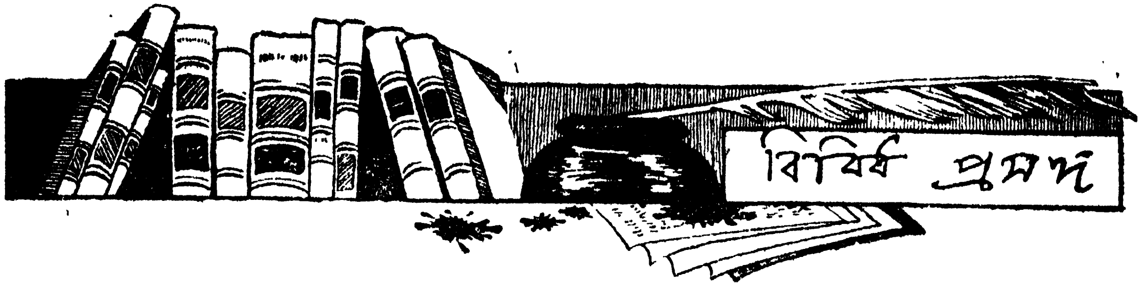
কৈলাস হিমালয়ে কি তুফান উঠলো,
মিথিলায় সয়ম্বর কি জোয়ার জুটলো,
দুকূলে ও বাঘছালে একি মধুগ্রন্থি—
কল্যাণ হলো আজ আদরেতে বন্দী !
পুলকের বেদে ও যে প্রণবের শব্দ,
রয়ে' রয় দিক্‌বধূ দিক্‌পাল স্তব্ধ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অন্ধ

আমাদের আর-সব সকলের মত
দেখিতে পাও না তুমি কিছুই হয়ত !
আমাদের আকাশের শশী ও তপন
হয়ত তোমার কাছে সুদূর স্বপন !
আমাদের তরুণীর রূপের পরশ
তোমার নয়ন-মন করে না সরস।
তাহলে কি এই দীর্ঘ জীবন তোমার
আলোহীন সুনিবিড় আঁধার অমার ?
আমাদের মুখে শুনে আলোর মহিমা,
রূপসীর কুসুমিত রূপের গরিমা,
কল্পনায় সৃষ্টি কি গো কিছুই করনি
আর একটা সুন্দর মধুর ধরণী ?
সেখানে যে আলো আছে—হয়ত অমন
স্বপনেও দেখেনিক শশী ও তপন !
হয়ত যে রঙ্‌ সেথা করেছে বাহার
রামধনু একটাও দেখেনি তাহার !
সেথাকার অপরূপ রূপসীর ছবি
ভাবেনি হয়ত কভু হেথাকার কবি !
বাস্তব জগত 'পরে মুদিয়া নয়ন
কল্পনার দেশে কি গো দেখিছ স্বপন ?

'বনফুল'



প্রবাসীর মূল্য দিবার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়

গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ডাকবিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল এই নিয়ম করিয়াছেন, যে, ডাকবিভাগের রেজিষ্টরী-ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহ তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ন্যূন মাশুলেই পূর্ব্ববৎ ভি-পি ডাকে পাঠান চলিবে।

এই কারণে, আমরা মাঘের প্রবাসীর ৫৭৮ পৃষ্ঠায়, "আগামী ১৩২৯ সালের প্রবাসীর মূল্য সাড়ে ছয় টাকার একখানি করিয়া রসীদ আমরা গ্রাহকদিগকে থামের মধ্যে পুরিয়া ভ্যালুপেয়েব্‌ল্‌ ডাকে আগামী ১০ই চৈত্র পাঠাইব," বলিয়া যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

কিন্তু ডাকবিভাগের পূর্ব্বেকার নিয়ম আবার প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও, ভ্যালুপেয়েব্‌ল্‌ ডাকে প্রবাসী লইয়া উহার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান, মূল্য দিবার অন্য দুটি-উপায় অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য রহিল।

প্রবাসীর মূল্য দিবার সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা উপায়—

নিজে বা লোক মারফত আমাদের আফিসে সাড়ে-ছয় টাকা জমা দেওয়া।

ইহাতে অতিরিক্ত কোন ব্যয় নাই। কলিকাতার গ্রাহকদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না, তাঁহারা মনি-অর্ডার দ্বারা ৬৸০ পাঠাইলে মোট খরচ ৬৸৵০ হইবে।

ভ্যালুপেয়েবলে প্রবাসী লইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ ৬৸৵০, ব্যয় পড়িবে।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রাহক-নম্বর টুকিয়া রাখিবেন। উহা প্রবাসীর মোড়কে গ্রাহকের নামের উপর হাতের অক্ষরে লেখা থাকে। টাকা দিবার সময় এবং অন্যান্য চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসীর ১৩২৯ সালের মূল্য আগামী ১৫ই চৈত্রের মধ্যে আমাদের হস্তগত হইলে ভাল হয়।

আইন-অনুযায়ী দণ্ড ও বেআইনী অত্যাচার

যে-কোন দেশে যাহারা দেশ শাসন করে, সেই দেশের আইন প্রয়োগ করিবার অধিকার তাহাদের আছে। আইনটা ভাল কি মন্দ, উহা ধর্ম্মনীতি-সঙ্গত, না তাহার বিরুদ্ধ, তাহার বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু কোন আইন থাকিলে, তাহার প্রয়োগের জন্য শাসকদিগের নিন্দা করা চলে না। গর্হিত আইন যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য। সেরূপ কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, বা তাহা বিধিবদ্ধ হইতে যাইতেছে, জানিবামাত্র উহা যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবার পর, উহা রদ করাইবার চেষ্টা যাহাতে চলিতে থাকে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি থাকা চাই। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা চাই, যে, ঐ আইনের অপপ্রয়োগ হইতেছে কি না। উপরে বলিয়াছি, উহার প্রয়োগের জন্য শাসকদের নিন্দা করা চলে না; কিন্তু অপপ্রয়োগের নিন্দা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অপপ্রয়োগের শুধু প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়; উহার প্রতিরোধ করাও বৈধ এবং কর্ত্তব্য।

খারাপ আইনের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে জনসাধারণের কর্ত্তব্য সাধারণভাবে উল্লিখিত হইল। খারাপ আইন নানা রকমের আছে। এখানে আমরা বিশেষভাবে সেইসব আইনের কথাই বলিতেছি যাহার দ্বারা সভ্য রাষ্ট্রের ভিত্তিভূত জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার লোপ বা খর্ব্ব হয়। লিখিয়া ছাপিয়া বা মুখের কথা দ্বারা মত চিন্তা ও ভাব

প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা, এবং প্রকাশ্য সভা করিয়া সার্ব্বজনিক বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার সভ্য রাষ্ট্রের মানুষদের থাকে। ভারতবর্ষে এই স্বাধীনতা ও অধিকার লোপ বা হ্রাস করিবার যে যে আইন আছে, তাহা খারাপ আইন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ খারাপ আইনের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের দ্বারা ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার লোককে জেলে পাঠান হইয়াছে। অপপ্রয়োগের নিন্দা আমরা করিতেছি। যে যে আইনের প্রয়োগ দ্বারা এতগুলি লোকের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, সেরূপ আইন জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কখনও বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল না। জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে এরূপ আইন করিবার ক্ষমতা কোন গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত নয়। যে-রকমের গবর্ণমেণ্ট দ্বারা এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় ও হইতে পারে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া অন্যবিধ শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

খারাপ আইনের প্রয়োগে ও অপপ্রয়োগে মানুষের শাস্তি অপেক্ষা বেআইনী অত্যাচার অধিকতর ভীষণ, নিন্দনীয় ও গর্হিত। আইন যতই খারাপ হউক তাহা গুপ্ত নহে, এবং তাহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ যেরূপ হউক, তাহা অপ্রকাশিত থাকে না। তাহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ফলস্বরূপ লোকের যে দুঃখ ও ক্ষতি হয়, তাহার একটা সীমা ও পরিমাণ আছে। কিন্তু বেআইনী অত্যাচারের প্রণালী প্রকার সীমা পরিমাণ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং তাহা অনেক সময় গুপ্ত ও অপ্রকাশিত থাকে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক সরকারী কর্ম্মচারী যে নানা স্থানে নানাপ্রকার লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল প্রদেশের বিস্তর খবরের কাগজে প্রত্যহ এবম্বিধ নানা অত্যাচার-কাহিনী বাহির হইতেছে। রাস্তাঘাটে বাজারে দোকানে প্রকাশ্য জনসভায় লোকেরা অপমান ও প্রহার সহ্য করিতেছে; অনেকের রক্তপাত হইতেছে; গুলিতে কাহারও কাহারও প্রাণ যাইতেছে; গ্রাম ও ঘরবাড়ী কোথাও কোথাও লুট হইয়াছে; জেলে অনেক রাজনৈতিক কয়েদীর সাময়িক অনাহার, অল্পাহার, অখাদ্য আহার, শীতবস্ত্রাভাব, দুর্গন্ধ মলিন কীটাকীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র ও শয্যা ব্যবহার, নগ্নীকৃত দেহে বেত্রাঘাত দণ্ডভোগ, হাতে কড়া ও পায়ে বেড়ি প্রভৃতি শাস্তিভোগ, ইত্যাদি নানা অত্যাচারকাহিনী বহু সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইতেছে। ইহার অধিকাংশের কোন সরকারী প্রতিবাদ ও অনুসন্ধান হইতেছে না। সংবাদগুলিতে আংশিক ভুল ও অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মূলে সত্য আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ অত্যাচার অত্যাচারী সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজে ক্রোধপ্রযুক্ত ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা বশতঃ করিতেছে, না তাহারা উপরওয়ালা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে বা জ্ঞাতসারে করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য। কেবল এইমাত্র বলা যায়, যে, এরূপ অত্যাচার কোন দেশেই তদ্দেশের গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতসারে বা আদেশে হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ, সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই কতকগুলি মানুষের সমষ্টির নাম, এবং এই মানুষগুলি বুদ্ধিভ্রংশ ভ্রম ক্রোধ প্রতিহিংসা আদির অতীত নহে। আয়ার্লণ্ডে এরূপ অত্যাচার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ও জ্ঞাতসারে হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ইংরেজদের কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছে।

—

জনতার দ্বারা অত্যাচার

সরকারী লোকেরা অত্যাচার করে বলিয়া বেসরকারী জনতার বা বেসরকারী ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা অত্যাচার মার্জ্জনীয় বা কম নিন্দনীয় নহে; পক্ষান্তরে বেসরকারী জনতার বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা অত্যাচার হয় বলিয়া সরকারী লোকদের অত্যাচার মার্জ্জনীয় বা কম গর্হিত নহে।

জনতার দ্বারা ভীষণ পৈশাচিক অত্যাচার গত তিন বৎসরের মধ্যে কয়েক জায়গায় হইয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারও বেসরকারী কোন কোন লোক নানাস্থানে করিয়াছে। জনতার দ্বারা ভীষণ পৈশাচিক অত্যাচার কয়েকদিন পূর্ব্বে গোরখপুর জেলার চওরী-চওরা গ্রামে হইয়া গিয়াছে। জনতা তথাকার থানা পুড়াইয়া দিয়াছে এবং বাইশ-জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহার মধ্যে কয়জনকে বধ করিবার পর পুড়াইয়াছে, এবং কয়জনকে পুড়াইয়া মারিয়াছে, তাহা বলা যায় না। থানা লুটও জনতা করিয়াছে।

এইরূপ ব্যবহার পৈশাচিক। সাধারণ জনতা দ্বারা ইহা হইয়া থাকিলে, ইহা পৈশাচিক; কিন্তু ইহা যদি

অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্বে হইয়া থাকে, বা যদি জনতার অধিকাংশ বা কিয়দংশ অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক ছিল, তাহা হইলে ইহা আরও অধিকতর গর্হিত এবং পৈশাচিক। কারণ, মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ অসহযোগী নেতারা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, যে, অসহযোগীদিগকে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাপন্থী হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর ইহা একটা ভান, এংলো-ইণ্ডিয়ান্ কাগজওয়ালারা এইরূপ বলে ও লেখে; আমাদের দেশী লোকদেরও কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা থাকা সম্ভব। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সত্যবাদিতা ও সরলতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তিনি অন্তরের সহিত অহিংসা চান। অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের যে সম্পূর্ণ অহিংসাপন্থী হওয়া উচিত, তাহা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষও একটি প্রতিজ্ঞা (resolution) দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে, সম্পূর্ণ অহিংসাপন্থী না হইলে কেহ স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবে না। সুতরাং অহিংসাব্রত গ্রহণ করিবার পর যে-কেহ গৃহদাহ ও নরহত্যায় লিপ্ত হয়, সে ত অমানুষ বটেই, অধিকন্তু মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ডও বটে।

কখন কখন সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে বা গুপ্তচরদের প্ররোচনাবশতঃ উত্তেজনায় বেসরকারী জনতা অত্যাচারী হয়, ইহা বলিলে দোষস্খালন হয় না। অত্যাচার যে কারণে যেরূপেই ঘটুক, তাহা নিন্দনীয়। অন্যদেশের পন্থা বা নজীর যাহাই হউক, আমরা খুব অত্যাচরিত হইলেও অত্যাচার করিব না, ইহা আমাদের আদর্শ হইলে তবে আমরা স্বরাজ স্থাপন করিতে পারিব।

—

মহাত্মা গান্ধীর দায়িত্ব এবং দেশের কর্ত্তব্য

বেসরকারী সমুদয় অত্যাচারের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে পরোক্ষভাবে দায়ী অনেকে করিতেছে, সাক্ষাৎভাবে দায়ীও কেহ কেহ করিতেছে। এই প্রকারে তাঁহার ঘাড়ে দায়িত্বের ও দোষের বোঝা চাপান খুব সোজা। কিন্তু প্রথম দোষ কে করিয়াছে, প্রথমে কে ঢিল ছুড়িয়াছে, তাহাও নির্ণীত হওয়া উচিত।

আমরা অনেকে এখন ঘরে বসিয়া কখন গবর্ণমেণ্টকে কখন গান্ধী মহাশয়কে, কখন বা উভয়কে দোষ দিতেছি। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া, জীবন তুচ্ছ করিয়াও, গান্ধী গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন, গত মহাযুদ্ধেও গান্ধী গবর্ণমেণ্টের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন (আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে ইহা তাঁহার করা উচিত হয় নাই); তিনি বরাবর অসহযোগী ছিলেন না। এরূপ সহযোগী গান্ধী অসহযোগী কেন হইলেন, তাঁহার সমালোচকদের তাহা জানা উচিত, বিশেষতঃ সেইসব সমালোচকদের জানা উচিত যাহারা কখন তাঁহার মত গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করেন নাই। গান্ধী কেন অসহযোগী হইয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছিলেন, এবং তাহা নানা সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই, যে, সহযোগিতা দ্বারা ইংরেজদের নিকট হইতে স্বরাজ জিনিয়া লওয়া যাইবে না; যুদ্ধে মানুষ যেমন সাহস দেখায় এবং কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করে, অস্ত্রহীন নিরুপদ্রব রক্তপাতহীন সংগ্রামে সেইরূপ সাহস দেখাইয়া এবং কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিয়া আমাদিগকে স্বরাজ জিনিয়া লইতে হইবে।

এ বিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকিতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতসংস্কার আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়া স্বরাজ পাওয়া যাইবে এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যদের ও গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কাজের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই দেখ কতটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বরাজপ্রাপ্তি নহে, কেন না কর্ত্তা ইংরেজই থাকিতেছে। তা ছাড়া ইংরেজ আম্‌লারা ২।৪টা বিষয়ে যে "মিষ্ট যুক্তিমার্গানুসারিতা" (sweet reasonableness) দেখাইতেছে, তাহা অসহযোগ প্রচেষ্টার বিদ্যমানতাবশতঃ কি না, "সংস্কারপন্থী"রা তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক, গান্ধী মহাশয়ের মত আমরাও মনে করি, যে, কেবল "সহযোগিতা" দ্বারা স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না; সম্পূর্ণ হউক, বা কোন কোন বিষয়ে হউক অসহযোগের প্রয়োজন।

অসহযোগ আন্দোলনে দেশে খুব অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা অসহযোগীরাও স্বীকার করিবেন। তবে,

তাঁহারা বলিবেন এই, যে, গবর্ণমেণ্ট দেশমত অনুসারে চলিলে দেশের দাবী গ্রাহ্য করিলে কোন অশান্তি ত হইত না; গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবর্ত্তে, দেশমতে অবজ্ঞা দেখাইয়া নিগ্রহনীতির অনুসরণ করায় অশান্তি হইয়াছে। অসহযোগীদের জবাব না হয় নাই শুনিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রথম ঢিল ছুড়িয়াছিল কে? একজন প্রবীণ ও সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় উদারপন্থী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রথম ঢিল ছুঁড়িয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট এবং সেই ঢিলটি হইতেছে রোলট্ আইন।" দেশের সব রাজনৈতিক দলের মতের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাস্ করিয়া দেশের লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং পরোক্ষভাবে দলন-ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সুতরাং খুব মডারেটরাও আশা করি স্বীকার করিবেন, যে, বর্ত্তমান অশান্তির জন্য গবর্ণমেণ্টেরও কিছু দায়িত্ব ও দোষ আছে।

যেমন কান টানিলে মাথা আসে, তেমনি অসহযোগের সঙ্গে সঙ্গে আসে অবাধ্যতা। "বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট্, ভারতীয় জাতির হিতসাধন ও সম্মানরক্ষার জন্য যাহা দরকার, তাহা করে না, বরং, ইহার দ্বারা ভারতীয় জাতির চূড়ান্ত অপমান হইয়াছে, এবং ইহা জাতীয় মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করায় জাতীয় অধিকার ও আত্মকর্তৃত্ব ইহা অস্বীকার করিয়াছে, অতএব ইহার সহিত সহযোগিতা করা অধর্ম্ম," এইরূপ বিশ্বাস যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তিনি শুধু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, যে, আমি এই গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিব না; তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, এই গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা মানিব না, ইহাকে ট্যাক্স্ দিব না, ইহার কাজ অচল করিব, এবং ইহার স্থানে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিব, যাহা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব কার্য্যতঃ মানিয়া চলে। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা না মানা, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে অচল করা, এবং তাহার স্থানে জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব-স্বীকারকারী শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা, প্রধানতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। এক হইতে পারে, সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা এবং আর এক রকম হইতে পারে নিরস্ত্র নিরুপদ্রব অবাধ্যতা ও প্রতিরোধ দ্বারা। মহাত্মা গান্ধী অহিংসাপন্থী ও আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী। এইজন্য তিনি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, কোন অবস্থাতেই কাহারও কোন গবর্ণমেণ্টের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন, কোন আইন লঙ্ঘন, কোন প্রকার অবাধ্যতা করা উচিত নহে; অথবা কোন গবর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠতর অন্যবিধ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। যাঁহাদের মত এপ্রকার, তাঁহারা যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ বহুদেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে লেখা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের মডারেট দলের নেতারা এই শ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহাদের আন্তরিক মত সম্ভবতঃ তিন রকমের হইতে পারে:—(১) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এত খারাপ নহে যে ইহার আজ্ঞা লঙ্ঘনাদি করিয়া ইহার পরিবর্ত্তে অন্য রকমের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক, কেননা ইহারই ক্রমপরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি দ্বারা জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। (২) ভারতীয় জাতির অবস্থা ও চরিত্র বর্ত্তমানে এরূপ যে ইহার মধ্যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট গঠনের মালমশলা নাই, সুতরাং নূতনবিধ গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলেও তাহা টিকিবে না বা তাহা অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। (৩) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের জায়গায় শ্রেষ্ঠ অন্যবিধ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক বটে, কিন্তু বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায় ও জাতি এমন শক্তিমান্ যে তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার শক্তি ভারতীয় জাতির নাই।

এই তিন প্রকার মতের কোনটিকেই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না, যে, এই তিনটি মতের কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য বা অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। বোধ হয়, ইহা বলিলে কোন দিকেই বেশী বলা হইবে না, যে, এই মতগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। তাহা হইলে ইহার বিপরীত মত সত্য হইতেও পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের জায়গায় অন্য রকম গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের ইচ্ছা ও চেষ্টা একান্ত ভ্রমপ্রসূত ও অনাবশ্যক না হইতেও পারে। অন্য রকম গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের মত শক্তি ভারতীয় জাতির আছে, এবং এই জাতির মধ্যে এরূপ গবর্ণমেণ্ট গঠনের উপযোগী

উপাদান আছে, এরূপ বিশ্বাসও নিতান্ত ভ্রান্ত না হইতে পারে। উল্লিখিতরূপ ইচ্ছা, চেষ্টা ও বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধীর থাকায় তিনি অতি কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ বা প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না ও নহেন। কেহ তাঁহার কথা শুনিতে আইনতঃ বা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহে। লোকে তাঁহার কথা শুনে তাঁহার যুক্তি শুনিয়া এবং জীবন দেখিয়া। তিনি বলপ্রয়োগ দ্বারা কাহাকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করেন না। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টপক্ষভুক্ত লোকেরা বলেন, গান্ধীর দলের লোকদের উৎপীড়নে ও ভয়ে লোকে তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য হয়। তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা চাহিতে অধিকারী, যে, গান্ধী কি প্রকারে এত সংখ্যাবহুল ও শক্তিমান্ দলের নেতা হইলেন যাহার ভয়ে গবর্ণমেণ্টের ভয় অনুগ্রহ ও প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া লোকে ঐদলের কথা শুনিতে বাধ্য হয়? গান্ধী লোককে ধন মান পদ কিছু দেন না, দিতে পারেন না; তিনি লোককে গরীব হইতে বলেন ও এমন কাজ করিতে বলেন যাহাতে লাঞ্ছনা, প্রহার, কারাদণ্ড, সর্ব্বস্বান্ত ও মৃত্যু ঘটিতে পারে।

মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে, যে, গান্ধী নিজে যাহা বিশ্বাস করেন, অন্যকেও তাহা বিশ্বাস করিতে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে বলেন। তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে গেলে যে দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত, ইহা লোকে জানে ও দেখিয়াছে; ইহা তাঁহার অসামান্য প্রভাবের অন্যতম কারণ।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে, কেহ যদি কাহারো উপর বল প্রয়োগ না করিয়া, কেবল নিজে দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়া নিজের মত ও বিশ্বাস প্রচার করেন, তাহা হইলে তাহা করিবার অধিকার তাঁহার আছে। গান্ধী এই প্রকারের মানুষ, সুতরাং তাঁহার এই অধিকার আছে। এখানে আপত্তি এই উঠিবে, যে, "গান্ধীর মত শান্ত ও সংযত মানুষ ত জনসাধারণ নহে; সুতরাং তাঁহার মতানুযায়ী কাজ শান্ত ও সংযত ভাবে করিতে না পারিয়া তাহারা উত্তেজনাবশে ভীষণ অত্যাচার করিতেছে। অনেকের অভিপ্রায়ই নহে তাঁহার মত অনুসারে কাজ করা, তাহারা গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক, কেবল লুট-তরাজের জন্য অবাধ্যতা-প্রচেষ্টার দল পুরু করিতেছে। গান্ধী জানেন, যে, দেশে এই দুরকম লোক আছে। অতএব এহেন দেশে তাঁহার মত ও বিশ্বাস প্রচার করা ও লোককে তদনুযায়ী কাজ করিতে বলা তাঁহার উচিত হয় নাই।"

ইহার উত্তরে কিছু বক্তব্য আছে।

যাহা কিছু অন্যায় গর্হিত অবৈধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা মানুষের কর্ত্তব্য। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মিক বিষয়—সব ক্ষেত্রেই প্রতিকারের প্রয়োজন হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকার-চেষ্টা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য, অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা নয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। এইরূপ প্রতিকার-চেষ্টা বুদ্ধ, ঈশা, মোহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, প্রভৃতি জগতের ধর্ম্মগুরুরা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের লোকদের বা তথাকথিত দলের লোকদের কাহারও কাহারও দ্বারা পৃথিবীতে অত্যাচার অনাচার পৈশাচিক ব্যবহার সংঘটিত হইয়াছে; তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস প্রচারিত হওয়ায় জগতের উপকারও হইয়াছে। অত্যাচার অনাচার আদি হইয়াছে বলিয়া কেহ এমন বলে না যে বুদ্ধ ঈশা শঙ্কর প্রভৃতি তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহারা যেমন কাহাকেও গর্হিত কাজ করিতে বলেন নাই, গান্ধীও তদ্রূপ কাহাকেও গর্হিত কাজ করিতে বলেন না, বরং বার বার নিষেধ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং গান্ধীর মত প্রচারের বিরুদ্ধে কেন আপত্তি হইতেছে?

অনেকে ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের তুলনা অসঙ্গত মনে করিবেন। তজ্জন্য, যদিও গান্ধীর মত ও প্রচেষ্টা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্কার বিষয়ক নহে, তথাপি আমরা রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রচেষ্টার অতীত ও আধুনিক দৃষ্টান্ত সকলই ধরিব। অনেক জাতি স্বাধীন হইতে গিয়া রক্তপাত ও নানা অত্যাচার করিয়াছে; অনেক অত্যাচার নেতাদের আদেশের বিরুদ্ধে ও অজ্ঞাতসারেও হইয়াছে। কিন্তু এইসব হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকে ঐতিহাসিকেরা অন্যায় বলেন নাই। আমাদের যুক্তি এ নয়, যে, যেহেতু অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার সঙ্গে রক্তপাত ও অত্যাচার জড়িত ছিল, অতএব আমাদের দেশে তদ্রূপ কিছু ঘটা দোষের

বিষয় নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়, আমরা একদিকে যেমন স্বাধীনতার চেষ্টা করিব অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি রক্তপাত অত্যাচারাদি পরিহার করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিব; এবং রক্তপাত ও অত্যাচারাদি হইবার সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে সে চেষ্টা আরম্ভ করিব না। দেখিতে হইবে, যে, গান্ধী রক্তপাত ও অত্যাচার পরিহার ও নিবারণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন কি না, এবং যাঁহারা নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিতে চান, শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ তাঁহাদিগকে কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছেন কি না। আমাদের বিশ্বাস এই দু'রকম কাজই তিনি করিয়াছেন। কোন স্থানের অধিবাসীরা নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহাদিগকে তৎপূর্ব্বেই যে যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে ও যে যে সর্ত্ত পালন করিতে হইবে, তাহা কঠিন; বঙ্গের কোন স্থানে সেরূপ কৃতিত্ব দেখা যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশের দু একটি স্থান হয় ত এই কঠিন পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। সমষ্টিগত নিরুপদ্রব অবাধ্যতা (mass civil disobedience) করিতে এইজন্য গান্ধী লোকদিগকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছেন। তাঁহার নিজের পরিচালনা ও নেতৃত্ব ব্যতীত ট্যাক্স না দেওয়া রূপ অবাধ্যতা যাহাতে কোথাও করা না হয়, তজ্জন্যও অনেক অনুরোধ করিয়াছেন।

তাঁহার উপদেশ অনুসারে, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছুক লোকদিগকে যে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করান, তাহাও কঠিন প্রতিজ্ঞা।

এসকল সত্ত্বেও যদি অনুপযুক্ত লোকদের দ্বারা অবাধ্যতা হয়, তাহা হইলে গান্ধীর দায়িত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং গবর্ণমেণ্টের দলভুক্ত লোকরা স্বীকার করিবেন যে, নরহত্যা, প্রহার, অন্যবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন, এবং লুণ্ঠন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নানা আইন, নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, সরকারী কোন কোন লোকদের দ্বারা নরহত্যা প্রহার লুণ্ঠন প্রভৃতি সময় সময় হইয়া আসিতেছে, ইহা প্রমাণিত তথ্য। কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কি নিজের বৈধ কাজ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন, না আইনাদি ভস্মীভূত করিয়াছেন? তাহা করেন নাই। তাহা হইলে দলের কোন কোন লোক বা অন্য লোক গর্হিত কাজ করে বলিয়া, গান্ধীকে নিজের বৈধ কাজ হইতে কেন ক্ষান্ত হইতে বলা হয়? আমরা তাঁহার কাজকে ধর্ম্ম অনুসারে অবৈধ মনে করি না। আইন অনুসারেও উহা বৈধ; কারণ উহা অবৈধ হইলে গবর্ণমেণ্ট এতদিনে নিশ্চয়ই উহা বন্ধ করিয়া দিতেন। কেহ কেহ অবশ্য বলিতে পারেন, যে, উহা আইন অনুসারে অবৈধ হইলেও গবর্ণমেণ্ট গূঢ় রাষ্ট্রনীতি অনুসারে তাঁহার কাজে, অর্থাৎ তাঁহার মত ও বিশ্বাসের প্রচারে, বাধা দেন নাই। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ, যে, গবর্ণমেণ্ট, যে-কোন কারণেই হউক, গান্ধীকে এমন একটা অবৈধ কাজ করিতে দিয়া আসিয়াছেন যাহার ফলে দেশে নানা অত্যাচার হইয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে শুধু গান্ধীকেই দোষ দেওয়া হয় কেন? গবর্ণমেণ্টকেও ত দোষ দেওয়া উচিত। আমরা কাহাকেও দোষ দিবার জন্য উৎসুক নহি। আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়াও যে প্রকাশ্য কাজে বাধা দেন না, তাহা গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে বৈধ।

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে দেশে বর্ত্তমান সময়ে অশান্তি, উপদ্রব, অত্যাচার সংঘটিত হওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী কি পরিমাণে দায়ী, তাহা স্থির করিবার পক্ষে সাহায্য হইবে। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, গান্ধী মহাশয়কে যদি খুব দোষী বলিয়াও মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, একমাত্র তাঁহার প্রভাবে দেশে এত অশান্তি ও উপদ্রব হইতে পারিত না, যদি অন্যান্য যথেষ্ট কারণ না থাকিত। কৃষকেরা দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত। যথেষ্ট অন্ন ও বস্ত্র তাহাদের অধিকাংশের নাই। তাহাদের বাস-গৃহ অস্বাস্থ্যকর, সংকীর্ণ ও জীর্ণ। তাহারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। রোগে তাহাদের চিকিৎসা হয় না। তাহাদের অধিকাংশ সম্বন্ধে এই কথা সত্য। কারখানার ও রাস্তা ঘাটের শ্রমীরা তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে আগে খুব সামান্য পারিশ্রমিক পাইত; এখনও যথেষ্ট পায় না। জ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর

গৃহ, রোগে চিকিৎসা, প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের অবস্থা কৃষকদের চেয়ে ভাল নয়। অধিকন্তু, তাহারা নিজ গ্রাম্য-সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মস্থান হইতে দূরে বাস করে বলিয়া তাহাদের চরিত্রের উপর এমন কোন প্রভাব থাকে না যাহা তাহাদিগকে দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই সব কারণে এবং আবগারী-বিভাগের কৃপা-ব্যবস্থিত সুরা-সুলভতায় তাহারা সহজেই পানাসক্ত ও পাশব-ভাবাপন্ন হয়।

ইহা ব্যতীত, কৃষকদের উপর ভূস্বামীর (অর্থাৎ খাস-মহল-সকলে রাজস্ব-সংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারীদের, এবং অন্যত্র জমীদারদের) উৎপীড়ন, অবমাননা এবং অন্যায় আদায় আছে। কৃষক, গাড়োয়ান, কুলী-মজুর, অনেককে অধস্তন পুলিসের অপমান ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। অশান্তি ও উপদ্রবের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে এই-সব কথা ভুলিলে চলিবে না।

সর্ব্বশেষে একটি প্রধান কারণের উল্লেখ করিতে হইতেছে। গত মহাযুদ্ধে যে সব দেশ ও জাতি এক বা অন্য পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এবং অন্যত্রও, এক মহা সামাজিক আলোড়ন এবং বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বুঝিয়াছে, তাহারা কেউ-কেটা নয়। যুদ্ধে জয়ের জন্য তাহাদের সাহায্য যে কি পরিমাণে আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, রক্ত দিয়াছে, কিম্বা কোন না কোন অঙ্গ দিয়াছে অধিকতম সংখ্যায় তাহারা; যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রমীর কাজ করিয়াছে কেবল-মাত্র তাহারা; এবং যুদ্ধের জন্য আবশ্যক অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-গুলি, বারুদ, জাহাজ, অর্ণবযান এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ-সম্ভার (munitions) প্রস্তুত করিয়াছে অধিকতম সংখ্যায় তাহারা। এই প্রকারে তাহারা নিজেদের গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহার উপর রুশিয়ার বিপ্লবে যে শ্রমীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছে, সে খবরটা আমাদের মত অজ্ঞ নিরক্ষর দেশের নিরক্ষর শ্রেণীর লোকদের কাছেও পৌছিয়াছে। সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে আর-একপ্রকারের সামাজিক আলোড়ন ও উলট্‌পালটের সূত্রপাতও হইয়াছে। যুদ্ধজয়ের গৌরব এবং লাভ প্রধানতঃ শ্বেতজাতিরা ও জাপান পাইলেও আফ্রিকার ও আমেরিকার কৃষ্ণকায়েরা এবং ভারতের অশ্বেত লোকেরা ইহা বুঝিয়াছে যে তাহাদেরও সাহায্য ব্যতিরেকে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইত না।

এই-সব কারণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এবং অশ্বেত পরাধীন দেশ ও জাতির সকল লোকদের মধ্যে মনুষ্যোচিত অধিকতর মর্য্যাদা গৌরব ধন সুখ সুবিধা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অথচ সব দেশেই প্রভুত্বশক্তিবিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ও ধনীরা অন্য-সকলকে এখনও তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নহে, যাহারা নীচে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি এখনও সতেজ রহিয়াছে। শ্বেতেরা অশ্বেত জাতি-সকলকে এখনও ছলে বলে কৌশলে দাবাইয়া রাখিতে ব্যগ্র।

সুতরাং অসন্তোষ ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এমন অবস্থায় গান্ধীর মত সাহসী শক্তিশালী সাধু পুরুষ যখন নিরক্ষর দরিদ্র মানুষদেরও মনুষ্যত্বে, চরিত্রে, লক্ষ্যস্থানে পৌছিবার শক্তির অস্তিত্বে, বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে সুপ্ত মনুষ্যত্ব যে জাগিয়া উঠিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু শক্তি ও শক্তিবোধ জাগাই যথেষ্ট নহে; সংযম, দায়িত্ববোধ, এবং সাফল্য-লাভের জন্য শক্তি-প্রয়োগ-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হওয়াও আবশ্যক। ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ও যথাসময়ে না জন্মায় অনেক অমঙ্গল হইয়াছে।

গান্ধী মহাশয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে দেশের অর্থাৎ দেশবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাই।

গান্ধী নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেছেন। তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসঙ্গতি দোষ এবং বিবেচনার ত্রুটিও হইয়া থাকিবে; কিন্তু তিনি সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়া কাজ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত অনুচরেরাও সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়া কাজ করিতেছেন। গান্ধীর উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যদি অনেক লোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য কেবলমাত্র তাঁহাকে

করা চলে না; গুণ্ডা বদ্‌মায়েস অর্থগৃধ্নু লোকেরা যদি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার জন্য কি তিনি দায়ী? বত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিশাল দেশের সর্ব্বলোকের নাড়ী-নক্ষত্র জানা কি একজন লোকের পক্ষে সম্ভব? তিনি নিজের সাধু উদ্দেশ্য ও একপ্রাণতার দ্বারা চালিত হইয়া যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের চরিত্র ও সাধু অভিপ্রায় সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আরামে চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সমালোচনা করিলেই কি আমাদের কর্ত্তব্য করা হইয়া যাইবে? তিনি দেশবাসী সকলকে যতটা নির্ম্মল স্বদেশপ্রেমিক সাধুচরিত্র ও সংযত মনে করেন, ততটা ভাল হইবার এবং সকলকে সেইরূপ ভাল করিবার জন্য আমাদের কি কোন চেষ্টা করিবার নাই? সেরূপ চেষ্টা কি আমরা করিয়াছি ও করিতেছি?

গান্ধী যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা করিতেছেন। অপবাদ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, গৃহবিচ্ছেদ, সর্ব্বনাশ, প্রাণনাশ, অনুচরদের বিরাগ-বিদ্রোহ, কিছুতেই তিনি বিচলিত ভীত হন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে ভ্রান্ত মনে করেন, কিম্বা কপট ভানকারী অভিনেতা মনে করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রচেষ্টাকে বলহীন ও ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে অধিকারী। কিন্তু এই চেষ্টা কাহাদের দ্বারা এবং কি আকারে হইতেছে?

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে ইহাই দেখা যাইতেছে, যে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয় চরিত্র জীবন হৃদয় সমবেদনা দেখিয়া। বুদ্ধ, যীশু, মোহাম্মদ, শঙ্কর, আসিসির সেন্ট্ ফ্রান্সিস্, নানক, কবীর, চৈতন্য, প্রভৃতি অপেক্ষা ধনী মানী প্রভুত্ববান্ পণ্ডিত তাঁহাদের সমসাময়িকদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের উপর রাজত্ব এইসব লোকদের অধিগত হয় নাই; হইয়াছিল সর্ব্বত্যাগী, দারিদ্র্যব্রতী, গরীব দুঃখী পাপীর ব্যথার ব্যথী সাধুদের। যাঁহারা গান্ধীর দৃষ্ট আলোককে আলেয়া বা কল্পনা মনে করেন, তাঁহারা চোস্ত্ ইংরেজী লিখিয়া ও বলিয়া, ভাল পোষাক উচ্চপদ মোটরগাড়ী প্রাসাদ রাজানুগ্রহ পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রভৃতির বলে দেশের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিবেন না, যদি তাঁহারা ত্যাগী না হন, গরীব দুঃখী পাপীর ব্যথার ব্যথী না হন, যদি তাঁহারা সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ না করেন।

দেশী মন্ত্রীরা বার্ষিক চৌষট্টি হাজারের এক পয়সা কম, স্ব-ইচ্ছায় বা লোকমতের খাতিরে, লইতে রাজী নন্। তাঁহারা গান্ধীর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবেন? যে-সব উদারনৈতিক অর্থাৎ মডারেট্ নেতা রাজপদ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদেরও জীবনে সাধু চরিত্রের, গরীবের প্রতি সমবেদনা ও রাজঅবিলাসিতার, এবং রাজভয়কে অগ্রাহ্য করিবার প্রমাণ না থাকিলে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে না। চাঁদপুরে কুলিদের জন্য মডারেট্ নেতাদের মধ্যে যিনি যিনি প্রাণ দিয়া খাটিয়াছেন, টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রশংসা করিয়াছি ও করি; তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু ভগবানের দাবী সবটার উপর। নিজের জন্য একটু কিছুও কেহ রাখিলে, তাঁহার জীবন ও চেষ্টা সেই পরিমাণে বিফল হইবে। গান্ধীরও হৃদয়ের কোণে যদি নিজের জন্য একটুমাত্র জায়গা থাকে, তাহা হইলে তিনিও অব্যাহতি পাইবেন না।

সরকার ও ঘটকদের মত যাহারা খবরের কাগজের পাতায় গান্ধীর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা গরীব দুঃখী অত্যাচরিত অস্পৃশ্য অজ্ঞ অপমানিতদের জন্য গান্ধীর সমবেদনার কিয়দংশেরও অধিকারী কি না, আত্মপরীক্ষা দ্বারা স্থির করুন। তাঁহারা দেশের দারিদ্র্য অজ্ঞতা অসুস্থতা, অবনত অত্যাচরিত অবস্থা ও পরাধীনতার প্রতিকারের নিমিত্ত সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ চেষ্টা করুন, শুধু গান্ধীকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিলেই হইবে না। তাহাতে দেশে কেবল অন্তর্বিবাদ বাড়িবে, এবং সরকার ও ঘটক প্রমুখ ব্যক্তিদের ইংরেজদের বাহ্য অনুগ্রহ ও আন্তরিক অবজ্ঞা লাভ ঘটিবে।

প্রকৃত কথা এই, যে, এখন যদি কেহ দেশের প্রকৃত হিত করিতে চান, তাহা হইলে শুধু নির্দ্দোষচরিত্র, হিতসাধক, ও দাতা হইলেই চলিবে না; গান্ধী যে সাহস একপ্রাণতা একনিষ্ঠতা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সেই আদর্শের মাপকাঠিতে হীন হইলে চলিবে না। যাহা খাঁটি তাহাকে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা মানবজাতির শক্তিও চূর্ণ করিতে পারিবে না; যাহা পুরা খাঁটি নয় তাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি বা সমুদয় মানবের বল খাঁটির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না।

কংগ্রেসের দাবী

অনেকে কংগ্রেসের দাবী বা গান্ধীর দাবীকে অত্যন্ত বেশী মনে করিতেছেন, কেহ কেহ বা ইহাকে আস্পর্দ্ধার আতিশয্য প্রসূত মনে করিতেছেন।

গান্ধীর কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম বলিয়া এই কথাটারও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম দাবী, এশিয়া মাইনর ও থ্রেস্ প্রভৃতি দেশ ফিরাইয়া দিয়া তুরস্কের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, সুলতানকে খলিফার সম্মান-ও ক্ষমতায় বাস্তবিক প্রতিষ্ঠিত করণ, মুসলমান তীর্থস্থানসকল হইতে অমুসলমান শক্তিমাত্রের সরিয়া দাঁড়ান এবং তথায় মুসলমান প্রভাবকে অব্যাহত করা, ইত্যাদি। এত দিন ইংরেজ এবং "জয়কেতে" ইংরেজ-পক্ষাবলম্বী ভারতীয়েরা বলিতেছিল, ইহা করা ব্রিটিশজাতির একলার ক্ষমতাবহির্ভূত ও অসাধ্য, অসম্ভব, ইত্যাদি। তাহার পর আসিল মুস্তাফা কমাল পাশার জয়শ্রীমণ্ডিত অভিযান সকল। তখন, আস্তে আস্তে 'অসম্ভ'-বাদ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তুরস্ককে কিছু ফিরাইয়া দিতে হইবে, ইত্যাকার কথা শোনা যাইতে লাগিল। তখন লর্ড নর্থক্লিফ্, আঠার লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত বত্রিশ কোটি লোকের অধ্যুষিত আমাদের এই দেশের নাড়ীনক্ষত্র ও মনের ভাব দশদিনে জানিবার জন্য আসিলেন। তিনি বলিলেন, মুসলমানকে খুশি করা চাই। কেমন করিয়া খুশি করিতে হইবে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, কংগ্রেস বা গান্ধী যাহা চাহিয়াছেন, ঠিক্ তাহাই দিয়া। জিজ্ঞাসা করি, অসম্ভবটা এখন হঠাৎ সম্ভব বোধ হইতেছে কেমন করিয়া? যাহা একা ব্রিটিশ শক্তির অসাধ্য ছিল, তাহা একজন ব্রিটিশ চাঁইয়ের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল কেমন করিয়া? ইংরেজরা তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসকে সাহায্য করিতেছিল। তথাপি মুস্তাফা কমাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কদের জয় হওয়ায়, এবং মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ ব্রিটেন ও গ্রীস বেশী লাভবান্ হওয়ায় ফ্রান্স ও ইটালীর মন ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ও ঈর্ষা জন্মায় ইংরেজ বুঝিয়াছে, যে, তুর্কসাম্রাজ্য, তুর্কশক্তি, ও তুর্কপ্রভাব কিয়ৎপরিমাণে যুদ্ধের আগেকার সময়ের মত হইবেই। সুতরাং এখন বাধ্য হইয়া সাধু, ন্যায়বান্ ও মুসলমানের মনোরঞ্জক সাজিতে হইবে।

তাহার মধ্যে অবশ্য কূটনীতির চা'লও আছে। লর্ড নর্থক্লিফের কথায় এবং প্রধান প্রধান ব্রিটিশ খবরের কাগজের কথায় কেবল তুরস্ক সম্বন্ধে কিছু করিয়া মুসলমানকে খুশি করার চেষ্টাই আছে, পঞ্জাবে অত্যাচার ও ভারতীয় জাতির অপমানের কর্ত্তাদের শাস্তি দেওয়া কিম্বা ভারতের স্বরাজ লাভের কোন উল্লেখ নাই। ইহার কারণ দুটি; (১) শক্তের উপর ভক্তি, (২) হিন্দু-মুসলমানের বর্দ্ধমান ঐক্যে বাধা জন্মান। মুসলমান জাতিসকলের মধ্যে এখনও যে শক্তি লোপ পায় নাই, মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ গালিপলিতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া এবং এশিয়া মাইনরের কুট্ শহরে সেনাপতি টাউনসেণ্ডের আত্মসমর্পণে তাহার প্রথম পরিচয় পায়; মুস্তফা কমাল পাশার জিতে তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ পাইয়াছে। অতএব শক্তের ভক্ত ইংরেজের পন্থা নির্ব্বাচনে বিলম্ব হয় নাই। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হইলে ইংরেজ প্রভুত্বের লোপ এবং ভারতীয় জাতির আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য, ইহা ইংরেজ জানে; ইহাও জানে যে, অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বৈতনিক ও অবৈতনিক চাকরীর ঈর্ষ্যা, মোপ্‌লা-বিদ্রোহ, জাতিভেদ আচারভেদ, প্রভৃতি সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে; ইহাও জানে যে, মহাত্মা গান্ধী ও অনুবর্ত্তী কংগ্রেস মুসলমানদের অসন্তোষের তুরস্কসম্পৃক্ত কারণটিকে পূর্ণমাত্রায় অমুসলমান-দেরও অসন্তোষের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কূটনীতিবিশারদ চালিয়াতেরা এখন কেবলমাত্র মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ দূর করিয়া তাহাদিগকে ভারতীয় জাতীয় প্রচেষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। ইহাতে দিল্লীর হাকিম আজ্‌মল খানের মত প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক মুসলমান নেতা ও তাঁহাদের সহকর্ম্মীরা ভুলেন নাই।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দাবী, পঞ্জাবে অত্যাচার ও জাতীয় অপমানের কর্ত্তা মাইকেল্ ওডোয়াইয়ার, ডায়ার, প্রভৃতির পেন্সান বন্ধ করা। তাহারা আমাদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার করিল, আমাদের জাতিভাইবোনদিগের চূড়ান্ত অপমান করিল, অথচ আমাদেরই টাকায় পেন্সান পাইতে থাকিবে, এবং তাহাতে পুষ্ট হইয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে এবং খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে

থাকিবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহার প্রতিকার হওয়া চাই। আইনের মারপ্যাঁচের জন্য তাহাদের পেন্‌শ্যন বন্ধ করা যায় না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। বিনা দোষে বিনা বিচারে ভারতীয় দেশী কর্ম্মচারীর পেন্স্যান্ বন্ধ হওয়ার নজীর আছে। যদি সত্য সত্যই আইনের বাধা থাকে, তাহা হইলে এইসব "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-রক্ষক"দের পেন্স্যান্ ব্রিটিশ্ রাজকোষ হইতে দেওয়া হউক। আমরা গুলি লাথি খাইব, নাকে খত দিব, আমাদের মা-ভগিনীরা অপমানিত হইবে, অথচ অত্যাচারী ও অপমানকারীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থ টাকা দিতেও আমরা রাজী থাকিব, ইহা হইতে পারে না।

কংগ্রেসের তৃতীয় দাবী, কানাডা প্রভৃতির মত পূর্ণ স্বরাজ। ইহাতে সম্মত হওয়া ব্রিটিশজাতি ও পার্লেমেণ্টের পক্ষে কেন অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের স্বরাজ প্রাপ্তিতে তাহাদের অসম্মতির দুটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথম কারণ, আমাদের অযোগ্যতা; দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজদের অপ্রবৃত্তি। স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য কে এবং অযোগ্যই বা কে, তাহার বিচার আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রবাসীতে অনেক বার করিয়াছি। জগতে যত স্বাধীন জাতি আছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ দেশের কাজ চালাইতে আমাদের চেয়ে অধিকতর সমর্থ ও দক্ষ, ইহা সত্য নহে। কোন জাতিই নিজের দেশের সব কাজ নিখুঁতভাবে চালাইতেছে না, চালাইতে পারে না। স্বাধীনতার যোগ্যতার একটা নির্দ্দিষ্ট পরখ আছে, যাহাতে বিস্তর স্বাধীন জাতিও উত্তীর্ণ হইবে না। সে পরখ হইতেছে, স্বাধীনজাতিটি বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ কিনা। গত মাসে আমরা স্বাধীন দেশসকলের যে তালিকা দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ছোট ছোট অখ্যাতনামা দেশসকলের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিখ্যাত দেশসকলের কথাই বলি। ফ্রান্স্ তাহার মিত্রদের সাহায্যে দেশ রক্ষা করিয়াছে, নতুবা পারিত না; বেল্‌জিয়ম্‌ও তাহাই করিয়াছে; ব্রিটেনও তাহাই করিয়াছে; কেন না, সবাই জানে আমেরিকা আসরে না নামিলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম্, সব জাতিই জার্ম্মেনীর দ্বারা পরাজিত হইত। অতএব ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সময়ে অন্যের সাহায্য ব্যতীত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম বলিয়া তাহার স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়, এরূপ কথা অসার ও মূল্যহীন। পৃথিবীর আরো গণ্ডা গণ্ডা দেশের নাম করা যায়, যাহারা এরূপ অক্ষমতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। ভারতের ধনে ধনী হইবার লোভই ব্রিটিশ জাতিকে ভারতবর্ষকে অধীন রাখিবার সপক্ষে নানা যুক্তি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত করে। সেইজন্যই ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভে ইংরেজের সম্মত হইতে এরূপ প্রবল অপ্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু আমরা যদি ঐক্যের সহিত যথেষ্ট অধ্যবসায় দৃঢ়তা ও সাহস দেখাইতে পারি, তাহা হইলে ইংরেজের এই অপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে শেষে লোপ পাইবে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধিস্থাপনার্থ দীর্ঘকালব্যাপী কথাবার্ত্তার মধ্যে ইংলণ্ড বহুবার বলিয়াছেন, আমরা এর বেশী স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব আয়ার্ল্যাণ্ডকে দিতে পারি না; কিন্তু আইরিশদের দৃঢ়তা, সাহস, এবং নিজের দাবীর ন্যায্যতাতে বিশ্বাস বশতঃ ইংলণ্ডকে ক্রমেই বেশী দিতে সম্মত হইতে হইয়াছে। শেষে যে যে সর্ত্তে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতেও আইরিশদের দৃঢ়তম নেতা ও দল সম্মত হয় নাই, এবং ইংরেজ-পক্ষের বিশেষজ্ঞ একজন ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন, যে, দু তিন বৎসরের মধ্যেই আয়ার্ল্যাণ্ডে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবে। আয়ার্ল্যাণ্ড ছোট দেশ এবং উহার লোক সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র। উহার আয়তন ৩২৫৮৬ বর্গ মাইল, এবং লোকসংখ্যা ৪৩৯০২১৯, অর্থাৎ আধ কোটিও নহে। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮০২৬২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় বত্রিশ কোটি। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড ছোট দেশ এবং আইরিশরা সংখ্যায় কম হইলে কি হয়, মানুষগুলা খুব ঐক্যসম্পন্ন, জেদী, সাহসী, দৃঢ়, এবং নিজেদের দাবীর ন্যায্যতায় পূর্ণ-বিশ্বাসী। তাহাদের একতা, জেদ, সাহস, দৃঢ়তা, এবং নিজেদের দাবীর ন্যায্যতায় বিশ্বাসের অর্দ্ধেকও যদি আমাদের হয়, তাহা হইলে কাহার সাধ্য আমাদিগকে দাবাইয়া রাখে? এই অর্দ্ধেক আমাদের অবশ্যই হইবে, তদপেক্ষা বেশী হইবে।

—

আব্‌দুল্ বাহা আব্বাস

গত ২৮শে নবেম্বর বাহাই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরু ও নেতা আব্দুল বাহা আব্বাসের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এই



আব্দুল বাহা আব্বাস।

সম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরু। এই ধর্ম্মে ইহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদের ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। পারস্য দেশের শিরাজ নগরে একজন পশমবিক্রেতার পুত্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গোঁড়া মুসলমান ধর্ম্ম সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বিশ্বজনীন শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি "বাব্" নামে অভিহিত। এইজন্য এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্য নাম "বাবী"। ছয় বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর বাব্ তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নিহত হন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা উৎপীড়িত হইতে থাকেন। তাহার পর নুর-নিবাসী মির্জা হোসেন আলি তাঁহাদের ধর্ম্মনেতা হন। তিনি বাহা উল্লা, অর্থাৎ "ঈশ্বরের মহিমা", নামে পরিচিত হন। তিনি স্বদেশ হইতে চল্লিশবৎসরব্যাপী নির্ব্বাসন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। আব্দুল বাহা আব্বাস তাঁহার পুত্র। পৃথিবীর নানাদেশে তাঁহার বহু লক্ষ শিষ্য আছে। তাঁহারা সকলেই পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্থাপনের প্রয়াসী।

—

মালবীয়ের আহূত মন্ত্রণাসভা

জগতের ঘটনাস্রোত, কোনও দেশ বা প্রদেশের ঘটনার স্রোত, কাহারো জন্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে না। একই বিষয়ে নিয়ত ঘটনার পর ঘটনা ঘটিতেছে, নানা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। দৈনিক খবরের কাগজে, দিন বা রাত্রির একটা নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা মুদ্রিত হয়, এবং খুব উদ্যোগী ও তৎপর সম্পাদকেরা সংবাদ খুব গুরু হইলে তাহার উপর মন্তব্যও সঙ্গে সঙ্গে ছাপেন। যে দৈনিক কাগজ যত টাট্‌কা খবর দিতে ও তাহার সঙ্গে তাহার উপর মন্তব্য ছাপিতে পারে, তাহার কৃতিত্ব তত বেশী। এইজন্য ইউরোপে ও আমেরিকায় কখন কখন কোন কোন দৈনিক দিনের মধ্যে চারি পাঁচটা সংস্করণ বাহির করে। দৈনিক কাগজের সুবিধা এই, যে, তাহাতে আজ কোন বিষয়ে যাহা বাহির হইল, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে ও নূতন ঘটনা ঘটিলে কাল তাহা মন্তব্য সহ প্রকাশিত হইতে পারে। মাসিক কাগজে এরূপ হইবার যো নাই। আজ ২৮শে মাঘ যাহা লিখিতেছি, তাহা পরশু ১লা ফাল্গুনের আগে কোন পাঠকের হাতে পৌঁছিবে না; অধিকাংশ পাঠকের হাতে পৌঁছিবে ২রা ৩রা ফাল্গুন। ঐ তারিখ নাগাদ অবস্থা বহু পরিবর্ত্তন হইতে পারে, নূতন ঘটনা ঘটিতে পারে। এবম্বিধ কারণে আমাদের পক্ষে অনেক বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা কঠিন এবং কখন কখন অনুচিত। প্রধানতঃ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের উদ্যোগে, গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বুঝাপড়া ও মিটমাট করিবার জন্য গত জানুয়ারী মাসে যে মন্ত্রণাসভা হয়, তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেই মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইয়া যাইবার পর আরও এমন অনেক-কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে মন্ত্রণাসভার আসল কাজের আলোচনা এখন অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রণাসভার নিযুক্ত কমীটি তাঁহাদের নির্দ্ধারণগুলি বড়লাটকে জানান্। বড়লাট, ঐ নির্দ্ধারণ অনুসারে সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সভা আহ্বান করিতে অসম্মত হন। কমীটি তাঁহাকে পুনর্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত আবার অনুরোধ করেন। এইসব চিঠি লেখালেখির বিষয় কমীটি গান্ধী-মহাশয়কেও যথাসময়ে জানাইয়া আসিতেছিলেন। কমীটি তাঁহাকে এই অনুরোধ করেন, যে, বড়লাটের নিকট হইতে তাঁহাদের শেষ চিঠির জবাব না-আসা পর্য্যন্ত তিনি যেন অপেক্ষা করেন এবং গুজরাটের বর্দ্দোলিতে তাঁহার সংকল্পিত নিরুপদ্রব অবাধ্যতা আরম্ভ না করেন। গান্ধী মহাশয় তাহা আরম্ভ করেন নাই বটে, কিন্তু কমীটিকর্ত্তৃক বড়লাটকে প্রেরিত শেষ অনুরোধের শেষ জবাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি স্বয়ং বড়লাটকে একটি চিঠি লিখিয়া তাঁহাকে জানান, যে, গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কাজ না করিলে তিনি বর্দ্দোলিতে তাঁহার সঙ্কল্পিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ও অবাধ্যতা আরম্ভ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর এই চিঠিটি সম্বন্ধে আমাদের মত এই, যে, তিনি কমীটির অনুরোধ অনুসারে আর নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া তৎপরে প্রয়োজন থাকিলে উহা লিখিলে ভাল হইত। তাহা না-করায় তাঁহার বিরুদ্ধে যে অতিব্যস্ততার দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। চিঠিটি লিখিবার ও পাঠাইবার সময় সম্বন্ধে আমাদের এই মন্তব্য। কিন্তু চিঠিটিতে আমরা কোন আপত্তির কারণ দেখিতেছি না। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারা এই চিঠি লেখার জন্য গান্ধীকে ধৃষ্ট, বেয়াদব, ইত্যাদি বলিতেছে। আমরা তাহা মনে করি না। জনসাধারণের নেতা ও প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারী ও প্রতিনিধি অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় লোক নহেন। সুতরাং তিনি গবর্মেণ্টের সহিত সমানে সমানে পত্রব্যবহার করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতে অধিকারী।

গান্ধী বড়লাটকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার জবাবে একটি কম্যুনিকে অর্থাৎ জ্ঞাপন-পত্র বাহির করিয়াছেন। ইহাতে গান্ধীর চিঠির কতকগুলি ভুল দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় সে চেষ্টা সফল হয় নাই। গান্ধী তাঁহার প্রত্যুত্তরে তাহা দেখাইয়াছেন। উভয় পক্ষের চিঠি হইতে বাদপ্রতিবাদের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার সত্যতা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিতাম, কিন্তু সময় ও স্থানের অভাবে তাহা পারিলাম না।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইসব উত্তর-প্রত্যুত্তরের কথা উত্থাপিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট জবাব দেন। সেই জবাবের নানা কথার মধ্যে বলা হইয়াছে, দর্প ও দম্ভের সহিত বলা হইয়াছে, যে বে-আইনী সভা ও জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বল প্রয়োগ করিবেন, ইহা স্পষ্ট ভাষায় গবর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন। এবিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। বে-আইনী সভা ও জনতা দুরকমের আছে। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য সভা করার বিরুদ্ধে যে আইন জারী করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সভা করার অধিকার লোপ করা হইয়াছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য নানা স্থানে যে-সকল সভা হইতেছে, তাহার কোনটিরই উদ্দেশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা, উপদ্রব করা, কাহারও অনিষ্ট করা, বা শান্তিভঙ্গ করা, নহে; উদ্দেশ্য কেবল সভা করিয়া বক্তৃতা ও গান করিয়া শান্তির সহিত স্বস্থানে চলিয়া যাওয়া। বলপ্রয়োগ করিয়া এরূপ সভা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা করা উচিতও নহে; কিন্তু সভাস্থ সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া আইনসঙ্গত শাস্তি দিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের আছে।

আর এক প্রকারের জনতা আছে, যাহার কাজ বা উদ্দেশ্য শান্তি ভঙ্গ করা, উপদ্রব করা, দাঙ্গা করা, লুট করা, ইত্যাদি। এরূপ জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বল প্রয়োগের আবশ্যক হইতে পারে।

যাহা হউক, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় প্রকারেরই সভা ও জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য যদি গবর্ণমেণ্ট বল-প্রয়োগ করিতে চান, তাহারও অর্থ, প্রকার, প্রণালী, সুনির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। একান্ত আবশ্যক না হইলেও লাঠি চালাইতে হইবে ও মাথা ভাঙ্গিতে হইবে, কিম্বা ধাঁ করিয়া গুলি চালাইয়া মানুষ মারিতে হইবে, ইহাই যেন এদেশের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের অনুমোদিত নিয়ম বলিয়া মনে হয়। ব্রিটেনে কিন্তু পুলিশ নিতান্ত বিপন্ন, নাচার, বা, কেহ

কেহ জখম, হইবার পূর্ব্বে গুলি চালায় না। এখানে মানুষের প্রাণটা সস্তা বলিয়া অকারণে, সামান্য কারণে, দায়িত্ববিহীন ভাবে অনেক সময় গুলি চালান হইয়া থাকে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আইন করাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহার কি হইল?

বড়লাটের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিবার মধ্যে এদিকে গোরখপুরের চৌরিচোরা গ্রামে যে ভীষণ পৈশাচিক নরহত্যা ও গৃহদাহ বেসর্‌কারী জনতা দ্বারা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। তাহার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়-মহাশয় গান্ধী-মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছেন, যে, আপাততঃ বার্‌দোলিতে নিরুপদ্রব অবাধ্যতার আরম্ভ স্থগিত থাকুক, এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য ১১ই ফেব্রুয়ারী (২৮শে মাঘ), অর্থাৎ অদ্য, বারদোলিতে কংগ্রেসের কর্ম্মী-কমীটির এক অধিবেশন হউক। তদনুসারে অদ্য তাহার অধিবেশন হইবে। ফল কি হয়, জানিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব থাকিবেন।

গান্ধী-মহাশয়ের দৃঢ়তা ও সাহস খুব প্রশংসনীয়। তিনি যদি একা কিছু করিতেন, তাহা হইলে যখন যাহা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলিত না; কারণ ফলভাগী প্রধানত তিনিই হইতেন। কিন্তু তাঁহাকে দেশের লোককে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘনের ও গবর্ণমেণ্টের অবাধ্যতার যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, তাহা দেশের অন্যান্য লোক অনুসরণ করিবে, তিনি ত ইহাই চান? তাহা হইলে, অত্যাচরিত হইলেও, খুব উত্তেজনার কারণ জন্মিলেও, নিরুপদ্রব ভাবে আইনলঙ্ঘন করিবার যোগ্যতা দেশের কতটা জন্মিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি নিজে ত বলিয়াছেন যে দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব ধীরভাবে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

পার্লেমেণ্টে চোখ-রাঙানী

বিলাতে ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে কোন কোন নামজাদা সভ্য চোখ্ রাঙাইয়াছেন। এ দেশে খুব কড়া শাসন চালাইবার, আন্দোলকদিগকে গ্রেপ্তার আদি করিবার, সংবাদপত্রসকলের দ্বারা রাজদ্রোহের বিষ ছড়ান বন্ধ করিবার, ভয় দেখান হইয়াছে;—যেন এরূপ কিছু এ পর্য্যন্ত প্রভুরা করেন নাই! আরও বলা হইয়াছে, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিপ্লব বা অন্য-কিছুর ভয়ে ভীত হইবেন না, তাঁহারা ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুসারে দৃঢ়ভাবে কাজ করিবেন।

ভয়ে কোন পক্ষেরই কিছু করা উচিত নয়,—জনসাধারণেরও নহে, শাসকদেরও নহে। জনসাধারণের ও তাঁহাদের নেতাদের উচিত ধীরভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাতে বজ্রের মত দৃঢ় থাকা। মনে রাখা উচিত, যে, আমরা এখন পরাধীন বলিয়াই যে আমাদের সংযমশক্তি, দুঃখ সহিবার শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, ও একতা, অন্য কোন জাতি অপেক্ষা বরাবর কম থাকিবেই, তাহা নহে। এইসব গুণে ও যোগ্যতায় আমরা যে-কোন জাতির সমকক্ষ হইতে পারি। আমাদের দাবী ন্যায্য। ঈশ্বর ন্যায্য দাবীর সহায়। ভয় নাই। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, যদিও বেসর্‌কারী জনতা কয়েকস্থানে পাশব ও পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি ভবিষ্যতে সংযত ও শান্ত ভাব ধারণ অসম্ভব হইয়া যায় নাই। যখন সংযত ও শান্ত ভাবে অহিংসার পথে নিরুপদ্রবে সমবেত ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দেশব্যাপী হইবে, তখন যদি নিরুপদ্রব অবাধ্যতার প্রয়োজন থাকে, তাহা করা সম্পূর্ণ বৈধ হইবে।

শাসকেরা বিপ্লবের, দাঙ্গার বা শান্তিভঙ্গের ভয়ে কিছু করিবেন না বলিয়াছেন। এই কথাটা বলাই অনবশ্যক এবং বোধ হয় এটা একটা অভিনয়ের ভঙ্গী। কারণ, শাসকেরা ভাল করিয়াই জানেন যে, উপদ্রব করিবার, বল প্রয়োগ করিবার, ক্ষমতা, প্রবৃত্তি, ও আয়োজন তাঁহাদের যেমন আছে, আমাদের তেমন নাই। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা কয়েক জায়গায় যাহাই করিয়া থাকুক, অসহযোগ-প্রচেষ্টা উপদ্রবাত্মক নহে, এবং ইহার নেতা ও প্রকৃত অনুচরেরা হৃদয়ের সহিত অহিংসাপন্থী। সুতরাং ভয় বা বিপ্লবের কথাটা উঠে কেন?

যাহাই হউক, আমরাও বলি, শাসকেরা ভয়ে কিছু করিবেন না। অনেক সময় লোকে হঠাৎ ভীত হইয়া ভয় ঢাকিবার জন্য ও সাহসের অভিনয় করিবার জন্য

ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসে। শাসকেরা যেন তাহা না করেন। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁহাদের ভাল করিয়া জানা আছে; জানা আছে যে, অতি দুর্ব্বল ও অবজ্ঞেয় বলিয়া যাহারা বিবেচিত, তাহারাও কোথা হইতে শক্তি লাভ করিয়া অসাধ্য সাধন পৃথিবীর ইতিহাসে নানা যুগে নানা স্থানে করিয়াছে। এ দেশেও তাহা ঘটিতেছে; ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে। ভারতীয় জাতি "অসাধ্য সাধন" করিবে, সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে। ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাতে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই। শাসকেরা ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া ভারতের ও জগতের সেই শুভদিনের আগমনের সহায় হউন।

—

সচল অন্ধকূপে মোপ্‌লাদের মৃত্যু

বদ্ধ মালগাড়ীতে মোপ্‌লাদের দম বন্ধ হইয়া মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত যে কমিটী বসিয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত বাহির হইয়াছে। তাহাকে বিলাতের ডেলিনিউস্ ভণ্ডামি এবং ময়লা ঢাকিবার নিমিত্ত চুন-কাম বলিয়াছেন। এদেশের "ইংলিশম্যান" পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন নাই। কমিটীর মতে যত দোষ রেল কোম্পানীর! মাকড় মারিলে ধোকড় হইয়াই থাকে! অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকূপ হত্যার ঔপন্যাসিক বা ঐতিহাসিকদের প্রেতাত্মারা এখন সিরাজুদ্দৌল্লার নিন্দাটা অল্প স্বল্প নরম করিতে পারিবেন কি? তদন্তের ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা অনুমিত হইয়াছিল। কারণ, যাহাদের দোষ আছে কি না নির্ণীত হওয়া উচিত ছিল, তাহাদের কেহ বা কমিটী নিযুক্ত করিল, কেহ বা কমিটীর সভাপতি বা সভ্য হইল। কাঠগড়ার আসামী কখন কখন বেকসুর খালাস পায়; সুতরাং বিচার-ফল প্রকাশিত হইবার আগেই কোন আসামীকে প্রকৃত অপরাধী মনে করা উচিত নহে। কিন্তু বিচারাধীন আসামীরূপে কাঠগড়ায় যাহাদের স্থান হওয়া উচিত ছিল, তাহারা বিচারকের নিয়োগকর্ত্তা বা স্বয়ং বিচারক হইলে অত্যন্ত অসঙ্গত রকমের ব্যাপার হয় বটে।

অনেক মোপ্‌লা, যুদ্ধে নয়, অন্য অবস্থায়, অনেক মানুষ খুন করিয়াছে, কাহাকেও কাহাকেও পৈশাচিক ভাবে মারিয়াছে, অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছে, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে; এসব সত্য। কিন্তু মালগাড়ীতে বোঝাই বন্দী মোপ্‌লারাই এইরূপ কাজ করিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। যদি তাহারা করিয়াই থাকে, তাহা হইলেও বিচারের পর তাহাদের আইনানুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। দম আট্‌কাইয়া মারা সে শাস্তি নহে। আমরা ইহা মনেও করি না, যে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে তাহাদিগকে এই ভাবে মারিয়া শাস্তি দিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলাও জানিয়া শুনিয়া অন্ধকূপের কয়েদীদিগকে বধ করেন নাই (যদি অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়া থাকে)। আমরা এত কথা লিখিতেছি এইজন্য, যে, কাহারও কাহারও মনের ভাব এরূপ থাকিতেও পারে, যে, যেহেতু মোপ্‌লারা ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, অতএব যে-কোন প্রকারেই তাহাদের মৃত্যু হউক, তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলি, খুব প্রয়োজন আছে। নৃশংস ব্যবহার যাহার উপরই হউক, তাহা গর্হিত, এবং তাহার দমন ও নিবারণ না হইলে মানব মাত্রেরই আত্মার এবং তৎপরে জীবনের অধোগতি হয়। সেইজন্য আমরা, একদিকে যেমন মোপ্‌লাদিগকে, যাহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মযোদ্ধা বলে, তাহাদের কপার দৃঢ় প্রতিবাদ ও নিন্দা করি, তেমনি অপরদিকে চাই যে, তাহাদের অনেকের দম বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছে যাহাদের দোষে তাহারা আবিষ্কৃত ও দণ্ডিত হউক।

ইহা সন্তোষের বিষয়, যে, বহুসংখ্যক মুসলমানশাস্ত্রজ্ঞ উলেমা জোর করিয়া কাহাকেও মুসলমান করার বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া বা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন।

—

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইয়াছে, যে, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে আইনানুযায়ীযোগ্যতাবিশিষ্ট নারীগণ এই সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন। এই দুই প্রদেশের নারীদের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে। উভয়

ভারতে যেমন পর্দা ও অবরোধ প্রথা আছে, দক্ষিণে ততটা নাই; কোথাও কোথাও এবং কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে মোটেই নাই। ইহা খুব স্বাভাবিক, যে, যেখানে নারীদের সামাজিক স্বাধীনতা আছে, রাষ্ট্রীয় অধিকারও নারীরা সেখানে আগেই পাইয়াছেন। উল্টা দিক্ দিয়া ধরিলে, ইহাও নিশ্চিত, যে, বঙ্গের নারীসমাজে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য যেরূপ সাহস, দৃঢ়তা ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বঙ্গে নারীদের সামাজিক স্বাধীনতার পথও খুলিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক একদিক দিয়া দেখিলে বাংলার নারীরা, যুবকেরা ও বালকেরা বঙ্গের মুখ রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু নারীরাও পুলিশ কর্ত্তৃক প্রহৃত ও আহত হওয়ায় উত্তেজনার সঞ্চার হইতেছে।

—

নারীকে আঘাত

কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই, যে, নারীদিগকে সভাস্থলে ইংরেজ পুলিশ আঘাত করায় যেরূপ দেশব্যাপী বিক্ষোভ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। নারীরা "বে-আইনী" সভা করিলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পার, কিন্তু তাঁহাদিগকে আঘাত করা অতি ঘৃণ্য কাপুরুষতা।

—

নারীধর্ম্ম রক্ষা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইয়াছে, যে, যে-কেহ ষোল বা তন্ন্যূন বৎসর বয়স্কা কোন নারীকে কুপথগামী হইতে প্রবৃত্ত, বা বাধ্য, বা তজ্জন্য ক্রয় বিক্রয়াদি করিবে তাহার দণ্ড হইবে। পাশ্চাত্য অন্তর্জাতিক একটি নির্দ্ধারণ অনুসারে এই বয়স ২১। আমাদের ব্যবস্থাপক সভাতেও কোন কোন সভ্য এই ২১ বৎসর বয়সের সীমা চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে ভাল হইত।

ভারতীয় বজেটের সব অংশের আলোচনা

ভারতীয় বজেটের, অর্থাৎ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণের, কোন কোন অংশের আলোচনা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা করিবার দাবী করিতে পারেন না। এবার মিঃ জিন্নওয়ালা নামক দেশী সভ্যের প্রস্তাবে সমুদয় বজেটটি আলোচিত হইতে দিতে ও ভোটে দিতে গবর্ণমেণ্ট রাজী হইয়াছেন। ভারতের সৈনিক ব্যয় আজগুবি রকমের। ব্যবস্থাপক সভা তত ব্যয়ে রাজী না হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। তাহা হইলেও, আলোচনাটা মন্দের ভাল। দেখাই যাক্ না, কি হয়।

—

নিগ্রহ-আইন জারী বন্ধ করিবার দাবী

আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার-ওড়িশা, ও বাংলা, এই তিন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা-ত্রয়ে নিগ্রহআইন ঢটির জারী বন্ধ করিবার সপক্ষে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টদের কর্ত্তৃক জারী বন্ধ হয় নাই। ইহাতে সভাগুলির মুরাদ বুঝা যাইতেছে।

—

আচার্য্য রায় ও চরখা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঘরে ঘরে তুলার চাষ ও চরখা চালাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের এতদ্বিষয়ক পুস্তিকার যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা সকলের পড়া উচিত।

—

চাউল রপ্তানী

বাবু অমূল্যধন আঢ্য একজন চাউলের আড়তদার ও বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। তিনি প্রস্তাব করেন, যে, গবর্ণমেণ্ট এখন চাউল রপ্তানীর নিষেধ তুলিয়া লউন, রপ্তানী অবাধে চলিতে থাকুক। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় ভালই হইয়াছে। চালের দর কিছু নামিয়াছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট নামে নাই। বাঙ্গালীর পেট ভরিবার পক্ষে যথেষ্ট চাল যখন দেশে জন্মে না, তখন রপ্তানী বন্ধ থাকাই উচিত। যদি এমন হইত, যে, অবাধ রপ্তানী হইলে তজ্জাত দরবৃদ্ধির সুবিধা চাষীরা পাইত, তাহা হইলে বরং অবাধ রপ্তানীর সমর্থন করা যাইত। কিন্তু দরবৃদ্ধির সুবিধাটা পায় মহাজন ও আড়তদারেরা, কৃষকদের কাছ পর্য্যন্ত উহা পৌঁছে কি না সন্দেহ।

আয়ার্ল্যাণ্ড

আয়ার্ল্যাণ্ডে আবার অশান্তি ও খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার আগে উহা থামিবে না।

—

ওয়াশিংটনে রণতরী হ্রাস সভা

রণতরী হ্রাস করিবার জন্য ওয়াশিংটনে যে অন্তর্জাতিক মন্ত্রণাসভা বসিতেছিল, তাহার বৈঠক শেষ হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইলেও কিছু সুফল হইয়াছে। জাপানের সঙ্গে চীনের শাণ্টাং প্রদেশ সম্বন্ধে মিটমাট এবং ব্রিটেনের নিকট হইতে চীনের ওয়েহেইওয়ে পুনঃপ্রাপ্তি, তাহার অন্যতম।

—

শ্রীযুক্ত হরিসিং গৌড়ের বিবাহ-সম্বন্ধীয় বিল

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বরকন্যার মধ্যে বিবাহ আইন-সঙ্গত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল, এবং শ্রীযুক্ত হরিসিং গৌড় পরে পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিল উপস্থিত করেন; কিন্তু কোনটিই পাস্ হয় নাই। আবার কাহাকেও সংশোধিত আকারে উহা উপস্থিত করিতে হইবে। উহা একান্ত আবশ্যক।

—

গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিবার প্রস্তাব

এদেশে ও বিলাতে জবরদস্ত্-নীতির পক্ষপাতী অনেকে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে বদ্ধ করিতে বা নির্ব্বাসিত করিতে পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারা জানেন না, যে-যে কারণে ভারতবর্ষে উপদ্রব রক্তারক্তি অশান্তি চরমসীমায় পৌঁছে নাই, মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীন ক্রিয়াশীলতা তন্মধ্যে প্রধান।

—

বাঁকুড়ায় স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে যে স্বাস্থ্য ও হিতসাধন প্রদর্শনী হইতেছে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার দ্বার উদ্ঘাটন ও প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। এরূপ প্রদর্শনীর খুব প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহা এসব বিষয়ে কর্ম্মিষ্ঠতার প্রারম্ভ বলিয়াই যেন বিবেচিত হয়, শেষ বলিয়া নহে। কৃষি ও শিল্পের দ্বারা জেলার ধনবৃদ্ধি, এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা জেলার স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, উভয়ের জন্য সর্ব্বদা অবহিত চিত্তে পরিশ্রম করিতে হইবে। রায় মহাশয় যে আলস্যকে অধোগতির অন্যতম মূল কারণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্। "বাঁকুড়াদর্পণ" হইতে তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য্যের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রায় মহাশয় জেলার দুরবস্থা ও তাহার প্রতিবিধানে জেলাবাসীর কর্ত্তব্য, কৃষকগণের প্রতি জমিদারদের অমনোযোগিতা, নিরীহ কৃষকগণের কষ্টলব্ধ অর্থে বিলাসী জমিদারদের সহরে আরামে বাস, প্রভৃতি নানা বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, দেশের দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে ঘরে ঘরে রামকাপাস কি বুড়ি-কাপাসের চাষ এবং চর্কার প্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাঁকুড়ার মাটী কাপাস চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বাঁকুড়াবাসী যদি তাহাদের প্রয়োজনীয় কাপড় স্ব স্ব গৃহে তৈয়ার করিতে পারে, তবে বাঁকুড়ার অন্ন ও বস্ত্র উভয় সমস্যার সমাধান হইবে। বাঁকুড়া জেলার লোকসংখ্যা দশ লক্ষ। এ জেলাবাসীর জন্য অন্যূন ৫০ ৬০ লক্ষ টাকার কাপড় আবশ্যক। বাহির হইতে যদি কাপড় না আনিতে হয়, তবে প্রতিবর্ষে এই টাকা বাঁকুড়া জেলায় থাকিবে। তিনি আরও বলেন, এ জেলার সকল বিষয়েই একটি অবসাদ আসিয়াছে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ যাহা করিতে পারেন নাই, বিষ্ণুপুরের মহারাজা তাহা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, আর বিষ্ণুপুররাজ ভাস্কর পণ্ডিতকে সসৈন্যে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এ জেলায় লা, আক, খেজুর প্রভৃতির চাষ অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু কাহারও এ বিষয়ে চেষ্টা নাই। এ জেলায় বহু কুষ্ঠরোগী আছে। আমরা হেলায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি। কখনও কাহারও অনুকম্পা হইলে ২।১টি পয়সা দিই মাত্র। কিন্তু এই সভায় এক ইংরেজ মিশনারী ভদ্রলোক রহিয়াছেন, ইঁহারা স্বদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদেরই জাতভাই কুষ্ঠরোগীদের সেবার ভার লইয়াছেন। জাপান ও বোম্বাই আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে ভাবিয়া দেখিতেছেন কি? বোম্বাই ও আহমদাবাদের কলওয়ালারা আমাদিগকে কাপড় বিক্রয় করিয়া একশত টাকা মূলধনের উপর বৎসরে এক হাজার টাকা লাভ করিতেছে, আর আমরা দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছি।"

—

মন্ত্রীদের বেতন

মন্ত্রীদের বেতন, গবর্ণমেণ্টের, তাঁহাদের ও উক্ত উভয় কয় বন্ধুদের চেষ্টায় বার্ষিক ৬৪০০০৲ই রহিল। কিন্তু প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দেশের লোকের কাছে তপত্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার শেষ সুযোগ হারাইলেন। বজায় রহিল, কিন্তু কার্য্যকারিতা গেল।

—

কলিকাতার গৌরী সেন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদ ন হইয়াছিল। ৭৫ টাকা বেতনের চাকরী বলিয়া উহা স্থাপিত হইয়াছিল, নিযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগের পর পেক্ষা অনেক বেশী বেতন দিবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে! বেতন স্বাধীন জাপানের মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হার টাকা অপেক্ষা অধিক! কলিকাতায় যে খুব নোংরা ন, অলিগলি, খা প রাস্তা বিস্তর আছে, তাহা কে না নে? কিন্তু তথাপি মিউনিসিপ্যালিটীর পরের টাকায় বী চা'লটা আছে।

—

নারীশিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা

স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা নারীদের শিক্ষার জন্য বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত প্রণালী হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদ্ধতির প্রয়োজন আছে কি না, তাহার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলাভাষার সাহায্যে শিক্ষা চান।

নূতন প্রণালীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া চালাইতে হইলে পুনার অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বের মত অনন্যকর্ম্মা, একাগ্র ও অধ্যবসায়শীল একটি মানুষ চাই।

—

আলীদের জননী

আলীভ্রাতাদের পূজনীয়া বর্ষীয়সী জননী দেশময় বেড়াইয়া সভা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। ধন্য তাঁহার উৎসাহ ও স্বজাতি-প্রেম!

—

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয়

যে চার্চিল তাঁহার এক বহিতে লিখিয়াছিলেন, যে, পূর্ব্ব-আফ্রিকা ইংরেজ অপেক্ষা ভারতীয়দিগের দ্বারাই সভ্য মানুষের বাসযোগ্য হইয়াছে, তিনিই অন্যতম ব্রিটিশ মন্ত্রীরূপে ভারতীয়দিগকে প্রকারান্তরে তথা হইতে তাড়াইবার কিম্বা হীন অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কৃতজ্ঞতা বটে!

সাঙ্কর্য্যে ফসলের উন্নতি

এক জাতীয় পুং-পুষ্পের পরাগ অন্য জাতীয় স্ত্রী-পুষ্পের কেশরে প্রয়োগ করিলে যে এক উৎকৃষ্ট ফলের উৎপত্তি য়া থাকে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

গত বৎসর পৌষ মাসে আমাদের দেশোৎপন্ন বৈতাল ড়ার ক্ষেত্রে Suttons Etamps জাতীয় কুমড়ার একটি বীজ বপন করি। বীজগুলি বেশ সুপুষ্ট ছিল, দেখিতে বড় কড়ির ন্যায়, রং শাদা। শীতের সময় গাছগুলি সতেজ ছিল, কিন্তু বসন্তসমাগমে দেশী কুমড়ার ছগুলি যখন সতেজে বাড়িতেছিল তখন পূর্ব্বোক্ত বিলাতী ড়ার গাছগুলি ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। অন্তিম দশা নিকট বুঝিয়া গাছগুলির ফলের আশা ত্যাগ করিলাম। পরে ইহার পুং-পুষ্পের পরাগ দেশীয় কুমড়ার স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশরে প্রয়োগ করিলাম। এ বৎসর সেই বীজোৎপন্ন গাছে কুমড়ার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলগুলি নীরেট—ভিতর ঠিক বেলের মত, মোটেই ফাঁক নাই। ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ অধিক। আস্বাদ অতি মধুর, ফলের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রন্থিতেই প্রায় দুইটি করিয়া ফল ধরিয়াছে। এক সপ্তাহ কাল মধ্যে এক-একটি ফল ওজনে প্রায় ⁄৬ ছয় সের পর্য্যন্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি?



আমেরিকার "ভারতের স্বাধীনতার বন্ধু" সমিতির এক অধিবেশন। ইহার মধ্যে বাঙালী মহিলা শ্রীমতী কমলা দেবী আছেন।

আরও আশ্চর্য্য এই যে, উক্ত কুমড়ার বীজগুলি পূর্ব্বোক্ত Suttons Etamps-এরই অনুরূপ হইয়াছে।

এই উপায়ে শশার স্ত্রীপুষ্পে খরমুজ বা সাঁচি লাউএর পরাগ মিশ্রিত করিলে এক নূতন জাতির ফল উৎপন্ন হইবে এবং ঐ উৎপন্ন শস্যে উভয় ফসলেরই ন্যূনাধিক গুণ বর্ত্তমান থাকিবে।

এই সমস্ত বিষয়ে আজকাল আমেরিকা আমাদের আদর্শস্থল। আমাদের দেশেরই বেগুন-বীজ হইতে সাঙ্কর্য্যের দ্বারাই আমেরিকাবাসীগণ কি অপূর্ব্ব বেগুন উৎপন্ন করিতেছেন। আমাদের দেশে কুত্রাপি বেগুন /২॥ আড়াই সেরের অধিক দৃষ্ট হয় না, আমেরিকায় সেই বেগুন নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে /৬ ছয় সের পর্য্যন্ত হইয়াছে। সুতরাং এই ভীষণ অর্থ-সমস্যার দিনে সাঙ্কর্য্য এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা শস্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মান্ধাতা-আমলের নিয়মাদি ধরিয়া চলিলে হইবে না।

শ্রীরামজীবন গুছাইত।



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২১শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৮

৬ষ্ঠ সংখ্যা

নাথপন্থ

নাথসম্প্রদায়ের যুগীয়া রাজা গোপীচাঁদের গান, [illegible]চাঁদের গান, গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কীর্ত্তিকাহিনী দেশ-দেশান্তরে গিয়া গাইয়া বেড়াইত। সাধুদের মুখে মুখে প্রচারিত গীতের ফলে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে নাথপন্থীদের ধর্ম্মের কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। রঙ্গপুর হইতে সংগৃহীত গ্রীয়ার্সন সাহেবের সম্পাদিত "মাণিকচন্দ্র রাজার গান", দুর্লভ মল্লিকের "গোবিন্দচন্দ্রের গীত", বিশ্বেশ্বর-ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত "ময়নামতীর গাথা", ভবানীদাস-লিখিত "ময়নামতীর পুথি", "ময়নামতীর গান", সহদেব চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল", শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন', সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত 'গোরক্ষবিজয়' ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে নাথদের কিছু কিছু কথা আছে। ময়নামতীর গান-গুলিতে কতকগুলি সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। একখানি গানে আছে,—

তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতির ঘরে॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়িরূপ ধরি॥
কানফা চলিয়া গেল অবরির ঘরে।
গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে॥
গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন।
কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন॥
বাম হাতে যতিনাথে মাদলে দিল ঘাত।
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্ক্ষনাথ॥
নন্দ মহানন্দ দুই চেলায় পুরে তাল।
ঝমকে ঝমকে তাল উঠে শব্দ তাল॥

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর Modern Buddhism নামক পুস্তকের এবং বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকায় নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

পদুমাবতীর যোগীখণ্ডে আছে—

জউ ভল হোত রাজ অউ ভোগু।
গোপিচন্দ নহিঁ সাধত জোগু॥
উহঁ-উ সিসিটি জউ দেখা পরেবা।
তজা রাজ কজরী-বন সেবা॥

বাঙ্গালার বাহিরে গোপীচন্দ্রের কথা এইরূপ—

গোপীচন্দ্র বাঙ্গালার এক রাজা ছিলেন। ভর্ত্তৃহরির ভগিনী মৈনাবতী ইঁহার মাতা। গোরখনাথ যখন ভর্ত্তৃহরিকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, তখন মৈনাবতীও গোরখনাথের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। গোরখনাথের

কৃপায় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সংসারের বিষয়বাসনাতে বদ্ধ হইলে জীবের আর নিস্তার নাই। বাঙ্গালার রাজার সঙ্গে মৈনাবতীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র গোপীচন্দ্র ও কন্যা চন্দ্রাবলী। সিংহলদ্বীপের রাজা উগ্রসেনের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্র বাঙ্গালার রাজা হন এবং বিলাসে মত্ত হন। একদিন পুত্রকে দেখিয়া মৈনাবতী ভাবিলেন, ছেলে এই ভাবে বিষয়ে মাতিলে সমস্তই নষ্ট হইবে। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, পুত্র, যদি অমর হইতে চাও, জীবনমুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে জলন্ধরনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর, এবং দীক্ষান্তে কদলীবনে চলিয়া চাও। গোপীচন্দ্র নিজে সিদ্ধ হইলেন এবং ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও সিদ্ধা করিলেন। গোরখ-পন্থীদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে, নূতন যোগী হইবার সময় গুরুর আজ্ঞা লইয়া নিজ ঘরে গিয়া যোগীকে আপনার স্ত্রীকে "মাতা" বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে এবং স্ত্রী তাহাকে "পুত্র, ভিক্ষা লও" এই কথা বলিয়া অন্ন ভিক্ষা দিলে যোগী তাহা লইয়া গুরুর নিকট গমন করে। গুরুর তখন বিশ্বাস হয় যে শিষ্য যোগসাধনে সমর্থ হইবে।

তখন যোগী মেখলা, শৃঙ্গ (নাদ), সেলী, কন্থা, খপ্পর, কর্ণমুদ্রা, কৌপীন, কমণ্ডলু, ভস্ম, বাঘাম্বর, ঝোলা ইত্যাদি ধারণ করে। গোপীচন্দ্র পাটরাণী পাটম দেবীর নিকট ভিক্ষা লইতে গেলেন। এই সময় তাঁহার সহিত পাটরাণীর যে যে কথা হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া যোগীরা নানাপ্রকার গীত গাইয়া বেড়াইত। নানা স্থানে গীত হইয়া এই গানগুলির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ সালে "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" ছাপেন। এই গানের সঙ্গে পূরণ-প্রসাদের ছাপা "গোপীচন্দ্র কী কথা"র অনেক পার্থক্য। গ্রীয়ার্সন বলেন, রাজ-পুতানা ও মালবপ্রান্তে এই আখ্যায়িকার যথেষ্ট প্রচলন আছে। যাহা হউক, গোপীচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, এই সংসার পক্ষি-সদৃশ, তখন তিনি কদলীবনে চলিয়া গেলেন। গ্রীয়ার্সন দেখাইয়াছেন, ডেরাডুন হইতে আরম্ভ করিয়া হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম এবং ইহার উত্তরে হিমালয়-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই কদলীবন। এই স্থানটিকে ঐ অঞ্চলের লোক কজরীবন বলিয়া থাকে। এখানে কদলীবৃক্ষ যথেষ্ট আছে, হাতীও অনেক। ইহা সিদ্ধদিগের থাকিবার স্থান। সিদ্ধ না হইলে এই বনে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত এই বনে শ্রীহনুমান সুখে বিরাজ করিতেছেন এইরূপ প্রবাদ আছে। গ্রীয়ার্সন মহাভারত হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন যে, দ্রৌপদীকে লইয়া পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে যাইবার পথে ছয়দিন এইখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে এইখানে হনুমানের সাক্ষাৎ হয়। এইখানে মহাভারতে আছে,—

স ভীমসেনস্তচ্ছ্রুত্বা স প্রহৃষ্ট-তনূরুহঃ।
শব্দপ্রভবমন্বিচ্ছংশ্চচার কদলী-বনম্॥
কদলীবন-মধ্যস্থমথ পীনে শিলাতলে।
দদর্শ স মহাবাহুর্ব্বানরাধিপতিং তদা॥

বনপর্ব্ব—১৪৫, অঃ—৭৫-৭৯।

হনুমান্ বলিলেন—আগে এ বনে সিদ্ধ ব্যতীত অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না।

অতঃপরমগম্যোঽয়ং পর্ব্বতঃ সদুরারুহঃ।
বিনা সিদ্ধগতিং বীর গতিরত্র ন বিদ্যতে॥
দেবলোকস্য মার্গোঽয়ং অগম্যো মানুষৈঃ সদা।
কারুণ্যাৎ ত্বামহং বীর বারয়ামি নিবোধ মে॥

১৪৬ অঃ—শ্লোক ৯২-৯৩।

মালিক মুহম্মদ ৯৪৭ সালে হিন্দীভাষায় "পদুমাবত" নামক পুস্তক রচনা করেন। সম্ভবতঃ ১৪৫ সালে বাঙ্গালী কবি সৈয়দ আলাওল এই পুস্তকের ভাষান্তর করেন। ইহাতে মচ্ছন্দরনাথ, গোরখনাথ ও গোপীচন্দ্রের কথা আছে।

লক্ষ্মণদাস তাঁহার হিন্দীগাথাতে গোপীচাঁদের কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে গোপীচাঁদের বাপের নাম তিলক-চন্দ্র, মাতার নাম মৈনাবতী, ভাগনীর নাম চম্পা। গন্ধর্ব্বসেন গোপীচন্দ্রের মাতামহ।

এ ছাড়া লাহোর হইতে গঙ্গারাম-কৃত 'সিহরফী গোপী-চন্দ', কবি কাশীরামকৃত 'বারামাহ গোপীচন্দ', বোম্বাই হইতে "সঙ্গীত গোপীচন্দ-কা", প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত-কৃত "গোপীচন্দ-রাজা-কো খ্যাল", আগরা হইতে 'গোপীচন্দ ভরথরী' [বোম্বাই হইতে খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস ও

"সংগীত গোপীচন্দ ভরথরী" নামে এই একই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন], কটক হইতে "গোবিন্দচন্দ্র গীত" নামক কয়খানি গ্রন্থে নাথদিগের অনেক কথা আছে। প্রায়ই দেখা যায়, কোন পুস্তকের সহিত কোন পুস্তকের ঘটনা সম্বন্ধে ঐক্য নাই। তবে সেগুলি হইতে সত্য বাহির করিতে পারা যায়। তিলকচন্দ্র, গোপীনাথ, ময়নামতীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিচার করিয়া নাথগুরু-সম্বন্ধ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা থাকায় পুনরায় আলোচনা করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহা পাঠ করিবেন। ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদের কথা প্রায় সকল দেশেই আছে। রাজেন্দ্র-চোড় ১০২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয় করেন। গোবিন্দচন্দ্রও পরাভূত হন। কল্যাণীর চালুক্য বিক্রমাদিত্য এই সময়ের রাজা ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ইহার কয়েক বৎসর পরে ভর্তৃহরি শতকের শ্লোক তুলিয়াছেন। কাজেই ভর্তৃহরি বিক্রমের সমসাময়িক। "নবনাথ-ভক্তিসারে" দেখা যায়, ভর্তৃহরির সহিত বিক্রমের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভর্তৃহরি বিক্রমের ভ্রাতা বা পুত্র। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "ভর্তৃহরিকে যদি বিক্রমাদিত্যের ভাই ধরা যায় এবং তাঁহার সংসার-ত্যাগের কথা সত্য হয়, তবে গোপীচাঁদ তাঁহার ভাগিনেয় হওয়া ও সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিচিত্র নয়।"

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে গোপীচাঁদ নামে এক সন্ন্যাসী-রাজার সম্বন্ধে অনেক রকমের প্রবাদ আছে। দু'একটি প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সন্তলীলামৃত" ও "গোপীচাঁদ নাটক" সমধিক প্রসিদ্ধ। সন্তলীলামৃত প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুস্তক। ইহার রচয়িতা মরাঠী কবি মহীপতি ১৭১৫ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গোপীচাঁদ নাটক বেশী দিনের গ্রন্থ নয়, ৫২ বৎসর পূর্ব্বে আপ্পাজী গোবিন্দ ইনামদার রচনা করিয়াছেন। মরাঠী প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদের কথা এইরূপ—

ত্রৈলোক্যচাঁদ রাজার পুত্র রাজা গোপীচাঁদ গৌড়বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন।

"গৌড় বংগাল দেশী নিশ্চিত
কাঞ্চনগর অসে কী।
তে থেঁ ত্রৈলোক্যচন্দাচা সুত।
গোপীচন্দ মী রাজা নিশ্চিত॥"

রাজমাতা মৈনাবতী গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন—এক দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বিক্রয়ের জন্য মাথায় করিয়া কাঠের বোঝা লইয়া যাইতেছেন। সন্ন্যাসীর নাম জলন্দর। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া রাজমাতা তাঁহার শিষ্যা হইয়া পড়িলেন।

তারপর একদিন রাজা মহিলাগণের সহিত প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময় দেখেন যে, তাঁহার শরীরে উষ্ণ জলবিন্দু পতিত হইল। ইহা তাঁহার মাতার অশ্রুবিন্দু জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার নিকটে গেলেন। মাতা পুত্রকে আত্মার উদ্ধারের জন্য জলন্দরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে স্তূপীকৃত গোময়ের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন।

এদিকে জলন্দরের এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন—নাম কণিকা। গুরুর অন্বেষণে তিনি এই রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। মৈনাবতী তাঁহাকে গুরুর অদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কণিকা রাগিয়া বলিলেন,—তোমার ছেলেই তাঁহাকে গোময়ে পুতিয়া রাখিয়াছে। মৈনাবতী পুত্রকে সকল কথা জানাইলে, গোপীচাঁদ ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর শরণ লইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

কিছুদিন পরে সেই নগরে মাচ্ছেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ আসিলেন। কণিকা তাঁহাদের সঙ্গে রাজার পরিচয় করিয়া দিলেন। মাচ্ছেন্দ্রনাথ রাজা ও রাজমাতার অনুনয়ে জলন্দরনাথের ক্রোধ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের তিনটি অবিকল রাজ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া গোময়স্তূপের নিকট রাখিলেন। তারপর উঁহাদের পিছনে থাকিয়া জলন্দরকে ডাকিতে রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজার তিনবার আহ্বানে তিনটি মূর্ত্তি ভস্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্থবার ডাকিতে রাজার আর সাহস হইল না। অথচ মাচ্ছেন্দ্রনাথের আদেশও অবহেলা করিতে পারেন না। শেষে সাহসে ভর করিয়া আহ্বান করিতেই জলন্দর বলিলেন, এখনও বাঁচিয়া আছ? রাজা বলিলেন, ইহা তাঁহারই আশীর্ব্বাদে।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিরজীবী হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে উঠাইয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন।

পূর্ণ অনুতাপীও লখোনি চিহ্ন।
বৈরাগ্য বিধর্ণে ত্যাগ কারণ॥
সৈলী মুদ্রা কন্থা লেবোন।
বিভূতি চর্চ্চন সর্ব্বাঙ্গী॥

সন্ন্যাসী রাজা প্রথমে বড় রাণীর নিকট গিয়া মাতৃ-সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। রাণী অবাক্ হইলেন। অনুরোধ উপরোধে কিছু হইল না। তিনি—

"ভিক্ষা মাগতাঁ নগরান্তরী। গেলা মৈনাবতীচা ঘরী।
ক্ষণে মাতে দুধভাত নিধারী। ভোজন সত্বরী ঘালাবে॥

দুধভাত খাইয়া তার পরদিন তীর্থযাত্রা করিলেন। পথে ভগিনীপতির রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভগিনী চম্পাবতী, ভদ্রাবতী নগরাধিপের মহিষী।

"যাচী ভগিনী চম্পাবতী। ভদ্রাবতী নগরী হোতী।"

কিন্তু তিনি সেখান থেকে গিয়া ১২ বৎসর ভারতের ৫৬ প্রদেশ ঘুরিলেন। শেষে কাঞ্চননগরে ফিরিলেন। সেখানে মাতা ও গুরুর সঙ্গে দেখা হইল। গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। হাজার বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

সন্তলীলামৃতে আছে যে, গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথকে স্ত্রীরাজ্যে দেখিতে পান। সেখানে মৎস্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাণী প্রেমলাকে লইয়া মাতিয়া ছিলেন। মহীপতি, গোরক্ষ ও মৎস্যেন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মছন্দরনাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরখনাথ। প্রবাদ, গোরখনাথ শিষ্য হইয়া তপ করিবার জন্য বনগমন করেন এবং বহু বর্ষ পরে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে মছন্দর বিষয়-বাসনায় লিপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হন। এই সময় গোরক্ষ গুরুদেবের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু তখন বেশ্যার নাচ দেখিতেছিলেন। দেখিয়াই গোরখনাথ নিজ সিদ্ধিবলে এমনই লীলা করিলেন যে, বাদ্যযন্ত্র ধ্বনি করিতে লাগিল—"মছন্দর জাগ, গোরখ আসিয়াছে।" শুনিতে শুনিতে মছন্দরের জ্ঞান হইল—গোরখকে ডাকিয়া বলিলেন—এখন তুমি আমার গুরু।

হঠযোগপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, চৌদ্দজন নাথ ছিলেন। ইহার প্রথম উপদেশে পাঁচটি শ্লোকে ইঁহাদের নাম এইরূপ,—

শ্রীআদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ॥
মন্থানো ভৈরবো যোগী সিদ্ধির্বুদ্ধশ্চ কন্থড়িঃ।
কোরণ্টকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটিঃ॥
কানেরী পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।
কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয়ঃ॥
অল্লামঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচোলী চ টিণ্টিণিঃ।
ভানুকী নরদেবশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথা॥
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ-প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরিষ্যন্তি তে॥

ইহাদের বিশ্বাস, গোরখ অনাদি অনন্ত পুরুষ। ইঁহারই ইচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের জন্ম। ইনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নবনাথরূপে অবতীর্ণ হন।

গোরক্ষপন্থীরা নবনাথের উল্লেখ করিয়া থাকে। তাহাদের মতে নবনাথের নাম—১। একনাথ, ২। আদিনাথ, ৩। মৎস্যেন্দ্রনাথ, ৪। উদয়নাথ, ৫। দণ্ডনাথ, ৬। সত্যনাথ, ৭। সন্তোষনাথ, ৮। কূর্ম্মনাথ, ৯। জালন্ধরনাথ।

কিন্তু "নবনাথভক্তিসার" নামক মরাঠী গ্রন্থে নবনাথের একটি শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই—

"নব নাথাঁচা শ্লোক"

গোরক্ষজালন্দরচর্পটাশ্চ অড়বঙ্গকানীপ-মচ্ছিন্দরাদ্যাঃ॥
চৌরঙ্গিরেবাণকভর্তিসংজ্ঞা ভূম্যাং বভূবুর্নবনাথসিদ্ধাঃ॥

এ ছাড়া ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। সুধাকরচন্দ্রিকায় উল্লেখ আছে—

নবইনাথ চলি আবহী, অউ চউরাসী সিদ্ধ।
অছুটি বজর জর ধরতী, গগন গরুর অউ সিদ্ধ॥

৮৪ জন সিদ্ধের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। নাথপন্থীরা এই সিদ্ধগণকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

১। সিদ্ধনাথ। ২। বদ্ধপদ্মনাথ। ৩। দৃঢ়নাথ। ৪। বীরনাথ। ৫। পবনমুক্তনাথ। ৬। ধীরনাথ। ৭। স্বাসনাথ। ৮। পশ্চিমতাননাথ। ৯। বাতায়ননাথ। ১০। ময়ূরনাথ। ১১। মৎস্যেন্দ্রনাথ। ১২। কুক্কুটনাথ। ১৩। ভদ্রনাথ। ১৪। অর্দ্ধপাদনাথ। ১৫। পূর্ণপাদনাথ। ১৬। দক্ষিণনাথ। ১৭। শবনাথ। ১৮। অর্দ্ধনাথ। ১৯। ধনুষনাথ। ২০। পারশিরানাথ। ২১। দ্বিপারশিরানাথ। ২২। স্থিরনাথ। ২৩। বৃক্ষনাথ। ২৪। অর্দ্ধবৃক্ষনাথ। ২৫। চক্রনাথ।

২৬। তালনাথ। ২৭। উদ্ধমুখনাথ। ২৮। বামসিদ্ধনাথ। ২৯। স্বস্তিকনাথ। ৩০। স্থিতবিবেকনাথ। ৩১। উত্থিতবিবেকনাথ। ৩২। দক্ষিণতর্কনাথ। ৩৩। পূর্বতর্কনাথ। ৩৪। নিঃশ্বাসনাথ। ৩৫। অৰ্দ্ধকূর্মনাথ। ৩৬। গরুড়নাথ। ৩৭। ব্যাঘ্রনাথ। ৩৮। বামত্রিকোণনাথ। ৩৯। প্রার্থনানাথ। ৪০। দক্ষিণসিদ্ধনাথ। ৪১। পূর্বত্রিকোণনাথ। ৪২। বামভুজনাথ। ৪৩। ভয়ঙ্করনাথ। ৪৪। অঙ্গুষ্ঠনাথ। ৪৫। উৎকটনাথ। ৪৬। বামাঙ্গুষ্ঠনাথ। ৪৭। জ্যোতিকানাথ। ৪৮। বামার্দ্ধপাদনাথ। ৪৯। বামভুজপাদনাথ। ৫০। ভুজপাদনাথ। ৫১। বামবক্রনাথ। ৫২। বামজানুনাথ। ৫৩। বামশাসনাথ। ৫৪। ত্রিস্তম্ভনাথ। ৫৫। বামপাদাপাননাথ। ৫৬। বামহস্তচতুষ্কোণনাথ। ৫৭। গোমুখনাথ। ৫৮। গর্ভনাথ। ৫৯। একপাদবৃক্ষনাথ। ৬০। মুক্তহস্তবৃক্ষনাথ। ৬১। হস্তবৃক্ষনাথ। ৬২। দ্বিপাদপার্শ্বনাথ। ৬৩। কন্দপীড়ননাথ। ৬৪। প্রৌঢ়নাথ। ৬৫। উপধাননাথ। ৬৬। উর্দ্ধসংযুক্তপাদনাথ। ৬৭। অর্দ্ধশবনাথ। ৬৮। উত্তানকূর্ম্মনাথ। ৬৯। সর্বাঙ্গনাথ। ৭০। অপাননাথ। ৭১। যোনিনাথ। ৭২। মণ্ডূকনাথ। ৭৩। পর্বতনাথ। ৭৪। শলভনাথ। ৭৫। কোকিলনাথ। ৭৬। লোলনাথ। ৭৭। উষ্ট্রনাথ। ৭৮। হংসনাথ। ৭৯। প্রাণনাথ। ৮০। কার্মুকনাথ। ৮১। আনন্দমন্দিরনাথ। ৮২। খঞ্জনাথ। ৮৩। গ্রন্থিভেদননাথ। ৮৪। ভুজঙ্গনাথ।

নাথদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আসন নিরূপণ জন্য এই নামগুলির কল্পনা হইয়াছে।

নবনাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই বিশেষরূপ প্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে ভারতের সর্বত্রই অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ আছে। প্রসিদ্ধ প্রবাদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গোরক্ষরাজ্যের তিনি মঙ্গল-দেবতা ছিলেন, পরে নেপাল-রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নেপালরাজ্য মৎস্যেন্দ্রের অধিকার হইতে চ্যুত করেন।

তারনাথ বলেন (Geschichte des Buddhismus in Indien, pp. 171, 255, 323), তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব ভাল যাদু জানিতেন। ইঁহার কানফট শিষ্যরাও বৌদ্ধ ছিল। ইহারা দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সেনবংশের পতনের পর বৌদ্ধ হয় (Sylvain Levi. Le Nepal, i, pp. 355-56)।

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহু-স্থানে নানা প্রবাদ আছে—

(১) রাইট সাহেব তাঁহার নেপাল-ইতিহাসে (পৃঃ ১৮০) লিখিয়াছেন, নেপালে প্রবাদ যে, গোরক্ষনাথ জলের সমস্ত উৎপত্তিস্থান বন্ধ করিয়া দিয়া ১২ বৎসর অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রবাদ একই রকম। তবে জলের মুখ ছাড়িয়া দিবার পদ্ধতি অন্যরূপ (Sylvain Levi, Le Nepal, i, p. 348, 351)।

(২) রাজা রসালু পঞ্জাবের একজন বীর। সিয়ালকোটের রাজা শালবাহন দুইটি বিবাহ করেন। এক পত্নী রাণী লোনান সপত্নীপুত্র পুরণের প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু পুরণ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না করায় রাণী তাঁর শাস্তিবিধান করেন। তাহাতে পুরণের হাত-পা কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু গোরক্ষনাথের কৃপায় পুরণ সারিয়া গিয়া ফকীর হন। গোরক্ষের প্রসাদে রসালুর জন্ম হয়। রসালু ও শ্রীসিয়ালপতি একব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (R. C. Temple—Punjab Legends, i, I. sted., p. 247)।

(৩) গুগা পীর। গুগাপীরের বাপ তাঁহার পত্নীকে তাড়াইয়া দেন। পত্নী গোরক্ষনাথের নিকট কয়েকটি মরিচ পান। গোরক্ষনাথ তাহা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে বলেন। তাহা খাইয়া গুগার জন্ম হয়, ইঁহার পিতার ঘোটকীও দুধ ও মরিচের পাত্র লেহন করিয়া গর্ভবতী হয়।

(৪) গুগার মাসীও দুইটি যব পাইয়াছিলেন। তাহাতে দুইটি পুত্র প্রসব করেন। (North Indian Notes and Queries, iii 96 par 205; Elliot, N. W. Provinces, i. p. 256; Crooke F. I. N. I. i. 211)

মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য হইয়াও গোরক্ষনাথ গুরুকে পুণ্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভারতের সর্বত্র গোরক্ষনাথ পূজিত। অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে। কাটিয়াবাড়ে "গোরক-মড়ি" নামে একটি ছোট মন্দির আছে। এখানে ইঁহার পূজা হয়। তবে হরিদ্বারের নিকট গোরখপুরে, নেপালে ও পঞ্জাবে ইঁহার পূজা বেশী হইয়া থাকে। ইনি নেপালের গোরখালিদের দেবতা। ইনি কচ্ছেও আসিয়াছিলেন। এই প্রদেশে ধমকদার নিকট ইঁহার নামে একটি কূপ আছে। সেখানে ইনি চিরজীবী বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

(৫) নেপাল তরাইএ একটি প্রবাদ আছে। যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে যখন মহাপ্রস্থান করিতেছিলেন, তখন সকলেই মরিয়া যান, কেবল ভীম জীবিত থাকেন। ইঁহাকে গোরক্ষনাথ রক্ষা করেন ও নেপালের রাজা করেন (Grierson, p. 138)।

(৬) সিদ্ধ গোরখনাথ যখন কামাখ্যায় গিয়াছিলেন, তখন এক দুষ্টা স্ত্রী ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে গোরখনাথের এক গরীব চেলার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখে। গোরখনাথ রাগিয়া সেই রাজ্যের সকলকে পাথর করিয়া দিলেন। শেষে সেখানকার রাজা কাঁদিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলে কৃপা করিয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন।

ক্রুক্‌স্ অনেকগুলি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে প্রবাদ অনুসারে তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এমন কি, তিনি ব্রহ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মানবের ভাগ্যও পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন যে, কখনও কখনও তাঁহাকে শিবের চেয়েও বড় বলিয়া দেখান হইয়াছে (J. A. S. B. pt. 1, 1878 p. 139)। বুকানন হামিল্টন গোরখনাথের অলৌকিক শক্তির উদাহরণ দিয়াছেন (Mont Martin's Eastern India, ii, p. 484)।

সত্যযুগে গোরক্ষনাথ পঞ্জাবে বাস করিতেন, ত্রেতায় গোরখপুরে, দ্বাপরে হরমুজে এবং কলিতে কাঠিয়াবাড়ে "গোরখমড়ি"তে অবস্থিতি করিতেছেন।

নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেব মচ্ছীন্দ্রনাথের একটি উৎসব নেপালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বোগমতী গ্রামে মচ্ছীন্দ্রনাথের একটি মন্দির আছে—সেই মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহও আছে। বৈশাখের প্রথম দিবসে উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিন মচ্ছীন্দ্রনাথকে পবিত্র জলে স্নান করান হয় এবং রাজার তরবারিও তাঁহাকে দেওয়া হয়। তারপর বিগ্রহটিকে প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করাইয়া পাটনে লইয়া যাওয়া হয়। রথমধ্যে একটি সুন্দর আসন পত্রপুষ্পে সজ্জিত করা হয়। তাহার উপর বিগ্রহটিকে বসাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে অলঙ্কৃত করিয়া রথটিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিগ্রহটি একদিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। যে যে স্থানে মচ্ছীন্দ্রনাথ বিশ্রাম করেন, সেইখানকার অধিবাসীদের ব্যয়ে সহযাত্রীদের ভোজনাদি নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ সাত দিন রথযাত্রা হইয়া থাকে। মচ্ছীন্দ্রনাথ পাটনে এক মাস থাকেন, পরে কোন শুভদিনে তাঁহাকে বোগমতীতে ফিরাইয়া আনা হয়। নেপালে এই শুভদিনের একটি বিশেষ নাম আছে—ইহাকে তাহারা "গুদরিঝাড়" বলিয়া থাকে। গুদরি শব্দের অর্থ কম্বল। ঐ দিন সকলের সম্মুখে মচ্ছীন্দ্রনাথের কম্বল ঝাড়া হইয়া থাকে। কম্বল ঝাড়িয়া তাহারা দেখাইতে চায় যে, মচ্ছীন্দ্র কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন না। ইহার অর্থ এই যে, মচ্ছীন্দ্র সর্ব্বশূন্য হইয়াও সন্তুষ্ট।

ঠাকুরীবংশের প্রথম রাজা অংশুবর্ম্মা। ইঁহার রাজত্বকালে কলিযুগের ৩০০০ বৎসর অতীত হয়। ইঁহার বংশের ৫ম রাজা বীরদেবের সময় কলিযুগের ৩,৪০০ বৎসর অতীত হয়। অতঃপর চন্দ্রকেতু রাজা হন। ইঁহার পর তৎপুত্র নরেন্দ্রদেব ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর নরেন্দ্রের পুত্র বরদেব রাজা হন। ইঁহার সময়ে গোরক্ষনাথ নেপালে শুভাগমন করেন। এখানে আসিয়া ইনি এইরূপে ধ্যান করিতে থাকেন,—"এই বিশ্বে সচ্চিদ্-রূপী নিরঞ্জন ও অন্যান্য বুদ্ধগণ লোক সৃষ্টি করিবার জন্য পঞ্চতত্বের সৃষ্টি করেন এবং পঞ্চবুদ্ধের রূপ ও নাম গ্রহণ করেন। অমিতাভ-পুত্র চতুর্থ বুদ্ধ—ইঁহার নাম—পদ্মপাণিবোধিসত্ত্ব। ইনি তাঁহার মন হইতে উৎপন্ন হইয়া 'লোকসংসর্জ্জন' নামক সমাধিতে সমাসীন হন। আদি বুদ্ধ তাঁহাকে 'লোকেশ্বর' নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার উপর লোকসৃষ্টির ভার দিলেন। তারপর তিনি ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবের সৃষ্টি করিলেন; ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবের সংরক্ষণে নিরত হইয়া 'সুখাবতীভুবনে' উপবিষ্ট বলিয়া ইঁহার নাম হইল—'আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিবোধিসত্ব'। এই বুদ্ধ সুখাবতী হইতে 'বগ' নামক স্থানে আসেন। এইখানে শিব তাঁহার নিকট হইতে 'যোগজ্ঞান' শিক্ষা করেন। ইহার ফলে যোগী গভীর ধ্যানের দ্বারা পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। শিব যোগজ্ঞান শিক্ষা করিয়া পার্ব্বতীর সহিত গৃহে ফিরিতে ফিরিতে একরাত্রি সমুদ্রতীরে অবস্থান করেন। শিব যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য পার্ব্বতী এই সময় শিবকে অনুরোধ করেন। শিব বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু পার্ব্বতী শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়েন। আর আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিবোধিসত্ত্ব মীনাকৃতি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর হইয়া 'হুঁ' দিয়া যাইতেছিলেন। এ দিকে পার্ব্বতী জাগিয়া যেরূপ ভাব দেখাইলেন, তাহাতে

শিব বুঝিলেন, পার্ব্বতী সব শোনেন নাই। ইহাতে শিবের সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই অপর কেহ শুনিয়াছে। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—'যে শুনিয়াছ, বাহির হও, নতুবা আমি অভিশাপ দিব।' ইহা শুনিয়া লোকেশ্বর তাঁহার প্রকৃত আকার ধারণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিব তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করায় লোকেশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হন। এই দিন হইতে মৎস্যাকৃতি গ্রহণের জন্য লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিজ্ঞাত হন।"

তারপর গোরক্ষনাথ জানিতে পারিলেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রত্যহ 'কামণি' পর্ব্বত যাইতেন। কিন্তু এটুকুও বুঝিলেন যে, সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াও বড় কষ্টকর। কিন্তু যিনি সমস্ত দেবতাদের গুরু এবং লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা এতই বলবতী হইল যে, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথকে না দেখিতে পাইলে তাঁহার জীবন থাকা না থাকা সমান। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে তাঁহার সম্মুখে আনিবার এক মতলব ঠিক করিলেন। তিনি নবনাগকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন কাজেই তাহারা আর বৃষ্টি দিতে পারিবে না। এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে লোকে হাহাকার করিবে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৎস্যেন্দ্রনাথকে তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য আসিতেই হইবে।

এই অভিপ্রায়ে গোরক্ষনাথ নবনাগকে একটি পাহাড়ে আকৃষ্ট করিলেন, এবং নিজে তাহার উপরে বসিলেন। ফলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইল। লোকেদের কষ্টের একশেষ হইল; রাজা বরদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় তিনি দেশের বৃদ্ধদের কথা শুনিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে তিনি বিরত্নবিহারে যান। সেখানে আচার্য্য বন্ধুদত্ত থাকিতেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, বন্ধুদত্ত তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে নানা কথা কহিতেছেন। কথায় কথায় তাঁহার স্ত্রী অনাবৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করায় বন্ধুদত্ত বলিলেন, 'কাপোতল-পর্ব্বতবাসী আর্য্যাবলোকিতেশ্বরের কৃপা ব্যতীত বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু রাজার প্রার্থনা ভিন্ন তিনি আসিবেন না। রাজা এ দিকে নির্ব্বোধ, পিতা নরেন্দ্রদেবের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না বলিয়া তাঁহার পিতা বিহারে বাস করিতেছেন।' এই কথা শুনিয়া রাজা ফিরিলেন এবং বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া আসিয়া বৃদ্ধ আচার্য্যকে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য অনুরোধ করিলেন। বন্ধুদত্ত স্বীকৃত হইয়া রাজাকে লইয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি যোগাম্বর-জ্ঞান-ডাকিনীকে সম্বোধন করিয়া পুরশ্চরণ করিলেন। কোটী মন্ত্র জপের পর তিনি প্রীত হইলেন। আচার্য্য তখন গোরক্ষনাথের কবল হইতে কর্কট নাগকে মুক্ত করিলেন এবং কাপোতল পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ভিন্ন অন্যান্য কয়জন নাথের মতবাদও নাথপন্থীদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ কয়জন নাথের নাম করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরনাথ একজন বড় সংযমী নাথ ছিলেন। ইনি সকলকে সংযম-শিক্ষা দিতেন এবং পরম তত্ত্ব সংস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে উপদেশ দিতেন।

চর্পটনাথ নাথগুরু ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, ইহাই তাঁহার প্রধান মত। ষড়রিপু বশীভূত করিবার প্রণালী ইনি শিক্ষা দিতেন।

নাথযোগী ভর্ত্তৃহরি বা ভরথরী কতকগুলি মুদ্রা সাধন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ বলিতেন ত্রিকুটীর মণ্ডলের উপর যে চৈতন্যপুঞ্জ বিরাজিত আছে তাহা উল্টাইয়া দিয়া লাভ কি? ঊর্দ্ধকে অচল স্থির করিয়া দেওয়াই পরম কার্য্য। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে (ইঁহাদের সাঙ্কেতিক শব্দ "অর্দ্ধ ঊর্দ্ধ") নিরঞ্জন বাস করে। ইড়া পিঙ্গলার একীকরণরূপ গ্রন্থি স্থির করিতে হইবে। এটি প্রধান সাধন। ইড়াপিঙ্গলাকে ইহারা "চন্দ্র সূর্য্য" বলিয়া থাকে।

ঘুঘুনাথের প্রধান উপদেশ এক সমস্যার মধ্যে ছিল। তিনি বলিতেন—

"ঘুঘুন থ পায়বো, জতীন কহাযবো।
সিদ্ধোন নাথবো, বোলবো পকড়াইবো॥
জদ অনহদ ভরম সুনায়বো।
সম একংকার খেলবে, শিবশক্তিম মেলবো॥
ধ্যানন ধরায়বো। উর্চ নীচ কহায়বো।"

চম্বানাথ ঘুঘুনাথের বিপরীত উপদেশ দিয়া বলিতেন যে, যাহা বক্তব্য তাহা বলিবে, যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিবে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। কোনরূপ বিচার করিবে না। সকল সময় কিন্তু হৃদয়ে ধ্যান লাগাইয়া থাকিবে।

খিছড়নাথ সাম্যবাদ প্রচার করিতেন। আর 'শব্দ-বিচার' উপদেশ করিতেন।

ধর্ম্মনাথ সিদ্ধোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি গুরুসেবা শিক্ষা দিতেন।

ধজনাথ 'প্রণব' সাধন বিশেষ করিয়া প্রচলন করেন। ইঁহার অন্যান্য মত গোরক্ষপন্থীদের ন্যায়।

প্রাণনাথ একজন বড় সাধক—ইঁহার প্রধান উপদেশ ছিল—

"নাম ভগতা সন্ত জুগতা, দৃঢ়তা রহিতো অরোগ।
প্রীতি লচ্ছণ উপদেশ অচ্ছণ, প্রেম পাযবো জোগ ॥"

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

যাত্রী

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসচে!—এই জীবনের সন্ধ্যা—তার পরে? তার পরে কি আছে গো আমার, তার পরে কি আছে? অন্ধকার রাত্রি কি? অথবা তিমিরাবসানে দীপ্তার্ককিরীটী বিচিত্র-বর্ণচ্ছটা-বিভাসিত সপ্তবর্ণানুরঞ্জিত আলোয় আলোময় নব প্রভাত! কি আছে এই নিবিড় আঁধার-ঘোরের ওপারে?

এ সন্ধ্যা কেবল আমারই আসেনি,—আমি এই জীর্ণ কুটীরতলে খোলা জান্‌লার কাছে শুয়ে প'ড়ে যে মরণের প্রতীক্ষা করছি এ তো শুধু আমারই আসছে না! কত রাজ-রাজ্যেশ্বর, কত সম্রাট সুখ-ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন আঁকড়ে প'ড়ে থেকেচেন, তবু এই কাল-সন্ধ্যার কালো আবরণ তাঁদের ঢেকে দিতে কসুর করে নি। আমার তো এ মুক্তি!

মরণ! মরণ! ওগো এর চেয়ে ভীষণ সুন্দর আর কিছু যে নেই! এই যে পলে পলে নীরব পা ফেলে এ আমার কাছে এগিয়ে আসচে! জীবনে কখনো তো কারুর অভয়-বাহুর আশ্রয়তলে এই লতার সঙ্গে উপমেয় নারীজীবন বিশ্রাম পায় নি! তাই আজ প্রিয়তমের সর্ব্বসন্তাপহর গভীর ঘন আলিঙ্গনের মত মৃত্যু আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে আসচে! এস, এস! আমার প্রাণ বলছে—

"অসতো মা সদ্‌গময়ো
তমসো মা জ্যোতির্গময়ো
মৃত্যোর্মামৃতং গময়ো।"

নিয়ে যাও গো, আমাকে মৃত্যু উত্তীর্ণ ক'রে অমৃতে নিয়ে যাও।

সুবৃহৎ একটা নিদাঘ-দিনের মত বিশ্বদাহী রুদ্র জ্বালাভরা, আগুনভরা আমার জীবনটা ব'য়ে গেছে,—সে যে কি জ্বালা, তা আর এই সন্ধ্যার কোলে এলিয়ে-পড়া শ্রান্তিভরা বিকৃত বিবর্ণ জ্যান্ত-মরা দেহটা দেখে কতটুকু বোঝা যাবে বল!

একদিন এই দেহখানিই সুন্দর ছিল। আজ যার রংয়ের সঙ্গে চামচিকে বা বাদুড়ের সঙ্গে তুলনা চল্‌তে পারে, তারই তুলনা একদিন বসোরা গোলাপের পল্লবের সঙ্গে চল্‌তো।

বিশ্বাস করা না-করাতেও আজ আমার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু তবু এ কথা সত্যি কথাই যে, সে রূপ থাকতেও আমি তার জন্যে কখনো গৌরব মনে করিনি, বরং তাকে অত্যাজ্য আপদই মনে ক'রে এসেছি।

দুয়োর খুলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুক্‌লো ছোট ছেলে মণি, তার মুখ শুক্‌নো, চোখ ব'সে গেছে, সেই সকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, এখন ছেলের বাড়ী মনে পড়্‌লো!

অভিমানে আমার গলা যেন বুজে আসছিল। বলবো না তো কথা। আমি এমন ক'রে আধমরা হয়ে ঘরে প'ড়ে আছি, আর ওদের এমন কাণ্ড! মণি আমার পায়ের গোড়ায় ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "আজ কেমন আছ মা, আর যন্ত্রণা বাড়েনি তো?"

কথা বল্‌লুম না।

সে বল্লে, "রাগ করেছ বুঝি মা, কিন্তু আমি যদি কথা বলি তো কাঠ হয়ে যাবে, যে তুদিন বাঁচ্তে, তাও হয়ত টিক্বে না—"

উঠে বস্তে চেষ্টা কর্লুম, পার্লুম না, এলিয়ে শুয়ে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লুম, "সে কি কথা রে? এমন কি কথা?"

"মেজ্দার আর সেজদার আজ জেল হয়ে গেল, ছ'মাস ক'রে।"

"এঁ্যা!"

"সত্যি মা।"

"কি অপরাধে? না, না, অপরাধ তো ঢেরই ছিল, তা এ ধরা পড়্লো কিসে?"

"সেই নেকলেস্ চুরি!"

"ও! তা বেশ হয়েচে।"

প্রকাণ্ড বড় একটা নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়্লুম। চোখের সুমুখে আমার দুটি ছেলের মুখ যেন অসহায় ভাবে ফুটে উঠ্তে লাগ্লো। তারা জেলে গেল। না গিয়ে উপায় কি ছিল? চুরি কর্লে তার শাস্তি ভোগ তো কর্তেই হবে!

হায় অন্ধ মাতৃমমতা! এ ভুলে যায় যে সন্তান পতিত তস্কর।

হলই বা তারা আমার পেটের ছেলে। ভগবানের পাবন কৃপাবারি এমনি ধারাবর্ষণেই লোকের পাপের গ্লানি ধুয়ে শুচি ক'রে দ্যায়। আমি যাদের মানুষ কর্তে পারি নি, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর যিনি, তিনি তাদের ঠিকমত চালিয়ে নেবেন বই কি!

বড় ছেলেকে তো মানুষ কর্তে পার্বো না ব'লেই নিঃস্বত্ব হয়ে পরের ঘরে পোষ্যপুত্র দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম সে মানুষ হবে। তা বড়লোকের ঘরের পোষ্যিপুত্তুররা যা হয়ে থাকে সে তাই হয়েচে! আর বেশী খুলে কি ভাবা যায়?

আমি তার মা, আমার গর্ভে তাকে স্থান দিয়েছিলুম, মনে কর্লেও লজ্জা করে যে! হায় সন্তান!

সন্তানের প্রার্থনা না কর্তেই সন্তান পেয়েছিলুম, তাই কি ছেলেরা আমার মুখ পুড়িয়ে আমাকে এমন ক'রে দাগা দিলে! হায় মর্তে তো বসেইছি, এই মরণ যদি আরও তুদিন আগে আস্তো!

(২)

আমার বোন্-ঝি বা সতীন-ঝি বীণা এসে ডাক্লে "কেমন আছ গো, ছোট মাসী?"

বল্লুম "কে, বীণা? আয় মা আয়,—আজও মরণ হচ্চে না তাই বেঁচেই আছি।—ওটি কে? বা চমৎকার মেয়েটি তো!"

বীণার সঙ্গে একটি তরুণী মেয়ে এসে দরোজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল,—বোধহয় আমার পায়ের কাছে মণি ব'সে ছিল ব'লেই সে সঙ্কোচ কর্ছিল।

আমি, মা, আমার মণি আমার কাছে বালক থাক্তে পারে; কিন্তু তার উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটা নেশা আছে তো! দেখ্লুম মণিরও অবনত মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে!

বীণা বল্লে, "ওটি আমার দেওরের মেয়ে, ওর মামার বাড়ী এসেচে। আয় না লতি, লজ্জা কি,—আয়!"

"আমার কাছে? না, না, ওই ওখানেই বসো মা, আমার যে ছাই রোগ, আমার কাছে কি কারু আস্তে আছে?"

বীণা একটু ক্ষুব্ধ গলায় বল্লে, "এখনো রক্ত ওঠে কি?"

"ওঠে বৈ কি,—তা উঠুক, যত শীগ্গির শেষ হয় ততই ভাল আমার নিরু আর অতুলের কথা তুই শুনেছিস তো?"

"শুনেছি,—তা দেখো এবারে তারা শুধ্রে আস্বে।"

"কিন্তু কি লজ্জা!"

"তা আর কি কর্বে বল। আচ্ছা ছোট মাসী, মধুপুরে আমার শ্বশুরের একখানি বাড়ী খালি প'ড়ে আছে, তুমি দিন কতক হাওয়া বদ্লে এস না কেন? যাবে?"

হাস্লুম। "যাবই তো! যেতে বসেচি যখন তখন যেতেই হবে। তবে পৃথিবীর হাওয়া আর নয়, এবারে লোকান্তরে হাওয়া খেতে যাচ্চি।"

"যাও, কি কথার যে কি উত্তর দাও।"

"ঠিক উত্তর, বীণা। আমার মণি অসময়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে যে সামান্য চাকরীটুক জুটিয়েছে সেই তো সম্বল! ওর

ওপর আর কি চাপ দিতে পারি? ছেলে বল্‌তে তো এখন ওই একটাই!"

বীণা এক চমকে মণির ছলছলে মুখখানি চেয়ে দেখ্‌লে। মণি তার কোঁচার কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে চ'লে গেল। যাবার সময়ে দেখ্‌লুম, আমার এ মায়ের চোখ নিশ্চয়ই মিথ্যে দেখেনি, আমি ভালো ক'রেই দেখ্‌লুম মণির মুখের চাপা হাসির ছটা লেগে তরুণী লতিকারও নত চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

তবে কি এরা পরস্পর পরিচিত?

আর এই যে নত নয়নের তলে গোপন দৃষ্টির মিলন-খেলা, এ তো কেবল মাত্র পরিচয়েরই চিহ্ন নয়

ওগো! বুঝেছি,—তাই বুঝি মণি আমার এমন কোমল, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, এত ধীমান্! প্রেমের আলো লেগেই তার প্রাণের দেবতার দুয়োর খুলে গিয়েচে!

কিন্তু ওরে দুঃখিনীর ধন, এ তুই কোন্ ফাঁদে পা দিয়েছিস্ রে,—ওরা যে বিভবের অহঙ্কার করে, তো'কে কি বরণ করবে ওরা? আমি বুঝেছি লতিকা কবিরাজ মশায়ের ভাগ্নী, মণি তো নিত্যই আমার ওষধপত্তরের জন্যে সে বাড়ী যাওয়া-আসা করে।

লতিকা মুখ নাবিয়ে ব'সে ছিল। দেখ্‌লাম মেয়েটি সুন্দরী, অভ্যুগ্র যৌবনছটা তার গা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। টলটলে মধুভরা ফুল যেমন পাপ্‌ড়ী মেলে' ফুটে থাকে, তেমনি একটি মিষ্টি স্নিগ্ধ শ্রীতে তাকে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা লোকের মেটে না, তাই আমারও তা মিট্‌ল না।

এই জীবসৃষ্টির আধখানা অঙ্গ চিরদিনই ফুলের সঙ্গে লতার সঙ্গে উপমিত হয়ে এসেচে, এই নিয়েই তো পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিক্‌কার কল্পনা-জগৎ মাতোয়ারা।

কোন্ আদিযুগের প্রতিভাকুশল কবিকল্পনা এই ফাঁদ দেখেই মনোভবের তূণের পঞ্চবাণ ফুলে ফুলে ভরিয়ে রেখেছিলেন। সে যদি ঈশানের চোখের আগুনে ভস্ম হয়েই শেষ হয়ে যেত, তা হলে সৃষ্টির এত সত্যি নিয়ে লুকোচুরি কি ক'রে চল্‌তো কে জানে!

ফুল সে ফুট্‌বেই। তার বর্ণ গন্ধ সে তো ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করবারই জন্যে। এই অতি পুরাতন তথ্যই না যুগে যুগে চিরনূতন হয়ে কাব্যকে অলঙ্কার পরিয়ে আস্‌চে!

বীণাকে আমার মা মানুষ করেছিলেন। বিয়েও মা-ই দিয়েছিলেন। আমার স্বামী তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত;—তিনি মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত হতেও পারেন নি।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে বিধবা হয়ে বীণা তার শ্বশুর-বাড়ীতেই কর্ত্রী হয়ে থেকে আস্‌চে—আমরা কোনো দিনই তার খোঁজ খবর বিশেষ নিতে পারিনি। এখন সে তার জায়ের বাপের বাড়ী এসেছিল, তার জায়ের ব্যারাম শুনে তাকে দেখ্‌তে!

আমাকে মধুপুরে যাবার জন্যে বার কতক ব'লে বীণা উঠে চ'লে গেল।

অবসর পেয়েই আমার হতভাগ্য ছেলেদুটোকে মনে পড়ল। সেখানে সেই নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন প্রহরীগুলো তাদের মানুষ ব'লে জ্ঞান করছে না। এই কুমাতার নারীমর্য্যাদাকে আক্রমণ ক'রে তারা তাদের গালাগালি করছে, এ আমার কত পাপের শাস্তি ভগবান্!

জীবনের সেই প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ ক'রে এই যে চিরদিন মাথা পেতে সব বাধাগৎ সহ্য ক'রে আস্‌ছি, হিন্দুর মেয়ের আজন্ম সংস্কারের চাপে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি, আজ এ পাচ্ছি কি আমার সেই পুণ্যের ফল?

নব যৌবনে আমিও অম্লান পল্লবে প্রভাত-রৌদ্রের শুভ্রতা মেখে ফুটেছিলুম, কিন্তু আমার সে বর্ণডালাতে আগুন লেগে গিয়েছিল।

কৌমার জীবন অন্তে আমার দ্বিতীয় অঙ্কে হ'তে হ'ল চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী,—থাক সে কথা আর নূতন ক'রে তুলে কি হবে? ব্যর্থতার বেদনা? তা সে তো এই ঘুচ্‌তে বসেছে—শেষ হ'য়ে এল ব'লে!

বড় ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর দিয়েচি। শুনতে পাই লোকে যখন তার খোসামোদ করে তখন বলে রাজপুত্তুর, আর আড়ালে গাল দেবার সময়ে বলে "আরে সেই তো ঘুঁটে-কুড়ুনি যে লোকের বাড়ী ধান ভেনে খায়, তারই ছেলে। ও আর কত ভালো হবে!"

হায় লোকে তো বোঝে না যে, সৃজন পালন, এ বড়

সোজা কথা নয়! একটুখানি বুঝে দেখার ভুলে জাতীয় জীবনে কি কলঙ্কের নিশানই তৈরী হয়ে দাঁড়ায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিকৃত হয়ে!

(৩)

সারারাত কেটে গেল। একটি মিনিটের জন্যেও ঘুম এসে এই যাতনার এতটুকু বিরাম হতে দেয়নি। আকাশ-ভরা তারার দিকে চেয়ে চেয়ে রাত ভোর হয়ে গেল।

কাশিতে এ কি যাতনা! বুকের ভিতর যেন বিষ-ফোড়া টাটিয়ে আছে।—এই যন্ত্রণা।—উঃ! কতদিনে এ যন্ত্রণার শেষ হবে, এই দুচোখ জুড়ে চিরনিদ্রা নেমে আসবে, সে কবে? অন্তহীন ঘুম! আঃ—সে কতদিনে ঘুমুতে পাবো, কবে?

এই রোগ,—ধরতে গেলে এ আমার নিজের হাতে তৈরি করতে হয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টা যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছি—দেহের যন্ত্রপাতিগুলোকে এতটুকু বিশ্রাম দিইনি,—ছেলেদের মানুষ করতে হবে ব'লে নিজের আহার নিদ্রা গ্রাহ্যই করিনি,—এ আমার তারই ফল।

তবু পারলুম না গো, পারলুম না,—মণি ছাড়া সব ছেলেগুলো মানুষ নামের কলঙ্ক হল, মানুষ হল না।

সন্তানকে মানুষ করতে না পারা,—এ যে মা-বাপের কি দুঃখ তা মা বাপ না হলে আর কে বুঝবে?

মণি আমার রাত্তিরের যাতনা দেখে ভোর না হতেই বেরিয়ে গিয়েছিল, কবিরাজ-মশাইকে সঙ্গে ক'রে ফিরে এল। কবিরাজ নিত্যকার মত একটু হাত দেখলেন, আর দু'চারটে বাঁধাগৎ আউড়ে চ'লে গেলেন। মণিকে একা পেয়ে আমি ডাকলুম, "মণি!"

"কি মা?"

"ওই মেয়েটিকে তুই চিনতিস্ মণি—?"

"চিনতুম,—কেন সে কথা?"

"কি ক'রে চিনলি বাবা, ও তো এখানকার মেয়ে নয়?"

"এখানে ও অনেক দিন থেকে আছে। যাই হোক তা দিয়ে কি হবে?"

একটু ইতস্ততঃ করছিলুম। যদি কাঁচা থাকে তো কেন আমি ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে সেটা পাকাতে যাই! কিন্তু মণির বিপন্নভাবে কথা বলার ভঙ্গী দেখে বেশ বুঝতে পারা যায়, যে, সে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে!

ছেলে মনে করলে আমি যাতে আর না এগিয়ে যাই তাই করা যাক্, তাই সে বললে, "মা, বড় দাদা তো আজকাল বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছে শুনচি।"

"করুক গে বাবা, ও কথায় কান দিয়ে তো কিছু করতে পারবো না—"

"আমার ভারি কষ্ট হল শুনে।"

"কি হবে তার জন্যে কষ্ট ক'রে? তাকে তো আমি পরকেই দিয়েছি, তারা ছেলের দাম ধ'রে কিছু টাকাও আমাকে দিয়েছিল, তবে আর তার কথা কেন?"

"হুঁ।"

মণি চুপ ক'রে রইল। আমিও আর কথা তুলবার সুবিধে পেয়ে উঠছিলুম না। অনেকক্ষণ পরে আবার কথা তুললুম, বললুম, "ওই মেয়েটিকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে মণি, ওদের আমি বলবো?"

"তুমি পাগল হয়েছ মা!"

"না বাবা, আমি পাগল-টাগল কিছু হইনি রে—"

"কি বল মা, তোমার এ ঘরে লোকে মেয়ে দিতে যাবে কি দেখে? ওইসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, কাল সারা রাত্রি তুমি ঘুমোওনি।"

"এই তো আর দু'দিন বাদে একেবারেই ঘুমুবো বাবা, আর জাগতে হবে না, তুই ছাড়া আর কারু সঙ্গে দেখাও হবে না, তবু যদি যাবার সময় দেখে যেতে পারতুম যে—"

"ছি, মা!"

মুখে বললে মণি "ছি মা" কিন্তু ওই যে তার অধর-কোণের হাসি-টুকু আমার চোখে ধরা প'ড়ে গেল।

ওরে, এ যে প্রণয়তপে বিকশিত চিত্তগগনের বিচিত্র ফুলের রং,—এ রং বুকের রক্ত ফেনিয়ে ফোটে,—এ তো অবহেলার ধন নয়।

এই ক্ষয়-রোগ-জীর্ণা ভীষণ আকৃতির বৃদ্ধা আমি,—একখানা আয়না সামনে ধরলে হয়তো নিজের রূপের শ্রী দেখে নিজেই আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতে পারি। একখানা

হাত যদি কষ্টেসৃষ্টে চোখের সুমুখে তুলে ধরি, তা হ'লেই যে শিউরে উঠি।

তবু একদিন তো আমিও তরুণ ছিলুম। তবে কিনা গাছ থেকে কুঁড়ি তুলে এনে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখলে যেমন সে মুকুল ফোটেও না ঝরেও না, শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে থাকে, তবু থাকে, আমারও হয়েছিল তাই।

এখন এই মৃত্যুর চুম্বনে যদি এই কাঠখানার মাঝেও শেষ একবার প্রাণের স্পন্দন জাগে!

সমস্ত হাত পা জ্বালা ক'রে জ্বর বেড়ে গেল। রোজই তো জ্বর বাড়ে, কিন্তু এদিনের মত টেম্পারেচার এত বেশী ওঠে না,-আর তো বেশী দেরী নেই কিনা?

রোজই যখন দিনের আলো অস্তচূড়োয় নিবতে সুরু করে, তখনই আমার মন আর রোগ দু-দুটি নিশাচরের মাতামাতি আরম্ভ হয়! সময় সময় ভাবি—রোগের জ্বালায় জ্ঞান হারানোও বুঝি এর চেয়ে ঢের ভালো!

এ আর পারা যায় না,—পারা যায় না।

মৃত্যুর মত ভীষণ সুন্দর যে, যে প্রিয়তমের মত হ'য়ে চুম্বনস্পর্শে সকল দাহ জুড়িয়ে দিতে আসচে,—মায়ের মত যে অভয় অঙ্কে তুলে নিয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে, এ তারই প্রতীক্ষা, এই যা আশা!

আমি বড় ছট্‌ফট্‌ করচি দেখে' মণি ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেল। একা প'ড়ে আছি,—এমন ক'রে ছটফট্‌ করচি কেন কি জানি; বড্ড যন্ত্রণা হচ্চে!

শেষ হবে কি আজই? অন্ততঃ বেশী দেরী আর হবে না। আহা মণিকে ভারী দুঃখ দিতে হচ্চে, আমি ম'রে গেলে ও বেচারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।—

৪

দুপুর বেলা বীণা এসে বসল, বললে, "মণি চল্‌, আমি আজ তোকে খাইয়ে দিইগে।"

মণি গেল না। ঘাড় নেড়ে বললে, "না, আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে ফলার খেয়েছি, আর কিছু খাব না।"

বীণার সঙ্গে আজও সেই লতিকা ছিল। সে মণির কথা শুনে একটুখানি চোখ তুলে চাইলে,—তরুণী নারীর চোখের করুণ মধুর চাহনি সে!

আমি ঠিক করলুম যে, এই মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে মরণের আগে আমি আমার সন্তানের জন্যে এই প্রথম একটা ভিক্ষা স্বীকার ক'রে যাব, পাই না-পাই সে আলাদা কথা।

বীণা বললে, "কাল তো কবরেজ-মশায় বলছিলেন বড্ড নাকি যাতনা গিয়েছে। আজ কেমন আছ, ছোট মাসী?"

"তেমনি। তুলসী-তলায় নামাতে যেটুকু দেরী। আমার সামনে ভাল ক'রে না বললে কি হয়, আমি শুনেচি যে, আজকের সন্ধ্যাই আমার শেষ সন্ধ্যা।"

"না,—তা কেন হ'তে যাবে।"

"তা আমি নিজের শরীর দিয়েই বেশ বুঝতে পারছি, বাতাস যে দুষ্প্রাপ্য ধন মনে হচ্ছে। নিশ্বাস টানতে এমন কষ্ট আর তো কোনোদিন হয় না।"

মণি আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস করছিল, লতিকা আস্তে আস্তে সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার হাতে পাখাখানি তুলে দিয়ে মণি আমার পায়ের গোড়ায় এসে বসলো।

ছেলের মুখ পানে চেয়ে আমি কিছু বুঝতে পারলুম না, সে নত চোখে একটা কাঠি দিয়ে ঘরের মাটিতে আঁচড় কাটছিল।

আমি বীণাকে বললাম, "দ্যাখ্‌ বীণা, আমার মণির জন্মের উনিশ বছর পরে আমার এই রোগ হয়েছে, তাও কিছু বংশগত রোগ নয়,—অতিরিক্ত দেহমনের খাটুনিতেই হয়েচে, ডাক্তারেরাও তাই বলেচে। তবে আমার মণির সঙ্গে লোকে এজন্যে মেয়ের বিয়ে দেবে না কেন?"

"কেন,—কে বলেছে তোমাকে একথা?"

"তা নেই বলুক।"

আবার ভয়ানক কাশতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কাশি আর তার যাতনা থামতেই আধঘণ্টা কেটে গেল। ঘামে সারা গা ভিজে উঠলো।

মণি মলিন মুখে বললে, "কেন তুমি কথা বলতে যাও মা, কথা বোলো না।"

খানিক বাদে দম নিয়ে বললুম, "যতক্ষণ পারি বলি বাবা। আচ্ছা বীণা, তা হলে মণির বিয়ে আমার রোগের জন্যে আট্‌কায় না তো।"

"তোমার কথা যে আমি বুঝ্‌তে পারছিনে মাসীমা। মণি যে বলছিল চাকরীতে প্রমোশন না পেলে বিয়ে এখন করবে না!"

"তা বলুক। আচ্ছা তোকে বুঝিয়ে বলচি শোন্—"

বলতে গিয়েও আবার অনেকক্ষণ ভেবে দেখলুম, এ ভিক্ষা চাইব কি না? লতিকা বীণার নিজের সন্তান তো নয়, সে আমাকে আশ্বাস দিতে পারবে না; তবু, একটু চেষ্টা করবে বললেও এই সুদূর যাত্রাপথে ওই দুটি তরুণ মুখে আমি চাঁদের আলোর মত আনন্দের স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তি দেখে চোখ মুদ্‌তে পারি!

অনেকক্ষণ কথা কইলুম না। সমস্ত শরীর যেন সুগভীর শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ছিল। হটাৎ একটা কোথাকার ঘড়ির টং টং আওয়াজে তন্দ্রা টুটে গেল। চম্‌কে বললুম, "কটা বাজ্‌লো?"

মণি বললে, "চারটে!"

বীণা বললে, "মুখ শুকিয়ে উঠ্‌চে,—একটু দুধ খাবে?"

"না।"

"কেন খাওনা একটু—, দে মণি একটু দুধ।"

"না, না, শোন্ বীণা, আমি মরবার আগে আজ তোর কাছে একটা ভিক্ষে চাইব।"

আর্ত্তগলায় ব্যথাবিবর্ণ-মুখে মণি চেঁচিয়ে উঠে বললে, "মা!"

"চুপ কর্ মণি, আমি প্রলাপ বকচিনে আমাকে একটু বলতে দে বাবা।"

আমার গলার স্বর বড় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে যা বলতে চাই, ওরা তা শুনতে পায় না, আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌ছে!

আমার মুখের কাছে কান নাবিয়ে এনে বীণা বল্‌লে "কি বলবে মাসীমা, বল।"

"আগে বল্ রাখবি কথা?"

দেখ্‌লুম, বীণা একটু শিউরে কেঁপে উঠ্‌লো! মণি মুখ ফিরিয়ে ব'সে ছিল, আমি তার মুখ দেখ্‌তে পেলুম না, চারিদিক কেমন ঝাপ্‌সা মনে হচ্ছিল।

বললুম, "বীণা, আমার মণির জন্যে যদি এই লতি—"

"ওঃ বুঝেছি মাসীমা, কিন্তু ওর যে সম্বন্ধ সব ঠিক হয়ে গেছে, আর তো ভাঙ্গা চলবে না—পাকা দেখা সব হয়ে গেছে।"

প্রবল একটা নিশ্বাস পাঁজরের হাড় কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল।

"ঠিক হয়ে গিয়েছে? সে পাত্তর কি—"

"তেজবরে, কিন্তু বড়লোক, খুব—"

শুনতে চাইনে, শুনতে চাইনে, আর আমি চাইনে শুনতে!

পায়ের আর মাথার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, উঃ, কি বিবর্ণ মোমের মত সাদা দুখানি তরুণ মুখ! হায় লতিকা,—সুমুখের কাম্যধন মন্দারতরু ছেড়ে কি পোড়া-কাঠের আশ্রয় নিয়ে ব্যর্থ হ'তেই জন্মেছিলে!

দেহের সমস্ত বাঁধন যেন পটপট্ ক'রে ছিঁড়ে আল্‌গা হয়ে গেল। আমার চারিদিক বেড়ে যেন সন্ধ্যা-তিমির ছেয়ে আস্‌চে।

দূর,—অতিদূর থেকে যেন কানে এসে বাজ্‌চে—"তুলসী-তলায়,—ওরে তুলসীতলায়!"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

করুণাময়

জলধি হইত যদি কালির দোয়াত,
কাগজ এ বসুধা শ্যামল;
চঞ্চল কলম প্রতি বেতসের শাখা,
প্রতি নর লিপিকা-কুশল।

তব কৃপা?—তার কথা লিখিতে লিখিতে
সাগর শুখায়ে যেত প্রভু!
ফুরাত কাগজ, ওগো অসমাপ্ত রত
করুণার কাহিনীটি তবু।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

তিব্বতে মৃতের সৎকার

(বিশ্বপর্য্যটক Dr. Sven Hedin-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বনে।)

তিব্বতে লামাধর্ম্ম প্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্মই অবশ্য ইহার মূল ভিত্তি। কিন্তু নানাপ্রকার বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান আসিয়া ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্ম যাহাই হউক, ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান ইহাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এমন আর কোনও দেশে দেখা যায় না—হিন্দুদের মধ্যেও নয়। ইহাদের তাসি-লামা, দলই লামা, ভিক্ষুসম্প্রদায়, মঠমন্দির, তীর্থস্থান, ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদি ত আছেই, তার উপরে প্রার্থনাচক্র, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ তুকতাকেরও অন্ত নাই। সারাটা জীবন ত এসব নিয়াই কাটে, মৃত্যুতেও তার জের চলে অনেকদূর পর্য্যন্ত।

যখন ইহাদের কাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে বুঝিতে পারে, তখন তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার শয্যার চারিদিক ঘিরিয়া প্রার্থনার মন্ত্র পড়িতে থাকে। যখন মৃত্যু হইল বুঝিতে পারে, অমনি আবার বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয় যাহাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা সহজে শরীরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং ইহজীবনের পরবর্ত্তী সেই অজ্ঞাত পথেরও কতকটা পর্য্যন্ত শান্তিতে অগ্রসর হইতে পারে। মৃত্যুর পর একজন ভিক্ষুর মৃতদেহ তিনদিন তাহার ঘরে রাখা হয়, সাধারণ লোকের মৃত দেহ পাঁচদিন এবং সঙ্গতি অনুসারে আরও অধিকদিনও রাখা হয়, ইহার উদ্দেশ্য যাহাতে মৃতের জন্য প্রার্থনা ও নির্দ্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্যকরূপে পালন করা যায়।

মৃত্যুর পর দেহটিকে সাধারণ ব্যবহারের পোষাকের মতই একটা নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করা হয়, পরে একটা কাপড়ে জড়াইয়া সৎকারভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। ভিক্ষুদের মৃতদেহ তাহারই সহযোগী দুই-একজনে বহিয়া লইয়া যায়। সাধারণ লোকের শব বহিবার জন্য একশ্রেণীর লোক আছে তাহাদিগকে লাগ্‌বা (Lagbas) বলে। এই লাগ্‌বাদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহারা একপ্রকার ঘৃণিত জাতি। ইহাদের সঙ্গে আর কাহারও সামাজিক বন্ধন নাই। ইহারা নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করিতে বাধ্য হয় এবং ইহাদের মধ্যে কেহ অন্য কোন কাজ বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে অনধিকারী বলিয়া ইহাদের জাত-ব্যবসাতেই ইহারা আবদ্ধ। ইহাদিগকে নগরের একপ্রান্তে স্থান দিয়া অত্যন্ত হীন অবস্থায়, মাত্র বাস করিতে দেওয়া হয়। এই হীন অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ইহাদের ঘরের দরজা-জানালায় কপাট নাই—কপাট লাগাইবার হুকুমই নাই! তিব্বতের মত শীত-বাত্যার দেশে ইহা যে কিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ বিশেষভাবে কাজে দক্ষতাও দেখাইতে পারে অথবা যদি তাহার সঙ্গতিতে কুলায় তবুও তাহার ভাল বাড়ীঘর বানাইবার অধিকার নাই। বলা বাহুল্য মঠ বা মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে ইহাদের প্রবেশ নিষেধ। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন আচার-অনুষ্ঠানে ইহাদের কোন অধিকার আছে বলিয়াও বোধ হয় না। নিজের আত্মার সদ্গতি সম্বন্ধে মনে কোন অশান্তির ভাব থাকিলে ইহারা কোন লামাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাহা দ্বারা নিজের আত্মার জন্য প্রার্থনা করাইয়া লয়। মৃত্যুর পরে তাহাদের আত্মা সাধারণতঃ পশু পক্ষী অথবা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের দেহ আশ্রয় করে; এইরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে জন্মজন্মান্তর পরে অবশ্যই তাহারাও নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হয়।

মৃত ব্যক্তিকে সৎকারভূমিতে আনা হইলে তাহার অঙ্গের সমস্ত আবরণ পোষাক পরিচ্ছদ উন্মুক্ত করা হয়। মৃত ব্যক্তি ভিক্ষুসম্প্রদায়ের হইলে তাহার সহযোগী যাহারা তাহাকে বহন করিয়া আনিয়াছে পোষাক পরিচ্ছদ তাহারাই ভাগাভাগি করিয়া লয়, হয়ত পরদিনই তাহারা মৃত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া বসে, ইহাতে তাহাদের একটুও সঙ্কোচ দেখা যায় না। মৃত ব্যক্তি সাধারণ লোক

হইলে তাহার পোষাক পরিচ্ছদ এমন কি স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ইত্যাদিও লাগবাদেরই প্রাপ্য হয়। সঙ্গতিশালী লোকেরা ভিন্ন ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।

বোম্বে প্রদেশের পার্শীদের Tower of Silence আছে; সেখানে মৃতদেহটি ফেলিয়া আসা হয় এবং দলে দলে শকুন আসিয়া তাহার সদ্গতি করে—উদ্দেশ্য যে মৃত্যুর পরেও মানুষের শরীরটা যেন বৃথাই অপব্যয়িত না হয়। তিব্বতেও ঠিক তাই; তবে পার্শীরা Tower of Silence পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া গিয়া মৃতদেহটা আস্ত ফেলিয়া আসে, আর তিব্বতীয়েরা শরীরটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শকুনীদের ভোগের আয়োজন করিয়া দেয়। এইখানেই লাগ্‌বাদের কাজ।

মৃতদেহ সাধারণ লোকের হইলে ত কথাই নাই, ভিক্ষুর মৃতদেহও তাহার সহযোগীরা সৎকারভূমিতে লইয়া আসিয়া পোষাক পরিচ্ছদের বিলি ব্যবস্থা করিয়া এই লাগ্‌বাদের জিম্মায়ই ফেলিয়া যায়। এই কাজের জন্য লাগ্‌বারা প্রতি শবের জন্য প্রায় বার আনা হইতে এক টাকা বার আনা পর্য্যন্ত মজুরী পায়, পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদের কিছু কিছু অংশও পাইয়া থাকে। মৃতদেহ ইহাদের দেওয়া হইলে ভিক্ষুসম্প্রদায়েরা তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়ে—বোধ হয় এই দৃশ্য যাহাতে দেখিতে না হয় এইজন্য অথবা হয়ত সে স্থানের দুর্গন্ধেও তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

সৎকারভূমিতে একটি খুঁটির গায়ে রশি বাঁধা থাকে। শবদেহ লাগ্‌বাদের জিম্মায় আসিলে সেই রশি শবের গলায় বাঁধিয়া তাহারা শবের পা ধরিয়া টানাটানি করিয়া সমস্ত দেহটাকে সোজা করিয়া ফেলে। লামাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ ভিক্ষুরা ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ আসন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। মৃত্যুর পরেও তাহাদিগকে ঐ অবস্থায়ই রাখা হয়। ঐসব স্থলে তিন দিন বা ততোধিক পুরাতন শক্ত দেহটাকে টানিয়া সোজা করিতে লাগ্‌বাদিগকে খুবই বেগ পাইতে হয়! এই প্রক্রিয়া হইয়া গেলে দেহের সমস্ত চর্ম্মাবরণ ছাড়াইয়া লইয়া শরীরের মাংস উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ মস্তকটিও দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তখন লাগ্‌বাদের চীৎকারে শকুনের দল আসিয়া ভোজে প্রবৃত্ত হয়। লাগ্‌বারা ঐখানেই বসিয়া অপেক্ষা করে। বেশীক্ষণ অপেক্ষাও করিতে হয় না, শকুনীদের ভোজের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইলে উহারা আবার কাজে লাগিয়া যায়। ভোজের অবশিষ্ট থাকে শরীরের হাড়গুলি, সেগুলি পাথরে গুঁড়া করিয়া মস্তিষ্কপদার্থের সহিত বেশ করিয়া দলিয়া মাখাইয়া সেগুলি ঢেলা ঢেলা করিয়া আবার পাখীদের খাবার জন্য দেওয়া হয়। হাড়ের গুঁড়ার সঙ্গে মস্তিষ্কপদার্থ না মিশাইয়া দিলে নাকি শকুনীরা তাহা স্পর্শও করে না—বোধ হয় এইজন্যই আমাদের দেশে শকুনীরা শবের মাংস খাইয়া গেলে ভুক্তাবশিষ্ট হাড়গুলি পড়িয়া থাকে। লাগ্‌বারা এই কাজে এতই অভ্যস্ত যে তাহারা কাজের অবসরে বিশ্রাম করিয়া সময় সময় চা পান করিয়া লয় অথবা খাবারও খায়, ইহাতে তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রবৃত্তি হয় না। হয়ত ইহারা সারাজীবন এসব কাজ করা সত্ত্বেও কখনও স্নানের আবশ্যকতা অনুভব করে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে শবের চামড়া না ছাড়াইয়া দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করা হয়; পরে শরীরটা মেরুদণ্ডের সোজাসোজি দুই ভাগে চিরিয়া লইয়া সেগুলি আরও ছোট ছোট টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া তবে শকুনীদের আহ্বান করা হয়। বলা বাহুল্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মৃতদেহই এইরূপ সার্থকতা লাভ করে।

তিব্বতীয়েরা আত্মার সদ্গতির জন্য এতই চিন্তিত বলিয়া বোধ হয় যে মৃত্যুর পরে তাহাদের দেহাবশেষের যে কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবনা অনুভব করে না। মৃত্যুর পরে আত্মীয়-স্বজনেরা আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া দেহটাকে লাগ্‌বাদের জিম্মায় ছাড়িয়া দেয়—সৎকারভূমি পর্য্যন্ত যাওয়াও তাহারা আবশ্যক মনে করে না।

লামাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যের জোরে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হয়, মৃত্যুর পরে তাহাদের দেহ অগ্নিসংস্কৃত করিবার নিয়ম আছে। যিনি এত বড় পুণ্যাত্মা তিনি অবশ্যই ধ্যানস্থ হইয়া অন্ততঃ আসন করিয়া বসিয়াই মৃত্যুলাভ করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা—বলা বাহুল্য ভিক্ষুসম্প্রদায়ই এরূপ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন—তাঁহার চিতাগ্নির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেগুলি ঢেলা

চেলা করিয়া কাটিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা অথবা মন্ত্র-তন্ত্র লিখিয়া রাখে। কেহ কেহ একখানা বড় কাগজের উপরে ধর্ম্মসঙ্গত আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নানারূপ চিত্র আঁকিতে থাকে। আর কেহ কেহ—হয়ত মৃতব্যক্তির ভৃত্যেরা—কাগজের উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত মোহর দ্বারা লাল কালিতে নানাপ্রকার প্রার্থনার মন্ত্র ইত্যাদি ছাপাইতে থাকে। এইরূপ সাত শত কাগজের টুক্‌রা প্রস্তুত করিতে হয়। এদিকে ঘরের ভিতরে যেখানে মৃতব্যক্তি উপবিষ্ট, সেখানে চারিজন ভিক্ষু বসিয়া তাঁহার আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন—এই প্রার্থনা তিন দিন তিন রাত্রি পর্য্যন্ত চলে। মৃতব্যক্তি একটি সুন্দর সুসজ্জিত খাটিয়ার উপরে উপবিষ্ট, তাহার গায়ে চিত্রবিচিত্র পরিচ্ছদ, পায়ে পাদুকা, মুখের উপরে একখানা পাতলা খদখ (Kadakh) কাপড় (আমাদের দেশী খদ্দর নয় ত?), মস্তকে লাল নীল বর্ণের এক আবরণ—অনেকটা মুকুটের মত। বিছানায় উপরে এই মূর্ত্তির সম্মুখে একখানি কাষ্ঠাসনের উপরে কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি এবং বাসনপত্র এবং দুইটি জ্বলন্ত মোমবাতি। সংকারের পূর্ব্বে একটা সাদা জামা পরান হয়। হাঁটুর উপরে একখণ্ড সমচতুষ্কোণ কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই কাপড়খানার উপরে একটি বৃহদাকার বৃত্ত এবং অন্যান্য চিত্র অঙ্কিত থাকে, মাথার উপরে একটি কাগজের টুপি পরান হয়। শ্মশানভূমিতে এই সব পরিচ্ছদে উপবিষ্ট অবস্থায় তাহাকে অগ্নিসংকৃত করা হয়। অগ্নি উৎপাদনের জন্য সেইসব কাঠের চেলা, কাগজ ইত্যাদি সমুদয়ই আহুতি প্রদান করা হয়—উদ্দেশ্য যে ঐসব প্রার্থনা ইহজগতের পরেও আত্মার অনুসরণ করিবে। অগ্নিসৎকারের পরে দেহাবশিষ্ট ভস্ম একজন লামা কৈলাস পর্ব্বতে* লইয়া গিয়া সেখানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটা পবিত্রস্থানে রাখিয়া দেয়।

তিব্বতের প্রাধান ব্যক্তি তাসি-লামা;—মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। সেই উদ্দেশ্যে তাসি-লামার রাজধানী শিগাজীতে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেখানে প্রত্যেক তাসি-লামার সমাধির উপরে একটি সৌধ নির্ম্মিত। সেই সমাধিস্থানে এ পর্য্যন্ত পাঁচটি সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হিসাবে বর্ত্তমান তাসি-লামা—ষষ্ঠ তাসি-লামা। তৃতীয় তাসি-লামা যিনি ছিলেন তিনি একবার (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) মাঞ্চুরাজের আমন্ত্রণে চীন-রাজধানী পিকিনে যাইতে বাধ্য হন; ঘটনাক্রমে সেখানেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। সেখানে এক স্বর্ণনির্ম্মিত শবাধারে তাঁহার দেহ রক্ষা করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত প্রার্থনা ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। পরে পিকিন হইতে শিগাজীতে তাসি-লামপোর সমাধিস্থান পর্য্যন্ত সমস্তটা পথ তাঁহার পবিত্র দেহ মানুষের স্কন্ধে বহন করিয়া আনা হয়। এই সুদূর পথ অতিক্রম করিতে সাত মাস সময় লাগিয়াছিল।

একই দেশে একই জাতির ভিতরে মৃতদেহের সংকারে ব্যক্তিবিশেষে এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই।

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

* কৈলাস পর্ব্বত তিব্বতীয়দের দেশেরই অন্তর্গত। এই পর্ব্বতের উচ্চতা ২১৮১৮ ফুট।

নির্জ্জন অভিসার

[মোমিনের উর্দ্দু হইতে]

মূল

তুম্ মেরে পাস্ হোতে হো গোয়া
যব কোই দুস্‌রা নহিঁ হোতা।

অনুবাদ

আছ যেন কাছে, হে প্রিয় আমার,
আর কেহ কাছে নাহি রবে আর।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

'মরণ হ'লে বাঁচি'

[জওকের উর্দ্দু হইতে]

মূল

অব্ তো ঘব্‌রাকে' কহ্‌তে হৈঁ কি "মর্ যায়েঙ্গে!"
মরকে' ভি চৈন্ ন-পায়া তো কিধর্ যায়েঙ্গে?

অনুবাদ

দুঃখে এখন বলছ বটে "মরণ কবে হ'বে!"—
ম'লেও যদি শান্তি না পাও কোথায় যাবে তবে?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

রবীন্দ্র-পরিচয়

বনফুল

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চম সর্গে সংসারের জটিলতা আরও ঘনাইয়া উঠিল। বনভূমির সরল স্বাভাবিকতা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—মানুষের সংসার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, এখানে মানুষে মানুষে কত ভুল বোঝা কত বিরোধ কত বিক্ষোভ। কেবল নীরদ-কমলাকে লইয়া নহে, চারিদিকে আরও কত অশান্তি কত জটিলতার সৃষ্টি হইল। সমস্ত ঘটনার মধ্যে কাননের সহিত লোকালয়ের পার্থক্য ফুটিয়া উঠিল।

নীরজা বিজয়কে ভালবাসে, কিন্তু বিজয় তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহার সুখ দুঃখ আশা নিরাশার কথা সে নীরজাকে ডাকিয়াই বলে। নীরজা বুঝিল যে বিজয়ের ভালবাসা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল, কমলার প্রতি তাহার মন বিমুখ হইল।

বিজয়ের নিকট নীরজা সখীমাত্র, বিজয়ের নিকট নীরজার নারীমর্যাদা কিছুই নাই, সে অসঙ্কোচে নীরজার নিকট তাহার প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করিয়াছে। কাদম্বরী-কাহিনীতে পত্রলেখার সহিত যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের যে সম্বন্ধ, নীরজার সহিত বিজয়েরও সেই এক সম্বন্ধ। কাদম্বরী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে পত্রলেখা অনাদৃতা কাব্যে উপেক্ষিতা, পত্রলেখার প্রণয়তৃষ্ণার্ত্ত চিরবঞ্চিত নারী-হৃদয়ের কথা বাণভট্ট বিস্মৃত হইয়াছিলেন। (১)

বালক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নীরজার কথা ভুলেন নাই, পঞ্চম সর্গে নীরজার কোমল নারীহৃদয়ের ব্যথিত শোক বেদনায় সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, নীরজা পাশ হইতে তাহাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

বিজয় ঘুমাইতেছে, এ স্থলে আকাশের একটি অদ্ভুত বর্ণনা আছে :—

"বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়,
নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে॥
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি!
ভয়ে ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র প্রাণ মন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন
অবশ্য দুয়ার ধরিত চাপি।" (১)

Weird চিত্র বর্ণনায় বালক-কবির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে ক্ষুধিত-পাষাণের ছবি যিনি আঁকিয়াছেন, বাল্যকালে তাঁহার দ্বারাই ক্ষুধিত আকাশের ছবি আঁকা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ষষ্ঠ সর্গ

এদিকে কমলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে যে তাহার সেই কাননের জীবন এবার ভুলিতে হইবে, মানুষের সংসারে ভাল করিয়া নিজেকে মিলাইয়া দিতে হইবে; এমন সময়ে সে নীরজাকে দেখিতে পাইল, নীরজাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—

"ওই যে নীরজা আসে পরাণ-স্বজনী,
একমাত্র বন্ধু মোর পৃথিবী মাঝার!
হেন বন্ধু আছে কি রে, নির্দয় ধরণী।
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?" (২)

কিন্তু নীরজা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, কমলা ডাকিয়া বলিল—

"ওকি সখি কোথা যাও? তুলিবে না ফুল?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবে না মালা?
. . . .
মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখিজল,
কোথা যাও, কোথা সই, যেও না যেও না।
কি হয়েছে? বল্ বিনে—বল্ সখী বল্!
কি হয়েছে কে দিয়েছে কিসের যাতনা?" (৩)

নীরজা চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে বলিয়া গেল—"জ্বালালি! জ্বলিলি!" নীরজার এই প্রত্যাখ্যান কমলার পক্ষে বড় কঠোর—বড় করুণ, অথচ ইহার জন্য নীরজাকে কোন

(১) ভারতী, ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১১১ পৃঃ।

(১) বনফুল, ৫ম সর্গ, ৫১ পৃঃ জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ, ৩১৮ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।
(৩) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫৫ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।

দোষ দেওয়া যায় না, সংসারে প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটিতেছে এবং তাহার জন্য দায়ী কেবল মানুষের স্বভাব।

কমলা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"জ্বালালি! জ্বলিলি!"—

"কমলা চাহিয়া রয় নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ়দেশে অশ্রুরাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস,
কমলা কহিল ধীরে—জ্বালালি জ্বলিলি!" (১)

কিন্তু বড় দুঃখের সময়েও কমলার দৃষ্টি আবার প্রকৃতির দিকেই ফিরিল, একমাত্র প্রকৃতির কোলেই বনফুলের সান্ত্বনা—

"আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে,
যমুনা-তরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর,
তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজতময় কর।
হেরিল আকাশ পানে, সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে।
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কি মনে লাগিল ভাবিতে!" (১)

নীরদের কথা মনে পড়িল, কমলা কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে নীরদকে ভালবাসায় দোষ কোথায়। সে বিজয়কে বলিয়াছে—

"বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল,
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান।" (২)

কমলা বুঝিতে পারে না যে বিজয়কে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সে কেন নীরদকে ভালবাসিতে পারে না—"এত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?"—কমলা বসিয়া বসিয়া নীরদের কথা ভাবিতে লাগিল।

কমলার সরলতা এরূপ স্বাভাবিক যে সংসারের মাপ-কাঠিতে যাহা কলঙ্ক তাহা কমলাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

"ঘরের ভিতর যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায়, তাহার ধূলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিন্তু বন্য ফুলের ধূলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না—সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধূলাও লাগে, তবু সে কেমন সহজে আপনার নির্ম্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধূলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই—সে সরলা অরণ্যের মৃগীর মত, নির্ঝরের জলধারার মত মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্ম্মল।" (১)

কমলাও অতি সহজে আপনার স্বচ্ছ নির্ম্মলতাটুকু রক্ষা করিয়াছে—কোন মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কমলা দেখিতে পাইল নীরদ চলিয়া যাইতেছে—

"মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা
হৃদয়ে শোণিতরাশি উঠে উথলিয়া।" (২)

কিন্তু—

"যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
যুবক চলিয়া যায়, বালিকা তবুও হায়!
চাহি রহে একদৃষ্টে আঁখি দুই মেলি।"
"ঘুম হতে যেন জাগি, সহসা কিসের লাগি
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়
. . . .
কোথা যাও—কোথা যাও—নীরদ! যেও না!
একটি কহিব কথা শুন একবার।
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত রও—পুরাও কামনা!
কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার!"

কমলা নীরদের নিকট আপনার হৃদয়ের কথা জানাইল। নীরদ বলিল, যে-বিজয়ের জন্য সে এতদিন সমস্ত সহ্য করিয়া আছে এখন সেই বিজয় তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছে, নীরদ চিরদিনের জন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে; কমলার নিকট সে বিদায় চাহিল।

নীরদের প্রতি বিজয়ের ব্যবহারের কথা শুনিয়া কমলা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—

"কমলা তোমারে আহা ভালবাসে বোলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়!
প্রেমেরে ডুবাব আজ বিস্মৃতির জলে
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন?
নিষ্ঠুর! আমারে আর পাবি কি কখন?
পদতলে পড়ি মোর, দেহ কর্ ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?" (৩)

চোদ্দ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে এরূপ স্থলে জোর করিয়া কোন লাভ নাই। "ঘরে বাইরে"তে নিখিলেশ সন্দীপকে কেন তাড়াইয়া দিল না বলিয়া যাঁহারা বিরক্ত

(১) বনফুল সর্গ, ৫৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১পৃঃ।
(২) বনফুল, ৫ম সর্গ ৫৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।

(১) "শকুন্তলা"—(প্রাচীন সাহিত্য, ৩০ পৃঃ) বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আশ্বিন, ২৭৮ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৩ পৃঃ।
(৩) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৩-৬৪পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৪পৃঃ।

হইয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত। বিজয়ের ব্যবহারে কমলার মন সম্পূর্ণ বিমুখ হইল, সে নীরদকে স্পষ্ট বলিল —

"নীরদ ! তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন !" (১)

এমন সময়ে বিজয়ের ছুরিকায় অতর্কিতভাবে আহত হইয়া নীরদ অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

"যুবকের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি রহিল তথায়,
একবিন্দু পড়িল না নয়নের জল
একবারো বহিল না দীর্ঘশ্বাসবায়।" (২)

নীরদ একবার মাত্র চেতনা পাইয়া বন্ধুর কথা স্মরণ করিল, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা শাণিত ছুরি অপেক্ষাও তাহাকে বেশী আঘাত করিয়াছে, তথাপি তাহার বিশ্বাস অটুট যে—"একদিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয়, একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকারে।" কমলার নিকট বিদায় লইয়া নীরদ মারল।

হাতে যতক্ষণ কাজ ছিল কমলার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই, সে স্থিরচিত্তে নীরদের শুশ্রূষা করিয়াছে; কিন্তু কাজ যখন ফুরাইল তখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া উঠিল—

"সমস্ত জগৎ ! ওগো চন্দ্র সূর্য্য তারা !
দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে !
পৃথিবীর পাপ-পুণ্য, হিংসা, রক্তধারা
তোমরাই লিখে রাখ জ্বলদ্ অক্ষরে !
সাক্ষী হও তোমরা গো, করিও বিচার ! —
তোমরা হও গো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর।
বহে যাও !—বহে যাও যমুনার ধার,
নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর।
এখনই অস্তাচলে যেও না তপন।
ফিরে এসো—ফিরে এসো তুমি দিবাকর,
এই—এই রক্তধারা করিয়া শোষণ—
লয়ে যাও—লয়ে যাও স্বর্গের গোচর।

. . . . .

অবাক হউক পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে।
অবাক হইয়া থাক আঁধার নরক।
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে !
প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়ন-পলক !" (৩)

বিজয়কে নীরদ ক্ষমা করিয়াছিল, কিন্তু কমলা ক্ষমা করিতে পারিল না—

"রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন !
বিস্মৃতি ! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে;
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ-হৃদয়ে !
বিষাদ ! বিলাসে তার মাখি হলাহল
ধরিও সম্মুখে তার নরকের বিষ !" (১)

এইখানেই কমলার পরাজয়, তপোবনের গাম্ভীর্য্য তাহার চরিত্রকে স্পর্শ করে নাই, শকুন্তলার স্তব্ধতা তাহার নাই। "মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসার-জ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই;—আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন।" কমলাকেও শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিলাম, কিন্তু সংসারের অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। মানুষের সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ দূরে বিজন কাননের মধ্যে কমলা তাহার চরিত্রে এমন কিছু সঞ্চয় করিবার সুযোগ পায় নাই যাহা তাহাকে তপোবন-লালিতা শকুন্তলার ন্যায় ধৈর্য্যে ক্ষমায় কল্যাণে স্থির রাখিতে পারে।

সপ্তম সর্গ—শ্মশান

সপ্তম সর্গে শ্মশানের ভয়ঙ্কর দৃশ্য বর্ণনা, বালক কবির অসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন—

"গভীর আঁধার রাত্রি, শ্মশান ভীষণ !
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন !
সরসর মরমরে মৃদুস্রোতে তটিনী বহে যায়,
প্রাণ আকুলিয়া বহে বনময় শ্মশানের বায় !
গাছপালা নাই কোথা প্রান্তর গভীর !
শাখাপত্রহীন বৃক্ষ শুষ্ক দেহ উঁচু করি শির
দাঁড়াইয়া দূরে— ......

. . . .

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢাকিয়াছে বুক
হেথা হোথা অঙ্গরাশি ভস্ম মাঝে লুকাইয়া মুখ !
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গার-শিখায়।
বিকট দশন মেলি মানব কপাল
মাংসের অভাবস্তূপ, কড়াকড়ি দেখিতে ভয়াল !
গভীর আঁখি কোটর, আঁধারেরে দিয়েছে আবাস,
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস !" (২)

নীরদের চিতা জ্বলিতেছে—

"ভয় দেখাইয়া যেন নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর মমরাশি ধসে।

(১) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৪ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৪ পৃঃ।
(৩) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৭-৬৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৫ পৃঃ।

(১) বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৯ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৫ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭০-৭১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৫৮ পৃঃ।

একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা নিক্ষেপিয়া আকাশের পরে!' (১)
"তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
নিশীথ-শ্মশান-বায়ু স্বনিছে উচ্ছ্বাসে!
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া!
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে!
শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া!—
নীরব শ্মশানময় তুলি প্রতিধ্বনি!
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি!" (২)

চিতার পাশে কমলা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে—

"এ হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা!
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ!
শূন্য নেত্রে, শূন্য হৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ন নিবেশ!" (৩)

কিন্তু কমলার মন ফিরিয়া যাইতেছে সেই বিজন কাননে—

"সুধাময়ী বীণাখানি লোয়ে কোল পরে—
সমুচ্চ হিমাদ্রি শিরে বসি শিলাসনে—
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে!
হরিণেরা বন হোতে শুনিয়া সে স্বর—
শিখরে আসিত ছুটি আহার ভুলি!
শুনিত ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর—
বড় বড় আঁখি দুটি মুখ পানে তুলি!" (৩)

কমলার ইচ্ছা করিতেছে সেই বিজন কাননে ফিরিয়া যায়—

"আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল
তটিনী বহিছে যেথা কল-কল স্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বনফুলদল।" (৪)

চিতা যতক্ষণ জ্বলিতেছিল, কমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু চিতা যখন নিভিয়া আসিল, তখন সেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ক্রমে চিতা সম্পূর্ণ নিভিয়া গেল, রাত্রি ভোর হইয়া আসিল—

"ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্ব্বাশার সুবর্ণ তোরণে,
রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতি ভালে দিল পরাইয়া।" (৫)

(১) বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭২-৭৩ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৫৯ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র ৪৫৯-৪৬০ পৃঃ।
(৩) বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৫ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৬০ পৃঃ।
(৪) বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৬-৭৭ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৬০—৪৬১ পৃঃ।
(৫) বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৬১ পৃঃ।

সকালবেলা কমলা শ্মশান হইতে উঠিয়া মানুষের লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম সর্গ—বিসর্জ্জন

কমলা তাহার সেই পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই—

"আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর!
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।
* * * *
কুটীর তটিনীতীরে, লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিল-দর্পণে!
হরিণেরা তরু-ছায়ে, খেলিতেছে গায়ে গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপ-কম্পনে।" (১)

কমলা লোকালয়ে যে দারুণ আঘাত পাইয়াছে তাহা ভুলিবার স্থান আর কোথায় সে পাইবে?—

"মুছিতে লো অশ্রুবারি এসেছি হেথায়।
তাই বলি পাপীয়ারে! গান কর্ সুধাধারে
নিবাইয়া হৃদয়ের অনলশিখায়!
তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে!
কিন্তু সেই ছেলেবেলা যেমন করিতে খেলা
তেমনি করিয়া খেলো নির্ঝরের সনে!
* * * *
তেমনি খেলিয়ে চল্, তুই লো তটিনীজল!
তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার।
নির্ঝর তেমনি কোরে ঝাঁপিয়া সরসী পরে
পড়্ লো উগরি শুভ্র ফেনরাশিভার!" (২)

কিন্তু মনের ভিতর সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—

"নির্ঝরের ঝরঝরে হৃদয় তেমন কোরে
উল্লাসে হৃদয় আর উঠে না নাচিয়া!
কি জানি কি করিতেছি, কি জানি কি ভাবিতেছি,
কি জানি কেমনধারা শূন্যপ্রায় হিয়া!
*
জুড়ায়ে হৃদয়ব্যথা দুলিবে না পুষ্পলতা
তেমন জীবন্তভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণহীন যেন সবি—যেন রে নীরব ছবি
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়!
*
দেখিয়া লতার কোলে, ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—
হৃদয় নাচে না ত গো তেমন উল্লাসে!
তেমন জীবন্ত ভাব নাই ত অন্তরে।" (৩)

(১) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৭৯—৮০ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৭ পৃঃ।
(২) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৭ পৃঃ।
(৩) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৩-৮৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮ পৃঃ।

পাখীদের কথা মনে পড়িল—"ছায়াকুঞ্জে শুনি গিয়া শুকদের গান"; কিন্তু পাখীর গানও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—

"শুক আর গাবে না কো খুলিয়ে পরাণ !
সেও যে গো ধরিয়াছে বিষাদের তান।" (১)

কিন্তু—

"তবুও যাহাতে হোক্ নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল !
তবুও ত আপনারে ভুলিতে হইবে হা রে !
তবুও নিভাতে হবে হৃদয়-অনল !" (২)

হরিণের কথা মনে পড়িল—

"মালা গাঁথি ফুলে ফুলে, জড়াইব এলো চুলে,
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গল !
বড় বড় দুটি আঁখি, মোর মুখ পানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল !" (৩)

কমলা হরিণের সন্ধানে কাননে প্রবেশ করিল, কিন্তু হায় তাহারাও কমলাকে ভুলিয়া গিয়াছে—

"হরিণ নিঃশঙ্ক মনে শুয়ে ছিল ছায়া-বনে
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি নয়নদ্বয় মুখপানে চাহি রয়
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।
ছুটিছে হরিণচয়, কমলা অবাক্ হয়,
নেত্র হতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রুজল,—
ওই যায়—ওই যায়—হরিণ হরিণী হায়—
যায় যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।" (৪)

কমলা তাহাদের ফিরাইবার জন্য কত ডাকিল—

যাস্‌নে—যাস্‌নে তোরা, আয় ফিরে আয়,
কমলা—কমলা সেই ডাকিতেছে তোরে !
সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে,
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে !
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে !
কোথা যাস্—কোথা যাস্—আয় ফিরে আয় !
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা !
কারে ভয় করি তোরা যাস্ রে কোথায়
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ ! আয় লো চপলা !" (৪)

কিন্তু তাহারা কমলাকে ভুলিয়া গিয়াছে—

"এলিনে—এলিনে—তোরা এখনো এলিনে—
কমলা ডাকিছে যে রে তবুও এলিনে !
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে ?" (৪)

লোকালয়ের চিহ্ন সে সম্পূর্ণ ঘুচাইয়া দিয়া আবার ডাকিল—

"খুলিয়া ফেলিনু এই কবরী বন্ধন,
এখনও ফিরিবি না হরিণের দল ?
এই দেখ্—এই দেখ্—ফেলিয়া বসন
পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল !" (১)

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বিজন কাননে কমলার আর প্রবেশাধিকার নাই। শকুন্তলা সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"তাহার পূর্ব্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্ব্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্য বিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত।" (২)

কমলার পক্ষেও তাহাই ঘটিল, সে কাননে ফিরিয়া আসিল বটে কিন্তু আশ্রয় পাইল না। কমলা তাহার শিশুকালে যে স্বর্গে ছিল, তাহা সুন্দর তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণের পর সেখানে আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। লোকালয়ের জন্য কমলা বনভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সংসারের জটিলতা প্রবৃত্তির উন্মত্ততা হিংসার দাবদাহে বিশ্বের গোপন বক্ষহত্যা কমলাকে ত্রাসে বিস্ময়ে বেদনায় বিহ্বল করিয়া দিল, সে ব্যথিত হৃদয়ে তাহার শৈশব-স্বর্গে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সংসারের কঠিন স্পর্শে তরুলতাপশুপক্ষীর সহিত কমলার সেই স্নেহের সম্বন্ধ সেই মাধুর্য্যের যোগ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বিজন কানন আজ আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না। বনভূমির এই কঠিন নিদারুণ প্রত্যাখ্যান বেদনা-কাতর কমলার পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক সকরুণ! বনফুলের ট্রাজেডি এইখানেই চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে—নীরদের মৃত্যু একটি দুঃখাবহ ঘটনামাত্র, মৃত্যু শোক সকলকেই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু কমলার ন্যায় এইরূপ দুঃসহ দুঃখ বেদনা ত সকলকে বহন করিতে হয় না।

য়ুরোপীয় কাব্যরীতি অনুসারে বনফুলের করুণ গীতি দুই স্থলে থামিতে পারিত। সপ্তম সর্গে যদি গল্প শেষ

(১) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮২ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮ পৃঃ।

(২) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৩ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮ পৃঃ।

(৩) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮২ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮ পৃঃ।

(৪) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৫-৮৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮-৫৬৯ পৃঃ।

(১) ৮ম সর্গ, ৮৫-৮৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৯ পৃঃ।

(২) "শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য, ৩২-৩৩ পৃঃ। বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আশ্বিন, ২৮৫ পৃঃ।

করা হইত তবে জ্বলন্ত চিতার পাশে মূর্চ্ছিত কমলার চিত্র পাঠকের মনকে অসমাপ্ত বেদনায় চিরদিন ব্যথিত করিয়া রাখিত। বাহিরের দিকে সেইখানেই ট্রাজেডি অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি নীরদের মৃত্যু কমলার পক্ষে চরম দুঃখ নহে, তাহা অপেক্ষা কঠিন আঘাত কমলাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, ভিতরের দিক দিয়া করুণ-গীতি এখানেও সমাপ্ত হইতে পারিত। ইহার পরে কমলা যে মরিল, ট্রাজেডির পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক নহে।

কিন্তু ভারতবর্ষের কবি সেখানেও কাব্য শেষ করিলেন না। মৃত্যুর মধ্যে কমলা যে পরম শান্তি লাভ করিল কবি তাহা দেখাইলেন। কাব্যের শেষভাগে হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস সংযত হইয়া আসিয়াছে, বর্ণনার অত্যুজ্জ্বলতা শেষ হইয়া গিয়াছে—কমলার মৃত্যুদৃশ্য প্রশান্ত গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ।

কমলা হিমালয়ের শিখর আরোহণ করিতেছে—

"এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর!
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারিদিক গেছে খুলে
উপত্যকা বনভূমি বিপিন ভূধর!
তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্রপথে দিল দেখা—
বৃক্ষছায়া ডুলাইয়া বহে বহে যায়!
ছোট ছোট গাছপালা
সঙ্কীর্ণ নির্ঝরমালা
সবি যেন দেখা যায় রেখা-রেখা-প্রায়।
গেছে খুলে দিখিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক—
কোথা কুঞ্জ—কোথা বন—কোথায় কুটীর!
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর!
. . . . . .
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা,
কে কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথায়!
বন গিরি লতা পাতা আঁধারে মিশায়!
. . . . . .
অনন্ত তুষার মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মোহ স্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে
চৌদিকে তুষাররাশি শিখর আবরি!
উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি—
জলদে মস্তক ঘিরি,
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন!
. . . . . .
অনন্ত আকাশ মাঝে একেলা কমলা!
অনন্ত তুষার মাঝে একেলা কমলা!
আকাশে শিখর উঠে—
চরণে পৃথিবী লুটে
একেলা শিখর পরে বালিকা কমলা!" (১)

এইরূপে মৃত্যুর মধ্যে প্রকৃতির সহিত মিলন চরম পরিপূর্ণতা লাভ করিল।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

তেরো চোদ্দ বছর বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথ যে এই আখ্যায়িকাটি নির্বাচন করিয়াছিলেন ইহা আমরা একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুগভীর সম্বন্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের নানাস্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপোবনকে আশ্রয় করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলন যে এই ভারতবর্ষেই একদিন চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এ কথা কবির মনকে চিরদিন নাড়া দিয়াছে। বাল্যকালেও কাব্যের বিষয় নির্বাচন করিবার সময়ে তিনি প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বালকসুলভ কল্পনায় তিনি বিজন কাননের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিলেন, প্রথম সর্গে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে কমলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু এই একান্ত স্বভাবগত সম্বন্ধের মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব ছিল—ইহা লোকালয়ের সংস্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারিল না, অষ্টম সর্গে কমলার সহিত বিজন কাননের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

"বনফুলের" মধ্যে বিজন কানন ও তপোবনের পার্থক্য সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। "তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম্ম পালিত হইত"; সেখানে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নহে, সমাজগত ভাবে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত। কণ্বাশ্রমের পরিপূর্ণতা শকুন্তলার চতুর্দ্দিকে এমন একটি অক্ষয় কবচ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল যাহা সংসারের সমস্ত দুঃখ-আঘাতেও বিনষ্ট হয় নাই এবং যাহা সকল বিপদ-বিক্ষোভের মধ্যেও শকুন্তলাকে রক্ষা করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে অন্য আরেকটি আশ্রম, মরীচির তপোবন "শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান"

(১) বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৭-৮৮, ৯১-৯২ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৯-৫৭১ পৃঃ।

করিয়াছিল। বিজনকানন মানব-সমাজের সম্পূর্ণ বহির্বর্ত্তী, সেইজন্য সেখানে পরিপূর্ণতার অভাব ঘটিয়াছে, বিজনকানন কমলার চরিত্রে এমন কোন শক্তিসঞ্চার করিয়া দেয় নাই যাহা সংসারের আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। অষ্টম সর্গে কমলা যে বনভূমিতে কোন আশ্রয় লাভ করিতে পারিল না তাহারও ঐ একই কারণ— বনভূমি তপোবন নহে।

বনভূমি ও তপোবনের পার্থক্য বালক কবি ইচ্ছা করিয়া দেখাইয়াছেন একথা বলিতেছি না, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেও বালক রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কমলার পরাজয়ের ভিতর দিয়া বিজনকাননের ব্যর্থতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তপোবনের সার্থকতা ও শকুন্তলার জয় ধ্বনিত হইয়াছে। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় সহানুভূতির ইহাও একটি নিদর্শন।

অন্যান্য কবির প্রভাব

বনফুলের ভাষা ও ছন্দ রূপের আলোচনা করা হয় নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব এই সময়ের অনেক লেখার মধ্যেই দেখা যায়। "কবি-কাহিনী", "ভগ্ন-তরী" প্রভৃতি গাথা ও অন্যান্য গীতি-কবিতার পরিচয় দিয়া তাহার পরে এসম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। সেই সময়কার বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি নূতন সুর যোগ করিলেন তাহাও পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

রজনীগন্ধা

(২৩)

ঘরের ভিতর চারিদিকে জিনিষ ছড়ানো। ছেঁড়া কাগজ, দড়ির টুক্‌রা, ময়লা চট স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। জান্‌লা দরজা অধিকাংশই বন্ধ। বাড়ীতে যে মানুষ আছে তাহার একমাত্র পরিচয় একটি শিশুর গলার স্বরে পাওয়া যাইতেছে।

"মাসিমা, আমরা কি আবার গিরিডি যাব?"

ক্ষণিকা বেণুর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই মৃদু স্বরে বলিল, "না বেণু, গিরিডি যাবে না, তুমি তোমার পিসিমার বাড়ী যাবে।"

"আর তুমি কোথায় যাবে? দিদিমা কোথায় যাবে? মামাবাবু কোথায় যাবে?"

ক্ষণিকা বাক্সে কাপড় গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "আমরাও সকলে বেড়াতে যাব।"

"কোথায় বেড়াতে যাবে বলনা? মামীমার কাছে যাবে বুঝি? যেও না, মামীমা দুষ্টু, কেন রাত্তির বেলা চ'লে গেল?"

ক্ষণিকা বলিল, "যাও বেণু, বাইরে লিলি তোমায় ডাকছে। খেলা কর গিয়ে, আঁধার ঘরে ব'সে ব'সে কি কর্‌বে?"

বেণু ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা আবার নিজের কাজে মন দিল। একটার পর একটা করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় বাক্স গোছান হইয়া যাইবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতরের ম্লান আলোতে বুঝিবার কোনো উপায় নাই যে বেলা কতখানি হইয়াছে। সাম্‌নের জান্‌লাটা খুলিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল। রোদ তখনও বেশ প্রখর, বেলা সাড়ে তিনটা হইবে। আবার নীচে নামিয়া বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ক্ষণিকা ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সাম্‌নের কাজটার চিন্তামাত্রেই তাহার সারা মনটা যেন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কি দরকার এই তুচ্ছ অভিনয়ের? সংসার যেখানে নাই, সেখানেও কেন জোর করিয়া এই সংসারের খেলা?

ক্ষণিকা কদমকে ডাকিয়া বলিল, "কদম, যাও ঠাকুরকে

ব'লে এসো একেবারে রান্না চড়াতে। চা আজ আর হবে না। বাবু কি ফিরেছেন?"

"না দিদিমণি। বেণুদিদির দুধ কি আমি খাইয়ে দেব, না আপনার কাছে নিয়ে আসব?"

"না যদি কাঁদে, তা হলে তুমিই দাও গিয়ে খাইয়ে।"

কদম নামিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর ঘরের দরজা খোলা, ক্ষণিকা একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। তিনি সেই একইভাবে খাটের উপর পড়িয়া আছেন। মনোজার মৃত্যুর পর আর কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে পারে নাই। এ পাশের ঘরের কপাট বন্ধ, উহা খুলিয়া দেখিবার সাহস এ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই।

গেটের সাম্‌নে দরোয়ান বসিয়া গুটি দুই-তিন স্বদেশী লোকের সহিত গল্প করিতেছে। পথে লোকজন বিশেষ নাই, মাঝে মাঝে আরোহীহীন এক-একটা গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে, কোনো রকম তাড়া তাহাদের নাই, পৃথিবীতে কাজ বলিয়া যেন জিনিষই নাই, যেমন খুসি চালে পথ চলিলেই হইল।

"বাড়ীর সকলে কোথায়?"

ক্ষণিকা সচকিতভাবে ফিরিয়া তাকাইল। তাহার পিছনে একজন মহিলা দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া সে মনে করিতে পারিল না। কিন্তু মুখের মধ্যে, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে কোথায় যেন একটু পরিচিত ভাব। এ কাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়? যে অনিন্দ্য রূপের এখন পৃথিবীতে আর ছায়ামাত্রও অবশিষ্ট নাই, কোথা হইতে এই মানুষটি তাহার আভাস লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল?

ক্ষণিকা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "বাড়ীর লোক আর আছে কে? মাসিমা ঐ ঘরে আছেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

মহিলাটি গৃহিণীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "আমাকে আর চিন্‌বে কি ক'রে? আমাকে দেখনি আগে কখনও। যাকে খুব চিন্‌তে আমি তারই বড় বোন। অনাদি কোথায়?"

ক্ষণিকা বলিল, "জানি না, খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।"

এমন সময় বৃদ্ধা গৃহিণী ঘরের ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে কথা কইছ গা? এ দিকে এস, দেখি একবার।"

আগন্তুক মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া ক্ষণিকা তাঁহার ঘরে ঢুকিল। গৃহিণী তাঁহাকে চিনিবামাত্র ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্ষণিকার চোখের সম্মুখে ঘরখানা ঝাপসা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এরকম করিয়া আর কতদিন কাটিবে? ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়া কোনো লাভ নাই, কারণ ভবিষ্যতের বিধান যিনি করেন তিনি মানুষের ভাবনার ধার ধারেন না। কিন্তু না ভাবিয়াও যে মানুষ পারে না? ক্ষণিকার জীবনের যেটুকু পথ সে অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহাতে পদে পদে কাঁটা মাড়াইয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে, কিন্তু তবু ত তাহা চলা। এমন করিয়া গভীর অন্ধকারের কারায় বন্দিনী হইয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া?

মনোজার মৃত্যুর পর কয়েকদিন বাড়ীর সকলেই কেমন যেন অভিভূতের মত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু ভাবিবার বা কিছু করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। প্রতিবেশীদের সযত্ন সেবার গুণে সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু মানুষ কয়টি কেমন যেন পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া গেল। সংসারের ভার তাহার উপর ছিল, কাজেই বাধ্য হইয়া ক্ষণিকাকে চাকরবাকরের সঙ্গে কথা বলিতেই হইত। বেণু তখনও আসে নাই, গৃহিণীর সঙ্গে কথা বলিয়া কোনো লাভ ছিল না। আর অনাদিনাথ?

মনোজার মৃত্যুর পর হইতে পরিচিত-জগৎ যে-অনাদিনাথকে জানিত, তাহাকে আর খুঁজিয়া পায় নাই। সত্য বটে, সেই আকারের এবং সেই নামধারী একজন মানুষ তখনও লোকের চোখে পড়িত, কিন্তু তাহাকে পূর্ব্বের পরিচিত বলিয়া দাবি করিতে কেহ সাহস করিত না। তাঁহার কাজকর্ম্ম আগে যে নিয়মে চলিত, এখনও তাই চলে, তাহার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু এইসকল কর্ম্মের মধ্যে যে প্রাণবান মানুষের সংস্পর্শ আছে তাহা আর মনে হয় না। ক্ষণিকা আর তাঁহার মুখের দিকে একবারও চাহিয়া দেখে নাই। কথা বলিবার প্রয়োজনও ছিল না, সুযোগও মিলিত না। অনাদিনাথ তাহার মনোজগতে এখন

আছেন কি নাই, এ চিন্তাকে সে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিত। আর এখন সে কথা ভাবিবার উপায় নাই। জীবিতলোকে যাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ক্ষণিকা মনে মনেও সম্বোধন করিয়াছিল, আজ মৃত্যুর পরপার হইতে তাহার অপরাজেয় আধিপত্য সে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইল। তাহার অনুভূতির সঙ্গে যাহা এমন ভাবে মিশিয়া আছে তাহাকে দূর করিতে হয়ত সে পারিবে না, কিন্তু আর তাহাকে মানিয়া লইবার উপায় নাই।

গৃহিণীর কান্নার শব্দ থামিয়া গিয়াছে, ক্ষণিকা আবার ধীরে ধীরে তাঁহার ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘরের ভিতর পদার্পণ করিয়াই সে প্রথম কথা শুনিল—"অনাদি কি কর্‌বেন ঠিক করেছেন?"

গৃহিণী অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিলেন, "সে ত কাজ ছেড়ে দিল। বেড়াতে বেরবে বল্‌ছে, জানি না মা কোথায় যাবে। সবাই ত ছেড়ে গেল, তবু আমার মরণ হয় না বাছা! এমন কপাল নিয়ে আর কেউ জন্মায়নি।"

মনোজার দিদি বলিলেন, "আপনার খুব ভাল ব্যবস্থা না ক'রে কি আর যাবেন? মন এখন খারাপ, তাই বেরিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছেন, কিন্তু মানুষের মন সময়ে আবার ত বদ্‌লায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমার আবার ব্যবস্থা! একেবারে মুখাগ্নিটা ক'রে যেত, তাহলে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হত। নাত্‌নীটা কাছে ছিল, তাকেও ত পিসি নেবার জন্যে দুই হাত বাড়িয়ে আছে। আমি যাচ্ছি ভাইয়ের ঘাড়ে জাঁতে, আর যাব কোন্ চুলোয়?"

আর কোনো কথা হইল না। অল্পক্ষণ পরেই আগন্তুক মহিলা বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ক্ষণিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। গৃহিণীর ঘর হইতে খানিকটা দূরে আসিয়া তিনি বলিলেন, "তোমাকে দেখিনি, কিন্তু জানি খুব ভাল ক'রেই। যা আমার কর্‌বার ছিল সে কাজ তুমিই করেছ, হয় ত আমার চেয়ে ভাল ক'রেই করেছ।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমার কাজই আমি করেছি, তাও যতটা কর্‌বার ছিল তা কর্‌তে পারিনি।"

মনোজার দিদি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি কি এর পরেও কাজ কর্‌বে?"

ক্ষণিকা বলিল, "কর্‌তে হবে বই কি। আমার শক্তি হয় ত শেষ হয়ে আস্‌ছে, কিন্তু প্রয়োজনের শেষ ত কোথাও দেখ্‌ছি না।"

ক্ষণিকার দুই হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, "আমার কাছে আস্‌বে? ওর আর কোনো চিহ্ন আমার কাছে নেই, তোমাকে সে ভালবাস্‌ত তা আমি জানি। তুমি চল আমার সঙ্গে।"

ক্ষণিকার বুকের ভিতরটা তীব্র বেদনায় শিহরিয়া উঠিল। মনোজার স্মৃতিচিহ্ন হইয়া কিনা শেষে তাহাকেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? নিয়তির তাহাকে লইয়া পরিহাসের এখনও কি অবসান হয় নাই?

নবাগতা বলিলেন, "কি বল? আস্‌বে?"

ক্ষণিকা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "এখন কিছুদিন ত পার্‌ব না, পরে ভেবে দেখ্‌ব।"

"আচ্ছা, আমি গিয়েই তোমায় চিঠি লিখ্‌ব, ঠিকানাটা রেখো। কখনো যদি আস্‌তে ইচ্ছা হয় এসো।" তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্ষণিকা সেই ধূলিময় সিঁড়ির উপর বসিয়া নিজের চিন্তাকে একেবারে রাশ ছাড়িয়া দিল। ভাবনাকে অত ঠেকাইয়া রাখিবারই বা প্রয়োজন কি? একবার শেষ অবধি ভাবিয়া দেখা যাক না, কতদূর ভাবা যায়? ভাবনা বা কল্পনার অতীত দুঃখও যদি কিছু থাকে ত থাক। সম্প্রতি যাহাদের ধারণার গণ্ডীর ভিতর আনা যায় তাহাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাক।

বিদায়ের ক্ষণ ত আসিয়া পড়িল। আজ নাই হোক, দু তিন দিনের মধ্যেই। ইহা যে চিরদিনের মত বিদায় সে বিষয়ে বিধাতা এবার আর কোনো সন্দেহ রাখেন নাই। আবার যদি শতবারও ক্ষণিকাকে এই পৃথিবীতে নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও যে জীবনকে সে আজ বিদায় দিতেছে তাহার ভিতর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। পারিবে ত নাই, যাইতে চাহিবার অধিকারও তাহার থাকিবে না। কিন্তু ইহার পর সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? তাহার জগৎ সংসার সকলই ত এক চিতায় ভস্ম হইয়া গেল, কিন্তু সে যে বাঁচিয়া আছে এবং থাকিবেও? স্বর্গ সে চায় না, পৃথিবীকে ভগবান তাহার

পায়ের তলা হইতে সরাইয়া দিলেন। এখন তবে কোন্ শূন্যতার মধ্যে মাটির মানুষ সে আশ্রয় পাইবে? তাহার প্রাণ যায় নাই, কিন্তু প্রাণ ধারণের উপায় কোথায়? পাওয়ার দিকে সে কিছুই পায় নাই, কিন্তু দিবার সুযোগ তাহার ছিল, ভাবিবার সুযোগ তাহার ছিল। কিন্তু এখন ত সংসারে এমন কেহ রহিল না যে তাহার দান গ্রহণ করিবে, পরলোক হইতে যাহার দিকে এমন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা বাহু বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহার ভাবনা ভাবিবার মত সাহস ক্ষণিকার নাই। জীবিতের ধন অপহরণ করা যায়, কিন্তু দেহত্যাগ করিয়া যে চলিয়া গিয়াছে তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ ত চিন্তাতেও করা যায় না। আর কাহাকেই বা সে কামনা করিবে? মনোজা নাই, কিন্তু অনাদিনাথই বা আছেন কোথায়? যে মানুষকে তাহারা দুজনে ভালবাসিয়াছিল, একজন যাহাকে মনোমন্দিরে অশ্রুর অর্ঘ্যে নিরন্তর পূজা করিয়াছে, আর একজন যাহাকে আপনার দেহ মন হৃদয়ের সকল সম্পদ দিয়া ধন্য হইয়াছে, তিনি আজ কোথায়? মনোজার চিতায় কি ক্ষণিকার পরিচিত অনাদিনাথও ভস্ম হইয়া যান নাই? মনোজার প্রিয়তম যিনি ছিলেন, সে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়াই হয়ত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন যাঁহাকে দেখা যায়, ক্ষণিকার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নাই, সে তাঁহার দিকে তাকাইতেও পারে না।

নীচে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া সে সিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। কাজ এখনও তাহার ফুরায় নাই। তাহার এতকালের চেনা সংসারকে বিদায় দিবার আয়োজন ত তাহাকেই করিতে হইবে? কিন্তু সে আয়োজন ত একলা সে করিতে পারিবে না! এই বিসর্জ্জনের ব্যাপারে আর-একটি অন্ততঃ মানুষের সাহায্য তাহার দরকার। ক্ষণিকা তাঁহারই সন্ধানে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচের তলায় সর্ব্বত্র সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিয়াছে। একটা ঘরের দরজার ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা বাহিরের আঁধারের গায়ে স্থির বিদ্যুতের মত হাসিতেছে। ক্ষণিকা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে আস্‌বো?"

অনাদিনাথ চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন।"

ক্ষণিকা ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "মাসিমা যাবার পর ত আমি থাক্‌তে পার্‌ব না, সেই কথা বল্‌তে এলাম।" ইহাও তাহাকে বলিয়া দিতে হইল! তাহার ভাবনা অতটুকু ভাবিবারও যে কেহ নাই!

অনাদিনাথ বলিলেন, "তা ত বটে! আমার মনে ছিল না। বেণুকে পরশু তার পিসিমা নিয়ে যাবেন, আপনিও তা হলে তার পরই যাবার বন্দোবস্ত কর্‌বেন। আমার দ্বারা কিছু সাহায্য হয় ত জানাবেন।"

ক্ষণিকা দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "মাসিমা কবে যাবেন?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "ঠিক নেই, আমি বেরবার আগে তাঁকে আমার মামার কাছে রেখে যাব।"

ক্ষণিকা বাহির হইয়া আসিল। আর দুইটা দিন মাত্র। তাহার পর কি হইবে তাহা ভাবিয়া কি স্থির করা যায়? কই, যতখানি বেদনা সে অনুভব করিবে মনে করিয়াছিল, ঠিক তেমন ত বোধ হইতেছে না, তাহার ব্যথার অনুভূতিও কি মরিয়া গেল? কিন্তু দুঃখ গেলে তাহার থাকিবে কি? জীবনের পথে সঞ্চয়ের ঘরে এই বেদনার ধন ছাড়া তাহার কিছুই জমে নাই। তাহাও যদি আজ হারায় তাহা হইলে যে রিক্ততার মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইবে তাহাকে সে কল্পনাও করিতে পারে না।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে রাত্রির বিপুল অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। নিজের ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া ক্ষণিকা এতদিনের সযত্নে সজ্জিত নীড়কে আপন হাতে টানিয়া ভাঙিতে লাগিল। এই ঘর থাকিবে, এইসব তুচ্ছ জিনিষ-গুলাও এখনই ধরার পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে না, কিন্তু ক্ষণিকার ঘর কি আবার কোথাও আকার গ্রহণ করিবে? যে মনোভাব হইতে মানুষের গৃহ জন্মলাভ করে, তাহা কোথায় কোন্ শূন্যে এখন উড়িয়া বেড়াইতেছে। ধরণীর কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের বন্ধনে আর কি তাহারা কোনোদিনও বাঁধা পড়িবে?

অনেক রাত অবধি জাগিয়া থাকিয়া ক্ষণিকা এই বিনাশের যজ্ঞে আহুতি দিল। ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ার

পরেও তাহার অতন্দ্রিত বেদনা বদ্ধ হৃদয় এই গৃহেরই প্রতি কোণে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সারারাত স্বপ্নের ঘোরে সে এই গৃহের মধ্যে, তাহার চিরদিনের জন্য হারানো বিগত জীবনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। জাগরণ-লোকে যাহা আর থাকিবে না, স্বপ্নের করুণাময় লোকে তাহাই যেন তাহার কাছে সকলের চেয়ে সত্য হইয়া উঠিল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আর একটিমাত্র রাত্রির অবসানে সে এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে দেখিতে পাইবে। তাহার পর অসংখ্য রাত্রি অসংখ্য অবসান লইয়া ত তাহার সম্মুখের জীবন পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোন্ দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইবে?

নীচে নামিতেই অনাদিনাথের দরোয়ান তাহার হাতে একখানা খাম দিয়া বলিল, "বাবু ভোরেই বেরিয়েছেন, এইটা আপনাকে দিতে ব'লে গিয়েছেন।"

ক্ষণিকার হৃদয় কি যেন একটা আশায় চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে আপনাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কঠিন হস্তে খামখানা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কয়েকখানা নোট, আর কিছু নাই।

ক্ষণিকার মুখে হাসি দেখা দিল। এই ত ঠিক। ইহার চেয়ে উপযুক্ততর বিদায়বাণী আর কিছু হইতেই পারে না। তাহার দিকে যাহাই থাক, অন্য দিকে টাকার পরিবর্ত্তে কাজ—এ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ক্ষণিকার টাকার প্রয়োজন কোনওদিন কম থাকিত না। কিন্তু তবু এ টাকা সে প্রয়োজনের জন্য গ্রহণ করিতে কিছুতেই পারিল না। দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "আমায় একশ টাকার মধ্যে একটা ছোট সোনার হার কিনে এনে দিতে পার?"

এ বাড়ীতে আসিয়া খেয়ালী মনিবের পাল্লায় পড়িয়া তাহাকে অনেকরকম অচিন্তনীয় ব্যাপার করিতে হইয়াছে, অগত্যা সে স্বীকার করিল।

সেদিন ভাত খাইবার সময় বেণুকে ক্ষণিকা লাল শাড়ী পরাইয়া, ভাল করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সোনার হারটা তাহার গলায় পরাইয়া দিল। বেণুর ত আনন্দ ধরে না। ক্ষণিকা তাহাকে কোলে করিয়া খাওয়াইতে বসিল, ইহা দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বুঝি আজ জন্মদিন মাসিমা? ও মাসের জন্মদিনে ত সোনার হার দাও'নি?"

ক্ষণিকা চোখ মুছিয়া বলিল, "এই মাসের জন্মদিনেই সোনার হার পরে। আচ্ছা বেণু, মাসিমাকে তোমার মনে থাক্‌বে?"

বেণু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ। আমি তোমাকে ভুল্‌বই না, আবার পাঁচ দিন পরে পিসিমার বাড়ী থেকে পালিয়ে আসব।"

দিনটা দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। শুইতে যাইবার আগে বৃদ্ধা গৃহিণীর কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষণিকা বলিল, "মাসিমা, কাল আমি যাচ্ছি। অনেকদিন আপনার কাছে ছিলাম, দোষ অনেক হয়েছে, কিছু মনে রাখ্‌বেন না।"

গৃহিণী তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া আনিয়া আবার কান্না জুড়িয়া দিলেন। ক্ষণিকার চোখের জলও অবাধে ঝরিতে লাগিল। যাহা বলিবার তাহা ভাষায় ত আর কুলায় না, চোখের জলের ভিতর দিয়াই এক বলা চলে।

বেণু পরদিন সকালেই চলিয়া গেল। যাইবার সময় সকলের চোখের জল তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে কেমন যেন ভয়চকিত করিয়া তুলিল। সে ক্ষণিকার গায়ে মাথা গুঁজিয়া কেবলি বলিতে লাগিল, "মাসিমা, আমি পরশু চ'লে আস্‌ব।" ক্ষণিকা তাহাকে জোর করিয়া তাহার পিসির বাড়ীর ঝিয়ের কোলে তুলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ইহার পর তাহার নিজের বিদায়ের পালা। যথাসাধ্য ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টায় সে ঘটা করিয়া কাহারও কাছে বিদায় লইতে গেল না। তবু অনাদিনাথের মায়ের হাতে পড়িয়া তাহাকে আর-একবার কাঁদিতে হইল। অনাদিনাথকে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সে একবার প্রণাম করিয়া আসিল। তিনি একবার শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। ক্ষণিকা তাঁহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

কৃষ্ণলালই তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই ক্ষণিকা একবার মুখ বাহির করিয়া চাহিয়া দেখিল। এই ত শেষ দেখা। আর-একবার সে ছাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য তাহাকে ছাড়ে নাই।

কিন্তু আর ত এ সংসার রহিল না, আর তাহাকে ফিরিতে হইবে না।

গেট পার হইয়াই কৃষ্ণলাল জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই সুপরিচিত গৃহ পথ বাগান ক্ষণিকার চোখের উপর বিদ্যুতের মত খেলিয়া গিয়া মিলাইয়া গেল।

তাহার মাথাটা আপনা-হইতেই গাড়ীর কোণে ঢলিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমাকে নূতন জীবন দাও। এই চোখে এ পৃথিবীকে আর আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। এর সঙ্গে যা-কিছুর ভিতর দিয়ে আমার পরিচয়, আজ সব শেষ হয়েছে, তবে তোমার সৃষ্টিকে আবার নূতন ক'রে সৃষ্টি কর।"

(২৪)

লালু স্কুল হইতে ফিরিবার পথে মহা স্ফূর্ত্তিতে শিষ দিতে দিতে চলিতেছিল। আজ তাহাদের ডিবেটিং ক্লবে তাহার লেখাটার 'স্যার' খুব প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুলের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক নীলিমেশের মুখ একেবারে চুন! বাহির হইতে না হইতেই সে লালুকে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের থেকে টুকেছ বাছাধন?"

ইহাতে লালুর উল্লাস বাড়িয়াছে বই কমে নাই। লেখাটা তাহা হইলে এমনই ভাল হইয়াছে যে লালুর রচনা বলিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। বিপক্ষের ঈর্ষার পাত্র হওয়া ত কম সুখের বিষয় নয়? আঃ, আজ যদি দিদিটা থাকিত! বাড়ীতে ত থাকিবার মধ্যে এক মা। বাবার কথা ছাড়িয়াই দাও, আর দাদাকে লেখার কথা বলাও যা—মাতালকে হরিনাম শোনানও তা। এমন একটা মানুষ নাই ঘরে, যাহাকে তাহার এই মহা আনন্দের ভাগ দেওয়া যায়। ছোড়্‌দি থাকিলেও হইত। বুঝুক, নাই বুঝুক, তাহাকে ক্ষ্যাপাইতে ত অন্তত পারা যায়? কিন্তু দিদি থাকিলে সব দিক দিয়া ভাল হইত।

এমন সময় ঠিক তাহাদেরই গলির সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। লালু অবাক হইয়া দেখিল যে-দিদির জন্য সে এতক্ষণ এক-মনে কামনা করিতেছিল, সে-ই গাড়ী হইতে নামিল।

অতিরিক্ত বিস্ময়ে তাহার কথা সুদ্ধ যেন লোপ পাইয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, না বলা, না কওয়া, হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। এ যেন আরব্য-উপন্যাসের গল্পের মত। একটা আংটি হাতে করিয়া দুনিয়ার যাহা-কিছু ইচ্ছা-কর, অমনি তা আসিয়া হাজির!

গাড়ীর উপর হইতে বাক্স-বিছানা নামাইয়া সহিসটা গলির ভিতর চলিল। লালুর লুপ্তশক্তি এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। গাড়ীর ভিতরে একটা ছোট বেতের বাক্স তখনও পড়িয়া ছিল, সেটা চট্‌ করিয়া উঠাইয়া লইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে চলিল।

ক্ষণিকা সদর দরজা পার হইয়াই তাহার মাকে দেখিতে পাইল। তিনি অকস্মাৎ মেয়েকে সম্মুখে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এলি যে? কেউ আন্‌তে গেল না, কিছু না!"

ক্ষণিকা বলিল, "মা, পিছনে গাড়ীর লোকটা জিনিষ নিয়ে আস্‌ছে, তার হাতে ভাড়ার আট-আনা পয়সা দিয়ে দিও।" বলিয়াই ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটা মাদুর কোনোরকমে মেঝের উপর টানিয়া ফেলিয়া, তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

লালু ততক্ষণে বেতের বাক্স হাতে করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মা তাহাকে দেখিয়াই, "গাড়োয়ানের ভাড়াটা চুকিয়ে দে, বালিশের তলায় পয়সা আছে। দেখি আমি মেয়ের কি হল!" বলিয়াই একরকম ছুটিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

লালু মায়ের কথামত ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা ততক্ষণ মেয়ের মাথা কোলে তুলিয়া চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "এ রকম জ্বর নিয়ে একলা এতটা পথ এলি? তারাই বা ছেড়ে দিল কি ব'লে? বাড়ীতে বিপদ তা না-হয় বুঝ্‌লাম, কিন্তু তাই ব'লে কি মানুষের দিকে একেবারে তাকাতে নেই?"

ক্ষণিকা মাথাটা তুলিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, তারপর বলিল, "জ্বর পথে হয়েছে, তারা কি ক'রে জানবে?"

লালু বলিল, "মা, দিদির জন্যে কিছু কিনে আন্‌ব ফল-টল? আজ ত আর ভাত খাবে না?"

তাহার মা বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ আবার ভাত খাবে,

যবে খায় দেখ এখন। গা ত আগুনের মত গরম। যাই, দুধটা গরম ক'রে আনি। তুই বোস্ একটু দিদির কাছে।"

লালু দিদির পাশে আসিয়া বসিল। বলিবার কথায় ত তাহার আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দিদির অবস্থাটা ঠিক তাহার কথা শুনিবার মত নয়। সে যে একটাও কথা বলে না?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কি খুব মাথা ব্যথা করছে? টিপে দেব?"

ক্ষণিকা বলিল, "দে।"

লালু মাথায় হাত দিয়া দেখিল গা খুবই গরম। তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিজয়গর্ব্বটা খানিকটা যেন ম্লান হইয়া গেল। ভাগ্যের উপর রাগও হইল, সেই দিদি আসিলই যদি, ত সুস্থ শরীরে আসিলেই ত চলিত? কিন্তু এখন সে কথা বলাও ত উচিত হয় না। এমন সময় মা আসিয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন।

লালু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "মা, দিদির বোধ হয় ভয়ানক মাথা ধরেছে। বালিশটা ত ভিজে গিয়েছে, কাঁদ্ছে বোধ হয়।"

তাহার মা বলিলেন, "তুই যা, খাবার রেখে এসেছি, নিয়ে খেগে যা। আমি দেখ্ছি ওকে।"

তিনি আসিয়া নীরবে মেয়ের পাশে বসিয়া রহিলেন। দারুণ রোগযন্ত্রণাও যে নীরবে সহ্য করিত, সে যে সামান্য মাথাধরার জন্য কাঁদিতেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। মেনকা হইলে না-হয় কথা ছিল, অল্প একটু-কিছুতেই কাঁদিয়া-কাটিয়া সে হাট বসাইয়া দেয়। কিন্তু ক্ষণিকার মুখ হইতে রোগে শোকে একটু কাতরোক্তিও ত কেহ কখনও শোনে নাই? পারিবারিক বিপদে তিনি নিজে যখন অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তখনও ত ক্ষণিকা তাঁহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিয়া, সংসারের সব ভার নিজেই বহন করিয়াছে। দুঃখ-বিপদে এতদিন যে ধৈর্য্য তিনি অবিচলিত দেখিয়াছেন, আজ কিসের আঘাতে তাহা টুটিয়া গেল? মনোজার মৃত্যু-সংবাদ তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সে ত অনেকদিন হইয়া গেল!

অনেক পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানের কাজে কি একেবারে জবাব দিয়ে এলি?"

ক্ষণিকা বলিল, "সে কাজ ত ভগবানই চুকিয়ে দিলেন, আমাকে আর জবাব দিতে হয়নি।"

মা বলিলেন, "তা যাক। এখন কিছুদিন আর তোকে কোথাও যেতে দেবো না। এক-একবার গিয়ে কি যে হয়ে আসিস্। সংসার যেমন ক'রে হোক চল্‌বে।"

ক্ষণিকা কোনো উত্তর দিল না। তাহার মা খানিক পরে আবার বলিলেন, "কেঁদে আর কি কর্‌বে বাছা? সংসার কর্‌তে হলেই এসব সইতে হয়। সুখ কপালে থাক্ বা না থাক্, দুঃখের হাত থেকে কারু নিষ্কৃতি নেই।"

ক্ষণিকা হঠাৎ উঠিয়া বসিল। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, সংসারে কি আমি আসতে চেয়েছিলাম? তোমরা বল ভগবান ন্যায়বান্, কিন্তু এই কি ন্যায়? যে জীবনের জন্যে আমি কোনও অংশে দায়ী নই, তার জন্যে এত দুঃখ আমাকে সইতে হবে? একবারও বল্‌তে পাব না যে আমি সইব না? কপালে লেখা যে থাকে, সে কার লিখন? যেমন খুসী লিখ্‌লেই কি হল? আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, কিছুই কি তিনি দেখ্‌বেন না? শাস্তি পাবার উপযুক্ত, কি সুখ পাবার যোগ্য, তাও দেখ্‌বার দর্‌কার নেই? যিনি আমাদের কোনো নিয়ম মানেন না, কেন আমরা কেবলই তাঁর নিয়ম মেনে চল্‌ব? আমরা সামান্য মানুষ মা, কিন্তু এমন অবিচার কর্‌তে পার্‌তাম না।"

ক্ষণিকার মা শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন। ইহারও মুখে এমন কথা? এ কি রোগীর প্রলাপ? তিনি তাহাকে তাড়াতাড়ি আবার ধরিয়া শোয়াইয়া বলিলেন, "থাক্ মা, এখন কথা বোলো না অত, ওতে জ্বর বাড়্‌তে পারে। দেখি প্রবোধ আসুক, একবার ডাক্তার-বাবুকে খবর দিতে বলি।"

ক্ষণিকা বলিল, "ডাক্তারে আমার দর্‌কার নেই মা, থাক্ এখন।"

তাহার মা বলিলেন, "তোর না থাক্, আমার ত আছে? আগে ছেলের মা হও, তার পর বুঝ্‌বে যে দর্‌কার কতখানি।"

ক্ষণিকা পাশ ফিরিয়া শুইল। জগতের সব বন্ধন তাহার এখনও ছিন্ন হয় নাই। যে মাটিতে সে জন্মলাভ

করিয়াছিল, এতদিন আকাশের নীলিমায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে আজ দিগন্ত পর্য্যন্ত ঢাকা, আজ তাই আবার তাহার শৈশবের স্নেহনীড়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হয় নাই, একটি আশ্রয় এখনও তাহার আছে। না চাহিতেই, না জানিয়াই যাহাদের ভালবাসা সে পাইয়াছিল, তাহাদের প্রেম এখনও সে হারায় নাই। ভগবান অযাচিতভাবে দুঃখ তাহাকে দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল দুঃখই দেন নাই। চাহিয়া সে যাহা পায় নাই, শুধু তাহাই কি মনে রাখিবে? না-চাহিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাও কি মনে রাখিবার নয়? সংসারে আসিবার মুহূর্ত্তে জীবকে ভীষণ যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই আসিতে হয়; কিন্তু সেইটুকুকে পরবর্ত্তী জীবনের সকল আনন্দের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে কি তাহার রূপ অন্যপ্রকার দেখায় না? আমাদের একই জীবনে আমাদের কতবার যে নূতন জন্ম লাভ করিতে হয়, তাহার ত ঠিকানা নাই, কিন্তু সে-সকল জন্মের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তও ত বেদনায় পরিব্যাপ্ত? খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে দুঃখকে যত বিরাট দেখায়, অখণ্ডভাবে সমগ্র জীবনকে যদি দেখি, তাহা হইলেও কি দুঃখ তেমনিই অসীম থাকে?

সন্ধ্যাবেলা প্রবোধ আসিল। মায়ের কাছে সব খবর শুনিয়া খানিক বকাবকি করিল, বাড়ীর লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্বন্ধে অনেকপ্রকার মন্তব্যও প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার পরে ডাক্তারও ডাকিতে গেল।

ক্ষণিকার মা ঘরে আলো দিতে আসিয়া দেখিলেন, ক্ষণিকা বালিশে ঠেশ দিয়া আবার উঠিয়া বসিয়া আছে। আলোটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার বস্‌লি যে? একটু ঘুমতে চেষ্টা কর্‌না?"

ক্ষণিকা ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "ঘুম একেবারেই আস্‌ছে না। আচ্ছা জ্যাঠাইমারা এখন কোথায়?"

"তিনি ত এখানেই আছেন। চোখে অস্ত্র ক'রে চোখ ত খোয়ালেন, বুড়ো-বয়সে দুর্ভোগ দেখ একবার। চিন্ময় ত কল্‌কাতাতেই আছে, কেন তোর সঙ্গে দেখা করেনি?"

ক্ষণিকা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে চিন্ময়ের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। ক্ষণিকার মা বলিয়া চলিলেন, "নানা হাঙ্গামে থাকে, তাই বোধহয় দেখা কর্‌তে পারেনি। দেশ থেকে কে এক পিস্‌তুতো বোনকে এনে রেখে গেছে, সেই বুড়ী-মায়ের দেখাশুনো কর্‌ছে। হিরণ্ময়টা ত কোনো কাজেরই নয়, আর বেটা-ছেলে কত কাজেরই বা হবে? সেদিন দিদিকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, বেচারী কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌ল, 'বোন, একটা মেয়ে যদি থাক্‌ত, তা হলে কি আর এত খোয়ার হত?' আমি আর কি বল্‌ব বল? বল্‌লাম, 'ছেলের বিয়ে দাও, বৌ এসে সেবা কর্‌বে।' তা বলে 'ছেলে ত আর আমার কথা শোনে না, সে বিয়ে কর্‌বে না'।"

ক্ষণিকার মা যাহা বলিবার ছিল শেষ অবধি বলিয়া গেলেন। ক্ষণিকা কোনো কথাই বলিল না। প্রবোধ ডাক্তার লইয়া আসিল। তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার পরীক্ষা, প্রশ্ন করা, ব্যবস্থা দেওয়া সব সমাপন করিয়া আবার বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ডাক্তার-বাবুকে ভিজিটের টাকা দিলে না?"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "উনি নেন্ না, প্রবোধের বন্ধু কিনা? তা না হলে কি আর যখন-তখন ডাকা চল্‌ত?"

ক্ষণিকা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, যাকে কিছু দিতে হয় না, তাকেই কি যখন-তখন ডাকা যায়?"

মেয়ের হাসি দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া মা বলিলেন, "এখন একটু ভাল বোধ কর্‌ছিস্, না রে? আলোটা আড়াল ক'রে দিচ্ছি, দেখ্‌না একটু ঘুমতে পারিস্ কি না।" আলোর সাম্‌নে একখানা পুরাতন মাসিকপত্র আড়াল করিয়া দিয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন। ক্ষণিকা শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনের ভিতর হাজার রকম ভাবনা তোলপাড় করিয়া ঘুমকে তাহার চোখ হইতে দূর করিয়া দিল।

যাহাদের ভিতর দিয়া বিধাতা তাহার জীবনে আঘাত আর বেদনা অজস্রধারে ঢালিয়া দিলেন, ক্ষণিকা এতদিন কেবল তাহাদের ভাবনাই ভাবিয়াছে। কিন্তু আঘাতের অস্ত্ররূপে তাহাকেও কি কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই? জগতে এমন মানুষ কি কেহই নাই যে তাহাকে সকলের চেয়ে ভালবাসিয়া, সকলের চেয়ে কঠিন আঘাত তাহারই কাছ হইতে পাইয়াছে? এমন কি কেহ নাই যাহার কাছে

ক্ষণিকা চিরজীবন অসঙ্কোচে দান গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিদানে কিছুই দেয় নাই? আপনাকে কিছুই দিতে হয় নাই বলিয়া কি তাহাকে সময়ে অসময়ে ডাকিতে কোনোদিন তাহার বাধে নাই? আলো-বাতাসের মত যাহাকে অতি সহজে চিরদিন পাইয়া আসিয়াছে, সেও যে মানুষ, সেও যে দানের বদলে প্রতিদান চায় তাহা ক্ষণিকা মনে রাখে নাই।

সত্য বটে চিন্ময় তাহার নিকটে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা দিবার ক্ষমতা ক্ষণিকার ছিল না। কিন্তু ঋণ-পরিশোধের আর কি অন্য উপায় নাই? প্রাণপণ সেবায় কি ভালবাসার ঋণ অল্প পরিমাণেও শোধ হয় না? চিন্ময়ের শ্রেষ্ঠদান যাহা তাহা না-হয় ঋণরূপেই আমরণ থাকিয়া গেল, কিন্তু চিরদিন তাহার কাছে যে অক্লান্ত সহায়তা সে লাভ করিয়া আসিল, এখন ত তাহার কিছু প্রতিদান দিবার দিন আসিয়াছে।

নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের রাজ্যেও কিন্তু তাহার ভাবনার দল তাহাকে একেবারে অব্যাহতি দিল না। সারারাত স্বপ্নে সে তাহাদেরই মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল, যাহারা জাগরণের লোকে তাহার সংসার জুড়িয়া ছিল। পরলোক হইতেও তাহার হৃদয় কাহার যেন সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভোরের বেলা দুঃস্বপ্নের মধ্যেই তাহার ঘুমের অবসান হইল। ঘর তাহার সত্যই ভাঙ্গিয়াছিল তাই স্বপ্নেও সে দুঃখ তাহার মনে লাগিয়া ছিল। কোথাকার বাসা ছাড়িয়া যেন তাহারা পথে বাহির হইতেছে। জিনিষ-পত্র গোছানোর একটা অস্ফুট কোলাহল, কোথায় যেন প্রচণ্ড হাতুড়ির শব্দ করিয়া কে ক্রমাগতই বাক্সের গায়ে পেরেক মারিয়া চলিয়াছে, তাহার আঘাতটা যেন ক্ষণিকার বুকে ঠিক সমান জোরেই বাজিতেছে। ইহারই শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চাহিয়া দেখিল তখনও ভোরের আলো সুপরিস্ফুট হয় নাই। যে স্বপ্নলোকের মাঝ হইতে সে জাগিয়া উঠিল, তাহারই মত সমস্তই যেন আবছায়া, ঝাপসা। ঘরের ভিতর তাহার মা আর লালু আর-একপাশে ঘুমাইয়া আছেন, আন্দাজে বুঝিতে পারিল।

দিনের বেলাটা জ্বরের ঘোরে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কেমন করিয়া, কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এক-একবার চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, তাহার মা অথবা ভাই পাশে বসিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। একবার দ্বারের কাছে আর-একজন কাহাকে যেন দেখিল, যে তাহার পরিচিত, অথচ যাহাকে সে তখন কিছুতেই চিনিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় কে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, তোমার একখানা চিঠি এসেছে।"

ক্ষণিকা ফিরিয়া তাকাইল। লালু চিঠিখানা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া, আলোটা কাছে আনিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। চিঠির হস্তাক্ষর তাহার পরিচিত নয়। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল। মনোজার দিদি মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

এমন সময় ক্ষণিকার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "মাথায় এত যন্ত্রণা, আবার পড়্‌ছিস কেন? কে তোকে চিঠি লিখেছে?"

ক্ষণিকা বলিল, "রেখে দাও মা ঠিকানাটা, হয়ত যেতে হবে।"

মা বলিলেন, "কোথাও এখন তোমার যেতে হবে না, একেবারে যেতে হয় নিজের ঘরে যেও। পরের বাড়ী ঘুরে ঘুরে আর তোমায় আধমরা হয়ে আস্‌তে হবে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "ঘর সকলের জন্যে ভগবান রাখেন না, তবু ত তাদের পৃথিবীতে থাকতে হয়?"

তাহার মা বলিলেন, "এখন বক্‌বক্ না করে ঘুমোও। যতদিন আমাদের একটা মাথা গুঁজ্‌বার কুঁড়েঘর থাক্‌বে, ততদিন পরের দরজায়, দায়ে পড়ে অন্ততঃ, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।"

ক্ষণিকা আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। কয়েকটা দিন তাহার যেন অজ্ঞাতসারেই কাটিয়া গেল। দিন-রাত্রির প্রভেদও সব সময় মনে থাকে না। কখন একসময় চাহিয়া দেখে, মা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেছেন, না-হয় দাদা ঘরের জান্‌লা-দরজা খুলিতেই সকালের আলো নূতন দিনের দূতরূপে হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আবার কখন দেখিতে দেখিতে দিনের আলো ম্লান হইয়া আসে, জান্‌লার ভিতর দিয়া আকাশের যে টুকরাটি দেখা যায়, তাহার উজ্জ্বল নীলিমা, কালিমায় ঢাকা পড়িয়া যায়।

কপালের উপর কাহার যেন হাতের শীতল স্পর্শ পাইয়া সে একবার চোখ খুলিয়া তাকাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্ময়দা, তুমি কখন্ এলে? তুমি না কল্‌কাতায় ছিলে?"

চিন্ময় তাহার খাটের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "তিন দিন হল এসেছি। কাল পরশু, দুদিনই তোমায় দেখ্‌তে এসেছিলাম, তুমি ঘুমুচ্ছিলে।"

ক্ষণিকা বলিল, "ঘুমইনি, একবার মনে হয়েছিল যেন তোমায় দেখ্‌লাম, কিন্তু ঠিক চিন্‌তে পারিনি। তোমার মা কেমন আছেন?"

চিন্ময় বলিল, "তাঁর অবস্থায় যতটা ভাল থাকা সম্ভব। আমার কাজ কল্‌কাতায়, অথচ মাকে যে কার কাছে রেখে যাব, বুঝ্‌তে পারি না। আমার পিস্‌তুতো বোন কিছুদিন এসেছিলেন, তিনিও চ'লে গেলেন, এখনই হয়েছে বিপদ। যাক্, তোমার কাছে ও-সব কথা তোলা উচিত নয়।"

ক্ষণিকা একটু হাসিয়া বলিল, "চিরকালটা আমার ঐরকম কথা শুনেই কেটেছে, আরো যদি বাঁচি ঐরকম কথাই শুনব। আমার এখন আর মনেও হয় না যে পৃথিবীতে সুখের কথা কিছু আছে, যদি থাকে তা আমি কখনও শুনব না।"

চিন্ময় চুপ করিয়া রহিল। কথা বলিল না, কিন্তু ঘর ছাড়িয়াও গেল না। খানিক পরে ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্ময়দা, তুমি এখন কি করছ?"

চিন্ময় বলিল, "অনেক কিছু করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কতখানি পারব জানি না। তুমি উঠে বস্‌লে পর একদিন এসে সব বলব। আজ আর তোমায় বেশীক্ষণ বকাব না।" সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষণিকা উঠিয়া বসিল। দাঁড়াইতেও তাহার বেশী দেরী হইল না। তাহার মা বলিলেন, "যা হোক বাপু, এ যাত্রা খুব বাঁচন বাঁচ্‌লে। গাড়ীর থেকে যা মুখ ক'রে নাম্‌লে, আমার যেন বুকের ভিতর কেমন কর্‌ছিল। জ্বর নিয়ে ভাগ্যে কল্‌কাতায়ই ব'সে থাকনি।"

ক্ষণিকা মুখে কিছু বলিল না। মনের ভিতর তাহার কিন্তু এই কথাই জাগিয়া উঠিল যে তাহার দিন ফুরাইয়া গেলে অন্তত দিন কাটাইবার ভাবনা নিজেকে ভাবিতে হইত না। কিন্তু সেকথা মাকে বলিয়া ব্যথিত করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না।

বিকালের দিকে লালু আসিয়া বলিল, "একটু বাইরে বেরিয়ে বস্‌বে চলনা? বেশ grand sunset হচ্ছে। তোমায় একটা জিনিষ দেখাবো কতদিন থেকে ভাবছি, তা তুমি এমন জ্বর বাধিয়ে বস্‌লে।"

ক্ষণিকা বলিল, "কি জিনিষ? সূর্য্যাস্ত? সে ত রোজই হয়।"

লালু বলিল, "আরে না। সূর্য্যাস্তের জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। আমার একটা লেখা, এবার ডিবেটিং ক্লবে পড়েছিলাম।"

ক্ষণিকা বলিল, "তা চল, বাইরে ব'সে শোনা যাক। তোমার অত সাধের লেখা এই আঁধার ঘরের কোণে শোনাতে তোমার মন উঠ্‌বে না।"

দুজনে বাহিরে আসিয়া বসিবার আয়োজন করিতে লাগিল। উঠানের মাঝে একটা ভাঙ্গা তক্তপোষ প্রায়ই পড়িয়া থাকিত, তাহারই উপরে একটা শতরঞ্চি বিছাইয়া লালু তাহার সাহিত্য-সভার স্থান করিতে লাগিল। তাহার মা বলিলেন, "বালিশ গোটা-দুই এনে দে, দিদি কি এখন খাড়া হয়ে অমনি বসে থাক্‌তে পারে? আবার পিঠে কোমরে ব্যথা ধ'রে যাবে।"

লালু বালিশ আনিতে ঘরে ঢুকিল। এমন সময় সদর দরজার কাছ হইতে কে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "প্রবোধ-দা! প্রবোধ-দা বাড়ী আছ? লালু আছিস?"

ক্ষণিকার মা বলিয়া উঠিলেন, "ও কে হিরণ্ময় না? অমন ক'রে চেঁচাচ্ছে কেন? দেখ্‌ত রে লালু।"

লালু আসিবার আগেই ক্ষণিকা দরজার কাছে দ্রুতপদে গিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে হিরণ্ময়? দাদা ত বাড়ী নেই!"

হিরণ্ময়ের মুখ তখন আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে। সে কোনরকমে ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল, "পুলিশ এসেছে, দাদাকে arrest করেছে, এখুনি নিয়ে যাবে। আপনারা আসুন।"

তাহারা গিয়া কি করিবে, ক্ষণিকার যাওয়া সম্ভব কি না, সে সব কথা আর কেহই ভাবিল না। হিরণ্ময়ের

পিছন পিছন সকলে আসিয়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

চিন্ময়ের মা তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। নীচের তলায় পুলিশের লোক, পাড়ার লোক, রাস্তার লোক মিলিয়া ভীড় করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষণিকা চারিদিকে চাহিল, চিন্ময় কোথায়? হিরণ্ময় বলিল, "উপরে মায়ের কাছে।"

তাহার দুর্ব্বল শরীর তখনও আপনার ভার যেন বহিতে চায় না। কিন্তু সেকথা ভাবিবার অবসর কোথায়? উপরে উঠিয়া ক্ষণিকার মা ছুটিয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা বৃদ্ধার মস্তক নিজের কোলে টানিয়া লইলেন। হিরণ্ময়কে বলিলেন, "বাতাস কর, এখুনি সাম্‌লে যাবেন। বেটা-ছেলে এতেই কি কেঁদে খুন হতে হয়? তুমিই ত এখন মায়ের ভরসা।"

চিন্ময় মায়ের পাশ হইতে সরিয়া ক্ষণিকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ক্ষণিকা চল্‌লাম। আমায় এখন কতদিনের জন্যে বাইরের জগতের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল জানি না। চিরদিনের মতও হতে পারে।"

ক্ষণিকার কণ্ঠস্বর যেন হারাইয়া গিয়াছিল। অস্ফুটকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কি intern কর্‌ছে? কোথায়?"

চিন্ময় বলিল, "জানি না। প্রবোধকে বোলো, একটু যেন দেখে মাকে।"

ক্ষণিকা বলিল, "কাউকে বল্‌তে হবে না, আমিই দেখ্‌ব। কেন বেঁচে উঠ্‌লাম বুঝ্‌তে পারিনি, এখন পার্‌ছি। আমার সব-চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বাকী ছিল। চিরদিন তুমি আমার সব দুঃখের ভার বয়েছ, আজ আমার পালা।"

(২৫)

বর্ষার সন্ধ্যা যেন অকালে রাত্রিকে ডাকিয়া আনিয়াছে। পথে দুচারজনের বেশী লোক নাই, দুইধারের বাড়ীগুলির দরজা-জান্‌লা অধিকাংশই বন্ধ। নিতান্ত প্রয়োজন যাহাদের তাহারা ছাড়া কেহ ঘরের বাহির হয় নাই। একটা ঝোড়ো হাওয়া গৃহের দ্বারে দ্বারে আর্ত্তকণ্ঠে কাহাকে যেন ডাকিয়া ফিরিতেছে।

রাস্তার উপরের একটা বড় বাড়ীর প্রায় অধিকাংশ ঘরই আলোকহীন, কেবল একটি ঘরে আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছে।

বিরল-পথিক পথ দ্রুতগতিতে অতিক্রম করিয়া একটি মানুষ এই বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সদর দরজাটা ভেজানো। একবার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিল। কোন সাড়া-শব্দ নাই। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "হিরণ্ময়!" কেহ উত্তর দিল না। তখন সে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

নীচের তলায় জনমানবের সাড়া নাই। উপরে উঠিয়া সে আলোকিত কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে একটিমাত্র মানুষ বসিয়া ছিল। সে আগন্তুকের পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া উঠিয়া পড়িল। দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "ভিতরে এসো।"

চিন্ময় বলিল, "আমার আসাটা তোমার একটুও কি surprise মনে হচ্ছে না?"

ক্ষণিকা বলিল, "ভগবান আর আমার কিছুতেই অবাক্ হবার দিন রাখেননি। তবে আনন্দের জিনিষ আমার ভাগ্যে নূতন বটে।"

চিন্ময় অল্পক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "যেমন রেখে গিয়েছিলে, দুবছরে কিছুই বদ্‌লান নি। চল তাঁর কাছে।"

চিন্ময় বলিল, "যাচ্ছি! তুমি আমার কাছে যা, তা যদি না হতে, তাহলে মুখের কথায় তোমাকে জানাতে হত যে আমি কতখানি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার কাছে তার কিছু দর্‌কার আছে?"

ক্ষণিকা এতক্ষণ পরে হাসিল। হাসিয়া বলিল, "জন্মাবধি তোমার কাছে যা নিয়েছি, কবে তার জন্যে মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছি? কিন্তু মুখে যা না বলেছি, কবে তোমার তা বুঝ্‌তে ভুল হয়েছে? এখন শুধু এইটুকু বল যে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যে সংসারের ভার আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলে তা নিজের হাতে নাও। আমাকে শুধু বল যে আমি ছুটি পাবার দাবি অর্জ্জন করেছি।"

চিন্ময় অগ্রসর হইয়া আসিয়া ক্ষণিকার দুই হাত ধরিয়া বলিল, "এই আমাকে বল্‌তে হবে? আমার

সংসার কোথায় যে আমি তার ভার নেব? আমার জন্মাবার আগেকার যে সংসার, যার সৃষ্টি আমার আনন্দের ভিতর দিয়ে হয়নি, তারি ভগ্নাবশেষের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকে, তুমি এখন সরে যেতে চাও? আমার এতকালের বন্দী-জীবনের অসহ্য দুঃখ কি এরই জন্যে তপস্যা কর্ছিল?"

কণিকা বলিল, "কি চাও তুমি বল? আমার দেবার যা সাধ্যাতীত নয়, এমন কিছুই এখন তোমায় দিতে আমার আপত্তি নেই।"

চিন্ময় বলিল, "আমার চাওয়ার কোনো বদল হয়নি। তোমার উত্তর কি এখনো বদ্‌লাবার দিন আসেনি?"

কণিকা বলিল, "হয়ত এসেছে। কিন্তু আমার অতীত জীবনকে তুমি আমারই থাক্‌তে দিও। তার সুখ-দুঃখ যা তা শুধু ভগবান আর আমার মধ্যেই থাক। আমার বর্ত্তমানকে, আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে তুমি নাও।"

(সমাপ্ত)

শ্রীসীতা দেবী।

বাঁকুড়া শিল্পপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন*

আপনারা আজ আমাকে আপনাদের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে আহ্বান করেছেন ব'লে আমি আপনাদের ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আমি একজন ক্ষীণজীবী ভগ্নস্বাস্থ্য, তা আমার চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন; তবে বিধাতার কৃপায় কোনরূপে জীবনধারণ ক'রে আছি। এইরূপ ভগ্নশরীর সত্বেও যে-কোন কাজে আহূত হই তা উপেক্ষা করতে পারি না। আমার বাঁকুড়া আগমন শিক্ষার্থীভাবে, উপদেষ্টাভাবে নয়—আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক জিনিষ শেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমেই আপনাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। খুলনা জেলায় আমার বাড়ী। অনেকদিন আগে খুলনার তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট খুলনার প্রদর্শনীর জন্য আমাকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটকে সুন্দরবনের Royal Bengal Tiger কেঁদো বাঘের চেয়েও বেশী ভয় পাই, আমাদের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ বাঘের অপেক্ষাও ভীষণ বলে' মনে হয়,—আমরা বাঘের সাম্‌নে যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে যেতে প্রস্তুত নই। জেলার কর্ম্মকর্ত্তা মানে ধর-পাকড় নয়, জেলে দেওয়া নয়, জরিমানা করা নয়; তাঁর ইচ্ছায় একটা জেলার হাওয়া বদ্‌লে যেতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে, কাউন্সিল বা মন্ত্রীপরিষৎ হচ্ছে, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা যদি ভাল না হন তবে সবই পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু এখানের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্য সত্যই সুন্দর। ইনও গভর্ণমেণ্ট চাকুরে, এর না কর্‌লেই পারতেন, সরকারের চাকরী বড় সুখের—বসে' থাক, প্রমোশন বা উন্নতি ধাপে ধাপে আস্‌বেই, সময়ক্রম-মোতাবেক (Time Scale) তাঁদের পদ (Grade) বাড়্‌বেই, এক কথায় They are simply kicked upstairs—লাথিয়ে তাঁদের উঁচিয়ে দেওয়া হবে! কেবল মাঝে মাঝে বড়সাহেবকে সেলাম দিয়ে আস্‌তে হবে। কিন্তু এখানে দত্ত-সাহেব যা করছেন তা একটা আদর্শ—এই রকম ত চাইই। তাঁর কর্ম্মপ্রণালী অতি প্রশংসনীয়। আমি রাজনীতি চর্চ্চা কর্‌ছি না, কোন দলের হয়েই আমি কিছু বল্‌ছি না—আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না দত্ত-সাহেব দেশের প্রকৃত হিতসাধন করছেন কি না; কেননা তাঁর জিম্মায় যে জেলা দেওয়া হয়েছে তার মঙ্গল-কামনার জন্য একাগ্র চেষ্টায় তিনি নন্‌কো-অপারেশানের বিষদাঁত ভেঙে দিচ্ছেন। সকল জেলার কর্ত্তা এরকম হলে অসহযোগ উড়ে যাবে।

এখন কথা হচ্ছে বাঁকুড়াতে দুর্ভিক্ষ হয় কেন? এখানকার দুর্ভিক্ষে ও খুলনা-যশোরের দুর্ভিক্ষে অনেক প্রভেদ আছে। খুলনার দুর্ভিক্ষ এখনও শেষ হয় নি, এ বছরেও অজন্মা; কি হবে, লোকগুলো কি করে বাঁচ্‌বে জানি না।

* মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ।

তবে খুলনার দুর্ভিক্ষ সমগ্র-জেলা-ব্যাপী হয় না—যতদূর নদীর নোনা জল যায়, ততদূর অজন্মা হয়; তার ফলেই দুর্ভিক্ষ। আগে নদীতে মিঠা জল এসে চাষ-আবাদের সুবিধা করে' দিত। কিন্তু এখন সে-সব নদীতে চড়া পড়ে' গেছে, সে-সব নদী কেটে জল আনা এখন বহুব্যয়সাধ্য। তাই বল্‌ছিলাম খুলনাকে নদীর উপর নির্ভর কর্‌তে হয় বলেই তার দুর্ভিক্ষ দৈবায়ত্ত। কিন্তু বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ সহজে নিবারণীয়।

এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ১৫০ বছর আগে গৌরবের স্থান ছিল—মহারাষ্ট্র দুর্দ্ধর্ষ বীর ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর-রাজাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন—সে-সব গৌরব আজ কোথায়? ১০০। ৫০ বছর আগে আপনাদের বিষ্ণুপুর কত সমৃদ্ধিশালী ছিল—পলাশীর যুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুরের কি গৌরবই ছিল! আর আজ বাঁকুড়া বাংলার মধ্যে দরিদ্রতম নিঃস্বতম জেলা। ১০ বৎসরে ১১ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ লক্ষ লোক কমে গিয়েছে—এ যেন মরণ-অভিশপ্ত দেশ! কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন—আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন—যে, আমরা মরণোন্মুখ জাতি, লুপ্ত হবার পথের পথিক। বাঙালী যে কেন মরণাপন্ন জাতি, তার কারণ বাংলার সংস্থান, জল-হাওয়া, ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থসমস্যা প্রভৃতি আলোচনা ক'রে আমাদের নির্ণয় করতে হবে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পূর্ব্বে যে এত সমৃদ্ধিশালী ছিল তার কারণ কি?—প্রধান কারণ এখানকার ক্ষেতে জল-সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত। যাঁরা ক্ষেতে জল-সেচনের ব্যাপারটি বুঝেন বা জানেন তাঁরা বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের সময়ে জল-সেচনের নিখুঁত ব্যবস্থা ছিল।—তখন এ জেলায় ৩০।৪০ হাজার দীঘি বাঁধ প্রভৃতি ছিল; এখন সে সব দীঘি পুকুর সব শুকিয়ে গেছে, অনেক মজে গিয়ে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আজ যদি এইসব বাঁধ দীঘি ভাল অবস্থায় থাক্‌তো, তাহলে এখানকার দুর্ভিক্ষ অর্দ্ধেক নিবারণ হতো।—এখন পুরাতন মজা বোজা পুকুর বাঁধ দীঘি আবার ঝালিয়ে কাটিয়ে সজল করে' তুল্‌তে হবে।—এইসমস্ত দীঘির পুনরুদ্ধার কর্‌তে হবে। বাঁকুড়া এখন দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি হয়েছে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়;—বাঁকুড়াতেও তার ভীষণ প্রকোপ দেখা গিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে এখানে আবার দুর্ভিক্ষ হয়। তার পর ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯১৪।১৫ সালের উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষে যে ভীষণ অবস্থা হয়েছিল তা এখনও আমাদের চোখের সাম্‌নে রয়েছে। আবার ১৯১৯ সালেও দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ইচ্ছা করলেই আমরা এই দুর্ভিক্ষ বন্ধ কর্‌তে পারি; এইসব বাঁধ দীঘি পুকুর কাটিয়ে আবার জলের সুবন্দোবস্ত কর্‌তে পারি। বাঁধ দিয়ে জল ধরে' রেখে সেই জল যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাতে পারা যায়। এই-সমস্ত বাঁধ বাঁধার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই। ২।৫টা গ্রামের লোক মিলে সেই গ্রামের জল সরবরাহের জন্য বাঁধ তৈয়ারী কর্‌তে হবে। সকলের স্বার্থ সেই বাঁধে থাক্‌বে। এইসমস্ত কাজের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক্ চাই। খুলনায় প্রথম আমাদের বাড়ীতে একটা ব্যাঙ্ক্ হয়। যামিনী-বাবু অধ্যক্ষ হয়ে তার কাজ আরম্ভ করেন। আমার মধ্যম ভ্রাতা রায় সাহেব নলিনীকান্ত তাঁর সহায়তা করেন। এখন সেই ব্যাঙ্কের অধীনে প্রায় ১০০টা ছোট ছোট ব্যাঙ্ক্ হয়েছে—এখন ক্রমেই এর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এখানে যাতে এরকম ব্যাঙ্ক্ ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা করা উচিত।

খুব সুখের বিষয়, আপনাদের এখানে সমবায় প্রথায় ২৪টি বাঁধ হয়েছে ও কাজও ভাল চল্‌ছে। উপকার বুঝ্‌তে পেরে প্রজারা আনন্দের সহিত টাকা দিতে রাজী হয়েছে। শালবাঁদের যে বাঁধ তৈরী হচ্ছে তাতে ২৭ খানা গ্রামের ৮০০০ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার হবে। আমাদের একটা দোষ যে আমরা সব কাজেই গভর্ণমেণ্টের দিকে চেয়ে থাকি। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাছ থেকে যখন খাজনা আদায় করেন তখন আমাদের সমস্ত অভাব পূরণ কর্‌তে তাঁরা বাধ্য ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি কিছু না ক'রে দেন, তবে কি আমরা চিরকাল শিশুর মত অসহায় থাক্‌বো; নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখ্‌বো না? আমরা তবে কি করে' আত্মনির্ভরতা শিখ্‌বো?—আমরা সবাই যেন এক-একটি ঝিনুকে-দুধ-খাওয়া খোকা!

আমার মনে হয় বাংলা দেশের বুদ্ধি ও বল পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। মল্লভূমি, বীরভূমি,—আজ মল্লশূন্য বীরশূন্য। আর বাঁকুড়ার লোক—সাঁওতাল বলুন—বাউরী বলুন—ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও কঙ্কালসার। খাদ্যের অভাবই ম্যালেরিয়ার কারণ। ডাক্তার বেণ্টলী বলেন—Malaria is a hunger disease—ম্যালেরিয়া ক্ষুধার ব্যাধি।

এখানে আস্‌বার আমার আর-একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—চর্‌কা ও তাঁতের প্রচলন করাই আমার এখন অভিপ্রায়। এখানে যে-রকম কার্পাস চাষ আছে আর সহরেও অনেক চর্‌কা চল্‌তে দেখেছি, তাতে এখানে অল্প চেষ্টাতেই কার্পাস চাষ বাড়াতে পারা যায়। বাঁকুড়ায় ১০ লক্ষ লোকের অন্ততঃ এক কোটী টাকার কাপড় লাগে; ঐ টাকা যদি বাঁকুড়াতেই থাকে তা হলে কি হয় ভাবুন দেখি।

আমি একজন ব্যবসাদার, ১৭টি ব্যবসায়ে আমি লিপ্ত আছি; তার মূলধন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আমি ব্যবসায়ীভাবেই কথা বল্‌ছি। আজ যদি বাঁকুড়ার প্রত্যেক ঘরে ১০।১৫টা রাম-কাপাসের গাছ থাকে, আর দিনে প্রত্যেক ঘরে ৪।৫ ঘণ্টা ক'রে চর্‌কা চালান যায়, তাহলে আমরা আমাদের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করতে পারি। মেয়েরা চর্‌কা না ধর্‌লে চর্‌কা চল্‌বে না। ছেলেরা প্রথমে চর্‌কা কেটে মেয়েদের লজ্জা দেবে, মেয়েদের শেখাবে। আমি এই যে কাপড় পরে' আছি, এ আমার গ্রামবাসীর দান—দেশের কার্পাসে দেশের মেয়েদের হাতে ঘরের চর্‌কার কাটা সুতায় দেশের তাঁতীর দেশী তাঁতে তৈয়ারী। কাপড়খানা খুব মোটা সত্যি, কিন্তু এ কাপড় আমি মাথায় করে রেখেছি—রজনীকান্তের কথায় "এ যে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—মাথায় তুলে নে রে ভাই"। আমার দেশবাসী এই কাপড়ের পরিবর্ত্তে যদি কাপড়ের ওজনে সোনা দিতেন তাতে আমি তৃপ্ত হতুম না। মোটা কাপড়ে দোষ কি? আমরা যতই সভ্য হচ্ছি ততই অধঃপাতে যাচ্ছি। আমার এই কথা শুনে মনে করবেন না যে আমি একেবারে পশ্চিমের সম্পর্কই বর্জ্জন করতে চাচ্ছি। ভারত যদি "নিশ্বাস রুধে চক্ষু মুদে" পশ্চিমের দিকে পিছন ফিরে বসে ও পশ্চিমের জ্ঞানবিদ্যাশিল্পচর্চ্চার সম্পর্ক ত্যাগ করে, তবে ভারতের পক্ষে সে দুর্দ্দিন হবে; কিন্তু কচের ন্যায় বিদ্যা অর্জ্জন করতে হবে শুক্রাচার্য্যের কাছে, স্বদেশে স্বদেশীর হিতসাধনের জন্যেই। দৈনিক ৫।৬ ঘণ্টা চর্‌কা চালালে অন্নবস্ত্র দুয়েরই সংস্থান হয়। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ইত্যাদি অনেকে এই চর্‌কা নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন। তিনি লিখেছেন যে একজন বৃদ্ধা একদিনে ৩ ছটাক পর্য্যন্ত সুতা কেটে দিয়েছেন। তিনি এত সুতা কাট্‌ছেন যে তার লাভে মহাজনের কিছু কিছু ঋণও শোধ হচ্ছে। আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ হয় অর্থের অভাবে, খাদ্যের অভাবে নয়। যদি চর্‌কার প্রচলন হয় তবে একটা লোক ৭।৮টা পয়সা দিন উপায় করতে পারে, আর ৪ পয়সায় আধসের চালে একটা লোকের পেট ভরে' যেতে পারে। বাঙ্গালায় সাড়ে চার কোটী লোকের বাস। তার মধ্যে সাড়ে তিন কোটী লোক ছেড়ে দিয়ে এক কোটী লোক চর্‌কা চালাবে, এই যদি আমরা ধরি, আর প্রত্যেকে দিন ২ পয়সা যদি আয় করে, তাহলে বৎসরে আমরা ১২ কোটি টাকা বাংলায় রাখ্‌তে পারি। তাই যদি আমরা পারি, তাহলে আমাদের ভাবনা কি? এখন আর কেবল ম্যাঞ্চেষ্টার লাঙ্কাশায়ার নয়,—জাপান বোম্বাই আমাদের ধনে ধনী হচ্ছে। নিজেরা খেতে পাই না, যা-কিছু আছে তাও পরকে তুলে দিচ্ছি। আপনারা বল্‌তে পারেন—বোম্বাই তো আমাদের নিজের দেশের লোক। আমি এরকম স্বদেশী হতে চাই না যে বাংলা না খেতে পেয়ে বোম্বাইকে ধনী করবে। যদিও বোম্বাই খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, তবু আমি এ সহ্য করব না যে বাংলার অর্থ শোষণ ক'রে বোম্বাই ধন সঞ্চয় করবে, ফিরে মুষ্টিভিক্ষা দেবার জন্যে। মিলের কাপড়ের দাম ৩।৪ গুণ বেড়েছে। ৫০।৬০ বৎসর আগে যখন মিল ছিল না, তখন কি আমরা উলঙ্গ দিগম্বর হয়ে ছিলুম, তখন কি আমাদের কাপড় ছিল না? আজ যদি আমাদের ঘরে ঘরে চর্‌কা থাক্‌তো, আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তাহলে একটি লোকও না খেতে পেয়ে মারা পড়্‌তো না। তাই আমি নিবেদন করি—

সকলেই দৃঢ়পণ করুন যাতে তুলার চাষ বাড়ে ও চর্‌কা প্রচলন হয়। এখানে এমন কে আছেন যাঁর বাড়ীতে ১০।১৫টা কার্পাস গাছ লাগাবার উপযুক্ত জমি নেই? আগে আমি চর্‌কার পক্ষপাতী ছিলুম না; কিন্তু এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি এর উপকারিতা; চর্‌কা সম্বন্ধে ছোট একটা পুস্তিকা লিখেছি। তাই এত জোর করে' বল্‌ছি বাংলার অন্যসব জেলা আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা করুক্ কেমন করে' গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তুলা তুলে চর্‌কা চালিয়ে তাঁত বুনে নিজের পায়ে ভর করে' দাঁড়িয়ে ধনী হতে হয় ও দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য রাক্ষসকে বধ কর্‌তে হয়।

আর একটা বিশেষ কথা। কৃষির উন্নতি চাই। জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই কমে' যাচ্চে; সারের প্রচলন কর্‌তেই হবে। গোবরসার আমাদের প্রধান সার। কিন্তু এই সারটা আমরা যেভাবে রাখি ও ব্যবহার করি তাতে সেটা অসার হয়ে যায়। একটা গর্ত্ত করে' গর্ত্তের উপর একটা ছাওনি দিয়ে যদি গোবরটা রাখা যায় তাহলে আমরা সারের ফল পাই। এ ছাড়া ধন্‌চে সবুজসার আমরা সহজেই প্রচলন কর্‌তে পারি—এতে জমির উর্ব্বরতা যথেষ্ট বাড়ে।

তারপর নানারকম নূতন ফসলের প্রচলন কর্‌তে হবে। ফরিদপুরে যখন গিছলুম তখন কৃষি-বিভাগের দেবেন্দ্র-বাবু আমাকে এক রকম আক দেখিয়েছিলেন তার নাম টানা আক—শিয়ালে শুয়োরে এ আক খায় না, ফলন অনেক বেশী। চিনির বাজার যে রকম, তাতে আকের চাষ বাড়াতেই হবে, আর টানা আকের চাষে দেশে যথেষ্ট ধনাগম হবে। আলু আর-একটি লাভবান ফসল। যত্ন ক'রে সার সেঁচ দিয়ে আলুর চাষ কর্‌লে এক এক বিঘা থেকে ১০০ মন পর্য্যন্ত আলু পাওয়া যেতে পারে। চীনাবাদামের চাষ ডাঙ্গা জমিতে বেশ হয়। এ ছাড়া খেজুর-গাছ লাগিয়ে গুড় তৈরী ক'রে, কুল পলাশ গাছে গালার চাষ করে', কত না অবস্থার উন্নতি কর্‌তে পারা যায়। এসব সহজ কাজ, অল্প চেষ্টাতেই হয়। কিন্তু আমরা কর্‌ব না—কি ভীষণ কুঁড়ে আমরা তাই ভাবি! গলিভারের ভ্রমণকাহিনীতে পড়েছিলুম যিনি একটা ঘাসের স্থানে দুইটি ঘাস জন্মাতে পারেন তিনি দেশের বড় বড় রাজনীতিকের চেয়ে বেশী কাজ করেন। আগে অন্ন বস্ত্র, তারপর স্বরাজ। দেবেন্দ্র বাবু এখানে রয়েছেন। তিনি উদ্যমশীল উৎসাহী। আপনারা তাঁর ও অন্য অন্য কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদের পরামর্শ নিয়ে কৃষির উন্নতি করুন—কৃষিকাজই দেশের প্রকৃত কাজ—চাষকে আর চাষার কাজ ব'লে ঘৃণা কর্‌লে চল্‌বে না—ফিরে কর চাষ আর ফিরে ধর চর্‌কা—এখন এই হচ্ছে আমার মন্ত্র।

এই বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে তসর, রেশম ও সুতার কাপড় যথেষ্ট হতো; পিতল কাঁসার জিনিষ, গালা প্রভৃতির জন্য এই জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯০৩।৪ সালে কেবল সোনামুখী থেকেই পাঁচ হাজার মন গালা কলকাতায় রপ্তানী হয়েছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের হলোওয়েলের লেখা থেকে দেখা যায় যে এই বিষ্ণুপুর থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত গালা সরবরাহ হতো। এখন তার অবস্থা কি হয়েছে ভাবলে কান্না পায়। এসব শিল্পের পুনরুদ্ধার করুন।

আমাদের দেশের কৃষকের মাসিক আয় গড়ে ২॥০ টাকা—রমেশ দত্ত ঠিক করেছিলেন ২৲ টাকা, লর্ড কর্জ্জন অনেক হিসাবপত্র দেখিয়ে ভারতবাসীকে ধনী প্রতিপন্ন করবার জন্যে বলেছিলেন ২৲ টাকা নয়—২॥০ টাকা! সুতরাং কৃষিকাজের উন্নতি ক'রে,চর্‌কায় সুতো কেটে শিল্পের পুনরুদ্ধার ক'রে আমরা যদি দৈনিক ৪।৫ পয়সাও আয় বাড়াতে পারি তাহলে কত না কাজ হয়। দেশের আয় দ্বিগুণ হয়।

আমরা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়্‌ছি। এইসব রোগের একটা কারণ হচ্ছে আমাদের বাসস্থান বাড়ীটাকে আমরা সিন্দুকের মত ক'রে রাখি, আলো বাতাস আস্‌বার পথ রাখি না—রুদ্ধ বায়ু, রুদ্ধ জল, রোগ শোক মৃত্যুর নিদান। আমি একজন রাসায়নিক; অক্সিজেন গ্যাসের প্রতি আমার মমতা ও বিশ্বাস আছে—তাই বল্‌ছি একটু বাতাস-আলোর পথ রাখ্‌তে হবে। পুকুরগুলোকে আমরা কি করে' ব্যবহার করি? যেন আঁস্তাকুড়! পুকুরগুলোকে মলমূত্র থেকে নিরাপদ কর্‌তে হবে। এইমাত্র আমি এখানকার কলেজে গিয়েছিলুম—কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টম্‌সন এখানে রয়েছেন—আমি সেখানে কি দেখ্‌লুম? কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! পরি-

ছয়ত্র দোরের সোপান—ওঁরাই বোঝেন, আর সেই ভাবে কাজ করেন। আর আমরা হিন্দুজাতি কেবল মুখে ব'লে বেড়াই আমরা পবিত্র, আমরা শুদ্ধ জাতি; কাজে আমরা ম্লেচ্ছেরও অধম। আমি বিপ্লবপন্থী বিদ্রোহী—পলিটিক্সে নয়—সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে। যুবকদের তাই বল্‌ছি সামাজিক উন্নতি কর্‌তে হবে। আমরা আধ্যাত্মিক জাতি ব'লে গর্ব করি; আর ওদের বলি বিষয়াসক্ত বস্তুতন্ত্র।—যথা, বিলেত থেকে টাকা এনে এখানে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন বিদেশী লোক, আর আমরা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকদের স্পর্শ করি না, এমন কি তাদের ছায়াও মাড়াই না—আমাদের তা হলে পাপ হয়—আমরা বলি, ওরা পাপ করেছিল কর্মফল ভোগ কর্‌ছে, আমরা কি কর্‌বো। মায়ের কাজ সোজা নয়, বাহবা নেওয়া উদ্দেশ্য নয় সেবাধর্মে দীক্ষিত হতে হবে, সেই হচ্ছে আসল দেশ-সেবা। এর চেয়ে মহত্তর কাজ আর কিছুই নেই।

বাঁকুড়ার দুর্ভাগ্য যে এখানকার বেশীর ভাগ জমিদারই প্রবাসী। নিজের জমিদারীতে তাঁরা বাস ত করেনই না, পদার্পণও কখনো করেন কি না সন্দেহ। তাঁরা এখান থেকে যতদূর সম্ভব আদায় ক'রে নিচ্ছেন, কিন্তু এখানকার মঙ্গলের কাজ কিছুই করেন না। এইসমস্ত প্রবাসী জমিদারদের ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়; জমিদারদের আমি জোর গলায় জানাতে চাই যে যদি তাঁরা আমার বন্ধু মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির মতন নিজের জমিদারী থেকে গ্রহণ করেন প্রচুর ও জমিদারীর ও প্রজাদের উন্নতির জন্য অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করেন সামান্য, তা হলে প্রজাদের মধ্যে বল্‌শেভিক মত প্রচার কর্‌বার বিরুদ্ধে বল্‌বার মুখ কোথায়? জমিদারেরা প্রজার কষ্টার্জ্জিত অর্থ শোষণ ক'রে কল্‌কাতায় ব'সে বিলাস ঐশ্বর্য্যে ডুবে পরের ধনে পোদ্দারী কর্‌বেন—এ আর চল্‌বে না; এরকম করার অধিকার জমিদারদের নেই—এ প্রকারান্তরে পরদ্রব্য অপহরণ—লুণ্ঠন। আমি বিজ্ঞানসেবী—সত্য আমার সেবনীয় বন্দনীয়; কাজেই আমাকে অনেক সময় অনাবৃত খোলাখুলি সোজা সত্য কথা বলতে হয়—অপ্রিয় হলেও আমি বিপ্লবের সম্ভাবনা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারীদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছি।

যাই হোক্ এখন আমাদের প্রধান কাজ গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি ও হিতসাধন সমিতি করে' দেশের উন্নতি করা। আপনাদের ম্যাজিষ্ট্রেট দত্ত-সাহেব এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন, খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। এইপ্রকম সমিতি ক'রেই দেশের পরম মঙ্গল সাধন করা যাবে—চাই একাগ্রতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর স্বদেশপ্রেমিকতা। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ ক'রে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন—এই আমার বিনীত অনুরোধ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত কেয়টখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়ায় যামিনীনাথকে শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয়। যখন বি-এ পড়েন তখন সংসার এরূপ অচল হইয়া পড়িল যে তাঁহাকে পাঠ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধানে কলিকাতায় আসিতে হয়।

১৮৯২ খৃঃ যামিনীনাথ কলিকাতায় আসেন। সেই সময়ে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসু বংশের স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গিরীন্দ্র-বাবু তাঁহার দুইটি মূকবধির পুত্রকে কথা বলিতে শিক্ষা দিবার জন্য একজন শিক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। মূক-বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সহানুভূতি ও অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া যামিনীনাথ শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন।

গিরীন্দ্র-বাবু তাঁহাকে ডাক্তার টমাস্ আর্ণল্ড (Dr. Thomas Arnold) লিখিত মূক-বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পুস্তক দেন। বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া যামিনী-

বাবু পুস্তকখানা সম্যকরূপ আয়ত্ত করিতে সমর্থ না হওয়ায় নিজের অধ্যবসায়গুণে মূক-বধিরদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন। উহার ফল অত্যন্ত আশাপ্রদ হইয়াছিল।

১৮৯৩ খৃঃ মে মাসে স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ সিটি কলেজের একটি প্রকোষ্ঠে একটি ক্লাস স্থাপন করেন। যামিনী-বাবু অনতিবিলম্বে তাঁহার সহিত যোগদান করেন। এইখানে বর্ত্তমান কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৯৪ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর যামিনী-বাবু দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তথায় তিনি The Training College for the Teachers of the Deaf বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এবং সসম্মানে প্রথম বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।



যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যামিনী-বাবু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমেরিকা যাইবার মনন করেন। ১৮৯৫ খৃঃ অগষ্ট মাসে ডবলীন সহরে The British Deaf & Dumb Association এর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইতেছিল। যামিনী-বাবু তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন, এবং তাঁহার বন্ধুদিগের সাহায্যে আমেরিকা গমনের জন্য যথেষ্ট পাথেয় অর্থ সংগ্রহ করেন। তথায় তিনি ওয়াশিংটনের গ্যালাডেট কলেজে (Gallandet College, Washington), ভর্ত্তি হন। তথায় তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটি বৃত্তি লাভ করেন; তাহাতে তাঁহার আমেরিকা-প্রবাসের সমস্ত খরচ কুলাইয়া যাইত।

গ্যালাডেট কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহার অধ্যাপক পরলোকগত ডাঃ গর্ডন (Dr. Gordon) তাঁহাকে কোনও একটি বিশিষ্ট আমেরিকান মূক-বধির-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ দিবার প্রস্তাব করেন। নিজের দেশের মূক-বধিরদের স্মরণ করিয়া যামিনী-বাবু ডাঃ গর্ডনকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

যামিনী-বাবু আমাদের দেশে মূক-বধিরদিগের শিক্ষা বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী পুরুষ। মূক-বধিরগণ কানে শুনিতে পায় না বলিয়াই বোবা হয়। আমরা অপরের কথা শুনিয়া এবং তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া কথা বলিতে শিখি। যে বধির, পরের কথা শুনিতে পায় না, সে কথা বলিতেও শিখে না। কাজেই বধিরের মূক হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মূক-বধিরদিগের বাক্যন্ত্রগুলি সমস্তই সাধারণ লোকের ন্যায়। তাহারা হাসে, কাঁদে, চীৎকার করে। কাজেই তাহাদের কণ্ঠে স্বর আছে। কিন্তু কান নাই বলিয়া এই স্বরকে নিয়মিতভাবে চালাইবার শক্তি হয় না, এবং ফলে সে বোবা হয়। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে মূক-বধিরদিগকে আমাদের মত কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমাদের বর্ণমালায় প্রত্যেকটি বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ, জিহ্বা, মুখের মাংসপেশীর বিভিন্ন আকার হয়। মূক-বধির বালকগণ শিক্ষকের মুখে ইহা লক্ষ্য করে এবং শিক্ষকের ও নিজের গলা বুক প্রভৃতি স্থানে হাত দিয়া সেই স্থানের কম্প ও আকুঞ্চন অনুভব করিয়া কথা বলিতে শিখে। তাহারা অপরের ওষ্ঠ ও মুখ দেখিয়া তাহাদের কথাও বুঝিতে পারে। যে ছাত্রগণ বুদ্ধির হীনতা, কোন পেশীর অভাব বা অন্য কোন কারণে কথা বলিতে সমর্থ হয় না, তাহারা অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। এই শ্রেণীর মূক-বধিরদিগের জন্য যামিনী-বাবু এক প্রকার অঙ্গুলি-

সঞ্চালন-প্রণালী (Finger or Manual Alphabet) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

যামিনী-বাবু একজন কর্ম্মবীর ছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ সিটি কলেজের একটি প্রকোষ্ঠে মাত্র দুইটি ছাত্র লইয়া যে কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার অধ্যবসায় ও আগ্রহের গুণে আজ এই বিদ্যালয় ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে এখন ৮৫ জন ছাত্র হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি, এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষক। ইহার প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ভূ-সম্পত্তি হইয়াছে।

১৯০৫ খৃঃ যখন স্যর রবার্ট কার্লাইল (Sir Robert Carlyle) কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন, তখন কোনও দৈনিক ইংরেজী সংবাদ-পত্র গভর্ণমেণ্টকে বিদ্যালয়টিকে হস্তে লইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্যর রবার্ট যামিনী-বাবুকে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দেন, "এবিষয়ে কার্য্যকারী সভা যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন। তবে আমি এই হস্তান্তর ব্যাপারে যথাসাধ্য বাধা দিব। আমি তোমাদিগকে দেখাইতে চাই যে আমরাও কোন নূতন জিনিষ গড়িতে পারি।" যামিনী-বাবু তাঁহার এই বাক্য প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের নব জাতীয় ইতিহাসে আমাদের কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে এক জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

১৯১০ খৃঃ ভারত সরকার কাইজার-ই-হিন্দ (Kaiser-i-Hind) মেডেল দিয়া যামিনীবাবুর নানাবিধ গুণরাশির সম্মান করেন।

বহু বৎসর যাবৎ তিনি বিক্রমপুর সম্মেলনীর সম্পাদকরূপে বিক্রমপুরের অশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় তিনি উক্ত সম্মেলনীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

যামিনী-বাবু অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। জীবনে তাঁহাকে কোনও দিন ক্রোধ করিতে দেখি নাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার এত প্রবল ছিল যে তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া অকালে স্বীয় স্বাস্থ্যহানি করেন। তাঁহার মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া স্কুলের কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর শেষরাত্রি চারি ঘটিকার সময় মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে মহাপ্রস্থান করেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীনভারতে মনুষ্যগণনা

বৃটিশ-অধিকৃত সভ্য ভারতে আজকাল সেন্সস বা মনুষ্য-গণনা হইয়া থাকে। বহু প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে এই মনুষ্য-গণনার রীতি প্রচলিত ছিল এবং যথাসময়ে সুনিয়মে এই কার্য্য সম্পাদিত হইত। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদি ও ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন,—"মনুষ্যগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করা এবং কত মনুষ্য কোন্ তিথিতে কি কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইল তাহা লিপিবদ্ধ করা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। সকল সম্প্রদায়ের জন্ম-মৃত্যু-বিবরণ যাহাতে সাধারণে অবগত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই মনুষ্য গণনা করা হইত, ইহাতে রাজস্ব গ্রহণেরও বিশেষ সুবিধা হইত।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যগণনা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসন-প্রণালীর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। যদিও বর্ত্তমানে মনুষ্যগণনা-রীতির সহিত প্রাচীনকালের মনুষ্যগণনার প্রভেদ বিস্তর, তবুও প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মনুষ্যগণনা করা যে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনুষ্যগণনা করা হইত না, রাজসভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মতানুসারে যে-কোন সময়ে এই কার্য্য আরম্ভ হইত।

ঐ সময়ে মনুষ্যগণনা করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী বিভাগ ছিল এবং অসংখ্য কর্মচারী এই বিভাগে কার্য্যকর্ত্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) কর্ম্মচারীকে সমাহর্ত্তা বলা হইত। সমাহর্ত্তার অধিকৃত প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত থাকিত, এবং প্রত্যেক ভাগের ক্ষমতাশালী কার্য্যকর্ত্তা 'স্থানিক' নামে অভিহিত হইতেন। স্থানিকের নীচে কতকগুলি কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেন, ইঁহাদের প্রত্যেকের উপর ১০টি বা ৫টি গ্রামের মনুষ্যগণনা করিবার ভার থাকিত, ইঁহাদের উপাধি ছিল 'গোপ'। এইসকল কর্ম্মচারী ব্যতীত, আর-একপ্রকার কর্ম্মচারী ছিল, ইঁহাদের 'প্রদেষ্টার' বলা হইত।* স্থানিক ও গোপগণ নিজ নিজ কার্য্য যথাযথ পালন করিতেছে কি না, এইসকল কর্ম্মচারী তাহা দেখিয়া বেড়াইতেন, এক কথায় ইঁহারা এই বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট গ্রাম বা নগরের মনুষ্যগণনা করা, কোন্ ব্যক্তি কি কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহা লিপিবদ্ধ করা, প্রত্যেকের আয়-ব্যয় ও চরিত্র কিরূপ তাহা নিরূপণ করা, প্রত্যেক গৃহস্থের পালিত পশুর সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা, গোপগণের প্রধান কার্য্য ছিল।

কার্য্য যথাযথ হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য সমাহর্ত্তা গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন, ইহারা গুপ্তভাবে স্থানিক গোপ ও প্রদেষ্টারগণের কার্য্যাবলি পরিদর্শনানন্তর, যেসকল ত্রুটি দেখিতেন তাহা সমাহর্ত্তার নিকট জ্ঞাপন করিতেন।

প্রত্যেক নগরের মনুষ্যসংখ্যা লিপিবদ্ধ করা, প্রত্যেক নগরে সর্ব্বসমেত কতগুলি বাড়ী আছে, বাড়ীর কর্ত্তা কে, প্রত্যেক ব্যক্তির জাতি ও সে কি কার্য্য করে ও প্রত্যেক গৃহস্থের আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়া গুপ্তচরগণ সমাহর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিতেন। নগরে নূতন গৃহস্থের আগমনের এবং পুরাতন অধিবাসিগণের নগর ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান ও মন্দচরিত্র ব্যক্তিগণের অন্বেষণ করাও গুপ্তচরগণের অন্যতম কার্য্য ছিল। এই শ্রেণীর চরগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা প্রকার বেশ ধারণ করিতেন ও নানাস্থানে ঘুরিয়া চোর প্রভৃতি দুষ্টব্যক্তিগণের সন্ধান লইতেন।

যেসকল কর্ম্মচারী রাজধানীর মনুষ্য-গণনা করিতেন,—তাঁহাদের 'নাগরিক' বলা হইত। ইঁহারাও কতকগুলি কর্ম্মচারীর সাহায্যে এই কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পথিক এবং নবাগত নরনারীগণের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য পান্থশালাধ্যক্ষগণ প্রত্যেক নবাগত ব্যক্তির গমনাগমন-সংবাদ স্থানিককে দিতেন,—প্রত্যেক গৃহস্থও তাঁহার বাটীতে নবাগত ব্যক্তিগণের সংবাদ কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট জ্ঞাপন করিতেন। এই নিয়মের অবহেলা করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। উদ্যান, দেবালয়, শ্মশান প্রভৃতি স্থানের তালিকা প্রস্তুত করাও এই বিভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল।

অনেকের বিশ্বাস,—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দ্বারাই এ দেশে মনুষ্য-গণনা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায় বহু প্রাচীনকালে ভারতে মনুষ্যগণনারীতি প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় চীন, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশেও প্রাচীনকালে মনুষ্যগণনা করা হইত।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিত "প্রাচীন ভারতে সমাহার (সেন্সাস)" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—উপাসনা শ্রাবণ ১৩২৮, ও প্রবাসী আশ্বিন ১৩২৮, ৮৭৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

* "সমাহর্ত্তা চতুর্ধা জনপদং বিভজ্য, জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ বিভাগেন গ্রামাগ্রং পরিহারকম্ আয়ুধীয়ং ধান্য-পশু-হিরণ্য-কুপ্যবিষ্টিকর-প্রতিকরম্ ইদম্ এতাবদ্ ইতি নিবন্ধয়েৎ। এবং চ জনপদ চতুর্ভাগং স্থানিকশ্চিন্তয়েৎ। গোপ স্থানিক স্থানেষু প্রদেষ্টারঃ কার্য্যকরণং বলিপ্রগ্রহং চ কুর্য্যুঃ।"—সমাহর্তৃপ্রচারঃ।



অধিকার

শিব যিনি মহেশ্বর তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর,
ভেদাভেদ নাই তাঁর কাছে,—
জীবজন্তু নরনারী অধিকার সবাকারি,
সমানের পুরো দাবী আছে!
করে সবে বসবাস ধরণীতে বারো মাস,
এক বায়ু আলো পেয়ে বাঁচে!
পুরুষ রমণী কিবা— এক নিশি, এক দিবা,
কেহ আগে, কেহ নয় পাছে!
আছে তাই অবসর দুজনে বাঁধিতে ঘর,
করিতে দুজনে মিলে কাজ,
সম সুখ দুঃখ ব্যথা, অনুরূপ আকুলতা,
ভিন্ন নয় পুণ্য ভয় লাজ!
পাপের সমান জ্বালা— একের অমিয়া-ঢালা,
অপরের নয় শিরে বাজ!
পুরুষের বুদ্ধি-গড়া বেদনার গাঁট-ছড়া,
মানবের পাষাণ সমাজ!
সেখানে নারীর বেলা যত বিধানের মেলা
নিয়ম নিষেধ যত কিছু;
সুযোগ সুবিধাগুলি পুরুষে নিয়েছে তুলি',
নারীভাগ্যে যত আগু-পিছু!
তারি পদে পদে বাধা, আগলে শিকলে বাঁধা,
তারি পথে যত উঁচু নীচু!
আজ হাতে নাই যার কাজ, কোথা পাবে আর,
ফিরে মরে অতীতের পিছু!
অতীতের বোঝা বয়ে চলিয়াছে ভয়ে ভয়ে,
ভূত-কথা ভূত-পত্রী যত,
ভাঙা চোরা ঠেকো দিয়ে টানিয়া মানিয়া নিয়ে,
আসে আর যায় অবিরত!
পুরুষ ভাঙিয়া ফেলে, ঠেলে দেয় অবহেলে,
ছারখার করে বিধিমত!
তাহাতে গৌরব বাড়ে, যশোগাথা চারিধারে,
পুণ্যশ্লোক বীর শত শত!
নারীর যত না ফাঁদ, পদে পদে অপরাধ,
বাঁধা আছে মরা-গিরে দিয়ে,
গারদে গরাদে-ঘেরা পরদায় ঘোরা ফেরা
তাহার বালাই যত নিয়ে,
রোদ বায়ু দূরে থাকে, আড়াল করিয়া রাখে,
পাছে আঁচ লাগে মুখে গিয়ে!
সংহিতায় হিতকথা মুনি বলে যথা তথা
পেট ভরে' সোমরস পিয়ে!
দেবী করিবার লাগি সবে কত অনুরাগী,
নারী হলে কমে যায় মান,
তাই ব্রত উপবাস ত্রিশ দিন বারো মাস,
যাগ যজ্ঞি সারা দিনমান!
আগুনে পুড়িয়া মর'; পুরুষে করিয়া দড়
জড় করি যতেক পাষাণ
সতীস্তূপ রচি দিবে, দীপ যাহে-নাহি নিভে,
সদা ওড়ে যশের নিশান!
পুরুষে পৌরুষ থাক্, নারী শুধু ফিরে পাক
বিধি যাহা দিল স্নেহ দান,
আলো আর বাতাসের, ধরণীর আকাশের,
যে আধেক অধিকারখান।
যা খুসী করিতে পারো, আমাদের পথ ছাড়,
আমরা যেমন সবে জানি
গড়ে নেব পথ ঘাট, ঘরের এ রাজপাট
সাজাব রতন মণি আনি!
তোমাদের অধিকারে লোভ নাই একেবারে,
ভাঙো চোরো যাহা ইচ্ছা করে,
বিধিদত্ত অধিকার কেড়ে নিতে সাধ্য কার,
ঠেকিয়া শিখিবে এর পরে!
মানুষ গড়িতে হলে, হয় কোন্ মন্ত্রবলে,
জানি মোরা যুগ যুগ ধরে',

মাতা হয়ে এল যারা, পরিমাণ জানে তারা,
হাত পেকে গেছে ছেলে গড়ে'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

—

মহিলা মেয়র

গত নভেম্বর মাসের নির্ব্বাচনে ডাক্তার এমী কান্‌কোনেন আমেরিকার ওহিও রাষ্ট্রের ফেয়ারপোর্ট শহরের মেয়র বা মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকার অন্যান্য শহরেও মহিলা মেয়র আছেন; তবে এমী কান্‌কোনেন সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ—তাঁর বয়স এই সবে ২৩ বৎসর। ইনি ফিলাডেল্‌ফিয়ার মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবিভাগে ডাক্তার নিযুক্ত ছিলেন। ইনি মাদক-নিবারণের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দলের নির্ব্বাচিত; এজন্য ইনি ফেয়ারপোর্ট শহরে মাদক নিবারণের ব্যবস্থা করিতেছেন ও আইন প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এঁর এই উদ্যম ও মেয়র পদে নির্ব্বাচনের জন্য রাষ্ট্রনায়ক দেশমুখ হার্ডিঙের পত্নী এঁকে অভিনন্দন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

সোম।

—

বেল্‌জিয়ামে নারী-প্রগতি

বেল্‌জিয়মে বহু মহিলা শহরের মেয়র নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং এই প্রথম একজন মহিলা বেল্‌জিয়ম পার্লামেণ্টের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন—তাঁর নাম মাদাম স্পাআক, তিনি সমাজপন্থী দলভুক্ত।—La Francaise.

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

মহিলা-কবি

জাপান-সম্রাট মিকাদো প্রতিবছরই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দশজন কবিকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। ১৯২১ সালের পুরস্কৃত দশজন কবির মধ্যে বিখ্যাত মহিলা-কবি চার্লস বার্‌নেট-পত্নীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর বাড়ী আমেরিকায়। আমেরিকার কবি-মহলে ইনি খুব সম্মানিতা। ১৯২১ সালের কবিতার বিষয় ছিল—"প্রাতঃকালে আইসি-মন্দির-দ্বারে।"

প্রতিযোগী কবিতার সংখ্যা ছিল—১৭০০০!

কবিতাগুলি জাপানী ভাষায় লিখিত। একজন বিদেশিনী মহিলার পক্ষে দুরূহ জাপানী ভাষা শিক্ষা করিয়া, কবিতা লিখিয়া, প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হওয়া কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে! বিদেশীর ভাগ্যে এ সম্মানার্হ পুরস্কার লাভ ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই।

নগেন্দ্র ভাণ্ডারী।

—

আবেস্তা সাহিত্যে রমণীর অধিকার

অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন। কেবল অধীন বলিলেই হয় না, স্ত্রীজাতি সৃষ্টির প্রারম্ভ-কাল হইতেই অবজ্ঞাত ও অনাদৃত। বাইবেলের সৃষ্টিকাণ্ডে পুরুষের অস্থি লইয়া স্ত্রীলোকের সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে; স্ত্রীলোকের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। আদম ও ইভার উপাখ্যানে নিষিদ্ধবৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া ইভাই ইডেন-উদ্যানে সকল অনিষ্টের হেতু হইয়াছিলেন। গ্রীক সুন্দরী পান্দোরাই মনুষ্যজাতির যাবতীয় আপদ-বালাইএর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে কোনও রমণী এ-প্রকার আপদ-বালাইএর হেতু বলিয়া কল্পিত হয়েন নাই বটে, কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ রমণী জাতিকে স্বাধীনতা দেন নাই, তাঁহারা বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন,—পুত্র শিশু হইলেও বৃদ্ধা তাঁহারই অধীন। রমণীর স্বাধীনতা আমাদের লৌকিক সংস্কৃতের (Classical Sanskrit) যুগেও অনুমোদিত ছিল না।

বহুকাল আন্দোলনের ফলে আমেরিকার ও ইউরোপের কোন কোন দেশে রমণীগণের ভোট দিবার অধিকার হইয়াছে। আমেরিকার শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে রমণীগণ পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিবামাত্রই পুরুষগণের চোখ ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে এতকাল পুরুষগণের হাতে তাঁহারা নিতান্তই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিলেন। কারণ সুচিকিৎসার অভাবে আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশে প্রসব-কালে রমণীগণ লাখে লাখে প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন; রাজকার্য্যে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বে পুরুষগণ ইহার প্রতিকারের জন্য কোনও চেষ্টাই করেন নাই। রমণীগণ পুরুষগণের সমকক্ষতা লাভ করিবার পরেই

দেশের মধ্যে নানাস্থানে অসংখ্য আঁতুড়-চিকিৎসালয় (Labour hospitals) স্থাপিত হইয়াছে। দেশের অন্তঃসত্ত্বা রমণীগণ এই স্থানে থাকিয়া বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবেন। প্রসবের পর প্রসূতি ও প্রসূত সন্তান সবল হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় স্বাধীন দেশের রমণীগণও পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া সভাসমিতি গড়িয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা তেমন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে মহিলাগণ ওকালতি করিবার অধিকার পাইতেছেন।

আর্য্যদিগের প্রাচীন সভ্যতার বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করিতে হইলে কেবল ভারতীয় সাহিত্য খুঁজিলে চলে না। কারণ আর্য্যজাতি যখন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভারত ও ইরাণ এই দুইদেশে বাস করিয়াছেন এবং উভয় জাতিরই এক-একটা বিরাট প্রাচীন সাহিত্য ছিল, তখন উভয় অংশের কোনও একটিকে বাদ দিলে আলোচনা ও অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ হইবেই হইবে। আমাদের দেশে এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধান হইয়াছে কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে। কিন্তু ইরাণীয় সাহিত্যের সন্ধান না থাকায় আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের অনেক অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের সভ্যতা যে এককালে অন্যান্য সকল জাতির সভ্যতা অপেক্ষা অগ্রসর ছিল তাহা আমরা সংস্কৃত ও আবেস্তা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বুঝিতে পারি। আবেস্তা সাহিত্য প্রায় আমাদের বৈদিক সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ইরাণের জরথুস্ত্র-ধর্ম্মী যে-প্রাচীন জাতির এককালে ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের বংশধরগণও এক্ষণে বাঁচিয়া আছেন এবং অনেকেই পারস্য ছাড়িয়া ভারতবাসী হইয়াছেন। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাঁহাদের সহিত আমাদের বিরোধবশতঃ তাঁহাদের ও আমাদের সভ্যতা যতটুকু বিভিন্ন-মুখী হইয়াছিল তাহার বিবরণ তাঁহাদের আধুনিক রীতিনীতি ও প্রাচীন সাহিত্য হইতে অনুসন্ধান করা যায়। সুতরাং আমাদের প্রাচীন সভ্যতা বা প্রাচীন রীতিনীতির বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার একটা নূতন প্রণালী হইল এই যে আমাদের যাহা-কিছু তাহাই ঐ পার্সীদিগের সহিত মিলাইয়া তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ আমাদের প্রাচীনকালের মহিলাদিগের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কতখানি ছিল তাহা জানিবার জন্য মনু-পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র ও আমাদের দেশের পুরাণ-ইতিহাস ঘাঁটিলেই চলিবে না। বৈদিক সাহিত্যেও হয়ত কুলাইবে না। আমাদিগকে বিদেশীয় মজ্‌দা-যশীয় জাতির রীতিনীতি ও সাহিত্য ঘাঁটিতে হইবে।

বেদে আমরা আমাদের প্রাচীন মহিলাদিগের বিষয় এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি যে পুরুষের ন্যায় কোনও কর্ম্ম করিতে তাঁহাদের বাধা ছিল না। অনেক স্ত্রী-ঋষি বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তা ছাড়া তাঁহারা অধ্যাপনাকার্য্যও করিতেন। একটা সামান্য শব্দের সাক্ষ্য হইতেই সেটা জানা যায়। আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের আইনে 'আচার্য্য' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দুইটি রূপ—'আচার্য্যাণী' ও 'আচার্য্যা'। যিনি আচার্য্যের পত্নী তিনি আচার্য্যাণী, কিন্তু যিনি স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য করিতেন তিনি আচার্য্যা। সুতরাং আধুনিক যুগে মহিলাগণের জন্য যে-সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রাচীন কালে তাহা নিষিদ্ধ ছিল না।

ইরাণীয় আবেস্তা সাহিত্যে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কোনও প্রভেদ নাই। উভয়েরই সকল কার্য্যে সমান অধিকার। পার্সীদিগের আধুনিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারও সেই প্রাচীন কালের অনুরূপ। ইঁহাদের অবরোধ-প্রথা ত নাইই; অধিকন্তু কি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ব্যবহার সর্ব্বত্রই পুরুষ ও রমণীতে অধিকারের চুল-চেরা ভাগ; কম-বেশী হইবার উপায় নাই। আবেস্তা সাহিত্যের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে পার্সীদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা 'অহুর মজ্‌দার' একটি সভা বা পরিষদ আছে। সেখানে পারিষদ সাতজন। প্রথমে 'অহুর মজ্‌দা'কে লইয়াই তাঁহারা ছিলেন সাতজন। পরে একজন অভিনব পারিষদ ঐখানে স্থান লাভ করায় ইঁহারা অহুর মজ্‌দাকে ছাড়িয়াই সাতজন হইয়াছেন। আধুনিকযুগের পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত তুলনা করিলে নবাগত পারিষদকে পুলিস-ডিপার্টমেণ্টের নায়ক বা ইন্‌স্পেক্টর-জেনেরল বলা যায়। কারণ ইঁহার কার্য্য

হইতেছে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন। চোর-ডাকাইতের শাস্তির ভার ইনিই লইয়াছেন। ইঁহার নাম 'শ্রওষি' (সং 'শুশ্রূষা' শব্দের জ্ঞাতি)। ইনি পুরুষ। কিন্তু নবাগত বলিয়া ইঁহাকে ছাড়িয়া দিলে পারিষদ-সংখ্যা হয় ছয়জন। এই ছয়জনের তিনজন পুরুষ, তিনজন রমণী। কুম্-বেশী হইবার যো নাই। ইঁহারাই পার্সীদিগের সর্ব্বোচ্চ দেবতা এবং জরথুস্ত্র ইঁহাদিগকেই দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে অহুর-মজ্দার পারিষদ্‌গণের নাম প্রদত্ত হইল।

অহুরো মজ্‌দা

পুরুষ	মহিলা
বোহু মনো (সাধুচিত্তের দেবতা) ১	৪ শ্‌পেন্ত আর্মইতি (পবিত্র ধর্ম্ম)
অষ-বহিষ্‌ত (সর্ব্বোত্তম পবিত্রতার দেবতা) ২	৫ হৌর্বতাৎ (স্বাস্থ্য)
খ্‌ষথ্র-বইর্যো (সর্ব্বোত্তম রাজ্যের দেবতা) ৩	৬ আমরেতাৎ (অমরতা)

৭ শ্রওষো (রক্ষক)

ইঁহারাই পার্সীদিগের স্বর্গবাসী দেবতা। ইঁহাদিগের নাম "অমেষ শ্‌পেন্তা" অর্থাৎ "মঙ্গলময় বা পবিত্র অমর"। ইঁহারা সদ্ধর্ম্মীদিগের (অর্থাৎ জরথুস্ত্রীয়গণের) মঙ্গল বিধান করেন এবং কুধর্ম্মাবলম্বিগণের দণ্ডবিধান করেন। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মে সৃষ্টির দুইটি উপাদান—'সু' ও 'কু'। সারা জগতে কেবল 'সু' আর 'কু' আছে। 'সু' হইতে উদ্ভূত ইঁহাদের স্বর্গের দেবতা 'অমেষ শ্‌পেন্তা' এবং জরথুস্ত্র মতাবলম্বী মানবগণ। 'কু' হইতে উদ্ভূত অমেষ-শ্‌পেন্তগণের শত্রুপক্ষ 'অঙ্গ্‌ মৈন্যু' (বদ্‌রাগী Ahriman) বা 'দ্রুজ্' ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ এবং তাঁহাদের উপাসকগণ। 'অহুরো মজ্‌দা' (Ormazd) এবং তাঁহার পারিষদগণ 'অহুর' (=অসুর) নামে পরিচিত এবং 'অঙ্গ্‌ মৈন্যু' ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ 'দএব' (=দেব) নামে পরিচিত। আমাদের ভাষায় 'অসুর' ও 'দেব' শব্দের বিপরীত অর্থ। এটা আমাদের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মগত বিরোধেরই পরিচয়। তাঁহাদের 'দএব'-গণ আমাদেরই দেবতা। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মের মতে অহুরগণের চিরশত্রু দএবগণ। মানুষ জন্মমাত্রই উভয় শক্তির অধীন হইবে এবং অহুরগণের প্রভাবে যেমন ধর্ম্মে রত হইবে, দএবগণের প্রভাবে তেমনি পাপে রত হইবে; কিন্তু অন্তিমকালে দএবগণের পরাজয় ও অহুরগণের জয় হইবে। ইঁহাদের অমেষ-শ্‌পেন্তগণের ন্যায় দএবগণেরও পরিষদ আছে। তাহাতেও অঙ্গ্‌ মৈন্যু ছাড়া ৬ জন পারিষদ। তাঁহাদের মধ্যেও তিনজন পুরুষ, তিনজন দএব-মহিলা।

অঙ্গ্‌ মৈন্যু

পুরুষ	মহিলা
অকমনো (অসচ্চিত্ত) ১	৪ নাওংহৈথ্য (অধর্ম্ম)
ইন্দ্র (অরাজকতা) ২	৫ তউরু (ব্যাধি)
শৌরু (পাপ) ৩	৬ জৈরী (ক্ষয়)

৭ অএষ্‌ম (ক্রোধ)

আবেস্তা-সাহিত্যের এইসকল বিবরণ হইতেই দেখা যায় যে আর্য্য-সভ্যতার একটি প্রধান উপাদান ছিল মহিলাগণের স্বাধীনতা। তাই তাঁহাদের সমাজের চিত্র তাঁহাদের দেবসমাজেও অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের মানবজাতির ধর্ম্মের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই মানবগণ নিজেদের চরিত্রের চিত্র হইতেই দেবতার চরিত্র কল্পনা করিয়াছে। মানবজাতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই দেবচরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে। তবে দেবচরিত্র কল্পনা করিতে যাইয়া প্রাচীনকালের মানবগণ অনেক স্থলেই মানবচরিত্রের নিকৃষ্ট অংশও দেবচরিত্রের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই আমরা গ্রীক দেবী জুনোর চরিত্রে সাধারণ রমণীর ন্যায় ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি অসদ্গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। সে যাহাই হউক যে জাতির দেবগণের মধ্যে পুরুষের ন্যায় রমণীরও ভোট দিবার সমান অধিকার, তাঁহাদের সমাজে মনুষ্যগণের মধ্যেও যে রমণীগণের সেইপ্রকার অধিকার ছিল তাহাতে সন্দেহ কি? আবার তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সেই-প্রকার অধিকার যখন পাইয়া আসিতেছেন, তখন সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকিতেছে না।

আমাদের বালিকাগণের উপনয়ন নাই, বালকগণেরই সে সংস্কার হইয়া থাকে। কিন্তু পার্সীদের বালকের ন্যায় বালিকাগণেরও নবজোত-সংস্কার হইয়া থাকে। এই সংস্কারের জন্য নির্দ্দিষ্ট বয়স ৭ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত। আমাদের যেমন বালকগণের যজ্ঞোপবীত সেইরূপ ইঁহাদের বালক বালিকাগণের 'কুস্‌তি'। আমরা যজ্ঞোপবীত গলায় পরি, ইঁহারা যজ্ঞোপবীত, ঘুন্‌সির ন্যায় কোমরে পরিয়া থাকেন।

আমাদের যজ্ঞোপবীত সূত্র-নির্ম্মিত, ইঁহাদের পশুলোম নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া বড় বেশী প্রভেদ নাই।

যশ্ন গ্রন্থে জরথুস্ত্রের কনিষ্ঠা কন্যা পৌরুবিস্তির বিবাহের বিবরণ আছে। ইহা হইতেই জরথুস্ত্রীয়গণের প্রাচীনকালের বিবাহপদ্ধতি বুঝা যাইবে। নিম্নে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ দিলাম।

গৃহপতির উক্তি—

"অগ্নি স্পিতমী (পবিত্রতমা) ও হএচদশ্‌পিৎ (হএচৎ-শ্‌প-বংশীয়া) পৌরুবিস্তি! ইঁহারই হস্তে তোমাকে প্রদান করা হইবে। তুমি জরথুস্ত্রের কন্যাগণের মধ্যে কনিষ্ঠা। 'বোহুমনো', 'অষ' ও 'মজ্‌দা'র কার্য্যে তুমি ইঁহার প্রধান সহায় ও রক্ষয়িত্রী হইবে। আরমৈতীর (সদ্ধর্ম্মের) ন্যায় দানশীল ও সাধু অন্তঃকরণ লইয়া তোমরা পরস্পর পরামর্শ করিবে এবং সর্ব্বদা সাধুতার সহিত আচরণ করিবে।"

পৌরুবিস্তির উক্তি—

"আমার পিতার নিকট হইতে যখন তাঁহাকে পাইলাম, তখন আমি তাঁহাকে অবশ্য ভালবাসিব এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইব।" *—যশ্ন। ৫৩।৩—৪।

এই বিবাহ-বিবরণে দেখা যায় যে পত্নী স্বামীর সমকক্ষ এবং পত্নীর সহিত সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শ করা স্বামীর কর্ত্তব্য। স্বামীকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করাও পত্নীর কর্ত্তব্য।

একটা কথা। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে পার্সীদিগের ধর্ম্মে বা ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহাই আর্য্যসভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিবার হেতু কি? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিব যে আর্য্যদিগের যখন দুই শাখা, তখন এক শাখার আচারব্যবহার ও সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায় তাহা অন্যশাখার প্রাচীন সাহিত্যের বিরোধী না হইলে তাহাকেই উভয় শাখার সাধারণ আচারব্যবহারের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, বেদে মহিলাগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। অবরোধ-প্রথা ত ছিলই না। সুতরাং উত্তরকালে ভারতবর্ষে আর্য্যরমণীগণের যে পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা আর্য্যসভ্যতার মৌলিক উপাদান নহে। পার্সীগণের আচারব্যবহারই এ বিষয়ে সুপ্রাচীন।

ইংরেজীভাষায় পত্নীশব্দের প্রতিশব্দ আছে "better half"; কিন্তু ইঁহাদের সমাজে যে-ভাবে রমণীগণ রাষ্ট্রীয় অধিকার হ'তে বঞ্চিত, তাহাতে ও-নামটা কেবল মিষ্ট কথা মাত্র। আবার কথায় ও কার্য্যে ঐক্য না থাকায় কেমন-একটা বিদ্রূপের গন্ধ উহাতে লাগিয়া আছে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণের সমাজে এ-প্রকার বিদ্রূপাত্মক ভাষার প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃত ভাষায় 'সহধর্ম্মিণী' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' প্রভৃতি পত্নীবাচক শব্দ আছে। শব্দগুলি অন্বর্থ। ইহাদের মৌলিক অর্থ যাহা, তাহাই ইহাদের সমাজে প্রযুক্ত অর্থ। আমাদের আর্য্য-পূর্ব্বপুরুষগণের কথায়-কাজে ভেদ ছিল না। আর নারী যে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন তাহা আবেস্তা-সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রপ্রদর্শনী

গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে এবার যে চিত্রপ্রদর্শনী বসেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সুখ্যাতির কথা হচ্ছে এই, যে, এখানকার ছবিগুলি সব ছবিই হয়েছে কাব্যও হয় নি, সঙ্গীতও হয় নি। তাই ব'লে অবশ্য এমন কথা বলছি না যে চিত্রের সঙ্গে কাব্য ও সঙ্গীতের কোন যোগসূত্র নেই; তা খুবই আছে এবং এই তিনটি মার-পেটের বোন হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়াবার জন্যে যে সদাই উন্মুখ হয়ে রয়েছে এবং এমন একজন সাম্যবাদী শিল্পীর প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে আছে যিনি এদের মিলন ঘটিয়ে দিতে পারেন, সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ কারুর মাঝে নেই। তবে কিনা কথা হচ্ছে, এই মিলন ঘটবার পরও চিত্র থাকবে চিত্র, সঙ্গীত থাকবে সঙ্গীত, আর কাব্য থাকবে কাব্য, এবং এইখানেই এদের বিশেষত্ব। ছবির মধ্যে কাব্য থাকবে, কিন্তু নিজেকে প্রচার করবার জন্যে নয়, ছবির ভিতর দিয়ে নিজের সত্তাকে

সার্থক ক'রে তোল্‌বার জন্যে। কিন্তু যেখানে দেখা যায় চিত্রের মধ্যে কাব্য এসে উৎপাত আরম্ভ ক'রে দিয়েছে এবং চিত্রকে ছাপিয়ে উঠে নিজেই গলাবাজী সুরু ক'রে দিয়েছে, সেখানে চিত্র ত কাঁদ্‌তে বস্‌বেই, কাব্যও যে ঠিক হেসে যেতে পার্‌বে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাব্যকে চিত্র ফুটিয়ে তুলুক চিত্র হয়ে—কাব্য চিত্রকে ফুটিয়ে তুলুক কাব্য হয়ে। চিত্র কাব্যকে ফুটিয়ে তুলুক তার রেখা এবং রংএর রঙ্গীন প্রীতির আবেশ দিয়ে, আর কাব্য ফুটিয়ে তুলুক চিত্রকে তার ছন্দ এবং মূর্চ্ছনার লীলায়িত বাহুবেষ্টনের নিবিড়তার ভিতর দিয়ে।



নমাজ

চিত্রকর শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়।

আমরা এইবার একে একে গোড়া থেকে নম্বর ধ'রে ছোটখাটোর মধ্যে একটা মোটামুটি চিত্রপরিচয় দেবার চেষ্টা কর্‌বো। বলা বাহুল্য, সব ছবির পরিচয় দিতে আমরা পার্‌বো না; কেবল সেইসব ছবির পরিচয় দেবো যার মধ্যে রসবস্তু নিজেকে ধরা দিয়েছে। প্রায় পাঁচশত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়খানি ছবির সম্বন্ধে দু'চার কথা আমরা বল্‌তে চাই।

আমরা প্রথমেই পাচ্ছি শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় মহাশয়ের ছবি। প্রথম সাতটি ছবিই তাঁর। এই শিল্পী সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার আছে। আমাদের মনে হয় এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীর মধ্যে যতগুলি ছবি দেখা গেছে তার মধ্যে প্রকৃত আর্ট হিসাবে যামিনী-বাবুর ছবি সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে। এমন অনাড়ম্বর সহজ সরল অথচ মনোজ্ঞ এবং সংযত ছবি বড় একটা দেখা যায় না। এঁর ছবিতে রং আছে, কিন্তু রংএর জন্যে নয়—বিষয়বস্তুকে রংএর সুরে সুরময় ক'রে তোল্‌বার জন্যে। তাই এঁর নমাজ-পড়ার ছবি শুধু একটিমাত্র মুসলমান ভক্তের ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার মত ভাবটিকে সার্ব্বজনীন এবং শাশ্বত করে তুলেছে, পটভূমিকার (Backgroundএর) উদাস রংটির ভিতর দিয়ে—বেলা-শেষের উদাস ক্ষণটুকুর করুণসুরের মত আবেশময় ক'রে। এই শিল্পীর রং দেবার



বে-ওয়ারিশ

চিত্রকর শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়।

কায়দা ঠিক ওস্তাদ গাইয়ের গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে তাক্‌মাফিক্ দু-একটি টুক্‌রো তান মেরে দেওয়ার মত, ঠিক তেমনি সংযত এবং ঠিক তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ। ইনি সবসুদ্ধ ৮।৯ খানি ছবি দিয়েছেন। আমার মনে হয় সবকখানিই উঁচুদরের আর্ট-সৃষ্টি হয়েছে—বিশেষতঃ বেওয়ারিস

নামক ছবিখানি। একটিমাত্র শীর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য পরিত্যক্ত গরুর করুণ একখানি ছবি এবং তারই মতন পরিত্যক্ত এবং কর্দ্দমাক্ত খানিকটা জমি আর তারই উপরে করুণ এবং ধূসর বিষাদমাখা উন্মুক্ত আকাশ—এই তিনের সমাবেশে যে একটি অখণ্ড করুণ এবং বিদায়ের সুর বেজে উঠেছে তা শিল্পীর সমস্ত চাতুর্য্যকে আড়াল ক'রে একটিমাত্র অশ্রু-ফোঁটার মত টল্‌টল্ করতে থাকে। তার পর একটি বৃদ্ধা বিধবার ছবি। সারা জীবনব্যাপী ঝড়ঝাপ্টার পর সব-খোয়ানো এই বিধবাটির মুখে বিষাদের সুরটুকুর সঙ্গে একটি নির্ভরতা এবং আত্মনিবেদনের করুণ অথচ ক্ষীণ এবং সূক্ষ্ম সুর কোন্ এক অদৃশ্য পুরুষের চরণের দিকে পুষ্পাঞ্জলির মত উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মোট কথা এই নিপুণ শিল্পীর



আহত পাখী
চিত্রকর শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

হাত আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর এবং সরস দরদী অন্তঃকরণও আছে যার অভাব চিত্রকে ক'রে তোলে ফটোগ্রাফ, কাব্যকে ক'রে তোলে ছড়া, আর সঙ্গীতকে ক'রে তোলে গ্রামোফোন।

যামিনী-বাবুর ছবির পরই আমরা পাচ্ছি গুটিকতক চেহারার ছবি। চেহারার ছবি জিনিষটা ফটোগ্রাফ নয়। ব্যক্তিবিশেষের অবিকল একটা নকলমূর্ত্তি খাড়া ক'রে তোলাই চেহারা আঁকার সব কাজ নয়। সেই ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ চিত্তবৃত্তিটির দিকে নজর রেখে শিল্পীকে অতি সাবধানে এই কাজে অগ্রসর হতে হয়। আর্টের এই বিভাগটি ফটোগ্রাফের মত শুধু নকল নয়,



শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রকর শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

এর মধ্যে সৃষ্টিশক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই। এক কথায় চেহারার ছবি আঁকার মধ্যে অনুকরণ-শক্তি এবং সৃষ্টিশক্তি এই দুয়েরই সমাবেশ দরকার করে এবং যে চেহারা-ছবির মধ্যে এই দুই শক্তির সম্যক্ মিলন ঘটেছে তাঁকেই ভালো চেহারা-ছবি বল্‌বো। এই হিসাবে আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা রবীন্দ্রনাথের চেহারা সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এই ছবিখানি রবি-বাবুর বাইরের



গানের টহল

চিত্রকর শ্রী টি. ওয়াড্ ।

চেহারাকে যেমন দর্শকের চোখের সুমুখে হুবহু ধ'রে দেয়, মনের চেহারাখানাকেও তার চাইতে কিছু কম এনে দেয় না। বিশেষ করে' রবি-বাবুর চোখের স্বপ্নময় ভাবটুকু মরমী কবির পক্ষে খুব বেশী ইঙ্গিতময় হয়েছে। এই চেহারা-ছবি এক কথায় প্রকৃত ছবি হয়েছে এবং এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

এর পরেই পাচ্ছি আমরা কালো-ধলো (Black and White) বিভাগ। এই বিভাগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের বনরাণী এবং আহত-পাখী ছবি দুখানি। সতীশ-বাবুর মণ্ডন-শিল্প বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। মণ্ডন অলঙ্করণ হিসাবে এই শিল্পীর আঁকা ছবিগুলি শুধু কেবল ভালো হয়েছে বল্লেই যথেষ্ট বলা হয় না—চমৎকার হয়েছে। অলঙ্করণ শিল্পের একটা মস্ত বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর মধ্যে সত্য এবং শিব অপেক্ষা সুন্দরের সাধনাই অধিক পরিস্ফুট। তাই আর্টের এই বিভাগটি সত্য এবং শিব এই দুয়ের রাজত্ব ছাড়িয়ে নিজের বিষয়বস্তুর সন্ধানে ছুটতে থাকে পরীর দেশে—রূপকথার রাজ্যে যেখানে গাছে ফোটে সোনার ফুল, সাপের মাথায় জ্বলতে থাকে সাতরাজার ধন এক মাণিক এবং দুগ্ধ-ধবল হাতীর গলায় দুলতে থাকে তারই মত ধবধবে শুভ্র গজমতির সাতনরী হার। শিল্পের এই বিভাগটির মধ্যে সুন্দর সবচেয়ে বেশী আপনাকে ধরা দেয়। কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখা দরকার—রূপকথার রাজকুমারীর মত এই মণ্ডন-শিল্পের নায়ক-নায়িকা দর্শকের চোখে এমন একটা সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে যার সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন-পঙ্গু জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এ সৌন্দর্য্য শুধু কেবল সৌন্দর্য্যই ; আর্টের জন্যই আর্ট চর্চ্চা (Art for art's sake) কথাটা খুব বেশী খেটে যায় এই মণ্ডন-শিল্পের বেলায়। কালো-ধলো বিভাগের আর-একটি ছবি আমাদের খুব ভালো লেগেছে, এখানি মিস্ এণ্ডার্সন

অঙ্কিত একটি সাহেবের ছবি। ভদ্রলোকটি চুরুট মুখে ক'রে ব'সে আছেন—এই হচ্ছে ছবিটির বিষয়বস্তু। কোন কাজ যখন মানুষের হাতে নেই, মনটা যখন একেবারেই খালি, কেবল পেঁজা-তুলোর মত হাল্‌কা সৌখিন এবং অলস চিন্তা একটা-আধটা মাঝে মাঝে খেয়ালের মত চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে বেড়ায়, সেই সময় মানুষের চোখে মুখে একটা যে অর্থহীন অলস-ভাব ফুটে ওঠে সেই ভাবটি এই লোকটির মুখে খুব চমৎকার ফুটে উঠেছে।



ধ্বংসের সুর

চিত্রকর শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

এর পরেই আমরা পাচ্ছি শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরীর তোলা কতকগুলি ফটো। এই ফটোগুলি এতই সুন্দর হয়েছে যে সহসা দেখ্‌লে ফটো ব'লেই ধরা যায় না, মনে হয় যেন কোন শিল্পীর আঁকা ছবি থেকে ফটো তোলা হয়েছে। আর্য্য-বাবুর আঁকা কতকগুলি জলো-রঙের ছবিও আমরা দেখ্‌লাম। এই ছবিগুলির মধ্যে "মরুৎ" ব'লে ছবিটি আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

এর পরে আমরা এ ঘরে প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য ছবি আর পাই নি, তবে এনায়েৎউল্লা অঙ্কিত দুএকখানা ছবি আমাদের মন্দ লা'গেনি। এঁর ছবির বিশেষত্ব এই যে এগুলি সিল্কের উপর আঁকা।



মা

চিত্রকর শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল।

এর পরই দ্বিতীয় কক্ষে এসে আমরা প্রথমেই শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুর আঁকা স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর একখানি



গুজরাটের গোয়ালিনী
চিত্রকর শ্রী রাম রাও।

তৈলচিত্র পাচ্ছি। এই তৈলচিত্রখানি চেহারা হিসাবে চমৎকার হয়েছে। যেমন অঙ্কন-রীতি, তেমনি রং মেশাবার কায়দা, তেম্নি আবার মুখ চোখ দিয়ে ভিতরকার আসল মানুষটিকে দর্শকের চোখের সাম্নে মেলে ধর্বার নিপুণতা।

এবার আমরা ওস্তাদ শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকখানি ভূচিত্র পাচ্ছি। তাঁর ছবি সম্বন্ধে অধিক কিছু ব'লে আমরা ধৃষ্টতা প্রকাশ কর্তে চাই না। তবে এ পর্য্যন্ত বল্তে পারি যে তাঁর ছবিগুলি তাঁরই উপযুক্ত হয়েছে।

এর পরে আমরা পাচ্ছি শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের একখানি তৈলচিত্র। একটি চাষা মাঠে লাঙ্গল চষ্‌ছে—এই হচ্ছে ছবিখানির বিষয়বস্তু। চাষার লাঙ্গল চষ্‌বার সময়কার পরিশ্রম ও কষ্ট এবং তারই সঙ্গে গরু দুটির হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে নিজেদের বারে বারে বাঁচিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে লাঙ্গল টানার ভাবটুকু এবং তারই উপর ক্লান্তবর্ষণ এক বর্ষা-প্রভাতের মেঘ ও রৌদ্রের জালিকাটা করুণ আকাশ—এই-সমস্ত ব্যাপার একত্র হ'য়ে অতি চমৎকার একখানি ছবি সৃষ্টি করেছে।

এর পরেই আমরা পাচ্ছি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের একখানি ছবি। একটি যুবতী ভিজে কাপড়ে স্নান ক'রে ফির্‌ছে এই হচ্ছে ছবিখানির বিষয়বস্তু। ভিজে কাপড় অঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে লেপ্টে বস্‌লে যেমনটি দেখায় চিত্রকর খুব নিপুণতার সঙ্গে সেটি আমাদের দেখিয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই ভিজে ভাবটি শুধু কেবল ভিজে কাপড়ের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে পটভূমিকার এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের ভিতর দিয়েও ফুটিয়ে তোলার দিকে নজর কর্‌লে চিত্রকর বোধ হয় চিত্রটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুল্‌তে পার্‌তেন। এক কথায় এই ছবিখানি শিল্পীর কলা অপেক্ষা কৌশলের পরিচয়ই বেশী দেয়।

এবার আমরা একজন খুব শক্তিশালী চিত্রকরের একখানি বড় ছবি পাচ্ছি। এই চিত্রকরের নাম এ একস্‌ ট্রিওাড্‌। একটি প্রৌঢ়া রমণী অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় বিশ্রামসুখ অনুভব কর্‌ছেন এই হল ছবিখানির বিষয়বস্তু। ছবিখানির বিষয়নির্ব্বাচনে চিত্রকরের কৃতিত্ব কিছুই নেই। কিন্তু বিষয় যতই সামান্য হোক্‌, সেই সামান্য জিনিষটিকে মানুষ যে কত নিখুঁৎ নিপুণতার সঙ্গে আঁক্‌তে পারে চিত্রকর তা আমাদের খুব ভাল ক'রে চোখে আঙ্গুল দিয়ে



ঘড়া-পায়া মিস্ত্রী

শিল্পী শ্রীকড়কে।

দেখিয়ে দিয়েছেন। এই ছবিখানি শক্তির দিক থেকে বোধ হয় এবারকার প্রদর্শনীর সেরা ছবি হয়েছে।

এর পরই আমরা পাচ্ছি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুর "ধ্বংসের সুর"। এই ছবিখানি আমাদের খুব ভাল লেগেছে। এই ছবিখানির আগাগোড়া সমস্তটার মধ্যেই আংশিক এবং সমগ্রভাবে ধ্বংসের একটা সুর আপনা হতে বেজে উঠ্‌ছে। কি বর্ণবিন্যাসে, কি রেখার টানে, সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই একই সুর বেজে উঠেছে।

এর পর হোসেনবক্সের আঁকা আঙুরের ছবি আমাদের ভাল লেগেছে। এই ছবির মধ্যে ধৈর্য্য এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আঙুরগুলি একেবারে রসে ভরা উজ্জ্বল স্বচ্ছ টলটলে।

এবারকার প্রদর্শনীতে একজন প্রকৃত শক্তিশালী চিত্রকরের ছবি আমরা পেয়েছি—এই চিত্রকরের নাম শ্রীযুক্ত রামরাও। এঁর আঁকা প্রায় সমস্ত ছবিই সুন্দর হয়েছে। এঁর অধিকাংশ ছবিই ভূচিত্র। এই চিত্রকর খুব অল্পের মধ্যে এবং খুব কম পরিশ্রমে এক-একটি গোটা দৃশ্য আমাদের চোখের সুমুখে এনে খাড়া ক'রে তোলেন। এঁর আঁকার আর-একটি বিশেষত্ব এই যে ছবিগুলির যেটুকু মাজা (finish) দরকার ঠিক সেইটুকু দিয়েই শিল্পী ছবিগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন—কোথাও অতিমার্জ্জন (over-finished) ক'রে তোলেন নি। রংএর উপর খুব বেশী দখল থাকা সত্ত্বেও এই সংযম বড় সোজা কথা নয়। এই চিত্রকর বাস্তবিকই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

হোসেনবক্সের আঁকা নিজের মেয়ের চেহারাটি আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। ছোট কচি মেয়েটির ছেলেমানুষি ভাবটি খুব চমৎকার ফুটে উঠেছে এই ছবিখানির ভিতর দিয়ে।

আমরা এইবার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শীল অঙ্কিত একখানি বেশ ভালো ছবি পাচ্ছি। একটি স্ত্রীলোক তার ছোট একটি ছেলেকে কোলে ক'রে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর একটি ছেলে চলেছে তার হাতখানি ধ'রে। ছবিখানিতে মা এবং ছেলেদুটির পশ্চাৎদিকমাত্র দেখান হয়েছে। মানুষের পিছন দিকও যে মানুষের মনের ভিতরকার অনেক কথা এক নিশ্বাসে ব'লে যেতে পারে তা চিত্রকর খুব নিপুণতার সঙ্গে আমাদের এঁকে দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকটির ঘাড়ের নতভাবটুকুর ভিতর দিয়ে মায়ের স্নেহটুকু এমন সুন্দর এবং সরলভাবে ফুটে উঠেছে যা অনেক চিত্রকর চোখের ভঙ্গিতেও সহসা ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন না। ছবিখানি আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

এইবার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের একখানি খুব চমৎকার ছবির উল্লেখ ক'রে আমরা চিত্রের পালা শেষ করবো। চিত্রকর ছবিখানির নাম দিয়েছেন, "গেঁয়ো মেলা"। সাঁওতালদের কালো কালো দুটি ছেলে ততোধিক কালো একজোড়া মোষে চ'ড়ে একটা জলাভূমির কর্দ্দমাক্ত নোংরা জমিতে দাঁড়িয়ে দুনিয়াটাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মনের প্রাণের কথা বল্‌ছে, এই হচ্ছে ছবিখানির বিষয়বস্তু। চিত্রকর খুব নিপুণতার সঙ্গে এই সরল ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছেলেদুটির সহজ সরল চাহনির মধ্যে এমন একটি অসঙ্কোচ ভাব ফুটে উঠেছে যা সাঁওতালদের ছেলেমেয়ের মধ্যেই সম্ভব। সতীশ-বাবুকে আমরা কালো-ধলো ছবি আঁকাতেই ওস্তাদ ব'লে জান্‌তুম্; তিনি যে আবার এমন সুন্দর রং ফলাতেও পারেন তা এই প্রথম জান্‌তে পারা গেল।

এইবার মূর্ত্তি-শিল্প বিভাগের উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ ক'রে আমরা প্রবন্ধ শেষ করবো। এই বিভাগের সবচেয়ে সেরা জিনিষ হচ্ছে মিঃ ফড়্‌কের গড়া একটি ঘড়িসাজান মিস্ত্রীর মূর্ত্তি। এখানি একটি অদ্ভুত জিনিষ হয়েছে। মানুষটির একাগ্রতা এবং কর্ম্মকুশলতা যেন চোখে মুখে কপালের কুঞ্চনে প্রত্যেক রেখার ভিতর দিয়েই মূর্ত্তিমান হয়ে ফুটে উঠেছে। এমন নিখুঁৎ মূর্ত্তি বড় একটা দেখা যায় না। তার পরই আমরা মিঃ কর্ম্মকারি মহাশয়ের উল্লেখযোগ্য কখানি মূর্ত্তি পাচ্ছি। এঁর গড়া স্বপ্নাবেশ নামক স্ত্রীমূর্ত্তিখানি আমাদের খুব ভাল লেগেছে। স্বপ্নাবিষ্ট যুবতীটির চোখে স্বপ্নের আভাসটুকু বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

বে-ওয়ারিশ ছবিখানি কিনেছেন শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বল্লভ, এবং আহত-পাখী ছবিখানি কিনেছেন মহামান্য লর্ড রোনাল্ড্‌শে বঙ্গদেশের গভর্ণর; ছবি দুখানি স্বত্বাধিকারীদের সৌজন্যে এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা হল।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

কাকের অহঙ্কার

চীৎকারে চিল কহে "মোর মত বলো বলবান কেবা ?
সব হতে আমি উর্দ্ধে উঠিয়া করি সবিতার সেবা।"
শিখী কহে "সখা, আমার মতন সুন্দর কেহ নাই,
ভুবন-ভুলানো নৃত্যে আমার মুগ্ধ কে নহে ভাই ?"
কোকিল কহিল "রূপ নাই মোর, নৃত্য করি না বটে,
আমার মতন মধুর কণ্ঠ কাহার ভাগ্যে ঘটে ?"
কাক কহে "আমি নহি সুকণ্ঠ, নাহি রূপ, নাহি জোর,
বিশ্ববিজয়ী কোকিলে পেলেছি ইহাই গর্ব্ব মোর।"
চকোর কহিল "গান গেয়ে আমি জাগাইয়া নিশা-পথে
আলোকিত করি বিশ্বভুবন কৌমুদীসম্পাতে।"
চাতক কহিল "বিশ্ব যখন গ্রীষ্মের দাহে মরে
মম আহ্বানে জলদপুঞ্জ শীতল জীবন ঝরে।"
কোকিল কহিল "গান গেয়ে আমি হিম ঘুম-ঘোর হরি'
বিশ্বের মাঝে আনি ঋতুরাজে বর্ষে বর্ষে বরি'।"
কাক কহে "আমি জানিনাক গান, অরুণ উঠার আগে
আমার রুক্ষ তাড়নে ভুবন বিভু-নামে নিতি জাগে।"

বেতালভট্ট।



আবেস্তা সাহিত্য

আবেস্তা বা জেন্দ্-আবেস্তা অগ্নি-উপাসক পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বা বেদ। অতি প্রাচীন কালে ইরাণ বা পারস্য দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে (বা তৎসন্নিহিত কোনও অজ্ঞাত দেশে) জরথুস্ত্র (Zoroaster) এই জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্সীদিগের আবেস্তা অপৌরুষেয়। জরথুস্ত্র নামের অর্থ লইয়া নানা মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জরথ (জরাপ্রাপ্ত) ও উষ্ত্র (সং উষ্ট্র) লইয়া জরথুস্ত্র শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'বৃদ্ধ-উষ্ট্র-রক্ষক'; বা 'জরথ' (সং হরিত) শব্দের 'পীত' বা 'হরিত' অর্থ করিয়া 'পীত-উষ্ট্র-রক্ষক'। পার্সী পুরোহিতগণ 'উস্ত্র' শব্দ উষ্ দীপ্তৌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ করেন, "যাঁহার দীপ্তি হরিত বা স্বর্ণ বর্ণ"; ও ম্যাসেন ও উইণ্ডিশ্মান 'স্বর্ণ-বর্ণ-তারকা' বলিয়া জরথুস্ত্র শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে সাইরস্, দরিয়স্, জরাক্সিস্ প্রভৃতি আকিমিনীয় নরপতিগণ এই জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন; কিন্তু খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বলদর্পী সিকন্দর অগ্নি-উপাসক পার্সীগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির অগ্নিসংস্কার করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মের আক্রমণের ভয়ে জন্মভূমির মোহ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ জরথুস্ত্রীয়গণ ভারতবর্ষের সুরাট ও বোম্বাই অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহারা ভারতবর্ষে। বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের সংখ্যা ৩০,০০০ হইবে। যাঁহারা মুসলমানদিগের নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অদ্যাপি ইরাণ দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইবে আন্দাজ ১০,০০০।

'আবেস্তা' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান, বিদ্যা, বা বেদ গ্রন্থ।' আসল গ্রন্থের নাম আবেস্তা ও তাহার পল্লবী টীকার নাম জেন্দ্। টীকা না থাকিলে 'সাদা' শব্দ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'ভেন্দিদাদ্ সাদা'। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত ইতিহাসগ্রন্থে এবং খৃষ্টীয়গণের বাইবেল গ্রন্থে আবেস্তা ও আবেস্তা-ধর্ম্মিগণের স্থানে স্থানে উল্লেখমাত্র আছে। হেরোডোটস্ (৪৫০ পূঃ খৃঃ) তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থে পারস্যবাসিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। প্লুটার্ক, প্লিনি ও অগথিয়সের সময় (৫০০ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত ইরাণীয়গণের বিষয়ে এই প্রকার সামান্য সামান্য উল্লেখমাত্র হইয়াছে। কেইরেবরী সহরে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে 'যশ্ন' গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ছিল। জর্জ্জ বৌচর্ নামক একজন ইংরেজ সুরাটে পার্সীদিগের নিকট একখানি 'ভেন্দিদাদ সাদা' সংগ্রহ করিয়া ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের বোড্লিয়ন লাইব্রেরীতে দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলিয়া রাখিয়া দেন। আঁকেতিল দুপেরঁ নামক একজন উদ্যোগী ফরাসী যুবক বিচিত্র উপায়ে ভারতবর্ষে আসিয়া সাত বৎসর থাকিয়া মূল আবেস্তা পাঠ করিতে শিক্ষা করেন। অনুবাদাদি কার্য্যে দশ বৎসর কাটাইয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই অমূল্য পরিশ্রমের ফল, মূল জেন্দ্-আবেস্তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ক্লৈকের (Kleuker) নামক একজন জর্ম্মন পণ্ডিত আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে দুপেরঁর গ্রন্থের জর্ম্মন ভাষায় অনুবাদ করিয়া জর্ম্মনীতে প্রচার করেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ মূল আবেস্তা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও আবেস্তার ভাষার নৈকট্য ইতিপূর্ব্বেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ডেন্মার্কের ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাস্ক প্রতিপন্ন করেন যে, ইহার ভাষা অতি প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ হইলেও ভাষা-দুইটি এক ভাষা নহে, পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। ফরাসীদেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিত ইউজিনি বর্ণুফ (Eugene Burnouf) আঁকেতিল-কৃত বহু ভ্রম-প্রমাদের সংশোধন করেন।

এই প্রাচীন আবেস্তা সাহিত্য ও আবেস্তা-ভাষার সাহায্যে বেদের ভাষা ও সাহিত্যের বহু রহস্যের তুলনামূলক সমাধান হইতেছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গ্রোটফেণ্ড (Grotefend), বর্ণুফ, লাসেন, স্যর হেন্‌রী রলিন্সন (Sir Henry Rawlinson) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পারস্যদেশে ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার হইয়াছে। এই-সকল লিপির ভাষা এবং বিষয় আবেস্তার ভাষা ও বিষয়ের অনুরূপ।

আবেস্তা-সাহিত্য ছয় ভাগে বিভক্ত:—১ যশ্ন। ২ জীষ্পেরেদ। ৩ যশ্ত্। ৪ ক্ষোর্দা আবেস্তা। ৫ বেন্দিদাদ। ৬ নাস্ক-সমূহ (হাধোখ্ত নাস্ক, প্রভৃতি)। প্রথম পাঁচ বিভাগের আবার দুই ভাগ। প্রথমভাগে বেন্দিদাদ, জীষ্পেরেদ, ও যশ্ন এবং দ্বিতীয়ভাগে ক্ষোর্দা আবেস্তা ও যশ্ত। বেন্দিদাদ, জীষ্পেরেদ ও যশ্ন লইয়াই প্রকৃত আবেস্তা। যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই তিন গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম গ্রন্থ যশ্ন। যশ্ন শব্দ ও সংস্কৃত যজ্ঞ শব্দ অভিন্ন। সর্ব্ব-প্রধান দেবতা অহুরো মজ্দার আহ্বান দ্বারা প্রথম ভাগের আরম্ভ। তৎপরে জরথুস্ত্র ধর্ম্মের অন্যান্য দেবগণের বন্দনা ও আহ্বান, তৎপরে 'জ ও থ' বা জল-শুদ্ধির প্রক্রিয়া, তৎপরে 'ররেস্ম' বা ইন্ধন-শুদ্ধি প্রক্রিয়া, তৎপরে 'হ ও ম' বা সোম রস প্রস্তুত প্রণালী ও তাহা উৎসর্গ করিবার প্রণালী এবং তৎপরে পিষ্টক ও মাংস উপহার দিবার প্রণালী প্রথম ভাগে আছে। দ্বাদশ যশ্ন পরোক্ষভাবে মাত্র যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ১৯—২১ যশ্ন নবদীক্ষিতগণের শিক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তর-মূলক উপদেশ। দ্বিতীয় ভাগে গাথা বা মন্ত্র বা গান। জরথুস্ত্রের প্রাণস্পর্শী উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এই অংশে সংগৃহীত আছে। এইখানে জরথুস্ত্র 'কু' ত্যাগ করিয়া 'সু' গ্রহণ করিবার বা অন্ধকার ত্যাগ করিয়া আলোক আশ্রয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই গাথা-সমূহ অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহার ভাষা সর্ব্বত্রই ব্যাকরণের শাসন মানে। তৃতীয় অংশে দেবগণের স্তব ও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ জীষ্পেরেদ। যাবতীয় দেবগণের স্তবস্তুতি ও আহ্বান গীতি আছে। জীস্পে রতবো—সর্ব্ব দেবগণ।

তৃতীয় গ্রন্থ যশ্ত। যেশ্তি (সং ইষ্টি) শব্দে 'স্তোত্র দ্বারা পূজা' বুঝায়। এই গ্রন্থে অসংখ্য দেবতা বা দেবদূতগণের (যজত,—পূজার্হ) স্তব-গান আছে। এইগুলি পদ্যে লেখা এবং উৎকৃষ্ট কাব্যরস-সম্পন্ন। পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক বহু কথা এই গ্রন্থে আছে। যশ্তসমূহের প্রধান—অর্দ্বি সূর-যশ্ত, জল-দেবী তিষ্ত্র্য তারকা মিত্র বা

সত্যদেব কুজমী বা পরলোকগত সাধুগণের আত্মা বিজয় বা জেরেথ্রম্ন এবং রাজ-মহিমা বা ক্ষত্র।

চতুর্থ গ্রন্থ প্রকীর্ণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুল কবিতা। স্তাইব, গাহ্, শিরোজ্‌হ্, আফ্রিগন্ প্রভৃতি প্রতিদিন বা নির্দ্দিষ্ট উৎসবের দিনে আবৃত্তি করিবার জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব, কবিতা বা আশীর্ব্বচন।

পঞ্চম গ্রন্থ বেন্দিদাদ। 'দএব' বা দৈত্যগণের বিরুদ্ধবাদী বিধান। (বী-দ-এব দাত)। পুরোহিতগণের আচার-ব্যবহার ও 'দ-এব' পূজার কুফল বর্ণনা। প্রথম পরিচ্ছেদে সৃষ্টিপ্রকরণ, সাংখ্যের দ্বৈত-বাদ-মূলক সৃষ্টি বর্ণনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যিমের রাজত্ব বা স্বর্ণযুগ (সত্যযুগ); এই পরিচ্ছেদে প্রলয়, ইরাণীয় বন্যাবিশেষ বা সৃষ্টিধ্বংসকারী শীতকালের বিবরণ আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষিকর্ম্ম। চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্মৃতি বা আইন-কানুন। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদে মৃতাশৌচের কথা। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদে কুকুরের কথা। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নানাবিধ অশৌচ হইতে শুদ্ধি বা মুক্তির কথা (অশৌচান্ত)। উনবিংশ পরিচ্ছেদে জরথুষ্ট্রের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। বিংশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিষয়ক।

ষষ্ঠ গ্রন্থ বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ বা ধ্বংসাবশেষ। এই খণ্ডসমূহকে নাশ্‌ক্ বা গ্রন্থ বা কোষ বলা হয়। ইহাতে হধোখ্‌ত নাশ্‌ক্ হইতে দু একটি কাণ্ড, লুপ্ত নাশ্‌ক্-সমূহের সূচী, নানাবিধ লুপ্ত গ্রন্থের অংশ, এবং জন্দ-পহ্লবী শব্দাদির সূচী আছে। সমস্তই আবেস্তা ভাষায় লিখিত এবং এককালীন বিরাট আবেস্তা সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ।

প্লিনী (Pliny) বলিয়াছেন যে, জরথুষ্ট্রের সাহিত্যে বিশ লক্ষ শ্লোক বা কবিতা ছিল। আরব ঐতিহাসিক তবরি (Tabari) বলেন, জরথুষ্ট্রের লেখা ১২০০০ গোচর্ম্মে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

পার্সীগণের কিম্বদন্তী সাধারণত দুইখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—রিবায়ৎ ও ডিংকার্ড। আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় পার্সীদিগেরও তিনটি অতি পবিত্র কার্দ বা মন্ত্র আছে—(১) যথা 'অহু বৈর্যো' বা 'অহুনা বৈর্য্যো' (যশ্ন ২৭।১৩), (২) 'অষেম্ ভোহু' (যশ্ন ২৭।১৪), এবং (৩) 'যেঙ্‌হে হাতাম্' (যশ্ন ৪।৭৪)। 'অহুনা বৈর্য্যো' মন্ত্রে একবিংশতি শব্দ। সেই একবিংশতি শব্দের এক-একটি লইয়া একবিংশতি নাশ্‌ক্ গ্রন্থের প্রথম শব্দ হইয়াছে।

একবিংশতি নাশ্‌কের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাক্রমে ১। (২২ অংশ) ধর্ম্ম ও পুণ্য। ২। (২২ অংশ) ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি। ৩। (২১ অংশ) মজদা-যশ্নীয় ধর্ম্ম এবং তাহার উপদেশ। ৪। (৩২ অংশ) ইহলোক ও পরলোক। ৫। (৩৫ অংশ) গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। ৬। (২২ অংশ) যজ্ঞকর্ম্ম ও তাহার ফল। ৭। (আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ৫০ অংশ, বর্ত্তমানে ১৩) রাজনীতি ও সমাজনীতি। ৮। (আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১২) ব্যবহার। ৯। (আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১৫) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক। ১০। (আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১০) নৃপতি গুষ্‌তাশ্‌পের রাজত্ব এবং জরথুষ্ট্রের প্রভাব। ১১। (আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ২২ অংশ, বর্ত্তমানে ৬) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক। ১২। (২২ অংশ) আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। ১৩। (৬০ অংশ) পুণ্যকর্ম্ম ও জরথুষ্ট্রের বাল্যজীবনের চিত্র। ১৪। (১৭ অংশ) অহুরো মজ্‌দা ও তাঁহার অমাত্যবর্গ। ১৫। (৫৪ অংশ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি, ওজন ও মাপ। ১৬। (৬৫ অংশ) নবানজ্‌দিষ্‌ত বিবাহ, অর্থাৎ নেদিষ্ঠ জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ। ১৭। (৬৪ অংশ) ভবিষ্যতে প্রাপ্য দণ্ড বা কর্ম্মফল; ফলিত জ্যোতিষ। ১৮। (৫২ অংশ) রাজশক্তি-পরিচালনে ধর্ম্মবুদ্ধি, নির্ব্বাণ ও পাপের ধ্বংস। ১৯। (২২ অংশমাত্র আছে) বেন্দিদাদ, শৌচাশৌচবিনিশ্চয়। ২০। (৩০ অংশ) মঙ্গল। ২১। (৩৩ অংশ) অহুরোমজ্‌দা ও তাঁহার অমাত্যবর্গের স্তব।

(ভারতী, মাঘ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ।

—

শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক?

মানুষের মধ্যে ক্রমোন্নতি হইতেছে; আজকার শিক্ষিত মানুষটি তাহার এক পুরুষ আগেকার শিক্ষিত মানুষ অপেক্ষাও বেশী জানে; সে তাহার পিতা-পিতামহের সঞ্চিত জ্ঞান ত পাইয়াছেই, তাহার উপর নিজে বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানও লাভ করিয়াছে। এই প্রণালীতেই মানবজাতির সভ্যতার অভিব্যক্তি হয়, সমস্ত জাতিটাই ক্রমোন্নতি লাভ করে; এবং তাহার ফল বর্ত্তমান যুগের একজন সভ্য সাধারণ মানুষ হাজার বৎসর আগেকার খুব চালাক লোক হইতেও বেশী বিদ্বান, বেশী কার্য্যদক্ষ।

প্রত্যেক পশুকে কিন্তু (কয়েকটি বংশগত সহজ সংস্কার ছাড়া) সব জ্ঞান সব সত্য নিজে নিজে অর্জ্জন করিতে হয়। তাহারা পূর্ব্বপুরুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত।

মানুষ ও পশুর মধ্যে এই যে পার্থক্য আছে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় মানুষের মধ্যে সেই পার্থক্য দেখা যায়। এই যেমন, একজন ভারতীয় কবিরাজ নিজ প্রতিভার বলে বা দৈবক্রমে কুষ্ঠ রোগের অথবা সাপের বিষের ঔষধ পাইলেন, তিনি তাহা গোপন করিয়া নিজ হাতে বা নিজ বংশে রাখিলেন। ইহার ফলে, হয় সেই ঔষধ তাঁহার মৃত্যুর সহিত লোপ পাইল, না-হয় একজনমাত্র লোকদ্বারা পরীক্ষিত হওয়ায় তাহার কোন উন্নতি হইল না। ইউরোপে এরূপ ক্ষেত্রে সেই ঔষধের আবিষ্কারক তৎক্ষণাৎ তাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া প্রচার করিয়া দেন, শত শত চিকিৎসালয়ে তাহা রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, শত শত রসায়নাগারে তাহার দোষগুলি বাদ দিবার এবং গুণগুলি সতেজ করিবার চেষ্টা হইতে থাকে; ইহার ফলে ঔষধটি চরম উৎকর্ষ লাভ করে, মানবজাতির হিতসাধন হয়। মহাপ্রতিভাশালী একজন মানব যাহা করিতে না পারেন সহস্র সহস্র সাধারণ মানবের সমবেত চেষ্টায় তাহা সাধিত হয়। এই সমবেত চেষ্টাই সভ্যতার উন্নতির মূল, এইজন্যই ইউরোপ এসিয়াকে পরাজিত করিয়াছে। ফরাসী বচনটা সত্য—"নেপোলিয়ন অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী একজন লোক আছেন, ভলটেয়ার অপেক্ষাও ধূর্ত্ত একজন লোক আছেন;—সেই লোকটার নাম মানবজাতি!"

শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার, নিষ্ফলতার, এবং ইউরোপের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভবের কারণ এই। আমাদের মধ্যে অনেক দক্ষ শিক্ষক দেখা দেন, নিজ জীবনে তাঁহারা চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়, শিক্ষকজাতি তাঁহাদের অভিজ্ঞতার দক্ষতার ফল হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে ভাবের বিনিময় নাই, সমবেত চেষ্টা নাই; শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার, মত (theory), আদর্শ বা পরীক্ষার ফল (experiment) আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী আলোচনা করেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না। সকলেই চোখ বুজিয়া নিজের কাজ করিয়া যান। কেহ ভাল করেন, কেহ মন্দ করেন; কিন্তু কাজে এই পার্থক্য

তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির বা ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার ফল,—সজ্ঞান স্বকৃত উন্নতি-চেষ্টার ফল নহে।

আসল কথা, দেশে ভাবিবার, সপ্রাণ অবিচ্ছিন্ন সমবেত উন্নতি-চেষ্টা করিবার নেতা ও কর্ম্মীর অভাব। আমাদের শিক্ষকগণকে সঙ্ঘে গঠিত করিতে এবং শিক্ষার "মুক্তি কোন্ পথে" তাহা তাঁহাদের দেখাইয়া দিতে, ত্যাগী শ্রমী দূরদর্শী প্রকৃত দেশবন্ধু "শিক্ষাগুরু" কবে আবির্ভূত হইবেন?

(শিক্ষক, মাঘ) অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ।

—

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস্,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হ'ত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা বলে' তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠ্‌ত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টল্‌মলিয়ে কি বল্‌ত যে
ঝল্‌মলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা
নাচন দিত জুড়ি'।
উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে'
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে'
কোথায় যেত ভেসে'।
সেই হ'ত তোর বাদল বেলার
রূপকথাটির মত;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত;
সেই আমারে বলে' যেত
কোথায় আলেখলতা,
সাগরপারের দৈত্যপুরের
রাজকন্যার কথা;
দেখ্‌তে পেতেম দুয়োরাণীর
চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে উঠে' পাতা আমার
কাঁপ্‌ত থরথর।
হঠাৎ কখন্ বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নাম্‌ত আমার পাতায় পাতায়
টাপুর-টুপুর নাচে;
সেই হ'ত তোর কাঁদন সুরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হ'ত তোর গুনগুনিয়ে
শ্রাবণ দিনের ছড়া।
মা, তুই হতিস্ নীলবরণী,
আমি সবুজ কাঁচা;
তোর হ'ত, মা, আলোর হাসি,
আমার পাতার নাচা।
তোর হ'ত, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে' চাওয়া,
আমার হ'ত আঁকুবাঁকু
হাত তুলে' গান গাওয়া।
তোর হ'ত মা, চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হ'ত দিনে দিনে
ফুল ফোটাবার পালা।

(বঙ্গবাণী, ফাল্গুন) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

শিল্পে অনধিকার

যোগ সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন ক'রে; কিন্তু শিল্প-সাধনার প্রকার অন্য—চোখ খুলেই রাখ্‌তে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখ্‌তে হয়, মনকে পিঞ্জর খোলা পাখীর মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনালোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে' বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে' থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়—Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds. (Millet.)

Art has been pursuing the chimera attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work of art may claim to be a creation. (Bracquem nt.) আমাদেরও পণ্ডিতেরা Artকে 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা' বলেছেন।

শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্ছে নালমতিবিস্তরেণ। অতি বিস্তরে যে অপর্য্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। 'আদানে ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিদানে চিরায়ুতা'—শিল্পীর উপরে শাস্ত্রকারের এই হুকুমটার একটা মানে হচ্ছে সব জিনিষের কৌশল আর রস চট্‌পট্ আদায় করতে হবে; কিন্তু সেটা পরিবেষণ করবার বেলায় ভেবে-চিন্তে চল্‌বে। খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। যাঁরা এই শিল্পের পথে আমার অগ্রগামী, তাঁদেরই উপদেশ আমি সবাইকে স্মরণে রেখে চল্‌তে বলি—"ধীরে ধীরে পথ ধরো মুসাফির, সীড়ী হৈ অথবনী!"—দুর্গম সোপান, হে যাত্রী, ধীরে পা রাখ। মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুট্‌লো,—এর বেশী শিল্পীর দিক্ থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই। মধুকর মধু নিয়ে তৃপ্ত হন; এতে ফুলের যতটুকু আনন্দ, তার চেয়ে শিল্পীর সজীব আত্মা সমজদার পেলে আর-একটু

খানি আনন্দ বেশি পায় সত্য, কিন্তু সেটা তার উপরি-পাওনা—হলেও হয়, না হলেও চলে। শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে। গোলাপ সৌরভ ছড়িয়ে রাঙা হয়ে ফুটলো, শিমুলও ফুটলো রাঙা হয়ে—খালি তুলোর বীজ ছড়াতে,—কিন্তু রসিক যে, সে তো সেই দুই ফুলেরই ফোটার গৌরব দেখে খুসি হয়। এই ফোটার গৌরব দিয়ে ওস্তাদ যাঁরা, তাঁরা শিল্পীর কাজের তুলনা ক'রে থাকেন—'দিবস চারকে সুরংগ ফুল ওহি লখ মনমে লাগল শূল'!—দুদণ্ডের জীবন ফুটলো, রসিকের এই দেখেই মন বলে—মরি মরি! এইখানেই শিল্পীতে আর কারিগরে তফাৎ; শিল্পের মধ্যে শিল্পীর মন ফুটন্ত হয়ে দেখা দিলে, আর কারিগরের গড়া অতি আশ্চর্য্য কাগজের ফুল ফুটন্ত ফুলকেও হার মানালে কিন্তু মনের রস সেটাকে সজীব করে' দিলে না। জগতে কারিগরেরই বাহবা বেশি শিল্পীর চেয়ে, কেননা কারিগর বাহবা পেতেই গড়ে, শিল্পী গড়ে' চলে নিজের কাজের সঙ্গে নিজকে ফুটতে বোধ করতে-করতে। এই কারণেই শিল্পচর্চ্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ রসবোধই নেই—রসশাস্ত্র পড়তে চলার যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চ্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি উপায়ে ফুলের পরিমল গিয়ে পৌছচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্যের আড়ালে। তেমনি মানুষের রসবোধ কি উপায়ে হয় কেমন করে', অলঙ্কার-শাস্ত্রে রস-শাস্ত্রে তারি জল্পনা যেমন দেখি, তেমনি এও তো দেখি যে রসশাস্ত্র নিংড়ে পান ক'রেও কমই রসিক দেখা দিচ্ছে। এই যে আলো-মাখা রামধনুকের রঙে বিচিত্র বিশ্বচরাচরের অফুরন্ত রস, এ তো মাটি থেকে প্রস্তুত রঙের বাক্সয় ধরা পড়ে না, কালীর দোয়াতেও নয়, বীণার খোলটার মধ্যেও নয়। এ বাঁধা পড়ে মনে;—এই হলো সমস্ত রসশাস্ত্রের প্রথম ও শেষ পাঠ। মৌচাক আর বোলতার চাক—সমান কৌশলে আশ্চর্য্যভাবে দুটোই গড়া। গড়নের জন্যে বোলতায় আর মৌমাছিতে পার্থক্য করা হয় না, কিম্বা মৌমাছিকে মধুকরও নাম দেওয়া হয় না—অতি চমৎকার তার চাকটার জন্যে। মৌচাকের আদর, তাতে মধু ধরা থাকে বলেই তো! তেমনি শিল্পী আর কারিগর দুয়েরই গড়া সামিগ্রি, নিপুণতার হিসেবে কারিগরেরটা হয়ত বা বেশী চমৎকার হলো, কিন্তু রসিক দেখেন শুধু তো গড়নটা নয়, গড়নের মধ্যে রস ধরা পড়লো কি না।

শিল্পীর কাজকে এইজন্যে বলা হয় নির্ম্মিতি অর্থাৎ রসের দিক দিয়ে যেটি মিত হলেও অপরিমিত। আর কারিগরের কাজকে বলা হয় নির্ম্মাণ অর্থাৎ নিঃশেষভাবে পরিমাণের মধ্যে সেটি ধরা। একটা নির্ম্মাণের মতো ঠিক, আর-একটি নির্ম্মাণ সম্ভব কিন্তু শিল্পীর নির্ম্মিতিকে কৌশলের কলে ফেলে বাইরের ছাঁচটা নকল ক'রে নিলেও ভিতরের রসের অভাব কিম্বা তারের বৈষম্য থাক্‌বেই। এইজন্যেই শিল্পীর শিল্পকে বলা হয়েছে "অনন্যপরতন্ত্রা"। আমার শিল্প এক, আর তোমার শিল্প আর-এক, আমার দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের অন্য,—এ না হলে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাক্‌ত না। Tradition বা প্রথা—অনন্তকালের সঞ্চিত ধনের মতো এর মোহ; একে অতিক্রম ক'রে যাবার কৌশল জানা হলে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে' তোলে, ডোব্‌বার আর ভয় থাকে না। শিল্পলোকের যাত্রাপথে এই যে একটা মোহপাশ রয়েছে—চিরাগত-প্রথার অনুসরণপ্রিয়তা,—সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্পশস্ত্র বৈদিক-ঋষিরা আমাদের দিয়ে গেয়েছেন—'মানুষের নির্ম্মিত এই-সমস্ত খেলানার সামগ্রী, এই হস্তী, কাংস, বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমুত্তই দেবশিল্পের অনুকরণমাত্র—একে শিল্প বলা চলে না, এ তো দেব-শিল্পীর দ্বারা করা হয়ে গেছে, মানুষের কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এ তো শুধু প্রতিকৃতি (নকল) করা হলো মাত্র! হে যজমান শিল্পী, দেবশিল্পীর পরে এলেম আমরা, সুতরাং আমাদের করাটা নামে মাত্র অনুকৃতি ব'লে ধরা যায়, কিন্তু আমাদের কাজে সৃষ্টির কৃতিত্ব যেখানে, সেখানে মানুষের শিল্পের সঙ্গে দেবশিল্পের রচনার উপায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথাও নেই, শুধু সেটি পরে করা হয়েছে—অনুকৃত হয়েছে মাত্র—এই রহস্য জানো! এ যে জানে সকল শিল্পই তার অধিকারে আসে, শিল্প তার আত্মার সংস্কারসাধন করে। এই যে শিল্প, এমন যে শিল্পশস্ত্র, কেবল তারি দ্বারা যজমান নিজের আত্মাকে ছন্দোময় ক'রে যথার্থ যে সংস্কৃতি তাই লাভ করে এবং প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সহিত মনকে, শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিলিত করে।'

যেদিন শিল্পকে মানুষ জান্‌লে, সেই মুহূর্ত্তেই তার মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠ্‌লো, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে—সবলে। এই শিল্পকে জানা, মানুষের সব-চেয়ে যে বড় শক্তি—সৃষ্টিকরার কৃতিত্ব,—তাকেই জানা। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে একটুকু মানুষ কেমন করে' বেঁচে থাক্‌তো যদি এই শিল্পকে সে লাভ না কর্‌ত! শিল্পই তো তার অভেদ্য বর্ম্ম, এই তো তার সমস্ত নগ্নতার উপরে অপূর্ব্ব রাজবেশ! আত্মার গৌরবে আপনি সেজে নিজের প্রস্তুত করা পথে সে চল্লো—স্বরচিত রচনার অর্ঘ্য বয়ে—মানুষ নিজেই যাঁর রচনা তাঁর দিকে! মানুষের গড়া আনন্দ সব তো এতেই শেষ! সে জানাতে পার্‌লে আমি তোমার কৃতী সন্তান! শিল্পের সাধনা মানুষ ক'রেই চল্লো পৃথিবীতে এসে অবধি, তবেই তো সে নানা কৌশলে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার কর্‌লে; সাত-সমুদ্র তের নদী, এমন কি চন্দ্রলোক সূর্য্য-লোকের উদ্ধেও তার শরীর ও মনের গতি, চলার সব বাধাকে অতিক্রম ক'রে, কতক সমাধা হলো, কতক বা সমাধা হবার মতো হলো। মানুষ তার আত্মাকে রূপ, রং, ছন্দ, সুর, গতি, মুক্তি সব দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে। এমন যে শিল্প, এত বড় যে শিল্প, তারই অধিকার ঋষিরা বল্‌ছেন নাও; কোনো শিল্প নেই, কোনো রস নেই—এটা সেকালের লোক কল্পনা কর্‌তে পারেনি; তাদের শিল্প-সামগ্রীগুলোই তার প্রমাণ।

শিল্পের অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাব না আমরা। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার, শিল্পভাণ্ডার অতুল ঐশ্বর্য্যে কালে-কালে ভর্ত্তি হলো সত্যি, কিন্তু আজকের আমাদের হালচাল দেখে কেউ কি বল্‌বে আমরাই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই হতশ্রী, নিরানন্দ, অত্যন্ত অশোভনভাবে নিঃস্ব, কেবলি হাত-পাতা আর হাতজোড় ছাড়া হাতের সমস্ত কাজ যারা ভুলে বসেছি, সূর্য্যের কণা দিয়ে গড়া কোণার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ—এগুলো কি আমাদেরই? ভারতবাসী ব'লেই কি এগুলো আমাদের হলো? তা তো হতে পারে না। এই সব শিল্পের নির্ম্মিতি, এদের নিজের বল্‌বার অধিকার অর্জ্জন কর্‌বো শুধু সেইদিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ কর্‌বো, তার পূর্ব্বে তো নয়। শিল্প যেদিন আমাদের হবে, সেদিন জগৎ বল্‌বে এসবই তো তোমাদের!—আমাদের শিল্পও তোমাদের! আমাদের দেশের রসিকরা বলেছেন শিল্পকে 'অনন্যপরতন্ত্রা'। শিল্পের সাধনা যে করে, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন নতুন সব শিল্পের ভোগ তারই কপালে ঘটে। কালাপাহাড় ভেঙে গেছে রাগে আর আমরা ভাঙ্‌চি বিরাগে—এই মাত্র তফাৎ। কাব্যকলা, শিল্পকলা, গীতকলা—এ সবাইকে 'রস-রুচিরা' ব'লে কবিরা বর্ণন করেছেন এবং তিনি হ্লাদৈকময়ী—আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন; আর তিনি অনন্যপরতন্ত্রা—যেমন-তেমন যার-তার কাছে ত তিনি বাঁধা পড়েন না; রসিক, কবি—এদেরই তিনি

বরণ করেন এবং এদেরই তিনি সহচরী সঙ্গিনী সবই। অলসস্য কুতো শিল্পং অসিল্পস্য কুতো ধনং।

অর্জ্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতো, এ হবার যো নেই। এখনকার ইউরোপের মহাশিল্পী রোদাঁ কি বলেছেন দেখ—

"Inspiration! Ah, that is a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination: it will drive him one night to make a masterpiece straight off because it is generally at night that these things occur, I do not know why. Craftsmanship is everything; craftsmanship shows thoughtful work, all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art!"

শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জ্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে' শিল্প আমাদের হয় না; কেননা শিল্প হলেন 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। বিধাতারও নিয়মের মধ্যে ধরা দিতে চায় না সে! নিজের নিয়মে যে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।

যুগের পর যুগ ধ'রে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন ক'রেই চল্লো—কবে মেঘের-কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন সহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে এক হুইস্‌লার এসে তার মধ্যে থেকেই আনন্দ পাবেন ব'লে। পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে-পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস, এক মাইকেলোস্‌, এক রোদাঁ, এক মেস্ট্রোভিক বেরেজেক্কা এমনি জানা এবং দেশের বিদেশের অজানা artistদের জন্যে। মোগল-বাদ্‌শার রত্নভাণ্ডারে তিন পুরুষ ধ'রে জমা হতে লাগলো মণি-মাণিক্য সোনারূপো—এক রাজশিল্পীর ময়ূরসিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্ম্মিত দেখে ব'লে! তেমনি এই যে আমরাও আয়োজন কর্‌ছি, চেষ্টা করছি: শিল্পের পাঠশাল, শিল্পের হাট, কারুছত্র, কলাভবন—এটা-ওটা বসাচ্ছি, সব সেই একটি আর্টিষ্টের একটি রসিকের জন্যে—যে হয়তো এসেছে কিম্বা হয়তো আসবে।

(বঙ্গবাণী, ফাল্গুন) ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

স্বরাজ

যতদিন রাষ্ট্রের বাহিরে শত্রু আছে ও সেই শত্রু সুযোগ পাইলে রাষ্ট্রের বিনাশ সাধনে প্রস্তুত, যতদিন রাষ্ট্রের ভিতরে ও রাষ্ট্রের বাহিরে মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শিকার-প্রবৃত্তিটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম, ততদিন শাসনযন্ত্রটি এমন হওয়া চাই যে প্রয়োজন হইলেই অল্প কয়েকজনের সম্মতিতে যন্ত্রটি পূর্ণবেগে চালান যাইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য যতটা বল বা শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, ততটা বল বা শক্তি চালকের ইচ্ছামত ও অবিলম্বে যাহাতে ঐ যন্ত্র হইতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা চাই-ই চাই। এক কথায় রাষ্ট্রশক্তি সমবেত, সুসংবদ্ধ, একলক্ষ্য ও এক কেন্দ্র হইতে চালিত হওয়া চাই (centralised organisation)। নতুবা রাষ্ট্র ও শাসনের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে না। প্রাচীনকালে য়ুরোপে ও এশিয়াতে সময়ে সময়ে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র দেখা দিয়াছিল। সে-সকল রাষ্ট্রের জনগণ অল্প-পরিসর স্থানে বাস করিত। প্রয়োজন হইলে সে-সকল রাষ্ট্রের জনগণ দুই-চারি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একত্র হইয়া তাহাদিগের সমিতির নির্দ্ধারণ স্থির করিতে ও তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিতে পারিত। য়ুরোপে এথেন্স, স্পার্টা ও রোমে একসময়ে এইরূপ নগর-রাষ্ট্র (city-state) ছিল। চীনদেশে ও আমাদের দেশেও এইরূপ নগর-রাষ্ট্র ছিল। সমবেত, সুসংবদ্ধ, একলক্ষ্য রাষ্ট্রশক্তিকে এক কেন্দ্র হইতে পরিচালিত করিবার ভার কোটী লোকের হাতে না দিয়া কয়েক শত প্রতিনিধির হাতে দেওয়া হয়। আর সেই কয়েকশত পরিচালক প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার (vote) দেওয়া হয় কোটী লোকের হাতে। আর প্রতিনিধিগণ যাহাতে নির্ব্বাচকদিগের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে তাহার জন্য নির্ব্বাচকদিগের নিকট প্রতিনিধিগণকে দায়ী রাখা হয় (responsible)।

জনসমাজে সাম্য সংস্থাপনের চেষ্টায় বল বা শক্তির (Force) স্থানে ব্যবহার বা আইনের (Law) প্রাধান্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ; কিন্তু আইন এ সম্পর্কে সভ্যতার শেষ বা সর্ব্বোচ্চ সোপান নহে। এ স্থলে বলিতেছি যে রাজার (King) ও রাজসভার (Court) শাসন অপেক্ষা নির্ব্বাচিত দায়ী প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Responsible and Representative Government) মানবমনের অধিকতর তৃপ্তি সাধন করে বটে; কিন্তু ইহাও রাষ্ট্রীয়-বৃত্তি-বিকাশ-চেষ্টার শেষ কথা নহে।

প্রতিনিধিদ্বারা শাসন-ব্যবস্থার আর-একটি কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কোনও রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের মতানুযায়ী শাসন নহে, প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া শাসন নহে। অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন হইবে, ইহাই তাহার ভিত্তি। প্রতিনিধিদ্বারা শাসন-ব্যবস্থায় অনেক স্থলে কিন্তু অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসনও হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রেও অনেক সময়ে প্রতিনিধিদ্বারা শাসনকার্য্যও অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন নহে। অল্পাংশ অধিকাংশের সহিত একই রাষ্ট্রে বাস করে। তাই বলিয়া অল্পাংশের অধিকার যে একেবারে নগণ্য, তুচ্ছ, এরূপ মনে করিবার কোনও সুযুক্তি নাই। অধিকাংশ যাহা বলিবে অল্পাংশকে সর্ব্বদা সকল ব্যাপারে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে, এরূপ বিধান হইলে, অল্পাংশের লোকের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায়। রাষ্ট্রের অধিকারের সহিত যেমন প্রজার ব্যক্তিগত অধিকারের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন, তেমনই অধিকাংশের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সহিত অল্পাংশের রাষ্ট্র-সম্পর্কিত অধিকারের সামঞ্জস্যসাধন চাই। নতুবা রাষ্ট্রপতির অত্যাচারের ন্যায় অধিকাংশের অত্যাচার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিবে।

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত শাসন-ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে জনগণদ্বারা শাসন বৃহদায়তন রাষ্ট্রে বেশীদিন চলে নাই। আজ যদি ভারতবর্ষ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, কাল আমরা এই প্রতিনিধি-দ্বারা-শাসন-ব্যবস্থা এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইব। আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ব্যবস্থারই শরণাপন্ন হইব। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি তথাকার জনগণের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের ইহাপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায় আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। কোনও কালে পাইবে না, একথা আমি বলিতেছি না। শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানী বা অপর কোনও রাষ্ট্র আজও নূতন পথ বাহির করিতে পারে নাই। রুশদেশ নূতন পথে চলিবার দুরন্ত প্রয়াস করিয়াছে। সেও আজ বৈরাজ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র ও প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, পথে নরশোণিতের নদীতে আজও হাবুডুবু খাইতেছে।

স্বাধীনতা আজ সেখানে মুমূর্ষু অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশ ও বিশুদ্ধ বাতাসের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

আমরা স্বরাজ-সাধনার পথে সবে পা দিয়াছি। সে পথে দেহকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শুধু মন ও আত্মা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের স্বরাজসাধনার পথে কখনও অসহযোগ, কখনও বিরুদ্ধাচরণ। কিন্তু সহযোগিতা সে পথে নিত্য সাধনার বিষয়। পুঞ্জীকৃত জঞ্জাল দূর করিবার জন্ত বিনাশ-চেষ্টাও সে পথে চাই; কিন্তু গঠনচেষ্টা তথায় নিত্য কর্ত্তব্য। আত্মনির্ভর সে পথে পরম সম্বল, কারণ আত্মশক্তিবোধ না হইলে সে পথে এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু হঠকারিতা সে পথে বিষম অন্তরায়। যেমন চাই নিজের শক্তি ও পুরুষকারে পূর্ণ আস্থা, তেমনই চাই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি ও পুরুষকারের পরিমাণ নিরূপণ। জাতীয়তাগঠন তথায় আপাততঃ অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্বমানবে প্রেম সে সাধনা হইতে নিরাকৃত হইলে তাহারও শাস্তিভোগ আমাদিগকেই করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাদ দিয়া বিশ্বমানব নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীও বিশ্বমানবের অন্তর্ভুক্ত ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। গঠনের পথ বা বিনাশের পথ, সহযোগের পথ বা অসহযোগের পথ, যে পথেই সাধনা কর সর্ব্বত্র চরিত্রবল চাই। আর চরিত্রবল শুধু সংযম, স্বার্থনাশ, সহিষ্ণুতা, অহিংসা, ধৈর্য্য নহে। স্বাবলম্বন, অধ্যবসায়, শ্রমাভ্যাস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিঘ্নসিদ্ধিতে নিপুণতা, দশের সহিত সমবেত উদ্যোগে উৎসাহ, দৈনিক জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সততা ও সুশৃঙ্খলা ও সর্ব্বোপরি স্বদেশপ্রেম—এ-সকলই চরিত্রবলের উপাদান। শুধু অভাবাত্মক গুণগুলিতে সিদ্ধ হইলে হইবে না। ভাবাত্মক গুণের সাধনা চাই। আর স্বদেশপ্রেম ত শুধু স্বদেশের আকাশ ও বাতাস, ধূলি ও জল, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের প্রতি টান নয়; স্বদেশের মানুষের প্রতি প্রেম। স্বদেশের মানুষের অধিকার প্রতিদিন সম্মান করিতে হইবে। শুধু ধনীর অধিকার নয়, নির্ধনের অধিকারও মানিয়া চলিতে হইবে। শুধু মানীর প্রতি সম্মান নয়, অমানীর প্রতিও সম্মান দেখাইতে হইবে। শুধু পুণ্যবানকে নয়, পাপীকেও ভালবাসিতে হইবে। আমার স্বরাজের আদর্শ যে পদদলিত করিতেছে তাহাকেও প্রেম করিতে হইবে। শুধু অভাবাত্মক "অহিংসা" (Non-violence) সাধনে স্বদেশপ্রেম সাধনা হইবে না। চাই ভাবাত্মক প্রেম (Love) সাধনা। এ বিশাল, মহান্ আদর্শের যোগ্য সাধক কয়জন? আমি ত নই। তবুও "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিতেছি। নিজের নগণ্য ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ না করিয়া পারিতেছি না। তোমরা দশজন তোমাদের শক্তি নিয়োগ করিলে আমার ন্তায় দুর্ব্বল সেবকও হৃদয়ে বল পাইবে। "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ॥

(নব্যভারত, মাঘ) শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

বৈদিক বিষ্ণু ও কৃষ্ণ

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এখন এদেশে ঈশ্বররূপে পূজিত। কিন্তু এই সম্মানের পদ পাইতে তাঁহাদের অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ, লাগিয়াছে। বিষ্ণু বেদে, বিশেষতঃ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতা। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ। বিষ্ণু "ইন্দ্রস্থ যুজ্যঃ সখা" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত)—ইন্দ্রের যুক্ত বা উপযুক্ত সখা। তাহা তো হইবেনই। বৈদিক বিষ্ণু আর কেহই নহেন, তিনি সূর্য্য। আর ইন্দ্র মেঘ ও বিদ্যুতের দেবতা। সূর্য্য বাষ্পাকারে জল আকর্ষণপূর্ব্বক মেঘ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের সহায়তা করেন। "ত্রিবিক্রম" আকাশে সূর্য্যের তিনটি সংস্থান মাত্র। বামনাবতারের বৈদিক মূল শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। ঋগ্বেদের "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—বিষ্ণুর সেই পরমপদ—যার অর্থ উপনিষদে দাঁড়াইয়াছে—ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ স্বরূপ—তাহা আর কিছু নহে—মধ্যাকাশে সূর্য্যের অবস্থান মাত্র। গায়ত্রীতেও (১ ১৬৪.৪৬) তাঁহার স্থান খুব উচ্চ যদিও গায়ত্রীর বেদান্তিক অর্থ তখনও কল্পিত হয় নাই; হংসবতী ঋক্ (৪ ৪০।৫) সূর্য্য-বিষয়িণী কি না সন্দেহ, কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে বোঝা যায় যে কোন কোন মন্ত্রচয়িতা বিষ্ণুকে পূজ্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণসমূহে তাঁহার যে স্থান, তাহা প্রাপ্ত হইতে কেবল অনেক সময় নহে, অনেক সংগ্রামও লাগিয়াছিল। সেই সংগ্রামের কথা বেদ পুরাণ উভয়েই আছে। ফলতঃ অবতারবাদ কল্পিত হইবার পূর্ব্বে এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার কৃষ্ণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। অবতারবাদ বৈদিক সময়ের অনেক পরে কল্পিত হয়, কিন্তু বিষ্ণু যেমন বৈদিক, যিনি পুরাণে বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপে অভিষিক্ত হইলেন সেই কৃষ্ণও বৈদিক।

মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ ধর্ম্মাচার্য্য ও যোদ্ধা দুইই। বেদে দুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্রচয়িতা ঋষি, আর-একজন যোদ্ধা।* মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য্য গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি-কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ আঙ্গিরা ঋষির বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা কৃষ্ণ অনার্য্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানা স্থানে উভয়ে কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্য্য কৃষ্ণ ইন্দ্রের ঘোর শত্রু। কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত, পুরাণে সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ,—প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। কৃষ্ণ এবং তৎপুত্র বিশ্বকায় বৈদিক দেবতা অশ্বিনদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। বিশ্বকায়ের পুত্র বিষ্ণাপুর মৃত্যু হইলে অশ্বিনদ্বয় তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কৃষ্ণ পুরাণে ঐশী শক্তি সহ পুনরাবির্ভূত হইয়া নিজ গুরু সান্দীপনি সম্বন্ধে এই দৈব কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যে তিনি "দেবকী-পুত্র" এবং আঙ্গিরস গোত্র ঘোরনামক ঋষির শিষ্য।

ঋগ্বেদে একটি যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তার এক পক্ষে ইন্দ্র, অপর পক্ষে অনার্য্য যোদ্ধা কৃষ্ণ। স্থান অংশুমতী নদীর তীর। "অংশুমতী" বোধ হয় কাবুল নদীর প্রাচীন নাম। কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সেনা যে অনার্য্য ছিল তার প্রমাণ এই যে ইহাকে ঋগ্বেদে "অদেবীঃ" অর্থাৎ দেবপূজা-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্যে এই সেনাকে বিনষ্ট করেন। এই বেদোক্ত ইন্দ্র-কৃষ্ণের যুদ্ধই পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র ও কৃষ্ণের সমুদায় বিবাদের মূল। পৌরাণিকেরা বৈদিক দেবপূজার স্থলে কৃষ্ণপূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। কাজেই কৃষ্ণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে বৈদিক প্রধান দেবতা ইন্দ্রের বিরোধী না করিলে হয় না। দুটিমাত্র বিরোধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করি। প্রথমটি বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন-পূজা-উপলক্ষে। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে যে অনার্য্য উপকরণ আছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কোনও খাঁটি আর্য্য নেতা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার বিরোধী হইতে পারেন না। যাহা হউক দ্বিতীয় বিবাদ পারিজাত-হরণ উপলক্ষে। জয় অবশ্য কৃষ্ণপক্ষেই হইল। যে সময়ে বিষ্ণু অন্য বৈদিক দেবতা হইতে বড় হইবার চেষ্টা করেন তখন ইন্দ্রের

* ইহাতে বিষ্ণুর বিবরণের হও . . নেই মত আছে . . . . . . [illegible]

[illegible]

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক মহা সংগ্রাম আনয়ন করিয়াছেন। সহযোগিতা বর্জ্জন, বা নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতা (Passive Resistance) নূতন কথা নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই প্রণালী সাধুদিগের অনুমোদিত। জগতে কোন ন্যায়, সত্য, প্রেমের বিধি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না, যদি ইহা না থাকিত। সমাজ ও ধর্ম্মের মধ্যে এই নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতা সর্ব্বদা দেখিতেছি। খৃষ্টজগতে ঈশা সর্ব্বপ্রথম এই নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যাহা অন্যায় মনে করি তাহা করিব না, সমাজশক্তি রাজশক্তি যাহা ইচ্ছা কর, বলিয়া অটলভাবে চিরদিন সাধুগণ কার্য্য করিয়াছেন। খৃষ্ট-জগতে যাঁহারা সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের মূল্য কত! সক্রেটিস্, গেলিলিও এই পথ ধরিয়া সত্যকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। যেখানে বিদ্বেষ, যেখানে পর-পীড়ন সেখানে সাধুজন কখনও যাইতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজ এই নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতার পথ ধরিয়াই শক্তিশালী হইয়াছেন। রামমোহন পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিতে যাইয়া এই পথ ধরিয়াছিলেন। শিবনাথ এই পথ ধরিয়াই পৈতা ফেলিয়া পিতামাতা ও সমাজের অবাধ্য হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন। যাহা সত্য তাহা সকল বিষয়েই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সমাজ ও ধর্ম্ম-নিয়ম অবৈধ হইলে তাহার বিষয়ে সহযোগিতা বর্জ্জন যদি বৈধ হয় তবে অবৈধ রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন কেন করিতে পারিব না? সমাজ-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মানুষ থাকিতে পারে, রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহার ভাগ্যে কারাগার, মৃত্যু প্রভৃতিই জীবনের সম্বল করিতে হইবে। বৈধ ও অবৈধ এই জ্ঞান যদি উজ্জ্বল হয়, আর অবৈধ বর্জ্জন যদি সত্য বোধ হয় তবে দুঃখ দারিদ্র্যকে কি ভয় করিবে? এখন বৈধ ও অবৈধ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। প্রথম ইংরেজি শিক্ষা:— ইহার অবৈধতা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। তাই এই বিষয়ে বর্জ্জন সঙ্গত নহে। অন্যায় আদেশে সভা-ভঙ্গ, অন্যায় আদেশে লোকের কারাগারে নিক্ষেপ এই-সকল অবৈধ আদেশের নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতার ফল ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রীয় অবৈধ কার্য্যে, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগিতা ধর্ম্ম ও নীতির পক্ষে অসঙ্গত নহে।

রবীন্দ্রনাথ জগতের প্রতি অতি উচ্চ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া যে কথা বলিতেছেন, ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহার কথা মাথায় করিয়া লইবেন। তাঁহার কথার সার—সকল মানুষ একজাতীয়, সামাজিক বিভিন্নতা-সকল কৃত্রিম। মানুষ মানুষকে জানিলে এই ভেদ, এই বৈরভাব দূর হইয়া যাইবে। মানুষকে জানিতে হইলে সহযোগিতা চাই—দূরে দূরে জানা হয় না। ইংরেজ, ফরাসী, ভারতবাসী পরস্পরের ভাষা, শাস্ত্র, ভাব অবগত হইয়া একভাবাপন্ন হইবে।

যাহারা একসঙ্গে বসিতে চায়, শিক্ষা করিতে চায়, শিক্ষা দিতে চায়, তাহাদের সঙ্গে এই সহযোগিতা নিশ্চয় সম্ভব। কিন্তু যে চাবুক হাতে লইয়া বলে আমার পাতের কুড়াইয়া ভোজন কর, আমাদের মেনে চল, তাহার সঙ্গে কি সহযোগিতা সম্ভব? সেখানে কি নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতার প্রয়োজন নাই? আমি যদি বলি, তোমার পাতের কুড়াইয়া খাইব না, বরং উপবাস থাকিব; তোমার অবৈধ আদেশ মানিব না, বরং দুই ঘা বেত্রাঘাত খাইব; তবে কি অন্যায় হয়? রবীন্দ্রনাথের উচ্চ ভূমিতে বসিয়া জগতের মহাসভায় ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদা এই আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করেন। মহাত্মা রামমোহন প্রথমে বেদ, বাইবেল ও কোরাণকে এক সঙ্গে মিলিত করিবার কথা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনের শঙ্খধ্বনি করিয়া উভয়কে আলিঙ্গন করিতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহা নিশান জগতের দ্বারে উত্তীত করিয়া সকলকে বলিতেছেন, এই মহানিশানের নিম্নে আসিয়া সকল অহঙ্কার, অত্যাচার, বিদ্বেষ, ঘৃণা বর্জ্জন কর। আর বলিও না (The East is East, the West is West and the twain shall never meet) পূর্ব্ব দিক পূর্ব্ব দিক, পশ্চিম পশ্চিম, এই দুই কখন মিলিবে না। জাতীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়িয়া সকলে মিলিত হও। রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করি। তাঁহার এই নিশানের নিম্নে সকলে দাঁড়াই।

এই ডাকের সঙ্গে গান্ধীর ডাকের প্রকৃত বিবাদ নাই। অবৈধ বর্জ্জনে নিষ্ক্রিয় অবাধ্যতা চাই। আমাদের দেশের লোকেরা এই বীরত্ব ও শক্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা।

[পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর মুখপত্র "সেবকে" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর লিখিত।]

—

স্বাধীনতার স্বরূপ

স্বাধীনতার অর্থ কি? ইহা সেই অবস্থা ও সেই সর্ত্ত যাহা কোন জাতিকে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে এবং স্বীয় ভাগ্য গঠন করিতে সমর্থ করে।

আমাদের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুযায়ী করিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার দাবি করিতেছি। আমরা চাই না ইহাতে পাশ্চাত্যের আরোপিত অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার শিক্ষা দ্বারা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে।

ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে। যখন ভারতে জাতীয় জীবনের অন্তর-স্পন্দন অনুভূত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথা উঠিতে পারে।

(নারায়ণ, ফাল্গুন) শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

—

দ্রবিড়-জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান

আর্য্যধর্ম্মের প্রধান উপাদান সূর্য্য, চন্দ্র, আপোদেবতা, অগ্নি, বায়ু, মরুৎ, দেযাঃ, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বস্তু হইতে দেবতা-কল্পনা; কতিপয় নরনারীর (অবতারভূত) দেবত্ব কল্পনা; এবং দেবতা ও নরজাতির মধ্যবর্ত্তী একটি বংশগত পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি। এই-সকল মৌলিক উপাদান যে ধর্ম্মে লক্ষিত হইবে, অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে হয় সে ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, না হয় আর্য্যধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

সাইবিরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তুর্কী, হাঙ্গারী, ফিন্‌লণ্ড, লাপলণ্ড প্রভৃতি সুদূর-স্থানে যে-সকল জাতি বর্ত্তমান যুগে বসবাস করিতেছেন তাঁহারাই শক (Scythian) জাতি বা তুরাণীয় জাতি। এই শক জাতি ও দ্রাবিড় জাতির ঐক্যমূলক মতবাদ সত্য হউক আর নাই হউক, ভাষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়জাতির মধ্যে বিলক্ষণ অনুরূপতা আছে সন্দেহ নাই। শকজাতি ও দ্রাবিড় জাতির ধর্ম্মে চারিটি অনুরূপ উপাদান লক্ষিত হয়—

(১) বংশগত পুরোহিত-শ্রেণী ইঁহাদের নাই। দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে দালালি করিবার জন্য পুরোহিত বা পাণ্ডার আবশ্যক ইঁহাদের হয় নাই। ইঁহাদের গৃহস্বামী বা কর্তা আবশ্যক হইলে পুরোহিত ও ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য করেন। ইচ্ছা করিলে যে-কেহ এ কার্য্য করিতে পারেন, এজন্য বর্ণবিচার নাই। সময়ে সময়ে বা প্রদেশ-বিশেষে গ্রামের মোড়ল পুরোহিতের কার্য্য করেন। যখন তিনি এ কর্ম্ম করেন তখন তিনি তাঁহাদের উপাস্য দৈত্য বা ভূতের প্রতিনিধি ও মুখস্বরূপ।

(২) তাঁহারা অদ্বিতীয় ভগবানের সত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার পূজা বা উপাসনা করেন না। কারণ ইঁহাদের মতে ভগবান্ এত 'ভালমানুষ' যে ভাল বা মন্দ তিনি কিছুই করিতে পারেন না।

(৩) ভগবানের অর্চ্চনা না করিলেও ইঁহারা দৈত্য বা ভূতের পূজা করেন। কারণ ভূত বা দৈত্য নিষ্ঠুরতার অবতার প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অব্যবস্থিতচিত্ত। সুতরাং ইঁহার ইষ্ট বা অনিষ্ট করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে। শোণিতাদির দ্বারা অর্চ্চনা ও তাণ্ডব নৃত্যে ইনি পরিতুষ্ট হয়েন।

(৪) জন্মান্তরবাদ ইঁহাদের নাই। ইঁহারা "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?" মতবাদী।

(নারায়ণ, ফাল্গুন) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র

কোনও একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য কতকগুলি লোক সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমবেত হইয়া কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সেই জনবৃন্দের সমবায়কে "সংঘ" অথবা "গণ" বলা যাইতে পারে। কথা দুইটি পাণিনির সময়েও, খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও, প্রচলিত ছিল। মহাপরিনিব্বাণ-সূত্রে আছে বুদ্ধের সমসাময়িক পূরাণকাশ্যপ প্রভৃতি নামে সাতজন 'সংঘিনো' অর্থাৎ 'সংঘপতি' ছিলেন, তাঁহাদিগকে "গণিনো" অর্থে ২ 'গণপতি' এবং "গণাচরিয়া" অর্থাৎ গণাচার্য্য বলা হইয়াছে। 'Craft guild'কে বা ব্যবসায়-সমবায়কে কৌটিল্য 'শ্রেণী' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রাজার পরিবর্ত্তে কোনও কোনও স্থলে এইপ্রকার সংঘের দ্বারাই কোন কোনও প্রদেশ শাসিত হইত। জৈনদিগের আচারঙ্গ সূত্র নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে এবং বৌদ্ধগণের অবদানশতকে (৮৮ সংখ্যা) আছে কতকগুলি প্রদেশ রাজশাসিত এবং অপর কতকগুলি স্থান গণতন্ত্রাধিষ্ঠিত ছিল। কাত্যায়নের সময়ে সংঘ অথবা গণশাসিত প্রদেশ ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে তিন প্রকার 'সংঘ' অথবা 'গণ' ছিল। ঋগ্বেদে ৫.৬৬।৬ "স্বরাজ্য" পদের প্রয়োগ আছে। সায়ণ 'স্বরাজ্য' পদের ব্যাখ্যায় 'স্বরাটত্ব' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসনকে স্বরাটত্ব বলা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও 'স্বরাট' পদের প্রয়োগ আছে। মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি প্রভৃতি পুস্তক হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ৪।১।৮৪ "রাষ্ট্রপতি ও গণপতি" শব্দের প্রভেদ দেখান হইয়াছে। পাণিনিও ৪।১।৮৪) "গণপতি" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১০৭এর অধ্যায় ৩৯৬৩ হইতে ৩৯৮৯এর শ্লোক) 'গণ' প্রজাশাসিত প্রদেশ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির 'গণপুঙ্গব', 'গণপ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কথাসরিৎসাগরেও 'গণনায়কের' উল্লেখ আছে। গৌতম গণ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১৫।৯।১৮)। মনু (৩।১৫৪), যাজ্ঞবল্ক্য (১।১৬) গণতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহমিহির 'গণনায়ক' ও গণতন্ত্রের (বৃহৎসংহিতা লোঃ ১৬ অঃ ৩৩) উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত কতকগুলি রাজ্যের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পুরাকালীন ভারতে সময়ে সময়ে রাজনির্ব্বাচন কার্য্যও প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই-সকল নির্ব্বাচিত রাজা কখনও যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাদের ভয় থাকিত যে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাঁহারা অপসারিত হইবেন

উত্তরভারতে বিশেষতঃ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে যে পুরাকালে সেকন্দরের আক্রমণের পূর্ব্বে ও পরে প্রজাতন্ত্র ছিল সে বিষয়ে গ্রীক্ লেখকগণের পুস্তকে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক দূত মেগাস্থেনিস্ তাঁহার বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন, মগধে তিনবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে Abastanoi, Kathaioi এবং Arohitoi প্রভৃতি জনবৃন্দ স্বাধীন ছিল অর্থাৎ তাহারা রাজশাসিত ছিল না।

কার্টিয়াস ক্ষুদ্রক জাতিকে স্বাধীন এবং নায়ক (প্রেসিডেণ্ট) দ্বারা শাসিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Sabarcae নামে আর-এক ক্ষমতাশালী জাতি ছিল, তাহারা রাজশাসিত ছিল না এবং তাহাদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। Oxdrakai জাতি স্বাধীন ছিল এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনার আলোচনা করিবার জন্য তাহাদের একটি স্থায়ী সভা ছিল (Permanent Council) (Mc. Crindle "Ancient India", pp. 167-9, 292)।

প্রাচীন গ্রীসদেশে অনেক City-state অর্থাৎ নগর-রাজ্য ছিল; এই-সকল নগর প্রজাদের দ্বারাই স্বাধীনভাবে শাসিত হইত। ডিয়োডোরাস City-stateএর উদাহরণ স্বরূপ পাতাল-নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই City-stateএর যুদ্ধ বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা বংশানুক্রমিক দুই রাজবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল; তদ্ভিন্ন অপরাপর সকল বিষয়ে "বৃদ্ধ সভাই" (a council of elders) প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসক ছিল। [Mc. Crindle, pp. 2, 202, 296 n. 356, 371], এই দুই প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত রাজ্য ব্যতীত ব্রাহ্মণদিগেরও আর একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। Sambus জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে সেকেন্দরকে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা শাসিত একটি নগর আক্রমণ করিতে হইয়াছিল এ কথা ডিয়োডোরাস স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যের কথা আরিয়ানও উল্লেখ করেন। সেকেন্দর প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিন্ধুদেশস্থ উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় তৎপ্রদেশস্থ গণতন্ত্র স্থানসমূহের অধিবাসিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইসকল জাতিকে উৎসাহিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রীক লেখকগণ আরও লিখিয়াছেন যে স্বাধীন প্রজাবৃন্দ যাহাতে স্বাধীনতার বিনিময়ে সেকেন্দরের সঙ্গে সন্ধি না করে তদ্বিষয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই উদ্যোগী ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাব, পূর্ব্ব রাজপুতানা এবং মালবদেশে প্রভূত ক্ষমতাশালী কয়েকটি প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল। মদ্রকগণ পঞ্জাবের মধ্য অংশে স্বাধীনভাবে বাস করিত। যৌধেয়গণ শতদ্রুর উভয় তীরে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের প্রভাব ভারতে খুব বেশী ছিল।

সেকেন্দরের আক্রমণকালে প্রজাদের দ্বারা শাসিত স্থানের সংখ্যা বড় কম ছিল না এবং অনেক প্রদেশেই "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পূর্ব্বে অন্যূন দশটি প্রজাতন্ত্র ছিল। এই দশ স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

ক্ষমতাশালী কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, মিথিলায় বিদেহগণ এবং বৈশালীর লিচ্ছবীগণ। পরবর্ত্তীকালে শেষে দুই জাতি একত্র হইয়া বৃজি নামে পরিচিত হইয়াছিল। রাজ্যশাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় বিষয়ের সুচারু মীমাংসা করিবার জন্য তাহাদের একটি স্থায়ী সাধারণ সভা ছিল। দেশের শাসনকার্য্যে বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই সমভাবে আগ্রহ প্রদর্শন করিত এবং দেশের অধ্যক্ষ সকল অধিবাসীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। অধ্যক্ষের উপাধি ছিল 'রাজা'।

বৃজিদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রজাতন্ত্র কতকটা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ধরণে গঠিত হইয়াছিল। আটটি বিভিন্ন স্থানের সমবায়ে ইহাদের রাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশ পরস্পর অনেক বিষয়ে স্বাধীন ছিল।

(ইতিহাস ও আলোচনা, ফাল্গুন) শ্রীরাধহরি চট্টোপাধ্যায় বি-এ।

—

আলঙ্কারিক-পঞ্চক

কাশ্মীরে,—মম্মটভট্ট

কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজানক মম্মট "কাব্যপ্রকাশ" এবং "শব্দব্যাপার-বিচার"এর রচয়িতা। অলঙ্কার বিষয়ে কাব্যপ্রকাশ সমগ্র ভারতে প্রথম-শ্রেণীর গ্রন্থ। ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভের কিছু পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার স্থান।

বঙ্গদেশে,—বিশ্বনাথ কবিরাজ

সাহিত্যদর্পণ, অলঙ্কারশাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিদিত গ্রন্থ; ইহার রচয়িতার নাম বিশ্বনাথ কবিরাজ। বিশ্বনাথের মৌলিকতা নাই; তিনি মূলে সংগ্রহকার মাত্র। বিশ্বনাথ নিজেকে বলিয়াছেন, তিনি আঠারটি ভাষায় পণ্ডিত। বিশ্বনাথ বাঙ্গলার অধিবাসী—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন চণ্ডীদাস। তিনিও কবি। বঙ্গসাহিত্যগৌরব চণ্ডীদাস কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমেই জীবিত ছিলেন। দুই চণ্ডীদাস যদি একই ব্যক্তি হন, তবে চণ্ডীদাসের পৌত্র বিশ্বনাথকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

উৎকলে,—বিদ্যানাথ

বিদ্যানাথ 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ' নামে অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত নাম প্রতাপরুদ্রীয়। গ্রন্থে যে-সব উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি উৎকলরাজ মহাদেবের পুত্র প্রতাপরুদ্রের (ইঁহার অন্য নাম বীররুদ্র বা রুদ্র) প্রশস্তিসূচক। দক্ষিণ ভারতে আজও ইহা অতি প্রচলিত, সমস্ত চতুষ্পাঠীতেই ইহার অধ্যাপনা হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণের ন্যায় ইহাও সংগ্রহমাত্র। বিদ্যানাথ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন; কারণ তাঁহার আশ্রয়দাতা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকাল ১২৯৪—১৩১৮।

বিদর্ভে,—জয়দেব

মহাদেব ও সুমিত্রার পুত্র জয়দেব দুই বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা—"চন্দ্রালোক" নামে অলঙ্কার-গ্রন্থ, আর "প্রসন্নরাঘব" নাটক। ছন্দোনিয়ম সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কাব্যাদর্শকার দণ্ডীর ন্যায় জয়দেবও অনুষ্টুভের আশ্রয় লইয়াছেন এবং দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার নিজের রচনা। তিনি বিদর্ভের অধিবাসী, সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক।

দক্ষিণে,—অপ্পয় দীক্ষিত

অপ্পয় দীক্ষিত দক্ষিণী, শৈবধর্ম্মের এক মস্তবড় পণ্ডিত। ইনি অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংসা, বৃত্তিবার্ত্তিক। অপ্পয় পূর্ব্বাচার্য্যদের দাসবৎ অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট, এইজন্য তাঁহার কোনও রচনাই উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই।

বিজয়নগরের প্রথম বেঙ্কটপতির রাজত্বকালে দক্ষিণদেশে সাহিত্যচর্চ্চার একটা প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। বেঙ্কটপতির সময় ১৫৮৫—১৬১৪। অপ্পয় ভেলোরের নায়কের আশ্রিত ছিলেন, এবং এই নায়ক ছিলেন বেঙ্কটপতির সামন্ত। সুতরাং অপ্পয় দীক্ষিতের সময় সুনিরূপিত হইয়াছে।

(ইতিহাস ও আলোচনা, ফাল্গুন) শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, বি-এ।

—

ভারতীয় চিত্রকলা

আসলে Art একটা সৃজন-চেষ্টা; কেহ বলেন সৌন্দর্য্য-সৃজন-চেষ্টা; কেহ বলেন ভাব-সৃষ্টির চেষ্টা; কাহারো মতে রসানুভূতি ঘটাইবার চেষ্টা। মানুষের, বিশেষতঃ সভ্যমানুষের দৈবী বা অধ্যাত্ম প্রকৃতি (higher nature) উদ্বুদ্ধ না হইলে এই চেষ্টা জাগে না; যে মানুষের বা জাতির এই অধ্যাত্ম বিকাশ যত বেশী, সে বা সেই জাতি ততই সভ্য এবং সেই পরিমাণে তার আর্ট-সৃষ্টি বা রসবোধ বাড়িয়াছে। কাজেই দাঁড়াইতেছে এই যে মানুষের যে-সব আধ্যাত্মিক চেষ্টা তাহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া ভাবের বা রূপের সৃষ্টি করিয়া রসানুভূতি ঘটায় তাহাই art। Art মানুষের সুপ্ত-দৈবীপ্রকৃতির ক্রমবিকাশের বাহ্য চেষ্টা। দৈবী প্রকৃতির পুষ্টি হয় রস উপলব্ধিতে, ভূমা আনন্দ বা লোকোত্তর আহ্লাদ এই রসের অনুভূতিফল। Artএ এই লোকোত্তর আহ্লাদের সঞ্চার করে রসসৃষ্টির ধারা।

মানুষের অন্তর্নিহিত চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি যে ভাব সৃষ্টি করিয়া আনন্দের ভিতর দিয়া রসানুভূতি ঘটায় তাহাকে আর্ট বলে। সেই বৃত্তি সুর ভাষা, রেখা, বর্ণ, তক্ষণ ও স্থাপত্য সাহায্যে এই ভাবকে মূর্ত্তি দান করে। এই ভাব-সৃজনের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ বা লোকোত্তর আহ্লাদ দান, আর গৌণ উদ্দেশ্য শিক্ষা দান। যাহাকে ইংরেজীতে বলে fine art, তাহার প্রধান লক্ষ্য ভাবের উদ্বোধন; এ ছাড়া যে-সব art বাহ্য জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য দান করে তাহা minor arts বা ব্যবহারিক শিল্প, ইহা শুধু চিত্তরঞ্জন করে মাত্র।

শিল্পকলাকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম ভাবশিল্প, দ্বিতীয় শোভাশিল্প বা Decorative arts। ভাবশিল্প বা সুকুমার-কলা আবার তিন জাতীয়, যথা:—চিত্রশিল্প (painting), তক্ষণ-শিল্প (sculpture) ও স্থাপত্য-শিল্প (architecture)।

তক্ষণ ও চিত্রশিল্প, বিষয় ভেদে তিন শ্রেণীর। মূর্ত্তিচিত্র (portrait), দৃশ্যচিত্র (landscape), ভাব বা তত্ত্বচিত্র (idea) ও ঘটনা চিত্র (events)। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের আদর্শ ভারতীয় তক্ষণ ও চিত্রকলা প্রধানতঃ ভাবাত্মক (idealistic)। পরবর্ত্তী রাজপুত ও মোগল যুগে মূর্ত্তি ও দৃশ্য, শিল্পের বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে ধ্যানযোগে প্রথমে রূপক রূপে কল্পিত করিবার পরে রেখাপাতে ও তক্ষণে প্রকটিত করিয়া মানুষের মনে আনন্দ ও শিক্ষা দেওয়াই আদর্শ ভারত শিল্পের প্রধান কাজ ছিল।

বৈদিক ও প্রাক্-বৌদ্ধযুগে শিল্পের এ মহান্ উদ্দেশ্য কল্পিত হয় নাই। তখন শিল্পীর প্রধান কাজ ছিল ব্যবহারিক চিত্তরঞ্জন। শিল্পীও ছিল সাধারণ কারিগর-শ্রেণীভুক্ত। কাজেই তাহার সেরূপ সমাজ-মর্য্যাদা ছিল না। ভগবান মনু এইসব ব্যবহারিক শিল্পীকে হীনপদস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিল্পশাস্ত্র যে মানুষের উচ্চজীবন লাভের কোনো সহায়তা করিতে পারে ইহা তখনো স্বীকৃত হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর শিল্পকলার আদর ও সম্মান বাড়িতে থাকে; সাধারণের মধ্যে তথাগতের পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্বের বহুল প্রচারের জন্ত চিত্র ও তক্ষণের সাহায্য লওয়া হইতে থাকে। আর ধর্ম্ম-আরাধনা ও ধর্ম্মাচার সাধনের জন্ত মন্দির, চৈত্য, বিহার, স্তূপ প্রভৃতির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যকলার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে কিন্তু বৌদ্ধযুগ হইতে শিল্পের সমধিক আদর ও চর্চ্চা হইতে থাকিলেও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতেই চারুকলার অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক যুগ বিভাগ করিলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগ পাই।

স্থাপত্য ও তক্ষণ শিল্প—

ক { ১। অশোক ও অশোকান্ত
২। গান্ধার যুগ
৩। কুশান যুগ, গুপ্ত যুগ, }

খ মধ্য যুগ

গ আধুনিক

চিত্র শিল্প— ১। প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগ
২। বৌদ্ধ যুগ
৩। হিন্দু যুগ
৪। রাজপুত-মোগল যুগ
৫ আধুনিক নবযুগ
বা জাগরণযুগ

শিল্পচর্চ্চার ইতিহাসের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া দেখিতেছি, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারার ইতিহাসের কাল যেমন প্রচলিত ধর্ম্মের নামানুসারে বিভক্ত হয়, আর্টের ইতিহাসেও তেমনি প্রধানতঃ ধর্ম্মের নামেই যুগ বিভাগ হইয়াছে। তাহার কারণ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সহিত ধর্ম্ম এমনিভাবে জড়িত, ধর্ম্মের সঙ্গে এমনি নিবিড় ভাবে সংবদ্ধ যে ধর্ম্ম ছাড়িয়া উহার কোনো কথারই আলোচনা হয় না। ভারতবর্ষের প্রধান তিন ধর্ম্ম—বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশে এই তিন ধর্ম্ম ষোলো আনা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; কাজেই হিন্দুর আর্ট বা সাহিত্য, কিছুই ধর্ম্মের আলোক ও উত্তাপ ও রস ছাড়িয়া পলাইতে পারে নাই। কাজেই আর্টের কালবিভাগ প্রধানতঃ ধর্ম্মের নামানুসারে করা হইয়াছে।

শিল্পপদ্ধতির ধারাভেদেও ইহার নামকরণ হইয়াছে; যেমন গান্ধার শিল্প, ইত্যাদি।

(প্রভাতী, বসন্ত সংখ্যা) শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ।

ধূলার নিধি

পথের ধারে ওই যে বসে' ভুট্টা মটর নিয়ে
কালো মতন, হরিণ-আঁখি বালা,—
দেখ্‌তে ওরে রোজ সকালে যাই যে ওপথ দিয়ে
ওরি গলায় দিইছি প্রণয়-মালা।

লুটিয়ে পড়ে পিঠের উপর রুক্ষ চুলের রাশি,
বক্ষ 'পরে ছিন্ন বসনখানি;
অধর-মাঝে একটুখানি মিষ্টি মধুর হাসি
বল্‌তে কি চায় সরম-ভরা বাণী।

আকাশ যেন বুঝ্‌তে পারে বাহুর নিবিড়তা,
বাতাস বাসে পরাণ ভ'রে ভালো;
জান্‌তে পারে ফুলের কলি যেন প্রাণের কথা,
মুগ্ধ দেখে নয়ন-ভরা আলো।

হঠাৎ যদি পথের পাশে শুনি মধুর হাসি,
মিলন ঘটে স্নিগ্ধ আঁখির সনে,
একটি কথাই জাগে কেবল,—"তোমায় ভালোবাসি,"
থাকেনাক' আর ত কিছুই মনে।

ওরি প্রাণের প্রেম-জমানো শুভ্র নিরেট ফুল
দেয় গো তুলে যখন করতলে:
আমার কাছে এগিয়ে আসে গুচ্ছ-দুয়েক চুল,
না-জানি কোন্ রঙ্গভরা ছলে!

লতার মতন অঙ্গখানি দেখ্‌তে ভালো লাগে,
যত্নবিহীন একটি মুঠা ফুল;
এমন পূর্ণ সার্থকতায় একটুখানি জাগে
কোন্ দেবতার এক-নিমিষের ভুল।

ইচ্ছে করে কানের কাছে গুন্‌গুনিয়ে বলি—
তোমায় কভু এমন স্থানে সাজে?
কুঞ্জবনের বক্ষমণি কুন্দফুলের কলি
মরুভূমির তপ্ত বালুর মাঝে?

পথের পাশে যাহার মুখে একটুখানি হাসি,
রুক্ষকেশী সূর্য্যমুখী বালা;
তরুণ হৃদি উজাড় ক'রে ওরেই ভালোবাসি,
ওরি গলায় দিইছি প্রণয়-মালা।

শ্রীগণেশচরণ বসু।



জিজ্ঞাসা

(১৩৩)

হুগলী জেলার বন্দিপুর গ্রামের সিংহরায়গণ চিতোরের রাণা লক্ষণ সিংহের বংশধর বলিয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়। শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা।

(১৩৪)

শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বদরপুর ঘাট ষ্টেসন হইতে প্রায় হাজার ফুট উত্তর দিকে বরাক নদীর তীরে, একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই দুর্গ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য কেহ জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীনবকুমার দত্ত।

(১৩৫)

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে চক্ষুর সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র শ্বেত কীটের মত কি যেন উড়িতে দেখা যায়। উহা কি?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা।

(১৩৬)

'টোল' শব্দটি কোন্ ভাষা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে এবং কতদিন যাবৎ উহা বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে?

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(১৩৭)

রবি হইতে শনি ও Sunday হইতে Saturday বার-সকল এবং বৈশাখ হইতে চৈত্র ও January হইতে December মাস-সকল কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে?

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী।

(১৩৮)

সুস্থ ছোট ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে ও কাঁদে কেন?

শ্রীসুভাষিণী মাইতি।

(১৩৯)

অন্ধকার গৃহে রাত্রিকালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিলেও গৃহমধ্যে নিঃশব্দে আলোক সঞ্চারিত হইলেও মুদ্রিত চক্ষুও আলোকের অনুভূতি পাইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? মুদ্রিত চক্ষু কিরূপে আলোক-সঞ্চার অনুভব করিতে পারে?

শ্রীস্নেহময় সান্যাল।

(১৪০)

বেলপাতা, তুলসী ও দূর্ব্বা হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র ও দেবার্চ্চনার অর্ঘ্যরূপে পরিগণিত হইল কিরূপে, কেন এবং কোন্ সময় হইতে?

শ্রীনলিনীকান্ত দাস।

(১৪১)

Human magnetism কি? প্রত্যেক মানবে ইহা বর্ত্তমান আছে কি না? ইহার উপকারিতা কি ও কিরূপে ইহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে?

শ্রীঅর্পণাচরণ ঘোষ।

(১৪২)

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে কখন হইতে প্রমিশরি নোট প্রচলন করেন? পূর্ব্বে ভারতে কোন প্রকার নোট বা তদ্বৎ অন্য কিছু, মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রচলিত ছিল কি না? আর কোন্ কোন্ সভ্যদেশে এই নোটের প্রচলন আছে?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার পাল।

(১৪৩)

হস্তী-ব্যবসায়ী এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম আসামের মাহুতেরা হস্তী চালাইবার যে-সব 'বুলি' ব্যবহার করে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মাহুতরাও প্রায় সেইসব 'বুলি'ই ব্যবহার করিয়া নিজ নিজ হস্তী চালনা করিয়া থাকে। আসামে ব্যবহৃত 'বুলি' এইরূপ—

"আগেট্"=সামনে যাও। "পিচ্ছু"=পেছনে যাও। "দেই"=ঘুর। "মাইল্"=যাও, চল। "মাইল্ হুচিয়ার," "মাইল্ খুপি"=সাবধানে যাও, পা টিপিয়া চল। "ধেত্"=থামো, খাড়া হও। "বিরি"=করিয়ো না। "বইঠ্"=বস, পড়িয়া যাও। "ঝোক্"=সামনের দুই পা পাড়িয়া বস। "খোল"=খুলিয়া দাও। "পিছু খোল"=পেছনের পা পাড়িয়া বস। "পা জুর"=দুই পা কাছাকাছি রাখ। "ডালে"=উপরের দিকে। "ধোর"=ধর। "মার"=মার ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মাহুতের ভাষা অনুসারে "বুলি"-গুলো একটু এদিক ওদিক হইলেও "বুলির" মূল ভাষা একটিই ছিল বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম মান্দ্রাজের মাহুতও আসামের "বুলিতে" হস্তীকে চালাইয়া থাকে এবং গুজরাটী মাহুতও বঙ্গদেশের "বুলিতে" হস্তীর দ্বারা কাজ সহজে করাইয়া লয়।

সেই মূল ভাষাটি কি? উপরোক্ত আদেশ-জ্ঞাপক শব্দগুলি মূলে কি ছিল?

শ্রীআদ্যনাথ শর্ম্মা।

(১৪৪)

যবক্ষার (Nitrogen) ভস্ম (Potash) ব্যতীত, ফস্ফরিক এসিড (Phosphoric Acid) উদ্ভিদের অন্যতম খাদ্য। হাড়ের গুঁড়া, শুষ্ক মৎস্য ব্যতীত দেশীয় কোন্ জিনিষে কত পরিমাণ ফস্ফরিক এসিড আছে?

শ্রীরামজীবন গুছাইত।

(১৪৫)

কাঁচ তৈয়ারি কোথায় যাইয়া শিখিতে হয়? ভারতবর্ষে কোন্ কোম্পানী কাঁচ প্রস্তুত করিতেছেন?

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়।

(১৪৬)

রেশমী, পশমী বা সুতী কাপড়ে লোহার দাগ লাগিলে উঠাইবার, এবং উৎকৃষ্ট উপায়ে পরিষ্কার করিবার উপায় কি?

শ্রীনটবর সানা।

—

মীমাংসা

(৮১)

দুর্গোৎসব প্রচলনের ইতিহাস।

সম্রাট আকবরের সময়ে বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংশনারায়ণ বাঙ্গালাদেশের সুবেদার এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি বৈদিক কোন মহাযজ্ঞ করিতে মনন করিলে বহু পণ্ডিত সমবেত হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে কলিতে যজ্ঞ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্য-বংশোদ্ভব পণ্ডিতপ্রবর রমেশ শাস্ত্রী রাজা কংশনারায়ণের পুরোহিত, বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। দুর্গোৎসব বৈদিক মহাযজ্ঞের সমান ফলপ্রদ বলিয়া ইনি রাজাকে শারদীয় দুর্গোৎসব করিতে পরামর্শ প্রদান করিলে তাহাতে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীও সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে রাজা কংশনারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম দুর্গোৎসব করেন। সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা দেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন হইয়াছে। অতএব রাজা কংশনারায়ণই বঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তক। বর্ত্তমান দুর্গাপূজা-পদ্ধতি পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী ঐ সময় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কাশী হইতে প্রকাশিত দ্বাদশ বর্ষের ৯ম সংখ্যা "ত্রিশূল" পত্রিকাতে "বঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

(৮৯)

প্রাচীনকালে মেয়েদের পাদুকা ব্যবহার।

গত মাঘ মাসের বেতালের বৈঠকে আর্য্যনারীদিগের মধ্যে পাদুকার ব্যবহার সম্বন্ধে মীমাংসায় আমার একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। কাদম্বরী হইতে যেটুকু তুলিয়া দিয়াছিলাম উহা কাদম্বরীর গৃহবর্ণনা না হইয়া সন্ন্যাসিনী মহাশ্বেতার গৃহবর্ণনা হইবে। কাদম্বরী বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী নহেন।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

(৯১)

প্রাচীনকালে বিচারে পক্ষ-সমর্থন।

রায় গুণাকর তাঁহার অন্নদামঙ্গলে বাদশাহী দরবারের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"উকীল আছিল যারা, কীল খেয়ে হ'ল সারা॥"

এখনকার এই "উকীল" অর্থ—যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যের সাহায্যার্থে প্রতিনিধিস্বরূপ বিচারাসনে ব্যবহারকার্য্য সম্পন্ন করে। মোগল বাদশাহদিগের দরবারে জমিদারদিগের পক্ষসমর্থন জন্য প্রতিনিধি থাকিতেন, তাঁহারা উকীল নামে পরিখ্যাত ছিলেন। এবং মুসলমানের বিবাহ-সময়েও উকীলের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মোগল বাদশাহদিগের সময়েই বিচারালয়ে পক্ষসমর্থক উকীল ছিল। হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ব্যবহারদর্শন-বিধি আছে, কিন্তু তাহাতে এরূপ পক্ষসমর্থনের বিধান বা উল্লেখ নাই। সুতরাং মুসলমানদিগের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ব্যবহার-শাস্ত্রে আদালতে পক্ষসমর্থন ছিল না বোধ হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

(১০২)

ধামুকার বিবরণ।

ধামুকার আচার্য্যপরিবার পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত গুরুবংশ এবং প্রভূতসম্পত্তিশালী; উঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ৺ বলরাম বাচস্পতি মহাশয় তপস্যার জন্য ভূ-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। শাস্ত্রে সাধকগণের জন্য এইরূপ ভূগৃহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে এই গৃহ নির্ম্মিত হয় বলিয়া অনুমান। কারণ উক্ত বাচস্পতি মহাশয়ের বহু কীর্ত্তির মধ্যে একটি মন্দিরে দুইটি শ্লোক খোদিত আছে—

শাকে পক্ষ সমুদ্রতর্ক-রজনীনাথে ধরিত্রীতলে
দুর্গাপাদবলাভিরাম-বলরামেঽহং ভগাঙ্কা জনঃ।
কৃত্বা ষট্‌পুরমন্দিরং মণিগৃহে শ্রীপার্ব্বতী-সঙ্গতং
শ্রীকাশীশ্বরমর্পয়ামি নিতরাং তাতস্য নিঃশ্রেয়সে।
আজন্ম-সঞ্চিত-তপঃ ফলমেতদেব
যন্মূর্ত্তিমান্ স্মরহরো মম মন্দিরেঽপি।
যাচে বরং তদপি লোচনগোচরে দেব
পাদারবিন্দ যুগলং শিব মন্ত্র দূরাৎ॥

ইহা দ্বারা জানা যায় যে ১৬২৫ শকাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি ৺ কাশীধামে গমন করেন। কাশীতে গালিসপুরায় অদ্যাপিও তাঁহার নির্ম্মিত বাড়ী "ধামুকার বাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য।

(১০২)

চোখের কাছে বই পড়া।

আমাদের চক্ষুতারার পিছনে একখানা কুব্জ লেন্স (Convex lens) আছে। দ্রষ্টব্য বস্তুর আলোকরশ্মি লেন্স অতিক্রম করিয়া অক্ষিপর্দ্দায় (Retina) পতিত হয়। লেন্স অতিক্রম করিবার কালে আলোকরশ্মি পরাবর্ত্তিত (Refracted) হইয়া অক্ষিপর্দ্দায় দ্রষ্টব্য বস্তুর একটি স্পষ্ট প্রতিকৃতি পাত করে। অক্ষিপর্দ্দায় কোনও বস্তুর স্পষ্ট প্রতিকৃতি পতিত হইলেই আমরা সেই বস্তুটিকে দেখিতে পাই। কুব্জ লেন্সের (Convex lens) বিশেষত্ব এই যে দূরের বস্তুর প্রতিকৃতি লেন্সের খুব নিকটে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুটিকে যদি ক্রমশঃ লেন্সের নিকটে আনা যায় তাহা হইলে ইহার প্রতিকৃতি ক্রমশঃ লেন্স হইতে দূরে সরিয়া যায়। আমাদের চক্ষে দূরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিকৃতি সব সময়ই আমাদের অক্ষিপর্দ্দাতে পতিত হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষুর লেন্স যদি কাঁচের ন্যায় কোনও কঠিন পদার্থে তৈয়ারী হইত তাহা হইলে আমরা দূরের বস্তু ছাড়া নিকটের কোনও বস্তু দেখিতে পাইতাম না। কারণ নিকটের বস্তুর প্রতিকৃতি অক্ষিপর্দ্দাতে পতিত হইত না। অক্ষিপর্দ্দাতে স্পষ্ট প্রতিকৃতি পতিত না হইলে আমরা সেই জিনিষটিকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পারি না। কিন্তু আমাদের চক্ষুর লেন্স এইরূপভাবে তৈয়ারী যে দ্রষ্টব্য বস্তু ক্রমশঃ নিকটে আনিলে ইহার বক্র ধার দুইটি এমনভাবে আরও বাঁকিয়া যায় যে দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিকৃতি সব সময়ই অক্ষিপর্দ্দায় পতিত হয়; তাই আমরা দূরের এবং নিকটের বস্তু দেখিতে পারি। চক্ষু লেন্সের ধার বক্র হইবারও একটি সীমা আছে। দ্রষ্টব্য বস্তু চক্ষুর খুব নিকটে আনিলে চক্ষু-লেন্সের ধার বক্র হয় না। ইহার দূরত্ব স্বাভাবিক চক্ষু হইতে ১০ ইঞ্চি। সুতরাং কোনও বস্তু চক্ষুর খুব নিকটে ধরিলে, তাহার প্রতিকৃতি অক্ষিপর্দ্দায় পতিত না হইয়া দূরে পতিত হয় এবং ক্রমশঃ নিকটে আনিলে প্রতিকৃতি আরও দূরে সরিয়া যায় এবং সেইজন্যই আমরা ইহা ক্রমশঃই অস্পষ্ট দেখিতে পাই।

শ্রীরাইমোহন দে মজুমদার।

(১০৫)

বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের সময় নির্ণয়।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের তারিখ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা

হইয়াছে কিন্তু সঠিক কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। "ছায়াশূন্য বেদ শশী পরিমিত শকে" আমরা ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ পাই। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্ Stewart সাহেবের মতে ১৪৯৯-১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; বর্ত্তমানে প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপি পাঠে হোসেন্ শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২৮ পৃঃ)। কিন্তু ইহার কোন তারিখই উপরোক্ত ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে মেলে না। Stapleton সাহেব বিজয়গুপ্তের বাসস্থান গৈলাগ্রামের এক পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিতে "ঋতুশশী বেদশশী" পাঠ দেখিয়াছেন; তাহাতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হয় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তারিখ অনুসারে তাহা হইলে হোসেন শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির পর বৎসরই মনসামঙ্গল রচিত হয়। উপরোক্ত হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ গ্রহণ করা ব্যতীত বর্ত্তমানে এ সমস্যাপূরণের অন্য উপায় নাই। এ বিষয়ে ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ১৮-১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

"ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক" এই সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ ১৪০৮ শক। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"। সুতরাং ছায়াপদে ৮ (রবি হইতে রাহু অষ্টম গ্রহ এবং রাহু শব্দের অর্থ 'ছায়া' ইতি অমরকোষ), শূন্য ০, বেদ ৪, এবং শশীপদে ১। এখন দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ক্রমে শব্দের অঙ্ক বসাইলেই ১৪০৮ শক হইবে।

ছায়াপদে আবার '২' অঙ্কও বুঝিতে পারা যায় (সুবল-বাবুর অভিধানের পরিশিষ্ট ভাগে রাগ-রাগিণী জাতিভেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

৪ স্থলে বেদ ও ১ স্থলে শশী ব্যবহৃত হয়। ছায়া-শূন্য শশী বোধ হয় পূর্ণ শশী (ষোল কলা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ছায়াশূন্য স্থলে ১৬ ধরা যায় তৎপর "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"র নিয়মানুসারে ইহা ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃঃ হয়। গৌড়ের হোসেন শাহ্ ১৪৯৪ হইতে ১৫২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং এই শকাব্দ (১৪১৬) বোধ হয় মনসামঙ্গল রচনার ঠিক তারিখ।

সৈয়েদ মর্ত্তুজা আলী।

ছায়া = ০, শূন্য = ০, বেদ = ৪, শশী = ১, এই অর্থে ০০৪১ সংখ্যা হয়, কিন্তু "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই নিয়ম অনুসারে ১৪০০ পরিমিত শকে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(১০৬)

শান্তিপুরের নাম নির্ণয়।

পূর্ব্বে শান্তিপুরের অন্য কোন নাম ছিল কি না জানা যায় না; তবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও যে শান্তিপুর নামই প্রচলিত ছিল সে প্রমাণ আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে পাই। অদ্বৈতাচার্য্য পঞ্চদশ শতকে শান্তিপুরে বাস করিতেন।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

(১০৭)

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণের পরিচয়।

আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বাংলাদেশে আনয়ন করেন তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের মতে আদিশূর কোলাঞ্চ দেশ হইতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। কিন্তু আধুনিক কোন কোন বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি স্থানে যথাক্রমে তাঁহাদের পুত্র ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভের নাম দেখা যায়।

যখন ব্রাহ্মণেরা এখানে আসেন তখন তাঁহাদের কোন পদবী ছিল না; তাঁহারা গোত্র দ্বারাই পরিচিত হইতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, কাঞ্জিলাল, সান্ন্যাল প্রভৃতি পদবী কালক্রমে বাসস্থান ভেদে ও অন্যান্য কারণে তাঁহাদের বংশধরগণের নামের সহিত যুক্ত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধির অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে আমরা বারেন্দ্র লক্ষ্মীধর সান্ন্যাল ও রাঢ়ী জয়বান মিশ্র, এই বিভিন্ন পদবীযুক্ত নাম দেখিতে পাই। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণের জন্য বিশ্বকোষে 'আদিশূর' ও 'কুলীন' এই দুই প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রের পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের নাম—সুধানিধি (কাশ্যপ), তিথিমেধা (ভরদ্বাজ), বীতরাগ (বাৎস্য), সৌভরী (সাবর্ণ্য) ও ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্য)।

শ্রীরাইমোহন দে মজুমদার।

(১০৯)

নিব প্রভৃতি তৈরীর কারখানা।

(১) পিতল, তামা প্রভৃতি পাতের নিব তৈয়ারি করিবার কলের খবর শ্রীযুক্ত কে এম ব্যানার্জ্জী, ২৩ শ্যামবাজার রোড ঠিকানায় পাইবেন।

(২) ছুঁচ আলপিন প্রভৃতির জন্য কল বিক্রয়ার্থ মজুত আছে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

Mohamad Ali and Chistee,
Old Fort,
Jullundhur City.

(৩) Cover, খাম কাটিবার যন্ত্র সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, ইহার মূল্য ৫৲ (অধিক মূল্যেরও পাওয়া যায়)।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) The Oriental Machine Supplying Agency Limited. 20-1, Lal Bazar Street, Calcutta :

(২) Sham Narain & Co. Ambala City.

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়।

Joyful Co. Nagpur City, C. P. এই ঠিকানায় খাম কাটিবার যন্ত্র (Envelope making machine) পাওয়া যায়।

সৈয়েদ মর্ত্তুজা আলী।

(১১২)

বাংলা ভাষার প্রথম নাটক।

বাংলায় নাটক অনেক কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব তাঁহার পার্ষদবর্গের সহিত চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। যখন স্ত্রীলোকেরাও এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন তখন ইহা অবশ্য ভাষায় রচিত হইয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কতকগুলি সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল; যথা,—লোচনদাস কর্ত্তৃক রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক, যদুনন্দন দাস কর্ত্তৃক রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, প্রেমদাস কর্ত্তৃক কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমাংশে যাত্রার বহুল প্রচলন হয় এবং তৎসঙ্গে বহু যাত্রানাটক অবশ্যই রচিত হইয়া থাকিবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে General Assembly স্কুলের গণিতশিক্ষক তারাচাঁদ শিকদার 'ভদ্রার্জ্জুন' নামে নাটক রচনা করেন; এই নাটক অন্য কোন নাটকের অনুবাদ না হইলেও ইহার বিষয় মৌলিক নহে। ইহার পরে রামগতি কবিরত্ন (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে) মহানাটক ও (১৮৫২ খৃষ্টাব্দে) নলদময়ন্তী রচনা করেন—এতদুভয়েরই বিষয় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত। ইহার পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন মৌলিক বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" রচনা করিয়া যশস্বী হন।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম নাটক 'রত্নাবলী'। ইহা ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

কিন্তু বঙ্গভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক 'বিধবা-বিবাহ'। ইহার রচয়িতা ৺উমেশচন্দ্র মিত্র। ১২৬৮ সালে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব"। রচয়িতা স্বর্গগত সুপণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। নিবাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ছিল।

অমিয়কান্ত দত্ত।

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম নাটক "ভদ্রার্জ্জুন"। প্রণেতা তারাচরণ শিকদার। ১৮৫২ খৃঃ প্রকাশিত।

সৈয়েদ মর্ত্তুজা আলি।

১৭৭৫ শকে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'পতিব্রতোপাখ্যান', 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', ও 'নবনাটক' রচনা করেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' তাঁহার প্রথম নাটক। তাঁহাকেই বাঙ্গালাভাষার প্রথম নাটক-রচয়িতা বলা হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার।

"চৈতন্যচন্দ্রোদয়, নাটক"। ১৬৩৪ শকে পুরুষোত্তম (প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ) মূল সংস্কৃত নাটক হইতে বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅবন্তীভূষণ পাল।

(১১৪)

পাকা রং।

দেশী গাছ-গাছড়ার কষের সাহায্যে সূতায় বা কাপড়ে সব রকমেরই পাকা রং করা যায়। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর "পাকা রং প্রণালী" নামক পুস্তকে সূতা বা কাপড় পাকাভাবে রঙ্গাইবার সহজ উপায় বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। পুস্তকখানার দাম মাত্র ৵০ দুই আনা। পাইবার ঠিকানা :—

হোমিও রিসার্চ লেবরেটারী।
পোঃ ব্রাহ্মণগাঁও। জেলা ঢাকা।
মহিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

রংএর সহিত কিঞ্চিৎ ফিটকারীর জল মিশ্রিত করিয়া সূতা সহ কিছুক্ষণ আগুনের তাপ দেওয়ার পর সূতাকে ছায়ায় শুকাইলে রং স্থায়ী হয়।

মোহাং খোর্শেদ আলম চৌং।

(১১৫)

বাল্মীকির মাতা।

"শ্রীমদ্ভাগবত-মতে ভৃগু ও বাল্মীকি বরুণের পুত্র। চর্ষণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে এই পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়।"—চরিতাভিধান।

সৈয়েদ মর্ত্তুজা আলী।

মহামুনি বাল্মীকির মাতার নাম 'সুকন্যা'। ইনি শর্য্যাতি রাজার কন্যা। চ্যবন মুনির একাধিক দার পরিগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বাল্মীকি চ্যবন মুনির পুত্র ইহা মূল রামায়ণে কোথায়ও নাই। ইহা কৃত্তিবাসের কবিকল্পনা কিম্বা তখনকার কিম্বদন্তী হইতে গৃহীত। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৫-৮ অধ্যায়) এক চ্যবন মুনির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার সহিত বাল্মীকির কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি ভৃগুমুনির ঔরসে পুলোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রমতি নামে এক পুত্র ছিল। মূল রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে বাল্মীকির আত্মপরিচয়ে আছে যে তিনি প্রচেতাঋষির বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রচেতা হইতে তিনি অধস্তন দশম পুরুষ,—

প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥

উত্তরাকাণ্ড, ১০৯ সর্গ, ১৮ শ্লোক।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

(১১৬)

ভাস্করাচার্য্যের যুগে সূচিকা-ভরণ ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শল্য-চিকিৎসা ও সূচিকাভরণ শব্দ দৃষ্ট হয়; তাহাতে বুঝা যায় পূর্ব্বে সূচিকা দ্বারা ঔষধ শিরার মধ্যে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

ভাস্করাচার্য্যের যুগে ঘড়ির প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রবাদ আছে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতীর বিবাহসময় নিরূপণের জন্য একটি জলপূর্ণ পাত্রে একটি একছিদ্র পাত্র রাখা হইয়াছিল; ঐ ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিয়া পাত্রটি জলমগ্ন হইলেই বিবাহলগ্ন সমুপস্থিত হইবে ভাস্করাচার্য্যের এইরূপ ধারণা ছিল। লীলাবতী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বারংবার পাত্রটি দেখিতে যান এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে নথ হইতে একটি ক্ষুদ্র মুক্তা পাত্রমধ্যে পতিত হইয়া জলপ্রবেশ-পথ রোধ করে। অনুমিত সময় অতিক্রান্ত হইলে ভাস্করাচার্য্য অনুসন্ধানে শেষে সবিশেষ কারণ অবগত হইয়া নিয়তির প্রভাব অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব যদি ঘড়ির প্রচলন থাকিত তবে সময় নিরূপণের জন্য এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন কেন? তবে ঐ সচ্ছিদ্র পাত্রকে ঘড়ি বলা যায় কি না তাহা সুধীগণের চিন্তনীয়।

শ্রীরামচন্দ্রলাল বিদ্যানিধি।

(১১৭)

বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-লেখিকা।

বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস লেখিকা শ্রীমতী মুলেন্স, তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাসখানির নাম "ফুলমণি ও করুণা"।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-লেখিকা। পুস্তকখানির নাম দীপনির্ব্বাণ।

শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী।

বঙ্গের মহিলালিখিত প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হইয়াছিল।

শ্রীসরোজপ্রসন্ন রায়। শ্রীপ্রমথনাথ বর্দ্ধন।

(১১৮)

আখের ডগায় উই নিবারণ।

আখের গোড়ার দিকটা শক্ত, উই ধরিতে সুবিধা পায় না। ডগার দিক অপেক্ষাকৃত নরম, সেইজন্য উই সহজে ছিদ্র করে। আখের

গোড়ার দিকে আধ হাত উপরে লবণ-জল বা তামাক ভিজান জল তুলা দিয়া সপ্তাহে একবার করিয়া লাগাইলে উই ধরিতে পারে না। বর্ষাকালে তুলা ঐ লবণ-বা তামাক-জলে ভিজাইয়া জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

আখের ডগা হাপর দিবার সময় ফিনাইলের জল দিয়া হাপর দিতে হইবে এবং পরে ডগা জমিতে বসাইবার সময় পদ্মপাতা রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া আখের খুপিতে দিয়া ডগা বসাইলে উই ধরে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

(১১৯)

প্রাচীনকালে মাতার নামে পুত্রের নাম।

পুরাণোল্লিখিত দৈত্য, বৈনতেয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পিতার নামানুসারে পরিচিত না হইয়া মাতার নামানুসারে হইয়াছিলেন। বৈনতেয় অর্থাৎ বিনতানন্দন গরুড়; দৈত্য অর্থাৎ দিতিপুত্র অসুর; ইত্যাদি। তাহার কারণ, ইঁহাদের সকলেরই পিতার নাম কশ্যপ। কশ্যপের অপত্য কাশ্যপেয়। দেবতা, দৈত্য, গরুড়, নাগ প্রভৃতি সকলকেই কাশ্যপেয় বলা যায়। কিন্তু ঐসকল ব্যক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি বলিয়া শুধু কাশ্যপেয় বলিলে সে ব্যক্তি দেবতা কি দৈত্য কি গরুড় তাহা স্থির করা অনেক সময়ে কঠিন হইবে। এইজন্য শাস্ত্রকার কশ্যপের সন্তানগণকে পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব মাতার নামানুসারে পরিচিত করিয়াছেন। এইরূপ যাঁহাদেরই অনেক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব মাতার নামানুসারে পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীসুধাংশুভূষণ পুরকাইত। শ্রীঅমিয়কান্ত দত্ত।

বৈদিক যুগের প্রভাতকালে বা মানবের আদিম অবস্থায় যখন মানবসমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয় নাই, তখন কে কাহার সন্তান তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। সুতরাং জন্মদাতা পিতার অনিশ্চিততা নিবন্ধন উহারা পিতৃনামে পরিচিত না হইয়া মাতৃনামে পরিচিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলেও এই আদিম প্রথানুসারে দক্ষরাজকন্যা ও কশ্যপপত্নী দিতি, অদিতি, দনু, বিশা, বিনতা, কদ্রু এবং মনু ইত্যাদির গর্ভজাত সন্তানগণ দৈত্য, আদিত্য, দানব, বিশ্বেয়, বৈনতেয়, কাদ্রবেয় এবং মানব প্রভৃতি নামে (মাতার নামানুসারে) পরিচিত হয়েন। তাই বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন "দিবৌকসাং সর্গ এব প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ" অর্থাৎ এই যে দেবগণের উৎপত্তিবিবরণ বিবৃত হইতেছে ইহারা মাতৃনামে পরিচিত। কালে এই রীতির কিছু পরিবর্ত্তন হয় এবং সন্তানগণ পিতৃনামে পরিচিত হইতে থাকেন। যেমন গর্গের পুত্র গার্গ্য, কন্যা গার্গী এবং ভৃগুর পুত্র ভার্গব, ইত্যাদি। আরও অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে এই পিতৃনামে পরিচয় প্রদান প্রথা হইতেই ভারতীয় আর্য্যসমাজে "বংশগত উপাধির" প্রচলন হয়। এতদ্ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ—মদ্ রচিত "প্রাচীন আর্য্যসমাজে বিবাহের উৎপত্তি ও প্রসার" (অর্চ্চনা, ফাল্গুন ১৩২৫) ও "উপাধিরহস্য" (নব্যভারত, ভাদ্র ১৩২৮), এবং পণ্ডিতপ্রবর বেদাচার্য্য শ্রীউমেশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন বিরচিত "মাতা মনু" শীর্ষক প্রবন্ধ ত্রিতয় দ্রষ্টব্য।

শ্রীললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ।

কদ্রু, দিতি, বিনতা ইহাঁরা তিনজনই প্রজাপতি দক্ষের কন্যা এবং কশ্যপ ঋষির স্ত্রী। দিতির গর্ভজাত সন্তান (দিতি+ণ্য অপত্যার্থে) দৈত্য। ঐ রূপ বিনতার সন্তান বৈনতেয় (অরুণ ও গরুড়)। কদ্রুর সন্তান কাদ্রবেয় (অপত্যার্থে ঢেয়) নাগগণ। ইহাঁরা পিতৃনামে পরিচিত হইলে "কাশ্যপেয়" বলিয়া আখ্যাত হইতেন। কিন্তু কাহার গর্ভসম্ভূত তাহা বিশদভাবে বোধগম্য হইত না।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি।

(১২০)

পঞ্জাবে সাপুড়িয়ার "বাঙ্গালী" নাম কেন।

পূর্ব্ববঙ্গের একজন বারভুঁয়া রাজা কয়েকজন সাপুড়িয়াকে পঞ্জাব প্রদেশের রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহে প্রেরণ করেন। তাহারা সেখানে অনেক লোককে সর্পযাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহকরতঃ দেশে ফিরিয়া আসে। ঐসকল সাপুড়িয়া পঞ্জাবে আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিত। তদবধি সেখানে তাহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সেই বাঙ্গালী নামে খ্যাত হইতেছে।—Old History of Panjab by Dr. Howard.

শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

(১২৩)

তামা তুলসী স্পর্শ করিয়া শপথ।

পূর্ব্বকালে লোকে তিল তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিত; কারণ তিলের এক নাম পবিত্র, কারণ

বিষ্ণোর্ দেহসমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণাস্ তিলস্ তথা।—মৎস্যপুরাণ ২২.৮৯।

তুলসীর এক নাম পাবনী ও অপর নাম পবিত্রা, যেহেতু তুলসী—

কলাংশেন মহাভাগে স্বয়ং নারায়ণপ্রিয়া।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অতএব—

তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা স্বীকারং যো ন রক্ষতি।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবচ্ চন্দ্র-দিবাকরৌ॥
করোতি মিথ্যা শপথং তুলস্যা যো হি মানবঃ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদ্ ইন্দ্রাশ্ চতুর্দ্দশ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড।

তথা গঙ্গোদকং তাম্রং গোময়ং গোরজস্ তথা।
সত্যং বা যদি বাসত্যং যদি দিব্যং করোতি যঃ
কর্ত্তা চ রৌরবং যাতি, তথা কারয়িতা প্রিয়ে॥

—গায়ত্রীতন্ত্র ১ম পটল।

নারদ সংহিতায় এইসব বস্তুকে "সত্যবাহন-শস্ত্রাণি" বলা হইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুদিগের নিকট তামা তুলসী গঙ্গাজল বিষ্ণুর সমান। উহা স্পর্শ করিয়া শপথ করা আর বিষ্ণুর নিকট শপথ করা একই। এইরূপ শপথের অপলাপ হইলে নিজের অমঙ্গল। নিজপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়। তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে যদি শপথের অপলাপ হয় তবে প্রাণাধিক পুত্রের অমঙ্গল হইতে পারে।

শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

শপথকালে পুত্রের মস্তক স্পর্শ করা শাস্ত্রসম্মত :—

"দেব ব্রাহ্মণ-পাদাংশ্চ পুত্র দার-শিরাংসি চ।
এতে তু শপথাঃ প্রোক্তাঃ মনুনা স্বল্পকারণে॥"

মিথ্যা শপথ করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। প্রমাণ—

"বৃথা হি শপথং কুর্ব্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি।"

(ব্যবহারতত্ত্ব)

"তথা গঙ্গোদকং তাম্রং গোময়ং গোরজস্ তথা।
সত্যং বা যদি বাসত্যং যদি দিব্যং করোতি যঃ।
কর্ত্তা চ রৌরবং যাতি তথা কারয়িতা প্রিয়ে।"

(গায়ত্রীতন্ত্র)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

(১২৫)

কাম্বোজ দেশ।

প্রাচীন ভারতে কাম্বোজের অবস্থান নিম্নোক্ত শ্লোকটি হইতে জানিতে পারা যায় :—

"কাম্বোজ-দেশো দেবেশি বাজিরাশিপরায়ণঃ।
বৈদর্ভদেশাদুর্দ্ধক ইন্দ্রপ্রস্থাচ্চ দক্ষিণে।"

(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

"ভারতের ভূগোলে এক সময়ে দুইটি কম্বোজ লিখিত হইয়াছিল,—একটি বর্ত্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। প্রথমটি মুসলমান অধিবাসী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, অপরটি সুবিশাল হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। * * * * প্রথমোক্ত কম্বোজই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান গ্রন্থকারেরা ইহাকে কম্বোজ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ তিব্বতকে কম্বোজ নামে নির্দেশ করিতেছেন।"

—সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১৯।

শ্রীনরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত।

কম্বোজ বর্ত্তমান ক্যাম্বোডিয়া (Cambodia) শ্যামরাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ঠিক ভারতবর্ষে নহে। তখনকার ভারতবর্ষ এখন অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক বড় ছিল, কিন্তু এখন ক্যাম্বোডিয়া কিম্বা কম্বোজ ভারতবর্ষে আছে বলিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

মন্মথনাথ চৌধুরী।

হরিবংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা সগর রাজ্যে অনুপস্থিত থাকার কালে কতকগুলি বহির্ভারতীয় জাতি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল; রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাদের পরাজিত ও দণ্ডিত করেন—

অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং, কাম্বোজানাং তথৈব চ॥

ইহা হইতে এই জানা যায় যে যেদিকে শক ও যবনদের দেশ, সেই দিকে কাম্বোজ; ও সেই দেশের লোকেরা সমস্ত মাথা নেড়া করে।

রঘুবংশে দেখা যায় যে রঘু দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া সিন্ধুতীর দিয়া কাশ্মীর অতিক্রম করিয়া হূণ দেশ জয় করেন ও তার পর কাম্বোজে যান এবং কাম্বোজ হইতে হিমালয়ে উপস্থিত হন (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৬৭-৭১)। কালিদাসের যেরূপ নির্ভুল ভূগোল-জ্ঞান ছিল দেখা যায়, তাতে এই জানা যায় যে কাম্বোজ দেশ কাশ্মীরের উত্তরের কোনো দেশ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করিয়াছেন যে কাম্বোজ মধ্য এসিয়ায় বর্ত্তমান পারস্যের নিকট ছিল; পরে সেখানকার লোক ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাম্বে উপসাগরের সন্নিহিত জনপদে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশ কাম্বোজ নামে খ্যাত হয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে আফ্‌গানিস্থানই কাম্বোজ।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত পুস্তকে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাম্বে প্রদেশকেই কাম্বোজ বলিয়াছেন।

হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম পর্ব্বতমালার কাছে কৌমজি কামতেজী ও কামোজ নামে শিয়াপোষ জাতি বাস করে; তাদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ঐ জাতিরা মুসলমানদের ভয়ে কান্দাহার-সন্নিহিত দেশ হইতে পলাইয়া হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। নামসাদৃশ্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন এরাই প্রাচীন কাম্বোজ জাতি, কাম্বোজ দেশের লোক।

অশোক-অনুশাসন হইতে জানা যায় যে অশোক প্রচারক পাঠাইয়া হিমালয় সন্নিহিত বহু দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন; সেইসব দেশের অন্যতম কাম্বোজ। নেপালের লোকেরা এখনও তিব্বতকে কাম্বোজ বলে (Foucher, *Iconographic bouddhique, p. 134*)। সেইজন্য ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তিব্বতকেই কাম্বোজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (Vincent A. Smith, Early History of India, p. 173; 2nd ed.)।

ভারতের বাহিরে ভারত যখন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বহির্ভারত বা বৃহৎভারত বিস্তার করিতেছিল, তখন বর্ত্তমান ক্যাম্বোডিয়া কাম্বোজ নামে পরিচিত হইত।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঘুবংশে রাজা রঘুর দিগ্বিজয়ে তাঁহার নিকট কম্বোজ-নরপতিদিগের পরাজয়ের কথা উল্লেখ আছে। রঘু পারস বিজয়ের পর সিন্ধুনদীর তীর দিয়া উদীচ্য নরপতিদিগকে পরাজয় করিবার মানসে ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কম্বোজ প্রদেশে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে পারস্যদেশ ভূমধ্যসাগর হইতে সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়েও পারস্য রাজ্যের সীমা এইরূপ ছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পারস্য রাজ্যের পূর্ব্বসীমাস্থ সিন্ধু নদীর তীর দিয়া উত্তর দিকে যাইলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে আসা যায়। রঘু সিন্ধুতীরস্থ হূনদিগকে পরাস্ত করিবার পর কম্বোজ আক্রমণ করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কম্বোজ ভারতবর্ষের সীমার পরপারে ঠিক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কম্বোজ মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময়েই বাক্ট্রীয়া প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল এবং ঐ প্রদেশ আলেকজাণ্ডার অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ প্রদেশ সেলুকাসের শাসনাধীন হইয়াছিল। সেলুকাসের সহিত মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে পঞ্জাবস্থিত গ্রীক অধিকার ও কাবুলপ্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং কাবুলপ্রদেশের উত্তরপশ্চিমস্থ বাক্ট্রীয়া প্রদেশ নিজে প্রাপ্ত হন। মহাভারতের সময়ে এই প্রদেশের নাম বাহ্লিক রাজ্য ছিল। আধুনিক নাম "বল্‌ক্" এবং আফ্‌গান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্লিক, কম্বোজ, বাক্ট্রীয়া ও বল্‌ক্ একই রাজ্য, তবে বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছিল, এবং এই প্রদেশ যে সকল সময়েই একই সীমার ভিতর আবদ্ধ ছিল এরূপ কথা বলা যায় না,—সময়ভেদে আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সীমার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

(১২৬)

এক চোখ দেখানো।

এক চোখে হাত দিলে দুই চোখে হাত দিতে হয় শাস্ত্রে আছে—

পাণিভ্যাং ন স্পৃশেচ্চক্ষুশ্চক্ষুষী নৈক পাণিনা।
চক্ষুঃ পরাহিতাকাঙ্ক্ষী ন স্পৃশেদ্ একপাণিনা॥

(কর্ম্মলোচনম্)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

(১২৮)

মুখের ব্রণ নিবারণের উপায়।

সোহাগা দুই-তিন দিন জলে রাখিয়া সেই জল মুখে দিলেই মুখের তৈল-পদার্থ কমিয়া যায় এবং তাহাতেই ব্রণ কমিয়া মুখের দাগ ক্রমশঃ উঠিয়া যায়। ইহাতে আমি নিজে ফল পাইয়াছি।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার গুহ।

১। মুখে ব্রণ ও মেচেতার বিশ্রী দাগ নিবারণ করিতে হইলে শ্বেতচন্দন কিছুদিন নিয়মিতরূপে মর্দন করা উচিত।

২। ডাবের জলে সোমরাজ ভিজাইয়া সেই জল কয়েকদিন যাবৎ দিনের মধ্যে অনেকবার করিয়া লাগাইতে হইবে। ঐ জল শুকাইয়া গেলে প্রত্যেক ঘায়েই এক টুকরা পাতলা নেকড়া দিয়া ধীরে মর্দ্দন করিতে হইবে।

৩। ব্রণগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হইলে একটি প্রস্তরে ২।৪টি মরিচ ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বেশ কাজ হয়। কাগজী লেবুর রস মর্দ্দনেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৪। ব্রণ আদৌ না টেপা ব্রণের সর্ব্বাপেক্ষা মহৌষধ।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায়।

১। মশুরী ডাল ঘৃতে ভাজিয়া জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ সারিয়া যায় এবং মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

ঝুনা নারিকেলের জল দ্বারা প্রতিদিন ২।৩ বার মুখ ধুইলে মুখের কাল দাগ এমন কি বসন্তের দাগ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। ("মুষ্টিযোগ-রহস্য"—প্রাণবন্ধু রায় কাব্যরত্ন)।

মোহাং খোর্শেদ আলম চৌং।

খাঁটী শরিষার তৈল আন্দাজ একপোয়া জ্বালে চড়াইতে হইবে এবং ভাল গোলমরিচ ২ তোলা গুঁড়াইয়া রাখিবে, বড় এলাইচ ৩ তোলা গুঁড়াইবে ও তেজপত্র ৩ তোলা আন্দাজ গুঁড়াইবে, শুঁট ২ তোলা গুঁড়াইবে; যখন ঐ তৈল খুব ফুটিতে থাকিবে তখন উক্ত গুঁড়া দ্রব্যসকল তাহাতে ফেলিয়া দিবে এবং যখন উহা সিদ্ধ হইয়া তৈলের রং লাল হইবে তখন তৈল নামাইবে। বোতলে কিম্বা শিশিতে রাখিয়া দিয়া প্রত্যহ রাত্রে এবং প্রাতে স্নানের পর একটু একটু বেশ মালিশ করিয়া রাখিতে হইবে। ২ সপ্তাহ মধ্যে মুখের সকল বিশ্রী দাগ ঘুচিয়া যাইয়া মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। ইহা আমার একান্ত পরীক্ষিত। তবে বসন্তের দাগ যাইতে পারে কি না জানি না।

শ্রীশক্তিপদ কর।

মুখব্রণে সোহাগা চূণ ও ময়দা ঘসিয়া দিলে উপকার হয়। শিমুলের কাঁটা ঘসিয়া মেছেতায় প্রতিদিন ২।৩ বার লাগাইলে উপকার হয়।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি।

তীক্ষ্ণ শিমুলের কাঁটা কাঁচা দুধের সহিত বাটিয়া মুখে প্রলেপ করিলে মুখের ব্রণের দাগ নিবারিত হয়।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

এক গ্লাস ফুটন্ত জলের উপর (অবশ্য গ্লাসটি যেন সম্পূর্ণরূপে ভরা না হয়) একখানা ন্যাকড়া দিয়া তাহার উপর কিছুক্ষণ নীচু করিয়া মুখ পাতিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ঘামিয়া উঠে এবং ২।৩ দিন এইরূপ করিলে মুখের বিশ্রী দাগ সহ সমস্ত ব্রণ নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত।

রক্তচন্দনের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে ঐ দাগ উঠিয়া যায়। আর যখন গরু দোয়া হয় তখন দুধে যে ফেনা হয় সেই ফেনা মুখে মাখিলে সব দাগ উঠিয়া যায়।

শ্রীনির্ম্মলা বসু।

ভাল শাঁখের চূর্ণ সাবানের ফেনার সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ দুইবার দিলে ব্রণ নষ্ট হইয়া যায়। ফেনা ও চূর্ণ ভালমত মিশাইয়া মুখে ১০।১৫ মিনিট বেশ করিয়া মাজিতে হইবে। এইরূপ করিলে ২৪ দিনেই বেশ উপকার পাওয়া যায়। অনেক লোক এইরূপ করিয়া বেশ উপকার পাইয়াছে।

শ্রীমোহিতমোহন রায়চৌধুরী।

মুখে ব্রণ হইলে তাহাতে উপর্য্যুপরি কয়েকবার নিজের থুথু লাগাইলে ব্রণ সারিয়া যায়। বিষস্য বিষমৌষধম্। মেচেতা সারাইতে mercolised-wax ব্যবহার করা যাইতে পারে, ডাক্তারখানায় উহা পাওয়া যায়। সোহাগা ও শ্বেতচন্দন জলে ঘষিয়া লাগাইয়া প্রত্যক্ষ উপকার পাইয়াছি।

শ্রীকরুণাময় মণ্ডল।

মুলা বা শণবীজ জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ আরোগ্য হয়। বাদাম বাটিয়া অথবা অশ্বগন্ধা পাতার রসের প্রলেপ দিলে, মেচেতা, ব্রণ, ছুলি প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত।)

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

একটা লেবু দুই খণ্ড করিয়া, পাথর কিম্বা কাচ পাত্রে রস নিঙাড়িয়া লইবে। এক আনি পরিমাণ সোহাগার খৈ চূর্ণ এই রসের সাথে মিশাইবে। পরে একটু চিনি ঐ রসে ফেলিয়া, একটি পরিষ্কার শিশিতে করিয়া এ ঔষধ রাখিয়া দিবে। ২।৩ দিন পর, এ ঔষধ হাতে করিয়া প্রত্যহ মুখে ঘষিয়া মালিস করিবে। এই প্রকারে এ আরক কয়েকদিন মালিস করিলে, মেচেতা ও ব্রণের দাগ আর থাকে না। প্রত্যহ ঝুনো নারিকেলের জলে মুখ ধুইলে, এসব বিশ্রী দাগ মিলাইয়া যাইয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

পাতি লেবুর রস স্নানের পূর্ব্বে বেসমের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে মাখিতে হয় এবং কিছুক্ষণ পরে গরম জলে কতকগুলি পাতি লেবুর (খোসা সমেত) রস বাহির করিয়া মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দিয়া মুখ ধৌত করিতে হইবে। কয়েকদিন এইরূপ করিলেই দাগ অদৃশ্য হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

(১২৯)

কাঞ্চীদেশের ইতিহাস।

কাঞ্চীর বর্ত্তমান নাম কাঞ্জিভরাম (Conjeeveram), সংস্কৃত নাম কাঞ্চীপুরম্। খৃঃ পূঃ ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কাঞ্চীসহর ইতিহাসে নানাবিধ অংশ গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তারপর, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন কাঞ্চী নগরের ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান এবং কাঞ্চীকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া অভিহিত করেন। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাংও কাঞ্চীর খুব প্রশংসা করেন। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন চালুক্যবংশীয় পল্লবেরা। ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্য হইতে পল্লবগণের শক্তি ও আধিপত্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকে।

কাঞ্জিভরাম মান্দ্রাজ হইতে ৫৬ মাইল। এই মাসের "ভারতবর্ষের" সম্পাদকের বৈঠকে কাঞ্চীর বিস্তৃত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।

নগেন্দ্র ভট্টশালী।

কাঞ্চীর বর্ত্তমান নাম কাঞ্জিভরম। সংস্কৃত নাম কাঞ্চীপুরম। উহা মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ চেঙ্গলপট জেলার প্রধান সহর। এই সহর হিন্দুগণের চক্ষে অতীব পবিত্র।

১১শ শতাব্দীতে চোলরাজগণ এই নগরটি অধিকার করেন। ১৩১০ খৃঃঅব্দে মুসলমানগণ ইহা জয় করেন। তৎপর ইহা বিজয়-নগরের অধীন হয়। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা মারহাট্টাগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের হাতে যায়। তারপর আবার মোগলগণের হাতে যায়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা ক্লাইব কর্ত্তৃক ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হয়।

শ্রীপ্রমথনাথ বর্দ্ধন।

(১৩০)

রেখাঙ্কণ-বিদ্যা (Short-hand) ।

রেখাঙ্কণ-বিদ্যা অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশরে, গ্রীসে ও রোমে প্রচলিত ছিল। আধুনিক রেখাঙ্কণ ১৭ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবিষ্কৃত হয়, যদিও ইহার অনেক পূর্ব্বে (১৫৮৮ খৃঃ) Dr. Timothy Bright ইত্যাদি অনেকেই এই বিদ্যা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেগুলি আয়ত্ত করা এক রকম দুঃসাধ্য। আজকালকার ইংরেজী রেখাক্ষরের আবিষ্কর্তা John Willis, ইনি ১৬০২ খৃঃ Art of Stenographie নামে একটি পুস্তক বাহির করেন। ইহার পরে যদিও রেখা-লেখা অদ্যাবধি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি এগুলি সবই উইলিসের মতানুযায়ী।

৩ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

এ্যাপোলোনিয়ার জনৈক সাঙ্কেতিক-চিহ্ন-লেখকের নিকট শিক্ষা-নবীশ নিয়োগের একখানি চুক্তিপত্রে ১৫৫ খৃঃ পূঃ প্রচলিত বর্ণমালার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহারের আদর্শ পাওয়া যায়। ঐ আদর্শ পত্রখানি মিশর দেশে পাওয়া গিয়াছিল এবং ভূর্জ্জপত্রাদির ন্যায় কোন বল্কলবিশেষের উপর লিখিত ছিল। শর্ট-হ্যাণ্ড (Shorthand) সম্বন্ধে Notæ Tyronianæ (Tyronian Note—বা টাইরোর সঙ্কেত)—যাহা এখনও রোমান (Roman) প্রণালীর নমুনা বলিয়া খ্যাত তাহা—সিসিরোর জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস (Tyro) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উহা কবি এনিয়াসের প্রথার উৎকর্ষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইরি কারপেন্টারের (Alphabetum Tironianum) আলফাবেটাম টাইরোনিয়ানাম (১৭৪৭ খৃঃ) (Louis the Pous) লুইএর কয়েকখানি (charter) দলিলের নমুনা আছে। তাহা (Tironianum) টাইরোর আদর্শে লিখিত। এই প্রণালী নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৫৮৮ খৃঃ ইয়র্কশায়ারের মেথিলির রেক্টর টিমোথি ব্রাইট Charac'erce An Art, Shorte, Swifte এবং Secrete Writing by Character মুদ্রিত করিয়া Shorthandএর পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। ১৬০২ খৃঃ John Willis সম্পূর্ণ বর্ণমালার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া Arte of Stenographie প্রকাশ করেন। এই সময়ে শর্টহ্যাণ্ডের Brachygraphy, Phonography, Stenography ইত্যাদি অনেক নাম ও orthographic, phonetic ইত্যাদি বিভিন্ন প্রথার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১৬৩০ খৃঃ (Thomas Shelton) টমাস শেলটনের Orthographic System প্রচলিত হয়। তাহার পর এই মত Theophilus Metcalfe, Jeremiah Rich ও অন্যান্য কয়েকজন কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়। ১৬৭২ খৃঃ (William Mason) উইলিয়াম মেসনের প্রথায় ১৭৫০ খৃঃ (Thomas Gurney) টমাস গার্নী কর্ত্তৃক উন্নতিসাধন হয়। Phonetic System সম্বন্ধে (John Willis) জন উইলিস ১৬০২ খৃঃ বর্ণমালার পরিবর্ত্তে উচ্চারিত শব্দানুসারে—এবং (Silent) অনুচ্চারিত উহ্য অক্ষর বাদ দিয়া লিখিবার উপদেশ দেন। ১৭৫০ খৃঃ (William Tiffin) উইলিয়াম টিফিন সম্পূর্ণ শব্দোচ্চারণ মূলে প্রথম প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে (Davide Lyle) ডেভিড লাইল ১৭৬২ খৃঃ, (Holdsworth) হলড্‌সওয়ার্থ, এবং (Aldridge) এলড্রিজ, ১৭৬৬ খৃঃ, (Richard Roe) রিচার্ড রো ১৮০২ খৃঃ এবং (Thomas Towndrow) টমাস টাউনড্রো ১৮৩১ খৃঃ (Phonetic) শব্দোচ্চারণ প্রথায় নিজ নিজ মত প্রচলন করেন। এই প্রথায় অত্যাবশ্যকীয় মত (Bath) বাথ বাসীয় (Isaac Pitman) আইজাক পিটম্যান সর্ব্বপ্রথম ১৮৩০ খৃঃ Stenographic Soundhand প্রকাশিত করেন। তিনি (Tylar) টাইলারের স্বরবর্ণ প্রকাশের (Vowel representationএর) উন্নতি করিবার চেষ্টায় ইহা আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ খৃঃ Phonography or Writing by Sound বা শব্দ-লেখ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন সম্বন্ধে ১৮৩৭ খৃঃ মতের কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। বর্ত্তমানের প্রচলিত স্বরবর্ণের চিহ্নসম্বন্ধীয় নিয়ম ১৮৫৮ খৃঃ স্থিরীকৃত হয়। Geometrical Script, Detached Vowel System, Joined Vowel System ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মতের প্রবর্ত্তন ও তাহাদের বিশেষত্ব উপস্থিত আলোচ্য বিষয় নয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

(১৩১)

কর্পূর জলে দিলে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন।

পদার্থ মাত্রই চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু দ্বারা বেষ্টিত। কর্পূর একটি উদ্বায়ু পদার্থ ; অর্থাৎ কর্পূর ক্রমাগতই বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই বাষ্প ও শূন্যের বায়ু ইহাকে সর্ব্বদাই বেষ্টন করিয়া আছে। এই হেতু উহা জলে পড়িলে ঠিক জলের সহিত স্পর্শে (contact) আসে না, কর্পূর ও জল এই দুয়ের মধ্যে বায়ু ও কর্পূরবাষ্পের ব্যবধান থাকিয়া যায়। কর্পূর অতি লঘু পদার্থ ; জলের সহিত তুলনায় ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) অতি সামান্য হওয়ায় এবং জলের উত্তোলক শক্তি বা force of buoyancy থাকায় ইহা বাষ্পবেষ্টিত হইয়া জলে ভাসিতে থাকে। জলের এই উত্তোলকশক্তিই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে উহার উপর কার্য্য করিতে বাধা দিয়া থাকে, অর্থাৎ উহাকে ভূকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেয় না। ফলে, এই দুইটি বিভিন্নশক্তি পরস্পরের বিপরীত দিকে কার্য্য করায় কোনটই প্রকৃত কার্য্যকারী হইতে পারে না, কারণ শক্তিদ্বয়ের প্রায় সাম্যাবস্থা (equilibrium) ঘটিয়া থাকে। এইরূপে এই দুই শক্তির নিকট হইতে একরূপ নিষ্কৃতি পাওয়ায় এবং বাষ্প দ্বারা জল হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায়, অপর একটি তৃতীয় শক্তি দ্বারা উহা সহজেই চালিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে জানা যায় যে পদার্থ মাত্রই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ; এই আকর্ষণের নাম universal attraction—ইহা জাগতিক সকল পদার্থেরই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হেতু একটি পদার্থ নিকটস্থ অপর একটি লঘুতর পদার্থকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে। এক্ষণে, যে পাত্রের মধ্যে জল রাখা হইয়াছে, সেই পাত্রটি কর্পূরখণ্ড অপেক্ষা অত্যধিক গুরু হওয়ায়, পাত্রের চতুর্দ্দিকস্থ অংশগুলি কর্পূরকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অবশ্য জলও কর্পূরখণ্ডটিকে আকর্ষণ করিতে ছাড়ে না। কিন্তু জলের আকর্ষণ ও পাত্রাংশের আকর্ষণ এই দুই শক্তির কার্য্যের একটি resultant force নিষ্পন্ন গতি দ্বারা কর্পূরখণ্ড চালিত হইতে থাকে। জল ও পাত্রাংশ কর্পূরখণ্ডের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান থাকায়, বিভিন্নমুখী বহুসংখ্যক নিষ্পন্নগতি উহার উপর ক্রমান্বয়ে কার্য্য করিতে থাকে এবং কর্পূরখণ্ডও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মজুমদার।

যে কারণে কর্পূর জলের উপর ঘুরে বেড়ায় বৈজ্ঞানিকেরা তার নাম দিয়েছেন surface tension। একখণ্ড পাতলা রবার দিয়ে কোন গেলাসের মুখ টেনে বেঁধে দিলে সেই রবারের যা দশা হয়, এক-গেলাস জলের উপরকার অবস্থাটাও সেইরকম। তার উপর কোন জিনিষ—যা ডুবে যায় না—ছেড়ে দিলে চারদিক হতেই তার উপর টানাটানির ধুম পড়ে' যায়। জোর যদি সব দিকেই সমান হয় তবে কাউকেই অবহেলা করা চলে না, কাজেই জিনিষটা স্থির থাকে। কিন্তু একদিককার জোর কোন রকমে কমে গেলে ভাসমান বস্তু তার

উল্টোদিকে চল্‌তে থাক্‌বে। কর্পূর যখন জলে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন প্রথমে তার উপর চারদিক থেকেই সমান টান পড়ে। কিন্তু কর্পূর জলে গুলে যায়। পরিষ্কার জলের চেয়ে এই কর্পূর-গোলা জলের টান কম। কাজেই যে দিককার কর্পূর বেশী ক্ষয়ে যায় সে দিকে টানও কমে' যায়। এই কারণে কর্পূর চল্‌তে থাকে। এক-এক সময় এক-এক দিক বেশী ক্ষয় হয়ে যায়, কাজেই বরাবর এক দিকে না চ'লে কর্পূরটি ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া গেলাসের কানার ধাক্কা খেয়েও দিক্ বদলে যেতে পারে। একটি ছোট কাঠের হাল্‌কা নৌকার সঙ্গে একখণ্ড কর্পূর বেঁধে দিলে তার একদিকই ক্ষয় হয়, নৌকাও একদিকেই চল্‌তে থাকে।

শ্রীদক্ষিণেশ্বর বক্সী। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী। চৌধুরী মহি-উদ্-দীন আহমদ্।

(১৩২)

রাম লক্ষ্মী গদাধর, গৌরী বায়ু পুরন্দর।

এখানে "লক্ষ্মী" কোন পৃথক্ ব্যক্তি নয়। বৈষ্ণবগণ গদাধরকে ৺লক্ষ্মীর শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানেন। সুতরাং ঐ লক্ষ্মী শব্দটি গদাধরেরই দ্যোতক। লক্ষ্মীর অংশসম্ভূত গদাধর ইতি লক্ষ্মীগদাধর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি।

ধরাপড়া

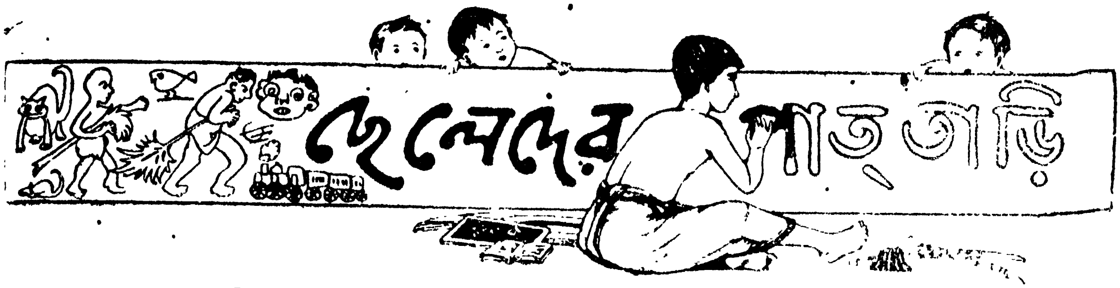
ওগো গোপন, তোমার গোপন কথায় পেয়েছি খোঁজ,
আজিকে পড়েছে ধরা—
হায়, যে গান তোমার বুকের ছন্দে লিখেছো রোজ
—গোপন-অশ্রুভরা,—
যবে নিরালায় তব নিদ্‌হারা ছুটি চোখের পরে,
ফাগুন-রাতির অনুরাগ-ফাগ পড়েছে ঝরে;
বুকের কুলায়ে বুলায়ে কে তার কূজনখানি
—স্বপন-নিঝর-ঝরা—
ওরে, ঢেলে দিল কার নিপুণ-নূপুর-মুখর বাণী—
সে কথা পড়েছে ধরা!
আজ সকলি পড়েছে ধরা!

ওগো মন-বনে তব বন-মল্লিকা উঠেছে ফুটি'
মানস-বৃন্ত ঘিরে;
কোন্ নির্জ্জনে নীড় রচিল তোমার নয়ন ছুটি,
ধরা সে পড়েনি কি রে!
আজো ধরা সে কি পড়েনি রে?
ওই বুকের গোপন অবগুণ্ঠন চকিতে খুলি
কে আজ তোমার বাতায়নে এসে বসেছে ভুলি;
নিমেষের লাগি সলাজ চোখের সজল চাওয়া
চেয়েছে চেয়েছে ফিরে;
তাই সুধা-সাগরের সলিলে যে মোর হয়েছে নাওয়া—
—অমৃত-সাগরনীরে!

তব লীল'-চঞ্চল লতাবিতানের ললিত রাগ
ছুঁয়েছে ছুঁয়েছে মোরে,
ওই হাসিকান্নার মেঘ-রৌদ্রের রঙীন ফাগ
মর্ম্মে রেখেছি ধরে';
রচ নিতি নব মালা, বুকের আঁচলে কুড়ায়ে ফুল—
সে মালা তোমারি হিয়ার কণ্ঠে দোলে দোদুল,
সে গন্ধ তব মন-মালঞ্চে রেখেছে ঢাকি'
গীতমঞ্জরী ভরে'—
হায় নিখিল ধরারে চিরকাল তুমি দিয়েছ ফাঁকি
না জানি কেমন করে!

তব গোপন কথার গুঞ্জন মোর বুকের কাছে
শিহরিল বার বার,
হায় ধরা পড়ে' গেছে, হে কবি, নিখিল ভুবন মাঝে
গোপন পুলকভার!
আজ বেদন-মগন বাঁশিটি তোমার পড়েছে ধরা,
—একা কোণে বসি' রঙীন স্বপন বয়ন করা—
আল্‌পনা রচি' কল্পলোকের কুহেলিকায়
রজনী কেটেছে কার,
হায় শিথিল হয়েছে কোন্ উতরোল উতলা বায়
বুকের বসন তার,
ঐ বুকের বসন-তার!

সুরেশচন্দ্র ঘোষ।



প্রকৃতির পাঁজি

চৈত্র মাস বৎসরের শেষ, বসন্তের শেষ,—একদিকে যেমন ফুল থেকে ফল হয়ে উঠ্‌ছে, অন্য দিকে তেমনি গ্রীষ্ম আস্‌ছে ফলগুলিকে পাকিয়ে তোল্‌বার জন্যে।

চৈত্র মাস থেকেই পদ্ম চাঁপা জুঁই প্রভৃতি গ্রীষ্মের ফুল ফুট্‌তে সুরু কর্‌বে। আমের বোল ঝরে' গিয়ে গুটি বড় হয়ে প্রকাশ পাবে। লকেট ফল এই মাসের শেষাশেষি পাক্‌বে। ফুটি তরমুজ পটল প্রভৃতিও এখন প্রচুর হবে। এখন আমড়া-গাছে বোল ধরেছে, নেড়া গাছে পাতাও গজাতে আরম্ভ করেছে।

চৈত্র মাসে রবিশস্য আক সব কাটা হয়ে মাড়া শেষ হয়ে যাবে।

এখন ভোরবেলা কোকিল বুলবুল দোয়েল পাখী উষা-কালকে মধুরস্বরে মধুরতর করে' তোলে।

এখন পাখীরা বাসা বাঁধ্‌তে সুরু করেছে, শীঘ্রই তারা ডিম পাড়্‌তে সুরু কর্‌বে।

চশ্‌মা।

—

প্রকৃতির পাঠশালা

তেলে জলে মেশে না কেন?—যখন দুটো তরল পদার্থ মিশে যায়, তখন বুঝ্‌তে হয় যে ঐ দুই পদার্থের অণু পরস্পরে মিলে মিশে পাশাপাশি থাকতে পারে। এক-রকমের পদার্থ যেমন মেশে, দু'রকমের পদার্থ তেমন বেমালুম হয়ে কিছুতেই মেশে না; জলে জল যেমন মেশে, জলে আর ফলের রসে ঠিক তেমনটি মেশে না। কিন্তু জল আর ফলের রস পরস্পরে যতটা সদৃশ, জল আর তেল তেমন সদৃশ পদার্থ নয়, উভয়ের অণুর আকার ও অবস্থান সমান নয়—জলের এক-একটি অণুতে তিনটি তিনটি পরমাণু থাকে, আর সেই পরমাণুর আকারও আবার অতি সূক্ষ্ম; কিন্তু তেলের অণুতে থাকে অনেক পরমাণু ও সেগুলি আকারেও বেশ বড় বড়। তাই জলে তেলে মিশিয়ে রেখে দিলেও জলের অণুর সঙ্গে জলের অণু সহজে মিশে তেল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে; আর তেলের অণুর সঙ্গে তেলের অণু সহজে মিশে জল থেকে পৃথক হয়ে যায়; আর জলের চেয়ে তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হওয়াতে তেল জলের উপরে ভেসে ওঠে—জলে তেলে কিছুতেই মিশ খায় না। যে তেল যত ঘন, তার না মেশবার শক্তি তত বেশী—কেরোসিন তেলের চেয়ে সর্ষের তেল ঘন, আবার রেড়ির তেল আরো ঘন; তাই কেরোসিন তেল জলে যতটুকু গুলে যায়, সর্ষের তেল বা রেড়ির তেল ততটুকুও মেশে না।

দুধ ওৎলালে জল দিলে ওৎলানো থামে কেন?—দুধ ডাল ভাতের ফেন ওৎলালে আমাদের মায়েরা হয় হাতা দিয়ে নেড়ে দেন, নয় একটু জল ঢেলে দেন, আর অমনি ওৎলানো থেমে যায়। দুধ প্রভৃতি যখন জ্বালে চড়ানো হয়, তখন তার তলায় যে পরিমাণ আঁচ লাগে উপরে সে পরিমাণ তাত লাগে না। তরল পদার্থের গায়ে তাত লাগলে সেই তরল পদার্থের তপ্ত অণুগুলি উপরে উঠে যায় আর অপেক্ষাকৃত শীতল অণুগুলি নীচে নেমে আসে; এইরকম ওঠানামা অনবরত চলতে থাকে। তা ছাড়া তরল পদার্থের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে বাতাস মিশে থাকে; তাপ পেলে সেই বাতাস হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে যায় আর তরল পদার্থের আবরণ ভেদ করে' বাইরের বাতাসের সঙ্গে ক্রমাগত মিশে যেতে থাকে। এই অণুর ওঠা-নামা আর বাতাসের বহির্গমন ব্যাপারকে আমরা বলি সেই তরল পদার্থের ফুটন্ত অবস্থা, আর বাতাসের বহির্গমন-

চেষ্টা আমরা দেখ্‌তে পাই—তরল পদার্থের বুদ্‌বুদের আকার ধারণে ও পরক্ষণেই সেই বুদ্‌বুদগুলি ফেটে ফেঁশে যাওয়ায়। বিশুদ্ধ জল জ্বাল দিলে জলের উপর-নীচের অণু-চলাচলে কোনো বাধা পড়ে না; কিন্তু ডাল ভাত দুধ জ্বাল দেবার বেলা ডালের ঝোল, ভাতের ফেন বা মাড়, ও দুধ জলের চেয়ে ঘন হওয়াতে, এবং নীচের চেয়ে উপরের স্তর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকাতে, উপরে একটা পাতলা স্তর জমে' সর পড়ে; তার পর যখন নীচের অণুগুলি ও বাতাস উপরে ঠেলে ওঠে তখন মাথার উপরে সর থাকাতে বাধা পায়, বাতাস আর বেরুবার পথ পায় না, গরম হাল্কা বাতাসের উঁচু দিকে উঠে যাওয়াই ধর্ম্ম হওয়াতে সে ক্রমাগত সরের তলায় ঠেল্‌তে থাকে পথ কর্‌বার জন্য; বাতাসের ঠেলার চেয়ে সরের সংহতি যদি বেশী হয় তবে সর ফাটে না, সর বাতাসের ঠেলায় ফেঁপে ফুলে ওঠে। তখন হাতা দিয়ে ঘেঁটে দিলে উপরের সরটা ছিঁড়ে যায়, বাতাস পথ ছাড়া পেয়ে পালিয়ে বাঁচে, উৎলানোও বন্ধ হয়; জল ঢেলে দিলেও ঠিক এই কাজই হয়, সর ফেটে বাতাসের পথ হয়, জ্বাল দেওয়া পদার্থটার ঘনত্ব একটু তরল হয় আবার খানিকক্ষণ সর জমা বন্ধ থাকে। ডাল উৎলালে তেল দিলেও ঠিক এই কাজই হয়—তেল পড়্‌তে সর ত ছিঁড়ে যায়ই, তা ছাড়া তেল সর্ব্বদা জলের মাথায় থাকাতে ডালের মণ্ড তার সঙ্গে ফুট্‌তে বাধা হয়, আর জমবার অবসরই পায় না। আমাদের মায়েরা কৃতকর্ম্মের অভিজ্ঞতায় যে কৌশল আবিষ্কার করেছেন, বৈজ্ঞানিকরা তার কারণ আবিষ্কার করেছেন। এইরকম সকল বিষয়ে প্রশ্ন তুলে অনুসন্ধান করা বুদ্ধিমানের কাজ।

সর্দ্দার পোড়ো।

—

সুল্‌তান ও সংলোক।

একবার এক সুল্‌তানের একজন সংলোকের দরকার হয় তাঁর খাজনাপত্র আদায় কর্‌বার জন্যে। কিন্তু ভালো লোক তিনি খুঁজে আর পান না। যে-সে লোককে কাজে লাগালে টাকা চুরি করে' নেবে—এই তাঁর ভয়। শেষে তিনি একজন জ্ঞানী লোককে ডেকে বল্লেন—আপনি বল্‌তে পারেন একজন সংলোক কোথায় বা কিরকম করে' পাওয়া যাবে?

জ্ঞানী লোকটি বল্লেন—আপনি বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক ডাকান্ আর তারা এক জায়গায় জড়ো হলে তাদের নাচ্‌তে বল্‌বেন, তাহলেই বলে' দেব কোন্ লোকটি সং।

জ্ঞানী লোকটির কথা-মত সুল্‌তান বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক ডাকালেন। তারা এলে একজন প্রহরী একটা অন্ধকার বড় দালানের মধ্যে দিয়ে তাদের রাজ-দরবারে যাবার পথ দেখিয়ে দিলে। তারা একে একে সব সুল্‌তানের কাছে গিয়ে হাজির হল। সুল্‌তান তাদের বল্লেন—তোমাদের সবাইকে নাচ্‌তে হবে, তবেই কাজ পাবে কি না জানাবো।

লোকগুলির কেউই তাতে রাজী হল না। কেবল একজন সুল্‌তানের কথামত নাচ্‌তে সুরু করে' দিলে। জ্ঞানী লোকটি বলে' উঠ্‌লেন—একেই কাজ দিন, এই লোকটি সং।

জ্ঞানী লোকটির কথামত অন্য লোকগুলির জামা-কাপড় পরীক্ষা করে' দেখা গেল তারা দালান দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে টাকা চুরি করে' পকেটে পুরেছে, তাই তারা নাচ্‌তে সাহস করে নি। সং লোকটি কিছুই নেয়নি, তাই তার নাচ্‌তেও ভয় হয় না।

গুপ্ত।

—

হাঁড়িচাঁচা পাখী

এক গৃহস্থের সাত ভাই, তাদের সাত বউ। বউদের কেউ কুঁড়ে, কেউ ঝগড়াটে, কেউ বা বৃথা বেড়িয়ে বেড়ায়। কেবল ছোটবউ কম্মিষ্ঠে, সেই রাঁধে, সেই বাড়ে। বড়-বউদের স্বামীরা বড় বড় চাকুরে, দিব্যি লেখাপড়া জানে; ছোটবউর স্বামী বেশী কিছু জানে না, তাই তার গঞ্জনা। বড়বউরা কেবল বকে, নয় তো গালি দেয়।

একদিন ছোটবউ রেঁধেছে, তাতে ভাত কিছু বেশী হয়েছে; বড়বউরা অমনি বল্লো, "ওমা, এত ভাত রাঁধা, এত ভাত অপচয়, একি প্রাণে সয়। তোমাদের তো রোজগার কর্‌তে হয় না, যাদের কর্‌তে হয়, তাদের বুকে মাটি ঠেকে।"

তখনই ছোটবউর চোখের জলে দুনয়ন ভেসে গেল। আর একদিন অমনি ছোটবউ কিছু ঠিক না পেয়ে

ভাত কম রেঁধেছিল। নিজে আধ-পেটা খেয়ে শাশুড়ী ননদ ও জা'দের ভরপুর খাইয়েছিল। তাতেও তারা বল্‌লো, "ও মা! এমনি করে' আমাদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা।"

এমনি ভাবে সুখে দুঃখে কিছু দিন কেটে গেল।

বার বার তিনবার; আবার একদিন হঠাৎ ছোটবউর হাত ফসকে একটা বাটি পড়ে' ভেঙে গেল। এই আর যাবি কোথা? তখন ছয় বাঘিনী তেড়ে এসে ছোট-বউকে কিল চাপড় লাথি মার্‌ল। যা'র হাতের গোড়ায় যা ছিল, সে তাই দিয়ে মার্‌লো। যা'র মনে যা এল সে তাই বলে' গাল দিতে লাগ্‌লো। এই দেখে' মনের দুঃখে ছোটবউ আস্তে আস্তে হাঁড়ি চেঁচে, হাঁড়ির কালী-ঝুল গায়ে মেখে খিড়্‌কী দিয়ে বনে পালিয়ে গেল। তখন তাকে দেখ্‌লে গৃহস্থদের ছোটবউ বলে' চেনা যেত না। সে সেখানে গিয়ে হাতজোড় করে' ও আকাশের দিকে মুখ করে' বল্‌তে লাগ্‌লো, "হা বিধাতা! মানুষ-জন্মে খুব সুখ কর্‌লাম, এখন এ অবস্থায় যদি কিছু সুখের থাকে, তবে তা'ই দাও দয়াময়!"

তার কষ্ট দেখে' দেবতার মনে বড়ই কষ্ট হলো। তিনি নিজে এসে বল্‌লেন, "মা, তুমি কেঁদ না। তোমায় বর দিলাম, যাও তুমি পাখী হয়ে উড়ে যাও। এই ভাবে থেকে তুমি এ নরকযন্ত্রণার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

সেই থেকে সে হাঁড়িচাঁচা নাম ধরে' গাছে গাছে থপ থপ করে' উড়ে বেড়ায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজগদ্বন্ধু পাল।

চন্দ্রভায়ার পদ্মাপার

চন্দ্রভায়া তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখেন রাত্রে,
পার হচ্ছেন বর্ষাকালে পদ্মানদী সাঁত্‌রে।
চিৎসাঁতারে ডিগ্‌বাজী খান; উঃ কি ভীষণ স্পর্দ্ধা!
(যদিও সাঁতার জানেন না ক,—দেখেন নি ক পদ্মা।)
হাত-পা তুলে মাঝ পদ্মায় করেন আবার নৃত্য,
নিজেই বলেন, "সাবাস্ ভায়া!" নির্ভীক তাঁর চিত্ত।
গর্ গর্ গর্ গর্জ্জে দেয়া,—ঝর্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি,—
চন্দ্রভায়া সাঁত্‌রে চলেন নাই ক তাতে দৃষ্টি।
আত্মীয়েরা ওপার হতে লাগিয়ে দিলে কান্না
"ওরে চন্দ্র আয় ফিরে আয়, ঢের হয়েছে আর্ না।
আয় ফিরে আয় ওরে চন্দ্র—কর্‌ছিস কি যে, দুর ছাই—"
পিতামাতার ঘন ঘন লাগ্‌ল হ'তে মূর্চ্ছাই।
বন্ধু সবে বাক্য-বিহীন, অশ্রু ঝরে চক্ষে,
ভাবে,—এবার চন্দ্রভায়ার কিছুতে নাই রক্ষে।
বুক ফুলিয়ে চন্দ্রভায়া উর্দ্ধে তুল্‌ল হস্ত
বলেন, "মিছে ভয় কোরো না, হয়ো না ক ব্যস্ত।"
এই রকমে স্বপ্ন দেখে কেটে গেল রাত্র,
কখন প্রভাত হয়ে গেছে হুঁস নাই তাঁর মাত্র।
চন্দ্রভায়ার ঘুম ভাঙেনি (তখন বেলা সাতটা),
জননী তাঁর জাগান এসে ঠেলে তাঁহার হাতটা।
চন্দ্রভায়া ভাবেন, হঠাৎ ধর্‌ল তাঁহার হাত কে?
"ওরে বাবা কুমীর!" বলে' উঠেন তিনি আৎকে।
প্রাণের ভয়ে লম্ফ দিয়ে জেগে দেখেন—লজ্জায়,
পার হয়েছেন পদ্মানদী শুয়ে শুয়ে শয্যায়।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

রাজভাণ্ডারের সেরা মাণিক

রাজার ছেলে আর মালীর ছেলে—দু'জনে ভারী ভাব। রাজার ছেলে থাকে সাতমহল রাজপুরীর সাততলার উপরে আর মালীর ছেলে থাকে রাজপুরীর সাত যোজন দূরে, এক কুঁড়ে ঘরে। তবু একজনের আর-একজনকে না দেখ্‌লে চলে না। তাই, রাজার ছেলে, রাজা রাণী দাস দাসী সব্বাইকে লুকিয়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে সাত-সাত-দিন বাদে মালীর ছেলের সাথে দেখা কর্‌তে যায়; এক-একদিন মালীর ছেলে মালঞ্চ ছেড়ে এসে, রাজবাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে, রাজপুত্রের ঘরের জান্‌লার দিকে চেয়ে থাকে—রাজপুরীতে ঢুক্‌তে সাহস পায় না।

আটদিনের দিন যেদিন রাজপুত্রের আসার কথা, সেদিন মালীর ছেলে এক যোজন পথ এগিয়ে এসে কান পেতে থাকে—ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দ শুনতে পেলেই ঘরে ছুটে গিয়ে, বাপের শোওয়ার খাটিয়াখানা বকুলগাছতলায় পেতে রাখে। তারপর, রাজার ছেলে এলে, দু-বন্ধুতে মিলে হেসে-খেলে রাতদিনে জমানো কত কথাই না হয়।

মনের কথা কইতে না-কইতে বেলা প'ড়ে আসে, রাজার ছেলের খিদে পায়, মালীর ছেলে বাগান থেকে ধব্‌ধবে শাদা কেশুর তুলে রাজপুত্রকে খেতে দেয়। রাজবাড়ীতে শুধু দুধ-ক্ষীর মেঠাই-মোণ্ডা, আর—কেওড়া-দেওয়া মিষ্টি সরবৎ,—গরমের দিনে কেশুরের কাছে তা?—খিদে-তৃষ্ণার মুখে টাট্‌কা-তোলা রসালো কেশুর খেয়ে' রাজপুত্রের সাধ আর মেটে না।

যায়—এ ভাবে ক'বছর যায়। রাজার ছেলে ডাগর হয়েছে, মালীর ছেলেরও বয়স হয়েছে। এর মধ্যে বুড়ো রাজা মরেচেন, বুড়ো মালীও মারা গেছে। রাজপুত্র এখন নিজেই রাজ্যের রাজা, আর মালীর ছেলে মালঞ্চের সর্দার মালী। রাজ্য দেখে' রাজার সময় হয় না, মালঞ্চের কাজে মালীরও ফুরসুৎ নেই; কাজেই এখন কে আর কার খোঁজ লয়! কিন্তু দুজনারই মনে মাঝে মাঝে ছেলেবেলার কথা জেগে ওঠে; আর গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলা শ্বেত-পাথরের ঘাট্‌লায় ব'সে পদ্মপুকুরের ফটিক-জলে সাদা হাঁসের মেলা দেখে ছ্যাঁৎ করে' রাজার মনে পড়ে—এই তো কেশুরের দিন!

মালীর বৌ প্রত্যহই বলে—"হলোই বা রাজা—ছেলে-বেলাকার আলাপ তো। ...একবার রাজার কাছে গেলে আর দোষটা কি?...এই যে আট পহর গতর খাটিয়েও পেট চল্‌চে না,—রাজার ভাঁড়ার-ঝাড়া খুদ-কুঁড়ো পেলেও যে আমাদের ঢের ঢের।" মালী বলে, "দূর পাগ্‌লী। রাজার কি আর ছেলে-বয়সের—সেই কবেকার কথা মনে আছে!

মালী-বৌ তবুও ছাড়ে না—দিন-রাত কানের গোড়ায় প্যান্‌ প্যান্‌ ঐ এক কথা!—শুনে মালী অস্থির। শেষে সইতে না পেরে, একদিন বাগানের মাটি খুঁড়ে, বেছে বেছে সবার-সেরা কেশুর নিয়ে সে রাজার বাড়ী চল্‌লো।

রাজবাড়ীর সিংহদরজার কাছে গিয়ে মালীর পা কিন্তু আর এগোয় না,—গায়ের ময়লা চাদরে কেশুরগুলি ঢেকে সে দরজার পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

পাত্র মিত্র লোক লস্কর নিয়ে রাজা মৃগয়ায় চলেচেন, ঐরাবত হাতীর পিঠে সোনার হাওদায় চ'ড়ে বাইরে আস্‌তেই দেখেন—দরজার গোড়ায় জড়সড় কে ঐ? চেয়ে চেয়ে ঠাওর ক'রে রাজা চিন্‌তে পার্‌লেন,—ছেলেবেলাকার বন্ধু মালী যে! তড়াক ক'রে হাওদা থেকে লাফিয়ে পড়ে' রাজা ছুটে গিয়ে মালীর গলা জড়িয়ে ধর্‌লেন। আচম্‌কা চম্‌কে উঠ্‌তে মালীর কাপড়-ঢাকা কেশুর মাটিতে প'ড়ে গেল। রাজা নিজ হাতে তাড়াতাড়ি দুটি কেশুর তুলে নিলেন। এই কেশুর তিনি চেয়ে চেয়ে কত খেয়েছেন, মালী ছোটবেলাকার সাধের জিনিষ যত্ন ক'রে তাঁর জন্যে বয়ে এনেছে—আনন্দে রাজার চোখে জল এলো। তিনি মালীর হাত ধ'রে রাজসভায় ফিরে এলেন। তারপর মহা আদরে কেশুর-দুটো রূপোর থালায় তুলে অন্দর মহলে রেখে দিলেন।

কাজকর্ম্ম সকল ছেড়ে, সেদিন মালীর সাথে রাজার কথা আর ফুরোয় না! পরদিন যাওয়ার বেলা মালীকে সাত-ঘড়া মোহর দিয়ে বিদায় দিলেন।

রাজার কোটালটি ছিল ভারি হিংসুটে। এ-সব দেখে শুনে তার মনে বড় ক্ষোভ হলো—ঈস্‌! সামান্য দুটো গাছের মূল দিয়ে কোথাকার কে সাত-সাত-ঘড়া ধন মেরে নিলে রে!—

শোওয়া নেই বসা নেই, কোটাল সারারাত পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বিস্তর দুধ জোগাড় করলে; তারপর সাত দিন ধ'রে তা জ্বাল দিয়ে দিয়ে সরের ছেঁচা ডেলায় তৈরী কর্‌লে—মস্ত এক ক্ষীরের কেশুর। পরদিন টিয়ের মত বুঝিয়ে-পড়িয়ে নিজের কোলের ছেলের হাতে সেই কেশুর দিয়ে রাজাকে ভেট পাঠালে। ননী সর রাজার নিত্যিকার খাবার, তবু এ নূতন রকমের কেশুর পেয়ে রাজা মহাখুসি। তিনি কোটালের ছেলেকে আদর ক'রে কোলে তুলে সরের ডেলা ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাওয়াতে লাগ্‌লেন।

আড়াই পহর বেলায় রাজসভা ভাঙ্গে ভাঙ্গে, কোটালের দুধের ছেলে এখনও নড়্‌চে না। কোটাল মনে মনে ঠাকুর-দেবতাদের ডাক্‌চে—সাত-ঘড়া ধন যেন না ফস্‌কায়। কিন্তু সভা ভেঙ্গে সিংহাসন ছেড়ে সত্যিই যখন রাজা উঠ্‌চেন, তখন আর থাক্‌তে না পেরে, কোটাল দৌড়ে গিয়ে, ছেলেকে চিম্‌টি কেটে ব'লে উঠ্‌ল—'বিদায় চা রে, ভেড়ের ভেড়ে।' কোটালের কাণ্ড রাজার চোখ এড়াল না। তিনি সিংহাসনে ফের ব'সে পাত্রমিত্র সভাসদকে ডেকে বল্‌লেন—'আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে—কোটালের ছেলে আমার



সবের কেশুর খাওয়ালে তবুও তো কিছুই দেওয়া হলো না।'

এ বলে 'এটা দিন' ও বলে—'সেটা দিন্‌'; কারু কথাই রাজার মনে লাগে না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কি মনে ক'রে নিজেই অন্দর-মহলে ছুটে গেলেন; আবার তখুনি সোনার ঝালর দেওয়া রেশমী কাপড়ে ঢাকা একখানি রূপোর থালা নিয়ে এলেন; কোটালের ছেলের হাতে তা দিয়ে বল্‌লেন—'বাছা, আমার মহা আদরের জিনিষ তোমায় দিচ্ছি—সাত-ঘড়া সোনায়ও এর মূল্য হয় না,—এ আমার রাজ-ভাণ্ডারের সকল মাণিকের সেরা।'

খুসি হয়ে কোটালের ছেলে থালাখানি হাতে নিতেই কোটাল লাফিয়ে এসে তা লুফে নিলে। খুলে দেখে—সোনার ঝালর আঁটা রেশমী কাপড়ের তলে রূপোর থালায় সেই মালীর দেওয়া একটি কেশুর, কিন্তু সাতদিন ঘরে থেকে, তা চিম্‌ড়ে কাঠ হয়ে আছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

কামারের স্বর্গারোহণ

আজ তোমাদের এক দুষ্ট, কামারের গল্প বল্‌ছি শোন।

তোমরা নিশ্চয়ই যীশু খ্রীষ্টের নাম শুনেছ। এক সময় ছিল যখন তিনি তাঁর দু-একজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে পৃথিবীতে মানুষকে দয়া প্রেম ক্ষমা ও করুণা শেখাবার জন্যে ও আর্ত্তজনদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। এমনিভাবে তিনি ও তাঁর সঙ্গী সেন্ট্‌ পিটার একবার সমস্তদিন ঘুরে পরিশ্রমের অবসাদে ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে সন্ধ্যেবেলায় এক গ্রামের বাইরে আশ্রয় পাবার আশায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের প্রথমেই দৃষ্টি পড়্‌ল রাস্তার ধারে কামারের কুঁড়ে ঘরটির ওপর। এই কামারটি মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিল। তাকে গ্রামের সবাই বেশ মান্‌ত আর তার উপদেশও সবাই বেশ আগ্রহে শুন্‌ত। খোলা দুয়ারের ধারে যেখানে কামার আর তার সঙ্গী-দুজন কঠিন পরিশ্রমে ব্যস্ত ছিল, পথিক দুজন এসে সেখানে দাঁড়ালেন। কামারের বয়স হবে ষাটেরও ওপর—কিন্তু সুস্থ ও সবলকায় থাকায় সে ত্রিশ বছরের যুবকের মত কাজ করতে প্রস্তুত। তার দৃষ্টি পথিক-দুজনের ওপর পড়্‌তেই ত্রস্তে এসে সে তাঁদের সাম্‌নে দাঁড়াল আর টুপী খুলে জিগ্‌গেস করলে যে সে তাঁদের কোনও কাজে লাগ্‌বে কি না। যীশু, বল্‌লেন যে তাঁরা রাত্রিটুকু থাক্‌তে প্যারেন এরকম একটি আশ্রয় খুঁজ্‌ছেন।

কামার বল্‌লে, "ওঃ! আপনারা কোনও রকম দ্বিধা না করে' ভেতরে চ'লে আসুন, আমার অনেক ঘর পড়ে' আছে। আমার স্ত্রীও এখন রান্না করছেন, এইসঙ্গে আপনাদের জন্যে আর-কিছু কর্‌তে তাঁর আর কোনই কষ্ট হবে না। তা আপনারা প্রথমে বেশ করে' হাত মুখটা ধুয়ে ফেলুন; এতে বেশ আরাম পাবেন আর আহারেও তৃপ্তি হবে।"

যীশু আর তাঁর সঙ্গী স্নান শেষ করে' এসে ভেতরে বস্‌লেন, আর কামারের সুশীলা স্ত্রী এসে তাঁদের অভিবাদন করে' গরম গরম খাবারের থালাগুলি সাম্‌নে রেখে গেলে তাঁরা সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে তা খেলেন।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক কামারের নানারকম গল্প শুনে সবাই তাঁরা সমস্তদিনের কাজের পুরস্কার-স্বরূপ শান্তিময়ী নিদ্রার আশ্রয় নিলেন। পরদিন সকলেই খুব ভোরে উঠ্‌লে পর যীশু ও তাঁর সঙ্গী গৃহস্থের সযত্ন-প্রদত্ত প্রাতরাশে তৃপ্ত হয়ে যাত্রার আয়োজন কর্‌লেন। কামার আর তার স্ত্রী তাঁদের দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিল। যাবার মুহূর্ত্তে যীশু তাদের বল্‌লেন, "তোমরা আমাদের প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছ, এরকম দয়ার প্রতিদান অবশ্যই দিতে হয়। আচ্ছা তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ইচ্ছামত তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ কর আমি তা পূর্ণ করে' দেবো।"

বুড়ো কামার কি চাইবে তা ভেবে না পেয়ে টুপীটি খুলে ফেলে তার টাক মাথাটিতে হাত বুলোতে লাগ্‌ল। শেষে অনেক করে' ভেবে বল্‌ল, "আচ্ছা এই যে আপেল গাছটি দেখ্‌ছেন, আমার প্রথম ইচ্ছা এই, যে-কেউ যখনই এ গাছে চড়্‌বে আমার অনুমতি না নিয়ে সে নাম্‌তে পার্‌বে না।"

সেন্ট্‌ পিটার তার এ ইচ্ছার কথা শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। কিন্তু যীশু কেবল বল্‌লেন, "তথাস্তু! তারপর তোমার দ্বিতীয় অভিলাষটি কি?"

কামার বল্‌লে, "ওই যে দেওয়ালে ঝোলান পিপেটি রয়েছে, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছে এই যে, যখনই কেউ এ পিপের

মধ্যে ঢুক্‌বে, আমার অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত সে এর ভেতর থেকে বেরোতে পার্‌বে না।"

সেন্টপিটার তার এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছের কথা শুনে আর চুপ করে' থাক্‌তে পার্‌লেন না—তিনি বলে' উঠ্‌লেন, "কার দায় পড়েছে বাপু এর মধ্যে যেতে ?"

কিন্তু যীশু কেবল বল্‌লেন, "তথাস্তু। তারপর তোমার তৃতীয় অভিলাষ ?"

"হুঁ। আমার তৃতীয় অভিলাষ এই যে, যখনই আমি আমার এ টুপী পেতে বস্‌ব তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কারুর সাধ্য হবে না যে আমাকে নড়ায়।"

সেন্ট্‌পিটার আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লেন না—কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের কুবাক্য বল্‌তে নিষেধ থাকায় কেবল কামারের নৈতিক চরিত্রের ও বুদ্ধিহীনতার তীব্র সমালোচনা করে'ই থেমে গেলেন। কিন্তু যীশু "তথাস্তু" বলে'ই স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে বল্‌লেন, "তারপর তোমার অভিলাষ তিনটি কি ?"

স্ত্রীলোকটি বল্‌ল, "মহাশয়, আপনি বড়ই সদাশয় ব্যক্তি। আমার প্রার্থনা কর্‌বার আর কি আছে ? তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যেন আমি সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকি, যেন আমি ঘুমিয়ে পড়ার মত সহজে মর্‌তে পারি, আর আমার আত্মাকে যেন দেববালারা স্বর্গে নিয়ে গিয়ে অনন্ত সুখের অধিকারী করে' দেয়।"

যীশু বল্‌লেন, "সুশীলে ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক।"

সেন্ট্‌পিটার এ দেখে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমার স্ত্রীকে ও শাশুড়ীকে দেখে' মনে যে অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাতে ধারণা ছিল যে মেয়েরা বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষের সমকক্ষ কিছুতেই নয়; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি এ বুড়ো আমার ধারণা বদ্‌লে দিল।"

তারপর যীশু ও সেন্ট্‌পিটার তাঁদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন।

বৃদ্ধা আরও দশ বৎসর তার আড়ম্বরহীন জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় নিলে, এক-জন দেববালা তার আত্মাকে অনন্ত শান্তিধামে নিয়ে গেল। আর বুড়ো কামারকে তার কষ্টসাধ্য কাজ কর্‌তে আরও কুড়ি বছর বেঁচে থাক্‌তে হল। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মের শেষে একটি সুন্দর দিনে যখন সে তার কাজে ব্যস্ত ছিল, যম এসে তার দোরে দাঁড়াল। যম এসে তাকে বাইরে আস্‌তে ইসারা করায় সে ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে চেয়ে রইল, যেন সে কিছুই বুঝ্‌তে পারেনি। যম বলে' বস্‌ল, "ভাল, তুমি ত অনেককাল বাঁচ্‌লে, এখন চল তোমায় নিয়ে যাই।"

কামার বল্‌ল "সে কি ! আমি এখন তোমার সঙ্গে কি করে' যাই ? দেখ্‌ছ না আমার কাপড়-চোপড় কিরকম ময়লা ! আর হাত-পাগুলো ঝুলকালীতে মাখা। তুমি আমায় দয়া করে' আধ ঘণ্টার ছুটী দাও যাতে আমি চট্ করে' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে' তোমার মত সুবেশী ভদ্রলোকের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে পারি। আচ্ছা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন কিছু খাওনি। বরং তুমি ততক্ষণ এই টুক্‌টুকে পাকা আপেলগুলি চেখে দেখো।"

যম ত এদিকে আপেল-গাছটির দিকে তাকিয়ে আর লোভ সাম্‌লাতে না পেরে বলে' বস্‌ল, "বেশ ত ! কিন্তু তুমি বেশী দেরী ক'রো না—জানই ত আমি কি রকম ব্যস্ত ! সত্যি বল্‌তে কি, দিনে রাত্রে আমার মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম নেই।"

তারপর যম ত তার হাতের কাঁচি জোড়া দেয়ালে হেলিয়ে রেখে অতিকষ্টে গাছের নীচের ডালটিতে গিয়ে বসে' মনের সুখে আপেল খেতে লাগ্‌ল। কারণ এর আগে সে আর এরকম সুস্বাদু ফল কখনও পায় নি। এদিকে বুড়ো কামার ত স্নান কর্‌তেই ঘণ্টা-খানেক লাগিয়ে দিলে। ততক্ষণে যম ত অধীর হয়ে তাকে তাড়াতাড়ি কাজ সার্‌বার জন্যে তাড়া দিতে লাগ্‌ল। শেষকালে বুড়ো তার সব-চেয়ে ভাল পোষাকটা পরে' দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে সে দেখ্‌তে পেলে যে যম তার প্রাণপণ চেষ্টায়ও এক পা নড়্‌তে পার্‌ছে না। এই না দেখে সে তার বর পাবার কথা ভেবে খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। যম ত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "এ আবার কি যাদুবিদ্যে ? আমাকে যে এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

আমি ত দেখ্‌ছি ঘণ্টা-খানেকের বেশী দেরী করে' ফেলেছি।"

কামারও অমনি ব'লে উঠ্‌লো, "তা তুমি ঘণ্টা ছেড়ে একশ বছর চেষ্টা কর না কেন দেখ্‌বে যে ঠিক সেই গাছের ওপরই ব'সে আছ। এ ঠিক জেনো যে আমি ওখান থেকে নাব্‌তে তোমার একটুও সাহায্য করব না।"

যম ত মুস্কিলে প'ড়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগ্‌ল; কিন্তু সবই মিথ্যে। শেষকালে বেচারা যম জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আচ্ছা কি পেলে তুমি আমায় ছেড়ে দাও?"

বুড়ো উত্তর কর্‌ল, "জান, আমি লোভী নই; তবে তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার আশেপাশে আর কখনও আস্‌বে না, তবে তোমায় ছেড়ে দি।"

অগত্যা মৃত্যু সকলরকম পবিত্র এবং অপবিত্র জিনিষের নামে শপথ করে' বল্‌লে, "ভাল, তাই সই।"

বুড়ো তাকে ছেড়ে দিলে। যাক্‌, এমনি ভাবে বুড়ো আরও কুড়ি বছর বেঁচে রইল। কিন্তু আবার একদিন যখন সে সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ার নাল তৈরী করছিল— এমন সময় সে শুনতে পেলে যেন উঠানে কেউ ভয়ানক গোলমাল করছে। সে শব্দ শুনে মনে হল যেন ড্রাগন অজগর সিংহ নেকড়ে আর গাধায় মিলে 'ঐক্যতান বাদন' করছে। যাহোক বুড়ো জানালা দিয়ে তাকিয়ে একটি আকৃতি দেখেই বুঝ্‌তে পারলে যে এ নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের অনুচর তাকে নিতে এসেছে। যাক্‌ তার জন্য বুড়ো একটুও দুঃখিত হ'ল না। সে দিব্যি ব'লে উঠ্‌ল, "অরে ভায়া একটু আস্তে। আমরা এখানে বেশী লোক নেই। তোমার যদি গানের বৈঠক দেবার ইচ্ছে হয়ে থাকে ত গ্রামের সরাইখানায় নাচঘরখানা গিয়ে ঠিক করনা কেন?"

সয়তান অমনি ব'লে উঠ্‌ল, "আচ্ছা আর ঠাট্টা করতে হবে না—তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। তোমার ত দিন ফুরিয়েছে—কিন্তু মৃত্যু ত তোমায় নিতে নারাজ, কাজেই আমার ওপর তোমাকে নিয়ে যাবার ভারটা পড়েছে। শোন, তোমায় আমি এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে আগুনে পুড়িয়ে লোহা পেটবার কথা বেশ ভাল করে' মনে থাকবে।"

"ও তাহলে তুমি বল্‌তে চাও যে তুমি সয়তান?"

"হ্যাঁ, আমি তাদেরই একজন। আমার জাতভাই ত অনেক।"

"ভাল, যে কেউ ত বল্‌তে পারে যে সে সয়তান। ভারি ত ছাগলের মাথার একটা খুলি নিজের মাথায় দিয়ে আর ষাঁড়ের একটা লেজসুদ্ধ চামড়া পিঠের ওপর সটান ঝুলিয়ে আর বড় জোর চামারকে বলে' খুরের মত চেরা একটি জুতো তৈরী করিয়ে পায়ে দিয়েই ত বেশ সয়তান সাজা যায়। ওঃ আমি গ্রামের মেলাতে এ রকম ঢের ঢের সয়তান দেখেছি। আমি কেমন করে' বুঝ্‌ব যে তুমি সত্যি সয়তান?"

"ভাল পরীক্ষা করে'ই একবার দেখ না। তুমি যা করতে বল্‌বে আমি তাই করে' দেবো।"

"আচ্ছা, তুমি এই লোহার পিপেটার ভেতর হামা দিয়ে ঢুকে যেতে পারো?"

"ওহে,—তুমি এই কথাতে বলছ? আমি ভেবেছিলাম না-জানি কিই করতে বল্‌বে। এ ত খুব সোজা।"

"বেশ তুমি যদি এ কাজ বেশ সহজেই করতে পার ত বুঝ্‌ব যে সত্যিই তুমি সয়তান আর পাতাল থেকেই এসেছ।"

সয়তান তৎক্ষণাৎ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে শেষে পিপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাহাতক সয়তানের পিপের মধ্যে যাওয়া, দুষ্ট কামারও অমনি পিপেটাকে উল্টিয়ে আগুনের ওপর ঠেসে ধরলে আর খুব জোরে হাপরে বাতাস করতে লাগ্‌ল। শেষে যখন পিপেটা আগুন-তাতে লাল হয়ে উঠ্‌ল, তখন সে তার সবচেয়ে বড় সাঁড়াশী দিয়ে সেটাকে নেহাইএর উপর রেখে সঙ্গীদের ডেকে বল্‌লে, "ওহে তোমরা যত জোরে পার এটাকে পিটুতে আরম্ভ কর ত।" তারাও অমনি আচ্ছা করে' পিটুতে আরম্ভ করে' দিলে। সে কি পিটুনী! সয়তান বেচারা ত চেঁচাতে আরম্ভ কর্‌ল। শেষে বেচারা এত জোরে চেঁচাতে আরম্ভ কর্‌ল যে ঘরের ভিত অবধি কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, আর যারা সে চীৎকার শুনতে পেলে তাদের ত মরণের দিন পর্য্যন্ত গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। আর তারা ভাব্‌ছিল বুঝি বা পৃথিবী এবার রসাতলেই যাবে। সয়তান আর সহ্য করতে না

পেয়ে বলে' উঠ্‌ল, "ওরে হতভাগা, আমায় এর ভেতর থেকে বের করে দে। আমি দেখ্‌ছি তুই আমাদের মত বদ্‌লোকের চেয়েও বদ্‌।"

আমায় বল্‌লে, "ভাল, যদি প্রতিজ্ঞা করিস্‌ যে তুই কিম্বা তোর জাতভাই কেউ আমার কুঁড়ের পঞ্চাশ মাইলের ভেতরও মাড়াবি না তবে তোকে ছেড়ে দি।"

তখন সয়তান তাদের রাজার নাম করে' বল্‌ল, "আচ্ছা তাই সই।" তারপর ছাড়া পেয়ে সে ঘুর্ণী বাতাসের মত, পৃথিবীর সেরা বরফঢাকা পাহাড়ে নিজের গায়ের জলুনী জুড়োতে ছুটে গেল।

যাক্‌, এমনিভাবে যমকে আর সয়তানকে নাকাল করে' বুড়ো আরও কুড়ি বছর কাটিয়ে দিলে। শেষে আবার একদিন যখন সে তার কুঁড়ে ঘরখানির সাম্‌নে ব'সে হাওয়া খাচ্ছিল, সে যেন পাখার পত্‌ পত্‌ শব্দ শুন্‌তে পেলে। তাকিয়ে দেখ্‌লে যে স্বর্গের দূত এসে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে।

দূত তাকে বল্‌ল, "তোমার ত কাল ফুরিয়েছে, এখন চল আমার সঙ্গে।"

বুড়ো দেখ্‌ল যে এবার আর এর হাত থেকে নিস্তার পাবার যো নেই, তখন সে দূতের অনুমতি নিয়ে তার কাপড়-চোপড় বদ্‌লে এসে বল্‌লে, "চল যাচ্ছি।"

কিন্তু টুপীটা মাথায় দিয়ে নিতে ভুল্‌ল না। দূত তাকে তখন বল্‌ল, "তুমি ত প্রত্যেক রবিবারে কখনও ধর্ম্ম-মন্দিরে যাওনি—আর স্বর্গে যা বলে না এ-রকম কুকথাও অনেক বলেছ, কাজেই আমাকে তোমায় এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে ধর্ম্মের কোনও রকম অনুষ্ঠান নেই আর যেখানে লোকেরা মন্দ কথা বল্‌লেও পুরস্কৃত হয়।"

কাজেই তারা একটি বাঁধান সুন্দর রাস্তা দিয়ে ক্রমশঃ নীচের দিকে যেতে লাগ্‌ল। শেষকালে কিছুদূর এসে তারা দেখ্‌তে পেলে যে একটা খুব উজ্জ্বল লাল আলো জল-জল করছে। দেখে' মনে হল যেন গ্রামে একশ উনুন একসঙ্গে জ্বল্‌ছে। আর সেখানে এমন একটা বিশ্রী গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল যে তাদের দম বন্ধ হবার জোগাড়! এখন হয়েছে কি, সেই যে সয়তান যাকে বুড়ো বেশ ক'রে নাকাল ক'রে ছেড়েছিল, সেই আবার সেদিন দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিল। সে নরকের প্রকাণ্ড খোলা দরজায় সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নূতন লোক যারা আস্‌ছিল তাদের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যেমনি সেই বুড়োকে দেখা—ছুটে গিয়ে ধড়াম্‌ করে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "তোমার মত লক্ষ্মীছাড়ার এখানে ঠাঁই হবে না। এখানে যদিও সয়তানের দুঃখ নেই, কিন্তু তুমি এলে হবে সকলের বাড়া—আর এসেই সকলকে জ্বালিয়ে মারবে।—না না বাপু, তোমার এখানে এসে কাজ নেই।"

দূত বল্‌ল, "তা হ'লে এখন উপায়? এরা ত দেখ্‌ছি তোমায় নিতে নারাজ, কিন্তু তোমায় ত আর পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না?"

"ভাল, আমায় কেন তা হ'লে স্বর্গে নিয়ে যাও না?"

"হ্যাঁ, যেমন ক'রে হোক একবার তারই চেষ্টা দেখ্‌তে হচ্ছে—" এই বলে' দেবদূত থাম্‌ল। কাজেই আবার তারা সেই সুন্দর রাস্তাটি ধ'রে ফিরে গেল আর ওপরে শেষ সীমানায় এসে একটা সরু দরজা পার হয়ে এগোতে লাগ্‌ল। যতই তারা সেই সরু পথটা ধ'রে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল ততই সেটা খাড়া হ'তে লাগ্‌ল। শেষকালে তারা স্বর্গের সোনার দরজার সাম্‌নে এসে পৌঁছাল। নীল আকাশের মিষ্টি বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা দেবকন্যাদের মধুর গানের শব্দ তারা সেখান থেকে শুন্‌তে পেলে। স্বর্গের দুয়ার খোলাই ছিল, আর দেখা গেল যে সেণ্ট্‌ পিটার নূতন লোকদের অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও যাই বুড়োকে দেখ্‌লেন, অমনি চট্‌ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "ওরে বোকা, তোর এখানে আস্‌বার সুন্দর সুযোগ থাক্‌তেও তুই তা অবহেলায় হারিয়েছিস, এখন আর তোকে আমি ভেতরে আন্‌ছি না।"

বুড়ো বেচারা কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে' শেষে দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা মেরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ও ভাই পিটার, যদি তুমি আমায় ভেতরে যেতে একান্তই না দেও, অত্যন্ত দয়া করে' একবার আমায় ফটকের ফাঁক দিয়ে ভেতরটা দেখ্‌তে দাও।"

সেণ্ট্‌ পিটার ভাবলেন, 'ভালই হল, বুড়ো একবার স্বর্গের অতুল সৌন্দর্য্য দেখে' বুঝুক যে ও কি জিনিষ হারিয়েছে। এই ওর উপযুক্ত শাস্তি হবে।'

এই ভেবে পিটার ফটকের একটা জানলা খুলে দিলেন আর বুড়োও অমনি তাতে মাথা গলিয়ে বেশ ক'রে চারিদিক দেখতে লাগল। খানিক পরে যেন অতর্কিতভাবে টুপীটা পড়ে গিয়েছে এই ভান করে' মাথা থেকে টুপীটা ফটকের ভেতর দিকে মাটীর ওপর ফেলে' দিয়ে ব'লে উঠল, "ও পিটার, দেখ আমার টুপীটা ওদিকে প'ড়ে গিয়েছে। ভাই, বুড়ো মানুষ আমি, যদি এ বাতাসের মধ্যে খালি মাথায় থাকতে হয় ত ঠাণ্ডা লেগে অমনিই সর্দ্দি হবে।"

সেণ্ট্ পিটার বুড়োর তৃতীয় অভিলাষের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কাজেই তিনি ব'লে উঠলেন, "কে বাপু তোমার ও ময়লা তেলচিটে টুপীটা ছুঁতে যাবে? যাও না, নিজে গিয়ে নিয়ে এসো। দরজা খুলে দিচ্ছি।"

বুড়োও ত তাই চায়। তাই যেই দেখল যে সেণ্ট্ পিটার দরজা খুলে দিয়েছেন, অমনি গিয়ে সে টুপী পেতে চেপে বসল। আর তাকে পায় কে? সে ত আর নড়বার নামটিও করে না—এই না দেখে সেণ্ট্ পিটার গিয়ে উপর-ওয়ালার কাছে নালিশ করলেন। কিন্তু ফল হলো এই যে যীশু বললেন, "যাই বল পিটার, বুড়ো যখন পৃথিবীতে ছিল, তখন নেহাৎ মন্দ ছিল না। সেখানে বেশ সাধুতার সঙ্গেই কাজ করেছে, কাউকে ঠকায়নি। লোকটা যদিও বড় বেশী বকবক করত কিন্তু কখনও মিথ্যে কিছু বলেনি। তাই বলি ওকে স্বর্গে রাখতে আর মানা কি? তা ছাড়া বুড়ো তার সুশীলা স্ত্রী বেচারীকে স্বর্গে দেখলে বড়ই খুসী হবে। কারণ সে বেচারীও তার স্বামীর আশাপথ চেয়ে এই সুদীর্ঘকাল বড়ই উদ্বেগে কাটিয়েছে।"

উপর থেকেই যখন এ কথা মঞ্জুর হয়ে গেল তখন পিটার তাকে স্বর্গে রাখতে বাধ্য হলেন। আর কামারও এমনি করে' দিব্বি তার স্বর্গারোহণ পর্ব্ব শেষ করল।

শ্রীরেণুকণা দেবী।

* Bruhl সাহেব লিখিত Three Old German Folk-tales হইতে Village Blacksmith এর ভাবানুবাদ। (Vide Calcutta Review, January 1922.)

দ্বিধাতু-পরিমাণ ও গ্রেস্‌হামের নিয়ম

আদর্শ ও নিদর্শক মুদ্রা।

প্রত্যেক দেশেই একটি বা একাধিক প্রধান ধাতুমুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অপ্রধান ধাতুমুদ্রাও (Subsidiary Coins) চলিয়া থাকে। যেমন ইংলণ্ডে প্রধান ধাতুমুদ্রা গিনী এবং অপ্রধান ধাতুমুদ্রা শিলিং পেন্স্ ইত্যাদি। প্রধান ধাতুমুদ্রাগুলি অধিক মূল্যের হয় বলিয়া অল্প মূল্যের বিনিময় দুই-চার পয়সার কাজ সুবিধামত চালাইবার জন্য কতকগুলি অল্পমূল্যের অপ্রধান ধাতুমুদ্রার প্রয়োজন। অর্থনীতির ভাষায় প্রধান ধাতুমুদ্রাকে বলে 'আদর্শমুদ্রা' (Standard Coin) এবং অপ্রধান ধাতুমুদ্রার নাম 'নিদর্শকমুদ্রা' (Token Coin)। আদর্শমুদ্রার মুদ্রামূল্য এবং উহার মধ্যে যতটা ধাতু থাকে তাহার মূল্য এই দুই-এর মধ্যে সমতা থাকে। এই সমতা বজায় রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এরকম ব্যবস্থা করেন যাহাতে আদর্শমুদ্রার জোগান্ নির্ভর করে দেশবাসীর প্রয়োজন ও ইচ্ছার উপর। এই ব্যবস্থানুসারে যে-কেহ টাঁকশালে ধাতু পাঠাইয়া সেই মূল্যের মুদ্রা পাইতে পারে। ইহাতে ফল হয় এই যে, আদর্শমুদ্রার মধ্যে যতটা ধাতু আছে তাহার বাজার-দরের সঙ্গে মুদ্রামূল্যের যদি বেশ-কম হয় তাহা হইলে ঐ মুদ্রার জোগান্ও বাড়ে বা কমে। গিনী ইংলণ্ডে আদর্শমুদ্রা। উহার মধ্যে বিশুদ্ধ সোনা আছে ২৩·২২ গ্রেন্। মনে করুন, কোনো কারণবশতঃ যদি সোনার দর এতটা চড়িয়া যায় যে, গিনীর ভিতর যতটা সোনা থাকে তাহার মূল্য গিনীর মুদ্রামূল্যের চেয়েও বেশী হয়, তাহা হইলে লোকে তখন গিনী অর্থহিসাবে ব্যবহার না করিয়া গলাইয়া ওজন-দরে সোনা হিসাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে গিনীর জোগান্ কমিয়া যাইবে। অন্যান্য বস্তুর মতো মুদ্রার জোগানও যদি প্রয়োজনের চেয়ে কমে তবে উহার মূল্য বাড়িয়া যায়। ঐ অবস্থায় গিনীর জোগান্ও হঠাৎ কমিয়া যাওয়ায় গিনীর মূল্য আবার

বাড়িবে; এবং গিনীর মুদ্রামূল্য ও ধাতুমূল্যের মধ্যে শীঘ্রই সমতা স্থাপিত হইবে।

নিদর্শকমুদ্রা (Token Coin) প্রধান বা আদর্শ মুদ্রার অংশ-বিশেষের মূল্যজ্ঞাপক। নিদর্শকমুদ্রার মূল্য উহার মধ্যে যে-পরিমাণ ধাতু থাকে তাহার মূল্যের চেয়ে বেশী। সিকি আমাদের দেশে একটি নিদর্শক মুদ্রা। উহার মধ্যে যে পরিমাণ রূপা আছে তাহার মূল্য চারি আনার কম, অথচ সিকি কাজ চালায় চারি আনার।

চলতসিক্কা (Legal Tender Money)।

সাধারণতঃ এই প্রধান বা আদর্শ ধাতুমুদ্রার মধ্য হইতেই একটি বা একাধিক ধাতুমুদ্রা চলতসিক্কা (Legal Tender Money) বলিয়া চলে। কাগজের অর্থ (Paper Money) যে চলতসিক্কা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু সকলপ্রকার কাগজের অর্থ সব দেশে সব সময়ে চলতসিক্কা বলিয়া চলে নাই, চলেও না। যাহা হউক, সে-সব বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা যাইবে। এখন চলতসিক্কার প্রকৃতি কি তাহাই বুঝা যাউক। যে অর্থে চলতসিক্কা (Legal Tender Money) তাহা দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা যায়—সে ঋণ যত বেশী পরিমাণেরই হউক না কেন—তাহা হইলে ওই ঋণ-পরিশোধ আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। মনে করুন, আপনার নিকট হইতে আমি এক লক্ষ টাকা ধার করিয়াছি। এখন শুধু এক-আনি দিয়া যদি আমি এই এক লক্ষ টাকার ঋণ শোধ করিতে চাই তাহা হইলে আপনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, এবং দেশের আইনও তজ্জন্য আপনাকে দণ্ড দিতে পারে না। কারণ এক আনির যোগে দায়-আদায়ের আম হুকুম (unlimited tender) নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে টাকা অথবা গিনী অথবা গবর্ণমেণ্ট নোট দ্বারা ওই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। নিদর্শকমুদ্রা যদি ব্যবহার করিতেই হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে একটাকা মূল্যের পর্যন্ত এই-সকল মুদ্রা দিতে পারা যায়; একটাকার অধিক নিদর্শকমুদ্রা লইতে কেহ আইন অনুসারে বাধ্য নহে। তাহাতে খাতক বা মহাজন কেহই আপত্তি করেও না এবং করিলেও সে আপত্তি টিকিবে না, আইন অনুযায়ী প্রধান মূল অর্থ (Standard Money) দ্বারা যে-কোন পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা যায়; কিন্তু নিদর্শক-মুদ্রা দ্বারা (Subsidiary Coins) কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেনা-পাওনাই মিটান যায়। যেমন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য ডলার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা যায়; কিন্তু অর্দ্ধডলার প্রভৃতি নিদর্শকমুদ্রা দ্বারা কেবল ১০ ডলার পর্য্যন্ত দেনা-পাওনা আইন অনুসারে মিটান যাইতে পারে। উহা দ্বারা তদপেক্ষা বেশী ঋণ পরিশোধ করিতে গেলে মহাজন তাহা গ্রহণ করিতে আইনত বাধ্য নহে। ইংলণ্ডে সোভারেন্ বা গিনী দিয়া যে-কোন পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা চলে; কিন্তু সিলিং প্রভৃতি মুদ্রা কেবল দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত নিতে লোকে বাধ্য। আমাদের দেশেও গিনী চলতসিক্কা। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে টাকা আদর্শমুদ্রা নহে, কারণ উহার মধ্যে রূপা থাকে প্রায় দশ-আনি, কিন্তু প্রত্যেকটি টাকা কাজ চালায় ষোল আনার। আদর্শমুদ্রা না হইলেও টাকা ও আধুলি এই দুইটি রৌপ্যমুদ্রা আমাদের দেশে চলতসিক্কা। সিকি, দুয়ানি, এক আনি, পয়সা ইত্যাদি নিদর্শকমুদ্রা।

দ্বিধাতু-পরিমাণ (Bimetallism)।

যদি কোনও দেশে দুই ধাতুর মুদ্রাই একই সময়ে চলিতসিক্কারূপে আইন অনুসারে প্রচলিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে দ্বি-ধাতু-পরিমাণ (Bimetallism) বলে। কোনও দেশে দ্বি-ধাতু-পরিমাণ প্রচলিত থাকিলে দেশবাসী যে-কেহ টাঁকশালে রূপা অথবা সোনা পাঠাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে সেই মূল্যের মুদ্রা পাইতে পারে, এই ব্যবস্থা অনুসারে একজন টাঁকশালে রূপা দিয়া যেমন তাহার পরিবর্ত্তে সেই মূল্যের মুদ্রা পাইতে পারে তেমনি স্বর্ণের মালিকও টাঁকশালে সোনা দিয়া তাহার বিনিময়ে মুদ্রা আনিতে পারে। আর স্বর্ণমুদ্রাই হউক, অথবা রৌপ্যমুদ্রাই হউক, দুই ধাতুর মুদ্রাই চলতসিক্কা বলিয়া গণ্য হয়; অর্থাৎ যত বেশী পরিমাণেরই ঋণ হউক না কেন, উহার যে-কোন একটি অথবা উভয় মুদ্রা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করা আইনসম্মত হইবে। স্বাধীনভাবে টাঁকশালে রূপা অথবা সোনা পাঠাইয়া মুদ্রা তৈয়ার করাইয়া আনিতে পারা এবং উভয়বিধ ধাতুমুদ্রাই

পুরা চলতসিক্কা বলিয়া গণ্য হওয়া এই দুইটি দ্বি-ধাতু-পরিমাণের বিশেষত্ব।

দ্বি-ধাতু-পরিমাণের প্রচলন হইলেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে, যে, বাজারে সোনা ও রূপার দামের মধ্যে যে তারতম্য, ঠিক সেই অনুপাতেই টাঁকশালে সোনা ও রূপার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নির্ম্মিত হয় কি না? টাঁকশালে ১৬ আউন্স রূপা দিলে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়, এক আউন্স সোনার পরিবর্ত্তেও যদি ঠিক সেই মূল্যের মুদ্রাই মিলে; আবার ধাতু-হিসাবে, বাজারে ১৫ আউন্স রূপা ও এক আউন্স সোনার দাম যদি সমান হয়, তাহা হইলে কেহই আর টাঁকশালে রূপা দিয়া মুদ্রা চাহিবে না। রূপা তখন মুদ্রা হিসাবে বেশী মূল্যবান না হইয়া ধাতু-হিসাবে অধিকতর মূল্যবান হইবে। এই অবস্থায় টাঁকশালের কাছে রূপার মূল্য কম হইল, এবং সোনার দর বাড়িল, কিন্তু বাজারে তখন রূপার দামই বেশী, সোনা সস্তা। আবার, টাঁকশালে যখন রূপা ও সোনার সম্বন্ধ ১৬ : ১ অর্থাৎ ১৬ আউন্স রূপা দিলে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়, ১ আউন্স সোনার বিনিময়েও ঠিক সেই পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যায়, তখন যদি বাজারে ১৭ আউন্স রূপার দর এক-এক আউন্স সোনার মূল্যের সমান হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে কেহ আর টাঁকশালে সোনা দিয়া মুদ্রা চাহিবে না; কারণ, তখন টাঁকশালের হিসাবে সোনার চেয়ে রূপার দাম বেশী হইলেও বাজারদর অনুসারে রূপাই সস্তা এবং সোনার দাম বেশী। এই অবস্থায় আমি যদি টাঁকশালে ১ আউন্স সোনা দেই তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে যতগুলি মুদ্রা পাইব, ১৬ আউন্স রূপা দিলেও ঠিক ততগুলি মুদ্রাই পাইতে পারিব। কিন্তু, সেই এক আউন্স সোনা টাঁকশালে না দিয়া আমি যদি তাহা বাজারে বিক্রয় করি তবে উহার পরিবর্ত্তে ১৭ আউন্স রূপা পাইব। আমি তখন এই ১৭ আউন্স রূপা টাঁকশালে দিয়া ১৬ আউন্স রূপা দিয়া যতগুলি মুদ্রা পাইতাম তাহার চেয়ে কিছু বেশী মুদ্রা নিশ্চয়ই পাইব। এই যে কিছু বেশী মুদ্রা পাইলাম, এইটাই আমার লাভ। এইরকম প্রায় সকলেই লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ান করিয়া সোনা বিক্রয় করিবে বাজারে, আর রূপা কিনিয়া আনিয়া টাঁকশালে দিবে মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া দিতে। তাহার ফলে এই দাঁড়াইবে যে, দেশের অর্থের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা আর তখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—রৌপ্যমুদ্রারই হইবে প্রাধান্য। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, যখন কোনো দেশে দুই ধাতুর মুদ্রা একসঙ্গে চলতসিক্কারূপে প্রচলিত থাকে, তখন টাঁকশালে ঐ দুই ধাতুর মূল্য যে হারে নির্দ্দিষ্ট হয়, সে মূল্য যদি উহাদের বাজারদরের সঙ্গে না মিলে, তাহা হইলে, বাজারদরে যে-ধাতুটি সস্তা সেই ধাতুর মুদ্রাই দেশে চলিতে থাকে, আর অপর ধাতুর মুদ্রা ক্রমশঃ সরিয়া পড়ে।

গ্রেস্‌হামের নিয়ম।

রাণী এলিজাবেথের বাণিজ্যবিষয়ক পরামর্শদাতা স্যর টমাস গ্রেস্‌হাম (Sir Thomas Gresham) ঐ-সকল ঘটনা হইতে একটি নিয়ম আবিষ্কার করেন। ইহাকে গ্রেস্‌হামের নিয়ম (Gresham's Law) বলে। ইহা তাঁহারই আবিষ্কৃত নিয়ম মনে করিয়া তাঁহার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ম আবিষ্কারের প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে। তাঁহার বহুপূর্ব্বে পণ্ডিতগণ এই নিয়মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিনি কেবল সুস্পষ্ট করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান এইমাত্র।

গ্রেস্‌হামের নিয়মটি এই—

যে দেশেই দুই ধাতুর মুদ্রা একসঙ্গে চলতসিক্কা বলিয়া প্রচলিত সেই দেশেই মানুষ ঐ দুইরকম মুদ্রার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত মন্দ সেই অর্থ দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালায়, আর ভাল অর্থ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

এখানে "মন্দ অর্থ" ও "ভাল অর্থ" দ্বারা আদর, ওজন, ও মূল্য এই তিনের যে-কোনটির হিসাবে ভাল বা মন্দ বুঝিতে হইবে।

হঠাৎ শুনিতে এই নিয়মটি একটি ধাঁধা বলিয়া মনে হয়। অনেকেই হয়তো বলিবেন, চিরকালই তো শুনিয়া আসিতেছি এবং দেখিতেছিও যে, লোকে মন্দ জিনিষটি ত্যাগ করিয়া ভালটি দ্বারা কাজ চালায়, উৎকৃষ্ট যেটি সেইটিই আদর করিয়া রাখে। আপনি আবার এ কি ছৃষ্টিছাড়া নিয়মের কথা আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানকালে

সমাজে শ্রমের স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা আছে। এখন সমাজের ভিত্তি এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষ সকল অবস্থাতেই তাহার অভাব সুন্দররূপে পূরণ করিতে পারে এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ পছন্দ করিয়া থাকে। তবে অর্থের বেলা কেন মানুষ উল্টা ব্যবহার করিবে?"

অর্থ ও ভোগ্য ধনের মধ্যে পার্থক্যটা মনে রাখিলে এই ধাঁধা পরিষ্কার হইবে। দুইটি কমলালেবুর মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট তাহাই লোকে ব্যবহার করিতে চাহে, এবং টক লেবুটি পরিত্যাগ করে, ইহা সত্য। কিন্তু অর্থ আমার সোজাসুজি ভাবে ভোগের জন্য নহে। তবে উহা ব্যবহার করি কেন? হয়তো বিনিময়ের জন্য দোকানদারকে অথবা বণিককে দিব বলিয়া, নচেৎ ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজনকে দিব মনে করিয়া। কাজেই ভাল ও খারাপ এই দুই প্রকার অর্থের মধ্যে যেটা দ্বারাই কাজ সম্পন্ন করি না কেন তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে ভাল অর্থ দ্বারা যে কাজটি চলে সেটি যদি খারাপ অর্থ দ্বারাও ঠিক একই ভাবে চলিয়া যায়, এবং সে অবস্থায় মন্দ অর্থ দ্বারা অর্থের কাজ চালাইলে যদি কিছু লাভ হয়, তাহা হইলে খারাপ অর্থ ব্যবহার না করিয়া ভাল অর্থ ব্যবহার করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কি? সুতরাং এরূপ স্থলে মানুষ ভাল অর্থ হাতে রাখিয়া খারাপ অর্থ দ্বারাই কাজ চালাইয়া থাকে। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, ভাল ও খারাপ এই দুইপ্রকার অর্থেরই সমভাবে কাজ সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক বণিক অথবা মহাজন ভাল ও খারাপ এই দুইপ্রকার অর্থই গ্রহণ অস্বীকার করিতে না পারে এরূপ হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এই দুইপ্রকারের অর্থই চলতসিক্কা (legal tender) হওয়া দরকার।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, চলতসিক্কার মধ্যে ভাল ও মন্দ দুইরকম থাকিলে ভাল অর্থের পরিবর্ত্তে খারাপটা দিয়া কাজ চলে ইহা না-হয় বুঝিলাম। কিন্তু ভাল অর্থ যে অর্থরূপে ব্যবহৃত না হইয়া ক্রমশঃ সরিয়া পড়ে, তাহা যায় কোথায়? ইহা তিন উপায়ে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে—

১। সঞ্চয় (Hoarding)।

২। বিদেশে প্রেরণ (Payments abroad)।

৪। ওজন করিয়া বিক্রয়।

১। সঞ্চয়।—মানুষ যখন ভবিষ্যতে বিপদের সময়ে ব্যবহারের জন্য, অনাগত প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তখন বাছিয়া ভাল অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে আর খারাপ অর্থ দিয়া বর্ত্তমানের কাজ চালায়। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফরাসী দেশে যাহারা সম্মুখে বিপদ দেখিয়া অর্থসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল তাহারা স্বর্ণমুদ্রাই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনকার সে-দেশের কতাদর কাগজের অর্থ—আসিগ্না (assignat) সঞ্চয় করে নাই। এই য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পর আমাদের দেশেও লোকে টাকা বা গিনি হাতছাড়া করিতে চাহে নাই, গভর্ণমেণ্ট-নোট দিয়াই কাজ চালাইয়াছে। আর যাঁহারা বেশী হিসাবী তাঁহারা প্রথম হইতেই টাকার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা বা গিনি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভাল অর্থের অর্থরূপে ব্যবহৃত না হইবার এই কারণটি ক্ষণস্থায়ী।

২। বিদেশে প্রেরণ।—দেশের অভ্যন্তরে ঋণ পরিশোধ খারাপ অর্থ দ্বারাও যেমন চলিতে পারে, ভাল অর্থ দ্বারাও ঠিক তেমনি ভাবে চলে। কিন্তু বিদেশের বণিক বা মহাজনকে যদি ধাতুমুদ্রা দিতে হয় তাহা হইলে সে তো আমার জাতীয় মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে না। সে তখন মুদ্রাতে যতটা ধাতু আছে, বাজার-দর অনুসারে তাহার যাহা মূল্য হয় সেই হিসাবে উহা গ্রহণ করিবে। কাজেই, যে-সকল মুদ্রা ব্যবহার করিতে করিতে অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে—তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে কাজ চালাইবার জন্য রাখিয়া নূতন ভারি মুদ্রা দ্বারা বিদেশের বণিকের বা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করাই লাভজনক। এইরূপে ভাল মুদ্রাগুলি দেশের টাকার বাজার হইতে সরিয়া পড়ে।

৩। ওজন করিয়া বিক্রয়।—যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন পুরানো বড় কাগজের দর ছিল সের-প্রতি দুই আনা, তখন কলিকাতা প্রভৃতি সহরে দৈনিক সংবাদপত্রের কোনো কোনো হিসাবী গ্রাহক তাড়াতাড়ি কাগজখানি পড়িয়া সেই দিনই অর্দ্ধমূল্যে কোনো সংবাদপত্রের ফেরিওয়ালার নিকট

বিক্রয় করিয়া দিতেন, ওজন করিয়া পুরানো কাগজ হিসাবে বিক্রয় করিতেন না। কারণ তখন 'সংবাদপত্র' হিসাবে কাগজখানা বিক্রয় করাই লাভজনক ছিল, কাগজ হিসাবে নহে। এখন পুরানো বড় কাগজের দর চড়িয়া প্রায় সের-প্রতি পাঁচ আনা হইয়াছে। কাজেই এখন আবার সংবাদপত্রখানা প্রতিদিন সংবাদপত্র হিসাবে বিক্রয় করা অপেক্ষা পুরানো কাগজ হিসাবে বিক্রয় করাই লাভজনক। কলিকাতায় অনেকে এখন এইরূপই করিয়া থাকেন। অর্থের বেলাও ঠিক তাহাই। আমাদের দেশের রূপার টাকার ভিতরে রূপা থাকে প্রায় দশ-আনি, কিন্তু প্রত্যেকটি টাকা দেশে কাজ চালায় ষোল আনার। মনে করুন, কোন কারণ বশতঃ যদি রূপার দর এতটা চড়িয়া যায় যে, টাকার ভিতরে যতটা রূপা থাকে তাহার মূল্য ষোল আনার চেয়েও বেশী হয়, তাহা হইলে লোকে তখন টাকা—টাকা-হিসাবে ব্যবহার না করিয়া, গলাইয়া ওজন-দরে রূপা হিসাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। গলাইয়া ওজনদরে টাকা বিক্রয় করিবার বেলা লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার করিতে করিতে যে সকল টাকা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে তাহা না গলাইয়া, নূতন ভারি টাকাই গলাইয়া থাকে। এইরূপে অনেক ভাল টাকা অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

নিম্নলিখিত তিন অবস্থাতে গ্রেসহামের নিয়ম পরিলক্ষিত হয়:—

(ক) ব্যবহার করিতে করিতে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এরূপ মুদ্রার সহিত দেশে যখন নূতন মুদ্রা চলিতে আরম্ভ করে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, নূতন মুদ্রা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে।

(খ) যখন হতাদর কাগজের অর্থের (Depreciated Paper Money) সহিত ধাতুমুদ্রা চলে, তখন দেশের ভিতরে অর্থের কাজ চালাইবার জন্য কাগজের অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায়; ধাতুমুদ্রা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ে।

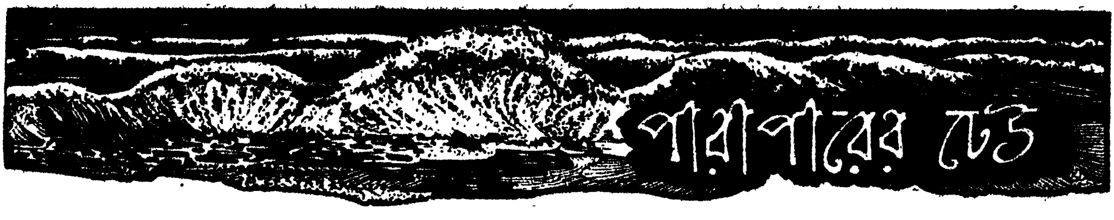
(গ) যখন হাল্কা মুদ্রার সঙ্গে ঠিক ওজনের মুদ্রা, অথবা শেষোক্ত মুদ্রার সহিত তদপেক্ষা ভারি মুদ্রা চলিতে আরম্ভ করে, তখন হাল্কা মুদ্রা ভারি মুদ্রাকে তাড়াইয়া দেয়। যে দেশে দ্বি-ধাতু-পরিমাণ (Bimetallism) আছে সেই দেশে আমরা এই অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

স্বপন

ঘুমের তিমির তুব্‌ড়ি থেকে
ঝর্‌চ আলোর ফুলঝুরি,
ফুট্‌চ তুমি কালোপাতার
আব্‌ডালে লাল ফুল-কুঁড়ি!
বন-মেহেদির মন-গোপনে
ফাগ-ফল্গুর তুই ধারা,
কাজল-পরা সাঁঝের চোখে
উঠিস্ জ্বলে' তুই তারা!
স্বপন তুমি ফাগুন-মায়া
লুকিয়ে থাকো চুপ করে'
কোন্ তুষারে কুজ্ঝটিকায়,—
হঠাৎ হাসো রূপ ধরে'!
স্বপন তুমি সাগরিকা,
নিশীথ-সাগর-জল-তলে
ঘুমিয়েছিলে,—জাগলে পরী,
প্রবাল-পাখা জ্বল্‌জ্বলে!
স্বপন তুমি সোনার স্বপন,—
স্বপন তুমি সুখ-রাণী,—
ছটায় দীপ্ত কর
বদ্ধ-দুয়ার বুকখানি!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী



ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের পর প্রলয়ের লেলিহান জিহ্বা ইউরোপের ধনসম্পদ ও কাত্রশক্তির প্রায় সবটুকুই গ্রাস করিয়াছে। ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার অবসানে যাহা-কিছু বাকি রহিয়া গিয়াছে তাহাকে বাড়াইয়া ইউরোপে নবজীবন সঞ্চারের যে বিপুল প্রয়াস চলিয়াছে তাহা সার্থক না হইলে ভবিষ্যতে জগতের ভাগ্যে কত দুঃখ-দুর্দ্দশাই যে আছে তাহার সন্ধান কে বলিবে? ইউরোপের ভাগ্যাকাশের এক কোণে যেমন আশার অরুণ-রেখা দেখা যাইতেছে তেমনই অন্য কোণে কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছে। একদিকে নূতন পথে নব যাত্রার আয়োজন যেমন নব উদ্যমে বিপুল বেগে চলিতেছে, অন্যদিকে দ্বেষ হিংসা পরশ্রীকাতরতা জাগিয়া অন্যকে হীন করিয়া নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইউরোপের রাজ্যগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিবার যোগাড় করিতেছে। নূতন চিন্তা, ও নব প্রচেষ্টা নবশক্তির সঞ্চারে যেমন ইউরোপকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করাইয়া মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়া তুলিতে চাহিতেছে তেমনই শক্তি পিপাসায় আর্ত্ত রাজ্যলোলুপ স্বার্থান্ধ ইউরোপ বিমূঢ় হইয়া যে হলাহল পান করিতেছে তাহাতে মৃত্যুবিষে ইউরোপের সর্ব্বদেহ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মধ্য-ইউরোপকে বল্‌কানিভূত (Balkanized) করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন; অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী বল্‌কান-রাজ্যসমূহ নিজের তাল রাখিতে না পারিয়া যেরূপ বেতালা (Unstable) হইয়া আছে, মধ্য-ইউরোপকে সেইরূপ বেতালা করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। যুগোস্লাভিয়া, জেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও পোলাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা এবং খনিজ ধনসম্পদের অধিকার লইয়া নানা গণ্ডগোলের অবকাশ রহিয়া যাইবার সুযোগ রাখিয়া দেওয়াতে ইহাদের সুরসঙ্গতি জমিয়া উঠে নাই। যেসব রাজনীতিধুরন্ধর শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এত সন্ধি সর্ত্ত ও এত আলোচনা-সভা গড়িয়া তুলিলেন তাঁহাদের দৃষ্টি কি এইগুলি এড়াইয়াছিল, না ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার অজুহাতে নিজের লাভের গণ্ডাটির প্রতি ঝোঁক এ সব মীমাংসার মূলে থাকায় এত গণ্ডগোলের কারণ রহিয়া গিয়াছে? চতুর্ধুরন্ধরের সভা (Council of Four), দশপ্রধান সভা (Council of Ten), দেশশ্রেষ্ঠের প্রধান মন্ত্রণা-সভা (the Supreme Council), অমাত্য-মন্ত্রণা-সভা (the Conference of Ambassadors), শক্তিবর্গের প্রধানমন্ত্রীবর্গের সভা, জাতিসমূহের সংঘ প্রভৃতি কত সভা, ভার্সাই, সেণ্ট জার্ম্মেন (St. Germain), নিউলি, সেভার্স প্রভৃতি কত সন্ধিসর্ত্ত, ম্যাণ্ডেট বা খবরদারী, স্বসংকল্প (Self determination), গণমত (Plebescite) প্রভৃতি কত রাজনৈতিক আদর্শ—এ-সকলকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে কোন্ বিষে? ইহা বুঝিতে হইলে যুদ্ধাবসানের পর হইতে যে-সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ইউরোপে ঘটিয়াছে তাহাকে একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার বিষক্রিয়াকে খর্ব্ব করিয়া যে-সকল মৃতসঞ্জীবনী সুধা ইউরোপকে অক্ষয় যৌবনে পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে, সেই বিপুল প্রয়াসের অন্তরালে যে-সকল শক্তির প্রবাহ বহিতেছে তাহার পরিচয়টি না লইলেও বর্ত্তমান যুগসমস্যা বুঝা যাইবে না। তাই ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ইউরোপ আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া এক কথায় সকল উড়াইয়া দিলেও চলিবে না, বা নব জাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছে বলিয়া স্তোকবাক্যে আপনাকে ভুলাইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেও চলিবে না। এই সমস্যা সম্মুখে রহিয়াছে; সাধ্য মত ইহাকে বুঝিয়া পরখ করিয়া দেখিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতি উইল্‌সনের মহাবাণী চৌদ্দ দফায় ঘোষিত হইল। মিত্রশক্তিবর্গ সেই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করাতে সহজে সন্ধি হওয়া সম্ভবপর হইল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে কোনও দফাকেই আমল দেওয়া হয় নাই।

উড্রো উইল্‌সন ঘোষণা করিলেন—"স্বসংকল্প রাজনৈতিক ফাঁকা আওয়াজ নহে। ইহা এমনিই একটি অবশ্যপ্রতিপালনীয় রাষ্ট্রনৈতিক মূলসূত্র যে রাজনীতিবেত্তাগণ ইহাকে অস্বীকার করিলে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কিত রাজ্যসম্বন্ধীয় সকল গোলযোগের মীমাংসা অধিবাসীবর্গের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। বিরোধী রাজ্যসমূহের মধ্যে একটা রফা-নিষ্পত্তি বা সরাসরি মীমাংসা দ্বারা ইহার শেষ নিষ্পত্তি সংসাধিত হইতেই পারে না।"*

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল রাজনৈতিক সুবিধাচারের অনুবর্ত্তন করিয়া প্রায় সকল সীমারেখা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অ্যালেনষ্টাইন, মারিয়েনবারডার, আপার সাইলিসিয়া, সেল্‌সউইগ, ইউপেন ও ম্যাল্‌মেডি ও অষ্ট্রিয়ার ক্লাগেনফুর্ট প্রদেশের অধিবাসীদিগের মতামত লইয়া তাহাদের ভাগ্য স্থির করা হইয়াছিল বটে কিন্তু আপার সাইলিসিয়া ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশগুলির প্রভাব বড়ই অল্প। বড় বড় রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনগুলি কিন্তু অধিবাসীবৃন্দের মতের অপেক্ষা রাখিয়া হয় নাই; মিত্রশক্তির সুবিধার দিক দেখিয়াই সেই পরিবর্ত্তনগুলি সংসাধিত হইয়াছে। আল্‌সেস্‌-লরেন, পশ্চিম প্রাসিয়া, পসেন, ড্যান্‌জিগ, টাইরল, স্লোভাকিয়া, ট্রান্সিল্‌ভেনিয়া প্রভৃতি স্থানসমূহ এইরূপ উদ্দেশ্যেই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। (Not only were the plebiscites few, but with the one exception of upper Silesia they were unimportant. The greater territorial changes and decisions, Alsace-Lorraine, West Prussia, Posén and Danzig, the whole reorganization of the Austrian Empire, the assignation of Tyrol to Italy, of Slovakia to the new Czech state, of Transylvania to Hungary were carried through by other methods—J. W. Headlam Morley.)

---

* Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle which statesmen will henceforth ignore at their peril. Every territorial settlement involved in this war must be made in the interest and for the benefit of the population concerned, and not as a part of mere adjustment or compromise of claims amongst rival states.—Woodrow Wilson.

টাইরল ও স্লাভবর্গের, অধিবাসীবর্গ অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর জার্ম্মানীর সহিত সম্মিলিত হইবার বাসনা জানাইয়াছিল। কিন্তু টাইরলকে ইটালীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। স্লোভাকিয়ায় জার্ম্মানজাতির আবাস; তাহারা জার্ম্মানীর সহিত যুক্ত হইতে চাহে। কিন্তু জার্ম্মান শক্তির পূর্ব্ব-অভিযান বন্ধ করিতে হইলে জেক জাতিকে শক্তিশালী করা দরকার। তাই স্লোভাকিয়াকে জেক রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। আল্‌সেস প্রদেশে জনমত গ্রহণ করিলে জার্ম্মানীর স্বপক্ষে বেশী ভোট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে সমগ্র আল্‌সেস্‌-লরেন প্রদেশ ফ্রান্সের পাওয়া চাই। তাই সেইখানে জনমত গ্রহণ করা হইল না। কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গের তরফ হইতে সবচেয়ে অবিচার করা হইয়াছে মণ্টিনিগ্রো রাজ্যের প্রতি। মণ্টিনিগ্রো মিত্রশক্তির সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল তবুও আশ্চর্য্য বীরত্বের সহিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি গ্রীসের অভিমুখে জার্ম্মান অভিযান বন্ধ করিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডকে রক্ষা করে। কিন্তু যুগোস্লাভিয়া রাজ্যকে পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত করা মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জোর করিয়া মণ্টিনিগ্রোকে যুগোস্লাভিয়া রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল (The compulsory termination of their independence and arbitrary abrogation of their national entity)। উড্রো উইলসন তাঁহার দশম দফায় বলিয়াছিলেন যে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর অধিবাসিবৃন্দের স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার সকল উপায় উন্মুক্ত রাখা হইবে (The peoples of Austria Hungary should be accorded the freest opportunity of autonomous development)। কিন্তু তাহা হইলে মধ্য ইয়ুরোপে একটি শক্তিশালী স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গড়িয়া উঠে; তাহাকে বেতালা করিয়া বল্‌কানরাজ্যসমূহের সামিল করা চলে না। আর অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী জার্ম্মানীর বন্ধু। জার্ম্মান শক্তিকে খর্ব্ব না করিলে পরম নিশ্চিন্তে পূর্ব্ব-ভূখণ্ড জোরদখল করা চলে না। পশ্চিম-প্রান্তিক এসিয়া ও জার্ম্মান-অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি বেড়া তোলা চাই। কাজে কাজেই বর্ত্তমান আকারে যুগোস্লাভিয়া ও জেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হইল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে অধিবাসীবৃন্দের জাতি অনুসারে এই রাজ্যগুলিকে সৃজন করা হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যায় যে মিত্রশক্তিরা জার্ম্মান-শক্তিকে খর্ব্ব করিবার মতলব সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যই ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং জার্ম্মান-শক্তিকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে পরাক্রান্ত করা প্রয়োজন হওয়াতে অনেকটা ভূখণ্ড ইহাদিগকে অন্যায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (There was a necessity for establishing a barrier between Germany and the Near East. Czecho-Slovakia and Jugo-Slavia were created apparently on the basis of nationality but really to play their part in support of an anti-German policy, even if that basis carried with it infringements of some of the tenets enunciated during the war. They were rewarded in a way not strictly justified by the avowed objects for which war was fought.—H. Charles Woods in The Truth about the Balkans" in the *Quarterly Review*.)

জার্ম্মানীর শক্তিকে খর্ব্ব করিবার উৎসাহে মিত্রশক্তিবর্গ যে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলেন তাহা ফিরিয়া মিত্রশক্তিবর্গকেই আহত করিয়াছে। উৎসাহের ঝোঁকে ফলাফল বিচার না করিয়া যে সব মীমাংসা করা হইয়াছিল তাহা যখন মিত্রশক্তিবর্গের কাহারো কাহারো লাভ আরও কাহারো কাহারো ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহাদের মনের মিল আর থাকে কি করিয়া? অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ বাড়াইয়াই তুলিতেছে। নিজকৃত অন্যায়ের বিষে আজ মিত্র-শক্তিবর্গ জর্জ্জরিত। তাই কান্ কন্‌ফারেন্স, জেনোয়া কন্‌ফারেন্স সকলই ব্যর্থ হইতে চলিল। কিন্তু মৃত্যুবিষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার বিপুল উদ্যোগও ইয়ুরোপে চলিতেছে।—সে সকলের পরিচয় ক্রমশঃ দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিসার

অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মরি,
　　কি মোহন সুর ধ্বনিয়া উঠিল ঐ!
আকাশ পাথার সুরের মায়ায় ভরি'
কে ভাসায়ে চলে অলক্ষ্য মায়াতরী,
কি জানি কাহারা নীল আকাশের গায়
　　করে কানাকানি উজলি' কনকবাতি,
অমৃত-পরশী অকাল দখিনা বায়
　　মোর কেশে বেশে কেন করে মাতামাতি!
পরাণের কূল ছাপিয়া উছলি' যায়
আকুল বাসনা নিখিল ভুবনে হায়,
আমার উতলা পরাণ উদাস করি'
　　কি বিরহ-গীতি রণিয়া উঠিল ঐ!
কোথা আছ তুমি কোন্ অচেনার পারে,
　　তারার আলোকে পাঠালে কি নিজ বাণী?

কোন্ ছায়াপথে কোন্ আলোকের দ্বারে,
দিবস-রজনী খুঁজিয়া ফিরিছ কারে?
আমি ত সেথায় তোমারি আশায় চাহি'
　　আঁধারে বিজনে প্রান্তরে বনে ফিরি;
ক্ষেপার মতন চলিয়াছি গান গাহি'।
　　—ছাইল আঁধারে কানন গগন গিরি।
উতলা আজিকে আকাশের যত তারা—
খুঁজে খুঁজে যারা ফিরেছিল দিশাহারা—
কি বারতা লভি' আজি তারা সারে সারে
ঝলিছে পুলকে নীল আকাশের পারে?
　　দখিনা বাতাস ব্যাকুল সুরভি-ভারে,
　　তারার আলোকে পাঠালে কি নিজ বাণী?
তাই বুঝি ঐ আঁধার-সিন্ধু-পারে
　　নিখিল ভুবন করে আজি কাণাকাণি!

শ্রীজীবনময় রায়।



থিয়েটারে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের অভিনয়—

সম্প্রতি আমেরিকার এক অভিনয়মঞ্চে এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সেখানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের অভিনয় করা হইয়াছিল। এই অভিনয়ের জন্য একটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ নির্ব্বাচিত করা হয় এবং তাহার এককোণে একটি ছোট পাহাড় তৈরী করা হয়। এই পাহাড়ের মুখে আবার আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মত একটি গহ্বরও তৈরী করা হয়। তারপর তাহার আশেপাশে ও উপরে নানা রকম যন্ত্রপাতি বসানো হয়। দর্শকদের বসিবার স্থান কিছু দূরে করা হয়। এবং বসিবার জায়গাগুলিতে চাকা দেওয়া ছিল; যখন আগ্নেয়গিরির অভিনয় হয় তখন সেগুলিকে বৈদ্যুতিক উপায়ে সরাইয়া লওয়া হয়। মঞ্চের একপাশে কতকগুলি কৃত্রিম বাড়ী তৈরী করিয়া রাখা হয়।

অভিনয় হইতেছে এমন সময় হঠাৎ দর্শকদের চেয়ারগুলি পিছু হটিয়া আসিল, এবং চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। মাটি জায়গায় জায়গায় হাঁ হইয়া গেল, যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। তার পরেই ভীষণ আওয়াজ এবং আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে পাথর, ধূলা, ধোঁয়া ও গলিতধাতু নিস্রবণ। সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম বাড়ীগুলির পতন! এই-সমস্ত মিলিয়া ব্যাপারটাকে একেবারে স্বাভাবিক করিয়া তুলে, গলিতধাতু বাহির হয় কতকগুলি পাইপের মধ্য হইতে বাষ্পীয় কলের সাহায্যে।

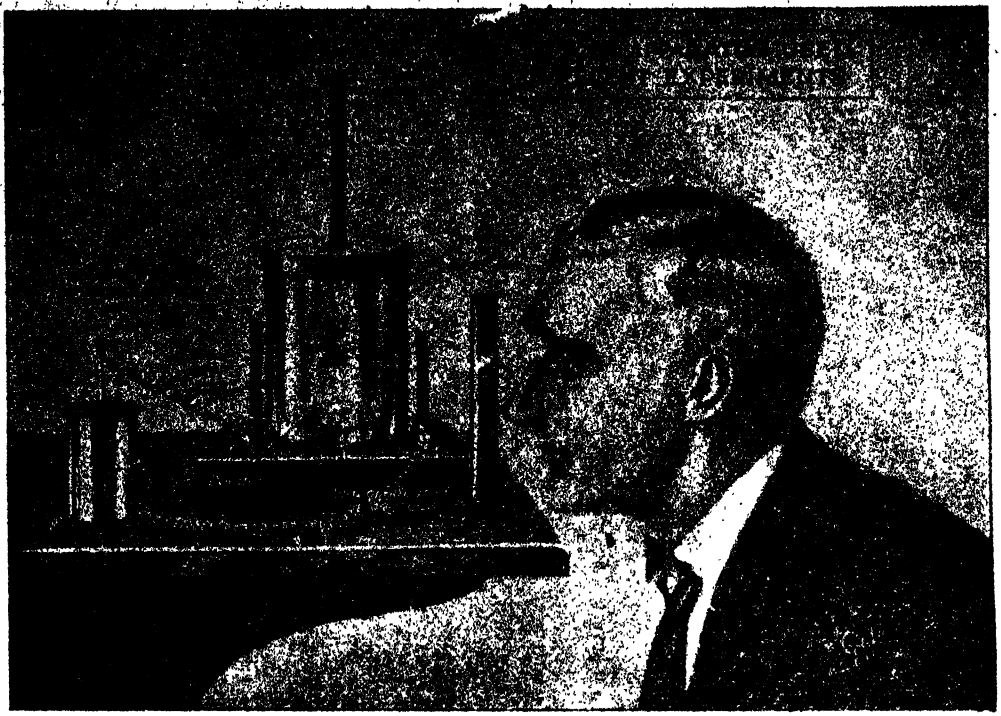
অনেকে বোধ হয় শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, গলিতধাতু চুনগোলা জল মাত্র। কৃত্রিম বাড়ীগুলি ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়া আগ্নেয়গিরির আগুনে আবার জ্বলিতে থাকে। মোটের উপর ব্যাপারটি অদ্ভুত



থিয়েটারে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের অভিনয়।

ছবির বাঁ দিকে উপরকার কোণে দেখানো হইতেছে, বড় বড় মাটির চাওড় টানিয়া সরাইয়া লইয়া কিরূপে ভূমিকম্পের সময়ের মত মাটি হাঁ করিয়া দেওয়া হয়।

বাঁ দিকে নীচেকার কোণে কৃত্রিম বাড়ী দেখা যাইতেছে। তাহাতে আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুস্রোত আসিয়া কেমন করিয়া পুড়াইতেছে তাহাও দেখানো হইতেছে।



ডাক্তার রসের যন্ত্রে দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা।

ঘটে। আমাদের দেশে এরূপ অভিনয় হইলে দর্শক খুব অল্পই জুটিত, কেননা পৈতৃক প্রাণটার উপরে আমাদের মায়া অসাধারণ।

—

চোখের দৃষ্টির রহস্যশক্তি—

মানুষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখদুটিই সবচেয়ে বিস্ময়াবহ। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় এই চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়া; আবার আমাদের নিজেদের মনের কত গভীর পরিচয় এই চোখ-দুটিতে প্রতিক্ষণ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চোখের যে স্বাভাবিক একটা জ্যোতি আছে, কবিত্বের দোহাই না দিয়াও একথা বলা চলিতে পারে; চোখের সম্মোহন-শক্তির পরিচয় লাভও হয়ত সকলেরই ভাগ্যে কখনো না কখনো ঘটিয়াছে। কিন্তু এসমস্ত ছাড়াও মানুষের চোখের দৃষ্টির মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য অচিন্তিতপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে, যে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে একটি জড় বস্তুকে স্থানচ্যুত করাও সম্ভব। ডাক্তার চার্লস্ রস নামক এক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের সাহায্যে এবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া চোখের এই অদ্ভুত শক্তিমত্তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাচের বাক্সের মধ্যে সুরক্ষিত, রেশমের সুতায় ঝুলানো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ধাতুফলকের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া দেখা গিয়াছে, ধাতুফলক পলক না পড়িতে নড়িয়া ওঠে।

—

হাঁটুওয়ালা কৃত্রিম পা—

হাঁটুর নীচে পা কাটিয়া গেলে কৃত্রিম পা পরিয়া সাধারণ লোকদেরই মতো চলাফেরা করা চলে, কিন্তু হাঁটুসুদ্ধ পা খোয়া গেলে কৃত্রিম হাঁটুওয়ালা পা পাইবার এতকাল কোনো ব্যবস্থা ছিল না; সম্প্রতি মানুষের পায়ের মাংসপেশীর অনুকরণে রবারের মতো সঙ্কোচনশীল পদার্থের টানায় ও অন্য কলকব্জার কৌশলে একরকম কৃত্রিম পা তৈরি হইয়াছে, ইহার সাহায্যে হাঁটুহীন লোকেরাও হাঁটুওয়ালা লোকদের মতো স্বচ্ছন্দ সহজ গতিতে চলিতে পারিবে। এই কৃত্রিম



হাঁটুওয়ালা কৃত্রিম পা।

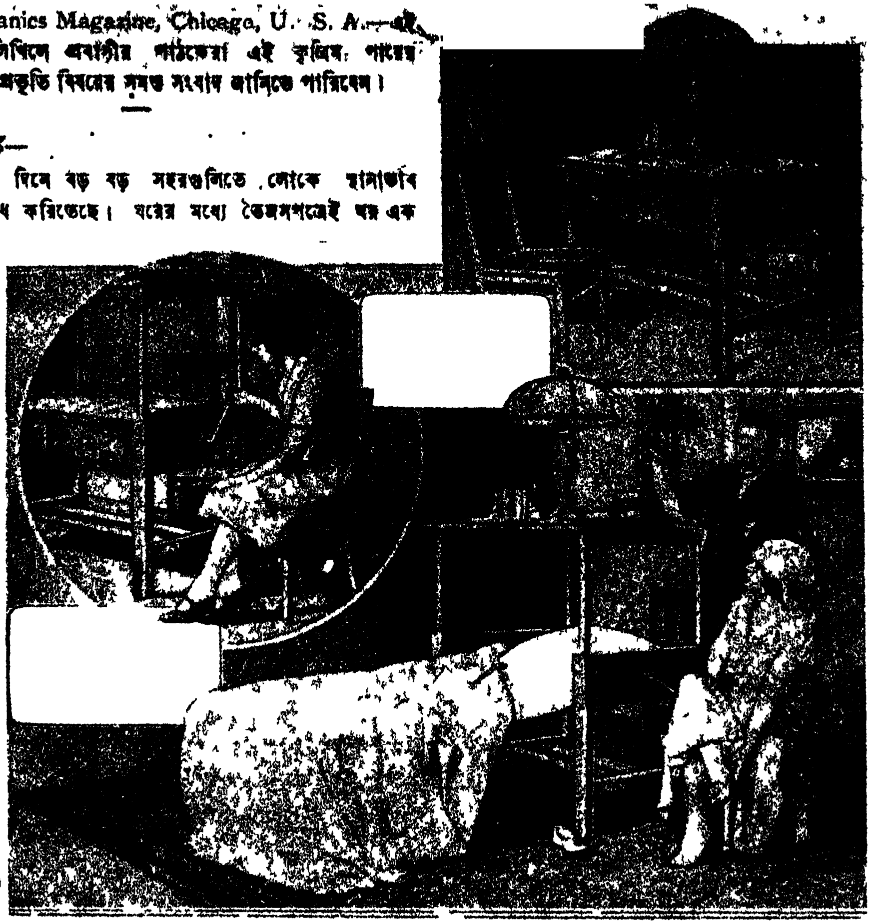
পায়ের উপর হইতে শরীরের ভর তুলিয়া লইলেই সঙ্কোচনশীল টানার টানে তার মাঝখানটা হাঁটুর মতন করিয়া মুড়িয়া মাটি হইতে উঠিয়া আসিবে, তারপর মাটিতে আবার ফেলিয়া ভর দিতে গেলেই ঋজু ও কঠিন হইয়া উঠিবে। Bureau of Information,

Popular Mechanics Magazine, Chicago, U. S. A.—এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে প্রবাসীর পাঠকেরা এই কৃত্রিম পায়ের মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি বিষয়ের সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন।

—

টেবিল-পালঙ্ক—

আজকালকার দিনে বড় বড় সহরগুলিতে লোকে স্থানাভাব বিশেষ করিয়া বোধ করিতেছে। ঘরের মধ্যে তৈজসপত্রেই ঘর এক



টেবিল-পালঙ্ক।

রকম বোঝাই হইয়া থাকে—আর নড়িবার চড়িবার স্থান বড় থাকে না। এক রকমের টেবিল-পালঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে কুঠরির মধ্যে অনেক স্থান বাঁচানো যাইতে পারে। টেবিলখানি দেখিতে একখানা এমনি টেবিলের মতই, তবে ইহার প্রত্যেক পায়ার মধ্যে আর-একটি করিয়া পায়া লুকানো থাকে। শুইবার ইচ্ছা হইলে লুকানো পায়াগুলি সমেত এই টেবিলের ডালাখানিকে একটা কলের সাহায্যে উপরে তুলিয়া দিতে পারা যায়। তাহাতে টেবিলের উপরের জিনিষপত্র স্থানান্তরিত করিতে হয় না। তারপর টেবিলের মধ্য হইতে আর-একখানা ভাঁজ-করা তক্তা টানিয়া বাহির করিয়া তার উপরের গুটানো বিছানা মেলিয়া আরামে নিদ্রা দেওয়া যায়।

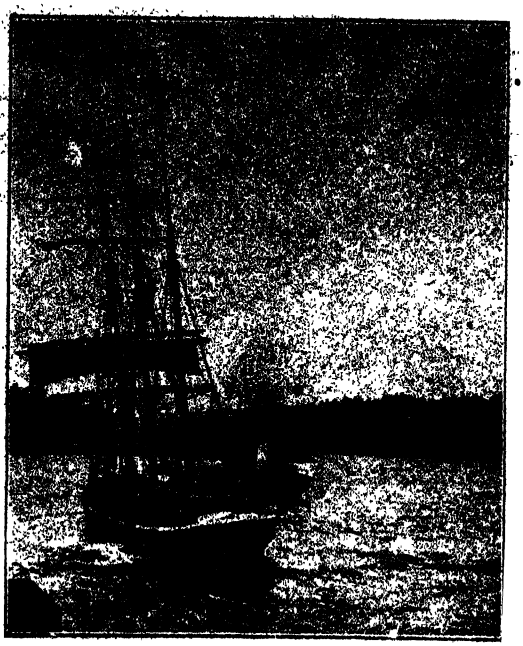
—

রবারের কাগজ—

বহু বছরের পরীক্ষার ফলে কাগজ নির্ম্মাণে রবারের মিশল দিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, খবর আসিয়াছে। রবার-মিশ্রিত কাগজ সাধারণ কাগজ হইতে বেশী টেঁকসই সুদৃশ্য ও দৃঢ় হইবে আশা করা যায়।

পৃথিবীর পুচ্ছ—

সূর্য্যাস্তের পর কিছুকাল ধরিয়া অন্ধকার পূর্ব্বাকাশের গায় কখনো কখনো এক রকমের দীপ্তির ছটা দেখিতে পাওয়া যায়; আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা অনুমান করিতেছেন, ইহা এই পৃথিবীরই এক জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ-বিশেষ হইতে পারে। সাধারণতঃ এই জ্যোতির্ব্বিম্বের পরিধি ১২টি চন্দ্র-পরিধির সমান, কিন্তু আকাশের ও বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা অনুসারে ইহার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এই পুচ্ছের নামকরণ হইয়াছে গেগেনশাইন্ (Gegenshein), গগনদ্যুতি। ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহিতেছেন, ইহা আর কিছুই নহে, সূর্য্যালোকের চাপে পশ্চাতে ছিটকাইয়া পড়া বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত সবচেয়ে হাল্কা গ্যাস হেলিয়াম ও হাইড্রোজেনের পিণ্ড মাত্র। অপর দল বলিতেছেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ স্তরগুলির নিজস্ব একপ্রকার দীপ্তি আছে, এই দীপ্তিময় আবরণে এই পৃথিবী আবৃত। কোন অজ্ঞাত সৌরক্রিয়া এই দীপ্তির হেতু হইতে পারে; ধূমকেতুর পুচ্ছদীপ্তিরও তাহাই হেতু। সুতরাং ইঁহারা অনুমান করেন, আমাদের এই পৃথিবীও একটি জ্যোতির্ম্ময়পুচ্ছসমন্বিত ধূমকেতু, পূর্ব্বাকাশের পূর্ব্বোক্ত রহস্যদীপ্তি ঐ পুচ্ছেরই দীপ্তি মাত্র।



পূব আকাশে পৃথিবীর পুচ্ছ-দীপ্তির ছটা।

এই পুচ্ছদীপ্তি কোথা হইতে আসে? কেহ কেহ বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ চন্দ্রপিণ্ড প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকারে ইহারা এক-একটি মার্বেলের চেয়ে বড় নহে। খালি চোখে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক এই চন্দ্রপিণ্ডে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া যখন পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে এবং পৃথিবীর বায়ুস্তরকে প্রদীপ্ত করিয়া তোলে, তখন সেই দীপ্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূত হয় নাই। অনেকের মতে সকলের চেয়ে সঙ্গত ও সমীচীন ব্যাখ্যা যাহা, তাহা এই :—

জলের গেলাসে পেন্সিল ডুবাইলে পেন্সিলের ডোবানো অংশ বেঁকিয়া যায়, ইহার কারণ পরাবর্ত্তিত সূর্য্যকিরণ। চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের রাহুগ্রস্ত অংশও পাণ্ডুর তামাটে রংএর হইয়া চোখে পড়ে; ইহার কারণও আর কিছুই নহে, সূর্য্যকিরণ পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া পরাবর্ত্তিত হইয়া বেঁকিয়া ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে ও ছায়াগ্রস্ত অংশকে ম্লানভাবে আলোকিত করে। পৃথিবীর পুচ্ছদীপ্তিও এই পরাবর্ত্তিত সূর্য্যকিরণেরই কোনো অজ্ঞাত লীলা। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সম্ভবতঃ শীঘ্রই আমরা জানিতে পারিব। আপাতত, আমরা একটি সপুচ্ছ ধূমকেতুতে চড়িয়া অসীমশূন্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছি, ইহা ভাবিতে মন্দ লাগিতেছে না। সহসা এই পুচ্ছের আরোপ মাতা বসুন্ধরার কেমন লাগিতেছে তাহা কে জানে?

—

উভচর রেলগাড়ী—

আফ্রিকার কঙ্গোনদীতে বারোমাস নৌ-চলাচল করা চলে না। নদীতে চরা পড়িয়া বা শুকাইয়া প্রতি বৎসরের কতক সময় উহা বড় রকমের সব জলযানের অগম্য হইয়া পড়ে। একজন বেল্‌জিয়ান্ লক্ষপতির গড়া একটি জোড়া-নৌকা তখন চরার বালির উপর রোদে পিঠ দিয়া হতাশভাবে পড়িয়া না থাকিয়া ডাঙায় উঠিয়া গড়গড়াইয়া চলা সুরু করে। জোড়া-নৌকাটির মাঝখানে একসারি চাকা লাগানো থাকে, জলের পালা শেষ হইয়া গেলে জলঠেলা দাঁড়-কল খুলিয়া ফেলিয়া একসারি সেই চাকায় একসারি তোলা রেলপথ বাহিয়া ইহা চলে। এই রেলপথ বরাবর নদীর ধার বাহিয়া তৈরি, কাজেই নদীতে বান আসা মাত্রই সেই নূতন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইহার কিছুমাত্র দেরি হয় না।

ফোটো ভাস্কর্য্য—

আলো-ছায়ার তারতম্যে আলোককুণ্ঠ কাগজের উপর ফোটো-গ্রাফের ছবি আঁকা হইয়া থাকে। সম্প্রতি লণ্ডনের এক ফোটো-



জোড়ানৌকার রেলগাড়ী।

প্রকার একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যন্ত্রটিকে ফোটো-ভাস্কর্য্যের যন্ত্র বলা যায়। ইহার সঙ্গে সংলগ্ন একটি বাটালি, আলোছায়ার ব্যতিক্রম অনুযায়ী গভীর বা অগভীর করিয়া কাটিয়া, যে-কোনো জিনিষের তোলা-ছবি বা রিলিফ প্রতিমূর্ত্তি মাটি বা আর কিছুর উপর আপনা হইতে গড়িয়া তুলিতে পারে। ফোটোগ্রাফের কল আবিষ্কৃত হওয়ার পর রঙের তুলিতে প্রতিকৃতি আঁকিবার রেওয়াজ কিছু কমিয়াছে; ফোটো-মূর্ত্তিও এর পর ভাস্কর্য্যশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাধাইয়া দিতে পারে। কিন্তু রসজ্ঞ রসিক শিল্পীর পৃথিবীতে যতদিন অভাব না ঘটিবে ততদিন যন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সত্যকার শিল্প পরাজিত হইবে না, এ ভরসা আমাদের আছে।



ফোটো-ভাস্কর্য্য।

ডাঙায় চলা মোটর-নৌকা

আমরা কিছুদিন আগে জলেচলা মোটরগাড়ীর ছবি ও বিবরণ ছাপিয়াছি। আমেরিকার নিউ জার্সি হইতে নূতন ধরণের একটি যানের খবর পাওয়া গিয়াছে। এই যানটি উভচর এবং মোটরে



ডাঙায় চলা মোটর-নৌকা।

চলে, কিন্তু দেখিতে চাকাওয়ালা নৌকার মতো বলিয়া ইহাকে জলেচলা মোটরগাড়ী না বলিয়া ডাঙায়-চলা মোটর-নৌকা বলিলেই বেশী ঠিক বলা হইবে।

—

মানুষের কাজে প্রকৃতি—

"পৃথিবীতে কয়লা এবং পেট্রল দিন-দিন কমিয়া আসিতেছে। অনেকের মনে ভয় হইতেছে—এমন একটা দিন আসিবে যখন আর একটুক্‌রা কয়লা বা একটিন পেট্রলও পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য এখন হইতেই চেষ্টা হইতেছে কেমন করিয়া প্রকৃতির অন্যান্য দ্রব্য হইতে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি উৎপাদন করা যায়। সূর্য্যের প্রচণ্ড শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইবার চেষ্টাও হইতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে যে অসীম শূন্যতা রহিয়াছে তাহার মধ্যেও নানা রকমের শক্তি বিদ্যমান। তাহাদের কেমন করিয়া মানুষের প্রয়োজনে বাঁধা যায় তাহার চেষ্টাও চলিতেছে। মানুষের দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে ৪......... নক্ষত্র দেখা যায়, ইহারা শূন্যপথে ভীষণ বেগে দৌড়াইয়া ফিরিতেছে; তাহাতেও যে কি ভীষণ একটা শক্তির লীলা চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কালে হয়ত সে শক্তিকেও কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতে পারে।

—

ডুবো জাহাজ—

এতকাল মানুষ ডুবোজাহাজকে কেবল ধ্বংসের কাজে লাগাইয়াছে। এখন ইহাকে নূতন সৃষ্টির কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই চেষ্টা সফল হইবার খুবই আশা রহিয়াছে এবং তাহাতে মানুষের উপকারও হইবে অনেক। পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ জল। এই সমুদ্রের জলের তলায় নানা প্রকারের রত্ন আমাদের চোখের আড়ালে বৃথাই পড়িয়া আছে। মণি, মুক্তা, প্রভৃতি কত রকমের অমূল্য রত্নই যে রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। অনেক জাহাজও ইহাতে ডুবিয়া গিয়া নানা রকমের দ্রব্যাদি লইয়া জলের নীচে পড়িয়া থাকে। ডুবোজাহাজের সাহায্যে এই-সমস্ত তোলার বন্দোবস্ত হইতেছে। তীরের কাছাকাছি অগভীর জলেই এই-সমস্ত রত্নাদি পড়িয়া আছে। ডুবোজাহাজ এই-সমস্ত স্থানে খুব ভাল করিয়াই কাজ করিতে পারিবে।

—

মাছের চাষ—

চাষ বলিতে আমরা ধান, যব ইত্যাদির চাষ বুঝি। দক্ষিণ সমুদ্রে যে-সমস্ত দ্বীপ আছে সেখানের লোকেরা একরকম চাষ করে, তাহা আমাদের কাছে নূতন। তাহারা মাছের চাষ করে। তাহারা সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া আনে এবং বদ্ধ জলে তাহাদের পালন করে। ধানের ক্ষেতে যেমন মাটির আল থাকে তেমনি ইহাদের খাদ্য-আবাদের



পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইবার যন্ত্র।

জলে আল থাকে প্রবালের। প্রয়োজন-মত তাহারা মাছ বিক্রয় করে বা খাদ্য রূপে ব্যবহার করে।

—

পদব্রজে নদী পার—

দুপায়ে দুটি ধাতুর পাতের হাল্‌কা নৌকার জুতা পরিয়া কালিফোর্ণিয়ার এক কৃষক পদব্রজে জলভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রতি পদক্ষেপে নৌকাদুটি জল হইতে তাঁহাকে অবশ্য টানিয়া তুলিতে হয় না, নৌকার গায়ে সারিসারি হাঁসের পায়ের আকারের দাঁড় লাগানো আছে, পা ঠেলিলেই সেই দাঁড়গুলি মুড়িয়া গিয়া নৌকাটি আগাইয়া যায়; পেছনের দিকে ধাক্কা লাগিলে দাঁড় মেলিয়া গিয়া জল আটকায় বলিয়া অন্য পাটি তখন একই জায়গায় স্থির থাকে।

—

কলহীন এয়ারপ্লেন—

পাখীর মতো পাখা মেলিয়া বাতাসে উড়িয়া বেড়ানো বোধহয় মানুষের আদিমতমকাল হইতে সাধ। বহুকাল নানা রূপক ও কল্পনার মধ্যে তার এই সাধ আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল, তারপর বেলুন উদ্ভাবিত হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে—এই সেদিন বলিলেও চলে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রবিদ্যার কল্যাণে বিমান-বিহার যে কি দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করিয়া চলিয়াছে সেকথা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু যন্ত্রের উপর নির্ভর করায় বিপদ্ যথেষ্ট, যন্ত্র বিগ্‌ড়ায়। তাই মানুষ চাহিতেছে, পাখী যেমন করিয়া নিজের ডানা দুটি মাত্র সম্বল করিয়া দিগ্বিদিক্‌হীন বাতাসের সাগরে ভাসে, তেমনিভাবে নিজের হাত দুটির উপর নির্ভর করিয়া বায়ুসমুদ্রে ভাসিতে; এক কথায় বাতাসের সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে কতকটা [illegible], আর কতকটা যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যথেচ্ছা এরোপ্লেনের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাওয়ার দায়ে ঠেকিয়া, জার্মানদের এই সাধ অনেকটা মিটিবার পথে আসিয়াছে। কলহীন ছোট ছোট এয়ারপ্লেনে হাতের বেগে পাখা ঝাপ্‌টাইয়া উড়িবার উপায় সেখানে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখনো এই উপায়ে ঠিক যথেচ্ছা যতদূর খুসি উড়িয়া বেড়ানো সম্ভব হইয়া উঠে নাই, কিন্তু ১৫ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারা গিয়াছে, উঁচুর দিকেও উঠিতে পারা গিয়াছে ৪০০ ফুট। গুল্‌তি হইতে গুলি যেমন করিয়া ছোটে, এই এয়ারপ্লেন্‌কেও প্রথমটা তেমনি করিয়া রবারের দড়ির টানে পেছনে টানিয়া "ছুঁড়িয়া" দেওয়া হয়। এয়ারপ্লেন তারপর সেই ধাক্কার গতি, উর্দ্ধমুখী বাতাসের স্রোত এবং পাখার ঝাপট—এই তিনটি জিনিষকে কাজে খাটাইয়া শূন্যপথে চলিতে থাকে। ইহাতে হাল আছে, সুতরাং মোড় ফেরাও চলে।

—

পায়ের জোর—

লুই সিডিঙ্গার নামে একজন ফরাসী রুটিওয়ালা কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রদর্শনীতে ২৪০০ পাউণ্ড ময়দার বস্তা পায়ের উপর তুলিয়াছিলেন। এই লোকটির দেহে খুব শক্তি আছে এবং নানা রকম খেলাতেও ইনি ওস্তাদ। এই বস্তাগুলির উপর আবার সাতজন লোকও



কলহীন এয়ারপ্লেন।



পায়ের জোর।

দাঁড়াইয়াছিল। কাজটি একেবারেই সোজা নয়, কারণ কোন রকমে একটু নড়চড় বা এদিক-ওদিক হইলেই মঞ্চদার বক্তার ভীষণ চাপে মরণ। সিভিল্লার বলেন যে তার উত্তোলন করা পায়ের জোরের উপরেই বেশী নির্ভর করে—বুকের বা হাতের জোর খুব কমই প্রয়োজন হয়। তিনি পায়ের উপর প্রায় ৩০০০ হাজার পাউণ্ড বা ৩৭॥ মণ ওজন পাঁচ মিনিট রাখিতে পারিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ দেহের শক্তির এবং মনের জোরের পরিচয় দিয়াছে।

—

চিনি-গাছ—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ একরকম নূতন গাছ হইতে চিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গাছ দেখিতে অনেকটা সাধারণ সূর্য্যমুখী ফুলের গাছের মত দেখিতে। যুক্তরাষ্ট্রে ইহাকে জেরুসালেম আর্টিচোক বলে। আকের রসে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, এই গাছের রসে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৬০ গুণ বেশী চিনি পাওয়া যায়। এই ফুলের গাছ জন্মাইতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না বা বিশেষ করিয়া চাষ করিতে হয় না। যেখানে-সেখানে যে-রকম সে-রকম ভাবে গাছ লাগাইলেই হইবে। কোন কোন স্থানে ইহা আগাছার মতই জন্মায়। এই আবিষ্কার হঠাৎ হইয়াছে, তাহার জ এখনও বলা যায় না, ব্যবসায় হিসাবে ইহা হইতে চিনি বাহির ক সুবিধার হইবে কি না। উত্তর আমেরিকাতে এই গাছ খুব বেশ পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে ঐ স্থানের আদিম কালের লোকেরা ইহা খাদ্য রূপে ব্যবহার করিত। আমাদের দেশেও আর্টিচোক চাষ হয়; আমাদের দেশের চাষীরা এর নাম রাখিয়াছে হাতীচোক।

—

মুখের দাগ-তোলা মুখোস—

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখে নানা রকমের দাগ পড়ে। এই সমস্ত দাগে মানুষের মুখের সৌন্দর্য্য খারাপ হইয়া যায়। ব্রিটিশ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্স হইতে একপ্রকার রবারের মুখোস্ আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা পরিলে ক্রমে ক্রমে মুখের সব দাগ উঠিয়া যায়, এবং মুখের লুপ্ত সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসে। কয়েকজন লোকের মুখে পরাইয়া ইহাতে চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে। এই রবার ডাক্তারখানাতে বিশেষভাবে এই কার্য্যের জন্যই তৈয়ার করা হয়। কাজ করিবার সময় বা ঘুমাইবার সময় যখন ইচ্ছা পরা চলে। তবে



মুখশ্রী বাড়াবার মুখোস।

রাত্রে পরাই ভাল, কারণ দিনে পরিলে, পাড়া-প্রতিবেশীর ছোট ছোট হাসিখুসী ছেলেমেয়েরা কাঁদিয়া উঠিতে পারে। কারণ মুখোসটা দেখিতে খুব সুদৃশ্য নয়। মুখের উপর এই মুখোস লাগাইতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না।

—

রেডিয়ো-ফোঁ—

তারহীন বা রেডিও-টেলিফোঁর ইতিমধ্যেই আমেরিকাতে খুব আদর এবং প্রসার হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, সমস্ত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ এই তারহীন টেলিফোঁর জালে ছাইয়া ফেলা হইবে।—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সমস্ত নরনারীই তাহা হইলে ইহার সুবিধা সম্ভোগ করিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই নানা সুশ্রাব্য গীতবাদ্য আবৃত্তি, অপেরার অভিনয়, গির্জ্জার উপাসনা, বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের বক্তৃতা এবং অন্য অসংখ্য প্রকারের খবরবার্ত্তা প্রভৃতি তারহীন টেলিফোঁতে যুক্তরাষ্ট্রের সীমা হইতে সীমান্তে ধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। শীঘ্রই সেখানকার প্রতি গৃহস্থালীতে ইহা ফোনোগ্রাফের কলের মতো ঘরোয়া ও অপরিহার্য্য বস্তু হইয়া উঠিবে। তখন সমস্ত মার্কিন শিশুরা অভাব টেলিফোঁতে রূপকথার রাজপুত্রের গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইবে, যোগশব্দ্যার

তাহারা টাকিনহরের মত পোকা চলিবে, মজার ভিড় হইবে না, ঠেলাঠেলি থাকিবে না, আফিসে বসিয়া সমস্তদিন গৃহকর্মরতা প্রিয়ার ভজনগান শুনিতে পাওয়া যাইবে, আরো কত কি।

পাকা তলোয়ারী—

সার্জেন্ট মেজর এগেন্টন নামে একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী এক নারীর ঘাড়ের উপর আলু রাখিয়া তাহা ধারালো তলোয়ার দিয়া কাটিতে পারেন। তিনি যখন এই আলু কাটেন, তখন তাঁহার চোখ



তলোয়ারের তাক।

বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এগেন্টন একজন পাকা তলোয়ারী। হাতের আন্দাজ তাঁর, দেখিবার মত জিনিষ।



সাপ ও বিছার আকারের ফুলকপি।

প্রকৃতির খেয়াল----

আমাদের সব্জিবাগানে এই দুটি ফুলকপি ফুটিয়াছিল। প্রকৃতির খেয়ালে তার একটি সাপের মতন, অপরটি বৃশ্চিকের মতন দেখিতে হইয়াছে!

শ্রীকাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল।

উদাসী

(বাউল)

দিক্‌হারারে এমন করে'
যে জন কাঁদায় বারে বারে,
ও-সেই পথ-উদাসী বন-ফেরারে
কেমনে বাঁধি বীণার তারে।
আজ কলাবনের বাব্‌রি নাড়ি'
উজানে বাও দ্যায় রে পাড়ি
সাগর-বাড়ি,
ও-তার নূপুর-ছোঁয়া শীতের কাঁদন
আমায় নে যায় কোন্ পাথারে।

আজ সর্ষে ক্ষেতের ঝরার ব্যথা
লুটিয়ে পড়ে বালুর চরে,
ও-তার বুকের মালা মটরশুঁটীর
সিঁদুর-বুকে আবির ঝরে।
বোরোধানের আসার ভাষা
নদীর কূলে আঁক্‌তে চাষা—
সর্ব্বনাশা
গান দিয়ে মোর মনপাখীরে
উড়িয়ে দিল বিজন পারে।

জসীমউদ্‌দীন।



রামায়ণ-মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ

মহাভারতের অনেক স্থলে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় (সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায় ২৩-২৫ শ্লোক)। বাল্মীকি-রামায়ণ সযত্নে খুঁজিয়াও তাহাতে বঙ্গদেশের নাম পাই নাই। পরন্তু ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রে "বাঙ্গালীর ইতিহাস" প্রবন্ধে দেখিলাম শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বাল্মীকি-রামায়ণে বঙ্গদেশের যে উল্লেখ আছে তাহাতে বঙ্গকে ছোট জাতি বলিয়া মনে হয় না; কেননা সেখানে বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল প্রভৃতি বড় বড় জাতির সহিত ইহার উল্লেখ থাকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে (বঙ্গকে ছোট জাতি বলিতে) পারা যায় না।" এই কথার সমর্থন নিমিত্ত তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের ৪০ অধ্যায়ের (রামায়ণে "অধ্যায়" শব্দ নাই "সর্গ" শব্দ আছে) এক শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের নির্দ্দেশমত রামায়ণের ঐ-সংখ্যক শ্লোকে একটি দেশেরও উল্লেখ নাই। তবে ঐ সর্গের ২২ শ্লোকের ২য় এবং ২৩ শ্লোকের ১ম পাদে কয়টি দেশের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহাতেও বঙ্গদেশের নাম ত নাই-ই, পরন্তু বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকের অনেক দেশের নামও উহাতে নাই।

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় বঙ্গদেশের নাম আছে বলিয়া মহাভারতের যে-সকল শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই-সকল শ্লোকেরও অনেক-গুলিতেই বঙ্গদেশের নাম নাই। যথা:—আদিপর্ব্ব ১০৪ অঃ ৫১ ও সভাপর্ব্ব ৫২ অঃ ১৯ শ্লোক এবং ৩০ অঃ ২৪ শ্লোক। উদ্‌যোগপর্ব্বের ৪০ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে ত নাই-ই, এই অধ্যায়েই বঙ্গদেশের নাম নাই। সম্ভবতঃ অনবধানে পর্ব্ব অধ্যায় এবং শ্লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে ভুল হইয়াছে। ইতিহাস লিখিতে এতটা অনবধানতা সমীচীন নয়। বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ও তাহা অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

এই পত্র সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। রামায়ণ বা মহাভারতের শ্লোক তুলিতে আমি আদৌ অনবধান হই নাই। Gasparc Gorresio ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন পুথি মিলাইয়া সযত্নে বাল্মীকি রামায়ণের সংস্করণ প্রকাশ করেন। আজ পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা রামায়ণের ভাল সংস্করণ বাহির হয় নাই। এই বিশেষ প্রামাণ্য সংস্করণের রামায়ণ হইতে শ্লোক আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। পত্রলেখক-মহাশয় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। মহাকাব্যের লক্ষণে রামায়ণের সর্গ-বিভাগ নয়। রামায়ণ কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডের উপবিভাগ অধ্যায় বা সর্গ হইতে পারে। 'অধ্যায়' যুক্ত সংস্করণও আছে। লেখক-মহাশয় লিখিয়াছেন, 'সযত্নে খুঁজিয়াও' রামায়ণে বঙ্গের নাম পান নাই। সযত্নে খুঁজিলে অন্যত্রও পাইতেন। অযোধ্যাকাণ্ডের দশম সর্গ বা অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকে সকল সংস্করণেই বড় বড় জাতির সহিত বঙ্গের উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এই—

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥"

তারপর মহাভারতের যে সমস্ত শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছি তৎসম্বন্ধেও কোথাও ভুল নাই। কেবল শেষের শ্লোকের ঠিকানায় ছাপার ভুলে ৪০ অধ্যায় হইয়াছে—৪৯ হইবে। মহাভারতের শ্লোকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট প্রামাণ্য সংস্করণ হইতেই দেওয়া হইয়াছে। পত্রলেখক মহাশয় মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে; কেহ কেহ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে খৃষ্টীয় পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সমাচারদর্পণকে প্রথম সংবাদপত্রের আসন দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামল বর্ম্মা মহাশয় "ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্য" প্রবন্ধে S. K. De's History of Bengali Literature in the 19th Century পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন —"বাংলা বেঙ্গল গেজেট কোনদিন বাহির হয় নাই। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ। যাঁহারাই বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কখনও বেঙ্গল গেজেট চক্ষে দেখেন নাই" (প্রবাসী, ৫০৫ পৃ)। তাঁহার সিদ্ধান্তের তিনি তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—(১) ১৮১৯ সালে প্রেস আইনের খুব কড়াকড়ি ছিল সুতরাং তখন নূতন পত্রিকা বাহির হওয়া সম্ভব ছিল না। লর্ড হেষ্টিংস তাঁহার শাসনের শেষভাগে censor তুলিয়া দেন ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জন্য মিঠেকড়া আইনের ব্যবস্থা করেন। এবং তৎপরেই শ্রীরামপুর হইতে সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হইতে থাকে। (২) বেঙ্গল গেজেট একখণ্ডও আজকাল দেখা যায় না, এমন কি তখনকার কোন সাময়িক কাগজেও ইহার উল্লেখমাত্র নাই। (৩) রাজনারায়ণ বসু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" বক্তৃতায় যে বলিয়াছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং উহাতে সচিত্র বিদ্যাসুন্দর, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কাব্য বাহির হইয়াছিল, ইহা ভুল; কারণ বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট গঙ্গাধর-প্রকাশিত ১৮১৬ সালের ছবিওয়ালা বই আছে, কিন্তু তাহার কোথায়ও বেঙ্গল গেজেটের ছাপ নাই।

বর্ম্মা মহাশয়ের যুক্তিগুলি সবই নেতিবাচক (negative), সুতরাং তাহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। (১) প্রেস আইনের কড়াকড়ি ১৮১৯ কেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমাচারদর্পণ প্রকাশের সময়ও ছিল। তখনও press censor ছিলেন, তখনও অনেক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থান অসংখ্য-তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কারণ অনেক সম্পাদকীয় মন্তব্য পত্রিকা মুদ্রণের পূর্ব্বক্ষণে censor কাটিয়া দিতেন। এইসব কারণে কেরী সাহেব প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশের খুব বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মার্শম্যান্ ও ওয়ার্ড সাহেবদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে পত্রিকাটির প্রকাশ হয়। এই পত্রিকা ২৩শে মে, (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) শনিবার দিন প্রথম বাহির হয়। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস censorship তুলিয়া দেন ১৯শে আগষ্ট তারিখে; সুতরাং সমাচারদর্পণের পরেও প্রায় তিনমাস প্রেসের

উপর গভর্ণমেণ্টের খুব কড়া নজর ছিল। এবং বর্ম্মা মহাশয়ের কথিত সম্পাদকের জন্ত "মিঠেকড়া" আইনেরও সৃষ্টি হয় এই ১৯শে আগষ্ট তারিখে। Censorship তুলিয়া দেওয়ার ও মিঠেকড়া আইনের বিস্তারিত বিবরণ ও তারিখের জন্ত Marshman প্রণীত Life & Times of Carey, etc, Vol. II, pp. 183—4 দ্রষ্টব্য॥ সুতরাং এত কড়াকড়ির মধ্যেও কাগজ বাহির করিবার সাধ শুধু গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কেন, মিশনারী সাহেবরাও করিয়াছিলেন। (২) বেঙ্গল গেজেট আজকাল দেখা যায় না এবং সমসাময়িক কাগজেও ইহার উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কি ইহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হয়? পাদ্রী লঙ্‌ সাহেব ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যে বাংলা বই ও সংবাদপত্রের এক তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে বেঙ্গল গেজেটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল গেজেটের নাম পাইলেন কোথা হইতে? ইহা কি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত? স্বল্পকাল-প্রচারিত বলিয়াই হয়ত ইহার উল্লেখ তৎকালীন কোন কাগজে নাই। আমাদের মনে হয় এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। (৩) গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্যে বেঙ্গল গেজেটের ছাপ নাই। হয়ত এইগুলি বেঙ্গল গেজেটে প্রকাশিত না হইয়া পৃথকভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, অথবা হয়ত বেঙ্গল গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া শেষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং ঐগুলিতে বেঙ্গল গেজেটের ছাপ না থাকায় বেঙ্গল গেজেট ছিল না ইহা প্রমাণ হয় না।

একপক্ষে বর্ম্মা মহাশয়ের যুক্তিগুলি যেমন বেঙ্গল গেজেটের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না, অন্তপক্ষে লঙ্‌ সাহেব, রাজনারায়ণ বসু ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়দের উক্তি বেঙ্গল গেজেটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। আজকাল আমরা কেহ বেঙ্গল গেজেট দেখি নাই ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইতে যাঁহারা বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই দেখেন নাই এরূপ অনুমান কোনক্রমেই করা যাইতে *পারে না। বেঙ্গল গেজেট না দেখিয়া থাকিলে "Descriptive Catalogue of 1400 Bengali Books and Pamphlets"এ উহার উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই লঙ্‌ সাহেবের ছিল না। শুধু বিদ্যানুরাগ-প্রণোদিত হইয়াই লঙ্‌ সাহেব উক্ত তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি যে ইহাতে খুব সাবধান হইয়া কাজ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের Calcutta Reviewতে লঙ্‌ সাহেব বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন; তাহাতে তিনি সমাচার-দর্পণকেই প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন (Calcutta Review, Vol. XIII, p. 145)। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে এই তালিকা প্রণয়নের সময় তিনি অধিকতর গবেষণার ফলে তাঁহার পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্গল গেজেটকেই বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্রের আসন দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি বোধ হয় যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেই বেঙ্গল গেজেট খুব বিরল ও আয়াসলব্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং তখন হইতেই সাধারণের মতে সমাচারদর্পণ প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া গ্রাহ্য হইতে আরম্ভ করে। বেঙ্গল গেজেট যে খুব ক্ষণস্থায়ী ছিল তাহার প্রমাণও আমরা লঙ্‌ সাহেবের A Return of Names and Writings of 515 Persons Connected with Bengali Literature নামক তালিকায় পাই; উহাতে লিখিত আছে যে বেঙ্গল গেজেট মাত্র এক বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল। হইতে পারে যে প্রেস-আইনের কঠোরতার জন্তই কাগজখানি অচিরে বন্ধ হইয়া যায়।

*রাজনারায়ণ বসু এবং রামগতি ন্যায়রত্ন উভয়েই তাঁহাদের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের উক্তির আমরা কোন আলোচনা করিলাম না, কারণ লঙ্‌ সাহেবের সাক্ষ্য ইঁহাদের আগেকার বলিয়া অধিকতর প্রামাণ্য এবং সে সাক্ষ্য কোনমতেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

এখন বাংলা সংবাদপত্রের ইংরেজী নাম (Bengal Gazette) কেন হইল তাহা একটু খট্‌কার বিষয়, এবং সেইজন্তই বোধ হয় বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "বাংলা" 'বেঙ্গল গেজেট কোনদিন বাহির হয় নাই।' আমাদের মনে হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে (Hickey) সাহেবের প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র Bengal Gazette-এর অনুকরণে গঙ্গাধর প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নামও বেঙ্গল গেজেট রাখেন।

ইহা অত্যন্তই ক্ষোভের বিষয় যে প্রথম সংবাদপত্রের একখানিও আজকাল দেখা যায় না। এ বিষয়ে আরও অনেক অনুসন্ধান আবশ্যক। কলিকাতাবাসী কোন পাঠক একবার Imperial Library, Asiatic Society Library, ও Bengal Library খুব ভাল করিয়া খোঁজ করিয়া দেখিবেন কি? বেঙ্গল লাইব্রেরীতে একটা কিনারা হওয়ার আশা আমরা করি, কারণ উক্ত লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ার সময় লঙ্‌ সাহেবের তালিকা (অবশ্য উপরোক্ত Descriptive Catalogue নহে, বাংলা বইএর অন্য এক তালিকা) দৃষ্টে পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা ছোটলাট বীডনের আমলে হইয়াছিল।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

সুশীল-বাবু বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে তাহার এক সংখ্যাও দেখেন নাই তাহা তিনি তাঁহার পুস্তকের ২৩২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস লঙ্‌ সাহেব প্রথমে এই ভুলটি করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মনীষী রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সুধীবৃন্দ নানাভাবে উহারই পুনরুক্তি করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য প্রতিবাদকারী বলিয়াছেন, বেঙ্গল গেজেটের অস্তিত্ব এখনও পর্য্যন্ত নাই বলিয়া যে তাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা প্রমাণিত হয় না। আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইতেছি; কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, অভাবাত্মক কোন-কিছু ভাবাত্মক কোন-কিছুর দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে না। আর সুশীল বাবু যে সমাচার দর্পণকেই প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত ছত্র হইতেও দেখা যায়—

"The Srirampur Missionaries could not land or settle anywhere in Bengal except under the protection of the Danish flag, and when they had set up there a printing press or planned *the first vernacular* news-paper, they were afraid of Government interference, and had to obtain special permission from Lord Wellesley."

আর Bengal Gazette এর বিদ্যমানতা সম্বন্ধে যিনি প্রমাণ করিতে চান, আইনের মতে প্রমাণের ভার (Onus of proof) তাঁহারই উপর। এখন দেখা যাউক, সুশীল-বাবু বা প্রতিবাদকারী এই কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সুশীল-বাবু যে কৃতকার্য্য হন নাই তাহা পূর্ব্বোক্ত ১৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত অংশ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত তথাকথিত লঙ্‌ সাহেবের তালিকার একটু বিচার করা যাউক। লঙ্‌ সাহেবের তালিকা যে সম্পূর্ণ নহে ও তাহাতে যে যথেষ্ট ভুল আছে তাহার প্রমাণ সুশীল-বাবুও দিয়াছেন

এবং সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকাগারে, Imperial Library, Board of Examiners, প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত কয়েকখানি পুস্তকের প্রথম মুদ্রণকাল দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। লঙ সাহেব "বিদ্যানুরাগ-প্রণোদিত হইয়া" যে ঐ তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি যে খুব সাবধানতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন প্রতিবাদকারী তাহার প্রমাণ পাইলেও আমরা সকল সময় পাই নাই। Calcutta Reviewর প্রবন্ধের পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত তালিকায় বেঙ্গল গেজেটের নাম দেখিয়াই বুঝিতে হইবে যে "তিনি অধিকতর গবেষণার ফলে তাঁহার পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্গল গেজেটকে বাঙ্গালার প্রথম সংবাদপত্রের আসন দিয়াছেন," তাহার "কোন যুক্তিযুক্ত কারণ" আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ১৮২৬ সালের Friend of India (July) সংবাদ-পত্র স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—"The first in print of age is the 'Sumachar Darpan.' published at the Serampore press, of which the first number appeared on the 23rd May, 1818......The next two papers are the 'Sumbad Koumudi' and the 'Sumbad Chandrika'......The youngest of the papers is the Teemer Naushuck—The Destroyer of Darkness." ১৮২৬ সালের Asiatic Journal (Aug., p. 217) পত্রে লিখিত আছে—"The number of newspapers published in the languages of India, and designed solely for native readers, has increased, in the course of seven years, from one to six. Four of these are in Bengalee and two in Persian." দেখা যাইতেছে ১৮১৮ হইতে ১৮২৫ সালের ভিতর মোটে চারিখানি বাঙ্গালা কাগজ বাহির হইয়াছিল। ১৮১৬ হইতে ধরিলে সাত বৎসর না হইয়া নয় বৎসর হইয়া যায়। Friend of Indiaর ও Asiatic Journal-এর নির্দ্দেশে বেঙ্গল গেজেটের নামগন্ধ নাই। তথাকথিত বেঙ্গল গেজেটের দশ বৎসর পরে প্রকাশিত বিবরণকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিব, না ৩৯ বৎসর পরে প্রকাশিত লঙ সাহেবের তালিকাকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিব? প্রতিবাদকারীর মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল গেজেট খুব বিরল ও আয়াসলব্ধ হইতে পারে, কিন্তু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে উহা হইবার কি ততটা সম্ভাবনা?" আমরা আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের আর-একটা অভাবাত্মক প্রমাণ এস্থলে দিতে চাই। Oriental Heraldএ নবপ্রকাশিত পুস্তকের পরিচয় থাকিত। নগণ্য বইও বাদ পড়িত না। Asiatic Journal প্রভৃতিরও থাকিত। কিন্তু ১৮১৬, ১৮১৭, ১৮১৮ সালের ঐ-সমস্ত পত্রে নূতন পুস্তক বা পত্রের পরিচয় স্থলে বেঙ্গল গেজেটের নাম কোথাও নাই। ১৮১৬ সালে কলিকাতায় Ferris & Co.র ছাপাখানা ছিল। ইহাদের ছাপাখানায় প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা তখনকার কাগজে বাহির হইয়াছিল। বেঙ্গল গেজেট ছাপা হইলে এইখানেই হওয়া সম্ভব; কিন্তু ইহাদের তালিকায় বেঙ্গল গেজেটের নাম নাই। গঙ্গাকিশোরের অন্যান্য বই এইখানেই ছাপা হইয়াছিল।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামে কোন প্রাচীন লেখকের নাম অর্ব্বাচীন আমরা জানি না। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকে জানি। লঙ তাঁহার তালিকায় (পৃঃ ৬৯) লিখিয়াছেন—"In 1816, the Bengal Gazette was started by Gangadhar Bhattacharjea, who had gained much money by popular editions of the Vidyasundar, Betal and other works, illustrated with wood-cuts, the paper was short-lived". এই উক্তি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয় বিদ্যাসুন্দর বেতাল প্রভৃতি পুস্তক বেচিয়া দু'পয়সা করিবার পর ভট্টাচার্য্যের Bengal Gazette বাহির হয়। দেখা যাক্ ছবিওয়ালা বিদ্যাসুন্দর কবে বাহির হয়। গঙ্গাকিশোর (গঙ্গাধর নয়) ভট্টাচার্য্যের পুস্তকের পরিচয়-পত্রে (Title page) লেখা আছে—

"OONOODAH MONGUL,
Exhibiting
Tales
of
Biddah and Soondar
To which is added
the
memoirs
of
Rajah Prutapadityu

Embellished
with six Cuts.
Calcutta
from the press of Ferris & Co.
1816."

পত্রিকান্তরের বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে ১৮১৬ সালের শেষে ইহা ছাপা হয়। লঙ নিজের তালিকায় ৭০ পৃষ্ঠায় বেতালপঞ্চবিংশতির মুদ্রণকাল ১৮১৮ দিয়াছেন এবং তাহাই ঠিক। এখন লঙ সাহেব বলিতেছেন যে, বেতালপঞ্চবিংশতি ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনের পর তিনি বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদি বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম প্রকাশকাল ১৮১৮ সাল হয়, তবে ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর কি করিয়া বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করিবেন? পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ দুইখানির প্রকাশকাল ১৮১৬ সাল মানিয়া লইলেও তাহা বিক্রয় করিয়া খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহার কিছু সময় লাগিয়াছিল। অতএব এক্ষেত্রেও ১৮১৬ সালে বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করা ততদূর সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। লঙ সাহেব নানা স্থানে নানা কথা বলিয়াছেন। তাহার কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিব?

১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত যদি যায়, তাহা হইলে দুপয়সা জমাইয়া বেঙ্গল গেজেট কি ১৮১৬ সালে ছাপা যায়? লঙ গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণেরও বিষয় ও সাল যে ভুল করিয়াছেন তাহা সুশীল বাবুর পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক পাদটীকা এবং ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৫৪ পৃঃ দেখিলেই বোঝা যাইবে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বেঙ্গল গেজেটকে পুস্তিকা (pamphlet) বলিয়া জাহির করিয়াছেন!

প্রতিবাদকারীর শেষ উপদেশ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি কলিকাতা-বাসী। Imperial Library ও Asiatic Societyতে আমার খুবই গতিবিধি আছে। এ দুই স্থানে তাঁহার Bengal Gazette নাই। Bengal Libraryতেও বহুবার অনুসন্ধান করিয়াও বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি। শ্রীরামপুর লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া লাইব্রেরী প্রভৃতি বিশিষ্ট লাইব্রেরীতেও আজ ২০।২২ বৎসরের অনুসন্ধানেও Bengal Gazette-এর খোঁজ পাই নাই। আমার শেষ কথা—যে-সব সিদ্ধান্তে লেখক মহাশয় কেবল অনুমান-বলে উপস্থিত হইয়াছেন সেগুলির কোন উত্তর দিলাম না।

শ্রীশ্যামল বর্ম্মা

বাংলার প্রথম সংবাদপত্র

মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে (৫২৩ ও ৫০৫ পৃষ্ঠায়) "বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র" সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা পড়িলাম। "বেঙ্গল গেজেট" নামক বাংলা ভাষায় কোন সংবাদপত্র ১৮১৬ হইতে ১৮২২এর মধ্যে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহা সন্দেহস্থল, কারণ তখন তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ও "Regulation III"র আমল; রাজনীতি আলোচনা করিতে হইলে রাজপুরুষদিগের বিষনয়নে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল।

শ্রীশ্যামল বর্ম্মা বলেন, "প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমাচার-দর্পণ।" এই "সমাচার দর্পণ" ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের "মে" মাসে প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী মার্শম্যান প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইলেও, উহার পাণ্ডুলিপি গভর্ণর-জেনারেলের অনুমোদনার্থে পাঠান হইয়াছিল। তখন "বেঙ্গল গেজেট" বর্ত্তমান থাকিলে, হাতে লেখা "সমাচার-দর্পণ" কেন স্বেচ্ছায় অগ্নি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইবে? এই "সমাচার-দর্পণে" রাজনীতি বা "সমাচার" থাকিত কি না তাহাও সন্দেহস্থল, কারণ, সে সময়ের পাদ্রীগণ ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত, সুতরাং ঐ ধর্ম্মমূলক সংবাদপত্রে "সংবাদ" থাকিত না, বলিলে হয় ত ভুল হইবে না। আমার বোধ হয় সংবাদপত্র হিসাবে দেখিতে গেলে "সংবাদকৌমুদী"কে প্রথমস্থান দিলে ভুল হয় না। "আলালের ঘরের দুলাল"কে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলিলে হয়ত অত্যুক্তি বলিয়া কেহ প্রতিবাদ করিবেন না। তাঁহারা কি "সংবাদকৌমুদী"কে সে গৌরব-মুকুট পরাইতে কাতর? "সংবাদকৌমুদী"র সম্পাদক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়—বলা বাহুল্য মাত্র। জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতী, সুপণ্ডিতের ভাষায় বলিতে গেলে, রাজা রামমোহন রায়ই "The father of Bengali journalistic literature"।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

চোখের খুব কাছে বই পড়া

যায় না কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীসত্যভূষণ সেন, শ্রীদুর্গেশনন্দিনী গুপ্ত ও শ্রীনিশিকান্ত সেন ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে দিয়াছেন। পড়িয়া দেখিলাম, তিনজনের মধ্যে একজনও ব্যাপারটার সঠিক মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

শ্রীসত্যভূষণ সেন ও শ্রীদুর্গেশনন্দিনী গুপ্তের মতে "আমাদের চক্ষু ঠিক fixed focus cameraর মত।" শ্রীনিশিকান্ত সেন এইরূপ ক্যামেরার কথা উল্লেখ না করিলেও তাঁহার মতটাও তাই। এই তিনজনের মধ্যে একজনও বলিতে পারেন নাই যে ক্যামেরাতে যেরূপ নিকট অথবা দূরের জিনিষ ফোকাস করিবার ব্যবস্থা আছে, আমাদের চক্ষুতেও সেইরূপ একরকম ফোকাস করিবার ব্যবস্থা আছে। তা যদি না থাকিত তাহা হইলে কেবল আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানের জিনিষ দেখিতে পাইতাম—তাহার চেয়ে কাছের জিনিষ দেখিতে পাইতাম না, দূরের জিনিষও অস্পষ্ট মনে হইত। Fixed focus cameraতে লেন্সের (focal depth) ফোকাল্ ডেপ্‌থ্‌টাকে কাজে লাগান হয়। ফোকাল্ ডেপ্‌থ্ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গেলে এ আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। একখানি Light বা আলোক-বিজ্ঞানের পুস্তক খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। চোখের খুব কাছে কেন লেখা অস্পষ্ট মনে হয় তাহার কারণ এই:—কোন জিনিষ যত দূরে থাকিবে তাহার ছায়া লেন্সের তত নিকট হইবে। এই নিকটত্ব অথবা দূরত্ব লেন্সের ফোকাল্ লেংথ্‌এর উপর নির্ভর করিতেছে। Focal length ফোকাল্ দূরত্ব যদি বড় হয় তাহা হইলে কটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে অবস্থিত বস্তুর ছায়া লেন্সের দূরে থাকিবে, ফোকাল্ দূরত্ব ছোট হইলে সেই ব্যবধানেই অবস্থিত বস্তুটির ছায়া লেন্সের আরও নিকটে হইবে। কিন্তু যদি লেন্সের ফোকাল্ দূরত্ব একরকমই থাকে যেমন ক্যামেরায়, তাহা হইলে নিকট অথবা দূরের জিনিষের ছায়াটাকে স্পষ্ট করিতে হইলে লেন্স ও বস্তুটির মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেটাকে বাড়াইতে অথবা কমাইতে হইবে, অর্থাৎ লেন্সটাকে আগু অথবা পাছু করিতে হইবে। ইহাই ক্যামেরার মূলতত্ত্ব, ইহারই নাম ফোকাস্ করা। কিন্তু মানুষের চোখে এইরকম লেন্সটাকে আগুপাছু করিয়া ফোকাস্ করা হয় না। এখানে লেন্সের ফোকাল্ দূরত্বটাকে বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া ছায়াটাকে স্পষ্ট করিয়া রেটিনার উপর ফেলা হয়। চোখের মধ্যে লেন্সটাকে পাতলা অথবা মোটা করিয়া এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহার নাম accommodation অবস্থানুযায়ী করিবার ক্ষমতা। খুব দূরে কোন জিনিষ থাকিলে স্বাভাবিক (normal) চোখ স্থির (at rest) থাকিয়া সেই জিনিষটাকে দেখিতে পায়, অর্থাৎ তাহার ছায়া রেটিনায় স্পষ্টভাবে পড়ে। কাছে কোন জিনিষ থাকিলে চোখকে accommodate অবস্থানুযায়ী করিয়া ফোকাল দূরত্বটাকে ছোট করিতে হয়—তাহা হইলেই দৃশ্যবস্তুর মূর্ত্তিটা স্পষ্টভাবে রেটিনা বা চক্ষুর পর্দ্দায় পড়ে। কিন্তু চোখের এই একমোডেশনের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। কিছু দূর পর্য্যন্ত accommodate করিয়া তাহার বেশী আর চোখ ধারণ করিতে পারে না। সব-চেয়ে বেশী accommodate করিয়া চোখ যত কাছের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়—তাহার নাম নিকট লক্ষ্য (near point)। এই নিকট লক্ষ্যের চেয়েও কাছে অবস্থিত বস্তুর ছায়া রেটিনায় স্পষ্টভাবে পড়ে না, কারণ চোখ আর তখন accommodate করিতে পারে না। কাজেই জিনিষটি অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। বয়স যত বাড়িতে থাকে, এই ধারণ-শক্তি তত কমিতে থাকে, অর্থাৎ নিকট লক্ষ্য তত দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। সেইজন্য বৃদ্ধ লোকেরা বই পড়িবার সময় বইটাকে দূরে ধরিয়া পড়েন; কাছে আনিলে তাঁহারা অক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখিতে পান না। দশ বৎসরের বালকের নিকট লক্ষ্য চক্ষু হইতে ৭ সেণ্টিমিটার দূরে অবস্থিত। ২০ বৎসরে ১০। ৩৫ বৎসরে ১৮। ৪০ বৎসরে ২২ (ইহার বাংলা নাম "চল্লিশে ধরা")। ৬০ বৎসরে ১০০। ৭৫ বৎসরে অনন্ত (Infinity). অর্থাৎ অন্ধ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা।

—

বাংলা ভাষার প্রথম নাটক

গতমাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম (?) নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সরল বাঙ্গালা অভিধানে (২য় ভাগ) হইতে জানা যায় যে ইহা সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা চড়কডাঙ্গা লেনের জয়রাম বসাকের বাটীতে অভিনীত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কাহার কথাটি ঠিক? এ বিষয়ে কাহারও কিছু জানা থাকিলে "প্রবাসীতে" উল্লেখ করিবেন।

শ্রীসরোজপ্রসন্ন রায়।

বেদব্যাখ্যা

কাশী, হাবড়া ও কলিকাতা হইতে বেদ বাহির হইতেছে। প্রত্যেক স্থলের ব্যাখ্যাই স্বতন্ত্র। বেদ স্বার্থ বা দ্ব্যর্থ কাব্য নহে যে উহার দুই বা ততোধিক অর্থ হইবে। কাশীর দল সায়ণের পক্ষপাতী; হাবড়ার দল আধ্যাত্মিক অর্থের পক্ষপাতী; এবং আমি কলিকাতা হইতে স্বাধীনভাবে বেদের যে নূতন ব্যাখ্যা করিতেছি, আমার সে টীকার নাম প্রকৃতার্থবাহিনী। আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি; পক্ষান্তরে যাস্ক, সায়ণ উবট ও দয়ানন্দ প্রভৃতির ব্যাখ্যাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আর ত্রৈগুণ্যবিষয়বহুল বেদের সকল মন্ত্রেরই যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইবে, ইহাও বিবেক ও যুক্তি বিরুদ্ধ কথা। বেদ-সকল প্রাক্তন ইতিহাস, প্রাক্তন ভূগোল, প্রাক্তন সাহিত্য ও প্রাক্তন ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং যে মন্ত্র যে বিষয় লইয়া বিরচিত, সেই মন্ত্রের অর্থ তদনুরূপ হইবে।

এই সত্য রক্ষার জন্যই আমি "হিতবাদী" পত্রে (২১ শ্রাবণ শুক্রবার) বেদ বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করি। চারি মাস পরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য "হিতবাদীতে" এক পত্র লিখিয়া জানিতে চাহেন, আমি কি কি বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করি, কে কে মধ্যস্থ হইবেন এবং বিচারের স্থান ও সময় কি হইবে। আমি সেই দিনই অগ্রহায়ণের "হিতবাদীতে" মুদ্রণের জন্য একখানি পত্র সম্পাদক-মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই।

তাহার সার মর্ম্ম এই—আমি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত বেদবিষয়ে বিচার করিতে প্রস্তুত। বিচার-সভার সভাপতি—পূজ্যপাদ সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

মধ্যস্থ—মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ; মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী; মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, এম-এ, পি-এইচ-ডি; শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম-এ; শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম-এ বিদ্যানিধি; এবং শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ।

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল।

সময়—প্রতি রবিবার ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।

যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহারা মধ্যস্থ হইতে পারিবেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার মনোমত অন্য মধ্যস্থের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

বিচার্য্য বিষয়—(১) বেদের উৎপত্তি; বেদ পৌরুষেয় কি না? নিত্য কি অনিত্য। (২) বেদের ভাষ্য ও নির্ব্বচন সমীচীন কি না; উহার কোন পরিবর্ত্তন, পরিমার্জ্জন প্রয়োজনীয় কি না। (৩) বেদের উৎপত্তিস্থান ও পৌর্ব্বাপর্য্য। (৪) শঙ্কর, মেধাতিথি, কুল্লুক প্রভৃতির ব্যাখ্যার সংস্কার হওয়া উচিত কি না।

হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক আমার পত্র না ছাপাইয়া মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে উত্তর লেখেন যে, জানুয়ারী মাসে আমার পত্রের উত্তর দিবেন। কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর না লিখিয়া প্রবাসীতে পত্র লিখিয়াছেন। আমি তদুত্তরে সাদরে জানাইতেছি যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি, মধ্যস্থ, স্থান ও সময় স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই আমি উপস্থিত হইব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিতবাদীতে আপনার বক্তব্য বিজ্ঞাপন করুন। সত্য বাহির হউক।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৩৭।১ শঙ্কর হালদারের লেন,
আহিরীটোলা, কলিকাতা।

সম্পাদকের মন্তব্য—এ সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে না।

বিরাট

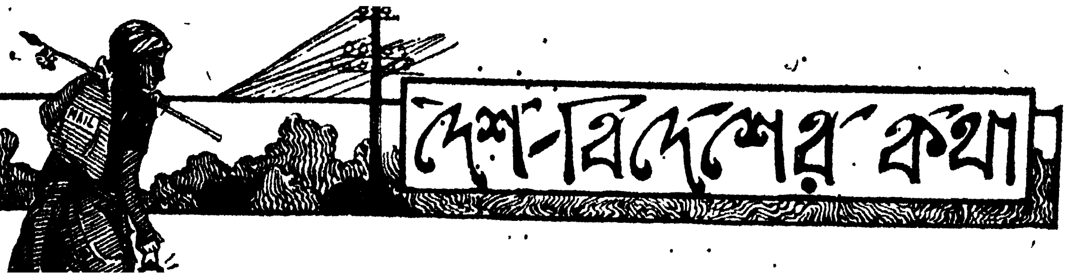
স্তব্ধ গভীর রাত্রি-বেলা দাঁড়িয়ে যখন একা
চৌদিকেরি আকাশখানা হেরি—
বুকখানা মোর চমকে ওঠে!—কেবল চেয়ে দেখা
বিপুল নভে তারারা রয় ঘেরি'।
নেইক হাওয়া, নেইক ধ্বনি, কেউ চলে না ধেয়ে,
পাষাণ সম আঁধার রহে চাপি'—
বিরাট বিশাল মৃত্যু যেন তারার চোখে চেয়ে,
শিউরে আমি থরথরিয়ে কাঁপি!

কে আমি কে?—এই সীমাহীন বিপুল নভতলে
দাঁড়িয়ে আছি একটি ছোট প্রাণী?
আকাশ জুড়ে বিশ্ব জুড়ে যে মহাপ্রাণ চলে
তার পাশে এ আমিই কতখানি!—
একটু নিশ্বাস, একটু ভাষা, একটু চলাচলি,
একটুখানি মিট্‌মিটিয়ে চাওয়া,
তার পরেতে চূর্ণ হয়ে শূন্যে মিশাই ঢলি';—
এমন আমার স্পর্দ্ধা, বেগে ধাওয়া!

চক্ষু মুদে বুঝছি যখন নিবিড় গভীরতা,
বুকের গতি আসছে মম থেমে,
এই আমি কি হাসি, খেলি, হর্ষে কহি কথা?—
তলিয়ে যে যাই যাচ্ছি কোথা নেমে!
দানব অসীম রুদ্র অসীম প্রবল বেগে ঘিরে—
আপ্‌নাকে আজ হারাই পারাবারে!
কোন্ সাহসে বড়াই করি, বেড়াই উঁচু শিরে,
এই ত আমি তুচ্ছ একেবারে!

নই কিছু নই বিশ্বে অসীম; ধার-করা এ প্রাণ
একটু পেয়ে চলছি নেচে হেসে,
আজ নির্জনে শক্তিশালী বিশ্ব-প্রাণের বান
গর্জ্জে' আসে, স্পর্দ্ধা গেল ভেসে!
চৌদিকে মোর সাগর সম প্রাণের অভিযান
ঘিরে ঘিরে আঁকড়ে যেন ধরে—
ভাসিয়ে নিল, ভাঙ্‌ল বুঝি, দিচ্ছে ঘন টান,
কাঁপছে হৃদি, অঙ্গ থরথরে!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।



ভারতবর্ষ

চৌরী-চৌরা—

অল্পদিনের ভিতরেই পুলিশের সহিত জনসঙ্ঘের কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে প্রাণহানিও কম হয় নাই। চৌরী-চৌরার ব্যাপারটিও পুলিশের সঙ্গে জন-সঙ্ঘের সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু নহে। তবে পূর্ব্বেকার ব্যাপারগুলির সহিত এই ব্যাপারটির তফাৎ আছে অনেকখানি। পূর্ব্বের ব্যাপারগুলিতে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের ভিতর প্রায় ষোল আনাই ছিল জনসাধারণের লোক—পুলিশের লোক বিশেষ ছিল না। কিন্তু চৌরী-চৌরাতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের ভিতর আবার পুলিশের লোকই বেশী—জনসাধারণের লোক ছিল খুব কম।

এ সম্পর্কে যে সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্যাপারটিতে পুলিশের সর্ব্বসমেত ২১জন লোক মারা গিয়াছে এবং জনসাধারণের পক্ষে মারা গিয়াছে দুইজন মাত্র। তাহা ছাড়া জনসাধারণের যে কতদূর পশু-স্বভাব হইতে পারে এই ব্যাপারটিতে তাহারও একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে খবরও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় নাই—অনেক ব্যাপারই এখনও রহস্যের যবনিকায় আচ্ছন্ন।

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী সংবাদ পাইয়াই ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"ঘটনার প্রকৃত বিবরণ হয়ত কখনো প্রকাশিত হইবে না। তবে সত্য নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। সাক্ষীদের এজাহারে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব হইতে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র ছিল না। জনসাধারণের কৃত কার্য্যের গুরুত্ব লঘু করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আমার অণুমাত্রও নাই। কিন্তু তথাপি আমি একথা বলিতে বাধ্য যে, বাজারে পিকেটিং করিবার সময় সব্‌ইন্‌স্পেক্টর দুইজন ভলান্টিয়ারের উপর মারপিট করিয়া খুব খারাপ কাজ করিয়াছিলেন। শান্তভাবে পিকেটিং করিবার সময় অকারণে যে-সব মারপিট চলিতেছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার একটি বৈঠক বসিয়াছিল। এই সভাটিও অমঙ্গলকর। উক্ত সভায় সম্ভবত সাব্-ইন্‌স্পেক্টরের কাজের প্রতিবাদ করিয়া তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করা হইয়াছিল এবং জনসাধারণকে মারপিট, এমন কি গুলি চালানো পর্য্যন্ত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সাক্ষীদের এজাহারে জানা গিয়াছে ভলান্টিয়ারগণ দলবদ্ধ হইয়া বাজার অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহাদের সঙ্গে কৌতূহলাক্রান্ত লোকজনেরও অভাব ছিল না। থানার লোকেরা তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে থাকে। এই জনসঙ্ঘের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং আনন্দধ্বনিতে পুলিশের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। উভয় পক্ষ একটু ধৈর্য্যধারণ করিলেই এ দুর্ঘটনা ঘটিবার অবকাশ আসিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। পুলিশ জনতার সম্মুখের লোকদিগকে লাঠিদ্বারা আক্রমণ করে, তারপর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঢিলও ছুড়িতে থাকে। জনতার ভিতর হইতেও অনেকে ঢিল ছুড়িয়া তাহার প্রত্যুত্তর দেয়। ইহার পর টোটা নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গুলি চালানো হয় এবং টোটা ফুরাইলে পুলিশ পলায়ন করে। তাহার পর এই দুর্ঘটনা। * * সর্ব্বত্র পুলিশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। খলিলাবাদ বস্তি হইতে পুলিশ-অত্যাচারের লোমহর্ষণকর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। * * পুলিশ এইরূপ অত্যাচার করিয়া চৌরীচৌরার প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হইবে না।"

শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীর মত আমরাও চৌরী-চৌরার ব্যাপারটার গুরুত্ব লঘু করিতে চাহি না—বরং সেখানে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার জন্য অসংযত জনসাধারণকেই আমরা দায়ী করিতেছি—ইহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার পক্ষে পুলিশের হাত কতটা ছিল তাহার বিচার না করিয়াই। কিন্তু আমরা যাহাই বলি না কেন মানুষের ভিতর একটা পশু আছে তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়। এবং সুযোগ পাইলেই ভিতরকার মানুষের সমস্ত বাধা-নিষেধকে উপেক্ষা করিয়া এই পশুটা গা ঝাড়া দিয়া ওঠেই। পুলিশের কর্ত্তব্য এই পশুটাকে সুশাসন ও সুচিকিৎসার দ্বারা সংযত করিয়া রাখা। কিন্তু তাহা না করিয়া অন্যায়ের দ্বারা পুলিশ ইহাকে কিভাবে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চৌরীচৌরার ব্যাপারেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, এবং তাহার পরেও সম্প্রতি পুলিশ এবং জনসাধারণের ভিতর যে কয়টি দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহাতেও এই কথাটাই ধরা পড়িয়াছে। এই দাঙ্গার সবগুলির সঙ্গে যে অসহযোগ আন্দোলনের যোগ আছে তাহাও নহে। সেই-সব ঘটনাগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইলে এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য অসহযোগ আন্দোলনকে যে আর তেমন ভাবে দোষ দেওয়া চলে না তাহা বলাই বাহুল্য।

বরদোলীর বৈঠক—

মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ১২ই ফেব্রুয়ারি বরদোলী তালুকের সমস্ত লোক দলবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের খাজনা বন্ধ করিবে এবং এইখানকার ফল দেখিয়া অন্যান্য স্থানে আইন-অমান্য-নীতি গ্রহণ করা হইবে কি না তাহা স্থিরীকৃত হইবে। বরদোলীতে আইন অমান্যের আয়োজনও সব প্রস্তুত ছিল। হঠাৎ এমন সময় চৌরী-চৌরার দাঙ্গা সমস্ত ব্যবস্থা উণ্টাইয়া দিয়াছে। চৌরীচৌরার সংবাদ শুনিয়াই মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। গত ১১ই এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী বরদোলীতে এই সভার বৈঠক বসিয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:—

(১) চৌরীচৌরার জনসংঘ থানার কনষ্টেবলদিগকে হত্যা করিয়া এবং থানা পোড়াইয়া দিয়া যেরূপ নৃশংস স্বভাবের পরিচয় দিয়াছে

সেজন্য এই কংগ্রেস-কমিটি অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের শোকে তাঁহারা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) জনসঙ্ঘকে বারবার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আইন অমান্য-নীতি পরিগ্রহের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই তাহারা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। ইহার দ্বারা বোঝা যায়, ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য নীতি চালাইতে হইলে দেশের অবস্থা যেরূপ নিরুপদ্রব হওয়া দরকার তাহা হয় নাই। চৌরীচৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা তাহার আর-একটি নূতন দৃষ্টান্ত। এই-সকল কারণে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সঙ্কল্প করিয়াছেন, বরদোলী এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য-নীতি চালাইবার যে কল্পনা করা হইয়াছিল তাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইবে। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের খাজনা এবং ট্যাক্স দিবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটিগুলি যেন প্রজাসাধারণকে পরামর্শ দিতে ত্রুটি না করেন। উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে এমন কোন কার্য্যে কেহই আপাততঃ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(৩) গোরক্ষপুরের মত অত্যাচার এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত হাঙ্গামা যতদিন না একেবারে অসম্ভবের কোটায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে অর্থাৎ যতদিন না দেশ সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব ব্রত গ্রহণের উপযোগী হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে আইন অমান্যের কাজ বন্ধ রাখা হইবে।

(৪) দেশের ভিতর শান্তির অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কংগ্রেসকমিটিগুলিকে অন্যরূপ উপদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কারা-বরণের নিমিত্ত কল্পিত কার্য্যসকল বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিতেছেন। কেবল মাত্র যে-সকল স্থানে শান্তি বজায় থাকিবে বলিয়া নিশ্চিত জানা যাইবে সেইসকল স্থানে স্বেচ্ছায় হরতাল ইত্যাদি কার্য্য এবং সাধারণভাবের অন্যান্য কংগ্রেস সম্পর্কিত কার্য্য চলিতে পারিবে। মদের দোকানে যাহারা মদ্যপানের জন্য গমন করে তাহাদিগকে মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে শান্তভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য সকল রকমের পিকেটিং বন্ধ রাখা হইবে। মদের দোকানে যাহারা পিকেটিং করিবে তাহারা সচ্চরিত্র এবং কংগ্রেস কমিটি দ্বারা বিশেষভাবে বাছাই-করা লোক হওয়া চাই।

(৫) ভলাণ্টিয়ারদের শোভাযাত্রা এবং সভাবন্ধের হুকুম অমান্যের উদ্দেশ্যেই যে সব সভার অধিবেশন হইতেছিল, সেই সব অধিবেশন অন্যরূপ আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। কিন্তু কংগ্রেসের নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রকাশ্য সভা আহ্বান করার প্রয়োজন হইলে তাহা বন্ধ থাকিবে না। এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস বা অন্যান্য কমিটির মিটিংও বন্ধ করিতে বলা হইতেছে না।

(৬) কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি সংবাদ পাইয়াছেন, রায়তগণ জমিদারদিগকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপারটা যে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর এবং কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবসমূহের বিরোধী তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এই সমিতি কংগ্রেসকমিটি ও কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে অনুরোধ করিতেছেন।

(৭) কংগ্রেস জমিদারদের আইনসঙ্গত অধিকার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি রায়তদের কোনো অভিযোগ থাকে তবে আপোষে বা সালিসী আদালতে তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়া সঙ্গত।

(৮) ভলাণ্টিয়ার-দল গঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বাছাই করিবার কার্য্যে নিয়মের শৈথিল্য হইতেছে। হাতে-তৈরী সূতার দ্বারা হাতে-বোনা খদ্দর যাহারা পরিধান করে না, যে-সকল হিন্দু অস্পৃশ্যতা দূর করে নাই, যাহারা কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী চিন্তায় ও কার্য্যে নিরুপদ্রব নীতি অবলম্বন করে নাই তাহাদিগকে ভলাণ্টিয়ার-দলভুক্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কংগ্রেসকমিটিসমূহকে আদেশ করিতেছেন, তাঁহারা ভলাণ্টিয়ারদের তালিকা সংশোধন করুন। ভলাণ্টিয়ারদের প্রতিজ্ঞা-পত্র অনুসারে যাহারা কাজ না করে তাহাদের নাম তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে।

(৯) কংগ্রেসের দলভুক্ত লোকেরা যদি কংগ্রেসের বিধি-বিধান এবং অনুপদ্রবনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কার্য্যপরিচালক সমিতির প্রস্তাবসমূহের অনুসরণ করিয়া না চলেন, এবং কংগ্রেসের উপদেশ অমান্য করিয়া যদি অনুপযুক্ত লোকদিগকে ভলাণ্টিয়াররূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং কখনো সিদ্ধ হইবে কি না সে সম্বন্ধেও বিস্তর সন্দেহ থাকিবে।

(১০) নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটির বিশেষ সভায় এই-সকল বিষয়ের যে পর্য্যন্ত আবার বিবেচনা করা না হইবে সে পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব-সমূহের অনুযায়ী কাজ চলিবে। কংগ্রেসের সেক্রেটারী হাকিম আজমল খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটি আহ্বান করিবেন।

নূতন ব্যবস্থা—

গোরক্ষপুরের ঘটনায় কংগ্রেস প্রমাণ পাইয়াছেন, সত্যাগ্রহের প্রধান অংশ অনুপদ্রবনীতির মাহাত্ম্য জনসাধারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই—এই নিরুপদ্রবনীতি ভিন্ন দলবদ্ধভাবে আইন অমান্য করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া, যে-সে লোককে ভলাণ্টিয়ারদের দলভুক্ত করা হইয়াছে। কংগ্রেসের নিয়ম-সকল অবহেলা করার জন্যই জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে বিলম্ব হইতেছে। সুতরাং কংগ্রেসকমিটিগুলিকে নিম্নলিখিত কাজগুলিতে আত্মনিয়োগ করিতে বলা হইয়াছে।

(ক) অন্যূন এক কোটী লোককে কংগ্রেসের সদস্য হইতে হইবে। অহিংসা ও সত্যপ্রিয়তা কংগ্রেসের মূল মন্ত্র। সুতরাং যাঁহারা এই দুটি জিনিষে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদিগকে সভ্য করা হইবে না। যে-সকল কর্ম্মী বার্ষিক চাঁদা দিবেন না তাঁহারাও সভ্য থাকিতে পারিবেন না। অতএব পুরাতন সভ্যদিগকেও নূতন করিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।

(খ) কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে চরকায়-কাটা সূতা এবং হাতে-বোনা খদ্দর পরিধান করিতে হইবে। তাঁহাদের সকলেরই সূতা কাটায় অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

(গ) গবর্মেণ্ট স্কুলসমূহে পিকেটিং করা হইবে না। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ভালো করিয়া ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

(ঘ) অবনত শ্রেণীর লোকদের সামাজিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধান করিতে হইবে। তাহাদের সন্তানদিগকে জাতীয় বিদ্যালয়ে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর আর সকল শ্রেণীর লোকের মত তাহাদিগকেও সাধারণ সুবিধাগুলি প্রদান করিতে হইবে। যে-সব স্থানে অস্পৃশ্যতা দোষ অত্যন্ত প্রবল, সে-সব স্থানে অবনত শ্রেণীর জন্য কংগ্রেসের অর্থে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন ও পৃথক কূপ খনন করিয়া দেওয়া হইবে। জনসাধারণ তাহাদের কূপ যাহাতে অবনত শ্রেণীর লোকদিগকে ব্যবহার করিতে দেয় সেজন্য তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

(ঙ) মদের দোকানে পিকেটিং করা অপেক্ষা পানাসক্ত

লোকদের বাড়ীতে গিয়া মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন চালাইতে হইবে।

(চ) পঞ্চায়তের দ্বারা বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহারা পঞ্চায়তের দ্বারা বিবাদ মিটাইতে নারাজ তাহাদিগকে সামাজিক দণ্ডের ভয় দেখানো হইবে না।

(ছ) সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর একতা স্থাপনের জন্য সেবা-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এ ব্যাপারে জাতিধর্ম্ম বিচার করা চলিবে না। প্রয়োজন হইলে ইংরেজের সেবা করিতে হইবে।

(জ) কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্য ও সহানুভূতিকারীকে তাহার ১৯২১ সালের আয়ের শতাংশের এক অংশ তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে দান করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। প্রাদেশিক তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের শতকরা ২৫ নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটীতে দান করিতে হইবে।

(ঝ) এই প্রস্তাবগুলি নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটীর অধিবেশনে অনতিবিলম্বেই উপস্থিত করা হইবে। যদি প্রয়োজন হয় তাঁহারা এগুলি সংশোধন করিতে পারিবেন।

(ঞ) যাঁহারা গবর্মেণ্টের চাকুরী ছাড়িয়া দিবেন তাঁহাদের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সেজন্য এই কমিটি মিঞা মহম্মদ হাজি, জান মহম্মদ ছোটানি, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস বাজাজ এবং শ্রীযুক্ত ডি জে পটেলের উপর একটি স্কিম তৈরী করিবার ভার দিতেছেন। এই স্কিম কংগ্রেসকমিটির অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এই প্রস্তাবগুলি দেখিয়া অনেকেই মনে করিতেছিলেন, চৌরীচৌরার পরে কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি একেবারেই বদলাইয়া যাইবে—এ আন্দোলন যে ধারা ধরিয়া চলিতেছিল তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। অর্থাৎ অনেকেই মনে করিতেছিলেন, এ আন্দোলন একেবারেই ব্যর্থ হইল। যাঁহারা এরূপ মনে করিতে-ছিলেন তাঁহারা দেখিয়া খুসী হইবেন, নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটির দিল্লীর বৈঠক এই প্রস্তাবগুলিকে ঠিক এইভাবে গ্রহণ করেন নাই। কর-বন্ধের প্রস্তাব সেখানে গৃহীত না হইলেও কংগ্রেসের পূর্ব্বের কার্য্যপদ্ধতি অনেকটাই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটি—

বরদোলীর প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল-ভারত-কংগ্রেসকমিটির এক বৈঠক বসিয়াছিল। হাকিম আজমল খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই সভাতে এক দীর্ঘ প্রস্তাব পেশ করেন। দুই-একটি সামান্য বিষয়ে সংশোধিত হইয়া সভায় মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবটিই পরিগৃহীত হইয়াছে। যদিও ব্যাপক ভাবে আইন-অমান্য নীতি সম্বন্ধে বরদোলীর সিদ্ধান্তই কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন, তথাপি সভ্যগণের ব্যক্তিগত আইন-ভঙ্গের অধিকার একেবারে লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে স্থির হইয়াছে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটি আইনভঙ্গের জন্য যে-সব সর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন সেই-সমস্ত সর্ত্ত পূর্ণ না করিলে কোনোরূপেই আইনভঙ্গের আদেশ দান করা হইবে না। বরদোলীর প্রস্তাবে যে যে সর্ত্তে মদ্য বিক্রয় সম্বন্ধে পিকেটিং করিতে দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই সর্ত্তে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেসকমিটি বস্ত্র সম্বন্ধেও পিকেটিং চালাইতে অনুমতি দিয়াছেন।

সহযোগবর্জ্জন বা আইনভঙ্গ ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেসের মূল কার্য্য-প্রণালীর কোন অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই, কেবলমাত্র অহিংস নীতি সহজসাধ্য করিয়া তুলিবার জন্য বরদোলীর প্রস্তাবিত গঠননীতিমূলক কার্য্যপ্রণালী পরিগ্রহের জন্য কংগ্রেস সভ্যগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। অসহযোগ ব্যাপারের কোন অংশ ব্যর্থ হইয়াছে একথা কংগ্রেস কমিটি একেবারেই মনে করেন না।

তাহা ছাড়া যখনই রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির পরিপন্থী হইবে, নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেসকমিটি তখনই আইন ভঙ্গ করা সঙ্গত বলিয়া রায় দিয়াছেন। ব্যক্তিগত আইনভঙ্গ বলিতে কি বুঝায় কংগ্রেস-কমিটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহারও অর্থ নির্দ্দেশ করিতে কসুর করেন নাই। যদি একটি নিষিদ্ধ সাধারণ সভার প্রবেশাধিকার টিকিটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তাহা হইবে ব্যক্তিগত আইনভঙ্গ; আর যদি কোন নিষিদ্ধ সাধারণ সভায় জনসাধারণের যোগদান সম্বন্ধে কোনরূপ বিধি নিষেধ না থাকে তবে সেইখানেই সেটা হইবে সাধারণ আইনভঙ্গ। কোনো সাধারণ কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিষিদ্ধ সভা আহূত হইলে তাহার ফলে যদি গ্রেপ্তারও চলে তবে তাহাকে আত্মরক্ষামূলক আইনভঙ্গ বলা হইবে; আর যদি গ্রেপ্তার হওয়া বা কারাগারে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই নিষিদ্ধ সভার অধিবেশন করা হয় তবে তাহাই হইবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আইনভঙ্গ।

মহাত্মা গান্ধী সহজে কংগ্রেসের 'পাসপোর্ট' পান নাই। দুই দিন ধরিয়া তুমুল তর্কবিতর্কের পর প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। বরদোলীর প্রস্তাবগুলিতে দেশ যে কিরূপ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিল এই তর্কবিতর্কের বহরই তাহার প্রমাণ।

উত্তেজিত জন-সঙ্ঘ—

আসামের অন্তর্গত নওগাঁর ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস-কমিটির পাব্‌লিসিটি বোর্ড গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন:—

গত ১৫ই তারিখ যমুনামুখ নামক স্থানে একটি গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। পুলিশ ছয়জন ভলাণ্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। ডেপুটি কমিশনার বিচার করিয়া উহাদিগকে ছয়মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় পাঁচ শত লোক উত্তেজিত হইয়া সব্-ডেপুটি কালেক্টরকে প্রহার করিয়াছে। ডেপুটি কমিশনার পলাইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হন। ষ্টেশন পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াও ডেপুটি কমিশনারকে ধরিতে না পারিয়া জনতা অবশেষে রেল্ লাইন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেই সময় মেল ট্রেন আসিয়া পড়ায় তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহার পর অসন্তুষ্ট জনতা পুলিশ থানা হইতে ভলাণ্টিয়ারদিগকে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

আমরা জনতার এ ব্যবহার বিন্দুমাত্র সমর্থন করি না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে এই কথাই বলিতে হয়, এগুলি কর্তৃপক্ষের কৃত-কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। আসামে জনসাধারণের প্রতি যেরূপভাবে অত্যাচার চলিতেছে তাহাতে জনসঙ্ঘের উত্তেজিত হইয়া উঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। আমরা এখানে অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা তুলিয়া দিতেছি। খবরগুলি অনেকদিন প্রকাশিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাহার কোনো প্রতিবাদ করেন নাই—অন্ততঃ কোনো প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই।

শিবসাগরের ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির পাবলিসিটি বোর্ড খবর দিয়াছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় চারিশত সশস্ত্র গুর্খা লইয়া রামানু-পুখুরিয়া হইয়া শিবসাগরে আসেন। পথে পথে তাঁহারা বাকি কংগ্রেস ও পঞ্চায়েৎ আফিসগুলি টানিয়া

ভাঙ্গিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। রাস্তায় গুর্খারা মারধরও চালাইয়াছিল।

জোড়হাটের অন্তর্গত ঝাঁঝি কংগ্রেস পাব্লিসিটি বোর্ডের সেক্রেটারী সংবাদ দিয়াছেন—গত ১৭ই তারিখ আসাম ভ্যালি রাইফেল্স নামক সেনাদলটি ঝাঁঝিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরদিন উহারা আমগুরী ও ঝাঁঝি চা বাগানে যায়। এই দুই বাগানের কুলীরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ১৮ই তারিখ বৈকালে দুই ডজন সৈন্যকে শিমুলগুরী মৌজায় পাঠানো হয়। তাহারা প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক-দলের কাপ্তেন শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাঁহার ভাইয়ের নিকটে ৫০৲ টাকা দাবী করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা টাকার পরিবর্ত্তে একশত টাকা মূল্যের এক জোড়া সোনার কেউর ও একটা সোনার আংটি দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। এই উপায়ে দুই ঘণ্টার ভিতর ৩৪খানা বাড়ী হইতে ৫৮০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকজন টাকা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ধরিয়া বেওনেটধারী সৈন্যদলের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়। সৈন্যেরা তাঁহাদের প্রতি সঙ্গীন খাড়া করিয়া রাখে। আত্মীয়েরা তখন টাকা দিয়া ইহাদিগকে খালাস করিয়া আনিয়াছেন। তারপর কংগ্রেস ও পঞ্চায়েৎ আফিস ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করা হয়। সমস্ত ভলাণ্টিয়ারের মাথার টুপী সৈন্যেরা কাড়িয়া লইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুশদেব গোস্বামী সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁহাকে দিয়া জোর করিয়া সেলাম আদায় করানো হইয়াছে। তিনি সেলাম করিলে একজন অফিসার উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'দেখো, তোমাদের গোস্বামী পর্য্যন্ত বিটিশ রাজকে সেলাম করিল। তোমরা মনে রাখিও, এখন পর্য্যন্ত গান্ধী-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

জনসাধারণের প্রতি যখন এই ধরণের অত্যাচার চলিতে থাকে তখন তাহাদের পরিণামের কথা ভাবিয়া কাজ করিবার মত মেজাজ থাকে না—কেবল এদেশের নহে, কোন দেশের জনসাধারণের তাহা নাই। অর্থসমস্যা ও অন্যান্য নানা রকমের দুঃখ-দুর্দ্দশায় জনসাধারণের মন তাতিয়াই আছে। এই বারুদের স্তূপে অত্যাচারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলে তাহার ফল কি হয় তাহা বোঝা একান্তই সহজ। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তি-উপদ্রবগুলির জন্য গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কর্ম্মচারীরা যতটা দায়ী জনসাধারণ ততটা নহে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

'ঐক্য' পঞ্চায়েৎ—

অযোধ্যার সাণ্ডিলা তহশিলে মাদারী পাশি নামক এক ব্যক্তি 'ঐক্য' নামে একটি পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়াছে। মাদারীর বাড়ী সাণ্ডিলা হইতে আট মাইল দূরে মোহনক্ষীরা নামক গ্রামে। মাদারীর অধীনে পাঁচহাজার ধনুক-লড়্কীধারী অনুচর আছে, সে এই-সব লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে কথকতার প্রণালীতে 'ঐক্য' মত প্রচার করিতেছে; এবং এক-একটি করিয়া পঞ্চায়েৎ বসাইতেছে। এই পঞ্চায়েৎ গ্রামের সকল বিবাদের মীমাংসা করে, মামলা করিবার জন্য কাহাকেও আদালতে যাইতে দেওয়া হয় না। ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চারি আনা করিয়া চাঁদা আদায় করা হয়। কেহ তাহার দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিলে সে নাকি তাহার উপর নানা রকমের অত্যাচার সুরু করিয়া দেয়। তাহার ক্ষেতের ফসল পাকিতে না পাকিতে কাটিয়া লইয়া যায়, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, কূপসকল অপবিত্র করে, হিন্দু ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গরুর হাড় নিক্ষেপ করে। সে প্রজাদিগকেও জমিদারের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। এই সকল কারণে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী অযোধ্যার নিয়মতান্ত্রিক সভার তালুকদার সভ্যগণ হরদোই জেলার সদরে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, ঐক্য আন্দোলনকারীরা কেবলমাত্র জমিদারদেরই বিরোধী নহে, তাহারা অত্যন্ত বিপ্লববাদী। সুতরাং গবর্মেণ্ট এই সময় মাদারীকে দমন করিতে না পারিলে তাঁহাদেরও বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। মাদারী জমিদার ও তালুকদারদের বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক জমিদার ইতিমধ্যে ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

মাদারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এই নিমিত্ত গবর্মেণ্ট একশত সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য একখানি স্পেশাল ট্রেনও ষ্টেশনে সর্ব্বদা মজুত আছে। কিন্তু মাদারীকে রক্ষা করিবার জন্যও নাকি ২০,০০০ লোক প্রস্তুত হইয়া আছে। কেবলমাত্র সাণ্ডিলা তহশীলেই ৫০,০০০ লোক 'ঐক্য' শপথ গ্রহণ করিয়াছে। আরো অনেক গ্রামে ইহার প্রভাব বিস্তারলাভ করিতেছে। 'ইংলিশম্যানের' সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন,—খেলাফৎ ভলাণ্টিয়াররাও নাকি এই সব গ্রামে যাতায়াত করিতেছে। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—আন্দোলনকারীদের চেষ্টায় টিকারী-রাজের জমীদারীর ভিতর অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। ছোট তরফের একজন পাটোয়ারী এই ব্যাপারে নিহত হইয়াছেন। আন্দোলনকারীরা রায়তদের কাছে ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা যদি জমিদারদের খাজনা দিতে অস্বীকার করে তবে কয়েক-মাসের ভিতরেই স্বরাজ পাইবে। জমিদারদের কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিবার জন্য ও স্বরাজলাভের জন্য সমিতিও গঠিত হইয়াছে। আন্দোলনকারীরা প্রজাদের বুঝাইয়া দিয়াছে, স্বরাজ পাওয়া গেলে জমীদারী প্রথা আর থাকিবে না—কাহাকেও খাজনা বা ট্যাক্সও দিতে হইবে না। এসমস্তই কিন্তু মাদারীর বিপক্ষ-পক্ষের কথা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ধর্ম্মঘট—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী টুণ্ডলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে যে ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে এতদিনেও তাহার জের মেটে নাই। বরং ধীরে ধীরে তাহা এই দীর্ঘ রেল-লাইনের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অণ্ডাল, এলাহাবাদ, গয়া, মোগল-সরাই, অম্বালা, আসানসোল, বর্দ্ধমান, ব্যাণ্ডেল, গাজিয়াবাদ, পাটনা, মধুপুর, এক কথায় এই বহুবিস্তৃত রেল-লাইনটির দুই-চারিটা ষ্টেশন ছাড়া প্রায় সব ষ্টেশনেই ইহার ঢেউ গিয়া পৌঁছিয়াছে—সে ঢেউ যেমন প্রবল তেমনি উত্তেজনার দ্বারা আবিল।

হঠাৎ যে কারণে এই ব্যাপারটা এমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল তাহা রহস্যাবৃত। ধর্ম্মঘটীরা বলিতেছে, গত ১লা ফেব্রুয়ারী একজন ইউরোপীয় 'ফোরম্যান' ও একজন ইউরোপীয় 'সাণ্টার' রামলাল নামক একটি 'ফায়ারম্যান'কে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা জানানো হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের অভিযোগের দিকে কোনোরকম নজর দেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মঘটীরা প্রতিকারের ব্যবস্থা আপনাদের হাতেই গ্রহণ করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন, ধর্ম্মঘটীদের এ অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ডাক্তারের দ্বারা রামলালকে পরীক্ষা করানো হইয়াছিল। কিন্তু প্রহারের কোনো চিহ্নই তাহার দেহে আবিষ্কৃত হয় নাই। রামলাল মারা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব উঠিয়াছে তাহাও একেবারে মিথ্যা।

এ ব্যাপারে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু যাহার কথাই সত্য হোক্ না কেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ধর্ম্মঘট যে দেশের ভিতর যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে

তাহাতে সন্দেহ নাই—কেবলমাত্র জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা নহে, এই ব্যাপারে আরো অনেক রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কয়লার মহার্ঘতা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের দামও অনেক স্থলেই আর পূর্ব্বের অবস্থায় নাই। তাহা ছাড়া ইহা লইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামাও কম হইতেছে না এবং সে দাঙ্গার ফলে কতকগুলি নির্দ্দোষী লোককে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছে।

এই ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিকসঙ্ঘের সম্পাদক গত ২৭শে তারিখ আসানসোল হইতে লিখিয়াছেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের প্রায় সমগ্র লাইনটাতেই ধর্ম্মঘট রহিয়াছে, অথচ মিটমাটের কোন চেষ্টাই হইতেছে না। প্রধান প্রধান রেলওয়ে-কর্ম্মচারীরা সকলেই নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে কাজ করিতেছেন। এজেণ্ট ২০শে তারিখ যে বিজ্ঞাপন জারী করিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করিতেছেন। বর্ত্তমানে ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যয়ও সঙ্কুলান হয় না একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় কর্ম্মচারীদের দাবীও তেমন বেশী নহে অথবা তাহা অযৌক্তিকও নহে। কোনো কোনো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ, এমন কি কোনা কোনো উচ্চপদস্থ রেল-কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটের সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেস ও খেলাফতের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা আপনিই প্রকাশ পাইবে। আমাদের এখন আর কিছু বলিবারও প্রয়োজন নাই। আমরা খবরের-কাগজওয়ালাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন গবমেণ্ট ও রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষের মনে ধর্ম্মঘটীদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা না করেন। জনসাধারণ অনতিবিলম্বেই সত্য কথা সমস্তই জানিতে পারিবেন।"

শ্রমিকসঙ্ঘ ধর্ম্মঘটের নিষ্পত্তির জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করিয়াছেন:—

(১) রেল-কর্ম্মচারীদিগকে এই সমিতির প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

(২) ভারতীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মাহিনা শতকরা ২৫ টাকা হারে বাড়াইয়া দিতে হইবে।

(৩) টুণ্ডলার অভিযোগের প্রতিকার করিতে হইবে এবং জাতিগত বৈষম্য দূর করিতে হইবে।

(৪) ঝাঁঝার ব্যাপার সম্বন্ধে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) ধর্ম্মঘটের জন্য কর্ম্মচারীদের চাকরীর সময়ের যে ধারাবাহিক ভাব নষ্ট হইল ও ধর্ম্মঘটীদের যে আর্থিক ক্ষতি হইল, রেলওয়ে বোর্ডকে সেজন্য শ্রমিকদের অনুকূলে বিচার-বিবেচনা করিতে হইবে।

ধর্ম্মঘটের বাহিরের কারণ যাহাই হোক, ভিতরের কারণ যে অন্ন-সমস্যা, আত্মসম্মান-সমস্যা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দুইটি সমস্যার মীমাংসার জন্য মনের ভিতর তাগিদ আসাও একান্তই স্বাভাবিক। ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণ একই মনিবের অধীনে একই প্রকারের কাজ করে; অথচ ইউরোপীয়গণ যেসব সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার কণামাত্রও ভারতবাসীরা পায় না। ইহাতে জাতি-বিদ্বেষের সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেস ও খেলাফতের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া খালাস হইতে চাহেন—হয়ত কূটনীতির সাহায্যে এবারকার ধর্ম্মঘট মিটিয়াও যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে ভবিষ্যতের কঠিনতর বিপদের সম্ভাবনা দূর হইবে না—এ কথাটা এইবার এইখানেই বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

শ্রীহট্টে গুলি—

শ্রীহট্টের কানাইয়ের হাটে গুলি চালানোর সম্বন্ধে যে সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হইয়াছে।—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী কানাইয়ের হাটে একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। উদ্‌যোক্তাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া দেওয়া হয় তাঁহারা বিনা অনুমতিতে যেন সভা না করেন। তবে তাঁহারা যদি প্রতিশ্রুতি দেন সভায় কোনোরূপ রাজনৈতিক আলোচনা হইবে না তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সভা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। ইহা সত্ত্বেও কেহই কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। বেলা ১০টা হইতে লোক জমিতে আরম্ভ হয়; সুর্ম্মাভ্যালির কমিশনার তখন কানাইয়ের হাটে তাম্বুতে ছিলেন, সংবাদ পাইয়াই তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হন—তাঁহার সঙ্গে ছিলেন একষ্ট্রা-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার মৌলবী মহম্মদ চৌধুরী এবং ৩০জন সশস্ত্র পুলিশ ও ১২জন নিরস্ত্র পুলিশ। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই জনসাধারণকে সরকারী আদেশের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইবার জন্য ৭ মিনিট সময় দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় অতিবাহিত হইবার পর পুলিশ জনতাকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। অসহিষ্ণু জনতা তখন বাঁশ লইয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে এবং ঢিল নিক্ষেপ করিতে থাকে। তখন পুলিশকে বলপূর্ব্বক জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হয়। এই সময় কমিশনার চারিদিক হইতে লাঠির দ্বারা আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় পড়িয়া তিনি বাধ্য হইয়াই গুলি চালাইতে হুকুম দিয়াছিলেন। জনতা তখনকার মত ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় বটে, কিন্তু পুলিশ যখন থানায় ফিরিয়া আসিতেছিল তখন তাহাদিগকে আবার আক্রমণ করে। তখন পুলিশ বাধ্য হইয়া আবার গুলি চালাইয়াছিল। জনতার লোকেরা একজন কনষ্টেবলের হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লয়, তাহা ছাড়া দুই-জন কনষ্টেবল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন নদী পার হইতে চেষ্টা করিতেছিল তখন তাহাদিগকে প্রহারের চোটে হত্যা করে। সন্ধ্যার সময় জনতা আপনিই ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। মোট তিনজন কনষ্টেবল এবং আটজন গ্রামবাসী এই ব্যাপারে নিহত হইয়াছে—আহত হইয়াছে কয়েকজন।

এই রিপোর্ট পড়িলে মনে হয়, পুলিশ অত্যন্ত সুবোধ শান্ত সুশীল বালক, কোনোরূপ দুরন্তপনা তাহারা করিতে জানে না—করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বলা বাহুল্য সরকারী রিপোর্টটির সহিত বেসরকারী রিপোর্টটির যথেষ্টই প্রভেদ আছে। কিন্তু এই পার্থক্য জিনিষটা কিছুমাত্র নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বেও এই ধরণের প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারে এ পার্থক্য দেখা গিয়াছে এবং তাহা লইয়া আমরা আলোচনাও করিয়াছি বিস্তর। সুতরাং সেই বহু আলোচিত বিষয়টি লইয়া আবার নূতন করিয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের বাজেট

গত পয়লা মার্চ্চ দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় ভারত-সরকারের রাজস্ব-সচিব স্যার ম্যাল্কম হেলি ১৯২২।২৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছিলেন। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় হইয়াছে ৩৪ কোটি টাকা বেশী। ২০ কোটি টাকার উপর রাজস্ব কম আদায় এবং ১৪ কোটি টাকার উপর খরচ বাড়িয়া যাওয়াই ইহার কারণ। তিনি হিসাব খতাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, শুল্কে সওয়া চার কোটি টাকা, আয়কর ও লবণ-শুল্কের প্রত্যেকটিতে ৯০ লক্ষ টাকা, আফিংএ ৭০ লক্ষ টাকা এবং ডাক ও টেলিগ্রাফে দেড় কোটি টাকার রাজস্ব কম আদায় হইয়াছে। রেলের খরচের জন্য বাজেটে

যত টাকা ধরা হইয়াছিল, তাহা হইতে বেশী খরচ হইয়াছে ৭।০ কোটি টাকা, এবং বাটার জন্ম খরচ হইয়াছে পৌনে চার কোটি টাকা। ইহা ছাড়া ওয়াজিরিস্থানের সামরিক অভিযানের খরচ অতিরিক্ত পৌনে তিন কোটি টাকা লাগিয়াছে।

বর্তমান বৎসরের জন্ম যে বাজেট তৈরী করা হইয়াছে তাহার অবস্থাও বিশেষ ভালো নহে। নূতন বাজেটে রাজস্ব ধরা হইয়াছে ১১০॥ কোটি টাকা কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ অনুমান করা হইয়াছে ১৪২॥ কোটি টাকা। সুতরাং আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের শেষে তহবিলে প্রায় ৩২ কোটি টাকা কম পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে।

এই কমতি টাকা পুরণের জন্ম স্যার ম্যাল্‌কম হেলী নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রস্তাব করিয়াছেন।—

রেলযাত্রীদের ভাড়া শতকরা ২৫ টাকা হারে বাড়ানো হইবে।

এক পয়সার পোষ্টকার্ডকে দুই পয়সা করা হইবে। খামের চিঠির ডাকমাশুল বাড়াইয়া চারি পয়সা করা হইবে, দুই পয়সা ও তিন পয়সার ডাক-টিকিট থাকিবে না।

সাধারণ আমদানী পণ্যের আনুমানিক দামের অনুপাতে শুল্ক শতকরা ১১ টাকা হইতে ১৫ টাকা এবং তুলার বাণিজ্য-শুল্ক সাড়ে তিন টাকা হইতে সাড়ে সাত টাকা করা হইবে। চিনির কর শতকরা ১৫ হইতে বাড়িয়া ২৫এ উঠিবে এবং আমদানী সূতার উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে কর বৃদ্ধি করা হইবে।

কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত এবং রেলওয়ের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির শুল্ক আড়াই টাকা হইতে শতকরা দশ টাকা বাড়ানো হইবে।

বিয়ার, লিকার ও স্পিরিটের শুল্ক শতকরা কুড়ি টাকা বাড়িবে।

দেশলাই ও লবণের শুল্ক বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে।

বিলাসদ্রব্যে ২০ টাকার স্থলে ৩০ টাকা হিসাবে কর দিতে হইবে।

কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, আয়কর, সুপার-ট্যাক্স প্রভৃতির উপরেও কর বৃদ্ধি করা হইবে। এই উপায়ে ২৯ কোটি টাকা রাজস্ব বাড়াইবার এক ফর্দিও স্যার ম্যাল্‌কম হেলী ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় পেশ করিয়াছেন।

স্যার ম্যাল্‌কম হেলী বলেন, নূতন ব্যবস্থায় সকলপ্রকার খরচের মাত্রাই বিশেষ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র জগতের টাকাকড়ির বাজারের বর্তমান অবস্থাই ভারতের এই গোলযোগের কারণ। ব্যবসার বাজার যে এমন মন্দা পড়িবে সে অনুমান পূর্ব্বে কিছুতেই করিতে পারা যায় নাই। ব্যয়ের অনুপাতে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই এ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় এবং ভারত এই উপায় অবলম্বনে দ্বিধা করিতে পারে না।

এরূপ অদ্ভুত রকমের বাজেট এই দেশেই সম্ভবপর। ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে যে-গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নাই তাহার আয়ের অঙ্কে শূন্য পড়াই স্বাভাবিক এবং ঋণ ভার পাহাড়-প্রমাণ বাড়িয়া উঠিয়া তাহার দেউলিয়া হইয়া পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। লাট-বেলাট হইতে আরম্ভ করিয়া, সেক্রেটারী আণ্ডার-সেক্রেটারী, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের ছোট-সাহেব বড়-সাহেব সকলের মাহিনা ইহাকে যেভাবে বহন করিতে হয় তাহা অদ্ভুত, ইহার সৈন্যবিভাগের ব্যয়ভার অদ্ভুত। ইহার হিসাবনিকাশ খরচের রীতি-পদ্ধতি অদ্ভুত। কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

ভারতবর্ষের সরকারী অর্থভাণ্ডারের অবস্থা যখন 'গজভুক্ত কপিত্থের' ন্যায় তখনই দিল্লীতে রাজধানী তৈরীর ব্যবস্থা চলিতেছে। এই রাজধানী তৈরী ব্যাপারের রিপোর্টগুলিতে খরচের যে অঙ্ক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিলে চক্ষুস্থির হইয়া যায়। এবারকার এই অসম্ভব বাজেট তৈরী করিবার সময়ও এজন্য দুই কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা সত্ত্বেও ইহার শাসনের জন্য প্রত্যেক বিভাগের উপর আবার একজন করিয়া কমিশনার আছেন। তাঁহার মাহিনা মাসে প্রায় ৩০০০ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৩৬,০০০ টাকা। এ ব্যাপারটা যে কিরূপ, এক বাংলার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। বাংলায় পাঁচটি বিভাগ আছে। সুতরাং কমিশনারদের মাহিনা-বাবদ তাহাকে ব্যয় করিতে হয় বৎসরে ৩৬×৫=১৮০ অর্থাৎ একলক্ষ আশী হাজার টাকা। অথচ এই কমিশনারের পদটি যে একেবারে নিরর্থক তাহা বলাই বাহুল্য।

নূতন ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশে চারিটি করিয়া এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলারের পদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা মাহিনা পান প্রত্যেকে মাসে ৫,৩৩৩ টাকা। মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তিনজন করিয়া, তাঁহাদেরও প্রত্যেকের মাহিনা মাসে ৫,৩৩৩ টাকা। তাহা ছাড়া সেক্রেটারী আণ্ডার-সেক্রেটারীর ত অভাবই নাই। কিন্তু এই যে এত টাকার নূতন ব্যবস্থা, ইহা সেকালের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের আমলের সেক্রেটারী আণ্ডার-সেক্রেটারী, মন্ত্রী, কাউন্সিলারের বাহুল্যশূন্য গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা সুশাসনে এবং প্রজার সুখসোয়াস্তি-বিধানে যে বেশীদূর আগাইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দুর্ম্মূল্যতা এবং দারিদ্র্যের হাহাকার এখন যেভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে সে সময় কখনো যে তেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না।

এখানকার শাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদিগকে সংগ্রহ করা হয় বেশীর ভাগই বিলাত হইতে। তাঁহারা চাকরী যখন করেন তখন হাতীর খোরাক ন্যায্য পাওনা বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং কর্ম্মাবসানে বিলাতে বসিয়া আমাদের আক্কেলসেলামী তাঁহাদের পেন্সনের টাকাগুলি পকেটস্থ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন না। দেশবাসীকে শাসন-যন্ত্রের কারখানা-ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে এই পেন্সনের টাকাগুলি, অন্ততঃ বিদেশে চলিয়া যাইবার অবকাশ পাইত না।

সৈন্য-বিভাগের ব্যয়ভারের সম্বন্ধে কোনো কথা না বলাই ভালো, কারণ তাহাতে অবাক হইবার যতটা মাল-মশলা আছে কথা বলিবার তেমন কিছু নাই। তবে দুঃখ এই, এত টাকা ব্যয় করিয়াও আমাদের সীমান্ত-ভীতি, চীন-জাপান-রাশিয়া-ভীতি সেকালের বাংলার বর্গী-ভীতির মতই প্রবল হইয়া আছে।

স্যার ম্যাল্‌কম হেলী যে ব্যয়সঙ্কোচের কথা বলিয়াছেন, তাহার স্বরূপ কি—এই ধরণের অসংখ্য নমুনাই তাহার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এ সঙ্কোচের নমুনা যতই অদ্ভুত হোক্ না কেন, তাহা অপেক্ষাও বেশী অদ্ভুত হইতেছে ইঁহাদের করবৃদ্ধির ব্যবস্থাটা। দরিদ্রের অবস্থা বর্ত্তমানে যথেষ্ট রকম শোচনীয়। এই ব্যবস্থায় সে দারিদ্র্য আরো দুঃসহ আরো দুর্ব্বহ করিয়া তোলা হইবে। অনেকে নুন-ভাত খাইয়া দিন-গুজ্‌রান করিত, অতঃপর সে নুনও তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। কাপড়ের অভাবে লোক ইতিমধ্যেই প্রায় দিগম্বর হইয়া উঠিয়াছে, ইহার পরেও যদি কাপড়ের দাম বাড়ে তবে লোকের অবস্থা কি হইবে বোঝা কঠিন নহে। এইরূপ এই নূতন বাজেটের অনেক ব্যাপার হইতেই দেখানো যায় কর বাড়াইবার সময় রাজস্ব-সচিব এদেশে জনসাধারণের সুখদুঃখের প্রতি কিছুমাত্র নজর দেন নাই। নন-কো-অপারেশনের নেতারা গবর্মেণ্টের কর বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বার বার ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহাদের বিনা চেষ্টায়, বাধ্য হইয়া জন-সাধারণ কর বন্ধ করিবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। নূতন

বাজেটে যেভাবে করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র অক্ষম জনসাধারণের পক্ষে ইহা ছাড়া আর কি উপায় আছে তাহা আমরা জানি না।

মালাবার-সম্পর্কে শ্রীমতী নাইডু—

বিদ্রোহের সময় মালাবারে মোপ্লারা ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে—তাহা লইয়া আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছে, হৈ চৈ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর যে কিরূপ অত্যাচার চলিয়াছিল তাহার খেয়াল বড় কেহ বিশেষ রাখে নাই।

সম্প্রতি মাদ্রাজে কয়েকটি বক্তৃতায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই-সব অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, অত্যাচার কেবল মোপ্লারাই করে নাই। যাহারা তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়াছিল সেই সৈন্যদলও অত্যাচার করিয়াছে এবং সে অত্যাচার নৃশংসতায় মোপ্লাদের অত্যাচার হইতে কিছুমাত্র কম নহে। তাহারা নারীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, শিশুদের উপরেও তাহারা বর্ব্বরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে কিছুমাত্র কসুর করে নাই।

শ্রীমতী নাইডুর এই বক্তৃতা মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট যে বিশেষ ভালো ভাবে গ্রহণ করেন নাই তাহা তাঁহাদের ব্যবহারের ভিতর দিয়াই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা শ্রীমতী নাইডুকে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কেবলমাত্র যদি আহ্বান করিতেন তবে কোন কথা ছিল না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইতেও ইতস্তত করেন নাই।

শ্রীমতী নাইডু অবশ্য এই আহ্বানের উপযুক্ত জবাব বেশ মুখের মত করিয়াই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্যাপারগুলি ইতিপূর্ব্বেই মাদ্রাজের সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে জানানো হইয়াছে এবং ইচ্ছা থাকিলে এখনও অতি সহজেই এগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি অসহযোগী, তিনি গবর্মেণ্টকে কোনো-রূপেই সাহায্য করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া তাঁহাকে ভয় দেখানো বৃথা। তিনি নিজে মালাবারে ঘুরিয়া যে-সব সত্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন কাহারো চোখ্ রাঙানীতে সেগুলিকে ব্যক্ত করিতে ভীত হইবেন না।

বস্তুতঃ গবর্মেণ্টের যদি কেবল সত্যনির্ণয়েরই ইচ্ছা থাকিত তবে শ্রীমতী নাইডুকে এ ধমক না দিয়াও তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন; গত ২১শে ফেব্রুয়ারীর "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্ট লিখিয়াছেন, "একটি ছোট মোপ্লা বালকের করুণ কাহিনী আমি ইতিপূর্ব্বে মিঃ এণ্ড্রুজের নিকট হইতে শুনিয়াছি। এবং আমার ধারণা ঘটনাটি তিনি গবর্ণরের কাছেও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে স্যার লায়োনেল ডেভিড্‌সন যেরূপ স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। মিঃ কে, পি, কেশব মেননের উক্তিও এ ঘটনার সত্যতাই প্রমাণ করিতেছে। কাহিনীটি হইতেছে এই—সৈন্যেরা মোপ্লাদের একটি গ্রাম দগ্ধ করিতেছিল। একটি বালক সেই সময় তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তাহাকে তাহারা সিঁড়ি দিয়া টানিয়া আনে এবং তাহার হাত-দুইখানি কাটিয়া দেয়। সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্, স্যার লায়োনেল ডেভিড্‌সন যে ব্যাপারটিতে অনুসন্ধানের উপযুক্ত সূত্র পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সূত্র যে গবর্মেণ্ট পাইয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই সন্দেহ নাই। সত্য আবিষ্কারের ইচ্ছা থাকিলে ইহার উপরে নির্ভর করিয়াই তাহা করা চলিত।

একথা কেহই বলিবেন না, বিদ্রোহীরা যেখানে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছে সৈন্যেরা সেখানে পাদ্রী সাজিয়া বক্তৃতার চোটে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবে। সেখানে সৈন্যদিগকে অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হয়। কিন্তু উপরের ঘটনাটিতে তাহারা যেভাবে অস্ত্র চালাইয়াছে, সত্য হইলে—তাহা বিদ্রোহদমন নহে, তাহা পাশবিক অত্যাচার, তাহা অমানুষিক নৃশংসতা। এই ধরণের অত্যাচারের জন্য বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় জার্ম্মানদিগকে এই ইংরেজরাই ধিক্কার দিয়াছেন।

মালাবারে সৈন্যদের এই অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক ঘটনাই ইতিপূর্ব্বে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদককে সে নিমিত্ত জবাবদিহি করিবার জন্য আহ্বান করা হয় নাই। অথচ শ্রীমতী নাইডু ইহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেই তাঁহার বিরুদ্ধে কড়া ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে। এ জিনিসটা আর যাহাই হোক্, গবর্মেণ্টের নিরপেক্ষতার পরিচয় মোটেই প্রদান করে না। তবে তাহা ছাড়া হিন্দুদের প্রতি মোপ্লারা যে-সব অত্যাচার করিয়াছে মালাবারে দেশী বিদেশী অনেক লোকই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সেগুলির প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থিত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট কাহারো উপর নোটিশ জারী করেন নাই। তেমনি মোপ্লাদের প্রতি যদি অত্যাচার হইয়া থাকে তবে তাহা বর্ণনা করিবার অধিকারও লোকের আছে। তাহা বর্ণনা করিলে কেনই বা অপরাধ হইবে এবং কেনই বা গবর্মেণ্ট সেজন্য ধমক চালাইবেন তাহার কারণ কিছুমাত্র বোঝা যায় না। সৈন্যেরা সকলেই কিছু যীশুখৃষ্ট নহে। অত্যাচার যে তাহারা করিতে পারে এবং সে অত্যাচার যে অনেক সময় পশুদের পাশবিকতাকে ছাড়াইয়া উঠে তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে।

মালাবারে যে-সমস্ত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে মিঃ এণ্ড্রুজ প্রভৃতির কথার উপরে নির্ভর করিয়া গবর্মেণ্ট যদি তদন্ত করিতেন এবং অপরাধীদিগকে বাহির করিয়া যদি তাহাদের শাস্তিবিধান করিতেন তবে তাহাই হইত কর্ত্তৃপক্ষের যোগ্য কাজ।

'ঐক্য' আন্দোলন—

'ঐক্য' আন্দোলন আমরা যতটা জানি, ইহা জমীদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের আন্দোলন—তাঁহাদের বে-আইনি আবওয়াব, নজর, সেস, প্রভৃতি বন্ধ করিবার আন্দোলন। জমীদারেরা প্রজাদের উপর যে কিরূপ অত্যাচার করে তাহা এই বাংলা দেশেও অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রজারা যদি এক হইয়া বিধিসঙ্গত পথে জমীদারদের সেই-সব অত্যাচার-উপদ্রব বন্ধ করিতে চেষ্টা করে তবে সেটা কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। ঐক্য আন্দোলনও সম্ভবতঃ সেইরূপ একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু ইংলিশম্যান ইহার ভিতর রাজনীতির গন্ধ পাইয়াছেন—বল্‌শেভিকবাদের গন্ধ পাইয়াছেন। বহু দিনের অত্যাচারের ফলে হয়তো কোনো কোনো স্থানে প্রজারা একটু আধটু মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এবং সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া ইংলিশম্যান ইহাকে যে চোখে দেখিয়াছেন সকলের পক্ষে ইহাকে সে চোখে দেখা কঠিন।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

বাংলা

আমাদের অর্থ-সমস্যা—

বাঙ্গলার বজেটে ১২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি।—বাঙ্গলা সরকারের ১৯২২-২৩ সালের সংশোধিত বজেটে আয় ও ব্যয় উভয়ই কম

হইয়াছে। আয়ে ৭৬ লক্ষের উপর কম পড়িয়াছে। তন্মধ্যে ৫২ লক্ষ টাকা খাজনা, আব্‌গারী ও ট্যাক্সে কম হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ কম হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য যে বজেট হইতেছে তাহাতে আয়ের দিকে কিছু উন্নতি হইবে এবং খরচের দিকে আরও কমান হইবে। ফলে ১২০ লক্ষ টাকা মোট কম পড়িবে। এই টাকা গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্‌স্ বসাইয়া উঠাইতে চাহেন।

কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আশা করেন ইহার পর অর্থের অনটনের জন্য বেগ পাইতে হইবে না। যদি কাউন্সিল ট্যাক্‌স্-বিল পাশ করেন তবে ভবিষ্যতে খরচ বাদে কিছু টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত বিল এখনও পাশ হয় নাই। সেকারণ উক্ত বিল পাশ হওয়ার পর কাউন্সিলে একটি অতিরিক্ত বজেট উপস্থিত করা হইবে। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট দেখাইবেন বাড়্‌তি টাকা তাঁহারা কিরূপ ভাবে ব্যয় করিবেন। সিলেক্‌ট্ কমিটীর পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব অনুসারে ১৪০ লক্ষ পাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে ২০ লক্ষ বাড়্‌তি থাকিবে।—মোহাম্মদী।

আয়বৃদ্ধি।—বাঙ্গলা-গবর্ণমেণ্ট ব্যয় হ্রাস করিয়া ৯০ লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। থিয়েটার, ঘোড়-দৌড় প্রভৃতির উপর ট্যাক্স স্থাপন করিয়া ২৫।৩০ লক্ষ ও ষ্ট্যাম্পের হার বেশী করিয়া ৪০ লক্ষ এবং কোর্ট-ফি বৃদ্ধি করিয়া ৮০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ তিন প্রকার ট্যাক্স হইতে ১।০ কোটি টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা। ব্যয় হ্রাস করিয়াও ৯০ লক্ষ টাকা ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৬৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আয় হইবে। সুতরাং ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবে। আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ২।০ কোটি টাকা বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ব্যয় সংক্ষেপ, ট্যাক্স স্থাপন ও ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থ, এই তিন উপায়ে ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০ লক্ষের বেশী টাকা মজুত থাকিবে।

—সঞ্জীবনী।

স্বাস্থ্য-কথা—

স্বাস্থ্য-বিভাগের বেণ্ট্‌লি সাহেব কিছুদিন আগে বলেচেন যে, বাংলার সাড়ে চারকোটি নর-নারীর মাঝে তিন কোটি লোকই ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌চে। তিনি বলেচেন, যে প্রণালী অবলম্বন করে' পানামা হতে ম্যালেরিয়া তাড়ান হয়েচে, বাংলা দেশে সেই উপায়ে ম্যালেরিয়া তাড়াতে হলে কম করে'ও আঠার কোটি টাকা লাগে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বেণ্ট্‌লি সাহেব বহু গবেষণা করেচেন, অনেক খড়-কাঠ পুড়িয়েচেন; কিন্তু তবু একটা হদিস পাননি—অথচ পপুলার মিনিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ এক বক্তৃতায় স্পষ্ট মীমাংসা করে' দিলেন। হাওড়ায় টাউনহলে তিনি বলেচেন, আমোদপ্রমোদের ওপর যে নূতন কর স্থাপন করা হবে, তা' থেকে আর অন্য উপায়ে দুই কোটি টাকা পাওয়া যাবে। সরকার তার কিছু অংশ রেখে দিয়ে বাকী টাকা জেলা-বোর্ডকে কর্জ্জ দেবেন। জেলা-বোর্ড এই টাকার সুদ দেবেন, আর আসলও কিছু কিছু শোধ কর্‌বেন—আর এই টাকা দিয়ে পানীয় জলের আর ড্রেনের সুব্যবস্থা কর্‌বেন। বাপের সুপুত্তুর হয়ে ম্যালেরিয়া দেশ ছেড়ে পালাবে। বাংলার মসনদে বস্‌বার সময় লর্ড রোনাল্ডশেও বলেছিলেন, বাংলা দেশ হতে ম্যালেরিয়া তাড়িয়ে দেবেন। তাঁর শাসন-কাল পূর্ণ হবার সময়ই বেণ্ট্‌লি সাহেব ঘোষণা কর্‌লেন যে বাংলার সাড়ে চার কোটি লোকের মাঝে তিন কোটি লোকই ম্যালেরিয়ায় ভোগে আর দশ লক্ষ করে' লোক বছর বছর মরে।

বক্তৃতায় যদি দেশোদ্ধার হয়, লোকের প্রাণে যদি সাত্ত্বিক ভাব গজায়, তা হলে ম্যালেরিয়াই বা বিদুরিত হবে না কেন?—বিজলী।

হাসপাতালের রোগীর সংখ্যা।—১৯২০ সালে হাসপাতালের হাজার রোগীর মধ্যে ৩১৭ জন ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়াছিল। ১৯১৯ সালে ১৯,৭২,৩০০ ম্যালেরিয়া-রোগী হাসপাতালে গিয়াছিল, কিন্তু ১৯২০ সালে ঐ রোগীর সংখ্যা ২২,৭০,০০০ হইয়াছিল। বসন্ত-রোগীর সংখ্যা ১৫৩৫ হইতে ১৮৪৮, প্লেগ-রোগীর সংখ্যা ১১৮ হইতে ১০৬৭, উপদংশ-রোগীর সংখ্যা ৬৪,২১১-এর স্থলে ৭০,৬১৬, যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা ৫০৪৭ হইতে ৫৮২৪, কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যা ৩১৯৮ হইতে ৫৫৩১, কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৯৭৪ হইতে ১০১৬ হইয়াছিল। কেবল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-রোগীর সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে হ্রাস হইয়াছে। তবুও ৭১৭১০ জন রোগী হাসপাতালে গিয়াছিল। যত লোক ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহার অল্পসংখ্যকই চিকিৎসার্থ হাসপাতালে যাইয়া থাকে।—সম্মিলনী।

বস্ত্রের কথা—

খদ্দর-প্রচার সমিতি।—অদ্য আমরা "খদ্দর-প্রচার সমিতির" স্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। শ্রীযুত অন্নদাচরণ দাস, যিনি বরিশাল ধর্ম্মঘটের সভাপতি ছিলেন তিনি এই সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ হইতেছেন। তাঁহার যত্নে এই সমিতি স্থাপিত হইল। ইহাতে খদ্দর সুতা ও তুলা ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। চট্টগ্রামের প্রস্তুত কাপড় এবং বিক্রমপুর বয়ন বিদ্যালয়ের প্রস্তুত কাপড় এই সমিতিতে পাওয়া যাইবে। আশা করি দেশবাসিগণ এই সমিতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। ইতি ১৮।২।২২

শ্রীহরদয়াল নাগ—সভাপতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, শ্রীসূর্য্যকুমার সোম, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীসাতকড়িপতি রায়।

সমিতির ঠিকানা

১৭।২, হ্যারিসন রোড, শিয়ালদহ, কলিকাতা।

—মোহাম্মদী।

সদনুষ্ঠানে দান—

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই শাহা মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিম্নলিখিতরূপ অর্থ দান করিয়াছেন। আমরা ধনী মাত্রকেই রায়সাহেবের এরূপ সৎদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি:—১। অনাথ আশ্রম ৫০৲, ২। ইডেন হাই স্কুল ৫০৲, ৩। পাগ্‌লা ফাটক ১০০, ৪। সেবাশ্রম ২৫৲, ৫। রামকৃষ্ণ মিশন ২৫৲, ৬। ন্যাশন্যাল ফি বোর্ডিং ২৫৲, ৭। বোবাস্কুল ৫০৲, ৮। রামমোহন লাইব্রেরী ২৫৲।—ঢাকাপ্রকাশ।

বরিশালের মুকুন্দ দাসের যাত্রাগানের টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা উঠিয়াছে, তন্মধ্যে একহাজার টাকা ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটীর হস্তে চর্‌কা বিতরণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।—ঢাকাপ্রকাশ।

সাহিত্য-সংবাদ—

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।—আগামী বৎসর বৈশাখ মাসে মেদিনীপুর সহরে ইষ্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। প্রধান সভাপতি হইবেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। ইতিহাস শাখার পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিজ্ঞান শাখার ডাক্তার চুণীলাল বসু এবং দর্শন শাখার পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, যদি বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত সত্যেন্দ্র-বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকার না করেন, তবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে ঐ পদে অভিষিক্ত করা হইবে। যশোহরের ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সূর্য্যকুমার অগস্তী মহাশয় অভ্যর্থনা সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষীগণ সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠ

করিবেন। লেখকলেখিকাগণ মেদিনীপুরে প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি পাঠাইতে পারেন।—হিন্দুস্থান।

অধঃপতিত হিন্দুসমাজ—

আনন্দময়ী ষোল বছরের এক গৃহস্থবধূ। বড় সাধ করে' অনেক আশা নিয়ে সে স্বামীর ঘর করতে আসে। স্বামী নগেন্দ্র ভাদুড়ী রোজ রোজই তার কাছে টাকার দাবী করে। আনন্দময়ী টাকা দিতে না পেরে পতি-দেবতার পীড়ন নীরবে সহ্য করে। নগেন্দ্র পত্নীর কাছে টাকা না পেয়ে ভারি চটে যায় এবং তার মা ও বোনের সঙ্গে যুক্তি করে' আনন্দময়ীকে ছাদের ওপর এক চালা-ঘরে বন্ধ করে রাখে এবং দিনান্তে একমুঠো করে' ভাত দেবার ব্যবস্থা করে।

আনন্দময়ীর বাপ মেয়ের খবর না পেয়ে নিজে এসে উপস্থিত হন। তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর মেয়ের স্বাস্থ্য ভালো নয় বলে' তাকে হাওয়া বদ্‌লাবার জন্য স্থানান্তরে পাঠানো হয়েচে। পিতা তাতেই আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যান। এদিকে মারপিট অত্যাচারের মাত্রা এত বেড়ে ওঠে যে, পাড়ার লোকেরা তা জানতে পেরে আনন্দময়ীর পিতাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু ভদ্রলোক এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে তো পার্‌লেনই না, অধিকন্তু তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো।

আনন্দময়ীর বাপ তখন পুলিসের সাহায্যে ছাদের ওপরকার ঘর হতে কন্যাকে উদ্ধার করেন। আনন্দময়ী রুদ্ধদ্বার চালা-ঘরে অজ্ঞানের মত পড়ে ছিল—তার সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন প্রকাশ। তাকে তখনই হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার অবস্থা নাকি সঙ্কটজনক।

বাংলার নারীদের তপ্তাশ্রু গৈরিক ধারার মত বাংলার সুখশান্তি সবই পুড়িয়ে দেবে।—বিজলী।

ঘটনাটির সহিত আরো অনেক বিশ্রী ব্যাপার জড়িত আছে বলিয়া প্রকাশ। এ ঘটনাটি কোনক্রমে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়াও লোকচক্ষুর অগোচরে আমাদের সমাজে বধূর প্রতি শাশুড়ী বা ননদের অনেক ছোট-বড় অত্যাচার সাধিত হইয়া থাকে। এ-সমস্তের প্রতিকারের একমাত্র উপায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও স্ত্রীলোকের আর্থিক স্বাধীনতা লাভ। শিক্ষাই শাশুড়ী ননদের অত্যাচার-ইচ্ছাকে সুবিবেচনায় পরিণত করিতে পারে এবং আর্থিক স্বাধীনতা পীড়িতাকে আত্ম-পোষণের ক্ষমতা দিতে পারে।

হিন্দুসমাজের ঔদার্য্য—

মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ।—মোপ্‌লারা যে সমস্ত হিন্দুকে জোরপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় দীক্ষা দেওয়া যায় কি না এবং হিন্দুসমাজে তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গৃহীত হইতে পারে কি না তাহার সম্বন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ করিয়া ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল জানাইয়াছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থানুসারে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিলে হিন্দুসমাজে পুনরায় তাহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।—হিন্দুস্থান।

স্বাদেশিকতার প্রসার—

অসহযোগ ও আইনভঙ্গ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় হেন্‌রী হুইলার উত্তর করেন, সারা বঙ্গদেশেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার হইয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, হাওড়া, পাবনা ও বীরভূম জেলায় বেশী; মেদিনীপুর, হুগলী এবং বীরভূম জেলায় ইউনিয়নের হার তুলিতে বেগ পাইতে হইয়াছে এবং রঙ্গপুর, রাজসাহী, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় করিতে বেগ পাইতে হইয়াছে। এ-সমস্ত অসহযোগ ও আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রচারেরই ফল।—হিন্দুস্থান।

আশ্চর্য্য এই, কিছুদিন আগে যে গবর্ণমেণ্ট অসহযোগ আন্দোলনকে অল্প লোকের আন্দোলন বলিয়া কথার কারসাজিতে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এখনও মাঝে মাঝে করেন, সেই গবর্ণমেণ্টকেই অসহযোগের বিপুল প্রসার ও তাহার সাফল্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

দমন ও পীড়ন-নীতি—

এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কাজ কর্‌বার জন্যে কতজন লোককে সাজা দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসের প্রকাশ-বিভাগ তার এক হিসাব বার করেছেন।—

বরিশাল	...	৩১২
কলিকাতা	...	৫৬০০
চট্টগ্রাম	...	৪৪৮
খুলনা	...	২৫
পাবনা	...	৩৭
নদীয়া	...	৫০
ত্রিপুরা	...	৭২
ফরিদপুর	...	৩২৫
যশোহর	...	৮
বর্দ্ধমান	...	৯৮
ঢাকা	...	১৯২
ময়মনসিংহ	...	২৫০
শ্রীহট্ট	...	১৯
রঙ্গপুর	...	৩৯৪
দার্জ্জিলিং	...	৮৩
রাজসাহী	...	১৪

—নবসঙ্ঘ।

জননেতৃগণের প্রতি অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যবহার।—গত ২২শে জানুয়ারী আসামের ছয়জন পরমসম্মানিত জননায়ককে পুলিস হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া পরস্পরের সঙ্গে শিকলি গাঁথিয়া গৌহাটি হইতে পদব্রজে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী ষ্টীমার ঘাটে লইয়া যায় ও তথা হইতে তেজপুর জেলে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করে। তাঁহারা কি ভীষণপ্রকৃতির দস্যু তস্কর এবং তাঁহাদের কি পুলিশকে মারিয়া পলাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে পথে যে কেহ তাঁহাদিগকে দেখিয়াছে, স্বদেশ-হেতু নির্য্যাতিত এই মহাপ্রাণগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহারই অন্তর অবনত হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই।—জ্যোতিঃ।

মৌলানা ওয়াজেদ আলী খাঁ পণি ওরফে চাঁদ মিঞা—জমিদার করটিয়া, "স্বরাজ-আশ্রমে" ১৮ মাস।—মৌলবী ওয়াজেদ আলী খাঁ পণি অসহযোগ আন্দোলন হওয়ার পরে নিজের পরিচালিত হাই স্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটির সহ-সভাপতির এবং ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সরকার স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারীকে তাঁহার নাম স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লইতে পত্র লিখেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি দেশবন্ধু দাশ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া করটিয়া

লইয়া যান এবং নিজের স্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া বহু ভূসম্পত্তি সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে দান করেন। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার তাঁহার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। তাঁহাকে ৯০,০০০ নব্বই হাজার টাকা জামিন দিতে বলা হয়, অন্যথা ১৮ মাসের বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি জামিন না দিয়া কারা বরণ করিয়া লইয়াছেন।

—মোহাম্মদী।

শ্রীহট্টে বে-আইনী সভা।—শ্রীহট্টের ১৭ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সহরের কাছে কানাইর ঘাট নামক স্থানে এক সভা হয়। সভায় কয়েক হাজার লোক উপস্থিত ছিল। সভা-বন্ধী আইন অমান্য করিয়া এই সভা হয়। কমিশনার একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া সভা ভাঙ্গিতে যান। লোকে সভা ভাঙ্গিয়া যাইতে অস্বীকার করাতে গুলি চালান হয়। গুজব যে গুলিতে ৫জন খুন এবং ২৭জন জখম হইয়াছে; এখন হতাহতের সঠিক খবর পাওয়া যাইতেছে না। কানাইর ঘাটের আশেপাশে লোক যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছে।

—হিন্দুস্থান।

আসামে ভীষণ অত্যাচার।—শিবসাগরের জেলা কংগ্রেস কমিটি গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদ দিয়াছেন যে, প্রায় পাঁচশত অস্ত্রধারী গুর্খা শিবসাগর ও বামুণপুকুরীর ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত একজন ইউরোপীয়ান ও একজন দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। প্রকাশ যে, তাহারা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই পথে তাহাদের সম্মুখে যত কংগ্রেস ও পঞ্চায়েত আফিস পড়িয়াছিল তাহারা সেগুলি ভাঙ্গিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া গিয়াছে। পথে তাহারা অনেক লোকের উপর অত্যাচারও করিয়াছে।

—হিন্দুস্থান।

আবার গুলি চালানোর অভিযোগ।—উলিপুর হাটে ভীষণ কাণ্ড। —রংপুর জেলায় কুড়িগ্রাম হইতে কাজী ইম্‌দাদুল হক লিখিয়াছেন:— কয়েকজন গুর্খা লইয়া ৩০জন সশস্ত্র পুলিস ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কুড়িগ্রামে উপস্থিত হয়। তাহারা ১২ মাইল হাঁটিয়া উলিপুর গ্রামে আসে এবং দুই মাস পূর্ব্বে স্থাপিত একটি হাট ভাঙ্গিয়া দিতে যায়। পূর্ব্বে উক্ত হাট কাশিমবাজারের মহারাজার জমিতে বসিত। কিন্তু মহারাজার কর্ম্মচারীগণের অত্যাচারে তাহারা উহা ত্যাগ করে। মহারাজার কর্ম্মচারীগণের দরখাস্ত অনুসারে জনসাধারণকে নূতন স্থানে হাট বসাইতে নিষেধ করিয়া ১৪৪ ধারায় একটি নোটিশ বাহির করা হয়। জনসাধারণ উহার প্রতিবাদ করিয়া বলে, তাহাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানে হাট বসাইবার অধিকার আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্য সশস্ত্র পুলিশ ও গুর্খা পাঠাইয়াছিলেন। সাধারণ লোক শান্তভাবে আইনসঙ্গত কার্য্যের জন্য সমবেত হয়; সুতরাং তাহারা চলিয়া যাইতে অস্বীকার করে এবং ফলে গোলমাল উপস্থিত হয়। অতঃপর পুলিস গুলি চালায় এবং কতকগুলি লোক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণের অভাব। সত্বর তদন্ত আবশ্যক।—মোহাম্মদী।

স্বেচ্ছাসেবককে গুলি।—২৭শে ফেব্রুয়ারী এখানে দুইটি রোমাঞ্চকর মোকদ্দমা ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, জে, লিলের অনুমতিক্রমে মিটিয়া গিয়াছে। তাহার একটিতে সোনাভীল চা ষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ টি, এস, সি ক্রন্‌হেল্‌ম্ একজন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবককে গুলি করিয়া আঘাত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অপরটিতে তিনজন স্বেচ্ছাসেবক বে-আইনী সভার সদস্য হওয়ার জন্য অভিযুক্ত হন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সোনাভীল চা বাগানে গিয়া জনসাধারণকে ও গাড়োয়ানাদিগকে বাগানে হাটে যাইতে নিষেধ করে। মিঃ ক্রন্‌হেল্‌ম্ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরে পরস্পরে কলহ উপস্থিত হয় এবং ক্রন্‌হেল্‌ম্ গুলি করিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবককে সামান্য আঘাত দিয়াছেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া ক্রন্‌হেল্‌ম্-এর বিরুদ্ধে আঘাত করার অভিযোগ সত্য বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। তিনজন স্বেচ্ছাসেবকও বে-আইনী সভার সদস্য বলিয়া পুলিশ রিপোর্ট দিয়াছেন। উভয় মামলাই ডেপুটী কমিশনারের এজ্‌লাসে শুনানির জন্য উঠিলে আপোষের দরখাস্ত দাখিল করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবে না—এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় মীমাংসার অনুমতি দেওয়া হয়।—মোহাম্মদী।

শ্রীমতী হেমনলিনীকে প্রহারের বে-সরকারী তদন্ত।—গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষকে কে প্রহার করিল তাহার জন্য বে-সরকারী অনুসন্ধান-কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান কালে ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার কীডের সহিত গত ২১শে জানুয়ারী বেলা ২-৩০ মিনিটে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি কীডকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন কি না। তাহাতে কীড সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি সভা ভাঙ্গিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না। তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলপ্রয়োগ করিতে কে অগ্রণী হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, "আমি"। এই বলিয়া তিনি বলিলেন, পুলিশের কর্ত্তা হুকুম না দিলে কনষ্টেবলদের সাধ্য কি যে তাহারা সভা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হয়? তিনি আমাকে আরও বলেন যে গত ১৯শে জানুয়ারী গবর্মেণ্ট যে কমিউনিক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহারই প্রদত্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত।—হিন্দুস্থান।

জলপাইগুড়িতে গুলি—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট জলপাইগুড়ি হইতে একটি ভীষণ হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়াছেন। প্রকাশ যে গত ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদারী-হাট নামক স্থানে এক হাটে দুইখানি বস্তার দাম লইয়া এক সাঁওতাল মুটের সহিত এক মাড়োয়ারী দোকানদারের ঝগড়া বাধে। মাড়োয়ারী মুটেকে প্রহার করে। সাঁওতালী এই প্রহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার জাত-ভাইদের লইয়া আসে, কিন্তু তাহাদের শান্ত করা হয়। কিছু পরে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া সেই মাড়োয়ারীর দোকানে ইট ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। তাহাদিগকে আবার শান্ত করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সেখান হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা দেখে যে, মাড়োয়ারীর দোকানটি অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা দোকান লুট করে। এই সম্পর্কে এক মামলা রুজু করা হয় এবং সেই কুলীদের ভিতর তদন্ত চলিতে থাকে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মাদারীহাট থানার একজন পুলিশ কর্ম্মচারী একদল অস্ত্রধারী কনষ্টেবল লইয়া ফালাকাটা পুলিশ-থানার এলাকাভুক্ত শালকুমার গ্রামে গিয়া কয়েকখানি বাড়ী খানাতল্লাসী করেন এবং চারজন সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করেন। প্রকাশ, ইহাদিগকে গত ১২ই তারিখে লুটপাট করিতে দেখা গিয়াছিল। যখন এইসব ব্যাপার চলিতেছে তখন গান্ধীটুপী-পরিহিত একদল লোক (কাহারও মতে ১৫০, কাহারও মতে ৪০০) কিছু দূরে এক বাঁশঝাড়ের নিকট জড় হয়। প্রকাশ, তাহারা সেখানে এক সভা করিবার জোগাড় করিতেছিল। তাহা-দিগকে সেখান হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহারা

সে কথায় কান দেয় নাই। পুলিশ সেখান হইতে ফিরিয়া গেলে তাহারা পুলিশকে ধৃত-ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলে। তাহারা বলিতে থাকে যে, গান্ধী-মহারাজের টুপী মাথায় আছে বলিয়া তাহাদের অঙ্গে গুলি লাগিবে না। তাহারা ক্রমেই উত্তেজিত হইতে থাকে। পুলিশ বন্দীদিগকে লইয়া দেড় মাইল পথ অগ্রসর হওয়ার পর লোকেরা পুলিশকে ঘিরিয়া ফেলে এবং পুলিশের কবল হইতে বন্দী ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। তাহারা পুলিশের কর্ম্মচারীকে প্রহার করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং একজন কন্‌ষ্টেবলের পাগ্‌ড়ী কাড়িয়া লয় ও একজনের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। এই সময়ে কয়েকজন লোক বন্দীদিগকে টানিতে সুরু করে। তখন পুলিশ গুলি ছাড়ে, ফলে ভিড় সরিয়া যায়। সর্ব্বসমেত তিনটি লোক হত হইয়াছে। একটি মৃতদেহের মাথায় গান্ধী টুপী ছিল। টুপীতে লেখা ছিল—"কালাকাটা স্বরাজ নম্বর ১৪৬।" ডেপুটি কমিশনার এই সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।—হিন্দুস্থান।

ধর্ষণ-নীতি নিবারণের উপায় কি ?—

মহাত্মা গান্ধী গুজরাটী "নবজীবন" পত্রে লিখিতেছেন, "এখন আর আমার জেলে যাওয়ার আদৌ ইচ্ছা নাই; আমি গুলির আঘাতে মরিতে চাহি। এবং অধিকাংশ গুজরাটী এইরূপ ইচ্ছা করুন, ইহাই আমার বাসনা। অনেক সময় আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যে, এই সর্‌কারের হস্তে যেন আমার মৃত্যু হয়।

"আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভারতবাসী যে-প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া সহ্য করা কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে। কাহারও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহাকেও বেত্রাঘাত করা হইতেছে। সর্‌কার পক্ষ হইতে মারপিট করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। এসব দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকা যাইতে পারে?

"এসকলের প্রতিকারের উপায় জেল নহে; জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ সৃষ্টির দ্বারাই ইহার প্রতিকার হইবে। সর্‌কার যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত এই উপদ্রব শীঘ্র বন্ধ না করেন তবে গুজ্‌রাটেই জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি হউক, আমি ইহাই চাই।

"আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া গুলির আঘাত সহ্য করিব। তোমরা এখন যেমন শান্ত হইয়া বসিয়া আছ, তেমনই শান্তির সহিত গুলিবৃষ্টির মধ্যেও বসিয়া থাকিতে সক্ষম হও; তোমাদের কর্ণ আমার (বাক্যের) দিকে বর্ত্তিত হোক, তোমাদের পৃষ্ঠ আমার দিকে ফিরিয়া থাকুক, কিন্তু তোমাদের বক্ষ ও নয়ন গুলির আঘাত গ্রহণ করিবার জন্য সেই দিকে ফিরিয়া থাকুক, আর ঝমঝম শব্দে গুলি চলিতে থাকুক, গুজ্‌রাটের পক্ষে ইহাই প্রার্থনার যোগ্য।" (—"হিন্দী কর্ম্মবীর")

—মোহাম্মদী।

বাঙালার প্রতি মহাত্মার উপদেশ—

বর্ত্তমান আন্দোলনে বাঙ্গালীরা অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশে বলিতে গেলে অনেকে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং এত নির্য্যাতন সত্ত্বেও আপনাকে অবিচল ধৈর্য্যের প্রাচুর্য্যে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি বাঙ্গালার নেতৃগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা কিছুকাল স্থিরভাবে অবস্থান করুন। এখনও কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। স্বাধীনভাবে কথা-বলা ও স্বাধীনভাবে সভা-সমিতি করা বিষয়ে দেশবাসিগণের যে সাধারণ অধিকার, তাঁহারা শুধু সেই অধিকারগুলির পরিচালনা করিতে থাকুন। কিন্তু সার্ব্বজনীন আইন লঙ্ঘনের কার্য্য বা সর্‌কারের রাজস্ব বন্ধ করা (যাহা ঐ সার্ব্বজনিক আইন-লঙ্ঘনেরই প্রকার-ভেদ) প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহারা এখন হস্তক্ষেপ করিবেন না। আপনারা প্রজাগণকে বর্ত্তমান কিস্তির খাজানা দাখিল করিতে পরামর্শ দান করুন। ইহাতেই তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে সংযম শিক্ষা হইবে।—জ্যোতিঃ।

চিন্তার বিষয়—

বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের পরিণাম কি হবে না হবে, দেশের জনসাধারণ কখনো মহাত্মার সাত্ত্বিক আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারবে কি না, বর্ত্তমান আন্দোলন স্থগিত করা গোল-টেবিলের বৈঠক বসাবার একটা কৌশলমাত্র কি না—সে-সমস্ত বিচার করা এখন নিষ্প্রয়োজন। উদ্দেশ্য বা আদর্শ আর যাই হোক, সকলেই এখন সাহস, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন ক'রে দেশের মধ্যে ঐক্য আর সামর্থ্য সৃষ্টির সহায় হতে পারেন। যাঁরা শুধু উচ্ছৃঙ্খল চাঞ্চল্য চান, তাঁদের এ কার্য্যপ্রণালী ভাল লাগ্‌বে না তা জানি, কিন্তু এই সংযম আর শৃঙ্খলার মধ্যে গ'ড়ে ওঠা তাঁদেরই সব-চেয়ে বেশী দর্‌কার।—বিজলী।

সেবক।

বিদেশ

মুক্তিপথে মিশর

সর্‌বৎপাশার দলও যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়া বসিলেন, তখন ইংরেজ-মন্ত্রীসভা একটু বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রীসভাকে অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য লর্ড অ্যালেন্‌বি ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এদিকে মিশরের উগ্রপন্থীদল আইনসঙ্গত আন্দোলনে কোনও ফল না পাইয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উত্তেজনার বশে গুপ্তহত্যা করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। মিশরে বিপ্লবের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। শিক্ষা-বিভাগীয় ব্যয় বিভাগের কর্ত্তা আল্‌ফ্রেড ব্রাউন ও মাইকেল জড়ন নামে একজন ব্যবসায়ী গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। সর্‌কার পক্ষ হইতে মিশরবাসীদিগের অস্ত্রব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া অস্ত্র-আইন জারী করা হইল। অস্ত্রব্যবহারের অধিকারপত্র (license) সকলের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল এবং গুপ্ত অস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সর্ব্বস্থানে অবাধ প্রবেশের অধিকার পুলিসকে দেওয়া হইল। সর্‌কার সকল অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন এবং কাহারও নিকট হইতে গুপ্ত অস্ত্র বাহির হইলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট প্রজাকে কেবল আইনের বলে দমাইয়া রাখা চলে না। তাই আবার অন্য দিকে মিশরবাসীকে সন্তুষ্ট করিবারও আয়োজন চলিতেছে। ইংরেজ-সর্‌কার মিশরের সুলতানের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

(১) মিশরে ইংরেজ অভিভাবকত্ব শেষ করিয়া মিশরকে স্বরাট বলিয়া স্বীকার করিতে ইংরেজ-সর্‌কার প্রস্তুত আছেন।

(২) মিশর-সর্‌কার ক্ষতিপূরণ-আইন পাশ করিলেই ইংরেজ-সর্‌কার ১৯১৪ সালের ২রা নভেম্বর যে সামরিক আইন ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিবেন।

(৩) ইংরেজ- ও মিশর-সর্‌কারের মধ্যে একটা স্থায়ীবন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, প্রাচ্যে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় পথসমূহ, ইংরেজ প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মিশরকে রক্ষা করা এবং সুদানের স্বার্থরক্ষা করার ভার ইংরেজ-সর্‌কারের হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে।

এই সর্ত্তগুলিকে পাঠাইবার সময় লর্ড অ্যালেনবি যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি সুলতানকে জানান যে মিশর-সরকারের তরফ হইতে পররাষ্ট্রবিভাগ পুনর্গঠনে আর ইংরেজ-সরকারের কোনও বাধা নাই। এবং ক্ষতিপূরণ আইন পাশ করিতে যদি কিছু দেরি হয় তবে মিশর-সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই ততদিন পর্য্যন্ত সামরিক আইনের ব্যবহার স্থগিত রাখিতে লর্ড অ্যালেনবি প্রস্তুত আছেন।

ইংরেজের যে সদভিপ্রায় ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা বুঝিয়া মিশর ইংরেজ-সরকারের সহিত একযোগে কাজ করেন ইহাই অ্যালেনবির আন্তরিক ইচ্ছা। লর্ড অ্যালেনবির পত্র পাইয়া সরবতের দল অনেকটা শান্ত হইলেন। সরবৎ পাশা বলিলেন যে বিগত নভেম্বর মাসে ইংরেজ-সরকার মিশর-শাসনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা হইতে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ব্বের ব্যবস্থা মিশরবাসীর গ্রহণের অযোগ্য ছিল, কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সরবৎ পাশা নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া নবনির্দ্দিষ্ট শাসনসংস্কারকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি প্রজাসাধারণের সাধারণ স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্ম নূতন নির্ব্বাচন-নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া মিশরে নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সামরিক আইন তুলিয়া দিতেও তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আইরিশ সমস্যা

ডেল আইরিয়েন লণ্ডনের রফা-নিষ্পত্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়াতে আয়ার্ল্যাণ্ডে কিছুদিনের জন্য একটা শান্তি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ডিভ্যালেরার দল ডেলের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী ডাবলিন সহরে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী-স্থাপন-প্রয়াসী দলের এক সভা ডাকিয়া ডিভ্যালেরা গ্রিফিথের তথাকথিত স্বাধীন-আইরিশ দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সভাতে বক্তৃতা দিবার সময় ডিভ্যালেরা বলেন যে লণ্ডন-নিষ্পত্তি আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বরাট বলিয়া স্বীকার না করাতে আইরিশ জাতি এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। আইরিশ জাতির পক্ষ হইয়া এই নিষ্পত্তি গ্রহণ করিবার কোনও অধিকার ডেলের না থাকায় আইরিশ সন্ধি সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলিয়া এই সভা ঘোষণা করেন। এবং সভাস্থ সকলে আইরিশ প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতে স্বীকার করেন। ডেল আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আইরিশ জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন বলিয়া একটি প্রস্তাব এই সভায় ধার্য্য হয়। এদিকে আলস্টারের সহিত বিবাদও নানা সূত্রে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি সিনফিন ফুটবল-খেলোয়াড় ফুটবল খেলিবার জন্য আলস্টারে গিয়াছিলেন। আলস্টার কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহের বশে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করেন। সিনফিন দল ইহার প্রতিকার কল্পে কুড়িজন আলস্টার পুলিশ-কর্ম্মচারীকে সুযোগ পাইয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই ব্যাপার লইয়া উভয় দলের মনোমালিন্য অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে এবং উভয় দলই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাহার পর সংবাদ আসিয়াছে যে দুই পক্ষই বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন এবং দুই দলের বিরোধ আপাতত স্থগিত আছে। দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের আভ্যন্তরিক দলাদলি মিটিতে পারে কি না তাহা দেখিবার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাবলিনের ম্যান্‌সন হাউসে দুই দলের একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ডিভ্যালেরা আইরিশ প্রজাসাধারণকে সন্ধি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে এবং নবনির্ব্বাচনের সময় যে-সকল ব্যক্তি ইংরেজ সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করেন কেবল মাত্র তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গ্রিফিথ প্রস্তাব করেন যে আইরিশ নিয়মতন্ত্রে এই সন্ধি গ্রহণ করিবার বাধা নাই, কাজেকাজেই ইহাকে গ্রহণ করা হউক এইজন্য যে ইহা আইরিশ জাতির স্বদেশের শাসন নিজ হস্তে লইবার প্রথম দফা। তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন যে যদি আইরিশ জাতি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তিনি জাতির সেই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিবেন; কিন্তু আইরিশ জাতি যদি ইহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে আইরিশজাতির অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতিকে বাধা দিবার অধিকার অপর পক্ষের নাই এবং সন্ধিসর্ত্তে বাধা দিবার চেষ্টা করা অপর পক্ষে সঙ্গত হইবে না। অনেক তর্কাতর্কির পর আইরিশ মহাসভার নির্ব্বাচন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে উভয় পক্ষ রাজী হন। কিছুদিনের জন্য স্বাধীন-আইরিশ দলের বিপক্ষে আন্দোলন স্থগিত রাখিতে গ্রিফিথের দল ডিভ্যালেরাকে অনুরোধ করেন। ডিভ্যালেরা কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইহার পর ডিভ্যালেরা চতুর্দ্দিকে খুব তীব্র আন্দোলন করিতেছেন। স্বাধীন-আইরিশ দলের প্রধান ভরসা ছিল আইরিশ সৈন্যদল। কারণ তাহাদের নায়ক মাইকেল কলিন্স স্বাধীন-আইরিশ দলের নেতা, এবং আইরিশ সেনাদলের উপর কলিন্সের খুব প্রবল প্রভাব ছিল। কিন্তু সেখানেও বিদ্রোহের সূচনা দেখা গিয়াছে। আইরিশ গণতন্ত্র-সৈন্যদলের সাউথ টিপারারি নামক সৈন্যদল এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়া ডেল আইরিয়েন ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার দেশের পক্ষে অনিষ্টজনক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্ব্ব লিমারিকের সৈন্যদলও উক্ত মর্ম্মে ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছেন। ডিভ্যালেরার দল ক্রমশই যেন প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। আইরিশ আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই দারুণ বিপ্লবের মধ্যেও আইরিশ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা চির-সারথির শুভ শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে। এরিন-ভাগ্যবিধাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশে স্বাধীনতার অরুণ-কিরণ-স্পর্শে নিদ্রিত আয়ারল্যাণ্ড ধীরে ধীরে জাগিতেছে।

গেডিস ব্যয়ভার-হরণ-কমিটি

বিশ্ব যুদ্ধের বিষময় ফলস্বরূপ প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সাম্রাজ্য-শাসন-ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া উঠাতে এই অভূতপূর্ব্ব ব্যয়ভার বহন করা সকলের পক্ষেই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ-সরকার ব্যয়ভারে বিব্রত হইয়া তাহা নিবারণকল্পে স্যার এরিক গেডিসকে সভাপতি করিয়া একটি ব্যয়ভার-হরণ-কমিটি নিযুক্ত করেন। কিরূপে শাসনব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভবপর তাহা স্থির করিবার ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হয়। ভারতবর্ষের সহিত যৌবনে স্যার এরিকের সম্বন্ধ ছিল, তিনি ভারতীয় রেল বিভাগে কাজ করিতেন। তাহার পর যুদ্ধের সময় সরবরাহ বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া (Inspector General of Transportation) খুব দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ নৌবিভাগের কর্ত্তৃত্ব পদ (First Lord of Admiralty) ইঁহাকে দেওয়া হয়। গেডিস কমিটির রিপোর্ট প্রকাণ্ড দুই খণ্ডে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মোটামুটি তাহার সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গেডিস-কমিটির মতে ইংলণ্ডের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমিক ও বৃদ্ধবয়সে কর্মীর পুরস্কার প্রভৃতির ব্যয় অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে এইসকল বিভাগের ব্যয় সর্ব্বসুদ্ধ আট কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ড ছিল, এখন তাহা চৌত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের মতে দেশ যতটুকু শিক্ষার জন্য সঙ্গতভাবে ব্যয় করিতে সক্ষম তাহা অপেক্ষা ষড়গুণ বেশী ব্যয় শিক্ষা-বিভাগের জন্য ইংরেজ-রাজকোষকে বহন করিতে হয়। তাই কমিটি ব্যয় সঙ্কোচের জন্য মধ্যমশ্রেণীর অবৈতনিক স্কুলগুলিকে কমাইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে তিন বৎসর বয়স হইতেই শিশুদিগের স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত আছে। সেইসব স্কুলে খেলাই বেশী হয়। তদন্ত-কমিটির মতে ছয় বৎসরের অল্পবয়স্ক শিশুদিগের স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্তের প্রয়োজন নাই। স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে যে-সকল আদর্শ নিবাস প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রীয় অর্থ বদ্ধ না রাখিয়া সেগুলিকে ব্যবসায়ীসমিতির নিকট বেচিয়া ফেলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। খনিজতৈল সংরক্ষণার্থ যে ব্যয় হয় তাহাও অনেক পরিমাণে কম করা প্রয়োজন, কিন্তু সবচেয়ে সঙ্কোচ সম্ভবপর সৈন্য- ও নৌ-বিভাগে। গেডিস-কমিটি বলেন যে ইংরেজ-রাজত্বসমূহে শ্বেতকায় সৈন্যের পরিবর্ত্তে দেশীয় কৃষ্ণবর্ণ সৈন্য নিয়োগ করিলেই যুদ্ধব্যয় অনেক কমিয়া যাইবে। উত্তরচীন, পারস্য ও তুরস্কে যে ইংরেজবাহিনী আছে তাহা রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মাল্টা, জিব্রাল্টার, সিঙ্গাপুর, ইজিপ্ট ও সিংহলেও সেনানিবাসের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটানো যাইতে পারে বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দেশী সৈন্য বেশ দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্য সংরক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে, সুতরাং ইংরেজ সৈন্য কম রাখা অতি সহজেই হইতে পারে। নৌ-বিভাগেও দুই কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ বৎসরে কম করা সহজসাধ্য বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সমুদ্রপার-বাণিজ্য-বিভাগ (Department of Overseas Trade) থাকিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া ইঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি সার্ট বিক্রয় বা দুই চারিখানি ভাঙ্গা ক্ষুর ধার দেওয়া প্রভৃতি সামান্য সামান্য সুবিধা এই বিভাগের দ্বারা হয় সত্য, কিন্তু তাহার জন্য যে ব্যয়ভার রাষ্ট্রের উপর পড়ে তাহাতে এই বিভাগের উপযোগিতা স্বীকার করা চলে না। আর ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসার প্রসারের চেষ্টা আপনা হইতেই করিবে। অতএব এত খরচ করিয়া এই বিভাগ না রাখিয়া ইহাকে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব কমিটি করিয়াছেন। মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে স্যার এল্ ওয়ার্দিংটন ইভান্স বলেন যে গেডিস-কমিটি ৩৫০০০ লোক সৈন্য বিভাগ হইতে কমাইতে বলিয়াছেন; কিন্তু গভর্ণমেন্ট ৩৩০০০ লোক কমাইতে প্রস্তুত আছেন। চব্বিশ দল পদাতিক, শাতচল্লিশ দল কামানবাহী ও পাঁচদল অশ্বারোহী সৈন্য উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কুড়ি কোটি পাউণ্ড খরচ কম করিবার কথা গেডিস-কমিটি বলিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ষোল কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ কম করিতে প্রস্তুত আছেন। নৌবিভাগের কর্ত্তারাও বলিতেছেন যে দুই কোটি পাউণ্ড খরচ কমাইতে গেডিস-কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন বটে কিন্তু নৌবিভাগের দক্ষতার হানি না করিয়া মোট এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ কম করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের চ্যান্সেলার স্যার রবার্ট হর্ন পার্লিয়ামেন্ট-সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে গেডিস-কমিটির স্কুল-সংক্রান্ত অনেকগুলি অভিমত গভর্ণমেন্ট গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। শিক্ষকদিগের বেতন হ্রাস করিবার প্রস্তাব ও ছয় বৎসরের নিম্নে কোনও শিশুকে স্কুলে ভর্ত্তি না করিবার প্রস্তাব সরকারপক্ষ গ্রহণ করিতে পারেন না। স্কুলে ছাত্রদিগের যেরূপ যত্ন লওয়া হয় এবং ছাত্রদিগের যেরূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় তাহাতে স্কুলে আসিয়া বালকদিগের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির কথা স্মরণে রাখিয়া ভারত-সরকার সেখানকার শ্বেতকায় সৈন্যের সংখ্যা কম করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই ইংলণ্ড-গভর্ণমেন্ট ভারতীয় সৈন্য সম্বন্ধে গেডিস-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। বিমান-বহরের ব্যয় এক কোটি পঁচাশি লক্ষ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে এক কোটি পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড করা হইবে। স্যার রবার্ট হর্ণ স্বাস্থ্য শ্রমিক এবং বৃদ্ধবয়সের পুরস্কার বিভাগে গেডিস-কমিটির নির্দ্ধারিত ব্যয়-সঙ্কোচ-প্রস্তাব ইংরেজসরকারের তরফ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া- ও ক্যানাডা-সরকারের অনুরোধে সমুদ্রপার-বাণিজ্য-বিভাগ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গেডিস-রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে ইংলণ্ডে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইতেছে বলিয়া ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সেখানে আন্দোলন হইতেছে। আর আমাদের দেশে শিক্ষা- ও স্বাস্থ্য-বিভাগে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ব্যয় মোটেই হয় না বলিলেও হয়। আমাদের শিক্ষাসচিব ও অর্থসচিবের ভাণ্ডার শূন্য। "Our feeding bottle of education is almost dry and sanitation is sucking its thumbs.—Rabindranath." তবুও আমাদের দেশের ব্যয়ভার এত অধিক যে হিসাব নিকাশে ৩৩ কোটি টাকা কম পড়িয়াছে। তাই এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত দেশে নূতন নূতন কর বসিতেছে। আর ব্যয়-সঙ্কোচের প্রস্তাব শুনিবে কে? আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের সহিত আমাদিগের প্রাণের যোগ যে নাই। বিভাগীয় ব্যয়ভার কম করিবার উপায় স্থির করিতে ঢাকা বিভাগে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের কমিশনার ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত আফ্‌জাল ও শ্রীযুক্ত আজাম এই কমিটির সভ্য নিযুক্ত হয়েন। কমিটি একবাক্যে স্থির করেন যে ঢাকায় যে পঞ্চাশজন ইউরোপীয় সার্জেন্ট পুলিশ বিভাগে কাজ করে, তাহাদিগকে রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সেই স্থানে দেশী সিপাহী রাখিলেই কাজ উত্তমরূপে চলিয়া যাইবে এবং ব্যয়ও অনেক কমিবে। সেই রিপোর্ট বাংলা সরকার গ্রহণ করিলেন না এবং বজেট আলোচনার সময় সরকার তরফ হইতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে যদিও আর হইতে শাসনব্যয় ঢের বেশী তথাপি ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভবপর নহে। (Retrenchment is not possible.)

*

সন্দেহদোলায় ইউরোপ

লর্ড গ্রে প্রভৃতি স্বাধীন উদারনৈতিক নেতৃবর্গ উদারনৈতিক দলকে সম্মিলিত-দল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া পুনরায় স্বতন্ত্রদলরূপে গড়িয়া তুলিবার যে উদ্যোগ করিতেছিলেন তাহাতেই সম্মিলিতদলের স্থিতি সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এদিকে নবীন রক্ষণশীলদলের নেতা স্যার জর্জ্জ ইয়ঙ্গার স্যার রবার্ট সেসিলের পক্ষ লইয়া সম্মিলিত-দলের কার্য্যপ্রণালীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ও আপনার শক্তির প্রকৃত পরিচয় লইবার জন্য লয়েডজর্জ্জ সম্মিলিত-দলের নেতৃবর্গের নিকট পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। স্যার এল, ডব্লু, ইভান্স সেই কথা কনচেষ্টার সহরে বিগত ৩রা মার্চ্চ বক্তৃতা করিবার সময়

প্রকাশ করিয়া লয়েডজর্জ্জের কার্য্যাবলীর সমর্থন করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অন্যতম রক্ষণশীল নেতা অষ্টেন চেম্বারলেনও লয়েড-জর্জ্জের পক্ষে বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অথবা চেম্বারলেনের পোষকতায় লয়েডজর্জ্জ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ব্যাল্‌ফুর প্রভৃতি রক্ষণশীলনেতাদিগের নিকট হইতে তাঁহার কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ সমর্থন ও ইয়ঙ্গারের বক্তৃতার স্পষ্ট প্রতিবাদ না পাইলে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। জেনোয়ার বৈঠকে ইউরোপের সমস্যার আলোচনা হইবে; সেই স্থানে লয়েডজর্জ্জের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে জেনোয়া-বৈঠক অবধি পদত্যাগ করিবেন না বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। ইহার পর ৬ই মার্চ্চ লর্ড বার্কেনহেডের গৃহে যে ভোজ হয় তাহাতে মন্ত্রীসভার সকলেই লয়েডজর্জ্জের নীতির পূর্ণ সমর্থন করিতে স্বীকার করেন। কিন্তু রক্ষণশীলদলের সাধারণ সভ্যদিগের পক্ষ হইয়া কোনও-প্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভবপর না হওয়াতে সেইরূপ প্রতিশ্রুতি লইবার চেষ্টা আপাতত স্থগিত আছে। এইরূপে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে লয়েডজর্জ্জ এবং সম্মিলিত দলভুক্ত উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের পদত্যাগ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইংলণ্ডে অচিরেই যে নব নির্ব্বাচন হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সেই নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান সম্মিলিত দলের কোনওপ্রকারে জয়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। রক্ষণশীলদল, উদারনৈতিকদল ও শ্রমিকদলের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলিবে। তবে উদারনৈতিক দল ও শ্রমিকদলের মধ্যে রফানিষ্পত্তি হইয়া আবার একটি নূতন সম্মিলিত-দল (Liblab Coalition) হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রমিকদলের নেতা হেণ্ডারসন, ক্লাইনিস, ইকেনওয়াল্‌স্‌ ও জন হেজ এইরূপ সম্মিলনের পক্ষপাতী। রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যে গুরুতর মনোমালিন্য বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে ফ্রান্স জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত হইতে একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু জেকো-স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী বেনীসের প্রচেষ্টায় লয়েডজর্জ্জের সহিত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পোঁয়াকারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া জেনোয়া-বৈঠক সম্বন্ধে একটা রফা নিষ্পত্তি হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে ইউরোপে দশ বৎসর যাহাতে কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ আর না ঘটিতে পারে এমন কোনও বন্দোবস্ত জেনোয়া-বৈঠকে করিতে হইবে। উপস্থিত জাতি সমূহ এই দশ বৎসর বর্ত্তমান সীমা-রেখা মানিয়া চলিবেন এবং প্রচলিত সন্ধিসর্ত্তগুলিকেও স্বীকার করিয়া চলিবেন। যাহাতে ইউরোপে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপিত হয়, মুদ্রার মূল্য যাহাতে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ধার্য্য হইয়া স্থির থাকে তাহার ব্যবস্থাও এই বৈঠকে করিবার চেষ্টা হইবে। আমেরিকা, রাসিয়া ও ইটালী কিন্তু জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে স্বীকার পাইতেছেন না, কিন্তু প্রাচ্য সমস্যা লইয়া ও জার্ম্মান ক্ষতি-পূরণ লইয়া যে মনোমালিন্য তাহা কমে নাই। Matin পত্রিকার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ফ্রাঙ্কলিন বাউলিন প্রাচ্য সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহা এই—

(১) স্তাম্বুল তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(২) তুরস্ক প্রণালীর মধ্য দিয়া জাহাজ যাতায়াত করিবার অধিকার স্থির করিবার জন্য তুরস্ক, বেসারাবিয়া, বুলগেরিয়া রুমেনিয়া প্রভৃতি কৃষ্ণোপসাগরের উপকূলস্থ নদীমাতৃকদেশসমূহ এবং মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মিলিত বৈঠক স্থির করিতে হইবে।

(৩) গ্রীসের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া থ্রেসের অধিবাসী-বৃন্দের স্বাধীন মত লইয়া থ্রেসের শাসনব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে।

(৪) গ্রীস এসিয়া-মাইনর তুরস্ককে ফিরাইয়া দিবে। গ্রীসের যুদ্ধঋণ মিত্রশক্তিবর্গ ছাড়িয়া দিবেন এবং সাইপ্রাসদ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রীক বলিয়া ইংরেজ সাইপ্রাসদ্বীপ গ্রীসকে ছাড়িয়া দিবেন।

(৫) তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদিগের স্বার্থের প্রতি জাতিসমূহের সংঘ লক্ষ্য রাখিবেন।

এইসকল প্রস্তাবে এতকাল ইংরেজ কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু এখন নানা কারণে ইহার অধিকাংশই মানিয়া লইতে ইংরেজ প্রস্তুত আছেন। ফরাসীর অপ্রীতি, অ্যাঙ্গোরার বাহুবল ও মুসলমান প্রজার অসন্তোষের ভয়ে ইংরেজের হঠাৎ ন্যায়বুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ-সরকার এনসমিডিয়া সীমারেখা পর্য্যন্ত থ্রেস প্রদেশ তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এসিয়া-মাইনর ও স্তাম্বুল ফেরৎ দিতেও তাঁহারা স্বীকৃত আছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। খিলাফত-সমস্যায় ভারত-সরকারের কিছু করণীয় নাই বলিয়াই ভারত-সরকার বরাবর ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা যাইতেছে যে তুরস্ক-সমস্যা সম্বন্ধে ভারত-সরকার ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার নিকট প্রকাণ্ড মন্তব্য প্রেরণ করিয়া তুরস্কের দাবীকেই সমর্থন করিয়াছেন। অ্যাঙ্গোরার প্রতিনিধি ইউস্থফ কামাল এবং তুরস্কের প্রতিনিধি ইজ্জতপাশা রফা নিষ্পত্তি করিবার জন্য ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। একটি ফরাসী জাহাজ আটকাইয়া গ্রীস এদিকে ফরাসীর বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। ইতালীর রাজনৈতিক গগনের মেঘ এখনও কাটে নাই। ডেসিকোলা মন্ত্রীসভা গঠনে অপারগ হওয়াতে সম্রাট ব্যনোমি ও অর্লোণ্ডোকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার প্রদান করেন। তাঁহারা এই কার্য্যে অস্বীকৃত হওয়াতে ইতালীর ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব সিনর ফ্যাক্টা (Facta)কে এই ভার দেওয়া হইয়াছে। তিনি সিনর জিওলোট্টির সহিত একযোগে এই ভার সম্পাদনের প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু ইতালীতে যেরূপ ফরাসীবিদ্বেষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় না যে মিত্রশক্তির অনুকূলে কোনও মন্ত্রীসভা অধিক দিন কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। ইতালীর ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী সেনর নিট্টি (Nitti) "শান্তিহীন ইউরোপ" (Peaceless Europe) বলিয়া একটি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে ভার্সাই-সন্ধিসর্ত্ত লইয়া ফরাসী ও ইংরেজ নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া মনোমালিন্যের কিরূপ পথ সৃজন করিয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। নিট্টির পুস্তকের আদর দেখিয়া মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি ইতালীর মনোভাব বুঝা যাইতেছে। সন্দেহবিষ ইউরোপকে কোন্ মৃত্যুর মুখে লইয়া যাইবে কে জানে?

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

আমার মালী

("রেভেন্‌শ কলেজ মেগেজিন" হইতে অনুবাদিত, লেখক অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।)

বেশ লোকটি ছিল, আমার মালী। গেল বৈশাখমাসে একদিন সকাল বেলা সে বল্লে, "আজ্ঞে, আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌ছি না, বয়স তিন কুড়ি পাঁচ হল। এখন ছুটি নেবার সময় হয়েছে।"

আমি তখন পড়্‌ছিলুম, তার অর্দ্ধেক কথাও শুন্‌তে পাইনি। মাথা না তুলেই বল্লুম, "কেন?"

বেচারা আমার ভাব দেখে আর-একটি কথা না কয়ে তার বাগানে চলে' গেল।

বাগানটি তারই ছিল। তার যা খুসী সে গাছ সে লাগাত। আমার পড়্‌বার ঘরের সামনে বাগান। জান্‌লা দিয়ে সবটা দেখা যেত। কিন্তু বাগান দেখ্‌বার আমার সময় হত না।

তার বয়স দেখ্‌লে, সে খুব খাট্‌ত। যখন সে আমার কাছে চাকরি কর্‌তে আসে, তখন কেউ তাকে রাখ্‌তে চায়নি। সে বুড়ো; বুড়ো কি কাজ কর্‌বে! আমি তার মুখের ভাব দেখে রেখেছিলুম। তাকে ভাল মনে হয়েছিল। পরেও দেখেছি, আমার ভুল হয়নি।

আমি তার নাম জান্‌তুম না। বাড়ীর কেউ জান্‌ত না। আমরা তাকে "বুঢ়া" ব'লে ডাক্‌তুম।

সে দিন সে গেল, বোধ হয় দুঃখ পেয়ে।—আর-একদিন সুযোগ বুঝে, আবার সে সেই কথা তুল্লে। এবার আমি বল্লুম, "লোকে কি শুধু-শুধু চাকরি ছাড়্‌তে চায়? তুমি কেন যেতে চাও?" যা পার তাই কর, তা হলেই হবে।"

"আজ্ঞে, আমার প্রভুর সেবা যে এখনও বাকি আছে। যে কটা দিন আছে, তাঁর সেবা করতে চাই।"

উত্তরটা আমার ভারি নূতন ঠেক্‌ল। আমি তাকে ভাল রকমই জান্‌তুম, কিন্তু কখনও ভাবি নাই, সে এতদূর কর্‌বে। আমি তাকে ছাড়্‌তে চাই না। বল্লুম, "আচ্ছা, বুঢ়া, এখানে থেকেই তোমার প্রভুর সেবা চলে না কি?"

"তা কেমন করে' চল্‌বে? এক মনে কেমন করে' হবে?"

তবু সে জাতিতে বাউরী। অপর চাকরে তাকে ছুঁতো না। সে যদি কোনো জিনিষের এক ধার ধর্‌ত, তারা অন্য ধার ধর্‌ত না। আমার বোধ হয়, ওড়িয়া ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সবটা তার কণ্ঠস্থ ছিল। সে সময়ে সময়ে ভাগবতের পদ আওড়াত। আমার আশ্চর্য্য বোধ হত। সে লেখা-পড়া শেখে নাই, অথচ এত জান্‌ত!

"কিন্তু, বুঢ়া, আমি ত জানি, সূর্য্য উঠ্‌বার আগে আর রাত্রে শোবার আগে, তুমি ভগবানের নাম অনেকক্ষণ কর। কাজ কর্‌বার সময়েও মাঝে মাঝে নাম কর। আর কি চাও?"

আমার কথা শুনে সে যেন বিষণ্ণ হ'ল। হয়ত ভাব্‌লে আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তাকে প্রসন্ন কর্‌তে বল্লুম, "আচ্ছা দেখা যাবে।"

বেচারা আমার অনুমতি না নিয়েই অনায়াসে চাকরি ছাড়্‌তে পার্‌ত। কিন্তু সে তেমন লোক নয়।

"দেখ, তোমার ছেলেকে দিয়ে যাও না? জান ত একজন ভাল লোক পেতে সময় লাগ্‌বে। তত দিনে তোমার হাতের বাগান বন হয়ে উঠ্‌বে।"

"আমার ছেলে পার্‌বে কি? এখনও সে কুড়িতে পড়েনি। যে বছর তার জন্ম হল, সে বছর আমাদের গাঁয়ের মহান্তীরা আমার জমির পাশের ১০ বিঘা জমি নিয়েছিল।"

"আমি ত তার কাজ দেখেছি। তোমার অসুখের সময় সেই ত মালী হয়েছিল।"

কিন্তু বুঢ়া অবুঝ। সে জানে না, পূর্ব্বজন্মে তার ছেলে কি কর্ম্ম করেছিল, এজন্মে কি ফল ভোগ কর্‌বে।

"আচ্ছা, তুমি কি জানো পূর্ব্বজন্মে কি করেছিলে?"

"না জান্‌লে উনিশ বছর থেকে মালী হলুম কি করে'?"

আমার তর্কের সময় ছিল না। থাক্‌লেও তাকে বোঝাতে পার্‌তুম না।

কিছু দিন গেল। একদিন বাগানের মাঝ দিয়ে বাড়ী ফির্‌ছিলুম। সে, আমায় একটা পাথর দেখালে। কি

বল্‌বে, বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু সে আর কিছুই বল্‌লে না, শুধু বল্‌লে, "আজ্ঞে আমায় ছুটি দেন।"

আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। এই কথার জন্য পাথর দেখানো কেন, বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু মনে হ'ল, পাথরটা সেখানে ছিল না। কোনও দেবী পাথরটাতে এসে তাকে চাক্‌রি ছাড়্‌তে বলেছেন নাকি? তাকে কথাটা বল্‌তে সাহস হ'ল না, কি জানি তার মনে কি হয়। আমি শুধু বল্‌লুম, "পাথরটা ত এখানে ছিল না?"

"না; আমি সকাল বেলা ব'য়ে এনেছি। বড় ভারী লাগ্‌ল।"

আমি হাঁফ ছাড়্‌লুম। কেউ পাথরটা আন্‌তে ব'লে থাক্‌বে, বুড়ার কষ্ট হয়ে থাক্‌বে। তাই আমি বল্লুম, "কে আন্‌তে বলেছিল? যদি ভারী লাগ্‌ল, আর কাকেউ ধর্‌তে ব'ল্লে না কেন?"

"আমি ভোরেই না সরিয়ে করি কি? এই পাথর! এর জন্য লোক ডাক্‌ব?"

আমার আবার মনে হ'ল হয়ত কোনও দেবী রাত্রে স্বপ্ন দিয়ে পাথরটা সরাতে বলেছিলেন। নইলে, এত তাড়াতাড়ি কেন? সেও ত আমাদের মতন কত কি মানে।

"যদি কেউ বলে নাই, তবে সরাতে গেলে কেন?"

সে আশ্চর্য্য হ'য়ে রইল। কারণ পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর এক ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি অন্ধকারে দেখ্‌তে পাননি, পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়্‌ছিলেন। মালী দেখেছিল।

"মহাপ্রভু রক্ষা করেছেন। নইলে হানি হ'ত।"

"যদি বা হ'ত, তোমায় কেউ দোষ দিত না।"

"আমায় না দিয়ে আর কাকে দিত? আপনার সময় নাই, বাড়ীতে কি হয়, না হয়, তা অপরে দেখে না। আমি যদি না দেখি, আমি আছি কেন? আমার পশু-জন্ম না হয়ে মানুষ-জন্ম হ'ল কেন?"

তার এই শেষের যুক্তি আমার বেশ জানা ছিল। ইহার খণ্ডন ছিল না।

"বুড়া, তুমি ভালই করেছ, পাথরটা সরিয়েছ। কিন্তু, যেতে চাও কেন?"

আমার কথায় সে অবাক্ হয়ে গেল। বোধ হয়, মনে মনে আমার বুদ্ধির নিন্দাও করেছিল। কিন্তু শুধু বল্‌লে, "পাথরটা বড় ভারী লেগেছিল।"

"হাঁ, পাথরটা বড়। এত তাড়াতাড়ি না ক'রে কাকেও ডাক্‌লে হ'ত।"

ব'লেই মনে হ'ল কেউ তার সঙ্গে পাথরটা ধর্‌ত না। তারা জাতিতে উঁচু। তারা মনে কর্‌ত ভগবান তাদেরই; বাউরীর নয়। বোধ হয়, মালী তাদের এই অবিশ্বাস টের পেয়ে দুঃখ পেত।

কিন্তু আমি আবার ভুল কর্‌লুম।

"কি? কুড়ি বছর আগে এক জোড়া ভারী জাঁতা চারি ক্রোশ ব'য়ে এনেছি; এখন কিনা ছোট একটা পাথর ভারী লাগ্‌ল!"

বুড়া কান্দ্‌তে লাগ্‌ল। তার শুখ্‌না গাল বেয়ে চোখের জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমার দুঃখ হ'ল; ভোলাবার তরে বল্লুম, "তা সত্যি। কিন্তু সে ত কুড়ি বছর আগের কথা। তখন তোমার বল ছিল।"

"সেই কথাই ত আপনাকে জানাচ্ছি।"

কিন্তু কি লজ্জা! আমি তার মনের ভাব মোটে ধর্‌তে পারিনি। তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম, যদি কিছু বলে। কিন্তু সে তেমন লোক নয়, এক কথা দুবার বল্‌বার নয়।

"তার পর?"

"আর কি চাই? বুড়ো হয়েছি, জান্‌তে বাকি কি?"

এখনও তার চোখ ছল-ছল কর্‌ছিল।

"যদি এই কথা, তা হ'লে পাথর-টাথর আর তুল্‌তে যেও না।"

হায়! সে কথাই নয়। সে যে বুড়ো হয়েছে, মহাপ্রভু প্রথমে আমার বন্ধুর পায়ে হোঁচট লাগিয়ে, পরে বুড়াকে দিয়ে পাথরটা সরিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

আমি তার যুক্তির মর্ম্ম বুঝ্‌লুম। কিন্তু তাকে ছাড়্‌তে চাই না। তেমন বীর, তেমন বিশ্বাসী, তেমন টানের লোক সহজে মেলে না। তাঁরই কথায় বলি, সে মানুষ হয়ে জন্মেছিল। পশু কেবল খাওয়া শোওয়া জানে। এই কথা সে কতবার অন্য চাকরদের বল্‌ত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—যখন তারা দুপুর বেলা স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে সারা বিকালটা কাটাত, তখন সে বুড়ার ঘুম থাক্‌ত না।

তারা যেখানে-সেখানে পাতা-টাতা ফেল্‌ত, বুঢ়া সে-সব খুঁটিয়ে তুলে বেড়াত। আমি তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইলুম, তার কুটুম্ব-পোষ্যের কথা তুল্লুম। কিন্তু সে অবুঝ। খাবার পর্‌বার ভাবনা মহাপ্রভুর, তার ভাবনা কি আছে?

ভাল লোকটি, এতও জান্‌ত। সে অপর চাকরদের শেখাত। তারা তাকে "বুঢ়া-পো" (বুড়া-ছেলে) বলে ডাক্‌ত। কত বাহিরের লোক তার পরামর্শ চাইত। তাকে তারা "মহান্তী" (মহাজন) ব'লে ডাক্‌ত। আগে যে মালী ছিল, সে ফুলগাছের যত্ন কর্‌ত না। বুঢ়া ঢুকেই মল্লিকা ও তুলসী লাগিয়ে দিলে। দূরে নয়, আমার পড়্‌বার ঘরের জান্‌লার ঠিক সাম্‌নে, যেন আমি ভগবানের দয়ার ভাগ প্রত্যক্ষ করি। কি দয়া! আমরা না চাইলেও তিনি সুগন্ধি সর্জ্জনা করেছেন আমাদের উপভোগের নিমিত্তে। মানুষ নির্ব্বোধ; বিনা মূল্যে পায়, তবু নিতে চায় না।

বুঢ়ার কিন্তু একটা দোষ ছিল। কোনও গাছ কাজের মনে কর্‌লে, সেটা কিছুতেই সরাত না। কতবার তার সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। আমি ধর্‌তুম্ যেখানকার গাছ সেখানেই সাজে; সে ধর্‌ত সেখানকার না হ'লে সেখানে জন্মিবে কেন? অত কথা কি, প্রভুর ইচ্ছা না হ'লে ঘাসও জন্মে না।

একদিন দেখি, বুঢ়া বাগান নিড়াচ্ছে, কতকগুলা ঘাস উপ্‌ড়িয়েছে। আমি সুযোগ বুঝে ধর্‌লুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেলুম—"সেগুলা কাজের ঘাস নয়।"

এই উত্তরে আমি খুসী হলুম, মনে কর্‌লুম এবার বুঝিয়ে দোব আমার কথাই ঠিক। কিন্তু বুঢ়াকে পারবে কে? বিনা প্রয়োজনে ভগবান কিছুই গড়েননি। কিন্তু যখন সে প্রয়োজন আমাদের জানাননি, তখন তুলে ফেল্‌তে দোষ নাই।

ভাল ফুল, ভাল শাগ-পালা জন্মাবার তরে বাগান রাখা হয় নাই। বাড়ীটা পরিষ্কৃত থাকবে ব'লে বাগান করা হয়েছিল। বুঢ়ার যা খুসী তাই রুইতে পেত। কখনও সে সারি সারি ঢেঁড়শ লাগাত, কখনও শিমের বন কর্‌ত, কখনও বা মেঠো ফশল 'মাণ্ডিয়া' চাষ কর্‌ত। একবার বুঢ়াকে একটু অনুযোগও করেছিলুম—"বুঢ়া, তুমি এত এত লাগিয়েছ কেন? দুই চারিটা ক'রে লাগালেই ত হ'ত। তা ছাড়া এটা কি মাঠ যে মাণ্ডিয়া বুনবে?"

"এতে কার কি ক্ষতি হচ্ছে? ইন্দ্র জল দেন, পৃথিবী ফল দেন।"

পরে শুন্‌লুম, পাড়ার কেঅট ও অন্যান্য দুঃখী জন বাগানের ফশলের ভাগ পায়। ইন্দ্র আর পৃথিবীর এত দান একলা ভোগ কর্‌লে পাপ হয়। ইহার পর আমি আর তাকে কিছু বল্‌তুম না।

তার মতন বন্ধু-বৎসল আমি আর দেখি নাই। বাহির-বাড়ীর একচালায় সে খেত, শুত। কিন্তু এমন দিন প্রায় দেখিনি, যেদিন সন্ধ্যার পর একজন দুজন কেহ-না-কেহ বুঢ়ার বন্ধু (কুটুম্ব) না এসেছে। মনে হ'ত বুঢ়ার কাছে বসুধৈবকুটুম্বকম্। সে তার জন্যে রাঁধ্‌ত বাড়্‌ত, কত কথা কইত, কত হাস্‌ত। জানি না, তার অল্প মাইনে থেকে কি ক'রে এত খরচ জোগাত। একবার আমার এক ছোট 'পূজারী' পাচক বলেছিল, বুঢ়া বাগানের সব জিনিষ বেচে চাল ডাল মাছ কেনে। সে দেখেছিল, বুঢ়ার বন্ধু-ভোজনে ভাল ভাল ব্যঞ্জন হ'ত। আমারও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ধরিনি। বাড়ীটা পরিষ্কার রেখেছিল।

সময়ে সময়ে পাঁচ-ছ-জন বন্ধু গ্রাম থেকে এসে তার কাছে পেত। পূজার সময় ঠাকুর দেখ্‌তে দশ-বারজনও আস্‌ত। সত্য কথা বল্‌তে কি, বুঢ়ার এই বন্ধু-বাৎসল্য আমার ভাল লাগ্‌ত না। একদিন বন্ধুরা চ'লে গেলে আমি বুঢ়াকে ধর্‌লুম—"দেখ, বাড়ীতে হোটেল খোলা ঠিক নয়।" কিন্তু যে উত্তর পেলুম, তাতে আর কথা বল্‌তে হল না। "এটা হোটেল কি? খাওয়ানার জন্যে সে পয়সা নেয় কি? না, তা নয়। ভগবান্ তাকে মানুষ-জন্ম দিয়েছেন; সে চাকরী করে বটে, কিন্তু সারাজীবন মানুষ ছাড়া আর কি হবে। পশুর দয়া মায়া নাই। মানুষ ত পশু হ'তে পারে না। লোকগুলি শহরের অপর বাড়ীতে যায় না কেন? আমাদের ভাগ্য যে তারা এ বাড়ীতে আসে।"

বুড়ার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

একদিন দেখি সকালে বুড়া ও পূজারী বকাবকি করছে। এত জোরে যে আমার পড়া বন্ধ করতে হ'ল। বুড়া জানালার সামনে এসে পূজারীর নামে নালিশ করলে। পূজারী বুড়াকে চোর বলেছে।

"কেন? কি হয়েছে?"

"কাল রাত্রে জনকতক বন্ধু এসে পড়ল। ব্যঞ্জনের কিছুই ছিল না। তাই বাগানের কাঁচকলা দিয়ে ব্যঞ্জন করি। একি চুরি হ'ল?"

আমি কষ্টে হাসি চেপে রেখে বল্লুম, "নিশ্চয়ই না। কলাগাছ তুমিই রুয়েছ, ফল নিশ্চয়ই তোমার।"

"না, না। তা ঠিক নয়।"

কি বলব, বুঝতে পারলুম না। ভয়ে ভয়ে বল্লুম—"তা যদি ঠিক নয়, তা হ'লে পূজারীর কথাই ঠিক।"

"কিন্তু আমি কি নিজে কলা খেয়েছি? পূজারীর কথা ঠিক হবে কি ক'রে? লোকে কি যার-তার বাড়ীতে যায়? তারা এখানে আসে কেন?"

"কারণ তারা যা চায়, বোধহয় তা পায়।"

"ঠিক। পূজারী বামুন হলেও ধর্ম্ম জানে না।"

বুড়া কেবল যে তার ধর্ম্ম রাখত, তা নয়, আমারও ধর্ম্ম রাখত। লোকে এসে ধর্ম্ম পালিবার সুযোগ দিত। আমরা দয়া করিনি, তারা করত।

বোধহয়, বুড়া ঠিকই বলেছিল। কারণ যখনই বাগান দিয়ে যাই, তখনই তাকে মনে পড়ে। জানি না, বাড়ীতে গিয়ে ধর্ম্ম সে কেমন রাখছে। যেমনই রাখুক, তেমন মানুষের মতন মানুষ আর পাব কি?

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আরবী ছন্দ

আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ তেম্‌নি তড়িৎচঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চম্‌কে-ওঠা-ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রকমের নয়,—তা একটু বেশ মন দিয়ে দেখ্‌লে বা পড়্‌লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।

আরবীছন্দ-সূত্রের যেখানে যেখানে × বা + চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।

(১) হজয্।

সূত্র:— "মফা আয়্‌লুন্ মফা আয়্‌লুন্
মফা আয়্‌লুন্ মফা আয়্‌লুন্।"

(× marks over "মফা" in each half)

কটির কিঙ্কিণ্
চুড়ীর শিঞ্জিন্
বাজায় রিণ্ ঝিন্
ঝিনিক্ রিণ্ রিণ্।
কাঁকণ্-কম্পন্
আকুল কন্‌কন্
নাচায় মোর মন,
অধীর দিন দিন।

(২) রযজ্।

সূত্র:— "মস্‌তফ্ আলুন্ মস্‌তফ্ আলুন্
মস্‌তফ্ আলুন্ মস্‌তফ্ আলুন্।"

বিল্‌কুল্ নদীর
মন্ আজ অধীর,
ছল্‌ছল্ দু তীর
চঞ্চল্ আথর।
বর্ষার মাতন
প্রাণ্ উন্মাদন্,
ঝঞ্ঝার কাঁদন
শন্‌শন্ পাতির।

(৩) রমল্।

সূত্র :— "ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্
ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্।"

খাম্‌খা হাঁসফাঁস্
দীর্ঘ নিশ্বাস,
নাই রে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।
হাস্‌তে প্রাণ চায়,
অমনি হায় হায়
বাজ্‌লো বেদনায়
ক্রন্দন্-উচ্ছ্বাস।

(৪) মোতা কারেব্।

সূত্র :— "ফাউলুন্ ফাউলুন্
ফাউলুন্ ফাউলুন্।

কলস-জল!
আবার বল্—
ছলাৎ ছল্
ছলাৎ ছল্!
রিণিক্ ঝিণ্
ঝিণিক্ রিণ্
বলুক ফিন্
কাঁকণ মল।

(৫) সরীএ।

সূত্র :—"মস্‌তফ্‌আলুন্ মস্‌তফ্‌আলুন্ মফ্‌উলাতুন্।"

লোকজন বেবাক্
একদম অবাক্
এম্‌নি গান গায়!
কণ্ঠের গমক্
চম্‌কায় চমক্
বিজুলি ঝঞ্ঝায়।

(৬) খফীফ্।

সূত্র :—"ফাএলাতুন্ মোস্‌তাফ্‌আলুন্ ফাএলাতুন্।"

আস্‌লো ফাল্গুন আস্‌মান জমীন হাস্‌লো বিল্‌কুল্।
গাইল বুল্‌বুল্ শোন্ ওই অলস ওঠ্ রে খিল খুল।

(৭) মযতস্।

সূত্র :— "মস্‌তফ্‌আলুন্—ফাএলাতুন্
মস্‌তফ্‌আলুন্—ফাএলাতুন্।"

সই তুই শুধাস্—কেমনে কই হায়,
প্রাণ্ মন্ উদাস কোন্ সে বেদনায়!
উন্মন্ হিয়ার ক্লান্ত ক্রন্দন্
কোন্ মোর পিয়ার বক্ষ-পুট চায়।

(৮) মোজারা-১।

সূত্র :— মফাআয়লুন্—ফাএলাতুন্
মফাআয়লুন্—ফাএলাতুন্।

ডাগর চোখ তোর বিজলী চঞ্চল
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্‌ছল্?
হিঙ্‌ল-লাল্ গাল পাংশু পাণ্ডুর,
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

(৯) কামেল্।

সূত্র :— মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্
মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্।

কুহুতান মদির
করে প্রাণ অধীর,
জেগে ওঠ অলস
চেয়ে দ্যাখ্ বধির!
মন্-আগুন দ্বিগুণ
এ যে সেই ফাগুন,
এ যে সেই বাসর
মদন আর রতির।

(১০) ওয়াফের্।

সূত্র :— মোফাআল্তুন্ মোফাআল্তুন্
মোফাআল্তুন্ মোফাআল্তুন্।

কানের তার দুল্ দোদুল্ দুল্ দুল্
কোথায় তার তুল্ কোথায় তার তুল্?
ফুলের লাল্চায় গালের লাল ছায়
শরম পায় গাল নথর তুল্তুল্।

(১১) মোতদারিক্।

সূত্র :— ফাএলুন্ ফাএলুন্
ফাএলুন্ ফাএলুন্।

তোর অথই
মন যতই
জিন্তে চাই
সই ততই
পাইনে থই
পাইনে থই!
মন শুধায়
কই সে কই?

(১২) তবীল।

সূত্র :— "ফউলুন্ মোফাআয়লুন্
ফউলুন্ মোফাআয়লুন্।"

চোখের জল!
আবার আয় ভাই,
হিয়ায় মোর
সোহাগ তোর চাই।
তুহার তুল্
দরদ্ বুঝ্বার
আপন জন
এমন কেউ নাই।

(১৩) মদীদ।

সূত্র :— "ফাএলাতুন্ ফাএলুন্
ফাএলাতুন্ ফাএলুন্।"

হায় এ কান্নার
নাইক শেষ,
কই মা শান্তির
কোন্ সে দেশ?
কোন্ সে দূর পথ
অন্তে হায়
পান্থ-বাস যা'র
নাই মা ক্লেশ।

(১৪) বসীত্।

সূত্র :— মোস্তাফ্আলুন্ ফাএলুন
মোস্তাফ্আলুন্ ফাএলুন্।"

কোন্ বন্ এমন
শ্যাম-শোভায়
প্রাণ্ মন্ জুড়ায়,
চোখ ডুবায়?
বুল্বুল্ ভোমর
বন-বিহগ
চঞ্চল এমন
আর কোথায়?

(১৫) মন্সরহ্।

সূত্র :— "মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন
মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন্।"

বাদ্লা-থম্থম্
তায় ঘোর নিশীথ,
মেঘ্লা মাঘ্ মাস
হায় হায় কি শীত!
শূন্য ঘর্ মোর
নাই কেউ দোসর—
ঝুর্ছে বায় হায়—
অন্তর তৃষিত!

(১৬) করাব।

সূত্র :— "মফাআলুন্ মফাআলুন্ ফাএলাতুন্।"

জীবন-সাধন,
প্রাণের বাঁধন—
হায় সে কান্নাই।
পেলেম আদর
পেলেম সোহাগ,
মনটি পাই নাই।

(১৭) যদীদ্।

সূত্র :— "ফাএলাতুন্ ফাএলাতুন্ মফাআয়লুন্।"

রক্ত-লাল্ বুক,
সিক্ত চোখ মুখ
হাসায় লোক ভাই।
ছিন্ন-কণ্ঠের
কান্না শুনবার
ধরায় কেউ নাই।

(১৮) মশাকেল্।

সূত্র :— "ফাএলাতুন মফাআয়লুন মফাআয়লুন।"

আজকে শেষ গান,
বিদায় তারপর
বিদায় চাই ভাই!
বেদনা সইতেই
জনম যা'র, নাই
শান্তি তার নাই।

কাজী নজরুল ইসলাম।

অভিমানিনী

(১)

শিশুর নাম ছিল অমিয়। যখন সবে তাহার বয়স চার বৎসর, তখন একদিন তাহার মা তাহার কচি হাতের নিবিড় বাঁধন ছাড়াইয়া রহস্যময় জগতে প্রস্থান করিলেন। পিতা নরেশ-বাবু শিশুহৃদয়কে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে তার মা ঐ আকাশে চলিয়া গিয়াছে—তবে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। শিশু পিতাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিয়া তুলিল—'বাবা আচ্ছা মা কোন্‌খানটায় আছে? ঐ যেখানে চাঁদা মামা বসে' আছে তার কোন্ দিকে? সে আমাদের দেখতে পাচ্ছে? তবে আস্‌ছে না কেন বাবা?'

অশ্রুসিক্ত পিতার উত্তর শিশুর নিকট প্রায়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিত; তখন সে অবুঝ বেদনায় আবল-তাবল বকিতে বকিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

(২)

সেদিন ভোর হইতে উঠিয়াই অমিয়ের স্ফূর্ত্তি অতিশয় বাড়িয়া গেল। সে শুনিল—আজ তাহার মা আসিবে। তাহার সারা দেহে পুলকবন্যা ছুটিল। তাহার বিস্মৃতপ্রায় মাতৃস্নেহের ক্ষুধা আজ আবার জলিয়া উঠিল। সে খেলা করে—আবার মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—'তাইত, বাবা, মা কখন আসবে? আর কত দেরী? কোন্ পথ দিয়ে আসবে?'

পিতার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। এই শিশুহৃদয়ে কি নৈরাশ্যের প্রচণ্ড আঘাত সহিবে? তাহার মাতৃস্নেহের যে অপূর্ব্ব আস্বাদ সে পাইয়াছিল নববধূ যদি তাহাকে ততখানি দিতে না পারে—তবে? শিশুহৃদয় কি ভাঙ্গিয়া পড়িবে না! উহারই জন্য ত আবার এই বিবাহ—বা বিবাহের অভিনয়। শিশুর এই অত্যাগ লালসা—মাতার আসার সম্ভাবনায় এই অনাবিল আনন্দের উৎসধারা পিতৃহৃদয়ে ঘোরতর আশঙ্কার সঞ্চার করিয়া দিল। তাঁহার একবার সন্দেহও হইল যে পুনরায় বিবাহ করা হয়ত ভুল। কিন্তু এখন ত আর ফেরা যায় না। সব যে স্থির হইয়া গিয়াছে।

পিতার নিকট উত্তর না পাইয়া অমিয় ছুটিয়া তাহার দিদিমার নিকট উপস্থিত হইল। এই নবাগতা বৃদ্ধাকে সে

মোটেই দেখিতে পারিত না। তিনি এই বিবাহের সব ভার লইয়াছেন ও মাত্র তিনদিনের কড়ারে আসিয়াছেন। অপরিচিতের ব্যবধান আজিও তাহাদের মধ্যে ঘুচে নাই। তবুও অমিয় আজ তাঁহারই নিকট ছুটিয়া গেল। এ খবর যে তাহার চাই। সে জিজ্ঞাসা করিল—'দিদিমা, মা কখন্ আস্‌বে?'

দিদিমার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। একটু অপ্রস্তুতের ন্যায় তিনি জবাব দিলেন—'আর দেরী নেই রে। কালই আস্‌বে।'

অমিয়ের মন দমিয়া গেল—'এঁ্যা—এত দেরী—তবে যে বল্লে আজ', তাহার আর দেরী সহিতেছিল না। যতদিন মায়ের আসার দিনের স্থিরতা ছিল না ততদিন সে আশায় সান্ত্বনায় প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু এখন আজের স্থানে কাল তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। কাল—সে যে বড় দেরী।

সে জামা কাপড় সব রাগ করিয়া খুলিয়া ফেলিল—পরে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল—ইচ্ছা কোন্ পথে মা ফিরিবে সেটা আবিষ্কার করা। কিন্তু চোখের জলে তাহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। সে প্রতিজ্ঞা করিল—'আমি কিছুতেই মার কোলে যাব না—কেন সে শুধু-শুধু এত দেরী করে?'

(৩)

নরেশ-বাবু বিবাহ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন অভিমানে হৃদয় কানায় কানায় ভরা থাকিলেও মাকে দেখার আশায় সকলের আগে গাড়ীর পাশে ছুটিয়া গেল অমিয়! মাতার নিকট ধরা দিবে না বলিয়া সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সবটাই আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

পিতার মুখ পাংশু হইয়া গেল। শিশু কিন্তু পিতার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। নববধূর আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে সে বলিল—'ওমা, তুই এমন হয়ে গেলি যে—এত দেরী কর্‌লি কেন?' সে হাত বাড়াইয়া কোলে উঠিতে গেল।

লজ্জাশীলা নববধূ সরমজড়িত হস্তে তাহাকে কোলে নিতে দেরী করায় অমিয় ছুটিয়া উধাও হইয়া গেল। দিদিমা একবার ফিরিয়া দেখিয়া সজল চক্ষে বধূ বরণ করিতে লাগিলেন।

আচার শেষ হইয়া গেলে নরেশ-বাবু অবকাশ পাওয়া মাত্র পুত্রের সন্ধানে ছুটিলেন। দেখিলেন—সে এক প্রজাপতির পিছনে তাহাকে তাড়া করিয়া ছুটিতেছে—তাহার চোখের কোলে অশ্রুচিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি ডাকিলেন—'খোকা।'

সে উত্তর দিল—'না বাবা, মা ভাল না—আমায় কোলে নিলে না কেন?'

পিতা গাঢ় আলিঙ্গনে পুত্রকে ঘিরিয়া ভাবিতে বসিলেন।

(৪)

নূতন বধূ লীলা প্রথম হইতেই বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এ কি? স্বামী উদাসীন—কোন কথা নাই। তবে তাহাকে বিবাহ করিয়া আনার কি প্রয়োজন ছিল? সংসারে স্ত্রীলোক আর কেহ নাই। বাড়ীতে যাহারা আছে—সকলেই তাহার উপর বিচারকের সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিয়াছে। সে গৃহিণী—শুধু ঘর-দ্বারের অধিকারে। পাষাণ-প্রাচীর ত তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না—তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। সে যে কত আশা করিয়াছিল—কিন্তু সে কি পাইল? স্বামী সেই বিবাহদিনে চাবীর গোছার রিং দিয়া তাহাকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তাহাতেই যেন তাঁহার সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেছে।

সত্য বটে অর্থের অভাব তার নাই। কিন্তু অর্থ কি অনাত্মীয়তার বেদনা মুছাইতে পারে—ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারে? না—তাহা পারে না। এতখানি যোগ্যতা তাহার নাই।

লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, স্বামী তাহার সহিত কথা কহিবার সময় যেন অপরাধী হইয়া পড়েন—কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরে। সময়ে সময়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের কথা—সেও ত কেবল—কোন্ দ্রব্য আনিতে হইবে—কি অভাব পড়িয়াছে—এই মাত্র। কোনো প্রাণের যোগ ত তাহাতে নাই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব-অভিযোগের প্রশ্ন—তাহার মধ্যে কিসের সঙ্কোচ? সে কি তবে এতই অনাবশ্যক?

সে বেশ বুঝিল, তাহার স্বামীর ভিতরে কোথায় একটা গোপন ব্যথা আছে, যাহার সাময়িক যন্ত্রণায় তিনি

মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া পড়িত। কিছুদিন যাইতে সে দেখিল—সে যখন স্বামীর সহিত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের কথা বলিতে যায় তখন যদি খোকা সেখানে আসিয়া পড়ে—তবে স্বামীর মুখ কালো হইয়া যায়, কে যেন তাঁহাকে কশাঘাত করে।

স্বামীর অবহেলার কথা লীলার মনে আর ততটা আধিপত্য করিতে পারিল না। সে যে স্বামীকে সুখী করিতে পারিতেছে না ইহারই তীব্র অনুভূতি তাহাকে নিজের ব্যবহারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে শিখাইল। অক্ষমতার বেদনায় লীলা মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিত ও সংকল্প করিত যে—সে প্রাণপণে দেখিবে—ইহার শেষ কোথায়।

সে শুনিয়াছিল—তাহার মৃত সতীন সরযূ রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিল। তাই সে স্থির করিল যে স্বামীহৃদয়ের শূন্যতা সে পূর্ণ করিবেই। সে মৃতার উদ্দেশ্যে কহিল—'দিদি, স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ করো—যেন তোমার উপযুক্ত বোন হ'তে পারি। স্বামীহৃদয়ের সকল গ্লানি যেন মুছে ফেল্‌তে পারি।'

(৫)

নরেশ চাহিত—লীলা সরযূ হোক্। কিন্তু সে বুঝিত না যে একটা লোক সম্পূর্ণ আর-একটার সমান হইতে পারে না। লীলাকে সে সরযূর আদর্শে বিচার করিত—বুঝিতে চাহিত না যে সরযূর মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে তাহার সব দোষ ঢাকিয়া গিয়া সে অনুপম সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার মধ্যে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্পনার জিনিস বাস্তব জীবনে প্রতি অঙ্গে সমানভাবে পাওয়া যাইবে কেন? নরেশ কিন্তু তাহা স্বীকার করিত না। তাহার ধ্যানের প্রতিমাকে সে সংসারেই পাইতে চাহে।

যেখানে ভালবাসার নিবিড়তাই একমাত্র সম্পর্ক—সেখানে সবই ভালবাসার অভাবে শুখাইয়া উঠে। তাই নরেশ ও লীলার মধ্যে সম্পর্কটা দিনে দিনে খাপছাড়া হইয়া উঠিতেছিল। যে চোখ রাতদিন দোষ খোঁজে—সে চোখে সামান্য ত্রুটিগুলিও বড় হইয়া উঠে। তাই লীলার ক্ষুদ্র বিচ্যুতিও নরেশের কাছে মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। এসকলের উপরে তাহার হৃদয়ে আর একটা ধারণা উঁকি দিত যে অমিয়কে লীলা অযত্ন করিবেই—সেইজন্যেই যেন তাহার আসা।

সেদিন অপরাহ্নে নরেশ যখন অন্দরে আসিল—তখন তাহার অসম্ভব গম্ভীর মুখে বিষাদরেখা দেখিয়া লীলা স্থির থাকিতে পারিল না। ভালবাসার দিক দিয়া না হইলেও—কর্ত্তব্যের দিক হইতে কে যেন তাহাকে জানাইয়া দিল—স্বামীর হৃদয়ভার লঘু করার চেষ্টা স্ত্রীর করা কর্ত্তব্য।

তাহার কথা বলা স্বামী পছন্দ করেন না জানিয়াও সে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—'তোমার কি কোন অসুখ করেছে—এত রুক্ষ দেখ্‌ছি কেন?'

নরেশ অস্বাভাবিক জোরে বলিল—'না'।

লীলা পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মধ্যপথে বাধা দিয়া নরেশ বলিল—'তুমি হয়ত জান না—তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে কত বড় বেশী কষ্ট—বুঝি বা পাপও—'

লীলা আর দাঁড়াইল না। সে যে স্ত্রীলোকের কতখানি অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া যাচিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিয়াছে তাহা যখন স্বামী বুঝিলেন না তখন সে আর কি করিতে পারে! নারীত্বের আত্মসম্মানের উপর যে এতখানি নির্ম্মম আঘাত করিতে পারে—সমাজ তাহাকে তাহার প্রভু করিয়া দিলেও—সে তাহার কেহ নয়—স্বামী—বন্ধু—না—অপরিচিতের চেয়েও অপরিচিত সে।

তবে সে এই লৌহনিগড়ে আবদ্ধ থাকিবে কাহার খাতিরে—কিসের প্ররোচনায়? তাহার মধ্যে তীব্র ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল যে সে স্বামীকে জানাইয়া দেয়—'তুমি আমার কেহ নও—আজ আর আমি তোমাকে বা তোমার সুখ-দুঃখকে একটুও গ্রাহ্য করি না।'

কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য ত এখনও শেষ হয় নাই। এই নীরব পুরীর নিভৃত কোণে যে তাহার এখনও একটি বন্ধন রহিয়াছে—তাহাকে সে ত ছাড়িতে পারে না। অমিয় যে বড় আশ্বাসে—বড় নির্ভরতার সহিত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে সে কোন্ প্রাণে বলিবে—'ওগো স্নেহের কাঙাল, আমি তোমার মা নই?' সে যে একান্তভাবেই তাহাকে মা বলিয়া জানিয়াছে—শিশুহৃদয়ে এত বড় আঘাত সে করিবে

কোন্ প্রাণে। তাহার নারীত্বের স্বভাবসুলভ কমনীয়তা—স্নেহপ্রবণতা ইহাতে সম্পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নারীর কোমল প্রাণ যে অতি অল্পেই ব্যথিত হইয়া উঠে।

(৬)

মানবহৃদয় যখন সারা পৃথিবীর মধ্যে নিতান্ত নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে যখন সে নিজেকে বিশাল পৃথিবীর বুকে একান্ত-ভাবে উপেক্ষিত মনে করে—তখন ভগবান তাহাকে একটি আশ্রয় জুটাইয়া দেন। প্রথম হইতেই লীলার সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল—শুধু লীলার বলিয়া নহে—প্রত্যেক মানবই সঙ্গীলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল। যখন কোন সঙ্গীই মেলে না, তখন সে আর সঙ্গীর দোষগুণ বিচার করিবার অপেক্ষা করে না—আগ্রহের ব্যাকুলতায় সম্মুখের প্রত্যেক জিনিস-কেই জড়াইয়া ধরিতে চাহে।

লীলারও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। ঠিক এই নিমিত্তই তাহার সপত্নীপুত্রের প্রতি বিদ্বেষ ত দূরের কথা—বরং তাহাকে আপনার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। অমিয়েরও চিরতৃষিত হৃদয় মায়ের কোলে মাথা রাখিবার জন্যই যেন বাঁচিয়া ছিল। আজ ভগবানের করুণায়—প্রকৃতির নিয়মে—দুইটি বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃষ্ণা পরস্পরকে দিয়াই মিটিয়াছিল।

(৭)

স্বামীর উপেক্ষায় লীলা যখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে ব্যস্ত ছিল ও অমিয়কেও একান্ত বাধা বলিয়া জানিতেছিল—তখন তাহার পীড়িত হৃদয়ের সকল তাপ দূর করিয়া অমিয় আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। লীলার সব চিন্তা—সব কর্ত্তব্য ভাসিয়া গেল। সে হাসিমুখে তাহাকে চুমা খাইয়া কহিল 'কি রে—এখন কি? এখনও তোর খাবার সময় হয় নি,—'

অমিয় বলিল—'তা' না হোক্—তুমি চল'—বলিয়াই সে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

লীলা দু-এক পদ অগ্রসর হইয়া কহিল—'কোথায় রে—'

শিশু উত্তর করিল—'বাবার কাছে—সে তোমায় ডাকছে—'

এক মুহূর্ত্তে লীলা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মায়ের এই অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া অমিয় মাকে আরও বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিল—বুঝি সে বুঝিয়াছিল মাকে আবার হারাইতে হইবে।

লীলা তখন শিশুকে কোলে করিয়া গুম হইয়া মেঝের বসিয়া পড়িল। তাহার চোখ হইতে প্রথমে আগুন পরে জল বাহির হইয়া ধারার পর ধারায় গাত্রবস্ত্র সিক্ত করিতে লাগিল।

আজ তাহার পক্ষে পৃথিবী শূন্য—তাহা না হইলে তাহার একমাত্র-নির্ভর পুত্রের মুখে এ কাহার কথা? নিতান্ত অসহ্য হইলেও ত' ইহা সহিতে হইবে। তাহার মন বলিতেছিল, শিশু সব ভুলিয়া যাক্। জগতের মধ্যে তাহাদের আপনার বলিতে যাহা সব চূর্ণ হইয়া যাক্। শুধু পুত্র মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া থাক্। বাঁচিয়া থাক্—মা ও ছেলে।

আজ যে তাহার বিবাহদিনের আশার রঙীন কাচ ভাঙিয়া গেছে। যে প্রেমের অঞ্জন চোখে দিয়া সে এই পৃথিবীকে রূপে রসে ভরা, গন্ধে বিচিত্র, শব্দে সঙ্গীতময়ী বলিয়া ধারণা করিয়াছিল—আজ চোখের জলে তাহার সে অঞ্জন ধুইয়া গেছে। সাদা চোখের সম্মুখে যাহা ভাসিয়া উঠিয়াছে—তাহা নিতান্তই কুশ্রী।

জগৎ আজ রূপহারা গন্ধহারা। সে এ জগৎ চাহে না। সব পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাক্। কিন্তু—অমিয়—না—সে এ কি ভাবিতেছে! সংযত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

(৮)

নরেশ বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল। অতখানি আঘাত কি কেহ হঠাৎ সহ্য করিতে পারে—না কাহারও করা উচিত? কিন্তু এ ভাবটা তাহার মনে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সরযু হইলে কি এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত? সে যে ইহার চেয়েও বড় দুর্ব্ব্যবহার হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে।

নরেশ একটু ভুল করিয়াছিল—সরযুর রূপ-গুণ তাহার প্রাণ-মন যে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে অন্য কাহারও স্থান করা যে কতখানি শক্ত ব্যাপার তাহা সে বুঝিত না। সে আরও বুঝিত না যে সরযু একদিনেই সরযূ হয় নাই। বিবাহের পর হইতে প্রেমের নিবিড়তায় তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু যেটা প্রকৃত বিবাহ—অন্ততঃ বিবাহের উদ্দেশ্য ও স্থায়িত্ব যে প্রেমে

—তাহা যে তাহার ও লীলার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি ইইতে পায় নাই—আর সেটাও যে তাহার দোষে—তাহা সে জানিত না বা জানিতে চাহিত না। কে জানে লীলা সরযূ হইতে পারিত কি না— অন্ততঃ তাহার গুণগুলির সত্তা যে লীলার অন্তরে নিহিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সব প্রবৃত্তি সার্থক হইতে পারিল না যে—তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত নরেশ যে করে নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতেই হঠাৎ নরেশ দেখিতে পাইল অমিয় তাহার নিকট আসিতেছে। এরূপ ব্যাপারে সে একটু বিস্ময় বোধ করিল। কই এ সময় ত অমিয় তাহার নিকট আসে না। এ যে তাহার নিদ্রার সময়। সে অগ্রসর হইয়া অমিয়কে কোলে লইয়া পরম স্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—'কি বাবা, কি চাই? এ কি চোখে জল দেখ্‌ছি যে—হাঁরে তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? কি হয়েছে তোর?'

পিতার এই প্রশ্নে বালকের চোখের জল দ্বিগুণবেগে ঝরিতে লাগিল। নরেশ ভাবিল— 'না জানি আবার এ কি! লীলা কি নিজের অপমানের শোধ ইহার উপর দিয়া তুলিয়াছে? এত বড় স্পর্দ্ধা তার হবে?'

স্নেহান্ধ সে মানবহৃদয়ের এত নীচ স্তরে পৌছিয়াছিল যে সে কল্পনাতেও আনিতে সাহস করিল এই নীচ প্রতিহিংসার কথা। অমিয় যে লীলার সপত্নীপুত্র —সুতরাং তাহার পক্ষে বিদ্বেষের বস্তু, তাহা ত সে ভালরূপেই জানে। তবে কেন সে তাহার উপর শিশুর ভার ন্যস্ত করিয়া ভুল করিয়া বসিল।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'কি বাবা, কি হয়েছে? মা কি মেরেছে?'

'না, বাবা, মা আবার ঐ আকাশে চলে যাবে কেন?'

অকস্মাৎ কে যেন তপ্ত অগ্নিতে শীতল জল ঢালিয়া দিল। শিশুর এই একটি কথায় নরেশ লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। কত নীচ সে। কত বেশী নীচ সন্দেহ সে এই মহিমময়ী নারীর উপর করিয়াছে। সে বলিল—'না বাবা, সে চলে যাবে না। আমরা তাকে ধরে' রাখ্‌ব—যাও তুমি শুতে যাও।'

শিশু নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল। অনুতপ্ত হৃদয়ে নরেশ মনে মনে তাহার অন্তর্য্যামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। হায় এত নীচ সে কেমন করিয়া হইল!

(৯)

পরদিন প্রভাতে নরেশ অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের পর লীলার নিকট গিয়া ক্ষমা চাওয়াই স্থির করিল। দিবসের আলোর সহিত লজ্জা নূতনভাবে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সে তাহা কাটাইয়া অগ্রসর হইয়া লীলার নিকট পৌছিল। লীলা তখন সবে অমিয়ের পোষাক পরানো শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখোচোখি হইতেই নরেশের সব দৃঢ়তা সব সংকল্প উধাও হইয়া গেল। তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইতে চাহিল—কিসের জন্য ক্ষমা? সে ত ঠিক কথাই বলিয়াছিল।

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সে যেন নিজের অগোচরেই বলিয়া ফেলিল—'লীলা আমি তোমার উপর বড় খুসী হয়েছি—' বলিয়াই সে কথাটার অসঙ্গতি বুঝিতে পারিল।

লীলা একটু বিদ্রূপের সুরে কহিল—'সত্যি নাকি? কেন?'—তাহার শিরার ভিতর তখন উষ্ণ রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—কানে বাজিতেছিল স্বামীর সেই বিষশল্য— 'তোমার সহিত আমার কথা কওয়া তাও বুঝি পাপ।'

নরেশ এই বিদ্রূপের কথায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে লীলার নিকট হইতে এ যাবৎ যাহা পাইয়াছে—তাহা কোমলতা স্নেহপ্রবণতা নম্রতা। এ মূর্ত্তি তাহার একান্তই অপরিচিত। ইহাকে সে সহ্য করিতে রাজী নহে।

সে পরুষকণ্ঠে কহিল—'এত স্পর্দ্ধা স্ত্রীলোকের শোভা পায় না লীলা। তবে অমিয়ের খাতিরে তোমায় ক্ষমা কর্‌লুম।'

লীলা বেশ একটু কঠিন হইয়াই উত্তর দিল—'ক্ষমা করার অধিকার যে তোমার হয়নি—সেটা ভুলে গেলে চল্‌বে কেন? সকল অধিকারই যে অর্জ্জন করে' নিতে হয়। তোমার খুসী—তোমার রাগ—তাতে আমার এমন কি আসে যায়?'

সে এ কথা বলিল বটে—কিন্তু তাহার এই দৃঢ় উক্তির ভিতর হইতেও যে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—তাহার অক্ষমতা —তাহার বিবাহিত নারীজীবনের অসম্পূর্ণতা, খর্ব্বতা।

নরেশ ধৈর্য্য হারাইল—উচ্চ কণ্ঠে কহিল—'শুধু অমিয়ের

জন্য—তা না হ'লে তোমায় আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। শুধু অমিয়ের জন্য এত ধৃষ্টতা তোমার সহ্য করছি—কিন্তু আজ শেষ—এর পরে আর তোমায় বিশ্বাস করতে পারিনে।—'

লীলা কম্পিত অথচ শাণিত কণ্ঠে উত্তর দিল—'তবে অমিয়ের সম্বন্ধে আমার আর কোনও দায়িত্ব রইল না—ঠিক বলছ ?' এত জোরের সহিত এ কথা বলিলেও ইহা যেন করুণ বিলাপের ন্যায় শুনাইল। যেন তাহার সর্ব্বস্ব কেউ কাড়িয়া লইতেছে—এমনই আর্ত্ত সেই স্বর। নিজের স্বরে লীলা নিজেই চমকিয়া উঠিল।

'হ্যাঁ—এই আমার শেষ কথা। অমিয় এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে।'

নরেশ চলিয়া গেল। লীলা কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝেয় বসিয়া পড়িল। 'ওগো অন্তর্য্যামী—তুমি কি এত নিষ্ঠুর! আমার মুক্তির পথে বাধা বলে ক্ষণেকের তরেও অমিয়কে দোষী করেছিলাম—তাই বুঝি তাকে এমন ভাবে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' নিলে।'

সে বসিয়া রহিল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কিন্তু কই অমিয় ত তাহার কাছে একবারও আসিল না—তাহাকে মা বলিয়া ডাকিল না। সে হৃতশাবক পক্ষিণীর মত লুটাইয়া পড়িল। সে ত ইহা চাহে নাই। একবার চকিতের তরে ভাবিলেও তাহার মন ত ইহা চাহে নাই। তবে এ কি শাস্তি—আজ আর তাহার আপনার বলিতে কিছু নাই—আজ সব শূন্য, তাহার এ গভীর আঁধারে শেষ আলোকরশ্মিও নিভিয়া গিয়াছে।

(১০)

লীলা স্থির করিল যে সে পিতৃপ্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা লইয়া কাশীবাস করিবে। সে টাকা তুলিতে যে কয়দিন দেরী তাহার একদিনও বেশী সে-আর পরের গৃহে নিজের অস্বীকৃত অধিকারের লজ্জা বহন করিয়া থাকিবে না।

সুদীর্ঘ তিন দিন তাহার কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে অমিয় একবারও তাহার নিকট আসিতে পায় নাই। সময়ে সময়ে সে বেশ দেখিতে পায় যে অমিয় তাহার নিকট আসিতে ঝোঁক ধরিয়াছে—কিন্তু নরেশ তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতেছে। সে অমিয়ের কান্নার স্বর শুনিতে পায়। আকাশ বাতাস সব মৃদু মর্ম্মরে মর্ম্মযাতনা তাহার বুকে ঢালিয়া দিয়া যায়। সে স্থির থাকিতে পারে না।

যাইবার দিন সে শুনিল—খোকার বড় অসুখ। তাহার সেদিন যাওয়া স্থগিত রহিল। ডাক্তারের আনা-গোনা যত বেশী বাড়িতে লাগিল—লীলার যাইবার আগ্রহ ততই কমিয়া যাইতে লাগিল। স্তব্ধ নিশীথে জাগরণক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট সে শুনিতে পায় অমিয় চীৎকার করিতেছে —'মা—আমি মার কাছে যাব।'

অসহ্য যন্ত্রণায় বুক ফাটিতে চাহিলেও সে খোকাকে দেখিতে যায় নাই। সে তাহার বিষাদমলিন কক্ষে প্রস্তর-শয্যায় শুইয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিত। তাহার পদদ্বয় মধ্যে মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যখন খোকার শয্যাপার্শ্বে লইয়া যাইত তখন তাহাকে সজাগ করিয়া দিত স্বামীর কথা—'তোমার আর কোনও প্রয়োজন নাই।'

(১১)

নরেশ দুইদিন তিনদিন অপেক্ষা করিল। ডাক্তার দেখাইলেই রোগ সারিয়া যাইবে। কিন্তু যেদিন ডাক্তার বলিয়া গেল যে মানসিক ব্যাধির ঔষধ চাই, নতুবা রোগ সারিবে না সেদিন নরেশ আর অভিমানকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার পিতৃহৃদয়ে সন্তানস্নেহই জয়ী হইল।

পঞ্চম দিনে লীলা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিল স্বামী-পুত্র। তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে কিছু বিলম্ব হইল, কিন্তু নরেশই প্রথমে কথা কহিল।

সে বলিল 'লীলা, যা হয়েছে তা' আর ফিরবে না। তোমার দুয়ারে ছেলের প্রাণ ভিক্ষে করতে এসেছি, দেওয়া না দেওয়া তোমার হাত।'

স্বামীর বিষাদ-মূর্ত্তি দেখিয়া লীলার চোখে জল আসিল। তাহার মনে হইল— এই পুত্রস্নেহই একদিন তাহাকে পথ দেখাইয়াছিল— আজ তাহার স্বামীও সেই পুত্রস্নেহের কাছে নিজের জেদ পৌরুষ বলি দিয়াছেন।

সে কথা বলিল না— অতি সন্তর্পণে অমিয়কে স্বামীর নিকট হইতে লইয়া তাহার এযাবৎ অব্যবহৃত শয্যার উপর উপবেশন করিল। নরেশ তৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ডাক্তার ডাকিতে গেল।

খোকা জ্ঞান পাইয়াই চাহিয়া দেখিল— মা। হাসিতে তাহার অধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া জানাইলেন— রোগীর জীবনের আশা করা যাইতে পারে।

(১২)

খোকা সারিয়া উঠিতেই লীলার যাওয়ার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। সে যে এ গৃহের অনাবশ্যক বোঝা মাত্র— তাহার যে কোন প্রয়োজনই নাই। তবে সে থাকিবে কিসের অধিকারে? অপরিচিতের গৃহে এরূপ অতিথিভাবে থাকা যায়— কিন্তু যেখানে সব চাইতে বড় সম্বন্ধ সেখানে অনাত্মীয়ের মত বাস কেবল অশোভন নহে—পরন্তু অপমান।

নরেশ যখন পুনরায় কেমন সুখের সহিত ঘরকরণা আরম্ভ করিবে স্থির করিতেছিল তখন তাহাকে ত্রস্ত করিয়াই লীলা আসিয়া চরণে প্রণাম করিল। নরেশ স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল— 'কি?'

লীলা সোজা উত্তর দিল— 'আজ আমি যাচ্ছি। এতদিন খোকার অসুখের জন্যে যেতে পারিনি, আজ সময় হয়েছে।'

নরেশ রীতিমত চমকিয়া উঠিল— তাহার মুখ হইতে রক্ত সরিয়া গিয়া সাদা হইয়া উঠিল। সে বলিল— 'কেন লীলা— তোমার কি সব কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে? কিছু বাকী নেই?'

লীলা নতমুখে উত্তর দিল—'হাঁ, আমায় ত তুমি মুক্তি দিয়েছ। কর্ত্তব্য?—তা' এমন কিছু দেখ্‌ছিনে—যার জন্যে আমার এখানে থাকার দরকার হ'তে পারে!'

নরেশ আর্ত্তস্বরে কহিল—'ভেবে দেখ লীলা, অত কঠিন হয়ো না। বিচারকের দৃঢ়তা ছেড়ে দাও। আমার জন্যে—না—খোকার জন্যেও কি তুমি থাকতে পার না?'

লীলা অকুণ্ঠিত চিত্তে কহিল— 'আমার ভাবা-চিন্তার অবসর বা প্রবৃত্তি নেই— আমি জানি— আজ আমি মুক্ত। খোকার দায়িত্ব নেওয়া আর আমার সাজে না—তবে শেষ একটা অনুরোধ রইল – যদি খোকার অসুখ হয়—আমাকে খবর দিতে দ্বিধা করো না।'

লীলা অগ্রসর হইল। পুনরায় নিজের ঘরে গিয়া দেখিল অমিয় তখনও ঘুমাইতেছে। সে আর না চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল।

গাড়ীতে উঠিতে গিয়াই সে দেখিল পার্শ্বে স্বামী। নরেশ বলিল— 'ফেরো, লীলা ফেরো -'

লীলা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল— 'আর তার সময় নেই—আমি আজ মুক্ত— কিন্তু তোমার বুঝবার ক্ষমতা হবে না যে কত বেশী দামে আমি আমার এই মুক্তি ক্রয় করেছি—' সে স্থির পদে গাড়ীতে প্রবেশ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

নরেশ দেখিল লীলা চোখের জল মুছিতেছে। তাহার বাড়ীর দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িতেই অমিয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'বাবা, মা কই?'

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নরেশ কহিল—'চলে গেছে রে—অভিমান করে' গেছে—'

বালকের আর্ত্ত চীৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হইয়া উঠিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কবি

সে চলেচে গভীর গতি-রঙ্গে—
মানব-মনের রহস্যময় অন্দরে;
সে চলেচে নীরবে, নিঃসঙ্গে,
গভীর হতে গভীরেরি অন্তরে!
মন্-রহস্যের কোথায় রে শেস কোন্‌খানে,
সে ধায় গোপন সেই সীমানা-সন্ধানে।

কে রহস্যময়ি—অয়ি! কোন্ অ-শেষের আবডালে
লুকিয়ে রচো বিশ্ব-জোড়া আবছায়া সব ভাব্-জালে!
কে গুণ্ঠিতা,—ভালের ভূষণ লুকিয়ে জলে কোন্ হীরে?
সে যে তোমার করবে হরণ সেই রহস্য-ধনটিরে!
সে যে তোমায় আন্‌বে ধরে' সাথ করে',
মুখের ঢাকা মুক্ত করে' এই বাহিরে—হাত ধরে'!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

পুস্তক পরিচয়

জীবনের ভুল—শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেনগুপ্ত। প্রকাশক কর মজুমদার এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম ১৷৷০ টাকা।

একখানি উপন্যাস। লেখকের হাত জায়গায় জায়গায় কাঁচা। প্লটটি মামুলি। তাহা হইলেও দুই-একটি চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। ভাষা ঝরঝরে সরল ও আড়ম্বরহীন। মধ্যে মধ্যে অসঙ্গতি থাকিলেও লেখকের চরিত্র-অঙ্কণে হাত আছে। গল্পে তাঁহার হাত খুলিবে—এরূপ আশা করা যায়। বইটির ছাপা বাঁধাই কাগজ বেশ ভাল।

মঙ্গলমঠ—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। প্রকাশক কর মজুমদার এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম তিন টাকা। পৃষ্ঠা ৪০৯। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

উপন্যাস। সুদূর বোম্বাই সহরের এক প্রান্তে রাজস্থানীদের মঠ ইত্যাদির মধ্যে দুই-এক ঘর বাঙ্গালীর বাস। ইহাই ঘটনাস্থল। আর একটি রাজস্থানী ব্রাহ্মণ যুবক ভাস্কর বইটির নায়ক। একটি বাঙ্গালী কিশোরীকে কয়েক বার দেখিয়া সুদৃঢ়মনা কর্ম্মী যুবকের সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। আট বৎসর ধরিয়া সে নিজের চিত্তের সঙ্গে লড়াই করিল। উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষিত হইয়া এবং ভগবানের ধ্যান করিয়াও সে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না। তার জীবন লক্ষ্যহীন উল্কার মত হইয়া গেল। কিশোরীরও সেই দশা। বইটার সবটাই কেমন অস্বাভাবিক। রাজস্থানী অনেকটা বাঙালী হইয়া গিয়াছে। ভাষাও সরল হয় নাই। লেখিকার "সেখ আন্দু" প্রভৃতির পাশে এ বইটি দাঁড় করানো যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ - বিষ্ণু ভাস্কর সরস্বতী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ আনা।

কর্ম্মী ও যোগী অরবিন্দ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী। অল্পের মধ্যে তাঁহার জীবনের অনেক তথ্য ইহাতে আছে। যাঁহারা অরবিন্দকে বুঝিতে চান এই পুস্তিকাখানি তাঁহাদিগকে সহায়তা করিবে।

চিতোর-গৌরব নাটক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত। যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস্, ১২৮ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, শালিখা, হাওড়া। আট আনা।

একখানি দুই অঙ্কের নাটক। কৃতিত্ব কিছুই নাই। তবে ভাষা সরল ও স্ত্রীলোকের ভূমিকা নাই বলিয়া স্কুলের ছাত্রদের অভিনয়ের পক্ষে বইটি মন্দ নয়।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী ও স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১১২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম চারি আনা।

পুস্তিকা। ইহাতে অন্যান্য দেশের রাজনীতির তুলনায় আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি ও শাসনপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। অল্পশিক্ষিত লোকদের দেশের অবস্থা বুঝিবার পক্ষে বইটি সম্পূর্ণ উপযোগী। তবে লেখক মধ্যপন্থী; তাঁহার সমস্ত কথা দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ খাপ খায় বলিয়া মনে হয় না।

কলেরা চিকিৎসা—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেনগুপ্ত, জামালপুর, মুঙ্গের। দাম একটাকা।

বইটিতে কলেরা রোগের লক্ষণ, পূর্ব্বসূচনা ও পরিণতি এবং প্রত্যেক অবস্থার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা সরল। বইখানি প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহে রাখিবার উপযোগী। সকলেরই পঠনীয়।

বৈষ্ণব-কবিতা—খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবিদের পদ-সংগ্রহ। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

বইটিতে নানা বৈষ্ণব কবির পঞ্চাশটি বাছাই পদ সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রহকারের উদ্দেশ্য সাধু ও প্রশংসনীয়। অল্পের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সহিত পরিচিত হইতে ইহা সহায়তা করিবে। তবে আরো কতকগুলি শব্দের টীকা দেওয়া থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইত। দুঃখের বিষয়—বইটিতে ছাপার ভুল অনেক আছে।

গুপ্ত।

চরিত্র—শ্রীশরৎকুমার রায়। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। দশ আনা।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। এই বইখানির মধ্যে কয়েকটি চরিত্র বেশ সহজ ভাবে এবং ভাষায় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। দেশী এবং বিদেশী কতকগুলি মহৎ চরিত্রের সমাবেশে বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বালক-বালিকাদের এই পুস্তক পাঠে উপকার হইবার আশা করা যায়। পুস্তকে কয়েকখানি ছবি আছে। ছবিগুলি সব জায়গায় ঠিক বসান হয় নাই। ছবি আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। ছবির সংখ্যা কিছু বেশী হইলে ছেলে-মেয়েদের কাছে বইখানি অধিকতর প্রিয় হইত। মোটের উপর বইখানি আমাদের কাছে বেশ লাগিয়াছে এবং আমরা ইহার প্রচার কামনা করি।

উচ্ছ্বাস—শ্রীশচীভূষণ মিত্র। দাম এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৪নং তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া।

কবিতার বই—লেখক অন্তত তাই বলেন। চেষ্টা বৃথা হইয়াছে।

চন্দ্রহাস—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। দাম বারো আনা। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছোট ছেলের লেখা; প্রথম চেষ্টা হিসাবে বইখানি মন্দ হয় নাই। তবে বইএর ভাষা চলিত সহজ ভাষায় লিখিলেই ভাল হইত। ছাপা, মলাট, বইএর ভিতরকার ছবি, বেশ ভালই হইয়াছে। লেখকের সমবয়স্ক বালকদের ইহা পড়িতে ভাল লাগিতে পারে।

তমাল-বিতান, অমিয়া—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কর। দাম ছয় আনা। সাং বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।

দুখানি কবিতার বই। প্রথম পুস্তকখানি মলাট বাদে সবই লাল কাগজের উপরে সবুজ কালিতে ছাপা।

গান্ধি ও চিত্তরঞ্জন—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সরস্বতী লাইব্রেরী; ৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের দুইটি উজ্জ্বল চরিত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। বইখানি পড়িতে অনেকের ভাল লাগিবে। ভাষা জোরালো, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাষা বড় বেশী ফেনাইয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

মোহাম্মদ আলী—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান জিয়াউর রহমান খাঁ, ২৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মৌলানা সাহেবের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা এই দেশ-সেবকের জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই বই পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। বইখানির ছাপা ও কাগজ আর-একটু ভাল করা উচিত ছিল।

ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা—শ্রীকালীপদ রায়। দাম দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান লেখকের নিকটে সিরাজগঞ্জে এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শুষ্ক-উপদেশ-পূর্ণ পুস্তক। যাহাদের জন্য লেখা হইয়াছে, তাহাদের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রনাথ বসুর সংযম-শিক্ষার অনেক কিছু এই পুস্তকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে দেখা যায়। এই ধরণের উপদেশ-পুস্তকে লেখকের গুরুগিরি হয় মন্দ নয়, তবে যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহা সফল হয় না। ছাপা ও কাগজ একরকম হইয়াছে।

গ্রন্থকীট।

ফাগুন পূর্ণিমা

গান

(১)

ফাগুনের সুরু হতেই
শুক্‌নো পাতা ঝর্‌ল যত –
তা'রা আজ কেঁদে শুধায়
"সেই ডালে ফুল ফুট্‌ল কি, হায়,
সেই ডালে ফুল ফুট্‌ল কত ?"
তা'রা কয় "হঠাৎ হাওয়ায়
এল ভাসি'
মধুরের সুদূর হাসি,
উতল হাওয়ায় আকুল হয়ে
ঝরে' গেলেম শত শত।"

তা'রা কয়, "আজ কি তবে
এসেছে সে
নবীন বেশে ?
আজ কি তবে এতক্ষণে
জাগ্‌ল বনে
যে গান ছিল মনে মনে ?
সেই বার্ত্তা কানে নিয়ে
যাই চলে' এইবারের মত।"

(২)

এনেছে ঐ শিরীষ বকুল
আমের মুকুল,
সাজিখানি হাতে করে'।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে
চলে' যাবে দিগন্তরে।

পথিক তোমায় আছে জানা,
কর্‌ব না গো তোমায় মানা,
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো
বিজয়মালা মাথায় পরে'।

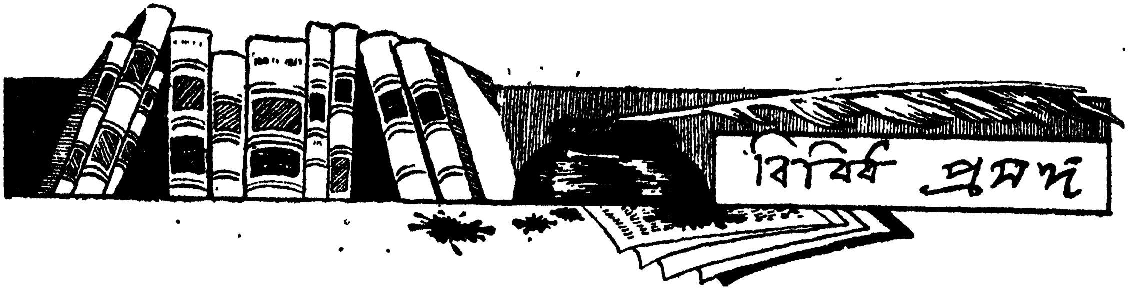
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে উঠ্‌বে হিয়ায়
তোমারি মিলন।
যাবে যখন তখন প্রাণে
বিরহ মোর ভর্‌বে গানে,
বাজ্‌বে সুরে দূরের কথা
সকল বেলা ব্যথায় ভরে'।

(৩)

রাতে রাতে আলোর শিখা
রাখি জ্বেলে'
ঘরের কোণে আসন মেলে'।
বুঝি সময় হ'ল এবার
আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার,
পূর্ণিমা চাঁদ তুমি এলে।

এতদিন সে ছিল তোমার
পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে,
যাক্ সে নিবে যাক্ সে নিবে,
যা আছে সব দিক্ সে ঢেলে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার

গত ২৬শে ফাল্গুন মহাত্মা গান্ধী রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার দলের হাজার হাজার লোক তাঁহা অপেক্ষা কম শক্ত কথা বলার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার গ্রেপ্তারে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু, ইংরেজের আইন অনুসারে যাহা রাজদ্রোহ, সেরূপ কথা তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে গ্রেপ্তার না করিয়া এখন গ্রেপ্তার করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না; বিশেষতঃ তিনি যখন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আইন অমান্য করিবার ও করাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে-কারণ সকলেই জানে ও বুঝে, তাহা ন্যায়- বা যুক্তি-মূলক নহে, তাহা কেবল কূট রাজনীতি মাত্র।

গ্রেপ্তারে বা কারাদণ্ডে মহাত্মা গান্ধী বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবেন না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার জন্য ভাবিবার বা দুঃখ করিবার কিছু নাই। তাঁহার গ্রেপ্তারের বা কারাদণ্ডের ফল কি হইবে, বলা যায় না; কিন্তু কি হওয়া উচিত তাহা মোটামুটী বলা যাইতে পারে।

তিনি সাধু ব্যক্তি; দেশের কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব পণ ও প্রাণপণ করিয়া তিনি কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে তিনি স্বার্থের লেশও রাখেন নাই। সম্যক্ জ্ঞানের অভাব, বিবেচনার ত্রুটি, প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানার জন্য ভ্রান্ত ধারণা পোষণ, প্রভৃতি দোষ তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইয়াছে। মানুষ মাত্রেরই, অসম্পূর্ণতা বশতঃ, এইরূপ দোষ হইতে পারে। কিন্তু এইসকল দোষ-ত্রুটি তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা এবং জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও চেষ্টাকে আচ্ছন্ন বা ম্লান করিতে পারে নাই। তিনি দেশের লোককে কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চান নাই। তিনি তাহাদিগকে নির্ম্মল, শুদ্ধান্তঃকরণ, সংযত, হিংসারহিত, স্বাবলম্বী, ও পরিশ্রমী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা তাঁহার দলের লোক নহেন, তাঁহারাও তাঁহার এইসকল উপদেশ মনে রাখিয়া চলিলে উপকৃত হইবেন। "সহযোগী" বা "অসহযোগী" কাহারও নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্বন্ধে আপত্তি থাকিতে পারে না।

(১) হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন সাধন।

(২) "অস্পৃশ্যতা" দূর করিয়া সকল হিন্দুর আন্তরিক মিলন সাধন।

(৩) স্বদেশজাত কার্পাস ও সূত্র হইতে নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার, এবং তাহা উৎপাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাহায্য করা।

(৪) মদ্য ও অন্য সকল প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে স্বয়ং বিরত থাকা এবং অন্যকেও, যুক্তি ও পরামর্শ দ্বারা, বিরত রাখা।

(৫) পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হইতে বিরত থাকা, এবং যথাসাধ্য নির্ব্বিবাদ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন বিবাদ ঘটিলে, আদালতের আশ্রয় না লইয়া, সালিসীর দ্বারা তাহার নিষ্পত্তির চেষ্টা করা।

মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ-আশ্রম ছাড়িয়া সবরমতি জেল অভিমুখে যাইবার পূর্ব্বে আশ্রমবাসীদিগকে শেষ যে-কয়টি কথা বলেন, তাহাতে এই অনুরোধ করেন, যে, যাঁহারা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে ভারতের সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব উৎপাদন ও বিস্তারের চেষ্টা করেন। জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের উদ্দেশে যাহা বলেন, এক কথায় "খদ্দর" তাহার চুম্বক। তাঁহার মতে খদ্দর অহিংসা, হিন্দুমুসলমানের ঐক্য, এবং অবনত শ্রেণীসমূহের বন্ধনমোচন সুনিশ্চিত করিবে। তিনি অসহযোগপন্থীদিগকে মডারেটদিগের সহিত বন্ধুভাব বর্দ্ধন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

মহাত্মা গান্ধী এ পর্য্যন্ত স্বদেশবাসীদিগকে যাহা করিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন তাহার কোন কোন কাজ বা প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ আছে ও হইতে পারে; কিন্তু মানবের কল্যাণ সাধনার্থে যে আমাদের সকলের হিংসা- ও স্বার্থশূন্য, নির্ভীক, অনলস ও একাগ্র হওয়া উচিত তাহাতে মতভেদ হওয়া উচিত নহে।

মহাত্মা গান্ধীর মহৎ জীবন হইতে আমরা যেন তাঁহারই মত মহান্ ব্রত গ্রহণ ও তাহার উদ্‌যাপন করিতে উদ্বুদ্ধ হই, এই প্রার্থনা করিতেছি।

আগামী বৎসরের প্রবাসী

বর্ত্তমান বৎসরের প্রবাসীর কোন কোন সংখ্যা ফুরাইয়া যাওয়ায় কয়েকমাস হইতে নূতন গ্রাহকদিগকে সমুদয় সংখ্যা দিতে পারিতেছি না। প্রতি বৎসরই বৎসরের আরম্ভে কতকগুলি গ্রাহক কাগজ লওয়া বন্ধ করেন, এবং অনেকে নূতন করিয়া গ্রাহক হন। সম্বৎসর ধরিয়া গ্রাহকবৃদ্ধি চলিতে থাকে। সেইজন্য একটা অনুমান করিয়া নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কাগজ বৎসরের প্রথম মাস হইতে আমরা ছাপিয়া থাকি। কিন্তু এই অনুমান সকল বৎসর ঠিক্ হয় না। ১৩২০, ১৩২১, ১৩২২, ও ১৩২৭ সালে কিছু কাগজ উদ্বৃত্ত ছিল। ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩২৬, বর্ত্তমান ১৩২৮ সালে কাগজ কম পড়িয়াছে। কাগজ উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয়, কাগজ ফুরাইয়া গেলে গ্রাহকবৃদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে স্থগিত থাকে। এই উভয় অসুবিধার মধ্যে আমরা কাগজ উদ্বৃত্ত না থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করি। সেইজন্য আমরা আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা কেবলমাত্র ৫০০ কাগজ বেশী ছাপাইব। বর্ত্তমান বৎসরে মাসে মাসে সাত হাজার ছাপান হইয়া আসিয়াছে। আগামী বৎসরে ৭৫০০ ছাপা হইবে। সম্ভবতঃ বৈশাখের এবং শারদীয় দুইটি সংখ্যার কাগজ আরও দুই একশত অধিক ছাপা হইবে।

কয়েকমাস হইতে প্রবাসী যে কাগজে ছাপা হইতেছে, তাহা চিক্কণ ও পুরু; কিন্তু ছাপিবার পক্ষে উহা মন্দ না হইলেও, উহার রং কিছু লালচে ছিল। মডার্ণ রিভিউ এবং প্রবাসীর জন্য তেইশশত রীম কাগজ কেনা ছিল। উহা এখন প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। বৈশাখের প্রবাসী উৎকৃষ্টতর সাদা কাগজে ছাপা হইবে; উহাতে বিজ্ঞাপনও ঐরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা হইবে।

প্রবাসী বৃহৎ কাগজ এবং উহা অনেক হাজার ছাপা হয় বলিয়া বৎসরের গোড়ায় নূতন অক্ষরে ছাপিতে আরম্ভ করিলেও বৎসরের শেষ নাগাদ অক্ষরগুলি ভোঁতা হইয়া ও ভাঙ্গিয়া যায়। এই কারণে বৈশাখ হইতে প্রবাসী আবার নূতন অক্ষরে ছাপা হইবে। লিনোটাইপ ও মনোটাইপ নামক দুই রকম কল আছে। তাহাতে প্রতিবারই ছাপিবার জন্য নূতন অক্ষর ঢালাই হইয়া ছাপা হয়। এইজন্য ঐ দুটির মধ্যে কোন এক রকম কল যে-সব ছাপাখানায় আছে, তাহারা বরাবর বেশ পরিপাটি ছাপিতে পারে। কিন্তু ঐ দুই কলে বাংলা ছাপা হয় না।

আগামী বৎসরে প্রবন্ধ আদির উৎকর্ষ রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইবে।

পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ মনিঅর্ডার দ্বারা কিম্বা লোক মারফৎ আমাদের আফিসে বার্ষিক মূল্য সাড়ে ছয় টাকা ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। ভ্যালু-পেয়েবল্ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া টাকা আদায় করিতে হইলে অনেক সময় আমাদের টাকা পাইতে বহু বিলম্ব ঘটে, এবং কখন কখন টাকা পাওয়াই যায় না। ডাকঘর কখন কখন একজনের টাকা অন্যের প্রদত্ত বলিয়া আমাদিগকে দেওয়ায় তাহাতেও অনেক গোলযোগ ঘটে। মনি-অর্ডার দ্বারা বা লোকমারফৎ টাকা পাঠাইলে এরূপ কোন অসুবিধা হয় না।

পুরাতন গ্রাহকগণের টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যক।

পরলোকগত বিহারীলাল সরকার

বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাসীর সংস্রবে কাজ করিয়া সংবাদপত্র পরিচালন কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজের জয়, শকুন্তলারহস্য, বিদ্যাসাগর-চরিত, প্রভৃতি বহি তাঁহার লিখিত। শুনিয়াছি, অন্ধকূপহত্যার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তিনিই প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং

কালিদাসের শকুন্তলার মূল যে মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে, তাহাও তিনি প্রথম নির্দ্দেশ করেন। তিনি অনেক গানও রচনা করিয়াছিলেন।

বার্ষিক ক্ষতিলাভ গণনা

ব্যবসাদারেরা যেমন বার্ষিক ক্ষতিলাভ গণনা করেন, তেমনি রাজ্য সাম্রাজ্য সাধারণতন্ত্র, মিউনিসিপালিটী জেলা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতিও বাৎসরিক ক্ষতি-লাভের হিসাব করিয়া থাকেন। সাধারণ ধনী, মধ্যবিত্ত, ও গরীব গৃহস্থেরাও অনেকে এইরূপ আয়-ব্যয়ের হিসাব করেন।

আর্থিক ক্ষতিলাভ ছাড়া অন্যপ্রকার ক্ষতি-লাভও আছে। অনেক ধার্ম্মিক লোক প্রাতঃকালে ঈশ্বরের নিকট এই কৃপা ভিক্ষা করেন, যে, সমস্ত দিবসের কার্য্যে, কথায় ও চিন্তায় যেন এমন কিছু করিয়া না ফেলেন, যাহাতে অপরাধ এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়। দিবাশেষে তাঁহারা সমস্তদিনের আচরণ স্মরণ করিয়া স্থির করিতে চেষ্টা করেন, যে, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে। এইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের দৈনিক হিসাবের মত হিসাব জাতিসকলও বর্ষশেষে করিতে পারেন।

জাতীয় ক্ষতি লাভ গণনা দুরকমের হইতে পারে। সাংসারিক ও আর্থিক ক্ষতি লাভ, এবং মানসিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিলাভ।

যে-সব জাতি স্বাধীন, তাহাদের গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের হিসাবে যে ক্ষতি লাভ, তাহাকে অনেকটা সেই জাতিরও ক্ষতি লাভ মনে করা যাইতে পারে। তা ছাড়া, সেই জাতি বৎসরের মধ্যে কত ফল শস্য পশু পক্ষী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যবহার ও দেশবিদেশে বিক্রয় করিল, অন্য দেশ হইতে কত আমদানী ও ক্রয় করিল, তাহা দ্বারাও ক্ষতি লাভ গণিত হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের এই প্রকার হিসাবের তুলনা করিলে ক্ষতি লাভ আরও ভাল করিয়া বুঝা যায়।

জাতির মানুষ কমিল না বাড়িল, তাহার দ্বারা জাতীয় ক্ষতি লাভ আর-এক প্রকারে অনুমিত হইতে পারে। এই অনুমান করিতে হইলে বৎসরের মধ্যে কত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও কত মানুষ মরিয়াছে, তাহার হিসাব দেখা দরকার। মানুষ লইয়াই জাতি, মানুষই জাতির প্রধান সম্পদ্। একটা দেশে যদি লক্ষ লক্ষ মণ সোনা রূপা হীরা থাকে, কিন্তু যদি উহা জনশূন্য হয়, তাহা হইলে সে দেশটা অন্য দেশের অধিবাসী জাতিদের ধনসম্পদের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের কোন জাতি না থাকায় সেই দেশের জাতীয় ধন বলিয়া কিছু উল্লেখ করিবার সার্থকতা থাকে না। কোন দেশ জনশূন্য না হইলেও যদি ক্রমাগত তাহার লোকসংখ্যা কমিতে থাকে, তাহা হইলে তাহা যে দরিদ্রতর হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান ধন মানুষ যে কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কেবল আর্থিক হিসাবেও সে দেশ দরিদ্রতর হইতেছে বলা যায়। কারণ, দেশের মানুষ কমিয়া গেলে ধন উৎপাদন কে করিবে, সম্ভোগই বা কে করিবে?

প্রত্যেক জাতির প্রধান সম্পদ মানুষ বটে; কিন্তু যে-দেশের লোকসংখ্যা যত বেশী, তাহার প্রধান সম্পদ্ অর্থাৎ মনুষ্যরূপ সম্পদ্ তত বেশী নির্ব্বিচারে বলা যায় না। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী, কিন্তু ভারতবর্ষ মনুষ্যসম্পদে ইংলণ্ড অপেক্ষা ধনী নহে। কেবল মাথাগুন্তি দ্বারা মনুষ্যসম্পদের পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে না। দেখিতে হইবে, প্রথমতঃ মানুষগুলা সুস্থ সবল বটে কি না, অর্থাৎ দৈহিক হিসাবে মানুষ নামের যোগ্য কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, এই মানুষগুলির দেহ সুস্থ সবল হইলেও তাহাদের জ্ঞান আছে কি না, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও সবল কি না, হৃদয়মন মানবের উৎকৃষ্ট গুণসকলে অলঙ্কৃত কি না, এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে কি না। কোন জাতি যদি সংখ্যাবহুল হয়, অথচ উহার লোকেরা দেহ মন আত্মায় সুস্থ সবল না হয়, তাহা হইলে সে জাতিকে মনুষ্যসম্পদে ধনী বলা যায় না।

বার্ষিক ক্ষতি লাভ কি কি প্রকারে গণনা করিতে হইবে, তাহা মোটামুটি বুঝা গেল। আমাদের দেশের ক্ষতি লাভ গণনা কিরূপে হইতে পারে দেখা যাক্। আমরা পরাধীন জাতি; সুতরাং আমাদের গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরে কত টাকা আয় হইয়াছে ও কত ব্যয় হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদের জাতির ধনশালিতা বা দারিদ্র্য পরিমিত হইতে পারে না। কারণ, আমরা সমুদয় জাতি যে আগেকার চেয়ে ধনী হইতেছি তাহার কোন প্রমাণ নাই,

অথচ আমাদের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের আয় বাড়াইতেছেন। স্বাধীন দেশের মত এদেশে জাতির ও গবর্ণমেণ্টের আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্নত্ব নাই।

গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় ছাড়িয়া দিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যে, আমাদের জাতির ধন বাড়িতেছে কি না। তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, যে, আমরা সম্বৎসরে ফল শস্য পশু পক্ষী মৎস্য আদি কত উৎপাদন ব্যবহার ও বিক্রয় করিয়াছি, এবং তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক বা কম কি না। খনি হইতে, অরণ্য হইতে, নদী ও সমুদ্র হইতে আমরা কি কি দ্রব্য কি পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি ও তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক কি না, তাহা দেখিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে, আমরা বিদেশ হইতে যত টাকার জিনিষ আমদানী করিয়াছি, বিদেশে তাহার সমান, তাহা অপেক্ষা বেশী, বা তার চেয়ে কম টাকার জিনিষ রপ্তানী করিয়াছি। টাকা ও জিনিষ দুই জড়াইয়া যদি আমরা রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী করিতে পারি, তবে আমরা আর্থিক হিসাবে ধনী হইতেছি বুঝিতে হইবে। কিন্তু অন্য দেশকে দরিদ্র করিয়া নিজেরা ধনী হইবার ইচ্ছা কথাটা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। নিজেদের অভাব নিজেরা মোচন করিয়া, যে দেশে যে জিনিষ হয় না বা হইতে পারে না, সেদেশে তাহা বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা ধর্ম্মসঙ্গত। কাপাস আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, এবং আরও বেশী হইতে পারে। অনেক দেশে উহা হয় না। অতএব কাপাস ও তাহার সুতার কাপড় আমাদের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করিয়া ঐসব দেশে বাকী উৎপন্ন কাপাস সুতা ও কাপড় প্রেরণ করা অন্যায় ত নহেই, বরং প্রেরণ না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়।

খনি প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত দ্রব্যের হিসাবে দেখিতে হইবে, যে, ঐসব দ্রব্যের কত অংশ বিদেশীরা সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে বা আপনাদের দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে, কত অংশই বা ভারতীয়েরা সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিতেছে। আমরা যতদূর জানি, ভারতবর্ষের খনিজ অরণ্যজ ও জলজ ধনের অধিকাংশ বিদেশীর দ্বারা সংগৃহীত হইয়া ভারতবর্ষের বাহিরের বহু দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে। অরণ্যজ ও জলজ সম্পদ্ পুনঃ পুনঃ সঞ্জাত ও নবীভূত হইতে পারে, কিন্তু খনিজ দ্রব্যসকল একবার সংগৃহীত হইয়া গেলে দুএক বৎসরে বা হাজার বা দশ হাজার বৎসরে আবার উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তৎসমুদয় বিদেশীদের দ্বারা সংগৃহীত ও আত্মসাৎ হইতে থাকিলে কেবল ভারতবর্ষের দরিদ্রতাই বৃদ্ধি পায়। দেশী লোকের টাকায় ও পরিশ্রমে পরিচালিত সকল রকমের কারখানা ও কারবার বাড়িতেছে কি না, দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, ও খনিজ সম্পদের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণাদির হিসাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা অনেক বিলম্বে প্রকাশিত হয়। বিলম্ব হইলেও, আমাদের সংবাদপত্রসমূহে তাহার যেরূপ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়, দুঃখের বিষয় তাহা হয় না।

আমাদের মনুষ্যসম্পদ্ বাড়িতেছে কি না, তাহার গণনা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত মাসিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যাসমূহ হইতে স্থির করা যায়। সমুদয় ভারতবর্ষ ধরিলে ভারতবর্ষের মনুষ্যসংখ্যা সামান্য বাড়িতেছে বলিতে পারা যায়, যদিও এই বৃদ্ধি অন্য অনেক সভ্য দেশ অপেক্ষা কম। শুধু বাংলাদেশ ধরিলে বিস্তর জেলায় বৃদ্ধি অপেক্ষা হ্রাসই দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যে, বাংলাদেশের মনুষ্যসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতেছে না। শুধু মাথাগুন্তির দিক্ দিয়াই যে বঙ্গের মনুষ্যসম্পদ্ বাড়িতেছে না, তাহা নহে। বাংলা দেশে যে শিশু যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মানুষগুলি জীবনযাপন করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই দেহ সুস্থ ও সবল নহে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর ত ছিলই, তা ছাড়া বসন্ত, ওলাউঠা, রক্তামাশয়; ক্ষয়কাশ প্রভৃতিও ছিল; তাহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জা আসিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। নানা রোগে যাহাদের প্রাণ গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদের মৃত্যুতেই যে দেশ মনুষ্যসম্পদে দরিদ্রতর হইয়াছে তাহা নহে; যাহারা আক্রান্ত হইয়াছিল অথচ মরে নাই, তাহারা অসুস্থ ও ভগ্নদেহ হইয়া জীবন্মৃত হইয়া আছে। তাহাদের দ্বারা জাতীয় মনুষ্যসম্পদ্ সংরক্ষিত হইতেছে না।

হৃদয়-মনের ও আত্মার সম্পদ্ জাতীয় প্রধান সম্পদ্। এই সম্পদে আমরা অত্যন্ত হীন। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা এক নহে, তাহা আমরা বুঝি। জগতের এমন দু-চারজ

লোকের নাম করা যায়, যাঁরা নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, অথচ বুদ্ধিতে বা জ্ঞানে বা সাহসে বা হৃদয়ের নানাগুণে মানব-সমাজের অগ্রণীদের সমকক্ষ ছিলেন। ইহাও জানি, যে, আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের মধ্যে অনেকে সৎলোক এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞও নহে। তথাপি মোটের উপর ইহা বলা ভুল নহে, যে, যে-জাতির প্রায় সব লোক নিরক্ষর সে জাতি অজ্ঞ। আমরা সেইরূপ একটি নিরক্ষর অজ্ঞ জাতি। এই অজ্ঞজাতির পুরুষদের চেয়ে আবার নারীরা আরও বেশী অজ্ঞ। আমাদের দেশের মানসিক সম্পদ বাড়িতেছে কি না, স্থির করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, যে, দেশের নিরক্ষরতা দূর হইতেছে কি না। কয়েক বৎসরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনা করিলে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ সামান্য বাড়িতেছে বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যার বৃদ্ধিও হইতেছে। এইজন্য আগে শতকরা যত লোক নিরক্ষর ছিল, এখনও প্রায় তাহাই থাকিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে যে সেন্সস্ লওয়া হয়, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে বুঝা যাইবে, ১৯১১ সালের সেন্সসে নিরক্ষরের অনুপাত যাহা ছিল, তাহাই আছে, না বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে।

নিরক্ষরতা অল্পে অল্পে দূর হইলে চলিবে না। উহা খুব শীঘ্র দূর করা আবশ্যক।

কিন্তু অল্পে অল্পে বা দ্রুত নিরক্ষরতা দূর হইলেই আমরা মনে করিতে পারিব না, যে, আমরা মানসিক সম্পত্তিশালী একটি জাতি হইতে পারিয়াছি। মানসিক সম্পত্তিশালিতার অন্যান্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ চাই। দেখিতে হইবে, দেশের কত লোক উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে। কত লোক শিক্ষা পাইয়া লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখে, তাহা জানিতে পারিলে জাতির জ্ঞানপ্রিয়তার পরিমাণ স্থির করা যায়। ভাল পুরাতন বহির নূতন সংস্করণ কত হয়, প্রত্যেক সংস্করণে কত শত বা হাজার ছাপা হয়, নূতন বহি কি কি বিষয়ক ও কত বাহির হয়, এবং সে সব বহি কতগুলি করিয়া ছাপা হয়, ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজ কতখানি বাহির হয় ও সেগুলি মোট কত ছাপা হয়, জানিতে পারিলে জাতীয় জ্ঞানলিপ্সা ও কৌতূহলের মাপ ঠিক্ হইতে পারে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদের চেয়ে বহি ও কাগজ লিখি ছাপি কিনি ও পড়ি অনেক কম। তাহার একটা কারণ অবশ্য জাতীয় নিরক্ষরতা। দরিদ্রতাও আর-একটা কারণ বটে। কিন্তু জ্ঞানলিপ্সার ও কৌতূহলের অল্পতাও অন্যতম কারণ। ইহা মানসিক দরিদ্রতার পরিচায়ক।

অসহযোগ আন্দোলন সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে শিক্ষা-বিস্তার ও জ্ঞান-বিস্তারের পরিপন্থী হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

যে কোন রকমের কতকগুলা বহি ও কাগজ বাহির হইলেই তাহা জাতীয় মানসিক ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক হয় না। যদি কোন দেশে উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য কাব্য, নানাবিধ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ, জীবনচরিত, ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক গ্রন্থ, এবং নানাবিষয়িণী সন্দর্ভমালা রচিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের অধিবাসীদের মানসিক শক্তি সম্পদ্ জ্ঞানলিপ্সা ও কৌতূহলের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এইসকল গ্রন্থ প্রধানতঃ বা সমস্তই অন্য দেশের গ্রন্থ হইতে সংকলিত বা অনুবাদিত হইলে সংকলক ও অনুবাদক জাতির জ্ঞানলিপ্সা ও কৌতূহলের প্রমাণ যতটা পাওয়া যায়, তাহাদের মানসিক শক্তি ও সম্পদের প্রমাণ ততটা পাওয়া যায় না। যে জাতি জগতের চিন্তা ভাব ও জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রতিভা ও গবেষণা দ্বারা যে পরিমাণে পূর্ণ করিতে পারে, সে জাতির মানসিক শক্তি ও সম্পদ্ তত অধিক বিবেচিত হইবে। এদিকে আমরা এপর্য্যন্ত কিম্বা কেবল মাত্র গতবৎসরে কিছুই করি নাই, এমন নয়। কিন্তু আমাদের দেশ যেরূপ বড়, এবং আমাদের জাতির লোকসংখ্যা যেরূপ বেশী, তাহার তুলনায় আমরা আধুনিক কালে জগতের চিন্তা ভাব ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে অল্পই রত্ন সঞ্চয় করিয়া দিয়াছি।

আমাদের মানসিক যে দরিদ্রতাবশতঃ আমরা পরাধীন হইয়া আছি, সেই দরিদ্রতা কি পরিমাণে দূর হইয়াছে, তাহারও হিসাব নিকাশ আবশ্যক। এই দরিদ্রতা নানা গুণের অভাবের সমষ্টি। আমাদের মধ্যে যথেষ্ট একতার অভাব দৃষ্ট হয়। হিন্দু-মুসলমানে একতার অভাব তন্মধ্যে প্রধান, কারণ, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এই দুটি সম্প্রদায়ই সংখ্যায় প্রধান। কিন্তু খৃষ্টিয়ান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সি,

ইহুদী, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম, প্রভৃতিদের মধ্যেও যথেষ্ট একতা দৃষ্ট হয় না। এই একতার মানে এ নয়, যে, সকলে নিজের বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস, মত, অনুষ্ঠান আদি ত্যাগ করিয়া একাকার হইয়া যাইবে; ইহার মানে এই, যে, সকলে পরস্পরকে ভারতীয় বলিয়া ও প্রতিবেশী বলিয়া অন্তরে ও বাহিরে স্বীকার করিবে, পরস্পরের প্রতি প্রীতি- ও শ্রদ্ধান্বিত হইবে, এবং দেশের কল্যাণসাধনে একপ্রাণ হইবে।

হিন্দুসমাজ নানা জা'তে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট একতা নাই, হিংসা দ্বেষ ও অবজ্ঞা আছে। বিশেষ করিয়া অবজ্ঞা ও অন্যায় আচরণ আছে, "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদের প্রতি। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে—বিশেষতঃ "স্পৃশ্য" ও "অস্পৃশ্য"দের মধ্যে—মিলন ব্যতিরেকে ভারতীয় জাতি কখন আত্মকর্তৃত্ব পাইবে না। এই দ্বিবিধ মিলন অল্প কিছু অগ্রসর হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু যথেষ্ট হয় নাই।

সাহসের অভাব আমাদের আন্তরিক দরিদ্রতার আর-একটি রূপ। সাহস যে অনেকটা বাড়িয়াছে, ইহা আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু দেশের আরও বেশীসংখ্যক লোকের খুব সাহসী হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে বা রাখিতে, সত্যের ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে,—সম্পত্তিনাশ, কারাদণ্ড, প্রহার, নিষ্ঠুর নির্য্যাতন, বা প্রাণনাশের—ভয় করেন না, তাঁহারা সম্মানার্হ। এইরূপ অনেক লোকের আবির্ভাবে প্রাণে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। এইরূপ লোক আরো শত সহস্রগুণ বেশী চাই।

একপ্রাণতার সহিত দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার শক্তি আমাদের অত্যন্ত কম ছিল। ইহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আরও বাড়া দরকার।

রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাঁহারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয়দের যুদ্ধ দ্বারা সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই; সেইজন্য তাঁহারা অহিংসাপন্থী। অন্য এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, যে, ক্ষমতা থাকিলেও এবং সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিলেও, হিংসা অধর্ম্মমূলক বলিয়া, হিংসার পথ অবলম্বন করা উচিত নহে; এইজন্য তাঁহারা অহিংসাপন্থী। যিনি যে-কারণেই অহিংসাবাদী হউন, দুই দলের লোকেরই অন্তরের সহিত অহিংসাতে বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য। দেশের লোক যে যথেষ্ট পরিমাণে অহিংসাপরায়ণ হয় নাই, পরন্তু কয়েক জায়গায় অনেকে পৈশাচিক হিংসার পরিচয় দিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের, এবং নিরুৎসাহ হইবার বিষয়। কিন্তু তথাপি নিরাশ না হইয়া আমাদিগকে অধিকতর অহিংসাপরায়ণ হইতে হইবে। আমাদের দেশ যেরূপ বড় এবং তাহাতে অশান্তি ও উত্তেজনার কারণ ও প্রকোপন যেরূপ বিদ্যমান আছে, তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। এইরূপ বিস্তৃত ও বহুজনাকীর্ণ পাশ্চাত্য কোন ভূখণ্ডে এইরূপ কারণ থাকিলে আমাদের দেশের চেয়ে কম হিংসা, ও রক্তপাত হইত না। আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য ইহা বলিতেছি না; অতিরিক্ত নৈরাশ্য ও অবসাদ নিবারণার্থ বলিতেছি। নতুবা, দোষ যাহা, তাহা পৃথিবীর অন্য সব দেশের লোকের থাকিলেও দোষ, না থাকিলেও দোষ।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে আর একটি গুণের অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাকেও আমরা আন্তরিক দারিদ্র্য মনে করি। আমরা অনেকে হুজুকে পড়িয়া খুব কষ্ট সহ্য করিতে পারি, এমন কি প্রাণটাও দিতে পারি। এই ক্ষমতার অগৌরব করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই; বরং দেশের কল্যাণার্থ এরূপ আচরণের ক্ষমতাকে প্রশংসার্হই মনে করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, উত্তেজনাবিহীন, বাহবাবিহীন পরিশ্রম দেশের কল্যাণার্থ করিবার ক্ষমতাও থাকা আরো অনেক বেশী দরকার। যে হাজার হাজার লোক সম্প্রতি জেলে গিয়াছেন, তাঁহারা প্রশংসার্হ। কিন্তু এই হাজার হাজার লোক কংগ্রেসের জাতিগঠনমূলক কাজগুলি, অর্থাৎ স্বদেশী সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, হিন্দুমুসলমানের মিলনসাধন, প্রভৃতি উত্তেজনাবিহীন কাজ যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে করিতে পারেন, এবং অধিকন্তু যদি তাঁহারা গ্রামসকলের অজ্ঞতাদূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্পাদন, কৃষিশিল্পাদির উন্নতিসাধন, বিবাদভঞ্জন, প্রভৃতি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আরও প্রশংসার্হ হইবেন।

জাতীয় ক্ষতিলাভ-গণনায় চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক

উন্নতি ও অবনতিকে গণনার মধ্যে আনিতে হইবে। যাঁহারা এরূপ গুরু বিষয়ে মন দিতে সমর্থ, তাঁহারা অবশ্য সর্ব্বপ্রথমে নিজের চরিত্রই পরীক্ষা করিবেন। তাহার পর আদালতে যে-সব অপরাধের বিচার হয়, এবং যে-সব ঘটনা আদালতের গোচর হয় না কিন্তু সমাজের লোকের গোচর হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি অবনতি কতদূর হইতেছে তাহা স্থির করিয়া বিহিত কার্য্য করিবেন।

জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের দুই পথ

অসহযোগ-পন্থার অন্তর্গত অন্যতম অনুষ্ঠান সমষ্টিগতভাবে নিরস্ত্র অবাধ্যতা আপাততঃ বন্ধ আছে, মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বিচার করা হইতেছে, ভারত শাসন আইন সংস্কারের প্রধান কর্ম্মী এবং পুনর্গঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মণ্টেগু সাহেব পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এইরূপ নানা কারণে লোকের মনে স্বভাবতই স্বরাজ বা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের উপায় ও পথ সম্বন্ধে নানা চিন্তা উদিত হইতেছে। এইজন্য এবিষয়ে আমরা আগে আগে যে-সব কথা অনেকবার বলিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। ইহা মূল নীতির কথা; ভিন্ন ভিন্ন কি কি কাজের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক নহে।

যিনি নিজেই নিজের রাজা, স্বরাজ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। নিজেই নিজের রাজা হইতে হইলে নির্ভীক হইতে হইবে, ন্যায়বান্ হইতে হইবে, মানবপ্রেমিক হইতে হইবে। নির্ভীক হইতে হইবে এইজন্য, যে, যদি কেহ তাঁহাকে বলে, "আমার হুকুম শোন, আমার আইন মান;" তিনি বলিবেন, যে-আদেশ আমার বিবেকবিরুদ্ধ তাহা শুনিব না, যে-আইন আমার কিম্বা আমার প্রতিনিধির প্রণীত নহে, তাহা আমি মানিতে বাধ্য নই,—তাহা আমি মানিতে পারি, না-মানিতেও পারি। তাহাতে যদি কেহ বলে, "তোমার জরিমানা করিব, তোমাকে বেত মারিব, জেলে বন্ধ করিব;" তিনি বলিবেন, জরিমানা দিব না, বেত খাইব ও জেলে যাইব, কিন্তু তোমার কথা শুনিব না। যদি কেহ ট্যাক্স্ চায়, তিনি বলিবেন, যে-ট্যাক্স্ স্থাপনে আমার বা আমার প্রতিনিধির সম্মতি ছিল না, তাহা দেওয়া বা না-দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন। তাহার পর জরিমানা, বেত্রাঘাত ও জেলের ভয়ের পূর্ব্ববৎ উত্তর। অবশ্য ইহার পর যাবজ্জীবন কারাবাস বা নির্ব্বাসন এবং আইনসঙ্গত বা বেআইনী প্রাণদণ্ডও আছে। তাহাতে যাঁহার ভয় হইবে না, তাঁহার স্বরাজ্যসিদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু এই নির্ভীকতা আসিবে কোথা হইতে? দৈহিক সুখ-দুঃখের বশ হইলে, প্রবৃত্তির দাস হইলে, প্রলোভনের বশ হইলে, স্বার্থের অধীন হইলে, সাংসারিক ও পারিবারিক মায়ামোহের বন্ধনে জড়িত থাকিলে, মৃত্যুর বিভীষিকা প্রাণকে অভিভূত করিলে, এই নির্ভীকতা আসিতে পারে না। সত্য ও ন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী জয়ে বিশ্বাসী, অমরত্বে বিশ্বাসী ও পরব্রহ্মে বিশ্বাসী হইলে অভয়পদপ্রাপ্তি ঘটে।

ন্যায়বান্ কেন হইতে হইবে? আপনি অপরের ন্যায্য পাওনা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে তাহারাও আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে; এবং তখন আপনি ন্যায়বান্ নহেন বলিয়া অন্তরে সেই সাত্ত্বিক বল ও সাহস পাইবেন না, যাহা কেবল ন্যায়বান্দেরই আছে।

মানবপ্রেমিক না হইলে আপনি অপরের প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করিবেন, তাহাতে আপনার চিত্তের ধৈর্য্য, শান্ত বিচার ক্ষমতা, এবং সাত্ত্বিক শক্তি নষ্ট হইবে, এবং অপরে আপনার অনিষ্ট করিবার বৈধ কারণ পাইবে।

ব্যক্তিগত স্বরাজ্যসিদ্ধি যাঁহার হইয়াছে, এরূপ একজন মানুষও জাতীয় স্বরাজ্যসিদ্ধির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ। যদি কোন জাতির মধ্যে এরূপ মানুষ অনেকগুলি থাকেন, তাহা হইলে ত সেই জাতিটি স্বরাজ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিকমতিবিশিষ্ট (politically minded) লোকেরা এখন কয়েকটি দলে বিভক্ত। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক দলেই অকপট স্বদেশপ্রেমিক লোক আছেন, স্বার্থসিদ্ধিপ্রয়াসী লোকও আছে। এইজন্য কে কোন্ দলের লোক তাহা ভাবিয়া কাহারও মত বা কার্য্যের আলোচনা করিতে আমরা অনিচ্ছুক। ব্যক্তিগত সমালোচনা না করিয়া সব দলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দুটি দলের রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারার আলোচনা করা যাইতে পারে।

একদল মনে করেন, আমরা যদি দেশের কোন কোন কাজ করিবার ভার পাইয়া ও লইয়া তাহাতে যোগ্যতা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে ক্রমশঃ অন্যান্য কাজের ভারও আমরা পাইব, এবং শেষে সব কাজই আমাদের হাতে আসিবে। এ সম্বন্ধে নানা বক্তব্য আছে। কিছু বলিতেছি।

যে-সব বিষয়ে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, তাহারও পুরা ভার আমরা পূর্ব্বে কখন পাই নাই, এখনও পাইতেছি না। সুতরাং দাতাদের ন্যায়বুদ্ধি ও সদাশয়তায় আমাদের পূর্ণ আস্থা নাই। সকলের চেয়ে দরকারী যেসব বিভাগ এবং জাতীয় স্বাধীন জীবনযাপন ও আত্মকর্তৃত্বের জন্য যে-সব কাজ ও বিভাগ একান্ত আবশ্যক, সেগুলি সব ভারতগবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। তাহার কোনটির দায়িত্ব আমরা এখনও পাই নাই, তাহা দিবার কোন অঙ্গীকারও গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। সকলের চেয়ে আবশ্যক শক্তি দুটি,—(১) সামরিক শক্তি এবং (২) আর্থিক শক্তি। সামরিক শক্তি ইংরেজের হাতে চিরকাল থাকিবে, প্রকৃত ব্যবস্থা ত এইরূপ—মুখের স্তোক বাক্য যাহাই হউক; এশার্ কমিটীর রিপোর্ট অনুসারে কাজ হইলে ভারতগবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ভারতের অর্থে পোষিত সৈন্যদলের কর্ত্তা থাকিবে না। কারণ, কি-জানি যদি কখন ভারতগবর্ণমেণ্টে ভারতীয়দের সংখ্যা প্রভাব ও ক্ষমতা বেশী হয়, তাহা হইলে ত সামরিক শক্তি ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা ব্রিটিশ জাতির প্রভুত্বের পক্ষে নিরাপদ না হইতে পারে। আমরা যেরূপ ক্ষমতাই পাই, আমরা বেয়াদব হইলে ও অবাধ্য হইলে আমাদের উপর গুলি চালাইয়া আমাদিগকে সায়েস্তা করিবার ক্ষমতা ইংরেজের হাতে থাকা চাই। সামরিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে রাখিবার দুটা ওজুহাত দেখান হয়। প্রথম, উহাদের হাতে তাহা না থাকিলে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিব; দ্বিতীয়, বাহিরের শত্রু আসিয়া আমাদিগকে পদানত করিবে। এমন কোন দেশ নাই, যেখানকার লোকেরা এখনও কিম্বা অদূর অতীত কালে পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিত না। তাহারা পরাধীন না হইয়াও নিজেদের মধ্যেই আপোসে মিটমাট করিয়া সদ্ভাবে বাস করিতে শিখিয়াছে। আমরা এখনও শিখি নাই, বা কোন কালেই শিখিব না, তাহার প্রমাণ কি? ইংরেজরা আসিবার আগে আমরা ইউরোপের দেশ-সকলের লোকদের চেয়ে বেশী অন্তর্যুদ্ধ- ও অন্তর্বিবাদ-পরায়ণ ছিলাম না; এবং যেরূপই ছিলাম, তাহাতে আমরা এত সমৃদ্ধ হইয়াছিলাম, যে, ইউরোপের নানা জাতি অর্থলোভে আমাদের দেশে বাণিজ্য ও প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছিল। অনেক দেশে এখনও অন্তর্যুদ্ধ চলিতেছে। ইংরেজ বা অন্য কোন জাতি ত তাহাদের পরিত্রাতা রক্ষাকর্ত্তা হন নাই? আর যদি ইংরেজের পক্ষপুটের আশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা আহাম্মকের মত নিজের মধ্যে মারামারি করিয়াই মরি, তাহা হইলে পশুর মত পরাধীন থাকা অপেক্ষা ধরাপৃষ্ঠ হইতে আমাদের লুপ্ত হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নহে? বাহিরের শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা সব দেশকেই এখনও করিতে হয়। অতীতে ত সকলকেই ওরূপ আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। অতীত কালে যেমন ইংলণ্ড বার বার রোমান, এঙ্গল্, স্যাক্সন্, জুট্, ডেন্, নর্ম্যান্ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিজিত হইয়াছিল, আমাদের দেশও তেমনি আক্রান্ত ও বিজিত হইয়াছিল। মুসলমান জেতারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাইবার পর এবং ইংরেজরা ভারতের প্রভু হইবার পূর্ব্বে কোন বহিঃশত্রু স্থায়ী ভাবে ভারত জয় করে নাই। ইংরেজ ও অন্যান্য বহিঃশত্রু যখন ভারতে আসিয়াছিল, তখনও আমরা তাহাদের সঙ্গে অনেকদিন পর্য্যন্ত সমানে সমানে লড়িয়াছিলাম; তখনও ভারতীয় বড় বড় দক্ষ সেনাপতি ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে পর্য্যন্ত ভারতীয় 'কালা' সেনাপতির অধীনে ইংলণ্ডীয় 'গোরা' সৈনিক যুদ্ধ করিয়াছে। ইংরেজ আমাদিগকে পদানত করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সৈন্যদ্বারা আফ্গানিস্থান বিজিত হইয়াছিল, মানসিংহ তাহার সুবেদার ছিলেন। তাহার পর শিখ্ আমলে হরিসিং নালুয়া আফ্গানিস্থান জয় করিয়া আফ্গানদিগকে এমন ভয়বিহ্বল করিয়াছিলেন, যে, এখনও পাঠান মায়েরা হরিসিংএর নাম করিয়া ছেলেকে জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকে। আর এখন এই সভ্যতার যুগে সভ্য ইংরেজের অধীনে দেড়শত বৎসরেরও উপর

থাকিয়া আমাদিগকে আফগান আক্রমণের ভয় করিতে হইতেছে। খুব উন্নতি হইয়াছে বটে! ইহা সত্য, যে, আমরা নব্য বিজ্ঞান শিখিতেছি, নূতন কলকারখানা ব্যবহার করিতে শিখিতেছি, পৃথিবীর খবর রাখিতেছি, এবং অন্য কোন কোন দিকে কিছু উন্নতি আমাদের হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান বিষয় যে দুটি, তাহাতে আমাদের অধোগতি হইয়াছে। সে দুটির কথা লিখিতেছি।

(১) আমরা অতীত কালে অনেকবার বহিঃশত্রুর পদানত হইয়াছি, শত্রু কখন কখন আমাদের দেশে বসবাস করিয়া আমাদের ভাই প্রতিবেশী হইয়া গিয়াছে ও ভ্রাতৃত্ব বা প্রভুত্ব করিয়াছে। কিন্তু আমরা অতীত কালে বহিঃশত্রুকে যতবার তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছি, কিম্বা দেশেরই স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত প্রভুর অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছি, তখনই তাহা আমাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা করিয়াছি; মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, পরের, বিদেশীর, মুখাপেক্ষা করি নাই, পরের, বিদেশীর, সাহায্য চাই নাই, পাই নাই, লই নাই। এই যে স্বাবলম্বনের ভাব ও স্বাবলম্বনের কাজ, এই যে বারবার ভূলুণ্ঠিত হওয়া ও নিজের জোরে খাড়া হইয়া দাঁড়ান ও দাঁড়াইবার শক্তিতে আত্মবিশ্বাস, এই অমূল্য জিনিষটি আমরা ইংরেজ রাজত্বে হারাইয়াছি। এখন আমরা পরের হাত হইতে অনুগ্রহের দান স্বরূপ "স্ব-অধীনতা" পাইব বলিয়া আশা করিতেছি! এইরূপ আশাটাই একটা স্ববিরোধী জিনিষ। কেন না, চাহিতেছি স্বাধীনতা, অথচ স্ব-অধীনতার আশাটা স্বাধীনতার কল্পনাটা পর্য্যন্ত পরাশ্রয়ী, পরানুগ্রহাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। আশা ও কল্পনা পর্য্যন্ত পরাধীন হইয়া যাওয়ার মত অধঃপাত ও গোলামী অতীত কোন যুগে আমাদের হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিকেরা বলুন। ইহাই প্রকৃত এবং সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাকর ও ক্ষোভজনক slave mentality, গোলামী ভাব, বা দাসসুলভ মতিগতি; দুই চারিটা চাকরীর প্রার্থী হওয়া ইহার মত গোলামী ভাব নহে।

(২) দ্বিতীয় যে অমূল্য জিনিষটি হারাইয়াছি, তাহা আত্মরক্ষার ক্ষমতা। ইংরেজ যখন প্রথম ভারতে আসে, তখন সব প্রদেশের লোকেরাই সৈনিক হইত ও হইতে পারিত, যুদ্ধ করিতে পারিত। ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও সব প্রদেশ হইতে দরকার-মত কোম্পানী সৈন্য লইয়াছে। তাহার পর ইংরেজশাসনভুক্ত প্রদেশগুলি ক্রমশঃ পৌরুষহীন ও নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে; এবং দেশী রাজ্যগুলি, নেপাল, আফগান সীমান্তের পাঠানের বাসভূমি, প্রভৃতি স্থান হইতেই প্রধানতঃ সিপাহী সংগৃহীত হইতেছে। এইরূপে ভারতবর্ষের লোকেরা আত্মরক্ষায় অনভ্যস্ত ও অসমর্থ হইয়াছে ও হইতেছে।

বিদেশী পর যতদিন আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে, ততদিন ত উহা "আত্ম-রক্ষা নয়; উহারা ত আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিতেছে, যেমন ভেড়ার মালিক নেকড়ে বাঘ হইতে মেষ রক্ষা করে। আত্মরক্ষার মানে নিজের জোরে নিজেকে রক্ষা করা। তাহা যদি আমরা না পারি, তাহা হইলে "মেষ আমরা, নহি ত মানুষ"; তাহা হইলে নরদেহধারী মেষদিগের ভূভার বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি?

অতএব ইংরেজ লেখক অধ্যাপক স্যার জন সীলি তাঁহার এক্স্প্যান্শ্যন অব্ ইংল্যাণ্ড্ (Expansion of England) নামক বহিতে যে লিখিয়াছেন, "Subjection for a long time to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration", "দীর্ঘকালের জন্য বিদেশীর অধীনতা জাতীয় অধোগতির বা অপকর্ষের অন্যতম বলবত্তম কারণ," তাহা ভারতবর্ষের সম্পর্কে অতি সত্য।

মনে করুন, একটা ঘরবাড়ী আছে ও তাহার সংলগ্ন কিছু জমী আছে। ছলে বলে কৌশলে যাহারা উহার মালিক হইয়াছে, তাহারা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে-অধিকারীদিগকে বলে, "তোমরা নর্দ্দমা সাফ্ কর, পাঠশালে গুরুমশায় নিযুক্ত কর, খুব ভাল করিয়া চাষ বাস কর, পরে ক্রমে তোমরাই মালিক হইবে; কিন্তু আপাততঃ প্রধান প্রধান পথঘাট, টাকাকড়ির আমদানীর প্রধান প্রধান উপায়, এবং, সর্ব্বোপরি, দারোয়ান চৌকিদার লাঠিয়াল বরকন্দাজগুলা আমাদের তাঁবে থাকুক," তাহা হইলে উত্তরাধিকারীদের পৈত্রিক ঘরবাড়ী ও জমীজমার মালিক হইবার সম্ভাবনা ও আশা যতটা হয়, ইংরেজদের নিকট হইতে ভারতশাসন-আইনের বলে আমাদের দেশের

মালিক হইবার সম্ভাবনা ও আশা তদপেক্ষা বেশী, বা তাহার সমান, পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।

রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারা আর-এক প্রকারের আছে। তাহা এই, যে, আমরা নিজেরই পৌরুষের দ্বারা নিজেদের দেশের মালিক হইব; মালিক হইবার পর নর্দ্দমা সাফ, গুরুমহাশয় নিয়োগ প্রভৃতি সহজই হইতে পারিবে; পরানুগ্রহে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পাইবার গোলামী আশা ও কল্পনাকেও মনে স্থান দিব না। কিন্তু এই পৌরুষ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে-প্রকারে দেখাইয়াছিলেন, সে পথ আমাদের নয়ন কেন নয়, তাহার উত্তর নানা জনে নানা রূপ দিবেন। কেহ বলিবেন, যুদ্ধ অপেক্ষা সত্যাগ্রহ ও সাত্ত্বিক প্রতিরোধ শ্রেষ্ঠ উপায়, অধিকতর ধর্ম্মসঙ্গত উপায়; কেহ বলিবেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব সত্যাগ্রহ ও সাত্ত্বিক প্রতিরোধ অবলম্বনীয়; কেহ বা সম্মিলিত এই উভয় কারণে এই নিরস্ত্র পন্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে। কারণ যাহাই হউক, ইহাই পন্থা। কিন্তু ইহাও যে যুদ্ধের মত একান্ত ত্যাগ, একান্ত কষ্টসহিষ্ণুতা, চূড়ান্ত সাহসের পন্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেহ এই পথের পথিক হইতে চাহিলে ইহা জানিয়া হইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, যুদ্ধে ও এই পথে প্রভেদ এই, যে, যুদ্ধে অপরকে দুঃখ দিতে হয়, নিজেও দুঃখ পাইতে হয়, এই পথে কেবল নিজেই দুঃখ সহিতে হয়, অপরকে বধ করা, অপরকে আঘাত করা, অপরের দ্বেষ করা এই পথে নিষিদ্ধ।

ভারতের বার্ষিক আয় ব্যয়

এখন সমগ্র ভারতের এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের আলোচনা চলিতেছে। পাঠকেরা মোট কথাটা বুঝিয়া রাখুন, যে, ইংরেজের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট অকাতরে অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য সৈন্যের জন্য ব্যয় খুব বেশী ধরা হইয়াছে, সব প্রদেশেই পুলিসের খরচের বরাদ্দ পূর্ণমাত্রায় করা হইয়াছে। আর একটা কথা বুঝিয়া রাখুন, যে, ইংরেজের ও ফিরিঙ্গীর সুখসমৃদ্ধি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য যাহা দরকার, তাহার জন্যও খুব অর্থব্যয় করা হইবে। এইজন্য মোট মাহিনা আরও মোটা হইয়াছে। বুদ্ধিজীবী চাকরদিগকে সন্তুষ্ট করা দরকার বলিয়া দেশী হাকিম অধ্যাপক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক প্রভৃতির বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরেজ ও দেশী যে-সব সরকারী চাকরের অন্নকষ্ট হয় নাই, তাহাদের বেতন আগে বাড়িয়াছে; কিন্তু সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর চাকরদের বেতন সর্ব্বশেষে সামান্য বাড়াইবার কথা উঠিয়াছে, কাহারও বাড়িয়াছে, কাহারও এখনও বাড়ে নাই; কারণ, ইহাদের যে অন্নকষ্ট হইয়াছিল! গীতাতে আছে, "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্;" অভিনব গীতার মন্ত্র "ঈশ্বরান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছ দীনে ধনম্"! তদনুসারে দেশের লোকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি শিল্পাদির উন্নতি, প্রভৃতির জন্য অতি অল্প টাকার বরাদ্দ হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় বা কোনও একটি প্রাদেশিক বজেট্ এত বড় জিনিষ, যে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা, প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য বজেটের আয়-ব্যয়ের সঙ্গে গৃহস্থের আয়-ব্যয়ের তুলনা করিয়া আমাদের দেশের বজেটটি যে কিরূপ অস্বাভাবিক, আমরা প্রধানতঃ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। এরূপ চেষ্টা আমরা আরও কয়েকবার করিয়াছি, অথচ এখনও তাহার প্রয়োজন আছে; সেইজন্য পুনরুক্ত অপরিহার্য্য।

সব গৃহস্থ সমান বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান গোছাল, সমান বুদ্ধিমান্ নহেন। সব গৃহিণীও ঘরকন্নার কাজে সমান দক্ষ নহেন। কিন্তু সবাই নিজের গৃহস্থালি নিজে করেন। এক জন গৃহস্থ বেশী বুদ্ধিমান্ বা বেশী গোছাল বলিয়া আর-একজনের কর্তৃত্ব লুপ্ত করিয়া তাহার আয়ব্যয় কিরূপ হইবে, নিজের সুবিধার জন্য, তাহার ব্যবস্থা করিতে পান না। কিন্তু জাতির বেলায় পৃথিবীতে বহুকাল হইতে অন্যরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এক জাতি অন্য জাতিকে বলিতেছেন, "তোমরা নাবালকের মত, তোমরা কাজকর্ম্ম আয়ব্যয় বুঝ না। আমরা তোমাদের ব্যবস্থা করিব।" একজাতি অন্যের গৃহস্থালির ব্যবস্থা অবৈতনিক বা নিঃস্বার্থ ভাবে করেন না। তাহা হইতে "বিলক্ষণ দু-পয়সা" রোজগার করেন; অধিকন্তু "নাবালক" জাতির কৃতজ্ঞতাও দাবী করেন।

এক জাতি যখন অন্য জাতির আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন, তখন তাহাতে যে অনেক খুঁত থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমাদের যাহা দরকার, তাহা অন্যেরা কি ঠিক্ বুঝিতে পারে? যতটা বা বুঝিতে পারে, কাজের বেলায় তাহার উপরও সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে না। কারণ, দুজন মানুষের যখন স্বার্থের সংঘর্ষ হয়, তখন কখন কখন উন্নতমনা কেহ কেহ নিজের স্বার্থ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে; কিন্তু একটা জাতি নিজের সুবিধা লাভের পথ ছাড়িয়া দিয়া স্বেচ্ছাক্রমে আর-একটা দুর্ব্বল জাতির মঙ্গল করিয়াছে, এপর্য্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে প্রায় দেখা যায় নাই;—পরে বেশী দেখা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের সরকারী কাজ চালাইবার ভার ইংরেজের উপর। কি পরিমাণে কোন্ ট্যাক্স বসাইয়া কত টাকা রাজস্ব আদায় করিতে হইবে, এবং সেই রাজস্ব কি কি বাবতে খরচ করা হইবে, তাহা স্থির করা ইংরেজের কাজ। এ বিষয়ে দেশের ২।৫ জন লোকের ২।৪ কথা কেবল বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হয় না; মোটের উপর ইংরেজের ব্যবস্থাই ঠিক থাকে। তাহা হইলেও সামান্য সামান্য বিষয়েও যদি দেশের পক্ষে হিতকর কিছু পরিবর্ত্তন বক্তৃতা ও যুক্তি দ্বারা করান যায়, তা ভালই। কিন্তু আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত যে আমরা নিজেই কেমন করিয়া নিজেদের দেশের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারি। কাহারও যুক্তি অকাট্য হইতে পারে, কাহারও বাগ্মিতা আকাশভেদী ও পাষাণদ্রাবক হইতে পারে; কিন্তু ক্ষমতা ও স্বার্থ যদি অন্যপক্ষে সন্ধিবন্ধন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? তথাপি যদি আন্দোলন করিতে হয়, মূল কথাটা লইয়াই সম্বৎসর খুব বেশী পরিমাণে লেখাপড়া ও চীৎকার করা ভাল।

গৃহস্থের যদি কোন কারণে কোন বৎসর অবস্থা অসচ্ছল হয়, তাহা হইলেও, জীবনমরণের ব্যাপারে তাহাকে যেমন করিয়াই হউক যথেষ্ট ব্যয় করিতে হয়। ছেলেটির কলেরা হইয়াছে; তখন ত গৃহস্থ বলিতে পারেন না, "এটা বড় দুর্ব্বৎসর, আস্‌ছে বৎসর হাতে বেশী টাকা হ'লে ডাক্তার ডাক্‌ব"। কারণ, তৎপূর্ব্বেই ছেলেটির পরলোকে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। মেয়েটি ম্যালেরিয়ায় পুনঃ পুনঃ ভুগিতেছে। তাহারও চিকিৎসা ফেলিয়া রাখা চলে না। ফেলিয়া রাখিলে প্লীহা ও যকৃৎ এত বড় হইতে পারে যে তখন আর চিকিৎসা চলিবে না। পাঁচ বৎসর বা দশ বৎসর পরে আমার আয় বেশী হইবে, তখন আমি মেয়ে বা ছেলের হাতে খড়ি দিব, এরূপ চিন্তা কোন বুদ্ধিমান্ পিতা-মাতা করেন না; কারণ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না; এবং শিক্ষার সময়ে শিক্ষা না দিলে পরে শিক্ষালাভের যোগ্যতা কমিয়া যায়। মাটি যখন ভিজা ও নরম থাকে, কুমার তখনই তাহা হইতে নানা রকম পাত্র ও মূর্ত্তি গড়ে; ধাতু যখন দ্রব বা নরম থাকে, তখনই তাহাতে ঢালাই বা পেটাই হয়। কৃষিই যদি গৃহস্থের সম্বল হয়, তাহা হইলে তাহাকে যথাসময়ে বাঁধ বাঁধিতে হয়, লাঙ্গল দিতে হয়, বীজ বপন করিতে হয়, শস্যে পোকা লাগিলে তাহা মারিবার উপায় করিতে হয়। এসব কাজে দেরী সয় না; দেরী করিলে সে বৎসর আর আয় হয় না, কিম্বা কম আয় হয়।

এক একটা জাতির কাজ এক একটা গৃহস্থের কাজের মত। তফাৎ এই, যে, আমাদের দেশে এমন লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ আছে, যাহাদের গৃহ না থাকার মধ্যে, যাহাদের অবস্থা তাহাদের জীবিতকালে কখন ভাল ছিল না, হইবারও আশা কম; এবং তজ্জন্য তাহাদের বাড়ীতে কলেরা হইলেও তাহারা ডাক্তার ডাকিতে পারে না, ছেলেমেয়েরা চিরজীবন নিরক্ষর থাকিলেও পাঠশালায় পাঠাইতে পারে না, এবং লাঙ্গল দিবার কোন জমীও তাহাদের নাই। কিন্তু এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, নিঃসম্বল, ভূমিশূন্য জাতি পৃথিবীতে একটিও নাই। আমাদের জাতি ত স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই এরূপ দরিদ্র নয়, যদিও আমরা পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি। পুরা কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আসিতেছে। আমরা যে দরিদ্র তার একটা প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশের সরকারী গৃহস্থালির কর্ত্তা আমরা নই, কর্ত্তৃত্ব অন্য হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য জাতির মঙ্গলের জন্য আমরা যাহা একান্ত আবশ্যক মনে করি, তাহার জন্য যথেষ্ট টাকা আগেও ইংরেজ জনভৃত্যেরা (Public Servants)

কখন খরচ করেন নাই, আগামী বৎসরের জন্যও করিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ কখন্ যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিবেন, জানি না; কিন্তু গত সালে যত জন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায়, কলেরায়, জ্বরে এবং আরো কত নিবার্য্য রোগে মরিয়াছে, এবং প্রতিবৎসর মরিতেছে, তাহারা ত আর ফিরিয়া আসিবে না। সকল বালকবালিকা যুবকযুবতীর শিক্ষার ব্যবস্থা কখন্ হইবে জানি না; কিন্তু এখন যাহারা মূর্খ-অবস্থায় বড় হইতেছে, তাহাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, শিক্ষার বয়স, আর ত ফিরিয়া আসিবে না। কত মানুষ জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিয়া বার্দ্ধক্যে পৌঁছিল ও মারা গেল, তাহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্য কে দায়ী হইবে? দেশের কৃষি ও শিল্পের সুব্যবস্থা কখন্ হইবে, জানি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে কত লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে, অর্দ্ধাশনে, দারিদ্র্যজনিত রোগে, প্রাণ হারাইয়াছে, তাহারা ত আর ফিরিয়া আসিবে না। কত লোক দারিদ্র্যের জন্য চুরি-ডাকাতি করিয়া, দারিদ্র্যনিবন্ধন শিক্ষার অভাবে দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া, নিজের ও দেশের অবনতি করিয়াছে, তাহার জন্য কি কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন?

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে না, কিন্তু সিবিলিয়ানদের পাওনা বাড়িয়াছে, এবং পুলিশের জন্য অর্থের ব্যবস্থা পুরা মাত্রায় আছে। আমরা চোরডাকাতকে নিশ্চয়ই ভয় করি, এবং খুনীদের হাতে প্রাণটা যায়, এরূপ ইচ্ছাও করি না। কিন্তু খুব সহজেই বুঝা যায় যে নিবার্য্য রোগে দেশে যত লোক মরে, খুনীদের হাতে তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও মরে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পুলিশের জন্য যত ব্যয় করেন, এবং পুলিশকে যত দরকারী মনে করেন, স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য তত ব্যয় করেন না, এবং স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীদিগকেও তত দরকারী মনে করেন না। স্বাস্থ্যের জন্য পুলিশের ব্যয়ের ষষ্ঠাংশও ব্যয় করেন কি না সন্দেহ।

অবশ্য খুন নিবারণ বা খুনের তদন্ত করাই পুলিশের একমাত্র কাজ নয়। চুরি-ডাকাতি নিবারণ, চোরডাকাত ধরা, ইত্যাদিও পুলিশের কাজ। কিন্তু চুরি-ডাকাতিতে জাতির যত টাকা নষ্ট হয়, নিবার্য্য রোগে লক্ষ লক্ষ উপার্জ্জনক্ষম লোকের মৃত্যুতে এবং তাহার অনেকগুণ বেশী লোকের রুগ্নতা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ উপার্জ্জনক্ষমতার হ্রাসে তদপেক্ষা হাজারগুণ আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চুরি-ডাকাতি নিবারণার্থ পুলিসের ব্যয় যত করেন, রোগজাত ক্ষতি নিবারণার্থ তাহার সিকিও খরচ করেন না।

এই যে রোগজাত প্রভৃত আর্থিক ক্ষতি, ইহার কথা ভাবিলেই স্তম্ভিত হইতে হয়। উপার্জ্জন-শক্তি ছাড়া আরো কত উচ্চতর শক্তি যে রোগে নষ্ট হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়া মানুষকে নীতিমান্ ও উপার্জ্জন-ক্ষম করিলে দেশে আইনভঙ্গ অপরাধ কম হয়, পুলিশের প্রয়োজনও কম হয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যে একটা স্কুল খোলে, সে একটা জেল বন্ধ করে। অতএব শিক্ষা ও উপার্জ্জনের পথ, উভয়ই করিয়া দেওয়া চাই।

যাহা হউক, বজেটে এইরূপ এক-একটি বিষয়ের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হইলেও, আমাদের জাতীয় গৃহস্থালির আয়ব্যয়ের উপর আমাদের নষ্ট কর্তৃত্ব কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, অর্থাৎ আমরা কি প্রকারে স্বরাজ লাভ করিতে পারি, অধিকতর ফলপ্রদ ও আবশ্যক।

ভারতের ১৯২২-২৩ সালের আয়ব্যয়

আগামী ১৯২২-২৩ সালের (অর্থাৎ ১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের) আয় নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া ১১০॥০ কোটি টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ব্যয় হইবে ১৪২॥০ কোটি টাকা। কম্‌তি পড়িবে ৩১॥০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ২৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা তোলা হইবে। তাহা হইলেও প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা কম থাকিবে। আগের আগের বৎসরেও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়াছে। চারি বৎসরে ৯০ কোটি টাকা ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। তজ্জন্য আগামী বৎসরে ৫২॥০ কোটি টাকা ধার করিতে হইবে।

১৯২২-২৩ সালের ১১০॥০ কোটি আয়ের মধ্যে সৈনিক বিভাগের ব্যয় হইবে ৬২ কোটি ১৮ ল

টাকা। সোজা কথায় বলিতে গেলে ইহার মানে এই যে, যে-গৃহস্থের আয় ১১০৸৹ টাকা তাহাকে বরকন্দাজ চৌকিদার প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যয় করিতে হইবে ৬২ টাকা। এরূপ গৃহস্থ কেহ দেখিয়াছেন কি? এরূপ গৃহস্থের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না এবং তজ্জন্য ক্ষীণজীবী রুগ্ন থাকিয়া সহজেই মহামারীতে মারা পড়ে; কাপড়ের অভাবে প্রায় নগ্ন থাকে, শীতে কষ্ট পায়; ভাল ঘর তৈরী করিবার জন্য টাকা না থাকায় ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে বা পথে ঘাটে থাকিয়া শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় কষ্ট পায়; রোগ হইলে চিকিৎসা ঔষধ পথ্যের অভাবে খুব ভোগে বা মারা যায়; খাইবার নাইবার ভাল জলের অভাবে এবং বাড়ীর, গ্রামের, ও সহরের নর্দ্দামা আদি ভাল না হওয়ায় প্রায়ই অনেকে বার বার পীড়াগ্রস্ত হয়; লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা ও অধিক সামর্থ্য না থাকায় মূর্খ থাকে, সুতরাং নানা উপায়ে ধন উপার্জ্জনও করিতে পারে না; কৃষির উন্নতি করিবার মত শিক্ষা ও সঙ্গতি না থাকায় জমী হইতে অন্য দেশের লোকদের মত ফল শস্য মূল পায় না; শিল্পবাণিজ্যের শিক্ষা যথেষ্ট না পাওয়ায়, এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য বা উৎসাহ না পাওয়ায় এবং কল-কারখানা চালাইবার মত সঙ্গতি না থাকায়, দেশে লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমুদয় উৎপন্ন করিতে পারে না ও তাহাতে বিদেশী জিনিষে দেশ ছাইয়া যাইতেছে; এবং দারিদ্র্য ও শিক্ষাভাব বশতঃ গৃহস্থের সন্তানেরা কখন কখন আইনবিরুদ্ধ কাজও করিয়া ফেলে;—এবম্বিধ নানা দুর্গতি নিবারণের দিকে সম্যক্ দৃষ্টি না দিয়া ১১০৸৹ টাকা আয়ের গৃহস্থ যদি বরকন্দাজ ও চৌকিদার রাখিতে ৬২ টাকা ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহাকে কি বিজ্ঞ বা কর্ত্তব্যপরায়ণ বলা চলে?

ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি এইরূপ গৃহস্থ। কিন্তু নিজের আয়ব্যয়ের উপর এই গৃহস্থের কোন হাত নাই; আয়ব্যয় সমস্তই বেহাত হইয়া পড়িয়াছে। বেহাত হইতে দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে সাতিশয় দোষের বিষয় হইয়াছে। পুনর্ব্বার আয়ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন আয়ব্যয়ের মালিক যাহারা তাহাদের নাম ভারত-গবর্ণমেণ্ট।

১৯২২-২৩ সালের সামরিক ব্যয়

আমরা দেখাইয়াছি, ভারত-গবর্ণমেণ্টের আয়ের অর্দ্ধেকেরও উপর সৈনিক বিভাগের ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। এরূপ ব্যয়ের সমর্থনে বলা হইবে, সর্ব্বাগ্রে দেশরক্ষা, তারপর তোমার শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, প্রভৃতি। কিন্তু একথা কি সত্য, যে, ভারতবর্ষের ব্যয়ে যত গোরা ও সিপাহী রাখা হয়, ভারতবর্ষে শান্তি-রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষকে আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও বিপ্লব এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তত সৈন্যের প্রয়োজন আছে? ইহা কি সত্য, যে, ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য আধুনিকতম সেই-সব অস্ত্র ও সরঞ্জামের প্রয়োজন যে-সব ইউরোপে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার আবশ্যক হইতে পারে? "তোমরা ভারতীয়, এবং ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের চিরশত্রু", ইহা বলিয়া যদি কেহ আমাদের কথা উড়াইয়া দিতে চান, সেইজন্য বর্ত্তমান ১৯২২ সালের ১১ই মার্চ্চের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজের মত উদ্ধৃত করিতে চাই। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ বলেন, যে, গত মহাযুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে যত ইংরেজ সৈন্য ছিল তার চেয়ে বেশী সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন নাই, এবং গোরা ও সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য যাহা আবশ্যক তাহার সমতুল্য করিবার প্রয়োজন নাই; যদি করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যয় বিলাতী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া কর্ত্তব্য। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ভারতবর্ষের হিতের জন্যই এ-সব কথা বলিতেছেন, এ বিশ্বাস আমাদের নাই; অন্যবিধ যে-কারণে ইহা বলিতে পারেন, তাহা অনুমান করিতে আমরা সমর্থ। কিন্তু তাহার আলোচনা এখন না করিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের কতকগুলি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

In the Legislative Assembly there are many men of intelligence and good sense who are just as keenly alive to the importance of maintaining law and order as the COMMANDER-IN-CHIEF himself. Granted, then, that the British garrison must not be reduced by a single man, they ask what the present strength of that garrison is, whether there has been any increase in it as compared with the pre-War establishment, and, if so, the reason for such increase. Next

as to the equipment of these and other Indian troops with the latest devices of modern scientific warfare, there surely is need for a little clear thinking. It requires no expert tactician to tell us that armoured cars and machine-guns—relatively inexpensive weapons which economize men and enable a few to do the work of many—are eminently suited to the purposes of the Indian Army; whereas tanks and heavy artillery—both very costly—are almost as little likely to be required for fighting on the North-West Frontier as for quelling a riot in the Indian bazaars. Obviously, therefore, the Indian Army should be well supplied with the cheaper weapons, and may dispense altogether with the others....

If heavy artillery, tanks, poison-gas appliances, and so forth are required in order that the British garrison may learn to use them against some possible European foe, the cost of all such weapons should be borne by the Home Government and not by the Indian. In a word, India does not require an army brought to a "high state of modern military efficiency" as measured by European standards, but one which will maintain order within her borders and protect her frontiers against aggression. Such an army should not cost anything approaching 62 crores per annum—possibly not one half that sum.

ঢাকা ও কলিকাতা—তুলনায় আলোচনা

আগামী বর্ষের বজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নয় লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একলক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা বঙ্গের রাজস্ব হইতে প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলগণ ঢাকার প্রতি পক্ষপাত করা হইয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি?

(প্রথমতঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রায় ৬৫ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বঙ্গের রাজস্বে পুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান সময়ে আর্থিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদ্যজাত, ইহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে পোষণ করিলে তবে ইহা কলিকাতার মত স্বাধীন আয়ে উপনীত হইতে পারিবে।

১৯২২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ১৯২২ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান নহে, ১৮৬০ বা ১৮৭০ সালের মত। নচেৎ ন্যায়সঙ্গত তুলনা হয় না। অথচ—

(দ্বিতীয়তঃ) অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফী লইয়া শুধু ডিগ্রী বেচিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উহার জীবনের প্রথম দিন হইতে শিক্ষা দিতেছে; এইরূপ শিক্ষাদাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বেশী, এবং পুঁজি (অর্থ, গৃহ, পুস্তকাগার, ইত্যাদি) জমাইয়া না রাখিলে বেশী অভাবে পড়িতে হইবেই।

(তৃতীয়তঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিভাগ, ডিগ্রী বেচা ও শিক্ষা দেওয়া। সমগ্র বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম (এবং এই কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্যন্ত ব্রহ্ম এবং বিহারও) ইহার ডিগ্রী বিক্রয় বিভাগের অধীনে; এই সমস্ত প্রদেশ-বাসী অযুত অযুত ছাত্র ইহার পরীক্ষার ফী দিতেছে, এবং সেই ফীর এক-তৃতীয়াংশ টাকা কলিকাতার পোষ্টগ্রাজুয়েট (অর্থাৎ শিক্ষা) বিভাগ পুষ্ট করিতেছে; কিন্তু ঢাকাতে শুধু শিক্ষা দিবার বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইহার এলাকা ঢাকা শহর ও তাহার দুটি কলেজ ও এক সহস্র আন্দাজ ছাত্রের মধ্যে নিবদ্ধ; সুতরাং ফী হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার শতাংশ মাত্র উপার্জ্জন করে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজস্ব হইতে ঢাকাকে অধিক টাকা দিয়া এই অসমান অবস্থা দূর করিলে তবেই ন্যায় বিচার হয়। মনে রাখিতে হইবে যে ফী এবং রাজস্ব উভয়ই সাধারণের টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ আসামের অযুত অযুত ছেলের বাপকে শোষণ করিয়া যে আয় করিতেছে, তাহার সহিত এই এক লাখ একচল্লিশ হাজার যোগ করিয়া দিলে ঢাকার নয় লাখ ও ফীকে (লাখ-খানেক) অতিক্রম করিয়া উঠিবে।

(চতুর্থতঃ) ঢাকা শহরের কলেজ-দুটি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত, কিন্তু ঢাকার বাহিরের এত সরকারী কলেজের একটিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বলিয়া হিসাবে দেখান হয় না, এমন কি প্রেসিডেন্সী কলেজও নহে। তাহাদের জন্য রাজস্ব হইতে যাহা ব্যয় হয়, তাহা পরোক্ষভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই ব্যয়, যদিও বজেটে এই লক্ষ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান বলিয়া লেখা হয় না।

আজ যদি ঢাকাকে affiliating university ঘোষণা করা হয় এবং সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের ও আসামের (সম্ভবত উত্তর বঙ্গেরও) স্কুলকলেজগুলিকে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধীনে আনা হয়, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজস্ব হইতে নয় লক্ষের অনেক কম টাকা দিলেই চলিবে।

গোলদিঘির প্রতিনিধি কি ইহাই চান?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ব্যয় ও কার্য্যপ্রণালী

বঙ্গের শিক্ষা-সচিব প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার বজেট বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে আশুবাবুর অধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত শোচনীয় অবিবেচনার সহিত খরচ করিয়াছে—"the financial management of the Calcutta University in the past was deplorable"। প্রকৃত হিসাবী বিবেচক লোকে ভবিষ্যৎ দেখিয়া আয় অনুসারে ব্যয় করে, আর আশুবাবুর দল বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াইবার নেশায় মত্ত হইয়া "দোষাবহ খেয়াল-পন্থীর মত" কাজ করিয়াছে ("almost criminal thoughtlessness")।

সমস্ত প্রদেশের শিক্ষা-সচিবও যখন এরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শোচনীয় অবস্থা আর লুকাইয়া রাখা যায় না। প্রভাসবাবু জনসাধারণের কর-আদায় হইতে অর্জ্জিত ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহারের জন্য দায়ী। তিনি নিজের কর্ত্তব্য, সাধারণের অভাব দুঃখ জানেন, সুতরাং তিনি রাজস্ব হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আশু-বাবুর অতলস্পর্শ গহ্বরে ঢালিয়া দিবার আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থার কারণ এবং অতীতের খামখেয়ালীর ইতিহাস পরীক্ষা করিতে বাধ্য। তিনি বুঝিয়াছেন যে ভবিষ্যতে রাজস্ব হইতে প্রদত্ত টাকার সদ্ব্যবহার এবং ঠিকমত হিসাব রাখা হইবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা ও ব্যবস্থা না হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিলে তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য-চ্যুতি ঘটিবে। বঙ্গের ব্যবস্থাপক-সভার অনেক সভ্যও নিজেদের এই কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা চান, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হউক, আশুবাবুর মস্তিষ্কের শোথের (megalomania) উপশম হউক, এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট আর্ট বিভাগকে সংযত হিসাবী এবং মিতব্যয়ী করা হউক। তবেই বঙ্গের প্রজাবর্গের কষ্টে অর্জ্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দিলে তাঁহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না, নিজ নিজ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন।

এজন্য ৩১শে আগষ্ট ১৯২১ বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভা কলির বিক্রমাদিত্যের হিসাব দেখিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন। তাহার পর প্রায় সাত মাস হইয়া গেল, এখনও আশুবাবু এই প্রস্তাবের উত্তর দেন নাই। দিবেন কি না সন্দেহ। অর্থাৎ যাহারা সাধারণের নিকট রাজস্ব ব্যয় করিবার জন্য দায়ী, তাহাদের হিসাব দেখাইবেন না, তাহাদের চোখে ঠুলী দিয়া ঢাকিয়া তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিবেন! গোমস্তা তাঁহার জমিদারকে কাছারী-ঘরে ঢুকিতে দিবেন না। রোগী কবিরাজকে নথল দিবেন না।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ যে এই চালের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা এরূপ মূর্খ নহেন, যদিও তাঁহাদের মধ্যে একজনও Ph. D. বা "রিসার্চার" নাই। তাঁহাদের কর্ত্তব্যের পথ পরিষ্কার; তাঁহারা বঙ্গের জনসঙ্ঘের নিকট দায়ী; তাঁহারা অর্থের অপব্যবহার, অজ্ঞাত ব্যবহার হইতে দিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উকীল নন, তাঁহারাও জানেন যে দেউলিয়া হইয়া আদালতের আশ্রয় লইতে হইলে প্রথমে নিজের সব আয়ব্যয় অকপটে আদালতে দাখিল করিতে হয়, জজের সমস্ত প্রশ্নের সত্য ও সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হয়। যদি কেহ জজকে চোক রাঙ্গান, the insolvent shows *cheek* but does not show his *accounts* তবে আইনে তাহার রক্ষার উপায় নাই! আবার disqualified proprietor যদি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের আশ্রয় পাইতে চান, তবে তাঁহাকে আদালতের হুকুম মানিয়া চলিতে হয়; ক্রমাগত অমিতব্যয় অগাধ দেনা করিবার ক্ষমতা আদালত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়।

M. L. C.-গণ কি ইহার অনুমোদন করিবেন, আর করিলেই কি প্রজাবর্গ তাহা সহ্য করিবেন? বৎসর বৎসর এইরূপ বজেট পাশ হইবে?

এক যাত্রায় ভিন্ন ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট্ বিভাগের ১৯২০ সালের রিপোর্টের ৩১৫ পৃষ্ঠায় নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক-

দিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চাটুজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার উপাধি M. B. B. S., কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বত্রই ডাক্তার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ পৃষ্ঠায় দুইবার, ৩৩৭ পৃষ্ঠায় একবার, ইত্যাদি। সকলেই জানেন যে যদিও প্রত্যেক হাতুড়ে চিকিৎসক নিজের সাইনবোর্ডে নিজকে ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত করে, প্রত্যেক বাজীকর, পালোয়ান ইত্যাদি নিজেকে প্রফেসার বলিয়া বিজ্ঞাপন দেয়, কিন্তু বিদ্বৎসমাজের চিঠি-পত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে যাঁহারা কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি পান নাই তাঁহাদের ডাক্তার বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীতে ঠিক অনাথবাবুর মতই M. B. পাশ করা [তৎকালে] "ডাক্তার"-উপাধি-হীন গিরীন্দ্র-শেখর বসু আছেন; তাঁহাকে কিন্তু "বাবু" নাম দেওয়া হইয়াছে (৪৭ পৃষ্ঠা), 'ডাক্তার বসু' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

নোটের আদর

পোষ্টগ্রাডুয়েট বিভাগের কার্য্যবিবরণীর মধ্যে ৩৫৫ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে—

The Secretary reported that Babu Pramathanath Banerji, M. A., Lecturer in History, had got *type-written copies of his lecture-notes* prepared at his own expense and had them *distributed among his students* of the last Sixth-year class and requested payment of *Rs. 70* (the cost borne by him). *Resolved that the amount be paid* [by the University.]

গোলদিঘির বিশ্ববিদ্যালয় যে চমৎকার মৌলিক গবেষণা-প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন, ইহা তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। চারিদিকে সংস্কারকগণ, ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলী, নোট ডিক্টেট করা এবং নোট মুখস্থ ও নোট উদ্গিরণ করা ভারতীয় অধ্যাপক ও ছাত্রদের দোষ বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর স্বয়ং সরস্বতী ছেলেদের নোট পড়ায় প্রশ্রয় ত দিতেছেনই, তাহার উপর নিজহস্তে নোট লেখার পরিশ্রম এবং [কিঞ্চিৎ] শিক্ষা হইতে অব্যাহতি দিতেছেন এবং সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে!

যদি ছাপান নোটই ছেলেদের দিতে হইবে তবে সে শিক্ষক এত মাস ধরিয়া বেতন লইয়া কি লেক্চার দিলেন? এ হেন বিশ্ববিদ্যালয় দেউলিয়া না হইলে প্রকৃতির নিয়মের বিপর্য্যয় হইত।

মণ্টেগু সাহেবের পদ ত্যাগ

ফ্রান্সের সেয়াভ্র্ সহরে যে সন্ধিপত্র রচিত হয়, তাহাতে তুরস্কের প্রতি খুব অবিচার হয়, এবং মুসলমানদের খলিফা তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা, প্রভাব ও কার্য্যশক্তির হ্রাস হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ও ভারতসচিবের সম্মতি লইয়া বিলাতী ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে ঐ সন্ধি কতকগুলি বিষয়ে পরিবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করেন। যথা—তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ ত্যাগ, তুরস্ককে স্মার্ণা পুনরর্পণ, আড্রিয়ানোপ্‌ল্ সহর ও তুর্কদের অধ্যুষিত থ্রেস্ পুনরর্পণ, মুসলমানদের তীর্থস্থান-গুলির উপর তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা ও প্রভাব পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করণ। এই অনুরোধ-পত্র ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবের সম্মতিক্রমে কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করেন। তজ্জন্য প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ মন্ত্রীসভার মত লইয়া মণ্টেগু সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বলেন। তদনুসারে মণ্টেগু পদত্যাগ করিয়াছেন।

কিছুদিন হইতে মণ্টেগু সাহেবকে তাড়াইবার জন্য পার্লামেণ্টের গোঁড়া রক্ষণশীল দল খুব চেষ্টা করিতেছিল। ইহা কতকটা নিশ্চিত, যে, এই দলকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়োজন না থাকিলে লয়েড্ জর্জ কখনই মণ্টেগুকে ইস্তফা দিতে বলিতেন না। সুতরাং সেয়াভ্র্ সন্ধিপত্র সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুরোধপত্র মন্ত্রীসভার বিনা অনুমতিতে প্রকাশ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যখন ঔপনিবেশিক সচিব চর্চিল্ সাহেব মন্ত্রীসভার সম্মতি না লইয়া আফ্রিকার কেন্যা (Kenya) দেশে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারাদি

বিষয়ে অনেক গুরুতর কথা পূর্ব্ব-আফ্রিকা ভোজের বক্তৃতায় প্রকাশ করেন, তখন ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলা হয় নাই? তা ছাড়া মণ্টেগু বলিতেছেন, যে, তিনি মন্ত্রীসভাকে, বিশেষতঃ লর্ড কার্জ্জনকে জানাইয়াছিলেন, যে, অনুরোধপত্রটি প্রকাশিত হইবে; উহার প্রকাশ বন্ধ করিবার যথেষ্ট সময় ছিল, অথচ বন্ধ করা হয় নাই। সুতরাং মণ্টেগু যদি মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ নীতি অনুসারে মন্ত্রীসভার মনোভাব বুঝিয়া কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইস্তফা দিতে বলা উচিত হয় নাই।

মন্ত্রীসভা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিতেছেন, যে, তুরস্ক সম্বন্ধে শীঘ্র মিত্রশক্তিদের যে কন্‌ফারেন্স (The Near East Conference) হইবে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ আগে হইতে প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় তাহাতে ব্রিটিশ-শক্তির সব দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা ও সুবিধার হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক মিত্রশক্তিদের কাহারও মর্জ্জি বা বিবেচনার বেশী ক্ষেত্র বা অবসর তুরস্কঘটিত সব বিষয়ে এখনও আছে কি? কমাল পাশার প্রতাপে স্মার্ণা, থ্রেস্, আড্রিয়ানোপল্ আবার ত তুর্কদের হাতে আসিয়াছে বা প্রায় হস্তগত; মুসলমান তীর্থ-স্থানগুলিতে ইংরেজ যে-সব সাক্ষীগোপাল রাজা বা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারা পদত্যাগোন্মুখ বা টলটলায়মান। সুতরাং অনুরোধপত্র প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া মণ্টেগু ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে বেশী কিছু মুস্কিলে ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারতগবর্ণমেণ্ট ঐ কাগজটি ছাপিবার নিমিত্ত মণ্টেগুর অনুমতি চাহিয়াছিলেন। লর্ড রেডিং অবশ্য জানেন, যে, সব কাজ দস্তুরমত করিতে হইলে সমগ্র মন্ত্রীসভার অনুমতি চাই। অথচ তিনি অনুমতি চাহিলেন শুধু মণ্টেগুর। প্রকাশে যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মণ্টেগুর নীচেই তিনিও অপরাধী। অতএব, তাঁহাকেও ইস্তফা দিতে বাধ্য করা উচিত। লয়েড্ জর্জ্ তাহা করিবেন কি না সন্দেহ। শুনিয়াছি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের টাকার দরকার হইলে যদি বিলাতেই টাকা ধার করিতে হয়, তাহা হইলে লণ্ডনের ইহুদী মহাজনদের শরণ লইতে হয়। একজন ইহুদীকে পদচ্যুত করায় এই মহাজনদের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে জানি না; দুজনকে পদচ্যুত করিলে তাহারা যে নিশ্চয়ই চটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লয়েড্ জর্জ্জের যদি সত্য সত্য টাকা কড়ির দরকার না থাকে, তাহা হইলে তিনি চটাইতে সাহসী হইতে পারেন; দরকার থাকিলে কিন্তু তিনি লর্ড রেডিংকে নিশ্চয়ই কিছু বলিবেন না। তা ছাড়া, ইহাও শুনা যায়, যে, মার্কোনী-শেয়ার্‌স্ ঘটিত ব্যাপারে লর্ড রেডিং লয়েড্ জর্জের সহায় থাকায় লয়েড্ জর্জের সুবিধা হইয়াছিল। উপকারী ব্যক্তিকে লয়েড্ জর্জ্ কি এখন সহজে ত্যাগ করিবেন?

মণ্টেগু সাহেব সম্বন্ধে এখন ভারতবর্ষে ইংরেজ ও দেশী নানা দলের লোক নানাবিধ প্রশংসা নিন্দা সমালোচনা করিতেছেন। গোঁড়া মডারেটদলের কয়েক ব্যক্তি, "বেঙ্গলী" মণ্টেগু সম্বন্ধে, উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু নিন্দার কথা বলায়, উহার সম্পাদকের উপর খাপ্পা হইয়াছেন এবং সম্পাদক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সত্য কথাগুলাও প্রত্যাহার করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে "বেঙ্গলী"তে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী ধীরভাবে নিরপেক্ষতার সহিত চিঠি লিখিয়াছেন। অসহযোগী ও চরম-পন্থী সম্পাদকেরা মণ্টেগু সাহেবের কোন গুণ দেখিতে বা প্রশংসা করিতে ইচ্ছুক নহেন, বাধ্য ত নহেনই। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ-সকলের মতের আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।

আমরা মনে করি, মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষের হিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যপটুতা প্রশংসনীয়। কিন্তু নূতন ভারতশাসন-আইন দ্বারা প্রকৃত ক্ষমতা অতি অল্পই ভারতবাসীদের হস্তগত হইয়াছে। অন্য দিকে, রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনের ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার একটা কারণ, শাসনযন্ত্রটা হইয়াছে পাশ্চাত্য ধরণের অথচ অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব রকমের। এরূপ ব্যয়-সাপেক্ষ শাসনযন্ত্র আমাদের গরীব দেশের উপযোগী নয়। দ্বিতীয় কারণ, মণ্টেগু, তাঁহার ভারতশাসন আইনের বিরোধিতা কমাইবার জন্য, ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সব রকম অন্যায় দাবী ও আবদার গ্রাহ্য করায় বেতন, পেন্সান, ছুটির সময়ের পাওনা, ইত্যাদি ভয়ঙ্কর বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে, এবং ট্যাক্স্

ও ঋণ বাড়িতেছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মণ্টেগুর কর্তৃত্ব ভারতের প্রভূত ক্ষতির কারণ হইয়াছে। রিভার্স্ কৌন্সিলস্ দ্বারা ভারতবর্ষের ৫ কোটি টাকা ক্ষতি পার্লেমেণ্টেই স্বীকৃত হইয়াছিল।

মণ্টেগু অপেক্ষা অধিক ভারতহিতৈষী বা রাজনীতিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ আর-কোন ব্যক্তি ভারতসচিব হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগে ভারতের সর্ব্বনাশ হইল, ইহাও মনে করি না। ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ চিরকাল হইয়াছে—আমাদের গৃহবিবাদে, স্বার্থপরতায়, দেশের লোক অপেক্ষা বিদেশীকে বেশী বিশ্বাস করায়, এবং দেশের লোকের সমবেত শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া পরমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করায়। এই মনোভাব থাকিতে দেশের কল্যাণ কোথায়? পরাধীন ভারতবর্ষে দেশরক্ষা কথাটার মানেও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভাল। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজে "ব্রিটিশ গ্যারিসন্" কথাটার ব্যবহার হইতে বুঝা যায়, ভারতবর্ষ রক্ষার মানে ইংরেজরা বুঝেন "ভারতবর্ষের ইংরেজাধীনতা রক্ষা।" আমরা দেশরক্ষার মানে বুঝি, প্রথমতঃ নিজেদের দেশের মালিক পুনর্ব্বার নিজেরা হওয়া, এবং তৎপরে তাহাকে কোনও বিদেশীর অধীন হইতে না-দেওয়া। অবশ্য, তাহা হইতে আপাততঃ এই মানেও আসে, যে, যতদিন না আমরা নিজেরা স্বদেশের মালিক হইতে পারিতেছি, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যেন ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশীর হস্তগত না হয়।

অন্য দেশের ও জাতির এবং ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের উদ্দেশ্য

স্বাধীন দেশ-সকলের সামরিক ব্যয়ের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ একটি বা দুটি :—(১) নিজের দেশের স্বাধীনতা ও সম্পদ্ রক্ষা, (২) অন্য দেশের স্বাধীনতা নাশ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন। ভারতবর্ষ অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে চাহে না ও পারে না, এবং অন্য কোন দেশের ধনও চুরি করিতে চায় না ও পারে না। সুতরাং, ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বাকী থাকে কেবল প্রথমটি। যাঁহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার কথা তুলিলে কেবল উপহাস করা হয় মাত্র। আমাদের স্বাধীনতা ও সম্পদ্ পরের আয়ত্ত। অতএব, ভারতবর্ষের যুদ্ধের আয়োজন ছোট বা বড় যাহাই হউক, তাহা আমাদের স্বাধীনতা ও সম্পদ্ রক্ষার জন্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের ইংরেজাধীনতা রক্ষা, এবং ভারতবর্ষকে ইংরেজ জাতির কামধেনুরূপে রক্ষা। তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করা যাউক, যে, ইংরেজের অধীনতা পৃথিবীর অন্য যে-কোন জাতির অধীনতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ইংরেজ ভারতবর্ষ কামধেনুকে যত প্রকারে যে পরিমাণে দোহন করে, অন্য কোন জাতি ভারতবর্ষের প্রভু হইলে তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রকারে ও পরিমাণে দোহন করিত। কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই স্বীকার করা যায় না, যে, ইংরেজাধীনতা স্বাধীনতার সমান বা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিম্বা দেশের ধন দেশে থাকা অপেক্ষা ইংরেজের দ্বারা অতিশয় আইনসঙ্গত উপায়েও শোষিত হওয়া ভাল, যা উভয় অবস্থা সমতুল্য। এইজন্য ইংরেজের অধীনতার সপক্ষে যতপ্রকার গুণের দাবী করা যাইতে পারে, তাহা স্বীকার করিলেও, কথাটা এইরূপ দাঁড়ায়, যে, ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন থাকায় ইংরেজেরও লাভ এবং ভারতের লোকদেরও লাভ; এ কথা মিথ্যাবাদী ভিন্ন কেহ বলিতে পারিবে না, যে, এই অধীনতায় কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই লাভ, এবং ইংরেজ শুধু পরহিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষকে নিজের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষ যাহাতে ইংরেজের অধীন থাকে, তজ্জন্য সমুচিত যুদ্ধের আয়োজন রাখার ব্যয় ইংলণ্ডেরও দেওয়া উচিত, ভারতবর্ষেরও দেওয়া উচিত।

ইহার একটা উত্তর কোন কোন ইংরেজ দিয়া থাকে। তাহারা বলে, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য রক্ষার জন্য ইংলণ্ডকে বিস্তর যুদ্ধজাহাজ রাখিতে হয়। যদি ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের যুদ্ধবিভাগের আংশিক ব্যয় দিতে বল, তাহা হইলে ইংলণ্ডের রণতরী বিভাগেরও আংশিক ব্যয় ভারতবর্ষের দেওয়া উচিত। উত্তরে যাহা বলিবার আছে, বলিতেছি। রণতরী দ্বারা সামুদ্রিক বাণিজ্য রক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্য সমস্তই বিদেশীর; প্রায় সমস্তই ইংরেজের হাতে। সুতরাং সামুদ্রিক বাণিজ্য

রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ ন্যায়তঃ কিছুই দিতে বাধ্য নহে। ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড কয়টি যুদ্ধ-জাহাজ ভারত-মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, আরব-সাগর প্রভৃতি সমুদ্রে রাখেন, জানি না। যদি কিছু রাখেন, তাহা হইলে সেই কয়টির আংশিক ব্যয় আমরা ন্যায়তঃ দিতে বাধ্য,—যদি অন্য সব বন্দোবস্তও ন্যায়সঙ্গত হয়। "যদি অন্য সব বন্দোবস্ত ন্যায়সঙ্গত হয়" বলিবার কারণ বলিতেছি। কেবল ন্যায়কারীই ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের দাবী করিতে পারে, অন্যে পারে না। এইজন্য ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষের কাছে কোন ন্যায্য দাবী উপস্থিত করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, যে, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার সব রকমের ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত, এবং ইংলণ্ড নিজের রণতরী-বিভাগ ও যুদ্ধ-বিভাগ হইতে যতপ্রকার সুবিধা ও লাভ পাইতেছেন, ভারতবর্ষও তাহা পাইতেছেন বা পাইতে পারেন। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সব-রকম ব্যবহারের ন্যায্যতা পরীক্ষা না করিয়া এখন শুধু যুদ্ধবিভাগ ও রণতরী-বিভাগের কথাই আলোচনা করি।

ইংলণ্ডের নিজের যত সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারী আছে, তাহারা সবাই ইংরেজ। (গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সব লোককেই আমরা এক্ষেত্রে সংক্ষেপতঃ ইংরেজ বলিব।) ইহারা যত বেতন ও ভাতা পায়, তাহাতে ইংরেজজাতির ধনক্ষয় হয় না; এবং ইহাদের রণদক্ষতা ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও ইংরেজদেরই সম্পত্তি থাকে। তদ্দ্বারা ইংরেজ জাতি দেশবিদেশে প্রবল থাকে। যুদ্ধের সবরকম অস্ত্র ও সরঞ্জাম ইংরেজরা নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত করিয়া ধন উপার্জ্জন করে। শিল্পনৈপুণ্যও তাহাদেরই থাকে। যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ তাহারাই করে, এবং তাহার লাভ এবং দক্ষতা তাহাদেরই থাকে। যুদ্ধজাহাজ দ্বারা তাহাদের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য রক্ষিত হয় এবং তদ্দ্বারা দেশ সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়। রণতরীর সামান্য মাঝিমাল্লা হইতে উচ্চতম নৌসেনাপতি পর্য্যন্ত সবাই ইংরেজ। তাহাদের বেতন ও ভাতা ইংরেজ জাতির ধনসমষ্টির অঙ্গীভূত হয়। তাহাদের রণনৈপুণ্য ইংরেজ জাতিকেই প্রবল রাখে। মতোযুদ্ধ-বিভাগ সম্বন্ধে এই সমস্ত কথাই খাটে। তজ্জন্য পুনরুক্তি করিব না। এখন ভারতবর্ষের কথা বলি

যুদ্ধবিভাগে ভারতীয়রা, বলিতে গেলে, কেবল সিপাহী হইতে সুবাদার-মেজর পর্য্যন্ত হইতে পারে; গোলন্দাজী (artillery) বিভাগে ভারতীয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিলেও চলে। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় লোকে লেফ্‌টেনেন্ট, কাপ্তেন, আদি হইয়াছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট হইতে ফীল্ডমার্শ্যাল-পর্য্যন্ত সব উচ্চ কাজ কার্য্যতঃ ইংরেজের একচেটিয়া। ইহাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি ভারতবর্ষের জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইয়া ইংরেজের ধনভাণ্ডার পুষ্ট করে। ইহাদের রণদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের অর্থে অর্জ্জিত হইয়া ইংরেজ জাতিকে শক্তিশালী ও প্রবল করে। ভারতবর্ষের যোদ্ধারা সংখ্যায় যত বেশী ও সাহসে যত প্রশংসনীয়ই হউক, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষ প্রবল ও শক্তিশালী দেশ বলিয়া পৃথিবীতে গণিত হয় না। ভারতবর্ষের যোদ্ধারা নিম্ন পদে থাকিয়া ও কেবলমাত্র পরিচালিত হইয়া কখনও নেতৃত্বের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না; পরন্তু ক্রমাগত অধীনস্থ থাকায়, যাহাদের কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক নেতৃত্ব-শক্তি থাকে, তাহাদেরও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষে সকল রকম যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হয় না। যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার কারখানাসমূহ ভারতবর্ষীয় লোকদের সম্পত্তি নহে। এইসকল কারখানায় কেবলমাত্র মজুর ও নিম্নশ্রেণীর কারিগর ভারতীয়; উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও পরিচালকগণ ইউরোপীয়। সুতরাং কারখানা-সমূহের আর্থিক লাভ ভারতকে ধনশালী করে না। কারখানাগুলিতে লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ ইংরেজের অভিজ্ঞতা। তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের লাভ হয়, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ও শিল্পনৈপুণ্য তদ্দ্বারা বৃদ্ধি পায় না। রণতরী-বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে ভারতের নিজের কোন যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিবার কোন ডক্‌ও (Dock) ভারতবর্ষে নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা কোন যুদ্ধজাহাজে সামান্য নৌসৈনিক হইয়াও প্রবেশ করিতে পারে না। যুদ্ধজাহাজ থাকিলে যে জাতীয় প্রতিপত্তি ও পরাক্রম বাড়ে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। ভারতীয়দের নিজের এমন কোন সামুদ্রিক বাণিজ্য নাই, যাহার রক্ষার জন্য রণতরীর প্রয়োজন। রণতরীর জন্য আমরা টাকা দি বা না দি, উহা হইতে স্বাধীন দেশ-সকলের যতপ্রকার লাভ ও

সুবিধা হয়, আমাদের তাহার কিছুই হইতে পারে না। নভোযুদ্ধের কোন আয়োজন এ দেশে নাই বলিলেই চলে। যদি ভবিষ্যতে সেরূপ আয়োজন হয়, তাহা হইলেও তাহার নেতৃত্ব ইংরেজের হইবে, সুতরাং তাহার দরুণ আর্থিক লাভ, অভিজ্ঞতা, প্রতিপত্তি, পরাক্রম ইংরেজের হইবে। নভোযুদ্ধের জন্য এরোপ্লেন প্রভৃতি নির্ম্মাণের কারখানাও ইংরেজের কর্ত্তৃত্বে স্থাপিত হইবে; উহা সরকারী বা বে-সরকারী যাহাই হউক ইংরেজেরই হইবে। সুতরাং কারখানার আর্থিক লাভ, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য ইংরেজকেই ধনশালী অভিজ্ঞ, নিপুণ ও প্রবল করিবে।

এই-সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, যে-সকল কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন দেশ যুদ্ধের আয়োজনের জন্য বিস্তর টাকা খরচ করেন, ভারতবর্ষের সেরূপ খরচ করিবার একটিও কারণ নাই। ভারতবর্ষের আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকিলে, ভারতবর্ষের লোকদের দেশের সমুদয় বিভাগের সমুদয় কাজে অধিকার থাকিলে ও নিয়োগ হইলে, এবং তাহাদের সকল রকম কারখানা থাকিলে, তাহারা স্বেচ্ছায় রাজস্বের যত অংশ ইচ্ছা যুদ্ধের আয়োজনের জন্য ব্যয় করিতে পারে। এখন তাহাদের ঘাড়ে যে গুরুতর বোঝা চাপান হইতেছে, তাহা সকল প্রকারেই অন্যায়, এবং তাহা জোর করিয়া চাপান হইতেছে।

ভারতীয় বজেট সম্বন্ধে মন্তব্য।

ভারতীয় বজেটের বিস্তারিত আলোচনা পণ্ডশ্রম। তাহা করিব না। গরীবের পক্ষ হইতে দুএকটা কথা কেবল বলি। প্রস্তাব হইয়াছে—(১) রেলের ভাড়া টাকায় চারি আনা বাড়িবে। এই বৃদ্ধিটা গরীব থার্ড-ক্লাসের যাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকেরা যে বোঝা সহজে বহিতে পারে, গরীবেরা তাহা পারে না। (২) লবণের উপর শুল্ক মণকরা ১।০ হইতে ২৷৷০ টাকা হইবে। লবণ গরীবদের আহারের ও স্বাস্থ্যের জন্য, এবং গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের জন্য, একান্ত আবশ্যক। লবণের উপর কোন শুল্কই থাকা উচিত নয়। (৩) পোষ্টকার্ডের দাম দু পয়সা এবং খামের চিঠির ন্যূনতম মাশুল এক আনা হইবে। ডাকমাশুল খুব সস্তা রাখা সভ্যতার একটা লক্ষণ ও কারণ। সুতরাং ডাকমাশুল বাড়ান উচিত নয়। একান্ত বাড়াইতে হইলে পোষ্টকার্ডের দাম এক পয়সাই রাখিয়া চিঠির ন্যূনতম মাশুল এক আনা করা কর্ত্তব্য। (৪) কেরোসীন্ তেলের ও দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বসান উচিত নহে। ইহাতে গরীব লোকের কষ্ট হইবে।

স্বদেশী মেলা

আগামী ২০শে চৈত্র হইতে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে একটি স্বদেশী মেলা খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আগে আগে স্বদেশী মেলা দ্বারা দেশের উপকার হইয়াছিল। এইজন্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। কিন্তু একজন রাজকর্ম্মচারীকে সভাপতি এবং দুজন রাজকর্ম্মচারীকে অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোনয়নের অনুমোদন আমরা করিতে পারি না। যদিও সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব নবাবআলী চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র বাঙালী, তথাপি তাঁহারা ইংরেজ-রাজের কর্ম্মচারী; স্বদেশী মেলা সম্পূর্ণ স্ব-দেশী হওয়া উচিত।

সুরেন্দ্র-বাবু প্রভৃতি তিনজন মন্ত্রীর মত ও কাজ কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে লোকমতের বিরোধী হওয়ায় আমাদের আপত্তি প্রবলতর হইয়াছে।

বাংলাদেশের বজেট

সমগ্র ভারতবর্ষের বজেটের মত বাংলা দেশের বজেট সম্বন্ধেও বিস্তর কথা বলা যায়। কিন্তু বলিয়া লাভ কি? স্বরাজ অর্থাৎ জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব না পাইলে বাক্যব্যয় বৃথা। অথচ বাক্যব্যয় না করিলেও লোককে বুঝান যাইবে না, যে, ভারতশাসন-আইনের সংস্কার দ্বারা দেশের লোক যথেষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী দেখিয়া অমনি নূতন ট্যাক্সের ব্যবস্থা হইল। ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা একেবারেই হয় নাই পাছে বলা হয়, তজ্জন্য সামান্য কিছু ব্যয়সংক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি যাহা হইয়াছে, তাহার তুলনায় উহা কিছুই নয়। ব্যয়সংক্ষেপ খুব ভাল করিয়া করিবার ক্ষমতাই ব্যবস্থাপক সভার নাই। যে-যে বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যয় হয়, সে-সব বিভাগের ব্যয়ের উপর সভ্যদের পূর্ণ ক্ষমতা নাই।

দেশের লোকদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যয়ের ব্যবস্থা নাই। লোকদের অজ্ঞতা দূর না করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতিও হইতে পারে না। অজ্ঞতা দূরীকরণ ভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আর যে-সকল উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহার জন্যও যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই। যাহাতে দেশের লোকের আয় বাড়ে, এরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা বজেটে ধরা হয় নাই। সর্ব্ববিধ উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ। দারিদ্র্য দূর না হইলে মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে না, নিজে শিক্ষালাভ করিতে বা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারে না। অন্যদিকে আবার যদি কেহ সুস্থ-সবল না থাকে, তাহা হইলে পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দারিদ্র্য দূরও করিতে পারে না। অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে, তাহার নানা উপায় জানা থাকা চাই। তাহা শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু শিক্ষাও সঙ্গতি এবং স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অনেক সভ্য শ্রমশীলতা, নির্ভীকতা, ও জ্ঞানবত্তার সহিত বজেটের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতা হইতে দেশের লোকে বুঝিতে পারিবেন, যে, রাজনৈতিক জ্ঞান আমাদের দেশের অনেক লোকের আছে, কিন্তু ভারতশাসন-আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকায় যথোপযুক্ত ফললাভ হইতেছে না।

নিগ্রহ

কয়েকটি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তত্তৎ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতির বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভ্যের মতে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। এই সভ্যেরা মডারেট দলের লোক। তাঁহাদের নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের কথা হইতে বুঝা যায়, যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সম্মতিক্রমে দেশ শাসন করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য যে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অসহযোগীদলের অনুমোদিত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি এখন লোকমতের উপর নহে, জোরের উপর।

মৌলানা হস্‌রত্ মোহানী

মৌলানা হস্‌রৎ (হজরৎ সাহেব) মোহানী কংগ্রেস্-সপ্তাহে আহমদাবাদে মহাত্মা গান্ধীর সহিত কি তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, তাহার একটি বৃত্তান্ত গোরখপুরের এক উর্দ্দু কাগজ হইতে অনুবাদিত হইয়া কোন কোন ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত প্রকৃত কি না জানি না। মহাত্মা গান্ধী যদি স্বাধীন থাকিতেন ও ইহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে বৃত্তান্তটি কি পরিমাণে সত্যমূলক তাহা বুঝা যাইত।

আমরা মোহানী সাহেবের সব কথার আলোচনা করিব না, কারণ তিনি যে-সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাই;—আমরা জানি না, রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে হিন্দু কয়জন, মুসলমান কয়জন, সরকারী-চাকরী-ত্যাগীদের মধ্যে কয় জন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, ওকালতী-ব্যারিষ্টারী-ত্যাগীদের মধ্যেই বা কয়জন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, ইত্যাদি।

মৌলানা সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন, যে, গান্ধী গবর্ণমেণ্টের প্রচ্ছন্ন বন্ধু, যেহেতু তখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই। আশা করা যায়, এখন মোহানী সাহেব মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর সন্তুষ্ট হইবেন ও স্বীকার করিবেন, যে, গান্ধী সরকারী গুপ্তচর নহেন! মোহানী সাহেব স্বয়ং ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যে, খণ্ডযুদ্ধ করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে তাড়াইয়া দিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা উচিত। এরূপ রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা করাতেও ত এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই। ইহার কারণ কি? কেহ যদি এই কারণে সন্দেহ করে, যে, তাঁহার সহিত গবর্ণমেণ্টের গোপনীয় সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরে তিনি কি বলিতে চান, জানিতে ইচ্ছা করি।

তিনি নাকি বলিয়াছেন, যে, তিনি খিলাফৎ চান, স্বরাজ চান না, এবং এই খিলাফৎ কমাল পাশা তলোয়ারের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এবিষয়ে তিনি ঠিক সংবাদ পান নাই। তুরস্কের সুল্‌তান মুসলমানদিগের খলিফা। তিনি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লে "রাজত্ব" করেন। কিন্তু কমাল পাশা ও তুরস্কের সুল্‌তান একযোগে কাজ করিতেছেন না। কমাল পাশা আঙ্গোরায় স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা মনে করা ও বলা ভুল, যে, কমাল পাশা খিলাফৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

মোহানী সাহেব স্বরাজ চান না, খিলাফৎ চান, ইহার মানে বুঝিলাম না। স্বরাজ এবং খিলাফৎ উভয়ই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতীয় মুসলমানদের আবশ্যক। তাঁহারা মনে করেন, যে, তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানসকল নির্বিঘ্নে করিবার নিমিত্ত খিলাফতের প্রয়োজন। কিন্তু স্বরাজ অর্থাৎ জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব না পাইলে দেশের কোন সম্প্রদায় ধনশালিতায়, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে অগ্রসর হইতে পারেন না। এই জন্য স্বরাজ চাই। যখন তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল, যখন তিনি নামে ও কাজে বাস্তবিক খলিফা ছিলেন, তখনও ত ভারতীয় মুসলমানেরা শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সম্পত্তিশালিতা বিষয়ে এখনকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর অবস্থাপন্ন ছিলেন না। সুতরাং তুরস্কের সুলতান পুনর্ব্বার নামে ও কাজে খলিফা হইলেও ভারতীয় মুসলমানদের ঐহিক উন্নতির নিমিত্ত স্বরাজের আবশ্যক হইবে।

স্কুলকলেজের দীর্ঘ ছুটি

ছাত্রদের প্রধান কাজ জ্ঞানে ও চরিত্রে মানুষ হইয়া উঠা। তাহার পর তাঁহারা জনসেবা করিবেন। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিতে ও চরিত্রবান্ হইতে হইলেও মানবের সংস্পর্শে আসিবার ও মানবের সেবা করিবার প্রয়োজন আছে।

সাধারণতঃ অন্য অনেক লোকদের চেয়ে ছাত্রদের অবসর কম। তথাপি তাঁহারা যে নানা সৎকাজ করেন, ইহা তাঁহাদের প্রশংসার বিষয়, এবং তাঁহাদের নিজের মঙ্গলেরও কারণ। ছুটির সময় ছাত্রদের বেশী অবসর থাকে। এই সময়ে তাঁহারা দেশসম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। দেশের স্বাস্থ্য কেন খারাপ ও কিরূপ খারাপ; দেশের গরীবেরা কেমন ঘরে থাকে, কতটুকু ঘরে কতজন থাকে; কি খায়; কি পরে; দেশের লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত কি আছে; কোন্ গ্রামের কতগুলি বালকবালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, কতগুলির নাই, ও কেন নাই; অনেক বালকবালিকা কেন লেখাপড়া শিখিতে পারে না; গ্রামের স্নানের ও পানীয়-জলের ব্যবস্থা কিরূপ; কি প্রকারে তাহার উন্নতি হইতে পারে; রোগীর চিকিৎসার কি উপায় আছে; নিঃস্ব রোগীর বিনাব্যয়ে চিকিৎসার কি উপায় আছে; গোচারণের কি ব্যবস্থা আছে; গ্রামের বালকবালিকাদের ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের খেলা ও আমোদের কি উপায় আছে; গ্রামে পাঠাগার আছে কি না; কথকতা হয় কি না; নানা বিষয়ে জ্ঞান দিবার জন্য গ্রামে ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা হয় কি না; প্রাপ্তবয়স্কা অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত আছে কি না; প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর পুরুষদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নৈশবিদ্যালয়াদি আছে কি না; চাষের উন্নতির জন্য ভাল ভাল বীজ জোগাইবার ব্যবস্থা আছে কি না; যৌথ ঋণদান-সমিতি গ্রামে আছে কি না;—ছাত্রেরা এইরূপ নানা বিষয়ের ঠিক্ খবর নিজে দেখিয়া শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন, এবং নিজেদের সাধ্যমত গ্রামের কোন কোন অভাব মোচনের চেষ্টাও করিতে পারেন।

আমাদের দেশের বিস্তর সম্পন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক আলস্যে কাল কাটান। মধ্যবিত্ত পরিবারেও ইহা দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই, যে, গরীবেরাও অলস জীবন যাপন করেন। সময় ও কার্য্যশক্তি ভগবানের অমূল্য দান, উহা আমাদের নিজের নহে। উহার সদ্ব্যবহার করা ধনী নির্ধন সকলেরই উচিত। আলস্য কেবল যে অনুচিত তাহা নহে, উহা হইতে নানা কুঅভ্যাস ও পাপেরও উৎপত্তি হয়। গরীবদের ত মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই শ্রম করা দরকার। তাঁহারা যদি নিজ নিজ গ্রামে থাকিয়া রোজ দুই-চারি পয়সাও রোজগার করিতে পারেন, তাহাও লাভ। সামান্য ২।৪ দিনের চেষ্টায় ও অল্প মূলধনে রোজগারের এবং সময় ও শক্তির অপচয় নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় চরখার প্রচলন। ছাত্রেরা দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিতে চরখা ও হাতের তাঁত প্রচলিত করিবার এবং নেতাদের সহযোগে তদুৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে সুফল হইতে পারে।

চরখার দেশময় প্রবর্ত্তনের জন্য বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

বসু বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা

কলিকাতায় যাঁদের বাড়ীতে তেতলা চারি তলায় জলের কল আছে, তাঁরা জানেন, যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মোটা মোটা বেতনের এঞ্জিনীয়ার এবং বহু লক্ষ টাকার য

থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় উপরতলায় জল পাওয়া যায় না। কিন্তু উচ্চতম গাছের উচ্চতম ডালের শেষ পাতাটির ডগা পর্য্যন্ত মাটি হইতে জল উঠে এবং তাহাকে সরস রাখে। কোন কোন গাছ তিনশত হাতেরও বেশী উঁচু হয়। কিন্তু কলিকাতার পাঁচতলা বাড়ীগুলাও ৫০ হাতের বেশী উঁচু নয়। তিন শ হাত উঁচু গাছের উচ্চতম ক্ষুদ্রপাতাটিতেও জল তুলিয়া রস যোগাইবার জন্য লোকালয়ে বা অরণ্যে কোন এঞ্জিনীয়ার নাই, ওয়াটার-ওয়ার্কস্‌ও নাই। আছেন স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা। কিন্তু তিনি কি কৌশলে জল তোলেন, শত বৎসরেরও অধিক কালের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিকেরা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরে স্ব-উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে রহস্যটি উদ্ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া শীঘ্র কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হইবে।

তুরপুন্ বা বর্ম্মা দ্বারা কিম্বা বড় পেরেক ম্যারিয়া যদি খেজুর গাছে ছিদ্র করা যায়, তাহা হইতে রস বাহির হয় না। যদি গাছটাকে করাৎ বা কুঠার দিয়া কাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেও রস পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গাছটির মাথার কাছে ত্বক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁছিয়া চাঁছিয়া পুনঃ পুনঃ কাটিলে রস বাহির হয়। বাছুর যেমন গাভীর স্তনে ঢুঁ মারিয়া দুধ বাহির করে, ইহা যেন কতকটা সেইরূপ। তাল গাছের ফুলের গোছার বোঁটায় পুনঃ পুনঃ ঘা মারিলে তবে রস বাহির হয়। ইহার সহিতও বাছুরের ঢুঁ মারার সাদৃশ্য আছে। আচার্য্য বসু তাঁহার সিজ্‌বেড়িয়া-স্থিত পরীক্ষা-উদ্যানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা খেজুর ও তালের রস নির্গমন সম্বন্ধে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি।

গত ২৯শে ফাল্গুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একটি বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নিম্ন-মুদ্রিত প্রস্তাব দুটি বিবেচিত হইবার কথা ছিল।

(1) "That the Senate consider it 'deplorable' that the Hon. the Minister, Department of Education, Government of Bengal, should have adopted the tone he did in his speech delivered before the Legislative Council on March 1, while discussing the educational policy hitherto adopted by the University."

(2) "That the Senate herewith records its opinion that under the Act, this body is the sole authority for outlining the educational policy of the University; although it is the duty of the Senate to submit audited accounts of the money made over to the University by donors, for the purpose of carrying into effect the above policy."

এই দুটি প্রস্তাব বিবেচিত হইবার পরিবর্ত্তে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের নিম্নলিখিত দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(1) "That a Committee of seven members be appointed to draw up a statement on the points arising in connection with the speech r[e] the resolution proposed by Dr. B. C. Ray."

(2) "That such statement be submitt[ed] Senate within one month from this date a[nd] consideration of Dr. Ray's motion be pending the receipt of such statement."

ডাক্তার সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী কমি[টি] নাম—সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), [আশু]তোষ চৌধুরী, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সা[র] রায়, ডাক্তার হাউয়েল্‌স্, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নীলরতন সরকার।

ডাক্তার নীলরতন সরকারের প্রস্তাব দুটি ভা[ল] কমিটির সভ্যনির্ব্বাচনে সেনেট সুবিবেচনার পরিচ[য়] বোধ হইতেছে না। কারণ, শিক্ষাসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া[ছেন] সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সার্ সরকার উভয়েরই ভাইস্-চ্যান্সেলরত্বকালে ঘটিয়া[ছে] শিক্ষিতসাধারণের ধারণা; সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও [প্রি] হেরম্বচন্দ্র মৈত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী এবং ডাক্তার হাউয়েল্‌স্‌কে চয়নিকার জন্য বিস্তর টাকা বিশ্ববিদ্যালয় দি[য়াছেন]। উক্ত পাঁচজন সভ্যের সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, যাঁহাদে[র] সেরূপ কোন কথা বলা যায় না, এরূপ লো[ক] নির্ব্বাচিত হইলে ভাল হইত।

ছাত্রহিতসাধক কমিটি

কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার বর্ত্তমান মার্চ্চ দেখিলাম—

"the Calcutta University under the Vice-ch[ancellor]ship of our distinguished physician Sir [...] Sircar, undertook the responsible duty of ex[amining] the 40,000 students reading under the Univer[sity] of finding out ways and means to improve t[he] of our young men. The Student's Welfare Co[mmittee] began its actual work from 28th March, 1[9..] since then with very limited resources in b[...] and money, have examined more than 3800 st[udents]

ছাত্রদের কল্যাণের জন্য তাহাদের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করাইয়া সার্ নীলরতন ও বিশ্ববিদ্যাল[য়] প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন সুসম্পন্ন হইতে থাকিলে ও অসুস্থ ছাত্রদের প্রতিকার হইলে, এই ব্যবস্থা ডাক্তার সরকার ও ব[র্ত্তমান] বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কীর্ত্তি হইবে।

প্রবাসীর ষাণ্মাসিক সূচী

গত কার্ত্তিক হইতে বর্ত্তমান চৈত্র পর্য্যন্ত ছ[য় মাসের] প্রবাসীর সূচী আগামী বৈশাখ সংখ্যার সহিত [দেওয়া] হইবে। যাঁহারা এখন গ্রাহক আছেন কিন্তু বৈশা[খে গ্রাহক] থাকিবেন না, তাঁহারা বৈশাখ মাসে দু পয়সা[র টিকিট] পাঠাইলে উহা বিনা মূল্যে পাইবেন।